দীনবন্ধু এণ্ডরুজ—শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১২৯
দীনবন্ধু, হে এণ্ডরুজ (কবিতা)—বনফুল ৩৩৪
দুটি কবিতা (কবিতা)—সীমা বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৭৪
দুটি দেশ : একটি ভাষা—শংকর ২৩৭
দুঃসময়ে মুখোমুখি (কবিতা)—শ্রীশামসুর রাহমান ... ১০৮৩
দূরবীন (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৭৮
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত ১৬, ১২০, ২২৩, ৩২৮, ৪২৮, ৫৩৯, ৬৪৪, ৭৫৬, ৮৬৮, ৯৭২, ১০৭৬, ১১৯২, ১৩০৮
দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকী—শ্রীকালী বিশ্বাস ৩৫৯
দ্বিতীয় সংগীত সংহতি সম্মেলন—নন্দনবিহারী ... ২৮৭

— ন —

নজরুলের গানের পাণ্ডুলিপি— ১৩১২
নতুন লোকসভা— ৭৫৩
নরেনদা—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩১৫
নিজের রক্তকে আমি (কবিতা)—শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ ... ৪৩৪
নিদ্রাজাগরণের মাঝখানে (কবিতা)—শ্রীআনন্দ বাগচী ... ৪৩৪
নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব— ২২১
নির্বাচন শেষে— ৬৪১
নেপথ্য নায়ক (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী ... ১৪
ন্যায়দণ্ড (কবিতা)—শ্রীদেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩১৪

— প —

পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯, ১২৩, ২২৭, ৩৩২, ৪৩১, ৫৪৩, ৬৪৭, ৭৫৩, ৮৭১, ৯৭৫, ১১১৫
পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা— ১৬৯
পত্রস্মৃতি—শ্রীপরিমল গোস্বামী ১৬৩
পরীক্ষা-সমস্যা— ১১৮৯
পরীক্ষার হলে নৈরাজ্য ও তৎসংলগ্ন কথা—
শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় ... ১৩৩৩
পশ্চিমবঙ্গে সৈন্যবাহিনী— ১১৭
পশ্চিমের বারান্দা পথের জার্নাল—জহুরি সদাগর ... ১১২৯
পুত্রহারা (কবিতা)—শ্রীজসীম উদ্দীন ১০৮১
পুনরায় কিছু একটা হোক (কবিতা)—শ্রীতৃপ্তি ভট্টাচার্য ১১১৮
পুস্তক পরিচয়— ৯১, ১১৪, ২২৯, ৪০৩, ৫০১, ৬১৫, ৮৩৮, ৯৪৩, ১০৪৫, ১১৬৫, ১২৭৩, ১৩৮১
প্রণম্য নেতার মর্মান্তিক জীবনাবসান— ৩৩১
প্রলয় : সাংবাদিকতা ও সাহিত্য—শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত ৪৭৩
প্রহরী—শ্রীঅভ্র রায় ১২০১

— ব —

বাঙালী ও বাংলা দেশ— ১০৭৩
'বাংলা দেশ'—স্বাধীনতা সংগ্রাম— ৮৩৫
বাংলা দেশের কবিতা—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... ১০৮১
বাংলা দেশের বিজ্ঞানচিন্তা—শ্রীসমরজিৎ কর ... ১১০৫
বিচিত্র রোজল—শ্রীমতী আরতি দত্ত ১০২৭
বিদেশী বই— ৮৯, ৫০৭, ৬১৩, ৯৪১, ১৩৭৯
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর ৪৯, ১৫৩, ২৪৫, ৩৭৩, ৪৬৫, ৫৮৩, ৬৮৩, ৭৮৯, ৯০৩, ১০০৫, ১২০১, ১৩৪১
বুকের মধ্যে সিংহাসন (কবিতা)—শ্রীদেবী রায় ... ৭৬১
বুর্জোয়া—শ্রীবিমল মিত্র ৬৪৯
বৃদ্ধদের বিষাদ মনোবিকার—শ্রীঅসীম বর্ধন ... ৯১২
বৈদেশিকী—দেবরাজ ১৮, ১২২, ২২৫, ৩৩০, ৪৩০, ৫৪১, ৬৪৬, ৭৫৮, ৮৭০, ৯৭৪, ১০৭৮, ১১৯৪, ১৩১০
ব্যঙ্গচিত্র— ১১৮, ৩২৬, ৪২৬, ৬৪২, ৭৫৪, ৮৬৬, ৯৭০, ১০৭৪, ১১৯০, ১৩০৬

— ভ —

ভয় (কবিতা)—শ্রীসামসুল হক ১২৬
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত ৪৯, ১৫৭, ২৫৯, ৩৮৯, ৪৫১, ৫৬৯, ৬৯৫, ৮০৫, ৮৯৬, ১০৪১, ১১৫৪, ১১৯৯, ১৩৩৪
ভালবাসার মুখ—শ্রীনগেন্দ্র দাশ ১১৫৭
ভিক্ষার ঝুলি গভীর (কবিতা)—শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায় ... ১১১৮
ভূতুড়ে ক্রিকেট—শ্রীবিশ্বজিৎ রায় ৬৫
ভোটার সাবিত্রীবালা—বনফুল ১২৭

— ম —

ময়না—শ্রীসুশীল রায় ২২৯
মহামতি এণ্ডরুজ (কবিতা)—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী ... ৩৩৩
মহারাজাকে নিবেদন (কবিতা)—শ্রীআবদুস সামাদ ... ২৭
মা তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল (কবিতা)—
শ্রীসামসুল হক ১০৮৪
মানুষের নামে (কবিতা)—শ্রীস্বপ্নেন্দু ভৌমিক ... ২৭
মানুষের সঙ্গে আর (কবিতা)—শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায় ... ১৩১৪
মানুষের মুখ—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত ৮৭৫
মুক্তির সংগ্রামে বাংলা দেশ—কলহন ১১১৯, ১২৫১, ১৩৩৯
মুনিয়ার চারদিক—শ্রীশীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ... ২৯

— য —

যে কোন আঁধারে (কবিতা)—শ্রীআনন্দ বাগচী ... ১৪

— র —

রক্তমাখা সিঁড়ি (কবিতা)—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ... ৫৪১
রঙ্গজগৎ— ৯৭, ১৯৯, ৩০৭, ৪১১, ৫১৭, ৬২১, ৭১৩, ৮৪৫, ৯৪৯, ১০৫৩, ১১৭১, ১২৭৯, ১৩৮৭
রত্ন ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ৪৩, ১৪৭, ২৫১, ৩৬৭, ৪৩৩, ৫৭১, ৬৬৯, ৭৬১, ৮৯৭, ১০১৭, ১১৩৭, ১২২৩, ১৩২৯
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র—ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ ৫৯, ১৫১
রানু চলে গেছে (কবিতা)—শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ... ১৩১৪
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য— ১৫, ১১৯, ২২২, ৩২৭, ৪২৭, ৫৩৮, ৬৪৩, ৭৫৫, ৮৬৭, ৯৭১, ১০৭৫, ১১৯১, ১৩০৭
রোগ—শ্রীসমীর রক্ষিত ৪০৫
রোশনারা (কবিতা)—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৮৪

— শ —

শাশ্বতকালীন (কবিতা)—শ্রীবিনয় মজুমদার ... ৭৬১
শিল্পপ্রাসঙ্গিক সমস্যা ও চারুকলা মেলা—শ্রীরবীন মণ্ডল ৮১৯

— স —

সাপ্তাহিক সংবাদ— ১০৪, ২০৮, ৩১২, ৪১৬, ৫২৪, ৬২৮, ৮৫২, ৯৩৬, ১০৫০, ১১৮০, ১২৮৮, ১৩৯৪
সামনে চড়াই তবু মেয়েরা পিছিয়ে নেই—শ্রীসুধীর ঘোষ ১৮৫
সাহিত্য-সংবাদ—সনাতন পাঠক ৮৮, ১৯৩, ২৯৭, ৪০১, ৫০৫, ৬১১, ৮৩৭, ৯৪০, ১১৬৩, ১৩৭৮
সিঁড়ির নীচে (কবিতা)—শ্রীসুভাষ ঘোষাল ১১১৮
স্বাধীন বাংলা দেশ—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ... ১১০৯
স্মৃতি সমীপেষু (কবিতা)—শ্রীঅর্ণব বসু ৮৭৪

— হ —

হকি খেলার আইন-কানুন—মুকুল ৪০৯, ৫১৫, ৬১১, ৭৪০, ৮৩৯, ৯৪৭, ১০৫১, ১০৭০, ১২৭৭, ১৩৮৫
হিম জড়ানো দীর্ঘ সেতু (কবিতা)—শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায় ৮৭৪

শুনেই তো আমি
লাফিয়ে উঠলাম
RILAXON
কুশনে
খরচা এত কম!
এত স্বলভে এমন দুর্লভ আরাম, সত্যি, ভাবা যায় না।
বিলেতে এখন রেওয়াজ হচ্ছে রবারকৃত গদির কুশন। যেমন কিনা রিল্যাক্সন। কেন জানেন? রিল্যাক্সন বরাবর তোফা আরাম দেয়। অন্যগুলোর মতন মাঝখানটা বসে যায় না। রিল্যাক্সন ইচ্ছে মতন উল্টে নেওয়া যায়। আজকের দিনে টেঁকার দিক থেকে এ কুশনের জুড়ি নেই। রিল্যাক্সন তুলতুলে নরম এবং সব ঋতুতেই সুখকর। তার কারণ? এর অসংখ্য ছিদ্রপথ দিয়ে বারোমাস হাওয়া খেলে। রিল্যাক্সন আপনি পাবেন আপনার দরকারমত যে কোনো গড়নের, যে কোন মাপের। রিল্যাক্সন পোকামাকড় আর আরশোলার অভেদ্য। স্বাস্থ্য বিধিসম্মত এবং ধোয়ামোছার যোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা, রিল্যাক্সন আপনি পাচ্ছেন কত কমে। ভাবলেও আরাম। নয় কি?
রিল্যাক্সন বলতে:
গদি, বালিশ, কুশন, তাকিয়া, মোটর গাড়ি-বাস-রেলের সীট আর ব্যাকরেস্ট, কার্পেটের তলায় পাতবার জিনিস, এয়ার ফিল্টার, প্যাকিং-এর উপাদান এবং আরও অনেক কিছু।
হেস্টিংস মিল লিমিটেড
কয়ার এণ্ড ফেল্ট ডিভিশন
১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
সেক্রেটারী:
ঠাকুর ব্রাদার্স লিমিটেড।
RILAXON কুশন
সবচেয়ে আরাম —সবচেয়ে কম দাম

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দুনিয়ার চারদিক	শ্রী[illegible] মুখোপাধ্যায়	২৯
উজ্জ্বল উদ্ধার	শ্রীমতী প্রতিভা বসু	৩৭
ভারতের অর্থনীতি	শ্রীসুব্রত গুপ্ত	৪১
রক্ত ও শ্রীমতী	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৪৩
বিশ্ববিজ্ঞান	শ্রীসমরজিৎ কর	৪৯
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা	ফাদার দ্যতিয়েন	৫৫
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ	৫৯
চিত্র প্রদর্শনী	চিত্রপ্রিয়	৬৩
ভুতুড়ে ক্রিকেট	শ্রী[illegible]	৬৫
ইংরেজী গীতাঞ্জলি ও ডবলু বি য়েটস	শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র	৭১
ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	৭৭
ঘরে বাইরে	শ্রীমতী	৮৩

(সি ২৩২২)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		৮৫
সাহিত্য সংবাদ—শ্রীসনাতন পাঠক		৮৮
বিদেশী বই—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত		৮৯
পুস্তক পরিচয়—		৯১
খেলার মাঠে—একলব্য		৯৩
টেবল টেনিসের আইন কানুন—মুকুল		৯৫
রঙ্গজগৎ—		৯৭
অরণ্যদেব—		১০০
সাপ্তাহিক সংবাদ—		১০৪

প্রচ্ছদ : শ্রীকামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবোধ শিশু

আপনি তো জানেন,
সর্দি বসে গেলে
বাড়াবাড়ি হতে পারে।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্ছার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি - কিছু আর বাকি থাকবে না - অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় - যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,- যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে। খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি বা, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,
— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)

বাইরে থেকে গায়ে

২)

ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।
সবচেয়ে সুফল যদি তাড়াতাড়ি পেতে চান তো ভিক্স ভেপোরাব যথেষ্ট পরিমাণে লাগান—১৯ গ্রামের পুরো এক শিশি, -বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৮ বার আর বড়দের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ বার লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব — নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮
শনিবার ২৩ মাঘ ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

মুদ্রণ, কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আজ আমাদের এক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই অবস্থায় পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হলে দাম বাড়ান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাই ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার মূল্য প্রতি কপি দশ পয়সা করে বৃদ্ধি করা হল। অতএব এই সপ্তাহ থেকে আমাদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার দাম হল প্রতি কপি ৬০ পয়সা। এজেণ্টদের কমিশনের হার পূর্বের মত থাকবে। গ্রাহকদের অবগতির জন্য যথা সময়ে বার্ষিক, ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক চাঁদার হার প্রকাশিত হবে।

দাম ৬০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

DESH

Saturday, 6 Feb., 1971

কলকাতা উন্নয়ন

কলকাতাকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই একটা টানাপোড়েন চলছে। আমরা যারা কলকাতাবাসী, অথবা যারা পশ্চিমবঙ্গবাসী, কলকাতাকে যে মূল্য দিয়ে থাকি, অন্যে তা দিতে নারাজ। জব চার্নকের এই শহরটির জন্যে আমাদের মায়া-মমতার যে কারণ অন্যে তা যদি না বুঝতে চান করার কিছু নেই, ধরে নিতে হবে বাঙালীর নবা-সংস্কৃতির এই প্রাণকেন্দ্রকে হয় তাঁরা ঈর্ষা করেন, নতুবা ভয় করেন। তা অন্যে যাই করুন, কলকাতার বর্তমান সমস্যাকে চাপা দিয়ে দিয়ে আর ঠেকানো সম্ভব হল না। সম্ভব হল না বলেই, আপাতত দেখা যাচ্ছে, এই দুর্দিনে কলকাতা উন্নয়নের কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, কলকাতার মতন বিরাট শহর এবং তার উপকণ্ঠ এলাকায় উন্নয়ন খুব সামান্য কথা নয়, সমস্যাও অল্প নয়, কাজেই আমরা আশা করতে পারি না, কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চমকপ্রদ কিছু দেখতে পাব। তবু এতকাল পরে, বেচারী কলকাতার ভাগ্যে যা ছিটেফোঁটা জুটতে শুরু করেছে তার জন্যেই খানিকটা সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

কলকাতা উন্নয়নের প্রাথমিক কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে কেষ্টপুর-ভাঙ্গড় কাটা খালের কাজ, টালির নালার কাজ, বানতলা ট্যাংকের সংস্কার। এই তিনটি কাজই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। কেষ্টপুর-ভাঙ্গড় খালের কাজের দুটো দিক আছে, তার মধ্যে একটা হল, জলনিকাশের সুব্যবস্থা। কলকাতার জল নিকাশী ব্যবস্থার এতে সুবিধে হবে। টালির নালাও দ্বিবিধ প্রয়োজন মেটাবে, তার অন্যতম হল জলনিকাশী ব্যবস্থা। বানতলা ট্যাংকের পুনর্সংস্কার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; আশা করা যাচ্ছে এই ট্যাংকের সঙ্গে যুক্ত একুশ মাইল দীর্ঘ—বানতলা-কুলটি পাকা 'ড্রাই ওয়াটার ফ্লো' খালের কাজ শেষ হয়ে গেলে রীতিমত একটা বড় কাজ শেষ হবে।

জল নিকাশী ব্যবস্থার অন্যান্য কাজও সি এম ডি এ হাতে নিয়েছেন, পরেও নেবেন। কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠ এলাকায় জল নিকাশী ব্যবস্থার অগ্রাধিকার প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কলকাতা শহরের জন্যে হাতে নেওয়া হয়েছে তা বস্তি উন্নয়ন। কলকাতা শহরে বস্তিগুলির অবস্থা অবর্ণনীয়, মনুষ্যবাসের অযোগ্য। যাই হোক, কলকাতার কয়েকটা বড় বড় এলাকায় বস্তি উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে—তার মধ্যে রয়েছে বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, কাশীপুর প্রভৃতি এলাকার মতন ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল।

এই শহর এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলির জন্যে আরও একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হল পানীয় জলের ব্যবস্থা। আমাদের পানীয় জলের অভাবের জন্যে নানা ধরনের রোগ লেগেই থাকে, বিশেষ করে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দেয়। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্যে পরিকল্পনার কথা শুনেছি।

এর পর রয়েছে রাস্তাঘাট ও যানবাহনের উন্নতির কথা। কলকাতার সামান্য কয়েকটি অঞ্চলে রাস্তাঘাটের ওপর নজর পড়েছে। কিন্তু সে খুবই নগণ্য। কলকাতার প্রধান কয়েকটি রাস্তা একেবারে অব্যবহার্য হয়ে গেছে—যেমন বিধান সরণী। অনতিবিলম্বে এর পূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। কয়েকটি রাস্তার মোড় ভিড়ের সময় অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, মানুষজন রাস্তা পেরোতে পারে না। এই ধরনের মোড়গুলিতে মানুষের হাঁটা-চলার এবং যান-বাহনের চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শোনা যাচ্ছে, ফ্লাই ওভারের একটা পরিকল্পনা রয়েছে।

সাধারণের যাতায়াতের সুবিধের জন্যে কিছু সরকারী বাস বাড়াব কথা, ট্রামেরও। সরকারী বাস, এখন যা রাস্তায় বেরোয় তার সংখ্যা সামান্য। নতুন বাস, মেরামতী বাস অবিলম্বে পথে নামা দরকার। ট্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ট্রাম লাইন সংস্কারের জন্যে আর বসে থাকা চলে না।

আমাদের ভূগর্ভ রেলের পরিণতি কোথায় তা আমরা জানি না। তবে সম্প্রতি যে সমীক্ষা রুশ-বিশেষজ্ঞরা করে গেছেন এবং নন্দজী যে-ধরনের আশ্বাস দিচ্ছেন তাতে মনে হয়, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে।

কলকাতা উন্নয়নের জন্যে আমরা কোনো একটি মাত্র সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাই না। এ দায়িত্ব সকল সংস্থার। সকলেই যদি সহযোগিতা করেন, কলকাতার মুখ চেয়ে কাজে নামেন—তবে দু'চার বছরের মধ্যে কিছু উন্নতি নিশ্চয় আমরা দেখতে পাব।

নেপথ্য নায়ক

গোবিন্দ চক্রবর্তী

জল [illegible]। [illegible] বিস্ময়।

[illegible] বেশ।
অলক, অনন্ত অমলেশ
উত্তরসূরীরা ছুটে বুঝি মন্দ নাগালও ধর নি।
প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন
দেখতে পাচ্ছি—প্রতিদিন
তৈরি করছে [illegible] নন্দন-সরণি।

আমি [illegible] আমি, মনে কর—
হেলে পড়া পিসা-র টাওয়ার
মরুপথে [illegible] আলেকজান্দার,
অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছে কিংবা যেন টলছি এন্টনী,
[illegible] কি [illegible]
অছাড়া, [illegible] যোগফল,
অবশ্যই [illegible]।

জল, [illegible], [illegible] [illegible]
নিসর্গ [illegible] না [illegible]।
সাইটিং [illegible] প্ল্যাটফর্মে [illegible]
কে অপেক্ষমাণ?
[illegible]
'দেখ [illegible]'—
এ রকম ভাবান্তর খুবই [illegible]

মেনে নিয়ে, বীতশোক সহিষ্ণু অশোক-
বৃক্ষের মতন তাই,
ছাড়পত্র করে যাই সহাস্যে মঞ্জুরে।

যাও মন্ত্রী, রাজদূত, ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা,
আরও কে কে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহার্ঘ বস্তুর!
যাও জল-তরঙ্গের শৌখীন সময়,
যাও, ওহে, যে যেখানে যাবে।
হে পুলিশ, কালের পুলিশ দেখ—
কার্য কারণে কাউকে, কোনো বাঁকে,
অপ্রস্তুত ঠেকতে না হয়।

একান্ত সংহত-বিস্তার
একান্তই, চক্ষুষ্মান বৃক্ষের স্বভাবে—
আমি ত' থাকবই সাক্ষী প্রতিটি বিম্বিত ঘটনার।
এবং সে প্রাপণীয় উপযোগিতার
যেহেতু রাজস্ব দিই নতজানু মহান সম্রাটে,
নিশ্চয়ই মেটাব পাওনা যথাযোগ্য, তাদেরও রাজার।

অম্লান প্রতীকে নম্র ললিত আঙিনায়
সর্তহীন সরবরাহে স্বভাবত পাবে
বৃক্ষেরই মৌলিক উপহার।
বৃক্ষেরই আসল ব্যবহার।
বৃক্ষই নেপথ্য রূপকার।

যে কোনো আঁধারে

আনন্দ বাগচী

গঙ্গায় জোয়ার এলে চাপা কলে অস্পষ্ট গোঙানি
পূর্ণিমার জোৎস্না করে মাঝরাতে [illegible] পড়ল
এখন বাঘের থাবা, [illegible], [illegible], সহজেই পিছুহানি;
এখন বৃষ্টিতে কই ভেজা যায় না, এ শরীরে শিশির অচল
দেহ আর বশে নেই জোরে হাসতে গেলে বুকে লাগে
চমকানো দাঁতের গোড়া, নিত্য মাথা খাচ্ছে পাকা চুল
কাছের মানুষ ঝাপসা, স্মৃতি মাঝে মাঝে করছে ভুল
কেবলই বাজীতে হারছি ভাবি বলছি খোয়াই পাল্লাকে
নিসর্গ নারীর রূপ গোলমাল ঘটায় হজমে
প্রেমিক [illegible] [illegible] [illegible] বেশ জমে।

•

যে [illegible] অসাবধানে
নষ্ট মেয়েমানুষের মত [illegible] অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে॥

এদিকে অনেক নীচে

বাসুদেব দেব

তুমি সেই পাহাড়ের দিকে জানলা খুলে শুয়ে আছো
খোঁপা থেকে ফুল ঝরে গেছে
পায়ের কাছে মিনতির মত কম্বল
মণিপদ্মে অশ্রু

এদিকে অনেক নিচে অকালবৃষ্টি
এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ঘামে ধোঁয়ায় মলিন সন্ধ্যা
ট্রাফিক জ্যাম
ছুটির দরখাস্ত জমা দিয়েছি

ততোদিন ফটোস্ট্যান্ড ভরে থাকো বকুল
ততোদিন ছবির মধ্য দিয়ে
দুঃখের মধ্য দিয়ে
আমার পুজো।

নির্বাচন কমিশনার পূজনীয়েষু

আপনাকে আমরা, নব কংগ্রেসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো আপনাকে [illegible] জন্য এমন সুন্দর একটা প্রতীক বেছে দেওয়ার জন্য তা ভেবেই পাচ্ছি নে। আপনাকে না আদর করে মামাবাবু বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে। ডাকব? রাগ করবেন না।

আপনি আইন বাঁচিয়ে আপনার সূক্ষ্ম প্রতিভা প্রয়োগ করে যতটা পার যায়, [illegible] নব কংগ্রেসের জন্য তা করছেন না, [illegible] আজকালকার [illegible] না। [illegible] জানেন যে, আমাদের নব কংগ্রেস [illegible] পার্টি। [illegible] সেই কথা [illegible] আপনাকে মামাবাবু বলে ডাকতে চাইছি। [illegible] পারি [illegible] ইলেকশন [illegible] পেটেনট করা [illegible] মামাবাবু [illegible] কথা [illegible] একবার জন্য [illegible] বেঁচে-বর্তে [illegible] কাজে অভ্য [illegible] সুযোগ আমাদের দুয়ারে পৌঁছে যাবে।

আমরা নব কংগ্রেসের ভাগ্যভাগীরা কৃতজ্ঞ এই মামাবাবু, এটুকু জানিয়ে রাখছি। আমাদের জন্য নির্বাচনী প্রতীক বাছাই ব্যাপারে আপনি যে তৎপরতা এবং [illegible] দেখিয়েছেন যে নমুনা দেখিয়েছেন, তা আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। সংখ্যাসংশ্লিষ্ট লোকেরা যাই বলুক, মামাবাবু, প্লিজ, আপনি কারও কথায় কান দেবেন না। অবিশ্যি আপনি সে পাত্রই নন। কান টানলে আপনার মাথা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, তা আপনার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। আপনি নিন্দুকদের কথায় কান দেবেন না। আপনি বরাবর এইরকম নিরপেক্ষ থাকুন।

হ্যাঁ, নির্বাচনী প্রতীকের ব্যাপারে যা বলছিলাম। জোড়া বলদের কথাই ধরুন। আপনার নিরপেক্ষ বিচার রাজা সলোমনকেও লজ্জায় মুখ লুকোতে বাধ্য করেছে। রাজা সলোমন একটি শিশুকে দু টুকরো করে দুই ভাগীদার মায়ের মধ্যে বেঁটে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনার বিচার আরও সূক্ষ্ম! আপনি জোড়া বলদকে আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস এই দুই দাবিদারের [illegible] কংগ্রেসের জোয়ালেই আটকে দিলেন। কেননা নব কংগ্রেসের অধিষ্ঠাত্রী প্রধানমন্ত্রী দেবী মাতৃজাতিরই প্রতিনিধি। [illegible] প্রাণ শরীরে।

জানেন মামাবাবু, আমরা না, আপনার রায় বের হবার আগেই লক্ষ লক্ষ পোস্টার ছাপিয়ে রেখেছিলাম, কেননা আমাদের মন বলছিল সূক্ষ্ম বিচারের রায় আমাদের [illegible] আসবে [illegible]। তাই আপনার

[illegible] সঙ্গে সঙ্গেই আমরা [illegible] শীঘ্র হইহই করে জোড়া বলদ নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে পেরেছিলাম। কিন্তু কপাল মন্দ। নির্বাচনী মাঠে একটা চষ দিতে না-দিতেই বাদ সাধলেন সুপ্রিম কোর্ট। জোড়া বলদে ইনজাংশন।

তারপর আবার আমরা আপনার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখি মামাবাবু এবার কী করেন। আমাদের তো মোটা বুদ্ধি। ভেবেছিলাম, আমরা তো প্রোগ্রেসিভ, বোধ হয় বাঁয়ের বলদটা আমাদের দেবেন আর ডাইনেরটা ওদের। তা হলে আমরা হতাম লেফটিস্ট বলদ আর ওরা হত রাইটিস্ট বলদ।

কিন্তু তার বদলে আপনি যা করলেন না মামাবাবু, একেবারে মাত [illegible]। দারুণ! দারুণ! এবার বলদের বদলে আমাদের দান করলেন একেবারে সবৎসা গাভী! মারহাবা! গাই গরু, আর বাছুর। এবং এ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের অন্তত কোনও সন্দেহ নেই যে, বাছুরটি এঁড়ে এবং বিলাত-ফেরত এঁড়ে।

মামাবাবু, আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে সত্যিই বলিহারি যাই। কি চমৎকারভাবেই না আপনি হিসেব মিলিয়ে ছেড়েছেন। গাভী আমাদের কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের প্রতীক এবং এঁড়ে অর্থাৎ বিলাত-ফেরত এঁড়ে আমাদের রাজ্য নেতৃত্বের প্রতীক। আবার দেখুন, বলদও গোরু এবং গাভীও গোরু। কিন্তু গাভীতে রস অধিক। আর কে না জানে গাভীরূপিণী প্রধানমন্ত্রী কামধেনুরই আরেক মূর্তি। তিনিই সুরভি। সদয় হলেই অনুগত জনের মনস্কামনা পূর্ণ হবে, হবেই। একেবারে সর্বসিদ্ধিলাভ।

আপনার অনুগ্রহে একসঙ্গে গাই বাছুর পেয়ে মামাবাবু, আমাদের বরং ভালই হল। এখন ভেবে দেখছি, না বুঝে জোড়া বলদের জন্য লম্ফঝম্ফ করে কিছুটা ভুলই করেছিলাম। এখন বুঝছি, সুপ্রিম কোরটের ইনজাংশন আমাদের পক্ষে শাপে বর হয়েই দাঁড়াল। যেমন লুকিয়ে আছে সকল শিশু সব পিতাদের অন্তরে, সেইরূপ ওই এঁড়ে বাছুরের অন্তরেই তো আগামী দিনের বলদ লুকিয়ে আছে। নয় কি মামাবাবু? কাজেই পুরো বলদ না পেলেও একটা পোটেনশিয়াল বলদ আমরা পেয়েই গিয়েছি। তা হলেই দেখুন, যেমন এক ঢিলে দুই পাখি, তেমনি আপনার এক রায়ে আমরা গাই বাছুর (এঁড়ে) তথা গাই ও পোটেনশিয়াল বলদ দুইই পেয়ে গেলাম। মাঝখান থেকে জোড়া বলদের ব্যাড ইমেজটাও খসে গেল।

আবার দেখুন, ভারতের মত গোরুগতপ্রাণ দেশে আমাদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের নতুন এক পথ খুলে গেল। গোমাতাকে উপেক্ষা বা অমান্য করবার মত বুকের পাটা এ-দেশে কটা লোকের হবে। একবার হাওয়া তুলে দিতে পারলেই হল যে, গাইবাছুরে ভোট না দিলে গোহত্যার পাতক হবে। ব্যস, মামাবাবু, দেখবেন জনসংঘীদের মুখে আর বাক্য সরবে না। হা হা, এবার বাছাধনেরা কেমন জব্দ। আমরা গ্রামে গ্রামে গোরুবাছুর নিয়ে যাব, ভোটদাতাদের ডাকব, গোরুর গায়ে ওদের হাত ঠেকিয়ে ভোট দেবার কড়ার করিয়ে নেব। গোরুবাছুরে ভোট না দিয়ে বাছাধনেরা যাবে কোথায়। হা হা। এইটেই হবে আমাদের সোশ্যালিসট রণকৌশলের প্রধান অস্ত্র। তবু মামাবাবু, আমাদের একটা অনুযোগ আছে। আমাদের যেমন গোরুবাছুর দিলেন তেমনি আদি কংগ্রেসকে না, গাছের ডালে ঘুঘুপাখি যদি দিতেন! উফ্! স্লোগানের কী সুবিধেই না হত! তা হলে আমরা দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে রাখতাম :

গোরুবাছুর দাঁড়িয়ে আছে।
ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে॥

বিদেশে (২)

প্লেন যখন রোম ছাড়ল তখন অপ্রশস্ত দিবালোক।

দিবালোকের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক আছে। যে-দেশে যাচ্ছি, সেই জর্মানির বড় দার্শনিক কাণ্ট নাকি বলেছেন কাল এবং স্থান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। (টাইম অ্যান্ড স্পেস আর আ প্রিয়রি কনসেপশন)।

কাজের বেলা কিন্তু দেখলুম, তত্ত্বটা আদৌ সরল সহজ নয়।

বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, যেন দেশের সকালবেলার সাতটা আটটা। কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়াতে দেখি, সেটি দেখাচ্ছে সাড়ে বারোটা। কি করে হয়? আমার ঘড়িটি তো পয়লা নম্বরী এবং অটোমেটিক। অবশ্য এ-কথা আমার অজানা নয়, অটোমেটিক বেশী সময় কোনো প্রকারের ঝাঁকুনি না খেলে মাঝে মধ্যে থেমে গিয়ে সময় চুরি করে। কিন্তু কাল রাত ভর যা এ-পাশ ও-পাশ করেছি তার ফলে ওর তো দম খাওয়া হয়ে গেছে দিনেক দুদিনের তরে। আমার পাশের সীটে একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। তার পরের সীটে এক বর্ষীয়সী—বাচ্চাটার ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। তাঁর দিকে ঝুঁকে শুধালুম, "মাদাম, বেজেছে কটা, প্লীজ?" মাদামের এলোমেলো চুল, সকালবেলার "ওয়াশ", মুখের চুনকাম, ঠোঁটের উপর ঊষার লালবাতি জ্বালান হয়নি। শুকনো মুখে যতখানি পারেন ম্লান হাসি হেসে বললেন, "পারদোঁ মঁসিয়ো, জ্য ন্য পার্ল পা লেঁদুস্তানি।" অর্থাৎ তিনি "হিন্দুস্থানী" বলতে পারেন না। ইয়াল্লা। সরলা ফরাসিনী ভেবেছেন, প্লেনটা যখন হিন্দুস্থানী, আমি হিন্দুস্থানে প্লেনে উঠেছি, চেহারাও তদ্বৎ।

অতএব আমি নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানীতে কথা বলেছি। আমি অবশ্য প্রশ্নটি শুধিয়েছিলুম আমার সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত প্রাইভেট নিজস্ব "বাঙাল" ইংরিজিতে। ওদিকে এ-তত্ত্বও আমার সবিশেষ বিদিত যে ফরাসীরা নটোরিয়াস, একভাষী—ফরাসী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিখতে চায় না। তাদের উহ্য বক্তব্য, তাবল্লোক যখন হন্দমুন্দ হয়ে ফ্রান্সে আসছে, বিশেষ করে কড়ির দেমাক, বন্দুক-কামানের দেমাক, চন্দ্রস্পর্শের দেমাকে ফাটো ফাটো মার্কিন জাত এস্তেক—ফরাসীর মত নাজুক জবান শেখবার বাৎ চেষ্টায় হয়রানি খাচ্ছে তখন ওদের আপন দেশে আপোসে তারা যে কিচিরমিচির করে সেগুলো শেখার জন্য খামখা উত্তম ফরাসী ওয়াইনে সুনির্মিত নেশাটি চটাবে কেন? তবু মহিলাটির উক্তি শুনে আমারো ঈষৎ তাজ্জব মানতে হল। দুন-দুনিয়ার ভারতীয় প্লেন সার্ভিস না থাকলে মহিলাটি কি কল্পনাও করতে পারতেন যে হিন্দুস্থানীও আন্তর্জাতিক ভাষা হতে চলেছে—মুসাফির যে-রকম অ্যার ফ্রান্সে ফরাসী, কে এল এমে ডাচ, বি ও এ সি-তে ইংরিজির জন্য তৈরী থাকে।

তখন পুনরপি আপন ঠেট অরিজিনাল ফরাসীতে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলুম। "আ—আ—! বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু এই সময়-সমস্যাটি ভারী "কঁপ্লিকে" অর্থাৎ কমপ্লিকেটেড জটিল। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনে।"

"তবু?"

"সব দেশ তো আর এক টাইম মেনে চলে না। "ভোয়ালা"—নয় কি? প্যারিসে যখন বেলা বারোটা তখন রেঙ্গুনে—আমি সেখানে বাস করি—বিকেল পাঁচটা ছটা। কিন্তু আপনাকে ফের বলছি, ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টাইম কত জেনে যাই আমার অতিশয় বিশ্বাসী মিনিস্টর, না সেক্রেতেরিয়রকে (যেমন সেক্রেটারি, অর্থাৎ ভিতরকার "ইন্টেরিয়রের" "এঁতেরিয়র"-কে) শুধিয়ে। সোজা কথায় পেটটিকে। ওখানে যখন লা-মার্সেইয়েজ সঙ্গীত (বাঙলায়, পেটে যখন হুলুধ্বনি) বেজে ওঠে তখন সেটা লাঞ্চের বা ডিনারের সময়। উপস্থিত আমার "এঁতেরিয়রেতে" সে-সঙ্গীত ক্রেসেন্ডতে (তার সপ্তকের পঞ্চমে)। তাই এখন রেঙ্গুনে নিশ্চয়ই দেড়টা দুটো।"

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "তা এখখুনি বোধ হয় লাঞ্চ দেবে।"

মাদাম যদিও বলেছিলেন তিনি টাইম নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু দেখলুম, তার প্রাকটিকাল দিকটা খাসা বোঝেন। আপত্তি জানিয়ে বললেন, "রেঙ্গুনে যখন লাঞ্চ তখন

এই মিত্রোপাতে (মিৎ=মিড্‌ল্‌;—রোপা. ইয়োরোপা-র শেবাংশ অর্থাৎ মধ্য-ইয়োরোপে) ব্রেকফাস্ট। জাপানে যারা এ-প্লেনে উঠেছে তাদের তো এখন ডিনারের সময় হয় হয়। সুতরাং কোন্ যাত্রী কোথায় উঠেছে, কার পেট কখন ব্রেকফাস্ট/লাঞ্চ/ডিনারের জন্য কান্নাকাটি শুরু করে সে-হিসেবে তো আর কোম্পানি ঘড়ি ঘড়ি কাউকে লাঞ্চ কাউকে কাউকে সাপার, কাউকে স্যানউইচসহ বিকেলের চা দিতে পারে না। তবে কি না এরা ব্রেকফাসটে যে পরিমাণ খেতে দেয় সেটা কলেবরে প্রায় লাঞ্চের সমান।...তাই বলছি, এসব টাইম-ফাইম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ট্রেনেও যদি ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িটার দিকে তাকান তবে সে জার্নি দীর্ঘতর মনে হয় না? আমি তো প্যারিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। 'খ' দিয়ো' (দয়ালু ঈশ্বর) ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর পৌঁছিয়ে দেবেন। নাতনীটা নেতিয়ে গিয়েছে।"

মহিলাটি যে-ভাবে সবিস্তার গুছিয়ে বললেন সেটা ধোপে টেঁকে কি না বলতে পারবো না, কারণ আমি যত বার এসেছি গিয়েছি, আহারাদি পেয়েছি তখন ঘড়ি মিলিয়ে দেখিনি কোন্‌টা লাঞ্চ কোন্‌টা কি? এবং আজকের দিনে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন টাইমের সালংকার সটীক ফিরিস্তি দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। রেডিয়ো, ট্রানজিসটারের কল্যাণে এখন বাড়ির খকুমণি পর্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেয়, বুঝিয়ে বলে গ্রীনিচ মীন টাইম, ব্রিটিশ সামার টাইম, সেণ্ট্রাল ইয়োরোপীয়ান টাইম, কোন্‌টা কি? তবু যে এতখানি লিখলুম, তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন টাইম যে কি ভাবে কসরৎ বিনা মেহনৎ আয়ত্ত করতে হয় সেটা ফরাসী মহিলাটি আমাকে শিখিয়ে দিলেন অতি প্র্যাকটিকাল পদ্ধতিতে। সেটা কি? রাজা সলমন যেটা গুরুগম্ভীর ভাবে, ধর্মনীতি হিসেবে আপ্তবাক্য রূপে হাজার তিনেক বছর পূর্বে প্রকাশ করে গিয়েছেন 'নো দাইসেলফ' 'নিজেকে চেনো (চিনতে শেখো)'। শ' বছর আগে লালন ফকীরও বলেছেন 'আপন চিনলে খুদা চেনা যায়।' ফরাসী মহিলাটিও সেই তত্ত্বটিই, অতিশয় সরল ভাষায় প্রকাশ করলেন 'আপন পেটটিকে বিশ্বাস করো। তার থেকেই লোকাল টাইম, স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সর্ব টাইম জানা হয়ে যাবে। ঐটেই মোক্ষমতম ক্রনোমিটার। বরঞ্চ ক্রনোমিটার মাঝে মধ্যে বিগড়োয়। আলবৎ, পেটও বিগড়োয়। কিন্তু বিগড়নো অবস্থাতেও সে লাঞ্চ ডিনারের সময়টায় নিগেটিভ খবর দিয়ে জানিয়ে দেয়, তার ক্ষিধে নেই।"

ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট না কি যেন এসে গেছে। মাদাম বলেছিলেন, "সেটা কলেবর"। আমি মনে মনে বললুম "বপু।" এ্যাব্বড়া বড়া ভাজা সসিজ, পর্বত প্রমাণ ম্যাশ্‌ট্ পটাটো, টোসট-মাখন, মার্মলেড, টম্যাটো ইত্যাদি কাঁচা জিনিস, আরো যেন কি কি। তখন দেখি, বেশ খাচ্ছি। অতএব পেটের ক্রনোমিটার বলছে, এটা লাঞ্চ, অর্থাৎ বেলা একটা দুটো। ঘড়ি মিথ্যেবাদী বলছে নটা!

যেন খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে। পায়ের বুড়ো আঙুলটা এমন টাটাচ্ছে, নখটা উল্টে গেল? উবু হয়ে সে দেখল। উল্টে যায়নি, তবে রক্ত বেরোচ্ছে, একটু চামড়া ছড়ে গেছে। কিন্তু এত ব্যথা লাগছিল, মনে হতে পারে আঙুলটা বুঝি কেটে চৌচির হয়ে গেছে! বাস থেকে নামতে গিয়ে এই বিপত্তি। নেমেছিল ঠিকই, বাসের কিছু দোষ নেই, পিছনে রিকশা সামনে ট্যাক্সি, তাড়াতাড়ি গা বাঁচাতে রাস্তা ছেড়ে পেভমেণ্টে উঠতে গিয়ে কিনারার শানের গায়ে হোঁচট খেয়ে, ভাগিস উল্টে পড়ে যায়নি, কিন্তু এমন লাগল আঙুলটায়। স্যাণ্ডেল পরে রাস্তায় চলার এই সুখ, যখন তখন আঙুলে চোট লাগতে পারে, যে কোনো জায়গায় খোঁচা-টোচা লেগে গোড়ালি জখম হতে পারে।

না রে দাদা, নিজের মনকে সে অবশ্য তৎক্ষণাৎ প্রবোধ দিল, পাম্পসু কি ডার্বি পরে হাঁটলেও, যখন বিপদ আসার ঠিকই আসে, কপালে দুর্ভোগ থাকলে জুতো খুলে রেখে ঘরের বিছানায় বসে থাকলেও তা এড়ান যায় না। বলে কিনা দুর্বিপাকের ধরাবাঁধা কোনো সড়ক নেই যে মহাশয়টি ঠিক ওদিক দিয়ে কি এদিক ধরে আসবে, আর তুমি বর্মটর্ম পরে তৈরী হয়ে থাকবে যাতে তোমার কেশাগ্রটিও কিছুতে স্পর্শ করতে না পারে। তবেই হয়েছিল আর কি। কে বলবে, সু পরা থাকলে নির্ঘাৎ হয়তো হুমড়ি খেয়ে সে পেভমেণ্টের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যেত, বরং পায়ে চটি ছিল বলে আঙুল ও গোড়ালির কিছুটা জোর ছিল, তার মানে খাড়া অবস্থায় ওরা কিছুটা কাজ করতে পারছিল, ডান পা-টা যখন পেভমেণ্টের উঁচু কার্নিশের গায়ে ঠোক্কর খেল তখন বাঁ পায়ের পাঁচটা আঙুল ও গোড়ালি দিয়ে শক্ত করে মাটি চেপে ধরে সে পড়তে পড়তেও সোজা হয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে তো রইল, পাম্পসু কি ডার্বি জুতোর বন্ধ খোলের ভিতর পা আটক থাকলে তা আর সম্ভব হত না। সে পড়ে যেত, আর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে হাঁ-হাঁ করে সব ছুটে আসত, দৃশ্যটা কল্পনা করে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। হয়তো জখম তেমন কিছু না, কিন্তু রাস্তার হাজারটা মানুষ গলা বাড়িয়ে দিয়ে এমন সব জেরা আরম্ভ করত, হয়তো ওই অবস্থায় মাটিতে পড়ে থেকেই তাকে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হত, উঁহু, কেবল উত্তর দিয়েই কাজ শেষ হত না, তারা তার কাছ থেকে সদুত্তর আশা করত। সদুত্তর, এলোমেলো কিছু বললে কেউ কানেই তুলত না। তার মানে একটা মানুষ ধপাস্ করে এমন প্রকাশ্য রাস্তার ওপর পড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বিচার আরম্ভ হয়ে যেত, তাকে টেনে তুলে সুস্থ করার আগেই তারা জেনে নিতে চাইত, নিজের দোষে ভদ্রলোক এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল না কি ওই রিকশাটা গায়ের ওপর এসে উঠতে চেয়েছিল, না কি ওই ট্যাক্সিটা বলুন বলুন মশাই, এখনো সময় আছে, ট্রাফিক জ্যাম হয়ে ওই তো মোড়ে লাল বাতি জ্বলছে, এখনো শালা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পালিয়ে যায়নি, এমন শিক্ষা বেটাকে দেব, আপনি দেখবেন, বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব, বেটার লাইসেন্স কেড়ে নেব, গাড়িটা জ্বালিয়ে দেব—বলুন, না কি ওই কলার খোসাটায় আপনার পা পড়েছিল, ফুটপাথের ওপর শুয়োরের বাচ্চা কলার দোকান সাজিয়ে বসেছে, ওই কলা খেয়েই তো কেউ খোসা ফেলে গেছে, একবার ঠিক করে বলুন মশাই, রাস্তার ওপর দোকান নিয়ে বসার কেমন সুখ এখনি টের পাইয়ে দিই বাছাধনকে—

ভাগিস সে পড়ে যায়নি হাজারটা মানুষ এখনি তাকে ছেঁকে ধরত। আঙুলের ব্যথা নিয়ে চেহারাটা সে একটু বিকৃত করল মাত্র, হুঁ, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে, কিন্তু খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না, মনে মনে ঈশ্বরকে সে ধন্যবাদ জানাল, তারপর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে এদিক ওদিক তাকাল, একটু ডেটল কি আইডিন লাগাতে পারলে ভাল হয়। ওদিকে একটা ডিসপেনসারী দেখা যাচ্ছে না? কলকাতা শহরে ডিসপেনসারী ক্লিনিকের অভাব! টিটেনাস ইনজেকশন নিতে হলে—না, সেই পয়সা আমার নেই। এমনি একটু ডেটল কি আইডিন দিতে,

হয় দিন, আঙুলটায় লাগিয়ে দিই। তারপর যা হবার হবে। তাই তো, সামান্য একটু রক্ত দেখে বা চামড়া ছড়ে যাওয়া দেখে যদি তার ধনুষ্টঙ্কারের ভাবনা ভাবতে হত, তবেই হয়েছিল আর কি। অবশ্য সামান্য থেকেই অনেক কিছু হয়। শুভেন্দুদের অফিসের এক ভদ্রলোকের স্ত্রী নাকি ব্লেড দিয়ে নখ কাটছিল, একটা নখের কোণায় ব্লেডটা সামান্য বসে গিয়েছিল, আলপিনের খোঁচার মতন একটু ব্যথা লেগেছিল, এমন তো রাতদিন কতই হয়। বঁটি দিয়ে আনাজ কুটতে বসে কত তো মেয়েদের আঙুলে কাটে, নখের কোণা ছড়ে যায়, কাজেই ভদ্রমহিলাও ব্লেডের কাটা নিয়ে তেমন কিছু মাথা ঘামায় নি, ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে আঙুলের মাথায় জড়িয়ে রেখেছিল। তা-ও একটু সময়। ঘরে আইডিন-ডেটল কিছু ছিল না বলে লাগাতে পারে নি ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল না বলে ঘরে চুন ছিল না, একটু চুন লাগিয়ে দিলেও কাজ হত, কিন্তু চুন আইডিন বা ডেটল থাকলেও যে মহিলা মনোযোগ করে সেটা লাগাত তারও কিছু ঠিক ছিল না, অর্থাৎ সামান্য কাটা বলে তেমন একটা গুরুত্বই দেয় নি। বিকেলের দিকেই আঙুলের মাথাটা বেশ ফুলে ওঠে, সন্ধ্যার দিকে গায়ে জ্বর এল, রাত্রে হাতের দারুণ যন্ত্রণা, তবু বাড়ির লোকের হুঁশ নেই, বাড়ির লোক বলতে শুভেন্দুর বন্ধু ভদ্রমহিলার স্বামী আর ভদ্রলোকের বুড়ি মা। বউ যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে শাশুড়ি নাকি সেই রাতদুপুরে পাশের বাড়ি থেকে একটু চুন যোগাড় করে এনে হলুদ বাটার সঙ্গে নরম করে বউ-এর আঙুলে লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে কতটা কাজ হয়েছিল বলা মুশকিল, শেষরাতের দিকে মহিলা অচৈতন্য হয়ে পড়ে, ভদ্রলোক অগত্যা তখন ডাক্তারের বাড়ি ছুটে যায়, ডাক্তার এসেই মহিলাকে হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু হাসপাতাল তো আর বাড়ির কাছে না। শুভেন্দুর বন্ধু বেলঘরিয়া থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় অফিসে এসে চাকরি করে—বেলঘরিয়া আর ধনুষ্টঙ্কার চিকিৎসার হাসপাতাল কোথায়, কাজেই যেহেতু ওই অবস্থায় মহিলাকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া ও ট্রেনে তোলা সম্ভব ছিল না, ওখান থেকে একটা লরি যোগাড় করে কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু ওই পর্যন্ত, লরিতে তোলার আগেই মহিলা মারা যায়।

নিজের আঙুলের অবস্থা দেখে কথাটা হুট করে তার মনে পড়ল। কিন্তু সে তো আর জখম আঙুলের অবহেলা করছে না, নিতান্তই যদি ওই সামনের মহামায়া ফার্মেসীর লোকেরা ডেটল-আইডিন দিতে না চায়—না দেওয়াটা অবশ্য কাজের কথা না, রাস্তার ওপর ওষুধের দোকান, বিনিপয়সায় কেউ

নধর টুসটুসে লেডিজ ফিঙ্গার এসে গেছে, কি কান্ড, ঐ তো ঝিঙে এসে গেল। কলকাতার মানুষকে বসন্তেই বর্ষার তরকারী খাওয়াতে চাষীদের কী অদম্য উৎসাহ।

রামানন্দ মনে মনে হাসল এই জন্য, ট্রাম বাসের ভিড়ের মধ্যে এই সবুজের মিছিল দেখে তার যেন কবিতাই মনে পড়ে গেল। যেমন কচি নেবুপাতার মতো নরম সবুজ ঘাস দেখে একদা এক কবির ইচ্ছা করছিল ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতন গেলাসে গেলাসে পান করতে, ঘাসের শরীর ছানতে, চোখে চোখ ঘষতে। শেষ পর্যন্ত কিনা ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাবার জন্য কবির আকুলতা। ঝাঁকা ভরতি কচি কাঁচা পটল ঝিঙে বেগুন কুমড়ো দেখে রামানন্দরও এখন ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে সেগুলি দু হাতে কচলায়, গন্ধ শোঁকে, কুলির মাথা থেকে এক একটা ঝাঁকা টেনে নামিয়ে খোঁতলে খানিকটা করে উচ্ছে পটল ঢেঁড়স ঝিঙের কাঁচা রস খেয়ে নেয়।

আমাদের কত রকম ইচ্ছে না হয়। শুভেন্দু এখন কাছে থাকলে ঠিক বলত, গরম গরম পরটা ও কচি পটল কি বেগুন ভাজা খেতে ইচ্ছে করছে। বিকাশ? না না, বিকাশের ভিতরটা প্রায় দু মাস ধরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, লিভার সহ্য করতে পারছে না বলে দেশী বিলাতী সবরকম একদম বন্ধ, অন্তত একটা বীয়ার খেতে পারলেও যেন বেচারা বেঁচে যেত, কিন্তু ইংরেজী মাসের মাঝামাঝি, মাইনে পেতে এখনও ঢের দেরি, এর মধ্যেই তার পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে জানা কথা। মোহনবাবুর চায়ের দোকানে আমরা কবিরা যখন একত্র হয়ে কবিতা আলোচনা করেছি, কবিতা পাঠ করেছি, দেখতাম বিকাশ তখন দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বড় বড় হাই তুলছে, কপাল ভুরু কুঁচকোচ্ছে, বেশ বোঝা যেত তার খুব অসুবিধা হচ্ছে, কাব্য আলোচনায় মন দিতে পারছে না, এমন কি দু মাসের মধ্যে একটাও নতুন কবিতা লিখতে পারেনি বেচারা। জানি না এখন এখানে উপস্থিত থাকলে আমার মতন শুভেন্দুর মতন কাঁপ বেগুন ঝিঙে পটল খেতে ইচ্ছে করত কিনা তার, না কি ঐ যে ঝাঁকা ভরতি করে কচি ডাব নিয়ে যাচ্ছে, যেহেতু তার ভিতরটা শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়ে আছে, চোঁ চোঁ করে বিকাশ ডাবের জল খেতে চাইত। কিন্তু রামানন্দ তা যেন ভরসা করতে পারল না, কদিন থেকে এমন খিটখিটে মেজাজ হয়ে আছে ওর—বলা যায় না, ডাব খাওয়ার প্রস্তাব দিলে না চটেপটে কুলিদের ওই ঝাঁকা থেকে একটা ডাব তুলে নিয়ে বিকাশ রামানন্দর মাথায় ছুঁড়ে মারত।

এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করে রামানন্দ মজা পেয়ে ভারি হো-হো করে হেসে উঠল। তার কি খেয়াল নেই বৌবাজারের মোড়ে দুপুরে ভিড়ের রাস্তায় সে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় এখানে একা একা হাসছে দেখলে যে কেউ তাকে পাগল টাগল কিছু একটা ঠাওরাত। কিন্তু রামানন্দর এটা ভাল জানা আছে, ভিড়ের মধ্যেই নির্জনতা বেশি, কেউ কারো দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকায় না, এখানে অনেক শব্দ, অনেক ছবি; কাজেই যে কোনো একটা শব্দ, যেমন এইমাত্র যেভাবে সে শব্দ করে হাসল, যে কোনো ছবি, যেমন হাসতে গিয়ে তার পুরু ঠোঁট দুটো যেভাবে ফাঁক হয়ে গেল, আলজিভটা প্রায় বেরিয়ে পড়ল, তামাটে রঙের মার্বেলের গুলির মতন চোখের মণি দুটো একটু চাপা হয়ে বড় হয়ে উঠে প্রায় সারা চোখে ছড়িয়ে পড়ল—কেউ দেখল না।

আসল কথা, শুভেন্দু বিকাশ নবকিশোর উৎপলেন্দু অরুণাভ এবং তাদের কাচকাচা আরো কটি ভক্ত, অর্থাৎ তারা যে কজন কবি শিল্পী বন্ধু কলেজ স্ট্রীটে মোহন রেস্টুরেন্টে একত্র হয়ে রোজ আড্ডা দেয়, তাদের কারো সঙ্গে রামানন্দর আজ কতদিন দেখা হচ্ছে না। তার সম্পর্কে তারা কী ভাবছে কে জানে। হঠাৎ প্রত্যেকটা মুখ রামানন্দর মনে পড়ে গেল। চোখ তুলতে সে দেখল গীর্জার মাথার ঘড়িটায় কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। আজ তার স্কুল ছুটি। ছুটির দিন ছেলেরা যেমন সারাদিন খেলাধুলো করতে ভালবাসে, এখানে ওখানে বেড়াতে বেরিয়ে যায়, তেমনি মাস্টারমশাই রামানন্দরও খুব বেড়াতে ঘুরতে ইচ্ছা করছিল। এ-বেলা অবশ্য তা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা আছে ও-বেলা একবার কলেজ স্ট্রীট চা মারবে, মোহনবাবুর চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে যাবে। নিশ্চয় এই কদিনে সাহিত্যের বাজারের মেলা খবর বন্ধুদের পেটে জমা হয়ে আছে, রামানন্দ সেখানে পা দেওয়া মাত্র তার বৃষ্টি করতে আরম্ভ করবে।

আশ্চর্য, রামানন্দ বুঝতে পারছিল না এই যে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল কলকাতার কবিতার হাটের সাহিত্যে বাজারের আর কোনো খোঁজখবরই রাখ

না, কোনো কবি বন্ধুর সঙ্গেও দেখা করবে না, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যাবে সে, শুধু যতক্ষণ স্কুলে মাস্টারী করার করবে, বাকি সময়টা অক্ষয়ের হাঁস মুর্গি নিয়ে কাটাবে। কোথায় গেল প্রতিজ্ঞা। ভাল করে সাতদিন পার হল না, এখনি আবার সে উসখুস করছে মোহনবাবুর দোকানের মধুর আড্ডায় ফিরে যেতে, না জানি কত কি খবর নিয়ে বন্ধুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এই জন্যই কি কথায় বলে সাহিত্যের রোগ। একবার যাকে ধরেছে তার আর রক্ষে নেই? নিমতলা পর্যন্ত [illegible] সঙ্গে যাবে?

নিজের ওপর রামানন্দ অসন্তুষ্ট হল কম না। বিকেলে শুভেন্দুদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাটা বাতিল করে দেবে কিনা নতুন করে সে ভাবতে আরম্ভ করল।

[illegible] মিছিল শেষ হয়ে রাস্তাটা একটু ফাঁকা হয়েছে। ট্রাম বাস পুরো দমেই চলেছে। রিকশা ঠেলাও [illegible]। কিছু শ্যামবাজারের দিকে যাচ্ছে কিছু এদিকে শেয়ালদার দিকে আসছে।

ওপারের [illegible] একটা [illegible] দেখা যাচ্ছে, রামানন্দ [illegible] কফি [illegible] রাখে ওরা। মাধুরী কফির কথা বলে দিয়েছিল। রামানন্দ ভুলেই গিয়েছিল। টিনের কফি মাধুরী খেতে পারে না। মাদ্রাজের কফি বাগান থেকে সোজা ভর্তি হয়ে যেসব দামী দামী কফি কলকাতায় চালান আসে প্যাকেট করে সেসব কফিই অক্ষয় মাধুরীর জন্য কিনে নিয়ে যেত। রামানন্দ দেখেছে টিনের কৌটোয় করে যেসব কফি বাজারে বিক্রী হয় সেগুলি ভয়ানক মিষ্টি। পাউডারের মতন। গরম জলে ছেড়ে দিলেই হল। ছাঁকতে হয় না। কিন্তু সেই কফি খেয়ে মাধুরীর মোটেই নেশা জমে না। রামানন্দ অবশ্য তেমন কফির ভক্ত না। তার মানে কফি খেতে যে তার ভাল লাগে না এমন না, কিন্তু কফি না হলেই চলে না এমন নেশা তার নেই। সময়ে চা বা কফি যে কোনো একটা পেলেই তার চলে। যে কোনো একটা খেয়ে সে সমান তৃপ্তিবোধ করে। সেজন্যই দানা-কফি আর টিনের মিষ্টি কফির পার্থক্যটা তার একেবারেই জানা ছিল না। কাল বিকেলে মাধুরীর মুখে শুনে সে ব্যাপারটা জানল।

[illegible] মুখ কালো করে থাকার পর কাল বিকেলে মাধুরীকে প্রথম হাসতে দেখা গেছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল হাসিটা। শ্রাবণ মাসে একটানা তিনদিন বর্ষার পর হঠাৎ এক বিকেলে ঝিরঝিরে [illegible] হলুদ রঙের রোদ উঠলে যেমন দেখায়। তা ছাড়া কাল চুলটাও একটু ভাল করে বেঁধেছিল, কদিন না-তেল না-চিরুনী, কেমন রুক্ষ লাগছে দেখাচ্ছিল মাথাটা, অথচ প্রচুর ঘন কালো চুল ওর মাথায়, এক কথায় কেশবতী বলা যায়। কিন্তু ঐ যে, অক্ষয় খুব বমিটমি করল, পায়খানার সঙ্গে একটু রক্ত দেখা গেল, হাসপাতালে দেওয়া হল তাকে, সেদিন থেকে মাধুরী কেমন হয়ে আছে, ভাল করে খাওয়া দাওয়াও করছে না, মুখটা অস্বাভাবিক থমথমে করে রেখেছে, দেখে রামানন্দের তো ভয়ই করছিল। এক রুগী হাসপাতালে গেছে, আবার না আর একজন একটা কঠিন অসুখ বাধিয়ে বসে। রামানন্দ অবশ্য দুবেলাই মেডিকেল কলেজে যাওয়া আসা করছে, অক্ষয়ের খোঁজ খবর নিয়ে আসছে। ডাক্তারেরা বলছে, পেটে আলসারের মতন দেখা গেছে এবং প্রথমটা খুব জোর দিয়ে তারা বলেছিল অপারেশন করতে হবে। কিন্তু তারপর ভাল করে এক্স-রে নিয়ে পরীক্ষা করার পর কেন ডাক্তার-

বাবুদের মত পাল্টে গেল। কাল সকালে রামানন্দ পাকা খবর পেল, অক্ষয়ের অপারেশন করার দরকার পড়বে না, তবে কয়েকটা দিন হাসপাতালে তাকে থাকতেই হবে। রামানন্দর মুখে খবরটা শুনে মাধুরীর বুক থেকে একটা ভারি পাথর নেমে গেল, ওর চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছিল। এমনি তো এতবড় একটা অসুখ দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল ও, তারপর অক্ষয়ের পেট কাটতে হবে শোনার পর থেকে ওর গলায় যেন আর জল ছিল না, আজ পাঁচদিন অক্ষয় হাসপাতালে আছে, এই পাঁচদিনের মধ্যে পর পর পুরো দুটো দিন মাধুরী পেট ভরে ভাত খেয়েছে বলে মনে হয় না। না-স্নান না-খাওয়া, কদিনে কী চেহারা হয়েছে। কাল যাহোক মুখে একটু হাসি ফুটল। বিকেলে উঠোনে হরিতকী গাছটার নিচে একটা বেতের চেয়ারে বসে রামানন্দ কফি খাচ্ছিল। নিজে যেমন জিনিসটা খেতে খুব ভালবাসে তেমনি তৈরী করতেও মাধুরী ওস্তাদ। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কফি খেয়েছে রামানন্দ। মোহনবাবুর দোকানে অবশ্য কফির পাট নেই। কফি খাবার ইচ্ছে হলে শুভেন্দুদের নিয়ে রামানন্দ সোজা কফি হাউসে চলে গেছে। কিন্তু সেই কফি আর এই কফিতে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। মাধুরীর হাতের তৈরী কফির স্বাদ গন্ধ রং আলাদা।

অক্ষয় অবশ্য কফি খায় না। চায়ের ভক্ত এবং বার বার তার চা চাই। কাল বিকেলে হরিতকী গাছের নিচে যে বেতের চেয়ারটায় বসে রামানন্দ কফি খাচ্ছিল সেই বেতের চেয়ারে সেই হরিতকী গাছের নিচে বসে অক্ষয়ও রোজ বিকেলে চা খেত। বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত তিনবার হয়ে যেত তার। রোজ আট-দশ কাপ চা খেয়েছে। কোনোদিন আরও বেশি হত। এখন রামানন্দ চিন্তা করে এত চা খাওয়ার ফলেই না অক্ষয়ের গ্যাস্ট্রিকের ব্যারাম হল।

হুঁ, কদিন মনমরা হয়ে থাকার পর কাল বিকেলে মাধুরী একটু ভাল করে কথাটথা বলল। হাসলও। মাধুরীর প্রকৃতি অবশ্য মোটেই গম্ভীর না, কথা বলতে ও ভালবাসে, এবং বেশ হাসিখুশিও, প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল রামানন্দ এখানে আছে, মানুষটাকে তো দেখছে। কিন্তু অক্ষয়ের অসুখ হওয়ার পর থেকে হঠাৎ এমন বিষণ্ণ স্তম্ভিত হয়ে আছে ও। কাল বিকেলেই মাধুরী বলছিল তার কফি ফুরিয়ে গেছে। এই কদিনের মধ্যে যা দেখা যায়নি, গা ধুয়ে চুলটুল বেঁধে একখানা ধোয়া শাড়ি পরেছিল কপালে খয়েরী টিপ পরেছিল। দেখতে সুন্দর সামান্য একটু সাজলেই এত ভাল দেখায় মেয়েকে।

রাস্তা ক্রশ করে রামানন্দ চায়ের দোকানে ঢুকে একশ গ্রাম কফি নিল। অক্ষয়ও একশ গ্রাম করে কিনে নিয়ে যেত।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তা পার হতে হবে বলে সে আর এই ফুটে এল না। ওদিকের ফুটপাথ ধরেই বেলেঘাটার বাস ধরতে শেয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলল।

রোদ চড়ে গেছে। তা হলেও রামানন্দর হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। পায়ের বুড়ো আঙুলের টনটনানিটা একটু কম লাগছিল। প্রায় সারাটা সকাল হাসপাতালে অক্ষয়ের কেবিনে বসে কাটিয়েছে সে। অক্ষয়ের সঙ্গে গল্প করেছে। পেয়িং ওয়ার্ডের এই সুবিধে। ভিজিটিং আওয়ারসের বালাই নেই। যতক্ষণ খুশি রুগীর কাছে থাকা যায়। অক্ষয়ের পয়সা আছে। মাধুরীর কথা মতন তাকে কেবিন ভাড়া করে রাখা হয়েছে।

হুঁ, এতটা সময় একটা [illegible] ওষুধ [illegible] মধ্যে আটকে থেকে এখন খোলা রাস্তায় এই [illegible] হাওয়াটা রামানন্দ [illegible] উপভোগই করছিল। তা না হলে এক মিনিটের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কেবল [illegible] আকাশের [illegible] দিকে তাকিয়ে থাকা। [illegible] করে প্রাণ [illegible] পেল।

বৌবাজারের রাস্তা [illegible] মোড়ের ওপর [illegible] দোকানটার সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

খুবই অবাক হল সে। যুবতী [illegible] ঠোঁট টিপে হাসল এবং সঙ্গে সঙ্গে [illegible] নুইয়ে [illegible] একটা প্রণাম [illegible] দাঁড়াল।

রামানন্দর মুখে কথা সরছিল না। অপ্রস্তুত হয়ে [illegible] দেখল।

'চিনতে পারলেন না?' [illegible] একটু [illegible] শব্দ করে হাসল।

'ঠিক [illegible] করতে পারছি না।' চোখ [illegible] শেষ করে রামানন্দ যুবতীর [illegible] ও গলার দিকে চোখ রাখল।

'আমার নাম রেখা, রেখা চক্রবর্তী।'

'অ'—রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু তখনও ভুরু কুঁচকে রইল। তার চেহারা দেখে যুবতী বুঝতে পারল রামানন্দ তাকে মনে করতে পারছে না। কাজেই রেখা একটু অপ্রস্তুত হল এবং লজ্জা পেয়ে খানিকটা লাল হয়েও উঠল। চোখ ও চিবুক দেখা শেষ করে রামানন্দ বড় বড় চোখ করে রেখার বুকের দিকে তাকাচ্ছিল। এই অবস্থায় আর পাঁচটি যুবতী যা করে। আঁচলটা বুকের ওপর টেনে দেবার অছিলায় হাত দিয়ে ওখানটা একটু ছুঁয়ে রেখা তখনি আবার হাতটা নামিয়ে নিল।

[ক্রমশ]

কোথাও বিস্ময় নেই

বিমলচন্দ্র ঘোষ

আশ্চর্য হওয়ার যুগ নয় এটা, এখন যা ঘটে
না ঘটার চেয়ে কোনো বিস্ময় সে আনে না, সংকটে
অশান্তি লেগেই থাকে অসম সংঘাতে অগ্নি জ্বলে
আশ্চর্য হওয়ার মতো রঙ নেই চেনা চিত্রপটে।
শিশিরে জ্যোৎস্নায় রোদে বর্ষায় বৃক্ষের ফুলে ফলে
বিদিত নিসর্গ লীলা, অবিমিশ্র ঘটাকাশে ঘটে
অচলে বিশ্বাস নেই, সম ভাব দুরন্ত সচলে।

অস্তিত্বের অস্থিরতা অবাস্তব নাস্তির প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে রহস্যমুক্তির চরাচরে
'কিমাশ্চর্য অতঃপর' জিজ্ঞাসা করে না ধর্মবক
অর্থহীন ধর্মতত্ত্ব শ্বাসরুদ্ধ গুহায় গহ্বরে।
প্রেমেও শতেক জ্বালা বিরহে মিলনে প্রাণান্তক
স্বার্থ বিনিময়ে দ্বন্দ্ব অবিরাম চলে ঘরে ঘরে,
জ্ঞানমার্গে কথা খোঁজে প্রেমরিক্ত বাচাল কথক।

খুঁজে পাই না

ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ

অনেক স্বপ্নের ভিড়ে খুঁজে পাই না আমার হারানো বিদেশিনী
খুঁজে পাই না বিয়েবাড়ির তোরণের সেই মস্ত প্রজাপতি।
সব পুরাতন বৃক্ষ পৃথিবীর বুকে এবার আমূল ধসে যায়;
ভুলে যাই ভালবাসা মানে জিৎ জীবনের কাছে; ভালবাসা মানে
আমার নিজস্ব মুখ প্রত্যেক আয়নায়।

দাঁড়াও পথিকবর! ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকো না।
কারণ এখন উপবনে গাছের পাতারা বড়ো নয়।
জ্যোৎস্নার কান্না সেরে নেয়।
রাজপথে ভয়ঙ্কর শপথেরা হেঁটে যায় বুক টান করে।

প্রাজল লণ্ঠন হাসে—বিলক্ষণ! দেখে নাও মাঠ পেরুলেই আকাশ
তার মানে এখনও সব নিয়মমাফিক। এখনও ঠিকঠাক চলছে।
এখনও শস্যের কাছে ঋণ শোধ না হলে পরিতাপ। এখনও
গোরস্থানে খেজুরের দীর্ঘতম ছায়া বলে—জাগো।
ঘুমোবে আর কত!

মানুষের নামে

স্বপ্নেন্দু ভৌমিক

প্রবাসে যাবার কালে—অরুণাভ জেনেছে সময়
ফিরবে না কোনদিন হৃদয়ের তন্ময় আকার
শার্দুলের চোখে ভয়—বনের ভিতর রাখা
ঈশ্বরের পুতুল
ঈশ্বরী—ঈশ্বরী কোরে কতকাল এই ভাবে কত লোক
করেছে ক্রন্দন
ঈশ্বর কোথায় আছে—অরুণাভ জেনেছে বিপ্লবে
বিপ্লব—বিপ্লব কোরে কত লোক এই ভাবে ঘুরেছে শহরে
কতকাল হত্যাকাণ্ড মানুষের শার্দুল আকার
অথচ গভীরে যাও—তারা দ্যাখে
হাতের পুতুল, সহজে সরানো যায় কিনা
এবং তা অনায়াসে প্রত্নতত্ত্ব হতে পারে
বরং রক্তের কাছে—এই ভেবে ক্ষমা চাওয়া
ভালো—আমরা তো বেঁচে আছি মানুষের নামে।

মহারাজাকে নিবেদন

আবদুস সামাদ

ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলি ওরে মূঢ় মরণের দোসর
অতিথি সৎকার হায় ঘটে না এমন কোনোখানে,
ইন্দ্রপ্রস্থে দেহ রেখে ঠিক সাড়ে চারটের বিমানে
ফুলের শয্যায় শুয়ে মহারাজা নগরে এলেন।

জীবন কাঁটার শয্যা ছিল যাঁর পীড়নে জর্জর,
পরাক্রান্ত রাজদ্রোহী ব্যর্থ জানি তবু কীর্তিবাস;
যাঁর ভয়ে শৃঙ্খলের হৃৎকম্প নিরন্ত সন্ত্রাস
কারায় ছিলেন বন্দী হিরন্ময় তিরিশ বছর।

রাজ্যহীন মহারাজা বৃদ্ধ অতি সম্বলবিহীন
মাদ্রাজ, বিহার, বঙ্গে, মান্দালয়ে, দূরে আন্দামানে,
যাবৎ-যৌবন জ্বালা সয়েছেন দেশের কল্যাণে
বাইশ টাকায় বিক্রি হল সেই রাজার কফিন।

ব্রু'র স্বাদ! নতুন স্বাদ!

Bensons 1156A/5 BEN

মুনিয়ার চারদিক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(এক)

লেবুগাছের গোড়া থেকে মুখ তুলল কালো একটা সাপ। মুখ তুলে সে একটা অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য দেখল। শীতের কুয়াশায় আবছা সকাল, রোদ এখনো নিস্তেজ সোনালী। সেই সুন্দর আলোয় ডালিম গাছের ডগায় একটি ছোট্ট ফলের দিকে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুনিয়া। দু পায়ের আঙুলের ওপর ভর, দেহটি টান, উৎকণ্ঠ মুখটি ওপরে তোলা, দু কাঁধে এলো চুল ভেঙে পড়েছে। তার সোনালী ফ্রক, নীল একটি সোয়েটার, পায়ে চপ্পল, মাথায় ডালিমপাতার ছায়া পড়েছে, পায়ে শিশির-ভার ফুটে-ওঠা। বড় সুন্দর সকালটি, মেয়েটি সুন্দর, তেমন সুন্দর আলো—সাপটা দেখল।

কিন্তু শীতে বাতাসে তার শরীর অসাড় হয়ে আসে, কেঁপে উঠে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লেবু গাছের গোড়ায় তার গর্তটির দিকে এগোয়। তার শরীর পাকে পাকে খুলে দীর্ঘ হয়ে যেতে থাকে। এত দীর্ঘ হয় যে প্রায় ডালিম গাছের গোড়া পর্যন্ত চলে যায়, যেখানে মুনিয়ার গোড়ালি।

বাঁ হাতে একটি ডাল টেনে নামায় মুনিয়া। সে ডালটার টানে গাছটা ঝুঁকে আসে। ডান হাতে বড় ডালটা ধরে মুনিয়া। ক্রমে ছোট্ট ডালিমটা নাগালে আসে। মুনিয়া ছিঁড়ে নেয় ফলটা। দাঁতে ঠোঁট টিপে সুন্দর হাসে। শ্বাস ফেলে। তারপর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাতে ডালিম ফল, তাতে কয়েকটা লালচে সবুজ পাতা।

তীব্র ব্যথায় কালো সাপ তার মুখখানা ফিরিয়ে দেখে। সেই সুন্দর আলো, সুন্দর মেয়েটি। কাঁদে সাপ মুখ ফিরিয়ে নেয়। শ্বাস ফেলে। শরীর টেনে নিয়ে চলে যেতে চায় তার উষ্ণ গর্তটিতে। সে ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করে, সুন্দর শীতের বেলাটিকে দেখে।

মুনিয়া কিছুই টের পায় না। সুন্দর শিশিরে ভেজা ডালিমটি তার হাতে। সে বড় অন্যমনস্ক। ফুটফুটে চপ্পল-পরা পা বাড়িয়ে সে এক পা এগোয়।

ব্যথায় নীল হয়ে যায় কালো সাপ।

তার দীর্ঘ দেহের কোন উৎস থেকে অন্ধকারের স্রোতের মতো তীব্র রাগ ছুটে আসে, আসে হিংসা, ভয়। শীত ভুলে সে তার শরীর তুলে দোল খায়। তারপর সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে যাওয়ার সময়ে সে ভিক্ষুকের মতো রিক্ত বোধ করে নিজেকে। মাথা মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুনিয়ার কাছে, সুন্দর শীতের বেলাটির কাছে।

মুনিয়া প্রথমে ভারি অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখে। এত অপ্রত্যাশিত, এত অদ্ভুত! কালো সাপটা তার পায়ের ওপর দিয়ে ছলকে সরে যায় এক ঝলক ছোট্ট ঢেউয়ের জল যেন। তার ফুটফুটে সাদা পায়ের পাতায় দুটি ছুঁচের মুখের মতো লাল ফোঁটা ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। সমস্ত শরীর ঝিন্‌ঝিন্‌ করে, শরীরের ভিতরে বিদ্যুতের মতো চমকায়।

একটু সময় লাগে বুঝতে। তারপর বোঝে মুনিয়া।

—মা—গো—ও—

খুব ভোরবেলায় উঠে পরাগ অনেকটা দৌড়োয়। পায়ে কেড্‌স্‌, গায়ে গরম জামা, পরনে খাটো প্যান্ট। দৌড়ে এসে সে খানিকটা জিরোয়। তারপর খোলা ছাদে উঠে আসে। অনেকগুলো বৈঠিং করে, পা তুলে লাফায়, হাজার স্কিপিং করে। করতে করতে ন'টা বেজে যায়। শীতের বেলা, তাই বেলা বোঝা যায় না। কুয়াশায় জড়ানো রোদে সোনালী রঙ লেগে থাকে, ভোরের মতো। এ বছর সে একটা বড় টিমে ফুটবল খেলবে—এই কথা ভাবতে ভাবতে পরাগ তার শরীরে আর মনে একরকমের উষ্ণ আনন্দ বোধ করে। তার পোষা চন্দনা পাখীটিকে কাঁধে নিয়ে সে ব্যায়ামের শেষে সারা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। হাতে মুঠো ভর্তি ভেজা ছোলা, আর আদার কুচি। সে খায়, খায় তার পাখীটা একই মুঠো থেকে। পাখীটা তার আঙুল কামড়ে ধরে। পা দিয়ে তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করে। পরাগ হাসে, পাখীর মোলায়েম গায়ে তার কিশোর গাল ঘষে দেয়। পাখী তার পায়ের থাবায় পরাগের হাতের আঙুল জড়িয়ে দোল খায়।

এ সময়ে প্রতিদিনই ছাদের দক্ষিণের রেলিঙ দিয়ে ঝুঁকলে সে মুনিয়াদের বাগান দেখতে পায়। মুনিয়াদের বাগানে গাছপালা ঘন, সবুজ। মুনিয়া বাগানে ঘোরে। ফুল তোলে, পেয়ারা পাড়ে, কখনো সখনো পরাগদের ছাদের দিকে তাকায়। পরাগ তার পাখীকে আদর করতে করতে মুনিয়াদের বাগানে রোজ সকালে মুনিয়াকে দেখতে ভালবাসে।

আজও দেখছিল। সোনালী ফ্রক পরনে, আর নীল সালোয়ার, গলায় নরম সাদা একটা মাফলার—মুনিয়া এই বেশে ডালিমের উঁচু ডাল থেকে ডালিম পাড়ছে।

পাখীটা তার মুঠো খুলবার চেষ্টা করছে, হাতের আঙুল দিয়ে একটা ছোলা ফেলে দিল পরাগ। পাখীটা লাফিয়ে নামল। মুনিয়ার টান শরীরখানা ধীরে ধীরে ডালিমের নাগাল পাচ্ছে—এই দৃশ্য কুয়াশা ভেদ করে আগ্রহভরে দেখছিল পরাগ। দেখছিল, কেমন সুন্দর সাদা হাতে পাতাসুদ্ধ ডালিমটা ছিঁড়ে আনল মুনিয়া। সে ঝুঁকে বলতে যাচ্ছিল—মুনিয়া, কী রে?

ঠিক সে সময়ে কালো বিদ্যুৎ স্পর্শ করল মুনিয়াকে। পরাগ কুয়াশায় কিছু দেখেনি। শুধু দেখল, মুনিয়া উবু হয়ে বসে পা চেপে ধরেছে, ডাকছে—মা গো—

পরাগ তার মুঠো খুলে ভেজা ছোলা

ছড়িয়ে দিল, ভুলে গেল তার প্রিয় পাখীটিকে। সে দৌড়ে ছাদের দরজা দিয়ে সিঁড়িতে নামল। পাখীটিও শুনেছিল মুনিয়ার সর্বনাশের ডাক। তবু নির্বিকার লাফিয়ে ঘুরতে লাগল গড়ানো ছোলার ওপর। ঘুরতে লাগল, আর আনন্দে পাখা ঝাপটে চীৎকার করতে লাগল।

দীর্ঘদিন লক-আউটের পর কারখানা খুলেছে। খুলবার আশা ছিলই না প্রায়। একবার শোনা গিয়েছিল, মালিক কারখানা তুলে নিয়ে যাচ্ছে গুজরাটে। আর একবার শোনা গেল, কারখানা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই সুবিনয় ভোরবেলা এসেছে কারখানায়। দূর থেকে দেখতে পেত কারখানার গেট-এর সামনে নীরব মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে পতাকা, ফেস্টুন, বুকে ব্যাজ, কিন্তু মুখে নিরাশা। কারখানার দেয়াল জুড়ে দাবিপত্র। প্রতিদিন একই দৃশ্য। নীরবে প্রতিটি ভোরে কারখানার সামনে সেই নৈরাশ্যপীড়িত জমায়েতের মুখোমুখি দাঁড়াত সুবিনয়। মাঝে মাঝে তারও মন কেমন ডুবজলে নেমে যেত। বুকটা গ্রীষ্মের প্রান্তরের মতো শূন্য লাগত, তবু তারই মুখ চেয়ে এতজন শ্রমিক—সে এদের নেতা—এই বোধ সর্বক্ষণ তাকে উদ্দীপ্ত রেখেছে। পূর্ব এশিয়ার মুক্তি আনছেন কার্ল মার্কস। আরো কত লড়াই পড়ে আছে। এ তো সামান্য একটা কারখানার কয়েকজন শ্রমিক, আর লড়াইটাও ছোটো—যার কথা খবরের কাগজে খুব ছোটো হরফে বেরোয়। এই সব ভেবে সুবিনয় মনের জোর ফিরিয়ে আনত।

যদি সত্যিই কারখানা গুজরাটে চলে যেত, কিংবা হত হাতবদল? সে অবস্থার কথাও ভেবে রেখেছিল সুবিনয়। রমলার সেলাই-ফোঁড়াইয়ের হাত ভাল, তাকে একটা সেলাই-মেশিন কিনে দিত সে। মুনিয়াকে ইস্কুল ছাড়িয়ে আনত। আর তার অবশ্য একটা পুরোনো এল-এম-ই ডিপ্লোমা আছে—কিন্তু সে মার্কামারা লোক বলে এবং কারখানাগুলির অবস্থা ভাল না বলে কিছুতেই চাকরি পেত না—ফলে সে হয়ে যেত পার্টির হোলটাইমার। বাড়িটা তার নিজের। পাকিস্তান হওয়ার পর বাবা সেখানকার সম্পত্তির সঙ্গে বদল করে বাড়িটা পেয়েছিলেন। অনেকটা জমি, বাগান। বাড়িটা বরাবরই তাকে পার্টির হোলটাইমার হতে এক ধরনের জোর দিয়েছে।

কিন্তু অতটা কিছু হয়নি। কারখানা খুলেছে। সুবিনয় লড়াইটা জেতেনি। শ্রমিকেরা দু' দলে ভাগ হয়ে মারামারি শুরু করে। অবস্থাটা সামলা দেওয়া যায়নি। মালিক সুযোগ বুঝে তাদের ডেকে কয়েকটা এলেবেলে শর্ত মেনে নিল, 'আপনারাই তো জিতলেন' এরকম একখানা ভাব করল। সেই ভাবটা বজায় রাখতে হল সুবিনয়দেরও।

অবশেষে কারখানা খুলেছে।

ইন্‌স্‌পেক্‌শন ডিপার্টমেন্টের ঘরটির দুই দিকে কেবল কাচের আবরণ। আলোয় টৈ-টম্বুর ঘর। বাইরে এখনো সকালের কুয়াশার আবছায়া, রোদ রাঙা। সেই রাঙা রোদে ঘরে একটা আনন্দিত উৎসবের আভা। সুবিনয় খুব মন দিয়ে একটা যন্ত্রাংশের মাপ নিচ্ছিল। টেবিলে এক পাশে একটা গরম চায়ের কাপ। হাতের কাজটি নামিয়ে রেখে সে চায়ে চুমুক দেয়। অসম্ভব সুন্দর সকাল বেলাটিকে দেখে। এই সব সুন্দর দৃশ্য দেখলে তার কেবলই মুক্তি পেতে ইচ্ছে করে। মানুষের জন্য মস্ত লড়াই পড়ে আছে এশিয়া জুড়ে, আর সে পড়ে আছে কোন কোণে। তার শোয়ার ঘরে মাথার কাছে আছে কার্ল মার্কসের একখানা ছবি। স্মিত মুখ, তৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী। যতবার সেই মুখ মনে পড়ে, ততবার সুবিনয় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয়, এ ঠিক জীবন নয়, অন্যতর এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য। পূর্ব এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কার্ল মার্কস। কাচের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে কুয়াশায় জড়ানো রোদ, সুন্দর সকাল, সুবিনয় অন্য মনে চেয়ে থাকে, চায়ে চুমুক দেয়।

—সুবিনয় চৌধুরী—ইন্‌স্‌পেক্‌শনের সুবিনয় চৌধুরী—আপনার ফোন—ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে—শীগগির যান—

ডিপার্টমেণ্টের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে কাল থেকে। ঝামেলা। কথায় কথায় ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে যাওয়া সুবিনয় পছন্দ করে না। লোকটা শত্রুপক্ষের। যদিও সুবিনয়ের এই চাকরিটা পাওয়ার পিছনে লোকটার হাত ছিল এক সময়ে। কিন্তু এখন দেখা হলেই ভ্রূ কোঁচকায়, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আগে 'সুবিনয়' বলে ডাকত, এখন ডাকবার নিতান্ত দরকার পড়লে 'মিস্টার চৌধুরী' বলে ডাকে।

ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখে আজ একটু ভাবান্তর ছিল। ভ্রূ কোঁচকানোই ছিল, তবে সেটা বিরক্তিতে নয় দুশ্চিন্তায়। সুবিনয়কে ফোনটা এগিয়ে দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বলল—দেখুন।

একটা অনিশ্চিত উৎকণ্ঠ গলা আক্রমণ

করে তাকে—কে ! সুবিনয় চৌধুরী ? আমি—আমি পরাগ বলছি কাকাবাবু—

—পরাগ ! ভারি অবাক হয় সুবিনয়—কে পরাগ ?

—আমি সান্যালদের বাড়ির পরাগ—আপনাদের পাশের বাড়ি—

—ওঃ। কী ব্যাপার ?

—একবার শীগগির আসুন—

কেমন একটু অনিশ্চয় লাগে সুবিনয়ের, পা দুটো কাঁপে, বুক কাঁপে, গলাটা ঠিক নিজের গলার মতো শোনায় না—ওঃ। কী হয়েছে।—আঁ, কী ব্যাপার ?

—তেমন সিরিয়াস কিছু না, ছোটোখাটো একটা অ্যাকসিডেণ্ট—

—কার ?

—মৃন্ময়ের।

ফোনটা অনামনস্ক সুবিনয় ক্র্যাডলে না রেখে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে নিলেন, বললেন—চলে যান। আমি ছুটির ব্যবস্থা করছি—

বড় অসহায় বোধ করে সুবিনয়, কয়েক পলকের জন্য ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু লোকটাকে ঠিক চিনতে পারে না।

শীতের বেলা পড়ে এল। বড় ঝিলের ওপাশে সূর্য ডুবছে। সি-সি-আর-এর রেল-লাইনের পাথরে পাইতি চালিয়ে ক্লান্ত দুটি লোক উঁচু রেলপথের ধারে ঘাসের ঢালু জমিতে একটু জিরোতে বসে। বিড়ি ধরায়। আকাশে কাচ-স্বচ্ছ কোদালে মেঘের রক্তিম খণ্ডগুলির দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমের দিগন্ত জুড়ে এক নিস্তব্ধ বিশাল রক্তারক্তি কাণ্ড। তারা দুজন খোলা প্রকৃতির রোদ কিংবা বর্ষার বিস্তর দৃশ্য দেখেছে। তাই অবাক হয় না, মুগ্ধও না। কেবল কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নেয়। সি সি-আর-এর উঁচু রেল-বাঁধের তলায় নিশ্চিন্দার রাস্তা বেয়ে একটা রিকশা ধীরগতিতে চলে যাচ্ছে। লোক দুটির একজন থুথু ফেলে বলে—ঐ দেখ, হাকিম ডাক্তার চলেছে।

—আই। অন্যজন বলে।

—গত বছর খুব বাঁচিয়েছিল তোকে, বইলে ?

যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তারা ধীরে রিকশাটাকে লক্ষ করে। ধীরে ধীরে রিকশাটা দৃষ্টির বাইরে যায়।

তখন একজন অন্যজনকে বলে—হাঁ রে, গত বছর বোশেখের ঝড়ে মোদের দক্ষিণের অমবাগানে আম পড়েছিল মেলাই। মাঝ-রাতে উঠে দৌড় দেনু। অন্ধকারে ভাল ঠাহর হয় না, হাতড়ে হাতড়ে কুড়োচ্ছি কোঁচড়ে, একটাতে কামড় বসাতেই জিবটা একটু চিন্ চিন্ করলো। তেমন কিছু বুঝিতে পারিনি তখন। দু চার কামড় খেতেই পেট ফাঁপলো, মুখে জোত, সারা শরীর জ্বালা-জ্বালা। ঘণ্টাটেকের মধ্যেই মুখে গাঁজলা উঠে এল। রাত না পোয়াতে তিন-টি বোতের এক লরী ধরে মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল, তা সেখানেও বলবে নিয়ে নিলে, বললে—এ তো বিষক্রিয়া, চিকিচ্ছের বাইরে গেছে। হাসপাতালেই মরি আর কী। সে সময়ে তো আর চৈতন্য ছিল না, পরে শুনেছি। আমার বাপ-ভাই বাইরের ফুটপাথে বসে কাঁদছে, একজন পথ-চলতি লোক দাঁড়িয়ে সব শুনে-টুনে বলল, মরবেই যখন তখন একবার হাকিমকে দেখিয়ে নাও না। তারপর তো তারাই বলল। তারাই আমাকে টেনে নিয়ে এল ওই হাকিম ডাক্তারের কাছে। সে বেশী কথা-টথা বলেনি, আমার পা দুখানা কেবল নেড়েচেড়ে দেখে ঠিক দু পুরিয়া ওষুধ দিলে। বললে, এক পুরিয়া বসে ঢেলে দাও ভিতরে যায় না—না যাক্, ওতে যদি কাজ হয় যদি চোখের পাতা ফেলে কি পা নাড়ে তো কাল সকালে আর এক পুরিয়ে......সাত দিন বাদে আমি পা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম।

—ধন্বন্তরী। অন্যজন বলে।

—আই। আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

পরনে ঢোল লুঙ্গি, সাদা ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি, শীতকালে কাঁধে একটা তুষের চাদর, খালি পা, গালে রুক্ষ দাড়ি, তীক্ষ্ণ নাকখানা, তার একজোড়া

চোখ। এই হচ্ছে ডাক্তার হামিদ, জি-টি রোডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ, যার সম্বন্ধে বিস্তর কিংবদন্তী ছড়ানো রয়েছে গ্রামে, গঞ্জে, সমবায় পল্লী, ঘোষপাড়ায়। লোকে পথ চলতে চলতে, কিংবা চায়ের দোকানে বসে, সেলুনে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে সেই সব কিংবদন্তীর কথা বলে, শোনে। আবার যে যার পথে চলে যায়। গ্রামে, গঞ্জে পল্লীতে, পাড়ায় লোকে রোগ-ভোগের ভয় থেকে আত্ম-রক্ষা করে ডাক্তার হামিদের কথা ভেবে। হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়।

হাসপাতাল থেকে মুনিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। এখন তাদের বাসার বারান্দায় তাকে শোয়ানো হয়েছে। ঠোঁট দুটি নীল। বেলাশেষের আলোয় সেই ডালিমগাছটার ছায়া এসে একটুখানি স্পর্শ করেছে মুনিয়ার পা।

বহু লোকের ভিড়ের মধ্যে সুবিনয় কিছুই লক্ষ করতে পারছিল না। বহু চেষ্টার পর হাসপাতালের ডাক্তার একবার দাঁতে ঠোঁট চেপে হতাশায় আক্ষেপ করে বলেছিল—ডেড্! কিন্তু সে কথা সুবিনয়ের বিশ্বাস হয়নি। ডেড্! কথাটা কেমন যেন! একটা ভারী পাথর খুব গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল।

একটু পরেই মুনিয়াকে নিয়ে যাবে সবাই। তবু সবাই অপেক্ষা করছে হামিদ ডাক্তারের জন্য। যদি হামিদ পারে! যদি হামিদ পারে!

সুবিনয় এক কোষ জল বমি করেছে বারান্দার ধারে বসে। এ শরীর যেন আর তার শরীর নয়, এমনই আলগা শিথিল তার হাত পা। কেউ একজন তার কাঁধে হাত রেখে বলছে—ভরসা রাখো। এখনো হামিদ আছে। সে এল বলে।

হামিদ! সুবিনয় যেন বা এ নাম আগে শোনেনি। কে হামিদ? কোথা থেকে সে আসবে! সুবিনয় মুখ তুলে পশ্চিমের আকাশে রক্তিম মেঘখণ্ডগুলি দেখে। মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর তীব্র ছটা বহুদূর নীলিমার প্রান্তে। ঐ কি হামিদের পথ। সে কি পথে আসবে!

মাথাটা কেমন টলমল করে সুবিনয়ের। কমলাকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে—কেঁদো না। হামিদ আসছে। হামিদ আসছে। ঐ দেখ চরাচর জুড়ে হামিদের জন্য পাতা হয়েছে পথ। আসছে হামিদ। মুনিয়া অনেক বড় হবে—দেখো।

বুড়ো রিকশওয়ালা খলিল ঝুঁকে প্যাডলে মারে, শরীর কাত করে শরীরের ভর দেয় প্যাডলের ওপর। রিকশা ধীরে চলে। বুড়ো খলিল কেবল কাশে আর কাশে। রিকশা ধীরে চলে।

রিকশা এসে দাঁড়ায় মুনিয়াদের বারান্দার ধারে, গোলাপী বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের তলায়। রঙীন পাপড়িগুলি শীতের বাতাসে খসে পড়ছে। পাপড়ি খসে পড়ে হামিদের গায়ে, কুষের চাদরে, রিকশার হুডের ওপর। চাপা গুঞ্জন ওঠে—হামিদ! ঐ তো হামিদ।

সুবিনয় মুখ তোলে। শ্যামবর্ণ ছিপ্‌ছিপে হামিদকে দেখে, দেখে তার বুড়ো রিকশাওয়ালাকে। ডেড্—এই কথাটা আবার হঠাৎ ভারী পাথরের মতো গভীর কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়।

ডালিম গাছের ছায়া কখন এগিয়ে গেছে অনেকটা। তার রঙ গাঢ়। সিঁদুরে মেঘের আভার আলোর ভিতর দিয়ে গাঢ় কালো ত্রিশূলের মতো ছায়া বিদ্ধ করেছে মুনিয়ার বুক।

খলিল দেখেছে অনেক। সে জানে, সময়মতো হামিদের হাতে পড়লে মানুষ মরে না। তবু মানুষ যে মরে সে তাদের নিজে-দের দোষে। নিজেদের শরীরে রোগের লক্ষণ তারা দীর্ঘকাল বুঝতেই পারে না। বুঝতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তারপর অ্যালো-প্যাথির বিষ জমায় শরীরে। রোগের লক্ষণ চাপা পড়লে ভাবে—সেরে গেল। অ্যালো-প্যাথ জবাব দিলে তখন অনতিক্রমণীয় মৃত্যুকে ভোজবিদ্যায় ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা ঈশ্বরের মতো হামিদকে খোঁজে। তাই, মানুষ যে মরে সে তাদের নিজেদের দোষে।

মাঝে মাঝে খলিল তার ছানির গ্রহণলাগা চোখে হামিদের মুখখানা বড় মমতাভরে দেখে। দেখে, হামিদের মুখে নানা চিন্তার দৃশ্য। বাচ্চা লড়ছে রোগের সঙ্গে। মানুষের জটিল দেহযন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে হামিদ। লড়াই জমেছে খুব। খলিল তার বুড়ো শরীর হেলিয়ে প্যাডলে মারে আর আপনমনে হাসে। মনে মনে সে আল্লার দয়া ভিক্ষা করে। প্রতিটি লড়াই জিতে আসুক হামিদ। মানুষের ঘরে ঘরে তার নামগান হোক।

ফেরার পথে রিকশা আরও ধীরে চলে। খোয়া-ওঠা রাস্তায় কাঁচাপথে রিকশা টাল খায়। শীতের বেলা ফুরিয়ে আসে হঠাৎ। উঁচু রেলবাঁধের ছায়ায় ঝুমকে আঁধার নামে পথে। গ্রহণ-লাগা চোখে সমুখের দিকটা ঠিক ঠাহর হয় না। খলিল রিকশা থামিয়ে নামে, কাঁপা হাতে কেরোসিনের ছোট বাতিটা জেলে নেয়। একপলক হামিদকে দেখে। মুখটা হুডের তলাকার অন্ধকারে, ঋজু রোগা দেহটি স্থির, কোলের ওপর সেই চামড়ার পুরোনো ওষুধের বাক্সটি। ঐ স্থির মূর্তি দেখলে খলিলের বুকটা ভয়ে আর সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। আল্লার প্রেরিত পুরুষ ঐ বসে আছে তার রিকশায়। এই ধন্বন্তরীকে সে-ই নিয়ে

মার গ্রামে, গঞ্জে, পাড়ায়, পল্লীতে। মিঞা হামিদ—এই নামে কত অন্ধকার বুকে আলো জ্বলে ওঠে! তবু যে মানুষ মরে সে তাদের নিজেদের দোষে। খলিল তার বুড়ো শরীর নিয়ে আবার রিকশায় ওঠে। প্যাডল্ ঠেলতে ঠেলতে বিড়বিড় করে—আল্লা, হামিদকে আরো শক্তি দাও। তার দুই হাত আলোর তলোয়ার হয়ে উঠুক।

যে দিন হামিদের রুগী মরে সেই রাতে খলিল তীব্র আবেগে, গভীর তৃষ্ণায় মদ খায়। জ্বালাময় অন্ধকারে তার শরীর ভেসে যায়। তারপর ক্রমে তার মাথার ভিতরে একটি আলোর ফুলঝুরি ফেটে পড়ে। সে হয়ে যায় চুর-চুর এক আনন্দিত মাতাল।

ফেরার পথটা দীর্ঘ চড়াইয়ের মতো কষ্টকর। ফুটফুটে মেয়েটা মারা গেল। বাঁচল না। খলিল বিড়বিড় করে—হামিদ কী করবে! হামিদের কোনো দোষ নিও না তোমরা—

মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা তৈরি হয়েছে। মুনিয়ার বন্ধুরা সাজিয়ে দিচ্ছে তাকে। কপালে টিপ, চন্দনের ফোঁটা। এলোচুল

আঁচড়ে দুটি বেণী ছড়িয়ে দিয়েছে দু ধারে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মুনিয়াকে। বোগেন-ভেলিয়ার পাপড়ি ঝরে পড়ছে শীত বাতাসে, উড়ে এসে রঙীন প্রজাপতির মতো বসছে মুনিয়ার খাটে, শরীরে, চুলে।

খাটের পায়া ধরে পড়ে আছে রমলা। যেতে দেবে না। পাড়ার বউ-ঝিরা ছাড়িয়ে নিচ্ছে তাকে। সুবিনয় এ সব কিছু দেখছে না। হামিদ নামে একজন অলৌকিক পুরুষের আসার কথা ছিল। আকাশে তৈরি হয়েছিল তার আলোকিত পথ। সেই পথে কেউ আসেনি। এক বিশাল শকুন তার ডানা বিস্তার করেছে, চরাচর জুড়ে তারই ছায়া।

নিহত মুনিয়ার শেষ ভেলা চারজন বাহকের কাঁধে দুলে দুলে ভেসে যায়।

অনেক রাতে মুনিয়ার শ্মশানবন্ধুরা ফিরছিল। তারা শুনল, চৈতলপাড়ার পথে পথে ক্ষুব্ধ এক বুড়ো মাতালের চীৎকার। চুর-চুর মাতাল খালল চেঁচিয়ে বলছে—তোমরা সাক্ষী আছো। আমি হামিদের এক ফোঁটা ওষুধও কখনো খাইনি। আমি যদি মরি তবে তার দোষ যেন হামিদকে না অসায়। হামিদ ধন্বন্তরী—হামিদ মরা মানুষ বাঁচায়—বিশ্বাস করো—

অনেক রাতে, ঘুমোবার আগে হামিদ তার সাদা, ছোট, সহজ সরল বিছানাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে, নমাজ পড়ার মতো পবিত্র ভঙ্গীতে। প্রতিদিন ঘুমোবার আগে সে এই কথা বলে—আল্লা, আমি তোমার সমকক্ষ নই। মানুষকে তুমি এই বিশ্বাস দিও যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।

(দুই)

মাঘের শেষে এক মাঝরাতে পরাগের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভেঙে দেখতে পায় বুকের ওপরে আকাশ। গভীর সমুদ্রের মতো অথৈ। নক্ষত্রের আলো কাঁপছে।

ত্রিপলের একটা কোণ উত্তরের বাতাসে উড়ে গেছে। শীত করছে খুব। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে উঠে বসে পরাগ। এক প্যাকেট সিগারেট চুরি করে রেখেছিল। বালিশের পাশ থেকে সেই প্যাকেট তুলে অনভ্যাসের একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর মৃদু শব্দে একটু কাশে।

সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সানাই বেজেছে, বেজেছে উলুধ্বনি, হাসি, নানা শব্দ। সন্ধ্যারাতে ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেল। এখন রাত গভীর। ছাদের ওপর ঘুম ভেঙে বসে আছে পরাগ। মাথার ওপর ছাদের ত্রিপলের একটা কোণ উড়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীচে এঁটো পাতা নিয়ে ঘেয়ো কুকুরদের গম্ভীর ঝগড়ার আওয়াজ।

পরাগ অপলক চোখে অথৈ আকাশটুকু দেখে। এ রকম মধ্যরাত্রির আকাশ এমন বিরলে সে আর কখনো দেখেনি। আজকাল আর হইচই ভাল লাগে না তার, তাই শোওয়ার সময়ে সে একটা চেয়ারের গদি আর কম্বল টেনে নিয়ে এসে ছাদে শুয়েছিল। এখন বুঝতে পারে, এই ভয়ঙ্কর শীতে আর ঘুম আসবে না। সে বসে থেকে সিগারেট খায়, আর অপলক শূন্য চোখে আকাশ দেখতে থাকে।

কোথায় যেন একটা কাশির আওয়াজ হয়, নাল-পরানো [illegible] [illegible], মাটিতে লাঠি ঠুকবার শব্দ। পরাগ উঠে ছাদের আলসের ধারে আসে। অন্ধকারে ঝুঁকে দেখে, মুনিয়াদের বাইরের বারান্দায় অন্ধকারে কে যেন বসে আছে। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। লোকটা সিগারেট ধরায়।

পরাগ ডাকে—কাকাবাবু।

—উঁ। সুবিনয় উত্তর দেয়।

—এখনো শোননি। রাত দুটো বেজে গেছে।

সুবিনয় গলার মাফলারটা ভাল করে জড়ায়, পায়ের মোজাটা একটু টেনে তোলে। তারপর বলে—ঘুম আসে না।

হাতের টর্চটা জেলে চার দিক একবার দেখে নেয় সুবিনয়, তারপর বলে—তুমি ঘুমোওনি?

—আমি ছাদে শুয়েছিলাম, কিন্তু এখানে

শীত পড়েছে। ঘুম আসছে না।

—হুঁ। এবারে শীতটা খুব পড়ল।

বাতাসে ত্রিপলের কোণটা উড়ে ফটাস শব্দ করে। তার কেউ চমকায় না।

পরাগ চাপা গলায় বলে—এই অন্ধকারে কি আর খুঁজে পাবেন? এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—যাই। উত্তর দেয় সুবিনয়, কিন্তু ওঠে না। বসে থাকে।

মুনিয়া মারা গেছে এক মাস। প্রায় এক মাস ধরে সারা দিন সুবিনয় শাবল আর লাঠি হাতে বাগানে ঘুরেছে। খুঁড়েছে গাছের তলা, মাটির ঢিপি, ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্ত। প্রথম প্রথম সঙ্গে পরাগ থাকত, থাকত পাড়ার উৎসাহী ছেলেমেয়েরা, যারা ভালবাসত মুনিয়াকে। ক্রমে ক্রমে সবাই যে যার কাজে ফিরে গেছে। এখন একা সুবিনয় সারা দিন সাপটাকে খোঁজে। গভীর রাত পর্যন্ত। আজকাল বড় একটা ঘুম আসে না।

পরাগ তার কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নেমে আসে। বারান্দা থেকে পাখিটা তীব্রস্বরে ডাকে—'পরাগ।' পরাগ নেমে আসে, সদর খুলে বেরোয়।

—কাকাবাবু, এই নিন এক প্যাকেট সিগারেট। আপনার জন্য রেখেছিলাম।

খুশী হয় সুবিনয়। হাত বাড়িয়ে নেয়। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বলে—মুনিয়া বেঁচে থাকলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম, বুঝলে পরাগ! মনে মনে আমি ঠিক করে রেখেছিলাম।

শীত বাতাস বয়ে যায়।

—এবার গিয়ে শুয়ে পড়ুন কাকাবাবু। শীতকাল—এখন সাপেরা বড় একটা বেরোয় না!

—তাই হবে। সুবিনয় বলে বসে থাকে।

তারপর বলে—তুমি যাও। আমি আর একটু দেখে গিয়ে শুয়ে পড়বো। যতক্ষণ ওটা আছে ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাই না।

পরাগ ওঠে। খুব শীত বলেই কিনা কে জানে তার চোখে জল আসতে থাকে।

একা আরো কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকে সুবিনয়। তারপর টর্চবাতিটা জ্বালে। ব্যাটারীর জোর কমে গেছে, আলোটা লালচে। টর্চটা ঘুরিয়ে সামনের মাঠটা একটু দেখে, বাগানের বেড়ার ধারে যায়। লেবুগাছ আর ডালিমগাছের গোড়া থেকে আলো সরিয়ে নেয়। দত্তদের বাড়ি উঠছে, তাদের ইটের পাঁজাটা দেখে সুবিনয় পথে নামে। পরাগদের বাড়ির সামনে খেয়ো কুকুরদের ভিড়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। বন্ধ ডাক্তারখানার চাতালে একজন মাতাল বসে আছে। সুবিনয় এগোয়। পুলিস-ব্যারাকের পিছনের দেয়ালের সামনে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে মোমবাতি, আলকাতরার টিন, তুলি। কী লিখছে।

টর্চের আলো ফেলে সুবিনয় দাঁড়াতেই ছেলেগুলো রুখে মুখ ফেরায়।

—কে?

এ পাড়ারই ছেলে। তাকে চিনতে পারে। একজন এগিয়ে এসে বলে—আমরা কাকাবাবু। আপনি কী খুঁজছেন—সেই সাপটাকে? ওটাকে কি আর পাবেন! বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

সুবিনয় টর্চের আলো ফেলে দেয়ালে, বলে—এসব কী লিখছো?

—তেমন কিছু না। আপনি বাড়ি যান কাকাবাবু। আমরা লিখি।

সুবিনয় লেখাগুলো পড়ে। ঠিকঠাক কিছু বুঝতে পারে না।

—লিখছো! আচ্ছা লেখো। বলে সুবিনয় আবার এগোয়। রেলরাস্তা পর্যন্ত চলে যায়। আবার ফিরে আসে। চারদিকেই অন্ধকার নির্জনতা।

দিন কেটে যায়।

তখনো অন্ধকার ঝুলে আছে চারদিকে, ভোর রাতে পরাগের চন্দনা পাখীটা ডাক দেয়—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগের আলস্যজড়িত ঘুম ভাঙে। উঠতে ইচ্ছে করে না। পাখীটা ডাকে ডাকতেই থাকে। বিরক্ত পরাগ পাশ ফিরে ধমক দেয়—এই, চুপ্!

পখীটা ডানা ঝাপটায়, কিন্তু আবার ডাকে পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

উঠতে ইচ্ছে করে না। সকালের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটি আর দেখা যায় না। মুনিয়াদের বাগানে মুনিয়া। কী হবে বড় হয়ে আর? পরাগের আর বড় হতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে তার বুকের ভিতরে এক গ্রীষ্মের প্রান্তরে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যায়।

পরাগ পাশ ফিরে শোয়। সিগারেটে এখন তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বালিশের পাশেই থাকে প্যাকেট। সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খায়। কিন্তু পাখীটা ডাকতেই থাকে—পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো। পরাগ ওঠো।

পরাগ চুপ করে থাকে। একবার ভাবে, উঠবো না—খেলোয়াড় হয়ে আমার কী হবে! আর একবার ভাবে, উঠি। ভাবতে ভাবতে তার শীত করে। লেপটা মুড়িসুড়ি দিয়ে শোয়। মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না। তাই শুয়ে সিগারেট টানে পরাগ। এই অনিয়ম দেখে তার চন্দনা পাখীটা রেগে গিয়ে ডানা ঝাপটায় আর ডাকে। ডানা ঝাপটায় আর ডাকে।

হঠাৎ মাথার ভিতরে একটি ঘন সবুজ মাঠের দৃশ্য ফুটে ওঠে। উঁচুতে একটা সাদা বল। সেই বলের দিকে লাফিয়ে উঠছে কয়েকজন লাল-সোনালী নীল-লাল জার্সি পরা খেলোয়াড়। হঠাৎ উষ্ণ একটা রক্তস্রোতে পরাগের শরীর ভেসে যায়। এ বছর পরাগকে ডেকেছে কলকাতার বড় একটা ফুটবল ক্লাব।

ভাবতে ভাবতে পরাগের শরীর চনমন করে। সেই উষ্ণস্রোত তার শরীরের শীতভাব দূর করে দেয়। সে উঠে তার জার্সি পরে, পরে নেয় কেডস্। তার পাখীটি চুপ করে দেখে। খুশী হয়।

মুনিয়াদের বাগানে আর মুনিয়াকে দেখা যাবে না।

পরাগ এ বছর কলকাতার বড় একটা ক্লাবে খেলবে।

ভোরবেলা বহু দূরে এক কারখানার ভোঁ বাজতে থাকে। কার জন্য বাজে?

সুবিনয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। একটা সেলাই মেশিন কিনেছে। দুজনের চলে যাবে কোনক্রমে। সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত সাপটাকে খোঁজে সুবিনয়। ঘুম আসে শেষ রাতে।

দাড়িওয়ালা স্মিতমুখ কার্ল মার্কসের ছবিখানা এখনো তার শিয়রে টাঙানো। মাঝে মাঝে সে ঘুম জড়ানো চোখে ছবিখানার দিকে চায়। অস্ফুট গলায় বলে—আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসতুম আমার মুনিয়াকে। আর কিছুকে নয়, আর কাউকে নয়। আমার এ অপরাধ ক্ষমা কোরো।

ক্রমে কার্ল মার্কসের ছবিখানায় ধুলো পড়ে। একদিন এক দুঃসাহসী মাকড়সা লাফ দিয়ে উঠে আসে, তারপর স্মিতহাস্যময় সেই মুখের ওপর তার অমোঘ জালখানা বুনতে শুরু করে।

উদ্ধার

প্রতিভা বসু

উড্ডানো উদ্ধার

॥ ১২ ॥

অঞ্জলি দেবীর চোখের জল তখন শুকিয়ে গিয়েছিলো। শুধু অন্তরে-বাইরে ভীষণ এক ঝড়ের দাপট তাঁকে নিয়ে লোফালুফি খেলছিল। একটা অসহনীয় যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ লুটিয়ে রইলেন মেঝেতে, তারপর আস্তে আস্তে উঠলেন, আস্তে আস্তে তিনিও কখন খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন পথে. একটা দমকা হাওয়া ঠাস করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

কিন্তু কী আশ্চর্য! তার ছ' সপ্তাহের মধ্যেই খুব সুন্দর এক সকাল তার সত্যের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রতিভাত হল দার্জিলিং শহরে। দুঃখীনি অঞ্জলি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভাগ্যের পরিহাস উপলব্ধি করে। কিন্তু তখন আর কী বা করণীয় ছিল।

সেই নাটকে নেপাল ডাক্তারই সূত্রধার হয়েছিলেন। দেখা হবার পর থেকে তিনি প্রায় নৈমিত্তিক অতিথি হয়ে উঠেছেন তখন। কেননা, একজন মরণাপন্ন রোগীকে উপলক্ষ করে প্রত্যেক দিন তাঁকে আসতে হত কাকঝোরা। যাবার পথে অঞ্জলিকে হাঁক দিয়ে যেতেন। সব সময়েই হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন, বলতেন, 'নাও ধরো, রোগীর বাড়ি থেকে দিয়ে গেছে।' ফলই আনতেন বেশী, মাঝে মাঝে কেক বিসকুটও আনতেন। অঞ্জলি সেই স্নেহের দান গ্রহণ না করে পারতেন না। তারপর যতটা পারেন প্লেটে সাজিয়ে তাঁকেই বসে বসে খাওয়াতেন। বাকীটা পাড়ার নেপালী বাচ্চাদের ভোগে লাগত।

সেদিনও তেমনিই থলি ভর্তি কী সব নিয়ে এসে হাঁক দিলেন, 'আমার মেয়ে কই গো?'

হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে অঞ্জলি দেবী বললেন, 'আসুন, কাকাবাবু।'

'কেমন আছ বল আগে।'

'ভালো।'

'সেই কোমর ব্যথাটা কমেছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'পায়ের ফোলাটা?'

'হ্যাঁ।'

থলিটা বাড়িয়ে ধরলেন, 'এই দ্যাখ, এক রোগী কী মস্ত এক মাছ দিয়ে গেল। বলছে জলপাইগুড়ি থেকে তাদের মেয়ে নিয়ে এসেছে। বললুম, আমি বাউল মানুষ আমাকে আবার এ সব কেন? শোনে না। তারপর ভাবলুম যাকগে, আমারও তো মেয়ে জুটেছে একজন। যাই, সেখানেই নিয়ে যাই। রাঁধো। সর্ষেটর্ষে দিয়ে খুব কটকটে করে রাঁধো। একটা বাঁধাকপি আমিই এনেছি, তরকারিটাও আমি বানাব, দেখা যাবে কে কত পটু। আলগা উনুনে আছে তো? আমাকে দাও, ধরিয়ে আনি। তারপর বাইরে রোদ্দুরে বসে রাঁধব। তোমার মনবাহাদুর দম্পতি কোথায়? ডাক তাদের, তারা দুজনও আজ নিমন্ত্রিত। দিব্যি বন-ভোজন হয়ে যাবে একখানা।'

ডাক্তারের এই রকম বনভোজনের বন্দোবস্তটা বোধ হয় অঞ্জলির নিরন্ধ্র অন্ধকার জীবনে একটু আলোর রেখা এনে দেবার প্রয়াস। অঞ্জলি কৃতজ্ঞও বোধ করে।

রান্না করতে করতে কথায় কথায় সেদিনই আসল তথ্য উন্মোচিত হল। নেপাল ডাক্তার পুরোনো কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন। যা স্মৃতি, তাই তখন তাঁর কাছে স্মরণীয়। সেই রকমই কোনো স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে বললেন, 'আমি কিন্তু জানতুম না তুমি দ্বিজেনবাবুর প্রথম পক্ষের মেয়ে।'

অঞ্জলি বললেন, 'ও।'

'সেই যে তোমার অসুখ করল, তোমার বাবা গিয়ে আমাকে ডেকে আনলেন, তখনই বুঝতে পারলুম এরই নাম বিমাতা।'

অঞ্জলি মাথা নিচু করে রইলেন।

'তুমি তো তখন অজ্ঞান, এসে দেখি প্রায় ঠাণ্ডা। নাড়ি নেই, প্রেসার নেই, চোখ দুটো মরা মাছের মত সাদা, রক্তের ঢল বয়ে যাচ্ছে বিছানায়—'

'রক্ত?'

'সাংঘাতিক। বললুম, কোথাও পড়েটড়ে গিয়েছিল কি? পেটে কি কোনো আঘাত লেগেছে? ওরে বাবা, তোমার মা মহিলাটি যেভাবে ফোঁস করে উঠলেন আমি তো অবাক। দ্বিজেনবাবু লজ্জায় লাল। বললেন, চুপ কর, চুপ কর—কার কথা কে শোনে। সমানে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'কেন চুপ করব? চুপ করে থাকলেই কি দোষ নয়? কোথায় তুমি দেখেছ, মেয়েরা রাত নটায় বাড়ি ফেরে?

কোথায় ছিল এত রাত পর্যন্ত শুনি? এসেই তো দেখলাম ঘরে গিয়ে শুলেন। আর চেহারা কী? বাপের জন্মে এমন দেখিনি।' আমি রেগে গিয়ে বললুম, 'দেখুন, আমি ডাক্তার, রোগীর উপর এখন সবচেয়ে বড় অধিকার আমার। দয়া করে আপনি অন্য ঘরে গিয়ে বিলাপ করুন। আমাকে ভাবতে দিন কী ভাবে এর জীবনরক্ষা হবে।' তোমার বাবাকে বললুম, 'যদি মৃত্যু চান, সে আলাদা কথা, নইলে দয়া করে ছুটে গিয়ে আমার ডাক্তারখানা থেকে এই ওষুধ আর এই ইনজেকশন নিয়ে আসুন। ইম্মিডিয়েটলি এই হেমারেজ বন্ধ করা দরকার, নইলে কোনো রকমেই বাঁচানো সম্ভব নয়। তিনি অবশ্য খুব বিচলিত হলেন। হাজার হোক বাপ তো! শেষে কত কাণ্ড করে সেই হেমারেজ বন্ধ করা হল। তিন দিনের ধস্তাধস্তির পরে তুমি প্রথম চোখ খুলে তাকাতে পারলে। পরে আমার মনে হয়েছিল, তোমার বোধ হয় অনিয়মিত হবার ধাত ছিল। তাদেরই অনেক দিন বাদে বাদে হঠাৎ এরকম হয়ে পড়ে। তাই কি?'

পলকহীন চোখে শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মাথা ঝাড়লেন।

অঞ্জলি দেবী অস্ফুটে বললেন, 'হ্যাঁ, কাকাবাবু।'

'চিকিৎসা করাওনি কেন?'

এ কথার জবাব দিলেন না তিনি। তাঁর শরীর থেকে আস্তে আস্তে সমস্ত ক্লেদের বোঝা যেন গলে গলে ঝরে পড়ছিল, তিনি মুক্তির স্বাদ অনুভব করছিলেন, অলৌকিক ভাবে মনে হচ্ছিল, মাস্টারমশায় বুঝি সত্যিই তাঁর কুমারীত্ব এইভাবে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তবে সেই তিনদিন কি তাঁর এক মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান ফিরে আসেনি? নইলে এত বড় ঘটনার একফোঁটাও মনে নেই কেন তাঁর?

সব জেনে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল সুদর্শনকে। চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করেছিল, 'সুদর্শন, এ সন্তান তোমার, তোমার, সত্যি তোমার। আমি ভুল বলেছিলাম।

তারপরেই শক্ত হয়ে গেলেন। মনে হল মাস্টারমশায় আমার নারীত্বের অবমাননা করেছেন; কিন্তু সুদর্শন আমার আত্মাকে অপমান করেছে। না, আমি তাকে কখনও কোনো দিন ক্ষমা করব না। না। না। না।

বালিশ ভিজে গিয়েছিল চোখের জলে, বুক থেকে উঠে আসছিল শব্দ, 'তবু তুমি আছ, আছ, তোমার সন্তান হয়ে তুমি আছ আমার মধ্যে, এইখানে আমি জিতে গেছি তোমার কাছে। এই আমার শেষ সান্ত্বনা।

✻

'আপনার ফোন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে অঞ্জলি দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গলির এ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, একটি বেয়ারা খবর নিয়ে এলো।

'আমার ফোন?' কেঁপে গেলেন তিনি, 'কোথায়?'

'অফিসরুমে।'

ব্যস্ত ব্যাকুল পায়ে ছুটে এসে রিসিভার কানে তুলে বললেন, 'হ্যালো। পুরন্দর? তুই কোথায়?'

পুরন্দরের বদলে একটি ভারি সম্ভ্রান্ত গলা ভেসে এল 'অঞ্জলি?'

'কে?'

'আমি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

'আমার সঙ্গে?'

'ছাব্বিশ বছর ধরে আমি এই দিনটিরই অপেক্ষা করছিলাম।'

'এ সব কী বলছেন?'

'নিরবে নির্জনে অনেকবার মার্জনা ভিক্ষা করেছি, একবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে চাই ক্ষমা কর।'

'আমি—আমি তো এখানে কাউকে চিনি না।'

'পশুর মত আচরণ করেছিলাম,

প্রায়শ্চিত্তও অনেক করেছি, এবার একটু বিশ্রাম চাই।'

'কিন্তু আপনি, আপনি—'

'আমি সুদর্শন। আমার গলা তুমি বুঝতে পারছো না?'

অঞ্জলি দাঁতে দাঁত আটকে বললেন, 'না।'

'হ্যাঁ পারছো। আমি জানি পারছো। আমি জানি, আমাকে তুমি ভোলোনি।'

কী আস্পর্ধা লোকটার! অঞ্জলি দেবীর ইচ্ছে করলো—কী ইচ্ছে করলো? না, তা তিনি জানেন না। শুধু ফোনটা ছেড়ে দিতে গিয়েও হাত মুঠো ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভেবে পেলেন না তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে আছেন। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন, নাকি সত্যিই ঘুমের স্বপ্ন।

'তোমার ছেলেটিকে আমি বারান্দায় বসিয়ে রেখে ফোন করছি।'

'আমার ছেলে?'

'তার নাম পুরন্দর। বলো, ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ পুরন্দর। পুরন্দর কী করছে ওখানে? কেন গেছে? কে তাকে নিয়ে গেল?'

'ব্যস্ত হ'য়ো না। সে নিজেই এসেছে।'

'আপনি অনুগ্রহ করে ফোনটা একটু দিন তাকে।'

'না। সেও যেমন তোমাকে লুকিয়ে এখানে এসেছে, আমিও তেমনি তাকে লুকিয়ে ফোন করছি।'

'কিন্তু কেন? কেন গেল সে?'

'অধিকারের দাবী নিয়েই এসেছে।'

'আপনার সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক!'

'কিছু না। কিন্তু তুমি তো পিতা হিসেবে আমার নামই ব্যবহার করতে দেখছি।'

সহসা একটা হিম প্রবাহ ব'য়ে গেল অঞ্জলি দেবীর সারা শরীরে। সহসা মনে হ'লো, তাঁর নিজের যে ভুলে তিনি যাবজ্জীবন নির্বাসিত হ'য়ে আছেন, সুদর্শন কি পিতা হ'য়ে তাঁর সন্তানের প্রতি আবার সেই ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নতুন ক'রে সর্বনাশ করলো? প্রায় আর্তের মতো ব'লে উঠলেন, 'আপনি তাকে বলেছেন? কী বলেছেন?'

'কী তোমার মনে হয়?'

'ও ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই, আমার এই অবশিষ্ট আলোটুকুও কি আপনি শেষে নিবিয়ে দিলেন?'

'অঞ্জলি, ছেলেটি তোমার ভারি সুন্দর, ভারি সুকুমার। ওর মুখের আয়নায় কতোকাল পরে আমি তোমাকে দেখলাম। কতোকাল পরে।'

'শুধু আমাকে?'

'আর কাউকে আমি দেখতে চাই না। ও তোমার ছেলে সেটাই আমার কাছে বড়ো কথা।'

'আপনি কি নিজের ছায়াও দেখতে চান না?'

'তা আর কে না চায় বলো? হ'লে তো ও আমার ছেলেও হ'তে পারতো? সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম অঞ্জলি, আমার পুরুষ নামের অযোগ্যতাই প্রমাণ করেছিলাম, অথচ কী আসে যায় বলো? আজ তোমার ছেলে আমাকে তিরস্কার করতে এসেছে। তার মায়ের প্রতি অন্যায়ের তিরস্কার, সন্তানের প্রতি কর্তব্যহীনতার তিরস্কার। আমি মাথা পেতে নিয়েছি, আমার নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান প্রৌঢ় জীবনে এই তিরস্কার আমাকে নতুন জীবনের স্বাদই দিয়েছে। অঞ্জু, আসবে? আমি গাড়ি নিয়ে যাবো? তারপর আমি তুমি আর আমাদের ছেলে—' সামান্য এক ফোঁটা হাসি ভেসে এলো, 'আমাদেরই বলা যাক কী বলো? যৌবনের সেই ঈর্ষার বয়েস আমি পেরিয়ে এসেছি, জন্মদাতা না হ'য়েও তোমার পুত্রকে পুত্র ভাবতে আর আমার কোনো দ্বিধা নেই। কেন থাকবে? আমাকে পিতা ভেবে যার হৃদয় অভিযোগে অভিমানে শতধা হ'য়ে যাচ্ছে, তার পিতা আমি ছাড়া আর কে হ'তে পারে? ভেবে দেখছি, মনুষ্য জীবনে মিথ্যারও প্রয়োজন আছে। সেদিনের সেই সত্য আমাদের কোনো মঙ্গলের রাস্তায় নিয়ে যায়নি। আমরা শুধু কাঁটার উপরে হেঁটেও ক্ষতবিক্ষত হলাম। তাই আজকের মিথ্যাকেই আমি সত্য ব'লে গ্রহণ করবো। শেষ পর্যন্ত ছেলের জন্য তোমাকেও তো মিথ্যার আশ্রয়ই নিতে হ'লো? সুতরাং আর তুমি আমার উপর রাগ করে থেকো না। জেনো, ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় জেদে আমার নিরপরাধ স্ত্রীকে কঠিন কথা ব'লে সেদিন আমি নিজেকেই আঘাত করেছিলাম। নইলে যে আমার প্রতি মুহূর্তের কামনার ধন, যাকে ছাড়া আমার সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, কেমন ক'রে তাকে এত দুঃখ দিতে পেরেছি? অঞ্জু, আমাকে ক্ষমা করো। আমি আসছি তোমার কাছে। এক্ষুনি আসছি। আমাকে তুমি আজ কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। কিছুতেই না।' সুদর্শন ছেড়ে দিলেন ফোন। অঞ্জলি দেবীও বিমূঢ়ের মতো রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ফিরে এলেন নিজের ঘ[illegible] পেলেন না এখন তিনি কী কর[illegible]। মেঝেতে হাঁটু ভেঙে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে মুখ ঢাকলেন দু'হাতে। পৃথিবীর প্রতিটি শব্দ বিদ্যুতের মতো চমক তুলতে লাগল তাঁর হৃদয়ের মধ্যে।

সমাপ্ত
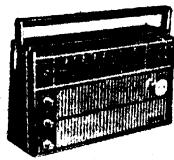
বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ এবং ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য

চতুর্থ যোজনার দুই বছর শেষ হতে আর মাত্র দুই মাস আছে, কিন্তু যোজনার কর্মসূচী যেভাবে এগোবার কথা ছিল সেভাবে এগোয়নি। ভারতের চতুর্থ যোজনা যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের অনিশ্চয়তা। যে কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের ঘাটতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। বিশেষ করে ভারতের মত উন্নতিশীল দেশে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং তা করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়ানো দরকার। তৃতীয় পাঁচসালা যোজনার শেষে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ যা ছিল, তার চেয়ে এখন অবস্থা কিছু পরিমাণে উন্নত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের অবস্থা যতটা উন্নত হবে আশা করা হয়েছিল ততটা হয়নি। চতুর্থ যোজনায় ৭ শতাংশ হারে প্রতি বছর রপ্তানি বাড়াবার যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে, তা কার্যকর করা এখনও সম্ভব হয়নি। রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের সঙ্গে জড়িত। যদি জাতীয় আয় শতকরা সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ভাগ পর্যন্ত বাড়ে এবং সেই সঙ্গে কৃষি উৎপাদন শতকরা পাঁচ ভাগ ও শিল্প উৎপাদন শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ বাড়ে তবেই রপ্তানির পরিমাণ ৭ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে এবং এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি জলসেচ ব্যবস্থার উপযুক্ত সম্প্রসারণ, উচ্চ ফলনশীল বীজ রোপণ, উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ ও নিবিড় চাষ পরিকল্পনা চলতে থাকে—তবে শতকরা পাঁচ ভাগ হারে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ছে না; বলা বাহুল্য, বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের সঙ্গে কৃষি উৎপাদন এবং বিশেষ করে শিল্প উৎপাদন খুবই জড়িত। তবে কৃষির উন্নতির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার উপর যতটা নির্ভর করতে হয়, শিল্পের উন্নতির জন্য সেই নির্ভরতার পরিমাণ অনেক বেশি। কৃষিজাত এবং শিল্পজাত সামগ্রী রপ্তানি করে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়ানো যায়, তেমনি কৃষিক্ষেত্রে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ করা অথবা শিল্পক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রয়োগ করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার উপর নির্ভর করতে হয়। কিভাবে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বাড়ানো যায় সেই

আলোচনা নতুন নয়। সুতরাং, বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ কিভাবে বাড়ানো যায় সেই আলোচনা না করে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কিভাবে সম্প্রসারিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের অনিশ্চয়তা কিছুটা দূর করা যায়, সেই আলোচনা করা যাক।

রপ্তানি বাড়াবার জন্য যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ভারত সরকার সেগুলি সবই অল্প-বিস্তর গ্রহণ করেছেন। তবুও শতকরা ৭ ভাগ হারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রপ্তানি সমস্যা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই উৎপাদনের দিক থেকে সমস্যাটি বিচার করা যাক। রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টা সফল করতে হলে প্রধান প্রয়োজন কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহের; তাছাড়া উন্নত ধরনের কলা কৌশল যাতে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সেজন্য বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ কারিগরেরও প্রয়োজন। শিল্পক্ষেত্রে যে কাঁচামালের প্রয়োজন তার অধিকাংশই আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। গত চার বছর ধরে কৃষি উৎপাদন মোটামুটি ভালই হচ্ছে। কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যা তত জটিল নয়, খনিজ সম্পদও ভারতে প্রচুর পরিমাণেই আছে। কিন্তু শিল্পোৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির একটি বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। প্রতিরক্ষা সামগ্রীর ক্ষেত্রেও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার উপর খুব নির্ভর করতে হয়। ভারতে অবশ্য ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হলে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তা-ও ভারতে উপযুক্ত পরিমাণে নেই। যন্ত্রপাতির যতটা বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব ততটা আমদানি করা হচ্ছে; কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রপ্তানি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক আরও বেশি করে অর্থ সরবরাহ করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য এখন কিছুটা অর্থ সরবরাহ করছে—রিজার্ভ ব্যাঙ্কও রপ্তানি বিলের (Export bills) উপর পুনর্বাট্টা হার (Rediscount Rate) কিছুটা কম করে দেয়। Export credit and guarantee corporation-এর কাজও যথেষ্ট এগিয়েছে। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার জন্য অর্থ সরবরাহ এখনও প্রয়োজন অনুযায়ী হয়েছে, একথা বলা যায় না। রপ্তানি বাণিজ্য যতটা সম্প্রসারিত হবে আশা করা হয়েছিল, ততটা যে হয়নি, রপ্তানি অর্থের (Export Finance) আপেক্ষিক স্বল্পতা তার একটি কারণ সন্দেহ নেই।

ভারতে রপ্তানি বাজার আশানুরূপ সম্প্রসারিত হচ্ছে না, বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ এ জন্যই আশানুরূপ বাড়ছে না। শুধু রপ্তানি শিল্পে উৎপাদন বাড়ানোই নয়—উৎপাদিত সামগ্রীর বাজার সম্প্রসারিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলিও তাদের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত করছে; এক্ষেত্রে উন্নতিকামী দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়া স্বাভাবিক। চা রপ্তানির ক্ষেত্রে সিংহল এখন ভারতের প্রধান প্রতিযোগী; পাটজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে পাকিস্তানও যথেষ্ট উন্নতি করছে। তাছাড়া অনেক দেশেই পাটজাত সামগ্রীর বিকল্প জিনিস তৈরির চেষ্টা চলছে। রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত করার জন্য ভারতের উচিত চিরাচরিত রপ্তানি সামগ্রীগুলির (Traditional export items) গুণগত উৎকর্ষ উন্নত করা এবং তার উপযুক্ত প্রচার চালানো; তাছাড়া নতুন
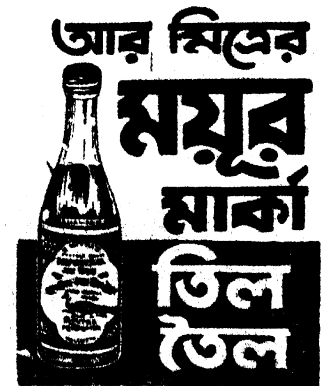
ধরনের রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী (Non-traditional export items) উৎপাদন করে এবং বিদেশে সেগুলির বাজার সম্প্রসারিত করার চেষ্টা চালানো দরকার। ভারতের বৈদেশিক মিশনগুলি এ ব্যাপারে মোটেই তৎপর নয়। বিদেশে ভারতীয় সামগ্রীর প্রচার চালানো এবং অন্যান্য দেশের অনুরূপ সামগ্রীর তুলনায় ভারতীয় সামগ্রী যে মোটেই খারাপ নয়, বরং বহু ক্ষেত্রে ভাল, তার উপযুক্ত প্রচার কাজ ভারতের বৈদেশিক মিশনগুলি ঠিকভাবে চালাতে পারছে না। ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের এ ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাত্রা যখন বেড়েই যাচ্ছে, তখন ভারত সরকারের উচিত আরও নতুন ধরনের জিনিস যাতে বিদেশে রপ্তানি করা যায় সেই প্রচেষ্টাকে জোরদার করা। চিরাচরিত জিনিসের বাইরে নতুন ধরনের জিনিসের রপ্তানি বাড়াতে পারলে অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। শুধু একই ধরনের জিনিসের রপ্তানির উপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। কারণ, রপ্তানি বাজার স্থায়ী নাও হতে পারে। তাই রপ্তানি বাণিজ্যে বিচিত্রতার প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকার অবশ্য অনেক দূর এগিয়েছেন; কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ এখনও এগোয়নি।

কোনও দেশ যখন উন্নতির পথে এগোয় তখন বৈদেশিক সামগ্রী, বিশেষ করে ভোগ-সামগ্রী ব্যবহার করার প্রবণতা দেশবাসীর মধ্যে বাড়ে। তার ফলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বহু পরিমাণে বাইরে চলে যায়। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার জন্য ভোগ-সামগ্রী আমদানির পরিমাণ কমানো প্রয়োজন সন্দেহ নেই: কিন্তু এটাই একমাত্র দাওয়াই নয়। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার একটি উপায় হল আমদানির বিকল্প জিনিস (import-competing goods) আরও বেশি করে উৎপাদন করা। কিন্তু আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদন করতে গেলেও বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয় এবং এজন্যও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। আমদানির বিকল্প জিনিস তো বেশি করে উৎপাদন করতেই হবে: কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো। এবং নতুন নতুন জিনিসের জন্য রপ্তানি বাজার গড়ে তোলা। রপ্তানি যোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার জন্য উৎপাদন-খরচ কমাবার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে এজন্য ভারত সরকারের পরোক্ষ কর-কাঠামোর সংস্কার করা উচিত।

বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের সমস্যা কোন উন্নতিশীল দেশের একক সমস্যা নয়। এজন্য সব উন্নতিকামী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সংহতি থাকা দরকার। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যতটা সম্ভব সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা দরকার যাতে উন্নতিকামী দেশগুলির উপর উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক আধিপত্য কমানো যায়। শুধু বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যত বাড়বে, ততই সেই ঋণ শোধ দেওয়া এবং ঋণের উপর সুদ দেওয়ার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বাড়বে। যতটা বৈদেশিক মূলধন পাওয়া যায় তা এমনভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে তার ফলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ বাড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মূলধনের চেয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভর করা অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত।

সুব্রত গুপ্ত

॥ পঁচিশ ॥

সাওতাই চম্পার সেই যে প্রভাত সেও প্রেমে পড়েছে। তারও সেই একই সমস্যা। গুরুজনের আশীর্বাদ। সেখানেও অসবর্ণ। তবে সেখানে জীবিকা নিয়ে বিবাহসংশয় নয়। প্রভাত এখন রেলওয়ে অফিসার। ওর বাগ্‌দত্তা সুলেখাও অধ্যাপনা করে। একটি স্কুলে।

প্রভাতের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে যায়। রেলের পাস নিয়ে ও মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। তদ্বির করতে। যাতে কলকাতায় বদলি হয়।

"শুনেছিলুম তোমরা নাকি ইলোপ করবে। কই, করলে না তো?" প্রভাত বলে ফুর্তি করে।

"কোথায় শুনলে? আমি তো বলিনি।" রত্ন অপ্রতিভ হয়।

"ভায়া হে, দেয়ালেরও কান আছে। তুমি গোপন করলে কী হবে, তোমার সীক্রেট আমাদের কারো অজানা নয়।" প্রভাত হাসে।

"বম্বে যাবার প্ল্যানও তোমার জানতুম ছিল?" রত্ন হতভম্ব হয়ে বলে।

"বম্বে যাচ্ছিলে নাকি? না, ওটা তো আমার জানা ছিল না।" প্রভাত কবুল করে।

"সেটা ভেস্তে গেছে। এখন আমাদের আর কোনো প্ল্যান নেই। কী যে করি বুঝতে পারছিনে। যদি জানতুম যে নির্ঘাত সফল হব তা হলে বিলেত যাবার প্ল্যান করতুম। কিন্তু তুমি তো জানো পেয়ালা আর ঠোঁটের মাঝখানে অনেকগুলি ফসকানি। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে জ্যোতিদার মতো একজন না থাকলে আমাদের সাহসে কুলোয় না। ওদিকে জ্যোতিদাও প্রেমে পড়ে বসে আছে।" রত্ন সে বৃত্তান্ত শোনায়।

সমস্ত শুনে প্রভাত বলে, "ওসব কোনো কাজের কথা নয়। তোমরা দুজন দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। এ সমাজে এতরকম ফাঁদ আছে আমিও কি জানতুম? একবার ভেবে দেখ দেখি আমার দশা। সুলেখা কুমারী মেয়ে, স্বাবলম্বী। আর আমি তো পদস্থ অফিসার। আমাদের তো এখনি বিয়ে হওয়া উচিত, কিন্তু যেমন দেখছি বছর ঘুরে গেলেও হবে না। ওকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। এখন তোমার মতো আমিও ভাবছি আমরাও ইলোপ করব।"

"ইলোপ করবে?" রত্ন উত্তেজিত হয়ে বলে।

"তবে লুকিয়ে নয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মোলাকাত করে। যাতে নারীহরণের অভিযোগ না ওঠে।" প্রভাত হুঁশিয়ার মানুষ।

"আমার বেলাও কি ওরকম অভিযোগ উঠত?" রত্ন শিউরে ওঠে।

"তোমার বেলা", প্রভাত আশ্বাস দিয়ে বলে, "খুব সম্ভব উঠত না। কেলেঙ্কারির ভয়ে বেগমপুরের বাবুরা ওটা চেপে যেতেন। চুপি চুপি ছেলের আরেকটি বিয়ে দিতেন। কিন্তু এ যা বলছি রেঙ্গুনের কথা স্মরণ করে বলছি। ইতিমধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। একটি শিশুর আবির্ভাব হয়েছে। এখন যশোবাবু কী করবেন না করবেন তা জোর করে বলা শক্ত। কামাক্ষ তো মনে করে ও'র জয়লাভ এখন সম্পূর্ণ। পারুলবোন কোনো মতেই জয়কে পরাজয়ে পরিণত করতে পারবে না। এখন সমস্ত প্রশ্নটা নতুন করে ভাবতে হবে।"

রত্নও ক্রমে ক্রমে সেই ধারণার অভিমুখীন হচ্ছিল। নতুন করে ভাবার একটি কারণ

গৌরীর মাতৃত্ব। আর-একটি জ্যোতিষ্কের প্রস্থান। দায় গেল বেড়ে, দায় বইবার লোক গেল কমে। রত্নর একার কাঁধে ডবল বোঝা।

"নতুন করে ভাবতে আমারও মন চায়।" রত্ন ওর বন্ধুর সঙ্গে একমত হয়। "কিন্তু নতুন করে ভাবলেও সেই পুরোনো সত্য তো তেমনি থেকে যায়। আমরা মধ্যযুগের নাইট আর লেডী। আমিও পাশ কাটাতে পারিনে, সেও কি পারে? বিবাহ নয়, কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড়ো। সেই জন্যেই একে এত মহত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। কারো আর গ নে। উপায় একটা না হোক আর-একটা খুঁজে বার করতে হবে। ইলোপমেন্ট না হোক আর কিছু। আজ না হোক এক বছর বাদে।"

প্রভাত ভেবে চিন্তে বলে, "পারুলের যতদিন বাপের বাড়িতে রয়েছে ততদিন ওর জন্যে ভাবনা নেই। যেদিন বেগমপুরে ফিরে যাবে সেইদিন ভাবনার প্রত্যাবর্তন হবে। এবার ছেলে হয়েছে। পরের বার মেয়ে হবে। অন্তত তার উদ্যোগপর্ব শুরু হবে। আবার সেই জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব।"

রত্ন এর থেকে এই বোঝে যে আর বেশী দিন সবুর করা উচিত নয়। "আজ না হোক এক বছর বাদে" বললে সময়সীমা পার হয়ে যায়। যেমন করে হোক বেগমপুরে ফিরে যাবার আগেই গৌরীকে উদ্ধার করতে হবে। নইলে বড্ড বেশী দেরি হয়ে যাবে।

"তাহলে তুমিই বল আমাদের কী করা উচিত।" রত্ন বন্ধুর পরামর্শ চায়।

"বিপদে ফেললে। কখনো তো ভেবে দেখিনি, ভাই।" প্রভাত পাশ কাটায়।

"সফল হলো বিলেতযাত্রা? সামনের জুলাই কি অগাস্টে?" রত্ন প্রশ্ন করে।

"বিফল হলে?" প্রভাত পাল্টা সুধোয়।

"সেইখানেই তো সংকট। তা হলে আমি কি দু দিক থেকে হেরে যাব?" রত্ন আক্ষেপের স্বরে বলে। গৌরীও কি হেরে যাবে? এতকাল লড়াই করার পরেও? হেরে গেলে ও কি বাঁচবে!"

"কেন, হেরে যাওয়া মানে কি মরে যাওয়া?" প্রভাত বলে। তারপর গাঢ়কণ্ঠে বলে, "রানু দিদি বেঁচে আছে। আমিও।"

"কিন্তু গৌরী যে অন্য ধাতুতে গড়া।" রত্ন তর্ক করে।

"হতে পারে। কিন্তু এতকাল বেঁচে আছে যখন তখন আরো কিছুকাল বাঁচবে। মা হয়েছে। মাতৃত্বের সাধ মিটিয়ে নেবে। প্রেমের সাধই কি একমাত্র সাধ, রতন? সব নারীর জীবনে কি প্রেমের সাধ মেটে? তবে অধিকাংশের জীবনে মাতৃত্বের সাধ মেটে। সেই জন্যে ওরা হেরে গিয়েও বেঁচে থাকে।" প্রভাত কারুণ্যের সঙ্গে বলে।

"কিন্তু হেরে যাওয়াটা যে ভালো নয়। যে সমাজে যত বেশী পরাজিতা নারী, সে সমাজ যে তত বেশী পরাজিত। সে দেশ

যে কিছুতেই জয়ী হতে পারে না। প্রশ্নটা কি নিছক ব্যক্তিগত? সমষ্টির এর জন্যে মাথাব্যথা নেই?" রঞ্জু সীরিয়াস হয়ে বলে।

"আমার সঙ্গে কুস্তি করে কী হবে, ভাই? সাধ্য থাকে তো এদেশের গুরুজন-দের সঙ্গে কর। আমি প্রতিবারেই ক্ষতবিক্ষত। তবে এবার আমি অত সহজে হাল ছাড়ছিনে। পুলিস নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করব সুলেখাকে। দেখি কেমন করে বন্দী করে রাখতে পারে!" প্রভাত তার প্ল্যান ফাঁস করে দেয়।

"তুমি আমাকে অবাক করলে, প্রভাত। যে মেয়ে স্কুলে পড়ায় তাকে বন্দী করে রাখবেই বা কে? স্কুলে যাবার নাম করে সে কি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসতে পারে না? অমন একখানা সীন করার কী দরকার?" রঞ্জুর মুখে হাসি দেখা দেয়।

"না, না, চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আমি আমার শক্তি প্রমাণ করতে চাই। ওরা বেঁধে রাখবে, আমি ছাড়িয়ে নেব। এর নাম নাটক নয়, এর নাম বীরত্ব।" প্রভাত গোঁফে তা দেয়।

"তা হলে যে বলছিলে তোমরাও ইলোপ করবে?" রঞ্জু চেপে ধরে।

"এটাও কি ইলোপমেন্ট নয়? তোমাদেরটা চোরের মতো। আমাদেরটা ডাকাতের মতো। পুলিস নিয়ে আইন অনুসারে ডাকাতি।" প্রভাত এর পর একটু নরম হয়ে বলে, "সবুর করলে এত কষ্টের দরকার হবে না, ভাই। সমাজ দিন দিন বদলে যাচ্ছে। অসবর্ণ বিবাহ শুনে লোকে শক পায় না। তবে সামাজিক অনুষ্ঠান এখনো দূরেই। আমরা সিভিল ম্যারেজই করব। তোমাকেও যোগ দিতে হবে। তুমিও সাক্ষী হবে। কেমন?"

"নিশ্চয় সাক্ষী হব, যদি দেশে ততদিন থাকি।" রঞ্জু সানন্দে কথা দেয়। "আর যদি তার আগে বিদেশে চলে যাই তবে সাদর অভিনন্দন জানাব।"

"তা হলে সেই কথা রইল।" প্রভাত বন্ধুর হাতে হাত রেখে বলে, "সাত ভাই চম্পার সবাইকে প্রত্যাশা করব। পারুল-বোনকেও। কিন্তু সেটা হয়তো সম্ভব হবে না।"

রঞ্জু তা শুনে ব্যথা পায়। "সেটা যদি সম্ভব না হয় তবে আমার সাধনা ব্যর্থ। আগে ভাগে কেন আমি মেনে নিতে যাব যে আমার সামনে আছে ব্যর্থতা?"

প্রভাতের কাহিনী গোরীকে জানায়। ও মেয়ে জ্যোতির বেলা যেমন তিক্ত হয়েছিল প্রভাতের বেলা তেমনি মধুর হয়।

"চমৎকার খবর!" গোরী লেখে। "প্রভাতই পুরুষের মতো পুরুষ। সেই জন্যেই বরাবর ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। সুলেখাকে ও হরণ করে নিয়ে যাবে বীরের মতো। সঙ্গে অবশ্য একজন সেপাই থাকবে। বীরদের সঙ্গেও কি সৈনিক থাকে না? চমৎকার, চমৎকার দৃশ্য। মহাভারতে অমন অনেক উপাখ্যান আছে। উষাহরণ, রুক্মিণীহরণ, সুভদ্রাহরণ। একালের মহাভারত যখন লেখা হবে তাতেও থাকবে সুলেখাহরণ। তোমরা সাত ভাই চম্পা সাতজনেই যদি প্রভাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তা হলে মহাভারতের উপাদান সৃষ্টি করতে। প্রত্যেকেই এক-একটি বীর। প্রত্যেকেরই এক-একটি বীরাঙ্গনা।"

"এক ভাই চম্পা যদি পারুলহরণ করে তা হলে কি সেটা রূপকথা সম্মত হবে?" রঞ্জু জিজ্ঞাসা করে চিঠিতে। "বিশেষত ওই কোটালের সাহায্যে পারুলহরণ?"

"না। ওটা ভালো নয়। তুই একদিন পুলিস ডেকে এনে আমাকে ধরে নিয়ে যাবি আমার বাপের বাড়ি থেকে? এত নিষ্ঠুর কি তুই হবি? প্রভাতকে বলিস সুলেখার গুরুজনের মনে দাগা না দিতে। ওঁরা যে একদিন প্রভাতেরও গুরুজন হবেন। কত ভালোবাসবেন ওকে। আইন আদালতকে আমি যমের মতো ডরাই। বেচারি সুলেখার জন্যে আমি ভীত। প্রভাত ছেলেটা এমন গোঁয়ার! বলে কী না পুলিস ডেকে নিয়ে যাবে ভদ্রলোকের বাড়ি হানা দিতে। না, না, হরণ-টরণ ওসব কলিযুগে চলতে পারে না। চলত দ্বাপর যুগে। ত্রেতাযুগে। সত্যযুগে। সেকালে সবাই সত্য কথা বলত। একালে সত্য কথা বলে কজন!" গোরী যুক্তি দেখায়।

তা হলে আর-একখানা মহাভারত হয় না। তা হলে হয় কী? আর-একটি চম্পা পারুল রূপকথা? সেটাও রয় গোষ্ঠীর বেলা হলো কোথায়! ওরা কেমন করে একদিন নাইট ও লেডী হয়ে গেল। যা নিয়ে মধ্যযুগের রোমান্স। এটা মধ্যযুগ নয়। সেইখানেই তো বাধছে।

না, শুধু সেইখানেই নয়। যুগটা

॥ ছাব্বিশ ॥

আধুনিক। এ যুগের তরুণ তরুণীরা নতুন একটি সম্পর্কের আস্বাদন পেয়েছে। তার নাম বন্ধু বন্ধুনী সম্পর্ক। তরুণের সঙ্গে যেমন তরুণের বন্ধুতা তরুণীরও তেমনি। ওরা চম্পা ও পারুলের মতো ভাইবোনও নয়। নাইট আর লেডীর মতো প্রেমিক-প্রেমিকাও নয়। সম্ভবপর স্বামী স্ত্রীও নয়। ওরা নিতান্তই বন্ধু বন্ধুনী।

এ রকম একটা সম্পর্ক রয় কোনোদিন প্রত্যাশা করেনি। এটা আপনা আপনি পাতানো হয়ে গেছে তার এক বছরের সিনিয়র সহপাঠিনী সেবা দাশগুপ্তর সঙ্গে। গোড়ার দিকে সেবাকে সে গতানুগতিক ধারায় "সেবাদি" বলে ডাকতে শুরু করেছিল, কিন্তু সেবার তাতে আপত্তি। তা হলে কি "মিস

দাশগুপ্ত?" না, সেটাও নয়। সেটা তো নেহাত ফর্মাল। তা হলে কী? শুধুমাত্র "সেবা" হাঁ, তাই। তা হলে আর "আপনি" কেন? অগত্যা "তুমি।"

পরস্পরের কাছে বই ধার করা, নোট ধার করা থেকেই আলাপের সূত্রপাত। সেই সূত্রেই সেবাদের ওখানে যাওয়া আসা। খেতে বললে খাওয়া। বুভুক্ষু হস্টেলবাসীর পক্ষে সেটাও একটা আকর্ষণ। নয়তো রূপের আকর্ষণ এক্ষেত্রে ছিল না। সেবার মুখে চোখে যা ছিল তা একপ্রকার অন্তর্দীপ্তি। সে যেন শ্যামবর্ণ একটি ইলেকট্রিক বালব। যেমন স্নিগ্ধ তেমনি ভাস্বর।

অধ্যাপক বুধকুমার দাশগুপ্তকে দেখলে ভক্তি হয়। অধ্যয়নকক্ষে তন্ময় হয়ে কী সব লিখে যাচ্ছেন, যতবার দেখা হয় ততবার ওই একই চিত্র। মিনিট দশেক পরে আবিষ্কার করেন যে রত্ন বলে একটি ছাত্র তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় আছে।

"ওঃ হাঁ, তুমি!" অধ্যাপক শশব্যস্ত হয়ে বলেন, "পরীক্ষা দিতে এলাহাবাদ গেছলে। কেমন দিলে? কী কী প্রশ্ন এসেছিল? কী লিখলে তার উত্তরে? হিসেব করে দেখেছ কত মার্ক আন্দাজ কোনটাতে পাবে?"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলার পর তিনি আবার তাঁর লেখার খাতায় ডুব দেন। এক কান দিয়ে যা ঢোকে আরেক কান দিয়ে তা বেরিয়ে যায়।

"শুনেলুম। শুনেলুম। সমস্ত শুনেলুম। তা তুমি ভালোই করেছ। ভালোই করবে। এবার আর কী? এবার খাও দাও ফুর্তি কর। কিছু দিনের জন্যে লেখাপড়ার কাজ তুলে রেখে টেনিস ব্যাডমিন্টন টেবল টেনিস খেলবে। যাতে তোমার শরীরের ক্ষতি পুষিয়ে যায়। দেখছ তো এত খাটুনি সত্ত্বেও আমার শরীর কেমন মজবুত। এখনো রোজ ডাম্বেল ভাঁজি কিনা। স্বামীজী বলতেন ফুটবল খেললে ভগবানকে আরো আগে পাওয়া যায়। তোমার বয়সে আমি রোজ ঘাড় ধরে ফুটবল খেলেছি। এখন কি আর সে বয়স আছে?" তিনি তড়িৎগতিতে বলে যান। আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকান।

সেবার মার সঙ্গে ইতিমধ্যে মাসিমা পাতানো হয়েছিল। তিনি পড়াশুনায় বেশী দূর এগোবার সুযোগ পাননি। তার আগেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। সেকালে একবার বিয়ে হয়ে গেলে তারপরে আর সরস্বতীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকত না। তাঁর দৌড় ওই মাসিকপত্র আর নাটক উপন্যাস পর্যন্ত। মাসিকপত্রে রত্নর লেখা থাকে এটা জানেন বলেই ওকে অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় অতিরিক্ত আদর করে খাওয়ান।

"তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, মা। রতন একদিন তোমাকে নিয়েও লিখবে। সব লেখকই চেনা জানা মানুষের চেহারা আঁকে। আমি তো সব সময় সতর্ক, যাতে রতন আমার উল্টো পিঠটা দেখতে না পায়।" সেবা রসিকতা করে।

"তোর আবার উল্টো পিঠ কী? একটাই তো পিঠ।" ওর মা হাসেন।

"কেন, আমি কি চাঁদপানা নই? ছেলেদের চোখে আমরা মেয়েরা ও ছাড়া আর কী? তবে রতন খুব ভালো ছেলে। কারো দিকে কোনোদিন অমন চোখে তাকায়নি।" সেবা সার্টিফিকেট দেয়।

"তা হলে ওকে আরো একখানা প্যানকেক দিতে হয়।" মাসিমা বলেন। দেবার বেলা একখানার জায়গায় দু' খানা বাড়িয়ে দেন।

"থাক, থাক। সর্বনাশ। আমি ভালো ছেলে হতে পারি, কিন্তু খাইয়ে বলে আমার নামডাক নেই, মাসিমা।" রত্ন কিন্তু খায় লোভে পড়ে।

সে অনেক সময় প্রলোভন বোধ করে সেবাকে ওর জীবনের আখ্যান খুলে বলতে। যাতে ওকে অকারণে ভালো ছেলে বলে আপ্যায়ন না করা হয়। ও যা ও তাই। সব শুনে যদি ওকে ভাগিয়ে দেওয়া হয় তাও সই, কিন্তু এই ভ্রম ভালো নয়।

একদিন ও সাহসে বুক বেঁধে সেবাকে বলেই ফেলে ওর ইতিহাস। সেবা তো কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না।

"আমার সহানুভূতি আছে, এইটুকু জানালে যদি সুখী হও তা হলে এইটুকুই বলব। বাকীটা পরে একদিন।" সেবা মৌন হয়।

"কেন, আজ বললে ক্ষতি কী? আমার কাছে তোমার মতামতের যথেষ্ট ওজন আছে। তুমি আমার বন্ধু।" বন্ধু কথাটার উপর জোর দেয় রত্ন।

"এর হ্যাপি এণ্ডিং আশা করা যায় না, রতন। কারো পক্ষে হ্যাপি হবে না। গৌরীর স্বামীর পক্ষে তো নয়ই, ছেলের পক্ষে তো নয়ই, গৌরীর পক্ষেও না, তোমার পক্ষেও না। তুমি মনে করছ চারজনের মধ্যে দুজন তো সুখী হবে। না, একজনও না।" সেবা সবজান্তার মতো বলে।

এবার মৌন হবার পালা রত্নর। সেবার ওটা কি ভবিষ্যদ্বাণী! ও কি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে পথের শেষে চারজনের মধ্যে চারজনেই অসুখী হবে?

"কিন্তু, সেবা, জীবনে সুখটাই কি পরম পুরুষার্থ? স্বাধীনতা নয়? প্রেম নয়?" রত্ন অবশেষে কথা খুঁজে পায়। "স্বাধীনতার জন্যে সুখ বিসর্জন দেওয়া, প্রেমের জন্যে দুঃখ বরণ করা এসব কি পুঁথিতেই লেখা থাকবে? জীবনে সত্য হবে না? আমার কথা যদি বল আমি এই ত্রিকোণের মধ্যে স্বেচ্ছায় আসিনি। এখন তো দেখছি চতুষ্কোণ। কিন্তু এসে পড়েছি যখন, তখন স্বেচ্ছায় সরে যেতে অক্ষম। যেদিন বুঝব যে আমার থাকা না থাকা দুই সমান, আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ, সেদিন ছুটি চাইব। তার আগে নয়।"

সেবা কী ভেবে বলে, "মনে রেখো, স্বাধীনতাতেই স্বাধীনতার শেষ।"

"আর ভালোবাসার?" আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে রত্ন।

"ভালোবাসাতেই ভালোবাসার শেষ।" সেবা গম্ভীরভাবে বলে।

রত্ন ধরতে পারে না। অনুধাবনের চেষ্টা করে।

"কেন, এ তো সহজবোধ্য। ব্যাখ্যার দরকার করে না।" সেবা বিশদ করে বলে, "ইচ্ছা করলে তোমরা সারাজীবন ভালোবেসে যেতে পারো, কিন্তু বিয়ের কথা ভেবো না। বিয়ের চিন্তা ছেড়ে দিলে স্বাধীন হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া যেমন তোমার পক্ষে তেমনি ওঁর পক্ষেও সম্ভব। একালের মেয়েদের জন্যে সব জানালা দরজা খুলে যাচ্ছে। কিন্তু বিবাহিতা হয়ে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদটা বাদ। ওটা খুলে গেলেও ওই পর্যন্ত গিয়ে থামতে হয়। ছেলের মুখ চেয়ে।"

রত্ন এবার বুঝতে পেরে স্তব্ধ হয়ে থাকে। গৌরীকে ভালোবেসে যাবে, কিন্তু সে ভালোবাসা হবে পরকীয়া বা অশরীরী দুটোর একটা। এ জীবনে গৌরীর সঙ্গে ঘর করতে পারবে না। গৌরী ওর সন্তানের মা হবে না। কিন্তু গৌরীর স্বাধীনতার বাসনা পূর্ণ হবে।

"ভালোবাসাতেই ভালোবাসার শেষ? স্বাধীনতাতেই স্বাধীনতার শেষ?" রত্ন পুনরুক্তি করে। "গৌরীর দিক থেকে এই হয়তো শ্রেয়, কিন্তু আমার দিক থেকে নয়। সেবা, তুমি নারী বলে নারীর দিকটাই দেখছ, পুরুষেরও একটা দিক আছে সেটা দেখতে পাচ্ছ না। না, নারীর দিকটাও নয়। শিশুর দিকটাই দেখছ। যেন সবার উপরে শিশু সত্য তাহার উপরে নাই।"

"কী করা যায়! শিশু যখন ছিল না তখন একরকম ছিল। এখন যে অন্যরকম। ওর দিকটাও তো দেখতে হবে।" সেবা এইখানে দাঁড়ি টানে।

অত পড়াশুনা করলে কী হবে, সেবাও সংস্কারবদ্ধ ব্রাহ্মমহিলা। বিবাহবিচ্ছেদ ওর

চঞ্চল্। রঞ্জ ওর পরামর্শ গ্রহণ করে না, কিন্তু ওর পিতার উপদেশ অনুসারে খেলা-ধুলোয় মেতে যায়। উৎপল হয় ওর খেলার সাথী।

অনেক দিন মালাদির সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়নি। এবার দু'জনে মিলে কার্নিভালে যায়, সঙ্গে অবশ্য মালাদির এক ভাই। ইতিমধ্যে রঞ্জ একটা স্যুট করিয়েছিল ইণ্টারভিউর জন্যে। সেটা শীতকালে পরতে বেশ আরামের। কার্নিভালে স্যুট পরা রঞ্জকে মালার সঙ্গে দেখে বন্ধুজনের চোখে দুষ্টু হাসি। রঞ্জও শেষকালে প্রেমে পড়ল। উৎপল তো সরাসরি অভিনন্দন জানায়। সেও ছিল কার্নিভালের দর্শক।

"ভুল করেছ, বন্ধু।" রঞ্জ বলে। "উনি আমার দিদি হন।"

"ও: তাই নাকি? আপন দিদি?" উৎপল সন্দিগ্ধ হয়।

"না, দূর সম্পর্কের। আলাপ করবে নাকি?" রঞ্জ ডেকে নিয়ে আলাপ করিয়ে দেয় মালাদির সঙ্গে।

ইরাবতী মান্নাও ছিলেন। মালাদির সঙ্গে তাঁরও আলাপ হলো। সবাই মিলে টো টো করা গেল। অংশ নেওয়া গেল অনেকরকম খেলায়। দেখা গেল মিস মিত্রও মিস মান্নার চেয়ে হইহুল্লোড়ে কম যান না। এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ।

বেচারি মিস সিংহরায়! তার জন্যে দুঃখ হয় রঞ্জর। এমনিতেই পরাধীন। তার উপর মা হয়ে অবধি যেটুকু বা স্বাধীনতা ছিল সেটুকুও গেছে। তার সমবয়সিনী মেয়েরা যখন প্রাণ খুলে ফুর্তি করছে সে তখন বাচ্চা নিয়ে পড়ে আছে।

বাড়ি ফিরে মালাদি আবার সেই অবদমিত হিন্দু বিধবা। মার ভয়ে ভিজেবেড়াল। আমেরিকান কার্নিভালে যোগদানটা যেন প্রক্ষিপ্ত।

পড়াশুনার চাপ ছিল না। যত রাজ্যের হইচই করে দিন কেটে যায়। দেখতে দেখতে গরমের বন্ধ এসে পড়ে। রঞ্জ কুষ্টিয়ায় বাবার কাছে চলে যায়। সেখানে সিনেমা বা থিয়েটার নেই, কার্নিভাল বা পিকনিক নেই। কিন্তু গোরাই নদী তো আছে। তার জলে রোজ সাঁতার কেটে তৃপ্তি পায়।

হঠাৎ একদিন বজ্রপাত। কাগজে মাত্র তিন-জনের নাম বেরিয়েছে। তাদের নেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। আরো দু'জনকেও নেওয়া হবে, তারা মনোনীত। রঞ্জর নাম নেই। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। আরো বড়ো শক পায় যখন প্রতিযোগীদের তালিকা আসে। সে তিনজনের একজন হয়নি বটে, কিন্তু পাঁচজনের একজন হয়েছে। তার প্রাপ্য দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুকে।

(ক্রমশ)

ঘ্রাণশক্তি।

অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমরা গন্ধ শুঁকি। গোলাপের মনোহারী সুবাসের সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত গন্ধের পার্থক্য, বিষাক্ত গ্যাস অথবা বাঘের গায়ের উৎকট গন্ধের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে, সেটা বুঝে উঠতে আমাদের এক মুহূর্তও সময় লাগে না। ঘ্রাণ-অনুভূতির চিহ্নিতকরণে নাসা-রন্ধ্রের বিশেষ এক ধরনের কোষ যে সাহায্য করে সে কথাও এখন জানা হয়ে গেছে। কিন্তু কোন এক ধরনের গন্ধের যথাযথ পার্থক্যটি বুঝে নিতে ঐ কোষ কীভাবে সাহায্য করে, বিজ্ঞানীরা আজও তার যথাযথ উত্তর যোগাতে সমর্থ হন নি। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে সেই রহস্যেরই সন্ধান দেবার চেষ্টা করেছেন স্টকহোম-এর রয়েল ভেটারিনারি কলেজের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড জি. আর. অটোসন।

মানুষ নয়, শুধুমাত্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যেই কোন বস্তু অথবা প্রাণীর স্বরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে অনেক বেশি দক্ষ সম্ভবত কুকুর। এ ব্যাপারে ওদের ক্ষমতার তুলনা মেলা ভার। কলকাতা পুলিসের আততায়ী সন্ধানকারী কুকুরের কত গল্পই তো আপনারা শুনেছেন। বহুদূরের কোন এক নির্জন স্থান থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একখণ্ড কাপড়ের শুধু গন্ধ শুঁকে অকুস্থলটি আবিষ্কার করা, অথবা নির্দিষ্ট খুনীর সন্ধান যোগান সাধারণের কাছে যেন অলৌকিক ঘটনা। যাঁরা শিকারী, তাঁরাও জানেন, ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা শিকারকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে কুকুরের পারদর্শিতার যেন তুলনাই হয় না। এবং শুধু কুকুরই নয়, আরও কিছু কিছু প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা এ ব্যাপারে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। যেমন ধরুন, যাযাবর-মথ। ওদের পুরুষগুলির ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, শুধু গন্ধ শুঁকেই কয়েক মাইল দূর থেকে ওরা স্ত্রী-মথের উপস্থিতির সঠিক স্থানটি বুঝে নিতে পারে। কোন কোন মানুষেরও গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা রীতিমত বিস্ময়কর। এবং এ ব্যাপারে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বেশ কিছু চটকদার গল্পও প্রচলিত রয়েছে।

বস্তুত এ পর্যন্ত শারীর বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের উপরই মানুষের অনুসন্ধিৎসা যেন চিরায়তভাবে কাজ করে গেছে। রক্তসংবহন, শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্যকরণ, এমন কি দৃষ্টি-শক্তির মূল তত্ত্ব আবিষ্কার, আজকের দিনে এরা সমস্তই পুরনো সমাচার। এবং তুলনায় প্রাণীর ঘ্রাণশক্তির কার্যকারণের সঠিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। এ নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে মাত্র কুড়ি বছর আগে। বলতে গেলে লর্ড আদ্রিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রাণী রহস্যের

গন্ধবাহ সিলিয়া যেন অদ্ভুত দুটি পর্দা। রাসায়নিক সংবেদনশীলতা যার অন্যতম ধর্ম। প্রতিটি পর্দার ক্ষেত্রফল ৩০ থেকে ৫০ বর্গ সেন্টিমিটারের মত

এই প্রথম দিকটির উপর সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন। তারপর থেকেই নানা রকম তত্ত্ব এবং তথ্যের আবির্ভাব। বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী হলেও ঐ সমস্ত তত্ত্ব এবং তথ্য ঘ্রাণশক্তির রহস্য সম্পর্কে নির্ভর যোগ্য উত্তর যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

আমাদের নাসারন্ধ্রের ভেতরে কোষকলার আস্তরণের নীচে বিশেষ এক ধরনের কোষ আছে যাদের বলা হয় 'অলফ্যাকটোরি সেল' বা ঘ্রাণশক্তিবাহ কোষ। অতি সূক্ষ্ম এই কোষই গন্ধসামগ্রীকে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে। সেই সঙ্গে গন্ধের মাত্রা এবং কী ধরনের বস্তু থেকে তার উৎপত্তি, তাকেও। তারপর সংগৃহীত ঐ তথ্য সে স্নায়ুকোষের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘ্রাণশক্তিবাহ কোষ আসলে এক ধরনের ডিম্বাকৃতি স্নায়ু কোষ। এর প্রান্তীয় ভাগ থেকে দণ্ডের মত একটি অংশ বেরিয়ে বাইরের আবরণীর সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানটায় দণ্ডের ডগাটি একটি বৃত্তাকার থলের মত খানিকটা বেশি জায়গা জুড়ে বিরাজ করে। বৃত্তীয় অংশের নাম অলফ্যাকটোরি ভেসিকল। এখান থেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তন্তুর মত কতকগুলি অংশ নির্গত হয়ে গিয়ে মিশেছে শ্লৈষ্মিক পর্দার সঙ্গে। এই তন্তুর নাম সিলিয়া। কোষটির আর একটি প্রান্ত শুঁচলো হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে। এর কাজ কোষটির গন্ধ-জনিত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া। গন্ধশক্তিবাহ ঐ কোষগুলিকে ঘিরে আর এক ধরনের কোষ অবস্থান করে। যাদের ওপর থেকে কতকটা আঙ্গুলের মত মনে হয়। এক সময়ে অনেকের ধারণা ছিল, সম্ভবত ভারসাম্য বজায় রাখাই তাদের মুখ্য ভূমিকা। তবে পরবর্তীকালে দেখা যায় ওদের বিপাকীয় মাত্রা অনেক বেশি। এর অর্থ, নিশ্চয় ঐ কোষগুলি সব সময় কিছু না কিছু কাজ করে থাকে। তা যদি না হত অত বেশি বিপাকীয় কার্যাবলী ওদের মধ্যে দেখা যেত না। কেউ কেউ মনে করে ঘ্রাণ-শক্তিবাহ কোষের মধ্যে অতিরিক্ত গন্ধদ্রব্যের সমাবেশ ঘটলে ঐ কোষগুলি সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়।

ঘ্রাণশক্তিবাহ কোষের সবচাইতে বিস্ময়কর অংশ তার ঐ তন্তু। রাসায়নিক বস্তুর ক্ষেত্রে ওরা প্রচণ্ড রকমের সংবেদনশীল। শ্লৈষ্মিক পর্দার উপর তারা বিস্তৃত থাকে। যে কোন গন্ধবস্তু সেখানে উপস্থিত হলেই জালের মত ছড়িয়ে থাকা ঐ তন্তুর মধ্যে তা ধরা পড়ে যায়। এবং গন্ধদ্রব্যের যথাযথ অনুভূতির প্রাথমিক কর্মকাণ্ড যে সেখানেই ঘটে থাকে এ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রমাণও পাওয়া গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সিলিয়া নামে ঐ তন্তু এতই সূক্ষ্ম যে, গন্ধসামগ্রীর সান্নিধ্যে তার ভেতরকার রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যের অনুভূতি উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিবর্তিত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে সত্যিকারের বোধ সৃষ্টি করার ব্যাপারে কীভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ চালান খুবই শক্ত। এবং জীবরসায়নবিদদের কাছে সবচাইতে বড় প্রশ্ন এটাই।

সিলিয়ার সবচাইতে বড় কাজ প্রতিটি ঘ্রাণশক্তিবাহ কোষকে যত বেশি সম্ভব গন্ধদ্রব্য সম্পর্কে সচেতন করা। কোন কোষের সিলিয়া যত বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকবে ঐ কোষের গন্ধ সম্পর্কিত সচেতনতাও সেই সঙ্গে বেড়ে যাবে। অনেকটা আলো সংগ্রহ করার অবতল প্রতিফলকের মত। ঐ প্রতিফলকের ব্যাস যত বেশি হয়, কেন্দ্রিভূত আলোর মাত্রাও যেমন বাড়ে, তেমনি কোন কোষের সিলিয়ার জালের বিস্তৃতি যত বেশি হয়, ঘ্রাণ-কোষের ক্ষমতাও সেই মত বেড়ে যায়। দেখা গেছে, মানুষের সিলিয়ার জালের ক্ষেত্রফল থেকে

শিল্পীর হাতে আঁকা গন্ধবাহ-কোষের ছবি

কুকুরের সিলিয়ার জালের ক্ষেত্রফল অনেক বেশি। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সম্ভবত এই কারণেই মানুষের চেয়ে কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি বেশি।

কিছুদিন আগেও অনেকে মনে করতেন, গন্ধবস্তু থেকে সম্ভবত বিশেষ ধরনের কোন বিকিরণ নির্গত হয়। অথবা হয়ত তারা কোন বিশেষ ধরনের বিকিরণ শোষণ করে নেয়। যার ফলে গন্ধশক্তিবাহ কোষ সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এবং ঐ উদ্দীপনার কায়দা কানুনের উপরই নির্ভর করে গন্ধের প্রকৃতি এবং তীব্রতা। তবে বর্তমানে এ মতবাদটি অচল হয়ে গেছে। জানা গেছে গন্ধদ্রব্য যদি সরাসরি গ্রাহক কোষের সংস্পর্শে না আসে এবং সেই সঙ্গে তাদের উত্তেজিত না করে তাহলে ঘ্রাণশক্তিবোধের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সিলিয়ায় পৌঁছনোর আগে গন্ধদ্রব্যের সূক্ষ্মকণাদের শ্লৈষ্মিক আবরণীর মধ্যে সঞ্চিত জলীয় তরলের মধ্যে দ্রবীভূত হওয়া দরকার। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, গন্ধ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রথম পর্যায় স্বরূপ গন্ধদ্রব্যের অণুগুলির প্রথমেই সিলিয়ার জাল কর্তৃক শোষিত হওয়া দরকার। পরে ঐ সমস্ত অণু এমনভাবে সজ্জিত হয়ে যায়, যাতে করে জালের —এখানে জালটিকে পর্দার সঙ্গেও তুলনা করা চলে—নির্দিষ্ট অংশে নিজস্ব গুণ অনুযায়ী স্থান করে নিতে পারে।

ব্যাপারটাকে এইভাবে বোঝান যেতে পারে। মনে করুন একটি পর্দার উপর লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানারকম রঙ লাগান আছে। পর্দার উপর আলো ফেলুন, দেখবেন, এক জায়গাটা লাল, অপর জায়গা নীল প্রভৃতি রঙের বাহার ফুটে উঠল। পদার্থবিদ্যার সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, সাধারণ আলো যখন লাল রঙের উপর এসে পড়ে, তখন ওই জায়গাটি আলোর সাত রঙের লাল বাদে বাকি ছয়টি রঙই শুষে নেয় এবং লাল রঙটিকে প্রতিফলিত করে। ফলে জায়গাটিকে আমরা লাল দেখি। সবুজের ক্ষেত্রে শুধু সবুজ ছাড়া আর সমস্ত রঙ শোষিত হয় বলেই সবুজ রঙটি দেখা যায়। অবশিষ্ট রঙগুলির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে।

গন্ধের ব্যাপারটাও অনেকটা যেন এই রকম। সিলিয়ার পর্দার বিস্তৃত অঞ্চলের এক একটি অংশে এক একটি বিশেষ গন্ধবস্তুর অণু তার নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে পারে। গোলাপের গন্ধই ধরা যাক। এ ক্ষেত্রে গোলাপের গন্ধবাহী অণু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রথমে গিয়ে হাজির হবে শ্লৈষ্মিক তরলে। তারপর তারা সিলিয়ার পর্দার এমন একটি বিশেষ অঞ্চলে এসে স্পর্শ করবে, যেখানে গোলাপ-গন্ধের অনুভূতিটাই শুধু বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিবর্তিত হয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে হাজির হতে পারে। অথচ ঐ বিশেষ জায়গায় গোলাপ ছাড়া আর কোন গন্ধসামগ্রী এলে তেমন কোন ফলই ঘটবে না। একটি মতবাদে বলা হয়েছে সিলিয়ার ঐ পর্দার বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধবাহী অণু গিয়ে পড়লে তবেই তাদের অনুভূতির মধ্যে আনা সম্ভব। সম্ভবত বিভিন্ন গন্ধবাহী অণুর ভিন্ন ভিন্ন গঠন বৈচিত্র্যের জন্যেই এমনটি ঘটে থাকবে।

অবশ্য এটা একটা মাত্র দিক। গন্ধগ্রাহী ঐ পর্দার উপর গন্ধবস্তুর আরও নানারকম গুণও যে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া করে থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় ঐ 'নানারকম গুণ'-এর ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও অস্পষ্ট। ওদের রহস্য যেদিন জানা যাবে সেদিন প্রায়-সমগোত্রীয় পদার্থের মধ্যেই একটির গন্ধ আর একটি পদার্থের গন্ধ থেকে পৃথক কেন সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যাখ্যা যোগান শক্ত হবে না।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক বার্নার্ড কাটজ সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সংবেদনশীল দেহকোষ জৈবিক-রূপান্তরক রূপে কাজ করে। যার কাজ কোন উদ্দীপনাকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করে অন্তর্বাহ স্নায়ুতন্ত্রীর সাহায্যে মস্তিষ্কে বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পাঠিয়ে দেওয়া। এই পদ্ধতির প্রথম অধ্যায়ে উদ্দীপনাগ্রাহী কোষের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঐ বিদ্যুৎ-প্রবাহ পর্যায়ক্রমে গন্ধবস্তু সম্পর্কে মস্তিষ্ককে অবহিত করে। সরাসরি তার পরিমাপ জেনে নেওয়া নীতিগত-ভাবে তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু মুশকিল হল, গন্ধ-শক্তিবাহ কোষগুলির আয়তন এত ছোট যে, তাদের এক একটির মধ্যে ঠিক কতটা বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হয় তা নির্ণয় করার মত যন্ত্র এখনও পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে সংবেদনশীল পর্দার উপর তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোড লাগিয়ে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা শক্ত নয়। খানিকটা সগন্ধ বাতাস নাসারন্ধ্রে ঢোকালেই শ্লৈষ্মিক পর্দা উদ্দীপিত হয়ে উঠবে। মুহূর্তে দেখা যাবে প্রবল বৈদ্যুতিক বিভবপ্রভেদ। পরক্ষণেই তা দ্রুত কমে আসবে।

বৈদ্যুতিক বিভবপ্রভেদের সূচক হিসেবে ধরে, কোন কোন গন্ধবস্তু কী ধরনের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা জেনে নিয়ে গন্ধসংক্রান্ত শারীরিক যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে, জানা সম্ভব হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর উপর বিভিন্ন গন্ধদ্রব্য শুঁকিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে প্রায় একই ধরনের ফলাফল লাভ করেছেন। ব্যাঙ এবং মানুষকে বিউটেনল নামে এক ধরনের জৈব-রাসায়নিক পদার্থের গন্ধ শুঁকিয়ে দেখা গেছে উভয়ের মধ্যেই গন্ধ-শক্তিজনিত বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাত্রা প্রায় সমান। সম্প্রতি মানুষের উপর অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে কয়েকজন ডেনিশ গবেষকও একই ধরনের ফলাফল সংগ্রহ করেছেন।

দেখা গেছে কাঁকড়ার চোখের স্নায়ুর মধ্যে ঠিক কতটা বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি হবে সেটা নির্ভর করে ঠিক কী পরিমাণ আলো চোখে এসে পড়ে তার উপর। আমরা জানি একই সঙ্গে আলোর পরিমাণ বাড়ালে, ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। অতএব, হঠাৎ এক ঝিলিক উজ্জ্বল আলো চোখের উপর ফেললে যতটা স্পন্দনের সৃষ্টি হবে, ঐ একই পরিমাণ আলো দীর্ঘ সময় ধরে নিক্ষেপ করলেও বৈদ্যুতিক স্পন্দনের পরিমাণ ততটাই দাঁড়াবে। গন্ধবাহী যন্ত্রও ঠিক তেমনই। একই পরিমাণ গন্ধদ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণ বাতাসের মধ্যে মিশিয়ে দিলেও, বৈদ্যুতিক স্পন্দন এক ধরনেরই হবে। তবে আলো এবং গন্ধের ব্যাপারে কিছুটা অমিলও রয়েছে। যেমন ধরুন, চোখের স্নায়ুর উপর আলোর প্রতিক্রিয়া যত বেশি দ্রুত, গন্ধবস্তুর প্রতিক্রিয়া গন্ধবাহ কোষের উপর তত দ্রুত নয়। তাছাড়া আলোর বেলায় চোখের পর্দায় যে আঘাত করে তার নাম ফোটন; কিন্তু গন্ধের ক্ষেত্রে গন্ধবাহ যন্ত্রে গিয়ে আঘাত করে কতকগুলি বস্তুকণা।

বিভিন্ন মাত্রায় বিউটেনল ব্যাঙের নাসারন্ধ্রে গন্ধবাহ কোষে কী ধরনের বৈদ্যুতিক স্পন্দন সৃষ্টি করে, লেখচিত্রের সাহায্যে তা দেখান হল। লক্ষ করুন, গন্ধদ্রব্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে স্পন্দন কেমন বেড়ে যায়। এবং পরমুহূর্তে গন্ধ-দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া হ্রাস পাওয়ায় স্পন্দনের মাত্রা দ্রুত কমে যেতে থাকে।

ফোটনের সঙ্গে ঐ বস্তুকণার তুলনাই চলে না।

কিন্তু তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, কোন সময়ে কতটা গন্ধ আপনি শুঁকলেন, গন্ধবাহ স্নায়ু শুধু সেটাই যে জানায় তা নয়, কী ধরনের ঘ্রাণ আপনি গ্রহণ করলেন তাও। অর্থাৎ গোলাপ বা হাস্নুহানার সুবাস অথবা পচা নর্দমার দেবু, এদের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটা বুঝে নিতে আপনার ভুল হয় না। গন্ধের এই পার্থক্যকে প্রাণীকোষ কীভাবে চিনে উঠতে পারে বিশেষজ্ঞদের কাছে এখনও পর্যন্ত তা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। এবং এ ব্যাপারে আরও একটি বড় অন্তরায় গন্ধ সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব। আলোর ব্যাপারে আমাদের যেমন লাল, নীল প্রভৃতি মৌলিক বর্ণ সম্পর্কে এক একটা নির্দিষ্ট ধারণা আছে এবং তাদের সঙ্গে মিলিয়ে অন্যান্য বর্ণের যেমন তুলনা করা হয়, গন্ধের বেলায় সেটা সম্ভব নয়। কারণ গন্ধের মৌলিকত্ব সম্পর্কে এখনও আমরা অন্ধকারেই পড়ে আছি। প্রাথমিক পর্যায়ে গন্ধ যে কতরকমের হতে পারে তার পরিমাপ করা এখনও সম্ভব হয়নি। অতএব এ ব্যাপারে কোন তুলনামূলক বিচারও চলে না। এ ছাড়াও গন্ধবাহী অন্দ্রের সঙ্গে গন্ধ-সংবেদনশীল সামগ্রীর যথাযথ প্রতিক্রিয়ার কোন হদিস এখনও পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভবিষ্যতে এ রহস্য উদ্ঘাটিত হলে সবচাইতে লাভবান হবেন মনোবিজ্ঞানীরা। গন্ধের সঙ্গে মানসিকতার যে সম্পর্ক সেটা জেনে নিয়ে শুধু উপযুক্ত গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে হয়ত তখন অনেক মানসিক ব্যাধিরই নিরাময় করা সম্ভব হবে।

রক্ত সংবহন নির্ণয়ে শব্দ

সম্প্রতি মেসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ্ টেকনোলজির দুজন বিজ্ঞানী, ডাঃ রবার্ট এস

জীন এবং অধ্যাপক সি কোর্বস ডিউই, জুনিয়ার, শুধু শব্দ শুনে ধমনীর রক্ত চলাচলের গতিবিধি জানার একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে চিকিৎসকরা হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুসের স্পন্দন যেভাবে জেনে নেন, নতুন এই পদ্ধতি কতকটা সেইভাবেই কোন ব্যক্তির পীড়িত ধমনীর রক্তসঞ্চালনের মাত্রা এবং ধমনীর ঠিক কোন কোন জায়গায় স্বাভাবিক রক্তচলাচল ব্যাহত হচ্ছে, তা জেনে নিতে সাহায্য করবে। এর জন্যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন রকম শারীরিক কষ্ট ভোগ করতে হবে না। দেখা গেছে, সবল এবং সুস্থ ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচলের সময় কোন শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু কোন কারণে ধমনী যখন অনমনীয় হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তার ভেতরকার কোন জায়গায় ছিদ্রাংশ সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়—যার আর এক নাম অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস—তখন রক্তপ্রবাহের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা যায় এবং যেখানটায় তা ঘটে সেখান থেকে বিশেষ এক ধরনের শব্দতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। মাইক্রোফোনের সাহায্যে এই শব্দ ধরা যেতে পারে। ব্যাপারটা অবশ্য অনেক

আগেই জানা ছিল। এই প্রথম তাকে কাজে লাগান হল।

ডঃ লীস এবং তাঁর সহকারী লক্ষ করেছেন, ধমনীর যে অংশটি সবচাইতে বেশি সরু হয়ে যায়, সেখানকার শব্দের মাত্রা অনেক বেশি। বলা হয়েছে, শব্দের মাত্রা বিশ্লেষণ করে ধমনীর ছিদ্রপথ কোন জায়গায় কতটা সরু হয়ে পড়েছে নতুন এই পদ্ধতির সাহায্যে ওঁরা হিসেব করে তা বলে দিতে পারবেন। ওঁরা এর নাম রেখেছেন ফোনোঅ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি। আপাতত দেহত্বকের কাছাকাছি ধমনী পরীক্ষার ব্যাপারে এর সাহায্যে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু যে সমস্ত ধমনী দেহের অনেক ভেতরে থাকে—তাদের বেলায় খুব একটা কার্যকর ফলাফল পাওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কারণ সে ক্ষেত্রে দেহত্বকের উপরে রাখা মাইক্রোফোন ভেতর থেকে আসা অত্যন্ত ক্ষীণ শব্দ ধরতে সমর্থ হয় না। তবে পদ্ধতিটিকে উন্নত করার চেষ্টা চলছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস রোগে কেউ আক্রান্ত হয়েছেন বলে সন্দেহ করা হলে, তাঁর ধমনীর মধ্যে ক্যাথেটার বিঁধিয়ে তার সাহায্যে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এক্স-রে ছবি তুলে দেখে নেওয়া হয় ঐ রঙিন পদার্থটি ধমনীর মধ্যে দিয়ে কোনখানে কীভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এবং তা থেকে ধমনীর কোন্ জায়গাটি স্বাভাবিক এবং কোথায় তার ছিদ্র সরু হয়ে এসেছে সহজেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু সব চাইতে বড় অসুবিধা, এ ধরনের পরীক্ষায় রোগীকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হয়। রোগীকে অজ্ঞান বা অসাড় করার ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়াও রোগ-সংক্রমণ হবার আরও বহু বিপজ্জনক সম্ভাবনা থাকে। নতুন ঐ পদ্ধতির সাফল্য ধমনীর রোগ নির্ণয় করার কাজ আরও সহজ করে দেবে, সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান পত্রিকা

গবেষণা : ২৭, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রো, কলকাতা-৯।

বিজ্ঞান সংস্থার মুখপত্র 'গবেষণা'র খণ্ড ২, সংখ্যা ৩, ৪, ১৯৭০ হাতে পেলাম। ইতিপূর্বে পত্রিকাটি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। ওঁরা শুরু থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে মৌলিক গবেষণা পত্র প্রকাশ করার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, দেখলাম বর্তমান সংখ্যাটিতেও সে অঙ্গীকার বজায় রয়েছে। এ ছাড়াও **সংবাদ ও ভাষ্য** নামে ফিচারটির মধ্যেও বেশ কিছুটা নতুনত্ব চোখে পড়ল। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলীও বাংলা ভাষায় যে কত সহজ এবং সরলভাবে পরিবেশন করা যায় ফিচারটিতে ওঁরা তার প্রমাণ রেখেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে **অত্রি মুখোপাধ্যায়ের ৩ ডিগ্রি কেলভিন—জাগতিক বিকিরণ**—তাৎপর্য খুব ভাল লাগল, শুধু ঝরঝরে ভাষার জন্যে নয়, তিনি বিজ্ঞানের একটি জটিল বিষয়কে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে। **শ্রীঅজয় হোমের পুষ্পান্বেষী বংশ** প্রবন্ধে পুষ্পান্বেষী পাখি সম্পর্কে তথ্যমূলক বর্ণনা পাওয়া গেল। এ ছাড়া লিখেছেন **শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসচৌধুরী** মশা সম্পর্কে, **শ্রীতারকমোহন দাস** এবং **মনোজকুমার সাধু** আলোচনা করেছেন, **শস্যের বৃদ্ধির উপর ধানের মূলনিঃসৃত পদার্থের প্রভাব এবং ইহার রাসায়নিক প্রকৃতির** উপর। এটিও মৌলিক গবেষণাপত্র। তথ্যভিত্তিক অথচ সাধারণ পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য হবে বলে মনে করি। এ ছাড়াও আগের সংখ্যার মত এ সংখ্যাটিতেও বাংলা ভাষার কোন্ পত্রিকায় গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ পর্যন্ত কে কোন্ বিষয়ের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তার দীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর সম্পাদক শ্রীআশিস সিংহকে ধন্যবাদ। বাংলা ভাষার মাধ্যমে এ ধরনের প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই শক্ত—তবে এখনও পর্যন্ত তিনি তা পেরেছেন, এটাই যথেষ্ট আশার কথা।

সমরজিৎ কর

চিঠি

গত ২৪শে পৌষ ১৩৭৭ তারিখের দেশ পত্রিকায় microbiology এবং antibiotic এই শব্দ দুটির বাংলা প্রতিশব্দ সম্পর্কে শ্রীদিলীপকুমার দাশ মহাশয়ের আলোচনা পড়লাম। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দের তালিকা সংকলন করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি জীবাণুবিদ্যা, জীবাণু-বিজ্ঞান, জীবাণুতত্ত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি microbiology বোঝাতে এবং আণবিক জীববিজ্ঞান বা আণবিক জীববিদ্যা molecular biology বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। Microbiology বোঝাতে অণু-জীববিদ্যা শব্দটির প্রয়োগ এখনও কোথাও দেখতে পাইনি। অণু-জীববিদ্যা শব্দটিও molecular biology-র বাংলা হিসাবে চলতে পারে বলে মনে হয়।

Antibiotic-এর বাংলা প্রতিশব্দ জীবঘ্ন যথার্থ হবে বলে মনে হয় না। কারণ জীবঘ্ন বলতে সর্বস্তরের জীবের ধ্বংসকারী বোঝায়। কিন্তু antibiotics কেবলমাত্র জীবাণুরই ধ্বংসকারী, সর্বস্তরের জীবের ধ্বংসকারী নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে, ১৯৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত) antibiotic-এর বাংলা হিসাবে 'প্রতিজৈবিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং A. T. Dev-এর Students' Favourite Dictionary-তে উক্ত শব্দটির পরিভাষা দেওয়া আছে জীবঘ্ন।

বিমলকান্তি সেন
ইন্‌স্‌ডক, দিল্লী

লেখকের বক্তব্য

শনিবার জানুয়ারী ৯, ১৯৭১-এর 'দেশ'-এর আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত শ্রীদিলীপকুমার দাশ মহাশয়ের চিঠির উত্তরে জানাচ্ছি, 'অণু-জীববিদ্যা' কথাটি আমি Molecular Biology অর্থে ব্যবহার করেছি, Microbiology অর্থে নয়। বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে দিলীপবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পানামা

সত্যিই
ভালো সিগারেট

বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাক নিপুণভাবে মিশিয়ে তাদের টাটকা স্বাদগন্ধ বজায় রেখে তৈরী হয় আপনার পানামা। নিজে খেয়েও আরাম পাবেন, অন্যকে দিয়েও ভাল লাগবে!

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৭
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT (P)-67) Ben. Greens' Advtg.
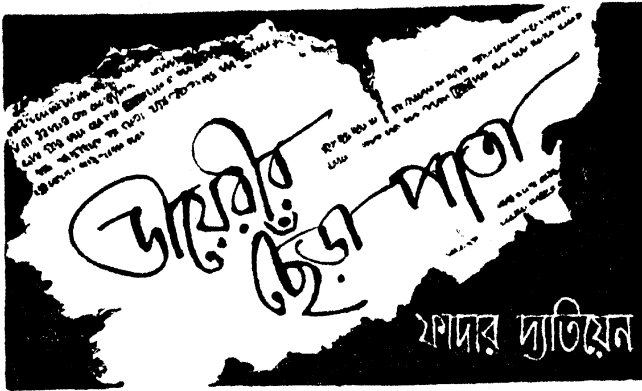
"কল্লোলিনী তিলোত্তমা"

আধুনিক কবি আশা করে গিয়েছেন, কলকাতা একদিন তিলোত্তমা হয়ে উঠবে; আঠারো শতকী পর্যটক দ্য গ্রাঁপ্রে কিন্তু কলকাতাকে তখনই উত্তমা বলে অভিহিত করেছেন—ভারতের শ্রেষ্ঠতমা নগরী, এশিয়ার সর্বাধিক মনোহারিণী তুরী গোটা দুনিয়ার আচ্ছা-আচ্ছা শহরের দোসর। কিন্তু হ্যাঁ, যাচ্ছেতাই-রকম নোংরাও বটে। বেশির ভাগ রাস্তারই দু পাশে নালী চলে গেছে বরাবর, দেড় ফুট মতো চওড়া আর ফুট তিনেক গভীর, যার মধ্যে শুধু পশু-শবই নয়, মানুষের লাশও নিক্ষিপ্ত হয়—অভাবে-অনাহারে রোগে ভুগে কিংবা দুর্ঘটনায় পড়েই পঞ্চত্ব পেয়েছে যারা, সেই সব হতভাগ্য মানুষের।

আর বাঙালীরাও খোপদুরস্ত, দেহ-সাজানায় মনোযোগী, গৃহ সাজানায় রুচিবান, কিন্তু ঐ গৃহপরিধি পর্যন্তই তাদের পরিচ্ছন্নতার পরিসীমা—সম্মার্জনী-সংগৃহীত ধূলিজঞ্জাল ও আবর্জনা তারা দ্বারদেশে পুঞ্জিত করবেই। ঘরদোর ঝকঝকে রাখার কথা বাঙালীরা বলে যখন, আসলে বলতে চায় তকতকে ঘরের কথাই, দোরে যতই থাকু না থিকথিকে আঁস্তাকুড়। সেখানে দুর্গন্ধ নেই?......নেই আবার, ভূত ভাগে তার চোটে! বাঙালীর পুত নাকে কাপড় দেয়, কিন্তু কোমরে কাপড় এঁটে হঠাতে আসে না। ভাগ্যিস শেয়ালেরা আছে, পালে পালে আসে রাত-বিরেতে, খাবলে-খুবলে সাপটে নিয়ে পেট ভরিয়ে যায়, আর তাদের ঝড়তি-পড়তি উচ্ছিষ্টাবশেষ কুড়োতে আসে কাক-শকুন—নইলে মুহুর্মুহু মড়ক লাগত।

আপাতত মড়কের বাড়া নরক যন্ত্রণা দেবার জন্য আছে মশাকের হুল। গোঁয়ার মশা, নাছোড় মশা, সীমাহীনভাবে রক্ত-পিপাসু। বাড়িতে বসে থাকতে হবে আপনাকে কার্ডবোর্ডে শ্রীচরণ দুটি ঢেকে। আর আপনার শ্রীহস্তের নিকটস্থ গ্লাস-খানিও ঢাকুন—গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো মশারও আছে উপরন্তুঃ নীল মাছি।

মাছির ভনভনের সঙ্গে কলকাতায় আরেকটি শব্দ হরদম শুনবেনঃ হুঁকোর ভুড়ুর। বিশেষ করে এই মহানগরীতেই হুঁকো ফোঁকার রেওয়াজটা চালু, আহারান্তে আধ ঘণ্টা ধরে ঘরে ঘরে তাই আলবোলার বোলবোলাও আওয়াজঃ বার্তাচিৎ-বিলকুল-ডোবানো ঐ ধ্বনির উদ্গারে বাবুরা আয়েস করেন। আর শুধু তাঁরাই কেন, বিবিরাও হুঁকোসক্ত: মৌজে টানেন, কখনো-সখনো হুঁকোর নল কোনো পুরুষের হাত থেকে গ্রহণ করে প্রসাদ বিলোন। বিবিজান যদি আপনার অর্পিত হুঁকা পরিগ্রহণে আপনাকে আপ্যায়িত করেন, তবে সমঝে নেবেন, আপনি ওঁর বিশেষ অনুগৃহীত। তবে হ্যাঁ, আরেকটা দিকও সামলে চলবেন বই কি: আপনার পর মহিলাটির নেকনজর আপনার প্রতি তাঁর অন্যান্য পুং-বান্ধবের বিষনজরের কারণও হতে পারে—স্বামী দেবতার কথা না-ই বা বললাম।

এমনিতে অবশ্য, দা গ্রাঁপ্রে মন্ত্রণা দেন, কারো দৌলতখানায় যদি পায়ের ধুলো দেন, হুঁকো আঁকড়ে হুঁকোবর্দার হাঁকিয়ে হাজির হোন; নচেৎ খানাপিনার পর বিরক্তিতে আর একঘেয়েমিতে হাঁপিয়ে উঠবেন।

"গংগাহৃদি বংগভূমি"

"বাংলাদেশ ব্রাহ্মণকুলের সাচ্চা আবাস"......আর এ-বংগধামে দ্বিজমাত্রেরই নামান্তে নাকি 'রাম'—যা কিনা জার্মান 'ফন্' আর হিস্পানী 'দম্'-এর ভায়রা-ভাই। বামুনেরা ভারি অমিশুক, মন খুলে কদাচ কথা বলে না। নিজেদের সংস্কৃত ভাষাকে তথা শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে আগুলে আগুলে বেড়ায়, 'পাছে কোনো ম্লেচ্ছ মাড়ায় পুণ্য ভিটে'। এই গোপনতা-রক্ষা তাদের কাছে ধর্ম-রক্ষারই শামিল। য়ুরোপ-মুল্লুকে যে-সব গ্রন্থ জোগাড়যন্ত্র করে নিয়ে তর্জমা করা হয়েছে, তাদের মূল পাঠের প্রামাণিকতা আর অনুবাদকর্মের যাথার্থ্য নিয়ে দা গ্রাঁপ্রে সন্দেহ প্রকাশ না করে পারেন না। ওগুলিকে সত্যি সত্যি প্রামাণিক বলে ধরতে গেলে বুঝতে হবে—জনাকয়েক ব্রাহ্মণচূড়ামণি বিদেশীর সনির্বন্ধ উপরোধে ঢেঁকি গিলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, ফলে জাতও খুইয়েছেন। আর 'জাত খোয়ানো' যে কি ভীষণ কাণ্ড ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে, তা কে না

আলবোলার বোলবোলাও আওয়াজ......

জানে। জ্ঞানের চেয়েও জাত বড় তাদের কাছে, উপরন্তু তেমনই ভণ্ডুর—যবনের হাতে শাস্ত্রের চাবিকাঠি তুলে দেওয়ার চেয়ে বহু বহু লঘু অপরাধেও তার থেকে চ্যুতি ঘটে থাকে। বস্তুতপক্ষে তাঁরা বোধ হয় শুধু সেই গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশগুলিই ফাঁস করেছেন বিদেশীর কাছে, যেগুলি গুরুত্বে অকিঞ্চিৎকর এবং সারবস্তুতে দীন। পরন্তু ম্লেচ্ছ-সন্তানদের অন্তঃপুর-ঔৎসুক্যে ইতি টানার জন্য আগাগোড়া গোটা গোটা জাল কেতাবই তাঁরা রচনা করে ফেলেছেন কিনা, তাই বা কে জানে?

......বাংলায় তখনো 'গোলাভরা ধানের' যুগ চলেছে, "অতীব উর্বর তার মাটি, ফি-সন ফলন হচ্ছে রীতিমতো, অজন্মায় বছর একটিও যায় না। গোটা ভারতের ভাঁড়ার তার ক্ষেতে ক্ষেতে, শাক-সব্জি অঢেল, ইংরেজরা তার উপর এক নতুন ফসলের চাষ চালু করেছে—ইক্ষুর। শুধু ফলটাই যা দেখছি, নিচু মানের।" আখের কল মহিষ-চালিত—অথচ খচ্চরের তাগদ কিংবা সহিষ্ণুতা, কোনোটাই মোষের নেই। লাঠির ঘা মেরে মেরে তাদের সচল রাখা—শুধু এই কাজটিই তো অন্যান্য সব কাজের

যোগফল ছাপিয়ে ক্লান্তিকর। ওরা ওয়াটার-মিল্ চালায় না কেন? পাশেই তো গঙ্গা।

সেই গঙ্গা পুণ্যতোয়াঃ "পুরাকালে শ্রীমতী দুর্গা নেমে এসে তাতে অধিষ্ঠান করেছিলেন, আজও অধিষ্ঠিতা হয়েই আছেন। এই কিংবদন্তিতে সংহিতাকারের দূরদৃষ্টিরই পরিচয় পাই, পুণ্যতার প্রলোভন দেখিয়ে যিনি বারংবার স্নানের প্রথাটা সূচিত করতে চেয়েছিলেন, উষ্ণ দেশে যার প্রয়োজনীয়তা সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই বিশ্বাসটি নিন্দনীয় পরিণামও পেয়েছে এক বিপজ্জনক কুসংস্কারে। গঙ্গায় ডুবে মরতে পারলে অনন্ত স্বর্গবাস ঘটে। ফলে দুর্ঘটের বলির সংখ্যাও কম নয়। কেউ ডুবছে দেখলে আর-সকাই এক পা নড়বে না, বাঁচাতে এগিয়ে যাবে না, বরং ধন্য ধন্য করে তাকে অভিনন্দিত করবে, অনুরোধ জানাবে তার সৌভাগ্যচ্ছায়ায় তাদেরও শরণ দিতে। উল্টে, তার ডুবে-যাওয়াটাকেই তারা আরও নিশ্চিত ক'রে তুলবে, পাছে তাদের সহায়তায় লোকটি তীরের বা তরীর নাগাল পেয়ে চাঙ্গা হয়ে ওঠে, পাছে তাতে শ্রীমতী দুর্গা চটেন।"

এই 'শ্রীমতী দুর্গার' পুজোও দ্য গ্রাঁপ্রে দেখে যান। "প্রতি পল্লীতে একটি ক'রে পুজো, অন্তত প্রতিটি ধনীগৃহে পুজোর আয়োজন, অবশ্যই। অপেক্ষাকৃত নির্ধনেরা ধনবানের বাড়ির পুজোতেই যোগ দেয়।" সর্বজনীন পুজো, দেখা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই অঙ্কুরিত। "দুদিন ধরে অর্চনার পর লোকে দেবীকে অপমান আর গালিগালাজ করতে শুরু করে দেয়, শেষটায় কাঁধে তুলে কান-ফাটানো চিৎকার আর হুল্লোড় সহকারে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে নদীর জলে।" সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে মুসলমানী 'তামসে' মিছিলের যে-সংঘর্ষ বাধতে পারে, সেটাও যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। দুর্গাপুজোর সঙ্গীতবাদ্যও কাপ্তেনের ভালো লাগেনিঃ "এতদুপলক্ষে কি যে একটা যন্ত্র বাজানো হয়—তার থেকে যে-ধ্বনি নিঃসৃত হয়, তদপেক্ষা উৎকট আর কিছু নেই, একমাত্র যে-সুরে সেটি বাজানো হচ্ছে, সেই সুরটিই ছাড়া।"

"ফিরায়ে আনিব তোরে......"

গঙ্গায় মজ্জমান কোনো হতভাগ্যের প্রাণরক্ষা করার সুযোগ দ্য গ্রাঁপ্রে পাননি, কিন্তু গঙ্গাতটে চিতানলে-আত্মবিসর্জনে উদ্যতা এক রমণীকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি যে-অভিযান করেছিলেন, গ্রন্থটিতে তার বিবরণ আছে।

খবরটা এনেছিল তার পিওন। এক ব্রাহ্মণকন্যা অমুক দিন চিতায় উঠতে চলেছেন—স্বামীর অনুমরণে। সতীদাহ-প্রথাটা সে-সময়ে ব্রাহ্মণকুলেই সীমিত হয়ে এসেছে, এবং অনিচ্ছুকের প্রত্যাখ্যানও গ্রাহ্য ব'লে স্বীকৃত—অবশ্য জাতিচ্যুতি, সেক্ষেত্রে, অবশ্যম্ভাবী। এই মেয়েটি, পিওন জানাল, দু-দুবার মনস্থির করে মন বদলেছে এর আগে; এবার শেষবারের মতো তারিখ ধার্য হয়েছে—আর তার নড়চড় হবে না। পিওন মানুষটি ভালো, বামুনদের উপর হাড়ে চটা। তার মুখ থেকে সাহেব জানলেন, মেয়েটি তরুণী। আর রূপসী। সাহেবের শিভ্যালরি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

মনে মনে তিনি একটা কথা বিবেচনা করলেন; দুবার যে-মেয়ে মরতে ইতস্তত করেছে, আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে সে মরতে যাচ্ছে না......। উদ্ধার পেলে, মনে হয়, পরিত্রাতার উপর ক্রুদ্ধ হবে না। ত্রাণকর্মের জোগাড়যন্ত্র ঝটিতি সম্পন্ন হল। অকুস্থল—শ্মশানক্ষেত্রটি—কলকাতা এবং মায়াপুরের মাঝামাঝি, নদীপথে যাওয়া সুবিধে, নৌকোর বন্দোবস্ত করা হল সর্বাগ্রে। সঙ্গী হিসেবে চলল তাঁর পিওন, কুড়িজন য়ুরোপীয় নাবিক—যাদের আছে যুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা, দুজন অফিসার, বারোটি বন্দুক, আটটি রিভলবার, কুড়িটি তলোয়ার। বিনা প্রতিরোধে কার্যোদ্ধার হবে না, তাই সংগ্রামের এতটা আয়োজন।

সঙ্গীদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, গায়ের অলঙ্কারের এক-ষষ্ঠাংশ তারা পাবে। বাকিটা মেয়েটিরই থাকবে, সে নিজে যদি তার সঙ্গে থাকতে রাজি না হয়।

পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী দলটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। এক ভাগে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে স্বয়ং দ্য গ্রাঁপ্রে; দ্বিতীয় ভাগে থাকবে পশ্চাদ্বর্তী সাহায্যকারী দল; অবশিষ্টেরা নৌকোতেই অপেক্ষা করবে। রণনীতি হবে এইঃ প্রথমেই দ্য গ্রাঁপ্রে এগিয়ে গিয়ে রমণীকে স্পর্শ করবেন; ম্লেচ্ছের ছোঁয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জাত খোয়াবে মেয়েটি, যায় সতী হবার অধিকারটুকু পর্যন্ত; এদিকে পিওন অগ্রসর হয়ে তাকে বোঝাবে, ভয়ের কোনো কারণ নেই, তাকে বাঁচাতেই তারা এসেছে, বাধা না দিয়ে সে তাদের সঙ্গে পালিয়ে আসুক......। সাহেব তাঁর দলটিকে নিয়ে পথ আগলে রাখবেন; মেয়েটি নিরাপদে তরীতে নীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এক পা নড়বেন না। নিরস্ত্র ব্রাহ্মণেরা অতর্কিত আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে যাবে হয়তো, য়ুরোপীয়দের অসি-বন্দুকের সামনে রুখে দাঁড়াবে না—তবু, সাবধানের মার নেই।

মসৃণভাবে প্ল্যান-মাফিকই চলতে থাকল সব। ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গাটিতে, নৌকাবতরণ। যথাযথ দক্ষতায়, যথার্থ দ্রুতিতে, অগ্রসৃতি। দাহক্ষেত্রে পৌঁছে দেখলেন—পড়ে আছে ছাইয়ের গাদা, তখনও ধোঁয়াচ্ছে। "ভয়ঙ্কর আত্মাহুতিটি আগের দিনই, হায়, সংঘটিত হয়ে গিয়েছে......। তার যে-রূপযৌবনের কথা শুনেছিলাম আর তাকে উদ্ধার করে যে-আত্মতৃপ্তি অনুভব করতাম—সব-কিছু ভেবে মর্মযাতনায় পীড়িত না হয়ে পারিনি।"

নট উইথ্ এ ব্যাং, নট্ উইথ এ হুইম্পার্

সাধারণভাবে ভারতীয়দের সম্পর্কে পর্যটকের মন্তব্যঃ তারা শিষ্টধী, অলস-স্বভাব, আশুতোষঃ অল্পেই তাদের প্রয়োজন মেটে এবং ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য যে-স্বল্প শ্রম লাগে, তার বাইরে তারা এক-চুল নড়বে না। দুটো টাকা যেই হাতে এল, এক বস্তা চাল উঠল ঘরে, আর তা যত-দিন বাড়ন্ত না হচ্ছে, কাজের কথাই শিকেয় উঠে রইল। অবশ্য সরকারী নায়েব-গোমস্তারা খুব একটা বসে থাকার সুযোগ তাদের দেয় না। ওদের আগ্রাসী বুভুক্ষা যে কি ভীষণ তীব্র, তা ব'লে বোঝানো যাবে না। বেচারীদের হাতে টাকা তিন-চার জমল কি জমল না, হাঁ হাঁ করে এসে পড়ে ওরা সেটুকুও নিংড়ে নিয়ে চলে যাবে।"

পণ্ডিচেরিতে ফিরে—মন্বন্তরের কালো ছায়া, মৃত্যুর দৃশ্য পথে পথে। নির্লিপ্ত, উদাসীন মৃত্যু, প্রতিবাদহীন, প্রতিরোধহীন। মৃত্যুর প্রতি এই অসীম অবজ্ঞা কি ভারতীয়-দেরই স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত নয়? "শস্যে কানায় কানায় ভ'রে আছে বড়লোকের ভাণ্ডার, দরিদ্রেরা

সেটা জানে; জানে, কিন্তু মেনে নেয়, আঘাত আনে না, ছিনিয়ে নেয় না। যে-মুহূর্তে কেউ বুঝে ফেলে তার দিন এসে গিয়েছে, অস্তিত্বটাকে বজায় রাখা আর সম্ভব নয়, কোনো ধনীর গৃহের সামনে সে শেষ শয্যা পাতে; তাঁরই চোখের সামনে সে তিলে তিলে মরবে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে তাঁর অপরাধ : ধনীমহাশয়ের বাড়তি ফসলের যৎকিঞ্চিৎ অংশ পেলে তার প্রাণরক্ষা হত, তবু তাঁর হৃদয়হীন কার্পণ্যে চিড় ধরল না—সেই অপরাধ। মৃত্যুপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে শুধু এক কলসি জল, তিন-চারদিনের পক্ষে যথেষ্ট। আর কিছু না। কিংবা আর শুধু প্রতীক্ষা—শেষ মুহূর্তের জন্য। জন্তুর পাল তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খেতে চায়......তাদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বন্ধুর দল তাকে বাড়ি ফিরতে বলে......তাদের অনুরোধ এড়াতে, এড়াতে সে সেই মুহূর্তেরই অপেক্ষা করে চলে।"

অথচ, এই সময়েই, পঁচিশ জন মজুরের দিনমজুরি কুলিয়ে যেত মাত্র এক টাকায়; স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পঁচিশটি পরিবারের ভরণপোষণের পক্ষে এক তনখাই ছিল যথেষ্ট......।

তিন

সংগ্রাম ও স্বাধীনতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, ভারতবর্ষের ভাগ্যকে সেদিন তাই সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র সেদিন যতটা আলোড়িত হয়েছিলেন, ততটা আলোড়িত গান্ধীজী ও জওহরলাল হননি। এবং সেই সংকটের দিনে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রই ভারত-ভাগ্যের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

১৯৪০ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হল রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন। মহাযুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর নীতির সূত্রই এই অধিবেশনে অনুসৃত হয়েছিল। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন, ব্রিটেনের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটবে, এবং এই বিশ্বাসের উপরেই গড়ে উঠেছিল যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর নীতি। সুভাষচন্দ্র সেখানে 'আপস বিরোধী সম্মেলন'-এর অনুষ্ঠান করলেন ও ঘোষণা করলেন, "ইউরোপের রণাঙ্গনে ব্রিটেন যতই ঘা খাবে, ভারতে তার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুঠোও ততই আলগা হতে বাধ্য। সাম্রাজ্যের সাহায্যে কিংবা ভারতের সাহায্যে ব্রিটেন বাঁচাবার কথা আমাদের তাই না-বলাই ভাল। এই নিদারুণ সংকটের মুহূর্তে ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে তার নিজের কথা ভাবতে হবে।...ভারতীয় জনসাধারণকে দাবি তুলতে হবে, অস্থায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করে তার মাধ্যমে অবিলম্বে তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেস যদি না স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ব্রিটিশ শাসন চালু থাকায় তার সায় আছে। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র আহ্বান জানালেন যে, পরাধীনতার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলবার জন্য অবিলম্বে এক সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করা চাই। কলকাতায় অন্ধকূপ হত্যার স্মারকস্তম্ভ অপসারণের আন্দোলন তারই সূচনা। সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলন শুরু করতেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনলেন ও তাঁকে আলিপুর জেলে আটক করলেন।

কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের মুক্তি-স্পৃহা তাতে ঝিমিয়ে যায়নি। সুভাষচন্দ্রের কর্মসূচীতে সেই মুক্তি স্পৃহাই তো একটি স্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠেছিল, সরকারের দমন নীতি তাকে নেবাতে পারল না।

॥ ২ ॥

ফ্রান্সের পতনের পর "ইংল্যান্ডকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত" করাই হিটলারের আশু লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল, এবং তাঁর সমরোদ্যোগও তখন সেই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হতে লাগল। ঘটনাস্রোতের এই গতি দেখে সুভাষচন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি স্থির করলেন যে, জার্মানরা গিয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ দখল করবার আগেই ব্রিটেনের দুর্বল মুঠি থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হবে। তার জন্য আন্দোলন শুরু করা দরকার। কিন্তু কে সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন? সুভাষচন্দ্র তখন কারাগারে। তিনি স্থির করলেন, তাঁকে মুক্তি পেতে হবে। মরিয়া হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমাকে মুক্তি দাও, তা নইলে আমি মৃত্যুবরণ করব।...১৯৪০ সনের ২৯ নভেম্বর থেকে শুরু হবে আমার অনশন।"

তাঁর সেই ঐতিহাসিক অনশনের কথা সকলেরই মনে আছে। দুর্দিন অনশনের

পর তাঁকে কারাগার থেকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হল। বাড়িতে বসে স্থিরচিত্তে তিনি যুদ্ধের যাবতীয় সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখলেন, এবং এ-ব্যাপারে নিঃসংশয় হলেন যে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে যদি তাড়াতে হয়, তবে তার জন্য কোনও বহিঃশক্তির সামরিক সাহায্য নিতেই হবে। কে দেবে সেই সামরিক সাহায্য? সুভাষচন্দ্র ভেবে দেখলেন, এ-ব্যাপারে রাশিয়া কিংবা জারমানির সাহায্য হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

তিনি ঠিক করলেন, তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে হবে। জানুয়ারির এক রজনীর শেষ যামে তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। কাবুল আর বোখারা হয়ে তিনি মস্কোয় পৌঁছন। সেখান থেকে, ১৯৪১ সনের ২৮ মার্চ তিনি বিমানযোগে বার্লিনে এসে নামলেন।

সুভাষচন্দ্র সেখানে প্রথমেই এই দাবি তুললেন যে, অক্ষশক্তিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু হিটলার তাতে রাজী হলেন না। ১৯৪০ সনের শেষের দিকে রাশিয়ার সঙ্গে হিটলারের যে গোপন আলোচনা হয়েছিল, তাতে ঠিক হয়েছিল যে, ব্রিটেনের পরাজয়ের পরে ভারতবর্ষকে রুশ অভীপ্সার এলাকা-ভুক্ত অঞ্চল বলে গণ্য করা হবে। ঘটনা কিন্তু অতঃপর অন্য পথে মোড় নিল। হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করলেন। এবং ১৯৪১ সনের ২২ জুনের পর সুভাষচন্দ্রও সক্ষম হলেন তাঁর কর্মসূচী অনুযায়ী অগ্রসর হতে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি আজাদ-হিন্দ বাহিনী। ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে ভারত-বর্ষকে স্বাধীন করাই তাঁর লক্ষ্য। সেই বাহিনীর ধ্বনি হল 'জয় হিন্দ' আর তার শ্রদ্ধেয় নেতা সুভাষচন্দ্রের নাম হল 'নেতাজী'।

ভারতবর্ষে যখন ১৯৪২ সনের মহান আগস্ট আন্দোলন চলছিল, তখন স্বাধী-নতার সেই সংগ্রামকে আরও তীব্র করে তোলবার জন্য সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বদেশ-বাসীর উদ্দেশে বারবার বাণী পাঠিয়েছেন। অথচ ভারতবর্ষের, এমন কী তাঁর আপন শহর কলকাতারও, কয়েকটি কাগজ তখন তাঁর নামে কুৎসা রটাতে ছাড়েনি; সুভাষ-চন্দ্রকে তারা 'অক্ষশক্তির চর' আখ্যা দিয়ে-ছিল। বার্লিন থেকে বেতারযোগে সুভাষ-চন্দ্র তার উত্তরে বললেন, 'আমার সমগ্র জীবনই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ, অবিচল, আপস-বিরোধী সংগ্রাম; এবং তারই মধ্যে আমার উদ্দেশ্যের সততার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যাবে। অক্ষশক্তির হয়ে ওকালতি করা আমার কাজ নয়। একমাত্র ভারতই আমার ভাবনা; এবং তার স্বাধীনতাই আমার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য যখন অর্জিত হবে, তখনই আমি স্বদেশে ফিরব।"

গান্ধীজী, জওহরলাল ও কংগ্রেসের নীতি যে কেন ভ্রান্ত, এবং তাঁর নীতি যে কেন ভ্রান্ত নয়, তার ব্যাখ্যা হিসেবে পুনশ্চ তিনি বললেন, "আপন বাহুবলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না; স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়।"

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় হিটলার তাঁকে একদিন দেওয়ালে-টাঙানো একটি মানচিত্রের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর মানচিত্রের দিকে আঙুল তুলে, জার্মানী থেকে ভারতবর্ষ কতটা দূরে তা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন যে, এত দূরে থেকে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে তাদের পর্যুদস্ত করা; সমরোদ্যোগের দিক থেকে খুবই কঠিন ব্যাপার।

ওদিকে জাপান ইতিমধ্যে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করেছিল, এবং তার সৈন্যবাহিনী ভারতের কাছে এসে পৌঁছেছিল। সুভাষ-চন্দ্র স্পষ্ট বুঝলেন যে, পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন করা সহজতর কাজ হবে।

এই কারণেই পশ্চিম থেকে পূর্বে রণাঙ্গনে চলে এলেন সুভাষচন্দ্র। ৮ই ফেব্রুয়ারি একটি সাবমেরিনে উঠে তিনি

জার্মানী ত্যাগ করলেন, তারপর ভারত মহাসাগরে তা থেকে উঠলেন একটি জাপানী সাবমেরিনে। ১৯৪৩ সনের ১৩ জুন তিনি টোকিয়োয় গিয়ে পোঁছলেন।

৯ জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরে ষাট হাজার সৈন্য তাঁকে ঘোষণা করতে শুনল, "চলো দিল্লি......আমাকে অনুসরণ করো ......আমি তোমাদের জয় আর স্বাধীনতার লক্ষ্যে পোঁছে দেব।"

বাংলা দেশে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। সেই দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ সরকারেরই সৃষ্টি। নেতাজীকে ভালবাসে, তাঁর আদর্শকে সমর্থন করে,—শুধু এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে ব্রিটিশ সরকার সেদিন বাংলা দেশের মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছিল। ১৯৪৩ সনের অগাস্ট মাসে নেতাজী জানালেন, উপহার হিসেবে ভারতবর্ষকে তিনি এক লক্ষ টন চাল পাঠাতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তো ভারতবাসীদের বাঁচাতে চায় না, ভারতবাসীদের তারা মারতেই চায়। তাই নেতাজীর প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করল; তাঁকে চাল পাঠাতে দিল না।

১৯৪৩ সনের ২১ অক্টোবর তারিখে নেতাজী অস্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা করলেন। শপথ নিলেন : "ঈশ্বরের নামে শপথ নিচ্ছি যে, ভারতবর্ষ ও আমার আট-ত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে মুক্ত করবার জন্য আমি সুভাষচন্দ্র বসু, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব।...স্বাধীনতা অর্জনের পরেও, ভারতবর্ষের সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব।"

অতঃপর গাওয়া হল জাতীয় সংগীত। সেই সংগীত রবীন্দ্রনাথের রচিত।

রবীন্দ্রনাথ একদিন ভারতবর্ষের ত্রাণ-কর্তা হিসেবে সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন। যে-আস্থা তাঁর উপরে ন্যস্ত করে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র তার মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

॥ ৩ ॥

১৯৪৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল। সেই সঙ্গে শেষ হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তি-অক্ষশক্তির মহাযুদ্ধ। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের যুদ্ধে সেখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল না। জাপানের আত্ম-সমর্পণের খবর শুনে নেতাজী মন্তব্য করলেন, "...একমাত্র আমরা আজও আত্ম-সমর্পণ করিনি।"

বস্তুত, তিনি স্থির করলেন যে, রুশ অঞ্চলে তিনি আশ্রয়লাভের চেষ্টা করবেন, এবং সেখান থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। মঞ্চুরিয়ার রুশ বাহিনী যেভাবে এগোচ্ছিল, তার থেকে তিনি আন্দাজ করে নিলেন যে, মোটামুটি কোন্ তারিখে তারা দাইরেনে গিয়ে পোঁছবে, এবং পরিকল্পনা করলেন যে, তার আগেই তাঁকে সেখানে গিয়ে পোঁছতে হবে।

১৯৪৫ সনের ১৭ আগস্ট তারিখে সায়গন থেকে নেতাজী ও জেনারেল সিদেই একটি দু-ইনজিনের বোমারু বিমানে উঠে দাইরেন অভিমুখে যাত্রা করলেন। জেনারেল সিদেই তখন কোয়ানটুং বাহিনীর নবনিযুক্ত অধিনায়ক। সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁরা তুরেন-এ গিয়ে পোঁছন। পরদিন সকালে আবার রওনা হলেন তাঁরা, এবং আন্দাজ বেলা দুটোর সময় ফরমোজার তাইপে (তাইহোকু) বিমানঘাটিতে গিয়ে নামলেন। সেখানে তাঁরা শুনলেন যে, ইঙ্গ-মারকিন কয়েকটি বিমান তাঁদের পিছু নিয়েছে; তাইপেতে তাঁদের ধরাই তাদের উদ্দেশ্য। পাছে তাদের হাতে বন্দী হতে হয়, এই আশংকায় তাইপে থেকে চটপট তেল নিয়ে তাঁদের বিমান আবার ছেড়ে দিল। আড়াইটের সময় আকাশে উঠল, এবং সেইদিনই সন্ধ্যায় দাইরেনে গিয়ে পোঁছল। ইঙ্গ-মারকিন বিমানগুলি যাতে আর নেতাজীর পিছু না নেয়, তার জন্যে তাদের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে জাপানের সামরিক গোয়েন্দা-বিভাগ একটা চাল চাললেন। নেতাজীর সহকারী হবিব-উর-রহমান তাইপেতেই রয়ে গেলেন। জাপ গোয়েন্দারা তাঁকে এই কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে নেতাজীর বিমান ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সেই দুর্ঘটনায় তিনি ভীষণ-ভাবে আহত হওয়ায় তাঁকে একটা হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি বাঁচেননি। রাত নটায় সেই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য ভারতীয় সংসদ ১৯৫৬ সনে একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু সেই তদন্ত-কমিটি তাইপেতে যাননি। জাপানীরা তাঁদের একটি ফোটো দেয়। কিন্তু এই ফোটোটি

১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্টের বিমান দুর্ঘটনার ফোটো নয়, ১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসের একটা দুর্ঘটনার ফোটো। বস্তুত, ১৯৪৫ সনে অনুরূপ কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। অথচ, জাপানীদের দেওয়া ফোটোখানি সেই অলীক দুর্ঘটনার প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হল। মূল সত্যকে এইভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ভারত সরকার অদ্যাপি তাকেই নেতাজীর মৃত্যুর চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য করছেন।

তাইপে, ইউরোপ ও রাশিয়ার স্বাধীন-ভাবে তদন্ত চালিয়ে কিন্তু জানা গিয়েছে যে, নেতাজী সেদিন নিরাপদে দাইরেনে পৌঁছেছিলেন। রুশ বাহিনী বন্দরটি দখল করবার পরে কিছুকাল তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। সেখানকার অসামরিক অধি-বাসীদের প্রতি রাশিয়ানদের নিষ্ঠুর আচরণ দেখে নেতাজীর স্বপ্নভঙ্গ হয়।

এর কিছুকাল পরে সুভাষচন্দ্র নানকিংয়ে স্বাধীন ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে যোগা-যোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দূতাবাসের সূত্রে চীনের কমিউনিসট নেতারা সুভাষচন্দ্রের গতিবিধির সন্ধান পেয়ে যান এবং ব্যাপারটা তাঁরা রাশিয়ানদের জানিয়ে দেন। পরিণামে রাশিয়ানরা হিটলারপন্থী যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দাইরেনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করে এবং তাঁকে তাদের সাই-বেরিয়ায় তাদের ইয়াকুটসক বন্দী-শিবিরে পাঠিয়ে দেয়।

জনাকয়েক জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের যুদ্ধবন্দী, এমন কী ইয়াকুটসক ও তার নিকটবর্তী অন্যান্য সাইবেরীয় বন্দী-শিবির থেকে প্রত্যাগত জনাকয়েক রুশ নাগরিকও এই তথ্য জানিয়েছেন যে, সুভাষ-চন্দ্রকে তাঁরা দেখেছিলেন. বস্তুত, ১৯৫৩ সনে স্তালিন যখন মারা যান, সুভাষ-চন্দ্র তখনও জীবিত।

প্রকৃত তথ্য বেদনাদায়ক ও নিন্দার্হ। এবং সেই তথ্যটা এই যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে যে মানুষটির ত্যাগ সবচাইতে বেশী, স্বাধীন হবার পরে অকৃতজ্ঞের মতো তাঁকেই আমরা ভুলে গিয়েছি। যেন এই অকৃতজ্ঞ বিস্মরণই তাঁর ভাগ্যলিপি।

সুভাষচন্দ্র যে-বছর স্বদেশ ত্যাগ করেন, রবীন্দ্রনাথও সেই বছরেই আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। এবং রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পর অন্য কোনও ভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাগ্য সম্পর্কে কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি।

রাশিয়া, বাস্তবে

১৯৪০ সনের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল। ইংল্যান্ড অভিযানের ব্যাপারে হিটলারের নির্দেশ সেই সময়ে কার্যকর করা হয়। হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী পশুরা তখন একমাত্র রাশিয়া বাদে প্রায় গোটা ইউরোপকেই পদানত করেছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষ যে-সব কীর্তি স্থাপন করেছিল, তার একটা মস্ত অংশকে তারা তখন নির্মমভাবে ধ্বংস করে চলেছে।

ব্রিটেনের আকাশে তখন ঘোর যুদ্ধ চলছে। সভ্য জগতের অধিকাংশ মানুষ অভিশাপ দিচ্ছে হিটলারের জঙ্গী নীতিকে।

ভারতবর্ষে কিন্তু ইউরোপীয় এই মহা-যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভিন্ন রকমের। ব্রিটিশ শাসকরা এ-দেশের সমুদয় অর্থ-সম্পদ শোষণ করে তাকে ব্রিটেনের যুদ্ধে নিয়োজিত করেছিল। ভারতভূমির মুক্তি-স্পৃহাকে তারা নির্মমভাবে দমন করেছিল। সুভাষ যা বলেছিলেন, তা-ই হচ্ছে তখন ভারতবর্ষের অন্তরের কথা। "ভুলে যেও না যে, দাসত্বই মানবজীবনের সবচাইতে বড় অভিশাপ। ভুলে যেও না যে, অবিচার ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাই সবচাইতে বড় পাপ। শাশ্বত এই নীতির কথা মনে রেখো যে, জীবন যদি চাও, তাহলে জীবনই তোমাদের দিতে হবে।"

হিটলারের প্রভুত্বকে ইউরোপের দেশগুলি ঘৃণার চোখে দেখেছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ শাসকরা যা করেছিল, তার ফলে ভারতের কাছে ব্রিটিশ শাসন হয়ে উঠে-ছিল আরও ঘৃণ্য। দুর্গত ভারতবাসীদের ভাগ্যের যে কোনও পরিবর্তন ঘটবে, এমন কোনও আশার ইঙ্গিতও সেই দুর্দিনের অন্ধকারে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। অনেকে ভেবেছিলেন, রাশিয়া নিশ্চয় হিটলারী নিষ্ঠুরতা ও ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক বর্বরতার বিরোধী ভূমিকা নেবে। তাঁদের স্বপ্নভঙ্গ হল। হিটলার-স্তালিন চুক্তি অনুযায়ী দেখা গেল যে, রাশিয়া নেহাতই নাৎসী সমরযন্ত্রের কাঁচা মাল যোগাবার ঘাটিতে পরিণত হয়েছে; ওদিকে স্তালিন তখন ভাবছেন যে, ব্রিটেন পরাস্ত হবার পর ভারতবর্ষের দৌলতে রাশিয়াকে তিনি আরও সম্পদশালী করে তুলবেন।

ইউরোপে যখন দুঃখ-নিশার অন্ধকার নেমেছে, এবং ভারতবর্ষে চলেছে উপনিবেশ-বাদী ব্রিটেনের চরম অত্যাচার, তখন নাৎসী-দের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বই ছিল সবচাইতে নৈরাশ্যজনক ব্যাপার।

॥ ২ ॥

১৯৪০ সনের শরৎকাল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন রোগমুক্ত হয়ে শান্তি-নিকেতনে রয়েছেন ও ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছেন। সেই সময়ে 'রোমাঞ্চক রাশিয়ায়' নামে আমার একটি বাংলা বই বার হয়। বইখানির একটি কপি হাতে পেয়েই আমি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শান্তি-নিকেতন যাই। এ হল সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের ঘটনা।

রাশিয়া সম্পর্কে গুরুদেবের খুব ঔৎসুক্য ছিল। আমার বইখানা তিনি এক-দিনেই পড়ে শেষ করলেন ও একটি আশীর্বাণী লিখে দিলেন। কিন্তু লেখার আগে সহাস্যে একটা প্রশ্নও তিনি করে-ছিলেন আমাকে। "রাশিয়া সম্পর্কে তোমার এই বইয়ে তুমি যা লিখেছ, তার কতটা কল্পনা আর কতটা বাস্তব?"

বললুম, "আপনার জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে গোর্কির শ্রদ্ধায় কোনও খাদ নেই। ভারতবর্ষ সম্পর্কে রুশ জনসাধারণের ভাল-বাসাটাও খাঁটি ব্যাপার। এ-সবই বাস্তব। তবে কিনা রুশদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে আনন্দ আমি দেখেছি, তার জন্ম আমার কল্পনায়।"

"মানবিক আনন্দই হল যুদ্ধের এক ভয়াবহ বলি। লন্ডনের যে ছবিটি আমার মানসপটে আঁকা রয়েছে, তাতে সবচাইতে সুন্দর দৃশ্য হল সেন্ট পলস গির্জা। শুনলুম, নাৎসী বোমা তাকেও রেহাই দেয়নি।"

"একদিকে যখন মানবসভ্যতার নানা শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিটলারের হাতে ধ্বংস হচ্ছে, অন্য-দিকে ব্রিটিশ সরকার তখন ভারতবর্ষে এক অমানুষিক শাসন চালাচ্ছে। গুরুদেব, আমাদের ও বিশ্বপৃথিবীকে ত্রাণ করবার জন্য আরও অনেক দিন আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে।"

গুরুদেব বললেন, "আমি তোমাদের নিরাশ করতে চাই না।"

মনে হল, তিনি চিন্তামগ্ন। তাঁর দৃষ্টি যেন যুদ্ধ বিপর্যয় ইত্যাদি পেরিয়ে আরও অনেক দূরের ভবিষ্যতে চলে গিয়েছে। তাঁর একটা ফোটো তুলবার জন্য অনুমতি চাইলুম। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন।

আজও যখন রাশিয়ার কথা ভাবি, সেই ফোটোর মধ্য থেকে গুরুদেবের চোখ দুটি যেন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে প্রশ্ন করে, "এ কি বাস্তব, না কল্পনা?"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মেলা —মনীষা যোশী

চিলড্রেনস লিটল্ থিয়েটার, অর্থাৎ শিশু রংমহল তথা অবন মহল। নাচ ও গান, পুতুলনাচ ও অভিনয়কলা এবং ছবির মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ এই সংস্থার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে শিল্পীদল আমাদের দেশের বয়স নির্বিশেষে সকলকে যে নির্মল আনন্দ দান করে আসছে তার তুলনা বোধ হয় অল্প দেশেই মেলে। বিশেষত, বর্তমান কলুষিত সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই নিছক আনন্দ অনুষ্ঠান অনেক সময়েই অনেকের, বিশেষ করে যাঁরা বহির্বাংলায় বাস করেন তাঁদের কাছে, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হয়—এবং তাঁদের সে অনুমান অসঙ্গত নয়। অথচ এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই শিশু রংমহলের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দীর্ঘ তিন সপ্তাহব্যাপী যে বিচিত্র আনন্দ রস পরিবেশন করল তার স্বাদ অনেকেই পেয়েছেন। সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, পুতুলনাচ ও ছবির মধ্য দিয়ে তারা সকলেই আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ করে আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ-এর কাহিনীটি পুতুলনাচের মধ্য দিয়ে তারা যে-ভাবে রূপায়িত করে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করেছে তার তুলনা মেলা ভার। সেই সঙ্গে অবন মহলের আর এক পাশে ছিল তাদের আঁকা নির্বাচিত ছবির কয়েকটি নিদর্শন।

প্রদর্শনীর প্রধান গুণ, সুনির্বাচিত প্রণালী। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে ১৬ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জল-রঙ, প্যাস্টেল ও কালিকলমে আঁকা ছবি প্রদর্শনীতে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, কয়েকটি ছেলেমেয়ে সমকালীন সমাজ-জীবনের রূপই তাদের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে রঙ ও তুলির সাহায্যে প্রকাশ করেছে। প্রদর্শনীর মান উচ্চ এবং কয়েক-জনের রচনায় নিষ্ঠা ও নিয়মিত শিল্পচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় অঙ্কন ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাদের ঠিক-পথে চালিত করার জন্য শিল্প-শিক্ষক সকলের ধন্যবাদ ভাজন।

ছবির বিষয়বস্তু নানা শ্রেণীর—গৃহ-কোণ ও বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বাজার, মেলা, নিসর্গ বা কোনও বহির্দৃশ্য ও বিশেষ করে অবন মহলের প্রিয় রঙ্গমঞ্চটি অনেকের ছবিতেই দেখা যায়। তবে অঙ্কনরীতির পার্থক্যও চোখে পড়ে। বার বছরের অনূর্ধ্ব ছেলেমেয়েদের প্যাস্টেলে আঁকা ছবির মধ্যে নূপুর ভট্টাচার্যের গণেশ শোভাযাত্রা অনেকের ভাল লাগে। শারদা রায়চন্দানীর আঁকা ছবিটিও মন্দ লাগে না। কালিকলমের একটি কাজ প্রশংসনীয়—মিতা শ্যামলাল জাভেরীর রেল স্টেশন।

এই বিভাগে জলরঙের কয়েকটি প্রশংসনীয় কাজ দেখা যায়। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রুচির যোশীর নিসর্গ দৃশ্য—এ ৮। সবুজ ও হলুদ রঙের টানগুলি পাকা হাতের, এটিতে শিক্ষক কোনওভাবে সাহায্য করেছেন কিনা জানি না। যদি না করে থাকেন, তাহলে ছেলেটির প্রতিভা আছে সন্দেহ নেই। নীল ও হলুদ রঙপ্রধান বীথিমুখর পার্বতীর জন্য (এ ২৮) সোমা সকলেরই প্রশংসা দাবী করে। আর একটি ছবি ভাল লাগে—জয়ন্ত ভট্টাচার্যের রীতি-মুখর মোরগ (এ ৪৬)। অপর পর ছবির মধ্যে মনীষা যোশীর মেলা, এবং বিশেষ করে অনসূয়া ঘোষের ছবি (এ ৩৬)-এর নাম করা চলে। ১২ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কয়েকজন অপেক্ষাকৃত ভাল ছবি এঁকেছে, বিশেষ করে জলরঙে, যদিও কালিকলমে আঁকা উল্লেখ্য কোনও ছবি চোখে পড়েনি। প্যাস্টেল কাজের মধ্যে তাপস সোমের স্ট্রীট কর্নার ভাল লাগে। জলরঙ বিভাগে কয়েকজন ভাল কাজ করেছে, বিশেষত দুজন সমকালীন কলকাতার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই কেকা বসুর নাম করা যায়। রাজপথে অতর্কিতে বোমা নিক্ষেপ, ভয়ার্ত পথচারীদের নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানে ছোটাছুটি—বর্তমান যুগের কলকাতার রাজপথের এই পরিচিত দৃশ্যটিই শিল্পী সুন্দরভাবে এঁকেছে। রঞ্জনা লাহিড়ীর প্রোসেসনও এই জাতীয় ছবি—দেখে সকলেই বুঝতে পারবেন যে এটির মধ্য দিয়ে অতি পরিচিত পথদৃশ্য ফুটে উঠেছে। আর একটি ছবির নাম করা যায়, রমিতা পালের 'জু'। প্রদর্শনীতে কারু-শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন দেখা যায়। কাপড়ের সুন্দর বাতিদান, চামড়ার ব্যাগ ও থলি, বিশেষ করে নারিকেল খোলের তৈরী অ্যাশট্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

*

শিল্পী গোপাল মিত্র অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর গ্রাফিক প্রিন্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। গোপাল মিত্র পাটনা সরকারী আর্ট স্কুলে ১৯৫৩ সালে শিক্ষা শেষ করে পরে আমেরিকায় উচ্চ শিল্পকলা শিক্ষা করেন। স্টুডিও আর্টে তিনি মিনেসোটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ও পরে আর্ট এডুকেশনে ডক্টরেট হন। ইতিপূর্বে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে তিনি পঞ্চাশেরও অধিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। তাঁর ছবি ও গ্রাফিক প্রিন্ট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওয়াশিংটন (মিনেসোটা) আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর আঁকা একটি ছবি আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি মহোদয়কে উপহার দেওয়া হয়। প্রদর্শনীতে মোট ৩৫টি প্রিণ্ট দেখা যায়, তাদের মধ্যে ২০টি ইনটাগ্লিও ও অবশিষ্ট কুড়িটি উডকাট প্রিণ্ট।

গোপাল মিত্রের প্রিণ্টের প্রধান আকর্ষণ

ফ্রাঙ্কলিন ব্রিজ, (উডকাট) —গোপাল মিত্র

তাঁর সূক্ষ্ম ও উন্নত শ্রেণীর খোদাই পদ্ধতি ও সেই সঙ্গে উন্নততর প্রিন্ট নেওয়ার প্রণালী। শিল্পীর আর একটি অনুকরণীয় গুণ এই যে, দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করে ও শিক্ষালাভ করেও তিনি নিজ মাতৃভূমিকে ভোলেন নি। বিদেশীয় নানা দৃশ্য বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করলেও শিল্পী বাংলা দেশের গ্রাম্য দৃশ্য তথা পল্লীবাসীর সরল-স্নিগ্ধ রূপও সেই সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। খোদাই রীতিও মিশ্র, অর্থাৎ বিমূর্তের সঙ্গে তিনি রিয়ালিস্টিক কাজও করেছেন। ফলে এই দুই রীতির কাজের মধ্য দিয়ে যেন শিল্পীর দুটি শিল্পীমনের সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশে রোলার, প্রেস, কাগজ, রঙ—যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুই উন্নততর ও সহজলভ্য। তিনি সেগুলি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন, যে সুবিধা আমাদের দেশের গুণী গ্রাফিক শিল্পীগণ ইচ্ছা থাকলেও পান না। শিল্পী প্রতিভাবান, তার ওপর উপযুক্ত মালমসলা পেয়েছেন, ফলে প্রিন্টগুলি হয়েছে সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। তাঁর উডকাট প্রিন্টগুলি রেখা ও খোদাই-বৈচিত্র্যে ঝলমল করে। বিশেষত ফ্রাঙ্কলিন ব্রিজ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চওড়া দীর্ঘ প্যানেল জাতীয় প্রিন্টে শিল্পী সূক্ষ্ম, মোটা ও নানা ধরনের খোদাই কাজ দ্বারা জলের ওপর স্থূলের প্রতিবিম্ব পর্যন্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। এটির কারুকার্য দ্রষ্টব্য। 'ভিলেজ হোমস' দেখে বাংলার চিরপ্রিয় শ্যামল সজল পল্লীগ্রামের রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে—এটির আলোকবিন্যাস লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড'-এরও নাম করা যায়। পৃথক পৃথক শ্রেণীর বিভিন্নমুখী রেখা খোদাই সাহায্যে শিল্পী ল্যান্ডস্কেপ প্রিন্টে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি প্রিন্টে আলংকারিক রূপ ফুটে উঠেছে, যেমন 'গাসপিং'। ইনটালিও অর্থাৎ গভীর খোদাইয়ের নিদর্শন হিসাবে 'রিক্লাইনিং ন্যুড' ও 'ওয়ে হোম' প্রিন্ট দুটির নাম করা চলে। প্রথমটির সুকুমার খোদাই কাজ ও লাল রঙের ব্যবহার ও দ্বিতীয়টির সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপ অনেককে মুগ্ধ করে। 'হোমেজ টু এস জে' বিমূর্ত প্রিন্টের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বৃত্তাকার গতিশীল সূক্ষ্ম খোদাইপদ্ধতি ও উপরে এবং দক্ষিণে ইঙ্গিতভিত্তিক মুখের অবতারণা লক্ষণীয়। কয়েকটি প্রিন্ট দেখে কোথে কোলভিংসের প্রিন্ট মনে পড়ে—যেমন 'গাসিপারস' (উডকাট)। শিল্পীর কাজ দেখে মনে হয় উডকাটেই তাঁর অধিক দক্ষতা। অপরাপর প্রিন্টের মধ্যে 'ফিশারম্যান', 'মার্কেটিং' (ইনটালিও) ও 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' এবং বিশেষ করে ভাস্কর্য জাতীয় প্রিন্ট 'অ্যাম আই অ্যালোন' (উডকাট)-এর নাম করা চলে।

—চিত্রপ্রিয়

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভবানীপুর সুভাষ উদ্যানে ২২-পল্লী সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত 'বসে-আঁকো-শিশু চিত্রাঙ্কন' প্রতিযোগিতার এক মনোরম দৃশ্য

শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

২২ পল্লী সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক "বসে-আঁকো" শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সাধারণতন্ত্র দিবস, ২৬শে জানুয়ারী '৭১ কলকাতার ভবানীপুরস্থ সুভাষ উদ্যানে (নর্দার্ন পার্ক) অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাটি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং শিশু বিভাগে (৫—৮) ১৯৪ জন, বালক বিভাগে (৯—১২) ২৩৪ জন এবং কিশোর বিভাগে (১৩—১৬) ১৯৭ জন প্রতিযোগী যোগ দিয়েছিল। দ্বিপ্রহর থেকে শিশুদের জমায়েত শুরু হয় এবং বেলা প্রায় ১টা নাগাদ প্রতিযোগিতার সমগ্র অঙ্গনটি হাসামুখর শিশু-শোভায় এক পুষ্পোদ্যানের চেহারা নেয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক শংকর (শ্রীমণিশংকর মুখার্জি) স্বাগত সম্ভাষণ জানান। স্টেটসম্যান পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক শ্রীসত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতিরূপে, প্রবীণ চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে এবং কলিকাতার মহানাগরিক শ্রীপ্রশান্তকুমার সুরকে উদ্বোধক হিসাবে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে শংকর এই প্রতিযোগিতার একটি বিরল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। ক্রমেই অধিকসংখ্যক প্রতিযোগী, যেমন আর্থিক সম্পত্তিসম্পন্ন নয় এইরকম পরিবার থেকেই যে এসেছে, এই দুঃখদুর্দশার দিনে তা সকলেরই প্রকৃত আনন্দের বিষয়। কোন দিক থেকে সহযোগিতার কোন অভাব হয় নি এবং তাতেই উদ্যোক্তাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, কল্যাণ-কার্যে সমর্থনের অভাব কখনও হয় না। সভার অংশ শেষ হওয়ার পর অঙ্কনের বিষয় যা এতক্ষণ বিশেষভাবে গোপন রাখা হয়েছিল তা ঘোষণা করা হয়। "যা খুশি আঁকো", তিনটি বিভাগেই এই ছিল অঙ্কনের বিষয়। প্রতিযোগীরা যে কেবল মাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী তা নয়, সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিশুও যোগ দিয়েছিল। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীরা বিচারকের কাজ করবেন এবং আশা করা যায় যে, ফেব্রুয়ারী '৭১-এর শেষ ভাগে ফলাফল ঘোষিত হবে।

ভুতুড়ে ক্রিকেট

বিশ্বজিৎ রায়

বিরিঞ্চিবাবুর পরিচয় দিলে তাঁকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। নাদুস-নুদুস মাথায়-খাটো-বহরে-বড়-বাঙালী-সন্তান-সুলভ চেহারা। সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন না কদাচ, যদিও জীবনের প্রারম্ভে কিছুদিন মাস্টারী করেছিলেন। অতঃপর ভারতীর সেবা না করে সোজাসুজিই লক্ষ্মীর আরাধনায় ব্রতী হন। আজ তিনি যে সিদ্ধকাম তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর বিপুল বসতবাড়ির হরেকরকম রং-এ, আয়কর-উকিলের সঙ্গে পরামর্শের বহরে, সদনুষ্ঠানাদিতে চাঁদা দেবার কার্পণ্যে। অবশ্য তিনি দেশ বা সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন নন। তিনি আধুনিক গানের পৃষ্ঠপোষক — কথা ও ভাব কী মনোহর রবীন্দ্র-পার্শ্ব, সুর ও ছন্দ কী মধুর নৈরাজ্যবাদী। বিরিঞ্চিবাবু ধর্মপ্রাণ—পুজোর সময় মোটরে করে ঘুরে ঘুরে দৈনিক কমপক্ষে পাঁচশোটি প্রতিমা দর্শন করে থাকেন। আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি ন-সিকে বাঙালী অর্থাৎ বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত-মানসসম্পন্ন—চৌরঙ্গীর কোন হোটেলে প্রবেশ করেন না; আর ঐ-সব স্থানের কথা ভাবলেই তাঁর কল্পনায় উদিত হয় সাংঘাতিক সব পাপলীলার চিত্র। অতএব বিরিঞ্চিবাবু জাতীয়তাবাদীও বটে—আধুনিকাদের সজ্জা এবং ভঙ্গিমা দু'চোখ ভরে দেখলেও তা তাঁর দু-চক্ষের বিষ এবং কালিদাস বা সাজাহানের যুগের ভারতীয় নারীর সাহসিক সজ্জা এবং আচারবিহার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞভাষ্য তাঁর অসহ্য। কিন্তু এহেন বিরিঞ্চিবাবুকে দংশন করেছিল ক্রিকেটের পোকা।
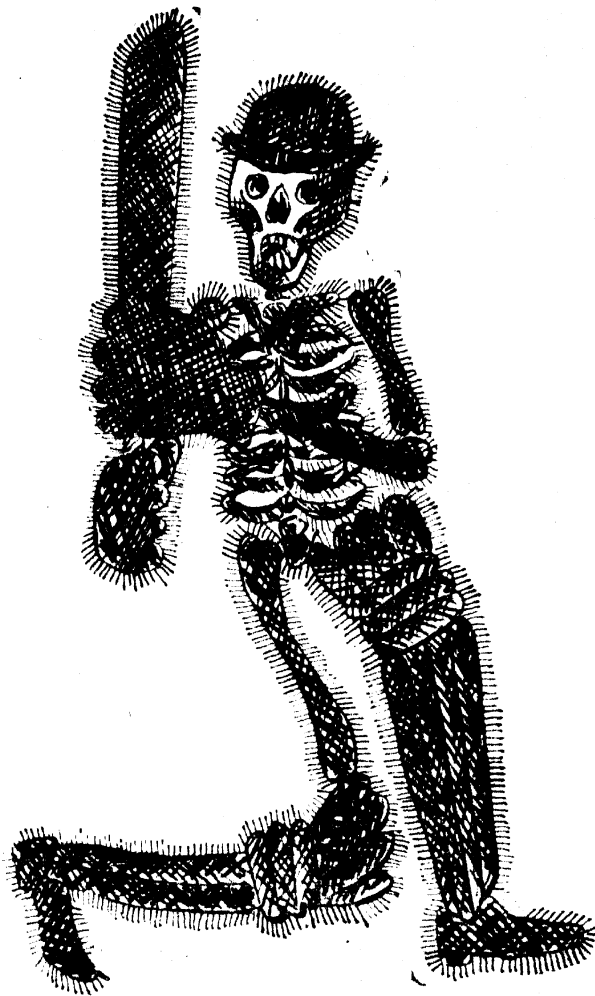
ক্রিকেট-পোকার দংশনক্রিয়া একেক-জনের উপরে একেক রকম হয়। তবে দংশিত ব্যক্তির বয়স বেশী হলে সাধারণত তিনি খেলা দেখতেই ছোটেন, নয়তো বড়-জোর উক্ত খেলা নিয়ে নানাপ্রকার দুঃখ-পোষা কাব্য রচনা করে পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের ধৈর্য পরীক্ষা করেন। বিরিঞ্চিবাবু বাঙলা বিশেষণের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ হওয়ায় এবং ইংরাজী ইডিয়মের বিষয়ে প্রায় অচেতন থাকায় স্বচ্ছন্দেই ক্রিকেট-সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে ক্রিকেট-পোকার আক্রমণ আরো তীক্ষ্ণ এবং সরাসরি হয়েছিল। ফলে তাঁর মধ্যে অন্তত একবার একটি চলনসই গোছের ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণের বাসনা দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের সমাজের যে পর্যায়ে বিচরণ করলে বিভিন্ন আশা পূরণ খুব সহজে হয় না বিরিঞ্চিবাবু উঠেছিলেন তারও উপরে। অতএব বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব হলেও তিনি একটি খেলায় যোগদানের বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন এবং সে সাধ মেটাতে তাঁকে খুব বেগ-ও পেতে হল না। মোটা অংকের চাঁদার বিনিময়ে টেস্ট-ক্রিকেটের টিকেট সংগ্রহ —যাকে অনেক নীতিবাদী নির্বোধ কালো-বাজারী ব্যবসা আখ্যা দিয়ে থাকেন, সেই সূত্রে সমাজতান্ত্রিক ইউনাইটেড নামে একটি মাঝারি খ্যাতির ক্লাবের সঙ্গে বিরিঞ্চিবাবুর একদা হৃদ্যতা হয়েছিল।
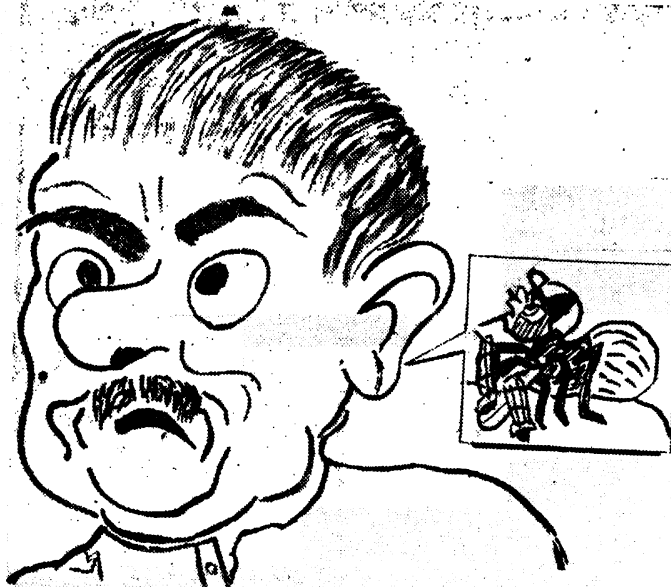
রাশি রাশি দুশ্চিন্তা তাঁর মনে বোলতার হুল ফোটাতে লাগল

সমাজতান্ত্রিক ইউনাইটেডের সঙ্গে সবুজ সংঘ নামে একটি অভিজাত দল—যার কিছু কিছু সদস্য গলফ এবং পোলো খেলাতেও আসক্ত হতে সচেষ্ট, তাদের বাৎসরিক প্রীতি-ক্রিকেট প্রতিযোগিতাটি উৎসাহ এবং উদ্যোগ—উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট ব্যাপক আর তীব্র হয়ে উঠেছে। বিরিঞ্চিবাবু কিঞ্চিৎ অর্থনিষেকের দ্বারা সেই খেলাতে সমাজ-তান্ত্রিক একাদশে স্থানলাভের বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

কিন্তু এই সম্মানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঘুম গেল ঘুচে। শয়নে স্বপনে তাঁর মনে হতে লাগল যে, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বয়সে তাঁর ক্রিকেট মাঠে অবতরণ—এবং তাও জীবনে প্রথম—খুবেই হঠকারিতার কাজ হবে। তিনি কেমন খেলবেন, কতটা খেলবেন, কী ভাবে খেলবেন এবং সর্বোপরি তাঁর খেলা সম্বন্ধে দর্শকদের—তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই মহিলারাও থাকবেন—রায় এবং মতামত তাঁর পরবর্তী জীবনকে কী পরিমাণে দুর্বিষহ করে তুলবে সেই সব রাশি রাশি দুশ্চিন্তা তাঁর মনে বোলতার হুলে ফোটাতে লাগল। অথচ খেলার এত কাছাকাছি এসে পেছনোও যায় না।

খেলার আগের রাতে বিছানায় ছটফট করছেন বিরিঞ্চিবাবু, এমন সময় হঠাৎ শুনলেন কে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় তাঁকে ডাকছে—"স্যার।" এ ডাক একদা শিক্ষক জীবনে ক্লাসঘরে বিরিঞ্চিবাবুর খুবেই পরিচিত ছিল। কিন্তু নিভৃত শয়নকক্ষে এমন সম্বোধন কার? বিরিঞ্চিবাবু বেড-সুইচ টিপলেন। কিন্তু কই, কেউ তো কোথাও নেই! বিরিঞ্চিবাবু ভাবলেন তাঁর ভুল হয়েছে। তিনি আলো নিবিয়ে দিলেন। কিন্তু আবার শুনলেন—"স্যার।" বিরিঞ্চিবাবুর গায়ে কাঁটা দিল। তিনি জাতীয়তাবাদী বাঙালী, প্রেতাত্মায় বিশ্বাস তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। তাঁর সন্দেহ রইল না যে তাঁর শিয়রে এমন কারো আবির্ভাব হয়েছে যাকে সাধারণত বলা হয় ভূত। এক প্রেতাত্মার এ-হেন ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসে বিরিঞ্চিবাবুর যা করা উচিত ছিল তাই করলেন। সাংঘাতিক ভয় পেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভয় প্রায় কেটে গেল, যখন তিনি জানলেন যে, ভূত জীবিতকালে ছিল তাঁর ছাত্র রামচন্দ্র বা রামু। সে তার প্রাক্তন শিক্ষককে বৃদ্ধবয়সে তরুণীভার্যার তুল্য ঘোরাল বিপদ—ক্রিকেট ম্যাচের সামনে পড়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতে দেখে তাঁকে সাহায্য দিয়ে গুরুর ঋণ পরিশোধ করতে এগিয়ে এসেছে। সে অশেষ শক্তির অধিকারী। অনায়াসে কখনো সূক্ষ্ম, কখনো স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে। আবার তার স্থূলে শরীরকেও সে দৃশ্য বা অদৃশ্য রাখতে পারে নিজের খেয়াল অনুযায়ী এবং তার গতি দশদিকেই বিদ্যুৎপ্রায় এবং যথেচ্ছ। সে কাল খেলার মাঠে উপস্থিত থাকবে এবং সর্বশক্তিপ্রয়োগ করবে যাতে বিরিঞ্চিবাবুর ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং দর্শকদের চোখে চমকপ্রদ ঠেকে। ফেয়ার গেম বা স্পোর্টসম্যানশিপ প্রভৃতি নীতিবাদী ধারণার দ্বারা বিরিঞ্চিবাবু কখনোই অযথা বিড়ম্বিত হননি। সুতরাং আলাদিনের দৈত্যের মত তাঁর প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ছাত্রের ক্রিকেট মাঠে সহায়তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে তিনি দেরী করলেন না এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আজ খেলা। পৌষশেষের সকাল। দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, প্রাতরাশ সেরে সদ্যক্রীত সিল্কের শার্ট, বেল্টযুক্ত ফ্লানেলের ট্রাউজার্স, নাতির হ্রস্বমাপের ক্যাপ আর কেডস পরে যখন বিরিঞ্চিবাবু মাঠের দিকে রওনা দিলেন তখন তাঁর সারা অঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে রোমাঞ্চের বিদ্যুৎ যদিও আত্মবিশ্বাসের অভাবজনিত একটা গভীর অস্বস্তি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। মাঠে এসে দেখেন উত্তর দক্ষিণে খাটানো স্ক্রীন, রং-চঙে সামিয়ানার তলায় বেতের চেয়ারে এবং বেঞ্চিতে ঝলমলে তরুণী এবং মহিলারা আর সুবেশ পুরুষেরা আসীন; মাঠের চতুর্দিকেও ভীড় হয়েছে মন্দ নয়। একটি সিগারেট ধরিয়ে তিনি এককোণে গিয়ে বসলেন, একলা। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় একটি ভয়াবহ কথা তাঁর মনে চমক দিয়ে উঠে দম প্রায় বন্ধ করে দিল। তাঁর মনে পড়ে গেল তার তিরিশ বছর আগেকার ছাত্র রামচন্দ্র ওরফে রামু আসলে কে। বিরিঞ্চিবাবুর এভাবে ভয়ে কালিয়ে যাওয়ার কারণ আছে। তিরিশ বছর আগে তাঁর ছাত্র রামু ছিল ইস্কুলের সমস্ত দৌরাত্ম্যের সর্দার। তার দুষ্কৃতির ঠেলায় সারা স্কুলে "ত্রাহি, ত্রাহি" রব উঠেছিল। বিরিঞ্চিবাবু স্বয়ং তার কাছে একগেলাস জল চেয়ে জীবনে প্রথম—এবং সম্ভবত সর্বশেষ—কেরোসিন তেল গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর পালা হাঁসদের বিশহাত গভীর কুয়োর জলে ফেলাও রামুরই কীর্তি ছিল। জীবনে যে কখনো অন্যকে বিড়ম্বনায় বা লাঞ্ছনায় ফেলার প্রলোভন দমন করতে পারেনি, মরণের পরে তার ভয়ঙ্কর রসিকতা-বোধ ক্রিকেট-ম্যাচে তাঁকে কেন্দ্র করে ভদ্রজন সমক্ষে কী উৎকট হয়ে উঠবে সে কথা ভাবতে গিয়ে বিরিঞ্চিবাবুর কপালে ঘাম জমে উঠল। ভূতের হাত থেকে রেহাই পেতে এক্ষেত্রে রামনামেও কাজ হবে কিনা সন্দেহ—এই ভূত নিজেই তো রামচন্দ্র। অনিশ্চিৎ আশঙ্কার একটি কালো ছায়া তাঁর মনে ঘনিয়ে এল।

টসে জয়ী হয়ে সমাজতান্ত্রিক ইউনাইটেড নিল ব্যাটিং। বিরিঞ্চিবাবু তাই-ই চেয়েছিলেন। শুনলেন, তাঁকে যেতে হবে অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে। খেলা শুরু হলো। সবুজ সংঘের প্রারম্ভিক বোলার বেশ দ্রুত বল দেন। কিন্তু তাঁর সঠিক লেংথ আয়ত্তে আনতে ওভার পাঁচেক লাগে। এই অবকাশে সমাজতান্ত্রিক ইউনাইটেডের প্রথম জুটি অনায়াসেই তুলে ফেলল বেশ কিছু রান, কিন্তু তারপরেই ঘটল বিপর্যয়। ফাস্ট বোলার লেংথ খুঁজে পেয়ে হঠাৎ

দুর্বার হয়ে উঠলেন এবং দু ওভারের মধ্যে নিয়ে নিলেন ৩টি উইকেট। অন্য দিকে এক স্পিন বোলারও ব্যূহভেদ করলেন দু'টি সুজ্ঞাত ব্যাটসম্যানের। সমাজতান্ত্রিক ইউনাইটেড দল এক দমকে বিনা উইকেটে ৪৫ রান থেকে ছিটকে এসে পড়ল ৫ উইকেটে ৫১ রানে। সঙ্গীন অবস্থা। এই বার বিরিঞ্চিবাবুকে নামবার জন্যে তৈরী হতে হয়। তাঁর মনে তখন সবেমাত্র কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছে। কারণ এতক্ষণ রাম-ভূত তাঁর কথানুযায়ী মাঠে উপস্থিৎ আছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিরিঞ্চিবাবু ভাবছিলেন একদিকে প্রথম জুটির আর তৎপরবর্তী ব্যাটসম্যানদের সাফল্যের জন্য তাঁকে আর হয়তো শেষ-পর্যন্ত নামতেই হবে না, অন্যদিকে ভূতের হাত থেকেও শেষপর্যন্ত রেহাই পাওয়া যাবে। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর কোন আশাই ফলল না। তাকে প্যাড, গার্ড ইত্যাদি—এতসব যে পরতে হয় কে জানতো—ধারণ করে খেলাতে নামার জন্য প্রস্তুত হতে হলো। আর একটি বেয়ারাকে দিয়ে তিনি যখন প্যাডের বকলস আঁটাচ্ছেন তখন তাঁর কানে ভেসে এল—"স্যার ভয় পাবেন না। আমি আছি।" বিরিঞ্চিবাবুর ভয়ের কারণ খেলা ততটা নয়; ভূতের সাহায্যের স্বরূপটি কী হবে সে কল্পনাতেই তিনি ম্রিয়মান। তিনি সকরুণভাবে ভূতকে অনুরোধ জানালেন, "বাবা রামু, তোমায় আমার জন্য পরিশ্রম করে আয়ুক্ষয় করতে হবে না।" উত্তরে শুনলেন, "হ্যাঃ কী যে বলেন স্যার, ভূতের আবার আয়ুক্ষয়। আপনি ওসব কথা মনেও আনবেন না। তাছাড়া, খেলাটা বড় মিইয়ে গেছে, আরেকটু উত্তেজনা না আনলে রস জমবে না। আপনি আমার ওপর সব ছেড়ে দিন।" এরপর বিরিঞ্চিবাবুর গলা থেকে কেবল এই আর্তরব বেরুল, "দেখিস বাবা, একটু বুঝেসুঝে। একেবারে বেইজ্জত করিস না।" নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে প্যাডপরা পা-টা বেয়ারার হাত থেকে টেনে নিলেন। তাঁর ভূতের সঙ্গে কথোপকথন যা অনাবশ্যক সোচ্চার স্বগতোক্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তা যে বেয়ারাকে খানিকটা চমকে দিয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

অনতিবিলম্বেই পড়ল ষষ্ঠ উইকেট। ক্রিজের দিকে কম্প্রপদে হাঁটা দিলেন বিরিঞ্চিবাবু। এই মুহূর্তের রঙিন সম্ভাবনার কত স্বপ্নই না তিনি দেখেছেন। কিন্তু আজ যখন সে-মুহূর্ত সমাগত তখন তাঁর মনে রস-রোমাঞ্চের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। তাঁর সম্মানে যে করতালি ধ্বনিত হচ্ছে সেদিকে পর্যন্ত তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনরত নেপোলিয়নও তাঁর তুলনায় নন্দনপথের যাত্রী ছিলেন।

বিরিঞ্চিবাবু মাঠের দিকে রওনা দিলেন

উইকেটে পৌঁছে গার্ড নিতে গিয়ে বৃথা কালহরণ করলেন না তিনি। সুপুষ্ট উদরটি যতদূর পর্যন্ত অনুমতি দেয় ততটা ঝুঁকে পড়ে ব্যাটটাকে ধরলেন শরীর থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে [ত্রি]রিশ ডিগ্রি কোণে হেলিয়ে। হাঁটুর ঠকঠকানিটা কিছুটা বিলম্বিত লয়ে আনার এবং [মাথা]র খাড়া চুলগুলি নমনীয় করার প্রয়াস সফল না হয়ে [illegible] নীল মুখখানি [illegible] পর্যন্ত তিনি তুলে ধরলেন বো[illegible] দিকে। ফাস্টবোলার সহজ শিকারের [লো]ভে প্রবল বেগে দৌড়তে শুরু করলেন। বিরিঞ্চিবাবুর বুকের ধুকপুকুনি তখন ইঞ্জিনের শব্দ এবং বেগ নিয়েছে। এল, এল, একটা লাল গোলা প্রচণ্ড তেজে ছুটে এলো লেগ-স্টাম্পের বাইরে পড়ে লাফিয়ে উঠে তাঁর নিতম্ব বরাবর। এ অবস্থায় তিনি ভারতীয় টেস্ট ব্যাটসম্যান হলে লেগ আম্পায়ারের পিছনে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু তাঁর পরাবর্তক তেমন দ্রুত না হওয়ায় তিনি সবেমাত্র পিছনের দিকে সরবেন বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন—এমন সময় বল এসে সোজা আঘাত করল ত[illegible]প্রদেশে। বিরিঞ্চিবাবুর আত্মমর্যাদার [illegible] লাঘব হলো। আর তা আরো বাড়[illegible]খন লেগ-আম্পায়ার তাঁর প্রতি কো[ন সহা]নুভূতি না দেখিয়ে কড়াভাবে জানালে[ন] নো-বল ডাকার অধিকার তাঁর, বিরি[illegible] যেন "নো" বলে হাঁক না দেন। বিরিঞ্চিবাবুর পক্ষে বলা সম্ভব হলো না যে বল তাঁর দেহের যে জায়গায় ধাক্কা মেরেছে সেখানে ভগবদ্দত্ত পুরু বর্ম থাকায় তাঁর কোন মারাত্মক ক্ষতি হয়নি, কিন্তু ঐ সাংঘাতিক সংঘাতে তাঁর মুখ দিয়ে "ঘ্যাঁক" করে যে শব্দটি নির্গত হয়েছে তা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত; তিনি "নো-বল" ডাকেননি। তিনি নীরবে অপমান হজম করলেন।

ফাস্টবোলার আবার বল দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এবার বল বা বোলারের গতি ঠিক পূর্বেকার মতো হল না। ভূত তার উপস্থিতি এতক্ষণে অনুভূত করাল। বোলার বলহাতে কিছুটা ছুটে এসেছেন এমন সময় দেখা গেল তিনি দৌড়নোর বদলে উড়তে শুরু করেছেন। বল তাঁর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল এবং লাগল গিয়ে মিড-অনে দণ্ডায়মান ফিল্ডারের শরীরের এমন কোমল স্থানে যেখানে অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও মার্জিতরুচি ফিল্ডসম্যান মহিলা দর্শকদের সামনে স্থানটি স্পষ্ট-ভাবে নির্দেশ করতে পারলেন না; "উঃ, আঃ" করতে করতে তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে ক্লেশ উপশমের চেষ্টা করতে লাগলেন। বোলার অবশ্য দীর্ঘকাল ওড়েন নি। সামান্য পরেই তিনি অবতরণ করলেন সামনে ঝুঁকে পড়া আম্পায়ারের পিঠে। আম্পায়ার স্বভাবতই বোলারের এ-হেন বোলিং-ভঙ্গীতে নিরতিশয় আশ্চর্য হলেন। কারণ বোলারের আম্পায়ারের পিঠে চেপে বল করার কোন নজির তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু তাঁর পিঠের বোঝা যখন তাঁকে জানালেন যে অকস্মাৎ কেউ তাঁকে লেঙ্গি মারায় তাঁকে বাধ্য হয়ে আম্পায়ারের পৃষ্ঠারূঢ় হতে হয়েছে তখন তিনি [আ]রও অবাক হলেন। তাঁর ধারণা হলে [ফা]স্ট বোলার কোন কোন মুহূর্তে মান[illegible] ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, কারণ বো[illegible] লেঙ্গি মারতে হলে তার নিকটতম ব্যক্তিরও অন্তত পনেরো ফুট লম্বা পা-এর দরকার। উক্ত লেঙ্গি যে ভূতের পদসম্ভূত সেটা তাঁর বোঝার কথা না।

যা হোক, বোলার আবার বল করতে তৈরি হলেন। কিন্তু গত বলের অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেকটা স্তিমিত করে দিয়েছে। তিনি এই বলটি দিলেন মাঝারি গতিতে। বিরিঞ্চিবাবু তখনো ঠিক বোঝেন নি যে ভূত সক্রিয় হয়েছে। তিনি আগের মতোই সন্ত্রস্ত হয়ে বলের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এবার একটু বেশীক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা কর[illegible]লো। কারণ বল বোলারের হাত ছে[illegible]চের মাঝখান অবধি এসে আচম্বিতে থে[illegible] শূন্যের উপরে। তারপর অতি ধীরে [illegible]রে এগিয়ে এল এবং বিরিঞ্চিবাবুর ব্যা[illegible] ঠিক সামনে এসে গাছের ডালে পাক[illegible] পেয়ারার মতো ঝুলে রইল। যাঁরা ব্যাপারটি দেখলেন তাঁদের মনে হলো যেন কোন অদৃশ্য হাত বলটিকে পিচের মাঝখানে লুফে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে ব্যাটসম্যানের কাছে এসে তাঁর ব্যাটের সামনে বলটিকে ধরে রইল। সত্যিই যে তাই ঘটেছিল সেটা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করলেন না।

এদিকে বিরিঞ্চিবাবু তাঁর সামনে ঝুলে থাকা বলটিকে সহ্য করতে পারলেন না। সমস্ত জোর দিয়ে বলের ওপর বসালেন এক ঘা বলা বাহুল্য সে মারে হ্যামণ্ডের মহিমা হাটনের সুষমা বা ওরেলের দীপ্তি ছিল না। তবু ব্যাটে-বলে এক হবার স্পর্শানুভূতিতে এবং শব্দমোহে বিরিঞ্চিবাবু রোমাঞ্চিত হলেন। কিন্তু সে সুখের শিহরণ আস্বাদ তাঁর কপালে ছিল না। প্রথমত, বলটি কোন দিকে গেল সে-বিষয়ে তাঁর সঠিক জ্ঞান ছিল না। দ্বিতীয়ত কানের কাছে তিনি শুনলেন গণধর ভূতের কণ্ঠস্বর, "ওয়েল ডান, স্যার। এবার দৌড়োন।" বিরিঞ্চিবাবুর ব্যাট চালিয়েই যথেষ্ট মেহনৎ হয়েছিল। তিনি আবার দৌড়োতে মোটেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ তিনি প্রচণ্ড ঠেলা খেলেন পিঠে। তিনি বুঝলেন ভূত তাঁকে দৌড়োতে উদ্দীপিত করছে। তবে সে বোঝায় তাঁর খুব উপকার হলো না। তিনি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে এসে উপুড় হয়ে পড়লেন পিচের মাঝখানে। দর্শক এবং খেলোয়াড়রা বলের সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার এবং বিরিঞ্চিবাবুর রান নেবার অভিনব পদ্ধতিতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তবুও তাঁরা করতালি দিলেন। পিচে শয়ান, রুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ বিরিঞ্চিবাবুর আশা হলো তিনি রান আউট হয়েছেন। তিনি অনেক ক্লেশে নিজের প্যাড-পরা পা-কে সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়িয়ে যখন শুনলেন যে বল মিড উইকেটে বাউণ্ডারী পেরিয়ে গেছে আর তাঁর নামের পাশে লেখা হয়েছে ৪ রান তখন আনন্দে অভিভূত হতে পারলেন না। তাঁর আর ব্যাট করার ইচ্ছে ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু তবুও ফাস্ট বোলারের ওভারের শেষ বল খেলার জন্য আবার ব্যাট ধরতে হলো। তিনি দেখলেন বোলার ছুটে আসলেন, লাফালেন, হাত ঘোরালেন—অর্থাৎ বল দেবার কোন ক্রিয়াই বাদ দিলেন না, কিন্তু কোন বল তাঁর হাত থেকে বেরোল না। বল অবশ্য এল আম্পায়ারের পিছন থেকে হঠাৎ উত্থিত হয়ে, একটি অলস প্যারাবোলায় তাঁর অফ স্টাম্পের বাইরে তাঁর ড্রাইভের আমন্ত্রণ নিয়ে। বিরিঞ্চিবাবু ব্যাট চালালেন, তবে পা-দুটিকে একটুও না নড়িয়ে এবং ব্যাটকে আড় আড়ি ধরে। স্বভাবতই বল ব্যাটের ডগায় লেগে উঠে গেল মিড অফের মাথার ওপরে। এবার নির্ঘাৎ আউট, এ-ক্যাচ মিস হতেই পারে না। কিন্তু বিরিঞ্চিবাবুর আউট হবার স্বপ্ন সম্ভব হলো না। বলটিকে ধরবার জন্যে ওপর দিকে তাকিয়ে, হাতটা বাগিয়ে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত অট্টহাসে ফেটে পড়ে শুয়ে পড়লেন মিড অফ এবং হাত পা ছুঁড়ে ছটফট করে, কাতরে কাতরে অপরিমিত হেসে যেতে লাগলেন। বল এসে পড়ল তার পাশে। মিড অফের অসময়ে

আম্পায়ারের পিঠে চেপে বল করার কোন নজির তাঁর জানা ছিল না

এহেন হিজিবিজবিজ-সুলভ ব্যবহারের কারণ শুধোলেন বোলার। মিড অফ জানালেন যে কে যেন তাঁকে সহসা প্রচণ্ড কাতুকুতু দিতে থাকে যার ফলে তিনি নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারেন নি। বোলার বললেন, "আমার হাত থেকেও বলটি হাত ঘোরাবার সময় কে যেন টপ্ করে কেড়ে নিল।"

এতসবের মধ্যে মাঠে ঠিক স্বাভাবিক আবহাওয়া থাকতে পারে না। তার মধ্যেই ওভার হলো। বিরিঞ্চিবাবু একটু হাফ ছাড়বার সুযোগ পেলেন। তবে সে আর কতটুকু? স্পিনবোলার অবশ্য প্রথম বলেই নিয়ে নিল ৭ম ব্যাটসম্যানকে আর চতুর্থ বলে ৯ম ব্যাটসম্যানকে। কিন্তু ১০ম ব্যাটস-ম্যান খেলতে শুরু করতেই নতুন গণ্ডগোল বাঁধল। হল কী, তিনি এসেই সজোরে ব্যাট ঘোরালেন। ব্যাটে খোঁচা লাগিয়ে সে বল গেল থার্ড ম্যানের দিকে। একটি রান তাতে ছিল অবশ্য ব্যাটসম্যানরা দ্রুতগামী হলে। বিরিঞ্চিবাবুর শর্ট রান বা কোনরকম রানের জন্যই দৌড়োবার স্বল্পতম ইচ্ছেও ছিল না। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। হঠাৎ তাঁর পাশ থেকে কে যেন হেঁকে উঠল, 'চলে আসুন' আর তার উত্তরে উল্টোদিকের ব্যাটসম্যান তাঁর ক্রিজ অভিমুখে ধাবমান হলেন। এতেও বিরিঞ্চি-বাবু রান করার উৎসাহ পেলেন না, তিনি অনড় রইলেন। কিন্তু আচম্বিতে তিনি খানিকটা শূন্যে উঠে গেলেন এবং কারো দ্বারা বাহিত হতে লাগলেন বিপরীত উই-কেটের দিকে। বিরিঞ্চিবাবু লজ্জায়, ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তাঁর বাহককে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে ভূতের কিছু হবার নয়। সে নির্বিকারভাবে ক্ষিপ্তভাবে হাত-ব্যাট-পা মাথা সঞ্চালমান বিরিঞ্চিবাবুকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে ওপারে নিয়ে গেল। তবে শেষ রক্ষা করতে পারলো না। ক্রিজে পৌঁছোনোর একটু আগে তার বগল থেকে ফসকে গিয়ে বিরিঞ্চিবাবু মহা-সমারোহে আছাড় খেলেন। বলা বাহুল্য, বিরিঞ্চিবাবুর ব্যাট ধরা, ব্যাট চালনা, রান করা এবং ঘন ঘন পতনের অলৌকিক ভঙ্গী দর্শকরা সহর্ষে, সচমকে এবং খেলোয়াড়রা সক্ষোভে এবং সভয়ে নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু অবমাননাকর মন্তব্য তাঁর কানে গেল এবং কান গরম করে দিল। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন রান আউট হয়ে যান। তিনি হতে পারতেনও। তিনি প্রথমে হাঁটুগেড়ে বসে, তারপর ব্যাটে ভর দিয়ে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্রিজে এসে যখন উঠলেন, তার আগেই থার্ড ম্যানের ছোঁড়া বল স্টাম্পে এসে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গেই বেলও পড়ল না, উইকেটও শায়িত হলো না। কোন সূক্ষ্ম শরীর যেন বুকের ভিতর জাপটে ধরে থেকে উইকেটকে অটুট রাখলো।

বিরিঞ্চিবাবুকে আবার ব্যাট ধরতে হলো। ওভারের শেষ বল দিলেন স্পিন-বোলার। বল এবার ভূতের দোলাতে মাটিতে পড়ে মাথা গুঁজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর শম্বুক গতিতে এগিয়ে এল গড়াতে গড়াতে। বিরিঞ্চিবাবু ব্যাট চালালেন সসংকোচে। তবে বলের সঙ্গে তা যুক্ত হলো না, বল লাগল তাঁর পায়ে। 'হু উজ দ্যাট'—রব উঠল। আম্পায়ার বিরিঞ্চিবাবুর আগমনোত্তর বিভিন্ন ঘটনাদিতে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে আউট দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে অনুভব করলেন যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠদেশে চড়ে পা দিয়ে তার হাতদুটি বজ্র বাঁধনে জড়িয়ে ধরেছে এবং হাত দিয়ে চেপে ধরেছে মুখ। অতএব তিনি প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও না পারলেন আঙুল তুলে, না পারলেন মুখে বলে বিরিঞ্চিবাবুকে আউট দিতে। অগত্যা ওভার হলো। উল্টোদিক থেকে বল শুরু হলো এবং বিরিঞ্চিবাবুর কাতর প্রার্থনা পূরণ হলো—অচিরেই পর পর দু বলে ১০ম এবং শেষ ব্যাটসম্যান পড়ে গেলেন। ঐতিহ্য মতো এবার হবে লাঞ্চ। তারপর আসবে সবুজ সংঘের ব্যাটিং-এর পালা।

সকলেই প্যাভিলিয়নের দিকে রওনা হলেন। সামনে রাখা হলো নট-আউট বিরিঞ্চিবাবুকে। অনেকে তাঁর উদ্দেশ্যে হাততালিও দিলেন। কিন্তু বিরিঞ্চিবাবুর মনের বা শরীরের অবস্থা এমন ছিল না যে, তিনি সেই অভিবাদনে গর্ববোধ করতে পারেন। ভূত তাঁকে কানে কানে বলল, 'স্যার, ক্যাপ তুলুন।' উত্তরে তিনি অনির্দিষ্টভাবে খেঁকিয়ে উঠলেন। অগত্যা ভূত তাঁর হয়ে তার কর্তব্য পালন করতে লাগল। সকলে দেখল ডান হাতে ব্যাট

জানাদিকে ছড়িয়ে বল দিলেন। বল আগের চেয়েও বিস্ময়কর ব্যবহার করল। বল এবারে যাচ্ছিল মিডউইকেটের দিকে। তার-পর হঠাৎ সাঁ করে চলে গেল লেগ আম্পায়ারের কাছে, তারপরে সেখান থেকে ব্যাটসম্যানের চোখ ধাঁধিয়ে তীরের মতো এসে গোঁত্তা মারল লেগ স্টাম্পে। ব্যাটস-ম্যানের সুইং বা সুওয়ার্ড সম্বন্ধে সামান্য ধারণা ছিল। তিনি তাঁর সে জ্ঞান যে কত কম, সেই চিন্তা করতে করতে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন।

বিরিঞ্চিবাবু তৃতীয় বলটি একটু জোরে দিতে গেলেন। তাঁর তখন একটু সাফল্যের নেশা ধরেছে বিশেষত তাঁর দলের উত্তেজনা-মত্ত ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য ফিল্ডসম্যানদের উল্লাসে। ঐ জোর বল দিতে গিয়ে তিনি একটু ভুল করে ফেললেন। বলটির পিচ পড়ল এমন জায়গায় যেখানটা নন-স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে ভাল লেংথ। তারপর বলটি বেশি নড়বার চড়বার লক্ষণ দেখাল না। ব্যাটসম্যান ঠিক করতে পারছিলেন না—তিনি কী করবেন। এমন সময়ে তিনি দেখলেন বল আবার গতিমান হয়েছে। সে আসছে তাঁর দিকে। তিনি ব্যাট প্যাড সব দিয়ে উইকেট ঢেকে বলের মুখোমুখি হলেন। আশ্চর্য বল তাঁর সামনে এসে একবার বাঁ দিকে গেল, একবার ডান দিকে গেল যেন সে হকি খেলার বল—প্রতিপক্ষের স্টিক এড়াচ্ছে। তারপর সাঁ করে অফ থেকে একেবারে লেগের দিকে ঘুরে মিডল স্টাম্পে গিয়ে লাগল। বিরিঞ্চিবাবু হ্যাটট্রিক করেছেন। মাঠে জয়ধ্বনি উঠল—যদিও সে ধ্বনি কিছু অবিশ্বাসের খাদ মেশানো।

আরো দুটি উইকেট রয়েছে। তাদের পক্ষে বাকি তিনটি রান তুলে ফেলা তেমন কিছু শক্ত নয়। বিরিঞ্চিবাবু কি তাঁদের ঠেকাতে পারবেন? বিরিঞ্চিবাবুর নিজের অবশ্য তেমন দুর্জয় আত্মবিশ্বাস ছিল না। তিনি কোনোরকমে নিরাসক্ত এবং নিরুদ্দিষ্ট-ভাবে আবার বল ছাড়লেন। আশ্চর্য ফরেন এড ছাড়াই যেমন ভারত সরকার মাঝে মাঝে কোন উদ্যোগে সফলকাম হন, তিনিও ভূতের বিনা সহায়তাতেই একটা স্বাভাবিক ধরনের সোজা বল দিয়ে ফেললেন। সে বল অবশ্য দ্রুততা, স্পিন, সুওয়ার্ড ইত্যাদি সবরকম জটিলতামুক্ত ছিল। তাই ব্যাটসম্যান বলটি মাঠ পার করে দিতে তৈরী হয়ে ব্যাট তুললেন। ব্যাট কিন্তু বলের ওপর নেমে এল না। বল ব্যাটের কাছে পৌঁছোবার আগেই ব্যাটসম্যান অকস্মাৎ এক গগনভেদী আর্তনাদ করে সবেগে পিঠ চুলকোতে লাগলেন। বল সোজা এসে লাগল উইকেটে। ব্যাটসম্যান ভাবতে লাগলেন তাঁর পিঠে অতর্কিতে দংশনকারী রাম-চিমটি কেটে কে তাঁকে তাঁর উইকেটের প্রতিরক্ষা তুলে নিতে বাধ্য করলো। একমাত্র উইকেট কীপার হতে পারেন? কিন্তু তাঁর গ্লাভস-পরা আঙুলে ঐ সুতীক্ষ্মতা তো সম্ভব নয়। ভ্রূকুটি কুটিল মুখে তিনি বিদায় নিলেন।

শেষ ব্যাটসম্যান মাঠে নামার আগে সবুজ সংঘের ক্যাপটেন তাঁকে কড়া নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন বলকে কোনমতেই উইকেটে লাগতে না দেন এবং পারলে কোনরকমে রান নেবার চেষ্টা করেন। একাদশ ব্যাটসম্যান তদনুযায়ী খেলতে বদ্ধ-পরিকর হয়ে ব্যাট ধরলেন। কিন্তু বিরিঞ্চিবাবু বল দেবার আগেই তিনি দেখলেন কভার পয়েণ্টের দিক থেকে একটি লাল বল তাঁর দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখে পড়ল মিড অনের কাছ থেকেও আরেকটি বল আসছে। তারপর তাঁর মনে হলো পয়েণ্ট, স্কোয়ার থেকেও একেকটা করে বল আসছে। কেন তিনি এমন একাধিক বল দেখছেন ব্যাটসম্যান বুঝে উঠতে পারলেন না। লাঞ্চের সময় বীয়ার তো বেশী দেওয়া হয়নি। যাই হোক, তিনি ঠিক কোন্ বলের সামিল হবেন স্থির করতে না করতেই বিরিঞ্চিবাবুও বল দিলেন। বিরিঞ্চিবাবু বলদানের ছন্দ বা ভঙ্গী কোন কোন ধরনের লোক-নৃত্যোপযোগী হলেও ক্রিকেটের পক্ষে খুব নিখুঁত হয়নি। সুতরাং তাঁর দেওয়া বলটি উইকেট বরাবর এল না, সেটি নিরীহভাবে গালির দিকে গেল। ব্যাটসম্যান ধরে নিলেন স্কোয়ারের দিক থেকে আগত বলটি সবচেয়ে বিপদজ্জনক। অতএব তিনি লেগে ঘুরে ঐ বলকে আঘাত করতে গেলেন। তিনি ব্যাট চালাতেই দেখলেন সে দিককার এবং অন্যান্যদিকের সব বল কোথায় মিলিয়ে গেল একমাত্র যে বলটি প্রকৃতভাবে মাঠে বিরাজমান সেটি মন্থরভাবে গালির কাছে এগোচ্ছে। তিনি এবার ঐ বলের মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু একবার লেগে ঘুরে সেখান থেকে পাক মেরে আবার গালিতে ধেয়ে গিয়ে বলের সম্মুখীন হওয়া ব্র্যাডম্যান, কম্পটন বা মুশতাক আলির মতো তড়িৎ পদক্ষেপের দাবী করে। সবুজ সংঘের একাদশ ব্যাটসম্যানের দ্বারা তা সম্ভব ছিল না। তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর ভারসাম্যচ্যুতি হলো। সকলে যদিও তাঁর স্টাম্পের উপর পতন এবং তার দরুণ আউট হওয়াটার জন্য ব্যাটস-ম্যানকেই দায়ী করলেন, ব্যাটম্যানের দৃঢ় ধারণা যে তাঁর পা পিছলে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি স্টাম্পের উপর পড়ে যেতেন না যদি না কোন অদৃশ্য হাত তাঁকে সবলে ধাক্কা না দিত। সে যাই হোক। সমাজ-তান্ত্রিক ইউনাইটেড দল তুমুল হর্ষে ফেটে পড়ল। তাদের জয় হয়েছে। আর এই জয়ের প্রধান কৃতিত্ব বিরিঞ্চিবাবুর। তিনি পাঁচ রানে পাঁচ উইকেট পেয়েছেন।

প্যাভিলিয়নে ফেরার পর সকলেই বিরিঞ্চিবাবুকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কিন্তু সে অভিনন্দনের ভিতর এমন অনেক কিছু ছিল যা বিরিঞ্চিবাবুর প্রীতিকর বা সম্মানপ্রদ লাগলো না। যেমন দুটি তরুণী তাঁকে অনুরোধ করলেন হাত না ঠেকিয়ে মাথার টুপিটা আবার তুলতে কিম্বা এক ক্রিকেটশাস্ত্রী জানতে চাইলেন বিরিঞ্চিবাবু হাতের কী কৌশলে কোন কোন আঙুলের ক্রিয়ায় একবার বাম থেকে ডানে আবার ডান থেকে বামে ঘূর্ণায়মান বল দিয়ে থাকেন। জনৈক প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যেভাবে ব্যাট করেন তাতে তাঁর দেহের কোন ক্ষতি হয় কিনা এবং তিনি যে অভিনব ভঙ্গীতে বল করেন সেটা দূর প্রাচ্যে কোনো কোচের কাছে শিক্ষা করেছেন কিনা। অবশ্য প্রায় সকলেই ঔৎসুক্য দেখালেন তাঁর শূন্যচারী বলকে একদিক থেকে আরেকদিকে টেনে আনার—এমন কি না ছুঁয়ে তা পকেটস্থ করার অসাধারণ শক্তির বিষয়ে। সর্বোপরি উপস্থিত জনৈক পোলিটিকাল নেতা নিবেদন করলেন, "আপনার মতো ক্ষমতা-সম্পন্ন লোককে আমাদের পার্টিতে পেলে কি কেন্দ্রীয় সরকার কি অন্য পার্টি—সবাইকে একবার দেখিয়ে দিতাম। যোগ দেবেন আমাদের সঙ্গে? বিরিঞ্চিবাবু অবশ্য কোন কিছুরই উত্তর দিলেন না। তিনি দ্রুতপদে তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন এবং শোফারকে বিরসকণ্ঠে বললেন, "ঘর চলো"। সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন—গাড়ি চলল, বিরিঞ্চিবাবু বুকের উপর হাত ভাঁজ করে বসে আছেন আর তাঁর ক্যাপটি স্বাধীনভাবে গাড়ির জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে দুলে দুলে বিদায় জানাচ্ছে।
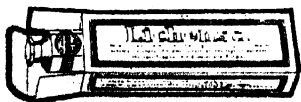
তিনি লক্ষ্য করেন নি, হাতিয়ারটি তাঁর স্বপক্ষে কাজ করছে, না বিপক্ষে। কেননা যে লাইনটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন সেটির মধ্যেই ভাষা সম্বন্ধে এমন একটি সূক্ষ্ম এবং সুকুমার অনুভূতির পরিচয় আছে এবং বাক্যটির শব্দবিন্যাসের মধ্যেও এমন একটি সহজ নিপুণতার নিদর্শন আছে যে এই লাইনটি পড়ে বুদ্ধিমান এবং রসজ্ঞ কোনো পাঠকের মনে যে প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক মনে হয় তা য়েট্‌সের অভীষ্ট প্রতিক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। প্রকাশক ম্যাকমিলানের এই সূক্ষ্ম ভাষাবোধ অথবা রসজ্ঞান ছিল এমন মনে করবার সংগত কারণ নেই। তথাপি দেখা যায় ঐ চিঠি পাঠ করবার পর ম্যাকমিলান রবীন্দ্রনাথের কম পক্ষে আরো কুড়িখানা বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু য়েটসের চিঠিটি যে প্রকাশকের মনে আদৌ রেখাপাত করেনি তার কারণ অবশ্য অন্যত্র। আসল কারণটি রোটেনস্টাইন কবিকে লিখিত একটি চিঠিতে বহু দিন পূর্বেই (৪ঠা আগস্ট ১৯১৪) সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছিলেন : **'Everything which now bears your name is gold to Macmillan'** । রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-প্রকাশের সপক্ষে এমন সারবান যুক্তি থাকতে য়েটসের 'অযাচিত' সমালোচনা এবং উপদেশ যে অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হবে, সেটা যে তিনি বুঝতে পারেননি তাতেই বোঝা যায় যে তাঁর মনটি তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল না।

শেষ প্রশ্নটি হল motive-এর প্রশ্ন, সেটি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। ম্যাকমিলানকে লিখিত য়েটসের চিঠিটির উদ্দেশ্য বা motive কী ছিল? উত্তরটা অন্তত অংশত পূর্ববর্তী কোনো কোনো অংশের আলোচনায় ইতিমধ্যেই আভাসিত হয়ে থাকলেও উপসংহারে সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে। Motive একটি নয়, একাধিক এবং জটিল। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ য়েট্‌স এবং অন্যান্য সকলেরই সহযোগিতা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করলে য়েট্‌সের আহত অহমিকার আক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, একটি স্থূল এবং দুর্দম লোভ : 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডেনার' এবং 'ক্রেসেণ্ট মুন'-এর যে অসাধারণ সিদ্ধি ও খ্যাতি একটা Tagore Craze-এর সৃষ্টি করেছিল তার কৃতিত্বের যতখানি সম্ভব আত্মসাৎ করবার এবং সেই পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব লাঘব করবার (অংশীদার হিসেবে স্টার্জ মূরের উল্লেখ এই কারণেই) একটি সুযোগ গ্রহণ করবার লোভ য়েট্‌স সংবরণ করতে পারেন নি। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বন্ধুজনোচিত সহযোগিতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্তু মূল লেখককে ডিঙিয়ে কোনো সহযোগী নিজ মুখে রচনাবিশেষের কৃতিত্বের মুখ্যাংশ প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে দাবী করছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার জানা নেই, অন্তত সেটা যে ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত সৌজন্যনীতির একটা বড় ব্যত্যয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকেই হয় তো জানেন, উইলফ্রেড ওয়েনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় সিগফ্রীড স্যাসুন্ পরিবর্তন হিসেবে কয়েকটি শব্দ যুগিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই শব্দগুলি ওয়েনের প্রকাশিত পাঠে অদ্যাবধি বিদ্যমান। কিন্তু স্যাসুন্ এ-বিষয়ে কোনোরকম দাবী উত্থাপন করেন নি এবং অপর কেউ এ-বিষয়টিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি। আরও একটি দৃষ্টান্ত : টি এস এলিয়ট্ তাঁর Four Quartets-এর গোড়ায় বিজ্ঞপ্তিতে সাংবাদিক এবং সমালোচক জন হেওয়ার্ড-এর নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন 'for improvements of phrase and constructions'. এলিয়টের লিখিত স্বীকৃতি

সত্ত্বেও হেওয়ার্ড এলিয়টের কবিখ্যাতির অংশ দাবী করেছিলেন অথবা অপরে এই জাতীয় কোনো সম্ভাব্য দাবী আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন এমন কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেন নি, অপর কেউ স্বীকার করেন নি, তথাপি প্রকাশককে লিখিত গোপন চিঠিতে য়েট্স নিজ মুখেই এই দাবী পেশ করেছেন। এর মধ্যে যে স্থূলতা এবং বিকৃতরুচির পরিচয় আছে সেটা প্রতিভার দীপ্তির মত বড় ব্যক্তিরও হোক না কেন মধ্যবয়স থেকে শেষ পর্যন্ত য়েট্সের চরিত্র এবং মনঃপ্রকৃতির যাঁরা সাভিনিবেশ অনুশীলন করেছেন তাঁরা অন্তত বিস্মিত হবেন না।

যাই হোক, তাঁর motiveটি মুলত লোভ-প্রণোদিত হলেও বৈষয়িক স্বার্থ-দৃষ্টির দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে তিন বৎসর ম্যাকমিলান রবীন্দ্রনাথের দশখানা বই প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ বছরে তিন-চারখানা করে। তার উপর ১৯১৬ সালে Bolpur Edition নামে এই দশখানি বইয়ের একটি সেট্ সুলভ এবং সচিত্র **deluxe** সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া ১৯১৭ সালেই প্রকাশিত হবে পাঁচখানা বই। তার পর প্রকাশিত হবার এই সব বই বইয়ের বাজার এবং সমালোচকদের attention এমনভাবে অধিকার করে বসে যে তার ফলে অন্যান্য লেখক প্রায় পাত্তাই পান না বলা চলে। এদিকে ম্যাকমিলান ১৯০৩ সালে য়েট্সের একটি নাটক (**The Hour Glass**) এবং ১৯০৬-০৭ সালে দুই খণ্ড কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তারপর ১৯১৬ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের ম্যাকমিলান কোম্পানি সহযোগী কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যবসায়িক সংস্থা। য়েট্সের কিছু কিছু বই প্রকাশ করলেও লণ্ডনের ম্যাকমিলানরা আর কোনো বই প্রকাশ করেন নি এবং প্রকাশ করবার কোনরকম আগ্রহও দেখান নি। অথচ লণ্ডনের গ্রন্থ প্রকাশ জগতে ম্যাকমিলানদের প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত এবং তাঁদের দ্বারা বই প্রকাশ করতে অনেকেই লালায়িত ছিলেন, য়েট্সও যে তাঁদের একজন ছিলেন তার নজির আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ম্যাকমিলানরা তখন এতই ব্যস্ত ছিলেন যে অপর কারও দিকে তাঁদের বিশেষ লক্ষ্যই ছিল না বলা যায়। সম্প্রতিক প্রকাশনের ক্ষেত্র থেকে কিপ্লিং এবং হার্ডি প্রায় অপসৃত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথই যে তখন 'the Macmillan poet' বলতে সেকালে যা বোঝাত তাই হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদিকে **Letters to Macmillan**-এর অন্তর্গত য়েট্সের অপর একখানি চিঠিতে (১৪-৯-১৬) দেখা যায় নিজের গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি প্রকাশকের

নিকট আবেদন-নিবেদন করছেন : 'when do you propose to publish my two books ?' দেখা যায় ১৯১৬ সালেই য়েট্‌সের দুটি বই আবার ম্যাকমিলান প্রকাশ করলেন এবং অন্যান্য প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত য়েট্‌সের কয়েকটি বই যা প্রথম সংস্করণেই অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে ছিল ম্যাকমিলান সেগুলি কিনে নতুন মলাট যোজনা করে বাজারে ছাড়তে শুরু করেন, কিন্তু তাগাদা সত্ত্বেও বৎসরে এক-আধটির বেশী নতুন বই প্রকাশ করবার উৎসাহ দেখালেন না। অতএব এ ক্ষেত্রে প্রকাশকের মুগ্ধ দৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে নিজের দিকে ফেরাবার অভিপ্রায়েও যে য়েটস ঐ বিচিত্র এবং কুটিল পন্থাটি অবলম্বন করতে কতকটা বাধ্যই হয়েছিলেন সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু এই রকম এক ঢিলে একাধিক পাখি শিকারের দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় আলোচ্য চিঠিখানা একক নয়। দৃষ্টান্ত আরো আছে, উদাহরণত **Letters to Macmillan**-এরই অন্তর্গত য়েট্‌সের চতুর্থ এবং শেষ চিঠিটির উল্লেখ এখানে বিশেষ কারণে প্রয়োজন। ১৯২৮ সালের

১২ই জানুয়ারী তারিখে লিখিত এই চিঠিখানা আপাতদৃষ্টিতে বিশেষত্বহীন, অর্থাৎ লেনক্স রবিনসন নামক অ্যাবিথিয়েটার-গোষ্ঠীভুক্ত য়েট্সের একান্ত অনুগত একজন অনতিখ্যাত নাট্যকারের বই প্রকাশ করবার জন্য ম্যাকমিলানের নিকট সুপারিশমাত্র, মনে হতে পারে। কিন্তু এই চিঠিখানার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় চিঠিটির এগারো বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও একটা মৌলিক সাদৃশ্য আছে এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থপূর্ণ বলেই এটির উল্লেখ এবং একটি সংক্ষিপ্ত টীকা আবশ্যক। চিঠিটির প্রথম প্যারাগ্রাফেই য়েট্স লিখেছেন : 'Lennox Robinson is at present the most accomplished dramatist of the Abbey Theatre. Casey has more startling material, but he has nothing like Lennox Robinson's mastery of his art'। কেসি বলে য়েট্স যাঁর উল্লেখ করছেন তিনি হলেন বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার সেয়ান ওকেসি (নামের বিকৃতিটা লক্ষণীয়)। ওকেসি "The Shadow of a gunman", Juno and the Pay Cock এবং The Plough and the Stars এই তিনটি নাটকের অসামান্য মঞ্চসাফল্য এবং জনপ্রিয়তার জন্য ১৯২৮-এর পূর্বেই অ্যাবিথিয়েটারের সাম্প্রতিক নাট্যকারগোষ্ঠীর মধ্যে কৃতিতম নাট্যকার বলে সাধারণে গৃহীত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে লেনক্স রবিনসনের তুলনাই হয় না। অথচ য়েট্স চিঠিতে ওকেসির চেয়ে তাঁকেই নিপুণতর শিল্পী বলে ম্যাকমিলানের কাছে উপস্থিত করছেন। ম্যাকমিলান ওকেসির প্রকাশক। এবং উক্ত প্রকাশকের কাছে রবিনসনের নাটক প্রকাশের জন্য দরবার করতে হলে ওকেসি সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যটি অপরিহার্য ছিল না। য়েট্স কেন ঐ মন্তব্যটিকে অপরিহার্য মনে করেছিলেন সেটা বুঝতে হলে, অল্প পরেই যে নাটকীয় ঘটনাটি ঘটে এবং যেটি আধুনিক অ্যাংলো-আইরিশ নাটকের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়, তার একটু খোঁজ খবর নিতে হয়। জ্ঞাতব্য তথ্য বিস্তারিতভাবে জানা যায় লেডী গ্রেগরীর Journals (1946), সেয়ান ওকেসির স্মৃতিকথার Inishfallen, Fare Thee Well (1949) নামক বিশেষ খণ্ডটি এবং অ্যাবিথিয়েটারের প্রাক্তন অভিনেতা এবং ওকেসির বন্ধু গ্যাব্রিয়েল ফ্যালনের Sean O'Caselv : the Man I knew (1965) নামক স্মৃতিচারণ-গ্রন্থটি পাঠ করলে। এইখানে ব্যাপারটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯২৮ সালের ২৭শে মার্চ (তারিখটি লেডী গ্রেগরীর 'জর্নাল' থেকে পাওয়া) ওকেসি তাঁর সদ্যরচিত The Silver Tassie নাটকটির পাণ্ডুলিপি অ্যাবিথিয়েটারে অভিনয়ার্থে মনোনয়নের জন্য পেশ করেন। নাটকটি সম্বন্ধে ওকেসির নিজের যথেষ্ট আস্থা ছিল, তিনি লেডী গ্রেগরীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'Personally, I think it is the best work I have yet done'

কিন্তু দেখা যায় ২৮শে এপ্রিল অ্যাবিথিয়েটারের উপর যাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল, আয়ার্লাণ্ডের সেই নোবেল লরিয়েট কবি ডব্লু বি য়েট্স একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে নাটকটি যে অ্যাবিথিয়েটারের 'অযোগ্য' সে কথা জানিয়ে সেটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। ওকেসির ঐ নাটকটি সম্বন্ধে লেডী গ্রেগরীর খুব একটা উৎসাহ ছিল না বটে কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানে তিনি যে যথেষ্ট আহত হয়েছিলেন সেটা তাঁর জার্নালের মধ্যে পরিস্ফুট। য়েট্সকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন তাঁর অনুগত ম্যানেজার-ডিরেক্টার-নাট্যকার লেনক্স রবিনসন। এই রূঢ় প্রত্যাখ্যানের ফলে ওকেসি এতই মর্মাহত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি শুধু অ্যাবিথিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন তাই নয়, তিনি অবিলম্বে আয়ার্ল্যাণ্ড পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্য লণ্ডনে নির্বাসিতের জীবন বেছে নিয়েছিলেন। অতঃপর লণ্ডনের বিভিন্ন স্টেজে The Silver Tassie অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং দীর্ঘ দিন চলে এবং আয়াল্যাণ্ডের আর এক নোবেল লরিয়েট নাট্যকার বার্নার্ড শ অভিনয় দেখে বলেন, 'It's the greatest thing I have ever seen !'

অ্যাবিথিয়েটারের স্থানিক খ্যাতি ছাড়িয়ে লণ্ডনের স্টেজ মারফত ওকেসি বিশ্বখ্যাতির স্তরে উন্নীত হলেন। য়েট্সের আচরণের মধ্যে যে 'a touch of maliciousness' ছিল গ্যাব্রিয়েল ফ্যালন তাঁর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত স্মৃতিচারণেই সেকথা অস্বীকার করতে পারেননি। উপরন্তু বিষয়টি সম্বন্ধে ওকেসির নিজের স্থির বিশ্বাসের কথাও বিবৃত করেছেন : 'He was convinced....that Yeats and Robinson had between them

made up their minds that if O'Casey's new play was a bad one they would accept it and that if it was a good one they would reject it' ওকেসি যে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি, এবং য়েট্‌স কর্তৃক তাঁর নাটকের প্রত্যাখ্যান যে নিরপেক্ষ বিচারের ফল ছিল না, তা ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত Letters to Macmillan-এর অন্তর্ভুক্ত য়েট্‌সের পূর্বোক্ত চতুর্থ চিঠিখানার তারিখটির দিকে তাকালেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ঐ চিঠির তারিখটা ছিল ১২ই জানুয়ারী ১৯২৮ : অর্থাৎ ওকেসির প্রত্যাখ্যাত নাটকটি বিবেচনার জন্য পেশ করবারও প্রায় আড়াই মাস পূর্বেই ম্যাকমিলানকে লিখিত 'গোপন' চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়ে গেছে। অথচ একদা য়েট্‌স নিজেই ওকেসির একজন বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। Juno and the Pay Cock-এর ড্রেস্ রিহার্সাল দেখে মুগ্ধ য়েট্‌স মন্তব্য করেছিলেন যে ওকেসির ঐ নাটক দেখে তাঁর ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসের কথা মনে পড়েছিল (যদিও গ্যাব্রিয়েল ফালন খবর দিচ্ছেন যে, য়েট্‌সের মন্তব্য শুনে, 'Lady Gregory turned to him and said : "You know, Willie, you never read a novel by Dostoievsky'. And promised to amend this deficiency by sending him a copy of the Idiot', তারপর The Plough and the Stars নাটক-অভিনয়ের চতুর্থ দিনে রাজনৈতিক কারণে থিয়েটারে যে গোলযোগ হয় এবং অভিনয় বন্ধ হয়ে যায় (অন্তত ফালনের মতে এই গোলযোগে সেনেটার য়েট্‌সের পরোক্ষ হাত থাকা অসম্ভব ছিল না) সেই প্রসঙ্গে স্টেজ থেকে দর্শকমণ্ডলীকে য়েট্‌স যে ধিক্কার দেন তার মধ্যে ওকেসি সম্বন্ধে বলেন : 'This is his (O'Casey's) apotheosis ! তারপর দু'-একদিন সামান্য গোলমাল হয়ে থাকলেও The Plough and the stars যখন সত্যিই অসাধারণ মঞ্চসাফল্য এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এবং য়েট্‌স যাকে 'apotheosis' বলে উল্লেখ করেছিলেন তা যখন সত্যিই সাধারণ্যে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হবার উপক্রম হল তখনই দেখা যায় ওকেসির প্রকাশকের কাছে য়েট্‌স 'গোপনে' নিন্দাবাদ শুরু করেছেন এবং অ্যাবিথিয়েটারের মঞ্চ থেকে তাঁকে একরকম তাড়িয়েই দিচ্ছেন। এইখানেই এগারো বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত চিঠিখানির সঙ্গে ওকেসি সম্বন্ধে ঐ চিঠিটির সাদৃশ্য। দুটি চিঠির patternটি একেবারে অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও য়েট্‌স একদা ঘোষণা করেছিলেন : 'I know of no man in my time who has done anything in the English language to equal these lyrics (Gitanjali) তারপর নোবেল পুরস্কারের দ্বারা তাঁর ঐ মতটিই যখন সমগ্র বিশ্বের সমক্ষে স্বীকৃত ও প্রচারিত হলো এবং ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ইংরেজী ভাষার লেখকদের মধ্যে 'বিখ্যাততম' বলে কবির খ্যাতি যখন ইঙ্গ-মার্কিন সীমা ছাড়িয়ে য়ুরোপীয় খ্যাতিতে, এমন কি বিশ্বখ্যাতিতে, পরিণত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে কবির প্রকাশকের নিকট ঐ 'গোপন' চিঠি! মঙ্ক গিবন এই জাতীয় কপটতা এবং অশালীন পন্থায় কলকাঠি নাড়ার অভ্যাসকে য়েট্‌সের প্রকৃতিসিদ্ধ 'manoeuvres' বলে বর্ণনা করেছেন। মঙ্ক গিবন্ একজন আইরিশ কবি, সম্পর্কে য়েট্‌সের Cousin। তাঁর লেখা The Masterpiece and the Man (1959) নামক স্মৃতিকথায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারেও য়েট্‌সের অভ্যাসগত এই জাতীয় কুটিল 'manoeuvre'-এর অজস্র এবং বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অতএব Letters to Macmillan-এর সম্পাদক যখন য়েট্‌সের চিঠিগুলি সম্বন্ধে বলেন, 'The following letters have been selected to illustrate his (Yeats's) interest in promoting the fortunes of others' তখন সেই উক্তিকে অজ্ঞতাজনিত accidental irony-র একটি প্রকৃষ্ট এবং উপভোগ্য উদাহরণ হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়।

যাই হোক, পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ম্যাকমিলানকে লিখিত 'গোপন' চিঠিটির প্রকৃত এবং কেন্দ্রস্থ motive-এর সন্ধান আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। ক্ষুব্ধ অহমিকা, অপরের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করার লোভ, ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য তদ্বির ইত্যাদির যে উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, motive হিসেবে সেগুলি নিতান্তই গৌণ। কেননা, লোভে, ক্ষোভে অথবা ব্যবসায়িক উন্নতির আশায় মানুষ অনেক বিচিত্র কাজ করতে পারে বটে, কিন্তু একখানি নাতিদীর্ঘ চিঠিতে প্রায় এক নিঃশ্বাসে এতগুলো মিথ্যাকথা বলতে হলে যে পরিমাণে মরীয়া হওয়া দরকার, তা কেবল একটিমাত্র আদিম রিপুর তাড়নাতেই মানুষ হতে পারে : সেটি হল ঈর্ষা। ঈর্ষার পোশাকী সংস্কৃত নাম মাৎসর্য এবং সকলেই জানেন মাৎসর্যের দুটি নিত্যসহচর আছে, অর্থাৎ সব সময়েই তার এক দিকে থাকে মদ এবং অপর দিকে থাকে মোহ। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তাঁর কবিযশ যখন দ্রুত প্রসার লাভ করে সমগ্র বিশ্বকেই আচ্ছন্ন করে ফেলছিল, তখন ঐ মদ-মোহ-মাৎসর্যের প্ররোচনায় কবির লণ্ডনস্থ বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যেই যে একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক-সংঘাতমূলক নাটক (বর্তমানের দূরত্ব থেকে দেখলে তাকে আজ প্রহসনই বলা উচিত হবে) জমে উঠছিল, ম্যাকমিলানকে লেখা য়েট্‌সের ঐ চিঠিখানাকে তারই একটি ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন অংশ বলা যায়। ঐ নাটকের কুশীলবদের মধ্যে য়েট্‌স ছাড়াও আরো এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা অদ্যাবধি এ দেশে রবীন্দ্রনাথের 'অকৃত্রিম বন্ধু' বলেই পরিচিত। এই নাটকটিকে উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে গেলে অনেক বিবৃতি, উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তার অবকাশ নেই। অতএব কিপলিং-এর কথায় বলি : 'that is another story for grown-ups'.

---

* শান্তিনিকেতনস্থ রবীন্দ্র-সদনের অবেক্ষক শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে অপ্রকাশিত চিঠিপত্র এবং অন্যান্য উপাদান পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

সমাপ্ত

॥ দশ ॥

বাবাকে একদিন আমি শুধিয়েছিলাম— এত এত বই যে বাবা! কেন তুমি এনেছিলে? এনে এমন করে সাজিয়ে রেখেছিলে কেন?

তুই আমার বয়সে এসে পড়বি বলেই! তোদের জন্যেই তো! বলেছিলেন তিনি।

কেমন করে তুমি টের পেলে বাবা যে আমরা আসব? এখনও তো কেউ আসিনি আমরা? জানলে তুমি কি করে?

জানা যায়।

নির্বিশেষের ন্যায় এক কথায় সেরে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু এখন আমি জানি তাঁর কথাটা সত্যি কতখানি। সবই জানা যায়—আর কারো না, তাঁরই জানা এমন। আমার চাইতে কথায়, কেমন, তিনি জানবার তিনিই জেনেন, যথাসময়ে যথাযথ মিলিয়ে থাকেন। যা মিলবার আপনার থেকেই এবং আর কবিতার মতই কেমন করে মিলে যায়—অসম্ভব মিলন ঘটাবার পাকা সেই তিনিই তো!

একদা আমার মতন অর্বাচীন এক বালকের সঙ্গে মেলার জন্যেই এই বইয়ের মেলা! এই মেলাই বই!

তিনি জানতেন সারা জীবন নিজের লেখার মেট ফেলতে আর মজুরি কুড়োতেই আমার দিন রাত কাটবে, পড়বার ফুরসৎ কোনদিন আর পাব না, লেখাপড়াই অদৃষ্টে নেই আমার—তাই কৈশোরকালের এই ফাঁক-তালে তাক মাফিক এক আধটু আমার পড়াশোনার এহেন ব্যবস্থা।

মোটামুটি যা কিছু জানবার শেখবার তখনই আমি শিখেছি জেনেছি। বাবার ঐ সব বই পড়েই।

পণ্ডিত হবার পক্ষে এমন কিছু না হলেও একজন মেহনতি মজদুরের পক্ষে, আমার ধারণায়, এই যথেষ্ট। এর বেশি পড়াশোনার দরকার নেই।

মা অবশ্যি বলতেন, বই পড়ে কিছুই জানা যায় না, মন দিয়ে জানতে হয়। চোখে দেখে, পরশ করে তবেই আমরা টের পাই। এর ভেতরে ওই মনটাই আসল। মন না দিলে কিছুই ঠিক দেখা যায় না বোঝা যায় না। এমন কি ওই বইও যদি মন দিয়ে না পড় তো ওর মর্ম মেলে না মোটেই।

তবে ছেলেরা যে এত এত পড়ে পড়ে পড়ে মুখস্থ করে- মুখস্থ করে মনে রাখে, তার মানে কী মা? আমি শুধিয়েছি। কত বড় বড় লোককেও ত বই মুখে পড়ে থাকতে দেখেছি আমি দিন রাত। পড়ে যায়, খালি পড়ে যায়।

না বুঝে পড়ার সবটাই বোঝা হয়ে তাদের মাথায় থাকে, বলেছেন মা: একদমই মনের সঙ্গে মিলিয়ে যায় না। জীবনের সঙ্গে মেশে না। জীবনের সঙ্গে মেলে না। সে পড়া শুধু ভার হয়ে থাকে মাথার ওপর, কাজে লাগানো যায় না কখনো, খাটানো যায় না নিজের জীবনে। সে বিদ্যা জীবন হয়ে ওঠে না, জীবিত হয় না। বুঝেছিস?

মার কথার মানে সেদিন আমি বুঝিনি, এখনো তার অর্থ ঠিক উদ্ধার হয় তা আমি বলতে পারি না। এখন আমার মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, কেন আমি নিয়মিত লেখাপড়া শিখিনি। আমার বন্ধুদের কত বড় পড়াশোনা, বিশ্বসাহিত্যের কী না তাঁরা জানেন! কী না পড়েছেন—কোনো কিছুই তাঁদের অজানা নেই। আর এক কণাও তার পড়া হয়নি আমার। পৃথিবীর কত মহৎ সৃষ্টি আমার অগোচরে অপঠিত থেকে গেল, আমার স্বদেশেরই কি সব জানতে পারলাম! মহাকাব্যের কথা না পড়েছি, পুরাণেরই বা কী! বাবার অত অত বলাতেও বাল্মীকি বেদব্যাসের রামায়ণ মহাভারত দুটো আমার পড়া হল না। বিদেশী মহৎ স্রষ্টাদের প্রায় সবাই তো অমনি বাকী রয়ে গেলেন! বিশ্বের নিত্য নূতন সাহিত্য সৃষ্টির সাথেই বা যোগ রাখলাম কোথায়! সর্বাধুনিক রচনারই বা কী পরিচয় পেলাম। অভয়ঙ্করের বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনা পড়েই আমার যা এই ভয়ঙ্কর বিদ্যে।

অবশ্যি উপেনদা (ভাগলপুরের উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন বিজলীর সম্পাদন-প্রকাশনায় বিজড়িত) একদিন সান্ত্বনাচ্ছলেই বুঝি আমায় বলেছিলেন, বাঁধাধরা লেখাপড়া তেমনটা তুই শিখিসনি যে তা এক পক্ষে ভালোই হয়েছে, শাপে বর হয়ে গেছে তোর। তোর ওপর অপর কারো প্রভাব পড়েনি, পড়তেই পারেনি একদম। তুই যা হবি আপনার থেকেই হবি, যা লিখবি নিজের মনের থেকেই লিখবি। কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের মতন হওয়াই তো ভালো রে! তোর লেখায় আর কারো প্রভাব পড়বে না। অবশ্যি তোর রচনায়

কোনো ঐতিহ্যসূত্র থাকবে না তা বটে, তাতে কি। তা না থাকলেও—তুই-ই নিজেই একটা ইতিহাস হতে পারিস হয়ত বা।

বাবার পাঠাগারে নানা ধরনের গাদা গাদা বই থাকলেও রবীন্দ্রনাথের রচনা ছিল না একখানাও। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পেয়েছিলাম ইস্কুলে ভর্তি হবার পর। বছর কয়েক মনর কাছে ঘরে বসে পড়ে বাংলা ইংরাজির কিছুটা রপ্ত করে সাহিত্য ব্যাকরণ গ্রামার ট্রানশ্লেশন একটুখানি দুরস্ত হয়ে পরীক্ষা দিয়ে ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম সটান ক্লাস সেভেন-এ। আর আমার ভাই এক ক্লাস নীচে। সেইকালে ইস্কুলের লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের খবর মিলল। আর পেলাম বাংলার সার-এর কাছে। তখন আমার বিস্ময় জাগল। বঙ্গদর্শন থেকে নব্য ভারত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার থেকে সমাজপতির সাহিত্য, ভারতবর্ষ প্রবাসী তা ছাড়া আরো কতো পত্র পত্রিকা, এমন কি গৃহস্থ গম্ভীরা মানসী মর্মবাণী, স্বাস্থ্য সমাচার এত ছিল, কিন্তু বাবার ভাঁড়ারে কবিগুরুর বই ছিল না একখানাও।

রবি ঠাকুরের ওপর কেন জানি না হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন বাবা।

কবি বলতে তাঁর কাছে মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র আর নবীন সেন! তাঁদের কবিতা তাঁর মুখস্থ—আওড়াতেন মুখে মুখে। সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণির থেকে শুরু করে হুর্‌রে হুর্‌রে হুররে করি গর্জিল ইংরাজ! নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ, পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ। আর, বাজাওরে শিঙা বাজ ঘোর রবে/সবাই স্বাধীন-এ বিপুল ভবে/সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে/ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়! আর সেই সাথে, হেমচন্দ্রের—হায় হায়! ঐ যায় বাঙালীর মেয়ে!

কবিতা তো এই সব! এ'রাই তো কবি। তা নয় তো কী, তোর ঐ রবিঠাকুর! 'আর বাঁকস না পায়রা কবি, খোপের ভিতর থাক ঢাকা/তোর বক্‌ বকম্‌ আর রকম সকম সব কবিত্বের ভাব মাখা। তাও ছাপালি পদ্য হোলো, নগদ মূল্য এক টাকা'!!

কবিকে ঠাট্টা করা কাব্যবিশারদের গালভরা এই ছড়াটা বেশ ফূর্তি করে তিনি আওড়াতেন।

বাবার উপরোধে মাইকেল নবীন সেন হেমচন্দ্রে এক আধটু হাবুডুবু খেয়েছিলাম। মাইকেলে হাঁপিয়ে উঠেছি, হেমচন্দ্রে উঠে হাঁপ ছাড়া গেছে, নবীন সেন মন্দ লাগেনি নেহাৎ। তবে স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস ফেলতে পেরেছি ভারতচন্দ্র পেয়ে। তাঁর কাব্যলোকে পেঁৗছে—তাঁর অন্নদামঙ্গল আর বিদ্যাসুন্দরে এসে রস পেয়েছি সেই বয়েসেই। আহা, কী ছন্দ! কী বাক্যের ছটা। কী রূপরাগের ঘটা! একেবারে যেন মাতিয়ে দেয়।

পুরানো সাধনা, আর স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনা ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের রচনার কিছু কিছু স্বাদ পেয়েছিলাম আর তদানীং কালের প্রবাসীতেও কিছু কিছু—কিন্তু ভূরিভোজ শুরু হোলো সেই ইস্কুলের লাইব্রেরীর নাগাল পেয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধের বইয়ে ঠাসা ছিল গোটা একটা আলমারিই।

পাঠশালার সেই ঝুলনযাত্রার পর যেন শারদীয়া মহাপূজার মহা মহোৎসবের মধ্যে এসে পড়লাম।

প্রথম দিনই আমি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' নিয়ে এসেছিলাম। তার প্রথম কবিতাটা ছিল, মনে আছে এখনো, 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে...'। ধূপের মতই যেন আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যছন্দে আর ভাবসৌরভে একেবারে মিলিয়ে গেলাম—বিলিয়ে দিলাম আপনাকে।

বইখানা হাতে নিয়ে বাবার সেই নাক সিঁটকানো...এখনো যেন আমার চোখে ভাসে। আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন বাবা—আমাদের ছেলে-চারু বার করেছে বইটা। পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে গেছে চারু!

ঐ পর্যন্ত, আর কিছু নয়।

লেখক হিসেবে চারুদা আমাদের অচেনা ছিলেন না। প্রবাসীতে তাঁর গল্প আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়তাম। তাঁর 'ভাতের জন্মকথা' বইটা তিনি আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড বিষ্টু সুকুলকে উৎসর্গ করেছিলেন—বিল্টুর কাছ থেকে নিয়ে পড়েছিলাম বইটা। এমন ভালো লেগেছিল যে! সে বইটা বোধহয় পাওয়া যায় না এখন আর।

চাঁচোরের রাজার সম্পর্কে কে যেন হতেন চারুদা আমাদের। রাজাকাকার জামাই-চারু বলে আরেকজনা ছিলেন, তাই বাবা-মা চারুদের কথা উঠলেই ছেলে-চারু বলে বোঝাতেন। চাঁচোরের পারিবারিক কাহিনী নিয়ে কয়েকখানা উপন্যাসও লিখেছিলেন চারুদা—পরগাছা, আরও যেন কী কী! প্রবাসীতেই বেরিয়েছিল, পড়েছিলাম।

তাছাড়াও 'ভাবের জন্মকথা' বলে চারুদার ছোটদের জন্যে লেখা বইখানা বন্ধু বিল্টু সুকুলের কাছ থেকে নিয়ে পড়েছিলাম।

বিল্টু সুকুলকে আমি রীতিমতন ঈর্ষা করতাম এক কারণে, ঐ বইয়ের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় তার নাম ছাপানো ছিল বলে। বিল্টুর ভাতের সময় বইটা তিনি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। বিল্টুর বাবা গৌরীপ্রসাদ সুকুল চারুদার বাল্যবন্ধু ছিলেন, যার মুখে শুনেছিলাম, গৌরীকে একবেলা না দেখতে পেলে তিনি নাকি ছটফট করতেন।

বিল্টুর জন্যও আমার সেইরকমটাই হত বোধ করি মাঝে মাঝে। একদিন কেলাসে গিয়ে নিজের পাশেই তাকে না পেলে সেই ছটফটানিই হত বুঝি। যেদিন সে অপর কোনো ছেলের পাশটিতে বসত এমন খারাপ লাগত আমার যে কী বলব! পাঠ্য পুস্তকের আড়ালে গল্পের বই পড়তেও মন লাগত না তখন আমার।

বিল্টুকে আমি বলতাম, তুই একজন বড় রাইটারের একখানা বই পেয়েছিস ত! আরেকখানাও পাবি তুই এক সময়। আমিই দেব তোকে। আমার একখানা বই উৎসর্গ করব তোর নামে। বড় হয়ে আমিও বই লিখব তো?

আরেকজন বড় রাইটার? চোখ বড় বড় করে সে তাকাত।

তা ঠিক বলতে পারি না, তবে রাইটার হব আমি ঠিকই। বড় হয়ে বই লিখব আমি। তুই দেখে নিস।

শ্নেছিলাম। এই কারণেই বোধহয় বই-গ্লো টি'কে ছিল।

বাবার নাম করতেই সমাদরে তাঁর বইয়ের ঘরে তিনি নিয়ে গেলেন আমাকে। আলমারিতে আলমারিতে সাজানো থরে থরে সব বই। তদানীন্তন লেখকদের বই যত। কত বই যে! ইতিহাস প্রবন্ধ গবেষণামূলক বইও কতো! রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যদ্নাথ সরকারের বই। শরৎচন্দ্রের বইয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল আমার সেইখানেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক আর কবিতার বইও পেয়েছিলাম। আরো কতোরকমের বই—মনে নেই এখন।

গ্রুদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশিত অনেক বই ছিল তাঁর। তার থেকে ইচ্ছেমত কয়েকখানা তিনি বেছে নিতে বললেন। আর বললেন পড়েটড়ে ফিরিয়ে এনে দিলে আবার পাব। এমনি করে সেকালের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

সকালে উঠে একখানা বই পড়ে শেষ করি। একখানা দ্পুরে পড়ার জন্যে ইস্কুলে নিয়ে যাই। আবার রাতে বিছানায় শ্য়ে শ্য়ে আরেকটা পার করতে লাগি। দ্দিন বাদ বাদ বই নিয়ে আসি গিয়ে।

বাবা বলতেন, গ্রন্থীঃ ভবতি পন্ডিতঃ। যারা গ্রন্থ নিয়ে পড়ে থাকে তারাই পন্ডিত হয়।

মানে, তুমি বলছ যে লাইব্রেরীয়ানরাই? যারা কিনা বই নিয়েই ব্যস্ত থাকে সব সময়?

না না, সেভাবে পড়ে থাকা নয়, গ্রন্থ নিয়ে পড়া—সেই কথাই বলছি রে! বই পড়েই বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়।

মা, বাবা কী বলছে জানো? মাকে গিয়ে বললাম, গ্রন্থীঃ ভবতি পন্ডিতঃ। কথাটা সত্যি নাকি? মানে কী ওর?

ঠিকই বলেছে তোর বাবা। যারা বই মুখে করে পড়ে থাকে সব সময়, তারা পন্ডিত না হয়ে আর যায় না। বই ছাড়া চোখের সম্মুখে কিছুই তাদের পড়ে না তো আর—তাই সবটাই পন্ড হয় তাদের। তার মানেই হোলো গিয়ে পন্ডিত।

তুমি কী বলছ মা? পন্ডিত মানে কি তাই? একেবারে পন্ড হয়ে যাওয়া?

গ্রন্থি কথাটার আরেকটা মানেও আছে

এইখেনে মন আনতে পারিস?

আবার। তার মানে গেরো। কপালে গেরো না থাকলে কি কারো পন্ড হয়? কেউ পন্ডিত হয় নাকি? এ হোলো গে ওই বইয়ের গেরো।

গেরোও বলা যায় আবার গেরোনও বলা যায় তাই না মা?

বলতে পারিস। বই থেকে কী জানা যায় কিছু? মন থেকেই তো জানা যায় সব। সেই জানাটাই আসল। মনের জানাটা বই দেখে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে কেবল, সত্যিকার জানা তোর ঐ মনেই। মনের মধ্যেই তোর সব রে।

বাবা যে ব্রহ্মগ্রন্থি দেয় পৈতেয়? সেটা তাহলে? সেটাও কি—?

ঐ গেরোই। ধরতে গেলে, সেই গেরোই একরকমের। ব্রহ্মও একটা গেরো ছাড়া কী? গেরোনও বলতে পারিস। যার কপালে ঐ গেরো আছে, যার বরাতে ঐ গ্রহণ লাগে, মানে যাকে তিনি গ্রহণ করেন তার কি আর নিস্তার আছে নাকি? ইহকাল পরকাল সব ঝরঝরে।

ভগবানের খপ্পরে পড়া তাহলে ভালোই নয় বলছ তুমি?

না, আমি কিছু বলছি না। কারো খপ্পরে পড়াটাই বুঝি ভালো নয়! তুই পৈতের ব্রহ্মগ্রন্থির কথা বলছিলিস না? সেটা হচ্ছে গিয়ে উপনয়ন সংস্কার। ভগবানের সঙ্গে জোট পাকিয়ে নতুন করে জন্মানো—ভগবান আর তুই দুজনে মিলে একজোটে দ্বিজত্ব লাভ, বুঝলি?

একদম না।

উপনয়ন মানে উপনীত হওয়া, ব্রহ্মের মুখোমুখি গিয়ে পৌঁছোনো। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ। উপনয়ন মানে তৃতীয় নেত্রও বোঝায় আবার। তার মানে, যা আমি বলছিলাম, তোর ঐ মনের চোখ। মনের চোখ খুলে যাওয়া। যার মনের চোখ খুলে যায় সে পৃথিবীর সব কিছুই যথার্থরূপে দেখতে পায়। আর তাই হল গিয়ে সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎ।

মনের সেই চোখ কি করে খোলে মা?

যার ইচ্ছে হলেই খোলে। এই জন্মেই খোলে, কারো-কারো আবার সাত জন্ম লেগে যায় খুলতে। আবার এই দণ্ডেই খুলে যায় কারো কারো। সবই যার ইচ্ছে।

মানে তোমার ইচ্ছে।

আমার ইচ্ছে? আমি কে? বলছি না যার ইচ্ছে? আমার মা, তোর মা, সবার মা—সেই বিশ্বজননী।

তুমিই তো সেই মা। সেই বিশ্বজননী। তুমিই তো! ভৈরবী বলেছিল আমায়।

দূর পাগ্লা! মা হাসতে লাগলেন আমার কথায়।—মাথা খারাপ করে দিয়েছে! আমি শ্ধ্ ভাবছি তুই খাবি কি করে রে? পড়ার বই ছ্ঁসনে একদম—রাতদিন নভেল নিয়ে পড়ে থাকিস। পাসটাস করতে পারবিনে—চাকরি টাকরিও জুটবে না তোর কপালে। লেখাপড়া শিখলি নে, মুখ্যু হয়ে থাকলি। কী হবে রে তোর? খাবি কি করে?

তুমি তো আছো। মা থাকতে ছেলের ভয় কি।

আমি কি চিরদিন আছি নাকি? বেঁচে থাকব চিরকাল?

না থাকলেও তখনো তুমি থাকবে, আমি জানি। আমার ভাবনা নেই।

তা কি হয় নাকি রে? তুই কি আমায় বেঁধে রাখতে চাস? আমি বাঁধা পড়তে চাই না। কিছুতে না, কারোতে না।

তারপর খানিক কী ভাবলেন তিনি—দাঁড়া, তোর সঙ্গে আসল মা-র পরিচয় করিয়ে দিই। তাহলে আর তোর কিছু ভাবনা থাকবে না। খাওয়া পরার তো নয়ই—কোনো দুঃখ কষ্টও পাবিনে জীবনে। দাঁড়া।

দাঁড়িয়েই তো রয়েছি। তোমার সামনেই তো দাঁড়িয়ে।

আমার দুই ভুরুর মধ্যবিন্দুতে আলতো করে তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি ছুঁইয়ে তিনি বললেন—এইখেনে মন আনতে পারিস? আন দেখি? এই দুই ভুরুর মাঝখানে?

মন?

হ্যাঁ। মন আনতে হবে, এনে স্থির করতে

হবে এখানটিতে। সারা দেহময়ই তো তোর মন ছড়িয়ে—তাই না? সেই সবগুলো মনকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এইখেনে নিয়ে এসে জড়ো করতে হবে—মনের মধ্যে মন। সেই মনের মধ্যেই মা দুর্গা থাকেন। সবার মা যিনি, বিশ্বজননী।...এনেছিস মন?

চেষ্টা করছি।

কী মনে হচ্ছে এখন?

কতো কী! কতো কী যে মনে পড়ছে।

মা দুর্গার কথা?

না তো। যতো সব আজে বাজে মেয়েদের কথা মনে আসছে কেবল।

তোর মনে আবার মেয়ে কী রে! মা তো শুনে হাসবেন।

রিনিটিনিদের কথাই মনে পড়ছে আমার।

তাই বল! শুনে হাসলেন মা—দাঁড়া, আমি তোর মন এনে দিচ্ছি এখেনে। এই বলে তিনি ভ্রূ মধ্যে তাঁর মুখ ছোঁয়ালেন—যতক্ষণ আমি তোকে চুমু খাব ততক্ষণ তোর মন এখেনে থাকবে। তুই মনে মনে মা দুর্গা মা দুর্গা কর—আমিও মাকে ডাকছি মনে মনে। মা আবার আমাদের দুজনকেই ডাকছেন। এইখেনে বসে। মিনিট খানেক বাদে মা শুধালেন—এলো মন?

হ্যাঁ।

কি রকমটা বোধ হলো তোর?

শিরশির করছিল গা।

মা দুর্গার আবির্ভাব হলো কিনা, সেই জন্যেই। তারপরে তিনি আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে হাত ছুঁইয়ে বললেন—এখানে থাকেন বাবা মহাদেব। পরম শিব। আর, তাঁর পায়ের তলায়, এইখেনে দুই ভুরুর মাঝখানটিতে পার্বতী রয়েছেন। দশভুজা দুর্গা। আর এইখানে, এই কণ্ঠদেশে, আছেন বাগ্দেবী—মা সরস্বতী। বুকে নারায়ণ, নাভিপদ্মে মা লক্ষ্মী—এমনি সব নানা দেবতা নানান অঙ্গে ছড়িয়ে, বড় হয়ে যখন বই পড়বি, তন্ত্রের বইটই পড়বি, তখন টের পাবি। দেহের নানা স্থানে নানান চক্র রয়েছে—ভুরুর মাঝখানটিতে আছে আজ্ঞাচক্র। মা দুর্গা এখানে বসে আজ্ঞা করছেন, বলছেন তথাস্তু। তথাস্তু। তাই হোক। তাই হোক। এখানে মন নিয়ে এসে তোর মন দিয়ে যা চাইবি তাই পাবি। পেয়ে যাবি—দেখিস।

তাই পাব? বলছ কি মা?

নিশ্চয়। চেয়ে দ্যাখ না তুই।

চাইব বইকি। আজই চাইব। আমার কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না মা।

বিশ্বাস না হলেও হবে। অবিশ্বাস করে চাইলেও পাবি—শুধু, মার কাছে এসে চাইতে হবে, এইখেনে মন নিয়ে এসে...

বিশ্বাস না হলেও?

অবিশ্বাসে কী আসে যায়? মা কি আর মা থাকে না তাহলে? অবিশ্বাস করে আগুনে হাত দিলে কি হাত পুড়বে না তোর? মা তো আগুন রে।

মাথায় বড় বড় বারকোস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে

তবে যে মামা বলেন, বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর...!

সে কথা কৃষ্ণর বেলা খাটতে পারে, মার বেলা নয়। মা তো তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সব সময় মিলে রয়েছেন।...যাই গে, আমার কাজ পড়ে রয়েছে।

চলে গেলেন মা। আমিও চলে এলাম আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের খোলা ছাদের নিমগাছের ছায়ায়। আমার শোয়ার, শুয়ে শুয়ে বই পড়ার প্রিয় জায়গা ছিল সেইটা। খোলা হাওয়ায় খোলা ছাদে গা গড়িয়ে ভুরুর মাঝখানে মা দুর্গাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগলাম শুয়ে শুয়ে।

বিকেল গড়িয়ে এসেছিল, খিদে পেয়েছিল বেশ। সেই কখন সন্ধ্যে হবে, লুচি ভাজবে খেতে বসব আমরা। এর মধ্যে যদি কিছু খেতে পাওয়া যায় কী ভালোই না হয় তাহলে মনে মনে মা দুর্গার কাছে খাওয়ার দাবি জানাতে লাগলাম।

মা দুর্গাকে ছেড়ে কখন ফের রিনিদের কথা ভাবতে লেগেছি টের পাইনি। এদিকে বড় বারকোস নিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল কজনা। সামনের ছাদে আমায় শুয়ে থাকতে দেখে ইশারায় তারা ডাকলো আমাকে।

কী ব্যাপার? না, মা সিংহবাহিনী আর রামসীতার শীতল ভোগের মহাপ্রসাদ—বৈশাখ মাসের বৈকালী। সারা বোশেখ মাসটা ধরেই প্রতিদিন বিকেলে এমনি ধারা বৈকালিক ভোগ দেয়া হবে তাঁদের, আর সেই প্রসাদ পালা করে বিলোনো হবে একেক জনকে একেক দিন।

আজ প্রথম দিনটিতেই রাজাবাহাদুরের হুকুমে আমাদের পালা পড়েছিল।

প্রকাণ্ড রূপোর আর শ্বেত পাথরের দু' থালায় সাজানো মাখন ছানা ক্ষীর সর বাদাম কিসমিস আখরোট অঙুর খেজুর ভিজে ছোলা শসা কলা ইত্যাদি যাবতীয় ফলটল—আর সেই সঙ্গে সন্দেশ টন্দেশ আরো কত কী!

সীতারাম সিংহবাহিনীর শীতল ভোগের মহাপ্রসাদ!

নয়া রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে রামসীতের প্রকাণ্ড মন্দির। দেখেছিলাম আমি। তার পাশেই সিপাহিদের বকেয়া ব্যারাকে আমাদের হাইস্কুল বসতো।

রোজ সন্ধ্যায় রামসীতার পুজোরতি হয় খুব ঘটা করে তাও শুনেছি। কোনো দিন তা দেখা হয়নি। কী করে দেখব? ইচ্ছে থাকলেও অত দূরে সন্ধ্যেবেলায় একলাটি কি আমায় যেতে দেয়? আমাদের এই পুরনো রাজবাড়ি থেকে নয়া রাজবাড়ি তো কমখানি পথ না।

রামসীতার দিনের বেলার পুজোর্চনাও দেখিনি কখনো। দুপুরে যে রাজভোগ হয় শত শত লোক তার প্রসাদ পায় নাকি। আর রাত্রির গোড়ায় সন্ধ্যারতি—তা নাকি একটা দেখবার মতই। দেখতে হবে একদিন। রিনিকে নিয়ে দেখে আসব না হয়।

রামসীতা রাজবাড়ির ঠাকুর। আর সিংহবাহিনী তাঁদের কুলদেবতা। সোনার প্রতিমা—ছোট্ট একটুখানি। দূর থেকে দেখা যায় না। খুব কাছে গেলে তবেই দেখা যায়, দেখিনি কখনো। পুজোর সময় পাহাড়পুরে রাজবাড়ির মহাপুজোয় বিরাট দুর্গা প্রতিমার

পাশেই নাকি সোনার সিংহাসনে সিংহ-বাহিনীকে রাখা হত—মা দুর্গার সঙ্গে তাঁরও পুজো হয়ে থাকে তখন। মা দেখেছেন সে ঠাকুর, আমার চোখে কিন্তু পড়েনি।

দু' থালা প্রসাদ, একটা শ্বেত পাথরের থালায়, আরেকটা থালা রুপোর।

দু থালা কেন গো? দু রকমের দুটো থালা যে।

রুপোর থালায় মা সিংহবাহিনীর প্রসাদ, আর শ্বেতপাথরে সীতারামের।

প্রসাদ রেখে দিয়ে থালা নিয়ে যাবে তো তোমরা? লোকজনকে শুধোলাম।

না না। থালা এখানেই থাকবে। থালা-সমেত রেখে যেতে বলেছেন রাজা বাহাদুর!

রাজবাড়ির ব্যাপার। রাজ-রাজড়ার চাল-চলন। তাঁদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

এর আগে আর কখনো আমাদের বাড়ি ঐকালীর পালা পড়েনি। আসেনি কখনো আর। সেই প্রথম এল।

আর সেই প্রথম আমার ঈশ্বরের প্রসাদ-লাভ...মার আশীর্বাদে।

[ক্রমশ]

ঈশ্বর কি পুরুষ না মেয়ে ?

খবরের কাগজে পড়লাম মস্ত মজার খবর। আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না। আমেরিকার মহিলা মুক্তি-আন্দোলনের পাগলামির পসরা এ পর্যন্ত যা হয়েছে সবকে টেক্কা দিয়েছে এ প্রশ্ন। ভগবান কি পুরুষ, না মেয়ে?

মহিলা মুক্তিকামীদের দাবী অনেকটা কংগ্রেস নাকি মেনে নিয়েছেন। এখন স্টেট-গুলোর মতামতের উপর নির্ভর মাত্র। কিন্তু ভগবান কি পুরুষ না মেয়ে এর সমাধান করবে কে বলুন?

নিউ ইয়র্কের এক ধর্মসভায় মুক্তিকামী-দের এক নেত্রী প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। নিজেই সমাধান করে বললেন, ঈশ্বরের ঐশ্বরিকতায় মেয়ে-পুরুষ ভেদের কথা আসে না। ঐশ্বরিকতা তার অনেক উপরের কথা। য়িহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসে ঈশ্বরকে পিতারূপে দেওয়াতে ও পুরুষকে তিনি নিজের রূপে দিয়ে গড়েছেন এ ধারণাতে সমাজে পুরুষপ্রাধান্যের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ পৃথিবীতে দেবীরূপে মাতারূপে আরাধ্যা উপাস্যা বহু দেশে আছে। ভারতে দেবী দুর্গা, কালী, বৌদ্ধশাস্ত্রে তারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা সবাই মায়ের রূপে পূজিত। বিশ্বজননীই তখন কল্পনার দেবী।

আমেরিকার ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ বা Theologian মহিলারাও মাথা কম ঘামাচ্ছেন না। বাইবেলোক্ত পদ "So God created man in his own image" একমাত্র কথা নয়। তারপর আছে—"in the image of God created He him, male and female created He them।" অতএব আধ্যাত্মিক ধ্যানের ভগবান পুরুষ ও মেয়ে উভয়েরই আত্মার উপলব্ধিগত মহান ধারণা।

আমাদের কিন্তু ধর্মে কোথাও মহামায়াকে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন আসতে হয় নি। আর্য-সভ্যতার আগেও দেবাদিদেব মহাদেব অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। রাধা আগে পরে কৃষ্ণ, সীতা আগে তবে রাম। ঈশ্বর সেখানে যুগলের মিলন। পুরুষ-মেয়ে ভিন্ন নয়।

তাই বোধ হয় আমাদের সমাজে মেয়ে-পুরুষে দ্বন্দ্ব এ-স্তরে কখনও পৌঁছাবে না।

পদযুগলের তরফ থেকে

শীতের মৌসুমী সমস্যার মধ্যে আপনার পদযুগলের রুক্ষতা বা কর্কশভাব একটি, বিশেষ করে বাংলা দেশে। আমরা তো ঘরে বহু সময় খালি পায়ে থেকে অভ্যস্ত। বাইরে যেতে চটিজুতো ভিন্ন আর কিছু বড়-একটা পরি না। আর্দ্রতাবিহীন, রুক্ষ হাওয়া বড় শহরে থাকলে কলকারখানা অথবা ঘরে ঘরে রান্নাবান্নার ধোঁয়া-কালি-ঝুল গরমের চেয়ে শীতে জমে যায় অনেক বেশি। পদযুগলকে যত্ন করার রেওয়াজও কম। সময় বা সুযোগ থাকলে মুখ-এর পরিচর্যা বরং হয়, তার চেয়ে বেশি যাঁরা করেন হাত বা গলা যথেষ্ট। পা-দুখানার দিকে নজর দিতে দেখা যায় অতি অল্পসংখ্যক মহিলাকে। অথচ পায়ে-চলা মেয়ের পরিচ্ছন্ন, সুন্দর চরণ দুটি কেবল সৌন্দর্যের পরিচায়কই নয়, শারীরিক স্বাচ্ছন্দতার বিশেষ সহায়।

দিনের কাজের ফাঁকে পায়ে তেল মালিশ করার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন। নখ কেটে, তার ধারালো ভাব একটু ফাইল দিয়ে ঘষে নিলে ভাল হবে। তাতে লেপ-কম্বলে নখ লাগবে না। এবার বেশ সুন্দর করে গরম তেল মালিশ করবেন। নারকেল তেল ফাটা নিবারণে বিশেষ উপযোগী। মালিশ করে উষ্ণ জল, যা পায়ে সইবে, তাতে পা ডুবিয়ে দেবেন মিনিট কয়েক। পা-দুখানা প্রাণভরে জল থেকে নেবে জলীয়ভাব। নখ যদি শক্ত হয় তবে নখ কাটা জলে ডুবিয়ে নেবার পরে করে নিতে পারেন। নখ তাতে কিছু নরম হবে। কাটা সহজও হবে।

পা জল থেকে তুলে বেশ করে সাবান ও ব্রাশ, স্পঞ্জ অথবা ধুঁধুল বা ঝিঙে জাতীয় তরকারির খোসা দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন। যাঁদের পা বেশি ফাটা, তাঁরা ঝামা ব্যবহার করতে পারেন। ঝামা না পেলে মাটি দিয়ে তৈরি ঝামার মত পা পরিষ্কার করার জিনিস যা বাজারে মেলে তা ব্যবহার করতে পারেন। পায়ের দু' পাশ ও তলা ঘষে পা ধুয়ে রগড়ে রগড়ে মুছে ফেলবেন। সস্তার গামছা অতি প্রশস্ত। স্নানে ব্যবহার না করলেও পায়ের জন্য একখানা রাখবেন। রগড়ানোতে সুবিধা হবে ও মর্দন বা মালিশের ফল হবে। রক্তসঞ্চালন ভাল হলে পা-দুখানা সতেজ তো হবেই, উপরন্তু সমস্ত শরীর চাঙ্গা বোধ করবেন।

যাঁরা নখরঞ্জনী ব্যবহার করেন তাঁরা ইচ্ছা মত রঙ বেছে নেবেন। হালকা রঙ-এর লিপস্টিকের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে হালকা রঞ্জনীর চলন হয়েছে। নানা বিচিত্র রঙ-এর সমাবেশ হয়েছে বাজারে। অলক্তরাগ এখন ফ্যাশন-যুদ্ধে পরাস্ত। তবু যেন মাঝে মাঝে মনে হয়, যেমন আমাদের ঐতিহ্যের আর পাঁচটা জিনিস ঘুরে-ফিরে সুন্দরীদের শোভাবর্ধন করছে তেমন আলতা মধ্যে মধ্যে মন্দ কি! মেহেদির-মান তো বজায় আছে।

পা ফাটা বন্ধ করতে দিনের কিছু সময় মোজা পরা ভাল। হাওয়ার হাত থেকে পা তাতে অনেকটা রক্ষা পাবে। খুব বাহারের মোজা দরকার নেই। কারও এক জোড়া ছেঁড়া মোজা সংগ্রহ করে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। পায়ে যাঁদের জল বেশি লাগে তাঁরাও পা শুকিয়ে তেলাক্ত কিছু মেখে রাখবেন। জলের দরুন যা ক্ষতি তা শুধরে

যাবে। পা-দুখানা মোলায়েম থাকবে।

নিত্য যত্নের সময় অল্প হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সপ্তাহে একবার যেমন মাথা ঘষেন, তেমন পায়ের যত্নের জন্যও সময় দিন। নিয়ম করে বসবেন পদচর্চা করতে, যাতে কাজের সময় অবসর খুঁজতে না হয়। পায়ের জন্য অন্য সাবানের চেয়ে মাথায় যে স্যাম্পু ব্যবহার হয় তা অনেক বেশি ভাল। পায়ের ত্বক তাতে মোলায়েম হবে। ফেনা উঠবে প্রচুর, বেশি ঘষাঘষির ঝামেলা নেই। তেলে তৈরি স্যাম্পু হলে আরও ভাল।

টুকিটাকি

ফুলদানিতে ফুলের জীবন দীর্ঘ করবার উপায় সম্বন্ধে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। আবার দু-একটি নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়ে আপনাদের জানাতে ইচ্ছা হচ্ছে।

এক সময় অ্যাসপিরিনের উপকারিতার কথা খুব চালু ছিল। বহু গবেষণার ফলে নাকি দেখা গেছে, অ্যাসপিরিন এমন কিছু পরিবর্তন করে না যাতে ফুল দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে এখনও কেউ কেউ বলেন, অ্যাসপিরিন রোগের বীজাণুকে দমন করে বলে ফুলের মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখে। সে কাজ সামান্য এক খণ্ড কাঠকয়লাতেও হতে পারে।

নানা বীজাণুতে যে ফুলের ডাঁটা বা বোঁটার ধ্বংস হয় সে সম্বন্ধে সতর্কতার জন্য ফুলদানি খুব পরিষ্কার থাকা দরকার। অতিরিক্ত পাতা, বিশেষ করে যে পাতা জলের তলায় থাকে তা ফেলে দেবেন। ফুল সাজাবার জন্য যতটুকু পাতা দরকার তা ভিন্ন পাতা-লতার সংযোগ না থাকাই ভাল। গাছে থাকার সময় দেখবেন পাতা কত সহজে শুকিয়ে উঠতে চায় এবং জল দেওয়া ঠিক মত না হলে ফুলগাছ নষ্ট হয়। কারণ, পাতা আর্দ্রতা বিকিরণ করে। এ বিকিরণ ধারা কাটা ফুলের পাতায়ও বর্তমান থাকে।

আধারে রাখা কাটা ফুল যাতে প্রচুর জল পান করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। ফুল কেটেই যদি ঈষদুষ্ণ জলে ডুবিয়ে রাখেন তবে ফুলের ডাঁটা প্রচুর জল পান করে নেবে। ঠাণ্ডা জলের চেয়ে গরম জল টানবে সহজে।

যদি বাজারে কেনা ফুল হয় তবে ফুল জলে দেবার আগে একটু করে কেটে নেবেন। অনেক সময় জল টানবার মুখ বন্ধ হয়ে থাকে। নিজের বাগানের ফুলের বেলায় সে প্রশ্ন নেই।

গোলাপ ফুলের বেলায় খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কাটা মাত্র জলে দিতে পারলেই ভাল। সামান্য কিছু দেরিতেও যে আর্দ্রতা নষ্ট হয় তাতে গোলাপ ফুলের জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রেও প্রথমে ঠাণ্ডা জলে না দিয়ে ঈষদুষ্ণ জলে রাখবেন।

শ্রীমতী

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ইচ্ছে করেই তাকে আমি বললাম না যে এই পদ্মাপাড়ি দেবার ব্যাপারটা স্থূলে অর্থে সত্য নয়, আসলে এটা 'কল্পনার পাড়ি...।"

এই প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীতে [৮ই মে ১৯৬৯] প্রকাশিত শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ক্রীড়ারসিক রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে জানা যায় কবি একবার 'বসুর টইটম্বুরে' পদ্মা দেখে সাঁতার কাটবার লোভ সামলাতে পারেন নি। ঝাঁপিয়ে পড়েন পদ্মায়। তার পরেই হৈ-চৈ কাণ্ড। নায়েব গোমস্তা থেকে আরম্ভ করে উপস্থিত সকলেই ত্রস্ত। সে এক সংঘাতিক অবস্থা। তাড়াতাড়ি নৌকো নাবান হল জলে অন্য জলের নৌকো আগেই ছুটেছে। কিন্তু নৌকায় উঠলেন না কবি। মাঝ পদ্মা থেকে আবার সাঁতার কেটে ফিরে এলেন তীরে। অবশ্য পদ্মার ওপারে তিনি যেতে পারেন নি।

নভেন্দুশেখর পাত্র
মেদিনীপুর

দেশ বিনোদন সংখ্যা

'দেশ'-এর বিনোদন সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘ বৃষ্টি আলো' পড়লাম। পড়ে এত ভাল লাগল যে এই চিঠিটা না লিখে পারছি না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক।

আমাদের চতুষ্পার্শ্বে অতি পরিচিত বাস্তব জগতের মধ্যেই তাঁর আনাগোনা। 'মেঘ বৃষ্টি আলো'র অনুরাধা, জয়শ্রী, শান্তনু, অরুণ প্রতিটি চরিত্রই এত জীবন্ত যে শুধু মাত্র উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে কিছুতেই যেন এদের ভাবতে পারি না। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এদের প্রত্যেককে আমরা ছুঁয়ে দেখছি। বর্তমান যুগের তরুণ তরুণীদের মানসিকতার অদ্ভুত, স্বচ্ছন্দ প্রতিফলন ঘটেছে এই উপন্যাসে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে মেয়েলী সংলাপগুলো। আড়ি পেতে কথা শোনার অভ্যেস আছে নাকি ভদ্রলোকের নইলে এত স্বচ্ছ বাস্তব সংলাপ উনি লিখলেন কেমন করে?

অনুরাধা ভালবাসায় বিশ্বাস হারিয়েছিল কিন্তু পেয়ে ওর কান্নাই যেন প্রমাণ করে দিল ভালবাসা এখনও মরেনি, এখনও শেষ হয়নি। এই ফ্রাস্ট্রেশনের যুগে এইটুকুই তো সঞ্জীবনের মন্ত্র, এইটুকু পাথেয় করেই তো বেঁচে থাক। সবশেষে লেখককে ও দেশ পত্রিকার সম্পাদককে এত সুন্দর একটা রচনা উপহার দেবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তা দত্ত
কলকাতা-৪৭

পি সি সরকার

'অতুলনীয় পি সি সরকার' রচনাটিতে (দেশ, ১ মাঘ ১৩৭৭) উল্লেখিত যাদুসম্রাটের একটি উক্তি—'আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ, তারা আমাদের কত ভুল ধারণা দিতে পারে, ম্যাজিক তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়'—প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এখানে সেই ঘটনার উল্লেখ করছি।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর পর দু বছর (খুব সম্ভবত ১৯৪২ ও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে) ডুয়ার্স অঞ্চলের কতগুলি চা বাগানে পি সি সরকার তাঁর ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন। সেই সময় স্বল্পকালের জন্য তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিন নানারকম আলাপ আলোচনা করতে করতে তিনি একটি ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন। তিনি একটি রুপোর টাকা ডান হাতে নিয়ে ঠং করে একটা টেবিলের উপর ফেললেন। তারপর টেবিল থেকে ডান হাতে সেই টাকা তুলে নিয়ে বাঁ হাতের মুঠোতে চালান করে দিয়ে উপস্থিত সবাইকে দেখালেন যে টাকা বাঁ হাতের মুঠো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর-পর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখালেন যে টাকা টেবিলের উপরেই পড়ে আছে, তিনি সেটা আদৌ তুলে নেননি। এই খেলাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, টাকা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা, শব্দ করে টেবিলের উপর ফেলা, তারপর কায়দা করে সেটি টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে বাঁ হাতের মুঠোয় চালান করবার ভাণ করার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে এমন একটা অনুষঙ্গ সৃষ্টি হয় যে টাকা টেবিলের উপর পড়ে থাকলেও দর্শক মনে করেন যে টাকা বোধ হয় যাদুকরের বাঁ হাতের মুঠো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সঠিক কথাগুলো যদিও মনে নেই, তাহলেও এই প্রসঙ্গেও তিনি এই ধরণের কথা বলেছিলেন বলে মনে পড়ে যে

কর্ণকের মনকে বিভ্রান্ত করতে পারে তাঁর দৃষ্টিভ্রম ঘটাতে ... বাদ্‌কেরকে মোটেই বেগ পেতে হয় না।

দিলীপকুমার দাস
সাপুর

দৃশ্যপট

২৩শে জানুয়ারির দেশ-এ ... মহাশয়ের কিছু রাজনৈতিক দলের সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্কারা দেবার বিরুদ্ধে লেখাটি পড়ে আনন্দ পেলাম। তবে ... দিক থেকে আমার একটি প্রশ্ন ... এ কথা অনেকেই বলে থাকেন এবং ... তাই বলেছেন যে পশ্চিম বাংলার মুসলমানেরা জোট বেঁধে ভোট দেন; ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তাঁরা সমবেতভাবে কংগ্রেসকেই ভোট দিয়েছেন, কিন্তু ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে তাঁরা কংগ্রেস ... করেছেন। ... জন ভোটা... হয়ে দল ... ১৯৬৭ ও প্রায় ২৫ ... যায় কংগ্রে... মতো শত... তবে মুসল... না আগের ... বিরোধী ... পরেও মো... আমার ... আসাতীত ... অথবা জো... দলগুলি ... বিরোধী জোটকেই সমর্থন ...ম বাংলায় শতকরা প্রায় ২৫ ...সলমান। এঁরা যদি জোটবদ্ধ ...বর্তন করে থাকেন তবে ৬৯ সালে কংগ্রেসের ভোট ...শ কমে যেত। কিন্তু দেখা ভোট বস্তুত কমেনি, আগের ৪০ ভাগই আছে। সত্যই কি ...রা জোটবদ্ধ ভাবে ভোট দেন, ...দের ভোট কংগ্রেস ও কংগ্রেস ... মধ্যে যে ভাবে ভাগ হত, ...ট সেই ভাবেই ভাগ হয়েছে? ... ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের ...ফল্য কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ...র জন্য নয়, কংগ্রেস-বিরোধী ...দ্ধ হয়ে লড়াই করার জন্য।

ইউসুফ আলাম
গঙ্গারামপুর, হাওড়া

॥ ২ ॥

তেইশে জানুয়ারি সংখ্যার 'দৃশ্যপটে' মুসলমান ভোট প্রসঙ্গে নবারুণবাবু উপসংহারে যা লিখেছেন, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। 'হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খৃষ্টান নয়......সব ভোটদাতাকে স্রেফ ভোটদাতা হিসাবেই দেখা উচিত'—এ অতি হক কথা, বলা বাহুল্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য নবারুণবাবু কেবল কয়েকটি দলের নাম উল্লেখ ক'রে কটাক্ষপাত করেছেন; ফলে লেখাটি পক্ষপাতিত্বমূলক হ'য়ে পড়েছে ও মূল বক্তব্য খানিকটা হীনবল হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সি পি এম, সি পি আই, নব কংগ্রেস নয়, উল্লেখযোগ্য প্রতিটি দলই ভোট পাবার আশায় ধর্মীয় সংকীর্ণতার প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছে। জনসংঘের সঙ্গে মিতালি ক'রে আদি কংগ্রেস কি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না? কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সাথে সাথেই কি জনসংঘের মুসলমান-বিদ্বেষী চরিত্র পালটে গেল? সংখ্যাগুরু হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার কত ভয়াবহ ও ক্ষতিকর হতে পারে তা তো নবারুণবাবু নিজেই লিখেছেন। কোন বিশেষ দলের প্রতি দুর্বলতা পরিহার ক'রে নবারুণবাবু যদি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে মন খুলে লিখতেন, তবে তাঁর লেখাটি বোধহয় অনেক বেশী বলিষ্ঠ হ'ত।

মনীশ সেন
কলকাতা-৪

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক

৯ মাঘ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত পুস্তক পরিচয় বিভাগে আপনাদের পুস্তক সমালোচকের মন্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটক যে রাসিনের ইফিজেনি নাটকের অনুবাদ এ তথ্যের আবিষ্কর্তারূপে ঢাকার অধ্যাপক মুনির চৌধুরীর নাম দেখলাম। ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার আমাদের প্রবেশ নিষেধ। আপনাদের অবগতির জন্য লিখি, এই বাংলায় অনুরূপ তথ্যের প্রথম প্রকাশ দেখেছি সংঘর্ষ পত্রিকার ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যায় পুলিন দাস লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহের ওপর আলোচনায়। তৎপূর্বে এই বাংলায় লিখিতভাবে এই তথ্য অপর কেউ জানিয়েছেন বলে জানা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণা আচার্য
শিলিগুড়ি

একটি অভিযোগ

আমি আপনাদের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৭-এর ২৪৪ পৃষ্ঠায় 'কবি ও কবিতা' কাব্য-

আকাদেমি পুরস্কার

এ বছরের আকাদেমি পুরস্কারের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর "আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থটি। এই সব পুরস্কারের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল বিচার থাকে, কখনো প্রকৃত গুণীর সমাদর হলে দুর্লভ আনন্দ হয়। লেখক হিসেবে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর নিষ্ঠা এবং তাঁর এই গ্রন্থখানির মূল্য সম্পর্কে বাংলা দেশে কারুরই দ্বিমত থাকার কথা নয়।

গত বছর, এই বইটিকেই রবীন্দ্র পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। অনেক দিন পর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এরকম একটি মূল্যবান রচনা সংযোজিত হলো। বইটি সম্পর্কে "দেশ"-এর নিয়মিত পাঠকদের নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই অবশ্য। এই বইয়ের অধিকাংশ রচনাই প্রকাশিত হয়েছে "দেশ" পত্রিকায় এবং পুস্তকাকারে প্রকাশের পর আমরা এই বিভাগেও সাধ্যমত সামান্য আলোচনা করেছিলাম।

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর জন্ম ১৯০৬ সালে। শিক্ষায়, জ্ঞানে ও সাহিত্য সাধনায় তিনি বাংলা দেশে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু। ১৩ বছর বয়েসে উর্দুতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়ে বাংলা শিখতে উদ্বুদ্ধ হন। ছাত্র ছিলেন বিজ্ঞানের, পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে পাশ করার পর তিনি এম এ পড়েন দর্শন শাস্ত্রে। দার্শনিক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে, এদিকে তাঁর আন্তরিক ঝোঁক বাংলা কবিতার প্রতি—রবীন্দ্রনাথ থেকে অতি তরুণ কবি পর্যন্ত। ওঁর স্ত্রী গৌরী আইয়ুবও সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

আইয়ুব ইংরেজিতে 'পোয়েট্রি অ্যান্ড ট্রুথ' নামে একটি বই লিখেছেন, বাংলায় এইটি তাঁর প্রথম বই। এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা বিষয়ে একটি গ্রন্থ লেখার কথা ভাবছেন।

অন্যান্য ভাষায় পুরস্কার পেয়েছেন : অসমীয়া — লক্ষ্মীনাথ ফুকন—মহাত্মার পেরা রূপ কোন ওয়ারলৈই (স্মৃতিকথা); ডোগরি — নরেন্দ্র খাজুরিয়া—নীলাম্বর কালে বাদল (ছোট গল্প); গুজরাটি—নগীনদাস পারেখ—অভিনব রস বিচার (সাহিত্য সমালোচনা); হিন্দী—রামবিলাস শর্মা—নিরালা কি সাহিত্য সাধনা (জীবনী); কন্নড়—এস বি যোশী—কর্ণাটক সংস্কৃতিয় পূর্বীকে (সংস্কৃতি বিচার); কাশ্মীরী—মহীউদ্দিন হাজিনী মাকালাত (প্রবন্ধ); মৈথিলী—কাশীকান্ত মিশ্র, মধুপ—রাধা বিরহ (মহাকাব্য)।

নতুন পুরস্কার

বাংলা দেশের একটি বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা, বেঙ্গল পাবলিশার্স একটি নতুন সাহিত্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। ভারতের বাইরে যাঁরা বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখককে প্রতিবছর এক হাজার টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। বাংলা নববর্ষে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থার উদ্যোগে যে সাহিত্য পুরস্কার সভা হয়, এই পুরস্কারটিও দেওয়া হবে সেই সভায়।

ভারতের বাইরের বাংলা ভাষার লেখক বললে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের কথাই মনে পড়ে। ভারতের বাইরে, অথচ আসলে আমাদের বাংলা দেশেই। ব্যাপারটা এখনো ভালো করে উপলব্ধি করা যায় না। যাই হোক, গত কয়েক বছর ধরে পূর্ব বাংলার লেখকরা বাংলা ভাষার মর্যাদার জন্য যে কিরকম লড়াই করে যাচ্ছেন, সে সংবাদ আর কারুরই অবিদিত নেই। কবিতা ও কথা সাহিত্যে ওখানকার লেখকরা নতুন স্বর এনেছেন। এবং বাংলা সাহিত্যের নানা শাখার গবেষণামূলক কাজেও ওঁরা সম্প্রতি আমাদের থেকে এগিয়েই যাচ্ছেন ক্রমশ। রাজনৈতিক বাধা তুচ্ছ করে, এই পুরস্কার ওখানকার লেখকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপনের আর একটি সেতু হবে, এই আশা রাখি।

পত্র পত্রিকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে হারাবার শোকচ্ছায়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এখনো চোখে পড়ে। অনেক পত্রিকাতেই তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা আছে, এর মধ্যে দুটি পত্রিকা সম্পূর্ণভাবেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এবং পত্রিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহকর্মী, সহযাত্রী লেখক, বন্ধু ও ছাত্ররা তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিকথা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন, হরপ্রসাদ মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ঊষা ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, নির্মলেন্দু গৌতম, শান্তনু দাস, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিয় সিংহ।

শিশু সাহিত্যেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সমান সিদ্ধহস্ত এবং ছোটদের মনের মতন লেখক। ছোটদের পত্রিকা রোশনাই-এর নতুন সংখ্যাটি সম্পূর্ণভাবে ওঁর স্মৃতি-সংখ্যা হিসেবে বেরিয়েছে। এতে লিখেছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, চণ্ডী লাহিড়ী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, সন্তোষকুমার দে, শৈল চক্রবর্তী, মনোজিৎ বসু, আনন্দ বাগচী, কিশলয় ঠাকুর, আব্দুল জব্বার, ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দে, সরল দে প্রমুখ। সম্পাদনা পীযূষ দাস।

সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" একটি নিয়মিত, নিষ্ঠাবান প্রবন্ধ পত্রিকা। মননশীল প্রবন্ধ, ছাপা ভালো, বেশ কয়েকটি ভালো লেখাও চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা সীরিয়াসলি মাথা ঘামাতে চান, তাঁদের পক্ষে একটি বিশেষ আশ্রয় এই পত্রিকা। নতুন সংখ্যা থেকে দেখলাম, এদেশী সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে দুটি নতুন বিভাগ শুরু হয়েছে। দেখে খুবই আনন্দ হলো, এবার বোধহয় কিছুটা লঘু ও বাঁকা লেখাও আমদানি ঘটবে। এ সংখ্যায় লিখেছেন, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দুনাথ ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, সুশীল রায়, কমলাক্ষ সরস্বতী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অরুণা সেন, মনোজিৎ বসু।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে চায় বিদেশেও "আধুনিক বাংলা কবিতা" বেরুচ্ছে কাটক মিরর থেকে। সম্পাদক সুকুমার দাস ও অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি আকারে ছোট, কিন্তু সম্পাদকদ্বয়ের আন্তরিকতা উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সংখ্যায় আছে ঋত্বিক ঘটকের টেপ রেকর্ড করা কবিতা, কল্যাণী সেনের একগুচ্ছ কবিতা এবং বিমলচন্দ্র সেনের কাছ থেকে পাওয়া সাহিত্য সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর। এছাড়া লিখেছেন শান্তিকুমার ঘোষ, বিবেকানন্দ, পূর্ণেন্দু, ফণিভূষণ আচার্য, রমেশ্বর হাজরা, সুব্রত রুদ্র প্রভৃতি।

সুভাষ সরকারের সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'এ মাসের কবিতা'। রঙীন কাগজে চার পৃষ্ঠা, এঁদের শ্লোগান "ননসেন্স গদ্যের বদলে কবিতা চাই"। লিখেছেন ধূর্জটি চন্দ, শান্তিকুমার ঘোষ, বঙ্কিম মাহাতো, শান্তনু গুহ, বিষ্ণু সামন্ত, সুভাষ সরকার, প্রদীপচন্দ্র বসু, তরুণ রায়, পরিতোষ বসু, প্রণব বসু, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, অসীম মাহাতো, সুব্রত ব্যানার্জি ও দেবযানী সরকার প্রভৃতি তরুণ বয়স্ক তেজী কবিবৃন্দ।

সনাতন পাঠক

হত্যাকার শূন্যতার মধ্যে। পরিবেশ ও চরিত্রগুলি যে-রকম সেইভাবেই তাদের উপস্থাপিত করে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন নাট্যকার। বাকি থাকে সংলাপ ও পাত্র-পাত্রীদের নড়াচড়ার বিবরণ, আস্তে আস্তে এবং ক্রমশ পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ছে তারা।

'দি স্লীপার্স ডেন'-এর মুখ্য চরিত্র মিসেস স্যানন, পরিবারের কর্ত্রী। প্রায় মধ্যবয়স্ক মহিলা—রোজগার নেই, পাওনাদার তাগাদা দিয়ে যায়, এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে চার্চের একটি মেয়ে দয়াপরবশ হয়ে পুরনো জামাকাপড় দিয়ে গেল তাদের, মাঝে মাঝে চা ও জল ছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির আর কোনো উপকরণ নেই। মিসেস স্যানন একা নয়, তার অনাবৃত্তির পোষ্য দুটি—মা এবং মেয়ে। একটি ভাইও আছে, কারখানায় কাজ করে সে কিছু উপার্জন করে, কিন্তু মিসেস স্যাননের প্রতি নির্লিপ্ত। সারাদিন করার কিছু নেই। তিন বয়সের তিন স্ত্রীলোকের মধ্যে সারাদিন চলে দিনযাপনের পৌনঃপুনিক ও ক্লান্তিকর প্রতিযোগিতা। মঞ্চে আসবাবের মধ্যে দৃশ্যগোচর একটি শয্যা—সেখানে তিনজনের কেউ না কেউ শুয়ে আছে সারাক্ষণ, বেশি সময় বুড়ী মা, কখনো দুজন এবং মাঝে মাঝে সকলেই। শুয়ে থাকে, ঘুমোনোর ভান করে। সংসার সামলাতে, মা ও মেয়ের এবং ভাইয়ের ধকল সামলাতে হিমশিম খায় মিসেস স্যানন। দুরূহ ক্লান্তি তার চোখে মুখে। তার কোন উদ্ধার নেই, উদ্ধারের স্বপ্নও নেই। কে তাকে আশ্রয় দেবে। ধর্ম? বছর খানেকের মধ্যে তারা কোনো যাজকের মুখ দেখেনি।

নিম্নবিত্তের ক্লিষ্ট, অসহায় চেহারাই শুধু নয়, এই নাটকে গিল একটি সূক্ষ্ম ঠাট্টাও ছুঁড়ে দিয়েছেন মনে হয়—ধর্মের প্রতি, যাবতীয় ব্যবস্থার প্রতি, মানুষের মুক্তির নানা দর্শনের প্রতি। মিসেস স্যানন একাই একটা গোটা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে, এইভাবে ভেবে নিলে অন্য সব চরিত্রই কমবেশি প্রতীকের ধারণা নিয়ে আসে। নাটকের শেষ দৃশ্যে বাইরের দরজায় সিন্দুকে ঠেকা দিয়ে জোয়ান বা মিসেস স্যানন যখন বুদ্ধিহীন অবসাদে ডুবে যাচ্ছে, সেই সময় ফ্রান্সিসের গলা শোনা গেল: 'ইউ নো হোয়াট ইওর ট্রাবল ইজ, ডোন্ট ইউ জোয়ান? ইউ ডোন্ট ট্রাই এনাফ।' মিসেস স্যানন নিরুত্তর। পরে, নিজের হাতে ঠেলা সিন্দুকটা সে সরাতে যায়, শক্তিতে কুলোয় না। তখন তার স্বগতোক্তি: 'আই'ম গোইং টু ডাই অফ্ নিস্।' বিছানায় তখনো পড়ে আছে তার অথর্ব আচ্ছন্ন মা। মিসেস স্যানন হঠাৎ ছুরিকাঘাত করতে যায় তাকে, পারে না। তারপর কায়ক্লেশে মাকে টেনে নিয়ে যায় রান্নাঘর দিয়ে বাইরে। ফিরে এসে ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। চাদর-টাদর যা ছিল টেনে ফেলে দেয় বিছানা থেকে—বিশাল প্রতীকের মতো ন্যাড়া খাটটা পড়ে থাকে একা। শেষ দৃশ্যে মৃত্যু দেখানো হয়নি। দেখানোর প্রয়োজন ছিল কি?

বিষয় হিসেবে হয়তো 'দি স্লীপার্স ডেন' নাড়া দেবে বেশি। কিন্তু, আমার মনে হয়, নাটক হিসেবে 'ওভার গার্ডেনস্ আউট' আরো উন্নত—বিষয় ও ভঙ্গীর এক চমৎকার ব্যতিক্রম। দুটি কিশোরের পারস্পরিক সম্পর্ক খুলে ধরার মধ্যে দিয়ে, তাদের সংলাপ ও ছন্নছাড়া আচরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে নাটামুহূর্ত। ডেনিস ও জেক্সের সম্ভাবনা ছিল, এখন নেই—পারিপার্শ্বিকের উপর এরা নানাভাবে প্রতিশোধ নিতে যায় এবং ব্যর্থ হয়। জেক্সে নাক্কারজনকভাবে দেয়ালে পেচ্ছাপ করে, ডেনিস চায় গোটা শহরটাকে আগুনে পোড়াতে। ডেনিস তার নিস্পৃহ বাপ-মাকে নানাভাবে নাস্তানাবুদ করে, নিজের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে তার সন্দেহ ঘোরতর; জেক্সের আছে তার গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে অশ্লীলতার যৌন সম্পর্ক। ইতিহাস ও রাজনীতির আবর্তে পৃথিবী বদলাতে থাকে নির্দয়। এরা কিছু হতে পারে হয়তো—অসার্থক পরিবেশ ও পটভূমি নষ্ট করে দিচ্ছে এদের উন্মেষের সম্ভাবনা এবং বাঁচুক।

মসৃণিয়ে হল, এই নাটকে [illegible] কোন টান কাহিনী নেই। [illegible] দিক [illegible] নিয়েছেন [illegible] ও প্রতীকধর্মী সংলাপে, ইঙ্গিতে ও [illegible], [illegible] নাটকের [illegible] বরং এর [illegible] [illegible] মনে হতে পারে, ডেনিস ও জেক্সের [illegible] পারছে [illegible] [illegible] পুনর ও [illegible]। এদের আর [illegible] হচ্ছে না।

দিব্যেন্দু পালিত

কবিতা

সংবাদ মূলত কাব্য। বিষ্ণু দে। সাহিত্যপত্র গ্রন্থ, ৯ কাশী ঘোষ লেন, কলকাতা-৬। চার টাকা।

পূর্ব-পশ্চিম। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। তিন টাকা।

বয়সে ও ভাবনায় সমান পরিণত কবি শ্রীবিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক এই কাব্যগ্রন্থে প্রায় তিন দশকের কবিতা স্থান পেয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর কবিতা কীভাবে বাঁক নিয়েছে, তার খোঁজ কাব্য পাঠক মাত্রেই জানেন। এই গ্রন্থে, যত দূর মনে হয়, অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি গত দুই দশকের এমন কিছু রচনা ও সাম্প্রতিক বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে; এবং এই নির্বাচনে মুখ্যত কবিতার মেজাজের মিলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

'সংবাদ মূলত কাব্যে' সমকালীন স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা একটি অন্যতম অংশ অধিকার করেছে :

> এ কী গান ভাসে দুর্মর এক ঝলকে।
> পথঘাট ফাঁকা, সন্ধ্যায় রাত নিশুতি,
> ট্রাম বাস নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেই
> যেন বা ধরেছে শহরের গোটা লাশটা।
> রূপকথা বুঝি এইভাবে ইতিহাসটাই
> পাল্টিয়ে দেয় অদৃশ্য কয় পলকে।'

৬৫-৬৬ সালে রচিত এই কবিতায় কলকাতার তৎকালীন ছবিটি সুস্পষ্ট। কিংবা ৬২ সনের ভারত-চীন দ্বন্দ্বের সময়ে কবির অভিজ্ঞতা :

> 'বস্তুত এ আশাভঙ্গ অপমান, বন্ধুর বঞ্চনা
> মৃত্যুর ক্ষতির চেয়ে মর্মান্তিক, কেননা জহ্লাদ
> গুপ্ত অপহন্তা নয়, তার হাতে প্রকাশ্য যন্ত্রণা।
> অবশ্য নূতন নয়, দেখেছি তো মণ্ডুকেরও কূপে

> ছদ্মবেশী আসে, জল্প তোলে, দূরদেশে নিয়ে যায়;
> বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে,
> যায় ছিন্নভিন্ন করে। তবু কোন্ রূপে তিক্ততায়
> এবার যন্ত্রণা পাওয়া! অন্ধকার মনের আকাশ,
> সত্যাসত্য একাকার।'

তির্যক যে-কণ্ঠস্বর বিষ্ণু দে-র কবিতার একটি বহুশ্রুত ব্যক্তিত্ব সংবাদ মূলত কাব্যের বহু কবিতায় তার নির্ভুল পরিচয়:

> "আহা, ক্ষমা দাও হে তরুণ! করো ক্ষমা।
> উন্নয়নের প্রথম আনাড়ি চাপে
> সভ্যতা জেনো স্বতই দ্বিধায় কাঁপে।
> কেটে যাবে এই নূতন নেশার অমা,
> রাত্রি সহজ হবে দিন হবে স্বাধীন।
> অবশ্য তুমি তখন হয়তো স্বর্গে,
> তোমার দয়িতা যেতেও পারেন মর্গে।
> মননে মরেছে সকল অর্বাচীন।"

গিরনারের সংরক্ষিত জঙ্গলে গিয়ে পথসঙ্গী কর্মচারীর কথাতেও এর আভাস:

> "সরকারী সংকল্পে ভারতের
> জাতীয় জন্তুরা মন্দ নেই, অবশ্য ত্রুটিও ঢের।
> বললেন গম্ভীর মুখে, জাতীয় এ রক্ষণাবেক্ষণে
> মানুষকে রাখলে কি মন্দ:
> গোটা দেশের মানুষ?
> শহরে জঙ্গলে বনে গ্রামে গ্রামে
> দগ্ধ শুষ্ক দেশে?"

আঙ্গিকগত পরীক্ষাতেও বিষ্ণু দে অক্লান্ত। 'সাবেক মেঘের গান' কবিতার মিলের পরীক্ষা, 'বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ' কবিতায় স্বরবৃত্ত ছন্দের সপ্রতিভ ব্যবহার, কিছু শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা (লোজ্‌কে মেঘলা বাড়ি) উৎসুক পাঠকের চোখ এড়াবে না।

অচিন্ত্যকুমার 'পূর্ব-পশ্চিম' গ্রন্থের নাম কবিতায় দুই বাংলার হৃৎস্পন্দনটিকে সুন্দর বাঙ্ময় করেছেন:

> "তোমার চোখের আকাশের রোদ আমার
> চোখের উঠোনে এসে পড়ে
> আমার ভাবনার বাতাস তোমার
> ভাবনার বাগানে ফুল ফোটায়।
> *
> তুমি আমার ভাষা বলো আমি আনন্দকে দেখি
> আমি তোমার ভাষা বলি তুমি আনন্দকে দেখ"

এই ভাষায় আমাদের আনন্দে আশ্চর্যে সাক্ষাৎকার।

অচিন্ত্যকুমার মুখ্যত কথাকার বলেই হয়তো তাঁর কবিতায় গল্প-ভাবনা প্রায়শই কাব্যরূপ পায়। ভাষায় তাঁর দখল অসামান্য, তিনি জানেন কী করে গল্পের শিকল ছিঁড়ে কবিতার পাখিটিকে আকাশে

উড়িয়ে দিতে হয়। কবিতায় যাঁরা প্রাঞ্জলতা পান না বলে নিরুৎসাহী, অচিন্ত্যকুমারের কবিতা তাঁদের আক্ষেপ দূর করবে। সহজ ভঙ্গিতে অথচ নিপুণ দক্ষতায় অচিন্ত্যকুমার এ গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই লিখেছেন। হয়তো তিনি আধুনিক নন ততটা, তাতে ক্ষতি কী। তিনি তো জানেন :

"জীবনের মুহূর্তগুলি তেমনই অক্ষর......
প্রতিটি মুহূর্তে তাই লেখা আছে কোনো
প্রতিশ্রুতি
কোনো উপন্যাসের প্রস্তুতি।"

২৯০।৬৯, ৩১।৭০

অনুবাদ

ব্যাঙের কেত্তন (বাত্রাখোয় : ফ্রগস্) : আরিস্তোফানেস : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত : সাহিত্য অ্যাকাদেমী, নিউ দিল্লি, মূল্য ৫·০০।
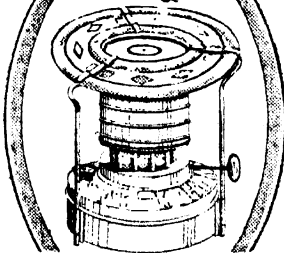
সম্প্রতি গ্রীক নাটকের কিছু অনুবাদ হয়েছে বাঙলায়, বাঙলাদেশে গ্রীক নাটকের অভিনয়ও হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত আরিস্তোফানেসের এই ক্লাসিক নাটকটির অনুবাদ গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী মনের সংযোগ ইতিহাসের একটি উল্লেখ্য ঘটনা বললে অন্যায় হবে না। আরিস্তোফানেসের কমেডিগুলি কেবল লঘু রসিকতার আধারই নয়। সেকালের সমাজ, সাহিত্য ও রাষ্ট্রনীতির ত্রুটি বিচ্যুতির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও এসব কমেডির লক্ষ্যস্থল। সেদিক থেকে তাঁর কমেডিগুলি কমেডি স্যাটায়রের সংমিশ্রিত শিল্পরূপ। বিষয়বস্তু গুরুপাচ্য হলেও বিন্যাস ও পরিবেশনের গুণে এগুলি লঘুপাচ্যও বটে। ফ্রগস আরিস্তোফানেস-এর সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক। এস্কিলাস ও এউরীপিডেস—এই দুই ট্রাজেডি রচয়িতার তুলনামূলক আলোচনাকে কেন্দ্র করে এই ব্যঙ্গ নাটকের সৃষ্টি। এই আলোচনাসূত্রে এমন সব নাটকের উল্লেখ আছে যা বহু যুগ আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের পাঠকের কাছে সেসব নাটক অজ্ঞাত। অনেক নাট্যকারের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত। অনুবাদক শ্রীদত্ত পাদটীকায় সেই সব নাটক ও নাট্যকারের পরিচয়ভাগ যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা কারের পরিচয়াভাস যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা আলোচ্য বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করার চেষ্টাও করেছেন অনুবাদক। অথচ সব মিলিয়ে অকারণ পাণ্ডিত্যের ভাব চাপানোর চেষ্টা নেই।

ভূমিকায় অনুবাদক স্পষ্টত স্বীকার করেছেন যে, এই নাটকটি ইংরেজি ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। অতএব এটি অনুবাদের অনুবাদ। এভরিম্যান লাইব্রেরী সংস্করণ, নোয়েবল ক্লাসিকস এবং গিলবার্ট মারে কৃত অনুবাদ এই তিন ধরনের অনুবাদের সাহায্য নিয়ে অনুবাদক নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজে নেমেছেন। গ্রীক নামের উচ্চারণে ও বানানে রূপান্তরণের কাজে সুনীতিবাবুর প্রামাণিক পরামর্শও পাওয়া গেছে।

মূল গ্রীক নাটকের সঙ্গে মেলালে অনুবাদে কিছু কিছু পার্থক্য ধরা পড়তেই পারে। তবুও মনে হয়, অনুবাদের অনিবার্য বাধা মেনে নিয়েও অনুবাদক অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন বাঙলায় নাটকটির ভাষান্তর করেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, মূল নাটকের রসোজ্জ্বলতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র খোঁচাগুলি বাঙলা ভাষার চলতি প্রয়োগের কৌশলে অপূর্ব জীবন্ত হয়েছে। একটি সংলাপ এবং একটি কোরাস থেকে তুলে দিচ্ছি :

সংলাপ : আর বলেন কেন। ঐ তো গত বছরের উৎসবে একটা লোক দৌড়োচ্ছিল, তাকে দেখে আমি হেসে বাঁচিনে। ইয়া মোটা ধুমসো চেহারা দৌড়োবে কি ও—হাঁপাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে তারা চেঁচাচ্ছে, হাততালি দিচ্ছে, ঘাড়ে পিঠে মাজায় পাছায় চাপড় মারছে। লোকটা আরোই ঘাবড়ে গিয়ে এমন জোরে হাঁপাতে লাগলো যে তার মশাল নিবে যাবার উপক্রম।

কোরাস : সেই মানুষ ধন্য যিনি সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং সুস্থ সংযত রুচির অধিকারী, আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত এই দৃশ্যই তার স্পষ্ট প্রমাণ। মহাজ্ঞানী মহাকবি লাভ করেছেন তাঁর যোগ্য পুরস্কার; অনুমতি পেয়েছেন স্বদেশে স্বজাতির কাছে ফিরে যাবার। একথা সুনিশ্চিত যে সোক্রাতেস্-এর সঙ্গে বসে বসে নিরর্থক পাণ্ডিত্য আলোচনা, চুলচেরা তর্ক, কথার মারপ্যাঁচ, ন্যায়ের কচকচি বৃথা কালক্ষেপণ মাত্র। রসচর্চা শিল্পচর্চা ছেড়ে তত্ত্ব নিয়ে মেতে থাকা। কবিশিল্পীর পক্ষে মূঢ়তা আর বাতুলতা।

সংলাপে মৌখিক কলোকিয়াল ভঙ্গির আন্তরিক টান যেমন স্বতঃস্ফূর্ত কোরাসে তীক্ষ্ণ সমালোচনার ভঙ্গি ও নির্দেশের গুরুত্ব তেমনি মানানসহ এবং অনায়াস। এই দুধরনের ভাষা প্রয়োগের কৌশলে অনুবাদক শ্রী দত্ত সমগ্র নাটকের রসোচ্ছলতা, ব্যঙ্গের কশাঘাত ও সমালোচনার প্রসন্ন সংযমকে মূলের প্রতি আনুগত্য রেখেই যথাসম্ভব সহজ ক্ষিপ্রতায় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে উৎসাহী পাঠকের প্রশংসা পাবেন।

নাটকটির ভূমিকার পূর্বকথা-রূপে কে ডি এফ কিটোর গ্রীক নাটক-সম্পর্কিত একটি রচনার অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। রচনাটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাজে লাগবে।

৯১।৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

ইতিহাস চক্র। রামমনোহর লোহিয়া। রামমনোহর লোহিয়া সাহিত্য প্রকাশন ট্রাস্ট : ১৮ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ৪·০০।

অশ্রু শিলালেখ। সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সদন : ৬৫এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০·০০।

লেনিন চিরকালীন : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য। শোভনা প্রেস পাবলিকেশনস : ১৬ সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনু, কলিকাতা-১৭। মূল্য ২·০০।

প্রতি বছর ফুটবল মরসুমের পর প্রায় ৪ মাস ধরে কলকাতা ময়দান কিছুটা ঝিমিয়ে থাকে নিত্যদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানের অভাবে। ক্রিকেট সাধারণত সপ্তাহ শেষের অনুষ্ঠান। তাছাড়া ক্লাব ক্রিকেটে সাধারণের আগ্রহও কম। হকি খেলা শুরু থেকেই ময়দান পাড়া ক্রীড়া চাঞ্চল্যে সরগরম হয়ে ওঠে। সেই হকি আরম্ভ হয়েছে।

যদিও মাত্র ৩ মাসের মরসুম তবু ফুটবলের পর হকিই আমাদের জনপ্রিয় খেলা। এবারকার হকি কেমন জমবে? বলা শক্ত। তবে কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় যাঁরা

এস মান্না

এর আগে কলকাতায় খেলেননি তাঁদের খেলতে দেখা যাবে। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন এবার সিদ্ধান্ত করেছেন লীগের মাঝে কলকাতার কোন ক্লাবকে বাইরের প্রতিযোগিতায় খেলার অনুমতি দেবেন না। খুবই ভাল সিদ্ধান্ত। কেননা নামকরা দলগুলি লীগের মাঝে বাইরে খেলতে যায় বলে তাদের দলের খেলা বন্ধ রাখতে হয়। ফলে লীগের আকর্ষণও সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হকি মরসুম শেষ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীয় সম্মান

শিক্ষায় দীক্ষায় বীরপনায়, সমাজ সেবা ও শিল্পকলায় এবং সংগীত ও সাহিত্যে যে সব জ্ঞানীগুণীর উল্লেখযোগ্য অবদান প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সম্মান বিলোবার সময় ভারত সরকার যে খেলাধুলার কথা ভুলে যান না এটা সুখের বিষয়। এ বছরও পাঁচজন ক্রীড়াবিদকে 'পদ্মশ্রী' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। খেতাব প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের মধ্যে কমলজিৎ সাধু এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় জি আর বিশ্বনাথ। এদের মধ্যে ফুটবল খেলোয়াড় এস মান্না বহুদিন আগে তাঁর ফুটবল জীবন পেছনে ফেলে এসেছেন। হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ও শেষ হয়ে গিয়েছে ১০ বছর আগে। অ্যাথলীট কমলজিৎ সাধু এবং ক্রিকেটার বিশ্বনাথের অপরিণত ক্রীড়াজীবন। মান্না এবং ক্লডিয়াস অনেক আগে খেতাব পেলেই বোধ হয় শোভন হত। কমলজিৎ ও বিশ্বনাথের পদ্মশ্রী খেতাব মানাত আরও কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর।
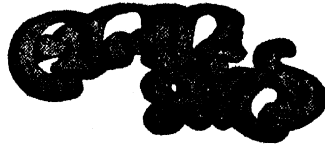
কারো নৈপুণ্যেই আমি খাটো করতে চাই না। কিন্তু বলতে বাধা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্মান দানের ক্ষেত্রে একটা রীতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক্রীড়া জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সম্মান প্রাপ্তিতে সাধারণের যেমন পূর্ণ তৃপ্তি হয় তেমন হয় প্রাপকের যোগ্য সমাদর। আবার সম্মানেরও মর্যাদা বাড়ে। অসময়ে অযাচিতভাবে সম্মান এলে স্বাভাবিক কারণে সম্মান বিলি বাটোয়ারায় বিস্ময় জাগে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ভারত সরকার এমন ক্রীড়াবিদকে সম্মান দিয়েছেন বহুকাল আগে যাঁর ক্রীড়াজীবনের উপর ছেদ পড়েছে বা যাঁর কথা লোকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। আবার এমন খেলোয়াড়কেও খেতাব দেওয়া হয়েছে একটি খেলা বা একটি অনুষ্ঠানেই যাঁর কীর্তি সীমাবদ্ধ বা খেলোয়াড় হিসাবে যাঁর জীবন অপরিণত। অপরিণত জীবনে অসাধারণ কোনো নৈপুণ্য প্রদর্শন করলে অবশ্যই উৎসাহ দেওয়া উচিত। তার জন্য পৃথক পুরস্কারের ব্যবস্থাও আছে। যেমন অর্জুন পুরস্কার। কিন্তু খেলোয়াড়ের উঠতি জীবনে 'অর্জুনের' বদলে 'পদ্মশ্রী' রাষ্ট্রীয় সম্মান দান সম্ভবত সুবিবেচনার পরিচয় নয়।

এ বছরের কথাই ধরা যাক। এবার 'পদ্মশ্রী' খেতাব পেয়েছেন ফুটবল খেলোয়াড় শৈলেন মান্না হকি খেলোয়াড় ক্লডিয়াস, মল্লবীর চাঁদগী রাম, মহিলা অ্যাথলীট

জি আর বিশ্বনাথ

লেসলি ক্লডিয়াস

যাই হক খেতাব প্রাপ্ত পাঁচজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

এস মান্না—এস মান্না ফুটবলের এক গাল ভরা নাম। বহু স্মরণীয় ফুটবল যুদ্ধের বিজয়ী বীর। প্রথম এশিয়ান গেমসে বিজয়ী ভারতের অধিনায়ক এবং অলিম্পিকে ভারতের দ্বিতীয় ফুটবল অধিনায়ক। ১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিকে নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৬ সালে রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলের নেতৃত্বের দায়িত্বও পড়ে মান্নার উপরে। তাছাড়া দেশে বিদেশে বহু খেলায় তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ ক্রীড়া ধারা ছিল আলোচনার বিষয়। অতীত দিনের দিকপাল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভের পর মান্নাই দ্বিতীয় ফুটবলার যিনি পদ্মশ্রী খেতাব পেলেন। এ ব্যাপারে গোষ্ঠ পালের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য অনেকখানি। গোষ্ঠ পালও ছিলেন ব্যাকের খেলোয়াড় এবং মোহনবাগানের খেলোয়াড়। মান্নাও তাই। খেলা ছেড়ে দিলেও ফুটবলের সঙ্গে মান্না এখনো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগামী

দিনের খেলোয়াড়দের তৈরী করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড থেকে ফুটবলের কোচিংও নিয়ে এসেছেন।

লেসলি ক্লডিয়াস—লণ্ডন, হেলসিঙ্কি, মেলবোর্ন এবং রোম—পর পর চারটি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন হকির দুচেতা সাইড হাফ লেসলি ক্লডিয়াস। রোমে ছিলেন ভারতের দল নেতা। সুতরাং ক্লডিয়াসের অধিকারে অলিম্পিকের ৩টি স্বর্ণ এবং ১টি রৌপ্য পদক। রোম অলিম্পিকের হকি ফাইনালে ভারতের পরাজয়ের দুর্ভাগ্যের সঙ্গেই সম্ভবত ক্লডিয়াসের সম্মান প্রাপ্তির ভাগ্য জড়িত হয়েছিল। তাই এতদিন তাঁর খেতাব প্রাপ্তির দাবী উপেক্ষিত হয়েছে। বর্ষীয়ান খেলোয়াড় ক্লডিয়াস এখনো হাতের হকি স্টিকস ছাড়েননি এটা আশ্চর্যের কথা। এখনো কাস্টমস দলে খেলে যাচ্ছেন এবং বহু তরুণের চেয়েও উদ্যম নিয়ে খেলছেন।

চাঁদগী রাম—মল্লযোদ্ধা চাঁদগী রামকে বর্তমানে নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্ল বলে অভিহিত করা যায়। এডমণ্ডের বিশ্ব কুস্তি আসরে, কমনওয়েলথ গেমসে এবং ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ১০০ কেজি ওয়েটে চাঁদগী রাম শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

জি আর বিশ্বনাথ—মহীশূরের ২১ বছর বছর বয়সী খেলোয়াড় জি আর বিশ্বনাথ বিশ্ব ক্রিকেটের সেই কয়েকজন ভাগ্যবানের অন্যতম যারা টেস্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছেন। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের বিগত ভারত সফরে বিশ্বনাথ টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েই ১৩৭ রান করেন তাছাড়া আর দুটি ইনিংসে করেন ৫০-এর উপর রান। পেলব কব্জির মারে তাঁর খেলা দর্শক চোখের তৃপ্তির খোরাক।

কমলজিৎ সাধু—ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসের ৪০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদকের অধিকারিণী কমলজিৎ সাধুই ভারতের প্রথম মেয়ে অ্যাথলীট যিনি বিদেশ থেকে সোনা নিয়ে ফিরেছেন। যদিও তাইওয়ানের বিস্ময় বালিকা চি চেঙ্গ-এর পায়ের মাংস পেশীতে টান ধরার জন্যই কমলজিতের স্বর্ণ প্রাপ্তি তবু কমলজিতের আগে ভারতের কোনও মেয়ে বিদেশ থেকে সোনা আনতে পারেন নি। চণ্ডীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রী দীর্ঘদেহী কমলজিতের সত্যিই অ্যাথলীটের অবয়ব। অ্যাথলেটিকসে আগ্রহও অসাধারণ। সম্প্রতি আমেদাবাদে আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকসেও কমলজিৎ সাধু ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন জাতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছেন।

কমলজিৎ সাধু

ভারতীয় ক্রীড়া-পুস্তকের বিদেশী সংস্করণ

স্বনামধন্য হকি আম্পায়ার হিসাবে তো বটেই, হকির পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবেও জ্ঞান সিং-এর নাম ভারতে সুবিদিত। হকি খেলা সম্পর্কে ইংরাজীতে প্রকাশিত জ্ঞান সিং-এর বই 'হাউ টু প্লে গ্রাস হকি' একখানি মূল্যবান সংস্করণ। ইংরাজী থেকে রাশিয়ান ভাষায় সম্প্রতি এই বইখানি অনূদিত হয়েছে। উদ্দেশ্য সোভিয়েট রাশিয়ায় হকি খেলাকে আরও জনপ্রিয় করা এবং উৎসাহী খেলোয়াড়দের খুঁটিনাটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা। এক হাজার দুই হাজার কপি নয়, রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত সংস্করণ এক সঙ্গে ছাপা হয়েছে ২০ হাজার। হকি খেলা সম্পর্কে রাশিয়ায় কোন বিদেশী বই অনুবাদ করার এটিই প্রথম ঘটনা।

অনুবাদক এ লিকিন রাশিয়ার ব্যাণ্ডি ও গ্রাস হকি ফেডারেশনের প্রেসিডিয়ামের সদস্য এবং নামকরা হকি আম্পায়ার। ব্যাণ্ডি হচ্ছে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ও রাশিয়ান আইস হকির নাম। বলা বাহুল্য আইস হকি (বরফের উপর হকি খেলা) রাশিয়ায় বহুকাল থেকে জনপ্রিয়। যাই হোক বইয়ের মুখবন্ধে এ লিখিন বলেছেন, 'টেকনিক ও ট্যাকটিস' অর্থাৎ খেলার প্রথা প্রকরণ সম্পর্কে এই বইয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হলেও প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়ে বইখানি খুবই উপযোগী। বিশেষ করে, বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন পজিশনের খেলা এবং আম্পায়ারিং সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।'

যদিও গ্রাস হকি এবং আইস হকির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে—যেমন প্রথা-প্রকরণের, চিন্তাধারা ঘাসের উপর এবং বরফের রিঙ্কের উপর খেলোয়াড়দের পজিশন, ট্যাকলিং, ডজিং ড্রিবলিং ইত্যাদি তবু গ্রাস হকি রাশিয়ায় বেশীদিন আরম্ভ হয়নি। ত্রিশ দশক থেকে একটু আধটু খেলা চললেও মস্কোতে অল ইউনিয়ন গ্রাস হকি প্রতি-যোগিতার শুরু ১৯৫৫ সাল থেকে। তাও অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮টি। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে রাশিয়ান ফুটবল দলের হকি মাঠে লড়াই যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করে। ভারতের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই হকি খেলায় পটু ছিলেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হকি খেলোয়াড়ও। প্রদর্শনী হিসাবে আয়োজিত খেলাটি ড্র হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল : রাশিয়া অচিরেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হকি খেলায় সুনাম অর্জন করবে। সেই থেকে রাশিয়ার হকি খেলার কদর বাড়লেও গ্রাস হকিতে ওদেশে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ শুরু হয়েছে মাত্র ১৯৬৯ সাল থেকে। তার আগে থেকে ক্রীড়া উপকরণ তৈরীর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হকি খেলার বল ও স্টিকস তৈরী করতে শুরু করেছে। ট্রেনিং স্কুলে হকি খেলা শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তবু কিন্তু আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রথম ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সুবিধা করতে পারেনি। তাই হকি খেলাকে আরও জনপ্রিয় করবার জন্য রাশিয়ায় সর্বতোমুখী চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। জ্ঞান সিং-এর 'হাউ টু প্লে গ্রাস হকি' বইয়ের ২০ হাজার কপি অনূদিত সংস্করণ ছাপা সেই প্রচেষ্টার এক অঙ্গ। তাছাড়া রাশিয়ার পিপলস গেম অর্থাৎ জনক্রীড়ায় হকি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রতি ক্লাব জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে জুনিয়র দল গড়েছে এবং জুনিয়র জাতীয় প্রতিযোগিতারও আয়োজন হয়েছে এই বছর থেকে। খেলাধুলোর ছেলে-মেয়েদের পটু করবার জন্য ওদের কতখানি আগ্রহ এইসব ঘটনা থেকে তারই পরিচয় মেলে।

একলব্য

টেবল টেনিসের আইন কানুন

টেবল টেনিস খেলার আইনকানুনের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যেসব সংজ্ঞা এবং শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'সংজ্ঞা ও ভাষ্য শীর্ষক' ১৭ নম্বর আইনে সেগুলি আরও পরিষ্কার করার চেষ্টা হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল আইনের এইটিই শেষ ধারা। প্রতিযোগিতা পরিচালনার নিয়মকানুন এবং আম্পায়ার, রেফারি বা স্ট্রোক কাউণ্টারের করণীয় এবং দায়দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিষয়গুলিও অবশ্য আইনের অঙ্গ। এগুলি পরে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখন ১৭ নম্বর আইনটি উদ্ধৃত করা যাক।

আইন ১৭ : সংজ্ঞা ও ভাষ্য

(এ) বল খেলার মধ্যে চালু থাকাকালীন সময়কে বলা হবে "র‍্যালি"। অর্থাৎ বল যতক্ষণ ইন প্লে থাকবে ততক্ষণই "র‍্যালি" বলে পরিগণিত হবে। সে র‍্যালি থেকে কোনো স্কোর হবে না, তাকে বলা হবে "লেট"। এবং যে র‍্যালি থেকে স্কোর হবে তাকে বলা হবে "পয়েণ্ট"।

(বি) প্রথম যে খেলোয়াড়ের স্ট্রাইক দিয়ে র‍্যালি আরম্ভ হবে তাকে বলা হবে "সার্ভার"। এবং যে খেলোয়াড় পরে স্ট্রাইক করবে তাকে বলা হবে "রিসিভার"।

(সি) "র‍্যাকেট হ্যাণ্ড" হচ্ছে সেই হাত যে হাতে র‍্যাকেট ধরা থাকবে এবং "ফ্রি হ্যাণ্ড" হচ্ছে সেই হাত যে হাতে র‍্যাকেট থাকবে না।

(ডি) "স্ট্রোক" কথার অর্থ হাতে ধরা র‍্যাকেট দিয়ে বলে আঘাত করা বা বল মারা। অথবা র‍্যাকেট হ্যাণ্ডের কব্জির নীচের অংশ দিয়ে অর্থাৎ হাতের পাতার দিক দিয়ে বল মারা। র‍্যাকেট হাত থেকে পড়ে যাবার পর শুধু হাত দিয়ে বল মারা, কিংবা হস্তচ্যুত র‍্যাকেট দিয়ে বল মারা, অথবা হাত থেকে র‍্যাকেট ছুঁড়ে দিয়ে সেই র‍্যাকেটে বল মারা বিধিবহির্ভূত।

(ই) 'ভলি' মারা কি? যদি নেটের একদিক থেকে মারা বল নেটের অপর দিকের কোর্ট (প্লেয়িং সারফেস) স্পর্শ করার আগে কোনো খেলোয়াড় র‍্যাকেট দিয়ে, কিংবা হ্যাণ্ডের কব্জির নীচ দিয়ে বল মারে তবে তাকে "ভলি" মারা বলে।

(এফ) টেবল-এর উপরকার কিনারা প্লেয়িং সারফেসের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরতে হবে। যদি বল খেলার মধ্যে থাকে (ইন প্লে) এবং পরে টেবল-টপ-এর কিনারায় লাগে তবে সেই বল খেলার মধ্যে আছে বলেই ধরতে হবে। তবে বল যদি টেবল-টপ-এর কিনারার নীচে অর্থাৎ প্লেয়িং সারফেসের পাশে লাগে তবে বল আউট অফ প্লে হবে এবং যে খেলোয়াড় পাশে বল মেরেছে সে পয়েণ্ট হারাবে।

(জি) "অ্যারাউণ্ড দি নেট" কথার অর্থ টেবল-এর বাইরে নেটের যে বাড়তি অংশ তার নীচ দিয়ে বা নেটকাঠামো বেষ্টন করে। কিন্তু নেট-পোস্ট এবং নেট-এর মধ্য দিয়ে নয়।

(এইচ) যদি সার্ভিস করার সময় কোন খেলোয়াড় বল মিস করে অর্থাৎ বল তার র‍্যাকেটে বা র‍্যাকেট হ্যাণ্ডে (কব্জির নীচে) একেবারেই না লাগে তবে পয়েণ্ট হারাবে।
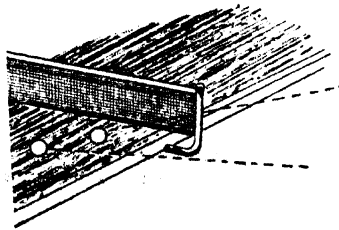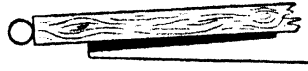
উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে প্লেয়িং সারফেসের কিনারায় বল লাগা আইনসম্মত, পরের ছবিতে পাশে বল লাগা আইন সম্মত নয়। নীচের ছবিতে দেখানো হয়েছে "অ্যারাউণ্ড দি নেট" বল গেলে সে বল 'ইন-প্লে' বলে পরিগণিত

কেন না সার্ভিস করার জন্য যে মুহূর্তে বলকে হাত থেকে উপরে তোলা হয় সেই মুহূর্ত থেকে বল পন প্লে বলে গণ্য।

জ্ঞাতব্য

র‍্যাকেট হ্যাণ্ড এবং ফ্রি হ্যাণ্ড সম্পর্কে পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ফ্রি হ্যাণ্ড টেবল স্পর্শ করলে খেলোয়াড় পয়েণ্ট হারায়। কিন্তু র‍্যাকেট হ্যাণ্ড টেবল স্পর্শ করলে কোন ক্ষতি নেই। টেবল নড়ে গেলে অবশ্য পৃথক কথা। র‍্যাকেট-হ্যাণ্ড দিয়ে বলও মারা যায় যদি কব্জির নীচের অংশ দিয়ে বল মারা হয়। কিন্তু সব সময় স্মরণ রাখতে হবে হাতে র‍্যাকেট ধরা থাকা অবস্থায় এই ধরনের মার আইনগ্রাহ্য। যদি হাতে র‍্যাকেট না থাকে বা র‍্যাকেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকে তবে শুধু হাত দিয়ে কিন্তু বল মারা যায় না। আবার হাত থেকে র‍্যাকেট ছুঁড়ে দিয়েও সেই র‍্যাকেট দিয়ে বল মারা যায় না। মোটের উপর হাতের আইনগ্রাহ্য অংশ দিয়েই বল মারা হক কিংবা র‍্যাকেট দিয়েই বল মারা হক মারার সময় হাতে যেন র‍্যাকেট থাকে।

টেবল-টপ-এর কিনারা যে প্লেয়িং সারফেসের অংশ, পাশের দিকটা অংশ নয়, সে কথা আগেও বলা হয়েছে। এই সঙ্গে ছাপা চিত্র থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

"অ্যারাউণ্ড দি নেট" কথার বাংলা অর্থ নেট বেষ্টন করে। কিন্তু এই অর্থ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয় না। আইনের সংজ্ঞায় তাই পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, "অ্যারাউণ্ড দি নেট" কথার অর্থ হচ্ছে— নেটের নীচ দিয়ে অথবা নেটের পাশ দিয়ে। টেবল-এর সঙ্গে নেট লেগে থাকে। সুতরাং নেটের নীচ দিয়ে বল আসার সুযোগ কোথায়? না টেবল-এর দুই পাশে নেটের যে বাড়তি অংশ থাকে তার নীচ দিয়ে।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে নেটের নীচ দিয়ে বল এলে সে বল 'ইন প্লে' বলে গণ্য হবে কেন? একটু উপর দিয়ে এলে যে বল নেটে আটকে যেত নীচ দিয়ে এলে সে আইন গ্রাহ্য হয় কোন যুক্তিতে? এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সভায় বহু আলোচনা হয়েছে। অনেকেরই অভিমত নেটের বাড়তি অংশের নীচ দিয়ে বল এলে সে বলকে 'ইন প্লে' বলে ধরা উচিত নয়। কিন্তু এ অভিমত ধোপে টেকেনি।

—মুকুল

সংখ্যার হিসাব কী বলে

ইনডিয়ান মোশন পিকচার প্রোডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের (আই-এম-পি-এ) বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সনে ভারতে নির্মিত কাহিনীচিত্রের সংখ্যা ৩৯৫। এত বেশী সংখ্যায় কাহিনী চিত্র এর আগে কখনও তৈরি হয়নি। একদিকে চলচ্চিত্র শিল্পে নানা

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি

প্রতিদ্বন্দ্বী-র পর সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি কী এ-নিয়ে দর্শক মহলে কৌতূহলের অন্ত নেই। গত সপ্তাহে দেশ-এর প্রতিনিধিকে শ্রীরায় জানিয়েছেন যে তিনি এবার শংকরের 'সীমাবদ্ধ' অবলম্বনে ছবি করছেন। 'সীমাবদ্ধ' এ-বছর শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছবির নাম অবশ্য 'সীমাবদ্ধ' নাও থাকতে পারে। সদাগরী অফিস জীবনের পটভূমিতে চাকুরীজীবীর উচ্চাশা ও হতাশার এক ভিন্নধর্মী গল্প এই 'সীমাবদ্ধ।' ছবির চিত্রনাট্য রচনার কাজ শ্রীরায় শেষ করেছেন। শুটিং আরম্ভ হতেও দেরি নেই।

বাধা-বিপত্তি, অন্যদিকে উৎপাদনের বৃদ্ধি—ব্যাপারটা যেমন আপাত পরস্পর বিরোধী, তেমনই চমকপ্রদ। আসলে বোঝা যাচ্ছে, করের চাপ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রশিল্পের প্রসার এবং অগ্রগতি অক্ষুন্ন। প্রসারের মূলে রয়েছে সিনেমার জনপ্রিয়তা, যা ক্রমবর্ধমান। টি-ভি এসে গেলে কী হবে বলা শক্ত, যতদিন না তা এদেশে ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন চলচ্চিত্রের চাহিদা বেড়েই চলবে মনে হয়। সেই অনুপাতে যদি চিত্রগৃহ নির্মিত হতে পারে, তবে এই শিল্পের আরও সমৃদ্ধি ঘটার কথা। সেইখানেই আপাতত একটা বড় অসুবিধা রয়েছে।

১৯৬৯ সালে নির্মিত কাহিনীচিত্রের সংখ্যা ছিল ৩৮৩। অর্থাৎ আলোচ্য বছরের চেয়ে ১২ কম।

"নবরাগ" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

শতাংশ রঙিন। রঙিন চিত্রের মোট সংখ্যা ৯৬; আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৬২।

'৭০ সনের ৩৯৫ খানি ছবির মধ্যে ২৪১টি তৈরি হয়েছে দক্ষিণ ভারতে, বোম্বাইয়ে ১১৭ এবং কলকাতায় ৩৭টি। আগের বছর উক্ত তিন অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল যথাক্রমে [illegible], ১১৯ এবং ৩৬ খানি ছবি। '৭০ সনে তৈরি কাহিনীচিত্রের ভাষাভিত্তিক সংখ্যার চেহারা এই রকম : হিন্দী-উরদু—১০৩; তামিল—৭৬; তেলেগু—৭১; মালয়লম—৪৩; কানাড়া—৩৮; বাংলা—৩৩; মারাঠী—৫, অসমীয়া—৩; গুজরাটী—২; ওড়িয়া—১, পানজাবী—১, ইংরাজী—১।

উত্তম-মাধবীর নতুন ছবি

উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্তীকে নায়ক-নায়িকা রূপে দেখা যাবে অগ্রদূতের "ছদ্মবেশী" ছবিতে। গত সপ্তাহে ছবিটির [illegible] সম্পন্ন হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কাহিনী নিয়ে আগেও "ছদ্মবেশী" ছবি হয়েছিল। চলচ্চিত্র ভারতী এই জনপ্রিয় কাহিনীর নতুন চিত্ররূপ প্রযোজনা করছেন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বিকাশ রায়, অনুভা ঘোষ, তরুণকুমার, শমিতা বিশ্বাস ও জহর রায় ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে গত শুক্রবার সকালে ছবির মহরত সম্পন্ন হয়। ক্ল্যাপস্টিক দেন শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য।

শতাব্দীর নাটক

শতাব্দীর হাসির নাটক "বল্লভপুরের রূপকথা" পুনরভিনীত হচ্ছে আগামী ৭ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে সন্ধ্যা ছয়টায়। নাট্যকার বাদল সরকার নিজেই নাটকের পরিচালক এবং অন্যতম অভিনেতা।

নাট্য-সমালোচনা

গন্ধরাজের হাততালি

(লোকায়ন)

এ ধরনের নাটকে চিন্তার বস্তু যত, আমোদের উপকরণ তত থাকে না। "শৌখিন" মঞ্চের বেশির ভাগ নাটক সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য। "গন্ধরাজের হাততালি" (রচনা ঃ মোহিত চট্টোপাধ্যায়) তার কিছুটা ব্যতিক্রম। নাটকটি ভাবায়, খুবই ভাবায় কিন্তু সেই সঙ্গে নাটক দেখার সুখও এতে মেলে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আগের নাটক দেখেছি, লোকায়ন-গোষ্ঠীরই প্রযোজনা। তাতে একালের রাজনীতিক ও নৈতিক সমস্যা প্রকট। আসলে সব সমস্যাই ভিতরের, মানুষের অস্তিত্বের, বুদ্ধির, চেতনার। 'গন্ধরাজের হাততালি' বেশি ভিতরের কথা, সম্পূর্ণ সাবজেকটিভ। নাট্যকার এখানে হৃদয়ের অভ্যন্তরের সমস্যার কথা তুলেছেন। প্রেমহীনতার যুগে মানুষের আত্মিক সর্বনাশের কথা। তার মন, প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও অনুভূতির মধ্যে যেন কোন সংহতি নেই। মানুষ যা ভাবে ও যা করে তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই যেন। একটা সম্পূর্ণ মানুষ আর নেই। অস্তিত্বের অংশগুলি তার বশীভূত নয়। এই নাটকের প্রধান চরিত্র হরিকিঙ্কর যেন 'সিম্বলিক'। শরীর থেকে সে তার মাথা, হাত, পা সবই আলাদা করে নিতে পারে। মাথাটা পরে শরীরে লাগাতে গিয়ে মুখের দিকটা চলে যায় পিছনের দিকে। মানুষের সত্তা এমনিভাবে বুঝি আজ ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। রূপকটা যেন একটু বেশি স্পষ্ট, বেশি সাজানো, কষ্টকল্পিতও বটে। অন্য কোন স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা বা সংলাপে তা বোঝানো যেত। কিন্তু তবু এর মধ্যে এবং অর্ধ পাগল ও বিচিত্র রঙের পোশাকে সজ্জিত হরিকিঙ্করের অন্যান্য কথা ও কাণ্ডকারখানার মধ্যে প্রমোদের উপকরণ আছে। আজকের পৃথিবী রঙ হারিয়ে ফেলেছে—মনের রঙ। হরিকিঙ্কর তাই খুঁজে বেড়ায়, বাইরের সব রঙ তার কাছে সঞ্চিত চশমার কাচে, জামার রঙে।

মন রাঙানোর কথা, প্রেমকে ফিরে পাবার কথা, সংগীতকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা, নিয়েই 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটক। সে-কারণেই হরিকিঙ্কর, সনাতন, ভবতোষ ও ডাক্তার এসে উপস্থিত হয়েছে নীলিমার বাড়িতে। নীলিমার জীবনে আবার সেই নানা রঙের দিনগুলি কি ফিরে আসবে? প্রৌঢ়-বেশী ভবতোষ প্রেমের একটা স্বপ্ন একটা আইডিয়া বয়ে নিয়ে এসেছে নীলিমার কাছে। নীলিমাকে লেখা সনাতনের পত্রই সে আইডিয়ার উৎস। দশ-বারো বছর আগে কিশোরী নীলিমাকে এক পলকের জন্য দেখেছিল সনাতন। নীলিমার ওই মুখ, ওই নিষ্পাপ চাহনি সে ভুলতে পারেনি।

ওই মুহূর্তটিকে ফিরে পেতে হবে, ওই প্রেমকে খুঁজে নিতে হবে। আজকের নীলিমা—যার অস্তিত্ব শীতলতায় আচ্ছন্ন—কি আবার সেই আগের নীলিমা হয়ে উঠতে পারবে? শেষ পর্যন্ত নাটকে দেখানো হয়েছে, নীলিমা ও ভবতোষ ওই প্রেমের আইডিয়ায় নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে। এই আইডিয়ার জনক সনাতনকে এমন একটা মামুলি চরিত্র করা হল কেন? তার চরিত্রে কোন গভীরতা আছে বলে মনে হয় না। সে ন্যাকা, হ্যাংলা, সর্বক্ষণ প্রেমে হাবুডুবু। ডাক্তারের চরিত্রটিও গতানুগতিক—পাগল গোছের পণ্ডিত যেমন দেখা যায় প্রায়ই, নাটকে বা সিনেমায় যারা বড় বড় তত্ত্বের কথা বলে। কমেডির প্রয়োজন এরা খুবই ভাল মিটিয়েছে। নাকি চরিত্রগুলি রাখা হয়েছে নাটকে ব্যালান্স রক্ষার জন্য? একটি সীরিয়াস প্রসঙ্গে সব চরিত্র সীরিয়াস হলে নাটকের ভারসাম্যও হয়ত রক্ষা হত না। তবু চরিত্র দুটি কি নতুনত্বের স্বাদ দিতে পারত না? সনাতনকে দেখে মনে হয় নাটকের মূল প্রেমের আইডিয়াকেই ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। নাটকের শুরুতে যেমন সোচ্চারে সংগীত বেজেছে তাতেও মনে হয় সংগীতের সপক্ষেই কি এই নাটক? নাকি এ-সব আজকের জীবনে প্রেম ও সংগীতের বিকৃত রূপ? সে হোক না হোক, নাট্য পরিচালনায় ও সংগীত পরিচালনায় অরুণ রায় আগাগোড়াই সুচিন্তিত পরিকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। নাটক প্রতি মুহূর্তেই দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে রাখে। নীলিমাকে যখন হরিকিঙ্কর বিভিন্ন রঙের কথা বলছে তখনকার নানা রঙের আলোকপাত লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে একা অরুণ রায়ের অভিনয়ই নাটকে একটা তাৎপর্য, একটা গভীরতা এনে দিয়েছে। এই নাটকের মর্ম যদি মঞ্চে সার্থক হয়ে থাকে সে অনেকটা অরুণ রায়ের অসাধরণ অভিনয়ের জন্যই। সীমা দাসের নীলিমাকেও ভাল লেগেছে। নীলিমার বিষণ্ণতা, অস্বস্তি ও তার চোখে-মুখে মুহূর্তের জন্য প্রেমের স্বপ্নের প্রকাশ সীমা দাস প্রশংসনীয়ভাবে দেখাতে পেরেছেন। গৌতম মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার), শান্তিরঞ্জন সিংহ (ভবতোষ) ও দিলীপ ভট্টাচার্য (সনাতন) নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করে তুলেছেন। দিলীপ দাসের মঞ্চসজ্জা খুবই শিল্পমণ্ডিত।

মঞ্চশিখার নাট্যাভিনয়

মঞ্চশিখার শিল্পীরা গত ১৯ জানুয়ারি রঙমহল মঞ্চে শক্তিপদ রাজগুরুর "মেঘে ঢাকা তারা" নাটক অভিনয় করেন। অভি-

ভারতের যে-কোনো প্রান্তে বসে ভারতীয় চলচ্চিত্র বা নাটকের আলোচনা শুরু করুন দেখবেন, কান টানলে মাথা আসার মত বাংলা দেশ এবং বাঙালীরা এসে পড়েছে সেই আলোচনায়। ভারতীয় নাটক নিয়ে আলোচনা করতে বসুন, বাঙালীদের হাত থেকে নিস্তার নেই। দেখবেন কোন ফাঁকে গিরিশচন্দ্র বা শিশির ভাদুড়ি নয়তো মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এসে ঢুকে পড়েছেন সেই আলোচনায়। এঁদের এড়াতে আলোচনা যদি কনটেমপোরারিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান তাহলেও শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করে উপায় নেই।

সেদিনের সিনেমা যদি আপনার আলোচনার বিষয় হয় তাহলে, নীতীন বোস, দেবকী বোস, বিমল রায়ের নামকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। আর আজকের সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতে বসলে তো কথাই নেই। সেখানে একা সত্যজিৎই অষ্টাদশ অধ্যায়।

বোম্বাই সত্যি সত্যিই একটি সার্বজনীন (কসমোপলিটন অর্থে) শহর। যদিও কলকাতাও তাই। তবু কলকাতার সঙ্গে বম্বের একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। সেটি হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রভেদ। কলকাতা সমস্ত কিছুর পরেও বাঙালী সংস্কৃতি শাসিত শহর। কলকাতায় থেকে বাঙালী সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বাঁচবার উপায় নেই। কিন্তু বোম্বাই-এ বাস করে মারাঠি সংস্কৃতির সংস্পর্শে না এসেও কারুর জাত যায় না। অথচ জাতে উঠবার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য নয়।

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের পক্ষ থেকে অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য সরযূ দেবী ও পদ্মশ্রী খেতাব প্রাপ্তির জন্য তৃপ্তি মিত্রকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ছবিতে শিল্পীদ্বয় পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

ফটো—দেশ

গত কয়েক বছরে ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট হু হু করে ছড়িয়েছে শহর বোম্বাই-এ এবং কালক্রমে এই ফিল্ম সোসাইটিগুলি উক্ত কসমোপলিটান সোসাইটির সাংস্কৃতিক মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুইডেনের ছবি, পোল্যান্ডের ছবি, চেকোশ্লোভাকিয়ার ছবি, ইতালির ছবি, জাপানের ছবি প্রভৃতির আলোচনায় গম গম করেছে দেশী বৈঠকখানা। বিদেশী ভাষায় আলোচিত বিদেশী ছবির আলোচনায় উদ্ভাসিত দেশী চেহারাগুলি ঝলমল করে উঠেছে দিনের পর দিন। তারপর একদিন এই ফিল্ম সোসাইটিগুলি দেশী ছবি দেখাতে শুরু করেছে। পুরোনো দেশী ছবি। নতুনদেরও দু-একটি দেশী ছবি মাঝে মধ্যে এঁরা দেখিয়ে থাকেন। আজকাল ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট বম্বেতে কিঞ্চিৎ মন্দা। কারণ ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্টের কর্তাব্যক্তিরা প্রায় প্রত্যেকেই ফিল্ম বানাতে শুরু করেছেন বা শুরু করার তালে আছেন। সুতরাং সোসাইটিগুলি কিঞ্চিৎ অবহেলিত।

ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের কসমোপলিটান সোসাইটির চিত্তবিনোদনার্থে আবার ইংরেজি নাটকের অভ্যুত্থান হয়েছে শহর

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

টম, তোর পরে আমি আবার যাব।
টমের আগে হোক
বেশ।

যাসনে টম!

এটা কী বানাচ্ছ, ওয়াকার-কাকা?
ভেলা।
বলসা-কাঠের এই ভেলাগুলো হাল্কা হলেও মজবুত। ভেলায় চড়ে বেড়াতে যাবি?
আমাদের সঙ্গে যাবে তো ওয়াকার-
*অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা

নিশ্চয়। সলোমন! নেফারতিতি!
ছপ্‌ছপ্‌!

যতক্ষণ না বাঁধটা পেরোচ্ছি, শক্ত করে লাগাম ধরে থাক্‌!
এ যে দারুণ মজা!
6/14
শুশুকে-টানা আজব গাড়ি?

খানিক এগোলেই কীলা-উয়ির সোনা-বেলা। যাবি?
নিশ্চয় যাব।
নিশ্চয়!

কীলা-উয়ির সোনা-বেলায় অরণ্যদেবের জেড-পাথরের বাড়ি।

প্রতি বছর পাইকারী বিয়ের ধুম লাগে।
আগামী সপ্তাহে: উৎসব

ভারতীয় বিমান ছিনতাই আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইনডিয়ান এয়ার লাইনস-এর একখানি ফকার ফ্রেনডশিপ বিমান শ্রীনগর থেকে জম্মুর পথে বিমানেরই দুজন যাত্রীর উদ্যত পিস্তলের মুখে লাহোরে গিয়ে নামে। জম্মুতে অবতরণের কয়েক মিনিট আগে বিমান চালকের বার্তায় জানা যায়ঃ বিমানটি ছিনতাই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিমানটি লাহোরে গিয়ে নামে। বিমানে ২৮জন যাত্রী এবং ৪জন বিমান কর্মী ছিলেন। পাকপন্থী গুপ্তচক্রী সংস্থা 'আল ফাত্তা'র কার্যকলাপ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর পুলিস জানিয়েছিলেন যে, অতঃপর ভারতীয় বিমান হাওয়াই ছিনতাই হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপহরণ করে প্রতিভূ হিসাবে আটক রাখার অপচেষ্টাও হতে পারে। যে দুজন বিমান দস্যু বিমানটি হাওয়াই ছিনতাই করেছে তাদের একজন তিন বছর যাবত সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীতে নিযুক্ত। গত এক বছর তার কর্মস্থল ছিল জম্মু বিমান বন্দর। তার নাম মহম্মদ কুরেশী। অন্য জনের নাম মহম্মদ আশরফ। এরা দুজনই শ্রীনগর থেকে বিমানে উঠেছিল। পাকিস্তান থেকে খবর আসেঃ বিমানের যাত্রী ও কর্মীরা সকলেই নিরাপদে আছেন। বিমান চালককে বিমান নিয়ে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিমান ছিনতাইকারী দুজনকে পাক সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছেন। ছিনতাই ভারতীয় বিমানের যাত্রী ও বৈমানিকদের ভারতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একখানি ভারতীয় বিমানকে লাহোরে নামার অনুমতি দিয়েছেন।

দেশী সংবাদ

২৫ **জানুয়ারি**—উত্তরপ্রদেশের সংযুক্ত বিধায়ক দল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং উপ-নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। এই উপ-নির্বাচনে ষোল হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন নব-কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিবেদী। প্রার্থী ছিলেন মোট সাতজন। পাঁচজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব শ্রী বি এল যোশীকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে পাকিস্তান ত্যাগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাক বেতারে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, গুপ্তচর বৃত্তির কাজে ভারতীয় কূটনীতিক লিপ্ত রয়েছেন।

২৬ **জানুয়ারি**—আজ প্রজাতন্ত্র দিবসে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে দশজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ডায়মণ্ডহারবারের। সেখানে গঙ্গায় এক সঙ্গে হাত বাঁধা ছয়টি ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে অপর একজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

ভারতের একবিংশতিতম প্রজাতন্ত্র দিবসটি সারা দেশে সাড়ম্বরে পালিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ কুচকাওয়াজ ও বর্ণাঢ্য মিছিল দেখতে ঘরের বাইরে আসে। দেশ জুড়ে জাঁকজমক পূর্ণ মিছিল, শোভাযাত্রা আর কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত হয় জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি।

২৭ **জানুয়ারি**—ইনডিয়ান অয়েলের পাইপ লাইন ফুটো করে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের পেট্রোল চুরির এক ঘটনা ধরা পড়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আই-ও-সি'র একজন পদস্থ অফিসার সহ তিনজন ধরা পড়েছেন। সি-বি-আই আরও তদন্তের জন্য এই কেসটি হাতে নিয়েছেন।

গতকাল বসিরহাটে মারকসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। বোমায় গাড়িটির গুরুতর ক্ষতি হওয়ায় অন্য গাড়িতে করে তিনি সভাস্থলে যান। গাড়ির আরোহীরা কেউ আহত হননি।

২৮ **জানুয়ারি**—আজ উত্তর ২৪ পরগনা এলাকায় উগ্রপন্থী সাতজন বিচারাধীন বন্দীকে যখন প্রিজন-ভ্যানে করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে উধাও হন। পরে নিউ-ব্যারাকপুরে একটি ঝিলের কাছে ওদের মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে—পুলিসসূত্রে বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং সওদাগরি সংস্থাগুলিকে নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে উপযুক্ত কর্মী দিয়ে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

২৯ **জানুয়ারি**—নির্বাচনের কাজে যে সব কর্মী নিয়োগ করা হবে তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তত দিন-সাতেকের জন্য ঝুঁকি বীমার মত কোন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করার বিষয়ে রাজ্য সরকার ভেবে দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, পুলিসের ক্ষেত্রে এ-রকম বীমার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৭১-৭২ সনের বার্ষিক যোজনায় রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন ৬৫.১৩ কোটি টাকা। রাজ্যপাল নিজে যোজনা কমিশন সমীপে ওই দাবি সপক্ষে জোর সওয়াল করেন। কিন্তু কমিশন ওই যোজনার আকার নির্দিষ্ট করে দেন ৫৯.৪১ কোটি টাকা। এই বার্ষিক যোজনায় কেন্দ্রীয় সহায়তার পরিমাণ হবে ৪১.২ কোটি টাকা।

৩০ **জানুয়ারি**—শুক্রবার রাত থেকে শনিবার রাত পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ৯ জন নিহত হন। শনিবার সকালে কলকাতা পুলিসের এ-এস-আই শ্রীনিবারণ মুখার্জি নারকেলডাঙ্গা এলাকায় আততায়ীর ছোরার আঘাতে গুরুতর আহত হন। টালিগঞ্জে গণেশ দাস নামে এক যুবক বোমার ঘায়ে নিহত হন।

নতুন ভোটার হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে এত বেশী সংখ্যক নাম পাওয়া গিয়েছে যে রাজ্য নির্বাচন দফতর আশংকা করছেন এর মধ্যে অনেক নামই ভুয়া। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার বলেন, কলকাতায় নতুন ভোটার হবার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছে। চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমা থেকে পাওয়া গিয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার আবেদনপত্র।

৩১ **জানুয়ারি**—ভারতের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ম্যানেকশ কলকাতায় এসেছেন। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সামরিক এবং অসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সোমবার তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন। নির্বাচনের সময় শান্তিরক্ষার প্রশ্নটি সেখানে প্রাধান্য পাবে।

আজ পশ্চিমবঙ্গে চারজন নিহত হয়েছেন। তার দুজন পুলিস, একজন সি পি এম এবং একজন নব কংগ্রেস কর্মী। বেহালায় বোমায় একজন এস আই খুন হন। সেখানে তার গুলিতেই সি পি এম যুবকটি মারা যান। ছুরিকাহত নব কংগ্রেস কর্মী মারা যান হাসপাতালে। কৃষ্ণনগরে খুন হন ডি আই বি'র কনসটেবল।

বিদেশী সংবাদ

২৫ **জানুয়ারি**—আজ রেডিও উগাণ্ডা প্রচার করে যে, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। প্রেসিডেন্ট ওবোটে তাঁর অনুপস্থিতিকালে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। সমস্ত ক্ষমতা এখন সৈন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই সংবাদে ঘোষক তার নাম প্রকাশ করেননি। তিনি নাকি সেনাবাহিনীর একজন অফিসার।

২৭ **জানুয়ারি**—ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে চীনের রাজধানীতে ভারতীয় দূতাবাসে যে অনুষ্ঠান হয় পিকিং-এর সরকারী বেতারে আজ তা প্রচারিত হয়েছে। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত সীমান্ত আক্রমণের পর এই প্রথম চীনা বেতারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান প্রচারিত হল।

২৮ **জানুয়ারি**—করাচিতে গতকাল ভাষা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যায়। কর্তৃপক্ষ আজ সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিয়েছেন। সিন্ধু প্রদেশ স্কুল বোর্ড অফিসে, উর্দুভাষীদের ক্ষেত্রেও সিন্ধু ভাষার পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করায় এই দাঙ্গার সূত্রপাত। উর্দু ভাষাভাষীরা এতে ক্ষুব্ধ। উল্লেখ্য, উর্দু—পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।

২৯ **জানুয়ারি**—পূর্ব পাকিস্তানের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী পদে শ্রীমনসুর আলি নাকি শেখ মুজিবর রহমানের মনোনীত ব্যক্তি। ঢাকা থেকে এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। শ্রীআলি শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগের অন্যতম সহ-সভাপতি।

৩০ **জানুয়ারি**—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা নতুন সংবিধান সম্পর্কে তিন দফা আলোচনার পরেও মতৈক্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁর দল সেই সংবিধানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যাতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধিকার দেওয়া হবে।

৩১ **জানুয়ারি**—কেপ কেনেডি থেকে জানানো হয়েছে ঃ আজ তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে অ্যাপোলো-১৪ মহাকাশ যান চাঁদের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তাঁরা চাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলে অবতরণ করবেন। ৩৬ তলা বাড়ির সমান উঁচু স্যাটার্ন রকেটটি অ্যাপোলোকে নিয়ে পলকের মধ্যে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

স্বাদে ভরা - পুষ্টির জন্যে !
THIN-ARROWROOT

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
পশ্চিমবঙ্গে সৈন্যবাহিনী—		...	১১৭
ব্যঙ্গচিত্র—		...	১১৮
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		...	১১৯
দৃশ্যপট—	শ্রীনারায়ণ গুপ্ত	...	১২০
বৈদেশিকী—	দেবরাজ	...	১২২
পঞ্চতন্ত্র—	ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	...	১২৩
এই দিন বড় ভাল লাগে (কবিতা)—	শ্রীভবেশ দাস	...	১২৬
অবশেষে (কবিতা)—	শ্রীবিজয়কুমার দত্ত	...	১২৬
ভয় (কবিতা)—	শ্রীসামসুল হক	...	১২৬
ভোটার সাবিত্রীবালা—	বনফুল	...	১২৭
দীনবন্ধু এণ্ডরুজ—	শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়	...	১২৯

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
এই তার পুরস্কার	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	১৩৩
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ	...	১৪১
রত্ন ও শ্রীমতী	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	...	১৪৭
বিশ্ববিজ্ঞান	শ্রীসমরজিৎ কর	...	১৫৩
ভারতের অর্থনীতি	শ্রীসুব্রত গুপ্ত	...	১৫৭
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা	ফাদার দ্যতিয়েন	...	১৫৯
পত্রস্মৃতি	শ্রীপরিমল গোস্বামী	...	১৬৩
গানের আসর	শার্ঙ্গদেব	...	১৭১
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	...	১৭৫
ঘরে বাইরে	শ্রীমতী	...	১৭৯
চিত্রপ্রদর্শনী	চিত্রপ্রিয়	...	১৮১

Ⓡ Registered User-Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona-3

TOM & BAY/KO-7011 B

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সামনে চড়াই উৎরাই তবু মেয়েরা পিছিয়ে নেই— শ্রীসুধীর ঘোষ ... ১৮৫
আলোচনা— ... ১৮৯
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক ... ১৯৩
পুস্তক পরিচয়— ... ১৯৪
খেলার মাঠে একলব্য ... ১৯৬
টেবল টেনিসের আইনকানুন—মুকুল ... ১৯৮
রঙ্গজগৎ— ... ১৯৯
অরণ্যদেব— ... ২০৭
সাপ্তাহিক সংবাদ— ... ২০৮

প্রচ্ছদ : শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

যখন দু'হাতেও কাজ সামলানো দায়

তখনই দরকার একটি প্রেস্টিজ Prestige প্রেশার কুকার
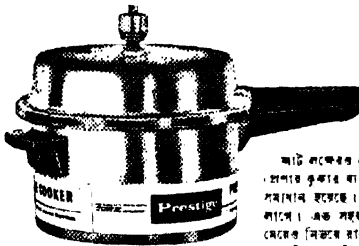
কারণ, প্রেস্টিজ প্রেশার কুকারে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না সারা যায় ব'লে রান্নাবান্নায় ঘণ্টাখানেক সময় বাঁচানো চলে।

প্রেস্টিজ—পাঁচ রকম সাইজে পাওয়া যায়—আপনার বাড়ীর জন্যে দরকারমতো বেছে নিন।

আট লক্ষেরও বেশী গৃহিণী আজ খুশী মনে এই **প্রেস্টিজ** প্রেশার কুকার ব্যবহার করছেন। এতে তাঁদের রান্নার সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্রেশার কুকারে রাঁধতে সিকি ভাগ সময় লাগে। এত সহজ ও এমন নিরাপদ যে একটি বারো বছরের মেয়েও নিজেই রান্না করতে পারে। এই কুকার ব্যবহার করে আপনি জ্বালানির খরচ কমাতে পারবেন, মেজাজ বিগড়ানো হৈ-চৈ আর ঝামেলাও এড়াতে পারবেন। কারণ একসংগে একই সময়ে এতে তিন রকম পদ রান্না করা চলে।

প্রেস্টিজে রাঁধা খাবার স্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু। খাদ্যের সমস্ত গুণ এবং খাঁটি স্বাদ এতে ষোল আনা বজায় থাকে। আজীবন গ্যারান্টি এবং বিক্রির পরেও সার্ভিসের সুবিধা [illegible] একমাত্র **প্রেস্টিজ** কিনলেই পাবেন।

'প্রেস্টিজ'-এর বিখ্যাত 'স্টীম-ইট', স্কিলেট ও সস্প্যান ব্যবহার করে সহজে চটপট রান্না সারা যায়।

টিটি. (প্রাইভেট) লিমিটেড, বাঙ্গালোর-১০

দেশের বাজারের জন্য বিদেশের জন্য

বিপন্ন বিস্ময়

বুদ্ধদেব বসু ॥ দাম ৮·০০

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলিতে নাগরিক বাঙালী জীবনে ও চিন্তাধারায় যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাসে তারই আলেখ্য এঁকেছেন। শুধু পরিবর্তন নয়—সব পরিবর্তনের অন্তরালে একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দুও লেখকের সন্ধান।

সামান্য-অসামান্য

সুশীল রায় ॥ দাম ৫·০০

সামান্য দুটি রমণী—জন্ম এবং জীবন যাদের মর্যাদাময় ছিল না, বরঞ্চ পাতিত্য এবং বহুবল্লভতার গ্লানিতে ছিল ঘৃণ্য—অসামান্যতা অর্জন করেছিল তারা নিজ কৃতিত্বে। সেই অতি সামান্য অথচ অতিশয় অসামান্য দুটি নারীর নিরন্তর তীব্র সুরে বাঁধা মর্মদাহী জীবনসংগীত ॥

কুবেরের বিষয় আশয়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ১০·০০

বাউন্ডুলে কুবের সাধুখাঁ বিষয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝেছিল যে, বিষয়ে তার শিকড় প্রবিষ্ট হলেও আসলে সে আগের মতই আশ্রয়হীন—মাথায় কোনও শেড নেই তার। এই মানুষটি তাই বৈভবের মধ্যেও আশ্রয় পেল না। শেষ পর্যন্ত তার আশ্রয় হয়ে দাঁড়াল প্রকৃতিই ॥

নুনের পুতুল সাগরে

ধনঞ্জয় বৈরাগী ॥ দাম ১০·০০

সফলতার চূড়ায় পৌঁছে হঠাৎ একদিন সাহিত্যিক অনাদিপ্রসাদের কেন যেন মনে হল : সাহিত্যসাধনার নামে এতদিন তিনি যা করেছেন তা সব মেকী। এই অকরুণ উপলব্ধি অনাদিপ্রসাদকে এক নতুন পথ-যাত্রায় নামাল। জীবনজিজ্ঞাসায় পীড়িত এক সাহিত্যিকের আত্মানুসন্ধানের মহান আলেখ্য এই উপন্যাস ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

ঘুণপোকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০

উচ্চাশাসম্পন্ন উত্তরতিরিশ এক তরুণ কেমন করে নৈরাশ্য এবং নির্বেদের অন্ধকার অতলে ডুবতে ডুবতে ধীরে ধীরে সংক্রান্তি হল জীবনচর্যা এবং ভালোবাসায়, তরুণ লেখক তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে এক প্রবীণ ঔপন্যাসিকের নৈপুণ্য নিয়ে তা চিত্রিত করেছেন ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

প্রকাশিত হল

বিমল করের

ভুবনেশ্বরী

রূপে লক্ষ্মী, করুণায় ভগবতী, শুচিতা পবিত্রতা মমতায় মেশানো এক অলৌকিক রমণী ভুবনেশ্বরীকে ঘিরে যে কিংবদন্তী কয়েক পুরুষ ধরে একটি পরিবারের রক্তে-শিরায়-স্নায়ুতে মিশে গিয়েছিল, সেই কিংবদন্তীর স্রষ্টা নিজেই জানতেন না যে, একদিন আপন হাতেই তাঁকে ভাঙতে হবে এই সুন্দর মিথ্যার জগৎ। কিন্তু ভাঙতে চাইলেই কি ভাঙা যায় সেই অলীক কল্পনার দেবীমূর্তিকে ? দিনে দিনে যা সত্যের থেকেও বেশী সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে ? সোমকান্তি অন্তত পারেননি। মানুষের জীবনের নিষ্ঠুরতম ট্র্যাজেডি হয়তো এটাই। এক-একটি ব্যক্তি-মানুষকে ঘিরে পৃথিবীতে যত 'মিথ' তৈরী হয়েছে, দেখা যায় তার অধিকাংশেরই কোনও ভিত্তি নেই। তবু সেই ভিত্তিহীন মিথ্যাই সত্যকে ম্লান করে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাম ৪·০০

● এই লেখকের অন্যান্য বই ●

মৃত ও জীবিত ৪·০০ **একদা কুয়াশায়** ৬·০০ **কুশীলব** ৩·৫০ **আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন** ৪·৫০ **যদুবংশ** ৭·০০ **পূর্ণ অপূর্ণ** ১০·০০ **পরিচয়** ৪·০০ **বালিকা বধূ** ৩·০০ **খড়কুটো** ৪·০০

গাছের পাতা নীল

আশাপূর্ণা দেবী ॥ দাম ৬·০০

তন্ময় তপস্যার দুর্গে নিজেকে সুরক্ষিত করে জীবনের মানে খুঁজেছিলেন সরোজাক্ষ সৌন্দর্য ও শুভের মধ্যে। তবু তিনি সচকিত হয়ে একদিন দেখলেন—বিষে নীল হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর সকল সবুজ, সকল স্নিগ্ধতা। এ যুগের আত্মিক দ্বন্দ্ব এবং তার বিমূঢ় অসহায়তার এক অনবদ্য চিত্র ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা

সমরেশ বসু ॥ দাম ৪·০০

দেশভাগের পর সুচাঁদ তার প্রিয় গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিল পশ্চিম বাংলায় অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু এখানে এসে আর দশজন উদ্বাস্তুর মতই পেল শুধু ঘৃণা আর করুণা। অভিমানে সুচাঁদ আবার ফিরে গেল তার নিজের গ্রামে। কিন্তু সেখানেও সে আজ অবাঞ্ছিত—সন্দেহভাজন বিদেশী গুপ্তচর ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

অসংলগ্না

বনফুল ॥ দাম ৩·০০

'অসংলগ্না' নতুন রীতিতে লেখা এক অদ্ভুত পূর্ব উপন্যাস। বিমূর্ত কতকগুলি ভাব ও কল্পনাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে সেগুলি অবলম্বনে সৃষ্ট এই উপন্যাস লেখকের সৃজন-শক্তির প্রাচুর্যের দিকটিই শুধু নির্দেশ করবে না, বাংলা উপন্যাসের জগতে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টিরও মর্যাদা লাভ করবে ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

নগ্ন নির্জন

বুদ্ধদেব গুহ ॥ দাম ৪·০০

রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনী বুদ্ধদেব গুহর কলমের ছোঁয়ায় এমন এক অদ্ভুত মাদকতায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে, যা পাঠকের মনকে এক মধুর আবেশে আবিষ্ট করে। তাঁর নতুন ধরনের উপন্যাস 'নগ্ন নির্জন' বন-জঙ্গল এবং শিকারের নির্জন ভয়াবহ পটভূমিকায় রচিত এক বিচিত্র ধরনের প্রণয়কাব্য ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

সেতুবন্ধ

মনোজ বসু ॥ দাম ১২·০০

এক রক্ষণশীল পরিবারের ভীরু মেয়ে যে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ভাঙন আমাদের মধ্য-বিত্ত সমাজকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে তার মুখোমুখি হয়ে কেমন করে পাঞ্জা কষেছিল তার সাথে, আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল, তারই অনুপম উপাখ্যান 'সেতুবন্ধ' ॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ ॥

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯ ॥
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯ ॥

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৫
শনিবার ৩০ মাঘ ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮০৪১

*

মুদ্রণ, কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আজ আমাদের এক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই অবস্থায় পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হলে দাম বাড়ান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাই ফেব্রুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার মূল্য প্রতি কপি দশ পয়সা করে বৃদ্ধি করা হল। অতএব এই সপ্তাহ থেকে আমাদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার দাম হল প্রতি কপি ৬০ পয়সা। এজেন্টদের কমিশনের হার পূর্বের মত থাকবে। গ্রাহকদের অবগতির জন্য যথাসময়ে বার্ষিক, ষান্মাসিক ও ত্রৈমাসিক চাঁদার হার প্রকাশিত হবে।

*

দাম ৬০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 13 Feb., 1971

পশ্চিমবঙ্গে সৈন্যবাহিনী

অন্তে পদে যেমন শ্রীমধুসূদন-স্মরণ, সেই রকম আমাদের যাবতীয় সংকটের শেষ ডাক, মিলিটারী। এতদিন মাঝে মাঝে শোনা যেত পশ্চিমবঙ্গের যে অবস্থা তাতে শেষ পর্যন্ত মিলিটারী ডাকতে হবে। দু চারবার কাগজেপত্রে কিছু কিছু গুজবও ছড়িয়েছে। কিন্তু মিলিটারী সত্যি সত্যিই নামবে কি নামবে না তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি। এখন আর অনিশ্চয়ের কিছু নেই, পশ্চিমবঙ্গে সৈন্য নেমে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সারা পশ্চিম বাংলায় চল্লিশ হাজারের মতন সৈন্য মোতায়েন থাকবে।

সৈন্য বাহিনীকে তলব করার কী প্রয়োজন হল এ-কথা আজ আর কারও অজানা থাকার কথা নয়। সরকারী বয়ানে বলা হয়েছে, এই রাজ্যে নির্বাচন উপলক্ষে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্য বাহিনীকে ডাকতে হয়েছে। কথাটা কারও কারও মনঃপূত না হতে পারে, কিন্তু চোখ চেয়ে চারপাশের অবস্থা দেখলে মনে হয়, এ ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? সারা পশ্চিমবঙ্গ দেখতে দেখতে এক মগের রাজ্য হয়ে উঠেছিল, নিত্য খুন, নিত্য সংঘর্ষ, নিত্য মৃত্যু। এমন সর্বনাশা রক্ত-পিপাসা পশ্চিম বাংলায় আগে আর দেখিনি। এমন একটা অনিশ্চয় ও ত্রাসের মধ্যে নির্বাচন-অনুষ্ঠান কী সত্যই সম্ভব। অনেকেই মনে করেছেন সম্ভব নয়, এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে রাজনৈতিক দল হিসেবে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, সৈন্য তলব করতে। সৈন্য বাহিনী না নামলে সাধারণের মনোবল ফিরে আসবে না, ভোট দিতে লোকে মণ্ডপে জড় হবে না, এ-রকম আশঙ্কা এঁরা করেছেন! তা ছাড়া ভোটকেন্দ্রগুলিও যে বোমায় অথবা আগুনে নষ্ট হয়ে যাবে না এমন কথাও কী জোর করে বলা যায়! অগত্যা, ভোটের জন্যে মিলিটারী ডাকা হোক এটা অনেকেরই মনে মনে প্রার্থনা ছিল। সরকার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, আজকের সৈন্য বাহিনী তলবের পেছনে নির্বাচন অনুষ্ঠানটাই বড় যুক্তি। পুলিস, সি আর পি ও অন্যান্যের দ্বারা যদি হত তবে নিশ্চয় ফৌজ ডাকার দরকার পড়ত না। কাজেই যাঁরা পশ্চিম বাংলার সাম্প্রতিক অবস্থাটা সঠিক অনুমান করতে পারছিলেন না, তাঁরা এবার অনুমান করতে পারবেন।

সৈন্য বাহিনী নামায় কোনো কোনো দল মুখে এক ধরনের আপত্তি ও অসন্তোষ জানিয়েছেন। এর সবটাই আমাদের বিশ্বাস করার কারণ নেই। আজ যেখানে নির্বাচন-প্রার্থী খুন হচ্ছে, ভোটের প্রচারকর্ম শুরু করতে না করতেই দলীয় কর্মী মরছে—সেখানে রাজনৈতিক দল ও দলীয় প্রার্থীদের মধ্যেও ভীতির ভাব স্পষ্ট। লক্ষ করলে দেখা যাবে, কোনো কোনো দল যার তাদের বিজিত এলাকা হারিয়ে ফেলেছিল, ইদানীং নির্বাচনের মুখে তারা সেই সব এলাকা উদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোমা বন্দুক দিয়েও তা উদ্ধার করতে পারছে না। এইসব এলাকায় আবার ঢুকতে হলে, অন্তত প্রচারকার্য চালাতে হলেও মোটামুটি একটা নিরাপত্তা দরকার। সে নিরাপত্তা কে দেবে? মিলিটারীর মুখ এরাও চেয়ে আছে, যদিও তা প্রকাশ করতে পারছে না।

একথা ভুললে চলবে না, এবারের নির্বাচনে ভোটারদের উৎসাহ কম, ভোট-প্রার্থী রাজনৈতিক দলগুলির উৎসাহই বেশী। গদির জন্যে সকলেই উন্মুখ হয়ে বসে আছে। সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এদের কাছে বাস্তবিক কোনো চিন্তা নয়; চিন্তা কোনো রকমে ভোটদাতাদের একটা মাস টিকিয়ে রেখে একবার ভোট-মণ্ডপে হাজির করানো। তারপর কে মরল, কে বাঁচল—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে যাচ্ছে না।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে সৈন্য বাহিনীকে মোতায়েন রাখার নজির গৌরবের তো নয়ই বরং কলঙ্কের বিষয়। এই কলঙ্ক আজ বাংলা দেশ গায়ে মেখে নিল। কেন নিল তা বলার প্রয়োজন আর মনে করি না। গণতন্ত্রের বুলি মুখে ছিল বটে আমাদের, কিন্তু গত দু তিন বছরে আমরা গণতন্ত্রের সমস্ত আবহাওয়া দূষিত ও বিষাক্ত করেছি। আইনকে অমান্য করতে শিখিয়েছি, শৃঙ্খলাকে ভাঙতে উৎসাহ দিয়েছি, অরাজকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি, মানুষের জীবনকে কানা কড়ির মূল্য দিতেও অস্বীকার করেছি। বলা বাহুল্য, সেই আবহাওয়া আজ ঘন হয়ে উঠেছে। জীবন যেখানে অনিশ্চিত, শান্তি যেখানে স্বপ্নেও আর আশা করা যায় না সেখানে ভোটের জন্যে কার গরজ? ভোট-দাতার নিশ্চয় নয়, ভোটপ্রার্থী-দলের। মিলিটারীকে ডেকে আনার দায়িত্বও তাদের। যে-কারণে আজ মিলিটারী নামল, সেই কারণের এরাই জনক ও পৃষ্ঠপোষক।

চাঁদে পাড়ি
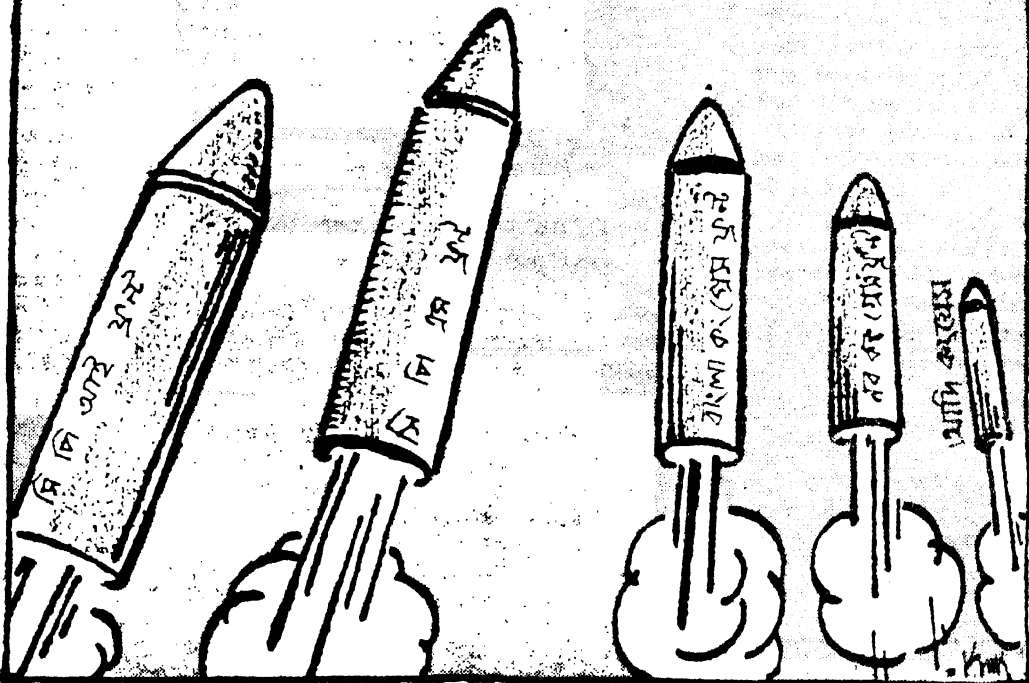
মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এবং

তদীয় উপদেষ্টাবৃন্দ! আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা পশ্চিমবঙ্গে সৈন্য নামানো সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে যে অ্যাডভাইস দিয়েছেন, সেটার প্রতি অনুগ্রহ করে নজর দেবেন। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা বলেছেন, "সৈন্য বাহিনীকে সাহায্যের জন্য তলব করার ভণ্ডামি না করে রাজ্য সরকার যেন পুলিসকে দিয়ে সঙ্গত কাজ করিয়ে নেন।"

আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা যতদিন অপজিশনে ছিলেন, ততদিন পুলিসের নাম শুনলেই তাঁর স্নায়ুগুলো লণ্ড বেতালা হয়ে উঠত। তারপর বাবা মার্কসেশ্বরের প্রসাদী ফুল মাথায় গুঁজে যেদিন থেকে গদিতে গিয়ে বসলেন, এবং পুলিসের সেবা যত্ন বিধিমতে পেতে থাকলেন, তখনই, ওয়ান ফাইন মর্নিং তিনি উপলব্ধি করলেন, 'তাই তো! আমার পুলিস যে পুলিস আর নাই রে!' এবং তিনি এ কথাও বুঝে গেলেন পুলিসের বিরুদ্ধে অনবরত গলাবাজি না করে নরমে গরমে ওদের দিয়ে "সঙ্গত" কাজ করিয়ে নিতে পারলে বেনিফিট বেশী পাওয়া যায়। তদনুসারে আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা নরমে গরমে পুলিসের সঙ্গে মিলেও মিশতে লাগলেন। ফল কি হল জানেন?

আমাদের লোকাল কমরেডদের সঙ্গে পুলিসের বেশ একটা মাখো-মাখো সম্পর্ক গড়ে উঠল। এবং অধিকাংশ থানাই আমাদের লোকাল কমিটির সৎপরামর্শে "সঙ্গত" কাজ করে যেতে লাগল। কিরকম সঙ্গত কাজ? তাও জানেন না?

আমাদের লোকাল কমরেডরা থানায় গিয়ে আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে আসতেন তারা অমুক জোতদার, তমুক পুঁজিপতি বা প্রতিক্রিয়াশীল, জনবিরোধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে যাচ্ছেন, অতএব থানার পুলিসের পক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করে থাকাই হবে সঙ্গত কাজ। এবং পুলিস তাই করত। এবং আপনাদের জানাতে বাধা নেই আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার আমলে প্রায় গোটা পুলিস বাহিনীই "সঙ্গত"ভাবে আমাদের এইসব প্রগতিশীল ক্রিয়াকলাপের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর দাঁড়িয়েছিল বলেই না আমাদের পরম আদরের সি পি এম বিয়ের জল গায়ে লাগা কনের মত কদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য ফিরিয়ে ফেলেছিল। কী দিনই না ছিল। সেসব কথা মনে পড়লে এখনও মনটা কেমন হু হু করে ওঠে। আর যেন জানিনে, চলে যায় বসন্তের দিন চলে যায়, এই গানটা দীর্ঘ-

শ্বাসের সঙ্গে বুক থেকে ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়!

আমাদের প্রিয় নেতা জ্যোতি বোসদার দুনিয়াদারি এইভাবে জমে উঠেছিল। কি ভালই না লাগত দেখতে, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা জাহাজের মত বড় একটা মার্কিনী গাড়ির বুক-ডুবে যাওয়া গদিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন
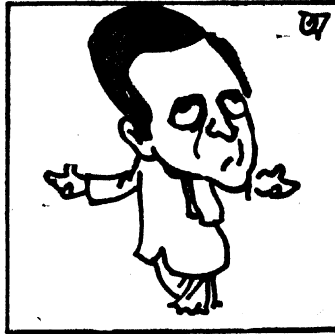
সামনে পোঁ-ও-ও আওয়াজ তুলে পুলিসের পাইলট তীব্র বেগে ছুটতে ছুটতে রাস্তার ভিড়, ট্র্যাফিক সব ক্লিয়ার করে দিচ্ছে, আলো নীল থাক আর লাল থাক আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার তাতে থোড়াই কেয়ার। ঠিক যেন বিধান রায়! সেই এক রবরবা।

তারপর আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার গদি গেল। পুলিস কিন্তু সেই আগের মতই তাঁর ন্যাওটো। কিছু কিছু অফিসার অবিশ্যি বেগোড়বাই করতে শুরু করল। তা এদের আমরা চিনে রেখেছি। কিন্তু বেশির ভাগ থানাই "সঙ্গত" কাজ ঠিক আগের মতই চালিয়ে যেতে লাগল। "হয় নির্বাচন, নয় বিপ্লব" আওয়াজ তুলে আমাদের কমরেডরা নির্বাচনের পথ ক্লিয়ার করার কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চললেন। দেখা গেল, বাবা মারকস, দাদা লেনিন, বৈমাত্রেয় দাদা মাও সবাই পারলামেনটারি পথে অর্থাৎ ভোটের পথে বিপ্লবের কথা বলে গিয়েছেন। অথচ এর আগে ওই চমৎকার কথাগুলো এমনভাবে কখনও নজরে পড়েনি। সুন্দরভাবে আমাদের প্রিয় নেতা-কমরেডদের নির্দেশে আমাদের প্রিয় ক্যাডার-কমরেডরা যখন দেওয়ালে দেওয়ালে ওই সব কথামৃত লিখে দিতে লাগলেন তখন সত্যিই বিশ্বাস হল, সবার উপরে সি পি এম সত্য, তাহার উপরে নাই।

এইভাবে আমরা ধাপে ধাপে "বিপ্লব বিপ্লব শুধু বিপ্লব" থেকে "হয় নির্বাচন নয় বিপ্লব" থেকে কেমন অনায়াসে চলে এলাম "ভোটের পথে বিপ্লবে"। সি পি এম-এর গতি কত স্বচ্ছন্দ!

ভোটের পথও আমাদের প্রিয় কমরেডরা ভালভাবেই সাফ করে যাচ্ছিলেন। নকশালী উৎখাতের নামে আমাদের ঝটিকা বাহিনীর প্রিয় কমরেডরা আমাদের সিওর সিটগুলোকে আরও সিওর করার জন্য পাইকারি হারে শত্রুমেধ যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করলেন। যেখানে ঢোকা আমাদের প্রিয় কমরেডদের পক্ষে অসুবিধাজনক তথা বিপজ্জনক ছিল, সেইসব জায়গায় পুলিস "সঙ্গত" কাজ করে তাঁদের সুবিধা করে দিচ্ছিলেন। আমাদের প্রিয় ঝটিকা বাহিনী অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে যে কত তরুণকে ইহলোক থেকে ঝটকে দিয়েছে, কত হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ব্লক কানায় কানায় ভরে দিয়েছে পুলিসের "সঙ্গত" সহযোগিতায় তার হিসেব একমাত্র আমাদের প্রিয় নেতারাই জানেন। আমাদের প্রিয় নেতাদের নির্দেশ হল, নকশাল কোতলই বিপ্লব। এবং যে সি পি এম নয় সেই নকশাল। আমাদের প্রিয় ক্যাডার কমরেডরা সেই নির্দেশই পালন করছিলেন। কিন্তু এই করতে গিয়ে এখন দেখা যাচ্ছে সি পি এম বিরোধী জোট বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এবং তাদের সমবেত পালটা আক্রমণের মুখে আমাদের কয়েকটা শক্ত ঘাঁটি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কয়েকটা ঘাঁটি সাময়িকভাবে আমাদের হাতছাড়াও হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার খাস তালুক বরানগর নির্বাচন কেন্দ্রের কয়েকটা এলাকা ঠিক বন্ধুর মত বিহেভ দিচ্ছে না। আমরা চাই, আপনাদের পুলিসকে আপনারা এমন "সঙ্গত" কাজ করার নির্দেশ দিন, যাতে পুলিস আরও সক্রিয় হয়ে আমাদের ঝটিকা বাহিনী অর্থাৎ প্রমোদ ব্রিগেডের হাত চালাবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। এই কথাই আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা বলতে চেয়েছেন। বুঝলেন।

আমাদের আরেক দাবি : অবিলম্বে নকশাল নেতা অজয় মুখুজ্জেকে গারদে পুরে দিন। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার বিরুদ্ধে বরানগরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে উনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলেন যে উনিই আসল নকশাল। পুলিস যদি ওকে না ধরে তবে জনগণ জানবে, কাজটি পুলিসের পক্ষে আদৌ সঙ্গত হল না।

মণিরামের পরে

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টি এন সিংকে নিয়ে আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং এস এস পি যা করছেন তা অদ্ভুত ব্যাপার। ত্রিভুবনবাবু নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু তবু ওই তিন দলের নেতারা বলছেন—টি এন সিং মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়বেন না, লোকসভার নির্বাচন হয়ে গেলেই তিনি আবার একটা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনে দাঁড়াবেন।

ন্যূনতম আত্মসম্মানজ্ঞান থাকলেও এই ধরনের কথা কারু পক্ষে বলা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই টি এন সিং এই নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্যই এর প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ, মন্ত্রিত্ব রাখতে গেলে আইনত ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য হতেই হবে। ত্রিভুবনবাবু রাজ্য বিধানসভা বা পরিষদ কোনওটারই সদস্য ছিলেন না। তাই মণিরাম কেন্দ্রে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তিনি পরাজিত হয়েছেন। মণিরামে তিনি কেন হেরেছেন সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু ঘটনাটা হল মণিরামে তিনি বেশ ভাল ভোটেই হেরেছেন। এর পর মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগই স্বাভাবিক। কিন্তু টি এন সিং তা করেননি। তাঁর সমর্থক দলগুলি ঘোষণা করেছেন, টি এন সিং পদত্যাগ করবেন না।

আইনত অবশ্য তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য নন। কারণ, ছয় মাস রাজ্যের কোনও সভার সদস্য না হয়েই তিনি মন্ত্রিত্ব অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে পারেন। ছয় মাসের মধ্যে কোনও কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এলেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে যেতে পারেন।

ব্যাপারটা কিন্তু শুধু আইনের নয়। এর সঙ্গে একটা রীতিনীতিরও প্রশ্ন আছে। টি এন সিং-এর পরাজয়ের পর এখন আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং এস এস পির নেতারা যা বলছেন সভ্য পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ইতিহাসে তার নজির মেলা কঠিন। কোনও সভ্য গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে হেরে গিয়ে কখনও এভাবে পদ আঁকড়ে থাকতে চাইতে পারেন না।

আমি শুধু একটা জিনিস ভাবি : ইন্দিরা গান্ধীর দলের কোনও মুখ্যমন্ত্রী এবংবিধ আচরণ করলে আদি কংগ্রেস, জনসংঘ বা এস এস পির নেতারা কি বলতেন! তাঁরা কি এই নজির দেখিয়ে আরও জোরে চিৎকার করতেন না, প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র ধ্বংস করছেন? তাঁরা কি দেশবাসীকে বলতেন না, দেখ, দেখ ইন্দিরার পার্টির লোকেরা কীভাবে গদী আঁকড়ে থাকতে চায়?

*

মণিরামের পরাজয়ের পরও ত্রিভুবনবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে রাখার দুটো কারণ দেখিয়েছেন তাঁর সমর্থকরা।

প্রথম কারণে প্রথম আসা যাক। আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং এস এস পির নেতারা নাকি মনে করেন, ত্রিভুবন সিং এখন পদত্যাগ করলে রাজ্যে রাজনৈতিক ডামাডোল শুরু হয়ে যাবে।

কেন তা হবে? সংযুক্ত বিধায়ক দল এখনও বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। টি এন সিং পদত্যাগ করার পর তাঁরা যদি অন্য কাউকে নেতা মনোনীত করেন তাহলে প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজ্যপাল তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করতে বাধ্য। সংযুক্ত বিধায়ক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে সেই দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী না করে রাজ্যপালের কোনও উপায় নেই।

যদি তিনি তা না করেন? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যপাল সংযুক্ত বিধায়ক দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করতে রাজী না হন? গায়ের জোরে তিনি তা করতে পারেন বৈকি। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যপালকে দিয়ে সংযুক্ত বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা গঠনের পথে নানা বাধা সৃষ্টি করতে পারেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহলে কি প্রধানমন্ত্রীর মুখে চুনকালি পড়বে না? তাহলে কি সেই কারণেও ভোটদাতারা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাবেন না? তাহলেই কি প্রমাণ করার সুযোগ মিলবে না যে, প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চান?

আমি নিজেই যদি সাধু, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি না মানি তাহলে অপরের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ধ্বংস করার অভিযোগ তোলা আমার সাজে কি?

এই সঙ্গে অবশ্য আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং এস এস পি নেতারা তাঁদের নিজস্ব একটি সমস্যার কথা চেপে যাচ্ছেন। তাঁরা স্বীকারই করতে চাইছেন না যে আজ টি এন সিং পদত্যাগ করলে সংযুক্ত বিধায়ক দলের পক্ষে কোনও বিকল্প নেতা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। কোনও দলের কোনও নেতার নামে আর সবাই রাজী নন। বিশেষভাবে ক্রান্তি দলের তো একমাত্র দাবি তাঁদের নেতা চরণ সিংকেই মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। তাই সংযুক্ত বিধায়ক দলের শরিকরা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের ব্যাপারে যেমন রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয় পাচ্ছেন, তেমনি ভয় পাচ্ছেন নিজেদেরও—অর্থাৎ সহযোগী শরিক দলকেও। মুখে তাঁরা শুধু কেন্দ্রের কথা বলছেন, কিন্তু চরণ সিংয়ের কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না।

ধরুন, লোকসভার আগামী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী নিজে হেরে গেলেন, কিন্তু লোকসভায় তাঁর দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেন। তারপর যদি নব কংগ্রেস ইন্দিরা

গান্ধীকেই প্রধানমন্ত্রী করতে চায় এবং যদি বলে যে, ছয় মাসের মধ্যে তিনি কোনও কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন—তাহলে কি আদি কংগ্রেস, এস এস পি এবং জনসংঘের নেতারা গণতন্ত্র জবাই-এর দোহাই দিয়ে প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দেবেন না?

✻

তিন পার্টির নেতারা দ্বিতীয় কারণ দেখিয়েছেন যে, এস ভি ডি মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করবে এবং তাতে এস ভি ডির শরিকদের নির্বাচনে প্রচণ্ড অসুবিধা হবে।

কথাটা সত্য সন্দেহ নেই। টি এন সিং সরকার থাকলে উত্তরপ্রদেশের লোকসভা নির্বাচনে আদি কংগ্রেস, জনসংঘ এবং এস এস পির সুবিধা হবে। এস ভি ডি বলে নয়, হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে সবাই দলীয় প্রয়োজনে প্রচণ্ডভাবে প্রশাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে না দেখলে পশ্চিমবঙ্গবাসী বোধ হয় অনুমানই করতে পারবেন না যে বিভিন্ন সরকার হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রশাসন যন্ত্রকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে। টি এন সিং সরকার বহাল থাকলেও তা করবেন। আবার, টি এন সিং সরকারের পতন ঘটে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন হলে নব কংগ্রেসও একইভাবে প্রশাসন যন্ত্রকে নির্বাচনে লাগাবে।

কিন্তু শুধু প্রশাসন যন্ত্র হাতে থাকলেই যে নির্বাচন জেতা যায় না মণিপুরেই তো সেটা প্রমাণিত। আবার, যেখানেই প্রশাসন যন্ত্র হাতে নেই সেখানেই যদি ইন্দিরা-বিরোধীরা অসুবিধার কথা তোলেন তাহলে তো ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে তাঁদের পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হওয়াই কঠিন। কারণ, অধিকাংশ রাজ্যে সরকারই ইন্দিরা-পন্থীদের হাতে। আর নির্বাচনে সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকেও গদী আঁকড়ে বসে থাকতে হবে এটাই বা কেমন যুক্তি।

✻

নব কংগ্রেসই হোক, আদি কংগ্রেসই হোক, জনসংঘ বা এস এস পি কিংবা সি পি আই অথবা সি পি এম যারাই হোক বেশী জনপ্রিয়তা এবং সুবিধাবাদের প্রমাণ দেবেন তারাই জিতে উঠবেন। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হতে পারেন, কিন্তু তা বলে তাঁরা বুদ্ধিহীন নন। দেখে শুনে তাঁরা বেশ কিছুটা বুঝতে পারেন বইকি। সুতরাং স্বার্থহীন নির্বাচন হলে সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে কিছুটা পড়বেই।

আর যদি গায়ের জোরের নির্বাচন হয়, যদি জাল ভোটের দ্বন্দ্ব হয়, যদি প্রধানত জাতপাতের লড়াই হয় তাহলে কথা স্বতন্ত্র।

যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ চান তাঁরা নিশ্চয়ই একটা স্বাধীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে চান। তারা নিশ্চয়ই জনমতের কথা ভাবেন! জনমতের কথা ভাবলে যথেচ্ছাচার করা চলে? টি এন সিং হেরে গেলে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে রাখা যায়?

যদি কেউ সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চান তাহলে অবশ্য যথেচ্ছাচারের প্রতিযোগিতায় অনায়াসে নামতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভাঙছেন—এই কথা বলে নিজেরাও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করা কি শোভন কাজ? না, তুমি খারাপ বলে আমাকেও খারাপ হতেই হবে?

৭-২-৭১

নবারুণ গুপ্ত

বিদেশে (৩)

অজগাইয়া যেরকম ওয়াকিফ হবার চেষ্টা না দিয়েই ধরে নেয় দিল্লী মেলও তার ধেধ্ধেড়ে গোবিন্দপুর ফ্ল্যাগ্ ইস্টিশানে দাঁড়াবে এবং চেপে বসে নিশ্চিন্দি মনে তামুক টানে, আমার বেলাও হয়েছিল তাই। আমার অপরাধ আরো বেশী। আমি জেনেশুনেই অপকর্মটি করেছিলুম। আমি ভালো করেই জানতুম যে প্লেনে যাচ্ছি সেটা যদিও জর্মনির উপর দিয়ে উড়ে যাবে, তবু সে-দেশের কোনো জায়গায় দানাপানির জন্যও নামবে না। অবশ্য এ্যার-ইন্ডিয়ার মুরুব্বী আমার, এক গাল হেসে আমায় বলেছিলেন, "এ প্লেনটা কিন্তু প্যারিসে নামে। আপনি সেখানে চলে যান। দু'চারদিন ফুর্তিফার্তি করে চলে যাবেন জর্মনি। খর্চা একই। আর প্যারিস—হেঁহেঁহেঁহেঁ—" সঙ্গে যে মিত্রটি ছিলেন তিনিও মৃদু হেসে সায় দিলেন। দুজনারই বয়স এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ। মনে মনে বললুম, এখন কলকাতা দিল্লীর রাস্তাঘাটেই যা দেখতে পাওয়া যায় প্যারিসের নাইট ক্লাব-কাবারে তার চেয়ে বেশী আর কি ভেল্কিবাজি দেখাবে? তদুপরি বানপ্রস্থে যাবার বয়সও আমার বহুকাল হল তামাদি হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে "নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং?" তাই আখেরে স্থির হল আমি এ্যার-ইন্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারলেন্ডের জুরিচ (স্থানীয় ভাষায় ৎস্যুরিষ্) নামবো। হোথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মোকামে পৌঁছব—অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে। তাই সই।

ফরাসিনীকে বিস্তর 'বঁ ভোয়াইয়াজ' (গুড জর্নি, গুড ফ্লাইট) বলে জুরিচের এ্যার পোর্টে নেমে পাসপর্ট দেখালুম। তারপর গেলুম খবর নিতে কলোনে যাবার প্লেন কখন পাবো। উত্তর শুনে আমি স্তব্ধ, জড়। দেশে বলে,

"অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর॥"

তখন বেজেছে সকাল ন'টা। রামপন্টক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন দ্বিপ্রহরে বর্গালিতার্থে আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা খানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনেছি, যে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের-টান-টান-হাঁটু যেন ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে খাড়া হয়ে খুড়তুতির দিকে গোত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরুতে থাকে।

আমার হল তাই। আমি হয়ে গিয়েছিলুম অচল অসাড়। "স্তম্ভিত" বললুম না, কারণ আজকের দিনের পয়লা নম্বরী এ্যার পর্টে স্তম্ভ আদৌ থাকে না। যাই হোক যাই থাক্, আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝটকা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ আর পটকা বোমার দুদ্দাড় বোম্বাম্। আর হবেই না কেন? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণপটহবিহারক তথা নয়নান্ধকারক আতশ-বাজি ছাড়ছি সেই আতশবাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে "বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্টুঙ" অর্থাৎ "বেঙ্গল রোশনী"; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে "ফ্যদ্য বাঙাল" অর্থাৎ "ফায়ার অব বেঙ্গল"।১

---

১ আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন: এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে "রাম্"মদ তৈরী হত বলে তার নাম গৌড়ী—মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে—যেমন মধু থেকে মাধ্বী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীন দেশে রিফাইনড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনির নাম হল মিসরি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলা দেশে—আতশবাজীর জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীন-দেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়—এবং সেটা ভুল।

তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে বাঙাল রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গসন্তান। আমি আমার "জন্মানি, জন্মানি" অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারো হক্ক থাকে তবে সে আমার। হুহুংকার ছাড়লুম:

"কি বললে? ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা আমাকে এই এয়ার পোর্টে বসে কলোনের প্লেনের জন্য তাজ্জিম মাজ্জিম করতে হবে? আমার দেশ যে-ভারতবর্ষকে তোমরা অন্তর ডিভালাপট কান্ট্রি—সাদামাটা ভাষায় অসভ্য দেশ—বলো সেখানেও তো তিন তিনটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না, কনেকশনের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি রেলগাড়ির কথাই বলছি। আমি যদি আজ ভারতের যে-কোনো ডাক-গাড়িতে করে যে-কোনো জংশনে পৌঁছই তবে আধ ঘণ্টার ভিতর কনেকশন পেয়ে যাই। না পেলে—সেটাও সাতিশয় কালে কস্মিনে—খবরের কাগজে জোর চেল্লাচেল্লি কার (মনে মনে বললুম—অস্মদ্দেশীয় রেলের কর্তারা তার থোড়াই কেয়ার করেন!) অ্যারোপ্লেনের তো কথাই নেই। সে তো আরো তড়িঘড়ি কনেকশন দেয়। আমাকে যত তাড়াহুড়ো করে মোকামে পৌঁছে দিতে পারে, ততই তার লাভ। অনন্ত অন্য প্যাসেঞ্জারের সেবার্থে যেতে পারলে তার আরো দু' পয়সা হয়।...অ। তোমাদের বিস্তর ধনদৌলৎ হয়ে গিয়েছে বলে তোমরা আর পয়সা কামাতে চাও না? আর শোনো ব্রাদার, এ তো হল ট্রেন প্লেনের কাহিনী। গোরুর গাড়ির নাম শুনেছ? বুলক্ কার্ট? সেই গোরুর গাড়িতে করে যদি আমি দশ বিশ মাইল যাই তবে সেখানে পৌঁছেও সঙ্গে সঙ্গে কনেকশন পাই। বোলপুর থেকে ইলামবাজার গিয়ে নদীর ওপারে তদ্দণ্ডেই অন্য গোরুর গাড়ির কনেকশন হামেহাল তৈরী। বস্তুত তখন ওপারের গাড়োয়ানরা গাহককে পাকড়াও করার জন্য যা হৈহল্লোড় লাগায় তার সামনে আন্তর্জাতিক পান্ডা প্রতিষ্ঠানের জেরুজালেম-পান্ডারা পর্যন্ত নতমস্তক হন। এ-নিয়ে আমি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত—খুড়ি, পাঁচখানা ইলিয়াড দশ-খানা ফাউস্ট্ লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত সেটা স্থগিত থাক। আমার শেষ কথা এইক্ষণে শুনে নাও। এই যে আমি কন্টিনেন্টে এসেছি তার রিটার্ন টিকিটের জন্য কত ঝেড়েছি জানো? এক একটা টাকা যেন নাক ফুটো করে কুরে কুরে বেরিয়েছে—তোমরা যাকে বলো, পেইং থ্রু দি নোজ্। রোক্কা ছ' হাজার পাঁচশটি টাকা। তারপর ফরেন একশচেঞ্জ্ গয়রহ হিসেবে নিলে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে সাত হাজারের মত। এ ভূখণ্ডে থাকবো মাত্র তিনটি মাস। এইবারে হিসেব করো তো দেখি, তবে বুঝি তোমার পেটে কত এলেম, এই যে কনেকশনের জন্য আমার তিনটি ঘণ্টা বরবাদ করলে তার মূল্যটা কি? সে না হয় গেল। কিন্তু সে-সময়টা যে বঙ্গরমণীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার জন্য তোমার হৃদয়বনে কোনো সন্তাপানল প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে না? তারা—"

ইতিমধ্যে আমার চতুর্দিকে একটি মিনি ম্যাক্সির মধ্যিখানের মিডি সাইজের ভিড় জমে গিয়েছে। ফ্রী এনটারটেনমেন্ট। অ্যাম সোক্রোতেসপারা, কিংবা দ্রৌপদী যে-রকম রাজসভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন সেই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার এদের হৃদয়-মনে যেন মলয়বাতাসের হিল্লোল, দে দোল দোল খেলিয়ে গেল। এদের বেশীর ভাগই আমার বেদনাটা সহানুভূতি সহ প্রকাশ করছে। "য়া য়া", "উই উই", "সি সি" নানাবিধ ভাষায় আমাকে মিডি-সমর্থন জানাচ্ছে। আমি ফের তেড়ে এগোতে যাচ্ছি এমন সময়—

এমন সময় সর্বনাশ! একটি কুড়ি একুশ বছরের কিশোরী, আমি যাকে কেন্তে মাচ্ছে দিব্য মেরে ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছি, কাউন্টারের পিছনের কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বললে "আপনার টেলিফোন।" তন্মুহূর্তেই সেই মহাপ্রভু তিলমাত্র না করে, যেন সার্সেমিয়ে দে ছুটে দে ছুট। লোকটা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের "আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে" গানটি জানে।

কিশোরী এক গাল হেসে আমাকে শুধোলে, "আপনার জন্য কি করতে পারি স্যর?"

দুত্তোর ছাই। আধ-ফোটা এই চিংড়ির সঙ্গে কি লড়াই দেব আমি।

"নাথিং বাট্ ইয়োর লভ্!" বলে দুম্‌দুম্ করে লাউঞ্জের সুদূরতম প্রান্তে আসন নিলুম।

সব এমব্রয়ডারী করা
কাপড়ই মনে হয়
একইরকম কিন্তু
হাকোবা
এমব্রয়ডারী করা কাপড়
আপনাকে
টাকার পরিবর্তে আরও
বেশি কিছু দেয়।

এই দিন বড় ভাল লাগে

ভবেশ দাশ

এই দিন বড় ভাল লাগে।
এই দিনে প্রতিটি মুহূর্ত
দুর্ঘটনার চাঁদোয়া দিয়ে
ঘেরা।

এই দিনে ঘটনার
বৈদ্যুতিক চাবুকে
নিজেকে জাগাতে পারি।
শত্রুকে সহজে পারি চিনতে, চেনাতে
আলোকে সহজে পারি দেখতে, দেখাতে;
এই দিনে নির্ঘুম কাটানো যায়
স্থির প্রত্যয়ে,
এই দিনে অনিঃশেষ মানুষকে
ঘিরে থাকে বিপন্ন আঁধার।

সে আঁধার ভেঙে ভেঙে
নিজেকে ফোটানো যায়,
বাঁ হাতে মৃত্যু নিয়ে জীবনের মুখোমুখি
একবার দাঁড়ানো যায়
নির্ভীক জ্যোৎস্নার পাশে
এক ভালো নিদারুণ দিনে।

তাই এই দিন বড় ভাল লাগে॥

অবশেষ

বিজয়কুমার দত্ত

চাঁদের দেশ থেকে আনা, পাথর সাজিয়ে
তুমি আমার যাত্রাপথ, দুরূহ করেছ
আমি ভাবছি, অতিক্রম করে যাব—
কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, সাক্ষাৎ মৃত্যুর
বিজ্ঞপ্তি—টাঙানো রয়েছে।

তোমাকে সেই চিরন্তনী কথা বলব বলে
কত অভিমান, আর শব্দের খাড়াই পাহাড়
পেরিয়ে এসেছি—
কত দুর্গম গ্রাম-নগরের মিলিত ধ্বনির
অভাবিত ব্যঞ্জনা শিখেছি,
অথচ সেই ঝলমলে কথা উচ্চারণের আগে
আমার প্রখর বাক্‌শক্তি স্তব্ধ।
যেদিকে চাই, আর যেখানে যেতে চাইছি
সর্বত্রই দেখছি নিষেধের অনুশাসন
রক্তচক্ষু মেলে ধরছে
আমার হৃদয় ভালোবাসতে গিয়ে
ঝি ঝি করে জ্বলে উঠছে—
এই দুরন্ত আক্রোশে জীবনকে মুঠোয় ধরে
কখনো ট্রামের ফুটবোর্ডে, কখনো মিছিলে
টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিই,
যদি করতলে, কিছু অবশেষ থাকে
সেই শেষ চিহ্ন রাখব—তোমার দৃপ্ত পদতলে।

ভয়

সামসুল হক

শৈশবের আর কৈশোরের ভয় আমার
পশ্চিম দিকের বজ্রে মৃত্যু
মায়ের মুখ
কিংবা ঐরকম অন্য কিছু
সে-সময় অদৃশ্য
শুধু দুপুরের ছাদের ছায়ায় পুতুলের সংসার
সারা চোখ জুড়ে
আমার অজস্র চোখ জুড়ে

প্রথম যৌবনের ভয় আমার
শিশিরমাখা ঘাসের জ্যোৎস্নায়
সর্পাঘাতে মৃত্যু
শিশিরের যৌবন
ঘাসের যৌবন
জ্যোৎস্নার যৌবন
একত্রে মিলে এক ধারালো লাল সাপের যৌবন
আর প্রথম যৌবনের ভয় আমার
জ্যোৎস্নামাখা ঘাসের শিশিরে
সর্পাঘাতে মৃত্যু
প্রেমিকার মুখ
কিংবা ঐরকম অন্য কিছু
সে-সময় অদৃশ্য
শুধু ঘড়া-বোঝাই সোনা যে-নিশ্চুপ দীঘির তলায়
তার উপরের দুর্দান্ত প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম
সারা চোখ জুড়ে
আমার অজস্র চোখ জুড়ে

এখনকার মাসের বৎসরের নানান আয়তনের সময়ের
ভয় আমার
মাথায় ভুল মোরগের ঝুঁটি সাজানো
দারুণ-দারুণ ভুলভাল কাজে অভ্যস্ত
গুপ্তঘাতকের হাতে মৃত্যু
জানলার গরাদ
খাটের তলার ছায়া
সিঁড়ির নিশ্চিত শব্দ
নানান পরিচিত মুখের অপরিচিত রেখা
আমার অনিদ্রার কারণ
আর যতোই নিদ্রাহীনতা সার্বিক সম্ভাবনায় অবধারিত
গুপ্তঘাতকের হাতে মৃত্যু
পুত্রের মুখ
কিংবা ঐরকম অন্য কিছু
সে-সময় অদৃশ্য
শুধু সারা গ্রীষ্ম টো-টো করে ঘুরে
অল্প দামে কেনা
কবিতার বইয়ের আলমারি
সারা চোখ জুড়ে
আমার অজস্র চোখ জুড়ে

ইত্যাদি ইত্যাদি। সাবিত্রী নীরবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখ মুখের অদৃশ্য অগ্নি শিখার বার্তা সম্ভবতঃ ডাক্তারবাবুর মনে গিয়া পৌঁছিল। তিনি বলিলেন—তোমার যদি সামর্থ্যে না কুলোয় হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই ভালো। তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি সেইটে নিয়ে তুমি হাসপাতালে যাও। চিঠি লইয়া সাবিত্রী সাতদিন হাসপাতালের ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করিল। কিছুই হইল না। একটি রোগী বলিল—এখানেও বিনা পয়সায় কিছু হয় না, ঘুষ দিতে হয়। এ কথা শুনিবার পর সাবিত্রী আর হাসপাতালে যায় নাই। অত টাকা পাইবে কোথায় সে? বিনা চিকিৎসাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল আবার। আবার সে রাস্তায় ঘুরিয়া মুটেগিরি শুরু করিল। একদিন তাহার এক সাথী তাহাকে বলিল—দেখ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তুই যদি কোন-রকমে ছ মাস আলিপুর জেলে কাটাতে পারিস, তোর যক্ষ্মা ভাল হয়ে যাবে—'

'জেলে গেলে যক্ষ্মা সেরে যাবে, বলিস কি।

রিপুর কথাটা প্রথমে বিশ্বাসই করিল না।

সঙ্গী বলিল—'হরু জেল থেকে ভালো হয়ে ফিরে এসেছে। তার যক্ষ্মা হয়েছিল। সেখানে খুব ভাল হাসপাতাল আছে। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। তুই জেলে চলে যা।'

কয়েক দিনের মধ্যেই রিপুকে ট্রামে পকেট কাটিতে গিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িল। সবাই যথেষ্ট প্রহার করিল তাহাকে এবং শেষে পুলিসের হাতে সঁপিয়া দিল।

আদালতে বিচারক বলিলেন—তুমি তোমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য উকিল দিতে পার। উকিল নিয়োগ করবার সামর্থ্য যদি না থাকে আমরাই তোমার পক্ষে উকি[ল] দিতে পারি একজন—'

রিপুকে হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, উকিলের দরকার নেই। পুলিস বলছে তা সত্য। আমি চুরিই করব বলে ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলাম।

বিচারক রায় দিলেন—'পঞ্চাশ টাকা জ[রি]মানা, অনাদায়ে একমাস জেল।'

রিপুকে হাত জোড় করিয়া বলি[ল]—ধর্মাবতার, টাকা আমি দিতে পারব [না]। কিন্তু আমাকে এক মাস জেল না দি[য়ে] ছ' মাস জেল দিন।'

বিচারক অবাক হইলেন।

'ছ' মাস জেল চাইছ কেন?'

'আমার যক্ষ্মা হয়েছে। শুনেছি আ[লিপু]রে জেলে যক্ষ্মার ভালো চিকিৎসা হ[য়], ছ মাসে সেরে যায়।'

বিচারকের রায় কিন্তু বদলাইল [না।] জেলের হাসপাতালে কিছু চিকি[ৎসা] হইয়াছিল কিন্তু অসুখ সারিল না। রিপু কাশিতে কাশিতেই জেল হইতে বাহির হ[ইয়া] আসিল এক মাস পরে। ইহার পর আ[র] এক মাস বাঁচিয়া ছিল সে। একদিন গভী[র] রাতে খুব কাশিতে কাশিতে উঠিয়া বসি[ল] এবং মায়েরই পায়ের উপর প্রচণ্ড রক্ত [বমি] করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল বেচারা।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল সাবি[ত্রী] ... তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে ... বাহির হইতে লাগিল। এক ফোঁটা অ[শ্রু] বিসর্জন করিল না সে।

ইহার মাস দুই পরে নির্বাচন হইয়া গি[য়াছে]। সাবিত্রী তখন একা ... তাহার ... একজন ভোটপ্রার্থী আসি[য়া] উপস্থিত হইলেন।

সাবিত্রী তাঁহার দিকে অগ্নি দৃষ্টি তুলি[য়া] বলিল, 'আপনাকে ভোট দেব? কেন? [কী] উপকার করেছেন আমার? আপনি ... ছিলেন—তখন আমার বিপদে ... সামান্য উকিলের মতো মারা গেছে আমার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখ[াতে] পারি নি। ... সে ... খেতে পায় না। ছোট ছেলেটা মারা যক্ষ্মায়, তার কোনও চিকিৎসা হল না, সরকারী ... আপনাকে ভোট দেব কেন, কাউকে ভোট দেব না—'

ভোটপ্রার্থী ভদ্রলোক বলিতে গেলেন 'কিন্তু ... —'

কিন্তু সাবিত্রী তাঁহাকে কথা শেষ করি[তে] দিল না।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠি[ল] 'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—'

তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক বাহির হ[ইয়া] গেলেন।

সশব্দে করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া [দিল] সাবিত্রী।

যেমন প্রদীপ জবলে তেমনি তাঁর চরিত্রের যা কিছু নিষুপ্ত শুভবোধ তা গান্ধীজির চরিত্র স্পর্শে জাগ্রত হয়েছে—গান্ধীজির জীবনবেদে উজ্জীবিত হয়েছে তাঁর যা কিছু প্রেরণা। এন্ডরুজ গান্ধীজির প্রতি সশ্রদ্ধ চিত্তে আরো বলেছেন—"ঐ আকাশের তারকাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, তেমনি অবিনশ্বর চিরন্তন চির নূতন সত্যের মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী।"

ডারবান থেকে ফিরে সে বছরই এপ্রিলে এন্ডরুজ শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। ১৫ এপ্রিল আম্রকুঞ্জের সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদেশী সখাকে কবিতার ছন্দে স্বাগত জানিয়ে বললেন—প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার/হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।/প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার/হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।/খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার/হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার/তোমারে পেয়েছি মোরা দান রূপে যাঁর/হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।"—শুধু সংবর্ধনা নয়—গুরুদেব সেবার নববর্ষের দিন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থ এন্ডরুজকে উৎসর্গ করলেন। এর পর শুরু হলো ভারত কল্যাণব্রতীর আশ্রমিক জীবন। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজে এন্ডরুজের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। সে যুগের আশ্রমবাসীর ভাষায় "খালি পা, পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি, গায়ে হাতকাটা পাঞ্জাবি, সাদা দাড়িগোঁফ, মুখে সরল হাসি—তিনি হনহন করে চলেছেন কাঁকর-ঢালা রাঙা রাস্তায়। এ-ছবি যেন এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।"

কিন্তু চিরপথিক এন্ডরুজের এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে ঘরবাঁধা সম্ভব ছিল না—ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তাঁর তরে—তাই শান্তিনিকেতনে সপ্তাহ খানেক স্থায়ী হওয়ামাত্র হয়তো তাঁর ডাক পড়েছে সবরমতি কিংবা সেবাগ্রাম থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রিটিশ গায়েনা, হংকং, মালয়, মরিশাস, ফিজি—সবত্রই তাঁর কর্মস্থল। আর্ত-অপমানিত মানবাত্মার আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন বারবার। ফিজির ভারতীয়রাই তাঁকে সর্বপ্রথম 'দীনবন্ধু' আখ্যা দেন। ভারতবর্ষের শ্রমিক-আন্দোলনের স্রষ্টাদের মধ্যে এন্ডরুজ একজন। আসাম ও পূর্ববঙ্গ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারত, সিংহল, পাঞ্জাব সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন—নানা প্রদেশের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন করেছেন, সামান্যতম প্রাণ যেখানে নির্যাতিত সেখানেই মমত্বপূর্ণ প্রাণ নিয়ে এন্ডরুজ উপস্থিত হয়েছেন। অত্যাচারী মানুষের সমব্যথী তিনি—সহৃদয় সঙ্গী তিনি। কোথাও যদি বন্যা, দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারীর খবর পেয়েছেন দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ ছুটেছেন সেখানে। তারই মাঝে বই লিখেছেন—বিষয়বস্তু ভারত-ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রসমস্যা সম্পর্কে, আড়কাঠি ও আফিম ব্যবসার বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী প্রসঙ্গে। আবার মিস মেয়োর কুখ্যাত 'মাদার ইন্ডিয়া'র প্রতিবাদে পাড়ি দিয়েছেন আমেরিকা, দেখা করেছেন লেখিকার সঙ্গে, প্রতিবাদ জানিয়েছেন 'ট্রু ইন্ডিয়া" লিখে। কিন্তু সময় অত্যন্ত কম কারণ তারই মাঝে আবার চা-বাগানের কুলি ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন—চাঁদপুরে ধর্মঘটীদের সঙ্গে মাটিতে শুয়েছেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। কংগ্রেসের অনুসন্ধান কমিটির পক্ষে পাঞ্জাবের শহরে গ্রামে দিনরাত্রি ঘুরে ঘুরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন আর স্বজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়ে। ওদিকে আবার আছে শান্তিনিকেতনের দায়িত্ব—সেখানকার অধ্যাপনা, বৃদ্ধ বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের রিকশটানা, বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থসংগ্রহ। আছে স্বাধীনতা-আন্দোলনের কাজ। গান্ধীজি অনশন করেছেন, শঙ্কিতচিত্ত দীনবন্ধু সমুদ্রপারের রাষ্ট্রপতিদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ফল?—কি পেয়েছেন তিনি? একদিকে স্বজাতি ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছেন অবজ্ঞা আর অপমান—অন্য দিকে ভারতবর্ষের কিছু কিছু লোকের কাছ থেকে জুটেছে সংশয় আর সন্দেহ। তা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত নির্যাতিত, নিপীড়িত ভারতবাসীর পাশে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক হবে—তাঁর এই বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত। গান্ধীজি কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু পথযাত্রী এন্ডরুজকে যখন শেষ দেখা দেখতে এলেন তখন এন্ডরুজ মহাত্মাজীর কানে কানে বললেন—"মোহন, স্বরাজের আর দেরি নেই, এ আমি স্থির দেখতে পাচ্ছি।"—এই ঘটনার কিছু কাল পরেই ১৯৪০-এর ৫ এপ্রিল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ ভাষণ "সভ্যতার সংকট"-এ স্মরণ করেছেন তাঁর এই মহান বন্ধুকে—লিখেছেন—"তাঁর (এন্ডরুজের) মধ্যে যথার্থই ইংরেজকে যথার্থ খৃীষ্টানকে যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থ সম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে — দিয়েছে।"

নতুন
'স্বাভাবিক চেকনাই'
ফরমুলার কারণে
টাটার শ্যাম্পু
আপনার চুলকে
আগের চাইতে আরও
নরম, রেশম-কোমল,
আরও পুষ্ট ক'রে
তোলে!
অজস্র ফেনা...
পরিষ্কার
চুলের চেকনাই...
কত সহজেই জায়গামত বসে
টাটার শ্যাম্পুর নতুন 'স্বাভাবিক চেকনাই' ফরমুলা আপনার চুলে কী তফাৎ এনে দেয় নিজেই দেখুন। আপনার চুল পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে চুল পুষ্ট রাখে, তাই আপনার চুল আরও নরম, রেশম-কোমল হয়ে ওঠে এবং আগের চাইতে আরও সহজে জায়গামত বসে। মনে রাখবেন, টাটার শ্যাম্পু বিশুদ্ধ নারকেল তেল থেকে তৈরী—আপনার চুলের পক্ষে খুবই ভাল।
৩ সাইজে পাওয়া যায়। পরিবারের সকলের ব্যবহারের উপযোগী বড় ইকনমি বোতল কিনুন।
বিশেষ সুযোগ। চিরন্তনী ও আধুনিক কেশসজ্জার সচিত্র পুস্তিকা বিনামূল্যে পাবার জন্য এই কুপনটি কেটে ও সেই সঙ্গে ৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে এই ঠিকানায় পত্র লিখুন: দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড, বম্বে হাউস, ব্রুস ষ্ট্রীট, বোম্বাই-১।
10
নতুন
উন্নত
ফরমুলা
NEW!
IMPROVED
Tata's
SHAMPOO
টাটার-এই শ্যাম্পু ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়

নিয়ে ভিতরে ঢুকছে। ওদিকেও মিটিমিটি হাসছে।

কাপ দুটো টেবিলে নামিয়ে রাখতে রামানন্দ কটমট করে তার মুখের দিকে তাকাল।

'কেক আছে? ভাল কেক?'

'চপ খান বাবু, মাংসের চপ, এই মাত্তর ভাজা হল, খুব গরম পাবেন।'

'বেশি কথা বলতে শিখেছ।' রামানন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার গলায় রাগ ফুলে উঠল। 'আমি কেক চাইছি, চপের কথা তো তোমায় বলা হয়নি।'

ছোঁড়া আর হাসল না। মুখটা কালো করে ফেলল।

'কদ্দিন এই দোকানে আছ?' কড়া সুরে রামানন্দ প্রশ্ন করল।

'এই তো গেল আশ্বিন থেকে।'

'যাও, ভাল কেক থাকে তো দুটো নিয়ে এসো—দেরি করলে চলবে না।'

সুবোধ ছেলের মত ঘাড়টা নেড়ে ছেলেটা বেরিয়ে গেল।

'আপনি একটা চপ খেলে পারতেন।'

'পাগল হয়েছ তুমি।' যুবতীর চোখে চোখ রেখে রামানন্দ ঈষৎ হাসল। 'আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না, তা হলেও কেকের কথা বললাম, একটু কড়া করে বেটাকে দুটো কথা শোনাবার খুব ইচ্ছে করছিল, ভয়ানক তে'দড়, দুজন এখানে ঢুকেছি, সেই থেকেই কেবল হাসছে।'

'শেয়ালদার দোকান তো—' রেখা সামান্য হাসল। 'অনেক রকমের পুরুষ মেয়ে এখানে চা খেতে আসে।'

'তা আমি বুঝতে পেরেছি।' চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিল রামানন্দ। 'হুঁ, কি বলছিলে তুমি—হাজরার সেই কবি সম্মেলন, তুমিও সেখানে ছিলে বুঝি?'

রেখা থুঁতনি নাড়ল।

'সেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম।'

'বিকাশ আমার বন্ধু—কিছুতেই তাকে এড়াতে পারলাম না, অথচ সে জানে ওসব সম্মেলন টম্মেলন আমার একদম ভাল লাগে না।'

'আমি জানি, কবি রামানন্দ সেন যে সাহিত্য সভাটভায় কোনোদিনই যান না, বিকাশদার মুখে শুনেছি। তা হলেও আমাদের খুব ইচ্ছা করছিল আপনাকে দেখতে, আমরা সবাই মিলে বিকাশদাকে চেপে ধরেছিলাম, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে—'

'তুমি বুঝি ওদিকেই থাক, হাজরার দিকে?'

রেখা মাথা নাড়ল।

'আমি ধারেকাছেই থাকি, ডক্টর্স লেনে। হাজরায় আমার মামাতো বোন অপর্ণারা থাকে। ওদের বাড়িতেই তো ফাংশনটা হয়েছিল।'

'হুঁ, দেখলাম খুব সাজানো গুছানো বাড়ি। মনে হল বেশ বড়লোক—'

রামানন্দ থেমে গেল। ছেলেটা ভিতরে ঢুকল। মুখটা বেশ বেজার। দুটো প্লেটে দুখানা কেক সাজিয়ে এনেছে। দুজনের সামনে প্লেটদুটো নামিয়ে রেখে তেমনি ঘাড় গুঁজে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রেখার চোখে চোখ রেখে রামানন্দও নিঃশব্দে হাসল।

'এবার খুব ভাল ছেলে হয়ে গেছে।' রেখা আস্তে বলল।

রামানন্দ কেক ভেঙে মুখে পুরল।

'সেদিন তোমাকে ওখানে দেখেছিলাম কিনা মনে করতে পারছি না।'

'না—রে গুচ্ছের মধ্যে একত্র হয়েছিলাম, ছেলের সংখ্যাও কম হল কি, অত ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একদিন কাউকে দেখে সেই মুখ মনে রাখা যায় বুঝি।'

'কিন্তু তুমি তো আমায় বেশ মনে রেখেছ, রাস্তায় দেখা হতেই ঢিপ করে প্রণাম করলে।'

যুবতী অল্প শব্দ করে হাসল। মাথার তুলনায় খোঁপাটা বেশ বড় ছড়ান। কাজল বুলানো চোখ দুটো দীঘির মতন টলটল করছে। এমনি বেশ ফরসা, তা হলেও গালদুটো একটু রঙ ছোপান হয়েছে। ঠোঁটে অবশ্য রং ছিল না। আর একটা জিনিস রামানন্দ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিল। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। সেই তুলনায় বুকের দিকটা কত বড় ও ভারি মনে হয়। এই জন্যই কি দোকানে ঢুকবার সময় শ্রীমতী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটছিল। স্তনভারাবনতা? শুভেন্দুদের পাড়ায় একবার সরস্বতী পুজোয় অবিকল এমন একটি আধুনিক সরস্বতী ঠাকুরুণ আনা হয়েছিল। শুভেন্দুর জেঠামশাই মূর্তি দেখে ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। কিন্তু পাড়ার ছেলেদের ব্যাপারে ভদ্রলোক শব্দ করতে পারেনি। অনেক দিন পর কথাটা মনে হতে রামানন্দর ভিতরে ভিতরে হাসি পেল।

'হুঁ, চুপ করে আছ, দেখা হতেই হুট করে পায়ে ধরে এতবড় একটা পেন্নাম, এমন ঘাবড়ে গেলাম আমি, ভাবলাম ভুল করে বুঝি তুমি কাউকে—'

'আপনাকে ভুলব?' অনবদ্য ভ্রূভঙ্গি করে রেখা চক্রবর্তী আবার হাসল। 'সেদিন অপর্ণাদের বাড়ি দল বেঁধে আপনাকেই যে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম, সেই আসরে আপনিই তো সব ছিলেন, এতবড় কবিকে অত সহজে ভোলা যায়? একদিন দেখার পর চিরকালের মতন মনে ছাপ থেকে গেছে।'

'বাস!' রামানন্দ প্রথম হাসল, তারপর ভুরু কুঁচকোল। 'এত বড় কবি! কার কাছে শুনেছ রামানন্দ সেন একটা সাংঘাতিক বড় কবি। বিকাশ বলছিল বুঝি?'

'তা বিকাশদার মুখে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি জেনেছি বইকি, ও'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনি, কিন্তু আমরা কি জানতাম না যে, রামানন্দ সেন বিকাশ চাটুয্যে, শুভেন্দু ভৌমিক, নবকিশোর চৌধুরী, উৎপলেন্দু গুপ্ত—মানে যাঁদের নিয়ে আজকের পদাবলী গোষ্ঠী গড়ে

উঠেছে, আপনি তাঁদের মধ্যমণি, আপনাদের পাক্ষিক কবিতা পত্র পদাবলীর নিয়মিত পাঠিকা আমি, গ্রাহিকা তো বটেই, কাগজ পেতে একদিনও দেরি হলে আমি রাত্রে ঘুমোতে পারি না, ভীষণ ছটফট করি, আমার মনে হয় আমার চারদিকের হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আমি মরে যাব—আমি আর—'

রামানন্দ হো-হো করে হেসে উঠল। টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে বসেছিল। এত জোরে সে হাসল, মনে হল হয়ে শরীর রেখে হাসিটা টেবিলের ওপর নেমে এসে কাপ ডিশ কাচের গেলাসসহ টেবিলটাকে কাঁপিয়ে দিল। থ্যাবড়া মতন একটা নাক, কপালটা চওড়া এবং একটু উঁচুও বটে, দম্ভটে ধরনের মুখ হলেও মুখের আকৃতির তুলনায় চিবুকটা বেশ মোটা ভারি দেখায়, ফলে কারো কারো মনে হতে পারে লোকটার সংকল্প দৃঢ় নয় না আছে, তার চেয়ে মনের মধ্যে আবেগ-উত্তেজনাগুলি বেশি কাজ করে। শিল্পীদের যেমন হয়, রামানন্দর হাতের আঙুলের মাথাগুলি মোটেই সরু, ছুঁচলো না, একটু গোল চ্যাপটা এবং আঙুলের গিঁটগুলিও কেমন অসমান এবড়োখেবড়ো।

যুবতীর মুখের কথা থেমে গেছে, কেমন থমকে আছে ও, বিস্মিত অপ্রস্তুত হয়ে করুণ চোখে রামানন্দকে দেখছিল, কেন না যে কথা ও বলছিল, ওর যেন মনে হল একটা ঝড়ো উচ্চ হাসি হেসে রামানন্দ সব উড়িয়ে দিল।

সরো রুমালটা পার্স থেকে তুলে রামানন্দ চোখের কোণ মুছল। সম্ভবত এত জোরে হাসার দরুন চোখের কোণ ভিজে উঠেছে।

যুবতী একটা অস্পষ্ট ঢোঁক গিলল, তারপর কেমন যেন কান্নার সুর করে বলল, 'আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না, আমি মিথ্যা বলছি?'

'অ্যা, তা বলবে কেন।' রামানন্দ আর হাসল না, আস্তে মাথা ঝাঁকাল। 'খুব মজা লাগছে কথাগুলো শুনে, পাক্ষিক পদাবলী সময় মতন না পেলে কারো চোখে ঘুম আসে না, ছটফট যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তোমার মুখে এই প্রথম শুনলাম, শুভেন্দু, বিকাশ ওরা জানতে পারলে বেজায় খুশি হবে। না কি বিকাশকে বলেছ।'

একটু চুপ থেকে যুবতী হাতের রুমালটা নাড়াচাড়া করল, তারপর রামানন্দর দিকে চোখ তুলল।

'আমি আপনাকে কি করে বোঝাব রামানন্দ সেনের কবিতার কত বড় ভক্ত আমি। কবিতার চলতি ফর্ম ভেঙে গুঁড়িয়ে এই বয়সেও যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন আপনি, রৌদ্র ছায়ার মতন কখনো উজ্জ্বল আশা, কখনো বিষাদ অস্থিরতা নিঃসঙ্গতার টুকরো টুকরো ছবি সাজিয়ে মাতিসের ছবির মতন যে আশ্চর্য ইমেজ আপনি সৃষ্টি করেন—না, আর কারো মধ্যে আমি এই জিনিস পাই না, রামানন্দ সেনের কবিতা পড়তে পড়তে আমি অবশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি—আমার সমস্ত কেমন ওলোটপালট তছনছ হয়ে যায়।'

'তোমার এটা ভুল ধারণা, ওগুলো আসলে কবিতাই নয়, রামানন্দ সেন কবিতা লিখতে পারে না, কিছুই হচ্ছে না ওসব।'

'এটা আপনার বিনয়, এত বড় কবি বলেই এসব কথা বলছেন, হ্যাঁ, শুনুন, একমাত্র পদাবলী কবিতা-পত্রেই আপনার কবিতা পাই, অন্য কোথাও আপনি লেখেন না, এই জন্য ওই কাগজটা নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা, এত উদ্বেগ।'

'আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি।' রামানন্দ এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসেছিল, এবার পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসল। 'গত দু' সংখ্যার পদাবলীতে আমার কবিতা নেই লক্ষ্য করেছ?'

'হুঁ, এটাই তো আমি জানতে চাইছি, কারণ কি, কদিন ধরে ছটফট করছিলাম, কোথায় গেলে আপনার দেখা পাই, পরশু

বিকাশদার সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞেস করতে বলল, ক'দিন নাকি আপনি ওঁদের কলেজ স্ট্রীটের আড্ডায়ও একদম যাচ্ছেন না, এদিকে পুরোনো বাসাও আপনি নেই শুনলাম, ছেড়ে দিয়েছেন, আপনার নতুন ঠিকানাও বিকাশদা বলতে পারল না—'

'না, ওরা আমার নতুন ঠিকানা জানে না।'

'বলল বেলেঘাটার ওদিকে কোথায় যেন থাকেন।'

রামানন্দ 'হুঁ' 'হ্যাঁ' কিছু শব্দ করল না।

'আগামী সংখ্যার পত্রিকাতে নিশ্চয় আপনার কবিতা দেখতে পাব।'

'না হয় না', রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'আমি আর কবিতার জগতে নেই।'

'আপনার রক্তের মধ্যে কবিতা, আপনার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কবিতা মিশে আছে—কবিতা না লিখে আপনি বাঁচবেন না যে।' এক ঝলক হেসে রুমালটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাল রেখা।

'আজ যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে—হঠাৎ এভাবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।'

'কবিতা পড়তে এত ভালবাস, লিখছও নিশ্চয়?'

যুবতী কথা বলল না। তার ব্যাগটা খুলে ঘাড় গুঁজে কিছু একটা খুঁজছিল। পেয়ে গেল। লাল টুকটুকে ছোট্ট একটা মনিব্যাগ বের করল।

চা খাওয়া শেষ, এবার উঠবার পালা। এর হাতে মনিব্যাগ দেখে রামানন্দর হুঁশ হল।

'উঁহু, আমি দেব।' রামানন্দ তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত ঢোকাল। অবশ্য খুব একটা জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারছিল না। কেন না সে সন্দেহ করছিল সবটা বিল মেটাবার মতন যথেষ্ট রেস্ত তার সঙ্গে আছে কিনা। 'বয়।' একটু কাঁপা গলায় ডাকল সে।

'আপনি চুপ করুন তো।' ধমকের সুর ছিল যুবতীর গলায়। 'এই নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

ছেলেটা ছুটে আসতে রেখা তার হাতে দু' টাকার একটা লাল নোট তুলে দিল।

'আর লাগবে?'

'না না, এই থেকেই তো আপনি বেলা চেঞ্জ ফেরত পাচ্ছেন।' দাঁত ছড়িয়ে ছেলেটা আগের মতন হাসল।

'চট করে নিয়ে আয়।' রেগে গিয়ে রামানন্দ জোরে ধমক লাগাল। ছোঁড়া বেরিয়ে যেতে রামানন্দ রেখার দিকে চোখ ফেরাল। 'আমার প্রশ্নের কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়নি।'

'কি? কবিতা?' রেখার চোখের পালক নেচে উঠল। যেন গালেও সামান্য লজ্জা ও খুশির রঙ লাগল। 'রামানন্দ সেনের সামনে কি করে বলি যে আমিও একটা-আধটা কবিতা লিখছি।'

'খুব ভাল, চমৎকার—কোন্ কাগজে বেরোচ্ছে?'

'কাগজে তেমন কিছু না, হাওড়া থেকে দু' মাস অন্তর বেরোয়, লিটল ম্যাগাজিন—সায়াহ্নের নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' রামানন্দ চোখ বন্ধ করল। 'একবার একটা কপি আমার কাছে পাঠিয়েছিল ওরা। সেবার আমাদের শুভেন্দুর কবিতা ছিল।'

'আপনি দেবেন ওদের একটা কবিতা? আমায় একবার বলেছিল, পেলে ওরা এত খুশি হবে!'

'আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি।' এবার রামানন্দর মুখের চামড়া শক্ত হয়ে উঠল। যুবতী আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

চেঞ্জ নিয়ে বয় ফিরে এল। তার হাতে একটা সিকি তুলে দিয়ে রেখা বাকি পয়সা ব্যাগে পুরল।

'চলুন এবার ওঠা যাক।'

'কটা বাজছে?' রামানন্দ চেয়ার ছেড়ে উঠল।

'হুঁ, তা অনেক বেলা হল।' ফরসা সরু কব্জি তুলে রেখা ঘড়িটা দেখল। 'পৌনে একটা।'

পর্দা সরিয়ে দু'জন বাইরে এল। কখন খদ্দের গিসগিস করছে, যেন আগের চেয়েও সংখ্যায় বেড়ে গেছে। হবে, রামানন্দ চিন্তা করল, অনেকেই মধ্যাহ্নের আহার পর্বটা এসব দোকানে এসে সেরে নেয়, একটু আগে খুপরীর দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা চমৎকার খাদ্য তালিকাটা মনে মনে সে পড়ে ফেলেছিল, ভাত, মাংসের কারী, ডিমের ঝোল, মাছের কালিয়া—অনেক কিছু, কাজে এরা মোহনবাবুর দোকান না যে কেবল বাসী অমলেট চপ আর চা খাইয়ে মানুষকে তুষ্ট রাখবে। অবশ্য বেচারা মোহনবাবুর দোষ নেই, তারা কবির দল ছাড়া সেখানে আর খদ্দের ছিল কোথায়। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দোকানের চেহারাটা রামানন্দ দেখে নিচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই ফাজিল ছোঁড়াটা, কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে এদিকে তাকিয়ে আছে, রামানন্দকে দেখছে রেখাকে দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে। বেআদপির সীমা আছে। রামানন্দর দু' কান গরম হয়ে উঠল। রাগ সামলাতে না পেরে ছুটে গিয়ে বাঘের মতন থাবা তুলে ছেলেটার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে দোকানের ভিতরটা থমথমে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা অনেকের চোখেই পড়ল। তাদের হাতের কাঁটা চামচ থেমে গেছে, চা খাচ্ছিল, চা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, গল্প করছিল কেউ কেউ, কথা থেমে গেছে। উত্তেজনায় রামানন্দ থরথর করে কাঁপছিল, ছেলেটা কিন্তু শব্দ করছিল না, কাঁদছিলও না, ঘাড় গুঁজে চুপ করে আছে।

কিন্তু এই থমথমে ভাব বেশিক্ষণ থাকল না, তৎক্ষণাৎ কাউন্টারের ওপাশ থেকে একজন বেরিয়ে এল, হয়তো দোকানের মালিক হয়তো ম্যানেজার।

'কি হয়েছে মশাই, আমার কর্মচারীকে আপনি মারলেন কেন?' ঘাড়ে গর্দানে চর্বি নিয়ে দশাসই চেহারা মানুষটার। চোখ লাল করে রামানন্দর দিকে তাকাল।

'আপনার কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করুন না কি হয়েছে, কি করেছে ও?' রামানন্দও কড়া করে জবাব দিল।

'এই, কি করেছিস তুই?'

'আমি কিছুই করিনি ম্যানেজারবাবু।' হাতের পিঠ দিয়ে ছেলেটা চোখ রগড়াতে আরম্ভ করল। 'চা চেয়েছিলেন উনারা, চা দিয়ে এসেছি, পরে কেক চাইলেন, কেক দিলাম, তারপর বিল মেটাবার জন্য দশ টাকার একটা নোট দিতে আমি আপনার কাছে দাম রেখে খুচরো ফেরত দিয়ে এলাম, আমি তো কিসসু বলিনি বাবুদের।'

'কি হল মশাই? এবার আপনি বলুন আমার বয়ের অপরাধটা।' ট্রাউজার্সের দু' পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে রেখেছিল ম্যানেজার, পকেট থেকে দু' হাত এক সঙ্গে বের করল।

'আমাদের দেখে ও হাসছিল, জিজ্ঞেস করে দেখুন, এখানে ঢুকেছি পর থেকে কখনো দাঁত ছড়িয়ে, কখনো ঠোঁট টিপে হাসছিল। এমন বদমাশ কর্মচারী আপনি রাখেন কেন?'

'কেন আপনাদের দেখে হাসবে কেন কারণটা কি?' রামানন্দর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ম্যানেজার দরজার পাশে দাঁড়ান সুন্দর চেহারার মেয়েটিকে দেখল। রেখাও ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, রামানন্দ হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করবে সে ভাবতে পারেনি। এবং তার ফলে যে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটবে প্রতি মুহূর্তে সে আশঙ্কা করছিল। এদিকে তার হাতে মোটে সময় নেই। এখনি ত কে ডালহৌসীর বাস ধরতে হবে।

'উনি আপনার কে হন?' ম্যানেজার রামানন্দর দিকে মুখ ফেরাল।

'আমার কেউ হন না।' রামানন্দ গোঁয়ারের মতন উত্তর করল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে খদ্দেরদের মধ্যে একজন বিশ্রী গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল।

'আপনার কেউ হন না', ম্যানেজার গলার স্বরটা এবার বেশ চড়িয়ে দিল ও সেই সঙ্গে দু' হাত শূন্যে ছড়িয়ে নাচাতে লাগল। 'কিন্তু আপনার পরিচিত নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, একটু-আধটু পরিচয় হয়েছে বইকি। উনি ধারেকাছেই থাকেন, চক্রবর্তী লেনে বাসা, কবিতাটবিতা লেখেন।' রামানন্দ মাথা ঝাঁকাল।

এবার পিছন থেকে এক সঙ্গে দু'জন গলা খাঁকারি দিল।

মোটা গোঁফ সমেত পুরু ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে ম্যানেজার যেন হাসতে চাইল, কিন্তু কি ভেবে মুখের চামড়া শক্ত করে ফেলল।

'অ, তা হলে বলছেন, সদ্য পরিচয় হল, রাস্তার বন্ধু? তারপর এক সঙ্গে চা খেতে দু'জন আমার দোকানের ভেতর ঢুকে পড়লেন?' রামানন্দর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মোটা থুতনি নাচিয়ে ম্যানেজার এমন একটা ভঙ্গি করল, ডাইনে বাঁয়ে পিছনে প্রায় চার পাঁচজন হো-হো করে হেসে উঠল, একজন এক কোণা থেকে মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে জোরে সিটি দিয়ে উঠল, আর একজন পিরিচের ওপর চামচ ঠুকতে লাগল। অন্য সময় দোকানে এমন হইহট্ট বিশৃঙ্খলা দেখলে ম্যানেজারের অবস্থা কি হত বলা মুশকিল, কিন্তু এই ব্যাপারে যেন খদ্দেরদের তার বেশ ভালই লাগল, উপভোগই করল।

এতক্ষণ রামানন্দ চড়া গলায় কথা বলছিল, হঠাৎ তার চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল, এত সব আওয়াজ উঠতে কেমন একটু থমকেও গেল, আর যেন সে মুখ খুলতে পারছিল না। রেখার অবস্থা আরও শোচনীয়। তার কান মাথা গরম হয়ে গেছে। মুখটা লাল টকটক করে ঘাড় গুঁজে জুতোর ডগা দিয়ে মেঝে ঠুকছিল। রামানন্দ যে-ভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছিল একটাও তার মনঃপূত হচ্ছিল না, মোটা বুদ্ধি হলে মানুষ এভাবে কথা বলে, এমন অঙ্গভঙ্গি করে, তা না হলে, রেখা চিন্তা করল, যেন

কত নোংরামীর গন্ধ পেয়েছে, চারদিক থেকে সব নানারকম শব্দ করে টিটকিরি-টাট্টা আরম্ভ করেছে।

'কি হল মশাই, চুপ করে গেলেন কেন, ওই চার নম্বর কেবিনে বসে বান্ধবীর সঙ্গে এমন কি ব্যাপার করছিলেন যে আমার বয় আপনাদের দেখে হাসছিল?'

'আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন, ভদ্রভাবে কথা বলবেন!' নতুন করে রামানন্দ উত্তেজিত হয়ে উঠল হুংকার ছাড়ল।

'হেঃ হেঃ', বেগুনের মতন ফোলা ফোলা গাল দুটো দুলিয়ে পানদোক্তার রসে ছোপ-ধরা ময়লা দাঁতের সারি বের করে এবং সেই সঙ্গে জালার মতন ভুঁড়িটা নাচিয়ে হেসে ম্যানেজার ভেংচি কাটল। 'আমি অভদ্র, আমি স্বীকার করছি আমি মোটেই ভদ্দর লোক নই, তবে কিনা আমায় দেখে কেউ হাসে না, আমি চায়ের দোকানে ঢুকে পর্দা খাটানো খুপচির ভেতর বসে এমন কাজ করি না যে, একটা ছোট বয়সের ছেলে আমায় দেখে হাসবে। কি হল, এবার কথার উত্তর দিন?'

আবার রামানন্দর মুখের কথা আটকে গেল। রাগে উত্তেজনায় হঠাৎ কি করবে ঠিক করতে পারছিল না, স্কাউণ্ড্রেল, ইতর, ছোটলোক, পর পর কয়েকটা শব্দ দাঁতের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে উঠল তাকেই যেন মনে মনে পিষছিল, একটা শব্দ সে মুখ দিয়ে বের করতে পারল না, কেবল ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

'বলুন দাদা, বলুন—' চিকন গলায় একজন টিপ্পনি কাটল। 'পর্দার আড়ালে বসে উনি বুঝি দাদাকে আদরের কবিতা শোনাচ্ছিলেন।'

রেখার আর সহ্য হল না। দরজার কাছ থেকে সরে এসে ম্যানেজারের সামনে দাঁড়াল।

'আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন, একটা কেন, দশটা কথা বলুন, আমি শুনতে রাজী আছি।' মাথা পেতে দেওয়ার মতন ভঙ্গি করে ম্যানেজার ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে দিল।

'তাই তো, উনি বলতে পারবেন না, নেপুলো কেন, হ্যাঁ, আমার ওই বয়ের নাম নেপুলা, আপনাদের দেখে হাসছিল, এবার আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন দিকিনি।'

'বুঝিয়ে বলার কিছু নেই, তবে আপনার এই দোকানে কারা আসে আমি জানি না, কিন্তু আমাদের এখানে আসা ভুল হয়েছে।'

'হুঁ, বলুন, তারপর কি বলার আছে বলুন।' ম্যানেজারের গলার স্বর শক্ত হয়ে উঠল।

আঁচল দিয়ে রেখা কপালের পাশটা মুছে ফেলল। ঘামছিল ও।

'আপনার ওই কর্মচারীটি, অল্প বয়েস ওর আমি অস্বীকার করব না, কিন্তু এমন সব লোক দেখে এখানে অভ্যস্ত যে আগেও তাদের দেখে সে এভাবে হেসেছে, মনে হয় ওর আজকের এই হাসি কিছু নতুন না।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না', মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে ম্যানেজার থুতনি নাড়ল। 'আমার লাইসেন্স করা দোকান, সতেরো বছরের দোকান, আপনাদের মতন ভদ্রমহিলারা ভদ্রলোকেরাই এখানে চা খেতে খাবার খেতে আসেন—অন্তত আমি তো তাই দেখছি, সকলেরই বেশ ভদ্র সাজপোশাক—অনেকেই বাইরে বসে খান, আবার যাঁদের ইচ্ছে হয়, হ্যাঁ উনাদের সঙ্গে অবশ্য জেনানা থাকলেনই, সরাসরি কামরায় ঢুকে পড়েন। এখন কামরার ভেতর বসে কে কি করেন আমি কি করে জানব বলুন।'

'তাই তো বলছি, এখানে আসা আমাদের ভুল হয়েছে।' দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণটা কামড়ে ধরে রেখা এক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। রামানন্দকে দেখল, দোকানের প্রত্যেকটা খদ্দের হাঁ করে এদিকে তাকিয়ে আছে, তা-ও সে লক্ষ্য করল। তারপর ম্যানেজারের দিকে ঘাড় ফেরাল।

'আপনি একে চেনেন না, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত কবি রামানন্দ সেন—নাম শুনেছেন?'

'না ভাই, আমি রামানন্দ সেনের নাম শুনিনি', ম্যানেজার মাথা ঝাঁকাল। 'আপনাদের মিথ্যা বলব কেন, আমি রবি ঠাকুরের নাম শুনেছি, তাঁকে স্বচক্ষে দেখেওছি, কবি কালিদাস রায়ের নাম শুনেছি, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম শুনেছি, ছোট বেলায় পাঠ্যবইয়ে ওঁদের কবিতাও ঢের পড়েছি, হ্যাঁ, কামিনী রায়ের নাম শুনেছি—রামানন্দ সেনের নাম শুনিনি।'

রামানন্দ সেনের দুর্ভাগ্য, নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল রেখা, পরক্ষণে দেওয়ালের একটা রঙিন ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ রেখে ভাবল, তাই তো, এ আমি কাকে কি জিজ্ঞেস করছি, লেখাপড়ার সঙ্গে অনেকদিন সম্পর্ক শেষ, এখন একটা রেস্তোরাঁ চালাচ্ছে মানুষটা, সারাদিন ওই চেয়ারটায় বসে খদ্দেরদের চপ, কাটলেট, ডিম, মাংস খাওয়া দেখে, খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বিল দিয়ে তাদের কাছে থেকে দাম আদায় করে নেয়, আধুনিক কোন্ কবি কবিতা লিখে নাম করল, কোন্ গল্প লেখক নতুন ঢঙের গল্প লিখে চমক সৃষ্টি করল তা সে জানবে কেমন করে। রামানন্দ যদি মন্ত্রী কি উপমন্ত্রী হত, কাগজে ছবি ছাপা হত, নিদেন করপোরেশনের একটা কাউন্সিলার কি ডাকসাইটে গুণ্ডা হত, বা এমনও যদি হত যে সিনেমার পর্দায় অন্তত এক আধবারও তার মুখ-দেখা গেছে কি রেডিওয় তার গানের গলা শোনা গেছে তখন না হয় একটা কথা ছিল, কাজেই—

'শুনুন?' রেখা ম্যানেজারের দিকে চোখ ফেরাল, 'গত জুলাই মাসে রামানন্দবাবুকে হাজরার একটা কবি সম্মেলনে সভাপতি করে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আমিও নিমন্ত্রিত ছিলাম, কবি রামানন্দকে সেদিন আমি প্রথম দেখি, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করার ইচ্ছে, তাঁর ঠিকানা জানা ছিল না বলে দেখা করার সুযোগ হয়নি। আজ হঠাৎ রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা, আমি তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয় না।'

'না তা তো হবেই না।' ম্যানেজার ভুরু পাকিয়ে মাথাটা একদিকে কাত করে ধরল। 'আপনিও যখন কবিতা লেখেন কবির সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে একটু নিরিবিলিরই দরকার বৈকি।'

পিছন থেকে আবার একজন গলা খাঁকারি দিয়ে উঠল।

'আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন না।' ম্যানেজারের গোঁফের আড়ালে একটু দুষ্টু হাসি উঁকি দিতে চাইছিল, তা হলেও গম্ভীর হয়ে খদ্দেরদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে তখনি আবার সুন্দর চেহারার মেয়েটির দিকে ঘাড় ফেরাল। 'হ্যাঁ, বলুন তারপর? দুজনে চার নম্বর কেবিনে ঢুকলেন, ন্যাপলাকে ডেকে ন্যাপলা চা নিয়ে গেল, তারপর? বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন দুজন ওখানে, আমি আমার হাতের ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি, প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট—'

'হ্যাঁ, তা হবে, অনেক কথাই হল রামানন্দবাবুর সঙ্গে।' চোখ আড় করে রেখা রামানন্দকে দেখল, মুখটা কালো করে ঘাড় গুঁজে আছে। খাঁটি কবি শিল্পীর বুঝি এমনই হয়, কি দরকার ছিল মাথা গরম করে ওই ছোঁড়াকে চড় মারার, তারপর আবার চটেমটে তার মনিবের সঙ্গে কথা বলার, এখানকার নোংরামী এখানে পড়ে থাকত, চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, আমরা বেরিয়ে পড়তাম, কিন্তু ঐ যে লোকে বলে শিল্পীদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মতন কাণ্ডজ্ঞান এঁরা অনেক সময় হারিয়ে ফেলেন। 'হ্যাঁ, কবিতা নিয়ে সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হল আমাদের।' রেখা ম্যানেজারের দিকে চোখ তুলল। 'যাক, সে সব আপনাকে বলে বিশেষ লাভ নেই, কেন না আধুনিক সাহিত্য আপনি পড়েন না, আধুনিক কবিদের নাম জানেন না এবং আপনার দরকারও পড়ে না এসবের।'

'তা তো নয়ই। আমি রেস্টুরেণ্ট চালাই, আমি ডিমের খোঁজ রাখি, মাংসের খোঁজ

রাখি, লেটুস' টমেটো বীট' গাজর কড়াই-শুঁটির খবর রাখি, আধুনিক সাহিত্য দিয়ে করব কি. আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখেন না জানেন তো।'

'কিন্তু আমার পরিচয়টা আপনার জেনে রাখা উচিত, এখন পর্যন্ত কিন্তু সেসব কিছু জিজ্ঞেস করছেন না।'

'আহা, শুনেলাম তো এই কবি ভদ্দর লোকের মুখে।' বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে দিয়ে ম্যানেজার রামানন্দকে দেখায়। 'আপনিও কবিতা লেখেন, শুনেলাম ডক্টর্স' লেনে বাসা।'

'আমার বাবার নাম শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী, রিটায়ার্ড জজ।'

'খুব ভাল কথা, তারপর?'

'আমি টেলিফোন-ভবনে চাকরি করি।'

'বেশ তো সুন্দর কথা, আপনারা আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েরা সবাই তো চাকরি করছেন। তারপর?'

'আমার দাদা রবিন চক্রবর্তী, পুলিস অফিসার, লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে আছেন।'

'অ—' একটা অদ্ভুত শব্দ মুখ দিয়ে বের করে হঠাৎ থেমে গেল। রামানন্দও খানিকটা চমকে উঠে মুখ তুলে যুবতীকে দেখল।

রেখা সেখানেই থেমে থাকল না।

'যদি বলেন, এখনি আমি তাঁকে রিঙ করে দেই, আপনার তো টেলিফোন রয়েছে, দাদা আসুক. স্কুটার নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে চলে আসবে।'

'না না, তিনি আসবেন কেন।' ম্যানেজারের চোখের রং গলার স্বর বদলে গেল ও সেই সঙ্গে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আপনি এ কথা বলছেন কেন, আপনার দাদার তো কষ্ট করে এখানে আসার কিছু দরকার নেই—'

'না তা হলেও—' তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে রেখা কাউণ্টারের ওপরে টেলিফোনটা দেখল, যেন এখনি ছুটে গিয়ে ডায়াল করবে. খদ্দেরদের কারো মুখে শব্দ নেই, ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা সেই আগের মতন হঠাৎ থমথমে হয়ে আছে. হাঁ করে সবাই দেখছিল, কেবল রূপ না—রূপের সঙ্গে বুদ্ধি, বুদ্ধির সঙ্গে অসামান্য তেজ, ক্রোধ এবং যেন এক আঙুলা ঘেন্না ও বিদ্যুতের মতন যুবতীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝলক দিয়ে দিয়ে উঠছে। 'আপনার লাইসেন্স করা দোকান ঠিকই, তা হলেও আমি জানতে চাই দেখতে চাই, মেয়েছেলে নিয়ে কেউ আপনার দোকানে ঢুকলেই তাদের দেখে দাঁত ছড়িয়ে হাসবে এমন অসভ্য অশিক্ষিত কর্মচারী রাখার লাইসেন্স আপনাকে কে দিলে, দাদা এসে এর বিচার করুক—'

'আহা-হা-হা.' হাত দুটো বুকের কাছে তুলে ক্ষমা চাওয়ার মতন চেহারা করে ম্যানেজার জোরে কচলাতে লাগল এবং, যেমন জেদ চেপে গেছে যুবতীর, কিছুতেই যাতে টেলিফোনের কাছে যেতে না পারে তাই মোটা দেহটা নিয়ে কাউণ্টারের ওদিকে যাবার রাস্তাটা সঙ্গে সঙ্গে আড়াল করে দাঁড়াল। 'শুনুন শুনুন, আমি বলছি এতক্ষণ আপনি বললেন, এবার আমাকে বলতে দিন'. তাড়াতাড়ি কথা বলার দরুন পুরু ঠোঁট বেয়ে খানিকটা পানের রস ম্যানেজারের জালার মতন প্রকাণ্ড ভুঁড়ির কাছে চমৎকার আকাশী রঙের শার্টের ওপর টুপ করে ঝরে পড়ল। 'আপনি আপনার পুলিস অফিসার দাদাকে ডাকবেন,—কেন, আমি কি ওই ছোঁড়ার বিচার করতে পারি না. আমার সতেরো বছরের দোকান, আজ অবধি সতেরো গণ্ডা বয় আপনাদের আশীর্বাদে এখানে চাকরি করে গেছে, কিন্তু এক আধদিন কোনোটা বেআদাবি করেছে কি বেতমিজি কিছু দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে সোনারচাঁদকে কান ধরে দোকান থেকে বের করে দিয়েছি। এই যে আপনি বললেন, আপনাদের দেখে ওই হারামজাদা হেসেছিল, বাস্, আর তো কিছুরই দরকার পড়ে না, এখানেই হয়ে গেল, আপনি কিছু বেলঘরিয়া বারাকপুর কোত্থেকে আসেননি, ধরতে গেলে এ-পাড়ারই মেয়ে, বউবাজার আর ডক্টর্স লেনে কতটা তফাৎ, আর এমন বিশিষ্ট ঘরের সন্তান সুতরাং একবার আপনি আমার কানে দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট, এবার দেখুন শুয়োরের বাচ্চার কী বিচার আমি করি, আপনার চোখের সামনে লাথি মেরে দোকান থেকে এখনি যদি তাড়িয়ে না দিচ্ছি—'

চোখ রগড়াবার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেটা টলটল করে সব দেখছিল শুনছিল, খদ্দেরদের গলা খাঁকারি শুনে সিটি শুনে দু একবার যেন ফিক করে হেসেও ফেলেছিল, এখন ম্যানেজারের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে. মুখটা কাগজের মতন সাদা করে ফেলেছে।

'থাক, মেরে কাজ নেই।' বাঁ-হাত থেকে ব্যাগটা ডান হাতে নিয়ে রেখা নরম গলায় বলল, 'ওই তো বয়েস, এখনো বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি, বুঝিয়ে বলুন, সংশোধন হয়ে যাবে, মারধর করবেন না, আর এই বাজারে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে বেচারা খাবেই বা কি।' রেখা রামানন্দর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'চলুন।'

রামানন্দ আর একটা কথাও বলছিল না।

দুজনে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

'আপনি তো ওদিকের বাস ধরবেন?' যুবতী বেলেঘাটার দিকে আঙুলে দেখাল।

রামানন্দ সামান্য হেসে ঘাড় কাত করল।

'আমি এদিকের বাস ধরব।'

'আচ্ছা।' রামানন্দ আর একবার ঘাড় কাত করল।

'কিন্তু একটা কবিতা আমার চাই, সায়েন্সের ওরা বার বার আমায় বলছিল।'

রামানন্দ 'হাঁ' 'না' কিছু বলল না। শেয়ালদার দিকে মুখ করে হাঁটতে আরম্ভ করে দিল।

(ক্রমশ)

আপনার সন্তানের হোক
ভালো চোখের দৃষ্টি
ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি হলে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টির ক্ষতি হতে পারে। প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স— আপনার বাচ্চাকে তার প্রয়োজনীয় "চোখের ভিটামিন" যোগায় —পুরোমাত্রায়।
সুস্থ রক্ত
জনের মধ্যে ৪ জন ভারতবাসীর আহারে লোহার অভাব থাকে। অথচ সুস্থ রক্তের জন্যে লোহা একান্ত প্রয়োজন। নারীত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে এমন বাড়ন্ত মেয়ের পক্ষে বিশেষ করে দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহা। দিনে মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স লোহার এই চাহিদা মেটাতে পারে।
মজবুত হাড়
সিরাপ
মিনাডেক্স
তিনগুণের এক টনিক— গ্ল্যাক্সোর তৈরী
প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করুন। কমলালেবুর স্বাদগন্ধে ভরা সিরাপ মিনাডেক্স ওর ভালো লাগবেই। সিরাপ মিনাডেক্স-এর দাম খুব অল্প অথচ আপনার বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্যে কত উপকারী।
১৭০মি.লি. মাত্র ৪টা: ৫৫প: } ট্যাক্স
৩৪০মি.লি. মাত্র ৭টা:৮৬প: } অতিরিক্ত
গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ
MINADEX
SYRUP
MINADEX
GLAXO
অল্প দাম!
স্বাস্থ্যে
ভরপুর!
CHGM-2-234 R BEN

চার

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলুম। যুদ্ধ শেষ হবার পর সেখান থেকে ছাড়া পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা পাটনায় আমাকে আটক করবার ব্যবস্থা করলেন। পাটনার সামাজিক পরিবেশকে তো শৈশব থেকেই আমি ঘোর অপছন্দ করে এসেছি, তাই আটকের আদেশপত্রকে ছিঁড়ে ফেলে আমি কাশ্মীরের পথে রওনা হলুম। অমরনাথে গেলুম। কোলাহাই হিমবাহেও গিয়েছিলুম। বাঁচবার জন্যে আমার তখন মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস নেওয়া দরকার।

কাশ্মীরে থাকতেই ১৯৪৫ সনের ২১ অগাস্ট দিল্লি-বেতারে আমি সুভাষচন্দ্রের 'মৃত্যু'-সংবাদ শুনি। বেতারে বলা হল যে, ১৮ আগস্ট তারিখে, তাইপেতে এক বিমান-দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের 'মৃত্যু' হয়েছে। ভারতবর্ষে খুব কম লোকই অবশ্য এই 'মৃত্যু'র খবর বিশ্বাস করেছিলেন।

আমি ইতিমধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধের ব্যাপারটা খুব মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবন করে যাচ্ছিলুম; এবং মানচুরিয়ার একটা মস্ত মানচিত্র জোগাড় করে লক্ষ্য করছিলুম যে, রুশ জেনারেল ভাসিলেভ্‌স্কি কোথায় কতটা এগোচ্ছেন। দাইরেনের তখনও পতন হয়নি; এবং জাপানীরাও রুশদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। সুভাষচন্দ্র যে ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়েননি, এই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। মানচুরিয়ার রুশ-জাপান রণাঙ্গনে তখন সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থাও ছিল খুব খারাপ। ফলত, আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিল, সুভাষচন্দ্র কি জীবিত রয়েছেন এবং রুশদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন?

বলা বাহুল্য, দক্ষিণ মানচুরিয়ায় সেই সময়ে যাঁরা রুশ বাহিনীর কর্তাব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের কাছে এ-ব্যাপারে ব্যাপক-ভাবে তথ্যানুসন্ধান না করে এই প্রশ্নের কোনও সুনিশ্চিত উত্তর দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে জাপ বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। জাপানীরা যখন ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার পর থেকে আর সুভাষচন্দ্রের গতিবিধির সঠিক সংবাদ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১৯৪২ সনে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন ব্রিটিশ গোয়েন্দা দফতরকে ফাঁকি দিয়ে আমার কিছু অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেগুলি উদ্ধার করবার জন্য কাশ্মীর থেকে আমি কলকাতায় চলে এলাম। আমার খাতাপত্রের মধ্যে ১৯৪০ সনে তোলা সেই ফোটোখানিও ছিল। রবীন্দ্রনাথের ফোটো। এবারে সেই ফোটোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, গুরুদেবের চোখ দুটি যেন নীরব ভাষায় আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে: 'লালফৌজে তোমার রুশ সহকর্মীদের এবারে জিজ্ঞেস করো, সুভাষ কোথায়?'

॥ ৪ ॥

১৯৪৭ সনের ১ জানুয়ারি আমি ইউরোপ যাত্রা করি। আমার পাসপোর্ট নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এ-যাত্রায় লণ্ডনে কিছু ঝামেলার সৃষ্টি করলেন; ফলে কিছুকালের জন্যে সেখানে আমি আটকা পড়ে যাই। আমার তখন পয়সাকড়ির খুব টানাটানি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বি-বি-সি থেকে গুটিকয়েক বক্তৃতা দিয়ে কিছু অর্থ পাওয়া গেল; তারই উপরে নির্ভর করে বার্লিন যাত্রা করলুম।

বার্লিনকে ঘাঁটি করে সেই সময়ে আমি নেতাজীর ভাগ্য সম্পর্কে খোঁজখবর করতে শুরু করি। ইউরোপে নেতাজীর সহকারী নাম্বিয়ার এবং 'আজাদ হিন্দ কেন্দ্র'-এর আরও অনেকে তখনও জার্মানির ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের নানা স্থানে আটক হয়ে ছিলেন। তাঁদের কারও-কারও সঙ্গে দেখা করলুম। যুদ্ধের আগে থেকেই তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় ছিল।

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে অস্ট্রিয়ার বাডগাস্টাইনে, নেতাজীর কাছ থেকে শেষ বার্তা পেয়েছিলেন নাম্বিয়ার। নেতাজী তাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নাম্বিয়ার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যেন এমন কোনও অঞ্চলে সরে যান, যেখানে রাশিয়ানরা তাঁদের সন্ধান পাবে; ব্রিটিশ সেনারা পাবে না। বলা বাহুল্য, নিজের সম্পর্কে নেতাজী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্ত তারই অনুরূপ। আমেরিকানরা এসে হেলুমস্টেডে পৌঁছবার আগেই ১২ এপ্রিল তারিখে নাম্বিয়ারের লোকজনরা সেখান থেকে সরে যান। ইংগ-মার্কিন বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে

ভারতীয়দের অনেকেই রুশ এলাকায় চলে যেতে পেরেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল?

এ-ব্যাপারে আমি যে তথ্য জানতে পেরেছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৮ সনের অকটোবর মাসে এই নিবন্ধ লিখছি আমি; এবং আমার সংশয় নেই যে, নেতাজীর অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই আজও লোহ যবনিকার অন্তরালে রয়ে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ক'জন মারা গেছেন, আর ক'জন অদ্যাবধি জীবিত, তা অবশ্য জানা যায়নি।

নেতাজীর নিজের খবরই বা কী?

॥ ৫ ॥

লোহ যবনিকার অন্তরালে নেতাজী ও তাঁর সঙ্গীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা জানা সম্ভাবনাকে তখন অত্যন্ত ক্ষীণ বলে মনে হচ্ছিল। তবে জার্মান যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে অনেকেই তখন রুশ বন্দী-শিবির থেকে স্বদেশে ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তর-সাইবেরিয়ার কুখ্যাত শিবিরে বন্দী-জীবন যাপন করেছে। বার্লিনের রুশ এলাকায় ওস্ট্‌বাম্‌হফে মাঝে মাঝে ট্রেন বোঝাই এই বন্দী-দল এসে পৌঁছত।

বার্লিনে থাকতে প্রায়ই আমি এই বন্দীদের দেখতে সেখানে যেতুম। আমার মনে এই ক্ষীণ আশা তখনও জ্বলছে যে হঠাৎ হয়ত তাদের মধ্যে এক-আধজন ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধার দেখা মিলে যেতে পারে।

ট্রেনগুলি লঝঝড়ে রকমের। সাইবেরিয়া থেকে জার্মান যুদ্ধবন্দী বোঝাই করে সেগুলিকে বার্লিনে পাঠানো হত। আমাদের দেশে মালগাড়ির যে-সব ওয়াগনে গরু-মোষ বোঝাই করা হয়, এগুলির সঙ্গে তার মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই। কামরার দেওয়াল বরাবর দু সারি বাঙ্ক, মেঝের উপরে খড় বিছানো, এবং কামরার উপর দিকে ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি। পুরনো একটা তেলের পিপে দিয়ে চুল্লির কাজ চলে। দরজার কাছে একটা ময়লা-ফেলার পাত্র; নিত্যকৃত্য তারই মধ্যে সমাধা করতে হয়। জানলা নেই, তবে কামরার দেওয়ালে ফাঁক-ফোকর আছে অনেক। বগির দুই প্রান্তে ছোট্ট দুটি প্ল্যাটফর্ম। তাতে থাকে লাল ফৌজের প্রহরী ও তাদের কুকুর। অর্থাৎ [illegible]কং শেষ হবার আগে যে কেউ নেমে পড়বে, তার জো নেই। বাইরে হয়ত বরফ পড়ছে, ছেঁড়া জামাকাপড় পড়ে বন্দীরা হয়ত ঠকঠক করে কাঁপছে, কিন্তু তাতে কী, সে প্রচণ্ড শীতেও ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাদের। যতক্ষণ না মাথা গুনতি শেষ হয়, ততক্ষণ। এক-এক করে গুণে দেখা হবে, রাশিয়ায় যাদের গাড়িতে তোলা হয়েছিল, তারা প্রত্যেকে বার্লিনে এসে পৌঁছল কিনা।

এই সব অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে, মিটার কুড়ি দূর থেকে ট্রেনটিকে আমি দেখতে পেতুম। ট্রেন থেকে সব-শেষে নামানো হত রুগ্ন, আহত ও মৃত বন্দীদের। সারা স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ত মানবিক দৈন্য-দুর্দশার দুর্গন্ধ।

প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে থাকত লাল ফৌজের সেনারা। একের-পর-এক বন্দী সেই শেষ বেড়া পার হয়ে আসত। প্রতীক্ষারত স্বদেশবাসীদের দিকে ছুটার আগে পর্যন্ত তারা চোখ তুলে তাকাতে পারত না।

যে সব বন্দী তখনও মৃত বলে ঘোষিত হয়নি, তাদের আত্মীয়স্বজনরা সেই [illegible] প্রত্যাগত সৈনিকদের ব্যাকুল [illegible] করত "আচ্ছা, কর্নেল হান্‌সের [illegible] জানেন আপনি? তাঁকে দেখেছেন?"

বন্দীরা মাথা নাড়ত। না, ওই নামের কাউকে তারা দেখেনি। না, তাঁর কোন খবরও তারা জানে না।

নিজের দেশের বিখ্যাত বন্দীদেরই খবর যারা জানে না, ভারতীয়দের সম্পর্কে আর কোন্ খবর তারা দেবে?

যাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ স্টেশনে আসেনি, এমন কয়েকজন বন্দীর কাছে অবশ্য কিছু খবর আমি পেয়েছিলাম। তারা আমাকে বলেছিল, "একমাত্র সাইবেরিয়াতেই এখনও দশ লক্ষেরও বেশী জার্মান বন্দী হয়ে আছে। আপনি ভারতীয়দের খবর জানতে চান? হ্যাঁ, উত্তরাঞ্চলের যে ভারকুটা শিবিরে আমরা ছিলাম, সেখানে জনাকয় ভারতীয়কে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। না, বোস্ পদবীর কেউ আমাদের ওখানে ছিলেন না। সব চাইতে বিপজ্জনক বন্দীদের রাখা হয় ইয়াকুট্স্ক শিবিরে। ইয়াকুট্স্কের একজনকে দিন কয়েকের জন্য আমাদের সঙ্গে রাখা হয়েছিল। তিনি একজন বৃদ্ধ চীনা। এখন তাঁকে লুবিয়াংকায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রুশরা সেখানে তাঁকে আরও জেরা করবে।"

১৯৪৮ সন। লণ্ডন অলিম্পিকস থেকে বার্লিনে ফিরেছি। এমন সময় হঠাৎ একদিন এক পুরনো জার্মান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি যখন ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তুম, তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। যুদ্ধের সময় সে ছত্রী-সেনাদলে যোগ দেয়; এবং যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন রাশিয়ানদের হাতে ধরা পড়ে। তাকে ইয়াকুট্স্কে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সে কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর কমিউনিস্টদের হয়ে প্রচার চালাবার জন্যে তাকে আবার জার্মানিতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সে যা বলল, তাতে আমার মনে আবার আশার সঞ্চার হল। "সুভাষচন্দ্র বোস? হ্যাঁ, গত বছরেই তাঁকে আমরা ইয়াকুট্স্ক বন্দী-নিবাসে দেখেছি। এখনও তিনি জীবিত, তবে আগের তুলনায় অনেক রোগা হয়ে গেছেন। রুশরা তাঁকে তাঁর জপের মালা আর ভগবদ্গীতা ফেরত দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, ফেরত দেবার আগে ছোট্ট সেই গীতাটিকে লুবিয়াংকায় তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।"

"গীতার মধ্যে আবার পরীক্ষা করবার কী ছিল?"

"রাশিয়ানরা ভেবেছিল, ওটি কোনও গোপন দলিল—বার্লিন আর টোকিয়োর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার কাজে সাংকেতিক বই হিসেবে ব্যবহারের জন্য হিটলার যা কিনা সুভাষচন্দ্রকে দিয়েছে। লেনিনগ্রাদের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুটের মেজর ভি— তো তোমার পুরনো বন্ধু। তিনি এখন বার্লিনের রুশ প্রেস সেণ্টারে লিয়াজ' অফিসারের কাজ

করেন। বোসকে জেরা করবার জন্যে, বিশেষ করে তাঁর ওই গীতা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে, মস্কো থেকে তাঁকে ইয়াকুটস্‌কে পাঠানো হয়েছিল। বোস কিংবা অন্যান্য যে-সব ভারতীয় আজও রাশিয়ায় আটক হয়ে আছেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি হয়ত তোমাকে আরও কিছু খবর দিতে পারবেন।"

বার্লিনে অনুসন্ধান

রবীন্দ্রনাথ একবার আইনস্টাইনকে বলেছিলেন, "অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে অবিরাম যে সমন্বয়ের খেলা চলছে, আমাদের অস্তিত্বের নাটককে তা-ই নিত্য-নবীনতা দেয়, তাকে জীবন্ত করে তোলে।"

অন্তরে অন্তরে সর্বদাই আমি অনুভব করেছি যে, সুভাষচন্দ্রের অদৃষ্ট অনুসন্ধানের এই ব্রতে রবীন্দ্রনাথই আমার প্রেরণা; এই কাজে তিনিই আমাকে ভিতর থেকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি একজন সামান্য লেখক; তবু রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ আশীর্বাদ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। সেই আশীর্বাদ যেন আমার কাছে সর্বদাই দাবি জানিয়েছে যে, যে মানুষটিকে একদা তিনি জাতির পরিত্রাতা বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং যে-মানুষ এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আবার জাগিয়ে তুলবেন বলে তিনি মনে করতেন, তাঁর অনুসন্ধান-কর্মে আমি যেন কোনও ত্রুটি না রাখি।

কিন্তু, কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলে ঘোষণা করেছিল। সুভাষচন্দ্রকে তারা তাদের এক নম্বর শত্রু বলে মনে করত। তারা তাই চেয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু হোক কিংবা তিনি জীবন্মৃত অবস্থায় দিনযাপন করুন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাদের ক্রোধ ছিল প্রচণ্ড। বার্লিনে ভারতীয় মিলিটারি মিশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা ছিলেন ব্রিটিশ; নাৎসীরা আত্মসমর্পণ করবার পরেও জার্মানিতে সুভাষচন্দ্রের যে-সব অনুগামী থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের উপরে দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে তবেই এই ব্রিটিশ অফিসারদের ক্রোধের শান্তি হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর জওহরলাল যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আমার আশা হয়েছিল, ইউরোপে যাতে সুভাষবাদীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা ব্যবস্থা হয়, তিনি তার জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু জওহরলাল, কিংবা তাঁর যে-সব অফিসার বার্লিনে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতীয় মিলিটারি মিশনের ভার পেলেন, তাঁরা কেউই এ ব্যাপারে কিছু করেননি। জওহরলালের মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি যেন ব্রিটিশ-নীতিই অনুসরণ করে চললেন। তার ফল হল এই যে, বার্লিনে যে-সমস্ত ভারতীয় অফিসারদের পাঠানো হয়েছিল, সুভাষপন্থীদের প্রতি তাঁদের আচরণে লেশমাত্র মমতার পরিচয় পাওয়া গেল না।

যে-সব তথ্য তখন আমি পাচ্ছিলুম, তার থেকে এই সত্যটাই ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল যে, জওহরলাল এমনভাবে তাঁর পররাষ্ট্র-নীতির বনিয়াদ গড়ে তুলছেন, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, বস্তুত সমগ্র কমিউনিস্ট দুনিয়ার সঙ্গেই, ভারতবর্ষের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

ইউরোপে তখন জওহরলালের সঙ্গে অনেকবার আমি দেখা করেছি। দিল্লিতে গিয়েও কয়েকবার তাঁকে বলেছি যে, সুভাষচন্দ্রের ব্যাপার নিয়ে রুশদের বিব্রত না করবার যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছেন, তার কোনও রাজনৈতিক কিংবা সাধারণভাবে নৈতিক যুক্তিও নেই। সুভাষচন্দ্রের কী হয়েছে, তা জানবার জন্য রুশ মহলে আমি অনুসন্ধান চালাতে চেয়েছিলাম। তার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় সাহায্য না হোক, অন্তত একটা অনুমোদন পাওয়া আমার দরকার ছিল। কিন্তু তা আমি কখনও পাইনি। বরং সেই অনুমোদন পাবার দাবি জানিয়ে যে 'ধৃষ্টতা' আমি দেখিয়েছিলাম, তার জন্য আমার বিস্তর ভোগান্তি হয়েছে।

॥ ২ ॥

সোভিয়েট কারাগারে যাঁরা অনেক বছর বন্দী ছিলেন, তাঁদের লিখিত বিবরণে মস্কোর লুবিয়াংকা এবং সাইবেরিয়ার বিভিন্ন দাস-শিবিরের অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এবং সেই বিবরণী আমার এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে, সুভাষচন্দ্রও সোভিয়েট অত্যাচারের এক অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারত তাঁর সম্পর্কে সোভিয়েট মহলে কোনও খোঁজখবর করেনি বলেই সুভাষচন্দ্রের এই পরিণতি।

যে-সব বিস্মরণীয় কথা আমি একটু আগেই বলেছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে একজন জেসুইট ধর্মযাজকের লেখা। তাঁর নাম, ওয়াল্টার জে চিসজেক। তাঁর বর্ণনায় কোনও অলঙ্কার নেই, এবং তাঁর নিপীড়কদের সম্পর্কে কোনও মন্তব্যও তিনি করেননি। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, তিনি 'ভ্যাটিকানের গুপ্তচর।' সুভাষের বিরুদ্ধে সেক্ষেত্রে অভিযোগ এই যে, তিনি হিটলারের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সেই তুলনায় চিসজেকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে খুব লঘুই বলতে হয়। অথচ, এই তুচ্ছ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও চিসজেককে দীর্ঘ তেইশ-বছর সোভিয়েট বন্দী-নিবাসে কাটাতে হয়েছিল। আমেরিকায় তাঁর এক বোন তাঁর মুক্তির জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যান। তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও প্রেসিডেন্ট কেনেডির উদ্যোগ। তা ছাড়া গোটা দেশের সহানুভূতি তো ছিলই। এই সম্মিলিত চেষ্টার ফলে ১৯৬৩ সনের অকটোবর মাসে দুজন দণ্ডিত সোভিয়েত গুপ্তচরের মুক্তির বিনিময়ে ফাদার চিসজেক ও আরেকজন আমেরিকানকে মুক্তি দেওয়া হয়।

চিসজেকের মুক্তির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল। অথচ সুভাষচন্দ্রের জন্য আমরা কিছুই করিনি। আর তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর অদৃষ্টে কী ঘটেছে, সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই আজ বলতে পারা যাচ্ছে না।

॥ ৩ ॥

তিরিশের দশক থেকে রাশিয়াকে আমি চিনি এবং আপন অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, বিপুল সংখ্যক মানুষের উপরে অমানুষিক অত্যাচার চালাবার যে নিষ্ঠুর পদ্ধতি সোভিয়েট ব্যবস্থায় উদ্ভাবিত হয়েছে, তত নিষ্ঠুর পদ্ধতি এ-যাবৎ অন্য কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্ভাবিত হয়নি। সোভিয়েট গুপ্ত পুলিসের কার্যকলাপের কথা যদি কোনক্রমে কখনও ফাঁস হয়, তো পৃথিবী তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, যেমন যুদ্ধকালে তেমনি শান্তির সময়েও মানুষের উপরে স্তালিন যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন তার তুলনায় হিটলারের যুদ্ধকালীন অত্যাচারের পরিমাণও অনেক কম।

আমার সন্দেহ নেই, সোভিয়েত গুপ্ত পুলিসের দলিল-দস্তাবেজের কোথাও নিশ্চয় মোটা একটি ফাইল রয়েছে। তাও লিন নামের এক চীনা হিসেবে দাইরেনে যেদিন সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়, তার পর থেকে তাঁর বিভিন্ন সময়ের ফোটোও সেই ফাইলের মধ্যে পাওয়া যাবে।

ফাদার চিসজেক ১৯৪৬ সন থেকে বহু বৎসর সাইবেরিয়ার দাস-শিবিরে ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "যে দলে আমাকে রাখা হয়েছিল, তাতে জনা পঁতিরিশেক চীনা ও দশজন রুশ ছিলেন। সকলেই তরুণবয়সী। শুধু দুজন বাদে। একজন আমি; অন্যজন এক বৃদ্ধ চীনা।" এখানে উল্লেখযোগ্য, ফাদার চিসজেক সুভাষচন্দ্রের চাইতে দশ বছরের ছোট। সোভিয়েট নথিপত্র ঘেঁটে অতএব জানা দরকার, এই "বৃদ্ধ চীনাটি" কে। ফাদার চিসজেক লিখেছেন, "তাঁরা (অর্থাৎ সেই চীনারা) মানচুরিয়া থেকে এসেছেন।" ১৯৪৫ সনের ১৮ অগস্ট অপরাহ্ণে সুভাষচন্দ্র দাইরেনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, এবং দাইরেন মানচুরিয়াতেই।

এই একই বৃত্তান্তের অন্যত্র আমরা দেখছি, "...অনুমানে আমি শুধু এইটুকুই বুঝলুম যে, আমাদের সকলের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ আনা হয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ। কেউ চীনা গুপ্তচর, কেউ মানচুরিয়ান গুপ্তচর, কেউ ভ্যাটিকানের গুপ্তচর।"

জেরার প্রসঙ্গে চিসজেক লিখছেন, "আমাকে যে লোকটি জেরা করছিল, দুজন প্রহরীকে সে ডেকে নিয়ে এল, এবং পাশের একটি ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। ঘরের মেঝেয় পুরু গালিচা, দেওয়ালও বেশ মোটা প্যাড মোড়া। সেখানে চলল রবারের মুগুর দিয়ে আমার মাথার পিছন দিকটায় আঘাত করবার পালা। যখনই মাথা নিচু করি, তখনই আমার মুখে একটা মারাত্মক আঘাত লাগে। ব্যাপারটা কষ্টদায়ক। উদ্দেশ্য যে তখনই আমাকে কথা বলতে বাধ্য করা, তা ঠিক নয়। বস্তুত, কোনও প্রশ্ন তখন আমাকে করা হচ্ছিল না। আসলে ওরা ভাবছিল যে, মার খেয়ে আমি কাবু হয়ে পড়ব, এবং—আবার আমাকে মারা হতে পারে, এই ভয়ে—পরে যখন আবার জেরা করা হবে, তখন চটপট সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব। ওদের বদ্ধমূল ধারণা, আমি একজন জার্মান গুপ্তচর।"

সাইবেরিয়ায় বন্দীদের গুলি করে মারাও ছিল অতি সাধারণ ঘটনা। তা ছাড়া, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বেয়নেট উঁচিয়ে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হত। "বাতাস কখনও থেমে যেত না; শুধু দিক পালটাত। মাঝে-মাঝে এমন তুষার পড়ত যে, হাত-খানেকের বেশী নজর চলত না; এমন ঠাণ্ডা পড়ত যে, খনি পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।...তুষার-ঝটিকা আর 'সাদা ঝড়' ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার; আর সেইজন্যই খনি পর্যন্ত রাস্তার পাশে থাকত দড়ি। গাইড-রোপ। সে-সব দুর্যোগের দিনে...ঘোড়া পর্যন্ত যেতে সকে ভয় পায়, এক পা নড়তে চায় না। কিন্তু বন্দীদের তবু যেতেই হত।"

আমাদের দেশে বসে কতরকমের সোভিয়েট সাফল্যের কথাই তো আমরা শুনি। সোভিয়েট রকেট 'চাঁদে' যাচ্ছে, শুক্রগ্রহেও যাচ্ছে। এ-সবই মস্ত সাফল্য সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ মূল্যে অর্জিত হয়েছে এই সাফল্য? সাইবেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের অস্থি-র বনিয়াদের উপরে গড়ে উঠেছে এই সাফল্যের প্রাসাদ।

সোভিয়েট নেতারা আধুনিক বিজ্ঞানকে বিস্ময়করভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ঠিকই, এবং তার জন্য আমাদের দেশের মানুষরা সব সময়েই তাঁদের অভিনন্দন

জানিয়েছেন। এবারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু একবার খোঁজ করেন যে. সাইবেরিয়ার দাস-শিবিরে যাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, সেই বৃদ্ধ চীনা'টি কে, তাহলে নিশ্চয় কূট-নৈতিক সৌজন্য কিছুমাত্র নষ্ট হবে না।

পশ্চিম ইউরোপে সম্প্রতি যে খবর এসে পৌঁছেছে, তাতে জানা যায় যে. সোভিয়েট দাস-শিবিরগুলিতে এখনও অন্ততঃ সওয়া লক্ষ মানুষ বন্দী-জীবন যাপন করছেন' প্রকৃত সংখ্যাটা হয়ত আরও অনেক বেশী। বন্দীদের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের মানুষরা তো আছেনই, সেইসঙ্গে আছেন কোরিয়া, চীন আর ভরতবর্ষের মানুষও।

সোভিয়েট রাশিয়ার নানা নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন দেখে রবীন্দ্রনাথও একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করতে চাই আমরা। এবং সেই কারণেই. সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কাছে এই আবেদন জানাবার অধিকার আমাদের আছে যে, ভারতভাগ্যের শ্রেষ্ঠ নিয়ামক সুভাষচন্দ্রের অদৃষ্টে কী ঘটেছে, তা জানবার জন্যে তাঁদের নথিপত্রের উপরে তাঁরা আমাদের চোখ বুলোতে দিন।

সমাপ্ত

সাতাশ

সত্যি কথা বলতে কী, রত্নর মন তখন ইলোপমেণ্টের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। গৌরী তো আর একা নয়, ওর সঙ্গে ওর শিশু। দুজনের জন্যে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। জ্যোতিদা থাকলে ওরাও দুজন হতো। তা হলে হয়তো আরো দুজনের ভার বইতে পারত। সমস্যা তো কেবল অর্থনীতির নয় যে প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হলেই মিটে যাবে।

ওদিকে গৌরীর মনও কি প্রস্তুত ছিল? না, সে তার নন্দনের বন্ধন কাটাতে পারত না। সনন্দন অকূলে ঝাঁপ দিতেও তার প্রাণে আতঙ্ক। রত্ন কৃতকার্য হলেই যে তখনি তার সমস্যা জল হয়ে যেত তা নয়। বরং তখনি শুরু হতো তার অগ্নিপরীক্ষা। সে কি শ্যামের জন্যে কুল ছাড়বে, না কুলের জন্যে শ্যাম ছাড়বে?

রত্নর আশংকা ছিল যে, প্রতিযোগিতার ফল শুনে গৌরী হয়তো বলবে রত্নটা একটা অপদার্থ। ওর উপর নির্ভর করলে কোনো কালেই মুক্তিলাভ ঘটবে না। খবরটা গৌরীকে সে ভয়ে ভয়েই দিয়েছিল। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সৌরভ ছিল তার চিঠিতে। সিদ্ধি তো তার হাতের মুঠোয় এসেও ফস্কে গেল। লক্ষে ছিল একজন সংখ্যালঘু প্রার্থী। 'পরের বার যদি একজনমাত্রও নেওয়া হয় তা হলে সেই একজন হবে রত্নকান্ত।' এই হলো তার ধনুর্ভঙ্গ পণ।

"আমার তো উলটো আশঙ্কা ছিল যে, তুই এইযাত্রাই সফল হবি ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করবি। আমি না পারতুম তোর সঙ্গে যেতে, না তোর বিরহ সইতে। আমার পরিস্থিতি তো জানিস। এটা আমি সাধ করে ডেকে আনিনি। যে কর্তব্যভার আমার ঘাড়ে চেপেছে তার থেকে মুক্তি কি জাহাজে উঠলেই মেলে? এর একটা ফয়সালা না করে আমার মুক্তি কোথায়? তুই তোর যথাসাধ্য করেছিস। এবার যখন এত উচ্চে উঠতে পেরেছিস তখন পরের বার আরো উচ্চে উঠতে পারবি। তোর উপর আমার অসীম বিশ্বাস। তুই ছাড়া আমার আর আছেই বা কে? মানিককে যদি গণনায় না আনি। তোরা দুটিই আমার দুটি চোখ। আমার জোড় মানিক। হাঁ, তুই আবার পরীক্ষা দে। এ সংগ্রাম চলবে। তোর পরাজয়ে আমারও পরাজয়। তোর জয়লাভে আমারও জয়লাভ। একবার পরাজয় হলো বলে হাল ছেড়ে দিসনে। পরাজয়ই বা কেন বলব? এটা অর্ধ জয়। আমার বাবারও তাই মত। তিনি এতদিন বাদে তোর উপর প্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু মার মনোভাব তেমনি অকরুণ। জিতলে তো তুই আমাকে হরণ করে নিয়ে যাবি। মা এবার আরো ভয় পেয়েছেন। ভিতরে ভিতরে মা তোকে ভালোবাসেন। কিন্তু তোর হাতে আমার ভাগ্য সঁপে দিতে পারেন না।'

মুক্তির পরে গৌরীর ভাগ্য গৌরীর নিজের হাতেই থাকবে। রত্নকে যদি সে স্বেচ্ছায় বরণ করে তা হলেও তার নাম ভাগ্য সঁপে দেওয়া নয়। দুজনেই স্বাধীন নায়ক-নায়িকা, কেউ কারো বন্দী নয়। কিন্তু প্রেমের যা স্বভাব, প্রেম প্রিয়জনকে সম্পূর্ণ আপনার না করে ছাড়ে না। সেইজন্যে একজনের নিয়তির সঙ্গে আরেকজনের নিয়তি জড়িয়ে যায়। তখন তারা যদি সামাজিক অনুমোদন চায় তো বিবাহের ভিতর দিয়ে যায়। তার মানে কি এই যে পত্নীর ভাগ্য পতির হাতে?

ওসব সেকেলে ধারণা। আধুনিক নর-নারী কেউ কারো হাতের পুতুল নয়। দুজনেই সমান স্বাধীন। বিয়ে করলেও স্বাধীন, না করলেও স্বাধীন। কিন্তু কী জানি কেমন করে রত্ন আর গৌরী উভয়েই ধরে নিয়েছিল যে পুরুষই নারীকে উদ্ধার করবে, রক্ষা করবে। ওটা ঠিক সমান সম্পর্ক নয়। তবু ওটা প্রায় বদ্ধমূল ধারণা। অথচ এটাও রত্নর মনের কথা যে, গৌরী সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হয়, স্বনির্ভর হয়। লতার মতো তরুকে যেন জড়িয়ে জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ না করে।

এ জীবনে রত্ন আর কোনো নারী চায় না। গৌরীকেই হতে হবে তার গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা। এটা যেমন তার অন্তরের একদিকের কথা তেমনি আরেক দিকের কথা গৌরী যদি তাকে আর ভালো না বাসে বা তার ভালোবাসা না পায় তা হলে কেউ কারুকে বেঁধে রাখবে না। সব নির্ভর করবে প্রেমের সত্যের উপরে। যেখানে প্রেম চলে গেছে সেখানে নীড় শূন্য পড়ে থাকবে, এইটেই তো স্বাভাবিক। তা বলে প্রেমকে তো জোর করে ধরে রাখা যায় না। সেটা অসত্য হবে।

রত্ন যখন এসব কথা খোলাখুলি বলে তখন বুঝতে পারে না যে, গৌরী তাতে ভয়

পার। প্রেমের বেলা প্রেমিক, প্রেম কুরোলে কেউ নয়, এর মধ্যে সত্য থাকতে পারে কিন্তু নিরাপত্তা নেই। নারী যদি নিরাপদ বোধ না করে তবে ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মেলাতে চায় না। এক যদি সে প্রেমের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ ক কথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণত সে তত্ত্ব না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সংযত হয়।

রঞ্জু মনে মনে গৌরীর আত্মসমর্পণই আশা করে। অথচ ও জানে যে ও পুরুষোত্তম নয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই যদি পুরুষোত্তম হওয়া যেত তা হলে আর ভাবনা কী ছিল! কিন্তু গৌরীর মতো প্রাণময়ী নারী কি তেমন একটি বিদ্বানের ক আত্মসমর্পণ করবে? কী করে সমান প্র হবে রঞ্জু, যখন তার উপরে পড়াশুনা ও ভাব। চিন্তার প্রচণ্ড দায়। সুতরাং আশা পোষণ করলেও সে নিশ্চিত ছিল না যে একদিন গৌরীর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ পেয়ে ধন্য হবে।

প্রথম দর্শনের পূর্বে গৌরীর চিঠিপত্রে আত্মসমর্পণের আভাস ইঙ্গিত অভিলাষ পরিস্ফুট থাকত। কিন্তু চোখের দেখার পর থেকে ওসব একরকম অদৃশ্য। এর থেকে অনুমান হয় রঞ্জু ওর পুরুষোত্তম নয় বলেই তার প্রতি এই নিরুত্তাপভাব। বার দুয়েক যে চুম্বন বিনিময় হয়েছে তার মধ্যেও তেমন উত্তাপ ছিল না। ছিল নিবিড় প্রীতি। তার জন্যেও ধন্যতা বোধ করে রঞ্জু। কিন্তু তার গভীর প্রত্যয় প্রথম দর্শনের পর গৌরী কিছু ফিরিয়ে নিয়েছে। তুলে রেখেছে আর কোনো পুরুষের জন্যে। সে হবে ওর পুরুষোত্তম।

বেশ তো, তাই হোক। রঞ্জু শুধু ওকে মুক্ত করে দিয়েই ক্ষান্ত হবে। মুক্তির পর ও যাকে খুশি বরণ করবে, স্বয়ংবরা হয়ে আত্মসমর্পণ করবে। মুক্তিদাতাকেই বরণ করতে হবে এমন কী বাধাবাধকতা আছে? অপর পক্ষে রঞ্জুর দিক থেকেও তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আর কোনো নারী যদি তার প্রতি অনুরক্ত হয়, তাকে বরণ করে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে তা হলে সেও স্বাধীন।

প্রথম দর্শনের পর থেকে যেটা রঞ্জু লক্ষ করে নি বললেও চলে মাতৃত্বের পর থেকে সেটা সম্পূর্ণ বিলীন। গৌরী আগের মতো রাশি রাশি চিঠি লেখে কিন্তু কোনোখানেই ব্যক্ত করে না যে তার অন্তরে রঞ্জুর জন্যে বাসনা কামনা আছে। যে বাসনা প্রণয়ী প্রণয়িনীর মধ্যে স্বাভাবিক। মাতৃত্ব এসে আর-সব কিছুকে খর্ব করেছে, ক্ষয় করেছে। গৌরী যেন মূর্তিমতী ম্যাডোনা। খ্রীষ্টজননী। যাকে ভক্তি করতে পূজা করতে সাধ যায়। কিন্তু কোলে নিতে সাহস হয় না।

নারীর সঙ্গে স্থূল সম্পর্ক রঞ্জুর কাম্য নয়। তা বলে একমাত্র সূক্ষ্ম সম্পর্কই কি তার কাম্য? তা যদি হয় তবে আর গৌরীতে সেবাতে মালাতে তফাত কী? নারীতে পুরুষে পার্থক্য কী? প্রাকৃত প্রেম তার কাম্য নয়, তা বলে অপ্রাকৃত কামও কি কাম্য? রঞ্জুর মনে একটা খটকা বেধেছে। সে পুরুষোত্তম বলে কি পুরুষ নয়? সে তবে কী?

আসলে যা হয়েছিল তা এই যে, গৌরীর প্যাশন কখন একসময় নিবে গেছল। আর রঞ্জুর প্যাশন কখন একসময় জ্বলে উঠেছিল। গৌরীর প্যাশন নিবে যাবার সময় রঞ্জুর প্যাশনকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। প্রেমের সবটাই কিছু আলোক নয়। আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাপও থাকে। যেখানে তাপ নেই সেখানে আলোক থাকলে সে আলোক চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ অথচ নিস্তেজ। নিশ্চয়ই মূল্যবান, কিন্তু সূর্যের আলোর বিকল্প নয়।

রঞ্জু চায় সূর্যের আলো। তবে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর নয়। যে আলোতে তাপও থাকবে, অথচ আরামের অতীত হবে না। গৌরীকে তার সত্তার ভয়। ও মেয়ে চাইলে তাকে ধ্বংস করতেও পারে।

নারীর প্রতি আকর্ষণটা যদি কেবল

হৃদয়ের হতো তা হলে তো কোনো গোলই বাধত না। জীবন হতো অতি মধুর একটি প্রেমের কবিতা। সমাজের সঙ্গেও ঠোকাঠুকি ঘটত না। ধর্মের সঙ্গেও না। পদে পদে শুনতে হতো না, এটা অসামাজিক ওটা অধর্ম। কিন্তু আকর্ষণ যে অনুভব করে সে পুরুষ। পুরুষের কেবল হৃদয় আছে তাই নয়। আছে দেহ, আছে তাপ। সেইজন্যে সে চায় নারীসঙ্গ। দিনরাত চিঠি লিখে যা পায় তা তো তাই নয়, তা আলো। নিশ্চয়ই মূল্যবান কিন্তু ফুল-ব্লাডেড ম্যান চায় ফুল-ব্লাডেড উওম্যান।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করে চাইতে। গোরী এখন নিবন্ত আগুন। যেদিন আবার জ্বলন্ত আগুন হবে সেদিন সে আগুনে ঝাঁপ দিলে রত্নই পুড়ে খাক হবে। কারণ যে আগুন তার ভিতরে জ্বলছে সে আগুন দুর্বল দেহের আগুন। নিরবচ্ছিন্ন মস্তিষ্কচর্চা তার বলবীর্য টেনে নিচ্ছে। নারীর জন্যে সামান্যই অবশিষ্ট রাখছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, এ দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা পুরুষকে যমের অরুচি না করুক, নারীর অরুচি করে। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।'

রত্নর চিন্তায় ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয় এই তত্ত্ব যে, ইনটেলেকচুয়াল পুরুষের জন্যে চাই ভাইটাল নারী। যে তাকে নিজের ভাইটালিটি দিয়ে ভাইটালাইজ করবে। ইনটেলেকচুয়াল পুরুষের জন্যে ইনটেকচুয়াল নারী নয়। তা হলে যে ইনটেলেকটের ডবল ডোজ হবে। সন্তান যদি হয় তবে সে হবে অতিমাত্রায় ইনটেলেকচুয়াল। তার ভাইটালিটি বলে বিশেষ কিছু থাকবে না। তেমন সন্তান কে চায়? চাই ইনটেলেকট তথা ভাইটালিটির সমন্বয়। গোরীর ও রত্নর সন্তান যদি হয় তবে তার মধ্যে এই বাঞ্ছনীয় সমন্বয় ঘটবে। সেই হবে আদর্শ সন্তান।

সন্তান বাসনা রত্নর মনে কোনোদিনই ছিল না। যুগলের ধ্যানেই সে এতকাল বিভোর। বৈষ্ণবরা যাকে বলে যুগল-কিশোর। যুগলতত্ত্বের মধ্যে তৃতীয় কেউ নেই। সন্তানও তো তৃতীয়। সন্তান হলে আর যুগল থাকে না। হয়ে যায় ত্রয়ী। ত্রয়ীর জন্যে রত্নর মন প্রস্তুত ছিল না। তবে আরো বয়স হলে সেও একদিন সন্তানের জনক হতে রাজী হবে। এখন অসময়ে গোরী ওর মধ্যে সন্তান বাসনা সঞ্চারিত করছে। লিখছে মানিক নাকি মানিকেরই ছেলে। আত্মিক অর্থে। তাই যদি হলো তবে এর পরেরটি কেন কায়িক অর্থে হবে না? অবশ্য মুক্তির পরে। সেই হবে আদর্শ সন্তান। যদি হয়।

গোরীকে রত্ন ওর ফরমাশ জানিয়ে রাখে। গোরী তো হেসে খুন। লেখে, "পুরুষদের তো গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনা পোহাতে হয় না। ওরা শুধু ফাঁদে ফেলতেই জানে।"

আটাশ

রেবাদিকে দেখে জ্যোতিদার গুরুজনের পছন্দ হয়। জাতের বাধা শেষ পর্যন্ত টেকে না। পরলোকের পিণ্ডির জন্যে ইহলোকের বিবাহ পণ্ড হলে ছেলে আর ঘরমুখো হবে না। হবে জেলমুখো। সেটা তো ভালো নয়।

"তা হলে আর দেরি কেন? শুভস্য শীঘ্রম্।" রত্ন উৎসাহের সঙ্গে বলে।

"তা কি হয়! এ যে হিন্দুমতে বিবাহ। এখন শুভদিন ও শুভক্ষণ নিয়ে গবেষণা চলছে। ইতিমধ্যে ঠিকুজি মেলানো হয়েছে। জ্যোতিষীদের হাত থেকে রেহাই পেলে তারপরে বামুনদের পালা। নাপিতদেরও

এতে একটা ভূমিকা আছে, জানো? নাপিত সঙ্গে না গেলে বিয়ে হবে না।" জ্যোতিদা হাসে।

"তা হলে শ্রাবণে নয়। হবে ভাদ্রমাসে।" রত্নর উৎসাহ কিছু কমে।

"দূর, ভাদ্রমাসে কি বিবাহ হয়? ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক বাদ। ও'রা দেখছি অগ্রহায়ণের পূর্বে আমাদের মিলতে দেবেন না।" জ্যোতিদা সংশয় প্রকাশ করে।

"মিলনের জন্যে তোমরা বিবাহ অবধি অপেক্ষা করবে কেন? তুমি তো বিবাহেই বিশ্বাস কর না। আমাদের বেলা তো অন্যরকম পাঁতি দিয়েছিলে।" রত্ন চেপে ধরে।

"কি করি, বল? রেবার মতো পিউরি-টানের প্রেমে পড়তে হবে, তা কি জানতুম? শুধু বিয়ে নয়। মন্ত্র পড়ে বিয়ে। যে দেবতায় অস্তিত্ব মানিনে তাঁর নাম নেওয়া। তাঁকে নমো করা। সাঁতা, আমার এক এক সময় ইচ্ছে করে পালাতে। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে। কিন্তু রেবা আবার ইলোপ-মেন্টে বিশ্বাস করে না।" জ্যোতিদা করুণ-ভাবে বলে।

"তা হলে তোমরা রেজিস্ট্রি করছ না কেন? সেটাও তো বিয়ে।" রত্ন পরামর্শ দেয়।

"রেজিস্ট্রিকে সেকেলে আত্মীয়স্বজনের আরো ভয়। ওটা নাকি বিবাহই নয়। বিবাহ বলতে ও'রা বোঝেন সম্প্রদান, সপ্তপদী, সাত পাক, কুশণ্ডিকা ইত্যাদি। এসব বাদ গেলে কেউ যোগ দেবেন না। পরে ছেলেমেয়ে হলে তাদের বিয়ে আটকাতে পারে। তবে রেজিস্ট্রিও আমরা করব। অসবর্ণ বিবাহ কিনা। হিন্দু আইন এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। পরে আবার উত্তরাধিকার নিয়ে গোলযোগ বাধতে পারে।" জ্যোতিদা বোঝায়।

"আচ্ছা; তুমিই না আমাকে বলেছিলে যে গোরী আর আমি যদি বিয়ের সংযোগ না পাই, অথচ আমাদের যদি ছেলেমেয়ে হয়, তাহলে খালি উইল করে সম্পত্তি দিয়ে গেলেই চলবে? আর বিবাহ তো কেবল উত্তরাধিকারের জন্যেই।" রত্ন জবাবদিহি চায়।

"তোমাদের বেলা বিবাহ অসম্ভব বলেই একথা বলেছিলুম।" জ্যোতিদা উত্তর দেয়। "তা বলে কি তোমাদের মিলন হবে না?"

"দুই বন্ধুর প্রিয় বিষয় গোরী। যেমন কানু বিনে গীত নেই তেমনি গোরী বিনে গল্প নেই। দেখা হলেই গৌরচন্দ্রিকার পর গোরীর প্রসঙ্গ ওঠে।

"গোরী আমার উপর টং হয়ে রয়েছে রতন। রেবাকে বিয়ে করছি বলে নয়। এত শীগগির বিয়ে করছি বলে। ওর একটা ব্যবস্থা না করে, ওকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে আপনি বিয়ে করছি, আমি কোন মুখে? আমার কি লজ্জাশরম নেই? আমি না ওর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ?" জ্যোতিদা আক্ষেপের স্বরে বলে।

"কথাটা ভুল নয়, জ্যোতিদা। তুমিই তো আমাদের পরিকল্পনার মধ্যমণি। তোমাকে বাদ দিলে পরিকল্পনা যে ধসে যায়। এই মুহূর্তে আমরা ইলোপ করছিনে বলেই রক্ষে। নইলে তোমাকে বাদ দিয়ে ইলোপ-মেণ্ট যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট।" রত্ন বলে খানিকটা সীরিয়াস-ভাবে, খানিকটা পরিহাসচ্ছলে।

"গোরীরও সেই নালিশ। ও বলছে ও তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিল। আমার জন্যেই ওর যাওয়া হলো না। কেন, আমার জন্যে কেন? রত্নর জন্যে কেন নয়? রত্নর পরীক্ষার ফল আর-একটু ভালো হলেই তো ওর অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল। কই, রত্নর

বিরুদ্ধে তো ওর কোনো নালিশ নেই?" জ্যোতিদা হাসে।

"না, আমাকে ও আরেকবার চেষ্টা করতে বলেছে। এখন ওর মন প্রস্তুত নয়। আমি সফল হলেও আমার সংগে ও যেত না।' রঞ্জু গৌরীর বক্তব্য বোঝায়।

"অথচ আমাকে দোষ দেয়, যেন আমার জন্যেই ওর যাওয়া হলো না। এর সোজা অর্থ ও এখন প্রস্তুত নয়। সুতরাং ওর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে ও আমাকে। তুমি আরেকবার চেষ্টা করবে। আমি আরেক বছর হাঁ করে বসে থাকব। আর রেবা? আসলে রেবার জন্যে গৌরী তৈরি ছিল না। রেবা ওর কাছে অপ্রত্যাশিত। ওই ছিল আকাশের একটিমাত্র তারা। এখন ওর দোসর হয়েছে রেবা। দোসরকে সইতে পারছে না। তা যদি বল রেবাও।" জ্যোতির চোখে দুষ্টু হাসি।

"রেবা সইতে পারছে না কেন?" রঞ্জুর ধাঁধা লাগে।

"রেবাকে আমি বলেছি যে গৌরীর জন্যে আমার কিছু করণীয় আছে। আগে রেবা ছিল না বলে রেবার সম্মতির প্রয়োজন হয়নি। এখন প্রয়োজন। রেবা কি সম্মতি দেবে? সব শুনে রেবা বলে গৌরী মোটেই আন্তরিক নয়। কোনোদিন যাবে না। খামখা দুটি ছেলেকে চোখ ঢাকা বলদের মতো নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। আমরা নাকি জোড়া বলদ! তুমি আর আমি!" হো হো করে হাসে জ্যোতিদা।

রঞ্জু ওর মধ্যে হাসির খোরাক না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলে, "রেবাদি ভাবছে গৌরীর জন্যেই ওর বিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে। আর গৌরী ভাবছে রেবাদির জন্যে ওর মুক্তি পেছিয়ে যাচ্ছে। পেছিয়ে যাওয়া হয়তো ভেস্তে যাওয়া। রেবাদি বা গৌরী কারো সেটা পছন্দ নয়। তোমারও নয়। আমারও নয়। তাহলে পেছিয়ে না দিয়ে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হয়। বিয়েরও, মুক্তিরও। চেষ্টা করলে বিয়ে এগিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মুক্তি এগিয়ে দিতে পারে কে? তুমিও না, আমিও না। তা হলে দেখা যাচ্ছে গৌরী আর রেবাদির মধ্যে রেবাদিই জিতছে, গৌরীই হারছে। একটি ঘোড়া পেছন থেকে ছুটে এসে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আরেকটি ঘোড়া তার জন্যে তোমাকেই দোষ দিচ্ছে, কারণ তুমিই ও ঘোড়ার সওয়ার বা সইস।" রঞ্জু এই বলে হাসির দৌড়ে ছাড়িয়ে যায়।

"আমরা দুটি বলদ আর ওরা দুটি ঘোড়া। কী চমৎকার উপমা!" জ্যোতিদা মৌজ করে বলে, "আর ওরা যদি ঘোড়া হয় আমরা ওদের সওয়ার তো নই, সইস।"

এর পরে জ্যোতিদা রঞ্জুকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে, "বিলম্বে কার্যসিদ্ধি। সবুরে মেওয়া ফলে। এ বছর আমাদের বিয়ে। আসছে বছর তোমাদের ইলোপমেণ্ট। প্রতিযোগিতায় তোমাকে কেউ রুখতে পারবে বলে মনে হয় না। তোমার সমুদ্রযাত্রা ধ্রুব। এই অবসরে গৌরীর মনটা যাতে তৈরি হয় তার জন্যে সবাই মিলে যত্ন করা যাক। যতনে রতন মেলে। তখন রতনের সংগে মিলে সাগর পাড়ি দেওয়া যায়।"

আপনার উপর রঞ্জুর বিশ্বাস আরো বেড়েছিল। তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সেইজন্যে আরো একজনকে সংগে রাখা দরকার। সেই একজন হলো জ্যোতিদা। কিন্তু রেবাদি ওকে ওর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দিলে তো! রেবাদি যে এর মধ্যেই ধারণা করে বসে আছে যে গৌরী আন্তরিক নয়, ও কোনোদিন ঘর ছেড়ে যাবে না। মেয়েমানুষের সহজাত একটা প্রতিভা আছে, যা দিয়ে ওরা মেয়েমানুষ চেনে। তার জন্যে চোখের দেখারও আবশ্যক হয় না।

"রেবাদির মনটাও যাতে তৈরি হয় সে ভার তোমাকেই নিতে হবে, জ্যোতিদা।" রঞ্জু বিশদ করে, "ধরো, পরের বারেও আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলুম। বলা তো যায় না। পরীক্ষার পড়া একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার। ফী বছর পরীক্ষা দিতে গেলে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ে। সেটাও একজাতের গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনা। শেষে হয়তো দেখা গেল মৃতবৎসা। পরীক্ষায় ব্যর্থ। তা বলে তো গৌরীর মুক্তি আবার পেছিয়ে যেতে পারে না। আমাদের আবার উদ্যোগী হতে হবে। তোমাকে আর আমাকে।"

"তা হলে যে রেবার আর আমার মিলিত জীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবে।" জ্যোতিদা করুণ স্বরে বলে। "কে জানে রেবা হয়তো সে সময় সন্তানসম্ভবা! এক নারীর দায়িত্ব নিলে আরেক নারীর দায়িত্ব বহন করা যায় না। তবে মহাত্মাজীর আহ্বান পেলে এক-মুহূর্ত দ্বিধা করব না। ওটা হলো একটা ঐতিহাসিক লগ্ন। ওতে আমিও একজন বরযাত্র।"

"রেবাদি হয়তো সে সময় সন্তানসম্ভবা।" রঞ্জু প্রতিধ্বনি করে। ঠেস দিয়ে।

"তা হলে ওকে ওর মার কাছে পাঠিয়ে দেব।" জ্যোতিদা গম্ভীরভাবে বলে।

শ্রাবণমাসেই বিয়ের দিন পড়ে। রঞ্জুও একজন বরযাত্র। সেইসূত্রে রেবাদির সংগে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কথাবার্তার সুযোগ মেলে না। পরে মোতি মুস্তফীর যাদবপুরের আবাসে বধূবরণের ভোজসভায় নববধূর সংগে প্রিয়বন্ধুর প্রথম আলাপ। তেমনি আরো একজনের সংগে। তিনি মোতিদার স্ত্রী ইংগেবর্গ। নরওয়ের মেয়ে। তাঁর এদেশী নাম চিত্রা।

দুটি বউ দুটিই দীর্ঘাংগী। একটি বিদেশিনীদের পক্ষে, আর-একটি স্বদেশিনীদের পক্ষে। কিন্তু গাত্রবর্ণে দুই বিপরীত মেরু। দুই জায়েতে গলাগলি ভাব। যেন পিঠোপিঠি দুই বোন। যদিও বয়সের ব্যবধান অনেক।

"সাহেবনগর আসছ তো?" রেবাদি সুধায় রঞ্জুকে।

"না, বউদি। আমাকে যে বলদের মতো খাটাতে হবে।" রঞ্জু রসিয়ে রসিয়ে বলে।

"তা বটে। বেগমপুরে হলে অন্য কথা!" রেবাদিও সুরসিকা।

পরস্পরকে খোঁচানোর খেলায় রেবাদিরই জিৎ। বিজয়িনী বলে, "এই ছেলেটা! চেহারার এ কী ছিরি! রবি ঠাকুর হতে চাও, সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু শুধু কি বাবরী চুল রাখলেই তাঁর মতো সুপুরুষ হবে? তাঁর মতো খেতে ও খেয়ে হজম করতে হবে তোমাকে। দেখে তো মনে হয় না যে খেতে পাও।"

রঞ্জু মুখ ফুটে বলতে পারে না যে হস্টেলে আধপেটা খেয়েই দিন কাটে। অন্যান্য ছাত্ররা বাইরে গিয়ে পেট ভরায়। ওর যে সে সংগতি নেই।

বিদায়ের ক্ষণে রেবাদি ওর হাত ধরে মিষ্টি হেসে বলে, "কেবল খুনসুটি করেই সময় কাটানো গেল। তোমার দাদার সংগে তো চলছে পিটাপিটি। চাষা ও চাষানী হবার মহড়া দিচ্ছি আমরা। এসো আমাদের চাষগাঁয়। পেটভরে পিঠে খাবে।"

"পিঠে খেলে কেমন লাগে তা তো দাদাকে দেখেই বুঝতে পারছি।" রঞ্জু তামাশা করে। যখন দেখে জ্যোতিদার পিঠে পড়েছে এক চাপড়।

জ্যোতিদাও তেমনি। দুই গালে দুটি চড় বসিয়ে দিলে, "আহা, লেগেছে? দাও, একটু হাত বুলিয়ে দিই।"

(ক্রমশ)

অশান্ত শিশু?

এ কথা ঠিক, শিশুদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা বা চাপল্য থাকেই। তাদের দুষ্টুমি মাঝে মাঝে পরিপূর্ণ প্রাণের লক্ষণ বলেও অনেকে মনে করেন। কিন্তু সেই শিশু যখন বড় হতে শুরু করে, শৈশব যখন ক্রমে কৈশোরের দিকে এগিয়ে যায়—আর ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে অবাধ্যভাব, অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য এবং অহেতুক অনিষ্ট করার প্রবণতা বিকাশ পেতে থাকে, আশঙ্কা তখনই। কারণ পরবর্তী জীবনে তার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবেই।... একটা স্পষ্ট অপরাধী মন তখন পারিপার্শ্বিক জনমানসে হাজারো সমস্যা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী-দের সিদ্ধান্ত : বাইরে থেকে ব্যাপারটাকে মানসিক বিকার বলে মনে হলেও, এর পেছনে কাজ করে তার জৈবিক ত্রুটি। এটা এক ধরনের রোগ, এ রোগ সে জন্মসূত্রেই লাভ করে।

সাধারণভাবে শিশুদের মধ্যে যখন অল্প অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য দেখতে পাই তখন ভয় পাবার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু দুর্ভাবনা তখনই যখন তার মধ্যে অদ্ভুত অসংলগ্নতা দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় এর নাম 'হাইপার অ্যাকটিভ চাইল্ড সিনড্রোম'। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় শিশুর অতিবৃত্তিক কার্যপ্রণালী। এ ধরনের ত্রুটির ফলে, শিশুর কাজকর্মের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় চপলতা ধরা পড়ে। এক মুহূর্তের জন্যেও কোন কাজ নিয়ে সে স্থির থাকতে পারে না। সব সময় তার মধ্যে একটা ছটফটানি ভাব। কথা বলে জোরে এবং তড়বড় করে। সেই সঙ্গে অত্যন্ত অধৈর্য এবং সামান্য কারণেই ভেঙ্গে পড়ে। বাড়িতে তার টেলায় টেঁকা ভার। তার দৌরাত্ম্য চিৎকার, হই-হুল্লোড় এবং অবাধ্যপনায় সকলেই অতিষ্ঠ। মিথ্যে ভাষণে দড়। স্কুলে তার অত্যাচারে লেখাপড়া চালান দায়। অতিরিক্ত কথা বলে, নিজের পড়াশুনার ব্যাপারেও অত্যন্ত অমনোযোগী। বলতে গেলে শিক্ষকের দেওয়া কোন পাঠই সে শেষ করতে চায় না এবং নিয়মানুবর্তিতার কোন চিহ্নই তার চালচলনে দেখা যায় না। ফলে শুধু পরিবারের কাছেই নয়, পারিপার্শ্বিকের কাছেও সে যেন এক অসহ্য ব্যক্তিত্ব। এক দুঃসহ ব্যাপার।

ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছিল কয়েকজন মার্কিন চিকিৎসকের দৃষ্টিতে, ১৯১৮ সালে। ঐ বছর মার্কিন দেশে শিশু-দের মস্তিষ্কে অদ্ভুত এক রকম রোগের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। জন্মের পর থেকে অনেকের মগজ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে, সেই সঙ্গে প্রদাহ। চিকিৎসার পর ওদের অনেকে সেরেও ওঠে। কিন্তু তারপরই দেখা গেল, যারা সেরে উঠেছে তাদের অনেকেই ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে বেশ কিছুটা যেন পালটে গেছে। তাদের মধ্যে অতি তৎপরতা বেড়ে যায়। সব সময় রগচটা ভাব, একটুতেই অধৈর্য, অবাধ্য, অপরের প্রতি অনিষ্ট করার প্রবণতা অতিমাত্রায় বেশী। অর্থাৎ এক কথায়, তারা প্রত্যেকেই যেন রাতারাতি সমাজ বিরোধীতে পরিণত হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে দেখা গেল, কারণ একটিই। যে সমস্ত শিশুর মগজ কোন রোগ, বিশেষ করে মাথায় আঘাত বা জন্মের সমকাল আগে বা পরে অক্সিজেনের অভাবজনিত কারণে অসুস্থ থাকে, তাদের মধ্যেও অস্থিরতা বা সমাজবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এবং অনেকে ধরেও নেন, মগজের বৈকল্যতাই সম্ভবত অনুরূপ দুর্ঘটনার কারণ। আর ঐ বৈকল্যতার মূলে কাজ করে কোন রোগ অথবা দুর্ঘটনাজনিত কোন আঘাত। তবে এ তথ্যও শেষ পর্যন্ত আর ধোপে টেঁকে নি। কারণ, অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, অতি দুরন্ত শিশুর অনেকেই ঐ ধরনের মগজের বৈকল্যতায় কখনই ভোগে নি। এ থেকে মনে হয়, যাদের মধ্যে মস্তিষ্কে আঘাতের দরুণ বা অনুরূপ কোন কারণে কথা বলা বা মানসিকতার দিক দিয়ে অস্বাভাবিকতা দেখা যায় সম্ভবত মস্তিষ্কের গঠনজনিত কোন পরিবর্তনের জন্যেও সেটা ঘটতে পারে। হয়ত তাদের মস্তিষ্ককোষের বিনাশ অথবা তাদের কোন অংশের ক্ষয় বা অবলুপ্তিই তার কারণ। ব্যাপারটা যেন, একটা ভাল যন্ত্র খানিকটা বিকল হয়ে গেলে কাজ করার সময় যেমন খানিকটা অসুবিধে সৃষ্টি করে, তেমনই।

শুধু শিশু এবং কিশোরই নয়, বড়দের মধ্যেও অনুরূপ অতিমানসিকতা বা বিরূপ ধর্মপ্রবণতা দেখা যায়। তবে অনুশীলন বা অভ্যাসের দরুণ, খানিকটা পরিবেশের চাপে এবং নিজস্ব ক্ষমতার প্রভাবে বড়দের পক্ষে ঐ সমস্ত ধর্ম অবদমিত করে রাখা সম্ভবত হয়। কিন্তু সে তুলনায় শিশুর কথা একবার ভাবুন। দৈহিক ক্ষমতায় তখনও সে দুর্বল লোকায়ত চালচলন, অভ্যাস, অনভ্যাস বা রীতিনীতি সম্পর্কে তখনও সে অনভ্যস্ত। আর ঠিক ঐ অবস্থায় চেয়ারে ঠায় বসে কাজকর্ম করা বা পড়াশুনো চালান, বাইরে থেকে পরিবেশ সৃষ্টি করে যত চেষ্টাই করা যাক না কেন, যদি তার মধ্যে দুরন্তপনার বীজ থেকে থাকে—তাকে অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। ফলে আমরা যেমনটি চাই, তেমনটি তাকে দিয়ে করান রীতিমত সমস্যা হয়ে ওঠে। আর তার চারিত্রিক অস্বাভাবিকতার শুরু তখনই।

হাইপারঅ্যাকটিভ বা অতি-বৃত্তিক শিশুদের সচরাচর কী কী ধর্ম থাকে, লক্ষ্য করুন :

অতিতৎপরতা, কোন কাজই তারা শেষ পর্যন্ত করার মত ধৈর্য রাখে না, অস্থির, খাবার সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, খেলনা বা আসবাবপত্র ভাঙচুর করার প্রবল ইচ্ছে, অতিরিক্ত কথা বলে, কাউকে মেনে চলতে চায় না, কাজকর্ম এবং আচরণে অসঙ্গতি, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া করে, কখন যে কী করে বসবে আগে থেকে বুঝে ওঠা ভার, অপরকে বিরক্ত করে, নিয়মানুবর্তিতার ধার ধারে না, সব কিছুর মধ্যেই মাথা গলান অভ্যাস, উচ্চারণে ত্রুটি, বদমেজাজ, বিরোধ-প্রবণতা, সময় মত ঘুমোন নেই, বেপরোয়া স্বভাব, কথাবার্তার একমাত্র অধৈর্য হয়ে পড়া, মিথ্যুক, দুর্ঘটনা ঘটাতে ওস্তাদ, জুলুম করা এবং ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম।

কয়েক বছর আগে চার্লস ব্র্যাডলে নামে জনৈক চিকিৎসক আবিষ্কার করেন, কিছু কিছু ওষুধ ঐ ধরনের রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে ভাল কাজ করে। উনি দেখলেন, অ্যামফেটামাইন (বেনজেড্রাইন) নামে এক ধরনের রাসায়নিক যোগ অতিঅস্থির শিশুদের সাম্য অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ওষুধটি প্রয়োগ করার পর দেখা গেল, ঐ ধরনের শিশুরা যথেষ্ট শান্ত হয়ে এসেছে। তারা এবার থেকে নিয়মিত এক জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারে, যে কাজটি তাদের করতে দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত তা সম্পন্নও করে। তারা যথেষ্ট শান্ত এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আবার এও দেখা গেছে, যন্ত্রণানাশক ওষুধ বার্বিচ্যুরেট খাওয়ানতে অনেক শিশুর মধ্যে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা বেড়ে গেছে। তারা অতিমাত্রায় অবাধ্য, অপরাধপ্রবণ এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

ব্যাপারটা তখনই সোচ্চার হয়ে উঠল জীব-রসায়নবিদদের মধ্যে। ওঁদের প্রশ্ন, বাইরের ওষুধ যখন শিশুদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কাজ করে, তাহলে এটাও তো হতে পারে, যাঁরা অস্বাভাবিক শিশু, তাদের জৈবিক গঠনের মধ্যেই এমন কিছু বৈকল্য থাকে যা তাদের অস্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করে—এবং ওষুধ জীব-রাসায়ন বিক্রিয়া ঘটিয়ে তার বিপাকীয় অবস্থার মধ্যে এমন একটি পরিবর্তন আনে যা তার ঐ ত্রুটি দূর করে তাকে সুস্থ মেজাজের একটি মানুষে পরিণত করে দেয়? প্রশ্ন, অস্থির চরিত্র বা স্বভাবের পেছনে তাহলে কি জৈবিক কোন কারণ নিহিত রয়েছে? শারীরিক বিপাকীয় পদ্ধতির সঙ্গে তার কি কোন সম্পর্ক থাকে? শিশুদের অস্বাভাবিক চরিত্র কি পরিবেশের চাপে দূর করা সম্ভব? না কি, শৈশবের ত্রুটি কৈশোরের অনুশীলনের মাধ্যমে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ পায় পরবর্তী যৌবন অবস্থায়?

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মার্ক এ স্টুয়ার্ট ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে
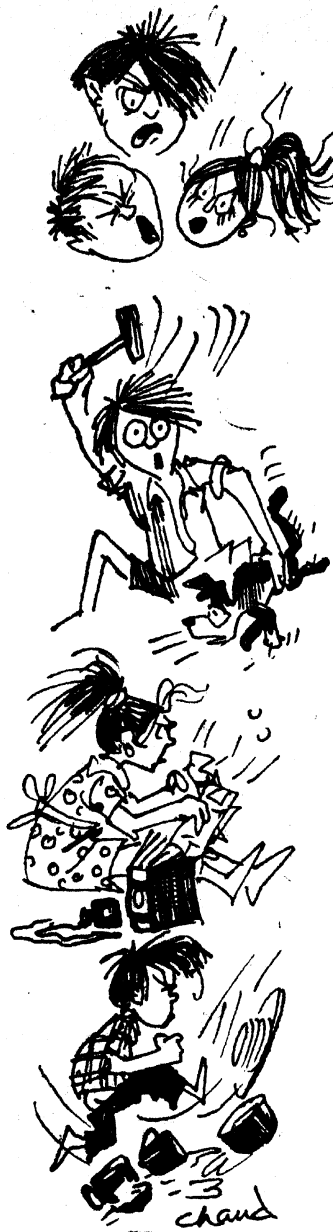
ছিলেন। এর জন্যে প্রথম পর্যায়ে তিনি অতিতৎপর স্বভাবের বত্রিশটি ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ের উপর পর্যবেক্ষণ চালান। এদের সঙ্গে তুলনা করে দেখার জন্যে কিছু সাধারণ স্তরের ছেলে আনা হল। এই দ্বিতীয় দলের ছেলেমেয়ের ও দুরন্তপনায় অবশ্য কম ছিল না। তবে তাদের ঐ চরিত্রের মূলে ছিল পারিপার্শ্বিক কোন না কোন ত্রুটি অথ যথাযথ অনুশীলনের অভাব। অথ শারীরিক রোগ প্রভৃতি। কিন্তু সে তুলন প্রথম দলটির মধ্যে, যাকে সাধারণভাবে রো বলা হয়, তেমন কিছুই ছিল না, দৈহি গঠন বা স্বাস্থ্যে বেশ পুষ্টও বলা চলে।

পর্যবেক্ষণের ফলাফল যা পাওয়া গে তা রীতিমত চমকপ্রদ। দেখা গেল, উপযু পরিবেশ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও প্রথম বিভাগে শতকরা আশিজন ছেলেমেয়ে ঠায় বসে চু করে যে নিজেদের খাওয়ার কাজটা শে করবে, সেটুকু ধৈর্যও যেন তাদের মধ্যে নেই। খেতে বসে সে এক এলাহি কাণ্ড একে খোঁচা মারা, তাকে চিমটি কাটা। এবং শেষ পর্যন্ত নিজের এঁটোকাটা ছড়িয়ে তুলকালাম কাণ্ড। অথচ সে তুলনায় দ্বিতীয় দলের শতকরা আটজন বাদে সকলেই নিয়ম-মাফিক আহারপর্ব শেষ করল। প্রথম দলের শতকরা চুরাশিভাগ মা-ই স্বীকার করলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা কেউই কোন কাজই অতিরিক্ত অস্থিরতার দরুণ শেষ করতেই পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় দলের কারুর মধ্যেই কোন ত্রুটি ধরা পড়ে নি। অথচ এই দ্বিতীয় দলের ছেলেমেয়েদের অনেকেই কিন্তু বাচাল এবং দুরন্ত। পরকে খোঁচা মারায় ওস্তাদ এবং অতিতৎপর ছিল। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ বা পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রথম দলের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তাদের দিয়ে অনেক বেশি ভাল কাজ স্বচ্ছন্দে করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করে মনে হয়েছে, উভয় শ্রেণীর মানসিকতার মধ্যেও একটা স্পষ্ট ব্যতিক্রম রয়েছে। যেন ভিন্নতর মেজাজ নিয়েই তাদের জন্ম।

আরও সন্ধান চালালেন ডঃ স্টুয়ার্ট। দেখা গেল বেশির ভাগ মায়েরই এক কথা। অতিতৎপর শিশুদের চরিত্র জন্মের পর থেকেই ভিন্নতর। অন্তত জন্মের পর দু বছর পর্যন্ত তো বটেই। ডঃ স্টুয়ার্ট দেখলেন, এই ত্রুটির সঙ্গে মায়ের সন্তান-ধারণ সময়ের স্বাস্থ্য বা মেজাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সন্তান প্রসবকালীন ত্রুটি, পারিবারিক মানসিক ব্যাধি। সাধারণ দুরন্ত এবং প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পারি-বারিক পরিবেশ এবং অবস্থা প্রায় সমান। তবে অতিব্যক্তিক বা অতিতৎপর ছেলেমেয়েরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে কতগুলো অসুবিধেতে ভোগে। যেমন, ভালভাবে তারা দুধ খেতে পারে না। প্রথম এক বছর ভাল-ভাবে ঘুমতেই পারে না। স্বাস্থ্যও খারাপ। এদের মুখের কথা ফুটতেও সময় বেশি লাগে। ছোটবেলা থেকেই কাজকর্মের অসঙ্গতি দেখা যায়।

অতঃপর পর্যবেক্ষণ চালান হয় বারো থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের উপর। অস্বাভাবিক কার্যকলাপ করার দরুণ এদের
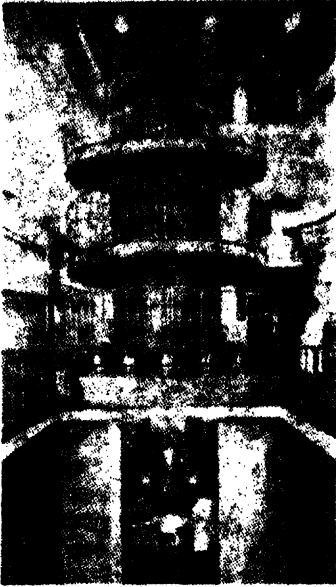
জাপানের হিতাচি লিঃ এবং ওসাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কুশলীরা যুগপৎ চেষ্টায় পৃথিবীর বৃহত্তমদের মধ্যে আরও একটি বৃহত্তম এই ইলেকট্রোন মাইক্রোসকোপটি সংযোজন করেছেন। তিন মিলিয়ন ভোল্ট তড়িৎ-বিভব মাত্রায় এটি কাজ করবে। নতুন এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির মধ্যে একটি বন্ধ প্রকোষ্ঠ রয়েছে, যার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াদের ভাসমান অবস্থায় রাখা যায়। বিগলিত ধাতুর ফেলাসন থেকে শুরু করে যে কোন জীবাণুর সূক্ষ্মতম অংশ এর সাহায্যে দেখা যাবে। ছবিতে নীচে দুজন বিজ্ঞানী অনুবীক্ষণ-যন্ত্রটির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছেন।

প্রত্যেককেই পাঁচ বছর আগে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওদের মায়েরাও অভিযোগ করেন, ছোট বয়েস থেকেই অতি দুরন্তপনা এবং অপরাধমূলক কাজকর্মের দরুণ তাঁদের হাড় জ্বলে যাওয়ার মত অবস্থা। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিবেশ এবং মানসিক প্রবণতাকে সমৃদ্ধ করার দরুণ যা যা ব্যবস্থা করা দরকার, সেগুলি করেও কোন লাভই হয় নি। ওরা অন্যায় করে, ওরা অপরের অনিষ্ট করে, যেন করতে হয় বলেই করে। এ যেন তাদের সহজাত ধর্ম। অথচ ডঃ স্টুয়ার্ট লক্ষ করেছেন, আরও অনেক শিশুর ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক এ ধরনের কোন ব্যাপার ঘটে নি। শৈশবে তাদের মধ্যেও অনেকে যথেষ্ট দুরন্ত ছিল, অপরের ক্ষতিও করেছে, কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটেছে, তারা সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনের মানুষে পরিণত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এমন দশ থেকে ষোল বছর বয়েসের কয়েকটি ছেলে মেয়ের মা স্বীকার করেছেন, তাঁদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত কম, তারা অনায়াসে মিথ্যে কথা বলে, কোন সৎ কাজেই মন নেই, তারা পরস্পর ঝগড়া করে, মারামারি করে। ঐ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা আশাবাদী নন। কারণ কোন রকম শাসন বা অনুরোধেরই ধার তারা ধারে না। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে কোন কোন কিশোর স্বীকার করেছে, স্কুলের পড়া তাদের ভাল লাগে না, কোন রকম পড়াশুনো চালানটাই তাদের কাছে অসম্ভব ব্যাপার। এদের চাল চলন নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক। তবে মনো-বিজ্ঞানীর ভাষায় যাকে অস্বাভাবিক বলে, তা নয়। কারণ তাদের ঐ মানসিকতার পেছনে স্থূল পারিপার্শ্বিক বা দৈহিক কারণ কত-খানি কাজ করে, বলা শক্ত।

ডঃ স্টুয়ার্ট ঐ সমস্ত ছেলেমেয়ের বাবা এবং মা'র সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার করেন। এতে দেখা গেছে, অনেক অতিবর্তিক ছেলে-মেয়েদের বাবারাও শৈশবে বেশ ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলেন। কম বয়েসেই তাঁদের অনেকেই শিক্ষাসমাপ্ত করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্যে বদরাগের ভাবটা বেড়ে যায়, অথবা অতিরিক্ত অসংযত। তবে, মায়েদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে তেমন কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সম্ভবত মেয়েদের চাপা স্বভাবের দরুণ এটা ঘটতে পারে। কারণ নিজেদের সম্পর্কে, বিশেষ করে অনাকাঙ্ক্ষিত দিকগুলি প্রকাশ করার ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশী সংরক্ষণশীল, এই কারণে।

পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানে সরাসরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ঘটনার সম্মুখীন হলেন। ওঁরা দেখলেন, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে ছোট-বয়েস থেকেই অতিবর্তিক তাদের দেহ-কোষের ক্রোমোজমের মধ্যেও যেন ব্যতিক্রম রয়েছে। একথা অনেকেই জানেন, পুরুষের দেহ-কোষে দুটি বংশাণু বা ক্রোমজোমের একটি একস (X), অপরটি ওয়াই (Y)। কিন্তু ঐ সমস্ত ছেলেদের কোষে পাওয়া গেল একটি 'একস' এবং দুটি 'ওয়াই'। অতএব প্রশ্ন এসে দাঁড়াল, অতিরিক্ত একটি 'ওয়াই' কি শেষ পর্যন্ত ঐ সমস্ত অনর্থের মূল কারণ? উল্লেখ্য, এ ধরনের ঘটনাকে নিঃসন্দেহে আমরা জৈবিক ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিতে পারি। স্বাভাবিক মেজাজের মানুষের মধ্যে এ ব্যতিক্রম চোখে পড়ে নি। সম্ভবত এরই দরুণ দেহের বিপাকীয় বা জীবরাসায়নিক প্রতিক্রিয়া এমন ভিন্ন সুরে
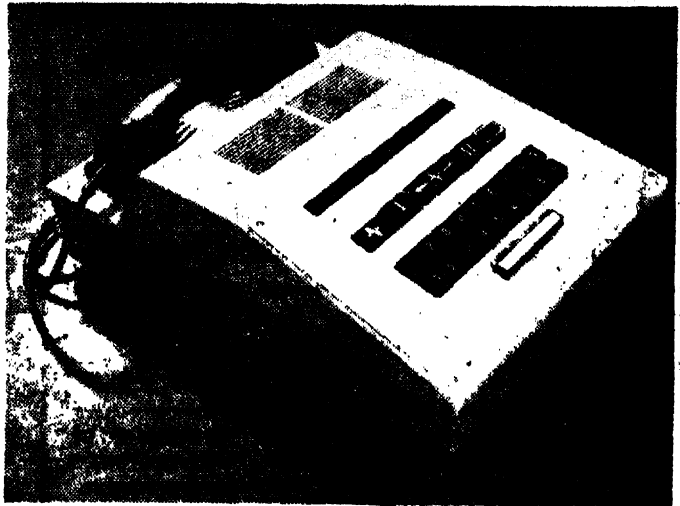
রিকো-৬০ নামে বিশেষ ধরনের এই বেতার-টেলিফোনটি তৈরি করেছেন লার্টভিখার সিনামা প্রতিষ্ঠান। এর সাহায্যে দুই কিলোমিটারের মধ্যবর্তী যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। লক্ষ করুন, টেলিফোনটির উপর কতকগুলি নিয়ন্ত্রক চাবি রয়েছে। এর যে কোন একটি টিপে কম করেও বাটজন লোকের সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন। প্রায়-পরিবাহী, বা সেমিকনডাকটার দিয়ে এর গ্রাহক এবং প্রেরক যন্ত্র তৈরি। ছোট্ট এবং হাল্কা এই টেলিফোনটি নোটবই-এর মত পকেটে পুরে আপনি চলাফেরাও করতে পারেন।

থেকে থাকে যার দরুণ, বাইরে থেকে বলে মনে হলেও, যারা ঐ ধরনের কোন প্রতিক্রিয়ার ভোগে, তার স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও ভিন্নতা ধরা পড়ে। এবং এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে একথাও অবশ্য বলা চলে, অশান্ত এবং অস্বাভাবিক স্বভাব এক ধরনের রোগ। যে রোগ জৈবিক কারণে জন্মসূত্রেই আমাদের কারুর কারুর মধ্যে সংবাহিত হয়।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, 'অতি-বৃত্তিক চরিত্রটি' কিন্তু মেয়েদের চেয়ে এ পর্যন্ত ছেলেদের মধ্যেই দেখা গেছে অনেক বেশি। সমীক্ষা চালিয়ে ডঃ স্টুয়ার্ট যে হিসেবটি দিয়েছেন তা হল, প্রতি ছয়জন ছেলে যেখানে অতিবৃত্তিক, সেখানে মেয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একজনে। এছাড়া মেয়ের তুলনায় ছেলেরা শিশুসুলভ অপরিণত পাঠক্ষমতার অভাব এবং দেরিতে কথা বলা প্রভৃতি সমস্যাতেও অনেক বেশি পরিমাণে ভুগে থাকে।

সে যাই হোক, অস্বাভাবিক বৃত্তি সহজাত অতিবৃত্তির মূলে যে জৈবিক কারণ বা বাইওলজিকেল ফ্যাকটার রয়েছে তার আরও একটি প্রমাণ এই ওষুধ প্রয়োগের পরে রোগীদের স্বভাব চরিত্রের যেটুকু উন্নতি হয়—সেটা ততক্ষণই বজায় থাকে যতক্ষণ ওষুধের ক্ষমতা শরীরের মধ্যে সক্রিয় থাকে। সেই ক্ষমতাটি নষ্ট হওয়ার পর রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে বানরের মস্তিষ্কের অগ্রভাগের একটি অংশ, যাকে বলা হয়, ফ্রণ্টাল লোক—তাকে অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে দেখা গেছে বানরের মধ্যে ঐভাবে অতিবৃদ্ধির অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু এতো গেল দৈহিক অবক্ষয়? আসল ব্যাপার যা, তা হল, যখন কোন শিশুর শারীরবৃত্তীয় সম্পদ একই রকম থাকে অথচ তার চালচলনে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তখন। মানুষের দেহ-কোষে অতিরিক্ত একটি 'ওয়াই' এর অবস্থিতি হয়তো সে প্রশ্নের সমাধানের সূত্রে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অণু-জীববিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত প্রাণী রহস্যের আরও অস্পষ্ট দিক স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। হয়ত তখনই সম্ভব হবে আমাদের ভালমন্দ গুণাগুণের উৎপত্তির যথাযথ কারণ। তবে একথা এখনই বলা চলে মানব-চরিত্রের মৌলিক উৎস পরিবেশের চেয়ে মানুষের মধ্যেই নিবদ্ধ রয়েছে অনেক বেশি পরিমাণে। প্রকৃতির অজ্ঞাত নিয়মে তার কোষের মধ্যে তার স্বরূপসম্পর্কিত টেপ রেকর্ডটির পাঠ যেদিন পুরোপুরি উদ্ধার করা যাবে হয়ত তখনই সম্ভব হবে সে রহস্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে ওঠা। পরিপূর্ণ মানব-সৃষ্টির উৎসটি তখনই আমরা খুঁজে পাব।

সংবাদ

সম্প্রতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের উপর একটি ধারাবাহিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেছেন। উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের যে সমস্ত তথ্য, যাদের সঙ্গে সর্বসাধারণ মানুষও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কোন রকম জটিলতা সৃষ্টি না করে সহজভাবে তাদের উপস্থিত করা। ওঁরা বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন ওঁদেরই কার্যালয়, পি-২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬-এর কার্যালয়ে। ফেব্রুয়ারী ১৬, বিকেল পাঁচটায় প্রথম বক্তৃতা করবেন চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডঃ সন্তোষ মিত্র।
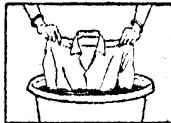
সমরজিৎ কর

কর্মসংস্থান কমিশন ও বেকার সমস্যা

ভারত সরকার গত ডিসেম্বর মাসেই শ্রীবিজয় ভগবতীর সভাপতিত্বে একটি কর্মসংস্থান কমিশন গঠন করেছিলেন। কমিশনের কাজ কতদূর এগিয়েছে তা আমাদের জানা নেই। তবে একথা স্বীকার্য যে বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়ছে। কমিশন নিশ্চয়ই বেকার সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করবেন এবং কিভাবে সমস্যার মোকাবিলা করা যায় তার জন্য কয়েকটি সুপারিশ দেবেন। কিন্তু বেকার সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেশের অর্থনৈতিক নীতির ভুল-ভ্রান্তি, জনসংখ্যার চাপ, শিক্ষানীতির গলদ, শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতিই হচ্ছে এই সমস্যার প্রধান কারণ। অনগ্রসর দেশে জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকলে সেই বর্ধিত জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। তার উপর যদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়, তবে সমস্যার তীব্রতা বাড়ে বই কমে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতের শাসনতন্ত্রে কাজের অধিকার (Right to work) যদি মৌলিক অধিকার হিসাবে সংযোজিত হয়, তবে নিশ্চয়ই তা সকলের কাম্য; কিন্তু এই অধিকারের ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা বর্তমান ভারত সরকারের নেই। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে অন্তত ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে; তার মধ্যে ১ কোটি হবে নতুন শ্রমিকদের জন্য এবং ৫৩ লক্ষ হবে আগেকার বেকার শ্রমিকদের জন্য। পরিকল্পনা কমিশন বলেছিলেন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারী প্রকল্পগুলি যথাসম্ভব এমন রাজ্যগুলিতে স্থাপন করতে হবে যেখানে বেকার সমস্যার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া, বেকার সমস্যার তীব্রতা যে অঞ্চলগুলিতে বেশি অনুভূত হবে সেই অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সুবিধাজনকভাবে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করেছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারেনি। একথা সুবিদিত যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমরা একটি "উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকট" (crisis of ambition) দেখতে পেয়েছিলাম, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও কর্মসংস্থানের "ব্যাপক সম্প্রসারণের" উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের জন্য যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ১০·৫ মিলিয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রে ৩·৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কর্মসূচীও সফল হয়নি। বর্তমানে বেকার সমস্যার তীব্রতা যে কত বেড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশজোড়া যে শান্তি-শৃংখলার অভাব দেখা যাচ্ছে, যুবগোষ্ঠীর মধ্যে যে হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের দিকে যে বাংলা দেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে, বেকার সমস্যা তার সবচেয়ে বড় কারণ।

কর্মসংস্থান কমিশন কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটির বিচার করবেন তা আমরা জানি না। তবে একটি জিনিস মনে রাখা দরকার; তা হল, যে কোন উপায়েই হোক স্বল্পকালীন ভিত্তিতে এমন কয়েকটি ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করা দরকার যার ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। সমস্যাটির দীর্ঘকালীন সমাধানের কথা আমরা নিশ্চয়ই চিন্তা করব; কিন্তু দীর্ঘকালীন সমাধানের উপায়ও দীর্ঘমেয়াদী হবে। সেজন্য কবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মত উন্নতির পথে দেশ এগিয়ে যাবে তার জন্য অপেক্ষা না করে এখনই এমন কতিপয় শ্রম-নিবিড় (labour-intensive) প্রকল্প গ্রহণ করা দরকার যার ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা কিছু হ্রাস পেতে পারে। কলকাতা শহরের কথাই চিন্তা করা যাক। সরকারী সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৭০ সালের শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ২১২টি কল-কারখানা বন্ধ আছে। এই কারখানাগুলির মোট কর্মী সংখ্যা ৩১

হাজারের বেশি। তাছাড়া কর্মক্ষম সম্পূর্ণ বেকারের সংখ্যা এ রাজ্যে কয়েক লক্ষ হবে। খুব দ্রুত কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কয়েকটি স্বল্পকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন কলকাতা শহরে অন্তত ৩০ হাজার অটো রিকশা এবং মফঃস্বল শহরগুলিতে অন্তত ২০ হাজার অটো রিকশা চালু করা। তাহলে শহরগুলিতে পরিবহণ ব্যবস্থারও কিছুটা উন্নতি হবে এবং ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া কলকাতায় যদি পাতাল-রেল, চক্র-রেল এবং গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়, তবে আরও ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। গ্রামীণ শিল্পগুলির উন্নতির জন্য এখন অর্থাভাব তত বড় হয়ে দেখা না-ও দিতে পারে; কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি পল্লী অঞ্চলে আরও বেশি করে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার যদি আরও তৎপর হন, তবে এভাবে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সমগ্র ভারতেই বেকার সমস্যার তীব্রতা কিছু কমানো সম্ভব। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলি হয়েছে। সবগুলিতেই শিল্প-বিরোধ লেগে আছে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ এড়াতে পারলে বহু লোককে আজ কর্মহীন থাকতে হত না। এজন্য সরকারের শ্রম-নীতির যেমন ত্রুটি আছে, তেমনি সমভাবে দায়ী মালিকপক্ষ এবং কিছুটা দায়ী আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বহুধা বিভক্ত নেতৃত্ব। সরকারের শ্রমনীতি গত তেইশ বছরে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সংঘাত দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। তার ফলে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট অথবা লক-আউট। এই শ্রম-বিরোধের ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ শ্রমিকদের, তাদের পোষ্যবর্গের। এখানে উল্লেখযোগ্য—শিল্পসংস্থায় বিপর্যয় দেখা দিলেও ইদানীংকালে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। পশ্চিমবঙ্গে তালিকাভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল ৪৯৫১; তার মধ্যে শুধু রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলেই তালিকাভুক্ত হয়েছে ৬২৫টি।

কর্মসংস্থান কমিশন এসব জিনিস নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। সাধারণ মানুষের কাজের অধিকার থাকলে সরকারের দায়িত্ব থাকে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার। কিন্তু কর্মক্ষম শ্রমিককে যদি কাজ না দেওয়া যায়, তবে তাকে বেকার-ভাতা দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে। বৃটেন অথবা পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে শ্রমিকদের যা দেওয়া সম্ভব, ভারতের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়, সীমিত অর্থ-সম্পত্তির মধ্যেই ভারতকে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কিভাবে আরও বাড়ানো যায় এবং এজন্য সরকারের বিনিয়োগ নীতির পুনর্বিন্যাস কিভাবে করা হবে অথবা শিক্ষানীতির গলদ কিভাবে দূর করা যেতে পারে, কর্মসংস্থান কমিশন নিশ্চয়ই তা বিবেচনা করবেন। শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন বাড়ছে এবং সেজন্য দায়ী সরকারের বিগত তেইশ বছর যাবৎ অনুসৃত শিক্ষানীতি। আজ যারা শিক্ষিত বেকার যুবক, তাঁদের অধিকাংশই স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা মানুষ হয়েছেন। তাঁরা যে একদিন কর্মক্ষম হবেন এবং সেজন্য যে ১৯৭০-৭১ সালে প্রচুর কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে একথা ভারত সরকারের আরও বিশ বছর আগেই ভেবে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে সরকার শুধু দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করার কথা একটি দৃষ্টিকোণ থেকেই ভেবেছেন, তা হল বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। কিন্তু সেই বিনিয়োগ এমনভাবে বাড়ানো হচ্ছে কিনা যার ফলে কর্মসংস্থানের দ্রুত সম্প্রসারণ হতে পারে, সরকার সেই দিকটি বিবেচনা করেননি। কর্মসংস্থান কমিশনের উচিত, আমাদের শিক্ষানীতির পুনর্মূল্যায়ন করা এবং যাতে শিক্ষাব্যবস্থা কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের অনুকূল হয় সেই ব্যবস্থার সুপারিশ করা। কর্মসংস্থান নীতির সঙ্গে শিক্ষানীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, একথা ভুললে চলবে না।

সুব্রত গুপ্ত
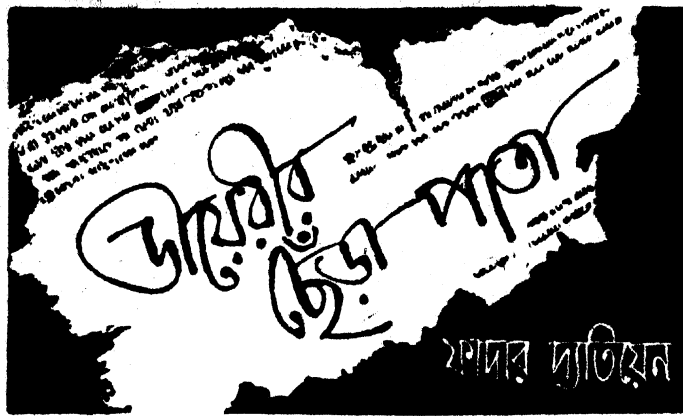
ফাদার সুনীল বনাম উত্তমকুমার

আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে ফাদার সুনীলের পরিচয় কোনোদিন করিয়ে দিই নি, না?...হ্যাঁ, যা ভাবছেন তা-ই : হিংসাবশত দিই নি : ফাদার সুনীল চোখ-ধাঁধানো সুদর্শন কিনা, টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো সুদর্শন। তিনি আবার টীচার। ফিজিক্সের টীচার। ছাত্রপ্রিয় টীচার।

সেদিন ফাদার সুনীল আমার কাছে এসেছিলেন, কি যেন কিসের সন্ধানে। কাজ-টাজ সেরে, মোমবাতি জ্বালিয়ে [আমার পাড়ায়, জানেন, বিজলি এমন বিশ্রী সময় ফেল্ করে!] কোলকাতার শহরতলির রাজনীতিক পরিস্থিতির আলোচনা করছিলাম; হঠাৎ এল দই।

দইয়ের ভালো নাম দয়াময়ী—ঠাকুরমার দেওয়া নাম। মেয়েটির অনুরোধ উপরোধ অমান্য করে, অনশনে-আত্মহত্যার ভয় প্রদর্শন অগ্রাহ্য করে মাতৃভক্ত পিতৃদেব দয়াময়ী নামটা বদলাতে রাজি হন নি।

দয়াময়ীর মা ডায়েরির পাঠিকা। সেই সূত্রে আলাপ। পত্রালাপ। ভদ্রমহিলা শুনেছেন, আজকে আমার জন্মদিন [সত্যি তো...আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম]: মেয়ের হাতে পাঠিয়েছেন আমার ফেভারিট্ ডিশ্ : চানাচুর, আলুর দম আর বাগদা চিংড়ির ফ্রাই।

ফাদার সুনীল আমার ঘরের একমাত্র টুল ছেড়ে চলে গেলেন; দয়াময়ী বসল, বক বক করতে শুরু করল। আপনি যদি বিদেশ থেকে এসে আমাদের এই ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা বঙ্গভূমিতে 'স্পোকেন্ বেঙ্গলি' শিখতে চান, তবে আমি বলব : দয়াময়ীকে প্রাইভেট্ ট্যুটর রাখুন। আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি : মেয়েটির ঐ অনর্গল বকবকানি শুনতে শুনতে বাংলা ভাষার অনেক কায়দা, ব্যাকরণের অনেক মারপ্যাঁচ অল্পায়াসে শিখবেন। আর দয়াময়ীর মা তাঁর আত্মজার বাচালতা থেকে ক্ষণিকের জন্য রেহাই পেলে আপনাকেও বোধ হয় কৃতজ্ঞচিত্তে খাওয়াবেন ঐ চানাচুর আর আলুর দম আর বাগদা চিংড়ির ফ্রাই।

"জানেন, ভূপতিনাথ নামে আমাদের এক 'বাড়ির মাস্টার' ছিলেন; শেক্সপীয়ার

মেয়েটির অনর্গল বকবকানি শুনতে শুনতে

পড়াতে পড়াতে উনি প্রায়ই বলতেন বউয়ের আর রান্নার কথা—বউয়েরই রান্নার কথা। হ্যামলেট থেকে মামলেট আর কি! আমরা একদিন ক্লাসের মধ্যেই ওঁকে জিগ্যেস করেছিলাম : 'আপনার বউ আজকে কি রান্না করেছেন?' উনি একটুও লজ্জা করলেন না, বললেন, 'ইলিশ মাছের ঝোল...'। হ্যাঁ, বেশ বুড়ো বটে আমাদের 'বাড়ির মাস্টার', থুরথুরে বুড়ো একেবারে। বাবা বলতেন, ছোকরা হলে প্রেম করবে...

"আর আমার ভাই পুতুল কি করে, বলব? স্নান সেরে এসে ও আমার কানে চেঁচিয়ে আওড়ায় গায়ত্রী মন্ত্র। মেয়েদের শুনতে নেই, জানেন?...পাপ হয়!" ঐ বিশেষ পাপটার জন্য মেয়েটি যে খুব বেশি অনুতপ্ত, তার কোনো স্পষ্ট লক্ষণ ধরা পড়ে না।

তারপর বান্ধবী শাশ্বতীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী—সে আবার ছন্দে রচিত : "রোজ রোজ উঠে ছাতে। চোখাচোখি করে মন্টুর সাথে...।" পুরো গল্পটা শোনার সুযোগ আর হল না; দয়াময়ী হঠাৎ থেমে বলে উঠল : "আপনার ঐ ফাদার বন্ধুটাকে সিনেমায় নামতে বলুন; দেখবেন, কিছুদিনের মধ্যেই কোনো বাঙালী মেয়ে উত্তমকুমারের অটোগ্রাফ আর চাইবে না... আর সৌমিত্রকে রাস্তায় দেখলে কেউ ওঁর দিকে তাকাবেও কিনা সন্দেহ!...আমি শুধু ভাবছি, ঐ ফাদার সুনীলের মতো সুপুরুষ সন্ন্যাসী হতে যান কোন্ দুঃখে —...কত মেয়ে ও-রকম ছেলে পেলে খুশী হত, তা কি জানেন?..."

আমি কিন্তু দয়াময়ীর সঙ্গে একমত হতে পারি না। আপনারা কি সত্যি সত্যি দুনিয়ার যত সুশ্রী ছেলেকে সরিয়ে রাখতে চান সংসারের জন্য?...আর ভগবানের ভাগে বুঝি শুধু পড়বে আমারই মতো দেখতে যত হাঁড়িমুখোর দল?...তাহলে কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলীর রিক্রুটিং বিভাগটাকে মুশকিলে পড়তে হবে, স্বপক্ষের এক সহজবোধ্য যুক্তি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সহজবোধ্য যুক্তিটা এই : বড় বড় চোখ মেলে দেখুন ঐ ফাদার সুনীলকে : "সারা দুনিয়া নিজের পায়ের তলায় রাখতে পারত সে, আর তবু সব-কিছুই স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন খ্রীশ্টসেবার উদ্দেশে।" তিনি এমন এক মেয়েকে পেতে পারতেন যার পিত্রালয় টেলিফোন-ভবনের মতো আকাশচুম্বী, যার গয়না-গাটি ভারতের তাবৎ রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কে ধরত না...আর তবু শুধু ঐশ ডাকে সাড়া দিয়েই তিনি ব্রহ্মচর্যের আজীবন ব্রত গ্রহণ করে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

সন্ন্যাস বনাম অমিতা

বলা বাহুল্য, এত স্বার্থত্যাগের পথে ঈশ্বর সবাইকে ডাকেন না...। ঐশ আহ্বান আবার সব সময় স্পষ্ট বোঝা যায় না—আর সেই অস্পষ্টতা হল কোনো কোনো যুবকের জীবনে এক রীতিমতো সমস্যা। এই ধরুন

আমার বন্ধু শুভেন্দুর কথা; আমার টেবিলে এখনও পড়ে আছে তার চিঠিখানা :

শ্রদ্ধেয় ফাদার, আপনি এত বছর ধরে আমাকে যে কত সাহায্য করেছেন, আমার ছোটখাটো সমস্যার উপর আপনি যে কত আলোকপাত করেছেন, সেই কথা ভেবে আমার অন্তর উপচে পড়ে কৃতজ্ঞতায়। আপনার পরামর্শ মতো আমি পুজোর ছুটিতে ব্যাণ্ডেলে কাটিয়েছিলাম তিনদিন—প্রার্থনায় ও মৌনব্রতে। বুঝলাম, স্পষ্টই বুঝলাম, ভগবান আমাকে ডাকছেন ফাদার হতে। ধর্মাধ্যক্ষও আশা দিয়েছিলেন, আসছে বছর বি-এ পরীক্ষার পর ধর্মাশ্রমে আমি যোগ দিতে পারব। ইতিমধ্যে...

ইতিমধ্যে এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। সমস্যাটার নাম—অমিতা। না, ঘাবড়াবেন না...প্রেমে পড়িনি, শুধু "আবিষ্কার" করেছি অমিতাকে। আমার বোনের বেস্ট ফ্রেন্ড...। আমাদের হাজারিবাগের বাগানবাড়িতে দেখা; রাস্তার ওপারেই ওর কাকাদের বাড়ি।

জানেন, আমি কত লাজুক প্রকৃতির। সোস্যাল ক্যাম্পে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার কিছু সুযোগ পেয়েছিলাম বটে—এর সঙ্গে ওর সঙ্গে পক্ষপাতহীনভাবে; কাজের ফাঁকে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতাম মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম', সরষের তেলের চড়া দাম, আন্তর্জাতিক শান্তির কথা...। ওদের কাউকেই জীবনসঙ্গিনী ব'লে ভাববার প্রলোভন আসে নি। ওদের ব্যক্তিগত গুণাগুণের বিচার যে করিনি, তা নয়; তবে শেষে সব সময়ে দেখতাম, ওদের নারীসুলভ প্রগল্‌ভতা আমার যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

আর আজ দেখুন...হাজারিবাগে দশ দিন থাকার কথা ছিল, কাটিয়েছি পুরো এক মাস। অমিতার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে, ওর সঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে গিয়েছি, ও আর আমি, দুজনে...এক মুহূর্তের জন্যও বিরক্ত বোধ করি নি। অনুভব করেছি রমণীর রমণীয়তা...। না, শারীরিক সৌন্দর্যের কথা বলছি না—অমিতা যদিও রূপসী। এমন কিছু করিনি যার জন্য অভিভাবকের সামনে বিন্দুমাত্র লজ্জা পেতে হত। কিন্তু আস্তে আস্তে বোধ করতে শুরু করেছি অমিতার উপস্থিতির আবশ্যকতা। দু সপ্তাহ হয়েছে ফিরেছি: ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে চিঠি-লেখালেখি। আজকের ডাকেও তার একটা পোস্ট কার্ড ছিল।
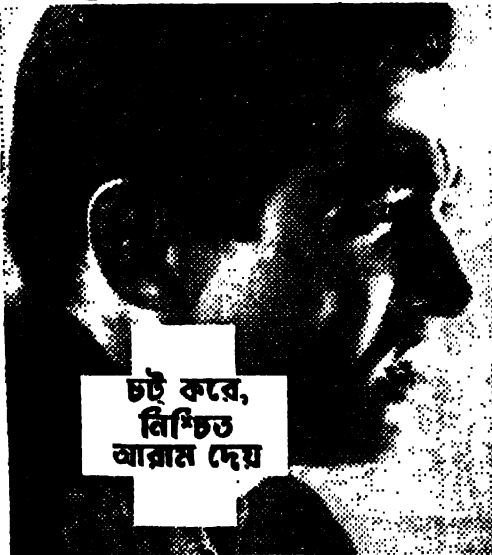
এক মুহূর্তের জন্য বিরক্ত বোধ করিনি

অনেক ইতস্তত করার পর ওকে বলেছি আমার সেই ঐশ আহ্বানের সম্ভাবনার কথা সন্ন্যাসগ্রহণের সম্ভাবনার কথা; বলেছি অবশ্য, এখনও কিছু স্থির করি নি...। ও যেন একটুও আশ্চর্য না হয়ে বলল, ভগবান আমাকে যদি ডাকেন, ভগবানের সঙ্গে ও প্রতিযোগিতা করবে না। আবার বলল, ভগবান যে আমাকে ডাকেন, সেই বিষয়ে ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আর কি লিখব?...আসল কথাটা তো লিখলামই। যত শীঘ্র পারেন উত্তর দেবেন। ইতি

স্নেহধন্য শুভেন্দু

স্নেহাস্পদেষু,

দয়াময়ী চলে যাওয়ার পরে [না, নিজে থেকে সে ওঠে না; ছোট ভাই ডাকতে আসে; ঘোষণা ক'রে যায়, দিদির স্নানের উষ্ণীকৃত জল দিদির জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে] একটা এ পি সি ট্যাবলেট গিলে মাথা-ধরাটা সারিয়ে নিয়ে চিঠির উত্তর লিখতে বসলাম। ব্যাপারটা নিজের কাছে যত মামুলি ঠেকুক

না কেন,' আমার অনেক পাঠকপাঠিকার কাছে নাকি যথেষ্ট কৌতূহলপ্রদ।

স্নেহাস্পদ শুভেন্দু, অমিতার স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, অমিতার আকর্ষণ শক্তির স্রষ্টাকে ধন্যবাদ, অমিতার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারের স্রষ্টাকে ধন্যবাদ। তোমাকে বলব কি? তোমার জন্য এমনই এক সাক্ষাৎকারের আশা করেছিলাম।

তুমি আবিষ্কার করেছ, আর দশজনের মতোই তোমারও হৃদয় প্রত্যুত্তর বাজে নারী-সৌন্দর্যের সংস্পর্শে। নারীর নিছক দেহলাবণ্যের কথা বলছি না [সেটাও যদিও অবজ্ঞার বিষয় নয়], বলছি নারীর উপস্থিতির আর বন্ধুত্বের কথা।

অমিতার সান্নিধ্যে তুমি যা অনুভব করছ, তার জন্য তোমার ঐশ আহ্বান অপ্রমাণিত হয়নি। সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রথম ও শেষ কথাই প্রেম: ভগবৎপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বিশ্বপ্রেম..। ভালোবাসতে জানে না যে মানুষ, প্রেমের অর্থ যার কাছে অবোধ্য সে জানুক—সন্ন্যাস গ্রহণের সে অযোগ্য।

বলতে চাই না, কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোই সন্ন্যাস গ্রহণের এক অনিবার্য প্রস্তুতিপর্ব। অনেকের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা দেখেছি যে, যাজকেরা নাকি ইহলৌকিক প্রেমসাধনায় ব্যর্থ হওয়ায় জন্যই মঠে যোগ দিয়েছেন পারলৌকিক সান্ত্বনার খোঁজে।...এমনও হতে পারে অবশ্য যে কেউ, প্রেমিকার বিশ্বাসঘাতকতায় কিংবা সহধর্মিণীর তিরোধানে মানবপ্রেমের অনিত্যতা উপলব্ধি করে, সর্বোপরি আরাধ্য যিনি, সর্বাপেক্ষা রমণীয় যিনি, আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁর সেবায়, সন্ন্যাস গ্রহণ করে। আমি কিন্তু ঐ ধরনের কাউকে জীবনে দেখিনি।

ধর, শুধু কল্পনা কর, অমিতা তোমাকে হতাশ করে অন্য কারও সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, আমি তার জন্যই কি তোমার ঐশ আহ্বান বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করব?...ধর, শুধু কল্পনা কর, অমিতা গাড়ি চাপা পড়ে মারা গিয়েছে, আমি তার জন্যই কি বলব যাজক হয়ে যাচ্ছ তুমি তোমার নৈরাশ্য লুকোতে?

ভগবৎপ্রেমের বেদিতে মানবপ্রেম উৎসর্গ করে যাজক শুধু দৈহিক উপভোগ আর পিতৃত্বের আনন্দ প্রত্যাখ্যান করেন না, পরিত্যাগ করেন নারীর সান্নিধ্য লাভে লব্ধ আশ্বাস, প্রেমপ্রাপ্তি ও প্রেমদানের সন্তোষ। যাজক যা যা পরিত্যাগ করেন, সেসব-কিছুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে আবশ্যকও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। এদিকে ভাবী যাজক যাকে বিয়ে করতে পারতেন, যাকে বিয়ে করলে সুখী হতেন, এমন এক মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্যে তাঁর লাভ হতে পারে, শুভেন্দু।

মুশকিল এই যে, ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে বিপদও আছে: মন স্ববশে থাকে না, অন্তরে মোহ আসে। তাই ভাবছি: হাজারিবাগে অবস্থান না বাড়াতেও পারতে।' আমার পরামর্শ চাও? ঘন ঘন চিঠি লিখবে না। তুমি যদি সঠিকভাবে জানতেও, ভগবানের ইচ্ছাই এই যে—তুমি ওকে বিয়ে করবে, তথাপি এই একই কথা বলতাম। সময় লাগে ফুল ফুটতে, সময় লাগে ফল পাকতে: ভালোবাসার বিকাশেও সময় লাগে।

এদিকে ভুলবে না ভগবানের সেই আহ্বানের কথা: তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হলেও তুমি দৃঢ়সংকল্প। এত মাস ধরে এত আগ্রহের সঙ্গে যে সন্ন্যাসের কথা ভেবেছিলে, তা সহজে জলাঞ্জলি দেবে না। ব্যান্ডেলের নির্জনতায় তুমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলে, সেই সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয় নয়, তা মানি: তোমার এই ঐশ আহ্বানের সমস্যার উপর অমিতার আগমন এক নতুন আলোকপাত করেছে। তবে অমিতার এই আবির্ভাব তোমার সমস্যার মীমাংসায় কোনো পরিবর্তন যে ঘনিয়ে তুলবেই, তা না হতেও পারে। তোমাকে নতুন করে, একান্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে।

কলেজ খোলার পরে, দৈনন্দিন ছাত্র জীবনের আটপৌরে বাস্তবের মধ্যে যদি বোঝ ভগবান তোমাকে ছাড়েননি, পরম স্বার্থত্যাগের কথা ভেবে যদি অনুভব কর শান্তি...তাহলে অমিতাকেও তুমি শোনাবে স্বার্থত্যাগের কথা, মঠে যোগ দেবে নির্ভয়ে। এদিকে সন্ন্যাস কথাটার উচ্চারণেই তোমার মনে যদি শুধু জাগে অতীতের স্তূপীকৃত স্মৃতি, ভবিষ্যতের প্রশ্ন উঠলেই নিজ থেকে আসে যদি বিবাহের আকাঙ্ক্ষা...তবে সানন্দে যোগ দেব তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে।

...না, কোনো উপহার নিয়ে যাব না—আমি নিজেই সন্ন্যাসী মানুষ কিনা।

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯৩৯ সনে। সে সময় 'অলকা' নামক একখানা স্বল্পায়ু মাসিকপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদকরূপে আমিও যুক্ত ছিলাম। এই উপলক্ষে ১ নম্বর পাম প্লেসের বাড়িতে আমি সপ্তাহে অন্তত একবার গিয়েছি তাঁর পরামর্শ নিতে। প্রথমবারে যখন অলকার জন্য লেখা পাঠিয়ে দেন, তখন তাঁর সঙ্গে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন—

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী

কল্যাণীয়েষু, আমার লেখাটি পাঠাচ্ছি। হস্তাক্ষর খুব স্পষ্ট নয় তাই একখানি proof পাঠিয়ে দিয়ো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী
২১-৮-৩৯

নিজের হস্তাক্ষরের সমালোচনা নিজেই করেছিলেন দায়ে পড়ে। এ সময় তাঁর লেখা এবং কথা বলার সময় ঠোঁট কিছু কিছু কাঁপতে আরম্ভ করে। কিন্তু কাঁপা লেখায় কমপোজিটর যাতে না কেঁপে যায় সেজন্য আমি নিজে তাঁর লেখা নকল করে প্রেসে পাঠাতাম, যার জন্য মূল লেখা কিছু কিছু এখনো আমার কাছে আছে।

১৯৬৩ সনে আমি যখন যুগান্তরের 'সাময়িকী' বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হই, সেই সময় প্রমথনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করি। তখন আমি ইন্দিরা দেবীর কাছে অনুরোধ জানাই—রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে তিনি যেন তাঁর মত আমাকে জানান। এখন যে চিঠিখানা উদ্ধৃত করছি তাতে অন্য প্রসঙ্গের সঙ্গে তাঁর মতামতও পাওয়া যাবে।

ওঁ

লাল বাংলা
১ ৫-৬-৪৫

কল্যাণবরেষু,

...চৌক সংখ্যাটিও দেখেছিলাম।—অন্যান্য অপ্রকাশিত বা খণ্ড প্রবন্ধ ইচ্ছে মত একদিন এসে দেখে প্রকাশ হলেই ত ভাল। মূল পত্রাদিও পরে ফেরত দিয়ে যেও।

রবীন্দ্র স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে আমার নিজস্ব পরিকল্পনা বিশেষ কিছু নেই। তিনি নিজে চেয়েছিলেন জনগণের মনে যে শ্রদ্ধাপ্রীতিপূর্ণ স্মরণ, তা যদি তাঁর কৃতকর্ম দিয়ে না পান, তবে কি বাইরের চিহ্ন দিয়ে পাবেন? তবে জনগণের পক্ষ থেকে একটা সাকার চিহ্ন রাখতে চাওয়া স্বাভাবিক। সে হিসেবে নব-গঠিত রবীন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডার সমিতি যে উদ্দেশ্য চতুষ্টয় ঘোষণা করেছেন, সেগুলিও আমার বেশ উপযোগী ও সার্থক মনে হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে যোগ ত রাখা চাই। "Rabindra Way"টা যেন মনোনীত নয়, সেটুকু সহজেই বলা যেতে পারে। কর্পোরেশনের কল্পনার দৌড় ত দেখি ঐ রাস্তার নামকরণ পর্যন্ত।"

শ্রীইন্দিরা দেবী।

রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে আমার একটা পরিকল্পনার কথা ইন্দিরা দেবীকে জানিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল হিমালয়ের (দার্জিলিঙের এলাকায়) কোনো একটি অখণ্ড পাহাড় খুঁদে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি গড়া, যা দূর থেকেও দেখা যাবে। এতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিরাটত্ব শুধু নয়, আমরা তাঁকে যে পরিমাণ বিরাট মনে করেছি তার কিছু প্রতিফলন তাতে পাওয়া যেত। আমার প্রস্তাব যে বাংলা দেশের পক্ষে বাড়াবাড়ি হয়েছিল, তা আমি বুঝেও পেশ করেছিলাম। আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার চিহ্ন দেখানো খুব শস্তায় সারা না গেলে তা আমরা করি না। সে হিসাবে করপোরেশনের পন্থাই শ্রেষ্ঠ। পথের নাম বদল। একই পথের নাম যুগে যুগে বদল করা চলে, তাতে সাইনবোর্ড লেখকের জন্য যেটুকু খরচ হয়।

আমার আরো একটি প্রস্তাব ছিল। সে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিখ্যাত চরিত্র কয়েকটির মর্মর মূর্তি নানা জায়গায় স্থাপন করা। কিন্তু এতেও তো খরচ। তাছাড়া এ রকম জিনিসের মূল্য বুঝতে আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের কি মূল্য সে বোধেরও ইন্দিরা দেবীর এই চিঠিখানায় কিছু আভাস আছে—

ওঁ

লাল বাঙ্গলা, ১নং পাম প্লেস
বালিগঞ্জ ২৯।৫।৪৫

"কল্যাণবরেষু,

"কদিন হল যুগান্তরের রবিবারের সংখ্যা পেয়ে খুসি হয়েছি। ওঁর মূল চিঠিখানি ফেরৎ পেলে আরও সুখী হব। আশা করি সুবিধেমত ফিরে পাঠাবে।

রবীন্দ্র স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে তোমার পরিকল্পনা খুব উচ্চস্তরের ও দরের; কিন্তু একটু নাগালের বাইরে মনে হল।"

শ্রীইন্দিরা দেবী

এই সব পত্রস্মৃতির সঙ্গে একটি দার্শনিক তত্ত্ব মনে উদয় হল। ছিন্ন-

পত্রাবলীতে ইন্দিরা দেবীর কৈশোরের একখানি ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। আর আমি ১৯৩৯ সনে তাঁর একখানি ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম। দুখানাই একই দিকে মুখ ফেরানো। কিশোরী ও বৃদ্ধা একই ব্যক্তি, মাঝখানের বছরগুলি উধাও। মানুষের জীবনের ও চেহারার স্থায়িত্বকাল যেন একটি নিশ্বাসের ব্যাপার। দুটি ছবি পাশাপাশি দেখলে আমি যা বললাম সেই চিরপরিচিত কথাটি আরো একবার উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়া যেত।

ইন্দিরা দেবীর হ্রস্বইকারের একটি মজার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একটি বাঁকা লাইন দুটি লাইন হয়েছে। তারও পরে ঐ দুটি লাইন গাছের পাতাতে পরিণত হয়েছে।

এই সঙ্গে আর এক অমায়িক ব্যক্তির কথা মনে এলো। সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৩৭ সনে। তারপর ১৯৪৫-এর পর থেকে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রথম আলাপেই তাঁর অকপট নিরহঙ্কার চরিত্রটি মনে একটা মধুরতার ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তাঁর কিছু কিছু লেখাও আমি চেয়ে নিয়ে ছেপেছি। একবার একটা মজার কাহিনী বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে থেকে তিনি যে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন সেই বিষয়ে। কাগজ চালানোর নতুন অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা এটি। তিনি সেই কাগজে নতুন লেখকদের লেখা ছাপবেন এই রকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। যাদের লেখা ছাপা হবে তাদের সেইসব লেখা ছাপার জন্য সম্পাদককে টাকা দিতে হবে, এই ছিল প্রস্তাব। লেখা ছাপা হওয়ার দুর্বলতার উপর কাগজের মুনাফা। বহু লেখা ও টাকা আসতে লাগল। এবং তাতে ছাপা খরচ ইত্যাদি বাদে সম্পাদকের মাসে অন্তত পঞ্চাশ টাকা লাভ থাকত। সুধাকান্ত তারপর বললেন, এমন উত্তেজক খবর শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কানেও পৌঁছাল। তিনি সুধাকান্তকে ডেকে তাঁর এই নতুন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য খুবই তারিফ করলেন, বললেন পরিকল্পনাটা খুবই ভাল, কিন্তু এ কাজ শান্তিনিকেতনে বাস করে আর ক'রো না, বাইরে গিয়ে কর।

বাস্, এমন লাভের ব্যবসাটা ঐখানেই বন্ধ করে দিতে হল।

এবারে আর একটি স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছি। ৫-২-৫২ তারিখে আমি সুধাকান্তের কাছ থেকে যে চিঠি পাই, তার অংশ এই—

শান্তিনিকেতন,
৪-২-৫২

"প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, গত ২৮-১-৫২ তারিখে বম্বে হতে ফিরেছি স্ব-রাজ্যে। পথে এলাহাবাদে ঠান্ডা লেগেছিল, ফলে ব্রংকাইটিস হয়ে শুয়ে আছি বিছানায়। সময় কাটাবার জন্য যোগাড় করেছি কতগুলি মাসিক আর দৈনিক। কার্তিক ১৩৫৮ সালের প্রবাসীতে দেখলুম "আমার চীন ভ্রমণ"। পরিমল গোস্বামী লিখিত দেখে আগাগোড়া মন দিয়ে ভ্রমণ কাহিনীটি পড়েছি। প্রবাসীর পরিমল কি আপনি?"

এই ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ে কিছু বলা দরকার। প্রবাসীতে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থায়ী আদেশ ছিল, ভ্রমণ কাহিনী হলেই তা যেন আমি প্রবাসীতে দিই। এই আদেশ মান্য করে কয়েকটি দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী প্রবাসীতে দিয়েছিলাম। ডুয়ার্স ভ্রমণ, সিমলা ভ্রমণ, হাজারিবাগ জেলা ভ্রমণ। কিন্তু ১৯৫১-তে কোথাও যাবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই আমি জানিয়ে দিলাম, এবারে তো বাইরে যাচ্ছি না, যদি কলকাতা ভ্রমণ করে সেই ভ্রমণ কাহিনী লিখি তা হলে চলবে?

উত্তর জানা গেল অবশ্যই চলবে।

তখন হঠাৎ মনে হল আমার চীনা বন্ধু ল চংগী (তখন যতদূর মনে পড়ে সে বঙ্গবাসী কলেজের বি-এ ছাত্র, স্পেশাল বেঙ্গলী সহ)—তাকে নিয়ে যদি কলকাতার চীনা পাড়ায় ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে 'আমার চীন ভ্রমণ' লিখি তা হলে একটা নতুন জিনিস হবে। ল চংগী খুব রাজি। সে যেন আমার চেয়েও বেশি উৎসাহী। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে সংস্কৃত নিয়ে। বাংলা দেশে তিন পুরুষ ধরে আছে। তার বাংলা রচনা খুব সুন্দর, আমি ছেপেছিলাম কয়েকটি। (এখন সে পুলিস সারজেন্ট, লালবাজারে।)

আমার কাঁধে লাইকা ক্যামেরা। দুজনে প্রথমে গেলাম ধাপায়। সেখানে চীনাদের চামড়ার যাবতীয় কাজ দেখলাম, বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলাম, অনেক ছবি তুললাম। তারপর আর একদিন সে ও তার কাকার সঙ্গে চীনা পল্লীতে প্রাচীন কালের বুদ্ধমন্দির
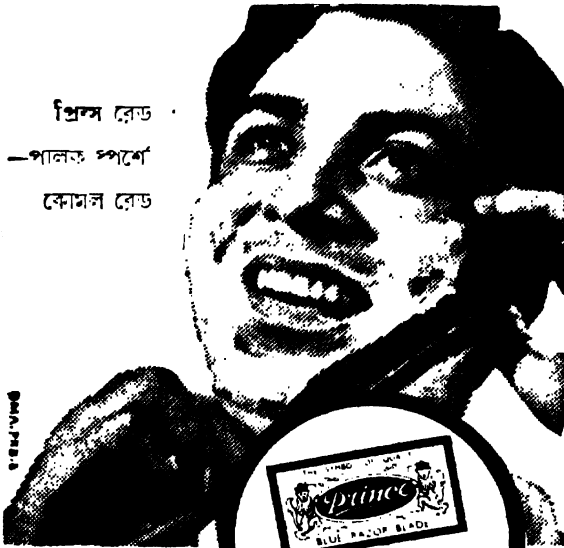
দুটিতে প্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করা গেল, এবং চীনা সমাজের নানা তথ্য। ফোটোগ্রাফ প্রচুর তোলা হল। আধুনিক চীনা বাড়িতে কলেজে পড়া মেয়ে ও তাদের নানা শিল্পকাজের ছবি তোলা গেল। সে অনেক কথা। প্রবাসীতেও অনেকগুলি ছবির সঙ্গে "আমার চীন ভ্রমণ" ছাপা হল। আমার সব ভ্রমণের সঙ্গে অনেক ফোটোগ্রাফ পাওয়া যাবে এটি প্রবাসীর ছিল প্রধান আকর্ষণ।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী প্রবাসীতে আমার এই লেখাটি পড়েই চিঠি দিয়েছিলেন। আমি তাঁর ৪ তারিখের চিঠি ৫ তারিখে পেয়ে সেই দিনই তাঁকে জানিয়েছিলাম প্রবাসীর লেখক আর আমি অভিন্ন। তাঁরও সন্দেহ ছিল না, তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তবে তাঁর কথা লিখলেন। আমি তাঁর আগের চিঠির উত্তর ৫ তারিখে দিয়েছিলাম, সে চিঠির উত্তর তিনি দিলেন ৭ তারিখে।

শান্তিনিকেতন
৭-২-৫২

"প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, আপনার ৫-২-৫২ তারিখের চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি। প্রবাসীতে প্রকাশিত "আমার চীন ভ্রমণ" পাঠ করে খুব খুসী হয়েছি। খুসী হবার কারণ লেখাটি নিছক সত্য ঘটনার পূর্ণ অথচ সরস সাহিত্য। কেবল ভ্রমণ বৃত্তান্ত এটা নয়, তার চেয়ে অনেক উঁচু দরের জিনিস, যেহেতু চীন ভ্রমণের উপলক্ষ ধরে এই চীনারা যে বাঙলার অত্যন্ত আত্মীয়ের রূপে দেখা দিয়েছে—অন্তত আমার মনের কাছে, চীনা বিদেশীদের সঙ্গে একটা ঘরোয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের নাড়ীর টান রয়েছে...সেই গভীর সম্বন্ধের মাধুর্য অন্তঃসলিলার মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে শতবর্ষ ধরে এই বাঙলায়, অথচ আমাদের স্বভাবগত ইনডিফারেন্সের জন্য আমরা এইসব মানুষকে নিজেদের ঘরের মানুষ বলে অনুভব করতে পারি না। আমরা দেহময় চোখ দিয়ে বিদেশে এবং দেশে ভ্রমণ করি, কিন্তু দরদী মনের চোখ দিয়ে না দেখি স্বদেশ, না দেখি বিদেশ। এমনি হয়েছি আমরা মমতাহীন, দৃষ্টিহীন। আপনি ঘরের ভিতরের, আশেপাশের জিনিস দেখেছেন সত্য দরদীর দৃষ্টিতে......" শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

কোনো লেখা ভাল লাগলে নিজে থেকে এভাবে লেখককে জানানো আমাদের দেশের সাধারণ রীতি নয়। কিন্তু সুধাকান্ত ছিলেন মানুষ হিসাবে কিছু স্বতন্ত্র। সরলতা ছিল তাঁর অন্তরের প্রধান সম্পদ। আমার সঙ্গে তাঁর যতবার দেখা হয়েছে অথবা যতবার তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন প্রত্যেকবারেই তাঁর অকপটতাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে।

একটি কর্মপ্রিয় মানুষ হঠাৎ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের দিক থেকে অচল হয়ে পড়লেও মনের সজীবতার জন্য তার পক্ষে জরাকেও অনেকখানি অগ্রাহ্য করা চলে, এসব কথা তিনি আমাকে বলতে ভালবাসতেন এবং নিজের মনটা যে আগের মতোই তাজা আছে একথা তিনি বার বার আমাকে লিখেছেন। তা ছাড়া অনেক ব্যক্তি যে আরো বেশি বয়সেও কর্মক্ষম আছেন সে কথাও স্মরণ করে হয় তো আরাম বোধ করতেন। আমি একবার কলকাতায় নলিনীকান্ত সরকারের একটি সামান্য দুর্ঘটনার কথা সুধাকান্তকে জানিয়ে সেই সংবাদে আমি আহত নলিনীকান্তকে পণ্ডিচেরীতে যা লিখেছিলাম, তা সুধাকান্তকে জানাই। আমি নলিনীকান্তকে লিখেছিলাম হেদোর কাছে রিকশ থেকে পড়ে গিয়ে ৭৮ বছর বয়সেও গাঝাড়া দিয়ে উঠে পণ্ডিচেরী যেতে পেরেছেন এটি আশ্চর্য ব্যাপার। আমি হলে দেহটাকে ফুটপাথের ধারে ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যেতাম। এ চিঠির উত্তরে সুধাকান্ত আমাকে লিখলেন,

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
২৩-১২-৬৮

"সুহৃদবরেষু, আজ আপনার ২১-১২-৬৮ তারিখের পত্র পেলাম। ...নলিনীকান্ত সরকারের মনের জোর অসাধারণ, তাই রিকশ

হতে মাটিতে পড়ে গিয়েও এবং বেশ চোট খেয়েও বেশ আছেন।...আপনি কি জানেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের কবি নিশিকান্ত আমার আপন ছোট ভাই? সেও মনের জোরেই বেঁচে আছে দেহাগারে বহুবিধ রোগ পুষেও? ইতি প্রীতিবদ্ধ সুধাকান্ত।"

আর একখানা চিঠিতে দেহের সঙ্গে মনের লড়াইয়ের কথা—

সেবাপল্লী শান্তিনিকেতন
১৩-১২-৬৮

সুহৃদবরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু.... আপনার বইটি [আমি যাঁদের দেখেছি] ছাপা হলে যদি দয়া করে এক কপি আমাকে রেজিস্টার্ড বুকপোস্টে পাঠাতে পারেন, তাহলে বাধিত হব।...ক্রমাগত গঙ্গাযাত্রার পথেই এগিয়ে চলেছি। অথচ আপনার মতন আমারও মন সজীব আছে। কিন্তু এই সজীব মনের সঙ্গে জরাগ্রস্ত দেহ কিছুতেই কো-অপারেশন করতে চায় না। এই... বিড়ম্বনা সত্যিই দুঃসহ। তবে জীবনদীপ নিবে না যাওয়া পর্যন্ত দুঃসহকেও সহ্য করতেই হয়। ইতি প্রীতিমুগ্ধ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

এর কয়েক মাস আগের লেখা একখানা চিঠিতে সুধাকান্তের স্বাস্থ্যকথার বাইরেও নিজের সম্পর্কে কিছু পরিচয় আছে—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১১-৩-৬৮

প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, আজ আপনার পত্র পেলাম। আপনার এবং আমার অবস্থা প্রায় সমরূপ, অর্থাৎ দেহ জরাগ্রস্ত, দুর্বল অথচ মন সজীব। সজীব মনের সঙ্গে দেহটা যদি সজীব সক্রিয় সহযোগিতা না করে তা হলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হয় বিড়ম্বনাময়, সংসারে (গৃহে) স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পর মতের অনৈক্য প্রবল হলে যেমন সেই গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয়। স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা সত্তা আছে, সেই নিজস্ব সত্তার সুস্থতা নির্ভর করে দেহযন্ত্রের সজীবতার। কাজেই মনের সজীবতাকে যখন পদে পদে দৈহিক দুর্বলতা তার (মনের) চিন্তাধারার প্রবাহকে বাধা দিতে থাকে, তখন সেই মনের অবস্থা হয় প্রবহমান নদীতে ধস নামা পাহাড়ের মতন। নদী চলতে চায়, কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়ে ইচ্ছেমতো চলতে পারে না। এই না চলতে পারা শেষটায় নদীতে বিকার ঘটায়। মানুষের সজীব মনও এই রকম দুর্বল না হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তাই আমার ভয় হয়— আমার বক্তব্যের বিষয় ক্রমে বিচারহীন ও যুক্তিহীন প্রলাপের মতো না হয়ে পড়ে। এই জন্যই আর কোন বিষয় প্রবন্ধ কবিতা বা সমালোচনা লিখতে সাহস হয় না। এই-রকম ভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি আর উট পেন দিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলে?

আমি হিন্দুস্থানী (চলতি হিন্দী) ভাষায় লিখতে এবং পড়তে পারি। আজকাল দু' একটি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রের ভাষা অহিন্দী বহু ভাষার শব্দ মিশ্রিত এবং সুপাঠ্য, যদিও গোঁড়া হিন্দীপন্থীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন হিন্দী ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দ্বারা প্রভাবিত করতে। আধুনিক কয়েক-জন স্বনামধন্য হিন্দী লেখকদের লেখা পড়ে বুঝতে পারি যে তাঁরা বেশ ভাল করেই ইংরাজী ও উর্দু ভাষার চালচলন জানেন— এই জন্যই এঁদের লেখা হিন্দী জোরালো এবং প্রগতিশীল, যেমন কথ্য বাংলা ভাষা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই আমরা য়ুরোপীয় সাহিত্য জগতের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত এবং বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচিত এবং বিজ্ঞান জগতের বহু তথ্যজ্ঞান লাভ করেছি, কাজেই নানা বিষয় বাংলা ভাষাতে গ্রন্থ রচনায় ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দেশ হতে ইংরাজ শাসন বিদায় নিয়েছে, তাই বলে ইংরাজী ভাষাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা মূঢ়তা।

এই চিঠিখানি সুধাকান্ত নামসই করতে ভুলে গিয়েছেন। অবশ্য এই ইনল্যান্ড লেটারের বাইরে নাম ঠিকানা লেখা আছে।

ইংরেজী রক্ষা করা বিষয়ে আগেও সুধাকান্ত আমাকে লিখেছিলেন। অবশ্য এ চিঠি লেখেন আমার একটি পাঁচ মিনিটের রেডিও কথিকা শুনে।
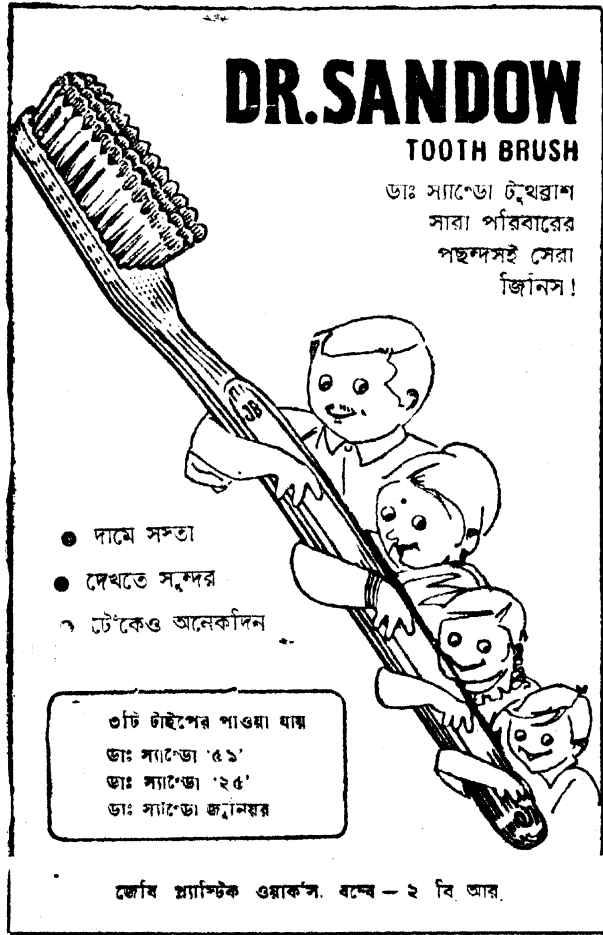
সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৬-৩-৬৮

...অনেকদিন পরে আপনাকে পত্র দিচ্ছি। কয়েকদিন পূর্বে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেডিওতে শুনতে পেলুম আপনার ছোট্ট ভাষণ।...মনে হল আপনার মতে বঙ্গসাহিত্যের বহুমুখী প্রগতি, বা উন্নতি ঘটেছে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে। যদি ঠিক আপনার ভাষণের মর্ম বুঝে থাকি তাহলে আমি আপনার সঙ্গে

একমত। য়ুরোপীয় সাহিত্য জগতের, বিজ্ঞান জগতের সংশ্রবে আমরা এসেছি প্রধানত ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে।

জনসাধারণ অবশ্য ইংরাজীতেও যেমন আনাড়ী হিন্দীতেও তেমনি আনাড়ী। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যদি ইংরাজী ভাষাকে পূর্বের মতন শ্রদ্ধার সঙ্গে চর্চা না করেন, তাহলে আমার ধারণা বঙ্গ সাহিত্যের ভাবীকালের অবস্থা হবে নিম্নস্তরের।

আমার স্বাস্থ্য জরাগ্রস্ত হয়ে ক্রমাগতই গঙ্গাযাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে, তবু দুর্ভাগ্য হেতু মনটা সজীব আছে, কিন্তু এই সজীবতা বিড়ম্বনাময়।...

আর একখানা চিঠিও আমার একটি রেডিও কথিকা শুনে লেখা—

সেবাপল্লী,
১৯-৩-৬৮

প্রীতিভাজনেষু, পরিমলবাবু, কয়েকদিন ধরে অসুস্থতায় কাবু হয়ে আছি। এই অবস্থাতেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু-এক দিন পূর্বে রেডিওতে, বঙ্গ সাহিত্যে হাস্য-কৌতুক বা ব্যঙ্গাত্মক রচনার খুব উৎকর্ষ হয়নি, যেমনটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হয়েছে, আপনার এই মন্তব্য যেটুকু শুনেছি তা যদি ঠিক বুঝে থাকি তা হলে আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই প্রসঙ্গে বলি, আমার ধারণা, বাঙলা দেশের সেকেলে মুখে মুখে প্রচলিত অনেক ব্যঙ্গ গল্পে, কবির লড়াইতে, বুড়োবুড়িদের অনেক হাস্য পরিহাসময় বাক্যে (যার ভাষা আধুনিক মতে শালীনতা-বর্জিত, অশ্লীল) এমন একটা সরস নির্লজ্জতা আছে, তা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি তার মর্মকথায় আছে বস্তুতান্ত্রিক গভীর অভিজ্ঞতা।......

পরবর্তী চিঠি একই জের। এ চিঠি আমার চিঠি পাবার পরে লেখা।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
২৬-৩-৬৮

পরম প্রীতিভাজনেষু, ...(১) আমার দৈহিক দুর্বলতা বেড়েই চলবে, কমবে না, সুতরাং মন যতদিন সজীব আছে এবং যতদিন সাধ্যে কুলায়, প্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের সঙ্গে পত্রদ্বারা যোগ রক্ষা করব। (২) আমাদের দেশে মুখে মুখে হিউমার-ভরা এমন অনেক গল্প আছে যা গোপাল ভাঁড়ের হিউমারের মত ছিল না—অথচ উপভোগ্য। এসব হিউমার ছাপার অক্ষরে গাঁথা থাকলে হিউমার সাহিত্যে স্থান পেত। (৩) কথা প্রসঙ্গে একবার রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, "বাহ্যত শব্দে ভাল্‌গার হলেও যেসব বাক্য শুনে লোকে প্রাণ খুলে অট্টহাসি হাসে, সেসব বাক্যের মর্মবাণী শ্রোতার মনে নির্মল আনন্দ দেয়। নির্মল আনন্দ না বোধ করলে অট্টহাসি হাসা যায় না, চোখটিপে মুচকি হাসি হাসা যায়। তবু স্বীকার করতেই হবে আজকাল ভদ্রসমাজে ভাললাগার হিউমার অচল, এবং অচল থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য খাঁটি। ...... ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

সুধাকান্ত শান্তিনিকেতনের প্রায় গোড়া থেকেই ছিলেন। কালক্রমে তিনি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। এমন নির্ভরযোগ্য কর্মতৎপর পরম উৎসাহী মানুষটিকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত বহু বিষয়ে তাঁর উপরে ছিলেন নির্ভরশীল। এমনকি ১৯৩৭ সনে চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে ধরে মঞ্চে নিয়ে আসার ভারও ছিল সুধাকান্তের উপরে। এর বাইরে অন্য সময়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের prop রূপে কাজ করেছেন বলেই অনুমান করি।

আমি মাঝে মাঝে সুধাকান্তের বিচিত্র জীবনের স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ করতাম। একবার তিনি লেখেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৩-৪-৬৮

...প্রীতিভাজনেষু, আমার মন সজীব আছে সত্য, কিন্তু এই মনটা প্রত্যহ তিক্ত হয়ে ওঠে, এক একবার সাংসারিক বিচিত্র জটিলতার আঘাতে। মন এরই তাল সামলাতে ঘায়েল হয়ে পড়ে। নইলে মনের এই সজীবতা দিয়েই (শ্রুতি লেখকের সহায়তায়) সাহিত্যে আমার যা দেয় ছিল দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু মনের সে সাধ মনেই জমা হয়ে রইল বাক্সে বন্দী জিনিসপত্রের মতন—যে বাক্সের ঢাকনি কেউই খুলে দেখতে পারবে না বাক্সে কি আছে। এককালে কত লেখাই তো লিখেছি প্রবাসী ভারতী ভারতবর্ষ সুপ্রভাত, উপাসনা, মালঞ্চ, সওগাত, মোসলেম ভারত তত্ত্ববোধিনী, দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি বহু পত্র-পত্রিকায়। কত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও প্রহসন ইত্যাদি।—থাক এসব কথা। প্রীতিবদ্ধ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

আর একখানা চিঠিতে লিখলেন (১৬-৪-৬৮) প্রিয় পরিমলবাবু, শুয়ে শুয়েই এই চিঠি লিখছি। আপনার গুড ফ্রাইডে তারিখের পত্রের উত্তরে জানাই—(১) আজকাল স্মৃতিকথা লেখার জন্য নিরুৎসাহ বোধ করি—কারণ উঠে বসে ফুলসক্যাপ কাগজের একটা তো দূরের কথা আধ পৃষ্ঠাও লিখতে পারি না। শুয়ে শুয়েই কোনরকমে

ছোটখাটো চিঠি লিখতে পারি মাত্র। (২) স্মৃতি কথা লিখলে কেউ কেউ এমন প্রশ্নও করবেন আপনার স্মৃতিকথা যে সত্যি তার প্রমাণ কি? বানিয়েও তো সুপাঠ্য স্মৃতি লেখা চলে ইত্যাদি। সত্যিই তো, এসব কথা যে কাল্পনিক নয় তা প্রমাণ করব কি রকম করে? সবই নির্ভর করে পাঠকের মনোভাবের উপর। (৩) স্যার পি সি রায়, স্যার জে সি বোস, স্যার যদুনাথ সরকার, শিশিরকুমার ভাদুড়ি ইত্যাদি বহুজন সম্বন্ধে (এক একটা ঘটনাকেন্দ্রিক) কিছু স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, স্মৃতি দর্পণে তাঁদের সদ্গুণের এক একটা দিক বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এসব তো আমার স্মৃতি।...ইতি প্রীতিবদ্ধ ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

সুধাকান্ত আমাকে খুবই স্নেহ করতেন, তাই তাঁর অবসরপ্রাপ্ত শয্যাশায়িত দিনগুলিতে আমার লেখা বা বেতার ভাষণ শুনলেই আপনা থেকেই আমাকে চিঠি লিখতেন, এবং সেই উপলক্ষে নিজের কথাও বলতেন। যেমন এই চিঠিখানায় দেখা যাবে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
২৫-১১-৬৪

প্রিয় পরিমলবাবু, আজই কিছুক্ষণ আগে সাপ্তাহিক "অমৃত" পত্রিকায় "একটি সাংস্কৃতিক মিলনের গল্প" পড়ে আপনাকে পত্র লিখবার ইচ্ছা হচ্ছিল, এমন সময় শ্রীমতী লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় [বিখ্যাত সাঁতারু লীলা চট্টোপাধ্যায়, তৎকালীন শান্তিনিকেতনে সাঁতার শিক্ষিকা] এসে বললেন, 'পরিমলবাবু জানতে চেয়েছেন আপনি কেমন আছেন।' আমি সঙ্গে...এই পত্র লিখছি।... বেশ বুঝতে পারছি যে, জরার প্রধান ধর্ম হচ্ছে অতীতের ভুলে যাওয়া বিস্তর স্মৃতিকে মনের দর্পণে খুব নিখুঁতভাবে এবং উজ্জ্বল রকমে ফুটিয়ে তোলা। এই দর্পণে দেখছি আমি আর ডক্টর রাম অধিকারী আর আপনি এক রজনীতে শিশিরকুমার ভাদুড়ি মহাশয়ের একটা অভিনয় দেখছি আরও কত কি। যুগান্তর অফিসের আড্ডা দেখছি।...আপনি আমার খোঁজ নিয়েছেন জেনে খুশী হয়েছি।...ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

স্মৃতিকথা বিষয়ে আরো একখানা চিঠি—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১-৫-৬৮

প্রীতিভাজনেষু, আপনার ২৯-৪-৬৮র পত্র পাইলাম। বৃদ্ধ বয়সের ভাগ্যবিড়ম্বনা —না বাদ দেয় পরিমলকে, না বাদ দেয় সুধাকান্তকে। আমাদের উভয়ের নাম মধুময় হইলে হইবে কি?...

উঠিয়া বসিয়া আর লিখিতে পারি না—প্রাপ্ত পত্রের জবাব দেই ঝাপসা দৃষ্টিতে শুইয়া শুইয়া। কাজেই স্মৃতি কথা কেমন করিয়া লিখিব? শ্রুতি লেখকও সহজে জোটে না। ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

রেডিওতে আমার একটি ভূতের গল্প শুনে সুধাকান্ত লিখছেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১৯-১২-৬৮

পরম প্রীতিভাজনেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, গতকাল (বুধবার) রাত্রিতে বেতারে আপনার ভৌতিক বা ভূতের গল্প শুনলাম।..

আমি বুড়ো এবং খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বিছানাতেই থাকি কাজেই অলৌকিক গল্প-কাহিনী বেশ উপভোগ করি।...যতক্ষণ উপকথা পড়া যায় ততক্ষণ উপকথার রাজ্য মনের মধ্যে এমনি স্বাভাবিক হয়ে যায় যে, সে রাজ্যের গোরুকে গাছে উঠতে দেখলেও মনে হয় ওই রাজ্যের সঙ্গে তার সঙ্গতি

আছে।......জন্মান্তর সম্বন্ধে আমি কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত। —সুধাকান্ত

সুধাকান্তের শেষ চিঠিগুলির কয়েকখানায় কিছু আত্মকথাও পাওয়া যাবে। এগুলি সবই ১৯৬৯ সনে লেখা এবং ঐ সনেই ১২ই নবেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৩০-৪-৬৯

সুহৃদরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, আজ সকালে পুলিন সেনের হাত হতে আপনার প্রেরিত উপহার গ্রন্থ [আমি যাঁদের দেখেছি] পেলাম। ধন্যবাদ, বইটি আগাগোড়া মন দিয়ে পড়ে আপনাকে আমার মন্তব্য জানাব। বইতে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনী দাস, নজরুল দাদাঠাকুর, শিশিরকুমার ভাদুড়ি, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল ও নলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের দু একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে পত্রালাপ হয়। শিশির ভাদুড়ি মহাশয়ের বেশ কয়েকটি চিঠি আমার কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে।...

কবি কন্যা মীরা দেবী সম্বন্ধে আমার স্মৃতি ভাণ্ডারে যা আছে তাই দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য পুলিনবিহারী সেন বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। নিজে নিজে তো উঠে বসে কিছু লিখতে পারি না। যোগ্য কোন শ্রুতিলেখক পেলে পুলিনের অনুরোধ রক্ষা করব (যদি বেঁচে থাকি)। মীরা দেবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ—ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে। ইতি প্রীতিবদ্ধ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

আর একখানা চিঠিতে আমার বই পড়ার পরে তাঁর যা মনে হয়েছে জানাচ্ছেন। এবং চিঠির মাথায় একটি ছবি এঁকেছেন "ঘর ছেড়ে নৌকা যাচ্ছে অজানা পথে"—ছোট্ট একটুখানি আঁচড়কাটা- কিন্তু তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে করেই যেন আঁকা, প্রথম দর্শনে মনে হঠাৎ ধাক্কা লাগে। নিচের ঐ কথাগুলি তাঁর মনে মৃত্যুর পূর্বাভাসরূপে ফুটে উঠেছে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৩-৫-৬৯

সুহৃদবরেষু, পরিমলবাবু, বলাই বৃথা জরাগ্রস্ত রোগগ্রস্ত দেহ নিয়ে সর্বক্ষণ শুয়ে আছি শয্যাগত। ...দেহের সঙ্গে মনের তীব্র অসহযোগ চলছে। তবু "আমি যাঁদের দেখেছি" বইখানা আগাগোড়া আজ পড়ে শেষ করেছি।...আপনার এই গ্রন্থটি পড়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছি তাঁদের সম্বন্ধে, যাঁদের দেখেছি, যাঁদের সঙ্গে মিশেছি (যথা কাজী নজরুল, দাদাঠাকুর, মোহিতলাল, প্রেমাঙ্কুর ইত্যাদি) এবং যাঁদের সঙ্গে এখনো পত্র ব্যবহার হয় (যথা সুনীতিবাবু, নলিনীকান্ত এবং পরিমল গোস্বামী)।

আপনার কি মনে পড়ে এক সন্ধ্যায় শিশিরবাবুর অনুরোধে শ্রীরঙ্গমে আপনি, ডাঃ রাম অধিকারী এবং আমি 'তখতে তাউস' দেখেছিলাম? আপনার বইটি পড়ে ভাল লাগল কারণ প্রত্যেকের সাহিত্যিক সত্তা এবং মানুষ সত্তার বিশ্লেষণ করেছেন নাতিদীর্ঘভাবে এবং যৌক্তিকভাবে। ক্লান্ত বোধ করছি। ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

এই চিঠির জের হিসাবে পরবর্তী চিঠিতে জানান তাঁর নিজের স্মৃতি।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৮-৫-৬৯

সুহৃদবরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,......প্রেমাঙ্কুরবাবু সম্বন্ধে আপনি আপনার গ্রন্থে সংক্ষেপে যা লিখেছেন, আমার সম্বন্ধেও কতকটা সেই রকম কিছু লেখা চলে। আমার জীবনটা হয় তো তত বেশি ভবঘুরে না হলেও মনটা ভবঘুরে প্রকৃতির। মনের তরী এক ঘাট হতে নানা বিচিত্র বিষয় বোঝাই করে অন্য ঘাটে বিনা মোহে উজাড় করে দিয়ে নতুন ঘাট হতে স্বল্প মেয়াদী শর্তে অনেক কিছু সংগ্রহ করে, আবার অন্য কোনো ঘাটে উজাড় করে দেয়। কোনো কিছুকেই ব্রত পালনের মতন আঁকড়ে থাকে না।...কোনো বাঁধন আমার ধাতে সয় না, তবু অনেক কিছু সহ্য করছি নিরুপায় হয়ে কৃতকর্মের দায়িত্ব পালনের জন্য। দায়িত্ববোধ আছে বলেই বন্ধনহীনতায় সম্যক আনন্দ পাই না।

ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

এই চিঠি পাঠানোর দুদিন পরে আবার লিখছেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১০-৫-৬৯

সুহৃদবরেষু, যেহেতু আপনি আমার সম্বন্ধে interested, সেই জন্য আপনাকে জানানো সঙ্গত মনে করি যে, (১) বাল্যকাল হতেই আমি বিশেষ কোনো লক্ষ্যপথ ধরে চলিনি, যদিও অনেক বিষয়ে আমার ইনটারেস্ট ছিল, কিন্তু সে ইনটারেস্টের আনন্দে মরসুমী লতা পাতা ফল ফুল দেখার মতন। কোনো জীবন-পথের লক্ষ্য মনে আঁকড়ে ধরিনি। সাহিত্য বিষয়ে আমার পড়াশোনা বেশি নয়, তবু দেশীবিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাও সত্য নয়। কিন্তু কোনো সাহিত্যিকই আমার যৎসামান্য সাহিত্য চিন্তাকে প্রভাবিত করেননি। লক্ষ্যহীন ব্যক্তিকে কীই বা প্রভাবিত করবে। আমি পিউরিটান না হলেও ইতরতা, নোংরামি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ভণ্ডামি কোনো বিষয়েরই অতিশয্যতাকে মন থেকে সহ্য করতে পারি না, তবে সমাজে বাস

করি বলে নিরুপায় হয়ে বাধ্য হ'য়েই সব কিছু সহ্য করি।...আমি প্রগতিবাদী কিন্তু প্রগতির অতিশয়তা আমার ভাল মোটেই লাগে না, পুরাতনের সব কিছুকেই ঝেঁটিয়ে ফেলতেও মন চায় না—আবার নতুনের সব কিছুকেই স্বাগত জানাতে ইচ্ছে হয় না।

ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

এর পরবর্তী চিঠিখানিতে সুধাকান্তের আত্মপরিচয় আরো চিত্তাকর্ষক বোধ হবে।

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
২১-৫-৬৯

সুহৃদবরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু, আপনার ৬ তারিখের চিঠি যথাসময়েই পেয়েছি, উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল, কারণ কয়েকদিন ধরেই বেশ দুর্বল বোধ করছি।...(১) শান্তিনিকেতনে আমার আসার সম্ভাবনাই ছিল না, কারণ আমার জন্ম-দেশ উত্তর প্রদেশের উনাও শহরে, সে আজ প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্বের ইতিহাস। আমার যে ভাই (বড়) বেঁচে আছেন, লখনৌতেই ঘরবাড়ি তৈরি করে সেইখানেই আছেন, তাঁর ছেলেদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করি হিন্দী ভাষায়, আর দাদার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করি ইংরাজী ভাষায়। (২) শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদি পর্বে সতীশ রায় (যাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ২১ বৎসর বয়সেই, শান্তিনিকেতনে) ছিলেন আমার মামা। আমার বয়স যখন আট-নয় বৎসর তখন তিনি তিন দিনের জন্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আগ্রায় আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি আমার মাকে বলেছিলেন, "ছোড়দি, খোকাকে (অর্থাৎ আমাকে) আর একটু বড় হলে শান্তিনিকেতনে আমার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া শেখবার জন্য পাঠিয়ে দিস, এই আমার অনুরোধ।" —এই অনুরোধের জন্যই বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা আমাকে এবং আমার ছোট ভাই নিশিকান্তকে (সে পণ্ডিচেরীর কবি নিশিকান্ত বলেই সাহিত্য-রাজ্যে সুপরিচিত) এখানে পাঠান। (বাবা ছিলেন উত্তর প্রদেশে উকিল LL. B.) তারপর বিচিত্র ইতিহাস। পরে লিখে জানাব। ভবদীয় প্রীতিবদ্ধ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

আমার বই "আমি যাঁদের দেখেছি"র জের এখনও চলছে। তিনি লিখছেন—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
১।৬।৬৯

সুহৃদবরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,...... পুনরায় সবটা বই পড়েছি।......কাজি নজরুলের সঙ্গে এক সময়ে আমি যে খুবই অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করেছি এবং আমিই সর্বপ্রথম লিখিত পত্রে তাঁকে জানিয়েছিলাম যে তিনি সত্যিকার কবি এবং মানবপ্রেমিক, এই সব কথা মুজফ্‌ফর সাহেব তাঁর নজরুল সম্বন্ধীয় প্রকাশিত গ্রন্থে লিখেছেন। সে আজ অনেকদিন আগের কথা। আমরা দুজনে মোসলেম ভারতেও কবিতা লিখতাম। সে-দিন আর বর্তমান দিনে আকাশ পাতাল তফাৎ। ...আপনার বইখানি অন্যকে পড়ে দেখতে দেবার ইচ্ছে থাকলেও দিতে সাহস হয় না, বহু বই পড়তে দিয়ে আর ফেরৎ পাইনি।

সুধাকান্ত এ চিঠিতেও নিজের নাম লিখতে ভুলেছেন। মৃত্যুর আর পাঁচ মাস বাকি। আমার অনুরোধ অনুযায়ী স্মৃতিকথা লিখতে সুধাকান্ত ছটফট করছেন। আমার বইখানা পড়ে উৎসাহ আরো বেড়েছে, কিন্তু দেহ সেই পরিমাণে অপটু হয়ে পড়েছে।—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
৫।৬।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু, প্রিয় পরিমলবাবু,...... উপুড় হয়ে সামনে বিছানায় খাতা রেখে কিছু লেখাও অসম্ভব......আপনার বইটি পড়ে খুব ভাল লেগেছে, শুধু স্মৃতিচারণ নয়, স্মৃতিসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিও সাহিত্য। কিন্তু এই দুই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা স্বতন্ত্র। আমার জীবনকথা বিচিত্র। যদি লেখা সম্ভব হয় লিখে পাঠাব, এখন সম্ভব নয়। খুবই দুর্বল হয়ে আছি। ভবদীয় প্রীতিবদ্ধ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

এর পর শেষ চিঠি, মৃত্যুর প্রায় তিন মাস আগে লেখা। এই চিঠিখানা পড়লে মনে হয় তিনি বিদায় নিচ্ছেন, যেন সেই শেষ দিনের পদধ্বনি তাঁর কানে এসে বাজছে। নইলে চিঠি যে সম্বোধনে আরম্ভ করেছেন, এবং যে ভাষায় শেষ করেছেন, আগের কোনো চিঠিতে ঠিক তেমন ভাষা লেখেননি। তাঁর অনেক চিঠি আমি পেয়েছি, এবং অনেক চিঠিতেই কোন্ লোকটি ৮০ বছর বয়সেও কর্মক্ষম, কোন্ লোকটি বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ছুটে বেড়াতে পারে তাদের কথায় ভরা। সুধাকান্তের বন্দী মনটা ঐ রকম হতে পারলে যেন খুশি হত, ইঙ্গিতটা তাই। শেষ চিঠিতেও তেমনি একজনের কথা আছে—

সেবাপল্লী, শান্তিনিকেতন
২৫।৮।৬৯

সুহৃদ্‌বরেষু, ভাই পরিমলবাবু, আজ আপনার ২৩।৮।৬৯ তারিখের পত্র...... পেলাম। ......দেহ শক্তি দুর্বল হয়েই চলেছে, তাই সজীব মনের সদ্ব্যবহার করতে পারছি না অনেক ভাল ভাল স্মৃতিকথা লিখে।

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারীর সঙ্গে এই এক বছরে দুতিনবার দেখা হয়েছে। তিনি এখনো বেশ সুস্থ এবং আগেকার মতো হাসিখুশী মানুষ।

পত্র শেষ করবার পূর্বে আমার প্রতি আপনার সহজ সরল প্রীতির জন্য যে আনন্দ পাই সে কথা বলা অবশ্য কর্তব্য বলেই জানাচ্ছি। আমার সাদর প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাই।

ভবদীয় সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

আমি কিন্তু ভাবিনি যে এটাই তাঁর শেষ চিঠি হবে। এ চিঠিতে বিদায়ের সুর ছিল তা এখন পড়ে বুঝতে পারছি। একখানা চিঠিতে সুধাকান্তের বাল্যকালের গোটাকত কথার মধ্যে তাঁর মামা সতীশচন্দ্র রায়ের উল্লেখ আছে। এই সতীশচন্দ্র আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। এতবড় প্রতিভা, শিক্ষায় এমন দীপ্ত উৎসাহ গুরুভক্তি এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বাঙালী যুবসমাজে বিরল বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি যে স্নেহপ্রীতি এবং শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তিনি নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন। সুধাকান্ত এঁর জন্যই শান্তিনিকেতনে আসতে পেরেছিলেন।

সুধাকান্তের প্রত্যেক চিঠিতে ছুটে বেড়াবার ব্যাকুলতা, এবং স্থবির হয়ে পড়ে থাকার বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। আরো দুখানা চিঠি আমার সামনে খোলা পড়ে আছে। একখানা সুধাকান্ত তাঁর কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুর (রবীন্দ্রসঙ্গীতে যার প্রসিদ্ধি হয়েছে) বিবাহের নিমন্ত্রণ, (বিবাহের তারিখ ২৮-১-৬৬) পাঠিয়েছেন। হলুদ চিঠি। আর একখানা কালো বর্ডার আঁকা কার্ড, সুধাকান্তের মৃত্যুসংবাদ (মৃত্যু তারিখ ১২-১১-৬৯) ও তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় উপস্থিতির নিমন্ত্রণ (অনুষ্ঠানের তারিখ ২৬-১১-৬৯)—এবং নিমন্ত্রণকারীদের অন্যতম শ্রীমতী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদিক সঙ্গীত বনাম লৌকিক সঙ্গীত

অনেকেই প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা মশাই, সামবেদ থেকে আমাদের সঙ্গীতের উৎপত্তি হল কি করে?" আবার কেউ কেউ অতিশয় ভক্তিভরে তাঁদের গ্রন্থে লেখেন—ভারতের মহান সঙ্গীত একদা তপোবনে ঋষিদের কণ্ঠে উচ্চারিত সামগান থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। সম্ভবত ইংরেজি বই খুললেও দেখা যাবে—দি ইণ্ডিয়ান মিউজিক ওজ ইট্‌স্‌ ওরিজিন ফ্রম দি সামভেদা। যাঁরা প্রশ্ন করেন তাঁদের আসল জিজ্ঞাস্য—রাগ রাগিনীর কোনও গূঢ় ব্যাপার সামবেদে আছে কিনা। যাঁরা বিনা প্রশ্নে বিবরটা মেনে নেন তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় সঙ্গীত যে খুবই প্রাচীন, দেশ বিদেশে সেইটা প্রচার করা। আসলে কিন্তু সকলেই একই তিমিরে এবং এই কুহেলিকাচ্ছন্ন তিমিরে এখনও পর্যন্ত আলোকপাত হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা আছে এমনটা দেখা যাচ্ছে না। সামবেদ বা বৈদিকশাস্ত্র আমাদের কাছে "টেবার"—সেখানে এগুবে কে? আর তার প্রস্তুতিপর্বও তো কম নয়? তখনকে সঙ্গীতচর্চাটিকে তো তাকে তুলে রাখতে হয়।

যাই হোক, বিষয়টা চিত্তাকর্ষক—সামবেদ এবং আমাদের প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গে সম্বন্ধটা কি? এই আলোচনার গোড়াতেই কিন্তু সঙ্গীতের উৎপত্তি সামবেদ থেকে—এই ধারণাটা কি করে হল সেটা বোঝা দরকার।

সামবেদ আসলে প্রধানত ঋক্‌মন্ত্রেরই সমষ্টি। যেসব ঋক্‌ গাওয়া হত সেগুলিই সাম। মন্ত্রের মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না। সামের মন্ত্রগুলির ওপরে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া থাকে সেগুলিই হচ্ছে সামের স্বরলিপি। এইসব সংখ্যার ব্যাখ্যা অন্যত্র পাওয়া যাবে।

২৩ ২ ৩ ১২

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং

৩ ১ ২ ১ ২ ২র

বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ।

৩১ ২ ৩১ ২

সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্॥

৩ ১ ২ ৩ ২

সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্॥

(হে অগ্নি তুমি পুচ্ছসহিত অশ্বের ন্যায়। তুমি অহিংসগণের শ্রেষ্ঠ। তোমাকে নমস্কারপূর্বক বন্দনা করি।)

এটি বারবন্তীয় স্তোত্র নামে খ্যাত। এটি কোন্ কোন্ স্বরে গাইতে হবে সেটি দেখানো হয়েছে ওপরের সংখ্যাগুলিতে।

বর্তমান স্বরগ্রাম অনুসারে এই সংখ্যা-সমূহের "২" হচ্ছে গান্ধার, "৩" হচ্ছে ঋষভ এবং "১" হচ্ছে মধ্যম। বর্ণগুলির লঘু-গুরু অনুসারে মাত্রা যোজনা করে স্বরলিপি করে নিলেই মূল সুরটি পাওয়া যাবে। যেসব বর্ণের ওপরে কোনও সংখ্যা নেই সেগুলি পূর্ব স্বরের অনুরূপ।

এই স্তোত্রগুলি কোথায় কিভাবে গাওয়া হত সেগুলি ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে। মন্ত্রগুলি গানক্রিয়ার জন্য কিভাবে ভাগ করা হত বা সাজানো হত এবং স্বরগুলির নির্দেশ সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রতিশাখা, শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। অতএব সামবেদে অর্থাৎ সংহিতায় সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যাই নেই।

সঙ্গীতের উৎপত্তি সামবেদ থেকে এই বিশ্বাসের উৎপত্তি স্থল হচ্ছে নাট্যশাস্ত্র। ভরত মুনি বলছেন যে, পিতামহ ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনা করবার সময় চারটি বেদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। পাঠ্য অংশ তিনি নিয়েছিলেন ঋক্‌বেদ থেকে, সামবেদ থেকে নিয়েছিলেন গীত, যজুর্বেদ থেকে নিয়েছিলেন অভিনয় এবং অথর্ববেদ থেকে আহরণ করেছিলেন রস। এর মানে এ নয় যে নাটকে এইসব বেদের মন্ত্র সন্নিবেশিত হয়েছিল। এর অর্থ এই যে, কেবলমাত্র বিভিন্ন বেদের বিশিষ্ট প্রণালী বা প্রক্রিয়া-গুলির রূপায়ণকেই গ্রহণ করা হয়েছে। সামগানের কতিপয় রীতিনীতি গ্রহণ করা হলেও এমন কথা বলা হয়নি যে সামবেদই সঙ্গীতের উৎস। পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারগণ নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তিটিকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যাতে সাধারণের মনে এমন একটা ধারণা হয় যে সামবেদ থেকেই আমাদের সঙ্গীতের উৎপত্তি ঘটেছে।

প্রাচীন নাট্যের পূর্বরঙ্গে তিনটি সাম গাওয়া হত। এর একটি বোধ করি গায়ত্রী সাম, অপর দুটি হচ্ছে রথন্তর সাম এবং বৃহৎ সাম। নাটকে প্রযুক্ত হত সাতটি গীত, যথা—মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক এবং উত্তর। এইগুলি নাকি সামবেদ থেকে বিনিসৃত হয়েছিল। কিন্তু এগুলির যে সমস্ত আঙ্গিকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলি

ব্রাহ্মণ, সূত্রাদি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় বলে শুনিনি। এমন কি এই গানগুলির উল্লেখও আছে বলে জানা নেই। তবে কিছু কিছু বৈদিক টেকনিক আছে যেমন "উপোহন", যাতে স্তোভাক্ষরের মত "ঝণ্টুং ঝণ্টুং দিগেল দিগেল" প্রভৃতি শব্দ যোজনা করা হত। কিন্তু আসলে এইগুলি ছিল লৌকিক সংগীত। মূলত বৈদিক প্রভাব হয়ত ছিল কিন্তু লৌকিক রীতি এইসব গানগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্ররূপ প্রদান করেছিল। নাটকে আরও তিনটি গানের প্রয়োগ দেখা যায়। এগুলি হচ্ছে ঋক্, গাথা এবং পাণিকা। ঋক্ নামক গীতটি অষ্টাক্ষর পাদযুক্ত অনুষ্টুপ ছন্দ থেকে দ্বাদশাক্ষর জগতী পর্যায়ের ছন্দে গঠিত হত। এই গীতও বৈদিক অথবা লৌকিক পদে গাওয়া হত। এতে বৈদিক প্রথা অনুযায়ী ওঙ্কার এবং হ-কার যোগ করা হত। গাথা নামক গীতেও নানাপ্রকার সামাঙ্গ নিয়োজিত হত। পাণিকা উল্লিখিত সপ্তগীতের কয়েকটি অঙ্গ নিয়ে গঠিত হত। কিন্তু এইসব গীত জয়, আশীর্বাদ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ কারণেই প্রযুক্ত হত। এগুলি সবই অতি প্রাচীন নাটকের গান। এই হচ্ছে নাট্যে প্রযুক্ত সামিক গীতির পরিচয়। কিন্তু এই গীতগুলি এই সাক্ষ্যই দেয় যে সামগান ক্রমেই লৌকিক গীতির প্রভাবে রূপান্তর গ্রহণ করেছে। সামের সাহিত্য বা তার স্বীকৃতিই ছিল তাকে গ্রহণ করবার কারণ।

এইবার বৈদিক সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আসা যাক। সকলেই জানেন ঋক্ পাঠ করা হত তিনটি স্বরে—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। স্বরিতের অবশ্য কিছু ইতরবিশেষ ছিল। বেদগ্রন্থাদিতে অধোরেখা, ঊর্ধ্ব-রেখা সহ পাঠগুলি দেওয়া আছে। সামগানের স্বরগুলি সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয়েছে। এই সংখ্যাগুলি নম্বর অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এইভাবে পরিচিত ছিল। ঋক্ মন্ত্রের আবৃত্তি কেবলমাত্র তিনটি স্বরেই হত। সামগানের—প্রথম যুগেও এই তিনটি স্বরই ছিল কিন্তু শ্রুতি বিশেষ ভিন্ন ছিল। অর্থাৎ ঋকের উদাত্ত ছিল আমাদের গান্ধারের সমতুল্য কিন্তু সামে এই উদাত্ত স্বর (প্রথম স্বর) মধ্যমে অবস্থান করত। স্বরিত স্বরটি ছিল সামগানের দ্বিতীয় স্বর, আমাদের গান্ধার এবং অনুদাত্ত স্বরটি ঋক্ এবং সাম উভয় ক্ষেত্রেই ছিল ঋষভের অনুরূপ। ঋগ্বেদের পূর্বার্চিক এবং উত্তরার্চিকে তিনটি মাত্র [illegible] গানরূপ থাকে প্রগাথ বলা হয়। এই তিনটি স্বরের প্রয়োগই দেখা যায়। কিন্তু আরও পরের যুগে যখন পূর্বার্চিকগুলি গ্রামগেয় এবং উত্তরার্চিকগুলি ঊহ্য গানে রূপান্তরিত হল তখন আরও তিনটি স্বরের প্রয়োগ দেখা গেল—এগুলি চতুর্থ (ষড়জ) পঞ্চম বা মন্দ্র (ধৈবত) এবং ক্রুষ্ট অতিস্বার বা অতিস্বর্য (নিষাদ)। এর সঙ্গে নানারকম স্তোভ (হাউ, হাই ওহোবা প্রভৃতি) ও অপাপগায় [illegible] যোজিত হয়। উচ্চারণের ভঙ্গীও এর সাথে পাল্টে গেল, যাকে সামের বিকার বলা হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক:—

> কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী
> সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া
> বৃতা॥

এটি বামদেব্য সাম বা চিত্র সাম নামে পরিচিত। এর গ্রামগেয় রূপ হল:—

> কায়া। নশ্চা ইত্রা আভুবাৎ॥ উ॥
> ঊতীসদাবৃধঃস। খা। ঔহোহাই।
> কায়াশচাই॥ ষ্ঠ্যোহো। হিম্মা॥
> বাওর্তো হাই॥ শ্রী॥

এই যে পরিবর্তন এর পিছনে লৌকিক সঙ্গীতের প্রভাব আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্রমশ লৌকিক রীতির সঙ্গে যুক্ত না হলে অধিকতর স্বরের প্রয়োগ এবং বিস্তৃত রূপায়ণের পরিকল্পনা হত না। এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতরত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে প্রদত্ত কয়েকটি শ্লোকের কথা মনে পড়ছে। এই শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে যে তানসমূহ (যা মূর্ছনারই নামান্তর) অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী প্রভৃতি প্রায় তাবৎ বিশিষ্ট যজ্ঞেই গাওয়া হত। এমনকি গ্রন্থকার বলছেন যে, এই তানগুলি শ্রুতি দ্বারা

শ্রেয় লাভের জন্য। কিন্তু শ্রুতি গ্রন্থাদিতে কি তান বা মূর্ছনার উল্লেখ পাওয়া যায়? অন্তত শতপথ ব্রাহ্মণের মত যাগযজ্ঞ সম্পর্কীয় বিপুল গ্রন্থে তান বা মূর্ছনার উল্লেখ আছে বলে জানি না। গ্রন্থকার এই তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন জানি না কিন্তু এই উক্তিতে আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে বৈদিক কর্মাদিতে ক্রমেই অধিকতর লৌকিক সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটেছিল।

বৈদিক সঙ্গীত এবং লৌকিক সঙ্গীতের গতি প্রকৃতি বিভিন্ন। বৈদিক সঙ্গীতে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম প্রভৃতি সপ্ত স্বরের পরিচয় ছিল না, তার বদলে ছিল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম (মন্দ্র), ষষ্ঠ (ক্রুষ্ট অতিস্বার), সপ্তম—এই সাত স্বর। লৌকিক সঙ্গীত সবদাই আরোহণক্রমে আচরিত হয়ে এসেছে কিন্তু বৈদিক সঙ্গীত অবরোহণ ক্রমে আচরণ করা হত। এর মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মধ্যম ছিল সামগানের সবচেয়ে চড়া স্বর (উদাত্ত)। স্বরগুলির অবরোহণ ক্রম ছিল এইরকম্—

মা গা রা সা
ধা় না় পা়।

এখানে দেখা যাচ্ছে অবরোহণের গতি বক্র, অর্থাৎ "মা গা রে সা নি ধা পা" না হয়ে হচ্ছে "মা গা রে সা ধা নি পা।" মন্দ্র ধৈবত থেকে কর্ষণ করে নি-তে চড়ানো হত বলেই নিষাদকে ক্রুষ্ট-অতিস্বার বলা হয়েছে। সামগায়নে এই খাদের নিষাদটি 'পা নি ধা' এইভাবে প্রযুক্ত হত। খাদের পঞ্চম ব্যবহৃত হত বলে জানা যায় না।

যথার্থ বৈদিক সঙ্গীতে কলি বিভাগ ছিল না। সামগানের প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, নিধন—এগুলি কলির মত ছিল না। একটি মন্ত্রকেই উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ভাগ করে এককভাবে এবং শেষে সমবেতভাবে গাইতেন। যেমন, বহিষ্পবমান স্তোত্রের "উপাস্মৈ গায়তা নরঃ পবমানায়েন্দবে। অভি দেবাঁ ইয়ক্ষতে"—এই মন্ত্রটিকেই এই রকম চার ভাগে ভাগ করে গাওয়া হত। লৌকিক সঙ্গীতের কলি বিভাগ সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল।

বৈদিক সঙ্গীতে ছন্দের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকলেও তালের প্রয়োগ ছিল না। চঞ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি তাল লৌকিক নিয়মে গঠিত হয়েছিল। বৈদিক মন্ত্র গাইবার সময় পর্ব অনুসারে বিরতি প্রদান করা হত। উহ গানগুলিতে লঘু গুরুর নিয়মও কঠোরভাবে পালন করা হত না।

বৈদিক সঙ্গীতে লৌকিক সঙ্গীতের রীতি অনুযায়ী গ্রামরাগ, জাতি, বাদী, সম্বাদী প্রভৃতি কোনটাই ছিল না। গ্রামরাগ বা জাতির বদলে সামগুলির সুর হিসাবে ভারদ্বাজ, কৌৎসীয়, যজ্ঞাযজ্ঞীয়, এই সব বহু প্রকার নাম প্রচলিত ছিল। মধ্যন্দিন পবমান স্তোত্রের প্রথম তিনটি মন্ত্র গাওয়া হত "আমহীয়ব" সুরে, পরের দুটি মন্ত্র গাওয়া হত রৌরব এবং যৌধাজয় সুরে। শেষের তিনটি মন্ত্রের সুর ছিল "ঔশনা"। তৃতীয় পবমান স্তোত্র সংহিত, সফ, পৌষ্কল, শ্যাবাশ্ব, আন্ধীগব, কাব—এইসব সুরে গাওয়া হত। রাগ বলতে যা বোঝায় এগুলো সে রকম ছিল না। স্বরগুলি সাজানোর কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন রীতি ছাড়া এই গায়ন পদ্ধতিতে আর কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বামদেব্যসাম যখন উহ গানরূপে গাওয়া হত তখন তার সুরটা হত এইরকমের—রা ধা় সা রা গা রা সা। ধা় মা গা। রা গা মা গা। রা ধা় গা। একটা মেলোডির রূপ এখানে স্পষ্ট। লোকসঙ্গীত ও উপজাতীয়দের গানেও এরকম মেলোডির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তা বলে এইটিই রাগ সঙ্গীতের উৎস বলা চলে না বরঞ্চ রাগসঙ্গীতের প্রভাব এতে পড়েছে এই অনুমানই সঙ্গত।

শিক্ষাকার নারদ লৌকিক গীত রীতির সঙ্গে সমন্বয় করে সামগানের যথার্থ স্বরূপ কি হওয়া উচিত সেটি নির্ণয় করেছিলেন। লৌকিক সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে সামগায়নের মূল্যায়ণ এই শিক্ষায় যদি না করা হত তাহলে আজ বেদগান সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ ধারণা হত কি না সন্দেহ। সম্ভবত এই নারদই ছিলেন ভরত মুনির অন্যতম সহযোগী যিনি নাট্যের সমগ্র সঙ্গীতাংশ যোজনা করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র শিক্ষা গ্রন্থটি বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে কতটা স্থান পেয়েছে তা সংস্কৃতের পঠনপাঠন যাঁরা করেন তাঁরা বলতে পারেন, কিন্তু লেখকের মনে হয় এই শিক্ষার গুরুত্ব অসামান্য কেননা বেদগানের বিশুদ্ধ স্বর কি হওয়া উচিত সেটি এই গ্রন্থে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। নারদী শিক্ষায় লৌকিক সঙ্গীতের মান দিয়েই সামগানের স্বরগুলি নির্ণয় করা হয়েছে; বৈদিক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্বর দিয়ে লৌকিক স্বরের অবস্থান নির্ণয় করা হয়নি। এতে এই প্রমাণ হয় যে বৈদিক স্বর থেকে লৌকিক স্বরের উদ্ভব বা পরিকল্পনা হয়নি। বৈদিক সঙ্গীতের স্বরগ্রামে আমাদের বর্তমান স্বরগ্রামের খুবই কাছাকাছি ছিল। সামগানের ক্ষেত্রে স্বরিত স্বরটি ছিল অন্তর-গান্ধার এবং অতিস্বার বা নিষাদ ছিল কাকলী নিষাদ। অতএব বর্তমান স্বরগ্রাম অনুসারে সামগানের স্বরগুলির স্বর নিরূপণ করে যদি মন্ত্রগুলি গাওয়া যায় তাহলে সেটা মোটামুটিভাবে শুদ্ধই হবে। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা যদি চেষ্টা করেন তাহলে চমৎকার সুরেলা আবৃত্তি করতে পারবেন।

ছন্দ সম্পর্কে বৈদিক এবং লৌকিক উভয় সঙ্গীতেই সমান গুরুত্ব অবলম্বন করা হয়েছে। লৌকিক সঙ্গীতের মার্গতাল প্রভৃতি ছন্দের রীতি নিয়মকে অবলম্বন করেই সংগঠিত হয়েছে। তবে লৌকিক সঙ্গীত এই ব্যাপারে অনেক জটিল হয়ে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে অধিকতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ব্যাপকভাবে আলোচনা করবার সুযোগ নেই কিন্তু এটা বোধ করি সব সময়েই স্পষ্ট হবে যে বৈদিক গায়নরীতি এবং লৌকিক গায়নরীতি ভিন্ন ধারায় চলে এসেছে। সামগানের গুরুত্ব, তার ঐতিহ্য এবং সাহিত্য লৌকিক সঙ্গীতে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ক্রমেই দেখা গেছে লৌকিক সঙ্গীত তার নিয়মে তথাকথিত সামগানকে পরিবর্তিত করে নিয়েছে। প্রায় কোনও দিক থেকেই এটা প্রমাণ করা যায় না যে সামগান থেকে বর্তমান সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে। বৈদিক সঙ্গীতের উৎপত্তিস্থল বা 'সোর্স' ছিল ভিন্ন এবং সেটা যে কী আর কোথায় তার 'ডেটা' পাওয়া যাবে সেটা 'ইন্ডলজিস্ট'রা গবেষণা করে বলবেন, জানি না এ দেশে এ বিষয়ে বিশদভাবে কিছু আলোচনা করা হয়েছে কি না।

শার্ঙ্গদেব

সেদিন সারা বিকেলটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রাণপণে মনটাকে ঢাকাতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথায় কী! সেই বৈকালী আর এলো না। কপালগুণে বাড়িতে দেখতে গিয়ে মাঝখান থেকে দিন বেড়ে গেল আরো।

বৈকালীর বদলে রিনি এল—'বেরুবে না আজকে? বেড়াতে যাবে না?'

'যাব বৈকি। মাঠের পারে কি পুকুর পাড়ে নয়, নতুন জায়গায় বেড়াতে যাব আজ, দাঁড়া, আগে কিছু খাবার ব্যবস্থা করি।' রিনিকে নিয়ে মার কাছে গেলাম।—'মা, কিছু খেতে দাও না আমাদের। ভারী খিদে পেয়েছে।'

'সেই কখন খেয়েছিস। খিদে পাবে তার অবাক কী! কি করছিলি এতক্ষণ?'

'নিমগাছের ছায়ায় ছাদে শুয়ে তোমার মা কালীকে ফাঁদে ফেলবার তালে ছিলাম, কিন্তু এত করে চাইলাম, বৈকালী তো কই, এল না আজ?'

'রোজ রোজ আসবে না কি? একেকদিন একেকজনের পালা যে? পালা করে সবার বাড়িতেই যাবে তো। তোর বাবা বয়সে আর মানে সবার চাইতে বড়ো বলে প্রথমদিনের পালাটা তাঁরই পড়েছিল। বামুন পাড়ার ঘর ঘর সবার বাড়িই যাবে, তারপর বড় বড় আমলাদের বাড়িতেও। সারা বোশেখ মাস ভোরই তো চলবে এইরকম।'

'তা যাই বলো না মা, চাইলেই পাওয়া যায় না সব সময়। তোমার মা কালী একটু খামখেয়ালী আছে।'

'তা আছে। তবে চাইলেই পাবি—পাবি যে, সেটা নিশ্চয়। কখনো তক্ষুনি, কখনো বা কিছু পরে। পেতেই হবে, না পেয়ে যাবিনে কক্ষণো। কখনো চেয়ে পাবি, কখনো বা পেয়ে চাইবি—এমনি ধারা চলতে থাকবে সারা জীবন। পরখ করে দেখিস।'

'পরখ করে দেখলাম ত এতক্ষণ।' আমার ক্ষুব্ধ স্বর শোনা গেল।

'আবার চাইবার আগেই পেয়ে যাবি একেক সময়। দেখবি যে না চাইতেই কখন 'দায়ে বসে আছেন মা।' মা বললেন।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, জীবনের কোন জিনিসই তো এখনো তেমন টেস্ট করা হয়নি। তাই আগে মা একটুখানি করে তাদের স্বাদ নেবেন। স্বাদ দিয়ে তোর সাধ জাগাবেন। আর, তোর সাধ মেটাবেন চাইলে পরেই তারপর। মেটাতে মেটাতে যাবেন তিনি জীবনভোর বরাবর।'

'একেই বুঝি সাধনা বলে থাকে? তাই না মা?'

'তাও বলতে পারিস। তবে সাধনা দু রকমেই—মার পুত্রসাধনা আর ছেলের মাতৃসাধনা। দুজনের দুজনকে নিয়ে সাধ আহ্লাদ।'

'বাঃ বেশ তো!' শুনে আমার বেজায় ফুর্তি হয়। হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে যাই।

'যেমন চাইবার আগেই পেয়ে গেছিস আজকে। পরে তুই চাইতে পারিস বলে তার আঁচ পেয়ে আগের থেকেই বানিয়ে রেখেছেন মা।'

'কোথায় পেলাম!' মার কথায় আমার অবাক লাগে।

'আজ সকালেই পৌঁছে গেছে তোদের বিকেলের জলখাবার।'

'বলো নি তো তুমি? কখন এল? কী এসেছে?'

'তোরা তো তখন ইস্কুলে ছিলি—বলব কখন? আজ সকালে তোর বাবা পাথুরপাড়ে তোর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গেছলেন না? বড় মা তোদের জন্যে ক্ষীরের ছাঁচ সরের নাড়ু চন্দ্রপুলি তিল-কুটো চিঁড়ে মুড়কির মোয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন সব।'

'দাও দাও। বলোনি কেন এতক্ষণ?' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি।

'বস। বসে খা।' রিনি আর আমাকে আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে বললেন মা।

'বসে বসে খায় নাকি মানুষ? রাস্তায় খাব আমরা। বেড়াতে যাচ্ছি না এখন? রিনিকে আমি রাম-সীতার মন্দির দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি আজ? আরতি দেখে ফিরব। ...যেতে যেতে খাব আর খেতে খেতে যাবো।'

শেষ ৭৯ পাতায়

বড়মার অবদানে আমার দু পকেট বোঝাই করে বেরুলাম।

'বেশি রাত করিসনে যেন।' পই পই করে বলে দিলেন মা।—'সামনে ক্লাস পরীক্ষা রয়েছে তোর। এসেই পড়তে বসবি, বুঝেছিস? বেশি রাত জেগে, কি মাঝ রাত্তিরে উঠে আমি পড়তে দেব না।'

ঝাড় নেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

'তোমার মা আবার কোন মায়ের কথা বলছিলেন গো! যিনি সব জাগিয়ে থাকেন? তোমার পাহাড়পুরের বড় মা?'

'না না, অন্য মা। আরেক মা। তোর মা, আমার মা, মার মা, বড় মারও মা—সবার মা, যিনি বিশ্বজননী, মা দুর্গা। তাঁর কথাই বলছিলেন মা।'

'মা দুর্গা?'

'হ্যাঁ, তিনিই খাবার পাঠিয়েছেন আমাদের—খেতে চাইবার আগেই।' রিনির বড় বড় চোখ আরো বড় হয়ে উঠল যেন।—'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। চ' না। যেতে যেতে বলছি তোকে সব। আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক। খিদে পেটে তত্ত্বকথায় মন যায় না।'

চন্দ্রপুলির তত্ত্ব নেবার পর রিনির চাঁদ মুখের তত্ত্ব নিলাম। —'তোর মুখে নারকোল নাড়ুর ভগ্নাংশ লেগে রয়েছে। দাঁড়া, মুখ মুছিয়ে দি তোর।'

'এ আবার কী ধরনের মুখ মোছানো? পকেটে রুমাল ছিল না? হাত ছিল না তোমার? মাঝ রাস্তার মধ্যিখানে...এই সব!' আপত্তি করল সে।

'হাত ছিল তো কী!' আমি বলি—'ঝগড়াঝাঁটির বেলায় অবশ্যি হাত থাকতে মুখ কেন? তখন কসে তোমার দু হাত চালাও। কিন্তু তেমন কারো মুখ মোছাতে হলে অন্য কথা। তখন মুখ থাকতে হাত কেন? তাই মুখ দিয়েই মুছে দিলাম।'

'বেশ করেছো। এবার শুনি তোমার সেই কথাটা। তোমার মা দুর্গার কথা।'

'তোমার মা দুর্গা আবার কিরে! তোরও মা দুর্গা তো। মা দুর্গা তো সবাইকার। বল্, আমাদের মা দুর্গা।'

'ওই হোলো। এখন শুনি তো কথাটা।'

'মা দুর্গা আছেন না? শিব আছেন দুর্গা আছেন লক্ষ্মী সরস্বতী দেবতারা সবাই রয়েছেন।'

'আছেন তা তো জানি।' একবাক্যে ভার সায়।—'তা কে না জানে?'

'কিন্তু আছেন কোথায়? সেই আকাশের মণ্ডলে নয়, আমাদের এই শরীরে—আমাদের মনের মধ্যেই। যেমন তোর শিব আছেন মাথার এইখানটায়, আর মা দুর্গা রয়েছেন তাঁর পায়ের তলায় বসে—এইখানে কপালের মাঝখানে। এখানে মন নিয়ে এসে এমনি করে.....মা দুর্গাকে ডাকতে হয়।

এ আবার কি ধরনের মুখ মোছানো?

আনতে পারিস এখানে তোর মন?'

'কি করে আনব?'

'দাঁড়া, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোকে। আগে আমার এখেনে ডেকে আনি মা দুর্গাকে.....বলাটা হয়ত ভুল হোলো... আগে আমাকে ডেকে নিয়ে যই এখানে মা দুর্গার কাছে, তারপর......'

তারপর মার আখ্যানের পুরোটাই তার দেহে মনে মঞ্জরিত করতে লাগি—। যথাবিহিত পুরঃসর আমার আখ্যানমঞ্জরী নিবেদনের পর শুধাই: 'কি রকম লাগছিল বল্ তো, আমি যখন......'

'তুমি যখন ঠোঁট ঠেকিয়ে রেখেছিলে না, সারা গা কেমন শিরশির করছিল আমার!'

'করবেই তো! কপালটা শরীরের শিরোভাগ না? তাই করবেই তো শির শির!'

'কপাল নয় গো, গাটা শিউরে উঠছিল যেন।'

'আহা, ওই শীর্ষদেশ থেকেই তো যতো শিরা উপশিরা আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। মাথার ডাকে সাড়া দিচ্ছিল তারা।' নিজের বুদ্ধিমতন আমার ব্যাখ্যা করা।

'এবার বুঝলাম। বেশত, ডাকা গেল না হয় মা দুর্গাকে। কিন্তু কারণে অকারণে নাহক তাঁকে ডাকতে যাব কেন? তাঁকে বিরক্ত করা হবে না?'

'মা আবার বিরক্ত হয় নাকি ছেলে মেয়ের ওপর? আর অকারণে কেন? কোনো কিছুর দরকার পড়লেই ডাকবি তো। চাইবার জন্যেই ডাকবি, পাবার জন্যেই ডাকবি রে। দেখবি তোর প্রার্থনা পূর্ণ হয় কিনা।'

'আচ্ছা, আমি কিছু না চাইবার জন্যে ডাকি যদি?' সে জানতে চায়।

'না চাইবার জন্যে ডাকা? না পাবার জন্যেই? সে আবার কী রে?' তার কথাটায় আমার ধাঁধা লাগে, বুঝতে পারি না ঠিক।

'ধরো, মা তো আমাদের আসছে মাসে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে। আমি এখন থেকে যেতে চাইনে। আমি যদি এখন মা দুর্গার কাছে না যাবার জন্যে চাই তাহলে আমাদের না যাওয়া হবে ত?'

'না চাওয়ার জন্য চাওয়া যায় কিনা তা আমি জানি না।' ওর কথায় আমি ভাবনায় পড়ি—জিগেস করতে হবে মাকে। তারপরে তোকে বলব।'

না পাওয়ার জন্য চাওয়াটা কী আবার? ওর কথাটা আমার অদ্ভুত লাগে—'সত্যি, তোরা মেয়েরা যেন কেমন ধারা। আমরা ছেলেরা চাইবার জন্যেই চাই, পাবার জন্যেই চেয়ে থাকি—পাই আর না পাই। কিন্তু এই তোরা—মেয়েরা! তোরা না চাইবার জন্যেও চাস আবার! না পাবার জন্যেও চেষ্টা করিস! আশ্চর্য!

'চাইলে যদি পাওয়া যায়, না চাইলে তবে না পাওয়া যাবে না কেন?' তার জিজ্ঞাসা।

'কে জানে! তোরা মেয়েরাই তা জানিস। আমরা ছেলেরা যা চাই তাই শুধু চাই, তোরা মেয়েরা তার ওপর আবার না চাইলেও চাইতে পারিস দেখছি। মামা যে বলেন কথাটা মিথ্যে নয় তাহলে, মামা বলতেন বটে কিন্তু আমি তার মানে বুঝতাম না তখন।'

'কী বলতেন তোমার মামা?'

'মেয়েরা ভারী নাচাইতে পারে।'

'তুমি ভারী বোকা! সেটা ঐ না চাওয়া নয় মশাই, তা হচ্ছে গিয়ে তোমার বাঁদর নাচানো।'

'তোরাই জানিস। তোরাই নাচাস তো।' বেড়াতে বেড়াতে আমরা মহানন্দার তীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

'আমরা যাচ্ছি কোথায় বলতো?' সে শুধোয়।

'রাসলীলার আরতি দেখতে যাচ্ছি না! নদীটা পেরিয়ে যেতে হবে।'

'জল আছে যে নদীতে!'

'ও হাঁটুখানেক জল। অক্লেশে হেঁটে পেরোনো যায়। বর্ষাকালে বান ডাকে। তখন ফেঁপে ওঠে এখানকার মহানন্দা! অন্য সময় বেচারী মহাবিষণ্ণ হয়ে পড়ে থাকে ওর একটুখানি জল নিয়ে।'

'ঐ তো দূরে পুল দেখা যাচ্ছে, সাঁকোর ওপর দিয়ে গেলে হয় না?'

'তাহলে এই ফুটবলের মাঠ ক্রস করে এলাম কেন? সাঁকো দিয়ে পেরিয়ে পাকা সড়ক ধরে গেলে অনেক দূর পড়বে, দৌড়

যখন অন্নপূর্ণাকেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছি...'

'অত অন্ন খাওয়া ভালো নয় মশাই। গরহজম হয়।'

'তা যা বলিস।' আমার জবাবঃ কিন্তু যতই খাই না কেন, তোর মাথা খেতে পারব না। তোর মাথা অলরেডি খাওনা। মামা বলে, কলকাতায় মাথা না খাওয়া মেয়ে নাকি একটাও নেই—তারাও নাকি আবার জোর মাথাখোর।' আমার মামাতে অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করি : 'আর, তুইও তো কলকাতার মেয়ে! তার ওপর এমন সুন্দর। তোর মাথা কি না-খাওয়া আছে এখনও?'.

'কে খেল শুনি?'

'কে খেয়েছে কে জানে!' কেউ না কেউ খেয়েছেই!'

'না বাপু, তুমি সড়ক ধরেই চলো। পথ দেখে দেখে যাব আমরা। পথের দুপাশে দেখবার নেই কি!'

অগত্যা তিলকুট আর চিঁড়ের নাড়ু চিবুতে চিবুতে সড়ক ধরেই চললাম আমরা।

এতখানি পথ! ইস্কুলে যাবার সময় কষ্টটাই না মনে হয়। কিন্তু এখন যেন দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেল। পাকেটের প্রসাদ ফুরোতে না ফুরোতেই পথ খতম।

'ও বাবা! কত বড়ো একখানা বাড়ি গো। এই বুঝি তোমাদের সেই রাজবাড়ি? চাঁচোরের রাজার?'

'হ্যাঁ, নতুন রাজবাড়ি। ওর ডান দিকে রামসীতার মন্দির ওই। আর তার পাশেই আমাদের হাই ইস্কুল।'

'কলকাতায় এত বড় বাড়ি দেখিনি।' রিনি অবাক হয়ে দ্যাখে।—'তবে কলকাতার কতটুকুই বা দেখেছি।'

'ভেতরে আবার আরও কতো বড়ো। যতখানি চওড়া দেখছিস সামনেটা, ততটাই ডান দিকে, বাঁ দিকেও ততখানি, পেছনেও আবার তাই। কতো কতো ঘর যে! কতো বড়ো একখানা ছাদ। ফুটবল খেলা যায়। ছাদে আবার কল আছে—খুললেই জল পড়ে।'

'কলকাতার মতই নাকি? বলো কি গো?'

'তা হবে। কলকাতার কল দেখিনি তো আমি।' ...কাঁসির ঘণ্টা বাজছে শোন! আরতি শুরু হয়ে গেছে এখন।'

আমরা মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াই। আরতি দেখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'বাঃ, বেশ ঠাকুর তো! রাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমান.....' রিনি গড় হয়ে প্রণাম করে। আমিও।

'তোমার সিংহবাহিনী কই গো? দেখছি না তো!'

'এরই মধ্যে আছে কোনোখানে। এতদূর থেকে ভালো দেখা যায় না। এইটুকু ঠাকুর তো!' আমি বলিঃ 'সিংহবাহিনী যে দুর্গাই। মা দুর্গারই একটা নাম সিংহবাহিনী। আমি এখানে মন দিয়ে এসে মার কাছে কী প্রার্থনা করলাম এখন জানিস?'

'কী?'

'আমি যেন রামের মতন রাজা হই।'

'রাজা হবে? রাজা হবে তুমি? রাজা হয়ে কী করবে?'

'সিংহাসনে বসব ঐরকম। তুই সীতা হয়ে আমার পাশে বসবি, আর আমার ভাই সত্য লক্ষ্মণ হয়ে ছাতা ধরে থাকবে আমার মাথায়। আর হরিটা হনুমান হবে।'

'হরি আবার কে?'

'আমাদের ছোট ভাই। আমার বাবা থাকে কলকাতায়। দিদিমার নাতনী কিনা। দিদিমা ভারী ভালোবাসেন তাকে। তাঁর কাছেই থাকে।' আমি জানাই : 'হনুমানের মত হাত জোড় করে থাকবে আমাদের সামনে।'

'হনুমানের মতন ল্যাজ আছে ওর?'

'নেই, তবে ল্যাজ হবে—হতে হতে ল্যাজ—তুই দেখে নিস।'

'হ্যাঁ, তোমারও ল্যাজ হয়েছে আর আমি সীতা হয়েছি।' রিনি হাসতে থাকে।

[ক্রমশঃ

বাহাদুর লড়কী!

কিরণ কোহ্‌লির মা বললেন, আমার মেয়ে বাহাদুর। দারুণ এই ঘটনার পর বিমান থেকে নেমেছে যেন কিছুই হয়নি, যেন সদ্য ডিউটি করে ফিরে এল মাত্র! যখন বসে লিখছি তখনও হাইজ্যাক করা হাওয়াই জাহাজের যাত্রীদের অভিজ্ঞতার খবরের জন্য সাংবাদিকের দল, রেডিও আর টেলিভিশনের কর্মচারীরা হানা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। নতুন দিল্লির গোলমার্কেট এলাকার ঘর ভরে উঠেছে। কিরণ কোহ্‌লির মাকেই দেখলাম সামলাচ্ছেন সবাইকে। পৌঁছেছেন যাত্রী এবং ক্রু আগের দিন সন্ধ্যা ছটা নাগাদ। পরদিন সকালেই কিরণ বললো, যেকোন ডিউটির জন্য সে প্রস্তুত আবার বাইরে যেতে।

কিরণ কোহ্‌লি এইতো সেদিন ট্রেনিং শেষ করে বিমান বিনোদিনী নিযুক্ত হয়েছে। মাস তিন চার মাত্র হবে। বয়স তার বিশ একুশের বেশী নয়। হোস্টেসরা দেখতে শুনতে সাধারণত চটপটেই হন। কিরণ ব্যতিক্রম নয়। তার একটি বড় ভাই আছেন। একমাত্র কন্যা, কিশোরী বীরাঙ্গনার গল্প করতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। হবারই কথা।

কিরণ কিন্তু বলেছে সেই একমাত্র সাহস দেখিয়েছে তা নয়। নাবিকদল বিপদে অটল তো ছিলেনই, এমনকি যাত্রীরা কেউই খুব চাইল্ড হননি। শ্রীমতী কল ছিলেন একমাত্র মহিলা যাত্রী। তিনি আসছিলেন জম্মুতে মেয়ের বিয়ে দেবেন বলে। এর মধ্যে এতসব ঘটে গেল। জম্মুতে নেমে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আপন দেশের নিশ্চিন্ত নির্ভর মাটিতে পা দিয়ে বোধহয় জমে ওঠা মনের ভার মুহূর্তে এলিয়ে গেল। না হলে কোনরকম বাড়াবাড়ি করেন নি তিনিও। কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন হাইজ্যাকিং-এর হঠাৎ-আসা বিপদ কেমন অবলীলাক্রমে সবাই বহন করেছে। পিছনে বাসার আর সামনে চালকের বসবার ককপিট। জম্মু ছুঁই ছুঁই। বিমানের চাকা পর্যন্ত বাইরে এসে গেছে। অকস্মাৎ হুমকি দিয়ে দুই হাইজ্যাককারী ডাকাত ক্যাপ্টেনকে মোড় ফিরিয়ে নিয়েছে বিপথে উড়িয়ে নিয়ে গেল। লাহোর বিমানপোত পৌঁছাবার আগেও বেশ কিছু সময় পাকিস্তানের এ শহর ও শহরের মাথায় চক্কর কেটেছে। তবু ধৈর্যহারা হয়নি কেউ। কিরণ কোহ্‌লি তাই বলছিল এয়ার হস্টেসকে তো বিপদে সহিষ্ণুতার

জয়মাল্যোভূষিতা কিরণ কোহ্‌লি

শিক্ষা নিতে হয় বিশেষ করে। সাধারণ মানুষ যে অসীম সাহস দেখিয়েছে সেটাই জাতীয় গৌরবের দীপ্তিমান প্রতীক।

আমার কিন্তু ঘরে ফিরে মনে হচ্ছিল জাতীয় গৌরবের প্রতীক যেমন এই যাত্রী কাজের সাহস তেমন কিরণ কোহ্‌লি

আধুনিক ভারতীয় কিশোরীর নূতন জীবন-এর প্রতীক। অ্যাডভেঞ্চার তার কাছে কল্পনাবিলাস নয় বলেই সে অ্যাডভেঞ্চারের যোগ্য হয়েছে। কিরণ-এর ভাগ্যে সাহস দেখাবার সুযোগ এসেছে, সুযোগ পেলে সত্তরের সুন্দরী তরুণী পিছিয়ে যাবে না অনেকেই। পদে পদে শাসনের ডোরে বেঁধে রাখার দিন পিছনে-ফেলে-আসা সম্ভব হয়েছে বলেই তারা আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর হতে পেরেছে। বহুযুগের জমানো সামাজিক বাধা নিষেধ মেয়েদের দফায় দফায় জানানো হয়েছে কি তাদের কর্তব্য, তাদের অধিকার নেই, স্বত্ব নেই নেই কেন দাবি। এখন যে মাতা পিতা অথবা গুরুজন অভিভাবক হঠাৎ বদলে গেছেন তাও মানি না। এখন যুবজন জেনেছে তাদের বঞ্চিত করা বা খর্ব করে রাখা চলবে না। হয়তো তারা হয়েছে দুর্নিবার, বেপরোয়া। হয়তো শান্ত হতে সময় নেবে কিন্তু পিছনে চলা সম্ভব নয়। তথাকথিত রক্ষণশীল ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষে, পুরাতন নূতনের সন্ধিক্ষণের সমস্যায় যখন ব্রিটেনের সমাজ বিপর্যস্ত তখন কোন কবি যেন বলেছিলেন 'পুরাতন এখন মৃত, নূতনের জন্ম হবার শক্তি সঞ্চিত হয়নি যথেষ্ট'—আমাদেরও আগামী দিনের সমাজের নবজন্ম যন্ত্রণা আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। পূর্ণ বিশ্বাস রাখি নূতনের নবরূপ বিফল হবে না। সে নবরূপের মেয়েরা হবে দৃঢ়তায়, আপনাতে আস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দুই যুগে

সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখলাম যৌনজীবন সম্বন্ধে কিভাবে কিশোর-কিশোরী জ্ঞান-লাভ করেন সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা। বোম্বাইতে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র ছাত্রীর মধ্য গবেষণা করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই তথ্যের উপর নির্ভর করে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা হয়েছে। স্থানকালের অথবা পাত্র-পাত্রী ভেদে তথ্যের হের ফের হতে পারে। তবে কিশোর সমাজ এখন দেশের সর্বত্র স্বাধীন এবং ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন।

১৯৫৮ এবং ১৯৭০ সালে একদল করে কলেজের ছাত্রীকে জীবনের কতগুলি বাস্তব তথ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। বারো বছরের তফাতে উত্তরের যে পার্থক্য হয়েছে তাতে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে কিশোরদের বহু ক্ষেত্রেই আজকাল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারলে বেশী খুশী হয়। ১৯৫৮ সালের গবেষণায় দেখা গেছে মায়েদের কাছে মেয়েরা শিক্ষা-লাভ করবার সুযোগ যা পেয়েছে তার চেয়ে বরং কম হয়েছে ১৯৭০ সালে। বন্ধু বান্ধবের কাছে ছিটে ফোঁটা করে সংগ্রহ করা জীবনের তথ্য আগেও যেমন ছিল এখনও প্রায় তাই। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কারণ কি সে বিষয়ে গবেষণার কোন ফল দেখানো হয়নি। কারণ হয়তো সত্যকে স্বীকার করে মুখোমুখি হবার স্বাধীনতায় মেয়েরা এখন দ্বিধাহীন অসংকোচে শিক্ষালাভ করতে চায়। আবার শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে আপত্তি আর করেন না বরং প্রয়োজনই মনে করেন। স্কুল কলেজের মাধ্যমে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের খবর একপাটে দেওয়া এবং আরও ব্যাপকভাবে দেওয়ার ভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নেওয়া দরকার। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে কিশোর কিশোরীর ভবিষ্যৎ অতি ঘনিষ্ট-ভাবে জড়িত।

টুকিটাকি

মাথায় খুস্‌কি হলে সোহাগার খই আর কর্পূর মিলিয়ে জলে গুঁকে বোতলে রেখে ব্যবহার করলে নাকি সেরে যায়। পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। নির্দোষ প্রয়োগ ক্ষতির ভয় নেই।

কমলালেবুর খোসা দুধের সরের সঙ্গে বেটে মুখে হাতে মালিশ করলে ত্বক কোমল হয়, উজ্জ্বল হয় দেহবর্ণ। তবে কমলালেবুর তাজা খোসা সর্বদা সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। ছায়াতে শুকিয়ে কমলার খোসা গুঁড়ো করে রাখলে সুবিধামত কাঁচা দুধ বা সরে মিলিয়ে মুখে মাখা চলে। তাজা খোসার মত উপকার না হলেও কিছু ফল পাবেন।

পালিশ করা আসবাবে জলের দাগ হলে মোম গরম করে ঢেলে দেবেন। গরম মোম অতি অল্প সময় রেখে মুছে ফেলে যদি যত্ন করে মোম পালিশ করে ফেলেন দাগ সম্পূর্ণ উঠে যাবে।

কোকো বা চকোলেটে সাদা জামায় দাগ হয় এবং তোলা কষ্টসাধ্য। প্রথমে ধারহীন ছুরি দিয়ে যতটা সম্ভব ঘষে পরিষ্কার করবেন। তারপর বেশ করে গরম জল ও সাবানে জামাটি ধুয়ে নিন। তা সত্ত্বেও সবটা দাগ হয়তো উঠবে না। তখন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড তুলোতে নিয়ে দাগে চেপে লাগিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলবেন।

হলুদের দাগ সাবান জলে গোলাপীভাব ধারণ করলে ভয় পাবার কিছু নেই। ঝকঝকে রোদে ফেলে রাখুন বেমালুম হয়ে যাবে। যদি বেমালুম না হয় তবে একটু সাবান জলে গুলে থকথকে করে নিন ও ঐ গাঢ় গোলা দিয়ে দাগটি ঢেকে শুকিয়ে নিন এবং চেঁছে সাবান তুলে ধুয়ে ফেলুন। একবারে যদি সম্পূর্ণ দাগ সাফ না হয় তবে আর একবার করুন। নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ছোপের শেষ রেখাটুকুও।

শ্রীমতী

বাংলা অ্যাকাডেমি কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি তাঁদের গ্যালারীতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে ৫৬টি ছবি ও আটটি ভাস্কর্য নিদর্শন দেখা যায়।

প্রদর্শনীর ছবি নির্বাচন ও সজ্জা ব্যাপারে বিচারক্ষমতা ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সেজন্য কর্তৃপক্ষ সকলের

দুর্গা —গোপালকুমার

ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। প্রত্যেকটি ছবির দুইপাশে প্রয়োজনমত জায়গা ছাড়ার ফলে দর্শকদের ছবি উপভোগ করার সুযোগ মিলেছে। প্রদর্শনীভুক্ত প্রায় সকল শিল্পীই অল্পবয়স্ক ও কমবেশী পরিচিত। অধিকাংশ রচনাই আধুনিক, বিমূর্ত ও সমবিমূর্ত বা সারিয়ালিস্টিক—কোলাজের নমুনাও চোখে পড়ে। কয়েকটি ছবি ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত নানা প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। শিল্পসম্ভারে প্রগতিবাদের সন্ধান মিললেও নতুন উদ্ভাবনের কোনও নিদর্শন চোখে পড়েনি। ভাস্কর্য বিভাগ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। প্রদর্শনী পরিক্রমা করলে বোঝা যায় যে, কর্তৃপক্ষ প্রধানত স্থানীয় শিল্পীদের সহ-

মারমেড মাদার —উমা সিদ্ধান্ত

যোগিতা লাভ করেছেন। বাইরাগত শিল্পী-সংখ্যা নগণ্য। তাহলেও কর্তৃপক্ষের প্রয়াস প্রশংসনীয়। আশা করি ভবিষ্যতে তাঁরা বহিরাগত শিল্পীদের শিল্পসম্ভারে এই প্রদর্শনীকে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক করার চেষ্টা করবেন। বিমূর্ত রচনা হিসাবে প্রথমেই বীণা ভাণ্ডারের মিউটেড র‍্যাপসোডি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চাপা নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে হলুদ, সবুজ ও গাঢ় নীল রঙের স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্পী যেন একটি রঙীন মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন। এর পরে মহিম রুদ্রের স্টিল লাইফ অনেকের চোখে পড়ে। লাল, নীল, সবুজ ও বেগুনী রঙের ছোট ছোট আকার ওপরে, নীচে ও পাশাপাশি সাজিয়ে তিনি মন রঙের মোজেক তৈরি করেছেন। কম্পোজিশন হিসাবে এটি প্রশংসনীয়। নরেনভগেনের কাজে সমকালীন যুগযন্ত্রণার বিকৃতরূপ ফুটে উঠেছে, যেমন গোপাল সান্যালের দি টর্চড সোল। ছবির মধ্যে নিপীড়িত, হতভাগ্য মানুষের মর্মব্যথা ফুটে উঠেছে। পরিকল্পনা ও কারুকার্যের জন্য অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিলিফ জাতীয় কম্পোজিশনের নাম করা যায়। অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী ইমেজিং উইংস এর ওপর লক্ষ্য দিয়েছেন। সে হিসাবে তাঁর টয়লেট অনেকের ভাল লাগে। অনেক দিন পরে শিল্পী যোগেন চৌধুরীর কাজ দেখা গেল। কারুকার্য ও প্রকাশভঙ্গিমার দিক থেকে তাঁর প্রতীক-প্রধান রচনা দি করাপটেড ওল্ড ম্যান ১৯৬৫ অনেকের চোখে পড়ে। অনীতা রায়চৌধুরীর এক্সপ্রেশানিস্ট রচনায় এবারে বিমূর্ত রূপের নতুন ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে (পেন্টিং)। কয়েকটি ছবিতে শিল্পীদের অঙ্কনবৈশিষ্ট্য

ধরা পড়ে—যেমন বিকাশ ভট্টাচার্যের গড ইজ অফুল, সুনীল দাসের হলুদ, লাল, নীল রঙ এবং নানা চিহ্ন ও প্রতীকমূলক স্পিরিট অব উওম্যান, রঙের স্তরভেদ ও কারুকার্যপ্রধান নির্মল দত্তর এনসিয়েন্ট টাইম, রাজগৃহ, পরিকল্পনা ও ইমেজারি সৃষ্টি করার জন্য শ্যামল দত্ত রায়ের দি চাইল্ড। কম্পোজিশন হিসাবে ইশা মহম্মদের ক্যাপটিভ লেডি অনেকের নজরে পড়ে। প্রকাশ কর্মকারের পার্ট অব দি ডোভল-ও বিমূর্ত কম্পোজিশন হিসাবে উল্লেখ্য, বিশেষ করে শূন্য স্থান সমাবেশ ও অঙ্কনচাতুর্যের জন্য। প্রাচীন লোক ও দেওয়ালী চিত্র ও বলিষ্ঠ রেখাসৌষ্ঠবের সমন্বয়গুণে রবিন মণ্ডলের কম্পোজিশন অনেকের চোখে পড়ে। সজল রায়ের অ্যাওয়েকেন্ প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানবের উদ্দেশে মুক্তি ও জাগরণের আহ্বান। ক্যালকাটা শকুন্তলার দি আর্ট গ্যালারী ইতিপূর্বে প্রদর্শিত। বি আর পানসেকরের ল্যান্ডস্কেপ দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন—বিশেষ করে স্বতঃস্ফূর্ত কালো রেখা ও সবুজ রঙের সুন্দর সমন্বয়ের জন্য। নিসর্গ দৃশ্য হিসাবে ইন্দু দুগারের দার্জিলিং নাইট একটি সুন্দর নিদর্শন। ছবিতে নীল রঙের স্তরভেদদৃষ্টি দ্রষ্টব্য। সনৎকুমার সেন রোকেন ইমেজে তাঁর শিল্পী ও কারিগর দুটি চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য নিদর্শনকে কেন্দ্র করে তিনি ছোট ছোট পাথর টুকরো সহযোগে একজাতীয় বিশেষ শিল্পকারুকার্য সৃষ্টি করেছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে মানু পারেখ-এর ড্রয়িং, অনিকেত সেনগুপ্তের শকুন্তলা, ইন লাভ, সুধীর সেনের মাদার

ইনোসেন্ট —প্রবীর দাস

অ্যান্ড চাইল্ড, অরুণ দত্তর স্কেচ, নিখিলেশ দাসের গ্রীড-১, টি এস অর্থনরীর কোলাজ, সরিৎ নন্দীর পিসফুল কো-এক্‌জিস্টেন্স ও গোষ্ঠকুমারের কাপড়ে আঁকা দুর্গার নাম করা চলে। ভাস্কর্য বিভাগে অধিকাংশ নিদর্শনই কাঠের, যদিও ব্রঞ্জের দু' একটি কাজও দেখা যায়। পরিকল্পনা ও গঠন-নিপুণতার দিক থেকে উমা সিদ্ধান্তর মারমেড মাদার ও প্রভাস সেনের কম্পোজিশন উইথ টু ফিগারস-এর নাম করা যায়। রঘুনাথ সিংহের হেড অ্যান্ড নেকও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সমরেশ চৌধুরীর লোহার টুকরো ও পাত সাহায্যে রচিত অ্যাফেকশান ও সুবল সাহার টরসো-র নাম করা যায়। এই প্রদর্শনী বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মনে হয় অনেকেই এই প্রদর্শনীর বিষয়ে জানতেন না। যথারীতি নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও প্রচারকার্যের মধ্য দিয়ে প্রদর্শনীর কথা ঘোষণা করলে অচিরে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করবে ও বহির্বাংলার অনেক শিল্পী সহযোগিতা করবেন।

*

সোসাইটি ফর আর্টস অ্যান্ড আর্টিস্টস-এর সভ্যবৃন্দ অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে সাতজন শিল্পীসভ্যের মোট ২২টি শিল্পকর্ম নিদর্শন দেখা যায়।

এই সংস্থার সভ্যবৃন্দ সকলেই তরুণ, অধিকাংশই সবেমাত্র অঙ্কনবিদ্যা শেষ করে প্রথম স্বাধীনভাবে কাজ করতে শুরু করেছেন। তবে অনেকের কাজে এখনও শিক্ষার্থী-সুলভ দুর্বলতা দেখা যায় এবং তা স্বাভাবিক। এঁরা সকলেই তেলরঙ ব্যবহার করেছেন, যদিও জলরঙ ও কালি সহযোগে কোনও কোনও শিল্পী কাজ করেছেন। অঙ্কনরীতি মিশ্র, অর্থাৎ রিয়ালিস্টিক ও আধুনিক রচনার সঙ্গে বিমূর্ত রচনাও চোখে পড়ে। প্রয়াস হিসাবে প্রশংসনীয় হলেও সংস্থার সভ্যবৃন্দের শিল্প-নমুনা সুনির্বাচিত হয়নি। মনে হয় দু' এক ক্ষেত্রে তাঁরা ইচ্ছা করলে আরও ভাল নিদর্শন প্রদর্শনীভুক্ত করতে পারতেন। শিল্পী-সভ্যদের মধ্যে অবশ্য প্রথমে শুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পীর কাজ দেখে বোঝা যায় যে, প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যায় তিনি পটু। সম্ভবত জলরঙের সঙ্গে কালিকলমের রেখাসৌন্দর্য সমন্বয়ে তিনি কাজ করে পরে ল্যাকার ব্যবহার করেছেন। ছবির মানবমূর্তিগুলিকে চেনা যায়, যদিও শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের আকৃতি ঈষৎ হ্রস্ব ও বিকৃত করেছেন। শিল্পীর রচনায় প্রাচীন সরলতার ছাপ আছে, অথচ তা সত্ত্বেও তারা যেন এই যুগেরই মানুষ—নৈরাশ্য ও সর্বহারার ব্যর্থ, দীর্ণ ও বিকৃত রূপ যেন তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে—শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে আছে আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের ভাব—অর্থাৎ তারা যেন বর্তমান যুগে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যেমন এক্লিপ্‌স্‌। কয়েকটিতে যেন, এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নৃশংসতার ভাব ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে স্টিল্‌স-এর নাম করা যায়। দু' একটি গ্রোটেস্ক ও বটে—যেমন ডিভেইন্স। মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জীর কাজে নারী-সুলভ কোমলতা ও দৃষ্টিভঙ্গী সহজেই ধরা পড়ে। প্রখর রৌদ্রের পরিপ্রেক্ষিতে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরিহিতা শ্রমিক নারী—কাঁখে শিশু ও মাথায় ঝুড়ি—অনেকের ভাল লাগে (নেচার)। কার্তিক সিংহের রচনা বিমূর্ত, স্থান সমাবেশ ও কারুকার্যের জন্য দু' একটি চোখে পড়ে—যেমন লাইট অ্যান্ড শ্যাডো অন দি ওয়াল। কম্পোজিশন হিসাবে ডেড কাইট ও দি সান অ্যান্ড দি বোটের নাম করা যায়। প্রবীর দাসের 'নও রিয়ালিস্টিক দু' একটি ছবি ভাল লাগে—শুধু নিছক সরলতার জন্য, যেমন ইনোসেন্ট (৫)। জহর সাহা পোদ্দারের রচনা দেখে মনে হয় বিষয়বস্তু অপেক্ষা রঙের বিষয়টির জন্য তিনি চিন্তা করেন। এই প্রসঙ্গে দি

ব্রাউন এণ্ড পলসন
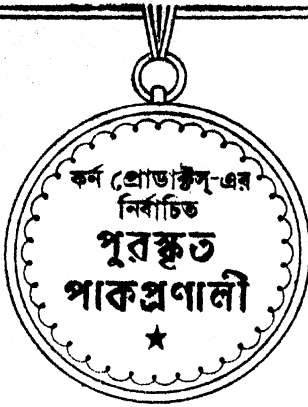
পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে তৈরী

মিসেস লক্ষ্মী গণপতি

ব্রাউন এণ্ড পলসন কর্নফ্লাওয়ারে দিব্যি মচমচে কড়কড়ে সামোসা ও প্যাটিস্ তৈরী হয়। (১ বড়চামচ থেকে ২ কাপ সাধারণ ময়দা মিশিয়ে নিন)। আপনার স্যুপ বা গ্রেভী (ঝোল) আরও ঘন মোলায়েম ও সুস্বাদু করে তোলবার জন্য ও ব্যবহার করবেন। **ব্রাউন এণ্ড পলসন** কর্নফ্লাওয়ার শিশু ও রোগী ব্যক্তিদের পক্ষে বেশ পুষ্টিকর। **ব্রাউন এণ্ড পলসন** সবচেয়ে সেরা কর্নফ্লাওয়ার কেননা সেরা-সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি সযত্নে প্রস্তুত।

কাগজের বাক্সেও পাওয়া যায়

উপকরণ :

১½ কাপ চিনি
½ কাপ ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার
½ কাপ ঘি
২ বড় চামচ রেজ রোজ সিরাপ
১ ছোট চামচ করে আলাদাভাবে কাজু ও বাদাম (কুচি করা)

১। চিনি দিয়ে এক পাত্র জল ৫ মিনিট ধরে গরম করুন।
২। ½ কাপ ঠাণ্ডা জলে **ব্রাউন এণ্ড পলসন** পেটেণ্ট কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করুন; এবার চিনির রস আস্তে আস্তে ঢালুন, দেখবেন যেন তাপমাত্রা বেশি না হয়।
৩। যখন কর্নফ্লাওয়ারটি ভালভাবে তৈরী হয়ে যাবে, একটু একটু করে ঘি মেশান; ক্রমাগত গুলে যেতে থাকুন যতক্ষণ না পাত্রের গা থেকে মিশ্রণটি আলাদা হয়ে আসে ও ঘি আলাদা হয়।
৪। এবার রেজ রোজ সিরাপ দিয়ে বেশ ভাল করে মেশান। যখন মিশ্রণটি পাতলা হয়ে আসবে ও পাত্রের গায়ে লেগে থাকবে না, তখন কুচিকরা বাদাম মিশিয়ে নিয়ে তেলাক্ত প্লেটে ছড়িয়ে দিন।
৫। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোনাকুনি কাটুন।

বিনামূল্যে! নতুন পাকপ্রণালীর বই নং ৩

আজই এক কপির জন্য লিখুন বিনামূল্যে এক সেট পাকপ্রণালী পাঠাবেন—

ইংরাজী / হিন্দী / বাংলা / তামিল / তেলেগু / মালয়ালম / গুজরাটি / মারাঠি / কন্নাড়া

নাম ……………………
ঠিকানা ……………………
……………………

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন : পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট কর্ণ প্রোডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি আর

DE-2

আপনার পরিবারের সবার মনের মত এ রকম আরো নানা খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন।

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি. আর

Bensons/5255-Ben

সামনে চড়াই উৎরাই মেয়েরা তবু এগিয়ে চলেছে

সুধীর ঘোষ

'লরী লোকটা কি অসভ্য!' অথবা 'পতৌডি এবারেও কিছু করতে পারল না'—মেয়েদের মুখে এ রকম মন্তব্য ইদানীং আর আমাদের তেমন বিস্মিত করে না। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের জয়-পরাজয়ও আমাদের অন্দর মহলে আজকাল আলোড়নের সৃষ্টি করে থাকে। খেলাধুলোর প্রতি বাংলার মেয়েদের এই নবজাগ্রত আগ্রহকে নিছক শৌখীন ঔৎসুক্য বলে মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে। অনেক দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক অনুশাসনের বেড়া পার হয়ে, বহু জীবন-চর্যার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিতে পেরেছেন,—খেলাধুলোর প্রতি মেয়েদের এই কৌতূহল তারই ফলশ্রুতি। আন্তর্জাতিক সাড়া-জাগানো তেমন কোন অসাধারণ কৃতিত্বের নজীর সৃষ্টি না করতে পারলেও খেলাধুলোর সর্বভারতীয় আসরে বাংলার মেয়েদের পারদর্শিতা আমাদের রীতিমত গর্বের বস্তু।

এই মুহূর্তেই হাতেকলমে একাধিক মেয়ের উল্লেখ করা যায় যাঁদের খ্যাতির সৌরভ বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য রাজ্যের ক্রীড়ানুরাগীদের কাছেও ছড়িয়ে গিয়েছে। কার কথা আগে বলি! টেবল টেনিসের সোনার মেয়ে রূপা মুখার্জী সাইক্লিং-এ 'কিন্নর-বালিকা' শিখা সেন, প্রথম বাঙালী মেয়ে ডাইভার চন্দনা সরকার অথবা ভারত-সেরা মেয়ে জিমন্যাস্ট অম্বালিকা মজুমদার। আপন আপন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্যের সূত্রে এঁদের প্রত্যেকের নামই আজ ভারত জোড়া।

টেবল-টেনিসের কথাই ধরা যাক। বাঙালী মেয়ে রূপা, যার পোশাকী নাম রূপালী, আজ সর্বভারতীয় টেবল-টেনিস মহলে একটি অতি পরিচিত নাম। দক্ষিণ কলকাতার দেশবন্ধু কলেজের এই ছাত্রীটি ইতিমধ্যেই ভারতের শীর্ষস্থানীয়া পাঁচজন বাছাই খেলোয়াড়দের অন্যতমার স্বীকৃতি পেয়েছে। রূপার কৃতিত্বের পরিমাপ অবশ্য নিছক গাণিতিক পর্যায়ের চেয়ে অনেক উচ্চতর। কারণ সমকালীন টেবল টেনিসে রূপার এমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই যাকে রূপা কোন না কোন সময়ে পরাস্ত করেছে। ভারতশ্রেষ্ঠা বাসন্তী কেটি চান্দ্রমানকেই অন্তত দু'বার নতিস্বীকার করতে হয়েছে এই সপ্রতিভ, চঞ্চল মেয়েটির কাছে। টেবল টেনিসে উৎসর্গীকৃত প্রাণ রূপাকে সময় সময় বাড়তি পড়াশুনো করে

জিমন্যাস্টিকসের বিভিন্ন ভঙ্গিতে (বাঁ দিক থেকে) নীলিমা গজ, অসীমা গজ, অম্বালিকা মজুমদার ও গোপা চক্রবর্তী

শিখা সেন ফটো—দেশ

অল্প সময়ের ঘাটতি মিটিয়ে নিতে হয় অথবা আরো টেকনিকের সন্ধানে রূপাকে ছুটে বেড়াতে হয় আজ ইংল্যাণ্ডে দক্ষিণাঞ্চলের খেলার আসরে কাল নিকটেই উত্তরাঞ্চলের অথবা প্যারিস, প্যাসিফিক অঞ্চলের আসরে। এছাড়া জাতীয় প্রতিযোগিতা তো আছেই। বেশ কয়েক বছর ধরে রূপা বাংলাদেশের কোন ঘরোয়া আসরে হার স্বীকার করেনি—এক বাংলার আর এক মেয়ে ইন্দু পুরীর কাছে ছাড়া। স্কুলের ছাত্রী হিসেবেই ইন্দু ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আন্তর্জাতিক আসরে। সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত এবারকার আন্তঃ এশীয় স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় ভারতকে নেতৃত্ব দেবার ভার পড়েছিল ইন্দুর উপর। দলগতভাবে ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করলেও চশমাধারী কৃশাঙ্গী এই মেয়েটির কুশলতা সিঙ্গাপুরের দর্শকদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। বিশেষ করে মালয়েশিয়ার পয়লা নম্বর মেয়ে লিউ লা পানাকে ইন্দু যেভাবে ঝড়ের গতিতে পরাস্ত করেছিল (২১—৫, ২১—৮) অনেকের কাছেই তা ছিল বিস্ময়ের বস্তু।

বিস্ময়ের বুঝি কোন শেষ নেই। ক'জন লোক কে ভাবতে পারেন মাত্র বারো বছরের মেয়ে শিখা সেন এরই মধ্যে সর্বভারতীয় সাইকেলের আসরে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করতে পারে। ভারতবর্ষে তো নয়ই, এত অল্প বয়সে এতখানি সাফল্যের দৃষ্টান্ত বিদেশেও কোথাও আছে কি না সন্দেহ। জাতীয় প্রতিযোগিতায় শিখার ক্রমোন্নতির গতিরীতিটি রীতিমত চমকপ্রদ। '৬৮-তে প্রথম প্রয়াসে শিখাকে ফিরে আসতে হয় শূন্য হাতে, পরের বছর দিল্লীতে শুধুই একটি ব্রোঞ্জ। প্রাথমিক ব্যর্থতা কিন্তু শিখাকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। তাই এ বছরের গোড়ার দিকে জাতীয় প্রতিযোগিতায় শিখা সাফল্যের স্বর্ণশিখরে—এবং ওর একক কৃতিত্বের সূত্রেই বাংলা বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন। বছর ঘোরবার আগেই শুধু বালিকা বিভাগেই নয় অদম্য মনোবল ও নিরলস অনুশীলনের জোরে শিখা মহিলা বিভাগেও বিজয়িনীর গৌরব অর্জন করেছে—হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-অঞ্চল ও জাতীয় জুনিয়র প্রতিযোগিতায়। সব মিলিয়ে একটি আসর থেকেই শিখা সংগ্রহ করেছে চারটি সোনা ও দুটি রূপোর পদক। বলা বাহুল্য, বাংলা তথা পূর্বাঞ্চল এবারেও চ্যাম্পিয়ন এবং তা সম্ভব হয়েছে কেবল শিখার একক নৈপুণ্যে। জানি না, একটি প্রতিযোগিতার আসর থেকে এতগুলি পদক জয়ের গৌরব অন্য কোন ভারতীয় মেয়ে পেয়েছেন কি না। শিখার উত্তরোত্তর অগ্রগতির ধারাবাহিকতা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে অচিরেই হয়তো শিখার সাফল্যের সূত্রে বাংলার মেয়েদের নাম ধ্বনিত হবে খেলাধুলার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। সচ্ছল পরিবারের মেয়ে নয় শিখা। সামান্য আয় ওর বাবার। কিন্তু দারিদ্র্য ওর অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারেনি।

খেলাধুলার আসরে জিমন্যাস্টিক এমন একটি রোমাঞ্চকর বিষয় যেখানে চরম

চন্দনা সরকার ফটো—দেশ

বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেহবল্লরীতে লীলায়িত ছন্দ-সুষমা ফুটিয়ে তোলা যায় বিচিত্র ভঙ্গিমার আসন গড়ে তোলার সূত্রে। এই জিমন্যাস্টিকস বাংলার মেয়েদের একটি গর্বের বস্তু। ১৯৫৮ সালে জাতীয় প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই এই বিষয়ে বাঙালী মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় অবিসংবাদিত। অধুনা নীলিমা পাল ও অম্বালিকা মজুমদারের ব্যক্তিগত সাফল্যের সূত্রেই বাংলার মেয়ে জিমন্যাস্টদের নাম এখন ভারতের ঘরে ঘরে। '৬৭-তে প্রথম প্রচেষ্টায় ওদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় রূপো আর ব্রোঞ্জের সম্মান নিয়ে। কিন্তু তারপর থেকে ওরা দুজনাই আর পিছন ফিরে তাকায়নি। সোনা আর রূপোর পদক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে—কখনো নীলিমা প্রথম কখনো বা প্রথম অম্বালিকা। ওদের মধ্যে পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন ঘটেছে সত্য—কিন্তু বাংলার সম্মান অক্ষুণ্ণ থেকেছে প্রত্যেকবারেই। বালিকা বিভাগেও নীলিমার সহোদরা অসীমার কাছাকাছি আসতে পারে গত তিন বছর যাবৎ এমন কোন প্রতিযোগিনীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বাংলার মেয়েরা সাঁতার জগতে একদা যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন এই মুহূর্তে তার কোন যোগ্য উত্তরাধিকারিণী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে আশার কথা সাঁতারে না হলেও সমগোত্রীয় ডাইভিং-এ নতুন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বাংলার মেয়ে চন্দনা সরকার। জিমন্যাস্টিকসের মতই শ্বাসরোধকারী ও বিপজ্জনক অথচ শিল্প-চাতুর্যের পরিচয়বাহী ডাইভিং-এ বাংলার মেয়ের পারদর্শিতার নজীর এই প্রথম। এবার পুজোর সময় ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় চন্দনা ডাইভিং-এর দুটি বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। সুইমিং পুল তো দূরের কথা, আন্তর্জাতিক মানের সাজ-সরঞ্জাম মেলা যেখানে দুষ্কর সেখানে অল্পদিনের আয়াসে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়াদের মধ্যে

গণ্য হওয়া রীতিমত কৃতিত্বের পরিচায়ক বৈকি!

মাত্র দু'বছর হল ভলিবল বাংলার মেয়েদের আকৃষ্ট করেছে। দৈহিক খর্বতার প্রতিবন্ধক পার হয়ে এরই মধ্যে অন্তত তিনজন বাঙালী মেয়ে—শুভ্রা বসু, তপতী মণ্ডল এবং কৃষ্ণা গুহ—আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় দলে স্থান করে নিয়েছে নিজেদের দক্ষতার জোরে। এ বছরের গোড়ার দিকে সিংহলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তপতী ও শুভ্রা ভারতীয় দলের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কৃষ্ণা ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছে আরো কিছু পরে—প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সফরকারী ছাত্রীদলের বিরুদ্ধে। বাংলার আরও মেয়ে এদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা মেয়েদের ভলিবলে একটি শক্তি বলে পরিগণিত হতে পারে।

কোন রকম প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র স্বাভাবিক প্রতিভাকে আশ্রয় করেও সর্বভারতীয় আসরে কতখানি ওঠা যায় এ রাজ্যের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় তুলসী ব্যানার্জী তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শিবরাত্রির সলতের মত তুলসীই এই মুহূর্তে একমাত্র বাঙালী মেয়ে যাকে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন মহলে সকলই এক ডাকে চেনে। শান্ত, ধীর অথচ আত্ম-প্রত্যয়ে অটুট বালিকা সদৃশ এই খেলোয়াড়টি এ বছরই সর্বভারতীয় বাছাই তালিকায় বালিকা বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। এবারের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের নেত্রী তুলসী মহিলা বিভাগেও এরই মধ্যে দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে কেবল আপন অদম্য প্রত্যয়ের জোরে। সবে মাত্র বাল্যের গণ্ডি কাটিয়ে ওঠা তুলসীর সামনে পড়ে রয়েছে সম্ভাবনা উজ্জ্বল অনেকগুলি বছর। নিরলস অনুশীলন ও যোগ্য প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলে তুলসী হয়তো ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারবে।

ইন্দ্রাণী মুখার্জি ফটো—দেশ

তুলনামূলকভাবে অ্যাথলেটিকসে আমাদের মেয়েরা এখনো তেমন কোন দৃষ্টি-কাড়া নজীর সৃষ্টি করতে না পারলেও বালিকা বিভাগে আমাদের মেয়েদের কৃতিত্ব রীতিমত আশাপ্রদ। ছশো মিটার দৌড়ে রীতা পাল শুধু স্বর্ণ-পদকই জয় করে আনে নি সেই সঙ্গে ভারতীয় মানকেও করেছে আরো উন্নত। এই তো কয়েকমাস আগে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় ক্রস কাণ্ট্রি রেসে সে তিন কিলোমিটারে (১২ মিঃ ২৯·৬ সেঃ) রেকর্ড করল। এছাড়া সুধীর নন্দী, নীভা আদক, শ্রীলতা চ্যাটার্জী প্রত্যেকেই ভবিষ্যতের স্বর্ণ-সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন। অপরদিকে সীমিত হলেও কিংকরী দাস, সুব্রতা পাল, ইন্দ্রাণী মুখার্জী অথবা শ্রীরূপা চ্যাটার্জী মহিলা বিভাগে সাফল্যের সূত্রে ভারতের সামনে বাঙালী মেয়েদের ক্রীড়াভূমিকাকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন।

ভারতীয় শুটিং জগতেও বাংলার মেয়েদের স্থান প্রথম সারিতে। গীতা রায়, শোভিতা চ্যাটার্জী অথবা জয়ন্তী সেন ভারতের শুটিং মহলে অতি পরিচিত নাম। অল্প কিছু আগে পর্যন্ত শুটিং-এর চর্চা কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইদানীং এন সি সি-র সূত্রে সাধারণ বাংলার মেয়েরাও শুটিং-এ আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

হকি অথবা বাস্কেটবলের মত কঠোর শ্রমসাধ্য খেলাধুলোয় মেয়েদের যোগদান অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও অকল্পনীয় বিবেচিত হত। তাই বাংলা জাতীয় হকি অথবা বাস্কেট প্রতিযোগিতায় যোগদান করলেও সে দলে পাঁচ-সাত বাঙালী মেয়ে মেলা ছিল অসম্ভব। তবে অতি সম্প্রতি বাঙালী মেয়েরা সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও এই দুটি খেলার প্রতিই সক্রিয় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলা হকি দলে বাঙালী মেয়ে আনারা নন্দীর মনোনয়ন। বাস্কেটবল দলে বাঙালী মেয়ে তন্দ্রালিকা মজুমদার ও জয়ন্তী বিশ্বাস ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তুলে ধরেছেন তাঁদের নৈপুণ্যের ভিত্তিতে।

কিন্তু বিভিন্ন খেলাধুলোয় বাংলার মেয়েদের অল্প বিস্তর সাফল্য সত্ত্বেও খেলাধুলো এখনো—পাশ্চাত্য দেশের নব

রীতা পাল

ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় তেমনভাবে বাংলার মেয়েদের মন কাড়তে পারেনি। অথচ কে না জানে ইটনের খেলার মাঠে যদি ওয়াটার্লুর যুদ্ধ জয়ের প্রস্তুতি হয়ে থাকে তবে জাতি গঠনের পথে যাঁদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তাদের গড়ে তোলা উচিত এই খেলার মাঠ থেকেই।

শৈশব থেকে শুরু করে বাল্যের শেষ সীমায় পদার্পণের আগে পর্যন্ত বাংলার মেয়েরা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে অল্প-স্বল্প নানা রকম খেলাধুলোয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু যে মুহূর্তে নিছক অবকাশ বিনোদনের স্তর পেরিয়ে প্রতিযোগিতামূলক আসরে যোগদানের ডাক আসে শত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মেয়েই তখন খেলাধুলোর মায়া কাটিয়ে ঘর-কন্নার দিকে মন দেন। অথচ যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? আজকের সর্বভারতীয় আসরে বাংলার যে সকল মেয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের। পড়াশুনা, চাকরী অথবা গৃহস্থালী সবকিছু বজায় রেখেও তাঁরা খেলাধুলোর চর্চা বজায় রেখেছেন। অবশ্য অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রতিকূলতা একটি বড় প্রতিবন্ধক। আর আছে দারিদ্র্য। যাঁরা আমাদের মেয়ে খেলোয়াড়দের বিস্তারিত খোঁজ রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ওদের অধিকাংশই শহরতলি বা গাঁয়ের। শহরের মেয়েরা এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে।

মুখে আমরা যতই নারী-প্রগতির কথা বলি না কেন, মেয়েদের খেলাধুলোকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতা এখনো সঙ্কোচগ্রস্ত। অ্যাথলেটিকস, হকি অথবা বাস্কেটবলের মত শ্রমসাধ্য পুরুষে খেলাধুলোর নিরন্তর অনুশীলনে রমণীসুলভ সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা খেলাধুলোর উপযোগী স্বল্পবাস পরার ফলে মেয়েদের স্বাভাবিক ব্রীড়াবোধ আহত হতে পারে—এরকম ভ্রান্ত ধারণা এখনও অনেকেই পোষণ করে থাকেন। যে দেশে প্রচলিত প্রবাদ 'মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি' সেখানে এর চেয়ে বেশী আমরা আর কিই-বা আশা করতে পারি। অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি যেখানে দু'তিন সন্তানের জননীও ওলিম্পিক আসর থেকে জয় করে এনেছেন একাধিক স্বর্ণপদক।

প্রয়োজনের তুলনায় আমরা মেয়েদের সত্যিকার কতখানি সুযোগ-সুবিধাই বা দিতে পেরেছি। স্বাধীনতার তেইশ বছর পরেও ব্যাডমিণ্টনে ঘেরা কোর্ট স্বপ্নরাজ্যেই রয়ে গেল। মেয়েদের উপযোগী মাপসই রেসিং সাইকেল এখনো দুর্লভ। নিয়মিত শুটিং অভ্যাস করা তো রীতিমত বিলাসিতার ব্যাপার। জিমন্যাস্টিকস অথবা ডাইভিং-এ আমাদের মেয়েদের সরঞ্জাম অন্য

কিঙ্করী দাস ফটো—দে

রাজ্যের উপহাসের বস্তু।

বায়-বহুল ব্যাপারগুলির কথা ছেড়ে দিলাম, লক্ষ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত এই শহ কলকাতায় এমন একটি মাঠ পাওয়া শব যেখানে স্বচ্ছন্দে স্বল্প দূরপাল্লার বিষর গুলি অনুশীলন করা চলে। দক্ষিণে রবীন সরোবর স্টেডিয়াম চারদিকের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের মধ্যে একটি ক্ষীণ প্রদীপের মত শহরের অন্য প্রান্তের মেয়েদের পা দৈনন্দিন চর্চা বজায় রাখবার জন্যে নি অতখানি পথ অতিক্রম করা এ যুগে অস্থির আবহাওয়ায় একেবারেই অসম্ভব আর এ কথা কে না জানে শক্তি-সামর্থ এমনকি প্রতিভা সত্ত্বেও অনুশীলনের কো বিকল্প নেই। আর এছাড়া যোগ প্রশিক্ষকের অভাব তো আছেই। য অভাবে অন্য সব কিছু গুণ থাকলে একটি নির্দিষ্ট মানের পর আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

এরই পাশাপাশি, না, পাশ্চাত্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লাভ নেই, ভারতের অন্য অনেক রাজ্যের মেয়েদের খেলাধুলোর সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। স্কুলের স্তর থেকে শুরু করে প্রতিটি সম্ভাবনাময় মেয়েকে খুঁজে বের করে তার অনুশীলন ও উন্নতির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ভার এক রকম রাজ্য-সরকারই গ্রহণ করে থাকেন। তাই অযথা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ নেই যে পাঞ্জাবের মেয়েরা আমাদের জিমন্যাস্টিকসে ছাড়িয়ে গেল অথবা সাঁতারে রাজস্থানের মান আমাদের চেয়ে উন্নততর অথবা ব্যাডমিণ্টনে মহারাষ্ট্র-কেরলের মেয়েরা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী।

সামনে অনেক বাধার পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা, পারিবারিক দারিদ্র্য, সামাজিক সংস্কারের ভ্রূকুটি—তবুও এত কষ্ট স্বীকার করেও এ রাজ্যের যে মুষ্টিমেয় মেয়েরা এগিয়ে চলেছেন অনেক স্বর্ণ-সোপান অতিক্রম করে সে কেবল খেলাধুলোর প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক ভালবাসার বশে।

বাংলার ভবিষ্যৎ

আমি দেশ পত্রিকার "সংবাদভাষ্য" নিয়মিত পাঠ করি এবং লেখকের লেখার কলাকৌশল ও বাচনভঙ্গীর তারিফ না করে পারিনে। এবারে অর্থাৎ ১৬ই মাঘ ১৩৭৭ তারিখের দেশে রূপদর্শী তাঁর ভাষ্যে যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তিনি সকলেরই অকপট প্রশংসার যোগ্য। তাই তাঁকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কথা কিছু বলতে চাইঃ—

তাঁর লেখার যে অংশটি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে তার একটু অংশ এখানে উদ্ধৃত করি—' "এবং সে সরকার যদি সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ পরিত্যাগ করে শক্ত হাতে একটা উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা রূপ দিতে এগিয়ে না যান, তবে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।" অকাট্য সত্য কথা।

মোটের উপর এই লেখার মধ্য দিয়ে লেখক বাংলা দেশের বন্ধু দুর্গত জনসাধারণের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন। বেশ কিছুকাল ধরে দেশের জনসাধারণ চাচ্ছে একটা স্থায়ী এবং দৃঢ় শাসনব্যবস্থা যার মাধ্যমে দেশে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। লোকের মন থেকে নিরাপত্তা-বোধ একেবারেই চলে গেছে। কারণ চোখের উপর দেখা যাচ্ছে লোকের ধন মান প্রাণ কিছুই নিরাপদ নয়। এই খুনোখুনির মধ্যে কোন উন্নয়নের কাজ তো সম্ভব নয়ই, উপরন্তু দেশ উত্তরোত্তর সর্বনাশের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই অনুন্নত দেশে যেখানে শিক্ষার বিস্তার নিতান্তই কম এবং দেশাত্মবোধ নেই বললেই হয়, সেখানে ডেমোক্রাসীর সুষ্ঠু রূপায়ণ বড়ই কঠিন কাজ। কর্তারা থাকেন শুধু গদি নিয়েই ব্যস্ত। কাজেই সর্বদাই ভোটের দিকে একটা চোখ রেখে শাসন যন্ত্র পরিচালনা করতে গেলে কড়া শাসন সম্ভব হবে কি করে? দেশের স্বার্থ যায় তলিয়ে, গদির মোহই বড় হয়ে ওঠে বলেই শাসন শৈথিল্য পদে পদে।

কিন্তু এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে যাঁদের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত হয় তাঁরা যদি কঠিন হাতে শাসন দণ্ড ধরেন এবং দৃঢ় পরিচালনার দ্বারা সন্ত্রাসের রাজত্ব দূর করে শান্তি শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠাপূর্বক জনমানসে নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে তাদেরকেই লোকে আবার চাইবে। আবার জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভালবাসার অধিকারী হয়ে তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পাবেন যে দেশের রাজনৈতিক চেতনার মোড় ঘুরে গেছে তাঁদেরই অনুকূলে। শাসক মানসিক দিক দিয়ে যেমন উদার হবেন, কাজের দিক দিয়ে তেমনি

কঠিন হবেন। তাই পক্ষপাতহীন বজ্র কঠিন শাসনই লোকের কাম্য।

বিশ্ববন্ধু বসু
কলকাতা-৬

॥ ২ ॥

আপনাদের পত্রিকার ১৩ সংখ্যায় (৩০।১।৭১) রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে তাঁর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে 'দেশ' পত্রিকার—সমাজের দুষ্টক্ষতের প্রতি বারংবার অঙ্গুলি নির্দেশ ও গঠনমূলক চিন্তাধারা গড়ে ওঠার প্রয়াসে—ভূমিকা একান্তই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার্হ। বর্তমান প্রতিটি সংখ্যা 'দেশ' আমার এই বক্তব্যের সাক্ষ্যই বহন করবে। সুতরাং অভিনন্দন গোটা 'দেশ' কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য।

রূপদর্শী তাঁর বর্তমান রচনায় যেভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতিটি পর্যালোচনা করেছেন, আমার মনে হয়, এতটা স্পষ্ট ভাবে এর আগে করা হয়নি, যার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রূপদর্শী সন্দেহাতীত ভাবে বলেছেন যে বাংলা দেশে একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা না হলে এবং সেই সরকার সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে না ছুটে শক্ত হাতে উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা রূপ দিতে না পারলে বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ কথায় দ্বিমত করার অবকাশ নেই। কিন্তু কোন্ দল একক গরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করবেন? সমস্ত যুক্তি, বুদ্ধি ও তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে বাংলা দেশে কোনও দল যদি সে সম্মান অর্জন করতে পারে তা হচ্ছে সি পি এম (যদিও তারা জোটবদ্ধ তাহলেও আর সব দল নগণ্য ও বক্তব্য রহিত)। কিন্তু সি পি এম, ইউনাইটেড ফ্রন্ট আমলে প্রশাসনিক নির্বাদ্ধিতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও সর্বোপরি দলীয় স্বার্থ চরিতার্থতার যে চূড়ান্ত নজির রেখে গেছেন তাতে তারা একক গরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করলে কি বাংলা দেশ আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে? অন্যান্য দলের কথা না তোলাই ভাল। সমস্ত দলই গদিলোভী, পেশাদার রাজনেতায় ভর্তি। এ'রা সত্যিই যদি বাংলা দেশের ভাল চাইতেন তাইলে জাতীয় স্তরে বিভেদ ভুলে গিয়ে এক হতে পারতেন না? এগিয়ে চলার পথে নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র বাংলা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যুব সম্প্রদায় (কোন ইজমের দ্বারা আক্রান্ত নন)। সমস্ত বৃদ্ধ, অপদার্থ নেতাদের নির্বাসন দিয়ে বলিষ্ঠ যুবকরা কি এগিয়ে যাবেন না নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য। যাদের মধ্যে থাকবে 'বাঘা যতীন' 'নেতাজী সুভাষ'-এর নির্ভীকতা, আত্ম-প্রত্যয়, ব্যক্তিত্ব ও সর্বোপরি সাধু-

সঙ্কল্প ও কর্মোদাম। এমন কেউ কি নেই যিনি এগিয়ে এসে দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারবেন যে কোনও "ইজম্" দেশকে দুর্দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না? কোনও পার্টির পকেটে কুবেরের ধন-ভাণ্ডার, লক্ষ্মীর ঝাঁপি নেই—যা দিয়ে তাঁরা সবার মুখে খাদ্য যুগিয়ে দেবেন, পরনের কাপড় দেবেন—কাউকে এক ফোঁটা ঘাম ঝরাতে হবে না? কে এই সত্য কথাটি বলবেন যে আসলে আমাদের প্রত্যেককেই পরিশ্রম করতে হবে, কঠিন পরিশ্রম সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, তবেই সমাধান হবে সমস্যার। বিরাম-হীন বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রমের পর এই generation সামান্যই তার ফলভোগ করে যেতে পারবেন, কিন্তু তা ভেবে স্বার্থ-পরের মত স[illegible]চিত হয়ে থাকলে চলবে না। আগামী generationকে এক সুন্দর ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়ে যাওয়ার স্বর্গীয় আনন্দই প্রত্যেককে চরিতার্থতা দেবে।

এ জাতীয় ব্যাপার যদি কিছু হয় তবেই বাঁচোয়া, নয়তো বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার, অনিবার্যভাবে।

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
দাদর, বোম্বাই

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

নবারুণ গুপ্ত গত ৯ই মাঘ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় দৃশ্যপট বিভাগে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী, নিরপেক্ষ এবং অকপট আলোচনায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মত অজস্র ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বার্থসিদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার আজ সাম্প্রদায়িক উস্কানি, যার অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলের উত্থান এবং মুসলমানদের মুসলমান হিসেবে দেখার অভিসন্ধিৎসায়।

প্রথমেই ধরা যাক মুসলিম লীগের কথা। স্বাধীনতার পর ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মুসলমান ভোটদাতারা কংগ্রেসকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা মুসলমান ভোটদাতাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ১৯৬৭'র নির্বাচনে, পশ্চিমবঙ্গের অ-কংগ্রেসী নেতারা প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক প্রচারে নেমেছিলেন (ফলস্বরূপ অধিকাংশ মুসলিম ভোট তাদের দিকে টেনে নিতেও সক্ষম হয়েছিলেন)। এই কংগ্রেসী এবং অ-কংগ্রেসী নেতাদের পরোক্ষ প্ররোচনাই বাংলা দেশে নতুন করে 'মুসলিম লীগের' জন্মের গোড়ার কথা। ১৯৬৮তে জন্ম নিয়েই ১৯৬৯ সালের উপনির্বাচনের আসরে নামলেন 'মুসলিম লীগ', বাছাই করা কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থী দিলেন এবং পুরোপুরি ধর্মীয় ভিত্তিতে ভোট চাইলেন। কংগ্রেস নামক সংকুচিত নির্বাচনে তাঁরা অন্ততঃ তিনটি কেন্দ্রে বাজিমাত করলেন। অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে জামানত বাজিয়ে গেলেন; আবদুস সাত্তার, ইনি মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস আসন হারালেন একটি নবাগত দলের কাছে। সেই তিনটি আসন পাওয়া প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লীগ এবার ইণ্ডিয়ান মুসলিম লীগের সঙ্গে মিশেছে। বর্তমানে হয়েছে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ।

কিন্তু লীগ নেতারা নিম্নলিখিত ফলাফলগুলির কথা একবারও ভেবে দেখেছেন কি? প্রথমত, মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার ফলে অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি হবে এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত কম মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানরা অসুবিধেয় পড়বে এবং কোন প্রদেশেই এই দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তৃতীয়ত, সাম্প্রদায়িক হিন্দু বা অন্যান্য দলের সঙ্গে সংঘাতের আশঙ্কা থাকবে। চতুর্থত, ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নষ্ট হবে এবং যার ফলে ক্ষতি হবে সংখ্যালঘু মুসলমানদেরই।

এবার অন্যান্য দল প্রসঙ্গে আসা যাক। যারা নিজেদের দারুণ লিবারেল বলে মনে করে সেই সি পি আই কেরালায় লীগের দোসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই পরিচালিত অন্তর্বাম জোট লীগের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী। কোথায় নেতাজীর ধর্মনিরপেক্ষ ফরোয়ার্ড ব্লক, কোথায় সাচ্চা মার্কসিস্ট শিবদাসবাবুর এস ইউ সি? অথচ অন্তর্বামে মহম্মদ ইলিয়াস, ডাঃ গনি, কলিমুদ্দিন শামস, মোকসেদ আলি আছেন। সি পি এম এর মধ্যবাম আর নব কংগ্রেস তো টাগ-অব-ওয়ার করলেন বদরুদ্দোজা সাহেবকে নিয়ে। সি পি এমে মুজফফর আহমেদ, আবদুল্লাহ রসুল আছেন তবুও তাঁদের বদরুদ্দোজাকে চাই। নব কংগ্রেসে আছেন ইশাক, সাত্তার, জয়নাল আবেদিন তবু কাসেম আলি মীরজাকে চাই। উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

নবারুণবাবুর কথা দিয়েই শেষ করি— 'হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান নয়—মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখা উচিত। ...তা না করে ভোটলোভাতুর রাজনৈতিক দলগুলি যতই সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে ভোট সংগ্রহ করতে যাবেন ততই রাজ্যের এবং রাজ্যের অধিবাসীদের বিপদ ডেকে আনবেন।' কোন উগ্র হিন্দু রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক কিংবা ফ্যাসিবাদী দলের উত্থান হলে তার দায়িত্ব বর্তমান নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করতে পারবেন না।

গৌতম নিয়োগী
খড়গপুর

মিস জুলিয়া খাতুন
আলিপুর

বিনোদন সংখ্যা

১৩৭৭-এর বিনোদন সংখ্যায় আমার আরাধ্যা এবং ছোটবেলার দেবী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা আঙ্গুরবালা দেবীর লেখা আজ পড়লাম। কী যে ভালো লাগলো বোঝাতে পারছি না। শ্রীযুক্তা আঙ্গুরবালা দেবীর ৬২ বছর বয়সের লেখা আমার কাছে যেন নতুন ভাবে তাঁকে দেখার সুযোগ করে দিল।

ছেলেবেলায় প্রথম যখন আমাদের বাসায় গ্রামোফোন এলো সঙ্গে সঙ্গে বাবা একটা 'রেকর্ড সঙ্গীত' কিনে দিলেন। প্রথম পৃষ্ঠাতেই শ্রীযুক্তা আঙ্গুরবালার ছবি আর তাঁরই প্রথম রেকর্ড 'রাধিকা তরীখানি' অপর পৃষ্ঠায় 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।' বাবার কাছেই শুনেছি ওটাই আঙ্গুরবালার প্রথম রেকর্ড। আজকের লেখায় জেনে নিলাম কীভাবে প্রথম রেকর্ড করা হলো। আমাদের আরও অনেক গায়কের রেকর্ড কেনা হয়েছিল, অনেকের গান শুনেছি, কিন্তু কেন জানিনে যখনই আঙ্গুরবালার রেকর্ড বাজানো হতো কাছে গিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুলে একমনে গান শুনেছি।

রেকর্ড সঙ্গীতে ওঁর দাঁড়ানো চেহারা কী যে ভালো লাগত আমার। তখন আমি বেশ ছোট এবং বোকা বোকা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমনি করে চুলটা কুঁচকে কুঁচকে আঁচড়ে কপালে নামিয়ে নিতাম। দশ হাত কাপড় কোনরকমে জড়িয়ে মাকে এসে বলতাম, "মা, দেখ, আমি আঙ্গুরবালা হয়েছি।"

আমার আরাধ্যা যাঁকে আমি এত ভালবাসার ডালি উজাড় করে দিয়ে এসেছি উনি কিন্তু জানতেও পারেননি একটি ছোট্ট মেয়ে (এখন ছোট নই) আসামের এক কোণে বসে প্রতিদিন তাঁকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে চলেছে। আজ এই মুহূর্তে অর্থাৎ যখন আমিও রোগশয্যায় শুয়ে তখন এই লেখার মাধ্যমে আমার আরাধ্যাকে খুঁজে পেলাম। এখান থেকেই তাঁকে প্রণাম জানাই।

মীনাক্ষী মজুমদার
মধ্যমগ্রাম

'হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে'

দেশে প্রকাশিত শ্রীতরুণ দত্তের 'হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে তোমাকে চিঠি, অরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। কিছু দিন আগে শ্রীনন্দের 'বিপ্লব এসে গেল?' শীর্ষক

প্রবন্ধটি পড়েছি। সন্দেহ নেই দুটি রচনাই বর্তমান সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। যে বা যে-সমস্ত ism বর্তমান তরুণসমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যার অবশ্যম্ভাবী ফল এই নারকীয় হত্যা-কাণ্ড, সেই বা সেই-সমস্ত ism-এর প্রকৃত স্বরূপের বিশ্লেষণ, (সম্পূর্ণ না হলেও) সেই মতবাদে অনুপ্রাণিত তরুণদের শোচনীয় অবস্থা ও শেষ পরিণতি অনেকাংশে খাঁটি। কিন্তু প্রবন্ধটিতে তিনি এ সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে যে নির্বাচনের পথ দেখিয়েছেন সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে।

যে দেশে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটা-ধিকার স্বীকৃত, অথচ যে প্রাপ্তবয়স্কের একটা বিরাট অংশ নিরক্ষর, রাজনীতি তথা সমাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, পার্টি নেতাদের উপদেশ আদেশ অনুরোধ প্রলোভন এমন কি প্রাণভয়ের ফলে ভোট ক্রয়-বিক্রয় হয়, সে দেশে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা যথার্থ ব্যক্তির নির্বাচন কিরূপে সম্ভব? বিশেষত যে দেশের অধিকাংশ অনশনে বা অর্ধাশনে দিন কাটায় তাদের কাছে ভবিষ্যতের সুখশান্তির প্রতি-শ্রুতি অপেক্ষা বর্তমানের সামান্য অর্থের প্রলোভন অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য—যার সুযোগ নিয়ে এতদিন শাসনতন্ত্রের শীর্ষে বিরাজ করেছে ধনবান আমলাতন্ত্র। সুতরাং যে দেশে নির্বাচনের নামে এত ভাঁড়ামি ও মিথ্যা চলে সে ক্ষেত্রে 'ভোটে জিতে, সংবিধান বদলে আমলা তাড়িয়ে নিজেদের ইচ্ছামত সরকার কায়েম' কি উপায়ে সম্ভব?

মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
কানপুর

'একটি কবিতা ও সিংহরাজ'

২ জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত সোমনাথ রায়ের 'একটি কবিতা ও সিংহরাজ' প্রবন্ধটির জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। 'ভারত সংগীত' কবিতাটিকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আজ পর্যন্ত জানা ছিল না যদিও হেমচন্দ্র সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে 'যবন' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে লেখকের অভিমত বিশেষ মূল্যবান। প্রবন্ধটির নাম-করণে 'সিংহরাজ' শব্দটি প্রয়োগ অত্যাবশ্যক ছিল কি?

১৪ নভেম্বর সংখ্যায় 'ডায়েরীর ছেঁড়া পাতায়' ফাদার দ্যতিয়েন 'লা ফোঁতেন ও মধুসূদন' সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা স্বর্গত বরেণ্য কথাসাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী করেছিলেন (দ্রঃ সতীনাথ-বিচিত্রা)। শ্রদ্ধেয় ফাদার দ্যতিয়েনের কাছে আমাদের সানন্দ ঋণের শেষ নেই। অনুগ্রহ করে তিনি যদি উপর্যুক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃততর একটি আলোচনা প্রকাশ করেন তবে বিশেষ আনন্দিত হই।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
নিউ দিল্লী-৫

প্রাচীন বাংলা গান ও ভবিষ্যৎ

শার্ঙ্গদেবের উক্ত প্রবন্ধটি পড়ে তাঁকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারলাম না। প্রাচীন বাংলা গান বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সংগীত-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার সুপরিকল্পনা সত্যই প্রশংসাযোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতির পরি-প্রেক্ষিতে মানুষের রুচির বিকারও যে ঘটছে বা ঘটবে—এ কথা নিঃসন্দেহে অনুমেয়, তাই বাংলা গানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সঙ্গীত-পিপাসুরা কামনা করেন। কেননা, সঙ্গীতও বাংলা দেশের কৃষ্টির একমাত্র পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় সম্পর্কে শার্ঙ্গ-দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গীতসম্রাটের জীবনা-লেখ্যও প্রয়োজন, যেমনটি আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখি।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
আমতা, হাওড়া

লেনিনের চোখে সাহিত্য

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি-প্রতিভা সন্দেহাতীত এবং এর প্রমাণ তিনি রেখেছেন তাঁর প্রবন্ধে 'লেনিনের চোখে সাহিত্য'। তাঁর উক্তি "আর মানব সভ্যতার ইতিহাসে? শেষ কথার পরের কথাই তো মার্কসবাদ।" তাঁর যে কোনো কবিতায় স্থান পেতে পারতো, এমনই অসীম অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা উক্তিটির। যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধকারের পক্ষে এমন ভাববাদী উক্তি করা সত্যিই কষ্টকর, আর প্রবন্ধকার যদি আবার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাস করেন তবে তাঁর পক্ষে এমন স্বভাববিরোধী সিদ্ধান্তে টানা স্বপ্নেও অভাবনীয়। মার্কস-বাদের দৃষ্টিতে সাহিত্য বিচারে শেষ কথা বলে কিছু নেই। কিন্তু সাহিত্য কেন, গোটা সামাজিক ব্যাপারেই মার্কসবাদ শেষ কথা বলে কিছু মানে না। কেবলমাত্র ভববাদীরাই শেষ কথা জানে বলে আত্মতৃপ্ত থাকে। দ্বান্দ্বিক নিয়মে ইতিহাস এগোয়, এগোবে, কোথায় এর শেষ তা আগে থেকে জানা যাবে কি করে? মার্কস যে 'কম্যুনিস্ট' সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটাও ইতিহাসের শেষ অবস্থা নয়। দুঃখের বিষয়, এসব প্রশ্নের গভীরে না গিয়ে সুভাষবাবু বললেন, 'শেষ কথার পরের কথাই যে মার্কসবাদ'। কি এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছি।

লেনিনের সাহিত্য সম্পর্কিত কতক-গুলো সুপরিচিত উক্তি উদ্ধৃত করে লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন লেনিনের 'দৃষ্টি কত উদার ছিল'। লেখকের কাছে প্রশ্ন?—হঠাৎ লেনিনের উদারতার ওপর এতটা জোর দিলেন তিনি কি প্রয়োজনে? লেনিন সম্বন্ধে 'সাদাসিধে ভালো মানুষের' (লেখকের ব্যবহৃত ভাষা) ভয় দূর করার জন্য? কারা এই সাদাসিধে ভালো মানুষ? কি তাদের শ্রেণীচরিত্র? লেখক আশ্চর্য-জনকভাবে নীরব। লেখক প্রসঙ্গ থেকে লেনিনের উক্তিকে আলাদাভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখার বিরোধী। কিন্তু এমন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেই তিনি লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থেকে—কে না জানে, লেনিন একবার বলেছিলেন ইঃ। কবে কি উপলক্ষে বলে-ছিলেন তা তিনি বললেন না, এমন কি বিখ্যাত প্রবন্ধটির নামটি কি তাও উল্লেখ করলেন না। বুর্জোয়া সংস্কৃতির কতটুকু লেনিন বজায় রাখতে চেয়েছিলেন তা বলেছেন লেখক, কিন্তু প্রলেতারীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কি এবং এ বিষয়ে ট্রট্স্কির সঙ্গে লেনিনের মতপার্থক্য কোথায় এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন তিনি। বস্তুত, লেনিনের সাহিত্য চিন্তার তত্ত্বগত আলোচনা করা মোটেই কষ্টসাধ্য কাজ নয়, গোলমাল বাধে কখন কোন্ পরিস্থিতিতে লেনিনের কোন্ উক্তি প্রযোজ্য তাই নিয়ে এবং সুভাষবাবু সেই কঠিন কাজটাকে খুব সহজে পাশ কাটিয়ে গেছেন। তত্ত্ব আর বাস্তবের এই দ্বান্দ্বিক নিয়মকে তাঁর অবহেলা করাটা দুঃখকর।

সুভাষবাবুর প্রবন্ধ পড়ে ধারণা হয় যে আজকের সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের একটি প্রধান সংকট হল ওপর থেকে চাপানো নিয়ম কানুন। কথাটা অনস্বীকার্য, কিন্তু এই কারণে লেনিনকে খুব বেশী উদার বানাবার প্রয়োজন আছে কি? আর একটি সংকট লেখকের চোখ এড়িয়ে গেল কেন? পোলিশ ও চেক চলচ্চিত্রে যে ব্যক্তিতান্ত্রিক উদারতা দেখা যায় তা কি তিনি সংকট বলে মানেন না? লেনিন কবে কি বলেছিলেন তা অনেকেরই জানা কিন্তু আজকের পরি-স্থিতিতে তাঁর কোন্ মতটি উপযুক্ত সেটা বিচার করাই আসল কাজ। তবেই পাস্টার-ন্যাক থেকে সোলঝেনিৎসিনের মূল্যায়ন সম্ভব। সুভাষবাবুর প্রবন্ধ এই মূল্যায়নের দিক নির্দেশ করবার কোনো দায়িত্ব নেয়নি। ফলে তাঁর প্রবন্ধ সুখপাঠ্য রিপোর্টের মত। কিছু তথ্য উপহার দেয় বটে কিন্তু সাহিত্য বিচারে কোনো নির্ভরযোগ্য লেনিনবাদী মানদণ্ড আমাদের হাতে তুলে দিতে ব্যর্থ হয়।

দীপেন্দু চক্রবর্তী
অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অজিত দত্তের নতুন বই

প্রবীণ কবি অজিত দত্তের নতুন কবিতার বই অনেকদিন বাদে বেরুলো। সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কল্লোল যুগের কবি লেখকরা যখন প্রথম বাংলা সাহিত্যকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময়েই অজিত দত্ত, সেই দলের অন্যতম কবি হয়েও বিশুদ্ধ রোমান্টিক রসের কবিতায় আলাদা স্থান করে নিয়েছিলেন নিজের। সেই সঙ্গে সরস রঙ্গ বিদ্রূপের ছড়া ও হালকা কবিতাও লিখেছিলেন কিছু, সেগুলো আজও ভুলবার নয়।

কয়েক বছর ধরে অজিত দত্তের কবিতার সাড়া খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাঁর এই নতুন বই, 'শাদা মেঘ কালো পাহাড়' হাতে পেয়ে বেশ ভালো লাগে।

তাঁর এই বইয়ের কবিতাগুলোতে দেখা যায়, শব্দ বা ছন্দের কারুকার্যের বদলে সরলভাবে অন্তরের কথা বলার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। কয়েকটি কবিতা প্রায় বর্ণনামূলক, ভঙ্গিটা কবিতার বদলে গদ্যের বেশী কাছাকাছি। এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কম বয়েসে শব্দের রহস্য ও মায়াপাশ কবিকে মুগ্ধ করে রাখে, বহু কোণ থেকে এক একটা শব্দকেই ইচ্ছে করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজাতে। এতেও কাব্যরসের সমৃদ্ধিই ঘটে; কিন্তু বয়েস বাড়লে কবির মনে অনেক কথা জমে যায়, তিনি চান যেরকম করে হোক তাঁর কথাগুলো পাঠকদের শুনিয়ে দিতে। বক্তব্য যেখানে অনেক বেশী জরুরী, সেখানে ভাষা-সৌকর্যের দিকে মন দেবার সময় থাকে না, ভাষা সেখানে সরল ও দ্রুতগতি হতে বাধ্য। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রায় সব কবিই প্রবীণ বয়েসে পৌঁছে গেলে, তাঁদের কবিতায় কাব্যরসের বদলে বক্তব্যের প্রাধান্য দেখা দেয়।

তবে যিনি দীর্ঘকাল কাব্যসাধনা করে এসেছেন, তাঁর সরল বর্ণনাভঙ্গিও এক হিসেবে কবিতারই অঙ্গ হয়ে ওঠে। শব্দ নিয়ে একবার যিনি মাথা ঘামিয়েছেন তাঁর পক্ষে আর কিছুতেই অবান্তর বা কু শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে নিরাভরণ সত্যের যে স্বাদ আছে, তা পাঠককে নিশ্চিত আবিষ্ট করবে। কয়েকটি প্রেমের কবিতা আছে, সেগুলিরও স্বাদ ছটফটে অতৃপ্তির নয়, প্রগাঢ় উপলব্ধির। 'কালো পাহাড়' কবিতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করি :

এ-অন্ধকারে এসো না
কারণ এ-অন্ধকারের বায়ু তোমার
নাসিকার ঘ্রাণ কেড়ে নেবে,
তুমি ফুলের সৌরভ পাবে না

এ অন্ধকারের বর্ষণ তোমার মুখের
স্বাদ ধুয়ে নেবে,
শুধু তৃষ্ণা ছাড়া তোমার জিহ্বায়
আর কিছুই থাকবে না।
তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের
মতো সর্বব্যাপী কৃষ্ণতা।

রূপাম্বরা

স্বদেশ ভারতী কলকাতা থেকে ইংরেজিতে রূপাম্বরা নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বার করেন। পত্রিকাটির একটি বিশেষ গুণ, প্রায় নিয়মিত বেরোয়। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা রচনার ইংরিজি অনুবাদে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই সংখ্যায় আছে বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া ও তামিল ভাষার কিছু কবিতা। সেই সঙ্গে ভিয়েৎনামের কিছু সাম্প্রতিক কবিতাও সংকলিত হয়েছে, সেগুলি পড়লে গভীর দুঃখের অনুভূতি জাগে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত **উদর্ক** একটি বিশেষ সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদনা করেছেন পুণ্ডমিত্র। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ভূদেব চৌধুরী, হরপ্রসাদ মিত্র, পঞ্চানন মণ্ডল, সোমজিৎ দাস, গৌরী ভট্টাচার্য, পান্নালাল দাশগুপ্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শান্তিদেব ঘোষ, ধ্রুবজ্যোতি ভৌমিক প্রমুখ। এ ছাড়া কিছু কবিতা ও গল্প। দু একটি প্রবন্ধে দেখা যায় আধুনিক সাহিত্যকে খুব এক হাত নেওয়া হয়েছে। মোটামুটি বক্তব্য এই, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু এখন সেরকম রচনার আর রেওয়াজ নেই, এখনকার লেখা গভীর কিংবা সামাজিক দায়িত্ব নিতে অক্ষম। কিন্তু একটা খুব সহজ কথা প্রবন্ধ লেখকরা এড়িয়ে গেছেন, এক সঙ্গে একটা গোটা জেনারেশনের সাহিত্য খারাপ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। লেখকদের কোনো দল নেই, তারা পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করে একই রকম লেখা প্রচারের দায়িত্ব নেন না। সাহিত্য তার নিজস্ব গতিতে ঠিক এগিয়ে যায়। অনেক সময় সমকালের সাহিত্যকে ঠিক চেনা যায় না অথবা বিচারে ভুল হয়। টি এস এলিয়ট একটা খুব সার কথা বলেছিলেন, "Every generation gets the Literature it deserves."

সুকোমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত **'কবিতা সাম্প্রতিক'** একটি উল্লেখযোগ্য কবিতার পত্রিকা। বাঁধন ছেঁড়া নবীন কবিদের রচনার স্বাদ পেতে গেলে **এইসব** পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় একটি অনুধাবনযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন।

প্রিতম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত **উলুখড়ও** একটি ভালো কাব্য পত্রিকা। সরাসরি কবিতা, গল্প ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা থাকে, আর কোনো ঝুটঝামেলায় এঁদের মতি নেই। এ সংখ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিষয়ক একটি আলোচনা আছে, তা ছাড়া গণেশ পাইনের ছবি সম্পর্কে প্রবন্ধ, অ্যাবসার্ড নাটক বিষয়ে মন্তব্য। কালীকৃষ্ণ গুহ, অরুণ বসু, দেবারতি মিত্র, অজয় সেন, অশোক দত্তচৌধুরী, অরুণেশ ঘোষ, ত্রিদিব মিত্র, অরণি বসুর কবিতা। প্রথমে ইংরেজি শিরোনামায় একটি নতুন মেনিফেস্টোতে অনেক গরম গরম কথা আছে—তরুণ বয়সে যে-রকম মানায়।

লালগোলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে **পদ্মা**: সম্পাদক সুশান্ত বাগচী। মলাটে নদী ও নৌকোর ছবি, রচনাগুলিতেও পদ্মা-পারের পশ্চিম বাংলার কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়। লিখেছেন আনন্দ বাগচী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, স্বপন ভাদুড়ী, প্রলয় সাহা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, নীরেন সরকার, অভিজিৎ দত্ত, বাণী বাগচী, সুদীপ্তা চৌধুরী প্রভৃতি।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

কাচের দরোজা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

এই উপন্যাসটি সদ্য পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ পর্বে লেখা। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে এটি লেখা যদিও এটির প্রকাশ মাস তিনেক আগে। উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে নতুন টেকনিকে তিনি যে দুচারখানি উপন্যাস লিখছিলেন 'কাচের দরোজা' সেগুলির মধ্যে অন্যতম। পাতাল কন্যা, নির্জন শিখর, তৃতীয় নয়ন, সন্ধ্যার সুর এবং কাচের দরোজা অনেকটা একই কৌশল-ধারার উপন্যাস। বিশেষ করে 'তৃতীয় নয়ন' এবং 'কাচের দরোজা' বই দুটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইনট্রোভার্ট চরিত্রের আমদানি এবং স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে যুগযন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, বিষণ্ণতা ফোটাবার চেষ্টা আছে।

কাচের দরোজার কালসীমা কয়েক ঘণ্টার। স্ত্রীর একটি চিঠি পড়ে স্বামী প্রবাল দত্ত রায় এবং তার বন্ধু নিত্যানন্দ সোম (যে স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত) আত্মচিন্তায় মগ্ন। এই আত্মচিন্তা কিছুটা সরব 'সলিলকি' ধরনের। দুই বন্ধুর মধ্যে চিন্তার বিনিময় চলেছে, মতপার্থক্য ঘটেছে, উভয়ের পৃথক পৃথক জীবন দৃষ্টির সংঘাত চলেছে আর কথোপকথনের আড়ালে 'মনতাজ'-এর মতো পূর্ব ঘটনাও কিছু কিছু এসে পড়ে নাটকীয় সাসপেন্সও সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তার কারণ অন্বেষণে প্রবাল এবং তার বন্ধু দুজনেই ব্যস্ত। নানা বিপর্যস্ত মূল্য এবং অন্য মহিলার সংসর্গ-ইতিহাস (যেগুলি টুকরো ছবির মতো মনতাজ রীতিতে বলা) তাকে ভাবিয়েছে, তেমনি তার বন্ধু সোমকেও ভাবিয়েছে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি তাকেও অপরাধবোধে দগ্ধ করেছে। কথাবার্তা প্রবাল এবং নিত্যানন্দ দুজনেই তাদের পূর্বেকার নারী সংসর্গের কথা স্বীকারোক্তির মতো বলে ফেলেছে। একটা সত্যকেই সেই স্বীকারোক্তিতে পাওয়া গেছে, প্রবালের স্ত্রীর চলে যাওয়ায় আয়নায় তারা দুজনে নিজেদের মুখ দেখে নিতে চায়। উপন্যাসের শেষে দেখা গেল যে স্ত্রীর যে চিঠিটি নিয়ে এতো বিপর্যয়কারী অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের চিন্তা সে চিঠিটি এখনকার লেখা নয়, বিয়ের বছর দুয়েক আগে কলহের আবেগে রোমান্টিক মৃত্যু-ইচ্ছার ফলশ্রুতি। আলমারির থেকে অন্য কিছুর সঙ্গে বেরিয়ে মাটিতে পড়েছে সেটি এবং ঝি সেটিকে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে গেছে। তখন পূর্বেকার সমস্ত আলোচনা তর্ক চিন্তাকে নিজেদেরই বিকৃত ছায়ার অনুসরণের মতো অর্থহীন ও হাস্যকর ঠেকেছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবাল ও নিত্যানন্দ যে মানসিক সঙ্কটকে সিগ্রেটের ধোঁয়ার জালে জটিল করে ফেলেছিল, এক একস্ট্রোভার্ট চরিত্র (প্রবালের মামা, যিনি বিপর্যস্ত চিন্তা বা অপরাধবোধের শিকার নন, আদর্শবাদী সাংগঠনিক রাজনীতি করা এক একস্ট্রোভার্ট মানুষ, যাঁর দাম্পত্যজীবন অভিন্ন আদর্শে সুস্থ ও সমন্বিত) এসে ধোঁয়ার উৎস ছাইদানে জল ঢেলে দিয়েছেন। দুশ্চিন্তার প্রতীক যে ধোঁয়ার জটিলতা তার উৎসে জল ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারটি যেমন প্রতীকী, তেমনি চিঠির পূর্বকালীনত্বের প্রমাণেও সেই অসুস্থতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত আছে। মামার আদর্শবাদী সংগঠনমূলক জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার ইচ্ছেও প্রবালের মুখে প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের শেষে : 'আমাদের যেতেই হবে মামা [তোমার কাছে]। জীবনের একটা মানে কোথাও আমাদের পাওয়া দরকার।'

মামা অসীম সরকার চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখকের সুস্থ ভারসাম্যময় ব্যক্তি আদর্শের আভাস উপন্যাসটিকে মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

২৬৭।৭০

প্রবন্ধ

মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। সম্পাদনা—সেখ আজিজুর রহমান। পরিবেশক—ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী; চৌরঙ্গী, কলকাতা-১৩। দাম—৩৫ পয়সা।

ভারতে হিন্দু সমাজে হিন্দু মেয়েরা যেসব অধিকার পেয়েছে, মুসলিম, খৃস্টান, পার্শী, ইহুদী প্রভৃতি সমাজের মেয়েরাও যাতে সেইসব অধিকার পায়, সেজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা ও বিতর্ক চলেছে। বর্তমান গ্রন্থটি কেবল মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করেই। বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের অবসান, মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি কোন কোন মুসলিম দেশে কেমন আছে, মূল প্রবন্ধটিতে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের নূতন মুসলমান পরিবার আইনের বিভিন্ন ধারার বর্ণনা এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মুসলিম যুবক-যুবতীদের বিতর্কমূলক চিঠিগুলিও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

দেশ বিদেশের শিক্ষা। শ্রীজ্ঞানান্বেষী। শ্রীবিমানকুমার ঘোষ : পোঃ শ্যামসুন্দর, বর্ধমান। মূল্য ৪·০০।

লন্ডনে ফাল্গুনে। হিরন্ময় ভট্টাচার্য। সিগনেট প্রেস : ২৫।৪ একবালপুর রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য ৪·০০।

Pakistan Elections: Background and Perspective. Asit Bhattacharyya. Compass Publications: 14, Khudiram Bose Road, Calcutta. Price 1.50.

দুই নিঃশ্বাসের আয়নায়। সুধাংশু গুপ্ত। ভাবীকা পাবলিশার্স : ১১৬।সি বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য ২·০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কৃপাকথা। শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ বোধচক্র : সারদা ভবন, ৭।১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৬·০০।

প্রবাল। শ্রীমুন্সী। ডাঃ শিশিরকুমার সিংহ : বাঁকুড়া। মূল্য ৩·০০।

সাদা মেঘ/কালো পাহাড়। অজিত দত্ত। কিঅক্ষ পাবলিকেশনস : ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৪·০০।

মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদ। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী : ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

ভারতের গৌরব (১ম খণ্ড)। পাবলিকেশনস্ ডিভিশন : পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লি-১। মূল্য ৩·৫০।

শ্রীম দর্শন (সপ্তম ভাগ)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট : ৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড়। মূল্য ৮·০০।

আলোকিত মেঘ—প্রশান্ত দাস। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ১৭৩/৩ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·০০।

উপন্যাস

কাচের দরোজা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

এই উপন্যাসটি সদ্য পরলোকগত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ পর্বে লেখা। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে এটি লেখা যদিও এটির প্রকাশ মাস তিনেক আগে। উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে নতুন টেকনিকে তিনি যে দুচারখানি উপন্যাস লিখছিলেন 'কাচের দরোজা' সেগুলির মধ্যে অন্যতম। পাতাল কন্যা, নির্জন শিখর, তৃতীয় নয়ন, সন্ধ্যার সুর এবং কাচের দরোজা অনেকটা একই কৌশল-ধারার উপন্যাস। বিশেষ করে 'তৃতীয় নয়ন' এবং 'কাচের দরোজা' বই দুটির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইনট্রোভার্ট চরিত্রের আমদানি এবং স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে যুগযন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, বিষণ্ণতা ফোটাবার চেষ্টা আছে।

কাচের দরোজার কালসীমা কয়েক ঘণ্টার। স্ত্রীর একটি চিঠি পড়ে স্বামী প্রবাল দত্ত রায় এবং তার বন্ধু নিত্যানন্দ সোম (যে স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত) আত্মচিন্তায় মগ্ন। এই আত্মচিন্তা কিছুটা সরব 'সলিলাকি' ধরনের। দুই বন্ধুর মধ্যে চিন্তার বিনিময় চলেছে, মতপার্থক্য ঘটেছে, উভয়ের পৃথক পৃথক জীবন দৃষ্টির সংঘাত চলেছে আর কথোপকথনের আড়ালে 'মন্তাজ'-এর মতো পূর্ব ঘটনাও কিছু কিছু এসে পড়ে নাটকীয় সাসপেন্সও সৃষ্টি হয়েছে। কী কারণে স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তার কারণ অন্বেষণে প্রবাল এবং তার বন্ধু দুজনেই ব্যস্ত। নানা বিপর্যস্ত মূল্য এবং অন্য মহিলার সংসর্গ-ইতিহাস (যেগুলি টুকরো ছবির মতো মন্তাজ রীতিতে বলা) তাকে ভাবিয়েছে। তেমনি তার বন্ধু সোমকেও ভাবিয়েছে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি, তাকেও অপরাধবোধে দগ্ধ করেছে। কথা-বার্তা প্রবাল এবং নিত্যানন্দ দুজনেই তাদের পূর্বেকার নারী সংসর্গের কথা স্বীকারোক্তির মতো বলে ফেলেছে। একটা সত্যকেই সেই স্বীকারোক্তিতে পাওয়া গেছে, প্রবালের স্ত্রীর চলে যাওয়ায় আয়নায় তারা দুজনে নিজে-দের মুখ দেখে নিতে চায়। উপন্যাসের শেষে দেখা গেল যে স্ত্রীর যে চিঠিটি নিয়ে এতো বিপর্যয়কারী অস্তিত্ব-অন্বেষণের চিন্তা সে চিঠিটি এখনকার লেখা নয়, বিয়ের বছর দুয়েক আগে কলহের আবেগে রোমান্টিক মৃত্যু-ইচ্ছার ফলশ্রুতি। আলমারি থেকে অন্য কিছুর সঙ্গে বেরিয়ে মাটিতে পড়েছে সেটি এবং ঝি সেটিকে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে গেছে। তখন পূর্বেকার সমস্ত আলোচনা তর্ক চিন্তাকে নিজেদেরই বিকৃত ছায়ার অনুসরণের মতো অর্থহীন ও হাস্যকর ঠেকেছে। এই মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবাল ও নিত্যানন্দ যে মানসিক সঙ্কটকে সিগ্রেটের ধোঁয়ার জালে জটিল করে ফেলেছিল, এক একস্ট্রোভার্ট চরিত্র (প্রবালের মামা, যিনি বিপর্যস্ত চিন্তা বা অপরাধবোধের শিকার নন, আদর্শবাদী সাংগঠনিক রাজনীতি করা এক একস্-ট্রোভার্ট মানুষ, যাঁর দাম্পত্যজীবন অভিন্ন আদর্শে সুস্থ ও সমন্বিত) এসে ধোঁয়ার উৎস ছাইদানে জল ঢেলে দিয়েছেন। দুশ্চিন্তার প্রতীক যে ধোঁয়ার জটিলতা তার উৎসে জল ঢেলে দেওয়ার ব্যাপারটা যেমন প্রতীকী, তেমনি চিঠির পূর্ব-কালীনত্বের প্রমাণেও সেই অসুস্থতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত আছে। মামার আদর্শবাদী সংগঠনমূলক জীবন-যাত্রার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার ইচ্ছেও প্রবালের মুখে প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের শেষে : 'আমাদের যেতেই হবে মামা [তোমার কাছে]। জীবনের একটা মানে কোথাও আমাদের পাওয়া দরকার।'

মামা অসীম সরকার চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখকের সুস্থ ভারসাম্যময় ব্যক্তিত্ব আদর্শের আভাস উপন্যাসটিকে মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। ২৬।৭।৭০

প্রবন্ধ

মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। সম্পাদনা—সেখ আজিজুর রহমান। পরিবেশক—ফরেন পাবলিশার্স এজেন্সী; চৌরঙ্গী, কলকাতা-১৩। দাম—৩৫ পয়সা।

ভারতে হিন্দু সমাজে হিন্দু মেয়েরা যেসব অধিকার পেয়েছে, মুসলিম, খৃস্টান, পার্শী, ইহুদী প্রভৃতি সমাজের মেয়েরাও যাতে সেইসব অধিকার পায়, সেজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা ও বিতর্ক চলেছে। বর্তমান গ্রন্থটি কেবল মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করেই। বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের অবসান, মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি কোন কোন মুসলিম দেশে কেমন আছে, মূল প্রবন্ধটিতে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের নূতন মুসলমান পরিবার আইনের বিভিন্ন ধারার বর্ণনা এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত মুসলিম যুবক-যুবতীদের বিতর্কমূলক চিঠিগুলিও এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

প্রাপ্ত স্বীকার

দেশ বিদেশের শিক্ষা। শ্রীজ্ঞানান্বেষী। শ্রী[illegible] ঘোষ : পোঃ শ্যামসুন্দর, বর্ধমান। মূল্য ৪·০০।

লণ্ডনে ফাল্গুন। [illegible] চট্টোপাধ্যায়। সিগনেট প্রেস : ২৫।৪ একবালপুর রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য ৪·০০।

Pakistan Elections : Background and Perspective. Asit Bhattacharyya. Compass Publications : 14, Khudiram Bose Road, Calcutta. Price 1.50.

দুই নিঃশ্বাসের মোহনায়। সুধাংশু গুপ্ত। ভাবীকা পাবলিশার্স : ১১৬।সি বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য ২·০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জগতের কৃপাকথা। শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ বোধচক্র : সারদা ভবন, ৭।১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৬·০০।

প্রবাল। শ্রীমুন্সী। ডাঃ শিশিরকুমার সিংহ : বাঁকুড়া। মূল্য ৩·০০।

সাদা মেঘ/কালো পাহাড়। অজিত দত্ত। কিঅস্ক পাবলিকেশনস : ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৪·০০।

মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদ। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী : ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

ভারতের গৌরব (১ম খণ্ড)। পাবলিকেশনস্ ডিভিশন : পাতিয়ালা হাউস, নিউ দিল্লি-১। মূল্য ৩·৫০।।

শ্রীম দর্শন (সপ্তম ভাগ)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট : ৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চণ্ডীগড়। মূল্য ৮·০০।

আলোকিত মেঘ—প্রশান্ত দাস। ডি লাইট বুক কোম্পানী : ১৭৩/৩ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ২·০০।

ডুরাণ্ড কাপের ফাইনাল খেলায় চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ২--০ গোলে পরাজিত করে ইস্টবেঙ্গল এ মরসুমে তিনটি বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা জয় করেছে। লীগ ও আই এফ এ শীল্ড জয় করে তারা আগেই কলকাতা ফুটবলের 'ডাবল' পেয়েছিল। এবার পেল 'ট্রিপল'।

ট্রিপল ক্রাউন কার?

এখন কথা উঠেছে এই কৃতিত্ব ভারতীয় ফুটবলের 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর সম্মান কি না। ১৯৪৯ সালে লীগ ও আই এফ এ শীল্ডের সঙ্গে যেবার ইস্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ জয় করে (সে বছর ডুরাণ্ডের খেলা বন্ধ ছিল) সেবার ইস্টবেঙ্গলকে 'ট্রিপল ক্রাউন' বিজয়ী বলেই ঘোষণা করা হয়। তারপর কথা ওঠে—না, স্থানীয় লীগ প্রতিযোগিতা জয়ের সঙ্গে সর্বভারতের দুটি প্রতিযোগিতা জয়ের সংবাদে 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর সম্মান হতে পারে না। সর্বভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতা অর্থাৎ আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ এবং ডুরাণ্ড কাপ জয়ই প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর সম্মান।

বলা বাহুল্য, 'ট্রিপল ক্রাউন' বা 'ডাবল' ফুটবলের সাংবিধানিক স্বীকৃত সম্মান নয়। অলিখিত সম্মান, পত্র-পত্রিকা এবং ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের স্বীকৃতিতেই এই সম্মানের স্বীকৃতি। ১৯৪৯ সালেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং ক্রীড়ামোদীরা ইস্টবেঙ্গলকে ত্রি-মুকুট বিজয়ী দল বলে মেনে নিয়েছিল। তার আগে ভারতীয় ফুটবলে প্রথম ত্রি-মুকুট বিজয়ী দল হিসাবে মেনে নিয়েছিল মহমেডান স্পোর্টিংকে ১৯৪০ সালে। সে বছর কলকাতার ফুটবল লীগ জয়ের সঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিং রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপও জয় করেছিল। যাই হোক, মহমেডান স্পোর্টিং একবার এবং ইস্টবেঙ্গল দুইবার তিনটি বড় প্রতিযোগীতা জয় করলেও ভারতের কোনো দল এখন পর্যন্ত তথাকথিত সত্যিকারের 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর অধিকার হতে পারেনি। ১৯৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গলই প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভের খুব কাছাকাছি এসেছিল। তারা ডুরাণ্ড ও রোভার্স পেয়েছিল। আই এফ এ শীল্ড ফাইনালেও মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা একদিন অমীমাংসিত থাকার পর আর খেলা হয়নি। যাই হোক, এ মরসুমেও কোনো ক্লাব প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর অধিকারী হতে না পারলেও অনেকবারের মত কলকাতার ফুটবল এবারও প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর অধিকারী হয়েছে। কেননা, ইস্টবেঙ্গল জিতেছে আই এফ এ শীল্ড ও ডুরাণ্ড কাপ মোহনবাগান জিতেছে রোভার্স কাপ। এ থেকে এই কথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষে এবং ইস্টবেঙ্গল এ বছরে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সংহতিপূর্ণ দল। রোভার্স কাপের সেমি-ফাইনালে অবশ্য হারউড লীগ চ্যাম্পিয়ন মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রর কাছে ইস্টবেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। সে হারের ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের একটু দুর্ভাগ্যও জড়িত ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল হার স্বীকার করলেও রোভার্সে কলকাতার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে মোহনবাগান ফাইনালে মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্রকে পরাজিত করে।

ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার পর ফুটবল উৎসাহীদের আনন্দের অভিব্যক্তি। তারা খেলোয়াড়দের ঘিরে ধরেছেন, কাপ নিয়ে নাচানাচি করছেন। বাঁদিকে অধিনায়ক শান্ত মিত্রের মুখ দেখা যাচ্ছে

ডুরাণ্ডেও কলকাতার প্রাধান্য

ইস্টবেঙ্গলের ডুরাণ্ড জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার তো বটেই, ডুরাণ্ডে কলকাতা ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। কেননা, সেমি-ফাইনালেই খেলেছে কলকাতার তিনটি দল।

মোহনবাগান প্রথম খেলায় দিল্লীর প্রথম ডিভিসন টিম মডার্নাইটসকে ৫—০ গোলে, পরের খেলায় বাঙ্গালোরের এল আর ডি ইকে ২—১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে ২—১ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিংকে ০—০ ও ৩—০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। অপর দিক থেকে ফাইনালে ওঠে ইস্টবেঙ্গল রাজস্থানের আর্মড কনস্ট্যুবলারিকে ৩—২ গোলে, মীরাটের শিখ রেজিমেন্টাল সেন্টারকে ৪—২ গোলে এবং সেমি-ফাইনালে বোম্বে ই-এর মফতলাল গ্রুপ অব মিলসকে ০—০ ও ১—০ গোলে পরাজিত করে। ৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লীর দর্শক ঠাসা কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলায় মোহনবাগানকে ২—০ গোলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি এবং ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল এস এইচ এফ জে ম্যানেকশ-র সঙ্গে ডুরান্ড বিজয়ী ইস্ট বেঙ্গল দল

মোহনবাগান ফাইনালে মোটেই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। অপর দিকে, পারস্পরিক যোগাযোগ, দৃঢ়তা এবং উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয়ে ইস্টবেঙ্গল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। খেলার ধারা অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গল আরও বেশী গোলেও জিততে পারত।

খেলাটিকে হাবিবের ম্যাচ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, হাবিব প্রতি অর্ধে একটি করে গোল করে জয়ের কাণ্ডারী তো হয়েছেনই, অনবদ্য ক্রীড়াধারায় দর্শকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অবশ্য হাবিবের সঙ্গে পুরোভাগে সমানভাবে তাল রেখে খেলেছেন স্বপন সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা ও অশোক চ্যাটার্জী, রক্ষণভাগে নাইম, সুনীল ভট্টাচার্য ও কাজল মুখার্জী।

মোহনবাগানের সামনেও যে গোলের সুযোগ আসেনি, এমন নয়। তবে ইস্ট-বেঙ্গলের তুলনায় সংখ্যায় ছিল অনেক কম এবং আক্রমণেও তেমন ধার ছিল না।

মোহনবাগান এর আগেই ৬বার ডুরান্ড জয় করেছে। তবে দুই দলেরই আছে একবার করে যুগ্ম জয়ের সম্মান। সেটা ১৯৬০ সালের কথা। ফাইনালে খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর দুই দলকে সে বছর যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ওইবছর ছাড়া মোহনবাগান ও ইস্ট-বেঙ্গল আর দু'বার ডুরান্ড ফাইনালে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ১৯৬১ সালে মোহন-বাগান ২—০ গোলে বিজয়ী হয়। এবার একই ফলাফলে বিজয়ী হয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

উল্লেখ্য, এই মরসুমে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ৩ বার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে—দুবার কলকাতার লীগে, একবার ডুরান্ড ফাইনালে। তিনবারই মোহনবাগান হার স্বীকার করেছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

কলকাতার দলগুলির মধ্যে বি এন আরও এবার ডুরান্ডের প্রতিযোগী ছিল। ব্যাঙ্গালোরের এ ডি আর সি কে ৩—১ গোলে হারিয়ে বি এন আর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে গতবারের রানার্স বর্ডার সিকিউ-রিটি ফোর্সের কাছে ১—০ গোলে হেরে যায়। এবার তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় গত বারের ডুরান্ড বিজয়ী গোরখা ব্রিগেডের পাঞ্জাব পুলিসের কাছে হেরে গিয়ে বিদায় গ্রহণ কিছুটা অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

জমকালো আসরে ডুরান্ডের খেলা শেষ হলেও দুঃখজনক দুটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে। একটি মহমেডান স্পোর্টিং ও পাঞ্জাব পুলিসের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার সময় পাঞ্জাব পুলিসের দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে অস্বীকার করা। আর একটি ইস্টবেঙ্গল ও মফৎলাল গ্রুপ অফ মিলস দলের সেমি-ফাইনাল খেলার শেষে মফৎলাল খেলোয়াড়-দের রেফারির প্রতি দুর্ব্যবহার। দুটি ঘটনাই অখেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

দ্বিতীয়ার্ধের ১৫ মিনিটে মহমেডান দলের জন একটি গোল করার পর পাঞ্জাব পুলিসের খেলোয়াড়রাই দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। রোশন সিং লতিফকে বিশ্রী রকমের ফাউল করলে রেফারি রোশন সিংকে মাঠ থেকে বার করে দেন। এরপর মাঠে ইটপাটকেল পড়তে আরম্ভ করে। নিক্ষিপ্ত এক ইটের আঘাতে পাঞ্জাবেরই খেলোয়াড় মহীন্দর পাল সিং আহত হলে পাঞ্জাব পুলিস খেলতে অস্বীকার করে। ফলে ডুরান্ড কমিটি খেলা বন্ধের সময় ১—০ গোলে এগিয়ে থাকা মহমেডান দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

ইস্টবেঙ্গল এবং মফৎলাল গ্রুপের সেমি ফাইনাল খেলার ঘটনাও প্রায় এক ধরনের। হারার মুখে মফৎলালের খেলোয়াড়দের মাথা গরম হয়ে ওঠে এবং খেলার শেষ বাঁশী বাজার কিছু আগে অবৈধ ফাউল করার জন্য রেফারি বালকৃষ্ণানকে মাঠ থেকে বার করে দেন। এর পরও খেলায় ফাউলের আধিক্য দেখা যায়। ২ মিনিট থাকতে মফৎলালের অধিনায়ক অমর বাহাদুর দৌড়ে এসে ইস্টবেঙ্গলের কালন গুহকে লাথি মারেন। শুধু তাই নয়, খেলার শেষে রেফারিকে মারধর করতেও মফৎলালের খেলোয়াড়রা কসুর করে না। ঘটনা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিসকে মৃদু লাঠি চালাতে হয়। রেফারিকে মারধর করার জন্য মফৎলাল ক্লাব অধিনায়ক অমর বাহাদুর এবং টিকারামকে ২ বছরের জন্য সাসপেণ্ড করেছেন।

খুবই প্রশংসনীয় ব্যবস্থা। খেলোয়াড়দের অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ লঘুভাবে দেখার ফলেই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় খেলোয়াড়দের অন্যায় আচরণের ক্ষেত্রে ক্লাব কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন না করে প্রকারান্তরে তার কাজ সমর্থনই করেন এবং ক্রীড়া সংস্থার কাছে কাজের সাফাই গাইতেও দ্বিধা করেন না। কলকাতায় এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু মফৎলাল ক্লাব যারা ঠিক ক্লাব নয়; ব্যবসায়ী সংস্থার ক্রীড়াবিভাগ তারা দলের অধি-নায়ককে সাসপেণ্ড করতেও দ্বিধা করেননি। আই এফ এ-র বিচারের মত শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া বা একদিন দুইদিনের জন্য সাসপেণ্ড নয়, দুই বছরের জন্য সাসপেণ্ড। মফৎলাল কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাচ্ছি

একলব্য

টেবল টেনিসের আইন কানুন

টেবল টেনিস খেলার মূল আইনের ধারা এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং সাধারণ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সুপারিশ, নির্দেশ এবং নিয়ম কানুন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের নির্দেশ, খেলার আগে অন্য কোনরকমের চুক্তি বা ব্যবস্থা না হলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এবং আন্তর্জাতিক ম্যাচেও খেলার সাজ-সরঞ্জাম এবং পরিবেশ সম্পর্কে মূল আইন, নিয়ম কানুন, সুপারিশ বা নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। অন্য কোন রকমের চুক্তি হলে পৃথক কথা। ওপেন টুর্নামেণ্টেও আইন কানুন এবং নিয়মবিধি মেনে চলতে হবে। যেখানে সম্ভব সেখানে সুপারিশ এবং নির্দেশাদিও মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। যদি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এবং অন্য কোন প্রতিযোগিতায় নিয়মবিধি বা সুপারিশাদির পরিবর্তন করতে হয় তবে অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়দের আগে থেকে তা জানিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিযোগিতার নিয়মে সেটা উল্লেখ করতে হবে।

খেলার টেবল, নেট এবং ফ্লোরিং সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশ এর আগে আইনের সঙ্গে লেখা হয়েছে। যেসব বিষয়ে লেখা হয়নি এখন সেইগুলি লিখছি।

পোশাকাদি

কোন খেলোয়াড় খেলার সময় সাদা বা হাল্কা রং-এর পোশাকাদি পরবেন না। সাদা বলে খেলা হয়। সুতরাং সাদা বা হাল্কা রং-এর পোশাক প্রতিপক্ষের অসুবিধা সৃষ্টি করে। যদি কোনো খেলোয়াড়ের গায়ের জামায় কোন 'ব্যাজ' বা অক্ষরের দ্বারা কোনো কিছু লেখা থাকে তবে সে 'ব্যাজ' বা অক্ষর বড় না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া 'ব্যাজ' বা অক্ষরের রং এমন হওয়াও উচিত নয় যা জামার রং-এর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করে। গাঢ় রং-এর জামার উপর বিপরীত রং-এর 'ব্যাজ' বা অক্ষর থাকলে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে।

এখন 'ব্যাজ' কত বড় আকারের হতে পারবে বা জামার উপর 'মনোগ্রামে' কিছু লেখা থাকলে তার রং বা আকার কি হলে প্রতিপক্ষের অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নিয়মবিধি অনুযায়ী রেফারির বিচার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রেফারি যদি কোন ব্যাজ বা অক্ষর বে-আইনী বলে মনে করেন তবে তিনি খেলোয়াড়কে ব্যাজ বা জামা পরিবর্তন করতে বাধ্য করতে পারেন।

আম্পায়ারের পোশাক

খেলোয়াড়দের মত আম্পায়ারকেও পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলে দেওয়া হয়েছে। তবে আম্পায়ারের পোশাক পরিচ্ছদের রং সম্পর্কে কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, আম্পায়ার এমন পোশাক পরবেন যাতে তাঁর আভিজাত্য বজায় থাকে এবং তিনি দর্শক ও খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করতে পারেন। সব সময় আম্পায়ারকে তৎপর শান্ত থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। খেলা পরিচালনার সময় কখনো তিনি যেন ধূমপান না করেন।

প্লেয়িং স্পেস

প্লেয়িং স্পেস, অর্থাৎ খেলার যায়গা কতটা দরকার? এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশ ঃ অন্য কোনরকমের চুক্তি না হলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক ধরনের খেলায় প্রতি টেবল-এর জন্য ১৪ মিটার দীর্ঘ ৭ মিটার প্রস্থ এবং ৪ মিটার উঁচু যায়গার প্রয়োজন। অন্য প্রতিযোগিতায় ১২ মিটার দীর্ঘ ৬ মিটার প্রস্থ এবং ৪ মিটার উঁচু যায়গায় একখানি টেবল স্থাপন করা যেতে পারে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

চার পাশের বেষ্টনী দ্বারা প্লেয়িং স্পেস বা এরিয়াকে পৃথক রাখা দরকার। এই বেষ্টনীর বর্ণ হবে গাঢ় এবং বেষ্টনী ৭৫ সেণ্টিমিটার উঁচু হবে। যদি একটি হলে একাধিক টেবল স্থাপন করতে হয় তবে প্রতি টেবল-এর জন্য নির্দিষ্ট যায়গা পৃথক পৃথক বেষ্টনী দ্বারা ঘেরা থাকা বাঞ্ছনীয়। বেষ্টনী হাল্কা ধরনের হওয়া উচিত। না হলে খেলোয়াড় দৌড়োদৌড়ি করার সময় হঠাৎ বেষ্টনীর উপর পড়ে গেলে তার চোট আঘাত লাগতে পারে।

ব্যাকগ্রাউণ্ড

ব্যাকগ্রাউণ্ড বা হলের দেওয়াল গাঢ় রং-এর হবে। দেওয়াল বা হলের বেড়ার রং সবুজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রং-এর প্রলেপ দেওয়ার সময় সব যায়গায় যাতে একই ধরনের রং লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এক যায়গায় গাঢ় এক যায়গায় হাল্কা রং খেলোয়াড়ের দৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর। যেখানে দর্শক-গ্যালারি দ্বারা হলের দেওয়াল ঢাকা থাকে বা প্লেয়িং এরিয়া থেকে শুধু দর্শকদেরই দেখা যায় সেখানে অবশ্য পৃথক কথা।

লাইটিং বা আলোর ব্যবস্থা

ফ্লোর বা হলের পাটাতন থেকে আলো খাটাবার সাজ-সরঞ্জাম ৪ মিটারের মধ্যে অবশ্যই থাকবে না। অন্ততপক্ষে ৪০০ লাক্স শক্তির আলো টেবল-এর উপর যাতে সমানভাবে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। টেবল-এর বাইরে প্লেয়িং এরিয়ার উপর অন্তত অর্ধেক শক্তি আলো সমানভাবে পড়া বাঞ্ছনীয়। যদি দর্শক-গ্যালারিতে আলোর ব্যবস্থা রাখতে হয় তবে সে আলো টেবল এর উপরের আলোর তুলনায় অনেক ম্লান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর খেলোয়াড়দের চোখের উপর কোনো আলো থাকা উচিত নয়। হলের দেওয়ালে কোনো আলো যাতে না থাকে এবং দেওয়ালের জানলা দিয়ে দিনের আলো হলের মধ্যে না আসতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটের উপর আলো সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকা দরকার।

টেবল-এর উপর আলো বেশী হলেও ক্ষতি নেই। বলা হয়েছে দি বেটার দি লাইটিং দি বেটার দি প্লে। অর্থাৎ আলোর ব্যবস্থা যত ভাল হবে খেলাও তত ভাল হবে। সত্য কথা বলতে কি, ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার জন্য খেলার সময় যদি আলো ঠিকরে চোখে পড়ে বা আলোর অভাব অনুভূত হয় তবে খেলায় রীতিমত ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আলোর প্রাচুর্যের জন্য টেবল-এর উপরে (ফ্লোর থেকে ১০ ফুট উঁচুতে) শেডের নীচে ১৫০ কিংবা ২০০ ওয়াটের ১০টি কি ১২টি বাল্ব যথেষ্ট। তবে শেড-গুলি এমনভাবে সাজাতে হবে যেন শেড থেকে নীচের দিকে আলো ঠিকরে এসে সমস্ত টেবল-এর উপর এবং প্লেয়িং এরিয়ার উপর সমানভাবে পড়ে।

মুকুল

চিত্র-সমালোচনা

তপন সিংহ পরিচালিত "জিন্দগী জিন্দগী" হিন্দী ছবির একটি দৃশ্যে ওয়াহিদা রেহমান ও সুনীল দত্ত

ফটো—দেশ
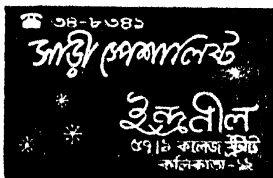
নবরাগ

(এস এম ফিল্মস)

বিবাহিত জীবনে ভুলবোঝাবুঝি তথা ম্যালঅ্যাডজাস্টমেন্ট-এরই গল্প 'নবরাগ'। স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরকে আবার সঠিক বুঝতে পারে তখনই গল্পের ক্লাইম্যাক্স কিংবা নবরাগ। সমস্যাটি আধুনিক হলেও কাহিনী কিন্তু পুরনো নাটকীয় নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। শিল্পপতি বিপুল দাশগুপ্ত হঠাৎ করে পূর্ব বাংলার গরীব অশিক্ষিতা উদ্বাস্তু মেয়ে নারায়ণীকে বিয়ে করে ফেলে। মূল কাহিনীতে (রচনা : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) সমাজের দুই শ্রেণীর দুজনকে একত্র করে হয়ত এই-ভাবেই দাম্পত্যজীবনে বিরোধের বীজ বপন করা হয়েছে যেটা একটা সহজ নাট্যপ্রণালী। অন্যদিকে পরিচালক বিজয় বসু কাহিনীর আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছেন। সন্তানের আধুনিক লক্ষণগুলি নায়িকা রিনার (নারায়ণীর নাম পরে রিনা) মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন। ঘুমের পিল ছাড়া রিনার ঘুম হয় না, সে মদ খেয়ে দুঃখ ভুলতে চায়।

প্রথমেই বলে রাখি, নাটক হিসাবে ছবিটি ভালই লাগবে। নাটকের মিলনান্ত পরিণতির আগে নায়ক-নায়িকার একমাত্র ছেলে রাজার হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া নিয়ে সাসপেন্স রচনা এবং নাট্যরস গড়ে তোলার কাজে পরিচালক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সাজানো গল্পে কোন শিশুরই কোথাও হারিয়ে যেতে কোন মানা থাকে না। ছেলেকে গ্রামের নন্দবাবুর আশ্রমে ভর্তি করানোর ব্যাপারে না হয় তার মা এমন কৌশল করেছেন যা আমরাও জানলাম না। কিন্তু ওই স্বভাবের ছেলে আশ্রমজীবনে হঠাৎ অনুরক্ত হল কী করে? দর্শকের মনে বারে বারে নানা প্রশ্ন জাগবেই। তবু উত্তম-কুমার ও সুচিত্রা সেন নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় থাকলেই ছবি আগাগোড়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখে। দর্শক প্রতীক্ষা করে থাকেন সেই প্রথাসিদ্ধ মুহূর্তটির জন্য কখন তাঁরা নাট্যসংঘর্ষের পর মিলিত হবেন এবং পরস্পরকে জড়িয়ে ধরবেন। এই ব্যাপারে যথাসময়ে যথাবিহিত পরি-চালক দর্শকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।

তা-ছাড়া শিল্পপতির ভূমিকায় উত্তম-কুমারকে মানিয়েছে খুব সুন্দর। এ-ধরনের রোল-এ উত্তমকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর অভিনয়ও অসামান্য। যেমন চরিত্রটির ব্যক্তিত্ব, তেমনি স্মার্টনেস। একজন উচ্চ-ভিলাষী ও অর্থলোভী ব্যবসায়ীর কুৎসা (যা শিল্পীর ভ্রূকুঞ্চনে প্রকাশ) যেমন তিনি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন তেমনি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রটির যন্ত্রণা। ছেলে হারিয়ে যাবার পর উত্তমকুমারের অভিনয় অবাক হয়ে দেখবার মত। সুচিত্রা সেনের চরিত্রের যন্ত্রণা কিন্তু তেমনভাবে আমরা বুঝতে পারিনি। চরিত্রটির স্লিপিং পিল খাওয়া, মদ্যপান এবং "আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান" গান গাওয়া সত্ত্বেও না। এর একটা সম্ভাব্য কারণ হয়ত এই যে, নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনে বিরোধের আভাস আছে কিন্তু অনিবার্য সংঘর্ষের তেমন কোন নাট্য-ঘটনা নেই। কাহিনী নটকেন্দ্রিক। এখানে কোন বিষয় শুধু জেনে নিলেই দর্শকের তৃপ্তি হয় না, নাটকীয় ঘটনায় তার সঙ্গে অস্তিত্ব চাই। শুধু সমাজের দুই বিপরীত মেরুর দুজন মিলিত হয়েছে বলেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ থাকবে নাট্য-কাহিনীতে এটা ধরে নেওয়াই যথেষ্ট নয়। চিত্রনাট্যের এই বাধা উত্তমকুমার অভিনয়ের জোরে সহজেই কাটিয়ে উঠেছেন। সুচিত্রা সেনের রিনার মর্মপীড়া কিন্তু তেমন বিশ্বাসযোগ্য হল না।

শিল্পীকে অবশ্য খুব দোষ দিয়ে লাভ নেই। ছবিতে দেখা গেছে বিপুল রিনার ছেলে রাজা কেমন যেন প্রথম থেকেই মাতৃ-দ্রোহী। সন্তানের প্রতি মায়েরই বা তেমন গভীর স্নেহের প্রকাশ দেখা গেল কই। ওরা যেন প্রথম থেকেই পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ এই ছেলে কী-ভাবে মানুষ হচ্ছে তা-নিয়ে প্রধানত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব। ছেলে বাবারই স্বভাব পেয়েছে—ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে ক্ষমতালিপ্সা, অর্থের লোভ। মা তাকে তেমনভাবে কাছে টেনে নিজের মত করতে চাইলেন কোথায় যে বিরোধ দেখা দেবে?

গল্পবিন্যাসের এই সব গলদের মধ্যেই সফিস্টিকেটেড রিনা ও গ্রাম্য নারায়ণীর দুই রূপে সুচিত্রা সেন তাঁর নিজস্ব অভিনয় দক্ষতার পরিচয় অবশ্যই দেখিয়েছেন। তবে নারায়ণী বেশে গ্রামে তাঁর মৃন্ময়ীর

(রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তির"র) মত স্বভাব দেখাবার কী দরকার ছিল? তাতে শ্রীমতী সেনকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। পরে শহরে যখন নারায়ণী তখন যেন গরীবের মেয়ে "চন্দ্রনাথ"-এরই সুচিত্রা সেনকে আবার দেখলাম। রিনার বেশে যখন শিল্পী 'ভ্রুভঙ্গ' করছেন তখনও 'সন্ধ্যাদীপের শিখা'র সুচিত্রা সেনকে মনে পড়েনা কি? ফ্ল্যাশব্যাকে গ্রামে নারায়ণীর কাহিনী ছবিতে না দেখালেই পরিচালক ভাল করতেন। গ্রামের ওই দৃশ্যে নায়িকার মুখে পূর্ব বাংলার ভাষা ও শহুরে ভাষা মিশে গেছে। অবশ্য ফ্ল্যাশব্যাকের একটি অংশে—নারায়ণী যখন শহরে—তখন সুচিত্রা সেন অতি চমৎকার অভিনয় করেছেন। ক্রিকেট খেলা দেখার সময় তাঁর আচরণ ও অভিনয় খুবই সুন্দর ও স্বাভাবিক। আরও কয়েকটি মুহূর্তে, বিবাহিত জীবনে, তিনি দর্শককে অভিনয়ের গুণে মুগ্ধ করেছেন। একটি মুহূর্ত তো খুবই উল্লেখযোগ্য—যেখানে তিনি অর্থের নেশায় মত্ত স্বামীকে অভি-যোগ করছেন। পিগম্যালিয়ন-এর ধাঁচে যখন নারায়ণী রিনা হয়ে গেল তখন থেকে শ্রীমতী সেন চরিত্রটিতে আগাগোড়াই সফিসটিকেশন দেখাতে পেরেছেন—কী টেলিফোনে কথা-বার্তায় কী বেশবাসে। অবশ্য নানা আধুনিক বেশে তাঁকে দেখিয়েছে সে ভিন্ন কথা। তাঁর পরনে সুইমিং পোশাক দেখতে মোটেই ভাল

লাগেনি। তেমনি দুরেক জায়গায় কথা বলার ঢংও বেশি কৃত্রিম—সমুদ্রের ধারে বিয়ের পর প্রথম তাঁর কথা বলার ধরনটি (আবার সমুদ্রের ধারে আসা নিয়ে) অবাঙ্গালীর মত কেন? ছবিতে আর যাঁরা রয়েছেন অল্প অবকাশে তাঁরাও মন্দ অভিনয় করেননি। বিকাশ রায়, বিজন ভট্টাচার্য, মন্টু ব্যানার্জী, জহর রায় ও বাসবী নন্দীর নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ভাল অভিনয় করেছেন জহর রায়। শিশু-শিল্পী শ্রীমান অমিতকেও ভাল লাগবে।

উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের মত অভি-নেতা-অভিনেত্রী পাল্লা করে ছবিতে প্রায় সর্বক্ষণ রয়েছেন। সে-সত্ত্বেও পরিচালক বিজয় বসু কিন্তু সর্বাংশে মামুলি বা নিয়মমাফিক ধারায় চিত্র পরিচালনা করেননি। তাঁর চিত্র পরিচলনা বা প্রয়োগকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য অবান্তর অংশ বর্জন। একটি দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি আধুনিক। উত্তমকুমার এসে সুচিত্রা সেনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছেন এবং পরক্ষণেই সমুদ্রের ধারে বিয়ের পর হানিমুনের দৃশ্য। দৃশ্য ও ঘটনাকে এমন-ভাবে কেটে কেটে নিয়ে যাওয়ার আধুনিক কৌশলটি খুবই প্রশংসার যোগ্য। জাম্প-কাটও তিনি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অন্য একটি বিশেষ গুণ, তিনি নায়ক-নায়িকার বিয়ের আগে কোন রোমান্টিক গল্প বা ঘটনা গড়তে চাননি। অথচ যেটুকু প্রস্তুতি দেখিয়েছেন তা খুবই সুন্দর ও সংযত। পরিমিতিজ্ঞান আগা-গোড়াই লক্ষ্য করা গেছে ছবিতে। পরি-চালকের কয়েকটি কাজ প্রশংসনীয়। হঠাৎ করে একটি ইংরেজি ছবি দেখিয়ে দেওয়ার মুহূর্ত তিনি চমৎকার বেছে নিয়েছেন। তেমনি ক্রিকেট খেলার দৃশ্যটি, নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা। ক্লাইম্যাক্সে নায়িকার চোখের জলের ভিতর দিয়ে নায়ককে ঝাপসা দেখার কল্পনাটিও চমৎকার। পরি-চালকের রুচিবোধের পরিচয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারে—সুমিত্রা সেনের "তুই ফেলে এসেছিস কারে" গানটি খুবই সুন্দর। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।" টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকেও ছবিটি বিশিষ্ট। দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উঁচু স্তরের ফটোগ্রাফি, প্রসাদ মিত্রর শিল্প নির্দেশনা এবং রবীন দাসের এডিটিং-এর সদ্ব্যবহার করেছেন পরিচালক। তাঁর এত সুন্দর পরিচালনা। তিনি কি একটি আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন গল্প বা তাঁর সুন্দর ট্রিটমেন্ট-এর উপযোগী কোন কাহিনী নিয়ে ছবি করবেন?

মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরির বাংলা ছবি "হরপার্বতী"-র (পরিচালনা : উমাপ্রসাদ মৈত্র) একটি দৃশ্যে পদ্মিনী

সংবাদপত্রের প্রথম পাতার অপরিসর পাতে একই সঙ্গে পরিবেশিত হয় 'আনন্দ সংবাদ', 'দুঃখ সংবাদ', 'উত্তেজক সংবাদ' এবং প্রচুর 'পানসে সংবাদ'। পাঠকের মন কখনো কোনো বিশেষ সংবাদে ঠেকে যায়, বাকি সংবাদগুলো তখন তার কাছে টক টক ঠেকে। নানান কারণে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারির সংবাদপত্র কিছু কিছু পাঠকের কাছে রীতিমত প্রতীক্ষিত। কারণ বছরের বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন, কোন্ মেজাজে কোন্ সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হবে তার কোনো স্থিরতা থাকে না। কিন্তু ছাব্বিশে জানুয়ারির সংবাদপত্র কিছু না কিছু শুভসংবাদ বহন করে আনবেই এটা আজকাল আমাদের জানা কথা। এই বিশেষ দিনে ভারতীয় গণতন্ত্রানবাসী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে নানান নামের রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্মানের এই বিশেষ ভূষণে আমাদের জগতের (মানে ফিল্ম জগতের) অনেকেই বিভূষিত হয়েছেন ইতিপূর্বে, এ বছরও হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন। সম্ভবত তাই-ই ছাব্বিশে জানুয়ারির সংবাদপত্রের এই বিশেষ প্রতীক্ষা। ইতিমধ্যেই আমাদের লাইনে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিতদের ছড়াছড়ি। গত বছর ছাব্বিশে জানুয়ারির উত্তর কোন এক সভায় একজন লেখক-প্রযোজক অন্য একজন প্রযোজকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, "এর সঙ্গে আলাপ করুন—ইনি 'পদ্মশ্রী' নন।" আচমকা আসায় জোকটা ঠিক বুঝতে পারিনি। সেটা বুঝতে পেরে ভদ্রলোক ব্যাখ্যা করলেন, "যে হারে সবাই 'পদ্মশ্রী' পেতে আরম্ভ করেছে এ হার বজায় থাকলে, কিছুদিনের মধ্যেই যাঁরা 'পদ্মশ্রী' নন্ তাঁরা বেশী ডিসটিংগুইশ্ট হয়ে পড়বেন।" ফিল্ম লাইনের কথা মুখ থেকে বেরুবার আগেই কান থেকে কানান্তরে পৌঁছে যায়। সম্ভবত উপরোক্ত পরিহাস যথাসময়ে কর্তা ব্যক্তিদের কানে পৌঁছে থাকবে। এবছরের

"অপর্ণা" (পরিচালনা : সলিল সেন) ছবিতে তনুজা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রীয় ভূষণ সম্ভবত সেই জন্যেই যথেষ্ট সংযত (অন্তত আমাদের লাইনের বেলায়)।

ভারত ক্রমশই রত্নহীন হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝেই কাউকেই 'ভারতরত্ন' ভূষণে করা যাচ্ছে না। এ বছর সামান্য কয়েকজন পদ্মবিভূষণ খেতাব পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং নৃত্যসম্রাট উদয়শঙ্কর অন্যতম। এ'দের কেউই ফিল্মি জগতের অধিবাসী নন তবু এ'দের আমাদের প্রতি-

---

বোম্বাই থেকে একটি চিঠিতে শ্রীমান্না দে জানাচ্ছেন, তাঁর "পদ্মশ্রী" খেতাব প্রাপ্তি উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে বহু ব্যক্তি অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার উত্তরে ব্যক্তিগতভাবে সকলকে পত্র দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই তিনি "দেশ" পত্রিকা মারফত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। সেই সঙ্গে রঙ্গজগৎ বিভাগের পাঠক-পাঠিকাদেরও।

বেশী ভেবে আমরা প্রতিফলিত গৌরবের ভাগ বসাতে চাই। 'পদ্মভূষণ'দের দলে আমাদের লাইনের প্রথম সারির অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক রাজ কাপুর একজন। শ্রীকাপুরের মাধ্যমে এ গৌরবে আমরা লাইনের সকলেই গৌরবান্বিত।

গৌরবের হাত ছেড়ে আনন্দের আলিঙ্গনে আসতেই দেখি সম্মানে বিব্রত ঈষৎ উদ্ভাসিত মান্না দের মুখ। পদ্মশ্রী মান্না দের চশমাবৃত দৃষ্টিমভরা চোখ। দিল্লীর সরকারী দফতর থেকে ফোন এসেছে, ডেপুটি সেক্রেটারী কথা বলতে চান। "কেন? কি করেছি?" মান্না দের স্বভাবসুলভ উত্তর। দূরভাষিনীর অপর প্রান্তের দূরভাষক তো হেসেই অস্থির। মান্না দে পদ্মশ্রী হয়ে গেলেন। কী বিপদ! বিখ্যাত উর্দু কবি এবং গীতিকার সাহির লুধিয়ানভীও 'পদ্মশ্রী' খেতাবে ভূষিত। সেখানেও সেই একই বিড়ম্বনা! পৃথিবীতে সামান্য সংখ্যক কিছু মানুষ আছে যারা যা কিছু পায়, অর্জন করে বা আহরণ করে তা পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে ভালবাসে। মান্না দে এবং সাহির সম্ভবত দুজনেই সেই দলভুক্ত। তাই দুজনেই সম্মানিত হলেই কোথায় যেন বিব্রত হয়ে পড়েন। এ জগতে সব কিছুর অংশ অন্যকে দেওয়া যায়, সমস্ত সুখ দুঃখের অংশীদার করা যায় অন্য কাউকে। কিন্তু সম্মান এমন একটি ভূষণ যা বহন করতে হয় একা। সম্ভবত তাই ই সহজ লোকেরা সম্মানে ভূষিত হলে কেমন যেন অসহায় হয়ে যান। সম্মানের সূচীতে এমন অসহায় লোকের নাম আরো বেশী করে খচিত হোক। তাহলে সংবাদ 'আনন্দ সংবাদ' হবে।

সরল শর্মা

নান্দীকারের সফর

অর্ধশতাধিক সভ্য-সভ্যা সহ নান্দীকার নাট্যসংস্থা বোম্বাই, ভিলাই ও জামশেদপুরে অভিনয়ের জন্যে বেরিয়েছেন ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। ইণ্ডিয়া কালচার লীগের আমন্ত্রণে ১৩ ও ১৪ এ'রা রবীন্দ্র নাট্য-মন্দিরে মঞ্চস্থ করছেন এ'দের "তিনটি একাঙ্ক" ও "নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র" এবং সম্মুখানন্দ হলে ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে "তিন পয়সার পালা" ও "মঞ্জরী আমের মঞ্জরী"।

২৮ ফেব্রুয়ারি জামশেদপুর বেঙ্গল ক্লাবের নিজস্ব মঞ্চে নান্দীকার প্রযোজনা করবেন "তিন পয়সার পালা"।

ফেব্রুয়ারি মাসে রঙ্গনায় নিয়মিত অভিনয় বন্ধ থাকবে। মার্চ মাস থেকে আবার তা শুরু হবে যথারীতি।

উত্তম-সুচিত্রার আর একটি ছবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা' অবলম্বনে একটি নতুন বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে। নাম : "হার মানা হার"। ছবিটি পরিচালনা করছেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। সরস্বতী পুজোর দিন ছবিটির মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন ছবিটির প্রধান দুই শিল্পী। সেবক শিল্প প্রতিষ্ঠান ছবিটির প্রযোজক।

শকুন্তলা

অলোকা পিকচার্স প্রযোজিত "শকুন্তলা" ছবির কাজ এগিয়ে চলেছে। সরল গুহ ছবিটির পরিচালক। সম্প্রতি কালীপদ সেনের সংগীত পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

চিৎপুরের যাত্রাপাড়ার হৃৎপিণ্ডটা এখন যে ভাবনায় থির থির করে কাঁপছে। যে গদিতেই যান, দেখবেন আলোর উজ্জ্বল্য অনেক ম্লান। দল-পরিচালকদের কপালে উদ্বেগের বলিরেখা। মরশুমের শুরুতে নতুন নাটক নিয়ে, ঢেলে-সাজা দল নিয়ে সোনালী আশায় যাঁরা উচ্ছকণ্ঠ ছিলেন, বন্ধু বান্ধব অতিথি-অভ্যাগত এলে যাঁরা চায়ের সঙ্গে 'টা' না খাইয়ে ছাড়তেন না, সে সব গদিতে গেলে আর তেমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়া যায় না।

খবরের কাগজে বড় করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে : "উত্তরবঙ্গ ও আসাম হইতে দল ফিরিয়া আসিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গে বায়না চলিতেছে।" কিন্তু কোথায় বায়না? তীর্থের কাকের মত ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকা। কিছু কিছু বায়না যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়, তবে কেবল বায়না নিয়েই বিশ্বাস নেই, 'গাওনা' হবে কিনা তা নির্দিষ্ট তারিখটি না আসা পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায় না। "আমাদের ওখানকার অবস্থা তেমন সুবিধার নয়"—এই অজুহাতে অনেক বায়না ক্যানসেল হয়ে গেছে এবং আজও যাচ্ছে চিৎপুর পাড়ায়।

আগেকার দিনে লোকে বলত, রাত-দুপুর না হলে যাত্রা জমে না। আসরে

আর একটু বেশি মনোযোগী হলে ভাল হত। গভীরে ডুব মারার ব্যাপারটা ছিল বটে, কিন্তু খুবই অল্পস্থায়ী।

(সি ৮১২৬)

তবলা সংগতের কথাটা আলাদা করে বলতে ইচ্ছে করছে। মনে হয় সেইভাবেই এই যন্ত্র ও যন্ত্রীদের কথা উল্লেখ করা উচিত। সেতার সরোদের ক্ষেত্রে তবলার ভূমিকাটা নিছক অ্যাকমপেনিমেন্ট ছাড়াও, তদতিরিক্ত কিছু। এও এক ধরনের যুগলবন্দী প্রোগ্রাম। আমজাদের প্রতিটি সপ্রশ্ন টংকার শংকর ঝংকারসহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি নৈঃশব্দ্য, লয়ের নিরুচ্চার সংকেতে পরিমাপ করেছেন। অথচ বেশি বলেন নি। সহযোগীকে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে সংগতে জুগিয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিশিয়ানকে ডেকে তবলার দিককার মাইককে কম করতে বলে দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানটি সবচেয়ে প্রশংসনীয় হয়। আমজাদ আলি সবশেষে ভৈরবী ধুন বাজান।

নন্দনবিহারী

সুর-বাহারের অনুষ্ঠান

সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র সুর-বাহারের সারস্বত সম্মেলন উপলক্ষে সুনীল সাহা ও কৃষ্ণা সমাদ্দারের পরিচালনায় এক মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশু শিল্পী রত্না দের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত ও দুর্গা রাগে খেয়াল দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ গান সুর-বাহার সংগীত গোষ্ঠীর পরিবেশনায় সলিল চৌধুরীর '...গান ভাবে, ...প্রাণ ভাবে'। কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে যোগ দেন বিমল মিত্র, দুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, রতনকুমার দে, তরুণ রায়, তাপস পাল, স্বপন দত্ত, সুনীল রায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শীলা রায় বর্ণালী সমাদ্দার, ছবি সরকার, রুণু চট্টোপাধ্যায়, নূপুর বসু, পুষ্প মিত্র, সন্ধ্যা দাশগুপ্তা ও গীতা দে।

অরণ্যদেব লী ফক

সোনা-বেলা আর কতদূর, ওয়াকার-বাবা?*
এই তো, কাছেই। কপাল ভাল হলে সেখানে একটা মজার ব্যাপার দেখবি।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার

কী দেখব?
কী দেখব?
এখন বলব না।

সোনা-বেলায় বিয়ের ধুম লেগেছে!

আশ্চর্য বেলাভূমি। তার বালুকণার শতকরা পঞ্চাশ ভাগই সোনার রেণু!
এখুনি ভিতরে যাওয়া যাবে না!

প্রতি বসন্ত ঋতুতে ওয়াম্বেসি আর লঙ্গো উপজাতির তরুণ-তরুণীরা এই বেলাভূমিতে এসে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়----
6/21

সেই বিবাহ-উৎসবে যোগ দেবার জন্যে শুশুকে-টানা ভেলায় চড়ে আসছেন অরণ্যদেব। সঙ্গে রাজা, টম আর জেভিল।

সোনা-বেলা! কত লোক ওখানে!
????

কী করছে ওরা?
বিয়ে করছে।

অরণ্যদে… সবাই খুশী!
অরণ্যদেব! অরণ্যদেব!

মানব অভিযাত্রীদের চন্দ্র পরিক্রমা এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। ২ ফেব্রুয়ারি তিনজন অভিযাত্রীকে নিয়ে মহাকাশ যান অ্যাপোলো-১৪ পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে। এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন ৪৭ বৎসর বয়স্ক কোটিপতি শেফারড। ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁরা মূল মহাকাশ যান থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে চাঁদের ভেলায় চড়ে চাঁদের বিভীষিকা রাজ্য ফ্রা-মরো অঞ্চলে নেমে পড়েন। এখানে তাঁরা আমেরিকার পতাকা উত্তোলন করেন, চাঁদের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলেন এবং এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করেন। অভিযাত্রীরা বলেন, ফ্রা-মরোর ঊর্ধ্বের আকাশ কৃষ্ণবর্ণ এবং নীচের মাটি অত্যন্ত নরম। মহাকাশচারীরা ফেরার পথে ত্রিশঙ্কুর রাজ্যের ছবি তোলার আশা রাখেন। ত্রিশঙ্কুর রাজ্যের মহাকাশে ভাসমান বস্তুকণিকা জড়ো হয়ে আছে বলে বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন। পরিক্রমা শেষে অভিযাত্রীরা ১০ ফেব্রুয়ারি বুধবার পৃথিবীতে অবতরণ করবেন বলে আশা করেন।

দেশী সংবাদ

১ ফেব্রুয়ারি—ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য কলকাতা-সহ সারা রাজ্যে মিলিটারী নামানো হবে। মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ বলেন: মিলিটারি নামানোর এই সিদ্ধান্ত আজ নেওয়া হয়েছে।

মহাকাশে ছিনতাই ভারতীয় বিমানের ২৬ জন যাত্রী ও চারজন বিমানকর্মী ৪৮ ঘণ্টা উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে আজ বিকালে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সড়কপথে হুসেনিওয়ালাতে পৌঁছে তাঁরা ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন।

২ ফেব্রুয়ারি—হাওয়াই-ছিনতাই করে লাহোরে নিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর ফকার বিমানটি আজ লাহোরের বিমানবন্দরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিমান-দস্যু দুজন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিমানটি ধ্বংস করে। এই ঘটনার পর ভারত সরকার ভারতের আকাশ-পথে পাকিস্তানের সামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেছেন।

গতকাল ভারত সরকারের সংস্থা লাক্ষা উন্নয়ন পরিষদের একটি স্টেশন-ওয়াগন-এর ড্রাইভার পরিষদ অফিসের (রাঁচি) সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে নিহত হন এবং তের হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। একদল সশস্ত্র লোক এই দুষ্কর্ম করে একটি অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে করে চম্পট দেয়। পুলিস পরে এ সম্পর্কে দুজনকে গ্রেফতার করে।

৩ ফেব্রুয়ারি—ভারতীয় এলাকার উপর দিয়ে কোন পাকিস্তানী বিমান—তা সামরিক, অসামরিক যাই হোক না কেন—যেতে পারবে না। অবিলম্বে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। ভারত সরকার এই নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতের বিরুদ্ধে বেআইনী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপে পাকিস্তান উস্কানি, উৎসাহ ও সহায়তা দিচ্ছে তাতে ভারত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

৪ ফেব্রুয়ারি—আজ অপরাহ্ণে পাক-দূতাবাসের ভেতর থেকে ছাত্রদের লক্ষ্য করে তিন-তিনবার গুলি ছোড়া হয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গতকালের মত আজও লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংস করার প্রতিবাদে পাক-দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ওই সময়ই গুলিচালনার ঘটনাটি ঘটে। আরও অভিযোগ, পাক-দূতাবাসের কর্মীরা বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের উপর লাঠি চালায়, ইটপাটকেল ছোড়ে।

আজ সন্ধ্যায় একদল দুষ্কৃতকারী আলিপুরে প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর থেকে ৮ জন বিচারাধীন বন্দীকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। পলাতকদের ৬ জন কলকাতায় কয়েকটি বড় ডাকাতির মামলার আসামী। আর ২ জন নকশালপন্থী। দুষ্কৃতকারীরা বাইরে থেকে গুলি ছোড়ে ও প্রচুর বোমা ব্যবহার করে, জেলের

ভিতরেও বোমা মারা হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি—শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে বরাহনগর কেন্দ্রে প্রার্থী করে বাংলা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের অন্তত একটি কেন্দ্রে সব সি পি এম বিরোধী পার্টিকে প্রকাশ্যে একজোট করার চেষ্টা করছেন। এই চেষ্টা সফল হলে তাঁরা এই জন্য অন্যান্য কতকগুলি আসনেও সচেষ্ট হবেন বলে জানা গেল। ইতিমধ্যেই নব ও আদি কংগ্রেস প্রকাশ্যে বরাহনগর কেন্দ্রে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে অজয়বাবুর প্রার্থীপদ সমর্থন করেছেন। আদি কংগ্রেস তাঁদের ঘোষিত প্রার্থীও তুলে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন—সি পি আই এবং আট পার্টি কী করবেন? বরাহনগরে আট পার্টির পক্ষে প্রার্থী দিয়েছেন সি পি আই।

আজ নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাই-কমিশনের বাইরে পুলিস এবং বিক্ষোভকারী ছাত্রদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষের ফলে একশরও বেশী, পুলিসকর্মী সহ দুশরও বেশী লোক আহত হন। ছাত্রদের সংখ্যা আজ কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছিল। লাহোরে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদ জানানোর জন্য আজ নিয়ে পর পর তিন-দিন ছাত্ররা পাকিস্তান হাই-কমিশনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান।

৬ ফেব্রুয়ারি—লোকসভা বাতিল হবার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থাকার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে এক আপীল পেশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীদের তাঁদের স্ব-স্ব পদে কাজ চালানো থেকে বিরত থাকার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন জারির প্রার্থনা জানানো হয়। মাদরাজ হাইকোর্টে এই ধরনের একটি রিট আবেদন বাতিল হয়ে গেলে সেই রায়ের বিরুদ্ধে ওই আপীল করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযানের শেষ দিনের সভায় কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে আজ এক বিপুল জনসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাকে হটিয়ে দিলে যদি কোন গরিব লোকের কল্যাণ হয়, তাহলে আমি এখনই পদত্যাগ করতে প্রস্তুত।' 'ইন্দিরা হটাও' স্লোগানের উল্লেখ করে প্রধান-মন্ত্রী বলেন, তাঁর স্লোগান গরিবী হটাও।

৭ ফেব্রুয়ারি—বাদবাদ ডিভিশনে বিশ হাজার রেলকর্মীর ধর্মঘটের আজ পঞ্চম দিন। ধর্মঘটের ফলে পূর্ব বাংলা-বিহারের খনিগুলি থেকে কয়লা আমদানি কার্যত বন্ধ। এজন্য প্রায় সারা দেশে ট্রেন চলাচল দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি রেল অঞ্চলে বহুসংখ্যক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

গারো পার্বত্য জেলার বালুগোর মৌজায় একটি স্বাধীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। অঞ্চলটি গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণ শালমারা মানকেলার সীমান্তবর্তী। নগরীটি ১২ বর্গমাইল এবং বৃত্তাকার। চারদিকে ইটের প্রাচীর। তা ছাড়া প্রচুর জলাধারা ও মন্দিরের চিহ্নও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১ ফেব্রুয়ারি—পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় চারদিন আলোচনা চালাবার পর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো গতকাল লাহোরে ফিরে এসেছেন। দেশের সামরিক শাসন অবসানকল্পে পাকিস্তানের দুই অংশের মতপার্থক্য সঙ্কুচিত করতে তাঁর এই আলোচনা ব্যর্থ হতে চলেছে। শেখ মুজিবর চাইছেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার। শ্রীভুট্টো চান পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা।

২ ফেব্রুয়ারি—আজ অ্যাপোলো—১৪ মহাকাশ যান চাঁদের দিকে অর্ধেক পথ অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। ইতিমধ্যে পূর্ব-নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী শুক্রবার চাঁদের নামবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পৃথিবী থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ গিয়েছে। দুইখানা মহাকাশযানকে গেঁথে দেওয়ার যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেটার সুরাহা হয়েছে।

৩ ফেব্রুয়ারি—আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ লাহোর বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমান ধ্বংসের নিন্দা করেছেন এবং এই ঘটনা সম্পর্কে সরকারী তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এই ব্যাপারে শ্রীরহমানের প্রতি-ক্রিয়া শ্রীভুট্টোর সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রীভুট্টো বলেছেন, এই ব্যাপারে পাকিস্তানের কোন দায়িত্ব নেই; কারণ ছিনতাইকারীরা কাশ্মীরের লোক এবং তারা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে।

৪ ফেব্রুয়ারি—লাহোরে ছিনতাই ভারতীয় বিমানটি ধ্বংস হতে দিয়ে পাকিস্তান ছিনতাই সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবটিকে লঙ্ঘন করেছে। একথা মনে করেন কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল। পাকিস্তান তাদের অভিযুক্ত করে শাস্তি দিতে বাধ্য এবং এর জন্য ভারতকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৫ ফেব্রুয়ারি...চীনের সরকারী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা চীনের সকল সংবাদপত্রকে সামরিকভাবে প্রকাশ স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছে। এরূপ একটি আদেশ একান্তই অস্বাভাবিক এবং ভাবী কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সূচক বলে মনে করা হচ্ছে। এই নির্দেশ চীনাভাষায় প্রচারিত হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি—সম্প্রতি যে দুজন আকাশ দস্যু লাহোর বিমান ঘাটিতে একটি ভারতীয় বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে, আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা তাদের অভিযুক্ত করার জন্য পাকিস্তানের কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছেন। শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার পথে বিমানটিকে ওই দস্যু দুজন পিস্তলের মুখে ছিনতাই করেছিল।

৭ ফেব্রুয়ারি—আজ কৃষ্ণনগরে এক সংবাদে জানা গিয়েছে যে, পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর-আমবাগান অঞ্চলে সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করছে। অঞ্চলটি তেহট্ট থানার অন্তর্গত বেতাই গ্রামের ভারতীয় সীমান্তের ঠিক বিপরীত দিকে।

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব—	২২১
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	২২২
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	২২৩
বৈদেশিকী—দেবরাজ	২২৫
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	২২৭
মরনা—শ্রীসুশীল রায়	২২৯
দুটি দেশ : একটি ভাষা—শংকর	২৩৭
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর	২৪৫
রঙ্গ ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়	২৫১
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন	২৫৫
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	২৫৯
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৬১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে বাইরে—শ্রীমতা	...	২৬৯
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	২৭১
ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী		২৭৩
এমনিভাবেই বাঁচতে হবে (কবিতা)—শ্রীশান্তনু দাস		২৭৮
কবিতার দিন (কবিতা)—শ্রীজয়োৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়		২৭৮
দূরবীন (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	...	২৭৮
তোমার আঁধার দিনের সংবেদন (কবিতা) —শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ	...	২৭৮
একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যন্ত্র মহাপ্রস্থানের পথে —তিমিরবরণ	...	২৭৯
দ্বিতীয় সংগীত সংহতি সম্মেলন—নন্দনবিহারী	...	২৮৭
আলোচনা—	...	২৯১
সাহিত্য সংবাদ—শ্রীসনাতন পাঠক	...	২৯৭

ঝক্‌ঝকে মার্বেল ফিনিশকরা সুন্দর পোর্সেলিনের টাইলস্—ঘরে ঘরে আলাদা বাহার খুলে দেয়।
পরশুরামের মার্বেল ফিনিশকরা টাইলস্ দিয়ে ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকের সমন্বয় করুন—আপনার ঘরের সাজসজ্জার সঙ্গে মানানসই চাররকম রঙের টাইলস্ পাবেন।
পরশুরাম থেকে আরও পাবেন সাদা ও চিত্তাকর্ষক মাজা রঙের চকচকে টাইলস্।
পরশুরাম মানেই অভিনবত্ব, উৎকর্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা আর এসব গুণ আপনি তাদের কাছ থেকেই আশা করতে পারেন চীনেমাটির জিনিষপত্র তৈরিতে ভারতে যারা পথিকৃত।
ISI
পরশুরাম—প্রথম আই এস আই স্বীকৃতিলাভ করেছে।
আপনার
ঘরগুলি যাতে
সুন্দর দেখায়...
তার
ব্যবস্থা করি
আমরা
Parshuram
পরশুরাম—
টাইলস্ সেইসঙ্গে
স্টাইল
পরশুরাম পটারী ওয়ার্কস্
কোং লিমিটেড,
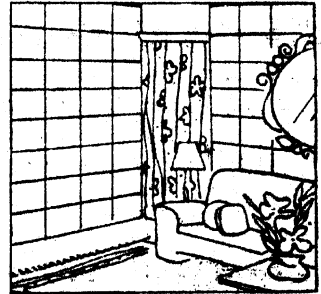
বিষয়	লেখ	পৃষ্ঠা
পুস্তক পরিচয়—	...	২৯৯
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৩০১
টেবল টেনিসের আইনকানুন—মুকুল	...	৩০৪
অরণ্যদেব—	...	৩০৬
রঙ্গজগৎ—	...	৩০৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৩১২

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মৌসুমী
নকশা
দেখে যান বাটার দোকানে। মৌসুমী
নকশার বিরাট সমারোহ।
সৌমেন
১৫.৯৫
মানসী
Bata

সরযূ দেবীর
স্মৃতিকথা
জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ির
আমি তখন মালয়ে
উপন্যাস
বিমল করের
এই প্রেম, আঁধারে
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
পরস্ত্রী
বড় গল্প
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ
বিশেষ রচনা
শ্রীপান্থ
পূর্ণেন্দু পত্রী
এছাড়া বহু ছোট গল্প
কবিতা, প্রবন্ধ এবং
বিস্তৃত চলচ্চিত্র বিভাগ

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬
শনিবার ৭ ফাল্গুন ১৩৭৭

*

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৪৩ ২৩-৪৫৪১

*

মুদ্রণ, কাগজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পত্রিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আজ আমাদের এক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই অবস্থায় পত্রিকার সুষ্ঠু পরিচালনা করতে হলে দাম বাড়ান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাই ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার মূল্য প্রতি কপি দশ পয়সা করে বৃদ্ধি করা হল। অতএব এই সপ্তাহ থেকে আমাদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার দাম হল প্রতি কপি ৬০ পয়সা। এজেন্টদের কমিশনের হার পূর্বের মত থাকবে। গ্রাহকদের অবগতির জন্য যথাসময়ে বার্ষিক, ষাণ্মাসিক ও ত্রৈমাসিক চাঁদার হার প্রকাশিত হবে।

*

দাম ৬০ পয়সা

উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 20 Feb. 1971

নির্বাচনের প্রস্তুতি-পর্ব

নির্বাচনের আর পক্ষকাল বাকি। দোলোৎসবেরও একেবারে গায়ে গায়েই নির্বাচন-পর্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে; সেদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের এবারের রাজনৈতিক বসন্তোৎসব বলতে দশই মার্চ দিনটিকে ধরা যায়। উৎসব সমাগত বলে তার প্রস্তুতি এবং আনুষঙ্গিক ঘটনা আমাদের চোখে পড়তে শুরু করেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে বিচিত্র ও সচিত্র লেখন ছাড়াও বিবিধ মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে। সৈন্য নেমেছে, নির্বাচন প্রার্থী ও কর্মী খুন হচ্ছে, বোমার বাজার আবার তেজী হয়েছে, নেতারা নির্বাচনী সভা শুরু করেছেন। কারও কারও হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। আরও বহু কিছু হচ্ছে, হবে।

এই মুহূর্তে কে কী বলছেন তা সব মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে কোনো কোনো কথা মনে না রেখে উপায় নেই। যেমন মার্কসপন্থী কম্যুনিস্টরা সাফসুফ বলে দিচ্ছেন যে, তাঁরা প্রত্যেকটি কেন্দ্রে আট থেকে দশ হাজার করে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক নামিয়ে নির্বাচন লড়বেন। এস ইউ সি বলছেন, অস্ত্র আইন তুলে নাও, সবাই যেন অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে—নচেৎ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে দুটি দলই প্রকাশ্যে নির্বাচনের জন্যে অস্ত্র ধরার পক্ষপাতী। অন্যরা অবশ্য অস্ত্রের কথা মুখ ফুটে বলছেন না। কিন্তু নির্বাচন রণে এবার যে অস্ত্রের আমদানি অপরিহার্য এটা বোধ হয় স্বীকার করছেন। যে ধরনের নির্বাচনী সংঘর্ষ এবং খুনোখুনি ইতিমধ্যেই হতে শুরু হয়েছে তা দেখে অন্তত আমাদের পক্ষে সেই রকমই অনুমান হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ নিজেও স্বীকার করেছেন, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে দলীয় সংঘর্ষ নিত্যকার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঘোষমশাই কোনো কোনো ব্যাপারে তেমন গা করেন নি। নিজস্ব সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দলীয় নির্বাচনের ব্যাপারে কাজে লাগানো কিংবা নির্বাচনের জন্যে আইনত অস্ত্র সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ—এসব বিবৃতি হয়ত তাঁর কাছে নিতান্ত মৌখিক বলে মনে হয়েছে, তিনি এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পান নি। তাঁর মনে মনে আশা, প্রকাশ্যে যে যা বলেছেন তা ধর্তব্য নয়, নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে এঁদের সহযোগিতার অভাব ঘটবে না।

আমাদের পক্ষে অতটা আশাবাদী হওয়া সম্ভব নয়। এটা ঠিক যে, সরকার অস্ত্র আইন তুলে নিচ্ছেন না, এবং যে কোনো লোক আইনগতভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারছে না। এস, ইউ, সি-র নির্বাচনী ইস্তাহারের এই ব্যাপারটা অনায়াসেই উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু অস্ত্র তো শুধু আইনগতভাবে হাতে আসে না, বেআইনীভাবেও যথেষ্ট আসে। আর সেটা ক্রমাগত যে উগ্র রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আসছে ও মজুত হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় কি করে? নয়ত সরকারই বা কেন স্বীকার করেছেন, বহু বেআইনী অস্ত্র পুলিস উদ্ধার করেছে। আমরাই বা কেন প্রত্যহ পথেঘাটে বোমার শব্দ শুনি, কেন সকালের কাগজে দেখি পাইপগান বা পিস্তলের গুলিতে অমুক ব্যক্তি নিহত বা আহত। বরং আমাদের পক্ষে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, নির্বাচনের মহড়ায় যত বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে, নির্বাচনের মুখে মুখে তার আধিক্য ঘটতে পারে। সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে বোমা, পাইপগান, পিস্তল, লোহার রড থাকবে না এরকম মনে করার সংগত কোনো কারণই নেই। তবে, এইমাত্র বলা যেতে পারে—হাঙ্গামা খুনোখুনি হলে শান্তি রক্ষার্থে পুলিস বা মিলিটারী আসবে। যারা মরার তারা আগেই অবশ্য মরে যাবে।

ঘোষমশাই নাকি স্বীকার করেন নি, আজকাল কলকাতার বহু এলাকায় পথেঘাটে দুর্বৃত্তেরা সশস্ত্র হয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ায়। জানি না, তিনি কোন্ কলকাতায় থাকেন। কোন্ সূত্রেই বা সংবাদ পান কলকাতা শহর নিরুপদ্রব হয়ে আসছে। আমাদের অভিজ্ঞতা কিন্তু তা বলে না। যদি এমনই হত, কলকাতার পথঘাট দুর্বৃত্তহীন হয়ে গেছে তবে মানুষের মনে এত ভীতি থাকত না। বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, বরানগর, সিঁথি, যাদবপুর প্রভৃতি বিখ্যাত এলাকা এখন শান্ত ও নিরুপদ্রব একথা কী ঘোষমশাই বলতে পারেন? কলকাতা শহরে রোজ যা ঘটে তার অধিকাংশই শেষ অবধি থানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছোয় না। আর সেটা থানায় না পৌঁছোনোর একমাত্র কারণ মানুষের মনে আতঙ্ক ও ভয়। সম্ভবত এই কারণে ঘোষমশাই বহু কিছু জানতে বা শুনতে পান না। যাই হোক, আমরা বুঝতে পারছি না এবারে দশই মার্চের বসন্তোৎসবে কলকাতা ও বাংলা দেশে কোন গাঢ় রঙের খেলা হবে? 'লাল রঙ কী?' কে জানে!

পশ্চিমবঙ্গের জন্য আশু প্রয়োজন উন্নয়নমূলক একটি বাস্তবসম্মত কর্মসূচী আর সেই কর্মসূচীকে রূপ দেবার মত দক্ষ একটি সরকার। ভেকধারী বিপ্লবী বাবাজীবনদের গলাবাজি এবং বিপ্লবের ছুতোয় পাড়া বন্ধ, শহর বন্ধ, গ্রাম বন্ধ, জেলা বন্ধ, কথায় কথায় ইস্কুল কলেজ বন্ধ, কাজ বন্ধ, উৎপাদন বন্ধ আজ বাঙালী জাতকে সর্বনাশের অতলস্পর্শী গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে. নির্বাচনের আগে এই রাজ্যের প্রতিটি লোককে এ কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এবং তা নিরসনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা অরাজকতা চাই? মাৎস্যন্যায় আবার চাই? নাকি আজকের এই অনিশ্চিত জীবনযাত্রার পরিবর্তে উত্তরণের ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যেতে চাই? প্রতিটি ভোটদাতাকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে।

এবং এ কথা জেনে রাখা ভাল, নির্বাচন হবেই। ভালভাবে হবে, না খারাপভাবে হবে, তা নির্ভর করছে প্রশাসন, রাজনৈতিক দলগুলো এবং অগণিত ভোটদাতার সদিচ্ছা, সাহস এবং সহযোগিতার উপর।

কোনও কোনও বিপ্লবী বাবাজীবনের মুখে একটা কথা শোনা যাচ্ছে, মিলিটারি আসাতে সাধারণ ভোটদাতাদের অসুবিধা হবে, মিলিটারি দেখে বেচারি সাধারণ লোকেরা ভড়কে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ভেকধারী এই সব বিপ্লবী মসীহদের জনসাধারণের জন্য উথলে-ওঠা দরদ যে মায়ের চাইতে বেশী এ কথা বুঝতে আজ কারোরই অসুবিধা হবার কথা নয়। বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক তাতেই বিপ্লবী বাবাজীবনেরা অসুবিধা বোধ করে থাকেন। কারণ বিশৃঙ্খলা তথা অরাজকতাতেই তাঁদের পোয়া বারো।

আমাদের কথা এই হওয়া উচিত যে, অরাজকতা আমরা চাই না। যে দল আমাদের উন্নয়নমূলক সুষ্ঠু একটি কর্মসূচী দিতে পারবে এবং সেই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য দক্ষ একটি প্রশাসনযন্ত্র সৃষ্টি এবং পরিচালনা করতে পারবে, সেই দলকেই সরকার গড়বার সুযোগ আমাদের দেওয়া উচিত।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য এই, এখানে যেসব দল গদি দখলের লড়াইতে নেমেছেন, তাঁরা প্রতিপক্ষের ছিদ্র অন্বেষণ করতেই এত ব্যস্ত যে, কীভাবে তাঁরা বাংলা দেশকে বাঁচাতে চান, সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা দুষ্কর। প্রতিপক্ষের নামে অপবাদ, কুৎসা ইত্যাদির সৃষ্টিতেই এঁরা এঁদের সমস্তটুকু সৃজনী প্রতিভা ব্যয় করে ফেলছেন। দেশের ছবিটি এঁদের মগজে তাই এত ধূসর রঙে আঁকা। এবং তাই এত আবছা।

বিপ্লবী এবং অবিপ্লবী হে মহারথীগণ! আপনাদের অতীত ক্রিয়াকলাপে, বিশেষত যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের অশেষ কৃপায় আমরা বাংলা দেশের অধিবাসীরা তো ডুবজলে পড়ে গিয়ে নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছি, এবার অন্তত অনুগ্রহ করে বলুন, আমাদের উদ্ধারের উপায় কী?

কে আমাদের উদ্ধার করবেন, তার চেয়েও বড় কথা কীভাবে আমরা উদ্ধারলাভ করব। সেই ছকটি জানা আমাদের পক্ষে বড়

প্রয়োজন। এই আসল জিনিসটিকে এড়িয়ে যাওয়ার বা ধামাচাপা দেওয়ার নামই তো জনগণের সঙ্গে তঞ্চকতা করা। নয় কি? আমাদের হাতে যে এই একটিই ব্রহ্মাস্ত্র, না [illegible] এই একটির ভোট ভীতি প্রদর্শন করে বা লোভ দেখিয়ে বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেটি বাগিয়ে নেবার চেষ্টা না করে এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করুন না, যাতে আমরা বিচার-বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে অবাধে সেটি প্রয়োগ করার সুযোগ পাই। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের এইটেই তো একমাত্র শর্ত।

বিপ্লবী বাবাজীবনেরা, যতই দিন যাচ্ছে, নির্বাচনের এই প্রাথমিক শর্তটির প্রতি যথোচিত আড়ম্বর সহকারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে নির্বাচনী সভাগুলিতে এক মুখে 'দেখে নেবো দেখে নেবো' করে সবাইকে মাসল্ দেখাচ্ছেন এবং অন্য মুখে 'ফ্রি অ্যানড ফেয়ার ইলেকশন' মিলিটারির আবির্ভাবে বানচাল হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

এইরকম বৈপ্লবিক হরিহর মূর্তি, একাধারে রুদ্র এবং ক্লিন্ন, এ শুধু সি পি এম-এই সম্ভবে। এই বিপ্লবী বাবাজীবনেরা গত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন। এই সকল বাবাজীবন এক দিকে ঘোর বিপ্লবে এবং অন্য দিকে পার্লামেনটারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। এঁরা একাধারে বুর্জোয়াতন্ত্রের মন্ত্রী এবং বিরোধী দলের বিপ্লবী নেতা। একই সময়ে এঁরা রাইটার্স বিলডিংসের তখ্তে সমাসীন থাকেন আবার দলীয় বিক্ষোভ জানাতে রাইটার্স বিলডিংস ঘেরাও করেন। এঁরা একই সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের হর্তাকর্তা, আবার লেঠেল দিয়ে জমি দখল চালিয়ে যান। শ্রমমন্ত্রী, আবার ধর্মঘট উৎসাহদাতা। শিক্ষামন্ত্রী, আবার শিক্ষক-ছাত্রকে পথে বসানোর বাঘা ওস্তাদ। জনগণের দুঃখে এঁদের সতত অশ্রু ঝরে, আবার পাড়া বন্ধের ডাক দিয়ে দিন-আনা দিন-খাওয়া লোকেদের সামান্য রোজগারের পথ বন্ধ করে দেন। এঁরা প্রোলেতারিয়েত কুলের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত গার্জিয়ান, আবার বিড়লা গোষ্ঠীর বিপত্তারণ।

এঁদের ক্রিয়াকলাপ এবং গতিবিধি দক্ষ তাঁতীর হাতে ডাইনে-বাঁয়ে-খটাখট-ঘোরা মাকুর মতোই স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। তাই মার্কসবাদী না বলে মাকুবাদী কমিউনিস্ট বললেই এঁদের চরিত্রচিত্র যথার্থ হয়।

এই মাকুবাদী কমিউনিজম পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অলস ভেকী বিপ্লবী মানসিকতার পক্ষে যতই প্রাণলোভা হোক না কেন, এবং সি পি এম মাকুবাদী বলেই ডালহৌসী স্কোয়ারের কেরানীকুলের এত আদরের,—সৃজনাত্মক কাজের পক্ষে এটা এতই অচল যে, নিশ্চিত অবলুপ্তি থেকে বাঙালীর পুনরুজ্জীবনে উত্তরণ মাকুবাদ দিয়ে সম্ভব নয়। এটা জেনে রাখা ভাল।

অথচ এই রাজ্যের অন্য মহলের রাজনীতির মহাজনেরা এত অপরিণামদর্শী, অহংকারী কলহপরায়ণ, স্বার্থপর এবং বিভ্রান্ত যে, মাকুবাদের কোনও জোরদার সুস্থ বিকল্প আছে কি নেই আজও তা পরিষ্কার জানা গেল না। বাংলার স্বার্থেই এটা অবিলম্বে জানা প্রয়োজন। আজকের রাজনীতি কর্মসূচীনির্ভর হওয়াই উচিত। কোনও একজন জননায়কের বা পার্টির মুখপানে চেয়ে উদ্ধারের মন্ত্র আউড়ে যাওয়া নিতান্ত অর্থহীন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিস্থিতিটা এখনও পর্যন্ত কত জটিল মনোনয়ন-পত্র দাখিলের পালা শেষ হতে সবাই তা বুঝে গিয়েছেন। প্রায় প্রতি কেন্দ্রেই তিনের বেশী প্রার্থী। বহু আসনে প্রার্থী সংখ্যা চারেরও বেশী। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রে।

গোড়ায় যেটা অনেকেই আশা করেছিলেন সেটা হল না। ১৯৬৯ সনের মারচে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পতনের পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী নির্বাচনী লড়াইটা প্রধানত সি পি-এম এবং একটা ব্যাপক সি পি এম-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু নির্বাচন যখন এল তখন দেখা গেল তা হচ্ছে না। সি পি এম এবং সি পি এম সৃষ্ট একটা জোট তো রয়েছেনই, রয়েছেন আরও অনেকে। আছেন আর একটা বামপন্থী জোট—যার নাম চলতি কথায় আট পারটি, আর সাধুভাষায় সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। আর আছেন তিন কংগ্রেস—সবাই আলাদা আলাদা। আদি, নব এবং বাংলা কংগ্রেস ২৮০টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য অন্তত ৬০০ প্রার্থী আসরে নামিয়েছেন। এ ছাড়াও আছেন ছোটখাট দলগুলি—যেমন আর এস পি, লোকসেবক সংঘ, জনসংঘ, মুসলিম লীগ প্রভৃতি।

সব মিলিয়ে ২৮০টা বিধানসভা আসনের জন্য ১২০০-র ওপর প্রার্থী। নাম প্রত্যাহারের পর্বটা সমাপ্ত না হলে সঠিক বলা মুশকিল শেষ পর্যন্ত কত প্রার্থী আসরে থাকবেন। তবে, এটা সবাই জানেন, যাঁরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তাঁদের মধ্যে খুব বেশী লোক নাম প্রত্যাহার করবেন না।

জোট ও দলগুলি সবাই সকলের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকেই আর সবাইকে পরাজিত করে নির্বাচিত হতে চান। সকলেই আশা করছেন, তাঁর বক্তব্য অধিকাংশ ভোটদাতা সমর্থন করবেন। সকলেরই ধারণা, তাঁর বা তাঁদের প্রার্থীরাই বেশী জিতবেন। সবাই বুঝেছেন, এবারের নির্বাচনের ফলাফলের উপর শুধু বাংলা দেশ নয়—তাঁদের দলেরও ভবিষ্যৎ বিরাটভাবে নির্ভর করবে।

নির্বাচনে এবার বহু বাধা। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে আর কোনও দিন নির্বাচন হয়নি। এমন খুনোখুনির আবহাওয়ায় এর আগে কোনও দিন ভোটযুদ্ধ হয়নি। ভোটের সময় এর আগে কোনও দিন গোটা পশ্চিমবঙ্গে সৈন্য নামেনি। পারটিগুলির কাছেও নির্বাচনী লড়াই আর কোনও দিন এভাবে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা হয়ে আসেনি।

এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই নির্বাচনী

কলাকৌশল অনেকটা পালটে গিয়েছে। অন্তত বৃহত্তর কলকাতায়। আমি এখনও গ্রামাঞ্চলের নির্বাচনী আসর দেখিনি। তাই, ওখানে অবস্থাটা কেমন তা ঠিক জানি না।

বৃহত্তর কলকাতার আসরটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে নির্বাচনী আসর তেমন জমেইনি। এবার সেভাবে জমবে বলেও মনে হয় না। কারণ, ভয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধে বহু মানুষই অংশ নিচ্ছেন না। প্রত্যেক দলেই কর্মীর অভাব। বিশেষ করে মধ্যবয়সী মধ্যবিত্ত কর্মীর অভাব। নির্বাচনী কলাকৌশল এঁরাই ভাল জানেন। এঁরাই আসরটাকে জমিয়ে তোলেন। এঁরাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটদাতাদের কাছে আবেদন জানাতে যান। এঁরাই পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী অফিসে ভিড় জমান। এবার বৃহত্তর কলকাতায় নির্বাচনী অফিসও তেমন খোলেনি। অতর্কিত হামলার ভয়ে সবাই অফিসের সংখ্যা একেবারে কমিয়ে দিয়েছেন।

অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে এবার জনসভার সংখ্যাও কম। কম দেখা যাচ্ছে পথ-সভাও। "হাউস টু হাউস স্ক্রুটিনি" নামক যে বস্তুটা নির্বাচনের প্রায় দেড় মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায় এবার তাও দেখা যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে বৃহত্তর কলকাতার এবার নির্বাচনী আসরটা একেবারে ভিন্ন। ভোটদাতারাও মুখ খুলতে একেবারেই নারাজ। যাঁরা ট্রামে বাসে চায়ের দোকানে এত রাজনীতি আলোচনা করতেন সেই বাঙালী জাতি একেবারে চুপ। আগে থেকেই তাঁরা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচনও তাঁদের উত্তেজিত করতে পারছে না—পারবে না।

*

আগেই লিখেছি, গোটা ভারতে যদিও লোকসভার নির্বাচনটাই প্রধান—কেন্দ্রে কে বা কারা সরকার চালাবেন সেই প্রশ্নটাই মুখ্য, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু লোকসভার চেয়েও মানুষে বেশী করে বিধানসভার নির্বাচন নিয়েই চিন্তিত। লোকসভার ৪০টা আসনের মধ্যে এ রাজ্যে কে কত পাবেন সাধারণ মানুষের কাছে তার চেয়ে বড় প্রশ্ন বিধানসভার ২৮০ টার মধ্যে কোন্ দলের ভাগে

কতটা পড়বে। দিল্লিতে ইন্দিরা, না মহাজোট—পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তার চেয়েও বড় প্রশ্ন কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে সি পি এম না নন-সি পি এম।

নির্বাচনী প্রচারের ধারাটাও এখানে তাই ভিন্ন। ইস্যুগুলিও ভিন্ন। এখানের সব নন-সি পি এম পার্টিই এবারের নির্বাচনে শান্তি ও অশান্তির প্রশ্নকে সবচেয়ে বড় করে তুলে ধরতে চাইছেন। কারণ, তাঁরা মনে করছেন শান্তি ও অশান্তির প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে সি পি এমের পরাজয় অবধারিত। তাঁদের হিসাব, সাধারণ মানুষ এই রাজ্যব্যাপী অরাজকতার জন্য মূলত সি পি এমকেই দায়ী করেন। তাঁরা আরও মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এখন সব কিছুর আগে চায় শান্তি—এই মারামারি কাটাকাটির অবসান।

অন্য দিকে সি পি এম চাইছেন এই নির্বাচনকে প্রধানত গরীব ও বড়লোকের লড়াইয়ে পরিণত করতে। তাঁরা ভোটদাতাদের বোঝাতে চাইছেন, সি পি এমই গরীবের বন্ধু—সি পি এম জিতলে তাই গরীব মানুষের ভাল হবেই। সি পি এম নেতারা তাই আবার পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবটাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন। এবার তাঁদের নির্বাচনী প্রচারের মূল বক্তব্য হল : কংগ্রেস বড়লোকের দল, সি পি এম গরীবের দল, সি পি এম বিরোধী সকলেই কংগ্রেসের বন্ধু, বড়লোকের বন্ধু এবং গরীবের শত্রু।

সি পি এম নেতাদের অনুমান, গরীব বড়লোকের সওয়ালটা তুলতে পারলে তাঁরা জিতবেনই। গরীব লোকই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সব গরীব লোক সি পি এমের দিকে এলে নির্বাচনে সি পি এম জিতবেনই। পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা একাই সরকার গঠন করতে পারবেন।

সি পি এমের নেতারা মানেন, গত দেড় দু' বছর ধরে প্রতিদিন গোটা রাজ্যে যে প্রচণ্ড সি পি এম-বিরোধী প্রচার চলেছে এবার দলকে নির্বাচনে জিততে হলে সেইটা আগে কাটিয়ে উঠতে হবে। সি পি এমই দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য দায়ী এই ধারণাটাও বহু মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। এবং সর্বোপরি দলের সাধারণ সমর্থকদের মন থেকে ভয়ের ভাবটা কাটিয়ে তুলতে হবে। যাতে তাঁরা প্রকাশ্যে নির্বাচনী প্রচারে এগিয়ে আসতে সাহস পান, যাতে তাঁরা ভোটের দিন হাজারে হাজারে নেমে আসতে পারেন।

*

সি পি এমের ইতিমধ্যেই একটা সুবিধা হয়ে গিয়েছে—সি পি এম-বিরোধীরা কোনও ব্যাপক জোট গঠন করতে পারেনি। তাঁরা নানাভাবে বিভক্ত। আগে সবাই প্রধানত সি পি এম-বিরোধী প্রচার চালাতে পারলেও এখন আর পারছেন না। এখন সবাই সবার বিরুদ্ধে। সকলেই সকলকে আক্রমণ করছেন।

যদি সি পি এম-বিরোধী ভোটটা বেশ ভালভাবে ভাগ হয়ে যায় তাহলে সি পি এম প্রদত্ত-ভোটের মোট ৩০% ভোট পেয়েও জিতে যেতে পারেন। যদি ধরুন কোনও কেন্দ্রে মোট প্রদত্ত ভোটের ৩০% পান সি পি এম প্রার্থী, ২৫% পান নব কংগ্রেস প্রার্থী, ১৮% পান ইউ এল ডি এফ প্রার্থী, ১৫% পান বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী এবং ১২% পান আদি কংগ্রেস প্রার্থী তাহলে নিশ্চয়ই খুব কম ভোট পেয়েও সি পি এম ১৪১টা আসন অনায়াসেই পেয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু সি পি এম-বিরোধী দল এবং জোটগুলি বলছেন, তা হবে না—কারণ সি পি এম-বিরোধী ভোট ঠিক ওভাবে ভাগাভাগি হবে না। প্রত্যেক কেন্দ্রের সি পি এম-বিরোধী ভোটদাতারা বেছে নেবেন কে সবচেয়ে শক্তিশালী সি পি এম-বিরোধী প্রার্থী। অধিকাংশ সি পি এম-বিরোধী ভোটদাতা সেই প্রার্থীকে ভোট দেবেন। তাই সি পি এম-বিরোধী ভোট সেইভাবে বিভক্ত হবে না। সি পি এম-বিরোধীরাই জিতবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ১৯৬৭ সনের নজির টানেন। বলেন, সেবারও কংগ্রেস-বিরোধী দুই ফ্রন্ট হয়েছিল। তবু, ভোটদাতারা বিভিন্ন কেন্দ্রে একজন কংগ্রেস বিরোধী ভোটদাতাকে বেছে নিয়েছিলেন। এবং ফলে, কংগ্রেস হেরেছিল। এবারও সি পি এম-বিরোধী ভোটদাতারা সেইভাবেই রায় দেবেন। এইটাই তাঁদের মূল ভরসা।

১৩-২-৭১

নিবারণ গুপ্ত

দেবরাজ

আবার চাঁদে

আমেরিকার যাকে বলে গরজ বড় বালাই। সে যে ঠিক করেছে নিয়ম করে চাঁদে মানুষ পাঠাবে সে সংকল্পের দেখা যাচ্ছে নড়চড় হবার জোটি নেই। তার বরাত জোর এ পর্যন্ত অঘটন তেমন কিছু ঘটে নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ? হিউস্টন থেকে মহাকাশে যারাই পাড়ি দিয়েছে তারাই বহাল তবিয়তে মর্ত্যে ফিরে এসেছে। তাই বলে বিভ্রাট কখনও দেখা দেবে না এমন কথা জোর করে কেউ কী বলতে পারে? অ্যাপোলো তেরো তো ধ্বংসপুরীর দরজা থেকে ফিরে এসেছিল। সে অভিযানে যে তিনজন মহাকাশচারী যোগ দিয়েছিলেন চাঁদে নামতে তাঁরা কেউই পারেন নি তাঁদের যন্ত্রপাতি বিগড়োবার দরুন। তা না পারুন। জেম্‌স্ লোভেল, ফ্রেড হেস আর জন সুইগার্ট যে ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলেন এই ঢের। কারুর কারুর মনে হয়েছিল চাঁদে বেড়াবার সাধ আমেরিকানদের মিটে গিয়েছে। আর গেলেই বা কী? একবার নয় দু-দুবার দিব্যি চাঁদে পাড়ি দিয়ে তারা তো সকলের ওপর টেক্কা দিয়েছে। আর না হয় নাই গেল।

সে ধারণা সত্যি বলেই মনে হয়েছিল যখন অ্যাপোলো ১৪র যাত্রার দিন বারবার বদলানো হতে লাগলো। সত্তরের জুলাই থেকে পেছিয়ে পেছিয়ে তারিখটা আনা হল একাত্তরের গোড়ায়। লোকে ভেবেছিল ও তারিখও হয়তো পালটাবে। তা কিন্তু হয়নি। ৩১ জানুয়ারি অ্যাপোলো চোদ্দ তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে উড়ে গিয়েছিল চাঁদে, আবার ন'দিন পরে তাদের ফিরিয়ে এনেছে নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে। জুলাই মাসে চাঁদে যাওয়ার অভিযান যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সে পর্ব বাতিল করে দেওয়ার জন্যে নয়, যাতে ভালোয় ভালোয় কাজটা চুকিয়ে ফেলা যায় সে ব্যবস্থা করার জন্যে। এপ্রিল মাসে অ্যাপোলো তেরোর মহাকাশযান যখন অল্পের জন্যে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে গেল তখন মার্কিন বিজ্ঞানী আর প্রয়োগবিদরা রণে ভঙ্গ দিতে চাননি। তাঁরা কেন অমন হলো সে রহস্য জানবার জন্যে একটা তদন্ত শুরু করেছিলেন। তা শেষ হয়েছিল গেল বছর জুনে। তদন্ত করে যে সব খুঁত ধরা পড়েছিল তা শুধরে নেবার জন্যেই এই দেরী। খামখা বাড়তি ঝুঁকি নিতে মার্কিন সরকার আর চাননি।

শুধু ও ৩১ জানুয়ারি যখন অ্যাপোলো চোদ্দর যাত্রা শুরু হলো স্টুয়ার্ট রুসা, অ্যালান শেপার্ড আর এডগার মিচেলকে নিয়ে তখন কেবল তিন মহাকাশচারী আর তাঁদের বউ আর ছেলেমেয়েদের বুক দুর দুর করেনি কেঁপেছিল যাঁরা মর্ত্যে থেকে মহাকাশে ওই অভিযান চালাচ্ছিলেন। সে বুক দুরদুর রীতিমত হৃৎকম্পে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যাত্রার আদি পর্বে। মাটি ছাড়িয়ে শূন্যে ওঠার ঘণ্টা তিনেক পরে রুসা যখন মূল জাহাজকে চাঁদের ভেলার সঙ্গে জুড়তে গেলেন তখন দেখা গেল তিনি ফসকে যাচ্ছেন। একবার নয়, দুবার নয়, অমনি ঘটলো পাঁচবার। শেষকালে রুসা আর মিচেল দুজনে মিলে জোড়টা কোনো মতে লাগিয়ে দিলেন—বারোটা আঁকড়ায় সে গাটছড়া মজবুত করে বাঁধা হলো। ঘাম দিয়ে তখন জ্বর ছাড়লো তিন মহাকাশচারীর আর হিউস্টনের বিজ্ঞানী আর প্রয়োগবিদ-দের। জোড়টা যদি না লাগতো তা হলে অবশ্য মহাকাশচারীদের প্রাণে মারা যাবার কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু চাঁদে তাঁরা আর নামতে পারতেন না। মাঝপথ থেকেই তাঁদের খালি হাতে ফিরে আসতে হত মর্ত্যে। অভিযানটা হত মাটি।

বিপদের কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। দেখা গেল চাঁদের ভেলার দুটো ব্যাটারির একটা সামান্য একটু কমজোর হয়ে পড়েছে। হিউস্টনের লোকজনদের খুঁতখুঁতুনি যেতে না যেতেই খবর এল ভেলার কম্পিউটার অর্থাৎ গণকযন্ত্র বিগড়েছে, তা থেকে ভুল নির্দেশ আসছে। বসল বৈঠক মাটিতে, পাওয়া গেল ভুল শোধরাবার উপায়, তা বাতলে দেওয়া হল হাজার হাজার মাইল দূরে মোচার খোলার মত মহাশূন্যে ভেসে থাকা চাঁদের ভেলায়। এর পর আর কিছু গড়বড় হল না। মূল জাহাজ নিয়ে চক্কর দিতে লাগলেন মহাকাশ রুসা, চাঁদে নামলেন ভেলা থেকে টুপ করে গোড়ায় শেপার্ড তারপর মিচেল। চাঁদে বেড়ালেন তাঁরা দুবার। প্রথমবার চালালেন রিকশা যা তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কথা ছিল দ্বিতীয়বার চক্কর দেওয়ার সময় তাঁরা উঠবেন চাঁদের পাহাড়ে। সে কাজ তাঁরা কিন্তু করে উঠতে পারেননি। খানিকটা গিয়েই তাঁরা এমন হাপরের মত হাঁপাতে লাগলেন যে, ঘাবড়ে গিয়ে হিউস্টনের কর্তারা হুকুম দিলেন আর এগুতে হবে না—এবার ভেলায় ফিরে যান। দুবার ঘোরাঘুরি করে যা করেছেন তাই ঢের।

এর পর ঘটনা কী দুর্ঘটনা বিশেষ কিছু ঘটেনি। তিন মহাকাশচারী এখন স্বদেশে। একুশ দিন তাঁদের রাখা হয়েছে সমাজ সংসার থেকে আলাদা করে যাতে তাঁদের ছোঁয়াচ কারুর না লাগে। উদ্দেশ্য চাঁদ থেকে কোনো রোগের বীজ কিংবা অজানা কোনো জীবাণু তাঁদের সঙ্গে মর্ত্যে চলে এসেছে কি না সেটা যাচাই করে দেখা। চাঁদে যাওয়া অবশ্য মানুষের এই প্রথম নয়। এর আগেও দুবার মানুষ চন্দ্রলোক থেকে ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু জানা-অজানা কোনো রোগই তারা ছড়ায় নি। তবু সাবধানের মার নেই। একই জায়গায় তো ফি বার চাঁদের ভেলা নামছে না, চাঁদটা এক চিলতে জায়গাও নয়। কাজেই আগেরবার কোনও ছোঁয়াচ লাগেনি বলে পরের বারও লাগবে না, এ কথার কোনো মানে নেই। তাই যতটা সম্ভব সাবধানে চলতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদ থেকে যে নুড়ি আর পাথর দুই অভিযাত্রী নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে কিছু জীবন্ত প্রাণী রেখে দেওয়া হয়েছে তাদের কোনও ছোঁয়াচ লাগে কিনা দেখার জন্যে। পণ্ডিত-দের ধারণা চাঁদের ধুলো-নুড়ি-পাথরে মানুষের কেন কোনো জীবেরই কিছু অনিষ্ট হবে না। সে ধারণা যে ঠিক তার জন্যেই এত সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

চাঁদে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকা এখন এক এবং অদ্বিতীয়। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন ক্ষমতা অন্য কোনও রাষ্ট্রের নেই। যে পারত সে আর এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে না। এককালে মনে হয়েছিল চাঁদে মানুষ পাঠাতে কেউ যদি পারে তো পারবে রাশিয়া। তাদের গুমর ভাঙবার পণ করেছিলেন কেনেডি, পেরেও ছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোনও দিন রাশিয়া বলেনি চাঁদে মানুষ পাঠাবার ইচ্ছে তার আছে কিংবা ও নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে সে পাল্লা দিচ্ছে। বরঞ্চ উলটোটাই বলা হয়েছে রুশীদের পক্ষ থেকে। তারা বলছে চাঁদের রহস্য জানাই তাদের উদ্দেশ্য, আর তা তারা যন্ত্র দিয়েই করতে পারছে। চাঁদে স্বয়ংচালিত মোটরগাড়ি তারা পাঠিয়েছে ১৭ নভেম্বর। এখনও তা কাজ করে যাচ্ছে। চাঁদের হাঁড়ির খবর তারা আনতে পেরেছে যান্ত্রিক উপায়ে, পাথরও। যিনি লুনাখোদ ১ বানিয়েছেন সেই রুশী যন্ত্রবিদ বলেছেন অ্যাপোলো চোদ্দ অসাধ্য সাধন করেছে সত্যি, তবে এমনভাবে মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলার দরকারটা কী? মহাকাশযান দিন দিন আরও মজবুত আর নিরাপদ হচ্ছে বটে। কিন্তু এমন যান এখনও তৈরি করা যায় নি যা নিয়ে নির্ভয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়া যায়। বাহাদুরি যা তো হয়েই গিয়েছে, আর কেন? এই হচ্ছে রুশীদের মত।

বিদেশে (৪)

সোফাটা মোলায়েম। সামনে ছোট্ট একটি টেবিল।

বেঞ্চার মুখে বসে আছি। এমন সময় দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দু' হাতে দুটি ভর্তি ওয়াইনগ্লাশ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক যতখানি নিচু হয়ে অপরিচিত জনকে বাও করাটা কেতা-দুরস্ত তাই করে শুধোলেন, "ভু পেরমেতে, মসিয়ো"— অর্থাৎ "আপনার অনুমতি আছে, স্যার?" "নিশ্চয়, নিশ্চয়।" যদিও সোফাটির যা সাইজ তাতে পাঁচজন কিংকং অনায়াসে বসতে পারে তবু ভদ্রতা দেখাবার জন্য ইঞ্চিটাক সরে বসলুম। ভদ্রলোক ফের কায়দামাফিক বললেন "ন ভু দেরাঁজে পা, জ ভু প্রী"। এর বাঙলা অনুবাদ ঠিক কি যে হবে [illegible] ফরাসী জানিনে, বাঙলাও না। [illegible] ব্যক্ত হবেন না। ঠিক [illegible]।" উর্দুতে বরঞ্চ খানিকটে বলা যায় "তকল্লুফ ন কীজীয়ে" ঐ ধরনের কিছু একটা। "তকল্লুফ" কথাটা "তকলীফ" (বাঙলায় কিছুটা চালু) অর্থাৎ "কষ্ট"। মোদ্দা: "আপনাকে কোনো কষ্ট দিতে চাইনে।"

সেই দুটো গ্লাশ টেবিলে রেখে একটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আরেকটা নিজে তুলে নিয়ে বললেন, "আপনার স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য।"

চেনাশোনা কিছুই নেই। খোদার খামোখা এ-লোকটা একটা ড্রিংক দিচ্ছে কেন? তবে কি লোকটা কনফিডেনস ট্রিকস্টার? আমাদের হাওড়া শ্যালদাতে যার অভাব নেই। ভাবসাব (কনফিডেনস) জমিয়ে বলবে "দাদা, তা হলে আপনি টিকিট দুটো কিনে আনুন। এই নিন আমার লিলুয়ার পয়সা, আমি মালগুলো সামলাই"। টিকিট কেটে ফিরে এসে দেখলেন, ভোঁ ভাঁ। আপনার মালপত্র হাওয়া।

কিন্তু এ-লোকটা আমার নেবে কি? "সুকুমার রায় (?) একদা একটি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। বিরাট ভুঁড়িওলা জমিদার টিঙ-টিঙে দারওয়ানকে শাসিয়ে শুধোচ্ছেন "চোর ভাগা কিঁও?" দারওয়ান বললে "মেরা এক হাতমে তলওয়ার দুসরেমে ঢাল। পকড়ে কৈসে?"—আমার এক হাতে তলওয়ার অন্য হাতে ঢাল। ধরি কি করে?

আমার এক পাশে আমার মিত্রের দেওয়া এটাচি, অন্যদিকে এ্যার ইণ্ডিয়ার দেওয়া ছোট্ট একটি বাক্সো। দুটোই তো বগল দাবা করে বসে আছি। লোকটাকে দেখে তো মনেও হচ্ছে না, ও স্বর্গত পি সি সরকার (এ স্থলে বলে রাখা ভালো সরকার কখনো এহেন অপকর্ম করতেন না) যে আমার দুটি বাক্স সরিয়ে [illegible] এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ-রকম [illegible] পোশাক-আশাক আমি একমাত্র ডিউক অব উইন-ডসরকে (উচ্চারণ নাকি উইনজার) পরতে দেখেছি—জীবনে একবার। ডিউকের জীবনে একবার নয়, আমার জীবনে একবার। সে বেশের বর্ণনা অন্যত্র দেব।

একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন। তাঁর নাম আঁদ্রে দ্যুপোঁ। তারপর এক গাল হেসে শুধোলেন, "যদি অপরাধ না নেন তবে একটি প্রশ্ন শুধোই, আপনি কি কস্টিঙে বিশেষজ্ঞ?"

আমি থতমত খেয়ে শুধোলুম "কস্টিঙ? সে আবার কি?"

ভদ্রলোক আরো থতমত খেয়ে কিন্তু চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "সে কি মশাই! এই মাত্র আপনার অনবদ্য লেকচারটি শুনলুম, আপনি ক' হাজার টাকা ঝেড়ে কলকাতা থেকে এ-দেশে আসার রিটরন টিকিট কেটেছেন, এবং কনেকশন না পেয়ে তিন ঘণ্টাতে আপনার কি পরিমাণ অর্থক্ষয় হল তার পুরোপাক্কা, করেক্ট টু দি লাস্ট সাঁতিম, ব্যালানস শীট। একেই তো বলে কস্টিঙ। আমি ব্যবসাবাণিজ্য করি। ঐ নিয়ে নিত্যি নিত্যি আমার ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি আপনার কাছে এসেছি একটি প্রস্তাব নিয়ে। আপনার যখন তিন ঘণ্টা বরবাদ যাচ্ছে তখন এক কাজ করুন না? মিনিট পনেরো পরে এখান থেকে একটা প্লেন যাচ্ছে জিনীভা: আমি সে প্লেনে যাচ্ছি। আপনি চলুন আমার সঙ্গে জিনীভায়। আমার সামান্য

একটি বাড়ি আছে সেখানে। আপনার খুব একটা অসুবিধে হবে না। বেড রুম, বাথ-রুম, ডাইনিংরুম, স্টাডি সব নিজস্ব পাবেন। (আমি মনে মনে মনকে শুধালুম একেই কি বলে "সামান্য একটি বাড়ি"?)। আমাদের সঙ্গে আহারাদি, দু' দণ্ড রসালাপ করে জিরিয়ে জুরিয়ে নেবেন। তারপর আপনাকে আপনার মোকাম, কলোনগামী প্লেনে তুলে দেব।" তারপর একটু ইতি-উতি করে বললেন, "কিছু মনে করবেন না। আমি এ-প্রস্তাবটা নিজের স্বার্থেই পাড়ছি। আমার একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ষোল, চোদ্দ, দশ। আপনার সঙ্গে আলাপচারী করে তারা সত্যই উপকৃত হবে। এদেশে চট করে একজন ইণ্ডিয়ান পাওয়া যায় না। পেলেও তিনি ফরাসী জানেন না। আর আমার বীবী খাসা রাঁধতে পারেন—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "কিন্তু এই দশ মিনিটের ভিতর আপনি আমার জন্য জিনীভার টিকিট পাবেন কি করে?"

মসিয়ো দ্যুপোঁ মুচকি হেসে বললেন, "সেই ফরমুলা, "ন ভু দেরাঁজে পা"— আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। এটা ওটা ম্যানেজ করার কিঞ্চিৎ এলেম আমার পেটে আছে; নইলে ব্যবসা করি কি করে! কাচ্চা-বাচ্চারা বড় আনন্দ পাবে। প্লেনের ভাড়াটার কথা আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না—"

আমি ফের বাধা দিয়ে বললুম, "আপনি ও-বাবদে চিন্তা করবেন না। এয়ার-ইণ্ডিয়ার আমার টিকিটটি অমনিবাস, অর্থাৎ যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারি, তার জন্য আমাকে ফালতো কড়ি ঢালতে হবে না (পাঠক, এ ধরনের মোটর অমনিবাসকে কবিগুরু নাম দিয়েছেন বিশ্বম্ভর। এবং তদীয় অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ মোটর গাড়ি, অটমবিলকে, যেটা আপন শক্তিতে চলে, তার নাম দিয়েছিলেন স্বতশ্চলশকট। অতএব এ স্থলে আমার যানবাহন প্লেনের টিকিটকে "স্বতশ্চল বিশ্বম্ভর মূল্য পত্রিকা" অনায়াসে বলা যেতে পারে)।"

একটু থেমে বললুম, "আমি এখখুনি আসছি।" অর্থাৎ সে-স্থলে যাচ্ছি, যেখানে রাজাধিরাজও ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারেন না অর্থাৎ শৌচাগার।

সেদিকে যাইনি। যাচ্ছিলুম অন্য পথে। এ্যাটাচি বাক্সো সোফাতেই রেখে এসেছি। এ রকম সহৃদয় সজ্জনকে বিশ্বাস করে আমি বরঞ্চ ও দুটো হারাবো, অবিশ্বাস করতে ঘেন্না ধরে। গেলুম 'বার'-এ। সেখানে মসিয়ো যে ওয়াইন এনেছিলেন তারই দু' গ্লাস কিনে ফিরে এলুম সোফায়। একটা গ্লাস তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে বললুম, "আপনার আন্তরিক আমন্ত্রণের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা বড়ই অসুবিধে আছে। কলোন এ্যারপর্টে আমার বন্ধুবান্ধবরা অপেক্ষা করছে। তারা খবর নিয়ে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছে, আমি তিন ঘণ্টা পরে কনেকশন পাবো। আমি আপনার সঙ্গে জিনীভা গেলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। তারা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে।"

আর মনে মনে ভাবছি, ইহ সংসারে, এমনকি ইয়োরোপেও, সেই বাগদাদের আবু হোসেনও আছে যারা রাস্তায় অতিথির সন্ধানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে একা এক খেতে পারে না।

মসিয়ো বড্ডই দুঃখিত হয়ে প্রথম বললেন, "কিন্তু আপনি আবার আমার জন্য ড্রিংক আনলেন কেন? এ কি দেনা-পাওনা!"

আমি মাথা নিচু করলুম। দ্যুপোঁ বললেন, "তা-হলে দেশে ফেরার যাবার সময়ে আমার ওখানে আসবেন?"

তার একটি পকেট-বই বের করে বললেন, "কিছু একটা লিখে দিন। ছেলেমেয়েরা খুশী হবে।" আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম:

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

হায়! ফেরার পথেও দ্যুপোঁর বাড়িতে যেতে পারিনি।

সুশীল রায় • ময়না

তীব্রবেগে ছুটে এসে একটা দীর্ঘ বর্শা যেন বিঁধে গিয়েছে বালিয়াড়ির মধ্যে, কালো দণ্ডটি অসাড় হয়ে পড়ে আছে দিগন্তকে দু ফালা করে; ওই বালিয়াড়ির মধ্যে বিঁধেছে অবশ্য সেই সড়কির ফলকটিই মাত্র।

এই সামান্য ব্যাপারটাকে কবিত্বের বাহাদুরি দিয়ে বলতে গেলে অবশ্য ওই ভাবেই বলা যেতে পারে। কিন্তু ওতে হয়তো কবিত্বই করা হয়, পরিষ্কার করে কিছুই বলা হয় না।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছু না। খুব বেশি চওড়া না—এমনি একটা মসৃণ পীচের রাস্তা সোজা লম্বা দৌড় দিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে থেমে গিয়েছে, হঠাৎ রাস্তাটা ফুরিয়ে গিয়েছে একটা বালিয়াড়ির কাছে।

কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে এমন কবিত্ব করার যে শখ হল, তার কারণ ময়না।

এবং হঠাৎ যে বর্শার কথা আর বিঁধে যাবার কথা মনে হল, তার কারণও ওই ময়না।

সফরে চলেছি চন্দনেশ্বর। তীর্থ করতেও অবশ্য অনেকে ওখানে যায়। কিন্তু আমি—আবার একটু কবিত্ব করেই বলি—তীর্থের কাক নই, সফরের শঙ্খচিল। আমি সফরেই চলেছিলাম। কিন্তু মাঝপথে পড়ে গেলাম এই ফাঁপরে।

আমার এই ছত্রিশ বছরের জীবনে এমন ফাঁপর কখনো দেখিনি। কখনো দেখতে হবে তা ভাবিওনি। যাকে বলে জীবনকে সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা করে ফেলা, এখন মনে হচ্ছে এখন সেইরকম করে ফেললেই সুবিধে হয়।

বর্শার ফলকটা যেখানে এসে বিঁধে গিয়েছে সেটা আমার বুকে অবশ্যই, কিন্তু সে কথা অন্য। এখন যে কথা হচ্ছে, অর্থাৎ যে কবিত্বটুকু করে এই কথা আরম্ভ করা গিয়েছে সেই জায়গাটা হচ্ছে বাংলার শেষ, উড়িষ্যার শুরু। এখানে মেদিনীপুরের সীমানা সমাপ্ত হল, এবং ঐ বালিয়াড়ি থেকে আরম্ভ হল উড়িষ্যা।

সমুদ্রের কিনার এ জায়গাটা। কানে এসে পৌঁছচ্ছে সমুদ্রের গর্জন। একটু উঁচু টিলার উপর দাঁড়ালে সমুদ্রের ঢেউ দেখা যায়।

নিজেকে সফরের শঙ্খচিল বলে উল্লেখ করেছি। ভুল করিনি। এই ছত্রিশ বছরের জীবনের মধ্যে শেষ বারোটা বছরের বেশির ভাগ সময়ই সফর করে করে কাটছে।

কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিলাম পাসটাও করে ফেলা গেছে। কিন্তু ডাক্তারিতে মন

বসছে না। একটা তৈরি ডিসপিনসারিও পেয়ে গেছি। কাকার ডিসপেনসারি। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ নামে কলকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটা রাস্তা আছে, বেশ বড় রাস্তা। সেই রাস্তার উপরেই ডিসপেনসারিটা। তার নাম —'মাই ডক্টর'। বেশ আধুনিক নামটা। অল্প বয়সে কাকা মারা গেলেন, ডিসপেনসারি চালাবার ভার বর্তালো আমার ওপর। আমি সেখানে মাঝে-মাঝে বসি বটে, কিন্তু আমার মন কিছুতেই বসে না।

ঘুরে বেড়াতেই আমার বেশ ভালো লাগে। ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত হই তখন ফিরে গিয়ে বসি ঐ ডিসপেনসারিতে। এটা যেন ডাক্তারখানা নয়, এ যেন আমার বিশ্রামখানা।

আমার মতিগতি দেখে মা কাকিমা ও দাদারা বেশ চিন্তিত। সংসারের ফাঁদে আমাকে বেঁধে ফেলার জন্যে তাঁদের ষড়যন্ত্র লেগেই আছে। তার আঁচ পাই। কিন্তু কিছুই যেন বুঝতে পারছি নে, এইরকম একটা ভঙ্গি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডিসপেনসারিতে এসে বসি।

কম্পাউন্ডার নরসিংহবাবু বেশ সজ্জন। ডিসপেনসারিতে আমি যে উপস্থিত নেই —এটা কাউকে বুঝতে দেন না। এই জন্যে তাঁকে আমার ভারি পছন্দ। তাঁর মত লোক না থাকলে এতদিনে ডিসপেনসারিটি লাটে উঠত। কাকার স্মৃতি এই ডাক্তারখানাটি—এটা বন্ধ হয়ে গেলে কাকিমা যে খুব কষ্ট পাবেন, তা বুঝতে পারি।

সেই জন্যে, অনেক চেষ্টা করে নিজেকে ওখানে আটক রাখি। কিন্তু বেশিদিন পারি নে, হঠাৎ মন ছটফট করে ওঠে, অমনি বেরিয়ে পড়ি। যেমন বেরিয়ে পড়েছি এবার।

এই ভাবে দেখা হয়ে গিয়েছে ভারতের বহু জায়গা। আমার মত এই বয়সে এত জায়গা দেখেছে, তেমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি হবে না—এটা নিশ্চিত।

শুধু তো জায়গা দেখা না, দেখেছি অনেক মানুষ—অনেক রকমের মানুষ। দেখেছি অনেক রকমের চেহারা। কত বিচিত্র রকমের মানুষ আর কত বিচিত্র রকমের চেহারা দিয়ে যে এই ভারতবর্ষ তৈরি, তা ভাবতেই অবাক লাগে।

বাংলা আর উড়িষ্যা যেখানে এক হয়েছে সেই বালির অপ্রশস্ত এলাকা জুড়ে কতকগুলি কাঁচা ঘর এলোমেলো ছড়ানো। এগুলি দোকান। চায়ের দোকান, পানের দোকান, খাবারের দোকান।

যেসব যাত্রী ঐ লম্বা কালো পিচের রাস্তা পার হয়ে আসে তারা ক্লান্ত হয়ে এসে বসে একটু জিরোয়, একটু গলা ভিজিয়ে নেয়। তাদের জন্যেই ক্ষুদে-ক্ষুদে দোকানের এই আয়োজন।

আমিও ঐ পথ পার হয়ে এসে ক্লান্ত হয়েছি। আমি একটা দোকানের সামনে গিয়ে লম্বা বেঞ্চের এক কোণে বসে পড়লাম।

যাত্রী-সমাগম এখন খুব কম। চন্দনেশ্বরের সিজন নাকি এটা নয়। সেখানে যখন মেলা বসে, তখন এই দোকানগুলো নাকি সরগরম হয়ে ওঠে।

আজ আমি একা এখানে। বেলাও এখন বেশ হয়েছে। এক কাপ চা খেলাম। দোকানীর সংগে না-ওড়িয়া না-বাংলো ভাষায় কথা বলে এ তল্লাটের খবরাখবর নিতে লাগলাম।

বনের থেকে বেরোনো টিয়ে-গোছের দোকানঘরের পিছন থেকে ওটা কে বেরিয়ে এল। এই বালুকাময় মরুর দেশে মনে হল এ যেন ওয়েসিস। বেশ লম্বা চেহারা, বেশ স্লিম, গায়ের রং বেশ ফর্সা—একটা গাঢ় নীলরঙের শাড়িতে শরীর আধ-ঢাকা করে বেশ সপ্রতিভভাবে সে এসে দাঁড়াল দোকানে। কোনো জড়তা নেই, কোনো সলজ্জ ভাব নেই, কোনো নির্লজ্জতা নেই। আত্মমর্যাদায় একটু বাধলও বটে, এই মেয়েটা কি আমাকে একজন পুরুষ মানুষ বলে গ্রাহ্যই করছে না?

বললাম, "এক-খিলি পান দাও।"

কাঁধের উপরে কাপড় একটু তুলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান সাজতে লাগল। আমি উদাসীনের মত কখনো আকাশ দেখছি, কখনো মেঘ, কখনো বা পান-সাজা।

কোনো কথা না বলে সে এগিয়ে দিল পান। আমি বুঝি একটু চমকেই তাকালাম ঐ পানের দিকে। আমি চাইলাম পানের খিলি, কিন্তু ও যেটা এগিয়ে ধরেছে সেটা যে অবিকল পানের পুলি।

অত্যন্ত মনোরম লাগল আমার। পানটা দেখতে একেবারে পুলির মত, তেমনি লম্বা, এবং কিনারটা ছোট-ছোট ভাঁজ করা—তার একদিকে একটি লবঙ্গ গাঁথা, অন্যদিকে বোঁটার উপায় এক বিন্দু চুন।

যদি ডিস্পেনসারিতেই বসে থাকতাম, যদি এদিকে এসে না পড়তাম তাহলে এ জিনিস তো দেখা হত না। আমি যে বেরিয়ে-বেরিয়ে পড়ি তা কি আর সাধে? কিন্তু এ কথা কাকে কী করে বোঝাব?

অনেক অনিয়ম চলেছে এই শরীরের উপর দিয়ে। এভাবে এলোমেলো ভাবে বেরিয়ে পড়লে নাওয়া-খাওয়ার কোনো ঠিক থাকে না। কিন্তু স্বাস্থ্যটা এখনও ভালো আছে, তাই যা বাঁচোয়া—অন্তত বন্ধুবান্ধবেরা তো তাই বলে।

পানটা মুখে দিতে মায়া হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল অমন সুন্দর করে সাজা জিনিসটা চট করে নষ্ট করে ফেলি কী করে। পানটা হাতে নিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম খাবার কিছু আছে কিনা।

মেয়েটা ঠোঁট উল্টে জানাল কিছু নেই। একটু ভেবে বলল, "নাড়ু আছে। নারকেলের নাড়ু।"

একটা নাড়ু মুখে পুরে স্বাদ পেলাম, আরও গোটা কয়েক নিয়ে ভরে ফেললাম থলির মধ্যে। থলির মধ্যে বোতলে-ভরা জল আছে, সঙ্গে রইল নাড়ু—হোক-না

চন্দনেশ্বর চার মাইল পথ, এতে আর ভাবনা কিসের।

অতি জাগ্রত দেবতা নাকি এই চন্দনেশ্বর। লোকের মনোবাঞ্ছা পূরণ নাকি তিনি করেনই। তাই বুঝি? তাহলে কী জিনিস তাঁর কাছে চাওয়া যায় তাই ভাবতে-ভাবতে হাঁটা দিলাম।

এখান থেকে কাঁচা-পথ বা পাকা-পথ কিছুই নাকি নেই, মাঠ-ময়দান ক্ষেত-খামার পার হয়ে-হয়ে চলে যেতে হবে। পথে কোনো লোকজন পেলে তাদের জিজ্ঞাসা করলে দিক ব'লে দেবে—এই ভরসায় রওনা হওয়া গেল।

পরিব্রাজকের মতন চলেছি একা। পরনে পরিব্রাজকের বেশ। আঁটো পায়জামা ও রঙিন পাঞ্জাবিতে শরীর ঢাকা। কাপড়ের ঝুলন্ত থলি কাঁধে। ঐ থলির নাম দিয়েছি হোল্ড-অল। জামা-কাপড় থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক রকম টুকিটাকি জিনিসে ওটা ঠাসা, বেতের টুপিও একটা আছে রোদ বা জল আড়াল করার জন্যে। কখনো তেমন দরকার হলে থলিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়াও চলে।

শহর-কলকাতার জনারণ্য দেখলে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই বুঝি মানুষ দিয়ে ঠাসা। কিন্তু এই পৃথিবীতেই এমন জায়গাও আছে যেখানে কোনো মানুষের বাস নেই। সেইসব জায়গার মধ্যের একটা হচ্ছে চন্দনেশ্বরের এই পথ।

অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁটছি, কিন্তু দিক জেনে নেব এমন একটা প্রাণী এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। মাথার উপরে বিরাট একটা আকাশ যেন বিরাট একটা জাম-বাটির মতন উপুড় হয়ে আছে, আশে-পাশে কেবল বালির ক্ষুদে পাহাড়, তার মাঝে-মাঝে আগাছারা যেন মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠে মাটি ফুঁড়ে উঁকি দিচ্ছে। কোথাও কোথাও বুনো-ফুলেরা বাহার বিছিয়ে গুচ্ছ বেঁধে দাঁড়িয়ে মৃদু হাওয়ায় একটু টলাটলি করছে।

মাঝে-মাঝে বাইরে না বেরোলে এমন জিনিস কি দেখা যায়?

কিছুটা ঢালু পথে নেমে যেতেই দেখা গেল ক্ষেত। চাষ-আবাদ হয়েছে, কিন্তু ফসল এখনো ফলেনি। ভাঙা-ভাঙা আল-পথ ধরে ওপারে গিয়ে উঠলাম। ওপার একটু সজল। গাছ-গাছড়া আছে। গোরুর বা ছাগলের গলায় বাঁধা ঘুণ্টির টুংটাং শব্দ কানে আসছে জঙ্গলের ভিতর থেকে। প্রাণের সাড়া পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ এল। চারদিকের রোদকে জ্যোৎস্না মনে করে নিলে এ সময়টাকে গভীর রাত্রি বলে ধরা যায়। তা যদি যায়, তাহলে এই নির্জন প্রান্তরে নিশাচর তো আমি একা।

অনেক ঘুরে-ঘুরে ধীরে-ধীরে চলেছি। মনে হচ্ছে, আবার গিয়ে বোধ হয় উঠব ঐ পানের দোকানেই। সেখানে পৌঁছে নিতান্ত বেকুবের মতন দাঁড়াব তারই সামনে যার তৈরি-করা পানটি এখনো আমি মুখে পুরতে পারিনি। ওটা থাক থলির মধ্যে, চন্দনেশ্বরে পৌঁছে আহারাদি সেরে ওটা তারিয়ে-তারিয়ে খাওয়া যাবে।

আল-পথ গলি-পথ অরণ্য-পথ পার হতে-হতে চলেছি। চলতে-চলতে অবশ্যই একটা-না-একটা নিশানা পাওয়া যাবে, মনের মধ্যে মাত্র এই ভরসাটি সম্বল। আর এইভাবে রোদ মাথায় ক'রে চলতে-চলতে একটু যদি অসুস্থতা বোধ হয় তার দাওয়াইও আছে সঙ্গে। আমি ডাক্তার—অনেক স্যাম্পল ট্যাবলেট আসে নানারকম রোগের, তার মধ্যে থেকে কিছু বাছাই-করা ট্যাবলেট রেখেছি এই থলিতে ভ'রে। এটা আমার হোল্ড অল —এতে আমার সব ধরে।

অনেকটা মাটি-পথ হেঁটে এসে আবার পৌঁছলাম বালির রাজ্যে। সমুদ্রের এত কাছাকাছি জায়গা বলেই বুঝি এখানে যত্রতত্র এই বালির ছড়াছড়ি?

কিছুটা বালি মাড়িয়ে হেঁটে গিয়ে বাঁয়ে

বাঁক নিতেই পেয়ে গেলাম প্রশস্ত রাস্তা। বালুকা-বিছানো রাস্তা। বালুর উপর রোদ পড়ে চিকচিক করছে, মনে হচ্ছে বুঝি একটা নদী। সত্যি অবিকল নদীরই মত দেখতে। দুই পাশে গাছ-গাছড়ার মেলা—ঐ দুই পাশ যেন নদীর দুই পার।

বালিতে রোদ পড়ায় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। কালো চশমা পরে নিলাম।

আরও আধঘন্টা বোধ হয় হেঁটেছি বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে। রাস্তাটা ঈষৎ বাঁক নিয়েছে একটু আগেই। তীর্থের পথ নাকি দুর্গমই হয়ে থাকে। তা হোক। আমার তাড়া নেই।

ওই বাঁকটা নিয়ে কিছুটা এগোবার পর দেখতে পেলাম কিছুটা দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে দুটি প্রাণী যেন বসে আছে ওই বালির মধ্যে। চোখ থেকে চশমা নামালাম। গা একটু ছমছম করল।

একেই বাধ্য হয়ে ধীরে হাঁটছিলাম, এখন আরও ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলাম। যতই কাছে আসছি ততই বুঝতে পারছি—ও দুটি সত্যিই দুটি প্রাণী।

একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে ওরা যেন ধড়ে প্রাণ পেল।

ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললাম, "কি হয়েছে?"

তার উত্তরে কী যে বলল তা বুঝতেই পারলাম না। ভাষাটা বাংলা, না, ওড়িয়া তাও বোঝা গেল না।

ক্রমশ যা বুঝলাম তা মোটামুটি এই—স্বামী অসুস্থ, তাকে নিয়ে চলেছে তার স্ত্রী চন্দনেশ্বরে। সেখানে গিয়ে স্ত্রী চন্দনেশ্বরে ধর্না দেবে। বাড়ির বার হয়েছে সেই অন্ধকার থাকতে। পথ আর ফুরায় না। স্বামী বেচারাও আর হাঁটতে পারছে না।

ক্রমশ যা বুঝলাম তা তো মোটামুটি ঐ। কিন্তু কিছুতেই যা বুঝতে পারছিনে তা হল—এত সৌন্দর্য আর অমন স্বাস্থ্য ও পেল কোথা থেকে। বয়স পঁচিশ হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে, কিন্তু বয়সটা বড় কথা নয়, বড় কথা ওই অবয়বটা। নাক মুখ চোখ হাত পা মাথা নখ—সব আলাদা-আলাদাভাবে বিচার করে দেখতে গেলে অনেক খুঁত পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঐ সবগুলি মিলিয়ে সমগ্রভাবে তার যে এই গঠিত হয়ে ওঠা, সেই গড়নের মধ্যে কোনো খুঁত নেই। এই অপর্যাপ্ত রোদের মধ্যে এই অপর্যাপ্ত শারীরিক সৌন্দর্য অপরিসীম বিস্ময় বলে বোধ হতে লাগল। বালুর উপরে রোদ প্রতিফলিত হয়ে তার চিবুক নাসাগ্র আর ভ্রূতল আলোকিত হয়ে উঠল।

বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, যা দেখতে পাচ্ছি তা সত্যি কিনা। চোখের ভ্রম কিনা মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত এটা মরীচিকা কিনা।

মেয়েটা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা বসা। বুঝি ধুঁকছে।

উবু হয়ে তার পাশে বসলাম। তার হাতটা হাতের মধ্যে নিলাম। নাড়িটা দেখে নিলাম একটু। ঠিক আছে। একে অসুস্থ শরীর, তার উপর রোদ লেগে ও এতটা পথ হেঁটে সে কাবু হয়ে গিয়েছে।

থলির মধ্যে থেকে টুপি বের করে ওর মাথায় চাপিয়ে দিলাম।

একটু পরে বোতল থেকে জল দিলাম জল খাওয়ার ধরন দেখেই বোঝা গেল খুবই তেষ্টা পেয়েছিল লোকটার। একটু নাড়ু দিলাম একটা ট্যাবলেট দিলাম। আবার জল দিলাম। তারপর ঐ বালুর উপর থেকে ওকে উঠিয়ে পাশেরই ছাড়াছাড়া গাছের অস্পষ্ট ছায়ায় নিয়ে গিয়ে তাকে বসালাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগছে?"

লোকটা মাথা নেড়ে জানাল—ভালো।

উঠে দাঁড়ালাম, লক্ষ করলাম ওর স্ত্রীর চোখে জল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিছু খাবে?"

সে ঘাড় নাড়ল। দুটো নাড়ু বের করে ধরলাম তার সামনে। সামান্য একটু দ্বিধা করে নাড়ু দুটো সে নিল। অন্য দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, মাথার কাপড় টেনে দিয়ে এদিকটা আড়াল করে সে ও-দুটো খেলো। তারপর বোতল উঁচু করে জলও খেলো।

আমি তৈরিই ছিলাম, ও ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে [illegible] ফিরিয়ে দিতে [illegible] আমি আমার পুঁটলি-করা [illegible] পানি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

একে কাড়াকাড়ি যদি কেউ মনে করেন উপায় নেই। প্রকৃতই যা ঘটেছিল তা এখানে বিবৃত করা গেল মাত্র।

কোনো এক ইংরেজ লেখক নাকি বলেছিলেন যে, ভ্রমণে যখন তিনি বের হন তখন প্রকৃতিই তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী। আমার প্রকৃতিও ঐ ইংরেজ লেখকের মতই। আমি প্রকৃতিকে সঙ্গিনী করে নিতেই চাই। কিন্তু এবার আমার যা অবস্থা হল তাকে সংগীন অবস্থাই বলা চলে।

আমাকে অগত্যা হুয়ে যেতে হল ওদেরই একজন। ছিলেম একা, হয়ে গেলাম তিনজন।

চন্দনেশ্বরে এসে পৌঁছতে আমাদের বিকেল হয়ে গেল। শেষ ঢাল-পথ নেমেই পেলাম একটা হাটের কঙ্কাল-বিশেষ। আজ হাটবার নয়, দোকানের ছাউনিগুলো নিঃসঙ্গ ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে।

এইখানে গাছের তলায় এসে বসল ওরা। এই তো চন্দনেশ্বর। ওপাশে পান্ডাদের বাড়ি, আর কয়েক পা এগোলেই মন্দিরের চত্বর তার এ পাশে একটা লম্বা পুকুর, তার কিনারেই যাত্রীনিবাস।

এই যাত্রীনিবাসে আস্তানা নেওয়া গেল। আমরা তিনজন হলাম এখানকার বাসিন্দা।

তেরো বছর হল নাকি বিয়ে হয়েছে তাদের। পছন্দ করেই নাকি তাকে বিয়ে করেছিল ঐ লোকটা। (লোকটা যেমনই হোক, তার পছন্দ আছে বলতে হবে।) বিয়ের পর তিনটি বছর ছিল তারা দিব্যি আরামে, তারপরেই কেমন রোগে ধরল ঐ লোকটাকে। এই এমনি শক্তসমর্থ ছিল মানুষটা, ক্রমেই তার হাল ফিরতে লাগল—এখন তো তার এই অবস্থা। অনেক টোটকা করেছে, অনেক কবিরাজি দাওয়াই খাইয়েছে, কিছুতেই কিছু হল না। বছর-খানেক হল অসুখ বাড়তে আরম্ভ করল, অকর্মণ্য হল, শয্যা নিল। পেট ফুলে উঠল, পা ফুলে উঠল কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে এবার এই পথ নিয়েছে। চন্দনেশ্বর নাকি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাই তাঁর দ্বারে এসেছে এবার। এবার এখানে সে ধর্না দেবে। একে জ্যান্ত করে তুলবে, তবে সে ঘরে ফিরবে।

ঘর তাদের আছে। ক্ষেতও আছে সামান্যই। চারটে গাই-গোরু আছে। দুটি প্রাণীর বেশ চলে যাবার কথা। কিন্তু ক্ষেতের কাজ কে করবে, এমন লোক তো চাষ-আবাদ করতে পারে না। এখন ঐ গাই-গোরুই তাদের সম্বল। ঐ দুধ বেচে দিন চলে।

এই জিলাতেই তাদের বাড়ি। এই তারকেশ্বরেই। চন্দনেশ্বরও তো তারকেশ্বর জিলাতেই। এখান থেকে তাদের বাড়ি ক্রোশ-চার পথ। তাদের গাঁয়ের নাম পিপলি। অনেক মানুষের বাস সেখানে। দিনে চার-সের দুধ দেখতে-দেখতে কেটে যায়।

আজ দশ বছর ধরে এই মানুষটাকে নিয়ে স নাকি নাকাল হচ্ছে। যতই নাকাল হচ্ছে ততই কেমন মায়ায় পড়ে যাচ্ছে। একেবারে শিশু হয়ে যাচ্ছে এই মানুষটা। এক দণ্ড চোখে না হলে চলে না।

লণ্ঠনের আলোয় ওর চোখে জল যেন চকচিক করে উঠল।

ছয়মাস ধরে সে টাকা জমিয়েছে। এখানে সে ধর্না দেবে, এখানে যতদিন থাকতে হয় থাকবে—এই পণ নিয়ে নাকি তার এই আসা।

বেশ। ভালো কথা। উপাদেয় কথা। তার আশা যেন পূর্ণ হয়—মনে-মনে এই প্রার্থনাই না হয় জানানো গেল; অবশ্য প্রার্থনার যদি কোনো দাম থাকে।

কেরোসিনের গন্ধে ঘর ভরে গিয়েছে, যতটা আলো দিচ্ছে লণ্ঠন, তার চেয়ে বেশি দিচ্ছে ধোঁয়া। পান্ডা-ঠাকুরকে বলে কালই লণ্ঠনটা বদলে নিতে হবে। যা দেখব তা একটু স্পষ্ট করে দেখাই ভালো, এমন অস্পষ্ট আলোতে মন যেন ভরে না।

লোকটার নাম বৃন্দাবন। সে টান হয়ে শুয়ে আছে। পেটটা উঁচু, পা দুটো ফুলো। সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

আলোর তেল বুঝি ফুরিয়ে এসেছে, লণ্ঠনটা তুলে একটু ঝাঁকি দিতেই সলতে বোধ হয় ভিজে উঠল, আলোও একটু তেজি হল। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্যে মাত্র।

বললাম, "তোমাদের গ্রামের নাম তো বললে পিপলি। কিন্তু একটা নাম তো বললে না।"

"কি নাম? কিসের নাম?"

একটু থেমে বললাম, "তোমার নাম।"

আলোটা বুঝি নিবেই যাবে, এটা নেবার আগে ওর মুখ থেকে ওর নামটা শোনার খুব ইচ্ছে হল।

বললাম, "বলো।"

সে আঁচলটা মুখের কাছে টানল, একটু হাসল, বলল, "মেয়ে লোকের আবার নাম!"

"তবু। কি বলে লোকে তোমাকে ডাকে?"

বাতিটা দপদপ করে উঠল। সে বলল, "ময়না।"

আলো নিবে গেল। ঘর অন্ধকার। বললাম, "কি বললে?"

অন্ধকারের মধ্যে থেকে শব্দ এল, "ওই তো শুনলে।"

"কি শুনলাম?"

"ময়না।"

একটা বর্শা বিঁধে গিয়েছে বুকের মধ্যে। এখন বেঁধেনি বটে, বিঁধেছে সেই দুপুর বেলা, সেই টা-টা রোদ্দুরের মধ্যে। এখন সেই জায়গাটা একটু টাটিয়ে উঠল।

অন্ধকারের মধ্যে কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে, কিছু দেখতে পাচ্ছিনে বটে, কিন্তু চোখের সামনে কেবলই ভেসে উঠছে একটা মূর্তি। খুঁটিনাটি করে বিচার করলে অনেক খুঁত হয়তো অনেকেই পাবে, কিন্তু সমগ্রভাবে যা হয়ে উঠেছে তার বুঝি তুলনা হয় না।

অনেক শরীর দেখা গিয়েছে, অনেক রকমের বাড়। হাসপাতালে কত রকমের

রোগী এসেছে. ডাক্তারের কাছে তো কক্সো কোনো লজ্জা রাখতে নেই. কারও কিছু গোপন রাখতে নেই। কেউ বিষ খেয়েছে, কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে—এমন অনেক রূপসীও তো এসেছে হাসপাতালে. তাদের সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। এবং এসব ছাড়াও তো অনেক রকমের সুন্দরী দেখা গেল এই বিশাল দেশটার বিভিন্ন জায়গায়।

কিন্তু কি নাম বলল? ময়না। ময়নার মতন এমন চেহারা কোথাও কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না।

আমি তার সঙ্গী হতে পেরেছি, এবং তার ভাষার, তার সহায় হতে পেরেছি তার ভরসা হতে পেরেছি এ আমার গৌরব অবশ্যই।

কিন্তু গৌরবের কী দাম? গৌরবের কী মানে?

পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু অদূরেই যুগল-নিশ্বাস-পাতের শব্দে ঘুম এল না।

রাত তখন গভীর। হয়তো একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ময়নার গলা পেলাম। অন্ধকারের মধ্যে থেকে শব্দ এল, "বাবু, বাবু! এ এমন করে কেন!"

লাফ দিয়ে উঠে থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টর্চ বের করলাম। টর্চের বোতাম টিপতেই সমস্ত ঘর আলোময় হয়ে উঠল।

ওদের কাছে গেলাম, বললাম, "কি হল?"

"এই দেখ, নাকের মধ্যে কেমন শব্দ হচ্ছে। ধাক্কা দিচ্ছি, সাড়া দিচ্ছে না।"

নিজের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ময়নার। সে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজের দিকেও তো একটু দৃষ্টি দিতে হয়! তা যদি সে না দেয় তাহলে আলো কি আমি নিবিয়ে দেব? কিন্তু আলো নিবিয়ে দিলে রোগীর পরিচর্যা হবে কী ভাবে? আলো নেবালাম না বটে, কিন্তু টর্চের মুখ একটু ঘুরিয়ে নিলাম। অমন অসহ্য-সুন্দর মূর্তিটির চেহারা তাতে যদি একটু ঝাপসা হয়।

রোগীকে দেখলাম। তার নাড়ি দেখলাম। বুকে কান পেতে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনলাম। কোনো কিছুই অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। চোখের পাতা টেনে চোখের দৃষ্টি দেখে নিলাম। তাতে তো এমন-কিছু এদিক-ওদিক নয়।

রোগীকে ছেড়ে সরে বসলাম, জ্বলন্ত টর্চ মেঝের উপর শুইয়ে রাখলাম।

উৎকণ্ঠার সঙ্গে ময়না বলল, "কেমন বুঝলে?"

বললাম "ভাল। সব ঠিক আছে। শুয়ে পড়ো। ঘুমোও। তুমিও তো ক্লান্ত।"

পথচলার এই পরিশ্রমে বৃন্দাবন ক্লান্ত। মড়ার মত তাই ঘুমোচ্ছে। সাড়া দিচ্ছে না তাই।

কিন্তু অত সহজে ময়নার মন উঠল না। ওকে ওষুধ দিতে বলল। ঐ-যে রাস্তায় বসিয়ে থলি থেকে বের করে যে বড়ি দিয়েছিলাম, সেই বড়ি দিতে বলল।

ঘুমন্ত মানুষ ঐ ট্যাবলেট কী করে খাবে? আর, ও-জিনিস দরকারও নেই এখন। একথা শুনেও সে আশ্বস্ত হল না। বার-বার অনুরোধ করতে লাগল।

বলল, সে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ওর মুখের মধ্যে দিয়ে দেবে, পেটে যাওয়া নিয়ে তো কথা।

মনে মনে সামান্য একটু বিরক্ত হয়ে থলি থেকে ওর হাতে একটা ট্যাবলেট দিলাম। বললাম, "নাও। যা করবার করো।"

নিজের জায়গায় সরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমিও টায়ার্ড। টর্চ নিবিয়ে মাথার কাছে রাখলাম।

কুড়মুড় কুড়মুড় শব্দ শুনলাম কিছুক্ষণ তার পর আর কোনো শব্দ পেলাম না। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরে কাসতে লাগল বৃন্দাবন। লোকটার গলায় কিছু আটকালো নাকি? বললাম, "একটু জল দাও ওর মুখে।"

আদেশ করলাম বটে, কিন্তু এই ঘোর অন্ধকারে কিভাবে জল দেবে তা ভেবে দেখলাম না। কিংবা বুঝি একটু ভেবেও দেখলাম। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে টর্চের বোতামে চাপ দিয়ে বললাম, "ঘটি কোথায় রেখেছ দেখে নাও। পেয়েছ?

"পেয়েছি।"

এর কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা বেশ হয়েছে। দেখলাম, ঘরে মাত্র আমরা দুজন—আমি ও বৃন্দাবন। বৃন্দাবনও জেগেছে, কিন্তু শুয়েই আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগছে?"

যেন সে বেশ কৃতজ্ঞ। কেন কৃতজ্ঞ তা অবশ্য বোঝা গেল না। গলার কৃতজ্ঞতার সুর, সে বলল, "বেশ ভালো বুঝছি।"

ভালো। ভালো বুঝলেই ভালো। চন্দ্রনেশ্বরের মাটিতেই তাহলে বেশ জাদু আছে। এখানে এসে ধর্না দেবার আগেই চন্দ্রনেশ্বর বিশ্বাসীকে তবে ধন্য করে দেন। বৃন্দাবনের চোখ-মুখের চেহারাও দেখলাম কালকের চেয়ে অনেক ভালো। অতটা পথ হাঁটার আর ঐ রোদের ঝাঁজে কাল তাকে অত কাবু লেগেছে।

বৃন্দাবন উঠে বসল। পেটটা মোটা, তাই হাঁটু তুলে বসার চেষ্টা করে পারল না, জোড়াসন হয়ে বসল।

এই মানুষটার জন্যে একটি সংসার উৎসন্নে যেতে বসেছে। এবার এ আরাম হয়ে উঠুক। ঘরে ফিরে যাক। ফিরে যাক তাদের পিপুলিতে। তাদের ক্ষেত নিয়ে আর তাদের গাই-গোরু নিয়ে গড়ে তুলুক তাদের সোনার সংসার।

এই রকম নানা কথা ভাবতে লাগলাম।

এদের কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমার নিজের কথা যে কে ভাবে, সেও এক ভাবনা। আমার ডিসপেনসারি নিয়ে আমার পরিজন-পরিবেশ নিয়ে আমি যে কেন ঐ রকম সোনার সংসার গড়ে তোলার কোনো চেষ্টা করছিনে, ও ব্যাপারে কেন কোনো আগ্রহ নেই আমার—এও এক কথা বটে।

কিন্তু মানুষের চরিত্রের এও এক ফাঁকড়া বটে, অন্যের ব্যাপারে যত গরজ, নিজের

চমৎকার তেলা না দিয়ে অন্যের গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বেড়ানো।

কবে থেকে কিভাবে তার অসুখ হল, বাড়াবাড়ি হল কবে থেকে, উপসর্গ কি কি— ইত্যাদি কথা তার কাছ থেকে শুনতে লাগলাম। শুনে মনে হল, এটা তার ইন্‌টেস্‌টিনাল টি-বি, ইন্‌জেকশান থেকেও হতে পারে। আবার সিরোসিস লিভার থেকেও হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলে তা ধরা যাবে। কিন্তু অসুখটা গুরুতর।

আমার একটু ডাক্তারি জানা আছে, তাই আমার ঐ রকম মনে হল, কিন্তু অন্যদের অন্য কথা মনে হতে পারে।

দরজার পায়ের শব্দ পেয়ে বৃন্দাবন একটু ফিরে তাকাল। আমিও তাকালাম। ময়না এসেছে।

কনে-দেখা-আলো এটা নয়, কিন্তু এই নতুন আলোয় তাকে যেন একটু নতুনই লাগল। শাড়িটা বদলেছে বলেই কি তাকে এত পরিচ্ছন্ন এবং এত প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

কোথায় সে গিয়েছিল তা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে আমার হল, কিন্তু কিছু বললাম না। জিজ্ঞাসা করল বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনের কাছে ধীরে ধীরে বসল ময়না। জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগছে?"

"ভালো।"

ময়না বলল, "ভালো ভালো ভালো। আমি ঐ কথাই শুনতে চাই। ভালো হয়ে উঠতে তোমাকে হবেই।"

তার চোখ বুঝি একটু ছলছল করল। তার পর বলল যে, পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে সে সব ব্যবস্থা করে এসেছে। আজ দুপুরে পুজো সেরে, তিনটে ডাব কিনতে বলে এসেছে। ঐ ডাবের জল দিয়ে চন্দনেশ্বরকে সে শীতল করবে, তার পর চাইবে তাঁর কৃপা।

আর, আজ সন্ধ্যা থেকেই আরম্ভ হবে তার ধর্না। তাতেও যদি না সারে, দুদিন পরে আবার সে আরম্ভ করবে সাত দিনের ধর্না। চন্দনেশ্বরের দোরগোড়ায় পড়ে থাকবে সে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে।

আমি শুনছিলাম। এবার কথা বললাম। বললাম, "আমি কিন্তু আজ চলে যাচ্ছি।"

অবাক হয়ে চমকে তাকাল ময়না।

বললাম, "তোমাদের সব ব্যবস্থা তো পাকা হয়ে গেল। এবার আর আমার থাকার দরকার কি!"

কিন্তু দরকার নাকি আমাকে দিয়ে আছে। এটুকু উপকার কি আমি করতে পারব না, জানতে চাইল ময়না। সে যখন মন্দিরে পড়ে থাকবে, তখন বৃন্দাবন এই ডেরায় থাকবে কার ভরসায়?

এ তো বড় ভীষণ দাবি। যদি আমার সঙ্গে দেখা হয়ে না যেত, তখন তাকে দেখত কে?

দুই হাত এক করে ময়না কার উদ্দেশে যেন প্রণাম জানাল, বলল, "যিনি তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন তাঁরই রাজত্বে তো আমাদের বাস।"

কার রাজত্ব এটা আমি জানিনে। ইতিহাস আমার সাবজেক্ট নয়। কিন্তু আমি অবাক হয়ে তাকালাম ময়নার দিকে।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি আর কথা বলতে পারলাম না। তিন দিন প্লাস দু দিন প্লাস সাতদিন—সব এক সঙ্গে করলে কতদিন হয়?—এই কয়দিনের জন্যে আমি বন্দী হয়ে যেতে স্বীকৃত হলাম।

আমি বৃন্দাবনকে নিয়ে আছি। ময়না মন্দিরে। সারাদিন কাটছে, সারা রাতও। এই রোগীকে পাহারা দেওয়াই আমার কাজ হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয় রাত্রে মন কেমন-যেন ছটফট করে উঠল মাঝরাতে টর্চ হাতে নিয়ে নিঃঝুম আর নিঃশব্দ মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করলাম। ক্রমে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের দরজায়। একবস্ত্রা ময়না তার পরনের শাড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গ আবৃত করে টান হয়ে শুয়ে আছে ঐ দরজায়। ঐ শাড়ি ভেদ করে ফুটে বেরিয়েছে তার সমস্ত শরীর। একটি প্রদীপ জ্বলছিল দরজায়, ঐ আলোতেই তাকে যেটুকু দেখতে পেলাম, তাই বুঝি যথেষ্ট। ইচ্ছে হল টর্চের বোতাম টিপে ওকে আর একটু স্পষ্ট করে দেখেই এখান থেকে পালাই।

কিন্তু জাগ্রত দেবতা চন্দনেশ্বর, তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে এই অসংযম প্রকাশে ভরসা হল না।

কখন, কোন্ অজান্তিতে আমি তার এই মায়ায় পড়ে গিয়েছি, তা আগে টের পাইনি।

তৃতীয় রাত্রেও আমি তস্করের মত গিয়েছিলাম তাকে দেখতে।

ময়না ফিরে এসেছে। তিনদিনের অনাহারে তার চেহারায় কোন পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ তাকে আরো যেন প্রশান্ত দেখাচ্ছে। চোখে যেন নূতন একটু দীপ্তি।

বৃন্দাবনের মুখের কাছে ঝুঁকে সে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ?"

অসহায় শিশুর মত ময়নার মুখের দিকে চেয়ে সে যেন স্বীকারোক্তি করল, বলল, "ভালো না।"

ঐ কথা শোনা মাত্র ময়নার চোখ জলে ভরে গেল। তার এই চেষ্টা তবে নিষ্ফল হয়ে গেল কিনা—দুই সজল চোখে ফুটে উঠল সেই জিজ্ঞাসা।

সত্যি, বৃন্দাবনের অবস্থা ভালো না। পেট আরও যেন ফুলে উঠছে, পা-দুটোও ফুলেছে আগের চেয়ে বেশি।

যাকে বলে অ্যাসপিরেশন, যাকে বলে সিরিঞ্জ দিয়ে পেটের জল ট্যাপ করা—ধর্নার বদলে সেই ঝরনার ব্যবস্থা করাই এখন দরকার। অন্তত ডাক্তারি শাস্ত্রে এই কথা বলে।

ময়না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল আমি তা বুঝতে পারলুম। বৃন্দাবনের সঙ্গে দুটো কথা বলে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম জানলায়।

কেমন যেন বেকুব হয়ে গিয়েছি আমি, কেমন-যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছি। এমন স্বভাব তো আমার কখনো ছিল না।

পাশের পুকুরে স্নানে নেমেছে ময়না। চোরের মত জানলার এপারে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি। আমার সমস্ত শরীর হাহাকার করে উঠেছে।

এ আমি কী হয়ে গেলাম?

স্নান শেষ করে যখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে আমি চট করে জানলা থেকে সরে এসে বললাম, "ও গেল কোথায়?"

বৃন্দাবন ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, "বোধ হয় পাণ্ডাঠাকুরের কাছে।"

বললাম, "তাই হবে।"

ময়না ঘরে ঢুকল, দরজা একটু ভেজিয়ে দিল, অজস্র চুল পিছন দিকে ছড়িয়ে দিয়ে গামছার বাড়ি দিয়ে ঝাড়তে লাগল সেই চুল।

চুল ঝাড়তে-ঝাড়তেই জিজ্ঞাসা করল, "পান্ডাঠাকুর খাবার-দাবার ঠিক মত দিয়ে গিয়েছিলেন তো?"

বৃন্দাবন উত্তর দিল না দেখে আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

ময়না বলল, "রান্না ওদের কেমন।"

"মন্দ কি!"

তিন দিন সে ছিল না—এই কয়দিন আমাদের কোনো অসুবিধে হয়েছে কিনা খুঁটিনাটি খবর নিতে লাগল ময়না। সে যা-যা বন্দোবস্ত করে গিয়েছিল তাতে কারোই কোনো অসুবিধে হবার নয়—তাকে এ কথা বার-বার করে বললাম বটে, কিন্তু সব কথা কি বলতে পারলাম তাকে? কতটা ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, কতটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল এই ঘরটা—সে কথা তাকে বলা হল না।

ময়নার এক ভাবনা। এমন কেন হল। তিন দিন তিন রাত্রি সে তার মনের ইচ্ছা অমনভাবে জানিয়ে এল যার কাছে, তার কাছ থেকে সাড়া পেল না কেন। কেন কমে গেল না, কেন বেড়ে গেল এই অসুখ?

কিন্তু মনোবাঞ্ছা কি কেবল একজন মানুষেরই থাকে? ও-জিনিস কি আর কারো থাকতে নেই? কার প্রার্থনায় কখন এবং কি জন্যে কে প্রসন্ন হন, তা কি কখনো বলা যায়?

যে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে, সে তো তাঁর করতলগত; কিন্তু যে বিশ্বাসী নয় তাকে বশ করার জন্যে দেবতারাও হয়তো কখনো-কখনো কোনো কৌশল করে থাকেন।

কিসে যে কী হয়, আর কিসে যে কী হচ্ছে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। সফরের শওখীচল আমি, কিন্তু আমিই কিনা হয়ে গেলাম তীর্থের কাক।

তিন দিন পরে আজ ভরে গেছে এই ঘর। তিন দিন পরে আজ ভরে গেছে মন।

কিন্তু দিন-দুই পরে আবার নাকি সে চলে যাবে সাত দিনের জন্যে। আবার খালি হয়ে যাবে, আবার ফাঁকা হয়ে যাবে এই ঘর। —এ কথা ভাবতেই আমার শরীর কেমন অস্থির-অস্থির করে উঠল।

বৃন্দাবনকে সেবা করে চলেছে ময়না। ওকে সুস্থ করে তোলার জন্যে তার চেষ্টার বিরাম নেই। ওকে আরাম করে তুলতে না পারলে সে নাকি আর ফিরবে না পিপলাতে। ওকে সারিয়ে তুলতে না পারলে তার গতি কী হবে, সে যাবে কোথায়? এও তার ভাবনা।

তার এই সজল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কোনো সান্ত্বনাও না, কোনো আশ্বাসও না। কিন্তু কত অজস্র কথাই তখন তাকে বলার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, সে তা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আমাকে নিয়ে আমি কী করি? আমি যে আমাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছে। অথচ আমার কথা আমি ছাড়া আর কেউ ভাবছে না—এ আমার মস্তবড় আক্ষেপ।

আমি কিন্তু ওদের সোনার সংসারের কথা ভেবেছি। ভেবেছি ওদের ক্ষেতের কথা, ওদের গাই-গোরুর কথা।

এই অল্প কদিনের মধ্যে আমার কেমন বদল হয়ে গিয়েছে। কেমন নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর হয়ে গিয়েছি আমি। ভাবতেই পারি নে আমি সেই ভ্রমণবিলাসী ডাক্তার শ্রীমন্ত মহাপাত্র। চন্দনেশ্বরের এই পর্ণ-কুটিরে এইভাবে আমাকে দেখে আমাকে আমি চিনতেই পারছি নে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি—ময়নার উপরে আপনাদের সকলের খুব সহানুভূতি হয়েছে; আপনারা চান বৃন্দাবন সেরে উঠুক, বেঁচে উঠুক।

কিন্তু তাতে আমার কী লাভ, আমার কী আনন্দ।

আমার কথা কেউ একটু ভাবছে না—এই আমার আক্ষেপ।

তাই ভাবছি, কাউকে কিছু না জানিয়ে চলেই যাব কিনা। কিন্তু ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছিনে। আর-কটা দিন না হয় দেখাই যাক। কি বলেন?

গল্প উপন্যাস লেখা বন্ধ রেখে এই প্রবন্ধে হাত দিয়েছি একাধিক কারণে। কিছুদিন আগে একজন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো, যিনি আমার সম্প্রতিপ্রকাশিত 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইটি পড়ে বেশ বিরক্ত হয়েছেন। ভদ্রলোক অনেকদিন বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন, সুতরাং ওপার বাংলার মানুষ সম্বন্ধে আমার থেকে অনেক বেশী জানেন। মন দিয়েই তাঁর বক্তব্য শুনলাম। তিনি বললেন, "আপনি না বুঝে-সুঝেই গদগদ হয়েছেন।"

আমি বললাম, "সামান্য কদিন বাইরে গিয়ে, পূর্ব পাকিস্তানের যে নতুন মানুষদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসেছিলাম, তাঁদের আমার ভাল লেগেছিল। আমার সেই সামান্য অভিজ্ঞতাটুকুর কথাই লিখেছি। এখানে আমি কোনো থিসিস খাড়া করবার চেষ্টা করিনি। তবে আমি আপনাকে জোর করে বলতে চাই, যতটুকু লিখেছি তার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই।"

ভদ্রলোক তারপর যা-যা বললেন, তার অর্থ দাঁড়ায় : পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষা সম্পর্কে যেসব আন্দোলন হয়েছে, তাতে এপারের বাঙালীদের পুলকিত হবার কিছু নেই। ওপারের লোকদের বাংলা ভাষা প্রীতিটা ওঁদের মুরগী পোষার মতই। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে বাংলা ভাষা একটা অস্ত্র মাত্র। এবং এই আন্দোলনটা চায়ের কাপে তুফান, কারণ বাঙালীরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু। বাংলা ভাষা স্বাভাবিকভাবেই তার যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে, তার জন্যে এপারে আমাদের গদগদ হবার কিছু নেই।

ভদ্রলোকের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কারণ সত্যিকথা বলতে কি, পূর্ব বাঙলার ভাষাপ্রীতি সম্পর্কে আমার মনে ভীষণ শ্রদ্ধা রয়েছে। এবং সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' উৎসর্গ করেছিলাম ওপার বাংলার সেই অকুতোভয় যুবকবৃন্দকে, যাঁদের নিষ্ঠা, প্রেম ও ত্যাগে বাংলা ভাষা একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

এর পরেই কয়েকদিনের জন্য দিল্লী গিয়েছিলাম। এবং সেখানে আকস্মিকভাবে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো যাঁরা কোনো এক সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্বিবিদ এবং বাংলা ভাষা প্রেমিক ডক্টর শহীদুল্লাহকে চিনতেন। তাঁদের মুখে দুটি গল্প শুনলাম, যা এই লেখার মধ্যেই যথা-স্থানে নিবেদন করবো।

এঁদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেও ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কথা উঠলো, এবং একটা জিনিস সহজেই বেরিয়ে পড়ল যে এই আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কাগজে প্রকাশিত কিছু লেখা, ও সাম্প্রতিক সভা-সমিতির ফলে আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখটা চিনতে শুরু করেছি। ঐ তারিখেই ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ বাংলা ভাষার জন্যে পুলিসের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এবং আমরা এও জেনেছি, পৃথিবীর সর্বত্র বঙ্গভাষীদের কাছে এই দিনটি পবিত্র। ওপার বাংলার মানুষরা অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে এই দিনটিকে প্রতি বৎসর পালন করেন। এ-বছর তো শুনছি একুশদিন ধরে স্মৃতি পালন হবে।

কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে পুলিসের গুলিতে আত্মবিসর্জন দেওয়াটা এপার বাংলায় এতই হামেশা হচ্ছে, যে সাধারণ লোকেরা সব সময় এর ওপর গুরুত্ব দেন না। কথাটা নিষ্ঠুর, কিন্তু দুঃখের বিষয় সত্যি। তা হলে যা দাঁড়াচ্ছে, পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান এইরকম : কায়েদে আজম জিন্নাহ তাঁর ঔদ্ধত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ঘোষণা করেছিলেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। কিন্তু কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছিল : না। না। তারপর ছাত্রদের মধ্যে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাই ক্রমশ সাইক্লোনের রূপ নিয়েছিল পবিত্র ২১শে ফেব্রুয়ারি। বরকত ও সালামের রক্তে পবিত্র সেই আন্দোলন তারপর সার্থক হয়েছিল। বলদর্পী শাসকরা জনতার ইচ্ছার সম্মুখে নতি স্বীকার করেছিলেন, বাংলা ভাষা তার যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছিল বিশ্বসভায়।

ব্যাপারটা যেন কত সহজ। কত সহজেই কেল্লা ফতে হলো। এপারে রাস্তায় বন্দুকের গুলিতে কত রক্ত পড়ে, কিন্তু পরের দিন তা মুছে যায়, কোনো চিহ্ন থাকে না, কিছুই হয় না। ওপারে একদিন যেই রক্তপাত হলো অমনি জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলো, বলদর্পী ক্যানিউট নতি স্বীকার করলেন।

মনের যখন এইরকম অবস্থা, ঠিক সেই সময় হঠাৎ ওপার বাংলা থেকে একটি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমার পরিচিত এক মুসলমান বন্ধু এই ছেলেটির হাতে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে। জানিয়েছে 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' তার ভাল লেগেছে।

পত্রবাহকটি হিন্দু, ওখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সবেমাত্র লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছে। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যি করে বলো তো ভাই, তোমাদের ওখানে কী রকম অবস্থা?"

ছেলেটি সোজাসুজি বললে, "আপনি কি সাম্প্রদায়িকতার কথা জানতে চাইছেন? তা হলে শুনুন, ছাত্রমহল এবং যুবসমাজ থেকে ওই জিনিসটা সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে।"

"তুমি মন থেকে কথাগুলো বলছো তো ভাই?" আমি আবার জিজ্ঞেস করি।

"একেবারে মন থেকে। কিছু যদি মনে না করেন, পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ, যে কোনো

প্রগতিশীল দেশের গর্বের বিষয় হতে পারে। তারা কোনোরকম 'ডগমা'য় ভোগে না। তারা আদর্শবাদী, নিভীক এবং দেশের জন্যে সবরকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।"

"তাহলে বলছো, যে-ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রকোপে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ছাত্রজীবন বিষময় হয়ে উঠেছিল, তা বিদায় নিয়েছে?"

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যামপাসের যে কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। এখানে এসে আমি তো তাজ্জব। শুনলাম, ইণ্ডিয়ার কোথায় যেন ছাত্রদের মধ্যে Caste riot পর্যন্ত হয়েছে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তুমি কী বোঝাতে চাইছ?"

ছেলেটি বেশ জোরের সঙ্গে বললে, "আমি যা বোঝাতে চাইছি, তা হলো, বয়স্থ সংসারী লোকদের কিছু অংশ সব দেশেই ধর্ম, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির ধুয়ো তুলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। নিরীহ মানুষ মরল কি বাঁচল তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু ছাত্ররা সব সময় নীচতার উর্ধ্বে থাকে। যখন ছাত্রদের মধ্যেও এই বিষ দেখা যায় তখনই চিন্তার কারণ।"

কথায় কথায় বেশ দেরি হয়ে গেল। তাতে মুশকিল বাড়ল। কারণ ছেলেটির অন্য এক জায়গায় যাবার ইচ্ছে ছিল। আমার হাতে একটা বই দিয়ে ছেলেটি বললে, "আমি এখানে নতুন এসেছি। রাস্তাঘাট কিছুই জানি না। আগামীকাল আবার পাকিস্তানে ফিরে যাবো। আপনি যদি দয়া করে এই বইটি অমুকবাবুর কাছে পোঁছে দেন।"

আমি বললাম, "চিন্তা করবেন না, নিশ্চয় পোঁছে দেবো।"

ছেলেটি বললে, "বইটা কেন এনেছি জানেন? এত বড় ভাষা আন্দোলন হয়ে গেল, অথচ বাংলা সাহিত্যে এখনও [illegible] স্থান হয়নি। আপনারা তো আমাদের ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কোনো সাহিত্যিক যদি এই আন্দোলনের ওপর একটা নাটক লিখতেন খুব ভাল হতো।"

আমি বললাম, "তোমরা আমাদের ভাষা-জননীর জন্য যা করলে তা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দূরে থেকে দেখেছি। তোমরা ইতিহাস সৃষ্টি করলে, আর আমাদের কেউ ওই ইতিহাস অবলম্বন করে এক আধটা নাটক লিখতে পারবে না, তা কী করে হয়?"

ছেলেটি বিদায় নেবার পর প্রতিশ্রুতি মতো নাট্যকার সেই ভদ্রলোককে ফোন করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত তিনি তখন কলকাতার বাইরে। শুনলাম দুদিন পরে ফিরবেন।

পরের জিনিস না বলে ব্যবহার করা উচিত না জেনেও বইটা বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম উল্টে দেখার জন্যে। ওপার বাংলার বই তো আমাদের কপালে জোটে না। আমাদের সরকারী কর্তারাও এ বিষয়ে উদাসীন। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রায় কিছুই করেন না। অথচ সাতসমুদ্র তের নদী পারে আমেরিকায় অন্তত বাইশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে দুই বাংলায় প্রকাশিত সব বই পাবেন। আমরা ভুলে যাই, শত্রু অথবা মিত্র যে ভাবেই আমরা প্রতিবেশীদের দেখতে চাই, তার জন্যে সেই দেশের চিন্তাধারার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্যক যোগাযোগ থাকা চাই। পরের মুখে ঝাল না খেয়ে আমাদের সেই দেশের বই এবং কাগজপত্র পড়া প্রয়োজন।

বইটির নাম 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি।' লেখক বদরুদ্দীন উমর। লেখকের নামটা আমার কাছে মোটেই পরিচিত নয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানী ছেলেটির কাছে শুনলাম, ওপার বাংলার বিদ্বৎসমাজে এই তরুণ গবেষক সম্প্রতি বিশেষ সুপরিচিত হয়েছেন।

কতটা সত্য জানি না, শুনে আরও অবাক হলাম, এঁদের আদি দেশ এপার বাংলায়, বর্ধমানের কাছে। এঁর বাবা নাকি অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগের একজন কর্তাব্যক্তি ছিলেন। এবং ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এঁরা আমাদের এই কলকাতাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই সময় বদরুদ্দিন উমর বালক মাত্র। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মনে সাধারণত দুরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেউ হয়ে যান অন্ধ সাম্প্রদায়িক আবার কারুর কারুর মনে প্রশ্ন ওঠে কেমন করে এই বিষ থেকে অনাগত বংশধরদের রক্ষা করা যায়।

লোকমুখে শুনলাম, বদরুদ্দীন উমরের মনে তরুণ বয়সে প্রশ্ন জাগে কেমন করে এই সর্বনাশা সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ আমাদের দেশে রোপিত হলো। তারপর রাজশাহী [illegible] বিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক হয়ে, গবেষণার এক বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন, সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস। জঙ্গী সরকার সঙ্গে সঙ্গেই এই বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেছেন বলে শুনেছি। এখানেও কারও সংগ্রহে বইটি যোগাড় করতে পারিনি।

শুনেছি, বদরুদ্দীন উমর পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন এবং যথাসময়ে রাজরোষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদটি হারান। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত সন্ধানীরা যেমন কোনো আঘাতেই ভেঙে পড়েন না, আমাদের উমর সাহেবও নাকি ভেঙে পড়েন নি। ঢাকার ছোটখাট কোন এক পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছেন এবং সেই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর গবেষণা। কতদূর সত্য জানি না, সাম্প্রদায়িকতা এবং ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গবেষণাপুস্তক নাকি ইংরেজী ভাষায় লিখিত হচ্ছে এবং শীঘ্রই বিলেত থেকে প্রকাশিত হবে। বিলেত থেকে প্রকাশিত হবে শুনে পুলকিত হচ্ছি এই জন্য যে সেক্ষেত্রে বই দুটি পড়বার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না।

'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, বইটি আকারে বৃহৎ। প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৭০। পাকিস্তানে সাম্প্রতিক ইলেকশন না হলে এই বইটিও যে সংগে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হতো সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। দু একটি জায়গায় আইয়ুব খাঁ সম্পর্কে যা মন্তব্য আছে তা প্রকাশ করতে গেলে রীতিমত সাহসের প্রয়োজন। আইয়ুব রচিত 'প্রভু নয় বন্ধু' নামক পুস্তকের একটি ঘটনা সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য: "মিথ্যা, বিকৃত ও বাহাদুরীপূর্ণ।"

আকারে বৃহৎ হলেও, পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাস এই বইতে লেখা হয় নি। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্যায়—১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মার্চ এবং ১৯৫২-এর জানুয়ারি মার্চ। পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত, সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপে তার প্রাথমিক বিকাশ এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের উন্নততর পর্যায়ে তার উত্তরণের বর্ণনা এই প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুসৃত নীতি ও তাদের আভ্যন্তরীণ সংকট সম্পর্কে আলোচনা। বাকি অংশ থাকবে বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে।

আমার নিজের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। নিশীথ প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে যাঁরা প্রতিদিন অধ্যয়ন করেন আমি সেই পণ্ডিতদের দলে নই। খুব কম বই আমাকে রাত জাগাতে পারে। কিন্তু বৃহৎ বই, এবং দুদিনের মধ্যে মালিকের কাছে ফেরত দেবার নৈতিক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে বইটি পড়তে আরম্ভ করলাম। তারপর কখন যে এর মধ্যে ডুবে গেছি, খেয়াল নেই। মনে হলো না সিরিয়াস প্রবন্ধের বই পড়ছি। মনে হলো বাঙালী জাতের ইতিহাসের একটা অপ্রকাশিত অধ্যায় আমার চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো ফুটে উঠছে, যা একজন বঙ্গভাষা সেবক হিসেবে অনেক আগেই আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু যা জানবার জন্যে কোনো প্রকার চেষ্টা আমি এতদিন করিনি।

আমার মনে ছিল না, ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসেই ভাষা আন্দোলনের বীজ প্রোথিত হয় ঢাকায়। ওরা জুন বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর রোয়েদাদ ঘোষণা করার পরেই মুসলিম লীগের কয়েকজন বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় 'গণ-আজাদী লীগ' নামে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন তৈরি হয়। 'আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ' এই নামে তাঁরা একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন এবং তাতে বলা হয়: 'সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি,

জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। সুতরাং আমাদের কর্তব্য এই নবীন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গঠিত করা এবং মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করা।' ভাষা সম্পর্কে বলা হয়, 'বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে স্থির হয় স্বাধীনতা-উত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন করা প্রয়োজন। ঢাকায় এসে এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সাহায্যে 'গণতান্ত্রিক যুব লীগ' গঠনের উদ্যোগী হন এবং বলাবাহুল্য মুসলিম লীগ সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। এঁদের যুব সম্মেলন পণ্ড করবার জন্যে গুণ্ডা নিয়োগ করা হয় এবং প্রচার করা হয় যে এঁরা নাজিমুদ্দীন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।

নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ৭ই সেপ্টেম্বর সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় : বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন এবং আইন, আদালতের ভাষা করতে হবে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার জনসাধারণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক।

উমর সাহেবের বই পড়ে জানলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র এবং অধ্যাপকের উদ্যোগে... ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। তাঁরা ১৫ই সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা—না উর্দু?' এই নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে লেখেন, ইংরেজরা এক সময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরিজী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেইভাবে কেবলমাত্র উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে কোন কোন মহলে সেই প্রচেষ্টা চলছে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

তমদ্দুন মজলিস প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে কাজী মোতাহার হোসেনের 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষাসমস্যা' প্রবন্ধটির কিছু অংশ তুলে দেবার লোভ

সংবরণ করতে পারছি না। কারণ উমর সাহেবের এই বই বহু পাঠকের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর প্রবন্ধে, বাংলা ভাষার উন্নতি ও চর্চার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা উল্লেখ করেন। (উমর সাহেবের মতে 'এসব কথা বলা প্রয়োজন হয়েছিল তার কারণ এক শ্রেণীর লোকের ধারণা অনুসারে বাংলা হিন্দুদের' ভাষা কাজেই পরিত্যাজ্য এবং উর্দু ইসলামের ভাষা কাজেই গ্রহনীয়।') কাজী মোতাহার হোসেনের নিজের ভাষায় শুনুন :

"পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আড়ষ্টতার দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষার সম্পর্কিত মনে করে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।

"বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে যেন কোন জিনিসই নাই, পরের মুখের ভাষা বা পরের শেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী, বিদেশীই যেন তার আপন।

"তাই তার উদাসী ভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা। পশ্চিমী চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে, বৃহৎ পাগড়ী বেঁধে বাংলা দেশে এলেই এদের পীর হওয়া যায়, কমের পক্ষে মৌলবীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু' পয়সা রোজগারের জোগাড় হয়। শহুরে দোকানদার যেমন করে গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠকিয়ে লাভবান হতে পারে। এ যেন ঠিক সেই অবস্থা। বাস্তবিক বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গাল বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।...

"আমি উর্দু ভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্য সত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙ্গালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা, অথবা বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসংগীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এই সব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।...

"এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বলেছে যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানীর ভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ত ওা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পারবেশন করার দায়িত্ব মুখ্যত মুসলমান সাহিত্যিকদেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে মুসলমান বিদ্বজন পুঁথি-সাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন; তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতা-বোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধর্না দিয়ে আমাদের কোন কালেই যথার্থ লাভ হবে না।"

এরপরে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৭। ছাত্ররা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে নাজিমুদ্দীনের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় করাচীতে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এবং সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় উর্দুই হবে পাকিস্তানের লিংগুয়া ফ্রাংকা। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলা ভাষার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা বসে এবং পরে মিছিল বেরোয়। ভাষার দাবীতে সেই হলো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের প্রথম সভা।

ছাত্রদের পিছনে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়ার ঘটনা এই সময় থেকেই শুরু হয়। উর্দুর সমর্থকরাও পিছিয়ে রইলেন না। তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন বাংলা মানেই আবার হিন্দুদের খপ্পরে পড়া। বদরুদ্দীন উমর এই প্রসঙ্গে নানা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো নাজিমুদ্দীনের কাছে প্রেরিত সিলেটের কিছু সংখ্যক নাগরিকের স্মারকপত্র। তাতে বলা হয় :

"একদল লোক নিজেদের বিরাট সাহিত্যিক শিল্পী ও পণ্ডিত বলে জাহির করে উর্দুর বিরুদ্ধে দারুণ প্রচারণা শুরু করেছে। পূর্ব বাংলার লোকেরা একটি জাতি, এই উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উর্দুকে জাতীয়তাবিরোধী ও বিদেশী ভাষা হিসাবে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশপ্রেমের মুখোশ পরে তারা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে চারিদিকে তোলপাড় আরম্ভ করেছে। জনমতের প্রতিনিধিত্ব করার ভব দেখিয়ে তারা নিজেরাই বাংলা মতো এমন এক ভাষার দাবী তুলেছে, যে-ভাষার একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভের মতো যোগ্যতা একেবারেই নেই। মুসলিম সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী উর্দু ভাষাকে বর্জন করার এই নির্লজ্জ প্রচেষ্টা যে শুধু ধ্বংসাত্মক তাই নয়, তা পশ্চাদমুখী, নিন্দনীয় এবং সর্বোপরি সার্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তারা যদি বাংলাকে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা এবং উর্দুকে ইংরেজীর জায়গায় রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতো তাহলে সেটা বোঝা যেতো। কিন্তু বাংলার সমর্থকরা উর্দুকে পূর্ব বাঙলা থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় এবং আমাদের সুচিন্তিত মতানুসারে সেটা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের পক্ষে আত্মহত্যা শামিল।"

সিলেটের একদল পুরুষ যাই করুক সিলেটের মহিলারা কিন্তু বাংলার পক্ষে বিবৃতি দেন। সৈয়েদা নজিবুন্নেসা খাতুন একটি বিবৃতিতে বলেন : "যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষায় বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কূপমণ্ডূকতুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন তাহাদের তত দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু যাহারা ধর্মের দোহাই দেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করে উর্দু ভাষাভিজ্ঞ অপেক্ষা সিলেটের উর্দু অনভিজ্ঞ মুসলমানের ইসলাম ধর্মের অনুশাসন পালনে কোন অংশে হীন ?"

আর একজন মহিলার মতামত : "বাঙালী হিসেবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর দাবি করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলা দেশের ভাষা হিসাবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করব না কেন?...পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র। তাই তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে সে ভাষা তাদের নিজস্ব হবে না এও কি বিশ্বাস করতে হবে ?"

বদরুদ্দীন উমরের বই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যেমন ধরুন আন্দোলন পাকিয়ে ওঠার পর কায়েদে আজমের ঢাকা আগমন, বক্তৃতা ও ছাত্রদের সংগে সাক্ষাতকার। সমকালীন ইতিহাসের এমন হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আমি আর পড়িনি। কায়েদ আজমের দু একটি কথা অবশ্য স্মরণীয় : "আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সির অর্থ সাহায্যপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানকে ধ্বংস করা।...পূর্ব বাঙলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা ত্যাগ করেনি!...এ কথা আমি পূর্বেই বলেছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে...কিন্তু এ কথা আপনাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। "

অপ্রীতিকর কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই বিরোধীপক্ষকে বিদেশী রাষ্ট্রের দালাল এবং পাকিস্তানের শত্রু বলে চিহ্নিত করার রেওয়াজ কায়েদে আজমই চালু করেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাতেও কোনো ফল হলো না। তার অন্যতম কারণ, এই অভিযোগের বিপদের দিকটা বুঝে কেউ কেউ বাংলা যে

কেবল হিন্দুদের ভাষা নয়, তা ইতিহাস থেকে প্রমাণের চেষ্টা করেন। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক গন্ধ থাকলেও আসলে এটা আত্মরক্ষার বর্ম মাত্র। বদরুদ্দিন সাহেব এর অনেকগুলি বিস্তারিত নমুনা দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি তুলে দিচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় হাবিবুল্লাহ বাহারের বক্তৃতা থেকে। বদরুদ্দিন উমর অবশ্য তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারকে সমর্থন করতে পারেননি এবং বক্তৃতাটিকে "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও সমগ্র ভাষা আন্দোলনের চরিত্রকে বিকৃত করবার অদ্ভুত প্রচেষ্টা" বলে বর্ণনা করেছেন।

হাবিবুল্লাহ বাহারের বক্তৃতার কিছু অংশ:

"ইসলাম গণতান্ত্রিক ধর্ম, বিপ্লবী ধর্ম, এই জন্য ইসলামের অনুসারীরা স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের ভাষা বাঙলাকে রাজদরবারে আসন দিয়েছিলেন। শাহী দরবারে বাঙলা ভাষা যখন মজলিস জমিয়ে বসেছিলো সে সময় এ দেশের শাস্ত্রকাররা রামায়ণ বা পুরাণের অনুবাদক বা অনুবাদের শ্রোতার জন্য রৌরব নরকের ব্যবস্থা দিচ্ছিলেন। কবি কাশীদাস মহাভারতের প্রতি অধ্যায়ের শেষে 'মস্তকে বাঁধিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ কহে কাশীদাস' বলে ব্রাহ্মণের বন্দনা করলেও এতটুকু সহানুভূতি পাননি তাঁদের কাছ থেকে। বরং ভট্টাচার্য মহাশয়েরা প্রবাদ বাক্য তৈরী করেছিলেন 'কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন-ঘেঁসে এই তিন সর্বনেশে' বলে।

"শুধু তাই নয়, শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব গীতিকথা ও পল্লীগান সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলো সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল মণি, বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে প্রশংসা পেয়েছে দেশী বিদেশী বহু আধুনিক সাহিত্য-রসিকদের কাছ থেকে, সেগুলোও সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল হিন্দু শাস্ত্রকারদের দ্বারা। কারণ কবির এই অপূর্ব সৃষ্টি শাস্ত্রের অনুশাসন মানেনি, লোকাচার ও সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে তুলেছে বিদ্রোহের আওয়াজ। এসব গানে নেই ঠাকুর দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির কথা। এতে আছে ইতর জাতির নায়কের প্রতি কুমারী নারীর স্বেচ্ছাপ্রণয়ের কথা, ভিন্ন জাতির নায়ক-নায়িকার প্রেমের কাহিনী।

"শাস্ত্রকারের বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে যে সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন হয়, যে ভাষা ছিল গণমানসের বাহন, তা যে গোড়া থেকেই মুসলিম নবাব, আমীর বাদশাহদের সমর্থন লাভ করবে তা স্বাভাবিক। আজ সেই ভাষা যে নতুন করে পূর্ব পাকিস্তানের আইনসভার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করবে তা আরও স্বাভাবিক—ইংরেজীতে যাকে বলে in the fitness of things.

"গৌড়ের দরবারে বাঙলা ভাষার আদি

কবি কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস যখন মর্যাদা লাভ করেছিলেন তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সমর্থন এ'রা পাননি। আনন্দের বিষয় আজ ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলিম, ত্পসিলী, খৃষ্টান সকলের সমর্থন পাচ্ছে জননী বঙ্গভাষা। বিরোধের সুর শোনা যাচ্ছে না আজকের এই সভায় কোন দিক থেকেই। অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ—বলে বাংগলা ভাষার সেবকদের যাঁরা অভিসম্পাত করছিলেন তাঁদের সুযোগ্য বংশধর বন্ধুবর গোবিন্দ ব্যানার্জী, গণেন চট্টোপাধ্যায় আজ আমাদের সংগে হাত মেলাচ্ছেন তাঁদের ধন্যবাদ।...

"ভারতের ইতিহাস অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রের বিরোধের ইতিহাস। আদি যুগে অভিজাত ঋষিদের ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা, আর লৌকিক ভাষা ছিল জনগণের ভাষা। এই দুই ভাষার বিরোধে লৌকিক ভাষার জয় হল। নিরুপায় হয়ে অভিজাততন্ত্রীরা লৌকিক ভাষাকে সংস্কৃত করে নিল। জনসাধারণ তখন ব্যবহার করতে লাগল লৌকিক ভাষা পালী। বিপ্লবী বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় পালী হয়ে উঠলো ঐশ্বর্যশালী। পরের যুগে পালী হল অভিজাত ভাষা, লৌকিক ভাষা হল প্রাকৃত। পালীকে হারিয়ে জনগণের ভাষা প্রাকৃত চলল এগিয়ে। এর পর প্রাকৃতকে পরাস্ত করে জনগণের ভাষা অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিল বংলা, হিন্দী, গুজরাতী, আসামী, উড়িয়া, মারাঠি ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা।

"অভিজাততন্ত্র আর গণতন্ত্রের এ লড়াই এখনো শেষ হয়নি। এ সংগ্রাম চলছে এখনো বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। জনগণের ভাষা পেতে চাচ্ছে সাহিত্যের মর্যাদা। বাংগলা ভাষা যখন রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেতে চলেছে সে সময় জনগণের ভাষা আমাদের কাছে স্বীকৃতি পাবে কিনা, এ প্রশ্ন নতুন করে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। আমরা গণতন্ত্রের সমর্থক। এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে পারা উচিত সহজেই। জনগণের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপায়িত করাই হবে আমাদের নীতি। লৌকিক বৈদিককে, পালী সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালীকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে যেমন করে হারিয়ে দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনিভাবে গণভাষা ও গণসাহিত্য সংস্কৃত ঘেঁষা অভিজাত সাহিত্যকে ঠেলে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক—এই হবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা।...

"বাংগলা ব্যাকরণেও মুসলমান প্রভাব কম নয়। 'খোর' (গোজাখোর ইত্যাদি শব্দে), 'দার' (ঠিকাদার ইত্যাদি শব্দে), 'দান' (পিকদান ইত্যাদি শব্দে) এবং 'গিরি' (গুরুগিরি ইত্যাদি শব্দে) তদ্ধিত প্রত্যয়ের কাজ করছে। ভট্টাচার্য পণ্ডিতের আপত্তি সত্ত্বেও 'ধন-দৌলত', 'গরীব-কাংগাল', 'হাট-বাজার', 'জিনিসপত্র', 'লজ্জা সরম', 'চালাক চতুর', 'কাণ্ড কারখানা', 'লোক লস্কর', থানা 'খন্দক', শাকসব্জী, ঝড় 'তুফান', মুটে 'মজুর', হাসি 'খুসী' প্রভৃতি যুগ্ম শব্দে সংস্কৃত, আরবী, ফারসীর সংগে যেমন গলাগলি করে চলেছে তেমনি হিন্দু মুসলিম হাত ধরাধরি করে সৃষ্টি করেছে বাংগলা সাহিত্য।...

"আদি বাংগলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে দেবতার লীলাখেলাকে কেন্দ্র করে। দেবভূমি থেকে বাংগলা সাহিত্যকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়েছেন মুসলমান। এরপর বহু দিন বাংগলা সাহিত্যের কারবার ছিল রাজরাজড়া নিয়ে। ধীরে ধীরে উজিরপুত্র, কোটালপুত্র, সওদাগরপুত্র স্থান পেয়েছে এখানে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সমাজে সাহিত্যকে নামিয়ে এনেছেন। বাংগলার বিরাট জনসমাজ এখনো সাহিত্যে স্থান পায়নি। আজ পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকের কাজ হবে—রিক্ত সর্বহারাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া। এদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা। এক কথায় সত্যিকারের গণ-সাহিত্য সৃষ্টির সাধনা হবে আমাদের সাধনা।...

"আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এই নূতন আবহাওয়ায় আমরা সন্ধান পাব জাতির শাশ্বত প্রাণধারার। আমরা সহজভাবে সাড়া দিতে পারব বিশ্ব সংস্কৃতির আবেদনে। নবলব্ধ আজাদীর অপূর্ব প্রাণশক্তি এনে দেবে আমাদের মানস ও মনকে অফুরন্ত উদ্যম ও তেজ। এই উদ্যম এই প্রাণ-চঞ্চলতা থেকে জন্ম নেবে নূতন যুগের নূতন সাহিত্য। এই নূতন সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে আজকের এই রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক প্রস্তাব নানাদিক থেকেই হবে সহায়ক।"

হাবিবুল্লাহ বাহারের এই বক্তৃতা সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমরের সমালোচনা: "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে উনিশ এবং বিশ শতকে হিন্দু সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষা চর্চা ও সাধনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। হুসেন শাহী আমল থেকে এক লাফে খাজা নাজিমুদ্দীনের রাজত্বে পৌঁছে গিয়েছেন।...এবং আগাগোড়া বক্তব্যকে একটা বিকৃত সাম্প্রদায়িক চরিত্র দান করেছেন।"

সরকারী কর্তাদের চেষ্টা দেখলে কিন্তু এঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে বিদেশী শত্রুর দালাল হওয়ার অভিযোগ আসতে কতক্ষণ? নবজাগ্রত মুসলিম জাতীয়তাবোধ তখনও নিজেদের বিরুদ্ধে সামান্য সমালোচনা সহ্য করতেও প্রস্তুত নয়। এই সুযোগকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে কর্তারা অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনকে কীভাবে নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করেছেন তার লোমহর্ষণ বিবরণ আছে বদরুদ্দীনের ঐতিহাসিক বইটিতে।

যেমন ধরুন নাচোল কৃষক বিদ্রোহ ও পরবর্তী নির্যাতন। রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার নাচোল অঞ্চলে সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই দলে ছিলেন ইলা মিত্র। আন্দোলনের এক পর্বে উত্তেজিত সাঁওতালরা পুলিস হত্যা করেন।

তারপর শুরু হয় এক অমানবিক নির্যাতনের ইতিহাস। বদরুদ্দীনের ভাষায়: "নাচোল থেকে রাজশাহী জেলের অভ্যন্তরে পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইলা মিত্র এবং এই সাঁওতালরা যে শুধু পুলিসের দ্বারা নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছেন তাই নয়, স্থানীয় জনসাধারণ এবং জেলের অন্যান্য সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত তাঁদের প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেছে। পাকিস্তান বিরোধী, হিন্দুস্থানের বাহিনী এবং শত্রুপক্ষের লোক এই সরকারী প্রতারণার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত এবং মুসলিম লীগের লোকজনের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে এই মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিক সাঁওতালদের তারা খাওয়ার পানি পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে স্পর্শ করতে দেয়নি।"

লেখক বলছেন, ইলা মিত্রের ওপর পুলিস যে অত্যাচার করে "পাকিস্তানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তার তুলনা নেই।"

রাজশাহী কোর্টে ইলা মিত্র যে জবানবন্দি দেন তা পাকিস্তানের কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু ইস্তাহারের আকারে ছাপিয়ে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে সেটি পূর্ব বাঙলার বিভিন্ন স্থানে বিলি করা হয়। লেখক বিবৃতিটি ছাপিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা আজও সেটি পড়েননি, তাঁরা শুনুন:

"কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বিগত ৭-১-৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিস আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস আই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।

"আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধেবেলাতে এস আই-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এর পর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস আই-এর

কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিন্ত ছিলুম না।

শুধু কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হল সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল এবং সে সময়ে চারিধারে যারা দাঁড়িয়ে ছিলো তারা বলছিলো যে আমাকে "পাকিস্তানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলেছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।

"সেলের মধ্যে আবার এস আই সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, "এবার সে কথা বলবে।" তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চীৎ করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌনঅঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

"৯-১-৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস আই এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এর পর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়ে আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস আইকে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম : আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস আই এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন সেপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো।২-এর আক্রমণের পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

"পরদিন ১০-১-৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণ ভাবে রক্ত ঝরছে আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেলে গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো।

"সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।

"১১-১-৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিল, তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

"১৬-১-৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল এবং আমাকে বলা হল যে পরীক্ষার জন্যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার পক্ষে নড়াচড়া সম্ভব নয় এ কথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হল এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলিনি কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার সই আদায় করল। তখন আমি আধা অচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল সেজন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হল। এরপর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হল তখন আমাকে ২১-১-৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেলে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হল।

"কোন অবস্থাতেই আমি পুলিসকে কিছু বলি নি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশী আমার আর বলার কিছু নেই।"

এই ভয়াবহ বর্ণনাটি পুনর্মুদ্রণ না করতে পারলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু কর্তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন (ভাষাই হোক আর অন্য কিছুই হোক) তাঁদের কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল তা আমাদের অনেকের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এসব কথা খোলাখুলিভাবে না জানলে ২১শে ফেব্রুয়ারির দাম আমরা বুঝতে পারবো না।

পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের আর একজনের গল্প আমি জমা করে রেখেছি। তিনি বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর শহীদুল্লাহ। তাঁর সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণ তিনি এবং আমি হাওড় জেলা ইস্কুলের ছাত্র। শহীদুল্লাহ এনট্রান্স পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাংলায় রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন। অতি সাধারণ ঘরের ছেলে শহীদুল্লাহ তখন থাকতেন হাওড়া পঞ্চাননতলা জলের ট্যাঙ্কের কাছে, যেখানে আমারও বালাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। হাওড়া জেলা ইস্কুলের শতবার্ষিকীর সময় শহীদুল্লাহ একটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে তাঁর ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা পাকিস্তান থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তাতে একটা লাইন আছে, তিনি পণ্ডিত মশায়ের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। কয়েকজন হিন্দু ছাত্র পণ্ডিত মশায়ের কাছে অভিযোগ করেছিল, আপনি মুসলমানকে সংস্কৃতে প্রথম করেন কেন? পণ্ডিত মশায় বলতেন, একশবার করবো, মুরোদ থাকে তো তোরা শহীদের মত লেখ।

শোনা যায়, শহীদুল্লাহ স্যার আশুতোষের স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে বেদান্ত অনুশীলন করার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে আশুতোষও তাঁকে ওখানে ঢোকাতে পারেন নি। এরপর আশুতোষই তাঁকে স্কলারশিপ দিয়ে প্যারিস না লন্ডন কোথায় পাঠিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাচর্চার জন্যে এবং বিদেশেই ডক্টরেট উপাধি পান শহীদুল্লাহ

সাম্প্রদায়িকতার এই ছোবলেও শহীদুল্লাহ কিন্তু নিজেকে গোঁড়া করে তোলেন নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের চর্চায় তিনি যা কাজ করেছেন, তা আমাদের কালের আর কোনো বাঙালী যে করেননি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এবার দিল্লী গিয়ে শহীদুল্লাহ সম্পর্কে একটি গল্প শুনলাম। এ কাহিনী পাকিস্তান

(সি ৮১৭০)

হবার অনেক দিন আগের ঘটনা। তখন তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁরি এক দিকপাল ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভট্টশালী মশায়ের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন শহীদুল্লাহ সাহেব। একদিন ও'রা সকলে খেতে বসেছেন। শহীদুল্লাহ তাঁর অতীতের অপমানের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, কেমন করে কিছু হিন্দু তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন কাছে আসতে দেন নি। ভট্টশালী মশায় ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। বললেন, "শহীদ, কয়েকটা লোকের ভুলের জন্যে সবাইকে ভুল বুঝো না। সব হিন্দুই যে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় না তার প্রমাণ দেবার জন্যে এই দেখো আমি তোমায় এ'টো খাচ্ছি," এই বলে সত্যিই নলিনীবাবু শহীদুল্লাহর মুখ থেকে ভাত তুলে নিলেন। তারপর এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। শহীদুল্লাহ নাকি সেদিন শিশুর মতো কেঁদেছিলেন।

পাকিস্তান হবার পরও হিন্দু বন্ধুদের যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্যে শহীদুল্লাহ কী আন্তরিক প্রচেষ্টা করতেন তা আমি এবার দিল্লীর এক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনে এসেছি। এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ি যাতে জবরদখল না হয়, তার জন্যে বৃদ্ধ শহীদুল্লাহ বহুলোকের কাছে ছোটাছুটি করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ডক্টর শহীদুল্লাহ, আজাদ পত্রিকায় লেখেন : "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের ভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা পশ্চাদগমনই হইবে। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয় তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার যুক্তি নাই।"

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৮ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি রূপে শহীদুল্লাহ যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তা বদরুদ্দীন উমর তাঁর বইতে উদ্ধৃত করেছেন। শেষ অংশটি আগে তুলছি। শহীদুল্লাহ বলেন : "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার-চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।"

শহীদুল্লাহর আরও কয়েকটি বক্তব্য : "স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য।...এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি... স্বাধীন পূর্ব বাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫জন যে-নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকতো আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকতো, তবে এই অক্ষর প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলা ভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।"

শহীদুল্লাহ আরও বলেন, "পূর্ব বাংলা জনসংখ্যায় গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্যে, জ্ঞানে গুণে শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হবে। তাই কেবল কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান, বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন দিতে হবে।"

শহীদুল্লাহ সাহেব এই বক্তৃতার জন্য কিভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন তা বদরুদ্দীন বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারি রেগে মেগে চিৎকার করে ওঠেন, "আমি কি ঢাকাতে আছি, না কলকাতায়?" আজাদ পত্রিকায় লেখা হল, "অখণ্ড ভারতের যুক্ত বাংলায় সাহিত্যিক অভিভাষণে এমন কথা অনেকেই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানী পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে, এ কথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈকি। তা ছাড়া কোন হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ "মা প্রকৃতির" এমন স্তব গাহিবেন, এ কথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।"

বদরুদ্দীন সাহেবের বইতে উল্লেখ না থাকলেও, বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, শহীদুল্লাহর অবস্থা এমন শোচনীয় করে তোলা হয়েছিল যে এক সময় তিনি পাকিস্তান ত্যাগ করার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কলকাতায় আসার জন্য তখনও ভিসা পাসপোর্ট চালু হয় নি, একটা পারমিটই যথেষ্ট। রাতের অন্ধকারে বৃদ্ধ শহীদুল্লাহ তাঁর দেশ ত্যাগের পরিকল্পনা পাকা করেছিলেন। কিন্তু সরকারী পুলিস পরের দিন বিমানবন্দরেই তাঁর চেষ্টা বানচাল করে দেয়।

হিমালয়ের মত বিরাট বাধা অতিক্রম করে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন কীভাবে সার্থক হয়ে ওঠে তা এই শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। এই মহা উপাখ্যানের সার্থক কাশীরাম দাস হলেন বদরুদ্দীন উমর। আমরা তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। এই কৃতজ্ঞতা শুধু তাঁর বিষয় নির্বাচনের জন্যে নয়, তাঁর নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে এবং তাঁর বিপুল পরিশ্রমের জন্যে। সমকালের এক স্মরণীয় অধ্যায়কে ভাবীকালের পাঠকদের হাতে তুলে দেবার জন্য তিনি কি চেষ্টা করেছেন, তার পরিচয় এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে। একজন সামান্য সাহিত্যসেবী হিসেবে তাঁকে আমি নমস্কার জানাই। ভূমিকায় বদরুদ্দীন সাহেব বলেছেন, "খবরের কাগজ, অন্যান্য সাময়িকী, পার্টি সমূহের দলিলপত্র, ইস্তাহার, পুস্তিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্যে আমি বস্তুতপক্ষে ১৯৬৩ সাল থেকেই চেষ্টা করে আসছি।...অনেক ক্ষেত্রেই নিরাশ হতে হয়েছে। কারণ যাঁদের কাছে কাগজপত্র থাকার কথা তাঁরা এমনভাবে সেগুলি রেখেছিলেন যাতে করে ১৯৫২ সালে এবং পরবর্তী ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সময় সেগুলির প্রায় সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়। কোন ক্ষেত্রে কাগজের মালিক নিজেই পুলিসের ভয়ে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আবার তাঁরা যাঁদের কাছে সেগুলি গোপন সংরক্ষণের জন্য জমা রেখেছিলেন তাঁরাই পুলিসী আক্রমণ ও তল্লাসীর সম্ভাবনা কল্পনা করে সেগুলি অনাবশ্যকভাবে পুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের কাপুরুষতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন।"

প্রবন্ধের গোড়াতেই যে বিলেত-ফেরত ভদ্রলোকের কথা বলেছি তাঁর প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার স্মরণীয় দিন হতে পারে। কিন্তু আমরা, অর্থাৎ এপারে বাংলার মানুষরা ঐদিনের কথা ভেবে তেতে উঠি কেন!

তাঁকে সোজাসুজি বলতে পারিনি, ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রত্যেক বাঙালীর জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। এপারে আমরা মুখে যা বলি, ওপারে ওরা তা কাজে করে দেখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আরএকটা কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাকে নাড়া দেয়। এই শতাব্দীতে বাঙালী যত আন্দোলন করেছে তার কোনটাই সফল হয়নি। আমাদের হীরের টুকরো ছেলেরা ফাঁসিতে ঝুলেছে, জেলে পচেছে, নিজেদের সর্বস্ব দিয়েছে, কিন্তু মায়ের দুঃখ ঘোচেনি। সমুদ্র মন্থনে যদি বা সামান্য দই উঠেছে তা নেপোয় মেরেছে। আমাদের ব্যর্থতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ২১শে ফেব্রুয়ারি। একমাত্র ২১শে ফেব্রুয়ারিই আমাদের সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছে—পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে, বিশ্বসভায় বাংলা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

মৃত্যু জীবজগতের অপরিহার্য পরিণতি।

যে শিশু এই মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করল, পরিবেশের সহায়তায় জৈবিক বিন্যাস এবং সমবায়ের মাধ্যমে একদিন সে পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে। অবশেষে ক্রমে কখন, কীভাবে এবং কেন অপরাহ্নের তির্যক রশ্মি তার জীবন-তরীটি গোধূলির শেষ লগ্নে পৌঁছে দেয়, বার্ধক্যের জরা তার শেষ প্রাণস্পন্দনটি গ্রাস করে, বিজ্ঞানীদের কাছে এ যেন এক চিরায়ত প্রশ্ন।

আকাশের পানে চাই,/সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি/অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া॥

—রবীন্দ্রনাথ

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ, যে সমস্ত দেহ-কোষ তার শারীরিক গঠনটিকে সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেকেই তরুণ থেকে ক্রমে অতি-বয়স্কের ভূমিকা গ্রহণ করে। শৈশবের প্রাণচাঞ্চল্য তখন হ্রাস পায়। অবশেষে সকলেই তারা স্থবির হয়ে যায় এবং অন্তিমে মৃত্যু। অণু-জীববিজ্ঞানীদের অভিমত: কার্য এবং অবস্থা বিশেষে কোষ বিশেষে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মৌলিক গঠনের দিক দিয়ে তারা সকলেই প্রায় সমান। অতএব যে কোন এক ধরনের কোষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে, কেন এবং কীভাবে ঐ কোষ বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে, যদি সে রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়, তাহলে অপরাপর কোষ সম্পর্কেও অনেক তথ্য আমরা জানতে পারব। আর তখনই বলে দেওয়া সম্ভব হবে শৈশব এবং বার্ধক্যের মাঝে যে জৈবিক ব্যবধান, তার স্বরূপটি কী? সেই সঙ্গে মৃত্যুর নবতর সংজ্ঞা।

ডি এন এ বা ডিঅক্সি নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের আবিষ্কার জীবজগতের এক নতুন দিগন্ত উন্মীলিত করেছে। ডি এন এ যেন এক একটি ছবির ব্লক। নির্দিষ্ট ছবির ছাপ পেতে গেলে যেমন নির্দিষ্ট ব্লকটির প্রয়োজন, প্রকৃতির অলিখিত নিয়মে ডি এন এ-র মধ্যে নিহিত থাকে অগণিত জীবন-সংকেত বা জেনেটিক কোড। শরীরের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্যে প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন দেহ-কোষ। তাদের কেউবা ডিম্বাকৃতির, কেউ আঁশের মত লম্বা, কারোর বা চেহারা ষড়ভুজ ফলকের মত। এক একটি জীবন-সংকেত নির্দিষ্ট এক ধরনের কোষ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ছাপাখানার একটি ফর্মার মধ্যে যেমন নির্দিষ্ট অর্থবহ কতকগুলি বাক্য থাকে, এবং কাগজের উপর ছাপ মারলে শুধু ঐ বাক্যগুলিই মুদ্রিত হয়, আর কিছু নয়, নির্দিষ্ট জীবন-সংকেতও ঠিক তেমনই তার নিজস্ব অর্থবহ কোষ তৈরি করে দেয়, অন্য কোনপ্রকারের কোষ নয়। বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করছেন, বার বার ছাপাখানার পর কোন একটি ব্লক এক সময়ে যেমন অস্পষ্ট হয়ে যায়, তার সাহায্যে পরিষ্কার ছবি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব হয়, ঠিক তেমনি অনিবার্য কারণে কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ডি এন এ-র মধ্যেও খানিকটা চিড় ধরে। তার কিছু কিছু অংশ নষ্ট হয়। আর এর মূলে কাজ করে ক্ষতিকর-বিকিরণ, শ্বাসকার্যের জন্যে ব্যবহৃত বাতাসের দূষিত অংশ অথবা খাদ্যের ক্ষতিকর উপাদান। ঐ সমস্ত পদার্থ ক্রমান্বয়ে তাদের ক্ষতি করে। ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া ডি এন এ যে সমস্ত বস্তু তৈরি করতে শুরু করে দেয় তাদের মধ্যে ভালর চেয়ে মন্দের অংশই যায় বেড়ে। এবং অবশেষে এই মন্দের মাত্রা যখন নির্দিষ্ট একটি সীমা অতিক্রম করে যায় তখন কোষগুলি আর জীবন্ত থাকতে পারে না। সম্প্রতি এই তত্ত্বটিকে আরও কিছুটা সরল করার চেষ্টা করেছেন লণ্ডনের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের জীব-পদার্থ গবেষণা বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডঃ স্টিভেন প্লেক।

ডঃ প্লেক-এর বক্তব্য: বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডি এন এ-টি যে নষ্ট হতে শুরু
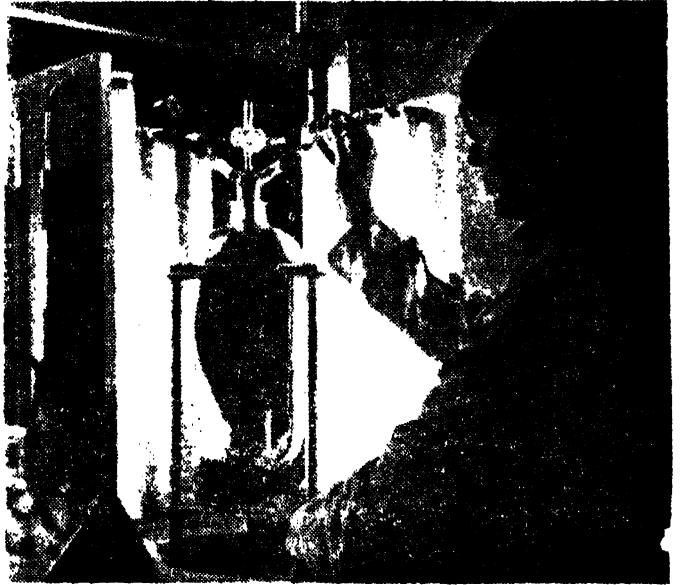
লণ্ডনের নিকটবর্তী অ্যাগারসাম-এর রেডিও কেমিকেল কেন্দ্রে জনৈক বিশেষজ্ঞ 'ক্যানা ইনডিকা' নামে এক ধরনের উষ্ণ অঞ্চলীয় গাছের পাতা থেকে কার্বন-১৪ সমন্বিত শর্করা সংগ্রহ করছেন। বেলজারের মধ্যে একটি জলপূর্ণ পাত্রে পাতাটিকে রেখে দেওয়া হয়েছে। জারটি পূর্ণ করা হয়েছে বাতাস এবং কার্বন-১৪ ঘটিত কার্বন ডাই-অক্সাইড। সালোক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর সাহায্যে পাতার সবুজ কণা কার্বন-১৪ ঘটিত গ্লুকোজ তৈরি করবে। পরে তাকে সংগ্রহ করে পাঠান হয় বিভিন্ন গবেষণাগারে। বিশেষ বিশেষ ধরনের গবেষণার জন্যে। উল্লেখ্য, সাধারণ কার্বনকে বলা হয় কার্বন-১২। কার্বন-১৪ কার্বনেরই একটি আইসোটোপ।

ফটো: স্পেকট্রামের সৌজন্যে

না, উনি রেডিওর কোন প্রোগ্রাম শুনছেন না, মোটরগাড়ির কোথাও কোন ফাটল ধরেছে কি না, সেটা পরীক্ষা করছেন। ব্রিটিশ ফোর্ড মোটর কোম্পানি এবং লন্ডনের ট্রান্স-গ্লোবাল ইলেকট্রোনিকস অভিনব এই যন্ত্রটির আবিষ্কারক। এতে আছে একটি হেডফোন, শব্দ প্রক্ষেপক এবং শব্দগ্রাহী যন্ত্র। সব কিছুই চলে ট্রানজিস্টারে। শব্দগ্রাহী যন্ত্রটি শুধু মোটরগাড়ির কাছাকাছি রেখে এদিক সেদিক করা। যদি কোথাও কণামাত্র ফাটল বা চিড় থাকে, যন্ত্রটিকে সেখানে নিয়ে গেলেই মুহূর্তে হেডফোনে শব্দ ভেসে উঠবে। ছবিতে গাড়ির সম্মুখের কাচের ঢাকনায় একটি সূক্ষ্ম চিড়ের সন্ধান করছেন জনৈক বিশেষজ্ঞ

করে এটা সম্ভবত ঠিক নয়। আসলে ডি এন এ-র কিছু কিছু সংকেত অর্থাৎ যাকে আমরা ছাপাখানার ব্লকের অর্থবহ বাক্যের সঙ্গে তুলনা করেছি, তাদের কোন কোন অংশ নষ্ট হয়ে যায়। দেখা গেছে, যে কোন একটি কোষ তৈরির পেছনে কাজ করে কম করেও প্রায় দশটি সংকেত। এক একটি সংকেত যেন কোন ছাঁচের গায়ে খোদাই করা এক একটি অংশ। জীবকোষ তারই প্রতিকৃতি নিয়ে তৈরি। ঐ সংকেত বা খোদাই করা অংশের যখন ক্ষতি হয় কোষ তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

অনেকের কাছেই ডঃ স্লেক-এর তত্ত্ব সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়েছে। কোন কোষের জীবনকালের গোড়ার দিকে ডি এন এ-র নিজস্ব ছাঁচটির অনুরূপে একটি ছাঁচ তৈরি হয় বলে মনে হয়েছে। দ্বিতীয় এই ছাঁচটিকে বলা হয় কার্যকর জীবন সংকেত। এই কার্যকর সংকেতই কোষটিকে তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করতে সাহায্য করে। এবং এইভাবে মূল ডি এন এ-র সংকেত বার বার অনুলিপিত হয়ে কোষ থেকে কোষান্তরে সংবাহিত হয়। এ যেন একটি ব্লক থেকে নতুন একটি ব্লক তৈরি করা, তারপর নতুন ঐ ব্লক দিয়ে ছাপার কাজ চালান। ফলে মূল ডি এন এ-র ক্ষতি হতে সময় লাগে অনেক কম। অর্থাৎ ব্যাপারটা কতকটা যেন এই রকম : ধরুন, একটি ব্লকে বটগাছের ছবি খোদাই করা হয়েছে। ঐ ব্লকের ছবি থেকে অনুরূপ অনেকগুলি ব্লক তৈরি করা যেতে পারে। এবং তাদের যে কোন একটির সাহায্যে অজস্র বটগাছের ছবি ছেপে নেওয়াও সম্ভব। মাঝখানে যদি একটি ব্লক অকেজো হয়ে যায় ত হলেও অন্যান্য ব্লকগুলি ভালভাবেই কাজ চালাতে পারবে। ডি এন এ-র ব্যাপারটাও কতকটা যেন এই রকম। এর অর্থ হল, যে কোন ডি এন এ-র একটি অনুলিপি যদি নষ্ট হয়ে যায়ও, তাহলেও সামগ্রিকভাবে জীবনকোষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তেমন থাকে না। এ ছাড়াও একই কোষ যখন নিজের কাজটি আরও যথাযথভাবে শেষ করতে চায় তখন তার প্রয়োজন হয় আরও অনেক নতুন ধরনের অংশবিশেষ। এবং ঐ অংশগুলি তৈরির জন্যেও দরকার আরও শত শত সংকেত। শুধু একটি মাত্র মূল সংকেতে তখন আর কোন কাজ হয় না। ডঃ স্লেক দেখিয়েছেন, যদি এই ধারণা বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে ইঁদুরের যে সমস্ত কোষ হরমোন নিঃসরণ করে থাকে, অতিরিক্ত হরমোনের প্রয়োজন হলে তারা অতিরিক্ত ডি এন এ-ও তৈরি করে। এদের কোন কোনটির মধ্যে বিপাকীয় কাজকর্ম করার ক্ষমতার অভাব থাকলে কোষের নিজস্ব কর্মও ব্যাহত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত সেই ডি এন এ পরিত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। কথা অনেকেই জানেন, জীবিত প্রাণী-মাত্র তার জীবনকালে নতুন নতুন ডি এন এ তৈরি করে। দেখা গেছে প্যারামেসিয়া যে এক ধরনের এক-কোষী প্রাণীর মধ্যে দুটি কোষ-কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থাকে। এদের ছোটটির নাম মাইক্রো নিউক্লিয়াস বা অণু-কোষ কেন্দ্র। কোষ বিভাজনের সময় এই কোষ-কেন্দ্রটি বিভক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংবাহিত হয়। কিন্তু অপর কোষ-কেন্দ্র, যাকে বলা হয় ম্যাক্রো-নিউক্লিয়াস, সেটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ডঃ স্লেক-এর বক্তব্য, ঐ মাইক্রো-নিউক্লিয়াসের মধ্যেই কোষের মূল জীবন-সংকেতটি সংরক্ষিত থাকে এবং নতুনতর কোষ সৃষ্টির ব্যাপারে তারা কাজ করে। আর ম্যাক্রো-নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে শুধু নির্দিষ্ট কোষেরই নিজস্ব জীবনের বিভিন্ন রকম কাজকর্ম করার সংকেত। অর্থাৎ তার জৈবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া কীভাবে চলবে তা নির্ভর করে এই শেষোক্ত নিউক্লিয়াসটিরই উপর। আর এরই মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে কোষের বার্ধক্যজনিত ত্রুটি। কীভাবে দানা বাঁধতে থাকে, বিজ্ঞানীদের কাছে আজও তা অস্পষ্ট। এ রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হলে তবেই মানুষ অমরত্ব লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে। আর কখন সেটা সম্ভব হবে ঠিক এই মুহূর্তে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও আপাতত প্রখ্যাত কাহিনীকার আর্থার সি ক্লার্কের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা ভেবেই না হয় আমরা অপেক্ষা করতে থাকি। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ক্লার্ক বলেছিলেন : ১৯৬৯-এ মানুষের চন্দ্রে অবতরণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কাঁটায় কাঁটায় তাঁর সে ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ধারণা অনুযায়ী ২০৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই অমরত্ব লাভ করবে। সময়ের ব্যবধান অনেক বেশি, তবু দেখা যাক, ভাবীকাল কী বলে।

ক্লোরোফিল কী পরজীবী ?

হ্যাঁ, আপাতত সেটাই তো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বললে ভুল হবে, বরং বলা চলে ইতিমধ্যে প্রমাণিতও হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করেছেন দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী-ডঃ স্টুয়ার্ট রিডলে এবং ডঃ রাচেল লিচ। ও'রা দুজনই ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিজ্ঞানী। এর ফলে চিনি বা অনুরূপ খাদ্যের জন্যে ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের আর গাছপালার উপর নির্ভর করতে হবে না। এ খবর পরিবেশন করেছেন স্পেকট্রাম তাঁদের ১৯৭০-এর ৭৯তম সংখ্যায়।

একথা সকলেই জানেন, গাছের পাতা বা কাণ্ডের সবুজ রং-এর মূলে যার ভূমিকা মুখ্য, তার নাম ক্লোরোপ্লাসট। সবুজ গাছের পাতায় সর্বত্রই তারা ছড়িয়ে থাকে। তাদের মূল উপাদান ক্লোরোফিল। অদ্ভুত এই কণিকা সূর্যরশ্মির স্পর্শে উদ্ভিদকে জটিল এক ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে—যার নাম ফোটো-সিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষণ। যার সাহায্যে উদ্ভিজ্জ জগৎ বাতাসের মধ্যে মিশে থাকা কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে শর্করা জাতীয় পদার্থ তৈরি করে এবং নিজস্ব জীবন সংরক্ষণে তাকে কাজে লাগায়।

জানা গেছে, উদ্ভিদের পাতা বা সবুজ কাণ্ডের মধ্যে বাস করলেও অদ্ভুত এই কণিকা উদ্ভিদের অন্যান্য-কোষসামগ্রী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেন পুরোপুরি এক স্বাধীন সত্তা। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরাও প্রমাণ করেছেন, ক্লোরোপ্লাস্ট-এর সৃষ্টির মূলে যে নিউক্লেয়িক অ্যাসিড কাজ করে, চরিত্রের দিক দিয়ে তারাও ভিন্নতর সামগ্রী। উদ্ভিদের অবশিষ্ট কোষ তৈরির পেছনে যে ধরনের জীবন-সংকেত কাজ করে, অর্থাৎ যে উদ্ভিদে সে বাসা বেঁধে থাকে তার সমস্ত প্রকার জীবকোষের সৃষ্টির মূলে যে সমস্ত জেনেটিক কোড বা জীবন-সংকেত সক্রিয় ক্লোরোপ্লাস্টের জীবন-সংকেতের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এটা এবং আরও অন্যান্য কারণে জীববিজ্ঞানীদের অনেকেই এখন একমত, পৃথিবীর আদি সৃষ্টির যুগে ক্লোরোপ্লাস্টরা হয়ত স্বাধীন জীবরূপেই বিরাজ করত। যেমন আজও করে শত সহস্র জীবাণু, কতকটা ব্যাকটেরিয়ার মত। উত্তরকালে কোন কারণে তারা আজকের সবুজ উদ্ভিদ জগতে বাসা বেঁধে নেয়। হয়ত পারস্পরিক প্রয়োজনের তাগিদে। জীববিজ্ঞানীরা যে ঘটনাটির নাম রেখেছেন 'সিমবিওসিস' বা অন্যোন্যজীবীত্ব। সাধারণভাবে যাকে বলা হয়, বিভিন্ন রকম জীবের পারস্পরিক মিলনের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা।
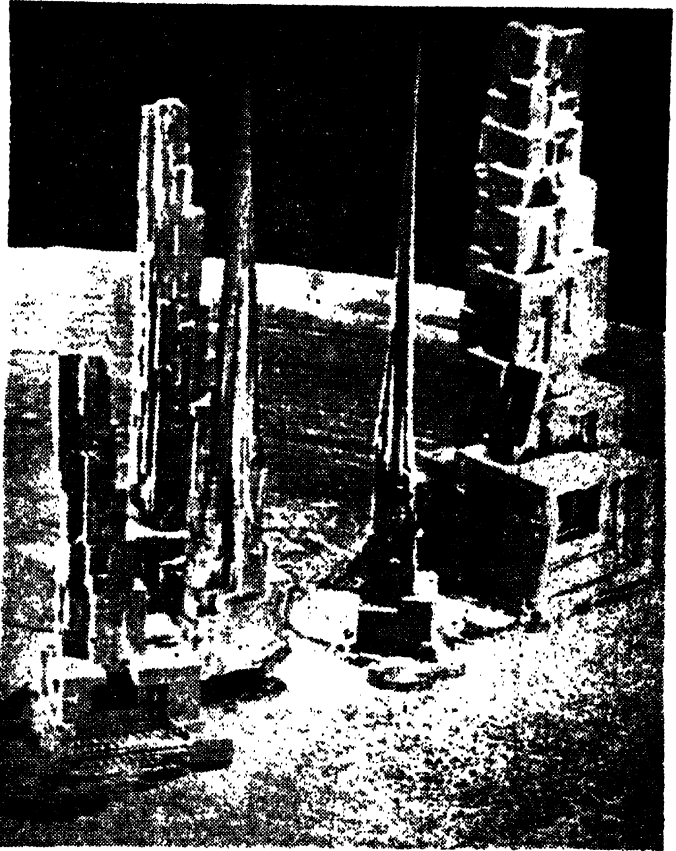
কী মনে করছেন, চাঁদের পিঠের সহর তৈরির পরিকল্পনা? আজ্ঞে না, যা দেখছেন তারা সকলেই এই পৃথিবীরই কোন একটি গবেষণাগারে সাজিয়ে রাখা কতকগুলি সীসে-টিন-টেলুরাইড-এর কেলাস। কেমব্রিজ স্টেরিওস্ক্যানের সাহায্যে তাদের ৯৪ গুণ বড় করে দেখান হয়েছে। যন্ত্রটি ত্রিতালিক ছবি তুলে থাকে। এর পরিবর্ধন ক্ষমতা ৫০০০০ গুণ। সাধারণ দূরবীনের চেয়ে কোন বস্তুকে কেন্দ্রায়িত করার ক্ষমতাও ৩০০ গুণ বেশি

ডঃ রিডলে এবং ডঃ লিচ তাঁদের পরীক্ষাটি চালিয়েছেন এইভাবে : তাঁরা উদ্ভিদ কোষ থেকে ক্লোরোপ্লাস্টদের পৃথক করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তৈরি এক ধরনের জলীয় দ্রবনে তাদের রেখে দেন। পুরোপুরি পৃথক অবস্থায় ঐ দ্রবনে যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে তার জন্যে সম্ভাব্য সব রকমেরই চেষ্টা করা হল। আর সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রায় এক সপ্তাহ পর দেখা গেল, ঐ অবস্থায় ওরা যে শুধু বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে তাই নয়, ওদের অনেকেই বিভক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধিও করেছে। একটি অ্যামিবা বংশ বৃদ্ধির সময় ঠিক যেভাবে দুটি অ্যামিবায় পরিণত হয়, ব্যাপারটা কতকটা যেন সেই রকম।

কৃত্রিম মাধ্যমে ক্লোরোপ্লাস্টের এই ধরনের বিভাজন এটাই প্রমাণ করল, উদ্ভিদের মধ্যে অবস্থান করার সময়ে তারা অনুরূপ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করল, তারা স্বাধীনভাবে সৃষ্ট এক ধরনের জীবাণু। এবং এই আবিষ্কারের সবচাইতে বড় দিক হল, ভবিষ্যতে উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণ ক্লোরোপ্লাস্ট সংগ্রহ করে ইচ্ছেমত কৃত্রিম পরিবেশেই তাদের যত বেশি সম্ভব বংশ বৃদ্ধি করানটা সহজভাবে সারা যাবে তখন উদ্ভিদ দেহে সূর্যরশ্মির সাহায্যে যেভাবে তারা শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন

করে, ঠিক সেইভাবে তাদের দিয়ে আমরা যত বেশি সম্ভব শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন তৈরি করে নিতে পারব। শর্করা জাতীয় খাদ্যের জন্যে তখন আর আমাদের গাছ-পালার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে না।

এর আরও একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল, উদ্ভিদ যখন শর্করা জাতীয় পদার্থ তৈরি করে, তার বেশ বেশ বড় একটি অংশ নিজেদের বেঁচে থাকার জন্যেই তারা ব্যবহার করে। অবশিষ্ট যেটুকু থাকে, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগায়। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারলে যেটুকু শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি হবে তার সবটাই প্রায় নিজেদের স্বার্থে আমরা কাজে লাগাতে পারব।

রোগ নিরাময়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ

ওষুধের পরিবর্তে ইদানীং অপরিবর্তী-বিদ্যুৎ প্রবাহ বা ডাইরেক্ট কারেণ্ট-এর সাহায্যে রোগ সারানর ব্যাপারে চিকিৎসক-দের আগ্রহ অনেক দেশেই বেড়ে গেছে। নতুন এই পদ্ধতিটির নাম গ্যালভানাইজেশন।

এর সাহায্যে সহজেই হৃদ্‌পিণ্ডের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। এই সঙ্গে অনেক স্নায়বিক রোগ এবং বিপাকীয় রোগও। সম্প্রতি বিদ্যুৎ প্রবাহ কাজে লাগিয়ে দেহ-কোষের মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু ওষুধও সংবাহিত করা হচ্ছে। বিশেষ করে সেই সমস্ত ওষুধ যেগুলি অয়নিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। যেমন, প্রোসেইন, আইওডিন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন প্রভৃতি। বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে শরীর কোষে এই-ভাবে ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতিটির নাম ইলেকট্রোফোরেসিস। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ইংজেকশন অথবা মুখের মধ্যে দিয়ে ওষুধ প্রয়োগের চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকর। কারণ ইলেকট্রোফোরেসিস-এর সাহায্যে যে সমস্ত ওষুধ শরীরে প্রবেশ করান হয় তাদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী এবং শরীরে প্রবেশ করার পর উপাদানগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে কোন ক্ষতি করে না।

সোভিয়েত দেশ-এর অল ইউনিয়ন রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল ইনস্ট্রুমেনটেশন 'পোটক-১' নামে একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন। গালভানাইজেশন এবং ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যাপারে ওঁরা দাবী করেছেন, অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় এটির কার্যক্ষমতা নাকি অনেক গুণ বেশি। পরিবর্তী-প্রবাহ বা অলটারনেটিং কারেন্টকে বিশুদ্ধ অপরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিবর্তিত করার জন্য যন্ত্রটিতে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা আছে। আর আছে নানারকম তড়িৎ-দ্বার বা ইলেকট্রোড। যাদের সাহায্যে বুক, হৃৎপিণ্ড, শিরদাঁড়া, পৌষ্টিকনালী, পাকস্থলী, মাথা, ঘাড় এবং শরীরের আরও বিভিন্ন অংশে সহজেই গালভেনাইজেশন বা ইলেকট্রোফোরেসিসের কাজ চালান যেতে পারে। এ ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির সহযোগে 'পোটক-১'কে বিভিন্ন রকমের অসংক্রামক রোগ, যেমন গেঁটেবাত, শরীরের কোন অংশে অতিরিক্ত লবণ জমে ওঠার দরুন রোগ, স্নায়বিক প্রদাহ প্রভৃতি সারিয়ে তোলাও সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত রোগের চিকিৎসার সময় যন্ত্রটিকে এক নাগাড়ে পাঁচ থেকে তিরিশ মিনিট ধরে কাজে লাগাতে হয়।

আপেল

একটা পুরনো প্রবাদ : 'রোজ যদি একটা আপেল খাও, তাহলে ডাক্তারের বাড়ি আর ছুটতে হবে না।' মাফ করবেন, প্রবচনটি এদেশের নয়, অন্যত্র প্রচলিত। বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, যেখানে আপেলের কৌলিন্য কতকটা আলুবেগুনেরই মত। আমাদের এখানকার মত এত মাগ্‌গা নয়, সুলভ। ইচ্ছে করলে দরিদ্রও সেখানে রোজ হয়ত একটি করে আপেল উদরস্থ করতে পারে। অতএব আপেলের কথা তুললেই দয়া করে এই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এ প্রবচনটির পেছনে যে সঠিক বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে, এর খবর পাওয়া গেল। বলা হয়েছে, পাকস্থলীর রোগ নিরাময়ে আপেলের ভূমিকা নাকি অনন্য। মিশরের আলেকজেন্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষকের বক্তব্য, আপেলের মধ্যে পেকটিন নামে যে উপাদানটি রয়েছে জীবাণু হত্যার ব্যাপারে তার ক্ষমতা অপরিসীম। উল্লেখ্য বিশ্ব-বিজ্ঞানের পাতায় কয়েকমাস আগে কমলালেবু প্রসঙ্গেও একথা আলোচনা করেছিলাম। আপেল এবং কমলালেবু উভয়েই এতদিন আমরা ভিটামিন-সি-এর অন্যতম আকর রূপে জেনে এসেছি। বিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, ভিটামিন-সি-এর চেয়ে জীবাণু-ঘটিত রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেই এই ফল দুটির গুরুত্ব অনেক বেশি বলেই মনে হচ্ছে। শরীরে যতটা না ভিটামিন-সি জুগিয়ে তারা সাহায্য করে, তার চেয়ে অনেক বেশি সাহায্য করে শরীরের মধ্যেকার ক্ষতিকর জীবাণুদের হত্যা করে।

● আলেকজেন্ড্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই দুজন বিশেষজ্ঞের নাম এম এ এল নাকীব

এবং আর টি ইউসুফ। **'প্লাণ্টা মেডিকা'র ১৮তম খণ্ডের ২০১ পৃষ্ঠায় আপেল সম্পর্কিত** পরীক্ষাটির উপর ওঁরা যা বলেছেন, তার সার কথা : বিশুদ্ধ পেকটিন নানারকম ব্যাকটেরিয়া অনেক কম সময়ের মধ্যেই ধ্বংস করতে পারে। একটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শতকরা এক ভাগ বিশুদ্ধ পেকটিন-এর জলীয় দ্রবন মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে নয় গ্রাম ক্ষতিকর ব্যাক-টেরিয়ার শতকরা নব্বুই ভাগ সাবাড় করে দিয়েছে। এবং দু ঘণ্টা পর তাদের কারোরই দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ছিল **প্রোটাস, সালমোনেল্লা** এবং **সিজেল্লা**। এরা সকলেই উদারময় রোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

তবে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া আমাদের তেমন কিছু ক্ষতি করে না, তাদের ব্যাপারে ফলাফলটা কিছুটা ভিন্নতররূপে দেখা গেছে। ওঁরা দেখেছেন, পেকটিন-এর সংস্পর্শে এসে ওদের কেউ কেউ অর্থাৎ বিশেষ কোন কোন গোষ্ঠী তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে এবং অনেকের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া অনেক ধীরে ঘটে থাকে। আবার **ব্যাসিলাস সেরেয়াস** নামে এক ধরনের জীবাণুর বেলায় ব্যাপারটা ঘটে ঠিক বিপরীত। তারা মারা তো পড়েই না, বরং পেকটিনকে তারা কাজে লাগায় নিজেদের খাদ্য হিসেবে। কিন্তু **ক্যানাডিয়া** নামে এক ধরনের ছত্রাক হওয়ায় এই বিশেষ রাসায়নিক যৌগটির ক্ষমতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে ঐ বস্তুটির সান্নিধ্যে শতকরা দশ ভাগ ছত্রাক চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে না।

উল্লেখ্য, ১৯৩০ নাগাদ উদারময় রোগের প্রতিশেধকরূপে আপেল খাওয়ার বিধান রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অতএব— ঐ রোগে যাঁরা ভুগছেন অথবা সম্ভাবনা আছে, অথচ বিস্বাদ 'পিল' যাদের কণ্ঠ-নালীর কাছে আটকে যায়, আপেলের ব্যাপারটা তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। রোগ নিরাময় এবং রসাস্বাদন, লোভনীয় বইকি!

সমরজিৎ কর

চিঠি

বিগত ১১ সংখ্যা 'দেশ'-এর নিয়মিত বিভাগ 'বিশ্ববিজ্ঞান'-এ 'পেঁয়াজ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সম্প্রতি এই বিভাগ বৈদেশিক পত্রিকার মতো লোকবিজ্ঞানকে জনমানসে উপস্থাপন করতে পারছে। 'দেশ'-এর মতো সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় লোকবিজ্ঞানকে এভাবে প্রাধান্য দেওয়া কমবড়ো কথা নয়।

পেঁয়াজ সম্বন্ধে আমি আরও একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। ১৯৬৬ সালে লক্ষ্ণৌর কে জি মেডিক্যাল কলেজের শ্রীযুক্ত এন এন গুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীরা সর্বপ্রথম দেখান যে পেঁয়াজ ধমনীর সুস্থিসম রাখতে ওস্তাদ! পরে ১৯৬৮ সালে ইংল্যাণ্ডের নিউকাসল-টাইনের একদল ডাক্তারের দ্বারা এটা স্বীকৃত হয়। ইতালীর বিজ্ঞানীরা পেঁয়াজের রস যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গিনিপিগদের রক্তে ইনজেকশন করিয়ে ঢুকিয়ে রোগ নিরাময়ের উপায় পেয়েছেন। রুশ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পেঁয়াজের মধ্যে ফাইটনসাইড নামে যে জীবাণুনাশক পদার্থ আছে তা মুখের সমস্ত জীবাণু ধ্বংস করে আর দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়। রয়াল ভিক্টোরিয়া ইনফারমারীর (ইংলণ্ড)) একদল গবেষক জানিয়েছেন যে প্রতিদিন এক প্লেট করে পেঁয়াজ খেলে হৃদরোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ভারতীয় 'মেটেরিয়া মেডিকা' (Materia Medica, Nadkarui & Co, Bombay, 1927) নামক গ্রন্থে তামাক-বিষক্রিয়া, ম্যালেরিয়া-জ্বর, অর্শ, অম্লাশয়, স্কার্ভি ইত্যাদি নানান রোগের নিরাময়ে পেঁয়াজের ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। সক্রেটিস মনে করতেন যে পেঁয়াজ খেলে মনে সাহস ও দেহে শক্তি হয়। প্রাচীন ইজিপ্সিয়ানরা বলতেন যে, মদের (Wine) সাথে পেঁয়াজ ফুটিয়ে খেলে শরীরের চামড়ার রঙ ফর্সা হয় (Science Reporter, Vel 6, No 11 page no 580)।

পেঁয়াজ সম্বন্ধে এরকম বহু ডাক্তারি খোঁজখবর আছে। অদূর ভবিষ্যতে হৃদপিণ্ডের রোগ নিরাময়ে পেঁয়াজ-পিল আসবে, আশা করা যায়।

শ্রীতমালকান্তি পাল
কলিকাতা-২৬

উন রুশ
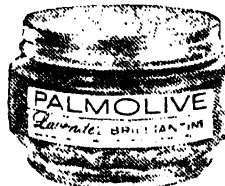
জ্যোতিদার বিয়ের পর শোনা গেল গৌরীর দাদা শ্রীশেখরেরও বিয়ের আয়োজন চলেছে। কলকাতায় পাত্রী দেখার জন্যে স্বয়ং সুমতি দেবী আসছেন। সঙ্গে গৌরী ও তার বাচ্চা। এটা নাকি দাদার ইচ্ছা। ওঁর বউ কে হবে না হবে সে বিষয়ে গৌরীর পরামর্শ নাকি অপরিহার্য। "গৌরীর মতো রুচি আর কার?"

শ্রীশেখরপ্রতাপের সঙ্গে রত্নর পরিচয় ছিল না। হলো জ্যোতির বিয়ের বরযাত্রীদের বৈঠকে। এসেছিলেন তিনি সাহেবী পোশাক পরে। আলাপ করলেন ইংরেজীতে। রত্ন তো দুটি একটি কথার বেশী বলতেই পারে না। সঙ্কোচে বোবা বনে যায়। কে জানে তিনিও হয়তো মনে মনে ওকে পরখ করে দেখছেন যে, গৌরীর মতো নারীর উপযুক্ত সাথী নয়।

মৌতি মুস্তফীর ওখানেও আবার দেখা ও আলাপ। এবার রত্নকে সমীহ করলেন শ্রীশেখর। ইতিমধ্যে ওঁর কর্ণগোচর হয়েছিল যে ছেলেটি আর দুদিন বাদে বিলেত যাচ্ছে। যেটা তিনি হাজার সাহেব সেজেও এতদিন পারেননি, বাণিজ্যে সফল না হলে কোনোদিন পারবেনও না। এবার তাঁর মুখ দিয়ে বাংলা বেরিয়ে এল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে গৌরীর সঙ্গে রত্নর বন্ধুত্ব কতদূর গড়িয়েছে এটা তিনি জানতেন না। শুধু জানতেন যে ওদের সাত ভাই চম্পা বলে একটা সাহিত্যিকমণ্ডলী আছে।

এবার রত্নর সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়ে যায়। বললেন, "আসবেন একদিন আমার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। মোহনকে তো আপনি চেনেন। ওই আপনাকে নিয়ে যাবে।"

একদিন মোহন সত্যি সত্যি এল। তার হাতে একখানা চিঠি। গৌরী লিখেছে খবর দিতে যে সে এখন কলকাতায় দাদার ফ্ল্যাটে। এতদিন এটা 'ছিল নারীবর্জিত'। শ্রীশেখর ওখানে বাস করতেন বাবুর্চি বেয়ারা সমেত। থাকতেন পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে। গৌরীর যেটা দুচক্ষের বিষ। সেইজন্যে সে যতবার কলকাতা এসেছে দাদার সাদর আহ্বান উপেক্ষা করেছে। এবার মা স্বয়ং এসেছেন বলে বাবুর্চিকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, তার জায়গায় রাখা হয়েছে ঠাকুর। তা সত্ত্বেও ফ্ল্যাটের গা থেকে বিলিতী গন্ধ যাচ্ছে না। কারণ অন্যান্য ফ্ল্যাটে বিস্তর সাহেব মেম। বেশীরভাগ আংলো-ইণ্ডিয়ান।

"তোকে জানাবার সময় পাইনি, মানিক। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল যে সামনের অগ্রহায়ণেই দাদার বিয়ে দিতে হবে। তা নইলে দাদাও হয়তো ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু জ্যোতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রেমে পড়বে ও অসবর্ণ বউ আনবে। প্রেম বা অসবর্ণ কোনোটাই ওর গুরুজনের পছন্দ নয়।" গৌরী লিখেছে।

ওটা সাহেবপাড়া বলে রত্ন সেদিন সাহেবী পোশাক পরেই যায়। পাছে ওকে দারোয়ান ঢুকতে না দেয়। মোহনকেও দেখা গেল সাহেবী পোশাক পরে থাকতে।

গৌরীর মা তখন কুটুম্ববাড়ি গেছেন, দাদা ওর আপিসে। গৌরী ওর ছেলের খাতিরে একলা রয়েছে। অবশ্য ঝি চাকর নিয়ে।

"আয়, আয়। অনেকদিন তোকে চোখে দেখিনি। শুকিয়ে গেছিস দেখছি।" গৌরী উঠে এসে রত্নকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের একটি সোফায় বসায়। একটুখানি দূরত্ব বজায় রাখে লোকচক্ষু এড়াতে। মোহনকে বিদায় দেয়।

সেদিন রত্নর চেহারা দেখে গৌরী যত না দুঃখিত হয় গৌরীর দশা দেখে রত্ন তার চেয়ে বেশী। ও মেয়ে শুকিয়ে যায়নি, মোটা হয়েছে। কিন্তু ওকে দেখলে মনে হয় ও ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে। ওর মনে ভাঙন ধরেছে।

"মরে যাচ্ছি, মানিক। কে আমাকে বাঁচাবে?" গৌরী হা-হুতাশ করে।

"কেন, কী হলো আবার?" রত্ন ঘাবড়ে যায়।

"শুভদর্শন? আমাকে নিতে আসছে।" গৌরী খবরটা শোনায়। লিখেছে বেগমপুর থেকে। লিখেছে পুরো এক বছর তো বাপের বাড়িতে কাটল। আর কতদিন কাটবে? ওদিকে মাধবের সেবাপূজা করবে কে? দেবতার অবহেলা হচ্ছে।"

রত্ন চুপটি করে শোনে। কী বলবে বুঝতে পারে না। ক্ষমতা তো নেই গৌরীকে আর কোনোখানে নিয়ে যাবার। থাকলে প্রস্তাব করত।

"অঘ্রানেই তো দাদার বিয়ে। আর কটা দিন সবুর করে বিয়েটা দেখে গেলে তো আরেক দফা খরচপত্তর করে বাপের বাড়ি আসতে হয় না। এত শীগগির ওঁরা পাঠাতে চাইবেনও না। এখন যাওয়া মানে
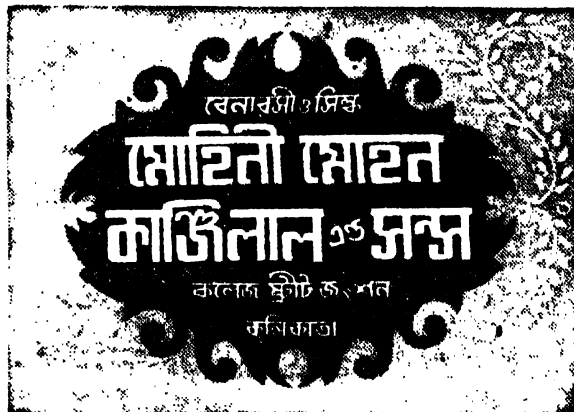
কে জানে ক'বছরের মতো যাওয়া!" বলতে বলতে গোরী ভুলে যায় যে আসছে বছর রঞ্জুর সঙ্গে ইলোপ করার কথা আছে।

রঞ্জুও মনে ক'রিয়ে দেয় না। কে জানে আসছে বছর কী আছে ওর বরাতে? সিদ্ধি না ব্যর্থতা? ব্যর্থ হলে কি ইলোপ করা চলে?

ওর মুখ দেখে গোরী অনুমান করে ওর মন। বলে, "তুই তোর যথাসাধ্য করেছিস ও করবি। কিন্তু জ্যোতি আমাকে হতাশ করেছে। কী শক! কী শক! ও শক আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। বোধ হয় পারবও না। একেই বলে গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া। এখন আমি কোন্ মুখে বেগমপুরে ফিরে যাই! মালিক আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসবেন। আর সে হাসি বিষের ছুরির মতো আমার মর্মে বিঁধবে। ওঃ কেন যে তখন তোর কথায় ভুলে আত্মহত্যা করিনি! কেন তুই অমন শত্রুতা করলি!"

রঞ্জু নীরবে শুনে যায়, প্রতিবাদ করে না। গোরী বলতে থাকে, "জ্যোতির কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিলুম। ও কী বলল শুনবি? বলল, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য তার নিজের কাছে সত্য হওয়া। আমি তা ছাড়া আর কী করেছি? অকস্মাৎ প্রেম এল জীবনে, এসে সব ওলটপালট করে দিল। আমি কি তাকে ডেকে আনতে গেছি? তোর বেলা যেমন মাতৃত্ব এসে সব ওলটপালট করে দিল। তোর জীবনে মাতৃত্বটাই সত্য। সেই সত্যকে মেনে নিয়েই তুই নিজের কাছে সত্য হলি, নিজের সঙ্গে সত্য রক্ষা করলি। তুই যদি আমার কাছে কৈফিয়ত চাস তো আমিও তোর কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারি। কেন তুই কথা দিয়ে কথা রাখলিনে, কেন অকস্মাৎ অন্তঃসত্ত্বা হতে গেলি, বেগমনামা বন্ধ হলো কার জন্যে? মুক্তি তো তখনি হাতের মুঠোয় এসেছিল। কেন তাকে হাতছাড়া হতে দিলি? যেদিন শুনি তুই মা হতে যাচ্ছিস সেদিন কী শক! কী শক! সে শক কি আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি না পারব? এই বলে জ্যোতি আমারি কথা আমার মুখে ছুঁড়ে মারে।"

আর ও নিয়ে তর্কবিতর্ক করে কী ফল! অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করেই বা কী লাভ! বেগমনামা যে ঘটল না সেটা জানাই যথেষ্ট। এতো বেগমকে দিয়ে অভিনয় করা যে গোরী সংসার-সম্ভবা। তখন স্বর্গ-সিঁড়ির পথ বাপের-বাড়ির পথ দুই পথই রুদ্ধ। বেচারা রকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়ে দুটি বেকার যুবক! মমতাজের কাছে না গেলে ট্র্যাজেডী ভিন্ন আর কী ছিল ওদের বরাতে!

"থাক, ও নিয়ে আর আলোচনা করে কী হবে? যা হবার তা হয়েছে, যা হবার নয় তা হয়নি।" রঞ্জু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "জ্যোতিকে তুই বিশ্বাস করেছিলি বলেই জ্যোতি তোকে হতাশ করেছে। কিন্তু আমি তো বরেছি, আমি তো এমন কিছু করিনি যা তোকে হতাশ করবার মতো। আমার উপর ভরসা রাখতে পারিস।"

"সেকথা ঠিক। কিন্তু," গোরী বলতে ইতস্তত করে, তারপর বলেই বসে, "জ্যোতি তোর মতো বিদ্বান না হলেও তোর চেয়ে অনেক বেশী সলিড। ও সবরকম অবস্থার ধকল সইতে পারে। ওর উপর দিয়ে ঝড়-বৃষ্টি-শীত অনেক সব কিছুই গেছে, কিন্তু ওকে টলাতে পারেনি। ও যেন একখণ্ড শিলা। তা বলে ওকে ভালোবাসা যায় না। আমি তো পারলুম না। আর কেউ যদি পেরে থাকে তো আমি নালিশ করবার কে? আমার শুধু এইটুকুই বলবার যে বিয়েটা কি

এখনি না করলে নয়! যাক, ওটা যখন হয়েই গেছে আর ও নিয়ে কথা বাড়িয়ে কী হবে? ওরা সুখী হোক, তা হলেই আমরা সুখী হব।"

জ্যোতি যে শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছে রঞ্জুকে দিয়ে তা ভরবে না, এইটেই সার কথা। প্রেমের অভাব ঘটেনি, ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের মহারথীর অভাব। রঞ্জু কি তেমনি একজন মহারথী? সত্যি, এর কোনো উত্তর নেই। রঞ্জু হয়তো একজন মহাপ্রেমিক, কিন্তু মহারথী কি না সন্দেহ। জ্যোতিদা এই বয়সেই গান্ধীর আশ্রমে বাস করে এসেছে, উত্তর-ভারত পদপরিক্রমা করেছে, শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে, জেলে গেছে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার দিনেও সে বেপরোয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু' এক ঘা লাঠিও খেয়েছে। ও জাত-বিপ্লবী। ওর সঙ্গে কার তুলনা! রঞ্জুর।

"জ্যোতিদা তো লড়াই থেকে সরে যায়নি।" রঞ্জু আশ্বাস দিয়ে বলে, "ওর স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে, ট্যাকটিকস বদলেছে। ও আমাদের সঙ্গে বিলেত না যাক, যাবে না, কিন্তু বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়াবে। ও আমাদেরই একজন। তবে বেবাদি সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। বেবাদি কেন বলছি, বউদি। বউদির মধ্যে প্রেমের দাবির চেয়ে মুক্তির দাবিই বড়ো, মুক্তির প্রশ্নের চেয়ে স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নই বড়ো। পাকা ঘুঁটি আর কাঁচিয়ে দেওয়া যায় না। তবে সময় পার হয়ে গেছে।"

গোরীর খোঁপা ভেঙে পড়েছিল। এক-রাশ এলোচুলকে সায়েস্তা করতে তার দুই হাত ব্যাপৃত। কেশের শোভা যেমন রসিক-লোকের মুগ্ধ করে তেমনি স্বপনের ডোর।

গোরীর অশ্রু আর বাধা মানে না। ও ধরা গলায় বলে, "তা হলে তো আজকেই এ পাট চুকিয়ে দিতে হয়। এই অবাস্তব স্বপ্ন। এই অসার্থক প্রেম।"

"তা যদি হয় তবে আমারই বা অনিশ্চিত প্রতিযোগিতার জন্যে শরীরপাত করা কেন? আমাকে ছেড়ে দিলে আমি নিজের প্রতিভার প্রতি সত্য হতে পারি। এটা তো আমার স্বধর্ম নয়, এটা পরধর্ম।" বলে রঞ্জু গোরীর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

"না, না, তোকে আমি ছেড়ে দেব না। আমার একমাত্র সম্বল এখন তুই। মুক্তির জন্যে যেমন প্রেমের জন্যেও তেমনি। আমি যে তখন বিষ খেয়ে মরিনি তার জন্যে তুই-ই দায়ী। তোকে ছেড়ে দেব? কক্ষনো না!" বলে গোরী ওর গালে চুম্বন বসিয়ে দেয়। ভক্ত খ্রীস্টানের মতো রঞ্জু তার আরেকটা গাল বাড়িয়ে দেয়। তারপর অ-খ্রীস্টানের মতো প্রতিশোধ নেয়।

গোরীও প্রতিশোধ নিল রঞ্জুকে এক-জোড়া কার্পেটের ফুলতোলা জুতো উপহার দিয়ে। **আগে একবার রঞ্জু ওকে একজোড়া** জরির নাগরা উপহার দিয়েছিল কিনা।

"এ তো পায়ে দেবার জন্যে নয়, মাথায় করে রাখার জন্যে।" বলে রঞ্জু গোরীর দান মাথায় ছোঁয়ায়।

ত্রিশ

বেগমপুরের বেগম বেগমপুরেই ফিরে যান। সেখানে তাঁকে আর তাঁর শিশু নবাবকে আতসবাজি পুড়িয়ে ও দীপাবলী জ্বালিয়ে সম্বর্ধনা করা হয়। গ্রামের লোক কয়েক রাত ধরে যাত্রা থিয়েটার কবির গান ও লীলাকীর্তন শোনে। মাধবকে রাজবেশ পরানো হয়, রাধাকে রানীবেশ। পাড়া ভেঙে পড়ে দেখতে ও হরির লুট করতে।

রঞ্জু নিয়মিত চিঠি পায়। তাতে কিন্তু ওসব কথা থাকে না। কারণ ওসব তো গোরীর বিজয়ের নিশানা নয়, বরং পরাজয়ের চিহ্ন। দুনিয়ার দৃষ্টিতে ও হেরে গেছে, কিন্তু রঞ্জুর দৃষ্টিতে তো নয়। কেন তবে ওর দৃষ্টিকে পতনের দিকে আকৃষ্ট করবে।

গোরী পারতপক্ষে ওর ছেলের কথা লেখে না। সেদিন ওর দাদার ফ্ল্যাটে দেখা-সাক্ষাতের সময়ও ওর ছেলেকে দেখায়নি। কী জানি কেন ওর ধারণা রঞ্জু ওটাকে পরাজয়ের লক্ষণ মনে করবে। কৃষ্ণনগরে থাকতে মাঝে মাঝে ছেলের উল্লেখ করত। কারণ তখনো বেগমপুরে ফিরে যাবার চিন্তা উদয় হয়নি।

রঞ্জুর এবার শেষ চান্স। এবার যদি ব্যর্থ হয় তবে আর প্রতিযোগিতার বয়স থাকবে না। উৎপল একবার ব্যর্থ হবার পর আর প্রতিযোগিতায় নামছে না। ওর বয়স নেই। সে এম-এর জন্যে তৈরি হচ্ছে। রঞ্জু যদিও এম-এ ক্লাসে যায় তবু লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য বই পড়ে। যাতে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে।

জ্যোতিদা কদাচ কখনো কলকাতা এলে রঞ্জুর সঙ্গে দেখা করে, গোরীর প্রসঙ্গ ওঠে। ওর কাছেই খবর মেলে বেগমপুরের বেগমের। সে খবর চিঠিতে থাকে না।

"সুধাদির জন্যে দুঃখ হয়, রঞ্জন।" জ্যোতিদা বিষণ্ণভাবে বলে।

"কেন, কী হয়েছে ওর।" রঞ্জু চমকে ওঠে।

"বেচারিকে নির্বাসনে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তুমি তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে ওখানেই বসবাস কর। মোটা মাসোহারা পাবে। সুধাদি চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু মাসোহারা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওর ভাইদের সম্পত্তি খায় কে। ললিতকে জাপানে এ সংবাদ জানানো হয়নি। পাছে তার মনে কষ্ট হয়। সুধাদির নির্বাসন যে কল্পনা করা যায় না। তাতাদা-ই ওর সর্বস্ব। সমবয়সী দেওর ভাজ ওরা। বারো বছর বয়স থেকেই দুজনে দুজনার বন্ধু।" জ্যোতিদার কণ্ঠস্বরে বিষাদ।

রঞ্জু বুঝতে পারে না কেন সুধাদির এই নির্বাসনদণ্ড। অপরাধটা কী।

"অপরাধটা কী আবার। সবাই তো জানে। তাতাদার সঙ্গে সুধাদির আর একটা সম্পর্ক ছিল। সেটা ওর বৈধব্যের পর থেকে। গোরীর বিবাহের পূর্বের থেকে। গোরী যদি প্রশ্রয় না দিত তা হলে ওটা কবে বন্ধ হয়ে যেত। গোরী প্রশ্রয় দিয়েছিল আপনাকে বাঁচাতে। এতদিন যে ও বেঁচেছিল সুধাদির জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। নইলে তাতাদা হয়তো রাগ করে আরেকটি বিয়ে করে বসতেন। সুধাদির প্রতি কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না এতদিন। এখন কিন্তু নির্বাসন।" জ্যোতিদা বিষাদাচ্ছন্ন।

আস্তে আস্তে বোঝা গেল যে জ্যোতিদার বিষাদ আসলে সুধাদির জন্যে নয়, গোরীর জন্যেই। সুধাদি ওকে পর্বতের আড়ালে রেখেছিল। পর্বত সরে গেলে যা হবার তাই হবে। স্বামী স্ত্রী স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করবে। তাতাদা যে অত নিষ্ঠুর হতে পারেন তা কে ভেবেছিল? গোরীর সম্বর্ধনার সঙ্গে সঙ্গেই সুধাদির বিসর্জন?

যশোদাবাবু এখন বাচ্চাকে নিয়ে মেতে আছেন। তাঁর বুড়ো বাপ-মা তো ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো করে থেকে প্রতীক্ষা করছিলেন। নাতির মুখ দেখবেন। নাতিকে পেয়ে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিয়েছেন। ওর পা মাটিতে পড়তে পায় না। জ্যোতিদা ওর নাম রাখতে চেয়েছিল "কোলবিহারী"। তা তো ওরা শুনবে না। যশোমাধবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে জয়মাধব।

"জয়মাধব! কার জয়?" রঞ্জু আবার চমকায়।

"কার আবার? ওর জনকের।" জ্যোতিদা হাসে।

"ওর জননী মেনে নিয়েছে?" রঞ্জু অবাক হয়।

"না মেনে উপায় আছে? সুধাদির উপরে ওরও তো জয়। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে সার্থকনামা হয়েছে।" জ্যোতিদা পরিহাস করে।

বোঝা গেল গোরী এখন বাস্তববাদী। যশোবাবুও ওকে জয়ের ভাগ দিতে প্রস্তুত। উনি গোরীর উপর জয়ী হয়েছেন, গোরী সুধার উপর জয়ী।

তা হলে গোরীর জন্যে বিষাদের কারণ কী থাকতে পারে? বিষাদ এই জন্যে যে ওকে এখন সুধার শূন্যতা পূরণ করতে হবে। যশোবাবু তো অপূর্ণ থাকবেন না। এমনি করে গোরীর মুক্তি আরো দূরূহ হলো। এর পরে কী করে ও প্রতিরোধ করবে?

"ভাববার কথা বটে।" বলে রত্ন প্রসঙ্গটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। প্রতি-যোগিতায় জয়লাভ হোক তো আগে। শেষ জয়টা তারই হাতে।

জ্যোতিদা তার সমর্থন করে। "হাঁ, শেষ জয়টা তোমারই হাতে। এখন একমনে নিজের জোর বাড়াও। গোরী অবলা বলে তুমিও যেন অবল না হও। অবলাকে বলবানই জয় করবে। বলহীন নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" উপনিষদ আওড়ায় জ্যোতিদা।

যার যা স্বভাব। গোরী আবার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠায় বেগমপুরে। আশ্রমে বাস না করলেও আশ্রমের কাজ জ্যোতিদা এখনো ছাড়েনি। এবার চাষের মরসুম পার হয়ে গেছে বলে চাষগাঁয় থেকে চাষবাস করা হয়ে উঠছে না। রেবা আছে সাহেবনগরের বাড়িতে। আর জ্যোতি কাপালিপাড়ার আশ্রমে। কাছাকাছি গ্রাম। তাই সপ্তাহের মধ্যে সাতদিন দেখাসাক্ষাৎ ও একদিন একত্রবাস।

"হ্যাভলক এলিস পড়েছ?" জ্যোতিদা প্রশ্ন করে।

"না, পড়িনি তো।" রত্ন তার অজ্ঞতা স্বীকার করে।

"এলিস আর তাঁর স্ত্রী আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকতেন। মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। এলিস একে বলেন সেমি-ডিটাচড লাভ। সংযুক্ত নয়, বিযুক্তও নয়। সব সময় একসঙ্গে থাকলে প্রেমের নিবিড়তা থাকে না। অপর পক্ষে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে প্রেম হয়ে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ প্লেটোনিক।" জ্যোতিদা বলে।

"তা হলে আর বিয়ে করা কেন?" রত্ন মন্তব্য করে।

"সেইখানেই তো বার্নার্ড শ'র সঙ্গে বিরোধ। শ'রা অবশ্য একসঙ্গেই থাকেন। কিন্তু দুই বন্ধুর মতো।" জ্যোতিদা জানায়।

এর পরে কথাবার্তা আবার গোরীর দিকে গড়ায়।

"গোরী এসেছিল একদিন বউ দেখতে।" জ্যোতি বলে, "বউভাতের সময় তো ছিল না নইলে আরো আগে বউ দেখত।"

"তারপর? বউ পছন্দ হয়েছে?" রত্ন কৌতূহলী হয়।

"বোধ হয় হয়নি। তা নয়তো রেবা কেন ওর উপর অত চটে যেত? মেয়েরা ভালো ভালো বোঝে কে কাকে পছন্দ করে, কে কাকে করে না।" জ্যোতিদা তাই ভাবে।

"বউদি চটেছিলেন বুঝি? আশা করি মিটে গেছে।" রত্ন বলে।

"রেবাও যাকে পছন্দ করে তাকে খুব পছন্দ করে। যাকে পছন্দ করে না তাকে আদপেই পছন্দ করে না। কোনো ধারই ধার ধারে না" জ্যোতিদা বাকীটুকু রত্নর অনুমানের উপর ছেড়ে দিয়ে বলে "আমি নাচার।"

দুই নারী যেন দুই নৌকা। দুই নৌকায় পা রাখলে যা হয় তাই হয়েছে জ্যোতির। সেইজন্যে ও গোরীর সঙ্গে সন্তর্পণে মেশে। তাতে গোরীর মন খারাপ। জ্যোতি যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে। রেবাও চোখা চোখা কথা শোনায় গোরীর সম্বন্ধে। তাতে জ্যোতির মন খারাপ।

"তোমার সম্বন্ধেও কী বলে শুনবে?" জ্যোতির চোখে মিটমিটে হাসি।

"শুনি।" রত্ন উৎকর্ণ হয়।

"হাতের কাছে পেলে ওর দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দিতুম।' জ্যোতি শোনায়।

"কেন, আমি কি তোমার মতো চাষা যে চড়টা চাপড়টা খাব?" রত্ন হাসে। মনে মনে বলে, বেশ মজা তো! একজন দেবে দুই গালে দুই চুমু, আরেকজন দুই গালে দুই চড়। চুমুর প্রতিদান আছে। চড়ের প্রতিদান আছে কি?

"তা নয়। ওর কথা হলো, গোরী এমন কী একজন গরীয়সী নারী যে ওর জন্যে তোমার মতো একটি উদীয়মান তরুণ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে সমগ্র হিন্দুসমাজ তোমার বিপক্ষে দাঁড়াবে?"...জ্যোতিদা উত্তর দেয়।

রত্ন তো শুনে থ। সমগ্র হিন্দুসমাজ।

জ্যোতিদা যা বলে তার মর্ম হিন্দুর বিবাহ একটা স্যাক্রামেণ্ট। একবার যদি তা ঘটে তবে আর তাকে অঘটিত করা সম্ভব নয়। জন্ম যেমন ফাইনাল, মৃত্যু যেমন ফাইনাল, বিবাহও যদি হিন্দুমতে হয় তবে তেমনি ফাইনাল। জন্মকে অঘটিত করতে পারে কেউ? মৃত্যুকে অঘটিত করবে কে? তা হলে বিবাহকে অঘটিত করতে চাওয়া কি মূঢ়তা নয়? অমন করে পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকতে গেলে কি মানুষ বাঁচে? রত্নও কি বাঁচবে? যে নারী বিধবা হয়েছে তার বিবাহ আপনা হতেই অঘটিত হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন। তার পরিণাম কী হলো? শেষবারের মতো তিনি স্বগ্রামে গিয়ে বিস্তর দান খয়রাত করেন, বহুজনের উপকার করেন। যখন পালকিতে চড়ে ফিরে আসছেন তখন তাঁর পালকির উপর ক্রুদ্ধ জনতার ঢিল বর্ষণ হয়। অকথ্য গালাগাল দেয় যারা তাদের মধ্যে অনেকেই বিধবা। বিদ্যাসাগর নাকি তাদের ধর্মনাশ করতে যাচ্ছেন।

"রেবা আমাকে শাসিয়েছে যে আমার বন্ধুর কপালেও আছে ঢিল বর্ষণ। আর অকথ্য গালিগালাজ। সধবারাই বলবে ও সধবার ধর্মনাশ করতে যাচ্ছে! ও হবে সধবা বিবাহের প্রবর্তক! এমন পাগল!" জ্যোতিদা গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারে না। হাসিমুখর হয়।

"গোরী তা হলে মুক্ত হবে না?" রত্ন কাতরভাবে বলে।

"রেবাকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। ও কী বলল শুনবে?" জ্যোতি বিবরণ দেয়।

"দুটি পুরুষকে দুই বগলদাবা করে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটার নাম কি স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করা? ক্রাচ দুটির থেকে একটি তো বেহাত। বাকী একটিতে ভর দিয়ে কতদূর যাবে!"

(ক্রমশ)
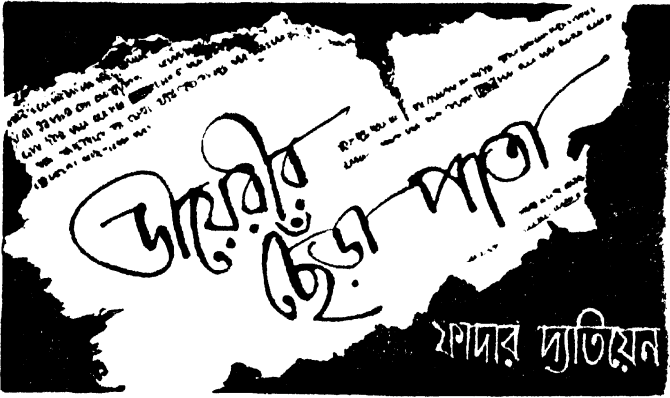
মুসাফির জহুরী সদাগর

নাম তার সাধনা। শিশুকালে আদর করে বলতাম, 'আমার সাধের সাধনা'। আমারই চোখের উপর তরতর করে বড় হল সে, কোল ছেড়ে স্কুল ধরল, স্কুল ছেড়ে প্রেসিডেন্সি; এম এ পাশ করে বেরিয়ে এল তার নিজস্ব সাধনাক্ষেত্র থেকে, তারপর বাপমার সাধসাধি উপেক্ষা না করতে পেরে সাদি করে, সধবা স্ত্রী হয়ে ঢুকল সাধুখাঁ-বাড়িতে। গত শুক্রবার সাধিত হল তার সাধভক্ষণ।

বাবাজীবন সাধুখাঁটি সাধুও বটে, খাঁটিও বটে, মাটির মানুষ, পরোপকারী, সুপুরুষ। শুধু সাধনার মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা কিছুতেই কাটল না। সে অমন আকমপ্লিশড মেয়ে, আর তার স্বামী কিনা বিজনেসম্যান! কয়লার ব্যবসা!

[বোমা ফাটল কয়েকটা; আকাশ ফাটল গুলির আওয়াজে; ব্যাপারটা দেখতে গেলাম জানলার সামনে দাঁড়িয়ে।] আচ্ছা বলুন তো, সাধনার কথাটা বলছিলাম কেন?...ওঃ হ্যাঁ, দেখুন না : সওদাগর হলে চৌকশ শিক্ষিত অর্থনীতিজ্ঞটি পর্যন্ত একটু নাক কুঁচকোন, সেক্ষেত্রে অনাত্মীয় সংস্কৃতিবান পুরুষেরা যে বণিকজনকে পাত্তা দেবেন না, এতে আর আশ্চর্য কি? তাভের্নিয়েকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি কেউ। বের্নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে চুপ, তেভ্‌নোও তাই; শার্দাঁ শুধু তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও শুধু গালপাড়ার জন্যই। অথচ তাভের্নিয়ে ভদ্রলোকটি ছিলেন ভারি ভদ্রস্বভাব, অন্যের কথা যখনই পেড়েছেন, সৌজন্যে ফাঁক পড়েনি এতটুকু।

ফরাসি মুল্লুক থেকে ভারতাগত পর্যটককুলে তাভের্নিয়ে কুলপতি ছিলেন—পাইওনীয়র। তাঁর আগে যাঁরা এসেছেন—ফিচ (১৫৮৩), মিল্ডেনহল (১৫৯৯), হকিন্স (১৬০৮), টমাস বেস্ট (১৬১১) সার টমাস রো (১৬১১)—তাঁরা কেউ ফরাসি নন। ফরাসি যাঁরা—ঐ বের্নিয়ে, তেভ্‌নো, শার্দাঁ—তাঁরা তাভের্নিয়ের পরবর্তী আগন্তুক। তাভের্নিয়ের চেয়ে তাঁরা উচ্চশিক্ষিত। ভারত থেকে ফিরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখেছেন—দার্শনিকতা-ঘেঁষা ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাভের্নিয়ের ভ্রমণকাহিনীই কিন্তু জনপ্রিয়তায় টেক্কা মেরে দিয়েছে সবার উপর; লোকের কাছে মনীষীর ভাবুকতার চেয়ে ঘরোয়া তথ্য ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গির আবেদন চিরকালই বেশি। 'তুরস্ক, পারস্য ও ভারতে ছ-দফা পাড়ি'—১৬৭৬-এ প্রকাশিত তাভের্নিয়ের এ-বইটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কাটতির বাজারে ভেল্কি খেলিয়েছিল। সপ্তদশ শতক ফুরোবার আগেই পনেরোটা সংস্করণ; ইংরেজি তর্জমাটির পর্যন্ত পাঁচ এডিশন কাবার। লেখক জাঁ-বাতিস্ত তাভের্নিয়ে ততদিনে কেউকেটা রীতিমতো, রাজপ্রসাদে ব্যারন্ অব ওবন্ খেতাবে ভূষিত।

জাত-বেনে এই তাভের্নিয়ে; আর তেমনি পাড় পর্যটক। জন্মেছিল ১৯০৬-এ, প্যারিসে, এক প্রোটেস্টান্ট পরিবারে; বাইশ বছরের মধ্যেই নাকি চষে ফেলেছিলেন য়ুরোপের আট-আটটা দেশ, তিরিশের কোঠায় হাতছানি দিল প্রাচী। একবার নয়, দুবার নয়, তাঁর প্রাচ্যযাত্রার রেকর্ড ছক্কা হয়েছিল। শুধু পয়লা দফাতে পারস্যে সে ইতি, বাকি পাঁচবারই তিনি ভারতে এসেছিলেন; ভ্রমণসূচীর মধ্যে ছিল সুরাট, আগ্রা, দক্ষিণ ভারত, ঢাকা...। তৃতীয় যাত্রায় গোয়াতে তিনি ইনকুইজিটর জেনারেলের কাছে সাদরে অভ্যর্থিত হন : তাঁর 'প্রোটেস্টান্ট বাইবেলটি' সঙ্গে নিয়ে যাননি, আর ঘোষণা করতেও ভোলেননি যে পিতামাতা উভয়েই প্রোটেস্টান্ট—অর্থাৎ কিনা তিনি নিজে 'ধর্মভ্রষ্ট ক্যাথলিক' নন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ যাত্রার ফাঁকে সপ্তপঞ্চাশত্তম বৎসরে পা দিয়ে তাভের্নিয়ে বিবাহ করেন।

গোলকুণ্ডার হীরকখনি ছিল তাঁর এক বিশেষ গন্তব্য—তিনি মুক্তো বেচতেন, হীরে কিনতেন। অবশ্য মৃগনাভি [সর্বশ্রেষ্ঠ মৃগনাভি পাওয়া যেত ভুটানের কস্তুরী-মৃগ থেকে], bezoar [ছাগজঠরে লব্ধ এক প্রকার শক্ত পিণ্ড, বিষহর বলে খ্যাত—হীরকপ্রসবা গোলকুণ্ডা এতেও ধন্যতম]—এগুলিও লেনদেন করতেন মুনাফার সম্ভাবনা থাকলে। হীরেতে ছিলেন দস্তুরমতো বিশেষজ্ঞ, বাহাদুর জহুরী।

চরিত্রগুণেও ঘাটতি ছিল না কোনো। আত্মশ্লাঘা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আড়াই লক্ষ কিলোমিটার ভ্রমণান্তে মুসাফির লেখক

এক উৎসর্গপত্রে রাজা চতুর্দশ লুইয়েরও উদ্দেশে লেখেন, "নতুন ক'রে সাগর-পাড়ি এ বয়সে আর সম্ভব নয়; তাই স্বদেশের সেবাকর্মে এই অক্ষমতায় লজ্জিত হয়ে লিখতে বসেছি—যা দেখেছি তার বিবরণ...। জানি, আমার ভাষায় নেই সৌষ্ঠব বা সৌম্যতা, তবু বিচিত্র, ঔৎসুক্যজনক ও গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্যের সমাবেশ এতে ঘটেছে; সর্বোপরি এতে আগাগোড়া রক্ষা করেছি সতর্ক সত্য ভাষণের পরাকাষ্ঠা—যার জন্য এই বই সাদরে পঠিত হবে।"

এই দূর যাত্রায় তাঁর সাহসিকতাও প্রশংসা কাড়ার মতো। কত-না শুনেছিলেন "দুর্গম ও বিপজ্জনক রাস্তাঘাটের কথা, যেখানে পিল্‌পিল্ করছে বাঘসিঙ্গি আর নরপশুরা..." তবু পিছপা হননি একবারও, বরং পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ ও সহৃদয় আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি অনুবর্তীদের অশ্বস্ত করে গেছেন, হিংস্র জন্তু জানোয়ারেরা অবশ্যই আছে; আর মানুষের প্রসঙ্গে: "পরদেশীর প্রতি তাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের পরিচয় পেয়েছি সর্বত্র।"

ব্যক্তিগত সততাতেও তিনি সংশয়ের ঊর্ধ্বে। "য়ুরোপের তুলনায় ভারতে শুল্কে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ ঢের বেশি... "এটা জেনেও এমন কি গোপন লেনদেনের চুক্তির পালা সাঙ্গ হবার পরেও প্রদেয় পাঁচ-শতাংশ মাশুল তিনি স্বেচ্ছায়—স্বাধীনভাবে চুকিয়ে দিয়েছেন। একবার ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদের হয়ে ষাট হাজার টাকা মূল্যের bezoar কেনার পরে বিক্রেতারা তাঁকে কিছু উপহার গ্রহণের অনুরোধ জানায়; তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বরং

শুধু চলমান বলদের সার

তিনি প্রস্তাব রাখেন, bezoar-প্রসূ দুয়েকটি ছাগল তারা যেন তাঁকে জোগাড় করে দেয়। তারা ছটি ছাগল এনে হাজির করল। তাভের্নিয়ে বিনামূল্যে তাদের নিতে রাজি হলেন না, পুরো দামটা মিটিয়ে দিলেন। ফাউ, ফালতু, উপরি—এসবের প্রতি তিনি ছিলেন নির্লোভ।

এমন সাধু সদাগর যে সাধ্যমতো সাচ্চা থাই বলবেন, সেটা স্বাভাবিক। পরন্তু এই বৃত্তান্ত স্বাদুও বটে, লিখবার সময়ে তাভের্নিয়ে মনে রেখেছেন তাঁর সম্ভাব্য পাঠিকাদের কথা, যারা নিজ নিজ প্রবণতা অনুযায়ী নানা খুঁটিনাটি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করত তাঁকে—জীবনযাত্রার ধরন কেমন ঐ ভারত নামক দেশটিতে, কেমন বেশভূষা পরে সেখানকার মেয়েরা, আর তারা নাকি জ্বলন্ত চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারে নিজেদের—এমনি হাজারো জিজ্ঞাসার ঢেউ। তাভের্নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁর এই মহিলা-মহলে কেল্লাফতে ক'রে ছাড়বে।

পথের পাঁচালি

ঘোড়া, গাধা কি খচ্চরের ক্যারাভান ভারতে দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু চলমান বলদের সার। প্রতিটি পণ্ডালিকায় থাকে বারো হাজার পর্যন্ত ষণ্ডের চলৎস্রোত, প্রতিটি ষণ্ডপৃষ্ঠে দেড়শো থেকে পৌনে দুশো কিলোগ্রাম ওজনের বোঝা। একবার যদি কোনো সঙ্কীর্ণ পথে অমনই এক ষণ্ডধারার মুখোমুখি পড়ে যান, দুদিন কি তিনদিন পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে—যতক্ষণ না শেষ ষাঁড়টি পর্যন্ত আপনাকে অতিক্রম করে যায়। এই ষাঁড়-বাহিনীর ব্যাপারী যারা, তারা একমাত্র এই ষাঁড়ের পিঠে পণ্যচালানোর বৃত্তিটাকেই আঁকড়ে থেকে জীবিকা উপার্জন করে। ঘর বাঁধে না কোথাও; পাশে বউ কাঁখে বাচ্চা নিয়ে যাযাবর বেদের মতো আজ এখানে কাল ওখানে উড়ে বেড়ায়। এই শিকড়হীন সমাজেও কিন্তু শিকড় গেড়েছে গোষ্ঠীভেদ; চালানের পণ্যভেদ অনুযায়ী এরা চার গোষ্ঠীতে বিভক্ত; এক গোষ্ঠী শুধু চাল বয়, আরেকটি শুধু ডাল, তৃতীয়টি গম, চতুর্থটি নুন। (সুরাট এমন কি কন্যাকুমারিকা থেকে আসে এই নুন।) দুই ক্যারাভানে যদি মোলাকাত হয় সামনা সামনি, তাহলে আর রক্ষে নেই। পথ-ছাড়াটা হার-স্বীকারের সামিল, ফয়সালা হয় রক্তারক্তির পথে।

গোলায় করেও ফসল চালানের দৃশ্য বিরলদৃষ্ট নয়: দুশো পর্যন্ত গোলা সারবন্দীভাবে চলে একেক মিছিলে, প্রতিটি গোলায় দশ বারোটি করে বলদ জোতা, দুদিকে দুজন করে সশস্ত্র প্রহরী বন্ধনরজ্জু মুঠো করে ধ'রে চলে সঙ্গে সঙ্গে—যাতে গোলা উল্টে গোল্লায় না যায়।

দূরপাল্লার পথ পাড়ি দিতে হলেও বলদ চাই। ভাড়া করতে না পারলে কিনতে হবে আপনাকে। তবে সাবধান, শিং দেখে

কিনুন। ফুটখানেকের বেশি লম্বা হয় যদি, বাতিল করুন। নইলে মশায় কামড়ে ত্যিতিবিরক্ত বলদমশায় মুণ্ডখানিকে পশ্চাদ্দিকে গোৎ খাওয়ালেই ঐ আখাম্বা ছুঁচোলো শুঙ্গাফলা আপনার পেট ফাঁসাবে। এ ছাড়া 'ভাড়ে কা গাড়ি' ভি হ্যায়, জোড়া বলদে টানা, দিনে এক টাকা রেট—সুরাট থেকে আগ্রা পৌঁছে দেবে চল্লিশ দিনে।

নইলে আছে মনুষ্যবাহিত বিশুদ্ধ ভারতীয় পাল্কির। বেয়ারা দুজন, কিংবা—দিনে ষাট কিলোমিটার পেরোতে হলে—কাঁধ বদলাবার জন্য, আরো ছ'জন। বেতন ঃ মাসে চার টাকা; ষাট দিনের জন্য দশ। আর যদি আভিজাত্য চান তাহলে সঙ্গে থাকবে আরো কুড়ি-ত্রিশজন সিপাই—তীর, ধনুক আর বন্দুকধারী সিপাই—আর একজন নিশানধর। ঐভাবেই ইংরেজ আর ওলন্দাজ সাহেবেরা যাতায়াত ক'রে থাকে, আপন আপন কোম্পানির ইজ্জতের ঝাণ্ডা উত্তোলন ক'রে।

পাল্কিটি সমতল পথে দিব্যি নেচে নেচে অবাধে চলে; কিন্তু যদি পথে পড়ে নদী? আর যদি সেই নদীতে না থাকে সাঁকো? বর্ষার পরে নদী খরস্রোতা, নৌকোও কালক্ষয়ী। সহজ দিশি পন্থাই সবার সেরা ঃ বুক আর পেটের মাঝখানে বায়ুপূর্ণ ছাগচর্ম এঁটে ভেসে চ'লে যান—আর বাচ্চাদের নিয়ে যান মাটির হাঁড়িতে ক'সিয়ে...।

যেতে যেতে দেখবেন—ময়ূর ভারতে অগুন্তি। খুব উপাদেয় এর মাংস—টার্কিরই মতো। কিন্তু তাই ব'লে লোভে প'ড়ে যেখানে-সেখানে শিকার ক'রে বসলে পস্তাতে হতে পারে। পারস্যের এক ধনী ব্যবসায়ী হিন্দু অঞ্চলে ময়ূর মেরেছিলেন—মূল্য দিতে হয়েছিল ঃ কশাঘাতে নিজের প্রাণ। মুসলমান তল্লাটই ময়ূর-ভোজের প্রশস্ত স্থান। তবে ধরাটা ঝঞ্ঝাট। এই বেশ কাছাকাছি এসেছিল, মানুষের টিকি দেখামাত্র পলকে উধাও—জঙ্গলে; চম্পটে ওস্তাদ, পিছু-ধাওয়া করলে জংলা কাঁটায় আপনার জামা-ই ছিঁড়বে শুধু, চিঁড়িয়া মিলবে না। মিলবে রাতে, অল্পায়াসে। রাতে ওরা গাছের ডালে এসে বসে। পদ্ধতিটা এইরকম ঃ নিশেন উড়িয়ে তাতে আঁকবেন একটি ময়ূর, পতাকাদণ্ডের উপর রাখবেন দুটি জ্বলন্ত মোমবাতি; ময়ূরেরা এসে যেই গলা বাড়াবে ঐ দণ্ডের দিকে, বেঁধে-রাখা ফাঁসে আটকে যাবে।

পশুপক্ষীর প্রতি ভারতীয়েরা বড় কৃপাপরবশ। শুধু যে নিধনেই পরাঙ্মুখ তা নয়, সেবাতেও সমুৎসুক। এদেশে হাসপাতাল আছে গাইয়ের জন্য, ষাঁড়ের জন্য, বাঁদরের জন্য। আমেদাবাদে প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবারে বানর-ভোজন হয়। বানরগুলো এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে

রাতে ওরা গাছের ডালে এসে বসে

ঠিক দিনে ঠিক জায়গাটিতে সমবেত হতে ওদের ভুল হয় না। উল্টে, কোনোদিন খাদ্যদানে গলতি দেখলে, খেপে উঠে বাড়ির ছাদের টালি তছনছ ক'রে দেয়। বাঁদরের যেখানে আছে, কাকের উপদ্রব সেখানে কম ঃ হতচ্ছাড়া বাঁদরগুলো বেচারী কাকদের ডিমগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফাটিয়ে দেয়।

মানুষজন

আরও অনেক য়ুরোপীয় পর্যটকের মতোই তাভের্নিয়ে লক্ষ্য করেন, ভারতীয়েরা কাজ করে র'য়ে-স'য়ে, ধীরে-সুস্থে, ধৈর্য সহকারে; আবেগের অবাধ প্রকাশে তাদের অনীহা—কাউকে হঠকারী কিংবা অগ্নিশর্মা হতে দেখলে নীরবে তাকিয়ে থাকে শুধু, এবং ব্যঙ্গের হাসি হাসে, অমিতব্যয়ী, অপচয়ী ব্যক্তির উদ্দেশে যেমন হেসে থাকে লোকে।

খায় ভাত, শুধুই ভাত; রুটির দেখা মিলবে মুসলমানী পাকশালায়। পশু হত্যায় বিতৃষ্ণার কারণ—কোনো মৃত আত্মীয়-বন্ধু ঐ পশুদেহে পাপের প্রায়শ্চিত্ত-রূপে জন্ম নিয়ে থাকতে পারে এই বিশ্বাস; অজ্ঞাতসারে প্রিয়জনের রক্তপাতে হস্ত কলঙ্কিত হতে পারে, এই ভীতি।

জন্মান্তরে এই আস্থা এতটাই দৃঢ় মূলে যে, মৃত্যুর আগে বহু হিন্দু মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখে, যাতে পরজন্মে তাকে দীনদরিদ্র ভিক্ষুক হয়ে জন্মাতে হলেও তার অর্থাভাব না ঘটে; এ জন্মের সঞ্চিত টাকা ও-জন্মের দারিদ্র্যে উপকার দেবে। তাভের্নিয়ে একবার ছশো টাকায় একটি অকীক কেনেন। বিক্রেতাটি তাঁকে বলে, মণিটি সে চল্লিশ বছর মাটির তলায় রেখে দিয়েছিল, এখন রেখে দেবে প্রাপ্ত টাকাটা; টাকা বা মণি—দুটোই তার পক্ষে একই কথা। আরেকবার আরেকজনের কাছে বাষট্টিটি হীরক কিনবার কালে বিক্রেতার খেদোক্তি শোনেন ঃ মৃত্যুর পরে যাতে উপযোগে আসে, সেজন্য জীবনের পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মণিরত্ন সঞ্চয় করেছিল সে—আর দুর্ভাগ্য দেখুন, অভাবের তাড়ায় এ-জন্মেই কিনা সেই সম্পদে হাত পড়ল।

অসমীয়ারা, যারা পৌত্তলিক হয়েও শবদাহ না ক'রে সমাহিত ক'রে থাকে, তাদের রাজার মৃত্যুর পরে রাজদেহ সমাধিস্থ করে তাঁর বিত্তসম্পদ সমেত। বিষ খেয়ে আত্মহনন করে তাঁর প্রিয়তম পত্নী আর তাঁর প্রধান কর্মচারীরা যাতে তাঁর সঙ্গে গোর পেয়ে পরকালেও তাঁর পরিচর্যায় আত্মোৎসর্গ করতে পারে। আর শুধু কি তাই? মহীপালের সঙ্গে মহীতলে যায় একটি হাতি, আধ ডজন ঘোড়া এক ডজন উট (?) আর অসংখ্য শিকারী কুকুর।

শাহজাহানী আমলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সুব্যবস্থা সম্পর্কে তাভের্নিয়ে প্রশংসা-মুখর। সর্বব্যাপারে আরক্ষা-বাহিনী এতদূর পর্যন্ত কঠোর ও সতর্ক যে চুরি-

চামারির জন্য কাউকে তৎকালে শাস্তি পেতে হত না। এদিকে তাঁর মতে, পৌত্তলিক ভারতীয়েরা সত্য পরমেশ্বরের বিষয়ে অজ্ঞ ও অন্ধ হলেও তিনি দেখেশুনে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি, স্বভাবে নৈতিকতায় তারা সাধু জীবন যাপন ক'রে থাকে। পত্নীর প্রতি অবিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত বিরল, ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত বিরলতর; অস্বভাবী অপরাধের কথা কখনো গোচরে আসে না। এমন ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, সেইজন্যই বাপমা সাত-আট বছর বয়সেই তাঁদের সন্তানদের বিয়ে দিয়ে দেন।

আর ভারতীয়দের বুদ্ধিসুদ্ধি? উঁচু কপালে য়ুরোপীয়দের লেখক জানিয়ে দিতে ভোলেন না, মননে ও সূক্ষ্মবোধে তারা কম যায় না, পরন্তু অর্থনৈতিক হিসেবপত্তর ও বিনিময়েও ইহুদীদের মতোই দড়। আর একটি ক্ষেত্রে তারা সাহেব-আদমিরই সগোত্র ঃ শ্বেত বর্ণের প্রতি অদম্য তাদের অনুরাগ; তাদের মনোহরণ করে শুক্লতম মুক্তো, শুভ্রতম হীরে, ধবলতম রুটি এবং অবশ্যই গৌরাঙ্গতমা গৃহাঙ্গনা।
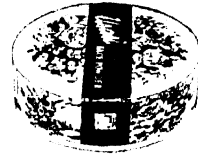
[ক্রমশ]

উন্নত দেশগুলির পরিপ্রেক্ষিতে...

উন্নত দেশগুলিকে যদি পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হয় তবে বিশ্বের প্রথম পাঁচটি উন্নত দেশ হল যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং ব্রিটেন। ১৯৬৯-৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় হয়েছে এক হাজার বিলিয়ন ডলার। তবে কানাডা, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ইটালী প্রভৃতি দেশও দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই দেশগুলিও প্রথম শ্রেণীর উন্নত দেশ হিসাবে বিবেচিত। ১৯৬৮ সালের জনপ্রতি জাতীয় আয় (১৯৬৩ সালের স্থির মূল্যস্তরের ভিত্তিতে) কানাডা, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও ইটালীতে ছিল যথাক্রমে ২৫২৯ ডলার, ২১৭৪ ডলার, ১৮৬৮ ডলার এবং ১১৭০ ডলার। এই দেশগুলির মধ্যে ইটালীর দ্রুত উন্নতি লক্ষণীয়। ১৯৬৩ সালের মূল্যস্তরের ভিত্তিতে ইটালীর বাৎসরিক জনপ্রতি জাতীয় আয় ১৯৬৯ সালে ছিল ৭০৮·৫ হাজার লিরা, অর্থাৎ, প্রায় নয় হাজার টাকার কাছাকাছি। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'দেশ' পত্রিকার ৯ই জানুয়ারীর সংখ্যায় ইটালীর উত্তর এবং দক্ষিণ অংশের জাতীয় আয় সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছিল তা শত টাকার ভিত্তিতে না হয়ে হাজার টাকার ভিত্তিতে হবে; হিসাবের ভুলের দরুণ শত টাকার ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল।) ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইটালীর জাতীয় আয় বৃদ্ধির গড় হার হচ্ছে শতকরা ৫·৭ ভাগ।

কিন্তু জাপানের উন্নতি বিস্ময়কর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ধারা জাপানে দেখা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ হবে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ বছরে জাপানে জাতীয় আয় বৃদ্ধির গড় হার হচ্ছে শতকরা ৯·৬ ভাগ (যা পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি)। পশ্চিম জার্মানীও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং বেশ কয়েক বছর আগেই ব্রিটেনের চেয়ে এগিয়ে গেছে। যে দেশগুলি বর্তমানে উন্নত বলে স্বীকৃত সেগুলি চিরদিনই এমন ছিল না। ব্রিটেনের কথা স্বতন্ত্র। বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে ব্রিটেন সবার আগে উন্নত হতে পেরেছিল। শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত সামগ্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রী করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। ফ্রান্সের পক্ষেও এই সুযোগ ঘটেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত শতাব্দী পর্যন্ত বৃটেনের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছে। রাশিয়ায় পাক-বিপ্লব যুগে বৈদেশিক সাহায্য যথেষ্ট নেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান কারিগরি বিশেষজ্ঞরা আমন্ত্রিত হয়েছেন। কানাডার অর্থনৈতিক উন্নয়নও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান এবং পশ্চিম জার্মানী বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। বৈদেশিক সাহায্যে জাপান এবং পশ্চিম জার্মানীর উন্নয়নের পর এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা এবং তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা এক জিনিস নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইটালীও মার্শাল পরিকল্পনায় প্রচুর সাহায্য পেয়েছে; বিশ্বব্যাঙ্কও দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে ইটালীকে প্রচুর সাহায্য করেছে। গত দশ বছরে ইটালীও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে। কিন্তু উন্নতিকামী দেশগুলি যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাচ্ছে সে অনুপাতে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারছে না কেন? স্বাধীনতার পর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি। ভারতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ একেবারে কম হয়নি। ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ভারতে মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হয়েছে ১৫, ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার; কিন্তু তার মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ১২,৫০৬ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, ২,৮৬১ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য পাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে তার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার করতে না পারার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর জন্য দায়ী হল ভারতের অনগ্রসর অর্থনৈতিক কাঠামো। বৈদেশিক সাহায্য নানা প্রকারের হতে পারে: বিদেশ থেকে ঋণ অনুদান (Grant), অথবা বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (direct investment) ইত্যাদি সবই বৈদেশিক সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কম করে গ্রহণ করা যেতে পারে যদি রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বৃদ্ধির গড় হার হয়েছে শতকরা ৫·৯ ভাগ। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং ইটালীর রপ্তানি বৃদ্ধির গড় হার হয়েছে যথাক্রমে ১২·৬ ভাগ, ১১·৮ ভাগ এবং ১৪·৬ ভাগ। ইটালীর রপ্তানি বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি। ভারতে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় শতকরা ৭ ভাগ হারে রপ্তানি বাড়ানোর কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই লক্ষ্যে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

রপ্তানি বাজারে আজ জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগী। এমন কি মার্কিনী বাজারেও জাপানী জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পশ্চিম জার্মানীতে জাপানী টেপ-রেকর্ডার অথবা সুইজারল্যান্ডে জাপানী ঘড়ির বিক্রী দেখলেই বোঝা যায় রপ্তানি বাণিজ্যের কী প্রভূত উন্নতি জাপানে হয়েছে। ভারতের পক্ষে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। কৃষিক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি আশাপ্রদ; কোন অঘটন না ঘটলে তীব্র খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাও বিশেষ নেই। এখন রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতি যাতে দ্রুত হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচী অনুসরণ করা দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদন নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে রপ্তানি-শিল্পগুলির উন্নয়নের উপর। তাছাড়া রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর মান উন্নয়ন, ব্যয় হ্রাস এবং নতুন ধরনের জিনিস রপ্তানি করার প্রচেষ্টা, প্রভৃতি কর্মসূচী তো অনুসরণ করতেই হবে।

পশ্চিম জার্মানী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অবিভক্ত জার্মানীর একটি অংশ ছিল, এবং তখনই ঐ দেশ যথেষ্ট উন্নত ছিল। জাপান সম্পর্কেও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও জাপান উন্নত দেশ ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জাপানের "Take off" পর্যায় ছিল ১৮৭৮ সাল থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে। বহু বাইরের কারণ জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত ধরনের চাষ-ব্যবস্থা চালু করে জাপান দুটি সমস্যার সমাধান করেছে—একটি হল খাদ্য সমস্যা এবং আরেকটি হল শিল্পক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল যোগানের সমস্যা। অবশ্য জাপানকেও বহু জিনিস আমদানি করতে হয়। কিন্তু তবুও জাপানের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ উন্নয়ন অর্জন করা বহু আগেই সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের পথেও জাপান অগ্রণী। ভারতের পক্ষে অবস্থা অনুরূপ নয়। তাই জাপানের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য সদ্ব্যবহার করা যেভাবে সম্ভব এবং যতটা সার্থক হয়েছে ভারতের মত উন্নতিকামী দেশের পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয়।

ভারতের পক্ষে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন অর্জন করা এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা (Self-sustaining Growth) অর্জন করার পথে অনেকগুলি উপাদান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতে মূলধনের অভাব, শ্রমিকদের স্বল্প উৎপাদনী শক্তি, প্রভৃতি কারণ তো আছেই। আমাদের দেশে যে হারে কর্মক্ষম বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে তার মোকাবিলা করতে হলে শিল্প-কাঠামোর

পরিবর্তন প্রয়োজন। দ্রুত শিল্পোৎপাদনের হার বাড়াতে হলে অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করার জন্য মূলধন-নিবিড় (Capital intensive) শিল্পগুলির দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু বেকার সমস্যার আশু মোকাবিলা করার জন্য এখনই কয়েকটি শ্রম-নিবিড় (Labour intensive) প্রকল্প গ্রহণ না করলেই নয়। সমস্যাটি হল শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি নির্বাচন (Choice of technique) সম্পর্কিত, যদিও বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কয়েকটি শ্রম-নিবিড় প্রকল্প এখনই গ্রহণ করা উচিত, সেগুলির লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন কিছু জিনিস উৎপাদন করা যেগুলি আমদানির বিকল্প সামগ্রী অথবা রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর সহায়ক হতে পারে। ভারতের পক্ষে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে হলে শিল্পোন্নয়নের হার আরও দ্রুত বাড়ানো দরকার এবং তার জন্য রপ্তানি শিল্পের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ৩ ॥

রামানন্দ তাই আন্দাজ করেছিল। মাধুরী এখন স্নানের খেলা খেলছে। হ্যাঁ, খেলা বইকি! আনন্দে বিভোর হয়ে ছিরছিরে ঐ খালের জলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে কুচকুচে কালো তালের গুঁড়ির ওপর কলসীর মতন গোলগাল নধর কোমরখানা বসিয়ে রোগা শরীরে সাবান ঘষে দুধের মতন ফেনায় ফেনায় চুল থেকে নাভি পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে কেউ যদি গলা খুলে গাইতে আরম্ভ করে, নিশ্চয় যে কোনো মানুষ এই দৃশ্য দেখলে ঠকে যেতই বলায়। দুধের মতন ফেনার জেল্লা, পাকা কাঁঠাল কোষের রঙের অঙ্গে ছলাৎ রোদ, ঢেউ ঢেউ আকাশ, তাজা মাঠ মাঠ, ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কাচের মতন স্বচ্ছ ঝিলমিলে ধুলোর ধুনো, আয়নার মতন চকচকে জল, ঘট ছড়িয়ে দুধের কচুরিপানার জঙ্গল ও কলমির দাম, সাদা ফুল, নীল ফুল, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, শামুক গুগলীর গন্ধ—উঃ, আরও বাকি আছে. কেউ যদি ছবি আঁকতে চাইত, ইজেল, তুলি ও রঙের বাক্স কাঁধে ফেলে পঁচিশ বি বাস থেকে নেমে এতটা মেঠো রাস্তা কষ্ট করে হেঁটে রামানন্দর মতন এখানে পৌঁছে যেত তো তার চোখের পাতা আটকে যেত, নিশ্বাস ভারি হয়ে আসত। কেবল কি মাধুরীর গানের গলা, কেবল কি ওর আগুনের রঙের কাঁধ বেয়ে পিঠ বেয়ে কিলবিলে সাপের মতন টাটা-টমাকের মিষ্টি সুগন্ধ তেজাল ফেনার ফুল-তোলা নয়নসুখ শায়ার তলায় লুকিয়ে পড়ার নরম ছবি। আর্টিস্ট আরও দৃশ্য দেখত, আরও শব্দ শুনত। হাজার হাজার বিঘা মেছোভেড়ি গঙ্গার বালুর নিচে চাপা পড়ে এখন গালভরা 'সল্টলেক জমি' নাম নিয়ে পাগলের মতন ধুলোর ঝড় তুলে কেমন হা-হা করে হাসছে, হাজার হাজার বিঘা বালুর নিচে মরে হেজে যাওয়া মাছের আঁষটে গন্ধ এখনও যেন একটি-দুটি চিলের নাকে লাগে, দূরের আকাশে উড়ে উড়ে তারা মরা কান্না কাঁদে। আকাশে চিলের কান্না, খালের কিনার ঘেঁষা মাদার ও মনসা গাছের বেড়া দেওয়া অক্ষয়ের পোলট্রির খাঁচার লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড ও পাঁচ রকম দেশী মুরগীর প্রহরে প্রহরে কক্কড় চিৎকার, খালের জলে অক্ষয়ের তিন কুড়ি পাতি ও রাজহাঁসের প্যাঁক প্যাঁক—তাই তো, বালুর ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া দমকা হাওয়ার শব্দের সঙ্গে আরও অনেক শব্দ এখানে ভেসে বেড়ায়। তা ছাড়া এখন ফাল্গুনে মাসে ঘাটের জলে পা ডুবিয়ে মাধুরীর মনোহর ছবিটি বাদ দিলেও চমৎকার রংদার ছবি অক্ষয়ের ঘরের সামনে পিছনে ফুটে উঠেছে। সব কটা মাদার গাছের মাথা লাল ফুলের আগুন হয়ে জ্বলছে।

বলতে কি, বসন্তের আগুন জ্বলে উঠতে মাধুরী ও মাদার গাছগুলি যেন আড়াআড়ি করে কে কত বেশি সুন্দর হবে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে।

কাজেই ইজেল ও রং তুলির বাক্স নিয়ে যদি কোনো বেটা এখানে ছবি আঁকতে আসত তো নাওয়া খাওয়াই ভুলে যেত। দিনভর কেবল ছবি আঁকত। কিন্তু রামানন্দ কোনো বেটা শিল্পীকে এখানে আসতে দেবে না। মাধুরীকে নিয়ে কবিতা লিখবে? কলসীর মতন ঢালু হয়ে আসা সুগোল নধর নিতম্ব, সুন্দরীর সরস স্তন চিবুক, অন্ধকার চুল—এইসব নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কুটকচালে কাব্যচর্চা? আসুক না কোনো কবি। মাথায় চাঁটি মেরে রামানন্দ এখান থেকে যদি তাড়িয়ে না দেয়। মাধুরীকে নিয়ে অক্ষয়কে নিয়ে গল্প লিখবে? এক জোড়া পায়রার সুখের জীবন, লাল টালি ছাওয়া ঘর, মাদার ও মনসা গাছের বেড়া, হাঁস মুরগির ব্যবসা? মাছের ভেড়ি খুইয়ে বুদ্ধি করে ব্যবসাটা না ধরলে অনেক ভেড়িওয়ালার মতন অক্ষয় কোথায় ভেসে যেত। ঐ যেমন পরাশর। মাঠের ধারে একটা ছাতিম গাছের নিচে বসে এখন বেল শশা কলা বেচে। ক'টা মানুষ এখানে বেল কলা শশা খেতে আসে? সারা দিন দোকান সাজিয়ে বসে থেকে দু' টাকাও বেচতে পারে না। এখনও তার হাতে মাছের গন্ধ লেগে আছে। খোসা ছাড়িয়ে নুন লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে পরাশর যখন খদ্দেরকে শশা খেতে দেয়, শশার গায়ে মাছের আঁষটে গন্ধ পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে এতটা রাস্তা রোদ মাথায় নিয়ে হেঁটে দু'দিন রামানন্দর দারুণ তেষ্টা পেয়েছিল, ছাতিম তলায় দাঁড়িয়ে পরাশরের শশা খেয়েছিল। দু' দিনই গন্ধটা পেয়েছে। তা বলে রামানন্দ নাক সিঁটকায়নি বা থুতু-টুতু ফেলেনি। পাছে পরাশর মনে কষ্ট পায়। এখন আর রামানন্দ তেষ্টা পেলেও অবশ্য শশা কিনে খায় না। হুঁ, ভেড়ি বন্দোবস্ত নিয়েছিল কি কারো সঙ্গে ভাগে মাছের চাষ করত, কি জলে নেমে জাল ছেঁকে মাল ধরত—এমন কত গণ্ডা মানুষ এখন কোথায় হারিয়ে

গেছে কেউ বলতে পারে না। কোন্ এক অনন্ত মণ্ডল নাকি কলকাতার রাস্তায় সাইকেল গাড়ি নিয়ে আইসক্রীম ফেরি করে পরিবার চালায়, কোন্ এক ... দাস, অক্ষয়ের মুখে এসব শোনা, চটকলে ঢুকে পড়েছে। আবার কিছু মানুষ সরাসরি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের মজুর বনে গিয়ে কোমর বেঁধে ভেড়ি বুজানোর কাজে লেগে গেছে। এখনও মোটা পাইপ লাইন ধরে মা গঙ্গার গর্ভ থেকে ধকধক করে পাঁক কাদার পিন্ড এসে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। ...দিকের আর ক'টা ভেড়ি গেছে, কিন্তু ওদিকে এখনও নলবন, চার নম্বর, নাটা, সাহেবখালি, সর্দার ভেড়ি, গোলতলার ভেড়ি, রুই কাতলা ও বাটা ফলুইয়ে বোঝাই হয়ে চকচকে ... নীল আকাশের ছায়া ধরে রঙ্গরসের ঢেউ তুলে হি-হি করে নাচছে। আস্তে আস্তে ওদের নাচ বন্ধ করা হবে, হাসি বুজিয়ে দেওয়া হবে, কাজেই কাজ চলছে, পাইপ লাইন, ড্রেন তাল খেলে মাটি টানছে, কোদাল চালিয়ে বালুর

চাই টে... অক্ষয়... চড়ায় এ... নিয়ে ক... দের ম... গেছে।... এখন ... থেকে ... হতুলের ... টালির ... মাথা ... বাড়ি ... নয়তো ... চালায়। সব ... এই সব ... নিয়ে ... যায়। ... আকাদ... কাজের

...নে মজুরেরা জমি সমান করছে। ...র ভেড়ির ধারে ধারে দূরের ... দুটো খালের কিনারে ঘরবাড়ি ...নুষ ঠাসাঠাসি করে ছিল, মাছে-...জ সব মরে হেজে ভূত হয়ে ছাড়া হয়ে অনেকেই পালিয়েছে, ক'টা মানুষ, দয়া করে সরকার ...ঠা করে জমি দেওয়া হয়েছে, ...র মতন এধার ওধার লাল ...তুলে কোনো রকমে বেচারারা আছে, ঠোঙা বানায়, ডালের ... শেয়ালদার বাজারে নিয়ে বেচে, কাঠির বাণ্ডিল তৈরী করে পেট

শুনুন রামানন্দ কদিনই ভেবেছে, ...ত বাস্তুহারা হতভাগা মেছোদের ...রেতের মতন একটা কিছু লেখা ... সবাই তা পারবে না, একমাত্র ...বজয়ী হেম মজুমদারই এই ...ক্ত। পরিশ্রমের কাজ। সন্দেহ

কি। দেশ নিয়ে সমাজ নিয়ে সর্বহারাদের নিয়ে হাজার পৃষ্ঠার গুরুগম্ভীর উপন্যাস বাংলা দেশে আর কে লিখছে। মাসিকে সাপ্তাহিকে কি দৈনিক কাগজে পাব্লিশাররা যখনই মজুমদারের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেয় তাঁর নামের আগে 'মহৎ স্রষ্টা', 'মানবদরদী শিল্পী', 'কালজয়ী উপন্যাস রচয়িতা' ইত্যাদি কয়েকটা দারুণ দারুণ বিশেষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রয়োগ করে। সস্তা জিনিস হালকা বিষয়, শুধুই প্রেম রোমান্স ইত্যাদি নিয়ে হেম মজুমদার গল্প উপন্যাস লেখে না। মানুষের ক্ষুধা বঞ্চনা নিপীড়ন অশিক্ষা বেকারত্ব অর্থাৎ যেসব সমস্যা নিয়ে দেশ জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে কেবল সেসব নিয়ে হেম মজুমদারের শিল্পকর্ম। সমস্যা যত গুরুতর হয় তত তাঁর কলম খোলে। শুভেন্দুরা ঠাট্টা করে হেম মজুমদারকে কখনও বাংলার 'টলস্টয়' কখনও 'ডস্টয়েভস্কি' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করে, কিন্তু ঠাট্টা করলে হবে কি, একমাত্র বইয়ের রয়্যালটির টাকায় নিউ আলীপুরে কোনো দিন তারা তার মতন বাড়ি করতে পারবে? না গাড়ি কিনতে পারবে? না কি ভিয়েনা ফেরত ডাক্তারের সংগে মেয়ের বিয়ে দেবে? তবেই হয়েছিল আর কি। শুভেন্দুদের আবস্ট্রাক্ট লেখা, সুররিয়ালিস্ট কবিতা বানের জলে ভেসে যাবে। বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক, পণ্ডিত, মনীষী বলে সবাই যাঁকে একবাক্যে শ্রদ্ধা করে, ডক্টর হরিমাধব সেনগুপ্ত সেবার কলকাতার অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্সে, যাকে বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঠিক একথাটাই কি জানিয়ে দেননি যে, হেম মজুমদারের রচনাই কালের সীমানা অতিক্রম করে টিঁকে থাকবে। তার লেখার মধ্যে দেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, দেশের মানুষের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শোনা যায়।

সেদিন পায়খানায় বসে রামানন্দ ভাই চিন্তা করছিল, একটা পোস্টকার্ড যদি মজুমদারের নিউ আলীপুরের ঠিকানায় কেউ লিখে দিত। মেছো-ভেড়ির মানুষেরা কী অমানুষিক সংগ্রাম করতে করতে হেরে গেল, মরে গেল। মরে হেজে যাওয়া মাছেদের সঙ্গে গঙ্গার বালুর নিচে তাদের কঙ্কালও চাপা পড়েছে। এই হাজার হাজার বিঘার বালু খুঁড়ে একটা মহৎ উপন্যাসের মালমশলা মজুমদার ঠিক পেয়ে যাবে। যা কিনা বাংলা দেশের আর কোনো লেখককে দিয়ে সম্ভব না। বলা যায় কি, এই উপন্যাসই হয়তো হেম মজুমদারকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাইয়ে দিত।

যাই হোক, এই তল্লাটের বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষদের নিয়ে মজুমদার, কি তার সমকক্ষ আর যদি কোনো

সাহিত্যিক থেকে থাকে, পাঁচ শ' হাজার কি দু' হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে যত বড় খুশি একখানা মহাকাব্য কি মহৎ উপন্যাস লিখে ফেলুক রামানন্দ আপত্তি করবে না, কিন্তু কোনো বেটা কবি, চিত্রকর বা ঔপন্যাসিক যেন এখানে মনসা ও মাদারের বেড়া দেওয়া মাধুরীর এই ফুটফুটে আঙিনার দিকে চোখ না দেয়।

উহু, অক্ষয়কে মাধুরীকে আলাদা করে দেখতে হবে। রামানন্দ তাই দেখছে। একটেরে জমি নিয়ে ওদের ছবির মতন ছিমছাম বাড়ি, দক্ষিণটা খোলা রেখে পুব উত্তর ও পশ্চিমের ভিটেয় বাঁশের বেড়া টালির ছাদ নিয়ে তিনখানা ঘর, মাঝখানে একফালি উঠোন, ওপাশে লাউ ঝিঙে কুমড়ো লতা এপাশে তুলসী মঞ্চ, আর উঠোনের সবটা পশ্চিম জুড়ে মুরগির খাঁচা, হাঁসের ঘর। এক নজর ওদিকে তাকালেই বোঝা যায় ভেড়ির ধারের কি খাল পাড়ের আর দশটা মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে অক্ষয়ের ভাগ্যকে মেলাতে গেলে ভুল হবে। ভগবানের দয়া? নাকি মানুষটার বুদ্ধি বিবেচনা কর্মক্ষমতা—সে যাই হোক, হাঁস মুরগি নিয়ে অক্ষয় দু' পয়সা করে ফেলেছে। তার ঘরে সেগুনে কাঠের খাট আলমারী হয়েছে, আর্শি ফিট করা চমৎকার ড্রেসিং টেবিলও হয়েছে। ভাল ভাল সাবান গায়ে মাখে মাধুরী, গন্ধ তেল মাথায় দেয়, নয়নসুখ কাপড়ের ফুল-শায়া পরে। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রং বেরঙের শাড়ি ব্লাউজ।

কিন্তু রামানন্দ সহ্য করবে না কোনো রকম কারচুপি এদের নিয়ে কেউ করুক। যে কারণে রামানন্দ আজ পর্যন্ত শুভেন্দুদের কাছে এখানকার ঠিকানা বলেনি। মরে গেলেও বলবে না। এই যে ঘাটে বসে জলে পা ডুবিয়ে মাধুরী গান গাইতে গাইতে গায়ে সাবান মাখছে, মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড আকাশ, ঘরের পিছনে মাদার বনে ফাল্গুনের শুরু থেকে আগুন লেগেছে, এখন অবশ্য অক্ষয় হাসপাতালে, তা না হলে সারাদিন হাঁস মুরগির তদারক করা আর ফাঁকে ফাঁকে এসে মাধুরীর হাতের চা খাওয়া এবং ফাঁক পেলেই একটু আড়াল পেলেই, রামানন্দ এখানে আছে কদিন ধরে তাই, তা না হলে বেশ বোঝা যায়, রামানন্দ খুবই কল্পনা করতে পারে, আড়াল-টাড়ালের দরকারই হত না, কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে অক্ষয় এক মুখে চা খয়েছে আর এক মুখে বউকে বুকের কাছে ঠেসে ধরে কষে চুমু খেয়েছে, হুঁ, এদের নিয়েই এই গভীর দাম্পত্য প্রেম, চকচকে আকাশ, হলুদ রোদ থোকা থোকা রক্তরাঙা মাদার ফুল, লেগহর্ন রোড আইল্যান্ড ও পাঁচ রকমের দেশী মুরগি, খালের জলে রাজহাঁস ও পাতি হাঁসের চেঁচামেচি, অবশ্য মরা রোদও আছে, আকাশ হঠাৎ কালো হয়ে ওঠা, অসুখ হয়ে অক্ষয়ের হাসপাতালে যাওয়া, মাধুরীর না-স্নান না-

খাওয়া না-ঘুম, অক্ষয় একটু ভাল আছে শুনে মাধুরীর মুখে এক একদিন ঝলক দিয়ে ওঠা হাসির রোদ্দুর, স্নানের সময় গান—তাই তো, মেঘ রোদ হাসি কান্না দুটোই থাকবে জীবনে—থাকুক, যেমন আছে তেমন করে এদের থাকতে দাও—তা বলে এদের নিয়ে কবিতা লেখা ছবি আঁকা গল্প উপন্যাস ফাঁদতে বসা—রামানন্দ এর ঘোর বিরোধী।

সংসারে অনেক কিছু নিয়ে কবিতা লেখা হচ্ছে, ছবি আঁকা হচ্ছে। গল্প উপন্যাসও ঢের লেখা হচ্ছে।

কিন্তু একটা দুটো জিনিস বাদ রাখতে ক্ষতি কি। রামানন্দ কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে, সে এখন কোনোরকম ইমেজ-এর ধার ধারে না, তা না হলে বেতলতার মতন পাতলা ছিপছিপে শরীরটা কোমরের কাছে ভেঙে দিয়ে খাঁচার সামনে ঝুঁকে অক্ষয়ের রূপসী গিন্নী মুরগির বাচ্চাদের যখন যবের ছাতু ভুট্টা চালের গুঁড়ো খেতে দেয়, ভোমরার চাকের মতন খোঁপাটা আধখানা খুলে গিয়ে পিঠের ওপর মুখ থুবড়ে থাকে, ওপর থেকে কামরাঙ্গা গাছের ডাল পাতার ফাঁক দিয়ে সিকি আধুলীর মতন টুকরো টুকরো গোল গোল রোদ ওর কাঁধে চুলে কোমরে পড়ে ঢেউ হয়ে নাচতে আরম্ভ করে—হ্যাঁ একটা দৃষ্টান্তই ধরা যাক, চমৎকার ছবি, রামানন্দের দারুণ লোভ হয় কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতে, বা যদি জগত মন্ডলের মতন রং তুলির কারবার করত সে সেসব নিয়ে আঁকাজোকা শুরু করে দিত। কিন্তু সে জেনে গেছে, কবিতার মধ্যে বা তুলির টানের মধ্যে সব কিছু ধরা দেয় না, পৃথিবীর কিছু আশ্চর্য জিনিস কিছু রং রেখা ও কালির আঁচড়ের বাইরে থেকে যেতে চায়. শত সাধ থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের সবটা রূপ প্রকাশ করতে পার না, কিছুটা পার, বাকি চৌদ্দ আনা অংশই তোমার দৃষ্টি তোমার অনুভবের আড়ালে থেকে যায়। কাজেই রামানন্দ মনে করে ওদের স্বভাব নিয়ে নিজস্ব রূপ নিয়ে, যেমন ওরা আছে, ওদের থাকতে দেওয়া উচিত। এখানে শিল্পচর্চার কোনো মানে হয় না। ছবি বা গল্প উপন্যাস নিয়ে রামানন্দ যদিও খুব একটা কিছু বলতে চায় না, কেননা ওই দুটো শিল্প তার এক্তিয়ারের বাইরে, তার চর্চা নেই, তাহলেও যতটা সে বোঝে, ওই যে হাসপাতালে শুয়ে অক্ষয় হলদে ফ্যাকাশে চোখ মেলে বেঁটে গোলগাল ফরশা চেহারার একটা নার্সের দিকে সময় সময় চেয়ে থাকে এবং ডিউটি শেষ করে নার্সটা বেরিয়ে যাবার পর ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে বাড়ির হাঁস মুরগি ঝিঙে কুমড়ো লতা ও মাধুরীর কথা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে এবং এক সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেশি ডিম ফুটোবার জন্য একটা ইনকিউবেটার কেনা যায় কিনা চিন্তা করে, তাকে নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখলেও পুরোপুরি ঠিক ওই মানুষটাকে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবে বলে রামানন্দ ভরসা করে না।

তার চেয়ে যে কেন [illegible] মদন-বাবুকে নিয়ে গল্প লেখা সহজ, বা বৌবাজারের চায়ের দোকানের সেই দশাসই চেহারার মালিকটাকে নিয়ে। বা রেখা চক্রবর্তীকে বিদায় দিয়ে রামানন্দ পঁচিশ-বি যে বাসটায় চড়ে এল সেই কন্ডাক্টার দুটিকে নিয়ে।

ছবির বেলায়ও তাই। ইম্প্রেশনিজম, কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, যে রীতি ধরেই কেউ অক্ষয় বা মাধুরীর ছবি আঁকুক না, সেই আঁকা খুব একটা সার্থক হবে না রামানন্দের ধারণা। যাই হোক, গল্প লিখিয়ে ছবি আঁকিয়েদের সম্পর্কে রামানন্দ এর বেশি কিছু বলতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি কবিতার কথা বলে, এদের দুজনকে নিয়ে কবিতা লিখতে কোনো কবির হাত সুড়সুড় করছে রামানন্দ শোনে, তবে সে মারমুখো হয়ে উঠবে।

আর এ-ও সত্য, রামানন্দ চোখ বুজে বলতে পারে কবিতা লিখতে বসে কবিরা শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কে বাদ দেবে, সে পুরুষ, তারা ভাববে অক্ষয়কে নিয়ে শিল্পকর্ম করার সব দায় দায়িত্ব গদ্য লিখিয়েদের। তারা মাধুরীকে নিয়ে পড়বে। বাংলা দেশ। কবিরা রাধার কীর্তন করতে খুব ভালবাসে। শ্রীমতীকে নিয়ে গীত ও পদ্য রচনা আজও পুরোদমে চলেছে। তবে এখনও কেউ কেউ বেশ রেখে ঢেকে, রবিঠাকুর যে বুদ্ধি দেখিয়ে গেছেন, মানে শরীরটার দিকে একটু কম ঝুঁকে, হৃদয় মন এ সবের ওপর জোর দিয়ে সেই সঙ্গে দক্ষিণের বাতাস, কৃষ্ণচূড়া ফুল

শ্রাবণের মেঘ, বৃষ্টি, ডাহুকের ডাক ইত্যাদি মিশিয়ে কবিতা ফাঁদছে, আসক্তি নিরাসক্তি দুটোই থাকছে, যাতে জিনিসটা মোটামুটি লঘুপাক হয়, পাঠকের হজমের গোলমাল না হয়। দেখা যাচ্ছে, তাতে ফল ভালই হচ্ছে, পাঠক তাদের চোখ বুজে পাতে নিচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য জীবনানন্দের মতন পৃথিবীর ঘাস ফড়িং নষ্টচাঁদ হলুদে জ্যোৎস্না লাল রক্ত, মদের গেলাস, রাত্রির গন্ধ ইত্যাদি নিয়ে চমৎকার প্রতীকী আবহ সৃষ্টি করে কুড়ি বছর পঁচিশ বছর বা যেন হাজার বছর পরে নায়িকার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছে, যেন নায়িকা আর মানুষী না, দূরের কোনো 'দ্বীপ' বা নক্ষত্র অথবা যেন শুধুই স্মৃতি, যেন স্মৃতি এসে সত্যের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে—এভাবে কায়দা করে কবিতা লিখছে, অর্থাৎ নায়িকাও থাকছে শুচিতাও রক্ষা হচ্ছে, ফলে অনেকে গোগ্রাসে এদের কবিতা গেলে, অনেকে বুঝতে না পেরে অসহায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কিন্তু কবিকে তারা গালাগাল করে না। বরং একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ঈর্ষার দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেখতে থাকে। বাদ বাকী যারা, যেমন শুভেন্দুদের মধ্যেও অনেকেই মাধুরীকে দেখলে এই মুহূর্তে 'নোংরা পাখি হয়ে ওর শরীরটা ঠুকরে খেতে চাইবে, কেননা ওখানে 'অলকোলি গোল্ড ও রঙ্গ' ছাড়া তারা আর কিছু দেখতে পেত না। কিন্তু তারা কি সত্যিকার মাধুরীকে দেখা পেত ওই কবিতায়? মোটেই না। এ সব কবিতার জন্য কলকাতা শহরে মেয়ে কম আছে কিছু! যেমন পূরবী। কবিতার নাম শুনলে যার বমি আসে। অথচ ওই কবিতা বিশেষণীকে দেখেও রামানন্দ কতদিন গুনগুনিয়ে বলেছে, 'কেশ কবরী আলোয় ভাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের আধখানা থাই আধখানা রাখি—' বা যেমন ওই রেখা চক্রবর্তী একটু আগে রামানন্দ বৌবাজারের পর্দাঘেরা খুপরির ভিতর বসে যার সঙ্গে পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট কবিতা নিয়ে কথা বলছিল, হ্যাঁ, কবিতার জন্য ধরতে গেলে যে একরকম উন্মাদিনী, আবার ওদিকে হাতের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সময় মিলিয়ে টেলিফোন অফিসে চাকরি করতে ছোটে, কোমরে কাপড় বেঁধে রীতিমত খাণ্ডারী হয়ে চায়ের দোকানের দুর্বিনীত ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে, সেই যুবতীর 'ভেজা ওষ্ঠাধর', 'শীতের দেশের মত হাসাহাসি-পোশাক' দেখে রামানন্দর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে ইচ্ছে করছিল, হায় মেয়েরা, তোমরা বিমানে আছো, মন্ত্রকে বা আদালতে সিংহাসনে বিদেশ মিশনে, এমন কি ঘরেও আছো... শুধু কবিতায় নেই...অর্থাৎ রামানন্দ বুঝে গেছে, যে মেয়ে কবিতায় নাম শুনলে নাক সিঁটকায় বা যে মেয়ে নিজে কবিতা লেখে এবং কবি ও কবিতার গন্ধ পেলেই আহ্লাদে নাচতে আরম্ভ করে, আসলে তাদের ভিতরটা এক, তাদের কবিতা ভালবাসা বা না-বাসা, কবিতা লেখা কি কবিতার বই হাতের কাছে পেলে উনুনের আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া এক জিনিস। আসলে এগুলি তাদের অনেকটা ওপরের ব্যাপার, সাপের খোলসের মতন। কেননা তারা অন্যদিকে ব্যস্ত, পৃথিবীর আর দশটা গুরুত্বের জিনিস নিয়ে তাদের অষ্টপ্রহরের ভাবনা। ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রাম বাস অফিস, দোকান বাড়ি গাড়ি, নিদেন একটা স্কুটার, একটা ভাল ফ্ল্যাট ফ্রীজ, গ্যাসের উনুন ভাল পোশাক (কেবল নিজের না, যে মানুষটির ঘরনী হয়ে আছে তাঁর পোশাক-ও সাবের দিকেও শ্যেনদৃষ্টি, রামানন্দর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি ভারি সোলের চপ্পল পূরবীকে কী দুঃসহ যন্ত্রণাই দিয়েছে) ছেলেমেয়েদের জন্য কেম্ব্রিজ ইংলিশ মিডিয়াম, বছর বছর বাইরে যাওয়া সর্বোপরি ভাল ভাল খাদ্য। কবিতা পড়ুয়া মেয়ে আর যিনি কবিতা ভালবাসেন না— প্রত্যেকেই কিন্তু একটা করে সাত হাত লম্বা জিভের অধিকারিণী।

তবু কলকাতার কবির দল আজও চুটিয়ে এদের নিয়ে কবিতা লিখে চলেছে। কেউ যদি দশটা কবিতা লেখে, তার মধ্যে সাড়ে নটাই ঐসব যুবতী গিন্নী কুমারীদের ওপর চোখ রেখে। কারো 'সবিতা', কারো 'সুনয়না' কারো 'কল্পাবতী', এবং এরা নক্ষত্র হয়ে কখনও শুধু আকাশে থাকে 'মাটিতে নামতে মানা' কেউ 'পাশ বালিশ' হয়ে বিছানা আঁকড়ে থাকে, শরীর 'সোনালী স্রোত', স্তনের বোঁটা 'চোখের তারার' মতন কাঁপে'।

ভাল কথা, কিন্তু তাদের কারো সঙ্গে যেন মাধুরীকে মেলান না হয়। কেননা কবিতার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে মাধুরীকে তুষ্ট করা যাবে না, আবার কবিতার কাঁটা ফুটিয়ে তাকে চটান কি কাঁদান যাবে না। কবিতা জিনিসটাই তার জানা নেই। তাই ভাবে রামানন্দ, কোনো বেটা শিল্পী এখানে ঘেঁষতে চাইলে রামানন্দ পরিষ্কার জানিয়ে দেবে মাধুরীর অন্য জগত, হাঁসমুরগি মাদার ফুলে হলুদ রোদ, সাদা বালু, তিরতিরে খালের জল, কচুরীপানা, হেলে দাম আর তার অক্ষয়।

কেউ এদের নিয়ে কবিতা লিখবে কি ছবি আঁকবে শুনলে মাধুরী এমন চোখে তাকাবে, যেন গ্রীক জানে না এমন মানুষকে কেউ গ্রীক ভাষা শোনাচ্ছে, হাসপাতালে অক্ষয়ের কানে কথাটা দিলে অক্ষয়ও হাসবে, ভাববে কেউ তাদের সঙ্গে রসিকতা করতে চাইছে।

তাকে নিয়ে তার বউকে নিয়ে আলাদা কোনো শিল্পকর্ম হয় সে মরে গেলেও বিশ্বাস করবে না।

তারা নিজেরাই একটা শিল্প।

এবং রামানন্দ এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা আছে কি যা একটা গাছকে ঠিকঠিক চিনিয়ে দিতে [illegible] আজ পর্যন্ত পারেনি। এমন [illegible] যা কিনা তুলির আগায় [illegible] লাল ফুল কেমন কেউ

হুবহু বুঝিয়ে দিতে পেরেছে। কি ঘাসের মাথার শিশির ফোটা।

তেমনি অক্ষয় মাধুরী, তাদের হাসমুরগি, তকতকে ঝকঝকে উঠোন, ঘরের পিছনের মাদায় মনসার ঝোপ, ঝোপের ভিতরে ঝিঁঝির ডাক।

আকাশের মেঘের মতন, ঝিমধরা দুপুরের রৌদ্রের মতন তারা আপন স্বভাব নিয়ে, রূপ নিয়ে রং নিয়ে আছে, থাকুক। কবিতা লেখার নামে শুভেন্দুদের কোনোরকম ফাজলামি, ছবি আঁকা নিয়ে জগত মণ্ডলদের কোনোরকম ইয়ার্কি এখানে অচল। এই জন্য পুরবীরা আছে, রেখা চক্রবর্তীরা আছে। পুরবী ও রেখার মতন বুড়িরা আছে ছুঁড়িরা আছে। সত্যি কলকাতায় কী নেই, লাখ লাখ মানুষ অগুণতি গাড়ি-ঘোড়া পার্ক ময়দান নালা নর্দমা পায়খানা প্রস্রাবখানা, চমৎকার সব ড্রয়িং রুম বেডরুম বড় বড় বস্তি শুঁড়িখানা, মোহনবাবুর চায়ের দোকান কফি হাউস, বেশ্যা দালাল গুন্ডা অধ্যাপক উকিল ডাক্তার, তাদের স্ত্রীরা ছেলেমেয়েরা—কবিতা লেখার ছবি আঁকার মালমশলার অভাব? আধুনিক কবিরা তাদের নিয়ে কবিতা লিখবে, ছবি আঁকিয়েরা ছবি আঁকবে, গল্প লিখিয়েরা গল্প তৈরি করবে। এজন্য শহরের সবাই আকুলিবকুলি করছে, তাদের আশা গল্পের মধ্য দিয়ে তারা নতুন করে বেঁচে উঠবে, কবিতার মধ্য দিয়ে সুরভি হয়ে উঠবে, ছবির ভিতর দিয়ে বর্ণাঢ্য হবে। হুঁ, তাদের রং জ্বলে গেছে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মুখের দিকে তাকাতে লজ্জা, তারা টের পায় তাদের নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, প্লীহায় যকৃতে ফুসফুসে পচন ধরেছে, সেই পচন আস্তে আস্তে চামড়ার ওপর ভেসে উঠবে। নখ খসবে, চুল খসবে, তারপর হাত পায়ের আঙুল খসে খসে পড়বে। নিজেদের সেই বীভৎস বিকলাঙ্গ মূর্তি কল্পনা করে প্রতিমুহূর্তে সব শিউরে উঠছে। ওপরের রূপটা কিছু না। ভিতরটা বিষাক্ত হয়ে গেছে। পুরবী বুঝতে পারে, রেখা বুঝতে পারছে। এই জন্য তাদের অস্থিরতা, এই জন্য রেখা কাব্য চর্চা করছে, কবিতা লিখছে, কবির ছায়ায় বসে দুদণ্ড নিজেকে শীতল করে নিচ্ছে। আহা, বেচারা পুরবী, রামানন্দর স্ত্রী, নিজে এক লাইন কবিতা লিখতে পারে না। অথচ রামানন্দ, এখানেই তার বোকামী, এই জীবনে একদিন একটা কবিতা লিখল না বেচারাকে নিয়ে। হয়তো কবিতার মধ্য দিয়ে ঐ যুবতীও সুগন্ধি সুন্দর হয়ে উঠতে চেয়েছিল। বুঝতে না পেরে রামানন্দ কিনা কেবলই তাকে অর্ধাঙ্গিনী শয্যাসঙ্গিনী করে রাখতে চেয়েছে। তাই না কবিতার ওপর মহিলা এত চটা, রামানন্দর ওপর এত বিদ্বেষ! কবিতার মধ্যে নিজেকে দেখল না সেই রাগ অভিমান। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া।

হুঁ, সবাই এমন চাইছে। সোনাগাছির সরযূ? জগত মণ্ডলের সঙ্গে রামানন্দ যার ঘরে সেদিন গিয়েছিল? এক পয়সা কর দিতে হয় না জগতকে এখন সেখানে। জমি নিষ্কর হয়ে গেছে। মনের আনন্দে আর্টিস্ট সেখানে লাঙল চালাচ্ছে। কারণ? কারণটা পরে বোঝা গেছে, যখন আলো জ্বালল, ধূপ-কাঠি জ্বেলে আদর করে সরযূ দুজনকে ধবধবে বিছানার ওপর বসাল। এই দেওয়ালে সেই দেওয়ালে খাটের মাথায় টেবিলের ওপর ওয়াড্রোবের আলমারীর মাথায় কেবল একটি মুখ, একটা মানুষ। সরযূ। চুল বাঁধছে, স্নান করছে, বই পড়ছে, সেতার বাজাচ্ছে, নাচছে, ঘুমোচ্ছে, স্বপ্ন দেখছে, হাই তুলছে, হাসছে, গান গাইছে—তৈলচিত্র রেখাচিত্র, পেন্সিলের কাজ সসের কাজ, চারকোলের আঁকা ছবি, গুণে শেষ করতে পারেনি রামানন্দ, কত ছবি আঁকা হয়েছে ঐ একটা মুখের।

রামানন্দর অপলক চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে সরযূ মিটিমিটি হাসছিল।

'সব জগতবাবুর আঁকা, দেখুন কত এঁকেছে আমাকে।' মেয়েটার দুই চোখে খুশি ধরছিল না।

'কিন্তু আর একটি গুণীকে তোমার ঘরে আনলাম, চিনে রাখ, মস্ত বড় কবি, রামানন্দ সেন।' জগত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল।

শুনে সরযূর মুখের হাসি দপ করে নিবে গেল। এত বড় একটা ঢোক গিলল। তারপর, রামানন্দ যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জগতের আঁকা ছবি দেখছিল, সরযূ চোখ ছোট করে রামানন্দর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল। কবিকে দেখল।

'আপনাকে একটা কথা বলব?' রামানন্দর হাঁটুর ওপর হাত রেখেছিল সরযূ। 'হুঁ, হুঁ, বলবে, কেন বলবে না।' জগত তাকে সাহস দিচ্ছিল। 'রামানন্দ সেন জাত কবি, খুব ভাল মানুষ, তোমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে যেভাবে ফ্রিলী কথা বলছ এঁর সঙ্গেও বলবে বইকি।'

'তা হলে এবার বলি, আমায় নিয়ে আপনি একটি কবিতা লিখুন।' আদুরে ঢঙে রামানন্দর হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে সরযূ পায়ের কাছে মেঝের ওপর চোখ রেখেছিল।

'নিশ্চয় লিখবে', দরাজ গলায় জগত তৎক্ষণাৎ তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। 'একটা কেন, দশটা কবিতা লিখে দেবেন, আমি যেমন তোমার ছবি এঁকেছি, তেমনি রামানন্দবাবু তোমায় নিয়ে অনেক কবিতা লিখবেন। এমন ঢলঢল চাঁদ মুখ নিয়ে কবিতা লিখবেন বলেই তো তোমার ঘরে আজ এঁকে নিয়ে এলাম। কি বলেন রামানন্দবাবু?'

রামানন্দ ঘাড় কাত করেছিল। জগত মণ্ডলের আঁকা এত এত ছবির মধ্যে নিজেকে দেখার পরেও সোনাগাছির সরযূর তৃপ্তি ছিল না। কবিতার মধ্যে নিজেকে নতুন করে দেখতে সেদিন মেয়েটা কী ভয়ানক আকুল হয়ে উঠেছিল আজও রামানন্দ ভুলতে পারছে না। সেদিন এক পয়সা তাদের মাশুল লাগেনি। দুজনে আনন্দ করে সরযূর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। রামানন্দ সময় সময় চিন্তা করে, তাকে নিয়ে একদিন রামানন্দ কবিতা লিখবে এই উল্লাস উত্তেজনা নিয়ে মেয়েটা হয়তো আজও জ্বলছে।

মোহন রেস্তোরাঁর মোহনবাবু? তারা কবির দল আড্ডা দিয়ে দিয়ে দোকানটাকে ফেল পড়ার পথে নিয়ে এসেছে। তবু মোহনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই। কেন না ভদ্রলোক সার কথাটা বুঝে গেছে। অনেকদিন আগে টের পেয়েছে তার ভিতরটা পচে পচে খুলে পড়ছে। ভাল করে দোকান চালিয়ে এত টাকা পয়সা জমিয়েও কিছু লাভ নেই। বরং কবিদের ছায়ায় বসে তাদের গায়ের আঁচ লাগিয়ে শান্তি। উঁহু, তা হলেও মোহন পাল বুঝি এত চুপ থেকে কবিদের অত্যাচার সহ্য করত না। কি শনিবার বিকেলে বিকাশ একটা করে মোহনবাবুকে নিয়ে নতুন কবিতা লিখে মেনু-বোর্ডের ওপর টাঙিয়ে দিত। যেন দেখছে না, সেদিকে মোটেই চোখ নেই এমন ভান করে মোহন পাল মাথা গুঁজে এক মনে হিসাবের খাতা দেখত।

কিন্তু আসলে কি তাই? রামানন্দরা টের পেত, রাত নটার পর যখন দোকান থেকে তারা বেরিয়ে আসত, যখন দোকানের দরজায় তালা দেবার সময় হত, ঠিক তখন মোহন পাল হিসাবের খাতাটি বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে মেনুবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াত এবং একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে কবিতাটা পড়ত। পড়ে মোহন পালের ফ্যাকাশে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় চুল বলতে পাটের আঁশের মতন পাতলা ফিনফিনে কিছু লোম, বৈশাখের দুর্দান্ত গরমেও গায়ের সেই রোঁয়া-ওঠা বিখ্যাত পশমী আলোয়ান, রং জ্বলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যেটা ছাল-ওঠা কুত্তার গায়ের চেহারা ধরেছিল, মাথার ওপর টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে সামনের গলি থেকে ডাস্টবিনের গন্ধটা সরাসরি এসে নাকে ঢুকছে, দোকান ঘরের ভিতরটা তখন শ্মশানের মতন শূন্য খাঁ খাঁ করছে—ঐ অবস্থায় বড় রাস্তার ট্রামের ঘড়ঘড় রিকশার ঠনঠন শুনতে শুনতে তার নিজেকে নিয়ে লেখা বিকাশবাবুর কবিতাটি দু' তিনবার

পড়ার পর মোহনবাবু যে এক ধরনের অতিন্দ্রীয় সুখ অনুভব করত তাতে সন্দেহ ছিল কি এভাবে যে শনিবার কবিতার মধ্যে দিয়ে মানুষটা নতুন করে বেঁচে উঠেছে।

কলকাতার সব মানুষ, যাদের ভিতর পচে যাচ্ছে, এভাবে কবিতার মধ্যে গল্পের মধ্যে নয়তো ছবির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর ছটফট করছে।

উঁহু, মাধুরীর সবটাই নতুন তাজা বর্ণাঢ্য সুরভিত। তোমার আমার তৈরী মেকি ছবি কবিতা গল্পের এখানে দরকার নেই। আকাশের নীল, খালের জল, রাজ-হাঁসের ধবধবে ডানা তার কবিতা। মাদুরের বেড়া দেওয়া টালির ঘর, খাঁচার রং বেরঙের মুরগি, খাঁচার পাশে সাজিয়ে রাখা হাঁড়ি ভরতি সব ভুট্টার ছাতু, হাড়ের গুঁড়ো, হাসপাতালে রুগ্ন অক্ষয়—এসব তার গল্প। আর এই যে এতক্ষণ সাবান-টাবান মাখার পর এখন জলে ঝাঁপ দিল পর পর দুটো ডুব দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কেটে হাঁসেদের কাছে চলে গেল, মদ্দা হাঁসটার লম্বা গলা জড়িয়ে তার কানে কানে দুটো কথা বলল—এসব তার ছবি, মাধুরীর জীবনের ছবি। অন্য ছবি তার পছন্দ হবে কেন।

একটা ন্যাড়া তালগাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মাথায় রোদ নিয়ে রামানন্দ সব দেখছিল। এখন সামান্য কেশে গলার শব্দ করল। টের পেয়ে মাধুরী ঘাড় ফেরাল। রামানন্দকে দেখে হাসল, হাঁসের গলা ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কেটে তখনি ঘাটে ফিরে এল।

'কখন ফিরলে মাস্টার?' যেন আর দেরি করা ঠিক না। আঁচলটা বুকের ওপর টেনে দিয়ে মাধুরী জল ছেড়ে তীরে উঠল। 'কেমন আছে ও?'

'ভাল।' পকেট থেকে রামানন্দ কফির প্যাকেটটা বের করল।

'একটু হাসল-টাসল?' কফির দিকে মোটেই চোখ নেই, মাধুরী তীক্ষ্ণ চোখে রামানন্দর চোখ দেখছিল।

'ভাল, ভাল', রামানন্দ ঘাড় নাড়ল, 'হাসল বইকি, অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্পগুজব করল।' ভেজা কাপড়ের নিচে মাধুরীর গায়ের রং ও মাংস কেমন তাজা কোমল সুশ্রী ঠেকছিল।

'সেই কখন বেরিয়েছ বাড়ি থেকে—' রামানন্দর সঙ্গে মাধুরী বাড়ির দিকে হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। 'এত ভাবছিলাম একা বসে বসে, এই তো চান করতে এলাম।'

'ভাবনার কিছুই নেই, অক্ষয় কদিনের মধ্যেই আশা করি বাড়ি ফিরতে পারবে।'

'ডাক্তারদের সঙ্গে আজ তোমার কথা হল?'

'না তা হয়নি, তা হলেও আমার মনে হচ্ছে—' রামানন্দ হঠাৎ চুপ করে গেল।

মাধুরী আর কিছু বলল না। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ সে বুঝতে পেরেছে অক্ষয়ের সকাল সকাল বাড়ি ফেরার আশাটা নিতান্তই রামানন্দর মনগড়া কথা, মাধুরীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মাত্র। রোদ্রে তার মাথার ভেজা চুল ভোমরার পাখার মতন চিকচিক করছিল।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার কফি এনেছ?'

'এনেছি বইকি।' হাতের প্যাকেটটা রামানন্দ তুলে ধরল। 'খুব ভাল জিনিস চালান এসেছে এবার, নীলগিরির কফি, ওরা বলল।'

'ওরা সব সময়েই ভাল জিনিস বলে, না খেলে কিছু বোঝা যাবে না।' মাধুরী আর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। হাঁটবার সময় ওর পিছনটা দুলতে থাকে। ওর হাঁসগুলির কথা মনে হয় তখন। যেন হাঁসেদের দেখে দেখে মাধুরী এমন পিছন দুলিয়ে হাঁটা শিখেছে। ওর নিতম্ব এমন কিছু ভারি না যে চলতে ফিরতে দুলবে। অস্বাভাবিক কি, রামানন্দ তখন চিন্তা করে, মানুষের কিছু কিছু স্বভাব পশু পাখিরা নেয়, পশু পাখিদের কোনো কোনো স্বভাব মানুষকে পেয়ে বসে।

'দ্যাখো দ্যাখো, কে আসছে!'

মাধুরীর চোখ অনুসরণ করে রামানন্দ সল্ট লেকের ধুধু জমির দিকে চোখ ফেরাল। সাদা বালু উড়িয়ে শফরী তার কালো লিকলিকে শরীরটা নিয়ে সাঁ সাঁ করে এদিকে ছুটে আসছে।

'শেয়ালের মতন দেখাচ্ছে ছেলেটাকে!' রামানন্দ গজগজ করে হাসল।

মাধুরী হাসল না।

'তোমার দৃষ্টি একরকম মাস্টার আমার অন্য রকম। অবিকল কেষ্ট ঠাকুরের মতন দেখাচ্ছে শফরীকে।' মাধুরী গাঢ় গলায় বলল।

এর পর রামানন্দ কিছু বলতে সাহস পেল না। একটা শুকনো ঢোক গিলল শুধু।

(ক্রমশ)

প্রগতির পথে প্রথম যাঁরা

কলকাতায় চক্রবেড়িয়া রোড যেখানে সেদিনের ল্যান্সডাউন রোড কেটে এগিয়ে গেছে সেখানে ছিল মধুসূদন দাসের সুন্দর বাড়িখানা। মধুবাবুকে আধুনিক ওড়িশার জনক বলা হয়। নূতন দিনের পথনির্দেশক ছিলেন তিনি। বাড়িখানার নাম শৈলাবাস ছিল। তাঁর পালিতা কন্যা শৈলবালাকে দিয়েছিলেন এ গৃহ। ওড়িশার যেমন তিনি ছিলেন নবজন্মদাতা, শৈলবালাকেও তিনি তেমনই দিয়েছিলেন শিক্ষা ও স্বাধীনতা। মধুবাবুকে দেখিনি কিন্তু শৈলমাসিমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন শৈলাবাসে বাস করবার সুযোগ হয়েছিল। তখন কুমারী দাসের বেশ বয়স হয়েছে। কাজকর্ম থেকে কিছুটা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু গল্প বলতেন কি চমৎকার!

গল্প বলতেন নিজের নানা অভিজ্ঞতার আর আমরা সবাই অবাক হয়ে শুনতেম। বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হতো না তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তিতে তেজস্বী ও সাহসী এই মহিলা কেমন অবলীলাক্রমে সমাজে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার আনতে সাহায্য করেছেন। তাঁর শত শত অভিজ্ঞতার কাহিনীর দু একটি এখনও মনে পড়ে। কবে নাকি রেলের প্রথম শ্রেণীতে এক সাদা সাহেব স্টেশন মাস্টারকে ডেকে বলেছিলেন ভারতীয় নারীর সঙ্গে তিনি এক কামরায় থাকতে রাজী নন। বর্তমান কালের কথা তো নয়। সেকালের সাহেবদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। এমন অন্যায় ইচ্ছা তাঁদের অকাতরে মেনে নেওয়াও হতো। ওড়িশার ছোট্ট রেল স্টেশন। স্টেশন মাস্টার মশাই আবার শৈলবালা দাসকে অনুনয় জানালেন। ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাশ কামরা আর নেই। কুমারী দাস দেখেন মাস্টার মশায়ের মহাবিপদ। করজোড়ে কম্পিত বক্ষে তিনি শৈলবালাকে অন্য কামরায় যেতে অনুরোধ করলেন। শৈল দাস সহজ মেয়ে ছিলেন না। প্রথম শ্রেণীর টিকিট তাঁর হাতে। কোন আইনে বর্বর বিদেশী রোধ করবে তাঁর পথ। সঙ্গে ছিল গৃহভৃত্য আর পরিচারিকা। চট করে গিয়ে আর দুখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে আনলেন তিনি। প্রথম শ্রেণীর উপরের দুই বার্থে উঠিয়ে দিলেন দুজনাকে। ভৃত্য এবং পরিচারিকাকে ধমকে দিলেন বেশ করে। এতটুকু যদি সংকোচ প্রকাশ কর তো একেবারে বরখাস্ত হয়ে যাবে। সেকালে ভৃত্য পরিচারিকা কর্মচ্যুতিকে ভয় পেত। হতভম্ব স্টেশন কর্মচারী, ক্রুদ্ধ, রুষ্ট শ্বেতাঙ্গ যাত্রী, দুখানা উপরের বার্থে নির্দেশমত পা ঝুলিয়ে পান চিবোচ্ছে পরিচারিকা, চেন্ডু

পাতায় মোড়া উগ্রগন্ধ বিড়ি ফুঁকছে ভৃত্যটি, গট গট করে তেজস্বিনী গিয়ে বসলেন নির্দিষ্ট আসনে। রেলের বাঁশি বেজে গেল। মুহূর্তে সচল হয়ে উঠলো লৌহশকট। নিরুপায় শ্বেতাঙ্গ নিতান্ত অসহায় হয়ে পাশ ফিরলেন।

শৈলবালা দাসের কথা বলতে বসিনি। যাঁর কথা বলতে বসেছি তিনি শৈলবালার সহোদরা সুধাংশু হাজরা। তাঁকেও সে সময় আমাদের গল্প শোনার আসরের শ্রোতা হিসাবে পেয়েছিলাম। সুধাংশুবালাও মধুসূদন দাসের আশ্রয়ে কন্যার মতই পালিত হয়েছিলেন। তবে শৈলবালাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করায় তাঁর পদবী পরিবর্তন করেছিলেন।

আইন ব্যবসায় এখন মেয়েদের কাছে নূতন নয়। কিন্তু মহিলাকে আইন ব্যবসায়ে অধিকার দেওয়া হয়েছিল প্রথম সুধাংশুবালার ক্ষেত্রে। একদিকে আইনজ্ঞ মধুসূদন দাস, অন্যদিকে নারী প্রগতির প্রতীকরূপে শৈলবালা এবং কিছু সহানুভূতিশীল উদার মনের মানুষের মিলিত চেষ্টায় ১৯২৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর সুধাংশুবালা হাজরা পাটনা হাইকোর্টে আইনজীবীর তালিকাভুক্ত হলেন।

সুধাংশুবালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগের কথা। পরীক্ষা পাশ করার বাধা ছিল না। বাধা ছিল আইন ব্যবসায়ে যোগ দেওয়ায়। মধুসূদন দাস তখন যুক্ত বিহার ওড়িশা সরকারের মন্ত্রী। তাঁর পরামর্শে সুধাংশুবালা পাটনার জেলা জজ সকাশে আইনজীবী তালিকাভুক্তির দরখাস্ত দিলেন। পাটনার জেলা জজ ব্যাপারটির অভিনবত্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দরখাস্তটি পাঠিয়ে দিলেন পাটনা হাইকোর্টে।

Indian legal Practioner's Act অর্থাৎ ভারতীয় আইন ব্যবসায়ের অধিনিয়মেও ঘটনাটি অভূতপূর্ব! প্রধান বিচারপতি মহাশয় সব কজন জজ নিয়ে ন্যায়াসনে বসলেন। মেয়েকে ব্যবহারজীবী করা চলে কিনা। কোর্ট গৃহ লোকে গম্ গম্ করছে। অসূর্যম্পশ্যা কুলকামিনী, আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা মুসলিম মহিলা, তাঁরাও এসেছেন রায় শুনতে। পাটনার বিচারে হেরে গেলেন সুধাংশু হাজরা। বিচারপতিরা নজীর দেখালেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে কুমারী রেজিনা গুহর আবেদনও একইভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল।

সুধাংশুবালার ওকালতি করা পিছিয়ে গেল। কিন্তু শৈলবালা পিছিয়ে যাবার মেয়ে নন। রেজিনা গুহর আবেদন অগ্রাহ্য হবার তিন বছর পরে ১৯১৯ সালে নারী পুরুষে ভেদজ্ঞান ব্রিটেনে আইন দিয়ে তুলে দেওয়া হয়। কেন সে সুযোগ ব্রিটিশ শাসিত ভারতে হবে না। কর্নেলিয়া সোরাবজী ব্যারিস্টার হয়ে এসে ঐ আইনের জোরে ঐ এলাহাবাদ হাইকোর্টে তালিকাভুক্ত হন। তবে তাঁকেও কেবল কোন বিশেষ মামলায় নিম্ন আদালতে আসতে দেওয়া হতো মাত্র। সম্ভবত ভারতীয় আইন ব্যবসায়ী অধিনিয়মের ফাঁদে তিনিও পড়েছিলেন।

আইন সংশোধন করা দরকার। আকাশে

বাতাসে নারী প্রগতির প্রথম পদক্ষেপ ধ্বনিত হ'চ্ছে। সাধারণ মানুষ আর নারীকে গৃহকোণসম্বল করে রাখতে ব্যস্ত নয়। পাটনা হাইকোর্টের রায় দেবার সময় জাস্টিস জওয়ালা প্রসাদও তাই বলেছিলেন।

লর্ড রিডিং তখন ভারতে ভাইসরয়। কুমারী হাজরা তাঁর কাছে এক বিরাট যাচনপত্র পেশ করলেন। আইন সংশোধন করা হ'ক। মেয়েদের অধিকার রক্ষা করতে, তাদের মূক মুখের প্রতিনিধিত্ব করতে মেয়েরাই পারবে। মহিলা আইন ব্যবসায়ী ঠিক বুঝবে তাদের দুঃখ কোথায়, কোথায় তারা প্রবঞ্চিত।

সূক্ষ্ম বিচারশক্তিতে ভরা এই আবেদনখানা বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মধুসূদন দাসের সহায়তায় একচল্লিশ দফায় সম্পূর্ণ হ'য়ে আইন জগতের এক চমৎকার দলিলরূপে দেখা দিল। তাকে অস্বীকার করা কঠিন কাজ। মধুবাবু ভারতীয় লেজিস্লেটিভ এসেম্বলির তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইটকে একখানা চিঠি লিখলেন, আর কাউন্সিল অফ স্টেটসের চেয়ারম্যান বিখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী হরি সিং গৌরকে লিখলেন আর একখানা। গৌর সাহেবের উদার মনের ইশারা পেয়ে দুই বোন এলেন দিল্লিতে। এসেম্বলির সদস্যদের এক এক করে বোঝালেন সব কথা। রাজধানীর আনাচে কানাচে ঘুরে জুটিয়ে আনলেন জনমত। সুধাংশুবালা যদিবা দ্বিধাগ্রস্ত হন, শৈলমাসিমার অনমনীয় সাহস তাঁকে নূতন শক্তি দেয়। সেই পরিণত বয়সেও শৈলমাসিমার চোখে বিদ্যুৎ খেলে যেতো। দুর্নিবার শক্তির রেশ যেন থমকে থমকে চমকে উঠত। দিল্লির দরবারের সাধ্য কি তাঁর প্রচেষ্টার পথ রোধ করে?

পথ রোধ করার চেষ্টা কেউ করেনি এমন বলতে পারা যায় না। তবে দারুণ যুদ্ধে জয়ী হলেন দুবোন। সুধাংশু হ'ওর পাটনায় উকিল হ'লেন। এরপর ১৯২৯ সালে কুমারী কর্নেলিয়া সোরাবজী কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করবার অনুমতি পেলেন। তারপর এই কয়েক বছরে আইনকে পেশা করা মেয়েদের কাছে সহজ ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে।

শৈলবালা দাস আর সুধাংশু হাজরা দুজনেই সেদিন নারী প্রগতির জয়যাত্রা সার্থক করেছিলেন। আমার কাছে সে জয়যাত্রার গল্প রোমাঞ্চকর লাগতো ঠিকই। তার চেয়েও আশ্চর্য হ'তাম তাঁদের মহিলা সুলভ বৃত্তিগুলি দেখে। দুবোন রান্নাবান্না করে লোক খাওয়াতে কি দারুণ ভালই না বাসতেন। আর রান্নার সে কি ঘটা! শৈলবালা একটু সাহেবি মেজাজের মানুষ ছিলেন। রাঁধতে বসলে ভাল পুডিং, রোল-কাটলেট ইত্যাদির লোভে আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। সুধাংশুবালা কিন্তু ঠিক উল্টোটি ছিলেন। শান্ত মানুষ। দিদির অনুগত। আইনের মারপ্যাঁচে তাঁকে একটুও বদলাতে দেয়নি। সস্নেহ আদর যত্নে শাশ্বতী ভারতীয় নারীর রূপে তাঁকে আমাদের কাছে মধুর করেছিল, আপন করেছিল। ১৯৪৮ সালে তেষট্টি বছর বয়সে সুধাংশুবালা মারা যান। সভ্যতা, স্বাধীনতা, শিক্ষা আর নারীর সহজাত চিরন্তনী মাধুরীর এমন সুসঙ্গত সমন্বয়ের সমাবেশ জীবনে কমই দেখেছি। তাঁর হাতে খেতাম লাউঘণ্ট আর পলতার ডালনা। বেশ লাগে ভাবতে।

শ্রীমতী

ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পে প্রাচীনকালে বাংলাদেশ যে কত সমৃদ্ধশালী ছিল অনেকেই হয়ত তা জানেন না। সুখের বিষয়, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদবৃন্দের পরিশ্রম, অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার ফলে প্রাচীন বাংলার বহু কলা ও ভাস্কর্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কলকাতা মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মিউজিয়ম ভবনে বাংলা দেশের প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে ১৮ শতকে প্রাপ্ত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নিদর্শনের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটি ছোট হলেও রুচিসম্মতভাবে সাজান হয়েছিল। বাংলা দেশের দামোদর ও কংসাবতী উপত্যকা শুশুনিয়া ও পাণ্ডুরাজ ঢিবিতে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগের প্রথম নিদর্শন মেলে। এগুলি কুঠার জাতীয় বস্তু, প্রদর্শনীতে দেখা যায়। মৌর্য যুগে মহাস্থান থেকে খোদিত প্রস্তর খণ্ডের সন্ধান মেলে। পরে চন্দ্রকেতুগড় (২৪ পরগণা) ও মহাস্থান থেকে শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্ত রাজত্বকালের পোড়া মাটির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই বাংলা দেশের ভাস্কর্য শিল্পের প্রথম বিকাশ। মাটিই ছিল তখন শিল্প প্রেরণা ও আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম, এবং ধনীজনও ভাস্কর্য শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন এবং প্রধানত তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই পোড়ামাটির কাজ তৎকালে জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুঙ্গ ও কুষাণ রাজত্বকালে ছাঁচও তৈরী হত এবং সেই ছাঁচ থেকে বৃহদাকার মাটির মূর্তিরও প্রচলন হয়। তার প্রমাণ মেলে প্রাপ্ত কয়েকটি খেলনা ও গৃহসজ্জার উপযোগী সামগ্রী দেখে। এক হিসাবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী কাল থেকেই পোড়ামাটির বৃহদাকার মূর্তি তৈরী শুরু হয় এবং মন্দিরের দেওয়ালেও নানা মূর্তি দেখা যায়। প্রদর্শনীর একাংশে উপরোক্ত নানা বস্তুর বহু নিদর্শন দেখা যায়। প্রদর্শনীর আর এক অংশে পোড়ামাটির প্রাচীন ভাস্কর্য নিদর্শন চোখে পড়ে। বর্ধমান জেলার একটি গ্রামে প্রাপ্ত অভিচারিক বিষ্ণু মূর্তি (৭ম শতক) ও বিশেষ করে পাল বংশের রাজত্বকালের ঢাল সমেত সৈন্য ও তরবারি ফিরিওয়ালার মূর্তি (৮ম শতক) দেখে বোঝা যায় যে তৎকালে বাংলা দেশ পোড়ামাটির কাজে কত **উৎকর্ষ লাভ করে। প্রদর্শনীতে প্রাচীনতম**

বাতায়নপথে দেবদাসী (কলকাতা মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে)

যে প্রস্তর মূর্তিটি দেখা যায় (বিষ্ণু কূর্মাবতার), সেটি ১০ম শতকের, পাওয়া যায় হুগলী জেলার একটি গ্রাম থেকে। ১২ শতকে উন্নততর প্রস্তর মূর্তি গঠিত হয়—তার প্রমাণ বিষ্ণু (সুন্দরবন) গণেশ (উঃ বঙ্গ), সূর্য দেবতা (দিনাজপুর) কল্যাণসুন্দর (সেহাটি) নিদর্শনগুলি। এই সময়কার আরও একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বাংলা ভাষার প্রথম লিপি। ১৩ শতকে যে বাংলা দেশ ভাস্কর্য শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল তার প্রমাণ মেলে একটি মূর্তি দেখে—বাতায়ন পথে দণ্ডায়মান কোনও দেবদাসী। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বাতায়নের একদিকে একটি মূর্তি ও অপর দিকে আর একটি—অথচ একই প্রস্তর খণ্ডে খোদিত; সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে ভাস্কর্য যে সেই কালে আপন স্থান অধিকার করে নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৩ থেকে ১৭ শতক পর্যন্ত বাংলা দেশে ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ উল্লেখ্য কোনও উদাহরণ চোখে পড়ে **না। মুসলমান শাসনের প্রভাবে হিন্দু দেব**দেবী পূজা ও পার্বণের সংখ্যা সম্ভবত কমে যায়, ফলে মূর্তি রচনার গতিও অনেকাংশে রুদ্ধ হয়। তবে সেই সময়ে শিল্পকলার আর একটি দিকের নতুন বিকাশ শুরু হয়—ধীরে ধীরে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সূত্রপাত হল এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত হল আলংকারিক নানা ফুলের ডিজাইন ও চকচকে টালির। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে গাজিপুর (২৪ পরগণা) ও মন্দির গাত্রে ডিমডিম বাদিকা উল্লেখ্য—দুটিই ১৮ শতকে তৈরী। প্রদর্শনীতে নানা প্রাচীন মুদ্রার নিদর্শন ছিল। খৃষ্টপূর্ব দুই শতক থেকে শুরু করে কিভাবে মুদ্রার ক্রমবিবর্তন হল এবং মোগল রাজত্বকালে ও পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ব্যবহৃত নানা মুদ্রার নমুনা দেখা যায়।

প্রদর্শনীর অন্য বিভাগে বাংলা দেশের একদা খ্যাত বালুচর শাড়ি (মুর্শিদাবাদ), ঢাকার মসলিন, জামদানী ও নীলাম্বরী শাড়ির চমৎকার নমুনা চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে পুরানো কাঁথায় সূচীশিল্পের কৃষ্ণ**লীলা উপাখ্যান দৃষ্টি আকর্ষণ করে।**

অন্যান্য শিল্পসম্ভারের মধ্যে ছিল দশাবতার তাস (১৮ শতক), পট চিত্র (কমলে কামিনী. ১৮ শ), কালীঘাট পট (গৌর নিতাই), হাতীর দাঁতের শ্রীদুর্গা মূর্তি, পালকি ও বিশেষ করে সিলেটে তৈরী সূক্ষ্ম ও অপূর্ব কারুকার্যশোভিত হাতপাখা। প্রদর্শনীর নৃতত্ত্ব বিভাগে বাংলা দেশের অধিবাসী ৪১টি বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল, লেপচা, ভুটিয়া, খারওয়ার, (পুরুলিয়া) মালপাহাড়িয়া (বাঁকুড়া), লোধা (মেদিনীপুর) ও মেচ (জলপাইগুড়ি) উপজাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বাসস্থান ও দৈহিক বিশেষত্বও প্রদর্শনীতে মডেল ও চার্ট সহকারে দেখান হয়। প্রদর্শনীটি শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নেই. তবে প্রাচীন চিত্রকলার আরও অধিক নিদর্শন রাখলে প্রদর্শনীটি আরও উপভোগ্য হত সন্দেহ নেই।

*

শিল্পী বি আর পানেসর সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা ২৫টি ছবি দেখা যায়, সেই সঙ্গে থাকে কালি কলমের কয়েকটি স্কেচ।

জীবিকার্জনের জন্য অন্য কাজে নিযুক্ত থেকেও যাঁরা স্বীয় চেষ্টা ও পরিশ্রমে শিল্প কলাক্ষেত্রে প্রবেশ করে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে পানেসর অন্যতম। শিল্পী কাজ করেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটে। চিত্রকলার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকায় তিনি অবসর সময়ে নিয়মিত ভাবে শিল্পচর্চা করে থাকেন। শুধু তাই নয়, শিল্পকলা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করার তাঁর অসীম উৎসাহ তাই কলকাতার প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতেই দর্শক সাধারণের মধ্যে তাঁকেও দেখা যায়। মাত্র কয়েক বছরেই জলরঙ ও কালিকলম রচনায় তিনি উন্নতি লাভ করেছেন।

শিল্পীর প্রধান গুণ তুলির অল্প ও কয়েকটি টানের মধ্য দিয়েই তিনি বক্তব্য ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর ভাষা স্পষ্ট, আবেদন সর্বজনীন। বাহ্য বা পরিচিত দৃশ্য রচনায় তিনি দক্ষ। কয়েকটি কেবলমাত্র তুলির টানে, অন্য কয়েকটি তুলির টানে, অন্য কয়েকটি তুলির টান ও ওয়াশ, আবার কতকগুলি ভিজা কাগজের ওপরে এঁকে তিনি সুফল লাভ করেছেন—যেমন ল্যাণ্ডস্কেপ-৬। সাদা ও নীল পৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে পুরোভাগে জলাশয়ে স্থাপিত কয়েকটি নৌকার মধ্য দিয়ে তিনি সুন্দর পরিবেশের অবতারণা করেছেন। কুয়াশার আবরণে ছবিটিকে ঘিরে ফেলে শিল্পী দক্ষ চাপা রঙ ব্যবহার ও তুলি চালনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ১০নং ছবিটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। রচনাক্ষেত্রটি সাদা রেখা শূন্য রেখে সবুজ, হলুদ ও লাল রঙ ব্যবহার করে তিনি ছবিটিকে সুন্দর করে তুলেছেন। শিল্পীর সব নিদর্শনই নিসর্গ বা বহিদৃশ্য। তবে দু একটিতে তিনি আকারের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে [illegible] ছবির নাম করা যায়। [illegible] একটি [illegible] চলছে [illegible] একাংশে [illegible] তুলির সঙ্গে মিশে গেছে। [illegible] সবুজ ও নীল রঙ ব্যবহারে [illegible] এবং বিশেষত্ব [illegible] ছবিটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কয়েকটি ছবি ইম্প্রেসানিস্টিক, যেমন ২২নং। গ্রামের একাংশে দু একটি [illegible] গাছ ও গ্রামের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে [illegible]। অন্যান্য ছবির মধ্যে ১০ ও বিশেষ করে ১২নং ছবির নাম করা উচিত মনে করি। শেষোক্তটির নীল রঙের নৌকো ও পুরো জায়গার ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়া সাদা স্থান ছবিকে রমণীয় করে তুলেছে। তবে শিল্পী বিমূর্ত রচনায় দক্ষতা লাভ করতে পারেন নি এবং দু একটি বিমূর্ত বা সমবিমূর্ত ছবি দেখে মনে হয় এ শ্রেণীর রচনায় তাঁর হাত এখনও কাঁচা। যেমন কম্পোজিশন নং ৫। ছবি পিকচার নং ২ ও রসোত্তীর্ণ হয়নি। শিল্পীর জলরঙ ব্যবহারে দক্ষতা আছে এবং ভবিষ্যতে যদি তিনি জলরঙে দীর্ঘাকার নিসর্গ বা বহিদৃশ্য অঙ্কনে মনোনিবেশ করেন তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—চিত্রপ্রিয়

॥ বারো ॥

আরতি দেখে ফিরতে একটু রাত হল। মা বললেন, 'কিরে, এত দেরি করলি যে। খাবার সময় হয়ে গেল, পড়তে বসলি কখন? সামনে তোর পরীক্ষা না?'

'পরীক্ষা কিসের মা। প্রোমোশন তো সামনে।'

'পাশ করেছিস?'

'কবে! পরীক্ষার ফল জানা হয়েছে, এক অংক ছাড়া আর সব বিষয়েই ভালো মতন পাশ।' জানালাম: 'বাংলায় তো ফার্স্ট হলাম।'

'বলিস কিরে! পড়লি না, টড়লি না, পাঠ্য বই পড়ে সময় কাটালি, পড়ার বই ছুঁলি না পর্যন্ত। পাশ করে গেলি!' মা হতবাক।

'তোমার আশীর্বাদে।' আমি জানাই: 'তুমি যে প্যাঁচ শিখিয়ে দিয়েছ না, তাই কাজেই ত তরে গেলাম এ যাত্রা। এবারের এই করেই তরব আশা করছি...কোশ্চেন সব আউট করলাম যে।'

'সে কিরে! কোশ্চেন আউট করলি কি? অ্যাঁ?' মা হতবুদ্ধি—'আমি আবার কী প্যাঁচ শেখালুম তোকে!'

'ঐ যে! ভুরুর মধ্যেখানে মন এনে মা দুর্গাকে ডাকতে—পরীক্ষাতেও সেই ভ্রুকুটি দেখিয়েছি। ঐ করে কোশ্চেন সব বার করেছি। তাই আমাকে আর কষ্ট করে পড়তে হয়নি, পরীক্ষা পাশ করতে হয়নি, এমনি করেই পরীক্ষার পাশ কাটালাম। পরীক্ষাই আমায় পাশ করে গেল এবার।'

'শুনি তো ব্যাপারটা।' মার আগ্রহ দেখা যায়।

'এইরকম আর কি, আমি বিশদ ব্যাখ্যা করে দিই। চোখ বুজে ঐ সন্ধিস্থলে, নাকি সন্ধিক্ষণে? মন নিয়ে আসি আর মা দুর্গার নাম করে একটা বইয়ের একটা করে জায়গা বার করি—এমনি করে পাঁচবার করার পর সেই সব জায়গার দুদিকের পাতায়, মোট দশ পৃষ্ঠায় সবখানি পড়ে দুরস্ত করে রাখি. তার পরে দেখা গেল ঐ দশ পৃষ্ঠার ভেতর থেকেই বেশির ভাগ প্রশ্ন এসে গেছে। পাশ করার মতন নম্বর পেয়ে গেছি তাইতেই।'

'এই করে পাশ করেছিস তুই?' মার মুখে রা সরে না।

'হ্যাঁ। এই করে ইংরেজি বাংলা ভূগোল ইতিহাস সব, শুধু অংকটাতেই সুবিধে হল না মা। পঁইত্রিশ পেয়ে টায়েটুয়ে কোনো-রকমে পাশ।'

'মোটে পঁয়ত্রিশ?'

'হ্যাঁ, সব অংক জানা ছিল না তো। একটা বড় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অংক, একটা ডেসিমেলের, ফ্র্যাকশনের আঁক একটা, আর ঐ সিঁড়ি ভাঙা একখানা কষতে পেরেছি কেবল। জিয়োমেট্রির একটা থিয়োরেমও করেছিলাম কিন্তু তার জন্যে মার্ক অর্ধেক দিয়েছে।'

'অর্ধেক কেন?'

'আমি এখানে মন নিয়ে এসে মনগড়াভাবে সেটাকে ভুলিয়ে দিয়েছিলাম কি না! অংকের স্যার বললেন যে আমি যেভাবে prove করেছি তাও হতে পারে বটে তবে বইয়ের মতনটাই ফলো করতে হবে আমাদের। সেই কারণে তার জন্যে পুরো নম্বর দেননি।'

'বাকী অংকগুলো তোর জানা ছিল না কেন? ঐখানে মন নিয়ে এসে চেষ্টা করিসনি কেন জানবার?'

'করেছিলাম। বের করেছিলাম দশটা পাতা, তার ভেতরের আঁকও এসেছে হয়ত বা, এসেছে কি না তাও জানি না, আসতে পারে হয়ত—কিন্তু ঐ অংকগুলো তো আমার জানা ছিল না, কষিনি তো আগে।'

'কেন, কষিসনি কেন? আর জেনে তখন-তখনি বা কষে নিলিনা কেন—ঐ অংকগুলো?'

'কী করে কষব? আগের অংক না জানা থাকলে কষে না রাখলে পরের অংক কি কষা যায় নাকি? এতো আর তোমার মুখস্থ

করা নয় যে মুখস্থ করে রাখলেই হবে—স্টেপ্ বাই স্টেপ্ এগিয়ে যাবার ব্যাপার। আগের অংকগুলোই করিনি যে।'

'অংকের মাস্টার ক্লাসে হোম টস্‌ক দেন না তোদের? দেখাতে হয় না প্রত্যেক দিন?'

'হয় বইকি। সে আমি ম্যানেজ করি।' আমি বলি, 'কাবিল হোসেন আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আমার খুব বন্ধু। হোমটাস্‌কের আঁকগুলো আমার খাতায় কষে দেয় সে রোজ রোজ—তাই আমি সেকেন্ড মাস্টারকে দেখিয়ে দিই। প্রতিদানে কাবিলকে আমি মাঝে মাঝে রসগোল্লা খাওয়াই বাণিজ্যার দোকানে।'

'তাই নাকি রে?'

'হাঁ। তবে সেও খাওয়ায় মা আমায়। তাদের হোস্‌টেলে মুর্গি টুর্গি হলে ডেকে নিয়ে খাওয়ায়।...মুর্গি খাওয়া কি খারাপ মা? মুসলমানের খেলে কি জাত যায় আমাদের?'

'পাগল! হিন্দু মুসলমান আবার কী? জাত বলে কিছু নেই রে! তবে গোরু টোরু-গুলো খাসনে যেন কখনো।'

'না, তারাও খায় না। আমরা মনে কষ্ট পাব বলে কাটেও না তারা।' মাকে আমি ভরসা দিই—'আমি তাকে তোমার ওই মা দুর্গার প্যাঁচটা শেখাতে গেছলাম, সে বললে যে, তাদের ওটা করতে নেই। আল্লা ছাড়া আর কোনো দেবতাকে ডাকলে তাদের গুণো হয়। সে বললে বিসমিল্লার কাছে প্রার্থনা করলেও সেই ফলই পাওয়া যাবে—বিসমিল্লা হের্ রহমানে রহিম—এই মন্তর বলে চাইতে হয় নাকি। তা কি হতে পারে মা?'

'কেন হবে না? একই তো সব। সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে সেই ভগবান—সেই কেন্দ্রস্থলে মন নিয়ে যেতে হয় কেবল, তাহলেই হলো। এখন, যে মন্তরে, যা বলে ডেকে সেখানে তুমি যাও না কেন! আসলে সেই একই জিনিস—এক ভগবান। বিসমিল্লা আর দুর্গা এক—সেই এক বিন্দুবাসিনী।

'বিসমিল্লা হের্ রহমানে রহিম আর মা দুর্গা এক? কথার হেরফের কেবল? আচ্ছা, যেমন করে এখানে মন এনে কোশ্চেন জেনে পাশ করলাম তেমনি করেই তো ফার্স্টও হতে পারি আমি?'

'তা কি করে হবে? পড়াশুনো না করে—পাঠ্যবইদের বিলকুল ফাঁকি দিয়ে? তা কি হয় নাকি রে?' মা বলেন, 'যে ছেলেরা রীতি-মতন খেটেখুটে পড়ছে তাদের ভেতর থেকেই ফার্স্ট হবে, তুই শুধু কোনোরকমে পাশ করে যাবি কেবল।

'তা কেন মা?'

'সাধনা না করলে কি সিদ্ধি হয় রে? যে ছেলেটা খেটে পড়ছে সে যদি মা দুর্গাকে নাও ডাকে তবুও সেই ফার্স্ট হবে—তার ঐ খাটুনিটাই ত আসলে ভগবানকে ডাকা। আর যদি খাটেও আবার সেই সঙ্গে ডাকেও—তাহলে সে কোথায় গিয়ে উঠবে বলাই যায় না। উন্নতির চূড়ান্ত হবে তার, আর এইভাবে ফাঁকি দিয়ে তরতে গিয়ে তোর তলিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু ঐ মাকে ডেকেছিস, তাই তুই ডুবে যাবি নে একেবারে শুধু ভেসে থাকবি কোনোগতিকে। সারাজীবন এইভাবে ভেসে ভেসেই কাটবে তোর।'

'ভাসা ভাসা জীবন হবে? তুমি বলছ?'

'আমি কিছু বলছি না। সেটা মার ইচ্ছে। তবে জেনে রাখিস্ সাধনা না করলে কোনই সিদ্ধি হয় না। যেমন তোর ওই অংকের মতন। কী অঙ্কগুলো আসবে জানতে পারলেও কষতে পারলিনি—স্টেপ্ বাই স্টেপ্ বরাবর এগুসনি বলে। ওই স্টেপ্

বাই স্টেপ্‌ এগিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে সাধনা। ফাঁকতালে কিছুই মেলে না রে, অমনি করে এগিয়ে গিয়েই পেতে হয় সব।'

'অঙ্ক যে আমার একদম্‌ ভালো লাগে না মা!'

'তাহলে কি করে হবে রে। তবে কি করে এখান থেকে উৎরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোবি? আর তা না হলে...তোর বাবা যে তোকে বিলেত পাঠাতে চায় রে। সেখান থেকে আই সি-এস পাশ করে আসবি তুই। জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবি। তোকে সিবিলিয়ান দেখার স্বপ্ন যে তাঁর অনেক কালের। খেয়ে না খেয়ে টাকা জমাচ্ছেন সেই জন্যে।'

'আমি চাই না জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে। ওসব হতে ভালো লাগে না আমার। কী হয় ওসব হয়ে? ওই তোমাদের এক বিচ্ছিরি শখ মা! ছেলেদের সব সিভিলিয়ান করার মতলব। বামুনপাড়ার অর্ধেক ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে—বসে বসে পড়তে লেগেছে সবাই। তাদের বাবাদের শখ সিভিলিয়ান করার। হাকিম মুনসেফ উকীল ব্যারিস্টার ডাক্তার সাবরেজিস্ট্রার হবে। বাবার শখ মেটাতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা।'

'সেটা কি খারাপ?' মা বলেন : 'ভালোই তো। তাদের নিজেদের পক্ষেই তো ভালো।'

'ভালো না ছাই! ওসব হতে চাই না আমি। আমি চাই আমি হতে। তা কী করে হওয়া যায় মা...!'

'ভেবে কোনো কূল পাচ্ছিস নে তার?'

'পেয়েছিলাম তো একটা কূল—তোমার কথায়। এখেনে মন এনে মাদুর্গার কাছে চেয়ে চেয়ে আমার কাজ বাগাতে। তুমি তো বলছ যে কেবল চাইলে হবে না। শর্টকাট করলে চলবে না, সারা পথটা হাঁটতে হবে—হেঁটে হেঁটে সারা হতে হবে আমার। কিন্তু তা কি করে হয়? অমনতর হাঁটবার আমার ক্ষমতা নেই। ইচ্ছেও করে না আমার।'

'তাহলে আর কি করে হবে।' মা সান্ত্বনা দেন—'তবে খুব বড় না হলেও কিছু একটা হবিই। কিছু কিছু হবে তোর। ভিক্ষে-টিক্ষে

চাইতেও হবে, চেষ্টা করতে হবে—তবেই হবে ষোল আনা

করে যা হয়। ভিক্ষাবাক্য তৈরি ... —বলেছে না? ভগবানের কাছে ভিক্ষে ... নও প্রায় সেই কথাই। তবে ওরই মা ... কথাখানি ইতর বিশেষ—এই যা।'

'কেবল প্রার্থনা করে মেলে ... না মা?'

'চাইতেও হবে, চেষ্টাও ... হবে—তবেই হবে ষোলো আনা। ... কি, তার চেয়েও ...শি হতে পারে। চেয়ে ... এগোতে হবে—এ পারে গিয়ে আগ ব... চাইতে হবে—তবেই না হবে পথ চলা ... চলাটাই তো আসল ...। গন্তব্যস্থ ... কোথাও নেই।'

'কী মুশকিল! কী মুশকিল ... মুশকিলটা আবার কোনখা...

'আমি ভেবেছিলাম তো ... সিদ্ধিদাত্রী আমার কাজে লাগাব। তোম... পাঁচটা কাছে যা চাবার হতে পারব—স... চাইবার যা পাবার পেয়ে যাব সব—এর ... খুঁজি...।'

'তোমার আবার সিদ্ধ... ...?' মা একটু বিস্মিতই।

'তুমি যে সিদ্ধিলাভ করে ... ভৈরবী বলছিল আমায়।'

'ভৈরবী তো সব জানে!' ... হ থাকেন মা : 'ওই সব আজেবাজে ক... কানে দিস তুই! বিশ্বাস করিস?'

'বা রে! ফল পেয়েছি যে' ... পাশ করে গেলুম কি করে তাহলে?'

'ও কিছু নয়। এক আধবা... কম হয়ে যায়। কখনো আবার হয়ও না ... যে হয় কেন যে আবার হয় না তা ... না না। মনে হয়, তুই যে একবার ব... ন না? মাকালী একটুখানি থামখেয়াল ... তাই হয়ত এর কারণ হবে। পরমহংসদে... কথামৃত পড়তে দিয়েছিলাম যে তোকে? পড়েছিলিস?'

'পা... হওই। করে শেষ করেছি।'

'কী বলছেন তাতে ঠাকুর? এরকমটা হলেও এটা হওয়াতে নেই। এটা একটা ছোটখাট সিদ্ধাই—বুঝেছিস? ঠাকুর সিদ্ধাই যে বিরুদ্ধে সেটা টের পাসনি?'

'পে...য়েছি। কিন্তু তিনিই তো আবার বলেছেন, ...গুরুকেও বাজিয়ে নিতে হবে? বলেননি ... বাজিয়ে না দেখলে সিদ্ধাই কিনা ...র ক...রে?'

'তা... ক তুই ওই সিদ্ধাইটা বাজিয়ে দেখছি...কি?'

'যদি বলি তোমাকেই? তোমাকেই বাজিয়ে দেখাচ্ছি আমি। যার চেয়ে বড়ো গুরু তো নেই আর, ভৈরবীর কথা। তুমি তো আমার পরম গুরু।—তাই তোমাকেই, তার মানে, তোমার কথাটাকেই বাজাতে লাগলাম। তোমার ওই সিদ্ধাইটাকেই...'

'আমার আবার সিদ্ধাই কিসের!'

'সিদ্ধাই না বলে যোগবল যদি বলি? তোমার যোগবল?'

'আমি আবার যোগ করলুম কবে রে?'

'যোগ না করলে তুমি এই কৌশলটা জানলে কি করে তবে? বাবা যে বলেন, যোগঃ কর্মসু কৌশলম, মানে যে, যোগ হচ্ছে গিয়ে কাজ করার কৌশল, সেটা কি মিথ্যে?'

'না না, মিথ্যে কেন হবে? শাস্ত্রবাক্যই!'

'আমি কেবল সেই কৌশলটাই কাজে লাগাচ্ছি তো। ছলে' বলে কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে হয় না? তাই কৌশলেই কাজ হাসিল করছি আমার।'

শুনে মা গুম হয়ে যান—কিসের ভাবনায় যেন তাঁকে কাতর করে: 'মনে হচ্ছে আমিই তোর সর্বনাশ করলুম বুঝি। তোকে এই প্যাঁচটা শিখিয়ে দিয়ে...যাক্, মা-ই তোকে বাঁচাবেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর পায়েই তো ফেলে দিয়েছি তোকে।'

'তুমি কি ব্রহ্মকে জেনেছ মা?' আমার আচমকা জিজ্ঞাসা। শুনে মা যেন চমকে যান —ব্রহ্ম? ব্রহ্মকে কি জানা যায় নাকি? জানতে পারে কেউ?'

'তুমি জেনেছ।'

'পাগল! জানলেও কি কেউ কাউকে তা জানাতে পারে? ব্রহ্মকে কেউ মুখের থেকে বের করতে পেরেছে কখনো? ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ঠ, বলেননি ঠাকুর? কী পড়লি তবে সেই কথামৃতে? ব্রহ্মকে মুখের থেকে বার করা যায় না, নিজে তার স্বাদ পেলেও অমৃততুল্য সে সোয়াদ আর কাউকে দিতে পারে না কেউ কখনো...'

'হ্যাঁ পারে। ব্রহ্ম কী তা জানিনে, তবে তার সোয়াদ অপরকে দেওয়া যায় জানি। রিনি একদিন দিয়েছিল আমায়।'

'রিনি? তাই নাকি? কী রকমের ব্রহ্ম শুনি তো একবার?'

'সন্দেশ।' আমি জানাই। রিনির স্বমুখের থেকে বের করা অমৃতে অংশটুকু উহ্য রেখে, ব্রহ্মস্বাদের পনের আনাই বাদ দিয়ে এক আনাটাক ব্যক্ত করি।

'সন্দেশ! সন্দেশই বুঝি তোর কাছে ব্রহ্ম রে? ব্রহ্মস্বাদ সহোদর ঐ সন্দেশ? বটে বটে?' হাসতে থাকেন মা—'তবে সেই সন্দেশ নিজে না খেয়ে পিঁপড়েদের খাওয়াতে যাস কেন? তাদের গর্তে গর্তে রেখে আসিস যে?'

'সব ভালো জিনিসই সবাইকে দিয়ে খেতে হয়, তুমিই তো বলেছ মা! বিলিয়ে না দিলে ভগবান মিলিয়ে দেন না। এমন কি, তোমার এই প্যাঁচটাকেও আমি অনেক ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছি। সবাই মিলে মা দুর্গাকে জব্দ করুক! আমি একাই কেন মজা পাই! তারাও ভগবানের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করুক না। তোমার ঠাকুর বলেছেন না?...'

'কী বলেছেন ঠাকুর?'

'বলেছেন গুরুর মতন হাঁড়ি কলসিকেও বাজাতে হবে, নাকি, হাঁড়ি কলসির মত গুরুকেও বাজিয়ে নিতে হবে? ভগবানের চেয়ে তো গুরুতর আর কিছু নেই। তাই হাঁড়ি কলসির মতই ভগবানকেও আমি বাজাতে লেগেছি। চাইকি, ভগবানের এই হাঁড়ি হাটেও একদিন আমি ভাঙতে পারি হয়ত।'

'সে কি রে!'

'তাই। ভগবানকে আমি কাজে লাগাতে চাই না। যে ভগবান আমাদের নিত্যকার কাজে লাগবে না, সে-ভগবানে আমাদের কী কাজ মা!' (ক্রমশ)

কবিতার দিন

জয়োৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

জানলার কাঁচে জমেছে জলের কণা
উজ্জ্বল রোদে ধুয়ে সাফ নীলাকাশ
বাতাস একটু বেসামাল, আনমনা
তবুও কবিতা আসছে না আসছে না!

কবিতা কি গেছে ঘুমপাড়ানীয়া গ্রামে
পেরিয়ে পাহাড়, উদাসীন নদী, মাঠ
বন্ধ কপাট নাড়িয়ে জাগাতে মানা
কবিতার কুঁড়ি ঘুম ভেঙে জাগবে না।

কিংবা কবিতা বিনিদ্র সারাদিন
জন-সমুদ্রে, মিছিলে, রক্তপাতে
হাতে উদ্যত কৃপাণে আগুন কণা
গেরিলার মত কবিতা দিয়েছে হানা
গ্রামে ও শহরে নগরে ও বন্দরে।

ছদর হয়েছে তেপান্তরের মাঠ
শূন্য পাতারা অবিরাম ঝরে পড়ে
শুধু সারাদিন ধরে।

এম্নিভাবেই বাঁচতে হবে

শান্তনু দাস

এম্নিভাবেই বাঁচতে হবে সারাজীবন
রাত থেকে ভোর
হোসপাইপে যেমন ধুলে ঝকঝকে হয় স্মৃতির শহর,
তেম্নি সময়
ফুসফুসটা নাড়িয়ে দিচ্ছে
কিংবা হয়তো মাড়িয়ে দিচ্ছে
থ্যাংলানো এক ব্যাঙের মতো।

মা আমাদের রত্নগর্ভা :
রত্নগর্ভা মা জননী, ভালোভাবেই বেঁচে আছি,
যেম্নি বাঁচে মেয়ের দালাল
রাতদুপুরের সোনাগাছি
কিংবা দিশি উপুড় করলে নড়েচড়ে গলায় নামে
তেম্নি আছি গোলকধামে
সারাজীবন রাত থেকে ভোর।

হোস পাইপে যেমন ধুলে ঝকঝকে হয়
স্মৃতির শহর।

তোমার আঁধার-দিনের সংবেদন

কালীকৃষ্ণ গুহ

তোমার প্রার্থনা, তোমার ঝড়-জলের আঁধাব-দিনের সংবেদন
আমি বুঝতে চেন্টা করি।

তুমি শতাব্দীতে রয়েছো, এ আমারও শতাব্দী, এখানে
আফ্রিকার একটি নারী তার শিশুটিকে সূর্যোদয় দেখাতে
নিয়ে যায় দীর্ঘ পথ

উৎসর্গ করে—

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শিশুটিকে সূর্যের দিকে হাত
পাততে বলে।

আমরাও পরস্পরের দিকে হাত পেতেছিলুম একদিন, আমরাও
জেগে থাকতে চেয়েছিলুম, অথচ

আজ তোমার প্রার্থনায় আফ্রিকার গ্রাম্যগীতি জাগে, রাত্রি
শেষ হতে চায় না, আজ

তোমার প্রার্থনা, তোমার ঝড়-জলের আঁধার-দিনের সংবেদন
আমি বুঝতে চেন্টা করি।

দূরবীন

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

সুখ ও দুঃখের জন্য অলস ঘোরানো এই বয়স
ফুরিয়ে গিয়েছে; তবু বয়ামের আচার শুকোয় ঠিক রোদে;
তবু ভালোবাসা চাই, কেননা বুকের কাছে বুক
শুল্ক গন্ধে হাজিবার বাহি রাখে খুলে। থেকে-থেকে
ঘাসের নরম শীষ থেঁতো করি, চিবাই না, দাঁতে
শঙ্কিত চুমুক ছিলো যে-রকম ঘাসেরও ভিতরে।
যদিও জলের চেয়ে নিরলস ভূপ্রকৃতির
কোনো রূপরেখা আর নেই, তবু নকল রয়েছে।

এই যে সময় তার ঠাণ্ডা সর যেমন হলুদ
হয়ে ওঠে, বিদায়ের দেরি নাই ব'লে তেমনি আমি
তুলেছি দূরবীন; জানি, সবই তো ফুরিয়ে এলো, তবু
ঐ যে গেলাশ-ভর্তি সবুজ অদূরে, তার ছোপ
জামায় লেগেছে, জামা ভেদ ক'রে বুকের ভিতরে
এসে গেলে, আমার কি শুল্কের অভাব হবে আর?

একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যন্ত্র মহাপ্রস্থানের পথে

তিমিরবরণ

সংগীত জগতে ভারতে যত রকম বাদ্যযন্ত্র আছে পৃথিবীর আর কোথায় যে নেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরাতন সংগীতশাস্ত্রে বহু প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যায় যেগুলি আমরা চোখেও দেখিনি, নামও শুনিনি। সারা ভারতের বহু যাদুঘরে এ রকমের বহু লুপ্ত যন্ত্র আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। পুরাতন সংগীতশাস্ত্রে আশী রকমের তালবাদ্যের যন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। এখনও তাল লয় রাখবার জন্য যে সব যন্ত্রে সংগত করা হয়ে থাকে তার মধ্যে তবলা, মৃদঙ্গ, খোল, ঢোল মাদল ইত্যাদির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। তার ও হাঁতের সুরের সঙ্গত যন্ত্র আমরা এখনও নিত্য শুনতে পাই। অনেক যন্ত্র লোপ পেয়েছে সত্যকারের উন্নত মানের নয় বলেই। আবার অনেক যন্ত্র শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ও ধৈর্যের প্রয়োজন বলেই লুপ্ত হয়েছে। আরও কিছু যন্ত্র লোপ পেয়েছে ভারতীয় মার্গ সংগীতের জন্য অসম্পূর্ণ বলে। ভায়োলিন বা বেহালা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র বলে স্বীকৃত। মাদ্রাজ মিউজিয়মে বহু পুরাকালে প্রচলিত বেহালার আকৃতির যন্ত্র আমি দেখছি। গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে শুনেছি "রাবনরাজা বেহালার অনুরূপ একটা যন্ত্র বাজাতেন যার নাম ছিল 'বাহুলীন'।" এই শব্দটির তাৎপর্য আছে। বাহুর ওপর লীন হয়ে বা ভর দিয়ে বাজাতে হয় বলেই কি ওই নাম ছিল তা আমার জানা নেই। কিন্তু ভায়োলিন শব্দটির সঙ্গে অতিশয় সাদৃশ্য আছে। আরও কয়েক প্রকার বাদ্যযন্ত্র এদেশ থেকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে গেছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। তবে কাঠামো ও বাজাবার পদ্ধতি বদলেছে। স্পেনে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় তবলা বাঁয়ার নকল যে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন। আমরা আবার সেই যন্ত্র আমদানি করে ব্যবহার করতে শুরু করেছি অনেকদিন থেকে। সরোদ, সেতার, তবলা-বাঁয়া, খোল ইত্যাদি ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেশ চলন হয়েছে। এরপর হয়তো ওই সব যন্ত্র পশ্চাত্ত্য দেশগুলি থেকেই কিনতে হবে এবং শিক্ষাও করতে হবে।

একটা বিখ্যাত যন্ত্র প্রায় চল্লিশ বছর আগে লোপ পেয়েছে। সেটার নাম রবাব। মিয়া তানসেনের পুত্রের দিক থেকে শেষ বংশধর মহম্মদ হোসেন খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। আমি তাঁর বাজনা শুনেছি। গিধোর মহারাজার স্টেটে ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রবাব যন্ত্রটা এখন কোলকাতার যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যাবে। উত্তর ভারতীয় বীণা যাকে আমরা সরস্বতী বীণা বলি সেটাও মৃত্যু পথে। এ সময় কোলকাতায় মহম্মদ দবীর খাঁ একমাত্র বীণকার। আরও দু একজন ভারতে আছেন। তারপর? যাদুঘরেই ঐ যন্ত্র দেখতে পাওয়া যাবে। এইসব যন্ত্র কেন লোপ পেয়েছে বা লোপ পেতে যাচ্ছে তার কারণ খুঁজলে পাওয়া যায়।

কিন্তু এখনকার দিনে যেটা ভারতের শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র সেটা যদি মহাপ্রস্থানের পথে যায় তাহলে ট্রাজেডী আর দুর্ভাগ্যের চরম হয়ে দাঁড়াবে। যন্ত্রটির নাম 'সরোদ'। আশ্চর্য হয়ে ভাবি এত লোকপ্রিয় হয়েছে যে যন্ত্র আজকাল-কার দিনে সেই যন্ত্রের এমন দুর্গতির কারণ কি। এ রকম সর্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্র ভারতে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। রবাবের জনপ্রিয়তা হারাবার কারণ আছে। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের ক্রিয়াকলাপ ও কলাকৌশল ঐ যন্ত্রে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না তাই অস্তিত্ব লোপ পেল। ঐ কারণেই অন্যান্য বিখ্যাত যন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। দবীর খাঁ যে বীণা বাজান রবাবের ন্যায় ওটাও তানসেন ঘরওয়ানার সৃষ্টি। কিন্তু ওই বীণাও সম্পূর্ণতা লাভ করেনি বলেই তাকেও যেতে হবে। সঙ্গীতের আসরে মাইক্রোফোনের ব্যবহারের জন্য বীণা আজ কানে শোনা যাচ্ছে। প্রাক মাইক্রোফোনের যুগে বীণা যন্ত্রটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ভারতে খুব কম লোকেরই ছিল। নামটাই-মাত্র জনসাধারণের শোনা ছিল। আর একটা

যন্ত্র যদিও ভারতের বহু দেশে, বিশেষত বাংলা দেশে এখনও বহুলোক বাজিয়ে থাকেন কিন্তু আমি বলবো এক হিসাবে সেটার মৃত্যু হয়েছে প্রায় পাঁচ দশক আগে। যন্ত্রটা হলো এসরাজ বা দিলরুবা। এখন এ যন্ত্রটা তার-সানাইয়ের রূপ নিয়েছে। প্রবীণ সংগীতশিল্পীরা যাঁরা এখনও জীবিত, এ যন্ত্রটির আসল বাজনা শুনেছেন। ভারতের মধ্যে একমাত্র গয়াতেই এই যন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আমি বহুকাল আগে মাত্র তিনজনের বাজনা শুনেছি তাঁরা সকলেই গয়াবাসী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হনুমান প্রসাদ। তাঁর দুই যোগ্য শিষ্য ছিলেন শ্রীচন্দ্রিক প্রসাদ দুবে ও ভেলুবাবু। শেষোক্ত ব্যক্তিটি বাঙ্গালী। চন্দ্রিকাপ্রসাদ বহুবার কোলকাতার আসরে বাজিয়ে ছিলেন। তাঁদের বাজনার বিশেষত্ব যা উপলব্ধি করেছিলাম তা হচ্ছে রাগ সংগীতের যা কিছু প্রয়োজনীয় অর্থাৎ আলাপ জোড়, তান ইত্যাদি অতি নিপুণভাবে তাঁরা বাজাতে পারতেন এবং কঠোর সাধনা করে হাত তৈরি করেছিলেন বটে। যে কোন দক্ষ সারেংগী বাজিয়ের সংগে তাঁরা পাল্লা দিতে পারতেন। অধিকন্তু ঝালাও দিতেন বা নকল করতেন। তবে এই ঝালা দেওয়াটাই আমার অসহ্য ঠেকতো। কারণ যে সব যন্ত্র ছড়ি দিয়ে বাজাতে হয় জোর করে ঝালা দিয়ে তাক লাগানোর চেষ্টা করা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। দুঃখের বিষয় আজকাল আর কেউ গয়া ঘরানার এসরাজের বাজনা শিক্ষা করতে চান না। তার কারণ যা দেখছি সেগুলো হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও একাগ্রতা আজকালকার শিক্ষার্থীদের ধাতে সয় না। সারেংগী যে বেঁচে আছে আজও তার কারণ গানের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে বলেই। একক বাজনা হিসাবে এ যন্ত্রের মূল্য নেই। এটা আমার অভিমত। প্রাক মাইক্রোফোন যুগে যে সব যন্ত্র লোপ পেয়েছে তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে সে সব যন্ত্রের উন্নতি হয়নি স্বরের দিক থেকে। আওয়াজ এত মৃদু ছিল যে মাত্র সামান্য কয়েকজন উপভোগ করতে পারতেন। আগেকার রাজা বাদশারা যে ওই সব যন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তার কারণ তাঁদের কানের কাছেই ওই সব যন্ত্র বাজতো। অধুনা বীণার যেটুকু কদর আছে সেটা মাইক্রোফোন আছে বলেই।

কয়েক বৎসর হল সারা ভারতে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সরোদ ও সেতার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেতার যন্ত্রটি শেখবার জন্য যত লোকের আগ্রহ, সরোদের বেলায় কিন্তু শতকরা একাংশও খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর আগেও সরোদ শেখবার জন্য যৎসামান্য আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু অধুনা দেখছি সেই উৎসাহে একেবারেই ভাটা পড়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত সারা ভারতে আলি আকবরের সরোদ লোকে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে শুনে থাকেন কিন্তু এই কলকাতা শহরে তাঁরই মিউজিক কলেজে সরোদের কটা ছাত্র আছে? বেশীর ভাগই সেতার, গীটার এবং বেহালার ছাত্র। এর কারণ কি? সরোদের মতন এমন একটা সর্বাঙ্গসুন্দর বাদ্যযন্ত্র লোকে কেন শিখতে চান না।

আমি যখন স্বর্গীয় আমীর খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করি ১৯২০ সালে, তখন কোলকাতায় এমন কি এ দেশের সারা বাংলা দেশে আমিই একমাত্র সরোদ শিক্ষার্থী ছিলাম। এর অন্তত পাঁচ বছর বাদে রাণীকণ্ঠ আর একজন, নাম মনে পড়ছে না, এবং রাধিকামোহন মৈত্র আমীর খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র রাধিকামোহনই সর্বশ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন। অধুনা আরও দু চারজনকে দেখেছি যাদের ঠিক বাজিয়ে বলা যায় না, সরোদের মুঠে বলা যেতে পারে। এরা ফিল্ম, স্টুডিও এবং রেডিওতে গানের সঙ্গে আওয়াজ দিয়ে থাকেন। কিছু অবান্তর কথা এসে গেল। তার কারণ এই পশ্চিম বাংলায় বহু বাদ্যযন্ত্রশিল্পী আছেন, তাঁদের মধ্যে কজন সরোদের মতন সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বজনপ্রিয় সঙ্গীতযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। আশ্চর্যের কথা, পাকিস্তানের উভয় অংশে একজনও নেই। আরও আশ্চর্যের কথা বিদেশে, বিশেষত আমেরিকায় বহু সরোদ কোলকাতা থেকেই রপ্তানি হচ্ছে। সেখানে এগুলি মিউজিয়ামে রাখবার জন্য নয় নিশ্চয়ই। সেখানে এই যন্ত্র শেখবার জন্য দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে। এটা শুধু একটা গৌরবের কথা নয়। হ্যাঁ, যদি বাস্তবিক আমাদের দেশেও এই যন্ত্র দিন দিন শেখবার জন্য লোকের আগ্রহ বাড়ছে তাহলে এ বিষয় ভাবনার কিছু নেই। শুনে অবাক

হতে হয়, এই কলকাতাতেই একটা সংগীত অ্যাকাডেমি আছে যেখানে সংগীতযন্ত্র শিক্ষা করবার জন্য দেড়শত ছাত্রছাত্রী আছে; তাদের মধ্যে একশো কুড়িজন গীটার শিক্ষার্থী, ঊনত্রিশ জন সেতার এবং একজন মাত্র সরোদ শেখে। কেন এরকম হলো ভাববার কথা।

সরোদ শিক্ষার জন্য এত অনাগ্রহ কেন? আমি কতকগুলি কারণ খুঁজে বের করেছি। আজকালকার অবিভাবকেরা তাঁদের পুত্রকন্যাদের সংগীত শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষকের কাছে বা স্কুলে পাঠান তাদের সংগীতে পারদর্শী করবার জন্য নয়। তাঁদের ছেলেমেয়েরা একটু-আধটু শিখে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সামনে বাহাদুরি নেবে—এটাই হলো আসল উদ্দেশ্য। তাও যদি বুঝতাম বেশ কিছুকাল শিখে তাদের কিছুটা যোগ্যতা হয়েছে। দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে যারা বোঝেন ও বোঝেন না সকলেই খুব প্রশংসায় মুখরিত হন। ভদ্রতা আছে তো। মুখের ওপর কেউ সত্য কথাটা বলে অপ্রীতিভাজন হতে চান না। আমি নিজেই এ রকম বিপদে পড়ি মাঝে মাঝে। অভিভাবকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ অনেক সময় এড়াতে পারি না, সুতরাং যেতেই হয়। মৌখিক খুব তারিফ করতেই হয়। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা হয় ওই অবিভাবকের গণ্ডদেশে একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের শিক্ষা দিয়ে চলে আসি। তবে একেবারেই যে শিশু প্রতিভা দেখতে পাই না তা নয়। তাদের অভিভাবকেরা সন্তানের শিক্ষার জন্য সত্যই আগ্রহী। মনে আছে তখনও আমি সরোদে হস্তক্ষেপ করিনি, ভাল গান বাজনা শোনা অভ্যাস ছিল। একদিন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর তবলা শুনে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আবার আসল কথাটা থেকে লাইনচ্যুত হয়ে গেলুম। বলছিলাম কি, সরোদ শেখে না কেন। একটা কারণ হচ্ছে সরোদ সকলে কিনতে পারে না। সংগীতযন্ত্রের মধ্যে সরোদের দাম বড় বেশী। যেখানে খুব সস্তা হলেও একটা সেতার আশী নব্বই টাকার মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে একটা সরোদ সাড়ে তিনশো থেকে চারশোর কমে পাওয়া যায় না। এ কথা ঠিক যে সরোদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাটির দাম কিছুটা বেশী। কিন্তু অতটা বেশী হওয়া মোটেই উচিত নয়। এর একটা কারণ ওই যন্ত্রের কারিগর খুব কমই আছে কোলকাতায়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও সস্তায় পাওয়া যায়। তবে খুব কম স্থানেই এই যন্ত্র তৈরী করতে পারে। তবে আমার মতে এই কোলকাতাতে এর মূল্য দেড়শো টাকার বেশী হওয়া মোটেই উচিত নয়। তবে এই যন্ত্রের চাহিদা কম এবং পরিশ্রমও বেশী বলেই সেতার অপেক্ষা দাম বেশী। অনেকে প্রায়ই আসে আমার কাছে সরোদ শেখবার

অনেকে শিখতে চায়, কিন্তু দাম শুনে সাধ থাকলেও ওদের সাধ্যের বাইরে। এদের জন্য সত্যই আমার দুঃখ হয়।

সরোদ না শেখবার প্রধান এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যেটা উপলব্ধি করেছি সেটাই এবার বলছি। এটা অবশ্য সমালোচনা পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এ রকম সমালোচনা করবার অধিকার আমার আছে বলেই আমি মনে করি। কৈফিয়ত স্বরূপ এখনও আমিই ওই যন্ত্রটা নিয়মিত বাজিয়ে থাকি। তাছাড়া দুটো ঘরানার বাজনা আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আয়ত্ত করেছি। প্রথম পাঁচ বছর শ্রীআমীর খাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলাম। তিনি ছিলেন বংশপরম্পরায় সরোদের ঘরানার বাজিয়ে। তারপর গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে আরও পাঁচ বৎসর শিক্ষা করেছি। এই দুই ঘরানার বাজনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। শেষোক্ত গুরুর বাজনার ভেতর সরোদ ছাড়াও বীণার বাজনা অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, গুরু আলাউদ্দিনও একজন বিখ্যাত সরোদিয়ার কাছে শিখেছিলেন। তাঁর নাম ছিল শ্রীআমেদ আলি খাঁ। তাছাড়া গুরু আলাউদ্দিন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান স্রষ্টা। আমার সৌভাগ্য যে দুই গুরুই আমি পেয়েছিলাম তাঁরা উভয়েই আমাকে পুত্রেরও অধিক ভালবেসে শিক্ষা দিয়েছেন। আমার সাধনা ও গ্রহণ করবার ক্ষমতায় তাঁদের সম্পূর্ণ তুষ্ট করতে পেরেছিলাম। আমার ওপর দিয়ে তাঁরা তাঁদের জীবনের সাধনালব্ধ সৃষ্টির পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আমি ভারতের অধুনা যে কোন সরোদ বাজিয়ের সমালোচনা করার অধিকার অর্জন করেছি, এই সব কারণে এতে নিশ্চয় কারুর আপত্তি থাকতে পারে না। হাফিজ আলি খাঁ সাহেবও আমার গুরু স্থানীয়। কারণ, নেপথ্যে থেকে তিনিও আমাকে বহু উপদেশ দিতেন। তাছাড়া আজকালকার দিনে যাঁরা সরোদ বাজিয়ে থাকেন আমিই তাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমার যুক্তি ও সমালোচনা কয়েকজন হয়তো অনধিকার চর্চা বলে মনে করতে পারেন কিন্তু অধিকাংশই আমার মতকে সমর্থন করবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

প্রথমেই বলে রাখি ভারতীয় যে কোন তারের যন্ত্র, এমনকি বেহালাও শিক্ষা দেবার ক্ষমতা আমার আছে এবং সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী। কারণ এক সময় আমি ঐগুলি যন্ত্রের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলাম। এমনকি বহু বৎসর ক্লারিওনেট অভ্যাস করেছিলাম এবং ওই যন্ত্রে আমি কোলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য হয়েছিলাম। কিন্তু ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত ওই যন্ত্রে অপূর্ণ থেকে যায় বলেই সরোদ যন্ত্রটা গ্রহণ করেছিলাম। যাই হোক দেখতে পাচ্ছি যে বেশীর ভাগ যন্ত্রসঙ্গীতপিপাসু গীটার (হাওয়াইয়ান) শিক্ষা করবার দিকেই অতি মাত্রায় ব্যগ্র। এর প্রধান কারণ দুটি। এক, যন্ত্রটার দাম কম। অন্য একটা বিশেষ কারণ হলো, এই যন্ত্রে ফিল্মের গান ভালভাবেই বাজানো যায়। এইটার লোভে প্রায় সকলেই গীটার শিখতে চান। তবে এ কথা স্বীকার করি যে, যন্ত্রটির আওয়াজ অতি মধুর। এর পরেই সেতার। সেতারে, বিশেষত বাঙ্গালা দেশে অনেকেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন। অবাক হই শুনে যে সকলেরই বাজনা এক ধাঁচের। মনে হয় সকলেই একজন বিশেষ শিল্পীর কাছে শিখেছেন। তফাৎ আছে বইকি, কিন্তু খুব কম। কিন্তু একজন মাত্র বিখ্যাত শিল্পী আছেন তিনি সেতারকে সেতার যন্ত্রের মতনই বাজান, সরোদের বাজনা মোটেই নকল করেননি। আমার ধারণায় সরোদ শিক্ষা করবার বিমুখতা ধীরে ধীরে দুই দশক ধরে লোকের মনে প্রবেশ করেছে। এর জন্য আমি দুজন বিখ্যাত শিল্পীকে দায়ী বলে মনে করি। তাঁরা দুই দশক ধরে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও যশস্বী শিল্পী হিসাবে বাজিয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে এসেছেন এবং

এখনও মধ্যে মধ্যে বাজিয়ে থাকেন। যাদের সরোদ শিক্ষা করবার আগ্রহ হয়, তাঁরা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যান এবং সেতার যন্ত্রটিকেই গ্রহণ করেন। তাঁরা বাজারে খোঁজ করে দেখেন যে সরোদের মূল্য অত্যন্ত বেশী। তদুপরি বুঝতে পারেন যে সরোদ শিক্ষা করে তাকে আয়ত্ত করা কঠিন সাধনা ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তাঁদের মনে উক্ত কারণগুলিই প্রাধান্য পায় নি। সর্ব প্রধান কারণটি হলো তারা বহুবার ওই বিখ্যাত শিল্পীদ্বয়ের যুগ্ম বাজনা ভাল করেই শুনেছেন কিন্তু ওই যন্ত্র দুটির বাজনায় তফাৎ কোথায়? তাঁদের বাজনার মধ্যে কোন তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায়নি। উভয় যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশল একই। একজন যা কিছু কৌশল দেখাচ্ছেন, অন্যজন ঠিক সেই কৌশলেই পারদর্শী। অর্থাৎ ওই দুটি যন্ত্রে একমাত্র আওয়াজ ছাড়া বাজে কোন পার্থক্য নেই। এমনকি বহুবার তাঁদের একক বাজনা শুনেও দেখা গেছে বাজে কোন তফাৎ নেই। সুতরাং কেবলমাত্র আওয়াজের পার্থক্যের জন্য সরোদ শেখবার আগ্রহ লোকের হবে কেন? আর যে ক্ষেত্রে সেতারের মূল্য সরোদ অপেক্ষা অনেক অনেক সস্তা। এ ছাড়া অন্যান্য কারণ যে নেই তা নয়। আজকালকার দিনে যারা সংগীত শিক্ষাভিলাষী তারা কি সংগীতের বিরাট মাহাত্ম্য এবং সুর-লয়-ছন্দের বহু বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে এই বিদ্যা শেখবার জন্য উদগ্রীব হয়েছেন? মিউজিক কনফারেন্স ও রেডিও মারফত যে প্রেরণাটি তাঁরা পেয়েছেন সেটা সংগীতের নয়, সেটা হলো সস্তায় ও অল্প সময়ে কিভাবে নাম করা যায়। কেবল শিক্ষার্থীরা নয়, বেশীর ভাগ অভিভাবকও তাঁদের অল্পবয়সী ও অপরিণত সন্তানদের শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠিয়ে থাকেন কিংবা সেই ধরনের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অনেকে সময়েরও কণ্ট্রাক্ট্ করেন। ছ মাস কিংবা এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের সন্তান-দের কয়েক বিষয়ে একেবারে দিগ্বিজয়ী ধনুর্ধর করে দেবার প্রতিশ্রুতি চান। অভিভাবকেরা যন্ত্র বা কণ্ঠসংগীতের একই রকম ফরমাস করে থাকেন। রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, ভজন, গজল ও ঠুংরি অন্তত দু-খানি করে যদি তাঁদের সন্তানেরা আয়ত্ত করতে পারে তো তাঁরা যৎপরোনাস্তি খুশী হয়ে থাকেন। আজকাল অবিবাহিত মেয়েদের সংগীত শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ বরপক্ষ কন্যা দেখতে এলে সাংসারিক গৃহকর্মের প্রয়োজনীয়তায় বিশেষ কোন প্রয়োজন মনে করেন না, গান, বাজনা, বা নৃত্য জানা থাকলেই পাশ মার্ক দিয়ে থাকেন। যাকগে, আমিও অপ্রয়োজনীয় কথায় এসে গেলুম। উপায় নেই, কথায় কথায় এসে যায়। যদিও এ প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো সরোদ শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি যে গীটার যন্ত্রটির ওপর ঝোঁক বড় বেশী হয়ে পড়েছে। এর প্রধান কারণ আধুনিক ও ফিল্মের গান আয়ত্ত করা। অনেকে রবীন্দ্রসংগীতও বাজিয়ে থাকেন। আসলে গীটার বাজনা অতি সোজা। প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকের প্রয়োজন থাকে তারপর বাকীটা নিজেদের ইচ্ছামত যা খুশি করা যায়। অনেকে ওই যন্ত্রে রাগরাগিণীর আলাপ করে থাকেন এমনকি সেতার সরোদের কিছু কলা-কৌশলও অনেকে দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার নিজের অভিমত যদিও ওই যন্ত্রটির আওয়াজ ভালই কিন্তু মনে হয় ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীত ওই যন্ত্রের সুরের সংগে খাপ খায় না। আবার পূর্ব কথায় ফিরে আসি।

এ কথা ঠিক যে সরোদ ও সেতার ভারতে ক্ল্যাসিকাল সংগীতে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু সেতারের তুলনায় সরোদের শিল্পী ও শিক্ষার্থী নগণ্য। এর কারণ কিছুটা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। আরও কিছু কারণ আছে। যন্ত্র হিসাবে সরোদের জনপ্রিয়তা হারাবার তো মোটেই কোন কারণ নেই। তবে? আসলে সরোদ

বাজনায় পারদর্শিতা লাভ করতে হলে অতি কঠিন পরিশ্রম, ধৈর্য, একাগ্রতা এবং সর্বোপরি সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা। তবে এ কথা ঠিক, আজকালকার অভিভাবকেরা সন্তানদের সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বহুগুণে উদার ও উৎসাহিত হয়েছেন যেটা আমাদের যুগে মোটেই ছিল না। কিন্তু সন্তানকে সরোদ কিনে দেবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই আছে। এটা একটা অত্যন্ত দুঃখজনক কারণ। বড় হয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে তখন সরোদ কিনে শিক্ষা করা অহেতুক। সংগীত শিক্ষা অল্প বয়স থেকেই করা দরকার নইলে হয় না। তবে সংগীত ও লেখাপড়া এক সঙ্গে হয় না এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি বহু প্রথম শ্রেণীর সংগীত শিল্পীদের জানি যাঁরা স্কুল কলেজেও ভালভাবেই পাশ করার পর জীবিকা হিসাবে সংগীতকেই বেছে নিয়েছেন। আজকালকার দিনে অন্ততপক্ষে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। আবার অন্য প্রসঙ্গ এসে গেল। সরোদের কথাতেই ফিরে যাই।

সরোদ অতি কঠিন যন্ত্র হলেও শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে না এটা গভীর পরিতাপের

বিষয়। সেতারও একেবারে জলবৎ তরলং নয়, সুবিধা এই যে পর্দা আছে। আর একটা যন্ত্র আছে সেটা আয়ত্ত করা অতি কঠিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রচলন অনেক বেশী। সেটা হচ্ছে বেহালা। এই যন্ত্রও পর্দাবিহীন। আমি চাই যে সরোদের মতন অসাধারণ যন্ত্র যেন লোপ না পেয়ে বসে। এই যন্ত্রে আলাপ, মীড়, গমক, হাজার রকমের ঝালা, তদুপরি পাখোয়াজ ও তবলার বোল, এমন কি কথক নৃত্যের বোল অতি সুস্পষ্টভাবে বাজানো যায়। আর এর আওয়াজের তুলনা হয় না। আমি যে যুগে সারা ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, সারাভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সরোদ বাজিয়েছিলাম তখন সম্পূর্ণ অ-মাইক ছিলাম। অর্থাৎ মাইক্রোফোনের চলন তখন ছিল না। কিন্তু এই যন্ত্রের আওয়াজ এত জোরালো যে তিন হাজার দর্শক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অতি দূরবর্তী শ্রোতাদেরও শুনতে কিছু মাত্র অসুবিধা হয়নি। এই যন্ত্রের প্রধান গুণ এর বাণী অতি সুস্পষ্ট। একটা নমুনা দিই, সরোদ বা সেতার বাজিয়েরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। যেমন (সুবিধার জন্য দ্বিগুণ করে ১৬ মাত্রা করা হলো) ড়েডারে ড়েডারে ডা, ডা ডেরেডেরেডেরে ডারে ডারে ডা—মধ্য লয়ে এই ৮ মাত্রায় বাণীটা সরোদে যত পরিষ্কার শোনায় সেতারে তত নয়। এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। তাছাড়া এগুলি রবাব ও সরোদের বাণী সেতারের নয়। কিন্তু সেই অ-মাইক যুগে মাত্র একজন সেতার বাজিয়ে ছিল যে সরোদের মতন বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে পারতো। গভীর পরিতাপের বিষয় যে গত ১৯৬৯ পয়লা ফেব্রুয়ারিতে তিনি ইহলোক থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। তার নাম অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য ওরফে ভোম্বল। স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠ সেতারী এনায়েৎ খাঁ সাহেবের প্রধান শিষ্য ছিল। যদিও অন্য প্রসঙ্গ এসে গেল, তাহলেও পরিতাপের বিষয় যে তার কোন গ্রামোফোন রেকর্ড নেই। মাত্র সামান্য নমুনা সে রেখে গেছে গ্রামোফোন রেকর্ডে যার তুলনা হয় না। হিন্দুস্থান-নিউথিয়েটার্স যুগ্ম প্রতিষ্ঠানের প্রথম রেকর্ডে আমার প্রথম যে অর্কেস্ট্রা রাধাকৃষ্ণ ও সাকী রেকর্ড করা হয়েছিল তাতে ভোম্বল সেতার বাজিয়ে ছিল। তখন তার বয়স ছিল পনেরো। সেটা ছিল ১৯৩৭ সাল। এখনও ওই রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায়। এখানকার বহু প্রথম শ্রেণীর সেতার বাজিয়েরা বলে থাকেন, "যদিও অতি কঠিন তবুও আমরা সেতারে বাজাতে পারি কিন্তু যে অদ্ভুত কোয়ালিটি আর মাপা ওজন আমরা বহু চেষ্টা করেও পারিনি।" তবে কয়েকজন শৌখিন লোকের কাছে টেপ রেকর্ডে তার বাজনা পাওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য—সরোদের মতন অসাধারণ সঙ্গীতযন্ত্রটা যেন কেবলমাত্র মিউজিয়ামেই স্থান না পায়। বাঙ্গালী কি এতই শ্রমবিমুখ ও বুদ্ধিগোময় জাতি যে এই যন্ত্র শিখতে ভয় পায়? সঙ্গীতকে জীবিকা হিসেবে সাধনা করলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত আছে। প্রথম শ্রেণীর সরোদ বাদক হতে গেলে মাত্র পাঁচ বছর যথেষ্ট। তবে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা থাকা চাই। আমার মতে যেটা প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনকার দিনে, সেটা হচ্ছে সাধারণ লোকের যন্ত্রটা ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আমি সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি যদি কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে। তাহলে ব্যবস্থা করতে পারা যায় যাতে যন্ত্রটার মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকার বেশী না হয়।

আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই পারিপার্শ্বিক সঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে বড় হয়ে উঠেছি। শিবুঠাকুর গলির পঞ্চাশ ষাটটা মাড়োয়াড়ি, ক্ষেত্রী এবং হিন্দুস্থানীদের মধ্যে মাত্র চার ঘর বাঙ্গালী আমাদের নিয়ে। অবাঙ্গালীদের বিরাট সব চার পাঁচতলা বাড়িগুলির প্রত্যেকটাতে ঘরের সংখ্যা ছিল প্রচুর। ভাড়া দেওয়াই ছিল এক মাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক বাড়িই অবাঙ্গালীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ছোট বেলা থেকেই দেখেছিলাম যে ক্ষেত্রীদের মধ্যেই সঙ্গীত চর্চার একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। আমাদের বাড়ির দু পাশেই কয়েকখানা বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা ছিল। তখনকার দিনের বহু ভারতবিখ্যাত গায়ক ও বাদকেরা বিশেষ একটা বাড়িতে আসতেন ও আসর জমাতেন। এছাড়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে এখনও পর্যন্ত আমাদের ঘরের মন্ত্রশিষ্য। মহারাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমল থেকেই ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের একবার করে গুরুর বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং আমরা তিন সহোদর যে সঙ্গীতে আকৃষ্ট হব এটা খুবই স্বাভাবিক। আসলে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সরোদ বাজাচ্ছি। তা ছাড়াও আমার বাড়িতে সিম্ফনী বা অর্কেস্ট্রা গড়ে তুলেছিলাম বলে সব রকম বাদ্যযন্ত্রই সঠিক ভাবে আমাকে কিছুটা অভ্যাস করতে হয়েছিল, নইলে শিক্ষা দেওয়া মুশকিল হতো। তবে সরোদই হচ্ছে আমার প্রধান অবলম্বন। কেবলমাত্র বাজানই নয় এই যন্ত্রের মেরামতের জন্য কারিগরি বিদ্যাও আমাকে শিক্ষা করতে হয়েছিল। উপযুক্ত যন্ত্রাদি পেলে আমি নিজেই সরোদ তৈরি করতে পারি। যন্ত্রের আওয়াজ ও বাজাবার পক্ষে সুবিধা অসুবিধা কি হতে পারে সেটা যত ভালই কারিগর হোক যন্ত্রীর প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করার ক্ষমতা নেই। বহুদিনের এক্সপিরিয়েন্স-এর পর আয়ত্ত করা যায়। যাই হোক, আবার স্মরণ করিয়ে দিই—ভারতের এই অপূর্ব শ্রেষ্ঠ বাদ্য যন্ত্রটা শিক্ষার্থীর অভাবে যেন মহাপ্রস্থানের পথে না যায়।

॥ দ্বিতীয় সংগীত সংহতি সম্মেলন ॥

সুরেশ সংগীত সংসদ আয়োজিত এই জলসা, রবীন্দ্র সদনে পুরো এক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাইশে জানুয়ারি শুরু, আঠাশে শেষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি শিল্পীদের নিয়ে আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম—সেই রাজ্যের নামাঙ্কিত অধিবেশনে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত শিল্পীর উপস্থিতি। গুণীজনের সুচিন্তিত বক্তব্য শোনার আয়োজন। তথ্যচিত্রের প্রদর্শন। শ্রোতাদের নির্বাচনে সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পীকে সম্মানের অর্ঘ্য অর্পণ, ইত্যাদি। প্রতিটি আয়োজন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত।

দিনে একটি কিংবা দুটি অধিবেশন বসেছে। প্রথম এবং সর্বশেষ আসর দুটি সর্বভারতীয় অধিবেশন। স্বাগতিক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ একদিন। এ ছাড়া রবীন্দ্র-আসরও ছিল। দক্ষিণ ভারত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান এবং গোয়ার দিনে ঐ রাজ্যের শিল্পী সমাবেশ এবং একজন করে স্থানীয় শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন।

এবার ব্যবস্থাপনার সামান্য ত্রুটির কথা ঘোষণা করি। একটি মহাবিরক্তিকর ও অসুবিধাজনক গলদ ছিল মাইক্রোফোন ঘটিত। এত কর্কশ মাইক ঐ রকম উঁচু জাতের প্রমোদগৃহে কেন থাকবে? ওতে গলা/যন্ত্র বেসুরো শোনাতে বাধ্য। কর্তৃপক্ষ এসব দিকে নজর দেন না কেন?

আর একটা ত্রুটি—অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের গোচর করছি। শিল্পী মঞ্চে বসে আছেন। একটা গান শেষ করে আর একটা সুর ধরেছেন, হঠাৎ তাঁর মুখের ওপর পর্দা নেমে এলো। সময় নিয়ে কড়াকড়ির জন্যেই এটা হয়েছে, সেটা ঠিক। তবু তার পরের বিরতির সময় থেকে না হয় এটা কেটে নেওয়া যেত। যেত না? ব্যাপারটা ভাল লাগেনি।

এবার গান বাজনার আলোচনায় আসি।

কণ্ঠসংগীত : ধ্রুপদ/খেয়াল/ঠুমরী/টপ্পা

বড়ে মোতিবাঈ : বারাণসী

বাগেশ্রী রাগে খেয়াল, কাফি ঠুমরী ও একখানি উত্তর ভারতীয় টপ্পা গেয়েছেন। পণ্ডিত সিয়াজী মিশিরের ও মৈজুদ্দিন সাহেবের ছাত্রী। এছাড়া আরো কয়েক-জনের কাছে তাঁর তালিম। আশি বছরের বৃদ্ধা মোতিবাঈ প্রায় কিংবদন্তীর মানুষ।

কিন্তু এই বয়েসেও তাঁর মধুক্ষরা গলা, তাঁর নির্ভুল স্বরবিস্তার, তাঁর অননুকরণীয় নম্র ভঙ্গি—সব কিছু দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, তিনি কতখানি জীবন্ত।

বলিষ্ঠ বিস্তার, কূটতান, বিবিধ পাণ্ডিত্য ইত্যাদি তাঁর গানে পাইনি। চমক নেই, চটক নেই, উচ্ছ্বাস নেই—কেবল অতল মর্মছোঁয়া সুরের আবেদন।...উনি নাকি এখনো গান শেখেন!

কৃষ্ণরাও পণ্ডিত : গোয়ালিয়র

গোয়ালিয়র ঘরাণার দীপ্তি যাঁরা বাড়িয়েছেন, ভারতবিখ্যাত কৃষ্ণরাও শংকর

বড়ে মোতিবাঈ

তাঁদের একজন। তাঁর গান অল্পবয়েস থেকে শুনছি। হলক, গমক, সপাটের আগেকার দাপট এখন বয়েসের জন্যে অনেকটা নিষ্প্রভ। কিন্তু অজস্র মীড়বহুল সুরবিন্যাস যা তাঁর বিস্তারকে ভরাট করে তোলে, বোলতান, ছোট ছোট মুড়কি—সব মিলিয়ে অচ্যুত সুরসঙ্গতি, যা কিছুতেই হারিয়ে যায় না—কোথাও তার ঘাটতি দেখলুম না। প্রথমে শ্রী ও পরে ভূপালী রাগে খেয়াল গেয়েছেন পণ্ডিতজী। ভূপালীর অবরোহণে গোড়ার দিকে দু'একবার যেন কড়ি মধ্যমের ঈষৎ আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে সুধুকল্যাণের একেই হয়। কিন্তু এটুকু ধর্তব্য নয়।

ফিরোজ দাস্তুর দাই : কিরানা

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে মারোয়া রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, পরে বাগেশ্রী কানাড়ার দ্রুত খেয়াল, সবশেষে দেশ রাগে খেয়াল অপোর ভজন শোনালেন। ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খানের একনিষ্ঠ শিষ্য, কিরাণার বিশিষ্ট গায়ক পণ্ডিত দাই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ঘরের গায়নশৈলী পরিস্ফুট করেন। একালে আমীর খান ছাড়া ঐ জাতীয় মারোয়া আর কেউ গান না। গভীর স্বরমগ্নতা, বক্র সহযোগে বিস্তার, মীড়খণ্ড তান, জটিল ত্রিসপ্তকী তান সরগম, মন্থর কিংবা দ্রুতগতি তানের কোথাও একচুল রাগচ্যুতি নেই—এই দুর্লভ সমন্বয় এঁর গায়কীর বিশেষত্ব। 'সরলতরণী' 'আরোহতরণী' তান ও সরগমের সম্মিলিত অভিযান, পণ্ডিতজী ব্যাখ্যাযোগে নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এটা খুব ভালো লেগেছে। কলকাতার আবহাওয়ায় তাঁর সর্দি লেগেছিল। তাই গলাটা একটু খারাপ ছিল। দুঃখ করছিলেন। শেষে 'ভুজঙ্গে...ভস্মঅঙ্গ' একতালে গাওয়া তাঁর মহেশ্বর ভজন শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে।

বিনায়করাও পটবর্ধন : পুণা

অসামান্য খ্যাতিসম্পন্ন বর্ষীয়ান শিল্পী পণ্ডিত পটবর্ধন। তাঁর কোনো পরিচিতি দেওয়া নিরর্থক। ভূপেন্দ্র স্মৃতি অধিবেশনে তিনি আমাদের পর পর খেয়াল, তরাণা রাগসাগর ও ভজন বিতরণ করেন। পূরিয়া রাগে গাওয়া খেয়ালে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিস্তার অংশ। স্বরক্ষেপ নিপুণ প্রেক্ষাগৃহ সুরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর তান নীরস, ধ্বনি মাধুর্যের অভাব, জাতেও খুব বলিষ্ঠ নয়। মারাঠী গায়নভঙ্গিতে জোরালো তান পাওয়া যায় না। বলতে সংকোচ বোধ করছি, কিন্তু তরাণার নামে এ অ্যাক্রোবেটিকস্ আমার পছন্দ নয় কোন দিনই তবে হয়ত অন্যদের ভাল লাগতে পারে 'রাগসাগর' খানিকটা ক্যাব্য-চমৎকৃতি। ইমন হামীর, ছায়া, কল্যাণ, দেশ, দরবারী নায়কী...তাবৎ রাগের টুইটেল নিয়ে রঙীন পুঁতির মালা। এক এক রঙের আলোয় তার চমক দেখানোর প্রয়াস। তা লাগেনি। অনুপমজ স্বামী, ...

বিখ্যাত ভজন 'শ্রীগিরধর আগে নাচুঙ্গী' খুব জমেছিল।

মুনাওয়ার আলি খান : পাতিয়ালা

রাজাধিরাজের গণতন্ত্রী সন্তান যুবরাজ মুনাওয়ার। কোনমতেই তাঁর পিতার কীর্তির সঙ্গে উপমেয় নন। কিন্তু একথাটা ভুলে গেলে বলতে পারি, বাংলার একজন সার্থক গাইয়ে। নিষ্ঠার সঙ্গে সুরের পুজো করেন। খুব খেটে গান করেন। সুললিত, সুখশ্রাব্য বেহাগ পেশ করেছেন। তানে সুরছুট হবার সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছেন। প্রথম কিছুক্ষণ সুর ঠিক লাগছিল না। পরে বাহার গাইলেন। সেটা খুব উৎরেছে। অমর-গীতি 'য়াদ পিয়াকী আবে' যখন ধরলেন, তখন চোখ ভিজে যাচ্ছিল, গলায় ব্যথা করছিল। যাঁকে ভুলতে পারব না, কিন্তু ভুলে থাকতে হবে, এমন এক বন্ধুকে বারবার মনে পড়ছিল। এ গীত আর কারুর গলায় জমে না। মুনাওয়ারের দোষ নেই।

চিন্ময় লাহিড়ী : জানাশোনা কোনো রাগ গাননি। তাঁর নিজের সৃষ্টিকরা রাগ : রামরঞ্জনী। হেন পর্দা নেই যা লাগেনি। কত রকম রাগের যে মেঘ ভেসে এসেছে, আমার মতন অল্পশিক্ষিত লোক তার পরিমাপ জানে না। এই ধরনের অনুষ্ঠানে মুখ খুলতে গেলে বলতে হয়, 'ভালো লেগেছে' কি 'লাগেনি।' না লাগেনি। বিভিন্ন নোটের সহাবস্থান খুব শান্তিপূর্ণ হয়নি। মনে হয়েছে বেসুরো হচ্ছে। যদিও জানি বেসুরো হয়নি। একে বোধহয়— 'হ্যাপি ব্লেন্ডিং' বলা যায় না। অথচ উনি খ্যাতিমান শিল্পী। ওঁর কণ্ঠ খুবই পরিশীলিত এবং আওয়াজ মিষ্টি।

কিশোরী আমোনকর : মিষ্টি ও সুরেলা গলার অধিকারিনী। বেশ স্বচ্ছন্দ প্রত্যয় আছে। কিন্তু মোটের ওপর নিরাশ করেছেন। 'নন্দ' রাগের মেজাজ আদৌ ফোটেনি। আলাপ ও বিস্তারের বেশ খানিকটা সময় মারুবেহাগের আন্দাজ আসছিল। তান অত্যন্ত হালকা। তবলা সংগতে তরুণ গোবিন্দ বসুর সহযোগিতা ওঁর খুব মনঃপুত হচ্ছে না মনে হচ্ছিল। কিন্তু গোবিন্দকে উনি একবার লয় ধরিয়ে দেবার পর, আর তো অসুবিধের কথা ছিল না। তবে?

আমিনুদ্দিন ডাগর : প্রথমদিনের প্রথম অধিবেশনের প্রথম শিল্পী। মুলতান রাগে
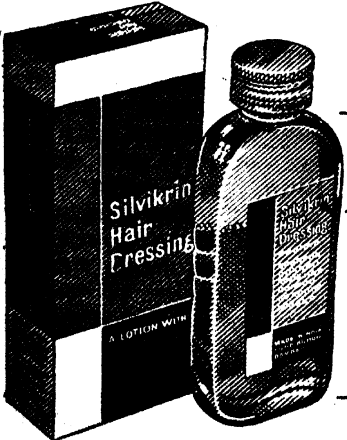
আলাপ ও ধ্রুপদ শোনান। পাখোয়াজ সংগত করেন রাজীবলোচন দে। আলাপ প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেনি।' খুব জোরালো আওয়াজ, 'কিন্তু ধ্রুপদের গভীর গাম্ভীর্য' ছিল না।

এ ছাড়া ইভু ব্যানার্জির ধ্রুপদ, অপর্ণা চক্রবর্তী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ দস্তুর ও সপ্তমেশ্বর গুরবের খেয়াল উল্লেখযোগ্য। কণ্ঠসংগীতের অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছিল—কীর্তন, পল্লীগীতি, রবীন্দ্র সংগীত ও ব্রহ্মসংগীত। শিল্পীরা—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রীতি সিংহ, ঋতু গুহ, সুচিত্রা মিত্র, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ এবং ছন্দম শিল্পী গোষ্ঠী।

যন্ত্রসংগীত : সেতার/সরোদ/তবলা

শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ অধিবেশনে শেষ শিল্পী শ্যামবাবু হেম বেহাগ বাজান। একটু একঘেয়ে হওয়া সত্ত্বেও ভালো আলাপ হয়েছে। তারপরে আকর্ষক গৎ। আর উপভোগ্য সওয়াল জবাব। সংগতে রামজী মিশ্র।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

তবলা লহরা শোনালেন। কণ্ঠ কিংবা নৃত্য কিংবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রকে সহযোগিতা দেয় কিন্তু এই যন্ত্রেরও নিজস্ব অনেক বলার আছে। জ্ঞানবাবুর মতন গুণী শিল্পীর তবলার হাত না পড়লে ওরা মুখ খোলে না। কয়েক মিনিট মুগ্ধ হয়ে ছিলাম। তবলা চড়ে যাচ্ছিল, সুরে যাচ্ছিল, তবুও।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দিনের অধিবেশনে জয়জয়ন্তী বাজালেন। নিখিলবাবু বাজনায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে থাকেন। বিচিত্র কণিকার মাধুরী এনে দিয়ে থাকেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচিতি অপেক্ষার নয়। আমি তাঁর বাজনার ভক্ত। কিন্তু একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বলছি, এদিনে তাঁর বাজনায় নিখিলসুলভ গভীরতার কিছু অভাব অনুভব করেছি। তাড়াতাড়ি ছিটোনো অনেক সম্পদ, স্থাপত্য কাজের ইঙ্গিত ... সৌকর্য সত্ত্বেও। আর কয়েকজনের বেপরোয়া ভাব বেড়েছে। কেন মনে হল জানি না। তবে মোটের ওপর ভালো প্রোগ্রাম। তবলায় যথাযথ সংগত করেছেন শংকর ঘোষ।

রহমত আলি খান

সরোদে ইমন কল্যাণ ও কিরোয়ানী বাজালেন। প্রথম রাগ আদৌ জমেনি। বাজনার [illegible] খুব মামুলি। তাছাড়া ইমন আর ইমন কল্যাণের প্রেজেনটেশনে পার্থক্য থাকা দরকার, সেটা ছিল না। তবে কিরোয়ানীর সময় তাঁর হাত খুলে গিয়েছিল। ওটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে। লতিফ আমেদের তবলাও মামুলী।

হাফিজ জাফর খান

রবিবার মহারাষ্ট্র অধিবেশনের শেষ শিল্পী। নিষ্ঠা-নিপুণ এই শিল্পীর সেতার বাংলার সুররসিকদের বরাবর আনন্দ দেয়। এবারেও দিয়েছে।

আমজাদ আলি খান

শেষ অধিবেশনের শেষ শিল্পী সরোদে রাগশ্রী রাগ বাজিয়ে শোনান। অপূর্ব সুর-ভরাট আলাপ। নিপুণ স্থপতির মতন সুরের ইমারত গড়েছেন। গত্‌টি এখনো কানে লেগে আছে। তাঁর অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ ছিল তিনটি : আলাপের মধ্যভাগ, গতের শেষাংশ আর সওয়াল জবাব। সার্থক সংগত করেন লতিফ আমেদ।

সংগত : তবলা/সারেঙ্গী/হারমোনিয়াম

অনেকের মধ্যে নাম করতে হয় সারেংগীতে গোপাল মিশ্রের। কয়েকটি আসরে অতুলনীয়। মাঝে মাঝে একটু অতিকথন করেছেন। হারমোনিয়ামে সোহনলাল শর্মা। তবলায় শংকর ঘোষ, শ্যামল বসু, রামজী মিশ্র ও লতিফ আমেদ। এঁরা চারজনই উঁচুস্তরের কৃতিত্ব দেখান। অনিল ভট্টাচার্যের বাজনাও মোটের ওপর মন্দ নয়।

—নন্দনবিহারী

সাদ নংক্রেম

দেশের গত ত্রয়োদশ সংখ্যায় 'সাদ নংক্রেম' সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীভদ্র মহাশয়ের মন্তব্য আমার চোখে পড়েছে। তিনি যে ধৈর্য ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রবন্ধটি পড়েছেন, সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রবন্ধটির বিষয়ে তাঁর প্রধান অভিযোগ দুটি। প্রথমত, ভাষার কতকগুলি বিকৃত রূপ (তাঁর মতে) এবং প্রবন্ধ রচনায় শুধুমাত্র ইংরাজদের বইয়ের উপর নির্ভর করা।

খাসি পাহাড়ে আমরা বহুদিন থেকে আছি। খাসিদের কাছেই খাসি ভাষা শিখেছি এবং এখনও চর্চা করছি। খাসি নেতা, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সুদূর পল্লী অঞ্চলের খাসিদের সঙ্গেও পরিচয় আছে। নংক্রেম উৎসব একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় সিয়েম বা রাজা তাঁর যে বাণী নোট খাতায় লিখে দিয়েছিলেন, তা এখনও সংরক্ষিত।

কাজেই তাঁর মূল অভিযোগ শুধুমাত্র ইংরাজদের বইয়ের উপর নির্ভর করেছি—একেবারেই ভিত্তিহীন। তবে রচনাকালে প্রাপ্তব্য সকল প্রাচীন গ্রন্থ, খাসি সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত 'সেঙ খাসি' (Seng Khasi) সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক পুস্তিকা পাঠ করেছি। আবার নৃতত্ত্ব সমীক্ষার উত্তরপূর্ব ভারত কেন্দ্রের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাদিও দেখেছি।

শ্রীভদ্র মহাশয় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই অঞ্চলে কতদিন ছিলেন এবং খাসি মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর কতটা যোগাযোগ ছিল, তা আমার জানা নেই। জানবার কথাও নয়। তবে খাসি ভাষার বিকৃত রূপ বলে তিনি যে কয়টি উদাহরণ দিয়েছেন তার সব কয়টিই ভুল। অবশ্য কয়েকটি শব্দ—যেমন শিরোনামে 'নাংক্রেম' এবং ভিতরের দিকে 'সিয়েম' ছাপার ভুল। তার জন্য আমি দায়ী নই।

প্রথমেই বলতে চাই যে, খাসিয়া শব্দটি ভুল। খাসিরা নিজেদের কখনোই খাসিয়া বলে না। অবশ্য কয়েক শ্রেণীর বহিরাগত খাসিয়া বলে থাকে। খাসি ভাষার বর্ণবোধ থেকে যে কোনও সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করলেই এটি জানা যাবে। সেই সঙ্গে আর একটি কথা আমি পরিষ্কার করে উল্লেখ করতে চাই যে, শব্দতত্ত্ব আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল না। কাজেই প্রবন্ধে সে বিষয়ে কোথাও কিছু বলার প্রয়োজন থাকতে পারে না। খাসি পর্বত এবং পূর্ববঙ্গ প্রতিবেশী অঞ্চল। ঐতিহাসিক যুগ থেকে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিদ্যমান। এবং এই যোগাযোগের সূত্রে ধরে অধিকতর শক্তিশালী বাংলা ভাষার কিছু সংখ্যক শব্দ যে খাসি ভাষায় অনুপ্রবেশ করবে, এতো খুবই স্বাভাবিক। শ্রীভদ্র মহাশয়ের বোধ করি জানা নেই যে, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেও খাসি ভাষা বাংলা বর্ণমালায় লেখা হত। শিবলঙে উপায়ুক্তের দপ্তরে এখনও বাংলা বর্ণমালায় লিখিত খাসি নথিপত্র সংরক্ষিত আছে এবং সেগুলি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পরে খৃষ্টান পাদ্রীদের দাপটে রোমান বর্ণমালা চালু হয়।

যাক সে কথা। এখন তিনি যে কয়টি খাসি শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখছি।

প্রথমত : ব্যাকরণগতভাবে 'কা সাদ নংক্রেম' শুদ্ধ। তবে খাসিরা চলতি কথাবার্তায়—বিশেষত ঐ অঞ্চলের পল্লীবাসীরা 'কা' অংশটুকু ব্যবহার করে না। তা ছাড়া, বাংলা ভাষায় লেখার সময় ঐ অংশটুকু অবান্তর। খাসিরা সাদ কথাটি সাদ্ উচ্চারণ করে। শাড্ নয়।

খাসি রাজা সিয়েম সিম নয়। খাসি ভাষায় সিম শব্দের অর্থ হল নাও। সিম সা মানে চা নাও। বিশকুরম শব্দটি বিশ্বকর্মা শব্দের অপভ্রংশে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাসি ভাষায় শব্দটি বিশকুরম—খাসিরা বলেও বিশকুরম। এখন বিশ্বকর্মা শব্দটি খাসি ভাষার অঙ্গ, এমন কি খাসি অভিধানেও নেই।

সিনসার শব্দটির বানান খাসি অভিধানে আছে SYNSHAR —খাসিরা বলেও সিনসার। সনসার কখনোই নয়। মূল শব্দ যাই হোক। তেমনি খাসিরা বলে থুবর—খবর নয়।

আবার কন্থেই শব্দটির তিনি ভুল উচ্চারণ লিখেছেন। খাসি অভিধানে এর বানান হল KYNTHE। কন্থেই নয়। শ্রীভদ্র মহাশয় শিলঙ গৌহাটি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খাসি সংবাদ শুনলেই তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন।

পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, খাসিদের উৎকৃষ্ট ও নিপুণ নৃত্যকলায় কোনও গৌরবময় ঐতিহ্য নেই। বহুদিন খাসিদের সঙ্গে থেকে, তাদের শহর-পল্লীর উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে যে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে তাঁর মন্তব্য আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারছি না বলে আন্তরিক দুঃখিত।

আরতি দাস
শিলঙ

একই হৃদয়বৃন্তের দুই ক্রীড়াবন্ধী

১৬ই মাঘ, ১৩৭৭ সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "একই হৃদয়বৃন্তের দুই ক্রীড়াবন্ধী" প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক লক্ষ্মীকান্ত দাশের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন—অবশ্য আমার পক্ষে শ্রীদাশের ঢাক পেটাস বিবরণ সম্বন্ধে সবকিছু জানা সম্ভব নয়। সামান্য যেটুকু জানি, সেইটুকুই পাঠকবর্গকে জানাতে প্রয়াসী।

যে কোন খেলোয়াড় সম্বন্ধে বিশদভাবে তার জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনা সাধারণের চোখে তুলে ধরা একটি সুপ্রয়াস সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীদাশের বিবরণের কিছুটা অংশ আমার গোচরে আছে এবং নির্জলা মিথ্যাকে ফলফুল দিয়ে সাজিয়ে বাহাদুরী নেওয়ার ধরন দেখে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলাম না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি রোম অলিম্পিকে উপস্থিত ছিলাম, দর্শক হিসাবে। লণ্ডনে থাকাকালীন রোম অলিম্পিকের আকর্ষণ আমায় রোমে টেনেছিলো। বাঙালী ও কলকাতাবাসী হওয়ায় কিছু বাঙালী

খেলোয়াড় ও কর্মকর্তার সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিলো। নিজের ব্যর্থতা অন্যের স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে ঢাকার প্রয়াসটা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলি একটি মুখরোচক সমালোচনা পেলেই ফলাও করে ছাপার ইচ্ছেটা দমন করতে পারেন না। সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার প্রয়োজনবোধ করেন না।

লক্ষ্মীকান্ত দাশের ক্ষোভের বিবরণও ঠিক সেইরূপ। আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা ক্রীড়াজগতে যখন নাম করেন, তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যথাটা অপরের পিঠে চাপিয়ে দোষ স্খালনের চেষ্টা করে তিনি বা তাঁরা যে একটা কেউকেটা এটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন।

রোম অলিম্পিক থেকে ফেরার পরই এই লক্ষ্মীকান্ত অপরের বকলমে কাগজে ফলাও করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। ভারোত্তোলনের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন উক্ত বিবৃতির জবাব পি টি আই মারফত দিয়েছিলেন। সারা ভারতবর্ষের লোক তা পড়েছেন। উক্ত বিবৃতিতে শ্রীদাশ তাঁর ম্যানেজার সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছিলেন। তারপর অবশ্য উক্ত বকলম লেখক আর কোন বিবৃতি দিতে সাহস করেননি। আমার নিকট দুটি পেপার কাটিংই দুর্ভাগ্যবশত আজও আছে।

দেশ পত্রিকায় রোম অলিম্পিকের সম্বন্ধে লক্ষ্মীকান্ত দাশের বিবৃতি—"পেটের জ্বালা জুড়োতে কলের জল খেতে হলো রাত একটায়। রাত দুটোয় ওজন তোলার জন্য যখন শ্রীদাশের ডাক পড়লো তখন ওর দৈহিক শক্তি চূর্ণ হলেও মানসিকতা অটুট।"

আমি যতটা জানি বা শুনেছি, লক্ষ্মীকান্ত দাশের দেহের ওজন দেবার সময় ছিল বেলা তিনটা থেকে ৪টা ও প্রতিযোগিতা শুরু হবার কথা ছিল চারটায়। যে কোন কারণেই উক্ত সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে গিয়েছিল। ফলে দাশ ওজন কমাবার সময় এক ঘণ্টার পরিবর্তে দুই ঘণ্টা পেয়েছিলেন। ২৬ জনের মধ্যে ২৫ জন প্রতিযোগী একবারেই ওজনের মধ্যে আসেন—দাশ ব্যতীত। ভারতীয় ফুটবল দলের একজন বিশিষ্ট নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত ওইদিন বেলা ১২টার সময় খাবার ঘরে একই টেবিলে একত্রে দুপুরের খাবার খান। দাশ একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট খেয়েছিলেন, যাঁর বেলা তিনটার সময় ওজন দেওয়ার কথা। উক্ত খেলোয়াড় দাশকে বলেছিলেন—"তোমার ম্যানেজার তোমাকে সামান্য সুপ খেতে বলেছিলেন না?" শ্রীদাশের উত্তর—আমার ওজন নিয়মমাফিক ওজন অপেক্ষা দুই পাউন্ড কম আছে।

লক্ষ্মীকান্ত দাশ যখন শেষবার ওজন দেন, তখনও তিনি চার আউন্স বেশি ছিলেন। তারই ম্যানেজার কর্মকর্তাদের হাতেপায়ে ধরে অনুমতি করান। দাশ আমাকে চিনতেন না, কিন্তু যতদূর আমার মনে আছে ওজন শেষ হবার পর দাশকে আমি নিম্নলিখিত খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ করতে দেখেছিলাম। আট স্লাইস মাখন ভেজানো রুটি, চারটি ডিম, চারটি কলা ও দুই বোতল দুধ। সাধারণ লোক হয়তো আশ্চর্য হবেন, ভারোত্তোলনকারী লক্ষ্মীকান্ত দাশের মতে এই খাদ্যবস্তুগুলি কলের জল পান করারই শামিল।

উক্ত প্রতিযোগিতার পরদিন প্রাতে সকলের মুখে একই কথা—কোন কর্মকর্তা নাকি লক্ষ্মীকান্ত দাশকে রাত দুইটার সময় দু বোতল দুধের সাথে ব্রাণ্ডি মিশাইয়া ক্লিনজার্কের তিনটি চান্সের আগে পান করাইয়াছিলেন।

প্রথম খাওয়াটা আমার স্বচক্ষে দেখা,

পরেরটা অবশ্য শোনা কথা, তবে যতদূর মনে আছে একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তার কাছেই শুনেছিলাম।

আমি পরে জেনেছি শ্রীদাশের রোম অলিম্পিকেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠা ভাঙিয়ে ভারোত্তোলন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজসে টোকিও ও জামাইকা বেড়িয়ে এসেছেন।

পাঠকবর্গের ইচ্ছা থাকলে ও দেশ পত্রিকার কর্মকর্তাদের অনুমোদন থাকলে আমি উল্লিখিত রোম অলিম্পিকের পর লক্ষ্মীকান্ত দাশের বকলম লেখকের ও ভারোত্তোলনের একজন কর্মকর্তার বিবৃতি ছাপাতে প্রস্তুত আছি।

বিপ্লব ঘোষ
কলিকাতা—৯

ঘরে-বাইরে

দেশ পত্রিকায় ১০ সংখ্যা ৩৮ বর্ষ "ঘরে বাইরে" বিভাগে "দেশের ভাগ্য জয়ের যাত্রায় মেয়েরা" এ পর্যায়ে লিখতে গিয়ে শ্রীমতী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছেন, "ভারতীয় মহিলা স্বাধীন। তাদের স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসের প্রয়োজন কোথায়?" (পৃষ্ঠা ৯৮৮)। এ প্রসঙ্গে

তিনি মার্কিন মেয়েদের "মুক্তির উন্মাদ প্রয়াসে বিভ্রান্ত" বলে আখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিদেশে থেকে অনেক দেরি জেনেও আমার কিছু বক্তব্য না পেশ করে পারছিনে সাধারণ মানুষ হিসেবে।

প্রথমে ধরা যাক—ইয়োরোপ ও আমেরিকার মেয়েরা কেন "উইমেনস লিবারেশন" নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। অনেক পারিবারিক সংঘাত বাদ দিলেও তাদের যে দুটি বাস্তব ভঙ্গি দাবি ছিল তার প্রথমটা হলো স্বল্প সংখ্যক মহিলার শিল্প কেন্দ্রগুলোতে নিয়োগ ও দ্বিতীয়টা হলো সমপর্যায়ভুক্ত পুরুষ কর্মীদের থেকে বেতন কম। সব মানুষের কর্মশক্তি সমান নয়। সব পুরুষেরও নয় সেজন্য মহিলাদের কর্মশক্তি পুরুষদের থেকে কম বলে যেসব শিল্প কেন্দ্রগুলো মহিলা নিয়োগ করেন না বা তাদের বেতন কম দেন তাদের বিরুদ্ধে যদি মহিলারা প্রতিবাদ করে তবে কি বলা যায় বিভ্রান্ত ?

এ কথা বলতে গিয়ে ভারতীয় মহিলারা স্বাধীন বলে তিনি যে উল্লেখ করেছেন—তা যে কতটুকু সত্যের অপলাপ তা যে কোন বুদ্ধিজীবীই উপলব্ধি করেন বলে আমার বিশ্বাস। স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভোট দিতে পারলেই কি ভারতীয় মহিলারা স্বাধীন ? আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন—যেখানে প্রতি পদে পদে মেয়েদের খাটো করা হয়। ভারতের আর সব রাজ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র বাংলা দেশকে যদি ধরা হয় তবে দেখা যায় প্রত্যেকটি পরিবারে একটা ছেলে যতটুকু সুযোগ সুবিধে পায় একটা মেয়ে ততটুকু পায় না। মেয়েদের জন্যে প্রতিক্ষেত্রে কতকগুলো বাধা নিষেধ আছে। এখনও আমাদের দেশের পুরুষেরা যখন-তখন যেখানে-সেখানে যেতে পারে। আমাদের দেশের মেয়েরা কি তা পারে ? তারা কি সব জায়গা নিরাপদ বলে মনে করতে পারে ? আমাদের দেশের বিয়ের ব্যাপারে একটা মেয়ের বাপ-মাকে যত বায় বহন করতে হয় একটা ছেলের বাপ-মাকে কি তা করতে হয় ? এখনও কি বিয়ের ব্যাপারে পণের ব্যবস্থা নেই ? মেয়ের বিয়ের পণের জন্যে কি মধ্যবিত্ত বাপ-মাকে ঘুমহীন রাত কাটাতে হয় না ? এ সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত পরিবার যদি মেয়ের জন্মকে অভিশাপ বলে মনে করে তবে কি তাদের দোষ দেওয়া যায় ? এরকম ভুরি ভুরি প্রশ্ন অনেক অনেক মেয়েদের মনে দিনরাত জাগে কিন্তু তা প্রকাশ করবার পথ তারা জানে না বা জেনেও ছোট বেলা থেকে বাধা পেয়ে পেয়ে আজ নিজেদের প্রকাশ করতে সংকোচ করে। অনেক মেয়ে তাদের জন্মগত অধিকার কি সে সম্বন্ধেই সচেতন নয়। তারা জানে না পুরুষ ও নারীর জন্মের পিছনে একই ইঙ্গিতে।

এদেশে "উইমেনস লিবারেশন" সম্বন্ধে নানা আলোচনা পড়তে পড়তে বার বার আমার একটা কথাই মনে হয়েছে—এদেশ থেকেও যাদের সাক্ষাৎকারের এই আন্দোলনের দরকার তারা হচ্ছেন আমাদের দেশের মহিলারা। কেন আমাদের মহিলারা এতে এগিয়ে আসেন না তা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে আছে। কোন সত্য উপলব্ধিকারী যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন (তিনি পুরুষ বা নারী যেই হোন না কেন) তবে আমার মত অনেক মহিলার সক্রিয় সমর্থন পাবেন বলে আশা করি।

জ্যোৎস্নাময়ী দাস
বেলজিয়াম

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সরাসরি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিক'-এর উপাদান ভেতরে গিয়ে রোধক কাজ করে।

ক্লিনিক এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল হ'য়ে ওঠে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

নবীন-প্রবীণ

একজন গণ্যমান্য লেখকের বাড়িতে আমি কোনো কোনো দিন সকালে যাই। প্রধান আকর্ষণ এই, ওঁর বাড়িতে যে-কোনো সময়ে গেলেই চা খেতে পাওয়া যায়। এবং মাঝে মাঝে দু' একখানা বই বা পত্রপত্রিকা পড়তে নিয়ে যাচ্ছি বলে নিয়ে গিয়ে ফেরত না দিলেও চলে। তা ছাড়া, ওঁর কাছে অনেক সময় নামকরা লেখকরা আসেন। তাঁদের দেখতে পাওয়া কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়।

ওঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, গ্রন্থ সংখ্যা আশীর বেশী, বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন, অন্তত পঁচিশ বছর ধরে তিনি বাংলা দেশের সাহিত্য জগতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যই ওঁর মন প্রাণ জুড়ে আছে।

একদিন সকালবেলা গিয়ে দেখি, উনি মন খারাপ করে বসে আছেন। মুখে বিরক্তি ও বিষাদের চিহ্ন, ভুরু দুটো কোঁচকানো। ঘরে ঢুকে আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। বসবো কি বসবো না। ঢুকেই তক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া যায় না, অথচ ওঁর যদি কথা বলার মেজাজ না থাকে, তা হলে কি শুধু শুধু চা খাওয়ার লোভে থেকে যাওয়া উচিত?

উনি জিজ্ঞেস করলেন, সিঁড়ি দিয়ে এইমাত্র একটি ছেলে নেমে গেল, তুমি দেখেছো তাকে?

আমি সচকিত হয়ে বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি, মানে, ভালো করে লক্ষ্য করিনি—

—রোগা, ফর্সামতন, চুলগুলো কপালের উপর এসে পড়েছে, এরকম একটা ছেলেকে নেমে যেতে দেখলে না?

—হ্যাঁ, দেখেছি, যখন উঠছি।

—দ্যাখো তো চলে গেছে নাকি? যদি না যায়, একবার ডাকতে পারবে?

—কেন? কিছু ফেলে টেলে গেছে?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে উঁকি দিয়ে ছেলেটিকে আর দেখতে পেলাম না। সম্ভবত কোনো চলতি বাসে উঠে পড়েছে।

আমি ফিরে আসার পর উনি বললেন, পেলে না? ছেলেটি আমার ওপর রাগ করে চলে গেল।

অবাক হলাম। প্রবীণ লেখকের কাছে কেউ তো রাগ করতে আসে না।

অনেকে আসে ভক্তি কিংবা স্তুতি জানাতে, কেউ কেউ রচনা পড়ে শোনাতে, কেউ অন্য কোনো স্বার্থে। রাগারাগির ব্যাপার থাকলেও মনে মনে চাপা থাকে— বাইরে তো বোঝার কথা নয়। আমি তো অন্যদিন এসে এই রকমই দেখেছি।

উনি বললেন, ছেলেটি আমাকে ওর কিছু লেখা পড়ে শোনাতে এসেছিল। আমি শুনেছে চাইনি।
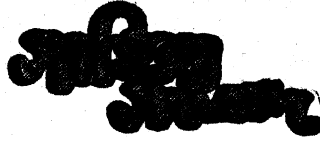
আমি সন্তর্পণে বললাম, ছেলেটি কবিতা লেখে নিশ্চয়ই। বেশীক্ষণ তো সময় লাগে না, শুনলেই পারতেন।

উনি রুক্ষভাবে বললেন, না। সব সময় আমার কবিতা শুনতে ইচ্ছে করে না।

আমি চুপ করে গেলাম। এর ওপর আর কিছু বলা যায় না। আমি আগেও এখানে এসে লক্ষ্য করে দেখেছি, সাহিত্যিকরা নিজেদের মধ্যে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন খুব কমই। অন্যান্য নানা প্রসঙ্গের মধ্যে কদাচিত সাহিত্যের কথা ওঠে। সাহিত্য রচনা নিশ্চিত একটা রক্তক্ষয়ী কঠিন কাজ, সেই জন্যই লেখকরা মাঝে মাঝে ও-কথা একদম ভুলে থাকতে চান। তা ছাড়া, সকালবেলা খবরের কাগজে সাত-খানা খুনের বর্ণনা পড়ার পর কোনো কবির পক্ষেও হয়তো কবিতা পড়তে ইচ্ছে না হতে পারে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি টেবিলে নোখ ঘষে দাগ কাটতে লাগলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন, আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কবিতা শোনাতে চাইছো কেন? এর উত্তরে তার কি বলা উচিত ছিল? যে আমার কাছে সে মতামত

শ্নেতে চায়। তাই তো? কিন্তু সে তা চায় না। সে অত্যন্ত ভাল্গার সুরে বললো, আমার কবিতা কোথাও ছাপা-টাপা হয় না। আপনি একটু সাহায্য করুন আমাকে। অর্থাৎ সে স্বার্থের জন্য এসেছিল। সকাল বেলা আমার সময় নষ্ট করে সে তার নিজের স্বার্থের জন্য—

আমি বললাম, ব্যাপারটা ওরকম হয়তো নাও হতে পারে। কবিরা বিশেষ স্বার্থটার্থ বোঝে না। ব্যাপারটা হয়তো এই, অনেক সময় একেবারে তরুণ লেখকরা আপনার মতন প্রতিষ্ঠিত লেখকের সামনে এসে নার্ভাস হয়ে যায়। ঠিক কথা খুঁজে পায় না। আমারও তো এরকম হয়। অচেনা লোকের সামনে এক কথা বলতে গিয়ে আর এক কথা বলে ফেলি!

—নার্ভাস হবার তো কোনো লক্ষণ দেখলুম না। বেশ স্মার্ট!

—ওটা বাইরের। যে নার্ভাস নয়, বে-লাজুক নয়, সে কবি হতে পারে না। সত্যিকারের স্মার্ট ছেলেরা খেলোয়াড় হবে, সিনেমা স্টার হবে, পলিটিক্সের পাণ্ডা হবে —কবিতা লিখতে যাবে কেন?

—থামো। বক্তৃতা করো না। ও আমাকে সাহায্য করার কথা বললো, কি সাহায্য করবো? ওর কবিতা ছাপিয়ে দেবো? ওকি শুধু একা? এ রকম দলে দলে ছেলে আসবে আমাকে কবিতা পড়ে শোনাতে আর ছাপিয়ে দিতে, এটা কি আমার কাজ?

—দেখুন, ব্যাপারটা আপনার পক্ষে অস্বস্তির, এটা ঠিকই। কিন্তু এটাও তো সত্যি, সত্যিকারের প্রতিভাবান অনেক নতুন লেখক লেখা ছাপাবার সুযোগ পায় না। বড় বড় পত্রপত্রিকায় নতুন লেখকদের জায়গা হয় না সহজে, আপনাদের মতন লেখকরা যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন—

—তোমরা ভাবো, এটা শুধু একালের সমস্যা? আমাদের সময়েও ঠিক এই রকমই ছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মেয়েদের ছদ্মনামে পাঠিয়ে প্রথম কবিতা ছাপিয়েছিলেন—সে গল্প জানো না? লেখা ছাপানোর সমস্যা সব দেশে সর্বকালেই ছিল ও আছে। এটা মোটেই আধুনিক সমস্যা নয়। এ ব্যাপারে কেউ কারুকে সাহায্য করতেও পারে না। যে সত্যিকারের লেখক, সে লিখবেই।

আমি সামান্য হেসে বললুম, এই যখন বলছেন, তা হলে আপনি আবার ছেলেটিকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন কেন? মন খারাপ করেই বা আছেন কেন?

—তার কারণ, ছেলেটিকে আমি একটা কথা জানাতে চেয়েছিলুম। ও ভাবলো, আমি নেহাৎ অভদ্র এবং রূঢ়ভাষী। অন্যদের সাহায্য করি না। কিন্তু ওকে দেখে আমার বারবার শুধু নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিল। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, ছেলেটির বাড়ি বাঁকুড়ায়, এখানে একটা মেসে থাকে। এম এ পড়ছে। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, টিউশানি করে নিজের খরচ চালায়। অর্থাৎ রীতিমতন কষ্টে আছে। অবিকল আমার মতন। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমিও থাকতাম মীর্জাপুরের একটা মেসে। বেশীর ভাগ দিনই দু বেলা খাওয়া জুটতো না। মুড়ি আর কলের জল খেয়েছি। গল্পগুলো সব পত্রিকা অফিস থেকে ফেরত আসতো, একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলেজ স্ট্রীটের কত দোকানে ঘুরেছি। এখন তো তবু কত ছোট-খাটো পত্রিকা বেরোয়, তখন তা-ও ছিল না। আমার মনে হলো, ছেলেটির সামনে কি দীর্ঘ দুঃখময় জীবন পড়ে আছে...কত অপমান, কত গ্লানি সইতে হবে।

—হয়ে, দেখুন, আপনি দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন বলেই যে অন্যদেরও ঠিক সেই রকম জীবনের মধ্য দিয়েই এসে সার্থকতা পেতে হবে, তার তো কোনো মানে নেই। বরং, অন্যদের যাতে সেরকম দুঃখ না পেতে হয় সেই চেষ্টা করাই তো উচিত।

—বাজে তর্ক করো না। যদি চা খাবার ইচ্ছে হয় তো ভেতরে গিয়ে তোমার বউদিকে বলো।

সনাতন পাঠক

প্রশাসন

Red tape and White cap. By P. V. R. Rao. Orient Longmans, 17, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13. Price : Rs. 25.

ভারতের সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ কম নয়। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নাগরিকদের হয়রানি প্রভৃতির জন্য সরকারে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রিয়তা হারান, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য গৃহীত কর্মসূচীও কার্যকর করা সম্ভব হয় না। মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারাও দুর্নীতির প্রসারে সাহায্য করে থাকেন। আবার তাড়াতাড়ি কাজ করানোর জন্য প্রায় সকলেই সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে "জানাশোনা লোক" খোঁজ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারী কাজকর্ম অনেক বেড়েছে কিন্তু সরকারী কর্মীদের উন্নত পদ্ধতিতে কাজ শেখানোর কোন ব্যবস্থা চালু হয়নি। অপরদিকে আগের তুলনায় স্কুল-কলেজে পড়াশুনার মান নেমে গিয়েছে। এই নিম্নমানের শিক্ষিত যুবকেরা চাকুরিতে ঢুকে বয়স্কদের মতো ও কাজ করতে পারছে না। ফলে নতুন কর্মীদের জন্য সরকারী কাজের মান আরও নেমে যাচ্ছে।

লেখক শ্রীর ও ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। সরকারী কাজে লালফিতার বাঁধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বইটি লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। লেখক ১১টি অধ্যায়ে সরকারী কর্মীদের বাছাই ও ট্রেনিং, প্রশাসনযন্ত্রে কর্মী ও মন্ত্রী বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক, দুর্নীতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, দ্রুত কাজ করা এবং দুর্নীতি নিবারণের কার্যকর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতারা এই বইটি পড়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দেশের উন্নতি হতে পারে।

(২৬০/৭০)

সঙ্গীত

An approach to the study of Indian Music—Purnima Sinha.
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ৩নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা ১। দাম কুড়ি টাকা।

লেখিকা শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। গ্রন্থটি সেই বক্তৃতামালাকে ভিত্তি করে রচিত। প্রথম অধ্যায়ে ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য শ্রোতার পরিচয় ও উপলব্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাগসঙ্গীতের সংগঠন সম্পর্কে গ্রাম, শ্রুতি, মূর্ছনা, বাদী, সম্বাদী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি প্রধানত শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল এবং অ্যালেন ডানিয়েলু প্রবর্তিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে লেখিকা বিভিন্ন ঘরানা এবং বাদ্যযন্ত্রাদির পরিচয় প্রদান করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে গজল, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং লেখিকার গভীর চিন্তা এই আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি যত্ন সহকারে বরাভূব

পরগনায় ও বিহার সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নানারকমের গান সংগ্রহ করে তাদের বিশ্লেষণ প্রদানপূর্বক রাগসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই জাতীয় গানের একটি সম্বন্ধসূত্র অন্বেষণ করবার চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থখানি স্বকীয় চিন্তায় সমৃদ্ধ। লেখিকার সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদের অবকাশ অবশ্য আছে কিন্তু এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক পন্থা ও যুক্তি নিয়ে তাঁর আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন, যা আজকাল দুর্লভ। বিদেশী পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

পত্রিকা

শতরূপা। সম্পাদক : নির্মলকুমার খাঁ। ১৪ মাকড়দহ রোড, কদমতলা, হাওড়া-১। মূল্য ১·৫০।

আলোচ্য কার্তিক-পৌষ (১৩৭৭) সংখ্যাখানি দেশবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে প্রকাশিত। বিদ্রোহী, রাজনীতিক, কবি, ধর্মপ্রাণ এবং সমাজসেবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনা সংখ্যাখানিকে মূল্যবান করেছে। শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনসূত্রে যাঁদের রচনা মুদ্রিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন আচার্য যদুনাথ সরকার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে দেশবন্ধুর জীবনপঞ্জী। প্রবন্ধাবলীতে দেশবন্ধু সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

অমৃতের সন্তান। গোপীনাথ মহান্তি। সাহিত্য অকাদেমী : রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজ শাহ রোড, নিউ দিল্লী-১। মূল্য ২০·০০।

বাইরের নাম-করা হকি খেলোয়াড়রা এখনো কলকাতায় এসে না পৌঁছলেও সব দল আসরে নামায় হকি মরসুম এগিয়ে চলেছে। তবে উৎসাহ-উদ্দীপনায় হকি মরসুম জমে উঠতে সময় লাগবে বলে মনে হয়। বর্তমানের খেলা নিরুত্তাপ রুটিন-মাফিক। না আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস, না আছে উন্নত ক্রীড়াশৈলীর পরিচয়।

এদিকে ফুটবলে জার্সি বদলের পালাও শুরু হয়ে গেছে। নাম-করা যেসব ফুটবল খেলোয়াড়ের চিত্ত দোদুল্যমান, এক দল ছেড়ে অন্য দলে যাবার জন্য মন উতলা, ক্লাবের আড়কাঠিরা তাঁদের চোখে চোখে রেখেছেন। সব সময়ই ভয় শিকল কেটে পাখি পালিয়ে না যায়। খবর, বহু খেলোয়াড়ের নাকি মুক্তভাবে চলা-ফেরার স্বাধীনতাও নেই। সুনাম ও প্রতিষ্ঠার এ এক বিড়ম্বনা। তবে যে যতই বেড়াজাল তৈরি করুন না কেন, জাল ছিঁড়ে দু' চারটি রুই কাতলা বেরিয়ে যাবেই। কে কোন ঝাঁকে মিশবে সেটাই প্রশ্ন।

বড় আকর্ষণ

এদিকে কলকাতার খেলাধুলোর বড় আকর্ষণ এশিয়ান টেনিসের মুক্ত আসর। মাসের পয়লা থেকে সাউথ ক্লাবে এই জমকালো আসর বসছে। যোগ দিচ্ছেন টেনিসের প্রবর্তক জন ম্যাকডোনাল্ডের গোষ্ঠিভুক্ত পৃথিবীর প্রথম সারির সব পেশাদার খেলোয়াড়। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার, জন নিউকোম্ব, টনি রোচ, কেন রোজওয়াল, আওয়েন ডেভিডসন, রয় এমার্সন, ফ্রেড স্টোলে, ব্রিটেনের রজার টেলর, মার্ক কক্স, গ্রাহাম স্টিলওয়েল, হল্যাণ্ডের টম ওকার, স্পেনের আন্দ্রে জিমেনো, যুগোশ্লাভিয়ার নিকি পিলিক, ইউনাইটেড আরবের এস মফি এবং ডেনমার্কের টোবার্ন উল্রিচ। বিশ্ব টেনিসের সব গালভরা নাম।

যদি সবাই আসেন তবে এটাই হবে টেনিস তারকা সমাগমে ভারতের সবচেয়ে বড় টেনিস আসর। এর আগে অবশ্য পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে জ্যাক ক্রামার, কেন রোজওয়াল, লুই হোড ও প্যাঞ্চো সেগুরা এক সঙ্গে কলকাতার সাউথ ক্লাবে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গিয়েছেন। অ্যামেচার গোষ্ঠীরও অনেক বড় খেলোয়াড় এখানে খেলেছেন। কিন্তু এক সঙ্গে বিশ্বখ্যাত এত খেলোয়াড়ের সমাগম ঘটেনি। তা ছাড়া প্রোফেশনাল খেলোয়াড়রা ভারতে প্রতিযোগিতামূলক কোনো খেলাতেও অংশ নেননি। ভারতের মাটিতে এটাই হবে প্রোফেশনাল টেনিসের প্রথম আসর। শুধু ভারতের মাটিতে কেন, এর আগে এশিয়ার কোনো দেশেও পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতামূলক আসর বসেনি।

আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশন এশিয়ান টেনিসের উদ্যোক্তাদের শুধু 'মুক্ত আসর' হিসাবেই এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালনার অনুমতি দেননি, তাঁরা এই প্রতিযোগিতাকে প্রোমোটারদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর যে ২০টি প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন সেই ২০টির মধ্যে এবারকার 'ওপেন এশিয়ান' চ্যাম্পিয়নশিপও একটি। লণ্ডনের অ্যালবার্ট হল ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপ এবং সিডনীর ডানলপ ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপের মাঝে বসছে এশিয়ানের আসর। কথা আছে লণ্ডন থেকে ভারতে এসে খেলোয়াড়রা ভারত থেকে সিডনী যাবেন। সুতরাং এশিয়ানে খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণের সম্ভাবনাই বেশী। তা ছাড়া টেনিস প্রবর্তক মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও জানিয়েছেন, দু'বার 'গ্রাণ্ড স্লামের' অধিকারী এবং দু'বার 'গ্রাণ্ড প্রিক্স' বিজয়ী রড লেভারের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত। অপরাপর খেলোয়াড়রাও ভারতে যাচ্ছেন। বাইরের এই সব খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতের জয়দীপ মুখার্জী এবং প্রেমজিৎ লালও অংশ গ্রহণ করবেন। খেলা হবে শুধু সিংগলস এবং ডাবলসে। যদিও বাইরের খেলোয়াড়দের তুলনায় আমাদের

১৯৭২ সালের মিউনিক অলিম্পিকের অফিসিয়াল ম্যাসকট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে জার্মানদের প্রিয় কুকুর 'ড্যাসহাণ্ড'। এই নির্বাচনের পর আন্তর্জাতিক বাজার এখন নানা উপাদানে তৈরী খেলনা ড্যাসহাণ্ডে ছেয়ে গেছে

জয়দীপ ও প্রেমজিৎ অনেক শক্তিহীন তবু ঘরের ছেলেরা বিশ্ব প্রধানদের সঙ্গে কেমন খেলে তা দেখার আকর্ষণও কম নয়।

খেলোয়াড়দের পুরস্কার-অর্থের জন্য ভারত সরকার আড়াই লক্ষ টাকার সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অনুমোদন করেছেন। সর্বসাকুল্যে খরচ হবে প্রায় ৪ লাখ টাকা।

এক থেকে সাত মার্চ এক সপ্তাহের খেলা দেখার জন্য সিজন টিকিটের দাম করা হয়েছে ৭৫, ১১০ ও ১৩০ টাকা। এক থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত দৈনিক টিকিটের হার ১০, ২০ ও ৩০ টাকা, ৫ থেকে ৭ মার্চ দৈনিক টিকিটের হার ১৫, ২০, ৩০ ও ৫০ টাকা। সাউথ ক্লাবে উদ্যোক্তারা প্রায় ৫ হাজার দর্শক-আসনের ব্যবস্থা করেছেন।

পাতৌদির ঘোষণা

ভোটারের বলে 'বোল্ড' হলে পাতৌদির নবাব মনসুর আলী ভারতের ইংলণ্ড সফরে আবার ব্যাট ধরবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ভোটারের বলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে নয় কেন? তখন কি লোকসভায় তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠবে? নাকি তাঁর মনে মন্ত্রিত্ব লাভের গোপন বাসনা আছে?

পাতৌদির নবাব আরও ঘোষণা করেছেন হরিয়ানার গুরুগাঁও কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হলে আগামী বছর তিনি হরিয়ানার পক্ষ হয়ে রনজি ট্রফিতে খেলবেন। না হলে খেলবেন হায়দরাবাদের পক্ষে। এটা কি হরিয়ানার ভোটারদের কাছে নির্বাচনপ্রার্থী পাতৌদির বিশেষ 'টোপ'?

আমার মনে হয় ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক এখন আর স্ট্রেট ব্যাটে খেলছেন না। রাজন্য ভাতা বিলোপের ব্যাপারে তাঁর পূর্বের উক্তি এবং বর্তমানের বক্তব্য এই কথাই প্রমাণ করে।

তবে দল গড়া সম্পর্কে পাতৌদি যা বলেছেন অবশ্যই তাঁর যুক্তি আছে। তিনি বলেছেন, বিদেশে খেলার জন্য ইঞ্জিনিয়ার এবং সুর্তিকে দলভুক্ত না করার নীতি সমর্থন করা যায় না। কেননা, বিদেশে খেলার ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতাই বাড়ে। অন্যান্য দেশ এই ধরনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের সাদরেই দলে নিয়ে থাকে। আমরা তাঁদের বাদ দিয়ে কি লাভবান হচ্ছি? কথাটা ভেবে দেখবার মত।

যাই হোক, খবরে প্রকাশ, পাতৌদির বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের আর একজন প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক লালা অমরনাথ গুরুগাঁও নির্বাচন কেন্দ্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তবুও পাতৌদিকে নিয়ে ওখানে নির্বাচনপ্রার্থী ১৩ জন। দ্বাদশ ব্যক্তি এবং একজন অতিরিক্ত খেলোয়াড় সমেত একটি টিম বলা যায়। ভোটের খেলায় এই টিমের কে অধিনায়ক হবেন তা জানবার জন্য আমাদের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

রনজির শেষ পাদ

রনজি প্রতিযোগিতার নক-আউটের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। নক-আউটে এবার ১০টি দল। এতদিন পাঁচটি অঞ্চলের লীগ বিজয়ী ৫টি দলকে নিয়েই নক-আউটের খেলা পরিচালিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবে এবং ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অনুমোদনে এবার থেকে পাঁচটি অঞ্চলের লীগ রানার্স দলও নক-আউট খেলার সুযোগ পাচ্ছেন। এই ব্যবস্থায় বিশেষ করে লাভবান হয়েছে পর পর ১২ বারের রনজি চ্যাম্পিয়ন বোম্বাই, ১০ বছর ধরে এক নাগাড়ে নক-আউট খেলার অধিকারী বাংলা এবং গতবারের দক্ষিণাঞ্চল চ্যাম্পিয়ন মহীশূর। এই তিনটি রাজ্যই এ বছর নক-আউট খেলার যোগ্যতা হারিয়েছিল।

ভারতের প্রথম সারির খেলোয়াড়রা এখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করছেন। তার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোম্বাই ও হায়দরাবাদ। এই দুই রাজ্যের নাম-করা খেলোয়াড়দের রনজি খেলার জন্য পাওয়া যাবে না। এই অবস্থায় কোন রাজ্য রনজি ট্রফি জিতবে? বলা শক্ত। তবে বাংলার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শক্তিহীন বিদর্ভকে হারিয়ে বাংলা সেমি-ফাইনালে উঠবে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার পর সেমি-ফাইনালে সম্ভবত তাঁদের বোম্বাইয়ের সম্মুখীন হতে হবে। বাংলা থেকে (উইকেট কিপার হিসাবে) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়েছেন একমাত্র জিঞ্জিরয়। সুতরাং প্রায় পূর্ণ শক্তি নিয়েই বাংলা এবার রনজির নক-আউটে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। রনজি প্রতিযোগিতার ৩৭ বছরের ইতিহাসে মাত্র একবারই বাংলা ট্রফি জিতেছে। সে ৩২ বছর আগের কথা। দেখা যাক এবার বাংলা কি করে।
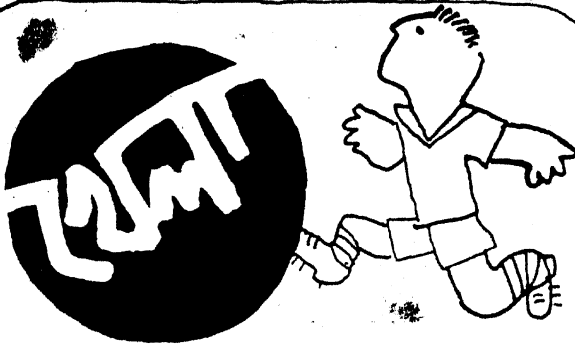
একলব্য

এবার ব্যাংককে
প্রদীপ ব্যানার্জী

জাকার্তার রণক্ষেত্রে
ছিলাম এগারজন
মুক্তিযোদ্ধা
চুনী গোস্বামী

খেলার সমুদ্রতীরে
দাঁড়িয়ে গুটিকতক
নুড়ি কুড়িয়েছি
রূপা মুখার্জী

আমার আসল খেলায়
কোন ঘাটতি পড়ে নি
গুরুবক্স সিং

আমার জীবনের
সবটাই ব্যর্থতায় ভরা
দীপু ঘোষ

প্রতিটি মুহূর্তই স্মরণীয়
অজিত লক্ষ্মণ ওয়াড়েকর

এ ছাড়া দুটি উপন্যাস
দুটি বড় গল্প
বহু গল্প কবিতা প্রবন্ধ
এবং বিস্তৃত চলচ্চিত্র বিভাগ।

বার্ষিক
(দেশ)
সংখ্যা
আনন্দ
বাজার
পত্রিকা
তিন টাকা

টেবল টেনিসের আইন কানুন

টেবল টেনিস খেলায় আলোর ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত সপ্তাহে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সপ্তাহে একটি চিত্র ছাপা হচ্ছে। এই চিত্র অনুযায়ী আলোর ব্যবস্থা করলে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

রেফারি

প্রত্যেক প্রতিযোগিতার জন্য একজন রেফারি নির্বাচিত হবেন। কে রেফারি হয়েছেন এবং প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে এ সব তথ্য অংশগ্রহণকারী সব খেলোয়াড় এবং অধিনায়কদের জানিয়ে দিতে হবে। নিয়মবিধি এবং আইন-কানুনের ভাষ্য সম্পর্কে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হলে রেফারির সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। যদি প্রয়োজন বলে মনে করেন তবে তিনি আম্পায়ার, লাইন জাজ এবং স্ট্রোক কাউন্টারকে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আম্পায়ার, লাইন জাজ ও স্ট্রোক কাউন্টারের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে।

আম্পায়ার

প্রতি ম্যাচের জন্য একজন আম্পায়ার নির্বাচিত হবেন এবং কে আম্পায়ার হয়েছেন সেটা অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় এবং অধিনায়ককে জানিয়ে দিতে হবে। লাইন জাজ ও স্ট্রোক কাউন্টার নিয়োজিত হলে তাঁদের করণীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে বাকী সব বিষয়ে (খেলা সম্পর্কে) আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

লাইন জাজ

লাইন জাজের করণীয় শুধু বল টেবল-এর কোণায় লেগে বাইরে গিয়েছে না টেবল-এর সারফেসের পাশে লেগে বাইরে গিয়েছে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানানো। যদি টেবল-এর কোণায় লাগে অর্থাৎ প্লেয়িং সারফেসের কিনারায় লাগে তবে লাইন জাজ কোন সিদ্ধান্ত জানাবেন না। নিশ্চুপ থাকবেন। যদি বল প্লেয়িং সারফেসের পাশে লাগে তবে লাইন জাজ 'অফ' ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

সাধারণত আম্পায়ার যেদিকে বসে খেলা পরিচালনা করবেন তাঁর উল্টো দিকে লাইন জাজ বসবেন। লাইন জাজ নিয়োগ করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আবার প্রয়োজন দেখা দিলে দু' পাশে দু' জন

আগামী সপ্তাহ থেকে হকি খেলার আইনকানুন

লাইন জাজ নিয়োগ করা যেতে পারে। যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন খেলোয়াড় বা প্রতিদ্বন্দ্বী জুটি অনুরোধ করেন কিংবা আম্পায়ার নিজে প্রয়োজন অনুভব করেন তবে দু'জন লাইন জাজ নিয়োগ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে লাইন জাজ লক্ষ্য রাখবেন এণ্ড লাইন-এর পেছন থেকে সার্ভিস করা হচ্ছে, না এণ্ড লাইন অতিক্রম করে সার্ভিস করা হচ্ছে। যদি এণ্ড লাইন অতিক্রম করে সার্ভিস করা হয়, লাইন জাজ 'ফল্ট' ডাকবেন। যদি 'ইন প্লে' থাকা অবস্থায় কোন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করে বা খেলোয়াড়ের পরিধেয় কিংবা অন্য কিছু স্পর্শ করে তবে লাইন জাজ 'ওভার টেবল' ডাকবেন। মনে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে লাইন জাজ কোন সিদ্ধান্ত জানাবেন না। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ের ভুলত্রুটি সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত নন সেসব ক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকবেন।

স্ট্রোক কাউন্টারের প্রয়োজন, শুধু 'এক্সপেডাইট সিস্টেম'-এর সময়। অন্য কোন ক্ষেত্রে স্ট্রোক কাউন্টারের প্রয়োজন হয় না। তবে যে কোন ম্যাচের সময় আম্পায়ারের পাশে স্কোর রাইটার থাকা বাঞ্ছনীয়। স্কোর রাইটারই পয়েণ্টের সঠিক হিসাব রাখবেন। তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

আম্পায়ারদের প্রতি উপদেশ

আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন 'গাইডেন্স টু আম্পায়ার' শীর্ষক নিবন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছেন। তাতে ব্যক্তিত্ব এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে খেলা পরিচালনা করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে খুঁটিনাটি বিষয়ে আম্পায়ার এমন কোন সিদ্ধান্ত দেবেন না যা খেলোয়াড়দের বিরক্তির কারণ হতে পারে। প্রয়োজনবোধে তিনি খেলোয়াড়দের মতামত গ্রহণ করেও সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। তবে একজনের মত নিয়ে অবশ্যই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন কোনো বিতর্কমূলক বিষয়ে একমত হলে তখন। কোনো ভুল সিদ্ধান্ত আম্পায়ার অবশ্যই পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত জানানোর পর র‍্যালি আরম্ভ হলে আর আগের সিদ্ধান্ত বদল করতে পারেন না।

আম্পায়ারের যথাযথ অবস্থান হচ্ছে নেট সোজাসুজি টেবল থেকে ২ থেকে ৩ মিটার দূরে। উঁচু চেয়ারে বসে আম্পায়ার তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। উঁচু চেয়ার পাওয়া না গেলে ডাবলস-এর খেলায় তাঁর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্তব্য পালন করা উচিত। কেননা বসে আম্পায়ারিং করলে সেন্টার লাইন ভালভাবে দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে।

—মুকুল
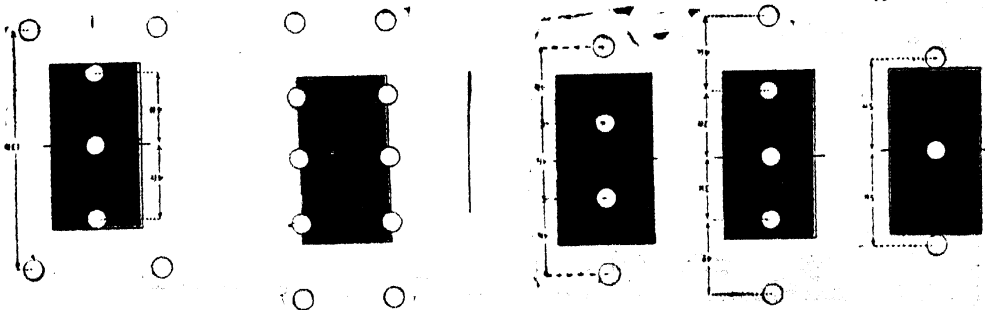
সিঙ্গল এবং ডাবল লাইনে টেবল-এর উপর এইভাবে আলোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

আসুন অরণ্যদেব, আমাদের বিয়েতে যোগ দেবেন, আসুন।
আসুন, আসুন!
সেইজন্যেই তো এসেছি!
আমি কখনো বিয়ে দেখিনি।
আমিও না।

সলোমন, নেফারতিতি —দাঁড়াও!
চক্-চক্- (তার মানে 'আচ্ছা')

তোমাদের বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই খুশী।
এ আমাদের সৌভাগ্য, অরণ্যদেব।
আপনি আমার 'বরকর্তা' হোন!

মা… আমার!
মা, আমার!
আমার আমার!
দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি সকলেরই বরকর্তা হব।

ওয়ামবেসি ও লঙ্গো উপজাতির পাইকারী বিবাহ-অনুষ্ঠান…
৩/২৪

অনুষ্ঠান শেষে নবদম্পতিরা সমুদ্রস্নানে নেমেছে…

তারপর গড়াগড়ি দিচ্ছে সোনা-বেলায়—
ওরা এমন করছে কেন?
?
বিবাহ-অনুষ্ঠানের এটা একটা অঙ্গ। এরপর ওরা দৌড়-ঝাঁপিয়ে যাবে।
৩৩

চিত্র-সমালোচনা

"অন্ধ অতীত" (পরিচালনা : হীরেন নাগ) ছবিতে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী
ফটো—দেশ

খামোশী

(গীতাঞ্জলি)

হিন্দীচিত্র "খামোশী" বাংলা "দীপ জেলে যাই" ছবির রূপান্তর ঠিকই, কিন্তু রূপে যে খুব একটা পালটেছে তা নয়। তার একটি প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, দুটি ছবিরই পরিচালক অসিত সেন এবং দুটি ছবিরই সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হয়ত তাঁরা "দীপ জেলে যাই" ছবিটিকে ভাল-মন্দ মিলিয়ে সর্বাঙ্গ হিন্দী ছবির বিশাল দর্শকগোষ্ঠীকে দেখাতে চেয়েছেন। "দীপ জেলে যাই" বাঙালী দর্শককে বেশ চমক দিয়েছিল। পরিবেশ হিসাবে মানসিক হাসপাতাল, চরিত্র ক্ষেত্রে মনোবিকারগ্রস্ত রোগী ও তার নার্স এবং রোগী সারাবার জন্য নার্সের প্রেমের অভিনয় ও ক্রমশ ওই অভিনয় সত্য হয়ে ওঠা ইত্যাদি বাংলা অনেক-চিত্রের ক্ষেত্রে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল বৈকি। অতএব এখানকার দর্শকদের কাছে "খামোশী" যদি "দীপ জেলে যাই"-এর সেই প্রথম শিহরণ ফিরিয়ে আনতে নাও পারে হিন্দীচিত্রের ক্ষেত্রে যে এর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অবশ্য "দীপ জেলে যাই" যাঁরা দেখেননি, "খামোশী" তাঁদের সেই একই আনন্দ দেবে।

"দীপ জেলে যাই" দেখা সত্ত্বেও "খামোশী" খারাপ লাগবে না। এর বিশেষ কারণ, "দীপ জেলে যাই" ছিল নায়িকা-প্রধান। "খামোশী"তে নায়ক-নায়িকার সমান ভাগ। এবং তাতে ওয়াহিদা রেহমান ও রাজেশ খান্নার অভিনয়ও চমৎকার। পরিচালক-চিত্রনাট্যকার অবশ্য "খামোশী"তে ঘটনা কিছু বাড়িয়েছেন। সব ঘটনাই খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। নায়ক অরুণ (রাজেশ খান্না) প্রতারিত হয়েছে যে মেয়েটির কাছে তাকে নিয়ে কিছু দৃশ্য ছবিতে সংযোজিত। এতে যে ছবির নাটকীয় ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব কিছু বেড়েছে তা মনে হয় না। ওই কারণে একটি যুবক অপ্রকৃতিস্থ হতে পারে তা সিনেমার খাতিরে মেনে নিলেও এ-সব দেখাবার খুব বেশি দরকার ছিল না। যদি ওই সব খোঁজাখুঁজি দেখানো না হত তবে আমরা অরুণের মানসিক বিকৃতির আরও গভীরতর কারণ কল্পনা করে নিতে পারতাম। আর কিছু না হোক, তার অপ্রকৃতিস্থতা আরও সহজগ্রাহ্য হত। বোঝা যায়, হিন্দী ছবির কিছু কিছু প্রমোদ-প্রণালী শ্রীসেনকে মেনে নিতেই হয়েছে। তাই নাচের দৃশ্য, নার্সকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য ফ্ল্যাশব্যাকে যুদ্ধের দৃশ্য, বেশি গান ইত্যাদি ছবিতে দেখাতে হয়েছে। অবশ্য "দীপ জেলে যাই" ছবিতে অসিত সেনের পরিচালনার যে বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল এ-ছবিতেও তা রয়েছে। বরঞ্চ সামগ্রিকভাবে তা আরও পরিণত। রেড ক্রসের বিরাট প্রতীকের নিচে একবার একটি মানসিক দ্বন্দ্বের মুহূর্তে ওই যে পরিচালক নার্স রাধাকে (ওয়াহিদা রেহমান) এনে দাঁড় করিয়েছেন তা খুবই ব্যঞ্জনাপূর্ণ। দৃশ্যের ফ্রেম ও শট কম্পোজিশনের কাজে অসিত সেনের সুনাম এ-ছবিতে আরও বাড়বে। মানসিক হাসপাতালের পাগলদের নিয়ে তিনি কমেডির রস রচনায়ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আনোয়ার হোসেনের (অরুণকে যিনি হাসপাতালে নিয়ে এলেন) চরিত্র বিশ্লেষণে ও পরিচালকের হিউমার ও মানবিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গান বেশি আছে, কিন্তু সুপ্রযুক্ত। রেকর্ড বাজিয়ে যে গান শোনানো হয়েছে তার মুহূর্তটি সুন্দর। গানগুলির সুরও হেমন্তকুমার দিয়েছেন খুব সুন্দর। গান হিট করবে। একাধিক গানের সুর যদিও আগের মতই, তবু হিন্দীতে সেগুলি যেন নতুন শোনায়। গানগুলি সুকৌশলে ব্যবহার করে পরিচালক ছবির আমোদ-আকর্ষণ বাড়িয়েছেন। এবং গল্পের পরিণতিতে যে মেলোড্রামা—রাধার অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাওয়া—তারও সদ্ব্যবহার করেছেন। অপ্রকৃতিস্থ নায়ক ও প্রেমের অভিনেত্রী নার্সের গল্প জীবন রহস্যের নৈঃশব্দ্যে মিলিয়ে যেতে পারত কিনা সে-প্রশ্ন "দীপ জেলে যাই" দেখার পরও জেগেছিল। তার সেক্ষেত্রে, নামটাই ছিল ভারী, কেমন যেন সাজানো ও নাটকীয়। "খামোশী" নামটি সুন্দর। এতে কী এই নৈঃশব্দ্য আনা করা যেত না?

"ফেয়ারওয়েল টু ক্রাউন" এবং "মর্মর স্বাক্ষর"

(চিত্রদর্শন প্রত্যাবলোকন)

এই দুটি তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু এক না হলেও অবলম্বন একই—মর্মর মূর্তি। কলকাতায় দু' রকমের মর্মর মূর্তি দেখা যায়। এক : ইংরেজ রাজত্বের দিকপালদের মূর্তি—সম্রাট, সেনাপতি, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি। দুই : আমাদের দেশের মনীষীদের মর্মর মূর্তি। প্রথম যে মূর্তিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বিমল ভৌমিক তৈরি করেছেন "ফেয়ারওয়েল টু ক্রাউন" তথ্যচিত্র। অপর মূর্তি নিয়ে তৈরি "মর্মর স্বাক্ষর"। পরিচালনা করেছেন শান্ত শীল।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে "ফেয়ারওয়েল টু ক্রাউন" ছবিতে ইতিহাসের কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। ক্যামেরার লেন্স ময়দানের এক একটি মূর্তির উপর যখন নিবদ্ধ তখন ওই ব্যক্তির কথা এবং অতীত ইতিহাসের একটি-দুটি ঘটনা নেপথ্যে বলা হয়েছে। ওই নেপথ্যভাষণ ইতিহাসের ক্লাশ লেকচারের মত। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের ধারাভাষ্য পাঠের ত্রুটির কথা বলছি না। ইতিহাসের উপকরণ অনেক চিত্তাকর্ষকভাবে ছবিতে উপস্থিত করা যেত। সরাসরি সেগুলি বলে যাওয়া হয়েছে বলে ছবিটি শিল্পগুণের দিক থেকে তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তবে বিমল ভৌমিক তথ্যচিত্রের সাবজেক্ট ভালই বেছে নিয়েছিলেন। কয়েকটি মূর্তি সরানোর কাজ দেখানো হয়েছে বলে "ফেয়ারওয়েল টু ক্রাউন" নামের অর্থও পরিষ্কার হয়েছে। এবং যদিও পরাধীনতা বা ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার বা অপকৌশলের কথা ছবিতে বলা হয়েছে তবু মূর্তিগুলি আজ বাতিল হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে করুণ সুর আছে সেটা ছবিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ছবিটির গুণ বলতে ওই পর্যন্তই। নতুবা কেবল সারি সারি মূর্তি আর মূর্তি দেখা। এই মূর্তির মধ্যে ভাস্কর্যের যে নৈপুণ্য আছে তাও ক্যামেরায় (কৃষ্ণ চক্রবর্তী-কৃত) তেমন ফুটে ওঠেনি।

এই সব ত্রুটি দ্বিতীয় চিত্র "মর্মর স্বাক্ষর"-এও আছে। তবু এই ছবিটি দেখার কালে মনে দেশাত্মবোধ জাগে। বাংলার মহাপুরুষ ও মনীষীদের যে মর্মর মূর্তি কলকাতার পথের ধারে ও পার্কে রয়েছে সেগুলি দেখাতে গিয়ে পরিচালক আমাদের জাতীয় আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ছবিটি এক কথায় মনীষী-প্রণাম। শ্যামল ঘোষ আবেগ দিয়ে ধারাভাষ্য পাঠ করেছেন। তাতে দর্শকের মনে প্রেরণা জাগে সহজেই। ছবির শেষে একালের কলকাতার পথের একটি মিছিল। আমরা এখনও পথের সন্ধানে এ ধরনেরই একটি কথা বলা হয়েছে। আগের কথাগুলিতে জাতীয় জীবনের

"জননী" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো—দেশ

আদর্শ ও সংস্কৃতি নিয়ে যে প্রচার, উপসংহারে তা অবর্তমান। এ ছবির ক্যামেরার কাজও (কৃষ্ণ চক্রবর্তী) আগেরটির মতই। দুটি ছবিরই পরিচালক নেপথ্যে দেশাত্মবোধক গানের সুর বাজিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

"মাল্যদান" মুক্তির প্রতীক্ষায়

চিত্রলিপির "মাল্যদান" অবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর। নন্দিনী মালিয়া, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছেন।

ফিল্ম লাইনে স্টার বললেই আমাদের মনে যাঁদের কথা আসে তাঁরা সংখ্যায় সামান্য। ওয়াকিবহাল পাঠক মাত্রেই জানেন যে কিছুদিন হ'ল হিন্দী চিত্রজগতে এইসব তারকাদের ওপর সিলিং প্রথা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্র জগৎকে সংযত করবার প্রয়াসে আরো অনেক সিলিংহীন এলাকাতেই সিলিং চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সিলিংয়ের শাসনে চলচ্চিত্র বৃক্ষের প্রায় প্রত্যেকটি শাখাই শাসিত। পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী, শিল্প নির্দেশক, সঙ্গীত নির্দেশক প্রভৃতি সকলেই আপন আপন অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্মিত নিয়মের ধারা কার্যের সীমায় সংযত হতে বাধ্য হচ্ছেন। বলাই বাহুল্য যে, যে কোন নবীন প্রথার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই একদল অনিশ্চিত এবং উপকৃত হন এবং অন্য দল হন আহত এবং ক্ষুব্ধ।

চলচ্চিত্র বৃক্ষের প্রত্যেক শাখাতেই দুচারটি তারকা চিহ্নিত পত্র আছে। বর্তমানে সেই পত্রগুলি সিলিং প্রথার ছত্রছায়ায় মোটেই সুখী নয়। এই সামান্য সংখ্যক তারকাযুক্ত পত্রদের অসুখ আরো বেড়ে যাচ্ছে ঐ তারকাহীন অসংখ্য পত্রাবলীর অকারণ সোল্লাসে! চলচ্চিত্রের যে কোনো শাখার অ্যাসোসিয়েশনেই অসফল সভ্যদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা। আর সফলদের সঙ্গে অসফলদের বিরোধ চিরকালীন। সিলিং প্রথা চালু করে সফলদের হয়ত সংযত করা যাচ্ছে, কিন্তু তাতে যে অসফলদের সুবিধা হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু সিলিং সিসটেমে অসফলরা যৎপরোনাস্তি খুশী। অনেকটা পরের যাত্রা ভেঙ্গে খুশী হবার মত আর কি! যাই হোক সিলিং প্রথা প্রবর্তনের ফলে নানান ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে—অবস্থা জটিলতর হবার দিকে। আপাতত সবুর করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ সবুর করলেই যে মেওয়া ফলবে এমন কথাও বুক ঠুকে ভাবা যাচ্ছে না।

আপন আপন অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যদের দ্বারা শাসিত সকল শাখার সভ্যরাই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নিজ নিজ অ্যাসোসিয়েশনের মুণ্ডপাত করছেন, কিন্তু প্রকাশ্যে নিজে কেউ এখনো কারুর অ্যাসোসিয়েশনের থেকে নিষ্কৃতি করেননি। বহুদিন আগে ইমপপার কিছু সদস্য আপন আপন স্বার্থ রক্ষার্থে 'গিল্ড' তৈরী করেছিলেন, তারপর আর

একদল সফল প্রযোজক নিজেদের সুসংবদ্ধ এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইউনাইটেড প্রডিউসার্স নামক আরেকটি দল গড়েন। উপরোক্ত দলগুলি এখনো বহাল তবিয়তেই বর্তমান। এবার সম্ভবত সঙ্গীত নির্দেশকদের অ্যাসোসিয়েশনটি দ্বিধা বিভক্ত হবে। বর্তমানে বোম্বাইয়ের নির্মীয়মান প্রায় একশো তিরিশটি ছবির মধ্যে প্রায় একশো কুড়িটি ছবির সঙ্গীত নির্দেশক যাঁরা, তাঁরা একত্র হয়ে ঠিক করেছেন যে তাঁরা একটি নতুন অ্যাসোসিয়েশন গঠন করবেন যে অ্যাসোসিয়েশন কারুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করবে না। এই অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের মধ্যে শঙ্কর-জয়কিষণ, শচীনদেব বর্মণ, লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, আর ডি বর্মণ, সলিল চৌধুরী, হেমন্তকুমার, কল্যাণজী-আনন্দজী, রবি, সোনিক-ওমি, দত্তারাম প্রভৃতি সকলেই আছেন। তারকাযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দিলীপকুমারই সম্ভবত একমাত্র অভিনেতা যিনি কখনো এক সঙ্গে দু' তিনটির বেশী ছবি করেননি নিজের সংযমগুণে এবং সঙ্গীত নির্দেশকদের মধ্যে ইদানীংকালে শচীনদেব বর্মণই সম্ভবত একমাত্র সফল সঙ্গীত নির্দেশক যিনি সাফল্যের সৌভাগ্যে ডগমগ করেও দু চারটির বেশী ছবির সঙ্গীত নির্দেশনার দায়িত্ব হাতে নেননি। চাহিদা, অনুরোধ, উপরোধ এবং অর্থ, সব কিছুকে পাশ কাটাচ্ছেন শচীন দেববর্মণ নানা অছিলায় আজ বেশ কয়েক বছর যাবৎ। সিলিং প্রথার দ্বারা নিজে আহত না হয়েও শচীনদেব সিলিং প্রথাকে স্বাগত জানাতে পারেননি কারণ 'সংযম এক জিনিস বাধ্য-বাধকতা আর'। প্রসঙ্গত আমার একটি কথা মনে পড়ে গেল : "মানুষ মাত্রেই যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, কিন্তু তাই বলে 'যাচ্ছেতাই' করার অধিকার কারুরই নেই।" সফল সঙ্গীত নির্দেশকদের প্রায় গঠিত দলটি সিলিং শাসিত চলচ্চিত্রের অন্যান্য শাখায় কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তা দেখবার জন্য আমরা সকলেই উন্মুখ।

সরল শর্মা

চিৎপুরের এক নামকরা দলের পরিচালকের সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ আলোচনা হল। ভদ্রলোক এককালে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি যাত্রা-জগতের সংস্পর্শে আসেন এবং তারপর থেকে এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। একদা যা নিছক কর্তব্যের তাগিদে করতেন, এখন সেটা হৃদয়ের ব্যাপারে পরিণত। যাত্রা-জগতকে এখন তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে ভালবাসেন।

"এখনই" (পরিচালনা : তপন সিংহ) ছবিতে স্বরূপ দত্ত ও অপর্ণা সেন

ফটো—দেশ

ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার-স্যাপার কিরকম বুঝছেন? এ-বছর তো আপনাদের 'খরা'র বছর বলেই মনে হচ্ছে।"

তিনি উত্তর দিলেন, "গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছরটা মন্দা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এতে তো আমি হতাশ হবার কিছু দেখছিনে, আর ভেঙে পড়বারও কিছু দেখছিনে। বাংলাদেশ এখন একটা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। আর সব ব্যবসার মত আমাদের এখানেও সে ধাক্কা এসে লেগেছে। তাই বলে হা-হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বসে বসে কপাল চাপড়ালেই কি এর প্রতিকার হবে?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "এ অবস্থায় কি করা উচিত বলে মনে করেন তবে?"

উনি বললেন, "শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে যখন বাজার খারাপ, তখন বাংলার বাইরে যেখানে যেখানে যাত্রার চাহিদা আছে সেখানে নতুন বাজার গড়ে তুলতে হবে। আমি তো মনে করি এখনই তার উপযুক্ত সময়।"

—"তার মানে?"

ভদ্রলোক বললেন, "আসামে যাত্রার একটা বড় বাজার আছে একথা সবাই জানে, আর সে বাজার বলতে আমরা জানি কয়েকটা বড় বড় শহর মাত্র। আসামের ছোট ছোট শহরে যে যাত্রার কি চাহিদা তার খোঁজ কেউ নিয়েছে কি? বড় বড় গ্রামগুলির কথা না হয় বাদই দিলাম। এবারে চলে আসুন উড়িষ্যায় আর বিহারে। ওই দুই জায়গাতেও ঠিক আসামেরই মত একটা বিরাট মার্কেট আনএক্সপ্লয়টেড অবস্থায় পড়ে আছে। চিৎপুরের গদিতে বসে দলকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে না দিয়ে যদি ওই সব অঞ্চলে একবার ঢু মারা যায় তাহলে হয়তো সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

—"কিন্তু সে মার্কেট তৈরি করতে তো বেশ কিছু সময় লাগবে।"

উনি বললেন, "তা তো লাগবেই। হয়তো এ বছরটা কষ্ট হবে, কিন্তু তারপর যখন বাংলাদেশের অবস্থা একটু ভালর দিকে যাবে তখন দেখবেন চিৎপুরে এখন যতগুলি দল আছে তার দেড়গুণ দল লাগবে সব জায়গাকার চাহিদা সামাল দিতে।"

বললাম, "তাহলে তো ভালই হবে। দল বাড়লে অনেক লোকের রুজি-রোজগার বাড়বে, নতুন নতুন পালা লেখা হবে, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নতুন কিছুর সন্ধান পাওয়া যাবে। চিৎপুরের বর্তমান মলিন চিত্রটি তো তখন খুবই উজ্জ্বল দেখাবে।"

উনি বললেন, "আমি তো সেই স্বপ্নই দেখি। কিন্তু বড় ভয় হয়—"

—"ভয় কেন?"

উনি বললেন, "যাত্রার বাজার এই অবস্থাতেও আরও ভাল হতে পারত। কিন্তু আমাদের নিজেদের সংকীর্ণতার জন্যই তা হতে পারছে না।"

—"সেটা আবার কিরকম?"

—"তাহলে বলি শুনুন। সম্প্রতি একটি দল আসামের একটি জায়গায় গান করতে গিয়েছিল। তিনটি পালা ওদের খুবই জমেছিল সেখানে। উদ্যোক্তারা খুব খুশি হয়ে দলের ম্যানেজারকে জানালেন যে, তাঁদের গান খুব ভাল লেগেছে। তারপর

একটি বিখ্যাত দলের নাম করে বললেন, আমাদের মতো সেই দলকে আনবার ইচ্ছা আছে তাঁদের। সেই দলের দুখানি পালা খুব ভাল হয়েছে বলে শুনেছেন তাঁরা। এ কথা শুনে ওই দলের ম্যানেজার কি বলেছে জানেন?"

—"কি বলেছে?"

—"বলেছে যে, দূর মশাই! আপনারাও যেমন। ও-দলের এখন আর আছে কী। সব ভেঙে অন্য দলে চলে গেছে। ও দলকে আনলে আপনাদের টাকাটা নির্ঘাৎ জলে যাবে—"

—"সে কি! এমন মিথ্যে কথা বলে লাভ!"

—"লাভ কিছুই না। স্বভাব। নইলে ওরা গেয়ে এসেছে, সুনাম পেয়েছে, টাকা পেয়েছে। ওদের যা প্রাপ্য সব পাবার পর অন্য একটা দল যদি দু' পয়সা পায়, একটু নাম করে, তাও যে কেন সহ্য হয় না তা ঈশ্বরই জানেন। এই মনোভাব নিয়ে এ জগতের উন্নতি কি করে হবে বলতে পারেন!"

—সূত্রধার

"চৈতালি"র মুক্তি আসন্ন

বনসাল রাজশ্রী প্রোডাকসন্স-এর সংগীত-বহুল প্রেমের ছবি "চৈতালি"-র মুক্তি আসন্ন। গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুধীর মুখার্জি। বিশ্বজিৎ, তনুজা, বসন্ত চৌধুরী, মনোমোহন (বম্বে) প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করেছেন শচীন দেববর্মণ।

শ্রীমতী দেবিকারাণীর সংবর্ধনা

অনেকদিন পর শ্রীমতী দেবিকারাণী ও তাঁর স্বামী বিখ্যাত চিত্রকর ডঃ স্বেতোস্লাভ রোয়েরিখ কলকাতায় এসেছিলেন গত সপ্তাহে। শ্রীমতী দেবিকারাণী এ বছরেই ভারত সরকারের "ফালকে পুরস্কার" পেয়েছেন। শ্রীমতী দেবিকারাণীকে গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন ক্যালকাটা আর্ট সোসায়েটি।

সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীমতী দেবিকারাণী বলেন, অনেকদিন বাদে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে তিনি আনন্দিত। বর্তমানে ফিল্ম নিয়ে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, শুধু সত্যজিৎ রায়ই নন আরও যাঁরা সিনেমার ক্ষেত্রে নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করছেন তাঁদের সকলের কাজের মধ্য দিয়ে এখনকার ফিল্ম উঁচু মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রী বি এন সরকার। বোম্বে টকীজের অতীত দিনগুলির কথা তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন এবং ভারতীয় সিনেমায় শ্রীমতী দেবিকারাণীর দানের কথাও তিনি বলেন। প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেন বিভাগীয় শ্রী এন এ মান্নুন। তিনিও শিল্পী হিসাবে শ্রীমতী দেবিকারাণীর দানের কথা উল্লেখ করেন।

আবিরে রাঙানো

পরিচালক অমল দত্তের "আবিরে রাঙানো" ছবির কাজ শেষ পর্যায়ে। মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের পটভূমিতে ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য। নতুন শিল্পীদের ছবির প্রধান ভূমিকায় নেওয়া হয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়।

"কানাগলি" নাট্যাভিনয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব সম্প্রতি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে "কানাগলি" নাটকটি অভিনয় করলেন। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটি খুবই উল্লেখযোগ্য হয়। অভিনয়ের জোরে নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে। প্রায় প্রতিটি শিল্পীর কাছেই ভাল অভিনয় আদায় করে দর্শকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন পরিচালক প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ক্ষেত্রে সবার আগে নাম করতে হয় গণেশের চরিত্রে হরিপদ খাসনবিশের। সৌমেন্দু ভট্টাচার্যের শ্যামসুন্দর ও পুতুল চক্রবর্তীর তরঙ্গও খুব মনোগ্রাহী হয়। সৌমেন রায় (বলরাম), রাণু রায় (করুণাময়ী), সুষমা মুখোপাধ্যায় (ছবি) ও বিনয় ভৌমিক (গোবিন্দ) দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন ভাল অভিনয় করে। অন্যান্য চরিত্রে শান্ত চৌধুরী, অনিল নাথ, নিখিলেন্দু চক্রবর্তী, সমীর গুপ্ত, নরে আলী, কিরণ চৌধুরী, বনমালী ভট্টাচার্য, দুর্গাশঙ্কর মণ্ডল ও শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রানুগ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব অভিনীত "কানাগলি" নাটকের একটি দৃশ্য

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বরানগর এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এই কেন্দ্রে এবার প্রাক্তন যুক্ত ফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বরানগরে প্রার্থী হিসাবে সি পি আই প্রার্থী শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেবার ফলে এখন প্রার্থী সংখ্যা মাত্র দু'জন—শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। অজয়বাবু এবার তমলুক এবং বরানগর দুটো কেন্দ্রেই দাঁড়াচ্ছেন। ১৯৬৭ সাল থেকেই অজয়বাবু দুটো কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন। সরকারীভাবে অজয়বাবু শুধু বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থী কিন্তু তাঁকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন আদি ও নব কংগ্রেস। আট পার্টি জোটও তাদের প্রার্থী বরানগর থেকে তুলে নিয়েছেন। জ্যোতিবাবু আনুষ্ঠানিকভাবেই ছয় পার্টি জোট অর্থাৎ ইউ এল এফ-এর প্রার্থী। এখন পর্যন্ত ওই জোটের বাইরের কেউ তাঁকে সমর্থন জানান নি। শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় জনসঙ্ঘের পক্ষ থেকে শ্রীমুখার্জিকে আন্তরিক সমর্থন জানান।

দেশী সংবাদ

৮ ফেব্রুয়ারি—পূর্ব রেলের ধানবাদ ডিভিসনে রেলকর্মী ধর্মঘট পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। কর্মীরা কাজে যোগ দিচ্ছেন এবং কয়লা-খনি অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। গ্রাণ্ড লাইনে কিছু ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে বলেও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৮,০০০ ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রের জন্য ৯২,০০০ ব্যালট বাক্সের প্রয়োজন হবে। ভোটের জন্য ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটপত্র, ৩৩ রকমের ১১,৫০০ প্রতীক ব্লক, ৩৫ হাজার বোতল কালি, ৬০ হাজার স্ট্যাম্প প্যাড, ৩২ রকমের ১০ লক্ষ ফরম, ২৫০০ টন কাগজ এবং ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রগুলির জন্য ১ লক্ষ ৭৫,০০০ কর্মী দরকার হবে।

৯ ফেব্রুয়ারি—শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ সকালে বরানগর কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। সি পি আই রাজ্য নেতৃত্বও ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন যে, বরানগর কেন্দ্রে তাঁরা অজয়বাবুর সমর্থনে প্রার্থী তুলে নেবেন। বরানগরে তাই অজয়বাবু এবং জ্যোতি-বাবু সম্মুখ সমরে নামবেন।

আগামী নির্বাচনে সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে নব কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযদুগোপাল রায় সোমবার রাত্রে তাঁর বাড়ির কাছে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। শ্রীরায় বীরভূম জেলার কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া এদিন আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন।

১০ ফেব্রুয়ারি—কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম-চারীদের হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে কেরল রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা আজ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। এদিকে কেরল সরকার জল সরবরাহ, হাসপাতাল জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অত্যাবশ্যক সার্ভিস বলে ঘোষণা করে বলেন, এই সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট বেআইনী বলে বিবেচিত হবে।

চিফ ইলেকশন কমিশনার শ্রীসেনবর্মা দিল্লি থেকে কলকাতা মহাকরণে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, নানান অসুবিধা সত্ত্বেও যে করেই হোক ১৩ মারচের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও লোক-সভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে হবে।

১১ ফেব্রুয়ারি—নিখিল ভারত বন্দর ও ডককর্মী ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এস আর কুলকারনী বোম্বাইয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, আন্তর্জাতিক পরিবহণ কর্মী ফেডারেশন পাকি-

স্তান সরকার যদি দুজন বিমানদস্যুকে ভারতে ফিরিয়ে দিতে অসম্মত হন, তাহলে পৃথিবীর সর্বত্র পাকিস্তানের সমস্ত ব্যবসায়িক বিমানকে বয়কট করবে।
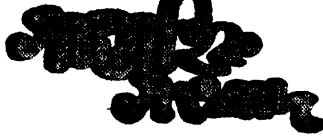
ভারতের বর্তমান মুদ্রা-স্ফীতির পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে এবং বর্তমান মূল্যমান যদি আরও বেড়ে যায়, তা হলে ভারতকে আবার টাকার মূল্য হ্রাসের মত অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। রিজারভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভরনর শ্রী এইচ ভি আর আয়েঙ্গার এই সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি—আজ রাজ্যপালের ভূমি রাজস্ব দফতরের উপদেষ্টা এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান যে, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে সম্প্রতি সংশোধিত পরিবার ভিত্তিক ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর হচ্ছে। ওই সংশোধনের ফলে ২ থেকে ৩ লক্ষ একর জমি সরকারে বর্তাবে এবং তা ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য পাওয়া যাবে। সেচ এলাকায় ৫ জনের অধিক পরিবার সাড়ে ১২ একর এবং সেচহীন এলাকায় পরিবার সাড়ে ১৭॥ একর জমি সর্বোচ্চ বলে ধার্য করা হবে।

১৩ ফেব্রুয়ারি—আজ হাবড়া থানা ঘেরাও মুক্ত ও জনতার বিক্ষোভ আয়ত্তে আনার জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করতে হয়। ধৃত বন্দী-দের মুক্তির দাবিতে একদল লোক বিক্ষোভ দেখালে পুলিস লাঠি চারজ করে। এরপর ছাত্ররা ট্রেন আটক করে, বাস-লরি ধর্মঘট হয়ে যায়। এ ছাড়া আগের রাতে কল্যাণগড়ে পি এস পি নেতা জিতেন চক্রবর্তীকে একদল লোক বাড়ি চড়াও হয়ে খুন করে বলে জানা গিয়েছে।

আজ রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে বাংলাভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য রচনার জন্য লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-কারী অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভি এ নভিকোভাকে ১৯৭০ সালের জন্য রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৪ ফেব্রুয়ারি—আজ দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় এক সপ্তাহব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর ওই ধর্মঘট মেটে। আই এন টি ইউ সি নেতা জানান, ব্লাস্ট ফারনেস এবং সিনটারিং বিভাগের আঠারশ' শ্রমিক এককালীন ১৬৫ টাকা করে পাবেন।

আজ সকালে হাবড়া এলাকায় পি এস পি নেতা জিতেন চক্রবর্তীর মৃতদেহ হাবড়া থানা এলাকার কয়াডাঙায় একটি ঝিলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর মাথা কাটা এবং শরীরের নানা স্থানে বহু আঘাতের চিহ্ন ছিল। মাথার খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। আগের রাতে কল্যাণগড়ে তাঁর বাড়ি চড়াও হয়ে তাঁকে খুন করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

৮ ফেব্রুয়ারি—কয়েক হাজার দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য আজ লাওসের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য: উত্তর ভিয়েতনামীদের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ হো চি মিন সড়ক ধ্বংস করা—যে কাজটি আমেরিকা ছয় বছর ধরে বোমা ফেলে করতে পারেনি।

৯ ফেব্রুয়ারি—জাপানের উত্তর উপকূলের সমুদ্রে যে সকল চিংড়িমাছ ধরা পড়ছে—সেগুলি অতিবিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় পদার্থ "কোবাল্ট-৬০" দ্বারা বিষাক্ত হয়ে রয়েছে। জাপানের চারটি পরমাণু-বিদ্যুৎ কারখানার আবর্জনা ওইখানেই নিক্ষেপ করা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারি—প্রকাশ, দক্ষিণ ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিবেচনার জন্য লাওসের ব্যাপারে আন্ত-র্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একটা জরুরী বৈঠক ডাকা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে ভারত।

১১ ফেব্রুয়ারি—পারমাণবিক অস্ত্র এবং ব্যাপক ধ্বংসকারী সক্ষম মারণাস্ত্রের সমুদ্রগর্ভে বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ভারত এই চুক্তিটি পরীক্ষা করে দেখছেন বলে প্রকাশ। ভারত পরে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে।

১২ ফেব্রুয়ারি—লাওস সরকার আজ সারা রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। দক্ষিণ লাওসে হো চি মিন অনুপ্রবেশ সড়কে উত্তর ভিয়েতনামী সৈন্যদের প্রবল সংঘর্ষের খবর পাওয়ায় এই জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। গত-কাল মন্ত্রিসভায় জরুরী অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের সংবিধান রচনা শুরুর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৮ ফেব্রুয়ারি নাগাদ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন বলে আজ পাকিস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া ১২০ দিনের মধ্যে পরিষদের বৈঠক ডাকার আদেশ দিয়েছেন। তা না হলে তিনি পরিষদ ভেঙে দেবেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি—আজ করাচির একটি কাপড়ের কলে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিসের কয়েক ঘণ্টা লড়াইয়ের পরে পুলিস এক হাজার শ্রমিককে গ্রেফতার করে এবং কারখানার দখল নেয়। ওই কারখানাটি শ্রমিকরা গতকাল দখল করে নিয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলকে ভিতরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
অকল্পনীয় হত্যা—তবুও নির্বাচন!	...	৩২৫
ব্যঙ্গচিত্র—	...	৩২৬
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	...	৩২৭
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	...	৩২৮
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	৩৩০
প্রণম্য নেতার মর্মান্তিক জীবনাবসান—	...	৩৩১
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৩৩২
মহাত্মীত এণ্ড্রুজ (কবিতা)—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী	...	৩৩৩
দীনবন্ধু, হে এণ্ডরুজ (কবিতা)—বনফুল	...	৩৩৪

অবোধ শিশু

মা!
আপনি তো জানেন,
সর্দি বসে গেলে
বাড়াবাড়ি হতে পারে।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব লাগান। সর্দির সবরকম ভোগান্তি আপনি এড়াতে পারবেন। বুকে সর্দি বসার ভয় থাকবে না।

ধরুন, বাচ্চার সবে সর্দি লেগেছে;—নাক দিয়ে জল পড়া শুরু হয়েছে—গলা খুস্ খুস্ করছে। তক্ষুনি যদি এর একটা ব্যবস্থা না করেন তাহলে এই সর্দি বুকে বসে গিয়ে শুরু হতে পারে নানান্ ভোগান্তি—নাক বন্ধ হয়ে নিশ্বাসের কষ্ট, গা ব্যথা, কাশি - কিছু আর বাকি থাকবে না - অযথা কষ্ট ভোগ করবে বেচারা।

সর্দির লক্ষণ দেখা দিলেই যদি ভিক্স ভেপোরাব লাগানো যায়, কোনো কষ্ট পেতে হয় না— বুকে সর্দি বসার ভয় থাকে না।

আর একটা কথা! ভিক্স ভেপোরাব লাগাতে হবে সেই সব জায়গায় - যেখানে ঠাণ্ডা বেশী লাগে,- যেমন নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে।

খুবই সহজ কাজ! তেতো বড়ি না, বিচ্ছিরি মিক্সচার খাওয়াতে হবে না।

ভিক্স ভেপোরাব কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে,
— সর্দির কষ্ট থেকে আরাম দেয় দু'ভাবে —

১)
বাইরে থেকে গায়ে

২)
ভেতর থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে

১) বুকে পিঠে লাগালে গায়ের বেদনা দূর করে-
২) গায়ে লাগাতেই ভিক্স গলে যে ভাপ বেরোয় তাতে ভিক্সের যাবতীয় ওষুধের গুণ বজায় থাকে। এই ভাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে, গলা আর বুকের সর্দি গলিয়ে দিয়ে আপনাকে সুস্থ ক'রে তোলে।

সব সময়ে মনে রাখবেন।

সবচেয়ে সুফল যদি তাড়াতাড়ি পেতে চান তো ভিক্স ভেপোরাব যথেষ্ট পরিমাণে লাগান—১৯ গ্রামের পুরো এক শিশি, -বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ৮ বার আর বড়দের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪ বার লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

সর্দির শুরুতেই ভিক্স ভেপোরাব — নাকে, গলায়, বুকে, পিঠে ভাল ক'রে মালিশ করুন। যতক্ষণ না আরাম পাচ্ছেন, এই চিকিৎসা চালিয়ে যান।

নতুন ১২ গ্রামের বড় টিন

সর্দি বসতে দেবেন না! সর্দি শুরু হলেই ভিক্স ভেপোরাব!

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কয়েদখানা	শ্রীপ্রবোধ সেন	... ৩৩৫
ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	... ৩৪৩
এই তার পুরস্কার	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	... ৩৪৯
দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকী	শ্রীকালী বিশ্বাস	... ৩৫৯
রত্ন ও শ্রীমতী	শ্রীঅন্নদাশংকর রায়	... ৩৬৭
বিশ্ববিজ্ঞান	শ্রীসমরজিৎ কর	... ৩৭৩
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা	ফাদার দ্যতিয়েন	... ৩৮১
গানের আসর	শার্ঙ্গদেব	... ৩৮৫
ভারতের অর্থনীতি	শ্রীসুব্রত গুপ্ত	... ৩৮৯
ঘরে-বাইরে	শ্রীমতী	... ৩৯১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আলোচনা—		... ৩৯৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		... ৪০১
পুস্তক পরিচয়—		.. ৪০৩
খেলার মাঠে—একলব্য		... ৪০৭
হকি খেলার গোড়ার কথা—মুকুল		... ৪০৯
অরণ্যদেব—		... ৪১৩
রঙ্গজগৎ—		... ৪১১
সাপ্তাহিক সংবাদ—		... ৪১৬

NEKO
Germicidal Soap
PARKE DAVIS

নতুন
'স্বাভাবিক চেকনাই'
ফরমুলার কারণে
টাটার শ্যাম্পু
আপনার চুলকে
আগের চাইতে আরও
নরম, রেশম-কোমল,
আরও পুষ্ট ক'রে
তোলে!
অজস্র ফেনা...
পরিষ্কার
চুলের চেকনাই...
কত সহজেই জায়গামত বসে
টাটার শ্যাম্পুর নতুন 'স্বাভাবিক চেকনাই' ফরমুলা আপনার চুলে কী তফাৎ এনে দেয় নিজেই দেখুন। আপনার চুল পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে চুল পুষ্ট রাখে, তাই আপনার চুল আরও নরম, রেশম-কোমল হয়ে ওঠে এবং আগের চাইতে আরও সহজে জায়গামত বসে। মনে রাখবেন, টাটার শ্যাম্পু বিশুদ্ধ নারকেল তেল থেকে তৈরী— আপনার চুলের পক্ষে খুবই ভাল।
৩ সাইজে পাওয়া যায়। পরিবারের সকলের ব্যবহারের উপযোগী বড় ইকনমি বোতল কিনুন।
বিশেষ সুযোগ। 'চিরন্তনী ও আধুনিক কেশসজ্জার সচিত্র পুস্তিকা' বিনামূল্যে পাবার জন্য এই কুপনটি কেটে ও সেই সঙ্গে ৫০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে এই ঠিকানায় পত্র লিখুন : দি টাটা অয়েল মিলস কোম্পানী লিমিটেড, বম্বে হাউস, ব্রুস ষ্ট্রীট, বোম্বাই-১।
10
নতুন
উন্নত
ফরমুলা
NEW!
IMPROVED
Tata's
SHAMPOO
টাটার-এই শ্যাম্পু ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়
Bensons 3163-AR-Ben

নির্ভয়ে ভোট দিন

আপনার ভোট একান্ত গোপন

এস পি সেনবর্মা
মুখ্য নির্বাচন সচিব

KUTTY
APOLOGIES TO
THE
ADVT.

সিউড়িতে নব কংগ্রেস প্রার্থী মদনগোপাল রায়, বর্ধমানের উখড়ায় বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মণ্ডল এবং শ্যামপুকুরে ফরোয়ারড ব্লক প্রার্থী সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা হেমন্ত বসু, আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন ফ্রি অ্যানড ফেয়ার ইলেকশন, পশ্চিমবঙ্গে এই অবাধ পৈশাচিক হত্যালীলার মধ্যে সম্ভব নয়।

এমনটা যে ঘটবে সে আশঙ্কা অনেকেই নানাভাবে প্রকাশ করে আসছেন। এখন আমাদের সামনে দুটো পথ। (এক) নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া বা মুলতুবি রাখা এবং (দুই) অবাধ নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

এতটা এগিয়ে এসে নির্বাচন বন্ধ করে দিলে বা কিছু দিন পিছিয়ে দিলে কী সুবিধে হবে। যদি এই হয় যে, সমাজজীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে, নির্বাচন বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার উপশম হবে, তা হলেও না-হয় নির্বাচন বন্ধ করে দেবার মানে হয়। কিন্তু কে আজ এই গ্যারান্টি দেবেন যে, নির্বাচন স্থগিত রাখলেই খুন জখম আপসে বন্ধ হয়ে যাবে? যাবে না। খুন জখম নির্বাচন হচ্ছে বলেই শুরু হয়েছে, তা তো নয়। খুন জখম চলছিলই, তারই মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। খুনের সঙ্গে জখম হওয়া বা না-হওয়া নির্বাচন হওয়া বা না-হওয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়।

তবে, অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা [illegible] যদি আগামী নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে, তার কারণ এই। পর পর কয়েকজন নির্বাচনপ্রার্থীর হত্যা ভোটদাতাদের মনে স্বভাবতই নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার করবে, যার অনিবার্য ফল হবে ভোটদাতার সংখ্যা হ্রাস। এবং যে নির্বাচনে ভোটদাতারা ভোট দিতে আসতে ভয় পান, সে নির্বাচন গণতন্ত্রকে উপহাস করে এবং হিংসাত্মক পরিবেশের মধ্যে অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন কিছুতেই অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

কমরেড চারু মজুমদারের গোষ্ঠীই নীতিগতভাবে নির্বাচন-বিরোধী। এ ছাড়া বিপ্লবী এবং অবিপ্লবী সকল দলই নির্বাচনে নেমেছেন। নির্বাচনপ্রার্থীদের হত্যার পিছনে নির্বাচন-বিরোধী এবং নির্বাচন-সমর্থক এই উভয় দলেরই হাত থাকা সম্ভব। নির্বাচন-বিরোধীদের যৌক্তিক বা অভিসন্ধি এই যে, নির্বাচনপ্রার্থী, নির্বাচনকর্মী প্রভৃতিকে হত্যা করলেই নির্বাচন ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অপর দিকে নির্বাচন-সমর্থক বিপ্লবে বিশ্বাসী দলের পক্ষে প্রতিপক্ষের জবরদস্ত প্রার্থীকে খুন করে পথের কাঁটা অপসারণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যাঁরা নির্বাচনে নেমেছেন, তাঁরা সকলেই সত্যই ফ্রি অ্যানড ফেয়ার ইলেকশনে বিশ্বাসী কিনা, তা যাচাই-এর দিন আজ এসে গিয়েছে। তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন, প্রতিহিংসার রাজনীতি বদলার রাজনীতি, হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি তাঁরা বর্জন করেছেন। দলীয় কর্মীদের উপর নেতৃবৃন্দ প্রভাব বিস্তার করুন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য উগ্রচণ্ডা ক্যাডারদের উপর চাপ সৃষ্টি করুন। এইভাবে হিংসার কবল থেকে প্রথমে নিজেদের মুক্ত করে নিন এবং তারপর দলমত নির্বিশেষে নির্বাচন-সমর্থক দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন-বিরোধীদের নির্বাচন ভণ্ডুল করে দেবার অপচেষ্টা বানচাল করে দিতে এগিয়ে আসুন। নির্বাচনের আগে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব যে সরকারী যন্ত্র গ্রহণ করেছে, শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের জন্য, ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দেবার পবিত্র অধিকার প্রয়োগ করতে সমর্থ হন তার জন্য সেই সরকারী যন্ত্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।

নির্বাচন কমিশনের উচিত, অবিলম্বে নির্বাচন-সমর্থক দলগুলোকে আহ্বান জানিয়ে, যাতে তাঁরা নির্বাচনের সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেন তার জন্য নির্দিষ্ট কতগুলি নীতির ভিত্তিতে দলমত নির্বিশেষে এক নির্বাচনী মোরচা গড়ে তোলা। যদি এই ধরনের এক মোরচা গড়ে তোলা যায় তা হলেই এবং একমাত্র তা হলেই নির্বাচন-বিরোধীদের নির্বাচন ভণ্ডুল করে দেবার সব রকম প্রচেষ্টা বানচাল করে দেওয়া সম্ভব। এবং এর জন্য পুলিস ও মিলিটারির সহায়তা গ্রহণ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

হে নির্বাচন-সমর্থক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ! আপনারা যখন নির্বাচনকেই শক্তি পরীক্ষার কষ্টিপাথর হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, তখন আর ভাবের ঘরে চুরি করে কী লাভ! সুষ্ঠু নির্বাচনের শর্ত পালন করাই এখন আপনাদের পবিত্র কর্তব্য। নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যই আপনাকে এ খেলায় জয়ী হবার চেষ্টা করতে হবে। এবং নির্বাচন মেনে নেওয়া মানেই যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের যাবতীয় নিয়ম এবং শৃঙ্খলা মেনে নেওয়া, সে কথা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু এই নিয়মকানুনগুলি আপনাদের কর্মীদের সকলে সব ক্ষেত্রে হয়ত মানেন না। আপনারা অনুগ্রহ করে যদি আপনাদের দলীয় কর্মীদেরও ওইসব নিয়মকানুন বুঝিয়ে দেন এবং তাঁরা সর্বদাই যাতে ওইগুলো পালন করে চলেন, সেইজন্য যদি ওঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তা হলেই রক্তারক্তি বন্ধ হয়ে যায়। এবং তা হলে আপনাদেরও অর্থাৎ উঁচুতলার নেতাদেরও আর খুনে খারাপির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয় না।

কিন্তু মুশকিল হয় তখন যখন আপনারা নির্বাচনেও নামেন আবার পাপবোধের যন্ত্রণা থেকে বৈপ্লবিক মানসিকতাকে মুক্ত করার জন্য নির্বাচনের আইনকানুনগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও করেন। তখনই আপনারা পরস্পরবিরোধী এক ধরনের দ্বৈত ব্যক্তিত্বের শিকার হয়ে ওঠেন। এই স্ববিরোধিতার ফলেই আপনারা আপনাদের উপাস্য দেবতা অর্থাৎ জনগণের বিচারশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অথচ আপনারা জানেন, জনসাধারণের ভোটই আপনাদের নির্বাচন-বৈতরণী পার হবার একমাত্র কড়ি। তাই সেটি ছলে বলে বা কৌশলে হাতিয়ে নেওয়াই আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যে মুহূর্তে সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান, অমনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আপনারা জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপের শিকার হয়ে পড়েন। এই দুষ্টচক্রের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ ভণ্ডামি বর্জন এবং জনসাধারণকে তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অবাধ সুযোগ দান। অবাধ নির্বাচনই নির্বাচন এবং এ ছাড়া তা ভণ্ডামি মাত্র।

পরিবর্তন

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ হেমন্তকুমার বসুকে বলেছিলেনঃ হেমন্তদা, একা একা বের হবেন না, দিন কাল ভাল নয়।

হেমন্তবাবু হেসে তাঁকে জবাব দিয়েছিলেনঃ কী যে বল, আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে কে কী করবে! তোমরাই সাবধানে থেক, তোমাদের উপর অনেকেরই রাগ আছে।

অনেকের মতই হেমন্তবাবুও জানতেন না আমাদের দেশের একদল ছেলের, একদল লোকের, একদল মানুষের মানসিকতা কীভাবে কতটা পাল্টে গিয়েছে।

জানতেন না যে সেইসব ছেলের কাছে, সেইসব লোকের কাছে, সেই সব মানুষের কাছে যুবা বৃদ্ধ, নারী পুরুষ, শিশু, বালক, রুগ্ন সুস্থ, পাপী নিষ্পাপীর কোনও প্রশ্ন নেই—তারা অনায়াসে বিনা সংকোচে সামান্যও দ্বিধা না করে যার তার প্রাণ নিতে পারে, যাকে তাকে নৃশংসতম ভাবে হত্যা করতে পারে।

কেন পারে? কারণ এদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। এরা মানুষ হয়ে জন্মেও আর সেই মানুষ নেই। এতদিন মানুষের সাধারণ দোষগুণ, দয়ামায়া, বিবেক, বোধশক্তি বলে আমরা যা জানতাম এরা তা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ কী করতে পারে না পারে তা নিয়ে হিসেব নিকেশ করা যায়; কিন্তু এরা কি করতে পারে না পারে তার হিসেব নিকেশ চলে না। কারণ, এদের মানসিকতা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছে। কারণ, এরা আর সে মানুষ নেই—দোষে গুণে যে মানুষকে এতদিন আমরা চিনতাম। চোখের সামনে দেখিয়ে দেখতাম।

আমাদের মধ্যে কিছু লোক বেশ কিছুদিন থেকেই পাল্টে যাচ্ছে। ধরুন রোগীর ওষুধ জাল করে, শিশুখাদ্য নিয়ে কালোবাজারী করে, গরীব নিরক্ষর লোককে ঠকায় তাদের মানসিকতার কথা। তারাও কি স্বাভাবিক মানুষ? কোনও সত্য সুস্থ লোক তাদের পূর্ণ মানুষ বলতে পারবেন?

আমরা তাদের দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। ওষুধ জাল করে বা শিশুখাদ্য নিয়ে কালোবাজারী করা বা গরীব নিরক্ষর নিঃসহায় মানুষকে ঠকানোর ঘটনা শুনলে বা দেখলে তাই আমরা এখন আর চমকে উঠি না। কারণ, ওগুলিকে আমরা স্বাভাবিক জিনিস মনে করি।

হত্যা, খুন, হাঙ্গামাও এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের কাছে ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠবে। এখন কিছু লোকের, কিছু ছেলের মানসিকতা পাল্টে গিয়েছে—এইভাবে ঘটনা প্রবাহ এগোলে গোটা সমাজের মানসিকতা আস্তে আস্তে পাল্টে যাবে।

*

আমরা হেমন্ত বসুর বীভৎস হত্যাকাণ্ডের খবরে বিস্মিত। কারণ ভাবতেই পারছি না যে হেমন্ত বসুর মত একজন-

মানুষকে কেউ হত্যা করতে পারে। যে লোক সারা জীবন মানুষের, সাধারণ গরীব মানুষের দুঃখে, উপকার করে গেলেন—জীবনের শেষ প্রান্তে আসার পর কেউ তাঁকে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে পারে—এটা আমাদের চলতি বিবেচনা শক্তিতে ভাবাই যায় না।

কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করেন, যদি সেই পটভূমিতে হেমন্ত বসুর হত্যা-কাণ্ডকে দেখেন তাহলে কি মনে হওয়া উচিত নয় যে এইরকম ঘটনা স্বাভাবিক? হেমন্ত বসু বৃদ্ধ, হেমন্ত বসু অজাতশত্রু, হেমন্ত বসু চিরজীবন সাধারণ মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যারা তাঁকে মেরেছে তাদের কাছে এসবের কোনও মূল্য আছে? হেমন্ত বসু, বলেছিলেন, আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে কে কী করবে? যারা তাঁকে মেরেছে তাদের কাছে যুবক এবং বৃদ্ধে কোনও তফাত আছে? শিশুর কোনও মূল্য আছে তাদের বিচারে?

এইটাই নতুন মানসিকতা। এই মানসিকতার মানে এখনও আমরা বুঝছি না। হয়ত কোনও দিনই বুঝব না। কিন্তু এই মানসিকতা যে আজকের পশ্চিমবঙ্গে বাস্তব তা বুঝতে আর কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

সেদিন শুনেছিলাম, কিছু ছেলে তাদের এক বন্ধুর মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে সৎকার করতে যাচ্ছিল। তাদের উপরও বোমা পড়ে। তারও দু'তিন দিন আগেই শুনেছি চারটি মৃতপ্রায় ছেলের কথা। ঘিরে ধরে তাদের খুন করা হয়। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। আর একজন কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল। "জল" "জল" বলে চিৎকার করছিল। পাশে কিছু মহিলাও দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। কেউ এক গ্লাস জল এনে দেননি।

এসবও কি সেই একই মানসিকতা নয়?

*

এই মানসিকতার ফলেই খুন, নৃশংসতম নির্বিচার খুন বাড়তে বাধা। এর শেষ এত চট করে হতে পারে না। হবেও না। এই মানসিকতার প্রকোপ থেকে এর স্রষ্টারাও বাদ যাবেন না। যেতে পারেন না।

কারণ, এই মানসিকতা এখনও এই সমাজের খুব সামান্য লোকের মধ্যে এসে থাকলেও যাদের মধ্যে আসেনি তাঁরা সবাই বোবা দর্শক মাত্র। সরকার ব্যর্থ। নেতারা এবং দলগুলি যে যার নিজের কাজ হাসিলে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষ ভীরু দর্শক।

এ মানসিকতা পাল্টাবে কে?

নবারুণ গুপ্ত

... তিনি বিপ্লবের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সনে ... ও ... যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হয় তাতে তিনি সক্রিয় অংশ নেন। ওই বছরই ডাক্তারখানায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয়।

১৯১৭ সনে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯২০ সনে যুদ্ধ থেকে ফিরে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ১৯২২ সনে তিনি উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন এবং আনন্দবাজার

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে

উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা মিলিয়ে দু মহাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র আছে গোটা ছাব্বিশ। এদের মধ্যে প্রতিপত্তি আর পয়সা কড়ি সবচেয়ে বেশী মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের। আমেরিকান মধুচক্রের সেই হচ্ছে মক্ষীরাণী। এদের মধ্যে যে কটা দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে রয়েছে তারা ছাড়া বাকী সবাই স্বাধীন হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মেনে চলে—অন্তত সেদিন পর্যন্ত চলেছে। পুরো দক্ষিণ আমেরিকাকে এক রকম মার্কিন সাম্রাজ্য বলে গণ্য করা হতো বারো বছর আগেও। হেন দেশ সেখানে নেই যেখানে আমেরিকার কোটি কোটি ডলার না খাটছে। মার্কিন বিরোধী কোনও সরকার যাতে কোথাও ক্ষমতা দখল করতে না পারে সেদিকে ছিল আমেরিকার কড়া নজর। দরকার হলে হুমকি তো দেওয়া হয়েছেই, সৈনাসামন্ত কিংবা জঙ্গী জাহাজ পাঠাতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিধা করেনি।

তার সাথে বাদ সেধেছে প্রথম কিউবা যখন সেখানে ক্ষমতা দখল করলেন ডঃ ফিডেল কাস্ত্রো ১৯৫৯ সনের পয়লা জানুয়ারি। আমেরিকার দু মহাদেশে ওই হলো প্রথম কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের পত্তন। তার উচ্ছেদ করার জন্যে চেষ্টা ওয়াশিংটন থেকে কম করা হয়নি। কিন্তু কাস্ত্রো দিব্যি কিউবার ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসে আছেন। তাঁর প্রতিপত্তি একটুও কমেনি, কমবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। ১৯৬১ সনে বে অব্ পিগসের অভিযান ব্যর্থ হবার পর কিউবাতে হানা দেওয়ার দুঃসাহস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেউ আর দেখায়নি। তবে ও অঞ্চলে এখন তিনি আর একা সাম্যবাদী রাম নন, তাঁর সুগ্রীব দোসরও জুটেছে চিলিতে। সে দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি ডঃ আলেন্ডি হচ্ছেন মার্ক্সবাদী। আমেরিকাতে তিনিই প্রথম কমরেড প্রেসিডেন্ট। জোর করে তিনি গদি দখল করেননি, পেয়েছেন নির্বাচনে জিতে। এর আগে আমেরিকাতে কেন, দুনিয়ার কোথাও ভোটে জিতে কোনও কম্যুনিস্ট প্রার্থী রাষ্ট্রপ্রধানের আসনে গদিয়ান হয়ে বসতে পারেননি। নতুন নজির খাড়া করেছেন ডঃ আলেন্ডি।

কিউবা-চিলির দেখাদেখি আমেরিকার সব দেশই কম্যুনিস্টদের হাতে নিজেদের ভাগ্য সঁপে দেবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে বামপন্থীদের জোর গোটা দক্ষিণ আমেরিকাতে ক্রমশই বাড়ছে। গেল বছর নভেম্বর মাসে বলিভিয়াতে ক্ষমতা জবর দখল করেছেন জেনারেল জুয়ান জোসে টোরেজ। তিনি বামপন্থী। মাস কয়েক আগে মাত্র তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে এক রকম চাপে পড়ে অবসর নিতে হয়েছিল। ভাগ্যচক্রে এখন তিনি বলিভিয়ায় খোদ রাষ্ট্রপতি।

দেশকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিন আর নাই দিন, মার্কিন পুঁজিপতিদের বোলবোলাও তিনি শেষ করে ছাড়বেন বলে পণ করেছেন। ও দেশে খনি আর শিল্প সরকারের দখলে আনা শুরু হয়েছে অনেক দিন আগেই। ১৯৫২ সনে খনিগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। পেট্রোল কোম্পানি সরকারের তাঁবে আনা হয়েছে মাত্র দু বছর আগে। কেবল বলিভিয়াতে নয়, মার্কিন পুঁজির দিন ঘনিয়ে এসেছে পেরুতেও। সেখানেও জঙ্গী সরকার দেশ শাসন করছেন। সে সরকারও বামপন্থী। বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে জেহাদ সেখানেও চলছে অন্তত বছর তিনেক। ১৯৬৮ সনে বিপ্লবী সরকার সেখানকার ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর তিনের খনি নিজেদের মালিকানায় নিয়ে এসেছেন।

এমনই চলছে আমেরিকার দেশে দেশে। যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তারা ক্রমশই খাপ্পা হয়ে উঠছে। তাকে মুরুব্বি বলে মানতে আজ তারা নারাজ। যে আমেরিকান রাষ্ট্রসংঘ (অর্গানিজেসন অব আমেরিকান স্টেটস্) ছিল তার হাতের মুঠোর মধ্যে তাও যেন ফসকে যাচ্ছে। আমেরিকার চব্বিশটা দেশ ও সংঘের সদস্য। নেই কানাডা আর গুয়েনা। কানাডা এতকাল নিজের চরকাতেই তেল দিয়ে এসেছে। গোটা আমেরিকার সমস্যা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি বলেই ওই সংঘের বাইরে ছিল। এখন তারও নাকি মতি ফিরেছে, সেও সংঘে যোগ দিতে চায়। গুয়েনা সদ্য স্বাধীন দেশ। কানাডার মতো কমনওয়েলথের সভ্য। যতদিন সে দেশে ছিল ইংরেজদের প্রভুত্ব ততদিন আমেরিকান রাষ্ট্র সংঘের মতো স্বাধীন দেশের সংগঠনে যোগ দেবার তার অধিকার ছিল না। সে অধিকার এখন সে পেয়েছে। কাজেই সংঘে সে ঢুকতেও পারে—যেমন ঢুকেছে বার্বাডোজ, জামাইকা, ট্রিনিডাড ও টোবাগো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভেঙে যে সব স্বাধীন দেশ গড়ে উঠেছে তাদের তিনটে সংঘে ঢুকে পড়েছে। বাকী গুয়েনা কী আর বাদ যাবে

কিন্তু সে সংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাল হয়েছে তাতে তাকে জিইয়ে রাখা উৎসাহ তার ক্রমেই ঝিমিয়ে আসছে ইদানীং কূটনীতিকদের গুম করার ঘট দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে এত ঘট যে সারা দুনিয়াতে তা নিয়ে হইচই চলছে সে মহাদেশের সব দেশ যদি একসঙ্গে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার আয়োজন করে হলে হয়তো সমস্যাটা মিটতে পারে, এই

করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংঘের একটা বৈঠক ডেকেছিল জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ওয়াশিংটনে। আগে থেকেই দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণপন্থী দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল যাতে তারা এ ব্যাপারে খুব কড়া নিয়ম-কানুন তৈরি করতে রাজী হয়। কিউবা ও সংঘের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছে। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভরসা ছিল তার মতেই সবাই মত দেবে। তা কিন্তু হয়নি। বিস্তর তর্কবিতর্কের পর আপসে রাজী হতে হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। তাতে বেঁকে বসলো মার্কিন বান্ধবরা। তারা বৈঠক ছেড়ে বেরিয়েই গেল। মুখ রক্ষে করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মানতে হলো অধিকাংশের দাবী। এখন ঠিক হয়েছে যারা বিদেশী কূটনীতিকদের গুম করে বসবে তাদের কোনও সরকারই আশ্রয় দেবে না। দরকার হলে তাদের দেশে ফিরে পাঠিয়ে রীতিমত বিচারের ব্যবস্থাও হবে। এ সিদ্ধান্ত অবশ্য কাঁচা। পাকা হবে প্রত্যেকটি সরকার যদি আনুষ্ঠানিকভাবে এটি মেনে নেয়।

যতটা কড়া কানুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল ততটা না হলেও কিছু সে অন্তত পেয়েছে এ ব্যাপারে। কিন্তু ফাঁপরে পড়েছে মার্কিন সরকার ও বৈঠকের আর একটা প্রস্তাবে। সেটা হচ্ছে দেশের উপকূলে সমুদ্রের ওপর অধিকার নিয়ে। সমুদ্রের ধারে যে সব দেশ তাদের আশে পাশে সামুদ্রিক এলাকাকেও ধরে নেওয়া হয় তাদেরই অংশ বলে। কিন্তু তার বিস্তৃতি কতটা হবে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। উপকূল থেকে চার থেকে বারো মাইল পর্যন্ত সমুদ্রকে তাদের অংশ বলে ধরে নেওয়াই সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু ১৯৫২ সনে পেরু, চিলি আর ইকোয়েডর ঘোষণা করেছিল একসঙ্গে যে তাদের সামুদ্রিক সীমানা হবে ২০০ মাইল পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মানতে নারাজ—মানলে তার

বিদেশে (৫)

জুরিকের মত বিরাট এয়ারপোর্টে কী করে মানুষ একে অন্যকে খুঁজে পায় সেটা বোঝবার চেষ্টা করে ফেল মেরেছি। তাহলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখানকার কর্মচারীদের পেটেপেটে এলেম আছে। তাদেরই একজন আমার সামনে এসে বললে, "আপনার জন্য একটা মেসেজ আছে, স্যর।" আমি সত্যিই বিস্মিত হলুম। আমাকে এই সাহারা ভূমিতে চেনে কে? বললুম, "ভুল করেননি তো" "আজ্ঞে না। আমি জানি—" সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা আমার পুরো নামটি বলে দিল। যদিও সে এদেশেরই লোক তবু আমার মনে হল সে "দেশ" পত্রিকার "পঞ্চতন্ত্র" নিত্য সপ্তাহে পড়ে এবং তারই মারফত আমার ভালো নামটি পুরো পাকা রপ্ত করে নিয়েছে। হয়তো ডাকনামটাও জানে। হয়তো "চোম্বল" "কাবুলী" জাতীয় আমার সেই বিদকুটে ডাক নামটা সে পাঞ্চজন্য শঙ্খ-ধ্বনিতে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু এসব ভাববার চেয়ে ঢের বেশী জানতে চাই, কে আমাকে স্মরণ করলেন।

ও। কুমারী ফ্রিডি বাওমান্! কিন্তু ইনি জানলেন কি প্রকারে যে আমি আজ সকালে এখানে পৌঁচচ্ছি। তাঁর মেসেজ খুলে জিনিসটে পরিষ্কার হল। কলকাতা ছাড়ার পূর্বে এয়ার-ইণ্ডিয়ার ইয়ারবা শুধিয়েছিলেন, জুরিকে আমার কোনো পরিচিতজন আছেন কি না, কেননা এখানে আমাকে কনেকশনের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। খবর পাঠালে ওঁরা হয় তো এয়ারপোর্টে এসে আমাকে সঙ্গসুখ দেবেন। আমি উত্তরে বলেছিলুম, জুরিকে নেই, তবে সেখান থেকে ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে লাৎসের্ন শহরে একটি পরিচিতা মহিলা আছেন এবং তাঁর নাম ঠিকানা দিয়েছিলুম। এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম দেবার। "দয়ার প্রস্তুত গাড়ি" "গাড়ুর পাটালি; কিছু ঝুনো নারিকেল; দুই ভাণ্ড সরিষার তেল; আমসত্ত্ব আমচুর—" এর মাঝখানে কবিগুরু যদি তাঁর প্রিয়া কন্যাকে ভুলে যান তবে সাতান্নটা হাবিজাবির মাঝখানে আমি যে এটা মনে রাখিনি তার জন্য সদয় পাঠক রাগত হবেন না।

কিন্তু এই সম্বন্ধে সেই খাঁটি জাত-সুইস মহিলাটির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই। ফ্রিডি বাওমান। ১৯৩২/৩৩-এ ইনি সেই মহারাজা সয়াজী রাওয়ের বরোদা প্রাসাদে প্রবেশ করেন। আজকের দিনে ক্রিকেট কিংবা/এবং পলিটিকসের সঙ্গে যাঁদেরই সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন বরোদার শ্রীযুক্ত ফতেহ সিংরাও গায়কোয়াড়কে। এঁকে ফ্রিডির হাতেই তিনি পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অথবা, মস্তকাবতীর্ণ করেন। কিন্তু তার উপর আমি জোর দিচ্ছিনে। রাজা মহারাজা ভিখিরি আতুর পৃথিবীতে সবাই নামেন একই পদ্ধতিতে।

আসল কথা, ফতেহ সিং রাও মানুষ হন ফ্রিডির হাতে। তিনি অসাধারণ শিক্ষিতা রমণী—সেই চল্লিশ বছর বয়সেই। জর্মন, ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরিজি সব-কটাই বড় সুন্দর জানতেন। এ-দেশে এসেছিলেন বেকারীর জন্য নয়। রোমান্টিক হৃদয়; ইণ্ডিয়াটা দেখতে চেয়েছিলেন। গ্যোটে তাঁর প্রিয় কবি। গ্যোটের ভারতপ্রেম তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। ওদিকে তাঁর উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ার অভ্যাস চিরকালের। রাজপ্রাসাদের কাজকর্মও গুরুভার নয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যে কি করে তাঁর প্রিয়সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণীর মর্মস্থলে পৌঁছে গেলেন সেটা বুঝলুম যেদিন তিনি আমাকে বললেন যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি সেণ্ট ফ্রানসিস অসিসির ভক্ত। এবং সকলেই জানেন, এই সন্তটির সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমণ সন্ন্যাসী, সাধুসন্তের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য। একদিকে যেমন দরিদ্রনারায়ণের সেবা, অন্যদিকে ঠিক তেমনি পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে প্রভু খৃষ্টের সঙ্গে একাত্ম বোধ করাতে তিনি এ-দেশের মরমীয়া সাধক, ইরান-আরব-ভারতের সুফীদের সঙ্গে এমনই হরিহরাত্মা যে অনেক সময় বোঝা কঠিন কার জীবনবৃত্তান্ত পড়ছি। খৃষ্টানের, ভক্তের না সুফীর?

কিন্তু আমার কী প্রগলভতা যে আমি তাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ততম ইতিহাসও লিখতে পারি। "দেশ" পত্রিকার প্রিয়তম লেখক শ্রীযুক্ত [illegible] যদি বাঙলায় তাঁর জীবনী লেখেন তবে গৌড়জন তাহা আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

*

কুমারী ফ্রিডির কথা পরেরবার লিখব। কন্টিনেন্ট সেরে দেশে ফেরার পথে, লাৎসের্নে শ্রীমতীর বাড়িতে সপ্তাহাধিক-কাল ছিলুম—সেই সম্বন্ধে। উপস্থিত ফ্রিডি লিখেছেন, তিনি আমার (এয়ার-ইণ্ডিয়া মারফত) টেলেগ্রাম পেয়েছেন কাল রাত্রে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জুরিকের এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে জানালেন, আমি জুরিকে নেমেই যেন তাঁকে টেলিফোন করি। বরাবর তিনি বাড়িতেই থাকবেন।

মনে হয় কত সোজা। কিন্তু যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদের উপকারার্থে এ স্থলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করে রাখি।

প্রথমত আপনাকে টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করতে হবে। সে বুথ আবার সদ্‌ব্রাহ্মণ। আপন দেশের খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য খান না। অর্থাৎ তাঁর বাক্সে আপনাকে ফেলতে হবে এদেশের আপন সুইস মুদ্রা। অতএব খোঁজ-খোঁজা করুন, সে সাহারাতে, কোথায় সে পুণ্যভূমি যেখানে আপনার ডলার বা পৌণ্ডের বদলে সুইস মুদ্রা দেয়। সবাই তো ইংরিজি বোঝে না। ভুল বোঝে অনেকেই। তাই কেউ বলে ঐ তো সেথায়, কেউ বলবে তার জন্য যে শহরে যেতে হবে। শেষটায় পেলেন সেই কাউণ্টার পুণ্যভূমি—আমি অতি, অতি সংক্ষেপে সারছি। পেলেন সুইস মুদ্রা। তখন আবার ভুল করে যেন শুধু কাগজের নোট না নেন! কারণ ফোন বুথ [illegible] নন; তিনি চান মুদ্রা। সেই মুদ্রা আবার ঐ সাইজের হওয়া চাই। ঠ্যাঙস ঠ্যাঙস করে চললেন ফের ঐ পুণ্যভূমিতে। আরো বহুবিধ ফাঁড়া-গর্দিশ আছে। বাদ দিচ্ছি।

আহ্! কী আনন্দ!! কী আনন্দ!!!

"কে বলছেন? আমি ফ্রিডি।"

"আমি সৈয়দ।"

মহামতি এণ্ড্রুজ

অমিয় চক্রবর্তী

অতীন্দ্রিয় বার্তা আসে, সন্ত বলেছেন সংসারীকে,
দিব্যবিভা ঐশীদান, শুভচিত্তে সে নিত্য অলোক;
শ্রুতিসাক্ষ্য পুণ্যশ্লোক জানালো সন্ত্রস্ত ধরণীতে
মাটিতে আসেন নর-নারায়ণ যৌগিক শক্তির
যুগে যুগে অবতার,—
অপরোক্ষ বুঝি না প্রাণের
অপার্থিব ধর্মোদ্দেশ।
দেখেছি ধুলোর পথে শুধু
দ্বারে এসে দাঁড়ালেন আমাদেরি আত্মীয় অজানা
জনসাধারণ কেউ অনন্য আনন্দমূর্তি নিয়ে
মুহূর্তে প্রাণের ব্রতী, লৌকিক, বরেণ্য, অগণিত
তাঁরা কেউ চাষী, শিল্পী, গৃহবধূ, দেশী সর্বদেশী
সূর্যস্নাত পৃথিবীতে—
এণ্ড্রুজের শান্ত নীল চোখে
দেখেছি অপার দৃষ্টি, মনে পড়ে আশ্রম পল্লীর
রতনকুঠিতে তিনি কবির অতিথি দূর হতে
হঠাৎ উদিত, তীর্থ-সমুদ্র পেরিয়ে বীরভূমে
একেবারে সমাগত প্রত্যেকের হৃদয়ে, সেদিন
উৎসবের লগ্ন যেন ক্ষুদ্র-গোষ্ঠী বন্দিত বন্ধুকে
একটি নির্মাল্য দান; অতি-মানবিক দাবি-হীন
শিখাহীন পান্থ, তাঁরে জানালো মর্মর-শালবীথি
কাঁকর খোয়াই আর দিগ্বলয় কুঠি তালবন
অব্যক্ত স্বাগত।

এই নম্র ইংরেজের মুখে চেয়ে
প্রাণের স্বধর্ম পেল কত পূর্ব-পশ্চিম বসতি,
সহস্র শাস্ত্রের এক মণিকাঞ্চন প্রজ্বলিত বাণী
ঘরে ঘরে আলো হল।
বাজেনি দামামা নির্ঘোষের
পুণ্যসন্ধ পাঞ্চজন্যে, সংহারী গুরুর শঙ্খধ্বনি
জাগেনি মর্ত্যের মৃত্যুস্তরে—
সাম্রাজ্য বিক্রম
অতিক্রান্ত যে-মানুষ, দুর্লভ প্রেমের নিত্যশ্রমে
দশকে দশকে যাঁর ব্যক্ত হল মুক্তির অধ্যায়,
শান্ত তিনি।
ভারতীর পরম আত্মীয়-নামাঙ্কিত
—দীনবন্ধু।

আত্মভোলা, পরিচয় কাহিনীর মতো:
যদিও বিদেশী রং, বেশ তাঁর ভারতে স্বদেশী
খাটো ধুতি, খাদি কুর্তা, কিম্বা কারো-দেয়া পাজামায়
মলিন কালির চিহ্ন, তারি সঙ্গে নতুন কোটের
ক্বচিৎ সঙ্গৎ; তাঁর চুল-ওড়া প্রশস্ত ললাট,
দীর্ঘদেহ, যাতায়াত পোস্টাপিসে কিম্বা গ্রন্থালয়ে,
প্রত্যেক কাজেই যেন শিশুর ব্যস্ততা আনন্দিত—
যেখানেই দেখ তাঁকে, সেবাগ্রামে শান্তিনিকেতনে
সেই মিশ্র দৃঢ়শান্ত কোমল দৃষ্টির করুণায়;
অবিরত চিঠি লেখা, কঠিন চেয়ারে সারাদিন
—ছাত্রের পরীক্ষা যেন—বই রচা, রাশি প্রুফ দেখা,
তার পরে অন্তর্ধান,—

কে জানে কোথায় জাঞ্জিবারে
লবঙ্গের ব্যবসায়ী হতাহত, সাদা-কালো ধনিকে-নির্ধনে
দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে বর্ণদ্বেষ, ব্রিটিশ প্রতাপ
শিথিল কিম্বা উগ্র, সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র অহঙ্কার
তখনো প্রমত্ত,
ধীর ইংলণ্ডের এই প্রতিনিধি,
কোনো জাতিধর্ম নয়, সত্যের সপক্ষে গৌরবী
খুঁজেছেন বেদনায় সহজ চিত্তের অধিকার,
খৃষ্ট-ক্রুশ বহনের অন্তিম প্রেরণা দাবি নিয়ে
তাঁকে পথে চলতে হল।
দীপ-পুঞ্জ দূরের ফিজিতে,
ত্রিনিদাদে, গিয়ানায়—আড়কাঠি দাস-ব্যবসায়ী
সামরিক অন্ধকার ছড়িয়েছে—একাকী এণ্ড্রুজ
দরিদ্রের একজন, তাঁকে ভক্তি দিলেন গান্ধীজি
তপোশক্তি; কবি-গুরু নত প্রেম-আশীর্বাদে
দ্বার খুলে দাঁড়ালেন পথে চেয়ে;
বৎসরে বৎসরে
এমন পুরুষ, তাঁর অজস্র ত্যাগের আবর্তিত
বার্তা আজ কে না জানে,
সার্বিক বিশ্বের ইতিহাসে
তবুও বীর্যের তথ্য অলিখিত, প্রেমের অক্ষয় শক্তিশীল
অন্তঃশীলা তাঁর দান, নদী-বাঁকে গ্রাম্য স্তরে স্তরে
যেমন অদৃশ্য পলি তুলে ধরে কাঁচ ধান, ভরে
প্রতিদিন ঘরকন্না মাতৃহৃদয়ের মাতৃভূমি,
সামান্যের দৈব সেই;
সাক্ষ্য তার কেবল প্রাণের॥

—

দুই

বারেবারে ফিরে দেখি, তাঁরি চোখে আমাদেরি চোখে
মাঝি এল নৌকো বেয়ে, তাঁতি বোনে চিত্র সুতোজাল,
গ্রাম্য মেয়ে চুল বাঁধে, কাঁকই বাঁ-হাতে কাছে-ধরা;
স্মিত সুধা জীবনীর;
লণ্ডনের লাল-বাসে চড়ে
দোতলা কক্ষের যাত্রী,
নিত্য কোন আশ্চর্যের পটে
যা-কিছু তুচ্ছ তা বড়ো;
দেশে দেশে, চির ইতিহাস
অলক্ষ্য ইঁটের গাঁথা ইমারত ভাঙে গড়ে আজো,
মানুষের এ-সংসারে স্মৃতি-বিস্মৃতির স্পন্দ জলে
প্রবাহ থামে না।
তবু এরি মূল্য কিনতে হয় জেনে
দুর্গতির ইতিবৃত্ত,
চাঁদপুরে চা-বাগানী যারা
ধর্মঘটে ছুটে এল অসহ বণিক-অত্যাচারে
বেয়োনেট-বিদ্ধ সেই অসহায় শ্রমিকের কাছে
দাঁড়ালে দুঃখীর বন্ধু, ছুঁড়ে ফেলে পশ্চিমী মর্যাদা,

পূর্বী-ধ্যানে তিরোভাব;
নীল চক্ষে ঘনানো বিদ্যুৎ
দেখেছি সেবার বীর্যে,
উড়িষ্যা-বন্যায় হা-ঘরে
জননীর শুশ্রূষায় ডেকে নিলে আমাদেরো, শত
ধ্যানের কঠিন সদাব্রতে.
বন্ধু যেন সব চেয়ে
ভারত-মুক্তির পথে ছিলে আজীবন, দুঃখে সুখে;
দুর্বিষহ পরীক্ষার ডাক এলো পঞ্জাবে দুর্দিনে
যখন সমস্ত দ্বার বন্ধ, স্তব্ধ, অন্তিক অশান্তে
মারণিক পররাষ্ট্র পিষ্ট ক'রে নিরস্ত্র জনতা
তুলেছিল রক্তধ্বজা.
সেদিন এণ্ড্রুজ পদাতিক
একাকী দিলেন নাড়া দুর্গের নিশান্ত প্রহরে.
প্রতিহত, তবু ফিরে গ্রামে গ্রামে ক্ষমার ভিখারি
জানালেন জনে জনে আপন জাতির অপরাধ,
সে-পাপ সবারি আজ—লোকালয় দগ্ধ করে যারা
তাদের বিক্রম দেখ।
কোনো যুদ্ধে কোনো অনাচারে
মানুষের পক্ষ ভুলে উষ্মা তাঁর উচ্চ বাচনিক
বাঁধেনানি ঐশিতায় কোনো রাষ্ট্র—উন্মত্ত সংগ্রামে,
সাম্যের সাধক তিনি;
প্রলয়ের নবপর্বে আজ
প্রসাদ বিকীর্ণ হোক তাঁর জীবনের আশীর্বাদে।

তিন

একদিন কলকাতায় ক্ষুদ্র এক শোকার্ত মিছিল
আমরা ক-জনে মিলে চলেছি সমাধি-যাত্রী দল
এণ্ড্রুজের দেহ নিয়ে—
ছিল না তো সে-দলে সেদিন
দেশী বা বিদেশী কোনো প্রতিনিধি রাষ্ট্রের, ধর্মের
সরকারী মহাজন, সম্মানের গৌরব-প্রতীক;
গরীবের বন্ধু যিনি তাঁর যোগ্য গরীব মর্যাদা
প্রার্থনায় পূর্ণ হল.
ছায়াচ্ছন্ন সেই ছলছল
পত্রকীর্ণ পরিধিতে শেষ হল অশেষ জীবন,
আলোকিত সেই সত্তা গাঁথা হল; আজো মনে আছে
জেগে উঠল তাঁর ছবি,
করুণায় আপ্লুত জীবন.
সেই কবেকার পুণ্য প্রত্যূষের শান্তিনিকেতনে
কবি আর এণ্ড্রুজের প্রাতরাশ, বাক্যালাপনুনি
দুই বন্ধু ঐকান্তিক কর্মের বন্ধনে কতবার
দেখেছি নিবিষ্ট চিত্ত,
মহাত্মা গান্ধীর শেষ নতি
আরোগ্যভবনে ভোরে মহামতি চার্লির মৃত্যুর
আসন্নিক পর্বে
কোন অসীম আশ্বাস ব্যাপ্ত হল :
শতবার্ষিকীর এই প্রণম্য উৎসবে অর্ঘ্য আনি,
সমর্পিত চিত্তযোগ রেখে যাই ভক্তের, বন্ধুর ॥

দীনবন্ধু, হে এনড্রুজ

বনফুল

দীনবন্ধু, হে এনড্রুজ, হে দীপ্ত, উন্নত
জানাই প্রণাম শত শত
তবু যেন মেটে নাক আশ,
তুমি বন্ধু আমাদের, নির্ভর বিশ্বাস
সত্যই আত্মীয় তুমি নিতান্ত আপন
আমাদের প্রেমলোকে পাতা তব হেম-সিংহাসন।
মরে গেছ তুমি শুনি,—সেটা বাজে কথা
আছ তুমি, থাকিবেও, তব অমরতা
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের কিরণে অঙ্কিত
মহিমান্বিত।

রয়েছে তোমারে ঘেরি
মার্শম্যান, কেরি
ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার;
আর
শুচি-স্মিতা
দেবী নিবেদিতা।

হতভাগ্য এ দেশের দুর্দশা-পঙ্কেতে
জানি না তো কাহার সঙ্কেতে
ফুটেছিলে শতদল সম
যার পরে মূর্ত হল মানবতা-বাণী-অনুপম।
নর-বেশে হে দেবতা, নয়নাভিরাম
সহস্র প্রণাম।

প্রলয় সেন
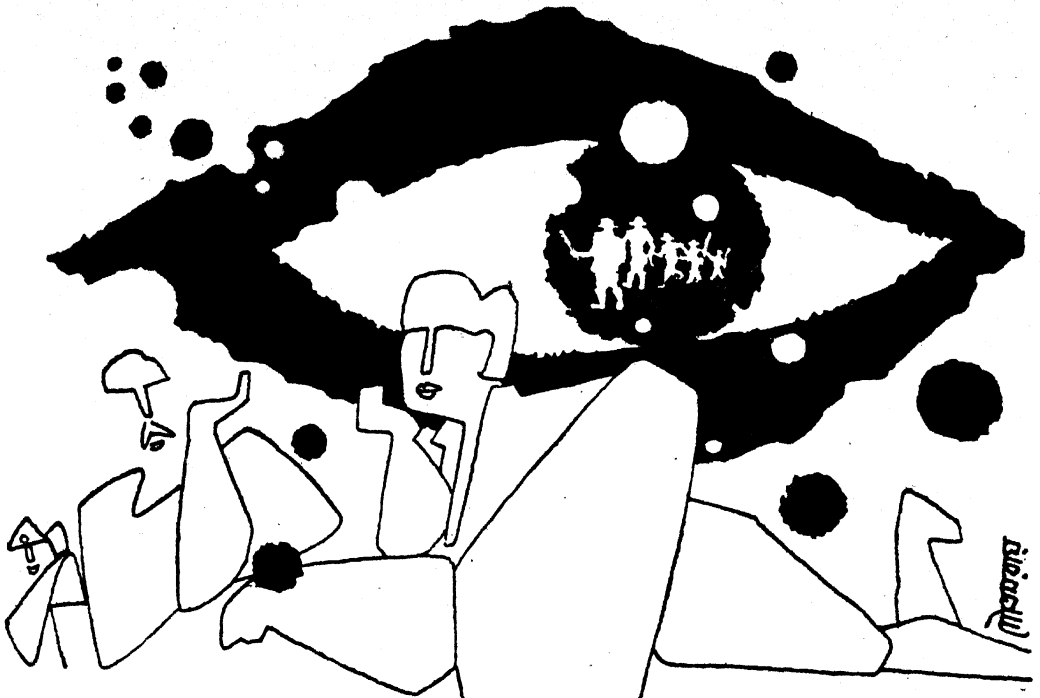
বাবার চেঁচামেচিতে নীলুর ঘুম চটে গেল। বাবা বারান্দায়। বাসন-ভাঙা গলায় তড়পাচ্ছিলেন, সুপুত্তুর পেটে ধরেছিলে, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করো!

তুলোর কম্বলটা গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নীলু উঠে বসল। কাঁচা ঘুম থেকে ওঠা। চোখের পাতা বিষব্যথায় টসটস করছে। শরীর জুড়ে অবসাদ। সকালে নাইট ডিউটি সেরে ফিরতেই, যেমনটা আশঙ্কা করেছিল নীলু, মা ঘর থেকে হাউমাউ করে ছুটে এসেছে। গতকাল মাকে যা হ'ক করে সামাল দিয়েছিল। বিলু আজ দু'দিন হলো বেপাত্তা। পরশু খেয়েদেয়ে দুপুর দুপুর সেই যে বেরিয়ে গেছে, তারপর থেকে ওর কোন খোঁজ নেই।

নীলু আর এগোয়নি। উঠোন থেকে পিছুটিধরাচোখে সটান থানায় ছুটেছে। তারপর যা হয়। পুলিসী দস্তুর। বেশ অনেকটা সময় নষ্ট করে নিমু মুখে টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছে।

ফের বাবার গলা শোনা গেল, কত বলেছি তোমাকে। অত আসকারা দিও না। শুনেছ আমার কথা!—অভিযোগটা যতই জোরালো হক না কেন নীলুর বুঝতে কষ্ট হল না বাবাও তলে তলে ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন।

বেলা প্রায় তিনটে। দেয়াল ঘড়ি থেকে চোখ সরাতে গিয়ে জ্যাঠামশায়ের ফটোটায় দৃষ্টি আটকে গেল। ফটোটা নীলুর জন্মেরো আগে তোলা। দাড়ি গোঁফে ঢাকা লম্বাটে তীক্ষ্ণ একখানা মুখ, আবক্ষ। ধুলো আর মাকড়সার জালায় ওপরের কাচটায় মরচে পড়েছে। আংটা থেকে দাড় একপাশে হেলে গিয়ে ফটোটা বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর ওদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। নীলু অবশ্য দু'একবার ভেবেছে। ভেবে শুধুই দুশ্চিন্তিত হয়েছে। কিন্তু সময় করে উঠতে পারেনি। ফটোটা ঝেড়ে পুঁছে ঠিকমত ঝুলিয়ে রাখা দরকার।

নিচের দিকে বিলুর ছাইরঙা বুশসার্ট ঝুলছে। চাকরির প্রথম মাসের টাকায় নীলু জামাটা কিনে দিয়েছিল। তার পাশে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট একখানা। বিলু ভাল ব্যাডমিণ্টন খেলত। এ পাড়া সে পাড়ার টুর্নামেণ্টে কয়েকবার চাম্পিয়নও হয়েছিল। ও ধারের নেয়ারের খাটখানায় বিলু শোয়। লেপ তোশক বালিশ সব লণ্ডভণ্ড। সুজনীটা মেঝেয় গড়াচ্ছে। শিয়রের কাছের টেবিলে বইপত্র এলোমেলো ছড়ানো, দোয়াত উল্টে টেবিলক্লথের একটা অংশ কালিতে নোংরা হয়ে আছে। নীলু বুঝল, পরশু ঘর থেকে বেরুবার আগে বিলু ভীষণভাবে জরুরী কিছু একটা জিনিস খুঁজেছিল।

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের খোপ থেকে চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিল নীলু। জানালার ও ধারের গলিপথে পড়ন্ত বেলায় বাসি রোদ। মিত্তির বাড়ির রোয়াকের কাছে বারোয়ারী জলের কলের কাছে হাড়ি কলসীর লাইন। তারপর সতীশ দত্তর মাঠকোঠা। ডাইনে কাঁচা নর্দমা ছুঁয়ে হাবুলের চায়ের দোকান। বৃন্দাবনের লণ্ড্রী। ভজুঅজার চোঙ খোলার খুপরি। দূরে সাবেককালের ডাণ্টবিনটা। গেঁজে ওঠা ময়লা আর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গলিটার

ঝাঁড়ছা আগলাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে নীলু দেখে আসছে, সেই সনাতন ছবি, চিরকালের কলকাতা, দুঃস্থ, বাড়হীন।

সিগ্রেটে গোটাকয় টান দিতে বুকের ভেতরকার যন্ত্রপাতি একযোগে ঝনঝনিয়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে গলার গোড়ায় এক-খণ্ড শ্লেষ্মা ঠেলে উঠতে কাশির দমক ছুটল। নীলু শীতের শুরুতে কারখানার ডাক্তারকে দেখিয়েছিল। ডাক্তার গলা বুক পরীক্ষা করে বলেছিল, ইয়ংম্যান, এ বয়সেই ইমিউনিটি এতটা কমে গেল কি করে। শরীরে ভিটামীনের অভাব। চটপট এক কোর্স ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকশন নিয়ে নিন।

পাজামার দড়ি বাঁধতে বাঁধতে নীলু বারান্দায় এল। পর পর দু'খানা ঘর। উত্তরেরটায় মা-বাবা আর শানু থাকে। দক্ষিণে আরো একটা ঘর ছিল ওদের। মামলা মোকদ্দমার পর কিছুকাল আগে ঘরখানা বাড়িঅলার দখলে গেছে। এখন বারান্দার একপাশ দরমায় ঘিরে রান্নার কাজ সারা হয়। মা উঠোনে। মুখ ধুচ্ছে। পাশে ডাঁই করা বাসনকোসন। নীলুর সাড়া পেয়েই বাবা পাথরের মূর্তি বনে গেলেন। যত হম্বিতম্বি মার সামনে। ছেলেদের মুখোমুখি হলেই কেমন দ' মেরে যান। বাবা আগে এমনটা ছিলেন না। রীতিমত রগুড়ে ফুর্তিবাজ মানুষ। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খোলামেলা মিশতেন। নীলু বোঝে আসল রোগটা কে থায়। পঞ্চাশ না ছুঁতেই চাকরিটা গেল। ফোর্সড রিটায়ারমেন্ট। তারপর, ব্যবসার বাতিকে ধরল। বছর না ঘুরতেই চাকরির থেকে পাওয়া টাকাগুলো সব ফুঁকে দিলেন।

নীলু সর্দিটানা গলায় শুধোল, মা শানু কোথায়?

সেফটিপিন দিয়ে দাঁতের গোড়া খুঁটবার ফাঁকে মা উত্তর করল, আমি কি জানি। দাঁধ কোথায় গেছে।

চটি জোড়া পায়ে গলাবার আগে সবার দিন ভেবেও চটপট শব্দ তুলে নীলু উঠোনে নামল। এখনো মার মুখের এটো শুকোয়নি। এ সময় চা করতে বলা অমানুষিক হবে।

সদর গেট থেকে গলিতে পড়তে ক্ষের থাবার গন্ধ শোনা গেল। হাবুলের দোকানে যথারীতি হৈহুল্লোড় শুরু হয়ে গেছে। সেই পরিচিত কটি মুখ। ভেতরে ঢুকতেই ওকে ধরল। সবার আগে পানু উঠে দাঁড়াল, আয়, সিগ্রেট ছাড় তো।—চারমিনারের প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে পাঁচ হাত ঘুরে সেটা মুহূর্তে নিঃশেষ হল। জগা বলল, কিরে, চাকরি পেয়েই কাট। এদিকে যে একেবারেই আসো না চাঁদ। আমাদের ভুলে গেলি নাকি।—পেছনের বেঞ্চ থেকে মিতাই মিলিটারী কায়দায় হাঁক পাড়ল, হাবুল, বেশ জম্পেশ করে ছ' কাপ চা কর। নীলুর নামে।—বিশু কম কথা বলে, কিন্তু শেয়ালের মত ধূর্ত। ও জগাকে উসকে দিল; নীলুর কাছে আমাদের একটা খ্যাটন পাওনা ছিল না রে জগা। চাকরিটা পেল।—জগা বিশুর উরুতে থাপ্পড় কষিয়ে চেঁচাল, শুধু খ্যাটন কি রে! সঙ্গে পাত্তর না হলে জমে।—পানু জিভে ঝোল টানল, মাইরি কতকাল ভালমন্দ পেটে পড়ে না—বলেই ও পাছা নাচিয়ে নিজের চারপাশে ঘুরে যেতে হাবুলের দোকানে যেন বোমা ফাটল।

দলের ভেতর একমাত্র নন্দ নিরুত্তেজ। সে এক মনে সতীশ দত্তর মাঠকোঠার জানালায় চোখ ফেলেছিল। সতীশ দত্তর মেয়েটা সবে স্বামীকে শ্মশানে চড়িয়ে ঝাড়া হাত পায়ে বাপের ঘরে এসে উঠেছে। বেশ গোলগাল ডাঁটো শাঁসজলে ভরন্ত গতর। সকাল সন্ধ্যায়

শো পাউডার মেখে পরিপাটি হয়ে জানালার মুখ ভাসিয়ে থাকে। সতীশ দত্ত বিপত্নীক, নিকট বলতে মেয়ে ছাড়া তিনকুলে আর কেউ নেই। এক সময় ছোটখাটো ব্যবসা ছিল। এখন বাড়ি ভাড়ার টাকায় কোন রকমে উদরান্নের আসান হয়।

হাসির ফোয়ারা থামতে বিশুর নজর দিকে চোখ পড়ল। বিশু চুকচুক আওয়াজ করে বলল, ছিঃ সোনা আমার! ওদিকে নজর দিও না। কোন লাভ নেই। বুড়ো বাপ শালাই যে নিজের মেয়েকে ভোগাচ্ছে।

এক ঢোক চা মুখে নিতে জিভটা বিস্বাদ ঠেকল। এক সময় এসব কথা দাঁতে কাটতে নীলুরও ভাল লাগত। এখন লাগে না। হঠাৎ করে সংসারটা ঘাড়ে এসে পড়ায় নীলুর দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাচ্ছে। ক্রমশ সে থিতিয়ে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই নীলু এখন অন্য পথে চলাফেরা করে। সেটা যে এদের ঘেন্না করে বলে তা নয়। বরং, এদের কথা ভাবতে তার বুকের ভেতরটা মাটির মত নরম হয়ে পড়ে। একই গলিতে জন্ম। ভাবের মধ্যে পাশাপাশি বেড়ে উঠেছি। সবার আগে তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। ওরা এক পাও নড়তে পারল না। বাবার রিটায়ারমেন্টের দৌলতে কোম্পানী তার প্রতি সদয় হল। চাকরিটা জুটল। তাও কি নীলু নিরুদ্বেগ। ছ' মাসের ভেতরেই এক প্রস্থ ধর্মঘট হয়ে গেছে। এখন হাওয়ার গতিক উল্টো। কোম্পানীর দুর্দিন চলছে। প্রতিটি মুহূর্ত ভয়ে কাটাচ্ছে। একদিন গিয়ে হঠাৎ দেখবে কারখানার গেট বন্ধ।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হল। মা দরমার চিকের ওধারে। হাতাখুন্তির শব্দ উঠছে ঘন ঘন। যা দিনকাল। কখন কি ঘটে। খাওয়ার পাট তাই সকাল সকাল সারতে হয়। বাবা বেরিয়েছেন। এতক্ষণে পাড়ার পার্কের চারপাশটা বেশ কয়েকবার পাক খেয়ে ফেলেছেন। এতকাল কাজের মধ্যে ছিলেন। ধরাবাঁধা নিয়মের ভেতর। এখন ওর সময় কাটে না।

ঘরের মধ্যে এসে নীলু হাঁক পাড়ল, শানু, শানু—।—দিন কয়েক আগে বাসনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন ওকে দিয়ে নীলু কবুল করিয়ে নিয়েছিল। আজ ছুটির দিন। সন্ধেটা দুজনে একসঙ্গে কাটাবে।

শানু উঠোনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কি! এত চেঁচাচ্ছ কেন?—শানুও বেরুচ্ছে। কোথায় যাবে কে জানে। সন্ধ্যের সময়টা, মা ছাড়া, কেউ ঘরে থাকতে চায় না।

নীলু বলল, জামাটা লন্ড্রী থেকে এনেছিস?

শানু বেণীর দুটি কাঁধের দিকে সজোরে চালান করে দিল, না।

নীলু দু' পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। শানুও দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে। পড়াশুনো হল না। হবার কথাও নয়। অনটনের সংসারে বুদ্ধিতেও ভাটা পড়ে। সেই সঙ্গে স্বভাবটাও ঘোলা হতে থাকে। এমনও হতে পারে, তারই পরিচিত কোন বন্ধুর সঙ্গে ও ফষ্টিনষ্টি চালাচ্ছে। এর জন্যে শুধুই ওকে দায়ী করা চলে না। দোষ তাদের, আবার ওর প্রাণধারণেরও বটে। রক্ত মাংসের শরীরটা ফুলে ফেঁপে উঠছে। সেই অনুপাতে মনটা ডালপালা মেলতে পারছে না। ফলে যা ঘটে। শিকড় নড়ে গেছে।

এখন দমকধমকের জোড়াতাড়ায় ওকে ঠিকমত দাঁড় করানোর চেষ্টা বৃথা।

নীলু দাঁতে দাঁত ঘষল, তোকে কতবার বলে রেখেছি। এখন বেরোই কি করে?

শানু উঠোনে নেমে যাবার আগে বলল, আমি তার কি করব। আজ সকালেও খোঁজ নিয়েছিলাম। বৃন্দাবনদার কেবল এক কথা, চারদিকে যা গণ্ডগোল চলছে, মঙ্গলবারের আগে হবে না।

ঘরে ঢুকে নীলু আলো জ্বালাল। চটপট প্যান্ট পরল। গেঞ্জিটা খুঁজে না পাওয়ায় মাথায় রক্ত চড়ল। এ নির্ঘাত বিশুর কাজ।

ছেলেটা ভয়ংকর রকমের ছন্নছাড়া। নিজে শান্তিতে নেই, অন্যকেও থাকতে দেয় না। মনে মনে একটা খিস্তি দিতে গিয়েও জ্যাঠামশায়ের ফটোয় চোখ পড়ায় নীলু থেমে গেল। চাক্ষুষ না দেখলেও বাবা ঠাকুমার মুখে শুনে শুনে ফটোটা সম্পর্কে তার মনের ভেতর এক জাতীয় শ্রদ্ধার ভাব চারিয়ে গেছে। জ্যাঠামশায় এককালের নাম-করা বিপ্লবী। এখনো, ওরই নামে, তাদের পরিবার এ তল্লাটে যাহ'ক খানিকটা মান-সম্মান কুড়োচ্ছে। ব্যাংক ডাকাতির কেসে জড়িয়ে পড়ে তিনি ফেরার হন। স্বাধীনতার কয়েক বছর আগেকার কথা। সেই থেকে আজ অবধি ওর কোন সন্ধান মেলেনি। মোটামুটি সকলেরই ধারণা, তিনি আর বেঁচে নেই। একমাত্র ঠাকুমা অন্যরকম ভাবত

মৃত্যুর আগ অবধি ঠাকুমা আশায় আশায় ছিল তার বড় ছেলে একদিন না একদিন ঠিক ফিরে আসবে। মাঝে মাঝে, নীলুর মনে আছে, ছেলের কথা ভেবে মন খারাপ হলে, বারান্দায় কোলকুঁজো হয়ে বসে সুর করে করে ঠাকুমা আওড়াত, কোন এক জেল থেকে লেখা জ্যাঠামশায়ের চিঠির একটা অংশ আমার জন্য চিন্তা করিও না। স্বয়ং ভগবান কতবার কারাগারে ছিলেন। সত্যযুগে তিনি ছিলেন অনন্ত জলধিরূপী কারাগারে, ত্রেতায় রাক্ষসগণের মধ্যে, আর দ্বাপরে ছিলেন কংসের কারাগারে। মা, কারাগারে না আসিলে কেহই শুদ্ধ হয় না।'—বলতে বলতে ঠাকুমার গলার স্বর ঝাপসা হয়ে আসত। চোখের জলে বুক ভাসত।

গলি থেকে বড় রাস্তায় পড়তেই বাসনাকে দেখার ইচ্ছেটা দপ্ করে নিবে এল। ইদানীং ওর সঙ্গ একঘেয়ে লাগছে। বাসনা এক আচ্ছা গেরো। কিছু দিন ওর সঙ্গে দেখা না হলে নিজেকে কেমন নিরালম্ব মনে হয়। ভীষণ কাছে পেতে ইচ্ছে করে। ফের মুখোমুখি হলেই দম ফুরিয়ে যায়। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মরে যায়। হাত ধরাধরি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে পথ হাঁটা রেস্টুরান্টে ঢুকে পর্দা আঁটা কেবিনে বসে আবোল-তাবোল বকা বড়জোর পার্ক অথবা ময়দানে অন্ধকারে নির্জনে সেঁধিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ওকে চটকানো। সব ব্যাপারগুলো আজকাল পানসে ঠেকে।

চৌরঙ্গীর মুখে আসতে নীলু দেখল বাসনা যথারীতি ফুটপাতের ধার ঘেঁষে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে। মুখে চড়া রঙ, চোখের নিচের পাতায় কাজলের পুরু টান। পাউডারের প্রলেপে গলা ও বুকের রঙে সমতা আনার চেষ্টা। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরা ব্লাউজের ভেতরকার কারুকরা ছোট জামাটা মাংস কেটে বসে আছে।...

এগিয়ে এসে নীলু এক পলকে বাসনাকে জরিপ করল। তারপর উজ্জ্বল গলায় বলল, কখন এলে?

বাসনা নড়েচড়ে উঠল, অনেকক্ষণ—

নীলু হাসতে চাইল, আর বলো কেন। বাড়ি থেকে বেরুতেই—

বাসনা মণিবন্ধে চোখ রাখল। ওর শরীর থেকে একটা চাপা সুগন্ধ ফুটছিল।

নীলু স্বাভাবিক গলায় বলল, চলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন।

বাসনার দৃষ্টি ছায়া হয়ে এল, আজ নয় নীলাদ্রি। হঠাৎ একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। এক্ষুনি যেতে হবে। আর একদিন—

নীলু মুহূর্তে জমাট বেঁধে গেল, তার মানে।

বাসনা নরম সুরে উত্তর দিল আজ দুপুরে বলা-কওয়া নেই বাড়িতে অবিনাশ-বাবুর লোক এসে হাজির। চিঠি নিয়ে। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার মধ্যে স্কুলে যেতে হবে একবার।

নীলু প ছড়িয়ে দাঁড়াল, আজ তো ছুটি, রোববার—

বাসনা মাথা নাড়ল, কি করব বলো! অবিনাশবাবু লিখে পাঠিয়েছেন। আসছে মাসের শুরুতে স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন। ছুটির দিন ছাড়া সময় কোথায়।

নীলু প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল, হুঁ। বুঝেছি।—বাসনা এক নার্সারি স্কুলে টিচারী করে। অবিনাশবাবু সেই স্কুলের মালিক।

বাসনা কনুই দিয়ে নীলুর পাঁজরে খোঁচা মেরে মুখ চেপে হাসল, বুঝেছ না ছাই। তুমি ভারি হিংসুটে!

নীলু রাস্তার চলাচলের দিকে মুখ তুলল, নাহ্, এম্নি—

বাসনা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, ভীষণ দেরি হয়ে গেল! চলি, কেমন। নইলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। আর একদিন—

নীলু অন্য কিছু ভাবছিল। বাসনা দু' পা ছুটে বাস ধরল।

নীলু আলোর নিচে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পর পর দুটো সিগ্রেট শেষ করল। একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। ভাবল : একবার থানায় যাওয়া যেতে পারে। সকালে ছোকরা অফিসার নোট নেবার সময় বলেছিল, দেখছেন তো অবস্থা। এখন ইনডিভিজুয়াল কেস নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঠিকানা তো রইলই। কোনো ইনফরমেশন এলেই খবর দেব।—কথাটা মিথ্যে বলেনি। নীলু সব সরেজমিনে দেখেছে। থানার সামনে বড় বড় ভ্যান। লোহার জালের ভেতর সঙ্গীন উঁচিয়ে থমথমে মুখের সার। দেখলেই বুক কাঁপে। শুধু ছেলেবেলায়, যুদ্ধের সময়, বাবার সঙ্গে বড় রাস্তায় বেড়াতে গিয়ে মিলিটারী কনভয় দেখে যেমনটা হত। ভ্যান থেকে থেকে পুলিস নামছে। কর্ডন করে নানা মাপের ছেলেদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। দলে মেয়েও রয়েছে। লক-আপে ঠাসাঠাসি। বেশির ভাগ কিশোর বয়সের। মাঝে মাঝে শ্লোগান দিয়ে উঠছে। একবার ওধারে এগুতে জমাদার গোছের

একজন ধাতানি দেওয়ায় নীলু পেছিয়েছে।

নীলু ভাল করে মাফলারটা গলায় জড়াল। থানার ইনচার্জের চোয়াড়ে মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে সে নড়েচড়ে উঠল। আপনার ভাই। বয়স কত, কুড়ি। কি করত। কলেজ স্টুডেন্ট, হুঁ। কিছুই খেয়াল করেননি, আশ্চর্য। পলিটিকস নিয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হত না। বাড়িতে লোকজন আসত। রাত্রে ফিরত কখন। আপনি বড় ভাই, কিছুই জানেন না!—লোকটা এমন জেরা করছিল যেন সে-ই আসামী।

ফুটপাতে উঠে নীলু ভিড়ে পড়ল। এখন থানায় গেলে মন খারাপ করে ফিরে আসতে হবে। নীলুর বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক বিলুর একটা খবর পাওয়া যাবেই। ভালো মন্দ, যে কোন ধরনের খবর। হয় বিলু কোথাও ধরা পড়ে জেলে বা থানায় রয়েছে। অথবা, যেমনটা দেখছে আজকাল, একদিন সকালের কাগজ খুলে বিলুর হদিশ পাবে।

দেখে শুনে একটা ছোট চায়ের দোকানে নীলু ঢুকল। ভিড় অসহ্য লাগে। বিশেষ করে একলা চলতে। যত আজেবাজে ভাবনা ছেঁকে ধরে। বাসনার জন্যেই ছুটির সন্ধ্যাটা মাটি হতে চলেছে। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে চা সরবত করে দোকানে সে অনেকটা সময় নষ্ট করল। একবার ভাবল, মহীতোষের বাড়ি গেলে মন্দ হয় না। গত অঘ্রাণে বিয়ে করেছে। গল্পগুজবে সন্ধ্যাটা বেশ কেটে যাবে। ফের ভাবল, পাড়ার আড্ডায় গেলেও চলে। অনেককাল বাদে সাতসতের খিস্তি-খাস্তা মেরে ঝরঝরে হওয়া যাবে। মহীতোষ বেপাড়ায় থাকে। আজকাল উঠতি বয়সের ছেলেরা অপরিচিত কাউকে দেখলেই বিষনজরে তাকায়। ঝামেলায় পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। হাবুলের দোকান কি এতক্ষণ খোলা আছে। পাড়ায় যা হুজ্জুতি চলছে।

চায়ের দোকান থেকে নেমে নীলু ট্রাম রাস্তা পেরুল। এদিকে ভিড় কম। একবার বাড়ি ফিরে যাবার কথাও মনে হল। কিন্তু সেকথা ভাবতে গিয়ে চিন্তা অলস হয়ে এল। সেই ছন্নছাড়া সংসার। দম আটকানো আলো-হীন দক্ষিণের ঘর। শানু এতক্ষণে ফিরে এলেও ঘরে নেই। দোতলায়। বাড়িঅলার নষ্ট মেয়েটার সংগে জমেছে। বাবা বারান্দায়। কলেপড়া ইঁদুরের মত অনবরত পায়চারী করে যাচ্ছেন। মা কখন খেতে ডাকবে সেই অপেক্ষায়। রান্না হয়ে গেছে। এ সময়টায় মাকে যেন ভূতে পায়। এটা সেটার ছুতোয় শুধু ঘরবার করছে। কবে মালাবদল করে একটা মানুষের সংসারে এসে উঠেছিল। তারপর, কালক্রমে তিনটে সন্তানের মা হয়ে যেন মহাপাপ করে বসেছে। এই পোড়া দেশে অভাব উদ্বেগে তিলতিল করে নিবে যাওয়া ছাড়া মার কিছুই আর ভূমিকা আছে।

নীলু রেলিঙ টপকে হাতের কাছের পার্কটায় ঢুকে পড়ল। শেষ ডিসেম্বরের হাড় কাঁপানো শীত। ভেতরে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। নীলু একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মনে পড়ে যাচ্ছে, কত গ্রীষ্মের দিনে সে আর বাসনা এখানে এসেছে। নরম ঘাসে শরীর ডুবিয়ে বাসনাকে ছুঁয়ে দুপুরটাকে বিকেল করে দিয়েছে। হাতের চেটো দিয়ে চোখ ডলতে জ্বালা ধরল। বাসনার মাস্টারটা কেই যুগিয়েছিল। পাড়ার এক মাতব্বর ব্যক্তিকে ধরে করে। বাসনার আপত্তি ছিল। নীলু শোনেনি। মাইনে সামান্য হলেও চাকরি তো। বন্ধুরাও সাবধান করেছিল মেয়েটাকে শকুনের ভাগাড়ে ঠেলে দিচ্ছিস! দেখিস, শেষমেষ যেন পস্তাতে না হয়। —সে-ও অবশ্য এর আগে অবিনাশ লোকটার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে কানাঘুষো দু' চার কথা শুনেছিল। নীলু কোন কথায় কান দেয়নি। বাসনার ওপর তার আস্থা ছিল ষোল আনা। এখন আর ওকে ফেরানো যায় না। ওর বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। গন্ডেছর ভাই বোন। বড় ভাই কিছুকাল আগে বিয়ে করে নতুন বাসায় উঠে গেছে। চাকরিটা এখন বাসনার কাছে জরুরী।

ফিরবার পথে শরীর কাঁপিয়ে জ্বর এল। বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার

আগে নীলু চেঁচিয়ে বলল, মা, আমি খাব না শরীরটা ভাল নেই।

মাঝরাতে কিছু একটার শব্দে ঘুম ভাঙল নীলুর। গলির দিকের জানলা দিয়ে শীতের মরা জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে কুয়াশার মত শূন্যে ঝুলেছে। নীলু দু' পা গুটিয়ে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল। দু' চোখের পাতা ভার। জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। নীলু দমবন্ধ করে কান পাতল। শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে। মা কি তবে ঘুমের ভেতর গোঙাচ্ছে। বাবা পাশ ফিরলেন। না কি শানুর যা বিশ্রী শোওয়া, খাট থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল! না। শব্দটা বাইরে কোথাও। কোথায়। গলির মুখে মনে হচ্ছে। একটা বড় গাড়ি ব্রেক কসে থেমে গেল খানিকটা সময় ইঞ্জিন যেমন ধুঁকছে গজরায়। কিছু ভারি পায়ের শব্দ। বুটের শব্দ কি। আওয়াজটা ক্রমশ এগুচ্ছে. হৃদপিণ্ডের ধকধকানির সঙ্গে বাড়ছে। বাদলবাবুর লণ্ড্রী সতীশ দত্তর মাঠকোঠা হাবুলের দোকান মিত্তির বাড়ি—আরো কাছে। আওয়াজটা হঠাৎ ডানদিকে মোচড় খেয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ক্ষীণতর হয়ে গেল। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতেও নীলুর দু কান থেকে সাঁই সাঁই করে আগুন ছুটছে। না, ফের শব্দের স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কোথায়। তাদের বাড়ির সদর দরজার মুখে কি! হ্যাঁ-হ্যাঁ। কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে না! লাথির শব্দও হতে পারে। পাশের ঘরে আলো জ্বলে উঠল। বাবার পায়ের শব্দ। মা চিৎকার করে উঠল একবার। কেউ মার মুখ চেপে ধরেছে কি। বাবা ধমকে উঠলেন কেন! দেয়ালে বিলুর [illegible] বুশ শার্টটা কাঁপছে। বিলু কোথায়। চোখের সামনে থানার ছোকরা অফিসারের মুখটা ভেসে উঠছে। তবে কি বিলুরই কোন খবর এল। কি খবর! নইলে এত রাতে থানা থেকে লোক আসবে কেন। নিশ্চয়ই বিলুর হদিস পাওয়া গেছে কিছু! বিলু কি তবে বেঁচে নেই! বিলু এখন কোথায়! লাশঘরে! রক্তাক্ত বিলুর মুখ! সারা শরীরে অস্ত্রের আঘাত। ছিন্নভিন্ন বিলু। অসাড়, প্রাণহীন, মৃত!

ওপাশের ঘরে দরজা খোলার শব্দ। বাবা বেরুলেন। বারান্দার আলো জ্বলে উঠল। বাবার পায়ের শব্দ, এলোমেলো। ফের মার ছত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া আর্ত চিৎকার শোনা গেল। নীলু দেয়ালে ঘোলাটে চোখ রাখল। দেয়ালে জ্যাঠামশায়ের ফটো। অস্পষ্ট। বিপজ্জনকভাবে দুলছে। নীলু উঠে বসতে চাইল। চিৎকার করে কিছু একটা বলতে চাইল। বুকের খাঁচাটা প্রবল কেঁপে উঠল। কাশির দমক ছুটল। বাবা টালমাটাল উঠোনে নামছেন। সদর দরজায় করাঘাত কিংবা লাথির আওয়াজ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। নীলু উঠতে পারল না।

BRITANNIA
THIN ARROWROOT
50 বছরের ওপর
জনপ্রিয়তায়
অদ্বিতীয়
ভারতে সবচেয়ে
বেশী বিক্রী—
ব্রিটানিয়া
থিন এরারুট বিস্কুট
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

॥ তের ॥

'ভগবানকে কাজে লাগাবি কি রে! ভগবানের কাজে লাগবি তো' আমার কথায় মা হতভম্ব হন।—'ভগবানের কাজের জন্যেই আমরা এসেছি তো......তাঁর সেবার জন্যেই।'

'ভগবানের সেবার জন্যেই সবাই?' আমি শুধাই : 'তাঁর সেবা করা ছাড়া আর আমাদের নিজেদের কোনো কাজ নেই?'

'আবার কী কাজ? তাঁর সেবা তাঁর উপাসনা করাটাই তো মস্ত কাজ।'

'আর ছাড়া আর সমস্ত কাজ? সেবা করাটা আবার কি রকম? উপাসনা কাকে বলে?'

'উপাসনা মানে তাঁর কাছে বসে থাকা, তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শোনা, তাঁর নামগান করে তাঁকে শোনানো।'

'আর সেবা মানে তো গিয়ে ভোগ দেওয়া? তাই না মা? আমাদের নিজেদেরকেই কি ভোগ দেব তাঁকে? নাকি, নিজেদের যতো ভোগ...? যত না কর্ম-ভোগ...?'

'সেবা বল পুজো বল ভালোবাসা বল। তাঁকে ভালোবাসার জন্যই আমাদের জন্মানো। তিনি যে ভালোবাসার ধন।'

'ভগবানকে ভালোবাসব কী মা?' তাঁর কথায় আমিও কম অবাক হইনে : 'ভগবানকে কি ভালোবাসা যায়? যার ধারণাই করতে পারিনে তাকে আমরা ভালোবাসব কি করে? সে তো অসম্ভব।'

'ভালোবাসা যায় না ভগবানকে?'

'একটা পিঁপড়ে কি একটা হাতীকে ভালোবাসতে পারে? হাতী যে কী, তা তো সে টেরই পায় না কোনোদিন। তার গায়ে হেঁটে চলে বেড়ালেও না, তার পায়ের তলায় চাপা পড়লেও নয়। হাতীও পিঁপড়ের টাওর পায় কি না কে জানে!'

'পায় না? তুই বলছিস?'

'হাতীর পক্ষেও একটা পিঁপড়েকে ভালোবাসা অসম্ভব। আর পিঁপড়ের ভালোবাসা পেতে হলে, কি পিঁপড়েকে ভালোবাসতে হলে তোমার হাতীকে ওই পিঁপড়ে হয়েই জন্মাতে হবে আমার মনে হয়।'

'তাই তো জন্মায় রে। ভগবান মানুষ হয়ে জন্মান তো সেই জন্যেই। তাঁর অবতার হওয়া তো সেই হেতুই।'

'তাই বল মা। তিনি মানুষ হয়ে জন্মেছেন, জন্মাচ্ছেন তাই ..আমাদের ভালোবাসা পাবার লালসায়। আমি তো সেই কথাই কইছি মা।...ভগবানকে ভালোবাসাই যায় না। মানুষকেই কেবল ভালোবাসা যায়, কারণ মানুষকে আমরা বুঝতে পারি, তার ভালোবাসাও টের পাই আমরা।'

'একই কথা। মানুষকে ভালোবাসাও সেই ভগবানকেই ভালোবাসা।'

'আর, মানুষের ভালোবাসাও সেই ভগবানেরই ভালোবাসা—তাই বলছ তো?' আমি হাঁফ ছাড়ি : 'আর রিনির ভালোবাসা আমার কাছে তাই ভগবানের ভালোবাসাই।'

'কী বললি?' মা চকিত হন।—'কার ভালোবাসা বললি?'

'বলছিলাম যে এই জন্যেই আমরা ভগবানের ভালোবাসার কাছে ঋণী। মানুষের এই ভালোবাসার জন্যেই। এবং তাঁরও এত কষ্ট করে মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের তরফে অন্য মানুষকে ভালোবাসার জন্যে এমন দুঃখ পোহানো—এই ত্যাগস্বীকার—তার জন্য আমরা ঋণী নই কি?'

'ঋণী বই কি। আর তিনিও তো আমাদের ভালোবাসার স্বাদ পাবার জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মান। এই কারণেই তো তাঁর অবতার হওয়া।'

'অবতার না হয়েও তো তিনি এন্তার মানুষ হয়ে জন্মেছেন—জন্মাচ্ছেন এখনো যত খুশি তোমার ভালোবাসো না! যাকে খুশি তাকে। তাই না মা?' আমি বলি—'কিন্তু আমরা মানুষকে না ভালোবেসে তাঁকে ভালোবাসাতে গিয়ে তাঁর সেই স্বাদে বাধ সাধছি কেবল। তাই নয় কি মা?'

'মানুষকে ভালোবাসলেও সেই তাঁকেই ভালোবাসা হয় রে?' মা বললেন, 'আর ভগবানকে ভালোবাসাও...ঠাকুর বলেছেন...'

'অত ঘুরে আমার নাক দেখতে যাব কেন মা? নাকের সামনেই তো মানুষ! সোজাসুজি মানুষকেই ভালোবাসব...মানে রিনিকেই...মানে কিনা, যার ভালোবাসায়

আমরা ঋণী...যার কাছে ভালোবাসার স্বাদ পেলাম প্রথম, সেই মানুষকেই।'

'ঠাকুরের কথাটা শোনো...'

'তোমার ঠাকুর যাই বলুন না মা', তাঁর কথায় আমি বাধা দিই—'ঠাকুরের বিবেকানন্দ কিন্তু কোনোখানেও ভগবানকে ভালোবাসার কথা বলেননি, মানুষকেই ভালোবাসতে বলেছেন। পড়লাম তো কতো বই-ই তাঁর, কিন্তু কোথাও না। ভগবানকে ভালোবাসবার কথাই নেই।'

'বলেননি তিনি কোথাও?'

'কোথায়! তিনি তো বলেছেন, জীবে প্রেম করে যেই জন...বলে আমি তক্ষুনি বিবেকানন্দ আওড়াতে যাই।

'কোথায় পেলি বিবেকানন্দের বই? পড়লি কবে?'

আমার জীব বার করার আগেই মার বাধা পাই। নিজীবের ন্যায় বলি—

স্কুলগায়। কোকনা-দার জোগাড়ে লাইব্রেরীর থেকে নিয়ে। তাঁর পাঠাগারে কতো রকমের বই আছে যে! বিবেকানন্দের বই, অশ্বিনী দত্তর ভক্তিযোগ এমনি সব ভালো ভালো বই। যতো কর্মবীরদের জীবনী। মানে সেই সব বই যা পড়লে নাকি মানুষ হওয়া যায়...গল্পের বই নয়, প্রবন্ধের বই যতো। সেখান থেকেই নিয়ে পড়েছি আমি।'

'বিবেকানন্দের কথাটা তুই বুঝিসনি ঠিক। ভগবানকে না ভালোবাসলে মানুষকে ঠিক ভালোবাসা যায় না।'

'ভগবানকে তো ভালোই বাসা যায় না মা!...ভগবানকে ভালোবেসে কোনো সুখ নেই।'

'সুখ নেই? বলিস কি রে তুই? ভগবানকে ভালোবাসলে তোর মানুষের ভালোবাসার চাইতে সহস্রগুণ সুখ, তা জানিস? ঠাকুর বলেছেন...'

'তোমার ঠাকুর যাই বলুন না মা, তাঁর কথায় আর কাজে কোনো মিল নেই—আমি বলব। ভগবানকে ভালোবেসেই যদি এত সুখ তবে তিনি শুধু তাই নিয়ে না থেকে মানুষকে ভালোবাসতে গেলেন কেন আবার? তিনি তো মা কালীকে দেখেছিলেন পেয়েছিলেনও হয়তো, তবে তিনি তাঁর ভালোবাসাতেই তৃপ্ত না হয়ে বিবেকানন্দকে নিয়ে মত্ত হতে গেলেন কেন? মা কালীতেই না মশগুল থেকে তাঁর কাছে নরেনকে এনে দাও নরেনকে এনে দাও বলে কান্নাকাটি লাগিয়েছিলেন কেন? নরেন তো একটা বাচ্চা ছেলেই তখন। প্রায় আমার মতই হবে।' আমি জানাই : 'মা কালীতেও তাঁর আশ মিটলো না। তাই, তাঁকে পাবার পরেও একটা ছেলের জন্যে তিনি পাগল হলেন শেষটায়।'

'মা কালীর জন্যেও কি তিনি বালিতে মুখ ঘষেননি একদিন?'

'তা ঘষেছিলেন। কিন্তু বালিঘষার পর হনুমানকে নিয়েই মজে গেলেন তো সেই!'

সুরেশ সমাজপতির মতন তীব্র সমালোচনা আমার।—'তাঁর আগের জন্মে যেমনটা ঘটেছিল প্রায় তেমনটাই।'

'আগের জন্মের...হনুমানকে নিয়ে মজলেন?' মা ঠাওর পান না ঠিক।

'মজলেন না? যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ তিনিই তো সেই রামকৃষ্ণ? তাহলে যিনিই বিবেকানন্দ তিনিই সেই হনুমান।' আমার অনুমান ব্যক্ত করি, 'অবশ্য আমার মতন হনুমান না, আমাকে তুমি যে হনুমান বলো সে হনুমান নয়, আমার ন্যায় দুর্বল নয়, হনুমানের মহাবীর সংস্করণ। মানে, বলছিলাম কি, আমার ব্যাখ্যা প্রকাশ করি—হনুমান যেমন সমুদ্রলঙ্ঘন করেছিলেন, বিবেকানন্দও তেমনি কি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে একালের স্বর্ণলঙ্কা আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার রাক্ষসদের তাক লাগিয়ে দেননি? হনুমান যেমন শ্রীরামের বাহন, বিবেকানন্দও তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের বাহন তো? তাঁর ভাবধারা বহন করে নিয়ে গেছলেন সেখানে। আসলে এটাকে—এই ক্রিশ্চান মুলুকে গিয়ে তোলপাড় করাটাকে আমি তাঁর লঙ্কাকাণ্ড বাধানোই বলব মা। তোমার ঠাকুর যেমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়েছিলেন তাঁর আগের জন্মে কৃষ্ণঠাকুর হয়ে...যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ তিনিই শ্রী...'

'তোর কথা শুনলে আমার মাথা ধরে। গোঁজামিলের কথা রাখ তো। এলোমেলো কথা যত তোর। এসব কথা থাক্, তোর বইখাতা নিয়ায় দেখি। পড়াশোনাটা কেমন হচ্ছে দেখা যাক একবার।'

খাতাপত্তর নিয়ে আসি সব। উল্টে-পাল্টে দেখে মা বললেন—'অঙ্কের খাতাটা কই? দেখছি না তো এর ভেতর।'

বলেছি না তোমায়? মাত্র অঙ্ক ছাড়া আর অন্য কিছু আমি জানি না। অঙ্কটঙ্ক একদম আসে না আমার।'

'তাহলেও খাতা একটা থাকবে তো? গেল কোথায়?'

'কাবিলের কাছে আছে। বলেছি না, আমার বন্ধু মহম্মদ কাবিল হোসেন আমার খাতায় প্রতিদিনের আঁকগুলো সব উৎরে দেয়। তাই সে খাতাটা ইস্কুল থেকে নিয়ে যায় পরদিন আবার নিয়ে আসে ইস্কুলে ঠিকঠাক করে। আমার আঁকের খাতার মোকাবিলা সে-ই করে।'

'দেখি তোর কম্পোজিশনের খাতা তবে। ট্রান্সলেশনের খাতাটা দেখি।'

'ওই তো আছে। তোমার সামনেই তো।'

'এসব কী লিখে রেখেছিস খাতায়?'

'দ্যাখো না।'

'গদ্যপদ্যের ছড়াছড়ি দেখছি। এসব কী আবার? কিসের মহাভারত?'

'মহাভারত নয়, রামায়ণ।'

'রামায়ণ!' মা যেন আকাশ থেকে আছাড় খান।

'পড়ে দ্যাখো না, কেমন আমি রামায়ণ লিখলাম।'

'রামপ্রসাদী কাণ্ড বাধিয়েছিস যে? তিনি যেমন হিসেবের খাতায় মায়ের গান বেঁধে ছিলেন, দে মা আমায় তবিলদারি-র গান বেঁধে রেখেছিলেন তুইও তাই করেছিস দেখছি।'

'শিবপ্রসাদের ছেলে হয়ে সেটা কি খুব বেশি দোষী হয়েছে মা? বাবা তো পদ্য লেখেন, বইও ছাপিয়েছেন সেই সব নিয়ে, আমিও তদ্রূপ কৃত্তিবাসের তহবিল তছরূপ করেছি মা। কৃত্তিবাসের মতন আমিও রামায়ণ লিখেছি একখানা।'

'দেখি তোর কাণ্ডটা।' পাতাগুলোর ভেতর দিয়ে ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে যান মা।

'একটা কাণ্ডও হয়নি এখনো।' আমি জানাই: 'সাতকাণ্ডর সবটাই বাকী। মাঝে মাঝে লিখে গেছি খানিক খানিক। যখন যেখানটা আমার মনে ধরেছে লিখে রেখেছি।' আরো আমি বিশদ করি—'তবে সপ্ত কাণ্ডের শেষ কথাটি আমি লিখে রেখেছি আগে-ভাগেই। ...এই যে! এই পাতাটায়, দ্যাখো না!'

মা দেখালেন, তার পরে শুরু করলেন সুর করে

'সুপণ্ডিত শিবরাম বিচক্ষণ কবি।
সপ্তকাণ্ডে গাহিলেন রামায়ণ সবি॥'

আওড়াবার পর মার সে কী হাসি! মার এরকম হাসি, এমন উচ্চহাস্য এর আগে আমি কখনো শুনিনি।

হাসির চোটে আমি রীতিমতন চোট খাই। ঘাবড়েও যাই বেশ। অপ্রতিভের মতন কই—ভালো লাগল না বুঝি তোমার?'

'কিস্‌সু হয়নি তোর। কৃত্তিবাসের কথাগুলোই উলটে পালটে বসিয়ে দিয়েছিস—তাঁর লেখাটাই আরেক রকম করে সাজিয়েছিস। তাঁর পয়ারের ভেতর থেকেই মিল টেনে এনে মিলিয়ে দেওয়া কেবল। এই যেমন তোর শেষ ছত্রটাই ধর না—! কৃত্তিবাসের রয়েছে—কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ/সপ্তকাণ্ডে গাহিলেন গীত রামায়ণ॥ তুমি বাপু, সেই কথাগুলোই ফের ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছ। ফের ফের তাই দেখছি তোমার আগাগোড়া।'

আমার ফেরেববাজির কথায় আমার প্রাণে লাগে—'কিছু হয়নি তুমি বলছ?' মার কথায় কান্না পায় আমার, বলতে কি! 'দেখাবো তোমায়?'

'কি করে হবে? সাধক না হলে কি এসব লেখা যায় রে? কৃত্তিবাস কাশীরাম—এঁরা মহাপুরুষ, মহা সাধক ছিলেন। মহাভক্ত তাঁরা, ভগবানের কৃপাতেই লিখেছেন, লিখতে পেরেছেন। নইলে কি লেখা হয় নাকি? তুই তা লিখবি কি করে?'

'তাহলে আমি বৈষ্ণব পদাবলীই লিখব

না হয়।' রুদ্ধ কণ্ঠে বলি—'তাও আমার বেশ আসে। আরেকটা খাতায় লিখেছি... দেখাবো তোমায়?'

'এইরকমই তো হবে, তার দরকার নেই, দেখলে আমার হাসি পাবে আরো।' না দেখেই হাসতে থাকেন মা: 'বৈষ্ণব পদাবলী তুই লিখলি কি করে? তোর বাবার পদাবলী সংগ্রহ পড়ে পড়ে?'

'না পড়লে কি লেখা যায় নাকি?' নিজের সাফাই গাই: 'লেখাপড়া শিখতে হলে যেমন আগে লেখা তার পরে পড়া, আগে হাতেখড়ি অ-আ-ক-খ যতো লিখে লিখে মরি, তার পরে তো বইটই পড়ি? তেমনি লেখক হতে গেলে আগে পড়া তার পরে লেখা। তাই নয় কি? আমার তো তাই মনে হয় মা। আগে পরের লেখা না পড়লে কেমন করে লিখব? কী লিখব কিরকম করে লিখব টের পাব কি করে?'

'কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী কি তাই? পড়লেই কি লেখা যায় নাকি?......তুই কি বৈষ্ণব? কৃষ্ণের ভক্ত কি তুই? সাধন ভজন করেছিস কিছু কখনো? তা না হলে ওসব লেখার অধিকারীই তুই নোস। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস এঁরা গুণী

লোক, যেমন সাধক তেমনি ভক্ত, তাই ওই পদাবলী তাঁরা লিখতে পেরেছিলেন। তাঁদের ভক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন ভগবান... যেমন সাধক তাঁরা তেমনি আবার মরমিয়া কবিও।'

মরমিয়ার মর্ম তখন আমার মগজে না ঢুকলেও কথাটা আমার মর্মে লাগল বেশ।—তবে আর লিখে কী হবে! আমি যখন পারবোই না তুমি বলছ। আমি কিন্তু মা, জয়দেবের মতন সমস্কৃত কবিতাও লিখব এঁচে রেখেছিলাম।' মর্মান্তিক কথাটা না বলে পারলাম না।

'জয়দেব! অ্যাঁ? বলিস কিরে? জয়দেব পড়েছিস নাকি তুই?'

'পড়ব না, কী মিষ্টি যে! বাবার আলমারিতেই তো রয়েছে—কুমারসম্ভব, শকুন্তলার সঙ্গে। পড়েছিও, বুঝেছিও। সমসকৃত হলেও বোঝা যায় বেশ, বাংলার মতন সোজাই তো!'

'তাহলেই বোঝ। বুঝে দ্যাখ তাহলে। কত বড় ভক্ত হলে তবেই না অত বড় কবি হওয়া যায়। তাঁর ভক্তির টানে ভগবান নিজে এসে তাঁর কবিতার অসমাপ্ত পদ স্বয়ং লিখে সম্পূর্ণ করে দিয়ে গেছলেন, জানিস তো?'

'জানি নই কি। স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্ দেহি পদপল্লব মুদারম্!'

'আহা! আহা!!' মার আহাকার-ধ্বনি শোনা যায়।

'রাধার মতন অমন আহামরি মেয়ে হলে তেমন পদপল্লবমুদারম করতে সকলেই পারে মা। এমন কি এই আমিও পারি। সত্যি কথা বলতে কি...'

বলতে গিয়ে আমি চেপে যাই। রিনির পদপল্লব নিয়ে নিজের মাথায় না ধরলেও প্রায় তার কাছাকাছি এনে সেই উদারতা আমিও যে দেখিয়েছি সে কথা আর কই না। সে কথা ফাঁস করে নিজের ফাঁসির দড়ি কি কেউ গলায় পরে সাধ করে?

'বড্ড পেকে গেছিস তুই! এই বয়সেই তোর বাবাই তোর মাথাটা খেল—একটুও শাসন করে না তোকে। এমন অনাসৃষ্টি সন্যাসী মানুষকে নিয়ে কি সংসার করা পোষায়!'

• 'তাহলে আর কী হবে! আমি তো কবি কি লেখক কিছুই হতে পারব না আর।' আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

'পারবি না কেন? তবে কিনা, পরের নকল করে তা হতে পারবি নে। পরের মত করে লিখলে কি হবে? তাহলে চলবে না, নিজের মত করে লিখতে হবে যে। পরের থেকে নিয়ে নয়, নিজের থেকেই হতে হবে তোকে। এই যেমন...' মা আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে এক দৃষ্টান্ত নিয়ে আসেন—'এই কবি রাজকৃষ্ণ রায়। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী পড়েছিস তুই? আছে তো আমাদের। তোর বাবার ঐ আলমারিতেই রয়েছে।'

'না, পড়িনি তো। এখনো পড়িনি।'

'পড়ে দ্যাখ তো। বাল্মিকীর অনুসরণে তিনিও রামায়ণ লিখেছেন, নানা ছন্দের কবিতায়—কিন্তু একেবারে নিজের মতন করে। সাত কাণ্ডের কোনোখানেও কবি কৃত্তিবাসের কোনো অনুকরণ করেননি। যদিও কৃত্তিবাস তাঁর ঢের আগেকার।'

'করেননি তিনি?'

'না। করলে তাঁর লেখা কিছুই হত না একেবারে। কিন্তু লিখেও যে কিছু হয়েছে তা নয়। হয়নি কেন জানিস? রামায়ণ বলে কথা! রামের ভজনা না করে শুধু বিদ্যাবুদ্ধির জোরে কি তা লেখা যায়? ভগবানের সাধক না হলে ভগবানের চরিত গাথা গাইবার ক্ষমতা হয় না, রচনাও করা যায় না। তুলসীদাস কৃত্তিবাস শ্রীরামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন—তাঁর কৃপাতেই ওই রামায়ণ লিখতে পেরেছেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায় ভক্ত সাধক ছিলেন না তো; লিখলেন বটে রামায়ণ, ভালোই লিখলেন বটে, কিন্তু লিখেও কিছু হল না। তাঁর বই লোক-সমাজে চলনই হল না মোটে। অথচ ভারতের ঘরে ঘরে রামচরিত মানস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এতেই বুঝবি।'

মার কথায় রাজকৃষ্ণ রায় নিয়ে বুঝতে বসলাম।

পড়ে দেখলাম চমৎকার লেখা। বিচিত্র ছন্দে রচিত, আশ্চর্য কবিতা সব। নতুন ধরণের মিল দিয়ে, আনকোরা লেখাই। কৃত্তিবাসের ধার কাছ দিয়েও যায় না, আলাদা রকমের লেখা, তাঁর চেয়ে আরো ভালো বলেই মনে হোলো। কিন্তু এমন করে লিখেও কিনা...এই দশা? এ-বই কেউ পড়ে না আজকাল? চলে না বাজারে?

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরে এসে লিখতে সে রাজকৃষ্ণের অমন কীর্তি যদি বাসি হয়ে গয়ে থাকে তো আমার এই অনাসৃষ্টির দশা কেমনটা দাঁড়াবে তাহলে?

ঘাবড়ে গেলাম বেশ। রাম জন্মাবার ষাট বছর আগে যেমন বাল্মিকীর রামচরিত রচিত হয়েছিল, আমার বেলায় সব দিক খতিয়ে দেখে জন্মাবার আগেই আমার রামায়ণ খতম্।

ক্রমশঃ

॥ ৪ ॥

শফী যতক্ষণ থাকে, বাড়ি মাথায় করে রাখে। অসম্ভব বকতে পারে ছোঁড়া, আর ক্রমাগত হই-হই ছুটোছুটি। এক সেকেন্ড এক জায়গায় স্থির হয়ে বসা, কি দু' মিনিট মুখ বন্ধ রাখা তার কুষ্ঠিতে নেই।

কদিনই দেখেছে রামানন্দ।

রাজাবাজারের দুর্গন্ধ বস্তি ছেড়ে এই খোলামেলা আকাশের নিচে মাধুরীর কাছে এসে শফীউল্লার প্রাণে আনন্দের তুফান ওঠে। তার চেহারাই বদলে যায় এই সময়টায়।

মিশমিশে কালো গায়ের রং। কিন্তু মুখটা ভীষণ মিষ্টি। টিকলো নাক। চোখ দুটো টানা টানা, উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন। গায়ের রং-এর যদি রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়, চোখ দেখে মনে হবে ভোরের আশ্চর্য নীল ময়ূরকণ্ঠী আকাশ। এখনও ঠাণ্ডা, বড় বেশি নির্মল। তবে সূর্য উঠবে। চোখের ধারে ধারে রক্তের লাল ছিটা, যৌবনের সতেজ রং প্রায় উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। দেবেই তো, পনেরো ষোল পার হতে চলল বয়স, পাতলা ঠোঁটের ওপর চিকন গোঁফের রেখা, চোয়ালের মৃদু ভাংগা-চোরা কাজ একটু একটু নজরে পড়ছে, গলার স্বর ভাংগছে।

কাজেই কৈশোরের অজ্ঞানতা, নিষ্পাপ নিরীহ অন্ধকার, আবার এদিকে যৌবনের উদ্দীপ্ত বোধ বিশ্বাস উজ্জ্বল অহংকার-এর মাঝামাঝি এক জায়গায় পৌঁছে শফী এমন চঞ্চল অস্থির।

নিজেকে চিনতে পারছে না আর, বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। কী ছিলাম আমি, কী হচ্ছি। সব মানুষেরই এই হয়, এমন বয়স আসে। পথ হারিয়ে ফেলার, একটা চেনা খুঁটি ছেড়ে চলে আসার হিজিবিজি ধাঁধায় পড়ে হকচকিয়ে যাওয়া।

ছোঁড়ার চালচলন হাবভাব দেখে রামানন্দ সময় সময় খুশি হয়, বিরক্তও কম হয় না। কিন্তু দোষ দেবে কেমন করে। শফী এখন আকাশের মেঘ হয়েও নেই, পৃথিবীর সমুদ্রেও নেই। উজ্জ্বল বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে মাঝপথে দুলছে, হাওয়ায় কাঁপছে। না কি সমুদ্রে যাবার আগে বনের কিনারে আয়নার মতন চকচকে, স্রোত নেই ঢেউ নেই, নিরালা জলাশয় পেয়ে ঝুপঝুপ করে তার ওপর লাফিয়ে পড়ছে। যেন তাই। মাধুরী বনের ধারের দীঘি। বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে শফী জলে শব্দ তোলে ঢেউ তোলে। শফী এলে মাধুরীর মুখে কথার খই ফোটে, হাসির ঢেউ ওঠে সর্বাঙ্গে, ঢেউয়ের সঙ্গে খুশির ছোট ছোট আবর্ত ওর গালে চিবুকে, চিবুকের নিচে কণ্ঠার কাছে অজস্র চোখে পড়ে, যেন দিশাহারা হয়ে ওঠে যুবতী।

এ-ও এক ছবি, মাথার ঝুঁটি হাঁস মুরগি, রোদ বালু, খালের জল, পানা, গুগলী নিয়ে যেমন, তেমনি শফীকে নিয়েও মাধুরীর কবিতা।

অবশ্য রামানন্দর চোখে। তা না হলে ঐ দুটি মানুষ কবিতা টবিতার বড় একটা ধার ধারে কিনা।

রাজাবাজার থেকে ছোঁড়া হাঁটিতে হাঁটিতে এতটা রাস্তা চলে আসে। হপ্তায় দু' দিন আসে, তিন দিন আসে, আবার চার দিনও হয়ে যায়। অক্রর ঠিক করে দিয়েছিল।

শফীদের ডিমের কারবার, এখানে সে ডিম নিতে আসে। হাঁস মুরগি ডিম পাড়লে, যে কটা বাচ্চা ফুটোবার আলাদা করে রেখে মাধুরী বাদ বাকি সব হাঁড়িতে তুলে রাখে, শফী এসে নিয়ে যায়। অবশ্য রোজ কিছু ডিম জমে না—দু'দিন, তিন দিন অন্তর শফীর আসার কথা।

কিন্তু রামানন্দ দেখছে, কেবল ডিমের জন্য আসা নয়, যেন আরও দরকারী কাজ থাকে শফীর এখানে, তাই কাল যদি মাধুরীর হাঁড়ি উজাড় করে সব ডিম নিয়ে গেল, পরদিন সকালেই আবার দেখা গেল গুনগুন করে গান করতে করতে সবুট লোকের সাদা ধুলো উড়িয়ে ছিপছিপে কালো শরীরটা নাচাতে নাচাতে ছোঁড়া ছুটে আসছে। কি ব্যাপার? দেখা গেল তার হাতের পুঁটলিতে বাঁধা কিছু শুকনো মাছ—পাবদা পুঁটকী। হাঁদু দিদির জন্য নিয়ে এসেছে। মাধুরীর ভীষণ প্রিয় খাদ্যটি। চাট-গাঁ থেকে শফীর মামা এসেছে চাঁদা ও পাবদা পুঁটকী নিয়ে। তাই থেকে শফী দিদির জন্য কটা পাবদা মাছ নিয়ে এল।

সেদিন পুঁটলি বেঁধে নিয়ে এসেছিল এত টোপা কুল। মেটিয়াবুরুজে শফীর মামার বাগানে দুটো কুল গাছে এবার ঝেঁপে কুল এসেছে। পাতা দেখা যায় না। টোপাকুল

মাধুরীর ভীষণ প্রিয়। এই জিনিস পেলে সে ভাত খেতে ভুলে যায়। আর একদিন শফীর হাতে দেখা গেছে একটা প্রকাণ্ড ফুলকপি। কলকাতার বাজারে কপির অভাব কি, কিন্তু কপির এতবড় সাইজ বড় একটা চোখে পড়ে না। একদিন শফি ওটা মাথায় বসিয়ে নিয়ে এসেছিল। ঘেমেটেমে একাকার। দেখে মাধুরীর কী হাসি।

আজও দিদির জন্য নিশ্চয় কিছু একটা এনে থাকবে। আজ ছোঁড়ার আসার কথা ছিল কি? কাল সে ঝুড়ি ভরতি করে ডিম নিয়ে গেছে। রামানন্দ যতটা জানে, আজ মাধুরীর হাঁড়িতে হাঁস বা মুরগির একটাও ডিম নেই।

সে যাই হোক, শফীর হাতে কিন্তু কোনো পুঁটলিটুটলি ছিল না। যদি মাধুরীর জন্য পকেটে করে কিছু এনে থাকে। তা-ও সে আনে বইকি। বাদামভাজা চানাচুর পকৌড়ি। এই তল্লাটে এসব পাওয়া যায় না। অথচ কুড়মুড় করে নানা রকম ভাজাভুজি খেতে মাধুরীর খুবই পছন্দ।

রামানন্দ স্নান করতে চলে এসেছে। শফীর মুখটা একটু ভারভার দেখল না? অন্য দিনের মত কেমন যেন হাসিখুশি না। দুজন তখনি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। মাধুরীর নিশ্চয় রান্নার কিছু বাকি ছিল। এমন হয়। স্নানের আগে খানিকটা সেরে নিয়ে উনুনের বাকি কাজগুলি ও স্নানের পর এসে শেষ করে। 'মাস্টার তুমি চট করে ডুব দিয়ে এসো, অনেক বেলা হল।' রামানন্দর দিকে মুখ না ফিরিয়ে মাধুরী বলছিল, 'কুমড়োর চচ্চড়িটা কেবল বাকি আছে। এখনি হয়ে যাবে।' তারপর মাধুরী আর উঠোনে দাঁড়ায়নি। শফীর হাত ধরে তার ছোট রান্নার চালায় গিয়ে ঢুকেছে। উঠোনটা হঠাৎ তখন কেমন ফাঁকা লাগছিল। চারদিকে রোদ টা টা করছে। শূন্য উঠোনটাকে মাধুরীর আঙুলের পরিচ্ছন্ন নখের মতন, না কি ঝকঝকে দাঁতের মতন মাজাঘষা পরিষ্কার মনে হচ্ছিল? হরিতকী গাছের উঁচু ডালে বসে একটা কাক অলস গলায় ডাকছিল। রামানন্দ ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়েছে, তারপর কাপড় গামছা নিয়ে তখনি বেরিয়ে খালের দিকে চলে এসেছে।

কিন্তু চট করে সে জলে নামল না। তীরে দাঁড়িয়ে সেই হাঁসটাকে দেখতে লাগল। ওপাশে কচুরিদামের কাছে ডুবিয়ে ডুবিয়ে গুগলী তুলছে। একটু আগে মাধুরী ওটার গলা জড়িয়ে খুব আদর করছিল। এখন মাধুরী কুমড়োর চচ্চড়ি রান্না করছে। শফী নিশ্চয় উনুনের ধারে বসে আছে। আর একদিন দেখা গিয়েছিল উনুনের কাছে বসে ছোঁড়া পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে। কী রান্না করেছিল সেদিন মাধুরী? রামানন্দ মনে করতে পারল না। সত্যি কি কেষ্টঠাকুরের মতন দেখায় শফীকে? কালো রং, কোঁকড়া চুল টিকলো নাক বলে? যদি তাই হয়, তার পাশে, হ্যাঁ যখন দুজন রান্নাঘরে ঢুকেছিল মাধুরীকে কেমন দেখাচ্ছিল? রাধা—রাই কিশোরী? না তা কেন হবে। গোলাপের মতন গায়ের রং, রাত্রির অন্ধকার নিয়ে এক মাথা চুল, সরসীর মতন ঢলঢলে আয়ত চোখ, সুঠাম গড়ন, কিন্তু পঁচিশ ছাব্বিশের কম বয়স হবে কি? চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি হয়ে অক্রূরের স্ত্রী থমথমে যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই দুটিকে রাধাকৃষ্ণ মনেই হয় না। হওয়া উচিত না। শফী অনেক ছোট, কৃশ। তবে? রামানন্দ ফাঁপরে পড়ল। তার কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিতে আরম্ভ করল। কিছুতেই সে মনে করতে পারছিল না ঐ দুটি মানুষকে পাশাপাশি বা মুখোমুখি দাঁড়ালে বা বসলে

ছিল ছেলেটা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখে লায়েক হয়ে বিলেত টিলেত যাক। কিন্তু তার সেই গুড়ে শফী অচ্ছা করে বালু ছড়িয়েছে। থার্ড ক্লাসের বেড়াই ডিঙোতে পারল না। দু' দুবার অ্যানুয়েল পরীক্ষায় আটকে গেল। তাই তো, বাপের শখ আহ্লাদ মেজাজ মর্জির সঙ্গে ছেলের শখ মেজাজ মর্জিও যে মিলে যাবে তার কি আছে। শফী কী চাইছিল, তার খেয়ালের নৌকো কোন্ দরিয়ায় ভাসাতে চাইছে ইয়াকুব একদম বুঝতে পারেনি, না হলে ধরে বেঁধে তাকে স্কুলে পাঠায়! এখন অক্ষয়ের এই ভিটেয় ইয়াকুব একবার এসে উঁকি দিয়ে দেখত! এখনকার চেহারা আর শফীর স্কুলের সেই চেহারা! ঘণ্টা পড়ার পরেও দশ মিনিট পার না করে যে কোনোদিন ক্লাশে ঢুকত না। মাস্টার মশায়ের বকুনি খাবার ভয়ে রোজ শেয়ালের মতন পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে, এই জন্যই না রামানন্দ আজও তাকে শেয়াল বলে ডাকে। হুঁ, পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকত আর ইতিউতি করে তাকাত, যেন কোথাও কিছু চুরি করে এসেছে। তা চুরিই সে করত, বাপের কাছে চুরি করত, মাস্টার মশায়দের কাছে করত,

ক্লাসের আর দশটা ছেলের কাছে কষ্ট। কেননা, কোনো দিন ভুল করেও একটা পড়া শিখে যায়নি। কিছু জিজ্ঞেস করলে নিচের দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকত। চুল ধরে টানো কান ধরে টানো, যত খুশি বকুনি লাগাও ছোঁড়া ঠিক চোখ দুটো বেঞ্চির দিকে নামিয়ে রেখে বোবা হয়ে আছে, পাথর হয়ে আছে। মারটা যেদিন বেশি পড়ত, একবার, একবারই শুধু চোখ তুলে তাকিয়েছে, অন্য মাস্টাররা কি করত তখন রামানন্দ বলতে পারে না, কিন্তু শফীর সেই অসহায় করুণ দৃষ্টি রামানন্দ সহ্য করতে পারত না। কেমন কান্না পেত তার, যেন কান্না বুঝতে দাঁতে দাঁত চেপে একটু সময় সে চুপ করে থাকত। কদিনই এমন হয়েছে, তারপর হাতের বেতটা নামিয়ে রেখে শফীর মাথায় হাত রেখে আদুরে গলায় বলত, কী দরকার, কষ্ট করে রোজ ইস্কুলে আসার, তার চেয়ে বাপের ডিমের কারবার দেখলে ভাল হত না কি, বাপজানকে বুঝিয়ে বল না।

ইয়াকুবকে ছেলে তাই বুঝিয়েছিল কি? রামানন্দ বলতে পারে না। তবে একদিন দেখা গেল শফী আর স্কুলে আসছে না। এক মাস দু' মাস—তারপর ছ' মাস কেটে গেল। রামানন্দ তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রামানন্দও বুঝল ছোঁড়া তার উপদেশ মাথায় করে নিয়েছে, হয়তো বাপের ডিমের কারবারেই লেগে গেছে। সত্যি, এক একদিন মার খেয়ে ছোঁড়া যখন নিষ্পলক চোখ দুটো তুলে ধরেছে, রামানন্দের মনে হত, চোখ না, যেন একটা কোমল উষ্ণ হাত বাড়িয়ে শফীউল্লা রামানন্দের হৃৎপিণ্ডের ওপর রেখেছে। যেন রামানন্দকে ডেকে বলছে, এখানকার এই পড়া বইটই টুল টেবিল চেয়ার বেঞ্চ ছাত্রের শব্দ চারদিকের দেওয়াল দপ্তরী আমার ভাল লাগে না স্যার, আমি হাঁপিয়ে উঠছি, আমায় মুক্তি দিন মুক্তি দিন।

সেদিন রামানন্দ কী দেখতে পেয়েছিল ইয়াকুবের ছেলের চোখের ভিতর? আকাশ ভরা রোদ মাঠ ভরা ধুলো? মাদার মনসার ঝোপে শালিক বুলবুলির নাচানাচি? একটা রক্তরাঙা পলাশ গাছ পায়ের কাছে মনোহর ছায়া ছড়িয়ে রেখে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত? হয়তো সেরকম কিছু দেখেনি, কিন্তু দেখতে পেলে রামানন্দ যেন শান্তি পেত। যেন রামানন্দ আশা করত, তেমন একটা রৌদ্র ছায়া ছড়ান বিশাল আকাশের নিচে পাখির ডাক ও ফাল্গুনে পাতায় ফুলে ফুলে গাছপালা ভরে উঠে এমন কোনো শান্ত পরিচ্ছন্ন জগতে শফীউল্লা তাকে ডেকে নিয়ে যাবে। শফী যখন আর স্কুলে আসছিল না তার করুণ চোখ দুটো মনে পড়ে রামানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলত। তার বুকে টনটন করত, তার মনে হত, যদি আবার কোনোদিন কোথাও ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা হয় রামানন্দ তৎক্ষণাৎ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবে, চুমোয় চুমোয় শ্যামলা রঙের কচি মুখটা আচ্ছন্ন করে দেবে। হুঁ, অস্বীকার করে লাভ নেই, যেন দরকার হলে রামানন্দ তখন গলা খুলে মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়, শফীর যে বয়স, গোঁফের রেখা উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, চোখে রক্তের ছিটা দেখা দিয়েছে, এই বয়সের একটি মেয়ের চেয়ে একটি ছেলের সাহচর্য তাকে বেশি সান্ত্বনা দেবে। অস্বীকার করে লাভ নেই। বুকে একটা হাহাকার নিয়ে রামানন্দ ঘুরছে, পূরবী তার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না, বাউণ্ডুলে কবি, গাধা স্কুল মাস্টারকে ঐ মহিলা মনেপ্রাণে ঘেন্না করে, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকবে বলে দিন-রাত শাসায়। মোটে বিয়াল্লিশ বছর বয়স, এখনই কিছু যৌনসম্ভোগ থেকে রামানন্দ বঞ্চিত হতে চায় না, আর একটা শরীরের উত্তাপ রক্তের স্পন্দন হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া বুক দিয়ে যে অনুভব করতে পারলে তৃপ্ত হয়, ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু কোথায় সেই জিনিস, ভোমরের ঝাঁকের মতন সুন্দর সুন্দর শরীর, সুন্দর মুখ নিয়ে মেয়েরা তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে ঠিকই, কবির সান্নিধ্য তাদের সুখ দেয়, রামানন্দর কবিতা পড়ে তারা মুগ্ধ, নিজেরাও কবিতা লিখতে চায়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, একটি মেয়ের প্রতিও রামানন্দ আকর্ষণ বোধ করে না, সব কটির চোখে সে পূরবীর চোখ দেখতে পায়, তাদের নিশ্বাসে পূরবীর নিশ্বাসের গন্ধ পায়। হাড়ে পূরবীর কাছ থেকে রামানন্দ জেনে গেছে, দৈবাৎ এই মেয়েদের কারো স্বামী যদি কবি হয়, পূরবীর মতন ভদ্রলোককে মেয়েটিও বিয়ের পরদিন থেকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করবে, সেই পুরুষের চুল চোখ গায়ের চামড়া এমন কি জামা-কাপড় দেখলেও তার গা-বমি করবে, আলাদা বিছানায় শোবে, কাব্যের সুষমা-টুষমা কর্পূরের মতন উবে গিয়ে ঘরে ছুঁচোর কেত্তন আরম্ভ হবে। কাজেই রামানন্দ মেয়ে জাতটাকেই আর সহ্য করতে পারছিল না। যদিও এর জন্য তার স্ত্রীই দায়ী। পূরবী তাকে ঘোর নারীবিদ্বেষী করে তুলেছিল।

এই অবস্থায় রামানন্দ মনে মনে শফীকে খুঁজছিল, ছোঁড়ার স্কুল ছাড়ার পরেও প্রায় ছ' মাস কেটে গেছে, ইতিমধ্যে পূরবী

আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করেছিল। একদিক থেকে রামানন্দ তখন স্বস্তিবোধ করছে, যখন খুশি বাড়ি ঢোক, যেমন খুশি খাও, অবশ্য খাওয়াটা তখন হোটেলেই সারা হচ্ছিল, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না, স্কুলে বেরোতে ইচ্ছেই করছে না, পরিচিত কোনো মানুষের মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না, এমন কি শুভেন্দু বিকাশদের মতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করছে, সারাদিন ঘরের দোর ভেজিয়ে কেবল বিছানায় শুয়ে থাকা, উঁহু, কোনো বই পড়া না, কিছু লেখা না, লেখা-টেখা শিকেয় তুলে রেখেছে, কোনোরকম চিন্তা অনুভূতি তার মধ্যে খেলা করবে না, এমন কি পৃথিবীর আলো শব্দ গন্ধ বাতাস কিছুই যেন তাকে স্পর্শ না করে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে বললে ভুল হবে, বরং তার তখন ভাবতে ইচ্ছা করছিল, 'ইন্দ্রিয়টিন্দ্রিয় বলতে যা বোঝায় সব কিছু তার ভেতর অকেজো হয়ে গেছে, যেন একটা মরা গাছ হয়ে পাথরের চাঙগড় হয়ে সে বিছানায় শুয়ে আছে। দিনের পর দিন এভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়, ইচ্ছা করলেই সে কাটিয়ে দিতে পারে, চুল কাটা দাড়ি কামান স্নান পায়খানা জামাকাপড় পরা—সব বন্ধ। এভাবেও কদিন কাটিয়েছিল বইকি রামানন্দ। স্কুলে যায়নি, সাত দিন কামাই করেছিল। কলকাতার রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি গাড়ি ঘোড়া, মানুষের মুখ তাদের ব্যস্ততা ছুটোছুটি, সাজ পোশাক খাওয়া বেড়ান, মানুষের ক্ষণে ক্ষণে রেগে ওঠা হেসে ওঠা, ট্রামবাসে ধাক্কাধাক্কি চারদিকের অফিস আদালত দোকান সিনেমা, স্কুল কলেজ, মিছিল স্লোগান, ভিক্ষুক রাস্তার মেয়ে, সাহিত্য খবরকাগজ মোহনবাবুর চায়ের দোকানের আড্ডা, শুভেন্দু বিকাশ নবকিশোর উৎপলেন্দু—মনে পড়লে রামানন্দর উটকি আসত, তার চেয়ে অন্ধকার ঘরে চোখ কান বুজে শুয়ে থাকা ঢের বেশি উপাদেয়, বাইরে যাবার কথা মনে হলেই একটা বধ্যভূমির ছবি তার চোখের সামনে তখন ভাসছে, গোটা কলকাতা শহরটা একটা কসাইখানা; রোগা জিরজিরে হাজার হাজার গরু ছাগল ভেড়া এনে জড়ো করা হচ্ছে আর কাটা হচ্ছে, কেবল রক্ত, পশুদের ভয়ার্ত চিৎকার পচা দুর্গন্ধ, ভনভন মাছি, লাল চোখ শকুনি গৃধিনী। এটা ভাবত রামানন্দ, ঘরের বিছানায় চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে এই দুর্গন্ধ রক্ত মাছি শকুনের কথা ভাবতে, কলকাতার রাজনীতি সাহিত্য বাজার হাট বইপাড়া স্কুল কলেজ অফিস কাছারি রেস্তোরাঁ বাজার সিনেমা ঘোড়দৌড়ের মাঠ—সব এক দেখছে। আর তখন নিজের মনে হেসে সে কবিতা আওড়াত: 'মনে হয় ঘণ্টা পড়ে গেছে, ট্রেন আসতে দেরি নেই—আমি কি কোথাও যাব? কোথায় যাব?' নিজের ও পরের লেখা সব কবিতাই তখন সে ভুলতে চাইছিল, শুধু সময় সময় একটা দুটো ভাল লাইন অন্ধকারে বিদ্যুতের মতন মগজের মধ্যে সে ঝলসে না উঠছে এমন না। সেদিন ঐ চরণটাই কবিতাটি মনে পড়তে সে খুশি হয়েছিল, নিজের মগজকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, কেননা সে তো শহর ছাড়তেই চাইছে, শত শাঁগুপীর সম্ভব দূরে কোথাও চলে যাওয়া।

এমন দিনে হঠাৎ একদিন শফীর সঙ্গে দেখা। কোথায় যেন বাসে করে যাচ্ছিল, বাস থেকে রামানন্দ দেখতে পেয়েছিল বৈঠকখানার মোড়ে অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে কালো রোগা শরীরটা ঝুঁকে করে শফী ফুটপাথের দোকান থেকে খেজুর কিনছে, নীল মাছি উড়ছে খেজুরের ঝাঁকার ওপর, শফীর পরনে টুকটুকে লাল লুঙ্গি। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ বাস থেকে নেমে পড়ে। তাকে দেখে ছোঁড়া অবাক। 'আমায় একটা ঘরটর দিতে পারিস? রামানন্দর প্রথম কথাই যেন ছিল ওটা। 'পুরোনো বাসাটা ছেড়ে দিচ্ছি।' কেমন

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন চেহারা করে শফী ফ্যালফ্যাল করে মাস্টার মশায়কে দেখছিল, তারপর লাজুক হাসি হেসে চোখ নামিয়ে বলেছিল, 'আমার তো তেমন ভাল ঘর জানা নেই, স্যার।'

'কেন, তোদের ওখানে কী? তোদের রাজাবাজার বস্তির মধ্যে একটা ঘর পাওয়া যায় না?'

'ওরে ব্বাস, ওখানে আপনি থাকতে পারবেন না স্যার।'

'কেন, তোরা আছিস না?' রামানন্দ চোখ ছোট করেছিল। 'তোরা থাকতে পারলে আমিও খুব পারব।'

কেমন করে যেন হেসেছিল শফী। তারপর মাথা ঝাঁকিয়েছিল। 'ভয়ানক হট্টগোল স্যার ওখানে, রাতদিন চেঁচামেচি, আর ধোঁয়া দুর্গন্ধ নোংরা মাছি—'

'তা হোক, থাকুক দুর্গন্ধ চেঁচামেচি মাছি, আমার একটা ঘর দে।'

কিন্তু শফী কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না তার মাস্টার মশায় ওখানে গিয়ে থাকতে পারবে।

'বুঝলি', রামানন্দ আবার বলেছিল, 'এখুনি আমার একটা ঘরের দরকার, আজ পেলে আজই চলে যাই।'

তখন শফী বেলেঘাটার সল্ট লেকের ধারে অক্ষরের বাড়ির কথা বলেছিল। খুব খোলামেলা পরিষ্কার জায়গা। একটু দূরে হয়। তা হলেও এমন ফাঁকা জায়গায় মাস্টার মশায়ের ভাল লাগবে। শফীকে প্রায়ই সেখানে ডিমের জন্য যেতে হয়। রামানন্দ আপত্তি করেনি। হ্যাঁ, দূরেই সে চলে যাবে, আর শফীও যখন প্রায় সেখানে যায়।

ঐ যে একদিন ছোঁড়ার চোখ দেখে রামানন্দর মনে হয়েছিল আকাশ রোদ পাখির ডাক, ফাল্গুনে পড়তে গাছের মাথা লাল হয়ে ওঠে এমন এক দেশে শফী তাকে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল।

কসাইখানার পচা রক্ত দুর্গন্ধ শকুন ও পশুদের আর্তনাদ পিছনে ফেলে এসে রামানন্দ বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

নাকটা মোটা, মোটা ধাতের দেহ তার। একদিন সে কবিতা লিখত মনেই হয় না। স্নান করে ভেজা গামছাটা মাথায় জড়িয়ে এই যে খালের ওপর দিয়ে হাঁটছে; দেখলে মনে হবে বুগীটুগী দেখে এসে খালের জলে স্নান করে গাঁয়ের এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, না কি মানুষটার মুদীর দোকান আছে, থপথপ হেঁটে বাড়ি ফিরছে। আবার পুরুত ঠাকুরও মনে হতে পারে, রামানন্দর গায়ের রং ফরসা। তার ওপর মাথায় লাল গামছা জড়ান। যেন পুজো-আচ্চা সেরে ঠাকুরমশায় যজমান বাড়ি থেকে এই ফিরছে। যাই মনে হোক, আমাকে কেউ কবি না ভাবলেই হল, মনে মনে বলল সে।

খুব চুপচাপ লাগছিল বাড়িটা। যেন কেউ নেই। অবশ্য রান্নার চালার দরজা খোলা। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না, রান্নারও শব্দ নেই। তবে বুঝি রান্না শেষ করে মাধুরী রামানন্দর জন্য বসে আছে? শফী? এত শীগগীর যে ভাইটিকে ও ছেড়ে দেবে রামানন্দর বিশ্বাস হল না। দুপুরে এলে ওকে দুমুঠো ভাত না খাইয়ে মাধুরী কোনোদিনই ছাড়ে না। ভেজা লুঙ্গি গামছা উঠোনের তারে শুকোতে দিয়ে রামানন্দ রান্নাঘরের দরজায় উঁকি দিল।

'কি হয়েছে!' অবাক হল সে। অবশ্য তখনি সে দেখে নিয়েছিল শফীর মুখে আজ হাসি নেই কথা নেই, মুখটা বেজার তার। এখন মাধুরীর পায়ের কাছে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। যেন এই মাত্র কাঁদাকাটি করছিল। হাতের পিঠ দিয়ে খুব চোখ মুছছে। 'কি হল?'

'ওর বাপজান আজ খুব মেরেছে।' মাধুরী দরজার দিকে চোখ তুলল।

'কেন?' রামানন্দ একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ভিতরে গলাটা বাড়িয়ে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়ালে ঘরের চাল মাথায় ঠেকে। 'ইয়াকুব ওকে মারল কেন? শফী!' রামানন্দ ডাকল।

শফী মুখ তুলল না।

'এই দ্যাখো মাস্টার।' হাত বাড়িয়ে শফীর পিঠের জামাটা তুলে ধরল মাধুরী।

রামানন্দ দেখল শফীর পিঠে কালশিরা পড়েছে। রং ময়লা। তাই জায়গাটা নীল নীল দেখাচ্ছে। (ক্রমশ)

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে
প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা
ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার টাটকা
স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান
আমেজের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে
শেষ টান পর্য্যন্ত পানামা আপনাকে
দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
GTC
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই—৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকী

কালী বিশ্বাস

নয়াদিল্লির রবীন্দ্রভবন। বিভিন্ন দেশের দূত মহোদয় ও বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি.ভি গিরি মহোদয় ললিতকলা আকাডেমি আয়োজিত দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকী (Second Triennale) প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে সভামণ্ডপ ত্যাগ করলেন। সকলেই প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করার জন্য অপেক্ষা করছেন। কয়েকজনের সঙ্গে প্রাঙ্গণ-সভার নিকট স্থাপিত ক্রমোন্নত একটি ভারার (ramp) ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। সহসা মাইক-

ফিগার, ল্যাডার, টিউব, স্ফিয়ার—হোর্স্ট আনটেস (ফেডারাল রিপাবলিক অব জার্মানি)

নিঃসৃত কোঁ-ও-ও কোঁ-ও-ও আওয়াজে অনেকে বিরক্ত হয়ে কান চেপে ধরলেন। এমন সময়ে একজন স্বেচ্ছাসেবক বললেন যে, যে ভারার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেটি আমেরিকা থেকে আগত ত্রিবার্ষিকী প্রদর্শনীর একটি ভাস্কর্য নিদর্শন এবং তীব্র ও বিক্ষিপ্ত শব্দটুকু আর কিছুই নয়, শব্দ ও সঙ্গীত অবলম্বনে রচিত শিল্পী কিথ সোনিয়ার-এর আর একটি কলা নিদর্শন! সকলেই বিস্ময়ে হতবাক। ভারা থেকে নেমে এসে সকলেই আর একবার কাঠের তক্তার তৈরি ভারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ত্রিবার্ষিকী, অর্থাৎ প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্র তথা ভাস্কর্যকলা প্রদর্শনী। এবারের প্রদর্শনীতে পৃথিবীর ৪৭টি দেশের ৩৬০ জন শিল্পীর ৮০০ নিদর্শন দেখা গেল—তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের নির্বাচিত শিল্প-সম্ভারের সংখ্যা সর্বাধিক, ১০৪। কয়েকটি দেশ থেকে এই উপলক্ষে কমিশনার তথা প্রতিনিধি হিসাবে সুপরিচিত শিল্পী ও কলা সমালোচক আসেন ও কয়েকজন এই দেশের সাংবাদিক ও কলা সমালোচকদের সাদর আমন্ত্রণ করে তাঁদের দেশের শিল্প নিদর্শন তথা সমকালীন চিত্রকলাধারা বিষয়ে আলোচনাও করেন। ফ্রান্স থেকে আগত কমিশনার মঁসিয়ে গি ভিলিন আয়োজিত সভায় আমার উপস্থিত থাকার সুযোগ হয়েছিল।

ত্রিবার্ষিকীর ৮০০ ছবি ও ভাস্কর্য-সম্ভার তিনটি বিভিন্ন স্থানে, অর্থাৎ রবীন্দ্রভবন, ত্রিবেণী ও জাতীয় কলাশালায় রাখা হয়। ইতিপূর্বে দিল্লির অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস সোসাইটি আয়োজিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমকালীন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার সময়ে কর্তৃপক্ষকে কি বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমি তা জানি। ত্রিবার্ষিকীর মত এত বৃহৎ ও ব্যাপক প্রদর্শনীর যথাযথ সংগঠন, সঠিক সুদৃশ্য ও সচিত্র চিত্র তালিকা-পুস্তক (Catalogue) প্রকাশন ও বিশেষত নিদর্শনগুলিকে রুচিসম্মতভাবে সাজানো বিষয়ে ললিতকলা আকাডেমি কর্তৃপক্ষকে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তা তিনটি বিভিন্ন গ্যালারী পরিক্রমা না করলে বোঝা যায় না। তার ওপর ছিল ছবি বিচার পর্ব। চিত্রকলা-জগতে খ্যাতনামা সাতজন আন্তর্জাতিক জুরির সভ্য হিসাবে এ দেশে এসে বিচারের কাজ করেছেন : মিঃ বি ডোরিভাল (ফ্রান্স), ডাঃ এস মোডে (জি ডি আর), মিঃ টি ওগুরা (জাপান), মিঃ এস পেড্রে সা (চিলি), মিঃ আর স্ট্যানিস্লস্কি (পোল্যাণ্ড), মিঃ জে জে সুইনি (আমেরিকা) ও মিঃ এন এস বেন্দ্রে (ভারতবর্ষ)। শেষোক্ত জনই জুরির সভাপতি নির্বাচিত হন। জুরির বিচারে ছয়জন শিল্পী শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছেন : মারিও গারাদো (কিউবা), জারোদি পানেক (পোল্যাণ্ড), ঈশ্বর সাগারা (ভারতবর্ষ), মিরা শেনডেল (ব্রেজিল), জিরো ওশিহারা (জাপান) ও ইভারাল (ফ্রান্স)। এঁরা প্রত্যেকেই স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেছেন। দুজন শিল্পীর কাজ উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয়েছে—পিটার স্যাগেল (ওয়েস্ট জার্মানি) ও মিরোশলাভ সুতেজ (যুগোশ্লেভিয়া)। সুতরাং এত বড় প্রদর্শনীর সুবন্দোবস্ত করার জন্য ললিত-কলা আকাডেমি কর্তৃপক্ষকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই।

ত্রিবার্ষিকীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে। প্রথমত, নিদর্শনগুলি দেখে পৃথিবীর শিল্পকলাক্ষেত্রে সমকালীন ধারার

আনটাইটলড্ —অ্যালান স্যার্ট (আমেরিকা)

সুপিরিয়র টাওয়ার — মারিও গালার্গো (কিউবা, পুরস্কৃত)
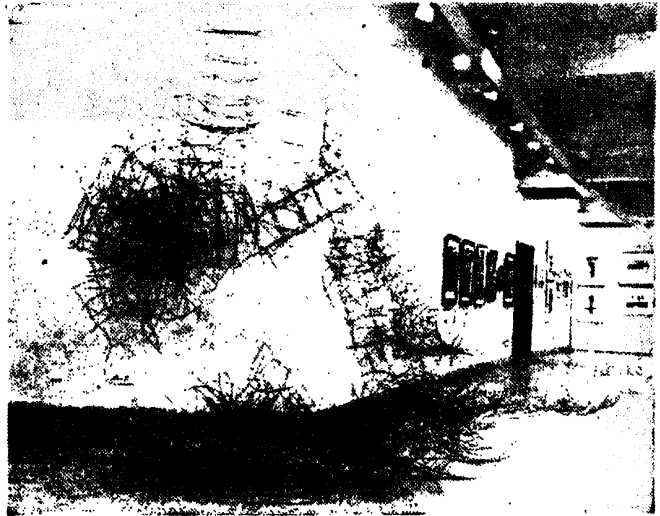
পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে বোঝা যায় বিভিন্ন দেশের পৃথক পৃথক রচনারীতি ও শিল্পীদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ দেশই বর্তমান যুগধারা অনুযায়ী তরুণ শিল্পীদের সমকালীন ছবি নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন। তৃতীয়ত, মৌলিক অঙ্কন পদ্ধতি দেখা গেলেও উন্নত ও প্রধান দেশগুলির শিল্পীদের কাজে বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার তথা আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রতিচ্ছবি নানাভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি, বিশেষ করে আমেরিকার শিল্পীরা (এবং ইতালিরও) জল, তেল ও অ্যাক্রিলিক রঙের পরিবর্তে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত ও ব্যবহৃত নানা জাতীয় বস্তু মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণীর নিদর্শন তৈরী করেছেন। অধিকাংশ ছবিই বিমূর্ত, সমবিমূর্ত, প্রতীকভিত্তিক বা সাররিয়ালিস্টিক। কোলাজ নিদর্শনও দেখা যায়। সেই সঙ্গে চোখে পড়ে কয়েকটি দেশের উচ্চশ্রেণীর গ্রাফিক প্রিন্ট ও ভাস্কর্য নমুনা। বিশেষ করে অপ আর্টের কয়েকটি চমৎকার নিদর্শন দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট ও উন্নতিশীল দেশ—নাইজিরিয়া, ফিলিপাইনস, সিরিয়া, কুয়েত ও গ্রীস থেকে আগত সুন্দর ছবি ও ভাস্কর্য নমুনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য দেশের মধ্যে ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও বৃটেন থেকে আগত নিদর্শনগুলি উচ্চশ্রেণীর। আমেরিকার নিদর্শনগুলিতে নতুনত্ব, চমক ও পরীক্ষা-স্পৃহা ধরা পড়ে। দুঃখের বিষয় সুপরিচিত কয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও ভারতবর্ষের নিদর্শনগুলি সুনির্বাচিত এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিদর্শনগুলিতে ভারতীয় শিল্পকলার ছাপ আছে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রদর্শনীভুক্ত শিল্পীদের বয়স সাধারণত ৩০ থেকে ৫০-এর মধ্যে এবং অনেকেরই বয়স ৩০ থেকে ৪০-এর ভেতরে। প্রদর্শনীর প্রবীণতম শিল্পী সোভিয়েত দেশের সার্গেই সাজিয়ান বয়স ৯০; কনিষ্ঠ, কুয়েতের শিল্পী আবদুল কাদির শরিফ, বয়স মাত্র ১৮। এটি বলার তাৎপর্য এই যে, অধিকাংশ দেশই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শিল্পীদের প্রাধান্য দান করেছেন। সুতরাং বয়স্ক
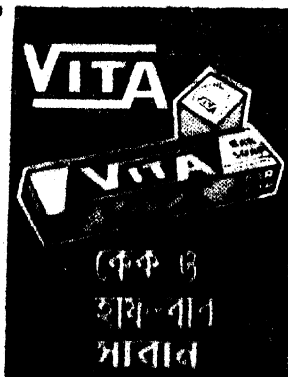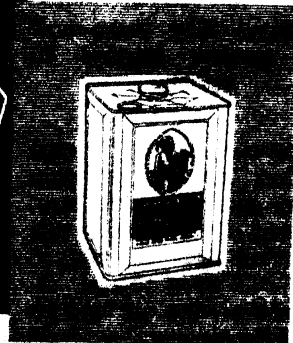
সিটি—২
—সুভেজ মিরোশ্লাভ (যুগোশ্লাভিয়া)
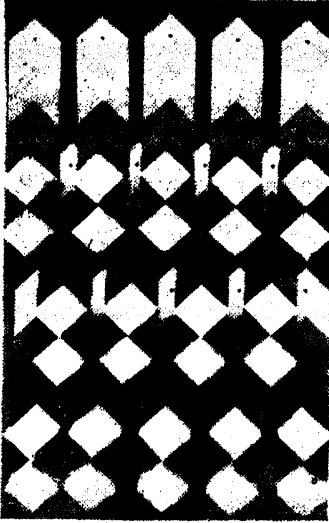
খ্যাতনামা শিল্পীদের সংখ্যা অল্প। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ও যন্ত্র সভ্যতা তথা নিস্তরঙ্গতা পাশ্চাত্য দেশের তরুণ শিল্পীদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে—বিভিন্ন দেশ তাদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তা-ই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। ত্রিবার্ষিকী প্রদর্শনীর সমগ্র শিল্পসম্ভার সাধারণের বোধগম্য নয়। তার কারণ সুস্পষ্ট। ছবির একটি নিজস্ব ভাষা আছে এবং ছবির রস উপভোগ করতে হলে সেই ভাষা শিখতে হয়। এবং তা শেখার একমাত্র উপায় বার বার এ জাতীয় শিল্পীদের শিল্পনিদর্শন দেখা ও বোঝার চেষ্টা করা। যাঁরা সত্যকার চিত্ররসিক তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে শিল্পীদের শিল্পকর্ম ও ধরা আগ্রহ সহকারে দেখতে থাকেন। সব সময়ে মৌলিক ছবি দেখার হয়ত সৌভাগ্য হয় না। তাহলেও চেষ্টা, অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন মাধ্যমে তাঁরা শিল্পকর্ম বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন। তবে দুঃখের কারণ নেই, যেহেতু সাধারণের বোধগম্য নিদর্শনের সংখ্যাও নেহাত অল্প নয়—তার ওপর আছে অপ আর্ট নিদর্শন—যেগুলি সকলেই উপভোগ করতে পারবেন।

পূর্বেই বলেছি, আমেরিকার নিদর্শনগুলি নতুন শ্রেণীর। শিল্পকলা বিষয়ে আমাদের প্রচলিত ধারণাটুকু কতদূর প্রসারিত করা যায় তা-ই দেখান হল আমেরিকান শিল্পীদের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি কাজে স্থান ও আকারের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করার পরীক্ষা নজরে পড়ে। তারা গাঁথার ভাস্কর্য তথা কাঠ, ম্যানিলা দড়ি ও ফাইবার প্লাসকে কেন্দ্র করে তাঁরা নানা জিনিস তৈরী করেছেন। পূর্বোক্ত ভাব ভাস্কর্যটি তৈরী করেছেন শিল্পী কেথ সোনিয়ার (বং ২৯)। ১৯টি ফাইবার প্লাস (উচ্চতা ৫০·৮ সেঃ, ব্যাস ৩০·৫ সেঃ) গোলাকারে সাজিয়ে রেখে ইভা হেস (বং ৩৪) স্থান ও আকারের সমন্বয় করেছেন। অ্যালান সারেট আবার রঙ করা তারের জাল দেওয়াল থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে মেঝেতে প্রসারিত করে নতুন রকমের পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা ও পরিকল্পনার দিক থেকে হয়ত মূল্য আছে—কিন্তু এগুলি ঠিক চিত্রকলা পর্যায়ে পড়ে বলে মনে হয় না। ফ্রান্সের আটজন শিল্পীর ১৯টি নিদর্শন দেখা যায়, তাদের মধ্যে প্রথমেই খ্যাতনামা প্রবীণ শিল্পী ভ্যাসারেলির (বং ৬২) অপরূপ কোলাজ নিদর্শন দুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৃহৎ ক্যানভাসের ওপর ছোট ছোট ডিম্ব ও চতুর্ভুজ আকারের বিভিন্ন রঙীন কাগজ স্থাপনা করে শিল্পী কোলাজ ও অপ আর্টের সমন্বয় ঘটিয়েছেন (অপ আর্ট ক্ষেত্রে ভ্যাসারেলি, ব্রিজেট রিলে, এরিক অলসেন, ফ্রানসিস্কো সবিনো, গান্থার উকার ও সুই ফুকার-এর বিচিত্র কাজ স্মরণীয়)। উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার ও স্তরভেদ সৃষ্টির জন্য দুটিই মনে দাগ কাটে (৭ ও ৮)। জর্জ ম্যাথিউর বিমূর্ত কমপোজিশন উপভোগ্য। রচনা ক্ষেত্রের চারিদিকে শূন্য স্থান ছেড়ে রেখে

সেঃ মার্শিমার উইথ লুভেবল অ্যালিমেন্টস
—সারা ক্যাম্পেসাম (ইতালি)

মধ্যস্থলে বিমূর্ত, রেখাপ্রধান কলকব্জার প্রতীকমূলক রচনা লক্ষণীয়। কাঠ, প্লাস্টিক ও তারের সাহায্যে রচিত ইভার লে-এর দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর অপ আর্ট নিদর্শন (৫ ও ৬) ত্রিবার্ষিকীর বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন আকারের দুটি বস্তুই দর্শকের চোখে দৃষ্টি আধ্যাস (optic illusion)-এর সৃষ্টি করে বিচিত্র ও নতুন নতুন গতিশীল রূপের সঞ্চার করে। জেনেভিভ ক্লেস-এর রঙীন বস্তু-প্রধান আর ৩৩ (৩নং) ও ক্রিশ্চিয়ান ফসিয়ারের গ্রাফিক প্রিন্টও উল্লেখ্য। জাপানের সাতজন শিল্পীর ১৯টি নমুনা

দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে একজন ভাস্কর। জাপানের শিল্পকর্মে দেশীয় ও বিমূর্ত দুই রীতিরই সন্ধান মেলে—বিশেষত কয়েকটি উড প্রিন্টে জাপানী স্বকীয়তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শিল্পী কুরাজাকি আকিরা বিমূর্ত রচনা উড প্রিন্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শূন্য পশ্চাদ্ভূমির পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল লাল, নীল ... রঙে প্রিন্টগুলি যেন ঝলমল করে। নেচো জোসাকুর রচনাও বিমূর্ত শ্রেণীর, তবে তাঁর কাজে প্রাচ্য আলংকারিক রূপই প্রধান (৯)। উসামি কেইজির রচনা জ্যামিতিক ক্ষেত্র প্রধান, যেমন নীল ও লাল বহুভুজ চতুর্ভুজকেন্দ্রিক ১৫নং ছবি। নাগাই কাজুমাসাও রেখা ও বর্গক্ষেত্র অবলম্বনে কাজ করেছেন তবে তাঁর রচনায় দৃষ্টি অভ্যাসের গুণে ধরা পড়ে। ওশিতারা হিডিওর লিথোগ্রাফ ও এচিং প্রিন্ট সাররিয়ালিস্টিক (১৭)। হোরিউচি মাসাকাজুর চারটি ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে ৪নং (ব্রঞ্জ) পরিকল্পনা ও নতুন আকার গঠনের দিক থেকে উল্লেখ্য। ইতালির ২০ জন শিল্পীর এক একটি নিদর্শন প্রদর্শনীতে আছে। অধিকাংশই ব্যবহারিক শিক্ষা, বিশেষ করে

বিদ্যালয় ও মিউজিয়মে রাখার জন্য তৈরী। প্রধানত এগুলি দর্শনেন্দ্রিয় তথা চাক্ষুষ উপলব্ধির বস্তু। বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারকে কেন্দ্র ক'রে অ্যালুমিনিয়ম, ইস্পাত প্লেক্সিগ্লাস, পার্সপেক্স সীট ও আয়না সাহায্যে গঠিত সুদৃশ্য বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষামূলক এবং এদের উদ্দেশ্য হল চোখ ও সেই সঙ্গে চিত্তে আনন্দরস সঞ্চার করা। সেই সঙ্গে আছে দু'একটি কাইনেটিক আর্ট বা গতিশীল শিল্পধারার নিদর্শন। প্রত্যেকটি শিল্পবস্তুই সুকল্পিত, সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন—অধিকাংশই স্বচ্ছ। এগুলি অনেকেই উপভোগ করবেন। এই প্রসঙ্গে উইলডিং লাডউইট-এর সিনেটিক এ (২০ প্রথমেই চোখে পড়ে। পিছনে পৃষ্ঠভূমিতে সূক্ষ্ম লম্বমান কালো রেখা, তার ওপর ঢাকা স্বচ্ছ কাচের ওপর অনুরূপ সরু সূক্ষ্ম রেখা ব্যবহারের ফলে দৃষ্টি অধ্যা হয় ও সেই সঙ্গে সমগ্র বস্তুটি নকশাভাবে গতিশীল রূপ পরিগ্রহ করে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে পিয়েত্রো লা উগো (৮), স্প্যাগনোলি রেনাতো (৯): কস্তালোঙ্গা ফ্রাঙ্কো (১৭) ও সারা ক্যাম্পেসান (১১)-এর কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটেনের মাত্র একজন খ্যাতনামা শিল্পীর রচনা দেখা যায়—অ্যালান ডেভি-র। বিভিন্ন চিহ্ন প্রতীক সমন্বয়ে তিনি বিমূর্ত, সর্ববিমূর্ত ও প্রাচীনকালে দেওয়ালে আঁকা ছবির মত সরল রচনা করেছেন। শিল্পী অতিরিক্ত উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী, বিশেষ করে লাল ও নীল। উদাহরণ স্বরূপে ১০, ৭ ও ২নং ছবির নাম করা চলে। গ্রাফিক প্রিন্টের মধ্যে ১৭ (লিথো গ্রাফ) দ্রষ্টব্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন শিল্পীর একটি নিদর্শন দেখা যায়, রবার্ট হান্টারের অ্যাক্রিলিকে আঁকা এনভিরনমেণ্টাল পেন্টিং। ছোট চতুর্ভুজ-প্রধান রচনাটির রঙ ব্যবহার ও স্থান পূরণ দ্রষ্টব্য। গ্রাফিক প্রিন্টের নিদর্শন হিসাবে অস্ট্রিয়ার কাজ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে উডকাটের (স্ফিঙকস্), সূক্ষ্ম খোদাই কাজ ও রঙের কারুকার্য লক্ষণীয় (শিল্পী আর্নস্ট ফুকস)। ব্রেজিলের কোলাজ ও গ্রাফিক প্রিন্ট উচ্চাঙ্গের—বিশেষ করে রবার্টো স্কোরজেলি-র সূত্রপ্রধান ও রঙ ব্যবহার নমুনা (১৩)। বেলজিয়মের ভাস্কর্য জাতীয় প্রিন্ট (৮) ও মার্কেল গুসেটিভ এর সারিরিয়ালিস্টিক এনগ্রেভিং (৫) অনেকের চোখে পড়বে। বালগেরিয়ার নিদর্শনগুলি মিশ্র রীতির, অর্থাৎ রিয়ালিস্টিক ও বিমূর্ত। কিরিল পেট্রভ ঐ দেশের খ্যাত-নামা শিল্পী—তবে জর্জি বেজিলভের একটি রচনা খুবই বলিষ্ঠ ও রঙ ব্যবহার রীতির দিক থেকে উল্লেখ্য (১)। গ্রাফিক প্রিন্টের মধ্যে টোডর পানাজোটভ-এর (৮, রঙীন ও ৯) কাজ ভাল লাগে। কানাডা

কোলাজ অন ক্যানভাস —ভ্যাসরেলি (ফ্রান্স)
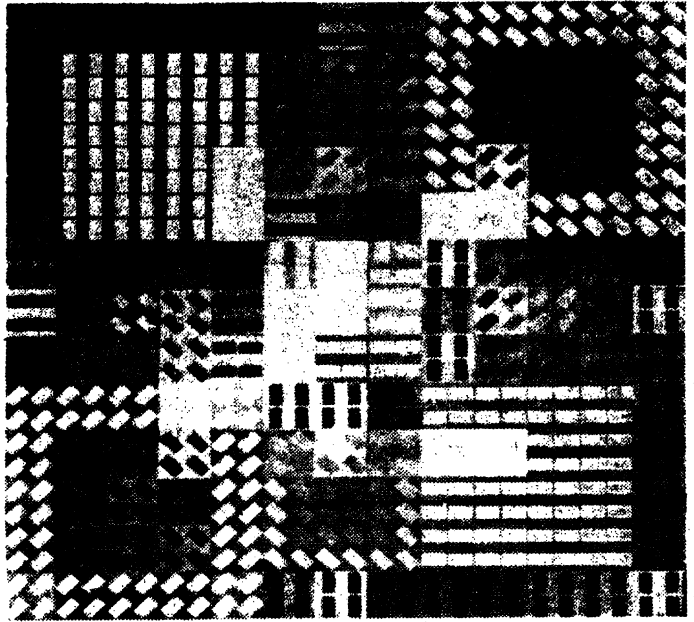
থেকে শিল্পী হ্যারা পাপাথিওডোরু-র আটটি রচনা দেখা যায়—সবই এস্কিমো ও ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন প্রতীক ও চিহ্ন অবলম্বনে রচিত—এগুলির সরলতা লক্ষণীয় (৪, ২ ও ৫)। কিউবার ২০টি নিদর্শনের মধ্যে ড্রয়িং ও গ্রাফিক রচনা চোখে পড়ে। রঙীন পৃষ্ঠভূমির পরিপ্রেক্ষিতে জ্যামিতিক ক্ষেত্র ও রেখাভিত্তিক কমপোজিশন এগুলির বৈশিষ্ট্য—যেমন, মারিও গালার্দো (২), কার্মেলো (২), কার্মেলো গনজালেজ (১১) ও অ্যালফ্রেডো সোসা ব্রাভোর নিদর্শন (৭)। ছোট ছোট দেশের মধ্যে কয়েকটি কাজ অনেকের চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে সাইপ্রাস (অ্যানজেলস মাকরিডস (৯), গ্রীস (স্পাইরস ভাসিলিউ (১ ও ৪) এবং কাঠখোদাই (গ্রামাটোপুলস (৮), হঙকঙ (ব্র্যান্ড ডগলাস ১, কোং ইউ টিং, ৩), কুয়েত (ছবি ও বিশেষ করে ভাস্কর্য কাজ, ও ১১), মরিশাস (ভাস্কর্য, দানেশ্বর দাসোয়া ২), সিরিয়া (নোশাদ জাহি ৩ মেহমুদ হামাদ ৮) এবং নাইজিরিয়ার উন্নত শ্রেণীর ভাস্কর্য নিদর্শন (বেন ওসাওয়ে ১১, ১২)-এর নাম করা যায়। পশ্চিম জার্মানীর শিল্পে মুক্ত শূন্যস্থান বিভাগের ওপর প্রাধান্য দান দেখা যায় (৪,৫)। পূর্ব জার্মানীর স্কেচ-

গুলি রিয়ালিস্টিক, তবে দু'একটি গ্রাফিক প্রিণ্ট ও বিশেষ করে ভাস্কর্য নিদর্শন সুন্দর (৩, ৪, ১৯ ও ৮)। রাশিয়ার ১২ জন শিল্পীর ১৭টি নিদর্শন ছিল—সবগুলিই রিয়ালিস্টিক। এদের মধ্যে নিসকি (১), রমাস্কিন (৪), জাখারভ (লিনোকাট ১৪) এবং নিকোগোসিয়ান-এর ভাস্কর্য নিদর্শন (১৫) উল্লেখ্য। তুরস্ক দেশের প্রগতিবাদী ছবিগুলি অনেকের চোখে পড়ে (৫, ৮ ও ১০)। গ্রাফিক প্রিণ্টের দিক থেকে সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনের নাম করা উচিত। প্রথমটির নানা জ্যামিতিক আকারে শূন্যস্থান বিভাজন (৬) ও খোদাই কারুকার্য (১, ২, ৩) এবং দ্বিতীয়টির সূক্ষ্ম কাজ ও রঙ প্রধান নিদর্শন (১, ৪, ১৩, ১৪ ও ১৭) বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। রঙ ব্যবহার রীতি, কারুকার্য ও কমপোজিশনের দিক থেকে যুগোস্লোভিয়ার নিদর্শনগুলি বিশেষভাবে

ভাস্কর্য নিদর্শন (ব্রঞ্জ)
—হোরিউচি মাসাকাজু (জাপান)

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ দেশের শিল্পীগণের রচনা মুখ্যতে বিমূর্ত ও তাঁরা নানাজাতীয় মাধ্যম সংমিশ্রণে কাজ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর্য নিদর্শন গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উদাহরণ স্বরূপ নেসকোভিক প্রেড্রাগ-এর সাররিয়ালিস্টিক অথচ আলঙ্কারিক কিস (১), ক্রস্তোভিচ নিভেস (৩ ও চতুর্ভুজমূলক ৪), নৌস মিলিজা-র স্টীল ও ফরমিকা মাধ্যমে গঠিত ১৩ এবং কন্জভোস্কি ডিমিটা-র (১৭ ও ১৮) নাম করা কর্তব্য। পোল্যাণ্ডের শিল্পীগণ অ্যালুমিনিয়ম ও কাচ ব্যবহার করে শিল্পবস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেই সঙ্গে আছে গ্রাফিক প্রিণ্ট। প্রথমোক্ত শ্রেণীর কাজে স্বচ্ছতা লক্ষণীয়, যেমন জার্জি বসোলোউইচ্-এর ১৬ ও ১৯নং নিদর্শন। প্রিণ্টের মধ্যে প্রিচিলস্কির ১২ ও ১৪নং উল্লেখ্য। এই প্রসঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রিণ্টেরও নাম করা চলে, যেমন স্ট্যানলি পামার (৬), মিস অ্যালিসন পিকার্মিয়ার (রঙীন এচিং, ১১)। নাইজিরিয়ার মত ফিলিপাইনস-এর • শিল্পেও প্রাচীন আকারের ওপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে, বিশেষ করে কাঠ খোদাই ক্ষেত্রে—সলোমন স্যাপ্রিড-এর ময়াল সাপের আকারে গঠিত বেগার বয় (২০) উল্লেখ্য। নরওয়ের শিল্পী হারমান হেবলার রচনাক্ষেত্রটি কয়েকটি জ্যামিতিক ক্ষেত্রে ভাগ করে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করেছেন। ইন্দোনেসিয়ার শ্রেষ্ঠ রচনা আফান্দির হোয়াইট হর্স ও ১ নং। সিদিক-এর রঙীন কাচ জাতীয় কমপোজিশন (৮) ও সাদালির কারুকার্যখচিত ১২ নং উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে জ্যামিতিক প্যাটার্নের জন্য মিস মেলা সানিগোলি (ফিজি-৪), জিরি জন ও ভিনসেন্ট লোজ্নিক (চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ ও ১৭, ১১), এদোয়ার্দো দার্গেনো (ভেনেজুয়েলা, ড্রয়িং ১, ২, ৬, ৭), সিজার এরিয়াস (স্পেন ১০), দোর্জি ও লাপিয়া (সিকিম, যথাক্রমে কাঠ খোদাই ও স্কন), শ্রীমতী হেমেন্দ্র কুমারী রাণা ও ঠাকুরপ্রসাদ মাইনালি (নেপাল, যথাক্রমে ২০ ও ১), অ্যানথিন লাউ (মালয়েশিয়া, ভাস্কর্য নিদর্শন ১৩), চান্ শিক্ কিম্ (কোরিয়া বাটি সাহায্যে রচিত গোলক ৪), ইসভান সিক ও ফেরেঙ্ক জিঙ্কে (হাঙ্গেরী, ৪ ও ৯), পল অ্যাগার (ডেনমার্ক, ৪), মাইকেল ক্যারেল (আয়ারল্যাণ্ড-আলপনা আঁকা পিঁড়ির মত কাজ) মিস ও লিণ্ডা মুস (জাম্বিয়া, ৫) উল্লেখযোগ্য। সিংহলের নিদর্শনগুলি সাধারণ—মতুনা দিশানায়েকের ১ নং নিদর্শন মন্দ লাগে না। দুঃখের বিষয়, চিলি থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও নিদর্শনই সময় মত এসে পৌঁছয়নি।
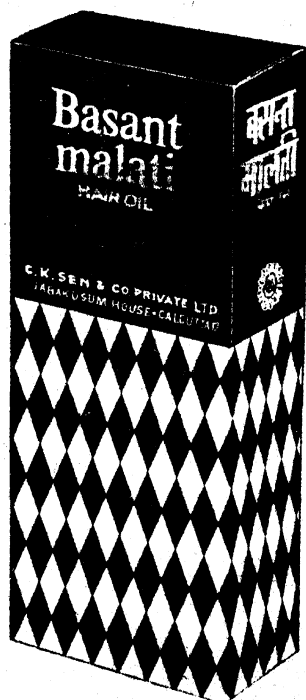
অঙ্কন ও ভাস্কর্য নিদর্শন সমেত, ভারতবর্ষের ৪৬ জন শিল্পীর ১০৪টি নিদর্শন ত্রিবার্ষিকীতে নির্বাচিত হয়েছে। খ্যাতনামা কয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও, প্রকৃতপক্ষে এই প্রদর্শনীতে তাঁদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয় না। কারণ সামগ্রিকভাবে বিচার করলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অঙ্কন তথা শিল্পমান অপেক্ষা আমাদের দেশের মান কোনও অংশে নিম্নস্তরের নয়—বিশেষ করে দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকীর পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতীয় শিল্পী নির্বাচনকালে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীকে প্রদর্শনীভুক্ত করা হয়নি—এটি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত তা জানি না। তবে প্রতিবারই যে খ্যাতনামা কোনও বিশেষ শিল্পীকে প্রদর্শনীভুক্ত করতেই হবে তার কোনও
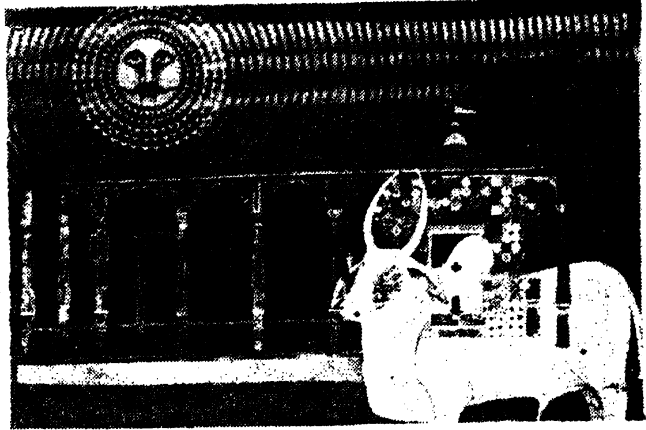
মন্দির —ঈশ্বর সাগারা (ভারতবর্ষ, পুরস্কৃত)

মুনলিট সোনাটিনা (কাঠ)
—রঘুনাথ সিংহ (ভারতবর্ষ)
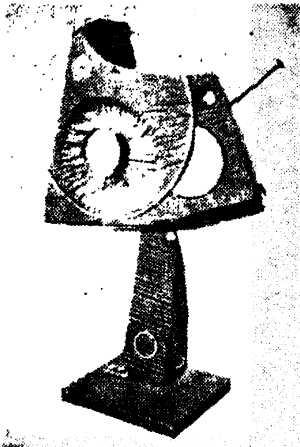
বাধ্যবাধকতা আছে বলে মনে করি না। আর একটি কথা, অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও মুখ্যত অল্পবয়স্ক ও উদীয়মান শিল্পীদের ওপরেই প্রাধান্য দান করা হয়েছে এবং মনে হয়, সেটা যুক্তি-সঙ্গত। প্রদর্শনীতে এদেশের প্রবীণতম শিল্পী পানিকার, বয়স ৬০, কনিষ্ঠতমা কুমারী নুমেতাজ সুলতান আলি, বয়স মাত্র ২৪।

প্রথমেই বলে রাখি যে নানা অঙ্কন-রীতির তথা প্রগতিবাদী রচনা থাকা সত্ত্বেও এদেশের শিল্পকর্মে একটি ভারতীয় রূপে ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়—বিশেষ করে অন্যান্য দেশের নানাজাতীয় রচনার পরিপ্রেক্ষিতে। দেশের প্রাচীন লোক ও দেওয়াল চিত্র, খেলনা, শাস্ত্রোক্ত নানা প্রতীক ও পুজো পার্বণে ব্যবহৃত নানা রেখা, বিন্দু তথা চিহ্নের ওপর বিশেষ প্রাধান্য দান করা হয়েছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিমূর্ত বা সমবিমূর্ত রচনাগুলিও এগুলিকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। নিত্য নতুন যন্ত্র আবিষ্কার, অনায়াসলব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে, পাশ্চাত্য দেশের শিল্পীগণ নতুনতর মাধ্যমে নানা পরীক্ষা করে চলেছেন—সেগুলি সেইসব দেশের পরিবেশ অনুযায়ী উপযোগী হতে পারে। কিন্তু সেই জাতীয় নিদর্শন দেখে অকারণ অভিভূত হয়ে পড়ার কোনও অর্থ হয় না। অধিকাংশই পরীক্ষামূলক কাজ। সে তুলনায় আমাদের দেশের নিদর্শনের মধ্যে পরীক্ষা-লব্ধ ফলের পরিচয় পাওয়া যায় অধিক। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে এদেশের অধিকাংশ শিল্পীর কাজে ঠিক অনুকরণ জাতীয় দোষ দেখা যায়নি। আর একটি জিনিসও চোখে পড়ে—ভাস্কর্যসম্ভার। সেদিক থেকে আমাদের দেশের কয়েকটি চমৎকার নিদর্শন দেখা যায়। অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশ থেকে ভাস্কর্য নিদর্শন পাঠানোও কঠিন এবং ব্যয় সাপেক্ষ।

এ দেশের শিল্প সম্ভারের মধ্যে প্রথমেই ঈশ্বর সাগারা, সুলতান আলি, গণেশ পাইন, যোগেন চৌধুরী, যতীন দাশ, জি আর সন্তোষ, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাশ, হেব্বার, সতীশ গুজরাল ও প্রকাশ কর্মকারের রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সম-কালীন রীতি ও পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সাগারা রস সৃষ্টি করেছেন, যাঁদও

তাঁর দ্বিতীয় নিদর্শনটি (৮৯) আমার আরও ভাল লাগে, বিশেষ করে তার আলঙ্কারিক কারুকার্য। সুলতান আলির কালি-কলম রচনা (১) সূক্ষ্ম ড্রয়িং-এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গণেশ পাইনের ছোট্ট ছবিখানি (মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড) অনেকেই দেখে থাকবেন। বিশেষ করে হলুদ রঙ ব্যবহার ও অন্য গাঢ় রঙের স্তরভেদের জন্য এটি কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। সাররিয়ালিস্টিক রচনা হিসাবে যোগেন চৌধুরীর পীর্থাঙ্কার রচনাগুলি (২২, ২৩, ২৪) চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে যতীন দাসের গতিবেগমূলক ছবিখানিও (২৫) উল্লেখ্য। গভীর রঙের পরিপ্রেক্ষিতে নানা প্রতীকমূলক সঙ্কেতের বিমূর্ত দুটি রচনা, বিশেষ করে ৯৩, অনেকের মনে রেখাপাত করবে। বিকাশ ভট্টাচার্যের নিও রিয়ালিস্টিক ডেথলেস অ্যান্টিক (১৮) অনেকের মনে বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করবে। সুনীল দাশের শূন্যেস্থান প্রধান ও প্রতীকমূলক রচনাটি (২৭)-র মধ্য দিয়ে শিল্পীর চিন্তাশক্তি ও অঙ্কন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। হেব্বারের দুটি ছবির মধ্যে মেলাডি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশেষ করে অপূর্ব কারুকার্য থেকে ইঙ্গিতে প্রকাশমান বাদ্য-যন্ত্র ও নারীমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সতীশ গুজরালের রচনা প্রাচীর চিত্র জাতীয়। জ্যামিতিক ক্ষেত্র প্রধান রচনাটির রঙবৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষণীয় (৩৯)। প্রকাশ কর্মকারের দুটি রচনা সমকালীন, বিশেষ করে ইন্ডিয়া ৫০। অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে শ্রীনারায়ণ (৫), প্রভাকর বার্ভে (১৩), দিলীপ দাশগুপ্ত (২৯), কে এস কুলকার্নি (৬০), এস নন্দগোপাল (৬৭), পানিকার (৭৪) এ পি কে রাজা (৮৩), এ রামচন্দ্রন (৮৭), পিরাজি সাগারা (৯১), এস জি বাসুদেব (১০৩) ও ওমপ্রকাশ (৬৯)-এর নাম করা যায়। গ্রাফিক প্রিন্টে বিমল ব্যানার্জী, দীপক ব্যানার্জী, সুখেন গাঙ্গুলী ও বিশেষ করে কৃষ্ণ রেড্ডির প্রিন্ট নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্য ক্ষেত্রে অধিকাংশই খোদাই কাজ, ঢালাই কাজের নিদর্শন অল্প। দু'একজন কেউ গ্লাসও ব্যবহার করেছেন। নিদর্শনগুলিতে সমকালীন চিন্তাধারা ও গঠনরীতির আভাস মেলে। অনেকে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ভাস্কর্য নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। অধীক্ষ চিন্তামণি করের মার্বেল পাথরে খোদিত যক্ষী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাবলীল আকার ও গঠনরীতির দিক থেকে এটির কাব্যছন্দ রূপ অনেককেই মুগ্ধ করে। এর পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রঘুনাথ সিংহের মুনলাইট সোনাটিনা। গঠন বৈচিত্র্য ও সৃজনশীলতার দিক থেকে এটি সুন্দর নিদর্শন। পি ভি জানকী-রামের আলঙ্কারিক ভাস্কর্য নিদর্শন হিসাবে ডিভাইন চাইল্ড ও ক্রাউন অব থর্ন উল্লেখযোগ্য। আর একটি সুন্দর সৃষ্টি অজিত চক্রবর্তীর সেল্ফ-ইমলেটেড। এক খণ্ড কাঠ থেকে খোদাই করা বিশিষ্ট ভঙ্গীমার মূর্তিটি ভাস্করের প্রতিভার স্বাক্ষর। আরও একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ধনরাজ ভগতের লুমিনাস বিইং। অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে অনন্ত পাণ্ডার সোলো ফিগারিন, এম ধর্মাণীর টু ফর্মস, বলবীর সিং কাট-এর সিটি স্কোয়ার ও বি ভিটাপলন স্বচ্ছ ব্রাউন ড্রপ উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনী ৩১ মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

একত্রিশ

বেগমপুরে ফিরে যেতে গৌরীর কিছুমাত্র অভিরুচি ছিল না। আবার তো সেইসব আরম্ভ হবে। কারই বা ওসব ভালো লাগে! বেগমপুরে ফিরে যাওয়া মানে তো অতীতে ফিরে যাওয়া। গৌরী চায় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে, অতীতের দিকে পেছিয়ে যেতে নয়।

ও ভেবেছিল বেগমপুরে ফিরে না গিয়ে কৃষ্ণপুরেই আরো একটা বছর কোনোরকমে পায়চারি করে কাটিয়ে দেবে। তারপরে রত্নর হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে। কেবল একটি বিষয়ে ও মনঃস্থির করতে পারছিল না। মানিককে কি সঙ্গে নিয়ে যাবে, না মার কাছে রেখে যাবে? মার কাছে রেখে গেলে মা যে ওকে রক্ষা করতে পারবেন তা নয়। বেগমপুর থেকে ওরা এসে ওকে ধরে নিয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে ও যে কার হাতে পড়বে কে জানে! ঠাকুমার হাতে পড়লে তবু ভালো। যদি সৎমার হাতে পড়ে তা হলে?

অপর পক্ষে, সঙ্গে নিয়ে গেলে জ্যোতির মতো একজন শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন। যার উপর চোখ বুজে নির্ভর করতে পারা যায়। রত্ন যে নিজেই একটা শিশু। নিজেকেই সামলাতে পারে কি না সন্দেহ। নারীকে আশ্রয় দিতে যদি বা পারে শিশুকে আশ্রয় দেওয়া ওর সাধ্য নয়। শেষ পর্যন্ত গৌরীকেই দুহাতে দুজনকে আগলাতে হবে। তা হলে মুক্তির স্বাদ পাবে কী করে ও কবে?

অপ্রত্যাশিতভাবে জ্যোতির বিবাহ গৌরীর মনের ভিতরে ভাঙন ধরিয়ে দিয়ে যায়। ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করে যে ওর একটা বাহু ভেঙে গেল। বাকী রইল আর একটা বাহু। সেটা কমজোরী। গৌরী দুর্বল বোধ করে। কিন্তু হাল ছাড়ে না।

এমন সময় শোনা গেল দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। সামনের অঘ্রাণেই দাদা বউ আনবে। তখন এ বাড়িতে গৌরীর স্থান কি তেমনি সম্মানের থাকবে? না পদে পদে অসম্মান সইতে হবে? কেমন বউ হবে কে জানে! ও যদি বড়লোকের মেয়ে হয়। কিংবা রূপে বিদ্যাধরী! না, তখন আর বাপের বাড়ির ভাত মিষ্টি লাগবে না। কোনোমতে হয়তো বাকী কয়েকটা মাস পায়চারি করে কাটিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু বাচ্চাকে রেখে যাবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ওর মামী ওকে দেখতে পারবে না।

ভাঙনটা ধরিয়ে দিয়েছিল জ্যোতির বিয়ে। তাকে বাড়িয়ে দিল দাদার বিয়ের সম্বন্ধ। মনে মনে ও নোটিশ পেল যে অঘ্রাণের মধ্যেই ওকে মানে মানে সরে পড়তে হবে। তৃতীয়বার সময় করতে হলো না। শ্বশুরবাড়ি থেকে তলব এল। স্বয়ং যশোবাবু এলেন নিতে।

স্বপ্ন ছিল রত্নর হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া। বাস্তব হলো স্বামীর হাত ধরে পেছিয়ে যাওয়া। সেটা ওকে পায়চারি করতে দিল না আরো একটা বছর। মনঃস্থির করবার অবকাশ দিল না। স্বপ্নে আর বাস্তবে অনেক ফারাক। বেচারি গৌরী!

আবার সেই বেগমপুর। সেই মাধব। সেই যশোমাধব। কিন্তু—এইখানেই বিস্ময়—সেই সুধা নয়। গৌরী আবিষ্কার করে যে পাখীর খাঁচা শূন্য। পাখী উড়ে গেছে। সুধার থাকাতে ও সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু না থাকাতে ব্যথিত হলো। আহা, কতকালের মানুষটা! এ বাড়ি তো তারও শ্বশুর-বাড়ি। সে তো আপন অধিকারেই বাস করত।

যশোবাবু সুধাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে গৌরীর সঙ্গে মিটমাটের সুরাহা হয়। সুধা থাকতে ওটা সম্ভবপর নয়। সুধার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো। ওর ভাইরাও চায় যে দিদি ওদের সংসারের হাল ধরে ওদের পৃথক হবার ভয় থেকে বাঁচায়। তা ছাড়া এদিক থেকেও মোটা মাসোহারা পাবে। কিসের অভাব! কিসের দুঃখ! দুঃখ যেটা সেটা বিচ্ছেদের। প্রায় বিশ বছর বাদে যশোবাবুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কী করা যায়। যশো ও গৌরীকে যে একটা সুযোগ দিতে হবে বোঝাপড়ার। সুধা ওর গদী ছেড়ে দেয়।

যশোবাবু গৌরীকে বললেন যে, পুত্র সন্তানের পিতা হয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন, পুত্রের জননীর কাছে তিনি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি নাকি শপথ নিয়েছেন যে এ জীবনে তিনি আর কোনো নারীকে স্পর্শ করবেন

না, আর কোনো নারীকে বিবাহ করবেন না। গৌরীর কাছে তাঁর যে ঋণ তা এইভাবেই শোধ করবেন।

পরোনো পাপীকে বিশ্বাস নেই। তা হলেও গৌরীর অন্তর থেকে একটা ভার নেমে যায়। ওর সন্তানকে সৎমার জ্বালা পোহাতে হবে না। স্বামীর আন্তরিকতায় সন্দিহান না হবার আরো একটা কারণ ছিল। যশোবাবু স্বয়ং সৎমার জ্বালায় জ্বলেছেন। সৎমাকে নিয়ে ওঁর বাবা একটু তফাতেই থাকেন, পৃথক মহলে।

গৌরী এই প্রথমবার নিষ্কণ্টক বোধ করে। কেবল বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও। ওর মনের উপরে এর ক্রিয়া চলতে থাকে চেতন ও অচেতনভাবে। মুখ ফুটে স্বীকার না করলেও গৌরীও একপ্রকার কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। যেপুরুষ অপর নারীতে আসক্ত সে অপর নারী ত্যাগ করেছে। যে

পতি অপর পত্নী গ্রহণ করতে পারত সে পতি অপর পত্নী গ্রহণ করবে না। এ কি বড়ো সামান্য কথা! এ যে একটা অলৌকিক ঘটনা! ঘটাল কী করে? ঘটাল কে? ঘটাল গৌরী। ঘটল তার বশংবদতায়।

মুক্তির দীপশিখা কিন্তু সমান অনির্বাণ। অন্যান্য ক্ষেত্রে আপস করলেও এই একটি ক্ষেত্রে গৌরী আপসহীন। স্বাধীনতা ওর চাই-ই চাই। না পেলে ও জীবন রাখবে না। স্বাধীনতা বলতে প্রেমের স্বাধীনতাও বোঝায়, নইলে তেমন স্বাধীনতার মূল্য কী? শুধুমাত্র পর্দার বাইরে যাবার স্বাধীনতা নিয়ে ও তৃপ্ত নয়। ইতিমধ্যেই সেটা ওর করতলগত হয়েছে। চিকের আড়াল থেকে ও বেরোবার অনুমতি পেয়েছে।

"তোমার মুক্তিতে আমি কি কোনোদিন বাধা দিয়েছি?" যশোবাবু বলেন। "বাধা দিয়েছে সমাজ। লড়াই চলুক সমাজের সঙ্গে লড়ুন। আমার সঙ্গে কেন?"

গৌরী বলতে পারত, কিন্তু বলে না যে মুক্তি বলতে বিবাহিতের থেকে মুক্তিও বোঝায়। বিবাহের বাইরে যাবার স্বাধীনতাও তার মধ্যে পড়ে। তার মন এখনো বিবাহের থেকে মুক্তির জন্যে প্রস্তুত নয়। বিবাহ যে একটা স্যাক্রামেন্ট। তবে বিবাহের বাইরে যাবার নজীর অনেক আছে। সমাজের চোখে ধুলো দিতে জানলে সমাজ কিছু বলে না। প্রকাশ্যে না করলে ঢাক ফাটিয়ে না করলে সমাজের কাছে সাত খুন মাফ। গৌরী কিন্তু যা করবে জানিয়ে শুনিয়ে করবে।

যশোবাবুকে একদিন বলে, "আমি আরেক-জনকে ভালোবাসি।"

"সেটা আমার অজানা নয়। আমি চোখ বুজে থাকি বলে অন্ধ নই। অপর একজনকে ভালোবাসা পুরুষের বেলা যদি অপরাধ না হয় তো নারীর বেলাই বা অপরাধ হবে কেন? তুমি যাকে খুশি ভালোবাসতে পারো। তবে হৃদয়ের ধন হৃদয়ে গোপন থাকলেই আর কারো চোখে পড়ে না। চোখে পড়লেই কথা ওঠে। সমাজই দুষবে, আমি নয়। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমি সহনশীল।" যশোবাবু নির্বিকার।

"তা যদি বল আমিও কি কম সহনশীল? আমি ওর চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করেছি। তুমি তো হৃদয়ের ধন হৃদয়ে গোপন রাখনি। পরকীয়ার সঙ্গে স্বকীয়ার মতো আচরণই করেছ। আমি যদি ততদূরে যেতুম তুমি ক্ষমা করতে?" গৌরী বাজিয়ে দেখে।

"না, ততদূর আমার সহ্য হতো না।" যশোবাবু কবুল করেন। "পুরুষেরা ততদূর গেলে ক্ষমা পায় মেয়েরা ততদূর গেলে ক্ষমা পায় না। মেয়েরাই মেয়েদের ক্ষমা করে না। তোমার সখীরাও তোমাকে ক্ষমা করবেন না। সমাজের একটা মেয়েও যদি তোমাকে ক্ষমা করে আমাকে তার নাম বললে আমিও তোমাকে ক্ষমা করব।"

"ধন্য তুমি। কিন্তু আমিও কারো চেয়ে কম কঠোর নই। কোনো মেয়ে যদি ততদূর যায় আমিও কি তাকে ক্ষমা করি নাকি?" গৌরী স্বীকার করে।

প্রেমের বহ্নিও সমান অনির্বাণ। স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে বলে যে রত্নর উপর টান শিথিল হয়েছে তা নয়। মাতৃত্বও সে আবেগের সমকক্ষ নয়। তবে মাতৃত্ব এসে এমন একটা স্থিতি দিয়েছে যে গতি তাকে টলাতে পারে না। গৌরী ওর ছেলেকে বুকে চেপে ধরে বলে, "তোকে ফেলে কোথাও যেতে পারি না, সোনা। তুই যেখানে আমি সেখানে।"

আবার অবিকল সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে চিঠিতে। রত্নকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "তোকে কি আমি ছেড়ে থাকতে পারি, ধন? যেখানে তুই সেখানে আমি।"

একজনকে না ছাড়লে যে আরেকজনকে পাওয়া যায় না, এটা কি ও বোঝে না? ওর বুদ্ধি বোঝে, কিন্তু ওর মন বোঝে না। তবে কি ওর ধারণা ছেলেকে নিয়ে ও রত্নর সঙ্গে থাকবে? না, সে ধারণা ওর নেই, কোনোদিন ছিল কি না সন্দেহ। ছিল জ্যোতির, ছিল রত্নর। ওরাই অবাস্তববাদী। গৌরী নয়। গৌরী পারলে ওর ছেলেকে কৃষ্ণনগরে রেখে যেত। বম্বে নিয়ে যেত না। বিলেতেও না।

ছেলেকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় গৌরীতে আর যশোবাবুতে। দিনের মধ্যে দশবার উনি ছেলেকে দেখতে আসেন আর কোলে নেন। ও যে যক্ষের ধন। তেমনি রাতের বেলা ওকে মাঝখানে রেখে শোওয়া হয়। গৌরী ঘুমিয়ে পড়লেও উনি জেগে থাকেন। ছেলে কেঁদে উঠলে ওকে বুকে করে পায়চারি করেন, যতক্ষণ না ওর কান্না থামে আর ঘুম আসে। ওর ময়লা কৌপীন

RATAN BATRA/CW/BEN/03

বদলে দেন। ভিজে কাঁথা সরিয়ে শুকনো কাঁথা পাতেন। এর জন্যে কোনো অভিযোগ করেন না। বরঞ্চ এতেই তাঁর পরিতোষ।

"বাপ তো নয়, মা-বাপ!" গোরী তারিফ করে বলে। "এমন করে মানুষ করলে ও পরম পিতৃভক্ত হবে। মার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

"মা যদি ওর দিকে ফিরেও না তাকায় তা হলে ওর কোনো অসুবিধে হবে না।" যশোবাবু হেঁয়ালির মতো করে বলেন।

"তুমি কি অন্তর্যামী বিধাতার মতো এখন থেকে সেই ঘটনার জন্যে তৈরি হচ্ছ নাকি?" গোরী চমকিত হয়।

"হব না? আরো একজন তৈরি হচ্ছে যে!" যশোবাবু ইঙ্গিত করে হাসেন।

"কোথায় শুনলে? কে বলল ওকথা?" গোরী বিরক্ত হয়ে বলে।

"সবাই জানে। তুমিই একে তাকে ওকে বলে বেড়াও। আমার নামে বেনামী চিঠি আসে। আমাকে সাবধান করে দেয়। তা তুমি যদি উড়তে চাও তো উড়তে পারো, কিন্তু তোমার অভাবে কারুর কোনো কষ্ট হবে না, পরী।"

বত্রিশ

গোরী এতদিন যশোবাবুর দিক থেকে ভাবেনি। এখন ভাবে। সত্যি, লোকটা খুব খারাপ নয়। বরং বেশ দুঃখী। ওঁর স্ত্রী ওঁর দুঃখ বোঝে না, বোঝে সুধা। ওঁর বউদি। সুধাও তো দুঃখিনী। অকাল-বিধবা। দুঃখীর সঙ্গে দুঃখিনীর একটা সমব্যথার ডোর ছিল। ওটা ঠিক প্রণয়ের ডোর নয়।

আগেকার দিনে একটা প্রবাদ ছিল যে, বিলেতে যেই যায় সেই ব্যারিস্টার হয়। যশোবাবু স্বপ্ন দেখতেন যে তিনিও একদিন বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবেন ও কলকাতা হাইকোর্টে পসার জমিয়ে ইঙ্গবঙ্গ সমাজে বিবাহ করবেন। উনি তো বংশের বড় ছেলে নন যে ওঁর উপর জমিদারি দেখাশুনোর ভার বর্তাবে। বেগমপুরে থাকবেন ওঁর দাদা জীবনমাধব। বাবা জগমাধবও যশোবাবুকে নিরুৎসাহিত করেননি, তবে একটা জায়গায় তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল। বিলেত যাবার আগে বিয়ে করে যেতে হবে। তিনি যাকে মনোনয়ন করবেন তাকে।

মুর্শিদাবাদের এক মুর্শিদজাদা বিলেত যাচ্ছিলেন। প্রস্তাবটা তাঁর তরফ থেকেই আসে যে যশোবাবু যদি তাঁর সহযাত্রী হন পাথেয় তিনিই বহন করবেন। তা ছাড়া লণ্ডনে ভর্তির ব্যাপারেও তিনি সহায়তা করবেন। এমন মওকা দুবার মেলে না। যশোবাবু যাবার জন্যে তল্পিতল্পা বাঁধতে বসলেন। বিয়ে! বিয়ের জন্যে সময় কোথায়! আর করতে চাইলেই বা পাত্রী কোথায়! জগমাধববাবু মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে অশেষবাবুর কন্যা শ্রীমতীর সঙ্গে যথাকালে যশোবাবুর বিবাহ দেবেন। কিন্তু সে মেয়ের বয়স তো আট কি নয়। এই মুহূর্তে ওর বিয়ে দিতে ওর মা বাপের অপত্তি। বিশেষত ওর মা একজন আধুনিকা। তিনি চোদ্দ বছর বয়সের আগে ওর বিয়ে দেবেন না। ততদিনে যশোবাবুরও চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়ে থাকবে। তিনি যে কোনো একটি পেশায় সেটলড হয়ে থাকবেন।

বহরমপুর কলেজে বি এ পড়া শেষ না করে লণ্ডনের মিডল টেম্পলে ভর্তি হলেন

যশোবাবু। পড়েছেন মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। খানার চেয়ে পিনাই বেশী। নাচগান পানভোজন খেলাধুলো ঘোড়ায় চড়া ও শিকার হয়তো নবাব জমিদারের শিক্ষার অঙ্গ, কিন্তু ব্যারিস্টার হতে চাইলে আরো কিছু করতে হয়, তার মান বছরে চারবার বার ডিনার খাবার পর পরীক্ষায় বসা। সে কার্যে অনবধান হলে নবাব ঘরানার কিছু আসে যায় না, ওঁকে তো সাঁত্য হাইকোর্টে গিয়ে প্রাকটিস করতে হবে না। কিন্তু যশোবাবুর কথা আলাদা। ওইটুকু জমিদারি দুই ভাইয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

যশোবাবু ধীরে ধীরে পড়াশুনার দিকে ঝুঁকছিলেন। তিন বছরের পরীক্ষা এক সঙ্গেই দেবেন এরকম একটা পরিকল্পনাও ছিল তাঁর। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের। জার্মানীর মিত্র তুরস্ক। অতএব তুরস্কের সঙ্গেও। মুর্শিদকুলা তো নর্মাইত। মুসলমান হয়ে কেমন করে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন! যশোবাবুর তেমন কোনো বোটানা ছিল না। অস্ত্র ধরতে তিনি তো প্রস্তুত। কিন্তু ধরতে দিচ্ছে কে? এমন সময় তিনি খবর পান যে বাঙালী রেজিমেণ্ট গঠন করা হচ্ছে ও তাঁর দাদা জীবনমাধব তাতে যোগ দিচ্ছেন। যোগ দিতে চেয়ে তিনিও দেশে চিঠি লেখেন। তাঁর বাবা তার উত্তরে লেখেন, দুই ছেলেকেই আমি যুদ্ধে পাঠাতে পারব না। তুই যদি যুদ্ধে যেতে চাস তবে তোর দাদাকে নিবৃত্ত কর।

জীবনমাধব কারো কোনো কথা শুনলেন না। জাত রাজপুত। যুদ্ধ তাঁর কাছে একটা সুযোগ। সুযোগ হাতছাড়া করতে আছে? একদিন সত্যি সত্যি তিনি মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, লড়লেন ও মরলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলেতে যশোবাবুর কাছে বার্তা এসে হাজির। "যশো, ফিরে আয়। মায়ের মরণাপন্ন অবস্থা।"

একেই বলে ডবল ট্রাজেডী। যশোবাবু ফিরে এলেন, কিন্তু মাকে দেখতে পেলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিলেতে গিয়ে পড়াশুনো শেষ করবেন, পরীক্ষা দেবেন, বার-এ কল্ড হবেন। এ জীবনে বি এ তো হলেন না। বার অ্যাট লও কি হবেন না? তা হলে তিনি হবেন কী? পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদে জমিদার? বিলেত থেকে আসার সময় তিনি সন্ধান পান যে জাহাজ কোম্পানী ভারতীয় ছাত্রদের কনসেসন রেটে রিটার্ন প্যাসেজ দিচ্ছে। সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ নয় বলে যাত্রীর অভাব, তাই সস্তায় কিস্তিমাৎ। যশোবাবু তো একজন মওকানবিশ বললে চলে। এক সঙ্গে দুপিঠের প্যাসেজ কেনেন এই ভেবে যে যদি নিতান্তই দেশ থেকে ফিরতে না পারেন তবু লোকসান এমন কিছু হবে না।

পুত্র শোকাতুর পিতাকে সান্ত্বনা দেওয়া ও দাদার স্থলবর্তী হয়ে সেরেস্তা দেখা এই গুরুভার কাঁধে নিয়ে তিনি আর বিলেত যাবার জন্যে ফাঁক পান না। কনসেসনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। যাক, পুরো খরচপত্র করে আবার একদিন যাবেন। বার ডিনার তো একরকম চুকিয়ে দিয়েই এসেছেন। বাকী যা আছে তার জন্যে ওরা পীড়াপীড়ি করে না। পরে যে কোনো এক সময় গিয়ে পরীক্ষা দিলেই চলবে। সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ না হলে বাবাও অনুমতি দেবেন না। "ক্ষেপেছিস? টর্পেডোর সঙ্গে দুদুবার চান্স কি! যুদ্ধ থামুক আগে।"

রয়ে গেলেন যশোবাবু যুদ্ধবিরতির অপেক্ষায়। কিন্তু ঘটে গেল আরো দুটি দুঃখকর ঘটনা। জগবাবু পত্নী বিরহ সহ্য করতে না পেরে আর একটি বিয়ে করে বসলেন। তারপর যশোবাবুরও বিয়ে দিলেন বছরখানেক বাদে। শ্রীমতী বলে সেই মেয়েটির সঙ্গে। ততদিনে ওর বয়স চৌদ্দ বছর হয়েছে। যশোবাবু জানতেন যে ওটা বিলেত যাত্রার আবশ্যকীয় শর্ত। প্রথমবার ফাঁকি দিতে পেরেছেন বলে দ্বিতীয়বারও কি পারবেন? করতেই হলো বিয়ে। ব্যারিস্টার হতে পারেন এই আশা বুকে পুষে।

কিন্তু বিলেত যাত্রার নাম মুখে আনতেই বাবা বলেন, "তা কি হয়! ওইটুকু কচি বউকে ফেলে তুই সাত সমুদ্দুর পারে যাবি? আরো কিছুদিন যাক। ওর ছেলেমেয়ে হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো ওকে।"

কাজেই যশোবাবুর সাগর পারে যাওয়া পেছিয়ে গেল অনির্দিষ্টকাল। কবে ছেলে-মেয়ে হবে, তারপরে তিনি ছুটি পাবেন। ছেলেমেয়ের জন্যে তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই বেধে গেল আড়াআড়ি। স্ত্রীর মন পাওয়ার জন্যে সবুর করতে হয়। গৌরীকে সময় দিলে সে হয়তো মনে মনে প্রস্তুত হতো। যশোবাবু তাঁর ব্যারিস্টারির দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে কেবলি হম্বিতম্বি বা হায়হুতাশ করেন। আর গৌরী দিন দিন বিমুখ হয়।

ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলেছিল সুধার সঙ্গে যশোবাবুর রসের সম্পর্ক। কাছাকাছি বয়স বলে ওদের ভিতর একটা সখ্যভাবিক সখ্য ছিল। জীবনমাধব থাকতেই। তাঁর অবর্তমানে ও গৌরীর আবির্ভাবের পূর্বে দুজনে দুজনাকে একান্ত অন্তরঙ্গ পায়। বয়সের ধর্ম প্রবল হয়। যা ঘটবার তা ঘটে যায়। একদিন গৌরী এসে জবরদখল চাইবে এটা তো তখন কেউ ভাবেনি। গৌরী এসে প্রথমটা কিছু বুঝতে পারে না। যখন বোঝে তখন অনমনীয় হয়। কাউকেই ক্ষমা করে না। না যশোবাবুকে, না সুধাকে। অথচ আত্মরক্ষার খাতিরে উভয়কে প্রশ্রয় দেয়। সে যেন দেখেও দেখতে পায় না, থেকেও নেই।

বিবাহে ওর একেবারেই রুচি ছিল না। বিশেষ করে অচেনা অজানা একজন পাত্রের সঙ্গে তো নয়ই। এমন কী গুণবান পাত্র! রূপবানই কিসের। রূপকথার রাজপুত্রের সঙ্গে যত না মিল তার চেয়ে বেশী মিল 'বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট' উপকথার 'বীস্ট'এর সঙ্গে।

তবে হাঁ, ব্যারিস্টার হলে বরণীয় হতো। কিংবা পুলিস বা মিলিটারি অফিসার হলে। অন্ততপক্ষে ডাক্তার হলে। তা তো নয়। পাড়াগাঁয়ের ক্ষুদে জমিদার। কাটাতে হবে সারাজীবন এরই সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের ভাঙা অট্টালিকায়। যেখানে দিনে দুপুরে শেয়াল ডাকে। বরও যেমন পছন্দ নয়, ঘরও তেমনি পছন্দ নয় ও মেয়ের। কোনোদিন পছন্দ হবেও না। এ বিবাহ বাতিল করতেই হবে। এ জীবন নতুন করে আরম্ভ করতেই হবে। মিথ্যার জন্যে আত্মত্যাগ করাও মিথ্যা। গৌরী তা করতে রাজী নয়।

কোথায় কলকাতা হাইকোর্টের উচ্চ ব্যারিস্টার আর কোথায় বেগমপুর এস্টেটের তুচ্ছ শরিক! যশোবাবুর আত্মকরুণার অবধি ছিল না। বন্ধুবান্ধবের কাছে আফসোস করেন, "আশায় ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়, তাই ভাবি মনে। দেশে থাকলে বহরমপুর থেকে বি এ পাশ করে, কলকাতা থেকে এম এ আর বি এল পাশ করে বহরমপুরে বার-এই জাঁকিয়ে বসতুম। পরে এক সময় লণ্ডনে গিয়ে বছরখানেক থেকে বার-অ্যাট-ল হয়ে ফেরা যেত। তখন বসা যেত কলকাতায়।"

তবে স্বভাবতই তিনি রিয়্যালিস্ট। যারা যতদিন না অনুমতি দিচ্ছেন ততদিন আবার বিলেত যাবার কথা ওঠে না। এবার গেলে সস্ত্রীক ও সপুত্রক যাবেন। তা হলে হয়তো গোরীরও পালাই-পালাই ভাবটা কেটে যাবে। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় যশোবাবুই ঘটিয়ে দেবেন। রক্ষর দরকার হবে না। এখন বুড়োর মর্জি হলে তো? হতে পারে, যদি যশোবাবু জমিদারির একটা সুবন্দোবস্থা করতে পারেন। দেখাশুনার অভাবে যেন সম্পত্তি নষ্ট না হয়ে যায়। যেমন মাইকেলের বেলা হয়েছিল।

আপাতত গোরীকে শহরের স্বচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে তিনি বহরমপুরের বাসাবাড়িটাকে বসতবাড়িতে পরিণত করতে চান। বেশীর ভাগ সময় সেইখানেই থাকবেন ও অনরারি ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করবেন। অনেকদিন আগেই তাঁকে ও পদ নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। যাঁর দাদা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর কাছে সরকার ঋণী হয়ে রয়েছেন। কিন্তু বহরমপুরে প্রত্যেক সপ্তাহে দুতিনবার যাতায়াত করতে তাঁর অভিরুচি ছিল না। না গেলে আবার কর্তব্যহানি। আসলে তখন ওটা নিলে কথা উঠত যে তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। অসহযোগ আন্দোলনের দিন কে জানে কাকে জেলে পুরতে হতো। সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের চোখে হেয় হতে হতো। ঘরের লোকটির কাছে আরো হেয়।

কিন্তু বহরমপুরে বসবাস করতে হলে একটা উপলক্ষ চাই। যশোবাবু ভেবে দেখেছেন যে অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট পদটাই তাঁর উপযুক্ত উপলক্ষ। যদি না দেশের ছেলেদের জেলে পুরতে হয়। এই নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। ওঁরা তাঁর এজলাসে পলিটিকাল কেস পাঠাবেন না। তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তা ছাড়া গোড়া থেকেই তো তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না। পলিটিকাল কেস কি দ্বিতীয় শ্রেণীর হাকিমের এজলাসে কেউ পাঠায়?

হোক না অনরারি, তবু তো ম্যাজিস্ট্রেট। পাঁচজনের একজন। ক্লাবের মেম্বর। নানান কমিটির সভা। গোরী যদি শহরে গিয়ে বাস করতে রাজী হয় তবে দেখবে তার স্বামী একজন নামী লোক।

(ক্রমশ)

'আন্তর্জাতিক মানের দিক দিয়ে ভারতের তৈরি রবার সামগ্রী উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। শুধু গত বছরেই এই কারখানা থেকে টায়ার-টিউব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার মত মালপত্র আমরা বিদেশে রফতানি করেছি। এর শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অবশিষ্ট মধ্য প্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব ইউরোপে। সম্প্রতি নতুন অর্ডার পাওয়া গেছে কানাডা, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, ইরাক, কোয়াইট, যুগোশ্লাভিয়া, পূর্ব জার্মানি, ইরান, বার্মা, থাইল্যান্ড, সিংহল, ইথিওপিয়া, মরিসাস এবং সুদান থেকে।' বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্যটি আমাকে জানালেন মাদ্রাজ রাবার কারখানার ম্যানেজার শ্রী জে ভি রামন। গত কয়েক বছরে উৎপাদনের শতকরা দশভাগ অংশ বিদেশে রফতানির যোগ্যতা অর্জন করায় ভারত সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে 'মেরিট সার্টিফিকেট' দান করেছেন।

মাদ্রাজ রবার কারখানায় ট্রাকের টায়ার তৈরির শেষ পর্যায়টি লক্ষ করুন। অত্যন্ত চাপ সহ এই যন্ত্রে মসৃণ এই টায়ারটির বাইরের অংশটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খাঁজকাটা হয়ে যাচ্ছে

মাদ্রাজ শহর থেকে মোটরে মাত্র মিনিট পনেরর পথ তিরুবত্তীআয়ার। একদা এক জলা এবং পতিত জমির বুকে এখন সেখানে জাঁকিয়ে উঠেছে একের পর এক কারখানা। ফলে আঞ্চলিক উন্নয়নই শুধু নয়, তিরুবত্তীআয়ার এখন ভারতের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র। বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করে বসেছে।

সকাল দশটা নাগাদ আমরা গিয়েছিলাম এখানকার রবার কারখানাটি ঘুরে ফিরে দেখতে। আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। কারখানার দেউড়িতে পৌঁছেই দেখা হয়ে গেল কারখানার ম্যানেজার শ্রী জে ভি রামন-এর সঙ্গে। তাঁর নিজস্ব অফিসের ঘরে। এখানে বসেই তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন, টায়ারশিল্পের আধুনিকীকরণের বিচিত্র তথ্য। আমাদের কথোপকথনে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন টায়ার কনস্ট্রাকসন ম্যানেজার তরুণ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী টি ইয়াপেন কোশী।

হাঁ, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে টায়ারের সম্পর্ক আজ একাত্ম হয়ে উঠলেও এর পেছনে বিশেষজ্ঞ এবং কুশলীদের যে প্রচেষ্টা তা রীতিমত রোমাঞ্চকর কাহিনী। এ যুগ টায়ারের যুগ। কারণ টায়ারের ব্যবহার আজ সর্বত্র। সাইকেল, ট্রাক, বাস, প্লেন, ট্রাকটার এবং বুলডজার—কৃষি, যানবাহন সর্বত্রই এর অবাধ গতি। তাই এর প্রতিটি অংশ তৈরির সময় কুশলীরা যেন দৃষ্টি মেলে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নেন। বিশেষ করে প্লেন এবং যানবাহনের জন্যে যে সমস্ত টায়ার তৈরি করা হয় তাদের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি না রাখলে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্ন করেছিলাম, ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলুন, মিঃ রামন।

উত্তর: দেখুন, গঠনের দিক দিয়ে যে কোন একটি টায়ারকে আমরা তিনভাগে ভাগ করি। এক, রিম অর্থাৎ তার খোলা মুখের দুটি প্রান্তীয় অংশ। অনেক বেশি টান সহ্য করতে পারে এমন ধরনের ইস্পাতের তার পাশাপাশি রেখে এই অংশটি তৈরি করা হয়। পাম্প করার পর এই রিমই গাড়ির চাকার সঙ্গে টায়ারটিকে শক্ত করে এঁটে রাখে। দুই, ফ্যাব্রিকস। বিশেষ ধরনের সুতো বা রেয়নের তৈরি চাদর দিয়ে এদের তৈরি করা হয়। চাদরগুলি মাপ অনুযায়ী কেটে বিশেষ ধরনের রবারের প্রলেপ মাখিয়ে পর পর কয়েকটি পরতে এদের জুড়ে দিতে

হয়। অতিরিক্ত ভারবাহী টায়ারের জন্যে নাইলনের সুতোও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

প্রঃ ঐ সমস্ত উপাদানের কোনটির জন্যে কতটা আমাদের বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়?

উত্তর : আমাদের এই কারখানায় যতটা নাইলন আমরা ব্যবহার করি তার সবটাই কিনতে হয় বাইরের দেশ থেকে। এ ছাড়া বিশেষ ধরনের কৃত্রিম রবার আনতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, সিঙ্গাপুর, সিংহল এবং মালয়েশিয়া থেকে। তবে দেশজ রবারের শতকরা পঁচানব্বই ভাগে আসে কেরালা থেকে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ তামিলনাড়ু থেকে আমরা সংগ্রহ করি। যাত্রীবাহী গাড়ির জন্যে কৃত্রিম রবারই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে।

প্রঃ রেয়নের ব্যাপারে আপনারা কি করে থাকেন?

উত্তরঃ আমরা যে ফ্যাবরিকস ব্যবহার করি তার শতকরা নব্বুইভাগই রেয়ন, অবশিষ্ট দশ ভাগ নাইলন। রেয়নের সবটাই আমরা পেয়ে যাই বোম্বাই এবং রাজস্থানের দুটি কারখানা থেকে। এছাড়া আরও কিছু কিছু জিনিস দরকার। যেমন ধরুন, রবারের উৎকর্ষ বাড়ানোর জন্যে চাই কার্বন ব্ল্যাক। এই কার্বন ব্ল্যাকের শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ আমরা পাই বোম্বাই-এর ইউনাইটেড কার্বন থেকে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ আসে দুর্গাপুরের ফিলিপস কোম্পানি থেকে। এর পরও আছে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস'। টায়ারের রবার যাতে অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে সহজে জারিত হয়ে না ক্ষয়ে যায়, এই বস্তুগুলি তার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

মিঃ রামন, আপনি কি বলতে চান, এই রবার কারখানার জন্যে যত রকমের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়, তার সবটাই এদেশে উৎপন্ন হয়?

উত্তর : না। কিছু কিছু মৌলিক রাসায়নিক যোগ বাইরে থেকে আমাদের কিনে আনতে হয়। কারণ ঐ সমস্ত সামগ্রী তৈরির ব্যাপারে আমাদের রাসায়নিক কারখানাগুলি এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নি।

প্র : প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণাগার থেকে এ পর্যন্ত আপনারা কি কোন সাহায্য পেয়েছেন?

উত্তর : এখনও পর্যন্ত তাঁরা আমাদের ব্যাপারে এগিয়ে আসেন নি।

প্র : আমাদের রবার গাছের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কী ধরনের ধারণা রয়েছে?

উত্তর : আমরা লক্ষ করছি আমাদের থেকে মালয়েশিয়ার রবার গাছগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। রবার গাছের উৎপাদন ক্ষমতা যাতে বাড়ে, তার উপর আমাদের আরও বেশি গবেষণা করা দরকার।

প্র : এই কারখানার যন্ত্রপাতির কতটা বিদেশ থেকে রফতানি করা হয়েছিল? বিদেশী কারিগরের বা বিশেষজ্ঞের সাহায্যই বা কতটা পেয়েছেন?

উত্তরঃ মুখ্যত গোড়ার দিকে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত সাজসরঞ্জামই আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেনসফিল্ড টায়ার কোম্পানির সহযোগিতায় পেয়েছিলাম। ওঁরা প্রযুক্তিগত তথ্য এবং বিশেষজ্ঞ

নিয়ে নিয়মিত আমাদের সাহায্য করে আসছেন। এ পর্যন্ত এই কারখানা পি এল ৪৮০-র তহবিল থেকে মোট এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধার হিসেবে পেয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন রকমের মিলিয়ে এই কারখানা দৈনিক ১৮০০র মত টায়ার এবং টিউব তৈরি করছে। সম্প্রতি আমরা সাইকেলের টায়ার এবং টিউব তৈরির ব্যাপারেও কাজ শুরু করেছি। এ ব্যাপারে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ইতিমধ্যে পরীক্ষাধীন কারখানাও তৈরি হয়ে গেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে আমরা আশা করছি কুড়ি লক্ষের মত টায়ার এবং টিউব উৎপাদন করতে পারব। আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরি করার ব্যাপারে ইদানীং আমরা এখানকারই কয়েকটি কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি। আমরা ওঁদের প্রয়োজনীয় নকশা দিয়ে সাহায্য করছি। সেই সঙ্গে বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েও। ফলে অদূর ভবিষ্যতে খুব বেশি আমাদের আর বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে না।

প্র : মিঃ রাসম, এই কারখানার নতুন চত্বর-প্রাঙ্গণের আবহাওয়া প্রভৃতি দূষিত হওয়ার আশঙ্কা থাকাটা অসম্ভব কিছুই নয়। মানে, আমি এনভায়রন-মেন্টাল পলিউশনের কথা বলছি। রবার কারখানার দূষিত গ্যাস অথবা কার্বন এবং সালফার প্রভৃতির সূক্ষ্ম গুঁড়ো বাইরে বেরিয়ে বাতাসে মিশে যাতে জনস্বাস্থ্য নষ্ট না করতে পারে, সে ব্যাপারে কোন প্রতিবিধানের উপর আপনারা কি কোন রকম লক্ষ রেখেছেন?

উত্তর : খুব সঙ্গত প্রশ্ন, মিঃ বস। হ্যাঁ, কিছু কিছু দূষিত গ্যাস এখান থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকেই। যতদূর সম্ভব তাদের সরিয়ে ফেলার চেষ্টা আমরা করেছি। আরও যাতে কমানো যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

প্র : আমার শেষ প্রশ্নে আমি আবার ঐ টায়ারের কথাই তুলছি, মিঃ রাসম। অনুগ্রহ করে কি বলবেন, বিশেষ ধরনের টায়ার—যেমন ইদানীং কোন কোন দেশ টিউববিহীন যে ধরনের টায়ার তৈরি করছে যাতে প্রয়োজনীয় বাতাস পুরে একেবারে সিল করে বাজারে ছাড়া হয় এবং পরে হাওয়া দেবার কোন প্রয়োজন হয় না—তেমন ধরনের কোন টায়ার তৈরির পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে?

উত্তর : আপাতত এটা আমরা ভেবে দেখি নি। ঐ ধরনের টায়ার ব্যবহার করার ব্যাপারে এদেশে কিছুটা
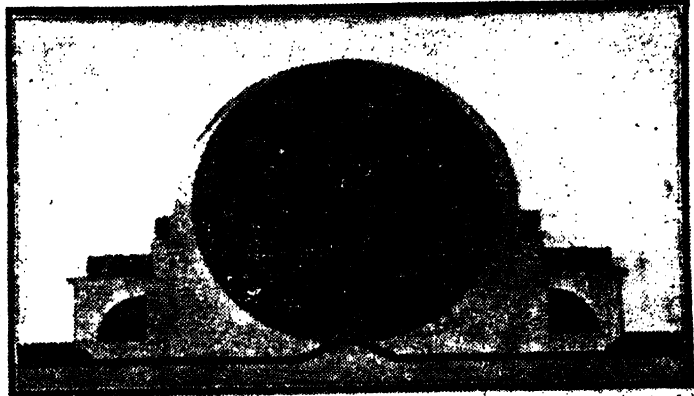
কাল্পনিক স্থাপত্য। উপরের ছবিতে ফরাসী স্থপতি বোলের কল্পনায় 'যাদুঘরে রাতের স্পর্শ।' নীচে লেদোর কল্পনায় হাউস অভ্‌ মিঃ হোসতেন। পরিকল্পনাগুলি করা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। পশ্চিম জার্মানির কাপ গবেষণা এবং নির্মাণ সংস্থার মতে বাতাস দিয়ে ফোলান তাঁদের হলঘরগুলি ওদের বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে

অসুবিধেও আছে। কারণ একবার অকেজো হয়ে গেলে তাকে সারিয়ে তোলা বা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা এখনও এদেশে গড়ে ওঠে নি।

অতঃপর শ্রীরাসম আমাদের কারখানার সমস্ত বিভাগ ঘুরিয়ে দেখালেন। অতি আধুনিক এই কারখানার সর্বত্রই যেন তালিকা ধরে একের পর এক কাজ এগিয়ে চলেছে। সাধারণ রবার এসে পড়ছে বিশেষ অংশে। নাইলনের পুরু চাদরে তাকে মাখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যন্ত্রের সাহায্যে সেই রবারের প্রলেপ মাখানো নাইলনের পুরু চাদরকে ভাঁজে ভাঁজে কাটা, তাকে যথাযথ ক্রমে চাকার মত তৈরি করা, অবশেষে বিশেষ মাপে ছাঁচে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ টায়ারে পরিণত করা—যেন ঘড়ির কাঁটার তালে তাল মিলিয়ে সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবু এখানেই তার শেষ নয়। এরপর এই টায়ারের প্রত্যেকটি নিয়ে আসা হচ্ছে খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার জন্যে। সুদক্ষ কারিগর আর আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তার প্রতিটি অংশের কার্যকারিতা সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ হচ্ছেন, একমাত্র তখনই তাকে ব্যবহারের উপযুক্ত বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন।

হ্যাঁ, মাদ্রাজ রবার কারখানা দক্ষিণ ভারতের এক প্রাণকেন্দ্র এবং ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের যে এক নতুন দিগন্ত, তাতে সন্দেহ নেই।

ডঃ এ কে লাহিড়ী পুরস্কৃত হলেন

জামশেদপুরের জাতীয় ধাতু গবেষণাগারের বিজ্ঞানী ডঃ এ কে লাহিড়ীকে ভারত সরকার ১৯৭০-এর 'জাতীয় ধাতুবিজ্ঞানীর সম্মানে ভূষিত করেছেন। এর জন্যে তাঁকে একটি বিশেষ মানপত্র এবং নগদ তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। 'করোশন প্রিভেনশন' বা ধাতুর রাসায়নিক ক্ষয়কারী রোধের অনন্য নিবারণমূলক ব্যবস্থা আবিষ্কারের উপর ডঃ লাহিড়ীকে ঐ সম্মানে ভূষিত করা হল।

ধাতুর অবক্ষরজনিত প্রতিবিধানের উপর প্রায়োগিক এবং মৌলিক গবেষণা করে ডঃ লাহিড়ী ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা ধাতু এবং ধাতু-সংকরের মরচে পড়া বা অনুরূপভাবে ধাতুর অপক্ষয় বন্ধ করার জন্যে নানা-রকম প্রলেপ তৈরি করেছেন যাদের ভূমিকা শিল্প জগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়াও পেট্রোলিয়াম, সার কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রভৃতির রাসায়ন-জনিত ক্ষয় রোধ করার ব্যাপারে যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করেছেন তাদের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লির ঐতিহাসিক লৌহস্তম্ভ, কোনারক-এর প্রাচীন লোহার তৈরি কাড়িকাঠ প্রভৃতি দীর্ঘকাল প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে থেকেও কেন মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায় নি এবং প্রাচীনকালে ভারতে কী কী পদ্ধতিতে লোহা নিষ্কাশন করা হত তার উপর ডঃ লাহিড়ীর গবেষণা-পত্র বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে। তাঁর এবং তাঁর সতীর্থদের মিলিত প্রচেষ্টা রোলিং-মিল এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের মরচে পড়া বন্ধ করার

বাঁ দিক থেকে : বক্তৃতা দিচ্ছেন ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর। ফটো : ভোলানাথ দেব

ব্যাপারে যে সমস্ত কাজ করেছে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গবেষণার অন্তর্গত ধাতু গবেষণা বিভাগের করোসন অ্যাডভাইসারি ব্যুরোর প্রধান হিসেবে ডঃ লাহিড়ী ধাতুর অবক্ষয় বিষয়ক বিভিন্ন উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। এ ছাড়াও তাঁর সম্পাদিত তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, করোসন ইন পিটজ প্লান্টস, করোসন ইন ফার্টিলাইজার অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম ইনডাস্ট্রি এবং করোসন ইন কেমিকেল ইনডাস্ট্রি।

সংবাদ

সম্প্রতি কলকাতার মার্কিন তথ্য দপ্তরের সাংস্কৃতিক বিভাগে তাদের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে বক্তৃতা ভাষণের মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করেছেন। উদ্দেশ্য, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সাধারণ শ্রোতার সামনে তুলে ধরা।

এই উপলক্ষে গত জানুয়ারী ২৭ প্রথম একটি অধিবেশন করা হয়। বক্তা কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর শিক্ষণ বিভাগের প্রধান ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। ঐ দিনের বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানের পটভূমিকা।

অতীত ঐতিহ্যের ভাষায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের কথা যেভাবে পরিবেশন করলেন, এক কথায় তা অনবদ্য। পরাধীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার বাধা কোথায় ছিল, কেন বিজ্ঞান জগতে জাতীয় মেজাজ তৈরি হতে এত বেশি সময় লাগল, স্বাধীনতার পরবর্তী এই তেইশ বছরে মৌল বিজ্ঞানচর্চা এবং কারিগরি বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকারের অন্তরায় কী কী ছিল সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তাঁর বক্তৃতায় পাওয়া গেল। তিনি আক্ষেপ করে বললেন, "আমাদের টেকনলজি বা কারিগরি শিক্ষা মোটেই বিজ্ঞানের সঙ্গে তাল রেখে চলেনি। এই শিক্ষা আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছে অনেক পরে। অথচ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা এতই পরস্পর নির্ভর যে একটির অনগ্রসরতার জন্যে অপরটিকেও পিছিয়ে পড়তে হয়। কারিগরি বিদ্যায় গত কুড়ি বাইশ বছর ধরে যে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে স্পষ্ট তিনটি পর্যায় দেখা যাবে। এক, বিদেশী যন্ত্র ও বিদেশী শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে কলকারখানা স্থাপন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বিদেশে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ, দুই, বিদেশী যন্ত্রের সাহায্যে দেশে যন্ত্র তৈরি করা, তিন, সমস্ত বিদেশী যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানি বন্ধ করে দেশীয় সূত্রে বিভিন্ন যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ তৈরি করা। আমরা এখন সবে তৃতীয় পর্যায়ের গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এই পর্যায় অতিক্রম করার অর্থ নিজেদ স্বাবলম্বী হওয়া। এবং তা যখন হবে, তখনই আশা করা যায়, দেশে গবেষণায় সুসময় আসবে।...এখনকার গবেষণা বহুল পরিমাণে যন্ত্রনির্ভর।... বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রের উপর নির্ভর করে গবেষণা কখনই সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। আজকের গবেষকরা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন, টেকনোলজিতে অনগ্রসর হওয়ার ফলে কী রকম অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।"

ডঃ চট্টোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ন প্রকল্প আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "ইতিহাসে এমন এক একটা সময় আসে যখন ঝুঁকি নেয়াটা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালে পরমাণু শক্তি কমিশন সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন বলেই আজ দুই দশকে আমরা পরমাণুশক্তির ক্ষেত্রে অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করে এসেছি। কৃষিবিজ্ঞান প্রথম দিকে অনেকটা অবহেলিত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেদিকে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা দিয়েছে। পাঁচটি প্রধান শস্যের ব্যাপারে সবুজ বিপ্লবের কথা আজ সর্বিদিত।

তাঁর মতে সে তুলনায় দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ক গবেষণা অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, কোন দেশে বিজ্ঞানের প্রগতি কী দিয়ে বিচার করা হবে? সে দেশে কতজন বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হলেন, কতজন নোবেল পুরস্কার পেলেন, তাই দিয়ে? তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের মত অনগ্রসর দেশের বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি নিরূপণের যথার্থ মানদণ্ড তা নয়। বিজ্ঞানের দ্বারা সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হল, দৈনন্দিন জীবনে তার দারিদ্র্য ও কষ্ট কতটা লাঘব হল, এগুলিই বিজ্ঞানের সাফল্যের প্রকৃত চিহ্ন। এই লক্ষ্য থেকে এখনও আমরা বহু দূরে।' অবশেষে তিনি আজকের বিজ্ঞানীদের বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করেন।

বস্তুত ঐ দিনের বক্তৃতায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় বর্তমান ভারতের বিজ্ঞান চর্চা এবং তার প্রয়োগের ব্যাপারে যে ধরনের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন তা যে শুধু বাস্তবানুগ তাই নয়, তার মধ্যে সাক্ষাকারের অবস্থাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং ভারাক্রান্ত তথ্যের সমাবেশ না ঘটিয়ে বিজ্ঞানের

স্বরূপেরে এইভাবে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। অথচ বিজ্ঞান পঠনের চেয়ে তার ভূমিকা জাতীয় জীবনে অনেক বেশি মূল্যবান। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই দায়িত্ব পালনের জন্যে আমাদের অভিনন্দন রইল।

ঐ একই বক্তৃতামালার দ্বিতীয় অধিবেশন বসেছিল ফেব্রুয়ারী ৫ তারিখে। বসু। সাহা ইনস্টিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর। তিনি আলোচনা করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবিধ প্রত্যয়-এর উপর। স্লাইডের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলি তিনি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় সাধারণের উপযোগী করে স্থাপন করলেন। নক্ষত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে, কীভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠল এবং ভারত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলির উপর নানারকম গবেষণার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা তাপ-আয়নন তত্ত্বের সাহায্যে বর্ণালী বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নক্ষত্রের পিঠের তাপমাত্রা নির্ণয় করার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সূর্যের বোঝা, নক্ষত্রের বিস্ফোরণ, কোয়াসার, পালসার, নিউট্রন নক্ষত্র প্রভৃতির উপর আলোচনা করে, ঐ সমস্ত জ্ঞান কিভাবে আমাদের সাধারণ জীবনের কাজে লাগছে সে কথা উল্লেখ করেন। তিনি আশা পোষণ করেন, ভারতের মত উন্নতিশীল দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চার একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক যুগে কোন বিজ্ঞানের শাখাকে অস্বীকার করে অন্য শাখার উন্নয়ন সম্ভব নয়। অন্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা হয়ত কঠিন। কিন্তু সামান্য আরম্ভের মধ্যে দিয়েও আমাদের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যটিকে সজীব করা প্রয়োজন। সুস্থ এবং সবল ভারত গড়ে তুলতে এই সব গবেষণা একান্ত অপরিহার্য।

এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্যে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমরজিৎ কর

সংশোধন

শনিবার মাঘ ৩০, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পৃষ্ঠা ১৫৫-এর বাঁ পাশের উপর দিকের ছবির পরিচয় প্রসঙ্গে 'ফেজ সন' কথাটা আসলে কেলাসন হবে। পৃষ্ঠা ১৫৬-র তৃতীয় কলেম ফ্রন্টাল জোক হবে না, হবে ফ্রন্টাল লোব।।

চিঠি

গত তেইশে মাঘ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের দেশ-এ বিমলকান্তি সেনের চিঠি দেখলাম। Antibiotic-এর প্রতিশব্দে প্রতিজীবক লিখলে ভালোই খাপ খায়। কিন্তু Microbiology বলতে মোটেই জীবাণু বিজ্ঞান বোঝায় না। সাদামাটাভাবে জীবাণু বলতে আমরা Bacteria বুঝি না কি? এবং সেইদিক দিয়ে Bacteriology বোঝাতে জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাণুবিজ্ঞান লেখাই সংগত বলে মনে হয়। আর তাছাড়া Microbes বলতে শুধুই জীবাণু মানে Bacteria বোঝায় না। আরো অনেক কিছু বোঝায়, যেমন Protozoa, Fungi বা ছত্রাক কিছু কিছু, কয়েকরকমের শ্যাওলা বা Algae ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বাংলায় মাইক্রোবায়োলজি লেখাই ভালো যেমন লিখতে হচ্ছে Virologyকে।

Molecular Biology বোঝাতে আমি যদিও অনেক জায়গায় 'আণবিক' লিখেছি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯।), তবুও একই অর্থে আণব জীববিজ্ঞান এবং/অথবা, অণু-জীববিদ্যা ব্যবহার করায় আমার অনিচ্ছা নেই। তবে ব্যবহার করার সময় ক্ষেত্রবিশেষে দেখতে হবে কানে কোনটা ভালো শোনায়, যেমন ধরুন, 'অণু-প্রজননবিজ্ঞান' লিখবেন, না 'আণব/আণবিক প্রজননবিজ্ঞান'! Genetics বলতে আমি প্রজননবিজ্ঞান লিখেছি কিন্তু, ভেবে দেখুন 'প্রজনন' বলতে Breeding কথাটা মনে আসে, যেমন জননতত্ত্ব বলতে Reproductive Biology। Genetics-এর প্রতিশব্দে বংশানুক্রমবিজ্ঞান ভালোই শোনায়, এবং ধারণা স্পষ্টতর করে। ক্রোমোসোমকে (Chromosome) অনেকে বোধহয় এইদিক দিয়েই 'বংশসূত্র' লিখছেন। আমার মনে হয় এতটা আবার না এগোনোই ভালো। Chromosomeকে ক্রোমোসোম, Nucleusকে নিউক্লীয়াস এবং Geneকে জিন রাখলে সুবিধে বাড়বে বই কমবে না। জীববিজ্ঞানের এই ধরনের শব্দগুলি বলতে গেলে এখন আন্তর্জাতিক। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই এই শব্দগুলি ঢুকে গেছে। বানানটা পাল্টেছে হয়তো কোথাও অংশস্বরূপ, না হলে মোটামুটি অবিকৃত। এতে ভাবের আদান-প্রদান সহজতর হয়।

আক্ষরিক পরিভাষা দেখা গেছে, ঠিক হলেও, অনেক সময় খটমট এবং হাস্যকর লাগে। সেক্ষেত্রে নিজের মৌলিক 'কমনসেন্স' কাজে লাগিয়ে সহজভাবে ব্যাপারটা বাতলানোই কর্তব্য।

প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়
সাইটোজেনেটিক্স ল্যাবরেটরি,
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
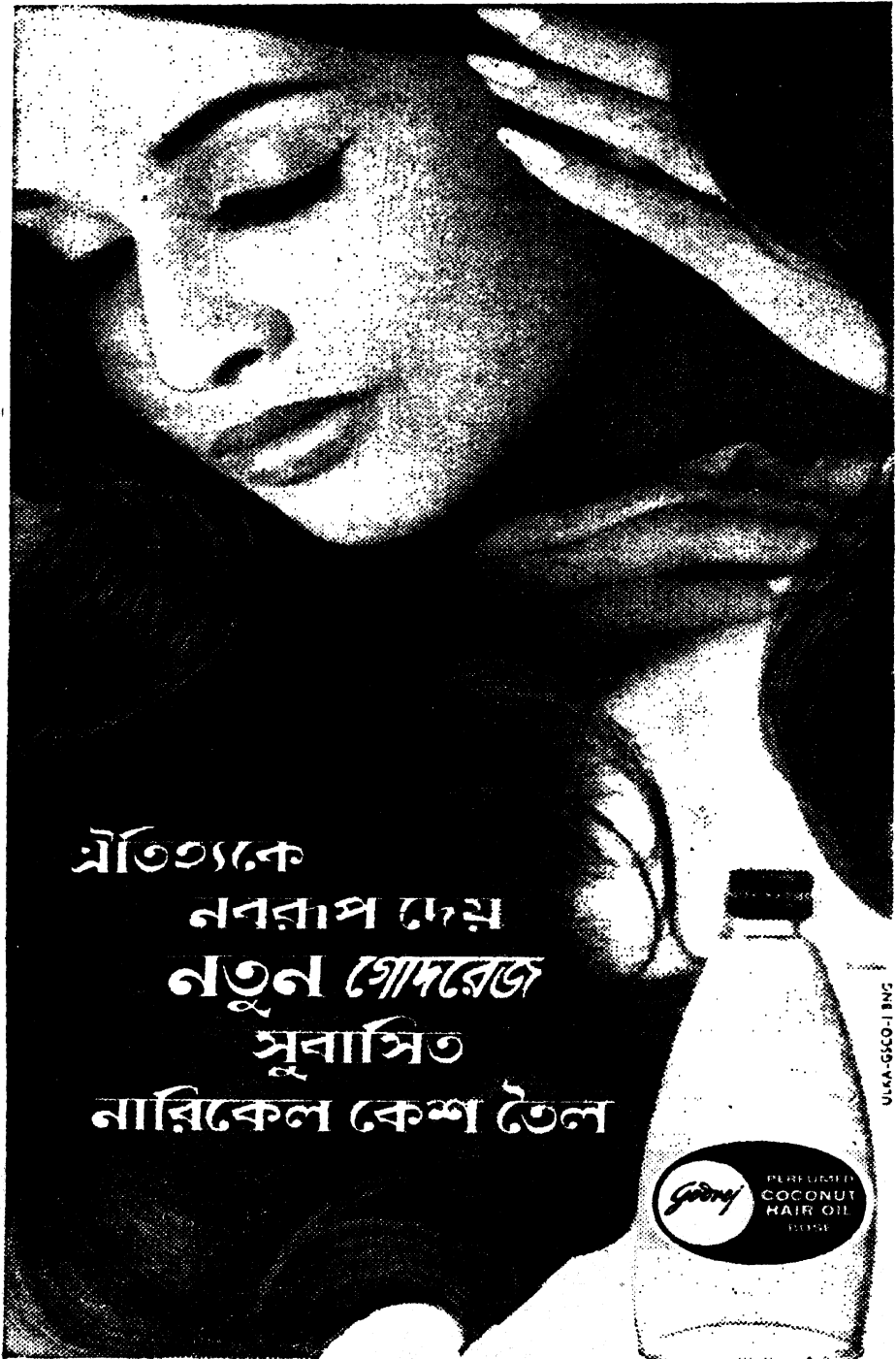
ঐতিহ্যকে
নবরূপ দেয়
নতুন গোদরেজ
সুবাসিত
নারিকেল কেশ তৈল
Godrej
PERFUMED
COCONUT
HAIR OIL
ROSE
ULKA-GSCO-1 BNG

পড়শীর কোন্দল
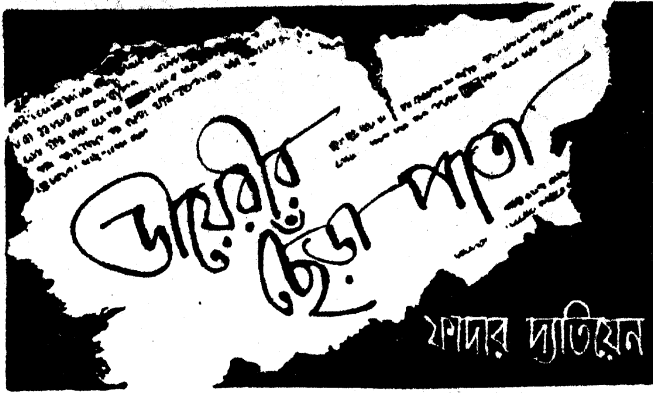
ফাদার এফ্রায়িম নামে এক ফরাসি কাপুচিন পাদ্রিকে নিয়ে ইঙ্গ-পর্তুগীজ-কলহের এক কৌতুকপ্রদ বিবরণী দিয়েছেন তাভের্নিয়ে। মাদ্রাজে তখন ইংরেজদের ঘাটি; পর্তুগীজরা জমিদারী পেয়েছে পার্শ্ববর্তী শহর মায়লাপুরে। বেশ জাঁকালো ব্যবসা কেন্দ্র এই মায়লাপুর—তুলোর বাণিজ্যে ওর নামডাক ছিল খুব। বহু দক্ষ কাথলিক শিল্পী-কারিগর ওখানে বসত গেড়েছিল, ব্যবসায়ীরাও সংখ্যা ও সমৃদ্ধিতে গরীয়ান।

এদের অনেকেই সমৃদ্ধতর মোহিনী মাদ্রাজের হাতছানিতে সাড়া দেবার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকত, কিন্তু সেখানে কাথলিক ধর্মানুষ্ঠানের সুযোগ না থাকায় সেটা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এমন সময় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন ফাদার এফ্রায়িম। যাচ্ছিলেন তিনি পেগু, কিন্তু জাহাজের অভাবে আটকা পড়ে গেলেন। ইংরেজরা তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করে, অনুরোধ-উপরোধে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাদ্রাজে অবস্থান করতে রাজি করিয়ে ছাড়ল। প্রচার ও আরাধনার ঢালাও সুযোগ দেওয়া হল তাঁকে। শুধু পর্তুগীজে নয়, দিশি ভাষাতেও তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে লাগলেন। মাদ্রাজের কদর এতে বাড়ল (মায়লাপুরের গির্জায় তখনো দিশি ভাষা অচল)। একে একে অনেক কাথলিক পাততাড়ি গুটিয়ে মাদ্রাজে এসে গুছিয়ে বসতে থাকল। পর্তুগীজরা অচিরে বুঝল, সব অনিষ্টের মূলে আছেন ঐ কাপুচিন-শিরোমণি। ওটাকে সরাতে পারলেই...

ফন্দি আঁটতে দেরি হল না। ফাদার এফ্রায়িম লোকটা নিজে ফরাসি হলেও ইংরেজি আর পর্তুগীজ ভাষার উপর তাঁর **দখল ছিল বেশ; তাই তিনি এই দুই** পড়শীর কোন্দলে কয়েকবারই মধ্যস্থতার কাজ করেছেন। পর্তুগীজরা স্থির করলে, ঐ পথেই এগোতে হবে।

একদিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো সম্পূর্ণ অকারণে পর্তুগীজরা মায়লাপুরে নোঙর-ফেলা এক ইংরেজ জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাল। ইংরেজ অধ্যক্ষ এই অবাঞ্ছিত আক্রমণের কৈফিয়ৎ চাইলেন। দৌত্যের দায়িত্ব এবারেও অর্পিত হল ফাদার এফ্রায়িমেরই উপর।

চতুর পর্তুগালনন্দনেরা এরই অপেক্ষায় ছিল। হাতে চাঁদ পেল তারা। অসন্দিগ্ধ এফ্রায়িম সহজেই পাতা-ফাঁদে পা দিলেন। ইনকুইজিশনের দশ-বারোজন অফিসার তৈরিই ছিল, খপ করে বেচারা ফাদারকে ধরে জলপথে গোয়ায় পাঠিয়ে দিল। বাইশ দিনের যাত্রা, পায়ে বেড়ি পরিয়ে নৌকোর মধ্যেই তাঁকে বেঁধে রাখা হল। প্রতি রাতে নোঙর ফেলে মাঝিমাল্লারা ঘুমোত তীরে নেমে, বন্দী পাদ্রিকে তরীতেই রেখে। দুলুকে নৌকো ঢেউয়ের তোড়ে, ঘুমোতে না পারে

তো বোনম্প্র বৃন্ত কাটাক এ ফরাসি আলখাল্লা-ওয়ালা, ইংরেজের ছাতার নিচে বসে কাথলিক ফুসলোনোর ফলটি এবার ভালো করেই টের পাবে বাছাধন।

গোয়ার ভাইসরয় কিংবা আর্চবিশপের শুভবুদ্ধির অভাব ছিল না। কাজটা যে গর্হিত, তা তাঁরা এক নজরে বুঝেছিলেন। কিন্তু ইনকুইজিশনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তাঁদেরও ছিল না। আইনত অবশ্য ইনকুইজিশনের আওতার বাইরে তাঁরা, কিন্তু পর্তুগালের রাজার সঙ্গে ইনকুইজিটরের দহরম-মহরম সুবিদিত। কে ঘাটাতে যাবে এমন শক্তিমানকে? তাঁরা চুপ করেই থাকলেন।

ওদিকে চুপ করে ছিলেন না যিনি, তাঁর নাম ফাদার জেনন, ফাদার এফ্রায়িমের সহকর্মী, সহধর্মী ও সুহৃদ। পাল্টা এক প্ল্যান ফাঁদলেন তিনি। মায়লাপুরের গভর্নর প্রতি রোববার ভোরে শহরের বাইরে একাই, পদব্রজে এক উপাসনালয়ে আসতেন। ফাদার জেননের অনুরোধে মাদ্রাজ-ফোর্টের কাপ্তেন তিরিশজন লোক নিয়ে অতর্কিতে ছোঁ মেরে এনে তাঁকে কয়েদ করলেন মাদ্রাজের কাপুচিন কনভেন্টে। ফাদার জেনন জানালেন : কিডন্যাপডটির ক্রয়মূল্য—এফ্রায়িমের রিলীজ।

কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হল না। মাদ্রাজের ইংরেজ প্রশাসক বন্দী গভর্নরের পদমর্যাদা স্মরণ করে রাজনৈতিক কানুন-মাফিক একত্র ডিনারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই সুযোগে এক ফরাসি বাদকের সহায়তায় মায়লাপুরের পাখি শিকল ছিঁড়ে পালাল ফের।

এদিকে ফাদারের কারারোধ য়ুরোপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। ফাদারের ভাই, প্যারিসের সংসদ-উপদেষ্টা, পর্তুগীজ

রাজদূতের কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। রাজদূতে পত্র লিখলেন রাজাকে, রাজা পত্র লিখলেন গোয়ায় : পঠপাঠ পাদ্রিমশায়কে ছাড়। রোম থেকেও পত্রাঘাত হল, পোপ লিখলেন : ও'কে না ছাড়লে গোয়ার তাবৎ যাজক-সম্প্রদায়কে ক্যাথলিক-সমাজ থেকে ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন দেব...। কা কস্য পরিবেদনা। চিঠি লেখাই সার হল, আরব সাগরের এপারে কড়ে আঙ্গুলটি পর্যন্ত নড়ল না।

আর তবু হঠাৎই ঘটল অঘটন। গোলকুণ্ডার অধীশ্বর এবার নাক গলালেন। ফাদারের কাছে ইনি কিছুদিন গণিত শিখেছিলেন। গুরুর ঋণ শোধের এই সুযোগ তিনি ছাড়লেন না। শিক্ষাটা তাঁর বৃথা যায়নি : দুইয়ে দুইয়ে যে চার হয়, এই সোজা হিসেবটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন পর্তুগীজদের। সেনাপতি মীর জুমলা হুমকি দিলেন : খালাস কর পাদ্রিটাকে—দু মাসের ডেডলাইন। নইলে গোটা মায়লাপুর তছনছ ক'রে দেব...। 'চিচিং ফাঁক' হল যেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর পর নৌকো ভাসল সমুদ্রে—গোয়ার উদ্দেশে। দেড় বছর কারাগারে কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন ফাদার এফ্রায়িম।
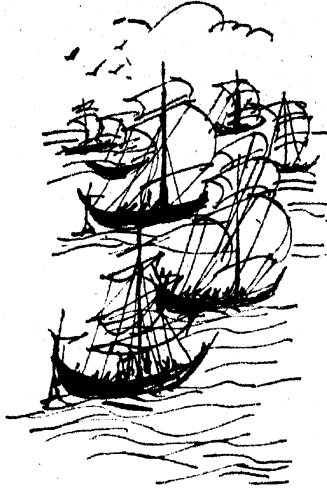
নৌকোর পর নৌকো ভাসল সমুদ্রে

মাস্তান ইংরেজের বীর্যবত্তা, ফাদার জেনেনের চাতুর্য, পর্তুগাল-পতির কড়া হুকুম, পোপের রক্তচক্ষু—সব যেখানে ব্যর্থ, এক বিধর্মী বিজাতীয় রাজার হুংকার মাত্রেই সেখানে ফল ফলল।

একথা-সেকথা-সতীদাহ প্রথা

প্যারিসের শৌখীন কৌতূহলী অভিজাত লেডি-মহলের অফুরন্ত ঔৎসুক্য-পিপাসা মেটাতে যথাসম্ভব বিচিত্র ও বিবিধ চুটকিতে গ্রন্থের ডালি সাজিয়ে দিয়েছেন তাভের্নিয়ে।

বলেছেন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কথা : তারা নাকি উইগে করে লুকিয়ে আনে সোনা। বলেছেন ভারতীয় বামুনদের কথা : তারা নাকি গঙ্গাপানি বিক্রি করে অগাঙ্গের অঞ্চলে; বিয়েতে হাজার তিনেক অবধি টাকা খরচ হয় শুধুমাত্র গঙ্গা জলের জন্য। তারপর আছে মণি কেনাবেচায় বাজারী রীতিটি : মুক্ত দিবালোকে, সবার চোখের উপরে, আর তবু চোখে ধুলো দিয়ে, দরদস্তুর সম্পন্ন হত। একফালি কাপড়ের নিচে মিলিত হত ক্রয়েচ্ছুক ও বিক্রয়োদ্যত হাত: সংকেতের প্রণালীটা ছিল-মর্দন। হাত টিপলে এক হাজার [দুবার টিপলে দু' হাজার]: পঞ্চাঙ্গুলি, একাঙ্গুলি, অর্ধাঙ্গুলি টিপলে, যথাক্রমে পাঁচশো, একশো, পঞ্চাশ। আঙ্গুলের ডগাটি টিপলে—দশ।

দশ কি?...দশ মুদ্রা নিশ্চয়। কিন্তু দেখবেন : শাহ্‌জাহানী মুদ্রা দাবি করুন। কুড়ি বছর আগে নির্মিত মুদ্রা, হাতে হাতে

ঘরে হয়তো. চার-শতাংশ ওজন খুইয়ে বসে আছে। আপনি ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন? ভারতীয় ব্যবসায়ীরা. দেখুন. টাঁকশাল থেকে যে-মুদ্রা দু' বছরও হয়নি বেরিয়েছে. তারই উপর ১ অথবা অন্তত ২ শতাংশ অতিরিক্ত চেয়ে বসে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরক্ষর সাধারণ মানুষ—মুদ্রার উপরে মুদ্রিত সাল পড়তে না পেরে ধূর্ত ব্যবসায়ীর খপ্পরে প্রবঞ্চিত হয়। অবশ্য সকলকেই আবার বঞ্চনা স্বীকার করে নিতে হয় বাদশার কাছে ঃ আপনি কিছু কিনুন. হালফিল রুপেয়া আপনাকে ট্যাঁক থেকে খসাতে হবে; সরকার আপনার কাছ থেকে কিনলে আপনাকে গছাবে পুরোনো টাকা। আপনার নীট্ লোকসান—৬% পর্যন্ত।

আর ভারতীয় ফকির?...আছে বটে। আট লাখ মুসলমান আর বারো লাখ হিন্দু ফকির ছড়িয়ে আছে গোটা ভারতে—এবং তাদের ফকিরিয়ানার আদি মডেল স্বয়ং লঙ্কাধিপতি রাবণ রামের হাতে রাজ্যপাট হারিয়ে যিনি নাকি, নির্বেদ ও বিতৃষ্ণার বশে, সর্বহারা ভিক্ষুকের মতো নাঙ্গা সন্ন্যেসি হয়ে ধরণী-পরিক্রমার শপথ নিয়েছিলেন।

জাত ও জাতি? হ্যাঁ, তারও উল্লেখ করেছেন তাভের্নিয়ে। চতুর্থ বর্ণ হল শূদ্রদের ঃ পেশায় ওরা লড়ুয়ে, রাজপুত-দেরই মতো। তফাৎ এই—রাজপুতেরা অশ্বারোহী, শূদ্রেরা পদাতিক। গাধার ব্যবহার শুধু ঝাড়ুদার গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ. জঞ্জাল বাহিত হয় গাধার পিঠে। অপরাপর বর্ণের কাছে জানোয়ারটা নিতান্ত অশুচি. অস্পৃশ্য।

সবার নিচে অবশ্য বিদেশী ম্লেচ্ছ। এই ধরুন—পর্তুগীজ। ওরা আবার উত্তমাশা অন্তরীপ পেরোলেই 'ফিদালগো' সাজে. নামের সঙ্গে 'দম' যুক্ত করে। লোকে তাদের ব্যঙ্গ ক'রে বলে ঃ 'উত্তমাশা অন্তরীপের ফিদালগো'। নিজেদের মেয়েদের ব্যাপারে এমন হিংস্র-হিংসুটে জাত জগতে আর নেই ঃ সন্দেহ হলেই হল, টুক ক'রে বউয়ের ঘাড়ে তরোয়ালের এক কোপ—কিংবা বিষ খাইয়ে খতম। শত্রুকে ক্ষমা-টমার বালাই ওদের নেই। নিজে না পারলে 'কালা আদমিদের' মধ্য থেকে ভাড়াটে খুনী জোগাড় ক'রেও বদলা নেয়।

ধর্মের কথা তাভের্নিয়ে লিখেছেন অতি অল্প ঃ তবে জানবেন, ভারতে এমন জীব আছে, যাদের নাকি 'ঈশ্বরে কিংবা শয়তানে কোনো বিশ্বাস নেই। ওদের ব্রাহ্মণদের কাছে রক্ষিত আছে এক শাস্ত্রগ্রন্থ, যার মধ্যে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নেই: আর সেই সমস্ত জঞ্জালের জন্য ঐ শাস্ত্রগ্রন্থের লেখক—Baudou (বুদ্ধ!) যাঁর নাম—কোনো বোধগম্য যুক্তি দেননি।"

ঐতিহাসিক তথ্য তাভের্নিয়ের গ্রন্থে কিছু পরিমাণে মেলে; তবে এই ক্ষেত্রেও তাঁর

ব্রেইরিক্সর অন্য। শাহজাহানের বিষয়ে এমন একটি গল্প আছে ইংরেজ অনুবাদে যা স্থান পায়নি : শাহজাহানের নাকি বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছিল : বারো-তেরো বছরের এক নেহাৎ ছুকরির প্রেমে মজে গিয়েছিলেন সম্রাট, কিন্তু তখন তিনি বিগতযৌবন, দারুণ কড়া কি একটা উত্তেজক দিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতেন—শেষ পর্যন্ত তারই প্রকোপে অসুস্থ হয়ে মরতে পর্যন্ত বসেছিলেন।

সতীদাহের কিন্তু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তাভের্নিয়েরের আছে। ব্যাপারটা আশ্চর্য লেগেছে তাঁর কাছে : ভারতের মানুষ সাপ মারতে দ্বিধান্বিত, ছারপোকা মারতে নৈতিক সংশয়ে ভোগে—আর জ্যান্ত একটা রক্তমাংসের মেয়েমানুষকে লকলকে আগুনে পুড়িয়ে মারাটাকে বলে ধর্মরক্ষা!...যে রমণীর স্বামী মরল, এমনিতেই তার কপাল পুড়ল। চুলের গোছা ছাঁটাই হল তার, গায়ের গয়না খুলে নেওয়া হল; যে ভবনে সে ছিল এতদিন সর্বময়ী কর্ত্রী, এক পলকে সেখানেই সে হয়ে দাঁড়াল অকিঞ্চন, অপাংক্তেয়, আজ্ঞাধীনা দাসী। চায় কেউ এভাবে বাঁচতে? জ্বলন্ত চিতাই মনে হয় একমাত্র মুক্তির পথ। অবশ্য বাধ্যবাধকতার প্রতাপটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মুসলমান প্রশাসকের অনুমতি নিতে হয় প্রতিটি সতীদাহের জন্য। নিঃসন্তান বিধবারাই শুধু অনুমতি পায়। দহনে প্রাণ যারা দেয় না, প্রাণ যতদিন থাকে দগ্ধে দগ্ধে মরে তারা দুর্বিষহ প্রায়শ্চিত্তে। কেউ কেউ মানত করে, বাকি জীবন শুধু গরু ও মহিষের মল থেকে নিষ্কাশিত হজম-না-হওয়া খাদ্যবস্তু কুড়িয়ে-খুঁটে খেয়ে বাঁচে; কেউ বা পথের ধারে উনুন জ্বেলে পথচারীদের সব্জির ঝোল রেঁধে খাওয়ায়, ধূমপানের আগুন জোগায়।

সতীদাহের তিন ধরন দেখেছেন তাভের্নিয়ে। গুজরাটে স্বামীদেহ কোলে নিয়ে সারাক্ষণ তাম্বুল চর্বণ করতে করতে সাধ্বীরা অগ্নিগ্রাসে ডুবে যায়। ভারতের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণের

শিশুটিকে কাপড়ের থলিতে ঝুলিয়ে গাছের ডালে বেঁধে রেখে আসে

রেওয়াজ; তারপর ব্রাহ্মণেরা সতীটিকে পিছন থেকে ঠেলে ফেলে দেয় চিতার উপর, আত্মীয়েরা আগুন বাড়াতে পাত্রের পর পাত্র তেল ঢালে। ওখানে আবার কোথাও জীবন্ত সমাধিদানের রীতি চালু। মৃত স্বামী ও অনুমরণপথযাত্রিণীকে গর্ত খুঁড়ে এক সঙ্গে নামিয়ে দেওয়া হয়, ঝুড়ি ঝুড়ি বালি নিক্ষিপ্ত হয়ে বুজে ওঠে বিবর, পুরোপুরি ভরাট হয়ে গেলে তার উপরে আত্মীয়স্বজনের উল্লসিত নৃত্য।

বাংলাদেশে মৃতদেহ আনীত হয় গঙ্গা-তীরে। কোনো কোনো স্থান থেকে গঙ্গা পৌঁছোতে কুড়ি দিন পর্যন্ত লাগে। মড়া ততদিনে পচে উঠেছে। তাকে ধোয়ানো হয় সলিলে, স্ত্রীর অঙ্কদেশে শুইয়ে দেওয়া হয়। আসে বান্ধব পরিজন, কেউ আনে চিঁড়ে, কেউ আনে চাল, কেউ-বা পয়সা কিংবা এক বস্ত্রখণ্ড : "এটা আমার মাকে দেবেন..."

"এটা আমার ভাইয়ের জন্য..."। পরলোকে নিয়ে যাওয়ার মতো আর-কিছু আর তিনা ভিগোস করে স্ত্রীর উপহারগুলি পুঁটুলি বেঁধে রেখে দেয় ... তার কোলের উপর স্বামীর পিঠের নিচে। তারপর চিতার কাঠে অগ্নিসংযোগ ... হয়। বাংলাদেশে জ্বালানীর অভাব; ... প্রায় পুড়ে শেষ হয় যখন—শব দুটি তখনো অর্ধদগ্ধ মাত্র—ঐ অবস্থাতেই গঙ্গায় নিক্ষেপ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। জলে কুমীর আর ... পূর্ণ গ্রাসের জন্য।

...আর ডাঙাতে আছে বামুনের ছাইয়ের গাদা সরিয়ে লুঠে নেয় স্বর্ণদানা সতী-অঙ্গ যা শোভিত করে ছিল।

বাংলাদেশের আরেক বিচিত্র স্বরূপ স্তনাবিমুখ শিশুর ভূত-ছাড়ানোর তাক... দাওয়াই। মায়ের বুকে রুচি নেই বাচ্চার, সে তো অমঙ্গলের লক্ষণ। দুষ্ট আ... ভর করেছে তার উপর। প্রতিবিধানরূপে শিশুটিকে কাপড়ের থলিতে ঝুলিয়ে গাছের ডালে বেঁধে রেখে আসা হয়, মুক্ত আকাশের নিচে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কখনো কখনো কাকেরা চোখ খুবলে নেয়। তাই বাংলাদেশে কানাচোখো কিংবা ক্ষতচক্ষু মানুষের সংখ্যাধিক্য এইজন্যই। ধারেকাছে বাঁদরের পাল থাকলে অবশ্য কাকের ভয় অনেকাংশে কমে যায়। শোনা গেছে মা... মাঝে ইংরেজ, পর্তুগীজ কিংবা ওলন্দাজেরা গিয়ে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে থাকে।

যেটা একদিন গাছে ঝুলেও বাচ্চা যদি মাতৃস্তনে আসক্ত না হয়, ফের তাকে এ... ঝোলানো হয় ডালে। তিনদিনের পরে অনাসক্তি অবিচল থাকলে স্থির হয়—সন্তান অশুভবাহী, মনুষ্যরূপী পিশাচ। গঙ্গায় বা পুষ্করিণীতে তাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

...বহুদিন পরে, বহু দেশ ঘুরে আবার স্বদেশেই ফিরে গিয়েছিলেন তাভের্নিয়ে। ফ্রান্সের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমে যে চিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব করেছিলেন নিজের মধ্যে, তা পরমেশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ : "চল্লিশ বছর ধরে, মাতৃভূমি থেকে হাজার হাজার যোজন দূরে, জল ও স্থলের সর্ববিধ সঙ্কট থেকে যিনি আমাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন, সেই পরাৎপরের উদ্দেশে বললাম : ধন্যবাদ...।"

আর- কোনোদিন প্রাচীতে যাওয়া তাঁর সাধ্যে কুলোবে না—এ তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। তবে একবার [তাভের্নিয়ের বয়স তখন উনআশী বছর] ব্রান্ডেনবার্গের ইলেক্টর তাকে রাষ্ট্রদূত করে আরেকবার প্রাচ্যে উদ্দেশে পাঠাতে চেয়েছিলেন; তাভের্নিয়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তা কিন্তু আর হল না। তাভের্নিয়ে তবু আরেকবার পথে নেমেছিলেন; রাশিয়ায়, ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

একক, দশক

একক, দশক, শতক—বাংলা গান একক-দশকে মিলে-মিশে হতে দেখেছি—শতক পর্যন্ত দেখিনি। সম্প্রতি বৎসরকাল বা তার কিছু অধিক হবে বাংলা গানে একক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। তার আগে একক অনুষ্ঠান হত না বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু সে তখনকার দিনে দিক্‌জোড়া যাঁদের নাম ছিল তাঁদের দিয়েই হত। অধিকার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠত না। আজকালকার একক সে জিনিস নয়—অধিকাংশই মাঝামাঝি স্তরের; আর যাঁরা মধ্যবর্তী, একক স্বীকৃতির দাবি তাঁদের করবার কথা নয়। যে ক্ষেত্রে এককের প্রধান আকর্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত সে ক্ষেত্রে একে সমর্থন জানাবার আগে কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দরকার।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে একক-দশকের ভূমিকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। সেইজে তিনি নিজে বসে পরিচালনা করতেন। দশকের মাঝখানে একক আবৃত্তি, নৃত্য—কত ভাবাইটি। এই দশকের একটা অনুপম মাধুর্য সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উচ্চ শিক্ষিত কণ্ঠে সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যেত: উচ্চারণে অস্পষ্টতা [illegible] সংস্কার আন্ডারস্ট্যান্ডিং—নির্দিষ্ট
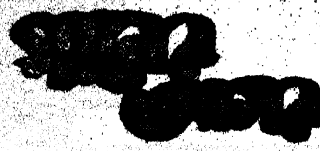
গণ্ডি থেকে একটুকু বৈলক্ষণ্য বা স্বাতন্ত্র্য দেখা যেত না। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যতবার এই দশকের মিলিত কণ্ঠে গান শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। সম্মেলক গানের যে কি মহিমা তা অনুভব করি রবীন্দ্রসঙ্গীত মিলিত কণ্ঠে শোনবার পর।

এতদিন ধরে এই রীতিই অনুসরণ করা হচ্ছিল; কিন্তু বর্তমানে মনে হচ্ছে মিলে-মিশে অনুষ্ঠান করাটা অনেকের পছন্দ নয়, তাঁরা একক স্বীকৃতি চান। কথা হচ্ছে, স্বীকৃতি যাঁদের আছে তাঁদের পক্ষে একক অনুষ্ঠান বহুমূল্য। সে কথাটা বোধ করি তাঁদের মনেও হয়নি। লেখকের ধারণা, বর্তমান রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যাঁরা যথার্থ ট্যালেন্ট তাঁরা এই ধরনের আত্মপ্রকাশে উন্মুখ হননি। তাঁদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিনয় এককের ঔদ্ধত্যকে অস্বীকার করেছে। তবে অনধিকারী বা অর্ধ-অধিকারী যখন একক অনুষ্ঠানের পর খবরের কাগজের কলম দখল করতে আরম্ভ করেছেন তখন তাঁদের পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ নিয়ে উত্তেজনা পরিহার করাটাই তাঁদের পক্ষে শোভন হবে, কারণ যে খ্যাতি তাঁরা অর্জন করেছেন তাকে প্রচারের মশাল জেলে আরও একটু উজ্জ্বল করে নেবার সার্থকতা নেই—তা নিজগুণেই ভাস্বর হয়ে আছে।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম স্তর যাঁদের ভবিষ্যতের মধ্যে নয় তাঁদের একটা সাইকলজি হচ্ছে স্বীয় প্রতিভা সম্বন্ধে অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করা। "জেলাসি"কে বোধ করি তাঁরা পরিহার করতে পারেন না। ক্রমবর্ধমান একক অনুষ্ঠানে এই মনোভাবটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অনেক বন্ধুবান্ধব অসন্তুষ্ট হবেন জানি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, খুব কম একক অনুষ্ঠানেই প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়েছি,—বরঞ্চ মনে হয়েছে এতে তাঁদের ত্রুটিগুলি আরও পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে—অবশ্য প্রমাণ করেছে যে, তাঁরা একান্তভাবেই মধ্যবর্তী। যাঁদের একক অনুষ্ঠানে সুখী হয়েছি তাঁরা দশকের সঙ্গে একক থাকলেও একই ধারণা হত। কেননা, এককের দাবি তাঁদের অনেক দিনই স্বীকৃত হয়েছে এবং তাঁরা নিজ সম্বন্ধে বিশেষ গৌরব আরোপ করতেও চাননি।

"একক শিল্পী" কথাটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী অর্থটিই নিহিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হবার দাবি করতে গেলে একটা বিরাট প্রস্তুতির দরকার। সেটা কি এঁরা অর্জন করেছেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অপর কাব্যসঙ্গীত এক নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু বিশিষ্ট গীতকলায় এমন কিছু উক্ত সঙ্গীতে আছে যার জন্য গত শতাব্দীর মর্মস্থলকে আবিষ্কার করতে হয়। কজন করতে পেরেছেন এই কাজ? বা কজন পরিক্রমা করেছেন সেই বিরাট সঙ্গীত-ক্ষেত্রে? এই সব অনুষ্ঠান যখনই শুনি তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পীর শিক্ষার স্বল্পতা। বাধ্য হয়ে তখনই বলতে হয় গলায় ধাক্কা দিয়ে তান করলেই সেটা টপ্পা হয় না, বা স্বরলিপিকে অনুসরণ করলেই সেটা পুরাতন বাংলা গানের সাব্জেক্টিভ প্রকৃতিকে উদ্ঘাটন করে না। আবার লোক-সঙ্গীতের বহু উৎকৃষ্ট শৈলী যা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন—তাও কি এঁদের কণ্ঠে সেভাবে ধরা পড়ে? না। কারণ সেদিক দিয়েও এঁরা বহুশ্রুত নন। এঁদের এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার অতিশয় আবেগ বা নাটকীয় ভাবালুতা সঙ্গীতকে রসোত্তীর্ণ করে না।

বেশ কিছুকাল পর্যবেক্ষণের পর লেখকের ধারণা হয়েছে এই "একক"-এর পিছনে আছে একটা হীনমন্যতা এবং প্রচারবাঞ্ছা। আরও অশোভন ব্যাপার হচ্ছে, এক-একটি শিল্পীর পিছনে এক-একটি গোষ্ঠী যেন রীতিমত ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠন করতে আরম্ভ করেছেন। লেখকের এক সহযোগী জনৈক একক শিল্পীর অনুষ্ঠানের সর্বাংশ প্রশংসা করতে না পারায় তাঁকে শাসানো হয়েছে, এমন খবরও পাওয়া গেছে। একক-এর বাহুল্যে ক্রমেই সঙ্গীত-সাংবাদিকগণ বিপর্যস্ত বোধ করছেন, কেননা সম্ভাবনাহীন একক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ সমালোচনা করাটা তাঁদের অভিপ্রেত নয়। দশজনের মিলিত অনুষ্ঠান হলে দোষগুণ মিলিয়ে একটা কিছু বলা যায়, কিন্তু একক অনুষ্ঠান আশানুরূপ না হলে একটি কথাই বলতে হয় এবং অপ্রিয় সত্য কেউই বলতে চান না।

অতএব "একক" আয়োজনকারীদের নিকট অনুরোধ, একটু আত্মসমালোচনা করুন, একক শিল্পী হওয়ার গুরুত্বটা উপলব্ধি করুন এবং নিজেদের অভীষ্ট শিল্পীকেই একক মর্যাদায় অভিষিক্ত করবার প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হোন। প্রস্তুতি, আরও অনেক প্রস্তুতি দরকার।

দিলীপ-গীতি

একজন বিশিষ্ট শিল্পী এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন যে, তিনি দিলীপ-কুমার রায় মহাশয়ের সুর দেওয়া বা রচিত

সুপরিচিত গানগুলি একটি বিশেষ স্বীকৃতি সহ রেডিওতে গাইতে চান; কিন্তু আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ এই বিশেষ পর্যায়ে দিলীপকুমারের গান প্রচার করতে তেমন ইচ্ছুক নন। তাঁরা আধুনিক পর্যায়ে এইরকম প্রোগ্রামের অনুমতি দিলেও দিতে পারেন। শিল্পী এ বিষয়ে আমাদের মতামত চেয়েছেন। লেখকের সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, দিলীপকুমারের গানগুলি তাঁর নামাঙ্কিত পর্যায়ে প্রচার করাটা অযৌক্তিক নয়। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল একক স্থান পেলে দিলীপকুমারের স্থান অবশ্যই হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে দ্বিধার অবকাশ তো দেখি না। আমাদের সঙ্গীতে আজ যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এর সূচনা দিলীপকুমারই করেন। তা ছাড়া সুধী মহলে একটা সংগীত-চেতনা আনবার চেষ্টা তাঁর মত আর ক'জন করেছেন? কম্পোজার হিসাবে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। অতএব আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তবে এইভাবে সুরকার অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন না করে গোটাটাই যদি কাব্যসংগীত-এর পর্যায়ে অমুক অমুকের রচনা বলে প্রচার করা হত—তা হলে সেটাই বোধ হয় সরকারী নিরপেক্ষতার দিক দিয়ে উত্তম হত। অর্থাৎ ঘোষণাটা যদি এমনি হত—"এখন কাব্যসঙ্গীত প্রচার করছেন শ্রী/শ্রীমতী...; রচনা—রবীন্দ্রনাথ / দ্বিজেন্দ্রলাল / অতুলপ্রসাদ ইত্যাদি।" যে ক্ষেত্রে সুরকার ভিন্ন ব্যক্তি সেখানে তাঁর নামও বলা চলত; যেমন—রচনা—অজয় ভট্টাচার্য, সুরকার—হিমাংশুকুমার দত্ত এইভাবে। বিষয়টি আশা করি আকাশবাণী বিবেচনা করে দেখবেন।

রাগ ভিশন্স্ (Raga Visions)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের তরুণ যন্ত্রী-শিষ্য শ্রীমান সুললিত সিংহ কতিপয় রাগসঙ্গীতের অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্র রচনা করেছেন। এই চিত্রগুলি অ্যামেরিকার সানফ্রান্সিসকো থেকে ছাপা হয়েছে। যন্ত্রী তথা চিত্রশিল্পী বলছেন এই চিত্রগুলি অ্যাস্থেটিক, মিস্টিক, স্পিরিচুয়েল, সাইকলজিকেল, সেন্সেডেলিক বা অন্য কোনও প্রকারের হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে রাগসংগীতগুলি সুরিয়েলিস্ট-এর ভিশনে গোচরীভূত হয়েছে। এই মানসলব্ধ অনুভূতিতে যে রাগরূপ ধরা পড়েছে তাকে তিনি কেবলমাত্র বর্ণ এবং প্যাটার্নের মাধ্যমে রূপায়িত বা সিম্বলাইজ করেছেন। এটি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এও এক প্রকার উপলব্ধি যা সুরের স্বপ্নজগতের ছায়াপথে বিবিধ বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টার

গত ১৩ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টার কর্তৃক আয়োজিত লোকসংস্কৃতি সম্পর্কীয় একটি অনুষ্ঠানে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এবং শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ভাষণ প্রদান করেন। লোকসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও তদীয় গোষ্ঠী, শ্রীপূর্ণ দাস বাউল, শ্রীঅমর পাল ও তদীয় গোষ্ঠী, শ্রীবিষ্ণুপদ দাস, শ্রীঅংশুমান রায় এবং গ্রামীণ গীতি সংস্থা। অংশ গ্রহণকারীগণ সকলেই সুবিদিত, সুতরাং এঁদের সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। এঁদের মধ্যে শ্রীঅংশুমান রায় যে গানগুলি গাইলেন তার কয়েকটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব লোকগীতি। রাঢ় অঞ্চলে তিনি বহু বৎসর যাবৎ বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নানান ধরনের লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন। গম্ভীর এবং মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট এই শিল্পীর গানে একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি। আর খুবই ভাল লাগল তরুণ ছাত্রদের লোকসংগীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এবং সমাদর। তাঁদের আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস যথার্থ, সহৃদয় এবং অনুভূতিসঞ্জাত। আমাদের তরুণ সম্প্রদায় যে লোকসংগীতের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল এবং এ সম্পর্কে যে তাঁদের গভীর উৎসাহ রয়েছে, এই কারণে তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। আশা করি এই উৎসাহ তাঁরা যথার্থ সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণায় নিয়োজিত করে যুব সম্প্রদায়ের সম্মুখে উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করবেন। কয়েকজন শ্রোতা বক্তাদের প্রশ্ন করেও আলোচনাকে চিত্তাকর্ষক করেছিলেন।

টপ্পা গায়ক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু)

ইম্ফল থেকে অধ্যাপক শ্রীসত্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে, তাঁর জ্যাঠামশাই ৺জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যার সম্বন্ধে কিছুকাল আগে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়ে গেছে) স্বরচিত সুরে বাংলা টপ্পা এবং উক্ত ঢঙে শ্যামাসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। এই সব গানের অনেকগুলি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়েছে। কালোবাবুর বেশ কয়েকখানি রেকর্ডও ছিল।

শার্ঙ্গদেব

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার বলেন:

"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ঋণ দান নীতির মূল্যায়ন—কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে

যখন চৌদ্দটি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল, তখন সাধারণ মানুষের মনে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আস্থার সূচনা হয়েছিল, এখন তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবসায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আর্থিক চাহিদা মেটাতে সমর্থ ছিল না এবং জাতীয় স্বার্থে ব্যাংকের আর্থিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সদ্ব্যবহার করার পথে বেসরকারী ব্যাংক ব্যবসায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মুখ্যত এই নীতির ভিত্তিতেই ভারতের প্রধান চৌদ্দটি ব্যাংককে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রে যে ব্যাংকিং ব্যবসায় লাভজনকভাবে চলতে পারে না তা নয়। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসের আগে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক ভালভাবেই ব্যাংকিং ব্যবসায় চালিয়েছিল। কিন্তু একথা ঠিক, কিছুদিন আগেও কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানি ক্ষেত্র সাধারণ ব্যাংকগুলির কাছ থেকে কিছুই আর্থিক সাহায্য পায়নি। দুই বছর আগেও কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নে যা কিছু ব্যাংক-ঋণ পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই এসেছে শুধু স্টেট ব্যাংকের কাছ থেকেই। সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি কৃষিক্ষেত্রে উদারহস্তে ঋণ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। এ ধরনের ঋণ দেওয়ার যৌক্তিকতা অথবা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না। তবুও যাঁরা ঋণ গ্রহণ করছেন, তাঁদের আদৌ ঋণ গ্রহণ করার যোগ্যতা (credit_worthiness) আছে কিনা, অর্থাৎ ঋণের টাকা তাঁরা ঠিকভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে পারবেন কিনা এবং সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন কিনা—এই দিকটির বিবেচনা কোন ব্যাংকই উপেক্ষা করতে পারে না। অবশ্য ঋণের জন্য যদি সরকারের দিক থেকে কোন গ্যারান্টি থাকে তবে সে কথা স্বতন্ত্র। কৃষি উন্নয়নে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির অভিজ্ঞতা সব রাজ্যে সমান নয়। পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন ব্যাংকের কাছ থেকে এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে যে, ঋণের টাকা কৃষক কর্তৃক সদ্ব্যবহৃত হয়নি এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া কৃষকদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কৃষি উন্নয়নে ব্যাংকগুলির অর্থসংস্থান সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংক যে নতুন নীতি নির্ধারণ করেছেন তাতে কৃষি-উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থান করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যথা : (১) কৃষিজাত সামগ্রীর গুণগত মান উন্নয়নে, (২) কৃষি-ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকায় উৎপাদনমূলক প্রকল্পে উৎসাহ দান, (৩) উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির প্রয়োগে সাহায্য দান এবং (৪) উদ্বৃত্ত সম্পদ যথোচিতভাবে কাজে লাগান। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি জিনিস ভাববার আছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি-ক্ষেত্রে কৃষকদের যে উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হচ্ছে তার অধিকাংশ যদি সঞ্চয় করে পুনরায় বিনিয়োগ (re-investment) করা যায়, তবে কৃষিক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়বে। সরকার অবশ্য কর ধার্য করে এই উদ্বৃত্ত আয়ের একটি অংশ কেড়ে নিতে পারেন এবং কৃষির উন্নতির জন্য তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাংক-ব্যবস্থার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকগুলি গ্রামবাসীদের সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়াবার কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যদিও পল্লী অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির নতুন নতুন শাখা খোলা হচ্ছে, তবুও আশানুরূপ আমানত বাড়ছে না বলে খবর পাওয়া গেছে। শুধু গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করেই যদি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দায়িত্ব শেষ হয়, তবে তার ফলে দেশের উন্নতি তো কিছুই হবে না, বরং ব্যাংক-গুলির ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে। সেজন্য প্রয়োজন হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হারে আমানত বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তাহলে কৃষকরা নিজেদের আমানত বিভিন্ন লাভজনক উপায়ে বিনিয়োগ করার প্রেরণা পাবেন। তা না হলে উদ্বৃত্ত আয় যদি শুধু ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে অথবা অনুৎপাদনমূলক প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হয়, তবে তা জিনিসপত্রের দামই বাড়াবে, উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে না। গ্রামাঞ্চলে শুধু যে কৃষির উন্নতির জন্যই ব্যাংকগুলি ঋণ দেবে তা নয়—ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির উপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন এবং বহুমুখী গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা বেকার সমস্যার সমাধানে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ; কেননা এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প সর্বদা শ্রম-নিবিড় (labour-

intensive) হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে রিজার্ভ ব্যাংকের এক পর্যবেক্ষক কমিটির সমীক্ষায় বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে সমস্ত ব্যাংকে মোট তিরিশ লক্ষ লোকের চাকরি হতে পারে। ব্যাংক সম্প্রসারণের প্রভাব বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করায় তার ভূমিকার কথাও ভাবতে হবে। এই পর্যবেক্ষক কমিটির রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি ব্যাংক প্রতি বছরে অন্তত পঞ্চাশটি ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে পারে। ব্যাংকগুলি কর্তৃক বিশেষ ঋণদান পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষক কমিটি রিপোর্ট দিয়েছেন। একথা সবাই স্বীকার করবেন, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা যদি সম্প্রসারিত করতে হয়, তবে ঋণ দেওয়ার নিয়মকানুন যথেষ্ট সহজ ও সরল করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে ব্যাংকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দিতে চায়; কেননা, দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ঝুঁকি থাকে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তখনই দেওয়া সম্ভব যখন ব্যাংক ঋণ-গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করার যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ অথবা ঋণের শর্ত হিসাবে শিল্পটির ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকবে অথবা এই ঋণের পিছনে সরকারের দিক থেকে গ্যারান্টি থাকবে। তবে বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করার সময়ে ব্যাংক যে নীতি অনুসরণ করে থাকে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা সম্ভব কিনা তাও বিবেচ্য। ক্ষুদ্র ব্যবসারের ক্ষেত্রে মধ্য-মেয়াদী (medium_term) এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়ার কোন কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যে উৎসাহ দেখাচ্ছে তা কথঞ্চিৎ আশাব্যঞ্জক; আরও কিছু করার নিশ্চয়ই আছে।

রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা

ভারত সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রসারিত করার চেষ্টা শুরু করেছেন। সম্প্রতি ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে যে নতুন পাঁচসালা চুক্তি হয়েছে তাতে রাশিয়ায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ১১ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকবে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে—এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আশানুরূপ সম্প্রসারিত হচ্ছে না। মধ্য-প্রাচ্যেও ভারতীয় পণ্য রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ বাড়ছে না। এ বিষয়ে ভারত সরকারের প্রচেষ্টা আরও ফলপ্রসূ করার জন্য রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর মান উন্নয়ন এবং ব্যয় হ্রাসের দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত। এখানে উল্লেখযোগ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী উন্নতিকামী দেশ-গুলি যে সকল কৃষিজাত সামগ্রী আমদানি করবে তার দাম মার্কিন ডলারেই দিতে হবে—সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রায় নয়। ভারতের ক্ষেত্রে পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্য-সামগ্রী আমদানি হয়ত বর্তমান বছরের শেষে বন্ধ হবে। কিন্তু এই চুক্তি অনুযায়ী যদি অন্য কোন সামগ্রী ভারতকে আমদানি করতে হয় অথবা এই চুক্তির বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন, পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকেই যদি অন্য কোন প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করতে হয় তবে তার দাম দেওয়ার জন্য যতটা বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের তহবিলে থাকা দরকার, ততটা নেই। রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার জন্যও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম অথবা কাঁচামাল আমদানি করার প্রয়োজন হয় এবং সেজন্য বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়ানো দরকার। শুধু বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করে রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রতি আরও যত্নবান হলে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যদিও রপ্তানি সম্প্রসারণের চেষ্টা যথেষ্ট চলছে, তবুও শতকরা সাত ভাগ হারে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। বিদেশে ভারতীয় জিনিসের কদর বাড়াবার জন্য ভারতের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশ-গুলি আজ যতটা প্রচার চালাচ্ছে, আমাদের বৈদেশিক দূতাবাসগুলি যে সে পর্যায়ে প্রচার চালাচ্ছেন না, এ-বিষয়ে বহু প্রবাসী ভারতীয়রা একমত।

সুব্রত গুপ্ত

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নয়

কি রোজ-নীল ঘরখানা সুন্দর। চারদিকে সাজানো তিব্বতী তান্‌খা, ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শন, মুঘল আর রাজপুত চিত্রকলা। বই-এর তাকে শিল্প সম্বন্ধে নানা আলেখ্যকুণ্ডিকা। কুঞ্জদার পরদা আর পরিপাটি পরিবেশ। অপেক্ষা করতে করতেই মনে হচ্ছিল গৃহকর্ত্রী নিশ্চয়ই সৌন্দর্যরসিক। ক'দিন ধরে সংবাদপত্রে শকুন্তলা মাসানিকে নিয়ে নানা মন্তব্যে তাঁর এদিকটার কথা মনেই হয়নি। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত মাসানির ঘরণী জগজীবন রাম কংগ্রেসের বাম মনোভাবাপন্ন লোকসভা প্রার্থী শ্রীমতী সুভদ্রা যোশীর জন্য জনসমর্থন সংগ্রহ করছেন, এ খবরটি ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজওয়ালাদের কানাকানির অন্ত নেই। তার উপর আবার নবেম্বর মাসে শকুন্তলার একমাত্র সন্তান জারির মাসানি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে ঐ কংগ্রেসের কর্মী হয়েছেন। কাজেই কেউ বা বলেন ছেলের প্রভাবে মা প্রভাবিত হয়েছেন। শকুন্তলা মাসানি কিন্তু নিজে তা একেবারেই স্বীকার করেন না। বলেন আচার্য বিনোবা ভাবে আর জয়প্রকাশ নারায়ণ যে কথা বলেছেন তিনি সেই মতে পথিক। পার্টির চেয়ে প্রার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে তিনি বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত সমর্থনেও আজ তারই জন্য উৎসুক হয়ে আছে। রাজনৈতিক দলগুলির ম্যানিফেস্টো বা প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা পড়ে দেখলে মনে হয় কে কাকে টেক্কা দেবে তার পাল্লা চলেছে জোর কদমে। সাধারণ মানুষ এখন চায় ঘোষণার প্রতি অকৃত্রিম, ছলনাহীন আন্তরিকতা। সম্পাদনার সম্ভাবনা তাদের আকৃষ্ট করে।

শকুন্তলা মাসানি

শকুন্তলা মাসানির স্বামীর রাজনৈতিক দলের এলাকার বাইরে প্রচার করার কথা নিয়ে আমার আগ্রহ অনেকের চেয়ে কমই ছিল। একই পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ এবং বেশ তীব্র মতবাদ বহু দেশের রাজনীতিতে এসেছে গিয়েছে। আমাদের এবারকার এই নির্বাচনেও শ্বশুর পুত্রবধূ, দুই ভগ্নী ইত্যাদির দ্বন্দ্বের খবর কানে এসেছে। আমার ঔৎসুক্য ছিল অন্যত্র। মহিলা হিসাবে, সহধর্মিণী রূপে, স্বামীর সংসারের কর্ত্রী হিসাবে এ মতদ্বৈধতা তাঁর কেমন লাগছে? নারী স্বাধীনতার শিখরের লক্ষণ নয় কি এ ব্যাপার?

ঠিক বলেছেন। হাসি মুখেই বললেন শ্রীমতী মাসানি। স্বামী তাঁকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন আপন মতবাদ পোষণ করতে। উত্তর প্রদেশের খ্যাতিমান রক্ষণশীল সম্পন্ন সংসারের কন্যা যেদিন ভরথুস্ত্রপন্থী পারসীক পরিবারের যুবককে বিবাহ করেন, সেদিনই তাঁর স্বাধীন মনের প্রথম পদক্ষেপ হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বড়লাট সাহেবের দক্ষিণ হস্ত। তবু স্যার জওয়ালা প্রসাদ শ্রীবাস্তবের গৃহিণী জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব এড়াতে পারেননি। তিনি প্রথম রাজনীতিতে নেমেছিলেন বহু যুগ আগে।

লক্ষ লক্ষ গৃহিণীরা

পোস্টম্যান খাঁটি তেলে যাবতীয় মুখরোচক রান্নাবান্না করছেন বাড়তি পুষ্টির জন্যে

৪০ বছর যাবৎ তাঁরা তাই করছেন—
কারণ পোস্টম্যান হচ্ছেঃ

● স্ফটিকের মত স্বচ্ছ গন্ধবিহীন, ১০০% পরিশুদ্ধ বাদাম তেল ● হাইড্রোজেন মিশিয়ে ঘন করা নয়
● ভিটামিন এ ও ডি যুক্ত ● সস্তা পড়ে—রান্নার পর তেল বেঁচে গেলে আবার ব্যবহার করা যায়।

উৎকর্ষের প্রতীকস্বরূপ পোস্টম্যান-এ থাকে সরকারী আগমার্ক ছাপ।

স্বাস্থ্য-স্বাদ-সাশ্রয়ের খাতিরে এটিকে আপনার রান্নার একমাত্র মাধ্যম ক'রে নিন!

আহমেদ মিলস
বোম্বাই ৮

পোস্টম্যান: ভারতের বিশ্বস্ত সর্বাধিক-কাটতি রান্নার তেল

সেই মায়ের প্রভাবও কম ছিল না। স্বাধীন-ভাবে নিজের বিচারবুদ্ধি চালনা করতে প্রেরণা হয়তো মা-ই দিয়েছিলেন।

শ্রীমতী মাসানি ইংরাজী সাহিত্যের এম-এ। ছবি আঁকতে ভালবাসেন। ছোটদের জন্য বই লিখেছেন অনেক। বেশীর ভাগই জীবনী। জওহরলালের জীবনী তার মধ্যে একটি। এক সময় ভাল নাচতে পারতেন। রাজনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেননি এতদিন। শিল্প ছিল প্রথম অবলম্বন। তা ভিন্ন চাকরি করেন তিনি এক ট্রাভেল এজেন্সি বা, পর্যটন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানে। তাতেও দিনের অনেকটা সময় কেটে যায়। এ নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। তিনি বিশ্বাস করেন, এ নির্বাচনের উপর নির্ভর করছে সারা দেশের ভবিষ্যৎ। নির্বাচনের ফল হয় দেশকে নিয়ে যাবে অগ্রগতির পানে অথবা নামিয়ে দেবে অধঃপতনের গভীরে। অরাজকতার আর শৃঙ্খলাহীনতার সম্ভাবনাও কম নয়। একমাত্র প্রকৃত সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ রোধ রাখতে পারে সাধারণকে আশায় ও সম্ভাবনাময় উত্তরকালের প্রতীক্ষায়।

শকুন্তলা মাসানির রাজনীতির আদর্শ-বিন্দুর যাই হোক বিশ্লেষণে ভিতু নন। আমাদের মেয়েরা রাজনীতি ও সংসারকে এমন করে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারেন যদি দ্বন্দ্ব হয় না। ভোটদানের ব্যাপারেও মেয়েরা নাকি পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত হন, একথা অনেকবার শুনেছি। কাজেই বিচার করবার মত স্বাধীন স্বচ্ছ মন নারী প্রগতির বিশেষ এক অধ্যায়।

রোগাতঙ্ক

শুনেছিলাম স্যার কৈলাস বোসের কথা। সেকালে গো-বীজের টিকা নিতে আপত্তি করতেন অনেকে। শীতলা মায়ের চন্দন বলে চালিয়ে তিনি গো-বীজের টিকা ব্যাপক-ভাবে দেওয়াতে পেরেছিলেন। দারুণ বসন্ত রোগের প্রতীকার করতে এটুকু ছলনা বিন্দুমাত্র দোষের ছিল না। কিন্তু রোগীর মন ঠান্ডা করতে অল্প বিস্তর ছলনা চিকিৎসককে বহু সময় করতে হয়। অল্প শিক্ষিত পল্লীবাসী নাকি কোথাও কোথাও গরম ইনজেকশন চান। গরম হলে নাকি ফল হবে তাড়াতাড়ি। ইনজেকশন দেবার পর খুব ভালরকম প্রতিক্রিয়া না হলে অনেক রোগী খুশী হন না।

রোগী মাত্র নয়। রোগীর আত্মীয়-স্বজনও ডাক্তারকে ছলনার আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। ছোট শিশুর কিছু হলে মা অস্থির হয়ে ওঠেন। ডাক্তার তখন নিরুপায় হয়ে ঘন্টায় ঘন্টায় দেবার মত ওষুধের পুরিয়ার ব্যবস্থা করেন। মা ব্যস্ত থাকলে মাথা ঘামাবেন কম। শিশুর হয়তো ওষুধের প্রয়োজনই নেই। সেরে ওঠার সময়টুকু মাত্র দরকার।

ডাক্তার চট করে অজ্ঞতা স্বীকার করেন না। করতে চানও না। আবার অজ্ঞতা স্বীকার করলে রোগী বিশ্বাস হারাতে পারে। কাজেই রোগে উতলা না হয়ে ডাক্তারের সহযোগীতা করুন। প্রয়োজন হলে যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতান্ত প্রয়োজন, তেমনই অকারণ আতঙ্কে ডাক্তার-বদ্যি নিয়ে হইচই করায় ক্ষতিও হতে পারে। রোগাতঙ্কও সাংঘাতিক ব্যারাম। এমনও দেখেছি, রোগ ভয়ে সুস্থ মানুষ জবুথবু। সকাল থেকে সন্ধ্যা সবরকম সাংঘাতিক

ভোটরঙ্গ নিয়ে ঠাট্টা তামাশা সব দেশে সব কালে হয়। সম্পূর্ণ কল্পনাভিত্তিক কৌতুকও কত সময় জমে ওঠে। এরকম একটি কৌতুক শুনেছিলাম একবার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি সাহেব ছিলেন ক্যাথলিক। যা হোক একবার এক প্রোটেস্ট্যান্ট মার্কিন মহাশয় বললেন, হয়তো কোনদিন শুনবো এক মহিলাই হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। শুনে কেনেডি বললেন, কখনই তা হবে না। ভাবনার কিছু নেই।

কেন?

আমেরিকায় নাকি প্রেসিডেন্ট হতে হলে বয়স হওয়া দরকার অন্তত পঁয়ত্রিশ। কোনও আমেরিকান মেয়ে পঁয়ত্রিশ বা তার ওদিকে যেতে রাজী নয়।

রোগের স্পষ্ট লক্ষণ তিনি নিজের শরীরে দেখেন। মায়েদের বেলায় শিশুর উপর সেই রোগাতঙ্কের ক্রিয়াও সমান ভয়াবহ।

টুকিটাকি

পুর, অর্থাৎ সিঙাড়া, কচুরি ইত্যাদির ভিতরে যা পোরা হয়, ভাজবার সময় একটু বেড়ে যায়। কাজেই পুর ভালভাবে দেওয়া দরকার কিন্তু অতিরিক্ত দিলে ফেটে বেরিয়ে যেতে পারে। মুরগীর রোস্টে পুর দেওয়া যাঁরা পছন্দ করেন তাঁরাও যেন পুর সাবধানে দেন।

ফেটানো ডিম দিয়ে ফুলো ফুলো ডিমের অমলেট প্লেটে পরিবেশন করলে চুপসে যেতে চায়। সামান্য গুঁড়ো চিনি ও কর্ণ ফ্লাওয়ার ডিমের কুসুমে মেখে নিয়ে তবে ফেটানো সাদা অংশে মিশিয়ে নেবেন এবং একটু বেশী ঘিতে ভাজবেন। ঐ অমলেট অনেকক্ষণ ফুলো থাকবে।

সাড়ে সতেরো গ্রাম জলে তিরিশ গ্রাম অ্যাসেটিক অ্যাসিড মেশালে রাসায়নিক সিরকা বা ভিনিগার হয়। কোন কাপড়ের রং কাঁচা মনে হলে ঐ ভিনিগার একটু জলে মিশিয়ে কাপড় কাচবেন।

সাধারণ জলের চেয়ে সামান্য লবণাক্ত জল তাড়াতাড়ি ফোটে। কাজেই তাড়া-হুড়োর সময় জলে কিছু সিদ্ধ করতে একটু নুন দেবেন।

ভাতের জলে লবণ মেশালে ভাত সুস্বাদু হয়। ভাতের ফ্যান গেলে এক চামচ ঘি হাঁড়িতে দিলে ভাত খুব উপাদেয় ঠেকবে।

সম্ভব হলে আলুর খোসা না ফেলে রান্না করবেন। খোসার ঠিক তলায় থাকে আলুর শ্রেষ্ঠ খাদ্যগুণ। নতুন আলু হলে তো খোসা ফেলার [illegible] নেই। যদি পুরোন ও মোটা হয়, তাঁরা খোসাও ছাড়িয়ে ব্যবহার করেন, তবে ঐ খোসা সুদ্ধ ব্যবহার করতে পারেন। সমান করে কেটে গরম ঘি বা তেলে মুচমুচে করে ভেজে পরিবেশন করতেও পারেন।

শ্রীমতী

দরবার নটী কলাবন্ত

'দরবার নটী কলাবন্ত' পর্যায়ে ২৬-৮-৭৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'তানসেন মেহের উন্নিসা সমাচার' নামে নিবন্ধটি সম্পর্কে দুটি প্রতিবাদপত্র মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম পত্রলেখক শ্রীঅসিত-কুমার দলুই আকবরকে 'মহান সম্রাট', 'মহামতি আকবর', 'বিবেকহীন উচ্চাশা আর কুটিল নৃশংসতা আকবরের মধ্যে মোটেই দেখা যায়নি' ইত্যাদি প্রশস্তি নিবেদন করেছেন ভিনসেন্ট স্মিথ উদ্ধৃত করে। কিন্তু পত্রলেখক ভিনসেন্ট স্মিথেরই নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি কি লক্ষ্য করেননি?—

'In reality a more aggressive king never existed. The ruling passion of Akbar was ambition. His whole reign was dedicated to conquest. His attacks were aimed at destroying the independence of every state . . . The people of Gondwana were happier under Rani Durgavati than under Asif Khan' (Akbar's General).

'Akbar's annexations were result of ordinary kingly ambition supported by adequate power. The attack, devoid of moral justification, on the excellent government of Rani Durgavati was made on the principle which determined the subsequent annexations of Kashmir, Ahmednagar and other kingdoms. Akbar felt no scrupples about initiating a war, and once he had begun a quarrel he hit hard and without mercy.' (Akbar the Great Mogul, p. 251).

ভারতবর্ষে আকবরের এই নীতিহীন রাজ্যগ্রাসের কারণও ভিনসেন্ট স্মিথের অপর একটি উক্তি থেকে সুপ্রকাশ:

'Akbar was a foreigner in India. He had not a drop of Indian blood in his vains. He was a direct descendant in the Seventh generation from Tamerlain (on his father's side). He was descended through Babar's mother, the daughter of Yunus Khan, Grand Khan of the Moguls, from Chazatai, the second son of Chingiz Khan, the Mongol scourge of Asia in the 13th century . . . . His mother was a Persian.' (Ibid).

পত্রলেখক শ্রীদলুই আকবরের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও যে সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তার কারণ মামুলি 'ইতিহাসের' প্রতি তাঁর সরল বিশ্বাস। স্কুল-পাঠ্য থেকে আরম্ভ করে প্রচলিত তাবৎ ইতিহাসই আকবরকে এক আদর্শ ও অসাধারণ চরিত্রবান নৃপতিরূপে চিত্রিত করে রেখেছে—প্রধানত আবুল ফজলের গ্রন্থকে আকর হিসাবে ব্যবহারের ফলে।

'The leading authority for the narrative of events in Akbar's reign is the Akbarnama written by Abul Fazl in obedience to an imperial

order and partly revised by Akbar himself' (Ain, vol. iii, p. 414) আকবর সম্পর্কিত আবুল ফজলের বিবৃতি সর্বথা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ তা পক্ষপাতদুষ্ট ও অ-নিরপেক্ষ। নিঃসম্বল, ভাগ্যান্বেষী আবুল ফজল আকবরের স্তুতি, তোষামোদ ও মনোরঞ্জন করে চার হাজারী মনসবদার এবং প্রচুর ভোগ বিলাসের অধিকারী হয়েছিলেন। উপরন্তু আকবর স্বয়ং 'আকবরনামা' সংশোধন অর্থাৎ আপন মনোমত করার জন্যেই গ্রন্থটি অপক্ষপাত ইতিহাসরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। ভিনসেন্ট স্মিথ যথার্থই বলেছেন,

'When Badani describes' Abul Fazl as being 'officious, time serving, openly faithless, continually studying the emperor's whims, a flatterer beyond all bounds', the language may be censured for its obvious malice, but I do not think it is far from the truth . . . . the author of Akbarnama & Ain-I Akbari was a consummate & shameless flatterer. Both works were conceived & executed as monuments to the glory of their writer's master. Almost all matters considered detrimental to Akbar's renown are suppressed, glossed over, or occasionally even 'falsified . . . . his books are one sided panegyrics & must be treated as such by a critical historian.' (Akbar the great Moghul, p 308-309).

'Abul Fazl has far too often been

(সি ৮৯৪৬)

accused by European authors of glattery & even wilful concealment of facts damaging to the reputation of his master ?' (Preface, Ain-I-Akbari. Vol. III. Translated by H. Blochman).

সুতরাং সমালোচকের সজাগ দৃষ্টি নিয়ে আবুল ফজল এবং নিজামুদ্দিন, বদায়ুনি প্রমুখ ও ইউরোপীয় লেখকদের সংগৃহীত তথ্যাবলী থেকে আকবর চরিত্রের মূল্যায়ন প্রয়োজন। নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে তাঁদের বিবৃতির মধ্যে থেকে সত্য উদ্ধার করতে হবে। আকবরের নৈতিক চরিত্র যে কতদূর কলঙ্কিত ও অধঃপতিত ছিল, সমসাময়িক মুসলমান ও ইউরোপীয়-লেখকদের বিবরণে তার নানা দৃষ্টান্ত প্রকট। তার কয়েকটি মাত্র এখানে উধৃত করা হল।

'It was at that place (Mathura) that His Majesty's intention of commeeting himself by marriage (sic) with the nobles of Delhi was just broached & qawals & eunuchs were sent into the harems for the purpose of selecting daughters of the nobles & investigating their conditions. And a great terror fell upon the city. Abdul Wasi's was a wonderfully beautiful & charming wife without a peer. One day the eyes of the emperor fell upon her. It is a law of the Mogul emperors that if the emperor cast his eyes with desire on any woman, the husband is bound to divorce her & the virtuous lady entered the imperial harem'. (P. 59, 60, vol. II, Muntakhabut Tawarikh by Abdul Qadir Badaoni).

আকবর যেসব পররাজ্য বলে, ছলে গ্রাস করতেন, তাদের পর্যুদস্ত রাজাদের ওপর আরোপিত শর্তাদির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল নারী উপঢৌকন। এই উপায়ে 'Akbar had introduced a whole host of the daughters of eminent Hindu Rajahs into his harem. (P. 12 Vol. II, Badion's Chronicle).

আকবরের হারেমে যে পাঁচ হাজারেরও অধিক রমণী জমায়েৎ রাখা ছিল, তা আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে জানা যায়:

'His Majesty has made a large enclosure with fine buildings inside, where he reposes. Though there are more than 5000 women he has given to each a separate apartment'. (Ain-I Akbari, Ain 15) এই উক্তির মধ্যে শুধু একটি অসত্য ঢাকা আছে। প্রত্যেক বন্দিনীকে যদি swite বা flat না দিয়ে একটিমাত্র কক্ষও দেওয়া থাকে বলা হয়, তাহলেও আবুল ফজলের এই বিবৃতি নিছক মিথ্যা। কারণ ৫০০০ কক্ষ সমন্বিত আকবরের কোন প্রাসাদ চত্বর ভারতের কোথাও দেখা যায়নি। আসলে এই হতভাগিনীদের বাদশাহ' অস্বাভাবিক কামাগ্নিতে ইন্ধন জোগাবার

অন্যো মনুষ্যেতর জীবদের তুল্য করাক্লেশে দিন যাপন করতে হয়।

আকবরের পরস্ত্রী-লোলুপতার এক জঘন্য উদাহরণ হল নো-রোজা উৎসবের মিনাবাজার। কর্নেল টড বিবৃত করেছেন, "The Noroza or 'New Year's Day' is not New Year's Day but a festival especially instituted by Akbar, and to which he gave the epithet Khusroz, a day of pleasure, held on the 9th day (Noroza), following the chief festival of each month. The Khusroz was chiefly marked by a fair within the precincts of the court, attended only by females. The merchants wives exposed the manufactures of every clime and the ladies of the court were the purchasers. His majesty is also there in disguise ...... These ninth day fairs are the markets in which Rajput honour was bartered and to which brave Prithviraj makes allusion (in the poem that he composed and is alleged to have sent to rekindle Rana Pratap's flagging spirit of dogged resistance to Akbar's aggressive onslaughts)... There is not a shadow of doubt that many of the nobblest of the race (of Rajputs) were dishonoured on the No-roza, and the chivalrous Prithviraj was only preserved from being of the number by the high courage and virtue of his wife, a princess of Mewar and a daughter of the founder of the Suktawats. On one of these celebrations of the Khusroz the monarch of the Moguls was struck with the beauty of the daughter of Mewar and he singled her out from amidst the united fair of Hind as the object of his passion....On retiring from the fair she found herself entangled amidst the labyrinth of apartments by which egress was purposely ordained, when Akbar stood before her. But instead of acquiescence, she drew a poinard from her corset and held it to his breast, dictating and making him repeat the oath of renunciation of the infamy to all her race. Rae Singh, the elder brother of the princely bard had not been so fortunate. His wife wanted either courage or virtue to withstand the regal tempter, and she returned to their dwelling in the desert despoiled of her chastity but loaded with jewels....(Pp. 274-275. Annals and Antiquities of Rajasthan by Lt. Col. James Tod, 1957, Reprint).

আশা করি, পত্রলেখক শ্রীঅসিতকুমার দোলুই 'ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে' অনুসন্ধান করে দেখবেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন চরিত্রের নজির আর কজন দেখা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পত্রলেখক শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উল্লেখ করা ঐতি-

হাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে যে তিনটিকে 'ভ্রমাত্মক' বলেছেন, প্রথমে তার উত্তর দিই, যদিও এই তিনটি প্রসঙ্গই গুরুত্বহীন। (১) ১৫৬৯ সালে ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের রাজধানী স্থানান্তরের কথা আমারও অজানা নয়। কিন্তু ১৫৬০ সালে সেখানে প্রথম তা স্থানান্তরিত হবার কথা লিখেছি এ কথাই জানাবার জন্যে যে উক্ত নগরী আকবরের নির্মিত নয়। তাঁর সমগ্র দরবার, বিশাল হারেম, সেপাই সান্ত্রী রক্ষী বাহিনী, কোষাগার, এক হাজার হস্তী অশ্বাদির পশুশালা ইত্যাদি সমেত আকবরের ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থান করতে যাওয়াকে রাজধানী স্থানান্তর বলা কি এমন ভুল?

(২) 'The next two histories of high value are the works by Nizamuddin and Badaoni, both of whom were in Akbar's service.' (Vincent Smith, Akbar the Great Mogul, p. 6.) বদায়ুনী দীর্ঘকাল দরবারে অবস্থান করে ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন এবং তিনি আকবরের বেতনভোগী। এজন্য তাঁকে সাধারণভাবে দরবারী লেখক বলেছি। বদায়ুনী যে আকবরের কঠোর সমালোচক

ছিলেন সে কারণেই আকবর সম্পর্কে কিছু যথার্থ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। শুধু স্তাবকের প্রশস্তির ওপর আকবরের ভাবমূর্তি সৃজন করতে গেলে বিষম ভ্রমে পতিত হতে হবে এবং তা ইতিহাস চর্চাও হবে না। (৩) মুবারক নামে পাঠান যে ব্যক্তিগত আক্রোশে বেহরম খাঁর হত্যাকারী হয়েছিল, আকবরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট সরকারী বিবরণ এই-ভাবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে কার্য কারণ সূত্র ও ঘটনা পরম্পরা সমগ্রভাবে বিচার্য। মুবারক খাঁর পিতা মাছিওয়ারার যুদ্ধে নিহত হয় ১৫৫৫ সালে, যখন বেহরাম খাঁ ছিলেন সেনানায়ক। তার দীর্ঘ ছ বছর পরে (১৫৬১, জানুয়ারি) বেহরম খাঁর হত্যা-কাণ্ড ঘটে। দূরে গুজরাটের সিদ্ধপুর পত্তনে বেহরমকে যখন হত্যা করা হয়, তখন রীতিমত রক্ষীদল ছিল তাঁর সঙ্গে। পশ্চাতে সংগঠিত গভীর ষড়যন্ত্র ও লোকবল না থাকলে মুবারক খাঁর পক্ষে বেহরমকে নিহত করা অসম্ভব হত। এই ঘটনার সঙ্গে নিম্ন-লিখিত সূত্রগুলি সংযোজ্য : ১৫৫৭ সাল থেকে বেহরম খাঁকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে কয়েক বার হত্যা করবার প্রচেষ্টা হয় তাঁর শিবিরে হস্তী প্রবেশ করিয়ে;

'When Akbar had entered on his 18th year (1560) .... he desired to be a king in facts as well as in name....Akbar was annoyed.... inasmuch as he had no privy purse' (Akbar the Great Mogul, P. 43); বেহরম খাঁর হত্যায় ভিনসেন্ট স্মিথের বক্তব্য : 'Akbar shook off the tutelege of Behram Khan' (Ibid. p. 48); বেহরম নিহত হবার পরই তাঁর পত্নী সলিমা বেগমকে আকবরের হারেমে আনা হয় ইত্যাদি। এই সমগ্র পটভূমিতে বেহরম খাঁর হত্যাকাণ্ডের বিষয়টিকে খোলা মন নিয়ে বিচার বিবেচনা করলে বোঝা যায় মুবারক খাঁ নিযুক্ত ঘাতক মাত্র। এ ধরনের অপকীর্তি আকবরের আরো আছে—যথা ঘাতক সাহায্যে পিতৃব্য পুত্রের হত্যাসাধন। মুবারক যে আকবরের নিয়োজিত ছিল, একথা বাদশার মনস্তুষ্টির জন্যে রচিত 'আইন-ই-আকবরী' কিংবা 'আকবর নামা'য় লিপিবদ্ধ থাকবার কথা নয়।

উক্ত পত্রলেখক শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের আমার প্রতি কথিত 'অভিযোগ ('আকবরের চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস তা স্বীকার করে না') খণ্ডিত করবার পক্ষে ভিনসেন্ট স্মিথ, বদায়ুনী প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতিগুলি যথেষ্ট মনে করি। আকবরের কলঙ্ককথা যদি স্মিথ সাহেবের বিবরণে প্রকাশ পায়, তা হলেই তিনি 'মহান মোগল সম্রাটের প্রতি সুবিচার করেননি'—এ মনোভাব 'তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস'-সেবকের উপযুক্ত নয়। সমসাময়িক কালে রচিত যে আকার গ্রন্থাদির প্রতি নির্বিচারে নির্ভর করে বিচারহীন বিশ্বাসে 'মহান মোগল সম্রাটের' চরিত্র কল্পিত হয়েছে তার মধ্যে নানা মিথ্যা বিবৃতি ও বৃত্তান্ত আছে* শুধু আকবরের বিষয়ে নয়, মধ্যযুগের আরো কয়েকজন সুলতান সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। মধ্যযুগীয় মুসলিম ইতিবৃত্ত লেখকদের রচিত এবং তাঁর পর্যালোচনায় অষ্ট খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক স্যার এইচ এম এলিয়ট ওই আমলের ভারতীয় ইতিহাসকে 'impudent and interested fraud'

বলেছেন, সেকথা ইতিহাসের ছাত্রদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

তানসেন-মেহের উন্নিসা প্রসঙ্গের উৎস সম্বন্ধে যে তথ্য উপস্থাপিত করেছি, শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তা খুব উৎসাহোদ্দীপক' মনে হয়নি। কোন বিষয়ে উৎসাহ জাগা না-জাগা নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রবণতা ও মানসিক সজীবতার ওপর নির্ভরশীল। সে বিষয়ে বলবার কিছু নেই। তবে সমসাময়িক ইতিবৃত্তে উল্লেখিত হয়নি এই মামুলি অজুহাতে আলোচনা এড়িয়ে না গিয়ে বিপক্ষেও তিনি মতামত প্রকাশ করতে পারতেন সুযুক্তিযুক্তভাবে। সমকালীন কোন রচনায় যে উক্ত প্রসঙ্গটির উল্লেখ নেই সেকথা তো আমিই বলেছি। কিন্তু তানসেনেরই অন্যতম পুত্র বংশে এবং মাতুল বংশে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত এই প্রসঙ্গের মধ্যে অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য ও অসম্ভবতা কিছু আছে কিনা এ কথাই বিবেচ্য। সমসাময়িক ইতিবৃত্তে কি যাবতীয় ব্যক্তির তাবৎ জীবন প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়? তানসেনের কোন জীবনী কি তাঁর কালে লিখিত হয়েছিল যে, এটি তার মধ্যে পাওয়া যায় না বলে এর সত্যতাকে এক কথায় নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে? বাংলার কোন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত, তাম্রশাসন কিংবা লেখমালায় একদা-প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার উল্লেখ নেই। অতএব বাংলায় কৌলিন্য প্রথা ছিল না? অপরপক্ষে সমকালীন ইতিবৃত্তে লিখিত হলেই যে তা ধ্রুবসত্য হয় না তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তো স্বয়ং আবুল ফজলের বিবরণ! তিনি লিখেছেন যে, আকবর কড়াই রাগটিকে সুখরাই নামে পরিবর্তিত করেন। কথাটি আদৌ সত্য নয়, কারণ আকবরের পূর্ব থেকেই সুখরাই প্রচলিত ছিল। আকবরের ৫০০০ অ্যাপার্টমেন্ট সম্বলিত জেনানা-মহলের অস্তিত্ব আবুল ফজলের উর্বর মস্তিষ্কেই ছিল, বাস্তব জগতে নয়। আকবর সম্বন্ধে সমসাময়িক আবুল ফজলের নিম্নলিখিত উক্তিও কি ঐতিহাসিক সত্য?- **'His majesty has made several inventions which have astonished the whole world,' 'His majesty has composed more than 200 tunes,' 'His majesty has such a knowledge of the science of music as trained musicians did not posses,'** ইত্যাদি উচ্ছ্বাসকে অলীক স্তুতিরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। সঙ্গীতে আকবরের বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা ছিল কিনা এ সম্পর্কে সমসাময়িক ইতিবৃত্তের সাহায্যে আলোচনা করব পরবর্তী একটি অধ্যায়ে। বর্তমানে স্থানাভাব। ইতি—

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

গত ৩০-১-৭০ তারিখের দেশ এ প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর একটি পত্রালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনাটি মূলত 'দরবার নর্তকী কলাবন্ত'র লেখক শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের তানসেন সম্পর্কীয় নতুন তথ্য 'মেহেরুন্নিসা' সমাচারকে স্বাগত জানিয়ে লেখা। কিন্তু এই পত্রের এক জায়গায় তিনি তাজ খাঁকে তানসেনের পুত্রবংশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বিভিন্ন পুস্তকাদিতে তানসেনের যে বংশতালিকা এ যাবৎকাল প্রকাশিত হয়েছে, তার কোথাও তাজ খাঁর নাম পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর ন্যায় বহুদর্শী পণ্ডিতের প্রতি আমি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ভবিষ্যতে তাজ খাঁকে কীভাবে তানসেনের পুত্রবংশীয় বলে গণ্য করা হয় জানান। প্রশ্নটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আশা করি শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী স্বীকার করবেন।

কমলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
কলিকাতা—৮

ভ্রম সংশোধন

২০ ফেব্রুয়ারি তারিখের "দেশ" পত্রিকায় "ভক্তীয় সংগীত সংহতি সম্মেলন" রচনাটিতে সারেগা সংগীত সংসদ আয়োজিত ওই সম্মেলনের রবীন্দ্র অধিবেশন দিবসের শিল্পী তালিকায় ভ্রমবশত ঋতু গুহের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। এবং অনবধানবশত ওই অধিবেশনে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে সুচিন্তিত মনোজ্ঞ ভাষণটির কথা উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য আমি দুঃখিত।

নন্দনবিহারী

পূর্ব বাংলার পত্রিকা

পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি টাটকা সাহিত্য পত্রিকা হাতে এলো। কণ্ঠস্বর, শিল্পকলা ও সাম্প্রতিক এবং অন্বেষা। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ছাপা, কাগজও ভালো মানের। হাতে নিলে পাতা ওল্টাতে ইচ্ছে করে, কোনো রচনার দু-এক লাইনে চোখ বুলোলেই শেষ করার ইচ্ছে জাগে। অর্থাৎ বেশ যত্ন করে এই পত্রিকাগুলো প্রকাশ করা হয়।

প্রথমেই পত্রিকার অবয়বের কথা বললুম এই কারণে যে, লিটল ম্যাগাজিনের মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জার একটা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষে সস্তা ছাপাখানা ও অনভিজ্ঞ কম্পোজিটরের খোঁজ করতেই হয়, কারণ ফান্ড কম, কিন্তু কল্পনাশক্তিতে ঘাটতি পড়ার তো কোনো কারণ নেই। এবং যে পত্রিকা বিক্রী বাড়াবার জন্য ব্যাকুল নয়, নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ সেই পত্রিকাতেই সবচেয়ে বেশী।

পত্রিকাগুলিতে আর একটা ভালো ব্যাপার নজরে পড়ে। সাহিত্যের মধ্যে গোষ্ঠী পাকাবার চেষ্টা নেই, কারুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার কিংবা এই দশক ঐ দশকের ভাগাভাগির ঝগড়া নেই। সুস্থ সাহিত্যবোধের পরিচয় সর্বত্র।

সাম্প্রতিক এর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ও সিকান্দার আবদুল হক। বর্তমান সংখ্যাটি ভাষা আন্দোলনের মহান দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শহীদদের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠাভাস নামে প্রবন্ধ লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রবন্ধটি বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও যথার্থ আধুনিক কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব কতখানি, লেখক তাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু'রকম আচ্ছন্নতা আমাদের পেয়ে বসেছে। একটি ভক্তির অন্ধ উচ্ছ্বাস, অপরটি বিদ্বেষের বিষ। লক্ষণীয় কথা এই যে, এই দিকদুটির কোনোটিই সাহিত্যিক কারণে জন্মগ্রহণ করেনি, বরঞ্চ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে জাত।" কথাটা ঠিক, রাজনৈতিক বিচারের সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে, প্রবন্ধ লেখক প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ বা প্রথম গদ্যকবিতা রচনার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথকে দিতে চাননি। ঐ দুটি কৃতিত্বই দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। বঙ্কিমের নিবন্ধ এবং "গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক" নামে কবিতার বই। এছাড়া কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শামসুর রহমান, আবু কায়সার প্রভৃতি। গ্রন্থ সমালোচনাগুলিও সুলিখিত।

কণ্ঠস্বর-এর সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এতে আছে জিন্দের সাহিত্য প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ অনূদিত হয়েছে, রিলকে সম্পর্কেও একটি বড় প্রবন্ধ। দুটি কবিতা লিখেছেন আবুল হাসান এবং মহাদেব সাহা। তিনটি গল্প লিখেছেন রশিদউল্লা আলম, শাহনাজ খান এবং শেখ আতাউর রহমান। গল্পগুলির সংবাদ আমাদের কাছে বেশ নতুন রকমের লাগবে।

শিল্পকলার সম্পাদনা করেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবদুল সেলিম। এর বিষয় বিন্যাসটি চমৎকার। শিল্পের অন্যান্য

শ্যাখার সঙ্গে সাহিত্যের কিরকম সম্পর্ক—তাই নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ। যেমন সাহিত্য ও ইতিহাস, সাহিত্য ও ধর্ম, চিত্রকলা ও সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র ও সাহিত্য। তবে, প্রবন্ধগুলি বড় সংক্ষিপ্ত, সূত্র সন্ধানের চেষ্টা আছে। বিশ্লেষণের স্থান হয়নি।

অন্বেষণা-র সম্পাদক আহমেদ সামসুদ্দিন। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কবিতা পত্রিকা। কয়েকটি মাত্র কবিতা, মনে হয় ছাত্রদের লেখা।

পত্রিকাগুলির নানা রচনার শুধু নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়, বিস্তৃত আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই রচনার পাঠকরা চেষ্টা করলেও পত্রিকাগুলি জোগাড় করতে পারবেন না। সুতরাং মূল রচনাগুলি না পড়তে পেলে শুধু সমালোচনার স্বাদ গ্রহণ অনেকটা হাওয়ায় সাঁতার শেখার চেষ্টার মতন।

'সাম্প্রতিক'-এর অন্যতম সম্পাদক সিকদার আমিনুল হক কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন। উনি পূর্ববঙ্গের একজন উল্লেখযোগ্য তরুণ কবি। দেখা করার পর আমি প্রশ্ন করলাম, বইপত্রের যাতায়াতের ব্যাপারটা কদ্দুর হলো? উনি আশা প্রকাশ করলেন, এবার খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে মনে হয়। ওখানকার জনসভায় প্রায়ই প্রবলভাবে এই দাবি ওঠে।

অন্যান্য

রাঁচী থেকে প্রকাশিত **স্ফুলিঙ্গ** একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক শরদিন্দু কর। পত্রিকাটি অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন। অন্যান্য জীবিকায় ব্যাপৃত হয়েও কিছু নবীন লেখক বাংলা দেশ থেকে দূরে বসে সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসাটুকু সযত্নে লালন করছেন। এতে প্রবন্ধ লিখেছেন কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী এবং হরিরঞ্জন সর্ববিদ্যা। চারটি গল্প লিখেছেন দিলীপ চক্রবর্তী, কপিলদেব, বিনয় বাজারী ও সুধীন সরকার। সুধীন সরকারের গল্পটি অনবদ্য। অরূপরতনের রম্য রচনাটিও উপভোগ্য। কবিতা লিখেছেন শচীন রাণা, স্মৃতিরঞ্জন দাশগুপ্ত, রূপক চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিকাশ অধিকারী, অনুরাধা কুণ্ডু, তুষার রায় প্রভৃতি।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত **'ক্যানটারি'** একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকা। এবং অনেক কিছু নতুন স্বাদের রচনা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। সম্পাদকীয়'র বদলে আছে অ-সম্পাদকীয়। বিষ্ণু দের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা বিষয়ে—এই প্রবন্ধ আর একবার পড়লেও ক্ষতি নেই। গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিমল কর। গৌরকিশোর ঘোষের দীর্ঘ কাব্য 'কাব্য নয়'। অন্যান্য রচনা লিখেছেন সতীন্দ্র চক্রবর্তী, আবদুল জব্বার, তুষার রায়, উদয় ভট্টাচার্য, অলকেন্দু শেখর পত্রী, দেবব্রত চক্রবর্তী, বাণীব্রত চক্রবর্তী, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চন্দ। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত রচনাটির মর্ম বোঝা গেল না। সম্পাদক রঞ্জন রায়চৌধুরী। দেবব্রত চক্রবর্তী মলাটে ভালো ছবি এঁকেছেন।

সনাতন পাঠক

কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও পুরস্কার না দিয়েই গ্রুপটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

যুদ্ধের মধ্যেই একদলের মনে প্রশ্ন জাগে, ইংরেজেরা নিজের দেশের সম্মানের জন্য যুদ্ধ করছে, কিন্তু ভারতীয়েরা কার দেশের সম্মানার্থে যুদ্ধ করছে? নিশ্চয়ই নিজের দেশের জন্য নয়। ব্রহ্মদেশ ও মলয়ে যুদ্ধের মাধ্যমে অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে পরিচিত হন। শ্রীদত্তের এক বন্ধু মালয়ে বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সদস্যের নিকট থেকে জওহরলাল নেহরু ও শরৎ বসুকে লেখা চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কেমন করে সে চিঠি পৌঁছে দিতে হবে, তা তাঁদের জানা ছিল না। "তলোয়ার"এ এই চিঠিই গুপ্ত সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নাবিকেরা কোন দেশী কাগজ পড়তে পারত না, এমন পরিবারের লোকদেরই নৌছিতে বা সৈন্য-বাহিনীতে ভর্তি করা হত, যাদের কোন আত্মীয় কখনও রাজনীতি করেনি। ফলে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে এদের একেবারেই কোন ধারণা ছিল না। দিল্লিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার কিছু নাবিকের মনে বিদ্রোহ করার প্রেরণা জুগিয়েছিল। 'তলোয়ার' জাহাজে শ্রীদত্তের উদ্যোগে গঠিত গোপন গোষ্ঠী বিদ্রোহ সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ঐ গোষ্ঠী একদিকে তলোয়ারে নিজেদের সমর্থক বাড়াতে তৎপর হয় এবং অপরদিকে বাইরে ৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে তলোয়ারের নাবিকেরা অনেকটা গান্ধীজী প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছিল। নৌবাহিনী থেকে পদত্যাগ করার কোন আইন ছিল না। কিন্তু আর কে সিং পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে প্রকাশ্যে ইংরেজ বিরোধিতার সিদ্ধান্ত করে। বিচারে সিংএর তিন মাস জেল হয়। নৌ-দিবসে 'ভারত ছাড়' শ্লোগান লেখার অভিযোগে লেখক ২রা ফেব্রুয়ারি গ্রেপ্তার হন। এই দুটি ঘটনা স্বাধীনতার সৈনিকদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহের আগের রাতে ১৭ই ফেব্রুয়ারিতেও গান্ধীজীর ডান্ডি সত্যাগ্রহে নুন তৈরির নাবির অনুকরণে খাবারের মত সাধারণ ব্যাপার নিয়েই বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নৌ-বিদ্রোহীরা ভেবেছিলেন, বিদ্রোহ করে নৌ-বাহিনীকে জাতীয় নেতাদের হাতে সমর্পণ করলেই নেতারা এগিয়ে আসবেন। নাবিকদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগের সঙ্গে 'ভারত ছাড়', "ইন্দোনেশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আন", "আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তি চাই" প্রভৃতি রাজনৈতিক দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছিল। কিন্তু নেতারা যে কোন উৎসাহই দেখাবেন না, তা নাবিকেরা ভাবতে পারেননি। বিদ্রোহীরা প্রথম দিনেই শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির সঙ্গে দেখা করেন। বিদ্রোহের তিনদিন আগেও নাবিকদের কথা তাঁকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধর্মঘটীদের অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক দাবি মিশিয়ে ফেলার জন্য তিরস্কার করে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং পণ্ডিত নেহরুকে

অফিসারদের বোম্বে আসার জন্য টেলিগ্রাম পাঠান। ধর্মঘট কমিটির সদস্যেরা নেতাদের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, কয়েকজন তো মুসলিম লীগের সমর্থন আদায়ের উপদেশ দিলেন। শ্রীমতী আসফ আলি তাঁদের পরিদর্শনের আমন্ত্রণ পেয়েও সেখানে যাননি। পণ্ডিত নেহরু ধর্মঘট প্রত্যাহারের আগে বোম্বাই যাননি, ধর্মঘট প্রত্যাহারের দু'দিন পরে গিয়ে চৌপাট্টিতে সভা করেন। লেখককে গ্রেপ্তারের সময় কর্তৃপক্ষ লেখকের ঘরে অশোক মেহতার একটি বই পেয়েছিল, কিন্তু অশোক মেহতাও নৌ-বিদ্রোহকে বৃহত্তর সংগ্রামের ড্রেস রিহার্সাল বলে দায়িত্ব শেষ করেন। মওলানা আজাদ দিল্লিতে সমর-সচিব মাসনের সঙ্গে নৌ-বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। সর্দার প্যাটেল নাবিকদের ধৈর্য ধরতে ও শান্তিপূর্ণ থাকতে অনুরোধ করে ২২শে ফেব্রুয়ারি অস্ত্র ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন। লীগ নেতা জিন্না মুসলিম নাবিকদের কাজে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় বললেন, নাবিকেরা অসুখী হলে পদত্যাগ করতে পারে। তিনি বিদ্রোহের মধ্যে হিংসার গন্ধও পেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ভুলেছেন যে, নৌ-বাহিনী থেকে কেউ পদত্যাগ করতে পারে না এবং নৌ-বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতেই সংগ্রাম করে এসেছে। গান্ধীজী ২৬ ফেব্রুয়ারি বিবৃতিতে বিদ্রোহেরই নিন্দা করেন। শ্রীমতী আসফ আলি ধর্মঘটীদের নেতৃত্ব না দিয়ে ছাত্র ও শ্রমিকদের সমর্থনের আবেদন জানিয়ে বোম্বাই পরিত্যাগ করেন।

শ্রমিক ও জনসাধারণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নেতাদের পাওয়া যায়নি। কিন্তু কমানিস্ট নেতারা কী করেছিলেন? পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীগঙ্গাধর অধিকারী ২২ ফেব্রুয়ারি বিবৃতি দিয়ে সেই সব কংগ্রেস নেতাদের ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আবেদন জানান যে-নেতারা নাবিকদের ধর্মঘটের নিন্দা করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব দেখার পরেই বৃটিশ সরকার বিদ্রোহীদের দমন করতে উদ্যোগী হন। ঐই কয়দিনে কেউই বিদ্রোহীদের বক্তব্য শোনার চেষ্টা করেননি। ইংরেজরা কিন্তু খবর ঠিকই রাখত। ইংরেজরা জানত, এদের উপর নির্ভর করে ভারতে আর রাজত্ব বজায় রাখা যাবে না। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় নেতাদের তা জানা ছিল না।

বিদ্রোহের অবসানে কারেকশতে নৌ-বিদ্রোহীকে জেলে ঢাকানো হয়, কয়েকমাস পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোন বিচারও হয় না, বিদ্রোহীরা সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্য টাকাও পায় না। পাকিস্তানে পরে নৌ-বিদ্রোহীদের চাকুরিতে নিলেও ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহীদের কোন স্থান হয়নি। বিদ্রোহীদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য কোন সাহায্য স্বাধীন সরকার করেনি। যে বিদ্রোহ ইংরেজকে ভারত ছাড়ার সংকল্প নিতে বাধ্য করল, সেই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীরা চিরকালই সরকারের নিকট অবহেলিত থাকল।

লেখক নৌ-বাহিনীর কোন কাগজপত্র তো দূরের কথা, ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী তদন্তের রিপোর্টও দেখবার কোন সুযোগ পাননি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন, তাই ভারতের অন্যত্র কীভাবে নৌ-বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, আর কারা সক্রিয় ছিলেন, ১৯৪২ সালে কোচিনে যে তরুণ বাঙালী নাবিকদের ফাঁসি হয়েছিল, তাদের প্রভাব কাদের উপর কতটা পড়েছিল তা আমাদের জানার উপায় নেই।

স্মৃতিকথার ভঙ্গীতে লেখা বলে বইটিকে পুরোপুরি ইতিহাস বলা চলে না। বিদ্রোহী নাবিকেরা যদি বিশেষ শিক্ষিত হতেন এবং তাঁদের বয়স ২২-২৪ বছরের বেশী হত, তা হলে আমরা হয়তো এত দিনে নৌ-বিদ্রোহের অনেকগুলি কাহিনী পেতাম। তবে নৌ-বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ব্যাপারে এই বইটি দিক-দর্শনের কাজ করবে। এই বইটি পড়েই আমরা জানতে পারলাম যে, ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের প্রধানতম নায়কের ভূমিকা যিনি নিয়েছিলেন, তিনি বাঙালী। বাঙালী হিসাবেও সেজন্য আমরা বইটির জন্য গর্বিত।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—৬ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড ২৮৭ (জন এডরিচ নটআউট ১১৫, জিওফ বয়কট ৫০, ডলিভেরা ৩১, অ্যালান নটআউট ৩০, রে ইলিংওয়ার্থ ২৯; গ্লীসন ৬৮ রানে ৩ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইকেটে ১০০ (বিল লরি নটআউট ৩৮, ইয়ান রেডপাথ নটআউট ২০; স্নো ১৭ রানে ২ উইকেট।

[খেলা অমীমাংসিত]

তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্ট

মেলবোর্ন মাঠের তৃতীয় টেস্ট বাতিলের কথা আগেই বলা হয়েছে। সিডনী মাঠের চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ডের ২৯৯ রানে জয় একদিকে ডেরেক আণ্ডারউড এবং জন স্নোর বোলিং কৃতিত্ব, আর একদিকে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়ের ফল। ইংলণ্ড অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ টসে জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান। ইংলণ্ডের সূচনা খুবই ভাল হয়। ৩ উইকেটে ২০১ রান ওঠে। কিন্তু আর ৬৬ রানের মধ্যে পড়ে যায় আরও ৪টি উইকেট প্রধানত ম্যালেটের প্রশংসনীয় বলে।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৩২ রানের উত্তরে দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া করে ৪ উইকেটে ১৮৯ রান, তৃতীয় দিন ২৩৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ইংলণ্ড তোলে ৩ উইকেটে ১৭৮। চতুর্থ দিন ৫ উইকেটে ৩১৯ রান তুলে ইংলণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন অস্ট্রেলিয়ার ঘাটতি ৪১৫ রান। খেলার বাকি দেড় দিন। এই বড় রানের ঘাটতি পূরণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সম্ভব হয় না। শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের ৩ মিনিট পরে ১১৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের উপর যবনিকা পড়ে। ফাস্ট বোলার জন স্নোর ৪০ রানে ৭টি উইকেট জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং কৃতিত্ব।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩৩২ (জিওফ বয়কট ৭৭, জন এডরিচ ৫৫, ব্রায়ান লাকহার্স্ট ৩৮, জন স্নো ৩৭, পিটার লেভার ৩৬; অ্যাসলে ম্যালেট ৪০ রানে ৪ উইঃ, গ্লীসন ৮৩ রানে ৪ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ২৩৬ (ইয়ান রেডপাথ ৬৪, ডগ ওয়াল্টার্স ৫৫, কিথ স্ট্যাকপোল ৩৩; ডেরেক আণ্ডারউড ৬৬ রানে ৪ উইঃ, ডলিভেরা ২০ রানে ২ উইঃ, লেভার ৩১ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ৫ উইঃ ডিক্লেঃ ৩১৯ (জিওফ বয়কট নট আউট ১৪২, ডলিভেরা ৫৬, রে ইলিংওয়ার্থ ৫৩; ম্যালেট ৪৩ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ১১৬ (বিল লরি নট আউট ৬০, কিথ স্ট্যাকপোল ৩০; জন স্নো ৪০ রানে ৭ উইকেট)

(ইংলণ্ড ২৯৯ রানে বিজয়ী)

পঞ্চম টেস্ট

মেলবোর্ন মাঠের পঞ্চম টেস্টের স্কোর বোর্ডের দিকে চোখ ফেরালে সহজেই বোঝা যায় প্রথম দিন থেকেই খেলার গতি ছিল ড্রর দিকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের বড় রানের উত্তরে ইংলণ্ডের লাকহার্স্ট ও ডলিভেরার দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। পাঁচদিনের খেলাতেই ব্যাটসম্যানরা বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ব্যাট চালিয়েছেন। পাঁচদিনে দুই দল সংগ্রহ করেছেন ১২১৫ রান। তাও ৪০টি উইকেটে নয় ২৩টি উইকেটে।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৯ উইঃ ডিক্লেঃ ৪৯৩ (ইয়ান চ্যাপেল ১১১, ইয়ান রেডপাথ ৭২, আর মার্শ নঃ আঃ ৯২, ডগ ওয়াল্টার্স ৫৫, বিল লরি ৫৬; উইলিস ৭৩ রানে ৩ উইঃ, ইলিংওয়ার্থ ৫৯ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩৯২ (ব্রায়ান লাকহার্স্ট ১০৯, বেসিল ডলিভেরা ১১৭, ইলিংওয়ার্থ ৪১; গ্লীসন ৬০ রানে ৩ উইঃ, টমসন ১১০ রানে ৩ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ৪ উইঃ ডিক্লেঃ ১৬৯ (বিল লরি ৪২, ওয়াল্টার্স ৩৯; স্নো ২১ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস বিনা উইকেটে ১৬১ (বয়কট নট আউট ৭৬, এডরিচ নট আউট ৭৪)

(খেলা অমীমাংসিত)

ষষ্ঠ টেস্ট

এডিলেডের ষষ্ঠ টেস্টে ইংলণ্ড দল দ্বিতীয় দিনের চা বিরতির ২০ মিনিট পরে যখন ৪৭০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করল এবং তৃতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ২৩৫ রানে শেষ হয়ে গেল তখন ২৩৫ রানে এগিয়ে থেকেও ইংলণ্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে ফলো-অন করালেন না। দ্বিতীয় ইনিংসে আরও কিছু রান করে চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে অসুবিধায় ফেলার উদ্দেশ্যে নিজেরাই আবার ব্যাট করতে নামলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২৩৩ রান তুলে যখন ইলিংওয়ার্থ ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার ঘাটতি ৪৬৮ রান। সময় হাতে ৯ ঘণ্টার মত। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার সামনে বড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করলেন কিথ স্ট্যাকপোল ও ইয়ান চ্যাপেল অনমনীয় দৃঢ়তায় সেঞ্চুরী করে।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৪৭০ (জন এডরিচ ১৩০, কেন ফ্লেচার ৮০, জন হ্যাম্পশায়ার ৫৫, বেসিল ডলিভেরা ৪৭, জন স্নো ৩৮, জিওফ বয়কট ৫৮; লিলি ৮৪ রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ২৩৫ (কিথ স্ট্যাকপোল ৮৭; লেভার ৯৪ রানে ৪ উইঃ, উইলিস ৪৯ রানে ২ উইঃ, স্নো ৭৩ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ৪ উইঃ ডিক্লেঃ ২৩৩ (জিওফ বয়কট নঃ আঃ ১১৯, ইলিংওয়ার্থ নঃ আঃ ৪৮, বয়কট ৪০; টমসন ৭৯ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ৩ উইকেটে ৩২৮ (কিথ স্ট্যাকপোল ১৩৬, ইয়ান চ্যাপেল ১০৪, ওয়াল্টার্স নঃ আঃ ৩৬)

(খেলা অমীমাংসিত)

সপ্তম টেস্ট

যে সিডনী মাঠের চতুর্থ টেস্ট জিতে ইংলণ্ড ১—০ খেলায় এগিয়ে ছিল সেই সিডনীতে শেষ খেলায় তাদের জয় সম্ভবত অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের গৃহ বিবাদের ফল। ষষ্ঠ টেস্টের পরেই অধিনায়ক বিল লরীকে অধিনায়কের পদ থেকে অপসারিত করা হয়, দল থেকেও বটে। নতুন অধিনায়ক হলেন ইয়ান চ্যাপেল। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ ডন ব্রাডম্যানের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতি থেকে পদত্যাগও তাৎপর্যপূর্ণ। এই অবস্থায় খেলোয়াড়দের মনোবল থাকার কথা নয়। থাকেওনি। না হলে প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের ব্যর্থতা দেখা যাবে কেন? ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো চতুর্থ দিনের খেলার আহত হওয়া সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলোয়াড় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করতে পারেনি এক কিথ স্ট্যাকপোল ছাড়া। ফলে ইংলণ্ড ৬২ রানে জিতেছে! সিরিজ জিতে অ্যাসেজও পুনরুদ্ধার করেছে।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২০৯টি টেস্ট খেলার মধ্যে জয়লাভে অস্ট্রেলিয়ার কৃতিত্ব এখনও বেশী। অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮০টি টেস্টে, ইংলণ্ডের ৬৮টিতে, ৬১টি টেস্ট খেলার ফলাফলের মীমাংসা হয়নি।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ১৮৪ (রে ইলিংওয়ার্থ ৪২, কেন ফ্লেচার ৩৩, জন এডরিচ ৩০; জেনার ৪২ রানে ৩ উইঃ ও'কিফে ৪৮ রানে ৩ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ২৬৪ (গ্রেগ চ্যাপেল ৬৫, ইয়ান রেডপাথ ৫৯, ডগ ওয়াল্টার্স ৪২, টি জেনার ৩০; লেভার ৪৩ রানে ৩ উইঃ, উইলিস ৫৮ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ৩০২ (লাকহার্স্ট ৫৯, এডরিচ ৫৭, ডলিভেরা ৪৭, ইলিংওয়ার্থ ২৯; ডেল ৬৫ রানে ৩ উইঃ, ও'কিফে ৯৬ রানে ৩ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ১৬০ (কিথ স্ট্যাকপোল ৬৭, গ্রেগ চ্যাপেল ৩০; ইলিংওয়ার্থ ৩৯ রানে ৩ উইঃ, আণ্ডারউড ২৮ রানে ২ উইঃ, ডলিভেরা ১৫ রানে ২ উইঃ)

(ইংলণ্ড ৬২ রানে বিজয়ী)

একলব্য

হকি খেলার গোড়ার কথা

॥ ১ ॥

হকি খেলার আইন-কানুন লেখার আগে গোড়ার কথা কিছু আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর প্রাচীন খেলাগুলোর মধ্যে হকি খেলা অন্যতম। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ একদিন তার হাতে হাতিয়ার তুলে নিয়েছিল। তার ব্যবহার শিখেছিল। গোলাকার কোন বস্তুকে হাতের লাঠি

এথেন্সের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে হকি খেলার আর এক চিত্র

দিয়ে আঘাত করায় মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। কৌতূহল থেকেই একদিন মানুষ গোল বস্তুকে হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করেছিল। তারপর তার মধ্যে পেয়েছিল বৈচিত্র্যের স্বাদ, খেলার আনন্দ।

মানুষ যত জোরে ছুটতে পারে তার চেয়েও জোরে ছোটাতে পারে কোন হাতের হাতিয়ার দিয়ে। হাত বা পা দিয়ে যত জোরে কোন কিছুকে চালিত করতে পারে তার চেয়ে অনেক জোরে কোন কিছুকে চালিত করতে পারে ওই হাতিয়ার দিয়ে। সম্ভবত গতি ও শক্তির এই সহজ সত্য থেকেই হকি, ক্রিকেট, গল্ফ প্রভৃতি খেলার উৎপত্তি।

হকি খেলার উৎপত্তি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি পৃথিবীর কোন দেশে

এথেন্সের প্রাচীরগাত্রে মর্মরফলকে খোদাই করা হকি খেলার চিত্র। চিত্রের নির্মাণ-কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৪ থেকে ৪৯৯

এবং কোন সময়ে প্রথম এই খেলা আরম্ভ হয়েছিল। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে যে এই খেলার প্রচলন ছিল তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছেন। সব জায়গায় অবশ্য এক নিয়মে খেলা হয়নি। খেলার ধরন এবং উপকরণও এক নয়। তবে সে সব খেলা যে হকিরই রকমফের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জার্মানীর পুরাতত্ত্ব বিভাগ এথেন্স শহরের মাটি খুঁড়ে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা অলিম্পিক স্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব নিদর্শন পেয়েছেন তার মধ্যে শ্বেত মর্মরে খোদাই করা হকি খেলার এক চিত্র প্রমাণ করে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বছরের আগেও হকি খেলার প্রচলন ছিল। কেননা ভাস্কর থেমিস্টোক্লেস (Themistocles) রচিত ওই মর্মরচিত্রের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৪-৪৯৯ বলে উল্লেখ আছে। ওই চিত্র এখন কোপেনহেগেনের ন্যাশনাল মিউজিয়মের এক দর্শনীয় বস্তু।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে দুজন খেলোয়াড় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বল নিয়ে 'বুলি' করছেন, দুজন খেলোয়াড় তাঁদের দু পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে 'বুলি' করছেন বিভিন্ন হকি স্টিকে স্টিকের মাথা ওপরের দিকে না রেখে উল্টোভাবে মাটির দিকে রেখে।

হকি খেলার প্রামাণ্য চিত্র হিসাবে এইটিই সব চেয়ে প্রাচীন চিত্র হলেও গবেষকদের অনেকের ধারণা প্রাচীন পারস্যই হকির মাতৃভূমি। ছোট ছোট বেড়াগাছের বাঁকানো ডাল দিয়ে পারস্যের অধিবাসীরা বল খেলত। ক্রমে পারস্য থেকে গ্রীসে, গ্রীস থেকে রোমে এবং রোম থেকে ফ্রান্সে হকি খেলা ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে এই খেলাকে বলা হত হকেট (Hoquet)। ফরাসী ভাষার হকেট কথার অর্থ পাচনবাড়ি। অর্থাৎ রাখালের লাঠি। সম্ভবত হকেট থেকেই খেলার নামকরণ হয়েছে হকি। এবং সেটা গ্রেট ব্রিটেনে খেলা প্রচলিত হবার পর।

গ্রেট ব্রিটেনে কবে থেকে হকির প্রচলন হয়েছে? বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে। তবে ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রালের একটি জানালায় হকি খেলার যে চিত্র আছে সেটি নাকি ৬০০ বছরের পুরনো। চিত্রটির বিষয়বস্তু: একটি ছেলে হকি স্টিকের মত বাঁকা স্টিক দিয়ে বল আঘাত করছে।

এথেন্সের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে খোদাই করা চিত্র থেকে হকি খেলার আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৪৮৬ সনের কাছাকাছি নির্মিত ফ্রান্সের একটি চিত্রের সঙ্গেও আধুনিক কালের হকির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

হকি খেলার অনুরূপ এক ধরনের খেলা নাকি আয়ারল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা ছিল। সেও একাদশ শতকের কথা। খেলার নাম ছিল হার্লে (HURLEY)। দ্বাদশ শতকে সিন্টি (SHINTY) নামে একই ধরনের খেলার প্রচলন ছিল স্কটল্যাণ্ডে। হাজার বছর ধরে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরাও এই ধরনের হকি খেলেছে যাকে আদিম হকি বলা চলে। খেলা তো নয়, বল আর লাঠি নিয়ে লাঠালাঠি। সূর্যোদয় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হকি খেলার মাধ্যমে দুই দল বা দুই সম্প্রদায় নিষ্ঠুর ভাবে লড়াই। যার মধ্যে জখম এবং মৃত্যু ছিল সাধারণ ঘটনা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় আধুনিক হকি খেলার প্রচলন এই শতাব্দীর পঞ্চম শতক থেকে। কিন্তু বহুকাল থেকেই তাজিকিস্থানে 'গুইবজি' (GUIBOZI) নামে এক রকমের খেলার প্রচলন ছিল—যে খেলার ধরনধারণ আধুনিক হকিরই অনুরূপ। এইভাবেই অনাদিকালের পথ বেয়ে আজকের হকি রূপ-রস-বর্ণ-সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। (ক্রমশ)

মুকুল

চিত্র-সমালোচনা

হর-পার্বতী

(মেড্রাজ সিনে ল্যাবরেটরি)

দেবলীলারও বুঝি রেহাই নেই, নতুবা হর-পার্বতীর মিলনের পরক্ষণেই তাঁদের এমন ফিল্মী নায়ক-নায়িকা সুলভ আচরণ কেন? পদ্মিনী যেহেতু পার্বতী হয়েছেন তাই বিবাহের পর হরজায়া অবশ্যই নাচতে পারেন। কিন্তু তখন শিবেরও এমন রোমান্টিক আবেশ কেন? ধূর্জটির এ কী রূপ!

পুরাণ-কথায় পরিচালকরা নিজেদের কল্পনাশক্তি খেলাবার অনেক সুযোগ পান. জানি। কারণ এখানে বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু দেবকাহিনীর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য রক্ষার দায়িত্ব কি পরিচালকের নেই?

দক্ষিণ ভারতের এই পৌরাণিক চিত্রটি নাকি কালিদাসের কুমারসম্ভব-এর ভিত্তিতে তৈরি। মহাকবির রচনার সামান্যতম কাব্যগুণ এতে থাকলে রুচিবান দর্শকের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হয়ত থাকত না। কালিদাসের উমা এখানে পদ্মিনী, বনে যখন তিনি তপস্যায় রত তখন তাঁর দেখাশোনার জন্য এক ভাঁড়-সদৃশ পরিচারক নিযুক্ত। উদ্ভট ব্যাপারগুলির সূচীপত্রে আর কাজ নেই। এই ধরনের ছবির দর্শক নিশ্চয়ই আছেন, সংখ্যায় তাঁরা কমও নন হয়ত। নতুবা পৌরাণিক চিত্রের ফরমুলাগুলি এতদিন ধরে টিঁকে আছে কী করে? নানা ট্রিক-শট ও অলৌকিক কান্ড সম্বলিত "হর-পার্বতী" উপাখ্যান প্রকৃতপক্ষে সিনেমারই কাহিনী। দেবকাহিনী মাত্রই যাঁদের মনে ধর্মভাব জাগায় তাঁদের কথা ভিন্ন, বেশির ভাগ দর্শককে ছবিটি শিব-পরিবারের মেলোড্রামা হিসাবে আমোদ দিতে পারে। শিবপুত্র কার্তিক ছবিতে যেন একটু বেশি অকালপক্ক, ফিল্মের বালকরা যেমন হয়ে থাকে। গণেশ সরল ও নিরীহ। বাবা-মায়েরই মত স্নেহশীল। এদের নিয়েই ছবির শেষ ভাগে নাটক। কার্তিকের তারকাসুর বধের ঘটনাও সংক্ষিপ্ত।

প্রথম ভাগে ফ্ল্যাশব্যাকে পার্বতীর পূর্ব-জন্মের কাহিনী তথা দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান দেখানো হয়েছে। এদিক থেকে দর্শকরা ভাগ্যবান। দুই পৌরাণিক কাহিনী তাঁরা দেখতে পেলেন।

হর-পার্বতী-কে বাংলা ছবি হিসাবে তৈরি করে নেওয়ার কাজে পরিচালক উমা-প্রসাদ মৈত্র গান সংযোজনের ক্ষেত্রে বেশি যত্নবান হয়েছেন। সন্তোষ মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত গান ও স্তোত্র সুখশ্রাব্য। পাত্র-পাত্রীদের মুখে গানগুলি বেশ মানিয়ে গেছে। তাঁদের মুখে বাংলা সংলাপ বসানোর কাজটা নিখুঁত হলে কোন ক্ষোভ থাকত না।

"ছদ্মবেশী" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী ও উত্তমকুমার

ফটো—দেশ

"প্রতিবাদ" ছবির মুক্তি এ-সপ্তাহে

আর্ট মুভিজের "প্রতিবাদ" ছবিটি এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলি। তপেশ্বর প্রসাদ ছবিটির পরিচালক। সুররচনার দায়িত্ব শ্যামল মিত্র। বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ছবিটির নায়ক-নায়িকা।

নাট্য-সমালোচনা

ফুলওয়ালী

(গন্ধর্ব)

আজকাল প্রতি নাটকেই নতুন কিছু দেখি, ফর্মের বিচিত্র একসপেরিমেন্ট। কী প্রয়োজনায় কী নাটক রচনারীতিতে নতুন কিছু দেখার প্রত্যাশা এখন সব নাটকেই থাকে। কৃষ্ণ ধরের "ফুলওয়ালী"-ও সেই প্রত্যাশা অনেকখানি পূর্ণ করেছে।

"প্রতিবাদ" (পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ) ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

তবে নাট্যকার শুনিয়েছেন কিন্তু সেই একই কথা, যা এখনকার প্রায় সব নাটকেই শুনি। আধুনিক নাট্যকারেরা যে বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন সেটা অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সমকালীন বিষয় বা রাজনৈতিক চেতনাকে বাতিল করে দিয়ে নাটক লেখা আজকের কোন সমাজসচেতন নাট্যকারের পক্ষেই হয়ত সম্ভব নয়। বিপ্লব আগত ওই—নাট্যকারেরা বলুন একথা আপত্তি নেই, তাই বলে কি সমসাময়িক মানবসম্বন্ধের কিছু রহস্যও থাকবে না?

ফুলওয়ালী-তে দুই-ই আছে, তবে উভয় দিকে নাট্যকারের সমান আগ্রহ নাটকটিতে সংহতি লাভ করেনি। ফুল-ওয়ালী মিশ্র রসের নাটক, অথবা রোমান্টিসিজম এবং সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমের অসবর্ণ যোগের পরিণাম। এতে সঙ্গীত আছে, স্লোগানও আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এ-নাটকে অতি স্পষ্ট। শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহারেই তার প্রকাশ নয়, সংলাপে ও চরিত্রকল্পনায়ও। নায়িকা মালিনীকেও, কেবল নামেই নয়, খুব চেনা মনে হয়। তার প্রেম ও দুঃখের মধ্যে যে নাট্যকারকে পাই তিনি রোমান্টিক। মালিনীর দুঃখের উত্তরণের মধ্যেও রবীন্দ্র-ভাবনা।

ফুলওয়ালী-তে সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি টুকরো টুকরো ঘটনায় ছড়িয়ে রয়েছে। একাধিক চরিত্রের মানসিকতায় আধুনিক পাপের লক্ষণ। নাট্যকারের চরিত্রটি আধুনিক মঞ্চে নতুন নয়। সে একালের জীবনের সূত্রধার।

আসলে নাটকটি রোমান্টিকতার স্পর্শে ও রাজনৈতিক ভাবনার উত্তাপে গঠিত। দুই বিপরীত মেরুতে, কল্পনার রাজ্যে ও বাস্তবে, দর্শক দুই রসের অংশীদার। অবশ্য এমন সব মুহূর্ত ও সংলাপ এতে আছে যা মনকে সত্যিই অবশ করে। এ ক্ষেত্রে প্রযোজনা ও নাট্য পরিচালনারও (দেবকুমার ভট্টাচার্য-কৃত) গুণ আছে। পরিচালক নাটকের গতি কখনও মন্থর হতে দেননি, এক একটি মুহূর্ত তিনি সযত্নে গড়ে তুলেছেন। সুপ্রযোজিত ও সুপরি-চালিত এই নাটকের অন্য বিশেষ গুণ অভিনয়। গন্ধর্বের টিম-ওয়ার্ক সত্যিই প্রশংসা করার মত। পাগলের ভূমিকায় নাট্যপরিচালক দেবকুমার ভট্টাচার্য কিংবা সুবলবাবুর চরিত্রে শিবাজী সেন মঞ্চের অভিনয়ে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা অল্পই দেখা যায়। কাজল মুখোপাধ্যায় ফুল-ওয়ালীর রূপসজ্জায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। লক্ষ্মীদের চরিত্রে যথাক্রমে লাবণ্যপ্রভা ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য বাড়াবাড়ি করেছেন। জগন্নাথ হালদার, সুধাংশু দে, গীতা কর্মকার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সুঅভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন। সঙ্গীতের জন্য অমর রায় সাধুবাদ পাবেন

চেনামহলের একাঙ্ক

চেনামহল সংস্থার তিনটি একাঙ্ক—সেই শ্মশানে, প্রতিধ্বনি ও পলাতক—বেশ উপভোগ্য হয়েছে। এই নাটকগুলিতে ভণিতা কম। বিশেষত প্রতিধ্বনি ও পলাতক নাটক দুটিতে। 'প্রতিধ্বনি' সমসাময়িক জীবনেরই নাটক। একালের মানুষ নিজে কি বাঁচা বাঁচে? আজ পরিবর্তে ... কালের যে পরিচয় নাটকে দেওয়া হয়েছে, যেমন চাকুরীজীবী পরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা রেশন দোকানের মুনাফাখোর মালিক ধনপতের বহুরূপিতা তা নাটকীয় চমকের ভিতর দিয়ে সহজ সরলভাবে উপস্থাপিত।

শেষের একাঙ্কটি কমেডির আঙ্গিকে পরিবেশিত। তবে এর মধ্যেও একটা বক্তব্য আছে। আমরা প্রত্যেকেই যেন পলাতক—নিজেদের জীবনের সমস্যা থেকে পালাতে চাই। নাকি নিজেরই কাছ থেকে? নাটকের শেষে পলাতকের অস্থিরতার চিত্রকল্পটি বেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কে যার ভয়ে ছুটছে।

চেনামহল শিল্পগোষ্ঠীর অভিনয়ের মান উন্নত। সঞ্জয় গুহর অভিনয় তো প্রতি চমৎকার। আর যাঁরা দর্শকদের বিশেষ-ভাবে মুগ্ধ করেছেন তাঁরা হলেন বরেন চক্রবর্তী, সঞ্জীব রায়, মনীষা ভাদুড়ী, উৎপল তরফদার, রঞ্জিত দত্ত, মানিক সুচেত রায়, অজয় ভট্টাচার্য, দিলীপ ঘোষ প্রমুখ। পলাতক-এ মিঃ গোয়েঙ্কার ভূমিকায় উৎপল তরফদার টাইপ কমিক চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বহুরূপীর নতুন নাটক

বহুরূপী সম্প্রদায় আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা ছটায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে তাঁদের সর্বাধুনিক নাট্যপ্রয়াস বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' সর্বপ্রথম মঞ্চে উপস্থাপিত করবেন। এবং এই পর্যায়ে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত অ্যাকাডেমি মঞ্চে প্রতি রবিবারই অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে।

নাটকটির নির্দেশনা শম্ভু মিত্রের। মঞ্চ-সজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহ-সঙ্গীতের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটিতে অভিনয় করছেন বহুরূপীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পিবৃন্দ।

বেড়েছে। এর একটা কারণ হতে পারে, এতে থিয়েটারের চেয়ে খরচ অনেক কম। স্টেজভাড়া লাগছে না, সিন-সেটের প্রয়োজন নেই। দু-একজন পেশাদার যাত্রা-নাচিয়ে বা গাইয়েকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে খুব কম খরচেই তাঁদের নাট্যতৃষ্ণা তৃপ্ত হচ্ছে। সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক ভাবধারার পালা হলে তো আর নাচ-গানের ঝামেলাও নেই।

এর ফলে অবশ্য মুশকিলে পড়েছে গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট দলগুলি। চিৎপুরে পাড়ার মত পুরোপুরি পেশাদার না হলেও এ সব দল আধা পেশাদার। দেশগ্রামে ধান কাটার মরশুম শেষ হলেই এই সব দল 'বিদেশে' বেরিয়ে পড়ে। ওদের কাছে বিদেশ যাওয়ার অর্থ মহকুমার বাইরে অথবা জেলার বাইরে কোথাও যাওয়া। এই সব দলের অধিকাংশ মানুষই প্রধানত কৃষিজীবী। ধান কাটা শেষ হয়ে গেলেই এরা স্থানীয় কোন 'অপেরায়' ভিড়ে যায়। অধিকাংশই পেট-খোরাকীতে, দু-চারজন সামান্য কিছু অর্থ পারিশ্রমিক হিসাবে পান। মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত এই সব দল জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামান্য টাকার চুক্তিতে পালাগান শোনায়। তারপর একটু বৃষ্টি পড়ে মাঠ ভিজল কি সব তাড়াহুড়ি বাঁধাছাঁদা সেরে গৃহাভিমুখী। মাঠে লাঙল পড়ার মরশুম এসে গেলে তাদের আর দলে রাখা দায়।

এমনি একটি দলের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "টাকা পয়সা না পেলে শুধু পেট-খোরাকীতে রাত জেগে গান করে বেড়ানোয় লাভ কী?"

বাইশ-চব্বিশ বছরের ডাগর ডাগর চোখ, বাবরি চুলঅলা ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, "বাবু, আমরা তো অন্যের জমি ভাগে চাষ করি, সোম্বচ্ছরের খোরাকী হয় না তাতে। তাই আমরা তিন ভাই দলে চলে এসেছি। আমাদের তিনজনের চার মাসের খোরাকী তো বেঁচে যায় এতে। এই দুর্দিনের বাজারে সেটাও তো কম নয় বাবু।"

আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমরা তিনজনে যে দলে চলে এলে, বাড়িতে কোন অসুবিধা হয় না?"

—"এখন আর অসুবিধা কি বলুন। এখন তো চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে হত। আর গরু-বাছুরের যা সামান্য কাজকর্ম তা আমার বুড়ো বাবাই করে নিতে পারবে।"

—"সারা বছর তো চাষের কাজকর্ম কর বলছ, তাহলে যাত্রাপালার পার্ট মুখস্থ কর কখন?"

—"সে বাবু রোজ রাত্তিরে আমাদের গেরামের চণ্ডীমণ্ডপে আখড়ায় পাঠ পাড়ি আমরা। আমি বেশির ভাগ পালায় রাজপুত্রের কাজ করি। আমার পরের ভাই ভাল তরোয়াল চালাতে পারে—ও সেনাপতির কাজ করে। আর সব্বের ছোট ভাইয়ের বার বছর বয়েস—ওর গানের গলা আছে, অম্বিকা মাস্টারের কাছে তালিম পেয়েছে, ও বেরষকেতু (বৃষকেতু) আর পেল্লাদের (প্রহ্লাদ) পাঠ করে।"

এমনি পাশাপাশি চার-পাঁচখানা গ্রামের লোকজন নিয়ে আধা-পেশাদার দল বাংলাদেশে অনেক আছে। তবে পল্লীবাংলায় যে রেটে শখের দল তৈরী হচ্ছে বলে খবর পাচ্ছি, তার পরে ওই সব প্রায়-অশিক্ষিত গ্রাম্য দলগুলি আর বোধহয় পাত্তা পাবে না। ইতিমধ্যেই ওই জাতীয় দলগুলি উঠে গেছে কিনা তার খবর আর কে-ই বা রাখছে। আর সেই ডাগর ডাগর চোখ, বাবরী চুলঅলা ছেলেটি—যার বাড়িতে সোম্বচ্ছরের খোরাকী হয় না—সে যে কিভাবে বেঁচে আছে তাই বা কে জানে।

—সূত্রধার

যুববাদ্যবৃন্দ : একটি প্রশংসনীয় উদ্যম

গত কয়েক বছরের বাংলা দেশের সংগীতের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলে একটা নৈরাশ্যের চিত্রই ফুটে ওঠে। কী চলচ্চিত্রে, কী রেকর্ডে, কী বেতারে, একই সুরের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি, কিংবা অন্যদিকে, বৈচিত্র্যের নামে কিছু কন্টকাকীর্ণ রচনা। কিন্তু এরই মাঝখানে কিছু কিছু অনুষ্ঠান আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এদেশের শিল্পীর নব নব সৃষ্টির উদ্যম ও উৎসাহ, সৃজনপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। গত ২০শে জানুয়ারি অপরাহ্ণে এ ইউ সি আয়োজিত যুববাদ্যবৃন্দের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এই উপলব্ধি নিয়েই ফিরে এসেছি। এই পরম প্রাপ্তিটুকুর জন্য ধন্যবাদ উদ্যোক্তাদের এবং যুববাদ্যবৃন্দের সাতাশ বৎসর বয়স্ক তরুণ অপরিসীম সম্ভাবনাময় সুরস্রষ্টা আনন্দশংকরকে। সেদিন ওঁরই সুনিপুণ নির্দেশনায় একটি মনোরম সুরের জগৎ গড়ে উঠেছিল।

কিছুদিন আগে একটি আসরে আনন্দশংকর তাঁর সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু রেকর্ড-বিধৃত নিদর্শন উপস্থিত করেছিলেন। বিদেশে থাকাকালীন ইলেকট্রনিক যন্ত্রনিঃসৃত জাজ-ধর্মী সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের সমন্বয় সাধনার কিছু কিছু নমুনা এবারেও তিনি শোনালেন। এ নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। এবারে তাঁর নতুন দুটি রচনার নাম হল : 'যুগচ্ছন্দ' এবং 'আনন্দম'। শেষোক্ত রচনাটি অবশ্য এর আগে বেতারের যুবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 'যুগচ্ছন্দে'র অনুষ্ঠান এই প্রথম। প্রধানত সমবেত বাদ্য, কিছু কিছু নৃত্য এবং কণ্ঠস্বরের সংযোগে উপস্থাপিত এ-ধরনের অনুষ্ঠানের সঠিক স্বরূপ-নির্ধারণ, যথার্থ পরিচয়-নির্দেশ সম্ভব নয়, কেননা এটা এখনও পরীক্ষার স্তরে। প্রধানত জাজ-সংগীত এই পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে, এই স্বীকারোক্তি স্পষ্টতই স্রষ্টা ব্যক্ত করেছেন। তাই যন্ত্রের মধ্যে পিয়ানো, অ্যাকর্ডিয়ান, ড্রাম-সিম্বল-সহ জাজ-সেট, ইলেকট্রিক স্প্যানিশ আছে, আবার সেই সঙ্গে আছে পাশ্চাত্যসংগীতের বেহালা, চেলো এবং সেতার সরোদ, বাঁশি, ঢোল, মৃদঙ্গ, তবলা-জাতীয় ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। তার সঙ্গে কিছু শিল্পী ছিলেন যাঁরা কণ্ঠস্বর-যোজনা করেছেন, আর লালপাড়ের গরদের শাড়ি-পরিহিতা চারজন তরুণী, যাঁরা কখনও মঞ্চের একপাশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন আবার কখনও নাচের তালে তালে বাদ্যবৃন্দের সুরে ও ছন্দের মধ্যে এসে মিশে যাচ্ছেন। এই পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে অভিনব।

রচনাভঙ্গির দিক থেকে 'যুগচ্ছন্দ' এবং 'আনন্দম' সমধর্মী। পরিবেশনও একই রকম। বেহালা ছিল তিনটি। তার মধ্যে একটি ভারতীয় ধ্রুপদী রীতিতে বেজেছে। একদিকে বিদেশী বাদ্যযন্ত্রে আধুনিক জাজের ছন্দ, আর একদিকে ওই বেহালা, সেতার ও সরোদে, মৃদঙ্গ, তবলা-সহযোগে ভারতীয় মেজাজটি ভারী সুন্দর পাশাপাশি ফুটিয়ে তুলেছিলেন আনন্দশংকর। রচনার দিক দিয়ে 'আনন্দম'এর ঝালার অংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই উপস্থাপনায় সুরের চেয়ে ছন্দের প্রভুত্বই বেশি এবং সেখানে মাঝে মাঝে অতি স্বচ্ছন্দ এবং সুন্দর নৃত্যভঙ্গিমা এসে একটি সামগ্রিক সাংগীতিক পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। পরীক্ষার দিক থেকে এটা অভিনব এবং নিঃসন্দেহে বহুল প্রতিশ্রুতিময়। পরিণতির বিচারক, বলা বাহুল্য, কালের কষ্টিপাথর। সর্বাগ্রে আনন্দশংকর স্বয়ং সেতারে যন্ত্রীদলের সঙ্গে সমবেতভাবে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা উপস্থিত করেছিলেন। রচনাটি সরল হলেও শ্রুতিমধুর।

—আনন্দ বর্ধন

অরণ্যদেব

লী ফক

সমুদ্রস্নানের পর তরুণ-তরুণীরা সোনা-বেলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। এ সবই বিবাহ-অনুষ্ঠানের অঙ্গ।
কী করছে ওরা, রাজা?
বিয়ে করছে, টম।

সমুদ্রে স্নান করে, তারা গায়ে স্বর্ণবালু মেখে তরুণ-তরুণীরা----

জেড-পাথরের ঘরের দিকে চলেছে-----

বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হল। এখন তারা দম্পতি।
দীর্ঘায়ু হও, সুখী হও।
ধন্যবাদ,

মুখে হাসি, গলায় মালা, দেখলেই বোঝা যায়, ওরা নবদম্পতি।
সুখী হও সবাই।
ভাল হয়ে থেকো।
ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

মধুযামিনী শেষ হবার আগে গা থেকে স্বর্ণবালু মুছে ফেলতে নেই। গায়ে সেই বালু মেখেই নবদম্পতিরা অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
7/5

আজ একশো বিয়ে হল।
চমৎকার।
এরই নাম বিয়ে? বলে কী!
বিয়ে করতে হলে একটা মেয়ে চাই!

অতর্কিতে আততায়ীর ভোজালির আঘাতে জননেতা হেমন্তকুমার বসুর মৃত্যুবরণ বর্তমান সপ্তাহের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২০ ফেব্রুয়ারি শনিবার বেলা প্রায় এগারটার সময় উত্তর কলিকাতায় টাউন স্কুলের কাছে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে উপর্যুপরি আততায়ীর ভোজালির আঘাতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ঘটনার পর আততায়িরা বোমা ফাটিয়ে সেই ধোঁয়ার আড়ালে পালিয়ে যায়। ভোজালির আঘাত করতে উদ্যত হলে তিনি বলেন: "আমাকে তোমরা মারছ কেন, আমি তো কারো কোন ক্ষতি করিনি।" ভোজালির আঘাতে তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে তৎক্ষণাৎ আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে। সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের যানবাহন, ট্রাম-বাস চলাচল এবং দোকানপাট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান এবং নেতাজীর সহকর্মী শ্রীহেমন্ত বসুর বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর। সর্বত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমন্তবাবু উনিশ শ' ছেচল্লিশ সাল থেকেই বিধানসভার সদস্য। এবারের নির্বাচনেও শ্যামপুকুর বিধানসভা-কেন্দ্রে দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রবিবার পূর্বাহ্ন প্রায় ৯টার মহাজাতি সদন থেকে মহান নেতা শ্রীবসুর মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা শুরু হয়ে অপরাহ্ন ৫টায় কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছে এবং যথারীতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শোক মিছিলে লক্ষ লক্ষ লোক শামিল হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

১৫ ফেব্রুয়ারি—কলকাতায় যে সব বাড়িতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হবে তার প্রত্যেকটিতে কম করেও দশজন সশস্ত্র প্রহরী থাকবেন। কোন কোন অঞ্চলে এই সংখ্যা ত্রিশ পর্যন্ত হতে পারে। কলকাতার তেইশটি নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য মোট ২৩১০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হবে। এজন্য সাত শ' বাড়ি দরকার হবে। প্রধানত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই এজন্য নেওয়া হচ্ছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক শ্রীসুনীলকুমার ধর আজ সকালে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। পাঁচদিন পূর্বে অফিসে কাজ করার সময় তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা ও পাঁচ পুত্র রেখে গিয়েছেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত জেলা শাসক ও জেলারদের অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁরা যাতে যে কোন আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন সেজন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই অফিসারদের অস্ত্রাগার থেকে পিস্তল ও রিভলবার দেওয়ার জন্য যথাস্থানে নির্দেশ গিয়েছে।

নব কংগ্রেসের ওপর "প্রতিশোধ গ্রহণের" জন্য সম্ভবত ১৯৬৭ সালের তুলনায় এবার প্রাক্তন রাজন্যবর্গ অধিক সংখ্যায় নির্বাচনী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এর কারণ হল, নব কংগ্রেস রাজন্যবর্গের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা বিলোপ সাধনের চেষ্টা করায় এঁরা সকলেই ক্ষুব্ধ।

১৭ ফেব্রুয়ারি—আজ বর্ধমান জেলার উখরা বিধানসভা কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীদেবদত্ত মণ্ডল খুন হন। এবারকার নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পর নির্বাচনপ্রার্থী খুন হওয়ার ঘটনা এই প্রথম। তার আগে বীরভূমের সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের নব কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসদগোপাল দাস মনোনয়ন-পত্র দাখিলের পর খুন হন। উখরা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট লোকসভার নির্বাচন যথারীতি ১০ মার্চ হবে।

আজ দুপুরে বিদ্যাসাগর কলেজের একজন [illegible] এই কলেজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একজনকে হত্যা করা হয়। [illegible] কাশীপুরেও একজন খুন হয়েছেন।

এ নিয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে মোট পাঁচজন খুন হন।

১৮ ফেব্রুয়ারি—লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী থেকে যাওয়ার বিরুদ্ধে মাদ্রাজের শ্রী ইউ এন আর রাও নামে জনৈক অ্যাডভোকেট যে আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট আজ তা খারিজ করে দিয়েছেন। কী কী কারণে এই আবেদন খারিজ করা হলো আদালত তা পরে জানাবেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাওনা গ্রান্ট-ইন-এইড এবং শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা ইত্যাদি মিটিয়ে দিতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। রাজ্যের বাজেটের ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্র থেকে বিশেষ সাহায্য হিসাবে সম্প্রতি যে সাড়ে সাত কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এই সব বকেয়া দেনা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি—ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হওয়ার পাকিস্তান যদি ভারতের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে তা হলে পাঁচ বছর ধরে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রুক্মপুরের জলপথ বন্ধ রাখার জন্য ভারতও পাকিস্তানের নিকট কোটি কোটি টাকা দাবি করতে পারে।

জম্মুর বিভিন্ন এলাকা থেকে আজ এই মর্মে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং জম্মুতে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা বরাবর বিপজ্জনক পাক-সৈন্যের সমাবেশ ঘটছে। আরও জানা গিয়েছে, গত তিনদিন ধরে সীমান্ত অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার পাকিস্তানী সেনা ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে সীমান্তের ঘাঁটি জোরদার করে তুলছে।

২০ ফেব্রুয়ারি—হেমন্তবাবুর হত্যাকাণ্ডের পর সরকার নিজের থেকে নির্বাচন বন্ধ করার কথা এখনও ভাবেন না। সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি যদি নির্বাচন অসম্ভব বলে অভিমত প্রকাশ করেন তা হলে তাঁরা তা নির্বাচন কমিশনারকে জানাবেন।

রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান নিহত শ্রীহেমন্তবাবুর মৃতদেহে মালা দিতে গেলে শোকাকুল জনতা রাজ্যপালকে আর জি কর হাসপাতালের ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকতে দেয় না। স্লোগান ওঠে "গো ব্যাক ধাওয়ান, কমিউনিস্ট দালাল ফিরে যাও, জ্যোতি বসুর দালাল ফিরে যাও।"

২১ ফেব্রুয়ারি—নির্বাচন চাই বলে পশ্চিমবঙ্গের দুটো প্রধান বামপন্থী জোট আজ প্রকাশ্যে দাবি তুলেছেন। হেমন্তকুমার বসুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন সুসম্পন্ন করতেই হবে।

আজ বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ শিলিগুড়ি স্পেশাল জেল থেকে ১৬ জন বিচারাধীন নকশালপন্থী নাটকীয়ভাবে পালিয়ে যায়। পুলিস পরে জেলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে পাঁচজন পলাতক বন্দীকে পাকড়াও করে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ ফেব্রুয়ারি—আজ ছিল ব্রিটেনের দশমিক দিবস। এইদিন আট শত বৎসরের পুরাতন পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স হিসাবের বদলে নতুন দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু হয়েছে। দশমিক মুদ্রা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন যে, তিন-চারদিন বাদে যখন সব রকমের লেন-দেন ও কেনা-কাটা হবে তখন কিছুটা গোলমাল হতে পারে।

১৬ ফেব্রুয়ারি—জাপানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নিখুঁতভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আজ ৬৩ কেজি ওজনের উপগ্রহটি পৃথিবীতে বেতার-সংকেত পাঠাতে শুরু করেছে।

১৭ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো সাহেবের হুঁশিয়ারি—ঢাকায় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেবেন না। যদি কেউ পাকিস্তান থেকে ঢাকায় যেতে চান তবে তিনি যেন নিজের দায়িত্বেই যান। ৩ মার্চ ঢাকায় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন বসার কথা।

১৮ ফেব্রুয়ারি—ইসলাম ও জাতীয় সংহতি বিপন্নের নামে প্রতিক্রিয়াশীলরা বাঙালীর সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করার কোনরকম চেষ্টা করলে এই পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তা বরদাস্ত করবে না। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ খবর দিয়েছেন ঢাকার দৈনিক পূর্বদেশ।

১৯ ফেব্রুয়ারি—পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ-র সঙ্গে আলোচনার পর পিপলস পার্টির নেতা শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো সংবিধান রচনায় আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছেন। তবে মুদ্রা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও কর নির্ধারণের প্রশ্নে তাঁর কিছু সংশোধন করার আছে।

২০ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর মন্ত্রি-পরিষদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্ত্রিসভা সেক্রেটারিয়েটের এক ইস্তাহারে বলা হয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ট্র্যাক্টর হাজারে হাজারে

আজকাল
কির্লোস্কর
আরএ এয়ার কুলড্ ইঞ্জিন
চালিত হাজার হাজার
ট্র্যাক্টর ভারতের সর্বত্র
ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে।

কির্লোস্কর আরএ ইঞ্জিনগুলি তাদের চমৎকার কর্মদক্ষতা, চালাবার কমখরচ ও নির্ঝঞ্ঝাট কাজের দরুণ হাজার হাজার কৃষকদের আস্থা অর্জন করেছে আর সেজন্যই কির্লোস্কর আরএ ইঞ্জিন চালিত ট্র্যাক্টরগুলি ভারতে সবাপেক্ষা বেশি কাটতি হয়।

- যেখাপোখা বা বদলাবার মত অল্প কয়েকটি অংশ।
- খরা জলের জ্বালানি নেই, জল চোঁয়ায় না, রেডিয়েটর নেই, ওয়াটার পাম্প নেই, হোজপাইপ নেই।
- ছিমছাম, সাদাসিধে গড়ন।
- ভারতের সর্বত্র সহজেই স্পেয়ার পার্টস্ মেলে ও দ্রুত বিক্রয়োত্তর পরিচর্যার ব্যবস্থা আছে।

এয়ার কুলড্ ইঞ্জিন

কির্লোস্কর

কির্লোস্কর অয়েল ইঞ্জিনস্ লিঃ.
এয়ার কুলড্ ইঞ্জিনের বৃহত্তম নির্মাতা
কারখানাঃ পুণা—ফরিদাবাদ

কির্লোস্কর আর এ এয়ার কুলড্
ইঞ্জিন বসানো ট্র্যাক্টরই
শুধু বেছে নেবেন

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আসন্ন নির্বাচন—	...	৪২৫
ব্যঙ্গচিত্র—	...	৪২৬
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	...	৪২৭
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	...	৪২৮
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	৪৩০
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৪৩১
একটি পরমাদ (কবিতা)—শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়	...	৪৩৪
নিদ্রা জাগরণের মাঝখানে (কবিতা)—শ্রীআনন্দ বাগচী		৪৩৪
নিজের রক্তকে আমি (কবিতা)—শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ	...	৪৩৪
রোগ—শ্রীসমীর রক্ষিত	...	৪৩৫
ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	...	৪৪৭

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত		...	৪৫১
রত্ন ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়		...	৪৫৩
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন		...	৪৬১
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর		...	৪৬৫
প্রলয়ঃ সাংবাদিকতা ও সাহিত্য—শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত			৪৭৩
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী		...	৪৮৫
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		...	৪৯৩
আলোচনা—		...	৪৯৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		...	৫০৫
বিদেশী বই—		...	৫০৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পুস্তক পরিচয়—	...	৫০৯
খেলার মাঠে—	...	৫১৩
হকি খেলার আইনকানুন—	...	৫১৫
অরণ্যদেব—	...	৫১৬
রঙ্গজগৎ—	...	৫১৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	৫২৪

প্রচ্ছদ : শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়

এখন পাবেন
গোল
আকারে

ভিমগ্র্যান®
মালটিপল ভিটামিনস-মিনারেলস ট্যাবলেটস

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

২/৭১নং কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত পদসমূহের জন্য দরখাস্ত হ্বান হইতেছে—

পর্যায় নং ১ : অ্যাপ্রেণ্টিস জুনিয়র কেমি-স্ট এবং মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের চারটি (৪) পদ। পদগুলি স্থায়ী। প্রতি ক্ষেত্রেই একটি পদ তপশীল জাতি ও তপশীল উপ-জাতির প্রার্থিগণের জন্য সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী : অন্ততপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাসহ বিজ্ঞানে ডিগ্রী।** বয়স ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে। মনোনীত প্রার্থিবৃন্দকে এক বৎসরকালের জন্য একটি **প্রশিক্ষণ** গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে সময়ান্তরিক বিধিনিয়মাবলীর অধীনে প্রদানযোগ্য মতে মহার্ঘভাতাসহ ১৫০, টাকা **স্টাইপেন্ড** প্রদান করা হইবে। সাফল্য-জনকভাবে **প্রশিক্ষণ** সমাপনান্তে প্রার্থিগণ ২১০,—৩০০, টাকা বেতনক্রমে **জুনিয়র কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-রূপে অস্থায়ীভাবে** নিয়োগের উপযুক্ত হইবেন। মনোনীত প্রার্থিবৃন্দকে রেলওয়ের সহিত একটি বন্ড সম্পাদন করিতে হইবে। **মহিলা প্রার্থি-দের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।**

পর্যায় নং ২ : ডেণ্টাল মেকানিকের একটি (১) পদ। পদটি স্থায়ী (তপশীলী জাতি ও উপজাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য পদ সংরক্ষিত নহে)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিয়া থাকা আবশ্যক, ডেন্টিউরস দাঁতের জন্য কৃত্রিম গোল্ডক্রাউন প্রস্তুতকরণ ও ডেন্টিউরসের ইম্প্রেশন গ্রহণে সক্ষম হওয়া আবশ্যক। তাঁহার কোন ডেণ্টাল কলেজের প্রশিক্ষণ থাকা আবশ্যক অথবা ৩ বৎসর কালের জন্য কোন প্রখ্যাত ডেণ্টাল সার্জনের নিকট কাজ করিয়া থাকা চাই। **বয়স : ১৮ হইতে** ২৫ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রম : ১৫০,—২৪০,** টাকা, তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাসমূহ।

পর্যায় নং ৩ : রেডিওগ্রাফার্সের দুইটি (২) পদ। পদগুলি স্থায়ী (একটি পদ তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** (ক) অন্যতম বিষয় হিসাবে **পদার্থবিদ্যাসহ** অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়/পর্ষদ হইতে **ম্যাট্রিকুলেশন** অথবা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। অন্যতম বিষয় হিসাবে **পদার্থবিদ্যাসহ** যাঁহারা **ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ** হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। (খ) নির্ধারিত একটি পাঠ্যসূচী **অনুসারে রেডিওগ্রাফার হিসাবে** কোন অনুমোদিত শিক্ষায়তন হইতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং পাঠক্রমের শেষে অনুষ্ঠিত একটি পরীক্ষায় **উত্তীর্ণ** বলিয়া ঘোষিত হইতে হইবে। **বয়স : ১৮ হইতে ২৫ বৎসর। বেতনক্রম :** ১১০,—২০০, টাকা, তৎসহ সময়ান্তরে প্রদান-যোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাসমূহ।

পর্যায় নং ৪ : ল্যাবরেটরী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একটি (১) পদ। পদটি অস্থায়ী। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী : প্রথম** বিভাগে এম এস-সি অথবা বি এস-সি (**বায়ো-কেমিস্ট্রি**)। বায়োকেমিস্ট হিসাবে কোন সাধারণ হাসপাতালে ন্যূনকল্পে তিন **বৎসর কালের** অভিজ্ঞতা। (ব্লাডগ্যাস অ্যানালিসিস, **ফ্লেম** ফোটোমিটার, পেপার ইলেকট্রোফোরোসিস ইত্যাদিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।) **বয়স :** ৩৫ বৎসর পর্যন্ত। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপযুক্ত প্রার্থিবৃন্দের ক্ষেত্রে ৩৮ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। **বেতনক্রম :** ৩২৫,—৫৭৫, টাকা (এ এস), তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাদি।

পর্যায় নং ৫ : স্টাফ নার্সের (মহিলা) পঁচিশটি (২৫) পদ। পদগুলি **স্থায়ী।** তপশীলী **জাতীয়** প্রার্থিবৃন্দের **জন্য** চারিটি (৪) ও তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের **জন্য ছয়টি** (৬) পদ সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতা-বলী :** প্রার্থিবৃন্দকে অবশ্যই **ম্যাট্রিকুলেট** অথবা তৎসমতুল যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং নার্সেস, মিডওয়াইফ অথবা স্বাস্থ্য পরিদর্শকের জন্য রাজ্য সরকারের আইনের অধীনে নিবন্ধ-ভুক্তিযোগ্য কোন অনুমোদিত মেডিক্যাল সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত একটি **জুনিয়র নার্সিং দীঘ সার্টিফিকেট** থাকা চাই অথবা সমতুল যোগ্যতা-সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রামাণ্য **অঙ্গনে** অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে। বি এস-সি (নার্সিং) ডিগ্রীধারী প্রার্থিবৃন্দকে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী সাপেক্ষে প্রতি প্রার্থীর গুণমানের ভিত্তিতে দুইটি অগ্রিম ইনক্রিমেণ্ট প্রদান করা যাইতে পারে। ইণ্ডিয়ান স্টেট মেডিক্যাল রেজিস্টারে অবশ্যই তাঁহাদের নাম থাকা চাই। তাঁহাদের অবশ্যই ইংরাজী, হিন্দী অথবা অসমীয়া বা বাংলায় কথা বলিতে সক্ষম হইতে হইবে। বয়স : ২০ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে—বেতনক্রম : ১৫০,—২৮০,, তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাসমূহ।

পর্যায় নং ৬ : হেলথ ভিজিটরের তিনটি (৩) পদ। পদগুলি স্থায়ী। তপশীলী উপ-জাতীয় **প্রার্থিবৃন্দের** জন্য একটি পদ সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** (১) প্রার্থিবৃন্দকে অবশ্যই **ম্যাট্রিকুলেট** অথবা ইংরাজীতে যথেষ্ট জ্ঞানসহ তৎসমতুল যোগ্যতাবিশিষ্ট হইতে হইবে, (২) মিডউইফরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং নিবন্ধ-ভুক্ত হইতে হইবে, (৩) অনুমোদিত কোন প্রশিক্ষণ সংস্থা হইতে পঠনপাঠনের একটি অনু-মোদিত পাঠক্রম সমাপনান্তে **হেলথ ভিজিটর্স** হিসাবে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে প্রদত্ত ডিপ্লোমাধারী হইতে হইবে এবং টিউবারকিউ-লোসিস অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক ব্যবস্থাকৃত মতে হেলথ **ভিজিটর (টিউবারকিউ-লোসিস)** হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইতে হইবে। নার্সের (জেনারেল নার্সিং) প্রশিক্ষণসম্পন্নগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। **বয়স : ২০ হইতে** ৩০ বৎসরের মধ্যে। বেতনক্রম : ১৫০,—২৮০, টাকা, তৎসহ **সময়ান্তরে** প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাসমূহ।

পর্যায় নং ৭ : ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যাণ্টের একটি (১) পদ। তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** প্রার্থীকে অবশ্যই অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা পর্ষদ হইতে **ম্যাট্রিকুলেট** অথবা তৎসমতুল যোগ্যতা-সম্পন্ন হইতে হইবে। **ইণ্টারমিডিয়েট বিজ্ঞান** পরীক্ষোত্তীর্ণগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। প্রার্থিগণের অন্ততপক্ষে ছয় মাসকালের জন্য কোন বড় হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে কাজ করিবার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসহ **অবশ্যই স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অথবা ভারতের অন্য যে** কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ল্যাবরেটরী টেকনি-সিয়ানের সংসারিত পাঠক্রমে, উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। **বয়স :** ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে **বেতনক্রম :** ১১০,—২০০, টাকা, তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে ভাতাসমূহ। পদটি স্থায়ী।

পর্যায় নং ৮ : শ্রেণী ইলেকট্রিক্যাল চার্জ-ম্যানের এগারোটি (১১) পদ। পদগুলি অস্থায়ী। তপশীলী জাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য একটি (১) এবং তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য দুইটি (২) পদ সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতা-বলী :** অনুমোদিত কোন শিক্ষায়তন হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ তিন **বৎসরের** ডিপ্লোমাসহ কোন অনুমোদিত **বিশ্ববিদ্যালয় অথবা পর্ষদ** হইতে, ম্যাট্রিকুলেশন, **অথবা** তৎ-সমতুল যোগ্যতাসম্পন্ন। **বয়স : ২০ হইতে ৩০** বৎসরের মধ্যে। **প্রশিক্ষণ কাল : অন্যান্য ভাতাদি-সহ** মাসিক ২০৫, টাকা **স্টাইপেণ্ডে ছয় হইতে** বারো মাস **কালের জন্য প্রশিক্ষণ। সাফল্যজনক-ভাবে প্রশিক্ষণ** সমাপনান্তে **তাঁহারা সময়ান্তরে** প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাদি এবং ২০৫,——২৪০, টাকার বেতনক্রমে **ইলেকট্রিক্যাল চার্জ-ম্যান** হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের **যোগ্য** হইবেন।

পর্যায় নং ৯ : অ্যাপ্রেণ্টিস মেকানিকদের (ইলেকট্রিক্যাল) **নয়টি** (৯) পদ (তপশীলী জাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য দুইটি ও তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য দুইটি **পদ** সংরক্ষিত সহ)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** প্রার্থি-বৃন্দকে অবশ্যই **গণিত** এবং **বিজ্ঞানসহ** অনু-মোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা **পর্ষদ হইতে ম্যাট্রিকুলেট** অথবা তৎসমতুলযোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। **বয়স :** ১৫ হইতে ১৯ বৎসর। **প্রশিক্ষণ :** মনোনীত প্রার্থিবৃন্দকে **পাঁচ** (৫) **বৎসরকালের** জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশিক্ষণ-কালের মধ্যে তাঁহারা সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য অন্যান্য ভাতাদি এবং ১৫০,—১৭০, টাকা বেতন-ক্রম মাসিক ১৫০,, টাকা হারে স্টাইপেণ্ড পাইবেন। মনোনীত প্রার্থিগণকে প্রশিক্ষণের জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণের পূর্বেই নগদে ৫০, টাকা (পঞ্চাশ টাকা) জমা দিতে হইবে **এবং এতদ্ব্যতীত পাঁচ বৎসর** কালের প্রশিক্ষণের **সাফল্যমণ্ডিত** পরিসমাপ্তির পর অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ **বৎসরের** জন্য রেলওয়েতে **কাজ করিবার প্রতিশ্রুতিসহ** একটি **বন্ড সম্পাদন করিতে হইবে**, অন্যথায় তাঁহারা বন্ডে লিপিবদ্ধ সর্তাদি ও **নিয়মাবলী** মতে শিক্ষণকালে তাঁহাকে **প্রদত্ত সমস্ত অর্থ ও** প্রশিক্ষণের ব্যয় প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য **থাকিবেন।** সাফল্যমণ্ডিতভাবে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে প্রার্থি-গণ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাদি এবং ২০৫,—২৪০, টাকা বেতনক্রমে ২০৫, টাকা বেতনে **চার্জম্যান** (ইলেকট্রিক্যাল) হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের উপযুক্ত হইবেন।

পর্যায় নং ১০ : গ্রেড ২ সাবইন্সপেক্টরের (আর পি এফ) **কুড়িটি** (২০) পদ। পদগুলি অস্থায়ী। (তপশীলী জাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য দুইটি, তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের জন্য তিনটি ও প্রাক্তন সামরিক কর্মচারিগণের জন্য দুইটি পদ সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** প্রার্থিগণের অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

অথবা পর্ষদ হইতে কলা, বিজ্ঞান অথবা বাণিজ্যে **ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষ** অথবা **ইণ্টারমিডিয়েট** অথবা তৎসমতুল পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হইয়া থাকা চাই। **প্রশিক্ষণকাল :** মনোনীত প্রার্থিগণকে **এক বৎসর কালের জন্য লক্ষ্ণৌস্থিত আর পি এফ প্রশিক্ষণ কলেজে** প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রশিক্ষণকালের মধ্যে তাঁহারা সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাদি এবং মাসিক ১৩০, টাকা স্টাইপেণ্ড পাইবেন। সাফল্যমণ্ডিতভাবে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে তাঁহারা **দুই বৎসরের** অথবা বর্ধিত হইলে অধিককালের জন্য অবেক্ষাধীনে ১৩০,—২১২, টাকার বেতনক্রমে সাব-ইন্সপেকটর **গ্রেড** ২ (আর পি এফ) হিসাবে পোস্টিং-এর উপযুক্ত হইবেন। প্রশিক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাদিগকে মেস অ্যালাউন্স হিসাবে ১০০, টাকা (একশত টাকা) জমা দিতে হইবে। **উচ্চতা :** তপশীলী উপজাতীয়গণ ব্যতীত অন্যান্য প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে ১৬৭·৬৪ সেমিঃ (৫´-৬´´)। তপশীলী উপজাতীয় অথবা পার্বত্য জাতি এবং উপজাতীয়গণের ক্ষেত্রে ১৬০·০২ সেমিঃ (৫´-৩´´)। **ছাতি :** অসম্প্রসারিত অবস্থায় ৮১·২৮ সেমিঃ (৩২´´)। **দৃষ্টিশক্তি :** চশমা ব্যতিরেকে বি/১ (এক)। **বয়স :** ১-৩-১৯৭১ তারিখে ১৯ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে। প্রাক্তন সামরিক কর্মচারিগণের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা, তৎকর্তৃক প্রতিরক্ষা সার্ভিসে প্রদত্ত পরিসেবা কাল তৎসহ আরোপিত পর্যায়ে ৩ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য কিন্তু উহা ৩০ বৎসর বয়সের অধিক হইবে না। খেলাধুলা, স্পোর্টস, অ্যাথলেটিকস, এন সি সি এবং আই জি/আর পি এফ/রেলওয়ে কর্তৃক অনুমোদিত মতে অনুরূপ অন্যান্য সংস্থায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। উপরিবর্ণিত মতে প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী ব্যতীত বয়ঃসীমা শিথিলকরণের সুবিধা প্রদানযোগ্য হইবে না।

পর্যায় নং ১১ : নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত টেকনিক্যাল স্কুলে সংশ্লিষ্ট **সিনিয়র লেকচারের** একটি (১) পদ। **পদটি স্থায়ী।** তপশীলী জাতির ও তপশীলী উপজাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য কোন সংরক্ষণ নাই। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী** (১) **মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ** ডিগ্রী অথবা তৎসমতুল অথবা ডিজেল ইঞ্জিনসহ পাঁচ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সমেত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডিপ্লোমা, (২) শিক্ষাদানের প্রবণতা। **বয়স :** ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে। যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থিবৃন্দের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিল করা যাইতে পারে। **বেতনক্রম :** ৪৫০,—৫৭৫, টাকা তৎসহ সময়ান্তরে বিধিনিয়মাবলীর অধীনে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতাদি।

পর্যায় নং ১২ : টিকিট কলেকটরের সতেরোটি (১৭) পদ। পনেরোটি পদ স্থায়ী এবং **দুইটি পদ** অস্থায়ী। (তপশীলী জাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য **তিনটি** এবং তপশীলী উপজাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য পাঁচটি (৫) পদ সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** বাধ্যতামূলক একটি বিষয় হিসাবে ইংরেজী লইয়া **ম্যাট্রিকুলেট** অথবা তৎসমতুল। **বয়স :** ১৮ হইতে ২৫ বৎসর। **বেতনক্রম :** ১১০,—১৮০, টাকা তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতা।

পর্যায় নং ১৩ : গুডস ক্লার্কের আটত্রিশটি (৩৮) পদ। চব্বিশ (২৪) পদ স্থায়ী এবং চৌদ্দটি (১৪) পদ অস্থায়ী। (তপশীলী জাতির প্রার্থিগণের জন্য সাতটি (৭) ও তপশীলী উপজাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য এগারটি (১১) পদ সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** বাধ্যতামূলক একটি বিষয় হিসাবে ইংরাজি লইয়া **ম্যাট্রিকুলেশন** অথবা তৎসমতুল। **বয়স :** ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রম :** ১১০,—২০০, টাকা, তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে অন্যান্য ভাতা। মনোনীত প্রার্থিগণ আলিপুরদুয়ার জংশনস্থিত এই রেলওয়ের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে তিন মাসকালের প্রশিক্ষণের (ঐ সময়কালের মধ্যে তাঁহাদিগকে প্রদানযোগ্য মতে ভাতাদি এবং মাসিক ১১০, টাকার একটি স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হইবে) সাফল্যমণ্ডিতভাবে পরিসমাপ্ত করিবার পর ১১০,—২০০, টাকা বেতনক্রমে **গুডস ক্লার্ক** হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের উপযুক্ত হইবেন। প্রার্থিগণকে নিয়োগের সময় জামিন হিসাবে ৩০০, টাকা (তিন শত টাকা) জমা দিতে হইবে।

পর্যায় নং ১৪ : কোচিং ক্লার্কের সাতাশটি (২৭) পদ। ষোলটি (১৬) পদ স্থায়ী এবং এগারোটি (১১) পদ অস্থায়ী। (তপশীলী জাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য **চারিটি** (৪) এবং তপশীলী উপজাতির প্রার্থিগণের জন্য **নয়টি** (৯) পদ সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** বাধ্যতামূলক একটি বিষয় হিসাবে ইংরাজি লইয়া **ম্যাট্রিকুলেশন** অথবা তৎসমতুল। **বয়স :** ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রম :** ১১০,—২০০, টাকা, তৎসহ সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মতে ভাতাদি। মনোনীত প্রার্থিগণ, আলিপুরদুয়ার জংশনস্থিত এই রেলওয়ের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে **তিন মাসকালের** প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে পরিসমাপ্তি সাপেক্ষে (এই সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে প্রদানযোগ্য মত ভাতাদি এবং মাসিক ১১০, টাকা স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হইবে) ১১০,—২০০, টাকা বেতনক্রমে **কোচিং ক্লার্ক** হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগের উপযুক্ত হইবেন।

পর্যায় নং ১৫ : ট্রেনী সিগন্যালারের পঁয়তাল্লিশটি (৪৫) পদ। আটত্রিশটি (৩৮) পদ স্থায়ী এবং সাতটি (৭) পদ অস্থায়ী। (তপশীলী জাতির প্রার্থিগণের জন্য **সাতটি** (৭) এবং তপশীলী উপজাতির প্রার্থিবৃন্দের জন্য এগারোটি (১১) পদ সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :** প্রার্থিগণকে অবশ্যই ইংরাজিতে ন্যূনকল্পে ৪০ শতাংশ নম্বর পাইয়া **ম্যাট্রিকুলেশন** অথবা তৎসমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তাঁদের বিষয়গুলির অন্যতম একটি হিসাবে ইংরাজিসহ **ম্যাট্রিকুলেশন** অথবা সমতুল অপেক্ষা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থিবৃন্দ অথবা তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে ইংরাজিতে ন্যূনপক্ষে ৪০ শতাংশ নম্বরের নির্ধারিত সীমা প্রযুক্ত হইবে না। তপশীলী জাতি/তপশীলী উপজাতীয় প্রার্থিবৃন্দের ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে অবশ্যই **ম্যাট্রিকুলেশন** অথবা তৎসমতুল পরীক্ষায় ইংরাজিতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। **বয়স : ১৮ হইতে ২৫ ব**
মধ্যে। প্রার্থিগণকে তিনটি বিষয়ে
ইংরাজি পাটিগণিত এবং সাধারণ
ইত্যাদিতে একটি লিখিত পরীক্ষায় অ
হইতে হইবে। যাঁহারা লিখিত পরীক্ষায় উ
হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মৌখিক পর
উত্তীর্ণ হইতে হইবে। মনোনীত প্রা
আলিপুরদুয়ার জংশনস্থিত এই রেল
জোনাল ট্রেনিং স্কুলে **ছয় মাসকালের** প্রশি
সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি সাপেক্ষে (ঐ স
মধ্যে তাঁহাদিগকে বিধিনিয়মাবলীর অ
প্রদানযোগ্য মতে ভাতাদি এবং মাসিক :
টাকা স্টাইপেণ্ড প্রদান করা হইবে) ১১
২০০, টাকা বেতনক্রমে **সিগন্যালার** হি
অস্থায়ীভাবে নিয়োগের উপযুক্ত হইবেন।

পর্যায় নং ১৬ : ট্রেনস ক্লার্কের আট
(৫৮) পদ। আটাশটি (২৮) পদ স্থায়ী
ত্রিশটি (৩০) পদ অস্থায়ী। (তেরটি (
পদ তপশীলী জাতির জন্য সংরক্ষিত
পনেরটি (১৫) পদ তপশীলী উপজা
প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত)। **ন্যূনতম যোগ**
বলী : আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরাজি
ম্যাট্রিকুলেশন বা ইহার সমতুল। **বয়স :** ১
২৫ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রম :** ১১০,—১
টাকা, তৎসহ বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত
অন্যান্য ভাতাদি। পর্যায়গুলির জন্য অ
কারের ক্রম উল্লেখপূর্বক নিম্নে বর্ণিত যে
বা সকল পর্যায়ের জন্য যে কোন প্রার্থী
ফর্মে আবেদন করিতে পারেন—(১)
কলেকটর, (২) গুডস ক্লার্ক, (৩) কোচিং
(৪) ট্রেনস ক্লার্ক, (৫) ট্রেনী সিগন্যালার
উপরোক্ত পদগুলির মধ্যে টিকিট কলে
ট্রেনস ক্লার্কের পর্যায়ে এক তৃতীয়াংশ
শূন্য পদ সেই সকল রাজ্য সরকারী কর্মী
দের ট্রান্সফার দ্বারা পূরণ করা হইবে য
রাজ্য সরকারের অধীনে অন্যূন পাঁচ (৫)
কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের বয়স ১-৩
তারিখানুযায়ী ৩৫ বৎসরের বেশী নহে।
উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত রাজ্য অ
কর্মচারিগণ আবেদন করিবার যোগ্য :—
(১) আসাম, (২) বিহার, (৩) ম
(৪) মেঘালয়, (৫) নাগাল্যাণ্ড, (৬) ত্রি
(৭) পশ্চিমবঙ্গ।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তা
নিজস্ব রাজ্য সরকারী কর্তৃপক্ষের :
নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত দাখিল করিতে হ
অন্যথায় তাঁহাদের দরখাস্ত বিবেচিত হইবে

পর্যায় নং ১৭ : চার্জম্যান 'সি'-এর
(২) **পদ। একটি** (১) পদ স্থায়ী এবং
(১) **অস্থায়ী।** (একটি পদ টিকিট
সেকশনের জন্য এবং অপরটি প্রোড
কণ্ট্রোল অর্গানিজেশন সেকশনের জন্য)।
পদ কেবল মাত্র তপশীলী উপজাতির প্রা
জন্য সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতাবলী :**
প্রিণ্টিং সেকশনের জন্য : (১) ম্যাট্রিকু
বা ইহার সমতুল, (২) প্রিণ্টিং টেকনোল
স্টেট ডিপ্লোমা বা অল ইণ্ডিয়া সার্টিফি
(৩) কোন প্রখ্যাত মুদ্রণালয়ে সুপারভা
ক্যাপাসিটিতে অন্যূন **দুই বৎসরের** ব্যব
অভিজ্ঞতা, (৪) হ্যাণ্ড কম্পোজিং,
মেসিন ও বাইণ্ডিং-এ ব্যবহারিক অভিজ্ঞ

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

বাঞ্ছনীয় যোগ্যতাবলী: (১) কম্পিটং এবং/অথবা এস্টিমেটিং-এ সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা, (২) মেকানিক্যাল কম্পোজিং, রোটারী প্রিণ্টিং মেসিন এবং স্টিরিও-টাইপিং ও টিকিট প্রিণ্টিং-এ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, (৩) প্রিণ্টিং-এর যে কোন ব্রাঞ্চে স্পেশালাইজেশনের সার্টিফিকেট। **প্রোডাকসন কণ্ট্রোল অর্গানিজেশন সেকশনের জন্য যোগ্যতাবলী:** (১) ম্যাট্রিকুলেশন বা ইহার সমতুল্য। (২) প্রিণ্টিং টেকনোলজিতে স্টেট ডিপ্লোমা বা অল ইণ্ডিয়া সার্টিফিকেট। (৩) কোন প্রখ্যাত মুদ্রণালয়ে সুপারভাইজরী ক্যাপাসিটিতে অন্যূন দুই বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। (৪) হ্যাণ্ড কম্পোজিং, প্রিণ্টিং মেসিন ও বাইণ্ডিং-এ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। **বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা:** (১) প্রিণ্টিং-এর যে কোন ব্রাঞ্চে স্পেশালাইজেশনের সার্টিফিকেট। (২) কম্পিটং এবং অথবা এস্টিমেটিং-এ সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা। (৩) মেকানিক্যাল কম্পোজিং, রোটারী প্রিণ্টিং মেসিন ও স্টিরিও টাইপিং-এ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। (৪) ইনসেনটিভে কাজ করার সহিত যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা। **বয়স:** ১৮ ও ২৮ **বৎসরের মধ্যে।** বেতনক্রম: ২০৫—২৮০ টাকা, তৎসহ বিভিন্ন সময়ে অনুমোদিত মতে অন্যান্য ভাতাদি।

সাধারণ নির্দেশাবলী: মাত্র ২ টাকা আদায় দিয়া তপশীলী জাতি এবং তপশীলী উপজাতি এবং নিম্নে উল্লিখিত মত পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত এবং বর্মা ও সিংহল হইতে প্রত্যাগত যথার্থ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য ৫০ পয়সা) গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলি হইতে নির্ধারিত দরখাস্ত ফর্মে প্রার্থীর স্বহস্তে (পুরুষ মহিলা) লিখিত এবং স্বহস্তে (পুরুষ মহিলা) স্বাক্ষরিত যোগ্যভাবে পূরণ করা দরখাস্তসমূহ ৩১শে **মার্চ, ১৯৭১** তারিখে **বা তাহার পূর্বে বেলা ১টার মধ্যে** নিম্নোক্তের অফিসে পৌঁছানো চাই—

জেনারেল ম্যানেজার (রিক্রুটমেণ্ট),
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে,
মালিগাঁও,
গৌহাটি—১১,
কামরূপ (আসাম)

(২) রেলওয়েতে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের নিশ্চিত হইতে হইবে যে, তাঁহাদের দরখাস্ত নিয়মানুগ পদ্ধতিতে ধার্য তারিখ অর্থাৎ **৩১শে মার্চ,** ১৯৭১ তারিখের মধ্যে যাহাতে পৌঁছায়, অন্যথায় তাঁহাদের বিষয় বিবেচিত হইবে না।

(৩) ১-৩-১৯৭১ তারিখানুযায়ী বয়স নির্ধারিত হইবে। নিম্নোক্তদের ক্ষেত্রে নিম্নানুযায়ী উচ্চতর বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য —(ক) (১) তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতির প্রার্থী, (২) ভারতে পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের প্রার্থী অর্থাৎ বর্তমানে যে অঞ্চল লইয়া পণ্ডিচেরী ইউনিয়ন টেরিটরি গঠিত সেই অঞ্চলের বাসিন্দা এবং চন্দননগরের পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের বাসিন্দাগণ ব্যতীত যাঁহারা ফরাসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর। (খ) যুদ্ধরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যুদ্ধে কাজ করার এবং পরবর্তী সামরিক বাহিনীতে চাকরির কাল পর্যন্ত। (গ) রিজার্ভিস্টদের ক্ষেত্রে ৪০ **বৎসর পর্যন্ত।** (ঘ) (১) গোয়া, দমন ও দিউয়ের পূর্বতন পর্তুগীজ অঞ্চলের বাসিন্দা; (২) কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, উগাণ্ডা ও জাঞ্জিবার প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি হইতে ঐ সকল দেশে সংবিধান পরিবর্তনের ফলে ভারতে আগত জন্মসূত্রে ভারতীয়গণের (ঐ সকল দেশে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহ) ক্ষেত্রে—যদি তাঁহারা যে অঞ্চলে সাময়িকভাবে বসবাস করিতেছেন তথাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে এই মর্মে সন্তোষজনক প্রমাণপত্র দাখিল করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসর। (ঙ) ৩য় শ্রেণীর ও ৪র্থ শ্রেণীর (ক্যাজুয়াল শ্রমিকগণ বাদে) রেলওয়ের চাকরিরত কর্মীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সর্বোচ্চভাবে ৩ বৎসর ও ১০ বৎসর সাপেক্ষে নিয়মিত কাজের কাল পর্যন্ত। (চ) অ্যাপ্রেণ্টিস পর্যায়ে নিয়োগের জন্য ৩০ বৎসর পর্যন্ত। (ছ) (১) ১-১১-১৯৬৪ তারিখে বা তাহার পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত (তঃ জাঃ ও তঃ উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ বৎসর)। তাঁহাদের এই সংগে তাঁহারা সাময়িকভাবে যে অঞ্চলে বাস করিতেছেন তথাকার ট্রানজিট সেণ্টার রিলিফ ক্যাম্পের ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট বা ঐ অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে। (২) উপযুক্ত সার্টিফিকেট কর্তৃক সমর্থিত হইলে যথাক্রমে ১-৬-১৯৬৩ এবং ১-১১-১৯৬৪ তারিখে বা তাহার পর বর্মা ও সিংহল হইতে ভারতে প্রত্যাগতদের ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত।

(৪) প্রার্থীদের **চারটি** (৪) সাম্প্রতিককালের পাসপোর্ট সাইজের ফটোর কপি পাঠাইতে হইবে। তন্মধ্যে একটি দরখাস্ত ফর্মে সাঁটিয়া দিতে হইবে এবং অপর **তিনটি** (৩) **অ্যাটেস্টেশন ফর্মে** সাঁটিয়া দিতে হইবে। সকল ফটোতে প্রার্থীর স্বাক্ষর থাকা চাই।

দ্রষ্টব্য—১২ হইতে ১৬ নং পর্যায়ের জন্য প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত অ্যাটেস্টেশন ফর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ৩টি ফটো ছাড়াও একটি কপি দরখাস্ত ফর্মে সাঁটিয়া দিতে হইবে এবং অপর একটি কপি ফর্মে সেলাই করিয়া দিতে হইবে।

(৫) যে সকল দরখাস্ত উপরোক্ত নির্দেশাবলীর এবং দরখাস্ত ফর্মে সম্বলিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী অনুসৃত হইবে না, সেইগুলি সংগে সংগে বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) উপরোক্ত পদসমূহে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রয়োজনবোধে টেরিটোরিয়াল আর্মি সার্ভিসে সাত (৭) বৎসর এবং টেরিটোরিয়াল আর্মি রিজার্ভে **আট** (৮) বৎসর অথবা এই ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে নির্দেশিত হইবে সেইমত কালের জন্য টেরিটোরিয়াল আর্মির রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং ইউনিটে সামরিক বাহিনীতে চাকরি করিতে হইবে।

(৭) পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে, রিক্রুটমেণ্ট কমিটি মালিগাঁও গৌহাটি-১১-এর অফিসে দরখাস্ত ফর্ম বিক্রয় করা হয় না।

(৮) ৫ ও ৬ নং **পর্যায় ব্যতীত মহিলা প্রার্থীদের আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই।**

(৯) তপশীলী জাতি এবং তপশীলী উপজাতির গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের নিম্নোক্ত অফিসারগণের নিকট হইতে তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে:

(১) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট/অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট/কালেকটর/ডেপুটি কমিশনার/অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার/ডেপুটি কলেক্টর/ফার্স্ট ক্লাশ স্টাইপেণ্ডারী ম্যাজিস্ট্রেট/একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার।

(২) সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট/তালুকা ম্যাজিস্ট্রেট/এক্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট—১ম শ্রেণীর স্টাইপেণ্ডারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদমর্যাদার নীচে না হয়।

(৩) চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট/অ্যাডিশনাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট/প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট।

(৪) তহশীলদারের পদমর্যাদার নীচে নয় এরূপ রেভিনিউ অফিসার।

(৫) প্রার্থী এবং/অথবা তাঁহার পরিবার সাধারণভাবে যেস্থানে বাস করেন, তথাকার সাব-ডিভিশনাল অফিসার।

(৬) সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কাউণ্টারসহিকৃত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের গেজেটেড অফিসারগণ।

(৭) অ্যাডমিনিস্ট্রেটর / অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সেক্রেটারী (লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ)।

এই সার্টিফিকেট নিম্নোক্ত আকারে হইতে হইবে:—

ইহা সার্টিফাই করা যাইতেছে যে, শ্রী/শ্রীমতি........................

....

রাজ্যের..................

..................জেলা/ডিভিশনের

...........গ্রামের শ্রী.............পুত্র/কন্যা.........

গোষ্ঠীভুক্ত যাহা কনস্টিটিউশন অর্ডার (তপশীলী জাতি), ১৯৫০/কনস্টিটিউশন (তপশীলী উপজাতি) অর্ডার, ১৯৫০/কনস্টিটিউশন (তপশীলী জাতি) পার্ট 'সি' স্টেটস) অর্ডার, ১৯৫১/কনস্টিটিউশন তপশীলী উপজাতি) (পার্ট 'সি' স্টেটস) অর্ডার, ১৯৫১-এর অধীনে একজন তপশীলী জাতি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃত।

শ্রী........................এবং/অথবা তাঁহার পরিবার সাধারণভাবে.........রাজ্যের............জেলা/ডিভিশনে বসবাস করেন।

(অফিস সীল)

স্বাক্ষর........................
পদমর্যাদা
স্থান........................
তারিখ........................

এই সকল সার্টিফিকেট দরখাস্ত ফর্মের নির্দেশাদির কাগজে নির্ধারিত আকারে হইতে হইবে।

টি/৫, ২, পি টি-২

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮
শনিবার ২১ ফাল্গুন ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩   ২৩-৮৫৫১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	... ৩২·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	... ১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	... ৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	.. ৩৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ..	... ১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ..	... ৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	... ৫৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	... ২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	... ১৪·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৪৪·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	... ২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	... ১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	... ৮৩·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	... ৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	... ২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 6 March 1971

আসন্ন নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনের আর মাত্র তিন চারটি দিন বাকি, তার পরই সেই দশই মার্চ. পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের আবার একটি নব অধ্যায় শুরু হবে। উনিশ শো সাতষট্টির নির্বাচন. উনোসত্তরের মধ্যবর্তী নির্বাচন—এই দুটি নির্বাচনেরই ফলাফল এবং তার প্রভাব আমাদের জানা. সে-অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে যেতে পারি না। তার জের এখনও চলছে। আপাতত যেটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার দিকেই সকলে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছি. কার কপাল ফিরবে আর কার কপাল পুড়বে কে জানে!

নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। প্রথমত এই যে, রাজনৈতিক নেতারা দলীয়ভাবে যে যাই বলুন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ, শতকরা নিরানব্বই জনই বোধ হয় এই নির্বাচনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করেননি. করছেনও না। করার সঙ্গত কোনো কারণও নেই। একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের জবরদস্ত সমর্থক, এই নির্বাচনে উৎসাহ বোধ করছেন। আজকের নির্বাচনের দাবিদার প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলি। তাঁদের উদ্দেশ্য, সরকারী ক্ষমতা দখল। সাধারণ মানুষের মনের ইচ্ছায় এবং দাবিতে নির্বাচন যদিও হচ্ছে না তবু সরকার আইনমত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন, নির্বাচন হচ্ছে। আমাদের পক্ষে এখন এটা বাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, নির্বাচন যখন হচ্ছে তখন সরকারের প্রধান কয়েকটি দায়িত্ব আছে। সরকারের কর্তব্য, এই নির্বাচনকে স্বাধীন ও সুষ্ঠু করে তোলা। অন্যান্য নির্বাচনে সরকারের কাজ ছিল শুধুমাত্র নির্বাচন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি করা, এবারে সেটার চেয়েও জরুরী হয়ে পড়েছে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা। অনুমান করা হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনের কাজে তেমন অশান্তি হবে না, তবে শহরাঞ্চলে হওয়া সম্ভব। বিশেষ করে, কলকাতায় ও তার উপকণ্ঠের কয়েকটি এলাকায় গোল-মালের সম্ভাবনা সকলকেই শঙ্কিত করে তুলেছে। বস্তুত কী ধরনের হাঙ্গামা হুজ্জত হতে পারে তা বলা যায় না। শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার কতটা সফল হচ্ছেন তার ওপর নির্বাচনের বারো আনা নির্ভর করবে।

তৃতীয় কথা, ভোটদাতাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। যে যতই বলুন, ভোটের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অনাগ্রহ বা অনিচ্ছার একটি বড় কারণ তাঁরা কেউই আজকের অবস্থায় নিরাপদ বোধ করেন না। দোষ তাঁদের নয়, দোষ আমাদের রাজনীতির। রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, হয় কোনো রাজ-নৈতিক দলের সক্রিয় সহায়তায় ভোটদাতাকে ভোট দিতে যেতে হবে, না হয় ভোট দিতে যাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এক-একটি মহল্লার রাজনৈতিক প্রভাব ও জঙ্গীপনাই সেই অঞ্চলের ভোটদাতাদের নিয়ন্ত্রিত করবে। মানুষ নিজের ইচ্ছায় ও খুশিমতন কিছুই করতে পারবে না।

তবু, এই নির্বাচনের অশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভোটদাতার সামনে আজ দুটি মাত্র পথ খোলা। হয় মার্কসপন্থী কম্যুনিস্ট দলকে ক্ষমতায় আনা, না হয় সি-পি-এম-বিরোধী দলকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য সি পি এম-বিরোধী দলেরও দুটি অংশ আছে, একটি অংশ নব বা আদি কোনো কংগ্রেসকেই বরদাস্ত করে না। ভোটদাতাদের অনিচ্ছা যতই থাক, আজ তাঁদের এই দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির একটিকে বেছে নিতে হবে। জীবনের ভয় দূর করে সকলে ভোট কেন্দ্রে যথাসময়ে হাজির হবেন এমন আশা আমরা করি না, তবু বলি—এই নির্বাচনকে এখন আর দূরে সরিয়ে রাখলে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আমাদের অনুরোধ, পরস্পরের মধ্যে হানাহানি বন্ধ রেখে অন্তত এখনও নির্বাচনের একটা সুস্থ আবহাওয়া আনার চেষ্টা করুন। ভোটদাতাদের মনে সাহস আসুক খানিকটা। হারজিতের প্রশ্নের চেয়েও বড় প্রশ্ন মানুষকে এইভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে পরিণামে লাভ হবে না। ভীত ও সন্ত্রস্ত মানুষ চিরকাল ভীত থাকে না। তার সহিষ্ণুতা এবং ভয়ের সীমা শেষ হলে সে ঘুরে দাঁড়ায়। আর তখনই বোমা বন্দুক পাইপগানের জোর ফুরিয়ে যায়।

আমাদের সরকার ভোটদাতাদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তার ওপর এখনও পর্যন্ত বিশেষ ভরসা কারও দেখা যাচ্ছে না। যদি শেষ পর্যন্ত সেই ভরসা মানুষ পায়—এই নির্বাচন বাংলা দেশের রাজনীতির আর-এক নব পর্বের সূচনা করবে। সেটা ভাল কী মন্দ সে-প্রশ্ন এখন না তোলাই ভাল।

চ্যালেঞ্জ!
মুজিবর রহমান

পরম পূজনীয় রাজ্যপাল স্যার

এই ক'দিন আগে শহীদ মিনারের তলায় আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা যে ভাষণটা দিলেন, খবরের কাগজে নিশ্চয়ই তার রিপোরট এতদিনে পড়ে ফেলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি স্যার আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার স্পিচ্ কানে শুনলে যতটা ইয়ে মানে প্রেরণ পাওয়া যায়, রিপোরটে তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না।

অচ্ছা স্যার, আপনি দেশ কিংবা আনন্দ-বাজারে অরণ্যদেব সিরিজ পড়েন? কিংবা হিন্দী পেপারে 'বন ভৈরব?' পড়েন না! আপনি অরণ্যদেব পড়েন না, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার ময়দান মিটিং-এর স্পিচ্ শোনেন না, আপনাকে নিয়ে আমরা যে কী করব, ভেবেই পাইনে।

আমি কিন্তু স্যার, অরণ্যদেব পড়ি, মাঠে গিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার মাইকের ভিতর দিয়ে ঢোলাই করা স্পিচ্ও শুনি। সত্যি বলছি স্যার, ওই দুইই আমার দারুণ লাগে। "লোকে বলে অরণ্য-দেবের কণ্ঠস্বর শুনলে পাপিষ্ঠদের রক্ত হিম হয়ে আসে"—এই রকম একটা কোটেশন অরণ্যদেব সিরিজে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার ময়দানী গর্জনও স্যার অবিকল ওই রকম একটা এফেকট্ সৃষ্টি করে।

মনে নেই স্যার, ক'দিন আগে আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা যেসব পুলিস অফিসার আমাদের মহান পার্টির নির্দেশ অমান্য করে চলেছে, আমরা যে-সব সমাজ-বিরোধীদের তালিকা তৈরি করে দিচ্ছি তদনুসারে যে-সব অকমরেড পুলিস অফিসার ধরপাকড় চালাতে অস্বীকার করছে তাদের কী কড়কানিটাই না দিলেন, উফ্ চার-দিকে কী তোলপাড়টাই না হল! আপনি অরণ্যদেব পড়ে দেখবেন স্যার, মাঝে মাঝে তাতে এই রকম লেখা থাকে "ক্রুদ্ধ অরণ্য-দেবের কণ্ঠস্বর যেন বজ্রের আওয়াজ—অরণ্যের প্রবাদ।" ক্রুদ্ধ জ্যোতি বোসদার আওয়াজও স্যার আমার কানে ঐ রকম। আমি স্যার অরণ্যদেবকেও লাইক করি, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদাকেও লাইক করি। তবুও মাঝে মাঝে আমার না স্যার আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদাকে কমরেড অরণ্যদেবের চাইতে আরও গ্রেট বলে মনে হয়। অনেস্ট্!

আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার প্রসঙ্গে অরণ্যদেবের কথা কেন উঠছে? অরণ্যদেব সিরিজ পড়া থাকলে স্যর আপনি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসই করতেন না। আমার ধারণা, আপনি না পড়লেও আমাদের রাজ্যপাল মাসীমা নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে অরণ্যদেব পড়েন। আপনি এ প্রশ্নটা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, দুজনের কোথায় যে মিল, উনি নিজেই দেখিয়ে দেবেন।

আমিও স্যর নাট্শেলে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

প্রথম মিল : অরণ্যদেব দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদাও দেখুন, বেছে বেছে

কমরেড অরণ্যদেব

পুলিসমন্ত্রীর পদটি নিয়েছিলেন। কেননা উনিও দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করতে ভালবাসেন। (এখানে অবিশ্যি শিষ্ট অর্থে আমাদের পার্টি কমরেড এবং দুষ্ট অর্থে অন্য পার্টির লোকেদের ধরে নিতে হবে।)

দ্বিতীয় মিল : অরণ্যদেব অরণ্যের এক-চ্ছত্র অধিপতি। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করবেন বলে পশ্চিম-বাংলায় অরণ্যের আইন চালু করে দিয়েছেন। (প্রমাণ : "তবে আমাদের উপর বোমা ছুঁড়লে আমরা কী করব? রাজ্য-পালের কাছেও আমরা এই প্রশ্ন করে তাঁকে বলে এসেছি বোমার বদলে কি আমরা রসগোল্লা ছুঁড়ব? আমাদের পিস্তল দিয়ে আক্রমণ করলে আমরা কী করব? বাঁচবার অধিকার, আত্মরক্ষার অধিকার আমাদেরও আছে। এই পবিত্র অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"—প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার ময়দান ভাষণ, ২৬ ফেবরুয়ারি '৭১)।

আত্মরক্ষার পবিত্র অধিকারের কায়দাটা যে কী, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা তাঁর ভাষণে সেটি উহ্য রেখেছেন। তবে সেটা যে কী তা বোঝা যাবে ২৭ ফেবরুয়ারি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট্ট একটু খবর পড়লে। ঐ খবরে বলা হয়েছে : "পুলিস কাটোয়া সি পি আই (এম) অফিসে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে চারটি পাইপ গান, চারটি অ্যাসিড বালব, তিন বস্তা ভর্তি হাতবোমা উদ্ধার করে।" শুধু কাটোয়াতেই নয় স্যার, সর্বত্রই সি পি এম-এর "আত্মরক্ষা"র প্যাটারন এই।

পরম পূজনীয় রাজ্যপাল স্যর, সভ্য দেশের মানুষ আত্মরক্ষার পবিত্র অধিকার রক্ষার জন্য নিজের বাড়িতে বা পার্টি অফিসে পাইপ গান, অ্যাসিড বালব, হাত-বোমা রাখে? কখনো শুনেছেন? কোথায় রাখে তা আপনি অরণ্যদেবের কাহিনী পড়লেই জানতে পারতেন। কেননা অরণ্যের প্রবাদেই বলা হয়েছে, "গভীর অরণ্যে সভ্য মানুষের রীতিনীতি অচল। সেখানে অরণ্যদেব শাসন করেন।"

এবং সব থেকে বড় মিল : অরণ্যদেবের গায়ে গুলি ছুঁড়লে, তাতে তাঁর গা বড় জোর ছড়ে যায়, মারাত্মক ক্ষতি কখনোই হয় না। স্যর, আপনি যদি অরণ্যদেব সিরিজের কাহিনীগুলো পড়তেন, কেন পড়েন না স্যর, প্লিজ স্যর, এবার থেকে নিয়মিত পড়বেন, তা হলে দেখতেন প্রতি সিরিজেই অরণ্যদেব বার কয়েক গুলি খেয়ে থাকেন এবং অবলীলাক্রমে সে-সব অগ্রাহ্য করে উড়ুতোড়িয়ে শত্রু নিধন করেন।

আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদাও স্যর, দেখুন, একবার গুলি এবং দু দুবার বোমা হজম করে দিব্যি স্বকার্য সাধন করে চলেছেন।

আবার দেখুন স্যর, অরণ্যদেবের সাকরেদ হচ্ছে গভীর অরণ্যনিবাসী ব্যানডর জাতি, যাদের কাছে সর্বদা বিষাক্ত তীর থাকে। এবং আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোস-দার ক্যাডারদের কাছে মজুত থাকে পাইপ গান, বোমা, অ্যাসিড্ বালব (শুধু থাকে না রসগোল্লা।) অরণ্যদেবের নির্দেশ নত-মস্তকে মানে যেমন অরণ্যরক্ষী বাহিনী, তেমনি আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদার, নির্দেশ এখনও মানে আমাদের সি পি এম-এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন পুলিস।

আরও শুনুন, অরণ্যের প্রবাদ, অরণ্য-দেবকে কেউ হারাতে পারে না। আবার আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা যা বলছেন তাও শুনুন : "আমাদের খতম করার ক্ষমতা ওদের নেই—দিল্লিরও নেই।"

তবু স্যর বলবেন, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড জ্যোতি বোসদা স্বয়ং কমরেড অরণ্যদেব নন?

ঐতিহাসিক নির্বাচন

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন ভারতের বহু রাজ্যে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ ভোটদাতাই তাঁদের রায় জানিয়ে দিয়েছেন। সে রায় প্রকাশিত হতে অবশ্য আরও কয়েকদিন সময় লাগবে। কারণ নির্বাচন কমিশন স্থির করেছেন, সব রাজ্যে ভোট গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশ করা হবে না। পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণ ১০ মার্চ বিকেল অবধি। তার আগে অন্য কোনও কেন্দ্রের ফলাফল জানা যাবে না।

১১ তারিখ থেকে পুরোদমে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ শুরু হবে। ১১ তারিখই বোঝা যাবে, ট্রেন্ডটা কী, কোন দিকে হাওয়া বইছে। লোকসভারও। যেসব রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হচ্ছে সেইসব বিধানসভারও।

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং ওড়িশা বাদে আর সব রাজ্যে হচ্ছে শুধু লোকসভার নির্বাচন। এই তিনটি রাজ্য ছাড়া আর কোথাও রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষভাবে এই নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত নয়। পরোক্ষ সম্পর্ক অবশ্য আছে। লোকসভার নির্বাচনী ফলাফলের উপর, আগামী কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বহু রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল যাই হোক অবিলম্বে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের উপর তার কতকগুলি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই।

যেমন ধরুন উত্তরপ্রদেশের কথা। শ্রীমতী গান্ধী যদি এই নির্বাচনে জিতে যান অর্থাৎ তিনি যদি সরকার গঠন করতে পারেন তাহলে উত্তরপ্রদেশের টি এন সিং সরকারের পক্ষে বেশীদিন আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না। ভেতরের ও বাইরের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে উত্তরপ্রদেশের এস ভি ডি সরকারের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে। প্রায় সব সরকারী দলেই ভাঙ্গন দেখা দেবে। আবার যদি শ্রীমতী গান্ধী সরকার গঠন করতে না পারেন তাহলেও তার প্রভাব এসে পড়বে উত্তরপ্রদেশ সরকারের উপর। কারণ তাহলে জাতীয় রাজনীতিতে এত ওলটপালট হবে যে তার ধাক্কা সামলে বর্তমান এস ভি ডিকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে।
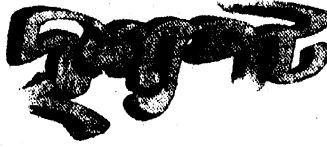
বিহারের ক্ষেত্রেও অনেকটা এই কথাই প্রযোজ্য। বিহারেও সংযুক্ত বিধায়ক দলের সরকারই ক্ষমতায়। যদিও শরিক দলগুলি দুই রাজ্যে এক নয়। আলাদা আলাদা। কতকগুলি অবশ্য দু রাজ্যেই কমন। তবে লোকসভার নির্বাচনের প্রভাব দুই রাজ্য সরকারের উপর মোটামুটি একইভাবে পড়তে বাধ্য।

প্রধানমন্ত্রী যদি জিতে যান তার প্রভাব মহীশূরে এবং গুজরাট সরকারের উপরও পড়তে বাধ্য। তাঁর জয়ের প্রভাব উত্তর প্রদেশ ও বিহারে যত দ্রুত পড়বে মহীশূরে এবং গুজরাটে অবশ্য তত দ্রুত আসবে না। কিন্তু আসবে যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীমতী গান্ধী জিতলে এই দুই রাজ্যে আদি কংগ্রেসের ওপর প্রচণ্ড আঘাত নামবে। বড় রকমের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে উঠবে। এবং সে ভাঙ্গনের ধাক্কায় এই দুই রাজ্যের বর্তমান সরকার দুটিও কেঁপে উঠবেন। গোটা দেশেই আদি কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আদি কংগ্রেসকে অর্থাৎ সর্বভারতীয় দল হিসাবে বাঁচিয়েই রাখা যাবে না।

আর যদি শ্রীমতী গান্ধী সরকার গঠন করতে না পারেন তারও প্রচণ্ড আঘাত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সমস্ত রাজ্যে। নব কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখাই তখন কঠিন হয়ে উঠবে। বিভিন্ন নব কংগ্রেসী রাজ্য সরকারে বিরাট ওলটপালট শুরু হবে।

✻

যে কোনও দিক দিয়েই বিচার করে দেখা যাক এবারের লোকসভা নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ লোকসভা নির্বাচন আগে কোনও দিন হয় নি। ১৯৬২ সন পর্যন্ত লোকসভার নির্বাচন নিয়ে তেমন কোনও উত্তেজনাই ছিল না। সবাই জানতেন কংগ্রেস জিতবেই। সবাই এও জানতেন, নেহরুই প্রধানমন্ত্রী হবেন।

১৯৬৭ সনের নির্বাচনে প্রথম সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু তাও নির্বাচনের আগে কেউই অনুমান করতে পারেন নি যে লোকসভায় কংগ্রেস এত কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনের আগে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব নিয়েও যথেষ্ট সংশয় ছিল। যদি নির্বাচনের ফলাফল ঠিক ওরকম না হত তাহলে সেবারই প্রধানমন্ত্রীর পদ অর্থাৎ কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব নিয়ে একটা বড় রকমের সংকট দেখা দিত। কিন্তু যেহেতু নির্বাচনে দলের অনেক বড় বড় নেতার বিপর্যয় ঘটল এবং পার্টি লোকসভায় অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশী আসন পেলেন তাই নেতৃত্ব নিয়ে তেমন একটা বড় রকমের কোনও সংঘাত হতে পারল না। সেবারের নির্বাচনের ফলাফলে দেশের রাজনীতিতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হল ঠিকই, কিন্তু সে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় গোটা দেশের রাজনীতিতে সঙ্গে সঙ্গে কোনও বিরাট ওলটপালট শুরু হয় যায়নি। যেমনটি এবার হতে পারে।

ভারতের ইতিহাসকেই এক নতুন পথে নিয়ে যেতে পারে এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। এই নির্বাচন সঙ্গে সঙ্গে নানা নতুন বিপদও ডেকে আনতে পারে। আবার এই নির্বাচন বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে দেশের আত্মরক্ষার একটা পথও বের করে দিতে পারে।

অনেক কিছুই নির্ভর করবে এই নির্বাচনের ফলাফলের উপর। দেশের

রাজনীতি তো নিশ্চয়ই। দেশের অর্থনীতিও। রাজনীতির সংগে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংগে অর্থনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

❋

কী হতে পারে এবারের ফলাফল?

কারু পক্ষেই সঠিক নির্বাচনী ফলাফল আগাম বলা সম্ভব নয়। আগে যেমন প্রায় সবাই ধরে নিতেন কংগ্রেস লোকসভায় নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেই এবার কোনও দল সম্পর্কেই তেমন ধরে নেওয়া যাচ্ছে না। একক নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার মত প্রার্থী দিয়েছেন একমাত্র নব কংগ্রেস। তাঁরা লোকসভার অর্ধেকের বেশী আসনে জিতবেনই একথা ধরে নেওয়া একমাত্র দলের উগ্র সমর্থক ছাড়া আর কারো পক্ষেই এখনই সম্ভব হচ্ছে না। দলের নেতারা যাঁরা নির্বাচনী প্রচারে বলছেন আমরা একা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবই তাঁরাও যে সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত নন তাঁদের ক্রিয়াকলাপেই সেটা ধরা পড়ছে।

যেমন ধরুন তামিলনাড়ু সম্পর্কে নব কংগ্রেস নেতৃত্বের সিদ্ধান্তটা। যদি তাঁরা বুঝতেন বা আশা করতেন যে গোটা দেশের নির্বাচনে তাঁরা অর্ধেকের বেশী আসন পাবেনই তাহলে কি তামিলনাড়ুতে ওভাবে ডি এম কের দাবির কাছে মাথা নত করে রাজ্যে দলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতেন?

কেন শ্রীমতী গান্ধী ডি এম কের দাবির কাছে মাথা নত করার জন্য স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের হুকুম দিলেন? মাত্র দুটো কারণে এই জিনিস তিনি করে থাকতে পারেন। (এক) তিনি ডি এম কেকে কোনও ভাবে চটাতে চান না। কারণ মনে করছেন যে নির্বাচনের পর কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য তাঁর ডি এম কের সমর্থন ও সাহায্য একান্তই আবশ্যক হবে। এবং (দুই) ডি এম কে তামিলনাড়ুতে তাঁর দলকে যে কটি লোকসভা আসন ছেড়ে দিয়েছে ডি এম কের সমর্থনে সেই কটিতে জয়লাভ করাতেই তিনি বেশী আগ্রহী। রাজ্য বিধানসভার উপর দৃষ্টি দেওয়ার মত অবস্থা এখন তাঁর নেই।

যে কারণেই প্রধানমন্ত্রী ডি এম কের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে থাকুন না কেন এটা পরিষ্কার যে তিনি যদি গোটা ভারতের অধিকাংশ আসনে তাঁর দলের প্রার্থীদের জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন তাহলে কিছুতেই এই সিদ্ধান্ত নিতেন না —এভাবে আত্মসমর্পণ করতেন না।

শ্রীমতী গান্ধী যদি অর্ধেকের চেয়ে ৫০টা আসনও কম পান তাহলেও তিনি অন্যান্যদের সমর্থনে সরকার গঠনের চেষ্টা করবেন। এই ব্যাপারে তিনি সমর্থন ও সাহায্য আশা করতে পারেন ডি এম কে, সি পি আই, পি এস পি, বি কে ডি, উৎকল কংগ্রেস, আকালী দল, বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতি দলের কাছ থেকে। এদের সমর্থনে যদি সরকার গড়তে হয় তাহলে এখন থেকেই এদের সংগে কিছুটা ভাল সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী সেই কাজটাই করছেন। তামিলনাড়ুতেও তাই করেছেন।

❋

সন্দেহ নেই, প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশে তাঁর দলের পক্ষে একটা বিরাট হাওয়া তুলতে পেরেছেন। এই হাওয়া যদি তাঁর সমর্থকরা এবং দলের প্রার্থীরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে তিনি একাই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও যেতে পারেন। যদি তা হয় তাহলে দল এবং দলের অন্যান্য নেতারা তাঁর নেতৃত্বের কাছে আরও বেশী করে আত্মসমর্পণ করবেন।

আর যদি তিনি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান তাহলেই দলের অন্যান্য নেতারা খেলা শুরু করবেন এবং সরকার গড়তে যেসব দলের সাহায্য প্রয়োজন হবে তারাও নানাভাবে চাপ দেবেন। নব কংগ্রেস অর্ধেকের যত কম আসন পাবেন তত এই খেলা এবং চাপ বাড়বে।

সেই অবস্থা হলে দুই কংগ্রেসের মিলনের দাবিও আবার উঠবেই। নব কংগ্রেস যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশ কম আসন পান এবং আদি কংগ্রেস যদি ৬০টা আসনেও জিততে পারেন তাহলে দুই কংগ্রেসের মিলনের দাবি দুই কংগ্রেসের ভেতর থেকে এবং বাইরেরও নানা মহল থেকে বিরাট সমর্থন পাবে। তখন একদিকে যেমন মহাজোট ভেঙে যাবে, তেমনি সরে যেতে হবে শ্রীমতী গান্ধীকে। দুই কংগ্রেসের মধ্যেই কিছু নেতা এই রকম একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁরা অতি সন্তর্পণে এ নিয়ে কিছু কথাবার্তাও বলে রেখেছেন।

নব কংগ্রেসের অধিকাংশ এম পিই স্বার্থের লোভে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে এসেছেন। এরা যদি দেখেন শ্রীমতী গান্ধীর হাতেই ক্ষমতা থাকছে তাহলে যেমন তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে চলার চেষ্টা করবেন, তেমনি যদি দেখেন সরকারী ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকছে না তাহলে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে চলে যেতেও এদের অনেকেরই এক মুহূর্তও লাগবে না।

২৭-২-৭১।

নবারুণ গুপ্ত

শান্তির শর্ত
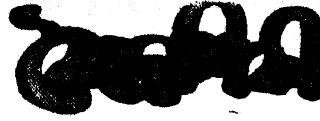
তাক লাগিয়ে দিয়েছেন দুনিয়াসুদ্ধ লোককে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নতুন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। যা নাসের পারেননি, তিনি তাই করেছেন—প্যাঁচে ফেলেছেন ইস্রায়েলকে আর তার মুরুব্বি আমেরিকাকে। পশ্চিম এশিয়াতে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে ইস্রায়েলের সঙ্গে আপসের তিনি যেসব শর্ত দিয়েছেন সেগুলো ইস্রায়েলও উড়িয়ে দিতে পারছে না, আমেরিকা তো নয়ই। একটা কিছু তাদের করতে হবেই, নইলে কেবল মুখ রক্ষে করা দায় হবে না, আর এক দফা লড়াই পশ্চিম এশিয়াতে ঠেকানো শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। কিছু না করলে নতুন করে যুদ্ধে নামার অজুহাত আরবদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইস্রায়েল যুদ্ধ করতে অবশ্য পেছপা নয়, লড়াইয়ের অতি-আধুনিক সরঞ্জাম তার ঘরে মজুত, টাকাও তার বিস্তর, শিক্ষিত সেনার অভাবও তার নেই। তবুও লড়াইয়ে কী যে হবে তা তো আর কেউ আগে থেকে সঠিক বলতে পারে না। খামাখা সে ঝুঁকি নেওয়ার দরকারই বা কী, বিশেষ যখন মিশর নিজেরা ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। ইস্রায়েলের খুঁটি যেমন আমেরিকা, মিশরের তেমনই তো রুশিয়া।

সাদাত বলেছেন, যদি ইস্রায়েল নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৬৭ সনের প্রস্তাব অনুযায়ী দখল করা আরব এলাকা ছেড়ে চলে যায় তাহলে সুয়েজ খাল তিনি খুলে তো দেবেনই, ইস্রায়েলকেও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবেন যা এতকাল আরব দেশগুলো দেয়নি। সুয়েজ খাল বন্ধ আছে চার বছর ধরে। ইউরোপ থেকে জাহাজ আসছে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে এসিয়াতে। সে খাল খুলে দিলে লম্বা পাড়ি বন্ধ হওয়ার দরুন খরচ সবারেরই বাঁচবে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের হবে আর্থিক লাভ, কাজেই টোপ সাদাত মন্দ ফেলেননি। সে খালে দুনিয়ার সব দেশের জাহাজ চলাচলের অবাধ অধিকার থাকবে, ইস্রায়েলও বাদ যাবে না। শুধু তাই নয়, ইস্রায়েলি জাহাজ যাতে নির্বিঘ্নে টিরানা প্রণালী দিয়ে যেতে আসতে পারে তার জন্যে শার্ম এল শেখে আন্তর্জাতিক পাহারা বসাতেও সাদাত রাজী। সে পাহারার ভার কে নেবে তা ঠিক করে দেবে নিরাপত্তা পরিষদ। দুনিয়ার চার প্রধান—রুশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স আর ব্রিটেনকে সে ভার দিতে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের আপত্তি নেই, ইহুদিরা সেখান থেকে চলে গেলেই হলো।

সবচেয়ে বড় কথা, সাদাত ইস্রায়েলকে মেনে নিতে চেয়েছেন। তবে সে ইস্রায়েলের

দেবরাজ

সীমানা হবে ১৯৬৭র ছদিনের যুদ্ধের আগে যা ছিল তাই অর্থাৎ ইস্রায়েলকে গুটিয়ে আসতে হবে তার মূল চেহারায়। এ ছাড়া প্যালেস্টাইন এলাকায় যারা উদ্বাস্তু হয়েছে তাদের একটা ব্যবস্থাও ইস্রায়েলকে করতে হবে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অন্যায় কিছু বলেননি। তাঁর কথা হচ্ছে, জোড়াতালি দিয়ে একটা সাময়িক মীমাংসা করার কোনও মানে নেই—যা করার তা পাকাপাকিভাবেই করা হোক। ১৯৬৭র আগুন তো একেবারে নিভে যায়নি, তাকে ছাই চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে বই তো নয়। গেল বছর সে আগুনের ফুলকি চারদিকে যেরকম উড়ছিল তাতে ভয় হয়েছিল দাউ দাউ করে সে আগুন বুঝি আবার জ্বলে ওঠে। একদিকে ইস্রায়েলিরা হানা দিচ্ছিল আরব এলাকায়—মিশর, লেবানন, জর্ডন, সিরিয়া—কিছু বাদ যায়নি। মরিয়া হয়ে আরবরাও পাল্টা হানা দিতে ছাড়েনি বিশেষ করে গেরিলারা। অনেক কষ্টে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয় আগস্ট মাসে দু পক্ষকে অস্ত্র সংবরণ করতে রাজী করিয়ে। সে চুক্তি আজও চলছে, তার মেয়াদ ফুরবে ৭ মার্চ।

সাদাতের কথা হচ্ছে, এর দরকার কী? দু পক্ষের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক না কেন। ইস্রায়েল আরব এলাকা ছেড়ে চলে যাক আর শান্তি চুক্তিতে সই দিক আরব দেশগুলোর সঙ্গে। সব ব্যাপারটা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মারফত হওয়াই তো ভাল। তা হলে কেউ কাউকে ধাপ্পা দিতে পারবে না। ১৯৬৭ সনের নভেম্বর মাসে জাতিপুঞ্জের সচিব উ থান্ট সুইডেনের কূটনীতিক গুনার ইয়ারিংকে আরব-ইস্রায়েল ঝগড়া মেটাবার জন্যে মধ্যস্থ নিয়োগ করেছিলেন। এতকাল তাঁকে কোনও পক্ষই পাত্তা দেয়নি। এবারে হাওয়া পালটেছে। ইয়ারিংয়ের সালিশী মানতে আরবরা রাজী। সাদাত তাঁর কাছেই তাঁর প্রস্তাব পেশ করেছেন। তাঁর পেছনে আছে অবশ্য রুশিয়া। আমেরিকাও সাদাতের উদ্যোগের সুখ্যাতি করেছে। তাঁর প্রস্তাব যদি সকলেই মেনে নেয় তা হলে পশ্চিম এসিয়ার অবস্থা শান্ত আর স্বাভাবিক হবে প্রেসিডেন্ট নিক্সনও তা স্বীকার করেছেন। মার্কিন সহকারী সচিব জোসেফ সিস্কো খানিকটা চাপও দিয়েছেন ইস্রায়েলের ওপর একটা ফয়শালা করে ফেলবার জন্যে। ইহুদিরা যতই চটুক আমেরিকার কথা তো তারা ফেলতে পারে না। কাজেই মনে যাই থাক, মুখে তারা সাদাতকে কটুকাটব্য করতে পারেনি।

রাগ ইস্রায়েলের গিয়ে পড়েছে গুনার ইয়ারিংয়ের ওপর। তাঁর অপরাধ তিনি দু পক্ষকেই চিঠি লিখেছেন কী কী শর্তে তারা বোঝাপড়া করতে পারে। ইস্রায়েলের কথা ইয়ারিং তো ডাকপেয়াদা, তাঁর আবার উদ্যোগী হয়ে মীমাংসার সূত্র খোঁজা কেন? কিন্তু ইয়ারিং তো আর গায়ে পড়ে কিছু করতে কবতে চাইছেন না, তাঁর পেছনে আছেন উ থান্ট আর নিরাপত্তা পরিষদ। কাজেই উত্তর তাঁর চিঠির একটা দিতে হয়েছে ইস্রায়েলকেও। তাতে সাদাতের প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়া না হলেও তাকে মেনে নেওয়াই হয়নি। ইস্রায়েল স্পষ্টই বলে দিয়েছে, আরবদের যেসব এলাকা সে দখল করেছে তার সবটা ছেড়ে দেওয়ার কথা উঠতেই পারে না। খানিকটা পেছিয়ে যেতে সে রাজী। কিন্তু ভবিষ্যতে আরবরা তাকে যাতে আর বিপদে ফেলতে না পারে সে জন্যে তার আত্মরক্ষার জন্যে দরকার এমন কিছু কিছু এলাকা সে নিজের তাঁবে রেখে দেবে। আর জেরুসালেম তো কিছুতেই সে ছাড়বে না, ওটা হচ্ছে ইহুদিদের মোক্ষ-ধাম, রাজধানী সে ওখানেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে—তাকে নতুন সাজে সাজাবার ব্যবস্থাও শুরু করে দিয়েছে।

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোলডা মেয়ার আর বৈদেশিক মন্ত্রী আব্বা এবান খোলাখুলি বলেছেন, ১৯৭১ সনে ১৯৬৭তে ফিরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বিনা শর্তে ইস্রায়েল যদি সুয়েজের পাড় থেকে পেছিয়ে আসে, সিনাই এলাকা ছেড়ে দেয় মিশরীদের, গোলান অঞ্চল সিরিয়াকে, জেরুসালেমের পূর্ব পাড়া জর্ডনকে তা হলে তো আরবরা আবার পেয়ে বসবে, আবার চড়াও হবে ইস্রায়েলের ওপর তাকে উচ্ছেদ করার জন্যে। তার চেয়ে বরং আরবরা ইহুদিদের সঙ্গে বৈঠকে বসুক, তখন দেখা যাবে কতটা আরব এলাকা তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দিতে পারে। ইস্রায়েলের সুবিধে হচ্ছে মিটমাট যদি কিছু নাও হয় তা হলেও তার কিছু এসে যায় না—যা নেবার তা তো সে নিয়েই বসে আছে। সাদাতও খুব অসুখী নন, তিনি জোর গলায় বলতে পারছেন দোষ ইহুদিদেরই, ফয়শালা তারা চায় না। তাঁর সঙ্গে রুশিয়াও যোগ দিয়ে কষে গাল দিচ্ছে ইহুদিদের। কূটনীতির খেলায় খানিকটা কোণঠাসা হয়েছে ইস্রায়েল। তবে সব চেয়ে বেশী মুশকিল হয়েছে আমেরিকার, ইস্রায়েল তো তারই হাতে গড়া, তাকে বাগ মানাতে না পারলে তার মান থাকে কোথায়?
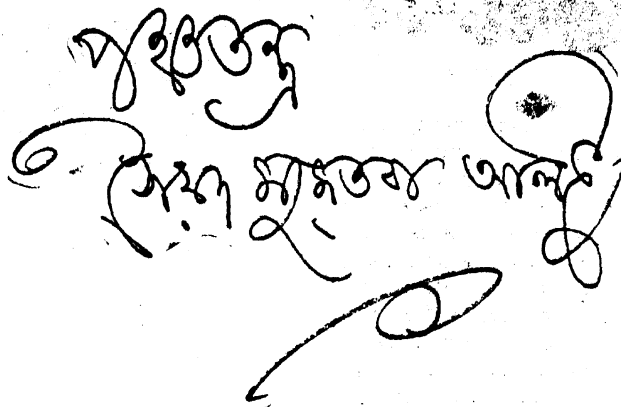
বিদেশে (৬)

ঐ যা যা! ট্রাঙ্ক লাইন কেটে গেল! পাবলিক বুথ থেকে ট্রাঙ্ক-কল করা এক গবরযন্তনা। আমি যে দুটি মুদ্রা মেসিনে ফেলে লুৎসেন পেয়েছিলুম, তার মানে ফুরিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো না ফেলার দরুণ লাইন কাট অফ। ফের ঢালো কড়ি।

অতি অবশ্য সত্য, ফোন যন্ত্রের গায়ে সুইটজরল্যান্ডে প্রচলিত তিন তিনটি ভাষা—ফরাসী, জর্মন এবং ইতালীয়—লেখা আছে কোন্ গুহ্য সরল পদ্ধতিতে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। লেখা তো অনেক কিছুই থাকে। ধর্মগ্রন্থে তো অনেক-কিছুই লেখা থাকে। সেগুলো পড়লেই বুঝি মোক্ষ লাভ হয়! জিমনাস্টিকের কেতাব পড়লেই বুঝি কিঙ্কঙ সিঙ-এর মত মাসল্ গজায়। প্র্যাকটিস করতে হয়। এবং তার জন্য খেসারতিও দিতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিনা যোগাভ্যাস করতে গিয়ে বিস্তর লোক পাগল হয়ে যায়!...আমি ইতিমধ্যে প্রায় দেড় টাকার মত খেসারতি দিয়ে "হ্যালো হ্যালো" করছি। আর, এ খেসারতির কোনো আন্তর্জাতিক মূল্য নেই। কারণ জর্মনি, ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রায় প্রত্যেক দেশই আপন আপন কায়দায় আপন আপন মেশিন চালায়। আর সেখানেই কি শেষ? তিন মাস পরে যখন ফের সুইটজারল্যান্ডে আসবো, তখন দেখব, বাবুরা এ-ব্যবস্থা পাল্টে দিয়েছেন। নূতন কোন্ এক আবিষ্কারের ফলে যন্ত্রটার ব্যবহার নাকি "সরলতর" করেছেন। "সরলতর" না কচু! তাই যারা এসব ব্যাপারে ওয়াকিফ-হাল নন, যারা এই হয়তো পয়লাবারের মত কন্টিনেন্ট যাচ্ছেন তাদের প্রতি আমার "সরলতম" উপদেশ, বিনা গুরু এসব যন্ত্রপাতি ঘাঁটাতে যাবেন না। অবশ্য গুরু পাওয়া সর্বত্রই কঠিন; এখানে আরো কঠিন। যে যার ধান্দা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। কে আপনাকে নিয়ে যাবে সেই বুথ-গুহায়, শিখিয়ে দেবে সে-গুহায় নিহিতং ধর্মস্য তত্ত্বং!

যাক্! ফের পাওয়া গিয়েছে লাইন।

"তুমি লুৎসেনে কখন আসছো?"

"অপরাধ নিয়ো না। আমি উপস্থিত যাচ্ছি কলোন। তারপর হামবুর্গ ইত্যাদি। তারপর লণ্ডন নটিংহাম। সেখান থেকে ফেরার পথে লুৎসেন। তুমি যেদিকে না দেওয়া পর্যন্ত তোমার বাড়িতে।"

"বাঃ! কিন্তু ততদিনে এখানে যে সব শীত জমে যাবে। গরম জামাকাপড় এনেছো তো? মাথাটা নিয়ে কিছু ভেবো না—সে যায় না।" আমার কাছে আছে।"

"তুমি এখনো ফ্রান্সিস আসিসীরই শিষ্য হয়ে গিয়েছ—কী করে কাতুর জনকে মদৎ করতে হয়, সেটি তোমার প্রধান চিন্তা। আমি কি তোমার স্কার্ট ব্লাউজ পরে রাস্তায় বেরোবো? সে-কথা থাক্। আমাকে এ্যারপর্টে আরো তিন ঘণ্টাটাক বসে থাকতে হবে। চলে এসো না এখানে। আজ তো রববার। তোমাকে আফিস দফতর করতে হবে না।"

"রববার! সেই তো বিপদ। বাড়ি থেকে যেতে হবে লুৎসেন স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিক। পঁয়ত্রিশ মাইল। সেখান থেকে বাস-এ করে তোমার এ্যারপর্টে। রববার বলে আজ ঢের কম সার্ভিস। সব কটা উঠতি নাবতিতে টায় টায় কোথায় পাবো কনেকশন—" আমি মনে মনে বললুম, "হুঁঃ। ফের সেই কনেকশন! ইলামবাজার রামপুরহাট। ফ্রিডি বললে,

"আচ্ছা দেখি" আমি বললুম "কতকাল তোমাকে দেখিনি।"

*

ফ্রিডি যদি এখানে আসে-ই তবে তার বাস্ দাঁড়ায় কোথায়? আমি বসে আছি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জারের খোঁয়াড়ে। এখানে তো ফ্রিডির প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য সে এ দেশের বাঁতিমত সম্মানিতা নাগরিকা (সংস্কৃত অর্থে নয়) সিটিজেন্। কাজেই সে স্পেশাল পারমিট যোগাড় করতে পারবে। তবে সেটা যোগাড় করতে করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে? আর আনতে পথে না ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে হয়তো আমার কলোন-গামী প্লেনের সময় হয়ে যাবে।

বাফস্টাণ্ডে যেতে হলে আমাকে খোঁয়াড় থেকে বেরোতে হয়। কিন্তু আমাকে বেরুতে দেবে কি? খোঁয়াড়ের বাইরেই স্বাধীন, মুক্ত সুইটজারল্যাণ্ড। তার জন্য ভিজার প্রয়োজন। আমার সেটা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কি হয় না হয়। সুকুমার রায় বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়।' সেইটে পড়ে আমার এক সখা ডাকপিয়নকে বলেছিল, "আমার কোনো

ঠিঠি নেই? কি যে বলছো? ফের খুঁজে দেখো। 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়'।"

খোঁয়াড়ের গেটে গিয়ে সেখানকার উর্দী'পরা তদারকদারকে অতিশয় সবিনয় নিবেদন করলুম, "সার! আমি কি একটু বাইরে ঐ বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে পারি?"

"আপনি তো ট্রানজিট। না?"

আমি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললুম, "বাস্-এ করে লুৎসেন' থেকে আমার একটি বান্ধবী—" হায় পাঠক, তুমি সেই তদারকদারের প্রতিক্রিয়া যদি তখন দেখতে। "বান্ধবী! বান্ধবী!! সেরতেন্মা (সার্টেনলি। চের্‌ৎমান্‌তে (ইতালিয়ানে, সার্টেন্‌লি)." এবং তার পর জর্মনে "জিখার জিখার" (শিওর, শিওর) এবং সর্বশেষে, যদি না বুঝে না পার, মার্কিন ভাষায় "শিওর, শিওর"।

আমি জানতুম, আমি যদি বলতুম, আমার বন্ধু আসছেন, সে বলতো, "নো।" যদি বলতুম আমার বৌদি, উত্তর হত তদ্বৎ। যদি বলতুম, বৃদ্ধা মাতা তখনো হত "না" —হয়তো কিঞ্চিৎ থতমত করে। কিন্তু বান্ধবী! আমার সাতখুন মাফ!

একটি পরমাদ

শাক্ত চট্টোপাধ্যায়

বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো!
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো, ভিতরে কেউ কাঁদছিলো......
বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো।
ও মন, দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়
একদিবসের প্রেমে প্রখর, স্মর-বিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো!
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক ছাপোষার হৃদয় হরণ সাধ ছিলো॥

নিদ্রা জাগরণের মাঝখানে

আনন্দ বাগচী

সমস্ত দেওয়াল জুড়ে কিছু কথা, কফিনের ভিতরে কাহিনী
ঘুমোয় নি, পাশ ফিরছে থেকে থেকে গভীর উদ্বেগে
পকেটে এখনো আছে সেই ময়লা ভাঁজকরা চিরকুট
স্বর্গের ঠিকানা খুঁজতে এসেছিল অন্ধকার গলির ভিতর
ফ্যাসফেঁসে গলায় কেশে গুটিকয় দেশলাইয়ের কাঠি
কয়েক ঝলক শুধু রক্ত তুলেছিল তার হাতে,
স্বর্গ খুঁজতে এসেছিল কুঁজো লোকটা দেওয়াল হাতড়িয়ে।
শেষ প্ল্যাটফর্ম কিংবা হাসপাতাল বোঝাই গেল না
হয়ত শেষ ট্রেন গেছে বহুক্ষণ, যেমন গিয়েছে চিরকাল
নিদ্রাতুর যাত্রী দল তুলে নিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে,
ঘণ্টা হলে বাঁশি বাজলে,

, সবুজ পতাকা-আলো-সিগন্যালের চোখ
যে-যার নিজের কাজ সেরে গেলো মধ্যরাতে, পিস্টনে দাঁত ঘষে
ফিসপ্লেট কাঁপিয়ে তার ঝড়ো মন্ত্রে ধুলোর ফুঁ দিয়ে
গনগনে বয়লার বুকে মত্ত রেল হুইসেলে হুইসেলে।

নিভেছে দেশলাই কাঠি, জীর্ণ ম্লান ভাঁজকরা চিরকুট
পকেটে এখনো আছে, কুঁজো লোকটা বিহ্বল তাকিয়ে:
চোখের পলকে গেল শেষ ট্রেন-ভর্তি প্যাসেঞ্জার
কিছু মালপত্র শুধু পড়ে রইল : মানুষের বিচিত্র লাগেজ
অংগ প্রত্যংগের মত টুকিটাকি, অন্তর্গত অবিচ্ছেদ্য পুঁজি

নিজের রক্তকে আমি ....

শিপ্রা ঘোষ

সমস্তই ছকে বাধা পর পর সাজানো সুন্দর
অন্ধকার বেশ্যালয় আত্মহত্যা প্রগতি ও নারী।
অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার ছায়া রক্তের সোপানে প্রায়লীন;
বুকের ভেতরে কিছু দীর্ঘশ্বাস চুম্বন উষ্ণতা

আমাদের সব স্বপ্ন বধ্যমঞ্চে নষ্ট বাসনায়
পদ্মপত্রে সমর্পিত প্রিয়তম জলবিন্দু প্রেম,
শরাহত হরিণীর মতো তিক্ত বিস্বাদ জীবনে
প্রথম বৃষ্টির রঙে কাঁপে অন্তহীন পিপাসায়

বন্ধদ্বার খুলো তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছার বাগানে
মনে হয় ঘুরে আসি : এই আলো অন্ধকারে সুখ
কোথায় খুঁজবো তীব্র আকাঙ্ক্ষার ঈপ্সিত অসুখ,
উন্মুখ অস্তিত্ব গাঢ় রুদ্ধশ্বাস মৃত্যুর নগ্নতা?

নিজের রক্তকে আমি আজও চিনি না প্রিয়তম
ইচ্ছার বাগানে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের ভেতরে,
গভীর ক্ষীরের রসে রক্তের প্রতিচ্ছায়া মিশে
পুঞ্জ পুঞ্জ দুঃখে গড়ে তোমার ব্যাকুল ওষ্ঠাধর।

নিজের রক্তকে যেন মনে হয় রাত্রির প্রবাসে
নিঃসঙ্গ স্মৃতির মতো : প্রচণ্ড খেলায় মেতে গিয়ে
চটুল বৃষ্টির ছলে যার সঙ্গে হঠাৎ অন্তত
[illegible]

কৌশিক এখনও ফেরেনি

ঠিক সন্ধ্যাবেলা, তখন সোমা সবে গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে শাড়ি পরছিল, বাইরের ঘরের দরজার কড়াটা নড়ে উঠল অস্থিরভাবে। তার দাদা কৌশিকের বন্ধুরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি কেউ আসে না। সন্ধ্যার পরেই সাধারণত ওদের আড্ডা জমে ওঠে বাইরের ঘরে। প্রায় প্রতিদিনই তাস চলে, কোনদিন তর্কবিতর্ক, কোনদিন রাগারাগি কাটাকাটিও যে হবার উপক্রম হয় না তা নয়।

অস্থির শব্দটা শুনে সোমার সন্দেহ হল কিশোরদা নয় তো। কিশোর মিত্র এ আড্ডারই নিয়মিত মেম্বার ছিল, ভাল গান গাইত। কলকাতায় রেডিওতে চান্স পেয়েছে। দু'দিন রেডিওতে গান শোনাও গেছে। এখন থেকে কলকাতারই বাসিন্দা হয়ে গেছে। সেজন্যই সকাল-বিকালে হারমোনিয়াম নিয়ে সোমা যখন গলা সাধে চোখ বুজে, তখনই কিশোরদার মুখটা তার মনে আসে।

দ্রুত পায়ে ভেতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলে দিল সে। দরজা খুলেই একটু চমকে দু' কদম পেছিয়ে এল সোমা। তার দাদার বন্ধুদের মধ্যে নিমাই। এই ভীষণ গরমকালেও গায়ে চাপানো সেই কালো কোটটা—সেটা আরো নোংরা হয়ে গেছে, নিমাইয়ের বড় বড় চুল উসকোখুসকো দাড়িও গজিয়েছে, চোখ আগের চেয়েও লাল। নিমাই মাঝে-মধ্যে খেয়াল হলে এখানে আসে। আজ অনেক দিন বাদে এল। সোমা কিছু বলবার আগেই নিমাই ঘরে ঢুকে পড়ল, সোমা পেছিয়ে সরে দাঁড়াল।

নিমাই কিছু জিজ্ঞেস করবে এই অপেক্ষায় সোমা দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু কিছুই সে জিজ্ঞেস করছে না, অথচ সেও নিতান্ত কিছু না বলে ঘরে ঢুকে যেতে পারছে না। শেষমেশ সোমাই বলল—'দাদার কিন্তু ফিরতে দেরি হবে।'

এ কথারও কোন উত্তর দিল না নিমাই, সে বেতের চেয়ারে বসে পড়ে কাগজের ওপরে চোখ রেখেছে, এ সময়ে তার ভুরু সামান্য কোঁচকাল মাত্র। অর্থাৎ এ সব জানবার তার কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হল না। ভেতরের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তবু কেমন যেন দায়িত্ব বোধ করছে সোমা—সে বলল, 'আপনাদের বন্ধু হরিদার খুব খারাপ অবস্থা, দাদা হাসপাতালে ওকে দেখতে গেছে।'

এ কথায় বড় বড় লাল চোখ তুলে নিমাই সোমার মাথার ওপর দিয়ে ঠিক দরজার ওপরে ক্যালেন্ডারের বাঘটার দিকে তাকাল। তাকিয়ে মুচকি হাসল। গোঁফঅলা বাঘটাকে বেড়ালের মত দেখাচ্ছে। সোমা আর দাঁড়াল না, ভেতরে ঢুকে খুব সন্তর্পণে, যাতে শব্দ না হয় এমন করে দরজা ভেজিয়ে ছিটকিনি আটকে দিল।

রান্নাঘরে সোমার মা এখন উনুনের ধারে বসে আছে, রুটি সেঁকছে। ছোট বোন দীপা বেলে দিচ্ছে। দীপা মাকে খুব জ্বালায় সোমার ধারণা, কারণ পাড়ার বখাটে ছোকরা বিভাসের সঙ্গে ওর লটপট চলছে, দীপা গোপনে রেজেস্ট্রি করেছে বলে সোমার ধারণা। সোমার বাবা গেছে বরাবর নদীর ধারে বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। ঘরে আর কেউ নেই। সোমা হারমোনিয়ামটা নিয়ে ঘরের কোণে তক্তপোশের ওপরে বসে ইমনকল্যাণ রাগে রেওয়াজ শুরু করল। সে সকালে আশাবরী রাগ ভেঁজেছে, তার গানের মাস্টারমশাই হরেনবাবু বলেছেন বিকেলে অন্তত একবার পূরবী কিংবা ইমনকল্যাণ রেওয়াজ করতে।

বাইরের ঘরে নিমাই সেই মুহূর্তে খবরের কাগজের একটা লম্বা টুকরো ছিঁড়ে নিয়েছে। কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত তার দু' হাতই সব সময় কাঁপে। সে কাগজটা নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়তে লাগল। এবং এ সময় ভেতরের ঘরের থেকে গানের শব্দ সম্ভবত তার কানে গেছে। কারণ তাকে সামান্য চঞ্চল এবং বিব্রত মনে হল। নিমাইয়ের দৃষ্টি ঘর-কোনো এক দিকে সাধারণত স্থির হয়ে থাকে

এবং এ সময়ে সে তার চোখের সামনে নানা দৃশ্য দেখতে পায়। সে এখন দেখল : একটা গোঁফঅলা হুলো বেড়াল একটা কচি বেড়ালছানাকে কামড়াচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে এবং মেরে ফেলার জন্য সেটাকে তার হিংস্র হাঁ-মুখে নিয়ে কোনো গোপন স্থানে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। এবং বেড়ালছানাটা বাঁচার জন্য শেষ আর্তনাদ করছে।

গানের শব্দে হয়তো এ-জাতীয় কোন আর্তনাদ বা ঐ দৃশ্য নিলয়ের মাথার ভেতরটা ছুঁয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন কিছুই স্পষ্ট নয়। তার মাথার ভেতরে যেন সব সময় গাঢ় কুয়াশা জমে থাকে। কুয়াশার মধ্যে সব দৃশ্য স্পষ্ট হবার আগেই হারিয়ে যায়। এবং নতুন কোন অসংলগ্ন দৃশ্য আবার ভেসে ওঠে। সাধারণত যে দৃশ্যটা প্রায়ই তার মাথায় ফিরে ফিরে আসে, এবারে হঠাৎ করে সে সেইটা দেখতে পেল : একটা বিরাট লম্বা হল-ঘর—তার দেয়াল কাচের, মেঝে কাচের, সিলিং কাচের। সেখানে আলো-অন্ধকারে উন্মত্তপ্রায়, অর্ধনগ্ন অসংখ্য মহিলা হল্লা করছে। আর ঠিক এমনি সময়ে একটি উলঙ্গ লোক মেঝের ওপরে এসে দাঁড়াল, কোথাও বাজনা বাজছে যেন এবং সেই লোকটি দু' হাতে অসংখ্য কাগজ ছড়াতে লাগল। মহিলারা সেই কাগজগুলোর জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ওই লোকটার মুখ আরেকটু স্পষ্ট হতেই মনে হল লোকটা অনাদি ঘোষ।

ক্রুদ্ধ কম্পিত হাতে নিলয় কাগজ ছিঁড়তে লাগল আরো দ্রুত।

অনাদি ঘোষ নিলয়ের বাবা। এবং এই মফস্বল শহরের একজন হোমরাচোমরা লোক। গোটা দশেক চা-বাগানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, লম্বাচওড়া—ফর্সা চেহারা। করলা নদীর ধারে বিঘে তিনেক জমির ওপরে একতলা ওদের পৈতৃক বাড়ি এবং বর্তমানে সামনের দিকে মডার্ন ডিজাইনের দোতলা বাড়ি এবং গোটা কয়েক গাড়ি। এ ছাড়াও কলকাতায় বালিগঞ্জ প্লেসে একটা বাড়ি রয়েছে। কিন্তু শুধুই এসবের জন্যেই নয়, অনাদি ঘোষের প্রতিপত্তি সামাজিক মান-সম্মান অন্য আরো দশটা কারণে। এ শহরের স্কুল-কলেজ খেলাধুলো ইত্যাদি জনহিতকর অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত। অনাদি ঘোষ সামাজিক মানুষ। এ শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিলয় সে অর্থে ভাগ্যবান। এমনি বংশে তার জন্ম এবং সে একমাত্র ছেলে অনাদি ঘোষের। এবং অনাদি ঘোষের মধ্যে যেটা অভাব ছিল ওর মধ্যে সেটা পূরণ হয়ে গিয়েছিল ছাত্র হিসাবে নিলয় মন্দ ছিল না, বরং ভালই ছিল বলা যায়, সায়েন্সে সে বায়োলজি নিয়ে পড়েছিল এবং তারপর কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হয়েছিল। তিন বছর সে পড়েওছিল, কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে হঠাৎ সে পড়া ছেড়ে দেয়। কারণ তখনই সে পাগল হয়ে যায়। লুম্বিনী পার্কে দেওয়া হয় ওকে। কেউ বলে একটি নার্সের প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছে, কেউ বলে মড়া কাটতে গিয়ে ভয় পেয়েছে। এসব কথা অবশ্য অনাদি ঘোষের মুখের থেকেই সবার শোনা। কিন্তু আসল কারণটা যেটা অনাদি ঘোষ কাউকে বলে না, সেটা তখন অবশ্যি সকলেই প্রায় জানে। সোমাও শুনেছে।

গান করতে করতে আজ যতবারই সোমা কিশোরদার মুখটা মনে আনতে চাইছিল, ততবারই নিলয়ের গাঢ় রক্তবর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত চোখ কিশোরের মুখটাকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। বিস্তারের সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই সহসা সোমার মনে হল বাইরের ঘরের আলো জ্বালানো হয়নি। কিন্তু এখন অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে এবং নিলয় একা সে ঘরে বসে রয়েছে। এ অবস্থায় বাইরের ঘরে যাওয়া চলে না, আগেই জ্বালানো উচিত ছিল, এ কথা মনে হওয়ায় অস্বস্তি হল সোমার। সে আরো ভাবল এখন নিলয়ের কাছে যেতে তার এত ভয়, অথচ যখন সে ভাল ছিল, কলকাতা থেকে ফিরে এসেই চলে আসত, মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করত 'কেমন আছ?' কখনো বলত, 'চা খাওয়াও দেখি কেমন পারো।'—বলে তার মাকে বলত—'মাসীমা, ওকে দিয়ে খুব কাজ করাবেন।' কীরকম স্মার্ট ছেলে ছিল, অথচ এখন সামনে দাঁড়ালে বুক কেঁপে ওঠে। সোমা একটা অস্বস্তির মধ্যে আ-আ করে গাইতে লাগল। তার কণ্ঠের ভেতরে উচ্চারিত সে শব্দ যেন সুরের গায়ে আঘাত করতে লাগল। তার গলা মুখ এবং বুকের ভেতরে রক্তবহা নাড়ীতন্ত্রীগুলো যন্ত্রণায় টান টান হয়ে উঠতে থাকল।

এ সময়ে বাইরের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডার রেগুলার মেম্বার তপন ব্যানার্জি হাঁকল 'কৌশিক।' তারপর কোন উত্তর না পেয়ে পান চিবুতে চিবুতে অন্য আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘর অন্ধকার। কিন্তু তপনের নাড়ীনক্ষত্র জানা এ ঘরের—সে বাঁ পাশে ঘুরে সুইচ টিপল। আলো জ্বলতেই সে অবাক হয়ে গেল নিলয়কে দেখে। চেয়ারে বসে সে তখনও কাগজ ছিঁড়ছে। তপন চেঁচিয়ে উঠল, 'কি রে শালা, তুই?' 'পাগলা' কথাটা স্বাভাবিকভাবেই তার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু সেটা সে উচ্চারণ করল না, কারণ কৌশিক রাগ করে। নিলয় কোন উত্তর না দেওয়াতে তপন এবারে হেসে বলল, 'ছিঁড়ে ছিঁড়ে তো পাহাড় বানিয়ে ফেললে বাবা।' তারপর তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চেয়ার দেখিয়ে বল, 'বসো সাহেব।'

সাহেব অর্থাৎ অতুল দত্ত 'ও-কে' বলে চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর নিলয়কে আরেকবার নিরীক্ষণ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তপনের দিকে তাকাল এবং ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—'এখনও সারেনি?' তপন মাথা দুলিয়ে ঠোঁট উল্টে জানাল—'না।' তখন হঠাৎ নিলয় তার রক্তবর্ণ চোখে অতুলের দিকে তাকাল। তপন তাড়াতাড়ি বলল, 'ওকে চিনলি না, নিলয়? অতুল—আমাদের এক বছরের সিনিয়ার, আর্টসে পড়ত।' অতুল তখন তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'গ্লাড টু মিট ইউ'—কিন্তু নিলয় সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতুল এতে খানিকটা অপমানিত বোধ করল এবং সে আত্মসচেতন হয়ে উঠল।

অতুল নিজেকে ওটাল ডার্ট বলে থাকে। তার গায়ের রঙ মিশমিশে কালো, লম্বা লম্বা চুল হিপিদের মত, জুলপি নীচের চোয়াল প্রায় ছাড়িয়ে গেছে। হলদে টেরিলিনের শার্টের ওপর একটা নীল টাই, কোমর থেকে নেমে একটা আঁটো জিনস্ তার দু পা আঁকড়ে ধরে আছে। বি-এ পাস করে এখানেই সে আগে অ্যান্টি-ম্যালেরিয়া ডিপার্টমেন্টে মেটবাবুর কাজ করত, এখন ছুটানে গেছে ডেপুটেশনে বছর তিনেক হল। বসতে তার সামান্য অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ মেদবহুল তার ভুঁড়িটা খানিক সামনে ঝুঁকে পড়েছে, সে দম টেনে বলল—'সো স্টাফি।'

'দাঁড়া, জানলাটা খুলে দেই'—বলে তপন দক্ষিণের ছোট্ট জানলাটা খুলে দিল। খোঁড়া মানুষের মত সামান্য কিছু বাতাস ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে ঘরে ঢুকল। অতুল পকেট থেকে তামাকের প্যাকেটটা বের করতে করতে বলল—'সো, টেল মি অ্যাবাউট ইওর বিজনেস, তোর কনট্রাক্টারি কেমন চলছে বল?' 'চলছে? চলছে কোথায় রে, জোরজার করে চালিয়ে যাচ্ছি'—তপন প্রায় সব সময়ই হাসে, এখনো হাসল। সে এখানকার পলিটেকনিক থেকে এল-সি-ই পাস করেছে। এতদিন চাকরির জন্য বসে থেকে, এখন কনট্রাক্টরি করছে। 'কেন বাবা, এ লাইনেই তো পয়সা এখন, আমাদের তো বাঁধা মাইনের চাকরি, নো ফিউচার অ্যাট অল।'—অতুল হাতের তালুতে তামাক ঘষতে ঘষতে বলল। 'টাকা ঢাললে তবে টাকা আসে এ লাইনে বুঝেছ, সাহেব। আমি শালা ট্রাকে করে চিপস সাপ্লাই করি তাতে আর ক' পয়সা?' তপন সহাস্য খেদোক্তি করল। 'টাকা ঢালো'—ঢালো কথাটা ঢেলে দেবার মত করে বলল অতুল। তপন হাসল—'তুই টাকা দে না, তোর বিজনেস লাগিয়ে দিই, তোর আমার ইকুয়াল শেয়ার।' অতুল সিগারেটের কাগজে জিভের থুথু লাগিয়ে বলল, 'আই ডোন্ট লাইক বিজনেস।'

'তা হলে একটা চাকরি জুটিয়ে দে'—তপন নাছোড়ের মত বলল। অতুল ফুক্‌ফুক্‌ করে হেসে বলল 'কেন, বাড়িতে খুব [illegible] চলছে নাকি?' 'আরে বাড়ির কথা ছেড়েই দে না, নিজেরও তো একটা ক্যারিয়ার আছে—একটা লাইফ আছে, না কি?'—তপন এখন আর [illegible] না, ক্লান্তভাবে মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'সত্যি আর পারছি না রে।' 'ডোণ্ট ওয়ারি ম্যান'—অতুল সিগারেটে টান দিল—'লাইফ স্ট্রাগল না করলে—' অতুল বলে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে আর বেশী বলতে দিল না তপন; প্রায় ধমকে উঠল 'থাম তো শালা, আর জ্ঞান ভাল লাগে না। চাকরি-বাকরি [illegible] করে দিতে পারিস তো বল—'

[illegible] থতমত খেয়ে অতুল বলল [illegible] চাকরি তো [illegible] ঠিক আছে, ওখানে [illegible] ডি-র ইঞ্জিনীয়ার [illegible] আমার বাংলোতে এসে মাঝে মাঝেই আড্ডা মারে, ড্রিংক করে ঠিক আছে, তোর কথা আমি ওকে বলব।' তপন তখন অতুলের ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুই বেশ আছিস, ফুলে ফুলে একেবারে ঢোল হচ্ছিস দিন দিন।' 'আল-কহল ভাই স্রেফ অ্যালকহল—' অতুল চোখ কোঁচকাল—'এতটা চর্বি ভাল নয়, কী বলিস?'

নিলয় আবার তার লাল চোখ ঘোরাল অতুলের দিকে। 'ওখানে তো ট্যাক্স ফ্রি, তাই না'—বলল তপন অতুলের থাইয়ের ওপর [illegible] মেরে বলল, 'তুই শালা এবার একটা বিয়ে করে ফেল।' 'বিয়ে?'—বলেই [illegible] এত জোরে হেসে উঠল যে, ঘরের [illegible] যেন কাঁপতে লাগল। নিলয় [illegible] বন্ধ করে অতুলের দিকে [illegible] তাকিয়ে রইল। অতুল চোখ [illegible] তপনকে বলল, 'বিয়ে করে [illegible] বুঝলি? [illegible] সেলস [illegible]—ইংরেজী বলতে বলতে অতুল [illegible] ফিরে এল, 'যখন দুধ সস্তা [illegible] কেন বল?' তপনের চোখ চকচক করে উঠল, 'কী ব্যাপার, খুব [illegible] নাকি?' অতুল কাঁধ ঝাঁকাল—'বাড়িতে একটা [illegible]-দেশী ঝি [illegible] নিয়েছি [illegible] ওখানে—সব কাজ পারে।' আরো কী বলতে যাচ্ছিল অতুল হঠাৎ এ সময় নিলয় প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁষি মারল টেবিলের ওপর। টিনের অ্যাশট্রেটা লাফিয়ে উঠে ঠং করে পড়ল, [illegible] উঠল [illegible]। আর তার হাত আরো জোরে কাঁপতে লাগল। তার রুক্ষ চোখের তারা [illegible] হয়ে উঠেছে, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে নিলয়। তপনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, 'সিগারেট দে।' [illegible] অতুল ওর [illegible] প্যাকেটটা নিলয়ের দিকে এগিয়ে ধরল, 'ইউ ক্যান হ্যাভ ইট।' 'নো'—বলে চেঁচিয়ে উঠল নিলয়, 'নো আই সে'—বলে সে এক ঝটকা মারল অতুলের হাতে। প্যাকেটটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে। উঠে গিয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে এনে বসতে বসতে অতুল বিরক্ত গলায় বলল—'লুনাটিক।'

নিলয় মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল আবার, তপন তাকে ধরে ঠাণ্ডা করল, 'বোস বোস, আমিই দিচ্ছি।' বলে পকেট থেকে বের করে একটা পানামা দিল ওকে। কম্পিত হাতে সেটা দু ঠোঁটের মাঝখানে রাখল নিলয়। দেশলাইয়ের কাঠি বের করে ধরাতে যাচ্ছিল তপন নিলয় সেটা কেড়ে নিয়ে নিজেই ধরাতে চেষ্টা করল। কয়েকটা কাঠি নষ্ট হল ঠিক জায়গায় ঘা লাগছিল না। তপন বলল—'তুই পারবি না, আমাকে দে।' খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে নিলয় গম্ভীর গলায় বলল, 'তুই আমার মত ধরাতে পারবি না। আমি এমন ধরাতে পারি, তুই সুদ্ধু জ্বলে যাবি।' তপন জোরে হেসে উঠল, 'শালা পাগল, তোমার জ্ঞানের নাড়ী টনটনে।' এবারে ফস করে একটা কাঠি জ্বলতেই নিলয় সিগারেটে টান দিল এবং খুকখুক করে কাশতে লাগল। এবং ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল শিকারী বাঘের মত। অতুল গুম হয়ে বসে থাকল চেয়ারে—যেন একটি শিকার।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অথচ সবারই ভেতরে যার যার নিজস্ব কথা বোধ হয় টগবগ করছিল। তপন ভাবছিল হঠাৎ পাগলাটা এত ক্ষেপে গেল কেন? অতুল খুবই বিরক্ত—পাগল হোক যাই হোক নিলয় তাকে অপমান করেছে, বিশেষ করে তপন রয়েছে। নিলয় আবার ওর চোখের সামনে সেই কাচের দেয়াল, কাচের মেঝে, কাচের সিলিং-এর হল-ঘর দেখতে পাচ্ছিল এবং উলঙ্গ লোকটাকে।

একটু আগে সম্ভবত নিলয়ের চীৎকারে সোমাও সচকিত হয়ে উঠেছিল। তার গানের আওয়াজ থেমে গিয়েছিল এখন আবার সে দ্রুত লয়ে গাইছে। তার কণ্ঠের আ-আ শব্দ টিনের চালের এই ঘর দুটোর ভেতরে অদৃশ্য হওয়ায় হা হু করে ফিরছিল। খুব তন্ময় হয়ে গাইবার ফলে দীর্ঘ ছন্দোময় সেই উত্তাল শব্দতরঙ্গ দ্বিতীয় কোন শব্দহীন এই ঘরের চেহারা যেন পাল্টে দিচ্ছিল। শুধু মাঝে-মাঝে কড়ার গায়ে [illegible] শব্দ [illegible] থেকে। কিন্তু [illegible] এই [illegible] তপন কিংবা অতুল কারো মনে কোনো রসের উদ্রেক করছিল না।

হঠাৎ অতুল গা ঝাড়া দিল, বিরক্ত গলায় [illegible] কি [illegible] না, [illegible] তপন [illegible] দিল। 'ও কখন আসবে? আটটা তো বাজে'—অতুল ঘাড়

দেখল—'কাল মর্নিং-এ আবার আমাকে কাস্ট বাক্সটা ধরতে হবে।' 'আউটা বাজে?' —তপন অবাক হল—'কৌশিক এখনো আসছে না কেন? বরুণ আর ফচও তো এল না, তাস পেটানো যেত।' 'ফচ কে?'—অতুল প্রশ্ন করল। 'ফণী চক্রবর্তী—কেন, তুই ফণীবাবুকে চিনিস না?'—তপন পাল্টা প্রশ্ন করল। 'অ—ওই যে প্রাইমারী স্কুলে পড়ায়? তোর নামটা দিয়েছিস তো—' এতক্ষণ পরে অতুল প্রাণ খুলে একটু হাসতে পারল। হেসেই বলল—'তোদের খুব তাস চলে বুঝি, পয়সা টয়সা দিয়ে?' 'চলে, তবে বিনা পয়সায়—আমরা শালা সব ফোতো বাবু।'—বলে তপন উঠে পড়ল, 'দাঁড়া, একটু খোঁজ নিই কৌশিকটার কী হল?'

তখন সোমার গান সবে পৌঁছাতে যাচ্ছিল। টকটক করে ভেতরের দরজায় টোকা মারল তপন। গান শেষ হবার আগে এরকম শব্দ করলে সোমা যে বিরক্ত হবে, তপন সেটা বোঝে না। গানটা এই মুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে উঠে আসা যে সোমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হবে, তপনের একবারও তা মনে হল না। সে দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, 'সোমা, সোমা!' সাধারণত দীপ রেওয়াজ

কথার পরে সোমা কেমন গম্ভীর আত্মস্থ হয়ে যায়, কায়িক শ্রমের জন্যই হোক কিংবা সুরের কোন মানসিক প্রতিক্রিয়ায় হোক তখন তার মনটা বেদনাময় নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে, অনেকক্ষণ সে কারো সঙ্গে কোন কথা বলে না। দরজার শব্দ শুনে মুহূর্তে সে একসঙ্গে অনেকগুলো রিড চেপে ধরল, তার মাথায় তখন চ্যাং করে যেন একটি ছোট্ট তন্ত্রী ছিঁড়ে গেল। বিরক্ত হাতে হারমোনিয়াম বন্ধ করে অস্থির পায়ে এসে সে দরজা খুলে দিল, 'কি হয়েছে?' সঙ্গে সঙ্গে তপন ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'কৌশিক কখন আসবে রে?' তপন জিজ্ঞেস করল। 'দাদার ফিরতে দেরি হবে।' —সোমার বিরক্ত গলা। 'কেন?'—তপন জানতে চাইল। 'হরিদা হাসপাতালে, খুব খারাপ অবস্থা, দাদা দুপুরে অফিস থেকে ফিরে ব্যাগ-ট্যাগ রেখে চলে গেছে, আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছে।'—সোমা যেন গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল। 'হরির খুব খারাপ অবস্থা? আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে?'—আপন মনেই আওড়াল তপন। [illegible] মৃদু হেসে তপন বলল 'একটা [illegible] এনেছি।' [illegible] তুলল। [illegible] সোমা প্রশ্ন করল, [illegible] এখন [illegible] না [illegible] এসেছে, রাগ [illegible] রয়েছে। [illegible] একটু [illegible] কর না [illegible] আচ্ছা, মা, তোকে একদিন [illegible] [illegible]—বলে তপন সোমার পিঠে হাত রাখল।

[illegible] তপনের [illegible] [illegible] তারপর জিজ্ঞেস করল—'মাসীমা আছেন এখানে?' তপন বলল—'হুঁ।' এ সময় তার গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল। 'আচ্ছা, [illegible]—বলে সোমা চলে গেল। তপন মনে মনে ভাবল, [illegible] হয়ে গেলে কী হবে, সোমার এখনো টান আছে নিজয়ের ওপর। আর আমি একটা বেকার বলে সোমাটা আমাকে পাত্তাই দেয় না। শালা মরা হাতীও লাখ টাকা!'—ঘটাং করে পেছনের দরজা বন্ধ করে দিয়ে রুষ্ট পায়ে বাইরের ঘরে চলে এল তপন—'কৌশিকটা শালা বড্ড ফ্যাচাং বাঁধাতে ওস্তাদ ওর ফিরতে দেরি হবে রে অতুল, হরির নাকি খুব খারাপ অবস্থা. হাসপাতালে রয়েছে।'

এতক্ষণ শিকার এবং শিকারী উভয়েই সম্ভবত তপনের অপেক্ষা করছিল। অতুল যেন বেঁচে গেল 'কী হয়েছে হরির?' 'কে জানে, গ্যাসট্রিক ফ্যাসট্রিক কি সব [illegible] চলছিল, [illegible] গেছে হয়তো।' তপন বসে পড়ল। 'কেন মারা টারা যাবে নাকি?'—অতুল মৃদু হাসল। 'মারা? [illegible] [illegible] [illegible]। তুই [illegible]'—হেসে তপন অতুলের চিবুক নেড়ে দিল।

'কেন ওতো খুব হার্ড ওয়ার্কিং ছেলে।'—অতুল গার্জেনের গলায় বলল। তপন মুচকে হাসল—'মফস্বলের হাট থেকে তরিতরকারি কিনে এনে শহরে বেচে, আর অতবড় একটা সংসার, তোমার ঘাড়ে চাপলে বুঝতে চাঁদু, হালটানা বেরিয়ে যেত।'

ঠিক এ সময়ে দূরে রাস্তা দিয়ে কারা যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল। তাদের পায়ের শব্দ সবাইকে সচকিত করে দিয়ে গেল। অতুল আড়মোড়া ভাঙল—'শরীরটা না মাইরী ম্যাজম্যাজ করছে, সারাদিনে একটুও আজ পেটে পড়েনি।' তারপর অর্থপূর্ণ চোখে তপনের দিকে তাকিয়ে বলল—'চল্ না বাজারের দিক থেকে একটা রাউণ্ড মেরে আসি।' তপন কী বলতে যাচ্ছিল, নিলয় তার টকটকে দৃষ্টি আবার অতুলের ওপর রাখল। আর ঠিক তখনই কদমতলার দিকে প্রচণ্ড শব্দে পর পর দুটো বোমা ফাটার শব্দ উঠল। মেঝে সুদ্ধ ঘর যেন কেঁপে উঠল সেই দুরন্ত শব্দে।

কয়েক মুহূর্ত সবাই স্তব্ধ। তারপর অতুল মুখ খুলল—'বাম্বিং না? তোদের বাংলাদেশটার না বারটা বেজে গেছে। এই জন্যই আসতে চাই না।' 'তুই বেশ আছিস'
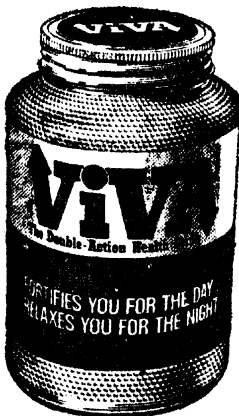
—তপন হাসল—'জানিস গত পরশু কমলা গার্লস স্কুলে কারা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে?' নিলয় হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল —'শেষ করেছে।' অতুল সেদিকে কান না দিয়ে বলল—'ইটস্ এ হেল্।' তারপর সে রোল গোল্ডের মত তার ঘড়ির সোনালী ব্যান্ডটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে উঠে পড়ল—'আমি চলি রে।' 'বোস চা হচ্ছে।'—তপন ডাকল। অতুল দরজার কাছ থেকে বলল—'আমার এখন চা খায়ে কিছু হবে না'—বলে সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সাইকেলের চেনের শব্দ পাওয়া গেল বাইরে। তপন লাফিয়ে উঠল—'কৌশিক এসে গেছে।'

কৌশিক ফিরে এল

পিচ রাস্তা থেকে নর্দমা পেরিয়ে অন্ধকারে কৌশিক আর ফণীবাবু বাড়ির সামনের পড়ো জমির ওপর দিয়ে আসছিল। ফণীবাবুর হাতে সাইকেল। ওদের মধ্যে যেন কী কথা কটাকাটি হচ্ছিল।

'সায়েন্সের যুগে অসম্ভব বলে কিছু আছে নাকি?'—কৌশিকের রূঢ় কণ্ঠস্বর। 'যাই বল কৌশিক, আমার মনে হয় এ রুগী বাঁচবে না।'—ফণীবাবুর বাড়ি ছিল রাজসাহীতে. ওর কথায় এখনো দেশের টান আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কৌশিক ক্ষেপে গেল—'কী মশাই বার বার এক কথা বলছেন, বাঁচবে না বাঁচবে না—আপনি কী ডাক্তারের থেকে বেশী বোঝেন নাকি?' সাইকেল দাঁড় করাতে করাতে ফণীবাবুও রেগে গেল—'আপনে মশায় খালি রাগেন। রাইগ্যা কোন কাজ হয় না। ডাক্তার তো বইলতেই কলকাত্তায় নিতে চান নিন, সেটা আপনাদের মেন্টাল স্যাটিস্‌ফেকশন'—

স্বভাবত শান্ত ধীরস্থির কৌশিক এর আর কোনো জবাব দিল না. তার মুখ বিরস, বিভ্রান্ত রেখাময়। আটাশ বছরের কৌশিককে দেখে আজ যে কেউ তাকে চল্লিশ বছরের লোক বলে ভাবতে পারে। ঘরে ঢুকে অতুল তপন নিলয়কে দেখে নিল, সে খানিকটা অবাক হল বোধ হয়। তারপর সোজা ক্লান্ত পায়ে তক্তপোশে গিয়ে বসল।

'হরিটার কী হল বল তো?—তপন সোজা প্রশ্ন করল কৌশিককে—'হঠাৎ করে এতটা সিরিয়াস হয়ে গেল?' 'কী আর হবে, যা হবার তাই হয়েছে।'—কিছুটা যেন উদাস-ভাবে বলল কৌশিক। তারপর লম্বা কৃশ হাতে মাথার চুল পেছনে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইল। 'কী হয়েছে সেটা বল।'—তপনের গলায় বিরক্তি। 'আর কী বছর খানেক ধরে তো সেই কালিক পেনটায় ভুগছিল জানিস, দিন দুয়েক সেনস্‌লেসও হয়ে গেছে, গত পরশু থেকে নাকি আবার শুরু হয়েছে। কাল রক্ত পায়খানা, বমি হয়েছে, বাধ্য আজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এখন তো প্রায়'—কৌশিক কথাটা আর শেষ করল না। ডাক্তাররা কী বলে?'—তপন কৌশিকের সামনে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে। নিলয়ের দৃষ্টি এখন কৌশিকের দিকে স্থির নিবদ্ধ।

'ডাক্তাররা বলছে ডিওডেনাম্ আল্‌সার ইমিডিয়েট্ অপারেশন করতে হবে।'—কৌশিক থামবার আগেই ফণীবাবু বলল, 'লিভারটা গিছে আর কি! যাবে না, সর্বক্ষণ চারমিনার ফুঁকবে আর খালি প্যাটে চা।' 'ইট্ ইজ্ দা কজ্'—অতুল গম্ভীর গলায়

মন্তব্য করল। 'তা অপারেশন কখন হবে?' —তপন উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল। 'আরে ওখানেই তো ফ্যাচাং, ডাক্তাররা বলছে এ অপারেশন এখানে হবে না। কালই যদি সকালের প্লেনে কলকাতা নিয়ে যাওয়া যায় পি জিতে কিংবা মেডিক্যালে'—কৌশিক ক্ষুব্ধ গলায় বল।

'এখানে হবে না কেন?'—হঠাৎ ক্ষিপ্ত-ভাবে তপন চেঁচিয়ে উঠল—'শালা মফস্বলের লোক কি মানুষ না?' তপনের কথায় ফণী-বাবু হেসে উঠল। 'না হাসবেন না'—তপন সত্যি ক্ষেপে গেছে—'আমি দেখেছি যখনই কারো অবস্থা সিরিয়াস হয়, অমনি ডাক্তাররা বলবে কলকাতা নিয়ে যান। ওখানে সব যন্ত্রপাতি, সব সুবিধা। এ কী রে বাবা!' 'আফটার অল ক্যাপিটাল তো'—অতুল মৃদু হাসল। নিলয় সঙ্গে সঙ্গে অতুলের দিকে ঘুরে তাকাল—'কলকাতা একটা নরক।' অতুল ওর রোগাডিগোঙ্গের মত ঘাড়ের ব্যান্ডেজটা রুমালে ঘষতে লাগল। 'নিকুচি করেছে তোর ক্যাপিটালের'—তপন আরো ক্ষেপে গেল 'সব শালা ভেড়ার দল, কিছু না বলাতে বলাতে পথ পেয়ে গেছে।

হঠাৎ আবহাওয়া খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কৌশিক বিব্রত বোধ করে। সে খুব মৃদু এবং দৃঢ় গলায় বলে—'এখন ওসব কথা নিয়ে চেঁচামেচি করে তো কোন লাভ নেই, এখন ওকে কলকাতা নেওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়, সেটা ঠিক করতে হবে।' 'কলকাতা নিয়ে যাওয়া কী চাট্টিখানি কথা?'—তপন বিরক্ত হাতে নিজের উরুর ওপর চাপড় মারল। ভেতরের দরজার ওপাশে তখন কয়েকটি মৃদু পায়ের শব্দ জড় হল।

কৌশিক অসহায়ভাবে তপনকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল—'সবাই মিলে কিছু একটা করতেই হবে তপন। আমি বলছি শোন তপন, আমি বড় জোর শ'দেড়েক টাকা নিজের থেকে দিতে পারি বুঝলি। বাকীটা সবাই মিলে চাঁদা করে'—'চাঁদা করে? আমি শালা ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি আমার একটা পয়সাও নেই'—তপনের কথায় কৌশিকের মুখটা আশঙ্কায় ভরে গেল। 'তপন, তুই একবার মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে, আমি হরিকে না হয় নিয়ে যাব, প্লেনের প্লেন-ভাড়া, এভাড়া ওখানে'—কৌশিকের কথা শেষ হল না; তপন এবারে খুব শান্ত গলায় বলল, 'তুই আমাকে কী করতে বলিস? শরীরটা বেচতে বলিস রাজি আছি। তুই জানিস না'—তপন আর কিছু বলতে পারল না হঠাৎ থেমে গেল। তারপর সিগারেট ধরাতে গেল, পর পর দুটো কাঠি নষ্ট হল। নিলয়ের হাত দুটো আরো জোরে কাঁপতে লাগল।

ফণী চক্রবর্তী যেন এসব শুনছিল না, সে গোপনে অতুলকে জিজ্ঞেস করল—'কবে আইলেন?' শিক্ষক যেমন অমনোযোগী ছাত্রকে ডাকে, গম্ভীর গলায় তেমনি কৌশিক ফণীবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল—'ফণীবাবু?' —অর্থাৎ আপনি কী পারবেন! ফণীবাবু সামান্য উসখুস করল, তারপর তপনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কথা তো জানেনই সব, প্রাইমারী ইস্কুলের ব্যাপার, তিন-চার মাস মাইনা বাকি।'

কৌশিক কিছু বলল না, শুধু তার দুপাশের চোয়ালের পেশী শক্ত হল। সম্ভবত সে দাঁতে দাঁত চাপছে। অতুল দেখল কৌশিক তাকে কিছু বলছে না, অথচ সে চায় তাকেও সে কিছু বলুক। যদিও বললে মুশকিল! কাজেই একটা উত্তর সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে। তবু কৌশিক তাকে কিছু বলছে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত সে নিজে থেকেই বলল, 'মিসেস কৌশিক, আই কুড হেল্প, আমার করাও উচিত কিন্তু আমার সঙ্গে তো টাকা নেই।'—কৌশিক বলল, 'না তোমাকে কিছু করতে হবে না।' অতুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'না, ইট'স এ ডিউটি। তোদের থেকে কেউ দিয়ে দে, আমি কাল ফিরলিং গিয়ে তোর নামে একটা চেক পাঠিয়ে দেব।'

তপন মুচকি হেসে ধোঁয়া ছাড়তে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে নিলয় হঠাৎ অতুলের হাতের দিকে দেখিয়ে খুব উত্তেজনার সঙ্গে কৌশিককে বলে উঠল 'শালার ঘড়িটা কেড়ে নে।' চড়াৎ করে অতুলের মাথায় রক্ত উঠে গেল, সে বলল, 'এই শালা লুনাটিকটা তখন থেকে আমার পেছনে লেগেছে কেন বলতো' বলার সঙ্গে সঙ্গে এবং কেউ কিছু ভাবার আগেই বিদ্যুৎ চমকের মত নিলয় উঠে পড়ল, টেবিলটার পাশ কাটিয়ে হঠাৎ ক্ষিপ্ত গলায় গর্জন করে উঠল—'স্কাউন্ড্রেল, আমি লুনাটিক?' বলেই দুম্ করে একটা ঘুঁষি মেরে দিল অতুলের মুখে। অতুল মুখটা সরাতে যাচ্ছিল এজন্য এবং নিলয়ের হাত কাঁপে বলে যথার্থ স্থানে ঘুঁষিটি না লেগে অতুলের দু' ঠোঁটের ওপর লেগেছে। সম্ভবত তার পাইওরিয়া আছে, দাঁতের গোড়ার রক্ত ঠোঁটে এসে লেগেছে, হাত দিয়ে সেটা স্পর্শ করেই সেও সজোরে একটা ঘুঁষি ছুঁড়তে যাচ্ছিল, তপন ক্ষিপ্র হাতে তাকে ধরে ফেলে। 'ছাড় শালাকে শেষ করে দেব।' —অতুল লাফিয়ে ওঠে। 'শালা লম্পট'—বলে নিলয় অতুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাতে তার লম্বা চুল আঁকড়ে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করতে থাকে। কৌশিক দ্রুত হাতে পেছন থেকে তাকে ধরে ফেলে—'এই কী হচ্ছে নিলয়?'

'এই লোকটার কাছ থেকে এক পয়সাও নিবি না।' —নিলয় আরেকটা ঘুঁষি ছুঁড়ল দূর থেকে—'আমি—আমি নিলয় ঘোষ সব টাকা দেব।' নিলয় যেন সদম্ভে ঘোষণা করল। নিলয়ের সমস্ত শরীরে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে তখন। তপ্ত লাভার মত রক্ত তার সারা শরীরে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার গায়ে কালো কোটটা কিন্তু তবু তার গায়ের তাপ যেন কৌশিককে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এত ক্ষিপ্ত হতে নিলয়কে কেউ কোন দিন দেখেনি। সে সাধারণত নিরীহ হয়ে বসে থাকে, কাজেই ছেড়ে। কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে ওর কাছ থেকে নেব না।' 'তো নেভার'—বিকৃত গলায় নিলয় চেঁচাল— 'শালা লম্পট বাড়িতে ঝি রেখেছে।' কৌশিক সদ্য বিস্ময়ে নিলয়ের কথাগুলো শুনল। এতক্ষণে যেন তার কাছে নিলয়ের ক্ষেপে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট হল। সে তপনের দিকে তাকিয়ে ইশারায় অতুলকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে বলল।

অতুলও তখন পাগলা কুকুরের মত ছটফট করছে। তপন তাকে বলল, 'চ—চ'। বলে তাকে প্রায় টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে অতুল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে গেল— 'শালাকে যদি আমাদের কলোনিতে কোন দিন পাই তো, শুট করে মারব।'

তপন সরে পড়ে। জমিটা পেরিয়ে নর্দমার কাছে এসেছে, পেছন থেকে কৌশিক তাকে ডাকল। তপন এলে কৌশিক বলল 'তোকে আজ রাতে হাসপাতালে নাইট ডিউটি দিতে হবে রে, ভুলেই গেছলাম। হরির ভাই থাকবে আর তুই, আমি নার্সকে বলে এসেছি তোর যেতে দেরি হবে। খেয়ে-দেয়ে চলে যা, এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের আট নম্বর বেড।' তপন শান্তভাবে সব শুনে

গেল। এখন সে যেন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, 'ঠিক আছে আমি খেয়েদেয়েই চলে যাব।'—বলে চলে যাচ্ছিল তপন, কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল এবং শান্তভাবে বলল, 'কৌশিক, আমি দাদাকে বলে দেখব রে কিছু যদি ম্যানেজ করতে পারি। তবে মনে হয় পঁচিশ তিরিশের বেশী পারব না।' 'ঠিক আছে, তুই যা তপন। আমি দেখি আমাদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রারের কাছে যাব একবার, ছুটিও নিতে হবে তা ছাড়া টাকাও।' নিলয় চেঁচিয়ে উঠল আবার—'বললাম তো, আমি দেব বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'ঠিক আছে তুই দিবি'—বলে কৌশিক নিলয়ের হাত ধরল। ধরে অবাক হয়ে গেল সে। নিলয়ের সারা শরীর এত উত্তপ্ত অথচ তার হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। 'চলুন ফণীবাবু ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি' —বলে কৌশিক এগিয়ে যেতেই ভেতরের দরজা খুলে সোমা বেরিয়ে এল, 'দাদা চা খেয়ে যা।' তার চোখ নিলয়ের দিকে। নিলয়ও রক্তাভ চোখে সোমাকে দেখল। কৌশিক বলল—'চা খাব না রে, আমার ফিরতে দেরি হবে।' এর পর ওরা পাড়ো জমি পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল।

রাস্তায় এসে হাত তুলে কৌশিক দূরের একটা রিকশা ডাকতেই, হঠাৎ নিলয় এক ঝটকায় অপ্রস্তুত কৌশিকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, 'ভেবেছিস আমাকে নিয়ে ঘরে আটকে রাখবি, না বাইরে রাখবি, না? [illegible] সব শালা অ্যান্টি [illegible] চলাচ্ছ।' কৌশিক তাকে জানি [illegible] প্রায়ই নিলয়কে ঘরে আটকে রাখে, [illegible] না। সে বলল, 'তোকে কেন আটকাতে যাব আমরা? [illegible] বাইরে ছিলি আমি। তোরা ভেবেছিস আমি পাগল? আজ সব শালাকে দেখে নেব।'—বলে হন হন করে হাঁটতে লাগল নিলয়। 'এই শোন' বলে কৌশিক একটু এগোতেই প্রায় যেন দৌড়ে ছুটে চলে গেল নিলয়। অবাক হয়ে ফণীবাবু বলল, 'পাগল আইজ এত ক্ষেইপ্যা কেন?' বিস্ময়ের চাপে প্রায় নিজের মনে কৌশিক বলল, 'অসুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে!'

কৌশিক একা

কৌশিক যখন তাদের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রারের বাড়ি থেকে ফিরল তখন অনেক রাত। ঠাণ্ডা তরকারি দিয়ে সে যখন গোগ্রাসে রুটি গিলছিল, মা তাকে খেতে দিচ্ছিল, তার বাবা তখন একটু দূরে মোড়ায় বসে। তার বাবার হাঁপানীর শব্দটা একটু বেড়েছে। যত রাত বাড়বে শ্বাসকষ্ট তত বাড়বে, ক্রমে সাঁই সাঁই শব্দ উঠবে। তার বাবা টেনে টেনে বলছিল, 'তোমার পক্ষে এত টাকা খরচা করা কী উচিত হবে?' এ কথায় বাবার দিকে চোখ তুলে চাইতে ইচ্ছা হল কৌশিকের, কিন্তু সে তাকাল না কারণ এখন বাবার মুখটা তার কাছে অসহ্য মনে হবে। 'তোমার তো অনেক দায়িত্ব—সোমার বিয়েটা না দিলেই নয়'—বাবা আরো বলল। কৌশিক আরো দ্রুত খেতে খেতে বলল—'কী করা যাবে? চোখের সামনে বন্ধুবান্ধব মরে যাবে?' 'সেখ বিবেচনা করে, নিজের ক্ষমতার কথাটাও তো ভেবে দেখতে হবে।' —বাবা সশব্দে শ্বাস টানে। মা বলে খুব আস্তে—'তোমার একার পক্ষে কী এত সম্ভব হবে?' ঠিক এ সময়ে হরির মা—মাসিমার মুখটা মনে পড়ল কৌশিকের। ঢক ঢক জল খেয়ে কৌশিক উঠে পড়ে। পেছনে বাবার কথাগুলো তাকে তাড়া করে—'কলকাতা নিয়ে গেলেও যে ভাল হয়ে উঠবে তার কোন গ্যারাণ্টি আছে?' 'আমার যদি ও রকম

চুলের পরিচর্য্যার নতুন উপায় গোদরেজের নতুন সুবাসিত ক্যাষ্টর হেয়ার অয়েল

পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই উপযোগী। মিষ্টি গন্ধে ভরা, বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল, মাথা ঠাণ্ডা রাখে। সারাদিন, সবসময়, আপনার চুলে সৌন্দর্য্য বজায় রাখে এবং পুষ্টি যোগায়।
গোদরেজের তৈরী

গোদরেজ সুবাসিত ক্যাষ্টর হেয়ার অয়েল

ভাজা যায় তার ধান্দা দেখি। কাজ্‌ টাজ্‌, কিস্‌কুট-কিস্‌কুট, ভালো মন্দ যা নাগালে পাই, এই গালে দিই—'

'দিন-রাত যদি এমনি খালি খান আর ঘুমোন তাহলে লেখেন টেখেন কখন?'

'কেন, পরের দিন?' আমার সপ্রশ্ন জবাব: 'পরের দিন তো পড়েই আছে। নেই কি, বলুন?'

'সে তো চিরদিনই পড়ে থাকে। কোনো-দিনই তো আর সে আসে না।'

'আমার সবই পরের ভরসা মশাই। পরদিনের, পর জনের...পরাৎপরের।'

'পরকাল আপনার ঝরঝরে।' হাসতে থাকেন ভদ্রলোক।

'ধরেছেন ঠিক। একি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন। এই বিছানাতেই বসুন—ওপাশটায়। দেখছেন ত অতিথি অভ্যাগতর জন্যে আমার ঘরে কোনো টেবিল চেয়ার কিছু নেই।'

'সেবারেই দেখে গেছি। এর মধ্যে কোনো শ্রীবৃদ্ধি হয়নি দেখছি ঘরখানার।'

'বরং কিছু বিশ্রী বৃদ্ধি হয়েছে। জঞ্জাল-টঞ্জাল বেড়েছে আরো একটুখানি। যাক্‌ গে ...এখন বলুন তো কী খবর, আপনার। নতুন খবরটবর কিছু আছে?'

'খবর তো আজকের কাগজে। সে তো আপনি বিছানায় পেতে ভাতের থালা রেখেছেন তার ওপর। দেখেননি কাগজ?'

'কই দেখলাম। দেখব দুপুরে। তবে এক কাজ করলে হোতো, খাবারটা থালায় না নিয়ে কাগজের ওপরে খেলে হোতো—খাওয়াও চলত কাগজও পড়া চলত এক সঙ্গে। খবর আর খাবার একাধারে।'

'মন্দ হত না। খেয়েদেয়ে আবার শুয়ে পড়তেন তার ওপরেই।'

'শুয়ে শুয়ে পড়াও চলত তার ওপর। ...বলুন, এখন কী বার্তা নিয়ে এসেছেন এবার?'

'বলছি দাঁড়ান। কিন্তু তার আগে জানতে চাই আপনি সেবার আমায় ধোঁকা দিয়েছিলেন কেন মশাই?'

'ধোঁকা?'

'ধোঁকা ই তো! আপনি বলেছিলেন যে ইস্কুল-কলেজের চৌকাঠ আপনি মাড়াননি। অথচ, আপনার এক প্রকাশকের কাছে আপনার খবর নিতে গিয়ে জানলাম আপনি নাকি দস্তুর মতন এম-এ পাশ!'

'এম-এ পাশ! কী সর্বনাশ!' আকাশ থেকে পড়তে হয় আমায়—'এমন তথ্য কে প্রকাশ করলেন? কিনি সেই প্রকাশক?'

'অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দিরের অমিয় চক্রবর্তী। এম-এ পাশ, তাও আবার ইংরেজিতে। লীলা মজুমদার আর আপনি এক বছরেই পাশ করেছেন, গেজেটে একসঙ্গে ছাপা রয়েছে আপনাদের নাম। অমিয়বাবু স্বচক্ষে দেখেছেন।

'বটে? কার কীর্তি কে জানে। আমি তো জানি ও-খেলা আমি কোনোদিন খেলিনি। ওই পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা। ওদের মায়া পাশে না জড়িয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছি চিরটা কাল।' বলে একটু থেমে যোগ করি: 'সত্যি বলতে, আপনাকে বেশ ভয় করছে আমার। আপনি যখন আমার এম-এ আবিষ্কার করেছেন, কোনদিন হয়ত আমার আমার মেয়েও বার করে ফেলবেন।'

'করেছি তো, কিন্তু স [illegible] পরে। তবে একথা না বলে পারি [illegible] যে, আপনি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী।'

'যা বলেছেন। একটা সত্যি কথা বললেন এতক্ষণে। গল্প লেখার সময় মিথ্যে লিখতে পারি আর কইতে গেলেই যত দোষ? তবে হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই শিবসত্য ইংরেজিতে ডিস্টিংকশন নিয়ে বি-এ পাশ করেছিল বটে। সেই পরে হয়ত এম-এ-টাও নিয়ে থাকতে পারে, আমার জানা নেই। তার নামের সঙ্গে আমার নামটা গুলিয়ে ফেলেননি তো অমিয়বাবু? গোড়ায় শিব আর শেষে চক্রবর্তী দেখেই আত্মহারা হয়েছেন ভেতরের সত্যটা খুলিয়ে দেখার যাননি বো-[illegible]র?'

'[illegible] কি হতে পারে নাকি? এত [illegible] দৃষ্টিভ্রম?'

'অসম্ভব কী [illegible] না হলে ধরুন না এই সহজ কথাটাই ধরুন। আমার ভাই যেকালে বি-এ পাশ করে ঘাটশিলা হাই স্কুলের হেডমাস্টার হতে পেরেছে সেকালে আমি এম-এ পাশ করলে, তা সে যে বিভাগেই করে থাকি না কেন, যে কোনো একটা মাস্টারি কি জুটিয়ে নিতে পারতুম না? নিদেন একটা সেকেন্ড মাস্টার হয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারতুম না কি? এই থার্ড ক্লাস লেখক হতে যেতাম কোন দুঃখে? লেখক হতে কি ভালো লাগে কারো? অন্তত আমার তো লাগে না মশাই!'

'লেখক হতে চান না আপনি?'

'একদম না। এই দণ্ডে যদি আমি হাজার দশেক টাকা পাই, তো আমার ছোটদের বইগুলোর একটা ট্রাস্ট বানিয়ে দিয়ে...ওগুলো তো আর আমার নয়, বাংলার ছেলেমেয়েদের সম্পত্তি...তার প্রকাশ ব্যবস্থাটা করে গঙ্গাস্নান করি গিয়ে আমি। তার পরে একেবারে তোবা তাল্লাক দিয়ে এই লেখাটেখা সব ছেড়ে দিই বেবাক্‌।'

'বলেন কি!'

'তাই বলি। কী যন্ত্রণার জীবন যে এই লেখক হওয়া—কী বলব। সাধ করে কি কেউ হতে চায়? নেহাৎ প্রাণের দায়—ও ছাড়া কিছু পারি না তাই।' যাক্‌ গে, সে কথা থাক। এখন বলুন আপনার বার্তাটি কী? সেবার তো আমার কুলের কেচ্ছা নিয়ে এসেছিলেন!'

'এবার এসেছি আপনার উপকূলকাহিনী নিয়ে।'

'উপকূল!' আবার আমার হতচকিত হতে হয়।—'সে আবার কী মশাই? উপকূল আবার কী?'

'উপকূল কাকে কয় জানেন না নাকি?'

'জানব না কেন? নদীর দুই উপকূল থাকে, সেই দুই কূলের গণ্ডী বজায় রেখে তাকে বইতে হয়...' আমি বলি: '[illegible] সাধারণ লোকেরও দুটি কূল থাকে জানি—পিতৃকূল আর মাতৃকূল।'

'কিন্তু লেখক শিল্পীরা কি সাধারণ লোক? তাঁদের কি কেবল দুকূল হয় [illegible] লেখায় মশাই?'

'তা বটে। দুকূলে শুধু নয় [illegible] শকুন্তলাকেই শোভা পেয়েছিল, লেখকদের একাধিক কূল থাকতে পারে বটে। [illegible] আপনি কি কোনো [illegible] পরকীয়া ইঙ্গিতটিঙ্গিত করছেন?'

'যা বলেছেন, তাই বটে। কলকাতার [illegible] আপনার ৫টি উপকূলের [illegible] পেয়েছি আমি। জানি না [illegible] [illegible] পারেন।'

'কী সর্বনাশ! [illegible] উপকূলের [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার প্রাণ যায় [illegible] এই [illegible] এমনটা আমি করেছি [illegible] না।'

'বিশ্বাস হয় না?'

'না মশাই! এতগুলি মেয়েকে [illegible] করব কি, কোনো মেয়েরই উপযুক্ত আমি নিজেকে জ্ঞান করিনি কখনো। [illegible] দেখলে এদেশের বেশির ভাগ মেয়েরই [illegible] দুঃখের জীবন। এদের একটিকে অন্তত আমি সুখী করতে চেয়েছিলাম আমার জীবনে...'

'কাকে?'

'যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করিনি। আমার হাতে পড়ে বেচারী অহরহ যে কষ্ট পেত তার থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।'

'বিয়েও করেননি, উপটুপও নেই বলছেন! মেয়ের অভাব কখনো বোধ করেননি আপনি?'

'বরং উলটো। মেয়ের প্রভাবেই এককে সময় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়েছে আমায়। আমার বাবা ততটা বউ পছন্দ করে নয় যতটা নাকি সাত শালী দেখে বিয়ে করেছিলেন শোনা যায়—রসিক ব্যক্তি ছিলেন নিশ্চয়। আমি স্বয়ং শালীবহন না হলেও তাইতেই পুষিয়ে গেছল আমার, বাবার উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার সাত মাসির সৌজন্যে সাতাত্তরটি কাজিন রত্ন লাভ করেছিলাম...'

'সাতাত্তর জন? বলেন কি মশাই!'

শুনেছি গেঁথে দৌঁশনি অবাধ্য, তবে আমার আন্দাজ। তাছাড়া, আমার নিজের স্বোপার্জিত কাজিনও কিছু ছিল বইকি তার ভেতর...'

'স্বোপার্জিত কাজিন কী রকমটা?'

'মনে করুন বন্ধুর মা—সে তো ঠিক মার মতই। নাকি তাকে আপনি অন্য কোনো উপমা দিতে চান? তাঁর মেয়েরা, মানে আমার বন্ধুর বোনদের তো বোনই ধরতে হবে?' নাকি আপনি তাদের উপবোন বলবেন, শুনি?'

'আমি আর কী বলব!'

'উপবনই বলুন। কারণ সেখানে যেকালে ফলের কোনো আশা নেই, আকাংখাও নেই কোনো—উপবনই বলা উচিত। তথায় ফুল ছেঁড়ারও অধিকার নেই আপনার, শুধু ওপর ওপর ঘ্রাণ নেওয়াই কেবল। একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু গান শুনি গোছের আর কি!'

'কিন্তু তাতে কি আশ মেটে? কাউকে ষোলো আনা পাবার সাধ জাগেনি কখনো আপনার? কেবল ফুল শুঁকে শুঁকে কি দুঃখ যায়? ফল কী তাতে?'

'মা ফলেষু কদাচন। ষোলো আনার সাধ মেটাতে গেলে ষোলো আনাই যে বরবাদ হয়। যদি কোনো মেয়ের ষোলো আনা আপনি পেতে চান তো বিনিময়ে তাকে ষোলো আনাই দিতে হবে আপনার—তার চেয়ে এক আনা পেয়েই খুশি থাকা কি ভালো নয়? শত শত একানি পেলে মোটমাট কতখানি দাঁড়ায় ভেবে দেখুন একবার।'

ভাবতে গিয়ে তিনি গুম হয়ে থাকেন। উপকূলের খবর নিয়ে এসে এখন বাঁঝি হিসেবের কূল পান না। এ কানার পাল্লায় পড়ে বোবা মেরে যান বোধ হয়। কিন্তু একটু পরেই তিনি গুমরে ওঠেন আবার—

'কিন্তু যাই বলুন না মশাই! কলকাতার চারদিকে আপনার যে চারজন রয়েছেন তাঁরা কখনই উপবন নন, তাঁরা আপনার...'

'উপস্ত্রী? তাই বলছেন ত! তাহলে বটে!' বলে আমার পঞ্চ ম-কারের পঞ্চমটিকে ধরে টানি—'তাহলেও আপনার হাওড়ার সেই মেয়েটির খবর জানা নেই যাকে নিয়ে আমি হাওয়া হয়েছিলাম একদিন...'

'তাই নাকি? জানি না তো!'

'জানবেন কি করে? আমি নিজেই জানতাম নাকি! খবরটা ধরা পড়ল হঠাৎ। আমার এক কিশোর বন্ধু একদিন বিবাহ রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে খবরটা জেনে এসেছিল। তার এক দূর সম্পর্কের মাসির সঙ্গে আমার এক সুদূর সম্পর্কিত খুড়োর অসবর্ণ বিয়ের নোটিশ দিতে গিয়ে রেজেস্ট্রি আপিসে গিয়ে দেখে এসেছিল যে, সেখানকার নোটিশ বোর্ডে হাওড়ার কোন মেয়ের সঙ্গে এক শিবরাম চক্রবর্তীর বিয়ের নোটিশ রয়েছে। জানলাম তার কাছে—তারপর আমি তার সঙ্গে গিয়ে নিজের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এলাম।'

'দেখলেন আপনাদের বিয়ের নোটিশ?'

'দেখলাম বইকি। তারপর কিছুদিন বাদ একটু সময় সুযোগ পেতেই হাওড়ায় ঠিকানাটায় গিয়ে সেই মেয়েটিকেও দেখে এসেছি।'

'কী দেখলেন?'

দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। তবে ভারী বিষণ্ণ চেহারা। তাহলেও তেমন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হওয়া যায় মনে হোলো। কিন্তু বিয়ের সুখ তার কপালে সইলো না...তার বিষণ্ণতার কারণ জানা গেল.....'

'বিধবা হয়ে গেল নাকি? বিয়ের পর মারা গেল সেই লোকটা? মানে সেই শিবরাম—'

'তার চেয়েও খারাপ। পড়শীদের কাছে জানতে পেলাম বিয়ের পর লোকটা মেয়েটির গয়নাগাটি সব নিয়ে উধাও হয়েছে। তার কোনো পাত্তাই নেইকো আর।'

'তাই নাকি?'

'তাই তো বললেন, প্রতিবেশী সেই ভদ্রলোক। কে লোকটা শুধোতে জানালেন—কোথাকার কে এক লেখক মশাই এই শিবরাম চক্কোত্তি! গল্পটল্প লেখেটেখে। বইটই আছে নাকি তার। তার লেখা পড়েই নাকি পটে গেছল মেয়েটা, পস্তাচ্ছে এখন। ফুসলে বিয়ে করে এখন তার যথাসর্বস্ব নিয়ে সে হাওয়া!'

'আপনারই কাণ্ড নাকি মশাই?'

'কে জানে! আমি তো মেয়েদেরই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলে জানতাম। তাদের ওপরেও যে পটীয়ান লোক থাকতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না।'

(ক্রমশ)

আর্থিক বছরের খতিয়ান

যদি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে বর্তমান সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান না করতেন তবে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের নতুন বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করা হত এবং আমরাও কর-ব্যবস্থার রদ-বদল নিয়ে আলোচনা করতাম। কিন্তু নতুন বাজেট এখন তৈরি না হলেও ৩১শে মার্চ বর্তমান আর্থিক বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। আসছে সপ্তাহে নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলে ৩১শে মার্চের মধ্যে তাকে অন্তত কয়েক মাসের ব্যয়-বরাদ্দ পার্লামেন্টকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতেই হবে। হয়ত জুন মাসে নতুন সরকার ১৯৭১—৭২ সালের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পার্লামেন্টে পেশ করবেন।

নতুন সরকার গঠিত হওয়ার আগেই ভারত সরকারের চলতি আর্থিক বছরের মূল্যায়ন করা যেতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী যখন গত বছর পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করেছিলেন, তখন তিনি বাজেটটিকে "কল্যাণধর্মী ও প্রগতিশীল বাজেট" আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরের শেষে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে গত এক বছরে ভারত সরকারের আয়-ব্যয় নীতি এমন কোন চিত্র উপস্থাপিত করতে পারেনি যাতে দেখা যাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণ আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। পরোক্ষ করের বোঝা জিনিসপত্রের দাম অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার সরকারী কর্মচারীদের (কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে) অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধি ও উৎপাদনের হার না বাড়লেও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সাধারণভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট দায়ী তাও স্বীকার করতে হবে। অথচ, জিনিসপত্রের দাম এবং জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গিয়েছে বলেই শ্রমিক ও সরকারী কর্মচারীগণ বেশি বেতন বা মজুরি দাবি করেছেন। দেখা যাচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার জন্য মজুরি বাড়াতে হয়েছে এবং মজুরি বাড়াবার জন্য জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়েছে। ভারত সরকার এমন কোন দাওয়াই এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি যা সেবন করলে শিল্পোৎপাদন পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত শিল্প-প্রধান রাজ্যে শিল্পোৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়াবার জন্য কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি বা কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে পারেননি তা আমরা দেখতে পেয়েছি। প্রকৃত পক্ষে ১৯৬৭ সাল থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে।

আর্থিক বছরের মূল্যায়ন করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই কর-ব্যবস্থার বিচার করতে হয়। আমাদের দেশে যতগুলি প্রত্যক্ষ কর আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আয় কর। কিন্তু আয় কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ আশানুরূপ হয়নি। ১৯৬৭—৬৮ সালে জাতীয় আয় শতকরা দশ ভাগের কাছাকাছি বেড়েছিল। কিন্তু সেজন্য ১৯৬৮—৬৯ সালে আয়কর থেকে রাজস্বের পরিমাণ যে খুব বেড়ে ছিল তা নয়। সাধারণভাবে এজন্য দুইটি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, গত

চার বছর ধরে আমাদের জাতীয় আয় যতটা বেড়েছে, তার তিন-চতুর্থাংশ বেড়েছে কৃষি-উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার দরুন। অথচ গ্রামাঞ্চলে যে হারে আয় বেড়েছে তার অর্ধেক হারেও যদি রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো যেত তবে সরকারকে আজ চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য ততটা চিন্তা করতে হত না এবং ঘাটতি অর্থ সংস্থানের (Deficit Financing) নীতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হত না। বর্তমানে জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির সম্মিলিত রাজস্বে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করসহ) কৃষিক্ষেত্রের অবদান শতকরা ২৭ ভাগের বেশি নয়। গত বছরের বাজেটে গ্রামীণ সঞ্চয় সুসংহত করার কোন প্রয়াস দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ত, কর ফাঁকি বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। কর ফাঁকি বন্ধ করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন আয়কর দেওয়ার সর্বোচ্চ হার কমানো। গত বাজেটে আয়কর দেওয়ার সর্বোচ্চ হার রাখা হয়েছিল শতকরা ৯৩.৫ ভাগ; অর্থাৎ, দুই লক্ষ টাকার উপর যা আয় হবে তার শতকরা ৯৩.২ ভাগ সরকারকে আয়কর দিতে হবে। আমাদের ধনী ব্যবসায়ী অথবা বিভিন্ন উপজীবিকায় নিযুক্ত এমন অনেককেই আছেন যাঁরা এই হারে স্বোপার্জিত আয়ের উপর কর দিতে প্রস্তুত নন। তার পরিণতি হল কর ফাঁকি। বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী নিকোলাস ক্যালডর যখন ভারতের কর-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট প্রদান করেন, তখন একদিকে যেমন তিনি ব্যয় কর, মূলধন-মুনাফা কর, সম্পদ কর ও দান কর ধার্য করার কথা বলেছিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি চেয়েছিলেন আয়করের সর্বোচ্চ হার অনেক কমিয়ে দিতে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সব নাগরিকের পক্ষেই আয়, ব্যয়, সম্পত্তি, দান-খয়রাতি প্রভৃতির বাৎসরিক হিসাব সরকারের নিকট পেশ করার নিয়ম চালু করতে। ক্যালডর চেয়েছিলেন, বর্তমান আয়কর এবং সুপার-ট্যাক্সের (Super-tax) পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা আয় পর্যন্ত প্রগতিশীল হারে (Progressive rates) কর ধার্য করতে এবং তার পর থেকে ফ্ল্যাট হারে Flat rate) টাকা প্রতি ৪২ পয়সা কর ধার্য করতে। ভারত সরকার নতুন কর সম্পর্কে ক্যালডরের সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন (যদিও ব্যয় কর পাঁচ বছর আগে দ্বিতীয়বারের মত প্রত্যাহার করা হয়েছে), অথচ আয়কর সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এবং বাধ্যতামূলক হিসাব দাখিলের নীতি (Compulsory Reporting System) চালু করার সুপারিশ গৃহীত হয়নি। আয়করের সর্বোচ্চ হার যদি অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কমানো হত এবং আয়কর ব্যবস্থা যদি আরও সরল করা হত (এক্ষেত্রে ভারত সরকার ভূতলিঙ্গম কমিশনের সুপারিশগুলিও গ্রহণ করেননি) তবে হয়ত কালো টাকার পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হত। ক্যালডরের সুপারিশ শুধু ভারতে কেন, অন্যান্য দেশেও পরীক্ষিত হয়েছে কিন্তু গৃহীত হয়নি। তাই সখেদে ক্যালডর বলেছিলেন, "Will the underdeveloped Countries never learn to collect taxes?" আয়করের সর্বোচ্চ হার কমিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে ধনী লোকদের আরও সুবিধা করে দেওয়া। বরং আয়করের সর্বোচ্চ হার কমিয়ে দিয়ে অন্যান্য করগুলির এমন সংস্কার করা যেতে পারে যাতে ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য কমানো সম্ভব হয় অথচ সরকারী রাজস্বের পরিমাণও বাড়ে। উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হয়, অথচ ভারতে রাজস্ব হিসাবে আদায় হয় জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ এবং তারও প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আসে পরোক্ষ কর থেকে যার চাপ বেশি পড়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর।

শহর অঞ্চলের সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু এখন পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়নি। কর-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই এ-জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর আদায় করার জন্য যে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের দেশে দেখা যায় তার মধ্যে দুর্নীতি এখনও প্রচুর রয়ে গেছে। আয়কর অফিসে ঢুকলেই বেয়ারা এবং এমনকি সরকারী কর্মচারীদেরও দক্ষিণা দিতে হয়—তাও যে স্বেচ্ছায় তা নয়; অনেক ক্ষেত্রেই দায়ে পড়ে তা দিতে হয়েছে বলে করদাতাগণ অভিযোগ করেছেন! কর ব্যবস্থার সংস্কার করা শুধু বিশেষ কোন করের হার পুনর্বিন্যাস করা অথবা প্রচলিত কোন কর প্রত্যাহার করা এবং নতুন কর ধার্য করা নয়। কর-ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে কর আদায়ের জন্য যে সরকারী বিভাগ আছে তারও সংস্কার করা দরকার। বহু সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকারী অফিসার এবং কর্মচারী আছেন যাঁদের কঠোর তত্ত্বাবধানে এই প্রশাসনিক সংস্কার সম্ভব। আয়কর এবং অন্যান্য করের অফিসে সৎ অফিসার এবং কর্মচারীর সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। তাঁরা আরও সতর্ক হলে কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। কর-দাতার মন থেকেও অহেতুক আশংকা ও দুশ্চিন্তা দূর করা দরকার যাতে সৎ-বুদ্ধি সম্পন্ন করদাতাকে অযথা নাজেহাল না হতে হয়।

চলতি আর্থিক বছরের মূল্যায়নে যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল আমাদের কর-ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে কাজ কিছুই এগোয়নি। তার ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণও আশানুরূপ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। সরকারী ঋণের পরিমাণ বছরের পর বছর বেড়েই যাচ্ছে। ১৯৬৯—৭০ সালে ভারতের সরকারী ঋণ ৬৫৮ কোটি টাকা বেড়েছিল এবং তার আগের বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫.১ শতাংশ। সরকারী ঋণ ছাড়াও সরকারের অন্য ধরনের কিছু কিছু দেয় (liablity) থাকে—যেমন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ, প্রভৃতি। এইসব বাবদ ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় ছিল ৪৪৭০ কোটি টাকা। ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ এ ধরনের দেয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭৩৫ কোটি টাকা।

ঘাটতি অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির কোন হেরফের গত আর্থিক বছরে পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৭০—৭১ সালের বাজেটে প্রাথমিকভাবে ঘাটতি ছিল (প্রচলিত করের ভিত্তিতে) ৩৫০ কোটি টাকা, অতিরিক্ত কর ধার্যের পর ঘাটতির পরিমাণ ২২৫ কোটি টাকা হবে বলে অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে গত আর্থিক বছরে ঘাটতির পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার কম হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

তেত্রিশ

চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া যেন নিশ্বাস নেওয়া ও প্রশ্বাস ফেলা। গোরী ও না হলে বাঁচতে পারে না। রত্নও কি পারে? এক এক সময় মনে হয় ওদের ভালোবাসা চিরদিন ওই স্তরেই নিবদ্ধ থাকবে। ওই চিঠি দেওয়া নেওয়ার স্তরে। মাঝে মাঝে এক আধবার চোখাচোখি হবে। ভাগ্যে থাকলে চুম্বন বিনিময়। ওর বেশী কোনোদিন নয়।

অথচ রত্ন মনে মনে একরকম ব্রত নিয়েছে। গোরীই হবে তার জীবনের একমাত্র নারী, যে নারীর কাছে পুরুষ সব কিছু প্রত্যাশা করতে পারে। তবে একটি ক্ষেত্রে সে অপরজনের জন্যে স্থান রাখতে চায়। সেটি হলো বিশুদ্ধ বন্ধুতার ক্ষেত্র। সেখানে থাকবে মার্শাল, সেখানে থাকবে সেবা। তেমনি আরো অনেকে। বন্ধুতার কি সীমা আছে না শেষ আছে! কাল আছে না দেশ আছে! যেমন পুরুষ বন্ধুর বেলা তেমনি নারী বন্ধুর বেলা রত্ন চায় অবাধ পরিসর। কিন্তু প্রেমের বেলা সে একজনের কাছে বাঁধা থাকতে রাজী। সেই একজন হচ্ছে গোরী। সেই হবে তার গৃহিণী সচিব অন্তরঙ্গ সখী। তার সন্তানজননী।

একদা সে গোরীর প্যাশনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। এখন তার নিজের ভিতরেও প্যাশন সঞ্চারিত হয়েছে। গোরী তার আঁচ পেয়ে শঙ্কিত। রত্ন তা শুনে লজ্জিত। গোরী যদি তার বান্ধবী হয়েই ক্ষান্ত তবে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু তার সঙ্গিনী হলে? একদিন না একদিন সেই আগুনের সম্মুখীন হতে হবে যে-আগুন জ্বলছে তারায় তারায় নক্ষত্রে নীহারিকায়। রত্নও কি একটি জ্যোতিষ্ক নয়? গোরীও কি তাই নয়? মা হয়েছে বলে কি তার জ্বালা নিবে গেছে? সে কি এখন পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ বা চাঁদের মতো উপগ্রহ?

তবে এটাও ধীরে ধীরে অনুভব করে রত্ন যে, রাধা কেমন করে মাডোনা হয়ে গেছে। গোরীর মাতৃমূর্তির আলোকচিত্র র‍্যাফেলের আঁকা সিস্টিন মাডোনার ভাব মনে আনে। এই মাতৃরূপিণী নারীর দিকে তাকিয়ে রাধাভাব যদি কারো মনে জাগে তবে তার লজ্জিত হওয়াই উচিত। লজ্জায় নীরব থাকাই শ্রেয়। রত্ন আর ও প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখে না। কিন্তু একবার যে লিখেছে তাইতেই গোরীর দেহে মনে ত্রাস লাগিয়ে দিয়েছে। গোরী এখন ওকে ডরায়। কথাটা ফিরিয়ে নেবারও উপায় নেই। ঢিল ছুঁড়লে হাতে ফিরে আসে কি?

পরস্পরকে ভালোবাসলে পরস্পরের দেহ মনেরও খোঁজ খবর জানতে হয়। রত্ন বিদেহী প্রেমিক নয়। সেও একটুকরো আগুন। যদিও ছাইঢাকা। জানুক গোরী এই সত্য। সত্যের সঙ্গে সত্যের বোঝাপড়া হোক। সম্বন্ধটা যদি হয়ে থাকে সম্ভবপর পতি-পত্নীর তবে আগুনকে কেন সত্তার ভয়! সত্তাই যে আগুনে দিয়ে গড়া। তবে কি ওরা চিরন্তন বান্ধববান্ধবী? তা যদি হয় রত্নকেও তার মুক্তির কথা ভাবতে হবে। মুক্ত হয়ে অন্য নারীর সঙ্গ পেতে হবে। অপরার সঙ্গে মধুর রসের আস্বাদন নিতে হবে।

ইতিমধ্যেই সে গোরীকে তার স্ত্রী বলে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছিল। কল্পনাটা একতরফা। গোরী আর রত্নই যেন স্বামী-স্ত্রী। যশোবাবু কেউ নন। তা বলে তাঁর ছেলেটিকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে ছেলে গোরীরও ছেলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রত্নই কেউ নয়। সে কেবল কল্পনাই করতে পারে। বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

গোরী যদি ওর বউ হয় তবে গোরীর সন্তান ওরও সন্তান। এর মধ্যেই তার প্রতি ও একপ্রকার বাৎসল্যভাব অনুভব করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কোন প্রাণে গোরী ওকে পেছনে ফেলে আসবে। সঙ্গে করে আনতে চাইলেই বা আনতে দিচ্ছে কে? যশোবাবু কি অমনি ছেড়ে দেবেন? তিনি যেমন পুত্র-অন্ত প্রাণ।

গোরীকে ভালোবাসতে বাসতে রত্ন ওর ছেলেকেও ভালোবেসেছে। তা বলে গোরীর উপর যেমন দাবী ওর ছেলের উপরও কি তেমনি দাবী? না, রত্ন ওকে যতই ভালোবাসুক না কেন ওর বাপের মতো ভালোবাসতে পারে না, ওর বাপের স্থান পূরণ করতে পারে না। তেমন দাবী করা সাজে না। ভালোবাসতে চায় ভালোবাসুক, কিন্তু কোনোদিন যেন কল্পনাও না করে যে গোরীর ছেলে ওকে নিজের বাপের জায়গায় বসাবে। বাপের টান যেমন ছেলের প্রতি, ছেলের টানও তেমনি বাপের প্রতি। প্রকৃতি এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে, তাই এ সম্পর্ক প্রেমের চেয়েও নিত্য। নরনারীর প্রেমে জোয়ার আছে ভাটা আছে। কিন্তু পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপরিবর্তনীয়।

এমনি করে রত্নর অলক্ষিতে ওর অন্তরে সন্তানক্ষুধা জন্মায়। ওরও একটি সন্তান চাই, যে একান্তভাবে ওর আপনার, যার

চার বছর ধরে আমাদের জাতীয় আয় যতটা বেড়েছে, তার তিন-চতুর্থাংশ বেড়েছে কৃষি-উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার দরুন। অথচ গ্রামাঞ্চলে যে হারে আয় বেড়েছে তার অর্ধেক হারেও যদি রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো যেত তবে সরকারকে আজ চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য ততটা চিন্তা করতে হত না এবং ঘাটতি অর্থ সংস্থানের (Deficit Financing) নীতি আঁকড়ে ধরে থাকতে হত না। বর্তমানে জাতীয় আয়ে কৃষিক্ষেত্রের অবদান শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। কিন্তু কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির সম্মিলিত রাজস্বে (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করসহ) কৃষিক্ষেত্রের অবদান শতকরা ২৭ ভাগের বেশি নয়। গত বছরের বাজেটে গ্রামীণ সঞ্চয় সুসংহত করার কোন প্রয়াস দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ত, কর ফাঁকি বন্ধ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। কর ফাঁকি বন্ধ করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন আয়কর দেওয়ার সর্বোচ্চ হার কমানো। গত বাজেটে আয়কর দেওয়ার সর্বোচ্চ হার রাখা হয়েছিল শতকরা ৯৩.২ ভাগ; অর্থাৎ, দুই লক্ষ টাকার উপর যা আয় হবে তার শতকরা ৯৩.২ ভাগ সরকারকে আয়কর দিতে হবে। আমাদের ধনী ব্যবসায়ী অথবা বিভিন্ন উপজীবিকায় নিযুক্ত এমন অনেকেই আছেন যাঁরা এই হারে স্বোপার্জিত আয়ের উপর কর দিতে প্রস্তুত নন। তার পরিণতি হল কর ফাঁকি। বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী নিকোলাস ক্যালডর যখন ভারতের কর-সংস্কার সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট প্রদান করেন, তখন একদিকে যেমন তিনি ব্যয় কর, মূলধন-মুনাফা কর, সম্পদ কর ও দান কর ধার্য করার কথা বলেছিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি চেয়েছিলেন আয়করের সর্বোচ্চ হার অনেক কমিয়ে দিতে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সব নাগরিকের পক্ষেই আয়, ব্যয়, সম্পত্তি, দান-খয়রাতি প্রভৃতির বাৎসরিক হিসাব সরকারের নিকট পেশ করার নিয়ম চালু করতে। ক্যালডর চেয়েছিলেন, বর্তমান আয়কর এবং সুপার-ট্যাক্সের (Super-tax) পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা আয় পর্যন্ত প্রগতিশীল হারে (Progressive rates) কর ধার্য করতে এবং তার পর থেকে ফ্ল্যাট হারে (Flat rate) টাকা প্রতি ৪২ পয়সা কর ধার্য করতে। ভারত সরকার নতুন কর সম্পর্কে ক্যালডরের সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন (যদিও ব্যয় কর পাঁচ বছর আগে দ্বিতীয়বারের মত প্রত্যাহার করা হয়েছে), অথচ আয়কর সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এবং বাধ্যতামূলক হিসাব দাখিলের নীতি (Compulsory Reporting System) চালু করার সুপারিশ গৃহীত হয়নি। আয়করের সর্বোচ্চ হার যদি অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কমানো হত এবং আয়কর ব্যবস্থা যদি আরও সরল করা হত (এক্ষেত্রে ভারত সরকার ভূতলিঙ্গম কমিশনের সুপারিশগুলিও গ্রহণ করেননি) তবে হয়ত কালো টাকার পরিমাণ কিছুটা কমানো সম্ভব হত। ক্যালডরের সুপারিশ শুধু ভারতে কেন, অন্যান্য দেশেও পরীক্ষিত হয়েছে কিন্তু গৃহীত হয়নি। তাই সখেদে ক্যালডর বলেছিলেন, "Will the underdeveloped Countries never learn to collect taxes?" আয়করের সর্বোচ্চ হার কমিয়ে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে ধনী লোকদের আরও সুবিধা করে দেওয়া। বরং আয়করের সর্বোচ্চ হার কমিয়ে দিয়ে অন্যান্য করগুলির এমন সংস্কার করা যেতে পারে যাতে ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য কমানো সম্ভব হয় অথচ সরকারী রাজস্বের পরিমাণও বাড়ে। উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হয়, অথচ ভারতে রাজস্ব হিসাবে আদায় হয় জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ১৪ ভাগ এবং তারও প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আসে পরোক্ষ কর থেকে যার চাপ বেশি পড়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর।

শহর অঞ্চলের সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু এখন পর্যন্ত তা করা সম্ভব হয়নি। কর-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই এ-জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর আদায় করার জন্য যে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের দেশে দেখা যায় তার মধ্যে দুর্নীতি এখনও প্রচুর রয়ে গেছে। আয়কর অফিসে ঢুকলেই বেয়ারা এবং এমনকি সরকারী কর্মচারীদেরও দক্ষিণা দিতে হয়—তাও যে স্বেচ্ছায় তা নয়; অনেক ক্ষেত্রেই দায়ে পড়ে তা দিতে হয়েছে বলে করদাতাগণ অভিযোগ করেছেন! কর ব্যবস্থার সংস্কার করা শুধু বিশেষ কোন করের হার পুনর্বিন্যাস করা অথবা প্রচলিত কোন কর প্রত্যাহার করা এবং নতুন কর ধার্য করা নয়। কর-ব্যবস্থার সংস্কারের সঙ্গে কর আদায়ের জন্য যে সরকারী বিভাগ আছে তারও সংস্কার করা দরকার। বহু সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকারী অফিসার এবং কর্মচারী আছেন যাঁদের কঠোর তত্ত্বাবধানে এই প্রশাসনিক সংস্কার সম্ভব। আয়কর এবং অন্যান্য করের অফিসে সৎ অফিসার এবং কর্মচারীর সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। তাঁরা আরও সতর্ক হলে কর ফাঁকি বন্ধ করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। কর-দাতার মন থেকেও অহেতুক আশংকা ও দুশ্চিন্তা দূর করা দরকার যাতে সৎ-বুদ্ধি সম্পন্ন করদাতাকে অযথা নাজেহাল না হতে হয়।

চলতি আর্থিক বছরের মূল্যায়নে যে জিনিসটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল আমাদের কর-ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে কাজ একটুও এগোয়নি। তার ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণও আশানুরূপ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। সরকারী ঋণের পরিমাণ বছরের পর বছর বেড়েই যাচ্ছে। ১৯৬৯—৭০ সালে ভারতের সরকারী ঋণ ৬৪৮ কোটি টাকা বেড়েছিল এবং তার আগের বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫.১ শতাংশ। সরকারী ঋণ ছাড়াও সরকারের অন্য ধরনের কিছু কিছু দেয় (liability) থাকে—যেমন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পি-এল ৪৮০ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ, প্রভৃতি। এইসব বাবদ ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় ছিল ৪৪৭০ কোটি টাকা। ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চ এ ধরনের দেয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৭৩৫ কোটি টাকা।

ঘাটতি অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির কোন হেরফের গত আর্থিক বছরে পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৭০—৭১ সালের বাজেটে প্রাথমিকভাবে ঘাটতি ছিল (প্রচলিত করের ভিত্তিতে) ৩৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্যের পর ঘাটতির পরিমাণ ২২৫ কোটি টাকা হবে বলে অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে গত আর্থিক বছরে ঘাটতির পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার কম হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

রত্ন ও শ্রীমতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

তৃতীয় ভাগ

ছেত্রিশ

চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া যেন নিশ্বাস নেওয়া ও প্রশ্বাস ফেলা। গোরী ও না হলে বাঁচতে পারে না। রত্নও কি পারে? এক এক সময় মনে হয় ওদের ভালোবাসা চিরদিন ওই স্তরেই নিবদ্ধ থাকবে। ওই চিঠি দেওয়া নেওয়ার স্তরে। মাঝে মাঝে এক আধবার চোখাচোখি হবে। ভাগ্যে থাকলে চুম্বন বিনিময়। ওর বেশী কোনোদিন নয়।

অথচ রত্ন মনে মনে একশরণ ব্রত নিয়েছে। গোরীই হবে তার জীবনের একমাত্র নারী, যে নারীর কাছে পুরুষ সব কিছু প্রত্যাশা করতে পারে। তবে একটি ক্ষেত্রে সে অপরজনের জন্যে স্থান রাখতে চায়। সেটি হলো বিশুদ্ধ বন্ধুতার ক্ষেত্র। সেখানে থাকবে মাসীদি সেখানে থাকবে সেবা। তেমনি আরো অনেকে। বন্ধুতার কি সীমা আছে না শেষ আছে! কাল আছে না দেশ আছে! যেমন পুরুষ বন্ধুর বেলা তেমনি নারী বন্ধুর বেলা রত্ন চায় অবাধ পরিসর। কিন্তু প্রেমের বেলা সে একজনের কাছে বাঁধা থাকতে রাজী। সেই একজন হচ্ছে গোরী। সেই হবে তার গৃহিণী সচিব অন্তরঙ্গ সখী। তার সন্তানজননী।

একদা সে গোরীর প্যাশনের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। এখন তার নিজের ভিতরেও প্যাশন সঞ্চারিত হয়েছে। গোরী তার আঁচ পেয়ে শঙ্কিত। রত্ন তা শুনে লজ্জিত। গোরী যদি তার বান্ধবী হয়েই ক্ষান্ত তবে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু তার সঙ্গিনী হলে? একদিন না একদিন সেই আগুনের সম্মুখীন হতে হবে যে-আগুনে জ্বলছে তারায় তারায় নক্ষত্রে নীহারিকায়। রত্নও কি একটি জ্যোতিষ্ক নয়? গোরীও কি তাই নয়? মা হয়েছে বলে কি তার জ্বালা নিবে গেছে? সে কি এখন পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ বা চাঁদের মতো উপগ্রহ?

তবে এটাও ধীরে ধীরে অনুভব করে রত্ন যে, রাধা কেমন করে মাডোনা হয়ে গেছে। গোরীর মাতৃমূর্তির আলোকচিত্র র‍্যাফেলের আঁকা সিস্টিন মাডোনার ভাব মনে আনে। এই মাতৃরূপিণী নারীর দিকে তাকিয়ে রাধাভাব যদি কারো মনে জাগে তবে তার লজ্জিত হওয়াই উচিত। লজ্জায় নীরব থাকাই শ্রেয়। রত্ন আর ও প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখে না। কিন্তু একবার যে লিখেছে তাইতেই গোরীর দেহে মনে ত্রাস লাগিয়ে দিয়েছে। গোরী এখন ওকে ডরায়। কথাটা ফিরিয়ে নেবারও উপায় নেই। ঢিল ছুঁড়লে হাতে ফিরে আসে কি?

পরস্পরকে ভালোবাসলে পরস্পরের দেহ মনেরও খোঁজ খবর জানতে হয়। রত্ন বিদেহী প্রেমিক নয়। সেও একটুকরো আগুন। যদিও ছাইঢাকা। জানুক গোরী এই সত্য। সত্যের সঙ্গে সত্যের বোঝাপড়া হোক। সম্বন্ধটা যদি হয়ে থাকে সম্ভবপর পতি-পত্নীর তবে আগুনকে কেন লজ্জার ভয়! সত্তাই যে আগুন দিয়ে গড়া। তবে কি ওরা চিরন্তন বান্ধববান্ধবী? তা যদি হয় রত্নকেও তার মুক্তির কথা ভাবতে হবে। মুক্ত হয়ে অন্য নারীর সঙ্গ পেতে হবে। অপরার সঙ্গে মধুর রসের আস্বাদন নিতে হবে।

ইতিমধ্যেই সে গোরীকে তার স্ত্রী বলে কল্পনা করতে আরম্ভ করেছিল। কল্পনাটা একতরফা। গোরী আর রত্নই যেন স্বামী-স্ত্রী। যশোবাবু কেউ নন। তা বলে তাঁর ছেলেটিকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে ছেলে গোরীরও ছেলে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে রত্নই কেউ নয়। সে কেবল কল্পনাই করতে পারে। বাস্তবের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

গোরী যদি ওর বউ হয় তবে গোরীর সন্তান ওরও সন্তান। এর মধ্যেই তার প্রতি ও একপ্রকার বাৎসল্যভাব অনুভব করতে শুরু করেছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কোন প্রাণে গোরী ওকে পেছনে ফেলে আসবে। সঙ্গে করে আনতে চাইলেই বা আনতে দিচ্ছে কে? যশোবাবু কি অমনি ছেড়ে দেবেন? তিনি যেমন পুত্র-অন্ত প্রাণ।

গোরীকে ভালোবাসতে বাসতে রত্ন ওর ছেলেকেও ভালোবেসেছে। তা বলে গোরীর উপর যেমন দাবী ওর ছেলের উপরও কি তেমনি দাবী? না, রত্ন ওকে যতই ভালোবাসুক না কেন ওর বাপের মতো ভালোবাসতে পারে না, ওর বাপের স্থান পূরণ করতে পারে না। তেমন দাবী করা সাজে না। ভালোবাসতে চায় ভালোবাসুক, কিন্তু কোনোদিন যেন কল্পনাও না করে যে গোরীর ছেলে ওকে নিজের বাপের জায়গায় বসাবে। বাপের টান যেমন ছেলের প্রতি, ছেলের টানও তেমনি বাপের প্রতি। প্রকৃতি এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে, তাই এ সম্পর্ক প্রেমের চেয়েও নিত্য। নরনারীর প্রেমে জোয়ার আছে ভাঁটা আছে। কিন্তু পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপরিবর্তনীয়।

এমনি করে রত্নর অলক্ষিতে ওর অন্তরে সন্তানক্ষুধা জন্মায়। ওরও একটি সন্তান চাই, যে একান্তভাবে ওর আপনার, যার

সঙ্গে ওর সম্পর্ক প্রকৃতির সৃষ্টি, সুতরাং নিত্যকালীন। ওর সন্তানের মা হবে কে? কে আবার? ওই গোরী। ওর একমাত্র নারী। সন্তানের জন্যে ও অন্য নারীর কাছে যাবে না। অন্য নারীকে বিবাহ করবে না। বিবাহ যদি করে তবে ওই গোরীকেই। সন্তানের পিতা যদি হয় তবে ওই গোরীর প্রসাদেই। এখন গোরী সম্মত হলেই হয়। কে জানে! ও মেয়ে কি সত্যি রাজী হবে! কিন্তু এখন থেকে ওসব কথা কেন? আগে তো ওর বন্ধনমোচন হোক।

লিখবে কি লিখবে না করতে করতে একদিন লিখেই ফেলে রক্ষ। ওর মনের সাধ কি কোনোদিন মিটবে, না? কী সাধ? ও চায় একটি ছেলে কি মেয়ে। এমন কোনো নারী কি এ জগতে নেই যে স্বেচ্ছায় ওর সন্তানের মা হবে, ওকে তার সন্তানের পিতারূপে মনোনয়ন করবে? ওদের দু'জনের সন্তান হবে প্রেমের সন্তান, নিছক আনুষ্ঠানিক বিবাহের উৎপাদন নয়।

রক্ষ সোজাসুজি জানতে চায়নি গোরী সেই নারী কি না। তা হলেও তীরটা লক্ষ্য-ভেদ করে। গোরী আরো আতঙ্কিত হয়। প্যাশন যত না ভয়ংকর মাতৃত্ব তার চেয়েও

বেশী। রঞ্জু কেন বুঝতে পারে না যে প্রেমের সম্বন্ধ মাঝখানে থাকলেও সম্মতি দেওয়া সহজ নয়। গোরীই বোঝে ওতে যন্ত্রণার ভাগ কত আর সুখের ভাগ কত। আবার সেই যন্ত্রণা। না, না, এত শীগগির নয়। পরে হয়তো দেহ মন অনুকূল হবে। তার আগে চাই বন্ধনমোচন। নতুন করে বন্ধন-স্বীকার যখন হবার তখন হবে। আপাতত চিন্তাও করা যায় না। এখনকার একমাত্র ধ্যান কবে মুক্তি, কেমন করে মুক্তি।

"আমার সমস্যা আরো জটিল হয়েছে, সোনা।" গোরী লেখে, "ইংরেজ সরকার যখন জোর জুলুম করে পারে না তখন শাসন সংস্কারের প্রলোভন দেখায়। আমাদের শাবুরা নির্লজ্জের মতো টোপ গেলেন। তেমনি আমার মালিকের পলিসি একবার গরম তো একবার নরম। এবার উনি ক্ষেপেছেন আমাকে খুশি করতে। আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ওঁর দিবারাত্র ব্যস্ততা। ওঁর আন্তরিকতা সত্যি আমাকে স্পর্শ করে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো আমাকে সোনার খাঁচায় আটক করে রাখা। লোহার না হয়ে সোনার বলে কি ওটা খাঁচাই নয়? আমি যে খাঁচার পাখিই ছিলাম সেই খাঁচার পাখিই আছি। ওঁর অভিলাষ যদি পূর্ণ হয় তবে সেই খাঁচার পাখিই থাকব। হায়, মুক্তির আনন্দ একবার যদি প্রাণভরে আমি পেতুম! তা হলে কি এই সোনার খাঁচার দিকে কোনদিনও ফিরে তাকাতুম। ওঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী আমি নই। হতেও পারব না আর এ জীবনে। কিন্তু ও কথা যদি মুখ ফুটে বলি উনি নিদারুণ আঘাত পাবেন। এখন দেখছি সুধাই ছিল ওঁর প্রকৃত সঙ্গিনী। সুধার অভাব কি আমি পূরণ করতে পারি! ওঁর সাধ্যসাধনা বৃথা। কিছুতেই ওঁর সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারব না। খাঁচাটা সুধাকেই দিয়ে যাব ভাবছি। কে একজন অচেনা মানুষ এ বাড়ির নতুন বউরানী হয়ে আসবে, তার চেয়ে চেনা মানুষই ভালো। তা ছাড়া সুধাও তো এ বাড়ির বড় বউ। বেচারি নিঃসন্তান বলে কি অনধিকারী? ওর স্বামী যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে সংসার তো ওরই চারদিকে ঘুরত। আমার চারদিকে নয়। সুধার জন্যে আমার দুঃখ হয়, মানিক। ওর না আছে স্বামী, না পুত্র। তবু লিখতে পারিনে যে, দিদি, ফিরে আয়। লিখতে বাধে।"

কেন বাধে রঞ্জু জানতে চায় না, ওদের ব্যাপার ওরাই বুঝুক। রঞ্জু কোথাকার কে। অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে ওভাবে জড়িয়ে পড়তে ওর অন্তরের আপত্তি। গোরী ভিন্ন আর কেউ ওর আপনার নয়। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল কি শিষ্ট? রঞ্জু কখনো যশোবাবুর প্রসঙ্গে একটি কথাও লেখে না। সব সময় এড়িয়ে যায়। তবে ছেলের প্রসঙ্গে লেখে। ছেলে যে গোরীরই অঙ্গ। গোরী যদি তার আপনার হয়ে থাকে তো ওর ছেলেও আধখানা আপনার। তা হলেও বাপের মতো দরদ দেখাতে যায় না। পাছে কেউ বলে, মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ।

আসলে হয়েছিল এই যে মা হবার পর থেকে গোরী একধাপ এগিয়ে রয়েছিল। রঞ্জু তো বাপ হয়নি, সে কেমন করে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে? মিলিয়ে নিতে হলে তাকেও বাপ হতে হবে। পরের ছেলের নয়, নিজের ছেলের বাপ। কিন্তু কেউ তার ছেলের মা হতে রাজী থাকলে তো?

তা ছাড়া সে নিজেও প্রস্তুত নয়। হবেও না বহুদিন। তার মন প্রস্তুত নয়, প্রস্তুত হতে সময় নেবে। তার আর্থিক প্রস্তুতিও নেই। সেটাও সময়সাপেক্ষ। তা ছাড়া সে স্বাধীন থাকতে চায়। অমন করে জড়িয়ে পড়লে স্বাধীনতা হারাবে। গোরীর যেমন মুক্ত হবার জন্যে ব্যাকুলতা রঞ্জুরও তেমনি মুক্ত থাকার জন্যে আকুলতা। বিবাহই যথেষ্ট বন্ধন, সন্তান হলে তো আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন।

স্বাধীন থাকতে হলে গোরীর মতো নিঃসন্তান হওয়া নয়, ওর অনুসরণ করা নয়। বরং ঠিক উল্টো। তবু এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে গোরী মা হয়েছে, রঞ্জু বাপ হয়নি, অভিজ্ঞতা দুজনের সমান্তরাল নয়। গোরী ওর পুত্রমুখ দেখে যা আস্বাদন করছে রঞ্জু তার ভাগ পাচ্ছে না। ভাগ পাচ্ছেন যশোবাবু। ধন্য তিনি।

যশোবাবুকে সে ঈর্ষা করে না। সে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তিনি যদি গোরীকে ওর মুক্তির স্বপ্ন ভুলিয়ে দিতে পারেন তবে সে নির্বিবাদে দূরে সরে যাবে। দূরে থেকে ভালোবাসবে। ভালোবাসতে তো কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। তেমনি গোরী যদি মনে মনে ভালোবাসতে চায় ভালোবাসতে পারবে। তখন সেই ভালোবাসার সঙ্গে

মুক্তির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকবে না। একজনকে উদ্ধার করার জন্যে আরেকজনকে অ্যাসিড নুন খেয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না, প্রতি-যোগিতায় নামতে হবে না, পরধর্ম বরণ করতে হবে না।

পরকীয়াকে স্বকীয়া করা হয়তো তত কঠিন নয়, কিন্তু পরধর্মকে স্বধর্ম করা একান্ত কঠিন। রঞ্জর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে জীবিকার পেষণে। যে জীবিকা তার স্বভাববিরুদ্ধ। এ জীবিকা ত্যাগ না করলে সে বাঁচবে না। তাই যদি হয় তবে আদৌ গ্রহণ করাই বা কেন? একজনের মুক্তির জন্যেই তো।

চৌত্রিশ

অনেকদিন বাদে কাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এসেছিল এক বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় মেয়ে দেখতে। জানে প্রথাটা ভালো নয়, মেয়েদের পক্ষে অমর্যাদাকর। তবু ও ছাড়া উপায় কী? রঞ্জর মতো সবাই তো নয় যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে।

কানন হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে সকলের বিশ্বাসভাজন। গোরী তো ওকে বিশ্বাস করেই, যশোবাবুও করেন। স্বহস্তে ওর চুরুট ধরিয়ে দেন। নিজের দেওয়া চুরুট।

"যশো-দার এখন সুদিন যাচ্ছে, রঞ্জন।" কানন বলে। "ছেলেটি পয়মন্ত।"

"হাঁ, শুনেছি উনি নাকি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন।" রঞ্জ পরিহাস করে।

"না না, তামাশার কথা নয়। দশ বছর আগেই যাঁর ব্যারিস্টার হবার কথা আজ তিনি হচ্ছেন কিনা অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট উইথ সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার্স। তুমি বলবে কমিক, আমি বলব ট্র্যাজিক। অথচ এ না হলে ও'র পুনর্বাসন হয় না। এতদিন কারো মাটি ধরে ধরেই ওকে উঠতে হবে। চলি চলি পা পা।" কানন উৎসাহের সঙ্গে বলে।

"আমি কিন্তু তামাশা করিনি, ভাই। আমারও সহানুভূতি আছে।" রঞ্জ আশ্বাস দেয়।

"এই কথা শিখেই ভদ্রলোকের চেহারা ফিরে গেছে, রঞ্জন। দেখলে মনে হয় একজন তৈরি ইমপার্টাণ্ট পার্সন। বলেন, আমরা [illegible] এ জেলার আইন ও শৃঙ্খলার [illegible] লোক। আমরা যাঁদের ম্যাজিস্ট্রেট বলে [illegible] পাওয়ার্স আছে।"

ছেলের বাপ হতে না হতে জেলার মা বাপ। কী অসামান্য প্রগতি! রঞ্জ কি হাসতে পারে! গম্ভীর মুখে বলে, "কথাটা ভুল নয়।"

"আসলে ব্যাপারটা কী, জানো?" কানন কানে কানে বলে, "তুমি পাশ করলে যা হবে তা উনি আগে ভাগেই হয়ে রইলেন। একই পদে নয় অবশ্য। তবু তো বলতে পারবেন যে উনিও একজন হর্তা কর্তা বিধাতা। পারুলদির চোখে যাতে খাটো না হন। তা ছাড়া আরো কথা আছে। ওটা ও'র জীবনেরও একটা কামনাপূরণ। সেদিন বলছিলেন, দ্যাখ হে, কোর্ট ভিন্ন আমার গতি নেই। একভাবে না একভাবে সেখানে আমাকে পৌঁছতে হতোই। ব্যারিস্টার হয়ে পরে হাইকোর্ট বেঞ্চে না হোক ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে বেরহামপুর বেঞ্চে। অনরারিই ভালো। লোকে বুঝুক যে টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যায় না। আমি কারো মাইনে করা চাকর নই। যে কোনোদিন আমি ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি। আমি কারো সাবর্ডিনেট নই যে সাহেবদের মন রাখা রায় দেব।"

রঞ্জ বুঝতে পারে ওটা ওরই উপর কটাক্ষ। কী করবে! হজম করে।

"তা গলটার সত্যি দাম আছে। তা না হলে এক লোন কোম্পানী ও'কে চেয়ারম্যান
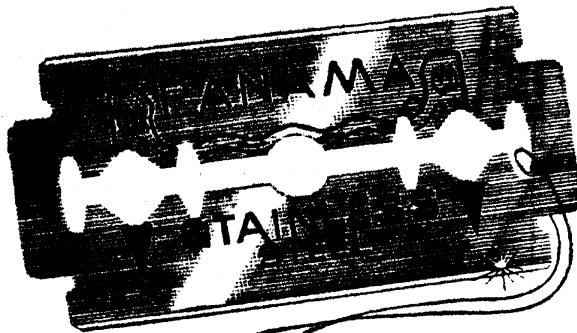
করে কেন? অবশ্য ওঁকেও কিছু ইনভেস্ট করতে হলো। কোর্ট আর কোম্পানী করতে ঘন ঘন সদরে আসতে হয় বলে বহরমপুর শহরে ওঁর নতুন ইমারত উঠছে। সেইখানেই বেশীর ভাগ সময় কাটাবেন। পারুলদিও পাড়াগাঁয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠছে। ওর মুক্তির আধখানাই তো পাড়াগাঁয়ের হাত থেকে মুক্তি। বাচ্চাকে ও পাড়াগাঁয়ে মানুষ করতে চায় না। বনো-দাও এ বিষয়ে একমত।" কানন বলে যায়।

"ভালোই তো।" রঞ্জু আর কী বলতে পারে! "অমনি করে যদি ওর মুক্তির বাকী আধখানাও মিটে যায় তা হলে আমারও ছুটি। আমি এই দুঃসাধ্যসাধনের দায় ঘাড়ে নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছি, ভাই।"

রঞ্জুর আত্মবিশ্বাস যদিও টিকটিকে তবু বাঘতাড়ার আশঙ্কাও ছিল পদে পদে। তখন গৌরীর জন্যে আর কী করতে পারে সে? কেই বা আছে তার সহায়? জ্যোতিদা তো পাশ কাটান। গৌরী যদি আপনি আপনার ভার নিতে পারত তা হলে সে-ই সব চেয়ে ভালো হতো না কি?

"তুমিও কি জ্যোতিদার মতো পাশ কাটাতে চাও রঞ্জু?" কানন শুনে বলে। "ও বেচারির দিকটা কি ভেবে দেখবে না?"

"কেন, ওর ভালোর জন্যেই তো একথা বলেছি।" রঞ্জু জবাবদিহি করে।

"ওকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ খুশি। বেগমপুর থেকে বহরমপুর ওর পক্ষে একটি প্রতিশ্রুতিময় পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়। বনোদা তো ওকে বিলেত নিয়ে যাবার অঙ্গীকারও দিয়েছেন। যাবেন উনি পরীক্ষা দিয়ে কলাউ টু দি বার হতে। ওটুকু কবে সারা হবার কথা! কেন হয়নি সেইটেই আশ্চর্য। স্ত্রীকে একা ফেলে যাবেন না এটাই বোধ হয় কারণ। অথচ সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও বারণ। পথি নারী বিবর্জিতা। ও অনুশাসন লঙ্ঘন করবার মতো সাহস এতদিন ব্রাহ্মিকাদেরই ছিল। ইদানীং হিন্দুর ঘরের মেয়েরাও কালাপানি পার হতে এগিয়ে আসছেন।" কানন দুটি একটি দৃষ্টান্ত দেয়।

"হোক, হোক, তাই হোক। গৌরী ওর স্বামীর সঙ্গেই বিলেত যাক। সেইভাবেই যোল আনা মুক্ত হোক।" রঞ্জু অকপটে বলে। যদিও বাথিত সুরে।

"তাই যদি সম্ভব হতো তা হলে ও অন্তরে অন্তরে অসুখী হতো কেন?" কানন বলে। "ও চায় শিক্ষিতা হতে, স্বাবলম্বী হতে। তারপর নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে। ও চায় ঘরসংসার নয়, সন্তানবৃদ্ধি নয় কমরেডশিপ বা কম্পানিয়নশিপ। বনোদার সাধ্য কী যে উনি ওকে সব রকমে সুখী করেন। সেই জন্যেই তো ও তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে। তুমিই পারবে। উনি পারবেন না। তবে তোমার সঙ্গে টক্কর দেবার চিন্তা যে ওঁকে বিলেতের দিকে টানছে এটা সুলক্ষণ। উনি যদি ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেন তবে উনিও নতুন করে জীবন আরম্ভ করবেন। বেগমপুর তো একটা পচা ডোবা। ডোবার ব্যাঙ হতই ফুলে উঠুক না কেন ব্যাঙ ছাড়া আর কিছু নয়। যে অমন সুন্দর বেহালা বাজাতে পারে সে কেন ব্যাঙের সেবা করে জীবনটা কাটাবে শুনি?" কানন উত্তেজিত হয়ে বলে।

"কিন্তু আমার সঙ্গে টক্কর বললে যে, আমি কি তার যোগ্য?" রঞ্জু অবাক হয়।

"এতদিন তোমাকে উনি সীরিয়াসলি নেন নি। এখন বুঝতে পেরেছেন যে তুমি সফল হলেও পারো। তখন পারুলদিকে ঠেকানো দায়। তাই উনি আপাতত বহরমপুরের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এর পরে বাড়াবেন বিলেতের দিকে। এতে ওঁরও তো অগ্রগতি। তুমিই সক্রিয় হয়ে ওঁকে সক্রিয় করে দিয়েছ। এটাও অলিখিত একটা প্রতিযোগিতা। এতেও শেষ পর্যন্ত জয় হবে তোমারই। তবে উনিও পেছনে পড়ে থাকবেন না। দশ রকম সাংসারিক অভিজ্ঞতা যাঁর তিনিই তো আইনের ব্যবসায় কুশলী হন।" কানন নিঃসন্দেহ।

"আমি কিন্তু কোনো অর্থেই ওঁর

প্রতিপক্ষ নই, কানন। তুমি কি এটা ওঁকে বুঝিয়ে বলবে? পারেন তো উনিই গৌরীকে মুক্ত করে দিন, সেই সঙ্গে ওর কমরেড বা কম্পানিয়ন হোন। ওর মনোনয়ন পেয়ে ওকে নতুন করে বিয়ে করুন। গৌরীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আমার যা থাকবে তা এক জাতের বন্ধুতা। আমারও স্বাধীনতা থাকবে অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসবার, ভালোবেসে বিয়ে করবার। তার সন্তানের পিতা হবার।" বলতে বলতে রঞ্জুর চোখ ছল ছল করে।

"ও কী বলছ তুমি!" কানন চমকে ওঠে।

"তোমাদের প্রেম এতদূর গড়িয়েছে যে এর পর আর অন্য কোনো মেয়ে বা অন্য কোনো পুরুষের কথা ওঠে না। পারুলদিকে তুমি একটা চান্স দাও। ওর স্বামীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটাকে ও ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেবে। উনি ওর ছেলের বাপ হয়েছেন বলে যে ওর সত্যিকার স্বামী হয়েছেন, তা তো নয়। ওর নিজের চোখে ও অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে। ও চায় স্বয়ংবরা হতে। ঘটনাকে মেনে নিলে তো ও হেরে গেল। কেন হেরে যাবে শুনি? ওকে জিতিয়ে দেবার ভার তোমার উপরে। আমাদের নৈতিক সমর্থনও তোমার উপর। তবে যশো-দাকে এ কথা বলা

যায় না। উনি বুঝবেন না। ও'র ধারণা ছেলের বাপ হয়ে উনি তুরুপের তাস হাতে পেয়ে গেছেন। এখন ও'র সুবিধামত তুরুপ করবেন। পারুলদির হাতের রঙের তাস তো তুমি। তুমি সাহেব হতে পারো, কিন্তু উনি হচ্ছেন টেক্কা।"

রত্ন তা শুনে দুঃখিত হয়। "তোমার কাছে স্বীকার করছি, কানন, যে গোরীর বেগমপুরে ফেরা আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি যদি সফল হতুম তা হলে হয়তো ওটা ঘটত না। কিন্তু ঘটেছে যখন তখন আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছে।"

"তা যদি বল, পারুলদিরও মাথা হেঁট। ছেলের মুখ চেয়েই ছেলের সঙ্গে যেতে হয়েছে ওকে। যেমন যায় ছেলের আয়া।" কানন রত্নকে প্রবোধ দেয়। "আয়ার যেটুকু প্রাপ্য তার বেশী প্রত্যাশা নেই ওর। ও স্ত্রীর অধিকার দাবি করে না। করলে তো স্বামীকেও স্বামী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ওর ধারণা ও একটি কুমারী জননী। ওটা একটা আকস্মিক ঘটনা। ওর জন্যে ও কাউকে স্বামী বলে স্বীকার করতে বাধ্য নয়। অথচ সন্তানের স্বার্থও রক্ষা করতে হবে। ছেলেকেও তার উত্তরাধিকার বুঝে নিতে হবে। ওরা নবাবী আমলের রাজপুত রইস। সূর্যের না চন্দ্রের কার যেন বংশধর। পারুলদিও এর জন্যে গর্বিত।"

রত্নর মন প্রবোধ মানে না। ওর প্রেম ওকে দেওয়ানা করেছে। আর দেওয়ানার মতো ও যত রাজ্যের অলীক অবাস্তব কল্পনায় ভোর হয়ে রয়েছে। গোরী নাকি ওরই নারী। ওর স্ত্রী হয়ে অন্যের ঘর করছে। অন্যের সন্তানের জননী হয়েছে। ও কেবল প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক নয়, বিড়ম্বিত স্বামী। ওরই অক্ষমতার জন্যেই তো এটা হলো। স্বামী হয়ে ও ওর স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারল না।

কানন হতভম্ব হয়ে শোনে। "এ সব কী যা তা বকতে শুরু করেছ, রতন! পারুলদি কবে থেকে তোমার স্ত্রী হলো! তুমিই বা কবে থেকে ওর স্বামী হলে! বিয়েই যাদের হয়নি, এক সঙ্গেই যারা থাকেনি তারা কিসের স্বামী স্ত্রী! আর অক্ষমতাই বা কিসের! কেউ কি বলছে যে তোমার ব্যর্থতার দরুনই পারুলদি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে? তা তো নয়। তুমি সফল হলেও পারুলদি ওইটুকু বাচ্চাকে নিয়ে বা রেখে তোমার সঙ্গে যেত না। ওর বাপের বাড়িতেও আর বেশী দিন থাকা চলত না। ও'দের ছেলেকে ও'রা নিয়ে যেতেনই। ওকেও যেতে হতো ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। মাকে ছেড়ে ছেলে কি বাঁচত?"

সব সত্য। তা সত্ত্বেও রত্নর অন্তর মানে না। ও প্রতিবাদ না করলেও ওর মুখ দেখে মনে হয় ওর প্রাণে ঘা লেগেছে। আস্ত একটা পাগল!

"ওসব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল, রতন। পারুলদি ওর স্বামীর স্ত্রী নয়। তা বলে তোমারও স্ত্রী নয়। আগে তো তুমি ওকে মুক্ত কর। মুক্তির পরে ও যদি স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে বরণ করে তবেই তুমি হবে ওর স্বামী। নয়তো শুধু-মাত্র প্রেমিক। অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর। অধীর হয়ে কী যেন ওকে লিখেছ, ওর মত নির্ভীক মেয়ের মনেও ভয় ঢুকেছে। ও বলছে, আমি কি তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি?" কানন জানতে চায় আগুন বলতে কী বোঝায়। অজানা দেশে পাড়ি?

রত্ন জানে আগুন মানে কী। ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। উত্তর দেয় না।

(ক্রমশ)

১২৬, ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম কথা

'হেমী নামে নগরীতে এক রাজা থাকেন; তিনি অসাধারণগুণগ্রাহী ও বহুধনাধিপতি ও সর্বদা ঈশ্বরপরায়ণ—কিন্তু অপত্যহীন। একদিন মন্ত্রীকে কহিলেন, হে মন্ত্রী, আমার দেশস্থিত সকল ব্রাহ্মণেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাও। আমি নিঃসন্তান, আমার এত সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন? সমস্ত ব্রাহ্মণেরদিগকে প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া মন্ত্রী নিমন্ত্রণপত্র লিখিয়া সর্বত্র পাঠাইলে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত আহ্লাদে আসিতেছে—ইতোমধ্যে পঞ্চমবর্ষীয় এক নিরক্ষর বালক রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কহিল, হে মহারাজ, তুমি অপুত্রক নও, যেহেতুক রাজা পিতৃমাতৃহীন বালকের পিতা। অতএব আমি পিতৃমাতৃহীন, আমি তোমার পুত্র। রাজা এই মধুর কথা শুনিয়া অতি প্রীত হইয়া সে বালককে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলেন ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরদিগকে সঞ্চিত সকল ধন দিলেন, কিন্তু সেই শিশু বালককে আপন রাজ্য দিয়া তাহাকে নিকটে রাখিয়া আপনাকে সপুত্রক জ্ঞান করিয়া পরম সুখে ঈশ্বরারাধন করিতে লাগিলেন ইতি।'

কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদিযুগের ক্রমবিকাশ ও প্রকৃতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাই বুঝবেন কেরীর 'ইতিহাসমালা'র ভাষার প্রাঞ্জলতা আর শৈলীর আধুনিকতার মূল্য। পুস্তকটি মুদ্রিত হয়েছিল, শ্রীরামপুরস্থিত মিশন প্রেস-এ, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে।

অনির্দিষ্ট কারণে ইতিহাসমালার প্রসার হয়নি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, ১৮১২ সালের মার্চ মাসের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে পুরো স্টকটা গুদামেই নষ্ট হয়েছে। অন্য ব্যাখ্যাও অবশ্য সম্ভাবনা-বিরহিত নয়: একাধিক গল্প আদিরসের বলে বিবেচিত হওয়াতে কোনো নীতি-বাগীশদের আদেশে বেশ হয় বইগুলো ইচ্ছে করেই অস্বীকৃত করা হয়েছে আর সেইজন্যই হয়তো শুধু ফোর্ট উইলিয়ম

হে মহারাজ তুমি অপুত্রক নও

কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় আর লঙ সাহেবের ক্যাটালোগে নয়, শ্রীরামপুরের 'মেমোয়ার্স' পর্যন্ত গ্রন্থটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীরামপুরের তথা উত্তরপাড়ার পুস্তকালয়ে ইতিহাসমালার কোনো কপি রক্ষিত হয়নি; রয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতে [তিনটি কপি] আর জাতীয় গ্রন্থাগারে।

গ্রন্থের বিবরণ

ইতিহাসমালার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২০। মুদ্রিত টেক্সটের আয়তন উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চি, প্রস্থে তিন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় সতেরোটি পংক্তির জায়গা আছে; প্রতিটি সম্পূর্ণ পংক্তিতে আছে গড়পড়তায় সাতটি শব্দ। ভূমিকা, পাদটীকা, সূচী—এ সবের বালাই নেই।

গ্রন্থটি দেড়শোটি 'কথায়' কিংবা 'ইতিহাসে' বিভক্ত। ইতিহাস বলতে কাহিনী বোঝায়: এক দস্যুতাকার, এক মহাজনের ইতিহাস...এক বানর এক মাণিক্য পাইয়াছিল, তাহার ইতিহাস...এক রাজা অবিচার করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস...।

প্রতিটি গল্পের শীর্ষনামে আছে যুগপৎ পরিমাণবাচক সংখ্যাচিহ্ন ও পূরণবাচক সংখ্যাক্ষর। ১৬টি গল্পে, আলাদা অনুচ্ছেদে ভূমিকা আছে—এক লাইন থেকে ছয় লাইন পর্যন্ত। ৩৮টি গল্পে আলাদা অনুচ্ছেদে, উপসংহার আছে—পাঁচটি শব্দ থেকে পঞ্চাশটি শব্দ পর্যন্ত। মাত্র দুটি গল্পে ভূমিকা ও উপসংহার দুটোই আছে। আর আছে দুটি গল্প যেগুলি অন্তঃস্থিত উপগল্প থাকাতে অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

গল্পগুলির দৈর্ঘ্য ১২টি পংক্তি থেকে সাড়ে চার পৃষ্ঠা পর্যন্ত। অধিকাংশ গল্পে 'ইতি' কথাটা বসানো হয়েছে। একটি গল্পে দুটো ইতি আছে—গল্পাংশের শেষে এবং উপদেশমূলক উপসংহারে।

দাঁড়ি 'ইতিহাসমালায়' ব্যবহৃত একমাত্র যতিচিহ্ন। দুয়েকটি গল্প দাঁড়ি-বহুল হলেও [একটি গল্পে দেখি চারটি লাইনের মধ্যে চারটি দাঁড়ি] অধিকাংশ গল্পে দাঁড়ির সংখ্যা অতিরিক্ত অল্প। একাধিক গল্পে [একটি গল্পে আবার পঞ্চাশটি পংক্তি আছে] কোনো দাঁড়ি নেই। উদ্ধৃতির কিংবা জিজ্ঞাসার চিহ্ন কোনোটাই নেই; হাইফেনও নেই—পংক্তির শেষে শব্দ অসমাপ্ত থাকলেও না: করিতে/ছেন, তাহার/দের, প্রভৃতি/ও, বাল/কের উদাম/দিতে কিঞ্চি/ন্মাত্র...।

শব্দের পুনরাবৃত্তি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশিত হয় : "পথে২ ভ্রমণ করিতে২"।

হসন্তের ব্যবহার আছে [বাক্‌সরস্বতী, হে স্বামিন্‌...]। কিন্তু ক্রিয়াপদে নয় ['দেখ' দেখ্‌-এর অর্থে]। কোনো কোনো শব্দের হসন্তহীন ও হসন্ত-সম্বলিত উভয় রূপ মেলে [দয়াবান্‌ ও দয়াবান; বিপদ্‌ ও বিপদ; বাদশাহ্‌ ও বাদশাহ...]।

অনুস্বারের ব্যবহার অনিয়ন্ত্রিত ['কিম্বা' কিন্তু 'সংভ্রম', 'সম্প্রতি' ও সংপ্রতি'...] Hiatus-এর বালাই নেই [কএক, দুইএর, পোআ, ভাইর, সিপাইর...]। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখি চন্দ্রবিন্দুর পশ্চাদীকরণ [সিধ', ইহাঁর, তাতিরা] কিংবা অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার [বাঁকী, ভর্গিগবামাত্র] এবং ঔ-কারের অপ্রচলিত রূপ [মৌনী, জলৌকা]। এ ছাড়া আছে অদা-অপ্রচলিত যুক্তাক্ষর [নয়ে-গ কিংবা দয়ে-গু : ভেদ্‌গতচিত্তে সদ্‌গুরু]; 'ব্‌' আর 'র্‌' অক্ষর শূন্য-হীন ['ব'-এর মতো]।

মুদ্রণকার্য ত্রুটিহীন নয় : শব্দগুলির মধ্যে ফাঁক এবং ফাঁকের অভাব কৌতূহলপ্রদ : মারাপড়িল, সভাসদ বর্গেরদিগের...। ভাঙ্গা ফাউন্টের সংখ্যাও অল্প নয়; পসাদ, সামগী মতপ্রায় কুকর, ভত্য, বাটা, কট...[প্রসাদ সামগ্রী, মৃতপ্রায়, কুকুর, ভৃত্য, বাটী, কটু...]। মুদ্রণ প্রমাদও আছে : সওদার, নিকস্থ সম্প্রদান, অনন্দ, মুদিত, অপল, কল্যা, প্রায়শ্চিত্ত, চম্পকরাণ্য, লক্ষ্মণাক্রান্ত...[সওদাগর নিকটস্থ, সম্পদবান, আনন্দ, মুদ্রিত, অল্প, কন্যা, প্রায়শ্চিত্ত, চম্পকারণ্য লক্ষণাক্রান্ত...]।

ইতিহাসমালার মানচিত্র

কোনো কোনো গল্পের কুশীলব অনাম্নী, কালও স্থান অনির্দিষ্ট : এক দেশে এক রাজা ছিলেন...এক নগর মধ্যে অতিশয় ধনবান এক বণিক ছিল...কোন এক নগরে এক ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ।...।

অধিকাংশ কাহিনীর ঘটনাস্থল : উত্তরদেশ, দক্ষিণদেশ, পূর্বদেশ, মধ্যদেশ। [পশ্চিম দেশের উল্লেখ নেই] কিংবা মগধ, সিংহল, বিন্ধ্য, কাশ্মীর সুরঙ্গ, কানাকুব্জ দেশ...। আর বঙ্গভূমি : গৌড়ে এক নির্বোধ পথিক ছিল, রাঢ়ে ছিল এক পলাতক ব্রাহ্মণ।

সেই সব দেশে পর্বত আছে [বিন্ধ্য, চন্দ্রশেখর চন্দদ্বীপ, চিত্রকূট...] নদী আছে [কাবেরী, গোদাবরী, কালিন্দী, ঘর্ঘরা...] আর আছে অরণ্য [দণ্ডক, চম্পক, কামাক, গোলা...]।

নগরের নামও শ্রুতিমধুর : পদ্মাবতী, শোভাবতী; চন্দ্রপ্রভা, সূর্যপ্রভা; হস্তিনা, চন্দনপুর, হিঙ্গুলো, তাম্রলিপ্তিকা...। আর আছে শান্তিপুর, যেখানে বাস করে এক মূর্খ তাঁতী দম্পতি।

কুশীলব

ন্যূনপক্ষে পঁচিশটি গল্পে খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে বহু-প্রচলিত 'ঈশ্বর' কথাটার প্রয়োগ আছে; একটা বক্তব্য কিন্তু খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব-অনুযায়ী নয় : "সে-ব্যক্তিও আপনার তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরেতে লীন হইলেন"। তখনকার দিনে প্রোটেস্টান্ট মহলে অব্যবহৃত 'ভগবান' শব্দও ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে : ঈশ্বরারাধন করিলে ভগবান সাক্ষাৎ হইয়া...." "ঈশ্বরারাধনা করিতেছেন, ইতোমধ্যে ভগবান..."।

দেবতাদের মধ্যে আছেন সমুদ্র ["সমুদ্র রত্নাকর : ইহার উপাসনা করিলে অবশ্য ধন পাইব"] ও সূর্যদেব [পুত্রলাভার্থে আরাধিত], কুবের ["যদি কেহ কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা করাইতে পারে, তবে তাহাকে লক্ষ সুবর্ণ দি"], শিব ["রাজমন্ত্রির মাতা রাজাকে কহিল, শিবারাধনা করিয়া চোর নিবারণ করিব"], ইন্দ্র ["পুরুষ নিজ সাহসেতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও ঈশ্বর হইতে পারে"], জগদীশ্বরী দুর্গা [রূপ ও সনাতনের গল্পে], কালী ["হে কালি, যে রাজপুত্র আমাকে শাস্ত্রে পরাজিত না করিয়া সাক্ষাৎকার করিবে, তাহার তৎক্ষণাৎ মস্তকচ্ছেদন হইবে—তুমি এ-বর দেও। দেবী বলিলেন, তথাস্তু"], ভদ্রকালী ও শ্মশানকালী। ভগবতী ও ভাগবতী নামও মেলে। আর আছে যক্ষ ["দুই যক্ষ পরস্পর অতিশয় বিরোধ করিতেছে; একজন কহে যে মাঘ মাসে অধিক শীত হয়, আর একজন কহে যে মেঘ হইলে অত্যন্ত শীত হয়"] ভূত ও বেতাল, রাক্ষস ["বিস্তৃতবদন হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সহিত রাজাকে গ্রাস করিল। রাজা বিকটদন্ত দুরন্তকৃতান্ত সদৃশ রাক্ষসোদরস্থ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন"] ও রাক্ষসী।

এক যে ছিল রাজা

এক তৃতীয়াংশ গল্পে রাজার ভূমিকা আছে। নামে তিনি প্রতাপচন্দ্র, প্রতাপসিংহ, প্রতাপসিংহ; বীরসিংহ, অজিতসিংহ; বিক্রমসিংহ, বিক্রমকেশরী; সোমসুন্দর, মদনসুন্দর; মণিচূড়, চন্দ্রচূড়; বীরধ্বজ, দানসিন্ধু, মুকুটমণি, চন্দ্রাবলোক; ধর্মপালক, প্রজারঞ্জন; কপটশীল, কলিপ্রিয়...[কেউ সম্রাট, কেউ বাদশাহ]। গুণে তিনি শ্রুতিধর (৭১), কৌতুকী (৩৩), সঞ্চয়ী (৫৮)...। তিনি আবার বুদ্ধিমান [যে-বানর রোজ রাজসভায় এসে তাঁকে পাঁচটি মাণিক্য দেয়, তিনি তাকে রোজই "পাঁচ চাবুক খুব কসিয়া মারেন" এই ব'লে যে "ছোটলোককে মুখ দিলে সে মাথার উপর চড়ে"] কিংবা মূর্খ [এই শালে "যে-ব্যক্তি বসিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার স্বর্গভোগ হইবে"—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা শুনে রাজা আরসকলকে "নিরস্ত করিয়া ঐ শালে বসিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন"]।

রাজার নৈতিক গুণের মধ্যে দেখি : তপস্যাভ্যাস, স্বার্থত্যাগ ও পরদুঃখকাতরতা (১০০, ১০৫)। তিনি আবার অধার্মিক ["তাহার সাধুপীড়ন পৌরুষ আর অসাধুসম্মান কীর্তি ও পরস্ত্রীগমন বিনোদ ও মিথ্যাবাক্য নিত্যক্রিয়া ও শিষ্টজনাপকার নীতি"] এবং লোভী ["যদ্যপি তাহার অধিকারে কোন লোক ধনবান হইত, তবে তাহাকে ছল দ্বারা মিথ্যা অপরাধি করিয়া দণ্ড করিতেন"]।

রাজা বিচার করেন, (১১০, ১২৩), দণ্ডাজ্ঞা দেন (১৮), সভাসদদের প্রশ্ন করেন ["কি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ হইলে পণ্ডিত কর্তৃক রাজপদবাচ্য হন?...সাধু লোকেরদিগের রক্ষণ ও দুষ্টেরদের দমন ও অনুগত ব্যক্তি সকলের পোষণ এবং অপ্রতিহতাজ্ঞত্বরূপ (?) লক্ষণাক্রান্তই রাজপদবাচ্য"], রাক্ষস বধ করেন (১০), পুরস্কার হিসেবে "কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য" দেন (১০৬), পণ্ডিত কিংবা মন্ত্রীর কাছে বরণ করেন পরাজয় (৭,৭৯,১১৫)।

রাজসভায় আছেন মন্ত্রী [মনোরঞ্জন, বুদ্ধিপতি...], পণ্ডিত [শ্রুতিধর, বুদ্ধিশেখর, দীর্ঘদর্শী; বিদ্যার্ণব, বিদ্যাবিনোদ; শিবশর্মা, উৎপন্নবুদ্ধি, প্রাজ্ঞবর; বিদ্যাপতি, বাক্‌সরস্বতী...] ও ভাঁড় (৪৬)। আর আছে রাজকুমারী [শশিপ্রভা, চিত্রলেখা, সর্বাঙ্গসুন্দরী...] ও রাজকুমার [বীরবাহু, সুবর্ণকেতু...]

ব্রাহ্মণের গল্প

এক ষষ্ঠাংশ গল্পে ব্রাহ্মণের ভূমিকা আছে। নামে তাঁরা প্রতাপেশ্বর, অগ্নিস্বামী, বিষ্ণুপদ, রুদ্রশর্মা, দুর্গাদাস, হরিদত্ত, সুতপা...। তাঁরা কেউ পূজক, কেউ ঘটক, কেউ জ্যোতির্বিদ...। ঈশ্বরপরায়ণ (৫৪) ও উদার (৪৯) হলেও ব্রাহ্মণ বারবার প্রতারিত (৭৬, ৮৫), চিরদরিদ্র (১৭)। "বশম্বদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পঞ্চ স্ত্রী ও পঞ্চাশৎ সংখ্যক অপত্য। ব্রাহ্মণ দরিদ্র। তাহার গৃহস্থ জীবসকল ক্ষুধানলে দগ্ধতাপ্রযুক্ত অস্থাবশিষ্ট— অতএব উন্দুরে দেখিয়া গৃহগোধিকা, বিড়াল দেখিয়া উন্দুরে, কুক্কুর দেখিয়া বিড়াল ভ্রম করে...।"

অন্য "এক ব্রাহ্মণ বড় গুণবান, এবং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং মণিমাণিক্য প্রবালাদি রত্নের ও ঘোটকাদি চতুষ্পদের মূল্যামূল্য ও গুণাগুণ বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ এ কারণ ধনোপার্জন করিতে পারেন না, ইহাতে বড় দুঃখী। স্ত্রী-পুরুষের ও সন্তানাদির ভরণ পোষণ হয় না একারণ দেশান্তরে গিয়া এক রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহার গুণেতে যথেষ্ট বাধিত হইয়া আপনার সভায় রাখিলেন; কিন্তু তাহার নির্বাহ কিরূপে হয়, তাহাতে রাজার মনোযোগ নাই। সেও রাজাকে কিছুই কহিতে পারে না। সেখানেও তাহার দুঃখ দূর হইল না।"

ব্রাহ্মণ তবু চতুরও হতে পারে : "এক ব্রাহ্মণ দৈবাধীন এক কূপ মধ্যে পতিত হইয়া (...) অকুতোভয় হইয়া কহিলেন, 'অরে মূর্খ সর্পেরা, কি আমাকে দংশন করিতে আসিতেছ? আমি তোমারদিগের রাজার নিকটে আসিয়াছি' (...)। হে মহারাজ, সুন্দের রাজার কন্যা অতি সুন্দরী; তাহার স্বয়ম্বর উপস্থিত। কন্যা তোমাকে বরমাল্য দিবেন, এই প্রকার মনস্থ করিয়াছেন।' (...) বিবাহের সম্বাদ এমনি যে, অত্যন্ত খলেরও অন্তঃকরণের আহ্লাদ জন্মায়!"

ব্রাহ্মণ ছাড়া দেখি সন্ন্যাসী (৬৫), যোগী (১৭), ব্রহ্মচারী (৬৪)...। অন্যান্য জাতেরও উল্লেখ আছে : কায়স্থ ["সে উৎপন্নবুদ্ধি, অতি ধূর্ত"], ক্ষত্রিয় (১৪৮), বৈশ্য (২৩)...। আছে বণিক, সওদাগর, সাধু, মহাজনের [ধনপতি, হিরণ্যগুপ্ত...] প্রায় কুড়িটি গল্প; ব্যাধের প্রায় দশটি গল্প।

আঃ কি উত্তম লোহ

মূর্খ কৃষক

কৃষক নির্বোধ। সে স্থির করে : "স্বর্গলোকে গমন করিয়া ঈশ্বরত্ব করিব।" তাই "কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র মধ্য আপনি বসিয়া তাহার উপরে চারি ক্ষুধিত গৃধ্র পক্ষি বাঁধিয়া, তাহার উপরে মাংস খণ্ড রাখিল। তখন গৃধ্রেরা উড়িয়া মাংস খণ্ড লইয়া খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লইতে পারিল না। পক্ষিরা যত উড়িতে লাগিল, তত উচ্চেতে উঠিতে লাগিল। এইরূপে দুই চারি দিনেতে অতিশয় উচ্চেতে উঠিল। পরে (...) পক্ষিরা ক্ষুধাতে কাতর হইয়া ক্রমে ক্রমে নীচেতে পড়িয়া এক মরুভূমিতে পতিত হইল। সেস্থানে কাঠরিয়া লোকেরা থাকে; তাহারা আশ্চর্য দেখিয়া তাহাকে একদিন খাওয়াইল। অন্যদিন তাহারা তাহাকে লইয়া কাষ্ঠ কাটিয়া মস্তকের উপরে ভার লইয়া কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল।"

আরেক "নির্বোধ ধন-গর্বেতে আপনাকে সুবুদ্ধি জানিয়া সসজ্জ হইয়া বিবাহার্থে তথায় উপস্থিত হইল। রাজকন্যার গৃহে গিয়া বিচিত্র আসনাদি ও শয্যা এবং উত্তম উত্তম খড়্গাদি অস্ত্র সকল দেখিয়া কৃষক ভীত হইয়া অন্য আলাপ করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ লোহের চৈকণ্য দেখিয়া কহিতেছে, 'আঃ কি উত্তম লোহ! ইহাতে ভাল ভাল লাঙ্গল হইতে পারে!' এমত এমত কৃষকতার বাক্য শুনিয়া এবং মূর্খের ব্যবহার দেখিয়া রাজকন্যা খড়্গ লইয়া সেই দেবীর নিকটে তাহাকে বলি দিতে উদ্যতা" হইলেন।

নাপিত, জেলে ও কাঠুরিয়ার একাধিক গল্প আছে। তাছাড়া দেখি : মুচি ও তাঁতী, গায়ক ও ভাট, গোয়ালা, পেয়াদা, কোটাল, সিপাই, স্বর্ণকার, রথকার, তৈলকার, মালাকার...। আরো আছে দাতেকার, দস্যু আর পেশাদার চোর ["আমরা দস্যুবৃত্তিতে মনুষ্যের ধনাপহরণ করিয়া আত্মপোষণ করি"]।

আর নারী চরিত্র?...নারী চরিত্রও আছে। থাকবে না কেন?

(ক্রমশ)

তিনি অত্যন্ত বিতর্কমূলক ব্যক্তি।

তিনি, অর্থাৎ অধ্যাপক নীহানস, তাঁর সঙ্গে শুধু একবার দেখা করে দু-একটি ইনজেকশন নিতেই কম করেও আপনার খরচ হবে আট হাজার টাকা। নিজের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতির তিনি নাম রেখেছেন 'সেলুলার থেরাপি'। তাঁর বক্তব্য, ভেড়ার ভ্রূণের দেহ-কোষ দিয়ে মাথার খুসকি থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত তিনি সারিয়ে তুলতে পারেন। বয়েস ৮৮, তুলনায় যথেষ্ট সতেজ এবং সুদেহী। অনেকের সন্দেহ, নিজেকে তরুণ রাখার জন্যে নিজের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা তিনিও কাজে লাগান। ইউরোপে তিনি বিখ্যাত। কারণ তাঁর খ্যাতিমান রোগীদের তালিকায় ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, উইনজর-এর ডিউক এবং ডাচেস, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, কনরাড অ্যাডেনাওয়ার, সোমারসেট মম, পোপ পিয়াস-১২ এবং বহু আমীর-ওমরাহ। কিন্তু ১৯৬৯ সালে সুইস ক্যানসার পুরস্কার পাওয়ার জন্যে তিনি যে গবেষণাপত্রাবলী দাখিল করেছিলেন, জনৈক পরীক্ষক সেগুলি দেখে মন্তব্য করেন, এক ধরনের কৌতুক উপভোগ করার ব্যাপারে লেখাগুলি মন্দ নয়। তবে ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, এমন চিকিৎসাও আমাদের দেশে চলে, অথচ তার জন্যে চিকিৎসককে শাস্তি দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই।

তবু নীহানসের রমরমা কারবার। কোটিপতি এই বৃদ্ধটি অনেকেরই আজ অনুরাগ পায়। এবং বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বড় রকমের এক বিভ্রান্তি!

ক্লারেন্স-এ অবস্থিত লা প্রেইরী ক্লিনিকে বসে তাঁর রোগীদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক নীহানস বলে থাকেন: আপনার শরীরে অতি মূল্যবান প্রাণী-কোষ সংবাহিত করা হল। এরা আগে তিন মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করবে। অতএব আমার অনুরোধ অন্ততঃ এ কটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন: এক, শরীরের অবশিষ্ট অংশ বাঁচানোর চেষ্টা না করে কোন অংশে এক্স-রশ্মি নিক্ষেপ করবেন না; দুই, অতি-বেগুনী রশ্মি বা ক্ষুদ্র-তরঙ্গ ঘটিত চিকিৎসা থেকে বিরত থাকবেন; তিন, খুব গরম বাতাসে চুল শুকনো করবেন না; চার, কোন চিকিৎসার ব্যাপারে তেজস্ক্রিয় জলে স্নান করবেন না; পাঁচ, জোর-স্নান বন্ধ রাখুন; ছয়, বিষাক্ত কোন বস্তু, যেমন নিকোটিন, অতিমাত্রায় অ্যালকোহল সেবন বন্ধ রাখবেন; সাত, মাদকজাত ওষুধপত্র খাওয়া বন্ধ করুন এবং কদাচিৎ হরমোন সংক্রান্ত ওষুধ ব্যবহার করবেন না। উপদেশগুলি আপনাকে যাবজ্জীবন মেনে চলতে হবে।

কিন্তু উপায়ই বা কী? পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রীতিমত বিখ্যাত লোক-গুলি যদি তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্যে হাজির হন, সে ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে প্রচণ্ড রকমের প্রচার বন্ধ করাও তো কঠিন! এ কথা ঠিক, যতটা প্রচার তিনি পেয়ে থাকেন, নীতির দিক দিয়ে কোন ডাক্তারের ক্ষেত্রে সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবু তাঁকে এড়িয়ে চলাও শক্ত যখন মম অথবা চ্যাপলিনের মত নামকরা লোক চিকিৎসার জন্যে তাঁর দোরগোড়ায় এসে হাজির হন।

ওঁর চিকিৎসা ব্যবসায়-এর মূল স্থানটি ক্লারেন্স-এর একটি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়। ভেভে শহরটি এবং জেনিভা হ্রদের বেলাভূমির উপর অবস্থিত মন্ট্রিক্স-এর মাঝ বরাবর। পুরো নাম পল নীহানস। জনৈক সুইস শল্যচিকিৎসক ওঁর বাবা। জন্ম ১৮৮২। লম্বায় ছ ফুটের ওপর। অত্যন্ত সুপুরুষ। ভাল ঘোড়সওয়ার এবং বন্দুকের সাহায্যে যে কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম। কাইজার উইলহেলম সম্পর্কে তাঁর খুড়োমশায়। তিনি ওঁকে সেনাবিভাগে শিক্ষানবিশীর সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হয় নি। বরং পছন্দ করে বসলেন চার্চ পরিচালকের কাজ। অবশেষে সে কাজটিও ছেড়ে দিয়ে হয়ে গেলেন একজন দক্ষ শল্যচিকিৎসক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বলকান এলাকায় তিনি সুইসদের নিয়ে একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল গড়ে তোলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন সাহসী যোদ্ধা এবং নিপুণ শল্যচিকিৎসক-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। যুদ্ধে দু'বার তিনি আহত হন। সার্বিয়ার রাজা বীরত্বের জন্যে তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

আর ঠিক এই সময়েই, সেটা ১৯২০—

ইউরোপে তখন মানুষের শরীরে পশুর গ্ল্যাণ্ড বা অন্তঃক্ষরণীক গ্রন্থি প্রতিস্থাপনের ব্যাপারটা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জনৈক চিকিৎসক যথেষ্ট টাকা-পয়সাওয়ালা ধনীদের শরীরে বাঁদরের এবং উল্লুকের শুক্রাশয় প্রতিস্থাপন করে বেশ দু পয়সা কামিয়েও নিচ্ছিলেন। কারণ, কেউ কেউ তখন মনে করতেন এইভাবে ঐ বৃদ্ধের দল হৃত-যৌন-ক্ষমতা ফিরে পাবে। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এর ফলে অনেকের শরীরেই বানরের সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

তবু ব্যাপারটা ভাল করে লক্ষ করলেন নীহানস। এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি নিজেও ঐ ধরনের শল্যচিকিৎসা শুরু করে দিলেন। ১৯২৭ সালে একজন তরুণ বয়সের বামনের শরীরে একটা বাছুরের কোন এক ধরনের বিশেষ গ্ল্যাণ্ডের বিশেষভাবে নির্বাচিত কোষকলা বা টিস্যু প্রতিস্থাপন করলেন তিনি। তাঁর মতে, এটাই কোষকলা প্রতিস্থাপনের প্রথম ঘটনা। তারপর, বামন ছেলেটি অল্পদিনের মধ্যেই চার ফুট তিন ইঞ্চি থেকে বেড়ে গিয়ে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চিতে পরিণত হয়েছিল। ঘটনাটি ঐ সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দারুণভাবে প্রচার লাভ করে।

তবে ডক্টর নীহানসের জীবনের সত্যিকারের মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দিল ১৯৩১-এ। তাঁর নিজের ভাষায়: 'এপ্রিল ১, ১৯৩১ হঠাৎ আমি একটা টেলিফোন কল পেলাম। কোন একটি ক্লিনিকের প্রধান আমাকে জানালেন, গলগণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে জনৈক তরুণীর প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভদ্রমহিলা খিঁচুনি রোগীর মত ছটফট করছেন। গ্ল্যাণ্ড প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে আপনার তো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার অনুরোধ, আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কোন পশুর দেহ থেকে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড সংগ্রহ করে ওঁর দেহে প্রতিস্থাপন করুন।' উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই বিশেষ গ্ল্যাণ্ডটির অভাবে মানুষ বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। অতএব, তখনকার মত এতটুকু কালহরণ মানে তরুণীটিকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া।

হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম। রোগিণী তৎক্ষণাৎ অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন অবস্থা,

ঐ সময়ে প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করতে গেলেই হয়ত তিনি অপারেশন টেবিলের উপরই মারা যাবেন। তবু শেষ অবস্থাতেও শেষ-বারের মত চেষ্টা না করে কোন ডাক্তারই তাঁর রোগীকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতে পারেন না? অদ্ভুত একটা অনুপ্রেরণ অনুভব করলাম আমি। একটি পশুর দেহ থেকে প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন করে বিশেষ ধরনের লবণের দ্রবণে মিশিয়ে রোগিণীর দেহে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা! মৃত্যুপথযাত্রী রোগিণী শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন! আর এখান থেকেই শুরু 'সেলুলার থেরাপি' বা প্রাণী-কোষের সাহায্যে চিকিৎসা পদ্ধতি। তবে সব চাইতে যা আমাকে বিস্মিত করে-ছিল, তা হল, ঐ ভদ্রমহিলা ইনজেকশনের পর তিরিশ বছরেরও বেশি সময় জীবিত ছিলেন।'

তখন থেকেই সত্যিকারের সূচনা। তখন থেকেই নীহানস প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পশুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রাণী-কোষ রূপে মানুষের শরীরে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে রোগ নিরাময়ের কাজ শুরু করেন।
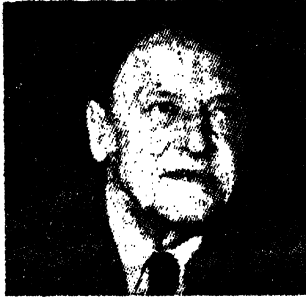
ডঃ নীহানসের রোগীদের মধ্যে ছিলেন (বাঁদিক থেকে) : সোমারসেট মম (১৮৭৪-১৯৬৫), কনরাড আদেনাউয়ার (১৮৭৬-১৯৬৭) এবং পোপ পিয়াস-১২ (১৮৭৬-১৯৫৮)

তাঁর মতে ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে আরও 'দুটি আবিষ্কার'-এর কৃতিত্ব তিনি অর্জন করেন। এর একটি তিনি করেছিলেন অ্যালেকসিস সারেল-এর ঐতিহাসিক গবেষণার উপর নির্ভর করে। অভিনব ঐ গবেষণার সময় সারেল একটি মুরগীছানার হৃদপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্লেটের উপর রেখে দেন। নীহানস দেখলেন, পরে অন্য একটি মুরগীর পেটের ভেতর থেকে ভ্রূণ বের করে নিয়ে, সেই ভ্রূণের কোষের সঙ্গে বিশেষ ধরনের দ্রবণ মিশিয়ে প্লেটে রাখা হৃদপিণ্ডটির মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে হৃদপিণ্ডটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এ থেকে নীহানস-এর ধারণা হয়, অন্তত বড়সড় কোন প্রাণীর দেহকোষের বদলে তাদের ভ্রূণের দেহ-কোষ ইনজেকশন করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে এবং অসুস্থ রোগীর দেহ সহজেই বরদাস্ত করতে পারে।

নীহানস-এর দ্বিতীয় আবিষ্কার, অন্তত তাঁর মতে, পশুদের মধ্যে ভেড়া কদাচিৎ ক্যানসার রোগে ভোগে। অবশ্য ক্যানসার অর্থে যদি তিনি ফুলে ফেঁপে ওঠা টিউমার বোঝান, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। তবে ভেড়ার শরীরে লিউকোমিয়া এবং লিমফোমিয়া বা ল্যাসিকা নালীর ক্যানসার হতে প্রায়ই দেখা গেছে।

ওঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার চিকিৎসা ... এর মূল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি ... ডক্টর নীহানস? ... বিজ্ঞানী নই। দুটি ... এক, ভ্রূণ-অবস্থায় কোন প্রাণীর দেহকোষ। দুই, ভেড়ার শরীরে ক্যানসার হয় না। এটাই আমার সাফল্যের মূল কথা। এ থেকেই জন্ম নিয়েছে আমার 'সেলুলার থেরাপি'। আর এ ব্যাপারে তাঁর সার কথা হল : যদি কেউ অসুস্থ বোধ করেন, বুঝতে হবে তাঁর শরীরের বিশেষ কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাবলী যথাযথ কাজ করছে না। যদি আপনি বুঝতে পারেন, ঠিক কোন যন্ত্রটি অকেজো হয়ে পড়েছে, তাহলে ভেড়ার ভ্রূণ থেকে ঐ ধরনের যন্ত্রের কোষকলা সংগ্রহ করে লোকটির শরীরে ইনজেকট করে দিন। অসুস্থ যন্ত্রটি ভ্রূণের কোষকলা গ্রহণ করে আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। এর দ্বারা ক্যানসারের হাত থেকেও লোকটি রেহাই পেতে পারে।

১৯৪৮। ডঃ নীহানস ঐ বছর থেকেই ভেড়ার-ভ্রূণের কোষ সংগ্রহ করে রোগ নিরাময়ের কাজে হাত দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসা কেন্দ্রটি ধনীদের ভীড়ে উপচে পড়তে লাগল। অবশ্য পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া অন্য কেউ সেখানে যাবেনই বা কী করে? কারণ, একবার সাক্ষাৎকারের জন্যেই তাঁকে ফী দিতে হয় ১৮৭৫ টাকা। এছাড়া রোগ নির্ধারণ, চিকিৎসা এবং ক্লারেনস-এ অবস্থিত তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসাকেন্দ্র 'লা প্রেইরী'তে এক সপ্তাহ ধরে থাকা বাবদ খরচ আরও ১৮,৭৫০ টাকার মত। অতএব নীহানসের খাই-এর ব্যাপারটা বুঝতেই পারছেন। ১৯৪৯ সালে একজন তরুণ রসায়নবিদকে সঙ্গে নিলেন নীহানস। উদ্দেশ্য, তাঁর সাহায্যে চিকিৎসার জন্যে প্রয়োজনীয় কোষকে হিমায়িত অবস্থায় শুকনো করে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা। হাইডেলবার্গে তৈরি হল কোষ-জীববিদ্যার গবেষণাগার। এখানেই বিশুষ্ক-কোষ উৎপাদন করার কারখানা স্থাপিত হল। বর্তমানে এই কারখানায় সত্তর রকম প্রাণীর দেহ-কোষ ইনজেকশনের অ্যাম্পুলের মধ্যে পুরে বিক্রি করা হয়, যার এক একটির দাম বিরানব্বই টাকা থেকে শুরু করে তিনশ বিয়াল্লিশ টাকার মত। প্রত্যেকটি অ্যামপুলের সঙ্গে দেওয়া হয় এক শিশি জীবাণুমুক্ত দ্রবণ। এই দ্রবণের মধ্যে মিশিয়ে বিশুষ্ক কোষ রোগীর দেহে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। কারখানাটির পরিচালক নীহানস-এরই জামাই ডঃ রোলফ লুটকে এবং গবেষণাগারের প্রধান ডঃ জোয়াকিম স্টাইন নামে জনৈক জার্মান, যিনি শরীরের আভ্যন্তরীন রোগ সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। কিছুদিন আগে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত 'টু-ডেজ হেল্থ' পত্রিকার বিজ্ঞান লেখক ওয়াল্টার এস রস-এর এক প্রশ্নের উত্তরে ডঃ স্টাইন বলেছেন, একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা ছাড়া বিশুষ্ক-কোষ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কেনা সম্ভব। সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঐ ধরনের কোষ এ পর্যন্ত তাঁরাই শুধু উৎপাদন করে থাকেন।

১৯৫৪ সালে পোপ পিয়াস-১২ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্যাথলিক ডাক্তাররা ডাক পাঠালেন নীহানসের। সাতাত্তর বছর বয়স্ক পোপকে ভেড়ার শুষ্ক-কোষ দিয়ে চিকিৎসা করায় সেরে

উঠলেন তিনি। এক্ষেত্রে শূদ্ধ-কোষ দিয়েই তাঁকে কাজ সারতে হল। কারণ, গর্ভবতী ভেড়া ভাটিকান শহরে এনে সিজারিয়ানের সাহায্যে তার ভ্রূণ সংগ্রহ করায় বাধা ছিল। এর পর আরও অনেক নামজাদা লোকের চিকিৎসা করেছেন তিনি।

ফলে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে পড়লেন নীহানস, শিরোনাম হয়ে পড়ল তাঁর 'সেলুলার থেরাপি'র কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র তাঁর এই চিকিৎসা-পদ্ধতি ডাক্তারদের কাছেও বেশ সমাদর পেতে লাগল। কিন্তু কিছু মৃত্যু সংবাদও পাওয়া গেল। তবে এই চিকিৎসাই যে তার কারণ সেটা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারলেন না।

রস ওঁর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মত কথা বলেছিলেন। তবে সত্যিকারের সাক্ষাৎকার বলতে যা বোঝায়, সেটা তিনি করে উঠতে পারেন নি। কারণ, নীহানস নিজের খেয়ালখুশী মতই ওকে চলেছিলেন। সম্ভবত বার্ধক্যজনিত মেজাজই গুছিয়ে কথা বলার মত ক্ষমতাটিকে তাঁর ভেতর থেকে কেড়ে নিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আবডারহালডেন প্রতিক্রিয়া মূল পরীক্ষার

কথা উল্লেখ করলেন। রোগীর রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ ধরনের এই পরীক্ষাটির সাহায্য নেয়া হয়।

'হ্যাঁ, ঐ একটি পরীক্ষাই বলে দেবে শরীরের কোন্ কোন্ কোষ ঠিকমত কাজ করছে না।' বলেন নীহানস। 'রোগীর প্রস্রাব এবং রক্ত নিয়ে শুরু করুন। ঐ তরল সামগ্রীর মধ্যেই এমন কিছু কিছু অপদ্রব্য খুঁজে পাবেন যাদের দেখে আপনি অনায়াসে বলতে পারবেন কোন কোন শারীরীক যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। এর দৌলতেই আমি বুঝে নিতে পারি, ঐ রোগটি সারিয়ে তোলার জন্যে কী ধরনের প্রাণী-কোষ আপনার দরকার। ১৯২৭ থেকেই এই পরীক্ষাটি আমি কাজে লাগাচ্ছি।'

বস্তুত, আবডারহালডেন পরীক্ষাটি এক সময়ে কোন মহিলা গর্ভধারণ করেছেন কিনা, সেটা জানার ব্যাপারেই বিশেষ কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হত। পরীক্ষাটির মূল হেতুঃ যদি শরীরের মধ্যে অস্থানিক কোন প্রোটিন কণা, যেমন ক্যানসার বা গর্ভ-ফুল প্রভৃতি থাকে, তাহলে ঐ প্রোটিনের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরীর প্রতিরক্ষামূলক এনজাইম নিঃসরণ করে থাকে এবং প্রস্রাব এবং রক্তের মধ্যে তাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে। অতএব কী ধরনের এনজাইম ঐ তরল পদার্থ দুটির মধ্যে অনুসন্ধান করছে, যদি তা জানা যায়, তাহলে শারীরিক ত্রুটির কারণও বলে দেওয়া সম্ভব। তবে বাস্তবে পরীক্ষাটি খুবই জটিল। নির্দিষ্ট ফলাফল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়াও শক্ত। যার জন্যে বেশির ভাগ চিকিৎসকই এই পরীক্ষাটি এড়িয়ে চলেন।

রস নীহানসকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার নিজের অসুস্থতা সারানর জন্যে কখনও কি আপনি প্রাণী-কোষের সাহায্য নিয়েছেন, অধ্যাপক নীহানস?'

নীহানস-এর উত্তর, 'হ্যাঁ, নিয়েছি। কুড়ি বছর আগে হঠাৎ আমার প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডটি স্ফীত হতে শুরু করেছিল। প্রস্রাব করার সময় আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অতএব আমি নিজের শরীরে খানিকটা সারটোলি কোষ নিয়ে নিলাম। এই কোষ যৌবন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এর পর আর কোন অসুবিধেই আমি বোধ করি নি। ভেবে দেখুন, কুড়ি বছর আগে মাত্র একটি ইনজেকশন, ব্যস, তারপর একেবারে নিশ্চিন্দি।' উল্লেখ্য, অনেকের ধারণা সারটোলি কোষ শুক্র-কে ধরনের সতেজ রাখতে সাহায্য করে।

তবে আরও চমকপ্রদ সংবাদঃ নীহানস বলেছেন, 'আমার জীবনের সবচাইতে বড় আবিষ্কার, যদি কারুর শরীর ক্যানসারে আক্রান্ত হয় না এমন কোন প্রাণীর দেহ-কোষ প্রবেশ করান যায়, তাহলে তার শরীর ক্যানসার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে 'কোন প্রাণী' বলতে আমি ভেড়াকেই বোঝাচ্ছি।' হ্যাঁ এটাও তাঁর আরও একটি দাবি। এবং প্রায়শই এই দাবির কথা তিনি উল্লেখ না করে ছাড়েন না। তাঁর বক্তব্য, যতজন লোককে আজ পর্যন্ত ভেড়ার কোষের সাহায্যে তিনি চিকিৎসা করেছেন, পরবর্তী সময়ে তাঁদের কেউ ক্যানসার রোগে মারা গেছেন বলে তাঁর জানা নেই।

রসের প্রশ্ন : এর অর্থ কী দাঁড়াল?

নীহানস : আমি ক্যানসারও সারিয়েছি।

প্রশ্ন : বলতে চান, ঐ সেলুলার চিকিৎসা দিয়েই সারিয়েছেন?

উত্তর : নিশ্চয়। ক্যানসার সারানর জন্যে ঠিক যে ধরনের কোষ দরকার সেটাই আমি কাজে লাগিয়েছি। এ ক্ষেত্রে রোগীদের আমি বলেও দিই। শরীর মেরামতের ব্যাপারে ভেড়ার কোষ প্রায় সাড়ে তিন মাসের মত সময় নেয়; তবে ক্যানসারের ব্যাপারে সময়টা একটু বেশিই লাগবে।

নীহানসের কথাগুলি রসের কাছে যেন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়েছিল। তাই আবার প্রশ্ন করে বসলেন তিনি—আপনি কি বলতে চান ঐ ভেড়ার কোষ দিয়েই আপনি ক্যানসার সারিয়েছেন?

নীহানসের সরাসরি জবাব : নিশ্চয়। আপনাকে আমি প্রমাণ দেখাতে পারি। হ্যাঁ, আমার কাছে এক্স-রে ফটোগ্রাফ আছে—রোগের চিকিৎসার আগের এবং পরের ছবি।'

অতএব, এরপর আর কোন কথা চলে না।

না, যে কেউ তাঁর কাছে এলেই তাকে যে তিনি তাঁর নিজস্ব রোগীর তালিকায় নাম লিখিয়ে নেবেনই, এমন কোন কথা নেই। এর জন্যে অপর কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তারী ভব্যতা হিসেবে এটা তাঁর কর্তব্য। রোগীদের বলা হয়, ভেভেআই অথবা মনট্রকসের কোন হোটেলে কোন রবিবার দেখে উঠে আসুন। সোমবার সকালে কোন কিছু না খেয়ে তাঁর নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্রে তাদের হাজিরা দিতে হয়। ঐ সময়ে রোগীর আবডারহালডেন এবং অন্যান্য পরীক্ষা চলে। পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রয়োজনে আবার পরীক্ষা। দরকার মনে করলে এক্স-রে ছবিও তোলা হতে পারে। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ রোগীদের আবার তাঁর অফিসে দেখা করতে বলা হয়। ঐ সময় তাঁরা পরীক্ষালব্ধ যাবতীয় তথ্যাবলী পেয়ে যান।
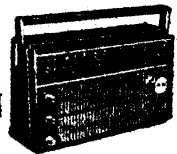
তারপর কাছাকাছি একটি জায়গা, নাম ফ্রাইবোর, সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় অন্তঃসত্ত্বা একটি ভেড়া। ফ্রাইবোর-এর খামারটি নীহানস যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এখানে সব সময় প্রায় ৫০০টি ভেড়া মজুত করে রাখা হয়। কাছের গ্রাম ভ্যাদ। সেখানে তিনি খামারটি স্থাপন করেন নি। কারণ স্থানীয় আইন অনুযায়ী ভ্যাদে ভেড়া রাখতে গেলে তাদের ভ্যাকসিন দিতে হয়। কিন্তু ফ্রাইবোরের ক্ষেত্রে তেমন কোন বালাই নেই। নীহানসের বিশ্বাস ভ্যাকসিন না দেওয়া ভেড়াই তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক বেশি কার্যকর।

চিকিৎসাকেন্দ্রের এক মাইল দূরে অবস্থিত বিশেষভাবে সংরক্ষিত একটি কসাইখানায় ভেড়ীটিকে হত্যা করে সিজারিয়ান-এর সাহায্যে তার গর্ভফুল সহ জীবন্ত ভ্রূণটিকে সংগ্রহ করা হয়। তারপরই এতটুকু দেরি না করে একটি জীবাণুমুক্ত থলেয় ভরে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসা কেন্দ্রে। এখানে ভ্রূণটিকে নীহানসেরই আবিষ্কৃত এক ধরনের ছুরির সাহায্যে টুকরো টুকরো সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করে নেয়া হয়। মস্তিষ্ক, মূত্রাশয় প্রভৃতি বিভিন্ন দেহাংশের এক থেকে দুই ঘন সেন্টিমিটারের মত অংশ পৃথক পৃথক সিরিঞ্জের মধ্যে রেখে তাদের গায়ে এবার লেবেল লাগান হয়। যাতে করে কাজ করার সময় তিনি না ভুলে যান কোন সিরিঞ্জে কী ধরনের প্রাণী কোষ রাখা হয়েছে। তারপর এক ধরনের জীবাণুমুক্ত তরল, সাধারণত রিনজারের দ্রবণ দিয়ে সিরিঞ্জে অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করে কোষগুলি ঝাঁকিয়ে তরলের মধ্যে মিশিয়ে নেন। বিচ্ছিন্ন কোষকলার আয়তন কিছুটা বড় থাকে বলে ইনজেকশনের সূঁচটিও একটু মোটা দেখে নিতে হয়। অনেক সময় তার বাইরের ব্যাস ১·৫ মিলিমিটারের মতও হয়ে থাকে। এবং ইনজেকশনের কাজটিও করতে হয় খুবই সাবধানে। নইলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

প্রত্যেক রোগীকে সাধারণত পাঁচ থেকে দশবার ইনজেকশন নিতে হয়। এবং তা নিতে হয় মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই। নীহানসের ভাষায়, 'এই হল আমার চিকিৎসা। আর কিছুই করার নেই।'

তবে কোন কোন সময় পরে আরও বেশি ইনজেকশনের প্রয়োজন হলে, সে ক্ষেত্রে রোগীদের আরও ছয় মাস অপেক্ষা করতে বলা হয়। কারণ, অপর কোন প্রাণীর দেহকোষ অনেক সময় ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মৃত্যুও ঘটাতে পারে। বিশেষ করে কোষগুলি রোগীর শরীরে প্রবেশ করানর পর যদি কোন বিপরীত ঘটনা ঘটে, তাহলে বিরত থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

আর এর জন্যেই বার্ন গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ হানস স্মিডট সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, মানুষের শরীরে বিপজ্জনক কোন প্রতিক্রিয়া করে কি না, সেটা না দেখে অন্য কোন প্রাণীর দেহ-কোষ ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। ফলে ১৯৫৮-র পর থেকে সদ্য সংগ্রহ করা প্রাণীকোষের সাহায্যে চিকিৎসা করানোর সমস্ত ব্যবস্থা ফরাসী সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, বিশুষ্ক-কোষের ব্যাপারটা ওঁরা এখনও পর্যন্ত রদ করেন নি। ফ্রান্সের বাইরে জর্মান, অস্ট্রিয়া এবং ইটালিতে প্রায় পাঁচ হাজারের মত চিকিৎসক প্রাণী কোষের চিকিৎসা চালিয়ে থাকেন। তবে ডঃ স্টাইনের মতে, 'সম্ভবত তাঁদের কেউই নীহানসের পদ্ধতিটি অনুসরণ করার যোগ্যতা রাখেন

না। জীবন্ত প্রাণী কোষ দিয়ে ঐ ধরনের চিকিৎসা চালানোর আরও একটা বিপদ হল, এর ফলে প্রাণীজ কোন উৎকট রোগ মানুষের শরীরে সংবাহিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া অনেক সময় প্রচলিত পরীক্ষায় প্রাণীদেহের বেশ কিছু সংখ্যক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভুল সন্ধান জোগানও শক্ত। অতএব যদি তেমন কোন ঘটনা ঘটে, চিকিৎসাধীন ব্যক্তিটি কম করেও কুড়ি রকমের রোগে আক্রান্ত হতে পারেন।'

নীহানস এ ব্যাপারে অবশ্য নিশ্চিন্ত। তাঁর দাবি, তাঁর সমস্ত ভেড়াই বিশেষভাবে শিক্ষিত পশুচিকিৎসকরা তাদের দেখাশুনো করে থাকেন। তাঁর বক্তব্য, 'এ পর্যন্ত আমি ৪৫,০০০ রোগীর চিকিৎসা করেছি। তাদের একজনও চিকিৎসার পর মারা যায় নি।

তবু অভিযোগেরও শেষ নেই। ভাদ সোসাইটি অব মেডিসিন-এর সভাপতি ডঃ জিনপিয়েরে গিল্লারড বলেছেন, 'নীহানসের চিকিৎসা পদ্ধতিকে কখনই আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখি নি। অভিযোগ, খবরের কাগজওয়ালারা ওঁকে নিয়ে বড় বেশি প্রচার করছে। এটা ডাক্তারী শিষ্টাচারের বাইরে। তা ছাড়া ওঁর ফীও প্রচণ্ড রকমের বেশি। ফলে সাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের পক্ষে ওঁকে দিয়ে কোন চিকিৎসা করান যায় না। এর জন্যেই নীহানসকে আমরা ১৯৬০ সালের পর সোসাইটির সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু নীহানসও স্বপক্ষে বক্তব্য রাখার ব্যাপারে পিছিয়ে যান নি। পাল্টা অভিযোগ করে তিনি বলেছেন, অনেক রোগী চিকিৎসা করাতে আসার সময় পথে তাদের মোটর-গাড়িগুলি লুকিয়ে রেখে আসে। ভাবটা, তার বড়ই গরীব সাহায্য চাই। একি এক ধরনের ঠকানো নয়? তাছাড়া সুইস সরকারের ট্যাক্সের কথাই ভাবুন। প্রতিটি ইনজেকশনের জন্যে তাদের ট্যাক্স গুণতে হয় ৯৩৮ টাকা। আগে একটি ভেড়ার দাম ছিল ৫০০ ফ্রাঙ্ক। এখন দাঁড়িয়েছে হাজারে। এছাড়া এক একটি রোগীকে কম করেও দশটি ইনজেকশন নিতে হয়। তার-পর ইনজেকশনের শেষে চব্বিশ ঘণ্টা তাকে শুইয়ে রাখতে হবে এবং দশ দিনের আগে তাকে কোন মতেই ছেড়ে দেওয়া হয় না। এসমস্ত খরচের কথা একবার ভাবুন? দশ দিন থাকার খরচই তো ১,৮০০ টাকা। অতএব খরচ তো পড়বেই।

১৯৬৯ সালে সুইচ ক্যানসার লীগের পুরস্কার পাওয়ার জন্যে নীহানস তাঁর কয়েকটি লেখা দাখিল করেছিলেন। সুইস ক্যান্সার প্রাইজ। মূল্য ৫০০০ সুইস ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ ৯৩৭৫ টাকা। কিন্তু পুরস্কার তো ওঁকে দেওয়া হলই না, বরং বিচারকদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন, 'এক ধরনের কৌতুক উপভোগ করার ব্যাপারে লেখা-গুলি মন্দ নয়। তবে ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, এমন চিকিৎসাও আমাদের দেশে চলে, অথচ তার দরুণ চিকিৎসককে শাস্তি দেবার কোন ব্যবস্থাই নেই।' রকফেলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশ্বখ্যাত কোষ-বিজ্ঞানী ডঃ পল ভেইজও স্বীকার করেন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাপারটাকে ভাবাই যায় না। 'সেলুলার থেরাপির ব্যাপারটা আমার কাছে একখানি পোস্টকার্ডের উপর ৬০০তলা একটি বাড়ি তৈরির মত অলীক বলে মনে হয়েছে।' তাঁর নীহানসের সঙ্গে সাক্ষাৎও ঘটেছিল। নীহানস বলেন, তিনি মোটেই একজন বিজ্ঞানী নন। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি নিয়ে আরও দু একজন পরীক্ষাও চালিয়েছেন, সাফল্যমণ্ডিত হতে পারেন নি। ব্যাপারটা এখন নীহানসেরই যেন একচেটে কাণ্ডকারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণের কাছে চমকপ্রদ। কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর সমস্ত কিছুই এখন এক ভয়াবহ বিভ্রান্তি।

সমরজিৎ কর

ভালো
তামাক
থেকেই হয়
ভালো
সিগারেট

Panama
20
CIGARETTES

প্রলয় সাংবাদিকতা ও সাহিত্য

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঝড়োপ্রলয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা পূর্ণাঙ্গ নয়। বিভিন্ন বিদেশী সংবাদসূত্র এবং পাকিস্তানের সরকারী বিবৃতির ওপর নির্ভর করে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছি। মাত্র। আসলে তার চেয়ে হাজার গুণে বেশী প্রলয়ংকর এই দুর্বিপাক। পাকিস্তানের পত্রপত্রিকাতেই এই দুর্বিপাকের আসল চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে গত দশ বছরে পূর্ব পাকিস্তানে যে সকল প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটে গিয়েছে তার কয়েকটির একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যাক। এ থেকেই সাম্প্রতিক মহা-দুর্যোগের বিধ্বংসের একটা ধারণা লাভ করা যাবে।

১৯৬০ সাল থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে আনুমানিক ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। গবাদি পশুর মৃত্যু, শস্যহানি, গৃহধ্বংস প্রভৃতি থেকে এইকালে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩৯৮ কোটিরও বেশী।

কিন্তু গত দশ বছরের সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোট যত লোকের মৃত্যু হয়েছে, গত নভেম্বর মাসের প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে তার চেয়েও বেশী লোকের মৃত্যু ঘটেছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। পাকিস্তান ও বিদেশী কোন কোন সংবাদ-সূত্রের মতে মৃতের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ লক্ষের মধ্যে।

এই দুর্বিপাকে সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রায় কটি জিলাই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নোয়াখালি, বরিশাল ও চট্টগ্রাম জিলার উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ

(ক) নোয়াখালি জিলা : মোট লোক-সংখ্যা ২৩৮৩১৪৫; আয়তন ১৮৫৫ বর্গমাইল

রামগতি থানা—লোকসংখ্যা ১৬১,৪১৫
হাতিয়া থানা— ১৬২,৭০১
সুধারাম থানা— ২৪৭,৭৬৬
কোম্পানিগঞ্জ থানা— ৮৬,৯৭২
সোনাগাজী— ১১০,৬০৬
চর আলেকজান্ডার ইউঃ— ২২,২৮৭
জাহাজমারা ইউঃ— ৯,৩০০
চর জব্বর ইউঃ— ৯,০০০
চর ভাটা ইউঃ— ২১.৫০৮

(খ) বরিশাল ও পটুয়াখালি জিলা : মোট জনসংখ্যা ৪২,৬১,৭৬৭; আয়তন ৪২৪০ বর্গমাইল।

ভোলা মহকুমা— ৭,০৭৮৭০
তজুমদ্দিন থানা— ৭৭২৬
পটুয়াখালি মহঃ— ১০৭৬৪৪৪
গলাচিপা থানা— ২০৭২১১

(গ) চট্টগ্রাম জিলা : লোকসংখ্যা—২৯৮২৯৩১; আয়তন—২৭০৫ বর্গমাইল।

কুতুবদিয়া থানা— ৪৮,১৬৫
মহেশখালি থানা— ৭৭,৮০৯
সন্দ্বীপ ১১০,৬২৬

বছর	বিপর্যয়ের ধরন	ঘটনার তারিখ	ক্ষতিগ্রস্ত জেলার নাম	জীবনহানি	গবাদি পশুর মৃত্যু
১৯৬০	সাইক্লোন	১০ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর	চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও বরিশাল	৮১৪৯	১১৪৭৬৯
১৯৬১	ঐ	৯ মে	ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি	১১৪৬৮	৭৭৯১৮
১৯৬৩	ঐ	২৮, ২৯ মে	বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি	১১৫২০	২৬৫৪৩
১৯৬৫	ঐ	১১, ১২ মে	বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি	২০১৫২	১৩৭৮৮৯
১৯৬৮	ঘূর্ণিঝড়	১১ এপ্রিল	ফরিদপুর	৩১৯	২২৪২০
১৯৬৯	ঐ	১৪ এপ্রিল	ঢাকা, কুমিল্লা	৭৫	৩৮৩

২২শে নভেম্বর ১৯৭০ সানডে পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান

এই তিন জিলার প্রায় ৯৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে কমপক্ষে এক ষষ্ঠাংশ অধিবাসীর জীবনহানি ঘটেছে।

বিগত ১০০ বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক দুর্যোগই বৃহত্তম। বোধ হয়, মানবেতিহাসেরও এটা অন্যতম প্রাণঘাতী দুর্বিপাক। খৃষ্টের জন্মপূর্বতীকালে বিষুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল সান্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে চীন দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। তার সংগেই কেবলমাত্র এই দুর্ঘটনার তুলনা করা যেতে পারে। ১৮৭৬ খৃঃ বাখরগঞ্জে যে বন্যা হয় তাতে দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। ১৮৮৭ খৃঃ চীন দেশের পীত নদীর্তে বন্যার ফলে হোনান প্রদেশে ৯ লক্ষ ব্যক্তি মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯০০ খৃঃ আমেরিকা টেকসাসে 'হারিকেন' ঝটিকার ফলে
হাজার, ১৯৩৫ খৃঃ হাইচিতে বন্যায়
হাজার, ১৯৫৩ খৃঃ ইংল্যাণ্ডে ঝটিকা
জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ২১ হাজার এবং ১৯৫
খৃঃ পশ্চিম মেক্সিকোতে বন্যায় ২ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের

সাম্প্রতিক বন্যার পূর্বে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছিল ১৯৩৯ খৃঃ চীনে। চীন দেশের উত্তরাঞ্চলে এই বছর বন্যা ও খাদ্যাভাবে প্রায় দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক দুর্যোগে জীবনহানির যে সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে, স্মরণযোগ্য যে তা কেবলমাত্র বন্যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ঘটেছে। পরবর্তীকালে ক্ষুধা ও মহামারীতে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের সংখ্যা এর মধ্যে ধরা হয়নি।

বরিশাল, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জিলার যে সকল অঞ্চলগুলি সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত সেগুলি উপরের মানচিত্রে পরিষ্কাররূপে দেখানো হয়েছে।

এই ভয়াবহ দুর্যোগের কিছুটা পরিমাপ করা যাবে পাকিস্তানের সংবাদপত্রের রিপোর্টিং থেকে। "রামগতি দ্বীপে লক্ষাধিক ব্যক্তি মারা গিয়েছেন অথবা নিখোঁজ হয়েছেন। রামগতির দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে চরলক্ষ্মী, চররমিজ, চরকাটাবুনিয়া, টুমচর ও বড়খেরীতে এখন পর্যন্ত বাইরের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই এলাকা এখনো তিন চার হাত পানির নীচে রয়েছে। একুশ ফুট পানির নীচে সমগ্র রামগতি ছয় ঘণ্টারও অধিককাল নিমজ্জিত ছিল।" দৈনিক পূর্বদেশ (ঢাকা) পত্রিকার রামগতির সংবাদদাতা ২৯শে নভেম্বর এই রিপোর্ট পাঠান।

এই পত্রিকার, সোমবার ১৪ই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তজিমদ্দীন থানার বন্যার ধ্বংসলীলার এক করুণ চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।

"বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারেনি আর মাত্র ১২ ঘণ্টার পর এ ভূখণ্ডে শুরু হবে ধ্বংসলীলার যজ্ঞ। সন্ধ্যায় বাতাসের বেগ বাড়তে শুরু করেছিল। আর রাত ১১টায় তা ঝড়ের রূপ লয়।"

এ বর্ণনা পূর্বদেশ পত্রিকার রিপোর্টারের নয়। তজিমদ্দীন থানার সোনাপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদ ভেলা গ্রামের যুবক এনায়েতউল্লা পূর্বদেশের রিপোর্টারের কাছে তার জীবনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। এনায়েতের ৯।১০ কানি জমি আছে। প্রতি বছর সে সর্বসাকুল্যে এক হাজার দেড় হাজার মণ ধান গোলায় তোলে। সেই কালরাত্রির কথা সে বলেছে এইভাবে—

"এ ঝড়েই তাদের একটা ঘর ভেঙে পড়ে। প্রাণরক্ষার জন্যে এনায়েত অন্য এক ঘরের নিরাপদ স্থানে ছুটে যায় আশ্রয়ের জন্য তার বউ ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। রাত তখন প্রায় ২টা। তার এক ভাই বাইরে থেকে চীৎকার করে বলল—'পানি এসেছে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসো সবাই।'

উঠোনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ঘরে হাঁটু পানি হয়ে গেল। ....ঘরের চালে আশ্রয় নিল তারা। গোটা একটা পরিবার। কিন্তু পানির প্রবল টানে থাকতে পারল না তারা কেউ। স্রোতের সাথে ভেসে গেল। ...একটু পরে তাদের ঘরের চালাটাও চলতে শুরু করল স্রোতের সাথে সাথে। ভেসে

যেতে যেতেই এনায়েত কখন একটা গাছের ডাল জাপটে ধরেছিল তা সে নিজেও জানে না। তার বড় ছেলেটা তার গলা আঁকড়ে ছিল। ভোরের আলোয় ঝলমল করে উঠল দ্বীপটা, তখনও এনায়েত মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলছে। তার নয়নের মনি তখনও তার গলা জাপটে আছে। পেট ফুলে তার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। ভেবেছিল মরে গেছে কিন্তু তবুও তাকে ফেলে দিতে পারেনি।

বেলা ১১টার সময় পানি কমলে এনায়েত গাছ থেকে নামল। গলায় ঝুলন্ত ছেলেটিতে মাটিতে নামাল। ...ঝাঁকি দিয়ে পেটের পানি ফেলে দিল তার দেহ থেকে। দেখতে দেখতে সত্যিই অদ্ভুতভাবে ছেলেটা প্রাণ পেল।

এরপর সে খুঁজতে বেরুলো তার পরিবারের লোকজনকে। বউকে পেল কয়েক মাইল দূরে এক খেজুর গাছে। উলঙ্গ সে। কিন্তু আর দুটো ছেলেকে খুঁজে পায়নি। বেড়ি বাঁধে আটকে থাকা হাজার খানেক লাশের মধ্যেও সে খুঁজেছে, কিন্তু কোথাও তাদের পায়নি। চাচাতো বোন রেণু, মরিয়ম, জাহানারা আর ভাই শাহেদকে কিন্তু খুঁজে পেয়েছে সেখানে। ফুলে মোটা হয়ে আছে।

তার ফুফা আবুল কাসেম বাটোয়ারী নিজে বেঁচেছেন, কিন্তু নিজের স্ত্রী ও পুত্র রশিদকে বাঁচাতে পারেননি। আজ সেই বৃদ্ধ উন্মাদ।

এনায়েতের এক বোন মেহেরজানের বিয়ে হয়েছিল লক্ষ্মীপুর গ্রামের জাফর আলমের সঙ্গে। তার বোনের পরিবারের ১৩ জনের সবাই বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। আর এক বোন মমতাজ জানের শ্বশুরবাড়ি কেউরাচোপী। তার স্বামীর পরিবারের লোক সংখ্যা ৯৫ জন, আর তার মধ্যে বেঁচে আছে ২৬ জন।"

এমনি করে একটি মানুষের চারিদিকের আত্মীয়পরিজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী—এ সব কিছুর বিরাট মহীরুহ সর্বনাশা বন্যা উপড়ে দিয়ে গিয়েছে।

এমনি আর একটি ছোট্ট ছেলে। তার শোক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মেঘনার ভাঁটিতে শাহবাজপুর নদী। সাগরের মোহানায় এই নদী চব্বিশ মাইল প্রশস্ত। তার তীরে মেদুয়া গ্রাম। আজ সেই গ্রাম নিশ্চিহ্ন।

সংবাদদাতা লিখেছেন—"একটা খাঁড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলাম, সাত আট বছরের একটা ছেলে গর্ত খুঁড়ে এক বালিকার আধপচা মৃতদেহ কবরস্থ করার চেষ্টা করছে।

—'তোমার নাম কি খোকন'?

—'হাশেম'। ও বলল।

—'ও তোমার কি লাগত'?

—'বোন!' অশ্রুসজল হয়ে উঠল ছোট্ট হাশেমের সরল দুটি চোখ।

বিধ্বস্ত দ্বীপাঞ্চলের পথে পথে ঘুরে প্রলয়ের পর একাদশ দিনে মেদুয়া গ্রামে মেঘনার খাঁড়িতে হাশেম খুঁজে পেয়েছে ওর দুর্ভাগা ভগিনীর গলিত শবদেহ। নিজের ছোট দুর্বল বাহু দুটি দিয়ে ভাগ্যহীনা বোনের গলিত শবদেহকে নরম মাটির আচ্ছাদনে ঢেকে দিচ্ছিল হাশেম।

হাশেম জানালো, ওর পরিবারের বাবা মা ভাই বোন কেউ বেঁচে নেই। আছে শুধু সে, আর তার চাচা।

—'তুমি কি করে বেঁচে গেলে?'

ও বলল, 'আমি কোন গাছে উঠতে চেষ্টাও করিনি। পানির স্রোতের সাথে ভেসে ভেসে ওপারে উঠছিলাম। তারপর এক সময় গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকলাম। সারাটা রাত গাছটা ধরে কাটিয়ে দিয়েছি। ভোরে গাছ থেকে নেমে দেখি আমি আমার গ্রাম থেকে অনেক অনেক দূরে। দুদিন পরে আমার চাচা পাগলের মত খুঁজতে খুঁজতে সে গ্রাম থেকে আমাকে বের করেছেন। আজ খুঁজতে খুঁজতে আমার বোন পাঁচির লাশটা এখানে পেলাম।'

পাঁচি আর হাশেম এক সাথে ধলো নিয়ে মাটি দিয়ে রোজ খেলত। হাশেম আজ বোনের কবরের ওপরে সেই মাটির খেলার শেষ বারের মত মাটি ছড়িয়ে দিল। পাঁচির হাতে তখনও [illegible] দেওয়া কাচের চুড়ি [illegible] করছে। (দৈনিক পূর্বদেশ, সোমবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭)

দুর্গতির পর যে সকল সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারী ও বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধি বিধ্বস্ত এলাকার ওপর দিয়ে বিমানে উড়ে গিয়েছেন, তারা দেখেছেন।

"Human habitations for miles after miles were razed to the ground by the cyclone and the tidal bore on that fateful night of November 12."

পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ এস ফারল্যান্ড ভোলা দ্বীপে প্রথম উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার বাহিনীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে বলেছেন—
"It is a very, very serious tragedy. The devastation is extensive. It is a gruesome sight, believe me." (Pakistan Observer, Sunday, Nov 22).

একটি সর্বহারা মানুষের মুখে সেই মহাপ্রলয়ের বর্ণনা দিয়ে এই ট্র্যাজিক কাহিনীর প্রথমাংশ শেষ করি।—

"গিয়ে উঠলাম ঘরের চালায়। জলের বাড়ন্ত ধাপটে চালের মাঝখানটা দুভাগ হয়ে গেল। আমি ও ছেলেটা রইলাম একদিকে, আর মেয়ে চারটিকে নিয়ে ওদের মা রইলো অন্যটায়।

সাম্প্রতিক প্রলয়ের পর পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে মর্মন্তুদ বিবরণ প্রকাশিত হয় তারই একটি নমুনা

জলের তোড় বাড়তে লাগল। আকাশটা আরও যেন রাঙ্গালো। কিসের রক্ত কে জানে। ওদিক থেকে ওদের মা আর না পেরে বলে উঠলো: 'আমি যে আর ওদের ধরে রাখতে পারছি না গো।'......

..........সালাম স্ত্রীর চীৎকারের উত্তরে বলেছিলো: 'তিনটা ছেড়ে দাও। ছোটটাকে ধরে রাখো।'

আর এই সময় বাঁচবার আকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষায় মায় বুকে জড়িয়ে ধরা বাচ্চাগুলো শুনতে পেয়েছিলো ওদের বাবার মুখের কঠিন কয়েকটি শব্দ। তাই ওরা আকুলি বিকুলি করে বলেছিল: 'মা আমায় ছেড়ে দিও না মা।' আর একজন বলল: 'মা আমায় ছেড়ে দিও না মা।' তৃতীয় মেয়েটাও বলে উঠল, সে কি করুণ আর্তনাদ: 'আমায় ছেড়ে দিও না মা। আমায় ছেড়ে দিও না মা গো।'

মা তার কোন সন্তানকেই ছেড়ে দায়নি। চারটি সন্তানকে জোর করে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে। তারপর এক সময় সালামের পরিবার তার চারটি মেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের সেই কালো জলে হারিয়ে গেছে। (পূর্বদেশ, সোমবার, নভেম্বর, ২০)

॥ দুই ॥

মহাপ্রলয়ের সংবাদের আঘাত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে প্রথমে মূক করে দিয়েছিল। তারপর একসময় বুকের জমাট অশ্রু সমুদ্রের উত্তাল উচ্ছ্বাসের মত বাঁধ ভেঙ্গে উদ্‌বারিত হয়েছিল কবিতায়, গানে, গল্পে, রিপোর্টাজে। তারপর ধীরে ধীরে সেই নিদারুণ বিপর্যয়ের বিস্তারিত সংবাদ আর সরকারী অবহেলার কথা ধীরে ধীরে সবাই জানতে পেরেছে। তারপর সেই কান্না এক সময় নিদারুণ ক্রোধ আর ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। সেই ঘৃণা আর ক্রোধই সাম্প্রতিক নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।

সরকারী ঔদাসীন্যের, বিশেষ করে বিদেশে পাকিস্তানী দূতাবাসগুলির ঔদাসীন্য সম্পর্কে 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার জেনিভাস্থ সংবাদদাতা লিখেছেন:

"The Pakistan embassies abroad are seen bseiged by hundreds of peoples for news and with offer of relief and voluntary work. But the embassies continue to make no comment and hide behind the words that no instructions have been received. . . . . . The total apathy of the Pakistanis abroad is shocking." (Sunday Pakistan Observer, Nov. 22).

দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি পাকিস্তান সরকারের ঔদাসীন্য এতই প্রকট যে বিদেশী সংবাদপত্রগুলিতেও তার তীব্র সমালোচনা হয়। লণ্ডনের একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে লেখা হয়:

"Five days after the cyclone devastated the Ganges delta it was reported that one helicopter was at work dropping supplies. You might as well try to put out the fires of hell with a water pistol. What about the military helicopters stationed 1000 miles away in West Pakistan?" (Daily Sketch, London, Nov. 13).

সরকার প্রথম থেকেই ঘটনার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেননি। তারপর সারা বিশ্বে যখন এই মর্মান্তিক দুর্বিপাকের কথা ছড়িয়ে পড়ল, তখন পাকিস্তান সরকার উদ্ধার ও সাহায্যের কাজে নামলেন। কিন্তু উদ্যোগও যথেষ্ট ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট হয়নি। ফলে আজ পর্যন্ত যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের দুঃখের বিশেষ লাঘব হয়নি। 'মহাপ্রলয়ের দেড় মাস পরে' এই শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তানের এক দৈনিক পত্রিকায় ভোলা ও পটুয়াখালির বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার এক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। তা এই—

"গত ১২ই নভেম্বরের মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার ভোলা, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমদ্দীন, চরফেসন; পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা, খেপুপাড়া, বরগুনা থানার অলগু ও চরাঞ্চলে এখনও যাহারা কোনমতে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের অধিকাংশই ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর দারুণ শীতে একরকম বিনা বস্ত্রেই উন্মুক্ত আকাশের নীচে কালযাপন করিতেছে। বেতার ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র দুর্গতদের মধ্যে সরকারী ও বৈদেশিক

সাহায্য বিতরণের যে ফিরিস্তি প্রকাশ করিতেছেন, সরেজমিনে তদন্ত করলেই, কেবলমাত্র তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনও হাজার হাজার লোক খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা, কচুগাছ ও অখাদ্যকুখাদ্য খাইয়া নামমাত্র বাঁচিয়া আছে। পৌষের এ তীব্র শীতের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এখনও বিনা বস্ত্রে হাজার হাজার লোক মৃত্যুপথযাত্রী। বিভিন্ন এলাকায় কয়েকজন শিশুর শীতে মৃত্যু বরণের খবরও পাওয়া গিয়াছে।

মহাপ্রলয়ের পর দীর্ঘ ৫০ দিন অতিবাহিত হইলেও সরকার আজও বিধ্বস্ত এলেকায় পরিবার পিছু একটি শীতের কাপড়ও দিতে পারেন নাই। দুর্গতদের ভাসিয়া যাওয়া কুঁড়েঘর নূতন করিয়া গড়িবার জন্য একখণ্ড বাঁশ, গোল-পাতা বা অন্য কোনরকম সামগ্রী যোগাড় করিতে পারেন নাই। অথচ বিভিন্ন সরবরাহ ডিপোতে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দ্রব্য এবং গৃহনির্মাণ সরঞ্জাম পড়িয়া আছে।......

......কয়েকটি ডিপোতে চাল, আটা ও অনেক রিলিফ পচিয়া যাইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।......

......ছেলে মেয়েদের পরনে কোন কাপড় নাই, শিশুরা ন্যাংটা ও বয়ঃজ্যেষ্ঠ মহিলা ও পুরুষেরা খেজুর গাছের পাতার বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া কোনরকমে ইজ্জত রক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ......

আমি ব্যক্তিগতভাবে এখনও উপদ্রুত এলাকার বহু গলিত মথিত মানুষ ও পশুর লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি।... চরফেশন থানার বেতুয়া স্লুইস গেইটের মধ্যে ও তাহার আশেপাশে এখনও বহু লাশ পড়িয়া আছে।......

একজন গ্রামবাসী আমাকে জানান যে তাহারা মাথাপিছু সপ্তাহে মাত্র অর্ধ সের চাউল ও আটা পাইয়াছেন।' **('মহাপ্রলয়ের দেড় মাস পরে : ভোলা ও পটুয়াখালি/ নিজামউদ্দীন আহমদ প্রদত্ত। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২২শে পৌষ, ১৩৭৭)**

দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের প্রতি সরকারের, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য কত প্রবল তা নীচের হিসেব থেকে দেখা যাবে। নীচের হিসেবে বিভিন্ন বছর বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে:

ঘটনা থেকে। —নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ থেকেই পাকিস্তানের আবহাওয়া দপ্তর আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস পায় এবং রেডিও মারফৎ তা প্রচারিত হয়। পরদিন অর্থাৎ ১০ তারিখ আরও সুস্পষ্ট ভাষায় দুর্যোগের কথা জানানো হয়। ১১ তারিখও সতর্কবাণী ঘোষণা করা হয়। তা সত্ত্বেও উপকূলবর্তী এলেকার প্রশাসক সরকারী কর্মচারিগণ এ জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেননি। বরং তারা নিজ নিজ জেলা পরিত্যাগ করে ঢাকায় এক সরকারী পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাদুর্যোগের পরের দিন শুক্রবার (১৩ই নভেম্বর), রেডিও সংবাদপত্র যখন ধ্বংস-লীলার প্রাথমিক সংবাদ প্রকাশ করেন, তখনও ঐ সমস্ত জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ এবং ডিভিসনাল কমিশনার

বছর	ঝঞ্ঝা ও সামুদ্রিক বাত্যার জন্য টা.	বন্যা টা.	মোট টা.	কেন্দ্রীয় সাহায্য টা.
১৯৬০	১,৩৪,৮৫,৪৩২	—	১,৩৪,৮৫,৪৩২	৪১,০০,০০০
১৯৬৩	২,৮৯,৫০,০৬০	—	২,৮৯,৫০,০৬০	২৯,০০,০০০
১৯৬৫	৪,২২,০৬,৫৬১	—	৪,২২,০৬,৫৬১	৭৫,০০,০০০
১৯৬৬	১,০৬,৭৯,২৪২	১,২১,২৮,২১৫	২,২৮,০৭,৪৬৭	১০,০০,০০০
১৯৬৯	৬০,১৯,০৪০	১,২৭,৫৫,১৩৯	১,৮৭,৭৪,১৭৯	—

১৯৬০ সাল হইতে ঝড় ও বন্যায় দুর্গতদের সরকারী সাহায্যের তুলনামূলক পরিসংখ্যান ২২শে নভেম্বরের পাকিস্তান অবজার্ভারে প্রকাশিত

এই অর্থের মধ্যে খয়রাতী সাহায্য বাবদ প্রদত্ত গমের মূল্যও অন্তর্ভুক্ত।

উপরের হিসেব থেকে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করেছেন ১৯৬৫ সালে ৭৫ লক্ষ টাকা। ঐ বছর ঝঞ্ঝাবাত্যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের ছয়টি জেলার মোট ১,০২,৯৮,০৯১ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি ধরলেও মাথা পিছু সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৫ পয়সা। এ ছাড়াও অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মঞ্জুর করেছিলেন, কিন্তু তা হল ঋণ বাবদ এবং তার পরিমাণও বেশী নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এবারের এই মহাদুর্যোগের ব্যাপারেও সরকারী সাহায্য ও ত্রাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার কঠোর সমালোচনা হয়েছে। সরকারী ঔদাসীন্য ও অক্ষমতার যে সকল বিবরণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা' বস্তুতই দুঃখজনক।

সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানহীনতার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই ঢাকায় অবস্থান করছেন। তাঁরা কয়েকজন রবিবার পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন। আবহাওয়া দপ্তরের জনৈক অফিসার সহ উপকূলবর্তী জেলাসমূহের কয়েকজন অফিসার রবিবার মর্নিং শো সিনেমা দেখেন, এমন খবরও সংবাদপত্রে বার হয়েছে (Sunday U.O. 22 Nov. 70/Hush Hush Over Tragedy.)

এই তো গেল সরকারী কর্মচারী ও কেন্দ্রীয় সরকারের কথা। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ, বিশেষ করে ধনিক সম্প্রদায়, পূর্ববঙ্গের এই মহাপ্রলয়ে বিশেষ বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। 'পূর্ব দেশ' পত্রিকার লাহোর সংবাদদাতা তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, **(পূর্ব দেশ, নভেম্বর ৩০/'ওরা ঈদের বাজার সওদা করতেই ব্যস্ত রয়েছে')—**

—"কিন্তু এ সময়েও গণমান্য নাগরিক-দের একটি ক্ষুদ্র অংশকে ঈদের বাজার সওদা করার ব্যাপারে খুব ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। এতো বড় বিপর্যয় সম্পর্কে এরা একেবারেই নির্বিকার।...এদিকে আঁটসাট পোশাক পরনে উচ্চবিত্ত পরিবারের কিছু সংখ্যক নরনারী মহানন্দে ঈদের বাজার
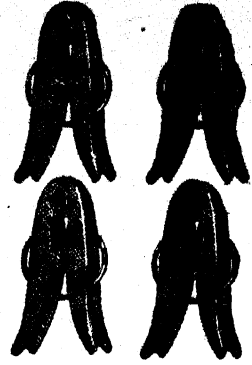
করছেন।...করাচী শিল্প ও বণিক সমিতি এ পর্যন্ত ২৬ হাজার টাকা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। আর লাহোর সমিতি দিয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। অথচ এই সমিতির সদস্য হচ্ছেন সেই কুখ্যাত ২২টি পুঁজিপতি পরিবার। ১৬০ জন মিল মালিকের ১০ লক্ষ টাকা দানও গুরুত্বহীন।"

তবে পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব মানুষেরা যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন। লাহোরের অধিকাংশ সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে নগরীর জনবহুল এলাকায়, যেখানে গরীব মানুষের বাস। তারা দিনরাত এই সাহায্যকেন্দ্রগুলিতে সাহায্যদান অব্যাহত রেখেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করবার সুযোগ পায়নি। যেমন বিদেশস্থ পাকিস্তানী ছাত্রসংস্থাগুলি পাকিস্তানের নাগরিক ও বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেনি, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানেও বেসরকারী সাহায্য-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। লণ্ডনের ওয়েস্ট লেস্টার স্কাউটের ক্যাম্প সংবাদ-পত্রে (মর্নিং নিউজ, ডিসেম্বর ১০) সম্পাদকের নিকট এক পত্রের মারফৎ এই সরকারী উদাসীন নীতির প্রতিবাদস্বরূপ তাদের 'টাকা' ও 'পণ্য' ফিরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সরকারী হৃদয়হীনতা, অব্যবস্থা ও ঔদাসীন্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মৌলানা ভাসানীর দল যে বিগত সাধারণ নির্বাচনে তাদের সমস্ত প্রার্থীদের প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তারও কারণ এই। পূর্ব পাকিস্তানে দুর্গত ও জলোচ্ছ্বাসপীড়িত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে ৪ঠা ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস পালন করার আবেদন জানানো হয়। এই উপলক্ষে মৌলানা ভাসানী, পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান এবং পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি পীর মোহসেনউদ্দীন সংবাদপত্র মারফৎ এক বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন—

"পবিত্র ইসলামের দোহাই দিয়ে যারা পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে শোষণ করছে সেই ইসলামের আদর্শ মত, ব্যক্তি সত্বরে সম্ভব তাড়াতাড়ি দাফন করা, কিন্তু তা কেউ পালন করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আজও স্বাভাবিক মানবতাবোধের পরিচয় দেয়নি, এখনও তারা নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত রয়েছে।"

॥ তিন ॥

পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ সচেতন সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিকরা সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিকায় যে সংবাদ-সাহিত্য, কাব্য ও সাহিত্য রচনা করেছেন তা অনবদ্য। তাদের রচনার মধ্য দিয়ে উদাসীন শাসকগোষ্ঠীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা এবং সঙ্গে সঙ্গে অপশাসন অবসানের জন্যে কঠিন সংকল্পবাণী ঘোষিত হয়েছে। আর দুর্গত মানবতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং মাতৃভূমির আনুগত্য তাদের রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনা ছিল এক নিদারুণ চ্যালেঞ্জস্বরূপ, এবং তারা গভীর নিষ্ঠা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন। ১৩ই নভেম্বরের সংবাদপত্রেই দুর্যোগের সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারপরই বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিকগণ ঘটনাস্থল অভিমুখে ছুটে যান। যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন বিপর্যস্ত, যানবাহন সংগ্রহ করা কঠিন। কয়েকটি দুর্গম এলাকায় পৌঁছতে বেশ কয়েকদিন লাগে। বিধ্বস্ত এলাকার জলপথ মৃতদেহ, গাছপালা, ভাঙ্গা ঘর ও ভাসমান অন্যান্য জিনিসে রুদ্ধ। বহু জায়গায় সংবাদিকদের দেশী নৌকাযোগে গিয়ে পৌঁছতে হয়। পথে কোথাও কোথাও দু' হাতে মানুষ ও পশুর মৃতদেহ পরিষ্কার করে তাদের নৌকার পথ করে নিতে হয়। পচা লাশের দুর্গন্ধে চারিদিক দুর্গন্ধে ভরে ওঠে। নাকে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়। খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই তাদের দিনের পর দিন কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে হয়।

এই সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ যে সকল প্রতিবেদন পাঠান তা শুধু একান্ত বস্তুর তথ্যই নয়, আবেগধর্মী সাহিত্য-গুণান্বিতও বটে। এ ভাষা তাদের বুকের গভীর থেকে উঠে এসেছে। সাংবাদিকতার বস্তুমুখী রিপোর্ট চিরন্তন সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

একজন সাংবাদিক লিখেছেন—"কয়েক আউন্স তুলো আর তার ভিতরে বেশ কয়েকটি ন্যাপথলিন পুরে একটি মুখোশ তৈরি করে নাকমুখ তা দিয়ে বেঁধে আমরা কয়েকজন এগুচ্ছিলাম। এগুচ্ছিলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের দানবীয় আক্রমণে লক্ষ লক্ষ লোকের বধ্যভূমি স্টালিনগ্রাদের দিকে নয়, সমুদ্রের স্টালিনগ্রাদ্ চর জব্বারের দিকে।"

তারপর তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর বিপর্যস্ত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎ করেছেন সেই বৃদ্ধটির সঙ্গে, যিনি রিলিফ নিতে চাননি, কেননা আজীবন তিনিই সবাইকে রিলিফ দিয়েছেন। যে হাতে তিনি সবাইকে দিয়েছেন, সেই হাতে তিনি নেবেন কি করে?

দেখে এসেছেন আঠারো উনিশ বছরের বলিষ্ঠ গড়নের যুবককে। সে একটি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সে তার বন্ধুদের সাথে এসেছিল রিলিফের কাজে। কিন্তু ধ্বংসলীলার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তাকে একটি বাড়ির উঠোনে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে ইকবালের 'শেকোয়া' কাব্য আবৃত্তি করছে—'হে খোদা, তুমিই আসামী। এত নিষ্ঠুর কেন হলে তুমি?

আর দেখেছেন পাশাপাশি দুটি লাশ। মৃত্যুও যাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। নববিবাহিত এক দম্পতি। একটি দামী সুতীর শাড়ীর দুই প্রান্তে দুজনের কোমর বাঁধা। দুজনের হাতেই মেহেদীর রঙ মাখানো। হয়তো সেই মহাদুর্যোগের রাতে তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। বিয়ের সময় মোল্লা পুরুত যে মন্ত্র পড়েন, এক হও, থাকো এক সঙ্গে, কেউ কাকে পরিত্যাগ করো না—তা তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনেছেন। মৃত্যুও কি এখানে হার মানল না? [দেখিয়া এলেম আমি আরবার হাহাকার ভরা/সলিমুল্লা/ পূর্বদেশ, সোমবার, ১৪ই অঘ্রাণ]

'পূর্বদেশ' সম্পাদকীয় লিখেছেন—"শাওয়ালের চাঁদে এবার বড় ইশারায় তাই নতুন জীবন জিজ্ঞাসা চিহ্নিত। আমরা জীবন্মৃত জাতি হিসেবে চরম ধ্বংসের দিকে এগুবো, না জীবনের নতুন সূর্যকে তমসার আড়াল থেকে ছিনিয়ে আনব। এবারের ঈদ সেই জিজ্ঞাসাই আমাদের কাছে বহন করে এনেছে। এবারের ঈদে অভিনন্দন নয়, শপথ গ্রহণ। খণ্ড চাঁদে জীবনের যে প্রতিভাস, হোক সে আজ ক্ষীণ; তাকে কয়েকজনের জীবনে নয়, সকলের জীবনে পরিপূর্ণ করে তোলার সাধনাই আমাদের এবারের ঈদ।"

আর কবি সাহিত্যিকদের কাছে এ বেদনায় রক্তিম নতুন এক চেতনা। গভীর বেদনার বিলাপে এবং কঠিন সংগ্রামের শপথে একই সঙ্গে উদ্বেলিত এবং সংহত তাদের চেতনা।

এমনি একটি কবিতাঃ

আর কাঁদিসনে মা/হাসনা আরা

একদা শান্ত ঝিলের স্বচ্ছ জলে
মুখ দেখত আমার রূপসী মা
সে জলে এখন ভাসমান তার ছেলে—
আমার মা।.........

কাঁদে আমার মা, মুক্তকেশা
অঝোর ধারে সে কান্নায় কাঁদে অবেলা
কাঁদে ভোরের শিশির, কাঁদে ভিন্ন দেশ,
হায়রে ভাগ্যবতী—
বুকে উপুড় হয়ে পড়া কেশ
মরণেও যেন আঁকড়ে ধরে
আবেগ সন্তান।.........

কুঁড়ির গোছা অজস্র
তার চেয়ে বুকে পাষাণ বাঁধ
ক্ষুধাতুর জনতার ওপর
তোমায় যারা করল অপমান,

দুঃখের গরল আকণ্ঠ পানে নীলকণ্ঠী হ
জননী আমার
স্বর্গ আমার, স্বর্গ আমার, কান্দিস নে
মা আর।

এমনি অসংখ্য কবিতা পূর্ব পাকিস্তানের রবিবারের সংবাদ সাময়িকীতে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার সবগুলি সংকলন করলে বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ হবে, যেমন হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ওপর লেখা কবিতা সংকলন।—

আর এক কবি, জাহিদুল হক, আর এক অপূর্ব কবিতায় অপরূপ শোকগাথা রচনা করেছেন। তার খানিকটা তুলে দিচ্ছিঃ

....
....

ভাড়ায় এখেনে শুন্ধে, আমাদের চারিদিক
আজ লাশে একাকার
অপহৃত শস্যের মাঠে, বাঁশ ঝাড়ে নিকানো উঠানে।
হাতিয়ার, সন্দীপে, খুলনায়, বরিশালে,
হৃদয়ের আনাচে কানাচে,
স্বপ্নে সবুজে এত লাশ—হে পৃথিবী আমরা
কোথায় যাবো,
আমাদের চান্দিকে ক্ষুধা, বিভীষিকা,
মৃত্যুর শরীর,

আমাদের রাসাঘর ভেঙে গেছে গত রাতে
ভীষণ তুফানে,
স্বপ্ন, সাধ, হৃৎপিণ্ড: আমাদের সভ্যতার
পাঁচ লক্ষ কারিগর,
গত রাতে বিনাশী তিমিরে ডুবে হাহাকার
লাশ হয়ে গেছে।

আমরা কোথায় যাব, ডানা ভাঙা সেই
পাখীটার মতো,
কোথাও সংসার নেই : চার পাশে অপহৃত
ফসলের মাঠ—আমরা কোথায় যাবো?
উড়ার এখোনো শূন্যে : নীল চোখ গলে গেছে
অই—সমগ্র শরীর
আমাদের সারা বুকে নিদারুণে জেগে আছে
স্বজনের নষ্ট কবর।

[নষ্ট কবর/জাহিদুল হক]

সাম্প্রতিক মহাদুর্যোগ যেন পূর্ব পাকিস্তান মানুষকে নতুন করে জাতি হিসেবে নিজেদের চিনবার সুযোগ দিয়েছে। মহাপ্রলয়ের রক্তাক্ত মেঘের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী আবার নিজেকে নতুন করে বাঙালী বলে চিনল। সে জানল, প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাছে মানুষ কত অসহায়, আর একদল উদাসী ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন শাসক কিভাবে সে অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে। এই দুর্যোগের মুখোমুখি হয়ে এক আর্ত বিলাপ তার বুক ফেটে বার হয়েছে। কিন্তু তা-ই সব নয়। এক নতুন আত্মবিশ্বাসও সে লাভ করেছে। জাতি হিসাবে তার মৃত্যু নেই। মানুষেরও মৃত্যু নেই—এই গভীর উপলব্ধি হল এই মহাদুর্যোগের ফলশ্রুতি।

শওকত ওসমানের একটি গল্পের ('নিজের লাশ লইয়া') কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি:—

"...আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি এককালে মুর্দাফরাস ছিলাম। এবং একটা লাশ নিজেই বয়ে এনে এই শতাব্দীর চতুর্মুখী সড়কের ওপর রেখেছিলাম। তা আমার নিজের লাশ এমন কোনদিন ভাবনায় আসেনি।...এখন দেখা যাচ্ছে, আমিই আমার শববাহক। আরো অন্তত তিনজন 'কলমা শাহাদাৎ' উচ্চারণ করে সঙ্গে থাকার কথা। সেদিন কিন্তু কেউ ছিল না। আমি চোরস্রোতের মাঝখানে বোঝাটা বড় স্বস্তির সঙ্গে নামিয়েছিলাম।......

নিজের সীনার সোজাসুজি ছোরা চালিয়ে সব উন্মুক্ত করে ফেললাম। আশ্চর্য হৃদপিণ্ডটা এখনও তাজা। যেন ঘা খেয়ে স্তব্ধ। অনেক সময় ঘড়ির যে দশা ঘটে হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে। প্রবল ঝাকুনিতে সব কলকব্জা থেমে গেছে। কিন্তু তাজা হৃদপিণ্ডে দুটো কালো কালো দাগ। কিসের দাগ?

হৃদপিণ্ড তখন আমাকে ডাক দিলে, 'ভেতরে এসো। ভয় পেয়ো না।' ইতস্তত করছি। আবার আমন্ত্রণ, 'এখানে ঢুকলে তোমার বোধ হয় আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তেমন আশঙ্কায় যদি অভিভূত হও, বুঝব, তুমি আমাকে ধারণ করবার উপযুক্ত নও। কোনদিন আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলে, তা মুছে দেবার চেষ্টা করব তখন।'

লজ্জার ঠেলায় একটা কালো দাগ ঠেলে আমি এগোতে লাগলাম। কত দূরে ঢুকে গেছি আমার হুঁশ ছিল না।...

কাছাকাছি যাওয়া মাত্র আমার পা আর এগোয় না। এখানে সকলে মৃত। বাহক এবং বাহকের বোঝা উভয়ই। মৃত অথচ সবাই দলে দলে হেঁটে যাচ্ছে। এক রমণীর মুখ দেখলাম। বাহক তাকে কাঁধে ফেলে এগোচ্ছে। আর ধুলোয় লুটোচ্ছে তার দীর্ঘ কেশপাশ। জীবন, মৃত্যু তবে কি একই মুদ্রার এ পিঠ ওপিঠ?...এই একেকার জীবজন্তু মানুষের কংকাল ঝড়ের আন্দোলনে শূন্যে ঘূরপাক খাচ্ছে। নাগরদোলার বিচিত্র ঘূর্ণির মধ্যে একদল কংকাল-শকুন বমি করতে লাগল। কংকাল তবু তার হেড়ো কণ্ঠনালী [illegible] বেরিয়ে আসতে লাগল নানা [illegible]—যেন বনভোজনের পর ছড়ানো চকোলেটের রঙীন মোড়ক। হড় হড় করে বেরোতে লাগল জুতো জামা, আরো কাপড় চোপড়, ফার্নিচারের নির্যাস।...অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হচ্ছে নিমেষে এবং আমি এক প্রচণ্ড ভাগাড়ের মধ্যে পা ফেলেছি—যার চারিদিকে বেশুমার লাশ পড়ে আছে, নগ্ন, নানা আসনে শায়িত—অথবা অবস্থা বিপর্যয়ে উপবিষ্ট—যে অবস্থায় তারা মরেছে। আবছা আলোয় দেখলাম, শিরস্ত্রাণ পরিহিত একদল উলঙ্গ নরাকার জীবই এখানে প্রকৃতির মুর্দাফরাস সেজেছে এবং শৃগাল কুকুর যেমন মৃতদেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং কলহ বাধায়—তেমনি পাশব ধর্মের ধারা অব্যাহত রেখেছে। আমার উপস্থিতি ওরা টের পেল, তা ধর্তব্যের মধ্যে আনল না। বরং ক্ষুন্নিবৃত্তির ভোজে মগ্ন রইল।...

...হঠাৎ আমার চোখ পড়ল নগ্ন এক সুন্দরীর লাশের দিকে যার অভিমুখে একটি লোমশ দানব এগিয়ে যাচ্ছে নিজের শিরস্ত্রাণ ঠিক করে। কিন্তু রমণীকে ধরার জন্য স্পর্শ করা মাত্র সে চীৎকার করে উঠল, "পুত্র, আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। এই ভাগাড়ে সব লাশ নয়। পাশব উল্লাসে পশুটা তখন রমণীকে জাপটে ধরেছে মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে নয়, মাংস উপভোগে। আমার চোখ নিবদ্ধ ছিল, হঠাৎ জ্বলে উঠল এবং আমি কংকালের হাতিয়ার নিয়ে সেই দিকে ধাইলাম। "পুত্র রক্ষা রক্ষা করো, রক্ষা করো।"

সেই আর্তনাদ চারিদিকের ভিত নাড়া দিতে লাগল ভূমিকম্পের মত।

জানোয়ারটা রমণীকে ছেড়ে দিল। তারপর সে দৌড়াতে লাগল। আমি পিছু পিছু ধাওয়া করি। এতক্ষণ এই লোমশ আকার দেখে যে ভয় পেয়েছি তা তাহলে মিথ্যে।...দানবটা দৌড়তে লাগল। আমি পিছু পিছু। সুড়ঙ্গটা ক্রমশ বিস্তৃত, তারপর বিস্তৃততর হল। চওড়া। যখন বেড়িয়ে এলাম, পেছন ফিরে তাকাই। জায়গাটা আমার হৃদপিণ্ডের সোজাসুজি পিঠের ওদিকে। নরদানবটা তখনও দৌড়চ্ছে। আমিও দৌড়তে লাগলাম। আমার আততায়ীকে দেখতে পেয়েছি।..."আমার আততায়ীকে চিনে ফেলেছি।" চীৎকার দিয়ে উচ্চারণ করি।...হঠাৎ মনে হল উলটো ঘুরলেই আমার লাশ থাকবে বা দেখা যাবে। তা ঠিক আছে তো? তাই একবার ঘুরে দাঁড়ালাম।

কিন্তু কোথায় আমার লাশ! স্তম্ভিত হয়ে থেমে যাই। আমার সামনে কোন লাশ নেই।

আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। জীবিত।
আমি উপলব্ধি করলাম, আমি রক্তবীজ।
আমার মৃত্যু নেই।"

মামণির গায়ের
গন্ধ কেমন মিষ্টি!
মামণিও নিশ্চয়ই
জনসন্স* বেবী!
Johnson's
baby
powder
সবাই পারেন জনসন্স বেবী হ'তে
(এমনকি মামণিও)
*ট্রেডমার্ক
জনসন অ্যাণ্ড জনসন*

'অন্য সব কাজের অসুবিধা হচ্ছে।' চেহারাটা বিকৃত করল বিকাশ। 'যেন পদাবলীর কাজ, কাজ না, ফর্মা পিছু গুণে গুণে এতগুলো করে টাকা দেওয়া হচ্ছে চাঁদুকে—'

'বলছিল কলেজের কী সব নোট-টোট ছাপা হচ্ছে, টাইপ শর্ট পড়ে যাচ্ছে—'

তোমার শালা চিরকালই টাইপ শর্ট থাকবে। মাগীবাজি করে টাকা ওড়াবে, টাইপ কিনবে কি দিয়ে—তা না হলে তোমার কত পরে স্টার্ট দিয়ে অরুণা-প্রেস আজ কত বড় হয়ে গেল। তুমি শালা সেই ঠুঁটো হয়ে রমানাথ কবিরাজ লেনের এঁদো গলিতে পচে মরছ—কলেজের নোট, রোয়াবি করার আর জায়গা পাচ্ছিল না—তুমি বললে না কেন, আমাদের যখন খুশি ধীরেসুস্থে প্রুফ দেখে পাঠাব। তাড়াহুড়ো করে একগাদা বানান ভুল নিয়ে পদাবলী বেরোক এ আমরা চাই না—' বিকাশের কথা শেষ হবার আগেই এক সঙ্গে আরও দুটি তরুণ ভিতরে ঢুকল। দুজনেরই ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মনে হয় কলেজে পড়ছে কি সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে। শুভেন্দুর মতন তাদের পরনেও শার্ট ট্রাউজার্স। সরু মাথার

চকচকে জুতো। তবে শুভেন্দুর যেমন পাট করা মাথা, এদের দুজনের চুল ছোট করে ছাঁটা, একটু রুক্ষ, যেন তেলটেল দেয়ার কিংবা চিরুনিটিরুনি চালাবার দিকে তেমন নজর নেই। একজনের হাতে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আর একজনের হাতে একগাদা কাগজ, যেন লিটল ম্যাগাজিন।

'এই যে অরুণাভ নবকিশোর এসে গেছে।' দরজার দিকে মুখ করে বসা ছিলে শুভেন্দু দুজনকে আগে দেখল। বিকাশ পরে ঘাড় ফেরাল। কিছু বলল না সে। 'তারপর, দুজনের কোথায় দেখা? একসঙ্গে উদয় হলে যে!' শুভেন্দু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

'আমি উত্তরপাড়া থেকে আসছিলাম, হাওড়া স্টেশনে অরুণাভর সঙ্গে দেখা, স্টেশনে দাঁড়িয়ে ও কাগজ কিনছিল।'

'বোসো বোসো।' শুভেন্দু অরুণাভর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'দেখি, কি কাগজ নিয়ে এলে।'

'ঐ তো, কটা লিটল ম্যাগাজিন।' দুজন দুটো চেয়ার নিয়ে বসল। অরুণাভ তার হাতের কাগজগুলি শুভেন্দুর দিকে ঠেলে দিল।

পাক্ষিক মাসিক ত্রৈমাসিক অনেক রকম কাগজ রয়েছে। শুভেন্দু আলতো করে কভারগুলি উল্টে পাল্টে দেখল, কোনোটা শুধুই কবিতা নিয়ে, কোনোটায় কবিতা গল্প প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদি [illegible] রয়েছে। কোনোটায় শুধুই গল্প।

বিকাশ একটা [illegible] সিগারেটটা শেষ করল। [illegible] সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু মেঝের ছুঁড়ে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল।

'আমাদের পদাবলী কবে বেরোচ্ছে শুভেন্দুদা?' নবকিশোর টেবিলের প্রুফের কাগজটার ওপর চোখ রাখল।

হাতের মাসিকপত্রগুলো অরুণাভর দিকে ঠেলে দিয়ে শুভেন্দু বড় করে একটা হাই তুলল। নবকিশোরের প্রশ্নের উত্তর দিল না।

'তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য লেখা নেই একটাতেও। ঐ যে "উন্মেষ" কাগজটা, দেখলাম আর্টপেপারে ছেপে কিছু চমক দেবার চেষ্টা করেছে ওরা। তেমন কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না।' অরুণাভ [illegible]।

'পদাবলী!' বিকাশ এই প্রথম কথা বলল, তারপর নবকিশোরের দিকে চোখ তুলল। 'তুমি কি যেন বলছিলে নব? পদাবলী বেরোচ্ছে কবে? কিন্তু বের করছে কে, একলা হাতে শুভেন্দু কদিক সামলাবে? লেখা জোগাড় কর, এডিট কর, প্রুফ দেখ, বিজ্ঞাপনের জন্যে ছুটোছুটি কর, প্রেসে কাগজ দাও—সব ঠিক রেখে একটা পত্রিকা চালান কি মুখের কথা!'

নবকিশোর একটু অপ্রস্তুত হল, লজ্জা পেল। চুপ করে রইল।

'আমাদের কিছু কিছু ভার নিলে খানিকটা তো করতে পারি।' অরুণাভ টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল। দু হাতের আঙুল একত্র করে হাত কচলাবার একটা অস্পষ্ট ভঙ্গিও করল।

শুভেন্দু হাসল। 'বেশ তো, দেখ না তোমরা, এই তো প্রুফের গাদা জমে আছে, প্রেস থেকে অনবরত তাড়া দিচ্ছে, পারবে ঠিক ঠিক করে প্রুফগুলো দেখে দিতে?'

নবকিশোরের মতন অরুণাভও যেন ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। হাত দুটো টেবিল থেকে সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'রামানন্দদা না থাকাতে খুব অসুবিধা হয়েছে।' নবকিশোর আস্তে বলল।

'রামানন্দদা!' নাকের শব্দ করে বিকাশ মৃদু হাসল। 'রামানন্দ কতটা করত পদাবলীর জন্য শুনি? লেখাগুলো দেখে দিত—এই তো? কিন্তু বাকি কাজগুলো?' এক সেকেণ্ড চুপ থেকে বিকাশ শুভেন্দুর প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে ধরিয়ে নিল। শুভেন্দুও একটা ধরাল। নবকিশোর ঢোক গিলল। অরুণাভ ঢোক গিলল। দুজনেই প্রচণ্ড সিগারেটখোর। আঙুলের ডগাটা পোড়া দাগ দেখলেই বোঝা যায়। রামানন্দর সামনে তো নয়ই, শুভেন্দু ও বিকাশের সামনেও এরা তো সিগারেট খেতে চায় না। অথচ দুজনের পকেটেই প্রচুর সিগারেট মজুত থাকে। তবে শুভেন্দু বা বিকাশ [illegible] থাকলে মাঝে মাঝে এদের দিকেও হাত বাড়িয়ে দেয়, কি হে তোমরা, সিগারেট টিগারেট আছে? আমার বাক্স খালি—দুটো দাও একটা।' তখন অরুণাভ কিংবা নব-কিশোর [illegible] সংকোচ না করে ঝটপট পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে ওঁদের হাতে তুলে দেয়। ওঁরা সিগারেট ধরাবার পর এরা নিজেরাও একটা করে ধরিয়ে নেয়। কিন্তু এক সেকেণ্ড [illegible] সুযোগ আসছে না [illegible] দুজন [illegible] করেছিল।

'রামানন্দকে কোনোদিন লেখা জোগাড় করতে ছুটোছুটি করতে হত না।' নব-কিশোরের দিকে চোখ রেখে শুভেন্দু হাসি-হাসি মুখেই বলল, 'প্রুফও দেখতে হত না। বিজ্ঞাপনের জন্যও তাকে একদিন দৌড়োতে বলা হত না। উঁহু, তার ক্ষমতাই ছিল না, এমন একটা কাজও গুছিয়ে করতে পারত না। শুধু সে এডিটর ছিল, বাকি সব কাজ আমাকে করতে হচ্ছিল, বিকাশ করছিল। পদাবলীর জন্য বিকাশও খুব খাটছে।'

এখনো শুনে বিকাশের কাঠখোট্টা শুকনো মুখে একটু হাসি উঁকি দিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তা মিলিয়ে গেল। বিকাশকে কোনোদিনই হাসতে দেখা যায় না। সর্বদা কেমন বিরক্ত বিষণ্ণ। কথা-বার্তাও কাটাকাটা। রসকস নেই। সম্ভবত লিভারের অসুখ বলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে। অথচ এই মানুষের হাত দিয়ে এমন আশ্চর্য সুন্দর সূক্ষ্ম বুদ্ধিউজ্জ্বল কবিতা বেরোয় কি করে, নবকিশোরের মতন তরুণ ভক্তরা অনেকদিন চিন্তা করেছে।

'রামানন্দ কেবল কবিতা লিখেই খালাস ছিল, বলে কিনা যে ব্যক্তি কথা দিতে ভুলে যায় তাকে দিয়ে হবে কাগজ এডিট করা প্রুফ দেখা বিজ্ঞাপন জোগাড় করা—তবেই হয়েছিল। শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস কর, কাগজ চালাতে গিয়ে রামানন্দকে আমরা কতটুকু পেয়েছি।' বিকাশের কথায় শুভেন্দু নাকের একটু শব্দ করা ছাড়া আর কোনো মন্তব্য করল না।

'পদাবলী রেগুলারলি চালিয়ে যাওয়ার

সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা কোথায় বলতে পার? না, এই নিয়ে তোমরা তরুণরা একদিন চিন্তা করেছ? কাগজের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে—তেমনি ছাপা খরচ, প্রেসগুলো তো দিন দিন ডাকাত হয়ে উঠছে। কমা [illegible] করে পেলে যে ওরা খুশি হবে, ওদের পেট ভরবে, ঈশ্বর বলতে পারে। [illegible] বিক্রী করে যে খরচ ওঠে না তা তোমাদের [illegible] আছে, তাও [illegible] কবিতা আর কবিতার আলোচনা—আমি বলি কি শুভেন্দু—' বিকাশ শুভেন্দুর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'এখন থেকে একটা করে [illegible] উপন্যাস [illegible] দাও, ধারাবাহিক [illegible] কাগজটা কিছু বিক্রী [illegible] বিজ্ঞাপন [illegible] পাওয়া যাবে।' এটা বিকাশের রাগের কথা অভিমানের কথা সন্দেহ কি। তাই শুভেন্দু মুখে কিছু বলল না। চোখ আড় করে মোহনবাবুকে দেখতে লাগল। হিসাবের খাতা থেকে চোখ তুলে মোহন পাল [illegible] [illegible] [illegible] অসম্ভব [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লাগে। শুভেন্দু একটা অলস হাই তুলল।

[illegible] একটা বিজ্ঞাপন [illegible] [illegible] এক সঙ্গে এতটা ধোঁয়া [illegible] বের করে বিকাশ আবার আরম্ভ করল: 'আমি [illegible] চেষ্টাই সার হবে—কাগজ কনসার্নের সঙ্গেই [illegible] তোমাদের জানা শোনা আছে—আমি কি কম পরিশ্রম করেছি। কলকাতার হেন বড় বড় পার্টি নেই মানে যারা কাগজে নিয়মিত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়ে—সব কটা দরজায় ঢু মেরেছি, উঁহু, সুবিধে হচ্ছে কোথায়। ফলে হচ্ছে কি কাগজ, 'প্রিন্টিং চার্জ', দপ্তরী—মানে সবটা খরচের চাপ একা শুভেন্দুকে বইতে হচ্ছে। রামনন্দ কোনোদিন একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি, আমার এই চাকরি নিয়ে সম্ভব না পদাবলীর জন্য মাস মাস—'

'আহা থাম না!' শুভেন্দুর আর চুপ থাকা হল না, যেন বিরক্তই হচ্ছে কথাগুলি শুনে, 'এদের এসব বলে লাভ কী, এখনো গায়ে কলেজ য়ুনিভার্সিটির গন্ধ লেগে আছে! কোন্ জন্মে এক একজন চাকরি করবে, আর চাকরির বাজারের যা অবস্থা! হুঁ, বুঝতাম, প্রত্যেকেই বড় বড় সার্ভিসে ঢুকেছে, তখন না হয়—কিন্তু আজ এদের পদাবলী কি করে চলছে, কেমন করে চলবে শুনিয়ে তো কিছু হবে না।'

আবহাওয়াটা থমথম করছিল। বিকাশ আর কিছু বলছিল না। মোহন পাল প্রচণ্ড শব্দ করে একটা হাঁচি দিল। চেয়ার থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে নাকটা ঝাড়তে যাবে, বাধা পেল, পাখির মতন ফুরফুর করে দুটি মেয়ে এসে ভিতরে ঢুকল। একজনের বাসন্তী রঙের শাড়ি, আর একজনের ব্লু। পায়ে দুজনেরই সাদা হালকা চটি। মাথায় [illegible] বেণী। গায়ের রং [illegible] ফরসা, যেন একটিকে ছাড়িয়ে আর একটি সুন্দর। টানাটানা চোখ, [illegible] ঠোঁটের মতন নাক। যেমন রেস্টুরেন্টের ভিতরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঝলমল করে উঠল।

কিন্তু দুটির একটিও কথা বলতে পারছিল না। ঠোঁট টেপা হাসি নিয়ে শুভেন্দুদের টেবিল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

'কি চাই আপনাদের?' শুভেন্দু প্রথম কথা বলল। তার মনে হল দুজনেই একটু একটু দুলছে, যেন ভিতরে কথা জমে আছে, অথচ বের করতে পারছে না—তারই ধাক্কা লেগে দুটি শরীর মাধবী লতার মতন আন্দোলিত হচ্ছে আর হাসছে। [illegible] ঠোঁট টিপছে।

কেউ না দেখতে পায় অরুণাভ [illegible] কিশোরের হাঁটুতে চোরা চিমটি কাটল। বিকাশ ইচ্ছা করে ঘাড়টা বেঁকিয়ে মোহন পালকে দেখছিল। পুরো একটা মিনিট [illegible] করে এদিকে তাকিয়ে থেকে এবার গলাটা দরজার বাইরে নিয়ে মোহন পাল ঘটা করে নাক ঝাড়তে আরম্ভ করল। পিঠের রং চটা পশমী আলোয়ানের কোণটা মেঝে লুটোচ্ছে।

'পদাবলী বেরিয়েছে?' চাপা গলায় [illegible] মুখের ভিতর লজেনস চিউইংগাম জাতীয় কিছু রয়েছে, একটি মেয়ে প্রশ্ন করল।

'না।' শুভেন্দু সংক্ষেপে উত্তর দিল।

'কবে বেরোবে?'

'দেরি হবে এবার কাগজ বেরোতে।' এদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ একটু রুক্ষ গলায় বিকাশ উত্তর করল। অরুণাভ ও নবকিশোর অসন্তুষ্ট হল।

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার বলেন:
"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"
"আমার চুলই তার প্রমাণ"
"আমার পছন্দসই মাত্র একটি কেশপ্রসাধন আছে আর সেটি হচ্ছে ব্রিলক্রীম।
ব্রিলক্রীম আমার চুল তেলচিটচিটে না ক'রে সুন্দরভাবে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে রাখে —ঠিক যেমনটি আমি চাই।
"ব্রিলক্রীম লাগালে নিজেকে মনে হয়—সম্পূর্ণ সুসজ্জিত"।
ব্রিলক্রীম :
দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কাটতি কেশপ্রসাধন
BRYLCREEM
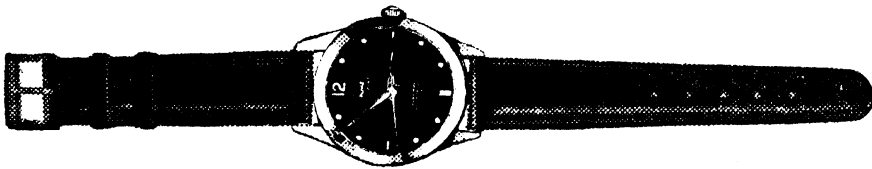
অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি দু'জন শিল্পীর একটি যুগ্ম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। দর্শকদের মধ্যে একজন মধ্যবয়স্ক বিদেশী ভদ্রলোক আগ্রহ সহকারে প্রদর্শনীভুক্ত ছবিগুলি দেখছেন। একটি ছবি অনেকক্ষণ দেখার পরে মুগ্ধ স্বরে বলে উঠলেন ঃ বা সুন্দর! আমি এটি রাখতে চাই। পরে অবশ্য শিল্পী তাঁকে ছবিখানি সকৃতজ্ঞচিত্তে উপহার দেন। যিনি ছবিটি দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন তিনি ডাঃ এচ মোডে, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকীর ছবি বিচার করার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক জুরির একজন বিশিষ্ট সভ্য ও যাঁর আঁকা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ও শিল্পী প্রণব দেববর্মণ অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছিলেন কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর ২০টি নতুন শিল্প নিদর্শন দেখে বোঝা যায় যে শিল্পী হিসাবে তিনি নিয়মিতভাবে ও নিষ্ঠাসহকারে কাজ করে চলেছেন। তাঁর চিন্তাধারা ও রচনারীতিতে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যেজন্য বার বার তাঁর কাজ দেখেও যেন তৃপ্তি হয় না। তাঁর গত প্রদর্শনী আলোচনাকালে বলেছি যে, তিনি প্রাচীন লোক ও দেওয়াল চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত হন ও আধুনিক রীতিতে অতি পরিচিত দৃশ্যগুলিই সেই পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত করে থাকেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বলিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ প্রাথমিক অংকন-পদ্ধতি। তাঁর রেখা স্পষ্ট ও সাবলীল, ক্ষেত্রবিশেষে সংক্ষিপ্ত। তার ওপর আছে ইচ্ছাকৃতভাবে মূর্তির আকারের হ্রস্বকরণ। শিল্পীর রঙ নির্বাচন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। অকারণ নানা রঙের মায়াজাল সৃষ্টি করে তিনি ছবিকে ভারাক্রান্ত করেন নি, বরং মাত্র দু'একটি গাঢ় রঙ ব্যবহার করে, রেখা ও রঙের কাব্যলোক সৃষ্টি করেছেন। কমপোজিশন হিসাবে ডিজাইন নং ৩ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি প্রতীকমূলক রচনা—ধানের শীষ, ঘট, মঙ্গলপ্রদীপ ও কারখানার ইঙ্গিতমূলক চাকা সংস্থাপন ও সমন্বয় করে তিনি গ্রাম ও শহরে জীবনের সংগতি প্রকাশ করেছেন। পটভূমির বেগুনী রঙের পরিপ্রেক্ষিতে লাল ও বাদামী রঙের সুকল্পিত ব্যবহার ছবিখানির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। পরিচিত বিষয়বস্তু বা দৃশ্যগুলিই যেন এ শিল্পীর হাতে নতুন রঙে ফুটে ওঠে—যেমন ভিলেজ ম্যাডোনা। গেরুয়া রঙের পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা ছবিটি অনেকের মনে থাকবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছবির উল্লেখ করা চলে—মেলা শেষে। দু'-একটি রচনা দেখে মনে হয় শিল্পী বুঝি তুলি সহকারেই কাব্য সৃষ্টি করেন, যেমন ব্লু বয় অ্যাণ্ড দি গ্রীন ট্রাম্পেট। আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সমগ্র রচনা ক্ষেত্রটি গভীর লাল রঙে ভরে ফেলে মাত্র রেখা মাধ্যমে সাবলীল মূর্তি এঁকে শিল্পী বক্তব্যটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিটি সুন্দর, দর্শক যেন এটিকে ভুলতে পারেন না। বলা বাহুল্য, তাঁর গ্রন্থ দি উওম্যান ইন ইণ্ডিয়ান আর্ট-এ ডাঃ মোডে এই ছবিখানি প্রকাশিত করবেন। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে কোজি ও ট্রেনার-এর নাম করা যায়।
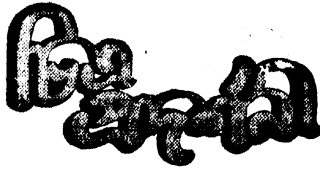
প্রণব দেববর্মণের ১৩টি নিদর্শন দেখা যায়—তাদের মধ্যে দুটি ভাস্কর্য নমুনা। প্রণব দেববর্মণ মুখ্যত বিমূর্ত শিল্পী, তবে দু'-একটি আলংকারিক কাজও চোখে পড়ে। শিল্পী তেলরঙে কাজ করেছেন তবে তাঁর রঙ ব্যবহার প্রণালী টেম্পারার মত—অর্থাৎ অন্যান্য রঙের সংগে তিনি সাদা রঙকেও প্রাধান্য দিয়েছেন—ফলে শিল্পীর রচনাবলীতে একটি সুন্দর কারুকার্য ফুটে উঠছে। অনেক স্থলে পটভূমিতে তিনি বালি ব্যবহার করেছেন, তার ওপর টেম্পারার মত নানা রঙ ব্যবহার করার ফলে সমগ্র রচনা-ক্ষেত্রটির একটি বিশেষ রূপ চোখে পড়ে। আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অনেক ক্ষেত্রে তিনি সাবলীল ও বলিষ্ঠ রেখা মাধ্যমে বিষয়বস্তু ফোটাবার চেষ্টা করেছেন, আবার কয়েক স্থলে শূন্য স্থানটুকু নানাভাবে বিভক্ত করে চাপা রঙে বক্তব্যটুকু বলেছেন। যেমন, স্নেক এবং মুড ফেস্টিভ। শেষ কৃতির বালির ওপরে চাপা লাল, হলুদ ও ছাই রঙ ব্যবহার লক্ষণীয়। দু'-এক ক্ষেত্রে শিল্পী কেবলমাত্র বিভিন্ন রঙকে আশ্রয় করেই বিমূর্ত রচনা সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ব্রোকেন টয়েজ-এর নাম করা যায়। শিল্পীর ইঙ্গিতমূলক কয়েকটি ছবিও মন্দ লাগে না বিশেষ করে লাল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে চাপা ছাই রঙ ব্যবহারের জন্য, যেমন গ্রে জাজ। কয়েকটি প্রতীকমূলক প্লাস, বাদ্যযন্ত্র ও অনুরূপ পরিবেশের ছায়া অবলম্বনে রচিত ছবিটিতে শিল্পী জাজ-এর সাংগীতিক তাৎপর্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এটি শিল্পীর সুন্দর ও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি। ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে আকার সৃষ্টি ও খোদাইপদ্ধতির দিক থেকে টর্সো (পাথর) অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

*

উদীয়মান বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্ম তথা রচনাধারা বহির্বাংলায় প্রচার করার উদ্দেশ্যে ট্রানজিশন পত্রিকা কর্তৃপক্ষ গত বছর থেকে একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছেন। গত বছর প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনীটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবার পরে নয়াদিল্লীতেও অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও, দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীটি সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত হবার পরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। ট্রানজিশন কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাকেও এ জন্য দিল্লী যেতে হয়, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এবারের প্রদর্শনীতে বাংলা দেশের ১৫ জন শিল্পীর ৩২টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নীরদ মজুমদার, রবিন মণ্ডল, সত্যেন ঘোষাল, মহিম রুদ্র, সুবল পাল, জগদীশ ব্যানার্জী, হেমন্ত মিশ্র, প্রকাশ কর্মকার, নির্মল দত্ত, স্বপ্নেশ চৌধুরী, গোপাল সান্ন্যাল, বিশ্বপতি মাইতি, মঞ্জরী বসু, সুনীলমাধব সেন ও ইশা মহম্মদ। মোটামুটিভাবে নিদর্শনগুলি সুনির্বাচিত হলেও দু'-একটি দুর্বল রচনা যে ছিল না তা নয়। তবুও প্রদর্শনীটি পরিক্রমা করলে বাংলা দেশের সমকালীন চিত্রকলা ধারার পরিচয় মেলে। দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফটস (AIFACS) গ্যালারীতে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রদর্শনীতে পদার্পণ করেন। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই নয়াদিল্লীতে দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হয় ও চিত্ররসিকবর্গ অনেকেই সেজন্য ব্যস্ত থাকেন। ললিত কলা অ্যাকাডেমির নতুন চেয়ারম্যান মিঃ কার্ল খাণ্ডেলওয়ালা আগ্রহ-সহকারে কয়েকটি ছবি দেখেন ও জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রদর্শনীর অধিকাংশ নিদর্শনই ইতিপূর্বে অন্যান্য প্রদর্শনীতে দেখা—সুতরাং তাদের বিষয়ে পুনরুল্লেখ করা নিরর্থক মনে করি। তবে চিন্তাধারা ও কমপোজিশনের দিক থেকে হেমন্ত মিশ্রের রেডিয়ান্ট টাইডিংস ও হোয়াইট ডাভ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে তাঁর রঙ ব্যবহার প্রণালীতে নিজস্ব স্বাক্ষর আছে। তরুণতম শিল্পীর কাজ হিসাবে বিশ্বপতি মাইতির কার্সড অনেকের ভাল লাগে—তবে মঞ্জরী বসুর দুটি রচনাই অপেক্ষাকৃত দুর্বল। জগদীশ ব্যানার্জীর একটি বিমূর্ত রচনা (কমপোজিশন) মন্দ লাগে না।

*

শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য, কাত্যায়ন অনলাত ও হ্রেনি বিজিমোরিয়া ৫২ চৌরঙ্গী রোডে একটি নতুন আর্ট গ্যালারী স্থাপন করেছেন। গ্যালারী উদ্বোধন উপলক্ষে প্রথম দু'জন শিল্পীর ছবি ও তৃতীয় জনের সিরামিক শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। চিত্র প্রদর্শনী ও বিশেষ করে শিল্পী তথা শিল্প-সমালোচকদের সঙ্গে চিত্রকলা চর্চা এবং সমকালীন ধারা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান করা এই গ্যালারীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

*

কলকাতায় আরও কয়েকটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, অনুপস্থিতির জন্য সেগুলি দেখা সম্ভব হয়নি। আশা করি সেজন্য শিল্পীবৃন্দ আমাকে ক্ষমা করবেন। ইতিমধ্যে যাঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী অঞ্জু চৌধুরী, প্রভাত সেন, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী ও শ্রীমতী অঞ্জলি রায় (ভট্টাচার্য), বিকাশ সেনগুপ্ত ও মুকুন্দলাল ভাদুড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

—চিত্রপ্রিয়

কৃষি শিক্ষা

গত ২৩ জানুয়ারীর 'দেশ'-এ কল্যাণী কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'কৃষি শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সময়োপযোগিতায় তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। প্রবন্ধটিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় প্রতিভাত হয় ঃ এক, সাধারণভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি তথা কৃষি শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; দুই, ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শিক্ষার সমস্যা ও ইতিহাস। কিন্তু এক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় ও বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা এসেছে দুই দিক থেকে, প্রথমত, ভারতীয় কৃষির সামগ্রিক সমস্যার বস্তুগত পটভূমিকায় বিষয়টি আলোচিত হয়নি এবং দ্বিতীয়ত, কৃষি শিক্ষা যে ভারতীয় অর্থনৈতিক তথা কৃষি পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ সে দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টিকে দেখা হয়নি। তাই প্রবন্ধটি কতগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবনা ও মন্তব্যে ভারাক্রান্ত হয়েছে, বস্তুর পরিস্থিতির সুষ্ঠু রূপায়ণ ততটা হয়নি। ফলে স্বাধীনতার এর দীর্ঘ তেইশ বছরেও যে আমরা ভারতে কৃষি উন্নয়নমূলক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ঐতিহ্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হইনি তার জন্য কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্ন ক্ষোভের উত্তরে প্রধানত দুটি সমস্যার উল্লেখ করতে হয়। তাঁর প্রবন্ধটি হল ঃ ভারতের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক আদর্শ, ধারা প্রেরণা লাভ করেছি, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে—কৃষি ও শিল্প—এই দুটির যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণাকে উন্নয়নমূলক কাজের অপরিহার্য সহায়ক অঙ্গ মতো গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল ততটা দেয়া হয়নি যদিও আমরা পুঁথিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছি যে "Education is the basis of all progress. This is no less true of agriculture than it is of other sectors of the economy". Report of the Second Joint Indo-American Team on Agricultural Education, Research and Extension, P. 9)

এই অবহেলার কারণ হিসেবে আমার মনে হয়েছে যে, যেহেতু শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অর্থব্যয়ের কোন তাৎক্ষণিক ও সরাসরিভাবে দৃশ্যমান ফলশ্রুতি লভ্য নয় সেই হেতু এই ব্যয় 'অনুৎপাদক' (Unproductive) বলে ধরে নেয়া হয়েছে, তাই তা অবহেলিত এবং প্রায়শ দেখি, বাজেটের ক্ষীণ তলানিটুকু থাকে সর্বস্তরের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য, আর প্রয়োজন মত বাজেট-কর্তনের প্রথম খাঁড়াটি পড়ে এরই ওপর। দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ও গবেষণার পেছনে এমন একটি সরকারী অবাস্তব যুক্তি সক্রিয়, যেখানে কৃষি শিক্ষা কোন পৃথক ব্যাপার নয়।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হল ঃ যেখানে জাতীয় আয়ের পঞ্চাশ শতাংশের বেশী এবং জাতীয় শ্রমের প্রায় সত্তর শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল এমন ঐতিহ্যলব্ধ কৃষি-প্রধান ভারতে 'গরু অমার খাবে কম দুধ দেবে বেশী'—কৃষিখাতে অর্থ বিনিয়োগ ব্যাপারে এমন পরিকল্পিত অবাস্তব নীতি গ্রহণের স্পষ্ট প্রবণতা ভারতীয় কৃষি (কৃষি-শিক্ষা সহ) তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী হয়েছে অনেকাংশে, আবার এদিকে খাদ্য ও শিল্পে কাঁচা মালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার গভীর প্রয়োজন অনুভব করে আসছি স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই। কাজেই এ অবস্থায় কৃষি শিক্ষার অপরিহার্য ব্যাপারটি অবহেলিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

এবার কৃষি শিক্ষার মূল প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে প্রথমেই একটি কথা স্বীকার করে নেয়া দরকার যে, যে কোন অনগ্রসর দেশের কৃষির অনুন্নত স্থিতিশীল অবস্থা (Stagnation) থেকে উত্তরণ (Take off) ও উন্নতি বিজ্ঞান-ভিত্তিক কৃষি শিক্ষার সুষ্ঠু বিস্তার ও যথাযথ প্রয়োগ ভিন্ন সম্ভব নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে কৃষি শিক্ষার সুফল নির্ভর করে কৃষির নির্দিষ্ট বস্তুগত সমস্যানুযায়ী তার সাংগঠনিক সুব্যবস্থা ও তদনুযায়ী কর্মদক্ষতার ওপর। সেক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কৃষি শিক্ষার কিছু পাঠক্রম চালু করে দিলেই চাষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ক্ষেত-খামারে পৌঁছাবে না, একর ও মাথা পিছু ফলনও বাড়বে না। অথচ গোড়া থেকে ভারতীয় কৃষির মৌল সমস্যাগুলি আমাদের যত গভীর করে উপলব্ধি করা দরকার ছিল করা তত হয়নি। আর কৃষি কাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত স্তরে যে সমস্যাগুলি যুগ-যুগান্ত ধরে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে সেগুলির সমাধানের একটা নির্ভর-যোগ্য পর্যায়ে না পৌঁছালে কৃষি শিক্ষা প্রসারের যে-কোন প্রকল্প ফলপ্রসূ হতে পারে না। এর কিছু সমস্যা কৃষির স্থায়ী আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত আর কিছু অস্থায়ী অবস্থার সঙ্গে। এই স্থায়ী আয়োজনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল—ভূমি ব্যবস্থা ও জল সেচ ব্যবস্থা। বৃটিশ ঐতিহ্যবাহী, চাষ ও চাষী বিরোধী ভূমি-বিন্যাস ভারতের কৃষি উন্নতির পরিপন্থী ধরে নিলেও স্বাধীনতোত্তর ভূমি সংস্কার-মূলক কর্মধারার মধ্য দিয়ে এ বাধা অপসারণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়নকে ভূমি সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়নি। এই অসহযোগিতার মূল কারণ এই যে, পরিকল্পনার প্রথম থেকেই যে সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্প দ্বারা ভারতের কৃষির উন্নতি চিহ্নিত তার 'মডেল'টি পরিকল্পনা কর্তারা নিয়েছিলেন এ্যালবার্ট মেয়ারের উত্তর প্রদেশস্থিত এটোয়া পাইলট প্রোজেক্ট (১৯৪৮) থেকে, যেখানে মূলত ধরে নেয়া হয়েছিল,

" . . . the project method rests on a degree of confidence that structural obstacles of village progress are either non-existent or insignificant". (Albert Mayer & others, Pilot Project, India, 1959, P. 477).

প্রাচীন ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-বিন্যাস যে কৃষি উন্নতির পথে বড় বাধা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার অথবা উপেক্ষা করার মত এমন শৈথিল্যবোধ আমাদের কৃষি পরিকল্পনার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল, আর কৃষি শিক্ষা তো সে কৃষি-পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ।

দ্বিতীয়ত, জল সেচের মতো কৃষির

মৌলিক উপাদান ব্যবস্থার এতকাল কোনো সাফল্যজনক অগ্রগতি হয়নি বলেই নতুন কৃষিজ্ঞান প্রয়োগ কেবলমাত্র সেচপ্রাপ্ত এলাকাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছে, অথচ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছোট-বড় সব খামারে কৃষি শিক্ষার সর্বভারতীয় বিস্তার।

ভারতে কৃষি শিক্ষা প্রসারের পথে আর একটি বড় বাধা খামারের সাংগঠনিক রূপ (farm organisation) ও তাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্য। যেহেতু বড় আকারের ব্যবসায়-ভিত্তিক ও (commercial), অথবা রাশিয়ান ধাঁচের সরকারী (collective farm) খামার আমাদের অভিপ্রেত নয় সেহেতু এখানকার পারিবারিক ছোট খামার এবং/অথবা সমবায় খামার নীতি গৃহীত হয়েছে এবং এই সুবিপুল পরিবার-ভিত্তিক ছোট খামার-গুলির আর্থিক সঙ্গতির এত অভাব যে নতুন উদ্যমে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি সহ নতুন আয়োজনে ব্যয়বহুল চাষের ব্যাপারটা আজও তাদের কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়। তাছাড়া, অসহায়, অশিক্ষিত, প্রাচীন সংস্কারাচ্ছন্ন চাষীদের মনোভাব ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তন সূচিত না হলে কৃষি শিক্ষার সুফলপ্রদ ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না এবং তার জন্য প্রথমে প্রয়োজন সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার। তার ফলে সমস্ত চাষী চাষ-আবাদ করে নতুন কৃষিশিক্ষাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে কৃষির উন্নতি সম্ভব হতে পারে এবং কৃষিপণ্যের বাজার, চাষের উপাদান সংগ্রহ এবং যান্ত্রিক চাষের সমস্যাগুলি সমাধানের পথে আসতে পারে। অবশ্য এর জন্য বিদ্যুৎশক্তির প্রসার—যা গ্রামীণ ভারতে এখনো সহজলভ্য নয় একটি বড় Infrastructure হিসাবে প্রয়োজনীয়। ভারতীয় কৃষি উন্নয়নের গতি কিন্তু এমন ধারা নেয়নি যে এগুলিকে এবং উপযুক্ত কৃষিশিক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেনি।

এখন ডঃ চট্টোপাধ্যায় নিশ্চয় স্বীকার করবেন, যেহেতু কৃষিশিক্ষা ফলিত-জ্ঞান-বিস্তারী এবং আর্থিক লাভ সন্ধানী সেহেতু প্রয়োগক্ষেত্রের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে সে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো তৈরি ও সংস্কার সাধন দরকার। কিন্তু ভারতে সর্ব-ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনা যেমন তার প্রয়োগ পরিকল্পনার সঙ্গে অসহযোগ তালে চলেছে তেমনি এখানে কৃষিশিক্ষার কাঠামোও বাস্তব প্রয়োগ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক-শূন্য। তার ফলেই স্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে কৃষিশিক্ষার অনুপ্রবেশের প্রয়োজন অনুভূত হলেও কার্যত তা পশ্চিমবঙ্গে ব্যর্থ হয়েছে; তাছাড়া স্কুলস্তরে যত ছাত্র কৃষি-শাখায় উত্তীর্ণ হয় তাদের সকলের জন্য কি স্নাতক স্তরে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ আছে? আর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের সামনে কৃষি-সেবার কি কি সুযোগ খোলা আছে? আজও কেন কৃষি-বিদ্যায় শিক্ষিত চাষীর ছেলেকে নিপুণভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালনা করতে গ্রামের দিকে আকৃষ্ট করা গেল না? এ সবের সদুত্তর খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে। তদুপরি, ডঃ চট্টোপাধ্যায়-উল্লিখিত কোঠারী কমিশনের Agricultural polytechnic-র সুপারিশ কার্যকরী করার আগে ভাবতে হবে—এ প্রকল্পটিও হাজার হাজার বেকার শিল্প-কারিগরের মত কৃষিবিদ্যার অসংখ্য বেকার কারিগরের জন্ম দেবে কিনা।

পরিশেষে, যে কথাটা ভারতীয় কৃষিশিক্ষার ব্যাপারে আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই—ডঃ চট্টোপাধ্যায় কৃষিশিক্ষা সংস্কারের যে মত প্রকাশ করেছেন সেটা সমর্থনীয় মনে হলেও কৃষির প্রয়োগ ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বান্তঃকরণে কৃষিশিক্ষার কাঠামো তৈরি করা দরকার। তাছাড়া, কৃষিবিদ্যার নতুন জ্ঞান ও পদ্ধতি সুদূর গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সমস্যার সমাধান সরকারী এজেন্ট দিয়ে যতটুকু হচ্ছে তা একান্ত অপ্রতুল এবং আন্তরিকতাশূন্য। এর জন্য গ্রামের স্থানীয় নেতৃত্ব গঠন, অন্যদিকে সরকারী এজেন্ট—এই দুয়ে মিলে কৃষিজ্ঞান বিস্তারের সুযোগ তৈরি করা প্রয়োজন। না হলে প্রয়োগশূন্য জ্ঞানের ভার ভারতীয় কৃষির ভাগ্যে লেখা রয়েছে।

ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। কলিকাতা-৯

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' রচনাটি পড়লাম। পড়ার পরে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছি এমন কিছু তথ্য জেনে যা ঠিক বোঝানো যায় না। আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে জানতাম যে, তিনি নেতাজী-প্রেমে ঠিক গদগদ না হলেও নেতাজী-বিরোধী

ছিলেন না। অন্তত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতাজীর ভূমিকার প্রশংসা প্রকাশ্যেই করতেন। কিন্তু সেটা যে নিতান্তই লোক-দেখানো, মনের কথা নয়, তা বোঝা যেত না। নেতাজী তদন্ত কমিশন তথা নেতাজী সংক্রান্ত বিভিন্ন গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ার পর আজ সকলের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। জওহরলাল কি তবে নেতাজী সম্বন্ধে নীরবতা পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন? আইজেনহাওয়ার ও কেনেডি ও তার দেশবাসীগণ ফাদার চিসজেকের মুক্তির জন্য যা করেছেন, জওহরলাল তার সামান্যতম কর্তব্য পালন করলেও আর কিছু না হোক, সাইবেরিয়ার জেলে সেই 'বৃদ্ধ চীনাটি' যে কে সেটা তো জানতে পারতেন।

ডঃ সিংহ নিজের থেকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে চেয়েও জওহরলালের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি এটা আমাদের বিস্মিত করেছে।

অবশেষে সাইবেরিয়ার জেলে লক্ষ লক্ষ বন্দীর ওপর সোভিয়েত রাশিয়া অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, সে ব্যাপারে ও নেতাজী সংক্রান্ত ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সব কিছুর [illegible] নতুন করে মূল্যায়ন করার [illegible] হয়েছে।

মৃণাল বণিক
[illegible]

॥ ২ ॥

"দেশ" পত্রিকার ১৩শ সংখ্যায় (৩৮ বর্ষ) [illegible] ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধটি অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। ডঃ সিংহের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আরো অনেক লেখা আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বেও পড়েছি। সেগুলোও ছিল তথ্যসমৃদ্ধ এবং সাধারণ আগ্রহের বিষয়। বর্তমান রচনাটিতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন ও তাঁর করুণার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার প্রকাশ করেছেন কিন্তু মূলত তিনি সুভাষচন্দ্রের বিতর্কমূলক মৃত্যু সংবাদের সত্যতা যাচাই ও সে সম্পর্কে তাঁর (ডঃ সিংহের) সন্দেহের কথা বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপনায় ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত এ লেখাটাকে তিনি তাঁর সুভাষচন্দ্রের (বরং বলা ভালো নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-রহস্যের) [illegible] সম্পর্কেই অনেক কথা বলেছেন। তাঁর লেখার সর্বত্রই একটা উৎকণ্ঠা চাঞ্চল্য অস্থিরতা এবং সর্বশেষে হতাশা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হয় এটা প্রায় [illegible]। ডঃ সিংহ [illegible] ভাবনাকে [illegible]। আমার একটা প্রশ্ন মনে জেগেছে, সেটা হলো এই যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আরো চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য-প্রমাণ এর আগেও বহুবার বহুক্ষেত্রে বহুভাবে আমরা দেখেছি। সে সমস্ত দেশ-বিদেশের অনেক প্রথম শ্রেণীর বহুলপ্রচারিত সংবাদপত্রে প্রচারিতও হয়েছে। কিন্তু আসল কাজের কি সত্যিই কিছু হয়েছে আজ পর্যন্ত? অর্থাৎ আমরা আজও তো সঠিকভাবে জানতে পারলাম না তিনি জীবিত আছেনই (অথবা নেই-ই)। নেতাজী সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের কাজ এখনও চলছে। সুতরাং এই সব তথ্য প্রমাণ (ডঃ সিংহের প্রবন্ধে উল্লিখিত) সেখানে উপস্থাপিত করা কি জরুরী নয়?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রাউরকেলা-৯

॥ ৩ ॥

দেশ পত্রিকায় ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহের 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধটি পড়লাম। আনন্দও পেলাম, দুঃখও পেলাম। আনন্দ পেলাম—অনেক নতুন কিছু কথা জানতে পেরে। আর দুঃখ পেলাম এইজন্য যে, এইসব নতুন কথা না জানলেই হয়তো ভালো হতো। আমাদের [illegible] বাঙালীদের রক্তের মধ্যে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। [illegible] এই [illegible] বিশ্বাস করি যে—আজ যে আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক বলে [illegible] নেতাজী [illegible] বিমান দুর্ঘটনাকে [illegible] মৃত্যু বলেই ধরে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে কিছু গুজব অবশ্য কানে এসেছে। কিন্তু তথ্যপ্রমাণহীন সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই ডঃ সিংহের প্রবন্ধটি পড়ে অবাক হয়ে গেলাম যে—সত্যিই যদি তখন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অনুসন্ধান চালাতেন—তাহলে হয়তো আমরা আমাদের নেতাজীর খবর পেতাম। অবশ্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর সম্বন্ধে হয়তো তেমন আগ্রহান্বিত ছিলেন না।

শ্রীমতী দীপালি দাশগুপ্ত
হায়দ্রাবাদ-৩৬

উজ্জ্বল উদ্ধার

এই অনবদ্য লেখার জন্য শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবীকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না। সাবলীল গতিতে তিনি যে-ভাবে লেখাটি শেষ করেছেন তা মনে সর্বদাই অম্লান হয়ে থাকবে। প্রতিভা দেবীর বহু দিন পূর্বে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'সমুদ্র-হৃদয়' লেখাটিও আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছিল। বিশেষ করে 'উজ্জ্বল উদ্ধার'-এর পুরন্দর (চৈতী) ও ডঃ রায়ের (বাপের) [illegible] অপেক্ষা রাখে না। তারপরই পুরন্দরের গাড়ি ছাড়ার আগে অতসীর সঙ্গে আলাপ বড়ই ভালো লাগলো।

ভানু দেববর্মণ
ত্রিপুরা

॥ ২ ॥

শ্রীমতী প্রতিভা বসুর উজ্জ্বল উদ্ধার উপন্যাসটি 'দেশ'-এর পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সম্প্রতি সেটি শেষ হলো। উপন্যাসটি আগাগোড়াই আগ্রহ সহকারে পড়েছি। অসাধারণ কিছু না হলেও, বলতে বাধা নেই, এ উপন্যাসটির স্বাদ আর পাঁচ দশটা উপন্যাসের চেয়ে আলাদা। অথচ লেখার মধ্যে কোথাও কোনো চটক নেই। আছে সচ্ছন্দ এবং অনাড়ম্বর গতি। ঘটনাবিন্যাস যথোচিত। চরিত্রগুলোও পরিচিত। অঞ্জলি দেবীর মানসিকতা বিভিন্ন দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সূক্ষ্ম তুলির টানে অন্যান্য চরিত্রগুলোও সুস্পষ্ট। তার অঞ্জলি দেবীর স্মৃতিচারণা এবং আত্মবিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে লেখিকা এমন কতগুলো তত্ত্বোক্তির সাহায্য [illegible]

প্রদীপ রায়গুপ্ত
কলকাতা-৯

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

৬ ফেব্রুয়ারীর দেশে শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা'—এই পর্যায়ের রচনায় কালীপ্রসন্ন [illegible] মূলক যে কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার প্রচলিত পাঠ হলো:

উড়িস্যা নে রে পায়রা কবি/খোপের ভিতর থাক ঢাকা/তোর বক্ বকম্ আর ফোঁস-ফোঁসানি/তা-ও কবিত্বের ভাবমাখা/তাও ছাপালি গ্রন্থ হলো :/নগদ মূল্য এক টাকা। শ্রীচক্রবর্তী প্রদত্ত পাঠটির উৎস কোথায় জানি না।

অনিমেষ বসু
অধ্যাপক, দুর্গাপুর সরকারী কলেজ

॥ ২ ॥

শ্রদ্ধেয় শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর স্মৃতিকথা 'ঈশ্বর, পৃথিবী ভালোবাসা'য় মালদা জেলার যে 'চাঁচোর' গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন, তার প্রচলিত নাম 'চাঁচোল' বলেই জানি।

এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে মালদা জেলা সম্বন্ধে কোন প্রাচীন পুঁথি নেই।

॥ ৩ ॥

'দেশ' পত্রিকায় শংকরের 'দুটি দেশ একটি ভাষা" পড়ে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বদরুদ্দিন উমর-এর "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" বইটি তিনি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, আমরা এখনো পাইনি। কিন্তু তিনি যে তার কিছুটা আস্বাদন নেবার সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তিনি লিখেছেন, বদরুদ্দিন উমরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে নি এর আগে। এই প্রথম এই গ্রন্থটির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। অনেক বাঙ্গালী পাঠকও বোধ হয় শংকরের প্রবন্ধটির মারফৎ বদরুদ্দিন উমরকে জানবেন এবং প্রবন্ধটির অন্তর্গত মূল্যবান বিষয়বস্তুর সঙ্গে আন্তরিক সাযুজ্য অনুভব করবেন।

বদরুদ্দিন উমর কিন্তু এ-পারে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নাম নয়। ইতি-পূর্বেই পত্রপত্রিকায় তাঁকে আমরা পেয়েছি, তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ করে আনন্দ লাভ করেছি। এই প্রসঙ্গে আমি তাঁর দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করছি। একটি—"বাঙ্গালী সংস্কৃতির সংকট" (এটি উৎকলিত হয়েছে কলকাতায় প্রকাশিত "পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ" গ্রন্থটিতে) আর একটি "রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি" (এটি প্রকাশিত হয়েছে 'নবজাতক' (পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭৭) পত্রিকায়। প্রথম প্রবন্ধটিতে আলোচনার বিষয়বস্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙ্গালীত্বের দোটানায় বাঙ্গালী মুসলমানের সমস্যা এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বাঙ্গালী সংস্কৃতির অঙ্গচ্ছেদ করে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেবার যে হীন প্রয়াস পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ ও কিছু পূর্ব পাকিস্তানী চালাচ্ছিলেন তারই বিরুদ্ধে লেখকের সোচ্চার প্রতিবাদ। ইতিহাস-সচেতন বিদগ্ধ প্রাবন্ধিক উমর সাহেব প্রথম প্রবন্ধটিতে বলেছেন—"বাঙ্গালীত্ব এবং মুসলমানত্বের মধ্যে বিরোধের কল্পনা সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতা-সৃষ্ট। ...বাংলা দেশে সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হল, মুসলমানরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানরা ততই সরে আসার চেষ্টা করল বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হল বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী এবং মুসলমানরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক, কাজেই তারা বাঙ্গালী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না।" এই মনোভাবের উৎপত্তি উনিশ শতকের ইংরেজ রাজত্বকালে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখার মধ্যেই "আমরা বাঙ্গালী না মুসলমান?" এ-প্রশ্নের উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যেই "চিন্তাধারার বিকাশ।" উমর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন এই প্রশ্ন কিছু পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মনে নতুন করে দেখা দিয়েছিল। এই অর্থহীন, অবান্তর ও উদ্ভট প্রশ্নের জবাবে উমরের বক্তব্য—"বাংলাদেশের যে কোন অংশে যারা মোটামুটি স্থায়ীভাবে বসবাস করে বাংলা ভাষায় কথা বলে বাংলা-দেশের আর্থিক জীবনে অংশ গ্রহণ করে এবং বাংলার ঐতিহ্যকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে তারাই বাঙ্গালী। কাজেই কে কোন্ ধর্মাবলম্বী সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়।..." বাঙ্গালী বলে নিজেদের পরিচয় দিলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা ইসলামবিরোধিতা হবে, পূর্ব-বঙ্গের কিছু শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে এই মনোভাব দেখে ক্ষুব্ধ বদরুদ্দিন উমর বলেছেন—"শত শত বছর ধরে একই দেশে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের পক্ষে সেই দেশ এবং তার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা বাঙ্গালী মুসলমান ছাড়া অন্য কেউ কখনো করেছে অথবা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে তার কোনও উদাহরণ নেই।...আমরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা এই সত্যকে যতদিন পর্যন্ত না যথার্থভাবে উপলব্ধি করব অর্থাৎ যতদিন না আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখব ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ হব না। মুসলমান বাঙ্গালীর জীবনে এই সাংস্কৃতিক সমস্যা সাম্প্রদায়িকতার সমসাময়িক। সাম্প্রদায়িকতা যখনই তীব্র আকার ধারণ করেছে, 'আমরা বাঙ্গালী না মুসলমান?' এ-প্রশ্ন তখনই আনুপাতিক প্রচণ্ডতার সাথে মাথা তুলে এই সাংস্কৃতিক সংকটকে করে তুলেছে দুরূহতর। এজন্যই সাম্প্রদায়িকতা যে পর্যন্ত আমাদের মানসলোকে রাজত্ব করবে সে পর্যন্ত আমরা এই সাংস্কৃতিক সংকটের হাত থেকে রেহাই পাব না।..."

"রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি" প্রবন্ধটিকে প্রথমটির পরিপূরক বলা যেতে পারে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের রবীন্দ্র-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনমতকে আত্মিক ও নৈতিক শক্তি জুগিয়েছেন যে-সব শিল্পী সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সাংবাদিক, বদরুদ্দিন উমর তাঁদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম। এই প্রবন্ধটির দু' একটি ছত্র পড়লেই বুঝতে পারা যাবে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে বদরুদ্দিন উমর তথা আজকের নব-আনন্দে জেগে-ওঠা পাকিস্তানী বাঙ্গালী সমাজের মনোভঙ্গিটি কি।

"...রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও ভারতীয় এই দুই কারণে তাঁকে নাকি বাতিল করা উচিত। কিন্তু মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, তক্ষশীলাকে এরা পাকিস্তানের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে সগৌরবে প্রচার করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাঁদের যত দুশ্চিন্তা ও আপত্তি পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।"

"...রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে ভারতীয়, কাজী নজরুল সে-অর্থেই রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক বেশি ভারতীয়। কারণ রবীন্দ্রনাথ পাকিস্তানের পূর্বেই দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম এবং তাঁর পরিবারের লোকজন সকলেই ভারতে এখনো দেহ ধারণ করে আছেন। নজরুল ইসলামকেও কি তাহলে বাতিল করা দরকার?..."

"রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হলেও তিনি নাকি হিন্দু। উপনিষদ ইত্যাদির প্রভাবে তাঁর মানসচরিত্র অনেকাংশে গঠিত, এই অর্থে ধরে নেওয়া গেল তিনি হিন্দু। কিন্তু তাঁকে বাতিল করলে রক্ষা পায় কে? মাইকেল খৃষ্টান হলেও ঐ একই কারণে হিন্দু। ঈশ্বরচন্দ্র নাস্তিক হলেও তাই। বঙ্কিম শরৎচন্দ্রের তো কথাই নেই। এ যুক্তিস্রোতের ফল দাঁড়ায় এই যে পূর্ব পাকিস্তানীদের ঈমান রক্ষার জন্য সব হিন্দু সাহিত্যিকদের

বাদ দেওয়া প্রয়োজন। এমন কি যে সমস্ত মুসলমান লেখক হিন্দু-ঘেঁষা তাঁদেরকেও সমানভাবে বাতিল করা দরকার।..."

বৈদগ্ধ্য ও মুক্ত বুদ্ধি, যুক্তি ও মানবিক চিন্তা, সংস্কৃতিপ্রাণতা ও সাহিত্যপ্রেম এবং স্বধর্মের প্রকৃত রূপ অন্বেষণ—সব দিক থেকেই তিনি ও তাঁর মতো পূর্ব পাকিস্তানী আরও অনেক বুদ্ধিজীবী (যেমন আবুল ফজল, আসাদ চৌধুরী, আহমদ শরীফ, শামসুর রহমান এবং আরও অনেক নাম।—তাছাড়া স্বনামধন্য ডঃ শহীদুল্লাহ্ এবং মহম্মদ আবদুল হাই—উভয়েই পরলোকগত—তো আছেনই) যেভাবে পূর্ববাংলার সমাজকে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বাঙ্গালী মুসলমানের স্বধর্ম মুসলমানত্বে নয়, বাঙ্গালীত্বে এ কথা আজ সেখানে প্রশ্নাতীত ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়—স্বধর্ম রক্ষায় তাঁরা তাই নিধনের ঝুঁকি নিতেও পিছ-পা হননি। ২১শে ফেব্রুয়ারিই তার দ্যোতক।

অরুণাভ সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৯

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ প্রসঙ্গে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৩-২-৭১ দেশ) অনেক তথ্যের অবতারণা করেছেন এজন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি নাম সম্ভবত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। যাঁর প্রসঙ্গে এণ্ডরুজ সাহেবের সপ্রশংস উল্লেখ আছে, তিনি হলেন সুশীলকুমার রুদ্র সেণ্ট স্টিফেনস্ কলেজের উপাধ্যক্ষ, (পরে অবশ্য অধ্যক্ষ) তাঁর সঙ্গে চিরদিনের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। এণ্ডরুজ সাহেব তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন।

"I owe to Susil Rudra what I owe to no one else in all the world."

আরো জানা যায় ভারতীয় চিন্তা ও চেতনার ধারা সম্বন্ধে এণ্ডরুজকে প্রথম প্রভাবিত করেন শ্রীরুদ্র।

রতন দাশগুপ্ত
রাঙামাটি, মেদিনীপুর

পঞ্চতন্ত্র

গত সংখ্যার (6th Feb., 1971) দেশ শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলী লিখিত পঞ্চতন্ত্রে দেখতে পেলাম তিনি সলমনের আপ্তবাক্য 'নো দাইসেলফ' উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত উক্তিটি সক্রেটিসের

(Gnothi Seauton, said Socrates: Know Thyself. Will Durant: Story of Philosophy)

সুপণ্ডিত ডঃ আলী ভুল করবেন এ কথা অবিশ্বাস্য। আমার মনে হয় সলমন এইরকম কোন কথা বলেছিলেন যেমন বলেছিলেন ভারতের প্রাচীন ঋষিরা 'আত্মানং বিদ্ধি'। রবীন্দ্রনাথের সেই বাউলও বলেছিল। 'মনের ভিতর মনের মানুষে কর অন্বেষণ।' এই সম্বন্ধে greatmen think alike প্রবাদটি স্মর্তব্য। যাইহোক সলমন সম্বন্ধে আমার দৌড় বাইবেল অবধি। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলে সুখী হবো।

সলিল দত্ত
ক্যালকাটা রিভিয়ু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দুই হৃদযন্ত্র ও এক ক্রীড়া যন্ত্রী

আপনাদের বহুলপ্রচারিত 'দেশে' রবীন্দ্রনাথ ঘোষের একই হৃদযন্ত্রের দুই ক্রীড়াযন্ত্রী প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ। লেখাটি মূল্যবান নিঃসন্দেহে।

আমি অ্যাথলেট নই, কোচও নই, নীরব দর্শক মাত্র, লেখক বাংলা দেশের যে একটি বিখ্যাত অ্যাথলেট কোচিং ক্যাম্পের অবস্থা তুলে ধরেছেন তা যে কোন বিদেশী অ্যাথলেটের চোখে রূপকথা।

সুতরাং বাংলা দেশের একটা নামকরা ক্যাম্পের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে অন্যান্য ছোটখাট উৎসাহী ক্যাম্পের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

কিছুদিন আগে এ রকম একটি ক্যাম্পে গেছিলাম। ছোট্ট মাঠ, ওখানে গোল করে দেড় শ' মিটার ট্র্যাক হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু পাশেই একটা প্রকাণ্ড ফুটবল খেলার মাঠ, চারিদিক ঘেরা, বহুদিন অব্যবহারের ফলে মাঠ হয়েছে উঁচু নীচু, আর ঘাস জন্মেছে প্রায় আধ মানুষ। ওই লোভনীয় মাঠের লোভ সংবরণ করেই আট দশটি ছেলে ওই ছোট্ট মাঠে প্র্যাকটিস করছে—লং জাম্প, হাই জাম্প, হার্ডল, রান ও আরও কয়েকটা ইভেনটের। অতটুকু জায়গায় যে কিভাবে অতগুলো ইভেন্ট এক সঙ্গে প্র্যাকটিস করছে তা আমার ভাবনার বাইরে, এখানেও কাঠি দিয়ে হার্ডল তৈরী করার পদ্ধতিটি চোখে পড়ল, তাছাড়া নানা রকম অভাব তাঁরা অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে পূরণ করেছেন।

এ দৃশ্য শুধু সুজিত সিংহের আর আমার দেখা কোচিং ক্যাম্পের নয়, বাংলার প্রতিটি অ্যাথলেটিক কোচিং ক্যাম্পের। সুতরাং এ অবস্থায় কোচেরা নিজেদের আশাকে জীবিত রেখে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ তাই এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় অ্যাথলেটদের কাছে রেকর্ড ভঙ্গের আশা যে কতটা দুরাশা তা বলাই বাহুল্য।

সুব্রত চট্টোপাধ্যায়
দাশনগর, হাওড়া

হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে

'হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে তোমাকে চিঠি, অরূপ' লিখতে গিয়ে শ্রীতরুণ দত্ত বর্তমান আধুনিক চিন্তাশক্তি সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর বক্তব্য বুদ্ধিহীনতার অবিশ্বাস্য সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতমূলক পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু বর্তমানে গলদ কোথায় সেটার উল্লেখ করতে গিয়েও শ্রীদত্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে বলেছেন যে, আদর্শের নামে বিপ্লবের নামে যখন প্রাণহানির একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী রাখা হয়, তখন মানুষের স্বভাবজাত পাশবিকতা বজায় থাকে।

শ্রী দত্ত উপেক্ষিত সমাজের বঞ্চিত, হতাশা বঞ্জনাময়, উপদ্রবের তৃতীয় পথের অনিবার্য প্রতীক হিসেবে অরূপকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই বলে যে জীবনের প্রতি ভালোবাসা অথবা মূল্যবোধ এখনকার সমাজের পক্ষে নিতান্তই অচল ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মোটের উপর তরুণবাবু তাত্ত্বিক হিসেবে বলতে চেয়েছেন যে হঠাৎ কোন গজিয়ে ওঠা বিপ্লবে বিশ্বাসী তরুণ গোষ্ঠী আমাদের সাধারণ নাগরিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনবে। কিন্তু মীমাংসার পথ তরুণবাবু দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আজকের এই অবস্থায় আমরা অসহায়। কেউ জোর গলায় বলতে পারি না যে, হিংসাকে ঘৃণা করুন হিংসুকদের ক্ষমা করুন। অথবা মহামতি টলস্টয়ের মতো বলতে পারি না যে, তুমি এই স্বতঃবিরোধিতার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পেয়ে অরূপকে ফেরাবার জন্য চিন্তা করবে? জ্ঞান বুদ্ধি না হারিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে আত্মরক্ষার্থে হিংসাত্মক বিপ্লব বন্ধ করার সুযোগ আনতে হবে।

শ্রীদীপ্তিকিরণ গুপ্ত
সোদপুর

ভ্রম সংশোধন

গত ২রা জানুয়ারী ১৯৭১ সালে 'দেশ' পত্রিকায় বাংলার লোক-সংস্কৃতি পর্যায়ে ৮৮২ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে আমার নাম ভুলক্রমে অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে অন্নপূর্ণা চক্রবর্তী ছাপানো হয়েছে। নামটি সংশোধন করে প্রকাশ করলে বাধিত হব।

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়
মেদিনীপুর

রবীন্দ্রনাথ থেকে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শোভন সোম ও মলয়শংকর দাশগুপ্তের উদ্যোগে মাঝে মাঝে পোস্ট কার্ডে সুসাহিত্য প্রচার করা হয়। উপলক্ষ, প্রখ্যাত কবিদের জন্মদিন পালন কিংবা কোনো কালজয়ী রচনার কথা পাঠকদের আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

এবারে তাঁরা যে সংখ্যাটি প্রকাশ করেছেন, তার উপলক্ষ নিশ্চিত সাম্প্রতিক হানাহানি ও রক্তপাত। এতে তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাটুকু তাঁর "জন্মদিন" কবিতার অংশ, এই বিভ্রান্তিকর আবহাওয়ায় বারবার পড়ার মতন। এখানে পুনরুদ্ধার করা যায় :

...ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার
দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড ঘের
ঘেরি
বীভৎস চিৎকারে তারা রাত্রিদিন করে
ফেরাফেরি
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে
উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি
বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায় ধনীর দৈন্যের
অত্যাচারে
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।...
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ়
অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে
শাশ্বত অধ্যায়।

বিষ্ণু দের কবিতাটিও বহু পরিচিত, নাম, "অন্ধকারে আর"। শেষ কয়েকটি লাইন পুনরায় স্মরণযোগ্য :

অসহ আলো আজ ঘৃণায়
দাঁষিত্র দিনে আর নেইকো রুচি
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবৎ ঘৃণায় স্তব্ধ
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ।

২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে

২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে পশ্চিম বাংলায় বেশ কয়েকটি পত্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা সম্প্রীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অজিত রায় যিনি অনলসভাবে প্রকাশ করেন **"এপার বাংলা ওপার বাংলা"** নামের পত্রিকা, এই সময়ে প্রকাশ করেছেন বিশেষ সংখ্যা ও নতুন গ্রন্থ। ঐ সমিতি থেকে প্রকাশিত ডঃ দুলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে "পূর্ব বাংলার লোক সংস্কৃতি" নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ। একটি মূল্যবান বই।

এ কথা আজকাল অনেকেই অনেক আমাদের জানা হয়ে গেছে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রবন্ধ রচনায় কাজে পূর্ব পাকিস্তানের লেখক ও ধীমান ব্যক্তিরা বিস্ময়কর অগ্রগতি দেখাচ্ছেন। এবং তাঁদের রচনায় যে কতটা মুক্ত মনের পরিচয় মেলে—দু সংখ্যা আগে বদরুদ্দীন ওমরের গ্রন্থ সম্পর্কে শংকরের লেখা থেকেই 'দেশ'-এর পাঠক তার অনেকটা পরিচয় পেয়েছেন।

লোক সংস্কৃতির ব্যাপারে পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের ঝোঁক অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বেশী। ডঃ দুলাল চৌধুরী ওঁদের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ—যা এখানে দুষ্প্রাপ্য—সংকলন করেছেন এই গ্রন্থে, তাঁর ভূমিকাটিও যথোপযুক্ত। এতে আছে ডক্টর মযহারুল ইসলাম-এর লেখা ফোকলোর ও লোকলোর; মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর লেখা লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি; মোহাম্মদ সাইদুর-এর লেখা লৌকিক চিত্রকলায় আলপনা; হাসান হাফিজুর রহমান-এর উত্তরবঙ্গের মেয়েলি গীত, রওশন ইজদানীর লেখা মোমেনশাহীর মুর্শিদী, মারফতী ও বাউল সাহিত্য এবং পাড়াগাঁয়ের শিলকী কিস্সা। ডঃ শহীদুল্লার ইংরেজী রচনা ট্রাডিশনাল কালচার ইন ইস্ট পাকিস্তান—এতে সংযোজিত হয়েছে।

তরুণ কবি অভিজিৎ ঘোষ 'কবিকণ্ঠ' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যাতে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার আধুনিক কবিদের কবিতা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। এতে এপার ও ওপার বাংলার প্রায় একশো জন কবির কবিতার স্বাদ পাওয়া যাবে।

ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, "এটাও একপ্রকার সেতুবন্ধন। তুলনা করতে যাঁরা চান তাঁদেরও এতে বেশ সুবিধে হবে। আমার ধারণা দুই স্রোতের মাঝখানে একটা অদৃশ্য সাদৃশ্য রয়েছে।" মুখবন্ধে বিমলচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, আমার বিশ্বাস দুই বাংলার কবিদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয়ের অন্তরালগুলিকে অতিক্রম করে দুই বাংলার কবিদের সাথে সংযোগের এই প্রচেষ্টা আগামী দিনে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষকেও বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

শশধর রায় সম্পাদিত **"অনন্তম"** পত্রিকার দীনবন্ধু এন্ড্রুজ স্মরণে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ দীনবন্ধু এনড্রুজ রচিত কয়েকটি কবিতার অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন, কৃত্তিধর, সোমেন্দ্রনাথ বসু, রণেন্দ্রনাথ দেব, অসিতকুমার ভট্টাচার্য ও শিশির দাস।

অমল মিত্র ও নরেশ মালাকার সম্পাদিত **'বিস্ময়'** একটি নতুন সাহিত্য পত্রিকা। বেশ কয়েকজন নতুন লেখকের রচনা রীতিমতন সার্থক মনে হয়।

সনাতন পাঠক

সমকালীন নিগ্রো লেখকদের মধ্যে রবার্ট ডীন ফার, ইতিমধ্যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সমালোচকদের। অথচ সাদা-কালোর সমস্যা নিয়ে আজ পর্যন্ত খুব কম গল্প উপন্যাস লেখা হয়নি। নিগ্রো সমাজের অনগ্রসরতা, তাদের দুঃখ-দুর্দশা—এ-সমস্যা শুধু সাহিত্যের কেন, আজকের পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্মেলনেরও একটি বহু আলোচিত প্রসঙ্গ। কিন্তু ডীন ফারের লেখায় এই সমস্যার কথা থাকলেও তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের উত্তাপ পাওয়া যায়।

বিশেষ করে 'উত্তাপ' কথাটাই হয়ত তার Book of Number উপন্যাসটি সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত। যেমন নতুন ভাবে এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ভঙ্গিতে তিনি এই জগৎকে দেখেছেন, তেমনি প্রচণ্ড এক স্পর্ধার সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রায় পাঁচশ পাতার এই দীর্ঘ উপন্যাসটির মধ্যে কোথাও নিগ্রোদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রচলিত কোন ক্ষোভ বা বিলাপ তাঁর হাতে প্রশ্রয় পায়নি। অভিশপ্ত এক জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তাঁর চরিত্রগুলো হা হুতাশ করে কেউ সহানুভূতিও কাড়াতে চায় না কারো। বরং তারা চিৎকার করে বলে—এটা কোন সমস্যাই নয়। শুধু গায়ের রঙ দেখে আলাদা একদল মানুষকে বানিয়ে তোলা হয়েছে, এটা মিথ্যে, মেকী সমস্যা। অনাচার এবং অপমানকর কিছু করুণা বিতরণ করে বহু-দিন ধরে তলে তলে চেষ্টা চলেছে তাদের আত্ম-প্রত্যয় বা আত্মমর্যাদার শেষ অস্তিত্ব-টুকুও নিঃশেষ করে দেবার। এটা আসলে একটা তৈরি করা সমস্যা। একটা হীন চক্রান্তকে জীইয়ে রাখবার একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র :

The Negro is a political entity. Nothing more.

একদিকে যেমন শোনা যায় দ্বিধাহীন এবং দুঃসাহসিক এই উচ্চারণ অন্যদিকে ভিন্ন এক চরিত্রের মুখে প্রায় একই সঙ্গে ঝলসে ওঠে এই অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড ব্যঙ্গের জ্বালা—A race of dogs can be breed—তাই বলে কি পছন্দমত এক জাত মানুষকেও তৈরি করা যায় নাকি? মানুষ নিশ্চয়ই কুকুরের চেয়েও নিম্নতর কোন স্তন্যপায়ীর শ্রেণীভুক্ত নয়।

সন্দেহ নেই, বড় নির্মম, বড় কঠিন এই আত্মধিক্কার। হয়ত, স্বয়ং এই বিড়ম্বনার অংশীদার হওয়ার জন্যে ফারের পক্ষে এমন নগ্ন বিদ্রুপ সম্ভব হয়েছে। এবং খুব কাছে থেকে দেখেছেন বলে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ঘৃণা-বিদ্বেষ দ্বিধা-দুর্বলতা তাঁর দৃষ্টিতে এত স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। সে দেখা অবশ্যই, কোন রঙীন কল্পনার ফানুস উড়িয়ে নয়; এক ঋজু নৈর্ব্যক্তিকতার অধিকারে বাইরের মুখোশটা খুলে যেন ভেতরের মানুষটাকেই দেখতে চেয়েছেন ফার। কলেজে পড়া বিজ্ঞানের ছাত্রী কেলি সিমস তার চার পাশে ঘনিয়ে ওঠা স্বপ্নের কুয়াশাকে ছিঁড়ে ফেলে তাই কী সহজে ব্যঙ্গ করতে পারে—
The day a Negro successfully robs a bank instead of a chiken coop we can honestly claim to be emancipated.

চরিত্রই হয়ত এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ঘটনাবহুল, নাটকীয় এই উপন্যাস,

---
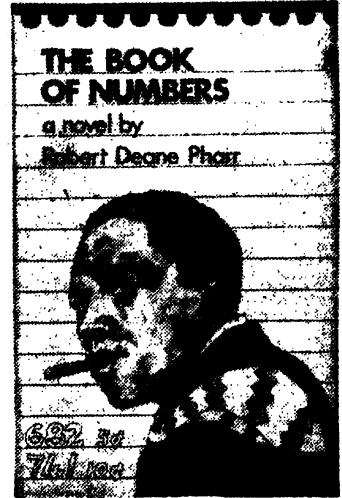
The Book of Numbers. Robert Deane Pharr. Calder E. Boyars London, 1970. 50s.

জোরালো চরিত্রের টানেই তরতর করে এগিয়ে গেছে।

নিগ্রো যুবক ডেভ গ্রীন শহরে এসে গড়ে তুলেছে একটি জুয়ার আড্ডা। তার সমস্ত অর্থ ও উদ্যম সে এর পেছনে ব্যয় করেছে। একজন পয়লা নম্বর গ্যাম্বলার হিসেবেও অন্তত সে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। ব্লু-বয় হ্যারিস, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া মানুষ—ডেভের সে বন্ধু, সহকর্মী। এই দুজনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে একটি বিরাট গ্যাম্বলিং প্রতিষ্ঠান, একটি নিগ্রো জগৎ। যেখানে

THE BOOK OF NUMBERS
a novel by
Robert Deane Phair

গ্রন্থ প্রচ্ছদ

এসে জুটেছে হোটেলের বয়, কলেজের ছেলে-মেয়ে, উকিল-শিক্ষক-ধর্মযাজক, দোকানদার-দেহপসারিণী এবং ভেসী স্ট্রীটের ছেলে-বন্ধু শিকারী মেয়ের দল। চোর, বাটপাড় এবং সঙ্গে পুলিসের দলও আসতে বাকি থাকেনি। সব মিলিয়ে একটা নিগ্রো অনুভূতি, কাঁচা পয়সার লেনদেন আর প্রচণ্ড হুল্লোড়ে চারদিক গমগম করে। ডলার, ড্রিংকস আর ফুর্তির প্লাবন বয়ে যায় রাতের পর রাত।

লক্ষণীয়, কাম-প্রেম, খুন-জখম, বিজয় ও ব্যর্থতার জ্বালাভরা উত্তেজক ঘটনাগুলো যথারীতি এই সুড়ঙ্গ জগতের মানুষ-গুলোকে ঘিরে ঘটতে থাকে। অর্থাৎ উপন্যাসে খাঁটি উত্তেজনার খোরাক বলতে যা বোঝায় তার কোন উপাদানেরই এখানে অভাব নেই।

কাহিনীর উগ্র মেজাজ, একটা প্রায় চিৎকারের ভাষায় তীব্র হতে হতে অতি নাটকীয়তায়ও পৌঁছে গেছে কোথাও কোথাও। কিন্তু তবুও ঘটনার এই অসংখ্য ঘূর্ণি চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। অনেক ঝড়ঝাপটার মাধ্যেও মানুষগুলোকে বিশ্বস্ত ও জীবন্ত করে রেখেছেন ফার। বিশেষত ডেভ, ব্রু-বয়, কেলি, কোকে, ডেলাইলার মত আশ্চর্য কয়েকটি নারী ও পুরুষের স্মৃতি বহুদিন মনে রাখবার মতো।

উপন্যাসটির তেজী ভাষাভঙ্গিও উল্লেখ করার যোগ্য। ঠাট্টা, পরিহাস ও শ্লেষে মোড়া ধারালো মন্তব্যের ব্যবহার ফারেব চরিত্রগুলোকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মতই শাণিত করে তোলে। যেমন ব্রু-বয়ের একটা মন্তব্য : 'মাতাল শান্তিতে পান করবার জন্য বরং তার বউকে জানলা দিয়ে ফেলে মদের বোতলটা টেনে নেবে। কিন্তু কস্মিন-কালেও কোন খাঁটি মাতাল তার বোতলটা জানলা দিয়ে ফেলে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরবে না। অথবা একটি উপমায় : It was a white folks smile, the kind they used to butter you up with just before they asked you for something for nothing.

এই তির্যক দৃষ্টির পাশাপাশি আবার প্রেম ভালবাসার কোমল আবেগেও বেশ গভীরতার স্বাদ পাওয়া যায়। কেলি-ডেভের প্রেমের অধ্যায় শারীরিক উন্মত্ততার গণ্ডী পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যেন এক গভীর ট্র্যাজিক দুঃখের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে। ডেভের জীবন থেকে কেলির শেষ বিদায়ের মুহূর্তটি যেন এক গভীর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

কেলি বিদায়, ব্রু-বয়ের মৃত্যু, ডেভকে পাগল করে দেয়। কিশোরী ডেলাইলা অকুণ্ঠ সেবা বা তার অসামান্য শরীরের আকর্ষণ দিয়েও তাকে আর প্রকৃতিস্থ রাখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ডেভ এবং তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয় ডেলাইলা। সহকর্মী তরুণ বন্ধু কোকে-কে পাঠায় আইন পাশ করে আসতে। তারপর বসে বসে স্বপ্ন দেখে : ডেভ আবার ভাল হয়ে গেছে! কোকে ল-ইয়ার হয়ে ফিরে এসেছে। Number Bank আগের মত জমজমাট। গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু চরিত্রকে স্বপ্নের হাতে তুলে দিয়ে ফার বিদায় নিতে নারাজ। একটি অদ্ভুত স্বগতোক্তির ভাষায় পাঠকদের তিনি তাঁর চরিত্রের নিয়তিকেও দর্শন করিয়ে দিতে চান। ভবিষ্যতের অন্ধকারে ও ই তিনি দেখতে পান : কোকে আইনজ্ঞের বদলে পাইলট হয়ে প্লেন ক্র্যাশ করছে। ইনকাম ট্যাক্স-এর আসামী ডেভ কয়েদখানায় তার দিন কাটাচ্ছে। এই দুঃখের দিনে বিমূঢ় ডেলাইলা একা তার পথে দাঁড়িয়ে।

বিভূতি রায়

উপন্যাস

রিপু। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। চতুষ্পর্ণী প্রকাশনী, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

প্রকাশকের নিবেদনে জানা যাচ্ছে, এটি লেখকের ট্রিলজির দু নম্বর উপন্যাস এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। এখানে বিশেষ নায়ক কেউ নেই; নায়ক সমকাল। সার্ত্র-র 'এজ অফ রিজন'-ও তিন খণ্ডের উপন্যাস এবং সেখানেও নায়ক করা হয়েছে সময়কে। 'রিপু'তে সার্ত্র-র নাম ঘন ঘন পাওয়া গেছে। যদিও প্রকাশক জানিয়েছেন 'এজ অফ রিজন' পড়ার আগেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'রাত্রি' লেখেন। বাংলা উপন্যাসে যে আজও শরৎচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি, প্রকাশকের এই মন্তব্য প্রমাণাভাবে স্বীকার করা যাবে না। গদ্যে ও পদ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য অবশ্যই মননশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রতি আগ্রহ এ-বইতেও সমান পরিস্ফুট। গল্প নামমাত্র; উপন্যাস এগিয়েছে বহুরকম চিন্তা-ধারণা ও চরিত্র-রচনার মধ্য দিয়ে। আসলে সময়ও নয়, লেখকই নায়ক হয়ে আছেন তাঁর লেখায়। মননের শিল্পী যাঁরা হয়তো সেটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তাতে লেখককে যতখানি চেনা যায়, তাঁর সৃষ্ট—চরিত্রগুলিকে চিন্তার কুয়াশা সরিয়ে আলাদা করে তত চেনা যায় না। তাদের মানুষ হয়ে ওঠার পক্ষে প্রবল বাধা লেখকের প্রবল ব্যক্তিত্ব। সংবাদ, সাহিত্য ইতিহাস, ভূগোল সবই লেখকের সংগ্রহের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সেগুলি সবই তিনি সাজিয়েছেন নিজের বুদ্ধি ও রুচির মাপে। ফলে, সময়ের হিসেব-নিকেশ সম্বন্ধে নির্ভুল হওয়া যায় না। তিনি কবি সুতরাং শব্দ ও বাক্যের প্রয়োগে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও সংযম তাঁর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত নয়। দুঃখের বিষয় বহুক্ষেত্রে তাঁর অনুপ্রাস ইত্যাদি বিরক্তিকর তারল্যে পৌঁছেছে।

৩৫২।৬৯

কবিতা

ঈশ্বরের মৃত্যু। সুব্রত রুদ্র। পুনশ্চ প্রকাশ, [illegible] পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা-২৯। তিন টাকা।

একটি শিশির বিন্দু। সত্যব্রত রায়। কণ্ঠস্বর, ৯৩/২এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৪। তিন টাকা।

তরুণতম কবিকুলের ভেতর সুব্রত রুদ্র এবং সত্যব্রত রায়,—নাম দুটি সাধারণভাবে পাঠক সমাজে তত পরিচিত নয়। তবে, কবিতা রচনার ব্যাপারে এরা দুজনেই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

তুলনামূলক বিচারে সুব্রত রুদ্র অনেক দুঃসাহসী। কাব্যকলার রীতি প্রকৃতি বিষয়ে তিনি আধুনিক কবিতার প্রচল ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলতে সদাসচেষ্ট। কবিতার বিষয় থেকে প্রযত্ন পর্যন্ত সব ব্যাপারেই তার প্রাক্তন অস্বীকৃত এবং বিদ্রোহ স্পষ্টলক্ষ্য। কিন্তু সুখের কথা, এই বিদ্রোহ যথেচ্ছাচার নয়, নতুন জিজ্ঞাসা। ফলত, শ্রী রুদ্রের কবিতা পাঠমাত্রেই রসিকজন বিচলিত বোধ করেন। কবিতাকে তিনি কখনই বিষয়ে ভারাক্রান্ত করতে চান না। কিংবা বক্তব্যকে পেলব, নমনীয় ও বাষ্পাচ্ছন্ন করে জনচিত্তজয়ী করতে প্রলুব্ধ হন না। অনুভূতি—ক্রমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং তীর্যক তীক্ষ্ণ করে বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংলগ্ন করে চিত্রকল্পময় করে তোলেন।

বিজ্ঞপ্তি

দেশ (সাপ্তাহিক)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেণ্ট্রাল) রুলস-এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশস্থান:
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

২। প্রকাশকাল: সাপ্তাহিক

৩। মুদ্রাকরের নাম:
শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
(ভারতীয় নাগরিক কিনা?):
হাঁ, ভারতীয়
(বিদেশী হইলে কোন দেশের নাগরিক): × × ×
ঠিকানা: ১, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

৪। প্রকাশকের নাম:
শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
(ভারতীয় নাগরিক কিনা?):
হাঁ, ভারতীয়
(বিদেশী হইলে কোন দেশের নাগরিক): × × ×
ঠিকানা: ১, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

৫। সম্পাদকের নাম:
শ্রীঅশোককুমার সরকার
(ভারতীয় নাগরিক কিনা?):
হাঁ, ভারতীয়
(বিদেশী হইলে কোন দেশের নাগরিক): × × ×
ঠিকানা: ২০, মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

৬। শতকরা এক ভাগ বা তাহার বেশী অংশের মালিকগণ:
১। শ্রীঅশোককুমার সরকার
২। শ্রীযুক্তা অলকা সরকার
৩। শ্রীঅভীককুমার সরকার
৪। শ্রীঅরূপকুমার সরকার
৫। শ্রীপ্রদীপকুমার সরকার
ঠিকানা: ২০, মদনমোহনতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

আমি, শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপযুক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর:
প্রকাশক—শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
তারিখ ১-৩-৭১

টুকরো টুকরো ছবি এবং চিত্রকল্প সমগ্র কাব্যশরীরকে দ্রুত গতিময় করে তোলে। তবে, কাব্য ভাবনার দিক থেকে তিনি কবিতাকে অতিরিক্ত বুদ্ধি-আশ্রয়ী করে তোলায় পাঠক যতটা সচকিত হন ততটা আপ্লুত হন না। প্রসংগত তাঁর কাব্যগ্রন্থের দু একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে,—'...দুঃখ তো কিছু নেই,/সুখের নামতা ভুললেই/নীলের পাশে বসে শত-ভিক্ষাই', 'মেয়েটির নাম ভালবাসা/ব্রণ, ঘামাচি, ব্রীড়া/মনে মনে হাজার মনে/কুঁকড়ে দিল তাকে'।

সত্যব্রত রায় ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা প্রকৃতির মতই আলো জল হাওয়ার দাক্ষিণ্যে সজল-স্নিগ্ধ। অনুভূতি-সার শ্রী রায়ের প্রতি কবিতাই যেন রূপবন্ধ হৃদয়ের বিচিত্র সংলাপ। কবিতাকে শেষ পর্যন্ত একটা বিশেষ প্রত্যয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কবির অন্বিষ্ট। জীবনের বেদনা, বৈফল্য, গ্লানি, হতাশা সবকিছুকে মন্থন করে হৃদয়ের নিবিড় সারাৎসারে নিজেকে উজ্জীবিত করে তুলতে কবি অক্লান্ত। ফলত, তাঁর কবিতা অনুভব ও অভিজ্ঞতায় বিচিত্রবর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনের রসরূপে নিবেদিত প্রাণ আত্মসমাহিত কবি স্বগত ভাষণের ভংগীতে যা উচ্চারণ করেন তা-ই কবিতা হয়ে ওঠে। যে কারণে, শ্রীরায়ের কবিতায় প্রতিশ্রুতি এবং প্রত্যাশা সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। শব্দবিন্যাস, চিত্রকল্পের সাংকেতিকতা এবং অনুভূতির ঐকান্তিকতায় তাঁর রচনা হৃদ্য হয়ে ওঠে। যেমন, 'আমার শব্দ তোমার সত্তার পাড়ে/কেবল মাথা কুটছে/একটা কবিতা হয়ে ওঠার জন্য', কিংবা—'যুগে যুগে আসে প্রেম তোমার আমার ছায়া বয়ে/তবু তা অতৃপ্ত রয়—বসন্ত বাতাস গেল কয়ে'।

প্রাপ্ত স্বীকার

সঞ্চীতাঞ্জলি (২য় খণ্ড)। নজরুল ইসলাম। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা-১৩। মূল্য ৫·০০।

জীবন সঙ্গিনী। সংঘগুরু শ্রীমতিলাল। প্রবর্তক পাবলিশার্স : ৬১ বিপিনবিহারী গাংগুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১০·০০।

সূর্যস্নাত। অংশুমান। বিনয়েন্দ্র চক্রবর্তী : ২৭ই মহীন্দ্র রায় লেন, কলিকাতা-৪৬। মূল্য ২·০০।

বাঙলার বিদ্যাসাগর। গোপালচন্দ্র মিশ্র। বিদ্যাসাগর সার্ধ-শতবার্ষিকী সাহিত্য-সংসদ : দলপতিপুর মিশ্র ভবন, পোঃ খড়ার, মেদিনীপুর। মূল্য ২·০০।

হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী। লেখক সমবায় সমিতি : ৭০বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৮·০০।

নচিকেতা ও হৈমবতী উমা। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। বিবেকানন্দ সঙ্গীত সঙ্ঘ : পোঃ সোনারপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য ০·৭৫

কবিকণ্ঠ/এপার বাংলা ওপার বাংলা। সম্পাদনা : অভিজিৎ ঘোষ। ২১/১ গড়িয়াহাট রোড (পশ্চিম), কলিকাতা-৩১। মূল্য ৪·০০।

কুমারী রাণী এলিজাবেথ। সুকেনা। করুণা প্রকাশনী : ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৭·০০।

চলচ্চিত্র
কখনো কখনো আপনার মনেও
নিশ্চয় জেগেছে ছবি করার বাসনা।
ছবির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে
চেয়েছেন প্রযোজক কিংবা পরিচালক
অথবা ক্যামেরাম্যান, এডিটার বা
অন্য কিছু হিসেবে। অথচ আপনার
জানা নেই কীভাবে ছবি হয়,
একটা ছবি করতে খরচ কত,
কীভাবে ছবি ওঠে ক্যামেরায়,
ছবি কথা বলে এবং গান গায়,
টুকরো টুকরো শট জুড়ে কীভাবে
গড়া হয় একটা গোটা ছবি।
এই বিরাট সৃষ্টির জগতের যাবতীয়
খুঁটিনাটি খবর এবার সরবরাহ
করা হচ্ছে দোল সংখ্যা আনন্দবাজার
পত্রিকার বিশেষ চলচ্চিত্র বিভাগে।
লিখছেন
দীনেন গুপ্ত/লোকেন বসু/ইন্দর সেন
ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়/দুলাল দত্ত/নানা বসু
সোনালী গুপ্ত/রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী
শৈলেশ মুখোপাধ্যায়/সূর্য দাশ
ওয়াকিবহাল প্রভৃতি।
বার্ষিক (দোল) সংখ্যা
আনন্দবাজার পত্রিকা
তিন টাকা

পায়ে দিয়ে অবাধ আরাম ..
দু রঙের অভিনব সমাবেশ
স্যানডাক পাপিয়া হালফিল ধরনের স্যান্ডাল। ভিন্ন দুই রঙ আর অভিনব গঠন বিন্যাস — সব মিলিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর। বাটার রসায়নী সংমিশ্রণ কেমিলনে তৈরি স্যানডাক জুতো যতোই পরুন, দেখাবে কেনার প্রথম দিনের মতোই ঝলমলে। পরিষ্কার রাখতেও ঝামেলা নেই। ভেজা কাপড়ে মুছে নিলেই নিমেষে নতুন।
স্যানডাক* পাপিয়া
কেমিলন*
সাইজ ২-৬
১০.৯৫

যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে টেস্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নজির কম নয় তবু ওদের বিরুদ্ধে কোনো টেস্টে জয়লাভের অক্ষমতায় এবং ১৯৬১-৬২ সালের সফরে পাঁচটি টেস্টেই ভারতের পরাজয়ের ফলে ওদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের কাছে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা মোটেই উঁচু ছিল না। কিন্তু কিংসটনের সাবিনা পার্কে সদ্য সমাপ্ত প্রথম টেস্টে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ভূমিকা ওদের মাথাব্যাথার কারণ হয়েছে। ভারত জয়ের সম্ভাবনার মধ্যে এসেও জয়লাভ করতে পারেনি। তবু ওয়েস্ট ইন্ডিজকে যে ভারত সর্বপ্রথম 'ফলো-অন' করাতে পেরেছে সেটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে বলা যায় এ টেস্টে ভারতের খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগত রান এবং জুটির রানে কিছু কিছু নতুন নজিরও সৃষ্টি করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সর্বপ্রথম ফলো-অন করানোর কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়, দিলীপ সারদেশাইয়ের ডাবল সেঞ্চুরিও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। ১৯৬১-৬২ সালে পোর্ট অব স্পেনের চতুর্থ টেস্টে পলি উমরিগরের নট আউট ১৭২ রানই ছিল এতদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত বড় রান। দিলীপ সারদেশাই সাবিনা পার্কের প্রথম টেস্টে করেছেন ২১২ রান। তৃতীয়, দিলীপ সারদেশাই ও একনাথ সোলকারের জুটিতে ১৩৭ রান এবং সারদেশাই ও প্রসন্নর জুটিতে ১২২ রান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড।

দিলীপ সারদেশাই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, প্রথম টেস্টের ২১২ রান নিয়ে ২২টি টেস্টে তিনি করেছেন ১৪০১ রান। এর মধ্যে একটি সেঞ্চুরি ও দুটি ডাবল সেঞ্চুরি রয়েছে। টেস্ট খেলায় ডাবল সেঞ্চুরির অধিকারীদের ভারতীয় খেলোয়াড়ের নাম বেশী নেই। মাত্র ৪টি নামের পাশে ৬টি ডাবল সেঞ্চুরি। ভিনু মানকড় ও সারদেশাইয়ের নামের পাশে দুটি করে, আর উমরিগর ও পাতৌদির নবাব মনসুর আলীর নামের পাশে একটি করে।

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের ব্যাটের বীর দিলীপ সারদেশাই

কিংসটনের প্রথম টেস্টের গতি দেখে এক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, 'ভারতের জয়ের সম্ভাবনা ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ফলো-অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছে তাতে সময় পেলে তারাও হয়তো জিততে পারত।' অস্বীকার করি না। সত্যিই পরাজয়ের মুখে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসে কানাই-সোবার্স-লয়েড যে দৃঢ়তায় ব্যাটিং করেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। তবুও সব মিলিয়ে এবারের সফরে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ধারণা বদলে গিয়েছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন ভারতীয় স্পিন বোলিং যেমন শক্তিশালী এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাস্ট বোলিং যেমন ধারহীন তাতে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অজেয় সম্মান এবার ক্ষুণ্ণ হলেও হতে পারে।

প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যাক। বৃষ্টির জন্য পাঁচদিনের টেস্ট ৪ দিনের টেস্টে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন আদৌ খেলা হয়নি।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ খেলা আরম্ভের প্রথম দিন বৃষ্টিভেজা মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক সোবার্স টসে জিতেও ভারতকে প্রথম ব্যাটিং করতে দেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিক থেকে ফল খুবই ভাল হয়। মাত্র ৭৫ রানের মধ্যে ভারতের পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। আবিদ আলী, জয়ন্তীলাল, অধিনায়ক ওয়াদেকর, দুরানী ও জয়সীমা আউট হয়ে যান। এই অবস্থায় ১০০ রানের মধ্যে ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে যাবে বলে অনেকের ধারণা হয়। কিন্তু দিনের শেষে দেখা যায় সারদেশাই ও সোলকারের অনমনীয় দৃঢ়তায় আর কোন উইকেট পড়েনি, ৫ উইকেটেই ১৮১ রান উঠেছে। সারদেশাই ৮১ ও সোলকার ৫০ রান করে নট আউট আছেন।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ খেলার দ্বিতীয় দিন ভারতের প্রথম ইনিংস ৩৮৭ রানে শেষ হবার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোন উইকেট না হারিয়ে তুলেছে ৩৬ রান। ভারতের সারদেশাই দীর্ঘ ৪১৭ মিনিট ব্যাটিং করে ১৭টি বাউণ্ডারী ও ১টি ওভার বাউণ্ডারী সহযোগে ২১২ রান করে বীরের সম্মান পেয়েছেন।

কে বলে অবলা? নিশ্চয়ই সবলা, স্ববলাও বলা যেতে পারে। পশ্চিম জার্মানীতে মেয়েদের মধ্যেও ফুটবল এখন জনপ্রিয় খেলা। 'কিক দি বল' ক্লাবের সদস্য এখন হাজারেরও উপরে। ইতিমধ্যে ওদেশে মহিলাদের ফুটবল লীগ আরম্ভ হয়ে গেছে

ওই অবস্থায় খেলার ফলাফল ড্র হবে বলেই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন ২১৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ফলো অনে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২ রানের মধ্যে দুটি উইকেট হারাল তখন ভারতের জয়ের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশ্য চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২ উইকেটে ৭২ রান তুলেছিল। তবু ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল ৯৮ রান, হাতে ছিল ৮টি উইকেট।

প্রশ্ন উঠল, ভারতের প্রসন্ন-বেঙ্কট-রাঘবন-বেদী কোম্পানীর স্পিন-কুটিল বলে প্রথম ইনিংসে যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ ৫টি উইকেট পড়েছে মাত্র ১৫ রানে সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কি শেষ দিন পরাজয় এড়াতে পারবে?

অবশ্য ভারতের জয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা কিছুটা মলিন হয়ে গিয়েছিল ভারতের সবচেয়ে কৃতী স্পিন বোলার প্রসন্নর পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরায়। চতুর্থ দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে এক ওভার বোলিং করেই পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরায় প্রসন্ন মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শেষ দিন অবশ্য প্রসন্ন বোলিং করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নয়। তাছাড়া খেলার পিচও স্পিন বোলিংয়ের প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে কানহাই, সোবার্স ও লয়েডের মুখে ছিল ম্যাচ বাঁচানোর কঠিন প্রতিজ্ঞা। ফলে শেষদিন ওদের ব্যাটের বিক্রমে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে থাকে। ৫৭ রানের মাথায় ক্লাইভ লয়েড রান আউট হয়ে গেলেও ভারতের খেলোয়াড়দের সামনে হিমালয়ের মত বাধা হয়ে দাঁড়ান কানহাই ও সোবার্স। মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওঠে ৩ উইকেটে ১৯২ রান; খেলা শেষ হবার সময় ৫ উইকেটে ৩৮৫। এর মধ্যে সোবার্সের ৯৩ নিঃসন্দেহে অধিনায়কোচিত ইনিংস, কানহাইয়ের নট আউট ১৫৮ জীবনের এক স্মরণীয় খেলা।

রোহন কানহাইয়ের কিছু কিছু ভাল ইনিংস আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে ইডেনে দেখেছি তাঁর চমক লাগানো ২৫৬ রানের ইনিংস। কিন্তু বিপদত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সাবিনা পার্কে তিনি ক্রিকেট প্রজ্ঞা ও নিখুঁত ব্যাটিংয়ের যে পরিচয় দিয়েছেন ক্রিকেট ক্রীড়ামোদিরা সহজে তা ভুলতে পারবেন না। ১৪০ রানের মধ্যে একবারও তিনি স্ট্রোক করেননি। একটি বলও মাটির উপরে তোলেননি। বিপদ কেটে যাবার পর ১৪২ রানের মাথায় অবশ্য একটি স্টাম্পিং চান্স দিয়েছিলেন। আর দেড়শো রান পার হবার পর একটি বল তুলে মেরেছিলেন। তাও যেখানে ফিল্ডসম্যান ছিলেন না সেই যায়গা দিয়ে। তাই সাবিনা পার্কের প্রথম টেস্টকে সারদেশাই ও কানহাইয়ের টেস্ট বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৬ মার্চ থেকে ত্রিনিদাদের কুইন্স পার্কে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট আরম্ভ হচ্ছে। ক্রিকেট ক্রীড়ানুরাগীরা আগ্রহ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে ওই খেলার দিকে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দুটি খেলায় বিজয়ী হয়েছে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে একদিনব্যাপী খেলায় ১০১ রানে এবং লীওয়ার্ড আইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনদিনব্যাপী খেলায় ৯ উইকেটে। কোনো খেলাতেই হার স্বীকার করেনি।

প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর।

ভারত—প্রথম ইনিংস—৩৮৭ (দিলীপ সারদেশাই ২১২, একনাথ সোলকার ৬১, এরাপল্লী প্রসন্ন ২৫; ভি হোল্ডার ৬০ রানে রানে ৪ উইকেট, সোবার্স ৫৭ রানে ২ উইকেট, শিলিংফোর্ড ৭০ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—২১৭ (রোহন কানহাই ৫৬, ফ্রেডারিক ৪৫, সোবার্স ৪৪, কামাচো ৩৫; প্রসন্ন ৬৫ রানে ৪ উইকেট, বেঙ্কটরাঘবন ৪৬ রানে ৩ উইকেট, বেদী ৬৩ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইকেটে ৩৮৫ (রোহন কানহাই নট আউট ১৫৮, সোবার্স ৯৩, লয়েড ৫৭, ফিণ্ডলে নট আউট ৩০; সোলকার ৫৬ রানে ২ উইকেট)

(খেলা অমীমাংসিত)

একলব্য

হকি খেলার গোড়ার কথা

হকি খেলা দুই রকমের—ফিল্ড হকি আর আইস হকি। মাঠের ঘাসের উপর যে হকি খেলা হয় তাকে বলা হয় ফিল্ড হকি, বরফের উপর হকি খেলাকে বলা হয় আইস হকি।

যদিও ফিল্ড হকির উপকরণের সংগে এবং নিয়মকানুনের সংগে আইস হকির উপকরণ এবং নিয়মকানুনের অনেক পার্থক্য তবু ফিল্ড হকি থেকেই আইস হকির প্রসার এবং পরিমার্জন।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব স্পোর্টসের মতে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আইস হকি আরম্ভ হয়েছে। আবার এনসাইক্লোপিডিয়া অব স্পোর্টস বলছে আইস হকির প্রসারের মূলে ফিল্ড হকি। আইস হকির সূচনা কানাডায়। মন্ট্রিল শহরই ছিল প্রধান কেন্দ্র। রয়াল ক্যানাডিয়ান রাইফেলস বাহিনীর কিছু ইংরেজ অফিসার ১৮৬০ সালে অন্টারিওর কিংসটন বন্দরে আইস হকি খেলেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু মন্ট্রিলের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডবলিউ এফ রবার্টসন ১৮৭৯ সনে ইংলণ্ডে বেড়াতে এসে ফিল্ড হকি খেলা দেখে সেই খেলার নিয়মকানুনের সংগে অনেকটা সামঞ্জস্য রেখেই আধুনিক আইস হকির নিয়মকানুন তৈরী করেন। পরে অবশ্য আইস হকির নিয়মকানুনের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু ফিল্ড হকিই যে আইস হকির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ফিল্ড হকির কথায় আবার ফিরে আসা যাক। যেহেতু আমাদের দেশে আইস হকির প্রচলন নেই সেহেতু ফিল্ড হকিকেই আমরা হকি খেলা বলে থাকি।

আঠারো শতকের শুরু থেকে ইংলণ্ডের কোন কোন ক্লাব হকি খেলতে আরম্ভ করে। যদিও ক্লাবের সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং খেলার নিয়মকানুনেরও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। হকি খেলার বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পরূপদানের ক্ষেত্রে যে ক্লাবের অবদান সব চেয়ে বেশী সে ক্লাবটির নাম 'ব্ল্যাকহিথ' ক্লাব। ১৮৪০ সনে ক্লাবটির সৃষ্টি। ক্লাবটি ছিল হকি, ফুটবল এবং রাগবী খেলার মিশ্র ক্লাব। হকি খেলা যখন কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করল তখন এই ব্লাকহিথ ক্লাব শুধু হকির জন্যই পৃথক একটি বিভাগ করে হকির সর্বজনগ্রাহ্য আইনকানুন তৈরির দিকে নজর দিল। এতকাল এক এক সময়ে এক এক নিয়মে এবং এক এক জায়গায় এক এক নিয়মে খেলা হয়ে আসছিল। ১৮৬২ সনে ব্ল্যাকহিথ ক্লাব নিয়ম করল, দুই গোল-পোস্টের মধ্যে পার্থক্য থাকবে ১০ গজ এবং এক গোল থেকে আর এক গোলের দূরত্ব থাকবে ২০০ গজ। কোন খেলোয়াড় বল ছাড়া গোলের ৪০ গজের মধ্যে থাকতে পারবে না। মাঠের যে কোন জায়গা থেকে হিট করে গোল করা যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আঁকা হকি খেলার উপরের এই ফরাসী চিত্র দেখে মনে নেওয়া যেতে পারে অতি প্রাচীনকালে ফ্রান্সেও হকি খেলার প্রচলন ছিল

হকি খেলার প্রথম দিকে দলের কাঠামোও ছিল অদ্ভুত ধরনের। ১১ জন খেলোয়াড় নিয়েই দল গড়া হত। কিন্তু ৮ জন খেলত ফরোয়ার্ডে, ১ জন গোলে আর ২ জন হাফব্যাকে। প্রতিনিয়ত কায়িক সংঘর্ষ এবং হিট ও রান পদ্ধতি ছিল খেলার বৈশিষ্ট্য।

১৮৮৩ সনে লণ্ডনের উইম্বলডন হকি ক্লাব খেলার নিয়মকানুনের কিছু সংশোধন করেন। ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক খেলা হয় ইংলণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে। খেলাটিতে ইংলণ্ড ৫—০ গোলে বিজয়ী হয়। এই সময় আয়ারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের মহিলাদের মধ্যেও হকি খেলা শুরু হয়। ১৮৯৬ সনে মহিলাদের প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় আয়ারল্যাণ্ড ২—০ গোলে পরাজিত করে ইংলণ্ডকে।

সাংগঠনিক পরিবেশে আধুনিক হকি খেলার সূচনা ১৮৮৬ সন থেকে। ওই বছর তখনকার প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ডকে সভাপতি করে একশোরও বেশী ক্লাবকে নিয়ে ব্রিটিশ হকি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯০০ সনে ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও ওয়েলসকে নিয়ে গঠিত হয় ইণ্টারন্যাশনাল হকি বোর্ড। দুই বছর পরে স্কটল্যাণ্ডও এই বোর্ডের সদস্য হয়। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই 'হকি বোর্ড'ই ছিল আইনকানুন রদবদল এবং নতুন আইনকানুন রচনার সর্বময় কর্তা। ১৯২৪ সালে আন্ত-র্জাতিক হকি ফেডারেশন গঠিত হবার প আইনকানুন রদবদল ও তৈরীর দু সংস্থা পাশাপাশি কাজ করতে থাকে। এ অসুবিধা দেখা দেয় এবং গ্রেট ব্রিটে থাকে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের বাইরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সা অলিম্পিক খেলাধুলো পরিচালনার প প্রেক্ষিতে গ্রেট ব্রিটেন আন্তর্জাতিক হ ফেডারেশনের সদস্য হতে রাজি হ প্রতিদানে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা আই কানুন রচনার সংস্থা ইণ্টারন্যাশন্যাল হ বোর্ডে পায় ৩টি আসন। আইনকানুনে ব্যাপারে এই ইণ্টারন্যাশন্যাল হকি বোর্ডের এখন সর্বময় কর্তৃত্ব। বিশ্ব হকি সাংগঠনিক দায়িত্ব আন্তর্জাতিক হ ফেডারেশনের।

ভারতে হকি খেলা—অন্যান্য খেল ধুলার মত হকি খেলাও ভার এসেছে ইংরেজদের মাধ্যমে। এবং ইংল যখন হকি খেলার প্রসার প্রচার জাঁকজ শুরু হয়েছে সেই সময়েই। তবে তা আগে পাঞ্জাব অঞ্চলে হকি খেলার ম এক ধরনের খেলার প্রচলন ছিল। কাপড় বল এবং বাঁকা লাঠি ছিল খেলার উপকরণ খেলাটির নাম ছিল "খিদ্দো খুণ্ডি"।

(ক্রম

মুকু

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

সোনা-বেলায় রাজা আর টম---
বন্ধু হয়ে আমি এখানে বিয়ে করতে আসব!
কে তোকে বিয়ে করবে?

সুন্দরী এক রাজকন্যা। দেখিস।
ভাগ! আরে!

কীলা-উয়িুর সোনা-বেলা।
আরে, এই বালি দেখছি গায়ে লেপটে গেছে!
বালি নয়, ওর অর্ধেকটাই হচ্ছে সোনার গুঁড়ো!
7/12

সোনার গুঁড়ো? সোনা এখানে কোথেকে এল?
প্রকৃতি এই বেলাভূমিকে এইভাবেই বানিয়েছে।
এ সোনার মালিক কে?

কয়েক শতাব্দী আগে আমার এক পূর্বপুরুষ এক সম্রাটের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সেই সম্রাটের নাম কুনকর। তিনিই আমার পূর্বপুরুষকে এই সোনা বেলা দান করেন।
আর এখন এটা তোমার, ওয়াকার-কাকা?
অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা

অরণ্যের অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবেই এই সম্পত্তি আমি রক্ষা করি।
কী চমৎকার বাড়ি!

দূর, দূর, এখানে সোনা পাওয়া যাবে না!
এই জঙ্গলের চাইতে আমার দাঁতে বেশী সোনা আছে!
ধৈর্য হারিও না!

আরে, এরা আবার কারা?
!!
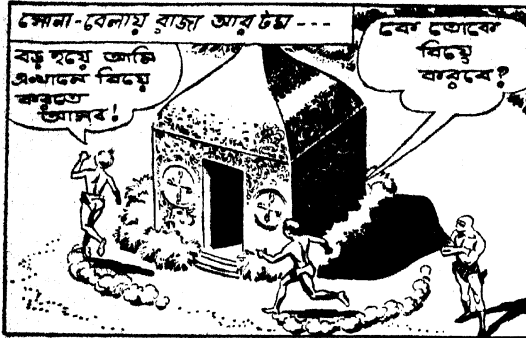
বি এফ জে এ-র নির্বাচন

"প্রতিদ্বন্দ্বী" বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি

সত্যজিৎ রায়ের "প্রতিদ্বন্দ্বী" চিত্রটি বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই নির্বাচন গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত হয় গত শনিবার সন্ধ্যায় ভোট গণনা হয় এবং ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ১৯৭০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্য থেকে এই নির্বাচন হয়েছে। সত্যজিৎ রায় এ ছাড়াও বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতার সম্মান পেয়েছেন ওই "প্রতিদ্বন্দ্বী" ছবির জন্যই। আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনার জন্য ওই ছবির কলাকুশলীরাও সম্মানিত হয়েছেন। "প্রতিদ্বন্দ্বী" সর্বমোট সাতটি পুরস্কার পেয়েছে।

এবারের নির্বাচনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মাধবী চক্রবর্তী ও দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী শারদার পুরস্কার লাভ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এঁরা দুজনেই যথাক্রমে উর্বশী পুরস্কারে ভূষিত। বাংলা ছবিতে অভিনয়ে "সাগিনা মাহাতো" চিত্রের জন্য অভিনেতা হিসাবে দিলীপকুমার এবং সহ অভিনেতা রূপে অনিল চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেয়েছেন। দীর্ঘকাল পরে ছবিতে অভিনয় করে কাবেরী বসু সাংবাদিকদের নিকট থেকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন "অরণ্যের দিনরাত্রি" ছবির সহ-অভিনেত্রী রূপে। যোগ্য খবর খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গীতিকারের সম্মান এবং রাজ কাপুরের পুত্র ঋষিরাজ

এই নির্বাচনের আরও দুটি উল্লেখ-

কাপুরের বিশেষ পুরস্কার লাভ।

নির্বাচনের পূর্ণ ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল।

শ্রেষ্ঠ দশটি ভারতীয় ছবি (গুণানুক্রমে) :
১। প্রতিদ্বন্দ্বী; ২। মেরা নাম জোকার; ৩। সাগিনা মাহাতো; ৪। ইন্টারভিউ; ৫। দিবারাত্রির কাব্য; ৬। সমাজ কো বদল ডালো; ৭। সত্যকাম; ৮। সফর; ৯। দর্পণ; ১০। অরণ্যের দিনরাত্রি।

[illegible]

শ্রেষ্ঠ তিনটি বিদেশী ছবি (গুণানুক্রমে) :
১। ব্লো-আপ; ২। দি গ্রাজুয়েট; ৩। ব্লো হট ব্লো কোল্ড।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (প্রতিদ্বন্দ্বী); হিন্দী—রাজ কাপুর (মেরা নাম জোকার); বিদেশী—মাইকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনি (ব্লো-আপ)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : বাংলা—দিলীপকুমার (সাগিনা মাহাতো); হিন্দী—রাজ কাপুর (মেরা নাম জোকার); বিদেশী—ডাস্টিন হফম্যান (দি গ্রাজুয়েট)।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : বাংলা মাধবী চক্রবর্তী (দিবারাত্রির কাব্য); হিন্দী—শারদা (সমাজ কো বদল ডালো); বিদেশী—ভেনেসা রেডগ্রেভ (লাভস অফ ইসাডোরা)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : বাংলা—অনিল চট্টোপাধ্যায় (সাগিনা মাহাতো); হিন্দী—ফিরোজ খান (আদমী ঔর ইনসান)।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী : বাংলা—কাবেরী বসু (অরণ্যের দিনরাত্রি) [illegible] (সমাজ কো [illegible])

শ্রেষ্ঠ সংগীত প[illegible] তপন সিংহ (সাগিনা মাহাতো); [illegible]—শচীন দেব বর্মণ (আরাধনা)।

শ্রেষ্ঠ গীতিকার : বাংলা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মঞ্জরী অপেরা); হিন্দী—নিরজ (প্রেম পূজারী)।

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (প্রতিদ্বন্দ্বী); হিন্দী—অসিত সেন (সফর)।

শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (প্রতিদ্বন্দ্বী); হিন্দী—ইন্দররাজ আনন্দ (সফর)।

শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী (সাদা-কালো) : বাংলা—সৌমেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বসু (প্রতিদ্বন্দ্বী); হিন্দী—রামচন্দ্র (সাত হিন্দুস্থানী)। **রঙীন :** রাধু কর্মকার (মেরা নাম জোকার)।

শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক : বাংলা—জে ডি ইরানী ও দুর্গাদাস মিত্র (প্রতিদ্বন্দ্বী); হিন্দী—আলাউদ্দিন (মেরা নাম জোকার)।

শ্রেষ্ঠ সম্পাদক : বাংলা—দুলাল দত্ত (প্রতিদ্বন্দ্বী); হিন্দী—তরুণ দত্ত (সফর)।

শ্রেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : বাংলা—অনুপ ঘোষাল (সাগিনা মাহাতো) এবং আশা ভোঁসলে (মেঘ কালো); হিন্দী—কিশোরকুমার (আরাধনা) এবং লতা মঙ্গেশকার (দো রাস্তে)।

শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক : বাংলা—সুনীতি মিত্র (সাগিনা মাহাতো); হিন্দী—এম আর আচরেকার (মেরা নাম জোকার)।

বিশেষ পুরস্কার : ঋষিরাজ কাপুর [illegible]

"জননী"-র শুভ [illegible]

রঞ্জিতমল কাংকারিয়া প্রযোজিত 'জননী' ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। রচনা ও পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলির। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুলোচনা চ্যাটার্জি, সুলতা চৌধুরী, বিলি চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, কালী ব্যানার্জি, সত্য ব্যানার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলি, সমিত ভঞ্জ ও জয়া ভাদুড়ী।

“[illegible]” (পরিচালনা : শচীন অধিকারী) ছবিতে দিলীপ রায়, সমিত ভঞ্জ ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্ত

চিত্র-সমালোচনা

প্রতিবাদ

(আর্ট মুভীজ)

সিনেমার নাটকীয় গল্পে ধনী-নির্ধনের সংঘর্ষ একটি ফলবান উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। “প্রতিবাদ” চিত্রেও এই বিরোধ। বড়লোক লম্পটের সঙ্গে নায়কের সংঘাত তো হিন্দী প্রমোদ-চিত্রে [illegible] লেগেই আছে, বাংলা ছবিতেও মাঝে-সাঝে দেখা যায়। “প্রতিবাদ”-এর নায়ক মানব (বিশ্বজিৎ) ধনী দুর্বৃত্তের হাত থেকে তার প্রেয়সী মঞ্জুকে (মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়) উদ্ধার করেছে শেষ সময়ে। মানব গলা টিপে মেরে ফেলেছে পাপ-চূড়ামণি ভূপতি সামন্তকে (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়)। পরিস্থিতি যে রকম তাতে ভূপতিকে খুন না করলেও সে পারত, কারণ ভূপতির রিভলবারে ছিল একটিই মাত্র গুলি যা দিয়ে সে তার আগের শিকার রেবাকে (সুলতা চৌধুরী) খুন করেছে। মানব যখন ভূপতির ঘরে গিয়ে ঢুকেছে মঞ্জুকে বাঁচাতে তখন রেবার মৃতদেহ মাটিতে পড়ে। খুনের দায়ে ভূপতির সাজা হতই। পুলিসও এসে গিয়েছিল। কিন্তু মানবের নিজের হাতে কিছু করা দরকার, অন্যায়ের প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন। তাই আদর্শবাদী নায়ক মুহূর্তের মধ্যে ভূপতিকে মেরে ফেলেছে।

আসলে গল্পের যা সাজানো কাঠামো (রচনা : অজিত গাঙ্গুলি) তাতে বোধ হয় [illegible] অপরিহার্য ছিল। কারণ [illegible] “[illegible]” [illegible] হবে। [illegible]

আরম্ভে মানব জেল থেকে বেরিয়েছে, জেলের ফটকে তাকে মালা পরিয়েছে তার অনুগামীরা। কাহিনীর বিস্তার ফ্ল্যাশব্যাকে। তাতে দেখা গেল বেকার মানব সমাজসেবার কাজেই ব্যাপৃত। ঘটনাচক্রে সে চাকুরিও শেষে যা পেল তা মিউনিসিপ্যালিটির জমাদারদের উপর খবরদারির কাজ। মানব হরিজনদের সেবায় লেগে গেল। এবং সেখান থেকেই তার সঙ্গে ভূপতি সামন্তের সংঘর্ষের উৎপত্তি। সূত্র এমন কিছু নয়, মানব ভূপতির ফার্মের কর্মচারীও নয় যে অন্য কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। বিবাদের উপলক্ষ একটি পচাই মদের দোকান যেটা ভূপতি বেনামে চালায়। মানব হরিজনদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছে যে তারা দারু ছোঁবে না। শুধুমাত্র একটি দোকান মানব-ভূপতির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হতে পারে না। কারণ আসলে মঞ্জু।

মঞ্জুও কি এই সংগ্রামের উপলক্ষ হতে পারে? গরীবের মেয়ের উপর শয়তান বড়লোকের শ্যেনদৃষ্টি এবং নায়ক কর্তৃক নায়িকা উদ্ধারের গল্পও ফিল্মে হামেশা মেলে। গল্পটিতে শ্রেণীগত বিরোধ নিয়ে আসার জনাই সম্ভবত মানব হরিজনসেবী ও সংগ্রামী। ফিল্মের গল্পের গতানুগতিক উপাদানের সঙ্গে মানবের প্রতিবাদ ও সংগ্রাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে বলে ছবিটি আজকের দর্শকের হাততালি পাবে। প্রেমের বিষয় গল্পে যা আছে তাও অনাস্বাদিতপূর্ব নয়। ভুলবোঝাবুঝির একটা পর্বও ছবিতে আছে। তবে ওই সময়ে আদর্শবান মানবকে যে দ্বন্দ্বাতীত বা অনাসক্তরূপে দেখানো হয় নি এবং সেও যে ভুল বুঝতে পারে, দুঃখ পেতে পারে, অভিমান ও রাগ করতে পারে সে-সব দেখানো হয়েছে বলে পরিচালক তপেশ্বর প্রসাদ এবং কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার অজিত গাঙ্গুলি প্রশংসা পাবেন। হরিজনরা মানবকে দেবতা বললেও পরিচালক তাকে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসাবেই দেখিয়েছেন।

যুক্তি-বিচার খাটালে ছবির অনেক ত্রুটিই হয়ত দেখা যাবে। কিন্তু সব কিছুর উপর দিয়ে ঘটনাস্রোত এমন স্বচ্ছন্দভাবে বয়ে গেছে যে, দর্শকরা ছবিটিতে নাট্যসুখ অবশ্যই পাবেন। শেষ অবধি ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার তো আছেই। তা ছাড়া, মানবের বোন ও নিঃস্বার্থ বন্ধুর (রবি ঘোষ) কথা এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘটনা দেখতে বেশ ভাল লাগে। এই ক্ষেত্রে পরিচালক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা বিন্যস্ত করেছেন। আবার অস্বাভাবিকতার নজিরও কম নয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা যে-ভাবে সকলের সামনে রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে নিয়ে লাঞ্চে যায় তা কি স্বাভাবিক?

অনেক অবাস্তবতার মধ্যেও বিশ্বজিৎ জায়গায় জায়গায় সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন। যে-সব মুহূর্তে মানবের পৌরুষ ও তেজ প্রকাশ পেয়েছে ওই মুহূর্তে শিল্পীর অভিনয় চমৎকার। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণ পরিণীতার ললিতা-লক্ষণাক্রান্ত হলেও তাঁকে ভাল লেগেছে। অভিনয় আরও কয়েকজনের বেশ ভাল—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, গৌর শী, জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, কালীপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, অজয় গাঙ্গুলি, মন্মথ মুখার্জি এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খুব বেশি প্রশংসা পাবেন রবি ঘোষ, নায়কের নিঃস্বার্থ বন্ধুর চরিত্রে।

ছবির উপভোগ্যতার মূলে অভিনয়ের দান অনেকখানি। গান দিয়েও পরিচালক দর্শককে ভোলাতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের ছবিতে গানের সুযোগ কম, আধুনিক গানের অবকাশ যদিও বা ছিল তা এমন কৃত্রিম ও মামুলি উপায়ে প্রযুক্ত যে গান মনে রেখাপাত করে না। অবশ্য শিল্পীরা ভালই গেয়েছেন—বিশ্বজিৎ নিজে, নায়িকার মুখে বনশ্রী সেনগুপ্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরকার শ্যামল মিত্রর গান এতে আছে। আবহসুর অতি চড়া। টেকনিক্যাল কাজের দিক দিয়ে ছবিটি উচ্চমানের নয়।

ভাসান

চিত্রকথার প্রযোজনায় “ভাসান” ছবির শুটিং আরম্ভ হয়েছে। কুমার বিশ্বরূপের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। অভিনয়ে মন্মথ মুখোপাধ্যায়, বেনু সেনগুপ্ত এবং আরও কয়েকজন নতুন শিল্পীকে দেখা যাবে।

সাগর আর্ট ইনটারন্যাশনালের পরবর্তী ছবির একটি দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র ও রাজেন্দ্রকুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক রামানন্দ সাগর

এতদিন আমার ধারণা ছিল যে পরনিন্দা, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা জাতীয় কতক গুলি গুণ আমাদের মানে বাঙালীদের একচেটে সম্পত্তি। কিন্তু প্রবাস বোম্বাইয়ে যুগাধিক কাল বাস করে আমি আমার ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি। বিশেষ করে গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা আমার বর্তমান ধারণা পরিবর্তনের সহায়ক। নানা কারণে আজকাল শহর বোম্বাই-এ প্রায় সবকিছুই আলোচনা হতে শুরু হয়েছে প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে। আপাত কারণটা রাজনৈতিক কিন্তু আমার ধারণা মূল কারণটা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক। যা রাজনৈতিক বা সামাজিক তা বিশ্লেষণের অধিকার সম্ভবত সরল শর্মার নেই, সুতরাং সে-পথে অগ্রসর না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

হঠাৎ আলোকপ্রাপ্ত বোম্বাইয়ের এক সো-কল্ড-সুধীসমাজ বর্তমানে বাঙালী নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছেন। বাঙালী-নিন্দুক এই সুধী সমাজকে জাতনিন্দুক আখ্যা দিতে বাধছে কারণ এদের সমাজে বাঙালীরা ছাড়া অন্য কেউই সাধারণত নিন্দিত হন না। আপনারা হয়ত জাত নিন্দুকের সংজ্ঞাটা জানতে চাইবেন এই ছুতোয় অথবা ধরে নেওয়া যাক জাত-নিন্দুকের সংজ্ঞা নির্ণয়ে আমিই তৎপর। আমার মতে জাত নিন্দুক সেই যে নিন্দের সুযোগ পেলেই নিন্দে করে, জাত বিচার করে না, পরনিন্দা করতে না পারলে যার খাবার হজম হয় না, রাতে ঘুম হয় না বা নিন্দাবিহীন দিবসযাপনে যার পেট ফুলে যায়। আলোচ্য হঠাৎ আলোকপ্রাপ্ত সুধী সমাজের সভ্যদের উপরোল্লিখিত সিমটমস কিছুই নেই, তাই তাঁদের জাত নিন্দুক আখ্যা দিতে বাধলো। আগেই বলেছি এ'রা বাঙালী ছাড়া অন্য কারুর নিন্দা করেন না। এবার শুনুন এ'দের নিন্দার ধরন ধারণের কথা। এ'রা বাংলা দেশকে ভারতের একটি 'সামান্য অংশ' বলে মনে করেন এবং সেই যুক্তিতেই (অর্থাৎ অংশ কখনই সমগ্রের সমান নয় এই যুক্তিতে) যা কিছু বাঙালী তা পুরোপুরি ভারতীয় নয় এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। এ'রা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'ইণ্টারভিউ' দেখে বলেছেন যে এ জাতীয় ছবি বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেও দেখানো উচিত নয়, বিদেশে দেখানো তো কোন্ ছার! এরা স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে কলকাতার 'নান্দীকার' সম্প্রদায় অভিনীত নাটকগুলি দেখে মন্তব্য করেছেন যে এগুলি মুখ্যত বাঙালী নাটক এবং সেই জন্যেই দেশী নয়। এ'রা আরো বলছেন যে এই বাঙালীরা জার্মান থেকে 'ব্রেখট্'কে আমদানী করে তাকে নিজস্ব করে ফেলেছে, ইতালী থেকে পিরেনদেল্লোকে আমদানী করে তাকেও আত্মসাৎ করছে অবলীলাক্রমে, "সুতরাং হে দেশবাসী সাবধান হও"। এরা বলছেন যে দিলীপকুমারের মত স্টারও বাঙালীপ্রীতির সৌজন্যে বাঙলা ছবিতে কাজ করছেন—কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো কই ভারতপ্রীতির জন্যে হিন্দী ছবি করছেন না? দিলীপকুমার যদি বাংলা শিখতে পারেন তাহলে সত্যজিৎ রায় হিন্দী শিখতে পারছেন না কেন? মৃণাল সেন যদিও বা হিন্দী ছবি করলেন, তবু অবাঙালীর গল্প নিলেন না কেন? ছবিতে বেশীর ভাগ অভিনেতা এবং কলাকুশলী বাঙালী নিলেন কেন? এ'রা বলছেন ভারতীয় সংস্কৃতি মানেই বাঙালী সংস্কৃতি এমন একটা ধারণা নাকি বিশ্ববাসীর মনে দিনকে দিন গভীর ভাবে শেকড় গেড়ে যাচ্ছে। সময় থাকতে যদি এ শেকড় উৎপাটিত করা না যায় তাহলে বাংলার প্রভাব থেকে ভারতকে নাকি বাঁচানো যাবে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বময় যাঁদের নামডাক তাঁরা সকলেই বাঙালী। রবীন্দ্রনাথ, উদয়-শঙ্কর রবিশঙ্কর, আলি আকবর, পি সি সরকার এমন কি সত্যজিৎ রায় সকলেই নাকি ভারতীয় নয়, এরা নাকি বাঙালী! এ'রা বলছেন বাঙালীরা নাকি 'বাঙালীই', ভারতীয় নয়। এবং সুযোগ পেলেই নাকি পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা একসঙ্গে মিলে যাবে এবং ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এমন দুর্ঘটনা যদি ঘটে তখন বাকি ভারতবর্ষ নাকি সমবেত স্বরে করুণ সুরে বাংলা ভাষায় জাতীয় সংগীত গাইবে! আশা করি এতক্ষণে এই হঠাৎ আলোকপ্রাপ্ত সো-কল্ড সুধী সমাজের সভ্যদের মানসিকতার খানিকটা আঁচ আপনারা পেয়েছেন। যতই অরাজকতার মধ্যে থাকুন, মনে হচ্ছে তবু বেশ আছেন আপনারা। আমার মত সরল মানুষরা পড়েছে জটিল প্যাঁচে, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'র অবস্থা। চান্স পেলেই এরা এ-রাজ্যে বাংলা বই দেখানো বন্ধ করে দেবে, বাংলা বই পড়াও হয়তো উঠিয়ে দেবে, বাংলায় কথা বললেও হয়তো একুশে আইনের খপ্পরে পড়তে হবে। যদি এমন হয় তাহলে হয়তো 'বোম্বাই বিচিত্রা' একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। তবে বাঁচোয়া এই যে তেমনটি হবে না, হতে পারে না, কারণ এই সো-কল্ড সুধী সমাজ যে হীনম্মন্যতার রোগে ভুগছেন সাধারণ মানুষরা কোনোদিন সে-রোগে ভোগে না। সুতরাং আসুন, ভুখা বাংলার 'প্রমোদ তরণী'তে বসে 'হা-হা' করে একটু অট্টহাস্য করা যাক!

সরল শর্মা

"জয়-জয়ন্তী" আগামী সপ্তাহে

মণি বর্মা রচিত কাহিনী অবলম্বনে এম মল্লিক পরিচালিত এম কে জির 'জয়-জয়ন্তী' আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে।

উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন ছবির দুই প্রধান শিল্পী। এ'দের সঙ্গে আছেন ললিতা চ্যাটার্জি, তরুণকুমার, গীতা দে, মণ্টু ব্যানার্জি, এন বিশ্বনাথন ও বহুদিন পরে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে চন্দ্রাবতী দেবী। সুর দিয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চিৎপুর থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার দূরত্ব কত? অনেক? সেই অনেক পথই পাড়ি দেবার ছাড়পত্র পেয়েছেন তরুণ অপেরা। হ্যাঁ, যাত্রাদল, যে যাত্রার নামে এক দশক আগেও শহুরে শিক্ষিতদের মুখ অকুঞ্চিত থাকত না। দলের পক্ষ থেকে শান্তিগোপাল আর শিব ভট্টাচার্য দু'জনেই জানালেন, আগামী জুন মাসে যাত্রা। কোন তারিখ তা মারচের শেষ দিকে জানা যাবে। বোধ হয় এখানে নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না, তরুণ অপেরার এই ভ্রমণ সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে।

আমাদের নাটকও সাগরপাড়ি দিয়েছিল। ঠিক সরকারী আমন্ত্রণে নয় সম্ভবত ব্যক্তিগত উদ্যোগে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার নাট্য-জগতের যাবতীয় রত্ন সম্ভার করে পাড়ি দিয়েছিলেন বিদেশে। ফিরতে হ'ল গভীর ব্যর্থতা নিয়ে। কথিত আছে নাট্যাচার্য তখন সখেদে বলেছিলেন : ওখানে আমরা আমাদের যাত্রাভিনয় করলে হয়তো জয়ী হতে পারতাম। তখন পারতেন কিনা বলা যায় না। এখনও যে সেই যাত্রা তামাম রাশিয়া মাত করে ফিরবে কে হলপ করে সে কথা বলবে? তবে ভরসা এই যাত্রা নাটকের আগে বিশ্বসম্মান পেয়েছে। দিল্লি কলকাতার সোভিয়েত সরকারী কর্তারা দেখেশুনে পরখ করেই এই জয়মাল্য তুলে দিয়েছে চিৎপুরের গলে।

নায়ক শান্তিগোপাল, দলনেতা শান্তি-গোপালেরও আনন্দ এখানে। শান্তিকে আমি শুধিয়েছিলাম, উত্তরে অত্যন্ত হাসের সঙ্গে সে বলল : যদিও সদলে যাচ্ছি, কিন্তু সুযোগ পেলে সকালের আগে আমি ওদের অপেরা দেখব। তারপর ব্যালে আর নাটক, সিনেমা এবং সার্কাস। আগে অপেরা দেখার আগ্রহ এ কারণে, রাশিয়ান অপেরার প্রযোজনার সঙ্গে আমাদের যাত্রার পার্থক্যটা কোথায় তা পরখ করে না নিলে ঠিক বোঝা যাবে না আমরা কোথায় আছি।
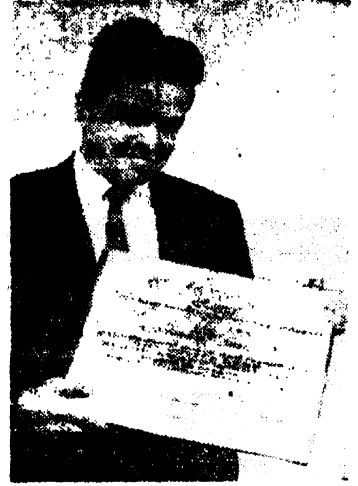
সোভিয়েত ল্যান্ড প্রদত্ত নেহরু পুরস্কারের স্মারক সহ তরুণ অপেরার মুখ্য অভিনেতা শান্তিগোপাল

বাগবাজার পালেদের বাড়ির ছেলে শান্তিগোপাল যখন যাত্রায় এল তখন ওর বয়েস ২৩। সুন্দর স্বাস্থ্যবান তরুণ, দরাজ গলা। নিউ রয়েলের নারাণ ভট্টাচার্য প্রথম ওকে রঘু ডাকাতের নাম ভূমিকায় নামান। যতদূর মনে পড়ে নারান আমায় বলেছিল : একটি জুয়েল জোগাড় করেছি। শান্তিগোপাল কিন্তু বজেন্দ্রবাবুর আপোষ বাঁশ আর কবি চন্দ্রাবতীতে নায়ক হয়ে নারাণের সে কথার সত্যতা প্রমাণ করে। পরে সূর্য দত্ত মশাইয়ের স্কুলিংয়ে সে নট্ট কোম্পানিতেও এক বছর অভিনয় করেছিল। এখন সেই শান্তিগোপাল তরুণ অপেরার সর্বেসর্বা। যাত্রার হিটলার, যাত্রার লেনিন এবং নেপোলিয়ান নামে তার খ্যাতি সুবিদিত।

গত বছরের জুন মাসে দিল্লির শ্রীশরদিন্দু সান্যালের উদ্যোগে যখন মিলন সমিতির সামিয়ানায় তরুণ অপেরার অভিনয় হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল মন্ত্রীরাই এসেছিলেন। বক্তৃতা করলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, ত্রিগুণা সেন। সংগীত নাটক আকাদেমির অনেকে ছিলেন। আর ছিলেন সোভিয়েত কনসালের বড় কর্তারা। কর্তাদের কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলাম,

'লেনিন' পালা ওদের মন জয় করেছে। এবং সেই মন জয় করা থেকেই 'সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার' প্রাপ্তির সূচনা।

তরুণ অপেরার অন্যতম ছোটো শিব ভট্টাচার্য জানালেন দলের ৪০ জনকে নিয়ে যাওয়ার কথা। ওখানে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন শহরে নিশ্চয় অভিনয় হবে। এবং এ-কথা ঠিক ভারতীয় যাত্রাগানের যে রূপ তা ভমায় সোভিয়েতকে মুগ্ধ করবে। যতদূর জানা গেছে, ওদেশের অপেরায় এখনও 'লেনিন' প্রযোজিত হয়নি।

মনে হতে পারে, তরুণ অপেরা বা শান্তি-গোপাল বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু কথাটা আদৌ সত্য নয়। তরুণ অপেরা আগে 'হিটলার' করেছে, আগামী সজে 'নাসের' করবেন না এমন কোনো গোঁড়ামি নেই। এ প্রসঙ্গে শান্তি-গোপাল বলেছেন : আমার কাছে আর্ট বড়, তার চেয়েও ব্যবসায়। একটি বিশেষ নীতির জন্য আমি দলের ৬০ জন লোককে কষ্ট দিতে পারি না। সে অধিকারও আমার নেই। প্রয়োজনে অমেরিকান কোনো নায়কের যাত্রারূপও আমি প্রযোজনা করতে পারি। অভিনয় করতে পারি।

চিৎপুরে শান্তিগোপাল একাই একক এ-কথা কেউ বলবে না। এ-ধরনের উৎসাহী, শিল্পবোধসম্পন্ন অভিনেতা আরও অনেকে রয়েছেন। সময় এবং সুযোগ পেলে তাঁদের অনেকেই এমনি বিকশিত হবেন—এ আশা আর কেউ না রাখুক, আমি রাখি। তবে এটা ঠিক শান্তিগোপাল এ-ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক হয়ে রইলেন।

—সূত্রধার

"চিৎপুর-চিত্র" সম্পর্কে

মহাশয়,

"দেশ"-এর রঙ্গজগৎ বিভাগে "চিৎপুর চিত্র" রচনায় যাত্রাশিল্পের প্রতি আপনাদের যে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে, যাত্রা শিল্পী সংঘের সম্পাদক হিসাবে আমি তা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। যাত্রা-শিল্পে বহু সমস্যা অতীতেও ছিল বর্তমানেও তা থেকে মুক্ত নয়। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা যাত্রাশিল্পের ক্ষতি করছে। লেখক সূত্রধার পর পর কটি সংখ্যায় যে সমস্যা ও যাত্রাশিল্পের দুরবস্থার কথা আলোচনা করেছেন।

কিন্তু গত ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় একজন 'ভূতপূর্ব' রাজনীতিক এবং বর্তমানে যাত্রা দলের পরিচালকের জবানীতে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে পাঠকদের চোখে যাত্রাশিল্প হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। পৃথিবীর সকল ব্যবসাতেই পরস্পরের স্বার্থরক্ষার জন্য আপন ব্যবসাকে বড় করার রীতি প্রচলিত। চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেও আমরা দীর্ঘ-কাল এই একই জিনিস লক্ষ করে এসেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই বাড়াবাড়ি লক্ষ করে খুবই দুঃখিত হয়েছি। যাত্রাশিল্পকে হীন প্রতিপন্ন করবার এই অপচেষ্টা উক্ত রাজনীতিক সম্পাদকের কেন? আমি সমগ্র যাত্রাশিল্পের পক্ষ থেকে উক্ত বক্তব্যের দৃঢ় প্রতিবাদ করছি।

শিব ভট্টাচার্য

সম্পাদক : যাত্রা শিল্পী সংঘ

"জনতার আদালত" (পরিচালনা : মধুকর গোষ্ঠী) ছবিতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারানী

একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র সম্প্রতি কলকাতার রবীন্দ্র সদনে তাঁর একক সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : "নাগরিক-জীবনের গ্লানি থেকে উত্তরণের আশায় যেন আজকের সন্ধ্যায় আছে—সব দিনের, সব অবসাদের ভিড় ছাপিয়ে এ যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা। একটু একান্তে আমাকে খুঁজে পাওয়া—সুরের রসে, ভাবের গভীরতায় নিজেকে লুপ্ত করে দেওয়া।" এ উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করলুম তাঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে, তাঁর গানগুলি শুনে। কলকাতায় একটা অস্বাভাবিক উত্তপ্ত হাওয়া চৈত্রী ঘূর্ণির আগেই ঘুরতে আরম্ভ করেছে। রবীন্দ্রসদনে যখন পৌঁছলুম তখনও সেই পীড়িত সত্তাকেই টেনে নিয়ে গেছি। কিন্তু একটা বিপুল শান্তি, প্রগাঢ় আনন্দ, একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি চিত্তকে পরিপ্লাবিত করে দিল যখন শ্রীমতী সুচিত্রা ধরলেন তাঁর প্রথম গান—"বীণা বাজাও হে মম অন্তরে" —যা ছিল কবিগুরুর অতিপ্রিয় গানের অন্যতম। এই কি রসের প্রকৃত আস্বাদন,—যাকে আলংকারিকেরা ব্রহ্মাস্বাদেরই তুল্য বলে ঘোষণা করেছেন? বোধ করি তাই। গায়িকা নিজেও নিমগ্ন হয়ে গেলেন তাঁরই কথিত "সুরের রসে, ভাবের গভীরতায়"।

শিল্পী কখন সিদ্ধিলাভ করেন? যখন তাঁর সংগীতে শুধু তিনিই নিমগ্ন হন না, শ্রোতারাও আবিষ্ট হয়ে যান;—একান্ত

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র

নীরবতা বিরাজ করে প্রেক্ষাগৃহে। এই সিদ্ধিকেই শাস্ত্রকার বলেছেন—"দৈবী সিদ্ধি"। এই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিই শ্রীমতী মিত্র লাভ করেছেন এই অনুষ্ঠানে, একথা বলতে পারি নিঃসংশয়ে, অকুণ্ঠিত চিত্তে। শিল্পী-জীবনের পূর্ণতায় এসে এই সন্ধ্যায় তিনি সার্থকতার যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন তা সম্ভব হয়েছে প্রতিভার প্রেরণায়, উপলব্ধির প্রজ্ঞায় এবং সাধনার নিষ্ঠায়।

এই অনুষ্ঠানে তিনি ক্রমান্বয়ে পঁচিশ

ত্রিশটি গান করে গেলেন। শেষের দিকে কণ্ঠে ছিল ক্লান্তির আভাস। হয়ত তিনি শ্রোতাদের দাবির প্রতি কিছু বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমার মনে হয় এক ঘণ্টা, কি তার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হলেই যথেষ্ট হত। শ্রোতারা তা হলেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়েই ফিরে যেতেন। অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, শিল্পীর পক্ষে ক্লান্তিকে সর্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত, প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে এটি তো বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। তথাপি, কুড়ি, একুশটি গান একাদিক্রমে গাইবার পরও যখন গাইলেন—"বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে" তখনও সেটি রসে, ভাবে শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল। কয়েকটি গান, যেমন—"রাখ রাখ হে জীবনে জীবনবল্লভে" "আয় আয়রে পাগল ভুলবি রে চল আপনাকে", "কার মিলন চাও বিরহী" "মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে", "দুঃখরাতে হে নাথ"—শ্রোতাদের চিরকাল মনে থাকবে।

অনুষ্ঠানের জন্য গানের নির্বাচন সুন্দর। শুধু গাম্ভীর্যেই নয়, নানা বৈশিষ্ট্যেই সেগুলি সমুজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় কথা শ্রীমতী

"আবিরে রাঙানো" (পরিচালনা : অমল দত্ত) ছবিতে কাল ও দেবব্রত

মিত্রের কণ্ঠের ডিগনিটি। পরিচ্ছন্ন নিখুঁত উচ্চারণে, সুরের সুঠাম সঞ্চরণে, সাবলীলতায়, মহিমায় প্রতিটি গান নিটোল এবং পরিপাটিভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

যন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদিনেশচন্দ্র (সেতার), শ্রীচন্দু ব্যানার্জি (তার সানাই), শ্রীরমেশ চন্দ্র (দিলরুবা), শ্রীবিপ্লব মণ্ডল ও শ্রীরামদাস ব্যানার্জি (খোল ও তবলা), শ্রীরবীন গাঙ্গুলী (মন্দিরা ও অন্যান্য বাদ্য)। এঁদের প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। বিশেষ করে সেতারের কয়েকটি স্পর্শ বিচিত্র আবেদন সৃষ্টি করেছে। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসজ্জা মনোরম। আলোকসম্পাতে ছিলেন শ্রীকণিষ্ক সেন।

রবীন্দ্রসংগীতের এই সার্থক উদাহরণ আশা করি উপস্থিত রবীন্দ্রসংগীতের ছাত্রছাত্রীদের অনুশীলনের বস্তু হবে।

শার্ঙ্গদেব

পারক সারকাস সংগীত সম্মেলন

শিল্পীর ভীড়ের চেয়েও যে শিল্পরসের নিবিড়তা অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলে, পারক ইউনিয়ন ক্লাব আয়োজিত পারক সারকাস সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাবর্গ সে-কথা জানেন। জানেন বলেই, গতবারের মতন এবারেও একটি রাত্রিব্যাপীসহ তিনটি অধিবেশন সংবলিত সম্মেলনটিকে সুনির্বাচিত শিল্পীদের নিয়ে আর সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান সূচী দিয়ে রসশ্রীমণ্ডিত করে তুলতে পেরেছিলেন।

একক কণ্ঠ সংগীতে ছিলেন তিনজন শিল্পী। ওস্তাদ আমীর খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক এবং ওস্তাদ মনোব্বর আলি খাঁ। শেষ অধিবেশনের রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রবীণ শিল্পী আমীর খাঁ দরবারী কানাড়ার বিলম্বিত খেয়ালটিতে তাঁর অসামান্য সুর-সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংযম এবং সাধনালব্ধ দক্ষতার সংযোগে রাগের পর্যায়িক বিস্তারটি ছিল অনবদ্য। একতালে নিবদ্ধ দ্রুতের বন্দেশটি কিছু লঘু, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর অন্তর্নিহিত লিরিকাল মেজাজটি খুবই উপভোগ্য। ওস্তাদ আমীর খাঁর কলাশ্রী কলাবতীরই একটি রেখাবযুক্ত সংস্করণ। ওঁরই কণ্ঠে এই রাগ এর আগে শুনেছি। সবশেষে উনি 'যোগ' রাগে গান শোনান। পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলির তুলনায় এঁর পরিবেশনা যেন কিছু ম্লান বলে মনে হল। ওই একই অধিবেশনের অপর কণ্ঠশিল্পী ছিলেন শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক। তিনি এবারেও একটি নতুন রাগ পরিবেশন করলেন। রাগটির নাম নীলমাধব। শ্রীমতী পট্টনায়কের গানে সুরবিস্তারের স্তরপারম্পর্য সর্ব সময়ে লক্ষ্য করবার মতন। বিশেষত, ধৈবতকে প্রাধান্য দিয়ে এই রাগটির একটা সুন্দর মূর্তি তিনি সুরে আর ছন্দে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। পূর্ববর্তী অধিবেশনের একমাত্র কণ্ঠশিল্পী মনোব্বর আলি খাঁর 'জয় জয়ন্তী'র পরিবেশনা যেমন চমৎকার, তেমনই গীতগোবিন্দের 'ললিত-লবঙ্গলতা'—এই পদটিকে আশ্রয় করে 'দেশ' রাগের মধ্যলয়ে বিধৃত বন্দেশটি এবং ছোট ছোট সূক্ষ্ম তানকর্তবগুলি বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁর তৃতীয় খেয়ালটি দ্রুত লয়ে। কণ্ঠ সংগীতের অনুষ্ঠানে এ-ছাড়া আর একটি আকর্ষণ ছিল এবং তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাগসংগীতকে আশ্রয় করে বন্দেগানের অবকাশ কিছু আছে কিনা, এ-সম্পর্কে সুপরিকল্পিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কঠোর অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এ-ধরনের কিছু অনুষ্ঠান ছোট-খাট আসরে

মাঝে মাঝে শোনা গেলেও বড় সম্মেলনে এর উপস্থাপনার সুযোগ বিশেষ মেলে না। এবারের সম্মেলনে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় পরিবেশিত বৃন্দগানের অনুষ্ঠান এ-দিক দিয়ে উদ্যোক্তাদের উদার ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। তবে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শেষের ভজনগুলির চেয়ে 'ইমন' রাগাশ্রয়ী খেয়ালটি, যেখানে সম্মেলক আস্থায়ীর ফাঁকে ফাঁকে একক-কণ্ঠে তানের ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছে, এ-জাতীয় সম্মেলনে অধিকতর সংগতিপূর্ণ। নিখাদকে ন্যাসস্বর করে আস্থায়ীর সুররচনাটিও সুন্দর ছিল।

এই সম্মেলনের আর একটি উল্লেখ্য অংশ নৃত্য। কথক পরিবেশন করেছেন তিন-জন শিল্পী: শিখা সেনগুপ্ত, সুমিত্রা মিত্র, এবং মায়া চট্টোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে সুমিত্রা মিত্র প্রথম দিনের অধিবেশনে দর্শকমণ্ডলীকে নিখুঁত এবং নিপুণ পায়ের কাজ প্রদর্শন করে মুগ্ধ করেছেন। তবে তাঁর অভিনয়াংশের অভিব্যক্তি একই ধরনের। এ-ক্ষেত্রে আরও একটু বৈচিত্র্য থাকলে ভাল হত। মায়া চট্টোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পদক্ষেপ এবং আশ্চর্য স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল নৃত্যভঙ্গিমা তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। তবলার বোলের সঙ্গে তাঁর পায়ের নূপুর যেন আচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। আবার অন্যদিকে, দীর্ঘ নৃত্য প্রদর্শনের পরেও যে ঠুংরীটি শোনালেন, পরিমিত কিছু মুদ্রা-সহযোগে, তাতে ক্লান্তির বা শ্রান্তির কোনো ছাপ ছিল না। আর রোজই কথক দেখে যদি দর্শকদের মধ্যে কোনো ক্লান্তি এসে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর প্রাণবন্ত এবং অসাধারণ শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত ওড়িশী নৃত্য দেখে। হাতের মুদ্রা, অভিনয়ের অভিব্যক্তি এবং ছন্দের কারুকৃতি ছাড়াও সামগ্রিকভাবে একটা নয়নবিমোহন সৌন্দর্য রচনা তাঁর নৃত্যকলার পরম বৈশিষ্ট্য। আর সেই দৃষ্টিনন্দন শিল্পসৃষ্টিকে শ্রুতিমাধুর্যে পরিপূর্ণ করেছিল ওঁর স্বামী শ্রীযুক্ত পাণিগ্রাহীর কণ্ঠসংগীত।

যন্ত্রসংগীতের আসরেও এবার সকলে উঁচু মানের বাজনা শুনিয়েছেন। মণিলাল নাগ সেতার শোনালেন মারু-বেহাগে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের সরোদে যোগ এবং কাফির মধ্যে শেষের রাগের পরিবেশনা ভোলবার নয়। ওঁর হাতের তানের পরিচ্ছন্নতা, সুরমাধুর্যের অভিব্যক্তিময়তা এবং ছন্দোবৈচিত্র্যের রমণীয়তা আরও সার্থক হতে পারত যদি সহযোগী তবলা-শিল্পী আর একটু সংযত হতেন। বাহাদুর খাঁর পাহাড়ী-ঝিঁঝিট নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ অনুষ্ঠান। কিন্তু আর একটি অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠান উপহার দিলেন সর্বশেষ শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলাসখানি-তোড়ীর কী আশ্চর্য বিশ্লেষণ! আলাপ, জোড়, ঝালার পর ওই একই রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত গৎ বাজল, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নব নব রসে অভিষিক্ত। সূক্ষ্ম মীড়ের কাজ না নিপুণ কৃন্তন, অথবা অভিনব ছন্দের আন্দোলনের জন্য কিনা জানি না; শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, সেদিন যে রসলোক নির্মিত হয়েছিল, তার বুঝি কোনো তুলনা হয় না। কানাই দত্তের বোল, পড়ন, আর নিপুণ সাথ-সংগতও কি ভোলবার! বস্তুত এই সবকিছু মিলিয়ে সম্মেলনের শেষের প্রহরটি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আনন্দবর্ধন

বোম্বাইয়ের সান-এন-স্যাণ্ড হোটেলে শচীন ভৌমিক ও বাঁশরী ঠাকুরের বিবাহের রিশেপসন পার্টিতে শচীন দেববর্মণ, শচীন ভৌমিক, নববধূ বাঁশরী ঠাকুর এবং শ্রীমতী মীরা দেববর্মণ

নতুন রেকর্ড

আধুনিক গানের কয়েকটি নতুন রেকর্ড সম্প্রতি বেরিয়েছে। তার মধ্যে সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধীর বাগচির গান উল্লেখযোগ্য। ফিল্মের প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে শ্রীবাগচির গান শ্রোতাদের আগে থেকেই শোনা। এবার এইচ এম ভি রেকর্ডে মায়া দেব সুরে শ্রীবাগচি গেয়েছেন "যখনি গানের মুখ মনে আসে না/চাঁদ বিনা সারাদিন"। গানের সুর ভাল, শিল্পী গেয়েছেনও ভাল। সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর দরদের সঙ্গে গেয়েছেন "রাগিনীর মন তো গেল না/আমি সবরী আঁখি নিয়ে (সুর: অজয় নিয়োগী)। গান দুটি জনপ্রিয় হবে। অপর উল্লেখযোগ্য রেকর্ড দীপেন মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গগীতি। হিন্দুস্থান রেকর্ডে শ্রীমুখো-পাধ্যায় "বিলম্বিত লয়" ও "প্রথম কদম ফুল"-এর দুটি হিট গানের প্যারডি (যদি বৌ হত পুলিস অফিসার/আমি শ্রীশ্রীনিরোধ-বরণ মালা) গেয়েছেন। প্যারডি দুটি উপভোগ্য। প্রশান্ত চৌধুরীর সুরে এইচ-এম-ভি রেকর্ডে গান গেয়েছেন মীরা সমদ্দার। এই নবাগতা শিল্পীর মধ্যে একটি গান (ভালবেসে করি ভুল) লোক-সংগীতের ধাঁচে, অপরটি (এ বি সি ক খ গ) নার্সারীর গান বা শিশুসংগীত। শিল্পী প্রতিশ্রুতিসম্পন্না।

ইকোটন রেকর্ডে সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সুরে গেয়েছেন "তোমার ওই অবুঝ চোখের/রাতের স্বপ্ন এমনি করে। হাঁস রেকর্ডে রত্ন মুখোপাধ্যায়ের সুরে দেবকুমার লাহিড়ি গেয়েছেন ঝরানো বকুলের/গন্ধ গুনে মৌমাছিরা গান শোনায়। শেষোক্ত রেকর্ডটির গানের সুর সুন্দর। দুজন শিল্পীই আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের গানগুলি গেয়েছেন।

অরোরার পরবর্তী ছবি "মানসী"

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরবর্তী প্রয়াস 'মানসী' ছবির মহরৎ সম্প্রতি অরোরার নিজস্ব স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে।

সুনীল চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। সুর সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। মহরৎ শিল্পী ছিলেন নবাগত রবীন ঘোষাল ও বিকাশ রায়।

আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার পরলোকগমন আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে তাঁর শিলং-এর বাসভবনে শ্রীচালিহা পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন হৃদরোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বৎসর। শ্রীচালিহার স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

চালিহার মৃত্যুসংবাদে সারা আসামে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ্য সরকার তিন দিন শোক দিবস পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আসাম এবং মেঘালয়ের সরকারী বাড়িগুলিতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে। মেঘালয় সরকার এবং নেফা প্রশাসনও শ্রীচালিহার মৃত্যুর পর তিন দিন শোকদিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। আসামের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা পদ্মবিভূষণ শ্রীচালিহা ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর থেকে পর পর তিনবার আসামের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আসামের কম বয়স্ক কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে শ্রীচালিহার স্থান ছিল একটু উঁচুতে। দেশের মুক্তি আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ১৯৩০ সালে তিনি দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯৫১ সালে শিবসাগর কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসে ভাঙন ধরলে চালিহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে ছিলেন। চালিহার বারো বছরের অধিককাল মুখ্যমন্ত্রিত্ব আসামে চালিহা যুগ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

দেশী সংবাদ

২২ ফেব্রুয়ারি—জননেতা শ্রীহেমন্ত বসুর মর্মান্তিক হত্যার প্রতিবাদে দুই জোট, তিন কংগ্রেস আরও নানা দল আজ ২৪ ঘণ্টার জন্য কলকাতা সমেত সারা বাংলায় যে হরতালের ডাক দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এদিন ট্রাম-বাস, ট্রেন-প্লেন ইত্যাদি কিছুই চলেনি। দোকানপাট, অফিস কাছারি খোলেনি, বন্দর থেকে একটি জাহাজও ছাড়েনি। স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে এদিন সূর্যোদয় থেকে পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত এই হরতাল প্রতিপালিত হয়।

রবি-সোমের খুনের গড় প্রতি আড়াই ঘণ্টায় একজন। গত চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে দশজন খুন হয়েছেন—দমদমে তিন, বরানগরে দুই, বেলেঘাটা, কাশীপুর, হাওড়া, শ্রীরামপুর এবং ফাঁসিদেওয়ায় একজন করে। এছাড়া, হাওড়ায় একজন ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থীর আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি—ভোট গ্রহণের কয়েকদিন আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের কতকগুলি এলাকায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে চান। ইস্টার্ন এরিয়ার জি ও সি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের জয়েণ্ট সেক্রেটারির উপস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কর্তারা এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি—নির্বাচনের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশ কয়েক হাজার সৈন্য এবং সি আর পি ও বি এস এফ আসছেন। উপদ্রুত জেলাগুলির থানায় থানায়ও সৈন্য মোতায়েন করা হবে। এর আগে সিদ্ধান্ত ছিল যে, ওই-সব জেলায় মহকুমা শহরগুলিতেই সৈন্যবাহিনীর লোকেরা হাজির থাকবেন। প্রয়োজন হলেই তাঁরা গ্রামে যাবেন।

আজ বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে সাতজন "উগ্রপন্থী" বন্দী নিহত হয় এবং ২৩ জন ওয়ারডারসহ ৩৬ জন আহত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে বহরমপুর শহরের পৌর এলাকায় আজ রাতে নয় ঘণ্টা কারফু জারি করেছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি—কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউস স্টাফদের কর্মবিরতি ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র

করে শহরে হাসপাতালে চিকিৎসায় সংকট ঘনিয়ে এসেছে। কারণ ওই ধর্মঘট সমর্থনে পর্যায়ক্রমে শহরের অন্যান্য হাসপাতালেও ধর্মঘট হচ্ছে। জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ হেলথ সার্ভিসের লোক দিয়ে হাসপাতালের কাজকর্ম চালু রাখার এক পরিকল্পনা রাজ্য সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

আদি ও নব—কংগ্রেসের এই দুই গোষ্ঠী ছাড়াও আরও অন্তত ছয়টি কংগ্রেস আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই দলগুলি হল : পশ্চিম বাংলায় বাংলা কংগ্রেস, আসামে জনতা কংগ্রেস, ওড়িশায় উৎকল কংগ্রেস ও জন কংগ্রেস, কেরল কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস। এইসব কংগ্রেস অবিভক্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকেই বেরিয়েছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে কাটোয়ার নব কংগ্রেসকর্মী শ্রীগৌরশঙ্কর দাস খুন হন। তিনি নির্বাচন প্রচারে উদ্যোগী ছিলেন। এর পর বেলা ১১টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত কাটোয়ায় কারফু জারি করা হয়। এদিন রাত্রে কলকাতায় বরানগরে সি পি এম-এর নির্বাচনী অফিসে শ্রীকানাই মজুমদার নিহত হন।

২৭ ফেব্রুয়ারি—কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা আজ থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁরা ধর্মঘট করেছিলেন। আজ সন্ধ্যায় তাঁরা কাজে যোগ দেন। সোমবার থেকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সহ আউট-ডোর ও ইনডোরের কাজ আংশিক চালু হবে বলে প্রকাশ।

আজ হাবড়ায় ছোরা দেখিয়ে কয়েকজন যুবক দুটি বন্দুক নিয়ে পালিয়ে যায়। এদিন বারাসতে কারফু জারি করে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ব্যাপক তল্লাসী চালানো হয়। তল্লাসীর সময় বোমা, বোমা তৈরির মশলা ও তলোয়ার উদ্ধার করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি—আজ সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট-বিরোধী নেতা ও আলিপুর বিধান সভা কেন্দ্রে সি পি আই প্রার্থী শ্রীমণি সান্যাল আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হন। ছুরিকাহত অবস্থায় তাঁকে শেঠ শুকলাল কারনানি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পুলিস এ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ জনকে ধরেছে।

আজ ভোরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে ছাত্র-পুলিসে প্রায় আট ঘণ্টা ধরে লড়াই চলে। পুলিস ৫৯ রাউনড গুলি চালায়। পুলিসকে লক্ষ্য করে বোমা বর্ষিত হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৩০ জন ছাত্র ও ৭ জন পুলিস আহত হয়েছেন। এ সম্পর্কে ১০৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে ৩৬ জন নামকরা নকশাল।

বিদেশী সংবাদ

২২ ফেব্রুয়ারি—পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান গতকাল অসামরিক মন্ত্রীদের বরখাস্ত করেছেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই রাজনৈতিক নেতার দাবি নস্যাৎ করে তিনি ইচ্ছামত পুরোপুরি সামরিক শাসন প্রবর্তন করতে পারেন, ইহা হয়ত তারই পূর্ব প্রস্তুতি।

২৩ ফেব্রুয়ারি—ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টির সদস্যরা ঠিক করেছেন যে, তাঁরা পাক জাতীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগও করবেন না এবং ৩ মার্চ ঢাকায় পরিষদের যে অধিবেশন হচ্ছে তাতে যোগদানও করবেন না। গতকাল করাচিতে ওই দলের এক মুখপাত্র একথা বলেছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি—আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ প্রাদেশিক স্বশাসনের অধিকার ছাড়া অন্য কিছু মেনে নেবে না। আওয়ামী লীগের দু দফা কর্মসূচীতে এই পূর্ণ প্রাদেশিক স্বশাসনের কথা বলা হয়েছে। শেখ পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন : তাঁরা যদি চান—কেন্দ্রের হাতে আরও ক্ষমতা দিতে পারেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই প্রধান নেতা, মুজিবর ও ভুট্টোর মধ্যে অচলাবস্থা চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। মুজিবর পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে পররাষ্ট্র দফতর দিতে নারাজ। পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যিক শোষণের নাগপাশ থেকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি দাবিও করেছেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি—সংবিধান রচনাকল্পে ৩ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন উদ্বোধনের সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে। সামরিক প্রশাসনের এক শীর্ষ নেতা আজ বলেছেন, অসামরিক হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

২৭ ফেব্রুয়ারি—চীন কয়েকটি মারকিন জেট বিমান কেনার জন্য খুবই আগ্রহী। চীন এ সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করেছে এবং মারকিন সরকারের মনোভাবও এ বিষয়ে চীনের অনুকূল। চীন এই বিমানগুলি চায় অসামরিক যাত্রী পরিবহণের কাজে।

২৮ ফেব্রুয়ারি—আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান আজ ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল ক্ষমতাসীন হলে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। পাকিস্তানের নতুন জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগই গরিষ্ঠ দল। আগামী ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা।

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
অতঃপর—	...	৫৩৭
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	...	৫৩৮
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	...	৫৩৯
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	৫৪১
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	...	৫৪৩
রক্তমাখা সিঁড়ি (কবিতা)—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৫৪৬
অনি—শ্রীঅসীম রায়	...	৫৪৭
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	...	৫৫৭
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	৫৬১

বিষয়	লেখক	পাতা
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত		৫৬৯
রক্ত ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়		৫৭১
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দাতিয়েন		৫৭৭
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর		৫৮৩
ঘরে বাইরে—শ্রীমতী		৫৯১
চিত্রপ্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		৫৯৩
ঈশ্বর পৃথিবী, ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী		৫৯৭
আলোচনা—		৬০৩
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক		৬১১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিদেশী বই—		... ৬১৩
পুস্তক পরিচয়—		... ৬১৫
খেলার মাঠে—একলব্য		... ৬১৭
হকি খেলার গোড়ার কথা—মুকুল		... ৬১৯
রঙ্গজগৎ—		... ৬২১
অরণ্যদেব—		... ৬২৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—		... ৬২৮

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীবামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

Clinic
SHAMPOO

Contains: 0.15% 3.4.4
Trichlorocarbanilide

Clears dandruff
from hair and scalp

*০·১৫%৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 2130

০ অধুনা প্রকাশিত কথাসাহিত্যের বই ০

ভুবনেশ্বরী বিমল কর ॥ দাম ৪·০০	**একটি পেরেকের কাহিনী** সাগরময় ঘোষ ॥ দাম ৩·৫০	**অবচেতন** সমরেশ বসু ॥ দাম ৪·০০
অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ বুদ্ধদেব বসু ॥ দাম ৫·০০	**দিনরাতের খেলা** সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ দাম ১০·০০	
দ্বিতীয় প্রেম জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ দাম ৩·০০	**শিব্রামের বারো আড়ি** শিবরাম চক্রবর্তী ॥ দাম ৫·০০	**নিশীথ ফেরী** বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৫·০০
শরদিন্দু অম্নিবাস শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ১৫·০০	**মানুষ** সমরেশ বসু ॥ দাম ৪·০০	**বেলা-অবেলার গান** প্রতিভা বসু ॥ দাম ৬·০০
পিকনিক রমাপদ চৌধুরী ॥ দাম ৫·০০	**দুঃখের বা সুখের জন্য** মতি নন্দী ॥ দাম ৫·০০	**বাসবদত্তা** সুবোধ ঘোষ ॥ দাম ৪·০০
মৃত ও জীবিত বিমল কর ॥ দাম ৪·০০	**রাজাবদল** বিমল মিত্র ॥ দাম ৭·০০	**দর্শকের ভূমিকায়** আশাপূর্ণা দেবী ॥ দাম ৫·০০
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন শিবরাম চক্রবর্তী ॥ দাম ৪·০০	**সাক্ষী বালুচর** শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০	**রৌরব** বনফুল ॥ দাম ৬·০০
তুমি কে? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ দাম ৪·০০	**আঁধার পেরিয়ে** হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ দাম ৫·০০	**সামান্য-অসামান্য** সুশীল রায় ॥ দাম ৫·০০
গাছের পাতা নীল আশাপূর্ণা দেবী ॥ দাম ৬·০০	**প্রেমিক** মনোজ বসু ॥ দাম ৬·০০	**প্রেম পরিণয় ইত্যাদি** বিমল মিত্র ॥ দাম ৭·০০
পুনর্মিলন বুদ্ধদেব বসু ॥ দাম ৪·০০	**যার যা ভূমিকা** সমরেশ বসু ॥ দাম ৭·০০	**আমরা যেখানে** গৌরকিশোর ঘোষ ॥ দাম ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড
অফিস : ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয়-কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯॥

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯
শনিবার ২৮ ফাল্গুন ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	৩১·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	...	৫৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১৪·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৪৪·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৮৩·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 13, March 1971

অতঃপর

এই লেখা যখন প্রকাশ পাবে ততদিনে ভোট-পর্ব শেষ হয়ে গেছে, নির্বাচনের ফলাফলও আমরা জেনে গেছি। সংসদের নব-নির্বাচনের ফল কী হবে তা এখন থেকে বলা যায় না, এই লেখাটি লেখার সময়ও নির্বাচন চলছে, কোথাও কোথাও শেষ হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও নতুন করে নির্বাচন হচ্ছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দল নব কংগ্রেস এই নির্বাচনকে একরকম বাজিই রেখেছেন বলা যায়, যদি তেমনভাবে জিততে পারেন তবে তো কথাই নেই না হলেও হয়ত তাঁকে আবার আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাব—অবশ্য অন্য কয়েকটি দলের সাহায্য নিয়েই এক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীকে সরকার গঠন করতে হবে। বলা বাহুল্য তাতে সরকারের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হবে।

সংসদের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের আগ্রহ বিধানসভা নিয়ে। বিধান-সভার নির্বাচনের ওপর নির্ভর করছে আমাদের ভাগ্য। বলতে আপত্তি নেই, এই অদ্ভুত নির্বাচনের ফলাফল কী হবে, তার জের টেনে কোথায় কী মর্মান্তিক পরিণতি ঘটবে—আমরা তা আজও বুঝতে পারছি না, অনুমান করতে পারছি না। এই লেখা ছাপাখানায় দেবার আর মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে পশ্চিমবঙ্গের অভূতপূর্ব ভোট-পর্বটি শুরু হবে। এই আটচল্লিশ ঘণ্টা, আমাদের মতন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতন, কেউ জানে না ওই সময়ের মধ্যে এবং ভোটের দিনটিতে কী ঘটতে পারে।

এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখছি তাতে বিমূঢ় বোধ করছি। সারা রাজ্যব্যাপী না হলেও কলকাতা এবং তার আশেপাশে কয়েকটি জেলায় হিংসা ও হত্যার দাপট বেড়ে গেছে। আদি কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম নেতা শ্রীবিজয়া-নন্দ চট্টোপাধ্যায় খুন হয়েছেন গত বৃহস্পতিবার, দমদম কেন্দ্রের আদি কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীপীযূষ ঘোষও নিহত হয়েছেন। তাছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ও বিধানসভার প্রার্থী শ্রীমণি সান্যালও ছুরিকাহত হয়েছেন। কলকাতা কর্পোরেশনের সি পি এম কাউন্সিলার শ্রীরথীন দেবও গত সপ্তাহে ছুরিকাহত হয়েছেন। এছাড়া সাধারণ কর্মী, নির্বাচনের কর্মীও প্রত্যহই কিছু কিছু খুন হচ্ছেন। এমন এক অবস্থায়, নির্বাচন শুরুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এবং নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত কত মানুষের জীবন যাবে কে জানে! জীবনের মূল্যে এমন নির্বাচন নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়।

যাই হোক, নির্বাচন সমাপ্ত হয়ে যাবার পর কী হবে আপাতত সাধারণ মানুষের মনে সে চিন্তাও এসেছে। স্থায়ী সরকার হোক বা না হোক সে চিন্তাও তেমন বড় নয়, তার চেয়ে বড় ভাবনা—শান্তি ও স্বাভাবিকতা। আজ যে কোনো মানুষের প্রথম কামনাই শান্তি। এই অশান্তি, নরহত্যা, বিশৃঙ্খলা, হিংসা আর সহ্য হয় না। কে সরকার গঠন করলেন তা নিয়ে মাথা ব্যথার গরজ যতটুকু তার চেয়েও বেশী গরজ জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসছে এটুকু দেখা। যাঁরা নির্বাচন দাবি করে উদ্বাহু হয়ে নেচেছিলেন সেই রাজনৈতিক দলগুলির মুখের কথা ছিল : রাজ্যের গঠিত সরকারই জনসাধারণের মনে নিরাপত্তার ভাব আনতে পারে, এই অশান্তি হানাহানি খুন-জখম বন্ধ করতে পারে। আমরা বাস্তবিকই আশা করব, এই নির্বাচনের পর যে-সরকারই গঠিত হোক তাঁরা সর্বাগ্রে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। আগে শান্তি শৃঙ্খলা, পরে অন্য কথা। মন্দ লোকে শুনেছি বিশ্বাস করে না, সরকার যেভাবেই গঠিত হোক—এই অশান্তি, খুনোখুনি বন্ধ হবে বা হতে পারে। কারণ সে ক্ষমতা আজ আর সরকারের হবে না। এ'রা নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, সাধারণ মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত এই নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণ করতে যাচ্ছে। সেই ভাগ্য কেমন হবে কে জানে।

[এই বিজ্ঞাপনটি অনুগ্রহ করে পড়ুন]

মনের মুকুলকে শোষক পোকার হাত থেকে রক্ষা করুন

● শোষক পোকা মনের মুকুলের মহাশত্রু। বর্তমান আবহাওয়া শোষক পোকার বংশবৃদ্ধির অনুকূলে। শোষক পোকা মুকুলের রস শুষে খায়। তার ফলে ফুল শুকিয়ে যায়, গুটি কম হয়ে এবং ঝরে পড়ে।

● এই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন এবং এক্ষুনি। বিলম্বে সর্বনাশ অনিবার্য।

কৃষি বিভাগ প্রচারিত এই ধরনের এক সতর্কতামূলক বিজ্ঞাপন আশা করি আপনাদের নজরে পড়েছে। কৃষি বিভাগ অবশ্য আমের মুকুলকে শোষক পোকার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। কারণ মনের মুকুলগুলোকে বাঁচানোর কাজটা তাঁদের আওতার বাইরে।

অথচ আজ কে একথা অস্বীকার করবেন যে পশ্চিম বাংলায় শোষক পোকার আক্রমণে মনের মুকুলই ব্যাপকভাবে উৎসন্নে যেতে বসেছে। সমবেত প্রচেষ্টায় শোষক পোকার আক্রমণ থেকে আমরা যদি মনের মুকুলগুলি রক্ষার জন্য এগিয়ে না আসি, আমাদের মন থেকে যদি শোষক পোকার ঝাড় নির্মূল করতে না পারি, তবে কীটদষ্ট বিকলাঙ্গ আমাদের ভবিষ্যৎ অনিবার্যরূপেই হয়ে দাঁড়াবে শত্রুপীড়িত নিহত মুকুলের শবসরোধী শবদেহের গন্ধে ভরা বীভৎস বিপুল শুধু এক লাশকাটা ঘর।

মনের মুকুলকে শোষক পোকার হাত থেকে রক্ষা করুন। মনে রাখবেন, বর্তমান আবহাওয়া শোষক পোকার বংশ বৃদ্ধির অনুকূলে। ভ্রান্ত বুদ্ধি ও ব্যর্থ নেতৃত্ব বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় বাম-ওঠা যে আবহাওয়ার জন্ম দিয়েছে, সেই আবহাওয়াতেই শোষক পোকার বংশ বৃদ্ধি ঘটছে। এ বড় কঠিন সময়। কেননা শোষক পোকা মনের মুকুলের সব রস শুষে খেয়ে নিচ্ছে। ফল বিকশিত হবার আগেই ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে, গুটি ঝরে পড়ে শবের সংখ্যাই কেবল বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখনও সতর্ক হোন।

আপনার নিজের বর্তমান এবং আপনার পরিবারের মুকুলগুলির ভবিষ্যৎকে রক্ষার জন্য, ভেবে দেখুন, আপনি কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আদৌ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি? অথবা ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন অনুভব করছেন কি? পাশ কাটিয়ে গেলে পার পাবেন না। উটপাখীর মত চোখ বুজে বালুর নিচে মাথা গুঁজেও না। কারণ এ বড় ব্যাপক মহামারী। এ মহামারী বড় মারাত্মক।

আপনি কি নিশ্চিন্ত, আপনি শোষক পোকা দ্বারা আক্রান্ত নন? হিংসা থেকে ভয় এবং ভয় থেকে অন্ধ হিংস্রতা। শোষক পোকায় আক্রান্ত মন এইভাবে লাফিয়ে চলে। হিংসার আশ্রয়ে শোষক পোকার বংশ বৃদ্ধি ঘটে। শোষক পোকা মনের রস শুষে খায়। মুকুলের বৃন্তগুলি অকালে ঝরে পড়ে। সতর্ক হোন, এখনই সতর্ক হোন। শোষক পোকার আক্রমণ থেকে মনের মুকুল রক্ষা করুন।

পরিশীলিত বুদ্ধি, সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং কল্যাণবোধই মনের মুকুলকে শোষক পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে। অবিলম্বে এদের ব্যবহার করুন। এদের উপর আস্থা রাখুন।

মনে রাখবেন, মানুষ এক জটিল প্রাণীয় অস্তিত্ব এবং মানুষের সমাজ জটিলতম সংগঠন। মানুষ একই সঙ্গে উৎকর্ষন এবং আত্মহননের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মানুষের মনে সৃষ্টি ও ধ্বংস এই উভয়ের বীজই উপ্ত। মনের রসই মানুষকে সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয়। মনের রস শুকিয়ে গেলে মানুষ ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়ে ওঠে। শোষক পোকা মনের রস শুষে খায়। তাই শোষক পোকা এত মারাত্মক। শোষক পোকার আক্রমণ থেকে মনের মুকুলগুলি রক্ষা করুন।

মানুষ সমস্যা মেটায়, আর এক সমস্যা মেটাতে গিয়ে শত সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ে। আজ যে বিপ্লবী, জনগণের নেতা, আগামীকাল জনতার আদালতে তার মাথা কাটা যায় জনবিরোধী হবার অপবাদে। মানুষের জীবন কাজের মূল্যায়নে আজ আর আগামীকালে কী দুস্তর ফারাক!

ইতিহাসের নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিকতার এমন অজস্র সাক্ষ্য পাতায় পাতায়। রোমক সভাসদ স্পুরিয়াস ক্যাসিয়াস ভিসেলিনাস সাধারণ মানুষকে জমির মালিক করে দিতে চেয়েছিলেন। আবার সেইসব মানুষই তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিল। সভাসদ স্পুরিয়াস মেলিয়াস ক্ষুধার্তকে রুটি পাবার অধিকার দিতে গিয়েছিলেন। আবার সেইসব লোকেরাই তাঁর প্রাণদণ্ড দিল, কারণ তাঁদের তৎকালীন মতে মেলিয়াস সম্রাট হবার চেষ্টা করেছিলেন। সভাসদ মরকাস ম্যানলিয়াস ভোর রাত্রে রাজহংসের কলরবে ঘুম থেকে উঠে দেখেন রোম আক্রান্ত। প্রাণপণ লড়াই করে তিনি রাজধানীকে রক্ষা করেছিলেন। আবার সেই রোমক নাগরিকগণ তাঁকে পরে বিশ্বাসঘাতক অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছিল। এমন কি কার্থেজের প্রাণপুরুষ মহাশূর হ্যানিবলকেও কার্থেজ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং প্রাসাদ ভেঙে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের বীর জননেতা রোবসপীয়েরের মুণ্ডু ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল প্যারিসের বিপ্লবী জনতারই হাতে। এমন কি মহান স্টালিন, হায়, কবরে শুয়েও তিনি লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পেলেন না! আজ ও আগামী কালে কত তফাৎ!

অতএব পরিণতি যখন এই, তখন শুধুমাত্র আজকের লড়াই ফতে করার জন্য কেন এই নিরর্থক এক উদগ্র অহমিকাকে প্রশ্রয় দেওয়া? কেন পেশীশক্তির উপর এত আস্থা?

এটা তো জানা কথা, মানুষের জটিলতম সংগঠন যে সমাজ তার কোনও সমস্যাই আজ পেশী শক্তির উপর নির্ভর করে করা যায় না। মানুষের সৃজনী প্রতিভাই তাকে অগণিত সমস্যার —যা তার নিজেরই সৃষ্টি— জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মনের মুকুল ঝরে পড়লে মানুষের সৃজনী প্রতিভাও ঝরে পড়ে। কারণ এই সৃজনী প্রতিভাই তো মনের মুকুল। মনের মুকুলকে শোষক পোকার হাত থেকে রক্ষা করা তাই এত জরুরী।

দায়িত্ব

এ তদিনে ভোটের ফলাফল বেরিয়ে গিয়েছে। লোকসভারও, বিধানসভারও। দিল্লিতে কে বা কারা ক্ষমতা পেলেন সেটাও যেমন আপনি আমি এতদিনে জেনে গিয়েছি, তেমনি জেনেছি রাইটার্স বিল্ডিংস কার দখলে গেল।

আজকে অর্থাৎ যখন লিখছি তখনও কিন্তু জানার কোনও উপায় নেই ১৩ মারচ অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল—নেতারা এবং দলগুলি কে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন তবে, যিনিই যেখানে গিয়ে পৌঁছান ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু সেইখানেই থাকবে। আজ ৭ই মারচ যেখানে আছে ছয়দিন পর ১৩ই মারচও সেইখানেই থাকবে।

থাকবে এই মানুষগুলিও, থাকবে এই সব সমস্যাও। ভোটে রাতারাতি কর্তা পাল্টালেও দেশ পাল্টায় না—সমস্যাগুলিও চট করে মিটে যেতে পারে না।

যাঁর বা যাঁদের হাতেই কর্তৃত্ব থাক—পরিবর্তন হোক আর নাই হোক—এই দেশ, এই রাজ্য চালাতে গেলে দেশের মানুষের কথা, দেশের সমস্যার কথা তাঁকে বা তাঁদের ভাবতেই হবে। সেগুলি সমাধানের চেষ্টা তাঁকে বা তাঁদের করতেই হবে।

একটা সময় ছিল যখন এদেশের মানুষও ধীরে ধীরে এগোবার জন্য অপেক্ষা করতেন। আস্তে আস্তে কর্তৃপক্ষ এগোচ্ছে দেখলেও সাধারণ মানুষ তেমন বিচলিত হতেন না। এখন আর সেদিন নেই। এখন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এগোচ্ছেন না দেখলে মানুষ চুপচাপ বসে থাকবে না। বসে থাকবে না ঘটনা প্রবাহও। দ্রুত তালে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সে করবেই।

তাই যিনিই ক্ষমতা পান—দিল্লিতে এবং কলকাতায়—দ্রুত তালে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে। শুধু মুখের কথায়, শুধু প্রতিশ্রুতিতে আর চলবে না। মুখের কথা এবং প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতেই মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গিয়েছে—সরকারী এবং বিরোধী নেতাদের কথা শুনতে শুনতেই দেশে নতুন প্রয়োজনের তাগিদ জেগেছে। এবং, সেই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে হতাশা।

এই হতাশ মানুষগুলি আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে রাজি হবেন না। তাঁরা সবাই না এগিয়ে এলেও অনেকেই এগিয়ে এসে ধাক্কা দেবেন।

কীভাবে সে ধাক্কাটা আসবে, কতটা জোরে সেই আঘাত এসে লাগবে সেটা ভিন্ন কথা। আসল কথা হল, সাধারণ মানুষ এখন আর খুব বেশিদিন অপেক্ষা করে বসে থাকতে রাজী হবেন না, ঘটনা প্রবাহও

কোনও দীর্ঘসূত্রী কর্তৃপক্ষের জন্য বসে থাকবে না।

*

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির কথাই ভাবা যাক।

প্রথমেই ধরুন এই দাঙ্গাহাঙ্গামার, এই খুনোখুনির ব্যাপারটা। যিনিই ক্ষমতা পান, যাঁর হাতেই শাসনদণ্ড ...—যদি অবিলম্বে এই জিনিস থামাবার জন্য অগ্রসর না হন যদি দু-তিন মাসের মধ্যে একে আয়ত্তের মধ্যে আনতে না পারেন তাহলে এর ধাক্কায় ঘটনা প্রবাহ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখন আমরা কেউই বুঝতে পারছি না।

ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। যে যাই বলুন, এই খুনোখুনির সঙ্গে এখন রাজনৈতিক আদর্শ বা কর্মসূচীর সম্পর্ক খুব কম। এখন যেটুকু আছে পরে তাও থাকবে না। সব একাকার হয়ে যাবে। রাজনীতির সামান্যতম সম্পর্কও আর থাকবে না। থাকবে শুধু খুনোখুনি, মারামারি—আসবে সবরকমের ক্রাইম। চক্রবৃদ্ধি হারে ক্রাইম বাড়বে। কারণ, সেইটাই তার ধর্ম।

ইতিমধ্যেই দেখুন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কতটা মস্তান-নির্ভর হয়ে উঠেছে। সাধারণ সুস্থ নম্র প্রকৃতির লোকেরা রাজনীতি থেকে কত দূরে সরে গিয়েছেন। এখনও অবশ্য নেতারা আছেন। মস্তান-নির্ভর রাজনীতি আর বেশি দূর এগোলে মস্তান ছাড়া আর কেউ নেতাও হতে পারবেন না।

এই খুনোখুনি, এই হাঙ্গামার পরিবেশ বড় বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের প্রত্যক্ষভাবে তেমন স্পর্শ না করলেও তাঁরাও আতঙ্কিত। তাঁরাও পালাই পালাই করছেন। ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ছোট ছোট কলকারখানা, ছোট ছোট দোকানদার, দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ এই হাঙ্গামার অনিশ্চয়তায় শেষ হয়ে যাচ্ছেন। টাটা-বিড়লা-সিংহানিয়া পশ্চিম বাঙলা ছেড়ে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু এরা পারবেন না। এরা শেষ হয়ে যাবেন। ইতিমধ্যেই অনেকের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে।

এর ফলে যে শুধু এঁরা মরবেন তাই নয়, মরবে আরও বহু বহু সাধারণ মানুষ। অর্থনৈতিক সংকট অনেককেই গ্রাস করবে। বহু হাজার মানুষ বেকার হবেন। বহু সহস্র পরিবারের অন্ন মারা যাবে।

খুনোখুনি কম হলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে—এমন কথা বলছি না। তবে, এটা ঠিক যে ... হাঙ্গামা, খুনোখুনি, অনিশ্চয়তা ... থাকলে অর্থনীতি দুর্বল হতে বাধ্য।

যে কোনও একটা কিছু ... বন্ধ হলেই তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয় ... যেমন ধরুন যদি কলেজ স্ট্রীটে হাঙ্গামা হয় তাহলে ওই অঞ্চলের ... পড়ের দোকানগুলো, বইয়ের দোকানগুলি ... বিতরণকারীর দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যায় ... তাতে শুধু যে ওখানের দোকানদাররাই ক্ষতিগ্রস্ত হন তা নয়; ক্ষতিগ্রস্ত হন বিভিন্ন এলাকার আরও বহু

লোক। কাপড়ের দোকানগুলির বিক্রি বন্ধ থাকলে তার ধাক্কাটা গিয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতির উপরও। বইর দোকানে বিক্রি না হলে তার ধাক্কা গিয়ে পড়ে প্রেসে এবং দফতরীখানায়। তরিতরকারীর দোকানগুলি বন্ধ থাকলে তার ধাক্কা গিয়ে পড়ে চাষীর উপর, পাইকারের উপর, ঠেলাওয়ালা এবং মুটের উপরও।

কলেজ স্ট্রীটের একটা বোমার ধাক্কা কত দূরে গিয়ে পৌঁছতে পারে ভেবে দেখুন।

পশ্চিমবঙ্গের একটা বিরাট সমস্যা হল বেকারী। গ্রামের বেকারী, শহরের বেকারী, শিক্ষিতের বেকারী, নিরক্ষরের বেকারী। লক্ষ হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার। এই বেকারী দূর না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি আসতে পারে না।

এই সমস্যা রাতারাতি দূর করা যাবে না। সময় লাগবেই। কিন্তু সময় লাগবে বলেই কেউ যদি মনে করেন যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বেকার বছরের পর বছর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। খুব দ্রুত কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। ২০ টাকা বেকার-ভাতা দিয়ে কিছু অপদার্থ সৃষ্টি করা নয়, গড়ে অন্তত দেড়শ টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীল কাজে এবারে লাগাতে হবে। তার জন্য উপার্জনশীলদের কাছ থেকেও বাধ্যতামূলকভাবে কর নিতে হবে। সেই টাকায়ও বহু বেকারকে উৎপাদনশীল কাজে লাগানো যাবে। তাতে উৎপাদন বাড়বে। অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। এবং সেই অর্থনীতিই আরও নতুন বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

গ্রামের বেকারীও ভয়াবহ। একদা জমির উচ্চতম সিলিং আরও নামিয়ে আনতে হবে। এবং নিঃস্বদের জন্য সমবায় চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের শুধু আধ বিঘা, এক বিঘা জমি দিলেই হবে না। কারণ, চাষ করতেও পয়সা চাই। সে পয়সা গ্রামের গরীবদের নেই। গ্রামের সম্পত্তিসম্পন্নরাও সেই পয়সা নিঃস্বদের দেবেন না। তাই, সমবায়ের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে। এই সব সমবায় অন্যান্য কাজও তাঁদের দিতে পারবে। তাঁরাই গ্রামের বেকার।

*

আশা করি পূর্ববঙ্গকে দেখে দিল্লির কর্তাদের এবার কিছুটা চোখ ফুটবে। দিল্লি পশ্চিমবঙ্গকে অবহেলা করছে, দিল্লি পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য দিচ্ছে না, দিল্লি অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে শোষণ করছে —এই অনুভূতি বাঙালীর মানুষের মনে যত বাড়বে ততই তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠবে।

তাই, দিল্লি যদি এখনও সচেতন না হন, যদি এরপরও তাঁদের পূর্বতন নীতি অব্যাহত রাখেন তাহলে দু-এক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবেই। করছি-করব অবস্থা আর এখন নেই।

ইতিমধ্যেই অনেকে এ জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। যে সব বিদেশী পূর্ববঙ্গে ইন্ধন জুগিয়েছেন, তাঁরা এখানেও সক্রিয়।

দিল্লির কর্তৃপক্ষের আর একটা জিনিস জেনে রাখা ভাল, সেনাবাহিনী এবং সি আর পি ও বি এস এফকে যদি বেশি দিন পশ্চিমবঙ্গে অপারেশন চালাতে হয় তাহলেও তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এ ব্যাপারে যা করার তাড়াতাড়ি না করলে তাঁরা পরে ভুগবেন।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

প্রমত্ত পদ্মা

পাকিস্তানে নির্বাচনের ফল যা হয়েছে তা যদি অন্য কোনও দেশে হতো যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে তা হলে সে দেশ বর্তে যেত। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে, যে দল আইনসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, মন্ত্রিসভা গঠন করে দেশ শাসন করার অধিকার তারই। বাকীরা সবাই সরকার বিরোধী দল বলে গণ্য হয়। আবার তাদের মধ্যে যদি এমন কোনও দল থাকে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও রীতিমত শক্তিশালী—আজ না হলেও কাল যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার আশা রাখে—তা হলে তো সোনায় সোহাগা। একদিকে স্থায়ী আর শক্তিশালী সরকার গঠনে কোনও অসুবিধে হয় না, অন্যদিকে প্রবল প্রতিপক্ষ আইনসভায় থাকাতে যা খুশি তাই করতে সে সরকার সাহস পায় না। দেশশাসন পালায় মূল গায়েন ওই দু দলই, বাকী ছোটোখাটো যে সব দল থাকে তাদের গাওয়া না গাওয়া সমান, তাদের শুধু গলা সাধাই সার। তারা গাইলে কী না গাইলে সে খবরও কেউ রাখে না, এক সরকারী নথি ছাড়া।

মুশকিল বাধে যদি সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনে কোনও দলের ভাগ্যেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না জোটে—যদি অনেকগুলো দল কিছু কিছু করে আসন পায়। তা হলে একটি মাত্র দল নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা যায় না—করতে হয় পাঁচটা দল মিলিয়ে একটা পাঁচমিশেলি সরকার। প্রায়ই সে সরকার হয় নড়বড়ে। তার না থাকে বাঁধন, না থাকে ছাদ। বেশীদিন সে সরকার টেঁকে না, মেয়াদ ফুরোবার আগে তাকে বিদেয় নিতে হয়। আবার একটা দল যদি এত বেশী আসন পায় যে অন্যদের বরাতে ছিটে-ফোঁটার বেশী জোটে না তা হলেও বিপদ আছে। তেমন হলে সে দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠে দেশে একদলীয় সরকারের পত্তন করতে পারে চিরদিনের জন্যে। তা না করলেও বল্গাছাড়া ঘোড়ার মতো উদ্দাম হয়ে চলতে পারে সে সরকার। তাতে নাভিশ্বাস ওঠে গণতন্ত্রের। বিপক্ষ দল-গুলোও মরিয়া হয়ে উঠে আইন কিংবা নীতির পরোয়া না করে হিংসার আশ্রয় নিতে পারে সরকারের উচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে। সারা দেশে তখন চলতে থাকে বীভৎস লংকাকাণ্ড। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গণতন্ত্রের আদর্শ।

পাকিস্তানের নির্বাচনে কিন্তু এমন কিছু হয়নি, যাকে বলা যেতে পারে ভাঙনের ইঙ্গিত। বরঞ্চ যা হয়েছে তাতে গণতন্ত্র দিব্যি চালু হওয়ারই কথা। জাতীয় পরিষদে এক নম্বর দল হচ্ছে আওয়ামি লীগ, দু' নম্বর হচ্ছে পিপলস পার্টি। রেওয়াজ অনুযায়ী সরকার গঠন করার কথা আওয়ামি লীগের, আর প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত পিপলস পার্টির। অন্য দেশ হলে হতোও তাই—আওয়ামি লীগের শেখ মুজিবর রহমান হতেন প্রধান মন্ত্রী আর পিপলস পার্টির জুলফিকার আলি ভুট্টো হতেন বিরোধী দলের নেতা। শাসন রথের চাকা তখন গড়গড়িয়ে চলতো, সঙ্গে সঙ্গে শেষ হতো পাকিস্তানে জঙ্গী শাসন। কিন্তু সব ভেস্তে দিলেন ভুট্টো। কেবল বিরোধী দলের নেতা হয়ে তিনি দিন কাটাবেন এমন পাত্র দাম্ভিক আর উচ্চাভিলাষী ভুট্টো নন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়াবই তাঁর ইচ্ছে নিদেন পক্ষে প্রধানমন্ত্রী কী উপপ্রধানমন্ত্রী কিংবা ওই ধরণের কিছু। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তা তো আর হয় না—যদি না আওয়ামি লীগ তাঁর পিপলস পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা কোয়ালিশন অর্থাৎ মিশ্র মন্ত্রিসভা তৈরি করে।
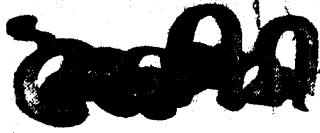
চতুর ভুট্টো শুরু করলেন সাঁড়াশি আক্রমণ। মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জপাতে চাইলেন যাতে তিনি ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে রাজী হন। সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামি লীগের গায়েও কমানের কালো বটিকা লাগালেন যাতে আসলটা পাক না। আওয়ামি লীগ সে তো আঞ্চলিক দল বই কিছু নয়। তাঁর কথা হলো পূব-পশ্চিম মিলিয়ে যখন পাকিস্তান তখন এমন দলেরই সরকার গঠন করা উচিত যার প্রভাব আছে পূবে শুধু নয় পশ্চিমেও—তেমন দল যখন নেই তখন পূবের এক নম্বর দল পশ্চিমের এক নম্বর দলের সঙ্গে মিলে মিশে দেশ শাসন না করলে অন্যায় হবে। তেমন আপত্তি শেখ মুজিবর রহমানের ও প্রস্তাবে থাকতো না যদি আওয়ামি লীগের মূল নীতি পিপলস পার্টি মেনে নিতে রাজী হতো। ভুট্টোর কিন্তু তাতে ঘোর আপত্তি। আওয়ামি লীগের দাবি যদি তিনি ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করেন তা হলে পশ্চিম এতকাল পূবের ওপর যে মাতব্বরি করে এসেছে তা চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে। ক্ষতি হবে তা হলে ভুট্টোর ভাই-বেরাদারদের, যারা এতকাল মুনাফা লুটে এসেছেন পূব পাকিস্তান থেকে আর অধিপত্য করেছেন দেশের প্রশাসনে আর ফৌজে, নৌবাহিনীতে, বিমানবাহিনীতে।

আওয়ামি লীগ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন লড়েছিল পূব পাকিস্তানের মুক্তির দাবিতে। তার কাছে পাকিস্তানের পূব এলাকা পূব পাকিস্তান নয় বাংলাদেশ। পদ্মমরা বাংলার শুকিয়ে-আসা গাঙে জীবনের জোয়ার আনতে চেয়েছেন শেখ মুজিবর রহমান। বড় তাঁর কাছে পদের মোহ নয়, বাঙালীর স্বার্থ। বাংলা আর বাঙালীর স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে দখল করেছেন জাতীয় পরিষদ যেখানে নতুন করে তৈরি হবে পাকি-স্তানের শাসনতন্ত্র। সে শাসনতন্ত্র এমনভাবে গড়ে তুলতে চান মুজিবর, যাতে বাংলা আর বাঙালীর ওপর এতকালের অবিচার ধুয়েমুছে গিয়ে তাদের ওপর সুবিচারের ব্যবস্থা হয়। ভুট্টোর মতো নজর তাঁর গদি নয়, পাকি-স্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আখের গুছিয়ে নেবার মতলব তাঁর নেই। ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা আর মর্যাদার বখরায় তিনি রাজী হবেন কেন? নরম বাঙালীর এই শক্ত মনোভাব দেখে প্রমাদ গণেছেন ভুট্টো একা নয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিজেও। তেসরা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডেকেও তিনি তা বাতিল করেছেন। অছিলা হচ্ছে পিপলস পার্টির সে বৈঠকে গরহাজির থাকার সিদ্ধান্ত। আসলে তিনি যাচাই করতে চেয়েছিলেন মুজিবর রহমানের নাড়ি।

মুখের মতো জবাব দিয়েছে তাঁকে বাংলাদেশ। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে কেবল ঢাকা নয়, পূব বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারে নি ইয়াহিয়া খাঁর পাঞ্জাবী, পাঠান আর বেলুচি ফৌজ। আকাশ থেকে মেশিন গান চালিয়ে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে হাজার হাজার নিরস্ত্র নরনারীকে। বাঙালীর খুনে একদিন যেমন লাল হয়েছিল ক্লাইভের খঞ্জর তেমনই হয়েছে ইয়াহিয়া খাঁর সঙিন। তাতেও কিন্তু দাবিয়ে রাখতে পারা যায় নি বাঙালীর বাঁচার দাবি। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে ইয়াহিয়া খাঁকে। জাতীয় পরিষদের বৈঠক তিনি ডেকেছেন ২৫ মার্চ। কিন্তু পূব বাঙলার বুকে যে দগদগে ঘা খুঁচিয়ে করেছে তাঁর বেপরোয়া ফৌজ, কোনও মলম দিয়ে তা কী তিনি সারাতে পারবেন? তাঁর মনে হয়েছিল বাকাবীর বাঙালীরা বন্দুকের নল আর সঙিনের বাহার দেখলেই ভয়ে যে যার ঘরে ঢুকে খিল দেবে। দেখা যাচ্ছে সে ধারণা একদম ভুল। এক হপ্তা বাংলার জীবনযাত্রা অচল হয়ে গিয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানের নির্দেশে। তাকে অচল করতে পারেনি ইয়াহিয়া খাঁর বুলি আর গুলি। জোর গলায় মুজিবর বলেছেন, তাঁদের মুক্তির আন্দোলন চলবে, যতদিন না তা সার্থক হয়। তার জন্যে কোনও ত্যাগই তাঁদের কাছে বড় নয়।

বার্ষিক [দোল] সংখ্যা

উপন্যাস

বিমল করের
এই প্রেম, আঁধারে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
পরস্ত্রী

বড় গল্প

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব গুহ

বিশেষ রচনা

সরযূবালা দেবীর
স্মৃতির ভুবন

ছোট গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
অঙ্কে মেলে না

সচিত্র বিশেষ রচনা

চণ্ডী লাহিড়ীর
চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা

শ্রী পান্থের

নিজের রাগ নিজে মাপুন

প্রকাশিত হল

বিশেষ রচনা : স্মৃতির ভুবন :
সরযূবালা দেবী

উপন্যাস

এই প্রেম, আঁধারে : বিমল কর
পরস্ত্রী : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বড় গল্প

কেন্দ্রবিন্দু : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
জলছবি : বুদ্ধদেব বসু

ছোট গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বলরাম বসাক, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, হিমানীশ গোস্বামী, বারীন্দ্রনাথ দাশ ॥

প্রবন্ধ

অন্নদাশঙ্কর রায়, কালিদাস রায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, শ্রীপান্থ, পূর্ণেন্দু পত্রী ॥

কবিতা

অজিত দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি ॥

চলচ্চিত্র

আপনি কি কোন ছবি করতে চান ?
এই বিষয়ে : দীনেন গুপ্ত, ইন্দর সেন, লোকেন বসু, দুলাল দত্ত, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, নানা বসু, সোনালী গুপ্ত, শৈলেশ মুখোপাধ্যায় ॥
নতুন দর্শকের জন্য : প্রমোদকুমার লাহিড়ী ॥

খেলা

প্রদীপ ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামী, রূপা মুখার্জি, দীপু ঘোষ প্রভৃতি ॥

বিদেশে (৭)

কলোনের নাম কে না শুনেছে? বিশেষ করে হেন ফ্যাশনেবল মহিলা আছেন কি যিনি কস্মিনকালেও প্রসাধনার্থে ও-দ্য-কলোন—জর্মনের ক্যলনিশ ভাসার—কলনের জল ব্যবহার করেননি। বিশ্বজোড়া খ্যাতি এই তরল সুগন্ধটির। '৪৭১১' এবং 'মারিয়া ফারীনা' এই দুটিকেই সবচেয়ে সেরা বলে ধরা হয়। এ-দেশেও কলোন জল তৈরি হয় কিন্তু ওটা বানাতে হলে যে সাত আট রকমের সুগন্ধি ফুলের প্রয়োজন, তার কয়েকটি এদেশে পাওয়া যায় না—সর্বোপরি 'প্রাক প্রণালী' তো আছেই। বিলেতেও কলোন জলের এতই আদর যে, হিটলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য চেম্বারলেন যখন সপারিষদ কলোন থেকে মাইল বিশেক দূরে গোডেসবের্গ-এর মুখোমুখি, রাইন নদীর ওপারে যে বাড়িতে ওঠেন, তার প্রতি ঘরে কলোন জল, কলোন জলের সুগন্ধ দিয়ে নির্মিত গায়ে মাথার সাবান, দাড়ি কামাবার সাবান, ক্রীম, পাউডার—বস্তুত প্রসাধনের তাবৎ জিনিস—রাখা হয়েছিল। হিটলারের আদেশে। চেম্বারলেন এই সূক্ষ্ম বিদগ্ধ আতিথেয়তা লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানিনে। কারণ তখন তাঁর শিরঃপীড়া তাঁর এ-অভিসার তাঁর দেশবাসী কি চোখে দেখবে। তাঁর আপন ফরেন অফিস যে সেটা নেকনজরে দেখছে না, সেটা তিনি জানতেন, কারণ ইতিমধ্যেই তারা একটা প্যারডি নির্মাণ করে ফেলেছে:

"ইফ এট ফার্স্ট ইউ কান্‌ট সাকসীড
ফ্লা ই ফ্লা ই এগেন।"

বলা বাহুল্য চেম্বারলেন ফ্লাই করে গিয়েছিলেন। আর আমি তো সেই গডেস-বের্গ-এর উপর দিয়ে কলোন পানে ফ্লাই করে যাচ্ছিই। সেই সুবাদে প্যারডিটি মনে পড়ল।

জুরিচে ফ্রিডির সঙ্গে মাত্র কুড়ি মিনিট কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলুম। মনটা খারাপ হয়ে আছে।

কলোন শহরের সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের পরিচয়।

এখান থেকে প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে বন। সেখানে প্রথম যৌবনে পড়াশুনো করেছিলুম। ট্রামে, বাস-এ, ট্রেনে জাহাজে করে এখানে আসা অতি সহজ। আমার একাধিক সতীর্থ কলোন থেকে বন ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করতো। তাদের সঙ্গে বিস্তর উইকএন্ড করেছি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরটাকে দেখেছি।

সে-সব সবিস্তর লিখতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। আর লিখতে যাবোই বা কেন? জর্মন টুরিসট ব্যুরো যদি আমাকে কিঞ্চিৎ "ব্রাহ্মণ-বিদায়" করতো তবে না হয়—"

যদি নিতান্তই কিছু বলতে হয়, তবে প্রথম নম্বর সম্বন্ধে বলি যে, সেটি আপনি চান কি না চান, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। কলোনের বিরাট গগনস্পর্শী গির্জা। প্যারিসে যে-রকম যেখানেই যান না কেন,

জর্মন মাত্রই যে-দেবতার পূজারী—মোটর গাড়ি

এ্যায়ফাল টাওয়ারটি এড়াতে পারবেন না, কলোনের এই কেথিড্রেলটির বেলাও তাই। তবে এ্যায়ফাল স্তম্ভ বদখদ, কিন্তু কলোনের গির্জাচুড়ো তন্বঙ্গী সুন্দরী। যেন মা-ধরণী ঊর্ধ্বপানে দু বাহু বাড়িয়ে পরমেশ্বরকে তাঁর অনন্ত অবিচ্ছিন্ন নমস্কার জানাচ্ছেন।

এ গির্জা আবার আমাদের কাছে নবীন এক গৌরব নিয়ে ধরা দিয়েছে।

বছর দুতিন পূর্বে কলোনবাসী প্রায় শ' দুই তুর্কী ও অন্যান্য মুসলমান ঐ গির্জার প্রধান বিশপকে গিয়ে আবেদন

মডার্ন ইয়োরোপের সর্বত্র

জানায়, "এ-বছরে ঈদের নামাজ শীতকালে পড়েছে। বাইরে বরফ; সেখানে নামাজ পড়ার উপায় নেই। হুজুর যদি আপনাদের এই গির্জের ভিতরে আমাদের নামাজ পড়তে দেন, তবে আল্লা আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।" বিশপের হৃদয়কন্দরে কণামাত্র আপত্তি ছিল না—কিন্তু...? এ শহরের লোক খৃশ্চান। তাদেরই বিত্ত দিয়ে, গরীবের কড়ি দিয়ে এ-গির্জা সাত শ বছর আগে গড়া হয়েছে। এখনো ওদেরই পয়সাতে এ-মন্দিরের তদারকী দেখভাল চলে। সেও কিছু কম নয়। এরা যদি আপত্তি করে? কিন্তু এই বিশপটি ছিলেন বড়ই সন্তপ্রকৃতির সজ্জন। এবং তার চেয়েও বড় কথা: সা হ সী। তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। মা-মেরী সাক্ষিক। তিনি সর্বসন্তানের মাতা।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম। তাঁর কাছে কোনো প্রতিবাদপত্র এল না। খবরের কাগজেও এই অভাবনীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো অভি-

যোগ বেরুলো না। অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!! অবিশ্বাস্য!!!

কিন্তু মার্কিন "টাইম" কাগজে বেরিয়েছে ও বিলেতেও বেরিয়েছে। তারপর সন্দ করে কোন্ পিচেশ!

*

কলোন এ্যারপর্টে নেমে দেখি, দুটো স্যুটকেসের একটা আমার নেই। ছুটে ছুটে দে ছুট,—সেই ঘরের দিকে যে-খানে "হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ" সম্বন্ধে তড়িঘড়ি ফরিয়াদ জানাতে হয়। নইলে চিত্তির। অবশ্য এরা নিজের থেকেই হয়তো দু পাঁচ দিনের ভিতরই আমার বেওয়ারিশ জাদুকে খুঁজে পাবেন, কিন্তু আমি কোন্ মোকামে আস্তানা গাড়বো, তার ঠিকানাটা এদের না দিলে মাল হস্তগত হবে কি করে? সেটা তখন তার মালিককে হারাবে! কোন এক গ্রীক দার্শনিক নাকি বলেছেন, "একই নদীতে তুমি দুবার আঙুল ডোবাতে পারবে না, একই শিখায় দুবার আঙুল পোড়াতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে।" মানলুম। কিন্তু একই স্যুটকেস নিশ্চয়ই দুবার, দুবার কেন দশ বার হারাতে কোন বাধা নেই। অতি অবশ্য কবিগুরু বলেছেন, "তোমায় নতুন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণেক্ষণ/ও মোর ভালবাসার ধন॥" কিন্তু প্রশ্ন, এটা কি হারানো বাকসের বেলাও খাটে?

আপিস ঘরটি প্রমাণ সাইজের চেয়েও বৃহদায়তন। ভিতরে একটি ফুটফুটে মেম-

জর্মন মাত্রেরই hobby
আমি বলবো উটের পিঠে
কর্তা তুলবেন ছবি

সায়েব বসে আছেন। আমার লাগেজ টিকিট দেখাতেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা খোওয়া যাবে না। কিন্তু বলুন তো, ওটার ভিতর কি কি আছে?"

সর্বনাশ! সে কি আমি জানি? প্যাকিং করেছে আমার এক তালেবর ভাতিজা মুখুয্যে। তার বাপ প্রতি বৎসর নিদেন তিনবার ইয়রোপ-আমেরিকা যেতেন। সে নিখুঁত প্যাকিং করে দিত। আমার বেলা এ-বারে করেছে—নিখুঁততর। কোন্ বাকসে কি মাল রেখেছে কি করে জানবো!

কিন্তু মিসি বাবা সদয়। পীড়াপিড়ি করলেন না। আমার ঠিকানাটি টুকে নিলেন। আর ইতিমধ্যে বার বার বলছেন, "এয়ার ইণ্ডিয়া বলুন, লুফট-হানজা বলুন, সুইস-এয়ার বলুন কোনো লাইনেই কোন লাগেজ খোওয়া যায় না। আপনি পেয়ে যাবেনই যাবেন।"

আমি মনে মনে বললুম, "বটে!" বেরবার সময় তাকে বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে বললুম, "গ্নেডিগেস ফ্রলাইন (সদয়া কুমারী)! একটি প্রশ্ন শুধোতে পারি কি?"

সুমধুর হাস্যসহ, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

আমি বললুম, "তাবৎ হারানো মালই যদি ফিরে পাওয়া যায়, তবে এ-হেন বিরাট আপিস আপনারা করেছেন কেন? আমি তো শুনেছি, কলোন এ্যারপর্টের প্রতিটি ইঞ্চির জন্য দশ বিশ হাজার টাকা ছাড়তে হয়।"

প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই এক লম্ফে দফতর থেকে বেরিয়ে মালসামান নিয়ে উঠলুম বিরাট এক বাস-এ।

*

বাঁচলুম, বাবা, বাঁচলুম। প্লেনের গর্ভ থেকে বেরিয়ে খোলামেলায় এসে বাঁচলুম। বাসটি যদিও পরিপ্রমাণ, সাগর কবিরে গ্রাস হয় অনুমান, তবু চলছে যেন রোলস রইস—রইস খানদানী গতিতে, মৃদু মধুরে। কবিগুরু গেয়েছিলেন, "কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে"— আমি গাইলুম, "বাঁচালে তুমি মোরে ভালো বাস-এর ছায়ে।"

আহা কী মধুর অপরাহ্নের সূর্যরশ্মি। কখনো মেঘমায়ায় কখনো আলোছায়ায়। দু-দিকের গাছ পাতার উপর সে-রশ্মি কভু বা মেঘের ভিতর দিয়ে আলতো আলতো হাত বুলিয়ে যায়, কভু বা রুদ্রদীপ্ত হয়ে প্রচণ্ড আলিঙ্গন করে। ঐ হোথায় দেখছি, বুড়ো চাষা ঘাসের উপর শুয়ে আছে, চোখের উপর টুপি ঢেকে। তার সবুজ পাতলুন যেন ঘাসের ঝিলিমিলির সঙ্গে "একতালে যায় মিলি।" এদেশের নবান্ন হতে এখনো বেশ কিছুদিন বাকি আছে। চতুর্দিকে অল্পবিস্তর ফসল কাটা হচ্ছে। আজ রবিবার। রাইন-ল্যাণ্ডের লোক বেশির ভাগই ক্যাথলিক। তাদের অধিকাংশই সেদিন সর্বকর্ম ক্ষান্ত দেয়। তাই ক্ষেত খামারে তেমন ভিড় নেই। ...আমিও মোকামে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। ইংরিজিতে প্রবাদ "এ সিনার হ্যাজ নো সনডে।" "পাপীর রবিবার নেই।" আমি তো তেমন পাপিষ্ঠ নই॥

রক্তমাখা সিঁড়ি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চেয়েছি নতুন দিন,
স্নানসিক্ত পৃথিবীর নতুন মহিমা
মানুষের মত বেঁচে থাকা যেন মনুষ্য জন্মেই ঘটে যায়
বঞ্চনা শব্দটি যেন
অচেনা ভাষার মত মুছে করে
এ জীবন আনন্দের, চতুর্দিকে হাহাকার মুছে যে রকম স্নিগ্ধ সুখ—
কখনো আনন্দ হয় ফুল ছিঁড়ে,
অপরের অন্ন কেড়ে নয়
চেয়েছি নতুন দিন, শ্রেণীহীন, স্পর্ধাহীন, বিশুদ্ধ সমাজ
যখন মুখোশে আর
লুকোবে না মানুষের মুখ
শস [illegible] ণিজ্যে সব লোভের করাল দাঁত ভাঙা
কুটি [illegible] ষড়যন্ত্রী শৃঙ্খলিত
পৃথিবীর সব জননীর
বুকে [illegible] শিশুরা রবে নিরাপদ একাকিত্বে কিংবা জনতায়
স্বপ্নের শব্দের মুক্তি—
ভালোবাসা মিশে যাবে দিগন্ত দেয়ালে
চেয়েছি নতুন দিন গ্লানিহীন যৌবরাজ্য সৃষ্টিতে স্বাধীন।

চাইনি এমন ঘোর কালবেলা, অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা
হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার
কণ্ঠরুদ্ধ দিনরাত্রে এত হিংসা বিষ
প্রদীপ জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে মুখ দেখাদেখি
চাইনি শ্মশান-শান্তি,
চাইনি পিচ্ছিল গলিঘুঁজি
সবাই [illegible] তবু কোথায় যাবে তা ভুলে পথে মারামারি
চাইনি অস্ত্রের রোষ,
শত্রু ভুলে নেশাগ্রস্ত মারণ উল্লাস
বিবেকের ঘরে চুরি, স্বপ্নের নতুন দিন ধুলোয় বিলীন
চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত,
আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন
এতে কার জয়
রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনো স্বর্গেও যাবো না!

'তোমরাই বলতে না বাবা, বাংলা দেশের রেনেসাঁটা বোগাস?' ,

এইরকম একটা কথা বোধ হয় অনি আমাকে বলতে চায়। কিন্তু আমাদের সংলাপে বেশির ভাগ সময় কারো ঠোঁট নড়ে না। কারণ ঠোঁট নড়লেই সংলাপ বন্ধ হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ঠোঁট নড়লেই সে যে আমার রক্তমাংস অস্থিমজ্জার অংশ সেই সচেতনতা যা মৌনে প্রকট তা হারিয়ে যায়। আর আমি এই দুর্লভ সংলাপকে কথা বলে নষ্ট হতে দিতে চাই না। অনি-র পাতলা গোঁফের পাশে একটা চাপা প্রায় সর্বক্ষণ সদাজাগ্রত হাসিটার দিকে চেয়ে আমি মৌনে বলি, 'কিন্তু বিদ্যেসাগরটা? ওটা বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যাই বলো বাপু।'

দিন সাতেক আগে বিদ্যেসাগর প্রসংগ অনি-র মা তুললে অনি বলেছিল, 'বিদ্যে-সাগরের চুষিকাঠি দিয়ে কদ্দিন মা ঘুম পাড়িয়ে রাখবে?' সেই জবাব আবার তার কচি গোঁফের ফাঁকে হাসির মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। আমি এতক্ষণ পর একটু নড়েচড়ে বসি। গলা ঝাড়তে ঝাড়তে এই মৌন ইন্দ্রজাল ছিন্ন করার চেষ্টায় বলি, 'তোর সর্দিটা সেরেছে?'

অনি অপ্রস্তুতভাবে হাসে। তার কালো বিষণ্ণ চোখ দুটো আমার দিকে মেলে হঠাৎ বলে, 'তোমাদের উনিশ শো আটচল্লিশটা—যখন তোমরা সশস্ত্র বিপ্লব করতে রাস্তায় নেমেছিলে—আর আজকের মধ্যে অনেক ফারাক। তখন তোমাদের পেছনে কেউ ছিল না, আর এখন সমস্ত পৃথিবীর মেহনতী মানুষ আমাদের পেছনে।'

আমি আতংকে আমার ছেলের দিকে চেয়ে থাকি। এর উত্তরে আমি কি বলব তা আমার ঠোঁটস্থ আর তার প্রতিক্রিয়ায় আমার ঘরে আসা যে অনি বন্ধ করে দেবে তাও প্রায় অবধারিত। আমরা দুজন গত এক বছর ধরে এই অন্ধকারে কানামাছি খেলছি, কেউ কাউকে ছুঁতে পারছি না, কেউ কাউকে বোধ হয় ছোঁবার চেষ্টাও করছি না। তার চেয়ে অনি যদি কথা না বলে আমার ঘরে একটুক্ষণ বসে থাকে তা হলে বোধ হয় আমার পিতৃত্বের বুভুক্ষা অনেকখানি মেটে। আমি সরব হতে গিয়েই জোর করে হাই তুলতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মন গজরাতে থাকে, 'বয়স বয়স অনি, বয়স, রক্ত ফুটছে তোর শরীরে। এই রক্ত-কোটি সারা দেশের ছেলেগুলোকে আমি পুষব মণ্ডামিঠাই দিয়ে, তারপর যেই রক্তের তোলপাড় শান্ত হয়ে আসবে, এই তিরিশ পেরোলেই তোদের ছেড়ে দেব। তখন তোদের মন বিচার করবে, বুদ্ধি পরখ করবে, কোন জিনিস মানবার আগে দুবার ভাববি, ঝাঁপ দেবার আগে তাকাবি, আর জীবনের এই মায়ায় অক্টোপাসের শুঁড়ে আবদ্ধ হবি। এই কয়েকটা বছর, এই দশ বারোটা বছর যদি দেশের ছেলেগুলো লাফ দিয়ে পার হয়ে বুড়ো হয়ে যেতে পারত। কারণ বাংলা দেশের তারুণ্য তো কখনই পরিণতি পাবে না, ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে তার জয়ধ্বজা

তো কখনও মিলাবে না সূর্যরাঙা দিগন্তে। তা সব সময় অন্তত ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় থেকেই এক অসমাপ্ত মহত্ত্বের প্রতীক মাত্র। এই অসমাপ্ত মহত্ত্বের শৌর্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে অনি। আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। আমি আর দেখতে চাই নে।'

আমার কথাগুলো যেন অনি বুঝতে পারে। তার পাতলা গোঁফের ফাঁকে আবার তার সাম্প্রতিক ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। আর আমি তার মা-কে বলা আমার সম্পর্কে কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই, 'আসলে বাবা তার নিজের অতীত থেকে বেরোতে পারছে না। কারণ বাবা আর পলিটিকাল এলিমেন্ট নন। বাবা ভাবছে তাদের সময় যেমন পুলিসের মার খেয়ে আন্দোলন গুটিয়ে গিয়েছিল এবারেও তাই হবে। একবারও তাকিয়ে দেখছে না চারদিক। শুধু নিজে কি করেছিলেন এককালে কেবল তারই স্বপ্ন দেখছেন। ওসব কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, ভুলে যাওয়াই ভাল। ওসব অতীত পুজো করে কিছু হয় না। আমরা যুদ্ধ শুরু করেছি, শেষ করব।'

অনির শেষ কথাটা হাতুড়ির মতো আমার মাথায় পড়ে। আমি পলিটিক্স থেকে সরে গেছি সত্যি কথা কিন্তু কোন স্লোগান হৃদয়ে রক্ত সঞ্চার করে, শ্রেণী সংবন্ধ করে নতুন প্রতিজ্ঞায় তা বুঝবার ক্ষমতা বোধ হয় এখনও হারাইনি। অনিদের স্লোগানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে যা আপাত-দৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড্রামার কথা, কিন্তু তার প্রচণ্ড রোখ আমার স্পর্শ করে। এই কথাগুলো যেন শুধু চীৎকার করে না, বস্তুত আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয়। যদি এরকম একটা ব্যাপার হত, আমি চারপাশের কেউ নই, আমি বাঙালী মধ্যবিত্ত নই, আজ জার্মান কিংবা পাঞ্জাবী, তা হলে লোকে যেমন সিনেমায় দেখে তেমনি এই বাংলা দেশের নতুন কাহিনীকে দেখতাম দূরে থেকে, উত্তর ভারতীয় ঔদাসীন্যে হাই তুলে বলতাম, মিলিটারি ডাকলে হয় না? কিন্তু আগুন এত কাছে যে, তার আঁচ গায়ে এসে লাগছে, ঘটনা এখন বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে এখন এমন এক স্বয়ম্ভূতা অর্জন করেছে, এমন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে রোজ প্রাতঃকালে উদিত হচ্ছে খবরের কাগজে যে, বিপ্লবের ইতিহাস ভূগোল যা যৌবনে পড়েছি এবং বহু কাল পর্যন্ত এই মধ্যবয়সী জীবনে স্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে থেকেছি তা সব ভুলতে বসেছি। আমি এখন নিজেই চমকে উঠি নিজের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায়। ছেলেটাকে যখন টেনে বুড়ো বানানো যাবে না তখন বিলেত পাঠানো যায় না, অন্তত দিল্লী, বম্বে কিংবা আহমেদাবাদ। এই সব অপরিণত মস্তিষ্কের চিন্তা অথবা বাহাত্তুরে চিন্তা আমাকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসে আর সঙ্গে সঙ্গে পিতৃত্বের অক্ষমতায় চিড়চিড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অন্তত অনিদের বিপ্লবটা যদি বছর পাঁচেক পরেও আসত আমার রিটায়ারমেন্টের সময় তা হলে বোসবাবুকে হাতেপায়ে ধরে কর্পোরেশনের একটা লাইটিং ডিপার্ট-মেন্টের পোস্টে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। বাপের জায়গায় ছেলে এ ঐতিহ্য অনেক অফিসের মতো আমাদের অফিসেও আছে। কিন্তু পাঁচ বছরে আমাদের দেশের কি চেহারা হবে এই সব ত্রিকালজ্ঞ ভাবনার চেয়েও আমার একটা প্রশ্নই কাঁটার মতো বিঁধে থাকে বুকের মধ্যে, উঠতে বসতে খচখচ করে—ছেলেটাকে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারব তো?

অনি বোধ হয় উঠে পড়বে। আমাদের মানসিক সংলাপ খুব বেশীক্ষণ চালানো যায় না। অন্তত আমার ভাল লাগলেও অনির বোধ হয় আপত্তি আছে। সেও অস্থিরতা বোধ করে। আমিও করি। আমি এবার মুখ খুলি, 'রূপনারায়ণপুর জায়গাটা বেশ, না অনি?'

'বড্ড একঘেয়ে, বড্ড নির্জন। কিছু করার নেই, ঘুমনো ছাড়া। তা ছাড়া আর কিছু দিন থাকা সম্ভব ছিল না। দাদুর ওপর চাপ হচ্ছিল। তুমি বলেছিলে বটে থাকতে, কিন্তু আর বেশী দিন থাকলে বোধ হয় ওদের অসুবিধে হত।'

বিলেতে নয়, রূপনারায়ণপুরে পাঠিয়ে-ছিলাম ছেলেকে, আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই সেখানকার স্টেশন মাস্টার। মাস দুয়েক আগে যখন সামনের বড় রাস্তায় পুলিসের গাড়িতে বোমা পড়ায় একজন পুলিস মরল আর তার তিন ঘণ্টা পর আততায়ী কাছেপিঠে বসে বসে চিঁড়ে-ভাজা খাচ্ছে এই গভীর প্রত্যয়ে পুলিস

এসে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অনিকেও নিয়ে গেল এবং পুলিস লক-আপে তাদের নিয়ে ফুটবল খেলার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ভাঙা অনি ফেরত এল দু'দিন পর। তারপর থেকে ঘন ঘন পুলিসের লোকের যাতায়াত। আমার স্ত্রীর স্নায়ুরোগের সূত্রপাত তখন থেকেই। মাঝরাতে হাওয়ায় দরজার পাল্লা নড়লেই ঘুমের মধ্যে নীহার চেঁচিয়ে ওঠে। আমি মরিয়া হয়ে চিঠি লিখি আমার স্টেশন মাস্টার জ্যাঠার কাছে। জ্যাঠা কোনো বাবাজীর ভক্ত, ভালমানুষ। নির্জনতায় আঁকপাঁক করেন। চিঠি লেখবার কয়েক দিনের মধ্যেই রাজী হয়ে গেলেন।

"আসলে আমি কাওয়ার্ড। আমাদের দরকার আজ মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া, সুগতর মতো। আমি তা পারছি না। সেইটাই তো আসল সমস্যা। আর তোমার কথা শুনলে বাবা হাসি পায়। মানুষ কি কুকুর বেড়াল যে, তাকে দু' বেলা খেতে দিলে আর আদর করে গায়ে হাত বুলোলেই তার সমস্যা মিটে যাবে?'

আমরা এতক্ষণ যে বন্ধুত্বের মৌন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলাম অনি তা দু' হাতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিল। আমরা যে দু'জন বাপ ছেলে দুই সমান্তরাল রেখা ধরে দৌড়চ্ছি কথা বললেই তা একেবারে স্পষ্ট। চুপ করে থাকলে এতদিন একসঙ্গে এতগুলো সকাল-সন্ধে-রাত্রির সান্নিধ্যের স্মৃতি যেন আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ ছাপিয়ে এক গভীর অন্তরঙ্গ পরিবেশ তৈরি করে, সমস্ত বৈরী বোধগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। এমন কি মৌনে বোধ হয় সম্ভাবনাও লুকোনো আছে, একসঙ্গে বেঁচেবর্তে থাকার সম্ভাবনা চুপ করে থাকার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দু'জনের রক্তেই সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অনির আঘাত আমাকে মুখর করে তোলে।

'অনি, তোরা কি একটা মেড-ইন-বেঙ্গল বিপ্লব সৃষ্টি করতে যাচ্ছিস?'

অজান্তে কথাগুলো আমার ঠোঁট ছিটকে বেরিয়ে যায়। কথাটার গুরুত্ব হালকা করার জন্যে আমি টেবিলে রাখা পেন্সিলটা দু'-বার নাচিয়ে দিই।

'মানে?' অনির সেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর মধ্যে আমি আবার বাংলা দেশের সেই তরুণ সমাজকে দেখি যারা এখন অসি ধারণ করেছে। কিন্তু এই হুঁশিয়ারি আমাকে শান্ত করে না। প্রবল অস্থিরতায় আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'মেড-ইন-বেঙ্গল ছাড়া কী বল? কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে আছে যে, ব্যক্তিগত খুনের মাধ্যমে বিপ্লব

স্বরান্বিত হয়? তুই একটা দেশ দেখা— রাশিয়া, চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম?'

'তুমি যা শিখেছো বাবা সেগুলো ভুলে যাও। নতুন বিপ্লব ঘটছে চারপাশে, সেখানে তৈরী হচ্ছে বিচারের নতুন মানদণ্ড। এ সম্পর্কে তো তোমাকে পড়তে দিয়েছিলাম? ভাল করে পড়েছিলে?'

অনির স্থির শান্ত কণ্ঠ আমাকে আরও অস্থির করে তোলে। বস্তুত তা যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ব্যঙ্গ করে, আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বিচার-বিশ্লেষণ এক মুহূর্তে নস্যি বানিয়ে দেয়।

'পড়েছি, পড়েছি। কিন্তু ওগুলো তো সব আপ্তবাক্য। সব ধরে নেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ জেগে উঠেছে, গ্রামে গ্রামে ক্ষেতে খামারে চাষীর মনে শ্রেণীঘৃণা উদ্দীপ্ত। আসলে কি জানিস, তোরা তোদের নিজের মনের মাধুরী দিয়ে তোদের ভুবন সৃষ্টি করছিস। কিন্তু বিপ্লব বস্তুভিত্তিক, বাস্তব অবস্থার ওপর বিপ্লব দাঁড়ায়।'

বলবার শেষে আমার মনে হল আমি একটা দারুণ বলে ফেলেছি। নিজের বিশ্লেষণী শক্তিকে মনে মনে তারিফ করে আমি অনির দিকে তাকাই। কিন্তু অনি যেন এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে কথাগুলো বার করে দিয়েছে। এ কথাগুলো তার কাছে যেন এমন যা নতুন করে ভাবায় না, যা আর পাঁচটা কথার মতো শোনা কথা।

'আসলে তুমি মন দিয়ে পড়নি যে লেখাগুলো দিয়েছিলাম তোমাকে পড়তে।'

এবার আমি আমাদের সন্ধ্যের মৌন ব্রত একেবারে ভুলে যাই। অনির প্রতি কোন আমার কোন দায় নেই, সে শুধু প্রতিপক্ষ মাত্র। চারপাশে যাই ঘটুক যে তাণ্ডব চলুক না, আমাদের একসঙ্গে গত বিশটি বছরের ইতিহাস তা কি লুপ্ত করে দিতে পারে? এই আত্মবিশ্বাস ঝুলে পড়ে এক নিমেষে।

'আমি তো বলছি তোদের একটা প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিক বিপ্লবের নাম করে সবাই যখন নিজের কেরিয়ার করছে তখন তোদের অপরিসীম আত্মত্যাগ...'

একটা হাত শূন্যে তুলে অনি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে, 'এই সব বস্তাপচা কথা, এই সব স্তোকবাক্য আর বলো না। সবাই বলে তাই তোমাকেও বলতে হবে? বিপ্লবটা কি খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ককটেল পার্টি? বিপ্লবে মৃত্যু, ত্যাগ অবধারিত। মানুষ আজ মৃত্যুঞ্জয়ী। সে সুগতের মতো মৃত্যুকে জয় করেছে বলেই বিপ্লব অবধারিত।'

এগুলো অবশ্য সে ঠোঁট খুলে বলে না। কিন্তু আমি ঠিক শুনতে পারি। এইসব কথাগুলো তার মার সঙ্গে হয়। আমার সঙ্গে ঠোঁট খুলে কথা বেশী দূরে এগোয় না। সামান্য এগোতে না-এগোতেই ছেদ পড়ে। এ ব্যাপারে অনি একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। আমার বিচার বিশ্লেষণী মন যখন নড়েচড়ে ওঠে, তখনই সে চুপ মেরে যায়। আর তখন তার মৌন মুখ থেকে তার উত্তরগুলো আমি ঠিক ঠিক শুনতে পাই।

তার হাত-তোলা তীক্ষ্ম সুকুমার শ্যামলা মুখখানার দিকে চেয়ে আমি অবসন্ন বোধ করি। চেঁচিয়ে উঠি, 'অনি অনি, আর একটু সবুর কর। এইরকম আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের ভস্ম করে দিস নে। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয় বছরের পর বছর।'

একটা চাপা হাসি খেলে যায় অনির ঠোঁটের দুপাশে, 'তোমরা যেমন গত বাইশ বছর জ্বালিয়ে রেখেছো।' স্পষ্ট আমি শুনতে পারি অনির উত্তর। আমিও ছাড়বার পাত্র নই, বলি, 'আসলে আমাদের দুর্বলতা আমাদের অক্ষমতার সাফাই গাইছি না সত্যিই দেশ স্বাধীন হবার পর যখন আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে তখনই একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখনই একটা মোড় ফেরার সময় ছিল

তা হলে আজ সারা দেশ জুড়ে, অন্তত আমাদের বাংলা দেশে, তরুণদের এমন মরিয়া হয়ে মাথা কুটতে হত না। ...আমার সেদিনটা বেশ মনে পড়ে। আমরা রাস্তায় নেমে মিছিল করে জেলের তালা ভাঙতে চলেছি, আর সানগ্লাস পরে মেয়েরা ক্রিকেট খেলা দেখতে ইডেন গার্ডেন ময়দানে ভিড় জমিয়েছে, আর আমরা পড়ে পড়ে মার খেয়েছি।'

প্রশান্ত হাসিতে সারা মুখ ভরে যায় অনির। তার আত্মবিশ্বাসের সেই হাসি আমার গালে যেন জুতো বসিয়ে দেয়। 'আর এখন? এখন কী হচ্ছে দেখছো না? সারা কলকাতা এখন মুক্তাঞ্চল হতে চলেছে। মধ্যবিত্ত ন্যাকামির কোন স্থান নেই। রাস্তায় বেরোতেই বারুদের গন্ধ নাকে আসে না? এই পথেই বিপ্লবের দিন এগিয়ে আসছে।'

আমি আড়ষ্টতায় থমথম করি। পঁচিশ বছর আগে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে, সেই দিনগুলো আবার মনের মধ্যে ফিরে আসে। বিপ্লবের পদধ্বনি তখন দিন রাত আমাদের রক্তে বেজে চলেছে। তারপর দু-তিন বছরের মধ্যেই সে জোয়ার যখন চলে গেল, তখন আত্মবঞ্চনার পাঁজরা হাড়গুলো পাঁক ঠেলে উঠে এল। আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী দৌড়ল অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের বস হতে, আর আমি হাত কচলাতে কচলাতে দাঁড়ালাম আমার এক বহু দূর সম্পর্কের মামা, কলকাতা কর্পোরেশানের এক ডেপুটি মেয়রের সামনে। তারপর যে-কোন ঘটনাকেই মার্কসবাদ দিয়ে সমর্থন খোঁজা হতে লাগল। এক সার্বিক আত্মবঞ্চনার ইতিহাসের পাতা আমাদের যৌবনের সামনে খুলে গেল। তার চেয়ে অনিদের ব্যাপারটা কি আরও স্পষ্ট নয়? আরও তাৎপর্যপূর্ণ নয়? এ কি সত্যিই পুনরাবৃত্তি, না পুনর্জন্ম?

আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনি আমার বইয়ের শেলফের দিকে সরে যায়। মার্কস লেনিন স্ট্যালিন মাও সে তুং-এর বইগুলোয় ধুলো পড়ছে। সে অন্যমনস্কভাবে একটা ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে তাকের ধুলোগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে থমকে তাকায়। আমি একবার আড়চোখে তাকাই কোন বিশেষ বই দেখছে। লেনিন, না মাও সে তুং?

'তোমার কি মনে হয় না বাবা, তোমার এই বর্তমান হাত-কচলানো অস্তিত্বের সঙ্গে, সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্যে দরকার হলে দুর্নীতি করে এবং তাকে গালভরা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করে বেঁচে থাকার সঙ্গে এই সব বইয়ের কোনো যোগ নেই? এ সব বই এরকম যাদুঘরে মানায় না, এইরকম মৃত বারবার একই বৃত্তের মধ্যে যান্ত্রিক চংক্রমণের সঙ্গে বিপ্লবের দুকূল জোয়ারের কোনো যোগ নেই। তোমার পঞ্চাশটা বছরে বিপ্লবের জন্যে তুমি যা না করেছো, তার চেয়ে সুগত তার একুশ বছরের জীবনে অনেক বেশী করেছে তার আত্মদানে। সে তার আত্মদানের মারফত বিপ্লবের দাবানল সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। তুমি করেছো তোমার বিশ্লেষণী শক্তি নিয়ে, তোমার ধুলোয় ভরা মার্কসবাদী বই নিয়ে?'

অনি এবার জানলার বাইরে পশ্চিমের আলোর দিকে চেয়ে আছে। বোধ হয় বয়স বাড়ার জন্যেই হোক আমি আজকাল এই পশ্চিমের আলো দেখতে ভালবাসি। আর সেদিকে চেয়ে আমার চোখ আটকে যায়। কলকাতার পড়ন্ত শরতের শেষ বেগনী বাহার যাদবপুরের আকাশে। বেগনীর পাশেই জাফরানী রং ধরেছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আমি আবার নিজের অতীতের দিকে চাই। অনির নিঃশব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে

আসা কথাগুলো আমাকে ওলটপালট করে দেয় ওদের স্লোগানের মতো। সত্যিই কি আমি যাদুঘরে বাস করছি, আমার মার্কসবাদী যাদুঘরে? কারণ সত্যিই তো রাজনীতি মানেই সেই নীতি, যা মানুষকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যায়। বিপ্লবের জোয়ার চলে যাবার পর পাঁকে কাদায় আমরা কি লক্ষ্য হারিয়ে ফেলিনি সেই কাদায় বাড়িঘর দোর বাঁধার চেষ্টা করে? সেই ক্ষয়কে জয় করবার জন্যে মর্মান্তিক পেটি বুর্জোয়া চেষ্টায়? তা ছাড়া আমরা কি করতাম? সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশ্লেষণী শক্তি মাথাচাড়া দেয়। এক সার্বিক আত্মহত্যার পথ উন্মুক্ত করতাম সারা দেশ জুড়ে এবং সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শহীদ হতাম?

আমি পেন্সিলটা হাতে তুলে আবার নাচাতে থাকি নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে। অনি হেসে ফেলে আমার দিকে চায়। এ হাসিতে ব্যঙ্গ নেই, মজা-পাওয়া তরুণের চমৎকার উজ্জ্বল হাসি। আমিও সে হাসিতে যোগ দিই। আমার মনে হয় আমার শরীরের রক্তসঞ্চালন যেন এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বছর দুই আগে সবে কলেজে-ঢোকা অনির রাফ খাতার পেছনে একটা লাইন দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।' 'এটা কার কবিতা রে?' অনি অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'জীবনানন্দ দাশ। নাম শোনোনি?' আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করতে সে মাথা নিচু করে বললে, 'রূপসী বাংলা বইটার নাম। চমৎকার কবিতা'। আমি তখন ভাবছিলাম ঐ লাইনেই তলে তলে হয়তো অনি এগোচ্ছে। আর আমি যদিও কবিতা-টবিতা বুঝি না, তবে তা বিপজ্জনক নয় ভেবে আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু গত দু বছরের রূপসী বাংলার রূপে যেমন পাল্টাতে লাগল, অনির রূপও পাল্টে গেল। অনির সেই চোঁচিয়ে খোলা হাসি লুপ্ত হয়ে গেল। পাড়ার এক চিলতে জমিতে খোলা ড্রেন, ভাঙা ঘুঁটে-লাগানো পাঁচিল আর আবর্জনার গাদার পাশে ক্রিকেট খেলার অসহ্য ছোট মাঠে তার ক্রিকেট-পেটানোও উঠে গেল। তার মুখ ক্রমশ থমথমে গম্ভীর। আর মাঝে মাঝে আয়ত চোখে চুপ করে চেয়ে থাকা। এই চলল। তারপর হঠাৎ থানায় ডাক পড়ল। তখন থানার ও সি ছিল আমার সহপাঠী। জানতাম না। বিশেষ করে নিজের রাজনীতির সঙ্গে এককালে সংস্রব থাকায় ও-পাড়ায় হাঁটতাম না। আমি চিনতেও পারিনি। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ চেহারা বানিয়ে ফেলেছে যে, চেনবার কোনো উপায় ছিল না। চায়ের সঙ্গে এটা সেটা আলাপের পর হঠাৎ বললে, 'ছেলের দিকে একটু নজর-টজর দিস। বাজে দলে মিশছে।' আমি আর ঘাঁটাইনি। চায়ের শেষ চুমুকের স্বাদ বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে আসি। আসবার মুখে আমাকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেবার জন্যেই সহপাঠীটি বললে, 'অবশ্য অনেক সোসিও-ইকনমিক ফ্যাক্টর আছে, আই অ্যাডমিট। তোরাও তো পলিটিকস করেছিস। এখন বুঝতে পারছিস তো, ভায়োলেন্স দিয়ে কিছু হয় না।' মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিছু বলিনি। ভায়োলেন্স ভাল কি মন্দ তা নিয়ে সারা দেশের নেতারা রোজ কাগজ ভর্তি করছেন। আমি কর্পোরেশনের লাইটিং ইন্সপেক্টর, আমি কি বলব? এইরকম আত্ম-বিশ্লেষণে সান্ত্বনা খুঁজি।

কিন্তু গত গ্রীষ্মেও যে অবস্থা ছিল, এখন তা স্বপ্ন এই শরত-শেষে। পাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ এবং সেজন্যে অনির হাজতে মার খাওয়া তাকে তার পন্থা আঁকড়ে ধরতে আরও উদগ্র করে তুললে। তারপর থেকে সে বাড়ির পাট মিটিয়ে দিল। হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভাব হত আর মা-র সঙ্গে দেখা করেই হত অন্তর্ধান। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত রূপ ছিল, যা আমার সঙ্গে তার সম্পর্কে ছিল না। তার মা তাকে বকতেন, গাল দিতেন আবার বুকে জাপটে আদর করতেন। এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড রক্তমাংসের টান ছিল। অনির মা কখনও তাকে ভয় করতেন না, বরং উল্টে

ঠাট্টা করতে ছাড়তেন না। মেয়েদের এই প্রত্যক্ষ শারীরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান খুঁজবার চেষ্টা আমি পাশের ঘরে বসে বসে বুঝবার চেষ্টা করতাম আমার ব্যর্থ মনোরথে। তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল, আমার বাড়ির ওপর আমারই রাজনৈতিক দলের আক্রমণ। যে দলের পতাকার তলায় আমার যৌবনকে দাঁড় করিয়ে একদা রাজপথে নেমেছিলাম, এমন কি এখনও পুরাতন বন্ধুত্বের সূত্রে যে দলের সঙ্গে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে যুক্ত, সেই দলের ছেলেরা গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা-বেলা এল অনির খোঁজে। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, দা, ছোরা, পাইপ গান। বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে এল সেই তরুণ দল, যাদের দাদা-মামার সঙ্গে একদা আমি রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছি। আমি হতভম্বের মতো চেয়েছিলাম সেই আততায়ীদের মুখমণ্ডলের দিকে কিন্তু দেখলাম তাদের একজনকেও আমি চিনি না, তারাও আমাকে চেনে না। আমি এই অদ্ভুত মোলোকামার জন্যে মোটেই তৈরী ছিলাম না। বাইরের চেঁচামেচি হট্ট-গোলে জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ধন্দ হয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার কানের চারপাশ দিয়ে খিস্তির বুলেট ছুটতে লাগল। একজন তরুণ এগিয়ে এসে বললে, 'বেশ তো ভুঁড়ি বাগিয়েছো ঘুষ খেয়ে খেয়ে।' আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'দে না ফাঁসিয়ে।' তারপর প্রবল লাথির ধাক্কায় দরজার একটা পাল্লা ছেড়ে ঝুলতে লাগল। তখন হঠাৎ আমার খেয়াল হয়, অনি এসেছে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে কাণ্ডহীন নর্তকের উল্লম্ফনে আমি ভাঙা দরজা কপাটে ধরে দাঁড়িয়ে থাকি উদ্যত তরোয়ালের সামনে। মনে হল আমি যেন ধড়হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। কারণ সামনে সেই হিংস্র কোলাহল আর সার সার আততায়ীর পলকহীন চক্ষু আমার দৃষ্টি ও শ্রবণের বাইরে। হঠাৎ আগের জন্মে দেখা একটা মানুষের মুখ যেন উঠে এল সেই হিংস্র মুখমণ্ডলের মুখের ওপর। একটা মোটা ভারী আদেশের গলা বেজে উঠল, 'এখানে না, এখানে না। যা করবে বাড়ির বাইরে, এ বাড়িতে না।' তারপর আমার কিছু মনে নেই। বোধ হয় চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। জ্ঞান হলে দেখলাম স্ত্রী আমার মুখেচোখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। অনি বাড়ি নেই।

হঠাৎ আমি আমার আত্মচিন্তার জগৎ থেকে ধড়মড় করে উঠি অনির কাশির আওয়াজে। অনি বোধ হয় উঠছে। আর বেশীক্ষণ বসে থাকা তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

'অবশ্য আমাদের মধ্যেও যে প্রশ্ন নেই

া নয়।' আমি কান খাড়া করে বসি। ানেক দিনের অভুক্ত লোক যেমন হ্যাংলার তো বাড়া ভাতের দিকে চেয়ে থাকে আমি ইভবে চেয়ে থাকি আমার ছেলের দিকে। নি বোধ হয় নীচু গলায় স্বগতোক্তি করে, ়ই যেমন সবাই বলে, তুমি বলো, দেশের াশির ভাগ গরিব মানুষকে নিয়েই প্লব। কিন্তু কি করা যাবে বলো? াদেরকে তো জাগাতে হবে, পথ দেখাতে বে। তোমরা যে পথে গিয়েছিলে, সে পথে া দেখলে, সে পথে খালি মিনিস্টার ওয়া যায়, বিপ্লব আসে না।'

আমি কিছু বলি না। আমাদের মৌন ংলাপের সন্ধ্যায় এইরকম স্পষ্ট সহজ ্খের মুহূর্ত খুব কম। যখন আমাদের াঁট নড়ে ওঠে তখন হয় আমি জ্ঞান দিই ত্তেজিতভাবে নিজের অতীত-বর্তমানের মর্থনে আর অনির কাছ থেকে আসে এক কটা বক্রোক্তি। আমি হ্যাংলার মতো অনির ীক্ষ্ন সুকুমার মুখখানার দিকে চেয়ে াকি যেন তাকে আমি এই শেষবারের মতো খছি। 'এখন এত দূর এগিয়ে যদি কমজোর য়ে পড়ি, আমার সহকর্মীরা আমাকে মা করবে না।' আস্তে আস্তে সে বলে।

'আমি তোকে দিল্লী পাঠিয়ে দেব', াগলের মতো হঠাৎ চীৎকার করে উঠি।

গভীর সহানুভূতিতে আমার দিকে য়ে থাকে অনি কিছুক্ষণ। তার সেই ধীর ়খনির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় ামিই বোধ হয় অনির ছেলে। পিতৃত্বের াভাবিক পরাজয় আমি সেই মুহূর্তে ীকার করি।

অনি বললে, 'তুমি আমাকে বাঁচাতে ারবে না বাবা। রাস্তায় দেখলে পুলিস ুলি করে মারবে, বাড়িতে এলে অন্য াটির লোক চড়াও হয়ে মারবে। আর দি চাকরি-বাকরি করব ভাবি তা হলে ামার বন্ধুরাও ছেড়ে দেবে না। আমার ্নো চেষ্টা করো না বাবা।' অনি উঠে ড়ে। আমি চোখ বুজি। চোখ খুলে দেখি নি চলে গেছে।

তারপর ক'দিন আমি আর কাগজ দেখি া, রেডিও খুলি না। রাজনৈতিক আলাপ যখানেই হয় সেখান থেকে পালিয়ে আসি। ়রকম অবস্থায় লোকে সচরাচর যা করে থা মদ্যপান সে চেষ্টাতেও ত্রুটি ছিল না; ন্তু আমার জ্ঞান এত টনটনে যে, মাল য়ে দুঃখ ভুলে থাকার ন্যাকামিতে আমার া ঘিনঘিন করে। অভিভাবক হওয়ার ায়িত্ব সম্পর্কে অনেক জ্ঞান শুনি, আমার াত্মীয়-স্বজনের কেউ কেউ আমার রাজ- নতিক অতীত ধিক্কার দিয়ে যান। এগুলো ামাকে স্পর্শ করে না। কারণ যে ভবিষ্যৎ নিবর্তনীয় নিয়তির মতো তা থেকে ালিয়ে যাওয়ার সাধ্য তো আমার নেই।

আমার এক হিতাকাঙ্ক্ষী আমার ছেলের মঙ্গলার্থে ছেলেকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার পরামর্শ দেন যাতে তার প্রাণ বাঁচার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু আমি সেই পলায়ন চাই না। সেই পলায়নে সাময়িক সমাধান থাকতে পারে কিন্তু অনি তাতে রক্ষা পাবে না তা আমি নিশ্চিত। বরং আমার সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তো ছাড়া এই অসি হাতে বাঙালী তরুণ তো আমাদেরই উত্তরাধিকার। যারা আজ নেই সেই অসংখ্য তরুণদের বিজয়কেতন তো আজ অনিদের হাতে। আজ যদি অনিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আমার কিছু বলার নেই। অন্তত এটুকু বুঝেছি আমার জ্ঞান দেওয়া সাজে না। জ্ঞান দিতে গেলে রণক্ষেত্রে নামতে হবে, যুদ্ধে যেতে হবে। অনিরা যে সব প্রশ্ন তুলেছে তাকে আপ্তবাক্য দিয়ে ধামাচাপা না দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। সে ক্ষমতা আমার নেই, কারুর আছে কিনা জানি না। তাই চোখ থেকেও আমি অন্ধ কান থেকেও আমি বধির।

সেদিন ভোরেই ফোনটা পেলাম। মর্গ থেকে অনির দেহ খালাস করার অনুমতি পুলিস দিয়েছে। আমি ফোনের জন্যে তৈরী ছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, গলা কাঁপে নি যখন ফোন তুলেই প্রশ্ন করেছিলাম 'পুলিসকে বোমা মেরেছিল অনি?' আর উত্তর না শুনেই দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলাম, 'পুলিসের গুলিতে মরেছে?'

আমার কোন সাড় ছিল না। কারণ এ তো অনির মৃত্যু না, এ আমারও মৃত্যু, আমার সমাজবাদ স্বপ্ন দেখার মৃত্যু, আমার লেনিন স্তালিন মাও সে তুংয়ের মৃত্যু। খালি একটা ব্যাপারে আমি চমকে উঠেছিলাম যখন হাঁক উঠল, 'চোর অনি, চোর অনি— কেউ এসেছেন?' আমি ধড়মড় করে উঠে পড়ি। বরাবর আমার ধারণা ছিল অনির্বাণ মুখার্জীর নাম চেষ্টা করলেও অবিকৃত থাকে, তার ওপরে নাম গড়ে কিংবা হয়ে বানানো মুশকিল। কিন্তু নাম পাল্টানোর এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার তারিফ না করে পারি না। আমার সঙ্গীটি অস্ত্রবিশেষজ্ঞ। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে অনির ক্ষতস্থান দেখে ফিরে এসে বললেন, 'খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে।' কিন্তু নিজের মৃত- দেহের সামনে এলে মানুষের কি কোন বক্তব্য থাকে? আমি ঘাড় ফিরিয়ে খোলা জানলার বাইরে চেয়ে থাকি। ঘুঁটে লাগানো একটা বেঁটে নিমগাছ প্রথম শীতের রোদ পোয়ায়। নীচে এক ফালি হলদে জমিতে দুটো শালিক ঝগড়া করে। অনির রাফ্‌খাতায় অনেক দিন আগে দেখা সেই কবিতার লাইনটা আমার মনে আসে, 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।'

G.E.C.-র এভারেষ্ট পাখা

এত ভাল চলে কেন ?

জি. ই. সি-র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী বলে।

আর শুধু যে ভাল চলে তা’ নয়, দেখতেও অপূর্ব।

জি. ই. সি. এভারেষ্টের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ঃ

* নিঃশব্দে চলে
* বছরের পর বছর ব্যবহারেও পাখার চেহারা নতুনের মত থাকে
* বহু বছর নির্ঝঞ্ঝাটে চলে

স্নিগ্ধ আমেজ আর নিবিড় নরম সুখ উপভোগ করার জন্য চাই জি. ই. সি-র এভারেষ্ট। আপনার ঘরে আজই লাগান।
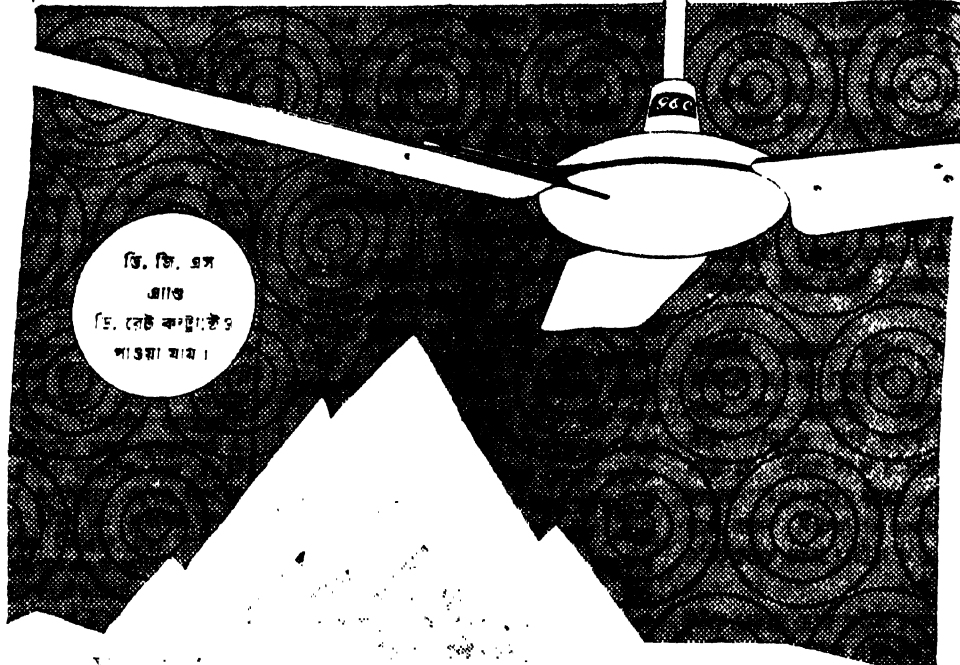
দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কলিকাতা ০ গৌহাটি ০ ভুবনেশ্বর ০ পাটনা ০ কানপুর ০ নিউ দিল্লী ০ চণ্ডীগড় জয়পুর ০ বোম্বাই ০ আমেদাবাদ ০ নাগপুর ০ জব্বলপুর ০ মাদ্রাজ ০ কোয়েম্বাটোর বাঙ্গালোর ০ সেকেন্দ্রাবাদ ০ এর্নাকুলাম

KALPANA G.E.C. 588.B

TRADE MARK G.E.C. PERMITTED USER—THE GENERAL ELECTRIC COMPANY OF INDIA LIMITED

সম্প্রতি বৈদিক ও লৌকিক সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখেছি। এ প্রশ্নও তুলেছিলুম যে মূর্ছনা বা তানের উল্লেখ প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় কিনা এবং সঙ্গীত রত্নাকর এইসব প্রয়োগের উল্লেখ পেলেন কোথা থেকে। উক্ত প্রবন্ধ লেখবার পর মনে পড়ল শতপথ ব্রাহ্মণে যেন "উত্তরমন্দ্রা" মূর্ছনার উল্লেখ দেখেছি। এই রকম উল্লেখ বিস্তৃত বৈদিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও থাকা স্বাভাবিক—খুঁজলে সেগুলি বেরুতে পারে। সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে "বৃহদ্দেশী" থেকে। নিঃশঙ্ক এই রকম আহরণের ব্যাপারেও তেমন শঙ্কার পরোয়া করতেন না। অনেক কিছুই তিনি এদিক ওদিক থেকে নিয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাষার একটু অদল বদল করেছেন, এই যা। সংস্কৃত সাহিত্যে এরকম পরদ্রব্য আত্মসাৎ করবার নমুনা প্রচুর আছে, ভারতীয় ফার্সী সাহিত্যেও কম নেই। গবেষকদের কাছে বোধ করি ব্যাপারটা অজানা নয়। যাই হোক, এখন কথা হচ্ছে বৈদিক সঙ্গীতের গায়নপ্রণালী যদি ভিন্ন ধারা থেকে এসে থাকে তাহলে লৌকিক সঙ্গীতের উদ্ভব হল কিভাবে? কারাই বা একে গঠন করে তুললেন এবং বৈদিক সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ই বা ছিল কতখানি। খুব কঠিন প্রশ্ন সন্দেহ নেই কিন্তু এই ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটন করতে গেলে অনেক ব্যক্তির অনেক সংবাদ পাওয়া যাবে যা রীতিমত চিত্তাকর্ষক।

গোড়াতেই কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লৌকিক সঙ্গীতের ক্রমাভিযানের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের অনেকেই বৈদিক গায়নপদ্ধতিতেও দক্ষ ছিলেন। শুধু দক্ষ নন তাঁরা সামগানেরও ধারক ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতের আদি গ্রন্থকার ভরতমুনি তদীয় গ্রন্থে একশত সহযোগী পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সবাই তাঁর পুত্র ছিলেন না, হয়ত বা বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এঁদের মধ্যে শাণ্ডিল্য এবং বাৎস্য বংশপরম্পরা সামগীতির আলোচনা করেছিলেন। কোহল নিজে সামগানে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং পুত্রানুক্রমে তাঁর পরিবারেও সামগানের আলোচনা চলে এসেছিল। অন্তত তিনজন সামজ্ঞ কোহল-বংশীয়ের নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এঁরা হলেন—মিত্রবিন্দ কোহল, প্রাতরহ্ন কোহল এবং শ্রবণদত্ত কোহল। সঙ্গীত এবং নৃত্যবিষয়ে ভরতের অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে তণ্ডুর নাম করা হয়েছে। ইনিই সঙ্গীত সহযোগে যে নৃত্য কম্পোজ করেছিলেন সেটি তাণ্ডব নামে পরিচিত। কিন্তু এঁর প্রকৃত নাম তণ্ডু কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ বর্তমান। মহাদেবের যিনি সর্বপ্রধান সুবিজ্ঞ অনুচর ছিলেন তাঁর নাম তণ্ডি। নাট্যশাস্ত্রে এঁকে একবার বলা হয়েছে তণ্ডু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে তণ্ডি বা তণ্ডী। তণ্ডু থেকে তাণ্ডব নামের পরিণতি সহজ কিন্তু "তাণ্ডা" নৃত্যও যে না বলা হয়েছে তা নয়। আমার কাছে এসিয়াটিক সোসাইটির যে ইংরেজি অনুবাদ (১৯৫১) আছে তাতে এই নামটি সর্বত্রই "তণ্ডু" বলা হয়েছে এবং উক্ত গ্রন্থের ৬৭ পাতায় ফুট নোটে নিম্নোদ্ধৃত মত প্রকাশ করা হয়েছে:—

Tandu's name does not seem to occur in any extant Purana. It is just possible that the name of this muni has been derived from tandava a non-Aryan word which originally may have meant dance.

কিন্তু এতে তণ্ডু, তণ্ডি, তণ্ডী বা তাণ্ডি এই নাম বৈষম্যের ওপর আলোকপাত করা হয়নি। কাশী সংস্কৃত সিরিজের নাট্যশাস্ত্রে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম দিকের শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে "তণ্ডু", কিন্তু ২৫৭-২৫৮নং শ্লোকে বলা হল—

তণ্ডিনাপি ততঃ সম্যক্ গানভাণ্ড সমন্বিতঃ ॥ (৩৫৭) নৃত্তপ্রয়োগ : সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতিস্মৃতঃ।"

অর্থাৎ তণ্ডি কর্তৃক সম্যকভাবে গানভাণ্ড সমন্বিত যে নৃত্তপ্রয়োগ সৃষ্ট হল সেটি তাণ্ডব নামে পরিচিত। অতঃপর ২৬৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে "দেবেন বাপি সংপ্রোক্তস্তাণ্ডস্তাণ্ডব-পূর্বকঃ"। এটি মহাদেবের উক্তি। তিনি তাণ্ড্যকে গীত সহযোগে তাণ্ডবনৃত্য সম্পাদন করতে বলছেন। পরবর্তী ২৬৬নং শ্লোকে আবার বলা হয়েছে "তাণ্ড্যপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্"। অর্থাৎ "তাণ্ডব" যে তাণ্ড্যকর্তৃক প্রযুক্ত এটি এখানে স্পষ্টভাবে বলা হল। তাহলে আমরা তিনটে নাম পেলুম—তণ্ডু, তণ্ডি (তণ্ডীও হতে পারে) এবং তাণ্ড্য। ভরতমুনিও তদীয় শতপুত্রের মধ্যে তণ্ডু ব্যতীত তাণ্ড্যায়নি, বিতাণ্ডা, তাণ্ড্য এবং বিচক্ষণ (তাণ্ড্য)—এই কটি নামের উল্লেখ করেছেন। এইবার পুরাণ প্রসঙ্গে আসা যাক। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে মহর্ষি তণ্ডির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন; ইনি মহাদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। এঁরই পুত্র তাণ্ডি ছিলেন বেদের সূত্রকর্তা। বিচক্ষণ-তাণ্ড্য নামক ব্যক্তি সামবেদ এবং সামগান শিক্ষা করেছিলেন গর্দভীমুখ শাণ্ডিল্যায়নের কাছ থেকে। গর্দভীমুখ আখ্যা থেকে মনে হয় এঁরা ছিলেন পার্বত্য এলাকার অধিবাসী এবং সম্ভবত শিবপন্থী। যাই হোক, তণ্ডিপুত্র তাণ্ডিই (যিনি সম্ভবত সামবেদীয় তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণের সূত্রপাত করেন) বোধ করি তাণ্ডব নৃত্যের স্রষ্টা এবং তাণ্ডিনৃত্যই এর প্রকৃত আখ্যা হওয়া উচিত ছিল। কাশী-সংস্করণে তাণ্ড্যপ্রযুক্ত যে নৃত্যের কথা বলা হয়েছে সেটি অতি সমীচীন বলেই মনে হয়।

ভরতমুনির অপর দুজন প্রধান সহযোগী ছিলেন নারদ এবং স্বাতি। নারদই নাটকে সঙ্গীতাংশ যোজনা করেন আর তালবাদ্য সংযোগ করেছিলেন স্বাতি। এই নারদ সম্পর্কেও তেমন আলোচনা বা আলোকপাত করা হয়নি। ইনি যে গন্ধর্ব জাতীয় ছিলেন এবং ইনিই যে সামজ্ঞ শিক্ষাকার নারদ এই রকম অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। দেবর্ষি নারদ ভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনি প্রাচীনতর ছিলেন এমন প্রমাণ আছে। ভরতোক্ত নারদের পরিচয়সূত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তিনি কশ্যপের সন্তান। পিতামহ ব্রহ্মার ছয়জন মানস-পুত্রের মধ্যে মরীচি ছিলেন অন্যতম। মরীচির পুত্র কশ্যপ। প্রচেতার পুত্র দক্ষ তাঁর তেরটি কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন কশ্যপের সঙ্গে। এ'দেরই একজন কন্যা ছিলেন মুনি এবং নারদ তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে মুনির ষোলটি ছেলের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন দেবতা আর কেউ কেউ ছিলেন গন্ধর্ব। চিত্ররথ ছিলেন এই রকম একজন গন্ধর্ব। কশ্যপের অপর স্ত্রী প্রধা বা প্রাবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এবং আর একজন স্ত্রী কপিলার গর্ভে জন্মেছিলেন আরও তিনজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব—হাহা, হুহু এবং তুম্বুরু। কিভাবে একই মায়ের সন্তান হিসাবে কেউ দেবতা কেউ গন্ধর্ব হতে পারেন তার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। নারদও কশ্যপের মত বৈদিক মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। বহু মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কশ্যপ মারীচ এবং সেই সঙ্গে নারদ। ইনি পর্বত নামক অপর এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সঙ্গে যুক্তভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলা হয়েছে পর্বত নারদৌ কাণ্ব আবার কোনও ক্ষেত্রে এ'দের বলা হয়েছে—"শিখণ্ডিণ্যাবপ্সরসৌ কাশ্যপৌ"। নারদ যে কাশ্যপ ছিলেন সেটি এ থেকেই ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়। দক্ষের এক কন্যা প্রধা কোনও এক দেবর্ষির ঔরসে অপ্সরাবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। সেই রকম দক্ষকন্যা মুনিও হয়ত ছিলেন ক্ষেত্রজ কন্যা এবং শিখণ্ডিনী নামের সঙ্গে এই দুই ব্যক্তির যুক্ত হবার হয়ত কোনও কারণ আছে যা আমাদের অজ্ঞাত। যাই হোক, গন্ধর্ব নারদ আসলে কাশ্যপ ছিলেন এটি নিশ্চিত। এ ছাড়া নারদী শিক্ষায় কেবলমাত্র কয়েকজন গন্ধর্বেরই নাম উল্লিখিত হয়েছে, যথা—"তুম্বুরুনারদবসিষ্ঠবিশ্বাসম্বাদয়শ্চ গন্ধর্বাঃ"। আসলে নারদী শিক্ষা অতি পুরাতন এবং শ্রুতিরই অন্তর্গত। বহুকাল পরে এটি লিপিবদ্ধ হয়। এই কারণেই এই শিক্ষায় কিছু কিছু অংশ অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন রয়ে গেছে।

স্বাতি সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না; তবে স্বাতি ঔস্ত্রাক্ষি নামক একজন সামবেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন যিনি প্রাতরহ্ন কৌহলের শিষ্য সুশ্রবা বার্ষগণ্যের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা তুলছি এই কারণে যে অনেকে কশ্যপ, নারদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের মাইথলজিকেল বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যাপারটা স্রেফ পৌরাণিক তো নয়, বেদমন্ত্রের সঙ্গে এ'দের যে প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ রয়েছে। যখনই কশ্যপ বলা হয়েছে তখন তার সঙ্গে মারীচ আখ্যাটিও যোগ করা হয়েছে। এই রকম রাজা নহুষ যেসব মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে "নহুষ মানব", অর্থাৎ মনুষ্যরাজ নহুষ। তাঁর পুত্র যযাতির সঙ্গে কিছু মন্ত্র যুক্ত আছে, সেক্ষেত্রে তাঁকে বলা হয়েছে যযাতি নাহুষঃ"। এইগুলি নিশ্চয়ই অলীক আখ্যা নয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি সেটি হচ্ছে এই যে দু-একজন অভিনেতাও বেদ-

মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন—কল্মষ-বর্হিষ শৈলূষি বা সুবেদা শৈলূষি। শৈলূষিক বা শৈলূষি শব্দে অভিনেতা বুঝিয়ে থাকে। এঁরা সম্ভবত প্রখ্যাত অভিনেতা বা তাঁদের বংশসম্ভূত ছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে নাটক যে বৈদিক যুগেও বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল সেটি স্বীকার করতে হয়। আমাদের আচার্যেরা কিন্তু ভরতকে খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর ওদিকে আনতে নারাজ। তাঁরা স্বয়ং ভরত গ্রন্থে যে উক্তি করেছেন তাকে নেহাৎ গালগল্প বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেই উক্তিটি কি সেটি একটু বললে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নাটক যখন হিমাচল সভ্যতায় (অর্থাৎ তথাকথিত স্বর্গলোক) যথেষ্ট প্রচলিত তখন রাজা নহুষ দেবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। তিনি গান্ধর্ব এবং নাট্য পরিদর্শন করে চিন্তা করতে লাগলেন কি করে এইসব প্রয়োগ ভারতে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এর আগে তাঁর পিতামহ পুরুরবার গৃহে উর্বশী নাট্যের কিছুটা প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে ভরতমুনির সঙ্গে আলোচনা করে তাঁকে রাজি করালেন। এরপর কোহল, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ধূর্তিল (দত্তিল) প্রভৃতি মহা প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং অভিনয়কুশল তথা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ভারতে সামাজিকভাবে নাট্য এবং গন্ধর্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

এখন কথা হচ্ছে রাজা নহুষ যিনি বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তিনি কি মাত্র খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্যক্তি? তাহলে তো বৈদিক যুগটাকেও ওই সময়েই এগিয়ে আনতে হয়। শুধু নহুষ নন সমগ্র নাট্য-শাস্ত্রেই এমন বহু ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যাঁরা দেববিৎ মন্ত্রদ্রষ্টা বলে পরিজ্ঞাত। এঁদের মধ্যে অত্রেয়, অঙ্গিরা, গৌতম, বিশ্বামিত্র, উশনা, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, কণ্ব, মেধাতিথি, রৈভ্য প্রভৃতি অনেকেই আছেন। এ ছাড়া নারদ এবং পর্বতের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বস্তুত নাট্যশাস্ত্র উত্তমভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় বৈদিক যুগের বহু লক্ষণ এবং ঋত্বিক বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে আলোচনা করা বাহুল্য বলে মনে করেছেন এবং মাইথলজি বা প্রক্ষিপ্ত বলে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাহ্য করাটা তাঁদের স্বভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী পণ্ডিতেরা যা করেছেন তা যথেষ্ট কিন্তু রাগসঙ্গীতের টেকনিকেল ব্যাপার বা গান্ধর্ব সম্পর্কীয় জটিল বিষয়ের আলোচনা তাঁদের কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি না।

আরও একটি কথা,—এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত The Natya_sastra, Vol II (1961) গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থের অনুবাদক তথা সম্পাদক নারদী শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন (পৃ-২০) :— The fact that it describes the Gandhara Grama in detail (together with its Murchanas) shows clearly that it is much anterior to the NS which ignores altogether this Grama and was written when they became obsolete. লেখক কিন্তু উক্ত গ্রন্থ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেও কোথাও সামান্য উল্লেখ ব্যতীত গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এমন প্রমাণ পান নি [illegible] নারদ লৌকিক সংগীতের আলোচনা করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল সামগানের সংখ্যা চিহ্নগুলির সঙ্গে লৌকিক স্বর-সমূহের সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এই গ্রন্থ বিশেষ ভাবে প্রয়োগধর্মী। ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও উল্লেখই এতে নেই। কিন্তু ভরত যে বার বার বলেছেন, তিনি নারদের সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পূর্বরঙ্গের সংগীত সংযোজনায় বা ধ্রুবা গানে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল—এগুলি কি গণনার মধ্যে আনবার বস্তু নয়? অবশ্য এই গ্রন্থের অধিকাংশ উক্তিকে বা ভরতের বিশেষ বিশেষ উক্তিকে যদি "Interpolated passage" বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর কোনও কথাই ওঠানো যায় না। তা ছাড়া যেহেতু ভরত গান্ধার গ্রামের উল্লেখ করেননি সেহেতু উক্ত গ্রাম পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা—এসব কোনও যুক্তি নয়। ভরত রাগসঙ্গীতের উল্লেখ করেননি কিন্তু রাগসঙ্গীত যে সে সময় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এটি অস্বীকার করা যায় না। তিনি [illegible] প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন [illegible] সেই তিনি প্রধানত [illegible] সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করেছেন।'

এ পর্যন্ত আলোচনাই বোধ হয় এ সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট কেননা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্যের উপর অধিক পীড়ন করাটা সংগত নয়। বৈদিক সংগীতের সম্প্রসার যে কেন তিরোহিত হল এবং উভয় সংগীতে পারঙ্গম ঋত্বিকরা যে কেন লৌকিক সংগীতের প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করলেন—সে সম্বন্ধে আলোচনাটা পরবর্তী কোনও সংখ্যার জন্য মুলতুবী রইল।

শার্ঙ্গদেব

---

৫ সেকেণ্ডে তৈরী হয়
NESCAFÉ
instant
coffee

॥ ৬ ॥

'আপনি শুভেন্দুবাবু?'

'হুঁ।' শুভেন্দু কপাল থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বসল।

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'এঁকে চিনলাম না?'

'কবি বিকাশ চ্যাটার্জি।'

'ও, নমস্কার নমস্কার।'

'নমস্কার।' পকেটে রুমাল ঢুকিয়ে বিকাশ থুতনি নাড়ল।

'এঁরা?'

'এটি নবকিশোর চৌধুরী, ওটি অরুণাভ চক্রবর্তী।'

'হুঁ, এদের লেখাও আমি পড়েছি। খুব ভাল লাগে। আপনাদের সকলের কবিতা আমার ভাল লাগে।'

'বসুন আপনি। দাঁড়িয়ে কেন।' বিকাশের রুক্ষ চেহারায় এতক্ষণ পর হাসির রোদ উঁকি দিতে দেখা গেল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ওদিক থেকে একটা চেয়ার এদিকে টেনে আনল। যুবতী বসল। অরুণাভ নবকিশোরের চোখেও উৎসাহের উজ্জ্বলতা ফিরে এল।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন।'

'পাইকপাড়া।'

'ও, হ্যাঁ।' শুভেন্দুর চোখ বড় হয়ে উঠল। পাইকপাড়ায় দুজনের নামে পদাবলী যায়। হেনা সেন, প্রেমাংশু দত্ত। আপনি অধ্যাপিকা হেনা সেন?'

'হুঁ', হেনা সেন ঘাড় কাত করল, 'কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে। যে জন্য আমাকে এখানে ছুটে আসতে হল।'

'কি বলুন তো?' বিকাশ ঝুঁকে বসল। কাগজ নিয়মিত পাচ্ছেন না? ডাকের গোলমাল হচ্ছে? ছাপার ভুলটুল বেশি দেখেন? না কি কাগজটা আর একটু বড় [illegible] বাড়াচ্ছি না বলে আমাদের ওপর খুশি হতে পারছেন না? বৈশাখ সংখ্যা একটু মোটা হবে, আধুনিক কবিতার ওপর একটা দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হচ্ছে।'

'তাই নাকি।' হেনা সেন চোখ বড় করল। পাখির বাসার মতন গোল গোল চোখ। মুখের ডৌল লম্বাটে, চিবুক পাতলা ছোট, সম্ভবত ঠোঁটের স্বাভাবিক রং লাল। আলগা রং বুলোবার দরকার ছিল না। দুদিক থেকে বেঁকে এসে ভুরু দুটি নাকের ওপর প্রায় জোড়া লাগার অবস্থা, তবু মাঝখানে আলপিনের মতন ফাঁক থেকে গেছে, ফলে মুখের সৌন্দর্য বেড়েছে বই কমেনি। কথা বলার সময় চোখের পাতা একটু একটু কাঁপে। গলার স্বর সামান্য পুরুষালি। 'কবিতার ওপর, আলোচনা আমার খুব ভাল লাগে। না, অভিযোগটা আমার অন্য কারণে। গত সংখ্যায় রামানন্দ সেনের কবিতা দেখতে পেলাম না কেন?'

চারজন নির্বাক স্থির হয়ে রইল। তাদের চোখে মুখে চাপা অস্বস্তি।

'আগামী সংখ্যার পদাবলীতে নিশ্চয় ওঁর কবিতা থাকছে?'

বিকাশ টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিল। নবকিশোর ও অরুণাভ ঘাড় গুঁজে অধ্যাপিকার গোড়ালির কাছে সায়ার সাদা লেসটুকু ফুলের পাপড়ির মতন কেমন একটু একটু কাঁপছে লক্ষ্য করছিল।

'শুনুন।' শুভেন্দু আর ইতস্তত করল না। 'আপনার কাছে গোপন করে লাভ নেই—সম্ভবত রামানন্দ সেনের কবিতা আর আপনাদের পড়াতে পারছি না। আগামী দু এক সংখ্যার পদাবলীতে তো নয়ই, তারপর কি হবে এখনও অবশ্য আপনাকে সঠিক কথা দিতে পারছি না।'

'কেন! যুবতীর মুখের গর্ত একটু সময়ের জন্য গোল হয়ে রইল। পরে নিচের ঠোঁট আলতো করে কামড়ে ধরে কিছু যেন একটা চিন্তা করল। ভুরুর মাঝখানে আলপিনের ফাঁকটুকু কুঁচকোনো চামড়ার ভাঁজের মধ্যে মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেল। 'উনি কি বর্তমানে কলকাতায় নেই?' দাঁতের চাপ থেকে ঠোঁট আলগা হয়ে গেল। 'বাইরে কোথাও গেছেন? তা গেলেনই বা। ওখান থেকে ডাকে কবিতা পাঠাতে

ক্ষতি কি। না কি, কবি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

'হুঁ, অসুস্থ।' শুভেন্দু কিছু বলার আগেই বিকাশ জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'রামানন্দ সেন অসুস্থ, আপাতত লেখাটেখা বন্ধ।'

'তাই নাকি?' হেনা সেনের গলায় উদ্বেগ প্রকাশ পেল। 'অসুখটা কী, অনেকদিন ভুগছেন?'

'মানসিক ব্যাধি।' রুষ্ট হয়ে বিকাশ বলল, 'হুঁ, বেশ কিছুদিন ভুগছেন।'

'হঠাৎ এমন হল কেন?'

'তা কি করে বলব।' বিকাশ ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছিল। 'কার মন কি কারণে বিগড়ে যায় আমরা বাইরে থেকে তা জানব কেমন করে বলুন।'

হেনা সেন চুপ করে রইল।

'পারিবারিক অশান্তি থাকতে পারে, আর্থিক সংকট একটা কারণ হতে পারে, শরীরে কোনো কোনো অসুখ থাকলে তা থেকেও মানুষের মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।' বিকাশ প্রুফের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

'রামানন্দ সেন সত্যি যদি লেখা বন্ধ করে দেন বাংলা সাহিত্যের দারুণ ক্ষতি হবে। আধুনিক কবিতার যে ধারা তিনি—

'শুনুন শুনুন।' শুভেন্দু আর চুপ থাকতে পারল না, মহিলা বড্ড বেশি 'রামানন্দ সেন' 'রামানন্দ সেন' করছে, কাজেই কথাটা না বলা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছিল না। শুভেন্দু ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসল। 'মানুষের মধ্যে যখন ফ্রাসট্রেশন এসে যায়, বিশেষ সে যদি শিল্পী হয়, কবি হয়, তার কাছ থেকে আমরা আর কিছু আশা করতে পারি না। সে ফুরিয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে ধরে নিতে হয়।'

'ফ্রাসট্রেশন! রামানন্দ সেন!' হেনা সেন বিড়বিড় করে উঠল। যেন আকাশের সূর্য ভেঙ্গে আধখানা হয়ে গেছে বা চন্দ্র এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে ধরনের কিছু শুভেন্দু তাকে শুনিয়ে দিল। কথাটা বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে না পেরে মহিলা রীতিমত ফাঁপরে পড়ে গেল। বেশ একটু চুপ থাকার পর আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা, তাঁর ঠিকানাটা কি দয়া করে আমায় দেবেন।' যেন ঠিকানা পেলে অধ্যাপিকা আজই, এখনি রামানন্দ সেনের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে যায়।

অরুণাভ ও নবকিশোর পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল। তাদের ইচ্ছা হচ্ছিল মহিলার সঙ্গে এই ফাঁকে একটা দুটো কথা বলে। কিন্তু যেখানে বিকাশ ও শুভেন্দু বসে আছে, সেখানে আগু বাড়িয়ে কিছু বলতে তারা সাহস পেল না।

মহিলা আবার বলল,—'রামানন্দ সেন—পুরোনো বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন শুনেছি। এখন তিনি কোথায় আছেন আপনারা নিশ্চয় জানেন?'

'না, আমরা জানি না।' বিকাশ চাটুয্যেকে শেষ পর্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠতে হল। 'তিনি তাঁর নতুন ঠিকানা আমাদের দেন নি।'

'সে কি! আপনারা তাঁর বন্ধু, এতকাল তিনি পদাবলী কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আজ তাঁর ঠিকানাটাও আপনাদের কাছে নেই!'

চোয়াল শক্ত করে বিকাশ প্রুফ দেখছিল। শুভেন্দু চুপ থেকে হাতের নখগুলি দেখছিল। অরুণাভ ও নবকিশোর ঘাড় গুঁজে মহিলার গোড়ালির কাছে সায়ার নকশা করা লেসটা নতুন করে দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনি মহিলা উঠে দাঁড়াল। যেন আর বসে থাকা বৃথা।

যেন ইচ্ছা করে এরা ঠিকানাটা দিচ্ছে না এমন একটা চেহারা করে 'আচ্ছা চলি, নমস্কার'— নমস্কার জানাতে অবশ্য এদের কারো দিকে তাকাল না, মোহনবাবুর টাক পড়া মাথাটা দেখতে দেখতে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'আপদ বিদায় হল।' শুভেন্দু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বিকাশ প্রুফ থেকে মুখ তুলল।

'ইচ্ছা করছিল একবার বলে দেই— বউ ঘর ছেড়ে চলে গেছে, রামানন্দর মাথা এখন বিলকুল খারাপ। সে এখন আকাশে বাতাসে চরকির মতন পাক খেয়ে ঘুরছে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁর ঠিকানা বলতে পারে না। আর কবিতা—কেউ কবিতা চাইতে গেলে রামানন্দ কিলিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দেবে।'

'সত্যি, ভাবতেও কেমন লাগে, এতবড় একটা আর্টিস্ট, কী হয়ে গেল!' নবকিশোর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আমি কাল রামানন্দদার স্কুলে গিয়েছিলাম। কদিন ধরে নাকি স্কুলেও আসছে না। আমাদের মতন ওরাও জানে মানুষটা নাকি বেলেঘাটায় আছে, কিন্তু সঠিক ঠিকানাটা কেউ বলতে পারল না।'

অরুণাভ আর থাকতে পারছিল না, চট করে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে শুভেন্দু ও বিকাশের দিকে বাড়িয়ে দিল। দুজনে দুটো সিগারেট তুলে নিতে নবকিশোরের হাতেও একটা গুঁজে দিয়ে অরুণাভ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। 'হুঁ, স্কুলের কেউই রামানন্দর নতুন ঠিকানা জানে না। কাউকে বলছে না।'

'এসকেপিস্ট্। এ ছাড়া আর কি বলা যায় ওকে।' শুভেন্দু নাকের ছিদ্র দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া বের করে দিল। 'লোকের কাছে বলতেও পারছি না আমাদেরই একজন বন্ধু, লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়, এতবড় একটা আর্টিস্ট, এতদিনের সাধনা, যে জিনিস নিয়ে এতকাল যুদ্ধ করে এল, আজ কিনা একটা খুঁটাক বউ-এর কাছে মার খেয়ে সব স্তব্ধ হয়ে গেল।'

'আমার মনে হয় অর্থ কষ্টটাই একটা বড় ফ্যাক্টার হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'

'ভাগ!' বিকাশ ধমক দিয়ে উঠল। নবকিশোর থেমে গেল। 'বলে কিনা মানুষ গাছতলায় বসেও শুনেছি কবিতা লেখে, কাঠের টুকরো চিবিয়ে ছবি আঁকে, তবু তো একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সে চাকরি করত, বউ রোজগার করে— শুভেন্দুর বাবার না হয় গাড়ি বাড়ি আছে, কিন্তু বাদ বাকি সবাই কি আমরা খেটে খাচ্ছি না? আমাদেরও অর্থ কষ্টের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়, তা বলে কেউ কবিতা লেখা বন্ধ রেখেছি—আমি তো আমার ওয়াইফকে রোজ বলি, খাই না-খাই, বাচ্চাগুলো শুকিয়ে মরুক কি বাঁচুক, কবিতা লেখা ছাড়ব না, কবিতা আমার জীবন আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতন, এই জিনিস বন্ধ করলে আমি মরে যাব।' গর্তের ভিতর বিকাশের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

'……পাখির নীড়ের মতন চোখ তুলে ……' গুণগুণ করতে করতে একজন দোকানে ঢুকল। সকলেই চোখ তুলল। কবি অমলেন্দু গুপ্ত। মাথায় ফুলান ফাঁপান বাবরি। হাঁটুর নিচে পাঞ্জাবির ঝুল। ধুতির কোঁচা মাটিতে লুটোয়। পায়ে বার্মিজ স্যান্ডেল। হাতে নস্যির ডিবে। শুভেন্দু হাসল।

'কোথায় আবার পাখির নীড় চোখে দেখে এলেন?'

'এই মাত্র, বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল।'

'মেরুন শাড়ি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' অমলেন্দু উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'শাঁখের মতন সাদা গোলাপী গায়ের রং?'

'হুঁ হুঁ, পায়ে জালিকাটা জুতো।'

'কানে লবঙ্গ ফুল?'

'আরে, সব মিলে যাচ্ছে দেখছি!' অমলেন্দু ধপ্ করে হেনা সেনের শূন্য চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'এখানে এসেছিল নাকি? তবে তো এখান থেকেই বেরিয়েছে।'

'হুঁ, জনালয়ে গেছে এতক্ষণ।' বিকাশ প্রুফের কাগজগুলি গুটোতে লাগল।

'কি ব্যাপার? পদাবলী বেরিয়েছে কিনা খোঁজ করতে?'

'রামানন্দ সেনকে খুঁজতে।'

'তারপর?'

'কোথায় আছেন এখন রামানন্দ, গত সংখ্যায় তিনি লেখেননি কেন, আগামী সংখ্যায় লিখছেন কিনা, কেবল এই সব।'

এক মিনিট গম্ভীর হয়ে থাকল অমলেন্দু। পকেট থেকে সিগারেট তুলে ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে টানল।

শুনেছে, রামানন্দকাব্যুদের স্কুলের আর এক মাস্টার মশাই, রজনী চাকলাদার ভদ্রলোকের নাম, আমাদের লেক প্লেসের কাছাকাছি থাকেন। সেদিন কথায় কথায় রামানন্দ সেনের প্রসঙ্গ উঠতে ভদ্রলোক হাসলেন ঃ মশাই, আপনাদের ঐ কবি বন্ধুটির মাথায় ছিট আছে। আগেও ছিল। ইদানীং জিনিসটা বেড়ে গেছে।

প্রায়ই বলছে স্কুলের চাকরি আর ভাল লাগে না। দুম্ করে একদিন হয়তো ছেড়েই দেব—'

'চাকরি ছেড়ে দেবে!' শুভেন্দু উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই প্রথম তাঁকে রাগ করতে দেখা গেল। 'আপনি চাকলাদারকে বললেন না কেন, এই বাজারে চাকরি ছাড়লে ঐ হাঁদাকান্ত গঙ্গারাম রামানন্দ সেন আর চাকরি জোটাতে পারবে না, উপোসে মরবে, রোজগেরে বউটিও সঙ্গে নেই যে, ঠেকনা দেবে, শ্রীমতী এখন আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে।'

'আহা সে তো বুঝলাম, ওই ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই রয়ে গেছে, আমরা রামানন্দের বন্ধু, আমরা জানি তার মিসেস তাকে কী চোখে দেখত, যেহেতু সে কবিতা লেখে, স্কুলে মাস্টারী করে। মানে পূরবী দেবী আশা করেছিল স্বামী চার হাজার টাকা মাইনের প্রকাণ্ড একটা চাকরী করবে, বাড়ি করবে, গাড়ি হাঁকিয়ে চলবে, সাহেবী চালে থাকবে, তিনিও মেমসাহেবটি সেজে থাকবেন। কিন্তু কিছুই যখন অপদার্থ রামানন্দকে দিয়ে হল না, গোঁসা করে মহিলা নিজেই চাকরীতে ঢুকে পড়ল। সেদিন থেকে রামানন্দর ওপর দুর্ব্যবহার। এবং এর পরিণাম যে একদিন এই হত আমরা যারা রামানন্দর খুব কাছাকাছি ছিলাম, যেহেতু রোজ তার ঘরের অশান্তির কথা এখানে এসে সে বলত, তখনই ধরে নিয়েছিলাম এই ফাটল বড় হতে হতে পরে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছোবে যখন কিছুতেই ওদের দুজনের আর একত্র থাকা হবে না—তা-ই হল। আজ দু মাসের ওপর মহিলা আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে আলাদা আছে, কদিন মতিচ্ছন্নের মতন কাটাল আমাদের বন্ধুটি, দেখাদেখা বন্ধ, চুল কাটে না দাড়ি কামায় না, গায়ে চাদর জড়িয়ে খড়ম পায়ে রাস্তায় ঘোরে, লোকে ভাবল কবি রামানন্দ হিপি হয়ে গেছে—যাই হোক, এসব কথা ঐ চাকলাদার মাস্টার মশাইটিকে বলিনি, বলতে বাধছিল, হুঁ, রামানন্দর মাথায় ছিট আছে, মানুষটা যেন কেমন কেমন—এসব বলার পর হুট করে আমার চাকলাদার কী বলল শুনবেন?'

অমলেন্দু হাসল। 'মশাই, আপনারা রামানন্দবাবুর বন্ধুবান্ধব সবাই শুনি বড় বড় কবি সাহিত্যিক—চেষ্টা চরিত্র করে রামানন্দবাবুকে একটা প্রাইজ-টাইজ পাইয়ে দিন না, আজকাল নাটক নভেল না লিখে লেফ লাইন মিলিয়ে পদ্য লিখছে এমন মানুষকেও তো শুনি আকাদমী রবীন্দ্র পুরস্কার টুরস্কার দেওয়া হয়, হুঁ, তবেই দেখবেন ভদ্রলোকের মনে উৎসাহ-টুৎসাহ আসবে, এক সঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা—আমার তো মনে হয় কবিতা লিখে মানুষটি সুবিধা করতে পারছে না, অথচ ওদিকেই নেশা, তাই এমন পাগলাটে গতিগতি, একটা প্রাইজ পেয়ে গেলে নামধামও হত বউটিও কাটত, দেখতেন একেবারে নর্মাল হয়ে গেছে আপনাদের বন্ধুটি। আমরা সাহিত্য-টাহিত্য করি না, কিন্তু কার মন কী চাইছে একটু আধটু তো বুঝি।'

বিকাশ ছাড়া আর সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। হাসবার পর শুভেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, 'এরা সাধারণ মানুষ, ভাবনা-চিন্তাও সেইরকম, দোষ দেওয়া যায় না।'

কিন্তু নবকিশোর ও অরুণাভর হাসি তখনও থামছিল না।

'হুঁ, রামানন্দবাবুকে পুরস্কার!' গলার শব্দ শুনে সকলে হতভম্ব। যে মানুষ কোনোদিন, এদের এ-সব আলোচনায় যোগ দেবে দূরে থাক, কান পর্যন্ত দেয় না, দোকানে কবিতাপাঠ হচ্ছে কি কবিতা নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, কোনো সাহিত্যিকের প্রশংসা হচ্ছে কি গালিগালাজ করে তার গোষ্ঠী উদ্ধারের আয়োজন হচ্ছে জানতে শুনতে একবার চোখ তুলেও এদিকে তাকায় না, আজ কুড়ি বছর, কেবল হিসাবের খাতায় ঝুঁকে থাকা আর ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার ওপারের ডাস্টবিনটা মনোযোগ দিয়ে দেখা—সেই মোহন পাল পান-দোক্তার রসে ছোপানো ময়লা দাঁত বের করে হি-হি হাসছে। 'রামানন্দবাবুকে প্রাইজ পাইয়ে দেবার পরামর্শ! চমৎকার! একবার যদি ওই মাস্টারমশাইটি আমার দোকানে আসত, তো আমিই বলে দিতাম, রামানন্দ সেন কথাটা শুনলে আপনার পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক কিল বসিয়ে দিত মশাই, ওই খোঁচাভাঙা মানুষটাকে আমরা চিনি, আমরা এত বছর দেখলাম, বলে কিনা পুরস্কার আর অপুরস্কার, নিন্দা আর প্রশংসা, খেদ আর খুশি, বাজে 'আর কথা, কিছু একটা গেরোহিরের মধ্যে আনে কিনা, অষ্টপ্রহর যার কাঁধে কবিতার ভূত চেপে আছে, চিনত শুধু নিজের কলমটা আর খাতাটা—ভুল বললাম শুভেন্দুবাবু?'

সকলেই চুপ। চুপ থেকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। মিথ্যা কি; রামানন্দকে তারা যতটা চিনেছে, মোহন পাল তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম চিনেছে কি, কুড়ি বছর মানুষটা এখানে বসে চা খেয়ে গেছে, কবিতা পড়েছে, কবিতা শুনেছে, কবিতা নিয়ে সকলের সঙ্গে হই-হই করেছে, আবার যখন সময় এসেছে, এই হট্টগোলের মধ্যেও হঠাৎ অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গিয়ে ভারজারে চোখ দুটো রাস্তার দিকে মেলে ধরে, মনে হত কোন্ সুদূরে চলে গেছে। যেন নির্জন নিঃসঙ্গ আকাশে এক ধূসর চিল ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে প্রায় চোখে দেখা যায় না, চেনা যায় না, বোঝা যায় না আর তাকে।

তা হলেও রক্তমাংসের শরীরটা তো এই চেয়ারেই বসে থাকত। সেই মূর্তি সকলের মনে জ্বলজ্বল করছিল। মোহন রেস্টুরেন্টের ধোঁয়া ধরা কালচে ঠান্ডা দেওয়ালের গায়ে সেই ছবি চিরকালের মতো আঁকা হয়ে আছে, চিরকাল না হোক অন্তত যতকাল পরবর্তী গোষ্ঠীর কবিরা এসে এখানে একত্র হবে, কাব্যালোচনা করবে ততকাল তো বটেই। উঁহু, রামানন্দকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনাই যে চলবে না। এবং চারটে দেওয়ালের মতোই মোহনবাবুও এই কবিবাসরের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। কাজেই রামানন্দ সম্পর্কে মোহন পালের মতামতের একটা দাম আছে না! রামানন্দর অভাব মোহন পালের মনে গভীর রেখাপাত

করেছে। তা না হলে মানুষটা হঠাৎ আজ এত কথা বলে! এত আবেগ প্রকাশ করে!

হওয়া না-হওয়া, পাওয়া না-পাওয়া, নিন্দা প্রশংসা, পুরস্কার অ-পুরস্কারের ঊর্ধ্বে ছিল রামানন্দ, হঠাৎ সে আজ এভাবে হারিয়ে গেল! না কি এমন করে হারিয়ে যাওয়া, চোখের আড়ালে চলে যাওয়াই তার ধর্ম, সকলের মধ্যে থেকেও যে একাকী থাকতে পেরেছে, নির্জনতার ধর্ম পরে ভিড়ের মধ্যেও যে বরাবর আত্মরক্ষা করে এসেছে।

তবে এটাই বা কী করে সম্ভব, শুভেন্দুরা তাও চিন্তা করে, মুখে তারা বলছে বটে 'পূরবী'—কিন্তু কিছুই যার কাম্য ছিল না, কোনো বন্ধনকেই যে বন্ধন মনে করত না, মুক্ত আকাশে নিঃসঙ্গ চিলের মতন পাখা মেলে দিয়ে বিভোর হয়ে শুধু ভেসে বেড়ানো যার আনন্দ, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলে তার এই অবস্থা! গুলীবিদ্ধ পাখির মতন কবিতার আকাশ থেকে খসে পড়ল! বসন্তের পুষ্পিত ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে অভিমানী ফুলের ভূতলের কাঁটা ঝোপের অন্ধকারে আত্মগোপন?

অনেক কিছু উপমাই কদিন ধরে শুভেন্দুদের মনে পড়ছে। এবং সব কটাই অস্বস্তিকর, অবাঞ্ছিত! তারা ভাবছে, না না, এমন হতেই পারে না, রামানন্দ ঠিক আসবে, এসে গেল বলে, ঐ যে মোড়ে দাঁড়ান রিকশাটার আড়ালে একটা মানুষকে দেখা যাচ্ছে না? হেলেদুলে থপথপ পা ফেলে এদিকে আসছে। অবিকল রামানন্দর হাঁটা, মাথার আকৃতিটা সেরকম। সামনেটা একটু উঁচু। পিছনটা খাড়া। যেন হঠাৎ ওদিকের হাড়টা সমান হয়ে গিয়ে ঘাড়ের দিকে মাথাটা খাড়া হয়ে নেমে গেছে। না, কোথায়, রিকশার আড়াল থেকে বেরিয়ে মানুষটা মোহন রেস্টুরেন্টের দরজা পার হয়ে চলে গেল। শুভেন্দুরা নিরাশ হল। এই মানুষের মাথার পিছনের হাড় মোটেই খাড়া না, পানের ডাবরের মতন গোল হয়ে কাঁধের দিকে বেঁকে নেমে গেছে। রামানন্দর মতন থপথপ করে হাঁটে বটে, কিন্তু হাতের ঐ মোটা টুসটুসে আঙুলে কোনোদিন কলম ওঠে না, কলমের বদলে কাঁচি। খসখস করে লেপ তোশকের বহর মেপে থান থান কাপড় কাটে। অলকা হোসিয়ারীর শিবানন্দ। রামানন্দর নন্দটাও পিছনে আছে। অন্যদিন হলে শুভেন্দুরা হাসাহাসি করত। আজ তারা গম্ভীর নীরব বিষণ্ণ।

'আমি এই মাত্র নীহার পাবলিশার্স থেকে আসছি।' অমলেন্দু বিড়বিড় করে বলল। শুভেন্দু শুনল, বিকাশ শুনল। চুপ করে রইল।

'হঠাৎ নীহার পাবলিশার্সে কেন অমলেন্দুদা?' উৎসাহের চোখ নিয়ে নবকিশোর প্রশ্ন করল। 'হুঁ, নতুন হয়েছে। ওদের কোনো বই দিলেন বুঝি?'

অমলেন্দু কলেজে ইকনমিকস পড়ায় এবং ফি বছর একটা-দুটো নোট বাজারে ছাড়ে। পাবলিশার পাড়ায় বেশ দহরম মহরম আছে। নবকিশোরের কথা শুনে হাসল। মাথা নাড়ল।

- 'ওরা পাঠ্য বই ছাপে না। গল্প উপন্যা কবিতা।'

'অ, কবিতার বইও ছাপছে। চমৎকার নবকিশোর চোখ বড় করল। 'আপনা এখনো কোনো কালেকশন বেরোয়নি। অথ অনেক কবিতা জমে গেছে। আমাদে পদাবলীতেই তো ডজন দুই ছাপা হয়েছে তাই না? নীহার পাবলিশার্স তা হবে আপনার কবিতার বই ছাপছে। খু ভাল।' খুশি চোখে নবকিশোর অরুণাভ দিকে তাকাল।

'হুঁ, খুব ভাল, কথাটা না শুনেই নাচতে আরম্ভ করলে।' পকেট থেকে সিগারেট বে করল অমলেন্দু। শুভেন্দুকে দিল বিকাশকে দিল, নিজে ধরাল একটা। 'এ ত নতুন প্রতিষ্ঠান, আমার কবিতার বই কোন সাহসে ছাপবে? কলেজে ওরা আমাকে টেলিফোন করেছিল। রামানন্দবাবুর কবিতার বইটা নতুন করে ছাপতে চাইছে।'

'স্বর্ণগোধূলি?' শুভেন্দু ভুর কুঁচকোল। 'ওটা কি করে ছাপবে। ওট যে মহাদেবের বই, ভগবতী লাইব্রেরীর বই? আট বছরে এডিশন করতে পারল না।'

'হুঁ, ভগবতীর মালিক মহাদেব আঢ্য তাই বলে। আট বছর কেন, চল্লিশ বছর পরেও স্বর্ণগোধূলির এডিশন হবে না, যার নাম মহাদেব, পাবলিশার পাড়ার খচ্চর দি গ্রেট।' বিকাশ দাঁতে দাঁত ঘষল। চেয়ার থেকে পিঠ তুলে শুভেন্দু সোজা হয়ে বসল।

'আমি সেদিনও আর একবার বেটার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, ওই এক কান্না, ত্রিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট ছেড়ে দিয়েও আট বছরে দেড়শ কপির বেশি বেচতে পারল না সব ফরমা গাদা হয়ে দপ্তরীর ঘরে পড়ে আছে, ইঁদুরে কাটছে উইয়ে খাচ্ছে।'

'কিন্তু এটাও সত্য শুভেন্দু, হারামজাদা কোনোদিনই বলবে না উই ইঁদুরের পেটে সব শেষ হয়ে গেল, তা হলেও তো বুঝতাম।'

'তা কি আর কখনো কোনো পাবলিশার বলে। তা ছাড়া মহাদেব হল গভীর জলের মাছ। আগুন লেগে তার দোকান আর দপ্তরীর ঘর ছাই হয়ে যাক না, দেখবে তখনও সে বলবে স্বর্ণগোধূলির কিছু ফরমা বেঁচে গেছে।'

শুভেন্দুর কথার একমাত্র বিকাশ ছাড়া বাকি সবাই হাসল।

'তা হলে আজ আপনাদের কাছে কথাটা বলি। এতদিন বলিনি।' যেন খুব একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। এক মুঠো কৌতুক নিয়ে অরুণাভর চোখ দুটো ঝকঝক করছিল। "পুজোর আগে আমরা য়ুনিভার্সিটির কজন ছেলে ভগবতী লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। আঢ্য মশাইকে খুব চেপে ধরলাম, মশাই, এখনো স্বর্ণ-

গোধূলি বিক্রী হচ্ছে লোকের হাতে প্রায়ই নতুন কপি দেখা যায়, কিন্তু আপনি বলছেন বইটার আর এডিশনই হল না, ক হাজার ছেপেছিলেন বলুন তো? চোখ দুটো গোল হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোকের। ফ্যাল-ফ্যাল করে একটু সময় আমাদের দিকে চেয়ে থেকে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে মাথাটা দুবার ঝাঁকুনি দিল। তা আপনারা বাইরে থেকে অনুমান করতে পারেন, স্বর্ণ-গোধূলি কিছু দশ বিশ হাজার ছেপে বসে আছি, আর রোজই দশ বিশ তিশ কপি করে বেচে বেচে আমি খাচ্ছি। কথাটা আপনারা ভুলেই যাচ্ছেন যে দেশটা বাংলা দেশ, হুঁ. ঢাউস ঢাউস উপন্যাস কিনে পড়ছে, তা বলে কবিতা, কবিতার বই? বলে কিনা সারা বছরে আমি পাঁচ সাত কপি স্বর্ণগোধূলি বেচতে পারছি কিনা সন্দেহ, আর আপনারা হুট করে বলে দিলেন, রোজই রামানন্দ সেনের কবিতার বই লোকে কিনছে—অ্যাঁ, এটা একটা কথার কথা! রবিবাবু নজরুলের বই ছাড়া কি হপ্তায় এসব কাব্যগ্রন্থের কটা ক্যাশমেমো কাটা হয় একবার দয়া করে ঘরে ঘরে খোঁজ নিন তো, এ পাড়ায় ভগবতী লাইব্রেরী ছাড়াও প্রকাশন সংস্থার কিছু কমতি নেই।

'সত্যি কথা, আমরা বেশ একটু বাড়িয়ে বলেছিলাম, তা হলেও হেরে যাব না এমন একটা জেদ নিয়ে দল বেঁধে সবাই সেদিন ভগবতী লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। বললাম, দেখুন, কাউণ্টারে বসে ক কপি স্বর্ণগোধূলি আপনি বেচেন, ক কপি বাঁধানো বই আপনার দোকানে আছে আর দপ্তরী বাড়িতে বা কী পরিমাণ লুজ ফর্মা পড়ে আছে তার হিসাব বার করা আমাদের পক্ষে শক্ত, পাবলিশারের হাতে বই চলে গেল মানে একটা অন্ধকার জগতে সেটা চলে গেল—এর সঠিক হিসাব খুঁজে বার করা বাইরের লোকের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় একমাত্র পাবলিশারদের সততার ওপর নির্ভর করে চলা ছাড়া অথরদের আর কোনো উপায় থাকে না— সেটা কথা না, কথা হচ্ছে কি, আজ কবিতার পাঠক সংখ্যা আগের চেয়ে আট গুণ বেড়ে গেছে, বিশেষ করে আধুনিক কবিতা, এবং আধুনিক কবিদের কথা উঠলেই সকলের আগে একটা নামই মনে আসে: রামানন্দ সেন—কাজেই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, আপনি যেমন বলে দিলেন, আট বছরে দুশ কপিও স্বর্ণগোধূলি বেচতে পারেননি। আমরা মনে করি, এদ্দিনে রামানন্দ সেনের ওই বিখ্যাত কালেকশনের এডিশন হওয়া উচিত ছিল—তো একটু চুপ করে থেকে মহাদেব কী বলল জানেন?'

সবাই উৎসুক হয়ে অরুণাভর কথাগুলি শুনছিল।

'কী বলল?' অমলেন্দু মাথা নাড়ল।

'আমার খাতাপত্র দেখুন, বস্তাবন্দী পুরোনো ক্যাশমেমোর তাড়া ঘাঁটুন, দপ্তরী বাড়ি চলুন—এইসব তো?'

'না, আঢ্য মশাই তাই বললে ভাল করতেন, তবে কি আর আমরা চটে যেতাম,' অরুণাভ হাসল। 'এখন আমরা বন্ধুরা ওই মুখের কথা মনে করে যখন তখন হাসছি, কিন্তু সেদিন ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম—খুব একটা পণ্ডিতের মতন চেহারা করে লোকটা হঠাৎ বলে বসল, রামানন্দ সেনের কবিতা নিয়ে এমন করছেন আপনারা, যেন আজকালের মধ্যেই ওঁর স্বর্ণগোধূলি একটা পুরস্কার টুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে—'

'তারপর!' এবার শুভেন্দু শব্দ করে হাসল। 'গবেট একটা। তোমরা তখন কী বললে?'

'মশাই, পেটে ওই বিদ্যা নিয়ে বইয়ের ব্যবসা করতে বসেছেন। এ সব কথা আপনার মুখে মানায় না।, না কি ভেবেছেন পুরস্কার পেলেই রামানন্দ সেন একটা সাংঘাতিক বড় কবি হয়ে গেল, এখন লিলিপুট হয়ে আছে? কবিতার কিছু বোঝেন? যেখানে রামশ্যা যদুমধু প্রাণকেষ্ট হরেকেষ্ট পুরস্কার পাচ্ছে সেখানে রামানন্দ সেন না হয় না-ই পেল। হুঃ, জ্ঞানপীঠ আকাদমী রবীন্দ্র শরৎ স্মৃতি প্রাইজ! যদি একটু ভাল করে লেখা পড়া শিখতেন তা হলে অন্য কথা বলতেন। বুঝতে পারতেন পুরস্কার পাওয়া পাঁচখানা কেতাব আর পুরস্কার না-পাওয়া অন্য পাঁচখানা কেতাবের মধ্যেও গুণের কত আসমান-জমিন ফারাক থাকতে পারে। পুরস্কার পেলেই লেখক বড়-লেখক হয়ে গেল, আর যেহেতু পুরস্কার পেল না বলে আর একজন ছোট লেখক হয়ে থাকল, এই ধারণা বদলে ফেলুন। খোঁজ নিয়ে গিয়ে দেখুন বাস-লরীর পারমিট, মদের দোকানের পারমিটের মতন এক একটা পুরস্কারের পেছনেও কত ঘোরাঘুরি ধরাধরি তদ্বির তোষামোদ চলছে। এই যখন অবস্থা, আমরা মনে করি কবি রামানন্দ সেনের পুরস্কার পেয়ে কাজ নেই। আমাদের আধুনিকদের কাছে রামানন্দ সেন পুরস্কার না পেয়েও অনেক—অনেক বড় কবি।'

'উত্তরে কী বলল আঢ্য?'

'আর উত্তর নেই। মুখটা হাঁড়ির মতন করে চুপ করে বসে রইল।'

'যাই হোক,' অমলেন্দু একটা হাই তুলল।

'ওই পিশাচের কাছ থেকে স্বর্ণগোধূলি বের করে আনা কঠিন—নীহার পাবলিশারকে আমি তাই বললাম—ও বইয়ের আশা ছেড়ে দিন, বরং আপনারা রামানন্দবাবুর হালের কবিতাগুলো নিয়ে একটা কালেকশন বার করুন। স্বর্ণগোধূলির পরেও তিনি অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখেছেন।'

'কী বলল?'

'ভেবে দেখবে।'

শুভেন্দু চুপ। গুরুদেব বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে বিকাশ যেন উঠব উঠব করছিল। অরুণাভ এবং নবকিশোরও উঠতে চাইছে। আবার দুজনের ধূমপানের নেশা প্রবল হয়ে উঠেছে। সকলেরই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমলেন্দুর জন্য চা এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মোহন পাল আর একবার মুখ খুলল।

কিন্তু বই যে করবেন, মূল মানুষটারই যে খোঁজ নেই। কবিতা বাছাই টাছাই করে আপনারা না হয় সব ঠিকঠাক করে দিলেন। কিন্তু বই ছাপতে অথরের পারমিসনের দরকার হবে যে।'

শুভেন্দুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'দেখলেন অমলেন্দুবাবু, আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে মোহন পাল মশাইও এসব ব্যাপারে কত গভীর চিন্তা করেন। আমি তো মনে করেছি মোহনবাবুর লাইফ নিয়ে একটা বই লিখে ফেলব। উপন্যাস।'

'বলেন কি?' মোহন পালের চোখ আতঙ্কিতে গোল হয়ে উঠল। সবাই ভেবেছিল কথাটা শুনে মানুষটা অতিমাত্রায় খুশী হবে। তাঁকে নিয়ে উপন্যাস! কিন্তু দেখা গেল খুশী হওয়ার পরিবর্তে অবাক হয়ে মোহন পাল শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। আর কিছু বলছে না।

'কেন, জিনিসটা কি আপনার মনঃপূত হচ্ছে না?' শুভেন্দু ওদিকে একটু ঝুঁকে বসল।

'নাঃ' মোহন পাল আবেগে মাথা নাড়ল। 'আপনি কবি—কবিতাই লিখবেন, আবার উপন্যাসে হাত দেওয়া কেন। স্বধর্ম থেকে আপনি কি আপনার এইসব কবি বন্ধুরা বিচ্যুত হবেন এ আমার সহ্য হবে না। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম—'

'হিয়ার হিয়ার!' বিকাশ ছাড়া বাকি সবাই চিৎকার করে টেবিল চাপড়াতে লাগল।

এবার খুশী হয়ে মোহনবাবু ঘাড় গুঁজে হিসাবের খাতায় চোখ রাখল।

(ক্রমশ)

নতুন সরকার—পুরনো সংকট

সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী চলতি সপ্তাহেই ভারতে নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশেই নতুন সরকার গঠিত হলে তার নতুন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে নতুন করে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে হলে যে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হবে সেগুলি সবই পুরনো। বেকার সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা, শ্রমিক অশান্তি, বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ,—সব সমস্যাই আজ আমাদের কাছে পুরনো। যে নীতিই নতুন সরকার কর্তৃক রচিত হোক না কেন, গালভরা কথা তাতে থাকবেই। বিগত পাঁচ বছরে যতগুলি সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়েছি, তার মধ্যে খাদ্যসংকট ছাড়া আর কোন সমস্যারই সমাধানের পথ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পর পর চার বছর ধরে কৃষি-উৎপাদনের অপ্রতিহত অগ্রগতি হওয়ায় বিগত সরকার যেমন গর্ববোধ করতে পারেন, তেমনি বেকার সমস্যা তীব্রতর হওয়ায় এবং জিনিসপত্রের দাম অপ্রতিহত গতিতে বাড়তে থাকায় সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ব্যর্থতাই সূচিত হয়েছে। যা হোক, নতুন সরকার নিশ্চয়ই দেশের সব সমস্যাগুলি বিবেচনা করে তার নতুন নীতি ঘোষণা করবেন এবং সেই নীতি নিশ্চয়ই চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হবে। তবুও ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি মূল বিষয়ের কথা ভাবলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যে-কোন উন্নতিকামী দেশের প্রধান প্রয়োজন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তার অর্থসংস্থানের জন্য যতটা সম্ভব জাতীয় সঞ্চয় বাড়ানো। জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ যদি সঞ্চয় করা যায় এবং তার অধিকাংশ যদি উৎপাদনমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যায়, তবে উন্নয়ন-হার দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হয়। যে-কোন সরকারের সামনেই বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতি (Investment criterion) নির্ধারণ করা একটি বিশেষ সমস্যা। বিশেষ করে যে দেশে প্রায় তিন কোটি লোক বেকার এবং যে দেশে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সরবরাহ খুবই বেশী, সে দেশে দ্রুত উন্নয়ন-হার বাড়ানোর জন্য মূলধন-নিবিড় বিনিয়োগ-প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত কিনা তা ভাববার বিষয়। অনেকে বলে থাকেন, মূলধন-নিবিড় বিনিয়োগ-প্রকল্প নতুন করে গ্রহণ করলে কিছু লোকের কর্মসংস্থান তো হবেই, তা ছাড়া বিনিয়োগ-প্রকল্পগুলি পুরোপুরি কার্য-করী হলে জাতীয় আয় বাড়বে এবং সেই বর্ধিত আয়ের পুনর্বিনিয়োগ করতে পারলে

দেশ ক্রমেই উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে বেশী করে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই যুক্তির যতই তাত্ত্বিক মূল্য থাকুক না কেন, গরীব দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক কি ভবিষ্যতের আশায় এভাবে বসে থাকবেন? আমাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারত সরকার গুরুভার শিল্পের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যতটা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে ধরা হয়েছিল তার অর্ধেকও হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতার বোঝা দ্বিতীয় পরিকল্পনার চেয়েও বেশী। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় সরকার কতটা কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করতে পারবেন তার নির্দিষ্ট সংখ্যা বা লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত না হলেও এটা পরিষ্কার যে, বেকার সমস্যা দেশের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে যে প্রায় পঙ্গু করে এনেছে এবং এ বিষয়ে যে কোন নীতিই সম্পূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়নি সরকার তা নিরুপায় দর্শকের মত অনুভব করেছেন। শেষ পর্যন্ত একটি কর্মসংস্থান কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু কমিশন গঠন করেই যে সমস্যার সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যাবে তা নয়।

নতুন সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি গৃহীত না হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কতিপয় স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজে লাগানো না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাও ফিরে আসবে না—বিপর্যস্ত অর্থনীতির কোন রূপান্তরও আশা করা যাবে না। তাই আজ সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, ইলেকশন তো শেষ হল, পার্লামেন্টের সদস্যরাও নির্বাচিত হলেন, অনেক প্রতিশ্রুতির কথাও শোনা গেল, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হবে কি? যাঁরা আজ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে দেশের নীতি নির্ধারণের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন মূল সমস্যাগুলির কথা ভাবেন। বেকার সমস্যার সমাধান এক দিনে নিশ্চয়ই হবে না, দুই বছরেও হবে না। কিন্তু দুই বছরের শেষে যেন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন যে, সমস্যার সমাধান হয়নি বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান করার পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। এখনই সরকারকে সমগ্র দেশ জুড়ে যতগুলি সম্ভব শ্রম-নিবিড় প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি তিন মাস অন্তর এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কতটা কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতি তিন মাসের জন্য প্রকল্প-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারিত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ জোরদার করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে, এত প্রকল্প গ্রহণ করার অর্থ কিভাবে আসবে? এই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং এজন্য কর-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়

সংস্কার করে, সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান ও ব্যয়ের মাত্রা কমিয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্মপরিধি আরও বিস্তৃত করে এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করে। আমাদের কর-ব্যবস্থার সংস্কার করার যথেষ্ট সুযোগ এখনও আছে এবং সরকার যদি দলীয় স্বার্থের কথা না ভেবে দেশের স্বার্থে এ ক্ষেত্রে নির্ভয়ে এগিয়ে যান তবে আগামী আর্থিক বছরেই জাতীয় আয়ের অন্তত ১৫ শতাংশ সঞ্চয় করা সম্ভব বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। হয়তো অনেকে ভাববেন, এটা অনেক বাড়িয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা দেখতে পাই কৃষি ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে তখন কি কৃষিগত আয়-কর থেকে রাজস্ব সেই অনুপাতে বাড়ছে? আমাদের জাতীয় আয় যে হারে বাড়ছে সেই হারে কি আয়-কর থেকে রাজস্ব বাড়ছে? ভারতে জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ১·৩ ভাগ থেকে ১·৫ ভাগ আয়-কর বাবদ আদায় করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে জাতীয় আয় শতকরা ১০ ভাগের কাছাকাছি বেড়েছিল; কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালের অনুপাতে ১৯৬৭-৬৮ সালের আয়ের উপর আয়-কর বাবদ রাজস্বের পরিমাণ কম হয়েছিল। এই বাড়তি আয় কোথায় গেল? সরকার যদি কর-ব্যবস্থার সংস্কার করে কালো টাকার অধিকাংশ আদায় করে নিতে পারেন, তবে সেই টাকাতেই নতুন শ্রম-ভিত্তিক বিনিয়োগ-প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং এমন কি মধ্যমায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পগুলির নতুন শ্রম-ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচীতে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ যাতে আরও বাড়াতে পারে সেজন্য ব্যাংক-আমানত বাড়াবার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে হবে। জাতীয় সঞ্চয় দ্রুত বাড়াবার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে যদি বেকার সমস্যার সমাধান কী করে করা যায় সে সম্পর্কে কোন বলিষ্ঠ ও সক্রিয় নীতি সরকার গ্রহণ করতে পারেন এবং তা নির্ভয়ে কার্যকরী করতে পারেন তবে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পথে সরকার এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবেন।

মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার সমাধান করতে হলে এক দিকে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস এবং অপর দিকে কঠোর হস্তে মুনাফাখোর, ফাটকা-কারবারীদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালানো দরকার। তা ছাড়া পরোক্ষ কর-ব্যবস্থারও কিছু সংস্কার প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি অনেকটা কর-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিণতি। গত বছর নতুন টাকা প্রচুর পরিমাণে ছাড়তে হয়েছে। যদি সরকার জাতীয় সঞ্চয়ের হার আরও বাড়াতে পারতেন তবে অতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহের উপর আরও কম নির্ভর করলেও চলত। মোদ্দা কথা, অর্থনৈতিক কাঠামো, বিনিয়োগ নীতি, কর-ব্যবস্থা, মুদ্রা সম্পর্কিত নীতি প্রভৃতির সংস্কার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীগণ যখন তাঁদের বাৎসরিক বাজেট বক্তৃতা দিয়েছেন তখন মনে হয়েছে, কথাগুলি তাঁদের মোটেই অজানা নয়, বরং তাঁরা খুবই গভীরভাবে তা বিচার-বিবেচনা করছেন। কথাটা নিশ্চয়ই সত্য, কিন্তু মননশীল চিন্তাধারা বাস্তব নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে কি? দেখা যাক, নতুন সরকার কী নীতি গ্রহণ করেন।

সুব্রত গুপ্ত

পঁয়ত্রিশ

কানন নিজেও প্রেমে পড়েছে, কিন্তু রত্নর মতো সর্বস্ব পণ করে নয়। ও বাপ মা ভাইবোন ঘরদোর সমাজ ছাড়বে না। ওদের বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে খাপ খায় এমন একজনকেই বিয়ে করবে। তবে ওর হৃদয়টা তো পারিবারিক শাসনের অধীন নয়। তাই ও যাকে খুশি ভালোবাসতে পারে। বিয়ে না করলেও ভালোবাসবে। ভালোবেসে যাবে।

"এইখানেই আমার আপত্তি।" রত্ন বলে। "একজনকে ভালোবাসবে, আরেকজনকে বিয়ে করবে। বিয়ের পরও ভালোবাসার জের টেনে যাবে। আবার স্ত্রীর সঙ্গেও রাত কাটাবে। এতে ভালোবাসাও পূর্ণাঙ্গ হয় না, বিবাহও অপূর্ণ থাকে।"

"মানছি। কিন্তু উপায় কী!" কানন বিষণ্ণ মুখে বলে। "যদি জানতুম যে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিয়ে কোনোদিন হবে তা হলে না হয় ততদিন অপেক্ষা করতুম। বাড়ির চাপ উপেক্ষা করা সহজ নয়, তবু ঠেকিয়ে রাখতুম।"

"কেন, বিয়ে কোনোদিন হবে না কেন। ইন্দ্রাণীও তো ভালোবাসেন তোমাকে। যতদূর জানি।" রত্ন জিজ্ঞাসু হয়।

"এটাও তো জানো যে ওঁরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখাতে আমি ভয় করি। আর সেটাও যদি অন্তরায় না হয় তা হলেও বাধছে বয়সে। দিদির বয়সীকে আমি দেবীর মতন পুজো করতে পারি, কিন্তু মানবীর মতো স্পর্শ করতে পারিনে। প্রভাত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে, জ্যোতিদাও রসিকতা করেন, আমি নীরবে পরিপাক করি। রবীন্দ্রনাথ যাই লিখুন না কেন, এ বৈষ্ণবের সাহস হয় না দেবতারে প্রিয়া করতে।" কাননও ভয় করে আগুনকে।

"তা যদি হয় তবে তোমার প্রেম ওই একটি জায়গাতেই চিরটাকাল পায়চারি করতে থাকবে। আর একটি পাও এগোবে না।" রত্ন মন্তব্য করে।

"নিরুপায়। তা বলে তো দেবতার গায়ে হাত দিয়ে তাঁকে অপবিত্র করতে পারিনে। আমি অস্পৃশ্য।" কানন সন্ত্রস্ত-ভাবে বলে।

"একটিবারও হাতে হাত রাখনি?" রত্ন সকৌতুকে শুধায়।

"সর্বনাশ! পাপ হবে যে!" কানন আঁতকে ওঠে।

"তা হলে তো চুম্বনও করনি বা পাওনি।" রত্ন ওকে ক্ষ্যাপায়।

"কী সর্বনাশ! মহাপাতক আর কাকে বলে!" কানন পেছিয়ে যায়।

"তা হলে আর কী। কোনো আনন্দই আস্বাদন করলে না। এত ভয়!" রত্ন হাসে "বৈষ্ণবরা কী বলে? ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। এ জন্মে তোমার কিছু হবে না। কারণ তোমার সাহসই নেই।"

"তোমার আছে?" কানন প্রশ্ন করে। চোখা প্রশ্ন।

"ছিল না। এখন একটু আধটু হয়েছে। নইলে প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁরা সবচেয়ে সার্থক প্রেমিক তাঁরা সবচেয়ে সাহসী প্রেমিক। দুঃসাহসীও বলতে পারো। দেবতার সঙ্গে লীলাখেলাও তাঁদের কাজ।" রত্ন হেসে ওঠে।

"তোমার পতন হয়েছে, রতন। আগে তো তুমি এরকম ছিলে না। আঁ! কী যা-তা প্রলাপ বকছ!" কানন শিউরে ওঠে।

"নারীর সঙ্গে পুরুষ হতে হয়। এটাই তো নিয়ম। এ যদি না পারি তবে গৌরী আমাকে পুরুষের মর্যাদা দেবে না কোনোদিন। পুরুষোত্তম তো দূরের কথা। আমি যেদিন থেকে প্রেমে পড়েছি সেদিন থেকেই শিখছি প্রেম কাকে বলে। এ আমার হাতে কলমে শেখা, পুঁথি পড়ে শেখা নয়।" রত্ন বলতে বলতে জ্বলে ওঠে।

"এই যদি হয় প্রেম তো কাম কাকে বলে?" কানন তর্ক করে।

"যেখানে আপনার সুখই একমাত্র কাম্য সেখানে ওর নাম কাম। যেখানে আরেক-জনকে সুখী করেই সুখ সেখানে ওর নাম প্রেম।" রত্ন তার উপলব্ধি থেকে বলে।

"কিন্তু কাম যে অতি ভয়ঙ্কর জিনিস, এটা তো তুমি মানবে?" কানন জেরা করে।

নিশ্চয় মানব। যুদ্ধও তেমনি ভয়ঙ্কর। তবু মানুষ যুদ্ধে যায়, বীরত্ব দেখায়, মালা পায়। নারীই মালা পরায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে থাকলে তো মেয়েদের হাতের মালা পাওয়া যাবে না, কানন।" রত্ন ইঙ্গিতে উত্তর দেয়।

"তোমার কথাবার্তার ধারা বদলে গেছে, ভাই। তুমি কি সেই তুমি!" কানন অবাক হয়।

"দুটো বছর মানুষের জীবনে বড়ো কম সময় নয়, ভাই। বিশেষত তরুণের জীবনে। যে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি ও যাচ্ছি সে তো সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়। আমার মনে হচ্ছে আমার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। যেন অকালপক্ক হয়েছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কী, শুনবে? আমার মধ্যে

সন্তানক্ষুধা জন্মেছে। যেটা এ বয়সে জন্মানোর কথা নয়। গোরী যদি মা না হতো আমিও বাপ হতে চাইতুম না।" রত্ন কবুল করে।

"আশ্চর্যের ব্যাপার বইকি।" কাননও স্বীকার করে।

"তা বলে আমি আর কারো সন্তানের জনক হবার কথা ভাবছিনে। সামঞ্জস্যটা গোরীর সঙ্গেই। ওর যদি আপত্তি না থাকে। বলা যায় না, ও এমনিতেই যা শঙ্কিত। আগুন ও নিজেই, তবু আগুনকে ওর এত ভয়!" রত্ন অবশেষে প্রকাশ করে।

"ও! এখন বুঝতে পারছি গোরী কেন বলেছিল, আমি কি আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি?" কানন মাথা নাড়তে নাড়তে বলে। "রতন, তুমি যদি এখন থেকে ওকে আগুনের ভয় দেখাও তা হলে ও কেমন করে তোমার সঙ্গে যায়, বল দেখি? আমি যতদূর জানি তোমাদের সম্পর্কটা হবে চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনীর সম্পর্ক। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।"

"তাই নাকি? বলেছে গোরী ওকথা?" রত্নর মনে খটকা বাধে।

"না, অত স্পষ্ট করে বলেনি। যা বলেছে তার মর্ম ও ছাড়া আর কিছু নয়। বলেছে, সব পুরুষই সমান। একজনও ভালো নয়। হাজার ভালোমানুষ সাজুক, একদিন না একদিন মুখোস খুলে যায়। বেরিয়ে পড়ে ভিতরকার পশু। একটু আড়ালে পেয়েছে কি, অমনি ছুঁতে এসেছে। ভান করবে স্বর্গীয় প্রেমের, কিন্তু মনের কথাটি তা নয়, সরলা অবলার সর্বস্ব হরণ। সময় ও সুযোগ বুঝে ওটা প্রকাশও করে। মুখে না হোক চোখে। শত শত প্রেমের গল্প পড়েছি, আদিতে যাই থাক অন্তে আদিরস। ঘেন্না ধরে গেছে, কানু।" কানন বিবরণ দেয়।

"তা হলে ও কী চায় আমার কাছে?" রত্নর ধাঁধা লাগে।

"যেটাতে ওর অরুচি ধরে গেছে সেটা নয়। শোননি, বাউলরা গায়, চণ্ডীদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দুজন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে? তোমাদের সম্বন্ধেও একদিন দেশের কবিরা গান বাঁধবে, রত্ন আর শ্রীমতিনী, ওরাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দুজন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।" কানন সুর করে বলে।

"না, না, ওটা আমাদের আদর্শ নয়। আমাদের বেলা একটু পাল্টে দিয়ে বলতে হবে, এক বাঁচনে দুজন বাঁচল প্রেমপূর্ণ প্রাণে।" রত্নও সুর করে বলে। কিন্তু শঙ্কান্বিতভাবে। কে জানে হয়তো সমাজের নির্যাতনে বাউলরা যা শোনায় তাই হবে।

"না, রতন, তোমাদের বেলা অমন ট্র্যাজেডী ঘটবে না।" কানন অশ্বাস দেয়। "সমাজ বদলে গেছে। আরো বদলাবে। ডিভোর্সও অসম্ভব নয়। বিয়েও অসম্ভব নয়। সমস্তই একে একে হবে। কিন্তু ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, জানো তো। সত্যিকার আগুন দেখলে দড়ি ছিঁড়ে পালাতেও পারে।"

রত্ন বোঝে। কিন্তু বিশ্বাস করে যে সত্যিকার আগুন মানুষকে বাঁচাতেও পারে। বন্ধুকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে বলে, "তোমরাই বা কম কিসে? কানন আর ইন্দ্রাণী লোর আর চন্দ্রাণী।"

লোর চন্দ্রাণীর উপাখ্যান কাননের জানা ছিল না। দৌলৎ কাজীর 'সতী ময়না' ওর অজানা। রত্নর মুখে শুনে শিউরে ওঠে। "স্বামী থাকতে অপরেকজনকে ভজনা। স্বামীটি বামন ও নপুংসক, তাই বলে কি পরপুরুষকে বরণ করতে হয়! দূর! ছি!"

কাননও ছড়া কাটে। "শ্রীমতী আর রতনু লায়লা আর মজনু। লায়লা মজনুর সঙ্গে তোমাদের তুলনা করছি কেন জানো? পারস্যের ছবিতে দেখেছি মজনু বেচারি তপস্যায় শুকিয়ে হাড্ডিসার। আর লায়লা কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবতী! স্বচক্ষেও তাই দেখছি। না খেয়ে না শুয়ে তুমি দিন দিন যা হয়ে দাঁড়াচ্ছ তা ওই ছবির মজনুর সঙ্গে মিলে যায়। ওদিকে বেগমপুরের গয়লারা দুধ ঘি ক্ষীর সর সরবরাহ করে রাধাম ধনকাঁটুকে এমন যত্নে রেখেছে যে তাঁর সেবিকারও তনুশ্রী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমাদের পরিণতি কি শেষ পর্যন্ত লায়লা মজনুর মতোই হবে?"

"কে জানে!" রত্নর কণ্ঠস্বরে বিষাদ। "যেদিন শুনলুম ও বেগমপুরে ফিরে গেছে সেদিন মনে হলো ও পেছিয়ে গেছে। তবে এমনও হতে পারে যে ওটা এগিয়ে যাওয়ার
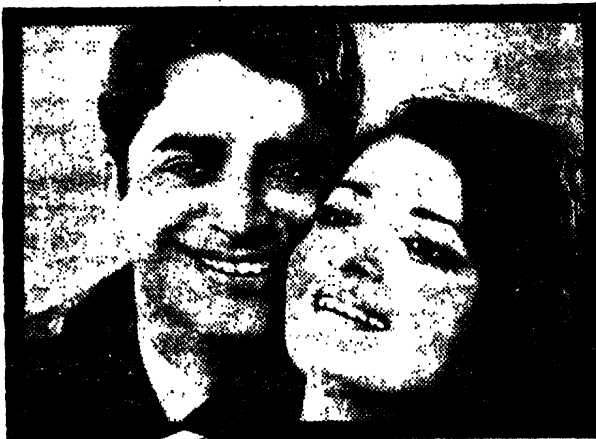
জন্যেই পৌঁছিয়ে যাওয়া। সৈনিকরা যা করে।"

"ঠিক। ওকে তো আমি চিনি। ও বেগমপুরে কখনো স্থির থাকবে না। বহরমপুরেও কি বেশীদিন পায়চারি করবে? না, তাও নয়। ও যা চায় ওকে তা দিতে হবেই। মুক্তি। এই পর্যন্ত আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। বাকীটা আমার দৃষ্টির বাইরে। অর্থাৎ তোমার সঙ্গে মিলন। তোমাদের মিলিত জীবন। সন্তানের মধ্যে পরিপূর্ণতা। কম্পানিয়নশিপ। পরস্পরের সাহচর্যে সৃষ্টি।" কানন রঞ্জুকে আশ্বাস দিয়ে বলে, "আমার দৃষ্টির বাইরে হলেও সম্ভাব্যতার বাইরে নয়। তুমি যে তপস্যা করছ তা কি ব্যর্থ যেতে পারে? প্রেমেরও তো একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। প্রেম যদি সত্য হয় তবে তা অঘটনকে ঘটায়।"

রঞ্জু সুখী হয়ে বলে, "গৌরীর মতো মেয়ে যে আমার মতো ছেলেকে প্রেমিকরূপে পছন্দ করেছে এটাই একটা অঘটন। এরপরে যদি স্বয়ংবরা হয়ে আমাকে বরণ করে তবে সেটা হবে আরো এক অঘটন। যদি আমাকে সন্তানের পিতারূপে মনোনয়ন করে তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো অঘটন। প্রত্যেকবারেই ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। তেমনি আমিও। আমরা দুজনেই সমান স্বাধীন। একপক্ষের ইচ্ছাই উভয়-পক্ষের ইচ্ছা নয়। যেমন সচরাচর দেখা যায়। আমরা হব সাধারণের থেকে ভিন্ন। গৌরীর যদি ইচ্ছা না হয় ও আমার স্ত্রী হবে না, আমার সন্তানের মা হবে না। কিন্তু তা হলে সমস্যার উদয় হবে। আমি তবে কী করব? চিরকুমার হব? নিঃসন্তান হব? প্রেমের জন্যে এসব হওয়া বিচিত্র নয়। অনেকেই হয়েছে। কিন্তু পরিপূর্ণতা কোথায়? আমি যে পরিপূর্ণতার ধ্যান করি সে ধ্যান কি বিসর্জন দেব?"

কানন তো হেসেই আকুল। "একেই বলে ইঁচড়ে পাকা। এখন থেকে কেউ অত কথা ভাবে!"

ছত্রিশ

সংসারের সার কী। রূপকথায় আছে, বাড়ির ছোট বউ বলেছিল, লবণ।

লবণ? শ্বশুর তা শুনে উপহাস করেছিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বড়ো বউ বলেছিল, ধনদৌলৎ। মেজ বউ বলেছিল, মানসম্মান। সেজ বউ বলেছিল ছেলেমেয়ে। সবাই ওরা বুদ্ধিমতী। কেবল ছোট বউটি বোকা।

একদিন রাঁধবার পালা ছোট বৌমার। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের বাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু শ্বশুর মশায় যেটাই মুখে দেন সেটাই আলুনো। থু থু করে ফেলে দেন। রাগে তাঁর পিত্ত জ্বলে যায়। খিদেয় জ্বলে যায় পেট। ছোট বউমাকে ধমক দিয়ে বলেন, "নুন দিতে ভুলে গেলে কেন?"

"না, বাবা, ভুলে যাব কেন? ইচ্ছে করেই দিইনি।" ছোট বউমা জবাব দেয়। "নুন এমন একটা কী জিনিস যার অভাবে সব থেকেও কিছুই মুখে দেওয়া যায় না? সব অসার?"

গৃহস্থ বুঝতে পারেন যে ছোট বউ যা বলেছে তাই ঠিক। লবণই সংসারের সার। নুন না থাকলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর খাওয়া বন্ধ হলে কালে প্রাণ বাঁচে না।

বাল্যবন্ধু কাননকে এই রূপকথাটি শুনিয়ে রঞ্জু বলে, "সংসারের সার কী? আমি হলে বলতুম, প্রেম। প্রেম না থাকলে জীবন শুকিয়ে যায়। ফুল ফোটে না। ফল ফলে না। জগৎ হয়ে ওঠে মরুভূমি। তখন তাকে মায়া বলে সন্ন্যাসী মন আপনাকে ভোলায়। আর গৃহস্থ মন জড়িয়ে পড়ে অন্তঃসার-শূন্য ধনদৌলৎ মানসম্মান ইত্যাদির বন্ধনে। নিয়ে এস এক ফোঁটা প্রেম। প্রেমের রসে সব সরস হবে।"

এত যে হানাহানি কাটাকাটি, এত যে যুদ্ধ আর বিপ্লব, এত যে শোষণ আর পীড়ন, এর মূলে প্রেমের অভাব। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে ভুলে গেছে। শুধু তাই নয়, ভালোবাসাটাকেই মনে করে দুর্বলতা। কিংবা পাপ। যার অন্তরে যত অপ্রেম বা যত অসাড়তা সেই তত বড়ো বাহাদুর। মানুষ যদি ভালোবাসতে না পারে তবে ভালোবাসা পেতে চায় কেন? পাবে কোন উৎস থেকে, কেউ যদি ভালো না বাসে?

"জ্ঞানচর্চা ও শক্তিচর্চার মতো প্রেমচর্চাও করতে হবে মানুষকে। প্রেমচর্চাই শ্রেষ্ঠ চর্চা হবে। আমাদের এ যুগটা হবে প্রেমের যুগ। এই আদর্শ নিয়েই আমরা বাঁচব। আমরা যারা আর দশজনকে বাঁচাতে চাই। শুধু আত্মগত জীবন কে চায়? আমরা যেন হতে পারি ধরিত্রীর লবণ।" রঞ্জু বলে আবেগভরে।

রঞ্জুর জীবনদর্শন ধীরে ধীরে প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তার ভালোবাসার আলোয় সে দেখতে পাচ্ছিল আগের চেয়ে বেশী, আর-সকলের চেয়ে বেশী। তার প্রেমই যেন তার দূরবীন, তার অনুবীক্ষণ। দূরতম ও সূক্ষ্মতমও তার চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের আকাশও যেন সুদূরপ্রসারী হয়। আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায় তার মন। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে ক্ষমতার ধারণা। যেন ইচ্ছা করলে সব কিছু পারে। শুধু গায়ের জোরটাই যা কম।

দুই বন্ধুর কথাবার্তায় ধ্রুবপদ যেমন প্রেম তেমনি ধ্রুবপদের প্রধান কথা হলো গৌরী। সুলেখার কথাটাও মাঝে মাঝে ওঠে। তবে কানন সে বিষয়ে স্বল্পবাক।

"প্রেমই আমার জীবনের কেন্দ্র। আর গৌরীই আমার প্রেমের কেন্দ্র।" রঞ্জু এমনভাবে বলে যেন ওটা একটা ঘোষণা। "প্রেম বিনা জীবন নয়। গৌরী বিনা প্রেম নয়।"

"এই তো চাই। এইজন্যেই তো তোমাদের

দিকে চেয়ে আছি। তোমরা একটা কীর্তি রাখবে। এ বিশ্বের প্রেমের ইতিহাসে আর এক জোড়া নাম কথনীভূক্ত হবে। রত্ন ও শ্রীমতী। তবে বাস্তবের উপরেও একটা চোখ রেখো। কী সম্ভব আর কী সম্ভব নয়, এটুকু জানা থাকলে তোমাদের প্রেম বিয়োগান্ত হবে না।" কানন বলে বিজ্ঞের মতো।

"বিবাহিতার সঙ্গে প্রেমের প্রায় সব ক'টিই তা বিয়োগান্ত প্রেমের নিদর্শন।" রত্ন এক এক করে নামের মালা গড়িয়ে যায়।

"তা হোক। তোমাদের বেলা হবে মিলনান্ত।" কানন নিঃসংশয়।

"এ শুধু বিবাহিতার সঙ্গে নয়। সন্তানবতীর সঙ্গে। আরো দুরূহ প্রেমের নিদর্শন।" স্মরণ করিয়ে দেয় রত্ন।

"তা হলেও তোমরা মিলবে। যখন এতদূর এগিয়েছ।" কানন উৎসাহ দেয়।

"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।" রত্ন প্রীত হয়ে বলে। "কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। প্রেমের সাধনাও একপক্ষের সাধনা নয়। গোরীকেও আমার সঙ্গে তাল রাখতে হবে। আপাতত ওকে বল দেখি একটু পড়াশুনা করতে। আমি যখনি যা

পড়ি ওকে আমার পড়ার অংশ দিই। সেই সূত্রে সমশিক্ষিতা করে তুলি। কিন্তু ওর চিঠিপত্রে পড়াশুনার পরিচয় যা পাই তা যত সব মামুলী উপন্যাসের। জ্যোতিদা তো নেই যে ওকে ইউরোপের চিন্তার পসরা বয়ে এনে দেবে।"

সমস্যাটা কঠিন, কেননা গোরী ইংরেজী যৎসামান্য শিখেছে। ওকে ইংরেজী বই উপহার দিলেও পড়ে বুঝতে পারে না। ওকে পড়াতে হয়। সে দায়িত্ব নিচ্ছে কে? যশোবাবুর কিসের গরজ? তাঁর দিক থেকে ও যথেষ্ট শিক্ষিতা।

কানন সম্প্রতি জ্যোতিদার সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। জ্যোতিদা অসুখী, গোরীর কাছে কথার খেলাপ হয়েছে। ওর মুক্তি-যাত্রায় যোগ দিতে পারবে না। তবে নৈতিক সমর্থন দূর থেকে জোগাবে। জ্যোতিদা থাকতে অর্থের অভাব হবে না।

তা শুনে গোরীর কী রাগ! জগতে অর্থই কি সব। কে চায় ওর অর্থ! ওর অর্থ ওর বউকে দিক। আর রেবাদিও তেমনি। সেও জ্যোতির উপর রুষ্ট। অমন একটা কথা কেনই বা দিয়েছিল? যখন অমন একটা কাজ বিজ্ঞজনের করণীয় নয়। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া কোন পরিবারে নেই? ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে। দেখবে একদিন মিটেও যাবে। মাঝখান থেকে জ্যোতি কেন জড়িয়ে পড়ে?

রেবাদি বিশ্বাস করে না যে গোরী তার বিবাহে সম্মতি দেয়নি বলে বিবাহের থেকে নিষ্কৃতি চায়। ওর মুক্তি একটা নেবুলাস স্বপ্ন। যতই বাস্তবের নিকটবর্তী হবে ততই স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে। জ্যোতি তখন ওর কোনো কাজেই লাগবে না। রত্নও কি লাগবে? লাগতে পারে রোমান্দের জন্যে। যে রোমান্দ পরিণয়ে পরিণতি পাবে না। শূন্যে ঝুলে থাকবে।

রেবাদি নাকি বলেছে, "আমার খালি দুঃখ হয় যে ও রত্নর মতো একটি অবোধ ছেলের মাথা খাচ্ছে।"

"অবোধ!" শুনে রত্ন হকচকিয়ে যায়।

"অবোধ না সুবোধ কী বলেছে ঠিক মনে পড়ছে না।" কানন এড়িয়ে যায়। "তবে মাথা খাওয়ার কথাটা বিলকুল মনে আছে।"

রত্নর বিরক্তি দেখে কানন রেবাদির পক্ষ নেয়। বলে, "রেবাদির মুখের উক্তি রূঢ়, কিন্তু মনের কথাটা মন্দ নয়। ও চায় গোরীর পাগলামির জন্যে ওদের পরিবারটা ভেঙে না যায়। ওর স্বামী হাজার অপরাধ করলেও ওঁকে শোধরানোর চেষ্টা করা উচিত। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তখন সেপারেশন। ডিভোর্স নয়। তবে উনি যদি আর একটি বিয়ে করেন তখন গোরীও আবার বিয়ে করার দাবীতে ডিভোর্স চাইতে পারে। ডিভোর্সের পক্ষপাতী নয় রেবাদি। কিন্তু ওই একটি পরিস্থিতিতে সমর্থন করে। তেমন পরিস্থিতি তো দেখা দেয়নি। যখন দেখা দেবে তখন দেখা যাবে।"

যাক, বাঁচা গেল যে রেবাদি একেবারে প্রাচীনপন্থী নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, অমন একটা পরিস্থিতির কবে উদয় হবে, তার জন্যে রত্ন কতকাল ধৈর্য ধরবে।

"যশো-দা কিন্তু সাফ বলে দিয়েছেন তাঁর ছে[illegible] ছেলের মা যদি ইচ্ছা করে সংবাপ দিতে পারে।" কানন ঠেস দিয়ে বলে।

রত্ন তো শুনে হাঁ। 'সংবাপ'। রত্ন হবে কিনা 'সংবাপ'। শব্দটা অশ্লীল নয়, তবু ওর মনে লাগে। যেন ওকেই ইচ্ছা করে অপমান করা হয়েছে।

"বুঝতেই পারছ যে এখন সমস্যাটা ঠিক আগের মতো নয়। এমন নয় যে পারুলদিকে কেউ প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিচ্ছে। সংগ্রাম কথাটা এখন অর্থহীন। কার সঙ্গে সংগ্রাম! কিসের জন্যে সংগ্রাম! জয়পরাজয় একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে তার পরে আর সংগ্রাম চলতে পারে না। তখন বিজেতা যিনি তিনি কৃপা করে উদার শর্ত দেন। সেই শর্তে সন্ধি হয়। যশো-দার শর্ত হলো, পারুলদি যেখানে খুশি যেতে পারে, চাইলে ছাড়পত্রও পাবে, কিন্তু নেপোর সঙ্গে ঘটে যাবে শেষ দেখা।" কানন এবার করুণ রসে গলে যায়।

"নেপো! নেপো আবার কে?" রত্নর ধাঁধা লাগে।

"নেপোলিয়ন। নেপোলিয়নাদিত্য।" কানন ব্যাখ্যা করে। "বাপ এই নামে ডাকেন। যদিও ওর আসল নাম হলো জয়মাধব।"

"জানতুম না তো।" রত্ন অন্যমনস্ক হয়।

"যা বলছিলুম। পারুলদি যদি স্বাধীন হতে চায় হতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে মাতৃত্ব করা চলবে না। কী হয়েছে, জানো! পারুলদি এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ হচ্ছে নারী। নারী চায় তার মনোমতো পুরুষ। তার মনোমতো পুরুষের সঙ্গ। আরেকভাগ হচ্ছে মাতা। মাতা চায় তার সন্তানকে চোখে চোখে রাখতে, চোখের আড়াল না করতে। এই যে দুটি ভাগ এর একটা সামঞ্জস্য না হলে পারুলদি কখনো সুখী হবে না। ও যদি সুখী না হয় তোমাকেই বা সুখী করবে কী করে! শেষ পর্যন্ত কে জিতবে বলা যায় না। নারী না মাতা। তবে আমার বিশ্বাস নারীই জিতবে। তোমার নারী তোমারই হবে। ওদিকে মাতৃহারা হবে একটি নিরাপরাধ শিশু। কী যে ট্র্যাজিক!" বলতে বলতে কাননের গলা ধরে আসে।

রত্ন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে ভাবে। তারপর বলে, "আমিই তা হলে এ নাটকের ভিলেন! কেই বা আমার জন্যে দু ফোটা চোখের জল ফেলবে?"

"না, না, নিজেকে দোষী ভাবছ কেন? তোমার কী দোষ? দোষ যদি কারো থাকে তার নাম নিয়তি। ওর তো মা হবার কথা ছিল না। দস্তুরমতো প্রতিরোধ করেছে। তা সত্ত্বেও যা হবার তাই হলো। আর সব তার পরিণাম। কে জানে হয়তো ও [illegible] ছেলের খাতিরে স্বামীর [illegible] বাড়ী। [illegible] হলে আর ট্র্যাজি[illegible]" কাননের মুখে হাসি ফোটে আবার।

"তা হলে [illegible] পক্ষে ট্র্যাজিক।" রত্ন বলে করুণ [illegible]

(ক্রমশ)

ইতিহাসমালার নারী চরিত্র

ইতিহাসমালার নায়িকাদের নাম : 'লাবণ্যবতী' বেশ্যা, 'রত্নপ্রভা' ও 'রত্নাবতী' বণিকপত্নী, 'রূপবতী' ব্রাহ্মণকন্যা, 'চন্দ্রা' রাজকুমারী, লহনা ও খুল্লনা...। কোনো ঐতিহাসিক নারী চরিত্র নেই। ঐতিহাসিক পুরুষচরিত্রও অবশ্য অল্প : কালিদাস, প্রতাপাদিত্য, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, আকবর ও বীরবল।

একাধিক গল্পে পড়ি : এক কন্যা 'অপূর্ব সুন্দরী ও পণ্ডিতা, কিন্তু অবিবাহিতা...' এক কন্যা অতি বড় সুন্দরী কিন্তু অবিবাহিতা...। রাজকন্যা হলে অবশ্য উপায় আছে। হয় পিতা স্থির করেন, "রাত্রি প্রভাতে প্রথম যাহার মুখদর্শন করিব, তাহার সহিত কল্যই কন্যার বিবাহ দিব..." নয় কন্যা নিজেই স্বয়ংবরে প্রবৃত্ত হন : "যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাজিতা করিবে, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।"

দৈনন্দিন জীবনে বিচিত্র বিবাহ-সমস্যা দেখা দেয়। এই ধরনের রূপবতীর গল্প : "সে-কন্যাকে ত্রৈলোক্যমোহিনী সুন্দরী দেখিয়া তিনজন ব্রাহ্মণকুমার তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়া অগ্নিস্বামিকে প্রার্থনা করিলেন। অগ্নিস্বামী বলিলেন, 'তোমরা রূপবন্ত ও গুণবন্ত আর মহাকুল-প্রসূত এবং বিখ্যাতবীর্য...এক কন্যা আমি কাহাকে দিব?' তাহা শুনিয়া একজন বলিলেন, 'আমাকে দেও'। অপর বলিলেন, 'আমাকে দেও'। আর একজন বলিলেন, 'যদি এ-কন্যা একজনকে দিবা, তবে অপর দুই ব্রাহ্মণ পুত্র প্রাণত্যাগ করিবে; তখন তুমি বধভাগী হইবা'। অগ্নিস্বামী ব্রহ্মবধ প্রযুক্ত কাহাকেও দিল না। এমত সময় দৈবাৎ রূপবতীর মৃত্যু হইল...।"

এমন মেয়েকেও, অবশ্য দেখা যায়—তখনকার দিনে অন্তত দেখা যেত।—যে ছেলের কাছে গিয়ে বলে, "আমি প্রার্থনা করি, তুমি আমাকে বিবাহ কর...।" আর একটা অমোঘ অস্ত্র ছিল : অনশন-অনিদ্রা... "এক দিবস, ঐ রাজপুত্রের সহিত চন্দ্রার সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আহারনিদ্রা-রহিতা

আমার বিবাহ হয় না, এই নিমিত্তে আমি দুঃখিনী

হইয়া আপন শয়নাগারে শয়ন করিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে চন্দ্রা, তুমি কি-কারণ খেদিতা আছ?' কন্যা কহিল, 'আমি রাজকন্যা, আমার বিবাহ হয় না, এই নিমিত্তে আমি দুঃখিনী। সম্প্রতি যে-পর্বতে ভগবতীর আরাধনা করিতে প্রত্যহ যাই, সেই পর্বতে এক রাজপুত্র তপস্যা করিতে আসিয়াছে; আমি তাহাকে দেখিয়াছি। অতএব যদি তাহার সহিত আমার বিবাহ দেও, তবেই প্রাণ ধারণ করিব, নতুবা মরিব।' এই কথা শুনিয়া রাণী রাজাকে কহিয়া ঐ রাজপুত্রকে আনাইয়া কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যা ও জামাতা স্বগৃহে রাখিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিলেন।" মেয়েটি বলল মাকে, গিন্নী বলল কর্তাকে, ছেলেটি হল ঘরজামাই...।

তারপর?...তারপর আরম্ভ হল বউয়ের অভিযোগ ["আমি আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না"] আর তিরস্কার। একটি গল্পে দেখি, এক বণিক "ভার্যার অনেক তিরস্কারেতে খিদ্যমান হইয়া মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ" করছে। আরেক গল্পে "ব্রাহ্মণী একদিন ব্রাহ্মণকে কহিলেন, 'হে স্বামি, আমি নিবেদন করি : স্ত্রী জাতির ও বালকের যদ্যপি উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধানে অতিশয় অভিলাষ হয়, তথাপি আমরা তাহা আশা করি না; কিন্তু অন্নাভাবে নিরন্তর জঠর-জ্বালাতে শরীর দগ্ধ হয়—ইহা অসহ্য। তুমি ভিক্ষা-করণেতেও অসমর্থ। অধিক কথন অনুচিত...' ইত্যাদি ভর্ৎসন-বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ কুটীর হইতে নির্গত হইয়া ঈশ্বর-নামোচ্চারণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন।" মেয়েটি অবশ্য পতিব্রতা : স্বামী একদিন তাকে এক সাপ রান্না করতে দিলেন; "ব্রাহ্মণী পতিব্রতা ব্রত-ভঙ্গভয়েতে কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া পাকারম্ভ করিয়া অতি দুঃখিতা" হইল।

বউ আবার আলাদা হওয়ার স্বপ্ন দেখে : "আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ রহিল; তবে ইহাদের সংসারে কেন একত্র আর থাকিব? এই বিবেচনা করিয়া আপন স্বামীকে কহিল যে, আজি আমি ভিন্ন হইব; তুমি কি বল?"

পতিব্রতা

ইতিহাসমালার সমস্ত নারী পতিব্রতা নয়। "এক রথকার অপূর্ব এক রথ নির্মাণ করিয়া আপন স্ত্রীকে কহিল যে, 'তুমি সাবধানপূর্বক গৃহে থাকহ আমি এই রথ বিক্রয় করিয়া অন্য দেশ হইতে আসিব। আমার বিলম্ব প্রায় মাসাবধি হইবেক।' (...) রথকার বাটী হইতে গমন করিলে পর ঐ স্ত্রী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ নগরের একজন ধনবানের পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা হইল। সে উপপতির সহিত অহর্নিশি ক্রীড়া-কৌতুকে কাল যাপন করে; প্রত্যহ উপপতির বাটীতে থাকে...।"

একদিন চিত্রপতি ধনপতিকে কহিল, 'হে পুত্র, তুমি কখনও দূরদেশ গেলা না : আমার অসত্ত্বে কিরূপে বাণিজ্য করিবা?

অতএব আমার স্থানে লক্ষ টাকা লইয়া বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে যাও।' ধনপতি তাহা শুনিয়া লক্ষ টাকা লইয়া যাত্রা করিল। ইতোমধ্যে রত্নপ্রভা নামে তাহার পত্নী সৌধোপরি হইতে আপনার করভূষণ ফেলিয়া দিল। সে তাহাও সঙ্গে লইল।" ধনপতি বিদেশে গিয়ে ধনশালী হল; দেশে ফেরার সময় সে শুনল, "দরিদ্র হইয়া তাহার পিতা মরিয়াছেন (...) একদিন ধনপতি এক কুট্টনীকে কহিল যে, 'এই সহরের চিত্রপতি নামে বণিকের পুত্রবধূকে আমার নিকটে আন; আমি তাহাকে দুই লক্ষ টাকা দিব।' কুট্টনী তথাতে গিয়া এ-কথা কহিবামাত্র রত্নপ্রভা স্বীকৃতা হইয়া ধনপতির কাছে আইল (...) আপন করভূষণ দেখিয়া আপন পতি জানিয়া লজ্জিতা হইল; ধনপতিও স্ত্রীলোককে অবিশ্বাসের পাত্র জানিল।"

রত্নপ্রভা অবিশ্বাসের পাত্র বটে; রত্নাবতী কিন্তু পরম বিশ্বস্তা। ধনদত্ত তার "পিতার সর্বস্ব দ্যূতেতে নষ্ট করিয়া দেশান্তরে গিয়া" হিরণ্য গুপ্তের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং তাঁর কন্যা রত্নাবতীর পাণিগ্রহণ করে। "কিছু দিন পরে ধনদত্ত

রত্নাবতীকে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে এক নিবিড় বনে এক কূপেতে রত্নাবতীকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার পিতৃদত্ত তাবৎ অলঙ্কার লইয়া স্বদেশে গেল। কিন্তু রত্নাবতী প্রাণে না মরিয়া সে-কূপের মধ্যেই থাকিল। দৈবাৎ পথিকেরা তৃষ্ণার্ত হইয়া তথা গেলে কূপ মধ্যে রত্নাবতীকে দেখিয়া তাহারা তাহাকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে রত্নাবতী কহিল যে, 'কোন চোর আমার তাবৎ অলঙ্কারাদি লইয়া আমাকে কূপে ফেলিয়া গিয়াছে।" (...) তাহার পিতা হিরণ্যগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর রত্নাবতী পতিব্রতা এ কারণ আপন স্বামীর দোষ না কহিয়া চোরের দোষ বলিল। কিন্তু রত্নাবতী আপন স্বামীর কারণ উৎকণ্ঠিতা সদা থাকিল। কিছু দিন পরে দ্যূতপ্রিয় ধনদত্ত অপর ধনেচ্ছাতে পুনর্বার আপন শ্বশুরালয়ে আসিয়া রত্নাবতীকে দেখিয়া লজ্জিত হইল। কিন্তু রত্নাবতী তাহাকে দেখিয়া অতি আনন্দিতা হইয়া কহিল, 'হে প্রাণনাথ, ভয় করিও না। আমি বাঁচিয়াছি; তোমার দোষ পিতার সাক্ষাৎ কহি নাই। আমার পূর্বপুণ্যে তোমার দর্শন পুনর্বার পাইলাম।"

এক গল্পে দেখি : "তোমার মাতা স্ত্রীস্বভাবা, তাহার কথাতে বিশ্বাস করিও না।" নারীদের শুধু কথায় কেন, কার্যেও বিশ্বাস করতে নেই। একটি লোক তার স্ত্রীকে বলেছিল, "হে প্রিয়ে, আমি মন্ত্র-প্রভাবে সকল জন্তু হইতে পারি। তাহার স্ত্রী কহিল, 'হে নাথ, আমি কখনও ব্যাঘ্র দেখি নাই, অতএব তুমি একবার ব্যাঘ্র হও।' সে কহিল, 'ব্যাঘ্র হওয়া বড় বিষম। দেখিও, সাবধান! মন্ত্রপূত করিয়া এই জল রাখি; আমি ব্যাঘ্র হইলে আমার মস্তকে এই জল দিও, তবে আমি পুনর্বার মানুষ হইব। এ জল আমার মস্তকে না দিলে মনুষ্য হইতে পারিব না।' তাহার স্ত্রী তাহা স্বীকার করিলে সে এক পাত্রে মন্ত্র পড়িয়া জল রাখিয়া আপনি মন্ত্রপ্রভাবে এক ভয়নক ব্যাঘ্র হইল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী ভয়েতে অজ্ঞানাবৃতা হইয়া সে জল মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন ব্যাঘ্র কাতর হইয়া দুই তিনদিন তথায় রহিল; পরে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া গো-মনুষ্যাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল।"

"আমার ব্রাহ্মণী কোথায়?"

এক গল্পে দেখি এক ব্রাহ্মণীকে গর্দভী হতে। আরেক ব্রাহ্মণী হল শূকরী। গল্পটা এই : দেবতা বর দিয়েছিলেন যে, হরিদত্তের "বাটীর সমীপে যে সরোবর আছে, তাহাতে সে ও তাহার স্ত্রী ও পুত্র একবার যে-যে কামনা করিয়া স্নান করিবেক, তাহা-ই তৎক্ষণাৎ হইবে। (...) হরিদত্ত তাহা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে সকল বৃত্তান্ত আপন স্ত্রীপুত্রের সাক্ষাৎ কহিল। তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। পরে প্রথমেই হরিদত্তের স্ত্রী নবযৌবন ও অপূর্ব বসন ও ভূষণ ও সৌন্দর্য কামনা করিয়া সেই সরোবরে স্নান করিবামাত্র কামনা-মত সমস্তই পাইল। ইতিমধ্যে এক যবন রাজা সে স্থান হইতে যাইতেছিল; সে অপূর্ব স্ত্রী দেখিয়া দোলাতে আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল। তাহার পুত্র উপায়ান্তর না দেখিয়া কামনা করিয়া সরোবরে স্নান করিল যে, 'আমার মাতা ঐ দোলার মধ্যে শূকরী হইয়া শব্দ করুক। পরে তাহার মাতা 'তৎক্ষণাৎ' শূকরী হইয়া ঘত ঘত শব্দ করিতে লাগিল। যবন রাজা সে শব্দ শুনিয়া তোমার [illegible] [illegible] তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া [illegible]। শূকরী অদ্য-প্রথা-অস্থিমাংসময় [illegible] [illegible] কাতরা হইয়া আপন [illegible] [illegible] হইয়া থাকিল। হরিদত্ত [illegible] হইয়া এই কামনা করিয়া স্নান করিল যে, আমার ভার্য্যা যেমন ছিল তেমন হউক।"

"আমি একটাই খাইব!"

তাঁতী নাকি নির্বোধ; তাঁতিনী কিন্তু কম মূর্খ নয়—প্রবাদে। "একদিন তাঁতী হাটে গিয়া তিনটি [illegible] [illegible] কিনিয়া আনিয়া আপন স্ত্রীকে দিল। তাঁতিনী জিজ্ঞাসিল, "হে স্বামী, [illegible] [illegible]

অন্য তিনটি—কে কয়টি খাইবে?' তাঁতী কহিল, 'আমি হাটে গিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছি; আমি দুইটি খাইব, তুই একটি খাইবি।' তাঁতিনী কহিল, 'আমি রন্ধনাদি করিব, আমারও শ্রম আছে ঃ আমিই দুইটি খাইব।' এইরূপে দুইজনে বিবাদ হইলে দুইজনে পরস্পর সত্য করিল যে, ইহার পর যে আগে কথা কহিবে, সেই একটি খাইবে। ইহা স্থির করিয়া তাঁতী কাপড় বুনিতে লাগিল, তাঁতিনী পাক করিতে লাগিল। আগে কথা কহিলে একটি খাইতে হইবে, এই ভয়ে কেহই কোন কথা কহে না। এইরূপে তিন চারিদিন গেল, তথাপি কেহ কথা কথা কহে না। পরে অনাহারে দুইজন মৃতপ্রায় হইয়া আপন আপন স্থানে রহিল। (...) প্রতিবাসি জ্ঞাতিরা তাহারদিগকে মৃত জ্ঞান করিয়া মাদুরিতে বান্ধিয়া দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া যায়—তখনও কথা কহে না। পরে দুইজনকে (...) চিতারোহণ করাইয়া অগ্নি দেওনের সময়ে তাঁতী ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া কহিল, আমি একটি খাইব।"

বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতা কিন্তু জাত মানে না—শুনুন একবার পণ্ডিত পত্নীর কথা। স্বামী ছিলেন জ্যোতির্বিদ; এমন 'সূক্ষ্ম সময়' স্থির করতে পারতেন যে মুহূর্তে "কোন ফল ছেদন কিংবা কোন জীব হত্যা করিলে সেই অবয়ব স্বর্ণ" হয়ে যায়। একদিন রাজসভায় তিনি এক কুষ্মাণ্ড আনতে বললেন: "লগ্ন স্থির করিয়া নিকটস্থ লোককে সংকেত করিলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণে কুষ্মাণ্ড ছেদন করিবামাত্র কুষ্মাণ্ড স্বর্ণ হইল। সভাস্থ লোকেরা ও রাজা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত এবং সুবর্ণ জন্মাইতে পারেন—ইঁহার পারিতোষিক কি দিব? কিঞ্চিৎ অর্থ দিলে ইহার তুষ্টির হইবে না, কেবল সম্মান কর্তব্য। ইহা ভাবিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পণ্ডিতকে এক প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বগৃহে" ফিরে গেল। ব্রাহ্মণী বলল, "হে স্বামি, যদি তুমি স্বর্ণ জন্মাইতে পার, তবে আমারদিগের কি চিন্তা? এইক্ষণে তদ পর্যন্ত উদ্যোগ কর। ইহাতে জ্যোতির্বিদ (...) এক কুষ্মাণ্ড আনিয়া লগ্ন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণীকে ছেদন করিতে কহিলেন। সেই সময় এক মশক ব্রাহ্মণীর শরীরের এক প্রদেশে দংশন করিলে সেই উত্তম সময় ব্রাহ্মণী মশককে মারিবামাত্র মশক কিঞ্চিৎ সুবর্ণ হইল।"

আরেকজন মূর্খা নারী হল সেই রাজমন্ত্রীর মাতা। "গ্রামের প্রান্তভাগে শিবালয়ে পুষ্প ও বিল্বপত্র ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী" নিয়ে সন্ধ্যার পরে সে পুজোতে বসল। চোর চক্রবর্তীর ভয়ে "দেশের লোক সদা সশংক থাকে; কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে না।" মন্ত্রীর মায়ের প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর নাকি প্রতিকার করবেন।

"চোরচক্রবর্তী সে সন্ধান পাইয়া সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া ও মস্তকোপরি জটা ধারণ করিয়া ও শৃঙ্গ-ডম্বুর হস্তে লইয়া এক কলুর ঘানিগাছ হইতে এক আঁড়িয়া বলদ চুরি করিয়া তাহার উপর চড়িয়া গালবাদ্য করিতে করিতে সেই শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর মাতাকে কহিল, 'হে পুণ্যবতি, তুমি ধ্যান ভঙ্গ কর; আমি শিব। তোমার তপস্যাতে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার এ সকল দ্রব্য আমি ভোজন করি।' ইহা কহিয়া সে সকল দ্রব্য খাইয়া কহিল, তোমার চোর ধরাতে কি প্রয়োজন? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই বলদের লেজ ধর ঃ আমি তোমাকে সশরীরে

কৈলাসে লইয়া যাই। কিন্তু চক্ষু মেলিলে যাইতে পারিব না। ইহা শুনিয়া চোর-চক্রবর্তী বলদকে অরিবাবাস্ত কাঁটা-বন দিয়া বলদ দৌড়িল। তাহাতে মন্ত্রীর মাতার শরীরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা পড়িতে লাগিল। পরে চোরচক্রবর্তী পুনর্বার ঘানি-গাছে বলদকে বান্ধিয়া রাখিয়া আপন ঘরে গেল। মন্ত্রীর মাতা বলদের সহিত ঘানি-গাছে ঘুরিতে লাগিল।"

তখনকার দিনে তবে বুদ্ধি, বুদ্ধিমতী নারী ছিল না? ধরুন বরং সর্বাঙ্গসুন্দরী নাম্নী সেই রাজকন্যার কথা। প্রতিদিন মন্ত্রী তার সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা করতে আসেন; একদিন তিনি জিগেস করলেন, "হে সুন্দরী, চারি অক্ষরে জলজ পুষ্পের নাম—তাহার প্রথমাক্ষরে ধরনীর নাম, শেষ তিন অক্ষরে ভূষণের নাম, মধ্যের দুই অক্ষরে সত্ত্বের নাম, শেষ দুই অক্ষরে আবেশের নাম; ব্যস্ত করিলে বসন্তাদি পুষ্পের নাম, ধান্যের নাম, তাঁতের নাম, অস্ত্রের নাম—এই সমস্ত নাম তাহাতে বুঝাইবে, এমত চারি-অক্ষরের জলজ পুষ্পের নাম কি?"

সুধী পাঠকের কাছে অনুরোধ: একটু থামুন, চায়ের পেয়ালায় আর একটু চিনি দিয়ে ভালো ক'রে গুলিয়ে নিন; চামচটা ঘোরাতে ঘোরাতে [রাজমন্ত্রীর মাতার মতো] ভাবুন, ধাঁধার উত্তরটা কি। অমরকোষ খুলে দেখুন পদ্মপুষ্পের চতুরক্ষর সমস্ত প্রতিশব্দ: শতদল, কুশেশয়, তামরস, কোকনদ, সরোরুহ, মৃণালিনী, কমলিনী, সরোজিনী...। হল না। একটু ব'লে দি, কেমন?...রঙটা নীল। তাহলে উৎপল?... না। ইন্দীবর?...তাও না। সর্বাঙ্গসুন্দরী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ধরতে পেরেছিল: কুবলয়।

"কুবলয় পদ্মের নাম। তাহার প্রথমাক্ষর কু-শব্দে পৃথিবীর নাম, বলয়-শব্দে কঙ্কণের নাম, মধ্যের দুই অক্ষর বল-শব্দে সত্ত্বের নাম; ব্যস্ত করিয়া পাঠ করিলে বকুল-শব্দে পুষ্পের নাম, কুল-শব্দে তাঁতের নাম, যব শব্দে ধান্যের নাম, লব-শব্দে অস্ত্রের নাম, লয়-শব্দে আবেশের নাম...। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিরুত্তর হইয়া গেল।"

আরেকটি মেয়ের চালাকি দেখুন। "এক ব্রাহ্মণ বিস্তর বিস্তর পর্যটন করিয়া কিছু

বলদের সহিত ঘানি গাছে ঘুরিতে লাগিল

ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (...) প্রতি-রাত্রিতে সে টাকাগুলি পুঁটলি করিয়া দুইজনের মধ্যস্থলে রাখিয়া শয়ন করিতেন।" এক রাতে চোর এসে সিঁধ কাটল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একদল ডাকাত "পুরী-প্রবেশ করিল। সেই কলরবে ব্রাহ্মণ চেতনা পাইয়া আপন টাকার পুঁটলি লইয়া সেই সিন্দ-দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া পলায়ন করিলে চোর বুঝিল যে, 'ব্রাহ্মণ আমাকে আক্রমণ করিতে সিন্দ-দ্বারে থাকিল'। অতএব চোর ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না। এবং ডাকাইতেরাও গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণীকে ধরিল। সে বলিল, 'আমাকে ধর কেন? ঘরের মধ্যে আমার স্বামী আছেন, ধন সকলি তাহার কাছে।' এইমতে তাহারা ব্রাহ্মণীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে সে চোরকে ধরিতে গেলে ব্রাহ্মণী পলায়ন করিল।"

কলহপ্রিয়া

মেয়ের নাকি ঝগড়াটে: "দুই সতীনে গালাগালি, মুখামুখি, তারপর ধরাধরি, তারপর চুলাচুলি তারপর কিলাকিলি হইলে বলেতে লহনা খুল্লনার সকল অলঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে চিরা কাণী পরাইয়া ছাগল-রক্ষণে নিযুক্তা করিল।"

শুধু বৌয়েরা কেন, মায়েরাও ঝগড়া করেন। "এক দেশে কন্দলিয়া এক স্ত্রীলোক ছিল। সে দিবারাত্রি কন্দল ব্যতিরেকে থাকিত না। তাহার কন্দলের জ্বালাতে প্রতিবাসী লোকেরা আপন আপন বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। তাহার দুই পুত্র ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ আপন মাতার কন্দলের জ্বালায় আপনি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া আপন বাটীর এক বৃক্ষে ভূত হইয়া রহিল। (...) কনিষ্ঠ পুত্রও মাতার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আপনি বিবেকী হইয়া দেশান্তরে চলিল।" এদিকে বড় ভাইও বৃক্ষে "মাতার ঝাঁটা প্রহারপ্রযুক্ত থাকিতে না পারিয়া দেশান্তরে" গেল।

কাহিনীটা যে-কোনো গল্পসঙ্কলন থেকে গৃহীত থাকুক না কেন, কেরী সাহেবের জীবনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বুঝবেন, সেই গল্পটির মধ্যে বোধ হয় কেরীরই আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে: কতবার তাঁকেও সামলাতে হয়েছিল গঙ্গাতীরের এক বটগাছে ভূত হয়ে বাস করার প্রলোভন!

[ক্রমশ]

অগ্রজ বিজ্ঞানী—১

আমাদের তরুণ সমাজ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমি দেখেছি অনুপ্রেরণার মত অবস্থা হলেই ওরা যথেষ্ট সাড়া দেয়। আমাদের সমাজে প্রচুর সমস্যা রয়েছে, যাদের অনুসন্ধানের দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানীর। তার জন্যে প্রয়োজন যথাযথ 'টেকনিকেল কম্পিটেন্স'। এদেশে তার বড়ই অভাব। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সত্যিকারের বিবর্তনের ধারাটি বুঝতে পারলে, তবেই সম্ভব সার্বিক মঙ্গলের উদ্দেশে সুষ্ঠু জাতীয় পরিকল্পনার রূপায়ন। অথচ যে দেশে চুয়ান্ন কোটি লোকের বাস সে দেশে চুয়ান্ন জন প্রথম শ্রেণীর সমাজ-বিজ্ঞানী খুঁজে বের করা শক্ত। সম্প্রতি আমার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ সমাজ-বিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। ওঁর বক্তব্য, দৈনন্দিন কার্যসূচীর মধ্যে, সেটা যত সামান্যই হোক, একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব থাকা দরকার। আমাদের মস্ত বড় অভাব এখানেই।

প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক বসু ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সায়েন্স কংগ্রেসে জীববিদ্যার উপর অধ্যাপক জে বি এস হলডেনের বক্তৃতার একটি অংশ উল্লেখ করলেন। ঐ বক্তৃতায় হলডেন মন্তব্য করেছিলেন, প্রত্যেক দেশের বিজ্ঞানীদের বিশেষ একটি দায়িত্ব আছে। সেই দেশের বা মানব-সমাজের কল্যাণ সম্পর্কে তাঁদের অবহিত থাকতে হবে। এবং হয়ত গবেষণার ধারা কতকাংশে তারই প্রয়োজনের নিমিত্তে নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রশ্ন করেছিলাম, অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা একটু বিশ্লেষণ করুন, অধ্যাপক বসু। ওঁর উত্তর: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি না। হলডেনের কাছ থেকেই ঠিক যেভাবে জেনেছিলাম, সেই-ভাবেই বলছি। সেটা ...১৯৫৮। তখন আমি 'অ্যানথ্রোপোলজিকেল সারভে'-র অধ্যক্ষ। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা নির্মলাদেবীর সহযোগিতায় হলডেনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটার সুযোগ হল। কথা প্রসঙ্গে হলডেন মন্তব্য করলেন, জীববিজ্ঞানের কথাই ধরুন। এদেশে এর উপর তো অনেক রকমের গবেষণাই করা যায়। প্রচুর
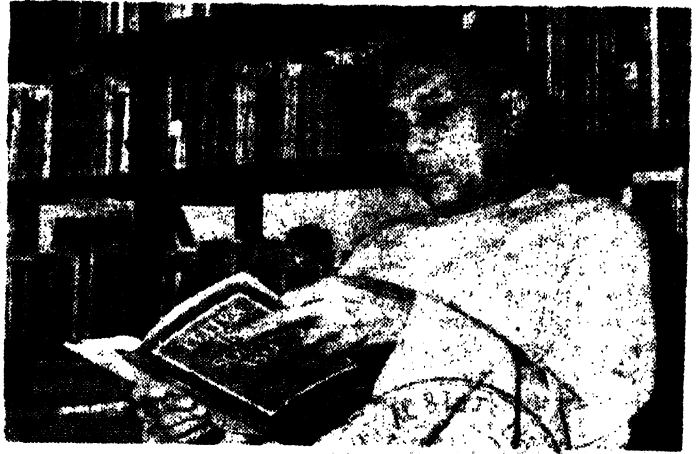
নিজস্ব গ্রন্থাগারে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

প্রসঙ্গ কথা

অ্যানথ্রোপোলজিকেল সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরে (কলকাতা) বসে অধ্যাপক নির্মল বসু সম্পর্কে কথা বলছিলাম বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী ডঃ সুরজিৎ সিংহ-এর সঙ্গে অধ্যাপক বসু সম্পর্কে ডঃ সিংহের বক্তব্য: ওঁর মধ্যে এমন কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যা সাধারণ একজন নৃবিজ্ঞানীর মধ্যে একান্তই অভাব। নিছক কতকগুলি বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক সমস্যা অবলম্বন করে প্রবন্ধ লেখার জন্যে উনি কোন গবেষণা করেন না। ওঁর প্রধান আকর্ষণ, ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা। যার উপর নির্ভর করে ভারতের সমাজ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়। এর জন্যে নৃতত্ত্বের সাধারণ গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে তিনি হিউম্যান জিওগ্রাফি বা মানব-প্রকৃতিবিজ্ঞান, সামাজিক ইতিহাস এবং প্রত্নতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ওঁর গবেষণার একটি প্রধান বিষয় ভারতের জাতি-প্রথা এবং তার গঠন। ভারতের ইতিহাসে শত শত বৎসর জাতিপ্রথাগুলি কী ভাবে টিঁকে থাকতে পারল? ওঁর অভিমত, জাতিপ্রথা আসলে প্রতিযোগিতাবিহীন অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর, সংস্কৃতির বিষয়ে সহনশীলতাই এই কাঠামোকে এতদিন ধরে চালু রেখেছে। উনি মনে করেন ভারতে শিল্পসভ্যতা আরও সম্প্রসারিত হলে তবেই জাতিপ্রথার বনিয়াদ দুর্বল হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত শিল্প প্রচেষ্টাগুলি সার্বিক-ভাবে জীবিকার পথ সুগম করতে পারেনি বলে মানুষ এখনও দু নৌকায় পা দিয়ে রেখেছে।......প্রথম দিকে ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদরা গবেষণা করতে গিয়ে প্রধানত এদেশের উপজাতিদেরই জীবনযাত্রার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন। অধ্যাপক বসু ভারতের নৃতত্ত্বকে সেই কূপমণ্ডূকতার হাত থেকে অনেকখানি মুক্ত করেছেন। ভারতীয় নৃতত্ত্ব শাখার অধ্যক্ষ থাকা কালে তিনি উপজাতির গণ্ডী অতিক্রম করে, সর্বসম্প্রদায় সাধারণ পল্লী অঞ্চল, মন্দির, পীঠস্থান, প্রাচীন এবং আধুনিক নগর জীবন, সর্বত্র গবেষণার দিগন্ত বিস্তৃত করেন। কুড়ি জন তরুণ বিজ্ঞানী নিয়ে তৈরি একটি দল গঠন করে ভারতের ৪৫০টি গ্রামের উপর তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ভারতের গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা জন্মানো। এরই ফলশ্রুতি তাঁর সম্পাদিত 'পিজেন্ট লাইফ ইন ইন্ডিয়া'। ওঁর ইচ্ছে, এই বই ভারতের সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়ে স্কুলপাঠ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা। ওঁর ধারণা, নৃতত্ত্বের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হলে তার চর্চা ও গবেষণার ধারা সমাজ জীবনের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ছাত্র জীবনে উনি বোয়াস, ক্রোবার এবং ম্যালিনস্কির মত খ্যাতিমান নৃতত্ত্ব-বিদদের দ্বারা প্রভাবিত হন। ফ্রয়েড, মার্কস, ক্রপোটকিন তাঁর চিন্তাধারাকে যথেষ্ট পুষ্ট করেছিল। উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আদিবাসী, কলকাতার নাগরিক জীবনের গোষ্ঠীগতরূপ, সেই সঙ্গে বিশ্লেষণী যুক্তি দিয়ে গান্ধীবাদ ও গান্ধীর সামাজিক পরীক্ষার উপর আলোচনা—সর্বত্রই সমানগতিতে তাঁর কৌতূহল কাজ করছে। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, মন্দির-স্থাপত্য, মানব-প্রকৃতিবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর যে সমস্ত কাজ করেছেন গুণগতভাবে তাদের তুলনা মেলা ভার। পৃথিবীর নৃতত্ত্বে অধ্যাপক বসুর মত বহুমুখী প্রতিভার দৃষ্টান্ত বিরল।

সমস্যা আশপাশে পড়ে রয়েছে। কিন্তু কার্যত দেখতে পাচ্ছি, আপনারা যা নিয়ে গবেষণা করছেন, তারা জীবন থেকে আসে নি। এসেছে বই থেকে। হলডেন তখন চারটে জিনিসের 'জেনেটিকস' বা প্রজনন বিজ্ঞানের উপর কাজ করছিলেন—ধান, নারকেল, হাঁস এবং তসরের গুটি। বললেন, তসরের গুটির ব্যাপারটা জানার জন্যে মানভূমে যাব। সেখানকার সাঁওতাল অধিবাসীদের মধ্যে তসরের চল অনেক বেশি। ওদের মধ্যে এর উপর একটা শিল্পও গড়ে উঠেছে অনেককাল থেকে। দেখব, তসর খারাপ হয়ে গেলে অর্থাৎ তসরের গুটি থেকে যে সুতো হয় তার উৎকর্ষ যখন কমে যায়, সাঁওতালরা কী করে। মানভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ওদের সঙ্গে কথা বললেন হলডেন। ওরা জানাল, সুতো খারাপ হতে শুরু করলেই কিছু কিছু গুটি ওরা দূরের কোন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর সেখান থেকেই তারা সংগ্রহ করে নতুন গুটি পোকা। অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যে সমস্ত গুটি পোকার ওরা চাষ করে, তাদের উর্বরাশক্তি কমে গেলে, যখন তাদের তারা দূরের কোন জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে, পোকাগুলি বড় হওয়ার পর ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী উচ্চ-উর্বরাশক্তির পোকার সঙ্গে তারা মিলিত হয়। ফলে তখন তাদের যে সমস্ত বাচ্চা হয় তাদের গুটি তৈরির ক্ষমতা আবার বেড়ে যায়। অথচ প্রজননগত এই যে সমস্যা, সাঁওতালরা তার সমাধান না জেনেই করে থাকে। বিজ্ঞানীদের উচিত ওদের ঐ জ্ঞানটাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করে আরও উন্নত করে তোলা। ধান, নারকেল প্রভৃতির ব্যাপারেও একথা খাটে। অর্থাৎ আমার বক্তব্য, আমাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা একান্ত সংযোগ রাখা প্রয়োজন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার রীতি-নীতিগুলি এবং তাদের কার্যকারণ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের উন্নতি সাধনে ব্রতী হওয়া দরকার।

কথা হচ্ছিল ওঁর ঘরে বসেই। খুবই ব্যস্ত মানুষ। রবিবার দুপুর বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত এর মধ্যে এক সময়ে দেখা করার সুযোগ পাওয়া গেল। সময়টা শুনে একটু দমেই গিয়েছিলাম। এক, দুপুর বারোটা থেকে তিনটে। দুই, রবিবার।

তিন, তাঁর নিজের বাড়িতে। ছুটির দিনে ঠিক ঐ সময়ে বিশ্রাম না করে কারুর পক্ষে কথাবার্তা চালান কি সম্ভব হবে?

নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আগের দিন অর্থাৎ শনিবার টেলিফোনে কথা বললাম। উনি জানালেন, কোন অসুবিধে হবে না। বারোটার সময় আমি বাড়িতে থাকব।

অতঃপর।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর জন্ম কলকাতায়, জানুয়ারী ২২, ১৯০১। শিক্ষা, পাটনার অ্যাংলো-স্যান্সক্রিট স্কুল, কামারহাটির সাগরদত্ত ফ্রী হাইস্কুল, রাঁচি জেলা স্কুল, পুরী জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৯ সালে বি এস সিতে ভূ-তত্ত্বর উপর প্রথম শ্রেণীর অনার্স এবং ১৯২৫ সালে নৃতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীর এম এস সি ডিগ্রী লাভ। ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব শাখার ফেলো হিসেবে কাজ করার সময় তিনি লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৫-এ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে মানব-বিজ্ঞানের রিডার। ১৯৫৯-৬৪ অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষ। ১৯৬৪তে আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্যবেক্ষক দলের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৬৭ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের শিক্ষাসমস্যা সম্পর্কিত তাঁর প্রতিবেদনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর, ১৯৫৯-এ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে পরে উইসকনসিন এবং মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সমাজ ও কৃষ্টির বিবর্তনের উপর বক্তৃতা দেন। এছাড়াও মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়, জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও সমাজ বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দেবার জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতীয় তথা সারা এশিয়ার সমাজ এবং কৃষ্টির উপর অনন্যসাধারণ গবেষণা এবং পরিকল্পনা রূপায়নের জন্যে তিনি অগণিত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

১৯১৬ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে নানারকম সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে অধ্যাপক বসুর প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত তখন থেকেই ছিন্নমূল মানব সমাজের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সম্পর্কের সূচনা। ১৯১৮ সালে তিনি সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের সঙ্গে জড়িত হন এবং এইচ এস সোরাবর্দি ও ডঃ কে এস রায়-এর সঙ্গে কাজ করেন। ১৯২০ সালে হিলি, দেওয়ান, [illegible]

মরিসাস এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে যে সমস্ত ভারতীয় মজুর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁদের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যাপারেও তিনি কাজ করেন। তাঁদের ত্রাণ-

---

ভারতীয় নৃবিজ্ঞান বিভাগ গত কুড়ি দশক থেকে দেশের সুপ্রাচীন নরকঙ্কাল এবং বিশেষ করে মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহ করে এসেছিল, কিন্তু তাদের উপর যথাযথ কোন নৃতাত্ত্বিক গবেষণাই হয়নি। ১৯৬১ সনে অধ্যাপক বসুর প্রচেষ্টায় সেই গবেষণারই বাস্তব সূচনা। ঐ বছর নৃতত্ত্ব বিভাগের তিনজন গবেষক শ্রীপবিত্র গুপ্ত, শ্রীপ্রতাপ দত্ত এবং শ্রীঅরবিন্দ বসু তাঁরই উদ্যম এবং পরিচালনায় প্রাচীন হরাপ্পা সভ্যতার নরকঙ্কালের উপর মৌলিক গবেষণা শুরু করেন এবং মাত্র এক বছর পর ১৯৬২-তে তার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। বলা হল, সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো মানুষের চেহারার সঙ্গে সিন্ধু এবং পাঞ্জাব অঞ্চলের বর্তমান অধিবাসীদের তুলনামূলক বিচার করে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়নি। এ থেকে অনুমান করা হয়েছে, প্রাচীন হরাপ্পা সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের পেছনে বহির্দেশীয় প্রভাব তেমন কাজ করেনি। যদি তার উপর বাইরে থেকে কোন আক্রমণ ঘটেও থাকে, তাতে এমন কোন কিছু ঘটেনি যা হরাপ্পার মানুষের মধ্যে সত্যিকারের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

*

অধ্যাপক বসুই সর্বপ্রথম সারা ভারতে ব্যাপকভাবে সমীক্ষা চালিয়ে ভারতবাসীর দৈহিক আকৃতিগত বৈচিত্র্যগুলি বিশ্লেষণের কাজে হাত দেন। পরে সারা ভারতের প্রতিটি জেলায় অনুরূপ অনুসন্ধান শুরু করা হয়। বর্তমানে বরানগরে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় অনুসন্ধানলব্ধ ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এত বড় নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এর আগে আর কখনও করা হয়নি। মুখ্য উদ্দেশ্য: কোথায় কী ধরনের মানুষ বাস করে তা জানা, অঞ্চল বিশেষে ভারতীয়দের চেহারার ব্যতিক্রম, একই জাতের (যেমন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি) মানুষের মধ্যে অঞ্চল বিশেষে চেহারা বা আচার অনুষ্ঠানে কী ধরনের প্রভেদ রয়েছে তা জানা, বিভিন্ন জাতের মানুষের পারস্পরিক, সামাজিক এবং পারিবারিক সংমিশ্রণের (বিবাহ) প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

শিবিরের যাবতীয় দায়িত্বই ছিল তাঁর উপর। ১৯৩০-এ স্বদেশীর মুচী, হাড়ী এবং বাউরি সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে বোলপুরে খাদি সংঘ [illegible]

সংগঠন বিভাগের সভা, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ত্রাণকার্য চালান এবং ঐ বছরেই মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে তাঁর দোভাষী এবং সচিবরূপে নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা ভ্রমণ মানব সমাজের এক ব্যাপক এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা যোগাতে তাঁকে সাহায্য করেছিল। সমাজকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬৬ সালে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ওঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী: কালচারেল অ্যানথ্রোপোলজি, ক্যানন অব ওড়িশান আর্কিটেকচার, একস্কাভেসন ইন ময়ূরভঞ্জ, কালচার অ্যান্ড সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, মডার্ন বেঙ্গল, প্রবলেমস অন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেসন, সিলেকশনস ফ্রম গান্ধী, স্টাডিজ ইন গান্ধিজম, গান্ধী ইন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স, গান্ধিজম অ্যান্ড মডার্ণ ইণ্ডিয়া, ওঁর বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী: হিন্দু সমাজের গড়ন, নবীন ও প্রবীণ, গান্ধীচরিত, স্বরাজ ও গান্ধীবাদ, পরিব্রাজকের ডায়েরি, ভারতের গ্রামজীবন এবং গণতন্ত্রের সংকট। এছাড়াও ১৯৫১ সাল থেকে তিনি 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদকরূপে কাজ করছেন।

হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা ওঁর অনেক। মানুষকে তিনি দেখেছেন, জেনেছেন কখনও একক মানুষ রূপে। কখনও গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষরূপে। অঞ্চল বিশেষে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। রীতি-নীতির স্বাতন্ত্র্য আছে। তবু তারই মাঝে মানুষের ব্যক্তিক দিকটিকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বৃত্তির সঙ্গে জাতিপ্রথার সম্পর্ক খোঁজার যাঁরা চেষ্টা করেন আংশিক ভাবে হয়ত তাঁরা ব্যর্থ। অন্তত স্বাধীনতার পর এ ব্যাপারটি নিয়ে আরও সুষ্ঠুভাবে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু হয়নি। উনি এই সত্তর বছর বয়েসেও এখনও ভেবে চলেছেন। ভাবছেন আঞ্চলিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর, সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অর্থ-নৈতিক পরিস্ফুটনের সম্পর্কের উপর, কোন পথে এবং কীভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত, লোক শিক্ষা এবং আরও অনেক অনেক বিষয়ের উপরই তাঁর ভাবনাচিন্তা। বয়েসে প্রবীণ হয়েও দৈহিক এবং মানসিকতার দিক দিয়ে তাঁর তারুণ্যের তুলনা মেলা ভার।

বস্তুত ভারতের সমাজব্যবস্থার বিস্ময়-রূপ, তার শতধা বৈচিত্র্য এবং স্বকীয়তা সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে শুধু বিস্ময় নয়, বড় রকমের একটি সমস্যা। প্রগতি অর্থে যদি বিজ্ঞান, কারিগরি প্রভৃতির উন্নতর প্রকল্প বুঝি, তাহলে ব্যাপারটা বুঝে উঠতে নিশ্চয় অসুবিধে হবে। বরং ঐ বিজ্ঞান, কারিগরি, রাজনীতি অথবা অর্থনীতি এদের উপর যত রকমের পরিকল্পনাই আমরা নিয়ে থাকি না কেন, ভারতের সার্বিক সমাজ [illegible]

বেশ গর্বের সঙ্গেই সিগারেটটি ধরিয়েছেন!
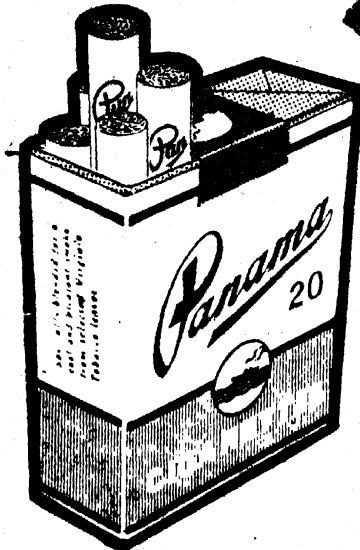
- সিগারেটটি হচ্ছে পানামা। বেশ মোলায়েম এবং ঠাণ্ডা আমেজের। আর তাজা স্বাদে—গন্ধে ভরপুর।
- সারা ভারতময় লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ীর প্রিয় সিগারেট।
- এই শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাটতির সিগারেট এটি।
- কী সুন্দর এর প্যাক! ভারতের সর্বপ্রথম পাউচ প্যাক।

পানামা সিগারেট

গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই—৫৭
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম

GT (P)—623 Ben. Greens' Advtg

প্রভাব কতটা, সেই প্রভাব জনজীবনের সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্যে কতটা কাজ করেছে, এদের খুঁটিয়ে দেখাই তো সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাজ। অস্থিরতা সমাজে আজকে আছে, চিরদিনই ছিল এবং থাকবে। কারণ মানব-জীবনের একটি ধারা আছে, নিজস্ব অভিব্যক্তি আছে এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ আছে। অতএব মানুষের কল্যাণ করব বলে যত রকমের তত্ত্বই তার উপর প্রয়োগ করি না কেন, দেখে নেয়া দরকার সেই তত্ত্ব প্রচলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতটা কার্যকর হতে পারে। দুঃখের বিষয়, তেইশ বছর হল দেশ স্বাধীন হয়েছে, এর মাঝখানে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে চার চারটে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাও প্রায় শেষ হয়ে এল, দেশে বড় বড় কলকারখানা হল, রকমারি স্কুল-কলেজ তৈরি হল, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নিয়ে প্রচুর রাজনৈতিক দলও জন্মলাভ করল। কিন্তু যে কারণে এ সমস্ত হয়ে গেল, নিশ্চয় সেটা মানুষেরই কল্যাণে এবং ভারতের মানুষের কল্যাণে, সেই মানুষ, তার আচার আচরণ, তার সংস্কার এবং সংস্কৃতি, এদের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য-প্রগতি সৃষ্টির ব্যাপারে ওদের প্রভাব কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, সে পরিমাপ এখনও আমরা করে দেখিনি। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের তোতাপাখীর মত। পাখী রইল গৌণ বস্তু, খাঁচাই শেষ পর্যন্ত সার এসে দাঁড়াল ভারতের সমাজ-বিজ্ঞানও এ ব্যাপারে অনেক অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

হ্যাঁ, এই হল প্রশ্ন। অধ্যাপক বসুর পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম ঠিক বারোটারই কাছাকাছি। উনিও প্রস্তুত হয়েছিলেন। বললেন, একটু বসুন, আমি আসছি। উনি চলে যেতেই একটি মেয়ে ওঁর লেখা কিছু কাগজপত্র দিয়ে গেল। ওগুলি সংগে সংগে মোটামুটিভাবে দেখে নিলাম। ছিল কয়েক খণ্ড 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'র 'জাতি এবং অস্পৃশ্যতার' উপর প্রবন্ধ, পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার উপর কারিগরি প্রকল্পের প্রভাব প্রভৃতির উপর তাঁর লেখা। মুশকিল হল, প্রত্যেকটি বিষয়ই মানব-বিজ্ঞানেরই পর্যায়ভুক্ত, কিন্তু এত বেশি ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে সীমিত সময় এবং পরিসরের মধ্যে তাদের ন্যূনতমভাবে উপস্থিত করাও শক্ত। তবু তারই মধ্যে থেকে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে মোটামুটিভাবে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেছিলাম এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

অধ্যাপক বসু বললেন: প্রতিদিনের কার্যাবলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের সংযোগ চাই। এই বিজ্ঞান বলতে আমি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির আবিষ্কারের কথা বলছি না, বলছি মানুষের কথা। একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রবণতা না থাকলে কোন সমস্যার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব কি? গান্ধীজির মধ্যে এটা ছিল। কিছু মনে করবেন না, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একবার পশ্চিম ভারতের এক জায়গায় কোন কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট করলেন। পরে মধ্যস্থতার জন্যে তাঁরা হাজির গান্ধীজির কাছে। গান্ধীজি তাঁর একান্ত সচিবকে বললেন, পুরো ব্যাপারটা জেনে নিয়ে যেন তিনি তাঁকে জানান। কিন্তু উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনে তিনি দেখলেন: ধর্মঘটীরা তাঁকে যে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছিলেন তার মধ্যে আংশিক সত্যতার সাক্ষ্য মিলল। ওঁরা ঠিক সেই সমস্ত তথ্যই তাঁর কাছে বলেছিলেন যেগুলি ওঁদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারেই শুধু কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রতিপক্ষ এবং নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে যেটুকু বক্তব্য ছিল তা আর প্রকাশ করেননি। এখানেই সমাজ বিজ্ঞানীর দায়িত্ব। গবেষণাগারের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সত্যতা সম্পর্কে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব, অথচ সাধারণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমরা কোন 'ভেরিফাই' করি না। দেখুন, যাকে আমরা 'সত্য' আখ্যা দিই সেটা আসলে বাস্তব ঘটনাবলীকে খুঁজে বের করার ক্ষমতা। তবে এই প্রসঙ্গে এটাও বলব, প্রচলিত ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশনকে শ্রদ্ধা করতেই হবে। আজকের দিনে যখন একশ রকমের পথ আছে তখন তাদের যাচাই করব না, কেন?

এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক বসু বিজ্ঞান-গবেষণার ব্যাপারে প্রচলিত ধারাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তার উল্লেখ করতে গিয়ে গোড়ার দিকে হুসেরের গৃটি সম্পর্কে হলডেনের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ উনি বোঝাতে চান, প্রায়োগিক বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারেও প্রচলিত পদ্ধতিগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করা উচিত। এর সব-চাইতে বড় দিক হল, এতে করে মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত করা যায়। তাছাড়া অর্থনৈতিক লাভ তো আছেই।

প্রশ্ন: অধ্যাপক বসু, আপনি কি মনে করেন সমাজ ব্যবস্থার নবীকরণের ফলে আমাদের দেশে সমাজ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি?

অধ্যাপক: বলার মত তেমন কিছু তো দেখছি না। আমাদের দেশে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, আমাদের পুরনো অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভিত্তি এখনও সম্পূর্ণ ভাঙে নি। যেমন ধরুন, বর্তমানে সারা ভারতে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে শতকরা ৪·২ জন, ছোট শিল্পে, কুটিরশিল্পে—নতুন এবং পুরনোই মিশিয়ে কাজ করছেন ৬·২ জন। দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত শতকরা ৯০ জন তাঁদের জাতিভিত্তিক

পেশাতেই নিযুক্ত রয়েছেন। যাকে আমরা 'মডারনাইজেশন' বা আধুনিকীকরণ বলে থাকি, আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যক লোকের উপরই তা বর্তেছে। আমাদের 'প্রোডাক্টিভ অর্গানাইজেনসনস' যা দুশ বছরের মত জাতিভিত্তিক অবস্থায় এদেশে আঁকড়ে বসে আছে এবং দেশের বেশির ভাগ মানুষ যাদের উপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছেন, তাদের পরীক্ষা করা দরকার। 'ওল্ড প্রোডাকটিভ অর্গানাইজেসনস'-এর সঙ্গে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কতখানি, সমাজ-বিজ্ঞানীদের সেটা গবেষণা করে বের করতে হবে। কত লোক পুরনো প্রথার উপর জীবন ধারণ করছেন, পুরনো সামাজিক প্রথার উপর তাঁদের আনুগত্য কতটা এবং তার কারণই বা কী, সেটা বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রশ্ন: এ ব্যাপারে আপনি কী বলতে চান?

অধ্যাপক: পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেশের বেশির ভাগ মানুষই 'আধুনিকীকরণের' সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পুরনো প্রথায় পেশাকে বংশগত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হত। ঐভাবেই এতকাল চলে আসছে। দেখা দরকার, ব্যক্তিগত গুণাগুণ অনুসারে সকলেই সুযোগ পাচ্ছে কিনা। শিক্ষার ধারাও ঐ পথে সঞ্চারিত হওয়া উচিত। শিক্ষার দায়িত্ব, ব্যক্তিগত গুণগুলি বিকশিত করার ব্যাপারে সাহায্য করা এবং সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে যাতে সকলে বেঁচে থাকতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া। এগুলি করতে গিয়ে কোথায় আমাদের আটকাচ্ছে, কিভাবে আটকাচ্ছে তার অনুসন্ধান করা দরকার।

প্রশ্ন: একটা ব্যাপারে কিন্তু বেশ খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক বসু। ভারতে পেশার সঙ্গে বংশ বা শ্রেণীর সম্পর্ক হয়ত এক সময়ে নিকটের ছিল, এখন কিন্তু কেমন উল্টো বলে কি মনে হচ্ছে না?

অধ্যাপক: কথাটা সত্যি। যেখানেই সুযোগ সুবিধে এসেছে সেখানেই ব্যতিক্রম ঘটেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৯২১ সালের বাংলার কথাই ধরুন। সেনসাস-এর প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা রোজগার করতেন, তাঁদের শতকরা চৌদ্দ ভাগই সংস্কৃত শিক্ষা, শিক্ষণ, যজমানি কাজ কর্মে লিপ্ত ছিলেন। অতএব অবশিষ্ট শতকরা ছিয়াশি ভাগ ব্রাহ্মণ আধুনিকতার সুযোগ পেয়ে বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন। ওঁদের বেশির ভাগই ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী পদস্থ কর্মী, জমিদার, ব্যাঙ্কার প্রভৃতি। ঠিক এইভাবে বিহার এবং অন্য প্রদেশে দেখা গেছে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ যজমানি বা ধর্মসংক্রান্ত কাজকর্ম ছেড়ে চাষ-আবাদে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিহারে ওঁদের বলা হয় ভুঁইহার ব্রাহ্মণ। আবার ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক, শিক্ষিত এবং যাজক সম্প্রদায়। এঁরা শিষ্যবর্গের উপঢৌকন প্রভৃতির উপর জীবিকা নির্বাহ করেন। দুই, দ্বিতীয় গোষ্ঠী লাঙ্গল স্পর্শ করেন না, তবে ভিন্নতর পদ্ধতিতে চাষআবাদ করেন। তিন, তৃতীয় গোষ্ঠী সাধারণ চাষীশ্রেণীর মতই লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষি জমিতে কাজ করে থাকেন। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাই তা হল, আমাদের পবিত্র গ্রন্থাদিতে ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে ঠিক যে ধরনের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল প্রয়োজন এবং সুযোগের দরুণ তাঁরা সেগুলি থেকে দূরে সরে এসেছেন। এবং সাম্প্রতিক কালে এই ব্যতিক্রম যে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, সম্প্রতি কলকাতার কাছাকাছি দেশের বৃহত্তম একটি জুতোর কারখানায় আমরা যে সমীক্ষা চালিয়েছিলাম তাতেই তা ধরা পড়বে। দেখা গেছে দক্ষ এবং অদক্ষ, কর্মীদের মধ্যে ঐ কারখানায় যে সমস্ত হিন্দু কাজ করছেন তাঁদের শতকরা ৪৩ ভাগই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য। কোন কোন জায়গায় ব্রাহ্মণকে আমি ক্ষৌর-কর্ম ব্যবসায়েও লেগে থাকতে দেখেছি। অর্থাৎ আমাদের বড়ো, শহর এবং কোন কোন

ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলেও বর্ণ ভিত্তিক পেশা যে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মোটেই সহায়ক নয়, এটা যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা পেশার পরিবর্তন করেছেন অথবা করার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন : কিন্তু একটা জিনিস সম্প্রতি আমরা লক্ষ করছি, অধ্যাপক বসু। দেশের একটা বড় রকমের অংশ আজ 'জমি দাও' বলে চিৎকার করছেন। ওঁদের বেশির ভাগই কিন্তু বংশগতভাবে চাষী। আপনি কি বলতে চান তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে বংশগত কোন প্রবণতা কাজ করছে না?

অধ্যাপক : সঙ্গত প্রশ্ন। না। আমি বলব, এর পেছনে পেশাগতভাবে বংশগত প্রবণতার চেয়ে আত্মরক্ষার প্রবণতাই অনেক বেশি সোচ্চার। একটা উদাহরণ দিই। তখন আমি দিল্লীতে নিম্ন বর্ণ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উপর কাজ করছি। দেখলাম, ওদের মধ্যে যাদেরই চাকরী যাচ্ছে তারাই জমি চায়। অথচ সব সময় সুষ্ঠুভাবে চাষ আবাদ করার মত অভিজ্ঞতাও যে তাদের আছে অথবা বংশগতভাবে তারা চাষী সে কথাও বলা না। বর্তমানে অনেক অঞ্চলে সাধারণ গরীব লোক, আদিবাসী অথবা উদ্বাস্তু ওঁদেরও জমি সংগ্রহের উপর আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। ব্যাপারটাকে প্রচলিত সরকারী ব্যবস্থার উপর তাদের পুরোপুরি অনাস্থা বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ওরা বুঝে নিয়েছে, সরকার কোন মতেই তাদের কর্মসংস্থান যোগাতে পারবে না। অতএব তাদের বক্তব্য, জমি দাও, তোমাদের আর কাজ দিতে হবে না। ফলে জমির চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। রাজনৈতিক দলও ব্যাপারটাকে কাজে লাগাচ্ছেন। আমি বলি, জমি দেবে কেন? অন্য কাজ দাও। কারণ তুমি জান, এদেশে জনসংখ্যার তুলনায় চাষের জমি কম। দারিদ্র্য মোচন করার জন্যে যারা খণ্ড খণ্ড জমি চাইছে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন করার ব্যাপারে তাদের অনেকেই অক্ষম। চাষের দক্ষতাও হয়ত অনেকের নেই। এটা নিশ্চয় বড় রকমের অপচয়। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় যেখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামীণ জীবনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের চেষ্টা প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে এইভাবে এগোলোটা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না। সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত এই সমস্যাটির উপর অনুসন্ধান চালান। দেখা দরকার সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তিগতভাবে যারা যে যে বৃত্তি বা পেশা নিয়ে আজ জীবন ধারণ করছে তাদের কতটা সংস্কারগত, কতটা নিজস্ব উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি। কারণ সাংস্কৃতিক অথবা অর্থনৈতিক না, কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হোক না কেন সেটা শুধু কতকগুলি তত্ত্ব খাড়া করে তাদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে, তাদের প্রবণতা এবং নিজস্ব যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতেই রচনা করা দরকার। অর্থাৎ ভারতের কোন অঞ্চলে কী রকমের এবং কতটা সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং কেন, তার উপর আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার। যেখানে ভাল চাষ আবাদ হচ্ছে, যাঁরা তা করছেন তাঁদের উৎসাহ দিন, উন্নত করার চেষ্টা করুন। যেখানে শিল্পের উপযোগী ব্যবস্থা আছে, অথচ কাজ করার মত মানুষের যোগ্যতা আছে, সেখানে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। এটাই তো সমাজবিজ্ঞানীদের দেখার কথা।

প্র : অধ্যাপক বসু, এ প্রসঙ্গে চীনের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান?

অধ্যাপক : দেখুন ওদেশেও শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ ছিল। তবে আমাদের দেশে পেশা বা বৃত্তির ব্যাপারে বংশগত ধারা যতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, ওদের তা করে নি। ওদের শ্রেণীভিত্তিক সমাজে কনফুসিয়াসের পর থেকেই দেখা যায়, জীবনে যে যে বৃত্তি গ্রহণ করবে তার জন্যে তাকে নিজস্ব গুণগত অবস্থার উপর নির্ভর করতে হত। অর্থাৎ মৎস শিকারীর ছেলেকে সব সময় যে মাছ ধরার ব্যবস্থা করতেই হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্যক্তিগত অনুশীলনের মাধ্যমে যে যে রকম দক্ষতা অর্জন করত, সে সেই রকম কাজ করার অধিকারী হত। এমন কি উচ্চ পর্যায়ের সরকারী চাকরী পাবার ব্যাপারেও বংশ মর্যাদার কথা তেমন স্বীকার করা হত না। ঐ ধরনের কাজ কে পাবে সেটা নির্ভর করত তার যোগ্যতার উপর এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তার সেই গুণগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হত। ১০৬০ সালেও এটা দেখা গেছে। অতএব বলা চলে সামাজিকতার দিক দিয়ে আধুনিকতার চল অনেক আগে থেকেই সেখানে শেকড় গেড়ে বসেছিল।

প্র : বর্ণগত বৈষম্য সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

অধ্যাপক : জটিল প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্বত্র এটা আজ বড় রকমের সমস্যা। এ শুধু মানুষের কালো-সাদার প্রশ্ন নয়, ইতর প্রাণীজগতেও এর উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন ধরুন, আমাদের দেশে টোডা নামে এ ধরনের পাহাড়ী জাত আছে। ওরা মহিষ পোষ প্রতিপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। ওরা লক্ষ করেছে সাদা-কালো ভূমির মোষ ওদের মেয়েদের সঙ্গে কখনোই মিলিত হতে চায় না। প্রাণী জগতের এই যে নির্বাচন ব্যবস্থা—এর মূলে কী ধরনের কারণ সক্রিয়তার কাজ করছে এখনও পর্যন্ত তা জানা যায় নি। মানুষের মধ্যে বর্ণভেদের কারণ কতটা সাংস্কৃতিক, কতটা সামাজিক অথবা অন্য কিছু সেটা জানার জন্যে সমাজবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক এবং তার বর্তমানের উপর আরও অনুসন্ধান চালানো দরকার এবং সেটা আন্তর্জাতিকভাবেই করতে হবে, এটাই অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মূল বক্তব্য। তাঁর মতে, সামাজিক বিবর্তনের ধারা প্রতিটি দেশের উপর শুধু পারিপার্শ্বিকতাই যে প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, তার পেছনে থাকে মানুষের অন্তর্নিহিত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য, সমাজবিজ্ঞানের যে কোন অনুসন্ধানীর সময় এ কথাটি মনে রাখা দরকার। এর জন্যে জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং যাঁরা সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা সুপারিশ করে দিয়েছেন তাঁদের সাহায্য করতে হবে। অতঃপর তারই প্রভাবে সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তন আসবে, সেই পরিবর্তনের মধ্যেই ধরা পড়বে মানুষ এবং প্রাতিষ্ঠানিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাৎপর্যও। আর এ ধরনের অনুসন্ধানের সময় গুরুত্ব দেওয়া দরকার ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক, পারিপার্শ্বিক স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক কাঠামো, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তি মানুষের ধ্যান ধারণার উপর। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, কৃষি ব্যবস্থা—যে কথাই আজ বলা হোক না কেন তাদের যথাযথ সমৃদ্ধি এবং সমাজ জীবনে তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে জানার জন্যে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীদের আরও ব্যাপক এবং বাস্তবভিত্তিক কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে।

সমরজিৎ কর

বাবা, তোমার গায়ে কী মিষ্টি গন্ধ!
ল্যাকমে ট্যালকম সত্যি অনুপম
অতুলনীয় পাঁচটি সুগন্ধের যে-কোনো একটি বেছে নিন। সবই ল্যাকমের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে ভরা। এই ট্যালকম সারাদিন ধরে আপনাকে স্নিগ্ধ, সতেজ ও সুবাসিত রাখবে। ল্যাকমে সারাক্ষণ মিষ্টি গন্ধের যে আমেজ ছড়ায় পুরুষেরা যেমন তা পছন্দ করেন, মেয়েরা ভালবাসেন খুবই। রেশমের মত কোমল বলেই ল্যাকমে ট্যালকম মুখের পরিচর্যায় অদ্বিতীয়। ল্যাকমের স্নিগ্ধ ধারায় আপনিও সুবাসিত, বিমোহিত হয়ে উঠুন। এই সুগন্ধ আপনাকে ঘিরে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
পাবেন পাঁচটি মনমাতানো সুগন্ধে। ল্যাভেণ্ডার, ভেটিভার, নির্য্যাস, চন্দন—মাঝারী আর ইকনমি সাইজে এবং রোয়াল মিষ্ট বড়, বড় ফ্যামিলি সাইজে।
ল্যাকমে ট্যালকম
মনমাতানো সুগন্ধে ভরা
Lakmé
ASP/L-67
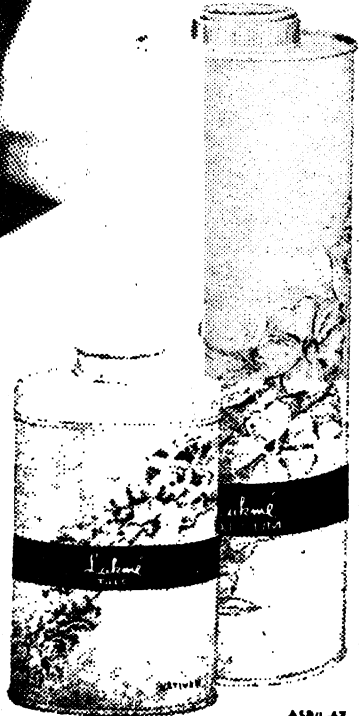
রান্নাঘরের হাতেখড়ি

গৃহকর্মে ও রান্নাবান্নায় হাতেখড়ি কিন্তু বেশ একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা। ছেলে বা মেয়ে শৈশবে, সামান্য থেকে শুরু করলে নিজেদের জীবনে স্বাবলম্বী হতে পারবে। রান্না ও অল্প বিস্তর গৃহকর্ম নারী পুরুষ উভয়েরই করা দরকার। এ বিষয় মতদ্বৈধ কোথাও নেই আজ।

ছোট ছেলেমেয়ের রান্নায় আগ্রহ নষ্ট করা খুব ভুল। খেলাঘরের মিছামিছি পরিবেশনের পালা শেষ করে সত্যি রান্নার সীমানায় তারা আনাগোনা আপনা থেকেই করবে। আপনার নিজের গৃহকর্মের অল্প অসুবিধা প্রথমে হতে পারে কিন্তু অচিরে তারা পরম সহায় হয়ে উঠবে। কাজেই আপনার ধৈর্যের ফল আপনিও পাবেন।

রান্নাঘরের হাতেখড়ির সর্বপ্রথম পাঠ আগুন সম্বন্ধে সতর্কতা। দ্বিতীয় পাঠ, পরিচ্ছন্নতা এবং শৃঙ্খলা। যে রান্নাঘরে যেভাবে উত্তাপ ব্যবস্থা তাকে ভাল করে জানা দরকার। বহু দুঃখময় দুর্ঘটনা তাতে এড়ানো সম্ভব হবে। হাঁড়ি কড়াই ধরবার পাকা বন্দোবস্ত থাকা দরকার। যে বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়াও দরকার। একটি জিনিসের ব্যবহার ভারতীয় রান্নাঘরে কম হয়। সেটি সজ্জারক্ষণী বা apron। পোশাকাদিতে ময়লা না লাগার জন্য দেহের সম্মুখ ভাগে এই পরিধেয় বস্ত্র খণ্ডের ব্যাপক ব্যবহারে যে কত উপকার বলে শেষ করা যায় না। পুরোনো শাড়ি, বিছানার চাদর ইত্যাদির টুকরো দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ তৈরী করে নিতে পারেন। বাহার দিতে চান তো দিতেও পারেন, নয়তো গলায় বা কোমরে বাঁধা যায় এ রকম সাদামাটা রক্ষণীতে কাজ চলে যাবে। ছোট ছেলেমেয়েদের অ্যাপ্রনে পকেট থাকলে তারা দু' একটা কাজের জিনিসও রাখতে পারবে। কোমরের ফিতেতে একখানা ঝাড়ন বা ছোট্ট তোয়ালে থাকবে। দরকার হলে হাত মোছা, বাসন মোছা চলবে। তবে হাঁড়ি ডেকচি গরম হলে এই ঝাড়ন দিয়ে ধরার লোভ সংবরণ করতে হবে। বরং খুব মজবুত শাঁড়াস, শক্ত দড়ে হোঁড়ে ইত্যাদির সম্যক ব্যবহার ছোট্ট রাঁধুনিদের জানা দরকার। অ্যাপ্রন, ঝাড়ন সবই সাদা হওয়া ভাল। যত ইচ্ছা ধুয়ে নিতে পারবেন, রং জ্বলে যাবার ভয় নেই। রঙ্গীন বস্ত্র তো সত্যিই কম ময়লা হয় না।

আমাদের রান্নায় হাতের আন্দাজ মস্ত বড় জিনিস। পাশ্চাত্ত্য পাকশালায় সবই প্রায় ফরমূলায় ফেলা থাকে। হাতের আন্দাজের বৈশিষ্ট্য যেমন প্রশংসনীয় তেমনই ছোট ছেলেমেয়েদের হাতেখড়িতে পরিমাপ সম্বন্ধে সতর্কতা নিতান্তই দরকার। বর্তমান বাজারে দশটা জিনিস নষ্ট করে রান্না শেখা সম্ভবও নয়। একটি পরিমাপের পেয়ালার সঙ্গে পরিচয় প্রথম পর্বেরই পাঠ। এক পোয়া মাপের পেয়ালা হলেই চলবে। অর্থাৎ আড়াইশ গ্রামের একটি মাপবার আধার। অ্যালুমিনিয়মের কাপ ও তাতে আড়াইশ' গ্রামকে আরও বিভক্ত করে দেখানো আজকাল বাজারে পাওয়া যায়। হাতের কাছে তার একটি থাকলে বাচ্চা রাঁধিয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর তার জানতে হবে :

(১) তিন চায়ের চামচ পরিমাণে হয় এক বড় চামচ বা table spoon।

(২) ১৬ টেবিল চামচে এক কাপ।

(৩) দুই কাপে প্রায় আধ লিটার।

(৪) ময়দা ইত্যাদি মাপতে বেশী ঝাঁকিয়ে না মাপা ভাল। তাতে পরিমাণ বেশী হয়ে রান্নায় অসুবিধা হতে পারে।

(৫) যেখানে আধ চামচ মাপবার দরকার সেখানে চামচ ভরে ডগা থেকে হাতল পর্যন্ত রেখা টেনে এক অর্ধেক নিতে হয়। মাপামাপির পালা ছাড়া সাধারণ রান্নায় যে বাসন ব্যবহার হয় তার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় দরকার।

হাতেখড়ির গোড়ার দিকটায় ডিম সিদ্ধ করা, আলু সিদ্ধ করা, চা বানানো, রুটি টোস্ট করা, ভাত বা রুটি, সহজ দু একটা তরকারি ইত্যাদি যথেষ্ট।

ডিম সিদ্ধ করা শক্ত নয়। কিন্তু ডিম সম্বন্ধে সামান্য দু একটা কথা জানা দরকার।

ডিম সহজে রান্না হয় ও অধিক উত্তাপে বিস্বাদ হয়ে যায়। ডিম সিদ্ধ করতে জল ফুটন্ত হবে না, কিন্তু ঠিক তার আগের অবস্থায় থাকবে। জলে ডিম খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ করা বা dropped egg পাঁউরুটির সংগে খাওয়া প্রশস্ত এবং পুষ্টিকর। যে কোন কচি ছেলেমেয়ে dropped egg করতে পারে। ডিম খুব পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবে। সাবধানে ভেঙ্গে একটি পেয়ালায় রাখতে হবে। কুসুম যেন গলে না যায়। কড়াইতে (ফ্রাইপ্যান হলে আরও ভাল) বেশ করে মাখন বা ঘি মেখে এক পেয়ালা জল এক চায়ের চামচের এক চতুর্থাংশ জল দিয়ে আঁচে রাখতে হবে। জল ঠিক ফুটবার আগে কাপে রাখা ডিমটি আস্তে ঢেলে দিলে শক্ত হয়ে উঠবে। গরম জল চামচে করে ঐ ডিমের উপর দিলে ডিমের উপর শ্বেতাংশের সুন্দর একটা পরদা হবে। সাবধানে তুলে মাখন মাখানো পাঁউরুটিতে রেখে খাওয়া যায়।

একটু বড় ছেলেমেয়েরা আর একটু বেশী দায়িত্ব নিতে পারে। আর পাঁচটা শখ বা hobby-র মত রান্নাকে hobby-র পর্যায়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না। খাদ্য তালিকা তৈরী করা, খাবার গরম করা, সময়মত গরম খাবার গরম ও ঠাণ্ডা খাবার ঠাণ্ডা পরিবেশন করা, সুসমতা রক্ষা করা সবই রন্ধনকলার এক এক দিক। আরও শিক্ষার জিনিস হচ্ছে খাদ্যের বাজেট বা হিসাব। প্রচুর পয়সা দিলে খাদ্যের মহিমা বৃদ্ধি হয় না এ কথা শৈশবেই শিক্ষা করা দরকার। খাদ্য তালিকায় বিভিন্নতা রসনা বিনোদন মাত্র নয়, মস্ত চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। রং ও রস দুয়ের সম্যক ব্যবহারের বোধ আয়ত্ত করতে হবে।

বাজারে আহার্য আয়োজনের কেনা-কাটাতেও বেশ নজরের প্রয়োজন। যেমন মাংস কেনার সময় উজ্জ্বল তাজা রং, কোন দুর্গন্ধ নেই দেখে নিতে হবে। কড়া কালচে লাল ভাল মাংসের পরিচায়ক নয়। মাছের বেলায় শিখতে হবে হাত দিয়ে মাছ পরীক্ষা করা। তাজা মাছ আঙ্গুল দিলে দৃঢ় মনে হবে, কানকো টুকটুকে লাল হবে। কারণ কানকোই মাছের শ্বাসযন্ত্র। কানকো বিবর্ণ হলে মাছ বাসি বুঝতে হবে। মাছের চোখ বসে গেলেও বুঝতে হবে মাছ অনেক আগের মরা।

রান্না করে রাখা খাবার গরম করে পরি-বেশন করতে শিখলে মায়ের কোন কাজে বাড়ির বাইরে বেশীক্ষণ থাকতে চিন্তা হয় না। ভাত রাঁধা থাকলে সোজা আগুনে রাখা ঠিক নয়। হয় ফুটন্ত জলে ভাপের পাত্র রাখতে হবে, নয় লবণাক্ত ফুটন্ত জলে ঠাণ্ডা ভাত দিয়েই জল ঝরিয়ে নিতে হবে।

টুকিটাকি

বিশিষ্ট ডাক্তারের মতে, মানসিক বা শারীরিক কঠিন পরিশ্রমের ঠিক পরেই খাওয়া উচিত নয়, অথবা ঠিক খাওয়ার পর কঠিন পরিশ্রম করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা কিছু খাওয়া উচিত নয়। আস্তে আস্তে ভাল করে চিবিয়ে খাবেন ও গলাধঃকরণ করবার জন্য জল খাবেন না।

খাবারে নানা বিভিন্নতা ভাল। কিন্তু বিভিন্ন দিনের জন্য বিভিন্নতা রাখবেন। একই দিনে অনেক রকম পরিবেশন করে হজমশক্তিকে বিপর্যস্ত করবেন না।

যদি জল তেষ্টা পায় তবে সামান্য জলপান করে কিছু সময় অপেক্ষা করে খাবেন। খাবার কিছু পরে জল খাওয়া স্বাস্থ্যকর।

খাবার পর বেঞ্চ বা ডেস্কে এমন করে বসবেন না যে বুকে চাপ পড়ে। ফুসফুস বা পাকস্থলী ও [illegible] মধ্যে যে [illegible]

শ্রীমতী

দুই বছর পূর্বে কলকাতা পৌরভবন সংলগ্ন মার্কেট স্কোয়ারে কয়েকজন তরুণ শিল্পী, বিশেষ করে প্রকাশ কর্মকারের উৎসাহে যখন প্রথম চিত্রমেলার (art fair) আয়োজন করা হয় তখন অনেকেই এটিকে শিল্পীসুলভ সাময়িক খেয়াল হিসাবে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু গত বছর এবং সম্প্রতি ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত তৃতীয় চিত্রমেলায় যাঁরা গেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে কলকাতার শিল্পকলা-ক্ষেত্রে চিত্রমেলা আজ একটি উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় বাৎসরিক উৎসব বিশেষ। প্রথম বৎসরের সাফল্য দেখে পরে শিল্পী অসিত পাল প্রমুখ অন্যান্য বহু তরুণ শিল্পী ও সোসাইটি অব কনটেম্পোরারী আর্টিস্ট-এর পরিচিত শিল্পী-সভ্যবৃন্দ চিত্রমেলায় যোগদান করে এটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এবারে গোষ্ঠী-নির্বিশেষে কলকাতার বিভিন্ন শিল্পিদলকে দেখে মনে হল—এই চিত্রমেলা আজ সত্যিই শিল্পিসম্প্রদায় ও সেই সঙ্গে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছে। আমাদের দেশের শিল্পকলার সঙ্গে জনসাধারণের ঠিক যোগাযোগ নেই। শিল্পী ও জনসাধারণের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ও সেই সঙ্গে তাঁদের অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ছবি কেনার সুযোগদান করাই ছিল চিত্রমেলার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, যতদিনই চিত্রমেলায় গিয়েছি ততদিনই দেখেছি বিপুল দর্শক-সমাগমে চিত্রমেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত। প্রবেশ-মূল্য থাকা সত্ত্বেও বহু লোক একাধিকবার চিত্রমেলায় পদার্পণ করেছেন, ঘুরে ঘুরে ছবি দেখেছেন, এবং সব চেয়ে বড় কথা, বহু লোক অল্পমূল্যে ছবি কিনেছেন। তাছাড়া মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে কয়েকজন শিল্পী দ্বারা আপন আপন প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিয়ে শিল্পীদের উৎসাহদান করেছেন। কর্তৃপক্ষের সুবন্দোবস্তমত বিভিন্ন শিল্পী এক একদিন তাঁদের শিল্প-সম্ভার দেখিয়ে ছবি বিক্রয় করবার সুবিধা লাভ করেন, ফলে, কলকাতার তরুণ শিল্পী-গোষ্ঠীর সকলেই জনসাধারণকে তাঁদের শিল্পনিদর্শন দেখাবার সুযোগ পান।

চিত্রমেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ। আলোকের বন্যা, ভেসে-আসা সানাইয়ের সুমধুর সঙ্গীত ও

চিত্রমেলা

তারই মধ্যে, কোনজন কোন শিল্পীর ছবি কিনলেন, মাইক মাধ্যমে তার ঘোষণা। প্রতি-দিনই মেলায় বহু সুপরিচিত তরুণ শিল্পীদের দেখেছি—তাঁরা দর্শকদের সঙ্গে ঘুরছেন, ছবি দেখাচ্ছেন ও বোঝাচ্ছেন। বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন শিল্পী ও শিক্ষার্থী উৎসুক নরনারীর প্রতিকৃতি আঁকছেন, তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কৌতূহলী দর্শকবৃন্দ—সত্যিই সে এক অপূর্ব পরিবেশ! দেখে মনে হল উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পেরও একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে—দেশের জনসাধারণ এই চিত্রমেলার মধ্য দিয়ে তা জানতে পারলেন। জনসাধারণের মধ্যে এই শিল্প-চেতনা জাগাবার জন্য চিত্রমেলা উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। বহু-নিন্দিত, সমস্যা-জর্জরিত এই শহরের বুকে এই চিত্রমেলার আয়োজন করে শিল্পিবৃন্দ মাত্র কয়েক দিনের জন্য এক নন্দনকাননের সৃষ্টি করে-ছিলেন। তাঁদের কাছে অনুরোধ, দেশের বিভিন্ন স্থানে এই চিত্রমেলার অনুষ্ঠান করে শিল্পপ্রচারক্ষেত্রে তাঁরা যেন পথিকৃতের প্রথম স্বাক্ষর রেখে দেন।

✻

শিল্পী মাধবী পারেখ, জোফিন মচোলা, মনু রাথোড়, বালভদ্র অগরওয়াল ও মনু পারেখ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে

গৌরি চৈতার —মাধবী পারেখ

প্রত্যেক শিল্পীর তেলরঙে আঁকা পাঁচটি, অর্থাৎ মোট ২৫টি নির্দশন দেখা যায়।

দু'একজনের দুর্বল রচনা চোখে পড়লেও প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি সুনির্বাচিত। তেলরঙ মাধ্যমে সকলে কাজ করলেও প্রত্যেকের রচনারীতিতে পার্থক্য ধরা পড়ে। মাধবী পারেখ তেলরঙের সঙ্গে প্যাস্টেলও ব্যবহার করেছেন। দেশের প্রাচীন লোক ও দেওয়ালচিত্রধারা অবলম্বনে তিনি ছবি এঁকেছেন। সূক্ষ্ম ও আঁকাবাঁকা রেখাজাল সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে লাল, নীল ও সবুজ রঙ ব্যবহারের ফলে তাঁর কাজে আলঙ্কারিক রূপ ফুটে উঠেছে। বস্তুত সূক্ষ্ম কারু-কার্যের জন্য কয়েকটি ছবিতে সূচিশিল্পের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কতকগুলি কাঁথা-জাতীয়। এই প্রসঙ্গে সি গড ও মাদার অ্যান্ড চাইল্ডের নাম করা চলে। কতকগুলির মধ্যে পুতুল বা খেলনার রূপ ফুটে উঠেছে, যেমন গরু। জোফিন মুচালা। বিমূর্ত শিল্পী, তাঁর রচনাবলী পরিচ্ছন্ন। দু'একটি প্রতীকপ্রধান, যেমন, উভ। লাল ও নীল রঙ-প্রধান প্রতীকমূলক মাছের মধ্য দিয়ে তিনি বক্তব্যটুকু প্রকাশ করেছেন। বিমূর্ত রচনা হিসাবে ব্রু-রিভার উল্লেখযোগ্য। আঁকাবাঁকা লম্বমান কয়েকটি নীলরঙের টানের মধ্য দিয়ে তিনি প্রবাহিত নদীর রূপ বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'মায়ার' নামও করা যায়—এটির ভাস্কর্যজাতীয় বৈশিষ্ট্য অনেকের চোখে পড়ে। বালভদ্র আগরওয়াল জ্যামিতিক বিভিন্ন ক্ষেত্র অবলম্বনে রচনা করেছেন। প্রধানত বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রঙের বৃত্ত পাশাপাশি বা একের ওপর আর একটি কৌশলে স্থাপন করে তিনি রূপজাল সৃষ্টি করেছেন। রঙীন পৃষ্টভূমির পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি রঙীন বৃত্তের ওপর অন্য রঙের বৃত্ত স্থাপনার (superimposition) ফলে শিল্পী রঙের সুন্দর তারতম্যের বিন্যাস করেছেন—যেমন, নীল, কমলা ও বেগুনী রঙপ্রধান পেণ্টিং ১ ও লাল ও হলুদ রঙ-প্রধান পেণ্টিং ৪। শিল্পী রঙ নির্বাচনে পটু, এবং নির্বাচন ও সুকৌশল ব্যবহারের জন্য দু'একটিতে তিনি আয়তনিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলছেন বিশেষ করে পেণ্টিং-৩-এ। মানু পারেখও বিমূর্ত শিল্পী—তবে তাঁর রচনায় অঙ্কন পদ্ধতি ও শূন্যস্থান বিভাজনই লক্ষ্যণীয়। শিল্পী প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যায় সুপটু, রেখা বলিষ্ঠ ও সাবলীল। দু'একটি রচনায় প্রতীকের সন্ধানও পাওয়া যায়। নানা বলিষ্ঠ ও অর্ধবৃত্তাকার রেখায় রচনাক্ষেত্রটি ভরে ফেলে তিনি স্থানে স্থানে সুনির্বাচিত রঙ ব্যবহার করেছেন—ফলে বিভিন্ন রঙের পরিপ্রেক্ষিতে রেখাগুলি স্পষ্টতর হয়ে একটি কমনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন, আমটাইটলড-১ ও আমটাইটলড-৪। শেষোক্তটির ভাস্কর্যরূপ অনেকের ভাল লাগে। মানু রাথোড়ও বিমূর্ত রীতিতে এঁকেছেন, তবে তিনি ব্যবহার করেছেন নানা চিহ্ন ও প্রতীক। এ জাতীয় রচনা তখনই রসোত্তীর্ণ হয় যখন শিল্পী যথাযথ-স্থানে এগুলিকে স্থাপন করতে পারেন। দুঃখের বিষয় সবগুলি ঠিক চোখে পড়ে না। চতুর্ভুজ ও চিহ্ন অবলম্বনে রচিত টৌপকানি-২-এর নাম করা যেতে পারে।

শিল্পী পরিতোষ দাস অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শিল্পী প্রধানত জল ও পোস্টার রঙে কাজ করেছেন, যদিও তেলরঙে আঁকা দু একটি নিদর্শনও ছিল। প্রদর্শনীতে মোট ২২টি ছবি দেখা যায়। পরিতোষ দাস তরুণ, ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে সার্টিফিকেট কোর্স শেষ করার পর থেকেই তিনি অভিনিবেশ সহকারে ছবির পর ছবি এঁকে যান—উদ্দেশ্য, শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। শিল্পীর অঙ্কনরীতি ও বিষয়বস্তু দুইই মিশ্র জাতীয়। অর্থাৎ শিল্পী সম-বিমূর্ত ও রিয়ালিস্টিক রীতিতে কাজ করেছেন। কয়েকটি ছবিতে বিমূর্ত রীতির মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তবে সব ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারেননি। রিয়ালিস্টিক রীতিতে রচিত দুএকটি নিসর্গ দৃশ্য মন্দ লাগে না। এই প্রসঙ্গে আনহার্ড সঙ-এর নাম করা যায়। কালো ও সবুজ রঙের ব্যবহার ও বিশেষ করে বিস্তীর্ণ আকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ছবিখানি কয়েকজনের চোখে পড়ে। পরি-কল্পনার দিক থেকে দি ক্যাপটিভ-এর নামও উল্লেখ্য। তবে গভীর রঙের স্তরভেদ সৃষ্টির জন্য দুটি ছবি অনেকেরই ভাল লাগে।

প্যাশন —পরিতোষ দাস

আর একটি কারণ, দুটিতেই সমকালীন জীবনের আভাষ মেলে। যেমন আজ ও বেঙ্গল টুডে। দুটিই প্রতীকমূলক। প্রথমটি যেন অন্ধকারে আবদ্ধ বন্দী জীবনের অবসানের আশায় স্বাধীনতা ও মুক্ত আলোকের প্রতীক্ষায় বঞ্চিত জীবনের আর্ত ক্রন্দন। দ্বিতীয়টি বর্তমান সমাজ-জীবনের ওপর তীব্র কশাঘাত। চিন্তাধারা, আচার ও ব্যবহারে যেন এ যুগের মানুষ আদিম গুহাবাসী অসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে—গভীর লালপ্রধান মিশ্র রঙের প্রতীক মাধ্যমে শিল্পী সম্ভবত তাই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। অপরাপর ছবির মধ্যে অ্যাসপিরেশন মন্দ লাগে না। শিল্পী ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েক স্থলে মানব মূর্তিকে বিকৃত করেছেন কিন্তু রসসৃষ্টি করতে পারেননি। মনে হয় অযথা বিমূর্ত বা সমবিমূর্ত রীতির পরিবর্তে শিল্পী যদি প্রতীক প্রধান রচনার দিকে লক্ষ্য দেন তাহলে তিনি লাভবান হবেন।

*

শিল্পী এ সি মাথুর বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে জলরঙ ও কালি-কলমের স্কেচসমেত ৫০টি নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশ ছবিই নিসর্গ ও বহির্দৃশ্য জাতীয়। জলরঙে আঁকা হলেও কতকগুলি রঙীন স্কেচ হিসাবেই ধর্তব্য। শিল্পীর জলরঙ ব্যবহার সব ক্ষেত্রে সমান নয়—অর্থাৎ কয়েক স্থলে তাঁর রঙ নির্বাচন ও ব্যবহারের মধ্যে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কয়েক ক্ষেত্রে নানা রঙ ব্যবহার করেও তিনি আশানুরূপ ফললাভ করতে পারেননি: যেখানে তিনি কাগজের ওপর বিনা আয়াসে রঙ ব্যবহার করেছেন সেখানেই তিনি সাফল্য-লাভ করেছেন, যেমন স্প্রিং ও মজ ফ্লাওয়ারস। কয়েকটি লম্বা গাছের পরি-প্রেক্ষিতে পাতলা, লাল, হলুদ ও বেগুনী রঙ ব্যবহার করার ফলে কাননের একাংশ যেন 'পলাশের নেশায়' মেতে উঠেছে। প্রথমটি চোখে পড়ে এবং দেখে দিল্লীর শিল্পী রামনাথ পাশরিচার জলরঙে আঁকা ছবির কথা মনে আসে। নিসর্গ দৃশ্যগুলি সরল রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে আঁকা। এই প্রসঙ্গে নিউ কনস্ট্রাকশনের নাম করা চলে। পৃষ্ঠভূমিতে ছোট্ট পাহাড়ের কিয়দংশ দেখা যায় ও তারই পদতলে ওপরে ও নীচে নতুন তরী কয়েকটি কুটীর, পুরোভাগের থানটুকু নিম্নভূমির দিকে নেমে গেছে। সবুজ রঙের তারতম্যের বিন্যাস ও লাল রঙের পরিমিত ব্যবহারের জন্য ছবিটি অনেকের ভাল লাগে। বেম্বুজও রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হতো যদি না অংকন-পদ্ধতি আড়ষ্ট হত। কালিকলমের স্কেচ হিসাবে কমপোজিশন-২-এর নাম করা যায়। বস্তুপ্রধান পরীক্ষামূলক ছবিও শিল্পী আঁকবার চেষ্টা করেছেন, তবে সুফল লাভ করতে পারেননি (রিফ্লেকশন)। অংকন-কৌশলের দিক থেকে রিফ্লাকশন মন্দ লাগে না।

*

অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি লিটল ফ্লাওয়ার্স-এর শিশুশিল্পীদের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে চার বছর থেকে শুরু করে বার বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা নানা ছবি দেখা যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা যে রঙ কত ভালবাসে তা প্রদর্শনীটি দেখলেই বোঝা যায়। লাল, নীল, হলুদ, কমলা যার যা খুশি সেই রঙ মনের আনন্দে ব্যবহার করেছে। দেখতে ভাল লাগে, তার প্রধান কারণ তাদের অবাধ স্বাধীনতা। নিয়ম-কানুনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না—আপনার খুশি মত তারা রঙ ব্যবহার করে গেছে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট শিল্পীদের বিষয়বস্তুও লক্ষ্য করার মত। কেউ এঁকেছে পাখী, কেউ এঁকেছে পুতুল আবার কেউ বা অদ্ভুতভাবে এঁকেছে ভূতপ্রেতের ছবি। উদ্বাস্তুদের দুঃখ দেখে হয়ত কারুর মন সমবেদনায় ভরে উঠেছে, তাই সে উদ্বাস্তুর ছবি এঁকেছে। কয়েকজনের ছবি অনেকেরই চোখে পড়ে। যাদের আঁকা ছবি প্রশংসা দাবি করে তাদের মধ্যে গোতম দে, শান্তনু দত্ত, রাজকুমার দত্ত, মৃণাল সরকার, পম বাগচি, অরুন্ধতী সেন, শমিতা দাস, মঙ্গল গোস্বামী, শর্মিলা রায় ও সুনেত্রা বাগচির নাম করা চলে।

*

কলকাতা চিত্রমেলার পরিচালক শিল্পীদের উদ্যোগে চিত্রমেলা প্রাঙ্গণে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন খ্যাতনামা ভাস্করশিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে দু'একজন অনুযোগ করেন যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসম্ভার দেখার সুযোগ পান না—বিদেশী শিল্পীদের ছবি বা প্রতিলিপি দেখার সুযোগ অপেক্ষাকৃত অধিক। অনেকে শিল্পগুরুর স্মৃতিকল্পে একটি স্থায়ী গ্যালারী স্থাপনের ওপর জোর দেন। শিল্পকলার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা, শিল্প সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মনোভাব ও

দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ করে তার শিক্ষাদান-প্রণালীর কথা উল্লেখ করে দেবীপ্রসাদ তার জীবনের প্রথমদিকে, অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থার, দু'একটি ঘটনা বিবৃত করেন। অধ্যক্ষ চিন্তামণি করও শিল্পগুরুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সভায় শিল্পী, কলা সমালোচক ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য নানা আলোচনা হয় ও পরে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় তাদের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য : শিল্পাচার্যের মুখাঙ্কিত শতবার্ষিকী ডাকটিকিট প্রকাশন ও সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধজ্ঞাপন ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করে একটি স্থায়ী গ্যালারীতে সেগুলি সযত্নে রক্ষা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন।

ভ্রম সংশোধন

দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিকী আলোচনায় (দেশ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী) ৩৬১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের চতুর্থ লাইনে শিল্পী কেথ সোনিয়ার (বয়স ২৯)-এর স্থলে শিল্পী অ্যালান সারেট (বয়স ২৭) পড়তে হবে।

—চিত্রপ্রিয়

॥ পনের ॥

'আমি চারুদার মতন গল্প লিখিয়েই হব নাহয়'। মাকে আমি বলেছিলাম—'কৃত্তিবাসের মত কবি নাই বা হলাম। সেও কিছু কম কীর্তি' হবে না মা'।

'ছেলে চারুর মত গল্প লিখবি তুই? বলিস কী রে?'

'পারব না লিখতে? চারুদার 'ভাতের জন্মকথা' বইটা বিল্টুর কাছ থেকে নিয়ে পড়েছি—চমৎকার! অমনতর লিখতে পারলেও তো মন্দ হয় না।'

'তুই কী লিখবি? ডালের জন্মকথা?' হাসলেন মা: 'চারুকে তো প্রবাসীর পাতায় পাতায় দেখি। তোকে তা হলে এরপর ডালে ডালে ঘুরতে দেখা যাবে!'

'ঠাট্টা করছো মা? কেন, ডাল নিয়েও লেখা যায় না নাকি? ডালও তো কত রকমের হয়। ছোলার ডাল, কলাইয়ের ডাল, খেসারির ডাল, অড়হর ডাল, মুসুরির ডাল, মুগের ডাল...'। ছোলা কলার থেকে শুরু করে মুগের ইস্তক ভাঙাতে লাগি।

'জানি। ডালের আবার কত পালা, শাখা প্রশাখা, কত কী! কিন্তু তার খোঁজ-খবর নিতেও ঢের পড়াশোনা করতে লাগে। চারুর মত বিদ্যে হয়েছে তোর? সে বি-এ পাশ। ডালপালার অতো শতো ফ্যাকরায় না গিয়ে তুই বরং তোর বাপের মতন পদ্য লেখ না কেন!'

হ্যাঁ, পদ্য লেখেন বটে বাবা। পয়ার ত্রিপদী, চতুষ্পদী—নানা আকারে, নানান ছন্দে বানানো ছোটখাট অনেক রকম পদ্য লিখেছেন বটে, নিজ ব্যয়ে বই করে ছাপিয়েছেনও সেসব আবার, কলকাতার থেকে ছাপিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছেন—তা, হাজারখানেক কপি তো হবেই। যে চায়, যে না চায় তাকেও, না চাইতেই বিনামূল্যে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন। চাঁচোর আর আশ-পাশের গাঁয়ে তাঁর বই পেতে বাকি নেই কেউ। কবিখ্যাতিও রটেছে নিশ্চয়।

নিজের নামেই নামকরণ করেছেন বইটার—শিবপ্রসাদ। নিজে ততটা না হলেও তাঁর বইটিকে তিনি স্বনামধন্য করে ছেড়েছেন।

বাবা বলতেন, সে কবিতাই বা কী আর সেই বনিতাই বা কীসের, পা ফেলার সাথে সাথেই যে হাতে হাতে তোমার মন না কেড়ে নেয়। বেড়ে কথা বলেছিলেন বাবা। 'পদবিন্যাস মাত্রেন মন না রমতে হয়া।' কথাটার মর্ম বুঝতে আমার একটুও বিলম্ব

পা দিয়েই যে মন হাতিয়ে নিতে পারে

হয়নি। কবিতার পদবিন্যাসে কী তখনো আমি তা ভালো করে জানি না, কিন্তু বনিতারটা জেনেছিলাম। রিনির পদবিন্যাসের সঙ্গে কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখেছিলাম—সত্যি বটে! বনিতা কাকে বলে কে জানে, কিন্তু অমন মেয়ে না হলে, যে তার পা দিয়েই সহজে যে কারো মন হাতিয়ে নিতে পারে—তার সঙ্গে ছাড়া আর বুঝি বনিয়ে চলা যায় না। আর কেউ তেমন বনবার নয়।

আমার সেই বাল্যকালে বাবার বইটা আমি কয়েক বারই তো পড়েছিলাম, কিন্তু এমনিই আমার বিস্মৃতি শক্তি, এতদিন পরে তার অতগুলো পদ্যর একটাও যদি আমার মনে থাকে!

কেবল তার একটা পদবিন্যাস আমার মনে আছে—যে-পদটা সত্যিই আমার মন ভুলিয়েছিল সেদিন! ভারী উপাদেয় পদ।

বাংলার নানান জায়গার কোথাকার কী খাদ্য, কোনখানের কোন খানা খাসা, তার সবিস্তার ফিরিস্তি তাঁর একটি পদ্যের কয়েকটি ছত্রে তিনি ধরে দিয়েছিলেন, তার মধ্যেকার সারাৎসার সেই লাইনটি—

'চাঁচোরের মানিক কলা সংসারের সার!'
এখনো আমায় মর্মে মর্মে গাঁথা হয়ে রয়েছে। মনের লালায়িত রসে সজিভ হয়ে এখনো।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভ্রান্ত প্রেমের (সেই কালেই আমার পড়া) "আহা, কী করিয়া বলিব কেমন সেই মুখ-খানি-র বর্ণনার সঙ্গেই বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে বুঝি সেই কলার তুলনা করা চলে। তেমন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কলা, (মর্তমান জাতীয়ই হবে বোধ হয়, কিন্তু বর্তমানে বিরল) চাঁচোরের বাইরে আর কোথাও আমি পাইনি, খাইনিকো অন্য কোথাও। ফজলি যেমন মালদা জেলার বিশিষ্ট আম (গোপালভোগ, বৃন্দাবনী, ক্ষীরসাপাতি ইত্যাদি আরো সব থাকলেও) তেমনি ঐ মানিক কলা চাঁচোরেরই বিশেষ আমদানি। খানদানি পরিবারেরাই খান-

স্নান—খান এবং দান করে থাকেন।

বাবার বইটির আরো কয়েক ছত্র, আমার জন্ম কাহিনীর সঙ্গে জড়ানো বলেই বোধ করি, আমার স্মরণে রয়ে গেছে এখনো—

'বঙ্গাব্দ তেরশ দশ প্রাতে রবিবার
সাতাশে অগ্রহায়ণ শিবের কুমার
শিবরাম জনমিল লীলাশঙ্খ বাজাইল
শিবহৃদে উপজিল আনন্দ-অপার॥'

'লীলাশঙ্খটা কী মা?' শুধিয়েছিলাম আমি মাকে : 'রবিবাবুর কবিতায় লীলা-কমলের মতই কোনো জিনিস-টিনিস নাকি? লীলাখেলা করবার?'

'নারে, তুই যখন জন্মালি না, জন্মানোর সময় শাঁখ বাজাতে হয়তো, তখন যে মেয়েটা তোর জন্মাবার সময় শাঁখ বাজিয়েছিল তার নাম ছিল লীলা।' মা জানালেন—'আর জানিস, তুই যখন হলি না, সূর্যিঠাকুরও উঠল ঠিক সেই সময়টায়—একসঙ্গেই এলি তোরা দুজনায়।'

'সূর্যিঠাকুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছিলাম বলছ না নিশ্চয়?'

'কে জানে! আর তুই জন্মেছিলি তোর দু হাত খুলে—সেটা একটা ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার।'

'আশ্চর্য্য কিসের?'

'সব ছেলেই জন্মায় দু হাত মুঠো করে—তাই নিয়ম। তুই এসেছিলি একেবারে খোলা হাতে। নানা জনে নানান ব্যাখ্যা করেছিল তার।'

'কি রকম?'

'কেউ বলল, এ ছেলে এক নম্বরের উড়নচন্ডী হবে, কিচ্ছু এর হাতে থাকবে না, কোনো জিনিস ধরে রাখতে পারবে না। কতজন কত কী বলল। তোর বাবা বলল যে, এ ছেলে কাউকে বাঁধবে না, কারো কাছে কোথাও বাঁধা পড়বে না। আমার ছেলে তো! আমার মতই হবে। জন্মসন্ন্যাসী। মুক্ত হাতে এসেছে, মুক্ত হাতে যাবে—সর্বদা মুক্ত হস্ত। মুক্ত পুরুষ।'—এই কথা বলল তোর বাবা।'

'মুক্ত পুরুষ! মুক্ত পুরুষ কী মা?' আমি জানতে চাই; 'অগাধ সমুদ্দুরের ডুবুরি যারা, মুক্ত খোঁজে, শুক্তি খুঁজে বেড়ায়, তারাই কি? নাকি, যারা মুক্তি খোঁজে তারা?'

'যারা মুক্ত খোঁজে তারাও—যারা মুক্তি খোঁজে তারাও।'

'মুক্ত তো খুঁজতে হয় সমুদ্রের তলায় গিয়ে। আর মুক্তি তো খোঁজে মানুষ ভগবানের কাছেই—তাই না মা? ভগবানই তো মুক্তি দিতে পারে—তাই না? বইয়ে তো সেই কথাই বলে থাকে।' আমি শুধোই : 'আমি যদি মুক্তি চাই তো ভগবানের কাছেই চাইতে হবে আমায়। তাই তো?'

'চাইতে পারিস। কিন্তু মুক্তিটা দিতে হবে তোকেই। ভগবানের তোকে মুক্তি দেওয়ার মানে হোলো, মানে তার অপর মানেটা, তোরই ভগবানকে মুক্তি দেওয়া অন্য কথায়।'

'তার মানে?'

'মানে, ভগবান তোকে কী মুক্তি দেবে রে? তোর কাছ থেকেই তাঁকে নিজের মুক্তি নিতে হবে। তুই-ই মুক্তি দিবি ভগবানকে। তুই মুক্তি দিলে তবেই তিনি নিজের মুক্তি পাবেন। সেটা তোর মুক্তি বল বা উন্মুক্তি বল। যা খুশি।'

'খুলে বলো না মা। খোলসা করে কও।'

মা তখন কথাটার খোলস ছাড়াতে লাগেন—'যেমন ধর এই সূর্য। সূর্যের ভেতর দিয়ে ভগবান আলো হয়ে মুক্তি পাচ্ছেন, আলো বানিয়ে সূর্যই ভগবানকে মুক্তি দিচ্ছে একথাও তো বলা যায়। সূর্য তাঁর

বাহন। বলা যায় যে, ভগবানই আলো হয়েছেন, কিন্তু সূর্যটি না হলে হতে পারতেন কি? সূর্যের যেমন ভগবানের দরকার নিজের আলোর জন্যে, তেমনি ভগবানেরও ঐ সূর্যটিকে চাই আবার। দুজনের না হলে দু-জনার চলে না।'

'এই জন্যেই কি দেবতাদের সব বাহন থাকে মা? মা দুর্গার যেমন সিংহ, সরস্বতীর যেমন কিনা হাঁস...।' আমি ফাঁস করতে যাই।

'বলতে পারিস। তা হলে দ্যাখ ভগবান যেমন তোকে মুক্তি দেবেন, তুইও তেমনি তাঁকে মুক্তি দিবি। কেবল নিজেকে নিয়ে কারো চলে কি রে? একক চেষ্টায় মুক্তি মেলে না, আরেক জনকে চাই। নইলে, ভগবান তো গোড়ায় একলাই ছিলেন আপনি, হাজারটা হতে গেলেন কেন তবে? এই জন্যেই তো। হাজার জনের ভেতর দিয়ে হাজার রকমের মুক্তির স্বাদ পাবেন—সেই জন্যেই না! হাজারটার মজাই আলাদা।'

'হাজা মজা যে বলে থাকে মা, তা বুঝি এই?' আমি কই—'ভগবান আমাদের ধেজে মজে গেছেন?'

'তোর যতো সব উল্টোপাল্টা কথা! কোনোই তার মাথামুণ্ডু নেই!' কথার মাঝখানে বাধা পেয়ে মার ব্যাজার ভাব। —'বড় হলে বুঝবি এসব।'

'না না, এখনই বুঝছি। এখনই বুঝব। তুমি বলে যাও। শুনছি তো আমি—এই যে!' কান খাড়া করে দেখাই।

'তা হলে দাঁড়ালো কী? ভগবান যেমন তোর মুক্তিদাতা, তুইও তেমনি তাঁর মুক্তিদাতা—কিম্বা উন্মুক্তিদাতাও বলতে পারিস। তোরা দুজনেই, যাকে বলে, পরস্পরের পরিপূরক। গতিমুক্তি—আশা-ভরসা।'

'তাহলে আমি...আমিই তো...না, আমি ঠিক নই...মানুষই তো তাহলে বিধাতার চেয়ে বড়ো হয়ে গেল মা? অত বড় বিধাতাকে, ধারণাই করা যায় না যার, এই একটুকুন মানুষ মুক্তি দিচ্ছে—?'

'হলই তো এক পক্ষে। তার সসীম দেহের ভেতর দিয়ে, তার আয়ুর খণ্ডকালের মধ্যে সেই অসীমকে অখণ্ডকে সবার কাছে নিয়ে...গণ্ডীর মাঝখানে ধরে বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছে এনে...একপক্ষে হলই তো সে। মুহুর্মুহু মৃত্যুর শিকার হয়েও সর্বদা ভগবানের অঙ্গীকার লাভে সে মহৎ।'

'আর সব মানুষের কথা থাক, বড় বড় মানুষের কথায় আমার কাজ নেই, আমায় বলো তুমি কী করে আমি মুক্তি পেতে পারি? কিম্বা, তোমার কথামতন, আমার ভগবানকে মুক্ত করতে পারি আমি? সেই কথাটাই বলো তুমি আমায়।'

'ভগবান প্রকাশ পান রূপে আর অপ-

রূপে—মানুষের দেহ-সুষমা আর তার শিল্পকলার সৃষ্টি-মহিমায় তিনি ধরা দিয়েছেন। তুই যদি কবি হোস, তা হলে তোর কবিতাই হবে তাঁর মুক্তি, যদি দেখতে সুন্দর হোস, তবে তোর সেই সৌন্দর্যেই তিনি উন্মুক্তি পাবেন। রকমটা এই আর কি! ভগবানের বাহন হতে হবে তোকে। কাউকে তিনি আপনার থেকেই নিজের বাহন বেছে নিয়েছেন, কারু আবার তাঁকে যেচে যেচে তাঁর বাহন হতে হয়েছে। ঠাকুরকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, বাণীরূপে তিনি মুক্তি পেয়েছেন সেখানে। আর রবিঠাকুরকে যেচে নিতে হয়েছে...নিজের কাব্যসাধনায় তাঁর সেই অন্তরদেবতাকেই তিনি উন্মুক্ত করেছেন।' বলে একটু থামেন মা—'আর, তুই যদি নিজের চেষ্টায় কখনো খুব বড়লোক হোস, তাহলে তোর নিজের অর্থ অপরকে দিয়েই সেই ভগবানকেই তুই বিলিয়ে দিবি। তোর সেই দানই ভগবান তখন। সেই ভগবানের দান, ভগবানকেই দেওয়া—বুঝেছিস। মানে, যা পাবি...রূপই হোক, শিল্পই হোক, অর্থই হোক, তা পেয়েই তোকে দিতে হবে—দিলেই তুই পাবি আবার। পেলেই দিবি, দিলেই পাবি—এমনি ধারা একটা মজার খেলা চলছে দুনিয়ায়। না দিলেও তেমনি কিছুই পাওয়া যায় না রে! দিলেও তেমনি কিছুই পাওয়া যায় না—এটা একটা রহস্যই।'

'বুঝেচি মা। আমি যদি বড়লোক হই, তবে আমাকে পেয়ে পেয়ে দিতে হবে, যদি গাইয়ে হই তো গেয়ে গেয়ে দিতে হবে। নইলে সত্যিকারের পেয়েছি কি না, তা আমি টের পাব কি করে? তাই তুমি বলছ তো?'

'হাঁ, তাই। নইলে, তোর লাখ টাকা মাটির তলায় পোতা থাকলে কার কী! তোর বা কীসের! অন্য কেউ ভাগ পেল না বলে টাকাটা তোর ভাগ্যেও এল না।'

'আর যদি আমি কাউকে ভালোবাসি

গাইয়ে হই তো গেয়ে গেয়ে দিতে হবে

মা, তাহলে কিন্তু খালি দিয়ে গেলেই চলবে না, সেখানে আমায় দিয়ে দিয়ে পেতে হবে—যেমনটা কিনা পেয়ে পেয়ে দিতে হবে। তা নইলে ভালোবাসা হল কোথায়? তাতো কখনো একতরফা হয় না মা। সেখানে আমায় চেয়ে চেয়ে দিতে হবে, দিয়ে দিয়ে চাইতে হবে—তাইত?

'এই বয়েসে তোর এত ভালোবাসার ধান্দা কিসের রে? আমি যে তোকে এত ভালোবাসি, আমি কি তোর ভালোবাসা চেয়েছি কখনো? চাই কখনো?

'তোমার ভালোবাসাই আলাদা।' আমি জানাই: 'মার ভালোবাসার কি তুলনা হয় কারো সঙ্গে?'

'দুটো হাতই মুক্ত রাখতে হয়—পাবার আর দেবার। দেওয়ার আর নেওয়ার। মুক্ত হস্তে দিবি, মুক্ত হস্তে নিবি। আদান-প্রদান একই খেলার এদিক ওদিক। যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতে হয়—নইলে, ভগবানের দান মেলে না। মনে কর না, বাইরে ভগবানের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোর ঘরের একদিকের একটি মাত্র জানালা খোলা রাখলে তার একটু হাওয়াও কি তুই পাবি?'

'একেবারে পাব না? বাইরে ঝড় বইলেও তার ঝাপটা লাগবে না আমার ঘরে? একটুখানিও না?' আমি জানতে চাই।

একদিকের একটা জানালা খোলা থাকলে—মা বলেন—সেই হাওয়ার ছিটেফোঁটা হয়ত আসতে পারে তোর ঘরে—কিন্তু ঘরের দু-ধারের জানালা যদি খুলে রাখিস তো সেই
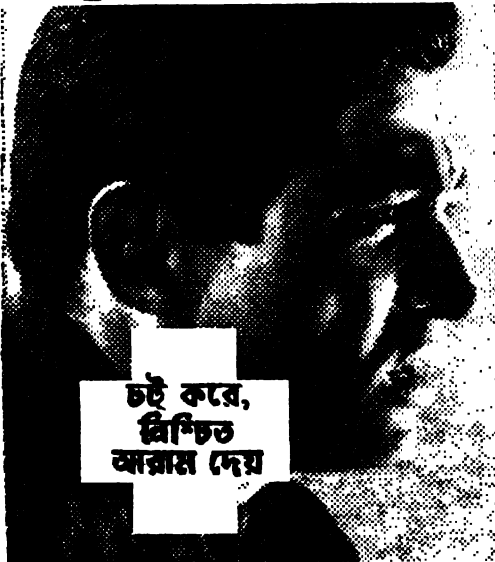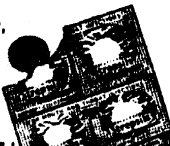
ঝড় তোর ঘরের ভেতর দিয়ে হুহু করে বয়ে যাবে। তাঁর কৃপার জন্য দুটো দরজাই খোলা রাখতে হয়—আসার এবং যাবার।'

'তা হলেই তাঁর কৃপার পার পাওয়া যায় না'—মার কথার ওপর আমার টিপপনি কাটি—মার ঢাকের ওপর আমার এক কাঠি।

'বেশ বলেছিস। কেবল ভগবানের দিকে ওপানিং থাকলেই হবে না, মানুষের দিকটাও ওপন রাখতে হবে, নইলে ভগবান তোর বাতায়নে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে যা আমরা পাই তা আবার কড়ায় গণ্ডায় আমাদের ফিরিয়ে দিতে হয় তাঁকে—কিন্তু সরাসরি তাঁকে দেব কি করে? তাই পৃথিবীকে দিয়েই তাঁকে দিতে হয়। মানুষকে দিলেই তিনি পান। নইলে পান না—পেতে পারেন না।'

'মানে, তাঁর দেওয়াটা একেবারে দান না? ধার দেওয়া কেবল? তার মধ্যে ফিরিয়ে দেবার কড়ার রয়েছে আবার? সুদ দেবার —শুধে দেবার কড়াকড়ি?,

'আছেই তো। কেবল যোগ করলেই হয় নাতো, বিয়োগ করতেও হয়—তবেই কিনা অঙ্ক মেলে। যোগবলে কী পেলি বিয়োগ ফলেই তো তা টের পাবিরে! যোগবলের চেয়ে ঐ বিয়োগবল বড়ো—বুঝেছিস?

'আর ওই বিয়োগ ফলটাই শেষ ফল মা? তাই না? এত যোগবল আর যোগফলের পরেও শেষের তোমার ওই প্রাণ বিয়োগ।' আমার দীর্ঘ নিশ্বাস।

'মা থাকতে মৃত্যু কোথায়? আবার তিনি এমনি জন্ম দেবেন—ভয় কিসের?... তোকেও দেবেন আমাকেও দেবেন।'

'তুমি তো বললে মা যে ভগবানের কাছ থেকে যা আমরা পাই, তা আমাদের মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হয় আবার। বললে না তুমি? কিন্তু একটা জিনিস আছে মা, যা নাকি কাউকে চেষ্টা করে পেতে হয় না, কষ্ট করে দিতে হয় না। টাকাকড়ি পরকে দিতে গেলে সব দিক দেখতে হয়, এমন কি, তোমার ঐ ভালোবাসাও—কাউকে দিতে যাওয়া তেমন সোজা নয়কো মা! অনেক চেয়ে চেয়ে পেতে হয়—দিতে হয়।'

'জিনিসটা কী তোর—শুনি?'

'রূপ। ওতো যে পায়, এমনিতেই পায়, অমনিই পেয়ে থাকে। অপরকে দিতেও তাকে কোনো বেগ পেতে হয় না। যেমনি পাওয়া অমনি তার দেওয়া। না দিয়ে উপায় নেই তার—ঝরনা যেমন আপনার থেকেই সর্বক্ষণ ঝরছে।'

'রূপ তো ভগবানেরই বিভূতি রে। তাঁরই ঐশ্বর্য—যে পায় তার মতন ভাগ্যবান কে আর? সবাই কি তা পায়?'

'যেমন কিনা মিনি, মানে যে ঐ জিনিস পেয়েছে, সে তাঁর কাছে ঋণী হয়েও সেই ঋণী নয়—তাকে আর কষ্ট করে পরকে দান করে তা শুধতেও হয় না। সে দেখা দিলেই তার দেওয়া হয়ে যায়। তাকে দেখতে পেলেই পাওয়া হয়ে গেল আমার—দর্শন দান আর দর্শন লাভ যুগপৎ! আশ্চর্য নয় মা?'

'আশ্চর্য—বই কি! পরমাশ্চর্যই। পরম ঐশ্বর্যও আবার।' মা বলেন—'রূপ ত ভগবানেরই প্রকাশ—সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ হয়েছেন।'

'অমনি আরেকটা জিনিসও আছে মা, যা নাকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া হয়ে যায়—খাওয়ার সাথে সাথেই খাওয়ানো। সেও কিছু কম আশ্চর্য নয় মা।' আমি বলি—'তার চেয়ে বড় অবদান বিধাতার কিছু নেই আর।'

'কিসের কথা বলছিস তুই?'

'কি সে র কথাই বলছি ত মা!' বলতে গিয়ে আমি ঢোক গিলি—ওর বেশি আর বলি না। সব কথা কি সবাইকে বলবার? গুহ্য কথা গুরুজনদের কাছে ব্যক্ত না করাই শ্রেয়ঃ। পূজ্যদের কাছে উহ্য রাখাই উচিত।

(ক্রমশ)

'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র'

"রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকাকে সম্পূর্ণ সমর্থন ক'রে শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ একদিন ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যে আস্থা তাঁর উপরে ন্যস্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র তার মর্যাদা রক্ষা করেছেন।" কিন্তু এই মহাসমর ও অক্ষশক্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে প্রবন্ধকার সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন।

বস্তুতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক বৈপরীত্যকে গৌণ করে দেখা অনুচিত। সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা তথা ব্রিটিশ-বিরোধিতার খণ্ড-দৃষ্টিতে। শ্রীসিংহ-উৎকলিত (সূত্র—ঐ; পৃঃ ৬০) সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য, "অক্ষশক্তির হ'য়ে ওকালতি করা আমার কাজ নয়। একমাত্র ভারতই আমার ভাবনা; এবং তার স্বাধীনতাই আমার লক্ষ্য।" পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ একে দেখেছিলেন বিশ্বমানবতার পূর্ণতির পরিপ্রেক্ষিতে। আগ্রাসী উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং তজ্জনিত সর্বাত্মক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে চণ্ড রূপ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর Cult of Nationalism" বক্তৃতামালায়, সেই অন্ধ শক্তিই যখন ফ্যাসিবাদের আকারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বমানবতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল, মৃত্যুশয্যা থেকে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তারবার্তা প্রেরণ করলেন (জুন, ১৯৪০) প্যারীর পতনের অব্যবহিত পরেঃ—"এক ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী শক্তি আজ সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে ফেলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তার মুখোমুখি। প্রতিটি মুহূর্তে লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে এই ভেবে যে, আমাদের ক্ষমতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, আমাদের কণ্ঠ অতি ক্ষীণ। যে পাপ আজ সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে তাকে জয় করার মত যথাযথ শক্তি ভারতের নেই। আমাদের সব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সমস্যা আজ এক হ'য়ে গেছে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে। আধ্যাত্মিকতাবাদী মনুষ্যের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে আজ সে সহায়তা ভিক্ষা করছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। যে বিশ্বব্যাপী সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যুক্তরাষ্ট্র পিছপা হবে না এই আমার বিশ্বাস। আমি জানি এ বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সেই

বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে এই ক'টি কথা না লিখে পারলুম না।" (U. S. I. S প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।)

অক্ষশক্তির অন্যতম প্রধান আক্রমণ স্থল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে এ কথা সেদিন বুঝেছিলেন যে, "আমাদের সব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সমস্যা আজ এক হ'য়ে গেছে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে।" বিপরীতপক্ষে, সে সময়ে সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল ফ্যাসিস্ত-অক্ষের আক্রমণে মিত্রশক্তির পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ করে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করা।

সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাশীল থেকেও বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্বমানবতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন তুলবার অবকাশ আছে যে, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ও অক্ষশক্তির স্বপক্ষে তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা আদৌ সঙ্গত হয়েছিল কিনা, এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে ফ্যাসিস্ত অক্ষের সহায়তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন আদৌ সম্ভবপর অথবা সঙ্গত ছিল কিনা।

রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের নাম যুক্ত ক'রে গণ-জীবনে একটা সুলভ ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলার প্রবণতা এ দেশে প্রায়ই দেখা যায়। গান্ধীজী, পণ্ডিত জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র এ'দের সকলের সঙ্গেই বহু ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনের মিল ছিল। পক্ষান্তরে, এ'রা সকলেই মানুষ হিসাবে প্রথম শ্রেণীর হওয়ায় বহু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য সত্ত্বেও এ'দের ভিতরে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক গুণগ্রাহিতার ভাব বরাবরই বজায় ছিল। দুঃখের বিষয়,

সংকীর্ণ পরিসরে যাঁরা নিজেদের গান্ধীবাদী, নেহরুবাদী বা সুভাষবাদী মনে করেন, তাঁরা অনেকেই বিভিন্নভাবে এটা প্রমাণিত করতে তৎপর হন যে, রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু বা সুভাষচন্দ্রের প্রতিই বিশেষভাবে পক্ষপাতী ছিলেন। "রাশিয়ার চিঠি"র উল্লেখ করে এ দেশে অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে কমিউনিজমের প্রচ্ছন্ন অনুরাগী প্রতিপন্ন করতেও কসুর করেন না। এইরকম আলোচনার অবতারণা ঘটলে সংগে সংগে এর বিপরীত দিকগুলির প্রতিও সতর্ক দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। কারণ সত্য প্রায়শই অর্ধ-সত্য মাত্র।

কান্তি গুপ্ত
কলকাতা-৪৮

একই হৃদযন্ত্রের দুই ক্রীড়াযন্ত্রী

'দেশ' ৩৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'একই হৃদযন্ত্রের দুই ক্রীড়া যন্ত্রী' প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমার জবানীতে যা লিখেছেন, তাঁর প্রতিবাদে কলকাতা-৯এর শ্রীবিপ্লব ঘোষ 'দেশ' ৩৮ বর্ষ ১৬ সংখ্যায় যে নিখাদ মিথ্যার আশ্রয়ে পত্রাঘাত করেছেন, তারই উত্তরে এই নিবেদন।

দুর্ভাগ্যসূচক ১৩ স্তবকব্যাপী ওই সাজানো বিকৃত মূলে বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে পত্রঘাতক প্রথম পাঁচ স্তবকে এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপরে এক দফা মনের ঝাল মেটাতে কতকগুলি কুযুক্তি হাজির করেছেন। উনি বিদেশ ঘুরে এসেই কী এই দাম্ভিকতা অর্জন করেছেন? নিজের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার কিছু কথামৃত 'দেশ' পাঠকের সামনে হাস্যকর উদ্গীরণ না করলেই কি নয়? উনি অভিযোগের ফাঁপা বাঁশি বাজালেও তার বায়বীয়তার গুটিকতক প্রমাণ পেশ করছি।

ওঁর অভিযোগ লিপির 'পঞ্চম স্তবকের উত্তরে জানাই, খবর কাগজের কর্তিতাংশ যদি উনি সযত্নে রেখেই থাকেন, তার সন, তারিখ ও সংবাদপত্রের নামের সম্বন্ধে চিঠিতে স্পষ্টোল্লেখ না রেখে শুধুই গৌরচন্দ্রিকার চন্দ্রিমায় বিলীন হয়েছেন কেন? আমাকে কোথায়, কখন, কী অবস্থায় কোন লেখকের সামনে বিবৃতি দিতে দেখেছেন, তা বলতে উনি অপারগ কেন? ব্যাপারটায় যে-কোন সুস্থ ধীমান পাঠকের মনে হতে পারে যে, বিপ্লববাবু জনৈক ভারোত্তোলন কর্মকর্তার হয়ে শিঙা ফুঁকছেন। এ সম্বন্ধে আরো বলা যায়, পাঠকরা আমাদের দেশের ক্রীড়া কর্মকর্তাদের এতাবৎ কু-কীর্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন, তা সত্ত্বেও বিপ্লববাবুকে অনুরোধ করছি, উনি যেন কাগজের টুকরো দুটো কিছুতেই বেহাত না করেন। আমার কাছে এত অজস্র খবর কাগজের কাটিং আছে, যা ভারতীয় ভারোত্তোলকদের শোচনীয় মানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করবে কতকগুলি কর্মকর্তা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় ভারোত্তোলনের ব্যবস্থাপনার উচ্চাসনে কায়েম থেকেও নিজেদের গাফিলতিতে ভারতীয় ভারোত্তোলকদের বিশ্ব মানে পৌঁছে দিতে পারেননি। এমন কি দেশের মধ্যে ভারোত্তোলনের প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধে তাঁদের অপদার্থতাও প্রমাণিত হবে। এমতাবস্থায় পাঠকদেরই বিচার্য—তাঁরা কোন কাটিং দেখবেন।

একটু মনঃসংযোগ করলেই বুঝতে পারবেন, প্রতিবাদকারী নিছক কানাকানির দোষে জড়িয়ে পড়ে আবার ভুল করেছেন পরের স্তবকে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার দরকার কি, আমার কাছে রোম (১৯৬০) অলিম্পিকের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার অফিসিয়াল প্রোগ্রামটি আজও আছে। প্রতিযোগিতা হয়েছিল ১৯৬০-এর ৭ থেকে ১০ সেপটেমবর, প্যালাজেটো ডেল্ স্পোর্ট স্টেডিয়ামে। নথিপত্র বলছে ৭-৯-৬০ তারিখে আমার ইভেণ্ট। ফেদারওয়েটের আগে ব্যানটামওয়েট শুরু হয়েছিল সকাল ৯টা থেকে। ফেদারওয়েট আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল বিকাল পাঁচটা থেকে। কিন্তু ব্যানটামওয়েট বিকাল পাঁচটার মধ্যে শেষ না হওয়ায় বিকাল সাড়ে পাঁচটায় জানানো হয়, ফেদারওয়েট শুরু হবে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে। ওজন নেওয়ার সময় এক ঘণ্টা বেড়ে দাঁড়ায় ৫টা থেকে ৭টা। অন্যান্য প্রতিযোগীর মত আমিও দু ঘণ্টা সময় পেয়েছিলাম ওজন কমানোর পরীক্ষা দেওয়ার। কিন্তু বিপ্লববাবু কোথায় হিসাব পেলেন যে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে পাঁচটায়। ওঁকে আরও জানাই—ভারোত্তোলন আইনে বলে, দৈহিক ওজন কমানোর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগী যতবার খুশি তুলা-যন্ত্রে ওজন কমার পরীক্ষা দিতে পারেন। সুতরাং পরিচালন কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি কোন পক্ষপাত করেছেন বলে মনে হয় কি? ওঁর আরও সংশোধন প্রয়োজন। ফেদার ওয়েটে প্রতিযোগী ছিলেন ২৭ জন, ওঁর হিসাব অনুযায়ী ২৬ জন।

আবার অষ্টম স্তবকে বিপ্লববাবুর প্রমাদ ঘটেছে। রোম অলিমপিক 'ভিলেজে' মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ছিল বেলা একটা থেকে তিনটে। অথচ বিপ্লববাবুর আষাঢ়ে গল্পে দেখা যাচ্ছে কোন ভারতীয় ফুটবলারের সঙ্গে আমি লাঞ্চ খেয়েছি বেলা ১২টায়। এই মুখরোচক রহস্য গল্পে লক্ষ্মীকান্ত দাস কি আর একটা জন্মে গেল? তবু এক ঘণ্টার ফারাক মার্জনা করলাম। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল টিম আমার প্রতিযোগিতার (৭-৯-৬০এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল) তিন দিন আগেই (৪-৯-৬০) রোম ছেড়ে ভারত অভিমুখে রওনা দিয়েছিল! সঙ্গী খাদক ফুটবলারটি তবে কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন? 'আস্ত মুরগির রোস্ট' রোম অলিমপিক ভিলেজের ভোজনশালায় কোনদিন দেওয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে বিপ্লববাবু প্রমাণ দাখিলের জন্য একবার চিঠি লিখে দেখবেন কি?

পরবর্তী স্তবক সম্পর্কে বিপ্লববাবুর জ্ঞাতব্য রোমে ওজন নেওয়া হয়েছিল দর্শকের ওজনের নিরীখে। সেটি ওঁর মত খুঁতখুঁতে বিচারক আউনসের হিসাবে পড়লেন কি করে? যদি আমার ম্যানেজার কর্মকর্তাদের পায়ে ধরে অনুমতি করিয়েই থাকেন, তবে আমার ওজন কমানোর জন্যে দু ঘণ্টা ধরে ছোটাছুটির কী প্রয়োজন ছিল? আর এরকম পায়ে ধরাধরির ব্যাপার যেখানে হল, সেখানে প্রতিবাদকের মত নিরপেক্ষজন হাজির থেকেও টুঁ হাঁ করলেন না—এ কেমন কথা? আমাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় রোমে উপস্থিত ভারোত্তোলন বিচারকরাই তা হলে দায়ী। অন্তত বিপ্লবাবুর বিচারে তাই তো মনে হয়। তাছাড়া উনি সামান্য দর্শক হয়ে কি করে ওখানকার ওজন নেওয়ার ঘরে ঢুকেছিলেন এবং আমার ওজন নেওয়াটা স্বচক্ষে দেখলেন? এই রোমহর্ষক কাহিনীর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে রাজি আছেন তো? কিন্তু দুটি অলিমপিক এবং একটি কমনওয়েলথ গেমসে আমার যোগদানের অভিজ্ঞতায় জানাই, ওই ধরনের বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতার প্রাক মুহূর্তে ওজন নেওয়ার পরীক্ষাগারে একমাত্র প্রতিযোগী ও তার ম্যানেজার ভিন্ন তথাকথিত ভি আই পি স্তরের কারোরই প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আজগুবি গল্পের আর এক দৃষ্টান্ত ওঁর দশম ও একাদশ স্তবক। আমার ব্রাণ্ডি ও দু বোতল দুধ খাওয়ার বানানো গল্প কোথায় শুনেছেন, বিপ্লবাবু তার উচ্চবাচ্য করেননি। কোন কর্মকর্তা আমাকে ব্রাণ্ডি ও দু বোতল দুধ গিলিয়েছিলেন, তার নাম প্রকাশে এত ভয় কিসের? কর্মকর্তা হয়েও যিনি আমাকে এমন পাপের পথে টেনে আনলেন, তার সঙ্গে প্রতিবাদকারী কি খুবই ঘনিষ্ঠ? রোমে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকেও বিপ্লববাবুর পক্ষে স্বচক্ষে দেখার কথা যে ওঠেই না, তা আমার ওজন নেওয়ার প্রসঙ্গে বলা আছে। এতদুপরি শোনা কথার উপর ভিত্তি করে 'দেশ'এর মত সাপ্তাহিকে ওঁর প্রতিবাদ দাখিলের বাহাদুরিকে সাধুবাদ না জানিয়ে থাকি কী করে।

পিঠোপিঠি দ্বাদশ ছত্রেই ওঁর জানার দৌড়ও পাঠকরা ভালভাবে অবগত হবেন। টোকিও অলিমপিক ('৬৪) এবং জামাইকার কমনওয়েলথ গেমসে ('৬৬) আমার যোগ দানের বিষয়ে যে দোষারোপ করেছেন, তাতে ওঁর অবগতির সূত্রটিও আবছা। রোম অলিমপিকে নির্বাচনের জন্য ভারতীয় প্রতিযোগীদের ন্যূনতম মান ছিল ৭০৫ পাউণ্ড (তখন ভারতে কিলোগ্রামের বারবেল সেট চালু হয়নি)। আমি ওই ন্যূনতম ওজন তুলেই ভারতের একমাত্র ভারোত্তোলক প্রতিনিধি হিসাবে রোমে গিয়েছিলাম, '৬৪তে টোকিওর নির্বাচনী ন্যূনতম মান ছিল ৩৩৫ কিঃ গ্রাঃ। আমি নির্বাচনের সময় তুলেছিলাম ৩৪০ কিঃ গ্রাঃ আর এই '৬৪তেই আমি প্রথম ভারতীয় ভারোত্তোলক হিসাবে আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন সংস্থার 'এলিট' ব্যাজ পাওয়ার যোগ্যতা লাভ করি। ৬৬তে জামাইকার কমনওয়েলথ গেমসে যোগদানের নির্বাচনী ট্রায়ালে হায়দরাবাদে রাশিয়ান কোচ ভি এ কুজিনের সামনে ৩৬২½ কিঃ গ্রাঃ তুলে নির্বাচন পাই। ওই হিসাবগুলি দাখিল করে বিপ্লববাবুকে আমার জিজ্ঞাসা কোন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজসে আমি টোকিও এবং জামাইকা বেড়িয়ে এসেছি (ওঁর অভিযোগ) তাঁদের নাম প্রকাশে উনি রাজি তো?

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস
হাওড়া-১

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে গত ১৬ সংখ্যায় শ্রীবিপ্লব ঘোষের মন্তব্যে ভীষণ মর্মাহত হয়েছি। পরশ্রীকাতরতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো শ্রীবিপ্লব ঘোষের চিঠি। শ্রীদাশের সম্বন্ধে কিছু ভালো বলা হয়েছে তা শ্রীঘোষের কিছুতেই সহ্য হলো না, তাই নেমে পড়লেন কাদা ছুঁড়তে। এটা ধরে নিতে কষ্ট হয় না যে, শ্রীঘোষ পরোক্ষ বা অপরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাশের উপর বিরূপ, তাই সযত্নে রেখে দিয়েছেন (ওঁর নিজের ভাষায় দুর্ভাগ্যবশত) অনেক দিনের পুরানো পেপার-কার্টিং। প্রখর স্মৃতিশক্তির এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রোম অলিম্পিকে ভারোত্তোলনের দিনে শ্রীদাশ কি কি খেয়েছিলেন তার হুবহু বিবরণ দিয়ে। রোম অলিম্পিকের পর আরো দু-দুটো অলিম্পিক হয়ে গেছে, তথাপি কি সুন্দরভাবে শ্রীঘোষ মনে রেখেছেন, "আট স্লাইস মাখন-ভেজানো রুটি (একটাও কম বেশী বলেন নি), চারটি ডিম, চারটি কলা ও দুই বোতল দুধ।" আশ্চর্য!

পরিশেষে অবান্তর না হলে বলি, নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সদ্য-সমাপ্ত জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় এই লক্ষ্মীকান্ত দাশই তাঁর খেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন যদিও নিজের বিভাগের প্রথম স্থান থেকে উনি বঞ্চিত হন তাঁরই অনুরাগীর হাতে। এখানকার প্রত্যেক পত্রিকা এবং অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাশকে এক "মহৎ খেলোয়াড়" বলে অভিহিত করেছেন।

অঞ্জন চৌধুরী
চাণক্যপুরী, নতুন দিল্লী-১১

(এ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ করা হবে না)

ভারতের অর্থনীতি

২৩শে মাঘ দেশ পত্রিকায় সুব্রত গুপ্তের লেখা বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ এবং ভারতের

রপ্তানি বাণিজ্য সম্বন্ধে নিবন্ধটি পড়ে আনন্দ পেলাম। তবে রপ্তানি বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার কতকগুলি প্রশ্ন আছে। একথা অনেকেই বলে থাকেন এবং লেখকও তাই বলেছেন।

চতুর্থ যোজনায় রপ্তানির বৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছিল প্রতি বৎসর শতকরা ৭ ভাগ হারে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের অনিশ্চয়তার জন্য রপ্তানির বৃদ্ধির হার লক্ষ্য ধারায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। ১৯৬৮-৬৯ সনে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৩৫৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, ১৯৬৯-৭০ সনে রপ্তানির পরিমাণ হয় ১৪১০ কোটি টাকা অর্থাৎ চতুর্থ যোজনায় প্রথম বৎসরে আগের বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৪ ভাগ মাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। উন্নতিকামী দেশগুলির সঙ্গে ভারত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। চা বা পাটজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে সিংহল ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত এঁটে উঠতে পারছে না। তা ছাড়া ভারত সরকারের নতুন ধরনের জিনিস বিদেশের বাজারে রপ্তানি করার বিশেষ আগ্রহ না থাকায় রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুফল দেখা যাচ্ছে না।

রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য ভারত সরকার কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারেন;

১। পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ঠিক রেখে দাম ও করের বোঝা কমাতে হবে।

২। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে অল্প খরচে দেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করতে হবে।

৩। কাঁচামালের বদলে নতুন ধরনের জিনিস তৈরারী করে বিদেশে রপ্তানি করতে হবে কিন্তু দেখতে হবে যে সেই সকল জিনিস দামে সস্তা ও দেখতে সুন্দর হয়। যেমন ১৯৬৯ সনে ১ কোটি জোড়া জুতা রপ্তানি হয়েছিল এবং তাঁত শিল্প কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পকে বিশেষ সুযোগ করে দিতে হবে।

৪। ইস্পাত রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস করে ইনজিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানি করতে হবে, তার জন্য ইনজিনীয়ারিং শিল্পগুলিকে ঠিকমত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইনজিনীয়ারিং দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধায় না পড়তে হয়।

৫। ভারত সরকার বিদেশ থেকে কতকগুলি বড় বড় জাহাজ ক্রয় করে কিস্তিতে দাম পরিশোধ করতে পারেন। এইসব জাহাজগুলি ভারতীয় দ্রব্য নিয়ে বিদেশে যাবে। এবং বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ভারতে নিয়ে আসবে। এইভাবে জাহাজগুলি ব্যবহার করলে জাহাজ ভাড়া কম লাগবে তাতে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশের বাজারে অনেক কমদামে বিক্রয় করা যাবে।

৬। বড় বড় বন্দরে ধর্মঘট বা লাগাতার ধর্মঘট বন্ধ করবার জন্য আইন পাশ করতে হবে এবং নাবিক ও শ্রমিকের সুবিধা ও অসুবিধা দেখবার জন্য কমিটি থাকবে।

ভারত সরকার যদি রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারেন তা হলে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে এবং ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি যাতে না ঘটে সেই দিকে ভারত সরকারের এখন থেকেই কঠোর দৃষ্টি দেওয়া দরকার, আর সেই দিকে দৃষ্টি না দিলে মুদ্রামূল্য হ্রাস করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

আশিস রায়চৌধুরী
কলকাতা-২৬

সংবাদ ভাষ্য

দৈনিক খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস যেমন, সাপ্তাহিক 'দেশ' পড়ার অভ্যাসটিও তেমন। গত ৬ ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পড়ার পর মনে হল, এবার আমাদের মত নেহাত সাধারণ পাঠকেরও বোধ হয় চুপ করে থাকা উচিত নয়। আমার বক্তব্য; রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে যেভাবে রুচিকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে তা 'দেশ' পত্রিকাকে আমাদের কাছে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে। রূপদর্শী

এর আগেও যে সব রচনা পরিবেষণ করেছেন এই সংবাদভাষ্য শিরোনামায় তা অনেক সময় অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অরুচিকর মনে হলেও প্রতিবাদ করার আগ্রহ ততটা বোধ করিনি। কিন্তু 'দেশে'র পাতা খুলে ৬ ফেব্রুয়ারীর সংবাদভাষ্যে রূপদর্শীর রচনাটি পাঠ করার পর মনে হলো, আমাদের প্রতিবাদহীনতায় তাঁর কলম যথেচ্ছা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং আমাদের তা মেনে নিতে বাধ্য করছে। ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার ক্ষমতা রূপদর্শীর প্রশংসনীয় হলেও তাঁর রচনায় প্রতিফলিত শালীনতাহীনতা ও অশিষ্টতাবোধ যে-কোনও ভদ্র রুচির পাঠক-পাঠিকার মর্মপীড়ার কারণ। 'দেশ' যে শ্রেণীর পত্রিকা, তার পাতায় এ ধরনের রচনা একেবারে বেমানান।

ললিতা কুণ্ডু
অধ্যাপিকা; বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ
কলকাতা-৬

এই বিস্ফোরণ

আপনার বহুল প্রচারিত 'দেশ' পত্রিকায় গত ১৩ সংখ্যায় "এই বিস্ফোরণ আমার চোখে" প্রসঙ্গে প্রদীপকুমার বসু এবং শ্রীনারায়ণ দাসচৌধুরীর যে দুইটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে আমি একমত, কিন্তু স্বদেশ ভট্টাচার্যের চিঠিটির আলোচনার সঙ্গে আমি সব জায়গায় একমত হতে পারলাম না, এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলব।

কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের নামে শুধু দলবাজি হয়, আর পার্টির নেতাদের কেরামতি জাহির হয়। ছাত্রকল্যাণের নামে শুধু দলের প্রচার চলে। বিবিধ পার্টির শ্লোগানে ছাত্ররা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ক্লাস বন্ধ হয় এবং সবশেষে হাতাহাতি, রক্তপাত। এর পিছনে আছে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতারা। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে ইউনিয়ন কিছুই করে না, যেটা না করলে নয় সেটা তাদের করতে হয়। যে পার্টির ইউনিয়ন সে পার্টি সব সময়ে নিজের দলের কাজেই ব্যস্ত থাকে। আমার মতে প্রতি বর্ষ বা ক্লাস থেকে কয়েকটি ছাত্রকে নির্বাচিত করা, (কোন দলের হবে না) তাঁরা ছাত্রকল্যাণের জন্য দাবি দাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং পরে এ সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিহিত করবে। এইরূপ কোন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে ছাত্র ইউনিয়ন পার্টির প্রচারের মাধ্যম এবং বিভিন্ন পার্টির ঝগড়ার অস্তানায় পরিণত হবে।

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিরা

পৌষের পুষ্প

গত ১৬ মাঘের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পৌষের পুষ্প' রচনাটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যে পাঠকদের মনে একটা ভুল ধারণা হতে পারে, হরটিকালচারাল সোসাইটিতে যে চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনী হয়ে গেল তাতে শ্রীবীরেন বসুই সবচেয়ে ভাল ফুল প্রদর্শন করেছেন এবং সব থেকে বেশী পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ভাল ফুল প্রদর্শন করেছিলেন কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু এই প্রদর্শনীতে শ্রীসুভাষ গুহ নিয়োগী সর্বাধিক পুরস্কার পেয়েছেন (১৩টি) এবং ফুলের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সবচেয়ে বেশী পয়েন্ট পেয়ে (৫৫) চ্যালেঞ্জ ট্রফি লাভ করেছেন—গত বছরেও তিনি চ্যালেঞ্জ ট্রফি পেয়েছিলেন। এই ১৩টির মধ্যে ১০টিই প্রথম পুরস্কার। অন্য দিকে শ্রীবসু পেয়েছেন সাতটি তার মধ্যে তিনটি প্রথম পুরস্কার। মোট পয়েন্ট ২৫। সুতরাং চন্দ্রমল্লিকাতে এবারে শ্রীগুহনিয়োগীরই জয়-জয়াকার। কিন্তু শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় রচনাটি এমন ভাবে পরিবেশন করেছেন—এমন ভাবে চন্দ্রমল্লিকা সহ শ্রীবসুর ছবি ছাপিয়েছেন যে, যে-কোন লোকই দেখলে মনে করবেন শ্রীবসুই 'চন্দ্রতে' এবার আসর মাৎ করেছিলেন। রচনাটিতে শ্রীগুহনিয়োগীর নামোল্লেখ মাত্র ছাড়া আর কিছুই স্থান পায়নি।

শ্রীঅশ্রুময় গুহঠাকুরতা
কলকাতা-৩২

ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু বি য়েটস

দেশ' পত্রিকার গত কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র লিখিত আলোচ্য প্রবন্ধটি নানা দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। প্রবন্ধটি লেখার পিছনে লেখকের তথ্য সংগ্রহ নিষ্ঠা এবং সংযমপূর্ণ যুক্তিজাল পাঠক মনে পদে পদে সম্ভ্রমপূর্ণ বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করে। তিনি দীর্ঘদিনের একটি সংশয়-বোধকে এ প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ অব্যর্থ যুক্তির সাহায্যে কাটাতে সক্ষম হয়েছেন। অস্পষ্ট-ভাবে হলেও এতদিন আমরা অনুভব করতাম, য়েটস গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছিলেন, তা সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের মত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অপরের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করা সম্ভবপর নয়। তবু সেই অনুভূতি অভ্রান্ত যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইদানীং বেশ কিছু শৌখিন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি লেখা সম্পর্কে কটাক্ষ-পূর্ণ মন্তব্য করতে আরম্ভ করেছিলেন। সৌরীন্দ্রবাবুর তীক্ষ্ণ ভাষা-বিশ্লেষণ প্রতিভা তাঁদের লজ্জা দিতে পেরেছে মনে করি। আশা করি, অচিরেই এই সুলিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

নীলরতন সেন
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

মুনিয়ার চারদিক

সংখ্যা ১৪, 'দেশ'-এ 'মুনিয়ার চারদিক' শীর্ষক গল্প আমাকে অভিভূত করেছে। বর্ণনাসর্বস্ব 'মুনিয়ার চারদিক' পড়ে আমি দারুণভাবে মুগ্ধ। তাই চিঠি না লিখে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'ঘুনপোকা'তে আমার হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন, তারপর 'উজান' এবং সবশেষে এই গল্প। বলতে দ্বিধা নেই, আমার 'দেশ' থেকে সংগ্রহ করা গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটি, আমার মতে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি আরও লিখুন, আরও ভাল লিখুন, পাঠক হিসেবে (বিশেষ করে তাঁর গল্পের) এ আশাটুকু করতে দোষ নেই নিশ্চয়।

নীলোৎপল সরকার
রানাঘাট, নদীয়া

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় ফাদার দ্যতিয়েনের ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা পড়ে কিছু না লিখে পারছি না। ফাদার দ্যতিয়েন রম্যরচনার হাল্কা আমেজের ভেতর দিয়ে ভগবৎপ্রেম ও নারীপ্রেমের মধ্যে যে মিল ও অমিল আছে তাকে অত্যন্ত গভীর ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তুলে ধরেছেন। ফাদার একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী। কিন্তু পড়ে অবাক লাগল তাঁর লেখায় কোথাও ধর্মীয় একদেশদর্শিতা নেই। অথচ, ভগবৎপ্রেম বিষয়ে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর বক্তা আর কে হতে পারেন!

পরিশেষে জানাই, আমি একজন বাঙ্গালী হিন্দু যুবক। তাঁর এই লেখা পড়ে আমার মনে জমে ওঠা বহু প্রশ্ন খুব পরিষ্কারভাবে সোজা হয়ে গেছে। আর, একজন ফরাসী সন্ন্যাসীর বাঙলা ভাষায় লেখা পড়ে আমাদের মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এমন ধরনের লেখা, যাতে ভগবৎপ্রেমের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হবে, বাঙলা দেশের বর্তমান নৈতিক সংকটের মধ্যে তার বোধ হয় একটা গুরুত্ব আছে।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৫৭

'দু'টি দেশ একটি ভাষা' প্রসঙ্গে

শংকর-এর 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' আমাদের হৃদয় আলোড়িত করেছিল, আর দেশে সম্প্রতি প্রকাশিত (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১) 'দু'টি দেশ একটি ভাষা' আমাদের চিন্তাধারায় ঝড় বইয়ে দিল। মন বার-বার কে'দে উঠে বলতে চাইছে—সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এই ভাঙ্গা সেতু আবার কবে জোড়া লাগবে? এপার বাংলার লেখকদের মাঝে শংকর সর্বপ্রথম এই কাজে লেগেছেন। তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু লেখকের পক্ষে এককভাবে এ কাজ শেষ করা অসম্ভব। আমাদের অনুরোধ সমস্ত লেখক সমাজ ও জনসাধারণ ভাঙ্গা সেতু জোড়া দেওয়ার কাজে যোগ দিন। আবার যেন আমরা প্রাণ খুলে বলতে পারি—আমরা এক, আমাদের ভাষা এক, আমাদের সংস্কৃতি দ্বিমুখী হলেও আমরা অভিন্ন। এক বৃন্তে দুই ফুল।

রণেশ ভট্টাচার্য
ডিব্রুগড়

"সামনে চড়াই উৎরাই"

৩০শে মাঘ সংখ্যাটি সোমবার (১৫ই ফেব্রুয়ারি) পেলাম। শ্রীসুবীর ঘোষের রচনাটি "সামনে চড়াই উৎরাই, মেয়েরা তবু এগিয়ে চলেছে" পড়লাম, ভালও লাগল। তবে জিমন্যাস্টিক বিভাগে মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী অরুণা দাশগুপ্তের নামটি না দেখতে পাওয়ায় আশ্চর্য হলাম।

শ্রীমতী অরুণা দাশগুপ্ত (অধুনা রায়) বাংলার প্রথম মেয়ে, যিনি জাতীয় প্রতিযোগিতায় এবং রাজ্য প্রতিযোগিতায় পর পর পাঁচবার চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেন। পঞ্চম দশকের শেষ ভাগ থেকে ষষ্ঠ দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী। শ্রীমতী দাশগুপ্ত শ্রীলংকা পরিভ্রমণ করেন শ্রীমনতোষ রায়ের সংগে। উনি রোম অলিম্পিকে নির্বাচিতা হন পাতিয়ালা কেন্দ্রে। কিন্তু নিম্নমানের জন্য দল প্রেরিত হয়নি। তিনি ভারতের প্রথম Plastic girl "মোমের পুতুল" (মুকুল-এর বাংলার মেয়ে খেলাধুলায় দ্রষ্টব্য)

আশা করি, লেখক এ বিষয়ে যত্নবান হবেন।

সলিল মুখোপাধ্যায়
টেলকো, জামসেদপুর।

"বিশ্ববিজ্ঞান"

শনিবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের দেশে শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের চিঠির আলোচনা মোটামুটি ভালই, তবে এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

Microbiology সম্পর্কে অনেক আলোচনার পর তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Micro কথা প্রথমে থাকলে আমরা তার সহজ অর্থ অণু অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র যোগ করি যেমন Microscope অনুবীক্ষণ। ঠিক এইভাবেই Microbiology অণু জীববিজ্ঞান এবং এর ব্যবহারও আমি অনেক ক্ষেত্রে করেছি।

Molecular কথাটির বাংলা আণবিক, আণব লেখাতেও দোষ নেই। এই সম্পর্কে পূর্বেও আনন্দবাজার ও দেশ-এ বহু আলোচনা হয়েছে। Molecular Biology বলতে অণু-জীববিদ্যা না লেখাই ভাল।

Plant Breeding and Genetics বলতে আমি উদ্ভিদ প্রজনন এবং জন্ম বিজ্ঞান বলতে চাই যদিও Genetics-এর জন্য বংশানুক্রম বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় সুপ্রজনন-বিদ্যা বলা হয়েছে।

ইংরেজী শব্দ গ্রহণে আমাদের আপত্তি নেই, ছিল না, থাকবেও না কিন্তু সেজন্য গ্রহণযোগ্য বাংলা প্রতিশব্দের প্রতি আমাদের এ্যালার্জি না থাকাই ভাল।

মুরারিপ্রসাদ গুহ
নয়াদিল্লী-৫

ছোট পত্রিকা

এই বিভাগে আমি মাঝে মাঝে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের ও বাংলার বাইরে থেকে প্রকাশিত অনেক ছোট-খাটো সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে লিখেছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই, কলকাতা যদিও অস্বাভাবিকভাবে সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ছোট শহরেও বহু সাহিত্যব্রতী ও সাহিত্য পাঠক ছড়িয়ে আছেন, এঁদের মধ্যে একটা যোগাযোগ থাকা দরকার। অর্থাৎ জলপাইগুড়ি বা জামসেদপুর থেকে যে পত্রিকাটি একটি ছোটখাটো সাহিত্যিকগোষ্ঠীর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি যেন তার জন্মস্থানেই সীমিত না থাকে, বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতা থেকেও এমন অনেক পত্রিকা বেরোয়, যা মফঃস্বলে যায় না।

কিন্তু এখন থেকে আমি আর ঐ সব ছোট পত্রিকা সম্পর্কে লিখবো না ঠিক করেছি। লেখা আর সম্ভব নয়। আমার অক্ষমতার কারণ অনেকগুলো।

প্রথম কারণ, পত্র পত্রিকার সংখ্যা। এই রকম ছোট সাহিত্য পত্রিকা প্রচুর সংখ্যায় বেরুচ্ছে, সেটা এক হিসেবে আনন্দেরই কথা। সাহিত্যের জন্য যাঁরা কোনো আত্মত্যাগ করেন, তাঁরা আমার চোখে শ্রদ্ধার্হ এবং এই ধরনের পত্র পত্রিকা বার করতে গেলে কিছু আত্মত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। তবে একসঙ্গে এত পত্র পত্রিকার সমালোচনা লেখার কাজটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার নয়। এই সব পত্রপত্রিকা আমার টেবিলে জমতে জমতে পাহাড় তৈরি করে, তার আড়ালে আমার দেহ (নেহাৎ ক্ষীণ নয়) ঢাকা পড়ে যায়। এত পত্রপত্রিকা সম্পর্কে লেখা কি আমার একার পক্ষে সম্ভব।

প্রায়ই আমাকে অভিযোগ শুনতে হয় যে, আমি পক্ষপাতিত্ব করি। চেনাশুনোদের পত্রিকা সম্পর্কে লিখি, অন্যদেরটা এড়িয়ে যাই। অভিযোগটা একেবারে মিথ্যে নয়। দূরে থেকে যিনি ডাকে পাঠান, আর প্রায়ই যার সঙ্গে দেখা হয়—এই দুজনের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। যার সঙ্গে বার বার দেখা হয়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে তার উপরোধ এড়ানো যায় না। এটা মানুষের দুর্বলতা।

স্থানাভাবের জন্য কোনো পত্রিকা সম্পর্কেই বিস্তৃতভাবে লেখা যায় না। অনেক পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে লেখারও কিছু নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আমার সমালোচনাটা হয়ে দাঁড়ায় এই রকম, "অমুক জায়গা থেকে বেরিয়েছে এই

পত্রিকা, এর সম্পাদক অমুকচন্দ্র অমুক, গল্প লিখেছেন অমুক অমুক, কবিতা লিখেছেন...ইত্যাদি। এরকমভাবে লিখতে আমার লজ্জা করে। অথচ এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? আমার মতন নগণ্য লেখকেরও সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ ধরনের অবান্তর কথা লিখতে কলম সরে না।

যিনি বা যে দলটি মিলে একটি ছোট সাহিত্য পত্রিকা বার করছেন, তাঁর বা সেই দলের পক্ষে সেই পত্রিকাটির প্রতি অনেক মমতা থাকা স্বাভাবিক। কত কষ্ট করতে হয় একটা পত্রিকা বার করার জন্য। সুতরাং তাঁদের মনে হতেই পারে, তাঁদের পত্রিকাটিই শ্রেষ্ঠ। কেউই নিজের পত্রিকার বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। আমি সাধারণত মানুষের মনে কষ্ট দিতে চাই না, তাই সবাইকেই মোটামুটি প্রশংসা করি। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রশংসাসূচক নতুন নতুন শব্দ ভেবে বার করাও তো কম শক্ত নয়। এ ছাড়াও বিপদ আছে, কারুকে যদি বলি খুব ভালো, তাহলেও তিনি অভিযোগ করেন, বাঃ, আপনি যে অমুক পত্রিকাকে বললেন, অত্যন্ত ভালো।

কেউ কেউ তাঁদের পত্রিকার সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে তারপর পরবর্তী সংখ্যার জন্য আমার কাছ থেকে একটা লেখা চান। আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার মতন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির কাছে লেখা চাওয়ার মানে কি! কেউ কেউ হয়তো লেখা

[illegible] খুশী হন, আমি [illegible] তা পাই।

অনেক পাঠক অভিযোগ করেন যে, দূরে থেকে কোনো পত্রপত্রিকা তাঁরা চোখেও দেখতে পান না, সেসব পত্রপত্রিকার দু'চার লাইন সমালোচনা পড়ে তাঁদের লাভ কি? “সাহিত্য সংবাদ” পৃষ্ঠাটি কি নেহাৎ পত্র-পত্রিকার পরিচিতির পৃষ্ঠা হয়ে উঠবে?—আমার নিজেরও ইচ্ছে হয়, এই বিভাগে সাহিত্য সম্পর্কে সাময়িক আলোচনা ও প্রশ্ন তোলা।

অনেক দূরের পাঠক আমার কাছে জানতে চান, ঐসব পত্রপত্রিকার দাম কত, কোথায় পাওয়া যায় এবং আমি পাঠকের ব্যবস্থা করতে পারি কি না। এইসব কাজও যদি আমাকে করতে হয়, তাহলেও তো আমার অবস্থা সঙ্গীন!

অনেক সাহিত্য পত্রিকা ঘাটাঘাটি করেছি বলে এ সম্পর্কে সাধারণভাবে দু'একটি মন্তব্য করার অধিকার বোধহয় আমার জন্মেছে। অত্যন্ত সঙ্কোচ ও অনিচ্ছার সঙ্গেও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এইসব পত্রিকার বেশীর ভাগেরই মান উঁচু নয়। যে কোনো ছোট পত্রিকাকেই লিটল্ ম্যাগাজিন বলা যায় না। কষ্ট করে পয়সা জোগাড় করে বন্ধু-বান্ধবদের রচনা দিয়ে একটা পত্রিকা ছাপলেই সেটা সাহিত্যে আসন পাবার যোগ্য হয় না। যিনি সম্পাদক, আগে তিনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন, পত্রিকা সম্পাদক হবার যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা। লেখা জোগাড় ও প্রেসে ঘোরাঘুরি করাই সম্পাদকের যোগ্যতার পরিচয় নয়। একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করার কোনো যুক্তি নেই। উদাহরণ হিসেবে “এই দশক” পত্রিকাটির নাম করা যায়। এই পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সবাই একমত হোন বা না হোন, এটিকে একটি সার্থক লিটল ম্যাগাজিন বলা উচিত। বেশীর ভাগ পত্রিকারই এই চরিত্র নেই। অধিকাংশই কবিতা পত্রিকা। পর পর এলোমেলোভাবে কতকগুলো কবিতা ছাপিয়ে পত্রিকা বার করার সার্থকতা কি, আমি বুঝতে পারি না। দেখে শুনে মনে হয় কবিতা লেখার কাজটা বুঝি খুব সহজ। কিন্তু মৃত ও অমর কবিবৃন্দের সাক্ষ্য থেকে আমরা জানতে পারি, কবিতা লেখা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার, হৃদয় খুঁড়ে শুধু বেদনা জাগালেই হয় না—শব্দ নামক সাংঘাতিক রহস্যময় ব্যাপারটির প্রয়োগও রক্তের মধ্যে আয়ত্ত করতে হয়।

লিটল ম্যাগাজিন তখনই সার্থক, যখন তা পাঠকদের মধ্যে (সীমিত সংখ্যক হলেও) একটা সাড়া জাগাতে পারে। পাঠক বুঝতে পারে, সেই পত্রিকায় যে ধরনের লেখা পাওয়া যায়, সেরকম লেখা আর কোনো পত্রপত্রিকাতে দেখা যাবে না। শুধু নতুন লেখক নয়, নতুন ধরনের লেখাই লিটল ম্যাগাজিনের প্রাণ। সেই লেখা সার্থক সাহিত্য হলো কি না সেটা পরের কথা।

এরপর থেকে কচিৎ কদাচিৎ হয়তো দু'একটা পত্রপত্রিকা নিয়ে আমি লিখবো নিজের গরজে। সমালোচনার জন্য ছোট বড় পত্রপত্রিকা এখন থেকে আমার বদলে “পুস্তক সমালোচনা” বিভাগে পাঠাবেন।

সনাতন পাঠক

কালের অমোঘ বিধানে প্রায় দেড় শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন ইতিহাসের পাতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই বিষয় সম্বন্ধে এখনো বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয়ে থাকে, অবশ্য সাধারণত এই সব আলোচনা ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই রচিত হয়। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, এই সাম্রাজ্যবাদের গুরুত্ব উপর্যুক্ত দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব সম্বন্ধে বড় একটা আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে না। এর একটা কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কেন্দ্র করে যদিও অসংখ্য বই লেখা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলিকে কিন্তু আঙুলে গোনা যায়। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এক গ্রীণবার্গার মাত্র তিনটি উপন্যাসের নাম করেছেন—কিপলিঙ রচিত 'কিম', ফর্স্টারের 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' এবং অরওয়েলের 'বার্মিজ ডেজ'। এই তিনটি উপন্যাস সম্বন্ধে অবশ্য অনেক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি ছাড়াও ভারত সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক উপন্যাসও আলোচনার দাবি রাখে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখকের মতে এরকম আলোচনার গুরুত্ব প্রধানত ঐতিহাসিক। তিনি এই গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন:

The relationship between literature and history is clearly an intimate one. Literature is particularly important in spreading ideas and images about things which are unfamiliar to the general reading public, thus helping to shape opinion and through it policy. At the same time it is an expression of views about many subjects. Thus from several angles literature can serve as an important source for the historian.

এরকম আলোচনার কিন্তু আরেকটি প্রয়োজন আছে। কোন দেশের সমাজচিত্র, সেখানকার অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, সমাজমানস এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা 'মাইনর' লেখকদের রচনাতেই আমরা দেখতে পাই। কারণ এই লেখকরা অনেক 'ইনহিবিশন' থেকে মুক্ত, লেখক হিসাবে নিজেদের 'ইমেজ' সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কিছু ভাববার প্রয়োজন হয় না এবং খ্যাতির ভারে তাঁরা ঝুঁকে পড়েন না, তাই তাঁরা খোলা মনে তাঁদের বক্তব্যকে রচনায় উপস্থাপিত করতে পারেন এবং প্রায়শই করে থাকেন।

এই আলোচনার গোড়ায় দু একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থের পরিচয়ে যদিও লেখক 'সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক সাহিত্য' কথাটি ব্যবহার করেছেন, বইটিতে তিনি কিন্তু কেবলমাত্র উপন্যাসেরই আলোচনা করেছেন। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়। এই বিষয়ের সাহিত্যে উপন্যাসের প্রাধান্যই সর্বজন-স্বীকৃত—ইংরেজি সাহিত্যের অন্যান্য দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব লক্ষণীয় নয়। এই বইটিতে তিনি পঞ্চাশ জন ঔপন্যাসিকের
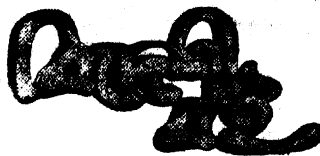
The British Image of India, Allen J. Greenberger. Oxford University Press. London. 1969. 45 sh Net.

লেখা একশো কুড়িটি উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন। এঁরা সবাই বৃটিশ ঔপন্যাসিক। এই উপন্যাসগুলির আলোচনায় লেখকের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য লাভ করেছে, উপন্যাসগুলির সাহিত্যিক প্রসাদ গুণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেননি। একটি মাত্র গ্রন্থের পরিধির মধ্যে এরকম আলোচনা করা সম্ভবও নয়। বস্তুত, লেখক এই উপন্যাসগুলিকে 'ডকুমেণ্ট' হিসাবেই দেখেছেন এবং সেভাবেই এগুলির আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি পাঠ করলে আলোচ্য ঔপন্যাসিকদের মানসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভারতীয়দের প্রতি তাঁরা কি ধারণা পোষণ করতেন, ভারতের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত কি ছিল, এসব বিষয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা আমরা পেতে পারি। এরকম আলোচনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এই গ্রন্থের পটভূমিকা বিস্তীর্ণ—১৮৮০ থেকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আলোচনার পরিধি। তাই আলোচনার সুবিধার জন্যে তিনি এই বিরাট সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং নামকরণ করেছেন, যথাক্রমে: (ক) বিশ্বাসের যুগ
(The era of confidence—1880—1910)
(খ) সন্দেহের যুগ
(The era of doubt—1910—1935)
(গ) বিষাদের যুগ
(The era of melancholy—1935-1960)
তাঁর এই কালবিভাজন যুক্তিযুক্ত এবং এটা তাঁর গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

প্রথম যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত উপন্যাস—কিপলিঙ রচিত 'কিম' এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসই শুধু নয়—এ যুগের বৃটিশ লেখকদের সাহিত্যিকমানসের যথার্থ প্রতিনিধিও বটে। এই যুগে বৃটেনের সাহিত্যিকেরা (যাঁরা ভারতবর্ষের পটভূমিকায় তাঁদের উপন্যাস রচনা করেছেন)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে একটি প্রায় চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে যে, এই সাম্রাজ্যবাদের অবসান কোনদিনই হবে না। শাসিত শ্রেণীর লোকেদের প্রতি তাঁদের ছিল প্রভূত অনুকম্পা এবং অবজ্ঞার মনোভাব, তাই তাঁদের দুঃখ-বেদনা ও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বকে তাঁরা উপন্যাসের উপজীব্য করেননি। বস্তুত, ভারতীয় চরিত্র দুর্জ্ঞেয় এ কথাটা তাঁরা বারবার দেখাবার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই তাঁদের উপন্যাসে বৃটেনের নরনারীরই প্রাধান্য। এই যুগে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই বিদ্রোহী সিপাহীদের নৃশংস ব্যবহার আর তার পাশে ইংরেজ সৈন্যদের মহত্ব, বীরত্ব ও বিচারবুদ্ধির আলোচনা করা হয়েছে। এ যুগে রচিত উপন্যাসগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এ উপন্যাসগুলিতে মুসলমান চরিত্রের গুণগান করা হয়েছে এবং হিন্দু চরিত্রকে বিকৃত করে দেখান হয়েছে। অর্থাৎ রাজনীতির জগতের অধুনা বিশেষভাবে নিন্দিত 'টু নেশন থিয়োরীর' প্রতিফলন এই উপন্যাসগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মকেও অযথাই ছোট করে দেখানো হয়েছে। অবশ্য বৌদ্ধধর্মের গুণগান শুধু 'কিম' উপন্যাসেই নয়, অন্যান্য অনেকগুলি উপন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায়।

ইংরেজীতে রচিত ভারতীয় উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগে প্রকাশিত অধিকাংশ উপন্যাসগুলিতেও প্রথম যুগের উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্যই বেশী করে চোখে পড়ে, এবং এ যুগের দু'জন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক মড ডাইভার এবং এডমন্ড ক্যান্ডলার প্রায়ই একইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গুণগান করে গেছেন। তবুও কিন্তু এই যুগেই দু'জন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের রচনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্ধকার দিকগুলির প্রতি সশক্তভাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ ধরনের উপন্যাসগুলির মধ্যে ফর্স্টার এবং অরওয়েলের পূর্বোল্লিখিত দুটি উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধীরে ধীরে এই দুটি উপন্যাসের প্রভাব অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও পড়েছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই তাঁদের রচনাতে এক বিষাদ এবং বেদনার সুর বেজে উঠেছে। এ যুগের লেখকদের মধ্যে এডওয়ার্ড টমসনের রচনার কথা লেখক বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছেন। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর মনে যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল প্রমুখ ভারতীয় মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, নিয়মিত পত্রবিনিময়ও চলত। তবুও কিন্তু ভারতীয় চরিত্রের প্রতি এক সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন যে ফুরিয়ে এসেছে তাঁর উপন্যাস পড়লে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি (এ ফেয়ারওয়েল টু ইণ্ডিয়া, অ্যান এন্ড অফ দী আওয়ার্স, নাইট ফলস্ অন শিবাজ্ হিল) সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ দিনগুলিতে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পরেও অনেক ইংরেজ ঔপন্যাসিক ভারতবর্ষের পটভূমিকে উপজীব্য করে তাঁদের উপন্যাস রচনা করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন। এইসব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আছেন, Christine Weston, William Buchan, Rumer Godden এবং John Masters. ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এঁদের সকলেরই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। তাই এঁদের উপন্যাসে বাস্তবজীবনের প্রতিফলন প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। এ যুগের লেখকেরা কিন্তু অতীতের ঘটনাবলী নিয়েও তাঁদের উপন্যাস রচনা করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহকে উপজীব্য করে বেশ কয়েকটি উপন্যাস এ যুগেও রচিত হয়েছে। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে ব্রিটিশ জাতি কি পেয়েছে আর কি হারিয়েছে, তারও মূল্যায়নের চেষ্টা এ যুগের উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ যুগের উপন্যাসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ভারতের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে রচনা। এই সম্প্রদায়ের জন্যে এই লেখকদের গভীর মমত্ববোধ, যা বোধ হয় এক সহজবোধ্য পাপবোধেরই ফল, প্রকাশ পেয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রচিত ইংরেজী উপন্যাসের দিন কি ফুরিয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেছেন যে, শুধু এখনই যে এরকম উপন্যাস লেখা হচ্ছে তা নয়, ভবিষ্যতেও এ ধরনের উপন্যাস রচিত হবে।

লেখক কেবলমাত্র ব্রিটেনের ঔপন্যাসিকদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন, তাই তিনি ভারতীয় ঔপন্যাসিকদের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু তিনি স্বচ্ছন্দে এ কথা উল্লেখ করতে পারতেন যে, ইদানীংকালে ভারতের ঔপন্যাসিকেরা যাঁরা ইংরেজী ভাষাতে তাঁদের উপন্যাস রচনা করছেন, ভারতের জনমানসের বিভিন্ন দিকগুলি সম্বন্ধে সার্থক উপন্যাস রচনা করতে সমর্থ হচ্ছেন। বস্তুত, তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি বিচার করা যায়, তা হলে যে-কোন নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন সমালোচক, তিনি বিদেশীয় হোন অথবা স্বদেশীয়, স্বীকার করবেন যে, আধুনিক কালের ভারতীয় ঔপন্যাসিকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীয় আধুনিক ঔপন্যাসিকদের থেকে অনেক ভাল লিখছেন। জন মাস্টার (যাঁকে এ ব্যাপারে সাধারণত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক বলে ধরা হয়) ভারতের পটভূমিকায় যেসব উপন্যাস লিখেছেন এবং লিখছেন, সেগুলির তুলনায় তরুণ ভারতীয় সাহিত্যিক মনোহর মালগোঙ্কর, নয়নতারা সেহগল কিংবা অরুণ যোশীর রচনা নিশ্চয়ই অনেক বেশী সুখপাঠ্য এবং সাহিত্যরসসমৃদ্ধ।

-দিলীপ চক্রবর্তী

পত্র-সাহিত্য

মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ। আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৯। ষোল টাকা।

'কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে।' তা হলে কোথায় পাব? বলা বাহুল্য, তাঁর লেখায়। কিন্তু লেখা বলতে যেন শুধু কবিতাই না বুঝি। কবির মানসিক গঠন কিংবা বিশ্বাসের পরিচয় কি শুধু তাঁর কবিতার মধ্যেই ফোটে? 'গীতাঞ্জলি'র কবিকে বুঝবার ব্যাপারে কি 'ধর্ম' কিংবা 'শান্তিনিকেতন'-এর প্রবন্ধগুলিও আমাদের সাহায্য করে না? ঠিক তেমনি, প্রকৃতি যে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে নাড়া দিত, তা বুঝবার জন্যে শুধু তাঁর কবিতা পড়লেই আমাদের চলে না, তাঁর পত্রগুচ্ছও পড়া চাই।

মোহিতলালের ক্ষেত্রেও এই একই কথা। রবীন্দ্রপরবর্তী অগ্রণী কবিদের তিনি অন্যতম; উপরন্তু সমালোচক হিসেবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। সম্প্রতি তাঁর পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে। সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত। তাঁদের এই যৌথ প্রয়াসের মূল্য বস্তুত অপরিসীম। স্বীকার করতে কারও কুণ্ঠা হওয়া উচিত নয় যে, কবি-সমালোচক মোহিতলালের সঠিক মূল্যায়নের কাজটাকে এই গ্রন্থ অনেক সহজ করে দিল। উপরন্তু এই পত্রগুচ্ছে মোহিতলালের ব্যক্তিজীবনের নানা ছবিও চমৎকার ফুটেছে। তার মূল্যই কি কম? 'কবিরে পাবে না কবির জীবন-চরিতে'—কথাটা, আর যার ক্ষেত্রেই খাটুক, মোহিতলালের ক্ষেত্রে খাটে না। তাঁর কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে যেহেতু ফারাক ছিল যৎসামান্য। অনেকাংশেই তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। কীভাবে করেছে, তাঁর এই পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত না-হলে তা নিশ্চয় ধরা পড়ত না।
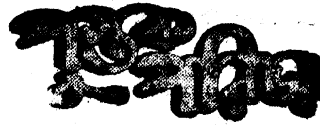
কিন্তু এই পত্রগুচ্ছ সংকলন ও সম্পাদনার কাজটা যে আদৌ সহজ ছিল না, তাও স্বীকার্য। কেন সহজ ছিল না, তা বুঝতে হলে মোহিতলালের ব্যক্তিত্বকে আর-একটু ভাল করে বুঝতে হয়। এমন মানুষ আমরা সর্বক্ষেত্রেই দেখতে পাই, কাউকে না-চটিয়ে সবদিক রক্ষা করে যাঁরা চলতে পারেন। মোহিতলাল তাঁদের সগোত্র নন। অন্য মানুষের কৃতি কিংবা ভূমিকা কিংবা চরিত্র বিচারে তিনি যে কখনও কোনও ভুল করেননি, এমন কথা কে বলবে। বস্তুত, সমাজ কিংবা রাজনীতি তো বটেই, সাহিত্যের ব্যাপারেও সকলের সম্পর্কে তাঁর সকল মতামত নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু একটা কথা ঠিক। সেটা এই যে, মতামত প্রকাশের ব্যাপারে তিনি কখনও দ্বিধা-সংশয়ে পীড়িত হননি। অমুক মহাশয় ক্ষুণ্ণ হতে পারেন কিংবা তমুক মহাশয় ক্ষুব্ধ এমন আশংকায় তো অনেকে অনেক ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন; কিংবা, নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভালোটাকে মন্দ বলেন আর মন্দটাকে ভালো। মোহিত-লাল সেক্ষেত্রে এই ধরনের কূটনৈতিক বাক্-সংযম কিংবা অনুভভাষণে আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁর যেটা বলবার কথা, সেটা তিনি অকুতোভয়ে ব্যক্ত করতেন। তাঁর ভালো-লাগা ও মন্দ-লাগা, দুই-ই ছিল সমান তীব্র। এবং তাঁর চিঠিপত্রেও তার প্রচুর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। ফলত, সে-সব চিঠিপত্র ছাপতে দিতে অনেকেরই অস্বস্তি হওয়া স্বাভাবিক।

এই অস্বস্তিজনিত সমস্যার কথা আজহারউদ্দীন খান তাঁর 'নিবেদন'-এ বলেছেন। মোহিতলালের চিঠিপত্রের যাঁরা প্রাপক, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ-গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। তাঁদের সম্পর্কে আজহারউদ্দীন খান বলছেন, "কেন জানি না, যোগাযোগ থাকলেও তাঁরা চিঠি দিতে কুণ্ঠিত। যাঁদের কাছে চিঠি পাবার প্রত্যাশা ছিল বেশী, তাঁরাই বিমুখ করেছেন সবচেয়ে বেশী।" কেন বিমুখ করেছেন, তা কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, চিঠিগুলিকে চেপে গিয়ে অনেকে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চাইছেন।

এইটেই হচ্ছে পত্রসাহিত্য-সম্পাদনার সবচাইতে বড় সমস্যা। পাশ্চাত্যে এই সমস্যা কাউকে ভোগায় না। এ-দেশে ভোগায়। পাশ্চাত্যের মানুষেরা ওঅর্ডস্বার্থের কিংবা লরেন্সের এমন অনেক চিঠি অক্লেশে ছেপেছে এ-দেশে যা কিনা 'তাজা বোমা' বলে গণ্য হত, এবং সাধারণ্যে যাকে পেশ করবার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। বস্তুত, তার তুলনায় অনেক নিরীহ চিঠি ছাপতে দিতেও আমরা ভয়ে কাঁপি। আমরা বুঝি না যে, সত্য যেক্ষেত্রে নিষ্ঠুর, সেক্ষেত্রেও তাকে গোপন করা ঠিক নয়। সত্যের চাইতে ভালোমানুষিকে আমরা

বেশী দাম দিই। ফলত আমাদের পত্র-সাহিত্য প্রায়ই কপট প্রশংসাপত্রসাহিত্য হয়ে ওঠে।

মোহিতলাল যেহেতু পত্র লিখতে গিয়ে শুধুই প্রশংসাপত্র লিখতেন না, তাই তাঁর পত্রাবলী সংগ্রহ করা কঠিন হবে, এইটেই স্বাভাবিক। বস্তুত এমন আশঙ্কা অকারণ নয় যে, তাঁর সমগ্র-পত্রাবলী কখনও প্রকাশিত হবে না, বহু পত্র লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যাবে। সেটা দুঃখের কথা। আর সুখের কথা এই যে, আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্ত যে ১৯৩টি পত্র এখানে পেশ করেছেন, তার মূল্যও সীমাহীন। 'মোসলেম ভারত'-সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের সেই বিখ্যাত চিঠিখানি তো এখানে আছেই, তা ছাড়াও আছে প্রবোধচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বনফুল, সরোজকুমার রায়-চৌধুরী, তারাচরণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে লেখা এমন অনেক চিঠি, যা মোহিত-লালের চরিত্র, আদর্শ, আনন্দ ও যন্ত্রণাকে চিনে নিতে আশাতীত সাহায্য করে। আমরা বুঝতে পারি, এই মানুষটির নানা বিশ্বাসে হয়ত ভ্রান্তি কিংবা নানা সিদ্ধান্তে হয়ত প্রমাদ ছিল, কিন্তু মনে-মুখে কোনও অমিল ছিল না। কবিতা, সমালোচনা, সম্পাদনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই পত্রগুচ্ছে অনেক জরুরী কথা তিনি বলেছেন; সেই কথাগুলি তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে অনেক স্বচ্ছও করে দেয়; কিন্তু এহ বাহ্য, পত্র-গুচ্ছের মধ্য থেকে একটি সত্যবাদী মানুষের যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেইটেই সবচাইতে বড়ো প্রাপ্তি। সেই চিত্রটি দেখলে মনে হয়, তিনি যেন এক ট্র্যাজিক নাটকের নায়ক। যাঁদের তিনি ভাল-বাসতেন, তাঁদের অনেকেই তাঁকে বিপজ্জনক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তাঁর স্পষ্ট-ভাষণের আগ্রহে তবু ভাঁটা পড়েনি।

আজহারউদ্দীন খান ও ভবতোষ দত্তকে ধন্যবাদ, মোহিতলালের এই অমূল্য পত্র-গুচ্ছকে তাঁরা সযত্নে পরিবেষণ করেছেন। সম্পাদনার বিন্যাসটা লক্ষণীয়। পত্রগুলিকে তাঁরা বিষয়-অনুযায়ী বিভক্ত করে সাজিয়ে-ছেন, সূচীপত্র এক্ষেত্রে নির্দেশিকার কাজ করছে; উপরন্তু গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বিস্তারিত তথ্যপঞ্জী। তা ছাড়া, পত্র-প্রাপকদের পরিচয় জানাতেও তাঁরা ভোলেন-নি। ভবতোষ দত্তের লেখা সুদীর্ঘ ভূমিকাটি অত্যন্তই মূল্যবান। এখানে মোহিতলালের সাহিত্যের উপরে নানা দিক থেকে অনেক আলো ফেলেছেন তিনি; মোহিতলালের কবিতা, সাহিত্যাদর্শ, ছন্দ-ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্রকে এমন-ভাবে তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন, যাতে ছাত্র, গবেষক ও সাধারণ পাঠকসমাজ, সকলেরই উপকৃত হবার কথা।

জীবনী

ভারতের গৌরব। প্রথম খণ্ড। পাবলিকেশন্স ডিভিশন। মিনিস্ট্রী অব ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং, গভঃ অব ইণ্ডিয়া, পাতিয়ালা হাউস, নিউদিল্লী-১। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল্যায়ণ বহু কাল পূর্বেই গুণীজনেরা উপস্থিত করেছেন। ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রমাণাদির মাধ্যমেই প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের পূর্বেই আমাদের ভারতবর্ষ শৌর্য, জ্যোতিষ, ধর্মজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য প্রভৃতিতে অগ্রসর-মান ছিল। বহু সহস্র বর্ষের সাধনা ও আত্ম-ত্যাগের মাধ্যমেই আজকের ভারতবর্ষের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু মহা-পুরুষের পদধূলিতে ধন্য হয়েই ভারতবর্ষ বিকশিত।

আমাদের ভারতবর্ষের সেই প্রাচীন মহা-পুরুষদিগের কয়েক জনের জীবনী—ভারত গৌরব। যদিও জীবনীগুলি সংক্ষিপ্ত তথাপি আজকের নবীন কিশোর ও কিশোরীদের জানার পক্ষে বইখানি সাহায্য করবে। এই সব মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে ভারতবর্ষকে মোটামুটিভাবে জানতে পারা যাবে এবং নিজের দেশের পুরাকালের গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে কিশোর কিশোরীরা মানসিক উৎকর্ষ লাভ করবে।

প্রথম খণ্ডে যাঁদের জীবনী দেওয়া হয়েছে তাঁদের পরেও আরো অনেকেই আছেন। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলিতে অন্যরাও আরও স্থান পাবেন, বিশেষ করে শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেব, কবি জয়দেব, গুরু নানক প্রভৃতি ভারত গৌরবরা।

বিবিধ বিষয়

বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। ধনঞ্জয় দাশ মজুমদার। সম্বোধি পাবলিকেশন, ২২ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। মূল্য আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বইটি পড়ে দুটি কারণে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। এক, লেখকের বাঙালী প্রেম। এমন প্রগাঢ় বঙ্গদেশ প্রীতি প্রায় দেখা যায় না। বেদ, পুরাণ, মহাভারত থেকে শুরু করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত তিনি এক প্রবল যুদ্ধ চালিয়েছেন। তাতে এই প্রমাণ করে তিনি বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ ও নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছেন যে, আর্য সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ ছিল বাংলা। কারণ গঙ্গারাঢ়ী কলিঙ্গরাই আধুনিক বাঙালীর পূর্বপুরুষ। মহাবীর, কপিল-মুনি, শীলভদ্র, অতীশ—এমন কি বাল্মীকি, বেদব্যাস, পতঞ্জলি সবাই বাঙালী ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, মহাবীরের জন্মস্থান বৈশালী নয়, বর্ধমান। গৌতম ছিলেন রাঢ়ের গঙ্গানগরের (বর্তমান পাণ্ডুয়ার) গঙ্গারাঢ়ী কলিঙ্গরাজ দণ্ড-পানির বোন মায়াদেবীর গর্ভজাত বাংলার সন্তান। ধান, কাপড়, রেশম এমন কি বালির কাগজ—সবই পৃথিবীতে প্রথম এনেছেন বাঙালীরা—প্রধানত কৈবর্তরা। কিন্তু এই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য হতোদ্যম জীর্ণশীর্ণ বাঙালীকে উপহার দিতে লেখককে যে-বিপুল অধ্যয়ন করতে হয়েছে তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

১০৬।৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

বাণী বন্দনা। অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী রেখা দেবী: ২৫/২ গিরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫।

আত্মসমর্পণ যোগ। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। প্রবর্তক পাবলিশার্স: ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.০০।

জীবনের আলো। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। প্রবর্তক পাবলিশার্স: ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.০০।

ব্রহ্মচর্য। সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল। প্রবর্তক পাবলিশার্স: ৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.৫০।

সাহিত্যলোক। অমলেন্দু বসু। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড: ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য ১০.০০।

বিশাখা নক্ষত্রের কাল। সুজিতকুমার পালিত। অভিজ্ঞান: ২এ মাধব দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩.০০।

রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন। দীপন চট্টো-পাধ্যায়। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন: ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪.০০।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৫.৫০।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩.০০।

রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়: ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৮.০০।

Some Poems of Ashis Sanyal. Bengali Literature Publication: 53 Bidhan Palli, Jadavpur, Calcutta-32. Price Rs. 2.00.

ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের দিকপাল এবং বিশ্ব ক্রীড়া মহলের সবচেয়ে পরিচিত ভারতীয় পঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যুতে কলকাতা ময়দানের খেলাধুলো এক সপ্তাহ বন্ধ ছিল।

গত ৬ মারচ শনিবার ক্যালকাটা মাঠে প্রদর্শনী ম্যাচ হিসাবে আয়োজিত মোহন-বাগান ও ইস্ট বেঙ্গলের হকি লীগের খেলা দেখার জন্যই পঙ্কজ গুপ্ত তাঁর পার্ক সার্কাস অঞ্চলের বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিলেন। কিছু দূরে এসেই গাড়ির মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গাড়ি উল্টো মুখে বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ি থেকে ধরা-ধরি করে বাড়িতে নামাতে নামাতে সব শেষ। সঙ্গে সঙ্গে দুঃসংবাদ পৌঁছে যায় তাঁর আজীবন স্মৃতি বিজড়িত গড়ের মাঠে। তখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার মধ্য বিরতিতে মাঠে ব্যান্ড বাজছিল। ব্যান্ড বাজনা থেমে যায়। মোহনবাগান ক্লাব পতাকা শোকের চিহ্ন এঁকে দিয়ে অর্ধনমিত হয়। এক বিষাদের ছায়া পড়ে সারা মাঠে। খেলোয়াড় সমেত মাঠের সমস্ত দর্শক নত মস্তকে মৌনব্রত পালনের মাধ্যমে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের মুকুটহীন সম্রাটের উদ্দেশে জানায় তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা। খেলার ধারাবিবরণী প্রচারক আকাশবাণী মারফত মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জেনে যায় পঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে ভারতীয় ক্রীড়া-ইতিহাসের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

ভারতীয় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কি ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত ? না খেলাধুলোর প্রচার-প্রসার, সংগঠন ও প্রশাসনের প্রথম পুরুষ। ভারতীয় ক্রীড়া মানচিত্রের নব রূপকার। এমন কোনো খেলা নেই যার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। এমন কোন ক্রীড়া সংস্থা নেই যার সংগঠন ও প্রশাসনে তিনি নেতৃত্ব দেননি। বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি সর্বভারতীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। রাজ্য সংস্থা এবং ভারতীয় সংস্থার ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেবল টেনিস, সাঁতার, ভলিবল, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লক্রীড়া, অ্যাথলেটিকস, অলিম্পিক আন্দো-লন—যেদিকেই তাকাই সেদিকেই পঙ্কজ গুপ্তের সংগঠনী শক্তির পরিচয় রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থায় কখনো সভাপতি, কখনো সম্পাদক, কখনো কোষাধ্যক্ষ, কখনো সহ-সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন। ক্রিকেট, ফুটবল ও হকি দল নিয়ে বহু বার বাহির বিশ্ব ঘুরে এসেছেন। ১৯৩২-এর লস এঞ্জেলস অলিম্পিক থেকে শুরু করে ১৯৬৮-র মেক্সিকো অলিম্পিক পর্যন্ত কোনো অলিম্পিকই বাদ যায় নি। একটি--আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া বাদ যায়নি কোনো কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসে উপস্থিতি। ফুটবল দল নিয়ে জাভা (এখন ইন্দোনেশিয়া), সিংহল, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হিসাবে ১৯৪৬ ও ১৯৫২ সনে ইংলণ্ড এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে অস্ট্রেলিয়া সফর করেছেন। হকি দল নিয়ে গিয়েছেন নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায়। তা ছাড়া এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক হকি ফেডারে-শনের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য, ভারতীয়

পরলোকগত পঙ্কজ গুপ্ত

ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে বহু বার তাঁকে হকি, ফুটবল ও ক্রিকেটের বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দিতে হয়েছে। তাই বাহির বিশ্বের ক্রীড়ামহলেও ভারতের পঙ্কজ গুপ্ত সবচেয়ে পরিচিত নাম। পঙ্কজ গুপ্তই প্রথম ভারতীয় হকি আম্পায়ার যিনি অলিম্পিক অঙ্গনে খেলা পরিচালনা করেছেন। পঙ্কজ গুপ্তই প্রথম ভারতীয় রেফারি যিনি পরিচালনা করেছেন আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা। এম সি সি-র প্রথম ভারতীয় সদস্যও পঙ্কজ গুপ্ত। এবং বলা বাহুল্য, এই কলকাতার ফুটবলে অচলায়তনের বাঁধ ভাঙ্গার মূলেও রয়েছে পঙ্কজ গুপ্তের ব্যক্তিত্ব। শ্বেত সদস্যদের কুক্ষিগত আই এফ এ-র সংবিধানে যখন ধারা ছিল দুটির বেশী তিনটি ভারতীয় দল প্রথম ডিভিসনে খেলতে পারবে না তখন প্রধানত পঙ্কজ গুপ্তের প্রচেষ্টাতেই সাহেবী সনদ বদলে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তাই বলে ওপার থেকে আগত পঙ্কজ গুপ্তকে কোনোদিন 'ওপার-এপার' দ্বন্দ্বের দাঁড়িপাল্লায় ঝুলতে দেখিনি। বরং সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড জয়ের কৃতিত্বে মোহনবাগানের ভাবধারা জাতীয় দলের ভাবধারায় পৌঁছনোর ফলে পঙ্কজ গুপ্ত মোহনবাগানকে 'মাই টিম' বলতে গর্ব অনুভব করতেন।

ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলোর শখ ছিল এই ছোটখাটো চেহারার মানুষটির। কিন্তু মনে ছিল স্বপ্ন, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন, খেলাধুলোয় ভারতকে বড় করবার রঙীন কল্পনা। তাই মাত্র পাঁচটি টাকা সম্বল করে যিনি ঢাকা থেকে ছাত্রজীবনে কলকাতায় চলে এসেছিলেন অজানার উদ্দেশ্যে, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসাধারণ সংগঠনী শক্তিতে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন। বলতে কইতে লিখতে যেমন পটু ছিলেন তেমন ছিলেন তীক্ষ্ম বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎ-পন্নমতির অধিকারী। স্মৃতি শক্তিও ছিল প্রখর। সাংবাদিক জীবনে তিনি ছিলেন আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর সম। হৃদয়ের উত্তাপে সকলকেই কাছে টেনে নিতেন। ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর প্রতিষ্ঠা কম নয়। লেখনী ছিল যুক্তিপূর্ণ। ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে অধুনালুপ্ত অ্যাডভান্স এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু পত্রিকাতেও নিয়মিত লিখতেন। মৃত্যুকাল পর্যন্তও ইন্ডিয়ান অলিম্পিক নিউজ-এর সম্পাদনাভার ছিল তাঁর উপর। তবে সাংবাদিক জীবনের শুরু কিন্তু রাজনৈতিক সংবাদদাতা হিসাবে ১৯২০ সনে। ওই বছর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সংবাদ সরবরাহ করেন অধুনালুপ্ত ঢাকা হেরাল্ড পত্রিকায়।

সত্যিই এক বৈচিত্র্যময় জীবন পঙ্কজ গুপ্তের। দেশ বিভাগের পর বহু দিন ধরে ঢাকা সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের সদস্য ছিলেন। দেশ বিভাগের আগে রাজ-নীতিতেও অংশ নিয়েছিলেন। অবশ্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হতে পারেননি।

অনেক দিন জিজ্ঞাসা করেছি—পঙ্কজ দা, এত কাজ করেন কিভাবে? সময় পান কোথায়? বলতেন, আমার ঘুম কম, দিনে ১৮।১৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করি। আর সব কিছুই করি একটা সিস্টেমের মধ্যে।

স্মৃতিশক্তির কথায় একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমরা জানতাম অন্যান্য খেলা-ধুলোর মত টেনিসের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নেই। একবার সাউথ ক্লাবে এশিয়ান টেনিসের প্রেস কনফারেন্সের পর বিশ্ব-টেনিস নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হল। আশ্চর্য, পঙ্কজদা কয়েক বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলির ফলাফল স্কোর সমেত গড়গড় করে বলে

১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকের সময় ডঃ গোয়েবলস-এর কাছ থেকে অটোগ্রাফ আদায় করছেন পঙ্কজ গুপ্ত।

যেতে আরম্ভ করলেন। আমরা ভেবেছিলাম আন্দাজে বলে দিচ্ছেন। ফলাফল হয়তো মনে আছে, স্কোর মনে রাখা কি সম্ভব? চ্যালেঞ্জ করতেই পঙ্কজদা বললেন, কাগজে লিখে রাখ, মিলিয়ে দেখিস। সত্যিই লিখে রেখেছিলাম এবং পরে মিলিয়ে দেখেছিলাম। খুব সামান্য ভুল ছাড়া সব স্কোরই তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম একজনের বড় হবার পেছনে অবশ্যই অনেক কিছু থাকে।

পঙ্কজদা চিরদিনই ডানপিটে। ঝুঁকি নিতে পেছপাও ছিলেন না। ১৯৩২-এ লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের একটি ঘটনা। জাতীয় পোশাকের অংগ হিসাবে মাথায় পাগড়ি বাঁধা ভারতীয় খেলোয়াড়দের অপরিহার্য ছিল। কিন্তু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান গোলকিপার আর্থার হিন্ড পাগড়ি পরতে অস্বীকার করায় নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন পঙ্কজ গুপ্ত আর্থার হিন্ডকে তল্পিতল্পা বেঁধে লস এঞ্জেলস থেকে দেশে ফিরে আসবার আদেশ দেন। অবশ্য হকি ফেডারেশনের সভাপতি হেম্যানের মধ্যস্থতায় হিন্ড ক্ষমা প্রার্থনা করায় ব্যাপারটি মিটে যায়।

ঝুঁকি নেবার কথায় আরও কথা এসে পড়ে। লস এঞ্জেলসের যাবার অর্থাভাব। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গান্ধীজির আবেদন আদায় করতে গেলে গান্ধীজি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হেসে বললেন, 'হকি কোন্ চীজ?' তারপর পঙ্কজ গুপ্ত নিজ দায়িত্বে পাঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার করলেন অলিম্পিক দল পাঠাবার জন্য।

১৯৩৬-এ বার্লিন অলিম্পিকের সময় হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন পঙ্কজ গুপ্ত। হিটলার তখন নাজী আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। অধিকাংশ সময় আন্ডার গ্রাউন্ডে থাকেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা পঙ্কজ গুপ্ত একজনের সহায়তায় গোপনে মাটির নীচের ঘরে প্রবেশ করলেন যেখানে হিটলার, গোয়েবলস ও গোয়েরিং পরামর্শ-সভায় বসেছিলেন। হিটলারের কাছ থেকে এবং পরে গোয়েবলসের কাছ থেকে আদায় করলেন অটোগ্রাফ।

তবু পূর্ণতা ও শূন্যতায় ভরা এক বৈচিত্র্যময় জীবন পঙ্কজ গুপ্তের। খেলাধুলোর উন্নতির জন্য জীবনভর চেষ্টা করেছেন। রাজার মত সম্মান পেয়েছেন। পেয়েছেন রাজপুরুষ ও রাষ্ট্রনায়কদের সখ্যতা ও সান্নিধ্য। সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন। সারা জীবন উপভোগ করেছেন ক্রীড়াকাননের নির্মল আনন্দ। আবার ছোট ছোট আঘাতও কম পাননি।

সব চেয়ে পরিতাপের কথা, জীবনে যাঁদের প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন তাঁদের কাছ থেকেই আঘাত পেয়েছেন বেশী। এখানেই শূন্যতা। শূন্যতা পারিবারিক জীবনেও। প্রৌঢ় বয়সে কোলে পাওয়া একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুও তাঁর জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তি।

হকির প্রতি পঙ্কজ গুপ্তের অনুরাগ বেশী থাকলেও এবং তাঁকে বাংলা হকির পালক-পিতা বলা হলেও ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের কাছ থেকে ইডেনের ক্রিকেট মাঠ কিনে নিয়ে ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের মাধ্যমে ইডেনে পৃথিবীর সুন্দরতম এবং সর্বাধুনিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত। একটি ব্লক খাড়াও করেছিলেন। কিন্তু একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ অজ্ঞাত কারণে তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলো। কুকথায় ডাঃ বিধান রায়ের কান ভরিয়ে তাঁকে দিয়ে অর্থাৎ রাজ্য সরকারকে দিয়ে ইডেন দখল করালো। ফলে ইডেনকে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান করা আর সম্ভব হল না।

একটি ব্লক খাড়া হওয়া ইডেনের ওই রূপ দেখলে আজকের দর্শকদের কাছে পঙ্কজ গুপ্তের ব্যর্থতার ছবিই ফুটে ওঠে। কিন্তু ইট-কাঠ-সিমেন্ট যদি কথা বলতে পারত তা হলে হয়তো ওই পাষাণবেশী বলে উঠত —'ওরা আমারও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল না, যে আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তার প্রাণেও আঘাত দিল।

আজ পঙ্কজ গুপ্ত সব কিছুর বাইরে চলে গেছেন। খেলাধুলোর কতখানি ভাল করেছেন আর কতখানি মন্দ করেছেন সে সমালোচনা আর তাঁর কানে পৌঁছবে না। কিন্তু যেটুকু করেছেন তার জন্য কি তাঁর স্মৃতিরক্ষার কিছু উদ্যোগ হওয়া উচিত নয়?

একলব্য

হকি খেলার গোড়ার কথা

(৩)

ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলার মত হকি খেলাও ভারতে এসেছে ইংরেজদের মাধ্যমে সে কথা আগেই বলেছি। ফুটবল এবং হকি, দুটি খেলাই এসেছে বিলিতী পল্টনের মারফতে। ফুটবল প্রথমদিকে প্রসার লাভ করেছে প্রধানত এদেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে। আর হকির প্রসার হয়েছে ভারতীয় ফৌজের মাধ্যমে। ভারতীয় ফৌজের ইংরেজ অফিসারদের কাছ থেকে ফিরিঙ্গি সম্প্রদায় প্রথমে হকি খেলা শিখেছে। পরে এই দুই সমাজের সংগে খেলে হকিতে হাত পাকিয়েছে ভারতীয় সিপাইরা। বলা বাহুল্য, ভারতীয় হকির সর্বপ্রথম বৈদেশিক সফরও সৈন্যদলকে নিয়ে। ১৯২৬ সালে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে গড়া এক হকি দল যদি নিউজিল্যাণ্ড সফর না করত, তবে কে জানে, ভারতীয় হকি দল অলিম্পিকে যাবার আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণা পেত কিনা।

যাই হোক, ভারতে ক্লাব ভিত্তিক হকির সূচনা কলকাতাতেই ১৮৮৫ সালে। কলকাতার বেটন কাপের খেলা শুরু ১৮৯৫ সালে। পরের বছর বোম্বাইয়ে শুরু হয় আগা খাঁ কাপের খেলা। দুটি প্রতিযোগিতাই প্রথম দিকে নিজ নিজ অঞ্চলের দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

১৮৮৫ সালে কলকাতায় হকি খেলা শুরু হবার পর অন্যান্য রাজ্যেও আস্তে আস্তে হকি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধুলোর মধ্যে হকি বিশেষ খেলা হিসাবে স্থান পায়। ওই বছরই লাহোর জিমখানা ক্লাব ডট ওয়েদার টুর্নামেন্ট নামে এক হকি প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করে। ইতিমধ্যে অন্যান্য রাজ্যেও হকি খেলা আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু সাংগঠনিক হকির পথ দেখায় বাংলা দেশ ১৯০৮ সালে। ওই বছর বেংগল হকি অ্যাসোসিয়েশন জন্মলাভ করে। অনেক পরে অর্থাৎ ১৯২০ সালে সিন্ধু হকি অ্যাসোসিয়েশন এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে বিহার, গোয়ালিয়র, ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া (বোম্বাই), দিল্লি ও পাঞ্জাব হকি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। অবশ্য ১৯১৯ সালে আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, সর্বভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠনে এই আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী।

তবে সর্ব ভারতীয় হকি সংস্থা গঠনের ব্যাপারেও বাংলা দেশ অগ্রণী। হকি খেলা যখন নানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তখন একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হকি খেলার প্রচার প্রসার এবং পরিচালনার প্রয়োজন বোধে বাংলা দেশের মিঃ এ মি ল্যাল, শ্রীএস আর ভট্টাচার্য এবং মিঃ এম টি এইচ রিচার্ডসন অগ্রণী হয়ে সর্বভারতীয় হকি সংস্থা গড়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় তাঁদের প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় না। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন রাজ্যে হকি খেলা চলতে থাকে।

প্রথম প্রচেষ্টার ১২ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২০ সালে পাঞ্জাব হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ সি ই নিউহাম সর্বভারতীয় হকি সংস্থা গঠনে উদ্যোগী হন। কিন্তু ইংরেজ সাংবাদিকের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ৪ বছর পরে এগিয়ে আসেন গোয়ালিয়র স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসার লেঃ কঃ সি ই লুয়ার্ড। ১৯২৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর গোয়ালিয়রে মিলিত হবার জন্য বিভিন্ন হকি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমন্ত্রণ যায়। ফলে গোয়ালিয়র, সিন্ধু, রাজপুতানা, পশ্চিম ভারত, পাঞ্জাব, বাংলা ও সার্ভিস স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় হকি ফেডারেশন গঠন করলেও ১৯২৭ সালের আগে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে হকি ফেডারেশন কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারে নি। তবে ওই ১৯২৫ সালেই প্রকৃতপক্ষে ফেডারেশনের সৃষ্টি। কর্নেল ব্রুস টার্নবুল হন ফেডারেশনের প্রথম সভাপতি এবং মিঃ এন এইচ আনসারি প্রথম সম্পাদক। ফেডারেশনের দ্বিতীয় সভাপতি মেজর ইয়ান বার্ন-মার্ডকের উদ্যোগেই ১৯২৮ সালে ভারতীয় হকি দলের সর্ব-প্রথম অলিম্পিক অভিযান এবং প্রথম অভিযানেই বিশ্ব জয়।

অবশ্য, আগেই বলেছি, ১৯২৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ফৌজি দলের বিরাট সাফল্যই ভারতীয় খেলোয়াড় ও হকি কর্তৃপক্ষের মনে অলিম্পিক অভিযানের অনুপ্রেরণা এনে দেয়। নিউজিল্যাণ্ড সফরের ২১টি খেলায় ১৯২টি গোল দিয়ে দেশে ফিরে আসে ভারতীয় ফৌজি দল। ২১টি খেলার মধ্যে বিজয়ী হয় ১৮টি খেলায়। ২টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। পরাজিত হয় মাত্র একটি খেলায়। এক, দুই, পাঁচ, সাত করে কোনো কোনো খেলায় এক ডজন, সওয়া ডজনও গোল করেছে ভারতীয় ফৌজি দল নিউজিল্যাণ্ডের সাহেবদের বিরুদ্ধে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের হাতের কৌশল, কব্জির [illegible], স্টিকের কাজ আর খেলার ধারা প্রকরণ দেখে নিউজিল্যাণ্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। ভেবেছে এ তো খেলা নয়—ম্যাজিক, হাতের স্টিক যেন হকি স্টিক নয়, প্রতিপক্ষকে বাঁদর নাচ নাচাবার যষ্ঠি।

নিউজিল্যাণ্ড সফরের দ্বিতীয় গৌরব ধ্যানচাঁদের আবিষ্কার। সৈন্য বিভাগের সাধারণ "সিপাই" ধ্যানচাঁদ সফরের আগে বে-সামরিক হকি প্রতিযোগিতায় খুব অল্প খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আগে অবশ্যই কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে ফৌজি দলে স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড সফরে দেখা গেল ধ্যানচাঁদ শুধু খেলোয়াড় নন, হকির সুন্দর শিল্পী, অনন্য মনীষা।

১৯২৮ সালের আমস্টার্ডাম অলিম্পিকের তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় জওয়ানদের কৃতিত্বে হকি কর্তৃপক্ষের মনে আত্মবিশ্বাস জেগেছে, চোখে জেগেছে স্বপ্ন। কিন্তু আমস্টার্ডামে হকির স্থান পাওয়া নিয়ে সংশয় ছিল। কেননা, ১৯০০ সালে প্যারি অলিম্পিকে সর্ব প্রথম হকি খেলায় সরকারীভাবে কোন দেশ বিজয়ীর সম্মান পায়নি। তারপর ১৯০৮-এর লণ্ডন অলিম্পিকে এবং ১৯২০-র অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিকে সরকারীভাবে হকি খেলা হলেও ১৯২৪-এর প্যারী অলিম্পিকে হকিকে স্থান দেওয়া হয়নি। নবগঠিত ভারতীয় হকি ফেডারেশন বিশেষভাবে চেষ্টা না করলে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকেও হকির আসর বসত কিনা সন্দেহ।

আমস্টার্ডামে দল পাঠাবার জন্যই সর্বপ্রথম আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আন্তঃ প্রাদেশিক হকির আসর বসে কলকাতায়। অর্থের অভাবে মাত্র ১৩ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গড়া হয়। তবে এদের সংগে আরো জুড়ে দেওয়া হয় ৪ জনকে, যারা তখন ইংলণ্ডে ছিলেন।

বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানের চিত্তচাঞ্চল্য এবং বিদেশে খেলার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে হকির কলানৈপুণ্য—আর অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় বিশ্ববাসীর চোখকে বিস্মিত করে ভারত বিজয়ীর জয়মালা নিয়ে ফিরে আসে। তারপর লস এঞ্জেলস, বার্লিন, লণ্ডন, হেলসিংকি ও মেলবোর্ন—উপর্যুপরি ৬টি অলিম্পিকে ভারত বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা। রোম অলিম্পিকের ফাইনালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছে ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হলেও টোকিও অলিম্পিকে আবার ভারত বিশ্বজয়ীর সম্মান পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু মেক্সিকোর শেষ অলিম্পিক থেকে সোনাও নয়, রুপোও নয়, ব্রোঞ্জ মেডেল নিয়ে ভারতকে দেশে ফিরতে হয়।

(আগামী সপ্তাহ থেকে আইনের ধারা)

—মুকুল

চিত্র-সমালোচনা

বোম্বাইয়ে আধুনিকতা

নতুন ধরনের ছবি তৈরির একটা প্রবণতা আজকাল বোম্বাইয়ে দেখা যাচ্ছে। সত্যিকারের একসপেরিমেনটাল ছবি তৈরির ঝোঁক অবশ্য এখনও তেমন প্রবল নয়। যদিও আমরা "উসকী কহানী"-কে বাতিল করে দিতে পারি না। "দো বিঘা জমীন"-এর পর বোম্বাইয়ে আরও আগে থেকেই নতুন থীমের ছবি বানানো যেতে পারত। যাই হোক, "তিসরী কসম"-এর পর সেখানে নতুনত্বের খোঁজ শুরু হয়েছে। হালে আমরা "সারা আকাশ" ছবিটিও দেখলাম।

বোম্বাইয়ে এই যে নতুন হাওয়া এসেছে তার প্রধান লক্ষণ স্টার সিস্টেম বর্জন। উসকী কহানী-তে তারকা-প্রথার প্রতি কোন আনুগত্য দেখা যায়নি। এখন তথাকথিত স্টার সিস্টেম বর্জন করে আরও ছবি হচ্ছে। পুণা ইনস্টিটিউট-এর শিল্পীদের ছবিতে নেওয়া হচ্ছে। এঁদের কেউ যদি ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ে স্টার হয়ে গিয়ে থাকেন তো অন্য কথা। নতুবা নতুন মুখের একটা সজীবতা ও আকর্ষণ তো আছেই। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ছবিগুলি এগোতে পেরেছে কি?

এই পরিপ্রেক্ষিতে "চেতনা" (নীতীন ফিল্মস) হিন্দী ছবির সপ্রশংস উল্লেখ করা যেতে পারে। ছবির বিষয় আধুনিক, "অ্যাডালট থীম" বলা যেতে পারে। প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য এই ছবি। পরিচালক-কাহিনীকার বি আর ইশারা যে আধুনিক বিদেশী চলচ্চিত্র দ্বারা প্রভাবিত সেটা ছবি দেখলেই বোঝা যায়। শট কমপোজিশান, উপর থেকে শট নেওয়া, জাম্প-কাট, কোন ব্যক্তিকে না দেখিয়ে শুধু তার কথাটুকু শুনিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ছবিতে দ্রষ্টব্য। এসব বাইরের দিক। কথাবস্তুর দিক থেকেও ছবিটিতে দুঃসাহসের পরিচয় আছে, সমকালীন ঘটনা। নায়িকা (রেহানা সুলতান) সম্ভ্রান্ত বারবণিতা, "রেসপেক-টেবল প্রোস্টিটিউট", তার এক রাত্রির মূল্য হাজার টাকার বেশি। ভারতীয় চিত্রে যতখানি সম্ভব খোলাখুলিভাবে বেডরুম দৃশ্য দেখানো হয়েছে। নায়িকা সব লজ্জা ফেলে দিয়ে নায়কের (অনিল ধাওয়ান) শয্যা-সঙ্গিনী হতে চেয়েছে অনায়াসেই। এ ক্ষেত্রে সেন্সরের বদান্যতার উল্লেখ করতেই হয়। নায়িকার মদ্যপান ও সিগারেট খাওয়ার ধরন

"চেতনা" ছবির নায়িকা রেহানা সুলতান

সমাজের উপর মহলের গণিকার মত—যাদের দূরে থেকে চেনার উপায় নেই।

সব জেনে শুনেই নায়ক বিষ পান করতে চেয়েছে। পতিতা সীমাকে চেয়েছে প্রেয়সী ও পত্নী হিসাবে। বিয়ের পর সীমার মধ্যে জটিলতা ও দ্বন্দ্ব পরিচালক সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। ছবির ওই অংশে গভীরতার স্পর্শ মেলে। পরিচালনার কাজে ব্যঞ্জনাত্মক মুহূর্তগুলিও চমৎকার। নায়ক অনিল সীমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছে। অনিলের কথা শোনার সময় সীমা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাইয়ের আলোটা আঙ্গুলে লাগাতে গিয়েই হাতটা সরিয়ে ফেলে।

সীমার চিত্তশুদ্ধির ভূমিকা ওইখানেই। বিয়ের পর তার অন্তরে দহন চলতে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঘটনা-গুলি বিন্যস্ত। সীমা প্রেমিকা হয়ে যাওয়ার পরই গল্পটি অতিমাত্রায় নাটকীয় হয়ে পড়েছে। আসলে একটা গল্পই বলা হয়েছে ছবিটিতে। গল্পের প্রয়োজনেই অনিল এত মহৎ ও উদার। তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভাব দেখতে পাই। সীমাও বলেছে, শয়তানের সঙ্গেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু দেবতার সঙ্গে নয়। বিয়ের পর সীমা যখন জানে সে গর্ভবতী, তার পেটের সন্তান তার স্বামীর নয়, বিয়ের আগের বেশ্যাবৃত্তির বিষফল, তখন সে অনেক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। অনিল অবশ্য ওই সন্তানকেও গ্রহণ করতে চেয়েছে এবং ওইখানেই অনিল সীমার চোখে দেবতা হয়ে উঠেছে। সমালো-চকের চোখে নায়ক হয়েছে একজন সাজানো মহৎ মানুষ।

বোম্বাই-হিন্দী ছবির বেশ কিছু লক্ষণ এ ছবিতে আছে। গানও বাদ যায়নি। স্বপন-জগমোহনের সংগীতও উঁচু পর্দার। যদিও গানের সুর ভাল। গান ছাড়াও আরও মামুলি ব্যাপার আছে। ভাঁড়ামিও বাদ যায়নি। রঙিন হয়েও ছবিটি একসপেরি-মেণ্টাল হতে পারত, কিন্তু হয়নি। তবে "চেতনা"-য় এমন কিছু গুণ আছে যা তথাকথিত হিন্দীচিত্রে দেখা যায় না। যেমন রেহানা সুলতানের স্বাভাবিক অভিনয়। সত্যিই তা হিন্দী ছবিতে বিরল। অনিল ধাওয়ানও মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছেন।

হিন্দী ছবির অগ্রগতির ক্ষেত্রে "চেতনা" নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আর কিছু না হোক, অনেক ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়েও "চেতনা" বোম্বাইয়ের চিত্রজগতকে যদি আধুনিকতা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন করে তোলে তারই মূল্য কম কী?

["চেতনা" আগামী সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তি পাচ্ছে।]

নাট্য-সমালোচনা

খাঁচা

(সুন্দরম)

আধুনিক নাটক অ-সমকালীন এই অপবাদ কেউ দিতে পারবেন না। আজকের শৌখিন মঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাটকের বিষয় সমকালীন তো বটেই, রাজনীতিক চেতনায়ও সম্পৃক্ত। "খাঁচা" এই নতুন ধারার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নাট্যকার-পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী কেবল মঞ্চ

আধুনিক বিষয়ের অবতারণা করেই ক্যাজ্জ হর্নান মঞ্চে নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যেতেও চেয়েছেন। তিনি মঞ্চে নতুন ডাইমেনশন যোগ করতে চেষ্টা করেছেন। তাই এই নাটকে ফিল্ম প্রোজেকশনও রয়েছে। আমেরিকায় যাবে না বুবু। বড়লোক বাপ ফর্ম পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। বুবু ফর্মটি দেখার পরই আমেরিকা যাবার প্রবল আপত্তি জানিয়ে দেয় তার বাবাকে। বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা এত সহজ কিনা সে ভিন্ন প্রশ্ন। নাটাকারের বক্তব্যের প্রয়োজনে কিংবা নাটকের খাতিরে এটা অতি সহজ মেনে নিতেই হবে। সে যাক্। তখনই মঞ্চ অন্ধকার, উপর থেকে একটি পর্দা নেমে আসে, তার উপর ভিয়েতনাম যুদ্ধের সংবাদ-চিত্র। ভিয়েতনামের জনসাধারণ শত্রু প্রতিরোধে আগুয়ান। নাটক দেখতে বসে হঠাৎ তথ্যচিত্র দেখার সুখ বা চমক দর্শক নিশ্চয়ই পেয়েছেন। দর্শক যত চমকসুখ পান ততই ভাল। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? নাটকেও গিমিক? গিমিক-এর ঝোঁক নাট্যকার-পরিচালক আরও দেখিয়েছেন। কনটেমপোরারি নাটক যেহেতু তাই শহরের পথের কিছু পোস্টার সুতোয় বেঁধে রীলের মত দেখানো হয়েছে। চমক আরও আছে। পর্দার বাইরে নাটকের পাত্রকে বসিয়ে দর্শকের উদ্দেশে কথা বলানো থেকে আরম্ভ করে নেপথ্য ধ্বনি পর্যন্ত অনেক জায়গায়ই চমকসৃষ্টির চেষ্টা। "পিওর থিয়েটার" বলে যদি কিছু থাকে এই সব চমক বা গিমিক-এ তার কিছুমাত্র

"ফরিয়াদ" (পরিচালনা : বিজয় বসু) ছবিতে সোম মুখার্জী

মূল্য বেড়েছে কি?

তথাপি বহিরঙ্গ চাতুর্যই "খাঁচা"-র মূল কথা নয়। একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ভিতরে নাট্যকার অনায়াসেই দর্শককে নিয়ে যেতে পেরেছেন। স্নেহ কিংবা খোকাকে (ওই বাড়ির ছেলে-মেয়ে) আমাদের খুবই চেনা মনে হয়েছে। স্নেহ সম্পূর্ণ অধঃপাতে যায়নি। বাবার জন্য তারও মন অনেক সময় ব্যথায় টনটন করে ওঠে। বাবা যখন অসুস্থ, তখন সেও তার কর্তব্য করতে চায়। এবার মানসিকতাও বুঝতে পারি। তাদের দাদা পরিবারের অভাব যথাসাধ্য মিটিয়ে একদিন পুলিসের গুলিতে মারা গেছে। অথচ তাদের দাদার স্মৃতি কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ি থেকে মুছে গেছে। এই উপেক্ষা ও অকৃতজ্ঞতা এরা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। নাট্যকার এখানে নির্মম। অভাবগ্রস্ত পরিবারে স্নেহ-মমতা কীভাবে অকালে মরে যায় পরিচালক-নাট্যকার তা নিষ্ঠুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই দেখিয়েছেন। তবে বড় ছেলে মরবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তার মা মন থেকে এত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে পারেন কি? কোনদিনই কি পারেন? এখানে পরিচালক বাস্তবের অপর দিকটি উপেক্ষা করেছেন। অনেকটা অতিপ্রাকৃত উপকরণের মত বাড়ির বড় ছেলে মারা যাওয়ার পরও সাইকেল নাড়তে যে মাঝে মাঝে এসেছে সেটা নিশ্চয়ই চমক নয়। সে যেন মরে গিয়েও পরিবারকে পাহারা করে চলেছে। এর মধ্যে একটা করুণ সুর আছে। আবেগও রয়েছে।

নাটকটি সর্বাংশে একালেরই, এতে নৈরাশ্য যা দেখা গেছে কিংবা ভাবিষ্যতের যে আশা তাও সমকালচিহ্নিত। তা-ছাড়া,

চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে স্বাভাবিকভাবে। বুবুর ভাবনা ও কর্ম আপাতবিরোধী মনে হয়। তবে তার মূল্যবোধহীনতা—যেখানে সে মদ্যপকে টাকা দেয় অথচ বন্ধুকে চরম বিপদে সাহায্য করে না—একান্ত স্বাভাবিক। এক একজন শিল্পীকে দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করানোর কৌশলটিও চমৎকার। এবং সেই সঙ্গে একালের টুকরো টুকরো ছবিগুলিও দেখতে ভাল লাগে—যেমন, ত্রিদিব ও সুস্মিতার ঘটনা। অবশ্য আধুনিক পাপ ও দুর্নীতির এই সব ঘটনা (ত্রিদিব ও সুস্মিতার ব্যাপার কিংবা এধাকে অন্তঃসত্ত্বা করে দিয়ে শক্তি যেভাবে তাকে ত্যাগ করেছে) অভিনব কিছু নয়। লম্পট প্রেমিকের পাল্লায় পড়ে এধার বিপদ ও সমস্যার বিষয়টিও পুরনো।

বাস্তবতা ও বৈসাদৃশ্য মিলিয়ে এবং কৌতূহলের সঙ্গে দেখবার ও শোনবার মত অনেক কিছু নিয়ে "খাঁচা" একটি বিশেষ সুখভোগ্য নাট্যপ্রযোজনা। অভিনয়ের দিক দিয়েও নাটকটি উপভোগ্য। পার্থপ্রতিম চৌধুরী হয়েছেন বুবু। বিভিন্ন মানসিকতা ও মুড-এ, বিশেষত—কমিক ঢঙে তাঁর অভিনয় দর্শকের প্রশংসা পাবে। চমৎকার চরিত্র চিত্রণ বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের (স্নেহ)। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন বেশে (ত্রিদিব, শক্তি ও দিলীপ) খুবই ভাল অভিনয় করেছেন। ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের এবা বরাবরই দর্শকের সহানুভূতি পেয়েছেন, সুস্মিতা-রূপিণী ছন্দা চট্টোপাধ্যায় সাবলীল অভিনয়ের গুণে দর্শককে মুগ্ধ করেছেন। বুলা সেনগুপ্তা (মা), ও দুলাল ঘোষ (বাবা) নিজেদের চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

সংগীত ও ধ্বনির একটি বিশেষ ভূমিকা এই নাটকে আছে। এটা সম্ভব হয়েছে নাট্যকার-পরিচালকের সংগীত নির্দেশনার গুণে।

এরা কারা
(শৌভনিক)

সমসাময়িক জীবনধারার একটি খণ্ডচিত্র "এরা কারা"। সকাল থেকে যারা পথের ধারের ছোট চায়ের দোকানে আড্ডা জমায় এবং পাড়ার সকলে যাদের ভয় করে, তাদের নিয়েই একাঙ্ক নাটক রচনা করেছেন অভিনেতা বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যকার, বলা বাহুল্য, তাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন। তাদের হতাশা ও যন্ত্রণার সংবাদ দিতে চেয়েছেন দর্শককে। নাট্যকারের সমবেদনা আছে, কিন্তু দার্শনিকতা নেই। অর্থাৎ এদের নিয়ে নাটক বা গল্প লিখতে গিয়ে অনেকেই সমাজ ও পরিবেশের অপরাধ ও দারিদ্র্যজ্ঞান-হীনতা সম্পর্কে কিছু সারবচন উপস্থিত করেন। "এরা কারা"-র নাট্যকারও [illegible]-

'জয়-জয়ন্তী' (পরিচালনা : এম মল্লিক) ছবিতে সুচেতা, পাপিয়া, সম্রাট, মধুমিতা এবং উত্তমকুমারের ঘাড়ে চেপে টিংকু

ছেন পাড়ার অভিভাবকরাও কীভাবে অনেক সময় ছেলেদের অন্যায় কাজে নিয়োগ করছেন। তবু তিনি নাটকে কখনও বক্তৃতা দিতে যাননি। বরঞ্চ যে দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক ও মানবিক তা-ই বেছে নিয়েছেন। নাটকটি অনেকটা রিপোর্টাজ-এর মত। মেয়েদের দেখে ছেলেরা কেমন উতলা হয় তাও বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখানো হয়েছে। রিপোর্টাজ-এর লক্ষণ আছে বলেই "এরা কারা" এত ভাল লাগে। খুব অন্তরঙ্গ সুরে বাস্তববোধের ভিতর দিয়ে তিনি একটি সমসাময়িক চিত্র নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছেলেদের কোথায় দোষ ও অক্ষমতা তাও নাট্যকার ইঙ্গিত করেছেন। বেশি প্রকাশ পেয়েছে তাদের ফ্রাস্ট্রেশন এবং তাদের প্রাণশক্তির প্রাবল্য।

নাটকটি বিশেষভাবে মজার সংলাপের জন্য উপভোগ্য। কমেডির ধাঁচেই এই নাটক গঠিত। শেষ মুহূর্তে বিষাদের সুর। ছেলেরা যেন নিজেদের হারিয়ে আবার খুঁজতে চলেছে। একদিন যে-গান তাদের ভাল লেগেছিল সে-গানের সুর শুনে কথাগুলি আর তারা মনে করতে পারছে না। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গান তারা ভুলে গেছে! চমৎকার শেষের ওই দৃশ্যটি।

সুন্দর একাঙ্ক, সুন্দর অভিনয়—শৌভনিকের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। অভিনয়ে পাড়ার ছেলেদের মধ্যে নাট্যকার বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ই মাতিয়ে রেখেছেন। কাশীনাথ হালদারও (ছেলেদের মধ্যে প্রথম) ভাল অভিনয় করেছেন। [illegible] ও প্রদীপ [illegible] হয়েছেন [illegible]

অভিভাবক। টাইপ চরিত্র সৃষ্টির প্রশংসনীয় ক্ষমতা দেখিয়েছেন তাঁরা। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন নির্মল বংশবনিক, ভূপাল মুখোপাধ্যায়, মানব মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তা, শিপ্রা চক্রবর্তী ও শঙ্কর গুপ্ত। শঙ্কর গুপ্তের মঞ্চসজ্জা প্রশংসার যোগ্য।

"এরা কারা"—নাটকের আগে শৌভনিক উপস্থিত করেন বুদ্ধদেব বসুর "পাতা ঝরে যায়"। শৌভনিকের এই প্রযোজনাটি বহু প্রশংসিত। গত ২১ ফেব্রুয়ারি মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে এই নাটকের দুটি চরিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয় করেন অমল মুখোপাধ্যায় ও কাজল মুখোপাধ্যায়। সুধাংশু মণ্ডল নাট্য-নির্দেশক।

নতুন ছবির খবর

রবীন্দ্রনাথের গল্পের হিন্দী চিত্ররূপ

রবীন্দ্রনাথের "সমাপ্তি" গল্পের হিন্দী চিত্র তৈরি হচ্ছে। ছবির নাম "উপহার"। বিশিষ্ট শিল্পনির্দেশক সুধেন্দু রায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। স্বরূপ দত্ত ও জয়া ভাদুড়ি নব-দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করছেন। কামিনী কৌশল, নন্দিতা ঠাকুর, পদ্মা দেবী, নানা পালসিকর, লীলা মিত্র, সুরেশ চৈতাওয়াল প্রভৃতি অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকার শিল্পী। রাজশ্রী প্রোডাকশন্স-এর তারাচাঁদ বারজাতিয়া ছবিটির প্রযোজক।

সেন্সরের অপেক্ষায়

গীতা [illegible]-এর 'জীবন-যৌবন' ছবিটির শুটিং শেষ। ছবিটি এখন সেন্সরের

অপেক্ষার। বিজয় দাস এর চিত্রনাট্যকার-পরিচালক। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, ডি-জি, নবাগতা সন্ধ্যা দাশগুপ্তা ও অপোরূপ ছবির প্রধান শিল্পী। খগেন দাশগুপ্ত সংগীত পরিচালক।

শুটিং শুরু

অসীমা পিকচার্স-এর "তারাপাত"-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। এর আগে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সংগীত পরিচালনায় ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, রবীন মজুমদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, এবং নবাগত অরুণ ও কল্পনা ছবির প্রধান শিল্পী। অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন বসু।

"সংসার" শেষ

নর্মদা পিকচার্স-এর সামাজিক ছবি "সংসার"-এর শুটিং শেষ। সলিল সেন ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক। বহু চরিত্র বিশিষ্ট এ-ছবিতে অভিনয় করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, নির্মলকুমার, জহর রায়, শমিতা বিশ্বাস, সন্ধ্যারাণী, অজয় গাঙ্গুলি, শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

উইমেনস কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন

একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে উইমেন্স কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৮ সনে। প্রধানত অর্থ ও সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। নারীসমাজে এই বিপত্তি রোধ করার জন্য অ্যাসোসিয়েশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমাজ সেবার আরও আদর্শ তাঁদের আছে। অ্যাসোসিয়েশনের গত বার্ষিক উৎসবে (রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত) ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীমতী কানন দেবী, (সংস্থার কোষাধ্যক্ষা), শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা (সংস্থার সভানেত্রী) প্রমুখ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর বিবরণ দেন। ওইদিন (৫ ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্র সদন) মহিলা শিল্পী মহলের সভ্যারা অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যার্থে "অগ্নিধারা" নাটক অভিনয় করেন।

বোম্বাই বিচিত্রা

প্রচার মাধ্যমের দৌলতে বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের অধিবাসীদের প্রচারপ্রিয়তা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। আগে সাংবাদিকরা সংবাদের খোঁজে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতেন, আজকাল সংবাদ খ‍ুঁজে বেড়ায় সাংবাদিকদের। স‍ুতরাং চাহিদা এবং সরবরাহের নীতি অন‍ুসারে বর্তমানে সংবাদের চেয়ে সাংবাদিক এবং পত্র-পত্রিকার বাজার দর অনেক বেশি। আমাদের চলচ্চিত্র জগতে আগে চিত্র-সাংবাদিকরা ঘ‍ুরঘ‍ুর করতেন নামজাদাদের আশেপাশে, আজকাল নামজাদারাও নিয়মিত প্রকাশিত হবার আগ্রহে সাংবাদিকদের নিয়মমাফিক তোয়াজ করে চলেছেন। চলচ্চিত্রের জমিতে নিত্য-নতুন চমকলার সংবাদ স‍ৃষ্টির তাগিদে এবং সে সংবাদকে যথাসময়ে ছাপার অক্ষরে ছড়িয়ে দেবার জন্যে নতুন এক শ্রেণীর স‍ৃষ্টি হয়েছে। এ‍ঁদের নাম পাবলিসিটি অফিসার। এ‍ঁরা একেবারে নতুন নন। এই নামে একদল, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের পর্যায়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেকালের পাবলিসিটি অফিসার এবং একালের পাবলিসিটি অফিসারের মধ্যে তফাৎ ততটাই, যতটা সেকালের সঙ্গে একালের। সেকালের পাবলিসিটি অফিসারদের পাবলিসিটির লক্ষ্য ছিল ছবির প্রমোশন, মূলত আসল ছবির জন্যে দর্শকমনে ছবির প্রয়োজনে বিশেষ ইমেজ স‍ৃষ্টির প্রয়াস। তখন ছবি ছিল সবচেয়ে বড়। নির্মাতা, নির্দেশক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী—এ‍ঁদের সকলকে মিলিয়ে। তাঁদের প্রতিভার নির্যাসে ছবিতে ছন্দ আসত। যাঁরা ছবি বানাতেন, তাঁরা তাই বলে নগণ্য ছিল না, ছবির সামগ্রিকতার খতিয়ানে তাঁরা ছিলেন এক-একটি অংশ। তখন ছিল ছবির জন্য স্টার, আজকাল স্টারদের নিয়ে ছবি। সেকালে ছবির প্রচারের কথা ভাবতেন নির্মাতা, আজকাল সকলেই ভাবে। তখন ছবির প্রচার হত ছবির প্রয়োজনে, আজকাল প্রচার হয় ব্যক্তির প্রয়োজনে। তখন সংবাদ ছিল চিত্র-কেন্দ্রিক, আজকাল সংবাদ হয়েছে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। যাই হোক, আজকালকার এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার-সাহিত্যের সাহিত্যিকদের কথায় ফিরে আসি। এই প্রচার-সাহিত্যিকদের প্রতিভার কষ্টিপাথর হল তিনি কোন্ তারকার প্রচার সচিব। আপনি যদি কোনো টপ স্টারের প্রচার-সচিব হন, তাহলে ছাপাখানার জগতে আপনি একটি ছাপমারা নাম। আপনার বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন সবই থাকবে। আপনার জীবনের প্রতিটি সন্ধ্যা

"কাটি পতংগ" (পরিচালনা : শক্তি সামন্ত) হিন্দী ছবিতে আশা পারেখ ও রাজেশ খান্না

হবে মজলিসের রঙে রঙিন, এক কথায় বহ‍ু-বর্ণ রঞ্জিত।

ছাপাখানার জগতে আপনি যখন যা চাইবেন, তাই ছাপা হবে: শ‍ুধ‍ু প্ল্যান করবেন সকালে বা দ‍ুপ‍ুরে—আর ঘোষণা করবেন ঐ বহ‍ুবর্ণ রঞ্জিত সান্ধ্য মজলিশে। এমন কি আপনার কর্তাকে লাখ‍ে দ‍ু লাখ সার্কুলেশন যেসব পত্রিকার তারাও বিশেষ সংখ্যা বার করবে নির্দ্বিধায়। আপনি শ‍ুধ‍ু ম‍ৃদ‍ু হেসে নিজের প্রতিভা এবং প্রভাবের পিঠ চাপড়ে দেবেন। কেবল খেয়াল রাখবেন আপনার রামভক্তি যেন আপনাকে হা-রাম-খোর না করে ফেলে কোনোদিন। মনে রাখবেন আপনার দীপ্তি চাঁদের মত, আপনি প্রতিফলিত গৌরবের গরবী! স‍ূর্য নিভে গেলে চাঁদ উঠবে না, এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। স‍ুতরাং আপনার নিজের প্রয়োজনে স‍ূর্য-স্তবকে সংবাদের স্তবকে স্তবকে সতেজ রাখ‍ুন। মধ্য-গগনকে সায়াহ্ন পর্যন্ত বিস্তারিত কর‍ুন। আপনার স‍ূর্যের জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সৌজন্য প্রার্থনা কর‍ুন। আপনার স‍ূর্য যদি এখনো কুমার থাকেন, তা হলে তিনি যাতে চিরকালের জন্যে চিরকুমার-সভার সভাপতিত্ব করতে পারেন, তার ব্যবস্থা চাল‍ু রাখ‍ুন। আর যদি কোন কারণে আপনার স‍ূর্যকুমার ইতিমধ্যেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর সহধর্মিণীকে সংসার ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে ছাপাখানার, ছাপা ছবির জগতের থেকে দ‍ূরে রাখ‍ুন। সাবধানী আপনার মঙ্গল করবেন। চটে গেলেও রাগ করবেন না, আপনার মুখে হাসি ছাড়া আর কিছুই শোভা পায় না। আপনার স্তুতি-সাহিত্য অনেকের ভবিষ্যতের সহিত বর্তমান স‍ুতরাং নিজের কথা না ভেবে পরের কারণে মরণেও স‍ুখ, আপনার কথা ভুলিয়া যাও' নীতি বাক্যকে বীজমন্ত্র জ্ঞানে জপ করবেন। বর্তমান ব্যবসায়-প্রথা আপনার প‍ুরস্কার করবে।

দেশী জিনিসের প্রচারকে প্রয়োজনমত করে তুলতে আপনার ঘর বিদেশী ম্যাগাজিনে গমগম করবে। আপনার পিছ-পকেটে সব সময় খাপখোলা তলোয়ারের মত পেন্সিল থাকবে কারেন্ট এডিশনের জোক ব‍ুকের। আপনার টুইট চাটনির মত চাটিত হবে চলচ্চিত্রের 'চামচে' মহলে। এইক্ষেত্রে অবশ্যই স‍ূর্যকুমারের সেক্রেটারির সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য হবার সম্ভাবনা খ‍ুব বেশি। কারণ এক স‍ূর্যের আপনারা দ‍ুই দাসী—একই স‍ূর্যের কিরণ নিয়ে আপনাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, এই কলহে জিত কিন্তু আপনারই হবার কথা, কেননা প্রচার-সাহিত্যিক হিসেবে আপনি অনেক মেধাবী, তা ছাড়া সেক্রেটারি হলেন চলচ্চিত্র জগতের অন্দরমহলের অন্তরঙ্গ লোক—স‍ূর্যকুমারের বাইরের জগৎ—মানে পাবলিক রিলেশনের জগৎ আপনার হাতে, তাই আপনি কলকলহে না গিয়ে আপনার কলহকে কলাত্মক করে তুল‍ুন, ম‍ৃদ‍ু হেসে সেক্রেটারিকেই স‍ূর্যকুমারের সাফল্যের জনক বানিয়ে দিন। তারপরই ঐ সেক্রেটারিকে উপদেশ দিয়ে তাকে প্রডিউসার বানিয়ে দিন—ছবির নায়ক করে দিন স‍ূর্যকুমারকে, আর নায়িকার জন্যে নিয়ে আস‍ুন স‍ূর্য-

কুমারের পছন্দসই কাউকে। এর কিছু-দিন পরেই দেখবেন সূর্যকুমারের আর সেক্রেটারির সম্পর্ক পাল্টেছে। আপনার পথ পরিষ্কার।

সরল শর্মা

যাত্রাপাড়ার মরশুম ফুরোতে এখনও প্রায় আড়াই মাসের মতন বাকি। শারদীয় ষষ্ঠী টু জৈষ্ঠ্যের এই মেয়াদ ফুরোতে না ফুরোতেই প্রতি বছর কানাকানি শুরু হয়ে যায়। ডাক করা হয় আগে থেকেই, তার ওপর যদি ম্যানেজার বা পরিচালক দলছুট না হলেন তো কথাই নেই। আশরফির থলে নয়, নোটের বান্ডিল পকেটে পুরে গোপন শলা-মতন দূরের কোনো আসরে আর্টিসট বায়নার কাজ সমাধা হল। ফুটবলের খেলোয়াড়দের মতন পরে জানা গেল, নয়া মরশুমে কার ঘর ভাঙল, কার দল হল আলোকিত।

যতদিন স্টার সিসটেম ছিল এই গোপন কমটি চলেছে, কিন্তু হালে হাওয়া বইতে শুরু করেছে উলটো দিকে। ফিল্ম স্টার আসরে দাঁড়ালে আর যাত্রার দর্শক ভেঙে পড়ছে না। খ্যাতনামা যাত্রাভিনেতারও কদর কম যদি না সে দলের পালাটি সুরচিত, সুনির্বাচিত এবং সুপ্রযোজিত হয়। আজকের যাত্রামোদীরা চায় বলিষ্ঠ দলগত অভিনয়, নির্বাচনে নতুনত্ব এবং কিছু অভিনব চিজ যা আগে যাত্রার আসরে ঘটেনি।

দর্শকের এই দাবি যাত্রাভিনয়ের মান অব্যাহত রাখতে দেয়নি। আগে ছিল কেবল জোরালো অভিনয়—এখন চমক এসেছে, ম্যাজিক এসেছে, রাজনৈতিক হাল বুঝে সুবিধাবাদী প্রয়োগেরও অভাব নেই। এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে বাস্তবিক নাট্যশূন্য বস্তু কেবল ম্যাজিকের জোরে হাজার হাজার দর্শক টানছে যাত্রা ব্যবসায়ীরা তাতে প্রভাবিত হচ্ছেন না এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু সকলে নন, সবটাই এমন নয় এই যা সান্ত্বনা। বেশিরভাগ যাত্রা দলই প্রগতি আর পরিবর্তন আনতে চাইছেন—বিশেষ করে পালা কাহিনী নির্বাচনে।

১৯৭১-৭২ সালের মরশুমের জন্য তাই শিল্পী নির্বাচনের আগে দলনেতারা ভাবছেন পালার কথা, পালাকারের কথা। বাদল সরকার কি যাত্রা লিখবেন? এ প্রশ্ন একজনের। আর একজন বলছেন 'বিজন ভট্টাচার্যকে দিয়ে পালা লেখালেন'। আর এক

মাধবী নাট্য কোম্পানির 'হেডমাস্টার' যাত্রাপালায় দিলীপকুমার ও রমেন ভাদুড়ি

দলের ইচ্ছা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি যাত্রাভিনয় পরিচালনা করতে রাজি হতেন তো একবার চেষ্টা করা যেতো। শম্ভু মিত্র, বরুণ দাশগুপ্ত, জোছন দস্তিদারের নামও অনেকে করছেন। হয়তো এমনও হতে পারে, এ অবসরে এঁদের কারো কারো সংগে দলের চুক্তিও সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে।

আসলে আগামী মরশুমে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন হওয়ার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে চিৎপুরে। গদীতে গদীতে গোপন শলা চলছে, ফোনে যোগাযোগও বোধ হয়। শোনা যাচ্ছে ৭১-৭২-এর মরশুমে পালা কাহিনী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার কথা হচ্ছে তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' ও 'কবি', বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ', প্রমথনাথ বিশীর 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই'। বিমল কর ও মতি নন্দীর কাহিনী সম্পর্কেও কোনো এক গদীতে জোর আলোচনা চলছে। নট্ট কোম্পানী গৌরকিশোর ঘোষের 'সাগিনা মাহাতো' আসরস্থ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আসন্ন মরশুমে শরৎচন্দ্রের চারটি কাহিনী এবং রবীন্দ্রনাথের একটি যাত্রায় প্রযোজিত হবে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে। বিদেশী চরিত্রের মধ্যে মাধবী নাট্য কোম্পানী প্রযোজনা করবেন 'রণনায়ক চার্চিল', এ ছাড়া 'গামাল আবদেল নাসের', 'চে গুয়েভারা', 'হো চি মিন' ও 'মুসোলিনী' আসরস্থ করার পরিকল্পনাও কয়েকটি দল গ্রহণ করেছেন। আজকের আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতি সম্পর্কিত পালা শম্ভু বাগের 'জনতার আফিম' প্রযোজনা করবেন [illegible] অপেরা। জানা গেছে পালা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রমেন লাহিড়ী। রোডেশিয়া, কামবোডিয়া, অশান্ত জেলিয়াং ও অগ্নিগর্ভ আরব কাহিনীও আগামী মরশুমে যাত্রার আসরে পরিবেশিত হবার কথা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিষয়বস্তুর এই পরিবর্তনে যাত্রা দর্শকের রুচিও বদলে যাবে বলে চিৎপুরী মহাজনরা মনে করছেন।

—সূত্রধার

"অভিনয় পুরস্কার"

মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অভিনয় পত্রিকার দুদিন-ব্যাপী বর্ষপূর্তি উৎসব সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হল। অনুষ্ঠানে প্রথম দিনে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রযোজনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ নাট্য গুণীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। অসিত মুখোপাধ্যায় পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরি-চালকের পুরস্কার 'পুনর্মিলন' নাটকের জন্য। 'যা বলো তাই বলো' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পেয়েছেন শ্রীমতী শাঁওলী মিত্র 'কিম্বদন্তী' নাটকের জন্য। 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকের মঞ্চসজ্জার জন্য শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-নির্দেশক রূপে পুরস্কৃত হয়েছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। কোরাস গোষ্ঠী 'এক যে রাজা' নাটকের ক্ষেত্রে ১৯৭০ এর শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান পেয়েছেন। মফঃস্বলে সর্বাধিক অভিনীত নাটকের রচয়িতার পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। এবং মফঃস্বলে সর্বাধিক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন নৈহাটির 'যান্ত্রিক' গোষ্ঠী। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে দর্শক ও নাট্যগোষ্ঠীর ভোটে নির্বাচিত বিভিন্ন গুণী শিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করেন প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়। অভিনয় পত্রিকার পক্ষ থেকে বিজন ভট্টাচার্যকে তাঁর অবদানের জন্য ১০১ টাকার চেক দেওয়া হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে 'এক যে ছিল রাজা' ও 'মহাকাব্য' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন যথাক্রমে 'যান্ত্রিক' ও 'লোকরঞ্জন' গোষ্ঠী। যোগেশ দত্তর মূকাভিনয় এদিনের অনুষ্ঠানের অতি-রিক্ত আকর্ষণ ছিল। ২৬ জানুয়ারি অনু-ষ্ঠানে 'মঞ্চের দর্শক'—এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত সুন্দর আলোচনা করেন অধ্যাপক দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও ঋত্বিক ঘটক। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার প্রাপ্ত নাটক 'এক যে রাজা' এদিনের অনুষ্ঠানে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। প্রথমদিন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও যোগব্রত চক্রবর্তী নির্বাচিত গুণী শিল্পীদের মানপত্র পাঠ করেন।

অরণ্যদেব

লী ফক

ওদের গায়ের রঙটা দেখেছ?
হলুদ! গায়ে বোধহয় রঙ মেখেছে!
??

রঙ বলে তো মনে হচ্ছে না। এই, তোরা একবার এদিকে আয় তো!
??

কবীলা-উম্বির সোনা-বেলায়।
আমার পূর্বপুরুষদের অনেকেই এই জেড-পাথরের বাড়িতে বিয়ে করেছেন!
তুমিও এইখানেই বিয়ে করবে তো?

কবে তুমি বিয়ে করবে, ওয়াম্বার-কাবা*?
খুব খাওয়া-দাওয়া হবে তো?
আরে, তোরা দেখছি খেপে গিয়েছিস!
চল, ওদিকে একবার যাই।
7/19
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াম্বার-কাবা।

বেলাভূমি থেকে কয়েক মাইল দূরে…
কী চাও তোমরা?
গায়ে কী মেখেছ তোমরা?
তা জেনে তোমাদের কী হবে?

রঙ নয়, বালি। দেখতে কিন্তু সোনার মতো।
গায়ে হাত দিচ্ছ কেন?
বেশী মেজাজ দেখিও না, রাজা।

সোনার মতো গন্ধ, সোনার মতো স্বাদ, খাঁটি বাবা, একদম সোনা ছাড়া আর কিছু নয়!
সারা গায়ে সোনার গুঁড়ো মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

এই গুঁড়ো-সোনা কোথায় পাওয়া যায়?
কবীলা-উম্বির সোনা-বেলায়!
সেখানে নিয়ে চল আমাদের।
?
১৬

পাকিস্তান বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৩ মারচ থেকে পাকিস্তানের নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের যে বৈঠক শুরু হবার কথা ছিল, পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীভুট্টোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পাক-প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া তা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করে দেন। পূর্ব পাকিস্তানের গবরনর অ্যাডমির্যাল এস এম আসানকে পদচ্যুত করে লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা মহম্মদ ইয়াকুব খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। প্রেসিডেনট পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক শাসনে আনবার মতলবে ঢাকার সর্বত্র সশস্ত্র ফৌজী প্রহরা মোতায়েন করেছেন। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে ২ মারচ সর্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। ফৌজী কর্তৃপক্ষ ঢাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারফিউ জারি করেছেন। পাক প্রেসিডেনট কর্তৃক উল্লিখিত গোল-টেবিলে যোগদান করার প্রস্তাব শেখ মুজিবর রহমান প্রত্যাখ্যান করেছেন। ৩ মারচ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাফল্যের সঙ্গে 'বনধ' প্রতিপালিত হয়েছে। গণ-বিক্ষোভে উত্তাল ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ফৌজি টহলদারদের গুলিতে কয়েক শত লোক নিহত হয়েছেন। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সেনা বাহিনীর গুলিতে কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে কিছু নেতার অভিযোগ। ৩ মারচ পাক প্রেসিডেনট ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ২৫ মারচ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে। মুজিবর রহমান ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবের সাফ জবাবে বলেছেন : সামরিক আইন খারিজ করুন, সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যাক, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন, সাম্প্রতিক নিধনযজ্ঞের তদন্ত হোক। ইয়াহিয়া খাঁ এই চার দফা দাবি মেনে নিলেই তাঁর দল ২৫ মারচ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের কথা বিবেচনা করবে। রবিবার বিকাল থেকে ঢাকা বেতারকেন্দ্র স্তব্ধ। আজ পাকিস্তানের চারদিনের ধর্মঘট শেষ হলো।

দেশী সংবাদ

১ মার্চ—পঞ্চম লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। দশদিনব্যাপী ভোট যুদ্ধের আজ প্রথম দিনে সাতটি রাজ্য ও চারটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ১৮০টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটদাতারা ভোট দেন। এই কেন্দ্রগুলির ১০১টি প্রার্থীদের ভোট ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। প্রথম দিনের নির্বাচন মোটামুটি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে কলকাতা হাওড়া ও ২৪ পরগনার পোলিং কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের কারণগুলি নিয়ে মহাকরণে উচ্চ পর্যায়ে এক বৈঠকে আলোচনার পর পোলিং কর্মীদের নিরাপত্তা-বিধান, জীবনবীমা দৈনিক ভাতা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবায় ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২ মার্চ—গত রাত্রে হাবড়ার অশোকনগরে সেনাবাহিনী গুলি চালালে দুজন নিহত হন। টহলদার সেনাদলের উপর বোমা পড়লে তাঁরা মোট চার রাউনড গুলি চালান বলে পুলিস জানায়। বোমায় সেনাবাহিনীর চারজন জওয়ান জখম হন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীসহ আরও পাঁচ শ্রেণীর কর্মীর ক্ষেত্রে বেতন কমিশনের সুপারিশের সরকার সংশোধিত হার চালু করার কথা আজ ঘোষণা করেন। আড়াই লক্ষেরও বেশী কর্মী এর দ্বারা উপকৃত হবে। এর মধ্যে ২ লক্ষই শিক্ষায়তনসমূহের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী। বেতন গড়ে মাসে সাড়ে সাত টাকা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত বাড়বে। ১৯৭০ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই আদেশ কার্যকর হবে।

৩ মার্চ—মঙ্গলবার মধ্যরাত্র থেকে টিটাগড় লোকো শেডে হঠাৎ কর্মী ধর্মঘটের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হাওড়ার সঙ্গে টিটাগড়, রাঁচি, ভিলাই ও রাউরকেলার ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আজ মুর্শিদাবাদের ... কেন্দ্রের পোলিংবুথের ... একদল সশস্ত্র লোক বন্দুক উঁচিয়ে ৮২টি

ব্যালট-পত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। দুষ্কৃতকারীদের হাতে ছুরি ও বন্দুক ছিল। তারা জোর করে একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ঢোকে এবং পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালটপত্র কেড়ে নিয়ে যায়।

৪ মার্চ...আজ সকালে কলকাতা করপোরেশনের সি পি এম কাউনসিলার শ্রীরথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব উত্তর কলকাতার বড়তলা এলাকায় পথে ছুরিকাহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅসীম রায় তাঁর বাড়ির কাছে বোমায় আহত হন। তাঁকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

৫ মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের (আদি) প্রথম সারির নেতা হাওড়ার অক্ষয় শিক্ষায়তনের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় জেলা 'কংগ্রেস ভবন' থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির এক ফারলং দূরে সকালে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

৬ মারচ—ছুরিকাহত আদি কংগ্রেস নেতা বিধানসভার দমদম কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীপীযূষচন্দ্র ঘোষ আজ ভোরে হাসপাতালে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দমদম অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন চলাচলও স্থগিত থাকে। কলকাতার সঙ্গে দমদমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কলকাতা এলাকার বাইরের বাসিন্দা লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় একশজন প্রার্থীর জন্য পুলিসরক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে কোন্-কোন্ দলের কতজন প্রার্থীর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তা রাজ্যের আই-জি পুলিস প্রকাশ করেননি।

৭ মারচ—আজ বিকালে মধ্য কলকাতার মুচিপাড়া থানা এলাকার রাস্তায় মোতায়েন সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর : লোহার মজবুত শিকলের একপ্রান্ত সশস্ত্র পুলিসের কোমরে, অপর প্রান্ত হাতের রাইফেলে বাঁধা। ওই থানা এলাকায় শনিবার পাহারারত পুলিসের হাত থেকে দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে এই সতর্কতা।

আজ বরানগরে দুজন নিহত হন। বারাসতে খুন হন দুজন, হাবড়ায় তিনজন, শেওড়াফুলিতে একজন, আলিপুরদুয়ারের কাছে দুজন। হাওড়ায় প্রাইভেট গাড়ির মধ্যে বিস্ফোরণে একজন। সব মিলিয়ে শনি-রবির চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নিহতের সংখ্যা তের।

বিদেশী সংবাদ

১ মার্চ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল ভবনে আজ বোমা বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে ওই ভবনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। এই ভবনে সিনেট ও প্রতিনিধি সভার অধিবেশন বসে। রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী ওই ঘটনার যে বিবরণ দেয়, তাতে জানা যায় যে, ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী।

২ মার্চ—সুইডেন সরকার পাকিস্তানকে ৪টি জঙ্গী বিমান বিক্রয়ের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছিলেন আজ সুইডিশ সরকারের এক বিবৃতিতে জানা যায়, পাকিস্তানকে ওই বিমান বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

৩ মার্চ—নির্ভরযোগ্য মহলের খবরে জানা যায় যে, ব্রিটেনের রক্ষণশীল সরকার ভারতকে সাবমেরিন বিক্রি করতে অস্বীকার করেছেন। এই-ব্যাপারে প্রথমে বৃটেনের শ্রমিক সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। গত জুন মাসে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন হয়ে ভারতকে সাবমেরিন বিক্রি করতে অস্বীকার করেন।

৪ মার্চ—পাক বেতারের এক খবরে প্রকাশ পাকিস্তানের এটর্নি জেনারেল শ্রীপীরজাদার নেতৃত্বে চারজনের একটি প্রতিনিধি দল আজ মনট্রিলে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। ভারতের ওপর দিয়ে পাক বিমানের যাতায়াত নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে পাকিস্তান মনট্রিলে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থার কাছে অভিযোগ পেশ করেন।

৫ মার্চ—মালয়েশিয়া ভারত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমনওয়েলথ সমীক্ষা দল থেকে আজ পদত্যাগ করেছে। রেডিয়ো অস্ট্রেলিয়ার খবর, আজ কুয়ালালামপুরে মালয়েশীয় তথ্য মন্ত্রক এই সংবাদ ঘোষণা করেছেন।

৬ মারচ—মারমুখী এক জনতা আজ কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের উপর বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং দূতাবাসের গাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে দূতাবাস ভবনের কাঁচের সারসি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

৭ মারচ—সংযুক্ত আরবের প্রেসিডেনট আনোয়ার সাদাত আজ সুয়েজ খাল বরাবর যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন, সংযুক্ত আরব এখনই যুদ্ধ শুরু করছেন না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যুদ্ধ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নির্বাচন শেষে—		৬৪১
ব্যঙ্গচিত্র—		৬৪২
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		৬৪৩
দৃশ্যপট—	শ্রীনবারুণ গুপ্ত	৬৪৪
বৈদেশিকী—	দেবরাজ	৬৪৬
পঞ্চতন্ত্র—	সৈয়দ মুজতবা আলী	৬৪৭
বুর্জোয়া—	শ্রীবিমল মিত্র	৬৪৯

সঙ্কলন সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের একটা করে গল্প নিয়ে এই সিরিজ

হালকা হাসির গল্প ৫·০০
রহস্য গল্পের সংকলন ৪·০০
খেয়াল খুশি অসম্ভব ৪·০০

সত্য ঘটনা সিরিজ

মরণ খেলার খেলোয়াড় ৫·০০
ময়ূখ চৌধুরী (শিকার)
গুপ্তচর কাহিনী ৫·০০
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
শ্মাগলিং ৫·০০
বোধিসত্ত্ব
কুমেরু অভিযান ৬·০০
থর হেইয়েরডাল
(সুবিখ্যাত অভিযান-কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)
চন্দ্র-অভিযান ৬·০০
শঙ্কর চক্রবর্তী

ভ্রমণ কাহিনী

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশ্মীর হতে কুমারিকা ৫·০০
চল যাই পশ্চিমে ৩·৫০

কিশোর সম্ভার সিরিজ
প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিশোরসম্ভার
উপেন্দ্রকিশোরের কিশোর সম্ভার
প্রতিটি ১০·০০

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর
টুনটুনির বই ২·০০
ছেলেদের রামায়ণ ২·০০
ছোট্ট রামায়ণ (কবিতায়) ২·০০
ছেলেদের মহাভারত ৩·৫০
পৌরাণিক কাহিনী ৩·০০
কিশোর সম্ভার ১০·০০
শিয়াল পণ্ডিত ১·২৫

বুদ্ধিভোলা সরকার ১·২৫
(টুনটুনির বই'-এর দুটি অংশ)

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
অসম্ভবের দেশে ২·৭৫
মেঘদূতের মর্তে আগমন ২·৫০
বজ্রপাতের দুঃস্বপ্ন ৩·০০
মানুষ পিশাচ ৩·০০
যকের ধনের স্বপ্ন ২·০০
কিশোর সঞ্চয়ন ৪·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
কলকাতার হালচাল ২·৫০
পণ্ডিত বিদায় (নাটক) ১·৫০
রাজায় রাজায় রাজার খেলা (ঐ) ১·২৫
কিশোর সঞ্চয়ন ৪·০০
মনোরঞ্জন ঘোষের
প্রত্যাবর্তন ৩·৫০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মরণের ডঙ্কা বাজে ৩·৫০
কিশোর সঞ্চয়ন ৪·০০

কিশোর সঞ্চয়ন সিরিজ

প্রতি গ্রন্থে কিশোর-উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি
এই সিরিজে
অবনীন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রকুমার, বিভূতি বন্দ্যোঃ অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, শিবরাম, নারায়ণ। প্রতি বই ৪·০০

বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প-উপন্যাস

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
মেঘদূতের মর্তে আগমন ২·৫০
অসম্ভবের দেশে ২·৭৫
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ময়দানবের দ্বীপ ৩·০০
বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প ৫·০০
জুল ভার্নের
টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস্ ৫·০০
মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড ৫·০০
ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন ২·৫০
জার্নি টু দি সেণ্টার অব্ দি আর্থ ২·৫০

জীবজন্তুর গল্প-উপন্যাস
ময়ূরকণ্ঠী বন ২·৫০
সুকুমার দে সরকার
হিমাচলের স্বপ্ন ২·০০
হেমেন্দ্রকুমার রায়
টুনটুনির বই ২·০০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
স্টুয়ার্ট লিট্‌ল্ ২·৫০
মাকড়সার জাল ২·৫০
ই. বি. হোয়াইট
কল অব্ দি ওয়াইল্ড ৩·০০

শিশিরকুমার দাশ
তারায় তারায় ২·৫০
বোধিসত্ত্ব
রহস্যময়ী আফ্রিকা ২·৫০
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
নূতন পুরাণ ২·০০
মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সোনার ঝরনা ৩·০০
সমরেন্দ্র
ছেলেধরা জয়ন্ত ২·০০
শৈবাল চক্রবর্তী
সোনালি ছড়া ১·০০
সুনির্মল বসু
রঙিন হাসি (ছড়া) ১·০০
লিও তলস্তয়
তলস্তয়ের অমর গল্প ৪·০০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

হেনড্রিক ভ্যান লুন
মানুষের কাহিনী ৭·৫০
(এ স্টোরি অব ম্যানকাইন্ড)
এইচ জি ওয়েলস্
এইচ জি ওয়েলসের গল্প ৪·০০
অলডেন
গল্প শোন ২·০০

শিকার সাহিত্য

জিম করবেটের
রুদ্রপ্রয়াগের চিতা ৫·০০
আমার ভারত ৫·০০
জাঙ্গল লোর ৫·০০
জে এ হাণ্টারের
হাণ্টার ৮·০০
তাহাওয়ার আলি খানের
সুন্দরবনের নরখাদক ৫·০০
ময়ূখ চৌধুরীর
মরণ খেলার খেলোয়াড় ৫·০০

রূপকথা সিরিজ

বাংলা মায়ের রূপকথা ৩·০০
ত্রিভঙ্গ রায়
অপরূপ রূপকথা ৪·০০
গ্রিম দু-ভাই
জাপানী ফানুস ২·০০
মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রিমভাইদের রূপকথা ৪·০০
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
আরবা-রজনীর গল্প
১ম ৫.০০, ২য় ৫.০০, একত্রে ১০.০০
তুষারকণা দে
আলিবাবা ১·০০

তুষারকণা দে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
বুড়ো আংলা
ঘংবেরং ৪·০০
মহাবীরের পুঁথি ৩·৫০
লম্বকর্ণ পালা ৪·৫০
কিশোর সঞ্চয়ন ৪·০০

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প সিরিজ
অচিন্ত্য : শৈলজা : বুদ্ধদেব
সৌরীন্দ্র : বিমল দত্ত প্রতি বই ২·০০
মার্ক টোয়েন
টমসইয়ার ৫·০০
হাকলবেরি ফিন্ ৫·০০
ভিখারী ও রাজপুত্র ৩·০০

অনুবাদ সিরিজ

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের
আত্মজীবনী ৪·০০
কোনান ডয়েলের
মেমোয়্যার্স অব শার্লক হোমস ৭·০০
আলেকজান্দার দুমার
থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ৭·৫০
টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার ৭·৫০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী - ৬৬৩
রত্ন ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায় - ৬৬৯
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী - ৬৭৫
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - ৬৭৭
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর - ৬৮৩
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন - ৬৮৯
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত - ৬৯৫
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয় - ৬৯৯
আলোচনা— - ৭০৩

সাবান একটি লাভ তিন রকম

নিকো বীজাণুনাশক সাবান অন্যান্য সাবানের চেয়ে আপনার ত্বকের বেশী পরিচর্যা করে

১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে

২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে

৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভদায়ক সাবান নিকো।

TRIPLE ACTION

NEKO

The Original Germicidal Soap

PARKE-DAVIS

NEKO

JAKSONS 72
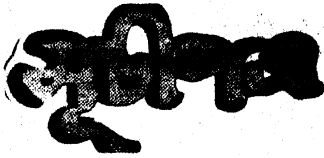
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
খেলার মাঠে—একলব্য		৭০৯
অরণ্যদেব—		৭১২
রঙ্গজগৎ—		৭১৩
অন্তর্বর্তী নির্বাচন : পশ্চিমবঙ্গের রায়—		৭১৯
ঘরের গ্যালারী থেকে—শ্রীদিলীপ দত্ত		৭৩৭
হকি খেলার আইনকানুন—		৭৪০

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

গত সপ্তাহের প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীধীরাজ চৌধুরী। ভ্রমক্রমে অন্য নাম প্রকাশিত হয়েছিল।

আপনার খুশীমত যেভাবে আপনার পছন্দ এখন সেভাবে আপনি জমাতে পারেন

দেনা ব্যাঙ্ক আপনার প্রয়োজনানুযায়ী ২ টি নতুন সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে

মাসিক সঞ্চয়—বার্ষিক বৃত্তি-পরিণতি ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থানুযায়ী আপনার কিস্তিতে জমান টাকা একটা নির্দ্দিষ্ট মাসিক আয় হিসাবে বৎসরাধিক কাল চলতে পারে। যেমন ১০৲ টাকা বা যেকোন দশমিক সংখ্যক টাকা ২৪, ৩৬, ৪৮, ৬০, কিস্তি জমিয়ে—এর দ্বিগুণ টাকা প্রতিমাসে ১৩, ২০, ২৮ বা ৩৭ মাস ধরে আয় হিসেবে আপনি পেতে পারেন। এই ব্যবস্থায় চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ পাওয়া যায় বলে আপনার পেনশন বা অবসরগ্রহণ পরিকল্পনার আর একটি আদর্শ সহায়ক আয় হয়।

বহুউদ্দেশ্য সাধক সঞ্চয় ব্যবস্থা

নিয়মিত প্রতিমাসে আপনার উপার্জিত বেতনের মত একটা সুনিশ্চিত আয় এই ব্যবস্থায় হ'তে পারে। ৩০০০৲ টাকা কিংবা তার দশমিক অংশ তিন বছরের জন্য জমা দিলে প্রতিমাসে ১৬৲ টাকা ৪ আনা বা তার আংশিক সুদ তিন বছর ধরে পাবেন এবং আপনার মূলধন সম্পূর্ণ মজুত থাকবে। এই আয় থেকে আপনি আপনার ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচের জন্য বা আপনার জীবন বীমার প্রিমিয়াম বা অন্য কোন সংসার খরচায় ব্যয় করতে পারেন।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটস্থ দেনা ব্যাঙ্ক শাখায় যোগাযোগ করুন।

দেনা ব্যাঙ্কের অন্যান্য সঞ্চয় ব্যবস্থা:

সেভিংস অ্যাকাউন্ট ——————— ৪% সুদ
মাইনর (নাবালক) সেভিংস প্রকল্প ——— ৪% সুদ
মেয়াদী আমানত —৪-১/২% থেকে ৭-১/৪% সুদ
রেকারিং ডিপোজিট স্কীম (পৌনঃপুনিক আমানত প্রকল্প) — ৫-১/৪% থেকে ৭% চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ

আপনার সঞ্চয় আপনাকে নিরাপত্তা দেয় আর সেই সঙ্গে দেশের অগ্রগতির সহায়ক হয়।

RATAN BATRA DB/8/303

—পশ্চিমবঙ্গে আমাদের শাখা—

বড়বাজার * ভবানীপুর * ব্রেবোর্ন রোড * শ্যামবাজার * রাসবিহারী অ্যাভিনিউ * পার্ক স্ট্রীট * ৬৪-৬৫, অরবিন্দ রোড, সালকিয়া, হাওড়া * জি টি রোড, আসানসোল

৫০ বছরের ওপর
জনপ্রিয়তায়
অদ্বিতীয়
ভারতে সবচেয়ে
বেশী বিক্রী—
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
ব্রিটানিয়া
থিন এরারুট বিস্কুট

খাঁটি সত্য ঘটনা

আমার লজ্জা করত সমুদ্রতীরে নিজেকে দেখতে

তারপর চোখে পড়ল বুলওয়ার্কারের বিজ্ঞাপন

বাড়ী বসে বিনামূল্যে পরীক্ষার জন্য চাইলাম

কয়েক সপ্তাহ পরে

"আরে"! একি সত্যি আমি!
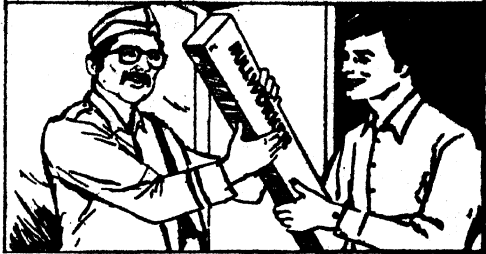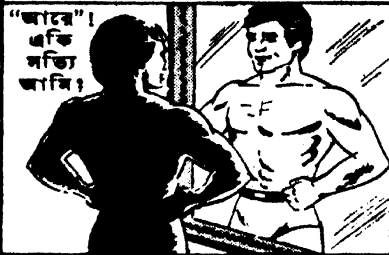
এখন মনে হয় আমি "দশ ফিট লম্বা"
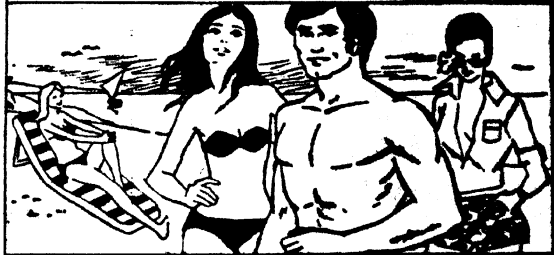
বুলওয়ার্কার "অপরিণত"কে শক্তিমান "পুরুষ"-এ পরিণত করে দিনে মাত্র ৫ মিনিট সময়ে।

দু সপ্তাহে নির্দিষ্ট সুফলের গ্যারান্টি, অন্যথা আপনি দাম দিচ্ছেন না।

উপরে বর্ণিত সাফল্যের কাহিনী হল বাস্তবে জন ফ্রেলিন-এর জীবনে ঠিক যা ঘটেছিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহে বুলওয়ার্কার অভ্যাসের পর জন তার "রোগা বাল-সুলভ" শরীরের কাঠামোতে ৫ কিলোর খাঁটি পেশী জুড়েছিল, বুক বাড়িয়েছিল ১০ সি এম, বাইসেপস ৫ সি এম, ঊরু ৩ সি এম। "বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল", জন লিখেছেন, "বুলওয়ার্কার প্রায় রাতারাতি আমায় একটা সবল পুরুষে পরিণত করল।" জন ফ্রেলিন-এর জন্যে ও তাঁর মত হাজার হাজার লোকের জন্যে বুলওয়ার্কার যা করেছে, আপনার জন্যেও তা করতে পারে।

সহজ, দিনে—পাঁচমিনিট বুলওয়ার্কার ব্যায়ামশিক্ষা আপনাকে যে সুফলের গ্যারান্টি দিচ্ছে তাকে আপনি দু সপ্তাহের মধ্যে অনুভব করতে, দেখতে ও সত্যিকার মাপতে পারবেন, অন্যথা কোনো দাম দিচ্ছেন না। প্রত্যেকদিন দাড়ি কামাতে আপনার যতটা সময় লাগে, তার চেয়েও কম সময়ে বুলওয়ার্কার আপনাকে এমন পুরুষোচিত দেহ গড়ে দিতে পারে যা অন্য পুরুষের ঈর্ষা ও মেয়েদের অনুরাগ সঞ্চার করে। প্রতিদিনের সহজ, আরামদায়ক, ৫-মিনিটের ব্যায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন মনের মত সরু হাতকে বিশাল, ফেঁপে-ফোলানো বাইসেপ-এ পরিণত করতে, শরীর, পেশীবহুল বুক গড়তে, কাঁধ চওড়া করতে, ইস্পাত-কঠিন পেটের পেশী ঢালাই করতে, শক্তিমান ঊরু ও পায়ের গুলি অর্জন করতে। মাত্র দুই সপ্তাহের পরে সুফল অবশ্যই আপনাকে চমকিত ও পুলকিত করবে, যদি না করে তবে আপনার কাছে আমাদের এক পয়সাও পাওনা নেই। পূর্ণ বিবরণের জন্যে আজই কুপন ডাকে দিন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

© Mail Order Sales Pvt. Ltd., 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

বিনামূল্যে

দিনে মাত্র ৫ মিনিটে শক্তিমান, পৌরুষপূর্ণ দেহ গড়ার জন্যে গ্যারান্টিপ্রদত্ত বুলওয়ার্কার প্রণালী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

BI-B

নাম ....

ঠিকানা ....

.... বয়স ......

BULLWORKER SERVICE, 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন DS 12

ইন্দ্রমিত্রের

গ্রাম্য বালক ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর' হয়ে ওঠার চমকপ্রদ ইতিকথা

বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা

দাম ৩·০০

বিদ্যাসাগর যদিও একটি উপাধিসূচক অভিধা, এবং এ উপাধি ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকেই অর্জন করেছেন, তবুও বিদ্যাসাগর বলতে বাংলা দেশের মানুষ একজনকেই বোঝে : তিনি বীরসিংহের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র—যাঁর লেখা 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে বাঙালী শিশুর শিক্ষাজীবন আজও শুরু হয়; যাঁর প্রণীত 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' দুরূহ সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার্থীর কাছে অনায়াস-অধিগম্য করেছে; যিনি শুধু সর্বজনমান্য বিরাট পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহীই ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারকও; বিদ্যার সাগরের সঙ্গে সঙ্গে যিনি ছিলেন দয়ার সাগরও ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতিকে এই তেজস্বী পুরুষ যেমন করে প্রভাবিত করেছিলেন, বাংলা দেশের সেই নবজাগরণের যুগেও তেমন করে আর কেউ তা করতে পারেনি।

প্রদীপ জ্বালাবার আগেও যেমন সলতে পাকানোর একটা ইতিহাস থাকে, কোনও মহাপুরুষের মহাপুরুষ হয়ে গড়ে ওঠারও তেমনি একটা প্রাক্‌-ইতিহাস থাকে। সে ইতিহাস প্রস্তুতির ইতিহাস। সেটিও কিছু কম কৌতূহলোদ্দীপক এবং আগ্রহসঞ্চারী নয়। 'বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা' একটি অতিদরিদ্র গ্রাম্য ব্রাহ্মণ বালকের নিজ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার সেই চমকপ্রদ প্রাক্‌-ইতিহাস।

প্রকাশিত হল

এই লেখকের আর একটি বই :
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ৩০·০০

মাত্র এক মাসে

প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-উপন্যাস

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

এই লেখকের : বাদশাহী আংটি ৪·০০ এক ডজন গপ্পো ৬·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ড-কারখানা ৪·০০

বিশ্বকর্মা-র
লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙালীর সাধনা ॥ দাম ২৫·০০

অম্লান দত্তের
সমাজ ও ইতিহাস ॥ দাম ৩·০০
প্রগতির পথ ॥ দাম ৩·০০
গণযুগ ও গণতন্ত্র ॥ দাম ৩·০০

সুধীর ঘোষের
গান্ধীজীর দূত ॥ দাম ১৫·০০

ইন্দ্রমিত্রের

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

একই সঙ্গে ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও পরিপ্রেক্ষিত এবং একজন যুগপ্রতিভূ মানুষের রক্তমাংসের জীবন ফুটিয়ে তোলার মতন দুঃসাধ্য কাজ করেছেন ইন্দ্রমিত্র। এর আগে বিদ্যাসাগরের অনেক জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এমন রসসমৃদ্ধভাবে সমগ্র জীবনের কথা বলা হয়নি। সেদিক থেকে এ গ্রন্থখানি একটি অতুলনীয় কীর্তি ॥ দাম ৩০·০০।

সুভাষচন্দ্র বসুর
তরুণের স্বপ্ন ॥ দাম ৬·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন
কাশ্মীর '৬৫ ॥ দাম ১০·০০

মেজর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর
আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে ॥ দাম ৪·০০

AMARENDRA NATH ROY'S
Students Fight for Freedom : 6.00

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড

অফিস ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলিঃ ৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২
বিক্রয় কেন্দ্র : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা ৯।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২০
শনিবার ৬ চৈত্র ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	৩১·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ,,	...	১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ,,	...	৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	...	৫৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১৫·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৪৪·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৮৩·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক	...	৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 20 March, 1971

নির্বাচন শেষে

নির্বাচন শেষ হয়েছে। তার ফলাফলও আজ অপ্রকাশিত নেই। আমাদের প্রথম আশঙ্কা ছিল পশ্চিমবঙ্গে নির্বিঘ্নে নির্বাচন হতে পারবে কিনা! একেবারে শান্তিপূর্ণভাবে সেটা সম্ভব হয়েছে এমন কথা বলা যায় না, তবু স্বীকার করতেই হবে ভোটদাতাদের সাহস এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারী সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে এই বৃহৎ কাজটি ভালভাবেই শেষ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলার আগে সংসদের নির্বাচন বিষয়ে কিছু বলা দরকার। জগজীবনপন্থী কংগ্রেস বা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস অবিশ্বাস্য এক কীর্তি করেছে। আমরা, যারা দিল্লি থেকে অনেক দূরে বসে আছি—ভারতের অন্যান্য রাজ্যের খোঁজখবর কাগজে পড়েই কোনো না কোনো ধারণা গড়ে নি, আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভবই হয়নি শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নেবেন। তাঁর এই জয় শুধু বিপুল নয়, সব দিক থেকেই এক বিরাট কীর্তি। শুধু আমরা নয়, অধিকাংশ লোকই যখন সন্দেহ করেছিলেন, কাজ চালাবার মতন সংখ্যাগরিষ্ঠতাও ইন্দিরাজী ভালভাবে পাবেন কিনা—সে সময়ে পাঁচ শো আঠারোটি লোকসভার আসনের মধ্যে তাঁর দল হেসে-খেলে তিন শো পঞ্চাশটি আসন দখল করে নিলেন এ কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি, এতদিন—বিশেষ করে কংগ্রেস ভাগ হয়ে যাবার পর যে দুর্বলতা নিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে, আর যখন সে সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র কোথাও থাকল না তখন তিনি শক্ত হাতে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু অন্যরকম। এখানে জগজীবনপন্থী কংগ্রেস পেয়েছেন এক শো পাঁচটি আসন। সি পি এম পেয়েছেন একশো এগারো। দলগত ভিত্তিতে সি পি এম হয়েছেন এখানের সর্ববৃহৎ দল। পরবর্তী দল নব কংগ্রেস বা জগজীবনপন্থী কংগ্রেস। সি পি এম দল পরিচালিত ছয় পার্টির জোটের অন্য পাঁচ শরিক পেয়েছেন বারোটি; অর্থাৎ এই জোট একত্রে পেয়েছেন এক শো তেইশটি আসন। অন্য দিকে নব কংগ্রেসের এক শো পাঁচটি আসন বাদ দিলে আদি কংগ্রেস পেয়েছেন দুই ও বাংলা কংগ্রেস লাভ করেছেন পাঁচটি আসন। এই তিন কংগ্রেস একত্রে হচ্ছেন এক শো বারো। বাকি থাকে অষ্ট বাম জোট, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য। অষ্ট বাম লাভ করেছেন একত্রে পঁচিশ; তার মধ্যে সি পি আই তেরোটি, অন্যরা বারোটি। অষ্ট বামের বাইরে লীগ সাতটি, পি এস পি এবং আর·এস পি তিনটি করে এবং অন্যান্যরা একটি করে।

হিসেবটা যেভাবেই ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গে এবারও কোনো একটি দলের পক্ষে সরকার গঠন করার মতন এক শো উনচল্লিশটি আসন হাতে আসেনি। ছয় পার্টি জোটও তা পাননি। তাঁরা একত্রে এক শো তেইশ। এঁরা অবশ্য বলছেন যে, জনগণের রায় তাঁদের দিকে—তাঁদেরই মন্ত্রিসভা গঠন করতে ডাকা হোক; পরে বিধানসভায় তাঁরা এক শো উনচল্লিশের সমর্থন দেখিয়ে দেবেন। মনে রাখতে হবে যে, উনিশ শো সাতষট্টির নির্বাচনে অবিভক্ত কংগ্রেস একা এক শো সাতাশটি আসন পেয়েও বলেছিলেন তাঁরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেননি বলে সরকার গঠন করবেন না, বিরোধী দলে যাবেন এবং তাই গিয়েছিলেন। জানি না পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের কী হবে? সেই ঘোলা জল আরও ঘোলা হবে। নানা ধরনের গোপন কাজকর্ম চলবে। আশ্চর্য এই যে, "জনগণের রায়" এই একটি অনির্দিষ্ট বাক্যাংশকে সুবিধে মতন কাজে লাগাবার আগ্রহ রাজনৈতিক দলগুলির কী অপরিসীম!

এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে যথার্থ লাভ করেছে সি পি এম দল। তারা আসনসংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে। আর নতুন করে জেগে উঠেছে নব কংগ্রেস, তার হারানো মর্যাদা আবার সে ফিরে পাচ্ছে, নয়তো গতবারের তুলনায় এবারে তার ডবল আসন লাভ হ'ত না। আর সেই সঙ্গে তরুণ মহলে তার জনপ্রিয়তা আসত না। এবার নব কংগ্রেসের তরুণরাও যা করেছেন তা প্রায় অসম্ভব। তবু তাঁরা করেছেন।

অন্তর্বর্তী নির্বাচন

ইতাশাবাদীদের সমস্ত আশংকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম বাংলার ভোটদাতারা হৈ হৈ করে ভোট দিয়ে এসে এই কথাই প্রমাণ করেছেন : তাঁরা গণতন্ত্রের পক্ষে, তাঁরা শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পক্ষে জনগণের আসল রায় এইটেই।

এই ভাষ্য রচনার সময় পর্যন্ত (মারচ, সকাল ১০টা) ভোটের ফলাফল দেখে আমাদের এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে, ভোটদাতারা অব্যবস্থিতচিত্ত নেতা বা দল সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। এই রাজ্যে একটা স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য ভোটদাতাদের আগ্রহ যে কত প্রবল তা তাঁদের নব কংগ্রেস এবং সি পি এম-এর পিছনে এসে দৃঢ়চিত্তে সার দিয়ে দাঁড়ানোর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

অগণিত সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিম বাংলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ কে করবেন? নব কংগ্রেস? সি পি এম? না কি আবার সেই অচলাবস্থা?

নব কংগ্রেস এবার সারা ভারতে ঘূর্ণি ঝড়ের বেগে বিরোধিতার সমস্ত প্রাচীর ধূলিসাৎ করে একচ্ছত্র অধিপতি। অতএব নব সঞ্জাত আত্মবলে নব কংগ্রেস এবার বলীয়ান। পশ্চিম বাংলায় নব কংগ্রেস বা সি পি এম যদি একক গরিষ্ঠতার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারে তবে এই হতভাগ্য রাজ্য আবার সংকটে পড়বে। এবং সেই রাজনৈতিক অচলাবস্থার সুযোগ গ্রহণের জন্য তিনটি পথে রাজনীতিক ঘোঁট শুরু হতে পারে। যথা (এক) নব কংগ্রেস এবং সি পি এম যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা দখলের জন্য দল ভাঙানোর খেলা শুরু করতে পারে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কোন না কোন ধরনের সুবিধাবাদী কোয়ালিশন। (দুই) মেকি বিপ্লবের ধ্বজা তুলে সি পি এম গরিষ্ঠতা না পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা দখলের জন্য অশান্তি সৃষ্টি করে জনজীবন অচল করে দেবার চেষ্টা করতে পারে। এবং (তিন) আবার রাষ্ট্রপতি শাসনের বকলমে নব কংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

আশংকাজনক অনেক কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু ভোটের ফলাফল, এই মুহূর্তে যখন অনিশ্চিত, তখন আশঙ্কার কথা না তুলে, একেবারে অন্য প্রেক্ষিত থেকে বিচারে বসা যাক। ধরে নেওয়া যাক, নব কংগ্রেস অথবা সি পি এম-এর যে কেউ দলগত সংখ্যার জোরে সরকার গঠন করলেন। এখন দেখা যাক, তাঁরা ভোটদাতাদের যে প্রত্যাশা এবারকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তার কতখানি পূরণ করতে সমর্থ হবেন।

এই প্রত্যাশা কী, তা শুরুতেই বলা হয়েছে। এখানকার ভোটদাতারা তাঁদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যালট পত্রকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেন, বোমা, পাইপগান, ছুরি, অশান্তি বা উচ্ছৃংখলতাকে নয়। এবং তাঁরা সুস্পষ্ট পরিবর্তন চান। এবং এমন পরিবর্তন চান যে পরিবর্তনে অগণিত সাধারণ মানুষই লাভবান হবেন। অর্থাৎ তাঁরা মাও-এর ভাষায় যাকে জনগণতান্ত্রিক
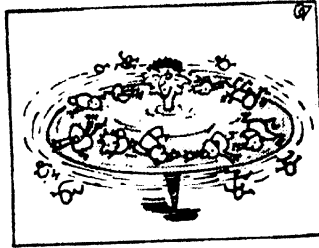
বিপ্লব বলে তাই চান, তবে কমরেড চারু মজুমদারের প্রদর্শিত 'পাইপগানই শক্তির উৎস' পথে নয়, ব্যালট বাক্সে নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী একটি ভোট ফেলে।

পশ্চিম বাংলার ভোটদাতারা, একথা স্মরণ রাখা ভাল, এবার নিদারুণ ঝুঁকি নিয়ে ভোট দিতে এসে একথা জানিয়ে দিয়েছেন, ভোট বাক্সে ফেলা তাঁদের প্রতিটি ভোটপত্রের পিছনে একটি করে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত আছে। এবং সেই সিদ্ধান্ত নির্বাচন পণ্ড করে যারা গণতন্ত্রের বুনিয়াদ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন সুস্পষ্টত তাঁদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কাজেই একথা প্রমাণ হয়ে গেল, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে যে নিষ্ঠুর, নির্বিচার, নির্বিকার হত্যা অব্যাহতভাবে সংঘটিত হয়ে চলেছে, তার পিছনে জনমত আদৌ নেই। ভোট পাবার জন্য প্রকাশ্য সভায় যে-সব অদূরদর্শী নেতা এদের মুখে চুমকুড়ি খেতে চেষ্টা করেছিলেন, ভোটদাতারা দেখা গেল, তাঁদের উপরও আস্থা রাখতে পারেন নি।

নব কংগ্রেস এবং সি পি এম উভয়েরই দৃঢ় হাতে এদের দমন করবেন বলে যে ধ্বনি তুলেছিলেন, কে জানে, এঁদের সাফল্যের মূলে ঐ ধ্বনিই সক্রিয় হয়ে উঠেছে কি না?

ভোটদাতারা এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, যে বিপ্লব অশান্তি সৃষ্টি করে তার প্রতি এঁদের অনীহাই বর্তমান। এঁরা চেয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অগ্রগতি। এঁরা চেয়েছেন কৃষিতে সবুজ বিপ্লব। শিল্প প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ দান। নিয়োগের ক্ষেত্রের বিপুল প্রসার। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার। সাধারণ লোকের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে নির্ধারিত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক পরিবারের জন্য বাসগৃহ। চিকিৎসার অবাধ সুযোগ। এই দাবি পূরণের জন্য বিধিসম্মত আন্দোলনে দেশের ক্ষতি হয় না, যদি দাবিদাররা তাঁদের উপর ন্যস্ত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত না হন। দাবি ও দায়িত্ব গণতান্ত্রিক অধিকারেরই এপিঠ আর ওপিঠ। দায়িত্ব পালন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত।

যেই সরকার গড়ুন, তাঁকে এইসব শর্তগুলি পালনের জন্য আন্তরিকভাবে অগ্রসর হতে হবে। এ কাজ এত বিপুল যে শুধুমাত্র সরকারী দলের একার পক্ষে হাসিল করা সম্ভব নয়। বিরোধী দলগুলির সাহায্যও অপরিহার্য। এবং তার জন্য চাই গোষ্ঠিগত সংকীর্ণ স্বার্থের উপরে উঠে এক উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি। বলাই বাহুল্য, একাজে সরকার পক্ষকেই আগে হাত বাড়াতে হবে। মনে রাখা ভাল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেনডেটা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোনও স্থান নেই। ভোটদাতাদের আস্থা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য।

এবং সেই আস্থা নিজেদের আচরণ এবং কাজের দ্বারাই অর্জন করা যায়। কাজ, অক্লান্ত কাজ এবং সৃজনাত্মক কাজের দ্বারাই পশ্চিম বাংলার দুর্গতি মোচন সম্ভব। কোনও ছুতোয় কাজ বন্ধ করে দেওয়া যে পশ্চিম বাংলার জনগণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং গণতান্ত্রিক বুনিয়াদকে ধ্বংস করা, সে কথা নতুন সরকার এবং বিরোধী দলগুলির বুঝবার সময় এসেছে।

পশ্চিম বাংলার ভোটদাতারা এবার অনেক কেন্দ্রে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ভোট দিয়েছেন গণতন্ত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, দলবাজি করে তা স্যাবোটাজ না করাই মঙ্গল।

ঐতিহাসিক রায়

ইন্দিরা গান্ধী প্রচণ্ডভাবে জিতেছেন। এত বড় জয় তিনি নিজেও আশা করেন নি। অন্যরা তো দূরের কথা। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনোত্তর লোকসভার কথা একবার ভাবলেই বোঝা যাবে এই জয়ের গুরুত্ব কত বেশী, এই জয় কত বিরাট।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনেই মনে হয়েছিল, এরপর আর কখনও কংগ্রেস একা কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারবে না। তারপর কংগ্রেস ভাগ হল। ইন্দিরা গান্ধীর দল লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেন। এর ওর সমর্থনের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী লোকসভা ভেঙে দিলেন। অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন।

অনেকের মনেই সংশয় দেখা দিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন কিনা। নানা হিসেবও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কার কার সমর্থন নিতে হতে পারে, কোন্ কোন্ দল বা গোষ্ঠী কী কী মূল্য চাইতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সব সংশয় কেটে গিয়েছে এই নির্বাচনে। ইন্দিরা গান্ধী বিরাট বিশালভাবে জিতেছেন—এত বড় জয় কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। কারু সাহায্য তাঁকে নিতে হবে না। কোনও দলের ভরসা আর করতে হবে না।

তাঁর নিজের দলের অন্যান্য নেতারও খেলার আর কোনও সুযোগ নেই। তাঁরা অনেকেই বিক্ষুব্ধ। তাঁদের কারু কারু মনে কিছু কিছু আশাও ছিল। তাঁরা সুযোগ পেলে নানাভাবে খেলতেন। সে খেলার সুযোগ আর পেলেন না।

এখন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এখন প্রধানমন্ত্রী তাঁদের রাখতে পারেন, মারতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর এখন বিরাট ক্ষমতা। দলের ভেতরে গান্ধীজী এবং বল্লভভাইয়ের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর পিতা এই ক্ষমতা পেয়েছিলেন। তাঁরও একটা বিশেষ সুবিধা ছিল বয়স এবং পূর্বখ্যাতি। শ্রীমতী গান্ধী বয়সে বহু নব কংগ্রেস নেতার চেয়ে ছোট। চার বছর আগেও দলে কেউ তাঁকে চবন বা জগজ্জীবন রামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না।

আর এখন? এখন কোথায় চবন এবং জগজ্জীবন রাম, আর কোথায় শ্রীমতী গান্ধী!

❋

যে রাজনৈতিক অস্থিরতা গোটা দেশকে গ্রাস করতে চলেছিল এই নির্বাচনে তা সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছে। সেইদিক দিয়ে এই নির্বাচনের গুরুত্ব বিরাট। সেই বিচারে এই রায় ঐতিহাসিক।

অনেকেরই ভয় ছিল, দিন দিন ভারতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতা বাড়বে। আঞ্চলিক দলগুলি ক্ষমতাবান হয়ে উঠবেন। আঞ্চলিকতাবাদ ক্রমেই মাথাচাড়া দেবে। সাম্প্রদায়িকতা তার নখদন্ত বিস্তার করবে। সে সব ভয়ও এই নির্বাচনে অনেকটা কেটে গেল। আগামী পাঁচ বছরে দৈব কিছু না

ঘটলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অটুট থাকবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়ভাবে এগোতে পারবেন—দশ দল দশ মতের কথা ভেবে "মাঝামাঝি" পথ ধরে চলতে হবে না।

আঞ্চলিক পারটিগুলি এবার তেমন কোনও সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁরা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছেন। এমন যে চরণ সিং, যিনি এত আশা করেছিলেন, এত হিসেব করে এগিয়েছিলেন, তিনিও রাজনৈতিকভাবে প্রায় খতম। আঞ্চলিক দলগুলি গত তিন চার বছরে প্রচণ্ডভাবে এগিয়েছিলেন। তাঁদের জয়যাত্রা শুধু আটকে যায় নি, তাঁরা বিপর্যস্তও। অনেকের অস্তিত্ব রক্ষাই এখন কঠিন হবে।

শোচনীয় অবস্থায় পড়েছেন আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পারটি, এস এস পি, প্রভৃতিও। এদের মধ্যে আবার আদি কংগ্রেসের এখন অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হবে। প্রফুল্ল সেন পশ্চিমবঙ্গে যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথে অন্যান্য রাজ্যের বহু আদি কংগ্রেসী এগোতে চাইবেন। তাঁদের উত্তর প্রদেশ সরকারকে আর বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন হবে। ধাক্কা পড়বে বিহারের সরকারের উপরও। গুজরাট এবং মহীশূরের আদি কংগ্রেস সরকারের "আদি" পরিচয় আর কতদিন থাকবে তাও বলা কঠিন।

জনসংঘ অবশ্য এর পরও থাকবে। তবে, তাঁরাও এই নির্বাচনে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছেন। কিন্তু তবু হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁরাই প্রধান নব কংগ্রেস বিরোধী শক্তি থাকবেন। স্বতন্ত্র পারটি আস্তে আস্তে উঠেই যাবে। তাঁদের অনেকেই জনসংঘে গিয়ে যোগ দেবেন।

নতুন মোড় নেবে এস এস পির রাজনীতিও। জনসংঘ এবং আদি কংগ্রেসের কাছ থেকে তাঁদের অনেক অনেক দূরে সরে যেতে হবে। বাঁচতে হলে আবার তাঁদের গরীবের দল, সাধারণ মানুষের দল বলে পরিচিত হতে হবে। একদা হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁরা সেইভাবেই পরিচিত ছিলেন। সেইটাই ছিল তাঁদের সাফল্যের কারণ। সে পরিচয় হালফিল তাঁদের মুছে গিয়েছিল।

*

আমার নিজের ধারণা, ইন্দিরা গান্ধীর সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ যে তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে পেরেছেন, আমি গরীব মানুষের ভাল করতে চাই। জনসংঘ, আদি কংগ্রেস, স্বতন্ত্র পারটি, এস এস পি প্রভৃতি আমার সেই প্রচেষ্টার বিরোধী।

গরীব মানুষ আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ বললে ভুল হবে—বিরাট বিশালভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা মনে করেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের ভাল করতে চান, জনসংঘ, আদি-কংগ্রেস জোট তাতে বাদ সাধছে। তাই তাঁরা প্রচণ্ডভাবে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। সংগঠনের তেমন প্রয়োজন হয় নি। ভোট তুলে আনার প্রশ্নও তত বড় হয়ে দেখা দেয় নি। এমন যে জাত-পাতের প্রশ্নও তাও প্রাধান্য পায় নি। গরীবরা প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছেন। তাঁরাই তাঁকে বিরাট বিশালভাবে জিতিয়েছেন।

তাঁরা স্বভাবতই এখন আশা করবেন, প্রধানমন্ত্রী প্রতিদানে তাঁদের জন্য কিছু করবেন। সেই আশায় তাঁরা দিন গুনবেন। সে আশা করলে অন্যায়ও নয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের হতাশ করলে তাঁরা কিন্তু তাঁকে ক্ষমা করবেন না।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

দুর্দিনের ইশারা

কী কুক্ষণেই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে ফৌজ পাঠিয়েছিল। যে আগুন সেখানে জ্বলছে তাতে পড়ে খাক হচ্ছে শুধু উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম নয়, লাওস আর কাম্বোডিয়াও। তার ঝলকানিতে ঝলসে যাচ্ছে আমেরিকা নিজে তো বটেই সে যুদ্ধে তার ভিনদেশী শরিকরাও। সে শরিকদের একটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ভিয়েতনামে রয়েছে সে দেশের ফৌজ, তারা লড়াইও করছে আবার অসামরিক সাহায্যও দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হ্যারল্ড হোল্ট তখন তিনি দেশের লোককে বোঝাতে চেয়েছিলেন নিজেদের স্বার্থেই তাঁদের উচিত ভিয়েতনামের লড়াইয়ে আমেরিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, নইলে কম্যুনিস্টদের ঠেকানো যাবে না, আবার অস্ট্রেলিয়াও বিপদে পড়বে। তাঁর যুক্তি তাঁর নিজের দল লিবারাল পার্টি তো মেনে নিয়েছিলই, মেনে নিয়েছিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় তাঁর সহযোগী দল কাণ্ট্রি পার্টিও, শেষ পর্যন্ত দেশের লোকও। ১৯৬৬ সনের নির্বাচনে সরকারী জোটের হয়েছিল জয়জয়কার, বিরোধী দল লেবার পার্টি হয়ে পড়েছিল কোণঠাসা।

অস্ট্রেলিয়াতে নির্বাচন হয় তিন বছর অন্তর। ১৯৬৬-র পর নির্বাচনের পালা ১৯৬৯ সনে। কিন্তু সে লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রী হোল্টকে আর নামতে হল না, তার আগেই তিনি বিদেয় নিলেন সংসার থেকে। ১৯৬৭ সনের ১৭ ডিসেম্বর পোর্টসীতে তাঁর প্রমোদভবনের কাছে তিনি সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। জাতিপাতি করে তাঁর খোঁজ করা হয়েছিল নৌকো থেকে গভীর জলে ডুবুরি নামিয়ে, আকাশে হেলিকপ্টার উড়িয়ে, কিন্তু তাঁর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। ধরে নেওয়া হল অতলে তিনি তলিয়ে গেছেন, তাঁর দেহের চিহ্নটুকুও আর পাওয়া যাবে না। এর পর এলো তাঁর উত্তরাধিকারী বাছাই-পর্ব। হোল্টের চার সহকর্মী এগিয়ে এলেন তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করতে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ লিবারাল দলের নেতাই হবেন প্রধানমন্ত্রী। দলের সহ-প্রধান উইলিয়াম ম্যাকমেহন এক ধাপ এগিয়ে প্রধান হতে চাইলেন না, তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রইলেন। চার দাবীদারের মধ্যে দল বাছাই করে নিলে সিনেটের সদস্য জন গ্রে গর্টনকে। হোল্টের পর তিনিই হলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

দলের মধ্যে সেই যে রেষারেষি শুরু হল তা আর থামলো না—তার জের আজও চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে সরকারী নীতি কিছু গর্টন পালটাননি কিন্তু সে নীতির সমালোচনা নানান দিক থেকে ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগলো বিশেষ করে ভিয়েতনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া নিয়ে। বিরোধী শ্রমিক দল অবশ্য বরাবরই ও-নীতির নিন্দে করে এসেছে। হোল্ট তাতে ঘাবড়াননি, গোড়ার দিকে গর্টনও নয়। কিন্তু তাঁর আর দলের চক্ষুস্থির হয়ে গেল ১৯৬৯-এর নির্বাচনের ফলাফল দেখে। এবারও পুরোনো জোটই ক্ষমতা ফিরে পেল বটে, কিন্তু তাদের জোর হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে বিলক্ষণ কমলো। সে সভা যখন ভেঙে দেওয়া হয় তখন তাতে জোটের সদস্য ছিল ৮০ জন—লিবারালদের ৫৯, কাণ্ট্রি পার্টির ২১। বিরোধী শ্রমিক দলের ছিল কুল্যে ৪২ জন সদস্য। এ ছাড়া জন দুই ছিলেন নির্দল। ১৯৬৯ সনে জোট সদস্যদের সংখ্যা হল ৬৬—লিবারালদের ৪৬, কাণ্ট্রি পার্টির ২০ অর্থাৎ হারটা বড় তরফেরই বেশী। ও-দিকে বিরোধী শ্রমিক সদস্যদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে হল ৫৯, আর একটু হলেই তারা সরকারী জোটকে ধরে ফেলেছিল। খুব বেঁচে গেলেন গর্টন সে যাত্রা।

কিন্তু কেন এমন হল? তার কারণ অবশ্য একটা নয়। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে, সরকারী নীতির ওপর লোকের ভক্তি চটে যাওয়া। ভিয়েতনামে মার্কিনদের সঙ্গে হাত মেলাবার কী দরকার এ প্রশ্ন অনেকেই তুলেছে। তাদের খুঁচিয়েছে বিরোধী শ্রমিক দল। সে দলেরও সেবার নতুন নেতা গাফ হুইটল্যাম। আগের নেতা কলওয়েলের থেকে অনেক তিনি পোক্ত। তাঁর যুক্তি অস্ট্রেলিয়ার অনেক ভোটারেরই মনে ধরেছিল। তিনি তর্ক তুলেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াতে অস্ট্রেলিয়ানদের নাক গলাবার দরকারটা কী? সেখানকার সমস্যা নিয়ে সেখানকার লোকেরাই মাথা ঘামাক না কেন, গায়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়া তাদের মুরুব্বি হতে চাইছে কোন্ বাবদে? তিনি চেয়েছিলেন, মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুর থেকে তার ফৌজ অস্ট্রেলিয়া ফিরিয়ে আনুক, ভিয়েতনাম থেকেও। তাতে ঝুঁকিও কমবে, টাকাও বাঁচবে। তাঁর কথার ভেতরে যুক্তি ছিল জোরালো, কইয়ে-বলিয়েও তিনি বেশ। গর্টন আর তাঁর দলবলকে তিনি প্রায় কাত করে এনেছিলেন সেবার। আইনসভায় গরিষ্ঠতা তাঁদের প্রায় যেতে বসেছিল।

দলের নেতা হিসেবে গর্টন আগেকার প্রধানমন্ত্রীদের চেয়ে ঢের বেশী নিরেশ। দলের মধ্যে তাঁর বিরোধী বিস্তর, এমন কী মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার দরুন কেউ কেউ মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন, এমন কী দলও। ১৯৬৯-র নির্বাচনের ঠিক আগেই সেন্ট জন দল থেকে নাম কাটিয়ে নির্দল বনেছিলেন আইনসভায়। নির্বাচনের পরেই জাতীয় উন্নয়নের মন্ত্রী ডেভিড ফেয়ারবেয়ার্ন জানিয়ে দিয়েছিলেন, গর্টন যদি আবার প্রধানমন্ত্রী হন তা হলে সে মন্ত্রিসভায় তিনি থাকবেন না। এবার দলের প্রধান হতে চেয়েছিলেন গর্টন, আর সহ-প্রধান ম্যাকমেহন। গর্টনের প্রধানমন্ত্রীর পদ অবশ্য শেষ পর্যন্ত কায়েম রইলো, ম্যাকমেহন হলেন আবার সহ-প্রধান আর বৈদেশিক মন্ত্রী। উপদলীয় কোঁদল কিন্তু গেল না—গর্টনের সঙ্গে তাঁর সহকর্মীদের খিটিমিটি লেগেই রইলো। তা চেপে রাখার চেষ্টা করলেও প্রায়ই বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ৮ মার্চ প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার হঠাৎ পদত্যাগ করে বসেছেন। উপলক্ষটা সেই ভিয়েতনামে পাঠানো অস্ট্রেলিয়ান ফৌজ। তা নিয়ে মতান্তর হয় ফ্রেজারের সঙ্গে প্রধান সেনাপতির। প্রধানমন্ত্রী ফৌজী প্রধানের দিকে ঢলে পড়াতে ইস্তফা দিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

ও-ব্যাপারটা তুচ্ছ করার মতো নয় লিবারাল দলের কাছে। সামনের বছরে আবার নির্বাচন। তার আগে যদি ঘর সামলানো না যায় তা হলে নির্ঘাত গদি হাতছাড়া হয়ে যাবে এই হল নেতাদের ভয়। সে ভয় আরও বেড়েছে ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য নির্বাচনের ফলাফল দেখে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে সরকারী জোটকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে বিরোধী শ্রমিক দল। নিউ সাউথ ওয়েলসে তারা হারতে হারতে বেঁচেছে। ফ্রেজার মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেবার পর প্রধানের ওপর দলের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। দেখা গেল, পাল্লা দুদিকেই সমান। ৩৩ জন গর্টনকে চান ওদিকে ৩৩ জনই আবার তাঁকে চান না। তখন একটা অদ্ভুত কাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। বেশ বোঝা যাচ্ছে দল আমাকে আর চায় না এই বলে তিনি ভোট দিলেন নিজের বিরুদ্ধে। তাতে এক ভোটে তিনি হেরে গেলেন। তখন নতুন করে প্রধান নির্বাচন করা হল বৈদেশিক মন্ত্রী ম্যাকমেহনকে। তাঁর অনেক দিনের গোপন ইচ্ছে পূর্ণ হল—১০ মার্চ থেকে অস্ট্রেলিয়ার তিনিই প্রধানমন্ত্রী। আপাতত সামলে নিলেও লোকের ধারণা শেষ রক্ষে সরকারী জোটের হবে না—আসছে বছরের নির্বাচনে লিবারাল দলের ২২ বছরের প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবে।

বিদেশে (৮)

বাস মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানেও রাস্তা নির্জন। বাচ্চাকাচ্চারা কোথায়? তারা তো ক্লাইপে বা সংধালয়ে যায় না—সেখানে অবশ্যই অক্কের কারবার, বেজায় ভিড়। আমার পাশের সীটে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললুম, "স্যর, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে আমি এসব গ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তখন তো ছেলে-মেয়েরা রাস্তার উপর রোল-স্কেটিং করতো, দড়ি নিয়ে নাচতো, এমন কি ফুটবলও খেলতে। ওরা সব গেল কোথায়?"

বৃদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "একাধিক উত্তর হয়তো আছে। চট করে যেটা মনে আসছে সেটা বলতে গেলে বলি, বন্ধ ঘরে টেলিভিশন দেখছে।"

আমি একটু ঘাড় চুলকে বললুম, "কিছু যদি অপরাধ না নেন, স্যর, তবে শুধবো, এটা কি সর্বাংশে ভালো? ফার্সীতে একটি দোহা আছে :—

> হর্ চে কুনী, ব্ খুদ্ কুনী
> খা খুব্ কুনী, খা বদ্ কুনী॥
> যা করবে স্বয়ং করবে
> ভালো করো কিংবা মন্দই করো॥

এই যে প্যাসিভভাবে বসে বসে টেলি দেখা তার চেয়ে রাস্তায় অ্যাকটিভভাবে খেলা-ধুলো করা কি অনেক বেশী কাম্য নয়?"

গুণী এবারে চিন্তা না করেই বললেন, "নিশ্চয়ই। অবশ্য ব্যত্যয়ও আছে। যেমন মনে করুন, আমরা যখন মোৎসার্ট বা শপাঁ শুনি তখন তো আমরা প্যাসিভ। আর তা-ই বা বলি কি করে? বেটোফেনকে গ্রহণ করা তো প্যাসিভ নয়। ভেরি ভেরি অ্যাকটিভ কর্ম! কী পরিমাণ কনসানট্রেশন তখন করতে হয়, চিন্তা করুন তো। কিন্তু বাচ্চাদের কথা বাদ দিন—কটা বয়স্ক লোকই সে জিনিস করে?"

বুঝলুম লোকটি চিন্তাশীল। এঁকে খুঁচিয়ে আরো অনেক তত্ত্ব কথা জেনে নিই। বললুম, "তা টেলিতে কি ভালো প্রোগ্রাম কিছুই দেয় না?"

"তা হলে শুনুন, আপনাকে পুরো ফিরিস্তি দিচ্ছি। যদিও আমি ঐ যন্ত্রটির পূজোরী নই। পুরনো ফিল্ম, নয়া থিয়েটার, গর্ভপাতের সেমিনার-আলোচনা, পাদ্রিদের বক্তৃতা (এ দুটো তিনি ঠিক পর পর বলেছিলেন সেটা আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে), রাজনৈতিকদের সঙ্গে ইন্টারভ্যু, খেলা, কাবারে, ইটালি ভ্রমণ, চন্দ্রাভিযান, ভিয়েটনাম থেকে প্রত্যক্ষ-দর্শীর প্রতিবেদন, পার্লামেন্টে হ্যার ভিলি ব্রান্ট ও হ্যার শেলের বক্তৃতা—এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ঐ একই কেচ্ছা, একই অন্তহীন খাড়াবড়িথোড়থোড়বড়িখাড়া (তিনি জরমনে বলেছিলেন "একই ইতিহাস" —ডী জেলবে গেশিখটে—)। সর্ববস্তু কুচি কুচি করে পরিবেশন। পরের দিনই ভুলে যাবেন, আগের দিন কি দেখেছিলেন—মনের উপর কোনো দাগ কাটে না। পক্ষান্তরে দেখুন, বই পড়ার ব্যাপারে আপনি আপনার রুচিমত বই বেছে নিচ্ছেন।"

ইতিমধ্যে আমাদের বাস কতবার যে কত ট্রাফিক জ্যামে কত মিনিট দাঁড়িয়েছে তার হিসেব আমি রাখিনি। অথচ এদেশে রিকশা, ঠ্যালা, গোরুর গাড়ি এমন কোনো কিছুই নেই যে-সব হযবরল আমাদের কলকাতাতে নিত্যি নিত্যি ট্রাফিক জ্যাম জমাতে কখনো স্বেচ্ছায় কখনো অনিচ্ছায়—বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠান।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ঐ দেখুন, আরেক উৎকট নেশা। মোটর, মোটর, মোটর। প্রত্যেক জরমনের একখানা মোটর গাড়ি চাই। জরমন মাত্রই মোটরের পূজোরী।"

আমার কেমন যেন মনে হল, আমরা বোধ হয় বন্ শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছি। কিছুটা চেনাচেনা ঠেকছে, আবার অচেনাও বটে। অথচ একদা এ শহর আমি আমার হাতের তেলোর চেয়ে বেশী চিনতুম। আমি ভদ্রলোককে আমার সমস্যা সমাধান করতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "এটা বনই বটে। তবে এ অঞ্চলটা গত যুদ্ধে এমনই বোম্বার্ড-মার খেয়েছিল যে এটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। তবে শহরের মধ্যিখানটা প্রায় পূর্বেরই মত মেরামৎ করে বানানো। আসল কথা কি জানেন, বম্বিঙের ফলে ঘিঞ্জি পাড়া-গুলো যে নষ্ট হয়ে গেল সেগুলোকে ভালো করে, নতুন করে প্ল্যান মাফিক বানাবার চান্সটা আমরা মিস করেছি। তবে এই যে বললুম, শহরের মাঝখানটা মোটামুটি আগেরই মত—হার্ট অব দি সিটি—আর জানেন তো পুরানা হার্টের জায়গায় নতুন হার্ট বসানো মুশকিল। এই ধরুন লুটভিক্ ফান বেটোফেন—"

আমি বললুম, "ওই নামটার ঠিক উচ্চারণটা কি আমি আজো জানিনে।"

হেসে বললেন, "ঐ তো ফেললেন বিপদে। মাঝখানের Vanটা যে খাঁটি জর্মন নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ও'রা প্রাচীন দিনের ফ্লামিশ। তখন তারা "ভান" না "ফান" উচ্চারণ করত কে জানে—অন্তত আমি জানিনে—"

আমি বললুম, "থাক, থাক। এবারে যা বলছিলেন তাই বলুন।"

"সেই বেটোফেনের বাড়ি যদি বোমাতে চুরমার হয়ে যেত তবে সেখানে তো একটা পিরামিড গড়া যেত না।"

"এমন কি তাজমহলও না।"

*

দুম্ করে গাড়ি থেমে গেল। একি? ও। মোকামে পৌঁছে গিয়েছি। অর্থাৎ বন্ শহরে। এবং সবচেয়ে প্রাণাভিরাম নয়নানন্দদান দৃশ্য—যে পরিবারে উঠবো তারই একটি জোয়ান ছেলে ভিটারিষ্ উলানোফস্কি প্রবলবেগে হাত নড়াচ্ছে। মুখে তিন গাল হাসি। পাশে দাঁড়িয়ে তার ফুটফুটে বউ। সে রুমাল দুলোচ্ছে।"

বিমল মিত্র
বুর্জোয়া

আমার বন্ধু হরনাথ জ্ঞান-পাপী। লোহার কারবার করে। কিন্তু বই-টইও পড়ে। লোহার কারবার করলেই যে সাহিত্যের রস থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে তেমন কোনও মাথার দিব্যি নেই। সে বই পড়ে বটে, কিন্তু খুব কম লেখকের লেখাই তার ভালো লাগে। বিশেষ করে আমার লেখা তো তার একেবারেই দু'চোখের বিষ।

সেদিন হরনাথের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় বললে—কেন, তোমরা কি আমাদের জন্যে কিছু গল্প লিখতে পারো না?

আমি তো অবাক। বললাম—তোমাদের জন্যে লিখি না তো কাদের জন্যে লিখি?

হরনাথ বললে—তোমার ওই সব সোসিও-ইকোনমিক্যাল গল্প আর ভাল্লাগে না। কেবল রাজনীতি আর গভার্মেণ্টের কেচ্ছার কাহিনী ছেড়ে একটু সহজ-সরল হওনা। সংসারেও রাজনীতি, তার ওপর আবার উপন্যাসেও রাজনীতি! কেন, রাজনীতি, দর্শন, ইকোনমিকস্ ছাড়া কি আর সাবজেক্ট নেই?

বললাম—আর কী সাবজেক্ট্ আছে বলো?

—কেন, সেক্স্?

*

তা এই হলো আমাদের হরনাথ! এই কথাটুকুতেই আশা করি পাঠকরা হরনাথের আসল পরিচয় পেয়ে গেছেন। মুখের কথা আর পেটের কথা এক সময় না এক সময়ে প্রকাশ হয়ে পড়েই। তা না হলে পাবলিসিটি অফিসার আর সাহিত্যিকের মধ্যে তফাৎটা কী? একজন পণ্যবস্তুর বিজ্ঞাপন লেখে আর একজন ধ্রুব বস্তুর। কিন্তু এক-একজন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা সাহিত্যের ছদ্মবেশ পরিয়ে পণ্যবস্তুর বিজ্ঞাপন লিখতেই ব্যস্ত। জীবন আর জীবিকার মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু অনেকের কাছেই জীবিকার জন্যে জীবন। তাদের কাছে জীবন একটা জড়বস্তু, আর সেই জড়বস্তুটার ভরণ-পোষণটাই হলো বড় কথা। কিন্তু জীবন তো জীবিকারও উর্ধে। যে সাহিত্যিক তার লেখার মধ্যে দিয়ে সেই উর্ধ্বস্তরটার দিকে ইঙ্গিত দিতে পারে সে-ই তো স্রষ্টা! যার আর এক নাম হলো ঋষি!

এখন এসব কথা হরনাথকে বোঝানো বৃথা। সেই কারণেই হরনাথের কথা আমি শুধু শুনে যাই, প্রতিবাদ করি না।

—কেন, সেকস্ কি ঘেন্নার জিনিস হে? এই আমার জিতেন কাকার কথা মনে করো না। ভদ্রলোক এত বড় একটা কোম্পানী করে গেলেন, কুড়ি হাজার লোক সেখানে খেটে রোজগার করে—

আমি চিনতে পারলাম না হরনাথের জিতেন কাকাকে।

হরনাথ বললে—চিনলে না? হপকিনস আটকিনসন লিমিটেডের মালিক। লেট রায় বাহাদুর জে এন সিংহ রায়—

বললাম—তিনি তোমার কাকা ছিলেন তা তো জানতাম না—

হরনাথ বললে—নিজের কাকা তো নয়। নিজের কাকা হলে ঠিক জানতে পারতে। আসলে আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আমি যে আজ আয়রন মার্চেণ্ট হয়েছি সে তো ওই কাকার কল্যাণেই।

হপকিনস আটকিনসন কোম্পানীর নাম বাঙলা দেশের লোকের কাছে অচেনা নয়। অন্তত বিশেষ করে যারা শেয়ার-মার্কেটের খবরাখবর রাখে তাদের কাছে। শেয়ার-মার্কেটের ভাষায় যাকে বলা হয় ব্লু-চিপস, ওই কোম্পানী সেই দলে পড়ে। কখনও তার বাজার-দর ওঠে, আবার কখনও বা নামে, কিন্তু এতকাল ধরে কোম্পানী চলছে কখনও তো তার লালবাতি ওলটায়নি, আর কখনও যে ওলটাবে এরকম তেমন সম্ভাবনাও নেই।

—আর কত দান ধ্যান ছিল জিতেন কাকার। গ্রামে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা কলেজ করে দিয়েছিল। সে কলেজ এখনও পুরোদমে চলছে, গেলে দেখবে কলেজের মাথায় এখনও লেখা রয়েছে 'রায় বাহাদুর জে-এন-সিংহ রায় কলেজ'। তারপর জিতেন-কাকার মা'র নামে কাশীতে বিরাট বিশ্বেশ্বর মন্দির। শেখপুরায় জিতেন-কাকার বাবার নামে মস্ত বড় চ্যারিটি হাসপাতাল। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির একটা ফেলোশিপ। এ সমস্ত কিছু জিতেন-কাকার দান। এক জীবনে তিনি এত কাজ করে গেছেন যে কেনও বাঙালী তার আগে করতে পারেনি। এক কথায় বলা যায় আমার জিতেন-কাকা ছিল সে যুগের একজন কর্মবীর মানুষ। কিন্তু শুনেছি জিতেন কাকা জীবন শুরু করেছিল সামান্য একজন মটর ড্রাইভার হিসেবে—

—মটর ড্রাইভার?

—হ্যাঁ, কুড়ি টাকা মাইনের মটর ড্রাইভার। তবে বাঙালীর মটর ড্রাইভার নয়, সাহেবের।

মরিস হেন্ডারসন নামে তখন একটা মস্ত বিলিতি কোম্পানী ছিল। তাদের ছিল ইম পোর্ট-এক্সপোর্টের কারবার। পুরোন নামজাদা কোম্পানী। তারই জেনারেল-ম্যানেজার মিস্টার হেন্ডারসনের মটর ড্রাইভার। মাত্র কুড়ি টাকা মাইনে, অথচ উদয়াস্ত খাটুনি। কিন্তু জিতেন কাকা গ্রামের নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষার ছেলে। মাত্র সাত-আট বিঘে জমির মালিক। খাটুনির কথা ভাবলে তার চলবে না। কলকাতায় এসে একদিন এর-ওর পা জড়িয়ে ধরে মটর ড্রাইভিংটা শিখে ফেললে। তারপর এ-ঘাটে ও-ঘাটে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকলো মরিস-হেন্ডারসন অ্যান্ড কোম্পানীর ঘাটে।

হেন্ডারসন সাহেব তখন কোম্পানীর মালিক। পার্টনার মরিস সাহেব মারা গেছে আগেই। জিতেন সিংহ রায় সেই অবস্থায় ঢুকলো গিয়ে সেই সাহেব কোম্পানীতে। তখনকার দিনে যে কোনও একটা চাকরি পাওয়াই একটা দুর্ঘট ব্যাপার। সরকারী চাকরির তো কথাই নেই। তা পাওয়া তো হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়া। তার ঠিক নিচের ধাপেই হলো মার্চেন্ট অফিসের চাকরি।

দেশের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতো জিতেন সিংহরায়। একদিন হাসিমুখে সেখানে গিয়ে হাজির। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

তিনি জিতেনের হাসি মুখ দেখে অবাক। বললেন—কী হে, এত হাসি কেন?

জিতেন বললে—আজ্ঞে আমার চাকরি হয়ে গিয়েছে। আপনাকে তাই জানাতে এসেছি।

—কত টাকা মাইনে?

—কুড়ি টাকা!

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—তাহলে তো তোমার খুব ভাগ্য ভালো হে, এবার আর কী, এবার তাহলে একটা বিয়ে করে ফেল—

কিন্তু জিতেন সিংহরায় যদি অত অল্পতেই সন্তুষ্ট হবে তবে হপকিনস্ অ্যাটকিনসন অ্যান্ড কোম্পানীর মত অত বড় কোম্পানীর সৃষ্টি হবেই বা কী করে? গোটা দেশে অত বড় কোম্পানী কটা আছে? হপকিনস্ অ্যাটকিনসন্ কোম্পানীর শেয়ারের দর ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে অত হাজার হাজার লোকের বুকের ছাতি ওঠে নামেই বা কেন?

হেন্ডারসন সাহেবের বাড়ি তখন ছিল আলবার্ট রোডে। চারদিকে কম্পাউন্ড-ঘেরা বাড়ি। বাঙলো প্যাটার্নের। তারই কোণের দিকে আউট-হাউস। সেখানে খানসামা-বাবুর্চি-বয়-আয়া সকলের থাকবার আস্তানা। তারই একটা ঘরে সংসার পাতলো জিতেন। জিতেন সিংহ রায়। চেহারাটা অবশ্য তাদের মধ্যে বড় বেমানান লাগতো। যেন একপাল হাঁসের মধ্যে একটা বক। তা হলে কী হবে, জিতেনের ঘর-ভাড়াটা লাগলো না। আর হেন্ডারসন সাহেবেরও সুবিধে। রাত-বিরেতে যখন হোক হাঁক দিলেই হলো। একবার হাঁক দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ইউনিফর্মটা গায়ে গলিয়ে জিতেন এসে সেলাম করে—জী হুজুর—

এক্স-মাসের সময় সাহেব-মেমরা এসে হেন্ডারসন সাহেবের বাড়ি আলো করে বসে। বাড়ির ভেতরে বিরাট হল-ঘর। সেখানে খানা-পিনা, নাচ-গান হয় অনেক রাত পর্যন্ত। সাহেবের খানসামা-চাপরাসি-বয়-বাবুর্চিদের তখন নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। ডিশ আর কাপ, পেগ আর ডিকেন্টার, হুইস্কি আর শ্যামপেনের স্রোত বয়ে চলেছে।

জিতেনও বাইরে সকলের চোখের আড়ালে ইউনিফর্ম পরে রেডি থাকে। যত রাতই হোক তার চোখে ঢুলুনি আসতে নেই। চব্বিশ ঘণ্টাই তার ডিউটি। হঠাৎ কখন যে হেন্ডারসন সাহেব হাঁক দেবে তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। হয়ত তখন রাত তিনটে। সেই সময় চোখে একটু ঢুলুনি এসেছে, এমন সময় হেন্ডারসন সাহেব হাঁক ছাড়লে—জিটেন—

জিতেন অমনি ভেতরে গিয়ে স্যালিউট লাগিয়ে দাঁড়ালো—সাব?

ঘরময় তখন সাহেব-মেমসাহেব কিলবিল্ করছে। লাল মুখের হাট বসে গেছে সেখানে। তার ওপর মদ খেয়ে মুখগুলো আগুনের মত হয়ে গেছে সকলের।

—জিটেন, মাই বয়, মিস মিলারকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এসো তো—

তারপরেই দৌড়ে বাইরে গিয়ে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতে হবে। গাড়ি এনে দাঁড় করাতে হবে পোর্টিকোর তলায়। তারপর মিস মিলার, কিম্বা মিস রোজ, কিম্বা কোনও মিস ক্যাথেরিনকে নিয়ে এসে হেন্ডারসন সাহেব তার গাড়িতে তুলে দেবে। আর জিতেনকে সেই গাড়ি ড্রাইভ করে মেম-সাহেবকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে কলকাতায় কোনও বিরাট হোটেলে।

কিন্তু তাতেই ছুটি নেই জিতেন সিংহ রায়ের। হেন্ডারসন সাহেবের মটর ড্রাইভারের অত সহজে ছুটি পাওয়া কপালে নেই। সমস্ত রাতই কাজ করো আর সমস্ত দিনই কাজ করো, ভোর পাঁচটার সময়েই আবার তোমাকে দাড়ি কামিয়ে ইউনিফর্ম পরে ডিউটি দিতে হবে। সাহেবও আবার তেমনি। সাহেব যত রাত্রেই বাড়ি ফিরুক কিম্বা যত ছুটিই থাকুক, সাহেবের ঘুম ভাঙবে ঠিক ভোর পাঁচটায়। তখন বেড-টি দিতে হবে

খানসামাকে তারপরে খবরের কাগজ আর সিগারেট।

জিতেন তখন থেকেই গাড়ি নিয়ে রেডি। কখন সাহেবের অফিস যাবার মর্জি হবে কেউ বলতে পারে না। হয়ত সাহেব ভোর ছটাতেই ডালহৌসি স্কোয়ারে তার অফিসে গিয়ে হাজির।

মরিস হেণ্ডারসন অ্যাণ্ড কোম্পানীর অফিসের সামনে বিরাট পেতলের একটা বোর্ড। বোর্ডের ওপর কোম্পানীর নাম বড় বড় অক্ষরে খোদাই করা। সাহেবের গাড়ি সামনে পৌঁছতেই শিখ দরোয়ান অ্যাটেনসন-এর ভঙ্গিতে সাহেবকে সেলাম করবে। সাহেব সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে দোতলায় নিজের কামরায় চলে যাবে। তখনও বেয়ারা আসেনি। সাহেব নিজের হাতেই জানালার পাল্লা খুলে দেবে, ডাস্টার দিয়ে টেবিল-চেয়ার মুছবে। তারপর আলো জেলে পাখা খুলে দিয়ে কাজ শুরু করে দেবে।

সারাদিন এমনি। এমনি কাজ করতে করতে দুপুরে দুটোর সময় উঠে ডাক পড়বে জিতেনের। তখন হোটেলে যেতে হবে লাঞ্চের জন্যে। সেখানে সাহেবের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে খেতে খেতে। খেয়ে উঠে খানিকক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলবে। তারপর আবার অফিস। অফিস মানে ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কাজ। সে কাজ কোটি কোটি টাকার কাজ। তাতে মাথা খাটাতে হয়; ব্রেন লাগে।

তারপর বিকেল হতে-না-হতে উঠে পড়বে সাহেব। তখন ক্লাব। ক্লাবে চলবে পান-ভোজন। তখন জিতেনকে বাড়িতে গিয়ে মাঝে-মাঝে মেম-সাহেবকে নিয়ে আসতে হবে।

দিনের পর দিন, এমনি। এমনি করেই জিতেন কাকা উদয়াস্ত খেটে তখন পেট চালাতো। কোনও দিন খাওয়া জুটতো, কোনও দিন বা জুটতো না। ঘুমও কোনও রাতে হ'তো, কোনও রাতে বা ঘুমোবার সময় পেত না।

কিন্তু ভাগ্য যখন মানুষের ফেরে তখন এমনি করেই অনেকের ফেরে। আর সে ভাগ্যফেরা যে এমন করে ফেরা তা কি সেদিন জিতেন কাকাই কল্পনা করতে পেরেছিল? কল্পনা করতে কি পেরেছিল যে সেই হেণ্ডারসন সাহেবের মটর ড্রাইভার একদিন হপকিনস্ অ্যাটকিনসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানীর মালিক হয়ে বসবে? না পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে নিজের দেশে একটা কলেজ করে দিতে পারবে? কাশীতে যার নামে বিরাট বিশ্বেশ্বর মন্দির, শেখপুরায় বাবার নামে চারতলা হাসপাতাল, ক্যালকাটা ইউ-নিভার্সিটিতে দশটা ফেলোশিপ, এসব জিতেন-কাকার মত কে করতে পেরেছে? নিজে সামান্য একজন কুড়ি টাকা মাইনের সাহেব কোম্পানীর মটর ড্রাইভার হয়ে?

বললাম—সত্যি, কী করে হলো?

হরনাথ বললে—সেই জন্যেই তো বলছি, তোমরা তো কেবল সোসিও-ইকোনমিকাল গল্প-উপন্যাস লিখবে, ভাববে ইনটেলেক-চুয়ালদের জন্যে লিখছো, কিন্তু আমাদের মত পাঠক কি ফ্যালনা?

তারপর বললে—তা হলে শোন, ঘটনাটা বলি—

বলে হরনাথ আবার বলতে আরম্ভ করলো।

*

কলকাতার ইংরেজরা তখন শহরের কুলীন মানুষ। পুরো ব্রিটিশ আমল। সাহেবরা যার পর আমাদের দিকে এক-আধটা কথা ছুঁড়ে দিলে আমরা তখন কৃতার্থ হয়ে যেতাম। এখন অতটা না হলেও কিছুটা। এখন এই ১৯৬০-৬১ সালেও কোনও ব্রিটিশ বা আমেরিকান টুরিস্ট দেখলে আমরা হাঙরের মতন তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ি, যদি আমাদের একবার আমেরিকা বা বিলেতে নিদেন জার্মানীতেও ঘুরিয়ে আনার সুযোগ করে দিতে পারে। আর ফরেন এমব্যাসিতে একবার ককটেলের নেমন্তন্ন পাবার জন্যে আমরা তো কারো পা চাটতেও প্রস্তুত!

আর তখনকার দিনে সাহেবরা ইণ্ডিয়ানদের মানুষই মনে করতো না, তায় আবার নেমন্তন্ন। সেপাই-বিদ্রোহের পর থেকে সেই যে সাহেবরা নিজেদের সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আটকে রইলো, তা থেকে শেষ পর্যন্ত তারা আর বেরিয়ে আসেনি। নিজেদের ফুটবল ক্লাব, নিজেদের নাইট ক্লাব, নিজেদের ক্রিসমাস-ফেস্টিভ্যাল, সমস্ত কিছুই নিজেদের মধ্যে। নিজেদের পাড়ার মধ্যেই তারা ঘোরাফেরা করতো, নিজস্ব হোটেলে তারা যেত। ভুলেও একবার ভবানীপুরে কি

সাহেব বললে—আজকে আবদুল বোধহয় হুইস্কির সঙ্গে সোডা কম দিয়েছে—

—তা হুইস্কি যতই স্ট্রং হোক, ও না তোমার মেয়ের বয়সী?

সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে

—তোমার জেলাসি হচ্ছে কেন ফ্রেনী, তুমি কি মনে করো আমি এই বুড়ো বয়েসে আনফেথফুল হবো?

—বুড়ো? তুমি আবার বুড়ো কোথায়? পুরুষ মানুষ কখনও বুড়ো হয়?

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তার কানে কিন্তু তখন এসব খবর কিছুই পৌঁছোচ্ছে না। জিতেন-কাকা গাড়ি নিয়ে তাকে হোটেলে পৌঁছে দিতেই সে তখন সোজা হোটেলের পানশালায় চলে গেছে। সেখানে তখন পুরোদমে মিউজিক চলছে। এমন মিউজিক চলছে যা কানে গেলে নীল রক্তও লাল হয়ে ওঠে। তার ওপর পলি হলো গিয়ে লর্ডের মেয়ে। লর্ডের আদুরে মেয়ে। সে তো ট্রপিকে ফুর্তি করতেই এসেছে। তার রক্তও তাকে জড়িয়ে ধরেই নাচতে শুরু করে দিলে। আরো অনেক জোড়া তখন সেখানে নাচছে।

সঙ্গে সঙ্গে ডবল-ভাস, চেলো, ভায়োলিন আর পিয়ানো, তারা আরো মুখর হয়ে উঠলো। মদের বারে আরো ভিড় বেড়ে গেল। টাকা আনা পয়সা পাহাড় হয়ে জমতে লাগলো কাউন্টারে।

মিস্টার উইলিয়াম হেন্ডারসন আসলে কারবারি লোক। ছোটবেলায় সবাই ভেবেছিল ছোকরা অপদার্থ। কিন্তু তারপরে কেমন করে কোন্ ভাগ্যচক্রে এসে পড়েছিল এই ইণ্ডিয়ায়। সাহেব এখানে এসে দেখলে এ এক অপরূপ রাজ্য। সাদা চামড়া দেখলেই এখানকার লোক ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। এখানকার লোকের কাছে সাদা হলেই সে দেবতা। কিম্বা স্বর্গের দেবতাও বুঝি মর্ত্যের মানুষের কাছে এত পুজো পায় না। স্বর্গের দেবতারা পুজো পায় বারো মাসে তেরোবার, আর এই সাদা চামড়ার দেবতারা পুজো পায় অষ্টপ্রহর। এমন দেশ হেন্ডারসনস সাহেবরা আর কোথায় পাবে? আর একবার যখন এখানে এসে পড়েছ তখন আমার জাত-ভাইদের তো আর আমরা উপোস করে মরতে দেব না। নিজের দেশে যা-হয় হোক, প্রবাসে আমরা সবাই এক। কেউ পর নও তোমরা।

তারপর আস্তে আস্তে কারবার করে টাকা জমানো, বাড়ি করা, সংসার করা, বিয়ে করা সবই হলো। তারপর যখন অনেক টাকা জমে যায় তখনই মানুষের আরাম করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঠিক আরাম করবার সময়েই পার্টনার মরিস একদিন হঠাৎ মারা গেল। তখন আর কোথায় আরাম? পুরোদমে তখন ব্যবসায় অষ্টির মন দিতে হলো। একটা বড় যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন। সেই যুদ্ধেতে একেবারে লাল হয়ে গেল সাহেব। তবু ব্যবসার নেশা মাথা থেকে ছুটলো না। শুধু ব্যবসার নেশা নয়, ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে যখন সারা জীবনটা কাটাতেই হবে তখন জীবনটাকে যতটুকু পারো ভোগ করে নাও। তখন ক্লাবে যেতে লাগলো সাহেব, বাড়িতে পার্টি দিতে লাগলো। এতোদিন টাকা উপায় করেছ এখন খাও-দাও-ফুর্তি করো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য তো আর কোনও দিন অস্ত যাবে না।

এমনি করেই চলছিল কলকাতার ইংলিশ সমাজ। সেই সমাজের মধ্যে হঠাৎ আর একজন ইংলিশ মেয়ে এসে হাজির হলো। যে মেয়ের টাকারও শেষ নেই, যৌবনেরও শেষ নেই।

একদিন মিসেস হেন্ডারসন রাত দশটার সময় ক্লাবে এসে হাজির। আসাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যেটা অস্বাভাবিক সেটা মেমসাহেবের চোখের চাউনি। মদ খেলে চোখ লাল হয় সেটা জানা কথা। কিন্তু এ লাল যে অন্য রকম লাল।

সাহেব তখন অন্য অনেকের মত বেশ নেশা করে নাচছে। জোড়ায়-জোড়ায় নাচ। সেই পলিও সাহেবের কণ্ঠলগ্ন হয়ে চোখ ঢুলু-ঢুলু করে তখন বেশ মশগুল। কিন্তু মিসেস হেন্ডারসনের কেমন যেন সন্দেহ হলো। নাচাটা দোষের নয়। নাচো না, যত খুশী প্রাণ ভরে নাচো। ইণ্ডিয়াতে এসেছ বেড়াতে ফুর্তি করতে। আরো কী-কী করতে তা লর্ড'ই জানে। কিন্তু অমন করে

আঁকড়ে জড়িয়ে ধরা কেন? অত মুখের কাছে মুখ নিয়ে যাওয়া কেন? অত ঘেঁষাঘেঁষি হওয়া কেন?

অনেকক্ষণ ধরে জিনিসটা লক্ষ্য করলে মেমসাহেব। আশেপাশের দু'একজন বন্ধু-বান্ধব এলে উইশও করলে। কিন্তু সেদিকে চোখ ফেরালে না মেমসাহেব।

একটু পরে একেবারে সোজা গিয়ে হেন্ডারসন সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—উইলি—

উইলি অবাক। পলিও অবাক। মাঝ পথে নাচ থামিয়ে দিয়ে সাহেব বললে—কী হলো, তুমি কখন এলে?

মেমসাহেব সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে—উইলি, লেটস্ গো হোম, চলো, বাড়ি চলো উইলি—

—এত সকাল-সকাল কেন?

—হোক সকাল-সকাল। আমার ভালো লাগছে না।

সাহেবের তখনও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছিল না। সবে তো মাত্র মজা জমে উঠেছে। আর কয়েকটা রাউন্ড না নাচলে কি খাবার হজম হয়?

বললে—আর একটু ওয়েট করো না, তুমিও কারো সঙ্গে নাচো না—ওই তো, বার্টলে খালি রয়েছে—

—না কিছুতেই না, ইউ মাস্ট কাম—

বলে উইলির হাত ধরে টানাটানি আরম্ভ করে দিলে। পলি দেখলে মিসেস হেন্ডারসন তার [illegible]কে নিয়ে [illegible] বাইরে চলে গেল।

[illegible] এ না [illegible]। ইন্ডিয়া [illegible] ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া হলো ব্রিটিশদের [illegible]। এখানে তো কেউ থাকবার নেই। দু'দিনের জন্যে আসা। তারপর ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবে সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে মালয় স্টেটস। তারপর বোর্ণিও জাভা ফিলিপাইনস—

*

কিন্তু সেইদিনই শেষ নয়। সেদিন মেমসাহেব হঠাৎ উইলির অফিসে গিয়ে দেখে পলি একেবারে উইলির কোল ঘেঁষে বসে আছে তার ঘরে।

সেদিনও চমকে গেছে দু'জনেই। কারণ মেমসাহেব অফিসে বড় একটা আসে না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছিল বহু দিন থেকেই। মিসেস বার্টলি, মিসেস গার্ডনার, মিসেস ক্যাথেরিন সকলের মুখেই ওই এক কথা। কী রকম মোটা উরু, কী রকম খাই-খাই চোখ মুখের ভাব। এ মেয়ে তো সোজা নয়। এ যে সমস্ত এম্পায়ার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

আপনার ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখুন!

এবারে গরমের সময়ে ঘামাচিতে কষ্ট পাবেন না!

অতিরিক্ত ঘামের জন্যে ঘামাচি হয়। নাইসিল চমৎকারভাবে ঘামাচি রোধ করে।

- নাইসিল সহজেই ঘাম শুকিয়ে ফেলে।
- নাইসিল বহুক্ষণ শরীরে লেগে থাকে।
- নাইসিল-এ ক্লোরফেনেসিন এন্টিসেপটিক থাকায় তাড়াতাড়ি ঘামাচির বীজাণু নষ্ট করে।
- মোলায়েম নাইসিল ব্যবহারে আরাম পাওয়া যায়। ঘাম গন্ধ দূর করে শরীরকে স্নিগ্ধ নির্মল করে তুলুন। সুরভিত এন্টিসেপটিক নাইসিল ব্যবহার করুন।

গ্ল্যাক্সোর তৈরি দেহরক্ষী পাউডার

নাইসিল

dCP/GLN/2 ben.

হয়েছে, এই কালই তো দেখলুম মিস্টার হেণ্ডারসন পলিকে নিয়ে সিনেমায় ঢুকলো—

কথাটা শুনে প্রথমে খুব রেগে গিয়েছিল মিসেস হেণ্ডারসন। ভেবেছিল তখনই কোর্টে গিয়ে একটা ডিভোর্স-সুট ফাইল করে আসবে। কিন্তু কিছুক্ষণ ভাবার পর একটু মাথাটা ঠাণ্ডা হলো। তখন একটা মতলোব ভেঁজে বার করলে। একেবারে মোক্ষম মতলোব।

সেই দিন দুপুরে বেলাই মেমসাহেব টেলিফোনে ডেকে পাঠালো জিতেনকে।

অফিস থেকে খবর পেয়ে জিতেন-কাকা এল। ভয়ে তখন তার প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছে।

মেমসাহেব বললে—জিটেন, কাম্ হিয়ার—বলে একেবারে বেড্-রুমের ভেতরে নিয়ে গেল তাকে।

বললে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে জিটেন। পারবে?

—কী কাজ মেমসাহেব?

—বলো পারবে কি না?

নিমক্ খায় মেমসাহেবের, পারবো না-ই বা বলে কী করে?

বলে ফেললে—পারবো ম্যাডাম।

শুনে যেন খুব খুশি হলো মেমসাহেব। তখনই কাকে টেলিফোন করে দিলে। দেবার খানিক পরেই কাদের আলি এসে হাজির। কাদের আলি তখনকার দিনে কলকাতার মস্ত নামজাদা ওস্তাগর। বড় বড় লাট-সাহেবরা পর্যন্ত কাদের আলির তৈরি কোট-প্যাণ্ট পরে।

জিতেন-কাকাকে দেখিয়ে মেমসাহেব বললে—এর একটা সুট্ করে দিতে হবে কাদের, খুব ভালো সুট। সাহেবকে যে-রকম সুট করে দাও তার চেয়েও ভালো। যত টাকা লাগে, বেস্ট কাপড় বেস্ট সেলাই হওয়া চাই। তুমি মাপ নাও—

কাদের আলি তখনই মাপ নিতে লাগলো। তখনও জানে না কীসের জন্যে কেন তার সুট করিয়ে দিচ্ছে মেমসাহেব।

—কবে চাই?

—আজই সন্ধ্যেবেলা। আরজেণ্ট!

—আজ হবে না মেমসাহেব। কাল সন্ধ্যেবেলা হবে। কাল সকাল বেলা শুধু একবার ট্রায়াল দিয়ে যাবো।

—ঠিক হ্যায়।

ওস্তাগর চলে গেল। জিতেন-কাকা বোকার মত তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই এত দামী সুট কেন দিচ্ছে তাকে মেমসাহেব। এই সুট পরে কী কাজ করবে তাও জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হলো না।

পরের দিন সকাল বেলা কাদের আলি সুট পরিয়ে ট্রায়াল দিয়ে নিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা শুধু সুটই নয়, শার্টও দিয়ে গেল। ওয়েস্ট-কোট দিয়ে গেল। হগ মার্কেটে গিয়ে ভালো জুতো পায়ে পরিয়ে দিয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে মোজা। আর গেঞ্জী। টাই।

বাড়িতে এসে মেমসাহেব বললে—এগুলো পরো—

বাইশ বছর মাত্র বয়েস তখন জিতেন-কাকার। চেহারা ভালো, স্বাস্থ্যও ভালো। জুতো মোজা গেঞ্জি, সুট টাই পরিয়ে দিয়ে মেমসাহেব বললে—ভেরি গুড, খুব ভালো দেখাচ্ছে তোমাকে। তোমাকে মেয়েরা লাইক করবে—

তখনও কিছুই বুঝতে পারছিল না জিতেনকাকা। ওদিকে মেমসাহেবও তৈরি হয়ে নিলে। খানিক পরে গাড়ি বার করতে বললে—

জিতেনকাকা সেই পোশাক পরেই গাড়ি চালাতে লাগলো। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। রাস্তায় বাতি জ্বলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। গাড়ি গিয়ে চৌরঙ্গীর একটা হোটেলের সামনে থামলো। মেমসাহেব গাড়ি থেকে নেমে বললে—গাড়ি রেখে তুমি আমার সঙ্গে এসো—

এ যেন সেই রূপকথা! মেমসাহেবের সঙ্গে জিতেনকাকাও হোটেলের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। হোটেলের ভেতরটা যেন সত্যিই রূপকথার রাজ্য। সেযুগে সত্যিই তাই ছিল। জিতেনকাকাকে আর চেনবার উপায় নেই তখন। সাহেবি পোশাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে সত্যি-সত্যিই একেবারে সাহেব হয়ে গেছে জিতেনকাকা। আর গায়ের রংটাও তার ফরসা ছিল কি না! একেবারে ধরবার উপায় নেই কারো।

কোণের দিকের একটা নিচু টেবিলে গিয়ে বসলো দুজনে। মেমসাহেব হুইস্কির অর্ডার দিলে দুজনের। বয় এসে দুটো গেলাস আর সোডা দিয়ে গেল। জিতেনকাকা আগে ওসব কখনও খায়নি। সাহেব মেমদের খেতেই শুধু দেখেছে এতদিন। গেলাসটা

নিয়ে চুপ করে বসে ছিল। ভাবছিল কী করবে।

মেমসাহেব বললে—খাই, খাও—

জিতেনকাকা বললে—কিন্তু এসব আমি তো খাই নি কখনও মেমসাহেব—

—তবু খাও। আমি যা বলছি তাই করো।

জিতেনকাকা তারপর সত্যিই খেলে।

—কেমন লাগছে?

খারাপ বললে মেমসাহেব খুশি হবে না বলেই জিতেনকাকা বললে—ভালো—

—ভালো জিনিস কেন ভালো লাগবে না? তবে হুইস্কি বেশি খেতে নেই। যেটুকু খেলে উপকার হবে সেইটুকুই খাবে। তার বেশি নয়—এ বড় পাজি নেশা—

—এর দাম কত মেমসাহেব?

দাম শুনে চমকে উঠলো জিতেনকাকা। গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত বংশের ছেলে। তার কপালে যে এমন সৌভাগ্য হবে কে ভাবতে পেরেছিল?

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। ক্রমে রাত অনেক হলো। হোটেলের মিউজিক আরো জোরে বাজতে লাগলো। ডবল-ডাস চেলো, ভায়োলিন আর পিয়ানো আরো মুখর হয়ে উঠলো। নেশা আরো নিবিড় হলো। মেমসাহেব একজন ওয়েটারকে ডেকে খবর নিতে বললে দু'শো বারো নম্বর ঘরের বোর্ডার ফিরে এসেছে কিনা। ওয়েটার ফিরে এসে খবর দিলে—ফিরেছে—

মেমসাহেব জিতেনকাকার দিকে ফিরে বললে—এবার তুমি ওঠো।

জিতেনকাকা জিজ্ঞেস করলে—বাড়ি যাবো?

মেমসাহেব বললে—না, আমি এখানে বসে থাকবো। তুমি দু'শো বারো নম্বর ঘরে যাও, গিয়ে মিস পলির সঙ্গে দেখা করবে।

—আমি? মিস পলির সঙ্গে দেখা করবো? কেন? দেখা করে কী করবো?

মেমসাহেব বললে—যা বলছি তাই করো, আমার হুকুম—মাই অর্ডার—

—কিন্তু আমায় যদি তাড়িয়ে দেয়?

—তাড়িয়ে দেবে কেন? তাহলে কীসের জন্য তুমি বাইশ বছরের ছোকরা হয়েছ? কীসের জন্য তোমায় এত দামী ড্রেস করিয়ে দিয়েছি? কীসের এতক্ষণ ধরে হুইস্কি খাইয়েছি? এসব নিয়ে তোমার পেছনে কত টাকা খরচ করেছি তা জানো? সব কি মিছিমিছি বলতে চাও?

—কিন্তু আমি গিয়ে কী করবো সেখানে?

মেমসাহেব বললে—পলি আনম্যারেড, তুমিও আনম্যারেড, এর চেয়েও কি বেশি খুলে বলতে হবে তোমাকে?

জিতেনকাকা সেখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। এ কী হুকুম দিচ্ছে মেমসাহেব! তখন যেন তার সমস্ত নেশা উবে গেছে।

মেমসাহেব বললে, যা বলছি তাই করো। আমার হুকুম, মাই অর্ডার—

মেমসাহেব ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—যাও—গো—

ধমক খেয়ে আর দাঁড়ালো না জিতেন-কাকা। আস্তে আস্তে বাইরের কোরিডোরে গিয়ে পৌঁছোল। সেখান থেকে বাঁয়ে বেঁকে সোজা গেলেই একটা লিফট। লিফট-ম্যানকে জিজ্ঞেস করে দু'শো বারো নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়ালো। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। একটু টোকা দিলেই হয়ত মিস পলি দরজা খুলে দেবে। তারপর? তারপর কী বলবে সে? যদি ভালো করে ইংরিজী বলতে না পারে? দু'একটা ইংরিজী কথা বুঝতে কিম্বা বলতে অবশ্য শিখে গেছে। কিন্তু ওই সব কথা বলবে কী করে? ইংরিজী দূরের কথা, ওসব কথা কি বাঙলাতেই বলা যায়?

কিছু ভাবতে না পেরে জিতেনকাকা যে-রাস্তা দিয়ে গিয়েছিল সেই রাস্তা ধরেই আবার ফিরে এল মেমসাহেবের কাছে।

—কী হলো? ফিরে এলে যে? ঘরে কেউ নেই?

জিতেনকাকা বললে—আছে, কিন্তু দরজায় টোকা দিয়ে ডাকতে বড় ভয় করলো। আমি পারবো না। আমায় আপনি ক্ষমা করুন মেমসাহেব—

মায়ের থেকে মেয়ের কাজে ধারাবাহিকভাবে
চলে আসছে উডওয়ার্ডস'এর বাণী

আপনার বাচ্চাকে সুস্থ আর সুখী রাখে

উডওয়ার্ডস্

গ্রাইপ ওয়াটার

বংশানুক্রমিকভাবে বুদ্ধিমতী মায়েরা উডওয়ার্ডস্ গ্রাইপ ওয়াটার দিয়েছেন নিজের ছেলেমেয়েদের। পেটব্যথা, অম্লতা, পেট ফাঁপা আর দাঁত ওঠার কষ্টে উডওয়ার্ডস্ মুহূর্তেই আরাম দেয়।
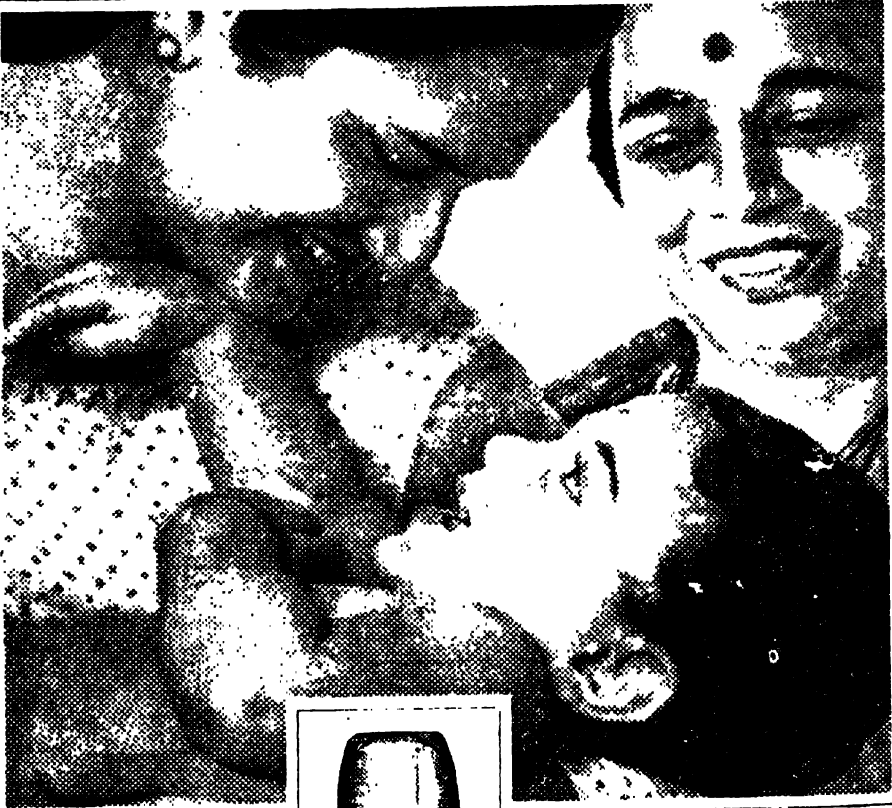
নিরাপদ থাকুন
নিশ্চিন্ত থাকুন
সবসময় একশিশি
কাছে রাখুন।

উডওয়ার্ডস্ গ্রাইপ ওয়াটার
শতাধিক বছর ধ'রে
বুদ্ধিমতী মায়েরা
ব্যবহার করছেন।

AS.32 BN

আপনার সন্তানের হোক
ভালো চোখের দৃষ্টি
ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি হলে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টির ক্ষতি হতে পারে। প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স— আপনার বাচ্চাকে তার প্রয়োজনীয় "চোখের ভিটামিন" যোগায়—পুরোমাত্রায়।
সুস্থ রক্ত
৫ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতবাসীর আহারে লোহার অভাব থাকে। অথচ সুস্থ রক্তের জন্যে লোহা একান্ত প্রয়োজন। নারীত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে এমন বাড়ন্ত মেয়ের পক্ষে বিশেষ করে দরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে লোহা। দিনে মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স লোহার এই চাহিদা মেটাতে পারে।
মজবুত হাড়
বাড়ন্ত বাচ্চাদের হাড় ঠিকমত গড়ে তোলবার জন্যে দরকার ভিটামিন 'ডি'। কারণ, খাবারে যে ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস থাকে, ভিটামিন 'ডি' তা বেশী করে কাজে লাগাতে পারে। ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে "হাড়ের ভিটামিন" আছে।
MINADEX
SYRUP
MINADEX
GLAXO
অল্প দাম স্বাস্থ্যে ভরপুর!
সিরাপ
মিনাডেক্স ®
তিনগুণের এক টনিক— গ্ল্যাক্সোর তৈরী
প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করুন। কমলালেবুর স্বাদগন্ধে ভরা সিরাপ মিনাডেক্স ওর ভালো লাগবেই। সিরাপ মিনাডেক্স-এর দাম খুব অল্প অথচ আপনার বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্যে কত উপকারী।
১৭০ মি. লি. মাত্র ৪টা: ৫৫প:
৩৪০ মি. লি. মাত্র ৭টা: ৮৬প:
ট্যাক্স অতিরিক্ত
গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরিজ (ইন্ডিয়া) লিঃ
CMGM-2-234 R SEN

॥ ষোলো ॥

'তা হলে এই পটানো কাজটি আপনার নয় আপনি বলতে চান?' জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

কী করে বলি? আপনার সম্বন্ধে কি সঠিক কখনো জানা যায়? নিজের রহস্য কি টের পায় কেউ? আপনার জন্ত মিলেছে কারো? সেই গুরু গোবিন্দর পর বলুন, পেয়েছি আমার শেষ—এমন গুরুতর কথা কটা লোক আর আওড়াতে পেরেছে? হাজার আত্মবিশ্লেষ করেও আত্মাবিষ্কার হয় না মশাই! এই কথাই আমি বলতে চাই।

সে তত্ত্বকথা বলুন না গো! অত ঘোরপ্যাঁচ যাচ্ছেন কেন!'

কিন্তু সহজ কথা যায় কি বলা সহজে! আমাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ বিশদ করা কি সোজা? কটা কাজ আমরা প্রকাশ্যে করি সকটাই বা আমাদের জ্ঞাতসারে হয়? প্রদীপ জ্বালার আগে যেমনটা সলতে পাকানো, অনেকটাই ত আমাদের অন্তলোকের অবচেতনায় ঘটে থাকে। ক্রিয়াকলাপের বেশির ভাগই আমাদের অন্তরগত, লোকলোচনের অন্তর্গত হবার নয়।

'এমন কাজ আপনি করতে পারেন বিশ্বাস হয় না।'

বিশ্বাস হয় না, যথার্থ। আমারও। আবার অবিশ্বাস করতেও প্রাণ চায় না। এমনতর নিজের নৈপুণ্য মনে মনে আমি কল্পনা করেছি অনেক। পটনকর্ম ত একটা শিল্পকর্মই, কর্মশিল্পও বলা যায়। পটনশিল্পী—পটশিল্পীর চেয়ে কিছু কম নন। আর, আমি কি এককালে (এই লিখিয়ে না হয়ে) পটুয়া হতেই চাইনি? চায় না কি লেখকরা? বিস্তর লেখালেখির পর রেখার হরিহরছত্রেও কি পটুত্ব দেখা যায়নি কারো কারো?

সন্দেহদের শুধু চিত্তপটে ধরে না রেখে (কিন্তু না রাখা যায় অমন করে?) চিরদিনের তরে চিত্রপটে বেঁধে রাখতে চাইনি কি?

দেখুন, এ বিষয়ে আমি সন্দেহবাদী জনাবরাহাদুরের প্রতি আমার জবাবঃ 'সব ব্যাপারের মতন এখানেও আমার একটুখানি সংশয় আছে। আমার কী মনে হয় জানেন—হয়ত আমিই করেছিলাম এই কর্ম, কিংবা হয়ত......হয়ত বা, আমার মতন অন্য কোনো পাপিষ্ঠ এই দুষ্কার্য করে থাকতে পারেন। পটিয়সীদের ওপরে পটিয়স হবার দক্ষতা আমার আছে জানলে স্বভাবতই আমার গর্ব হয়, কিন্তু কে জানে, আমার ওপরেও টেক্কা মারার মতন আরও কোনো টেকচাঁদ ঠাকুর থাকতে পারেন। আমার চাইতেও বাহাদুর কেউ নেই কি আর?'

'তাহলে আপনার কোনো ডবল? আপনি বলতে চান?'

'অবিকল। ঠিক ধরেছেন আপনি। আমার প্রবল সন্দেহ তাই। ফুয়েরার হিটলারের যেমনটি ছিল বলে শোনা যায়—তাঁরা বোধ হয় কখনো ফুয়েরার নন। আমি একবার ওয়েলিংটন-ধর্মতলার মোড়ে কল্পতরু আয়ুর্বেদ ভবনে সুভাষচন্দ্রের মতন বজ্ঞানিস্থ একজনকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেছলাম। পরে জানা গেল, উনি সেই দেশনায়ক নন, কবিরাজ গণনাথ সেনেরই কে যেন হন।'

'দেখেছিলেন নেতাজীর অন্তর্ধানের পরে? সত্যি?'

'তা বই কি। সেই রকম কেউ হয়ত আমার অনুরূপ ধারণ করে আমার ওপরে এই হাঁটি করে যাচ্ছেন বারম্বার—যদিও তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ভেড হাঁট হয়নি এখনো অব্দি। তিনিই হয়ত আমার বিয়ের সাধটা মিটিয়ে গেছেন। আমার বংশরক্ষার শখও মিটিয়েছেন কি না কে জানে।...... তাহলে তো আমার...আমাদের মৃত্যুর পর জলপিণ্ডির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

'পুত্রপিণ্ডের প্রয়োজনেই ভার্যাবরণ করা হয়, শাস্ত্রে বলে। জানি।'

হ্যাঁ। আর পুত্র পিণ্ডের ভরণপোষণ মানুষ করার দায় থেকে বেঁচে গিয়ে নিখরচায় যদি ঐ পুত্রপিণ্ড, পুত্র আর পিণ্ড, আলাদা আলাদা, রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে কারো যোগানো পাওয়া যায় মন্দ কি!'

'আপনি ভাগ্যবান! খেটে মরলো হাঁস, ডিম খেল দারোগাসাহেব!'

'তাই ত হয় মশাই, এক একজনের বরাতে অমনিধারা। বর না হয়েও কনে পায় তারা—ঘরের কোণেই মিলে যায় অবলীলায়। আমার কী মনে হয় জানেন? ঐ মহাপ্রভু! উনিই! আমায় কোনো মেয়ে দিয়েছেন কি না এখনো জানিনে, তবে আমায় ঐ এম-এ

কবির ভাষায় বলা যায়। আমার দৌড় ওই মসজিদ অবধি—ছিঁচকে ব্যাপার—প্রাণ বাঁচানোর দায়ে-করা ছিঁচকেমি যত। সেই ছিঁচকাদুনি আর গাইতে চাইনে। বাঁচতে হলে মানুষকে এক আধটু ক্রাইম করতেই হয়—অবশ্য সবদিক বাঁচিয়ে—আইনের দিকটাও—না হলে চলে না। আর বাঁচার মতন বাঁচতে হলে সময় সময় কিছু কিছু সিন না করলেই নয়। এই আমার ধারণা। তবে বাঁচোয়া এই যে, তার অনেকখানিই আমরা মনে মনে সারি—বাক্যে এবং কার্যে পারি না। বেশির ভাগই আন্তরিক উপভোগ।' আমি যোগ করি: 'আর আসলে সুখ দুঃখ তো আমাদের মনেই মশাই! জন্মভূমির মতন আমাদের মনোভূমিও তো স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। স্বপ্নসাধ আর স্মৃতিসুখ—এই নিয়েই তো আমাদের আধখানা বাঁচা। আধেক জীবন।'

'সমাজে বাস করে অপরাধপ্রবণ হওয়া উচিত নয়।' তাঁর সুচিন্তিত অভিমত।—অপরের চেয়েও নিজের মনেই তার প্রতি-ক্রিয়া বেশি হয়।'

'তা তো বটেই। জানি, অপরাধ করলে একটা অপরাধবোধ সর্বদাই মনের মধ্যে খোঁচায়, তেমনি আবার কোনো কোনো অপরাধ না করলে নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকতে হয়।...পস্তাতে হয় জীবন-ভোর।'

'জানি না ঠিক। এবার শুনি আপনার কারাবাসের কাহিনী। সময়টা খুব কষ্টের ছিল নিশ্চয়?'

'কষ্ট কিসের! অমন সুখের সময় আর আসেনি আমার জীবনে। আমার বিশ্বাস সহজে লোকে জেলে যেতে পারে না বলেই সাধ করে বিয়ে করে—ওই জেলে না যাওয়ার দুঃখ ঘোচাতেই। ওই জাতীয় একটা সুখের লোভে নিজের বাড়িতেই জেলখানা এনে বানায়। হাতে পায়ে শেকল বাঁধে।'

'তবে জেলখানাকে নরক ভোগ বলে কেন মশাই?' আমার কথায় তিনি বেশ একটু অবাক হন।

'ভিন্ন রুচির লোক—তাই থাকে না? তাই হবে বোধহয়। জেলখানার বিচার তো জেলের খানা দিয়েই। প্রেসিডেন্সি কি আলিপুরের জেলে থাকতে—কোনটায় ছিলাম জানিনে, তবে এটা বলতে পারি যেখানেই ওই চুয়াল্লিশ ডিগ্রী বিরাজিত সেইখানেই—খাওয়াটা ছিল একেবারে যাচ্ছেতাই। একটা জগা খিচুরির মতন খেতে হত আমাদের—নাম ছিল তার লপসি। সহজে গলা দিয়ে গলতে চাইত না। কিন্তু সেখানকার সেল থেকে বেরিয়ে বহরমপুরের জেলে গিয়ে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পেলাম। সেখানকার খানাই ছিল আলাদা। মাথাপিছু তিন টাকা করে বাঁধা ছিল সবার—সেই টাকায় কী এলাহী খাওয়া হোতো যে! তা কহতব্য নয়।'

'বটে বটে?'

'সেখানে গিয়ে জে এল বাঁড়ুয্যে, নজরুল ইসলামের দেখা পেলাম। আলাপ হোলো কবি বিজয় চাটুজ্যে, বিপ্লবী বীর পূর্ণ দাসের সাথে। আরো কে কে যেন ছিলেন মনে পড়ে না এখন—তাঁদের প্রত্যেকেই দিকপাল। কাজী নাকি ছোটবেলায় সে নাকি কোথায় বাবুর্চির কাজ করেছে—সব রকমের রান্না জানে। প্রমাণ দেবার জন্যে সবার রান্নাটা সেই করত। আর কী খানাই যে বানাত মশাই কী বলব! বিরিয়ানি পোলাও থেকে শুরু করে চপ কাটলেট কোপ্তা কোর্মা কাবাব কারি—কাবাব আবার নানা কিসিমের—শিক এবং নন-শিক্—কারিকুরি কত না!'

'রান্নাবান্না ছাড়া আর কিছু করত না কাজী?'

'তার গানে কবিতায় আবৃত্তিতে গল্প-গুজবে আড্ডায় মাতিয়ে রাখত। এমন মজার মজার কথা কইতো সে! অমন প্রাণোচ্ছল প্রদীপ্ত যুবক জীবনে আমি আর দেখিনি।' খানাকুলের থেকে আমি কৃষ্ণ-নগরের দিকে এগোই—'তার প্রেমের গান সেইখানেই শুনেছিলাম। তার বিদ্রোহের কবিতার পাশাপাশি দোলনচাঁপার কাহিনী। প্রেমের স্মৃতিচারণ তার অবিস্মরণীয় যতো গজল। সোজা গজালের মতন গিয়ে গেঁথে যায় মগজে।'

'বিদ্রোহের গানটান গাইত না?'

'গাইত না আবার। তার বিদ্রোহী কবিতাটার আবৃত্তি তার মুখে বার বার

শুনেলাম। আর বিপ্লবের যতো গান! কারার ঐ লৌহকপাট/ভেঙে ফ্যাল করে লোপাট/রক্তজমাট/শিকল পুজোর পাষাণ-বেদী/ওরে ও পাগলা ঈশান/বাজা তোর প্রলয় বিষাণ/রক্তনিশান/উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি।' মনে হয় এ-গানটা তার ঐ জেলেই বাঁধা। কী উল্লাসে গাইত যে!'

'আর কী করত কাজী?'

'তাছাড়া কবিগুরুর গানও গাইত একেক সময়। তার মুখে কবির ঋতু পর্যায়ের গান-গুলো এমন ব্যঞ্জনা পেত যে বলা যায় না। তোমারি গেহে/পালিছ স্নেহে/তুমি ধন্য ধন্য ধন্য হে! কবির এ গানটার এমন চমৎকার এক প্যারডি বেঁধেছিল সে। গেয়ে গেয়ে সেটা শুনিয়েছেও আমাদের।'

'গানটা কী শুনি।'

'আমি তো গাইতে পারব না, শোনাতে পারি—তোমারি জেলে/পালিছ ঠেলে/তুমি ধন্য ধন্য হে!/তোমারি অশন/তোমারি বসন/তুমি ধন্য ধন্য হে!

'আপনারা বেশ আরামেই ছিলেন দেখা যাচ্ছে সেখানে। তবে জেলখানাকে এত মন্দ জায়গা বলত কেন লোক?'

'মন্দের ভালোটা তারা দেখতে পেত না তাই। ভালোর ভালো বলে এই দুনিয়ায় কিছু তো নাই। মন্দের ভালোই সত্যিকার ভালো। তাই নিয়েই খুশি থাকতে হয়। আমাদের কবিও কি সেই কথাই বলে যাননি? অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো/সেই তো তোমার আলো/সকল দ্বন্দ্ববিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো/সেই ত তোমার ভালো! বলেননি কি তিনি?

'জেলখানাটা আপনার বরাতে দেখছি এক রাজযোটক হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়। আমার স্বনামধন্য সেই ভদ্র-লোক আমার হয়ে কষ্ট করে পাশটাশ করে-ছেন, বে থাও করেছেন, সেজন্যে আমার কোনোই ব্যথা নেই, কিন্তু কী ভাগ্যি, তিনি আমার হয়ে এই জেলটাও খাটেননি—তাহলে, সত্যিই! কী সর্বনাশ যে হত আমার! এইসব অন্তরঙ্গদের সংগসুখ পেতাম না। যথার্থই সর্বহারা হতাম। রাজযোটক তো বটেই। যত রাজাগজার সঙ্গে যোগাযোগ সেই সুযোগেই আমার ঘটল তো! আর সেই খানা! জেলখানার সেই খানা। অহামরি! কার সঙ্গে তার তুলনা করি। মনে পড়লে এখনো জিভে জল সরে। আমি নিজেকে যেন সজিভ বোধ করি আবার। আহা, তেমনটি আর জীবনে কখনো খাইনি।'

কী বলেন যে!'

'আরে মশাই! এই চেহারা আমি ফিরিয়ে আনলাম সেই জেলের থেকেই। বলব না? আগে তো আমি এই কড়ে আঙুলটির মতই টিঙটিঙে ছিলাম। কোনো ব্যায়াম-টায়াম করে নয়, টনিক ফনিক মেরে না, জল-বায়ু পরিবর্তনেও নয়কো, সেই কড়ে আঙুলের ন্যায় চেহারা নিয়ে গিয়ে চেহারা হয়ে ফিরলাম! এই [illegible] আঙুলের মত হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেরিয়ে এলাম বহরমপুরের সেই গারদ থেকেই। দেখছেন ত বেঁটেখাটো আমার এই প্রতীকচিহ্ন! দোর্দণ্ড প্রতাপ ব্রিটিশ সরকারকে আমার এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে এলাম। আর, তার-পর থেকে......।

'তারপর থেকে?'

তরপর থেকে জেলখানায় আর জেলের খানায় গড়া এই মোগলাই চেহারা একটু খানিও টসকায়নি আমার। সেইরকমটিই রয়ে গেছে প্রায়। আদ্দিন বাদেও এখনো আমার সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই দেখাচ্ছি আমি সবাইকে।'

জবাবে কাজীর প্যারডির একটি পংক্তিই তিনি পুনরুচ্চারণ করলেন—'তুমিই ধন্য ধন্য হে!'

সত্যি বলতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুদ্রাযন্ত্র তার দুঃশাসনী কারাগারের খর্পর থেকে আমার এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার অদ্বিতীয় কৃতিত্বের জন্য নিজেকেই কি আমার ধন্যবাদ দেবার ইচ্ছে করে না একেক সময়?

[ক্রমশঃ]

সুলভ মূল্যের পেপারব্যাক সংস্করণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — **আরণ্যক** ৪·৫০

বিমল মিত্র — **স্বরসতীয়া** ১·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — **রঞ্জনা** ১·৫০

ওগো বধূ সুন্দরী মনোজ বসু ॥ ১·৫০

এই বইগুলিতে পাঠকদের ২০% Discount দেওয়া হচ্ছে।

মন্মথ বসু / অনিল দাস সম্পাদিত

নতুন চীনের গল্প ৪·০০

নতুন চীনের কবিতা ৩·০০

চীনের গল্প / কবিতার আধুনিক সংকলন
পাঠকদের সুবিধার্থে ২০% Discount দেওয়া হচ্ছে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ

কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য-চতুষ্টয়। মূল্য ১২·০০ (২০% কমিশন বাদে ৯·৬০)

বনলতা সেন/রূপসী বাংলা/মহাপৃথিবী/ধূসর পাণ্ডুলিপি

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদ স্মরণে

ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার মানুষ বরকত, সালামের মত শহীদদের রক্তরাঙা মাটি ছুঁয়ে যে আন্দোলনের শপথ নিয়েছিল, তা আজও শেষ হয়নি। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন আজ রচনা করতে চলেছে নূতন ইতিহাস। এই শুভ মুহূর্তে ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই শহীদদের স্মরণে প্রকাশিত হয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী ৮·০০
সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমান

একুশের রক্তে ৫·০০
সম্পাদনা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সৈয়দ মুজতবা আলীর

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ২·৫০

এপার বাংলায় প্রকাশিত ওপার বাংলার কবি
শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

নিজ বাস ভূমে ৪·০০

নবজাতক প্রকাশন C/o বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

(সি ২৫)

নিগূঢ়ানন্দের

মোগল সন্ধ্যা ৭,

প্রশান্ত রায়চৌধুরীর

লাল গোলাপের পাপড়ি ৭,

শক্তিপদ রাজগুরুর

মনমোহানা ৭,

বসু [illegible]/[illegible], কলি—১০

(সি ১৮০০)

অভিযাত্রী'র
অবনীন্দ্র সংকলন

সম্পাদক—বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

অবনীন্দ্র প্রসঙ্গে/দেবীপ্রসাদ রায়
অবনীন্দ্রস্মৃতি/মৈত্রেয়ী দেবী
অবনীন্দ্র-চিত্রের রূপরহস্য/
অলোক রায়
অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য/
পুলক চন্দ ও যীশু চৌধুরী
ঠাকুরবাড়ীর অবন ঠাকুর/প্রভাত দাস
অলৌকিক অবনমহল/সুধীন মিত্র
বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী প্রসঙ্গে/
অসীম রেজ
সাম্প্রতিক শিল্পকলা : অবনীন্দ্রনাথ/
তপনলাল ধর
অবনীন্দ্রনাথের ওপর একটি চিত্রনাট্য
এবং তার সমালোচনা/
নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও সোমেন ঘোষ
অবনীন্দ্র-সৃষ্টির সালতামামি/
মঞ্জুমিতা মিত্র
সাম্প্রতিক কবিতার বিস্তৃত
সমালোচনা/সুবন্ধু ভট্টাচার্য
ও মলয়শংকর দাশগুপ্ত
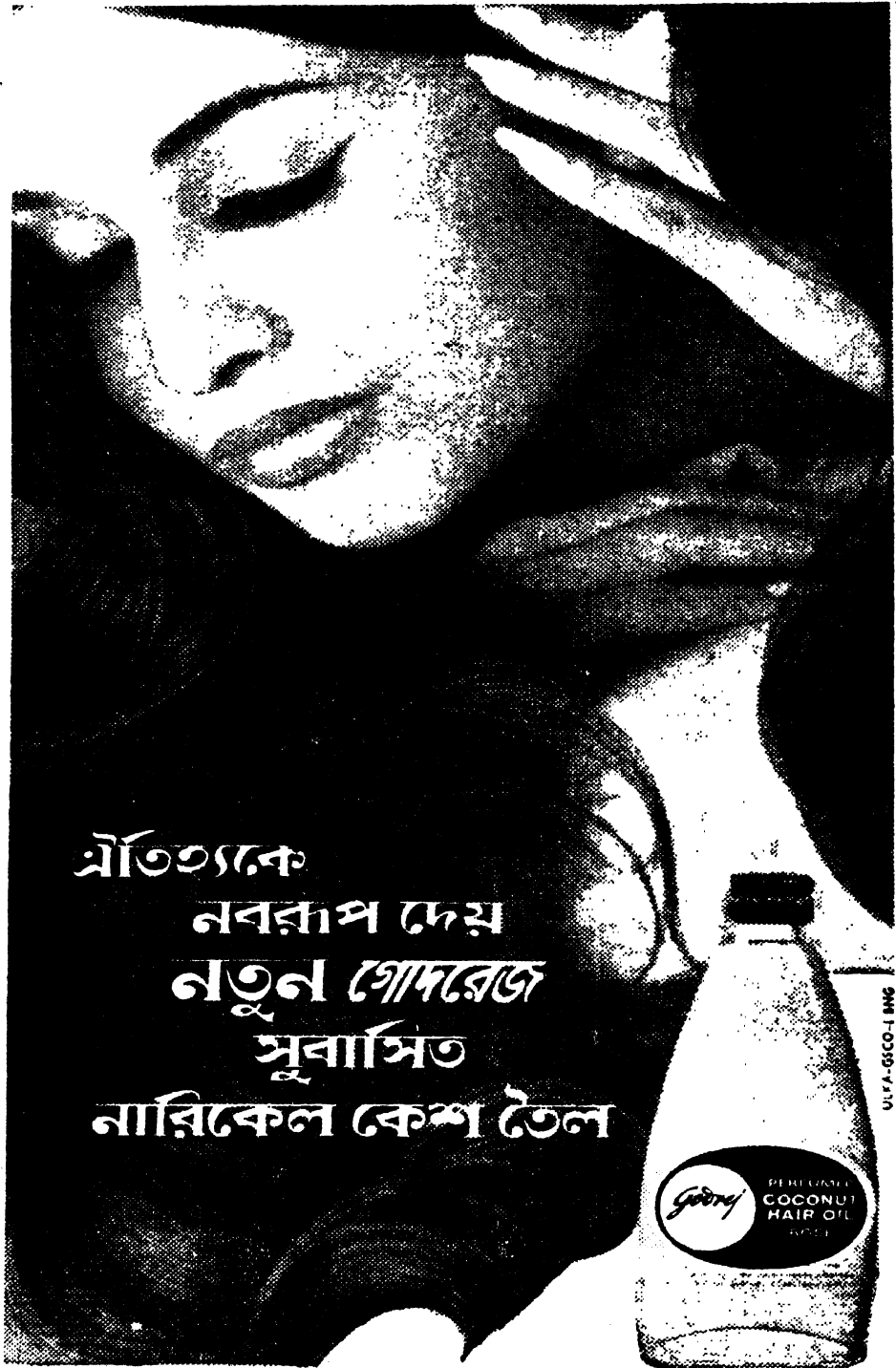
মডেল পাবলিশিং
২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ঐতিহ্যকে
নবরূপ দেয়
নতুন গোদরেজ
সুবাসিত
নারিকেল কেশ তৈল
Godrej
PERFUMED
COCONUT
HAIR OIL

সাতাশ

কথাটা [illegible] মিথ্যা নয় যে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের বন্ধুতা হয় না, হলে [illegible] দাঁড়ায় প্রেমে। রত্নর ধারণা ছিল [illegible] সে মনে করেছিল প্রেম [illegible] সম্ভব নয়, [illegible] নয়। প্রেমে [illegible] আছে। কিন্তু বন্ধুতা [illegible] সম্ভব। যেমন একরাশ ছেলের সঙ্গে [illegible] একরাশ মেয়ের সঙ্গে। [illegible] ভালোবাসা যায়। [illegible] নাই ছায়।

সেবা আর রত্ন বন্ধুত্বে ছিল [illegible] প্রেমে পড়েছে [illegible] পড়ে থাকে তবে [illegible] প্রেমও ভালো নয়, [illegible] ভালো নয়।

[illegible] পরে কথা, সেবার [illegible] নিয়েছিলেন যে ওদের মেলামেশার একটা পর্যায়ে ওরা পরস্পরের কাছে বাগদত্ত হবে। [illegible] আগে গুরুজনের অনুমতি চাইবে। তাঁরা সবুর করতে রাজী ছিলেন। যথাকালে [illegible] সমারোহ। সেবা দাশগুপ্ত [illegible] হবে সেবা মল্লিকে।

[illegible] ফাঁদ। সেটা উপলব্ধি করবামাত্র রত্ন স্থির করে ফেলে সে ওটা যেমন করে হোক এড়াবে। সেবাকে বলবে সে আরেকজনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু তা হলে [illegible] সঙ্গে [illegible] পরিকল্পনাটা জানাজানি হয়ে যায়। কাজ কী অসময়ে [illegible]?

"সেবা, তোমাকে একটা কথা বলব?" রত্ন একদিন বলে।

"কী কথা শুনি?" সেবা জানতে চায়।

"এস, আমরা নতুন একটা সম্পর্ক পাতাই।" রত্ন একটু রহস্যময় করে তোলে।

"নতুন সম্পর্ক? সেটা আবার কী?" সেবা [illegible] ওঠে। সেটা প্রস্তাব নয় তো।

"তুমি আমার শত্রু। আমি তোমার শত্রু।" রত্ন ওকে চমকে দেয়।

"না না, শত্রু কিসের? আমরা তো বন্ধু।" প্রতিবাদ করে সেবা।

"বন্ধু হবার অনেক জ্বালা। কেউ সহজে বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে বন্ধুত্বেই বন্ধুতার শেষ। ওদের ধারণা ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুতা হতে পারে না। ওদের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে এই ভালো নয় কি?" রত্ন যুক্তি দেখায়।

সেবা প্রথমটা আহত হয়েছিল। পরে বুঝতে পারে ওটা আসলে একই জিনিস, নাম আলাদা। সেইসঙ্গে আরো অনুমান করে যে রত্ন কোনো এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে চায়। তার বেশী এগোতে চায় না। তা একটু ক্ষুণ্ণ হয় বইকি।

"আচ্ছা, এখন থেকে পরস্পরকে আমরা শত্রু বলে সম্বোধন করব। সেটা বেশ একটা নতুন সম্পর্ক হবে। তা বলে পুরোনো সম্পর্কটা পালটে যাবে না। কী বল, শত্রু?" সেবা ফুর্তি করে বলে।

"শত্রু, আমারও সেই মত।" রত্নও [illegible] বলে।

পুরোনো সম্পর্কটা পালটে যায় না ঠিক।

কিন্তু তার থেকে উত্তাপ চলে যায়। তা হলে কি লোকের ধারণা ভুল নয় যে, ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুতা হয় না, হয় যেটা সেটা প্রেম? আর প্রেম যদি হয় তো তার অনিবার্য গতি বিবাহের অভিমুখে।

তবে দুজনে দুজনাকে মিষ্টি স্বরে ডাকে, "শত্রু।" আর চিঠি লিখলে লেখে, প্রিয় শত্রু।" এক বিচিত্র সম্পর্ক।

লোকে যা নয় তাই মনে করে রঞ্জু ও মালাদির বেলাও। সেই যে ওরা একসঙ্গে কার্নিভালে যায় তারপর থেকে শুনতে হয়, "তোমরা তো এনগেজড।"

সেদিন রঞ্জুর পরনে ছিল সাহেবী পোশাক। সেটাও বোধ হয় গবেষণার সূত্রে। মালাদিকেও একটু উন্মনা মনে হয়েছিল। সেটা রঞ্জুর জন্যে নয়। আর একজনের জন্যে। হাঁ, রঞ্জুই দুজনের মাঝখানে দূতীগিরি করেছিল। এর চিঠি নিয়ে ওকে পাঠায়। ওর চিঠি পেয়ে একে দেখায় ও যেন একটি ডাকঘর।

রঞ্জুকে শিখণ্ডী করে ঝণ্টুদাকে তার পত্রবাণের লক্ষ্য করেছিল মালাদি। তিনিও বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন মালাদির উদ্দেশে। সরাসরি পত্রালাপ নয়, হলে মালাদির মা টের পেতেন। টের পেলে খাঁটাহস্ত হতেন। ঝণ্টুর উপর খাঁটাহস্ত। তাই ঝণ্টুদা মালাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হননি। যদিও কলকাতা দিয়েই ও'র যাওয়া আসা।

শেষে একটা ফন্দী আঁটা হয়। মালাদি যাবে রঞ্জুর সঙ্গে কার্নিভালে। বেচারির কি সামান্য একটা শখও মিটবে না? মেটাবে কে? ওর ভাইরা তো হাতের কাছে নেই। রঞ্জুই অনুগ্রহ করে রাজী হয়। ওর পরীক্ষার পড়ার কামাই করতে।

সেখানে ঝণ্টুদার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎকার। রঞ্জু কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রেখে। তারপর অনেকক্ষণ ওর পাত্তা নেই।

ঝণ্টুদা গোঁফ দাড়ি গজিয়ে এক সাধু-বাবার মতো দেখতে। তাঁর সঙ্গে মালাদিকে লক্ষ করে কেউ কিছু মনে করে না। মনে করে কেবল রঞ্জুর মতো বিবাহযোগ্য যুবককে দেখলে। মজা মন্দ নয়। সাধুবাবাও মাঝে দুটো একটা তত্ত্বকথা শোনাচ্ছিলেন। অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে। "নির্বাণ হচ্ছে বাসনা কামনার নির্বাণ। যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েছে সেই তো নির্বাণ লাভ করেছে। মরণের এপারেই সেটা সম্ভব। মরণের সঙ্গে নির্বাণের কী সম্পর্ক! পরকাল যদি সত্য হয় তবে বাসনা কামনাও পরকালে দগ্ধ হয়।"

মালাদি অবশ্য তত্ত্বকথা শুনতে আসেনি। যা শুনতে এসেছে তা বাসনা কামনার নির্বাণের অন্য কোনো উপায় আছে কি না। বেশ কিছুকাল স্বামীসঙ্গ করলেও তো বাসনা কামনার নির্বাণ হতে দেখা যায়। বিশেষত সন্তানাদি হবার পরে।

গোরীর মতো মালাদির ভিতরেও এক দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে হয়ে যায়। ঝণ্টুদাকে রঞ্জু নরম করে এনেছিল। অভয় পেলে তিনি প্রস্তাবও করতেন, পাণিগ্রহণও করতেন। বিধবা বলে তাঁর কোনো বিকার ছিল না। মালাদি যে তাঁর জন্যে পার্বতীর মতো তপস্যা করছে এর জন্যে তিনি শিবের মতো সন্তুষ্ট।

কিন্তু বাধা ছিল মালাদির ভিতরেই। লোকলজ্জায় মুখ দেখানো যাবে না। মা বাবা সমর্থন করবেন না। ভাইদের মধ্যে মতভেদ। একজন যদি বলে, "সমাজকে চালাতে দিলেই চলবে" আরেকজন বলে, "সমাজ এখনো প্রস্তুত নয়।" কী করা, যাক্‌। আপাতত একমনে পড়াশুনা করাই শ্রেয়। তাতে তো সমাজের আপত্তি নেই।

"মালা আমাকে যতদিন সবুর করতে বলবে আমি ততদিন সবুর করব রতন।"

ঝণ্টুদা বলেন। "যদিও পারিবারিক চাপ ক্রমেই প্রবল হচ্ছে আমার উপর।"

"মালাদি কি সবুর করতে সত্যি চায়? করতে বাধ্য হয়ে।" রঞ্জু বলে ঝণ্টুদাকে আশ্বাস দিতে।

গোরীর মতো মালারও ভাবনা কেমন করে সে স্বাবলম্বী হবে। তেমন কোনো অর্থাভাব ছিল বলে নয়, এমনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে। বিধবার বিবাহ যে দেওয়া হয় না তার কারণ কি এই নয় যে বিধবারা পরনির্ভর?

ঝণ্টুদার সঙ্গে পরে একদিন রঞ্জুর কথা-বার্তা হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস হয় না যে মালা কোনোদিন মনঃস্থির করতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়ালেও পরের কথায় চলাই ওর অভ্যাস। ওর ওই মা-টি ওকে মাটি করবে। আমার উপরে ও'র জাতক্রোধ। তুমি দেখবে তোমার উপরেও তাই হবে, যদি উনি জানতে পারেন যে তুমি আমাদের বিয়ে দিচ্ছ।"

বিয়ে দিচ্ছে কে? না রঞ্জু। একথা শুনলে কার না মাথা ঘুরে যায়? রঞ্জু তার উদ্যোগ বাড়িয়ে দেয়। যখন তখন মালাদির সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওরা দুজনে কী যে অত ফিসফাস গুজগুজ করে মালাদির মা বুঝতে পারেন না। রান্নাঘরে কে? না মালা আর রঞ্জু। কী হচ্ছে ওখানে? না চা খাওয়া। মালাদির আছে একটা স্পিরিট স্টোভ। সেটাতে ও যখন খুশি চায়ের জল চাপিয়ে দেয়। ঘাড় ঘাড় চা খায়।

হঠাৎ মা যদি ওপথ দিয়ে যান ওদের কথাবার্তার বিষয়টা মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়। মালাদি বলে, "ও প্রশ্ন দু' বছর আগে একবার এসেছিল। এবারেও আসতে পারে। কী লিখব, বল না, লক্ষ্মীটি!"

"কেন, তোমার কাছে মোহিত ঘোষের নোটস নেই? আচ্ছা, আমিই না হয় তোমার জন্যে একটা উত্তর খসড়া করে দিচ্ছি।" রঞ্জু অভয় দেয়।

অথবা ওদের কথাবার্তা এমন ধারাও ধরে। মালা বলে, "তুমি যে উপন্যাস লিখতে চাও তার নায়ক নায়িকার বিয়ে হবে তো শেষ পর্যন্ত? না বেচারিদের কপালে চির-বিরহ?"

"লেখক কি তা আগে থেকে কাউকে জানতে দেয়?" রঞ্জু গম্ভীরভাবে বলে, "ওটা লেখকের সীক্রেট।"

"কিন্তু বিয়ের অনেক বাধা আছে যে! একেই তো মেয়েটি বিধবা। তার উপর ওর যৌবন দিন দিন চলে যাচ্ছে। নায়ক ওকে সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর সাধছে একটা বেলা থাকতে মনঃস্থির করতে। নায়কের নিজেরও তো যৌবন যায় যায়।"

"কী করব, বল। আমি কি ওদের বিয়ে দিতে নারাজ! বরঞ্চ আমারই উৎসাহ ওদের চেয়েও বেশী। মেয়েটির বদ্ধমূল ধারণা বিধবার বিয়ে পাপ। অথচ বিপত্নীকের বিয়ে পাপ নয়। এই দোরোখা নীতির বিরুদ্ধেই তো কলম ধরতে হচ্ছে আমাকে। নইলে ও বই লিখতুম কেন? অবশ্য এখনো হাত দিইনি লেখায়।" রঞ্জু বানিয়ে বলে যায়।

মালাদির মা প্রখর বুদ্ধিমতী না হলেও প্রবল স্বার্থসচেতন। ওরা দুটিতে মিলে কী এক মহাভারত অশুদ্ধ করার মতলব আঁটছে এ সন্দেহ অনেকদিন থেকেই তাঁর মনে উঁকি মারছে। কিছু বলতেও পারছেন না, কারণ মেয়ের জন্যে বিনে পয়সায় টিউটর তিনি পাচ্ছেন কোথায়। অথচ যেই টিউটর হয়ে ঢুকবে সেই নাগর হয়ে বেরোবে এটা কি বরদাস্ত করতে পারেন? ঝণ্টুকে তিনি গলাধাক্কা দিয়ে তাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবার রঞ্জুর পালা।

"বুঝেছি! বিধবা বিবাহের ষড়যন্ত্র। আমার সঙ্গে চালাকি! আমার চোখে ধুলো দিবি তোরা!" একদিন গর্জে ওঠেন তিনি। আর রঞ্জুকে দরজা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, "এখন যা। আমার ইচ্ছা নয় যে আর আসিস।"

আটত্রিশ

মালাদির সঙ্গে বন্ধুতা হঠাৎ এমনি করে এক ফুঁয়ে নিবে যায়। ভালো করে বিদায় পর্যন্ত নেওয়া হয় না। রঞ্জু আর পেছন ফিরে তাকায় না। তাকালে দেখতে পেত মালা যেন বিষাদের প্রতিমা।

মালার সঙ্গে বন্ধুতার মালা ছিঁড়ে গেলেও সেবার সঙ্গে শত্রুতার ডোর অটুট। তবে দেখা বড় একটা হয় না। ওরা ইচ্ছা করেই দূরত্ব রক্ষা করে। কেউ কারো চেয়ে কম ব্যস্ত নয়। দেখা হলে একজন সুধায় আরেকজনকে, "কেমন আছ, শত্রু?" উত্তর পায়, "মন্দ কী!"

জ্যোতিদার বিয়ের সময় রঞ্জু আবিষ্কার করে যে রেবা আর সেবা দুই মাসতুত বোন। শুধু নামের মিল নয় চেহারারও মিল। কিন্তু রেবা যেমন প্রাণবতী সেবা তেমন নয়। আবার সেবা যেমন মনস্বিনী রেবা তেমন নয়।

আশ্চর্য এই যে জ্যোতিদার বরাতে জুটেছে রেবা আর রঞ্জুর বরাতে জুটত সেবা, যদি মাঝখানে গৌরী না থাকত। এর জন্যে

দুঃখিত নয় রত্ন। কারণ মনস্বিনী নারীকে ও স্পর্শ করতে ভয় পায়। কানর্ যেমন দেবীকে।

বিলেতে যাদের অবজ্ঞাভরে বলা হতো ব্লু স্টকিং সেবা হচ্ছে তাদেরই একজন। ও জানে ও একদিন অধ্যাপিকা হবে বেথুনে পড়াবে। রত্নর খাতিরে ওর কেরিয়ার ও ছাড়বে না। ওর উচ্চাভিলাষ ওর বাবার কাজের জের টেনে চলা। ধারা বজায় রাখা। রত্নর সাধ বা সাধনার সঙ্গে ওর একাত্মতা নয়।

"সেবা," রত্ন একদিন কথা প্রসঙ্গে বলে "আমার সত্যিকারের কাজ কী তা নিয়ে আমি ভাবনায় পড়েছি।"

"কেন, রতন," সেবা বলে, "তুমি যাতে হাত দিয়েছ তা কি অকাজ?"

"অকাজও নয়। সুকাজও নয়।" র খোলসা করে। "একটা না একটা কেরিয়ার বিনা পুরুষের চলে না। এখন তো দেখি নারীরও। কিন্তু সেইটেই কি জীবনের কাজ? না, জীবনের কাজ বলতে আমি বুঝি সেই কাজ যার জন্যে আমাকে ডাক হয়েছে। যার জন্যে আমি একটা ডাক অনুভব করছি।"

"তুমি কি তেমন কোনো ডাক শুনেছ?" সেবা আগ্রহের সঙ্গে সুধায়।

"রকমারি ডাক শুনতে পাই। কোনটি যে আমার পক্ষে সত্যিকার ডাক তা তো জানিনে। এই যেমন একটা হলো এ যুগের উপযোগী রামায়ণ মহাভারত লেখা। সেই জিনিস নয়, কিন্তু তেমনি মহান এপিক। বিংশ শতাব্দীর জীবনদর্পণ। জীবনদর্শনও বলতে পারি।" রত্ন বোঝাতে চেষ্টা করে।

রত্নর আসমানে কেল্লা বানানোর পরিকল্পনা এই প্রথমও নয়, এই একমাত্রও নয়। মৃদু হেসে সেবা মন্তব্য করে, "তুমি হয়তো আর একজন রাম সৃষ্টি করতে পারবে, কিন্তু আর একজন রাবণ? আর একটি হনুমান? এদের বাদ দিয়ে কি রামায়ণ হয়? তারপর যুধিষ্ঠির হয়তো একালেও সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু দ্রৌপদী বা কুন্তী? এঁদের বাদ দিয়ে কি মহাভারত হয়। রামায়ণ মহাভারতের মহত্ত্ব কোনখানে? যেখানে মানুষ আইডিয়াল সেখানে, না যেখানে মানুষ রিয়াল সেখানে?"

রত্ন এর উত্তর দিতে না পেরে গালে হাত রেখে বসে।

সেবা খিল খিল করে হেসে ওঠে। রত্নর দশা দেখে নয়, তার বাবার কাছে শোনা একটি কাহিনী স্মরণ করে। "জানো, এক নবাব একবার এক পণ্ডিতকে ফরমায়েশ দিয়েছিলেন তাঁকে নিয়ে একখানা নতুন মহাভারত রচনা করতে। শুধু ফরমায়েশ নয়, জায়গা জমি সোনাদানা শালদোশালা। নবাব চেয়েছিলেন চিরস্মরণীয় হতে।"

"না, এ গল্প আমি শুনিনি তো!" রত্ন উৎকর্ণ হয়।

"তা হলে শোন। তোমার কাজে লাগবে।" সেবা গম্ভীরভাবে হাসি চাপে। "তা নবাব যতবার তাগিদ করেন পণ্ডিত বলেন, হচ্ছে, হবে। জায়গা জমি সোনাদানা সব হজম হয়ে যায়, তবু মহাভারতের পাত্তা নেই। শেষকালে নবাব রাগ করে হুকুম দেন, মুণ্ডু লে আও! পণ্ডিত তো বগলে এক তাড়া হিজিবিজি লেখা ভূর্জপত্র নিয়ে হাজির। নবাব তা দেখে বলেন, এর মধ্যে কী আছে? সব আছে, জাঁহাপনা, পণ্ডিত জবাব দেন, শুধু একটি কথা নেই, সেইজন্যেই তো এটি শেষ করতে পারা যাচ্ছে না। নবাব জানতে চান, কী কথা? পণ্ডিত কাঁপতে কাঁপতে বলেন, ওরে বাবা কি [illegible] বলি? [illegible]

আকাশের তারা আর আমি যদি হয়ে থাকি মাটির পতঙ্গ তা হলে তো এ জীবন চিরবিরহেই নিঃশেষ হবে।" এই বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রঙ্গ।

"মানছি সমস্যাটা শক্ত।" স্বীকার করে সেবা। "সারাজীবন অপেক্ষা করাই মহত্ত্ব, কিন্তু ক'জন পুরুষ তা পারে। পারলে মেয়েরাই পারে।"

"তা হলে তুমি আমাকে কী করতে পরামর্শ দাও, শত্রু?" রঙ্গ কাতরভাবে তাকায়। "আমি কি অনন্তকাল অপেক্ষা করব? যদি না পারি, তা হলে কি আর কারো সঙ্গে রসের সম্পর্ক পাতাব? না শুধুমাত্র সেই তাড়নায় আরেকজনাকে বিয়ে করব? যার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই?"

"শক্ত। শক্ত। জবাব দেওয়া শক্ত।" কবুল করে

"আমি তো দেখছি তিনটি নারী না হলে আমার চলবে না। যে নারী আমার হৃদয়ের প্রেম পাবে, যে নারী আমাকে রসের আস্বাদন দেবে, যে নারী আমার সঙ্গে সংসার করবে।" রঙ্গ লক্ষ করে সেবা কাঁদছে।

[ক্রমশ]

নির্বাচনী নিবন্ধ

আমি লিখতে বসেছি মধ্যবর্তী নির্বাচনের তৃতীয় দিনে। আপনারা যখন পড়বেন তখন মতদানের শেষে আগামী দিনের পরিকল্পনার পালা। কাজেই আজ যা বলছি, তার কিছু কিছু অতি অবাস্তব ঠেকবে। তবু এ বিরাট যজ্ঞে আমরা মেয়েরা কোথায় কি করছি ভাবতে ইচ্ছা করে বইকি।

এ পর্যন্ত ভোটগ্রহণের দুটি লক্ষণ স্পষ্ট। প্রথম বেশ মন্দা চলছে মতপত্রীর বাজার। তাও শহরে মতপেটিকা ভরছে ধীরে

মধ্যবর্তী নির্বাচনে আসামের মহিলা ভোটদাতা

ধীরে এবং পল্লীবাসীর উৎসাহ বেশী। দ্বিতীয়, মহিলাদের আগ্রহ পুরুষের চেয়ে বেশী। হিমাচল থেকে সৌরাষ্ট্র, আসাম থেকে মাদ্রাজ শহর মেয়েরা আপন অধিকার নিয়ে অধিকতর সচেতন।

কারণ কি? বিদেশী সাংবাদিক একজন বললেন, শ্রীমতী গান্ধী হয়তো মহিলাদের আকর্ষণ করেছেন বেশী। মহিলা হিসাবে আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। মেয়েরা এগিয়ে আসছেন কারণ, অগ্রগতির আগ্রহ তাঁদের বেশী। শ্রীমতী গান্ধী দেশের নেত্রী, দলের নেত্রী, মাত্র মেয়েদের মতদানে তাঁর প্রভাব প্রভেদ সৃষ্টি করবে কেন? উত্তর প্রদেশের কোন এক নির্বাচন কেন্দ্রে অন্ধ বৃদ্ধা বললেন ইন্দিরা ভিন্ন কেউ তাঁর সমর্থন পাবে না। এ ঘটনার মতই ব্যাপার কত নয় হয়েছে। নেহেরুর জীবদ্দশায় বহু কেন্দ্রে ভারতীয় নাগরিক কঠিন প্রতিজ্ঞায় কেন্দ্রে অপেক্ষা করেছেন নেহেরু আসবেন তবে তাঁর হাতে তুলে দেবেন ভোটপত্র। পরদায় যাঁরা থাকেন এরকম মুসলিম মহিলাই আগে ভোটদানে বিরত থাকতেন। আজও তাঁদের এক বিরাট অংশ ঘরের বাইরে

যেতে আপত্তি করতেন। ভোটদান অন্যান্য কোন কোন দেশের মত Compulsery বা অবশ্য দেয় নয়। মিশরে নাকি মোটা রকম জরিমানা হয় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মেয়ে ভোট না দিলে। এখন পরদা প্রথাই ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। অবগুণ্ঠন বা বোরকা আর স্বাধীন মনের বাধা নয়। মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি কারণ বিরাট এক যুবসমাজ। এবার ভোটদাতার তালিকায় নূতন নাম সংযোগ হয়েছে ২০,০০০,০০০। আশা করা যায় তাদের মধ্যে মেয়ে ভোটার আর পুরোনো দিনের সংশয় বা সংকোচে বাঁধা নয়। গত নির্বাচনে ৮৬,০০০,০০০ পুরুষ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন এবং সেস্থলে মহিলা ভোটার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৬,০০০,০০০। সিংহলে নাকি মহিলা ভোটের প্রভাব পরিপূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল মত গ্রহণে।

এবার নির্বাচনী আয়োজনে শত সতর্কতা সত্ত্বেও বেশ কিছু অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তথাকথিত অশান্ত পশ্চিমবঙ্গ বাদেও প্রচুর শান্তিভঙ্গের সংবাদ নিত্য কানে আসছে। এও নূতন লক্ষণ বললে চলে। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। ভারতের ভোটদাতা সংখ্যা ২৭১,০০০,০০০। সোভিয়েত রুশ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোনটির সমগ্র লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী। গত নির্বাচনের পর ভোটার সংখ্যা কিছু বেড়েছে নূতন ভোটার সংযোগে এবং কিছু বেড়েছে ভালভাবে তালিকা তৈরির ফলে।

প্রদেশগুলির লোকসভা প্রতিনিধি হবে ৫০০। ইউনিয়ন টেরিটরি বা কেন্দ্রশাসিত স্থানগুলির ২৫টি পর্যন্ত প্রতিনিধি থাকতে পারবে। এখন হবে ১৮। প্রদেশের লোক-সংখ্যাকে আসনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যা ফল হয় তার হিসাবে লোকসভপ্রার্থীর নির্বাচন এলাকা অবধারিত হয়।

৫১৭টি লোকসভা আসনের জন্য ২৭৮৮ প্রার্থী নির্বাচনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৬৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩৬৯। এবার নির্দলীয় প্রার্থী সংখ্যা বেশী। গতবার ছিল ৮৭৪ আর এবার ১১১৪।

পশ্চিমবঙ্গের ভোট গণনা হবে ১১ই মার্চ। অন্যত্র গণনা আরম্ভ হবে ১০ই

তার এতটা দুঃখ হত না। ভাবত, তবু একটা সুন্দর জিনিস চোখের সামনে রেখে অক্ষয় পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তার শেষ সময়ের এই জ্বালাপোড়া সার্থক হচ্ছে বলে সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারত। তাতে একটা তৃপ্তি পাওয়া যেত।

রামানন্দ অবশ্য ইচ্ছা করে মাধুরীকে সঙ্গে আনত না। অক্ষয়ের এই চেহারা দেখলে মাধুরী আরও বেশি ঘাবড়ে যাবে। কান্নাকাটি করবে। তা না হলে রোজই তো রামানন্দর সঙ্গে সে হাসপাতালে আসতে চেয়েছে। একথা সেকথা বলে রামানন্দ ওই মেয়েকে ঠেকিয়ে রেখেছে।

আজ আর রামানন্দর কাছে জিনিসটা খারাপ লাগছিল না, বেদনাদায়ক মনে হচ্ছিল না। কেননা এখন আর অক্ষয়কে মুমূর্ষু বলা যায় না। মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে গিয়ে চোখে একটা চাকচিক্য উঁকি দিয়েছে। যেন মানুষটা খুব শীগগীর মরছে না, এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। সাধারণ মানুষ তাই বুঝবে। এখন ডাক্তাররা অক্ষয়ের চেহারার এই সাময়িক উন্নতির ওপর কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তাদের আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হওয়ার মতন অবস্থায় রোগী আসলে ফিরে এসেছে কিনা সেটা জানার অবশ্য উপায় ছিল না। তবে কাল বিকেলেও রামানন্দ একবার ওঁদের সঙ্গে দেখা করেছিল। মনে হয় ভয়ের কিছু নেই, একজন ডাক্তার গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল। এর বেশি কিছু বলেনি। রামানন্দও আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

যাই হোক, সাধারণ মানুষ হিসাবে রামানন্দ ধরে নিতে পারে অক্ষয় মোটামুটি ভাল আছে। কাজেই আজ এই মাত্র ফুলরেণু যখন তাকে দুধ খাইয়ে গেল, ওষুধ খাইয়ে গেল আর অক্ষয় দুধ ওষুধ কোনোটার দিকেই মনোযোগ না দিয়ে, মানে নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে সেগুলো গলাধঃকরণ করে চোখের পলক না ফেলে কেবল ফুলরেণুর শরীরের গোছা গোছা ফরসা মাংস ও চর্বির ছোট বড় ঢেউ দেখছিল, রামানন্দর খুব একটা খারাপ লাগেনি। অক্ষয় বাঁচবে, সুতরাং চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা নারীদেহ দেখে তার যে কামনার উদ্রেক হবে ক্ষুধা হবে, এ খুবই স্বাভাবিক। রামানন্দ হৃষ্টমনে অক্ষয়ের এই কামার্ত দৃষ্টি কয়েকবারই লক্ষ্য করেছে। এবং বেশ উপভোগও করেছে।

'তুমি তো রাতের ওটিকে দেখনি মাস্টার, দেখেছিলে কি?' ফুলরেণু বেরিয়ে যেতে অক্ষয় শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে চেটে সারামুখে রীতিমত একটা পাশবিক হাসি ফুটিয়ে তুলল।

'না দেখিনি।' রামানন্দ মাথা নাড়ল। অক্ষয়ের কেবিনে এখন পর্যন্ত সে রাত কাটায়নি। কেবল প্রথম রাতটাই সে হাসপাতালে ছিল। কিন্তু সেদিন অক্ষয় ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে। কেবিনে নিয়ে আসা হয় দুদিন পরে। 'কিরকম দেখতে? কাল?'

অক্ষয়ের ডান পায়ের গোড়ালির কাছে একটা বেশ গোলগাল দাদের চাকা রয়েছে। কবে থেকে তার এই রোগটা রামানন্দ জিজ্ঞেস করেনি। অনেকদিন ভেবেছে অক্ষয়কে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কেমন সংকোচ বোধ করত। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অক্ষয় একটু সময় চুপ থেকে গোড়ালিটা আচ্ছা করে চুলকে নিল।

'উঃ, কি বললে, দেখতে কেমন?'

চুলকানো শেষ করে অক্ষয় রামানন্দর চোখে চোখ রেখে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। ঢোক গিলল। যেন সেই দৃশ্য মনে পড়ে তার নতুন করে কামোদ্রেক হল, উত্তেজনা উপস্থিত হল।

'কেমন দেখতে, খুব সুন্দর? ফুলরেণুর মতন মোটা না ছিপছিপে?' রামানন্দ এবার ইচ্ছা করে হাসল।

'আহা, মোটা কি এসে যায়।' অক্ষয় যেন খুব একটা সন্তুষ্ট হল না রামানন্দর কথায়। 'সবই ছিপছিপে দেখলেই হবে তার কি মানে আছে।'

রামানন্দ লজ্জা পেল। মাধুরীর গড়ন ছিপছিপে। বাড়তি চর্বি মাংস বলতে কিছু নেই। যেন তার শরীর নিয়েই শরীর। রোদের রেখার মতন। কোমরের নিচের গোল ভারি অংশটুকু এমন নিখুঁত মানানসই যা নিয়ে পৃথিবীর যে কোনো রূপসী গর্ববোধ করতে পারে।

কাজেই অক্ষয়ের উত্তর শুনে রামানন্দ হোঁচট খেল। তবে কি হাসপাতালে এসে

মানুষটা মোটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। যেখানে বাড়তি মাংস আছে মেদের আধিক্য আছে? রামানন্দ ভুরু কুঁচকে রইল।

অক্ষয় সেটা লক্ষ্য করল। যেন রামানন্দকে খুশি করতে উৎসাহের আতিশয্যে বালিশ থেকে পিঠটা তুলে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসল। শোয়া ছেড়ে কাল থেকে অক্ষয় বালিশে হেলান দিয়ে একটু একটু করে বসতে আরম্ভ করেছে।

'অবিকল মাধুরীর মতন দেখতে ওটি। নাম তরলা। তরলা বোস। মানে মাধুরীর মতন লম্বা পাতলা গড়ন। কিন্তু মাধুরীর রং পায়নি। শ্যামলা গায়ের চামড়াটা দেখলে, তোমায় কী বলব মাস্টার, কাঁচা ফলটলের কথা মনে পড়ে যায়।'

'বাঃ!' রামানন্দও ঝুঁকে বসল। অক্ষয়ের বেড-এর পাশে একটা টুলের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিল সে। যতক্ষণ এখানে থাকে রামানন্দ ঐ আসনটিতে বসে অক্ষয়ের সঙ্গে কথা বলে। তরলার গায়ের রং ও চামড়ার বর্ণনা শুনে রামানন্দর মনে হল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অক্ষয়ের মধ্যে যেন একটু কাবিত্বটাবিত্ব এসে যাচ্ছে।

'আর গলার [illegible] শা, তোমার কি বলব মাস্টার, রাত হলে সারা ওয়ার্ডটা একেবারে ঝিম মেরে থাকে তো, তরলার গলা কানে এলেই মনে হয় একটা ডাহুক ডাকছে। বুকের ভিতরটা তখন হু হু করে ওঠে।'

অক্ষয়ের কথা শুনতে শুনতে রামানন্দ এক দৃষ্টে তার চোখ দুটো দেখছিল। বরং যখন সে একটু বেশি অসুস্থ ছিল, গোড়ার দিকে, তখনও অবশ্য অল্প বয়সের নার্সটার্স দেখলে ভিতরে ভিতরে অক্ষয় কাতর হয়ে উঠেছে, তার চোখ দেখলে বোঝা যেত, কিন্তু কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার পরেই আবার সে তার হাঁসমুরগি, খালের জল, খোলা আকাশ, মাটি ও মাধুরীর কাছে ফিরে গেছে, রামানন্দর সঙ্গে সেসব আলোচনা করে সে বেশি তৃপ্তি পেয়েছে।

কিন্তু দু একদিন ধরে, রামানন্দ লক্ষ্য করছে, অক্ষয় আর যেন বাড়িটাড়ির কথা বেশি বলছে না। ফুলরেণু কেবিনে ঢুকলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ফুলরেণু বেরিয়ে গেলে বড় বড় নিশ্বাস ফেলে। আজ তার কাছে আর একটির উল্লেখ করল অক্ষয়। বাঙের তরলা। মাধুরীর মতন ছিপছিপে গড়ন, শ্যামলা রং, কাঁচা ফলের মতন গায়ের চামড়া। 'কথা তো বলে না, যেন মনে হয় ডাহুক ডাকছে'—অক্ষয় আর একবার রামানন্দকে শুনিয়ে দিল।

'তবে তো একরাত্তি আমাকেও তোমার কেবিনে থাকতে হয়, দেখতে হয় মেয়েটিকে।' রামানন্দ রসিকতা করল।

[illegible] সেটা গম্ভীরভাবে নিল।

'থাকবে? থাক না। তরলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

রামানন্দ একটু চিন্তা করল।

যেন অক্ষয় তা বুঝতে পারল।

'তুমি মাধুরীর জন্য ভাবছ, রাত্রে একলা থাকতে পারবে না? ভয় পাবে?'

'হুঁ।' মাথা নেড়ে রামানন্দ কথাটা স্বীকার করল।

'কেন, শফী আসে না?' অক্ষয় ভুরু কুঁচকাল।

'তা আসে। প্রায় রোজই এখন আসছে।'

অক্ষয় নিশ্চিন্ত হল। বিড়বিড় করে বলল, 'ছেলেটা ভাল। বড় বাধ্যের। মাধুরীর কথাটথা খুব শোনে।'

'হ্যাঁ, তা শোনে।' রামানন্দ আবার বলল, 'তবে কিনা ওর বাপ বড় বেশি মারধর করছে ওকে।'

'কেন!'

'কাজকর্মে মন নেই।'

'কেন, ডিমটিম নিয়ে যাচ্ছে না এখন।'

'হ্যাঁ, তা নেয় নিয়ে বাবাকে দেয়। তা হলেও ইয়াকুব নাকি যখন তখন ছেলেকে ধরে পিটয়। আজ তো দেখে এলাম মারের চোটে শফীর পিঠে কালসিটে পড়ে গেছে।'

'পিঠ খুলে তোমাদের দেখালে বুঝি?'

রামানন্দ মাথা নাড়ল। 'মাধুরীকে দেখিয়েছিল, তখন আমি দেখেছি।'

'ইয়াকুব কিন্তু এমনিতে খুব ভাল মানুষ। গোড়ায় তো ডিম নিতে মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসেছে। অনেক কথাটথা বলেছি।' একটু চিন্তা করে অক্ষয় বলল, 'তবে কিনা এখন বুড়িয়ে গেছে। তা ছাড়াও বউটা মারা যাওয়ার পর থেকে মেজাজটা কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে।'

'শফী তাই বলল, মাধুরীকে নিশ্চয় আগেও বলেছে, আমাকে আজ কেঁদে কেঁদে বলল, ইয়াকুব এখন রাতদিন সরাব খায়,

জনমাটুরা খেলে, আর যখন তখন ছেলেকে ধরে মারে। যখন মার আরম্ভ করে বুড়োর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, একেবারে গরু পেটা করে ছাড়ে।'

অক্ষয় শুনল। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

'আমি ভেবেছি কি একদিন রাজাবাজার গিয়ে ইয়াকুব মিঞাকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে বলব। মা মরা ছেলে। তা ছাড়া ছেলেটা ভাল। তোমার ডিমের ব্যবসা চালু আছে ঐ ছেলের জন্যই। কত হাটাহাঁটি পরিশ্রম করে এখন ওখান থেকে ডিম জোগাড় করে নিয়ে যায়।'

রামানন্দর কথা শুনে অক্ষয় খুশি হল।

'তাই চল, মাস্টার, তুমি একদিন কষ্ট করে রাজাবাজার যাও। গিয়ে বুড়োকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে এসো। হ্যাঁ, ওতে আমার মনে হয় কাজটা হবে।'

রামানন্দ একটু হাসল।

'শঙ্করী আজ বলছিল, আর সে বাড়ি ফিরে যাবে না, মাধবীর কাছে থেকে যাবে।'

অক্ষয়ও হাসল।

'অভিমান হয়েছে বাপের ওপর। তুমি

কি আলবার্ট সজ্জার দেখে এসে ছোঁড়া তখনো মাধুরীর কাছে বসে আছে?'

'হুঁ, তবে এখন ফিরে এসেছে মনে হয়। আজ অবিশ্যি ডিমের জন্য যায়নি। এমনি।'

'ঐ আর কি,' অক্ষয় বালিশে পিঠ ঠেকাল। 'অভিমান। খুব কষ্ট হয়েছে মনে। ইয়াকুব মিঞা কেমন মারধর করেছে, মাধুরীকে তাই দেখাতে এসেছিল। হুঁ, এতক্ষণ নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে। আসলে কিন্তু বাপজানকে ছোঁড়া পাগলের মত ভালবাসে।

ইয়াকুবও ছেলেকে খুব ভালবাসে। তবে কিনা বউ মারা-যাওয়ার পর থেকে বুড়োর মেজাজটা প্রায়ই খারাপ থাকে। তাড়ির নেশা করে। ঐ নেশার ঝোঁকে শফীকে মারধর করে, তা না হলে'—অক্ষয় থেমে গেল। ফুলরেণু ঘরে ঢুকল।

'আর একটা ওষুধ খাবার সময় হয়েছে বুঝি।' অক্ষয় দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

ফুলরেণু মুখে কিছু বলল না। মাথাটা ঈষৎ ঝাঁকাল। হলদে রাংতায় মোড়া ওষুধের বড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মোড়ক ছিঁড়ে অক্ষয়কে একটা বড়ি খেতে দিল। অক্ষয়ের শিয়রের কাছে মিটসেফ, ওখান থেকে কাচের গ্লাসে বরফ জল গড়িয়ে নিয়ে অক্ষয়ের হাতে তুলে দিল। জল মুখে নিয়ে অক্ষয় আধবোজা চোখ করে বড়িটা কোঁৎ করে গিলে ফেলল। রামানন্দর মনে হল ভিটামিন টেবলেট। কাঁচের গ্লাসটা ধুয়ে মিটসেফের মধ্যে আবার ঢুকিয়ে রেখে হাতের ঘড়িটা দেখতে দেখতে ফুলরেণু বেরিয়ে গেল।

অক্ষয়ের মতন রামানন্দও ঘাড় ফিরিয়ে ওর পিছনটা একবার দেখল।

'বুঝেছ মাস্টার, মোটা শরীরও খারাপ না। এরও আলাদা একটা বাহার আছে। তা ছাড়া রংটা তো খুব ফরসা। ও যখনই আসে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।'

'কিছু বলে না?'

'তা কি আর ওরা বলে, মেয়ের জাত, পুরুষের চোখ দেখলেই সব টের পায়।' দাঁত ছড়িয়ে অক্ষয় শব্দ না করে হাসল।

শুক্লার দিকেও এভাবে চেয়ে থাক নাকি।'

'হুঁ, আমার ঘুম পাতলা। জুতোর খুট শব্দ শুনলেই জেগে উঠি। মাথার ওপর ঐ নীল বাল্‌বটা জ্বলতে থাকে। মনে হয় তখন আশ্বিন মাসের অমাবস্যার পাতলা জ্যোছনার মধ্যে আমি ডুবে আছি। আর ঐ কচি কাঁচা চাঁদের আলো গায়ে মেখে একটা ডাহুক এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ায়।'

রামানন্দর মুখে শব্দ নেই। কেমন হতভম্ব হয়ে অক্ষয়কে দেখছে। এ যে রীতিমত কাব্য। জানালার ধারে বসে ইলেকট্রিক আলোর নিচে প্যাড কলম নিয়ে রামানন্দ এসব চিন্তা করত লিখত, এমন সব ইমেজ দেখত। এখনও দেখছে শুভেন্দুরা। মোহনবাবুর চায়ের দোকানে গোল হয়ে বসে সেসব কবিতা পড়ে তারা এ ওকে শোনায়।

তা শোনাক। কিন্তু অক্ষয়ের মুখে এসব কেন। রামানন্দ বিষণ্ণ হয়ে উঠল। রোদের গায়ে রোদ মিশে থাকে, মেঘের বুকে মেঘ জমে থাকে। একটা প্রকাণ্ড আকাশের নিচে ধু ধু বালুর দেশে মাদারের বেড়া দেওয়া লাল টালির ঘরে মাধুরী ও এক ঝাঁক হাঁসমুরগির সঙ্গে অক্ষয় চমৎকার মিশে আছে।

আলাদা করে কিছু কাব্য নেই সেখানে। দরকার পড়ে না। হঠাৎ আজ অক্ষয়ের চোখে মোহনবাবুর চায়ের দোকানের কবিদের স্বপ্ন, ইমেজ। লিটল ম্যাগাজিনের পচা পচা কবিতার উপমা। বিশ্বাস করতে কেমন লাগছিল রামানন্দর।

হয়তো তাই হবে, রামানন্দ পরে চিন্তা করল, মাধুরীদের কাছ থেকে দূরে সরে এসে দিনকতক শহরের হাসপাতালের একটা কেবিনে শুয়ে থেকে অক্ষয়ের মধ্যে এই সংক্রমণ হয়েছে।

অক্ষয়, রামানন্দ মনে মনে বলল, তুমি তোমার মাধুরী ওখানকার রোদ মেঘ খালের জল ও রাজহাঁস মাদার ফুল নিয়ে অনেক বেশি সত্য তাজা খাঁটি। শুভেন্দুদের চোখ দিয়ে হাসপাতালের নার্সকে 'ডাহুকী' দেখা তোমাকে একেবারে মানায় না। এসব কাব্য-ভাবনা অসুখের লক্ষণ। ওরা অসুখে ভুগছে, শুভেন্দু বিকাশ অমলেন্দু নবকিশোর অরুণাভ, কত নাম করব, কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওদের নিশ্বাসে ওষুধের গন্ধ পাবে, গায়ে সাগুবার্লির গন্ধ পাবে, তোমার মতন সব কটির চোখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে সারাক্ষণ কবিতার প্রলাপ বকে। তুমি সেরে উঠে মাধুরীর কাছে ফিরে যাবে, ওদের কোথাও যাবার জায়গা নেই। ওদের মাধুরী নেই আকাশভরা রোদ নেই, কলেজ স্ট্রীটের দমবন্ধ

হাওয়ায় কোনো রকমে শ্বাস টেনে টেনে এক একজন কেমন শিঁটিয়ে গেছে যদি দেখতে। আমি পালিয়ে এসেছি, তোমাদের খালের জলের রং, মাদার মনসা ঝোপের বাতাস অসাধারণ, আমার অসুখটা একদম সেরে গেছে। আমি যে কত সুখী এখন।

'কি হল, চুপ করে আছ, মাস্টার?' অক্ষয় চোখ টিপল।

'এবার উঠব।' রামানন্দ হাই তুলল।

'তা হলে কথা রইল, একদিন রাত্রে আমার কেবিনে এসে থাকবে, মাধুরীর জন্য ভয় নেই, বলে রাখলে শফী এসে পাহারা দেবে। শুক্লার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।'

রামানন্দ কৃত্রিম ধমক লাগাল।

'রাখ নির্লজ্জ তোমার শুক্লা? আমার দেখে কাজ নেই, আলাপ করে দরকার নেই। কবে সকাল সকাল সেরে উঠবে, তার চিন্তা কর। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

একটা শুকনো ঢোক গিলে বোকা বোকা চোখে অক্ষয় রামানন্দকে দেখল। হাসল।

'চলি', রামানন্দ উঠল। টুলটা অক্ষয়ের খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল। 'কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

রামানন্দ বেরিয়ে যেতে অক্ষয় মনোযোগ দিয়ে পায়ের দাদটা চুলকাতে আরম্ভ করল। 'মাস্টার একেবারে বেমক্কা চালচারী হয়ে গেছে এখন।' মনে মনে বলল।

[ক্রমশ]

ফুরিয়ে যাবে যে!
বাড়ীর সববাই
আমার জনসন্স*
ব্যবহার করছে
সবাই পারেন জনসন্স বেবী
হ'তে
Johnson's
baby
powder

পেট্রোলিয়াম

যানবাহন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে এই বস্তুটির চাহিদা বর্তমান দশকে আরও অনেক বেশি বেড়ে যাবে। আশাবাদীদের ধারণা, এখনই ভাবনার কোন কারণ নেই। ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজ চলছে, পৃথিবীর ভূগর্ভে সঞ্চিত খনিজ তেল আমরা প্রায় শেষ করে ফেলেছি বলে যাঁদের ধারণা, এখনও তাঁরা আশা রাখতে পারেন। 'পেট্রোলিয়াম সন্ধান'-এর উপর এবার সংক্ষিপ্ত একটি প্রতিবেদন নিবেদন করছেন শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাসমান এই ড্রিলিং যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র গর্ভের ভূ-স্তরে কূপ খনন করে খনিজ তেল সংগ্রহের কাজ চলছে

স্থল, জল এবং আকাশ পথে শুধু যানবাহন চালনার জন্যেই নয় পেট্রোলিয়ামের চাহিদা আজ সর্বত্র। পেট্রোলিয়াম থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে কেরোসিন, আলকাতরা, ন্যাপথেলিন এবং আরও নানা রকমের উপজাত পদার্থ। ঐ সমস্ত সামগ্রী গাড়ির টায়ারের রবারের উৎকর্ষ সাধনে, বিভিন্ন রকমের প্রসাধন দ্রব্য, সাবান, ছাপার কালি, রঙ এবং প্লাস্টিক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সার, কীটঘ্ন ওষুধ এবং অনুরূপ রাসায়নিক বস্তুর নিয়মিত উপাদান অব্যাহত রাখার দরুনও পেট্রোলিয়ম জাত সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন দারুণ ভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে অশোধিত-খনিজ তেলের নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই আজ কোন না কোন ভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। স্থলভাগে এবং বিশেষ করে সমুদ্রে গভীর নলকূপ বসিয়ে এ ব্যাপারে কাজও শুরু হয়ে গেছে। উত্তর মেরু থেকে আফ্রিকা, এশিয়া থেকে ল্যাটিন আমেরিকা—মানুষের সন্ধানী দৃষ্টি আজ সর্বত্র। বিশেষজ্ঞদের হিসেব, ব্যাপক এই তৈল-সন্ধান অভিযানকে সফল করে তুলতে হলে এই সত্তর দশকেই ব্যয় করতে হবে কম করেও ৭৫০০ কোটি টাকা।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস দপ্তর স্থাপিত হওয়ার পর বস্তুত ভারতে ব্যাপক তেল অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের শেষ পর্যন্ত এদেশে মোট তৈলকূপ খনন করা হয়েছে ২০৩২টি। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে তিনটি জায়গায় তেলের নতুন উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালে আসামের নাহারকাটিয়ায়, ১৯৫৬ সালে মোরানে এবং ১৯৬০ সালে গুজরাটে। সম্প্রতি ভারত সমুদ্র গর্ভেও খনিজ তেলের অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়েছে; গত বছর কাম্বে উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমুদ্রে ড্রিলিং শুরু করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভারতে অশোধিত তেলের উৎপাদনও বেশ বেড়ে গেছে। ১৯৫০ সালে যেখানে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টন অশোধিত তেল উৎপন্ন হয়েছিল, সেখানে ১৯৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ছাব্বিশ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার টন। আর ১৯৬৯ এর শেষ পর্যন্ত মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টন। অনুমান, ভারতের ভূগর্ভস্থ তেলের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এখন এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ কোটি ১২ লক্ষ ৯ হাজার টনের মত। আরও অনুসন্ধানের কাজ যথারীতি চলছে।

একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ভারতে পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থের চাহিদা ১৯৫০ সালে ছিল ৩৩ লক্ষ ২০ হাজার টন, আর ১৯৬৯ সালে তার পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টন এবং মাথাপিছু ঐ সমস্ত পদার্থের ব্যবহার ১৯৫০ সালে যেখানে ছিল ৮·৪ কিলোগ্রাম ১৯৬৯ সালে সেটা এসে দাঁড়িয়েছিল ২৮·২ কিলোগ্রামে।

এছাড়া ভারতে তৈল শোধনের কাজও বেড়ে গেছে। ১৯৪৭ সালে এদেশে একটি মাত্র শোধনাগার ছিল আসামের ডিগবয়-এ। আজ সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে নয়টিতে। দশম শোধনাগারটির নির্মাণের কাজ চলছে হলদিয়ায় এবং আরও একটি স্থাপিত হবে আসামের বনগাইগাঁও-এ। ১৯৬৯ সালে ভারতে মোট এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার টন অশোধিত তেল শোধিত করা হয়েছিল, অথচ ১৯৫০ সালে শোধিত তেলের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৫২ হাজার টন। ভারত এখন পেট্রোলিয়াম পদার্থ রফতানির কাজেও হাত দিয়েছে। ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৯-এ। ১৯৬৭ সাল থেকে এই সংস্থাটি মোটর গাড়ির প্রয়োজনীয় গ্যাসোলিন থাইল্যাণ্ডে রফতানি করছেন।

পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্য একটি শিরোনাম। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশ এবং চল্লিশ দশকে ঐ অঞ্চলে বিশ্বের অন্যতম প্রধান তৈল উৎপাদক রূপে সর্বপ্রথম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ১৭০০ কোটি ব্যারেল বা পিপা অশোধিত পেট্রোলিয়াম মজুত রয়েছে উল্লেখ্য, এক ব্যারেল তেল মোটামুটি ভাবে ৪২ গ্যালন বা ১৫৯ লিটারের সমান। ১৯৬৬ সালের একটি হিসেবে বলা হয়েছে, ঐ বছর মধ্যপ্রাচ্যে অশোধিত তেলের মোট উৎপাদন দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৩৩৯ কোটি ১০ লক্ষ ব্যারেল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভূগর্ভে সঞ্চিত অশোধিত তেলের শতকরা ৮০ ভাগই রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে। সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'ইউ এস নিউজ আণ্ড ওয়ার্লড রিপোর্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বর্তমানে পৃথিবীতে মোট তেলের সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪৬৪০০ কোটি ব্যারেল। বাৎসরিক খরচ ১,২৮০ কোটি ব্যারেল। এবং ঠিকমত অনুসন্ধান চালালে আরও

৩১,০০০ কোটি ব্যারেল পেট্রোলিয়ামের সন্ধান মিলবে। অবশ্য এই সমীক্ষায় কম্যুনিস্ট দেশগুলি ধরা হয় নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত সোভিয়েত দেশে অশোধিত তেল উৎপাদনের পরিমাণ নিয়মিত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালে ওঁদের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র আড়াই কোটি ব্যারেল। ১৯৬২ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়াল ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টন বা ১২৮ কোটি ব্যারেলের মত, ১৯৬৬তে ১৬৮ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেলে। বর্তমানে সোভিয়েত দেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অশোধিত তেল উৎপাদনকারী রূপে পরিগণিত হয়েছে।

আলাস্কা ও কানাডার সুমেরীয় অঞ্চলে সম্প্রতি তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের সুনিশ্চিত ধারণা, বেরিং সাগর থেকে কানাডার সুমেরীয় দ্বীপগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত বরফে ঢাকা অঞ্চলের নীচে চাপা পড়ে আছে প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেলের সঞ্চয়। তাঁদের অনুমান, এই তেলের পরিমাণ ৮০০০, কোটি ব্যারেলের কম হবে না। কানাডার অপর অনেক অনগ্রসর অঞ্চলেও ভূগর্ভে তেলের ভাণ্ডার রয়েছে।

সম্প্রতি নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ডস ও ব্রিটেনের অদূরে উত্তর সাগর অঞ্চলে খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদদের অনুমান, খনিজ তেলের এই নতুন উৎস ইউরোপে মজুদ তেলের পরিমাণ প্রায় চারগুণ বাড়িয়ে দেবে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ইউরোপ এতকাল খনিজ তেলের ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার তৈল ভাণ্ডারের ওপরই নির্ভরশীল ছিল। মাত্র বছর দশেক আগেও আফ্রিকা বিশ্বে উৎপন্ন মোট খনিজ তেলের এক শতাংশও উৎপাদন করত না। কিন্তু এখন আফ্রিকা উৎপাদন করছে বিশ্বের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশ। খনিজ তেলের উৎপাদনে আফ্রিকার এই উন্নতির মূলে কারণ হল নাইজিরিয়ায় দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসান। নাইজিরিয়ার মজুদ তেল সিরিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সিরিয়ায় মজুদ তেলের পরিমাণ হবে প্রায় ৩,৫০০ কোটি ব্যারেল। অ্যাঙ্গোলাও একটি বেশ বড় তেল উৎপাদকে পরিণত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এশিয়ার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া খনিজ তৈলসন্ধানী কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্যস্থল। ১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়

খুবই ব্যয়সাধ্য। আমেরিকার ব্যুরো অব মাইনস ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কতকগুলি কারখানা চালু করে প্রমাণ করলেন যে, এই জাতীয় শিলাখণ্ড থেকে তেল নিষ্কাশন করা অসম্ভব নয়। অবশ্য এই তেলের পরিমাণ হয়ত উল্লেখ করবার মত বেশি হয় নি। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অচিরেই এমন এক নতুন কারিগরি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হবে যা এই কঠিন পাহাড়ের বুকে থেকেও অজস্র পরিমাণে তৈল রসধারা নিষ্কাশন করে নিতে পারবে। তখন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৈল-শিলার অবদানও কম হবে না।

উদয়ন মোহান্তির কৃতিত্ব

ভারতীয় ছাত্র শ্রীউদয়ন মোহান্তিকে এ বছর 'ওয়েস্টিং হাউস সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ' বিজয়ী রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের বিজয়ীর মোট সংখ্যা ৩০০ এবং ওকলাহোমা স্টেট-এ মাত্র ৪। উদয়ন ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বিজ্ঞান মেধা সম্পর্কিত এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ওয়েস্টিং হাউস। বিজয়ীদের ওঁরা বলেন, 'জাতির (মার্কিন দেশ) শ্রেষ্ঠ মেধা'।

উদয়নের বয়েস এখন সতের। আদি নিবাস ওড়িশা। তবে বাবা মার সঙ্গে কলকাতাতেই থাকত। বছর দুই আগে ওঁদের সঙ্গে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায় এবং নরম্যান উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। উদয়ন বলেছে, 'ভারতে থাকার সময় একটি বিজ্ঞান-কোষ পড়ে ওয়েস্টিং হাউসের ঐ প্রতি-যোগিতার কথা প্রথম আমি জানতে পারি।' তার বক্তব্য, তখন থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে সে ভাবতে শুরু করে। তারপর ১৯৭[illegible] মোহান্তি পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেবার পরই সে কাজ শুরু করে দেয়।

প্রতিযোগিতায় যে গবেষণাপত্রটি সে পেশ করেছিল তার শিরোনাম 'দা প্র[illegible] অব্ রিজিড বডি ইন রিলেটিভিটি অ্যান্ড ইন ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স'। এটি তৈরি করতে তার মোট সময় লেগেছিল পাঁচ মা[illegible] এবং এর তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে [illegible] সময় [illegible] উদয়ন [illegible] বা স্থিতিস্থাপক বস্তুকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। কারণ [illegible] কোন বস্তুই যথার্থ স্থিতিস্থাপক [illegible] উদ্দেশ্য, পদার্থের আণবিক গঠনের [illegible] এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালান।

কলকাতা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নরম্যান উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে [illegible] তাকে ভর্তি হতে হয়। প্রচুর [illegible] এখানেই। এখানেই সে উচ্চতর পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো শুরু করে দেয়। অবশ্য তার সবই গবেষণার প্রয়োজনীয় পাঠ। ঐ সময়ে সে বন্ধু হিসেবে পায় ডঃ [illegible]কে। এক সময়ে উনি দিল্লি এবং [illegible] শিক্ষক ছিলেন। এখন ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ডঃ মেরেন্দা তাকে আপেক্ষিকতাবাদের উপর একটি বই পড়ে নিতে উপদেশ দেন। কিন্তু ঐ বইটি বুঝতে যতটা গণিতের জ্ঞান দরকার হয়, তা উদয়নের [illegible] না। অতএব গণিতের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু তাকে আয়ত্ত করতে হল সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। ওর গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত উপদেশ দিয়েছিলেন ডঃ মেরেন্দা। এছাড়াও তাকে সাহায্য করেছিল নরম্যান উচ্চ বিদ্যালয়ের জীববিদ্যার শিক্ষিকা ও ডি জনস। এবং তারই ফলশ্রুতি উদয়নের সাফল্য। উল্লেখ্য, উদয়নের বাবা ডঃ জিতেন্দ্র মোহান্তি বর্তমানে ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে

কাজ করছেন। সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে ওকলাহোমা থেকে প্রকাশিত 'দ্য নরম্যান ট্রানসক্রিপ্ট' দৈনিক পত্রের রবিবার, জানুয়ারি ২৪, ১৯৭১ সংখ্যায়।

দ্রুতগামী মনোরেল

বিভিন্ন শহরের সঙ্গে দ্রুত যানবাহন সংযোগের জন্যে পশ্চিম জার্মানি সম্প্রতি মনোরেলের একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। ওঁরা বলছেন, ঠিক এই মুহূর্তে নয়, আগামী আশির দশকে ব্যবস্থাটি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। মনোরেল স্থাপন এবং ঐ রেলপথে যে গাড়ি চলাচল করবে তার পরিকল্পনা করেছেন মুনিখ-এর ক্রাউস-মাফাই প্রতিষ্ঠান। নাম রেখেছেন 'ট্রান্স র‍্যাপিড'। ওঁদের ঐ গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় পাঁচশ কিলোমিটার। ওঁদের বক্তব্য, যে সমস্ত জায়গার অন্তর্বর্তী দূরত্ব ২০০ থেকে ১৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে প্রচলিত অন্য যে কোন রকমের যানবাহনের থেকে সে সমস্ত অঞ্চলে অনেক কম সময়ে যাতায়াত করা যাবে। এমন কি বিমানের চেয়েও কম সময়ে। অথচ এর জন্যে খরচ পড়বে বিমানের চেয়েও কম। এখনকার প্রথম শ্রেণীর রেল টিকিটের যা খরচ, তার চেয়েও কম হতে পারে।

মনোরেলের প্রতিটি বগি লম্বায় হবে পঁয়ত্রিশ মিটার, ওজন সত্তর টনের মত। যাত্রীবহন ক্ষমতা ১৫০ থেকে ২২০ জনের মত। যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একসঙ্গে দুই বা তিনটি বগি জুড়ে দেওয়া হবে। রেলগাড়ি তৈরি করার ব্যাপারে ক্রাউস-মাফাই কোম্পানি তিনটি বিশেষ যান্ত্রিক সুবিধের কথা বিবেচনা করছেন। এক, নির্ভরযোগ্যতা, দুই, রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কম খরচ এবং তিন, শব্দ প্রতিরোধ এবং ইঞ্জিন থেকে নিষ্ক্রান্ত জ্বালানির ধোঁয়া থেকে আবহাওয়ামণ্ডলকে মুক্ত রাখা। ইঞ্জিনে থাকবে গ্যাসচালিত টারবাইন এবং জেনারেটার। কারণ ওঁরা মনে করছেন অত দ্রুতগতিতে গাড়ি চললে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় অসুবিধে হবে। বিশেষ ধরনের ব্রেক ঘণ্টায় পাঁচশ কিলোমিটার চলমান গাড়িকে মাত্র পঞ্চাশ সেকেণ্ডের মধ্যে থামিয়ে দিতে পারবে। আর এই সময়ে ট্রেনটি অতিক্রম করবে মাত্র সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরত্ব। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ফ্রান্সও অনুরূপ মনোরেলের কথা ভেবেছেন। তাঁদের গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগের কথা বলা হয়েছে ঘণ্টায় ৩৩৪ কিলোমিটার। তবে ঐ গতিতে চলার সময় ব্রেক কষে গাড়িকে থামাতে বেশি সময় লাগবে এবং সম্পূর্ণ থামাতে হলে দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে প্রায় আঠারো কিলোমিটারের মত।

আপাতত ওঁরা দুটি রেলপথের কথা চিন্তা করছেন। এক, মুনিখ থেকে স্টুটগার্ট হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং দুই রুর থেকে হামবুর্গ। এর জন্য মোট ১১৮টি বগির ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রত্যেকটি পথে দিনে ৫৭০০০ যাত্রী বহন করবে।

ক্রাউস-মাফাই প্রতিষ্ঠান যে মনোরেলের কথা ভাবছেন

পত্রিকা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান (রামন স্মৃতি সংখ্যা) সম্পাদক : শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-২৩, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬।

বাংলা ভাষী জনপ্রিয়-বিজ্ঞান পাঠক-পাঠিকার কাছে এই পত্রিকাটি সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। কারণ আজও পর্যন্ত এটিই বাংলা ভাষার একমাত্র সার্থক বিজ্ঞান পত্র। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সি ভি রামনের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিভিন্নভাবে তাঁর উপর অনেক প্রবন্ধই প্রকাশ করেছেন। দুঃখের বিষয় তার বেশির ভাগই দাঁড়িয়েছিল সাময়িক ঘটনার রোজনামচার মত। তাদের মধ্যে আবেগ ছিল। ইন্ধন ছিল না। শুধু বাক্যপুঞ্জোই ছিল, বক্তব্যের যথাযথ স্বরূপটি তেমন উদ্ঘাটিত হয়নি। সে যেন এক বিস্ময়প্রায় বাস্তবকে নতুন করে উপলব্ধি করার প্রয়াস। রামনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির গল্প এবং 'রামন-এফেক্ট' সম্পর্কে ভাসা ভাসা কিছু আলোচনা, বেশির ভাগ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল এই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর রামন-স্মৃতি সংখ্যা প্রকাশ করে তাঁরা বড় রকমের একটি শূন্যতাকে দূর করলেন। বিশেষ এই সংখ্যাটিতে তাঁরা রামনের বৈজ্ঞানিক এবং মানসিক দিক সম্পর্কিত বিশিষ্ট লেখকদের যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন যে কোন কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকার কাছে সেগুলি মূল্যবান 'রেফারেন্স' হিসেবে যে সমাদর পাবে তাতে সন্দেহ নেই।। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার, সূর্যেন্দু বিকাশ কর, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত বসু, রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রভৃতি। ওঁরা আলোচনা করেছেন রামন এফেক্টের আবিষ্কার তত্ত্ব, লেসার রামন বর্ণালী বিজ্ঞান, রামনের বিজ্ঞান সাধনার কলকাতা অধ্যায়, রামন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রসায়ন বিজ্ঞানে রামনের আবিষ্কারের প্রভাব, প্রভৃতির উপর। রামন সম্পর্কে ঠিক একসঙ্গে এত বিস্তৃত এবং তথ্যবহুল সংকলন আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। শুধু পত্রিকার মাধ্যমে ঐ মূল্যবান রচনাগুলি ফেলে না রেখে পরিষদ যদি পুস্তকাকারে ওদের একটি সংকলন প্রকাশ করেন, ভবিষ্যৎ পাঠক-পাঠিকারাও উপকৃত হবেন বলে মনে করি।

সমরজিৎ কর

পানামা
সিগারেট
একটি পানামা সিগারেট ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার স্বাদ। তারপর টানের পর টানে ধূমপানের অপূর্ব আমেজ পাবেন — একেবারে শেষ টান পর্য্যন্ত।
শেষ টান পর্য্যন্ত ভালো!
Panama
20
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

মূর্তি নির্মল জলে দেখিয়া ক্রোধেতে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলেন ও তাহার প্রতিধ্বনি হওয়াতে সিংহ শৃগালকে কহিলেন, 'কি! বুঝি আমার শত্রু জলে আছে, দেখিলাম, শব্দও শুনিলাম...' তখন শৃগাল কহিল, 'হে মহাশয়, শত্রু থাকিলে সর্বদা ভীত থাকিতে হয়, অতএব ইহাকে নষ্ট করা উচিত।' তৎক্ষণাৎ দুইজনে জলের নিকটে গেলে সিংহ আপন মূর্তি দেখিয়া ঝম্প দিয়া পড়িবামাত্র কুম্ভীর তাহাকে নষ্ট করিল। তদনন্তর শৃগাল ঐ সকল মাংস লইয়া আপন সন্তানেরদের নিকটে গেল ও তাহারদিগকে দিল।"

বলা বাহুল্য, ঈশপ, ফেদ্রুস, লা ফোঁতেন ও বিদ্যাসাগরের ক্লাসিকাল গল্পে বাঘের জায়গায় আছে কুকুর, হিংসার জায়গায় আছে লোভ, কূপ ও সরোবরের বদলে নদী, প্রতারণার বদলে মূর্খতা।

শৃগালের ঔষধে বলদের আরোগ্য

ঈশপের (আর লা ফোঁতেনের) আরেকটি গল্পের সঙ্গে ঈতিহাসমালার আরেকটি গল্পের তুলনা আরো কৌতূহলপ্রদ। ঈশপের গল্পের নামঃ 'সিংহ, নেকড়ে ও

হোলা রাজার সহিত ... ঔষধ সেবন করিলে তেনমার সম্পদ হইবে।' ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন যে, 'তোমা হইতে বুদ্ধিমান আর কে আছে?' সিয়াগোস উত্তর করিল, 'যদি আমি বুদ্ধিমান হইতাম, তবে কেন অপমানগ্রস্থ হইলাম?' অনন্তর শার্দূল কহিলেন, 'তবে বানর বুদ্ধিমান; যাহা উপযুক্ত হয়, শীঘ্র কর।'

এ-আজ্ঞা হইবামাত্র সিয়াগোস বানরকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কহিল যে, 'তুই আমার পদ লইয়া অনায়াসে প্রধানত্ব করিতে উদ্যত হইয়াছিলি; এখন তোর রক্ষক কে?' তাহাকে বানর কহিল যে, 'আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।' অনন্তর সিয়াগোস নখেতে বানরের শরীর বিদীর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রাজাকে সুস্থ করিল। বানর সে বন হইতে প্রস্থান করিল।"

ইতিহাসমালার পশুরাজ সিংহ নয়, বাঘ; শিয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী নেকড়ে নয়, বানর। প্রধান পার্থক্য কিন্তু শেয়ালের চরিত্রের মধ্যে : ইতিহাসমালার শিয়াল নৈতিকতা-বিবর্জিত নয়, 'আহারোপযুক্ত মাংস' এনে দিতে সে প্রস্তুত ছিল; বাঘ কিন্তু ঐ ধরনের ভিক্ষা চায় না, শুধু এমন সাহায্য চায়, সে যাতে নিজেই স্বচ্ছন্দে মৃগ বধ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হতে পারে। শিয়াল আবার তার শত্রুর মৃত্যু চায় না, শুধু তার 'কিঞ্চিৎ রক্ত' চায়...না, তাও না, বানরের রক্ত সে চায় না, বুদ্ধিমানের রক্ত চায়; বাঘ নিজেই বুঝুক, বুদ্ধিমান কে।

পশুরাজের বিচারালয়ে

ইতিহাসমালার চাতুর্য শৃগালের একচেটিয়া নয় : সিংহও চতুর হতে পারে। পুত্রহীন এক রাজা একটি নেকড়িয়া-বৎস এবং একটি ব্যাঘ্র-বৎসকে প্রতিপালন করতেন। "নৃপতির মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া দুই বৎস একত্র রাজ-সন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিল যে, 'মহারাজার অবর্তমানে আমারদিগের কি প্রকারে প্রতিপালন হইবে।' ভূপাল কহিলেন, 'আমি এক মহাপুরুষের স্থানে একখানি রুটী পাইয়াছি। সে-রুটী হইতে যে-অংশ যে-খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা পাওয়া যায়। সেই রুটী তোমারদিগকে দেওয়া গেল।' ইহা কহিয়া বৎসেরদিগকে দিলেন।

পরে রাজার মৃত্যু হইলে ঐ রুটীর অংশের জন্যে দুই বালকেতে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। নেকড়িয়ার বৎস কহিল, 'আমি রাজার প্রথম প্রতিপালিত এবং জ্যেষ্ঠ, আমি অধিকাংশ পাইব।' ব্যাঘ্রের বালক কহিল, 'আমি ব্যাঘ্রের ঔরসজাত; তুই স্বভাবতঃ আমার হইতে ছোট, আমি অধিক অংশ পাইব।' এই বিরোধ করিয়া অপ-নিষ্পত্তির কারণ বিবাদভঞ্জক নামে এক পশুরাজ সিংহের নিকটে দুই বালক ঐ রুটী লইয়া উপস্থিত হইল ও সকল বৃত্তান্ত কহিল। মৃগেন্দ্র বিস্তারিত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'তোমরা দুইজনেই ভূপতির প্রতিপালিত : উভয়েতে সমানাংশ পাইবা।' এই কথা কহিয়া রুটি লইয়া ভাঙ্গিয়া দুই অংশ সমান করিতে এক অংশ অধিক হইল। তাহাতে তুল্য করিবার নিমিত্ত অধিকখানের কিছু সিংহ ভক্ষণ করিলেন। ইহাতে ন্যূনাংশখান অধিক থাকিল। পুনর্বার সেই ন্যূনাংশের কিঞ্চিৎ ভোজন করিলে পুনঃ অধিকাংশখান অধিক থাকিল। এইরূপে সমাংশ করিতে ক্রমে উভয়াংশই সিংহের ভক্ষিত হইল।"

এই ধরনের দুটি গল্প লা ফোঁতেনের সংকলনে মেলে। একটি গল্পের নাম : 'ঝিনুক ও বাদীদ্বয়'। দুজন যাত্রী সমুদ্রতীরে লোলুপ দৃষ্টিতে একটা ঝিনুক দেখতে পায়। তর্ক ওঠে : ঝিনুকটা কে খাবে? কে আগে ওটা দেখেছে? একজন মধ্যস্থের কাছে ওরা শরণ পন্ন হয়। লোকটি ঝিনুকটাকে খুলে তার শাঁসটা গিলে ফেলে উভয়কে একটা ক'রে শূন্য খোলা দেয়।

দ্বিতীয় গল্পের নাম : 'বিড়াল, বেজি

পরিকল্পনার বিশ বছর ও

বিদেশের সমালোচনা

মার্চ মাসেই আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিংশতি বছর পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত আমরা পরিকল্পনা থেকে কী সুফল পেয়েছি—ভুলত্রুটির মাসুল আমাদের কী দিতে হয়েছে, উদ্দেশ্য থেকে আমরা কতটা পিছিয়ে এসেছি, সব কিছুই একবার বিচার করা দরকার। আমাদের পরিকল্পনা যখন শুরু হয় তখন পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করে বলেছিলেন, যদি পরিকল্পনার কাজ ঠিকভাবে চলে তবে ১৯৭০-৭১ সালে আমাদের দেশ ভারসাম্যসূচক উন্নয়ন বা সুষম উন্নয়নের (Balanced Growth) পথে এগিয়ে যাবে এবং উন্নয়নের প্রকৃতি হবে স্বনির্ভরশীল; কিন্তু বিশ বছর বাদে যাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন বা ভারসাম্যসূচক উন্নয়ন অর্জিত হয় সেজন্য গোড়া থেকেই ক্ষেত্রবিশেষকে অগ্রাধিকার (Priority) দিয়ে দেশকে সেই উন্নয়নের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াবার জন্য এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষির উপর গুরুত্ব বেশী আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যদিও সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছিল, তবুও মোট বিনিয়োগের বণ্টনে আপেক্ষিকভাবে গুরুভার শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল; ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে অবশ্য উপেক্ষা করা হয়নি। পরিকল্পনা কমিশন তখন ভেবেছিলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন বা সাহায্য পাওয়া যাবে। গুরুভার শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও কাঁচামাল আমদানি যাতে সহজেই করা যায় সেজন্য ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার আমদানি নীতি যথেষ্ট শিথিল করেছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একমাত্র ১৯৫৮ সাল ছাড়া কোন বছরেই খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। আমদানি নীতি শিথিল করার পর থেকে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত আমদানি চলতে থাকে, খাদ্যসামগ্রীর আমদানিও বাড়তে থাকে; তার ফলে সৃষ্টি হয় তীব্র বৈদেশিক মুদ্রা সংকট। বৈদেশিক সাহায্যও আশানুরূপ পাওয়া যায়নি, শেষ পর্যন্ত বাজারে প্রচুর নতুন মুদ্রা ছেড়ে [illegible] [illegible] [illegible] করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দুই বছর পেরিয়ে যাবার পর সরকার "উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকট" (Crisis of ambition) যে কী জিনিস তা উপলব্ধি করলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনা সংশোধন করা হল, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল সামান্যই। তৃতীয় পরিকল্পনা যখন শুরু হয় তখন ভারতের সামনে চারটি সমস্যা দেখা গেল এবং সবগুলি সমস্যাই ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ—সেগুলি হল খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, এবং মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। রপ্তানির ক্ষেত্রেও সরকারের কর্মসূচী সফল হল না। রিজার্ভ ব্যাংক তার মুদ্রা সম্পর্কিত নীতির পরিবর্তন করলেন, সরকারও কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও মুদ্রামূল্য বৃদ্ধির গতি প্রতিহত করা গেল না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বাড়াবার লক্ষ্য ছিল শতকরা ১২.৫ ভাগ; কিন্তু তা বেড়েছিল শতকরা ১৮ ভাগের বেশী এবং তাও বেড়েছিল সাড়ে চার বছরের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় যেখানে শতকরা ২৫ ভাগ বাড়বে বলে ধরা হয়েছিল, সেখানে তা বেড়েছিল শতকরা ২০ ভাগ। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। কৃষি, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, কোন ক্ষেত্রেই আমরা সাফল্যের দরজার কাছাকাছিও যেতে পারিনি। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বেড়েছিল মাত্র ১৭.৫ ভাগ।

পর পর তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার এই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার কারণ হল বর্তমানে আমাদের পরিকল্পনা কোন পথে চলছে তার পুনর্বিবেচনা করা। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাবার পর তিনটি বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং একটি বড় পরিকল্পনার ঝুঁকি গ্রহণ না করে সরকার সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। এই নীতির সুফল আমরা দেখতে পেয়েছি পর পর চার বছর ধরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে। ১৯৭০-৭১ সালে ভারসাম্যসূচক বা সুষম উন্নয়ন ভারতে অর্জিত হয়নি; বরং কর্মসংস্থান ও মূলধনের স্থিতিশীলতা এই দুইটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যর্থতা সূচিত হয়েছে। কিন্তু কেন? কর্মসংস্থান যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাড়ানো যাচ্ছে না, এটা নিশ্চয়ই পরিকল্পনার ত্রুটি; কিন্তু বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন যে বেড়ে যাচ্ছে তার সব কারণই পরিকল্পনার ভুলচুকের দরুন নয়। শিল্পক্ষেত্রে অশান্তির ফলে শিল্পোৎপাদন যে হ্রাস পাচ্ছে এবং এজন্য যে নতুন শিল্প স্থাপন ও বর্তমান শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না, তার জন্য পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ দায়ী নয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উস্কানি বহু ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিল্পোন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়েছে এবং কল-কারখানা বন্ধের কারণ হয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। জনসংখ্যাবৃদ্ধিও একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকার পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচার করে জন্মহার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারেন; কিন্তু মৃত্যুহার কমে যাওয়ার জন্য যে জনসংখ্যা বাড়ে তার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা যখন বাড়বেই তখন তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই হবে। কর্মসংস্থান সম্প্রসারিত করার

দায়িত্ব সরকারের এবং সেজন্য বিনিয়োগ নীতির পুনর্বিন্যাস করা দরকার; কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের পরিকল্পনা পদ্ধতি এক্ষেত্রে নতুন করে সাজানো দরকার।

১৯৭০-৭১ সালে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ উন্নত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে যাওয়ার কারণ রপ্তানির সম্প্রসারণ যতটা, তার চেয়ে বেশী হল আমদানি হ্রাস। অথচ, কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ করার জন্য এবং শিল্পক্ষেত্রে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনা অথবা উৎপাদন বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি অথবা কাঁচামালের আমদানি আরও বাড়াতে হবে। রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ কিছুতেই লক্ষ্যমাত্রায় (শতকরা সাত ভাগ) নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যদি রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়ানো না যায় তবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আর বাড়তে থাকবেই না, বরং বর্ধিত পরিমাণে আমদানি হলে অবস্থা আবার খারাপের দিকে যেতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করাও তখনই সম্ভব হবে যখন উৎপাদন আরও দ্রুত হারে বাড়বে। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির একটা লক্ষণীয় দিক হল শিল্পজাত ভোগ্য সামগ্রী,

কাঁচামাল প্রভৃতির দাম যতটা বাড়ছে, কয়েকটি কৃষিজাত সামগ্রীর দাম ঠিক সেই হারে বাড়ছে না। কৃষি-উৎপাদনের সাম্প্রতিক বৃদ্ধির জনাই এটা সম্ভব হয়েছে। অধিক মুদ্রা বাজারে ছাড়ায় যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাঙ্ক রেট গত জানুয়ারী মাসে পাঁচ শতাংশ থেকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তাতেই সমস্যার যে সমাধান হবে না তা বোঝা যাচ্ছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়া তখনই প্রতিহত করা সম্ভব হবে যখন সরকার কঠোর হস্তে মুনাফাখোরদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, কালো টাকার পরিমাণ কমাতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলির উৎপাদন বাড়াতে পারবেন। কিন্তু নতুন সরকার কি তা পারবেন?

১৯৭৩-৭৪ সালে যদি পুরোপুরি খাদ্য-শস্য আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হয়, তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্তত একটি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হবে। কিন্তু বেকার সমস্যার তীব্রতা দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে, তাতে সেই সাফল্য চাপা পড়ে যাবে ব্যর্থতার বোঝায়। সেজন্য এখন প্রয়োজন চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার মূল কাঠামোর মধ্যেই বিনিয়োগ নীতির পুনর্বিন্যাস করা। কর্ম-সংস্থানের সম্প্রসারণ না করতে পারলে সাধারণ মানুষের মনে পরিকল্পনা সম্পর্কে আস্থার ভাব ফিরে আসবে না।

বিদেশে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে এখন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। ভারতে কৃষি উৎপাদন কর্মসূচীর সাফল্য যেমন প্রশংসিত হচ্ছে, তেমনি শিল্প উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতি এবং কর্মসূচী গ্রহণে ব্যর্থতা এবং মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা হ্রাসে ব্যর্থতায় বিদেশী সমালোচক-গণ মুখর। বিশেষ করে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকাগুলি ভারতের ব্যর্থতার দিকটির দিকেই আলোকপাত করছে। ভারত যে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পেয়েও আশানুরূপ উন্নতি করতে পারেনি, এটা খুব জোরের সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে; কিন্তু জনপ্রতি হিসাবের ভিত্তিতে (On Per Capita basis) ভারত যে বহু দেশ থেকে (পাকিস্তান সহ) অনেক কম বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে—এ কথা কোন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় স্থান পায় না। যা হোক, বিদেশী সমালোচকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ আমাদেরই। পরিকল্পনার ব্যর্থতার বোঝা যাতে আর না বাড়ে সেদিকে এখন নতুন সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং সেভাবে পরিকল্পনা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করা উচিত।

সুব্রত গুপ্ত

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় **ফারুখ ইঞ্জিনীয়ার** বলেন:

"শুধু ব্রিলক্রীমই আমার চুল আমার পছন্দমত পরিপাটি আর পরিষ্কার রাখতে পারে।"

BLB-2082

সানসাইন থ্রু দি উড —রুচির যোশী

...প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। শিল্পী ... রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী, এবং এই ... রঙের মধ্য দিয়ে অনেক ... রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান ... রূপায়িত করেছেন। সুতরাং ... বিভিন্ন রচনাগুলিকে ঠিক শিল্প-... হিসাবে বিচার করা উচিত নয় বরং ... রবীন্দ্রসঙ্গীত রূপায়ণের প্রথম প্রচেষ্টা বলা চলে। অধিকাংশ রচনাই ... অঙ্কনরীতির নির্দিষ্ট ... দেখা যায় না, এবং শিল্পীর ... করা যায় না। তবুও ... প্রচেষ্টার দিক থেকে বিচার করলে কয়েকটি মন্দ লাগে না—বিশেষ করে যেখানে শিল্পী ... নীল বা বেগুনী রঙ ব্যবহার ... তথা স্তরভেদ সৃষ্টি করেছেন —যেমন নীলবর্ণপ্রধান-কে। আংশিক আবরণে ... তিনটি মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়ে শিল্পী ...গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে ... ও ... নাম করা চলে। ছবির মাধ্যমে গানের রূপ বা তাৎপর্য প্রকাশ করা দুরূহ কাজ, অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীই এ বিষয়ে সচেতন। সুতরাং প্রচেষ্টা হিসেবে শিল্পীর কাজ প্রশংসনীয়।

*

দেশের বিভিন্ন স্থানে আজকাল শিশু-শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, ফলে বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আজ নিয়মিত-ভাবে ছবি আঁকে ও নানা প্রদর্শনীতেও যোগদান করে। নিষ্ঠাসহকারে ছবি এঁকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকেই সুনাম অর্জন করেছে। সম্প্রতি আকাডেমি গ্যালারীতে একটি ছোট ছেলের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল—তার নাম রুচির যোশী। প্রদর্শনীতে তার আঁকা ৩৮টি নিদর্শন দেখা যায়।

রুচির যোশীর বয়স মাত্র ১১—হিন্দী স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। এই বালকশিল্পী পোস্টার রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী, এবং এই রঙেই সে ছবির পর ছবি এঁকেছে, তবে তার রীতি সবক্ষেত্রে এক নয়। অধিকাংশই ইম্প্রেশনিস্টিক, তবে কয়েকটি বিমূর্ত ও সেমিবিমূর্ত নিদর্শনও চোখে পড়ে। দেখে মনে হয়, ছেলেটি তুলি-চালনায় অধিক দক্ষ। বিষয়বস্তু নানা শ্রেণীর—নিসর্গ দৃশ্য থেকে শুরু করে বিশেষ কোনও মনোভাবও সে রঙের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। কয়েকটি ছবির তুলি-ব্যবহার পরিণত হাতের পরিচায়ক। মনে পড়ে, অবন মহলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ছেলেমেয়েদের একটি প্রদর্শনীতে এই ছেলেটির আঁকা একটি ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলাম যে, কোনও অভিজ্ঞ শিল্পীর সাহায্য না থাকলে ছবিটি সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। প্রদর্শনীর অধিকাংশ কাজ দেখেই একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। যেমন পোলকের রীতিতে আঁকা সিটি বাই নাইট বা স্প্রিং ইন এ মাদার্স লাইফ। হলুদ রঙের ব্যবহার ও স্তরভেদ সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে সবুজ রঙের সংমিশ্রণ করে রুচির যোশী কয়েকটি সুন্দর ছবি এঁকেছে। এই প্রসঙ্গে অটাম ইজ কামিং-এর উল্লেখ করা যায়। কয়েক ক্ষেত্রে সে বিভিন্ন রঙের মধ্য দিয়ে ইমেজারি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, যেমন লেক থ্রু দি ট্রাঙ্ক অব এ ট্রি। সবুজ রঙের স্তরভেদ-প্রধান আর-একটি ছবিরও নাম করা চলে—সানসাইন থ্রু দি উড। অপরাপর ছবির মধ্যে ব্লুমিং ফ্লাওয়ার্স ইন দি সানসেট, দি ফিল্ড অ্যান্ড দি ফেন্সেস ও বিশেষ করে গোল্ড ইন দি ফিল্ডস উল্লেখযোগ্য। ছোট শিল্পীদের মধ্যে পরলোকগত পাপুর কথা অনেকের মনে আছে, অনিমেষের ছবিও অনেকে দেখে থাকবেন, সেই সঙ্গে এই ছোট শিল্পীর কাজ দেখেও অনেকে খুশি হবেন, সন্দেহ নেই।

—চিত্রপ্রিয়

সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে মোলায়েম, হাওয়ার চেয়ে হাল্কা লিপস্টিক
ল্যাকমে
আলট্রা-গ্লো
আর
আলট্রা-ফ্রস্ট
লিপস্টিক
নানা রঙে রঙীন ঝলকানি—
এঁকে চলে রেশমী মসৃণ গতিতে
ASP/L-71

কখনও বা নির্ভয়চিত্ত ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের ছাদে উঠিয়া বন্দী ছাত্রদের উৎসাহিত করিতে আওয়াজ তোলে—"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, জেলে যেতে ভয় নাই।" পুষ্পমালা, অথবা ফল, বিস্কুটের বাক্স প্রভৃতি সুউচ্চ প্রাচীর উপর দিয়া কারা প্রাঙ্গণে ছুঁড়িয়া দেয়। সে এক অপূর্ব জাগরণের প্রতিচ্ছবি!

মিঃ জিন্না সেই সময়েই ঢাকা আসেন ও বলেন, 'Urdu and Urdu alone shall be state language', ছাত্রসমাজ তাহাতে আরও বিক্ষুব্ধ হয় ও মিঃ জিন্নাকে সরাসরি challenge জানায়। ক্রমাগত দিনের পর দিন মিছিল শোভাযাত্রার মারফত প্রবল বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে এমন কি পরলোকগত ফজলুল হক সাহেবও সে সময় একদিন শোভাযাত্রায় যোগদান করায় পুলিস দ্বারা আক্রান্ত হন ও বিশেষরূপে আহত হন।

অবশেষে ছাত্রসমাজের দৃঢ়মুষ্টির আঘাতে ঢাকা ও অন্যান্য জেলের লোহকপাট খোলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর মামুদ হোসেন আমাদের সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে সাক্ষাৎ করেন ও অবশেষে হাজার হাজার অপেক্ষমান ছাত্রছাত্রীর সম্মুখে বন্দী মুক্তির আদেশ জারী হয়। জেল গেটে বিপুল সম্বর্ধনার মধ্যে তাঁকে চড়িয়া এবং দিতে দিতে ছাত্র নেতারা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

১৯৪৮ সালের বাংলা ভাষার এই আন্দোলন হইতে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ একদিকে যেমন ভাষা [illegible] প্রতিক্রিয়াশীল হিংস্র শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ দেখিতে পান তেমনি তাহারা [illegible] গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য ছাত্র সমাজের পাশে শ্রমিক ও কৃষকদেরও জমায়েত করার প্রয়োজন বোধ করেন। বাংলা ভাষা আন্দোলন হইতে উদ্ভূত নতুন নতুন ছাত্র কর্মীও নেতার আবির্ভাব হয়। নতুন পর্যায়ে ছাত্র কৃষক ও শ্রমিককে সংগঠিত করিয়া তাহাদের [illegible] সঙ্গে বাংলা ভাষার সংগ্রামও শুরু করে। এই সময় আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া যাঁহারা নেতৃত্ব দেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের দুই পুত্র তকীয়ুল্লাহ্ ও নকীয়ুল্লাহ্, ছাত্রী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী নাদেরা বেগম, বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপিকা। 'অজাদ' পত্রিকা সম্পাদক মুকুল ফৌজের শিশু সাহিত্যিক আবদুল্লাহ্ আলমুতী ও অধ্যাপক সর্দার ফজলুল করিমের নামও বিশেষভাবে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক সর্দার ফজলুল করিম অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের [illegible] শিষ্য। ফিলজফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

বন্দীরা সম্ভবমত অনশন ধর্মঘটের সময় কি বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হইয়া যখনই সুযোগ পান তখনই বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ন, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস রুশ ও ফরাসী ও চীন ভাষার সাহিত্যের পঠন পাঠন ও আলোচনা বা অনুশীলন করিয়া কারাগৃহে দিন যাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষভাবে অবদান রাখিয়াছেন তাঁহারা হলেন পূর্ব পাকিস্তানে খ্যাতনামা ও প্রবীণ সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার। তাঁহারা প্রত্যেকেই এখন পূর্ব পাকিস্তানে আছেন। সম্প্রতি সত্যেন সেন লেখায় বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা একাডেমীর বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীর বাংলা ভাষা আন্দোলন অত্যাচারে নিষ্পেষিত পূর্ব পাকিস্তানে শুধু বাংলা ভাষাকেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে নাই। বাংলা ভাষা আন্দোলনের বহু যোদ্ধার মুক্তির ফলে কারা প্রাচীর অন্তরালে প্রায় নির্বাপিত জীবন প্রদীপকে নতুন জীবন দান করিয়াছে।

আমি তখন চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দী। ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে অনশনের সময় নেতৃত্ব করার অভিযোগে শাস্তির জন্য আমরা মাত্র তিনজন যশোহর জেলে স্থানান্তরিত হই। সেখানে দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার দুই বৎসর পর চট্টগ্রাম জেলে স্থানান্তরিত হই। এই সময় প্রতিদিন বাহির হইতে শোভাযাত্রা ও সভার আওয়াজ পাওয়া যায়। বেশ কয়েকজন ছাত্র, লেখক, অধ্যাপক ও মধ্যবয়স্ক সরকারী কর্মচারী বাংলাভাষা আন্দোলনে বন্দী হইয়া আমাদের জেলখানার ওয়ার্ডে আসেন। তাঁহাদের কাছে বাহিরের বাংলাভাষার আন্দোলনের পূর্ণ বিবরণ শুনিয়া বুঝিতে হয় না যে শুধু বাংলাভাষা সুপ্রতিষ্ঠার নয়, আমাদের কারামুক্তির দিনও আসন্ন। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে আমি ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাই। তাহার পর ছয় মাসকাল স্বগৃহে অন্তরীণ থাকিয়া ভাষা ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহের সুযোগলাভ করি। সদ্যপ্রকাশিত এক কপি হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' শহীদদের স্মৃতি তর্পণ নিমিত্ত পুস্তিকা আমার হাতে আসে। সে পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধের একাংশ নীচে উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না :

"...একুশে ফেব্রুয়ারীর পেছনে দেশ-জোড়া এই বিপুল জমায়েত সম্ভব হয়েছিল কেননা এতো শুধু ভাষা আর সাংস্কৃতিক প্রশ্নই ছিল না এর সাথে জড়িয়ে ছিল আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার আত্মনিয়ন্ত্রণের [illegible] রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং

সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও। জাতিগত এবং আঞ্চলিক অত্যাচার ও শোষণের চিরচরিত সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াতে পূর্ব পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক মানুষই কোন ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠা বোধ করে নাই।"

হিমালয়ের মত বাধা অতিক্রম করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন যেভাবে সার্থক হইয়া উঠে তাহা এই পাক-ভারত উপমহাদেশে শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে ও পশ্চিমবাংলার সহিত পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন ঘটনায় বিচিত্র পূর্ণাঙ্গরূপে নির্ধারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কত গভীর ও ব্যাপক জাতীয়তাবোধ ও আত্মাহুতির ফলেই যে ইহার সম্ভব তাহারও পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবু আমরা আশায় থাকিব যে বদরুদ্দিন উমর যে প্রচেষ্টা সার্থকভাবে শুরু করিয়াছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক লেখক যাহাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাইয়াছেন সে প্রচেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

দেবপ্রসাদ মুখার্জী
অ্যাডভোকেট

একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় যন্ত্র মহাপ্রস্থানের পথে

দেশ পত্রিকায় ৭ই ফাল্গুন (১৩৭৭) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবীণ সরোদবাদক শ্রীতিমিরবরণের উক্ত লেখায় কয়েকটি অসঙ্গতির বিষয়ে সবিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মিঞা তানসেনের পুত্রের দিক থেকে শেষ বংশধর মহম্মদ হোসেন খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রবাব যন্ত্রটি লোপ পেয়েছে। প্রথমত, মহম্মদ হোসেন খাঁ নামটি ভুল; প্রকৃত নাম—মহম্মদ আলী খাঁ ওরফে ছেটকু মিঞা, বাসৎ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বিতীয়ত, মহম্মদ আলি খাঁ তানসেনের শেষ বংশধর নন; তানসেনের পুত্রবংশীয় তাজ খাঁর বংশ বোম্বাইতে বর্তমান। তৃতীয়ত, মহম্মদ আলীর মৃত্যুর সঙ্গে রবাব যন্ত্রটি লোপ পেয়ে গেছে? বাংলার সুপরিচিত সংগীত-গুণী শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যে অদ্যও রবাব বাদন করে থাকেন এ কথা শ্রীতিমিরবরণের বিস্মৃত হওয়া কিংবা স্বীকার না করা দুঃখের বিষয়। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে গত জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহেও রায়চৌধুরী মহাশয় আধ ঘণ্টা পুরবীতে রবাব বাদন করেন এবং তিনি 'এ' শ্রেণীর শিল্পী, এ কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। ১৯২৭ সালে মহম্মদ আলী খাঁর মৃত্যুর আগে শেষ প্রায় দু বছর তাঁরই নিকটে রবাব যন্ত্রে তালিম পান শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর। তাঁর পিতৃদেব শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর মহাশয় তখন তাঁর গৌরীপুর স্টেটে মহম্মদ আলী খাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং খাঁ সাহেব সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন ও বীরেন্দ্রকিশোরকে শিক্ষা দেন। মহম্মদ আলী খাঁর জীবিতকালেই রবাব যন্ত্র প্রায় লুপ্ত হয়ে আসে, তিনি ভিন্ন আর বিশেষ কেউ রবাবী তাঁর সমকালে ছিলেন না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরেও শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর এই যন্ত্রটির চর্চা, শৌখীন হলেও, যে অব্যাহত রেখেছেন—এ স্বীকৃতি শ্রীতিমিরবরণ দিতে পারতেন।

(২) শ্রীতিমিরবরণ লিখেছেন—'এ সময় কলকাতায় মহম্মদ দবীর খাঁ একমাত্র বীণকার।' দুঃখের বিষয়, এই বিবৃতিটিও বড়ই একদেশদর্শী। কলকাতার সঙ্গীত সমাজ তথা আকাশবাণীর শ্রোতৃবর্গ বিলক্ষণ অবগত আছেন যে—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জিয়াউদ্দিন ডাগর, সৌকত আলি খাঁ, শ্রীমতী মায়া মিত্র, ও শ্রীনন্দগোপাল বিশ্বাস বীণাযন্ত্রে অনুষ্ঠান করে থাকেন।

(৩) লেখক বলেছেন, 'আমি যখন স্বর্গীয় আমীর খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করি ১৯২০ সালে, তখন কলকাতায় এমনকি অবিভক্ত সারা বাংলা দেশে আমিই একমাত্র সরোদ শিক্ষার্থী ছিলাম।' এই উক্তির কি কোন অর্থ বা প্রয়োজন থাকে, যদি না তাঁর বক্তব্য হয় যে তিনিই অবিভক্ত বাংলার প্রথম সরোদ শিক্ষার্থী? উত্তরে নিবেদন করি, ১৯০৮-৯ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত স্বনামধন্য সরোদগুণী কৌকব খাঁর নিকটে রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, স্বর্গত

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু অমৃত্যু সরোদসাধক ছিলেন এবং সর্বভারতীয় নিরিখেও একজন প্রথম শ্রেণীর সরোদীরূপে গুণীসমাজে স্বীকৃত হন। বর্তমান বাংলার সুপরিচিত সরোদবাদক শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় ১৫ বছর যাবৎ সরোদ চর্চা করেন উক্ত শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসুর শিক্ষাধীনে, এ কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

(৪) শ্রীতিমিরবরণ লিখেছেন, 'একজন মাত্র বিখ্যাত শিল্পী আছেন তিনি সেতারকে সেতার যন্ত্রের মতনই বাজান, সরোদের বাজনা মোটেই নকল করেন না।' কে সেই আদি অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় সেতারী? লেখক তাঁর অবিস্মরণীয় নামটি প্রকাশ করে অন্ধকারচ্ছন্ন সেতার চর্চার জগৎকে আলোকিত করুন, তাঁর নিকটে এই সনির্বন্ধ প্রার্থনা। সেই সেতারবাদক কি রবিশঙ্কর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল নাগ, সংস্কৃত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে আছেন? যদি না থাকেন, তা হলে উল্লিখিত সেতারী গুণীরা কি সরোদের বাজনা নকল করেন?

তীর্থঙ্কর মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-৬

সার্থক নেতৃত্ব আর দলগত সংহতির সাফল্য।

এ জয়ে ভারতীয় দলের সবারই কিছু না কিছু অবদান আছে। ব্যাটের বীর সারদেশাই, সুনীল গাভাসকার, সোলকার, মানকড়ের কৃতিত্ব যতখানি, বোলার বেদী, বেঙ্কটরাঘবন, প্রসন্ন, দুরানি এবং আবিদ আলীর কৃতিত্বও ততখানি। খেলাটির পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং-শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন সেলিম দুরানি সোবার্স ও লয়েডের মত ধুরন্ধর দুজন ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিয়ে। তবু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে ব্যাটের বিক্রমে এ ম্যাচে বড় হয়ে উঠেছেন দিলীপ সরদেশাই এবং সুনীল গাভাসকার। বলের ধাঁধায় বেঙ্কটরাঘবন।

পাঁচদিনের খেলা চারদিনের মাথায় শেষ হলেও খেলাটি কিন্তু প্রথমদিন থেকেই আশা-আতঙ্ক এবং নাটকীয় মুহূর্তের আকর্ষণে ভরা ছিল। যেমন প্রথম দিনের প্রথম বলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওপেনিং ব্যাটসম্যান রয় ফ্রেডারিক বোল্ড। পৃথিবীর টেস্ট খেলার ইতিহাসে এটি চতুর্থ ঘটনা। তারপর ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় সব চেয়ে কম রানে (২১৪) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ। ভারতীয় ইনিংসেও নাটকীয়তা কম নয়। ভাল জিতের গাথুনিতে এক সময় ঘুণ ধরান জ্যাক নরিগা পর পর সুনীল গাভাসকার ও অধিনায়ক ওয়াড়েকরকে ফিরিয়ে দিয়ে। নরিগার হ্যাটট্রিক লাভেরও সম্ভাবনা জেগেছিল। আবার দ্বিতীয় ইনিংসেও চমক কম নয়। প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারত ১৩৮ রানে এগিয়ে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র একটি উইকেট খুইয়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে দিল। তৃতীয় দিনের শেষে এগিয়েও রইল ১৭ রানে। ১ উইকেটে যারা ১৫০ রান তুলেছিল চতুর্থ দিন বাকি ৯টি উইকেটে ১১১ রান যোগ করে এবং ভারতের জয়ের জন্য মাত্র ১২৪ রানের প্রয়োজন রেখে তারা ২৬১ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করবে এটা অনুমান করা যায়নি। তবু অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল যখন ৮৪ রানের ভিতর ভারতের তিনজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান অশোক মানকড়, সেলিম দুরানি ও দিলীপ সারদেশাই আউট হয়ে গিয়েছিলেন। একে টার্নিং উইকেট, তার উপর ভারতকে খেলতে হচ্ছে চতুর্থ উইকেটে এবং জ্যাক নরিগার স্পিনের বিরুদ্ধে যে নরিগা প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন নয়টি উইকেট। ক্রিকেটে তো সবই সম্ভব। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরও তো শেষ পাঁচটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল মাত্র ১৫ রানের মধ্যে। কিন্তু সুনীল গাভাসকার এবং আবিদ আলীর মুখে কঠিন প্রতিজ্ঞা। আর কোন উইকেট না খুইয়েই ভারত জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৭ উইকেটে জিতে যায় চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার ৫ মিনিট আগে।

আগেই বলেছি, দলগত সাফল্যের সঙ্গেই ক্রিকেটে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। ব্যাটের বীর দিলীপ সারদেশাই যিনি প্রথম টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি এ টেস্টেও সেঞ্চুরি করেছেন। জীবনের প্রথম টেস্টে তরুণ গাভাসকার করেছেন নাটকীয় মুহূর্তে জয়সূচক বাউণ্ডারি স্ট্রোক সহ ৬৫ ও নটআউট ৬৭ রান। ওপেনিং জুটির সমস্যা মিটিয়েছেন গাভাসকার ও মানকড়। বলের ধাঁধায় চমক লাগিয়েছেন প্রসন্ন আর সহ-অধিনায়ক বেঙ্কটরাঘবন।

এ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দেরও কৃতিত্বের নজির রয়েছে। জ্যাক নরিগার নটি উইকেট পাবার কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় ইনিংসে রয় ফ্রেডারিকের ৮০ রান এবং দুই ইনিংসে চার্লি ডেভিসের ৭১ ও ৭৪ রান বিশেষভাবেই উল্লেখের দাবী রাখে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজিত হয়েছে কিন্তু ডেভিস পরাজিত হননি। দুই ইনিংসেই তিনি নট আউট।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—২১৪ (সি ডেভিস নট আউট ৭১, জি সোবার্স ২৯, কানহাই ৩৭, শিলিংফোর্ড ২৫, নরিগা ২৫; প্রসন্ন ৫৪ রানে ৪ উইঃ, বেদী ৪৬

রানে ২ উইঃ, আবিদ আলী ৫৪ রানে ২ উইঃ)।

ভারত—প্রথম ইনিংস—৩৫২ (সারদেশাই ১১২, গাভাসকার ৬৫, সোলকার ৫৫, মানকড় ৪৪; জ্যাক নরিগা ৯৫ রানে ৯ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—২৬১ (ফ্রেডারিক ৮০, ডেভিস নটআউট ৭৪, কানহাই ২৭; বেংকটরাঘবন ৯৫ রানে ৫ উইঃ, দুরানি ২১ রানে ২ উইঃ, বেদী ৫০ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইকেটে ১২৫ (গাভাসকার নট আউট ৬৭, মানকড় ২৯; শারেট ৪৩ রানে ৩ উইকেট)।

শতাব্দীর সাড়া-জাগানো লড়াই

নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে শতাব্দীর সব চেয়ে সাড়া-জাগানো হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধে জো ফ্রেজিয়ার প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলী অর্থাৎ পূর্বনামীয় কেসিয়াস ক্লে-কে পয়েন্টে পরাজিত করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এই জন্যই বলতে হচ্ছে যে, আমেরিকার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করায় সাড়ে তিন বছর আগে তখনকার চ্যাম্পিয়ন ক্লের খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে
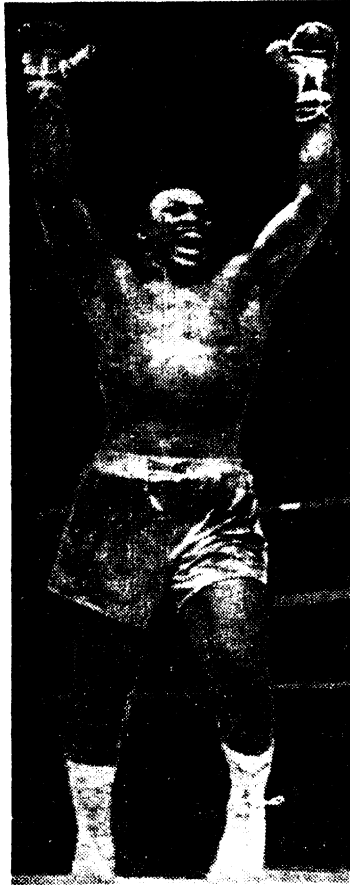
জো ফ্রেজিয়ারের জয়ের আনন্দ

ফ্রেজিয়ার হয়েছিলেন চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী। কিন্তু—তাতে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম পুরুষ হিসাবে ক্লের সম্মানে আঁচড় লাগেনি। তার ভাবমূর্তি বড় হয়েই ছিল। অবশ্য যখন ক্লের খেতাব কেড়ে নেওয়া হয় তখন ফ্রেজিয়ারই ছিলেন তাঁর সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বী।

মহম্মদ আলীর বিরুদ্ধে জেল জরিমানার আদেশ এবং তাঁর জীবনের উপর দিয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যাবার পর এই লড়াইয়ের আয়োজন। তাও সরাসরি ফ্রেজিয়ারের সঙ্গে লড়বার সুযোগ পাননি আলী। জেরি কোয়ারী এবং অসকার বোনাভেনাকে হারিয়ে ফ্রেজিয়ারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রেজিয়ারকে পরাজিত করতে পারেননি। প্রোফেশনাল জীবনে উপর্যুপরি ৩১টি লড়াইয়ে জয়ী মহাবলী আলীকে ৩২তম লড়াইয়ে প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অপরদিকে জো ফ্রেজিয়ার তাঁর প্রোফেশনাল মুষ্টিযুদ্ধের জীবনে পর পর ২৭টি লড়াইয়ে জয়ের গৌরব পেয়েছেন। অর্থাৎ এর আগে দুজনই ছিলেন অপরাজিত।

লড়াই হয়েছে পুরো ১৫ রাউণ্ড। পয়েন্ট ডিসিশন। কিন্তু শেষ রাউণ্ডে বাঁ হাতের প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে ফ্রেজিয়ার একবার আলীকে ভূতলশায়ীও করেছিলেন। বিচারকদের সর্বসম্মত অভিমত, আলী যোগ্যের কাছে হেরে গেছেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে।

স্থানাভাবের জন্য শতাব্দীর এই সাড়া—জাগানো ঘুষোঘুষি খেলার বিশদ আলোচনা সম্ভব হল না। তবু দুই নিগ্রো মুষ্টিকের অর্থ-ভাণ্ডার কথা বলা দরকার। বিজয়ী এবং বিজিত দুজনই পেয়েছেন প্রায় দু'কোটি করে টাকা। আর খেলাধূলায় অর্থ সংগ্রহের সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে এই মুষ্টিযুদ্ধে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ ওই টাকায় আমাদের এই বিরাট দেশের দেড়টা নির্বাচন হয়ে যেতে পারে। কেন না, মধ্যবর্তী এই সাধারণ নির্বাচনের ব্যয় ১০ কোটি টাকার মত।

ভাবছি ফ্রেজিয়ারের স্বর্ণভাণ্ডার কথা। যে দেশের কসাইখানায় প্রাণীঘাতকের কাজ করত, মুষ্টিযুদ্ধ আরম্ভ করেছিল দেহের ওজন কমাবার জন্য সেই ছেলেটি (টোকিও অলিম্পিকেও স্বর্ণপদক পেয়েছিল) এখন স্বর্ণখনির মালিক।

একলব্য

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

রাজা আর টমের খুব বিয়ে করবার ইচ্ছে···
এইভাবে ওরা এসে সমুদ্রে নামে!
হ্যাঁ!

তারপর বালির উপরে এইভাবে গড়াগড়ি দেয়!

কীলা-উয়ির সোনা-বেলায়।
দ্যাখো, আমাদের সারা গা সোনালী হয়ে গেছে।
বড় হয়ে এই খানেই আমরা বিয়ে করব?
তা বেশ তো।

আস্ত একটা বেলাভূমি এইরকমের গুঁড়ো-সোনা দিয়ে তৈরী!
আমাদের সেখানে নিয়ে চলো!
ওদের কথায় আপত্তি করে ফল হবে না, তারান!

'জঙ্গলের হাজার চোখ।' ওরা যে বেলাভূমির দিকে যাচ্ছে, সে-খবর তাই চাপা রইল না।

অরণ্যে হঠাৎ ঢাক বেজে উঠল·····

ঢাক বাজছে কেন?
কী অর্থ ওই ঢাকের শব্দের?
অর্থ এই: 'মনের মধ্যে হিংসা নিয়ে কীলা-উয়িতে গেলে বালির তলায় মারা পড়তে হয়।'

বিয়ে করবে?
চুপ!
শব্দ!

ওদের গ্রুপের মনে হয়নি। মণ্টু ব্যানার্জি নায়কের সেক্রেটারি হিসাবে খুব বিশ্বাসযোগ্য। ফটোগ্রাফ (বিজয় ঘোষ) ও এডিটিং (রবীন দাস) গল্পের মুড ও গতি ব্যাহত করেনি। এ দুটি কাজ ভালই।

গান ছবির একটি প্রধান আকর্ষণ। সব কটি গানের সুরই চমৎকার। সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিউজিক লেসেনস-এর গান কিংবা রাগপ্রধান গান—সবই হিট করবে। তবে এত গানের দরকার ছিল কিনা, সব গানই অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবু তো সুন্দর গান শোনার আনন্দ আছে। সেটাই বা মন্দ কী।

নাট্য-সমালোচনা

পাগলা ঘোড়া

(বহুরূপী)

পাগলা ঘোড়া ছোটেনি। ছুটলে হয়ত তার খুরের আওয়াজে আওয়াজে বুকের ভিতরটা দগদগ করে উঠত। "পাগলা ঘোড়া" নাটকটি ছোটেনি।

প্রচণ্ড প্যাশান বা দুরন্ত জীবন-বাসনার মুখোমুখি হতে পারেনি নাটকের চার ব্যক্তি। কেউ সভয়ে সরে গেছে, কেউ বা সংস্কারের বশে। তাদের অপরাধবোধই বা কোথায় যে স্বীকারোক্তি শুনব? শ্মশানে বসে যখন তারা প্রেমের গল্প বলেছে তখন সেটা গল্পের মতই শুনিয়েছে। শ্মশানে পোড়াতে এসেছে তারা সতেরো বছরের মেয়েটাকে। শ্মশান এই নাটকের পটস্থল। এখানে এলে হয়ত মানুষ নিজের দিকে একবার তাকায়। নিজের প্রতি হয়ত কিছুটা নির্মম হয়, অন্তত নিজেকে আর ঠকাতে চায় না। নিজের চুলচেরা বিচার করে। নাট্যকার বাদল সরকার নাটকের পটস্থলটি বেছে নিয়েছেন ভাল। শ্মশানে চিতায় জ্বলছে মেয়েটির দেহ, সেই সঙ্গে জ্বলছে চার শ্মশানবন্ধুর অন্তর। তারা মদের গ্লাস নিয়ে বসেছে। সুরা কি মানুষকে অবচেতনের চৌকাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়?

নাট্যকারের পরিকল্পনা সুন্দর। প্রেম ও প্রবৃত্তির গভীর কোন কথা বা জীবনের কঠিন কোন দ্বন্দ্বের বিষয় অবতারণার প্রস্তুতি নাটকের শুরুতে। শুরুতেই বা বলি কেন, প্রায় শেষ অবধি। কারণ সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে ওই চারজনের মন আদৌ কেন জ্বলবে তার কোন হদিস পাইনি। প্রত্যেকের অতীতের টুকরো টুকরো ঘটনা—প্রেমের গল্প—ঘুরে ঘুরে এসেছে, কিন্তু তা এত জোলো, এত মামুলী যে ওই বড় রকমের কোন প্রস্তুতির কোন সার্থকতর পরিণাম দেখা গেল না। জীবনের নিগূঢ় রহস্যের কোন পাতার উদ্ঘাটিত হল না। পাগলা ঘোড়া সত্যিই ছোটেনি তাদের জীবনে, কিন্তু বাসনাকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে তেমন জটই বা সৃষ্টি হল কৈ! এর জন্য নির্জন শ্মশানের পরিবেশ, বঞ্চিতা তরুণীর আত্মহত্যার পর তার অন্ত্যেষ্টি, শ্মশানে বসে মদ্যপান ইত্যাদির কী প্রয়োজন ছিল? প্রত্যেকের গল্প তো সেই সহজ ও সরল উপকরণে তৈরি।

নাটকের একটি বিশেষ চমক ওই মেয়েটি। যতক্ষণ চিতায় তার শরীর পুড়ে শেষ না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তার ঘুরে ঘুরে মঞ্চে আসার পালা। বুঝতে হবে সে অশরীরী, তার কথা শ্মশানবন্ধুরা শুনতে পাচ্ছে না। সে ঘুরে ঘুরে আসছে শ্মশানবন্ধুদের জীবনের গল্প শুনতে। সে একটা কথাই বলে যাচ্ছে—প্রত্যেকের জীবনেরই কোন না কোন গল্প আছে যা সে বলতে চায় না, নিজের মুখোমুখি হতে হবে বলে এই সব গল্প সে লুকিয়ে রাখে। মেয়েটি কি নাট্যকারের জবানীতে কথা বলছে? নাকি সে মানুষের জীবনের রহস্যের প্রতীক? মেয়েটির গল্পও যা জানা গেল তা তো একেবারেই সাদাসিধে, আটপৌরে গল্প। অত্যাচারী সমাজ, অত্যাচারী স্বামী, "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা", বিষপানে মৃত্যু ইত্যাদি উপকরণ। অথচ মেয়েটি প্রথম থেকেই যখন বার বার আসছিল দর্শকের কৌতূহল ততই বাড়ছিল। মনে হয়েছিল হয়ত তারই গল্প এমন জটিল হবে যাতে পরিবেশের তাৎপর্যও সুন্দরভাবে প্রকাশ পাবে।

প্রসঙ্গত বহুরূপীর প্রযোজনা এবং শম্ভু মিত্রর নাট্যপরিচালনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে রাখি এইখানেই। নাটকের শুরুতে মঞ্চ অন্ধকার। শ্মশানের পরিবেশ গঠনে এবং মেয়েটির ভৌতিক উপস্থিতিতে ওই অন্ধকার ক্ষণটুকু চমৎকার সহায়ক হয়েছে। মঞ্চসজ্জা (খালেদ চৌধুরী-কৃত) খুব ভরাট কিছু নয়। তবু যে তারই মধ্যে শ্মশানের পরিবেশ খুঁজে পেয়েছি সেটা নাট্যপরিচালকের অসাধারণ প্রয়োগ-পরিকল্পনার গুণে। গভীর বিষয় যদিও নাটকের নয় তবু যে নাটকটিতে মানবমনের রহস্য ও গভীরতার বিষয় জানবার একটা মানসিক প্রস্তুতি অনায়াসেই দর্শকের মনে এসে যায়

[illegible] নতুন আগত শিল্পীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃষ্ণা বসু, সুস্মিতা মুখার্জি, ভাস্কর চৌধুরী, মৃণাল মুখার্জি, জয়শ্রী রায়, হান্দু ব্যানার্জি, রণজিৎ মল্লিক, রূপক মজুমদার ও অন্যান্যদের সঙ্গে পাহাড়ী সান্যাল

দের মধ্যে। এইরকম কয়েকটি বিতর্কের আসরে উপস্থিত থেকে দেখা গেল যে, সমান্তরাল সিনেমার প্রবক্তারা প্রায় সকলেই সুবক্তা। এ'রা প্রায় সকলেই চিত্রনির্মাতার চেয়ে অনেক ভাল চিত্রসমালোচক। এ'রা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই টেবিল চাপড়ে শান্তারাম/বিমল রায় থেকে শুরু করে সত্যজিৎ/মৃণাল সেনের আদ্য-শ্রাদ্ধ-সপিণ্ডকরণ করে ফেলেন—উপরি কিছু সময় পেলে গড়ে প্রায় পনেরো মিনিটে এক-একটি আর্ট ফিলিম বানিয়ে ফেলেন এবং সুযোগ পেলেই 'ফিল্ম অ্যাণ্ড ফিল্মিং', 'সাইট অ্যাণ্ড সাউণ্ড' বা 'ফিল্ম কোয়ার্টারলির' মতন বা তার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান-কামী চিত্র পত্রিকা বার করতে পারেন। এ সবই এ'রা পারেন, কিন্তু আপাতত এ'রা সমান্তরাল সিনেমার সংজ্ঞা নির্ধারণে ব্যস্ত, সেই জন্যেই......। একজন কালো কফির শেষ ঢোঁকটা মেরে দিয়ে বললেন, যে সিনেমা ব্যবসায়ের পরিপন্থী সেই সিনেমাই সমান্তরাল সিনেমা। অন্য একজন একটু সোচ্চার হলেন, তিনি বললেন, 'তার মানে যে ছবি ফ্লপ হচ্ছে সেই ছবিই সমান্তরাল সিনেমার মাল'। আরেকজন সোনায় সোহাগা জোগালেন, তিনি বললেন, 'তার মানে সমান্তরাল সিনেমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে সেই ছবি যে ছবি কোনদিন প্রদর্শিতই হবে না।' হো হো করে হেসে উঠল পুরো দলটা, একজন যিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক তিনি আলোচনাটাকে হাস্যকর না হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে "অবতার, অবতার" বলে উঠে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন, 'সমান্তরাল সিনেমা হল বৌদ্ধ ধর্মের মত, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচারে যখন মানুষ জর্জর [illegible]

তেমনি সমান্তরাল সিনেমার আবির্ভাব চলচ্চিত্রের জগতে, এখন কেবল একজন অশোকের দরকার, কোনোরকমে 'কলিঙ্গ যুদ্ধ বাধিয়ে দাও' তাহলেই দেখবে...' ভদ্রলোককে শেষ করতে দিলেন না একজন ফ্রেঞ্চ-কাট কম্যুনিস্ট, তিনি বললেন, 'সমান্তরাল সিনেমা সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে ধর্ম, রাজনীতি এসব থেকে উদাহরণ যারা দিচ্ছে তারা সকলেই এ রাজ্যে অপাঙক্তেয়, আসলে আমরা অফ্‌বীট, নিউ ওয়েভ, আনডারগ্রাউণ্ড সিনেমা মুভমেণ্ট প্রভৃতির বাঁশপাতা নাড়া-চাড়া করে নিজেদের যুক্তিকে খাড়া করি, কমার্শিয়াল সিনেমা জগতকে এবং তার দর্শকদের চমকে দিতে নতুন নতুন ক্যাপশান, নতুন নতুন ফ্রেজেস কয়েন করি, তাই নিয়ে লেখালেখি করি নইলে কিছুতেই কিছু হবে না—উই মাস্ট হ্যাভ এ নিউ সিনেমা মুভমেণ্ট।' পাশের টেবিলে [illegible] বসে এক ভদ্রলোক চুকচুক করে চা খাচ্ছিলেন তিনি হয়ত কোনো সরকারী বা সওদাগরী অফিসের কেরানী অথবা কোনো কলেজের অধ্যাপক অথবা যাই তিনি হোন আমাদের চিত্রজগতের চরিত্র নন এটা ও'র হাবভাব এবং চেহারা দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "কিছু মনে করবেন না, সম্ভবত অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে, তবু......আপনারা যে এতক্ষণ ধরে সমান্তরাল সিনেমা, নিউ সিনেমা ইত্যাদি মুভমেণ্টের কথা বলছেন এবং ব্যবসায়িক সিনেমার মুণ্ডপাত করছেন—এসব আপনারা কিসের ভিত্তিতে করছেন? কোথায় আপনাদের সমান্তরাল সিনেমা, বা নিউ সিনেমা যে মুভমেণ্ট মুভমেণ্ট করে চেঁচাচ্ছেন—মুভমেণ্ট কি কখনো কোনো শিল্পের জন্ম দেয়? শিল্প হলে তবে তাকে কেন্দ্র করে [illegible]

মোটামুটি সাধারণভাবেই আরো অনেক [illegible] বললেন, [illegible] সিনেমার [illegible] মানুষের সাধারণ কথার [illegible] বোবা হয়ে গেলেন।

সরল শর্মা

নতুন শিল্পীর সংবর্ধনা

চিত্রজগৎ [illegible] মিলনায়তনে ২৮ ফেব্রুয়ারি [illegible] অনুষ্ঠিত। [illegible] যে সব নবাগত শিল্পী [illegible] করেছেন তাঁদের সংবর্ধনা [illegible] করা হয়। [illegible] এইভাবে উৎসাহ দান প্রশংসনীয় [illegible] নেই। [illegible] চট্টোপাধ্যায়, [illegible] চৌধুরী, কৃষ্ণা বসু, জয়শ্রী রায় [illegible] কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপর্ণা সেন প্রভৃতি [illegible] শিল্পীরা এই সংবর্ধনা-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত [illegible] দেখা দেন: মৃণাল মুখার্জি, কৃষ্ণা [illegible] সলিল মিত্র, অনুরাধা [illegible] চৌধুরী, ছায়া মুখার্জী [illegible] ও [illegible] মণ্ডল। [illegible] কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন। [illegible] প্রদর্শন করেন চঞ্চল [illegible]। [illegible] রঞ্জন বিশ্বাসের 'রক্ত-তরঙ্গ' [illegible] হয়। অনুষ্ঠান-সূচী ঘোষণা করেন [illegible] নেতা রূপক মজুমদার।

"চৈতালি" এ-সপ্তাহে

আর ডি বনশল নিবেদিত [illegible] (পরিচালনা: সুধীর মুখার্জি)। [illegible] মুক্তি পাচ্ছে। বিশ্বজিৎ ও [illegible] [illegible]
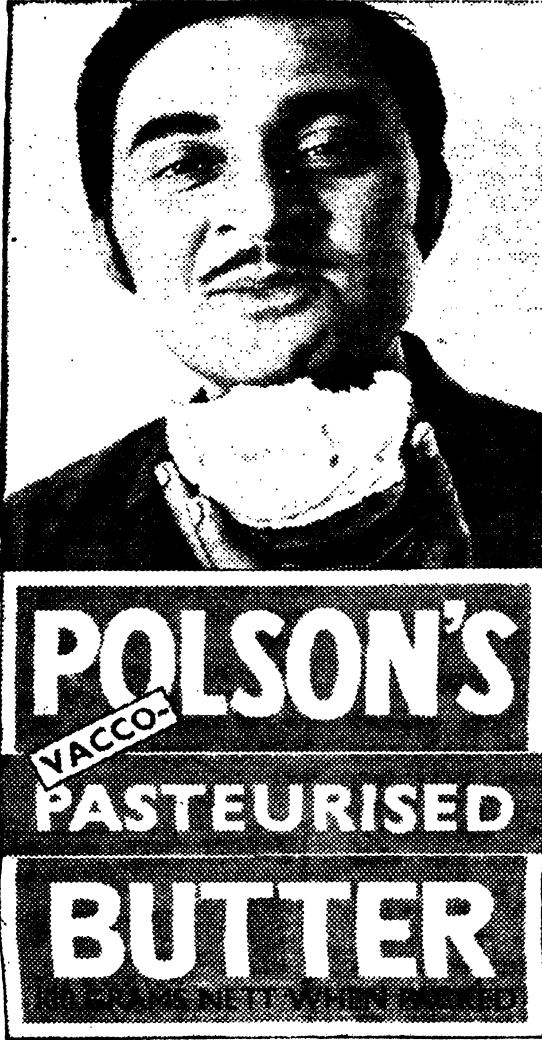
অন্তর্বর্তী নির্বাচন : পশ্চিমবঙ্গের রায়

১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৭২ সালে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার দু-দুটি অন্তর্বর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল—প্রথমটি ১৯৬৯ সালে এবং পরেরটি এই কয়েক দিন মাত্র আগে গত ১০ মার্চ তারিখে। লোকসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন হল ১৯৭১ সালে। এই নির্বাচনগুলির ফলাফল থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির একটি চিত্র সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

১৯৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সংক্ষিপ্ত ফলাফল—বিধানসভা ও লোকসভার—এখানে সংকলিত করা হয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্রগুলির নাম, প্রত্যেকটি কেন্দ্রের বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম, তাঁদের দলের নাম ও প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার এতে কেবলমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এই সঙ্গে মুদ্রিত মানচিত্রগুলিতে এই নির্বাচনে কোন্ কোন্ দল কোন্ কোন্ আসন পেলেন তা দেখানো হয়েছে; সঙ্গের টীকায় রয়েছে বিভিন্ন দলের বর্তমান নির্বাচনে ও গত নির্বাচনে প্রাপ্ত আসনসংখ্যার উল্লেখ। এতে একটি তুলনামূলক চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে।

বিধানসভা

বিজয় সিংহ নাহার (বৌবাজার)
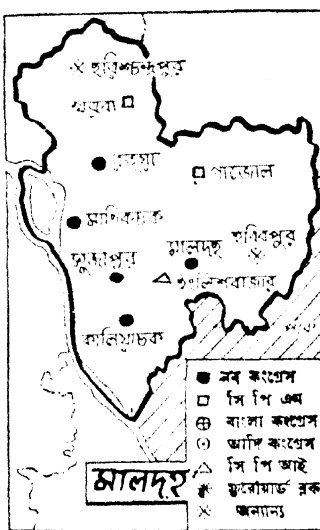
জ্যোতি বসু (বরাহনগর)

প্রফুল্লচন্দ্র সেন (আরামবাগ)

অজয় মুখার্জি (তমলুক)

মালদহ

মানিকচক ॥ বিজয়ী [illegible] মণ্ডল (নব কংগ্রেস) ১৫,৬৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] মানিক (সি পি এম) [illegible] ভোট।

সুজাপুর ॥ বিজয়ী আবদুল বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী (নব কংগ্রেস) [illegible] ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] (মুসলিম লীগ) ৭,৫৮২ ভোট।

কালিয়াচক ॥ বিজয়ী [illegible] (নব কংগ্রেস) ১৮,৫৭৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমোদরঞ্জন বসু (আর এস পি) ১৪,৯৩৭ ভোট।

মালদহ ॥ বিজয়ী মহম্মদ [illegible] রহমান (নব কংগ্রেস) ১৭,৫৮০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ [illegible] মিয়া (সি পি আই) ৬,৪০১ ভোট।

বিধানসভায় মালদহ জেলার মোট আসন সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : কংগ্রেস ৪, সি পি আই ৩, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, নির্দল ২। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : নব কংগ্রেস ৫, সি পি এম ২, সি পি আই ১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, নির্দল ১

ইংলিশবাজার ॥ বিজয়ী [illegible] দাস (সি পি আই) ১৪,১৪৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরিপ্রসন্ন মিশ্র (জনসংঘ) ১১,৯২০ ভোট।

হবিবপুর ॥ বিজয়ী সরকার মুর্মু (নির্দল) ১৫,৭৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বয়লা মুর্মু (আদি কংগ্রেস) ১৪,৩০৭ ভোট।

গাজোল ॥ বিজয়ী সুফল মুর্মু (সি পি এম) ১৯,২৪৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বেঞ্জামিন হেমব্রম (বাংলা কংগ্রেস) ১৪,৭৭৭ ভোট।

খরবা ॥ বিজয়ী গোলাম ইয়াজদানি (সি

বিধানসভায় কলিকাতা জেলার মোট আসন ২৩টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : সি পি এম ৮, কংগ্রেস ৫, সি পি আই ৪, ফরোয়ার্ড ব্লক ২, আর এস পি ২, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, নির্দল ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : নব কংগ্রেস ১৬, সি পি এম ৫, সি পি আই ১, নির্বাচন স্থগিত ১

পি এম) ২৯,২৮৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবুলবুল হক (নব কংগ্রেস) ২২,৮৬২ ভোট।

হরিশচন্দ্রপুর ॥ বিজয়ী মহম্মদ ইলিয়াস রাজি (ওয়ার্কার্স পার্টি) ২৬,৩৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র (আদি কংগ্রেস) ১৯,৪৪১ ভোট।

রতুয়া ॥ বিজয়ী নীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (নব কংগ্রেস) ৭,১৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আলি (সি পি এম) ৬,৫২০ ভোট।

কলিকাতা

কাশীপুর ॥ বিজয়ী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ (নব কংগ্রেস) ২৬,০০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণগোপাল বসু (সি পি এম) ১৫,৮৫৫ ভোট।

জোড়াবাগান ॥ বিজয়ী নেপালচন্দ্র রায় (নব কংগ্রেস) ২০,৮৩৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী (সি পি এম) ১০,০৩৭ ভোট।

জোড়াসাঁকো ॥ বিজয়ী দেওকীনন্দন পোদ্দার (নব কংগ্রেস) ১৮,৬২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যনারায়ণ দাস (সি পি এম) ৮,৭১০ ভোট।

সত্যপ্রিয় রায় (টালিগঞ্জ)

কৃষ্ণপদ ঘোষ (বেলিয়াঘাটা উঃ)

কবিতীর্থ ॥ বিজয়ী রামপিয়ারী রাম (নব কংগ্রেস) ১৯,৩৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কলিমুদ্দিন শামস (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১২,৯৫৫ ভোট।

আলিপুর ॥ বিজয়ী কানাইলাল সরকার (নব কংগ্রেস) ১৯,০২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মণি সান্যাল (সি পি আই) ১৪,২৯৬ ভোট।

ঢাকুরিয়া ॥ বিজয়ী সোমনাথ লাহিড়ী (সি পি আই) ২৫,৯১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরিদাস মালাকার (সি পি এম) ১৭,৮৫৪ ভোট।

বেলিয়াঘাটা (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী অর্ধেন্দুশেখর নস্কর (নব কংগ্রেস) ১৬,৯৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন বড়াল (সি পি এম) ১৫,৩০১ ভোট।

এণ্টালি ॥ বিজয়ী মহম্মদ নিজামুদ্দিন (সি পি এম) ১৫,৫০১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এ এম ও গনি (সি পি আই) ১২,৯১৮ ভোট।

শিয়ালদহ ॥ বিজয়ী বিনয় ব্যানার্জি (নব কংগ্রেস) ২০,৮৪৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুধাংশু পাল (সি পি এম) ১০,৯৬৬ ভোট।

বিদ্যাসাগর ॥ বিজয়ী মহম্মদ সামসুজ্জোহা (নব কংগ্রেস) ১৭,৫৩৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সমরকুমার রুদ্র (সি পি এম) ১২,৪১৮ ভোট।

বহুবাজার ॥ বিজয়ী বিজয়সিংহ নাহার (নব কংগ্রেস) ২০,৮৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাসিম আবদুল হালিম (সি পি এম) ১০,৪৯৯ ভোট।

টালিগঞ্জ ॥ বিজয়ী সত্যপ্রিয় রায় (সি পি এম) ৩২,৭৮৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয় দাশগুপ্ত (সি পি আই) ১৮,৭২৮ ভোট।

বেলিয়াঘাটা (উত্তর) ॥ বিজয়ী কৃষ্ণপদ ঘোষ (সি পি এম) ২৩,৩১৮ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুবোধ দে (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২০,৩৪৫ ভোট।

বড়বাজার ॥ বিজয়ী রামকৃষ্ণ সারোগী (নব কংগ্রেস) ২৩,০৪৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাপ্রসাদ নাথানি (জনসংঘ) ১১,৭১৭ ভোট।

চৌরঙ্গী ॥ বিজয়ী শঙ্কর ঘোষ (নব কংগ্রেস)।

কালীঘাট ॥ বিজয়ী রথীন তালুকদার (নব কংগ্রেস) ২৪,৫৯৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাধন গুপ্ত (সি পি এম) ১৫,৯৫৬ ভোট।

রাসবিহারী ॥ বিজয়ী লক্ষ্মীকান্ত বসু (নব কংগ্রেস) ২৩,৩৩৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শচীন সেন (সি পি এম) ১১,৪৭৫ ভোট।

বিধানসভায় জলপাইগুড়ি জেলায় মোট আসন ১১টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল: কংগ্রেস ৭, আর এস পি ২, সি পি আই ১, এস এস পি ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে: নব কংগ্রেস ৯, সি পি এম ১, আর এস পি ১

বালিগঞ্জ ॥ বিজয়ী সুব্রত মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ১৭.৬৫৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতি ভট্টাচার্য (ওয়ার্কার্স পার্টি) ১৩.৯৪৩ ভোট।

তালতলা ॥ বিজয়ী আবদুর রউফ অনসারি (নব কংগ্রেস) ১৪.৫৬৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল হাসান (সি পি এম) ১৩.২৮। ভোট।

বড়তলা ॥ বিজয়ী অজিতকুমার পাঁজা (নব কংগ্রেস) ১৯.৭৯৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মীকান্ত দে (সি পি এম) ১০.০৩৫ ভোট।

বেলগাছিয়া ॥ বিজয়ী লক্ষ্মীচরণ সেন (সি পি এম) ২৫.০১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণপতি সুর (নব কংগ্রেস) ২২.২৩৫ ভোট।

মানিকতলা ॥ বিজয়ী অনিলা দেবী (সি পি এম) ১৬৭৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনন্ত ভারতী (নব কংগ্রেস) ১৫,১৮২ ভোট।

শ্যামপুকুর ॥ ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হেমন্ত বসু নিহত হওয়ায় নির্বাচন স্থগিত।

জলপাইগুড়ি

ধূপগুড়ি ॥ বিজয়ী ভবানী পাল (নব কংগ্রেস) ১১,৪৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অনিলচন্দ্র গুহ নিয়োগী (এস এস পি) ১১,২৭৯ ভোট।

জলপাইগুড়ি ॥ বিজয়ী অনুপম সেন (নব কংগ্রেস) ২৩,৬০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পরেশচন্দ্র মিত্র (সি পি এম) ১৪,৫২০ ভোট।

রাজগঞ্জ ॥ বিজয়ী ভগবান সিংহ রায় (নব কংগ্রেস) ১১,৭৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধীরেন্দ্রনাথ রায় (সি পি এম) ১০,৩৪৫ ভোট।

কালচিনি ॥ বিজয়ী ডেনিস লাকরা (নব কংগ্রেস) ১০,৬৮১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অথর্ব বাক্সলা ওঁরাও (আর এস পি) ৮,৭৪৩ ভোট।

কুমারগ্রাম ॥ বিজয়ী পীযূষকান্তি মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ১৬.৬১৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিতাইচন্দ্র দাস (সি পি এম) ৭.৯৮৪ ভোট।

ফালাকাটা ॥ বিজয়ী জগদানন্দ রায় (নব কংগ্রেস) ১৩.৮১০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অভয়চরণ বর্মণ (সি পি এম) ১১,৫১৫ ভোট।

নাগরাকাটা ॥ বিজয়ী পুনাই ওঁরাও (সি পি এম) ২২,৮১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলোইস লাকরা (নব কংগ্রেস) ৯,৫৪২ ভোট।

ময়নাগুড়ি ॥ বিজয়ী বিজয়কৃষ্ণ মোহান্ত (নব কংগ্রেস) ১২,৭৮১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরিপদ রায় (নির্দল) ৬,০৭৫ ভোট।

মাল ॥ বিজয়ী অ্যান্টনি টপনো (নব কংগ্রেস) ১৩,৩৮৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগন্নাথ ওঁরাও (সি পি এম) ৯,৬৪০ ভোট।

আলিপুরদুয়ার ॥ বিজয়ী নারায়ণ ভট্টাচার্য (নব কংগ্রেস) ২০.৪৫৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রঞ্জিত দাশগুপ্ত (সি পি এম) ১১.২১৯ ভোট।

মাদারিহাট ॥ বিজয়ী এ এইচ বেস্টার উইচ (আর এস পি)।

নেপাল রায়
(জোড়াবাগান)

সোমনাথ লাহিড়ী
(ঢাকুরিয়া)

হুগলি

জাঙ্গিপাড়া ॥ বিজয়ী মণীন্দ্রনাথ জানা (সি পি এম) ২২.৬৭৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণেশচন্দ্র হাতুড়ি (নব কংগ্রেস) ১৩.৯২৬ ভোট।

চণ্ডীতলা ॥ বিজয়ী কাজি সফিউল্লা (সি পি এম) ১৬.৫৬২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাহাদাত আলি (নব কংগ্রেস) ৬.৮৬০ ভোট।

চাঁপদানি ॥ বিজয়ী হরিপদ মুখার্জি (সি পি এম) ২৩,২১০ ভোট। নিকটতম
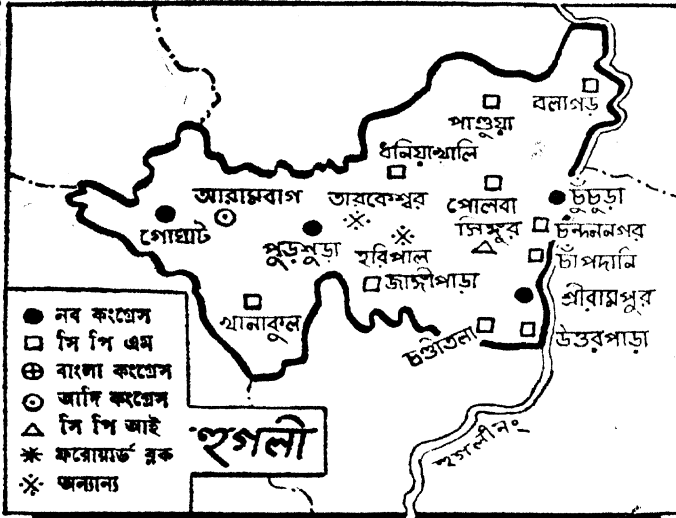
বিধানসভায় হ্‌গলি জেলার মোট আসন সংখ্যা ১৮টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : সি পি এম ৯, ফরোয়ার্ড ব্লক ৩, কংগ্রেস ২, সি পি আই ১, এস এ স পি ১, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কিস্ট) ১, নির্দল ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : সি পি এম ১০, নব কংগ্রেস ৪, আদি কংগ্রেস ১, সি পি আই ১, ওয়ার্কার্স' পার্টি ১, ফরোয়ার্ড ব্লক মার্কিস্ট ১

প্রতিদ্বন্দ্বী নিশীথকমল সান্যাল (নব কংগ্রেস) ১২,৯১৬ ভোট।

চন্দননগর ॥ বিজয়ী ভবানী মুখার্জি (সি পি এম) ৩১,৩২২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিপিনবিহারী সাউ (নব কংগ্রেস) ১৮,৭৩৪ ভোট।

চুঁচুড়া ॥ বিজয়ী ভূপতি মজুমদার (নব কংগ্রেস) ২৩,৫১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয়কুমার নন্দী (সি পি এম) ২৩,২৭৪ ভোট।

পোলবা ॥ বিজয়ী ব্রজগোপাল নিয়োগী (সি পি এম) ২৪,১৯৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানীপ্রসাদ সিংহ রায় (নব কংগ্রেস) ২০,০৯৫ ভোট।

বলাগড় ॥ বিজয়ী অবিনাশ প্রামাণিক (সি পি এম) ২২,৭৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন সরকার (নব কংগ্রেস) ১৫,৭৭৮ ভোট।

পানডুয়া ॥ বিজয়ী দেবনারায়ণ চক্রবর্তী (সি পি এম) ২৮,৯১৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেন্দ্র চ্যাটার্জি (বাংলা কংগ্রেস) ১৮,২৭৪ ভোট।

ধনিয়াখালি ॥ বিজয়ী কাশীনাথ রায় (সি পি এম) ২৩,৯১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাশীনাথ পাত্র (নব কংগ্রেস) ২০,৩১৮ ভোট।

তারকেশ্বর ॥ বিজয়ী রাম চ্যাটার্জি (ফরওয়ার্ড ব্লক—মার্কিস্ট) ২৮,২৮৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রামসিং পাল (নব কংগ্রেস) ১৩,৩০৮ ভোট।

আরামবাগ ॥ বিজয়ী প্রফুল্লচন্দ্র সেন (আদি কংগ্রেস) ৩০,৯২৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ষষ্ঠীরাম চ্যাটার্জি (সি পি এম) ১৪,৮৯৭ ভোট।

গোঘাট ॥ বিজয়ী মদনমোহন [illegible] (নব কংগ্রেস) ১১,২৬১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] দাস (সি পি এম) ৮,৭১৯ ভোট।

উত্তরপাড়া ॥ বিজয়ী শান্তশ্রী চ্যাটার্জি

(সি পি এম) ২৯,৪৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোবিন্দ চ্যাটার্জি (সি পি আই) ১৭,০২২ ভোট।

শ্রীরামপুর॥ বিজয়ী গোপালদাস নাগ (নব কংগ্রেস) ২৬,৩৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (সি পি এম) ২২,৮৬৭ ভোট।

সিঙ্গুর॥ বিজয়ী অজিতকুমার বসু (সি পি আই) ২৪,১০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোপাল ব্যানার্জি (সি পি এম) ২১,৬৫৮ ভোট।

চাঁপদানি॥ বিজয়ী চিত্তরঞ্জন বসু (ফরোয়ার্ড পার্টি) ২২,৫৯৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অধীরকুমার ঘোষ (নব কংগ্রেস) ১৬,৮২৯ ভোট।

পুরশুড়া॥ বিজয়ী মহাদেব মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ২২,০৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানস মজুমদার (সি পি এম) [illegible] ভোট।

খানাকুল॥ বিজয়ী মদন সাহা (সি পি এম)।

পশ্চিম দিনাজপুর

চোপরা॥ বিজয়ী আবদুল করিম চৌধুরী (নব কংগ্রেস) ১৫,৭৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাচ্চা মুন্সি (সি পি এম) ১২,৭১৪ ভোট।

গোয়ালপোখর॥ বিজয়ী সরাফত হুসেন (নব কংগ্রেস) ১০,৯৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজামুদ্দিন (মুসলিম লীগ) [illegible] ভোট।

রায়গঞ্জ॥ বিজয়ী রমেন্দ্রনাথ দত্ত (নব কংগ্রেস) ২৩,৯২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনস রায় (সি পি এম) [illegible] ভোট।

কালিয়াগঞ্জ॥ বিজয়ী দেবেন্দ্রনাথ রায় (নব কংগ্রেস) ২১,৯৬৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] রায় (সি পি এম) ১১,১০৩ ভোট।

গঙ্গারামপুর॥ বিজয়ী মোসলেহউদ্দীন আহমেদ (নব কংগ্রেস) ২৬,৪৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অহীন্দ্র সরকার (সি পি এম) ১৩,২৫৬ ভোট।
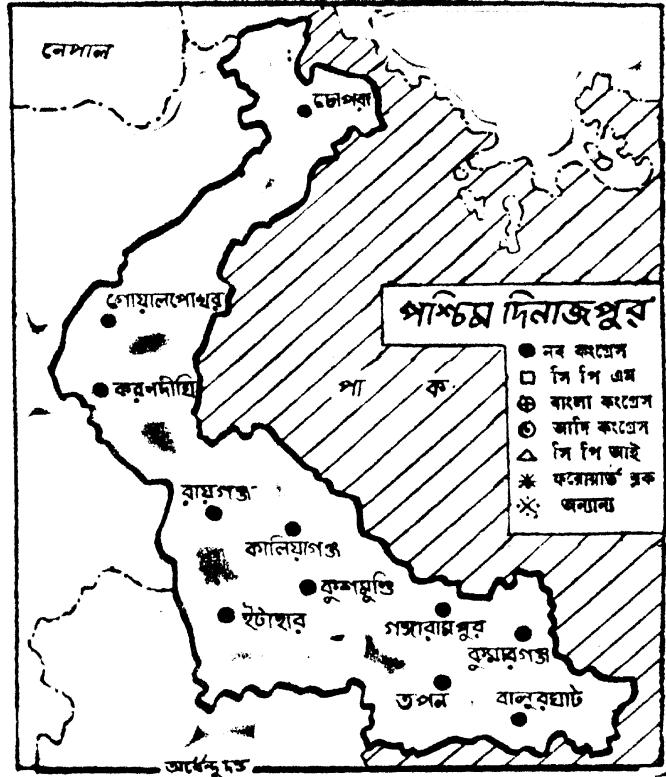
বিধানসভায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মোট আসন ১১টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : কংগ্রেস ৩, সি পি এম ২, আর এস পি ২, বাংলা কংগ্রেস ১, ফরোয়ার্ড ব্লক ১, প্রগতিশীল মুসলিম লীগ ১, আই এন ডি এফ ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নব কংগ্রেস ১১

কুমারগঞ্জ॥ বিজয়ী প্রবোধকুমার সিংহ রায় (নব কংগ্রেস) ১৮,৮২৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কামিনীকান্ত মজুমদার (সি পি এম) ১৭,৩৮২ ভোট।

করণদীঘি॥ বিজয়ী হাজি সাজ্জাদ হুসেন (নব কংগ্রেস) ২০,৭১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেশচন্দ্র সিংহ (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১১,৩৭৪ ভোট।

ইটাহার॥ বিজয়ী জয়নাল আবেদিন (নব কংগ্রেস) ৩০,২২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হরিচরণ দেবনাথ (সি পি এম) ১২,৫৪১ ভোট।

কুশমুণ্ডি॥ বিজয়ী যতীন্দ্রমোহন রায় (নব কংগ্রেস) ২০,৯৮৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপালচন্দ্র সরকার (সি পি আই) ৭,৪৪০ ভোট।

বালুরঘাট॥ বিজয়ী বীরেশ্বর রায় (নব কংগ্রেস) ২৫,১০৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যতীন চক্রবর্তী (আর এস পি) ২২,৯৪১ ভোট।

তপন॥ বিজয়ী পত্রাস হেমব্রম (নব কংগ্রেস) ২১,৯২১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] (আর এস পি) ১৮,৪৫৬ ভোট।

মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর॥ বিজয়ী হবিবুদ্দিন আহমদ (মুসলিম লীগ) ৯,৭৭৯ ভোট। নিকটতম

কাশীকান্ত মৈত্র (কৃষ্ণনগর পূর্ব)

ডাঃ কানাই সরকার (আলিপুর)

সুশীল ধাড়া (মহিষাদল)

ভূপতি মজুমদার (চুঁচুড়া)

বিধানসভায় মুর্শিদাবাদ জেলার মোট আসন সংখ্যা ১৮টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : কংগ্রেস ৫, আর এস পি ৫, প্রগতিশীল মুসলিম লীগ ২, বাংলা কংগ্রেস ২, সি পি আই ১, এস এস পি ১, নির্দল ২। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : নব কংগ্রেস ৮, মুসলিম লীগ ৪, সি পি এম ৩, আর এস পি ১, জনসংঘ ১, নির্দল ১

প্রতিদ্বন্দ্বী আশরাফ হুসেন (নব কংগ্রেস) ৯,১৬৮ ভোট।

সাগরদীঘি ॥ বিজয়ী অতুলচন্দ্র সরকার (নব কংগ্রেস) ৬,৮৯৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চাঁদ দাস (আর এস পি) ৫,২৬৩ ভোট।

লালগোলা ॥ বিজয়ী আবদুস সাত্তার (নব কংগ্রেস) ১৩,৩৭৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ মুজিবর রহমান (নির্দলীয়) ৮,৫৩৬ ভোট।

ভগবানগোলা ॥ বিজয়ী মহম্মদ সামাউন বিশ্বাস (মুসলিম লীগ) ১১,৬৪৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (জনসঙ্ঘ) ৬,৯৭৩ ভোট।

হরিহরপাড়া ॥ বিজয়ী আফতাবউদ্দিন আহমেদ (মুসলিম লীগ) ২৬,৩০১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দুশেখর বিশ্বাস (জনসঙ্ঘ) ১০,১২৯ ভোট।

বহরমপুর ॥ বিজয়ী শংকরদাস পাল (নব কংগ্রেস) ১৬,৮২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণরঞ্জন চৌধুরী (সি পি এম) ৭,৪৭২ ভোট।

বেলডাঙ্গা ॥ বিজয়ী তিমিরবরণ ভাদুড়ী (আর এস পি) ২১,৮০৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ খোদাবক্স (নির্দল) ১৩,৩৫৭ ভোট।

কান্দি ॥ বিজয়ী অতীশচন্দ্র সিংহ (নব কংগ্রেস) ১৬,৭৩২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মির্জা আজাহার (নির্দল) ৯,০০৮ ভোট।

খড়গ্রাম ॥ বিজয়ী হরেন্দ্র হালদার (নব কংগ্রেস) ৯,৫৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দীনবন্ধু মাঝি (সি পি এম) ৯,৫৩৮ ভোট।

আবদুস সাত্তার (লালগোলা)

প্রফু... ঘোষ (কাশীপুর)

সুতী ॥ বিজয়ী মহম্মদ সোহারাব আলি (নব কংগ্রেস) ১৯,৫০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিস মহম্মদ (আর এস পি) ১৬,৪৭২ ভোট।

জলাংগ ॥ বিজয়ী প্রফুল্লকুমার সরকার (জনসঙ্ঘ) ১১,৬৬০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাহিমুদ্দিন আহমদ (মুসলিম লীগ) ১১,৫৫৭ ভোট।

ফরাক্কা ॥ বিজয়ী জেরাত আলি (সি পি এম) ১৬,৬৬২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জোহদ আহমেদ (মুসলিম লীগ) ১৫,৮৪৯ ভোট।

নবগ্রাম ॥ বিজয়ী বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (নির্দল) ২১,৯৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল বারি বিশ্বাস (নব কংগ্রেস) ১১,৭৪৬ ভোট।

মুর্শিদাবাদ ॥ বিজয়ী মহম্মদ ইদ্রিস আলি (নব কংগ্রেস) ১০,৫৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাফর্স হোসেন সরকার (সি পি এম) ৯,৭৬৫ ভোট।

ডোমকল ॥ বিজয়ী মহম্মদ আবদুল বারি (সি পি এম) ১৭,৩৩৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহীদুল ইসলাম খোন্দেকার (মুসলিম লীগ) ১২,০৭৮ ভোট।

নওদা ॥ বিজয়ী নাসিরুদ্দিন খাঁ মল্ল (মুসলিম লীগ) ২২,৭৮৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রমেশচন্দ্র বিশ্বাস (জনসঙ্ঘ) ১৩,৩৩৯ ভোট।

বড়ঞা ॥ বিজয়ী সুনীলমোহন ঘোষ মল্লিক (নব কংগ্রেস) ১৫,১৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমলেন্দুলাল রায় (আর এস পি) ৯,২৮১ ভোট।

ভরতপুর ॥ বিজয়ী কে এম নূরে আহসান (সি পি এম) ১৩,৭১৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীশচন্দ্র সিংহ (নব কংগ্রেস) ৯,৪৮৬ ভোট।

চব্বিশ পরগণা

বাগদা ॥ বিজয়ী অপূর্বলাল মজুমদার (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৯,৮৫১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কান্তিচন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) ১৪,৫৮১ ভোট।

বারাসত ॥ বিজয়ী সরল দেব (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৭,৮৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেশ দাশগুপ্ত (সি পি এম) ১৬,৫১২ ভোট।

রাজারহাট ॥ বিজয়ী খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (নব কংগ্রেস) ২৬,৬৫৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল (সি পি এম) ২১,১৬৮ ভোট।

স্বরূপনগর ॥ বিজয়ী চন্দ্রনাথ মিশ্র (নব কংগ্রেস) ২৪,৫৩৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যামিনীরঞ্জন সেন (সি পি আই) ১১,৯৬১ ভোট।

বাদুড়িয়া ॥ বিজয়ী কাজি আবদুল গফফর (নব কংগ্রেস) ২৩,১১৭ ভোট।

নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ আলি আমেদ (সি পি এম) ১৩,১৬৩ ভোট।

বসিরহাট ॥ বিজয়ী ললিতকুমার ঘোষ (নব কংগ্রেস) ১৮,০০৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণ মুখার্জি (সি পি এম) ৭,৭০৫ ভোট।

হাসনাবাদ ॥ বিজয়ী মোল্লা তাসামাতুল্লা (নব কংগ্রেস) ১৮,৩৯৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিমলকুমার সেনগুপ্ত (সি পি এম) ৮,১৬৩ ভোট।

বারুইপুর ॥ বিজয়ী বিমল মিস্ত্রী (সি পি এম) ১৯,৭১১ ভোট। নিকটতম প্রতি-

মহম্মদ আমিন (টিটাগড়) আবদুল গফফর (বাদুড়িয়া)

দ্বন্দ্বী রমাকান্ত মণ্ডল (নব কংগ্রেস) ১৯,২৬৫ ভোট।

বেহালা (পূর্ব) ॥ বিজয়ী নিরঞ্জন মুখার্জি (সি পি এম) ২২,৮১৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন ঘটক (নব কংগ্রেস) ১৮,০৬৯ ভোট।

বেহালা (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী রবীন মুখার্জী (সি পি এম) ৩০,০৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (সি পি আই) ২৫,৩১৪ ভোট।

গার্ডেনরিচ ॥ বিজয়ী এস এম আবদুল্লা (নব কংগ্রেস) ১৫,৫৮২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছেদিলাল সিং (সি পি এম) ১৩,৫৯৩ ভোট।

বজবজ ॥ বিজয়ী ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণ (সি পি এম) ৩২,৩৯৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাদ ইমানী বেগ (সি পি আই) ১৫,৬০২ ভোট।

বিষ্ণুপুর (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী প্রভাসচন্দ্র রায় (সি পি এম) ৩২,২৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ মকবুল হক (নব কংগ্রেস) ১৯,৬২৭ ভোট।

বিষ্ণুপুর (পূর্ব) ॥ বিজয়ী রামকৃষ্ণ বর (নব কংগ্রেস) ২২,৭৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দরকুমার নস্কর (সি পি এম) ২২,৯৭১ ভোট।

ফলতা ॥ বিজয়ী জ্যোতিষ রায় (সি পি এম) ৩০,৭১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাত মাঝি (নব কংগ্রেস) ১৫,৩৯৬ ভোট।

ডায়মণ্ড হারবার ॥ বিজয়ী আবদাল কাইয়ুম মোল্লা (সি পি এম) ৩০,০৫৪

বিধানসভায় চব্বিশ পরগণা জেলার মোট আসন ৫০টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : সি পি এম ২৪, সি পি আই ৭, বাংলা কংগ্রেস ৫, কংগ্রেস ৪, এস ইউ সি ৪, ফরোয়ার্ড ব্লক ২, আর এস পি ২, এস এস পি ১, প্রগতিশীল মুসলিম লীগ ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : সি পি এম ২৪, নব কংগ্রেস ১৪, এস ইউ সি ৪, ফরোয়ার্ড ব্লক ২, মুসলিম লীগ ২, বাংলা কংগ্রেস ১, সি পি আই ১, আর এস পি ১, নির্বাচন স্থগিত ১

ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দৌলত আলি শেখ (নব কংগ্রেস) ২৭,১৫০ ভোট।

মগরাহাট (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী সুধেন্দু মণ্ডল (বাংলা কংগ্রেস) ১৯,৩১৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুভান আলি গাজি (সি পি এম) ১৯,১৬৯ ভোট।

কুলপি ॥ বিজয়ী মুকুন্দরাম মণ্ডল (সি পি এম) ১১,৭৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুরারিমোহন হালদার (বাংলা কংগ্রেস) ৯,৭৫৮ ভোট।

নৈহাটি ॥ বিজয়ী গোপাল বসু (সি পি এম) ৩৭,১৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তারাপদ মুখার্জি (নির্দলীয়) ২৬,০৯৩ ভোট।

ভাটপাড়া ॥ বিজয়ী সত্যনারায়ণ সিং (নব কংগ্রেস) ৪০,৯৭৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সীতারাম গুপ্ত (সি পি এম) ৩৭,৬০৩ ভোট।

নোয়াপাড়া ॥ বিজয়ী যামিনীভূষণ সাহা (সি পি এম) ৩৬,৫৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শরদিন্দু রায় (নব কংগ্রেস) ১৭,৩৭১ ভোট।

রবীন মুখার্জি
(বেহালা পশ্চিম)

অপূর্বলাল মজুমদার
(বাগদা)

টিটাগড় ॥ বিজয়ী মহম্মদ আমিন (সি পি এম) ৩৩,১১৯ ভোট। নিকটতম প্রতি-দ্বন্দ্বী কৃষ্ণকুমার শুক্ল (নব কংগ্রেস) ২৭,৭৭০ ভোট।

খড়দহ ॥ বিজয়ী সাধন চক্রবর্তী (সি পি এম) ৩৫,৪৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গোপাল ব্যানার্জি (সি পি আই) ৩১,৩৬৪ ভোট।

জয়নগর ॥ বিজয়ী সুবোধ ব্যানার্জি (এস ইউ সি) ২৩,৯০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসন্নকুমার ঘোষ (নব কংগ্রেস) ২৩,৬৫৬ ভোট।

বনগাঁ ॥ বিজয়ী অজিত গাঙ্গুলি (সি পি আই) ২০,১৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রণজিৎ মিত্র (সি পি এম) ১৭,২৬২ ভোট।

গাইঘাটা ॥ বিজয়ী চণ্ডী মিত্র (নব কংগ্রেস)।

দেগঙ্গা ॥ বিজয়ী মহম্মদ হারুন-অল রসিদ (মুসলিম লীগ) ২০,১৪২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ সৌকত আলি (নব কংগ্রেস) ৯,১৬৮ ভোট।

হাবড়া ॥ বিজয়ী তরুণকান্তি ঘোষ (নব কংগ্রেস) ২৮,২২৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হেমন্ত ঘোষাল (সি পি এম) ১৫,০৮৫ ভোট।

অশোকনগর ॥ বিজয়ী ননী কর (সি পি এম) ২০,৯০৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য (নব কংগ্রেস) ১৫,৬৫৫ ভোট।

হিঙ্গলগঞ্জ ॥ বিজয়ী গোপালচন্দ্র গায়েন (সি পি এম) ১২,৫৫৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চানন মণ্ডল (আদি কংগ্রেস) ১১,৪৯৭ ভোট।

গোসাবা ॥ বিজয়ী গণেশচন্দ্র মণ্ডল (আর এস পি) ২৩,৫৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পরেশচন্দ্র বৈদ্য (নব কংগ্রেস) ১২,৬৬৩ ভোট।

সন্দেশখালি ॥ বিজয়ী শরৎ সর্দার (সি পি এম)।

হাড়োয়া ॥ বিজয়ী গঙ্গাধর প্রামাণিক (নব কংগ্রেস) ১৩,৫১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তিপদ মণ্ডল (সি পি আই) ৩,৫৪১ ভোট।

বাসন্তী ॥ বিজয়ী পঞ্চানন সিংহ (নব কংগ্রেস) ১৭,৫৬৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাউদ খাঁ (সি পি এম) ১৩,৬০০ ভোট।

সুবোধ ব্যানার্জি
(জয়নগর)

রাম চ্যাটার্জী
(তারকেশ্বর)

ক্যানিং ॥ বিজয়ী গোবিন্দচন্দ্র নস্কর (নব কংগ্রেস) ২০,০১৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তরঞ্জন মৃধা (সি পি এম) ১৯,৮৬২ ভোট।

কুলতলি ॥ বিজয়ী প্রবোধ পুরকাইত (এস ইউ সি) ২৬,৭০৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরবিন্দ নস্কর (নব কংগ্রেস) ২৫,৩৬৪ ভোট।

সোনারপুর ॥ বিজয়ী [illegible] (সি পি এম) ৩০,০০৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] নস্কর (সি পি আই) ১৪,০৩৬ ভোট।

ভাঙড় ॥ বিজয়ী এ কে এম হাসানুজ্জামান (মুসলিম লীগ) ২০,৬৩৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুর রেজ্জাক মোল্লা (সি পি এম) ও [illegible] আলি মোল্লা (সি পি আই) ১০,৪৭৩ ভোট (উভয়েই)।

যাদবপুর ॥ বিজয়ী দীনেশ মজুমদার (সি পি এম) ৩৮,১১৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তিময় রায় (সি পি আই) ১৯,১৭০ ভোট।

মহেশতলা ॥ বিজয়ী সুধীরচন্দ্র ভাণ্ডারী (সি পি এম) ২৪,১৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপেন বিজলী (নব কংগ্রেস) ২২,৭৮৫ ভোট।

মগরাহাট (পূর্ব) ॥ বিজয়ী রাধিকা রঞ্জন প্রামাণিক (সি পি এম) ২৩,৮৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন হালদার (নব কংগ্রেস) ২২,২১৬ ভোট।

মথুরাপুর ॥ বিজয়ী রেণুপদ হালদার (এস ইউ সি) ২৪,৪০৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রনাথ হালদার (নব কংগ্রেস) ১৭,৮৭৫ ভোট।

পাথরপ্রতিমা ॥ বিজয়ী রবীন মণ্ডল (এস ইউ সি) ২৫,৮০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গুণধর মাইতি (সি পি এম) ১০,৬৮২ ভোট।

কাকদ্বীপ ॥ বিজয়ী হৃষীকেশ মাইতি (সি পি এম) ২৭,৭৭৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হংসধ্বজ ধাড়া (আদি কংগ্রেস) ১১,৫২২ ভোট।

সাগর ॥ বিজয়ী প্রভঞ্জনকুমার মণ্ডল (সি পি এম) ২৫,৯৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিলোকেশ মিশ্র (নব কংগ্রেস) ১১,৫২২ ভোট।

বীজপুর ॥ বিজয়ী জগদীশচন্দ্র দাস (নব কংগ্রেস)।

পানিহাটি ॥ বিজয়ী গোপালকুমার ভট্টাচার্য (সি পি এম)।

কামারহাটি ॥ বিজয়ী রাধিকা ব্যানার্জি (সি পি এম)।

বরাহনগর ॥ বিজয়ী জ্যোতি বসু (সি পি এম) ৬৩,৩৮০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অজয়কুমার মুখার্জি (বাংলা কংগ্রেস) ৩২,২৮৭ ভোট।

দমদম ॥ আদি কংগ্রেস প্রার্থী পীযুষ ঘোষ নিহত হওয়ায় নির্বাচন স্থগিত।

বিধানসভায় বীরভূম জেলার মোট আসন ১২টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল: ফরোয়ার্ড ব্লক ৪, সি পি এম ৩, এস ইউ সি ২, বাংলা কংগ্রেস ১, নির্দল ২। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে: সি পি এম ৭, এস ইউ সি ২, সি পি আই ১, আর সি পি আই ১ নির্দল ১।

বীরভূম

বোলপুর ॥ বিজয়ী প্রশান্ত মুখার্জি (সি পি এম) ১৩,০৮৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রঞ্জিতকুমার চৌধুরী (বাংলা কংগ্রেস) ১০,৯৭৭ ভোট।

সিউড়ি ॥ বিজয়ী প্রতিভা মুখার্জি (এস ইউ সি) ১২,০৬০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণকুমার চৌধুরী (সি পি এম) ৮,০৯০ ভোট।

হাঁসন ॥ বিজয়ী ত্রিলোচন মাল (আর সি পি আই—কুমার) ৯,১৮১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যবান মণ্ডল (নব কংগ্রেস) ৪,৮৯৪ ভোট।

নলহাটি ॥ বিজয়ী গোলাম মহীউদ্দিন (নির্দল) ১০,১৮৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোল্লা ওহেদুল ইসলাম (নির্দল) ৫,৮৫৯ ভোট।

ময়ূরেশ্বর ॥ বিজয়ী পঞ্চানন লেট (সি পি আই) ১০,৯২৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অধর সাহা (নব কংগ্রেস) ১০,৭৭৪ ভোট।

অর্ধেন্দু নস্কর
(বেলেঘাটা দক্ষিণ)

আনলা দেবী
(মানিকতলা)

নানুর ॥ বিজয়ী বনমালী দাস (সি পি এম) ১৮,৪৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইলা দাস (বাংলা কংগ্রেস) ১২,৪২০ ভোট।

রামপুরহাট ॥ বিজয়ী ব্রজমোহন মুখার্জি (সি পি এম) ১৫,৫৪৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দগোপাল রায় (নব কংগ্রেস) ১১,১০৩ ভোট।

লাভপুর ॥ বিজয়ী সুনীলকুমার মজুমদার (সি পি এম)।

দুবরাজপুর ॥ বিজয়ী শেখ মজরুল ইসলাম (সি পি এম)।

রাজনগর ॥ বিজয়ী নন্দ বাউড়ি (সি পি এম) ১০,৪৪৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নলিনীধর মণ্ডল (নব কংগ্রেস) ৯,৯৯৬ ভোট।

মহম্মদবাজার ॥ বিজয়ী ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সি পি এম) ১৩,৪৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নীলরতন ঘোষ (নব কংগ্রেস) ৮,৩৭০ ভোট।

মুরারই ॥ বিজয়ী বজলে আহমেদ (এস ইউ সি) ১৬,৩১০ ভোট। নিকটতম

বিশ্বনাথ মুখার্জি
(মেদিনীপুর)

গোলাম ইয়াজদানী
(খরবা)

প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ মনসুর আলি হক (নব কংগ্রেস) ৪,৭৫৯ ভোট।

নদীয়া

নবদ্বীপ ॥ বিজয়ী দেবীপ্রসাদ বসু (সি পি এম) ২৮.৩৪২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শচীন্দ্রমোহন নন্দী (আদি কংগ্রেস) ১১.৩১১ ভোট।

কৃষ্ণনগর (পূর্ব) ॥ বিজয়ী কাশীকান্ত মৈত্র (এস এস পি) ১৮.১৩৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাধন চ্যাটার্জি (সি পি এম) ১১.৭৮৫ ভোট।

কৃষ্ণনগর (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী অমৃতেন্দু মুখার্জি (সি পি এম) ২০.০০৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহাদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য (নব কংগ্রেস) ১০.২৫৭ ভোট।

রানাঘাট (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী গৌরচন্দ্র কুণ্ডু (সি পি এম) ৩০,৭২৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিনয়কুমার চ্যাটার্জি (নব কংগ্রেস) ২৯.২৭৯ ভোট।

করিমপুর ॥ বিজয়ী সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল (সি পি এম) ২২,৪৮৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নলিনাক্ষ সান্যাল (নব কংগ্রেস) ১১,১৪৩ ভোট।

তেহট্ট ॥ বিজয়ী মাধবেন্দু মহান্তি (সি পি এম) ২০,৩৮৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খান সুরত আলি (নব কংগ্রেস) ৯,৩৯০ ভোট।

কালীগঞ্জ ॥ বিজয়ী মীর ফকির মহম্মদ (নির্দল) ১০,৬৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ ইসলাম মোল্লা (নির্দল) ৯,০৪৭ ভোট।

নাকাশিপাড়া ॥ বিজয়ী গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল (মুসলিম লীগ) ১০,৮২৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নীলকমল সরকার (নব কংগ্রেস) ৮,৬১৪ ভোট।

চাপড়া ॥ বিজয়ী সাহাবুদ্দিন মণ্ডল (সি পি এম) ১৭,০৪৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবুবকর মণ্ডল (মুসলিম লীগ) ৭,৮৪০ ভোট।

হাঁসখালি ॥ বিজয়ী আনন্দমোহন বিশ্বাস (নব কংগ্রেস) ২৩,৬৫৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (সি পি এম) ১৮,৬৩৮ ভোট।
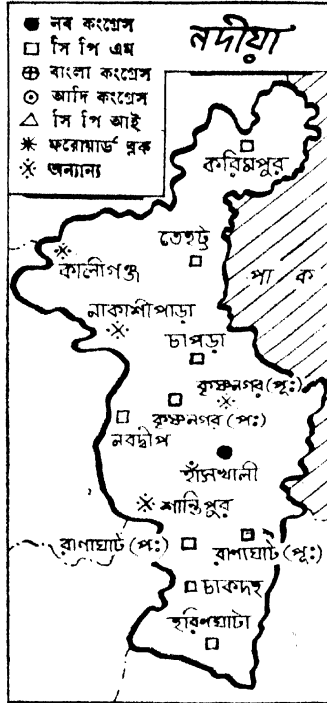
বিধানসভায় নদীয়া জেলার মোট আসন ১৮টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : কংগ্রেস ৫, বাংলা কংগ্রেস ৩, সি পি এম ২, সি পি আই ১, এস এস পি ১, আর সি পি আই ১, নির্দল ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে: সি পি এম ৯, নব কংগ্রেস ১, **এস এস পি ১, আর সি পি আই ১, মুসলিম লীগ ১,** নির্দল ১

শান্তিপুর ॥ বিজয়ী বিমলানন্দ মুখার্জি (আর সি পি আই) ১৬,৮২৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অসমঞ্জ দে (নব কংগ্রেস) ১৬,৫৩০ ভোট।

হরিণঘাটা ॥ বিজয়ী ননীগোপাল মালাকার (সি পি এম) ২৭,৯৬৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানসকুমার গাঙ্গুলি (নব কংগ্রেস) ২৫,৩৭৫ ভোট।

রানাঘাট (পূর্ব) ॥ বিজয়ী নরেশচন্দ্র বিশ্বাস (সি পি এম) ১৮,৫৫৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুশীলকুমার রায় (নব কংগ্রেস) ১৬,২৭৪ ভোট।

চাকদহ ॥ বিজয়ী সুভাষচন্দ্র বসু (সি পি এম) ২৯,৩০১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুবলচন্দ্র মণ্ডল (বাংলা কংগ্রেস) ১৬,৫৬১ ভোট।

সুব্রত মুখার্জি
(বালিগঞ্জ)

[illegible]
(ঘাটাল)

বর্ধমান

হীরাপুর ॥ বিজয়ী বামাপদ মুখার্জি (সি পি এম) ১৮,৬০৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিতীশ শেঠ (সি পি আই) ১১,১৪৩ ভোট।

কুলটি ॥ বিজয়ী রামদাস ব্যানার্জি (নব কংগ্রেস) ১২,৮২৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রশেখর মুখার্জি (সি পি এম) ১০,৫০২ ভোট।

রানীগঞ্জ ॥ বিজয়ী হারাধন রায় (সি পি এম) ৩২,১৬১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন মুখার্জি (নব কংগ্রেস) [illegible] ভোট।

দুর্গাপুর ॥ বিজয়ী [illegible] (সি পি এম) ৪০,৯৯৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনন্দগোপাল মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ৩৬,২২০ ভোট।

ফরিদপুর ॥ বিজয়ী [illegible] (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস) ১৭,৩৬৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] ঘটক (নব কংগ্রেস) ৯,১৬০ ভোট।

ভাতার ॥ বিজয়ী [illegible] (সি পি এম) ১৮,৫১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] (বাংলা কংগ্রেস) ১২,৯৭৭ ভোট।

গলসি ॥ বিজয়ী অনিল রায় (সি পি এম) ২১,২৯৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন বকসী (বাংলা কংগ্রেস) [illegible] ভোট।

বর্ধমান (উত্তর) ॥ বিজয়ী [illegible] (সি পি এম) ৩৩,৯৫৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী [illegible] বিশ্বাস (নব কংগ্রেস) ১৮,৪৩০ ভোট।

বর্ধমান (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী [illegible] চৌধুরী (সি পি এম) ২৮,২৫৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য (নব কংগ্রেস) ২৬,৯৮৫ ভোট।

কালনা ॥ বিজয়ী হরেকৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম) ৩১,৮৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নুরুল ইসলাম [illegible] (নব কংগ্রেস) ২৪,৯৩০ ভোট।

নাদনঘাট ॥ বিজয়ী সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ (সি পি এম) ৩৬,২৪৮

বর্ধমান

● নব কংগ্রেস
□ সি পি এম
⊕ বাংলা কংগ্রেস
⊙ আদি কংগ্রেস
△ সি পি আই
✱ ফরোয়ার্ড ব্লক
҉ অন্যান্য

কুলটি বেড়াবনী জামুরিয়া হীরাপুর আসানসোল উখরা (স্থগিত) রানীগঞ্জ ফরিদপুর দুর্গাপুর আউসগ্রাম কেতুগ্রাম কাটোয়া মঙ্গলকোট পূর্বস্থলী ভাতার মন্তেশ্বর নাদনঘাট গলসী বর্ধমান (উঃ) বর্ধমান (দঃ) খণ্ডঘোষ মেমারী কালনা রায়না জামালপুর দামোদর নদ

বিধানসভায় বর্ধমান জেলার মোট আসন ২৫টি, তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : সি পি এম ১৭। কংগ্রেস ২, বাংলা কংগ্রেস ২, এস এস পি ২, সি পি আই ১, নির্দল ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : সি পি এম ২১, নব কংগ্রেস ১, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ১, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্ক্সিস্ট) ১, নির্বাচন স্থগিত ১

ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শরৎচন্দ্র গোস্বামী (আদি কংগ্রেস) ২২,৩১৫ ভোট।

কাটোয়া ॥ বিজয়ী [illegible] সিংহ (সি পি এম) ২৭,৬৬৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুব্রত মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ২০,৯৯০ ভোট।

রায়না ॥ বিজয়ী গোকুলানন্দ রায় (সি পি এম) ৩২,৫৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুকুমার চাটার্জি (নব কংগ্রেস) ১৯,১৪২ ভোট।

খণ্ডঘোষ ॥ বিজয়ী পূর্ণচন্দ্র মালিক (সি পি এম) ২২,৮৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মনোরঞ্জন প্রামাণিক (নব কংগ্রেস) ১৭,৫৮৮ ভোট।

মন্তেশ্বর ॥ বিজয়ী [illegible] চৌধুরী (সি পি এম) ২৯,৭৫০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেন্দ্রনাথ হাতি (নব কংগ্রেস) ১৭,৬৭২ ভোট।

মেমারি ॥ বিজয়ী বিনয়কৃষ্ণ কোঙার (সি পি এম)

জামালপুর ॥ বিজয়ী কালীপদ দাস (ফরোয়ার্ড ব্লক মার্ক্সিস্ট)

আউশগ্রাম ॥ বিজয়ী শ্রীধর মল্লিক (সি পি এম)

জামুরিয়া ॥ বিজয়ী [illegible] মণ্ডল (সি পি এম) ১৫,৩৯৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমরেন্দ্র মণ্ডল (নব কংগ্রেস) ১০,৪৫৪ ভোট।

বরাবনী ॥ বিজয়ী সুনীল বসু রায় (সি পি এম) ২০,২১১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুকুমার ব্যানার্জি (নব কংগ্রেস) ১৩,৮৭৭ ভোট।

আসানসোল ॥ বিজয়ী লোকেশ ঘোষ (সি পি এম) ১৯,০৬৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয় সিংহ (সি পি আই) ১৪,৩০৫ ভোট।

পূর্বস্থলী ॥ বিজয়ী হুমায়ুন কবির (সি পি এম)

মঙ্গলকোট ॥ বিজয়ী নিখিলানন্দ সর (সি পি এম)

কেতুগ্রাম ॥ বিজয়ী [illegible] মণ্ডল (সি পি এম)

উখড়া ॥ বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মণ্ডল নিহত হওয়ায় এই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত।

সুধীন কুমার
(হাওড়া মধ্য)

হরেকৃষ্ণ কোঙার
(কালনা)

দেওপ্রকাশ রাই
(দার্জিলিং)

প্রভাস রায়
(বিষ্ণুপুর পশ্চিম)

বিধানসভায় পুরুলিয়া জেলার মোট আসন ১১টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : লোকসেবক সংঘ ৪, কংগ্রেস ৩, বাংলা কংগ্রেস ১, সি পি আই ১, ফরোয়ার্ড ব্লক ১, এস ইউ সি ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : নব কংগ্রেস ৯, সি পি এম ১, এস ইউ সি ১।

পুরুলিয়া

জয়পুর ॥ বিজয়ী রামকৃষ্ণ মাহাতো (নব কংগ্রেস) ১৫,৩০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভরতচন্দ্র ভাণ্ডারী (বাংলা কংগ্রেস) ৪,৪৬২ ভোট।

পাড়া ॥ বিজয়ী শরৎচন্দ্র দাস (নব কংগ্রেস) ১০,৬৮৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শৈলেন বাউড়ি (এস ইউ সি) ৬,৯৮৭ ভোট।

ঝালদা ॥ বিজয়ী কিংকর মাহাতো (নব কংগ্রেস) ১৮,৫০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তরঞ্জন মাহাতো (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১২,৩১৫ ভোট।

রঘুনাথপুর ॥ বিজয়ী হরিপদ বাউড়ি (এস ইউ সি) ৯,৫৭৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাদাস বাউড়ি (নব কংগ্রেস) ৮,২৮২ ভোট।

কাশীপুর ॥ বিজয়ী মদনমোহন মাহাতো নব কংগ্রেস) ১১,৫৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমথ মণ্ডল (সি পি আই) ৭,৬২৩ ভোট।

হুড়া ॥ বিজয়ী শতদল মাহাতো (নব কংগ্রেস) ১৬,৪৪৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অম্বরীষ মুখার্জি (সি পি এম) ,৯৪৫ ভোট।

বলরামপুর ॥ বিজয়ী বিক্রম টুডু (সি পি এম) ১২,৩২৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গীতা হেমরম (নব কংগ্রেস) ১০,৯৮২ ভোট।

পুরুলিয়া ॥ বিজয়ী সনৎকুমার মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ১৭,০৫০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (লোকসেবক সঙ্ঘ) ১১,২৩০ ভোট।

বান্দোয়ান ॥ বিজয়ী শীতলচন্দ্র হেমব্রম (নব কংগ্রেস)।

মানবাজার ॥ বিজয়ী সীতারাম মাহাতো (নব কংগ্রেস) ১৯,২৮৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গিরিশ মাহাতো (লোকসেবক সংঘ) ১৩,০৯০ ভোট।

আরশা ॥ বিজয়ী নিতাইচাঁদ দেশমুখ (নব কংগ্রেস)।

কুচবিহার

মেখলিগঞ্জ ॥ বিজয়ী মিহিরকুমার রায় (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৯,৮৮০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মণিভূষণ রায় (নব কংগ্রেস) ১৫,৯৮২ ভোট।

মাথাভাঙ্গা ॥ বিজয়ী বীরেন্দ্রনাথ রায় (নব কংগ্রেস) ২১,৩০২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া (সি পি এম) ১৮,৩৮৬ ভোট।

কুচবিহার (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী রজনী দাস (নব কংগ্রেস) ২২,৫৬২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুধীর প্রামাণিক (সি পি এম) ১৩,৭৪৯ ভোট।

সিতাই ॥ বিজয়ী মহম্মদ ফজলে হক (নব কংগ্রেস) ২০,৯৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিতেন্দ্রচন্দ্র নাগ (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১২,২৪৪ ভোট।

দিনহাটা ॥ বিজয়ী যোগেশচন্দ্র সরকার (নব কংগ্রেস) ২৫,২৪৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমলকান্তি গুহ (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২১,৮২৩ ভোট।

কুচবিহার (উত্তর) ॥ বিজয়ী সুনীল কর (নব কংগ্রেস) ২৫,০৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (সি পি এম) ১৬,৯৯৭ ভোট।

বিধানসভায় কুচবিহার জেলার মোট আসন ৮টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : কংগ্রেস ৬, ফরোয়ার্ড ব্লক ২। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : নব কংগ্রেস ৭, ফরোয়ার্ড ব্লক ১

নন্দীগ্রাম ॥ বিজয়ী ভূপাল পান্ডা (সি পি আই) ২৬,৫৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীর জানা (আদি কংগ্রেস) ১৫,০৪১ ভোট।

সুতাহাটা ॥ বিজয়ী বাণেশ্বর পান (বাংলা কংগ্রেস) ১৯,৯৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ করণ (সি পি আই) ১৪,১৩০ ভোট।

রামনগর ॥ বিজয়ী রাধাগোবিন্দ বিশাল (আদি কংগ্রেস) ১১,২৯৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হেমন্ত দত্ত (নব কংগ্রেস) ১০,১১১ ভোট।

মুগবেড়িয়া ॥ বিজয়ী অমরেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী (সি পি এম)।

পটাশপুর ॥ বিজয়ী প্রফুল্ল মাইতি (নব কংগ্রেস)।

গড়বেতা (পশ্চিম) ॥ বিজয়ী সরোজ রায় (সি পি আই)।

কেশপুর ॥ বিজয়ী রজনীকান্ত দলুই (নব কংগ্রেস)।

এগরা ॥ বিজয়ী প্রবোধচন্দ্র সিংহ (পি এস পি)।

ভেবরা ॥ বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ বেরা (নব কংগ্রেস)।

দাঁতন ॥ বিজয়ী পুলিনবিহারী ত্রিপাঠী (সি পি আই) ১৫,৭৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদ্যোতকুমার মহান্তি (আদি কংগ্রেস) ১৫,৪৯৫ ভোট।

মহিষাদল ॥ বিজয়ী সুশীলকুমার ধাড়া (বাংলা কংগ্রেস) ২৭,১৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগদীন্দ্র মাইতি (সি পি আই) ১৩,৯৩৫ ভোট।

নরঘাট ॥ বিজয়ী বঙ্কিম মাইতি (বাংলা কংগ্রেস)। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বদেশকুমার মান্না (সি পি আই)।

বিধানসভায় হাওড়া জেলার মোট আসন ১৬টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : সি পি এম ৮, ফরোয়ার্ড ব্লক ৫, কংগ্রেস ১, বাংলা কংগ্রেস ১, আর সি পি আই ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : সি পি এম ১২, নব কংগ্রেস ৩, আর সি পি আই ১

হাওড়া

হাওড়া (উত্তর) ॥ বিজয়ী শঙ্করলাল মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ২৩,৩৫৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তব্রত মজুমদার (সি পি এম) ১৮,৭৭৪ ভোট।

হাওড়া (মধ্য) ॥ বিজয়ী সুধীন্দ্রনাথ কুমার (আর সি পি আই—কুমার) ১২,৬১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শরদিন্দুশেখর শেঠ (আদি কংগ্রেস) ১০,৪০৭ ভোট।

ডোমজুড় ॥ বিজয়ী জয়কেশ মুখার্জি (সি পি এম) [illegible] ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেবতীরঞ্জন মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ১৫,৫৬৮ ভোট।

উলুবেড়িয়া (উত্তর) ॥ বিজয়ী রাজকুমার মণ্ডল (সি পি এম) ৩০,০০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কালীপদ মণ্ডল (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৯,৭৫৮ ভোট।

অজিত পাঁজা

প্রতিভা মুখার্জী

উলুবেড়িয়া (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী বটকৃষ্ণ দাস (সি পি এম) ২২,৫৯১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাশঙ্কর রায় (নব কংগ্রেস) ১১,৯৮৪ ভোট।

সাঁকরাইল ॥ বিজয়ী হারানচন্দ্র হাজরা (সি পি এম) ২৫,৩৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরবিন্দ নস্কর (নব কংগ্রেস) ১৩,৫২৭ ভোট।

বালি ॥ বিজয়ী পতিতপাবন পাঠক (সি পি এম) ২৫,১৮৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভবানীশঙ্কর মুখার্জি (নব কংগ্রেস) ১৯,০৪০ ভোট।

হাওড়া (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী শান্তিকুমার দাশগুপ্ত (নব কংগ্রেস) ১৮,৮৯৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রলয়কুমার তালুকদার (সি পি এম) ১৬,৫৭১ ভোট।

শিবপুর ॥ বিজয়ী [illegible] (সি

বিধানসভায় বাঁকুড়া জেলার মোট আসন ১৩টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : বাংলা কংগ্রেস ৬, সি পি এম ৪, সি পি আই ১, ফরোয়ার্ড ব্লক ১, এস এস পি ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : সি পি এম ৮, নব কংগ্রেস ৩, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস ১, ঝাড়খণ্ড ১।

পি এম) ১৭,২৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কানাইলাল ভট্টাচার্য (ফরোয়ার্ড ব্লক) ১৩,৪৯১ ভোট।

আমতা ॥ বিজয়ী বারীন্দ্র কোলে (সি পি এম) ৩০,৬৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গুণাকর সিং (নব কংগ্রেস) ১১,৭১৭ ভোট।

উদয়নারায়ণপুর ॥ বিজয়ী পান্নালাল মাঝি (সি পি এম) ৩১,০৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল করিম মল্লিক (নব কংগ্রেস) ১৮,৫০৯ ভোট।

জগৎবল্লভপুর ॥ বিজয়ী তারাপদ দে (সি পি এম)।

আবদুল রউফ আনসারি
(ভালতলা)

লক্ষ্মীকান্ত বসু
(রসাবহারী)

রামপিয়ারী রাম
(কাবতীর্থ)

তরুণকান্তি ঘোষ
(হাবড়া)

পাঁচলা ॥ বিজয়ী অশোককুমার ঘোষ (সি পি এম)।

শ্যামপুর ॥ বিজয়ী শিশিরকুমার সেন (নব কংগ্রেস) ২২,৬৩৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শশবিন্দু বেরা (ফরোয়ার্ড ব্লক) ২০,৩৮১ ভোট।

বাগনান ॥ বিজয়ী নিরুপমা চ্যাটার্জি (সি পি এম) ২৭,৭৬৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অমলেন্দুবিকাশ মাইতি (নব কংগ্রেস) ১৭,২৮১ ভোট।

কল্যাণপুর ॥ বিজয়ী নিতাইচন্দ্র আদক (সি পি এম)।

বাঁকুড়া

তালডাংরা ॥ বিজয়ী মোহিনীমোহন পান্ডা (সি পি এম) ২৩,৮৫৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রদ্যোতকুমার সিংহ চৌধুরী (নব কংগ্রেস) ২১,৩৮৯ ভোট।

ইন্দপুর ॥ বিজয়ী প্রয়াগ মণ্ডল (বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস) ৯,৭৮৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রামশরণ সাহানা (নব কংগ্রেস) ৫,৬৯৪ ভোট।

বড়জোড়া ॥ বিজয়ী অশ্বিনীকুমার রায় (সি পি এম) ২৪,৩৭৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুধাংশুশেখর তেওয়ারি (বাংলা কংগ্রেস) ১৩,৩৯৯ ভোট।

বিষ্ণুপুর ॥ বিজয়ী ভবতারণ চক্রবর্তী (নব কংগ্রেস) ১২,২০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী করুণাময় গোস্বামী (সি পি এম) ১০,৮৯১ ভোট।

সোনামুখী ॥ বিজয়ী সুখেন্দু খান (সি পি এম) ১৫,০৯১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কানাই সাহা (নব কংগ্রেস) ১৩,৯৭৯ ভোট।

রায়পুর ॥ বিজয়ী বদুলাল হাঁসদা (ঝাড়খণ্ড) ৯,৩৬২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাবুলাল হেমব্রম (নব কংগ্রেস) ৯,২৯২ ভোট।

রানীবাঁধ ॥ বিজয়ী সুচাঁদ সোরেন (সি পি এম)।

ছাতনা ॥ বিজয়ী কমলাকান্ত হেমব্রম (নব কংগ্রেস)।

গঙ্গাজলঘাটি ॥ বিজয়ী কালীপদ বাউড়ি (সি পি এম)।

বাঁকুড়া ॥ বিজয়ী কাশীনাথ মিশ্র (নব কংগ্রেস)।

ওন্দা ॥ বিজয়ী মানিক দত্ত (সি পি এম)।

কোতুলপুর ॥ বিজয়ী জটাধারী মুখার্জি (সি পি এম) ১৬,১৩৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শশাঙ্কশেখর মিত্র (নব কংগ্রেস) ১৫,২৩১ ভোট।

ইন্দাস ॥ বিজয়ী বদন বেরা (সি পি এম)।

মহঃ নিজামুদ্দীন
(এন্টালী)

রমেন্দ্রনাথ দত্ত
(রায়গঞ্জ)

দার্জিলিং

ফাঁসিদেওয়া ॥ বিজয়ী ঈশ্বরচন্দ্র তিরকি (নব কংগ্রেস) ১৯,২৫৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রস মিনিস (সি পি এম) ১৪,৬৭৮ ভোট।

কালিম্পং ॥ বিজয়ী মদনকুমার প্রধান (গোর্খা লীগ) ১০,৮১০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পদ্মালক্ষ্মী সুব্বা (বিদ্রোহী গোর্খা লীগ) ৭,৩৮৮ ভোট।

দার্জিলিং ॥ বিজয়ী দেওপ্রকাশ রাই (গোর্খা লীগ) ১৪,৯৯৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মদনকুমার থাপা (নব কংগ্রেস) ২,৯৩৩ ভোট।

জোড়বাংলো ॥ বিজয়ী আনন্দপ্রসাদ পাঠক (সি পি এম) ১২,৮৫৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দলাল গুরুং (গোর্খা লীগ) ১২,৫৭২ ভোট।

শিলিগুড়ি ॥ বিজয়ী অরুণকুমার মৈত্র (নব কংগ্রেস) ২০,৭৬৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন বসু (সি পি এম) ১২,২৬৮ ভোট।
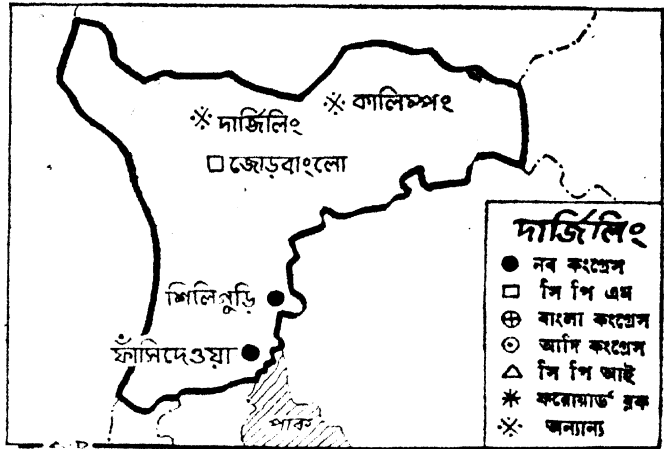
বিধানসভায় দার্জিলিং জেলার মোট আসন ৫টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৯ সালের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : গোর্খা লীগ ৪, কংগ্রেস ১। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : গোর্খা লীগ ২, নব কংগ্রেস ২, সি পি এম ১

* কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়ী ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর নামের পাশে তাঁদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার উল্লেখ করা গেল না। সরকারীভাবে সংখ্যাগুলি না পাওয়ার জনাই এই ত্রুটি থেকে গেল। এজন্য আমরা দুঃখিত।

লোকসভা

কুচবিহার ॥ বিজয়ী বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী (নব কংগ্রেস) ১,৫০,৮৬৯ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নগেন্দ্রনাথ রায় (সি পি এম) ৮০,২৬৫ ভোট।

জলপাইগুড়ি ॥ বিজয়ী টুনা ওরাও (নব কংগ্রেস) ১,১৩,১০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বীরসেন কুজুর (সি পি এম) ৬০,১০৭ ভোট।

দার্জিলিং ॥ বিজয়ী রতনলাল ব্রাহ্মণ (সি পি এম) ৮৪,৪০৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জি এস গুরুং (গোর্খা লীগ) ৭২,১৩১ ভোট।

রায়গঞ্জ ॥ বিজয়ী সিদ্ধার্থশংকর রায় (নব কংগ্রেস) ১,৪৭,৩৬০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুবোধ সেন (সি পি এম) ৮৩,৩৫৩ ভোট।

বালুরঘাট ॥ বিজয়ী রসেন্দ্রনাথ বর্মন (নব কংগ্রেস) ১,৫৯,৮৯৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পীযূষকান্তি দাস (সি পি এম) ৭৪,৬১৮ ভোট।

মালদহ ॥ বিজয়ী দিনেশচন্দ্র জোয়ারদার (সি পি এম) ১,৩৭,০৭১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজিমুদ্দিন সরকার (আদি কংগ্রেস) ৫৩,২৮৯ ভোট।

জঙ্গীপুর ॥ বিজয়ী লুৎফল হক (নব কংগ্রেস) ১,০৪,১৭০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বরুণ রায় (আর এস পি) ৫৪,৮১৪ ভোট।

মুর্শিদাবাদ ॥ বিজয়ী আবু তাহের চৌধুরী (মুসলিম লীগ) ৯৩,৭১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ বদরুদ্দোজা (এফ এম ও এম) ৭৩,৩৩৪ ভোট।

বহরমপুর ॥ বিজয়ী ত্রিদিব চৌধুরী (আর এস পি) ৭৫,৩১৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেজ উল করিম (নব কংগ্রেস) ৬৪,৫৫৯ ভোট।

কৃষ্ণনগর ॥ বিজয়ী রেণুপদ দাস (সি পি এম) ১,০৮,৮৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইলা পালচৌধুরী (নব কংগ্রেস) ৭৯,২৪১ ভোট।

নবদ্বীপ ॥ বিজয়ী বিভা ঘোষ (গোস্বামী) (সি পি এম) ১,৭৬,৫৪৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (নব কংগ্রেস) ১,৬৫,৯৪৩ ভোট।

বারাসত ॥ বিজয়ী রণেন্দ্রনাথ সেন (সি পি আই) ১,১১,৮০৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হেমন্ত গাঙ্গুলি (সি পি এম) ১,০২,১৬৭ ভোট।

বসিরহাট ॥ বিজয়ী এ কে এম ইশাক (নব কংগ্রেস) ১,২৮,৬৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আবদুল্লা রসুল (সি পি এম) ৭৩,৭৫০ ভোট।

জয়নগর ॥ বিজয়ী শক্তিকুমার সরকার (নব কংগ্রেস) ১,৫৮,৯৪৩ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মলকুমার সিংহ (সি পি এম) ৮৪,৭০৭ ভোট।

মথুরাপুর ॥ বিজয়ী মধুর্য হালদার (সি পি এম) ১,১১,৬৫৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিমলেন্দুশেখর নস্কর (নব কংগ্রেস) ১,১০,০৭১ ভোট।

ডায়মণ্ডহারবার ॥ বিজয়ী জ্যোতির্ময় বসু (সি পি এম) ২,০৪,৯৮৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অম্বরপ্রসাদ ব্যানার্জি (নব কংগ্রেস) ১,৩১,৬৫১ ভোট।

আলিপুর ॥ বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) ১,৭৩,৭৯৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমল সরকার (সি পি এম) ১,৪৬, ৮৩৭ ভোট।

কলিকাতা (দক্ষিণ) ॥ বিজয়ী প্রিয়রঞ্জন দাশ মুন্সী (নব কংগ্রেস) ১,৪৪,৯৫২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণেশ ঘোষ (সি পি এম) ১,২২,৯৪৩ ভোট।

কলিকাতা (উত্তর-পূর্ব) ॥ বিজয়ী হীরেন মুখার্জি (সি পি আই) ১,১৩,২৩০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তিকান্তি দাশগুপ্ত (সি পি এম) ১,১০,৯৩৯ ভোট।

ব্যারাকপুর ॥ বিজয়ী মহম্মদ ইসমাইল (সি পি এম) ২,৮৪,৫৯০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেণু চক্রবর্তী (সি পি আই) ২,০০,৫৮৭ ভোট।

কলিকাতা (উত্তর-পশ্চিম) ॥ বিজয়ী অশোককুমার সেন (নব কংগ্রেস) ১,৪৪,০৫৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রশান্ত শূর (সি পি এম) ৭০,৭৭৬ ভোট।

হাওড়া ॥ বিজয়ী সমর মুখার্জি (সি পি এম) ১,৫০,৯১৭ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি (নব কংগ্রেস) ১,২৫,০৭৫ ভোট।

উলুবেড়িয়া ॥ বিজয়ী শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (সি পি এম) ১,৭৬১৯২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুরারিমোহন মান্না (নব কংগ্রেস) ১,২৩,৪৭২ ভোট।

শ্রীরামপুর ॥ বিজয়ী দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সি পি এম) ১,৬৭,৫৩০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যদুগোপাল সেন (সি পি আই) ১,০৫,০৭২ ভোট।

হুগলি ॥ বিজয়ী বিজয়কৃষ্ণ মোদক (সি পি এম) ২,০২,৬৭২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফণী ঘোষ (নব কংগ্রেস) ১,৭১,২০১ ভোট।

আরামবাগ ॥ বিজয়ী মনোরঞ্জন হাজরা (সি পি এম) ১,৩৭,৮৪২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শান্তিমোহন রায় (নব কংগেস ১,১৫,৬২২ ভোট।

ঘাটাল ॥ বিজয়ী জগদীশ ভট্টাচর্য (সি পি এম) ১,২৮,৩৬৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পরিমল ঘোষ (নব কংগ্রেস ১,২৭,০৪৪ ভোট।

তমলুক ॥ বিজয়ী সতীশচন্দ্র সামন্ত (বাংলা কংগ্রেস) ১,৪২,২৯৪ ভোট নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণা আসফ আলি (সি পি আই) ১,৩৫,০২৩ ভোট।

কাঁথি ॥ বিজয়ী সমর গুহ (পি এস পি) ১,৪১,৫৪০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আভা মাইতি (আদি কংগ্রেস) ৭১,৬৮১ ভোট।

মেদিনীপুর ॥ বিজয়ী সুবোধচন্দ্র হাঁসদা (নব কংগ্রেস) ১,৪০,৩২৬ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণ চৌবে (সি পি আই; ১,১৮,৩১৭ ভোট।

ঝাড়গ্রাম ॥ বিজয়ী অমিয়কুমার কিসকু (নব কংগ্রেস) ১,০২,৭৬২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী যদুনাথ কিসকু (সি পি এম) ৮৮,০৫০ ভোট।

পুরুলিয়া ॥ বিজয়ী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো (নব কংগ্রেস) ১,৩০,২৬৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভজহরি মাহাতো (লোকসেবক সংঘ) ৫৪,২২১ ভোট।

বাঁকুড়া ॥ বিজয়ী শংকরনারায়ণ সিংদেও (নব কংগ্রেস) ৮১,১৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহাদেব মুখার্জি (সি পি এম) ৫৫,৪৪৬ ভোট।

বিষ্ণুপুর ॥ বিজয়ী অজিতকুমার সাহা (সি পি এম) ৯৮,৪৩৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুপদ খাঁ (নব কংগ্রেস) ৯৫,৯৭৮ ভোট।

আউশগ্রাম ॥ বিজয়ী কৃষ্ণচন্দ্র হালদার (সি পি এম) ১,৬০, ১০০ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মহাদেব সাহা (নব কংগ্রেস) ৬২,১৬৮ ভোট।
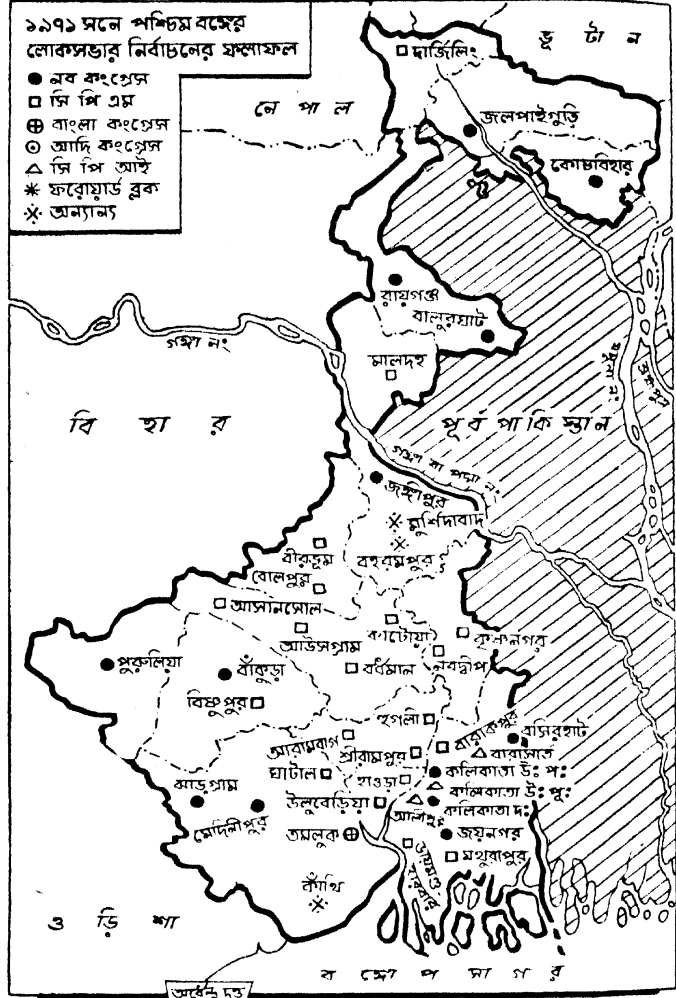
লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মোট আসন সংখ্যা ৪০টি। তন্মধ্যে গত ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন ছিল : কংগ্রেস ১৪, সি পি এম ৫, সি পি আই ৫, বাংলা কংগ্রেস ৫, ফরোয়ার্ড ব্লক ২, পি এস পি ১, এস এস পি ১ আর এস পি ১, লোকসেবক সংঘ ১, এস ইউ সি ১, নির্দল ৪। এবারকার নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে : সি পি এম ২০, নব কংগ্রেস ১৩, সি পি আই ৩, বাংলা কংগ্রেস ১, পি এস পি ১, আর এস পি ১, মুসলিম লীগ ১।

আসানসোল ॥ বিজয়ী রবীন সেন (সি পি এম) ১,৩২,২৬৮ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণ চৌধুরী (নব কংগ্রেস) ৯৮,৬০৮ ভোট।

বর্ধমান ॥ বিজয়ী সোমনাথ চ্যাটার্জি (সি পি এম) ২,০৩,৬৪৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভোলানাথ সেন (নব কংগ্রেস) ১,৩৯,৫৬৫ ভোট।

কাটোয়া ॥ বিজয়ী সরোজমোহন মুখার্জি (সি পি এম) ২,১০,৪২২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বৈপায়ন সেন (নব কংগ্রেস) ১,৪১,৯৩৫ ভোট।

বোলপুর ॥ বিজয়ী শরদীশ রায় (সি পি এম) ১,১৫,৫৯১ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফুলরেণু গুহ (নব কংগ্রেস) ৭৮,৯৬৬ ভোট।

বীরভূম ॥ বিজয়ী গদাধর সাহা (সি পি এম) ৮০,৭১২ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কানাই সাহা (নব কংগ্রেস) ৭২,৩২৭ ভোট।

দিলীপ দত্ত

[স্বামী যখন খেলার মাঠে স্ত্রী তখন হয়ত গ্যালারিতে দর্শকের ভূমিকায়, কিংবা বাড়িতে রেডিওতে শুনছেন। খেলা ভারতের বাইরে হলে পরদিনের খবরের কাগজ পড়ে তবে স্বস্তি; অবশ্য স্বামী যদি ভাল খেলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণপুরুষটির ভুলে যদি পরাজয় ঘটে? শুধু তাই নয়—খেলোয়াড় স্বামী হলে কোনক্রমেই আর পাঁচজন স্ত্রীর স্বামীর মত সান্নিধ্য পাওয়া অসম্ভব। তাই বলে কী খেলোয়াড়দের স্ত্রীরা অসুখী? ওঁরা কি ভাবেন, স্বামীর খেলার সময় মন কেমন করে তার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে চার যুগের চারজন ফুটবল খেলোয়াড় ডাঃ সম্মথ দত্ত, পি ভেঙ্কটেশ, চুণী গোস্বামী ও প্রণব গাঙ্গুলীর স্ত্রীর কাছ থেকে।]

এস এস শীল্ড দেখে যাও

আমি এবং বাড়ির সকলে ওঁর খেলোয়াড়-জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলাম। প্রত্যেকটি খেলা দেখতে [illegible]

পরের দিন কাগজে [illegible] খেলা হত তার কাটিং রেখে দিতাম [illegible] করে।" প্রশ্ন করার আগেই যেন বলা শুরু করলেন চল্লিশ বছর আগের বিখ্যাত ফুটবলার ডাঃ সম্মথ দত্তর স্ত্রী শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত।

খেলার আগের দিন এবং খেলার দিন উনি যাতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারেন তার জন্যে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করতুম। কেউ টিকিটের জন্যে অনুরোধ করলে রেগে যেতুম, বলতাম, উনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, টিকিট চেয়ে বিরক্ত করবেন না। সকলে মিলে খুব সেবা করতুম ওঁর।

[illegible]

খেলার আগের দিন থেকে বাড়ির সকলে উদ্বিগ্ন থাকতুম। আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটত। খেলার দিন সকাল থেকে পরিকল্পনা হত, কে কী পরবে, কোন রাস্তা দিয়ে খেলার মাঠে যাবে। ওঁর যেন মুখ না দেখতে পাই। এমন অনেকদিন গেছে 'লাকি' শাড়ী বলে ছেঁড়া শাড়ী পরেই মাঠে গেছি। এবং আমরা রোজ ঠিক একই রাস্তা ধরে খেলার মাঠে যেতাম।

একদিন এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি হবে বলে অন্য এক রাস্তা দিয়ে আমাদের মাঠে নিয়ে গেলেন। আমরা গাড়ীতে বসেই অনেক আপত্তি করেছিলাম, সেদিন হেরে গিয়েছিল ওরা। খুব রাগ হয়েছিল ভদ্রলোকের উপর।

খেলার মাঠে উনি যখন নামতেন বেশ উত্তেজনা আসত। খেলা চলার সময় আমরাও খেলার মধ্যে মেতে থাকতুম। অনেকে অনেক মন্তব্য করত। একবার মনে আছে, উনি বেশ ভাল খেলছেন, সমর্থকরা বলল, বাঃ ভাই, বেশ খেলছে, বেশ ভাই। তারপরেই যেই একটা বল মিস্ করেছেন, অমনি "দূর্, শালা, মাঠে নাম কেন?" ঘটনা ঘটেছিল বিয়ের পর প্রথম দিনেই মাঠে গিয়ে।

আমি অবশ্য এসব মন্তব্যে কান দিতাম না। বরং বাড়ি ফিরে এসে ওঁর খেলা নিয়ে আলোচনা করতাম, ওটা ওরকম-ভাবে মারলে কেন, ওটা মিস্ করেছ, বলটা ওকে দিয়ে দিতে পারতে। উনি কিছু বলতেন না, চুপ করে থাকতেন। আমার কিন্তু দুদিন ধরে রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনের মধ্যে ভাসত, আহা উনি যদি বলটা ঠিক-ভাবে রিসিভ করতে পারতেন তাহলে গোল হত না।

একবার কাদের সঙ্গে খেলায় ওঁর মেজাজ বিগড়ে গেল। ঐ একবারই দেখেছিলাম মাঠের মধ্যে মাথা খারাপ করতে। উনি বলেন, কোন্ এক খেলোয়াড় নাকি ওঁর কান কামড়ে দিয়েছিল। যাই হোক বাড়িতে এসে ওঁকে খুব বকেছিলাম। তোমার জন্যেই আজ টীম হারল, তুমি ওরকম মাথা খারাপ করতে গেলে কেন? আমাদের সকলের মনে হয়েছিল মাঠে নেমে যাই, তোমায় বোঝাই।

যেদিন জিতে ফিরতেন। আমি জানলা দাঁড়িয়ে লোকদের মিষ্টি খাইয়েছি। যখন কোন ট্রফি নিয়ে আসতেন, বাড়িতে উৎসব পড়ে যেত। ঠাকুর দেখার মত সকলকে ডেকে ডেকে বলতাম, এসো, এসো, শীল্ড দেখে যাও তোমরা!

আর যেদিন হেরে যেতেন বাড়ির কাছে কেউ আর ঘেঁষত না। আমরা সকলে মাঠ থেকে এসে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়তুম। [illegible]

দিব্যি সবকিছু খেতেন। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতেন, ওদের সব খাওয়া হয়েছে? ঠাকুর বলত দিদিরা বলেছেন ওঁদের খিদে নেই। উনি মুচকি হেসে শুতে চলে যেতেন।

মাঠে যখন ওঁর চোট লাগত, আমার কোন অভিব্যক্তি হত না। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে সেই আঘাত সারিয়ে তোলার জন্যে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করতুম। এখনকার খেলোয়াড়রা যেরকম সুযোগ সুবিধে পান তখন ততটা ছিল না। তাই তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্যে আমাদেরই সব বন্দোবস্ত করতে হত।

ওঁর খেলোয়াড়জীবনে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু ঐ খেলার জন্যেই আবার কত ভাল ভাল চাকরির সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করেন নি। সেসব চাকরি ছিল কলকাতার বাইরে। উনি বলতেন, ওইসব চাকরি পেলে কলকাতা ছাড়তে হবে, আর কলকাতা ছাড়তে হলে খেলা হবে না।

উনি খেলা ছেড়ে দেবার পর মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হত আরও কিছুদিন খেললে পারতেন। নাম থাকতো।"

(শ্রীমতী সুধারানী দত্তর স্বামী ডাঃ সম্মথ দত্ত ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মোহনবাগানে কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন। খেলতেন ব্যাকে। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৩৬ সালে ভারতে আগত চাইনীজ অলিম্পিক ফুটবল দলের এবং ১৯৩৭ সালে ইংল্যান্ডের কোরিন্থিয়ান ফুটবল দলের বিপক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বও ছিল সম্মথবাবুর উপর।)

এখনো আগের মতই লাগে

"শুনেছি খেলোয়াড়ের সঙ্গে বিয়ে হলে অনেকের অনেক অসুবিধে হয়। আমার কিন্তু কোনই অসুবিধে হয়নি। উনি সব দিক দিয়ে ভাল। খেলায় যেমন ভাল, স্বামী হিসেবেও তেমনি। সবদিন ঠিক সময়ে বাড়ি আসতেন। সংসারের সব খোঁজ খবর রাখতেন। এমন অনেকবার হয়েছে যে কলকাতার বাইরে খেলতে যাবার কথা কিন্তু আমি একলা থাকব বলে উনি সে খেলা খেলতে যাননি।" পি ভেঙ্কটেশের স্ত্রীর মুখে বিশুদ্ধ বাংলা শুনে অবাক হলাম। পরে বিস্ময় কাটে তিনি বাঙালী জেনে। নাম দীপ্তি।

"যখন নিয়মিত প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলতেন। তখন কত লোক আসত, যেত।

দীপ্তি ভেঙ্কটেশ

রাস্তায় বের হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। লোকে ওঁকে দেখবার জন্যে পাগল।

ওঁর সঙ্গে যখন মাঠে যেতাম দেখতাম, কত জনপ্রিয়। খেলতে নামতেন। আমার অবশ্য সব সময় মনের ওপর ভরসা ছিল যে উনি গোল দেবেন আর বেশীর ভাগ সময় গোল দিতেনও।

যেদিন বড় খেলা থাকত তার আগের দিন থেকে উনি খুব বেশী উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তেন। আর সকালে উঠেই ছটফট করতেন—আজ খেলায় কি হবে! জিততে পারবো ত? আমি ভরসা দিতাম। তোমরা জিতবে, তুমিই গোল দেবে।

উনি খেলতে যেতেন। সকলে আমায় বলত, 'দিদি জিতলে কি খাওয়াবেন?'

যদি হার হত তাহলে তারাই আবার বলত, 'আপনার টিম হেরে গেছে, হেরে গেছে।'

জিতে বাড়ি এলে উনি বলতেন, 'চল চল বেড়িয়ে আসি।' ভাল ভাল খাবার আসত, বেড়ান হত। আর টিম হেরে গেলে চুপ করে বাড়ি আসতেন। কোথাও যেতেন না। শুয়ে পড়তেন তাড়াতাড়ি। আমরাও আর বিরক্ত করতাম না।

উনি যখন বিদেশে খেলতে যেতেন আমার খুব অসুবিধে হলেও ভাল লাগত। ভাবতাম কত দেশ বেড়াচ্ছেন, কত নাম হচ্ছে, আমার মন সেই খুশিতেই ভরে থাকত।

আগে দেখতাম খেলার টিকিটের জন্য কত লোক আসত। এখনও আসে। কিন্তু এখন অত টিকিট পাবেন কোথায়! তবুও উনি ওদের টিকিটের যোগাড়ের জন্য বেরিয়ে পড়েন। আমি নিষেধ করি। উনি বলেন, ওরা কত আশা করে আসে কি করে ফিরিয়ে দিই বল!

আমার ১৭ বছর বিয়ে হয়েছে। তিনটি ছেলেমেয়ে শ্রীনিবাসন, চন্দ্রা আর কুমার। আমার কিন্তু এখনও আগের মতই লাগে। কোন পরিবর্তন মনে হয় না। ওঁর খেলা ছেড়ে দেবার পরও।

(শ্রীমতী দীপ্তি ভেঙ্কটেশের স্বামী শ্রী পি ভেঙ্কটেশ ১৯৪৮ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানে ফুটবল খেলেছেন। তার আগে খেলতেন বাঙ্গালোর ব্লুজে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফিতে মহীশুর ও বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(ভেঙ্কটেশ ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলেছেন। তাছাড়া ভারতীয় দলের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য এবং ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে রাশিয়া সফর করেছেন। স্ত্রী দীপ্তি বাংলারই মেয়ে।)

খেলা ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছেন

'আমার খেলাধুলায় উৎসাহ ছিল না তাই বিয়ের সময় মনে হয়েছিল, অতবড় একজন খেলোয়াড়ের বাড়িতে বিয়ে হয়ে না জানি কি হবে! কিন্তু শ্বশুরবাড়ি এসে দেখলাম, কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। এঁরা আমাদের মতই হাসিখুশি লোক, খেলোয়াড়ের বাড়ি বলে আলাদা কিছু নেই। বরং বাড়িতে খেলার গল্প ছাড়া অন্য গল্প আলোচনাই বেশি হয়। তাছাড়া খেলোয়াড়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, আমিও সেইভাবে নিজেকে বানিয়ে নিয়েছিলাম। খেলার জন্য ওঁকে বিদেশে যেতে হয় নিয়মিত প্র্যাকটিশে যেতে হবে এসব আমার সয়ে গিয়েছিল। উনি খেলছেন, বিদেশ যাচ্ছেন, নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এইটেই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ। যখন উনি 'অর্জুন' পুরস্কার পেলেন, তখনই আমার বিয়ে হয়েছে। একসঙ্গে আমি রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলাম। আমার খুব ভাল লেগেছিল।" দক্ষিণ কলিকাতার যোধপুর পার্কের বাড়িতে বসে কথাগুলি বলছিলেন চুণী গোস্বামী—জায়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী। তিনি একছেলের মা।

"আমি ওঁর একটি মাত্র খেলাই দেখেছি, সেটা তাতাবানিয়ার সঙ্গে। খেলাটা ভাল লাগল, ওঁর ত বটেই। আর বুঝতে পারলুম, খেলার দিন কেন অত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন। সারাটা মাঠ অতক্ষণ ধরে ছোটাছুটি সত্যিই পরিশ্রমের।

মোহনবাগানের খেলার আগের দিন বা খেলার দিন ওঁর মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখতাম না। কেবল আগের দিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেন। খেলায় জিতে এলে খুব আনন্দ করতেন, কিন্তু হেরে

বাসন্তী গোস্বামী

হেরেও খুব একটা মন খারাপ দেখতাম না, কেবল বলতেন, ভাল খেলেও জিততে পারলাম না, 'লাক ফেভার' করল না। বিদেশ থেকে যখন খেলে ফিরে আসতেন তারপর অনেকদিন ধরে বিদেশের নানা গল্প শুনতাম, আমরা অনেকে একসঙ্গে বসে। আর বিদেশ থেকে উনি সবচেয়ে বড় পুরস্কার যা এনেছেন, জাকার্তার সোনার মেডেল, সেটা এখনও আমার কাছে।

উনি যখন খেলতেন, তখন বাড়িতে দর্শকদের চিঠি আসত। তার মধ্যে ভাল চিঠিও অনেক আছে, আর ছিল অনেক বাজে চিঠিও। সে সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল। খেলা ছেড়ে দেবার পর অনেক চিঠি এসেছে, "উনি কেন এত তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে দিলেন, আরও ত খেলতে পারতেন!"

কিন্তু আমার মতে উনি ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছেন। ফর্ম পড়ে যাবার পর লোকে দর্শকদের বিদ্রূপ মন্তব্য শোনার চেয়ে ফর্মে থাকতে থাকতে খেলা ছেড়ে দেওয়া অনেক সম্মানের।

ওঁকে যেমন ভালবাসি তেমনি মোহনবাগানকে

"আমার ক্রিকেট খেলায় উৎসাহ ছিল, ক্রিকেট খেলা দেখতে মাঠে যাই, ফুটবলের প্রতি কোন আগ্রহই ছিল না। কিন্তু ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে বিয়ে হবার পর ফুটবল খেলার প্রতি আগ্রহ এল। দেখলুম ওঁর বেশ নাম ডাক আছে। নাম বললে লোকে চেনেও। আমারও ফুটবল খেলাকে ভাল লাগতে লাগল। আর ইচ্ছে হল ও আরও ভাল খেলুক, আরও নাম করুক।" বললেন ওরফে প্রণব গাঙ্গুলীর স্ত্রী শ্রীমতী সোমালী সব অকপটে স্বীকার করলেন। স্বামী সম্পর্কে তাঁর অভিযোগও কম নয়।

"বিয়ে হবার পর ওর একটু আলস্য এসেছিল। প্র্যাকটিস করতে যেতে চাইত না। আমি জোর করে পাঠাতুম। 'যাও, যাও প্র্যাকটিস করতে যাও, তা না হলে ভাল খেলতে পারবে না যে!"

আমি কিন্তু কোনদিনই ওঁর খেলা দেখিনি। বান্ধবীরা বলে, "কেমন খেলে রে, দেখেছিস?" আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু ও নিয়ে যায় না। বলে, মাঠে মেয়েরা যায় না, একলা একলা তোমার ভাল লাগবে না।

বললাম, "সে কী মাঠে ত অনেক মেয়ে যায় আজকাল।"

প্রণবের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, ওমা, কি দুষ্টু দেখেছেন, "আমায় বলে মাঠে মেয়েরা যায় না। আমি এবার যাবই।"

জিজ্ঞেস করলাম, স্বামীর খেলার আগের দিন বা খেলার দিন ওঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখেন?

খেলার দিন ও কম খায়, এবং আমিও বিশ্রাম নিতে সাহায্য করি, বেশী খেতে দিই না। ও এমনিতে একটু খেতে ভালবাসে, তাই খাবার দিকটা আমি নজর রাখি। খাওয়া বেশী হলে আর দৌড়াতে পারে না, ভাল খেলতে পারে না।

খেলায় জিতে এলে ও খুব হাসিখুশি

সোমালী গাঙ্গুলী

থাকে, বাড়িতে এসে হৈ হুল্লোড় করে আর হেরে এলে একেবারে গুম, কারও সঙ্গে কথা বলে না, একলা চেয়ারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সেদিন হয়ত খেতেই চায় না। দু'তিনদিন এই ভাবটা থাকে। আর যেদিন হেরে যাবে তার পর থেকে দশদিন আর আমাকে নিয়ে বেড়াতেই যায় না।

এমনিতে বাড়িতে সকলেই খেলার বিষয়ে খুব উৎসাহী। কিন্তু হাত ভেঙে যাবার পর থেকে আর কেউ চান না যে ও আরও খেলুক। কেবল আমার এবং ওর ইচ্ছে, খেলতে হবে। ও আরও খেলুক, আরও নাম করুক এইটেই আমি চাই।

ওর খেলা দেখতে পাই না। কিন্তু রেডিওতে রিলে শুনতে খুব ভাল লাগে। ওকে যেমন ভালবাসি, ওর টিম মোহন-বাগানকেও ঠিক তেমনি। সব সময় প্রার্থনা করি ওর টিম জিতুক। কিন্তু যদি হেরে যায় খুব মন খারাপ হয়ে যায়। এই ত সেদিন লীগের শেষ খেলায় ওরা যখন গোল খেল আমার চোখে জল এসে গেল, রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে কাঁদতে লাগলুম।"
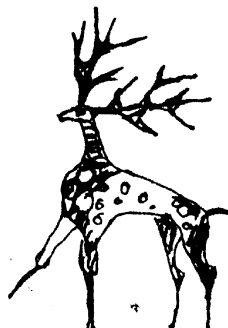
হকি খেলার আইন কানুন

হকি খেলার আইন-কানুন বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য চারটি বিভাগে ভাগ করতে হচ্ছে। যেমন—(১) মূল আইনের ধারা, (২) মূল আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য, (৩) আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ এবং (৪) খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ। প্রতিটি আইনেই পৃথক পৃথকভাবে এই চারটি স্তম্ভ থাকছে। তবে যেখানে ভাষ্য বা উপদেশের প্রয়োজন নেই সেখানে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

॥ আইন ১ ॥ দল এবং খেলার সময়

(এ) খেলা দুটি দলের মধ্যে হবে। কোনো দলে ১১ জনের বেশী খেলোয়াড় থাকবে না। সাধারণভাবে দলের গঠন হচ্ছে ৫জন ফরোয়ার্ড, ৩জন হাফব্যাক, ২জন ব্যাক এবং ১জন গোলকিপার।

(বি) খেলা আরম্ভের আগে যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক একমত হয়ে খেলার সময় নির্দিষ্ট করে না থাকেন তবে খেলার সময় হবে প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে মোট ৭০ মিনিট। মধ্য সময়ে দুটি দল পাশ পরিবর্তন করবে। মধ্যবর্তী বিরতির সময় হবে ৫ মিনিট। তবে খেলার আগে দুই অধিনায়ক একমত হয়ে যদি বিরতির সময় সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করে থাকেন সেটা পৃথক কথা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিরতি সময় ১০ মিনিটের বেশী হবে না।

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) দুজন আম্পায়ারেরই প্রতি অর্ধ সময়ের হিসাব রাখা উচিত।

(২) যদি একজন আম্পায়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঁশী না বাজিয়ে খেলা চালিয়ে যেতে থাকেন অপর আম্পায়ারের খেলা বন্ধ করা উচিত।

(৩) খেলার সময় সম্পর্কে প্রতিযোগিতা কমিটি বা প্রাদেশিক সংস্থার নিয়ম আম্পায়ারকে মানতে হয়। প্রতিযোগিতা কমিটি বা কোনো সংস্থা তাঁদের সুবিধামত সময় নির্দিষ্ট করতে পারেন। বিরতির সময় সম্পর্কেও একই কথা। তবে মধ্যবর্তী সময়ে ৫ মিনিট বিরতি পাবার অধিকার খেলোয়াড়রা অবশ্যই দাবি করতে পারেন। বিরতির সময় কোনো মতেই ১০ মিনিটের বেশী হতে পারে না।

অমীমাংসিত খেলায় অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা হলে সাধারণত ৫ মিনিট করে ১০ মিনিট অথবা ১০ মিনিট করে ২০ মিনিট খেলানো হয়ে থাকে। অতিরিক্ত সময়ের মাঝে বিরতির ব্যবস্থা থাকে না এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা আরম্ভের আগে অবশ্যই 'টস' করতে হয়।

(৪) যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগে দৈব দুর্ঘটনায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অন্য কোনো কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায় তবে খেলার তখনকার ফলাফল যাই হক না কেন আর একদিন পুরো সময় খেলানোই আইনের বিধান।

(৫) যাতে কোনো ভুল না হয় তার জন্য দুজন আম্পায়ার সময় সম্পর্কে একটি সংকেত ঠিক করে নেবেন যে সংকেতে বোঝা যাবে বিরতির সময় বা খেলা শেষ হবার সময় সমাসন্ন। প্রতি অর্ধ শেষ হবার মিনিট খানেক আগে এই সংকেত জানানো দরকার।

(৬) খেলার সময় নষ্ট হলো সে সময় খেলার মধ্যে কিভাবে যোগ হবে সে সম্পর্কে দুজন আম্পায়ারের একমত হওয়া উচিত। কোনো দৈব দুর্ঘটনা, খেলোয়াড় ও আম্পায়ারের চোট-আঘাত, দর্শকদের মাঠে প্রবেশ কিংবা বল হারিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে খেলার সময় নষ্ট হতে পারে। যে অর্ধে সময় নষ্ট হবে সেই অর্ধের সঙ্গে নষ্ট সময় যোগ করতে হবে। পেনাল্টি স্ট্রোকের জন্য সময় নষ্ট হলেও একইভাবে নষ্ট সময় খেলার সময়ের মধ্যে যোগ হবে।

(৭) হকি খেলার সময় খেলোয়াড় পরিবর্তনের নিয়ম নেই। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক হকি বোর্ডের বিধানে একজন খেলোয়াড়ের বদলে অপর একজন খেলোয়াড় মাঠে নামতে পারেন না। ১১ জনের কম খেলোয়াড় নিয়ে গড়া দল মাঠে নামতে পারে। খেলার যে কোন সময় বাকি খেলোয়াড়রা যোগ দিতে পারেন। তবে কম খেলোয়াড় নিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হলে খেলা আরম্ভের আগে সে কথা আম্পায়ারকে জানাতে হবে এবং খেলার মধ্যে নতুন খেলোয়াড়কে মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ করতে হলেও আম্পায়ারের সম্মতি নিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে হবে।

(৮) ৫জন ফরোয়ার্ড, ৩ জন হাফব্যাক, ২জন ব্যাক এবং ১জন গোলকিপারকে নিয়ে সাধারণভাবে দল গড়ার কথা বলা হলেও ইচ্ছে মত দল সাজানো যেতে পারে। কিন্তু দুজন গোলকিপার হিসাবে খেলতে পারেন না। ফুটবল খেলা গোলকিপার ছাড়া আরম্ভ করা যায় না। কেননা ফুটবলের আইনের মধ্যেই আছে ১১ জনের মধ্যে ১জন অবশ্যই গোলকিপার হবে। কিন্তু গোলকিপার ছাড়াও হকি খেলা আরম্ভ করা যেতে পারে।

(৯) আন্তর্জাতিক হকি বোর্ডের মতে বিরতির সময় কোনো দলের মাঠ ত্যাগ করা উচিত নয়।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

(১) খেলা আরম্ভের আগে [illegible] অবশ্যই জেনে নেবেন প্রতি দলে কতজন করে খেলোয়াড় রয়েছেন।

(২) খেলা চলার সময় যদি [illegible] প্রয়োজনে কোনো খেলোয়াড় মাঠের বাইরে যান বা বাইরে থেকে কোনো বল, প্রয়োজন হলে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে [illegible] বেরিয়ে [illegible] উচিত নয়।

(৩) প্রতিযোগিতার নিয়ম [illegible] হবে। যেখানে অতিরিক্ত সময়েও খেলার মীমাংসা না হলে আবার খেলা আরম্ভ করে গোল হবার সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ করে দেবার বিধান আছে সে বিধানও মানতে হবে।

(৪) যদিও আইনে উল্লেখ নেই তবু আম্পায়ারের উচিত খেলার সময় এবং অতিরিক্ত সময়ে কত মিনিট খেলা হবে সে কথা অধিনায়কদের জানিয়ে দেওয়া।

খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ

(১) খেলোয়াড়দের পোশাক সম্পর্কে যদিও আইনে উল্লেখ নেই তবু যাতে খেলার মর্যাদা ও মাধুর্য বজায় থাকে সেইমত পোশাক পরা উচিত এবং দুটি দলের মধ্যে পোশাকের রং-এরও পার্থক্য থাকা উচিত।

(২) চালু খেলার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে মাঠের যে অর্ধ দিয়ে প্রবেশ করবেন সেই অর্ধের আম্পায়ারের সম্মতি নিয়ে মাঠে নামবেন।

(ক্রমশ)

—মুকুল

ব্রাউন এণ্ড পলসন

ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে তৈরী

মিস গিরিজা পদ্মনাভন

উপকরণ:

এক টুকরো মাখন, ১০০ গ্রাম কাজুবাদাম (ভালভাবে কুচি করা), ১ প্যাকেট ব্রাউন এণ্ড পলসন ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার (ভ্যানিলা), ১/২ লিটার দুধ, ৮ বড় চামচ চিনি, ৩ বড় চামচ দ্রাক্ষা (বীজ বার করে কুচি করা), ৫৫ গ্রাম খেজুর (কুচি করা), ১ প্যাকেট ব্রাউন এণ্ড পলসন ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার (র‍্যাসপবেরি), ৩ বড় চামচ কিসমিস (পরিষ্কার), ১ কলা (খুব পাকা নয়), সস-এর জন্য ৬ বড় চামচ ছাপাছাপি চকোলেট অথবা কোকো পাউডার, ১/৪ লিটার জল, স্বাদমত চিনি।

১। পুডিং জমাবার পাত্রের গায়ে গলানো মাখন মাখান। নিচে অর্ধেক কাজুবাদাম ছড়িয়ে দিন। ২। অর্ধেক দুধ নিন। এর একটুতে ভ্যানিলা প্যাকেটের সবটুকু গুলে নিন। বাকি দুধটা গরম করুন, আঁচ থেকে সরিয়ে নিন ও এতে গুলে রাখা ভ্যানিলা ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিয়ে ভালভাবে নাড়ুন। আঁচে বসান, সমানে নাড়তে থাকুন। ৩। ৪ বড়চামচ চিনি, দ্রাক্ষা, ও খেজুর মেশান। সমানে নাড়তে থাকুন। গাঢ় হলে আঁচ থেকে সরিয়ে নিয়ে কাজুবাদামের ওপর ঢেলে দিন। জমে যেতে দিন। ৪। আলাদা করে রাখা দুধটা নিন। এর একটুতে র‍্যাসপবেরি প্যাকেটের সবটুকু গুলে নিন। বাকি দুধটা গরম করুন, আঁচ থেকে সরিয়ে নিন ও এতে গুলে রাখা র‍্যাসপবেরি ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিয়ে ভালভাবে নাড়ুন। আঁচে বসান, সমানে নাড়তে থাকুন। ৫। বাকি কাজুবাদাম, কিসমিস, ৪ বড় চামচ চিনি ও মাখনের টুকরো মেশান। যতক্ষণ না গাঢ় হচ্ছে, ততক্ষণ নাড়তে থাকুন, আঁচ থেকে সরিয়ে নিন। ৬। কলাটি চাকা চাকা করে কেটে ভ্যানিলা পুডিং-এর মাথায় পাশাপাশি সাজান। ৭। এর ওপর সমানভাবে র‍্যাসপবেরি পুডিংটি ঢালুন। জমে যেতে দিন। ৮। একভাবে সস বানান: কোকো ও জল মিশিয়ে অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন যাতে পুরোপুরি কোকো গলে যায়। মিষ্টি করুন। ৯। পুডিং বার করে নিন। চকোলেটের সস সবার ওপরে ঢালুন। ঠাণ্ডা করুন।

বিনামূল্যে! নতুন পাকপ্রণালীর বই নং ৩

কুপনটি এক কপি রন্ধন... বিনামূল্যে এক কপি পাকপ্রণালী পাঠাবেন—

ইংরাজি/ হিন্দী/ বাংলা/ তামিল/ তেলেগু/ মালয়ালম/ গুজরাটি/ মারাঠি/কন্নড়

নাম ....

ঠিকানা ....

....

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন: কনসিউমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, কর্ন প্রোডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীনিবাস হাউস, ওয়ার্ডবি রোড, বোম্বাই-১ বি, আর

DE-5

ব্রাউন এণ্ড পলসন ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে সহজেই নানারকমের পুডিং ও ডেসার্ট তৈরী করা যায়। শিশু ও বয়স্ক সকলের পক্ষেই উপকারী ও পুষ্টিকর। **ব্রাউন এণ্ড পলসন** সবচেয়ে সেরা ফ্লেভার্ড কর্নফ্লাওয়ার কেননা সেরা সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি যত্নে প্রস্তুত।

৫টি পছন্দমত চমৎকার স্বাদ

আপনার পরিবারের সবার মনের মত এ রকম আরো ভালো খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন।

কর্ন প্রোডাক্টস কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

শ্রীনিবাস হাউস, ওয়ার্ডবি রোড, বোম্বাই—১, বি, আর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নতুন লোকসভা—		... ৭৫৩
ব্যঙ্গচিত্র—		... ৭৫৪
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		... ৭৫৫
দৃশ্যপট—	শ্রীনবারুণ গুপ্ত	... ৭৫৬
বৈদেশিকী—	দেবরাজ	... ৭৫৮
পঞ্চতন্ত্র—	সৈয়দ মুজতবা আলী	... ৭৫৯
শাশ্বতকালীন (কবিতা)—	শ্রীবিনয় মজুমদার	... ৭৬১
এ আমার ভিখেরী হাত নয় (কবিতা)	—শ্রীস্বপন সেনগুপ্ত	... ৭৬১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তোমরা আমাকে (কবিতা)—শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য		৭৬১
বুকের মধ্যে সিংহাসন (কবিতা)—শ্রীদেবী রায়		৭৬১
কাঁটাতার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র		৭৬৩
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী		৭৭৩
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী		৭৭৭
রত্ন ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়		৭৮১
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর		৭৮৯
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী		৭৯৭
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত		৮০৫
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা—ফাদার দ্যতিয়েন		৮০৭
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব		৮১৩
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		৮১৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শিল্পপ্রাসঙ্গিক সমস্যা ও চারুকলা মেলা	—শ্রীরবীন মণ্ডল	... ৮১৯
জামুরিয়া আরবিয়া লিবিয়া	—শ্রীনিরঞ্জন চৌধুরী	... ৮২১
আলোচনা—		... ৮২৯
সাহিত্যসংবাদ	—সন্ধানী পাঠক	... ৮৩৭
পুস্তক পরিচয়—		... ৮৩৮
হকি খেলার আইনকানুন	—মুকুল	... ৮৩৯
খেলার মাঠে	—একলব্য	... ৮৪১
অরণ্যদেব—		... ৮৪৪
রঙ্গজগৎ—		... ৮৪৫
সাপ্তাহিক সংবাদ—		... ৮৫২

প্রচ্ছদ—শ্রীমতী শিপ্রা আদিত্য

দিনে দিনে সব পাখার চেহারাই
G.E.C. এভারেষ্টের মত হ'তে
চলেছে—কারণ জি. ই. সি.
এভারেষ্ট যে কেবল কাজের
বেলায় অতুলনীয় তা' নয়,
দেখতেও অপূর্ব।
স্নিগ্ধ আমেজ আর নিবিড়
নরম সুখ উপভোগ করার
জন্য চাই জি. ই. সি-র
এভারেষ্ট। আপনার ঘরে
আজই লাগান।
G.E.C.

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২১
শনিবার, ১৩ চৈত্র ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮০ ২৩-৮৩৫১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক ... ৩২·০০ টাকা
ষান্মাসিক ... ১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ... ৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্থানে
(রেজিস্ট্রি সমেত)

বার্ষিক সডাক ... ৩৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক ... ১৮·০০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ... ৯·০০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক ... ৫৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক ... ২৮·০০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ... ১৪·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ... ৪৫·০০ টাকা
ষান্মাসিক ... ২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ... ১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ... ৮৩·০০ টাকা
ষান্মাসিক ... ৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ... ২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 27 March, 1971

নতুন লোকসভা

নতুন লোকসভা গঠিত হয়েছে। এটি পঞ্চম। চতুর্থ লোকসভার সঙ্গে এর কিছু পার্থক্যও আছে, তবে সবচেয়ে বড় পার্থক্য—এই নতুন সভায় নব কংগ্রেসের পরম নিশ্চিন্ত অবস্থা; তার বিরোধী যারাই থাক, যতই থাক—সে বিরোধিতা একেবারেই নগণ্য। এমনই নগণ্য যে, সংসদীয় ভাষায় যাকে যথার্থ বিরোধী গোষ্ঠী বলে তেমন একটি গোষ্ঠীও নেই। এই নগণ্য বিরোধী-দল থাকার ফলে সুবিধে এই যে, সরকারকে পদে পদে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে নিজেকে অসহায় বোধ করতে হবে না, অন্য দলের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হবে না। নিজের ক্ষমতাতেই তাঁরা শাসন পরিচালনা করতে পারবেন, প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধনও।

এবারে লোকসভার সদস্য হিসেবে অনেককেই আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না। অনেকের মধ্যে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ ও নামকরা পার্লামেন্টারিয়ানও বেশ কয়েকজন আছেন। এঁদের যেমন আর আগামী পাঁচ বছর সংসদে দেখা যাবে না, সেই রকম বেশ কিছু নতুন মুখকে আমরা দেখতে পাব আগামী অধিবেশনগুলিতে, এবং আশা করব এঁদের মধ্যে কেউ কেউ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হয়ে দেখা দেবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও নতুন করে গড়া হয়ে গেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নতুন মন্ত্রিসভায় আপাতত যাঁদের নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুরোনো সহকর্মী অনেকে আছেন, অনেকে নেই। যাঁরা আছেন— তাঁদের মন্ত্রিসভার অভিজ্ঞতা বহুদিনের, এঁরা সকলেই প্রবীণ। আবার নতুন যাঁরা তাঁর মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছেন তাঁরা প্রশাসনিক কর্মে অপটু নয়। সে শিক্ষা তাঁদের অন্যত্র অর্জিত হয়েছে। আমরা আশা করব, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা ও সংসদীয় নিজ দলটিকে নিয়ে প্রশাসনকর্মে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেবেন। একথা ভুললে চলবে না, শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর দল যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের কাছে দিয়েছেন তা পালন করার ওপরই এদেশের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। যদি তা পালন করা যায় তবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শত্রুদের রটনা বন্ধ হবে, এদেশের গণতন্ত্র রক্ষা পাবে; নচেৎ আজ যারা নগণ্য বিরোধী হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা সবল হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রে নতুন মন্ত্রিসভা গড়া হয়ে গেলেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত কোনো মন্ত্রিসভা গঠন করা যায় নি। তবে এ-যাবৎ যেটুকু ছবি ফুটে উঠেছে তাতে মনে হয়, সি পি এম-বিরোধী একটি মন্ত্রিসভাই শেষ পর্যন্ত এখানে হতে পারে। সি পি এম পরিচালিত ছয় পার্টির পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি জানানো হলেও রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান সে দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। মন্ত্রিসভা গঠনের মতন সদস্য-সমর্থন তাঁরা দাখিল করলে শ্রীধাওয়ান অবশ্য ছয় পার্টির নেতা জ্যোতিবাবুকে সে সুযোগ দিতেন। ছয় পার্টি সে সুযোগ পায় নি। তার মানে এই নয় যে, এঁরা আশা ভরসা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। এখনও একটা চেষ্টা হচ্ছে। তবে মন্ত্রিসভা গড়ার চেষ্টায় সি পি এম-বিরোধীরা সম্ভবত আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদির চেষ্টায় পথ অনেকটা পরিষ্কার। সি পি আই শর্ত সাপেক্ষে নব কংগ্রেসকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে এপ্রিল মাসের গোড়ায় পশ্চিম বাংলায় আমরা একটি মন্ত্রিসভাকে দেখতে পাব।

নির্বাচনের পর কলকাতা এবং উপকণ্ঠে অশান্তি আবার বেড়ে উঠেছে। রোজই সাত আট জন করে খুন হচ্ছে। নতুন মন্ত্রিসভা যবেই গড়া হোক, এই অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা দমনে আর বিন্দুমাত্র অবহেলা করা যায় না। আমরা চাই, বাংলা দেশে যে অশান্তি স্থায়ী হয়ে উঠেছে তা সর্বাগ্রে দমন করার চেষ্টা করতে হবে। আগে মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসুক, তারপর অন্য কথা। যে দলই মন্ত্রিসভা গড়ে তুলুন তাঁর প্রথম কাজ হবে মানুষের মনে আবার নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনা, খুন জখম হত্যা বন্ধ করা, শান্তির ভাব সমাজে আবার প্রতিষ্ঠিত করা।

দৃষ্টিদান

পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে লাভবান সি পি এম এবং নব কংগ্রেস। তাঁরা দু দলই আপাতত তাঁদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। তাঁরা এখন দুদিকের দুই অবিসংবাদী নেতা।

মধ্যবর্তীরা শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত। তাঁদের ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে সি পি এম এবং নব কংগ্রেস দুদিক দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এখনও অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে বহু দল আছে। কিন্তু তাঁদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সেই অবস্থা আর নেই। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে অন্তত আগামী নির্বাচন পর্যন্ত মধ্যবর্তী দলগুলিকে সি পি এম

এবং নব কংগ্রেসের মধ্যে যে কোনও একটা পক্ষকে বেছে নিতেই হবে। এরপরও মধ্য-পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে আগামী নির্বাচনে যে তাঁরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন তা সবাই বুঝেছেন। এরা এও বুঝেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচন খুব দূরে নয় —হয়ত এক বছরের মধ্যেই।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর সরকার গঠনের যে রাজনীতিটা চলছে সেটাও আগামী নির্বাচনকে উপলক্ষ করেই। এটা সবাই বোঝেন, সি পি এমের নেতৃত্বে এখন যদি কোনও সরকার গঠিত হয় তাহলে সেই সরকারও এক বছরের মধ্যে আবার নির্বাচন করতে চাইবেন। আবার, নব কংগ্রেস যদি কোনও সরকার করেন বা তাঁদের সমর্থনপুষ্ট কোনও সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাঁরাও আগামী বছরই আবার নির্বাচন করাতে এগোবেন। সুতরাং এখন যদি পশ্চিমবঙ্গে কোনও সরকার গঠিত হয় তা হবে অন্তর্বর্তী সরকার—এক বছরের সরকার।

যিনিই সরকার গঠন করতে পারবেন তাঁরই সুবিধা। প্রথমত, তাঁরই আওতায় অর্থাৎ তাঁরই সরকারের সুপারভিশনে বা তদারকিতে আগামী নির্বাচনটা হবে। দ্বিতীয়ত, সরকার হাতে পেয়ে তিনি বা তাঁরা জনসাধারণকে কিছুটা কাজ দেখাবার সুযোগ পাবেন। শেষ পর্যন্ত কার্যকরী করতে পারুন আর না পারুন, চান আর না চান সরকার কতকগুলি জনহিতকর কাজ শুরু করে দিতে পারেন। আগামী নির্বাচনে জনসাধারণকে দেখাতে পারবেন, আমরা এত ভাল ভাল কাজ করতে চলেছি, আমরা আপনাদের এত মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করছি। তৃতীয়ত, সরকারী ক্ষমতা হাতে পেয়ে সরকারী দল বা গোষ্ঠী প্রধান প্রতি-পক্ষকে কিছুটা খর্ব করে দিতে পারবেন। সরকারী ক্ষমতা হাতে যিনিই পাবেন তিনিই প্রতিপক্ষের "বিষ দাঁত" সবার আগে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

এই জন্য প্রধান দু পক্ষই সরকার করতে চাইছেন। আগামী নির্বাচনে অন্তত প্রকা-ভাবে জয়ের জন্যই হাতে সরকার চাই।

যদি নিজেরা সরকার করতে না পারেন তাহলে দু পক্ষই এমন অবস্থা করতে চান যাতে অন্তত অন্য পক্ষ সরকার করতে না পারেন। প্রতিপক্ষের শাসনের চেয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন দুই প্রধান গোষ্ঠীর কাছেই সুবিধাজনক।

রাষ্ট্রপতির শাসনে আবার বেশী সুবিধা সি পি এমেরই। তাঁরা রাষ্ট্রপতির শাসনের কোনও ব্যর্থতার জন্য দায়ী হবেন না। আবার, রাষ্ট্রপতির শাসনের নীচের তলা, অর্থাৎ যাঁরা আসলে প্রশাসন চালান, বহুভাবে তাঁদের সাহায্য পাবেন। তাঁরা আগামী নির্বাচনে ভয়ে হোক, লোভে হোক সি পি এমকে বেশ কিছুটা খাতির করে চলতে বাধ্য হবেন। তাঁদের মনে এ ভয় বা আশা জাগা স্বাভাবিক যে, যে-দল ৮৬কে ১২৩ করেছে, সে দল ১২৩-কে ১৪১ করবেই। সেই ভয়ে বা আশায় তাঁরা সি পি এমকে খাতির করে চলবেনই।

অন্যদিকে, প্রত্যক্ষভাবে শাসন ক্ষমতা হাতে না পেয়েও নব কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য দায়ী হবেন। কারণ, রাষ্ট্রপতির শাসন মানে কেন্দ্রের শাসন। কেন্দ্রের শাসন মানে নব কংগ্রেসের শাসন। কিন্তু সেই রকম নব কংগ্রেসী শাসন যে শাসন এখানের নব কংগ্রেসীদের নির্দেশে চলবে না—যে শাসনের নীচের তলায় বিরাট অংশ এবং ওপরের তলারও একটা বিশেষ অংশ সি পি এমকে ভয় এবং ভক্তি করে চলবে, যে শাসনের প্রকাশ্যে তাঁরা মুণ্ডুপাত করতে পারবেন না—যেমন পারবেন এবং করবেন সি পি এম।

✻

ইতিমধ্যে সি পি এম এই নির্বাচনে কয়েকগুলি জিনিস প্রমাণ করে রেখেছেন।

প্রথমত, তাঁরা সকলের সামনে প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের দলই সবচেয়ে শক্তিশালী দল, তাঁরাই রাজ্যের প্রধান দল। তাঁরা প্রায় সব জেলাতেই কিছু না কিছু আসন পেয়েছেন, সব জেলাতেই তাঁরা প্রচণ্ড শক্তি সংগ্রহ করেছেন। যে সব আসনে তাঁরা হেরেছেন তারও অনেকগুলিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা বিস্তারিত অঞ্চলে গ্রামে ঢুকেছেন। তাঁরা গ্রামের সব গরীবের ভোট পেয়েছেন বলব না। তবে, এটা নিঃসন্দেহে বলব যে তাঁরাই এখন গ্রামের গরীব বলে পরিচিত মানুষদের সবচেয়ে শক্তিশালী দল। গ্রামের গরীব মানুষকে তাঁরা এটা বোঝাতে পেরেছেন যে সি পি এম তাঁদের হিতাকাঙ্খী, সি পি এমই তাঁদের দল। আমার মনে হয়, এটা গত তিন বছরের রাজনীতিতে সি পি এমের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

তৃতীয়ত, তাঁরা কংগ্রেস-বিরোধী মানুষদের অধিকাংশকেই বোঝাতে পেরেছেন যে তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গে আসল কংগ্রেস-বিরোধী দল—আর সবাই মেকি; তাঁরাই প্রধান কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি—কংগ্রেস-বিরোধী মাত্রেরই উচিত সি পি এমকে সমর্থন করা। তাঁরা এটা দেখাতে পেরেছেন যে সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি প্রভৃতি দলের দিকে কেনও কংগ্রেস-বিরোধীর যাওয়ার একমাত্র অর্থ পরোক্ষে কংগ্রেসকেই সাহায্য করা।

বাংলার রাজনীতিতে যতদিন সি পি এমের এই অবস্থা থাকবে ততদিন নিজেদের কংগ্রেস-বিরোধী অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সব দলকে সি পি এমের নেতৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। সি পি এমের এই পরিক্রমণে যদি কোনও দিন চিড় ধরে তাহলে আবার তাঁরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু আপাতত বামপন্থী থাকতে গেলে সি পি এমের অবিসংবাদি নেতৃত্ব তাঁদের মানতেই হবে। এবং তাঁরা তা করলে সি পি এমকে আগামী নির্বাচনে সার্বিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পৌঁছতেও সাহায্য করতে বাধ্য। সি পি এম এদের এখন সোৎসাহে সঙ্গে নেবেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সি পি এম আবার এদের খপ্পরে পড়তে রাজী হবেন। এমন অবস্থা সি পি এম আর কিছুতেই হতে দিতে চাইবেন না যেখানে আবার তাঁদের ওইসব ছোট বামপন্থী দলের মর্জির উপর নির্ভর করতে হতে পারে।

এইদিক দিয়ে এবারের নির্বাচন সি পি এমের বিরাট সুবিধা করে দিয়েছে এবং অন্যান্য বামপন্থী দলকে চরম শোচনীয় অবস্থায় ফেলেছে। আজ তাঁদের এগোলেও বিপদ, পিছুলেও বিপদ। কংগ্রেসের দিকে গেলে বামপন্থী 'চরিত্র' নষ্ট হয়; সি পি এমের দিকে গেলে তাঁদের হুকুম মেনে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে হয়—ক্রমে ক্রমে ওয়ারকারস পারটি হওয়ার জন্য এখনই মানসিকভাবে তৈরী হয়ে নিতে হয়।

✻

নব কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় সাফল্য যে তাঁরাই আজ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বলে পরিচিত হতে পেরেছেন। অন্তত নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদেরই কংগ্রেস বলে বেছে নিয়েছেন। আগামী নির্বাচন যদি এক বছরের মধ্যে হয় তাহলে সেই পুরনো কংগ্রেস-ভোটের সবটাই তাঁরা পাবেন। আগের বার তাঁরা ছিলেন ৪৩, এবার হয়েছেন ১০৫—আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি।

তবে, তাঁরা এখনও পুরনো কংগ্রেস-ভোটের সবটা পান নি। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে যখন দুই কংগ্রেস ছিল না কংগ্রেস শুধু শাসক ছিল, যখন কংগ্রেসের সমালোচনা সর্বত্র শোনা যেত, যখন পর পর দুটো যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকাল মৃত্যু ঘটেনি, যখন সি পি এমের বিরুদ্ধে এত দল একভাবে প্রচারে নামেন নি, যখন নকশাল গোষ্ঠী ছিল না, এবং যখন এবারের মতই বামপন্থীরা বিভক্ত ছিলেন তখনও কংগ্রেস ১২৭টি আসন পেয়েছিলেন। তাও সেই কংগ্রেস। এখনও কিন্তু নব কংগ্রেস নতুন ইমেজ নিয়ে, ইন্দিরা গান্ধীর হাওয়া নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারেন নি। কেন পারেন নি, সেটা নব কংগ্রেস নেতাদের ভেবে দেখা উচিত।

মোটা ভাবে নব কংগ্রেস গরীবের একচেটিয়া সমর্থন পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তা পান নি। পশ্চিমবঙ্গে গরীবের চেয়ে মধ্যবিত্ত তাঁদের বেশী সমর্থন করেছেন। শহরেও, গ্রামেও। গরীবের ভোট তাঁরা একেবারে পান নি, তা নয়। কিন্তু সি পি এমের তুলনায় অনেক কম পেয়েছেন। শিল্পাঞ্চলে এবং গ্রামে গরীবের ভোট পেয়েছেন বিশেষ করে সি পি এম। তাঁদের মধ্যে সি পি এম শক্ত ঘাঁটি গেড়েছেন। এই কাজ কেরলের সি পি এম পারেন নি; কিন্তু এই প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম সফল হয়েছেন। এই নির্বাচন তার প্রমাণ।

মধ্যবিত্তরা, এমন কি নিম্ন মধ্যবিত্তেরা অনেকেই এবার সি পি এমকে ছেড়েছেন। শহরেও, গ্রামেও। শহরে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত কংগ্রেসের দিকে অনেকেই ফিরে এসেছেন। সি পি এমের রাজনীতিতে তাঁরা অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। তাই, কলকাতায় সি পি এমের এত হার হয়েছে।

এই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত—গরীব মানুষ চট করে ভ্যাসিলেট করেন না, অর্থাৎ এদিকে ওদিকে যাতায়াত করেন না। আর মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্তও চিরকালই তাই করেন। তাঁরা চিরকালই দোদুল্যমান। সি পি এম তাই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের অনেককে হারিয়ে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত, গরীবদের, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরীবদের পেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী লাভবান। গত তিন বছরের রাজনীতিতে এইটাই সি পি এমের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য।

১৯।৩।৭১

নবারুণ গুপ্ত

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

দেবরাজ

তেরো বছর আগে ইউরোপের ছটা দেশ মিলে যে কমন মার্কেট অর্থাৎ জোটের বাজার তৈরি করেছিল, এখন তাতে ঢোকবার বিস্তর উমেদার। ব্রিটেন তো পা বাড়িয়েই আছে, দরজা খোলা পেলে এখুনি সে ঢুকে পড়বে এই তার ইচ্ছে। পারেনি তার সাধে ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গল বাধ সেধেছিলেন বলে। বিলেতের নতুন টোরি সরকারও বাজারে ঢোকবার জন্যে একরকম মরিয়া হয়েই আছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না ফ্রান্সের জন্যে। দ্য গল গেলে কী হয় পঁপিদু তো আছেন, সহজে ভেজবার পাত্র তিনিও নন। তাঁকে যতটা নরম বলে মনে হয়েছিল দেখা যাচ্ছে ততটা তিনি মোটেই নন। বিলেতের বেলা তিনি আদৌ নরম কি না সন্দেহ। চার বছর আগে ব্রিটেন কমন মার্কেটে ঢোকবার জন্যে যে দরখাস্ত করেছে তার নিষ্পত্তি আজও হয়নি, কবে যে হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। জোটের বাজারে ঢোকবার উমেদারিতে ব্রিটেন অবশ্য একা নয়। তার সঙ্গে আছে আয়ারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক আর নরওয়ে। সুইডেনও ও বাজারে ঢুকতে চায় তবে তার নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখে। ১৯৬৭ সনে চারটে দেশই তাদের দরখাস্ত পাঠিয়েছে কমন মার্কেটের সদর দপ্তরে।

সেই থেকেই তারা আশায় আশায় দিন গুণছে। কথাবার্তা, আসা যাওয়া, সবই চলছে, কিন্তু ফয়সালা আর হচ্ছে না। সব উমেদার দেশগুলোতেই এ নিয়ে অনেক কথা উঠছে। তাতে সেসব দেশে যারা কমন মার্কেটের বিরুদ্ধে তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কী ব্রিটেন কী আয়ারল্যাণ্ড, কী ডেনমার্ক কী নরওয়ে কোথাও দেশসুদ্ধ লোক সবাই যে আর কমন মার্কেটে ভিড়ে পড়ার পক্ষে নয়। যত দেরী হচ্ছে ততই বিরোধীরা জোর গলায় জোটের বাজারের নিন্দে করছে। কিন্তু এ নিয়ে যতটা ঘোঁট পাকিয়েছে নরওয়েতে এমন আর কোনও দেশে হয়নি। তর্কাতর্কিতে তার শেষ হয়নি—হয়েছে সরকার ভাঙাগড়ার খেলায়। যে নরওয়ের নাম কস্মিনকালে দেশে দেশে খবরের কাগজের পাতায় ওঠে না সে দেশেরই নাম পয়লা পাতায় ঠাঁই পেয়েছে কমন মার্কেটের দৌলতে। সে মার্কেটে ঢোকবার এক্তিয়ার নরওয়ের আজও নেই, তার দরখাস্ত খারিজও হয়ে যায়নি। তবুও ও বাজারে ঠাঁই করে নেওয়ার চেষ্টাকেই উপলক্ষ করে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে যার ধাক্কায় ভেঙে গেছে সেখানকার চার দলের মন্ত্রিসভা।

নরওয়েতে চালু আছে যাকে বলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাজা সে দেশে আছেন বটে কিন্তু বিলেতের মতো তিনি নৈবেদ্যের চূড়ো, শাসনযন্ত্রের শোভা। রাজত্ব তিনি করেন নামেই, রাজ্য চালান প্রধানমন্ত্রী আর চোদ্দজন মন্ত্রীকে নিয়ে গড়া মন্ত্রিসভা। শেষ নির্বাচন সেখানে হয়েছে ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে। কোনও দলই সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সেটা অবশ্য নরওয়েতে নতুন কিছু নয়। তেমনই হয়েছিল আগের বারের নির্বাচনে ১৯৬৫ সনে। সে নির্বাচনে তিরিশ বছর একটানা সরকার চালানোর পর হেরে যায় লেবার পার্টি অর্থাৎ শ্রমিক দল। অর্ধেকের বেশী আসন সংসদে তাদের ভাগ্যে শুধু নয় কারুর ভাগ্যেই জোটেনি। তাহলে কী হয়, চারটে দল জোট বেঁধে তৈরি করল কোয়ালিশন সরকার অর্থাৎ মিশ্র মন্ত্রিসভা। শ্রমিক দল তখন গিয়ে বসলো বিরোধীদের আসনে। লেবার হাতে পেয়েছিল ৬৮টা আসন, আর চার দলের জোট ৮০টা। তার মধ্যে কনজারভেটিভ অর্থাৎ রক্ষণশীলেরা পেয়েছিল ৩১, লিবারাল অর্থাৎ উদারনৈতিকেরা ১৮, সেন্টার অর্থাৎ মধ্যপন্থীরা ১৮ আর খ্রীস্টান পিপলস পার্টি ১৩। লেবার ছাড়া জোটের বাইরে ছিল সোশ্যালিস্টদের দুজন।

চার দলের জোটের নেতা হয়েছিলেন পের বোর্টেন। তিনি সেন্টার পার্টির প্রধান। দেশের প্রধানমন্ত্রীও হলেন তিনিই। ১৯৬৯-এর নির্বাচনে জোট হারাতে হারাতে বেঁচে গেল। তাদের মোট আসন কমে গিয়ে দাঁড়াল ৮০র জায়গায় ৭৬, ওদিকে শ্রমিকদের বেড়ে হল ৬৮র থেকে ৭৪। জোট আর শ্রমিকদের মধ্যে তফাৎ রইল দুটি ভোটের মাত্র, আগে ছিল ১২ ভোটের। জোট কিন্তু ভাঙলো না, অটুট রইলো। প্রধানমন্ত্রীর গদিতে ফের বসলেন পের বোর্টেন। নিয়ম মতো তাঁর সে গদিতে থাকার কথা ১৯৭৪ সন পর্যন্ত যখন আবার নির্বাচন হবে। তা কিন্তু হল না। নিজের দোষে সে গদি তিনি খুইয়েছেন ২ মার্চ। সে একেবারে শুকনো ডাঙায় আছাড় খাওয়া। চার দলের জোট ভেঙে পড়েনি। সংসদে তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়নি, জোট থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেউ শ্রমিক দলে ভেড়েনি, তবুও এমনই তাঁর বরাতের ফের যে তাঁকেও যেতে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চার দলের জোটকেও। নরওয়েতে তখ্তে ফিরে এসেছে আবার শ্রমিক দল। প্রধানমন্ত্রী এখন ট্রিগভি ব্রাটেলি। ১৭ মার্চ তাঁর ১৪ জন মন্ত্রীর নাম তিনি ঘোষণা করেছেন।

কী করেছিলেন পের বোর্টেন যে বিপক্ষের হাতে রাজ্যপাট সঁপে দিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হল? সে এক মজাদার কাহিনী। জোটের বাজারে যেসব দেশ যোগ দিতে চায় তারা সবাই আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্যে একটা করে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে কমন মার্কেটের সদর দপ্তরে ব্রাসেলসে। দরকার হলে মন্ত্রীটন্ত্রীরা বাজারের সভায় যান দিন কয়েকের জন্য, কিন্তু মূল কথাবার্তা চালান ওই প্রতিনিধি দলের লোকেরা। যেমন যেমন ঘটে তেমন তেমন রিপোর্ট তাঁরা পেশ করেন নিজের নিজের সরকারের কাছে। তাতে অনেক কিছুই থাকে যা গোপনীয়—সাধারণ লোকের যা জানবার কথা নয়। এমনই একটা গোপন রিপোর্ট অসলোর একটা খবরের কাগজে ফাঁস হয়ে গেছে সম্প্রতি। গোপন খবর ছাপতে পারা খবরের কাগজের অবশ্য কৃতিত্ব। কিন্তু তাই বলে তো আর কিছু জানা যায় না, সেটা তো একটা চুরি। কী করে সে খবরটা বের করা হয়েছিল নরওয়ের কাগজে, চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল কোথা থেকে কে লোক ফাঁস করেছে। কিন্তু দেখা গেল কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়েছে সাপ।

খবরটা ফাঁস করার দায়িত্ব আর কারো নয়—স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর। বোর্টেনই গোপন রিপোর্টটা আড়ালে দেখিয়েছিলেন কমন মার্কেটের ঘোর বিরোধী এক নেতাকে। তার বক্তব্যের সারটুকু তিনিই পৌঁছে দিয়ে থাকবেন খবরের কাগজের অফিসে। তিনি অবশ্য দোষ স্বীকার করেননি। কিন্তু কাজটা যে তাঁরই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পের বোর্টেনও সেটা অস্বীকার করেননি, শেষে চাপে পড়ে কবুল করেছেন গুপ্ত সরকারী দলিল তিনি অন্য লোককে দেখিয়েছেন। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল, তাঁর আর মুখ দেখাবার জো রইল না। তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হল। গোড়ায় চেষ্টা হয়েছিল চার দলের জোটের রাজত্ব কায়েম রাখা। তার চেষ্টা হয়েছিল বোন্ডেভিককে নতুন সরকার গড়বার। কিন্তু দেখা গেল সেটা সম্ভব নয়—তাঁকে সমর্থন করতে জোটের চার দলের সব সদস্য রাজী নন। নরওয়েতে মাঝপথে আইনসভা ভেঙে দেওয়ার নিয়ম নেই। কাজেই দায়িত্ব অর্শেছে বিরোধী শ্রমিক দলের ওপর। নতুন সরকার কিন্তু সংখ্যালঘু সরকার। তবুও নতুন প্রধানমন্ত্রী ব্রাটেলির কোনও অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। দরকার হলে দেশকে তিনি জোটের বাজারেও ভেড়াতে পারবেন। তাই তিনি চানও।

তাঁর বীণা শনেতে পান না। তখন তিনি আরম্ভ করলেন ঐ-সব কানের চোঙা ব্যবহার করতে। পাঠক, দেখতে পাবে, তাঁর বধিরতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন যেমন বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোঙার সাইজও বাড়তে লাগলো। তাতে করে তাঁর কোনো লাভ হয়েছিল কি না বলা কঠিন। তবে এটা জানি, তার কিছুকাল পরে, যখন তাঁর সঙ্গীতপ্রেমী কোনো সহচর বলতেন, "বাঃ! কী মধুর সুরেলা বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে রাখাল ছেলেটি", আর তিনি কিছুই শুনতে পেতেন না তখন বেটোফেন বলতেন, তিনি তৎমুহূর্তেই আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর বিশ্বাস থাকতো যে সঙ্গীতে এখনো তাঁর বহু কিছু দেবার আছে। আমাদের শ্রীরাধা যেরকম উদ্ধবকে বলেছিলেন, "যদি না আমার 'বিশ্বাস' থাকতো, প্রভু একদিন আমার কাছে ফিরে আসবেন, তাহলে বহু পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যেতো।" এবং
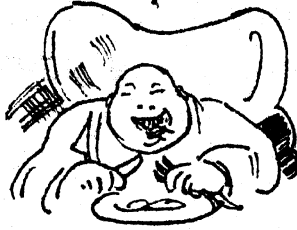
জর্মন, আহারান্তে একজন এক মন

সকলেই জানেন, বধির কালা হয়ে যাওয়ার পরও বেটোফেন মনে মনে সঙ্গীতের রূপটি ধারণা করে বহুবিধ স্বর্গীয় রচনা করে গেছেন। যেগুলো তিনি স্বকর্ণে শুনে যেতে পাননি। আমি যেন কোথায় পড়েছি, তিনি সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে করুণ আবেদন জানাচ্ছেন, প্রভু যেন তাঁকে একবারের মত তাঁর শ্রুতিশক্তি ফিরিয়ে দেন যাতে করে তিনি মাত্র একবারের তরে আপন সৃষ্ট সংগীত শুনে যেতে পান। তারপর তিনি সর্বান্তঃকরণে পরলোকে যেতে প্রস্তুত।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ডীটরিষ শুধলো, "মামা, কথা কইছ না যে!"

বললুম, "আমি ভাবছিলুম বেটোফেনের কানের চোঙাগুলোর কথা। ওগুলো সত্যি কি তার কোনো কাজে লেগেছিল?"

ডীটরিষ বললে, "বলা শক্ত। কোনো কোনো আধাকালা একখানা কাগজের টুকরো দু' পাটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কাগজের বেশীর ভাগটা মুখের বাইরে রাখে। ভাবে, ধ্বনিতরঙ্গ ঐ কাগজকে ভাইব্রেট করে দাঁত হয়ে মগজে পৌঁছোয়, কিংবা কান হয়ে। কেউ বা সামনের দু পাটির চারটে দাঁত দিয়ে লম্বা একটা পেনসিল কামড়ে ধরে থাকে। কি ফল হয় না হয় কে বলবে?...আচ্ছা, মামু, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কী রকম অদ্ভুত, প্রিমিটিভ মিনি সাইজের যন্ত্র দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র সঙ্গীত রচনা করেছিলেন? আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগে।"

আমি বললুম, "কেন বৎস, ঐ যে তোমার ছোট পিসি, যার সঙ্গে আমার চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব, লীজেল—দেখেছো, ঝড়তি-পড়তি কয়েক টুকরো লেটিসের পাতা, আড়াই ফোঁটা নেবুর রস আর তিন ফোঁটা তেল দিয়ে কিরকম সরেস স্যালাড তৈরী করতে পারে? মুখে দিলে যেন মাখম!!...আর তোর আমার মত আনাড়ীকে যাবতীয় মশলাসহ একটা মোলায়েম মুর্গী দিলেও আমরা যা রাঁধবো সেটা তুইও খেতে পারবিনি, আমিও না। পিসি লীজেল কি করবে, জানিনে। অথচ জানিস, ঐ অভুক্ত মুর্গীটি তাঁকে তখন দিয়ে দে। তিনি সেটাকে ছোট ছোট টুকরো করে যাকে ফরাসীরা বলে রাগু ফ্রাঁ, বা ফ্রিকাস্ অর্থাৎ লম্বা লম্বা ফালি-ফালি করে কেটে, মুর্গীটিতে আমরা যে-সব বদ-রান্নার ব্যামো চাপিয়েছিলুম সেগুলো রাইনের ওপারে পাঠিয়ে এ্যামন একটি রান্না করে দেবেন যে, প্যারিসের শ্যাফতক্ আমরি আমরি বলতে বলতে তারিয়ে তারিয়ে খাবে।...প্রকৃত গুণীজন যা-কিছুর মাধ্যমে যা-কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। আমাদের দেশে এরকম বাদ্যযন্ত্র আছে। "একতারা" তার নাম। তাতে একটি মাত্র তার। তার দুদিকে দুটি ফ্লেকিসিবল বাঁশের কৌশল আছে। সে দুটোতে কখনো জোর কখনো হাল্কা চাপ দিয়ে, আর মাঝখানের তারটাকে প্লাক করে নাকি বিয়াল্লিশ না বাহান্নোটা নোট বের করা যায়। তবেই দ্যাখ্। বেটোফেনের মত ক'টা লোক পৃথিবীতে আসে—আমাদের দেশেও গণ্ডায় গণ্ডায় তানসেন জন্মায় না। যদিও আমাদের দেশ তোদের দেশের চেয়ে বিস্তর বিরাটতর, এবং সেখানে কলাচর্চা আরম্ভ হয়েছিল অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে। এবং আমাদের কলা জগতে আমরা এখন সাহারাতে। এবং—"

ডীটরিষ বললে, "তুমি আমাদের পার্লামেণ্ট হাউসটা দেখবে না। রাইনের পারে। আমি একটু ঘোরপথে যাচ্ছি। সোজা পথে গেলে দু'পাঁচ মিনিট আগে বাড়ি পৌঁছতুম।"

"সাধু ডীটরিষ, তোর পিসি নিশ্চয়ই বিস্তর কেক, পেসট্রি আমাদের জন্য বানিয়ে বসে আছে—"

ডীটরিষের বউ বললে, "মামা, শুধু কেক পেসট্রি বললেন! ওদিকে পিসি কি কি বানিয়ে বসে আছেন, জানেন? কোনিগস বের্গের ক্লপসে (কোনিগসবের্গ শহরের একরকম কোফ্তা), ফ্রাঙ্কফুর্টের সসিজ, হানোফারের ষাঁড়ের ন্যাজের সুরুয়া—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে তো জানি। কিন্তু লীজেল পিসি আমার জন্য কি কাঙারু ন্যাজের সুরুয়া তৈরি করেছে?"

দুজনাই তাজ্জব। আমি বললুম, "ষাঁড়ের ন্যাজের ভিতরে থাকে চর্বি এবং মাংস। তার একটা বিশেষ স্বাদ থাকে। কিন্তু ষাঁড়ের ন্যাজ আর কতটুকু লম্বা? তার চেয়ে কাঙারুর ন্যাজ ঢের ঢের বেশী। ওটা যদি পাঁচজনকে খাওয়ানো যায় তবে বিস্তর কড়ি সাশ্রয় হয়।"

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামলো।

"এটা কি রে? মনে হয়, গোটা আষ্টেক বিরাট বিস্কুটের টিন একটার উপর আরেকটা চাপিয়ে দিয়েছে।" বললাম আমি।

ডীটরিষ বললে, "এটাই আমাদের পার্লামেণ্ট।"

শাশ্বতকালীন

বিনয় মজুমদার

ঝরালি ঝিকির নাম লিখি আজ ফাল্গুনের মসৃণ বাতাসে।
ওইখানে লিচুগাছে অগণিত মুকুল ধরেছে।
তিনটি মৌমাছি ওড়ে আরো যে সকল কীট পতঙ্গ রয়েছে
ওসব মুকুল ঘিরে তাদের গোত্র বা পরিচয়
জানা নেই ওরা ওড়ে ঈষৎ গুঞ্জন করে করে।
ওদের ডানার ছন্দে কেবলি পরাগ ঝরে যায়।
তা সত্ত্বেও এসকল আলুনী আলুনী লাগে, হায়।
ঝরণ ঝিকির ঘাম মুখের লবণ এই উদ্যানে ঝরেনি।

সকল বিচ্ছেদ পরে সকল সাধনা শিল্প যাজনার পরে
একবার পৃথিবীর দিকে চোখ ফেরাবার রীতি।
প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত ব্যাপার ঘটনাবলী কী করে ভ্রমায়
মিশে আছে তাই দেখা, পৃথিবীর ঢেউগুলি স্বয়ং পৃথিবী।
এই ভালো আমাদের যে-কোনো প্রকার ভালো লাগা
কর্ম করণেরা ভরে আছে অপরের মুখাপেক্ষিতায়।

এ আমার ভিখেরী হাত নয়

স্বপন সেনগুপ্ত

এ আমার ভিখেরি হাত নয় যা দেবে করুণায়
তাই হাত পেতে নেব,
পোষা বেড়ালছানার মতো ছুঁয়ে আদর করতেই
ঘর্ঘর শব্দ হবে   কিংবা
উৎসবের আলো দ্যাখলেই বাঁশী কিনতে যাব।

চোখের নীচে এখন সমুদ্র ওতরোল
বয়েসে বয়েসে বুঝি মানুষ বদলায়:
খোলস খোলার আগেই সমস্ত শরীর গলে.
ফোঁটা ফোঁটা রক্তে আবার ভেসে ওঠে মুখ:
পুরানো কবিতার খাতা সব ছিঁড়ে ফিঁড়ে যায়
দু' পকেট খালি কোরে বাড়ি ফিরে আসি।

যারা দাঁড়াতে শেখে হাত রেখে ঠুনকো জঠরে
হাতের মুঠো থেকে চলমান সমুদ্র হারায়,
লুম্বিনি পার্ক থেকে ফিরে আসে অসুস্থ আকাশ।

তোমরা আমাকে .....

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

তোমরা আমাকে অতিরিক্ত আলোর দিক-দর্শন বুঝিয়ে
শুধু অন্ধকারেই রেখেছ।
আমি স্পষ্টই বলেছি,
আমাকে শুধু হাত ধরে নিয়ে যাবে? দ্যাখো,
আমার হাতের তালুতে অসংখ্য রেখা—এর প্রত্যেকটি
সংগ্রাম, বিপ্লব, স্মৃতি, ইতিহাস, বিস্তৃতসময়, ভালোবাসা-

তোমরা আমাকে যেসব শব্দ শেখাচ্ছ অবিকল
নিজের বিপক্ষে বলছি আমি
কিন্তু আসলে কোনো শব্দ আমাকে পৌঁছে দিতে পারেনি
—যেখানে ক্ষত আছে।

তোমরা আমাকে অতিরিক্ত আলোর দিক দর্শন বুঝিয়ে
শুধু অন্ধকারেই রেখেছ।
কিন্তু এখন,
আমি ভালোবাসার কোনো ভৌগোলিক সীমানা মানি না
আমি নিহত হবার আগে,
শেষ দৃশ্যে, শুধু শব্দহীন স্মৃতি জড়াবো
—সেই নারী, নদী, আর বন্ধুরা
কে কে জানি.....

বুকের মধ্যে সিংহাসন

দেবী রায়

এখনো যে ভালোবাসা পায়নি
এবং
যে ভালোবাসা হাতের মুঠোয় পেয়েও হারিয়েছে
এই দুজনের মধ্যে কে বেশী দুঃখী—
দুঃখের ভার, বেশী কার?
প্রায় সব ফুল-ই, আমি ভালোবাসি
ফুলের ভিড়ে, রজনীগন্ধা সবচেয়ে প্রিয় আমার!
তা বলে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাকে
মালাকার হতে বলো না!
অল্পবিস্তর সব রমণী-ই আমার ভালোবাসার পাত্রী
তবে বুকের মধ্যে সিংহাসন পেতেছি, শুধু একজনার!
ক্ষণিক দুর্বলতার মোহে আমাকে ভ্রষ্টাচারের দিকে—
ঠেলে দিয়ো না।

ভালোবাসা, পত্রবহুল বৃক্ষের মতন!
বৃক্ষের কাছে হেঁটে গিয়ে স্পষ্ট গলায় বলি:
'মানুষের হাতে-গড়া পৃথিবীতে, যে কটা দিন বেঁচেবর্তে
আছি, শুধু ভালোবাসা দিয়ে
ভরিয়ে তোলো এ জীবন
ভালোবাসার অভাব যেন কোনোদিন—
গ্রাস না, করে আমায়।'

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে দীপা পার্কের দিকে তাকিয়ে ছিল। এ পাড়ায় আসা অবধি সে এই পার্কটিকে নানা সময়ে নানাভাবে দেখে আসছে। পার্কের ভিতর দিয়ে তার স্কুলে যাতায়াতের পথ। সে যখন পাড়ার অন্য মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে স্কুলে যায় কয়েকজন বুড়ো ভদ্রলোককে পার্কের চারদিকে রাউন্ড দিতে দেখে। আবার স্কুল ছুটির পর বেলা সাড়ে দশটায় কি এগারোটায় যখন বাড়ি ফেরে একদল ছেলেকে দেখে গাছতলায় বসে আড্ডা দিচ্ছে আর সিগারেট খাচ্ছে। ওদের মধ্যে বয়স্ক ছেলেও আছে। কিন্তু কেউ ওদের কাছে আসতে সাহস পায় না। দূর থেকেই এটা ওটা মন্তব্য করে। কিন্তু দীপা নীলা আর কমলাদের কেউই ওসব গ্রাহ্য করে না।

পার্কের মধ্যে যে বড় একটি পুকুর আছে তাতে কেউ কেউ নাইতে নামে।

কেউ বা সাঁতার কাটে কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। পার্কের ভিড়টা সব চেয়ে বেশি হয় বিকালে আর সন্ধ্যা বেলায়। তখন পাড়ার সমস্ত লোক যেন পার্কে এসে জড় হয়। কেউ কেউ ঘুরে বেড়ায় কেউ কেউ বেঞ্চে বসে গল্প করে। যাদের নতুন বিয়ে হয়েছে তারা আসে। বিয়ে যাদের হয়নি তারাও ঘাসের পর পা ছড়িয়ে বসে গল্প করে। দীপার মনে হয় ওরা নিশ্চয়ই এ পাড়ার নয়। অন্য পাড়ার ছেলে মেয়ে বলেই এমন অসংকোচে আসতে পারে এমন কাছাকাছি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে পারে। চেনা মুখ দেখলেই লজ্জা। অচেনা মানুষ আর গাছপালা সমান।

আগে আগে নীলা মলা কমলার সঙ্গে বিকাল বেলায় দীপাও এই পার্কে বেড়াতে আসত। সবাই মিলে চাঁদা তুলে ফুচকা খেত আলুকাবলি খেত। কোন দিন বা চীনাবাদাম কি চানাচুরেই খুশি থাকত।

কিন্তু বছর দুই ধরে মা আর দীপাকে সন্ধ্যাবেলায় পার্কে যেতে দেন না। বলেন, 'না বাপু, এখন বড় হয়ে গেছ এখন আর হুট হুট করে যেখানে সেখানে যাওয়া ভালো দেখায় না।'

বড় হওয়ায় সুখও যত আছে অসুবিধা অশান্তিও প্রায় ততটাই। নীলা আর মলার মা জেঠীমারাও ওদের ওই রকম শাসনে রাখেন।

দীপা বড় হয়েছে বইকি। দু বছর ধরে স্কুলে শাড়ি পরে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম পায়ে জড়িয়ে যেত, অস্বস্তি লাগত এখন আর তেমন লাগে না। যদিও শাড়ি যে সব সময় পরে থাকে দীপা তা নয়, স্কুল থেকে বাড়িতে এসেই শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরে। মা-ই বলেন ফ্রক পরতে। শাড়ি পরতে দেখলে বাবা খুশি হন বেশি। হেসে বলেন, 'দীপু একেবারে লক্ষ্মী ঠাকরুণটি হয়েছিস যে।'

মা বলেন, 'লক্ষ্মী না ছাই কিছু। মেয়ে তো নয় যেন একখানি ফোঁস মনসা। যেমন রাগ তেমনি জেদ। ঠিক একেবারে তোমার স্বভাব পেয়েছে।'

বাবা বলেন, 'স্বভাব আমার পায় পাক। কিন্তু আকার খানি যে তোমার পেয়েছে তাতেই আমি খুশি।'

মা বাবাকে ধমক দেন 'বয়স বাড়ছে আর আক্কেল বুদ্ধি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে তাই না?'

দীপার সামনে বাবা যে ঠাট্টা তামাশা করেন বা মা তা পছন্দ করেন না। কারণ দীপা বড় হয়ে উঠছে। মা দেখতে সুন্দরী। পাতলা ছিপছিপে চেহারা গায়ের রং ফর্সা। সবাই বলে দীপা নাকি মায়ের মতই হয়েছে। একতলার মাসীমা বলেন, 'তুই তোর মার চেয়েও সুন্দরী হবি।'

মাসীমার বাবা মেয়ে জামাইর কাছে থাকেন। তাঁকে দাদু বলে ডাকে দীপা। দাদু বলেন, 'এই তো সেদিনও ঘাঘরা পরে ঘুরে বেড়াতিস এরই মধ্যে ষোড়শী ভুবনেশ্বরী হয়ে উঠলি কবে?'

দীপা বলে, 'তাতে আপনার কি দাদু।

এই দাদুই সেদিন মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে এসে খবর দিলেন 'দীপা তোদের পার্কের ভিতর দিয়ে স্কুলে যাওয়া বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেল।'

দীপা বলল, 'কেন দাদু?'

'দেখিসনি পার্কের পশ্চিম দিকে মিলিটারির তাঁবু বসেছে? দক্ষিণের মাঠ জুড়েও অনেকগুলি তাঁবু। যেন যুদ্ধ শিবির।'

দীপা বলল, 'আপনি আজ গিয়েছিলেন দাদু?'

দাদু ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে বললেন,

[illegible] মিলিটারি ট্রাক। বন্দুকধারী সৈনারা কেউ উঠছে কেউ নামছে। তাঁবুর ভিতরে কেউ ঢুকছে কেউ ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। কেউ লম্বা কেউ বেঁটে। কারো মুখে দাড়ি গোঁফের লেশ নেই কারো মুখে কালো চাপ দাড়ি।

নীলা বলল, 'এই দীপা, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।'

নীলা বলল, 'তোর যে চরণ আর সরছে না রে। তোর আঁচল সেই কাঁটা তারের বেড়ায় আটকে গিয়ে ছিল না রে দীপা?'

'যাঃ ফাজিল কোথাকার।'

নীলা বলল, 'বড় দিদিমনির পারমিশন নিয়ে তুই কাল থেকে আবার ফ্রক পরে [illegible] দীপা। শাড়ির ঝামেলা অনেক। পায়ে পায়ে পা জড়িয়ে যায়, কাঁটা তারে আঁচল আটকে যায়। কবে যে তুই মুখ থুবড়ে [illegible] তারের ওপর পড়ে যাবি তার ঠিক নেই।'

দীপা নীলাকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুই [illegible]।'

[illegible] চণ্ডীতলার গলি। [illegible] আর [illegible] কিন্তু তার একটি গন্ধও আছে [illegible] বাড়িটার [illegible] শহর যেন আরো বড় [illegible] নতুন করে [illegible]।

[illegible] এই বছরই [illegible] সুন্দর [illegible] অনেকদিন ধরেই [illegible]। কিন্তু ওঁকে আগে এত [illegible] না। কথাবার্তায় এত [illegible] ছিল না যেন। তিনি বললেন, '[illegible] সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে আনবে।'

নীলা বলল, '[illegible] পার্কের মাঠে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে দেখেছেন? তাঁদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেবেন না?'

নীলা দীপার দিকে আড়চোখে তাকাল। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল নীলা। ভারি ফাজিল মেয়ে। ওর জারিজুরি যখন দীপা ভেঙে দেবে তখন বুঝবে মজা।

[illegible] ক্লাস তেমন ভালো লাগে না দীপার আজ কিন্তু বেশ লাগল। ইতিহাসের ক্লাসে মন উধাও হয়ে গেল পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার উপাখ্যানে। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর রণক্ষেত্রে দীপাও ঘুরে বেড়াতে লাগল। পৃথ্বীরাজের মুখখানা যেন চেনা চেনা। সদ্য দেখা জনৈক সৈনিকের মুখের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

ফেরার পথে সেই কাঁটাতারের বেড়ার সামনে দিয়ে আর গেল না দীপা। নীলা আর ঠাট্টা করবে।

সন্ধ্যার পর একতলায় দাদু ওপরে উঠে এলেন বাবার সঙ্গে গল্প করতে আর চা খেতে। পাড়া সম্পর্কে পাতানো দাদু। কিন্তু আপনজনের মতই ভালোবাসেন।

দাদু বললেন, 'নাঃ পার্কের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে। বেড়িয়ে আর সুখ নেই।'

বাবা বললেন, 'কেন মেসোমশাই।'

দাদু বললেন, 'আর বল কেন। আগে অবাধে চলাফেরা করতে পারতাম। সেই অভ্যাসে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারের বেড়ার ওপর গিয়ে পড়েছিলাম রাইফেলধারী পাহারাদার কটমট করে তাকাল। গুলি করে দিলেই হল।'

দীপার বাবা বললেন, "সত্যি এই মিলিটারি দিয়ে যে কী হবে আমি তো ভেবে পাইনে। এ কি সত্যসত্যি যুদ্ধ?"

দাদু বললেন, 'তা হলে তো অনেক ভালো ছিল। কে জানে আমরা হয়তো সেই যুদ্ধের দিকেই এগোচ্ছি।'

তারপর কলকাতার এখনকার অবস্থা নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে তুমুল তর্ক বিতর্ক। দুজনের মধ্যে কখনো মতের মিল হয় কখনো বা হয় না।

দীপার মা বলল, 'আর পারিনে মেসোমশাই। এবার আপনারা অন্য কথা বলুন। দু বেলা এই খুন জখমের আলোচনা আর বোমার আওয়াজ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। দীপা তুই এখানে বসে কী করছিস। যা, পড়তে যা। পড়াশোনা তো গোল্লায় গেছে—'

দীপা উঠে পাশের ঘরে চলে এল। পড়ার টেবিলে এসে বসল। কিন্তু মন যেন পড়ায় বসতে চায় না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন রূপকথার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়।

জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারে পার্কটিকে দেখা যাচ্ছে। ঝাউপাতার আড়ালে টিউবে নিওন লাইট জ্বলছে। ফাঁকে ফাঁকে তাঁবুগুলির অস্পষ্ট আভাস। আচ্ছা সেই সৈনিকটি কি এখনো সেখানে তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর পা ব্যথা হয় না? ঝিঁঝি ধরে যায় না? দিনভর অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে। দাদু বলছিলেন সৈন্যটি নাকি কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। দীপার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না। দাদু বানিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসেন। বাড়াবাড়ি করেন। দীপা যে চোখ দেখেছে সে তো কটমট করে তাকাবার চোখ নয়। দাদু নিশ্চয়ই অন্য

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ায় খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক সবরকমের খুসকি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান জোরালো ভাবে কাজ করে।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

ক্লিনিক শ্যাম্পু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস।
কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

HDL 21X

কাউকে দেখেছেন।

খেয়ে দেয়ে শোবার পরেও পার্ক আর পার্কের ওই তাঁবুগুলি দীপার মন জুড়ে রইল। সেবার ওই পার্কের মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়েছিল। এমন ছোট ছোট তাঁবু নয়, মস্ত জোড়া বিরাট এক তাঁবু। বাবা-মার সঙ্গে সেই সার্কাসে বাঘসিংহের খেলা দেখতে গিয়েছিল দীপা। কিন্তু এবারকার এই তাঁবু যেন আরো রহস্যময় আরো রোমাঞ্চকর। ভাবাই যায় না তাদের বাড়ির এত কাছে যুদ্ধশিবির বসেছে। যে কোন সময় অসংখ্য গুলির শব্দ শোনা যাবে। গুলি গুলি রাস্তা পেরিয়ে ছুটে ছুটে এদিকে চলে আসবে। আচ্ছা কত সৈন্য আছে ওদের। এক হাজার দেড় হাজার দু' হাজার? দীপা ঠিক জানে না। নাকি এক অক্ষৌহিনী? অক্ষৌহিনী কথাটি শুনতে বেশ ভালো। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা ভাবতে বেশ ভালো লাগে। কি ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু আমল, মোগল আমল এমন কি ইংরেজ আমলের যুদ্ধের কাহিনী পড়তেও ভালো লাগে। সেই সব যুদ্ধে কত লোক মারা গিয়েছিল, কত ক্ষয় আর ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু দীপার যেন তাতে কিছু এসে যায় না। সব যেন রূপকথার আর মহাভারতের গল্পের মত। কিন্তু চোখের সামনে যেন ওই যুদ্ধবিগ্রহ না দেখতে হয় বাবা। রক্ত দেখতে দীপার বড় ভয় করে। অথচ কত রক্তারক্তি কাণ্ডই না হচ্ছে। নিজের চোখের ওই ধরনের কিছু না দেখার এখনো কিছু দীপা দেখেনি তাই রক্ষা। দেখলে কী যে হত তা ভাবা যায় না। সেবার মেডিকাল কলেজের সার্জিকাল ওয়ার্ডে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল জ্যাঠামশাইকে দেখতে। তাঁর অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন হয়েছিল। হাত-পা বাঁধা সব রোগী। কেউ কাতরাচ্ছে, কেউ কোঁকাচ্ছে। ফিরে এসে সে কি গা বমি বমি দীপার। দু'দিনের মধ্যে ভালো করে খেতে পারেনি, ঘুমুতে পারেনি। সৈনিক তুমি বন্দুক হাতে করে দাঁড়িয়েই থেকো। বন্দুক ছুঁড়ে আর তোমার দরকার নেই। কারো গায়ে লাগলে সে বড় ব্যথা পাবে। মরে যেতেও পারে।

রাত্রে দীপা স্বপ্ন দেখল সে যেন এক সাদা-ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছে। তরোয়াল হাতে আর একজন অশ্বারোহী তার সামনে। সেই রাজপুত্রের রূপের তুলনা হয় না। ঘোড়াটা ছুটছে তো ছুটছেই। তার আর থামবার নাম নেই।

সুখের স্বপ্ন দেখতে দেখতে দীপার ঘুম ভাঙল। জেগে উঠেও কি কম সুখ? স্কুলে যাতায়াতের পথে দূর থেকে একটি মুখ সে এক পলকের জন্য দেখে যায়। যে চোখের দিকে সে তাকায় অনায়াসে সেই চোখ দুটিরও দৃষ্টিশক্তি আছে। কী সুন্দর সেই শান্ত। শুধু দেখবার শক্তি, দেখবার ভঙ্গি। কী মধুর এই দেখার বদলে দেখা। এই পার্কের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে গাছপালা, ফুল, ফল, বাতাসে পুকুরের ছোট ছোট ঢেউ কত সুন্দর সুন্দর বস্তুই না দীপা দেখে। কিন্তু সবই একদিকের দেখা। সেও দেখছে ওরাও দেখছে তাতো আর হয় না। কোন চক্ষুষ্মানকে দেখার মত আনন্দ যেন আর নেই। সব চোখ অবশ্য দেখার মত নয়। কোন কোন বুড়োর লুব্ধ দৃষ্টি দু'একটি বকাটে অশালীন ছেলের তাকাবার ভঙ্গিতে দীপা ভ্রূ কুঁচকে শাসন করে। কিন্তু এমন একজোড়া চোখ যে পৃথিবীতে আছে তা কে জানত যাকে আর শাসন করা যায় না, শাসন করতে ইচ্ছাও হয় না?

স্কুল থেকে ফিরে এসে দীপা মাঝে মাঝে দেখতে পায় মা তখনো রান্না করছেন। একটা না একটা তরকারি মায়ের কড়াতে থাকবেই।

বইখাতা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দীপা মায়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়. 'অত কি রাঁধছ মা? কত রাঁধছ?'

মা বললেন, 'স্কুলের কাপড়েই চলে এলি? যা শাড়ি বদলে আয়।'

দীপা হেসে বলল, 'কেবল ধমক আর ধমক। তুমি কি ধমক ছাড়া কিছু জান না মা? কী হয়েছে বলত?'

মা বললেন, 'মনমেজাজ ভালো না বাপু। বলাই দত্ত লেন থেকে ছোড়দার ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে। এখনো ছাড়েনি। তোর মত নেচে নেচে যদি বেড়াতে পারতাম তাহলে আর কথা ছিল কি। চারদিকে খুনোখুনি কান্ড লেগেই আছে। ভালো লাগে না আর।'

মায়ের আপন ভাই নয় পিসতুতো ভাই। তাঁর ছেলে নির্মলদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। বোমা ছোঁড়াছুড়ির মধ্যে নাকি ছিল। শুনে কিছুক্ষণের জন্যে মন খারাপ হয়েছিল দীপার। কিন্তু বেশিক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকতে পারেনি। তাদের বাড়িতে নির্মলদার তো বেশি আসা যাওয়া ছিল না। কতটুকুই বা নির্মলদার সঙ্গে তার আলাপ। কিন্তু তবু তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, বেদম মার দিয়েছে বলে দুঃখ পাওয়া উচিত। দমদমে দুই দলের মধ্যে প্রায়ই খুনোখুনি হচ্ছে। আরো কত জায়গায় অল্প বয়সী সব ছেলেরা ছুরি খেয়ে মরছে গুলি খেয়ে মরছে। মারছে আর মারছে। দমদম তো বেশি দূর নয়। সেখানকার বোমার শব্দ শেষ রাত্রে দীপাদের বাড়ি থেকে রাত্রে শোনা যায়। দীপার দুঃখ পাওয়া উচিত, পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া উচিত।

তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে কাজল পরতে পরতে ঠোঁটে আলতো করে লিপস্টিকের ছোঁয়া লাগাতে লাগাতে দীপা নিজেকে শাসন করে, 'তোমার এত সুখী হওয়া উচিত নয়, এত সুখী হওয়া নিষ্ঠুরতা। স্কুলের দিদিমনিরাও তো সেই কথা বলেন। দেশের যা দিনকাল তাতে কারোরই বেশি আমোদপ্রমোদ করা উচিত নয়।'

দীপা ভাবে, 'সত্যি এত দুঃখকষ্টের মধ্যে আমার দুঃখিত না হওয়া অন্যায়। বাংলার দিদিমণি বলেন, সমবেদনা সহানুভূতি মানবীয় ধর্ম। ভগবান আমাকে সহানুভূতিশীলা কর। আমাকে দুঃখিত হতে দাও। বাবার বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা কত চিন্তা করেন। আমাকেও তেমনি চিন্তা করতে দাও। উদ্বিগ্ন হতে দাও। আমাকে বেশি সুখী কোরো না। এত সুখ নিয়ে আমি কী করব। এত সুখ কি মানুষের সহ্য হয়?'

বিকালে ছড়ি হাতে বেরোবার আগে দাদু একবার করে খোঁজ নিয়ে যান দীপার 'কী গো দীপালীরানী আজ যে একেবারে লাল টুকটুকে ফ্রক পরেছ।'

দাদুর মুখের দাড়ি গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথায় একরাশ পাকা চুল। রুপোর টোপরের মত দেখতে। শুধু চুলেই বুড়ো। চাল চলনে অত বুড়ো মনে হয় না।

দীপা হেসে বলে, 'আপনার ভালো লাগছে দাদু?'

দাদু বলেন, 'তো আমার বলতে [illegible] এখন তো সব লাল রঙেরই বাহার। শহরের রাস্তা ঘাট লালে লাল। রণজিৎ সিংহের মত ছেলের বলছে সব লাল তো জামা। শুধু রক্তকরবী, তোর ঘাঘরার রঙের মানে আলাদা।

দীপা রাগ করে, 'আপনি ঘাঘরা বলেন কেন দাদু, ফ্রক বলতে পারেন না?'

দাদু হেসে বলেন, 'ওই হল। ইংরেজী শব্দ মনে থাকে না। চারদিকে শুধু তরঙ্গিনী ধারা। জীবনরঞ্জিনী শুধু তুই।'

দীপা বলে, 'দাদু, আমাকে যুদ্ধের বই এনে দেবেন বলেছিলেন। কই দিলে না তো?'

দাদু বলেন, 'ভুল গিয়েছি। দেব এনে।'

'হ্যাঁ, অবিশ্যি এনে দেবেন। আপনাকে আমি চা করে দেব, কফি করে খাওয়াব। আমি মার চেয়ে ভালো কফি করতে পারি। না দাদু?'

দাদু বলেন, 'ভুলে গিয়েছি। দেব এনে।' সন্দেহ কি।'

আর কিছুই না। রোজ [illegible] পরে একবার করে একজনের মুখের দিকে

নীলা আড়চোখে তাকে দেখিয়ে দিল। তারপর হেসে বলল, 'ওর আবার সেপাই ছাড়া আর কাউকে পছন্দ নয়। সেদিন আমাকে বলছিল বিয়ে যদি করি একজন সোলজারকে করব। সোলজারকে তো বাংলায় সেপাই বলে না দিদিমণি? নাকি আজকাল হয়েছে জওয়ান?'

ক্লাস সুদ্ধ মেয়েরা হেসে উঠল। কাজলদিও হাসলেন। হেসে বললেন, 'আমার মেয়ে ঝিলঝিলেরও এই অবস্থা। চার বছর মাত্র বয়স। কিন্তু দারুণ পাকা। কি মাসে একবার করে বর বদলায়। গয়লা, কয়লাওয়ালাকে ডিভোর্স করে এখন সে ডাকপিওনের গলায় বরমালা পরিয়েছে। দীপা তোমার অ্যাম্বিশন আরো কিছু উঁচু হবে আশা করেছিলাম।'

সারা ক্লাস আর একবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

দীপা রাগে দুঃখে স্তব্ধ হয়ে রইল। তার এতদিনের বন্ধু নীলা যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে দীপা কি ভাবতে পেরেছিল? বয়সে তার চেয়ে দু বছরের বড় নীলা। দীপা তাকে দিদির মত দেখে। তার এই কাজ? সে এমন করে তাকে ক্লাসের

মধ্যে উপহাসের পাত্রী করে তুলল?

ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে নীলা অবশ্য তারপর ফের দীপার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। বার বার করে ক্ষমা চাইল। কিন্তু দীপা আর ওকে আমল দিল না। ওর সঙ্গে কথাও বলল না। স্কুলে যাতায়াতের সময়ও সে ওদের এড়িয়ে চলতে লাগল। এক সঙ্গে এলেও সে হয় অনেক এগিয়ে যায়, না হয় পিছিয়ে থেকে। কিছুতেই আগের মত পাশাপাশি গল্প করতে করতে হাঁটে না।

কাঁটা তারের বেড়ার ওপাশে বন্দুক নিয়ে যে সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে। সৈন্যদলে সে যে কোন পদের অধিকারী তা কি আর দীপা জানে? নাকি জানবার কোন দরকার বোধ করেছে? সে যে রূপকথার রাজপুত্র। তার জন্য আছে রাজাধিরাজের স্বর্ণ সিংহাসন। কিন্তু আজ দীপার মনে হল সে হয়তো [illegible] সেপাই শান্ত্রীর চেয়ে বড় কিছু নয়। রাগ হল দীপার নিজের ওপর, রাগ হল [illegible] সেপাইয়ের ওপর বিশ্ব সংসার [illegible] ক্রোধে দগ্ধ হতে লাগল।

[illegible] কী হল তোর? এতদিন তো [illegible] বেড়াচ্ছিলি। হঠাৎ তোর [illegible] গেল কেন? এত ভাবছিস [illegible]। [illegible] কেন এমন, [illegible] অনেকবার মা মণি মা মণি বলে ডাকলেন। কিন্তু দীপা সাড়া দিল না।

[illegible] বললেন, 'মা ডাকে যখন সাড়া দিচ্ছে না তখন থেকে কিন্তু [illegible] ডাকতে [illegible] করব।'

[illegible] দীপাকে টলাতে [illegible] না।

[illegible] দিদি, তোর কী হল [illegible] মনে হচ্ছে তুই যেন এক [illegible] ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিস? [illegible] সব বন্ধ।'

[illegible] ঠাট্টাকে ধরলেন দাদু।

কিন্তু দীপা পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলল, '[illegible] সব ইয়ার্কি ভাল্লো লাগে না।'

[illegible] হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

[illegible] চারদিনের মধ্যে দীপা আর সেই কাঁটা তারের বেড়ার কাছাকাছি গেল না। [illegible] পথে স্কুলে যেতে লাগল। ফিরতেও [illegible] সেই পথে।

কিন্তু পঞ্চম দিনে আর পারল না। খুব ভোরে সেদিন স্কুলে বেরোল। আজ আর কেউ তার সঙ্গে নেই। যারা মর্নিং ওয়াক করেন তাঁদের সংখ্যা কমে গেছে। দু একজন যাঁরা বেড়াচ্ছেন তাঁরা অনেক দূরে। কাঁটা তারের কাছে কেউ আসছেন না।

দীপা ভাবল, আজ সে সাহস করে কথা বলবে। জিজ্ঞাসা করবে, 'আপনি এখানে কী চাকরি করেন? আপনি এখানে কোন পোস্টে আছেন?'

[illegible] বিশ্বাস এই চারু দর্শন সৈনিকটি বাঙালী। তিনি তার সব কথা বুঝবেন। সব কথার জবাবও দেবেন। বেশি বলতে হবে না। তাঁর একটি দুটি কথাতেই দীপা সব বুঝতে পারবে।

দীপা কাঁটা তারের বেড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কি কোথায় সেই স্মিত-মুখ প্রসন্ন পরিচিত দৃষ্টি? সেই চেনা সেনানীর বদলে কালো কুচকুচে চাপ দাড়িওয়ালা মোটা সোটা এক শিখ জওয়ান বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দীপাকে দেখে সে কটমট করে তাকাল। তারপর হাতের ইশারায় দূরে সরে যেতে বলল।

দীপা দ্রুত [illegible] সেখান থেকে সরে এল। তার মনে হল শুধু নীলা নয় আজ সমস্ত পৃথিবী দীপার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে।

একটি প্রতিভা বহুদিন ধরে প্রদীপ্ত হচ্ছেন—তিনকাল ধরে আলো দিচ্ছেন অন্তত। এখন ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন প্রদীপ জ্বলছে,—নিভেও যাচ্ছে তেমনি—এবং আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দেশ। ভালোই তো বলতে গেলে।'

'তা বটে। তাহলেও মরবার পরে অমর হতে না পারলেও আপনি অন্তত ধারাবাহিক হতে পারবেন।'

'পারতাম, কিন্তু আর বোধ হয় সে আশা করা যায় না। আমার কী মনে হয় জানেন? উক্ত ভদ্রলোক বোধ হয় আর বেঁচে নেই।'

'কেন এমন আশংকা আপনার?'

'আমি যদি তাঁকে মেরে ফেলে থাকি?...'

'অ্যাঁ? তাই নাকি? খুন করেছেন তাঁকে?' তিনি শিহরিত হন : 'আপনি বার বার পিলে চমকে দিচ্ছেন আমার। ঈর্ষাবশতই মেরেছেন বোধ হয়? কী করে মারলেন?'

'ট্রেন দিয়ে।'

'ট্রেন দিয়ে? চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন নীচেয়? অ্যাঁ?'

'না, তা নয় ঠিক।'

'তবে কী? ট্রেন দিয়ে কি কাউকে মারা যায় নাকি?' তিনি একটু সন্দিগ্ধই : 'তবে হ্যাঁ, ট্রেন উড়িয়ে দিয়ে অনেককে ঘায়েল করা যেতে পারে বটে।'
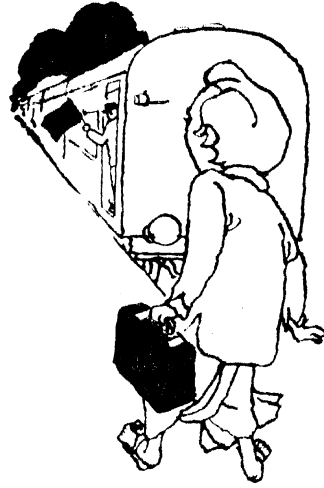
সে ট্রেনটা নির্ঘাত ফেল হয়ে যায়

'মারা যায় না ট্রেন দিয়ে? কী যে বলেন। পাকিস্তান যদি লরী দিয়ে সাতজন বিদেশী ডিপ্লোমাটকে কাত করতে পারে তাহলে কি আমি ট্রেন দিয়ে একজনের মোলাকাত করতে পারব না—যদিও আমি তাদের মতন তেমনটা লড়িয়ে নই।'

'খুলে বলুন ত, শুনি আপনার কাণ্ডটা। কী করে খতম্ করলেন তাঁকে?'

'ক' বছর আগেকার কথা। সেবার মহাষ্টমীতে বাড়ি থেকে বেরিয়েই দুর্ঘটনা ঘটল। মহাষ্টমীতে যাত্রা নাস্তি বলে থাকে পাঁজিতে জানেন ত? আজকাল আমরা তা মানিনে, নিজের সুবিধে দেখি। মহাষ্টমীতে পুজোর ভীড়টা কমে যায় বেশ—ট্রেন যাত্রা ঢের সহজ। তাই ওই দিনই আমি আমার মুল্লুকে যাই। সেবার হাওড়া স্টেশন থেকেই দুর্ঘটনার শুরু—প্ল্যাটফর্মে পৌঁছেই ট্রেনটা পেয়ে গেলাম। ধরতে পারলাম, চড়তে পারলাম কামরায়। আশ্চর্য ব্যাপার।'

'আশ্চর্য কিসের! দুর্ঘটনাই বা কোথায়?'

'বরাবর আমায় পরের ট্রেনে যেতে হয়—সিটি বুকিং-এ আগের থেকে টিকিট কেনা থাকলেও। যে ট্রেনের জন্যে মনে করে বেরুই, যে কারণেই হোক, সে ট্রেনটা নির্ঘাত ফেল করে বসি, তাকে আর ধরতেই পারিনে। সেই কারণেই পরের গাড়িতে যেতে হয় আমায়... তবে সবই তো পরের ট্রেন। সেদিক দিয়ে ধরলে, কোন ট্রেনটাই বা আমার নিজের বলতে পারি বলুন?'

'তা বটে!' তিনি ঘাড় নাড়েন : 'ট্রেন আর কবে কার। তারপর?'

'তারপর আর কি! সেই ট্রেনটায় না যাবার জন্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। ঘটল আমার সেই ট্রেনেই।'

'কোন ট্রেনে?'

'পরের ট্রেনে যেটাতে আমার যাবার কথা অথচ আমি যেতে পারিনি। আগের ট্রেনটা পেয়ে তাতেই চেপে চলে গেছি। যথাসময়ে ঘাটশিলায় পৌঁছে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছি, এমন সময়ে সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই বিদ্যুতের এক আওয়াজ এল—ঘাটশিলার অদূরে থেকেই। সোরগোল উঠল ঘাটশিলার কাছেই নাকি এক ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে—বে লাইন হয়ে উলটে গিয়েছে গাড়ি। পরের দিনের কাগজে বিস্তৃত খবর বেরুল—হতাহতের তালিকায় এক শিরস্ত্রাণের নাম।'

'অ্যাঁ? সে কী মশাই?'

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। না না, ঐ ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য নয়—আমি দায়ী মানে, আমার দোষেই ঐ ভদ্রলোক হতাহত হলেন কি না! আমি যদি পরের ট্রেনে আসতুম তো আমিই মারা যেতাম নির্ঘাৎ। এক বাড়িতে দুবার বজ্রাঘাত হয় না, এক লোককে দুবারে কামড়ায় না সাপে—

everest/1073e/AM ben
লক্ষ লক্ষ গৃহিণীরা
পোস্টম্যান খাঁটি তেলে
যাবতীয় মুখরোচক রান্নাবান্না
করছেন বাড়তি পুষ্টির জন্যে
৪০ বছর যাবৎ তাঁরা তাই করছেন—
কারণ পোস্টম্যান হচ্ছেঃ
● স্ফটিকের মত স্বচ্ছ গন্ধবিহীন, ১০০% পরিশুদ্ধ বাদাম তেল ● হাইড্রোজেন মিশিয়ে ঘন করা নয়
● ভিটামিন এ ও ডি যুক্ত ● সস্তা পড়ে—রান্নার পর তেল বেঁচে গেলে আবার ব্যবহার করা যায়।
উৎকর্ষের প্রতীকস্বরূপ পোস্টম্যান'এ থাকে সরকারী আগমার্ক ছাপ।
স্বাস্থ্য-স্বাদ-সাশ্রয়ের খাতিরে এটিকে আপনার রান্নার একমাত্র মাধ্যম ক'রে নিন।
POSTMAN
REFINED GROUNDNUT OIL
আহমেদ মিলস
বোম্বাই ৮

নায়ককে মহিলা বলে বিশেষ করে এদিকটা তাঁদের আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তো এখন বিশ্ব নেতাদের সেরা একজন। ব্রিটিশ খবরের কাগজ পরম প্রভাবশালী ফাইনান-সিয়াল টাইমস স্বীকৃতিতে বলেছেন, In seer size, unexpectedness and personal significance Mrs. Indira Gandhi's victory in Indian general election is one of the most remarkable in the history of free democracy—স্বাধীন গণতন্ত্রের ইতিহাসে শ্রীমতী গান্ধীর জয় এক অসাধারণ ঘটনা। দেশের আয়তন, সম্ভাবনার আশার সীমা ছাড়ানো ফল, ইন্দিরার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সব একত্র মিলেছে।

শ্রীমতী গান্ধীর জয়যাত্রা কবে থেকে শুরু হয়েছে বলা কঠিন। আজ তার প্রত্যক্ষ ফল আমাদের চোখের সামনে কিন্তু দলীয় রাজনীতিতে যখন তাঁর সম্বন্ধে কটু মন্তব্যে মানুষের মন বিষিয়ে দেবার প্রচন্ড প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে তারও আগে দরিদ্র, নিরন্ন ভারতবাসী তাদের আশা ভরসা দিয়ে তাঁর মূর্তি মনে এঁকেছে। একটি ঘটনা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মঙ্গলা আমাদের বাড়ি বাসন মাজতো, উনুন ধরাতো আর কাপড় কাচতো। তার বয়স ষাট-সত্তরের মত হবে। তিন কুলে কেউ নেই। দেশ মেদিনীপুরের কোন এক গাঁয়ে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে তোলা উনুনে আগুন দেবার ব্যবস্থা। দিন কতক বাদে দেখি রান্নাঘরের তাকের উপর যত্নে রাখা সেই পুরোনো কাগজের ক'খানা। জিজ্ঞাসা করলাম কাগজ জমিয়েছে কি কারণে। মঙ্গলা বলে, 'মাগো, ঐ কাগজে রয়েছে ইন্দিরার ছবি। তাতে আগুন? আমার যে মহাপাপ হবে।' মঙ্গলা ইন্দিরার কথা জানলো কি করে, এমন করে তাঁকে ভালবাসলো কি করে আজও জানতে পারি নি। তার মত সহস্র সহস্র মানুষ একইভাবে বিশ্বাস করে ইন্দিরা অসহায়ের সহায়। বৃদ্ধা মঙ্গলার মতই আবার যুব-সমাজও চায় পরিবর্তন। তারাও মনে করে ইন্দিরার হাতেই হবে তা। বেকার পাবে কর্মজীবন, হতাশ পাবে আশার ইশারা।

ভবিষ্যতের কাজও সহজ নয়। শ্রীমতী গান্ধীকে ভরসা করে তাঁর দায়িত্বভার হয়েছে দ্বিগুণ। অঙ্গীকার তাঁর অনেক। দারিদ্র্য দূর করতে হবে, মানুষে মানুষে অসমকক্ষতা কমাতে হবে, অন্যায় আচরণের শেষ করতে হবে। মূল্যমানের উর্দ্ধগমন রোধ করতে হবে। সেও শক্ত কথা। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গৃহস্থ সংসারের গৃহিণীর কাছে মূল্যবৃদ্ধি বিরাট সমস্যা। তারা সবার চেয়ে থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয়ের দাম নাগালের মধ্যে আনার জন্য। শিশু মঙ্গলের যে মস্ত পরিকল্পনা তার জন্য প্রস্তুতি চাই। ভোট দেওয়া বা ভোট পাওয়ার পরের পর্বই বড় কঠিন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ আমাদের নির্বাচনেই কিছু হয়েছে। জাতি-ধর্ম এবার ভোটবাজারে নিঃসন্দেহই অচল ছিল।

শ্রীমতী গান্ধী বার বার সেই সব দায়িত্বের কথা উল্লেখ করছেন। তবে দায়িত্বের ভার প্রত্যেক ভারতবাসীর। এক ইন্দিরা এতবড় উপমহাদেশের সকল দায়িত্ব বহন করবেন কি করে? ঠিক যেমন করে ভারতীয় নাগরিক তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করেছে ঠিক তেমনি করে তাঁর জয়যাত্রার পতাকা বহন প্রত্যেকে যদি করে তবে ভারতবর্ষের শুভদিন অদূরে। এমন এক মহীয়সী মহিলার অধিনায়কত্বের সুযোগ সামান্য নয়। ইন্দিরা মানেই আপনি আমি। ইন্দিরার সার্থকতার সঙ্গে সবার স্বার্থ সমান জড়িত।

আদমশুমার

১৯৭১ সাল সরকারী আদমশুমার বা জনগণনার শতবার্ষিকী। আদমশুমার বর্তমান জগতে জনগণনা মাত্র নয়। নানা তথ্য সংগ্রহ করা সেনসাস বা আদম-শুমারের বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এবারের তালিকায় বিবাহিত মহিলাদের জন্য বিশেষ একটি প্রশ্ন আছে। তালিকায় পঞ্চম প্রশ্ন হচ্ছে বিবাহিত, অবিবাহিত বিধবা ইত্যাদির খবর। পুরুষ এবং মেয়ে উভয়ের জন্যই প্রশ্নটি চারভাগে ভাগ করা। N M বা not married অর্থাৎ অবিবাহিত currently married বা বিবাহিত। W,
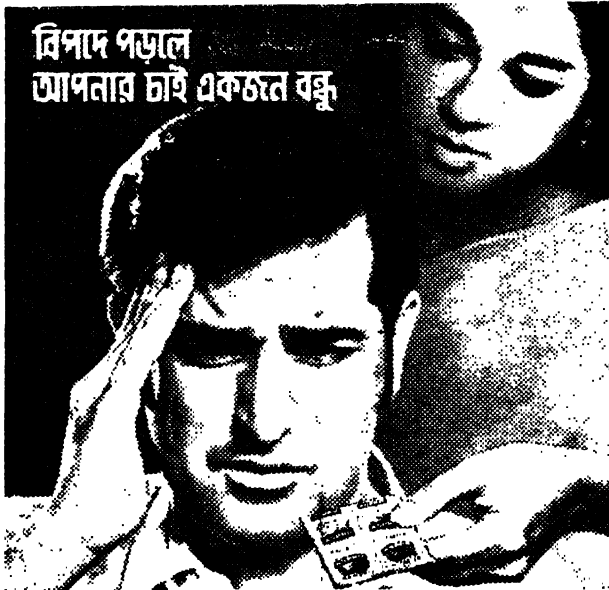
বা বিপত্নীক অথবা বিধবা। ও বা separated। এমনকি গণিকাদের বেলায়ও প্রশ্ন করে তাদের উত্তরহিসাবে তথ্য তালিকা পূরণ হবে।

currently married বা বিবাহিত মেয়েদের জন্য ষষ্ঠ প্রশ্নটি উর্বরতা বা fertility সম্বন্ধীয়। প্রজনন বা সন্তান প্রসব করার হার এখন উন্নতির পথযাত্রী দেশগুলির লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সাহায্য করবে বলে বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেন। প্রশ্নের প্রথম অংশ যা Enumerator বা গণনাকারী যা জিজ্ঞাসা করবেন তা হচ্ছে বিবাহের বয়স। মহিলার বিবাহের বয়স অবশ্য প্রথম বিবাহের হবে যদি তাঁর একাধিকবার বিবাহ হয়ে থাকে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হবে গত এক বছরে বিবাহিত মহিলা কোন সন্তান প্রসব করেছেন কিনা। অনেক সময় মহিলাদের বছর কবে থেকে গণনা হয়েছে এ নিয়ে খট্‌কা থাকতে পারে। কাজেই দোল বা ঐরকম কোন উৎসব ধরে প্রশ্ন করা হবে। একমাত্র জীবিত সন্তানের ক্ষেত্রেই উত্তর "yes" হবে। সন্তান জন্মের সময় পরেও যদি মৃত্যু হয় তাহলেও yes কিন্তু মৃত সন্তানের বেলায় yes নয়।

বহু ক্ষেত্রে সন্তান খবর সংগ্রহের সময় জীবিত থাকলে তার কথা উল্লেখ করা হয় না। গণনাকারী সাবধানে সে প্রশ্নের সঠিক সন্ধান করবেন আশা করা যায়।

দেশের উন্নতির জন্য জনসংখ্যার হিসাব ভারতবর্ষে নূতন নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জনগণনার উল্লেখ আছে। সে তো প্রায় ২,০০০ বছর আগের কথা। অবশ্য Census কথাটির জন্ম রোমে। Censor ছিল ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁরা জনসংখ্যার গণনা করতেন কর আদায়ের জন্য। Censor থেকে এসেছে Census. যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহের জন্যও এ তালিকা কাজে আসতো। ক্রমশ এ রকম হিসেব সাধারণের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আরম্ভ হয় জনগণনা। বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও নূতন দিক নূতনতর সম্ভাবনাময় উদ্দেশ্যে জনগণনা বহু মঙ্গল ও কল্যাণের পথে যাবে বলে আশা করা হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ তার সামান্য একটু দিক।

টুকিটাকি

অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত একটি ভাঁজ করা ছোট্ট পুস্তিকায় ভারতীয় গালিচার যত্ন সম্পর্কে নানা পরামর্শ পড়লাম। নির্দেশগুলি এই। যাঁদের কার্পেট বিছিয়ে দেবার সামর্থ্য আছে, তাঁদের হয়তো কাজে লাগবে।

কার্পেটের দাগ তোলায় কাপড়ের দাগ তোলার মতই ভিন্ন ভিন্ন ছোপ বা কলঙ্কের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জিনিস ব্যবহার হয়।

কালির দাগ কাঁচা ও সদ্য লাগা হলে প্রথম চোষ কাগজ দিয়ে যতটা সম্ভব কালি টেনে নেবেন। তারপর জলে যে কোন ভাল পরিষ্কারক দিয়ে স্পঞ্জ জাতীয় জিনিস দিয়ে ঘষে ঘষে তুলবেন।

বার্নিশ বা রং-এর দাগ হলে তার্পিন তেল লাগাবেন। ঐভাবে স্পঞ্জ দিয়ে বাইরের দিক থেকে দাগের দিকে এগিয়ে যাবেন। তারপর পেট্রোল বা অন্য ড্রাই ক্লিন করবার তরল পদার্থের সাহায্যে বাকিটুকু সাফ্ করবেন।

তৈলাক্ত কিছু পড়লেও পেট্রোল বা ড্রাইক্লিন করবার কোন তরল পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করা যায়।

দুধ, আইসক্রীম বা দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন গালিচায় দাগ সৃষ্টি করলে প্রথম গরম জল-এর সঙ্গে ডিটারজেন্ট গুলে প্রথম পরিষ্কার করুন। তা সত্ত্বেও দাগ না গেলে বড় চামচের এক চামচ ময়দা এক চায়ের চামচ পরিমাণ দুধে ফেলে লেই তৈরি করুন। ঘণ্টা দুই তিন রেখে, শুকিয়ে গেলে ভোঁতা ছুরি দিয়ে সাবধানে তুলে ফেলবেন ও স্পঞ্জ গরম জলে ঘষে দেবেন।

বাড়িতে বেড়াল কুকুর থাকলে তারা কার্পেটে গিয়ে ভিজিয়ে আসে কখনও কখনও। সাদা সির্কা বা ভিনিগার ১ চায়ের চামচ তিন চায়ের চামচ গরম জলে দেবেন। সেই লোশন বেশ করে দাগে লাগিয়ে শুকিয়ে নেবেন। তারপর ডিটারজেন্ট মিশ্রিত জল দেবেন। আবার ভিনিগার মেশানো জল দিয়ে, সব শেষে সাধারণ গরম জল দিয়ে স্পঞ্জ করে ফেলবেন।

ভোটরঙ্গের আদিকালে

ভোটের প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধ্যায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। মানিনী এক মহিলা নামলেন সমরে। সে যুগে সবই সস্তা ছিল। ভোট যাচঞার এজেন্টও অল্প পয়সায় মিলতো। অবিনাশকে মানিনী নিযুক্ত করলেন তিন মাসের অভিযানের অধিকর্তা হিসাবে। সংগঠিত ও ব্যাপক প্রচারকার্যে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে তার তুলনা ছিল না। অবিনাশের প্রচারের জোরেই হক অথবা মানিনীর বরাত গুণেই হক তিনি নির্বাচিত হলেন। তারপর নেতা হবার মহড়া। এখানে ওখানে আনাচে কানাচে লোক জমায়েৎ করে মানিনী ভাষণ দিতে আরম্ভ করলেন। এদিকে অবিনাশের সামান্য প্রাপ্য আর মিটিয়ে দেবার কথা মানিনীর মনেই নেই। অবিনাশও ছাড়বার পাত্র নয়। এক জমজমাট মিটিং-এ মানী মন খুলে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দূষিত কলুষিত সমাজের সংস্কারের জন্য তিনি গৃহের বন্ধনের বাইরে পা রেখেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। জনতার কাছে মহিলার মর্মস্পর্শী বাণী বেশ জমে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে অবিনাশের ভোট জাগানো গলা। আমার দুপয়সা যে মেরে দিয়েছে, তার বক্তৃতা দিতে বাধে না? মুগ্ধ জনতা মুখ ফিরিয়ে দেখলো মানুষটি অনর্গল মানিনীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাহিনী কইতে লেগেছে। সেই জুলিয়াস সিজারের যুগ থেকে নিয়ে জনতার মন একইভাবে বইছে। গুণগুণ গুঞ্জন ধ্বনিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানিনীর আপন মানুষ কেউ ঘট করে অবিনাশকে সরিয়ে নিয়ে গেল। তার প্রাপ্যের দশগুণ গচ্চা দিয়ে তবে রেহাই। অবিনাশ আজও ভোট যাচ্ঞার ঠিকাদার। তবে এখন পাওনা-গণ্ডা অগ্রিম নেয়।

সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনেরই আর

একটি গল্প। গল্প নয় সত্য। নিছক খাঁটি কথা। অবিভক্ত বাংলাদেশ। গ্রামের লোকে ভোটরঙ্গ ঠিক করায়ত্ত করতে পারেনি। লরি ভরে ভরে রাজনৈতিক দল তাদের কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পূর্ব বাংলার পল্লীর মানুষ সব, রাস্তায় পিপাসা পেলে পায় লেমনেড্ বরফ ইত্যাদি। ভারী আনন্দ একে মিঠা পানি। তার বোতল খুললে ফ'স করে যেন সাপের শোষাণি। সাপের হিস হিস এর মত গ্লাসের জল যেন ছোবল মারে মুখে মনে, কিন্তু গরল নয়, অমৃত। ভোট দিয়ে ফিরবার সময় যখন তাদের পিপাসা আকণ্ঠ, জল চাইলে মেলে সাদা পানি। বিস্বাদ! যারা তাদের ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে তাদের জিজ্ঞাসা করে। সেই জল কোথায়? মাতব্বররা উদাসভাবে বলে ভোট দেবার আগে জল ফ'স্ ফ'স্ করে কিন্তু পরে আর করে না।

পল্লীবাসীও আর আজ ছেঁদো কথায় ভোলে না। বাকচাতুরির যুগ গেছে। ভোটের পরের ফ'সটাই সাধারণ মানুষ আগে আন্দাজ করতে চায়।

শ্রীমতী

৭৮০

তাকেও আপনার করে নিতে হবে। নয়তো সামঞ্জস্য হবে না।”

“কার সঙ্গে সামঞ্জস্য?” সেবা জিজ্ঞাসা করে।

“ওর সঙ্গে সামঞ্জস্য। ওর সন্তানের সঙ্গে সামঞ্জস্য। প্রেমের চেয়ে সামঞ্জস্যের প্রশ্নই আজকাল আমাকে বেশী ভাবায়। সামঞ্জস্য না হলে প্রেম কি স্থিতি পাবে? তা ছাড়া আমারও তো সন্তান ক্ষুধা আছে।” বলতে বলতে রঞ্জু রক্তিম হয়।

সেবা তো শুনে থ! এই বয়সেই সন্তান ক্ষুধা!

“তা তুমি এক কাজ কর। সৃষ্টির কাজ। ওই দিয়ে তোমার সাবলিমেশন হবে। এক একখানি সৃষ্টিও তো এক একটি সন্তান।” সেবা পরামর্শ দেয়।

কথাটা রঞ্জুর মনে ধরে। এক একটি সৃষ্টিও তো এক একটি সন্তান। কিন্তু সেইসব শিশুর মা হবে কে? গৌরী। আবার কে!

গৌরীকে একথা লিখতে হবে। রঞ্জু মনে মনে সঞ্চয় করে রাখে এ চিন্তা। সেবাকে বলে, “তোমার পরামর্শ শুনব। তোমাকে

শুধু না বলে সচিব বলাই উচিত। তুমি কি আমার সচিব হবে?"
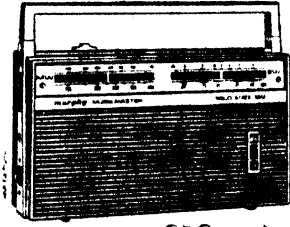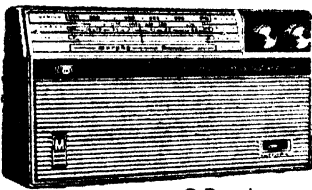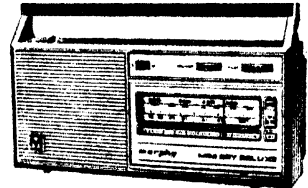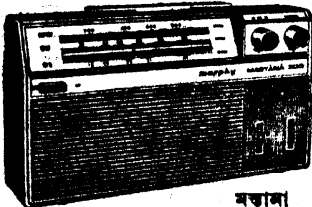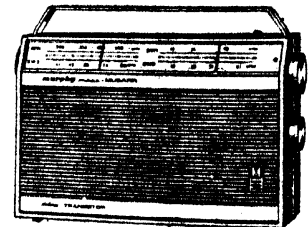
"এই প্রস্তাবটা," সেবা হেসে বলে, "আরো আগে করলেই পারতে। এখন আমি যে আরো একজনের সচিব হতে চললুম।"

এমনি করে সেবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু আড়াআড়ি নয়।

মেয়েতে ছেলেতে বন্ধুতার এইখানেই ইতি। নিভেজাল বন্ধুতা যদি চাও তো মেয়েদের সঙ্গে নয়। অন্তত প্রেমের সম্ভাবনা থাকতে নয়।

মলা আর সেবা দুজনের সঙ্গেই ছেদ পড়ে যাওয়ায় মেয়ে বন্ধু বলে আর কেউ রইল না ওর। দুঃখের বিষয় বই কি। কিন্তু দুঃখ করবার মতো অবকাশ ছিল না। পড়াশুনোর চাপে রঞ্জুর দৈনন্দিন জীবন ভরে গেছে। তারই ফাঁকে গৌরীকে চিঠি লিখতে হয়। গৌরীর চিঠি পড়তে হয়। ও মেয়েটি স্বল্পভাষিণী নয়। রাইটিং প্যাডে কুলোয় না বলে ফুলস্ক্যাপ কাগজ ভরে। কিংবা একসারসাইজ বুকের পাতা।

ওর স্বামীর কথা ও আর লেখে না। [illegible] না। লেখে শিশুর কথা। কিন্তু শিশুর নাম যে নেপো এটা উল্লেখ করে না। রঞ্জুর কাছে ওর নাম মানিক। [illegible] কাছে ওর নাম নেপোলিয়ন। গৌরীর নিজের কাছে ওর অষ্টোত্তর শত নাম। [illegible] একটি শ্রীকৃষ্ণ আর কী!

ও ছেলে বড়ো হলে ধনুর্ধর হবে এটা তো [illegible]। সেটা লোকে জানে না সেটা হচ্ছে ওর অসাধারণ কবিপ্রতিভা। ও নাকি এক বছর বয়সেই অবোধ্য ভাষায় কথা বলছে [illegible] করে। এ বিদ্যা ও পেলো কার কাছে? রঞ্জুর কাছে নয় তো?

কী জানি কী এক নিগূঢ় প্রণালীতে রঞ্জুর [illegible] পাচ্ছে ওর মানস পুত্রের [illegible]। দেখতে অবিকল ওর বাপের [illegible] হয়। স্বভাবটি তো ওর [illegible] মতো। সামঞ্জস্য আর কাকে বলে! এই তো কেমন সামঞ্জস্য! রঞ্জুর [illegible] আর আইডিয়াল দিয়েই ওর মনঃশরীর গড়ে উঠছে। ও রঞ্জুসংকাশ।

জ্যোতির কথা গৌরী আগেকার দিনে ঘন ঘন লিখত। বিয়ের পরের দিন থেকে কদাচ কখনো। জ্যোতি নাকি এক নম্বর স্ত্রৈণ। ওর বউ নাকি কামরূপের কন্যার মতো ওকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে।

"তোমাদের জ্যোতিবাবুর কাণ্ড শুনেছ? উনি সস্ত্রীক [illegible] বেড়াচ্ছেন। [illegible] উনিও একজন [illegible] চাষা আর ওঁর গিন্নীও একজন [illegible]। কিন্তু [illegible] ধরতে [illegible] চুটকি [illegible] বড়ো একটা দেখা যায় না। [illegible] খবর হলো ওরা [illegible] একটা কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। মহাত্মার আশীর্বাদ পেলেই ওটা শুরু হয়ে যাবে। চাষীদের কানে মন্ত্র দেওয়া হচ্ছে, আওয়াজ দিয়ো না, খাজনা বৃদ্ধি করলে খাজনা বন্ধ কোরো। কর্তার চেয়ে গিন্নী শুনেছি আর এক কাটি সরেস। বলেছেন, গাছ জমিদারের নয়, গাছ প্রজার। এর পরে একদিন বলবেন, জমি জমিদারের নয়, জমি প্রজার। কী ভয়ংকর কথা! ইংরেজরা বিদেশী লোক, ওদের বেলা যা নিয়ম, —জমিদাররা স্বদেশী লোক, তাদের বেলাও কি সেই নিয়ম? স্বদেশী বিদেশীর বাছবিচার নেই? জমিদার কি দেশের অর্থ বিদেশে চালান করে দিয়েছে? না প্রজার অর্থ প্রজার জন্যে অকাতরে ব্যয় করেছে? এই যে বারো মাসে তেরো পার্বণ, মেলা আর যাত্রা আর থিয়েটার, এসব কি শুধু জমিদার ঘরানাদের জন্যে? জমিদারের পুকুরে স্নান

করে, কাপড় কাচে কারা? জঙ্গলে কাঠ কুড়োয় কারা? রাস্তায় গোরুর গাড়ি হাঁকায় কারা? জ্যোতিবাবুদের ধারণা জমিদাররাও শোষকশ্রেণীর লোক। তা হলে আন্দোলনের জন্যে জমিদারদের কাছে চাঁদা চান কেন?"

এমনি অনেক কথা। জ্যোতির চেয়ে রেবার উপরেই আরো উষ্মা। চাষানীদেরও তলে তলে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। ওদের স্বামীদের যেন ওরা সাহস যোগায়। জমিদার বড়জোর জমি কেড়ে নেবে। জমিতে লাঙল দিতে তো পারবে না। তখন ডাক পড়বে চাষীকেই। চাষী যেন সাফ জবাব দেয় যে লাঙল যার জমি তার। কী ভয়ানক কথা!

জ্যোতি বা রেবার সঙ্গে দেখা হয় না। ওরা আসে না, বলে ওদের কাজ আছে। এরাই বা যায় কী করে! গেলে পুলি রিপোর্ট যাবে। গোরীর মনের ই জ্যোতিকে নিবৃত্ত করা। সিপাহী বিদ্রে এক জিনিস। কৃষক বিদ্রোহ আরে জ্যোতি যদি সিপাহী বিদ্রোহকে ঘটিয়ে তুল পারত তা হলে গোরীও ঝাঁপিয়ে পড় যাই মনে করে করুক ইংরেজ। কি কৃষক বিদ্রোহ কার কোন কাজে লাগবে

ওতে কি দেশ স্বাধীন হবে? কেবল হতভাগ্য জমিদার শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা! জমিদার উৎখাত হলে প্রজাও কি বাঁচবে? প্রজার উপর সরকারের অত্যাচার বেড়ে যাবে। জমিদার ভক্ষক নয়, রক্ষক। চাষীর মা বাপ। জমিদারই দেশের রাজা। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে রাজদ্রোহ।

চল্লিশ

জ্যোতিদা মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসে। রত্নর সঙ্গে দেখা হয়। গোরীর কথা ওঠে। গোরীর চিঠির কথা। কৃষক বিদ্রোহের প্রস্তাবনার কথা।

"ওঃ! লিখেছে নাকি গোরী ও কথা!" শুনে আমোদ পায় জ্যোতিদা।

"ও এখন রুশ দেশের জারিনা। ওর ছেলে একদিন রাজাপাট পেয়ে জার হবে। যেমন, জমিদারি পেয়ে জমিদার। কে ওকে বোঝাবে যে কেউ চিরন্তন নয়? না জার, না জমিদার। আমি শুধু চেষ্টা করছি যাতে ওদের মাথা কাটা না যায়, যাতে ওরা ভালোয় ভালোয় বিদায় হয়। বলতে গেলে আমিই তো ওদের সেভিয়ার।"

জ্যোতিদা আরো একটু খোলসা করে। "আমিও ওই শ্রেণীভুক্ত। স্বশ্রেণীর প্রতি আমার কি মায়ামমতা নেই? কিন্তু জমিদারকে ভালোবাসা এক জিনিস আর জমিদারিকে ভালো বলা আরেক জিনিস। জমির উপর কার অগ্রাধিকার? জমিদারের না চাষীর? এই প্রশ্নের উত্তর গোরী দিতে চায় একভাবে, আমি দিতে চাই আরেকভাবে। সংঘাত অপরিহার্য। জমিদাররা যদি চাষীদের অগ্রাধিকার আপসে মেনে নেয় তা হলে জমিদারও থাকে, চাষীও থাকে। বাঁচো আর বাঁচাও, এই নীতিই আমার নীতি। আমি তো সত্যি লেনিন নই যে বলব, জমিদাররা পা দিয়ে ভোট দিক।"

রত্ন তা শুনে অবাক হয়। লেনিনটা তো বড়ো সাংঘাতিক! একটুও দয়ামায়া নেই! মৌমাছিকে তাড়িয়ে দিয়ে মৌচাক দখল করা!

"ওল্ড অর্ডার টিকবে না, রতন। তার উপর পা রেখে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের পতন অনিবার্য। তা বলে তাদের আমি তাড়িয়ে দিতে চাইনে। তারা চাষীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গা গতর খাটিয়ে বাঁচুক। এমন কি ইংরেজদেরও আমরা বেরিয়ে যেতে বলছিনে। থাকুক না ওরা। শুধু আমাদের ইচ্ছায় চলুক।" জ্যোতিদা এমনভাবে বলে যেন ওর অথরিটি আছে।

"গোরী কিন্তু চায় ইংরেজদের তাড়াতে, জমিদারদের না তাড়াতে। একদলকে তাড়ালে পরে আরেক দলকেও তাড়াতে হবে, এর লজিক ও মানবে না। ওকে বোঝানো দায় শেষকালে আমার সঙ্গে না আড়ি হয়ে যায়।" রত্ন মুচকি হাসে।

"ওর সঙ্গে কিছুদিন থাকলে তুমি নিজেই টের পাবে যে ও যেমন নারীর জন্যে মুক্তি চায় তেমনি চাষীর জন্যে মুক্তি চায় না। চাষী যেমন গোরুর সঙ্গে গোরুর মতো খাটছে তেমনি জোয়াল কাঁধে চিরটাকাল খাটবে। কোথায় এর মধ্যে লজিক?" জ্যোতিদা দুঃখ করে।

"ওর সঙ্গে কিছুদিন থাকার সুযোগ পেলে তো?" রত্নও আক্ষেপ করে।

জ্যোতিদা বলে, "লিবারেশন জিনিসটা বিচ্ছিন্ন নয়, রতন। নারীর মুক্তি যেমন চাই তেমনি চাই চাষীর মুক্তি, চাষীর মুক্তি যেমন চাই তেমনি চাই মজুরের মুক্তি। এসব যদি না পাই তো দেশের মুক্তি আমার কাছে যথেষ্ট নয়। দেশ স্বাধীন হোক, এখানে গোরী আর আমি একমত ও এক পথের পথিক। নারীর মুক্তি হোক, এখানেও আমরা এক। কিন্তু এর পরে ও আর একটি পাও এগোতে চায় না। ও যে ফিউডাল যুগের লেডী।"

"তা বলে আমিও কি ফিউডাল যুগের নাইট?" রত্ন চমকে ওঠে।

"না, না, তুমি ফিউডাল যুগের কেউ নও।

তুমি এ যুগেরই ফেমিনিস্ট। আমিও তাই। সেই জন্যেই তো তোমার সঙ্গে এত বনে।" জ্যোতিদার কণ্ঠস্বরে স্নেহ।

"আমি তোমার উপরে গৌরীর ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত রয়েছি, রতন। তুমি যেমন একব্রত তুমিই পারবে। নারীর মুক্তির চেয়ে চাষীর মুক্তি আমার কাছে আরো জরুরী। শুনেছি গান্ধীজী নাকি বারডোলিতে সত্যাগ্রহ করবেন। এখন নয়, পরে এক সময়। বারডোলিতে সত্যাগ্রহ শুরু হলে সে আগুন কি সেইখানেই থামবে? কাপালিপাড়ায়ও লাগবে। লাগাবে কে? সে আমি। তখন যদি আমি তোমাদের সঙ্গে বম্বেতে বসে থাকি তো আমার জীবনের পরম লগ্ন এসে ফিরে যাবে। আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও, ভাই।"

"আমি মুক্ত করে দিলে কী হবে? গৌরী কি তোমাকে মুক্ত করে দেবে? আমি যতদূর জানি ও মন থেকে তোমাকে ছাড়েনি। মনে মনে আশা করছে রেবাকে ছেড়ে তুমি ওর সঙ্গে যাবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যব। ওর পরিকল্পনায় তোমার স্থান পূরণ করতে হবে তোমাকেই। আমি করব আমার স্থান পূরণ। কেবলমাত্র একজনের সঙ্গে মিলে

ঝাঁপ দিতে ওর অন্তরের অনিচ্ছা। তাই চেপে ও অনন্তকাল অপেক্ষা করবে। আগে তো ওই সব চেয়ে অধীর ছিল, আমরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম। এখন দেখছি টেবিল উল্টেছে। ওর মধ্যে তেমন অধীরতা নেই, যেমন আমার মধ্যে। আমি অনির্দিষ্ট-কাল অপেক্ষা করতে নারাজ।" রঞ্জু কী যেন চাপতে চায়।

"খুলে বল, যদি বলার মতো হয়ে থাকে।" অভয় দেয় জ্যোতিদা।

"আমার মধ্যে দুটো শক্তি কাজ করছে। প্যাশন আর কম্প্যাশন। গোরীর দুর্দশা দেখে আমি কম্প্যাশন অনুভব করি। আর ওর মোহন রূপ দেখে প্যাশন। কম্প্যাশন ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসছে, কারণ ওর উপর রেজেন্টমেন্ট বৃদ্ধ হয়ে আসছে। এদিকে প্যাশন কিন্তু দিনে দিনে বাড়ছে। এখন আমিই ওর মুক্তির জন্যে অধীর। ও আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কি না সন্দেহ।" রঞ্জু অকপটে বলে। বলতে গিয়ে রেঙে ওঠে।

আশ্চর্য হবার মতো কিছু নয়। তা হলেও এই প্রথম শুনছে বলে জ্যোতি হকচকিয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, "যেখানে প্রেম আছে সেখানে প্যাশনও আছে। না থাকাটাই অস্বাভাবিক। আর কম্প্যাশন তো যেখানে প্রেম নেই সেখানেও দেখতে পাই। দুঃখিত হব সেদিন শুনব যে তোমার মধ্যে শুধু কম্প্যাশনই কাজ করছে। প্রেমের আগুন নিভে গেছে।"

"আর সেদিন", জ্যোতিই আবার বলে, "গোরীও কি তোমার সঙ্গে যেতে চাইবে? তোমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল বলেই তো আমাকেও ডেকেছিল, যাতে আমি নৈতিক সমর্থন যোগাই। নীতির জন্যে আমি। প্রীতির জন্যে তুমি। হাঁ, আমিই ওকে বিশ্বাস করিয়েছিলুম যে ওটা পাপ নয়, ইউরোপে অমন সব হয়।"

"কেন, ভারতেও কি হয় না?" রঞ্জু জিজ্ঞাসা করে।

"ভারতে যেটা হয় সেটার কোনো বৈপ্লবিক তাৎপর্য নেই। যারা যায় তারা সমাজের বাইরে চলে যায়, আর ফিরে আসে না। তোমরা তো সমাজ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছ না। সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে সামাজিক মানুষের মতো বাস করতে যাচ্ছ। তোমরা পলাতক নও, তোমরা বিদ্রোহী।" জ্যোতিদা জোর দিয়ে বলে।

রঞ্জু তাতে যথেষ্ট বল পায়। "ঠিকই তো।"

জ্যোতি বলে যায়, "এই নিয়ে রেবার সঙ্গে মতের অমিল। ও আমাকে হুঁশিয়ারি দেয়। 'দেশে আর একটি আনা কারেনিনা যেন না হয়। নারীর রক্ত তোমার হাতেও লাগবে। সে দাগ তুমি মুছে ফেলতে পারবে না। রঞ্জুকেও নিবৃত্ত কর। গোরীকেও আর প্রশ্রয় দিয়ো না।' দেখছ তো, টলস্টয় কেমন একখানা বই লিখে গেছেন? যেন নারীর পক্ষে বিদ্রোহের যথেষ্ট হেতু ছিল না। সমাজের পক্ষে পরিবর্তনের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল না। যেন ওটা নিতান্তই একটা অসামাজিক ব্যাপার।"

গোরীর দশা একদিন আমার মতো হতে পারে একথা ভাবতেই রঞ্জুর চোখে জল আসে। কিন্তু কেন? কেন অমন হতে বাধ্য? এমন কী অবশ্যম্ভাবিতা আছে ওতে?

"অবশ্যম্ভাবিতা আছে জানলে আমি কেন ওকে প্ররোচনা দিতুম? অবশ্যম্ভাবিতা নেই, কিন্তু ঝুঁকি আছে। যশোধাম ওকে ওর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না। কারেনিন যেমন আনাকে দেননি। কারেনিন ডিভোর্সও তো প্রথমে দিতে চেয়ে পরে দিলেন না। দিলে কি আনা অত নিঃসহায় বোধ করত! ইউরোপের মেয়েরা ডিভোর্সের স্বাধীনতা অনেকটা আদায় করে নিয়েছে। তাই ওরকম ট্র্যাজেডী আজকাল আর ঘটে না। ভারতেও তাই হবে। তার জন্যে গোরীকেই অগ্রণী হতে হবে।" জ্যোতিদা বিধান দেয়।

জীবন কখনো কখনো আর্টের অনুবর্তন করে। রঞ্জু ও শ্রীমতীর জীবন যদি আনা কারেনিনার অনুবর্তন করে তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ যুগের ভারত তো ও যুগের রুশ দেশের মতোই ঘোরতর রক্ষণশীল। টলস্টয় বলতে গেলে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছেন। তা বলে গোরী তো আনা নয়, রঞ্জুও ভ্রনস্কি নয়, দু' জনের কামনা-পূরণও হয়নি, সন্তানও হয়নি।

মাঝখানে জ্যোতিদা থাকলে কত ভালো হতো! ওর উপস্থিতি যেন একটা নিশ্চিতি যে গোরী রঞ্জুকে ভুল বুঝে ওর উপর রাগ করে দুম করে হঠাৎ কিছু করে বসবে না।

"আমার নৈতিক সমর্থন সব সময় তোমাদের পক্ষে। কিন্তু কায়িক উপস্থিতি আর সম্ভব নয়। রেবা ভুল বুঝবে। সেও ভুল বোঝার ঊর্ধ্বে নয়। এখনো তাকে আমি কনভিন্স করতে পারলুম না যে গোরীর বিবাহ ওর অমতে হয়েছে বলে সে বিবাহ রদ করার অধিকার ওর আছে ও তারপরে তোমাকে বিয়ে করার বা তোমার সঙ্গে বাস করার অধিকারও অযথা নয়। ও যে বিশ্বাসই করতে চায় না যে গোরী নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতের আশায় ঝাঁপ দেবে। আসলে ওরও একটা ব্রাহ্ম সংস্কার আছে। সেটা হিন্দু সংস্কারেরই নামান্তর। 'ডিভোর্স' ও দু' চক্ষে দেখতে পারে না। বিশেষত যে মেয়ের কোলে সন্তান এসেছে তার। সন্তানের স্বার্থেই ওকে নিজের স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। জানিনে গোরী মা হবার আগে রেবা এলে কী হতো।" জ্যোতিদা দুঃখের সঙ্গে বলে।

"তা তুমিই বা সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেলে কেন? যখন জানতে যে গোরী মা হয়েছে ও রেবার মনোভাব বিরূপ।" রঞ্জু অনুযোগ করে।

"তুমি কি জানো না যে চাষ করতে গেলে যেমন হাল লাঙল লাগে তেমনি লাগে একটি চাষানী বা চাষীবউ? নইলে চাষ কখনো ইকনমিক হয় না। এতদিন আমি যার সন্ধানে ছিলুম এই সেই মেয়ে। যে আমাকে ভালো-বেসে চাষীবউ হতে রাজী। চাষীরা যদি কোনো দিন বিদ্রোহী হয় সেদিন ওই আবার বিদ্রোহিনী হবে। জেলে যাবে। লাঠির বাড়ি খাবে। গুলীও খেতে পারে, এত তেজ।" জ্যোতি পঞ্চমুখে বলে।

"সবাই তো ভালো, কেবল আমাদের উপর বিরূপ।" রঞ্জু আক্ষেপ জানায়।

"তোমাদের তাতে কী আসে যায়? তোমাদের সংকল্প স্থির থাকলেই হলো।" এই বলে জ্যোতিদা হাত বাড়িয়ে দেয়। "আমরা ধান কেটে নবান্ন করছি। তোমাকেও নিমন্ত্রণ। এলে সুখী হব, কিন্তু পরীক্ষার ক্ষতি করে নয়। দেখবে চাষী ও চাষানীর সংসার কাকে বলে। রেবা আজকাল হুগোর খাড়ু পরে, জানো। কোমরে আঁচল বেঁধে রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে ঝাট দেয় গোবর তোলে ঘর নিকোয় ছাই ফেলে কাপড় কাচে গাই দোয়। কারো কারো মতো পটের বিবি নয়।"

(ক্রমশ)

লুনোখোদ-১কে চাঁদের বুকে নামান হয়েছিল নভেম্বর ১৭, ১৯৭০। প্রায় পুরোপুরি যন্ত্রলব্ধ অভিজ্ঞতায় তৈরি এই যানটি প্রথম পর্যায়ে তিনদিন ধরে সেখানে ৩৬০০ মিটার লম্বা এবং ১৫০ মিটার চওড়া একটি অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। তারপর চাঁদের হিমশীতল পরিবেশে কিছুকাল নিশ্চল হয়ে থাকার পর ফেব্রুয়ারি ৬, ১৯৭১ আবার সে সচল হয়ে ওঠে এবং ফেব্রুয়ারি ১০ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী চারদিনে, ঠিক যেখানে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে চাঁদের উত্তর দিক বরাবর আরও ৫৭৮ মিটার পথ অতিক্রম করে। মানুষের তৈরি প্রথম চক্রযান দু' দুবার চাঁদের পিঠে সঞ্চরণের সময় কী কী দায়িত্ব পালন করেছে, সোভিয়েত তথ্যদপ্তর এই প্রথম তার এক বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করলেন। সেই সঙ্গে লুনোখোদ-১-এর স্বরূপ এবং তার বিভিন্ন কলাকৌশলের ইতিবৃত্ত।

বিজ্ঞান

হ্যাঁ। চন্দ্রচারী চক্রযান লুনোখোদ-১ এর সম্ভাব্য বাস্তব রূপ সম্পর্কে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা প্রথম কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, যেদিন পৃথিবীর প্রথম স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশ স্টেশন লুনা-৯ স্বচ্ছন্দ গতিতে চাঁদের বুকে গিয়ে অবতরণ করেছিল। সেই প্রথম প্রমাণিত হয়েছিল লুনা ৯ এর মত পার্থিব একটি বস্তুর ওজন চাঁদের ভূস্তর ধারণ করতে পারে। পরে লুনা-১৩ আরও কিছু কিছু নতুন তথ্য যোগাতে সমর্থ হয়। অতঃপর লুনা-১৬-র ঐতিহাসিক চন্দ্রযাত্রা এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় চাঁদের মাটি নিয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। এই সাফল্য থেকেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বুঝে নিয়েছিলেন, পৃথিবীর গবেষণাগারে বসেই বেতার তরঙ্গ বা লেজারের সাহায্যে চাঁদের দেশে অনেক জটিল যান্ত্রিক এবং পর্যবেক্ষণের [illegible] চালানো তেমন কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান লুনা-১৬ চাঁদ থেকে যে মাটি এবং কাঁকর সংগ্রহ করে এনেছিল, ওঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন তার সবটাই মুখ্যত বেসল্ট পাথর। তবে গঠন বৈশিষ্ট্যে খানিকটা ভিন্নতা চোখে পড়ল। ওঁরা বুঝতে পারলেন, চাঁদের ভূ-ত্বকের বৈচিত্র্য এবং গঠনতত্ত্ব সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা পেতে হলে তার কোন একটি বিশেষ জায়গায় থাবলা মেরে খানিকটা মাটি নিয়ে এসে পরীক্ষা চালিয়ে সহজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। চাই ব্যাপক অনুসন্ধান। তার জন্যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পর্যবেক্ষণ চালাতে হবে। অথচ সরাসরি মানুষ পাঠিয়ে সে সমস্ত কাজ চালাতে গেলে শুধু সময়ই নয় অনেক বেশি ঝুঁকি, এবং তার-চাইতেও বেশি খরচের পাহাড় কাঁধে চাপাতে হয়। ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী সাফল্যগুলি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে ওঁদের সাহায্য করেছিল। বিশেষ করে লুনা-১৬-র অভূতপূর্ব সাফল্যে ওঁরা পরিষ্কার বুঝে নিলেন, মানুষ না পাঠিয়েও চাঁদের বুকে অনেক জটিল কাজ-কর্মই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণাগার থেকে চালানো সম্ভব। মন্দ কী, যদি চাকাওয়ালা একটি গাড়ী সেখানে পাঠান যায়, যার ভেতরে থাকবে বিভিন্ন গবেষণা চালানোর মত স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি, যারা পৃথিবী থেকে পাঠান সংকেত বার্তায় কাজকর্ম চালাবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করবে? শেষের ব্যাপারগুলি যে মোটেই কঠিন নয়, লুনা-৯, লুনা-১৩ বা ভেনেরা গোষ্ঠীর মহাকাশযানগুলি একে একে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব

বলতে যা বোঝায় তা হল, চাঁদের পিঠে কোন চক্রযানকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চালিয়ে নেয়া সম্পর্কে সত্যিকারের কোন ধারণা।

সব চাইতে বড় সমস্যা, মূল মহাকাশ যান থেকে চাকাওয়ালা গাড়িটি না হয় চাঁদের মাটিতে নামান গেল, কিন্তু তারপর? সেখানকার বিস্তৃত অঞ্চলে ঠিক কী ধরনের পথ ধরে সে বিচরণ করবে? ধরুন, চলতে গিয়ে সামনে এসে পড়ল মস্ত বড় একটি পাথরের চাঁই, তাকে এড়িয়ে পাশ ফিরে চালিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা সরাসরি পৃথিবী থেকে কি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? কখনও গাড়ীটিকে বাঁকা পথে চলতে হতে পারে অথবা ঢাল বেয়ে। এই সময়ে এক পাশটা কাত হয়ে উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া চাঁদের মাটির ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম এবং নিম্ন মাধ্যাকর্ষণ পরিমণ্ডলে যথাযথ বল প্রয়োগ করে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা দরকার তখনও তার অভাব ছিল। কারণ এ পর্যন্ত যা কিছু তাঁরা জেনেছেন সমস্তই রবটের সাহায্যে, যন্ত্রের অনুভূতিকে অবলম্বন করে।

INC.6-140 BB

তবু সেই যান্ত্রিক অভিজ্ঞতা অবলম্বন করেই বাস্তবনির্ভর অনুমানের সাহায্যে তৈরি হয়ে গেল লুনোখোদ-১, পৃথিবীর মহাযুগের ইতিহাসের বিস্ময়কর এক চক্রযান। আলোড়নকারী এই গাড়ীটি চাঁদের দেশে গিয়ে পর পর দুবার সাফল্যের সঙ্গে সেখানে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে সমর্থ হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এর যথাযথ স্বরূপটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বহির্বিশ্বের কাছে প্রকাশ করেন নি। এই প্রথম লুনোখোদ-১-এর যথার্থ কলাকৌশলের উপর বিস্তৃত একটি ছবি তাঁরা প্রকাশ করলেন। প্রথমে লুনোখোদ-১ এবং পরে বিচিত্র এই যানটি এ পর্যন্ত চাঁদে বিচরণ করে যে সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে সে নিয়ে আলোচনা করব।

❋

লুনা-১৭, অর্থাৎ যে মহাকাশযানটির সাহায্যে লুনোখোদ-১কে চাঁদের দেশে পাঠান হয়, তা আগের বারে পাঠান অন্যান্য লুনার মত তার গঠন-বৈচিত্র্য এবং কাজকর্ম কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। এবারকার যানটিকে মুখ্যত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, স্বনিয়ন্ত্রিত গবেষণাগার। যার উপর দায়িত্ব ছিল পৃথিবী এবং চাঁদের অন্তর্বর্তী মহাকাশ বলয় সম্পর্কে জ্যোতিপদার্থ বিষয়ক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা এবং চাঁদের নিকটবর্তী পরিমণ্ডলের উপর অনুসন্ধান চালান। দুই, চাঁদে নির্বিঘ্নে অবতরণ করার জন্য গাড়ির রকেট। এই রকেটগুলির মুখ্য দায়িত্ব ছিল লুনা-১৭-এর গমনপথটিকে যথাযথভাবে নির্দিষ্ট রাখা, মহাকাশ পথ থেকে তাকে চাঁদের চারপাশের কক্ষপথে নেওয়া, মহাকাশ পথ থেকে তাকে চাঁদের ভূতলের অভিমুখে বরাবর চালনা করা এবং অবশেষে ধীর গতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিন্দুতে অবতরণ করান। লুনা-১৭ র একটি বিশেষ আচ্ছাদনের মধ্যে ঢাকা ছিল লুনোখোদ-১ এবং লুনা-১৭ থেকে চাঁদের মাটিতে চক্রযানটিকে নামিয়ে দেবার ব্যবস্থায় ছিল দুটো পথ। চাঁদে অবতরণ করার কিছুক্ষণ পরে পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে লুনা-১৭ থেকে ঐ চলার পথটিকে বের করে চাঁদের ভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছিল, যেমন কোন প্লেনের সিঁড়ি যেভাবে বের করে অবতরণস্থল পর্যন্ত নামিয়ে আনা হয়, অনেকটা সেই রকম করে। অতঃপর চলার পথ ধরে ধীরগতিতে লুনোখোদ চাকার উপর ভর দিয়ে চান্দ্রভূমিতে অবতরণ করে।

বলা হয়েছে, যান্ত্রিক চালকহীন লুনোখোদ-১কে মুখ্যত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সমন্বিত বাক্স-বিশেষ অর্থাৎ বগি। দুই, চক্রবাহী কাঠাম। পুরো চক্রযানটির ওজন ৭৫৬ কিলোগ্রাম, আয়তন একটি ফিয়েট কার-এর মত।

চক্রযানটির বাক্সটি এমনভাবে ঢাকা যাতে এতটুকু বাতাস তার মধ্যে ঢুকতে না পারে। পাশ থেকে চেহারাটি উপরের অংশ কেটে দেয়া একটি শঙ্কুর মত। বাক্সটি বিশেষ ধরনের ম্যাগনেসিয়াম-সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি হওয়ায় ওজনে যথেষ্ট হালকা অথচ মজবুত। গাড়িটির ওপরের অংশে বিশেষ ধরনের তাপ বিকিরণ ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। এর সাহায্যে তাপ নিয়ন্ত্রণ করে গাড়িটির সমস্ত যন্ত্রপাতি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের ঢাকনা দিয়ে এই অংশটি ঢেকে রাখা হয় এবং প্রয়োজনে ঢাকনাটি খুলে বা বন্ধ করে শীততাপ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। চাঁদের দেশে যখন রাত্রির আগমন ঘটে, পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে ঢাকনাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে বিকিরণের মাধ্যমে গাড়ির ভিতরকার উত্তাপের অপচয় রোধ করা সহজতর হয়ে থাকে। দিবভাগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনাটি আবার খুলে যায়। তখন প্রখর সূর্যের আলো অপ্রতিহত অবস্থায় এসে পড়ে গাড়ির মধ্যে সারিবদ্ধ করে সাজান সৌর কোষের উপর। সূর্যরশ্মির সাহায্যে ঐ কোষ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে। গাড়িটিকে চালিয়ে নেয়া থেকে শুরু করে তার সমস্তরকম কার্যাবলী চালানোর দায়িত্ব ঐ বিদ্যুৎশক্তির উপরই ন্যস্ত।

যন্ত্রবাহী কক্ষটির সামনের অংশে আছে কয়েকটি জানালা। এদের মধ্যে বসান রয়েছে টেলিভিশন ক্যামেরা, বিদ্যুৎশক্তি চালিত বেতার সংকেত-গ্রাহক-প্রেরক বা অ্যান্টেনা। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে এই অ্যান্টেনাটিকে যথাযথ দিক বরাবর স্থাপন করা হয়। এর দায়িত্ব চাঁদের পিঠের টেলিভিশন ছবি পৃথিবীর গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেওয়া। আরও একটি অ্যান্টেনা আছে। এটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্থাপন করার মত কোন ব্যবস্থা নেই। এটির কাজ পৃথিবী থেকে পাঠান বেতার সংকেত ধরা এবং চাঁদের দেশ থেকে সংগ্রহ করা তথ্যাবলী বেতার সংকেতের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া আছে কয়েকটি তথ্য-সংগ্রাহক যন্ত্র এবং একটি লেজার রশ্মি-প্রতিফলক।

কক্ষটির বাঁ এবং ডান পাশের অংশে রাখা হয়েছে: একটি করে টেলিফটো-ক্যামেরা। যে জায়গাটি থেকে ফটো তুলবে সেখানকার উল্লম্ব তলটির সঙ্গে তাল রেখে যাতে তা তুলতে পারে, প্রত্যেক ক্যামেরাতেই সে ধরনের ব্যবস্থা করা আছে। আর আছে চারটি পৃথক শ্রেণীর অ্যান্টেনা। এরা ভিন্নতর কম্পনাঙ্কের বেতার তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। অর্থাৎ এই অ্যান্টেনাগুলিই পৃথিবী থেকে পাঠান বেতার নির্দেশ গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেয় রবটের কাছে। রবট তখন ক্যামেরা দুটি প্রয়োজন মত কাজে লাগায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের টুকরোর সাহায্যে গাড়িটির মধ্যে তাপ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা আছে। উদ্দেশ্য, চাঁদের দীর্ঘতর রাত্রিতে বাইরের তাপমাত্রা যখন হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে যাবে তখন ঐ উত্তাপের সাহায্যে গাড়ির মধ্যে সংরক্ষিত তরল বাতাসকে উষ্ণ গ্যাসে পরিণত করা। পরে সেই গ্যাসের সাহায্যে গাড়ীর ভেতরের অংশ এবং যন্ত্রাবলী স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করা হবে

থাকে। পারমাণবিক তাপ-উৎসটির পাশে বসান রয়েছে আরও একটি যন্ত্র। এর কাজ, চাঁদের বুকে সচক্রযানটি ঘুরে বেড়ানর সময় পাথর কাঁকর, মাটি প্রভৃতি তার সংস্পর্শে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা পরীক্ষা করা। উল্লেখ্য, লুনোখোদে-১-এর মোট চাকার সংখ্যা নয়। এর মধ্যে চারটি করে দু' পাশে মোট আটটি চাকা আছে। ঐ চাকাগুলির উপর ভর করেই গাড়িটি ঘুরে বেড়ায়। অবশিষ্ট একটি চাকা লাগান রয়েছে সামনের দিকে। পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে বিশেষ ধরনের হাতলের সাহায্যে এই চাকাটিকে নামিয়ে মাটি স্পর্শ করান যায়, আবার দরকার হলে গুটিয়ে উপরের দিকে তুলে রাখা যায়। ব্যাপারটা প্লেনের চাকার মত। প্লেন মাটিতে অবতরণ করার সময় চাকাগুলি যেমন চাকা অংশের ভেতর থেকে পা বাড়িয়ে নেমে আসে, আবার আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে যায়, কতকটা সেই রকম। এই চাকাটির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়, ধাতব-চক্রের সংস্পর্শে এসে চাঁদের মাটি কতটা ঘাত সৃষ্টি করে। পাথরের মসৃণতা, কাঠিন্য এবং ঘর্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতি জেনে

চক্ষুর উদ্দেশেই একে কাজে লাগান হয়। সম্মুখের টেলিভিশন ক্যামেরা দুটির কাজও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়ে থাকে। চক্রযানটি যখন চাঁদের বুকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, আশপাশের অঞ্চল গাড়িটির পরিপ্রেক্ষিতে এদিক ওদিক সরে যেতে থাকে, যেমনটি ঘটে ট্রেনে চেপে এক জায়গা থেকে অন্য কোন জায়গায় যাওয়ার সময়। নিশ্চয় দেখেছেন, আশপাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি কেমন পেছন দিকে ছুটে চলে, অথচ দূরে দিগন্তের অঞ্চলগুলি কেমন যেন আবর্তন বেগ পেয়ে যায়? চাঁদের পিঠে লুনোখোদ-১ যখন চলতে শুরু করবে তখন গতি অবস্থার ঐ সমস্ত ব্যাপারগুলি যাতে টেলিভিসন ছবিতে ধরা পড়ে তার জন্যে তাড়াহুড়ো না করে কিছুটা ধীর গতিতে ছবি পাঠানর ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত এটি করা হয় তিন থেকে কুড়ি সেকেন্ড পর পর সময়ে।

এছাড়া দুটি টেলিভিশন ক্যামেরা লুনোখোদ-১ এ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এদের কাজ আশপাশের বিস্তৃত অঞ্চল, পৃথিবী থেকে যেভাবে আমরা আকাশকে দেখে থাকি, চাঁদ থেকে তেমনি আকাশকে দেখা যায় তার চেহারা, সূর্য এবং পৃথিবীর ছবি তুলে পাঠান। উদ্দেশ্য, নক্ষত্র জগতের সঙ্গে তাল রেখে চক্রযানটির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই ক্যামেরা দুটি যানটির দু পাশে এমনভাবে লাগান রয়েছে যাতে করে তারা উভয়েই দিগন্তের সমতলে ১৮০ ডিগ্রি কোণ ব্যাপী অঞ্চল এবং ভূমি থেকে ৩০ ডিগ্রি উচ্চতা পর্যন্ত অঞ্চলের ছবি তুলতে সক্ষম হয়। অপর দুটি ক্যামেরার কাজ ঊর্ধ্বাকাশে চারদিকের এবং লম্বরেখার উপরের অংশ থেকে ৭০ ডিগ্রি কোণ ব্যাপী অঞ্চলের ছবি তোলা। অর্থাৎ চারটি ক্যামেরা চক্রযানের চারপাশ থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বাকাশের সমস্ত অঞ্চলেরই ছবি তুলতে সমর্থ হয়েছে।

চাঁদের দেশে দিন এবং রাত্রির তাপমাত্রার পরিবর্তন এত বেশি যে চরম ঐ তাপীয় অবস্থার হাত থেকে চক্রযান এবং তার ভিতরের যন্ত্রপাতি রক্ষা করার ব্যাপারেও যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। ভেতরকার যন্ত্রপাতির অন্তর্বর্তী স্থানগুলির ফাঁকে ফাঁকে রাখা হয়েছে, পদার্থের আচ্ছাদন। এই পদার্থের ভেতরের অংশ ফাঁপা এবং সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য। যেভাবে থার্মোস ফ্লাস্কের বোতলটি তৈরি হয় সেইভাবে। আচ্ছাদনের দু পাশে বিশেষ ধরনের প্রলেপ মাখান হয়েছে। ফলে একটি যন্ত্রের তাপের পক্ষে বিকীর্ণ হয়ে অপর যন্ত্রের গায়ে গিয়ে পড়াটা অনেকটা হ্রাস করা গেছে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় নলের মধ্যে দিয়ে পারমাণবিক চুল্লী থেকে সংগৃহীত তাপে উত্তপ্ত গ্যাসকেও বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত করা হয়। গাড়িটির বাইরের অংশও তাপ-বিকিরক হিসেবে কাজ করে। প্রখর সূর্যতাপের বেশির ভাগ অংশই সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বিদ্যুৎ শক্তির উৎসরূপে কাজে লাগান হয়েছে সৌর-কোষ এবং রাসায়নিক-কোষ। সৌর-কোষের গুচ্ছটি আনুভূমিক তলের সঙ্গে শূন্যে ডিগ্রি থেকে ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত আবর্তন করতে পারে। এর ফলে সূর্য আকাশের যেখানেই থাক না কেন কোষ-গুলির পক্ষে তার আলো সংগ্রহ করা শক্ত হয় না।

চাকাগুলি কাঠামোর সঙ্গে লাগানর সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। চাকানোর হাতল এবং কাঠামোর সঙ্গে চাকা-গুলি এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যাতে করে চাঁদের অমসৃণ পাথরের টুকরো বা মাটির উপর দিয়ে চলার সময় তারা যথাযথ খেলা করতে পারে। ঢাল বেয়ে চড়াই-এ ওঠা, ছোটখাটো গর্ত, বাধা বা পাথর অতিক্রম, দরকার বিশেষে পিছু হটে পাশ ঘুরে সামনে এগুনো এবং দ্রুত কোন বাঁকা রাস্তা ধরে চলার সময় যাতে না উল্টে যায়, এমন বহু যান্ত্রিক সমস্যার দিকেই পরিকল্পকদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। প্রত্যেকটি চাকার সঙ্গে একটি করে মোটর লাগান হয়েছে যাতে করে ইচ্ছেমত তাদের যে কোন একটির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর আছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ঘাত প্রতিরোধক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক চালন ব্যবস্থার সুইচ, 'ইলেকট্রো ডাইনামিক ব্রেক', পুরোপুরি থামিয়ে দেবার জন্যে 'ডিসক ব্রেক'। বাঁক ঘোরার সময় বিভিন্ন চাকার গতি ভিন্ন ভিন্ন-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করা হয়। চাকার তাপ মাত্রা এবং প্রত্যেকটি চাকা কতবার ঘুরল সেটা মাপার জন্যে যন্ত্র লাগান হয়। গাড়িটি কতটা দূরত্ব অতিক্রম করছে জানা যাবে চাকা কতবার ঘুরল তার পরিমাপ বের করে।

পৃথিবী থেকে মাত্র একটি সংকেত—'স্টার্ট'। লুনোখোদ-১-এর যন্ত্রগণক সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠবে। অথবা 'স্টপ', মুহূর্তে সে থেমে পড়বে। সমস্ত কাজকর্ম নিয়মমাফিক চালানর জন্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের তড়িৎ-বর্তনী ব্যবস্থা। নাম 'লজিকেল সার্কিটস'। যার কাজ পর্যায়-ক্রমে প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা। এই সময়ে সে মনে রাখে আগে কী কী কাজ সে করেছে, এখন কী করতে হবে অথবা ভবিষ্যতে কী করা দরকার। তার দায়িত্ব কোন যন্ত্রে কতটা বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতে হবে সেটা দেখে নেয়া এবং সেই মত বিদ্যুৎপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা, গাড়ির কাঠামোয় লাগান স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি চালান

বা তারা ঠিকমত কাজ করছে কিনা লক্ষ রাখা, সামনের রাস্তা সোজা হলে অথবা বাঁক ঘোরার সময় চাকাগুলিকে কতটা কোণ বরাবর ঘুরিয়ে দিতে হবে সেদিকে নজর দেওয়া। হয়ত কোন চড়াই-এ উঠতে গিয়ে সামনে প্রচণ্ড একটা খাড়াই এসে উপস্থিত হল। গাড়ির পক্ষে অতটা খাড়াই ধরে ওঠা সম্ভব না হলে স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দেবে। যদি দরকার হয় একটি চাকার ঘোরা বন্ধ করা তাও করা যেতে পারে। মনে করুন শুধু সামনের বাঁ পাশের একটি চাকা ঘুরিয়ে গাড়িটিকে একটু সরিয়ে নিতে হবে, তাও করা সম্ভব। মাটির প্রকৃতি জানার জন্য বিশেষ যন্ত্র কখনও বা জমিতে মই দেবার মত সরাসরি বুকে হেঁটে চলবে, কখনও বা লাঙ্গল দেবার মত গর্ত খুঁড়ে জানিয়ে দেবে কোন জায়গার মাটি কতটা নরম, কতটা শক্ত অথবা হাল্কাভাবে সাজানো। সামনের নয় নম্বর চাকার ভূমিকাই এ ব্যাপারে মুখ্য।

*

হাঁ, চাঁদের গাড়ি তো নামল' টেলিভিশন ক্যামেরা, জটিল যন্ত্র, তাদের নিয়ন্ত্রক যন্ত্র মানব রবট। চাঁদের মাটিতে গাড়ি চালানোর সময় কী কী ধরনের অভিজ্ঞতা, সুযোগ বা অসুবিধে আসতে পারে মোটামুটি সে ধরনের একটি ধারণ অবশ্যই তার যন্ত্র মগজে দেওয়া আছে। অতএব ঘটনা চক্রে যদি লুনোখোদের-১-এর গায়ে একটু বেশি রোদ এসে পড়ে কীভাবে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে সেটা তার জানা। তার জন্যে যেটুকু কাজ করা দরকার পৃথিবীর নির্দেশ ছাড়াই সে তা চালিয়ে যেতে পারে। অথবা সৌর-কোষগুলি সূর্যের দিকে সব সময় মুখ রেখে যাতে অবস্থান করতে পারে সে দিকে লক্ষ রাখাও তার নিজস্ব দায়িত্ব। অর্থাৎ যে সমস্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাকে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পারদর্শী মানুষের মত নিপুণতার সঙ্গে সে তা করে যেতে পারে।

কিন্তু তারপর? অনাস্বাদিত যে অভিজ্ঞতা, যে সম্পর্কে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকের মানুষও আগে থেকে কখনও প্রস্তুত হতে পারে না, যদি তেমন কোন কিছুর সামনে গিয়ে লুনোখোদ ১ উপস্থিত হয় তখন? মানুষের ভূমিকা এখানেই। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্থক্য ঃ যন্ত্রকে

যা শেখানো যায় ততটুকুই সে করতে পারে, আর মানুষ তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধির সাহায্যে অনভিজ্ঞ মনকেও বাস্তবভাবে পাথর অতিক্রম করার মত সামর্থ যোগায়।

অতএব লুনোখোদ-১-এর রবট চাঁদে বসে যত দায়িত্বই পালন করুক না কেন তার মূল চাবিকাঠি পৃথিবীর গবেষণাগারে। সেখান থেকেই তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ। তাই মানব-চালকবিহীন চন্দ্রযানটির শ্যেন দৃষ্টি মেলে প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগ এবং উত্তেজনা যাঁদের পোহাতে হল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধিনায়ক, চালক, দিকদর্শক, পর্যবেক্ষক এবং প্রযুক্তিবিদ। পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণাগারে বসে লুনোখোদ-১-এর যাবতীয় নিরাপত্তা এবং কার্যাবলী সম্পাদনের মূল দায়িত্ব ছিল এঁদের উপর। অধিনায়কের কাজ, লুনোখোদ-১-এর সাহায্যে কী কী কাজ করা হবে এবং কোন রকম বিভ্রান্তি দেখা দিলে কী করা উচিৎ সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। চালকের দায়িত্ব —তার যাবতীয় গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ টেলিভিশন পর্দার সামনে তিনি বসে রয়েছেন। পর্দায় ফুটে উঠেছে লুনোখোদের-১-এর সমস্ত রকমের গতিবিধি বা অবস্থান। দিকদর্শক হিসেব কষে বের করবেন চক্রযানটির কোন পথে কতটা গতিবেগ নিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। একমাত্র তাঁর নির্দেশেই চালক নিয়মমাফিক যানটিকে চাঁদের পিঠে চালিয়ে নিয়ে যাবে। প্রযুক্তিবিদের লক্ষ যানটির যাবতীয় যন্ত্রপাতির উপর নজর রাখা। লুনোখোদের রবটের পাঠান সংকেত বার্তা দেখে তিনি দেখে নেবেন সমস্ত যন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে কিনা। কোন রকম গোলমাল দেখা দিলে পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে কীভাবে তা সংশোধন করা যায় সে দিকে লক্ষ রাখা।

কিন্তু কোন লক্ষ্যের দিকে চোখ রেখে পাড়ি দেবে লুনোখোদ-১? পথের নিশানা এবং নিরাপত্তার কী হবে। চালক কী ইচ্ছে মত তাকে ডান, বাঁ, সামনে অথবা পেছনে নিয়ে যেতে পারে? এর ঝুঁকির কথাটা একবার ভাবুন?

না, চালক এতটুকু ঝুঁকি নিতে রাজি নন। লুনোখোদ-১ চলতে শুরু করল। আর টেলিভিশন ক্যামেরা সম্মুখভাগের চান্দ্রভূমির ছবি তুলে পাঠাতে শুরু করল। সেই ছবি দেখেই দিকদর্শক বুঝতে পারবেন সম্মুখের পথ বন্ধুর না সরল। সেখানে মরণ ঝাঁপ দেবার মত কোন জ্বালামুখ অথবা দাঁড়িয়ে মারার মত অচল পাথরের স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে কী না? ছবি দেখেই তিনি কোন পথে চক্রযানকে এগিয়ে যেতে হবে, চাঁদের রাতে কোথায় বিশ্রাম নিতে হবে, বলে দেবেন। কোন গর্তে ডিগবাজি খাওয়া সম্ভব, কোন জ্বালামুখের পাশ দিয়ে বাঁক ঘেঁষে যেতে হবে—সমস্ত কিছুই ঠিক করবেন তিনি। আর তারপরই চালক হয়ত বলবে, 'ডানে, বাঁয়ে, সামনে ছোটো অথবা থেমে পড়', ইত্যাদি।

*

লুনোখোদ-১। তার বিচিত্র যন্ত্রপাতি এ পর্যন্ত যে সমস্ত গবেষণার ফলাফল জানিয়েছে সংক্ষেপে তারা এই: লুনা-১৭ যেখানে অবতরণ করে তার চারপাশের বিস্তৃত চন্দ্র-ত্বকের গঠন, তার রাসায়নিক গুণাগুণ, নমনীয়তা বা কাঠিন্য, আশপাশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য। ও'দের ধারণা, চাঁদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অ্যাপলো-১১-র বিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, লুনোখোদ-১-এর বর্ষাসাগরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার মিল রয়েছে। চাঁদের বুকে গর্ত বা জ্বালামুখগুলির অনেকেরই সৃষ্টি কোন মুহূর্তগত ব্যাপারে ঘটেনি, বেশির ভাগই তারা তৈরি হয়েছে দীর্ঘ সময়ের অবক্ষয়ের ফলে। তবে বেশির ভাগ জ্বালামুখ বা ঘাত বিস্ফোরণ অথবা প্রচণ্ড আঘাতের দরুনই সৃষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত পাথরের টুকরো বা চাঁই লুনোখোদ-১ পরীক্ষা করেছে তা থেকে মনে হয়েছে তাদের পিঠের বেশির ভাগই পাথর বিস্ফোরণের সময় জ্বালামুখের ভেতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্ষাসাগরের ত্বক বেসল্ট-লাভা দিয়ে তৈরি। চোদ্দটি জায়গায় বিভিন্ন পাথরের টুকরোর উপর একস-রশ্মি নিক্ষেপ করা হয়। ঐ রশ্মি তাদের গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে ঐ প্রতিফলিত রশ্মি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে চাঁদের ভূ-ত্বকে প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিয়ন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, টাইটানিয়াম প্রভৃতি রয়েছে। তাঁদের বুকে বর্ষাসাগরের হাল্কা ধুলোর আস্তরণ ছয় থেকে আট সেন্টিমিটার পুরু হবে না। চাঁদের দেশে মহাকাশ থেকে ছুটে আসা একস-রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই রশ্মির একটি অংশ ভিন্ন নক্ষত্র জগৎ থেকে ছুটে আসছে। এবং সবচাইতে বড় ব্যাপার চাঁদের কোন বিকিরণ-বলয় নেই। তেজস্ক্রিয়তার দিক দিয়ে চান্দ্র-ত্বক অনেক বেশি দুর্বল। ডিসেম্বর ১২, ১৯৭০ ভেনেরা-৭ আন্তর্গ্রহ মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিও দূর আকাশপথ থেকে চাঁদের উপর যে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিল তাতেও এ সমস্ত তথ্য প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থাৎ লুনোখোদ-১-এর সবচাইতে বড় বাস্তব দিক হল, অনেক কম খরচে অনেক বেশি মূল্যবান তথ্য যোগাতে সে সমর্থ হয়েছে। মানুষ কোনদিন চাঁদে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে কিনা ভবিষ্যৎ-বক্তারা সে কথা হয়ত বলতে পারেন, তবে ঠিক এই মুহূর্তে চাঁদকে যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি শ্রেষ্ঠতম এবং আদর্শ গবেষণাগার হিসেবে কাজে লাগাতে হয়, লুনোখোদের মত যন্ত্রযানকেই সম্ভবত সহজতম এবং শ্রেষ্ঠতম উপায় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এবং এর ফলে মহাকাশ-প্রযুক্তিবিজ্ঞানের পাওনা থেকেও পৃথিবীর মানুষের বঞ্চিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

সমরজিৎ কর

করে যেন হাসল। 'দেরি করলে গিন্নী রাগ করবে?'

রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'না, সেসব কিছু না।' একটু থেমে আবার বলল, 'কোথায় আর ঘুরব। বেরিয়েছি অনেকক্ষণ।'

'মশাই, আপনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ, আধুনিক কবিতা লেখেন কি করে! কোথায় ঘুরব। কলকাতা শহরে জায়গার অভাব?' কথা শেষ করে মণ্ডল ফ্যা ফ্যা করে হাসল। 'চলুন আমার সঙ্গে। দুভাই আনন্দ করব।'

আর একদিনের কথা রামানন্দর মনে পড়ল। সেদিনই মানুষটার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। মন খারাপ করে রামানন্দ দম-দমের ওদিকটায় রেল লাইনের কাছাকাছি একটা পুরোনো ইটখোলার কাছে চুপ করে বসে ছিল। যেন রেল লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করত সে। কথাটা মনে হলে আজ তার হাসি পায়। যেন এর ঠিক কদিন আগে পূরবী আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে আরম্ভ করেছিল বলে রামানন্দ জগত সংসার অন্ধকার দেখেছিল, জীবন অর্থহীন মনে হয়েছিল। সত্যি কি তাই।

ধূমপানের আনন্দের জন্যে পানামা...
একটি পানামা ধরিয়ে দেখুন। একেবারে প্রথম টানেই বুঝতে পারবেন ওর বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাকের চমৎকার টাটকা স্বাদগন্ধ। তারপর টানের পর টান আমেজের সঙ্গে টেনে চলুন। একেবারে শেষ টান পর্য্যন্ত পানামা আপনাকে দেবে ধূমপানের অপূর্ব আনন্দ।
Panama
20
GTC
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিঃ,
বোম্বাই—৫৬
GT (P)-673 Ben. Greens Advtg.
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যম।

যাচ্ছে।' রিকশা বাঁয়ে ঘুরছে দেখে রামানন্দর সন্দেহ হল। আজ যেন মণ্ডল তাকে নিয়ে আর চিৎপুর যাচ্ছে না।

'বৈঠকখানা।' জগত চোখ আড় করে রামানন্দর মুখ দেখল। 'দিশী চলে তো আপনার?'

'হুঁ, হুঁ,' রামানন্দ লম্বা করে ঘাড় কাত করল। 'দিশীই তো খাই, বিলিতী খাব পয়সা কোথায়।'

'না, পকেটে টাকা ছিল। আপনাকে নিয়ে একটা ভাল বার-টার-এ যাওয়া যেত, কিন্তু ওদিকে নন্দ শালাকে আবার বলে রেখেছি, বৈঠকখানার দোকানে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। হয়তো গিয়ে দেখব বসে আছে।'

'বেশ তো চলুন না, আমি দিশী খাই, দিশীতে আপত্তি নেই।'

কিন্তু নন্দটা কে রামানন্দ বুঝতে পারছিল না। যে-ই হোক, জগত মণ্ডলের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়ে গেল এটাই বড় কথা। সেদিনের মতন আজও মণ্ডল তাকে আনন্দ করতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই বলে দিলদরিয়া পার্টি। আজ বোধ হবি মালটাল খেয়ে তারপর মণ্ডল তাকে জায়গায় নিয়ে যাবে। মণ্ডলের পকেট ভারি। আজ আর কথা কি। সেদিন বউয়ের ব্যাগ থেকে কুড়ি টাকা চুরি করে এনে কম ফুর্তি করেছিল!

'আমার মশাই রেখে বাঁচিয়ে চলার অভ্যেস নেই। একটা বাক্সে ছবি বেচে এক শ টাকা পেয়েছি—হুঁ, বলতে পারেন অভাবের সংসার, বউয়ের হাতে তুলে দিলে কাজে লাগাতে পারত। ভেবেও ছিলাম একবার দিয়ে দি। কিন্তু যেখানে হাজারটা ফুটো রয়েছে সংসারে, সেখানে এই একশ টাকা দিয়ে কী হত, কদিন চলত বলুন? মাঝখান থেকে আজকের আমোদ ফুর্তিটাই মাটি হত। তা ছাড়া টাকাটা তো পাওয়ার কথা ছিল না, বলতে গেলে ওটা মুফৎ পাওয়া। এমন দু চারশ ছবি, যদি কোনোদিন আমার বুন্ধু ওস্তাগর লেনের বাসায় যান, দেখবেন ঘরের আনাচে কানাচে তক্তাপোশের নিচে, কিছু বউয়ের ঘুঁটের বস্তার পাশে, কিছু রান্নাঘরের তাকের ওপর কালিঝুলি নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।'

'সব এক জায়গায় গুছিয়ে রাখেন না?'

'কত গুছিয়ে রাখব বলুন।' জগত হাসতে গিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'তা ছাড়া, সেদিন বলেছি আপনাকে, বউ ছেলে মেয়ে সবাই আমার ওপর খাপ্পা, সবাই ভাবে ওগুলো হল ঘরের জঞ্জাল, ওদের দোষ দেওয়া যায় না—একটাও বিক্রি হয় না, অথচ দিনের পর দিন আমি ছবি এঁকে চলেছি, তা না হলে, চিন্তা করে দেখুন—আমি সময় না পাই, ওরা তো যত্ন করে গুছিয়ে-টুছিয়ে সব তুলে রাখতে পারত, কিন্তু ওদের সেই উৎসাহ আসবে কোথা থেকে। কেনই বা আসবে।'

রামানন্দ জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

'তা হলেও আপনার আঁকা জিনিস, আপনার সৃষ্টি, ওঁরা যত্ন না করুক, আপনি সেগুলো এখানে সেখানে পড়ে থেকে নষ্ট হতে না দিয়ে প্রিজার্ভ করবেন—করা উচিত।'

নাকের ছিদ্র দিয়ে এতটা ধোঁয়া বের করে যেন সেই নাক দিয়েই জগত হাসল। 'আসল কথা কি জানেন, যখন আঁকি—আঁকি, আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা, জীবন সম্পর্কে যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, হুঁ, যদি স্বপ্ন বলেন তবে তাই, এমন কি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে সবটা উৎসাহ উদাম সময় শ্রম ঐ এক টুকরো কাগজের ওপর ঢেলে দিয়ে আমি রং ছিটিয়ে যাই, যেন তখনকার মতন ওটাই আমার গান, হুঁ, কবিতাও বলতে পারেন, আপনারা যেমন কবিতা লেখেন হি-হি—

কিন্তু তারপর কী হল! ছবিটা আঁকা হয়ে গেল, বাস, আর আমি ওখানে নেই—আমার আর এক বিন্দু মায়া থাকে না ওটার ওপর, এখন সেই ছবি গিন্নীর ঘুঁটের বস্তার পাশে পড়ে রইল কি নর্দমার জালির মুখে আটকে গিয়ে জল কাদায় মাখামাখি হতে থাকল, আমার আর খেয়ালই থাকে না সেদিকে তাকাবার, আমি ভুলেই যাই কবে কি সব এঁকেছিলাম।'

কথা না বলে রামানন্দ একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। রিকশাটা দাঁড়িয়ে আছে। আগে পিছনে অনেক গাড়ি জমে গেছে। ট্রাফিক জ্যাম।

'কি হল, চুপ করে আছেন?'

'বলুন।' যেন জগত মণ্ডল একাই বকে যাবে, রামানন্দ শুধু শ্রোতা। চোখ আড় করে আর্টিস্টের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি শুনছি।'

'একটা কবিতা লেখা' হয়ে থাকার পর ওটা সম্পর্কে আপনার উৎসাহ-টুৎসাহ আর তেমন থাকে কি?' আমার কথা আমি বললাম, এবার আপনারটা বলুন।'

'আমি আর কবিতাই লিখছি না, কবে লিখতুম তা-ও এখন প্রায় ভুলতে বসেছি।'

'লিখছেন না!' খুব একটা 'অবাক হল না যেন জগত, 'তেমন অখুশিও হল না। আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলে পিঠ টান করে বসল। গাড়িটা আবার চলছে। 'যাক গে. বাঁচা গেল, ভাবলাম ঘণ্টা খানেকের জন্য বুঝি শেকড় পোঁতা হয়ে গেলাম। যা বাবা, ছুটে চল এই বেলা, তীর্থের কাক হয়ে নন্দ শালা ওদিকে হাঁ করে বসে আছে। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম', রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা শেষ করে জগত এদিকে ঘাড় ফেরাল। 'লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। কি করা হচ্ছে তা হলে এখন?'

'হাঁস মুরগি নিয়ে আছি।'

'চমৎকার, ওয়ান্ডারফুল!' মণ্ডল চেঁচিয়ে উঠল। রাস্তার মানুষ ঘাড় ঘুরিয়ে রিকশাটা দেখল। হাসল। বাঙ্গাল, নিশ্চয় ভাবছে ওঁরা—রামানন্দ চিন্তা করল, অথবা এ-ও ধরে নিতে পারে, লোকটা মদ খেয়েছে,
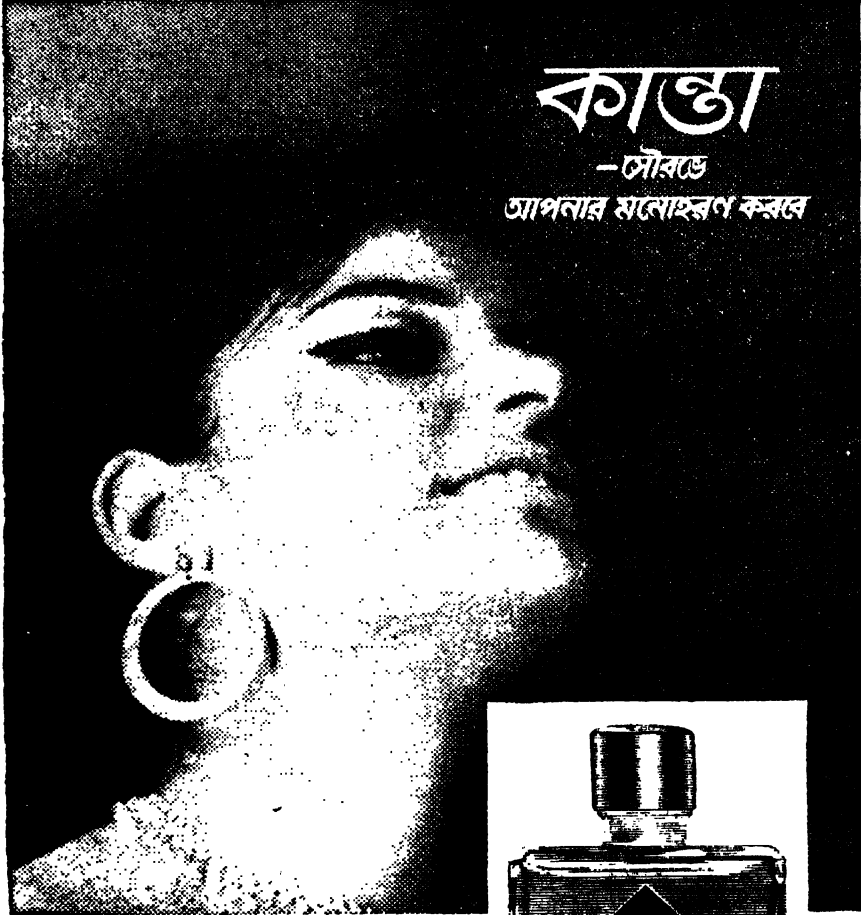
না হলে রিকশায় বসে এমন চেঁচায়! 'খুব ভাল করেছেন রামানন্দবাবু, বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

রামানন্দ কথা বলল না। জগত ভুরু কুঁচকোল।

'চাকদা গেছেন কখনো আপনি?'

'না', হঠাৎ চাকদা কেন রামানন্দ ভেবে পেল না। 'জায়গাটার নাম শুনেছি, যাইনি।'

'আঃ যদি যেতেন।' জগত মাথা ঝাঁকাল। 'উঁহু, ঠিক চাকদা বলতে রেল স্টেশন রেজিস্টারি অফিস স্কুল বাজারের ঐ ঘিঞ্জি চৌহদ্দিটা না. একেবারে ইণ্টিরিয়ারে, বারো-চৌদ্দ মাইল ভেতরে—ট্রেন থেকে নেমে বাস-এ চাপলে ঘণ্টা দেড়েক লাগে পৌঁছোতে. যাকে বলে অজ পাড়া গাঁ, আমার এক পিসি থাকে। ঐ পিসির বাড়ি আমি চলে যাই। হুঁ, আঁকাউঁকি যখন আর ভাল লাগে না। এমন তো হয়ই, আজ যেমন আপনার মনের অবস্থা, কবিতা লিখতে ইচ্ছা করছে না. আমারও সময় সময় এটা হয়—ছবি আঁকার নাম শুনলেই গা-বমি করে। পিসির বাড়ি গিয়ে দিন কতক হাঁস মুরগি গরু ছাগল নিয়ে খুব হইচই করি—গাছ থেকে পেড়ে আম জাম খাই, পিসির দুটো দীঘি, মাছ ধরি, জলে নেমে সাঁতার কাটি—অর্থাৎ আমি যে কোনো দিন কলকাতায় থাকতুম, বুদ্ধ ওস্তাগার লেনের এক উপোস করা আর্টিস্ট—কথাটা স্রেফ ভুলে যাই, ভুলে থাকি। বেড়ালের অসুখ দেখেছেন?'

রামানন্দ অল্প হাসল।

'দেখেছি যেন।'

'ওটা আসলে কিন্তু অসুখ না, ইচ্ছা করে শরীরে অসুখের মতন একটা অবস্থা তৈরি করে, দেখবেন বেড়াল তখন খুব করে ঘসটাস খায় তারপর এক সময় সব উগরে ফেলে, মনে হবে বুঝি জ্বর হয়েছে, তক্ষুনি বমি করছে, বমি করার পর কেমন নেতিয়ে পড়ে, তখন ঝোপের আড়ালে কি বাড়ির পেছনে কোনো নিরিবিলি জায়গায় টানটান হয়ে শুয়ে থাকে, এভাবে সারাটা সকাল, কখনো সারটা দুপুরে কোনো কোনো সময় একটা পুরো দিনই হয়তো কাটিয়ে দেয়—ইঁদুর ধরা মাছ ভাজা চুরি করা মুরগির পেছনে ছোটা—কিছু তখন তার মনে থাকে না। সব ভুলে থাকে। তেমনি আমরা শিল্পীরা। দিন কতক সব ভুলে থাকতে হয়। থাকা ভাল। তারপর যখন আপনি কলম ধরবেন দেখবেন কেমন সব জিনিস অগাধ থেকে বেরোচ্ছে—তাই করি আমি, হইচই করে পিসির বাড়ি ক'দিন কাটিয়ে তারপর কলকাতা ফিরে এসে যখন তুলি ধরি—আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই, এমন ছবি আমার হাত দিয়ে বেরোয় কি করে। দেখবেন, অসুখের অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার পর বেড়াল কেমন খপাখপ ইঁদুর ধরে বেড়াচ্ছে। কেমন তেজ তার তখন।'

রামানন্দ আর হাসল না। মুখে বেজার করে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আমার আর কোনো দিনই কবিতা লেখা হবে না।'

'এটা মনে হয়। আমারও হয়। পিসির বাড়ি দীঘির পাড়ে নেমে মাগুর মাছ শোল মাছ ধরি আর ভাবি, এই হাতে কোনো দিন তুলি উঠবে না। এভাবে মাছ ধরে সারা জীবন কাটবে।'

ছানাপট্টি পিছনে ফেলে রিকশা বাঁয়ে বাঁক নিয়ে শিয়ালদার দিকে ছুটল।

'এই যে কবিতা সম্পর্কে আপনার একটা বিতৃষ্ণা এসেছে, যেমন ছবি আঁকার ব্যাপারে আমার আসে, হাঁস মুরগি নিয়ে এখন মেতে আছেন. মানে সাময়িক একটু অন্য রকম জীবনযাপন, শিল্পীর পক্ষে এটা দরকার। এতে তার মনের শরীরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কেরানী সারা জীবন কেরানী হয়ে থাকতে পারে, উকিল উকিল হয়ে থাকতে পারে, ডাক্তার ডাক্তার। কিন্তু আমার আপনার কেস অন্য রকম। আমরা কী আমরা কে বা আমরা কী হতে চাইছি—সব ভুলে থেকে দিন কতক উড়নচণ্ডী হয়ে এদিক-ওদিক করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকে না।'

আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হয়ে গেল। জগত মণ্ডল থামছিল না।

'এই ধরুন যেমন এখন, দু' ভাই বৈঠকখানার শুঁড়িখানায় ঢুকে প্রাণভরে দু' নম্বর খাব, আপনি কি দু' নম্বর খান?'

'হুঁ, ওটা আমার সুট করে।'

'গুড, আমি দু' নম্বর ছাড়া কিছু খাই না। এক রকম জিনিস খেয়ে যাওয়া ভাল। তাতে লিভার ডেমেজ কম হয়—অনেক দিন চালিয়ে যাওয়া যায়। হুঁ, কি যেন বলছিলাম—প্রাণভরে দুজনে খাব, এক পাইট দু' পাইট, তিন চার পাঁচ, তার মানে খেতে খেতে বমি করে দোকানের টুল টেবিল ভাসিয়ে দেওয়ার মতন যখন অবস্থা হবে, তখন আমরা উঠব, টলতে টলতে ওখান থেকে বেরিয়ে হাতের কাছে রিকশা ট্যাক্সি যা পাওয়া যায় একটা নিয়ে সোজা চলে যাব সোনাগাছি রামবাগান বা শ্যামবাগান যেখানে হোক। তারপর আর কি, সরযু হোক সোনামণি হোক, গেনদা মানদা—যে কোনো একজনের বিছানায় আমরা নেতিয়ে পড়ব, ইঁদুর ধরা, মাছভাজা চুরি করা, মুরগির পেছনে ধাওয়া করা, কবিতা লেখা, ছবি আঁকা—কিছু মনে থাকবে না আমাদের। আমরা তখন এই জগত থেকে অনেক দূরে। আমাদের হুঁশ থাকবে না। ঘাস খেয়ে অসুখ হওয়া দুটো বেড়াল হয়ে সারা রাত দুজনে বেশ্যাবাড়ি পড়ে আছি, হি-হি।'

একটু দম নিয়ে জগত আবার হাসল। 'তবে একটা কথা ব্রাদার—পিছুটান থাকলে, মানে তখন যদি আপনি বউদির কথা চিন্তা করেন, আনন্দটাই মাটি হবে। আমি কাল না। অথচ আমার খুব জানা আছে, কাল সকালে চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন বাড়ি গিয়ে হাজির হব, ওয়াইফের হাতে ঝাঁটার বাড়ি খেতে হবে—কিন্তু কে আর সেসব গেরাহ্যি করে মশাই, ফ্রেশ এনার্জি নিয়ে, বলতে পারেন তাজা একটা গোলাপের মন নিয়ে তুলি হাতে তক্ষণে আমি সৃষ্টি-কার্যে নেমে গেছি—সেই একটা সকালে এমন ব্রিলিয়ণ্ট কিছু একটা আমার হাত দিয়ে বেরোল, যার সঙ্গে অন্য পাঁচ দিনের কাজের কোনো তুলনাই হয় না।'

'আমরা এসে গেছি।' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল। বৈঠকখানা বাজারের মুখে রিকশাটা দাঁড়াল।

'আমি দিচ্ছি—' রিকশা থেকে নেমে জগত তড়বড় করে পকেট থেকে পয়সা বের করল। রামানন্দ মনে মনে বলল, 'এমনিও আমি রিকশা [illegible] না। জগত মণ্ডলের [illegible] বেরোলে একটা নয়া-পয়সাও আমার খরচ নেই।'

ভিড় ঠেলে দুজন বাজারের গলির ভিতর ঢুকল।

'কেমন, এসব ব্যাপারে—মানে একটু ওড়াওড়ি করে যখন বাড়ি ফেরেন, গিন্নীর খানিকটা সিম্পেথিটিম্পেথি পান! না কি আমার মতন ঝাঁটার বাড়ি খেতে হয়?'

[illegible] রামানন্দ জগতের [illegible] বলল না। কি বলবে সে?

(ক্রমশ)

পর্যটন শিল্পের প্রতি অবহেলা

পর্যটন শিল্প যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং এই শিল্পের মাধ্যমে যে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে এ কথা সবাই জানেন। অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বাদ দিলেও রাজনৈতিক দিক থেকেও পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ বিদেশী পর্যটকরা আমাদের দেশে এলে তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কও অনেক ভাল হয়। আমাদের ঐতিহ্য, প্রাচীন গৌরব ও সংস্কৃতির নিদর্শন এবং বর্তমানের প্রগতি উভয়ের সমন্বয়ে যে সরল জীবনযাত্রা, তার পরিচয় বিদেশীরা পেতে পারেন এদেশে বেড়াতে এলে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণকল্পে যতটা তৎপরতা সরকারের দিক থেকে আশা করতে পারি, ততটা দেখতে পাই না। ●

পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশে, বিশেষ করে ফ্রান্স, ইতালী ও সুইজারল্যাণ্ডে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হল বিদেশী পর্যটকদের আগমন। পর্যটন-কেন্দ্রগুলি নানাভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিদেশীদের আকর্ষণ করার জন্য। হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাব, নাচের আসর, মদের দোকান থেকে শুরু করে কী—নেই কত কী-সব কিছুরই আয়োজন বিদেশীদের আকর্ষণ করার জন্য। সারা বছর ধরে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ পর্যটকদের পরিভ্রমণ থেকেই নিজেদের জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করে থাকেন। অথচ প্রকৃতির লীলাভূমি, প্রাচীন ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের কেন্দ্রস্থল—ভারতে কি সুন্দর জায়গার অভাব আছে? কিন্তু ভারতে পর্যটকদের সংখ্যা বাড়ছে না কেন? এ বিষয়ে ভারত সরকার যতটা তৎপর হতে পারতেন ততটা হননি। বিদেশী পর্যটকগণ কেন ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন না তার অনেকগুলি কারণ আছে। ভারতে নয়াদিল্লী, বোম্বে ও কলকাতা ছাড়া খুব কম শহরেই প্রথম শ্রেণীর হোটেল আছে। মাদ্রাজ, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, ব্যাঙ্গালোর, শ্রীনগর প্রভৃতি শহরে বিদেশীদের থাকার জন্য হোটেল আছে বটে—কিন্তু [illegible] তাছাড়া বিদেশীরা যাতে [illegible] এদেশে বেড়াতে আসেন সেজন্য [illegible] অল্প হারে বিমানযোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা করার আগ্রহ ভারত সরকারের দিক থেকে এতদিন বিশেষ দেখা যায়নি। বিদেশীরা যখন এদেশে আসেন, তখন ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগ সযত্নে দ্রষ্টব্য স্থানের তালিকা থেকে কলকাতার নাম বাদ দেন। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং ও আসামে শিলং বিদেশী পর্যটকদের কাছে আদর্শ স্থান হলেও খুবই কম সংখ্যক বিদেশীকে আতিথেয়তা দেখাতে পারে।

অনেকক্ষেত্রে বিদেশীরা যে আমাদের দেশে আসবার প্রেরণা পান না সেজন্য আমাদের রক্ষণশীলতাও অনেকটা দায়ী। মদ্যপান আমাদের দেশে অনেকের কাছেই নৈতিক অপরাধের শামিল। কিন্তু বিদেশীদের কাছে সেটা নিত্য পানীয়। বিশেষ করে খাবারের টেবিলে জলের পরিবর্তে অন্য পানীয় তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য অথচ আমাদের দেশে কেন কোন রাজ্য সরকার এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে বিদেশীদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে মদ কিনতে হয়; নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতা তাঁদের পক্ষে সুখদায়ক নয়। তাছাড়া বাঙালীদের যেমন মাছ না হলে চলে না বিদেশীদেরও তেমনি গো-মাংস ছাড়া খাওয়া চলে না। বিদেশীদের মনে এমন একটি ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে ভারতে গো-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং এজন্য রেস্তোরাঁতে তা পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। দ্বি-জাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে অবিভক্ত ভারত যে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল তারও মূল কারণ নাকি গো-মাংস নিয়ে হিন্দু, মুসলমানের বিবাদ,—এ-জাতীয় উদ্ভট ধারণাও যে বিদেশে প্রচলিত আছে, তার প্রমাণ পেয়েছি। অথচ ভারত সম্পর্কে বিদেশীদের এই অজ্ঞতা দূর করার জন্য আশানুরূপ সক্রিয় প্রচেষ্টা ভারত সরকারের দিক থেকে দেখা যায়নি।

চতুর্থ যোজনায় পর্যটন বিভাগের উন্নয়নের জন্য ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করবেন ২৫ কোটি টাকা। এই ২৫ কোটি টাকার মধ্যে ১১ কোটি টাকা খরচ করা হবে পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য এবং অবশিষ্ট ১৬ কোটি টাকা খরচ করা হবে কেন্দ্রীয় পর্যটন বিভাগের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য। এই কর্মসূচীতে আছে নতুন হোটেল নির্মাণ করা, পর্যটকদের যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা করা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এলাকায় বাংলো নির্মাণ, প্রভৃতি। বিদেশী অভ্যাগতদের জন্য অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করা দরকার। ভারতের প্রথম শ্রেণীর হোটেলগুলিতে থাকা খুবই ব্যয়সাধ্য এবং সব বিদেশী পর্যটকের পক্ষে এত টাকা খরচ

করে বেশী দিন থাকা সভব নয়। প্রয়োজনের তুলনায় চতুর্থ যোজনার বরাদ্দ যথেষ্ট কম। ভারতের হস্তজাত শিল্প এবং গ্রামোদ্যোগের উন্নয়নও যোজনার কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছে। ভারতের কুটির শিল্পজাত সামগ্রীগুলির কদর বিদেশীদের কাছে খুবই বেশি। বিদেশী পর্যটকগণ এদেশে বেড়াতে এলে শুধু যে বৈদেশিক মুদ্রাই অর্জিত হবে, তা নয়—আমাদের শিল্পজাত জিনিসগুলিও বিদেশীরা কিনবেন—আমাদের হোটেল, দোকান-পাট, প্রভৃতির ব্যবসায়ে উন্নতি হবে, এবং বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ভারত সরকারের উচিত এই শিল্পটির উন্নতির জন্য আরও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভারত কি আবার মুদ্রামূল্য হ্রাস করবে?

খবরটি খুবই ছোট, কিন্তু গভীর অর্থবহ। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন গভর্নর শ্রীএইচ ভি আর আয়েঙ্গার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ভারতের বর্তমান মুদ্রা-স্ফীতির পরিস্থিতি যদি চলতে থাকে এবং জিনিসপত্রের দাম যদি আরও বেড়ে যায়, তাহলে হয়ত ভারতকে তৃতীয়বার টাকার মূল্য হ্রাস করতে হতে পারে। অনেকে মনে করেন, লোকসভার নির্বাচনের আগে যখন ভারত সরকারের এ রকম ঝুঁকি গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ছিল না, তখন আশা করা যায়, নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ায় এ ধরনের ব্যবস্থা হয়ত গৃহীত হতে পারে।

আমাদের মনে হয়, এখনই আবার টাকার বহির্মূল্য হ্রাস করার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অবস্থা ১৯৭১ সালের গোড়ায় গত বছরের তুলনায় অনেক ভাল। কৃষি-উৎপাদনও পর পর চার বছর ধরে ভাল হয়েছে। জিনিসপত্রের, বিশেষ করে বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রীর দাম খুবই বেড়ে গেছে; তবুও কয়েকটি প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর দাম অন্যান্য ভোগ-সামগ্রীর অনুপাতে আকাশ-ছোঁয়া হয়নি। মনে থাকতে পারে, ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ টাকা করে প্রতি কিলো চাল বিক্রি হয়েছিল এবং সেটা ছিল মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তী বছর। কিন্তু, ১৯৭০-৭১ সালে চালের দাম ততটা বাড়েনি। গম সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রী এইচ ভি আয়েঙ্গার ব্যাংকিং জগতে একজন বিশেষজ্ঞ; মুদ্রা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই তাঁর সতর্কবাণী সম্পর্কে যথেষ্ট ভাববার আছে। মুদ্রামূল্য হ্রাস করা তখনই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যখন বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি কোন প্রকারেই দূর করা সম্ভব হয় না এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মেটাবার মত বিদেশী সাহায্য, অনুদান অথবা বিনিয়োগও সহজলভ্য হয় না। ১৯৬৬ সালে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুদ্রামূল্য হ্রাস করার আগে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল; বর্তমানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। তবুও, বর্তমানে সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা যতটা বেড়েছে তেমনটি আর কোনদিনই দেখা যায়নি। নবগঠিত সরকার যদি এই সমস্যার প্রতিরোধে ব্যর্থ হন তবে হয়ত শ্রী আয়েঙ্গারের আশংকাই সত্যে পরিণত হবে। যাতে এই ধরনের আশংকা সত্যে পরিণত না হয় সেজন্য সরকারের উচিত একদিকে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ এবং অপরদিকে আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রয়াস (বিশেষ করে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে) জোরদার করা।

সুব্রত গুপ্ত

বিনামূল্যে!
৪টি রঙীন
লন্ড্রি ক্লিপ পাবেন

FOAMEX
THE SUPER CLEANING POWDER

এ-দুষ্কর কার্যের শ্রম ও তোমার নিপীড়ন আমার অতি অসহ্য। এই দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়ের নিমিত্তে পূর্ব বৃত্তান্ত তোমাকে কহি। আমি পূর্বজন্মে মনুষ্য-দেহে তোমার স্থানে পঞ্চশত মুদ্রার ঋণী থাকিয়া মরিয়াছিলাম; সেই কর্মফলে এই পশুযোনি-প্রাপ্ত হইয়া তোমার নিকটে বদ্ধ থাকিয়া তোমার এই কর্ম করিতেছি। কিন্তু এখন অতি দুর্বল হইয়াছি, অতএব তোমার ঋণের পরিশোধ ও আমার দুঃখের ত্রাণের কারণ এক উপায় আছে : তুমি আমাকে সদয় হইয়া তাহা করহ।'

ধনঞ্জয় কহিল, 'কি?' বৃষ কহিল, 'ঐ পূর্বজন্মে এক ব্যক্তি আমার নিকটে ঋণী থাকিয়া মরিয়া আপন কৃত অন্য কোন কর্মফলে এ-জন্মে হস্তী হইয়া এ-নগরের রাজার সংসারেতে বদ্ধ আছে। তুমি রাজার নিকটে যাইয়া কহ যে, আমার এক বৃষ আছে; মহারাজের হস্তির সহিত তাহার যুদ্ধ করাইতে চাহি—এই নিয়মে যে, আমার বৃষ পরাভূত হইলে আমরা সপরিবারে রাজসংসারে বিক্রীত হইব ও হস্তী পরাভূত হইলে সহস্র মুদ্রা পাইব। যুদ্ধকালে ঋণভয়ে হস্তী নিকটেও আসিতে পারিবে না—অতএব জয় হইবেক। তাহাতে তোমার মুদ্রা শোধ হইয়া উপরন্তু লভ্যও হইবেক।' তৈলকার ইহা শুনিয়া রাজসংসারেতে গিয়া ইহা কহিল। রাজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কৌতুক দেখিবার কারণ ইহাতে আজ্ঞা দিলেন। পরে নির্দিষ্ট কোন সময়ে ঐ বৃষ তার হস্তিকে যুদ্ধার্থে এক স্থানেতে উপস্থিত করণেতে হস্তী বৃষকে দেখিয়া পূর্বজন্মকৃত ঋণ স্মরণ হইয়া ভয়েতে স্তব্ধ হইল। বৃষ নানা প্রকার আস্ফালন ও ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিল। ত্রাসে তাহার নিকটে হস্তী আসিতেও পারিল না। এ প্রকারে হস্তী পরাভূত হওনেতে তৈলকার বৃষের ঋণ—সহস্র মুদ্রা—রাজার সংসার হইতে পাইয়া বৃষকে পরিত্যাগ করিল।"

অল্পসংখ্যক গল্পে পরমেশ্বরের মঙ্গল-বিধান উল্লিখিত হয়েছে : 'বিপৎকালে ঈশ্বরকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিলে সে-বিপৎ হইতে মুক্ত হয়...ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার কোনরূপে আপদ হয় না...... প্রাণিরদিগের রক্ষার্থে পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা, তাহা কহা যায় না...। একটি গল্পে বাইবেলীয় ভাবার আভাস মেলে : "ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি তাহার প্রতি ছিল (...) ঈশ্বরের প্রেরিত দূতে সদা তাহাকে রক্ষা করিলেন।"

ইতিহাসমালার কোনো কোনো নীতি নেতিবাচক রূপে ধরা পড়েছে : ছোট লোককে মুখ দেওয়া ভাল নয়...ছোট লোকের হিত বাক্যও কহিবে না...আসল শূদ্রের নিকট কদাচ যাইবা না...কর্মত্যাগ

বৃষ নানাপ্রকার আস্ফালন করিতে লাগিল

বিরোধ কর্তব্য নহে...।
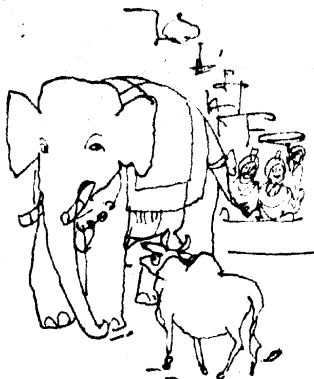
আত্মরক্ষার জন্য সাহসের প্রয়োজন : "যদি সামান্য পুরুষও বিপৎকালে সাহসী হয়, তবে সে অবশ্য আপৎ হইতে উত্তীর্ণ হয়।" কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার চাতুর্য দরকার। "যে-কর্ম উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা পরাক্রমে হয় না..."। এমন কি ধূর্ততা : "ধূর্তের কাছে ধূর্ততা ব্যতিরেকে কর্মসিদ্ধি হয় না...শঠ ব্যক্তির সহিত শাঠ্য করিবেক।"

রাজার প্রতিজ্ঞা পালনে লক্ষ্মীর পলায়ন

এমন গল্প আছে যার নীতি অনুচ্চারিত : ইতি গুণ প্রশংসা...ইতি খলের ইতিহাস...। 'রাজার প্রতিজ্ঞা পালনে লক্ষ্মীর পলায়ন' গল্পটি ঐ ধরনের। "নরসিংহ নামে রাজা এক হাট বসাইয়া ঘোষণা দিলেন যে, 'আমার এ হাটে যে-যে সামগ্রী বিক্রয় করিতে আনিবে, তাহা বিক্রয় না হইলে সন্ধ্যাকালে আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইব।' পরে যে-যে দ্রব্য হাটে কেহ ক্রয় না করিত, তাহা রাজা সায়ংকালে আপনি ক্রয় করিতেন। অনন্তর এক দুষ্ট লোক এক দিবস এক অলক্ষ্মী প্রতিমা গঠাইয়া ঐ বাজারেতে বিক্রয় করিতে আনিল। লোকেরা তাহা দেখিয়া তাহার গুণ ও মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রতিমা-বিক্রেতা কহিল এ-প্রতিমা যে-স্থানে থাকেন, সে-স্থানে লক্ষ্মী কদাচ থাকেন না—ইহার এই গুণ; আর ইহার মূল্য : সহস্র মুদ্রা।' এই সকল কথা শুনিয়া সে-মূর্তির নিকটে কেহ গেল না। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা এ-প্রতিমা ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অমাত্যবর্গেরা কহিল, হে মহারাজ এই প্রতিমা যে-গৃহে থাকে, সে-গৃহেতে লক্ষ্মী কদাচ থাকেন না, ও সম্পত্তি না থাকিলে সম্মান ও ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে না। অতএব এই মূর্তি একান্ত লইবেন না।' রাজা কহিলেন, 'সম্পত্তি প্রভৃতি থাকুন কিম্বা না থাকুন, আমি যেরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা কদাচ করিব না।' ইহা বলিয়া সহস্র মুদ্রা দিয়া ঐ অলক্ষ্মী মূর্তি লইয়া আপন ধনাগারে রাখিলেন।

পরে ঐ দিন অবধি আত্ম-কলহাদি নিরন্তর হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মী ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কে? তখন লক্ষ্মী কহিলেন, 'আমি সম্পত্তি। এখানে অলক্ষ্মীর বসতি হইল; অতএব স্থানান্তরে যাইব।' রাজা কহিলেন, 'ভাল'। এইরূপে সম্মানও গেলেন। পরে ধর্মও রাজাকে কহিলেন, 'যে-স্থানে অলক্ষ্মীর প্রভুতা হয়, সে-স্থানে আমি থাকিতে পারি না; অতএব তোমার স্থানে বিদায় হইয়া যাই।' নৃপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন যে, 'লক্ষ্মী এবং সম্মানের এ-স্থান হইতে যাওয়া উপযুক্ত বটে। আমি তোমার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করিয়া অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিয়া লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলাম...এখন তুমি কি-প্রকারে যাইতে চাহ?' ধর্ম ইহা শুনিয়া পুনরাবৃত্ত হইয়া রাজগৃহে থাকিলেন। ধর্মের থাকাতে পুনর্বার লক্ষ্মী প্রভৃতিও আসিয়া থাকিলেন। এবং তাঁহারদের থাকাতে অলক্ষ্মী ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। রাজা ধর্মানুষ্ঠানে স্বচ্ছন্দে থাকিলেন।"

হাঁড়ি ভাঙ্গে, রাণী হাসে

ইতিহাসমালার প্রতিটি 'কথা' নীতি-মূলক গল্প নয়, এমন কি একাধিক গল্পে কোনো আখ্যায়িকা নেই [৬০, ৬৭, ১০২]। নীতিহীন গল্পের মধ্যে আছে স্থূল রসের একটি গল্প [রাজা ও ভাঁড়ের স্বপ্ন : "আমি দেখিলাম, আমরা দুইজন আপন আপন কুণ্ড হইতে উত্থান করিয়া মহারাজ দাসের অঙ্গ এবং এ-সেবক মহারাজের শরীর চাটিতে লাগিলাম"] এবং কয়েকটি 'দুর্নীতি-গল্প' : পত্নী ও উপপতি; বণিক বধূর সতীত্ব-পরীক্ষা; হাঁড়ি ভাঙ্গে, রাণী হাসে...।

"এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর

dura stitch

মন্ত্রীর সঙ্গে আত্যন্তিকী প্রীতি ছিল। এক দিবস মন্ত্রী রাণীকে কহিল, 'হে রাণী, আমারদের গোপনভাবে এ প্রীতি রাজা জ্ঞাত হইলে প্রাণে বধিবেন। অতএব চল, এ স্থান হইতে দেশান্তরে যাই। অদ্য নিশাভাগে এই নগরের অন্তে পুষ্করিণীর তটে বৃক্ষের মূলে আমি বসিয়া থাকিব; তুমি কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া আমার নিকটে যাইবা। পরে দুইজনে একত্র হইয়া সুখে গমন করিব।' এই সঙ্কেত করিয়া মন্ত্রী আপন ঘরে গেল। রাত্রি হইলে মন্ত্রী সেই বৃক্ষের মূলে বসিবামাত্র সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল। পরে রাণী নিশাশেষে রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া সেই স্থানে গিয়া দেখিল যে উপপতি মরিয়াছে। তাহাতে উদ্বিগ্ন

হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল

হইয়া দেশান্তরে যাইয়া বেশ্যাধর্ম আশ্রয় করিল। তাহার পর রাজার মরণান্তর পাত্র-সভাসদ প্রভৃতিরা বিচার করিয়া রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাজপুত্র যুবাবস্থা প্রাপ্ত হইল ও মহামত্ত হইয়া বেশ্যা গমন করিতে লাগিল; ও দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া, যেখানে ভাল বেশ্যা পায় সেই স্থানে যায়। ইতিমধ্যে যে স্থানে তাহার মাতা বেশ্যা হইয়াছে, সে স্থানে গিয়া তাহার সঙ্গে অভিগমন করিল। কিন্তু রাণী আপন পুত্র বলিয়া জানিল। তারপর সে পুত্র মরিলে তাহাকে দাহ করিবার সময় রাণী চিতা প্রবেশ করিতে গেল, তাহাতে ভয়ানক অগ্নি দেখিয়া পলাইয়া এক গোপ-গৃহে যাইয়া রহিল। রাজরাণী ছিল বেশ্যাধর্ম করিল, দুঃখ জানে না। গোপ-গৃহে কতদিন বসিয়া খাইবে? এক দিবস গোপ কহিল, বসিয়া কি করিতেছিস? ঘোল বিক্রয় করিতে যা।' ইহা কহিয়া ঘোলের হাঁড়ি মাথায় তুলিয়া দিল। রাজরাণী মাথায় ঘোলের হাঁড়ি লইয়া দুই তিন পাদ গমন করিবামাত্র মস্তক হইতে ঘোলের হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। রাণী হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। সকলে দেখিয়া কহিল, 'তোর লজ্জা নাই? ঘোলের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাসিতেছিস?' তখন রাণী কহিল, 'আমি রাজাকে মারিয়াছি, উপপতিকে সর্পাঘাত হইল, তাহা দেখিয়া বেশ্যাধর্ম করিলাম, তাহাতে পুত্রেতে রত হইয়া চিতা প্রবেশ করিতে গেলাম, সেখান হইতে পলাইয়া গোপ গৃহিণী হইলাম, আজি কিঞ্চিৎ ঘোল নষ্ট হইল, এজন্যে শোক করিব?"

নাপিতের চুরি, ব্রাহ্মণের মৃত্যু

আরেকটা 'দুর্নীতি-গল্প' হল : নাপিতের চুরি, ব্রাহ্মণের মৃত্যু। "অত্যন্ত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতেন, ও তাঁহার বন্ধু এক নাপিত ছিল। নাপিতও অত্যন্ত দুঃখী; আপন ব্যবসায়ের দ্বারা প্রত্যহ দুঃখ পাইয়া আহারের সংস্থান করিয়া কালক্ষেপ করে। ব্রাহ্মণ একদিন নাপিতকে কহিলেন, 'হে মিত্র, আমার পুত্রের যজ্ঞোপবীত দিতে হইবেক। এখানে প্রত্যহ যাহা ভিক্ষা করিয়া আনি, তাহা থাকে না, আহার করিতে যায়। এখান হইতে অন্য দেশ গমন করিয়া কিছু না আনিলে পুত্রের উপনয়ন হয় না। অতএব ইহাতে কি পরামর্শ তোমরা আমাকে দেহ।' নাপিত ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিল, মহাশয়, ভাল আজ্ঞা করিয়াছেন। আমার পুত্রের বিবাহ দিব। দুই মিত্র একত্র বিদেশ গমন করিয়া যাহা আনিতে পারি তাহাতে আপন আপন কর্ম-নির্বাহ হয়। নতুবা এখানে থাকিয়া কিছু হইতে পারে না।' এ-মত দুইজন পরামর্শ স্থির করিয়া বিদেশ গমন করিলেন। এক ভদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়া বাসা করিয়া থাকিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ধনবান লোকের আলয়ে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া ভিক্ষা করেন; সকলেই কিছু কিছু দেয়; প্রায় চল্লিশ টাকা ভিক্ষার দ্বারা পাইলেন। নাপিত প্রত্যহ আপন ব্যবসায় দ্বারা পনর টাকা উপার্জন করিল। দুইজন পরস্পর কহিলেন, 'চল, দেশে যাই; যাহা এখানে পাইলাম, ইহাতে কর্ম নির্বাহ হইতে পারিবেক।' দুইজন একত্র হইয়া আপন আপন মুদ্রা লইয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে রাত্রি হইল, সেখানে এক গৃহস্থের বাটীতে দুইজন অতিথি হইয়া থাকিলেন। ভোজনান্তে দুইজন শয়ন করিল। ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল, তখন ধূর্ত নাপিত মনে বিবেচনা করিল, 'ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া উহার ধন লইয়া আমি দেশে প্রস্থান করি; তবে পুত্রের বিবাহ, ঘটা করিয়া দিতে পারিব। নতুবা যে টাকা আমি লইয়া যাইতেছি, ইহাতে কর্ম নির্বাহ হইবে না।' ইহা স্থির করিয়া অল্পে অল্পে ব্রাহ্মণের গলদেশে ক্ষুর দিয়া প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণের সমুদায় টাকা লইয়া সে রাত্রে সেখান হইতে আপন নগরেতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের বাটীতে সমাচার দিল, 'তাহার পীড়া হইয়া বিদেশে মৃত্যু হইয়াছে।' ব্রাহ্মণী স্বামীর মৃত্যু সমাচার শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ধূর্ত নাপিত আপন আলয়ে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রহিল।"

এটি কিন্তু [illegible] সবচেয়ে দুর্নীতিমূলক গল্প নয়। সেটা এই :

"একজন কৃপণ ও একজন দুষ্ট লোক—এই দুইজনের অতিশয় প্রীতি ছিল। এক দিবস উভয়ে একবাক্য হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে কোন নির্জনে দেবালয়ে গিয়া মন স্থির করিয়া ধ্যানযোগে রহিলেন। এই প্রকারে কিছুদিন ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বর তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, 'হে পুত্র, আমি তোমারদিগের আরাধনায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। অতএব বর প্রার্থনা কর। তোমারদিগের মধ্যে একজন যে বর প্রার্থনা করিয়া যে ফল পাইবা, দ্বিতীয় জনের বিনা প্রার্থনায় ঐ ফলের দ্বিগুণ ফল-প্রাপ্তি হইবেক।' ঈশ্বরের এই বাক্য শুনিয়া কৃপণ নীরব হইয়া থাকিল। দুষ্ট ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে বর প্রার্থনা করিল যে, 'আমার এক চক্ষু অন্ধ হউক।' ঈশ্বর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দ্বিতীয় জনের দুই চক্ষু অন্ধ হইল।"

আশ্চর্য কেরী সাহেব

যে সমস্ত গল্পের বিষয়বস্তু খ্রীষ্ট-ধর্মতত্ত্ব-বিরোধী অদৃষ্ট, কর্মফল কিংবা শঠের সঙ্গে শাঠ্য করিবে ধরনের নীতি, সেগুলি যে ইতিহাসমালায় স্থান পেয়েছে, কথাটি কারো কারো চোখে আশ্চর্য লাগাতে পারে। আশ্চর্যতর লাগবে হয়ত কেরীর সেই সংকলনে ভাঁড়ের ও বেশ্যার কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি। শেষোক্ত গল্পদ্বয় [illegible] বন্ধুর সেই চূড়ান্ত প্রবঞ্চনা এবং খুব বিশেষভাবে পরমেশ্বরকে নিয়ে সেই [illegible]। একজন গোঁড়া মিশনারি যে, নায়কদের আচরণ কোনোমতেই নিন্দা না করে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি, তা বোধ হয় আশ্চর্যতম।

…নাকি সেই কারণেই সংকলনটি প্রচারিত হয়নি?

কী সুন্দর কফি! যে হাতে তৈরী
অর মত ...আপনার!
POLSONS
FRENCH
COFFEE
COFFEE & CHICORY
BLEND
অভিরুচি মত
সুন্দর কফি
তৈরী করতে
দরকার
শুধু ২টি মিনিট
পলসনের
ফ্রেঞ্চ কফি
everest/18e/PL/Ben

ও-পার বাংলার গান এ-পার বাংলায়

মনে পড়ছে কয়েক বছর আগেকার কথা। [illegible] বন্ধু এসেছিলেন বেতারের একটি স্ক্রিপটের ব্যাপারে। অনুষ্ঠানটা কি ছিল মনে নেই, তবে সেটা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অনেকে তখন মনে করতেন আমরা মিছেই পূর্ব পাকিস্তানের মন জয় করতে চেষ্টা করছি কারণ আমাদের বন্ধুত্ব এবং প্রীতির সম্ভাষণ প্রত্যাখ্যাত হবে রাগে এবং বিদ্বেষে। কিন্তু তখন হয়ত আমরা [illegible] ঢাকার বেতার কোনও সময় [illegible] মুখপাত্র ছিল না, উক্ত দেশের মানসিক প্রতিফলন ঘটেনি এখানকার বেতার প্রতিষ্ঠানে। তখন একটা কথা মনে পড়েছিল যা লেখক বরাবর বিশ্বাস করে এসেছেন যে দেশ ভাগ হতে পারে, কিন্তু মন ভাগ হয় না। আমাদের বেতার থেকে এই কথাটি প্রচারিত হয়েছিল এবং [illegible] এই প্রচারিত হয়েছে শুনেছি।

[illegible] হিন্দু মুসলমানের মনোভাবটা [illegible], বরং মিলটাই সত্যি; কিন্তু কি কি কারণে উভয়ের মধ্যে বৈষম্য [illegible] এবং উত্তেজনার পরিমাপ [illegible] হয়নি তা হয়ত ইতিহাসের [illegible] প্রকাশ পাবে যখন পরিপূর্ণ [illegible] পর আমাদের আত্মশুদ্ধি [illegible] দিক থেকে একটা সুবিধা ছিল [illegible] থেকে এমন একটা [illegible] সুযোগ হয়েছিল যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক সঙ্গে বাস করতেন এবং সম্পর্কটা ছিল গভীর প্রীতির। এই অভিজ্ঞতায় যে কত উপকৃত হয়েছি তা আজ বুঝতে পারি এবং এই উপলব্ধির ফলেই এই প্রত্যয় বরাবরই [illegible] যে নানা কারণেই উভয় বাংলা [illegible] কাছাকাছি আসবেই।

ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গে শুনে এসেছি বহু বাউল দরবেশের গান। লোকে তাদের [illegible] বলত। তারা বোধ হয় সুফী মতের লোক ছিল। তাদের গানে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। মুসলমানী কয়েক ধরনের গান যেমন তাদের ছিল, তেমনি ছিল বৈষ্ণব সঙ্গীতের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সাহেব আলী জাতে ছিলেন মুসলমান কিন্তু তাঁর গান "মনদুঃখে মরি রে সুবল সখা ব্রজের কিশোরী রাধা [illegible]" আজও আমার কানে লেগে আছে। আর কি চমৎকার দোতারা বাজাতেন তাঁরা। সে [illegible] একটা আর্ট। বহু ফকীর দরবেশের গানের পুঁজি ছিল অসামান্য, [illegible] হিন্দু শিষ্য পরম ভক্তি সহকারে সেগুলি সংগ্রহ করত। আজ মনে হয় সেই

সময় কেবলমাত্র ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহের কোনও কোনও অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যদি গান সংগ্রহ করতাম তাহলে আজ বোধ হয় গর্ব করবার মত সংগ্রহ হত।

এ কাজ অবশ্য অনেকে করেছেন। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই রকম নানা গান নানা আসরে শুনেছি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও এই সংগ্রহকে কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু বাঙালী শ্রোতা আর্টের দিক থেকেই এসব গানের সমাদর করেছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই সব গানের প্রচার সার্থক হয়নি।

দেশ বিভাগের পর কোনও কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল যাঁরা গভীর যত্নে এইসব গানের সংরক্ষণে যত্নবান হয়েছেন। এ যেন তাঁদের বুকের রক্ত। পদ্মার ঢেউ আর তাঁরা কোনওদিন দেখবেন কি না জানেন না, সেই জলে ডোবা পাটক্ষেত আর হয়তো জীবনে চোখে পড়বে না, সেই ফেলে আসা গ্রাম, মাঠ, প্রান্তর, খাল, বিল, পথ, ঘাট—হয়তো চিরকালের মত স্মৃতির বস্তুই হয়ে রইল—শুধু নিয়ে আসতে পারলেন কতকগুলি গান আর তাদের সুর। এখানে যখন আকাশ কালো হয়ে আসে তখন তাঁরা প্রমত্ত পদ্মার কথা স্মরণ করে গানের পর গান গাইতে থাকেন; এখানে যখন বসন্তে আমের মুকুল মঞ্জরিত হয়ে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস দিতে থাকে তখন তাঁরা তাঁদের দেশের গন্ধামোদিত গ্রাম পথ, পল্লীভবনের কথা স্মরণ করে দোতারায় ঝংকার তোলেন। বেদনায় সংরক্ষিত এই যে বস্তু—এর মূল্য বোধ করি নির্ণয় বা পরিমাপ করা যায় না। তাঁদের ভয় ছিল হয়ত উর্দুর প্রসারে বা অন্যান্য বিবিধ কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে এইসবই লুপ্ত হয়ে যাবে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন উপনিবেশ, জেগে উঠবে নতুন "জেনারেশন" যারা এই ঐতিহ্যের আর কোনও খবরই রাখবে না! তাই যতটা পারা যায় তাঁদের জিনিসকে তাঁরা গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে।

এপার বাংলা তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করেনি। এখানকার বেতার, সাংস্কৃতিক আসর তাঁদের সাদর আহ্বান জানিয়েছেন, এখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন যাতে পূর্ববঙ্গের সঙ্গীত-শিল্প বিনষ্ট না হয়। এই কলকাতাতেই বহু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে লোক-সঙ্গীতের চর্চায় পূর্ববাংলার লোকগীতি একটি প্রধান বস্তু। মৈমনসিংহ-গীতিকার কত পালা আমরা এ কবছরে পূর্ববাংলার লোকসঙ্গীত সহযোগে অভিনীত হতে দেখলাম। অন্তত গানের দিক দিয়ে পূর্ববাংলার কোনও সুরই পশ্চিমবঙ্গে অবহেলিত নেই।

আজকের নবজাগরণের দিনে ওপার বাংলা নিজস্ব শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাংলা ভাষাকে সকল লাঞ্ছনা থেকে তাঁরা সগৌরবে রক্ষা করেছেন। দেশবাসীর এই পুণ্য অভ্যুত্থানে এপার বাংলা থেকে আমরা অভিনন্দন জানিয়ে বলতে পারি ওপার থেকে আমরা যা পেয়েছি তাকে সগৌরবে, সযত্নে রক্ষা করে এসেছি, তাকে পালন করেছি, বিস্তার করেছি, তার বীজ নিয়ে নতুন সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছি। মন—মনের ভাগ হয়নি। দুই বাংলার বাঙালীই আজ নিজেদের প্রত্যয়ে আত্মগতভাবে অভিন্ন থেকে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার গানের আসরে ৫৫৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—"তা ছাড়া যেহেতু ভরত গান্ধার গ্রামের উল্লেখ করেননি সেহেতু উক্ত গ্রাম পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা—এ সব কোনও যুক্তি নয়"। এই লাইনের "পরবর্তী" শব্দটি "পূর্ববর্তী" হবে। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি উদ্ধৃতাংশ "anterior" শব্দের পরিপ্রেক্ষিতেই এটি বলা হয়েছিল।

শার্ঙ্গদেব

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে চারিদিকে বহু ঘটনা ঘটে থাকে যেগুলি সচরাচর সকলের চোখে পড়ে না। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত শিল্পী, তাঁদের চোখে সেগুলি ধরা পড়ে, কারণ তাঁদের চক্ষু দুটি সজাগ। যিনি কথাশিল্পী তিনি এ জাতীয় ঘটনা অবলম্বনে কথার মালা গেঁথে সাহিত্য সৃষ্টি করেন; চিত্রশিল্পী এগুলিকে কেন্দ্র করে রঙ ও তুলির মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি করেন, আবার স্থির চিত্রশিল্পী ক্যামেরার মধ্য দিয়ে এই ঘটনাকেই চিরস্থায়ী করে রাখেন। একটি অন্ধ ভিখারীকে দেখে আপনি দয়াপরবশ হয়ে পয়সা দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু আপনি চলে যাবার পরে সে যখন পয়সাটি দুটি অন্ধ চোখের কাছে এনে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে বুঝতে চাইল এটা পাঁচ বা দশ পয়সা, তখন তার মুখে মুহূর্তের জন্য কি ভাব ফুটে উঠল সেটা আপনি জানতে পারলেন না। আপনারই বাড়ির উঠানের এক কোণে দুটি ছোট্ট বিড়ালছানা পরম আনন্দে খেলছে, পরস্পরকে কামড়াচ্ছে—আপনি হয়ত সেটি চোখেও দেখেন না। অথচ শিল্পী বা স্থিরচিত্রশিল্পীর চোখে এ দুটি জিনিসই ধরা পড়ে। কথাগুলি মনে এল বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল আয়োজিত একটি স্থিরচিত্র প্রদর্শনী দেখে। প্রদর্শনীতে ৪৬ জনের একবর্ণ ও ১৬ জনের রঙীন স্থিরচিত্র নিদর্শন দেখা যায়।

স্থিরচিত্র শিল্পক্ষেত্রে ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল একটি সুপরিচিত সংস্থা। যোগ্য সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সাহার পরিচালনায় এই সংস্থা গত কয়েক বছর যাবৎ স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সংস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্বাচন তথা বিচার পদ্ধতি। কয়েকটি সাধারণ নিদর্শন থাকলেও, প্রদর্শনীর মান উন্নত। সব চেয়ে বড় কথা, সবগুলিই স্বাভাবিক স্থিরচিত্র হিসাবে গৃহীত, কোনটিতে ক্যামেরাকৌশলের আধুনিকতম কোনও ছাপ নেই। সকলেই জানে যে, স্থিরচিত্রে রসসৃষ্টি করতে হলে চারটি গুণ অত্যাবশ্যক : বিষয় নির্বাচন তথা কম্পোজিশন, প্রকৃত স্থানে দৃষ্টি সমাবেশ, বিশেষ মুহূর্তটিকে ধরে রাখা ও

নো টাইট্‌ল্ —মুকুল দে

ক্যামেরাচালনা। নিদর্শনগুলি দেখে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন স্থিরচিত্রশিল্পী আপন আপন পছন্দমত নানা ঘটনা ক্যামেরায় ধরার চেষ্টা করেছেন। অনেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দৈনন্দিন জীবন থেকে উপযুক্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কমপোজিশন ও স্বাভাবিকতার দিক থেকে দুলাল গড়াইয়ের ইয়ং আর্টিস্ট ও টি নরেন্দ্র পাল সিং-এর ল্যাম্প অ্যান্ড দ্য গার্ল এর উল্লেখ করা যায়। শিশুর ছবির মধ্যে বিবেকানন্দ দাসের বিজ বুটস আর নট মেড ফর ওয়াকিং ও ডি রায়ের সোনিয়ার নাম করা যায়। অভিনব বিষয়বস্তু ও কমপোজিশনের দিক থেকে কয়েকটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন সমর ব্যানার্জির সাসপিসিয়াস, টি কাশীনাথের টেন্ডার লাভ ও অরুণাংশু মুখার্জীর পার্টিং টাইম। প্রথমটির বেঞ্চে উপবিষ্ট পুরুষ ও শায়িতা নারীর সন্দেহাকুল চোখের ভাষা, দ্বিতীয়টির আলোছায়ার বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অতি স্বাভাবিক একটি বিষয়বস্তুর অপরূপ রূপায়ণ ও তৃতীয়টির স্টেশনের ওয়েটিং রুমের স্বল্পালোকে গৃহীত একটি যুগলের বিদায় গ্রহণ দৃশ্য সকলেরই ভাল লাগে। আর একটি নিদর্শনে মুকুল দে (নো টাইট্‌ল্) তার অনুসন্ধিৎসু চোখের পরিচয় দিয়েছেন। পোস্টার ও স্লোগান জর্জরিত দেওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে একজন বৃদ্ধের অজ্ঞাতে স্থির চিত্র গ্রহণের ফলে তাঁর মুখের বিরক্তিভাবটুকু স্থির চিত্রশিল্পীর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। আর একটি সুন্দর নিদর্শন, যোগীন্দ্র চাওলার প্রিন্ট নং ৩। ধাবমান একটি বাছুরের একটি বিশিষ্ট রূপ এটিতে ফুটে উঠেছে। অপরাপর নমুনার মধ্যে নিশীথ রায়ের ডোন্ট টক, টি কাশীনাথের ফেয়ারওয়েল, তারা দাশগুপ্তের দেয়ার ইজ নান ও ধ্রুব দাশগুপ্তের নো টাইটল-এর নাম করা যায়। মোট ২৪৪টি প্রাপ্ত স্থিরচিত্রের মধ্য থেকে

[illegible] মাত্র ১০৩টি নির্বাচিত করে সুনির্বাচনের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, তবে দুঃখের বিষয় সমস্ত প্রদর্শনীতে ঠিক সমকালীন যুগের কোনও আভাষ পাওয়া গেল না। এটা উদ্যোক্তাদেরও নজরে পড়েছে, এবং তাঁরাও এ বিষয়ে অবহিত হয়ে সমকালীন যুগের প্রতিরূপ ফলনের উদ্দেশ্যে বর্তমান তরুণ সম্প্রদায় ও পথ ব্যবসায়ীদিগ বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ঐ বিষয়ে উপযুক্ত ও যথাসংখ্যক স্থিরচিত্র তাঁরা পাননি। চিরপরিচিত ও শাশ্বত বিষয়বস্তু অবলম্বনে স্থিরচিত্রশিল্পিগণ রস সৃষ্টি করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সমকালীন জীবনের বিভিন্ন দিকও তাঁদের ভুললে চলবে না। কারণ যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, শিল্পে, সাহিত্যে, নাটকে আজ সকলেই সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলন দেখতে চান। এবং যাঁরা প্রকৃত শিল্পী, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করেই রসসৃষ্টি করে থাকেন। আশা করি দেশের স্থিরচিত্রশিল্পিগণ এ বিষয়ে সচেতন হবেন। রঙীন স্থিরচিত্রের প্রাপ্ত ১০৩টি ট্র্যান্সপেরেন্সির মধ্য থেকে প্রদর্শনীতে ২৪টি নির্বাচিত করে দর্শকদের দেখানো হয়। বলা বাহুল্য এগুলির মান খুব উন্নত নয়। অধিকাংশের বিষয়-বস্তু পরিচিত ও সাধারণ। এগুলির মধ্যে অজয় ঘোষের অ্যামেচার, পেণ্টার ও ড্যাডি আই ক্যান মুভ ইট ডি এস নাহারের সিস্টার, অরুণাংশু মুখার্জীর রিটার্ন ও পি কে দে'র রাফ ওয়েদারের নাম করা যায়।

*

শিল্পী ওয়াই সি মোহান্তি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে তেল ও জলরঙের ৫০টি নিদর্শন দেখা যায়।

মোহান্তি একজন স্থপতি। উড়িষ্যার সম্বলপুরে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি বোম্বাইয়ে স্যার জে জে ইন্সটিটিউট অব আর্টে স্থাপত্যবিদ্যা শেখেন ও এখন স্থপতি হিসাবেই [illegible] কাজ করেন। গত ১২ বছর যাবৎ তিনি নিষ্ঠাসহকারে ছবি আঁকছেন এবং [illegible] বহু স্থানে প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্থপতিও শিল্পী, কারণ শিল্পীসুলভ মন ও চিন্তাধারা অনুযায়ী তাঁকে ছবির পরিবর্তে [illegible], সুন্দর ও নতুন ধরনের নানা ইমারতের পরিকল্পনা করতে হয়। তাছাড়া স্থাপত্যবিদ্যা শিক্ষাকালে এক বছর তাঁকে আবশ্যিকভাবে চিত্রাঙ্কনও শিখতে হয়। সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও আর্ট স্কুলে শিক্ষা না পেলেও শিল্পসৃষ্টি ও সেই সঙ্গে শিল্পকর্ম সৃষ্টি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। লে কর্বুজিয়ে প্রমুখ পৃথিবীতে বহু খ্যাতনামা স্থপতি আছেন যাঁরা শিল্পী হিসাবেও সুপরিচিত। দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, এখনও অনেকে স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ে সঠিক জানেন না এবং স্থপতিকে সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে ভুল করেন। স্থপতি হিসাবে শিল্পী তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে প্রফুল্ল মোহান্তি (ইউনিক গ্যালারীর প্রদর্শনী স্মরণীয়)র পথ অনুসরণ করলেন। শিল্পী বহুকাল ইংলণ্ডে ছিলেন, সম্ভবত সেজন্যই তাঁর রঙ ব্যবহার রীতিতে ঐ দেশের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। অঙ্কনরীতির কোন নির্দিষ্ট ধারা দেখা যায় না। কয়েকটি ছবিতে নিছক সরলতার ছাপ আছে, আবার কয়েকটিতে গ্রাফিকের রেখাভিত্তিক কারুকার্য দেখা যায়। শিল্পীর বিষয়বস্তুও নানা জাতীয়। কোনওটি ইমপ্রেশানিস্টিক, আবার অন্যটি

হয়েছে সর্মবিমূর্ত। শিল্পী চাপা রঙ ব্যবহারের পক্ষপাতী, এবং এই রঙ ব্যবহার প্রণালীর বৈশিষ্ট্যের জনাই কয়েকটি কাজ ভাল লাগে। তবে যে স্থলে তিনি বহুর পরিবর্তে একটি বা দুটি মূর্তি এঁকেছেন সেখানেই তিনি অধিক সাফল্যলাভ করেছেন, যেমন ব্যালেরিনা ও ভেলাসিটি। নিছক সরলতার দিক থেকে দি বিগিনার অনেকের চোখে পড়ে। গভীর নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারী মদ্যপান করছে—দুজনের মুখেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে। সর্মবিমূর্ত রচনা হিসাবে ফিগার ইজ এ সঙ এর উল্লেখ করা চলে। একটি বৃত্তকে কেন্দ্র করে শিল্পী প্রতীকমূলকভাবে একটি বাদ্যযন্ত্রের মধ্য দিয়ে নিজ বক্তব্যটুকু প্রকাশ করতে চেয়েছেন। স্টিল লাইফ নিদর্শন হিসাবে এনং দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ফিশার উওম্যান। পিছনে কয়েকটি কুটীর ও পুরোভাগে মাছের ঝাঁকা নিয়ে কয়েকজন জেলেনী বসে আছে। দু' একটি নীল, হলুদ ও লালরঙের মধ্য দিয়ে শিল্পী এই ছবিটি পরিচ্ছন্ন সুষম পরিকল্পনায় রূপায়িত করেছেন। আগেই বলেছি, শিল্পীর অংকনরীতিতে নির্দিষ্ট কোনও ধারা তথা স্টাইলের সন্ধান পাওয়া যায় না। কয়েকটি যেমন ভাল লাগে তেমনি অনেকগুলিই রসোত্তীর্ণ হয়নি। মনে হয় শিল্পী প্রধানত পরীক্ষামূলকভাবে নানা রীতিতে কাজ করার চেষ্টা করে কয়েকটিতে আশানুরূপ ফললাভ করেছেন, অন্যগুলি নির্দিষ্ট কোনও মানের পর্যায়ে উঠতে পারেনি।

*

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দাদের আচারব্যবহার, রীতিনীতি ও পরিচ্ছদে পার্থক্য দেখা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিল্প ও কারুকলা তথা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভারতের এক একটি প্রদেশে আপন আপন বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আবার সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বিভিন্ন প্রদেশের এই বৈচিত্র্য সম্ভারের মধ্য দিয়েই সারা ভারতের একটি সর্বজনীন সংহতি ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। দেশভুক্ত ছোট ছোট প্রদেশের নিজস্ব অবদান ফুটে ওঠে সৃজনমূলক নানাবিধ হস্ত ও কারুশিল্পে। যাঁরা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের হস্তশিল্প প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরাই, পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও, এই দুটি প্রদেশের কারুশিল্প বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে থাকবেন। বাংলা দেশের বালুচর শাড়ি, হাতীর দাঁতের কারুকার্যখচিত কাজ, ঢোকরা ও মৃৎশিল্প ও পুতুলের নিদর্শন এবং বিহারের

ছোট তাঁতে বোনা কার্পেট নিদর্শন —নেফা

মধুবনী চিত্রকলা ও কাশিদা সূচীশিল্পের মধ্য দিয়ে দুটি পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও নির্ভরশীল প্রদেশই তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব বজায় রেখেছে। সম্প্রতি আবার কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে নেফা প্রদেশের একটি হস্তশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সেখানে এই বয়ঃকনিষ্ঠ প্রদেশটির নানা হস্ত ও কারুশিল্প দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। প্রদর্শনীতে পশম ও সুতোর কার্পেট, নানা আকারের মুখোশ, কাঠের খেলনা ও মূর্তি ও বাঁশের তৈরী নানাবিধ জিনিস দেখা

মুখোশ... —নেফা

যায়। প্রত্যেকটি নিদর্শনে সুরুচি ও ব্যবহারিক প্রয়োজন ও উৎকর্ষের সমন্বয় চোখে পড়ে। আমরা সমতলবাসী, আমাদের মধ্যে সুতির কাপড়ের অধিক প্রচলন, তাই অনেক গ্রামেই হাতের ধুতি ও শাড়ি বোনা হয়। শীতপ্রধান দেশে স্বভাবতই শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হয়, সুতরাং সেখানকার নরনারী ছোট্ট তাঁতে (loin loom) পশমের নানা পরিধেয় থেকে শুরু করে কম্বল বা কার্পেটও বুনে থাকেন। শীতপ্রধান দেশের নরনারী প্রকৃতির কোলে মানুষ, তথাকথিত সভ্যতার সংস্পর্শে এখনও অনেকে আসেননি। তাই তাঁদের পশমশিল্পে লোকদেবতা, জন্তুজানোয়ার ও এমনকি সরল রেখাভিত্তিক নানা মোটিফ দেখা যায়। নেফায় বোনা কয়েকটি কার্পেটের বুনোনী ও ডিজাইনের নিদর্শন মৌলিক ও মনোহর। গভীর নীল-কালো রঙে চিত্রিত মুখোশগুলির মধ্য দিয়ে নেফাবাসীদের অলৌকিক দেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও কল্পনাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কাঠখোদাই মূর্তিগুলি যে শুধু কারুশিল্পের নিদর্শন তা নয় উপরন্তু সেগুলি গৃহসজ্জার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। প্রদর্শনীতে নেফা প্রদেশের শিল্পসম্পদ, লোকসংখ্যা তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যাদিও পরিবেশিত হয়। বলা বাহুল্য, সকলকে নেফাবাসীদের হস্ত ও কারুশিল্পসম্ভার দেখানোর সুযোগ দান করে উদ্যোক্তাগণ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। তবে, ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই এইসব শিল্পসামগ্রী কিনতে পারেন না। সুতরাং নেফার নিজস্ব হস্তশিল্প নিদর্শনগুলির প্রসারের জন্য নেফা সরকার যদি দেশের বড় বড় শহরে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন তাহলে অচিরে যে নেফার কারুশিল্পসম্ভার জনপ্রিয়তালাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

হনোলুলু আকাডেমি অব আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্থায়ী সংগ্রহশালায় রাখার জন্য প্রথম হাওয়াই জাতীয় প্রিন্ট প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সুপরিচিত শিল্পী বিমল বানার্জীর একটি গ্রাফিক প্রিন্ট ক্রয় করেছেন। হাওয়াইয়ের শিল্পীদের মধ্যে বেন নরিস, জে হোল কক্স, এডওয়ার্ড স্টাসাক ও জীন চার্লট খ্যাতনামা। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্লট-এর আঁকা দেওয়ালচিত্র ও হাওয়াইয়ের ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের ওয়াইকিকি শাখায় রাখা বেন নরিস-এর কোলাজ প্রাচীর চিত্র উল্লেখযোগ্য। এটি জানাবার উদ্দেশ্য এই যে, সমকালীন শিল্পকলাক্ষেত্রে হাওয়াইও উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়ে চলেছে।

—চিত্রপ্রিয়

শিল্পপ্রাসঙ্গিক সমস্যা ও চারুকলা মেলা

রবীন মণ্ডল

দীর্ঘকাল ধরে একটা অভিযোগ শুনে আসছি যে, আধুনিক শিল্পকলার স্রষ্টাদের সঙ্গে গণমানসের কোন যোগসূত্র নেই। নেই কোন আত্মিক যোগাযোগের সচল এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা। এমনি একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায় আধুনিক শিল্পকলা সম্বন্ধে যে আজকের শিল্পকলা জীবন-বিমুখ। জীবন-চৈতন্যের সার্থক প্রতিফলনের কোন চেষ্টা এখানে অনুপস্থিত। ফলত স্রষ্টা এবং ভোক্তার মধ্যে একটা বড় রকমের ফারাক থেকে গেছে যা বহুকালের। স্রষ্টাদের পক্ষে যে বক্তব্য তা নানা কারণে অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে। কষ্ট করে কিছু জানা বা উপলব্ধির ব্যাপারে দর্শকসাধারণের যে অনীহা তা ক্ষমনীয় নয়। শিল্পীরা মনে করেন বোধবুদ্ধি এবং চৈতন্য জাগরিত না করলে শিল্পসাহিত্যের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। এ কারণে সমকালীন শিল্পমানসিকতার যে বিশেষ ভাষা তাকে আত্মস্থ না করলে আধুনিক শিল্পকলার তাৎপর্য বোধগম্য হবে না। শিল্পীরা মনে করেন, ঠিক মত সমকালীন হতে যে বিশেষ মানসিকতার প্রয়োজন তাকে সচেতনভাবে গড়ে তুলতে হয়। শিল্পী ব্রাকের কথায় বলা যায়, "সমকালীন হওয়া বেশ কষ্টকর" (It is too difficult to be contemporary.")

সাধারণ অর্থে দর্শকসাধারণের মধ্যে যে শিল্পচেতনা তা সংস্কারপ্রধান। বিশেষ সামাজিক পরিবেশে, বিশেষ পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করার ফলে তাঁরা দর্শনযোগ্য সব কিছু শিল্পের মধ্যে একটা কাহিনীভিত্তিক বা পরিচিত পরিবেশ খুঁজে পেতে চান। এবং যে মুহূর্তে সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশটি শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থেকে যায়, সেই মুহূর্তেই ভোক্তার মানসচেতনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ কারণে শিল্পীর সৃষ্টি সাধারণভাবে দর্শকচেতনা আলোড়িত করতে না পারায় উপেক্ষিত থেকে যায়। এ সমস্যা কমবেশী সব দেশেই। কিন্তু এ সমস্যার প্রচণ্ডতা আমাদের দেশে অনেক ব্যাপক এবং সামগ্রিক অর্থে এ সমস্যা সমাজজাত। স্বাভাবিকভাবে একথা স্বীকার করতে বাধা আমাদের দেশে সর্বাঙ্গীণ অর্থে সমাজ এখনও স্থিতিশীল নয়। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অতিক্রান্ত হলেও সুস্থ সামাজিক পরিবেশ—যা প্রধানত অর্থনীতি নির্ভর—তা এখনও ব্যাপক অর্থে মুষ্টিমেয়ের করতলগত। শাসক কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে আমাদের সমাজে যে অর্থনৈতিক অসাম্য তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের সমষ্টি মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। ফলে স্বাভাবিক কারণে শুধুমাত্র জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছাড়া বোধ বা চৈতন্যকে জাগরিত করতে বিশুদ্ধভাবে শিল্পকলা বা সাহিত্যের স্বারস্থ হতে মন অপারগ হয়। অবশ্য শিল্পীদের তরফ থেকে সচেতনভাবে এমন কোন প্রচেষ্টা এত দিন লক্ষ্য করা যায় নি যা ব্যাপকভাবে দর্শক-চেতনাকে শিল্পমুখী করে তোলে। এক্ষেত্রে উভয় তরফের যে অসুবিধা তা দূরীকরণে কোন সচেতন আন্দোলনও গড়ে ওঠে নি। অবশ্য একাধিক সামাজিক কারণ বিদ্যমান থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, সচেতন আন্দোলনের অভাবহেতু আজকের বাংলা দেশের শিল্পীকুল জনমানসে স্থান করে নিতে পারে নি। দীর্ঘকালের অবহেলায় অনীহার যে মানসিকতা গড়ে উঠেছে তাকে শিল্পমুখী করে তুলতে বেশ কিছুটা সচেতন আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

বিগত কয়েক বৎসর যাবত কিছু শিল্পী ও শিল্পপ্রেমিক এ বিষয়ে একটা কিছু করার কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন এমন কিছু করার প্রয়োজন যাতে সাধারণচিত্তের মানুষ শিল্পী ও শিল্পবস্তুর সামনাসামনি এসে দাঁড়াতে পারেন। যেহেতু অভিযোগ আছে, শিল্পীরা বিত্তবান মুষ্টিমেয় ধনী এবং বুদ্ধিজীবী মানুষ সম্বন্ধে যত সচেতন ব্যাপক গণমানসের সঙ্গে এবং সাধারণচিত্তের মানুষ সম্বন্ধে ততটা আগ্রহী নন। এবং এ কারণে কলকাতার অভিজাত, বিত্তবান মানুষদের সুবিধার্থে শিল্পীরা প্রায়শই চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট ইত্যাদি অঞ্চলের অভিজাত পল্লীর গ্যালারিতে তাঁদের শিল্প-কর্মের বেসাতি নিয়ে উপস্থিত হন, যেখানে সাধারণ মানুষের গতায়াত আশ্চর্য রকমের সংবদ্ধ। এ অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না। যদিচ অভিযোগের সবটুকু শুধুমাত্র শিল্পীদের ওপর বর্তালে তা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হবে বলে মনে হয়। অবশ্য একাধিক সামাজিক কারণও এ বিষয়ে জড়িয়ে আছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শিল্পীদের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা না থাকায় তাঁদের পক্ষে শুধুমাত্র স্ববৃত্তিনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মুষ্টিমেয় বিদেশী এবং দু-চারজন এদেশীয় বিত্তবান মানুষের কাছে দু-চারটে চিত্র বা ভাস্কর্য বিক্রি করে একটা দেশ বা জাতের শিল্পী কোনক্রমেই বৃত্তিনির্ভর মত্র হয়ে টিকে থাকতে পারে না। শিল্পবস্তুর ক্রয়-ক্ষমতা যদি স্বদেশবাসীর করতলগত না হয় তবে কোন জাতের বা দেশের শিল্পীকুল সার্থক শিল্পসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ পায় না। এ দিক থেকে শিল্পীদের পক্ষে—তিনি যে মানসিকতার অধিকারী হোন না কেন, স্বদেশবাসীর কাছে নিজেদের শিল্পবস্তুর চাহিদা তৈরি করতে কিছুটা আন্দোলন-প্রয়াসী হয়ে ওঠার দরকার—যখন এটা স্পষ্ট যে, সরকার বা বিত্তবান মানুষেরা শিল্পী-কুলের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন নন। শিল্পীদের তরফ থেকে যেটা বড় রকমের অসুবিধা সেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্ম ক্ষেত্রে

আন্দোলনের পথে নামা। স্বভাবত অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা উদাসীন। এবং এই উদাসহীনতায় স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব। এ কারণে একাধিক শিল্পী নানারকমে জর্জরিত হয়ে সৃষ্টি-বিমুখ হয়ে ওঠেন।

মনে হয় সামগ্রিকভাবে বিচার করলে এটা জোর করে বলা যায় যে, নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কলকাতার চারুকলা মেলা মারফত বিগত তিন বৎসর যাবত জনমানসে শিল্পী এবং শিল্পপ্রেমিকরা একটা আন্দোলন-প্রয়াসী-মনের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। একে আন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা বললে বাহুল্য হবে না এ কারণে যে, বৃহৎ জনমানসের সঙ্গে সংযোগ সাধনের চেষ্টা এখনও স্পষ্ট এবং সম্ভবত প্রথম। বক্তব্যে এবং সংগঠনে তাঁদের উদ্যম স্পষ্টতর। অর্থনৈতিক সাফল্যের থেকে দর্শকদের রসিক করে তোলাই এখানে উদ্দেশ্য—যদিও শুরু থেকে শিল্পীরা আর্থিক সাফল্য সম্বন্ধে কোন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন নি। শিল্পকে বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে উপস্থাপিত করার যে প্রয়াস তার নিদর্শন বিরলদৃষ্ট। গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ কথা স্পষ্ট করে বলা চলে, শিল্পী এবং শিল্পপ্রেমিকের সমবেত প্রচেষ্টায় কলকাতা চারুকলা মেলা শিল্প-আন্দোলনের স্বাক্ষর বহন করছে। অল্পমূল্যে ছবি বা ভাস্কর্য বিক্রি করে শিল্পীরা তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে, এমন কথাও কোন কোন শিল্পী বা রসিকের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। এ কথা জোর করে বলা যায়, সাময়িকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও লাভের দিকও কম নয়। কারণ, জনমানসে শিল্পচেতনা সঞ্চার সম্ভব না হলে বিদেশী বা উচ্চবিত্তের বুদ্ধিজীবীদের পোষকতায় বাংলা দেশের শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। বাংলা দেশের শিল্পসমস্যা যে শুধুমাত্র অর্থকেন্দ্রিক তা নয়, দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পচেতনার দৈন্য আরও ব্যাপক ও গভীর। বিশেষ করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ক্রমশ যে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে—যেখানে প্রয়োজনভিত্তিক জীবনধারণের নিম্নতম মান থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত, সেখানে শিল্পীদের পক্ষে অহেতুক আভিজাত্য বা কৌলীন্যের ভাবনা নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকা বেশ কিছুটা হাস্যকর বলে মনে হয়।

বিগত তিন বৎসরের মধ্যে শিল্পমেলায় যে সব শিল্পবস্তু প্রদর্শিত হয়েছে তার সবই যে শিল্পকৌলীন্যে উজ্জ্বল তা হলফ করে বলা চলে না। তবে শিল্পী বা ছাত্রশিল্পীদের পরিণত শিল্পভাবনার প্রতীক হিসাবে যেমন কিছু বলিষ্ঠ কাজ দেখা গেছে তেমনি দুর্বল, অপুষ্ট মানসিকতার ছাপও একাধিক কাজে প্রতিফলিত। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই বলিষ্ঠতা এবং দুর্বলতা দর্শকসাধারণের মনে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাঁদের অনেকের বক্তব্য আরও ভাল ছবি এবং ভাস্কর্য দিয়ে মেলাকে আরও জোরদার করে তোলা উচিত। তাঁদের এ বক্তব্য স্পষ্ট এবং অভিনিবেশ-যোগ্য। মনে হয় মেলা-কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে সচেতন এবং সংগঠনের শিল্পীকর্মীরা ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করলে ভবিষ্যতে এ মেলা অনেকটা ত্রুটিমুক্ত হবে, এটা আশা করা যায়।

শিল্পপোষকতার ক্ষেত্রে সরকারী ভূমিকা যথাযথ না হওয়ার দরুন শিল্পীরা স্বাভাবিক কারণে সরকারী ব্যাপারে নিরুৎসাহী। তবে শিল্পীরা যদি তাঁদের প্রচেষ্টা দ্বারা সরকার পক্ষকে নিজেদের অভাব-অভিযোগ এবং অসন্তোষ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে না পারেন তবে তাঁদের অর্থহীন বৈরাগ্য শিল্পীবৃন্দের সহায়ক হবে না। এ ব্যাপারে জোরদার কিছু করে তুলতে হলে সমবেতভাবে সব শিল্পীকে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, যে আন্দোলনের ভূমিকা হিসাবে শিল্পমেলাকে গণ্য করার একাধিক কারণ স্পষ্ট।

উৎসাহ নিয়ে কাজকর্ম শুরু করলে সহযোগিতার সুযোগ যে এসে যায় তার একাধিক প্রমাণ এই মেলায় পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে কলকাতার পৌরসভা-কর্তৃপক্ষের আন্তরিক এবং উদার সহযোগিতার কথা অনস্বীকার্য। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে হয়ত এ মেলা বাস্তবরূপ গ্রহণ করত না। যদিও শিল্পীরা পৌর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরও ব্যাপক এবং স্থায়ী সহযোগিতা আশা করেন। তাঁরা মনে করেন, পৌর-কর্তৃপক্ষ একটু সচেতন হলে চারুকলার একটি স্থায়ী সংগ্রহশালা গড়ে ওঠা সম্ভব হবে।

অল্পমূল্যে ছবি বিক্রয় এবং নিম্নমানের ছবি বা ভাস্কর্য প্রদর্শনের ব্যাপারে অনেক শিল্পী বা রসিকের মনে অভিযোগ জেগে এসেছে। এ অভিযোগ মেনে নিয়েও বলা চলে ভাল এবং ন্যায্যমূল্যের ছবির বাজার যখন নেই তখন স্বল্পবিত্তের মানুষের কাছে কিছু ছোট কাজের নমুনা বিক্রি করলে বা দেখালে ক্ষতি কি? মেলার বিশেষ চরিত্র এই যে, প্রচণ্ড গোছালো কিছু করলে মেলা-মেলা ভাব থাকে না—বিশেষ করে শিল্প-কলার ক্ষেত্রে। তা হয়ে ওঠে বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনীর স্থান—যার চরিত্রে একটা কপট গাম্ভীর্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা মনকে বাধিত করে। এই কারণে মেলাকে সজীব রাখতে নানা মানসিকতার নানারকম কাজ শিল্পীরা হাজির করেন এ মেলায়। প্রতিষ্ঠিত শিল্পী যাঁরা, যাঁদের ছবি বা ভাস্কর্যের কিছুটা বাজার আছে, তাঁরা অনেকেই মেলায় অংশ গ্রহণে বেশ কিছুটা অনিচ্ছুক, হয়ত তাঁদের আভিজাত্যে কিছুটা বাধে। শিল্প-সামগ্রী আভিজাত্যের বস্তু, সেই শিল্পবস্তু নিয়ে আজকের দিনে বাংলা দেশের তরুণ শিল্পীরা খোলা মাঠের মেলায় নামবেন, অনেক বয়স্ক তথা তরুণ শিল্পী বা রসিক-সাধারণের পক্ষে এরূপ ভাবা কষ্টকর ছিল। আধুনিক শিল্পকলাচর্চা মূলত নগর-মানসিকতার ছাপ বহন করে এবং যে কারণে সব কিছুর মধ্যে একটা গোছালো পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মেলার মধ্যে কিছু গ্রামীণতা থাকলে তা অনেক বেশী সজীব হয়ে ওঠে। ফলে নগর-মানুষের কাছেও মেলার গ্রামভাব যে বেশ কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয় তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

স্বাধীনতাপূর্বকালে কলকাতার চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল সাধারণ মানুষের কাছে যতটা অগম্য ছিল আজকের দিনে তা প্রায় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে হাত-ছোঁয়ার মধ্যে। ফলে মেলা-প্রাঙ্গণে ভিন্ন-বিত্তের মানুষের যে সমাবেশ দেখা গেছে তা নানা দিক থেকে বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য দেয়। শুধু জনসমাবেশ ছাড়াও এ মেলার আর একটি বড় আকর্ষণ হল, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের সম্মিলন। নানা স্বাদের শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের যে সমাবেশ ঘটেছিল তা অভিজ্ঞতায় অভূতপূর্ব বলা চলে। এ মেলার কথা আজ শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতের অন্যান্য শহরের মানুষকে কিছুটা আগ্রহী করে তুলেছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাংলা দেশ এবং তার বাইরে থেকে কিছু কিছু শিল্পী সতীর্থ এবং শিল্পী-বন্ধুদের সঙ্গে মিলনার্থে এখানে জড়ো হয়েছেন, যদিও সব শিল্পী যে একই মানসিকতায় বা রীতির অনুগামী তা নয়। সম-বিত্তের মানুষদের এই ধরনের সাক্ষাৎকার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। সাধারণ মানুষের কাছে আরও যে দিকটি বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছে তা হল সামনে মডেল রেখে প্রতিকৃতি আঁকা। সমাজের কিছু স্তরের মানুষের কাছে এ অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যের স্বাদ দিয়েছে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বলা যায়, আজকের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও কলকাতার চারুকলা মেলা তার সমগ্র ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেও সমাজের ভিন্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কিছুটা শিল্প-প্রাসঙ্গিক কৌতূহল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যার পূর্বতন কোন নজীর কলকাতা তথা ভারতের কোন অঞ্চলে দেখা গেছে বলে শুনিনি। মনে হয়, শিল্পীদের ক্ষতির পরিমাপ না করে সামগ্রিক লাভের দিকটার কথা ভাবলেও মনের দিক থেকে নিরুৎসাহ হওয়ার কথা নয়।

বাঙ্গালী, যেখানে মা-কালী, সেখানে পাঁঠা-বলি, সেইখানেই দলাদলি, এ কথা সত্য হলে, বাঙ্গালী চরিত্রের এই আপন করা ভাবটিও সত্য।

॥ দুই ॥

আমাদের মনের পর্দায় আরব দেশের যে ছবি সচরাচর ভেসে ওঠে তা হচ্ছে—ধু ধু বিস্তীর্ণ বালুকারাশি মরুভূমি নিঃসঙ্গ খেজুর গাছ, আর সারি সারি উট চলেছে মুখটি তুলে এ হচ্ছে তার প্রাকৃতিক ছবি। আর আরব সমাজ সংস্কৃতির যে ছবি আমাদের মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয় তা হচ্ছে—তার বেদুইন অধিবাসী, বোরখা পরা মেয়ে, ইসলাম। আরব দেশের, অন্তত আজকের আরব দেশের এই ছবি যুগপৎ সত্য ও মিথ্যা, আরব দেশ ও আরব জীবনের এই ছবি সত্য। বহু অতীতে হয়ত এটিই তার একমাত্র ছবি ছিল যা আরব চরিত্র ও আরব জীবনের রূপ নির্ধারণ করেছে। কিন্তু আজকের আরব দেশের এই ছবি একমাত্র ছবি নয়, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আরব দেশ ও আরব সমাজ পাল্টিয়েছে। এবং এই পরিবর্তন এশীয় ও আফ্রিকার অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশি ও দ্রুত ঘটেছে। তাই বলছিলাম আরব দেশ ও আরব জীবনের যে ছবি আমাদের মনে বহু অতীত থেকে গাঁথা হয়ে আছে তার সবটা সত্য নয়।

॥ তিন ॥

এবার আকস্মিকভাবে বেশ কিছুদিন বেইরুটে থাকতে হলো। বম্বে থেকে বেইরুটে পৌঁছে দেখি আমাদের ত্রিপোলী যাওয়ার ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে, ওখানকার রাজনৈতিক পালা বদলের জন্য। সুন্দর শহর এই বেইরুট। মধ্যপ্রাচ্যের সেরা শহর। বহু দিন আগে আমার এক ডাচ বন্ধু বলেছিলেন, বেইরুট তাঁর ভালো লাগেনি। প্রশ্ন করেছিলাম—কেন? তিনি বলেছিলেন—'আমার ইউরোপের চোখ বেইরুটে কোন নতুনত্ব খুঁজে পায়নি, ও যেন ইউরোপের প্রতিচ্ছবি। আমার কিন্তু বেইরুট ভাল লেগেছে। আমি পূর্ব দেশের লোক। বেইরুটের ইউরোপীয়ানা আমার জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। পূর্বের একটি দেশে ইউরোপের জীবনের সাথে সুবিধা পেয়েছি, তাই বেইরুট আমার ভালো লেগেছে। প্রকৃতি যেন দু' হাত তুলে লেবাননকে আশীর্বাদ করেছে। তার ভূমধ্য-সাগরীয়

জলবায়ু, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, সমুদ্র পর্বত, দীর্ঘ সভ্যতার ইতিহাস মানুষকে চুম্বকের মত টানবে তাতে আর আশ্চর্য কি? মধ্যপ্রাচ্যের বহু আমীর-ওমরাহ, রাজা-উজীরের বেইরুটের শহরতলীতে বাড়ি আছে। তাদের টাকা খাটছে লেবাননের ব্যাঙ্কে। বেইরুটের স্বাস্থ্যশ্রীর এটাও নাকি একটি কারণ। ইকনমিকসের পাতায় যাকে Laissez faire নীতি বলে, লেবানন অনেকটা সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছে। আমি অর্থনীতির ছাত্র নই, অর্থনীতির পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন লেবাননের এই স্বাস্থ্য সত্যি মজবুত কিনা।

বেইরুট আমার ভালো লেগেছে আরও দুটি কারণে। প্রথমটি, আর কোন আরব দেশে সংবাদপত্র পড়ে তৃপ্তি পাইনি। ফ্রি প্রেস সাংবাদিকতা যাকে বলে আরব দেশ সমূহে তার বড় অভাব। তার উপরে আছে সরকারী বাধা নিষেধ, যে যখন ক্ষমতার গদীতে বসলো তার মুখের দিকে চেয়ে লিখলে লেখা এক-দায়ে হতে বাধ্য। এই একঘেয়েমির চেয়েও বড় কথা এতে সত্য সংবাদ অনেক সময় থাকে না। ইরাককে দেখেছি, যখনই ক্যু দে-তার ফলে গভর্নমেণ্ট বদলিয়েছে, নতুন গভর্নমেণ্ট ক্ষমতাসীন হয়ে পুরাতন গভর্নমেণ্টের দোষত্রুটির তালিকা ছাপাচ্ছে। আর এই তালিকা ছাপাচ্ছে সেই একটি সংবাদপত্র। এই যদি সব সত্য হয় তা হলে সেই কাগজ এতদিন সরকারের এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির কথা লেখেনি কেন? খবরের কাগজ এখানে আক্ষরিক অর্থে খবরের কাগজ, আমাদের দেশে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে এক ধরনের ওষধি সাহিত্য পরিবেশন করা হয় তা এখানে নেই। খবরের কাগজে ত খবরই থাকবে। আবার সাহিত্য কেন?

দ্বিতীয় কারণটি ফুল। আরব দেশে ফুলের যেমন প্রাচুর্য ফুলের ব্যবহার তেমন দেখি না। হিন্দুরা রোজই গৃহদেবতার পূজো করে। সেই পূজোয় নিত্য ফুলের দরকার হয়। দক্ষিণ ভারতে মেয়েরা খোঁপায় ফুল গোঁজে। ওটা ওদের রূপচর্চার অঙ্গ। মেয়েরা ভোরে উঠেই এই খোঁপার ফুল সংগ্রহ করে মালা গাঁথে। হিন্দুর বিয়েতে, হিন্দুর মৃত্যুতেও ফুলের দরকার হয়. ইউরোপে ফুলের এ রকম ব্যবহার হয় না। কিন্তু ঘর সাজানোর জন্য ফুল চাই, ইউরোপে গরীবের ঘরেও রয়েছে ফুলদানিতে ফুল। জন্মদিনে, বিয়ের দিনে, হাসপাতালের রোগীর জন্য, উৎসবের দিন ফুল উপহার দেওয়া ইউরোপের সামাজিক-রীতি। হিন্দুর মতো ইউরোপীয়দেরও ফুলের নিত্য ব্যবহার। ওদের ফুল হচ্ছে সৌন্দর্যানুরাগের প্রকাশ। আরব জীবনে ফুলের ব্যবহার তেমন দেখি না। হিন্দুর মত ধর্মকর্মে কিংবা রূপচর্চার, বা ইউরোপীয়দের মত সৌন্দর্যচর্চার অঙ্গ হিসাবে আরব দেশে ফুলের ব্যবহার হয় না। এক বেইরুটে তার ব্যতিক্রম দেখেছি। ফরাসীদের মত লেবানিজেরাও বলে Et Puls des fleurs।

লেবানন আরব দেশ বটে, কিন্তু পুরোপুরি ঐসলামিক ও আরবীয় সভ্যতার দেশ নয়। লেবাননের অর্ধেক লোক খৃষ্টান, এর বিব্লস শহরেই প্রথম বাইবেল লেখা হয় বেইরুটের ইউরোপীয়ানাও আমার মনে হয়। অনেকটা এই খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য। এখানেই মুসলমানদের ইনস্পিরেশন আসে মক্কা-কায়রো থেকে, এখানেও খৃষ্টানদের ইনস্পিরেশন আসে প্যারিস-নিউ ইয়র্ক থেকে। এদের দুটি জীবন ধারা পাশাপাশি চলছে। রাষ্ট্রের দিক থেকে এক হলেও কালচারের দিক থেকে এক নয়। এদের এক দেশ, ভিন্ন কালচার।

॥ চার ॥

যে কয়টি আরব দেশ দেখেছি, তার মধ্যে লিবিয়াকে আমার মনে হয়েছে বেশি অগ্রসর। এক সৌদি আরবিয়া লিবিয়ার মেয়েরাই বোধ হয় সম্পূর্ণ অশিক্ষা ও ঘোর পর্দার আড়ালে আছে। এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে মসজিদ। দিনে পাঁচ বার এই মসজিদ থেকে গগনভেদী আওয়াজ ওঠে মোয়াজ্জেমের—আল্লাহ্ আকবর। যেমন

ও পর্তুগালের ক্যাথলিক ধর্মের মত লিবিয়ার ইসলাম জীবন্ত। ছাত্রাবস্থায় আমি স্পেন দেখেছি। স্পেনের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা আমাকে পীড়িত করেছে। আমি সেদিন নিজেকে প্রশ্ন করেছি, ভারতের দারিদ্র্যের জন্য আমরা ইউরোপের কলোনিয়ালিজমকে দায়ী করি, স্পেনের দারিদ্র্য তো ভারতের চেয়ে কম নয়। এর জন্য দায়ী কে? আমার এক ফরাসী সতীর্থকে বলতে শুনেছি—স্পেনের অনগ্রসরতার জন্য স্পেনের ক্যাথলিক ধর্মই দায়ী। পাদ্রীরা বাইবেলের চার দেওয়ালের বাইরের জগৎকে স্বীকার করতে চায় না। শিক্ষার এই চোখ বাঁধা দৃষ্টি ওদের বিজ্ঞান, সমাজ ও মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। তাই ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের এত কাছে হয়েও ফ্রান্সের পলিটিকাল রিভলিউশন কিংবা ইংল্যাণ্ডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের তাৎপর্য এদের কাছে ধরা পড়েনি। লিবিয়ায় ইসলামের সার্বভৌম আধিপত্য দেখে এই কথাগুলি আমার আবার মনে পড়ল। ধর্ম কি তাহলে প্রগতির পরিপন্থী?

॥ পাঁচ ॥

ব্যবসায় হচ্ছে দু মুখী পথ। এতে ক্রেতার যেমন, বিক্রেতারও তেমন স্বার্থ আছে। ইংরেজ ব্যবসায়ীর motto হচ্ছে Customers are our masters। লিবিয়ান ব্যবসায়ী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ওদের হাবভাব দেখে মনে হয় গরজটা একা ক্রেতারই। প্রথম প্রথম এতে বিরক্ত হতাম। এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তা হলেও লিবিয়ান ব্যবসায়ীরা সাধারণত স্বভাবে সৎ। সহজে ঠকায় না। একবার এক দোকান থেকে বাচ্চার একটি জামা কিনেছিলাম। দেখি, দোকানী বলা দাম থেকে আরও দশ পয়সা কম নিল। ওর ভুল হয়েছে মনে করে কথাটি ওকে বললাম, ও বলল—তুমি দর করবে মনে করে দশ পয়সা বাড়িয়ে দাম বলেছিলাম। তুমি দর করনি। তাহলেও ওটা তোমারই প্রাপ্য। ওদের কুঁড়েমি ও উদাসীনতায় যেমন বিরক্ত হয়েছি, ওদের এমনিধারা সততায় মুগ্ধ না হয়েও পারিনি।

বেশির ভাগ দোকানে self service নীতি। নিজের জিনিস নিজে তুলে নাও, ওজন করে নাও। যাওয়ার সময় দাম দিয়ে যাও, ক্রেতার সততায় দোকানীর এবং দোকানীর সততায় ক্রেতার এখানে খুব আস্থা। এই আস্থার অভাবে আমাদের দেশে সুপার মার্কেট নেই। আর এই আস্থার জন্যেই এখানে যত্রতত্র সুপার মার্কেট। (দিল্লী বাঙালোরে সুপার মার্কেট আমি দেখেছি। ওগুলিকে সুপার মার্কেট না বলে গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বলাই উচিত।)

॥ ছয় ॥

ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিদ্রোহ এ যুগের সাধারণ ঘটনা। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স সর্বত্রই ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সমস্যা ওসব দেশের গভর্নমেন্ট ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই ব্যাপারে বোধ হয় ভারতের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। কারণ আমেরিকা, রাশিয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছাত্র রাজনীতি ঘুরছে কোন একটি বিশেষ সমস্যাকে নিয়ে। ভারতের ছাত্র রাজনীতিতেই রয়েছে এসব দেশের সব কয়টি সমস্যা। লিবিয়ার যুব ও ছাত্রসমাজ এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর কারণও আছে। প্রথম কারণ শিক্ষা এখানে সর্বস্তরে অবৈতনিক। কলেজের ছাত্ররা উপরন্তু মাসোহারা পায়। এই মাসোহারা পেতে হলে শুধু একটি মাত্র শর্ত পালন করতে হবে—একবারের বেশি ফেল করা চলবে না। ছাত্ররাও তাই মনে করে—"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।" দ্বিতীয় কারণ পাশ করার পর চাকরীর জন্য বিশেষ কোন উমেদারীর দরকার হয় না। গভর্নমেন্টই সব ব্যবস্থা করে দেয়। অন্তত এখনও পর্যন্ত তাই করছে। তৃতীয় কারণ ছাত্ররা পড়াশোনা চলতে থাকার সময়ে বা পড়াশোনা শেষ করবার অব্যবহিত পরেই বিয়ে-থা করে। এতে যৌবনের যে বিরাট সমস্যা 'সেক্স' তার সমাধান হয় সামাজিক পরিবেশে। অবশ্য এসবের পেছনে রয়েছে এদের আর্থিক সম্পত্তি—তেলের রয়্যালটি। 'সেক্সের' ব্যাপারে লেবানন অনেকটা ইউরোপের অনুকরণ করছে—ডেটিং, গার্ল ফ্রেণ্ড ও ফ্রি লাভের পথ ধরে। এখানে ছাত্র সমস্যার অনু-

পরিস্থিতির চতুর্থ কারণ—ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত এখনও নৈর্ব্যক্তিক সংখ্যায় পৌঁছয়নি। তাই শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের প্রগ্রেসের খোঁজ খবর রাখা সম্ভব। আর ছাত্ররা যে দলীয় রাজনীতি করবে আরব দেশে সে সুযোগ নেই। আরবদেশে গভর্নমেন্ট পাল্টায় সৈন্যবাহিনীর ক্যু-দে-তার জোরে, ভোটের জোরে না। একদিক থেকে দেখতে গেলে ছাত্ররা ন্যাশনাল রাজনীতিই করে। এক আধ ডজন বর্ণচোরা কম্যুনিস্ট এখানে ফৈজালের বিরুদ্ধে, ওখানে বুর্গিবার বিরুদ্ধে কিছু কিছু বলে ও করে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশি নয়। আমার মনে হয় এ যুগের নতুন ধর্ম কম্যুনিজম আরব দুনিয়ায় ইসলামের দুর্গ প্রাচীর ভাঙাতেই সবচেয়ে বেশি বাধা পাবে। খৃস্টান ইউরোপ, বৌদ্ধ চায়না ও হিন্দু ভারতে প্রবেশের মত তার পথ অত সহজ হবে না এবং ইসলামের দুর্গ প্রাচীর যখন ভাঙাতে পারবে তখন সেই কম্যুনিজমের চেহারাও কেমন হবে কে জানে?
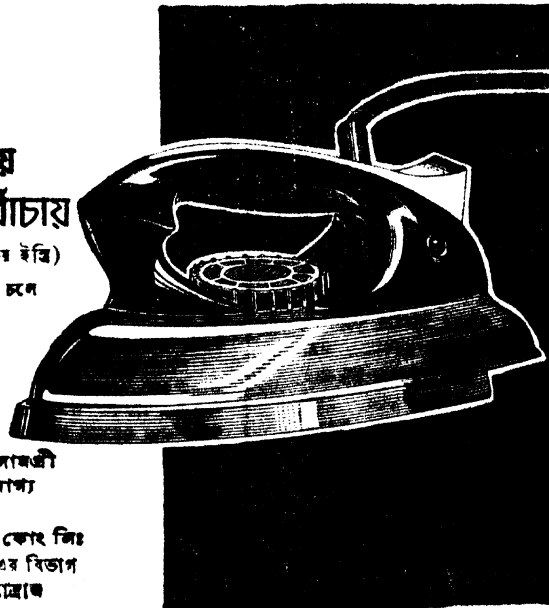
॥ সাত ॥

ভারত ত্যাগের পূর্বে ভারতের দেহ থেকে ছিঁড়ে করে বৃটিশ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভারতের পারস্পরিক ঝগড়া লেগে রয়েছে, সেই ফাঁকে চতুর বৃটিশ উভয় দেশে তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। কখনও দেশের পিসি, কখনও কানের মাসী। এই খেলায় এখন আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনও এসে জুটেছে, ফলে সমস্যা আরও জটিল হচ্ছে। ভারতের কাঁটা যেমন পাকিস্তান আরবদের কাঁটা তেমন ইজরাইল। পাকিস্তান ও ইজরাইলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পাকিস্তানের অধিবাসীরা আবহমান কাল থেকেই সেই মাটিরই সন্তান। জন্মের পর থেকে ইজরাইল ওখানের আদি বাসিন্দা হটিয়ে ইউরোপ আমেরিকা থেকে দলে দলে ইহুদি এনে বসাচ্ছে। ধর্মের ভিত্তিতে ইজরাইলের সৃষ্টি, যেমন ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। মজার কথা এই যে যে ধর্মের ভিত্তিতে আজকের পাকিস্তানীরা পাকিস্তান দাবী করছে, সেই ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইলকে পাকিস্তান স্বীকার করে না। আরবেরাও ঐসলামিক পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে যুক্তি দেখে, ইহুদি ইজরাইলকে অন্যায় মনে করে। একেই বলে—এক যাত্রা, তবুও পৃথক ফল। ভারত পাকিস্তানের কথা উঠলে আরব মনোভাব হয়—'পাকিস্তান আমাদের ভাই, ভারত আমাদের বন্ধু।' কথায় বলে—blood is thicker than water। যতদিন আরবেরা ইজরাইল নিয়ে ব্যস্ত আছে ততদিন বিশ্ব রাজনীতিতে আরবেরা ভারতের প্রতি শত্রুতাচরণ করবে না। কিন্তু ইজরাইল সমস্যা সমাধান হলেই আরব দুনিয়া যে পাকিস্তানের ডেপুটে ফুঁ দেবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। রাবাত কনফারেন্সের অপমানের পর ভারতের এ কথা বুঝা উচিত। ভারতের বৈদেশিক নীতি প্রো-আরব হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু যেন অ্যান্টি-ইজরাইল না হয়।

॥ আট ॥

জেনারেল পোস্টাপিস হচ্ছে ত্রিপোলীর হৃদপিণ্ড, কেন্দ্রস্থল। ইস্তিকলাল ও পরলা সেপ্টেম্বর স্ট্রীট দুটি তার দুই প্রধান ধমনী—শপিং সেন্টার। কাছাকাছি সমুদ্রের ধার ধরে চলে গেছে সুদীর্ঘ প্রমনাদ (Promenade)—শান বাঁধানো পায়চারী পথ। গরমের দিনে এই প্রমনাদে বেজায় ভীড়। সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়ার লোভে শহরের চার প্রান্ত থেকে ভ্রমণার্থীরা আসে এখানে। শীতের দিনে এই প্রমনাদ কিন্তু একেবারে ফাঁকা। কি শীত, কি গ্রীষ্ম জেনারেল পোস্টাপিসে কিন্তু ভিড়ের অভাব হয় না। জনস্রোত সেখানে লেগেই থাকে। বিদেশীরা তো নিশ্চয়ই, লিবিয়ানেরাও চিঠি ডাকে দেবার অছিলায়, চিঠি পাবার আশায় দিনে একবার করে পোস্টাপিসে ঢু মারবেই। কেউ বা যায় বিদেশী সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন সংগ্রহের জন্যে, কেউ বা যায় নিঃসঙ্গতা ও নিষ্কর্মতার হাত এড়াবার জন্যে। এক গরমের সন্ধ্যায় এমনি সময় কাটানোর জন্যে গেছি আমার ছোট মেয়েটির হাত ধরে। ওকে যেন কি বলছিলাম। হঠাৎ

দেখি পাশ থেকে এসে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—বাঙ্গালী মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমিও। বাড়ি কোথায়?

—কলকাতায়। আপনার?

—ঢাকায়।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ গল্প করলেন। বললাম—কথা শুনে তো আপনাকে ঢাকাইয়া মনে হচ্ছে না।

উনি জবাব দিলেন—কথা শুনে আপনাকেও কলকাত্তাইয়া মনে হচ্ছে না।

হেসে বললাম—ঠিকই বলেছেন, একদিন আমি চাটগাঁর বাঙ্গাল ছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন—আমিও নোয়াখালির।

উনি পেশায় ডাক্তার শুনে বললাম—এখানে প্রাইভেট ডাক্তার পাওয়া দুষ্কর। সবকিছুর জন্য হাসপাতালে যেতে হলে সময় লাগে প্রচুর। উনি বললেন—প্রাইভেট ডাক্তার থাকলেও সুবিধে কি? বলুন দেখি—গা কেমন কেমন করছে—ইংরেজি করে। বললাম—রবীন্দ্রনাথও নাকি horse is a noble animal-এর বাংলা খুঁজে পাননি।

এ কথা শুনে ভদ্রলোক খুব একচোট হাসলেন। সেই হাসি শুনে কে বলবে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের মধ্যে এত মারামারি ঝগড়াঝাঁটি।

আমার নিকট প্রতিবেশীও এক পূর্ব পাকিস্তানী পরিবার। ওদের বাড়িতে দিন-রাত চলছে হিন্দী ফিল্মের গান—'বোল রাধা বোল', 'মেরে কিসমৎ কি রাজা'। সেই বাড়ির গিন্নী একদিন আমার স্ত্রীকে বললেন—'জানেন ভাবী, পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রসংগীত বন্ধ করলে কি হবে। সব পাকিস্তানীরাই লুকিয়ে লুকিয়ে কলকাতার রেডিও শোনে!'

'আ মরি বাংলা ভাষা!'

এক একবার ভাবি—দেশে আমরা ধর্ম নিয়ে কত না লাঠালাঠি করছি। কিন্তু এই বিদেশে মুসলমান পাকিস্তানীরা স্বধর্মীয় আরবদের সঙ্গে না মিশে, বিধর্মী ভারতীয়-দের সঙ্গেই তো তাদের আড্ডা দেয়, ডিনার খায়, গল্পগুজব করে, আনন্দ পায়। ধর্মের ভিত্তির উপর 'টু নেশনস্ থিওরী' যে দাঁড়াতে পারে না, এটা কি তার প্রমাণ নয়?

॥ নয় ॥

১৯৬৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর বুড়ো বাজা ইদ্রিসকে তাড়িয়ে সৈন্যবাহিনীর কিছু যুবক অফিসার লিবিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করেছে। এর এক বছর পরে হুকুম হল—'ইটালিয়ানেরা এদেশে বহিরাগত, তাদের চলে যেতে হবে।' পঞ্চাশ ষাট বছর আগে এসব ইটালিয়ানেরা এদেশে এসেছিল। এদের অনেকে কখনও তাদের মাতৃভূমি দেখেনি। এদের জন্মভূমি ও মাতৃভূমি এক নয়। এদের পূর্বপুরুষেরা এদেশে এসেছিল ধনের সন্ধানে, নতুন জীবনের সন্ধানে। আজ তাদের চলে যেতে হবে। একটি হুকুমে ওদের এতদিনের শ্রমে, বুদ্ধিতে গড়ে তোলা দোকানপাট, বাড়িঘর হাত বদল হয়ে লিবিয়ানদের হয়ে গেল। বিনা আয়াসে, বিনা পরিশ্রমে লিবিয়ানেরা এই যে ধনের অধিকারী হল, তাকে ওরা রক্ষা করতে পারবে তো? কালকের ফকির হল আজকের সুলতান। আজকের সুলতান হল আগামী-কালের ফকির। এই ত জীবনের খেলা। এ কথা ভুললেও চলবে না যে লিবিয়ান আরব ভূমির ইটালিয়ানেরা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার প্রতিনিধি। হিটলারের 'সারভাইভেল অব্ দি ফিটেস্ট' থিওরী আজ বিশ্বনিন্দিত। তবুও এর মধ্যে কোন সত্য কি নেই? যে জাতির বুদ্ধি, শ্রম ও সৃজনীশক্তি বেশি সে-জাতি অন্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করবেই, কলোনিয়ালিজম আজ মৃতপ্রায়। তার মধ্য-যুগীয় রূপ পাল্টাচ্ছে। কিন্তু জাতির উপর জাতির আধিপত্য কি শেষ হবে? বিশ্ব রাজনীতির হালচাল দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। আরবেরা যতদিন বিজ্ঞান শক্তিতে আত্ম-নির্ভর হতে না পারছে, ততদিন ইউরোপের বাণিজ্য শক্তি তাদের শোষণ করবেই। আরব দুনিয়ার মাটির নীচে কালো সোনার যে স্রোত বইছে, ইউরোপের টেক্‌নলজি ছাড়া তার উদ্ধারের উপায় নেই। তাই ভাবছিলাম—কয়েক হাজার ইতালিয়ান তাড়িয়ে লিবিয়া কি ইউরোপের হাত থেকে মুক্তি পাবে? সেই লক্ষণ ত দেখি না। এখানে ইস্কুলের চেয়ে মসজিদ নির্মাণের দিকেই ত ঝোঁক বেশি দেখছি। এতে পরকালে পুণ্যার্জন

হবে কিনা জানি না। তবে ইহকালে বিজ্ঞান চর্চা যে বাধা পাবে সে বিষয়ে সুনিশ্চিত। বিজ্ঞান চর্চা বাধা পেলে, বৈষয়িক উন্নতিও যে বন্ধ থাকবে তা কে বোঝে?

॥ দশ ॥

ত্রিপোলীর স্নায়ুকেন্দ্র যে জেনারেল পোস্টাপিস সে কথা পূর্বেই বলেছি। সেই পোস্টাপিসের পাশেই বিরাট সুউচ্চ রোমান ক্যাথেড্রাল। বহু দিন এই ক্যাথেড্রালের প্রবেশে দাঁড়িয়ে কখনও নবজাতকের ব্যাপটিজম, কখনও নববধূর সজ্জা পরিহিতা ইতালিয়ান সুন্দরীকে দেখেছি বিয়ে করতে ঢুকছে। কখনও কখনও তার সুউচ্চ ঘণ্টা-গম্বুজের ডিং-ডং-ডিং-ডং আওয়াজ শুনে হাতের ঘড়ি মিলিয়েছি। একদিন দেখি সেই ক্যাথেড্রালের বিরাট লৌহকপাট অর্গলবন্ধ হয়ে গেছে। ইতালিয়ান সম্পত্তি-রূপে সেটা এখনও বাজেয়াপ্ত রয়েছে লিবিয়ান সরকারের হাতে। ইতালিয়ানেরা এখন নেই। ভক্ত নেই। পাদ্রী নেই। উপাসনা করবে কে? উপাসনা করাবে কে?

তার কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন শুনি তার ঘণ্টা-গম্বুজ থেকে ডিং-ডং-ডিং-ডং আওয়াজের স্থলে আল্লাহ আকবর ধ্বনি উঠছে। দেখি তার অর্গলবদ্ধ বিরাট লৌহ-কপাট উন্মুক্ত হয়েছে। আর তাতে বাতারে কাতারে লোক ঢুকছে। ব্যাপার কি? আমারই মত এক পথিক বলল—জান না? আজ এই ক্যাথেড্রালের নতুন নামাকরণ হয়েছে "গামাল আবদুল নাসের মসজিদ।" একদিন যে পাল্পিটে দাঁড়িয়ে পাদ্রী বাইবেল পড়ত, আজ সেই পাল্পিটে বসে মোল্লা কোরাণ পাঠ করছে।

আমার এক সহকর্মীর সঙ্গে পরের দিন এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি বললেন—'আমি কম্যুনিস্ট দেশের লোক, কিন্তু কম্যুনিস্ট নই। ধর্ম নিয়েও মাথা ঘামাই না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তর করেছে বলেই যে আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি তা নয়। আমার খারাপ লাগছে জায়গাটা থুথু ছিটিয়ে নোংরা করার জন্য। না, ইউরোপ এ নিয়ে ক্রুসেড লড়বে না। ইউরোপকে আমি যত-

টুকু বুঝি ধর্মের গোঁড়ামি থেকে ইউরোপ মুক্ত হতে চায়। কাগজের দৃশ্য দেখে দ্য গলের পুরোনো একটি কথার তাৎপর্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্য গল বলেছিলেন—'নতুন করে যদি আবার বিশ্বযুদ্ধ হয় তবে সেই বিশ্বযুদ্ধ কোন idealism-এর যুদ্ধ হবে না। সে বিশ্বযুদ্ধ হবে racialism-এর', তার পরে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—'সেই যুদ্ধে ইউরোপের হার হবে।'

অধ্যাপক ব্রেজিনা ইউরোপ নামটি এখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি, করেছেন প্রতীক হিসাবে। এই ইউরোপ হচ্ছে—আধুনিক বিজ্ঞান-মন দর্শন, ও লিবারেল হিউম্যানিজমের ধারক, একটি আদর্শের প্রতীক। বললাম—ইউরোপীয় সভ্যতার যদি কোন সত্য মূল্য ও শক্তি থাকে তা হলে তার কখনও হার হবে না। দৈহিক যুদ্ধে পরাজয়ের পরও সেই সত্য অম্লান থাকবে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করবে।

ম্লান হেসে অধ্যাপক ব্রেজিনা বললেন—'ওটা তোমার হিন্দু বিশ্বাস। ইতিহাস নির্মম। যে হারবে তার সাক্ষ্য চিরতরে মুছে যাবে।'

সমালোচনায় ব্লচম্যান বরং ব্যথিত হয়েছেন (লেখক শ্রীমুখোপাধ্যায় যার 'হাফ-কোটেশন' তুলেছেন)। ব্লচম্যান লিখছেন, "....if we compare his works with other historical products of east, we shall find that while he praises he does so infinitely less and with much more grace and dignity than any other Indian historians or poet. No native writer has ever accused him of flattery......"

আবুল ফজল প্রভুর প্রশংসা করেছেন ঠিকই, কারণ তাঁর প্রভু একজন অনামা কায়কোবাদ বা সিকান্দার লোদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং সম্রাট আকবর। কিন্তু এ সত্ত্বেও আকবরের আমলের অনেক ঘটনাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। গুজরাটের বিদ্রোহী নায়ক হুসেন মির্জার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। সম্রাটের প্রিয়পাত্র তোডর মল্ল (Todar Mall) ও মুনিম খাঁর অনেক কাজকে তিনি নিন্দা করেছেন পরিষ্কার ভাষায়। আবুল ফজলের সমালোচনার ধার এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, জাহাঙ্গীর তা সহ্য করতে পারেন নি। জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহকে আকবর পিতা হিসাবে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিলেও ঐতিহাসিক হিসাবে আবুল ফজল সন্তানের অকৃতজ্ঞতাকে ঘৃণার চোখেই দেখেছেন। "আকবর-নামা"য় তা লিপিবদ্ধ করতে ভোলেন নি। বিনিময়ে জাহাঙ্গীরের চক্রান্তে গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। আকবরের জন্ম, শৈশব ও বিবাহের একমাত্র জ্ঞানের উৎস আবুল ফজলের "আকবর-নামা"ই আমাদের কাছে। কোনো দ্বিতীয় গ্রন্থ নয়।

সবচেয়ে উল্লেখ্য বদায়ুনির গ্রন্থে যেখানে সন-তারিখের বালাই নেই ("Muntakhaleut Tawarikh") সেখানে আবুল ফজল বিস্ময়করভাবে সঠিক সন-তারিখ অনুযায়ী ঘটনাক্রম সাজিয়ে গেছেন।

বদায়ুনি ছিলেন গোঁড়া মোল্লা। আবুল ফজলের মত ধর্মের কোনো উদারতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। প্রায় একসঙ্গে রাজদরবারে ঢুকে আবুল ফজল আপন যোগ্যতায় চাকুরিতে তাঁকে অনেক দূর টপকে গিয়েছিলেন। এর জন্য অবশ্য সম্রাটকেই তিনি দায়ী করতেন। তার উপর মুসলমান হয়ে সম্রাটের কথায় হিন্দুর "রামায়ণ" ও "মহাভারত" ফারসীতে অনুবাদ করার জন্য তাঁর মনে জমেছিল আকবরের প্রতি ক্ষোভ। কিন্তু সম্রাট যখন ধর্মসমন্বয়ের চেষ্টায় "দিন্-ই-ইলাহী" প্রচারে ব্রতী হলেন তখন আর বদায়ুনির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। রাজকার্যে পদচ্যুতির আশঙ্কায় প্রকাশ্যে কিছু না করে নিজের গ্রন্থে ঝুরি ঝুরি আকবরের নামে অশুভভাষণ করে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সম্রাটের বিভিন্ন ভাষণ ও নির্দেশনামার অর্ধ বিকৃত বিবরণ ও হাফ-কোটেশনে ভরা। প্রচুর উদাহরণের মধ্যে একটি বলি। বদায়ুনির মতে, আকবর নাকি সারা দেশের যাবতীয় মসজিদ ভাঙার ঢালাও হুকুম জারী করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোথায়, কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ তারিখে এই হুকুমনামা জারী করেছিলেন তার কিছুই উল্লেখ নেই। বদায়ুনি তো শেষের দিকে আকবরকে আর মুসলমানই বলতে রাজি ছিলেন না! এ অভিমত খানিকটা জেসুয়িট পাদ্রীদেরও ছিল। তাঁরাও সম্রাটকে 'চতুর', 'ভড়ংধারী' ও 'দাম্ভিক' প্রভৃতি গাল-মন্দ করে গেছেন। কারণ, আকবর তাঁদের বাড়াভাতে ছাই দিয়েছিলেন। আশা দিয়েও শেষ পর্যন্ত আকবর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হন নি। ঐতিহাসিক হিসাবে ভিনসেন্ট স্মিথ এঁদেরই প্রধান সাক্ষী হিসাবে মেনেছেন।

মনে রাখতে হবে আকবর ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের (১৫৫৮-১৬০৩) সমসাময়িক। যাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই উচ্ছৃঙ্খল, অথচ তিনি ইংরেজদের কাছে "কুমারী" হিসাবে আজও সশ্রদ্ধেয়। এবং ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইংরেজ অধিকৃত ভারতে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ভূতপূর্ব রাজকর্মচারী ভিনসেন্ট স্মিথের নিকট আমরা কি আশা করতে পারি! আমরা কি আশা করব তিনি এলিজাবেথের তুলনায় আকবরকে ষোড়শ শতকের পৃথিবীর এক সর্বগুণান্বিত সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে অভিহিত করবেন? আকবরের খ্যাতিকে তিনি তাই তাঁর গ্রন্থে এসিয়ার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। স্মিথের নিকট আকবর একজন "Asiatic ruler" ছিলেন, তার অধিক কিছু নয়। আকবরের আমলের রাজস্ব ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ত্রুটি খুঁজে না পেয়ে স্মিথ সাহেব অনুমান করেন, নিশ্চয় এর

প্রশাসনব্যবস্থায় কোথাও বড় রকম গলদ ছিল। ("He (Vincient Smith) believes in the benevolent intentions of Akbar but to prove the superiority of the Anglo-Indian administration over the Mughal, he opines that "these were commonly defeated by distant governors enjoying practical independence during their term of office." Vide Modern Indian History; Vol.-1; Revised Edition; p. 277) [illegible]টির মধ্যে স্মিথও থেকে গেছেন দাম্ভিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ। এ কারণে লরেন্স বিনিয়ন (Lawrence পাদ্রী জেসুয়িট সাহেবরা এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক স্মিথের এক অপূর্ব মিল। এ কারণে লরেন্স বিনিয়ন (Lowrenoe Binyon) ও তাঁর গ্রন্থে ("Akbar") স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে স্মিথ তাঁর নায়ক আকবরের প্রতি অবিচার করেছেন (curiously unfair to his hero")।

বিনিয়ন আকবরের রাজ্যবিস্তারকে বিদেশীর রাজ্যবিস্তার হিসাবে লক্ষ্য করেন নি। স্মিথের চোখে আকবর অবশ্য তাই ছিলেন। (এই মর্মে স্মিথের গ্রন্থ থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায় এক দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।) বিনিয়ন বলেছেন :
"Though a foreigner, he identified himself with India he had conquered. And much of his system was to be permanent." (Akbar; Pp 8-9).

আসল কথা তার পাঁচজন সম্রাটের মত আকবরও একজন সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট ছিলেন এবং একজন সম্রাটের রাজ্যবিস্তারের পিছনে কতখানি ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ থাকে আর কতখানি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা থাকে তাই আমাদের বিচার করতে হবে। আকবরকে সমালোচনা করতে গেলেও এই উভয় মানদণ্ডেই বিচার করা দরকার। মনে রাখতে হবে জর্মান ঐতিহাসিক Count Von Noer আকবরের রাজ্য বিস্তারের মধ্যে প্রশংসার কিছুই দেখেছেন ("Kaiser Akbar")।

আকবরের একাধিক স্ত্রী ছিল কি রক্ষিতা ছিল কি 'হারেম' ছিল তা কি একজন মধ্যযুগীয় সম্রাটের কৃতিত্ব নিরূপণে আমাদের কাছে একান্তই অপরিহার্য? জানি না চন্দ্রগুপ্ত 'হারেম' বর্জিত ছিলেন কিনা বা "মহান" অশোকের একটি মাত্র স্ত্রী ছিল কিনা! তবে, এসব বিচারে রমেশচন্দ্র দত্তের মূল্যবান মন্তব্যটি স্মরণীয়। "We should never make the mistake of comparing the XVI and XVII centuries with the XIX and XX centuries either in Europe or in India." মিনা বাজারে আকবরের লাম্পট্যের যে উদ্ধৃতি শ্রীমুখোপাধ্যায় টডের (Tod) গ্রন্থ থেকে দিয়েছেন সে সম্পর্কে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে টডকে আধুনিক কোনো পণ্ডিতই 'সিরিয়াস' ঐতিহাসিক হিসাবে গ্রহণ করেন না। এমন কি স্মিথও বলেন, "Tod requires to be read with caution." (Akbar, the Great Mogul, 2nd Edition: V. Smith, P. 354)

সবশেষে বৈরাম খাঁকে আকবরের নিজেরই যদি হত্যা করার বাসনা থাকত তাহলে তিনি তা গোপনে সংঘটিত না করে প্রকাশ্যেই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও আকবর তাঁর প্রাক্তন গুরুকে ক্ষমা করেছিলেন (এপ্রিল, ১৫৬০)। এবং তাঁর মক্কা যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। তীর্থযাত্রী বৈরাম খাঁর 'রীতি-মত' রক্ষী দলের সংখ্যা কি ছিল সমসাময়িক বিবরণী সে ব্যাপারে চুপ। তাই মোবারক খাঁ যখন অতর্কিতে তাঁকে পঞ্চাশ-ষাটজন দুর্দান্ত সশস্ত্র আফগান সহ আক্রমণ করে হত্যা করেন তখন আমরা সাধারণ পাঠকরা কিন্তু খুব অবাক হই না। এ ছাড়া একটা হত্যার পিছনে "মোটিভ" থাকে। বৈরাম খাঁ যখন স্বেচ্ছায় বিদেশে চলে যাচ্ছেন তখন তাঁকে হত্যা করে আকবরের কি উদ্দেশ্য সার্থক হবে?

শ্যামাপ্রসাদ বসু
খড়্গপুর

বিশ্ববিজ্ঞান

॥ ১ ॥

আমার চিঠির প্রত্যুত্তরে লেখা শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের চিঠি (দেশ, ২৭শে ফেব্রুয়ারী) দেখলাম। Microbiologyর বাংলা পরিভাষা সম্পর্কে শ্রীমুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন, তা গ্রহণীয় নয় বলেই এ চিঠি। Microbiology কথাটির উৎপত্তি হয়েছে microbe থেকে। E F Galeর ভাষায় "The word 'microbe' itself was first introduced by Sedillot in 1878 and used to designate any organism so small as to be invi-

sible to the nacked eye but visible under the microscope, and in 1882 Pasteur suggested that the science of microbial life should be called 'microbie" or "microbiologie"

[Gale E F : Development of microbiology (In Needham J., ed : chemistry of life, p. 41)]

আবার microbe শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে গ্রীক শব্দ mikros এবং bios-য়ের সংমিশ্রণে। শব্দ দুটির ইংরেজী যথাক্রমে micro এবং life। Micro শব্দটির বাংলা হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে অণু কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন microscope অণুবীক্ষণ, microwave অনুতরঙ্গ, microlite কেলাসাণু ইত্যাদি। Micro এবং life-য়ের বাংলা যথাক্রমে অণু এবং জীব ধরে microbe-য়ের বাংলা দাঁড়ায় জীবাণু। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে জীবাণু এবং জীবাণুবিজ্ঞান যথাক্রমে microbe এবং microbiology-এর সার্থক বাংলা পরিভাষা।

এবার শব্দ দুটির চলতি ব্যবহার দেখা যাক। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে জীবাণু বলতে সাধারণভাবে ব্যাকটিরিয়া বোঝায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় যে নির্ভুল নন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের উদাহরণগুলো থেকে। (১) "এই জীবাণুগুলি অনেক প্রকারের।... এরা কখনও এককোষী, কখনও বা বহু-কোষী, কোনটা ছোট, কোনটা বা সে তুলনায় অনেক বড়। এদের নানারকমের নাম দেওয়া হয়েছে: যেমন—ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট, মোল্ড্, ভাইরাস, রিকেটসিয়া ও প্রোটোজোয়া" [সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়ঃ খাদ্যে জীবাণু-ঘটিত বিষক্রিয়া. জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬৯, ২২(১), ৩৫] (২) "পণ্য উৎপাদনে যে সব জীবাণু ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো সাধারণ ঈস্ট, মোল্ড্ ও ব্যাক্টীরিয়া পর্যায়ভুক্ত" [সতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী : কিণ্বন পদ্ধতি বা ফার্মেন্টেশন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬৯, ২২ | (২), ৭২] (৩)" যে সব জীবাণু আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে পাই, তারা হল ব্যাক্টীরিয়া ও ফাংগাস শ্রেণীভুক্ত...এই দুই রকম ছাড়া আর এক রকমের জীবাণু (ভাইরাস) আছে, যারা আরও অনেক ছোট বলে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না" [দীপক বসু ও দেবিকা বসুঃ জীবাণু ও মানুষের সংগ্রাম। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬৮, ২১(৩), ১৮২] (৪) "আশা করা যায় যে, জীবাণু-তত্ত্ববিদ (Microbiologist) ও ইঞ্জিনীয়ারের যৌথ প্রচেষ্টায় ধাতু-নিষ্কাশনের কাজে জীবাণুর ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা শীঘ্রই শোনা যাবে" | সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় : ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে জীবাণুর প্রয়োগ। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬৯, ২২(৭), ৪০৬|

এই ধরনের উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া চলে। কিন্তু তার প্রয়োজন সামান্য বলে, কেবলমাত্র ১৯৬৯ সালের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে জীবাণু শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করছি। উপরের উদাহরণগুলো যে সব প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া ১৯৬৯ সালের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত আরও পনেরটি রচনায় জীবাণু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে কেবলমাত্র দু তিনটি রচনায় জীবাণুকে bactiria-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, একটি রচনাতে virus-এর প্রতিশব্দ হিসাবে, এবং অবশিষ্ট রচনায় প্রোটোজোয়া, ছত্রাক, ব্যাক্টীরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতিকে জীবাণুর অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে।

ব্যাপকার্থে প্রোটোজোয়া, শেওলা, ছত্রাক ব্যাক্টীরিয়া, রিকেটসিয়া ও ভাইরাস Microbiology-এর অন্তর্ভুক্ত। যে সব বিজ্ঞানী বাংলায় লিখছেন, তাঁরাও ঠিক এগুলোকেই জীবাণুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জীবাণু শব্দটির ব্যবহারের দিক থেকে বিচার করলেও Microbiology-এর বাংলা দাঁড়ায় ঐ জীবাণু বিজ্ঞান।

এবার ব্যাকটিরিয়া প্রসঙ্গে আসা যাক। অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের পর লিউয়েনহুকের চোখে যে সব ক্ষুদে প্রাণীরা অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল, তাদের অনেকের চেহারা ছিল লাঠির মত। গ্রীক ভাষায় ছোট লাঠিকে বলা হয় bakterion। তাই লাঠির আকৃতি ঐ ক্ষুদে প্রাণীগুলোর নাম হয়েছিল bacteria। এ দিক থেকে বিচার করলে bacteria-এর বাংলা জীবাণু হয় না। আর bacteria-এর প্রতিশব্দ হিসেবে জীবাণু শব্দটির ব্যবহারও খুবই কম। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিজ্ঞানীরা বাংলায় bacteria-কে ব্যাকটিরিয়া বলারই পক্ষপাতী। ১৯৬৯ সালের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মোট দশটি প্রবন্ধে (পৃঃ ৩৫, ৭২, ৯৭, ১৩১, ১৪৭, ৩৪৫, ৩৮৬, ৪০৯, ৫২৮, ৭০৬) ব্যাকটিরিয়া শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

আর তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা"

bacteria ও microbe-এর বাংলা দেওয়া আছে যথাক্রমে ব্যাকটিরিয়া ও জীবাণু।

যে পারিভাষিক শব্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়ার পর যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত হয়ে গেছে, তাকে নাকচ করার এবং তার পরিবর্তে নতুন পারিভাষিক শব্দ গ্রহণের কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

বিমলকান্তি সেন
দিল্লী-১২

॥ ২ ॥

'বিশ্ববিজ্ঞান' বিভাগে প্রকাশিত এক চিঠিতে (দেশ, ১৪ ফাল্গুন ১৩৭৭) শ্রীপ্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সাধারণভাবে জীবাণু বলতে আমরা Bacteria বুঝি না কি? এবং সেইদিক দিয়ে Bacteriology বোঝাতে জীবাণুতত্ত্ব বা জীবাণুবিজ্ঞান লেখাই সংগত...।' প্রবীরবাবুর এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না। মাইক্রোব এবং মাইক্রোবায়োলজির পরিভাষারূপে যথাক্রমে জীবাণু এবং জীবাণুবিদ্যা অথবা জীবাণুতত্ত্ব কথাগুলি কেবল ভুল ও অপপ্রযুক্ত কোনও প্রতিশব্দ নয় এবং যথার্থ নির্দিষ্টভাবে প্রচলিত বলেই জানি।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দগুলি ও তাদের প্রচলিত অর্থগুলির সমার্থক হিসেবে বৈজ্ঞানিক প্রতিশব্দগুলি প্রযুক্ত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বল, শক্তি ও ক্ষমতা প্রায় সমার্থক বলে আমরা জানি। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কৃত পরিভাষার তালিকায় ঐ শব্দগুলি স্থান পেয়েছে যথাক্রমে force, energy এবং power-এর প্রতিশব্দ হিসেবে। আবার সাধারণ প্রয়োগে জীব ও প্রাণী সমার্থক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, অথচ জীববিদ্যা প্রতিশব্দে জীব কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে যাহার জীবন আছে তাহাই জীব এই অর্থে। এ থেকে বোঝা যায় যে সাধারণভাবে যে শব্দ ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে সেই শব্দই যখন বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তখন পরিভাষারূপে ঐ শব্দ বিশেষ অর্থবহ হয়ে থাকে। এজন্য Microbe-এর প্রতিশব্দ হিসেবে জীবাণু কথাটি স্বীকার ও ব্যবহার করতে কোনও অসুবিধা নেই। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কৃত পারিভাষিক শব্দের তালিকা অনুসারে Microbe ও Bacteria-র প্রতিশব্দ হচ্ছে যথাক্রমে জীবাণু ও ব্যাকটিরিয়া।

সাধারণভাবে ইংরেজী অর্থ অনুসারে বিচার করতে বসলে মাইক্রোবায়োলজির অর্থ ছোটখাটো জীববিদ্যা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাণুর জীবন চর্চার তত্ত্ব এই উদ্দিষ্ট অর্থ নিয়েই মাইক্রোবায়োলজি কথাটি প্রবর্তিত ও প্রচলিত হয়েছে। ঐ উদ্দিষ্ট অর্থ অনুযায়ী মাইক্রোবায়োলজির বাংলা পরিভাষারূপে জীবাণুবিদ্যা কথাটি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করি।

ক্রোমোসোম অর্থে বংশাণু কথাটির ব্যবহার (বিশ্ববিজ্ঞান—দেশ, ৩০ মাঘ ১৩৭৭) সংগত বলে মনে হয় না। ক্রোমোসোম-এর প্রতিশব্দরূপে বংশসূত্র অসার্থক নয় কিন্তু শ্রুতিমাধুর্যের দিক থেকে বিচার করে দেখলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক একই অর্থে ব্যবহৃত ক্রৈবসূত্র অধিকতর উপযোগী পরিভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে যে জেনেটিকস এবং জিন-এর পরিভাষা হিসেবে কৌলিকবিদ্যা এবং কুলকণা প্রতিশব্দ দুইটি গ্রহণযোগ্য কিনা।

দিলীপকুমার দাস
সোদপুর।

॥ ৩ ॥

গত ৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৭ শনিবার প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় শ্রীঅমরসিংহ কর মহাশয়ের লিখিত 'বিশ্ববিজ্ঞান' শীর্ষক রচনাটি সত্যই উপভোগ্য এবং এই লেখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ঐ রচনায় 'আপেল' পর্যায়ে লিখিত ২৫০ পৃষ্ঠায় বিশুদ্ধ পেকটিন যে ব্যাকটিরিয়াগুলিকে সাবাড় করার কথা লিখেছেন তাদের নামগুলি 'প্রোটাস', 'সালমোনেল্লা' এবং 'সিজেল্লা' ছাপা হয়েছে। সম্ভবত এই নামগুলি প্রোটিয়াস (Proteus) সালমোনেলা (Salmonella) এবং সিগেলা (Shigella) হবে, এবং বাংলা পরিভাষা করবার সময় এই উচ্চারণগুলি বিকৃত হয়েছে। এইজন্য পরবর্তীকালে লেখকের নিকট অনুরোধ তিনি যেন বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজীটিও বাংলা নামের সঙ্গে রাখেন এবং তাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হব।

ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ পাল
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

নৌবিদ্রোহ

২৭শে ফেব্রুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় পুস্তক পরিচয় বিভাগে বলাইচন্দ্র দত্তের Mutiny of the Innocents বইটির সমালোচনায় উল্লিখিত হয়েছে "এতদিনের মধ্যে নৌ-বিদ্রোহের কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি।" এই গ্রন্থটিই যে ঐ বিদ্রোহের "একমাত্র প্রামাণ্য দলিল" তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু মূল ইংরেজী সংস্করণটি এই বছর নৌ-বিদ্রোহের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হলেও ইংরেজী পাণ্ডুলিপি থেকে এরই সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ (৮৪ পৃষ্ঠা) 'নৌবিদ্রোহ' নামে ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসেই কম্পাস পাব্লিকেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির ইংরেজী শিরোনাম ছিল "Revolt of the Innocents।" ৮৪ পৃষ্ঠার মূল পুস্তিকাটির সঙ্গে পান্নালাল দাশগুপ্ত রচিত একটি মূল্যবান দীর্ঘ পরিশিষ্ট রয়েছে ৫৪ পৃষ্ঠায়।

সুলভ মূল্যে প্রায় তিন বছর আগেই যে এর সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছে তা জানলে পাঠকেরা উপকৃত হবেন।

নীরেন দাশগুপ্ত
কলকাতা-৬

মিশরীয় ধর্মে পশু দেহধারী দেবতা

গত ৯ই জানুয়ারীর দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুধীন দে মহাশয়ের 'মিশরীয় ধর্মে পশু দেহধারী দেবতা'—নামে মনোগ্রাহী নিবন্ধটি গভীর আগ্রহ সহকারে পড়লুম। রচনাটি অনুবাদ-গন্ধী হলেও তথ্যবহুল এবং কৌতূহলোদ্দীপক। বিশেষ করে প্রবন্ধের

চিত্রগুলি চমৎকার। প্রবন্ধটি বিষয়ানভিজ্ঞ এবং এই বিষয়ে গবেষকগণের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে The Encyclopaedia of Religion and Ethics Golden Bough ইত্যাদি গ্রন্থের কথা মনে পড়ল। হাতের কাছেই পেলুম মিশরজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় মহাশয়ের ১৯৬৭ সালের প্রকাশিত The Folk Art of India গ্রন্থখানি। 'দেশ'-এর ১০২২ পৃষ্ঠায় 'ব্রত এবং পুজো নিয়েই হল আমাদের ধর্মীয় জীবন' থেকে 'সেই লৌকিক ধর্মের সূত্রপাত পশুমূর্তি কল্পনা থেকে।'—পর্যন্ত পড়ে খট্‌কা লাগল। এই অংশটি শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের অষ্টম পৃষ্ঠায় "Brata as we see it" থেকে "the former from zoolatry" এবং একাদশ পৃষ্ঠায় "But in India" থেকে "folk religion of Brata" অংশের আক্ষরিক অনুবাদ বলে মনে হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত দে মহাশয় চিত্রগুলি রচনার জন্যে শিল্পীর ও লেখকের আত্ম-স্বীকৃতির উল্লেখ করেছেন, অথচ রায় মহাশয়ের গ্রন্থের বা অন্য আকর গ্রন্থগুলির কোনো স্বীকৃতি নাই।

প্রাবন্ধিক দে মহাশয় তাঁর এই অনুবাদ কর্মের আকর গ্রন্থগুলির যথাযথ স্বীকৃতি যথাসময়ে প্রকাশ করলে আমরা আনন্দিত ও উপকৃত হবো।

সুমঙ্গল রাণা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী,
শান্তিনিকেতন

সাদ নং ক্রেম

গত ৭ই ফাল্গুনে দেশ পত্রিকায় সাদ নং ক্রেম সম্বন্ধে আমার আলোচনার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে শ্রীমতী আরতি দাস কিছু অবান্তর এবং অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি করেছেন। তিনি লিখছেন : "শ্রীভদ্র মহাশয়ের বোধ করি জানা নেই যে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেও খাসি ভাষা বাংলা বর্ণমালায় লেখা হত। পরে খৃষ্টান পাদ্রীদের দাপটে রোমান বর্ণমালা চালু হয়।" স্বীকার করে নিচ্ছি যে, লেখিকার মতো "শিলঙে (?) উপায়ুক্তের দপ্তরে সংরক্ষিত খাসি নথিপত্র দেখার সৌভাগ্য" আমার হয়নি। তা সত্ত্বেও কিন্তু দেশ পত্রিকার ষোড়শ সংখ্যায় লেখিকার বর্তমান আলোচনাটি প্রকাশিত হওয়ার তেইশ বছর আগেও যে, উনিশ শতকে বাংলা বর্ণমালায় খাসিয়া ভাষা লেখার প্রচেষ্টার কথা আমার অজানা ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৩৫৪ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সংবলিত আমার 'পাহাড়িয়া কাহিনী' অভিধাযুক্ত পুস্তকে। সেই বইয়ের একেবারে গোড়ার দিকেই আমি বলেছি—"বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে খাসিয়া ভাষায় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলশ মিশন সেখানে আড্ডা গাড়েন। তাঁরা প্রথমে **বঙ্গাক্ষরে** খাসিয়া ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়নের প্রয়াস পান, কিন্তু শেষে তার বদলে রোমান অক্ষরের প্রচলন করেন।" (পাহাড়িয়া কাহিনী—পৃঃ ২)

"...পরে খৃষ্টান পাদ্রীদের দাপটে রোমান বর্ণমালা চালু হয়" ইত্যাদি উক্তি লেখিকার সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। আসামের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মণিপুরীদেরই নিজস্ব লিপি ও বর্ণমালা আছে। অন্যান্য সকল শ্রেণীর আদিবাসীরা ছিল নিরক্ষর। তাদের সাক্ষর করেন খৃষ্টান মিশনারীরাই। খাসিয়া পাহাড়ে তাঁরাই প্রথম বাংলা অক্ষরে খাসিয়া ভাষা লেখার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে সুবিধা না হওয়াতে তা বর্জন করে শেষে রোমান অক্ষর "চালু" করেন এ বিষয়ে মেজর পি আর টি গর্ডন প্রমুখ জাতিতত্ত্ববিদদের মধ্যে ঐকমত্য আছে। এবং এ বিষয়ে এঁদেরই মত প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়।

শ্রীমতী দাস আর একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শ্রীভদ্র মহাশয় (অর্থাৎ আমি) খাসিয়া পাহাড়ে কতদিন ছিলাম এবং খাসিয়া মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমার কতটা যোগাযোগ ছিল তা তাঁর জানা নেই। এ কথা সসংকোচে স্বীকার করছি যে, রাজ-রাজড়াদের সঙ্গে তো নয়ই, মন্ত্রী নেতা রাজনৈতিক কর্মী প্রমুখ উঁচু দরের মানুষদের সঙ্গেও আমার দহরম মহরম হয়নি, কিন্তু খাসিয়া মানুষ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মূলে ছিলেন এক সন্ন্যাসী। তিনি খাসিয়া পাহাড়ে রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রভানন্দ। খাসিয়াদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্যে কতকগুলি বইও রচনা করেছিলেন স্বামীজি। এই আদিবাসীদের কল্যাণ সাধনকে জীবনের ব্রত বলে বরণ করে তাঁদের মধ্যে [illegible] কাটিয়েছিলেন স্বামীজি। তাঁর সঙ্গে একবার আমি খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত শেলা থেকে শিলঙ এবং শিলঙ থেকে জৈন্তা পাহাড়ের রাজধানী জোয়াই পর্যন্ত পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছি, তার পর চড়াই উতরাই ভেঙে বহুবার খাসিয়া পাহাড়ের সর্বত্র চষে বেড়িয়েছি। এই ভ্রমণ কালে আতিথ্য গ্রহণ করেছি খাসিয়া গ্রামে। কোনো কোনো স্থানে তিন চার দিন পর্যন্ত কাটিয়েছি। স্বামীজির সঙ্গে একত্রে অবস্থান করেছি শেলা রামকৃষ্ণ আশ্রমে, তারপর খাসিয়াদের জ্ঞাতি সিন্টেংদের দেশ জোয়াইয়ে চলে গেছি রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্কুলে সিন্টেং ও খাসিয়া ছেলেদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কাজ নিয়ে। এমনিভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে তিন বৎসরেরও অধিককাল আমার কেটেছিল খাসিয়া পাহাড়ে। খাসিয়া ও সিন্টেংদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি আমি 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী' পুস্তকে।

শ্রীমতী দাস বলেছেন যে, 'খাসি ভাষার বিকৃত রূপ' বলে আমি যে কয়টি উদাহরণ

লিখেছি তার সব কয়টিই ভুল। কিন্তু আমাকে কার্যোপলক্ষে খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের এমন সব স্থানে বাস করতে হয়েছে যেখানে তখনকার দিনে দু' একজন ছাড়া বাঙালী ছিলেন না। কাজেই আমাকে খাসিয়া ভাষা শিখতে হয়েছিল বেঁচে থাকবার দায়ে! সাধারণ মানুষের মুখের উচ্চারণ শুনেই আমাকে উচ্চারণ রপ্ত করতে হয়েছিল। নিজের কানে যা শুনেছি তাকে ভুল বলে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। ওদের মুখের ভাষাকেই তো রোমান অক্ষরে লেখা ভাষার তথা সাহিত্যের রূপ দেন খৃষ্টান মিশনারীরা, অভিধান রচনার সূচনাও তো করেন তাঁরাই। ইংরেজি রোমান অক্ষর ওয়াই খাসিয়া ভাষায় ই রূপে উচ্চারিত হয় না। দু একটি দৃষ্টান্ত দিই Dy Khar (বিদেশী। শব্দটি ডিখার নয়, ডেখার), Kyndai (সংখ্যা বাচক ৯) কিন্ডাই নয়, কেন্ডাই। এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। [illegible] (Synsar) এর [illegible] নয়। [illegible] কথা আমার সামান্য জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে, রোমান অক্ষরে লিখিত অভিধান থেকে অনেক খাসিয়া শব্দের আসল উচ্চারণ বুঝতে পারা বাঙালী পাঠকদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আমার যে কয়টি উদাহরণকে তিনি ভুল বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয়। কিন্তু অতি সংক্ষেপে দু একটি কথা উল্লেখ করছি। আমার উল্লিখিত ভুলের তালিকায় [illegible] শব্দটি ছিল। লেখিকা [illegible] ভুল [illegible]। শব্দটি একেবারেই [illegible]। জৈন্তা পাহাড়ের রাজধানী [illegible] শহরে কতকগুলি পাকঘর আছে। [illegible] কাইং-পাকাই বলে। কাইং-পাকাং বললে তো [illegible]। [illegible] উৎসবের সময় এই কাইং-পাকাংগুলিতে খুব ধুমধাম হয় দেখেছি।

এই প্রবন্ধে লেখিকা লিখেছেন বিশ্বকুরমা। আমার আলোচনায় আমি উল্লেখ করি যে, আসল শব্দটি হবে বিশ্বকর্মা। [illegible] আলোচনার উত্তর দিতে গিয়ে লেখিকা দেখছি আমার সিদ্ধান্ত আংশিক ভাবে মেনে নিয়েছেন। [illegible] করেছেন এবং [illegible] গ্রহণ করে লিখেছেন বিশ্বকুরমা। [illegible] এই বানান দেখতে পাচ্ছি বিশ্বকুরমাকে এবং বিশ্বকর্মার কতকটা কাছাকাছি বলে চিনতে পারা যায়।

লেখিকা আলোচনার এক জায়গায় বলেছেন খাসি পাহাড় এবং পূর্ববঙ্গ প্রতিবেশী অঞ্চল। কথাটা ভুল। আসলে খাসিয়া পাহাড় এবং শ্রীহট্ট জেলা এই দুটি অঞ্চল পরস্পরের প্রতিবেশী অঞ্চল। আর এই শ্রীহট্ট বৃটিশ আমলে ছিল আসামের অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক যুগ থেকে খাসিয়া পাহাড়ের যোগাযোগ এই শ্রীহট্টের সঙ্গে, পূর্ববঙ্গের কোনো জেলার সঙ্গে নয়। তাই বাংলা ভাষার যে শব্দগুলি খাসিয়া ভাষায় ঢুকেছে সেগুলি শ্রীহট্টেরই প্রান্তিক অঞ্চলের বাংলা শব্দ।

খাসি শব্দটি যে শুদ্ধ তা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু ভুল হলেও খাসিয়া শব্দটি বাংলা সাহিত্যে অর্ধ শতাব্দীরও উর্ধকাল যাবৎ এমন কায়েম হয়ে বসেছে যে, মনে হয় খাসি চলবে না এবং চালানোর চেষ্টা না করাই সমীচীন।

লেখিকা কর্তৃক একাধিকবার উল্লিখিত

'শিবলং' সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। এই বানানে বাংলা তথা সারা ভারতে অতি পরিচিত 'শিলং' শহরটিকে চেনা যায় কি?

খাসিয়া বানান ও উচ্চারণ প্রসঙ্গে আরও অনেক কিছু বলবার ছিল। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়াতে এখানেই এই প্রসঙ্গে ইতি টানতে হল। অন্য 'ভুল' (?) গুলি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর হল না।

উপসংহারে লেখিকা জানিয়েছেন যে খাসিয়া নৃত্যকলা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য তিনি মেনে নিতে পারছেন না। খাসিয়ারা যে নাচে গানে খুবই উৎসাহী সে কথা আমিও অস্বীকার করি না। আমার পাহাড়িয়া কাহিনীতে আমি বলেছি, খাসিয়ারা "সরল বিশ্বাসী, সত্যবাদী, আমুদে ও নৃত্যগীত প্রিয়।" (পৃঃ ৫)। কিন্তু নৃত্যে উৎসাহ থাকলেই কি কোনো জাতির মানুষ নৃত্যকলায় নৈপুণ্য অর্জন করতে পারে? আসামের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মণিপুরী নাচেরই গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। সেই নাচের খ্যাতি আজ দেশে বিদেশে প্রচারিত। নাগাদের যুদ্ধ নৃত্যেও কতকটা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু খাসিয়াদের 'উৎকৃষ্ট ও নিপুণ' নৃত্যকলার গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা আজ পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কিংবা কারুর লেখায় পড়িওনি। নংক্রেম এবং অন্যান্য স্থানের খাসিয়া নাচ দেখে শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছি। নংক্রেমের নাচ ত খাসিয়া নৃত্যেরই একটি প্রকৃষ্ট (?) উদাহরণ। কিন্তু এই নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে একে উৎকৃষ্ট ও নিপুণ নৃত্যকলা বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবেন—এ রকম নৃত্যরসিক বিরল বলেই মনে হয়।

*

খাসিয়াদের স্বজাতি সিণ্টেংদের জাতীয় প্রধান উৎসব বে-ডিং-খ্লাম উপলক্ষে জোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত নাচও আমি দেখেছি—সেও তো মুখে 'হৈ' 'হৈ' আওয়াজ আর প্রচণ্ড লম্ফ ঝম্প ছাড়া কিছু নয়।

নলিনীকুমার ভদ্র
কলিকাতা-৯

(এ সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ সম্ভব নয়)

শিক্ষায়তনে পবিত্রতা

গত ১২ সংখ্যা শনিবারের "দেশ" পত্রিকায় "রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে" শিক্ষায়তনে পবিত্রতা প্রসঙ্গ পড়লাম। সংবাদভাষ্যটি সময়োপযোগী হলেও তিনি সবকটি ছাত্র সংগঠনকে এক সাথে ফেলে তালগোল পাকিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার প্রতি আমার প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। লেখকের সঠিকভাবে জানা উচিত সত্যিকারের যে অর্থে ছাত্র সংগঠনের সার্থকতা বোঝায় তা বাংলা দেশে বা ভারতবর্ষের কোথাও আছে কিনা। যদি থাকে তা যত ছোট হোক আর বড়ই হোক সে তার ধর্ম বজায় রাখতে পারছে কিনা। লেখকের চোখে বড় বড় সংগঠন বা বর্তমানে ছয় পার্টি আট পার্টি জোট এবং পূর্বের কংগ্রেস ছাড়া অন্য কিছু নজরে পড়ে না।

সোস্যালিস্ট স্টুডেণ্টস অর্গানাইজেশন-এর মত বামপন্থী আদর্শ ও নীতিযুক্ত ছাত্র সংগঠনকে অন্য দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি। সি পি এম-এর ছাত্রফ্রণ্ট ও আট পার্টির ছাত্র ফ্রণ্ট বিশেষ করে সি পি আই-এর বিভিন্ন জায়গায় যে হানাহানি, শিক্ষক লাঞ্ছনা ও ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তার প্রতিবাদ ও বাধাদান আমরা যে ভাবে করেছি তা অন্য কোন ছাত্র সংগঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও তারা সংগঠন বড় করে দেখায় ও বড় বড় কথা মাঠে-ময়দানে বলে থাকে।

আমরা ছাত্রের স্বার্থে বহুবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার জন্য বহু ছাত্র সংগঠনের কাছে আবেদন করেছি। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি।

স্কুল কলেজে হামলা রোধ, শান্তিরক্ষা, শিক্ষক লাঞ্ছনা বন্ধ, পরীক্ষায় টোকাটুকি বন্ধ করা ব্যাপারে এবং শিক্ষায়তনের সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ডবলিউ বি সি ইউ টি এ-এর সাথে বহু আলোচনা করেছি। তাতে অধ্যাপক সমিতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তথাকথিত বামপন্থী ছাত্রগুলির সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার কাজে বিভিন্ন রকম বাদ সাধলেন এবং এড়িয়ে গেলেন, আর বৃহৎ সংগঠন ছাত্র পরিষদ সাড়াই দিল না। সবাই দলের কথা ভাবল।

সাঁইবাড়ির ঘটনা, হালতু স্কুলের ছাত্র পিনাকি নাগ, দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পারুল বসু, রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা ও ডঃ গোপাল সেন, সৌম্যেন্দু চক্রবর্তীর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও সভা সমিতির মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় পিছপা হইনি। কিন্তু সংবাদপত্রে আমাদের খবর চাপা পড়ে যায়। আমরা আদর্শ ও নীতি সামনে রেখে বামপন্থী ভূমিকাই পালন করেছি।

এর জন্য নাগরিক নিরাপত্তা কমিটি, শান্তি কমিটি করে কাজ করে চলেছি। আমরা বাংলার বর্তমান অবস্থার মোকাবিলা করে যাব।

হরেন পয়রা
কলিকাতা-১৪

ভ্রম সংশোধন

৬ মার্চ তারিখের "দেশ"-এ আলোচনা বিভাগে "হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে..." প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনার লেখক প্রদীপ্তকিরণ গুপ্ত। ভ্রমক্রমে দীপ্তিকিরণ গুপ্ত ছাপা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

গল্পগ্রন্থ

দেবেশ রায়ের গল্প। দেবেশ রায়। সারস্বত লাইব্রেরী. ২০৬ বিধান সরণী. কলকাতা-৬। ছয় টাকা।

আজ থেকে প্রায় এক যুগ বা তারও কিছু বেশি আগে বাংলা গল্পে কয়েকজন তরুণ লেখক সচেতনভাবে যে আন্দোলনের সূচনা করেন, দেবেশ রায় ছিলেন তার পুরোভাগে। সে আন্দোলনের আক্ষরিক সূচনা ঘটবার আগেই অবশ্য দেশ ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেশের দু' একটি গল্পে বিষয়, ভাষা ও আঙ্গিকের নতুনত্ব লক্ষ করা যাচ্ছিল (দ্রষ্টব্য এই গ্রন্থের আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা গল্পটি) ; যেমন দেখা গিয়েছিল তাঁর সমসাময়িক আরো কোনো কোনো তরুণ লেখকের রচনায়। প্রচলিত প্যাটার্ন বিরোধী. এইসব বিচ্ছিন্ন প্রয়াসই পরে একটি সংহত আন্দোলনের রূপ নেয়। আন্দোলনের নিয়মে সে-আন্দোলন বিস্মৃত হলেও সেইসব তরুণদের অনেকেই আজ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে ছোট গল্পের বই প্রকাশে প্রকাশকমহলে অনীহা দেখা না দিলে পাঠককুল একটি বৈচিত্র্য ও তাৎপর্য পূর্ণ সাহিত্য ধারার সংস্পর্শে নতুন স্বাদ অনুভব করতে পারতেন। 'দেবেশ রায়ের গল্প' গ্রন্থটি সেদিক থেকে একটি প্রকৃষ্ট অভাব পূরণ করবে।

আরো একটি কারণে বইটি উল্লেখ দাবি করে। দেবেশ বর্তমানে খুবই কম লিখছেন; সাহিত্য ভিন্ন বর্তমানে তাঁর আগ্রহ রাজনীতিতেও সমানভাবে সক্রিয়—উভয়ের মধ্যে কোনটিকে তিনি শেষ পর্যন্ত অবলম্বন করবেন, তা অবশ্য এখনই বলা যায় না। কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গটি তাঁর রচনা কর্মের আলোচনায় অপরিহার্য কেননা তাঁর চিন্তা ও মানসিকতা গঠনে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত যে সমাজবোধের ছায়া তাঁর অধিকাংশ রচনায় পরিব্যাপ্ত, তীব্র সমাজানুসন্ধিৎসা ব্যতীত তা সম্ভব হত না। এইখানেই বোধ হয় তাঁর সমসাময়িক অধিকাংশ লেখকের সঙ্গে তাঁর প্রভেদটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অব্যবহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও সংঘর্ষ এবং তার ফলে উদ্ভূত অস্তিত্বের মৌল পরিচয় উদ্ঘাটনই দেবেশ রায়ের গল্পের প্রধান বিষয়। বিষয়ের পটভূমি থেকে চরিত্রগুলিকে প্রায়ই তিনি পৌঁছে দিয়েছেন আত্মোপলব্ধির সেই স্তরে—যেখানে তারা নিজ ও অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে অক্ষম, অসহায় ও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত; অন্যত্র—একই ফলে—ক্রমে স্বার্থপর, মুমুক্ষু, এবং উদ্বাস্তু। গ্রন্থে সংকলিত 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা', 'কলকাতা ও গোপাল', 'ইচ্ছামতী', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন ?' এবং 'উদ্বাস্তু' এই পর্যায়ের গল্প। এইসব গল্পের বিষয়ের অন্তরে পৌরাণিক তথা নিয়তিবাদের উপস্থিতিও কেউ কেউ লক্ষ করতে পারেন। 'আহ্নিকগতি ও মাঝখানের দরজা' গল্পে শিশির ও তৃপ্তির সম্পর্কের মধ্যে দরজাটি সুস্পষ্ট প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; 'জনক' ও 'পিতা' এখানে অসেতুসম্ভব তাৎপর্য। তেমনি 'নিরস্ত্রীকরণ কেন ?' গল্পে মানুষের অস্তিত্বের দুই ভূমিকা—পরস্পরবিরোধী ভূমিকা—প্রশ্নে উৎকীর্ণ : "জীবন কি এই কামরায় নারী আর শিশুতে কাঁদছে, নাকি বাইরে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছে ? এটা কি বাঁচা না মারা ? ট্রেন, এই বাষ্পচালিত মহান যন্ত্র, কামরার ভেতরের লোকগুলোকে বাঁচাচ্ছে, নাকি বাইরের লোকটাকে মারছে ?" 'উদ্বাস্তু' গল্পের 'আত্মপরিচয়হীন' স্বামী স্ত্রী সত্যব্রত ও অনিমা—'সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দুটি আত্মা'—অপেক্ষা করে পরিচয় পুনঃপ্রাপ্তির বা উদ্ধারের মুহূর্তটির; ওই আভাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে গল্প। 'উদ্বাস্তু' ও 'নিরস্ত্রীকরণ কেন ?' গল্প দুটি শুধু এই গ্রন্থের কেন ইদানীং রচিত বাংলা গল্পসমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'পা', 'কলকাতা ও গোপাল' এবং 'ইচ্ছামতী' গল্পের ব্যঞ্জনা ভিন্নতর হলেও এদের মধ্যে উপরোক্ত অনুষঙ্গ লক্ষ করা দুরূহ নয়। তুলনায়, 'দুপুর' ও 'পশ্চাৎভূমি' ভিন্ন মেজাজের গল্প—যেখানে অব্যবহিত , পরিবেশ থেকে বেরিয়ে চরিত্ররা প্রকৃতি ও অতীন্দ্রিয়ের অংশ হয়ে ওঠে। এগুলিও বিশেষভাবে দেবেশেরই

লেখা গল্প। একই সঙ্গে লক্ষণীয় এঁদের ব্যাঙ্গধর্মিতা এবং রীতির চাতুর্য; বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে যেগুলিতে ম্যানারিজম্ আবিষ্কার করাও অসম্ভব নয়।

কিন্তু দেবেশ রায়ের ভাষা ও ভঙ্গি যেমন তাঁর নিজস্ব, তেমনি নিজস্ব তাঁর কোথাও কোথাও অতিকথন, পৌনঃপুনিকতা এবং উপমা ব্যবহারের প্রবণতা—যা নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর স্টাইল। বলাবাহুল্য, তাঁর গদ্য-ভঙ্গি থেকে তাঁর বিষয় ও বক্তব্যকে আলাদা করে দেখা হাড় থেকে মাংস আলাদা করে নেয়ার মতোই বিসদৃশ ব্যাপার। বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই সে-চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন।

৩৮০/৬৯

প্রবন্ধ

পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ রচনা। মীরা অধিকারী। পরিবেশক : সাহিত্য প্রকাশ, ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৯। নয় টাকা।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম ব্যঙ্গরচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অথচ, দুর্ভাগ্যের কথা, কঙ্কাবতী-ডমরুচরিত-ফোকলা দিগম্বর-এর অমরস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথের পরিচিতি এবং প্রশংসা মুষ্টিমেয় রসিকজনের বাইরে তেমন একটা নেই। এ বিচারে আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্যাপকতর বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গ্রন্থের আলোচনাধারা সুবিন্যস্ত এবং সুপরিকল্পিত। আলোচিত বিষয়বস্তু চারটি স্তরে বিভক্ত হয়ে, মুখ্যত গবেষণাধর্মী আলোচনায় যে জটিল নীরসতা এবং কেতাবিরীতি লক্ষ করা যায় এ গ্রন্থের বিন্যাসপদ্ধতি তার ঊর্ধ্বে নয়। প্রথম স্তরে ব্যঙ্গসাহিত্যের প্রেক্ষিত-প্রেরণা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিজীবন পরিচয় এবং সাহিত্যসম্ভারের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয় স্তরে উত্তরকালের ব্যঙ্গ রচয়িতা কেদারনাথ এবং প্রভাতকুমারের উপর ত্রৈলোক্যনাথের প্রতিক্রিয়া প্রভাব দর্শানো হয়েছে। সবশেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পের পরবর্তী অংশ ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য রূপসী হিরন্ময়ী গল্পটির পুনর্মুদ্রণ বেশ চিত্তাকর্ষক। সমগ্র গ্রন্থে নাটকীয় ঘটনাবহুল ত্রৈলোক্যনাথের জীবন পরিচয় পাঠকের সবচেয়ে বেশি কৌতূহল আকর্ষণ করবে। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টিধারার বিচারে মাঝে মাঝে মূল রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে লেখিকা আলোচনাধারায় সুখপাঠ্যতা নামক গুণটি নিয়ে আসতে সফলবতী হয়েছেন। তবে, দৃষ্টিভঙ্গী একান্তভাবে একাডেমিক হওয়ায় বিচার রীতি প্রায়শই নীরস এবং ক্লান্তিকরতায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে আবেগের অসংযম বিশ্লেষণক্রিয়াকে অস্বচ্ছ করে ফেলেছে। ভাষা ব্যবহারেও মননের দৈন্য প্রকট।

নামপত্রে এবং ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্রী জানিয়েছেন, বইখানি তাঁর সমগ্র পরিকল্পনার প্রথম অংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে পরশুরাম-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি বিষয় পরিকল্পনাকে সুসম্পূর্ণ করবেন। এ জাতীয় অজুহাত বোধ হয় আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টিপরিচয় যেক্ষেত্রে এই বইয়ের আলোচিত বিষয় এবং যখন পরশুরামকে নিয়ে তিনি তেমন শব্দব্যয় করেন নি—সেক্ষেত্রে বইটির নাম 'পরশুরাম ও ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরচনা' রাখায় সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে—এ বিষয়ে লেখিকা খানিকটা সতর্ক হলে ভাল হত।

২৫৬/৭০

পত্রিকা

বিস্ময় : সম্পাদক : সুজিত ধর। ১৩৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-৯।

সায়েন্স ফিকসন নিয়ে ইদানীং বাংলা ভাষায় কিছু কিছু লেখক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। শুধু গত এক দশকে যাঁরা বাংলা ভাষায় মৌলিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প লিখে কিছুটা সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন, সংখ্যায় তাঁরা খুবই নগণ্য। ইদানীং বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকা বাড়লেও, শুধু বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প বা সায়েন্স ফিকসনের কাগজ এ ভাষায় নেই বললেও চলে। কয়েক বছর আগে একটি পত্রিকা যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সাড়াও জাগিয়েছিল। এখন সেটি নির্বাপিত প্রায়। ঠিক এই সময়ে 'বিস্ময়' নামে সায়েন্স ফিকসনের কাগজটি সর্বসাধারণের কাছে বেশ কিছুটা যে কৌতূহল সৃষ্টি করবে, বলাই বাহুল্য। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় নিবন্ধ বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা। এ সংখ্যায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, বিশু দাস, প্রভৃতি। বিশু দাসের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পটি সরস এবং যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। ঠিক এই সুরটি বজায় রাখলে জনপ্রিয় হওয়ার ব্যাপারে **'বিস্ময়ের'** তেমন বাধা থাকবে না।

প্রাপ্তি স্বীকার

উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত। দিলীপ মুখোপাধ্যায়। **কল্যাণী প্রকাশন** : ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ৬·০০।

রবীন্দ্রনাথের অচলায়তন। শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য। দীপিকা : ৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫·০০।

A Report to the Nation. Edited by: Amiya Rao and B. G. Rao. Orient Longman Ltd. : 17 Chittaranjan Avenue, Calcutta-13. Rs. 7.50.

ভ্রম সংশোধন

'দেশ' ১৩ মার্চ, ১৯৭১ (৩৮ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা)-এর ৫৪০ পৃষ্ঠায় **পাঠভবন, ১২/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২**-এর বিজ্ঞাপনে, বইয়ের নাম **'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা-র** পরিবর্তে **'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'** পড়িতে হইবে।

হকি খেলার আইন কানুন

আগের সপ্তাহেই লিখেছি, আন্তর্জাতিক হকি বোর্ডের বিধান অনুযায়ী হকি খেলার সময় প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে মোট ৭০ মিনিট। ফুটবল খেলার মত হকি খেলাতেও জাতীয় বা রাজ্য সংস্থার সময় স্থির করার অধিকার আছে। আবহাওয়া অনুযায়ী তার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। যেমন কলকাতায় হকি লীগের খেলা হয় প্রতি অর্ধে ৩০ মিনিট করে ৬০ মিনিট। আবার বেটন কাপের খেলা হয় প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে ৭০ মিনিট।

॥ আইন ২ ॥ অধিনায়ক

অধিনায়কের কর্তব্য হচ্ছে—

(এ) মাঠের কোন পাশে প্রথম দাঁড়াবেন তার জন্য অধিনায়করা টস করবেন।

(বি) যদি আম্পায়ার অনুপস্থিত থাকেন তবে আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন। কিংবা কোনো সহ খেলোয়াড়ের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

(সি) কে গোলে খেলছেন—খেলা আরম্ভের আগে তা আম্পায়ারকে জানিয়ে **দেবেন এবং গোলকিপার বদল করলেও সে কথা জানিয়ে দেবেন।**

হকি মাঠের মাপজোক

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) খেলার আগে টস করার কথা। মাঠের মধ্যেই সাধারণত টস করা হয়। তবে মাঠের বাইরেও টস করা যায়। মেলবোর্ন অলিম্পিকে অধিকাংশ খেলার টস হয়েছে প্যাভিলিয়নের মধ্যে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক খেলাতেও এর নজির আছে।

(২) আম্পায়ারের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কের আম্পায়ারের দায়িত্ব পালনের কথা আসে প্রীতি বা প্রদর্শনী খেলায়, প্রতিযোগিতার খেলায় নয়।

(৩) দলের স্বার্থেই খেলার আগে গোলকিপার সনাক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা বল কিক করার অধিকার ও দেহের যে কোন অংশ দিয়ে বল প্রতিরোধের অধিকার একমাত্র গোলকিপারেরই আছে।

(৪) খেলার যে কোন সময় গোলকিপার বদল করা যায়। তবে, বদলের কথা আম্পায়ারকে জানিয়ে দিতে হয়।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

(১) কোনো কোনো ক্ষেত্রে আম্পায়ারেরা টস করে থাকেন। কিন্তু আইনে দুই অধিনায়কেরই টস করার কথা।

খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ

দলের খেলোয়াড়দের জামার রং থেকে গোলকিপার যদি পৃথক রং-এর জামা না পরে মাঠে নামেন আম্পায়ারের কিছু করণীয় নেই। কিন্তু দলের স্বার্থেই গোলকিপারের পৃথক রং-এর জামা পরে খেলা উচিত। বিশেষ করে গোলকিপার যদি পায়ে প্যাড না পরে মাঠে নামেন সে ক্ষেত্রে তো বটেই।

গোলকিপার বদলের কথা আম্পায়ারকে অধিনায়কই জানিয়ে থাকেন। অপর কোনো খেলোয়াড়ও জানাতে পারেন।

॥ আইন ৩ ॥ মাঠ

(এ) খেলার মাঠ হবে চতুষ্কোণ, দৈর্ঘে ১০০ গজ এবং প্রস্থে ৫৫ গজ থেকে কম নয়, ৬০ গজ থেকে বেশী নয়। সাদা রেখা দ্বারা মাঠ চিহ্নিত করতে হবে। দৈর্ঘ্যের সীমারেখাকে বলা হবে সাইড-লাইনস, প্রস্থের—সীমারেখাকে বলা হবে গোল-লাইনস। গোল-লাইনস সমস্তটা ৩ ইঞ্চি চওড়া হবে।

(বি) মাঠের চার কোণে, সেন্টার লাইনের দুই দিকে এবং ২৫ গজী লাইনের দুই দিকে ফ্লাগ-পোস্ট (৪ ফুটের কম উঁচু নয়) পুঁততে হবে। সেন্টার লাইন এবং ২৫ গজী লাইনের পাশের ফ্লাগ-পোস্ট থাকবে সাইড-লাইনের এক গজ দূরে।

—মুকুল

হয়েছেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। এবং অনেকেই হাতে নাতে ফল পেয়েছেন। কারো হজমশক্তি কম ছিল, কারো রাতে ঘুম হত না, কেউ স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছিলেন, কারো ভুঁড়ি বেড়ে যাচ্ছিল, কেউ বা কষ্ট পাচ্ছিলেন রক্তের চাপে। যোগব্যায়ামের নানা প্রক্রিয়ায় এবং নিয়মিত অনুশীলনে প্রায় সবাই আশাতীত ফল পেয়েছেন, গাদা গাদা ওষুধ গিলেও যে ফল পাননি। প্রায় ৫০ জন সভ্যের এই যোগব্যায়াম কেন্দ্রটির পরিচালক সদেহী রবীন চক্রবর্তী, যিনি উনিশশো … তে ভারতশ্রী খেতাব পেয়েছিলেন।

প্রদর্শনী দেখে বেশ ভালই লাগল। আরও ভাল লাগল হাতে নাতে ফল পাবার খবর শুনে। পরিচালক রবীন চক্রবর্তী জানালেন, শুধু স্বাস্থ্যোদ্ধার এবং সভ্যদের সদেহী করে তোলাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়, সমাজের দারিদ্র্য দূর করা এবং বর্তমানের হিংসাশ্রয়ী অরাজকতার মোকাবিলায় সভ্যদের মানসিক গঠন এবং আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। অপটু শরীর এবং ভীরু মন মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। স্বাস্থ্যের সঙ্গেই আসে মানসিক দৃঢ়তা।

নিজের জীবনের উপমা দিয়ে রবীন চক্রবর্তী জানালেন, স্বাস্থ্য তার খুবই খারাপ ছিল। পাড়ার একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে বিশ্রী ধরনের এক অসামাজিক অন্যায় কাজ করলে রবীন চক্রবর্তী তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নাকাল হয়ে ফিরে আসে। রবীনের মনে হয় স্বাস্থ্য সম্পদে শক্তিশালী না হলে ও কোনোদিনই অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবে না। তারপর থেকে আরম্ভ হয় নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চা। সদেহী রবীন পরবর্তী কালে বহু সম্মানের অধিকারী এবং ভারতশ্রী খেতাব পেলেও লক্ষ্য স্থির রেখে কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন।

কিছুদিন আগে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় আয়রনম্যান নীরদ সরকারের একখানি চিঠি পড়েছিলাম। বর্তমানের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হিংসাশ্রয়ী ঘটনার মোকাবিলার জন্য নীরদবাবু বলেছেন, পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য জাতীয় আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে যেমন সঙ্ঘ সমিতি গড়ে উঠেছিল, যুব সমাজকে দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান করে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলা হয়েছিল সেইভাবেই যদি আবার যুব সমাজকে জাগিয়ে তোলা যায় তবে সন্ত্রাসকবলিত জনজীবনে কিছুটা আস্থা ফিরে আসতে পারে। কথাটা ভেবে দেখবার মত।

এই সঙ্গেই স্মরণ করছি মহাত্মা গান্ধীর কাছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সেই বিখ্যাত উক্তি—"বাঙালীর মরার সাহস আছে, কিন্তু বাঁচার সাহস কোথায়?"

আজ সত্যিই বাঙালীর সব চেয়ে বড় প্রয়োজন বাঁচার এবং বাঁচাবার সাহসের। সঙ্ঘ সমিতি এবং ব্যায়াম কেন্দ্র এই সাহসের অবশ্যই সহায়ক হতে পারে।

রবীন চক্রবর্তী

ইংলণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ের খবর এবং অন্যান্য খবরাখবর পরিবেশনের জন্য এর আগে ইংলণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট খেলার সমীক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১২ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার করে দেশে ফেরবার পথে ইংলণ্ড দল নিউজিল্যাণ্ডে দুটি টেস্ট খেলেছে। একটিতে বিজয়ী হয়েছে ৮ উইকেটে, একটির ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে।

খেলা দুটির পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে অ্যাসেজ-জয়ী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ড রীতিমত কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের সর্বপ্রথম টেস্ট জয়েরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখের ক্রাইস্টচার্চে আরম্ভ হয় ইংলণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট। টসে বিজয়ী হয়ে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং প্রথম ব্যাট করবার সিদ্ধান্ত নেন। ৩৩ রানের মধ্যে ৪টি উইকেট পড়ে যাবার পর বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং বৃষ্টির জন্য ৮০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। বৃষ্টিভেজা উইকেটে নিউজিল্যাণ্ডের পরবর্তী খেলোয়াড়রা পর পর আউট হতে থাকেন। ফলে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে ৬৫ রানে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। তবে দিনের শেষে ইংলণ্ডও ৩টি উইকেট হারায় মাত্র ৫৬ রানের মধ্যে।

প্রথম দিনের খেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইংলণ্ডের ২৫ বছর বয়সী ন্যাটা স্পিন বোলার ডেরেক আণ্ডারউডের ১২ রানে ৬টি উইকেট লাভ।

দ্বিতীয় দিন প্রধানত বেসিল ডলিভেরার সেঞ্চুরির ফলে ইংলণ্ড ২৩১ রানে ইনিংস শেষ করে ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উইকেটে ৫৪ রান করলে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বৃষ্টির জন্য শেষের ৯০ মিনিট খেলাই হয় না।

দেখা যাচ্ছে নিউজিল্যাণ্ডের প্রতি ভাগ্যদেবী বিরূপ। কেননা, দুই ইনিংসেই তাদের খেলতে হয়েছে বৃষ্টি ভেজা উইকেটে। তবু নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেটাররা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এ তারা তৃতীয় দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২১২ রান সংগ্রহ করতে পেরেছে।

চতুর্থ দিন ২৫৪ রানে নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর জয়ের জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন থাকে ৮৯ রান। ২ উইকেট হারিয়ে ওই রান সংগ্রহ করে তারা খেলায় জেতে ৮ উইকেটে।

ন্যাটা স্পিন বোলার ডেরেক আণ্ডারউড, যিনি প্রথম ইনিংসে ১২ রানে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি দ্বিতীয় ইনিংসেও ৮৫ রানে ৬টি উইকেট পেয়ে মোট ৯৭ রানে দখল করেন ১২টি উইকেট। টেস্ট-জীবনের শ্রেষ্ঠ বোলিং আণ্ডারউডের। স্কোর বোর্ড :

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—৬৫ (ভিক পোলার্ড ১৮; ডেরেক আণ্ডারউড ১২ রানে ৬ উইকেট, কেন সাটক্লিফ ১৪ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৩১ (বেসিল ডলিভেরা ১০০, জন হ্যাম্পশায়ার ৪০, রে ইলিংওয়ার্থ ৩৬; প্রিস্টপটন ৩৫ রানে ৩ উইকেট, কলিঞ্জ ৩৯ রানে ২ উইকেট)।

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২৫৪ (টার্নার ৭৬, কংডন ৫৫, কানিস ৩৫, পোলার্ড ৩৪, হাওয়ার্থ ২৫; আণ্ডারউড ৮৫ রানে ৬ উইকেট, সাটক্লিফ ২৭ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২ উইকেটে ৮৯ (হ্যাম্পশায়ার নট আউট ৫১, লাকহার্স্ট নট আউট ২৯; কলিঞ্জ ২০ রানে ২ উইকেট)।

[ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী]

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

কীলা-উয়ি জায়গাটা কোথায়?
সেখানেই আমাদের নিয়ে যাচ্ছ তো?
তা যাচ্ছি। তবে সেখানে পৌঁছুবার পরে তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে!

বন্দুক-হাতে বিদেশী মানুষেরা কীলা-উয়ির দিকে যাচ্ছে
ঢাক বাজছে কেন?

কীলা-উয়ির সোনাবেলা।
?
বন্দুক হাতে বিদেশী মানুষেরা কীলা-উয়ির দিকে যাচ্ছে—

রাজা, টম, বিপদ ঘটতে পারে। সলোমন ও নেফারতিতি তো রয়েছে। ভেলায় উঠে তোরা বরং দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর।

সলোমন আর নেফারতিতি! অরণ্যদেবের পোষা দুই আশ্চর্য শুশুক!
অরণ্যদেব তো ভেলার উপরে শুয়ে থাকতে বললেন!
সেই ভালো

এই সেই সোনাবেলা! কী আশ্চর্য!
!!
বেল্লা ফর্টে

খালি সোনা আর সোনা!
ভাবুন, ওদের এখানে নিয়ে আসা কি ঠিক হল?
অরণ্যদেব ওদের শাস্তি দেবেন।
৪/২

'লোভীরা কীলা-উয়িতে গিয়ে মারা পড়ে—' অরণ্যের প্রবাদ।
এই যে খাঁটি সোনা!
কোটি কোটি টাকা—
এ শুধু আমাদের
১৮

আনডারগ্রাউনড সিনেমা

"The underground cinema with its poor production technique is nothing more than pornography gone wrong."

"Sexploitation—a licence to print money."—Today's cinema.

আনডারগ্রাউনড সিনেমার বাংলা নাম কী হতে পারে? পাতাল-ফিল্ম? নাম যাই হোক, শুধু pornography gone wrong অথবা sexploitation বলে একে বাতিল করে দেওয়া যায় কি? এর কি কোনই তাৎপর্য নেই? সমালোচকেরা আজ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। দু'একটি শ্লেষাত্মক কথায় অথবা শুধু তিরস্কারে সিনেমার এই অবাধ্য বংশধরকে কিন্তু অনেকেই বাতিল করে দিতে পারছেন না। স্টাইল ও বিষয়ের দিক থেকে পাতাল-ফিল্মের মূল্য তো অনেকেই স্বীকার করছেন। এমন কথাও অনেকে বলেছেন—সিনেমা, এখন যে-রকম, যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন ওই জায়গায় নতুন কিছু তো আসবেই। পাতাল-ফিল্ম কি সিনেমার বিবর্তনের পরের ধাপ? এই প্রশ্ন উঠছে। কেননা গদার তাঁর অধুনাতম ছবিগুলিতে (যেমন, "ইস্ট উইনড") তো দেখিয়েই দিয়েছেন যে প্রচলিত মিডিয়ামটির আর তেমন দরকার নেই। আরও অনেক শিল্পীই তো বলে দিচ্ছেন, অবশ্যই তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে, যে সাজানো-গোছানো ওই যে সিনেমা সে এখন আর বেঁচে নেই। অতএব, সে জায়গায় আনডারগ্রাউনড সিনেমাকে অবধারিত বলে মেনে নিতে বাধা কী?

পাতাল-ফিল্মের পথ কিন্তু এখনও তেমন প্রশস্ত নয়। কিছুদিন আগে লন্ডনে ইনটারন্যাশনাল আনডারগ্রাউনড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়ে গেল। আনডারগ্রাউনড নাকি তেমন কিছু সংবর্ধনা পায়নি। লোক-চক্ষুর অন্তরালে যা তৈরি লোকচক্ষুর গোচরে তার তেমন কদর হল না। শোনা যায়, ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে কোন নামকরা সমালোচককে দেখা যায়নি। অথচ ওই আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রায় বারোটি দেশের আশীজন চলচ্চিত্রকার তাঁদের পাতাল-ফিল্ম পাঠিয়েছিলেন। তবে পশ্চিম জার্মানীর "ক্লেজ" নাকি বহি-র্জগতের চলচ্চিত্রমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ

শার্লি ক্লার্কের "পোর্ট্রেট অফ জেসন"

করেছে খুব। আমেরিকায় বরঞ্চ আনডার-গ্রাউনড সিনেমা তেমন অবহেলার বস্তু নয়। কারণ হয়ত, কয়েকটি ছবি ব্যবসার দিকে খুবই সফল। আনডারগ্রাউনড সিনেমার অ্যান্ডি ওয়ারহোলকে যে হলিউডে

অ্যান্ডি ওয়ারহোল

দেখা যায় এর কারণ তাঁর "দি চেলসি গার্লস", "বাইক বয়" এবং "লোনসাম" ছবিগুলি অনেক টাকা পেয়েছে। এক-একটি ছবির যা খরচ তার চাইতে শত শত গুণ বেশি লাভ। সে কারণেই আমেরিকার বড় বাজেটের ছবির জগতে আনডার-গ্রাউনড সিনেমার জামাই আদর শুরু হয়েছে। কারণ আরও একটি আছে। টেলিভিশনকে ঠেকাবার জন্য হলিউডের প্রথম দরকার হয়েছিল বড় স্ক্রীন, তারপর কালার। তাতেও যখন কিছু হল না তখন ভরসা ছিল সুপার-স্পেকটেকল্। এখন মানুষের অস্তিত্বের কিছু বিষয় খোলাখুলি দেখানো ছাড়া উপায় নেই—টেলিভিশন যা দেখাতে পারে না। সুতরাং আনডারগ্রাউনডকে একে-বারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি হলিউডের পক্ষে। আনডারগ্রাউনড জগতের গুরু জোনাস মেকাসের পছন্দ নয় কেউ তাঁদের অনুসরণ করেন। তিনি বলেছেন, আমাদের ছবির মান অনেক উন্নত। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: **The more people who walk out, the better the film must be.**

জোনাস মেকাস যতই রাগ করুন, আনডারগ্রাউনডের প্রভাব কমার্শিয়াল ছবির উপর পড়তেই লাগল। একটা বড় উদাহরণ—"ইজি রাইডার", তবে ছবিটিতে নাকি আনডারগ্রাউনডের বিষয়বস্তুর ছাপই বেশি, ফর্মের নয়। যদিও দু'একটি জায়গায় বিশেষ করে নাকি কবরখানায় কাল্পনিক প্রেম ঘটনায় রন রাইস এর "চুমলাম" এবং এড এমসহুইলারের "রিলেটিভিটি" আনডারগ্রাউনড ছবি দুটির লক্ষণ বেশি স্পষ্ট।

অন্য দিকে আবার এ কথাও বলা হচ্ছে যে, হলিউডের উপর আনডারগ্রাউনডের প্রভাব তত বেশি নয় যতটা আনডারগ্রাউনডের উপর হলিউডের প্রভাব। কেনেথ অ্যাঙ্গারের "স্কোরপিও রাইজিং" (আনডারগ্রাউনড) ছবিটি তার প্রমাণ। পাঁচ বছর বয়সে কেনেথ অ্যাঙ্গার "এ মিডসামার নাইটস ড্রিম" ছবিতে নেমেছিলেন। অ্যাঙ্গারের সব ছবিতেই অলংকরণের একটা প্রবণতা দেখা যায়, যা চরমে উঠেছে "স্কোরপিও রাইজিং"-এ। হলিউডের প্রতি আনুগত্য বুঝাবার জন্য "হোল্ড মি হোয়াইল আই অ্যাম নেকেড"

[illegible]

"স্কোরপিও রাইজিং" : কেনেথ অ্যাঙ্গার

পরিচালনায় নচিকেতা ঘোষ এবং গান রচনা এবং "কালার মি শেমকেস" ছবিতেও স্পষ্ট।

নিউ ক্রনিকল-এর সমালোচক রিচার্ড উইনিংটন এমন একদিনের অপেক্ষায় ছিলেন যখন ফিল্ম ক্যামেরাকে কলমের মতই ব্যবহার করা যাবে। "হোম মুভীজ"-ও কি তাই? জোনাস মেকাসের "ডায়েরিজ, নোটস অ্যান্ড স্কেচেজ" ছবিটি বহু প্রশংসিত। এতে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ছবি তুলেছেন—বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া, বিয়ে, বেড়ানো ইত্যাদি। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "I make home movies because I am alive". ক্যামেরা এ-ভাবেই কলমের মতই ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু কী?

আনডারগ্রাউনড সিনেমার শিল্পীরা অনেকেই ছিলেন অংকনশিল্পী, ভাস্কর ইত্যাদি। তাই তাঁদের ছবিতে ফ্রেম-এর দিকে নজর বেশি, ফ্রেম নিয়ে অনেক রকম একসপেরিমেন্ট। অবশ্য বিষয়বস্তুর নতুনত্বও উপেক্ষা করা যায় না। এক্ষেত্রে তাঁরা আরও দুঃসাহসী। শার্লি ক্লার্কের "পোরট্রেট অব জ্যাসন" যেমন। য [illegible] গল্পে বা সিনেমায় বলা বা দেখানো যায় না তা বিনা কুণ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়ে দিচ্ছেন আনডারগ্রাউনড সিনেমার শিল্পীরা। শার্লি ক্লার্ক-এর "পোরট্রেট অব জ্যাসন" ছবিটির বিষয় পুরুষের "গণিকাবৃত্তি"। স্ট্যান ব্রাকেজ তাঁর ছবিতে আছেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা। ক্যামেরাকে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যেন সেটা তাঁর "অপটিক নার্ভ"। আট মিলিমিটারে তিনি ছবিটি তুলেছেন। সর্বাধুনিক ছবিতে (সিনস ক্রম আনডার চাইলডহুড) তিনি সাধারণ ফিল্ম প্রোজেকশানকেও নাকি অস্বীকার করেছেন। সে নাকি অন্য ধরনের এক প্রোজেকশান, ছবিটি দেখার সময় এই কারণেই দর্শকের মনে থাকবে যে ফ্রেমগুলি বার বার ঘুরে আসবে। বর্তমান প্রোজেকশান ব্যবস্থা নিয়ে পাতাল-ফিল্ম নির্মাতাদের কী রকম যেন এক অসন্তুষ্টি। একজন সমালোচক আন্তর্জাতিক উৎসবের ছবির প্রোজেকশান দেখে বলেছেন—

Such films are best in the home, where one can really get up to the screen (preferably with headphones and acid rock in the stereo.")

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নতুন নাটক "সওদাগর"

সমরেশ বসুর "সওদাগর" উপন্যাসের নাট্যরূপ শীঘ্রই মঞ্চস্থ হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন সমরেশ চক্রবর্তী। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন তৃপ্তি মিত্র। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় আছেন জ্ঞানেশ মুখার্জি, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, তরুণকুমার, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অজিত মিত্র, শম্ভু ব্যানার্জি, গণেশ শর্মা, পান্নালাল চ্যাটার্জি, কমল গুপ্ত, আরতি দাস, অলক গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জি ও সংকেত চৌধুরী। অনেকদিন পর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন রবি ঘোষ। সঙ্গীত করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন হেমন্ত মুখার্জি, সতীনাথ মুখার্জি ও শ্যামল মিত্র। আলো ও মঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যাপক অমর ঘোষ।

চি ত্র - স মা লো চ না

চৈতালী

(বনশ্রী-রাজশ্রী প্রোডাকশন্স)

পাহাড়ী মেয়ে লাজু—"চৈতালী"-র নায়িকা—পথে বিক্রি করে, তদুপরি সে সংগীতসাধিকা। তার কথাবার্তা (অধিকাংশ হিন্দীতে) ব্যবহার, হাসি, মানসিক প্রতিক্রিয়া, অভিব্যক্তি ইত্যাদি মোটেই গ্রাম্য মেয়ের মত নয়। লাজুর নাচ-গানের ক্ষমতা দেখে বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার অমিতাভ মুগ্ধ।

কয়েকদিন আগেও একটি হিন্দীচিত্রে দেখলাম—প্রায়শই দেখি—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজন শহুরে, অপরজন একেবারেই গ্রাম্য। তারপরেই "পিগম্যালিয়ন"-পর্ব, অর্থাৎ একজন অপরকে সভ্য-ভব্য করে তোলার জন্য সচেষ্ট। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই প্রণয়।

"চৈতালী"-তে এই ছকটি তো আছেই, তার সঙ্গে অন্য বিষয়গুলিও নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত। অমিতাভ তিব্বতের এক উপত্যকায় সরকারী অফিসে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেনে নিয়েছে যে এক শয়তান কনট্রাকটারের সঙ্গে তাকে সমানে যুঝে যেতে হবে। ভিলেনের বাস এই অঞ্চলেই, "হোলটাইম ভিলেন" সর্বক্ষণই অপকর্মে ব্যস্ত। তার শয়তানির দরুণ কোন ইঞ্জিনীয়রই নাকি ওই অফিসে টিকতে পারেনি, একজন প্রাণ হারিয়েছে। অমিতাভর বেলায় তার উল্টো হতেই হবে, কারণ সে ছবির নায়ক। ভিলেনের পতন কী-ভাবে ঘটবে সে কৌতূহল দর্শকের মনে থেকেই যায়। তবে অবশ্য হিন্দীচিত্রের ফরমূলা মত শয়তানের হাত থেকে নায়িকা উদ্ধারের কাজে অমিতাভর অমিত বিক্রম, দুঃসাহস ও সংগ্রাম দেখা যায়নি। লাজু নিজের বুদ্ধিতেই খলনায়কের হাত থেকে পালিয়ে সোজা থানায় চলে এসেছে। মাঝখান থেকে দুষ্টের হাতে প্রাণ দিয়েছেন এই অঞ্চলেরই সংগীতসাধক বুদ্ধ দেব, তিনি ছিলেন লাজুর বন্ধু, সঙ্গী, অভিভাবক ও সংগীতের প্রেরণা।

গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা : গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু) দর্শকদের নিছক আমোদের জন্যই লেখা, বিশেষ কোন জটিলতা এতে নেই। এবং যেহেতু দর্শকের প্রমোদই প্রধান লক্ষ্য)

ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবে "সীমাবদ্ধ"-র কিছু দৃশ্য গ্রহণ করেন সত্যজিৎ রায়; ছবিতে (বাঁ দিকে) নতুন শিল্পী পারমিতা চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায়, (ডাইনে) শর্মিলা ঠাকুর

ফটো—দেশ

ওই ছবিটা হিন্দীছবির অনুগামী। নায়িকার সংলাপেও বেশির ভাগ হিন্দী, শুধু গানগুলির সুরে একাধিক গানও হিন্দী, ভিলেন বোম্বাইয়ের মনোমোহন, সেই কথাও হিন্দীতে এবং ওই যে সাজানো চরিত্র এর সাজেন তিনিও সুযোগ বুঝেই উর্দু বলেছেন। ছবিটি যাতে বাঙালী ও হিন্দীচিত্রের অনুরাগী দর্শককে একই সঙ্গে আনন্দ দিতে পারে সে-ব্যবস্থা যেমন গল্পে তেমনি পরিচালক সুধীর মুখার্জীর গল্প-বিন্যাসে। পরিচালক সুধীরবাবুর দায়িত্ব এ-ছবিতে খুব সহজ—দর্শকদের কিছুক্ষণ এনটারটেনমেন্ট-এর আমেজে ধরে রাখা। প্রথমভাগে এ-কাজে তিনি খুবই সফল। দ্বিতীয়ভাগে ঘটনাগুলি ঘটেছে চটপট। হিন্দীচিত্রের ক্রাইমের উপকরণ এখানে থাকলেও এর বিধিব্যবস্থা তেমন রোমাঞ্চকর নয়। নায়িকার মুক্তি, নবাবের মৃত্যু, দুর্বৃত্তের বিনাশ ইত্যাদি খুবই সহজ প্রক্রিয়ায় সাধিত। অমিতাভ ও পাহাড়ী সান্যালের মিলনের পথেও তেমন জট বা জটিলতা নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে এটা আশা করাও অসঙ্গত। পরিচালক হাতে যা উপাদান পেয়েছেন তা দিয়েই তিনি দর্শককে তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন, এতে চেষ্টার কোন ত্রুটি বা "প্রিটেনশন" নেই। প্রয়োগের গুণে ছবিটা গতিসম্পন্ন, আউট-ডোরের দৃশ্যগুলিও সুন্দর। অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহার ফটোগ্রাফিও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ওই পরিবেশে নায়িকার নাচ ও নায়ক-নায়িকার গান ছবির একটা

"সীমাবদ্ধ"-র নায়ক বরুণ চন্দ্র ও শর্মিলা ঠাকুর

ফটো—দেশ

বিশেষ প্রমোদ-উপকরণ। এবং তার চাইতেও চিত্তাকর্ষক গানগুলি—তার দরুনেই ছবিটা তো হিট করবেই।

নায়কের হাতে আবার বাঁশি কেন তুলে দেওয়া হল জানি না। হয়ত সুযোগ-প্রাপ্ত লাজু ও অমিতাভকে সংগীতের জগতে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। একদিকে বাঁশি ও প্রেম এবং অপরদিকে ন্যায়নিষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ারের কর্তব্যপালন—এই দুয়ের মাঝখানে বিশ্বজিৎ চিত্রনাট্যের মধ্যে উদ্দেশ্যটা যথাসম্ভব সার্থক করে তুলেছেন। বাঙালী নায়িকার আবেগের পাঠ তো তনুজার নেওয়াই আছে, পাহাড়ী মেয়ে লাজুর বেশ-বাসে, ছুটোছুটি, নাচ ও অংগ-ভঙ্গিমাতে বোম্বাইয়ের এই শিল্পী আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। ভিলেনের পার্টে মনোমোহনের অসফল হবার কথা নয়, অরুণকুমারও তাঁর দুষ্ট সহযোগী হিসাবে বেশ কাজ করে গেছেন। নায়কের ভৃত্য তথা আপনজন হিসাবে জহর রায়ের অভিনয়ও মনোজ্ঞ।

এঁদের তুলনায় রীতিমত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে বসন্ত চৌধুরীকে, নবাব চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথের মত মেক-আপ নবাবের, তিনি আবার রবীন্দ্র-ভক্ত। দিল্লি যাবার নাম করে শান্তিনিকেতনে চলে যান রবীন্দ্র সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আহরণের জন্য। অবাঙালী নবাব উর্দু বলেন চমৎকার, কিন্তু তাঁকে অবাঙালী মনে করার কোন কারণ নেই। রসিক লোক, বৈষ্ণব প্রেমকবিতাও তাঁর পড়া, মাধুর্যরসে তাঁর

"কালো রাস্তা সাদা বাড়ি" (পরিচালনা : অজয় কর) ছবিতে দেবরাজ রায়

মন ভরপুর, আদর করে নায়িকাকে ডাকেন ছোটি বেগম। আর কথায় কথায় রবীন্দ্র-নাথের কবিতার লাইন বলেন। এ-হেন চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী কী-ই বা করতে পারেন। তবু ফাঁকে ফাঁকে তাঁর অভিনয়ের সাবলীলতা ও কবিতা আবৃত্তি দর্শকের ভাল লেগেছে। তবে রবীন্দ্রসংগীত-বিহীন "চৈতালী"-র ব্যাপারে নবাবের

"সোনা বৌদি" (পরিচালনা : পীযূষ গাঙ্গুলি) ছবিতে সুখেন দাস ও সমিত ভঞ্জ

গুণে গুণে কফিন-লাগানো পরিবেশ। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের একটানা শব্দে পরিবেশ গুমোট হয়ে উঠলো। "দিলীপকুমারকে এখনো খবর দেওয়া হয়নি"। চঞ্চল হয়ে উঠলো ভিড়। ঘণ্টা খানেক বাদে দিলীপকুমার এলেন। শোক একটু সরব হল। তারপর কে আশিফের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল তাঁর বাড়িতে।

আজ ৯ই মার্চ, কে আশিফের মৃত্যুদিন। কয়েক ঘণ্টা আগে আশিফ সাহেব মারা গেছেন। আজ বোম্বের চিত্রজগৎ কে আশিফের মৃত্যুতে মুহ্যমান।

সরল শর্মা

চিৎপুর চিত্র

মরশুমের আরম্ভ শেষ হতে না হতেই চিৎপুরের যাত্রাপাড়া এক বিরাট ভাঙনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান মরশুমের যে-শিল্পী যে-দলে আছেন, তার বেশির ভাগকেই আসন্ন মরশুমে সে-দলে আর দেখা যাবে না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। চিৎপুরী ভাঙাগড়ার কাজ অবশ্য মার্চেই শেষ—এখন শুধু বাকি মুখ ফুটে সত্য স্বীকার করা। সেই সত্যই সকলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। অথচ কে না জানে, চিৎপুরের হাওয়ায় কথা ভাসে। যাঁর জানবার তিনি জেনে বসে আছেন। শিল্পীরা কেবল কাকের মতন চোখ বুজে জিনিস লুকিয়ে যাচ্ছেন।

চিৎপুরী হাওয়া থেকেই গুজবের জন্ম। কে একজন আমায় খুব আগ্রহ নিয়ে বলছিল, জানেন কি 'জনতা অপেরা'য় কী হচ্ছে? 'না তো'—জবাব দিলাম। সে বললে, 'তবে শুনুন, দলের লোস হিসাবে আসছেন স্বপনকুমার।' বললাম, 'কিন্তু সে তো নিউ আর্য অপেরায়, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' করবে...।' ভদ্রলোক বললেন, 'গুজবে কান দেবেন না: তিনি জনতা নিচ্ছেন।'

চিৎপুরে কোনটা সত্যি কোনটা গুজব অতি বড় ধুরন্ধরের পক্ষেও তা বোঝা কঠিন। শোনা যাচ্ছে পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, রীতা দত্ত সম্ভবত লোকনাট্যে যাবেন। এই তালিকায় রয়েছেন রমেন ভাদুড়ী আর সুজিত পাঠকও। অরুণ দাশগুপ্ত কি অন্য দলে যাচ্ছেন? প্রশ্ন একজনের। দিন দুয়েক আগেও এই শিল্পীর সঙ্গে কথা। বৈকুণ্ঠ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না বললেন। অথচ রটল, সুজিতবাবুর জায়গায় যাচ্ছেন অরুণ দাশগুপ্ত। আমার এক ঘোড়েল যাত্রাবন্ধু বলছিলেন, বিজন মুখার্জির সঙ্গে নাকি শম্ভু ঘোষের কথাই পাকা হয়ে গেছে। হাঁ, বেলা দেবীও নাকি ওই দলে যেতে পারেন। অর্থাৎ রঞ্জনে।

যাত্রা-সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত কি সত্যি নাট্যভারতীতে থাকছেন? গুজব বলছে : না। তবে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর : সত্যাম্বরে। অথচ শৈলেনবাবু এসে শুনে গেলেন, তিনি কিছুই জানেন না! তাজ্জব! জ্যোৎস্না তবে কোথায় যেতে পারেন? একজন বললেন নিউ অপেরায়। অপরের মন্তব্য : রয়েলেও যেতে পারেন। তবে জয়শ্রী মুখার্জি এবার সত্যাম্বরে আসছে—এ প্রসঙ্গে একজন বাজি রাখলেন। আর একজন বললেন জয়শ্রী যাচ্ছে নাট্যভারতীতে।

এই লেখাটি লিখবার সময় নট্ট কোম্পানী আর বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের মালিক মুখন এসে উপস্থিত। না, দু-একজন ছোটখাটো শিল্পী ছাড়া তার দলে বড় কোনো ভাঙন আসছে না বলেই তার ধারণা। তবু মনোজ-কুমার সম্পর্কে কথা রটেছে। কেউ বলছে নাট্যভারতীর কথা—কেউ লোকনাট্য। তপনকুমার সত্যাম্বরে থাকছে না বলে যে গুজব রটেছে তার কতটা সত্যি কে জানে? কেউ বলছেন এবার তপন-জ্যোৎস্না জুটি হচ্ছে, কারো মতে সে জুটি আসলে তপন-জয়শ্রী।

দিলীপ-মধুশ্রীকে নিয়ে মাধবীর 'বেনারসের চাঁচিকা' খোলা হবে স্থির ছিল। এইমাত্র কোনো এক দল-মালিক খবর দিলেন আসলে ওঁরা পাকা কথাই নাকি দিয়ে ফেলেছে তাঁর সঙ্গে। আগে শোনা গিয়েছিল দিলীপ যাচ্ছে প্রভাসে।

শান্তা চক্রবর্তী কি তবে সত্যাম্বরে?

অনেকের ধারণা তাই। ওই ঘরের তিনি পুরনো শিল্পী—যাওয়াটা আশ্চর্যের নয়। কিন্তু খবর সত্যি হলে শৈলেন মোহান্ত বলতেন আমাকে। দিলীপ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কোনো গুজব নেই। অভয় হালদার, ছবি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও গুজব শুনেছি।

চিৎপুরী গুজব—তার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে বলা মুশকিল। আসলে এমনও হতে পারে এই গুজবটাই আসলে সত্যি। বাকিটুকু সব মিথ্যে।

—সূত্রধার

নতুন ছবির খবর

আবার নতুন শিল্পী

সত্যজিৎ রায়ের "সীমাবদ্ধ" ছবির একটি মুখ্য স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যে নতুন শিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন তাঁর নাম পারমিতা চৌধুরী। অপর একটি প্রধান চরিত্রে শিল্পী শর্মিলা ঠাকুর। "সীমাবদ্ধ"-র শুটিং প্রথম হয় পাটনায়, তারপর কলকাতায় রেসের মাঠে কিছু দৃশ্য তোলা হয়। এখন শহরে একটি অফিসে ছবির শুটিং চলছে। হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির অপর দুই বিশিষ্ট শিল্পী। নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করছেন বরুণ চন্দ।

এবার উত্তম-মাধবী

কবি অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত "ছদ্মবেশী" (কাহিনী : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তাতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি ও পদ্মা দেবী। "ছদ্মবেশী" তৈরি হচ্ছে আবার। ছবির পরিচালক অগ্রদূত। এবার নায়ক-নায়িকা হয়েছেন উত্তমকুমার ও মাধবী চক্রবর্তী। ছবির তৃতীয় পর্যায়ের একটানা ইনডোর শুটিং শুরু হয়েছে। বিকাশ রায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, [illegible] বিশ্বাস ও জহর রায় ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে ছবির গানও রেকর্ড হয়েছে।

প্রায় শেষ

সাহা ফিল্মসের 'অর্চনা' প্রায় শেষ। [illegible] ও জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাছে ছবির কিছু দৃশ্য সম্প্রতি তুলে নিয়ে এসেছেন পরিচালক পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনেতা সুখেন দাসের চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। মাধবী চক্রবর্তী ছবির নায়িকা। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুখেন দাস, শ্যামল ঘোষাল, তরুণকুমার, বিজন ভট্টাচার্য, সুধীর সাহা, গীতা দে প্রভৃতি

"নিমন্ত্রণ" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে শিবানী বসু ফটো—দেশ

ছবির বিভিন্ন বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অজয় দাস।

আউটডোরে

"ছন্দপতন" (নবযুগ) ছবির শুটিং [illegible] আউটডোরে আরম্ভ হয়েছে। গল্প হলেও ছবিটি (কাহিনী : পুলক মজুমদার) পরিচালনা করছেন [illegible] চট্টোপাধ্যায়, নন্দিনী মালিয়া, [illegible], সমিত ভঞ্জ, [illegible] চক্রবর্তী, অনুভা ঘোষ, জহর রায়, শিবানী বসু প্রভৃতি ছবির প্রধান চরিত্রগুলির শিল্পী। সংগীত পরিচালনায় আছেন [illegible] রায়।

এন-বি এণ্টারপ্রাইজের অনুষ্ঠানে "ব্যাপিকা বিদায়"

রূপকার-গোষ্ঠীর "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ের জনপ্রিয়তার কথা নতুন করে বলবার কিছু নেই। এবার "ব্যাপিকা বিদায়" আরও ভাল লাগল। সম্প্রতি এন বি এণ্টারপ্রাইজ-এর চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে রসরাজ অমৃতলালের নাটকটির অভিনয় হল রবীন্দ্র সদনে (১লা মার্চ)। নাটকে নতুন শিল্পী এসেছেন—কল্যাণী ঘোষ, সংগীতা বসু। এঁদের আগমনে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। আগের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ছিলেন। সবিতাব্রত দত্ত ও গীতা দত্ত এঁদের আগের ভূমিকায়, আগের মতই, হয়ত আরও বেশি সুন্দর তাঁদের চরিত্র চিত্রণ ও গান। বিশেষ করে শ্রীদত্তের। রোগ ভোগের পর সেদিন রেবা দেবী প্রথম মিসেস পাকড়াশীর চরিত্রে অভিনয় করলেন। অভিনয়-শেষে নাট্য পরিচালক সবিতাব্রত দত্ত দর্শকদের জানালেন সে কথা, রেবা দেবীর মঞ্চ-প্রীতির কথা। দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্ত হাততালি দিয়ে শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন। কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত বসু, সলিল চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত, অমল ঘোষ দস্তিদার, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন সাহা প্রভৃতি সকলেই অভিনয়ের শেষে এসে দাঁড়ালেন। এঁরা সবাই অভিনন্দন পেলেন তাঁদের চমৎকার অভিনয়ের জন্য।

অভিনন্দন পেলেন এন. বি এণ্টারপ্রাইজ-এর নিমু ভৌমিক "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ের [illegible] এন বি এণ্টার-[illegible] প্রধান [illegible] এবং সভাপতি চিত্র পরিচালক শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী। তারপর রবীন্দ্রসংগীতের আসরে চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, নীহারিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমর ঘটক গান করেন। এঁদের গান শোনার আনন্দ ছিল দর্শকদের উপরি পাওনা।

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

শংকরের
সীমাবদ্ধ

এক মাসেরও কম সময়ে দুটি মুদ্রণ বিক্রয় সম্পূর্ণ — তৃতীয় মুদ্রণও নিঃশেষিত প্রায়

বাংলা দেশে যথার্থ স্মার্ট লেখা যে ক'জন লিখতে পারেন তাঁদের মধ্যে শংকর অগ্রগণ্য। বর্তমান কাল এই গ্রন্থের পৃষ্ঠপট, বর্তমান যুগের মনোভাব এর নায়ক। এ কাহিনী সর্বকালেরও।

॥ ছ'টাকা ॥

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের "জঙ্গলে জঙ্গলে" যখন ধারাবাহিকভাবে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই অসংখ্য লেখক, সমালোচক, অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং অগণিত পাঠক এই রচনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—এবং জানতে চেয়েছেন কে এই লেখক। যিনি এমন আকস্মিকভাবে একেবারে এতখানি শক্তি নিয়ে বাংলা-সাহিত্য জগতে উদিত হলেন। বই পড়ার পর আপনাকেও মুগ্ধ বিস্ময়ে এ প্রশ্ন করতে হবে বার বার। এমন বই এক এক দশকে দু'তিনখানার বেশী প্রকাশিত হয় না।

জঙ্গলে জঙ্গলে ৫৲

বাংলা ভাষায় এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

বাসুদেব বসুর

নেফা, সুন্দরী নেফা ৪॥

প্রমথনাথ বিশী ও বীথিকা চক্রবর্তীর

গবেষণামূলক গ্রন্থ

বঙ্কিম সাহিত্য বিচার

॥ দাম ১২৷৷৹ টাকা ॥

লীলা মজুমদারের

অনন্য অবদান

পাখী ৫৲
আর কোনখানে ৫৲

বাংলা পকেট বই

প্রতি খণ্ড ২৲, একত্রে চৌদ্দ টাকা। গ্রাহকগণের দেয় আর টাঃ ৯·২০ পয়সা। ডাকব্যয় ২·২০।

প্রথম দফায় সাতখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ৭ জন শ্রেষ্ঠ লেখকের ৭ খানি নূতন উপন্যাস ৭টি বহুবর্ণের বিচিত্র প্রচ্ছদপটে। গ্রাহকগণ দয়া করে জানান কীভাবে তাঁরা সংগ্রহ করতে চান।

পাঠক সাধারণের কাছে সবিনয় নিবেদন ঃ

বিভূতি রচনাবলী

বাংলাসাহিত্যের এই অমর কীর্তিগুলো নির্ভুল ও ত্রুটিহীনভাবে প্রকাশিত হয় এটাই বাঞ্ছনীয়। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—প্রামাণ্য ও প্রথম সংস্করণের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে ছাপতে। সব বইয়ের প্রামাণ্য পাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যদি কোন পাঠকের কাছে মৌলিক সংস্করণের গ্রন্থ থাকে এবং তাঁদের এই রচনাবলী পাঠের সময় কোন অসংগতি নজরে পড়ে— অথবা কোন মুদ্রাকর প্রমাদ — দয়া করে আমাদের জানালে পরবর্তী মুদ্রণের সময় সে ভ্রম বা অসংগতি সংশোধন করা সম্ভব হতে পারবে।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এবার ফেরাও ৫৲

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

৩৪৲

আবদুল জব্বারের

বাংলার চালচিত্র

॥ দশ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৪৮৭৯২, ৩৪৩৪৯২

প্রিয় সঙ্গ লাভের প্রচুর অবসর
রান্নার ভার দিন হিমাজীর ওপর
হীমার স্বাদের তুলনা নেই!
এর মুখরোচক কড়াইশুঁটি, মিষ্টিমধুর
মিঠাই, নোন্‌তা জলখাবার আর মজাদার সুপ...
সবই এমন, যে পেট ভরে তবু আশ মেটে না!
হীমাজী আপনার দাসানুদাস! যা হুকুম করবেন কয়েক মিনিটেই তৈরী। কাটাকুটির ঝামেলা নেই, ধোওয়ার প্রয়োজন নেই, ভেজালের ভয় নেই, মাপ-জোখের দরকার নেই। স্রেফ উনুনের ওপর চাপান...ব্যস, চটপট তৈরী! সব জিনিষই কত স্বাদের! আপনার স্বামী বিয়ের আগে যে রান্না খেয়েছেন তা' ভুলে যাবেন! তবে আপনার রান্না আপনার বাচ্চারা সারাজীবন মনে রাখবে। আজই হীমার চার-ছয় প্যাকেট নিয়ে এসে পরিবারের সবাইকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিন।
Hima
cake mix
Hima
kheer mix
PEAS
Hima
gulab jamun mix
হীমা
স্বাদের নাই সীমা
কড়াইশুঁটি, গোলাপ জাম, ক্ষীর, দোসা, দহি বড়া, ইডলী, সাম্বার, সুপ, কেক।

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
'বাংলাদেশ' : স্বাধীনতা সংগ্রাম—	৮৬৫
ব্যঙ্গচিত্র—	৮৬৬
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	৮৬৭
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	৮৬৮
বৈদেশিকী—দেবরাজ	৮৭০
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	৮৭১
দুটি কবিতা (কবিতা)—সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৭৪
স্মৃতি সমীপেষু (কবিতা)—শ্রীঅরণি বসু	৮৭৪
হিম জড়ানো দীর্ঘ সেতু (কবিতা)—শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়	৮৭৪
মানুষের মুখ—শ্রীদিব্যেন্দু পালিত	৮৭৫

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী		- ৮৮১
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী		- ৮৮৭
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী		- ৮৮৯
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত		- ৮৯৬
রত্ন ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়		- ৮৯৭
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর		- ৯০৩
জরা ভরতের উপাখ্যান—ইন্দ্রজিৎ		- ৯০৯
বৃদ্ধদের বিষাদ মনোবিকার—শ্রীঅসীম বর্ধন		- ৯১২
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন		- ৯১৫
দরবার নটী কলাবন্ত—শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়		- ৯১৯
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়		- ৯২৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আলোচনা— - ৯৩৫
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক - ৯৪০
বিদেশী বই— - ৯৪১
পুস্তক পরিচয়— - ৯৪৩
খেলার মাঠে—একলব্য - ৯৪৫
হকি খেলার আইনকানুন—মুকুল - ৯৪৭
রঙ্গজগৎ— - ৯৪৯
অরণ্যদেব— - ৯৫৫
সাপ্তাহিক সংবাদ— - ৯৫৬

প্রচ্ছদ : শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায়

ব্রু'র স্বাদ! নতুন স্বাদ!

একমাত্র ব্রু'ই
পাওয়া যায়
সুদৃঢ় এবং সুন্দর
কাঁচের জার-এ—
যা পরেও
ব্যবহার করা যায়।

প্রতিটি 'জার' থেকে অনেক বেশী কাপ কফি তৈরী হয়।

ব্রু'র চাহিদা তাই বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। স্বাদে গন্ধে ব্রু'র মতো কড়া অথচ আমেজভরা ইন্‌স্ট্যান্ট্‌ কফি আর নেই। ব্রু আপনাকে অনেক, অনেক বেশী তৃপ্তি দেবে। কফির জগতে এক নতুন আলোড়ন এনেছে ব্রু। তাছাড়া পরিমাণেও বেশী—অন্য যে-কোনও ইন্‌স্ট্যান্ট্‌ কফির তুলনায় অনেক বেশী কাপ কফি পাবেন ব্রু'র প্রতিটি 'জার' থেকে।

ব্রু-কফির এই নতুন স্বাদ
দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে লোকের মুখে মুখে।

১০,০০০ জীবন — প্রতি বছরে পথের বলি

আপনার জীবন বিপন্ন করবেন না

ডানলপ নির্দেশিকা

মন দিয়ে পড়ুন

ভাবতে অবাক লাগে প্রতি বছর দুর্ঘটনায় আমাদের দেশের রাজপথে ১০,০০০-এর বেশী লোকের মৃত্যু হয়। যাঁরা আহত হন তাঁদের সংখ্যা ৫০,০০০-এর বেশী। অথচ দৈবের উপর সবটা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায় না। কেননা দুর্ঘটনার কারণ, হয় গাড়ির চালক না হয় পথচারী। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার জন্যে নিচে কয়েকটা সহজ নিয়ম মেনে চলুনঃ—

এই লাইন বরাবর কাটুন

ডানলপ নির্দেশিকা

পথচারীদের জন্য

১। মনে রাখবেন ট্রাফিক সিগন্যাল শুধুই গাড়ির জন্যে নয়, পথচারীদের জন্যেও। ভাল করে সিগন্যাল দেখুন।

২। পেভমেন্ট কিংবা ফুটপাথ থাকলে, তার উপর দিয়ে হাঁটুন। ফুটপাথ না থাকলে রাস্তার ডান দিক ধরে হাঁটাই নিরাপদ—উল্টো দিক থেকে যেসব গাড়ি আসছে সেগুলো দেখতে পাবেন।

৩। ভিড়ের রাস্তায় অনেকে মিলে পাশাপাশি হাঁটবেন না। এতে যানবাহনের অসুবিধা হয় এবং দুর্ঘটনায় আহত হবার আশঙ্কা থাকে।

৪। রাস্তার বাঁকে কিংবা এমন কোথাও দাঁড়াবেন না, উল্টো দিক থেকে আসা গাড়ির চালক যেখানে আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

৫। 'জেব্রা' চিহ্নিত জায়গায় রাস্তা পারাপার করুন। প্রথমে ডানদিক, তারপর বাঁদিক এবং আবার ডানদিকে তাকিয়ে, পথ ফাঁকা দেখলে, চটপট রাস্তা পার হোন। ভয় পাবেন না, দৌড় লাগাবেন না, মাঝপথে গিয়ে মত পাল্টাবেন না।

৬। বাস কিংবা ট্রাম যখন চলছে, তখন ওঠানামা করবেন না।

৭। দাঁড়িয়ে থাকা কোনও গাড়িতে আপনার দৃষ্টি ব্যাহত হলে, আরও বেশী সতর্ক হোন। রাস্তা পরিষ্কার কিনা সেটা ভাল করে না জেনে কোনও গাড়ির পিছন থেকে হট করে এগিয়ে যাবেন না।

৮। কীভাবে রাস্তা চলতে হয় বাচ্চাদের শেখান। রাস্তায় তাদের খেলতে দেবেন না।

৯। পিচ্ছিল রাস্তা বিপজ্জনক, রাস্তায় ফলের খোসা ফেলবেন না।

১০। সৌজন্য আর করুণার পরিচয় দিন। বাসে ট্রামে আর রাস্তায় শিশু, বৃদ্ধ, অন্ধ আর পঙ্গুদের সাহায্য করুন।

মোটর গাড়ির জন্য

১। ট্রাফিক লাইন আর সিগন্যালের উপরে সতর্ক চোখ রাখুন। মনে রাখবেন, ট্রাফিক পুলিশ আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

২। আপনার গাড়ি ভাল অবস্থায় আছে কিনা দেখুন। বিশেষ করে ব্রেক, স্টিয়ারিং, টায়ার এবং আলোর দিকে নজর রাখবেন।

৩। ওভারটেক করা কিংবা ডাইনে বাঁক নেবার প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে চলুন।

৪। রাস্তায় ভিড় থাকলে খুব সাবধানে গাড়ি চালান। দাঁড়ানো কোনো গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব নজর রাখবেন, হঠাৎ কোনো পথচারী আপনার গাড়ির সামনে এসে পড়তে পারেন।

৫। চৌরাস্তায় একটু বেশী পরিমানে সতর্ক থাকা চাই। ঠিকমত সিগন্যাল দিন। আপনার ডানদিকের যানবাহনের গতি অবরোধ করবেন না, তাদের আগে যেতে দিন।

৬। ডানদিকে বাঁক নেবার সময় ঠিকমত গাড়ি ঘোরাবেন, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

৭। রাস্তার যে জায়গাটি পথচারীদের পারাপারের জন্যে চিহ্নিত সেখানে সতর্ক থাকুন, ট্রামের যাত্রীরা যেখানে ওঠানামা করছেন সেখানেও সতর্ক হওয়া চাই।

৮। নিজের কিংবা অন্যের বিপদ ঘটবে না, এমন বুঝলে তবেই ওভারটেক করবেন, নইলে নয়। একমাত্র ডানদিক দিয়ে ওভারটেক করবেন। তার আগে দেখে নিন, সামনের গাড়ির ড্রাইভার ডানদিকে মোড় নেবার সিগন্যাল দিচ্ছেন কিনা, সেক্ষেত্রে ওভারটেক করবেন না। কেউ যখন আপনাকে ওভারটেক করছে, তখন গতি বাড়াবেন না।

৯। ঠিক সময় আলো জ্বালুন, যেটুকু দরকার, তার চাইতে জোরালো আলো ফেলবেন না।

১০। এমনভাবে দরজা খুলুন, যাতে পথচারীদের ধাক্কা না লাগে, কিংবা অসুবিধে না হয়।

এই লাইন বরাবর কাটুন

পথে নিরাপত্তার অপেক্ষায়

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ ও সেফটি ফার্স্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সহযোগিতায় প্রচারিত।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২২
শনিবার ২০ চৈত্র ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৩৫১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	৩১·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক ,,	...	১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ,,	...	৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	...	৫৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১৪·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৪৪·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৮৩·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 3 April, 1971

'বাংলাদেশ' : স্বাধীনতা সংগ্রাম

সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পূর্ববঙ্গ আজ তার নতুন পরিচয়টি সর্বজনের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে; সে আর জিন্নাসাহেবের পাকিস্তান নয়, তার পশ্চিমা গোত্রের স্বার্থান্বেষী বান্ধবদের কাছে নীলামে বিকিয়ে যাওয়া দেশ নয়, এর নতুন পরিচয় 'বাংলা দেশ'। এই 'বাংলা দেশ' সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকা আজ পূর্ববঙ্গের শহরে বাজারে, হাটে মাঠে বাতাসে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে উড়ছে। আবার সেই বাতাসেই নতুন করে মিশেছে বারুদের গন্ধ; মাটিতে অসহায় নিরীহ মানুষের রক্তের দাগ শুকোতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আর তাঁর সাকরেদ পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক টিক্কা খাঁর সত্তর হাজার অনুগত সৈনা পূর্ববঙ্গের মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার জন্যে বাংলা দেশের সর্বত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই নির্বিচার হত্যার মোকাবিলা করার জন্যে আজ সেখানকার সাড়ে সাত কোটি মানুষও একতাবদ্ধ। জঙ্গী শাসক ও তার নির্মম ফৌজের সঙ্গে লড়াই চলছে জনগণের, এঁদের পাশে রয়েছে আঞ্চলিক রাইফেলস বাহিনী ও পুলিস। খবরে বলছে, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; ঢাকায়, চট্টগ্রামে, কুমিল্লায়, সিলেটে, শহরে গঞ্জে রাস্তায় রাস্তায় রক্তক্ষয়ী এই সংগ্রাম চলছে। বাংলা দেশের মানুষ বলছেন, এই সংগ্রাম স্বাধীনতার জন্যে, যদি মরতে হয় কুকুর বেড়ালের মতন মৃত্যু তাঁরা বরণ করবেন না, বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তান হিসেবেই শত্রুর মোকাবিলা করবেন।

পূর্ব বঙ্গে বা বাংলা দেশে আজ যা ঘটছে এমন ঘটনা একেবারে অসম্ভব না হলেও খানিকটা অপ্রত্যাশিত। অন্তত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকায় আসার পর এবং শেখ মুজিবরের সঙ্গে আলোচনা শুরু করার পর ঘটনা যেদিকে মোড় নিচ্ছিল তাতে মনে হয় নি এমন নৃশংস কাণ্ড ঘটতে পারে। বরং ইয়াহিয়া এবং মুজিবরের আলোচনার শেষের দিক বার বার এমন আশা জাগানো হয়েছিল যে আমাদের ধারণা হচ্ছিল মুজিবরের দাবির বারো আনাই বুঝি ইয়াহিয়া মেনে নিতে রাজী। অথচ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানী ফৌজ এবং টিক্কা খাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে গোপনে করাচী পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে গেলেন ভুট্টো সাহেবও। বলা বাহুল্য, প্রেসিডেন্টের এই দুষ্কর্ম সম্পূর্ণভাবেই রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি এবং তাঁর উপদেষ্টারা আলোচনার নামে বেশ কিছু সময় ব্যয় করেছেন, এবং সেই সুযোগে সমুদ্রপথে হাজার হাজার সৈনা আমদানি করে ফেলেছেন। তারপর আলোচনার বদলে রাতারাতি পূর্ব বাংলাকে ফৌজী তাণ্ডবের মুখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছেন। এমন বিশ্বাসঘাতকতা বিশ শতকের রাজনীতিতে আর দেখা যায় না। সমস্ত মানুষের ধিক্কার ও ঘৃণা আজ যদি পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের প্রাপ্য হয় তাহলেও প্রতিবাদের কারণ নেই। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া হয়ত আজ তাঁর সহকর্মীদের হাতের পুতুলমাত্র। তবু তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস ক্ষমা করবে না। তিনি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের অভিভাবক হতে পারেন না। সে অধিকার জনসাধারণ তাঁকে দেয় নি। যাঁকে দিয়েছিল—সেই মুজিবরকেই আজ বলা হচ্ছে 'দেশদ্রোহী'! আশ্চর্য!

শেখ মুজিবর অপরিণামদর্শী রাজনীতিক নন। তিনি ইয়াহিয়া ও তাঁর বান্ধবদের মনের কথা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। কোনো ব্যবস্থাই তিনি পরে করেন নি, আগেভাগেই সেরে রেখেছিলেন—তার প্রমাণ পূর্ববঙ্গে জঙ্গী দাপট ঘোষিত হবার আগেই তিনি অন্তরালে চলে গেছেন সহকর্মীদের নিয়ে। অন্তরাল থেকেই নিত্য তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে : বাংলা দেশ-এর কোণায় কোণায় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান,...শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বস্থানে নিরাপদে পালিয়ে গিয়ে বলেছেন—শেখ মুজিবর রাষ্ট্রদ্রোহী, তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু। আর এই শত্রু দলনের জন্যেই সত্তর হাজার পাক ফৌজ আজ সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে কারফু, মেশিনগান, গ্রেপ্তার, হত্যা, বোমার রাজত্ব কায়েম করতে যাচ্ছে। আমাদের মনে হয় না, প্রেসিডেন্ট যে-পথ নিয়েছেন এই পথে সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চিরকালের মতন নীরব রাখা যায়। প্রেসিডেন্ট চোখের সামনে সামান্যমাত্র দেখেছেন, দূরের কিছু তাঁর নজরে আসেনি। একদিন তিনি তা নজর করতে পারবেন—কিন্তু ততদিনে তাঁর করার কিছু থাকবে না।

নব সম্মার্জনী
অতীত
ভ্রান্তি
ক্ষমতা

ব্যা-মা-খাঁ-ক কী—সার, না সালসা, না বীজ?

আপনি কি বসন্তকালীন আবহাওয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন? হজমের গোলমাল বা নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটছে? ওজন কমছে বা প্রাতঃকালীন মাথা ভার ভার বুক টিপটিপ প্রভৃতি উপসর্গ পীড়িত করছে আপনাকে? বিকালের দিকে হঠাৎ পরিশ্রান্ত বোধ করছেন? কাজে মন বসছে না? ওয়ারক টু রুল, ঘন ঘন ঘেরাও কি বাংলা বন্‌ধে আর তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না? না কি মানব জমিনে আবাদ সুবিধের হচ্ছে না?

হতাশ হবেন না। আপনাদের জনাই আমরা নিজ কারখানায় প্রস্তুত ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম বাজারে ছেড়েছি সম্প্রতি। আমাদের ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম ব্যবহার করুন। হতাশের প্রাণে আশা এবং অবলের দেহে বল সঞ্চার করতে এর আর জুড়ি নেই।

ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজমে আপনি ইমপোরটেড কম্যুনিজমের গুণে ও ঝাঁঝ সবই পাবেন, উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রস্তুত করা হলে এটা বাঙ্গালীর কাছে অধিকতর রুচিকর বোধ হবে। স্বাদও অতুলনীয়। রাইচুং এবং আই আর-৮-এর মত আমাদের ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম বা ব্যা—মা—খাঁ—ক-৬ ও অধিক ফলনশীল এবং অনুকূলে ও প্রতিকূল অবস্থায় একই রকম ফলদায়ক।

বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় ব্যা—মা—খাঁ—ক-এর ক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটে, যুক্ত ফ্রন্টের বীক্ষণাগারে কৃত্রিম পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তার মধ্যে আমাদের বিশেষজ্ঞেরা গবেষণা করে এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম বা ব্যা—মা—খাঁ—ক ডেমোক্রেটিক কাঠামোর মধ্যেও সমানভাবে সক্রিয়। (জনগণ আদর করে কোনও কোনও জায়গায় একে বামাখ্যাপাও বলতে শুরু করেছেন যেমন আই আর—৮-কে ইরি ধান। আমরা ঘোষণা করছি ব্যা—মা—খাঁ—ক-এর অপভ্রংশরূপ বামাখ্যাপার সঙ্গে সাধক বামাক্ষ্যাপার কোনও যোগ নেই।)

যুক্ত ফ্রন্টের বীক্ষণাগারে সীমিত ক্ষেত্রে ব্যা—মা—খাঁ—ক ব্যবহার করে যে আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়েছিল, তার উপর নির্ভর করে গত নির্বাচনে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কমারশিয়ালি ব্যাপকভাবে ব্যা—মা—খাঁ—ক-এর ব্যবহার করেছি। ব্যা—মা—খাঁ—ক বা ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কমিউনিজম যে কী নিদারুণ ফলপ্রদ তা এবারের নির্বাচনী ফলাফলেই প্রকাশ পেয়েছে। অতএব আর বিলম্ব নয়, আগামী নির্বাচনে সুফল পেতে হলে এখন থেকেই ব্যা—মা—খাঁ—ক বা ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, ব্যা—মা—খাঁ—ক-ই পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করতে পারে হতাশের প্রাণে আশা, অবলের দেহে বল সঞ্চার করতে পারে। মনে রাখবেন, ব্যা—মা—খাঁ—ক সুফলার কৃতিত্বও ম্লান করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বর্তমানে কম্যু-

নিজমের তিনটি ব্রানড চালু আছে। (এক) রাশিয়ান ব্রানড (ইম্পোরটেড), দুই চৈনিক ব্রানড (স্মাগলড) এবং (তিন) দেশীয় মূলধন এবং বিদেশে বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় প্রতিভার মণিকাঞ্চন যোগে প্রস্তুত আমাদের একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম।

উদারভাবে দেখলে এ কথা বলা যায় যে ইম্পোরটেড রুশ মার্কা বা স্মাগলড চীন মার্কা কম্যুনিজমের সঙ্গে ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজমের চরিত্রগত কোনও তফাৎ নেই। তবে ইম্পোরটেড জিনিস এ দেশীয় এজেনট বা পাইকার মারফৎ সরবরাহ হলে খাঁটি অবস্থায় জনগণের কাছে আসে না। ভেজাল মিশিয়ে তা বাজারে ছাড়া হয়। অথবা তুখোড় প্রোগ্রেসিভ বুর্জোয়া মহাজনেরা কম্যুনিজমের মত দর্শনধারী যে সিনথেটিক মাল বাজারে ছাড়ে তার সঙ্গে স্বাদে বা বর্ণে ইম্পোরটেড (রুশ মার্কা) মিশ্র কমিউনিজমের তফাৎ কোথায় জনগণ তা ধরতে পারে না। চোরাপথে আমদানীকৃত চীনা মার্কা কমিউনিজম আসল না নকল তাও বুঝবার উপায় নেই।

এইসব সমস্যার সমাধানের জনাই দীর্ঘদিনের গবেষণার ফলে প্রস্তুত ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজম আমরা ছেড়েছি। আর ভয় নাই। রুশ, চীন, কিউবা উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম থেকে শুদ্ধ কম্যুনিজমের বিশুদ্ধ বীজ এনে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলের বীক্ষণাগারে দেশীয় বীজের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে পরিবেশোপযোগী চমৎকার এক সংকর বীজ সৃষ্টি করা হয়। কালক্রমে দেখা যায়, কেরলের বীজ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রনটের আবহাওয়ায় উৎপন্ন ও লালিত ব্যা—ম—খাঁ—ক—২ অধিকতর তেজস্ক্রিয় ও ফলনশীল হয়েছে। এতে উৎসাহিত হয়ে গত নির্বাচনে আমরা আরও উন্নত ভ্যারাইটি ব্যা—মা—খাঁ—ক—৬ ব্যবহার করি। এই ব্যা—মা—খাঁ—ক—৬ ব্যবহারের ফল এই রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের জেলাগুলিতে, বিশেষত বর্ধমান বীরভূম এবং নদীয়া ও ২৪ পরগনায় দেখা দেয় অভাবনীয়। বামপারুরূপ।

উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতার জনগণের জন্য বর্ধমান জেলায় কি করে ব্যা—মা—খাঁ—ক ব্যবহার করতে হয় তা হাতে কলমে শেখাবার নিমিত্ত ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, জনবিরোধী পুলিস আমাদের হাটগোবিন্দপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বে-আইনিভাবে হানা দিয়ে হাতে কলমে ব্যা—মা—খাঁ—ক প্রয়োগের কৌশল শিখাবার সরঞ্জামাদি যথা ব্যালট বাকস, সীল মোহর, ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছে এবং আমাদের অন্যতম দক্ষ প্রশিক্ষককে গ্রেফতার পর্যন্ত করেছে। তবুও আমরা জানাচ্ছি, আমাদের কর্মসূচী বাতিল হবে না। পূর্ব পরিকল্পনামতই চলছে এবং চলবে।

কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়া এই ত্রিবিধ ব্যবহারে লাগাবার জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞগণ ব্যা—মা—খাঁ—ক বা ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজমকে বীজ, সার এবং সালসা এই তিন প্রকারেই প্রস্তুত করেছেন। যিনি এটাকে যেভাবেই ব্যবহার করুন ফল একই পাবেন। বীজরূপে ব্যা—মা—খাঁ—ক—৬ একশ গ্রামের বায়ুশূন্যে পলিথিন প্যাকেটে পাওয়া যায়। বীজ রূপে ব্যাণ্ডাল মার্কা খাঁটি কম্যুনিজমের নাম হরেকৃষ্ণ বীজ, সাররূপে তারই নাম জ্যোতি সার, আড়াই কে জি থেকে এক কুইনটল পর্যন্ত বিভিন্ন ওজনের প্যাকেটে এবং সালসা নামে তাকে প্রমোদ সালসার পাইট বোতলে পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আজই জেলা বা স্থানীয় এজেনট অথবা কলিকাতাস্থ আলিমুদ্দীন স্ট্রীটের হেড অফিসে লিখুন।

পূর্ব বাংলা

পূর্ব বাংলায় এবার যা শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় কেউ জানে না। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা এখন ইয়াহিয়া খাঁন বা শেখ মুজিবর রহমনের পক্ষেও বলা সম্ভব নয়।

একটা মিটমাটও হয়ে যেতে পারে। এবং সম্ভবত সেইটা করাই ইয়াহিয়া খাঁনের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। না হলে পূর্ব পাকিস্তানে ভিয়েৎনাম হতে পারে। অথবা হতে পারে বায়াফ্রা—যদিও তা হওয়া খুব কঠিন।

কোন্ পথে ঘটনা প্রবাহ এগোবে সেটা নির্ভর করবে প্রধানত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের উপর। অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসক পাঞ্জাবীদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। তাঁরা যদি মনে করেন যে, কোনও মিটমাট করবেন না, সেনাবাহিনীকে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত করবেন তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঠকতে বাধ্য। তাহলে পূর্ব পাকিস্তান তো যাবেই। এবং ঢাকের দায়ে শেষ পর্যন্ত মনসা অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানও শেষ হয়ে যাবে। সামরিকভাবে না হলেও অর্থনৈতিকভাবে নিশ্চয়ই।

এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাধ্য নেই শ্রেফ নিজের সামরিক ও অর্থনৈতিক রসদের উপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানে কোনও দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চালায়। লড়াই চালাতে হলে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামীদের বাইরের সাহায্য চাই, তেমনি পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষেরও বিদেশী সাহায্য অত্যাবশ্যক। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে কোনও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব—সামরিক এবং অর্থনৈতিক দুই বিচারেই।

*

পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ মুজিবরের নতুন বাংলা দেশে গিয়েছিলাম। একটা দিন ছিলাম। খুলনার কয়েকটা গ্রামে। সাতক্ষীরা এলাকায়।

কতকগুলি জিনিস চোখে পড়ল।

প্রথমত, আবালবৃদ্ধবণিতার মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ এসেছে। একটা নতুন জাতি যেন জন্ম নিয়েছে। সারাদিন শতাধিক লোকের সঙ্গে কথা বললাম। ছেলে-বুড়ো যুবক-প্রৌঢ়—সকলের সঙ্গে। সবাই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। খানদের অর্থাৎ পাঞ্জাবীদের আর রাজত্ব করতে দেবে না। ওঁরা ওখানে পাঞ্জাবীদের বলেন 'খান'।

দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়রা না হলেও পূর্ব পাকিস্তানের যুবকরা খান-শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। তাঁরা এখনও গেরিলা যুদ্ধের কায়দা কানুন পুরোপুরি জানেন না। কিন্তু ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি তাঁদের কিছুটা লড়াইয়ের কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে। যেমন রাস্তা কেটে দেওয়া এবং প্রধান সড়ক-গুলিতে চোরা গর্ত খুঁড়ে রাখা। দুএকটা চোখের উপরই দেখলাম। সাতক্ষীরা-যশোর-পারুলিয়া রোডের ওপর বিরাট বিরাট গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। শুনলাম কতকগুলি এলাকায় আবার বড় রাস্তায় বড় বড় চোরা গর্ত খুঁড়ে তার ওপরটা সাবধানে ঢেকে রাখা হয়েছে। যাতে সেনাবাহিনী এগোতে গেলেই হুমড়ি খেয়ে তার মধ্যে পড়ে। যশোর-খুলনা রোডে এইরকম একটা ঘটনার কথা শুনলাম। সামরিক বাহিনীর কনভয় এগোচ্ছিল। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুলনা শহরের দিকে। এইরকম একটা চোরা গর্তের উপর পড়ল। সামনের দু তিনখানা ট্রাক হুমড়ি খেল। কনভয় আসার খবর পেয়ে আগেই মুজিবরের সমর্থকরা রাইফেল হাতে পাশেই লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কনভয়ের উপর গুলি চলল। বহু সেনা খতম হল। কনভয় ফিরে যেতে বাধ্য হল।

গোটা পূর্ব পাকিস্তানের সড়ক ব্যবস্থা এখন বিপর্যস্ত। ব্রীজগুলি অধিকাংশই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় দু পাঁচ মাইল অন্তরই বিরাট বিরাট গর্ত। সেনাবাহিনীর পক্ষে হেলিকপ্টার বা প্লেন ছাড়া চলাচল করা কঠিন। মুজিবরের সমর্থকদের প্রধান সহায় সাইকেল। ভিয়েৎনামীদের মতই পূর্ব পাকিস্তানীরাও বেশ কয়েক বছর যাবত সাইকেলে ভারী মাল বহনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এক একজন পায়ে চলা পথের উপর দিয়েই দিনে তিন চারশ মাইল সাইকেলে এগোতে পারে। পেছনে একজন লোক এবং সামনে একটা বস্তা তারা অনায়াসে নিয়ে যায়।

তৃতীয়ত, সেনাবাহিনীর পক্ষে শহর ছেড়ে গ্রামে এগোনো অত্যন্ত কঠিন। একে তো

পথ নেই। যা আছে তারও অধিকাংশই তাঁদের অচেনা। আঞ্চলিক অধিবাসীরা সবাই তাঁদের বিরুদ্ধে। কেউ সহযোগিতা করতে রাজী নয়।

সেইজন্যই যশোর-খুলনা অঞ্চলে এখনও সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে ভেতরে এগোবার কোনও চেষ্টা করেনি। শহরেরও সর্বত্র তারা যায় না।

চতুর্থত, সেনাবাহিনীর সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। পেট্রোলের ভীষণ অভাব। বন্দর থেকে ভেতরে পেট্রোল নিয়ে আসাও অত্যন্ত কঠিন। পথে নানা প্রতিবন্ধক। দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়ারও অত্যন্ত অভাব। কারণ স্থানীয় লোকজন তাদের কিছুই দিতে রাজী নন।

পঞ্চমত, আওয়ামী লীগও এখনও পর্যন্ত এই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত নয়। গেরিলা যুদ্ধের কায়দা জানা ছেলে তারা তৈরী করেননি। প্রচুর যুবক-বালক-প্রৌঢ় পক্ষ এগিয়ে এসেছেন সংগ্রামে যোগ দিতে। কিন্তু ঠিকভাবে তাঁদের কাজে লাগাবার মত সংগঠন নেই। জেলা পর্যায়ে নেতৃত্বও তেমন মজবুত নয়। সাংগঠনিক কায়দা-কানুন এবং আঞ্চলিক লড়াইয়ের নেতৃত্ব নেওয়ার মত লোক এখনও সর্বত্র গড়ে ওঠেনি। যদিও মানুষের মধ্যে বিরাট উৎসাহ এবং অসাধারণ দৃঢ়তা। যদিও তাঁরা যে কোনও মূল্যে লড়াই চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ষষ্ঠত, সরকারী কাজকর্ম একেবারে বন্ধ। এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গে সরকারী কাজকর্ম চালু করা ইয়াহিয়ার পক্ষে অসম্ভব। গ্রামে গ্রামে তো নয়ই। শহরেও না। সরকার চালাতে গেলে অন্তত সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতা তো চাই-ই। তা মিলছে না। মেলাও কঠিন। কারণ কোনও বাঙালী পাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত নন। এবং সপ্তমত, পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামীণ অর্থনীতি এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও বেশীদিন এই অবস্থা চলতে পারে না। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বাইরের বা দূরের সরবরাহ নেই। শিল্পোৎপাদনও প্রায় বন্ধ। যদিও গত রবিবার আমরা দেখলাম মাঠে মাঠে ঠিকই কাজ চলছে। হাটবাজার ঠিকই বসেছে। বেচাকেনায়ও কোনও কমতি নেই। দেখলাম [illegible] বড় একটা পাকাবাড়ি তৈরীর কাজও বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছে।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে এই লড়াইয়ের ধাক্কা পড়তে বাধ্য। যদি আওয়ামী লীগের সংগঠন মজবুত হত তাহলে তাঁরা এখন থেকেই অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। অর্থনীতি চালু রাখার জন্য যা যা প্রয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু এখনও সেজন্য তাঁরা তৈরী নন।

*

এই লড়াইয়ের ধাক্কা ভারতে এসে পড়তে বাধ্য। ইতিমধ্যেই সীমান্ত এলাকায় গিয়ে পড়ছে। এপারের হাজার হাজার ছেলে ওপারের ছেলেদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে।

ভারত সরকার যদি এতে বাধা দেন তাহলেও তাঁদের বিপদ। কারণ গোটা দেশ চটবে। আবার সাহায্য করলেও বিপদ। কারণ পূর্ববঙ্গে যদি কোনও দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে তার সংক্রমণ থেকে পূর্ব ভারতকেও রক্ষা করা যাবে না।

২৮-৩-৭১

নবারুণ গুপ্ত

স্বাধীন বাংলা দেশ

চব্বিশ বছর আগে যখন পাকিস্তানের পত্তন হয় তখন 'নতুন রাষ্ট্রের যে বিশেষত্ব দুনিয়ার নজরে পড়েছিল তা হচ্ছে তার ভৌগোলিক সংহতির অভাব। এমনতর দুটো আলগা টুকরো নিয়ে একটা রাষ্ট্র এর আগে কখনও গড়ে ওঠেনি—তাও আবার দুটো টুকরো কাছাকাছিও নয়, তাদের মধ্যে হাজার মাইলের ফারাক। আকাশ দিয়ে ছাড়া এক টুকরো থেকে আর টুকরোয় যাবার কোনও সোজা পথ নেই। ডাঙা দিয়ে যেতে গেলে যেতে হবে পরের এলাকা মাড়িয়ে। স্বাধীন আর স্বচ্ছন্দভাবে সে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া সম্ভব নয়। জলপথে আনাগোনা করা যায় বটে, তবে সেটা ঘুর পথ, খরচও বেশী, ঝুঁকিও ঢের। তবুও লোকে ভেবেছিল ধর্মের বাঁধনে ও আলগা টুকরো দুটো শক্ত হয়েই বাঁধা থাকবে, মাটি তাদের তফাত হলে কী হয়, অন্তর তো এক। এই কথাটাই দুনিয়ার লোককে বোঝাতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের দিক্‌পালেরা, তারা তা বিশ্বাসও করেছিল। যেটা তাঁরা চেপে গিয়েছিলেন ইচ্ছে করে আর যা দুনিয়ার লোকের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল তা হচ্ছে পাকিস্তানের দু' টুকরোর মধ্যে কেবল ভৌগোলিক নয়, ভাবগত সংহতিরও অভাব। তাদের ভাষা আলাদা, আদবকায়দা ভিন্ন, ভাবধারা স্বতন্ত্র, আর্থিক স্বার্থও এক নয়।

ধর্মের কাঁথা মুড়ে এতটা গরমিল কী ঢেকে রাখা যায়? তা যে যায় না, কায়েদে আজম জিন্না বেঁচে থাকতেই তা বুঝে-ছিলেন। ১৯৪৮ সনের একুশে মার্চ তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় গিয়েছিলেন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কায়েম করতে। জিন্না সাহেব ভেবেছিলেন তিনি যা বলবেন পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা মাথা নিচু করে তাই মেনে নেবে, তাঁকে অই বুঝিয়েছিলেন তাঁর সাকরেদরা। কাজে কিন্তু তা হলো না। মাথা উঁচু করে পূর্ব পাকি-স্তানের তরুণেরা জোর গলায় দাবি করেছিল —উর্দু নয়, বাংলা চাই। জিন্না সাহেব সে দাবিতে অবশ্য কান দেননি। বেয়াড়া বাঙালী ছোকরাদের ঝটপট জেলে পোরবার হুকুম দিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন করাচিতে। সেই বেতমিজ বাঙালী ছেলেদের মাথা ছিলেন ছাত্রনেতা মুজিবর রহমান। সেই তাঁর প্রথম রাজনীতির নাটমঞ্চে আবির্ভাব, সেই প্রথম জেলে যাওয়া আর সেই বোধ হয় বাংলা দেশের বাঁচবার লড়াইয়ের শুরু। জিন্না দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু বাংলা ভাষার যে দাবি তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন এক ফুৎকারে তা তাঁর চেলাদেরই পরে মেনে নিতে হয়েছে, বাংলা ভাষাকে সসম্মানে ঠাঁই দিতে হয়েছে পাকিস্তানের দেওয়ান ই আমে, তাকে মানতে হয়েছে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। আর যা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি বাংলা দেশ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হয়েছে।

পাকিস্তানের শুরু থেকে যাঁরা সে দেশের মাথা তাঁদের সবাই প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। মহম্মদ আলি জিন্না, লিয়াকত আলি খাঁ, গুলাম মহম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা, আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁ—এঁদের কেউই বাঙালী নন। বাংলা ভাষাও তাঁরা শেখেন নি। বাঙালীর দাবিদাওয়ার সঠিক মর্ম বোঝা এঁদের পক্ষে তাই সম্ভব হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে দু' চার জন করাচিতে-রাওলপিণ্ডিতে কলকে পেয়েছিলেন নাজিমুদ্দিনের মতো তাঁদেরও বাংলার নাড়ির সঙ্গে যোগ ছিল না। যাঁদের ছিল সেই ফজলুল হক আর তাঁর সমগোত্রীয়দের করাচি - পিণ্ডি - ইসলামাবাদ কোনও দিনই পাত্তা দেয়নি। জিন্না আর লিয়াকত আলি যে পূর্ব অঞ্চল থেকে পাকি-স্তান গণ পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন সে কেবল বাঙালীদের স্তোক দেবার জন্যে। তাদের মন বোঝবার কিংবা পাবার কোনও চেষ্টা তাঁরাও করেননি, অন্যরা তো নয়ই। রক্তের কড়িতে বাঙালীকে কিনতে হয়েছে তার অধিকার। ১৯৫২ সনে ঢাকার মাটি ছাত্র শহীদদের খুনে রাঙা না হয়ে উঠলে বাংলা ভাষা পাকিস্তানে অন্ত্যজ হয়েই থাকতো—হয়তো তাকে নষ্ট করে ফেলার চক্রান্তও হতো। অথচ পাকিস্তানে ছিল অধিকাংশেরই মাতৃভাষা বাংলা।

এমনি করেই জান দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে কেড়ে বিগড়ে নিতে হয়েছে পাকিস্তানে বাঙালীদের নিজেদের ন্যায্য দাবি। সংখ্যার অনুপাতে জাতীয় পরিষদে তাদের যত আসন পাওয়া উচিত তাও তাদের দিতে চায়নি গোড়ায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা। নেহাত চাপে পড়ে দু' এলাকার মধ্যে সমান-ভাবে আসন ভাগে তারা রাজী হয়েছিল। ইয়াহিয়া খাঁর আমলে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে বাঙালীরা তাদের ন্যায্য পাওনা আসনের ব্যাপারে আদায় করতে পেরেছে। তারই ফলে শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু এতই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের বাঙালী বিদ্বেষ যা স্বাভাবিক আর আইনসংগত তাও তাঁরা করতে চাননি। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বীকার করে নেননি শেখ মুজিবর রহমানকে, ঢাকায় বসতে দেননি জাতীয় পরিষদের বৈঠক। কথা দিয়েও কথার খেলাপ করেছেন ইয়াহিয়া খাঁ।

ঢাকায় যখন ইয়াহিয়া খাঁ আসেন তখন শেখ মুজিবর রহমান আর তাঁর আওয়ামি লীগ কী চায় তা তাঁর অজানা ছিল না। শেখ তো ঢেকে ঢেকে কিছু বলেননি, লুকিয়ে চুরিয়েও কিছু করেননি। তিনি তো সাফ বলে দিয়েছিলেন যে ছ' দফা দাবির ভিত্তিতে তিনি নির্বাচন লড়েছিলেন তা থেকে তিনি এক চুলও নড়বেন না। তবুও ইয়াহিয়া খাঁ যে ঢাকায় এসে-ছিলেন আর দিনের পর দিন শেখ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন তা বাংলা দেশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। তিনি একাই আলাপ-আলোচনা করেননি। ঘটা করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সব দলের মুরুব্বিদের জড়ো করেছিলেন ঢাকায় যাতে কাকপক্ষীতেও টের না পায় তাঁর গোপন ফিকির। জুলফিকার আলি ভুট্টো, খান আব্দুল ওয়ালি খান, মিঞা মমতাজ আলি খান দৌলতানা, খান আবদুল কাইয়ুম খান। মৌলানা মুফতি আহমেদ, সরদার সৌকত হায়ত খান, মৌলানা নুরানি, ঘাউস বকস, ইয়াহিয়া খাঁর তলব পেয়ে এঁরা সবাই ছুটে এসেছিলেন বাংলা দেশে আবার ফিরে গিয়েছেন কোনও ফয়শালা না করেই। করবেনই বা কী করে—ফয়শালা তো তাঁদের হাতে নয়, ইয়াহিয়া খাঁর হাতে। এক ভুট্টো ছাড়া তাঁর পেয়ারের লোক এঁদের মধ্যে আর কেউ তো নন।

যে কদিন ঢাকায় ইয়াহিয়া খাঁ ছিলেন সে কদিনই তিনি বাংলা দেশের টুঁটি সাজাবার বন্দোবস্ত করেছেন অবশ্য গোপনে। কাজটা শক্ত হয়েছে আরও ভারতের এলাকার ওপর দিয়ে বিমানে পাড়ি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়াতে। তাই তাঁকে সৈন্য-সামন্ত অস্ত্রশস্ত্র আনতে হয়েছে জাহাজে করে খুলনায়, চট্টগ্রামে। আগুন জ্বালাবার সব ব্যবস্থা করে তিনি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে গেছেন করাচি, সেখান থেকে ইসলামাবাদ। গুলি, বারুদ, বন্দুক, কামান, বোমারু বিমান আর সাঁজোয়া গাড়ি সব পৌঁছে গেছে বাংলা দেশে। মুজিবর রহমানকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছেন ইয়াহিয়া খাঁ, বে-আইনী করেছেন আওয়ামি লীগকে, জঙ্গী হুকুমত নতুন করে খাড়া করেছেন সেখানে। ভুট্টো মাথা নেড়ে বলেছেন খোদা বাঁচিয়েছেন এ যাত্রা পাকিস্তানকে। কিন্তু যা ঘটছে তাতে পাকিস্তান বেঁচে গেল বলে তো মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ যে আগুন জ্বেলেছেন ইয়াহিয়া খাঁ তাতে জ্বলছে পাকিস্তান আর তার চিতা থেকে জেগে উঠছে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলা দেশ। অস্থায়ী সরকার তার গড়া হয়ে গেছে। লক্ষ বাঙালী তার জন্যে ইতিমধ্যেই প্রাণ দিয়েছে, আরও দেবার জন্যে তৈরি। তারা প্রাণ শুধু দেয়নি নিয়েছেও। ইয়াহিয়া খাঁর জ্বালানো আগুনে পুড়েছেন বাংলা দেশে তাঁর জঙ্গী শাসক টিক্কা খাঁ।

বিদেশে (১০)

যাকে বলে মডার্ন আর্ট, পিকাসসো উপস্থিত যার পোপস্য পোপ সেই পদার্থটি জর্মনরা কখনো খুব পছন্দ করেনি। কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেলম, যাকে এখানে মার্কিনইংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করে তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আর্ট এবং আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : আর্ট হবে সুন্দর, আর্ট হবে সমাজসেবক, রাষ্ট্রসেবক আর্ট মানুষের দুঃখদৈন্যের ছবি না এঁকে আঁকবে এমন ছবি, কম্পোজ করবে এমন সঙ্গীত, রচনা করবে এমন সাহিত্য যাতে মানুষ আপন পীড়াদায়ক পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হবে। আজকের দিনে আমরা এটাকে নাম দিয়েছি এসকেপিজম — পলায়নমনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য জর্মন আর্টিস্ট—সাহিত্যিক সঙ্গীত-স্রষ্টা—কাইজারের এই পথনির্দেশ খবরের কাগজে পড়ে স্তম্ভিত হন। তা হলে আর্টিস্টের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই! সে তার আপন সুখ দুঃখ, আপন বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন হৃদয়ে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আশাবাদী চিত্র অঙ্কন করতে পারবে না! সে হবে রাষ্ট্রের ভাঁড়, ক্লাউন! তার একমাত্র কর্তব্য হল জনসাধারণকে কাতুকুতু দিয়ে হাসানো!

কিন্তু জর্মন জনসাধারণ কাইজারের কথাই মেনে নিল। এটা আমার বাড়িয়ে বলা নয়। এই পরিস্থিতিটা বোঝাতে গিয়ে প্রখ্যাত জর্মন সংবাদিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক শ্রীযুক্ত য়োখিম বেসার বলেছেন, জর্মনমাত্রই উপরের দিকে তাকায়; রাজা কি হুকুম দিলেন সেই অনুযায়ী কাব্যে চিত্রে সঙ্গীতে আপন রুচি নির্মাণ করে।

১৯১৮-এ কাইজার যুদ্ধে হেরে হল্যান্ডে পলায়ন করলেন।

তখন সত্য সত্য আরম্ভ হল "মডার্ন আর্টের" যুগ। যেন কাইজারকে মুখোমুখি প্রদর্শন করার জন্য আর্টিস্টরা আরম্ভ করলেন রঙ নিয়ে নিত্য নব উন্মাদ নৃত্য, ধ্বনি নিয়ে সঙ্গীতে তাণ্ডব একসপেরিমেণ্ট, ভাস্কর্যে বিকট বিকট মূর্তি যার প্রত্যেকটাতেই থাকত একটা ক্যুটো (তার অর্থ বোঝাতে গেলে পুলিশ আমাকে জেলে পুরবে)। আমি ঐ সময় জর্মনিতে ছিলুম। মডার্নদের পাল্লায় পড়ে একদিন একটা চারুকলা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একলম্ফে পুনরপি বেরিয়ে এসেছিলুম। একদা যে-রকম কোনো এক জুতোর দোকানের সামনে থেকে বিদ্যুৎ গতিতে পলায়ন করেছিলাম। বোটকা গন্ধে।

তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে সেখানে উত্তম দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না। নিশ্চয়ই ছিল। রাস্তার ডাস্টবিন খুঁজলে কি আর খান দুই লুচি, একটা আলুর চপ পাওয়া যায় না? কিন্তু আমার এমন কি দায় পড়েছে।

এরপর ১৯৩৩-এ এলেন হিটলার। তাঁর কাহিনী সবাই জানেন। কিন্তু আর্ট সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সবাই হয়তো জানেন না; তাই সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হিটলার সর্বক্ষণ কাইজারকে অভিসম্পাত দিতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কাইজার যদি কাপুরুষের মত হার না মেনে লড়ে যেতেন তবে জর্মান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতেই করতো।...অথচ আর্ট সম্বন্ধে দেখা গেল, হিটলার কাইজার সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন। তিনি কঠিনতর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলে যেতে লাগলেন "আর্ট হবে সমাজের দাস, অর্থাৎ

জর্মন পার্লামেণ্টের বিস্কুট-বাকসো প্যারা বাড়ি দেখে সে ভয় পায় না। কিন্তু মিউজিয়মে গিয়ে, "মডার্ন আর্ট" দেখে সে হকচকিত। গৃহিণী তো ভয়ে কর্তাকে জাবড়ে ধরেছেন। কর্তা তাঁকে অভয় দিচ্ছেন।

নাৎসিদের দাস। সূর্য নিম্নে এই পৃথিবীতলে তারা যে ন্যায়সম্মত আসন খুঁজছে, তারই সেবা করবে আর্টিস্টরা।"

কাইজারের চরম শত্রুও বলবে না, তিনি অসহিষ্ণু লোক ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও যাঁরা মডার্ন ছবি আঁকতো তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রকারেরই কোনো-কিছু করেননি।

কিন্তু হিটলার চ্যানসেলার হওয়ার পর আরম্ভ হল এঁদের উপর নির্যাতন। উদ্ভট উৎকট ছবি, নব নব সঙ্গীত ব্যান করা হল। সেরা সেরা পুস্তক পোড়ানো হল—কারণ এগুলো নাৎসি সঙ্গীতের সঙ্গে এক সুরে এক গান গায় না। আমি দূরে থেকে এরকম একটা অগ্নিযজ্ঞ দেখেছিলুম। কাছে যাইনি। পাছে প্রভুরা আমার রঙ দেখে, আমাকে ইহুদী ঠাউরে আমার নাকটা না কেটে দেন। যদিও আমার নাকটি খাঁটি অ্যাংলোস্যাক্সনীয়ন। খাটো, বেঁটে, হ্রস্ব। কিন্তু বলা তো যায় না।

হিটলার তাঁর সাধনোচিত ধামে গেছেন।

এখন জর্মনরা উঠে পড়ে লেগেছেন "মডার্ন" হতে। চোদ্দতলা বাড়ি ভিন্ন অন্য কথা কয় না।

তাই এই বিস্কুটটিনপারা পার্লিমেন্ট?

*

ডীটরিষকে বললুম, "জানো, ভাগিনা, আমাদের দেশেও এ ধরনের স্থাপত্য হুশ হুশ করে আকাশ পানে উঠছে। তারই এক আর্কিটেকট্ এসেছেন আমাদের সঙ্গে তাস খেলতে। ভদ্রলোক সিগার খান। বর্ষাকাল। সিগার গেছে মিইয়ে। ঘন ঘন নিভে যায়। ভদ্রলোক দেশলাই খোঁজেন। খেলা শেষ হল। তখন কেন জানিনে তিনি তাঁর দেশলাই আর খুঁজে পান না। আমাদের এক রসিক বন্ধু বসে বসে খেলা দেখছিল। সে দরদী কণ্ঠে বললে, 'দাদাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর্কিটেকট্ মশায়ের মডেলটি তোমরা কেউ গাপ্ মেরো না। ঐ দেশলাইটির মডেল থেকেই তো তিনি হেথাহোথা সর্বত্র বিয়াল্লিশ তলার বিলডিং হাঁকাচ্ছেন! ওটা গায়েব হলে ওঁয়ার রুটি মারা যাবে যে'।"

ডীটরিষ বললে, 'জানো, মামু, আমাদের বিশ্বাস প্রাচ্যদেশীয়রা বড্ডই সীরিয়স। সর্বক্ষণ গোমড়ো মুখ করে, লর্ড বুদ্ধের মত আসন নিয়ে শুধু আত্ম-চিন্তা মোক্ষানুসন্ধান করে। তারাও যে রসিকতা করে এ কথা ৯৯.৯% জর্মন কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। অথচ তোমার এই বন্ধুটির রসিকতাটি শুধু যে রসিকতা তাই নয়। ওতে গভীর দর্শনও রয়েছে। মডার্ন আর্কিটেকচর সম্বন্ধে মাত্র ঐ একটি দেশলাই দিয়ে তিনি তাঁর তাচ্ছিল্য সিনিসিজম সহ প্রকাশ করলেন কী সাতিশয় সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে। ভদ্রলোক কি তোমার মত লেখেন টেখেন—লিতেরাত্যোর?"

আমি বললুম, "তওবা, তওবা! ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের ফরেন অফিসের ডেপুটি মিনিস্টার; পণ্ডিত নেহরুর সহকর্মী। খুব বেশী দিন কাজ করেননি। ঐ সব দার্শনিক সিনিক্ রসিকতা তিনি সর্বজন-সমক্ষে প্রকাশ করতেন তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সহকর্মী মন্ত্রীদের সম্বন্ধে। ঠিক পপুলার হওয়ার পন্থা এটা নয়—কি বলো? কাজেই তিনি যখন ফরেন অফিস থেকে বিদায় নিলেন তখন আমি বলেছিলুম, তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিদায় নেবার সময় উল্লাসে নৃত্য করলেন এবং মন্ত্রিমণ্ডলীও তাঁর থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে উল্লাসে নৃত্য করলেন'।"

ডীটরিষ চুপ। আমি একটু অবাক হলুম। সে তো সব সময়ই জুৎসাফিক উত্তর দিতে পারে।

সে বললে "আমার অবস্থাও তাই। যে অফিসে আমি কাজ করি সেটা থেকে বেরুতে পারলে আমিও খুশী হই; ওরাও খুশী হয়॥"

আপনার শরীরের জন্যে চাই ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় 'খাদ্যগুণ'

দুধে আছে মাত্র ৯টি

কমপ্ল্যান-এ পাবেন পুরো ২৩টি

(প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজপদার্থ সমেত)

এক কাপ কমপ্ল্যান সম্পূর্ণ, সুষম আহার। চিনি আর পছন্দমত স্বাদগন্ধ যেমন—কফি, কোকো, ভ্যানিলা, জাফরান ইত্যাদি (অরেঞ্জ আর পাতিলেবুর রস ছাড়া)।

কমপ্ল্যান কেন দরকার: আপাত দৃষ্টিতে যে খাবার পুষ্টিকর বলে মনে হয় আসলে তাতে একাধিক খাদ্যগুণের অভাব থাকতে পারে। এমনকি শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক আহার দুধও সব সময়ে এই অভাব পূরণ করতে পারে না। সম্পূর্ণ পুষ্টির জন্যে, একমাত্র কমপ্ল্যান-এই আছে পুরো ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে, কাজে ব্যস্ত বয়স্ক, যাঁরা মা হ'তে চলেছেন বা সবে মা হয়েছেন, প্রবীণ এবং রোগো-মুক্তদের কমপ্ল্যান খাওয়া উচিত।

কমপ্ল্যান—অসুখে বা রোগের পর সেরে ওঠার সময় আদর্শ তরল পথ্য, সারা পৃথিবীর ডাক্তাররা দেখে বলেন।

কমপ্ল্যানের ২৩টি পুষ্টিকর উপকরণ এবং এগুলো কিভাবে আপনার উপকার করে।

প্রোটিন—রক্ত ও অণুকোষ গড়ে তোলে এবং এদের ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে।

লিপিড—শক্তি ও উত্তাপের প্রচুর উৎস।

কার্বোহাইড্রেট—শরীর কর্মক্ষম ও উত্তাপে ভরিয়ে রাখে।

ক্যালসিয়াম—দাঁত, হাড়কে সুস্থ সবল দৃঢ় ও শক্ত।

ফসফরাস—শরীরের জীবন্ত অংশ, হাড় ও দাঁতের জন্য।

সোডিয়াম—রক্তের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে।

ক্লোরাইড (সি, এল-এর আকারে)—পেশীর ক্রিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; খিল ধরা রোধ করে।

পটাসিয়াম—এর অভাবে দেখা দেয় মানসিক বিভ্রান্তি, পেশীর দুর্বলতা।

আয়রন—লাল রক্ত গড়ে তোলে।

আয়োডিন—থাইরয়েডের কার্যক্ষমতা বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এর ঘাটতি হলে দেখা দেয় ওজনের সমস্যা, গলগণ্ড।

ভিটামিন-এ—চোখ ও এপিথেলিয়াল কলাকে সুস্থ ও সবল রাখে।

ভিটামিন-বি-১—ক্ষুধার উদ্রেক করে, স্নায়ু সবল রাখে এবং বেরিবেরি প্রতিরোধ করে।

রিবোফ্ল্যাভাইন—মুখ, জিভ, ঠোঁট আর ত্বক সুস্থ সবল রাখে।

নিকোটিনামাইড—হজম ও স্নায়ুর ক্ষমতা গড়ে তোলে।

ক্যালসিয়াম প্যান্টোথিনেট—ত্বক ও কেশ সুস্থ রাখে।

কোলাইন—যকৃতের সুষ্ঠু স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য।

পাইরিডোক্সাইন (বি,৬)—পেশীর উত্তেজনা প্রশমিত করে।

ভিটামিন বি-১২—রক্তস্বল্পতা রোধ করে।

ফোলিক এসিড—লোহিত-রক্ত-কোষ উৎপাদনে সাহায্য করে।

ভিটামিন সি—রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে, স্কার্ভি রোগ রোধ করে।

ভিটামিন ডি—হাড় ও দাঁত সবল করে।

ভিটামিন ই—পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে।

ভিটামিন কে—রক্তের স্বাভাবিক জমাট বাঁধবার ক্ষমতা সুনিশ্চিত করে তোলে।

ট্রেস এলিমেন্টস—ভিটামিনের মত কাজ করতে এবং এদের মূল কাজের জন্য।

রিসার্চ-এর জগৎ-বিখ্যাত সৃষ্টি

কমপ্ল্যান — সম্পূর্ণ আহার

পুষ্টিহীনতা থেকে আপনাকে রক্ষা করে।

দুটি কবিতা

সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

[অকালে স্বর্গতা এই কবির দুটি কবিতা আমরা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছিলাম। পাঠকদের অনুরোধে আরও দুটি কবিতা পত্রস্থ হল।]

অ্যাকসিডেন্ট

১লা মে,
সন্ধে তখন সাড়ে সাতটা,
আমরা দুটি 'ভালবাসা'য় মিলে
গ্রিলে-ঘেরা সুন্দর বারান্দায়
খুন করলাম
'স্বর্গীয় প্রেম' নামক হাস্যকর এক অস্তিত্বকে।
আমার হাতে ছিল একটা ধারালো, তীক্ষ্ণ
উচ্চাশা,
আর তার কাছে ছিল ভীষণ ভারী
গোঁড়ামির মুগুর।
তাই
খুব সহজেই ওটাকে মেরে ফেলা গেল।

তারপর?
ইনফ্যাক্ট, সে এক ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার।
দুজনেই প্রাণপণে
নিজেদের বাঁচাবার জন্যে
পরস্পরের বিপরীত দুই প্রান্তের দিকে ছুটে চললাম।
তা নাহলে
সোজা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হত।

তবু চুপিচুপি বলি,
আমি ওই হাস্যকর ব্যাপারটাকে
মেরে ফেলতে চাইনি।

আমাতে তোমাতে

নিমফুলের আবেশে
কালবৈশাখীর পর্দায়
[illegible] মোমবাতি জে[illegible]
তবেই দেখলাম,
তুমি অনেক অনেক মহান।
(আসলে আমিই তোমাকে 'অনেক' করেছি।)
আমি ফুলের সুবাসে
ঝড়ের মত্ততায়
মোমের আলোয়
হয়ে উঠলাম উদ্ভাসিতা।

স্মৃতি সমীপেষু

অরণি বসু

তোমাকে দেখেছি অন্ধকারে, যেন আলোর নদীতে
ভেসে আসা চাঁদ
বুমেরাং প্রতিধ্বনির মত মাঝরাতে পাতাল থেকে
উঠে আস তুমি, স্মৃতি,
পুনরাবৃত্তিতে শুধু তোমারই ক্লান্তি নেই।

তোমার হাত ধরে কত সহজে ঘুরে আসা যেতে পারে
হারানো বছরে
স্বচ্ছন্দে চ'লে যাওয়া যেতে পারে বুক-খোলা
হাসির গাড়ীবারান্দায়,
মাঝে মাঝে আবার অতীত ভুলের জন্যে আচমকা
দুঃখ দাও তুমি
পুরনো অপমানের শোধ নিতে হাতের চেটোয়
বয়ে আন নিরঙ্কুশ ক্রোধ।
অথচ প্রতিবারই সুনিপুণ অভ্যাসে
আশ্চর্য নির্বিকার তুমি, স্মৃতি,
এয়ার হোস্টেসের মৌলিক সহাস্য ঔদাসীন্যে
নিজের কাজ ক'রে যাও।

স্মৃতি, তোমার দ্রুততায় লজ্জায় মুখ ঢাকে
অহংকারী রাজধানী একসপ্রেস,
অলস মুহূর্তে গোপনে প্রশ্বাসের সংগে শরীরে ঢুকে
নিশ্বাসে মাথামাখি হতে হতে
কখন যে চৌহদ্দি পেরিয়ে যাও কেউ সঠিক জানে না।

হিম জড়ানো দীর্ঘ সেতু

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

হিমজড়ানো দীর্ঘ সেতু ঘুমিয়ে আছে কুয়াশার ভিতর
দুই প্রান্ত ঝুঁকে পড়েছে শূন্যে ঝুঁকে পড়েছে অনন্তে
দুটি ব্যাকুল হাত ধরতে চায় মাটি
এমনি করেই অনন্তকাল

হিমজড়ানো দীর্ঘ সেতু পারাপারহীন চলার গল্প জানে
: ছায়ারা হাঁটে
: খোঁজে পরপারের তৃণ
: খোঁজে আরম্ভের দিকচিহ্ন
ছায়া মিলিয়ে যায় অন্ধকার নামে ছায়া মিলিয়ে যায়
রৌদ্র নামে রোদ ফুরিয়ে যায় কুয়াশা নামে

এমনি করেই অন্ধকার এমনি করেই রৌদ্র এমনি ভাবেই
কুয়াশা জড়িয়ে থাকে শতাব্দীর দণ্ডপল
শতাব্দী গড়িয়ে পড়ে নিচে প্রবহমান স্থির স্রোতে
হিমজড়ানো দীর্ঘ সেতু ঘুমিয়ে থাকে অনবসান কুয়াশার ভিতর
পারাপারহীন চলার গল্প বুকে নিয়ে

বাড়ি পৌঁছে বিভূতি শুনল অজয় তখনো ফেরেনি। সন্ধ্যের আগে কেউ এসে ডেকেছিল; অজয় তখন খাচ্ছে। ডাক শুনে মুখের খাবার ফেলে চটপট বেরিয়ে যায়। কিছু পরে খেয়াল হতে দরজা খুলে প্রথমে বাসন্তী, তারপর মণিকা বাইরে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। আজকাল এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে থাকে; আশঙ্কা ও দুর্ভাবনায় আজ আরো বেশি ফাঁকা লাগছিল। শোনা যাচ্ছে পাইপগানের গুলিতে আজও একজন মারা গেছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরেছিল বিভূতি। বাস রাস্তা থেকে আধ মাইল গলি পেরিয়ে আসতে আসতে বার দুয়েক মানুষের গলার শব্দ পেয়েছিল, কয়েকটা কুকুর এবং একটি পাগল ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়েনি। হত্যাকাণ্ডের বিবরণ শুনেছিল বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অন্ধকার গলির দিকে তাকিয়ে তখনই ভেবেছিল বিভূতি—সে কোন অন্যায় করেনি, কোনদিন কারুর পিছনে লাগেনি। ন্যায়ত তার খুন হবার কারণ নেই। এই ভেবে ঘড়িটা হাত থেকে খুলে পকেটে রেখেছিল।

এখন মণিকার কথা শুনে সামান্য আশ্চর্য হল না। উদাসীন গলায় শুধু জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছিল?'

মণিকা জানে না। দুপুরে বেরিয়ে, বিকেলের ডাকের চিঠি হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল অজয়। এলাহাবাদ থেকে মা কণিকার বিয়ের কথা লিখেছে। মণিকা তখন চিঠি পড়াতেই ব্যস্ত ছিল। বাসন্তীর কথায় হুঁশ হয়। অজয় আবার বেরিয়ে যাবে এবং আর ফিরবে না জানলে দরজায় পাহারা দিত।

এতো কথা বিভূতিকে বলা যায় না। বলেই বা লাভ কী।

'গলা শুনে তো মনে হল শীতল।'

'কোন্ শীতল?'

'দোতলা লাল বাড়িটাতে থাকে। অজয়ের বন্ধু—'

'শীতল কি করে হবে!' বলতে বলতে বিভূতি বলল, 'গত রবিবার ওকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।'

মণিকা আর কিছু বলতে পারল না। আশঙ্কা থেকে শীতলের নামটা মুখে এসেছিল—যদি বিভূতিকে কোনো ক্লু দেওয়া যায়। অজয় সম্পর্কে আলাদা কোনো জ্বালা অনুভব না করলেও এই ব্যাপারে সে পুরোপুরি নির্বিকার থাকতে পারেনি। সন্ধ্যে থেকে এতোটা সময় পর্যন্ত শ্বশুর শাশুড়ীকে সামলেছে, অজয়ের ছোট দীপককে আটকে রেখেছে ঘরে। পাশের বাড়ির বিশ্বনাথ বিভূতির সমবয়সী এবং বন্ধু, তাকেও খবরটা দিতে গিয়েছিল, যদি কিছু করা যায়। খুনের খবরটা সেখানেই শোনে। 'বিভূতি ফিরলে একবার খবর দেবেন।' বিশ্বনাথ বলল, 'এর মধ্যে না ফিরলে একটা কিছু করা যাবে।' এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

বিশ্বনাথের কথাটা স্বামীকে বলে দরজায়

মানুষের মুখ / দিব্যেন্দু পালিত

পর্দা টানতে গেল মণিকা। তারপর বলল 'কোথায় আর যাবে! নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তুমি যেন আর এতো রাত্তিরে গোঁয়ার্তুমি করে খুঁজতে বেরিও না।'

বিভূতি উচ্চবাচ্য করল না। দূরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দে তার কাঁধ দুটো সামান্য নুয়ে এলো। মনে হল গলাটা শুকিয়ে আসছে।

এই নিয়ে এ পাড়ায় খুনের সংখ্যা সাত দাঁড়ালো। অন্যান্য পাড়া নিয়ে অনেক বেশি হবে। হিসেবটা মনে থাকে না। খুনটুন এখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে—এতো স্বাভাবিক যে সকালে উঠে কাগজে খুনের খবর না পেলে স্নায়ুগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে কেমন, স্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করে বিভূতি। শুধু মৃত্যু ও গণ্ডগোলের সংবাদের জন্যে আজকাল সকালে ও রাত্রে সে নিচু স্বরে আকাশবাণীর খবর শোনে। রাস্তা দিয়ে হাঁটে খুব সাবধানে, ভিড় বাঁচিয়ে, নিজেকে একটুও আহত না করে। হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে বুকের মধ্যে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে হৃৎপিণ্ড। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সে হঠাৎ জীবনের মর্ম বুঝতে শিখেছে।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে থাকল বিভূতি। বারান্দা থেকে ভেসে আসা ননীমাধবের কাশি শুনলো। শুকনো কাশি; উত্তেজনা বা পেট গরম হলে এ-রকম হয়। নিজের ঘরে ঢোকার আগে প্যাসেজে ইজিচেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিল বাবাকে—অন্ধকারে বিষণ্ণ পড়ে থাকার ধরন দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। আটটার বেশি রাত হলেই স্বভাবে বলে ওঠে, এতো রাত হল। আজ বলেনি। যতো রাতই হোক, সে তবু ফিরে এসেছে। অজু ফেরেনি।

নিজের ভিতর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল বিভূতি। রক্তাক্ত ছুরিসমেত শীতলকে পুলিসে ধরার পর অজু সম্পর্কেও কিছুটা দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছিল মনে। পারতপক্ষে বাড়ি থেকে না বেরুনোর জন্যে সাবধান করে দিয়েছিল অজুকে। সতেরো বছরের ব্যবধান থেকে কোনো উপদেশ লক্ষ্যে পৌঁছয় বলে মনে হয় না। চাপা হাসিতে অজুর ঠোঁট দুটো বেঁকে গিয়েছিল অল্প। তা হলেও এ রকম হবে ভাবেনি। আশঙ্কার অনুভূতিটা এখন কি ভাবে প্রকাশ করবে বুঝতে পারল না।

এখন বেরুতে হবে ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন থেকেই নিজেকে প্রাণপণে ভালোবাসতে শুরু করেছে বিভূতি। এই ভালোবাসা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দেয় তাকে। সাঁইত্রিশ বছর পেরিয়ে এলো—অর্ধেকের বেশি—এখন ক্রমশ এগিয়ে যাবে মৃত্যুর দিকে। আজকাল সে চা খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, রোজ সকালে ডিম খায় একটি করে। একবার ঠাণ্ডা ডাবের লোভে টিফিনে অফিস থেকে দূরে চলে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। অফিস থেকে ফেরার পথে ইতিমধ্যে একদিন মিষ্টির দোকানে ঢুকে দুশো রাবড়ি কিনে খেয়েছিল। আগের দিন রাতে ওদের অফিসের পরেশ দাস খুন হয়।

মণিকা ফিরে এলো। থমথমে মুখ। টেবিলের ওপর নিঃশব্দে খাবারের প্লেট নামাতে দেখে বিভূতি জিজ্ঞেস করল, 'কি হল! এতো রাতে খাবার কেন?'

মণিকা জবাব দিল না। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে বলল, 'চা খাবে?'

'না।'

'বেরুতে হবে এই বেলা ঘুরে এসো। যেতেই যখন হবে—'

বলতে বলতে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মণিকা।

বিভূতি জানত তাকে বেরুতে হবে। জানত, অজু সম্পর্কে শেষ সংবাদ আনার দায়িত্ব তার। ননীমাধবের ঘন ঘন শুকনো কাশি, এতো কাণ্ডের পরেও বাসন্তীর কিছু না বলা এবং মণিকার বিরক্ত মুখ, এ সবই তাকে সচেতন করার জন্যে। এতক্ষণ বসে বসে সে অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় হাঁটছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে বোমার শব্দ নেই, ভিড় ও জটলা নেই, লোকজনের ছুটোছুটি নেই—নিরাকার জলের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে বিভূতি। জলের ভিতর ছাড়ে-দেওয়া পয়সাটা খুঁজে আনতে হবে। না হলে কাশি থামবে না ননীমাধবের, বাসন্তী মুখ দেখাবে না এবং ক্রমশ ক্রুর হয়ে উঠবে মণিকা। সে যেখান দিয়ে হাঁটবে, ছায়ার মতো গোটা সংসারের দুর্ভাবনা অনুসরণ করবে ওকে।

মণিকা ঠিকই বলেছিল, বিভূতি ভাবল, যেতে হলে এখনই বেরিয়ে পড়া ভালো।

ভাবামাত্র উঠে দাঁড়ালো বিভূতি। উঠতে গিয়ে হাঁটু দুটো কেঁপে উঠল সামান্য। গলার শুকনো ভাবটা যাচ্ছে না। বিছানার একপাশে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে তার বছর দুয়েকের মেয়ে। [illegible] বয়স নয়; গোলমাল শুরু হবার মুখে মণিকা তার ছেলেকে বালীগঞ্জে দাদার কাছে রেখে এসেছে—ওদিকে উপদ্রব কম। এই মুহূর্তে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিভূতি ভাবল, কপালে থাকলে অজু না ফিরুক, সে নিশ্চিত ফিরে আসবে। এবং নিঃশ্বাস চাপল।

মণিকা ঘরে ঢুকেছিল। বিভূতি বেরুতে দেখে বলল, 'খেলে না?'

'না।'

মণিকা চুপ করে গেল। [illegible] বিভূতির [illegible] 'বিশ্বনাথবাবুকে ডেকে নিও।'

[illegible] ফেরার কথা [illegible] না। একটু আগে বাসন্তীর সঙ্গে [illegible] করেছে, [illegible] এ-রকমই হয়। একজনের দায় [illegible] একজনকে ঘুচাতে হবে কেন! বাসন্তী [illegible] কথার মানুষ। বলেছিল, ছেলে [illegible] আমারও! মণিকা আর এগোতে পারেনি। ননীমাধব মরলে বাড়ির অংশ পাবে [illegible] বিভূতিকে আলাদা থাকার পরামর্শ দিত।

বিভূতি বেরিয়ে যেতে দরজায় দাঁড়িয়ে মণিকা ভাবল, সত্যি সত্যিই যদি অজু না ফেরে। দাদাদের বয়স বাড়ছে, [illegible] এখনো ওকে দেখে। বাসন্তীর সঙ্গে কথাকাটাকাটির এরপর ওকে আর একটু সাবধান হতে হবে।

বিভূতি বুঝতে পারল না রাস্তায় বেরুবার আগেই কেন সে বার বার রাস্তাটা পেরিয়ে যাচ্ছে! প্রাণের মায়া! এমন কি হয় সে অজুর খোঁজে বেরুলো এবং আর ফিরল না। একটু আগে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় ভরে উঠেছিল বুক—সে কী নিজের জন্যে! এই চিন্তায় গলা ঘেমে উঠল। জিবে দাঁত বসিয়ে নিজেকে অনুভব করল বিভূতি।

'টর্চ লাগবে?'

জায়গাটা অন্ধকার। দু' প্রান্তের আলো নিবিয়ে মনের ভারসাম্য বজায় রাখছে ননীমাধব। বেসামাল মনে হলে কাশছে। কথা শুনে মনে হবে এতোক্ষণ ওর বলা হবার অপেক্ষায় ছিল।

'টর্চ কী হবে!'

দাঁড়াবে না ভেবেও দাঁড়িয়ে পড়ল বিভূতি। ননীমাধব সম্ভবত আরো কিছু বলবে।

'তোর অতো হয়রানি!' স্টেজ ভাবলে

বিভূতি এখন স্টেজে একা। নেপথ্য থেকে ফিসফিসে গলায় ননীমাধব বলল, 'হারামের মূল বোঝে না! ঘরের লোকের সামান্য দায়িত্ব নিতে পারে না, এরা নাকি সমাজ বদলাবে!'

'এ-সব ভেবে লাভ কী!'
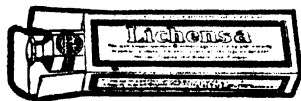
'না, লাভ কিছু নেই। তবে—', থেমে বলল ননীমাধব 'আছে কী নেই এ-খবরটা তো পাওয়া দরকার।'

বিভূতির মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীর ঠাণ্ডা নেমে গেল। চিন্তাটা এতোক্ষণ [illegible] উত্যক্ত করছিল তাকে। বাঁচিয়ে দিল ননীমাধব। কথা শুনে মনে হচ্ছে [illegible] শুধু খবরটা পেতে চায়। [illegible] আবার দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে না।

[illegible] বাড়িয়ে ননীমাধব বলল, '[illegible]'

[illegible] মধুর স্পর্শ [illegible] এটাকে [illegible] অন্ধকারে ননীমাধবের মুখের একটা [illegible] ধরা পড়ে। ইচ্ছে করলে এখন টর্চের আলো [illegible] চোখের ওপর কাঁচাপাকা ভুরু নামানো ননীমাধবের কঠিন মুখটা দেখে নিতে পারে। বিশ্বাস হয় না এই লোকটিই তার [illegible]! কিংবা বলা যায়, নিজে না গিয়ে আমাকে পাঠাচ্ছো কেন। এখনো কিছুদিন আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছিল!

'না, থাক।' ননীমাধব ভয় পাবে।

[illegible] টর্চটা চেপে ধরল বিভূতি। [illegible] আসতে দিল।

'[illegible] আগে বেরিয়েছে শুনলাম। [illegible] একটা ফোন করলে না কেন!'

'[illegible] বেরিয়েছিলাম।' গলা পর্যন্ত [illegible] ননীমাধবের। সম্ভবত [illegible] প্রার্থনা করছে। সামলে নিয়ে [illegible] কোত্থেকে! দোকানপাট [illegible] বন্ধ হয়ে গেল।'

'[illegible] বাড়িতে ফোন আছে—'

ননীমাধব জবাব দিল না। শুনল কি না বোঝা গেল না। মাথাটা হেঁট করে [illegible] দিকে ঠেলে দিল অল্প। তারপর হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে খাড়া উঠে দাঁড়ালো।

'তোর বেরুতে ভয় করছে?'

অদ্ভুত স্পষ্ট উচ্চারণ। যেন কুড়ি বছর পিছিয়ে গিয়ে কথা বলল ননীমাধব. এতো কৈফিয়ত চাইছ কেন। এতোক্ষণের অভিজ্ঞতা দিয়ে একে মেলানো যায় না।

নিজেকে গুটিয়ে নিল বিভূতি।

'ভয় পাবার কথা হচ্ছে না। চার ঘণ্টা পরে আমি তাকে কোথায় খুঁজবো!'

'খুঁজতে হবে না। পারলে থানায় একটা খবর দিয়ে এসো।'

আর কিছু শুনতে চাইল না ননীমাধব। হেঁটে গেল আস্তে আস্তে। হয়তো এরপর বাসন্তীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে; কিছু বলতে চাইবে, পারবে না। তারপর দু' আঙুলে রগ টিপে ধরে বসে পড়বে। এখন কিছু বলার সময় নয়। তাকে বেরুতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বিভূতি তার গভীর একাকিত্ব টের পেল। জ্যোৎস্নায় অবারিত কুকুরগুলো কেউ জেগে কেউ ঝিমিয়ে বিচরণ করছে সন্তর্পণে। শীত শেষ হয়ে আসছে। খুচরো হাওয়ায় কপালের ঘাম শুকিয়ে এলো। আজ বিকেলে যার মৃত্যু হল, মনে হচ্ছে ছুঁয়ে-যাওয়া আলগা হাওয়ায় মিশে আছে তার নিঃশ্বাস। যারা খুন হয়, মৃত্যুর আগে তারা কোন্ কথা ভাবে! যারা খুন করে, খুন করার আগে তারা কোন্ কথা ভাবে! একটি মুহূর্তে এসে তারা কী পরস্পরকে চিনতে পারে! ইতিমধ্যে যদি অজুকে খুন করা হয়ে থাকে, তাহলে...পরবর্তী ভাবনা এসে বিভূতির কণ্ঠরোধ করল। তার হাত-পা শিথিল হয়ে এলো; এবং স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল, এক চাঁই বরফের চাপে কাপড়ের নিচে তার নিম্নাঙ্গ ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে ভিতরে।

ইচ্ছে করলে বিভূতি এখন ফিরে যেতে পারে। দরজায় কান লাগিয়ে বসে আছে মণিকা; পায়ের শব্দে ছুটে এসে দরজা খুলবে। অজু ফিরবে না, বা খুন হতে পারে, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। এটা ঠিক, ফিরে গেলে ননীমাধবও কিছু বলবে না। বললেও করার কিছু নেই। বাড়িটা তুমি বানিয়েছো, তোমার কর্তৃত্ব বলতে ওইটুকু। কিন্তু, আমি চাকরি করি, সংসারের যাবতীয় ঝামেলা এখন আমাকেই পোহাতে হয়—অজুকে নয়; ভেবে দ্যাখো, অজুর চেয়ে আমার জীবনের দাম অনেক বেশি। এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করল বিভূতি। কিন্তু, যাকে জোর পাওয়া বলে পেল না। চোখের সামনে ভেলভেলে মুখ নিয়ে বার বার ফিরে আসছে অজু। বলা যায় না, অজু হয়তো এখনো বেঁচে আছে। এই মুহূর্তে সে হয়তো বিভূতিরই আবির্ভাবের অপেক্ষা করছে—ছোটবেলায় পুকুরের জলে ডুবতে ডুবতে যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দাদা...!' সেইরকম বা অনুরূপ কোনো প্রার্থনায় নুয়ে আসছে ক্রমশ। এ-সময় বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকা দরকার।

বিভূতির শরীর ফুঁড়ে তিরতির করে ঘাম বেরুতে থাকল। তখন আর এখন—দুজনের মধ্যে তফাত অনেক। তখন সাঁতার ছিল ঢের বেশি, অজু না বললেও সমস্ত পেশী জড়ো করে ঝাঁপ দিতে পারত। জীবনের বিভিন্ন স্বাদ—গার্হস্থ্য ও শারীরিক

নানারকম শব্দ—তাকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে বাঁচার দিকে। এই দুরবস্থা থেকে অজুই তাকে বাঁচাতে পারে, যদি সে এক্ষুণি ফিরে আসে।

বিপন্ন চোখ তুলে সামনে তাকাল বিভূতি। বহু দূরে পর্যন্ত রাস্তা পড়ে আছে শব্দহীন, এলোমেলো হাওয়ার ঘষা লেগে পিচের ওপর শব্দ উঠছে খসখস। একটা শালপাতা উড়তে উড়তে তার পায়ের কাছে সরে এলো। বাঁ দিকে ঘুরে রাস্তাটা যেখানে পুকুরের দিকে চলে গেছে, মনে হচ্ছে সেখান দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হেঁটে গেল কয়েকজন। ক' মুহূর্ত পরে চাকা ঘষটাতে ঘষটাতে টালমাটাল একটা গাড়ি ছুটে গেল। সম্ভবত পুলিসের গাড়ি—নিঃশব্দ কৌতূহলে কুকুরগুলো দৌড়ে গেল সেদিকে। দূরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দ। ভারী রোলারের মতো ফাঁকা রাস্তাটা গড়াতে গড়াতে ঢুকে পড়ল বিভূতির বুকের মধ্যে। অজু ফিরল না।

বিভূতি হাটতে শুরু করল। সে এখন আর কিছুই ভাবছে না। বিশ্বনাথ বলেছিল খবর দিতে। আপাতত, ভাবল, বিশ্বনাথকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবে। তারপর থানায় যাবে

যা যা হোক কিছু করবে। বিশ্বনাথ সঙ্গে থাকলে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম; অতর্কিত আক্রমণে তাদের মধ্যে যে কেউই খুন হতে পারে। বিশ্বনাথের কিছু হলে সে দুঃখ বোধ করবে ঠিকই, কিন্তু, নিজে তো বাঁচবে।

দরজায় কলিং বেল টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বিভূতি। জানলা বন্ধ। দুশ্যমান নয় বলেই ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত নিশুতি ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয়। আবার বেল টিপতে আলোর সুইচের শব্দ হল। মৃত্যু সম্ভাবনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তার ইন্দ্রিয়গুলোও সম্ভবত প্রখর হয়ে উঠেছে, না হলে এতো সূক্ষ্ম শব্দটা কানে পৌঁছুতো না।

'কে ?'

'আমি।'

জানলাটা খুলে গেল। বিভূতি চিনতে পারল না।

'বিশ্বনাথ আছে তো ?'

'দেখছি।'

পায়ের নিচে মাটি খুঁজল বিভূতি। এখন প্রতিটি মুহূর্তই মনে হচ্ছে মূল্যবান। বাড়ি ফিরে ঘড়িটা তুলে দিয়েছিল মণিকার হাতে। তখনো দশটা বাজেনি। সাধারণত তার ফিরতে এতো রাত হয় না। সহকর্মী পরেশ দাসের মৃত্যু উপলক্ষে ছুটির পর শোকসভা বসেছিল। ভাঙতে ভাঙতে দেরি হয়ে গেল। বেরিয়ে শুনল নর্থ-এ হাঙ্গামা, ট্রাম-বাস বন্ধ। তখন কি করবে না করবে ভাবতে ভাবতে শেয়ালদার দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। স্টেশনে পৌঁছে হঠাৎ খেয়াল হল ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির দিকে অনেকটা হাঁটতে হবে তাকে। বিপজ্জনক রাস্তা—অফিসে আসার সময় ওদিকে পুলিসের গাড়ি ও মিলিটারী কনভয় ছুটে যেতে দেখেছিল। যদি কোনো কারণে ধরে, বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়, কবে এবং কি অবস্থায় ছাড়বে বলা যায় না। ইত্যাদি ভেবে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। অনেকটা এগিয়ে একটা পাবলিক বাস পায় এবং উঠে পড়ে। পরেশ দাস না মরলে তার এই হয়রানি হত না।

'ওর তো খুব জ্বর।'

রাত কতো বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তা ও অন্ধকারের দিকে পিছন ফিরে বাণীকে দেখল বিভূতি।

'জ্বর !'

কপালে গোল সিঁদুরের টিপ থেবড়ে গিয়ে নাক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। নাকের ডগায় ও চিবুকে বিজবিজ করছে ঘাম। সম্ভবত মশারির ভিতর থেকে উঠে এলো বাণী। শিকের ফাঁকে মুখটা ঠেলে দিতে মৃদু উত্তেজনা শুরু হল বিভূতির বুকে। তিনদিন পরে মণিকা আজ চুলে তেল দিয়েছিল, সিঁদুর পরেছিল, গল্প করে।

দরজা বন্ধ করার আগে হঠাৎই গা ঘেঁষে এসেছিল। বিভূতি না ফেরা পর্যন্ত বসে বসে হাই তুলবে।

'মণিকা আসেনি?'

'হ্যাঁ।' আঁচল টেনে গলায় জড়ালো বাণী। 'তখন থেকেই জ্বর। ঘুমুচ্ছে। না হলে বেরুতো।'

সোজাসুজি বাণীর মুখে চোখ রাখল বিভূতি। ইচ্ছে করল রূঢ় হতে। ফর্সা ঘামে ভেজা কপালে সিঁদুর, না রক্ত! ইচ্ছে করল ফিরে যেতে। সে যতক্ষণ না ফিরবে ননীমাধবরা জেগে থাকবে। না, সে ধরা পড়তে চায় না।

বিশ্বনাথ বেরুবে না। রাত জুড়ে ঘুমোলে জ্বর ছেড়ে যাবে—কাল সকালে দাড়ি কামিয়ে অফিসে যেতে অসুবিধে হবে না কোনো। যে যার নিজের নিয়মে চলছে। তার কোনো নিয়ম নেই। আপাতত আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে গেল।

'মণিকা আপনাকে ছাড়ল!'

অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলল মুখে। বেরোয় দগদগে ক্ষত। খুব দূর দিয়ে ট্রেন চলে যায় হুড়মুড় করে—হুমছুমে হাওয়ায় গা ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে আসা কুকুরগুলি ছুটে যায় আবার। দূরত্বময় তাদের ডাকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন শালপাতা ও কাগজের কুচির উড়ে যাওয়ার সম্পর্ক থাকে না কোনো। প্রতিটি শব্দই মনে হয় অপরিচিত আক্রমণের রহস্যে ভরা।

জবাব না দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো বিভূতি। আলো নিবে যাবার পর এখন সবকিছুই অসম্ভব প্রকৃতিস্থ, অসম্ভব শীতল: মনে হয় পৃথিবীর শেষতম মানুষ হেঁটে গেছে এই রাস্তা দিয়ে। বিপ্লব আসছে, কথাটা প্রায়ই কানে আসে—হয়তো এই পথেই বিপ্লব আসবে। বিভূতি এসব বোঝে না। সে পড়ে থাকে গভীর অনিশ্চিতির মধ্যে। হাঁটতে হাঁটতে ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে মেরুদণ্ড।

পরেশ দাস অন্তর্হিত হবার পরের দিন ভোরে বাড়ির দরজায় চটের থলিতে ঢাকা তার কাটামুণ্ড পাওয়া গিয়েছিল। পুলিস এলো কুকুর নিয়ে। কাটামুণ্ডের ঘ্রাণ নিয়ে দুলাতে দুলাতে কুকুরটা চলে যায় অনেক দূর পর্যন্ত—সেখানে ওর বিচ্ছিন্ন ধড়টি পাওয়া যায়। এ সব গল্প বিভূতি শুনেছে অফিসে বসে। নির্জীব শিশুকে কোলে তোলার মত করে স্বামীর কাটামুণ্ডটি বুকে তুলে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল পরেশের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। মাস দুয়েকের মধ্যেই বাচ্চা হবে তার। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল, মুণ্ডু বলেই এমনটি করা সম্ভব হয়েছিল। বেশ বড়োসড়ো শরীর পরেশের, ভারী ধড় ওভাবে তোলা মেয়েমানুষের কাজ নয়।

আকস্মিক ভয়ে টর্চটা পড়ে গেল বিভূতির হাত থেকে। সামনে দুধের ডিপো। পাশ দিয়ে ঘোড়ার নালের মত বেঁকে গেছে গলিটা। কিছু দূরে গিয়ে আবার মুখ তুলেছে বাস রাস্তায়। বাঁক ধরে এগোলে পুকুর, শিব মন্দির, তার পরেই কিছুটা ফাঁকা জমি। এক সময় পুকুরসমেত জমিটা কেনার সাধ হয়েছিল ননীমাধবের। দু মেয়ের বিয়ে দিতে দিতেই সর্বস্বান্ত হল। তারপর কিছুদিন এই পুকুরে ছিপ ফেলে বসে থাকত মাছের আশায়। সুচতুর মাছের দল সম্ভবত দিনের পর দিন ফাঁকি দিয়ে গেছে তাকে—এখন আর ওমুখো হয় না।

মনে হচ্ছে কারা যেন গলির ভিতর থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। একদলা কফের মত হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এলো বিভূতির। একবার ভাবল শব্দের মুখোমুখি হবার আগেই ছুটে বড় রাস্তার দিকে এগোবে। সাহস হল না। রাত্রে ওখানে পুলিস পিকেট থাকে।

দ্রুত পায়ে ডিপোর পিছনের দেওয়াল-ঘেঁষে সরে গেল বিভূতি—ভাগ্যে হয় যদি অন্ধকারে এখন সে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনজন যুবককে ডিপোর সামনে দিয়ে ছুটে যেতে দেখল। টর্চটা ছিটকে পড়ল দূরে—না, সে নিরাপদেই আছে। কুকুরের চীৎকার থেমে যাবার পর দোমড়ানো শরীরে দ্রুত গলির ভিতর ঢুকে পড়ল বিভূতি। সম্ভবত এ যাত্রা বেঁচে গেল। বাকি রাস্তাটুকু যেতে পারলে থানায় পৌঁছুবে এবং অজয়ের খবর দিয়ে বলবে, দয়া করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন। ইতিমধ্যে অজয় ফিরে এলে ভালো। না হলে ননীমাধবকে বলবে, আর কিছু করার ছিল না। আমাকে ছেড়ে দাও।

দ্রুত হাঁটতে লাগল বিভূতি। ঘামেভেজা সর্ব শরীরে এখন সে প্রচণ্ড জোর পাচ্ছে। হাল্কা জ্যোৎস্নায় জড়ানো পুকুরটা পেরিয়ে খুব সহজে পৌঁছে গেল শিবমন্দিরের কাছাকাছি। শিব মন্দির পেরোতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো। মুহূর্তে অসাড় হয়ে এল হাত, পা। চাপা গোঙানির শব্দ। চোখ তুলে দেখল মন্দিরের পাশে নিমগাছের গোড়া বরাবর পড়ে আছে একটা শরীর! মাথাটা নড়ছে অল্প অল্প, আঃ, আঃ, মাঝে মাঝে শব্দ উঠছে মুখ থেকে।

'অজু!' ভয়ার্ত গলায় চীৎকার করে উঠল বিভূতি। শব্দটা কান পর্যন্ত পৌঁছল না। দেখে মনে হয় যুবক। না, অজু নয়। অজুর মাথার চুল এত ছোট নয়, শরীর এমন লম্বা নয়। আর একটা ফাঁড়া পেরিয়ে এলো বিভূতি। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে চলে যেতে হবে।

যুবকটি পেট থেকে হাত তুলল। জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত ক্লান্ত তার চোখ। মুখ বিকৃত করে একবার ঘাড় তোলার চেষ্টা করল, পারল না। শুকনো জিভে ঠোঁট চাটতে চাটতে কোনরকমে বলল, 'বাঁচব না। তারপর, জল—আঃ, একটু জল—'

কথাটা শুনেও শুনল না বিভূতি। বিস্ফারিত চোখে শুধু দেখল হাঁ করা পেটের ভিতর থেকে যুবকটির দলা পাকানো নাড়িভুঁড়ি ঢলে পড়েছে মাটির দিকে। অন্ত্রের চেহারা এ-রকমই হয়—গলায় থুতু ঠেলে বিভূতি ভাবল, বলা যায় না, যারা খুন করেছে, তারা, বা আর কেউ এখানে এসে পড়তে পারে। নিঃশ্বাসে কাঁচা রক্ত ও অন্ত্রের ঝাঁঝালো গন্ধ উঠে এলো বিভূতির। বলা যায় না গন্ধটা হয়তো তার শরীরেও ছড়িয়ে পড়ছে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল, হয়তো এই গন্ধই তাকে সনাক্ত করবে। এই ভেবে সে অন্ধের মত ছুটতে শুরু করল।

আলো পেল বড় রাস্তায় পৌঁছে। তার সামনে দিয়ে একটা খালি বাস চলে গেল। অনতিদূরে খড়ের আগুন জেলে গোল হয়ে বসেছে রিকশাওয়ালারা। ডানদিকে পুলিস পিকেট এবং বাঁ দিকে থানা। থেমে দাঁড়িয়ে বুকভর্তি হাওয়া টানল বিভূতি। এবং ভাবল, অজু হলে সে নিশ্চয়ই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করত। ভাবল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ পাড়ায় খুনের সংখ্যা সাত থেকে আটে দাঁড়াবে। একদিনে কী দুটোর বেশি খুন হওয়া সম্ভব! ভাবল, অজু হয়তো নিরাপদেই আছে, হয়তো ফিরে আসবে।

তারপর এতক্ষণে স্বাভাবিক মানুষের মত রাস্তার ধারে নর্দমায় গোঙানো [illegible] করল!

॥ আঠারো ॥
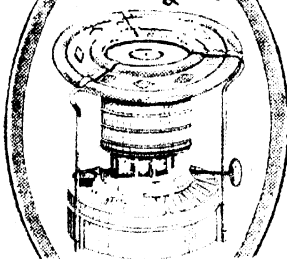
'পা তুলে গুটিয়ে বিছানার ওপরে ভালো করে বসুন না মশাই।' বললাম আমি জনাব সাহেবকে—'ঘরের ধুলো বালি আপনার পায়ে লেগেছে বলছেন? এক কাজ করুন না। আমার এই বিছানাতেই পা-টা মুছে নিন না হয়।'

'বিছানাতে পা মুছব?' তিনি যেন অবাক হন।—'বলছেন কী!'

'কোথায় মুছবেন আর? পাপোষ ত নেই আমার ঘরে। কী হয়েছে? আমিও তো তাই মুছে থাকি সর্বদাই।'

'বিছানাতে পা মোছেন নাকি?'

'বিছানাতেই কি আর? তা কি কেউ মোছে নাকি? চাদরের তলাতেই মুছি। চাদর তুলে কম্বলের গায় মুছে দিই। চাদর আমার ফিটফাট—ধোপদুরস্ত। চাদরের তলায় কী আছে কে দেখতে যাচ্ছে বলুন? ওপরটা চাকচিকন হলেই হল। চাদরের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক। বিছানার কী! নিন, মুছুন।'

চাদর তুলে আমার কম্বল শয্যা উন্মুক্ত করি।

'আমার কোনো বিষয়াসক্তি নেই। বিছানাকে যে চাদর দিয়েছি সেই ঢের—তার বেশি আদর করা ঠিক হবে না। মাঝে মাঝে পা মুছি তাই—এই, জুতো টুতো পরার আগে কিম্বা বাইরে থেকে ফিরে এসে। মাঝে মাঝে পদাঘাত করতে হয় বিছানাকে—তবেই ব্যাটা দুরস্ত থাকে।'

তিনি পা নিয়ে ইতস্তত করেন।

'নইলে নাই পেলে বিছানা মাথায় উঠবে যে! অনেকে অবশ্যি বিছানাকে মাথায় করে রাখেন। ঝালর দেওয়া সুজনি টুজনি বিছিয়ে তার ওপর। আমার মতে, বিছানা হচ্ছে ঘুমোবার জন্যে, ঘুমোটি হলেই হোলো। শান্তিতে ঘুম—নির্বিবাদ শান্তি তার জন্যেই বিছানা। বিছানায় বিছা না থাকলেই হোলো। নেইও আমার। কামড় দেবার কেউ কেউ। বিয়ে করিনি তো!'

'সারারাত বিছের কামড় সইতে পারবেন না বলেই নাকি?'

'ঐ ফাঁকির দেমাক সয় না আমার। তার ভেতর মধ্য পথেই না এলাম। অঙ্ক মেলাতে পারতুম না বলে অঙ্কশায়িনীও মিলল না বোধহয়। ভালোই হোলো একরকম। বিছানাকে নাই দিতে হোলো না, বিছানাময়ীকেও নয়।'

'জীবনমন্থনের বিষভাগকে বাদ দিতে গিয়ে অমৃতের ভাগেও বঞ্চিত হলেন শেষটায়। জীবনটাকেই বিস্বাদ করলেন।' আমার ভাষাতেই যেন তাঁর বিসংবাদ শুনি; 'ফাঁকি দিয়েছেন নিজেকেই। ফাঁকি পড়েছেন একেবারে।'

'সাধ্য কী!' আমি বলি—'নেচার অ্যাভরস্ ভ্যাকুয়াম্, শোনেননি? কোথাও ফাঁক রাখার যো আছে কি? প্রকৃতিই থাকতে দেয় না। ভগবান একেবারে ফাঁকি পড়তে দেন না কাউকেই। সব ফাঁক সবার ফাঁকই ভরাট করে দেন একেক সময়—ভগবানের প্রকৃতিই তাই।'

'বটে?' তিনি জানতে চান—'তাহলে অঙ্কশায়িনীও ঘটে যায় একেক সময় বলছেন? [illegible] না করলেও?'

'আমি কী বলব? [illegible] বলুন।

এসব কথা কি কাউকে কখনো মুখে বলার? নিজের মনে নিজ গুণেই সমঝে নিতে হয়। আবং ভাবের কথাই তো ভাববাচ্য মশাই!'

তিনি যেন ভাবে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কথা সরে না হঠাৎ। তারপর বলেন—'আশ্চর্য কিছু নয়।'

'আশ্চর্য কী! কার কোথায় কখন কীভাবে কোন্ অভাব মোচন হয়ে যায় কেউ বলতে পারে? কখনো দৈবেন দেহীমিতি—দৈবাৎ মেলে, কখনো বা পুরুষকারের দ্বারা লভ্য পুরস্কার। মোটের পর ভগবতীর রাজ্যে কেউ কদাপি ফাঁক যায় না—একেবারে ফাঁকিতে পড়ে না কেউ। কালী কল্পতরু, কালও আবার তাই। কালক্রমে মেলে সব, জানেন নাকি?'

'কী জানি!'

'কী জানবেন আর! জানবার কী আছে! ভগবানের অপার রহস্য,—কিছু কি তার জানা যায়? নিন, পা তুলে ভালো হয়ে বসুন তো! নইলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।...শুতে পারছি না বলে শান্তি পাচ্ছিনে।'

'পড়ুন না শুয়ে। কে আটকাচ্ছে?'

'আপনাকে ওই প্রায়োপবেশনে রেখে কি শোয়া যায় মশাই? ভদ্রতায় বাধে যে?' সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুযোগ: 'লেখকরা যদিও ঠিক ভদ্র নন কখনো—তাহলেও চক্ষু-লজ্জা বলে একটা আছে তো!'

ভদ্রলোক আমার উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন সসংকোচে চাদরের এক ধারটা তোলেন—'এ তো কম্বল দেখছি কেবল। দুখানা কম্বল। এই আপনার বিছানা! তোষক টোষক নেই?'

'পাবো কোথায়? কে দেবে? জেল-খানার দৌলতে পাওয়া ওই কম্বল দুটোই দুনিয়ার সম্বল আমার।'

'আঁ? কী বললেন? জেলখানার কম্বল?'

'হ্যাঁ। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর অবদান। সেখানে হাজত বাসের সময় ও দুখানা দিয়েছিল—একটা পাতবার জন্যে আর একটা গায়ে দেবার। তারপর আদালতে কারাদণ্ড হবার পর সেখান থেকে বহরম-পুরের জেলে চালান যাবার কালে ওদুটো নিয়ে হোলো—শীতকাল ছিল কিনা তখন! প্রহরী আর কম্বল-পরিবেষ্টিত পৌঁছলাম বহরমপুরে গিয়ে। কম্বল নিয়েই ঢুকলাম সেখানকার গারদে।'

'তারপর?'

'সেখান থেকে খালাসের সময় আমায় বললে তোমার যা জিনিসপত্র আছে, যা যা সঙ্গে এনেছিলে নিয়ে যেতে পারো। নিজের বলতে ওই কম্বল দুখানাই ছিল। নিয়ে এলাম সমভিব্যাহারে। বাধা দিলে না কেউ। ব্যবহারে লাগিয়েছি এখন।'

'পলিটিক্যাল আসামী বলে ভ্রূক্ষেপ করেনি কেউ। সেইজন্যেই আনতে পেয়েছেন।'

'আনন্দবাবুও সেই কথাই বললেন...'

'আনন্দবাবুটি কে?'

'এই বাড়ির মালিক। আনন্দমোহন সাহা। তাঁর এই বাসায় তিনিই তো ঠাঁই দিয়েছিলেন আমায়। দুঃখের বিষয়, এখন আর বেঁচে নেই। সস্ত্রীক স্বর্গত। আহা, তাঁরা বেঁচে থাকতে কতো ভালোমন্দ খেয়েছি যে! পায়েস পিষ্টক ভুনি খিচুড়ি—ভূরি ভূরি খেয়েছি। খিচুড়িটা ঠিক পোলাওয়ের মতই খেতে—প্রায়ই আসত তাঁদের বাড়ি থেকে। আর পায়েস! আহা সে কী পায়েস! আয়েস করে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মতন। খাসা চাল, দুধ নয়, ক্ষীরের মধ্যে সেদ্ধ করা আগাগোড়া। তেমনটি আর হয় না। আজকাল কোথাও খেতে পাই না আর।' আনন্দ বিয়োগের ততটা নয়, ওই পায়েসের শোকেই আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—'আমার জীবনের আনন্দ তিনি নিয়ে গেছেন। সেই আনন্দবাবুই এই কম্বল দেখে বললেন, আরে ভাই! করেছো কী! জেলখানার মাল নিয়ে এসেছো! কেউ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না—চুরির দায়ে ধরা পড়বে যে! হাতকড়া পরাবে। আর এবারকার জেলটা ঠিক বিরিয়ানি খাবার হবে না, তবে দস্তুর মতন ঘানি টানার।... সরিয়ে ফেল সরিয়ে ফেল এক্ষুনি।'

'বললেন তিনি? এই কথা বললেন?'

'হ্যাঁ। শুনেই না আমি সরিয়ে ফেলেছি তক্ষুনি। চাদরের তলায় চাপা দিয়েছি তাদের।'

'আর ঐ বালিশটা পেলেন কোথায়? নক্সাকাটা ওয়াড় দেয়া খাস বালিশ তো? ওটাও কি জেলখানার নাকি?'

'না। ওটা আমার বোন পুতুল দিয়েছিল আমায়। একদা সে এসে দেখল কি, আমার মাথাটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে...'

'মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল? আপনার মাথা?'

'আহা, ওই হোলো। এই বিছানাতেই গেল না হয়। গড়াগড়ি যাচ্ছিল তো ঠিকই! আর টাকা মাটি মাটি টাকা যদি হতে পারে তো বিছানার মাটি হতে বাধা কিসের? তাই না দেখে সে তক্ষুনি বেরিয়ে কোত্থেকে একটা বালিশ কিনে এনে উপহার দিল আমাকে। ওই বালিশটাই। সঙ্গে আবার ওয়াড় দিল খান দুয়েক। দুখানা কেন? শুধিয়েছিলাম তাকে। যাতে আমায় কাচাকাচির কাজে না যেতে হয় সেইজন্যেই দুখানা—একটা ধোবা বাড়ি কাচতে যাবে, আরেকটা পরানো থাকবে। মেয়েরা কখনো কাঁচা কাজ করে না।'

সুতাই বলুন। কিন্তু এই কম্বল শয্যায় সঙ্গে ঐ উপাদেয় উপাধানের খাপ খাচ্ছে না ঠিক। কেমন বেখাপ্পাই ঠেকছে।'

পুতুলের কি তার জিনিসের কোনো [illegible] করবেন না আপনি আমার কাছে।' আমি বলে দিই। 'তার দৌলতেই আমার এমন দেহলাভ আর এই দেহরক্ষার জন্যে এ [illegible] শয্যা—তা জানেন?'

জানলাম। কিন্তু এইটে আমি বুঝতে পারছিনে আপনার এমন সব বোন থাকতে তাঁরাও কি এই ঘরটার ওপর একটু নজর দেন না? সাফসুফ করতে চাননি কখনো ঘরখানা?'

চাননি কি আর? বিনি ইতু পুতুল—যে এসেছে, ঘরের এই চেহারা দেখেছে, সেই এর হাবভাব বদলাতে চেয়েছে, কিন্তু দিচ্ছে কে হাত লাগাতে? বিনিকে নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক গল্প লিখেছি এককালে [illegible], সে সবের বিনিময়ে টাকাও পেয়েছি [illegible] তা জানি, কিন্তু—তাই বলে আমার [illegible] আমার ঘরের ওপরে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাকে দিইনি আমি। আর ইতু [illegible] পুতুল এ-ঘরের জঞ্জালে হাত লাগাতেই [illegible] আমার সঙ্গে হাতাহাতি বাধার যোগাড়। [illegible] ইতুদেবীর পূজারী কি পৌত্তলিক [illegible] হই না কেন, আমার ব্যক্তিস্বাধীনতায় [illegible] হস্তক্ষেপ আমি সইতে পারি না। [illegible] নিতে আমি নারাজ। ব্যক্তিত্বই তো [illegible] চরিত্র। চরিত্রহীন হতে চায় কে?'

[illegible] পরিষ্কারের সাথে ব্যক্তিত্বের, ব্যক্তি [illegible] কী সম্পর্ক মশাই?' তিনি ঠিক [illegible] পারেন না।

[illegible] কি আমার ব্যক্তিত্বের অংশ নয় [illegible] আমার ঘরের সঙ্গে আমার [illegible] কি জড়িত নয়? কী বলেন! [illegible] মনের রূপের বহিঃপ্রকাশ [illegible] এই [illegible] খানিকটা অন্তত নিশ্চয়ই। আমার [illegible] পুঞ্জীভূত জঞ্জালের অভিব্যক্তি [illegible] কী আর? সত্যি বলতে, পরিষ্কার [illegible] সোজা সেট সাজানো পোশাকী [illegible] আমি যেন ঠিক স্বস্তি পাইনে।'

বুঝতে পেরেছি। এই হেতুই কোথায় আপনি হবেন এক বিরাট জমিদারি আর [illegible] মহলা বাড়ির সুসজ্জিত সাতষট্টিখানা ঘরের মালিক' খাটপালঙ্ক গদি সাজানো ঘর সব, তা না হয়ে...।' গদির কথায় তাঁকে [illegible] হয়ে উঠতে দেখি।

'আর কোথায় একমাত্র ঘরের এই চৌকিদার আমার।' তাঁর বাক্যটা আমিই সম্পূর্ণ করি: 'অবিশ্যি, সেই সাথে কয়েকটি চটিরও মালিক বটি।'

'চটি না বলে স্লিপার বলুন বরং।'

'স্লিপার তো আমিও কিছু কম নই। ওরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, আর আমি সর্বদা এই শয্যায় নিক্ষিপ্ত। তফাৎ এই, ওরা সব জোড়ায় জোড়ায়, আর আমার আদৌ কোনো জোড়া নেই। এ ঘরে নেই অন্তত।'

'সারা বাংলা মুলুকেই আপনার জোড়া নেই।' কথাটা যেন তার ব্যাজস্তুতিচ্ছলেও বলা নয়।—'তা জানি।'

'জুড়ি একজনা ছিল বটে—কিন্তু সে জুড়ি তো আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি কোন্ কালে। হাওড়ার রেলগাড়িতেই। বললাম না আপনাকে?'

'অন্য জুড়ি জুটলে এমনটা হত না। বিয়ে করলে এভাবে থাকতে পারতেন না কিছুতেই। বোন না হয়ে বৌ হলে কি আর এসব আবর্জনা বরদাস্ত করত?

[illegible] হাতাহাতি করেও সব জঞ্জাল সাফ করে ছাড়ত এক লহমায়।'

'তা হয়ত হত, কিন্তু সেই জঞ্জাল সাফ হত কি করে?' আমার প্রশ্ন রাখি।

'কোন জঞ্জাল?'

'সেই জঞ্জাল হটানো জঞ্জাল? তিনি আবার যে পদ্মাম নরক আমদানি করতেন সেই সব?'

স্ত্রীপুত্ররা সব জঞ্জাল নাকি আপনার কাছে? তাদের অবশ্যি মায়াজাল বলেছে বটে শাস্ত্রে, কিন্তু...তাহলে আপনার বোনরাও তো আপনার কাছে জঞ্জাল এক-রকম?'

'মোটেই না। আমার কাছে তারা সব নন্দন কানন। নন্দন অংশ বাদ দিলেও—সেই পারিজাত সৌন্দর্য-সুরভির সীমা নেই, তুলনা হয় না। বন উপবন যাই বলুন, সেসব ব্যক্তি স্বাধীনতার ইস্তাহারক মন্ত্র, স্বচ্ছন্দ বিচরণের স্থান। আস্তে আস্তে তারা সব ছেড়ে যায়, বেঁধে রাখে না, বাঁধা থাকে না। বন ক্রমেই গভীরতর হয়ে নিছক রোদনের অরণ্যরূপে, কালক্রমে নিজে সংসারসমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যায়। তারা তো ছাড়ান দেয়, ছেড়ে যায় যথাসময়ে কিন্তু বৌকে তো আর ছাড়ানো যায় না কিছুতেই। কখনই না।'

'দরকার কি তার?'

'সম্বন্ধদের সেই গলগ্রহের ন্যায় সুতে হবুকযোগে লব্ধ গোধূলি লগ্নের উদ্বাহিত সেই ভার্যাকে ঘাড় থেকে আর নামানো যায় না যে! তারপরে 'শেষকালেতে মাথার রতন লেপটে রইলেন আঠার মতন!' কবি ডি এল রায় একথা কেন বলে গেছেন কে জানে! যে জন্যেই বলুন, মোদ্দা কথা এই, তারপর সেই নাছোড়বান্দার নেহাৎ বান্দা হয়ে বন্দীদশায় যাবজ্জীবন কাটান!'

'তাই বলছেন আপনি? বৌয়ের বিরুদ্ধে এই আপনার অভিযোগ?'

'আমি কেন বলব? বৌয়ের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই।' আমি জানাই : আমার আবার অভিযোগ কিসের! বিয়েই করিনি আমি। মাথা নেই তো মাথাব্যথা কেন? কিন্তু যাঁরা করেছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের, তাঁদের সেই ফার্স্ট হ্যান্ড নলেজের ফল গল্প কাহিনীর ছলনায় তাঁদের আত্মচরিতেই ব্যক্ত হয়েছে। আমার বন্ধুরাই মুখে না বলে লিখে জানিয়ে গেছেন।'

'লিখে জানিয়েছেন? বলেন কি?'

'কেন, পড়েননি নাকি? কে যেন তার বৌকে কুয়াসার আড়ালে হারাতে চেয়েছিল—অবশ্যি মেয়েটি হারায়নি শেষ পর্যন্ত। হারাবার কি হারবার পাত্র নয় মেয়েরা—হারিয়ে না গিয়ে উলটে তারাই হারিয়ে দেয় আমাদের। ...সেই কার যেন স্ত্রীকে শৃঙ্খলের মত বোধ হয়েছে, কে যেন আবার দেনার

গল্প কসে দিয়ে স্টোভ ফেটে বৌয়ের অপঘাতের অপেক্ষায় বসেছিল—বিস্ফোরণের এক মাত্রায় সহধর্মিণীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়াও তার বাঞ্ছনীয় ছিল নাকি—পড়া হয়নি আপনার?'

'পড়ব না কেন? বিখ্যাত গল্প সব। কিন্তু আপনার লেখক বন্ধুদের একজনেরই তো গল্প এগুলো—আর কোনো বন্ধুর কেউ কি এরকম দুর্লক্ষণ দেখিয়েছেন? তার উল্লেখ করুন!'

'দরকার করে না, উনি একাই একশ। আমাদের সবার মুখপাত্র। গৌরবে বহু-বচন—তাঁকে নিয়েই আমাদের গৌরব। হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই আর সবার হালচাল জানা যায়। তাঁর লেখাতেই আর সকলের টিপসই রয়ে গেছে। তবে একথা ঠিক, গল্প কথা হলেও এগুলি অল্প কথা নয়। এর মধ্যে শিক্ষণীয় আছে অনেক কিছু।...'

'কিন্তু শুনেছি তো, তাঁর মতন পত্নী বৎসল নাকি হয় না...'

'ঠিকই শুনেছেন।...' স্ত্রী না হলে একদণ্ডও চলে না ওঁর। বউকে ছেড়ে সেই কি আমেরিকায় গিয়েও উনি স্বস্তি পাননি একদিনও তিষ্ঠোতে পারেননি সেখানে। সম্ভাবিত নোবেল প্রাইজ পাবার লোভ সম্বরণ করে দুদিন বাদেই নাড়া [illegible] সেই [illegible] ফিরে এসেছিলেন [illegible]!'

'কেন এলেন বলুন! তাহলেই বুঝবেন স্ত্রী কী চীজ!'

'আসলেই হবে যে। আর সেই কারণেই তো আমার বলা—দাম্পত্য জীবনের [illegible] সমানভাবে দাঁড়িয়ে, অন্য [illegible] আর। হয়তো একটু প্রশ্র-[illegible] সৃষ্টি করলেও অন্য [illegible] পক্ষে ক্ষতিকর। বউ কোনো [illegible] দেয় না, স্বাচ্ছন্দ্যবিহার [illegible] না, বাড়িতেই বন্দী হয়ে থাকতে হয় [illegible] কেচ্ছার ভয় আছে না? সেসব [illegible] বাউণ্ডুলেদের। বউ অন্তরের [illegible] সব পথ বন্ধ করে দেয়—নিজের [illegible] অন্তরীণ রাখে। এইজন্যেই সে [illegible] স্বাধীনতার অন্তরায়!'

'কিন্তু অসুখবিসুখে দেখা শোনা [illegible]...'

'[illegible] সে, নানান অভিযোগ [illegible] করাতেও তেমনি। বিবাহিত ব্যক্তির নানান অসুখ বিসুখ তো লেগেই থাকে, কেন বলুন দেখি?'

'আপনিই বলুন না।'

'ঐ বউয়ের জন্যেই মশাই! রোগেই তো রোগ টানে। গোড়াকার রোগ ওই দারাই। [illegible] সেবাসুখ পাবার লোভেই [illegible] না অসুখ! বউ এসে গায় মাথায় হাত বুলোবে, যত্নআত্তি করবে, তার মুখের আছা উঁহু শোনা যাবে সেইজন্যেই না। যার ঘরে বউ নেই তার কোনো ব্যামোও নেই, অন্তত তেমনটা নেই—এইজন্যেই।'

'আপনার অসুখ বিসুখের সময় আপনি কি চান না আপনার প্রিয়জনরা কেউ এসে গায় মাথায় হাত বুলাক?'

'মাথায় থাক। অপর কেউ আমার গায় মাথায় হাত বুলোলে আমার গা জ্বলে করে—আমার মা ছাড়া আমার কপালে আর কারো করাঘাত আমি সইতে পারিনে—পাছে কেউ আমায় অসহায় অবস্থায় পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে যায় সেই ভয়ে আমার কোনো অসুখই করে না কখনো। এই বছর পঞ্চাশ তো এই বাসায় কাটালাম, জিগোস করুন না বাসার ঠাকুর চাকরদের, জানবেন একদিনের জন্যেও আমার কোনো [illegible] কখনো। এমন কি একবার...' কথাটা বলব কিনা আমি ভাবি।

'একবার?' তিনি উসকে দেন আমায়।

'একবার এ বাসায় ফুড পয়জন হয়েছিল অনেকদিন আগে। নৈশাহারের পরেই। পরদিন শুনি আগের রাত থেকেই বাথরুমে কারো কারো যাতায়াত শুরু হয়েছিল। পরের দিন সকালে উঠে বেরিয়ে গেছি, কিছু জানিনে, রাত্রিবেলায় ফিরে দেখি রান্নাঘর অন্ধকার। উনুনে আঁচটাচ পড়েনি, কী ব্যাপার? না, সারাদিন ধরে বাসাড়েরা কেউ বিশ কেউ পঁচিশ কেউ বা বাহান্নবার বিগলিত হয়েছেন—কেউ কেউ আবার হাসপাতালেও গেছেন নাকি। আমাদের বাসার ওড়িয়া ঠাকুর—পরশুরাম পাড়ী—

সে নাকি সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু তারপরে সেও এখন মুক্তকচ্ছ হয়েছে। বাসার সবাই আজ ধারাবাহিক, তাই আজ রান্নাঘরে আঁচ পড়েনি, হাঁড়ি চাপেনি তাই।'

'বটে?'

'অথচ সেদিন সকালে যেখানে গেছলাম সেই বন্ধুর বাড়িতে বেদম খেয়েছি—খাবার

লোভেই আমার যাবার গরজ তো—তারপরে বাসার ঐ নিরাহার চেহারা দেখে বেরিয়ে পড়তে হোলো আবার। দেলখোস কেবিনে গিয়ে গিলতে বসে গেলাম।'

'আপনার জীবনে কখনো কোনো অসুখ বিসুখ করেনি তাহলে? এই কথাই বলতে চাইছেন আপনি?'

'করেছিল বইকি। একবার করেছিল। মোক্ষম অসুখ। প্রায় মোক্ষ প্রাপ্তির কাছাকাছি নিয়ে গেছল বলতে কি। এখানে সেখানে ভালোমন্দ খেয়ে না খেয়ে বহুকালের ব্লাডপ্রেসার তো আমার। দারুণ প্রেসার। তার দরুন একটা স্ট্রোক হয়েছিল হঠাৎ। ব্লাডপ্রেসার মানতাম না, ডাক্তারের মানাটানা না শুনে তার ওপরেও খেতাম—একটানা গিলে যেতাম—মাংস ডিম মাখন ক্রীম—তার ফলেই ওই দুর্ঘটনা! কিন্তু তারপরেই আমি সাবধান হয়ে গেছি খুব। কোথাও যাই না, গেলেও তেমনটা খাই না। কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর জন্মদিনে বেজায় ঘটা করে ষোড়শোপচারে খাওয়ানো হয়, সেখানে গেলে পাছে লোভ সামলাতে না পারি—তাই যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, তাঁরাও বেঁচে গেছেন মনে হয়, কেননা কারো জীবনের শুভদিন অপর কারো শোকাবহ মৃত্যুদিন হয়ে জন্মোৎসবটা নষ্ট হোক তাঁরাও তা চান না নিশ্চয়। নিজ গুণে ক্ষমা করেছেন আমাকে।...'

'মুক্তারামের তক্তারামে শুয়ে—অচিন্ত্যবাবুর ভাষায়—শুক্তোরাম খেয়ে সুখে রয়েছেন?'

'সর্বদা মার্কস শেকস্পীয়রের দুর্গ-মর্ধ্যে দুর্বার মুক্ত বায়ু সেবন করে—আমি জানাই—এই, সকালে খাই চারটি ভাত, কত কটি, চোখেই ত দেখলেন? দুপুরে বোনের বাড়ির থেকে আমার ভাগনের নিয়ে আসা একখানি রুটি কয়েক টুকরো মাছ, একটু তরকারি আর রাত্রে খালি হর্লিকস। তার সঙ্গে হয়ত এক আধটা বিস্কুট। তবু আমার রক্তের চাপলা যায় না মশাই!'

'কখনো আপনার কোনো অসুখ হয়নি একথা আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হয়নি কি? হয়েছে। ছেলেবেলাতেই হয়ে গেছে। কী অসুখটাই না ভুগেছি তখন—কত রকমের যে অসুখ! যত রকমের সুখ আর অসুখ আছে তার উপভোগ সেই আর কৈশোরেই হয়ে গেছে আমার। সে সবের লিস্টি দিয়ে কী হবে? যেমন রোগা ছিলাম তখন, তেমনি রোগও ছিল কত। কিন্তু সেও সেই মা এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। বিছানার পাশটিতে বসে থাকবে দিনরাত, সেই লোভেই ত! আর, ইস্কুলে যেতে হবে না, শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়া যাবে মজা করে—কী আনন্দ! সুখের জন্যেই আমাদের যতো অসুখ, বুঝেছেন?' আমার বক্তব্যের উপসংহার—"তারপর সেই যে বাড়ির থেকে পালিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে পড়লাম উদার পৃথিবীতে তারপর থেকে আমার একটিও অসুখ করেনি কখনো। কার জন্যে করবে?'

'তা না হয় হোলো, কিন্তু এখন আপনার এই বয়সে যদি হঠাৎ কোনো অসুখ বিসুখ করে, কোনো শক্ত অসুখই হয়, এখন তো যে কোনো সাধারণ অসুখই সহসা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সবাই নিজের কাজ নিয়ে আপন ধান্দায় ব্যস্ত—এই বাসায় একলাটি কী হবে আপনার? বলুন দেখি?'

'কী হবে আর? মারা যাবো? এই না? তা বলে দৈনন্দিন মার খেয়ে মরতে হবে না ত? মারা যাবার সময় কারো ওই আহা-উঁহু শুনতে পেলাম আর না পেলম। কী ক্ষতিবৃদ্ধি? তখন কি কারো ফোঁসফোঁসানি ভালো লাগে মশাই? বিশেষ করে শুধু আমিই যখন মারা যাচ্ছি—আর কেউ মরছে না আমার সঙ্গে—অন্তত, এই মুহূর্তে নয়—তখন আমার অন্তরের সেই হাহাকার তাদের ঐ আহাকারে কি থামবার? সেই কালে তাদের ওই সহানুভূতি আমার মরার ওপর খাঁড়ার ঘার মতই মনে হয় না কি?'

'কিন্তু আপনার যদি বৌ থাকত এ সময়ে—'

'রক্ষে করুন! সারা জীবন ধরে বৌয়ের অসুখ সামলাতো কে? তারা কিছু কি কম অসুখে ভোগে নাকি! তাদের অসুখের ঝামেলা পোহাতে হোতো না সারা জীবন? নিজের অসুখের দায় বরং সওয়া যায়, কিন্তু সেই বোঝার উপর বৌয়ের বিসুখের ঐ শাকের আঁটিটি—তার ঠেলা কি কম নাকি?'

'আরে মশাই, দিন রাত অসুখে ভুগবে কেন সে? দেখে শুনে স্বাস্থ্যবতী এক যুবতীকে বিয়ে করতে পারতেন না? পরির মতন একটি বৌ হলে আপনার ঘর আলো করে থাকত নাকি? আপনার দেখাশোনাও করত সে?'

'সত্যি কথা বলব? পরির মত মেয়ের কথা বলছেন? আমার জীবনে কোনো পরির দ্বারাও আমি দৃষ্ট হতে চাইনি, শুধু একটি মেয়ের দ্বারাই পরিদৃষ্ট হতে চেয়েছি।'

'কে সে মেয়েটি, জানতে পারি?'

'আমার মা।'

'তিনি তো কবে মারা গেছেন!'

'মায়েরা কি কখনো মারা যাবার? তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকেন, থাকতে হয় তাঁদের। ছেলেকে দেখাশোনার জন্যেই, বুঝলেন? ছেলের মরণের পরও তাঁকে বাঁচতে হয় ছেলেকে কষ্ট করে পুনর্জন্ম দিতেই আবার। মায়ের সেই ঋণ কি শোধ হবার কখনো? এ জন্মে না—কোনো জন্মেই না।'

(ক্রমশ)

বাংলার প্রবাসী তনয়া মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় (ভোট গণনার শেষে)

লোকসভার নূতন রূপ

লোকসভার নূতন রূপ নেহাৎ অমনোযোগী মানুষের নজরেও ঠেকবে। শাসক কংগ্রেসের বিপুল বিজয় আর বিপক্ষ দলের কোণঠাসা ছাঁটাকাটা ছবি চোখে পড়তে দেরি হয় না। ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে ভোটদাতা ভরসা করে তার দুঃখ-দুর্দশার অবসান, অনেক মুশকিল আসান আর অভাব-নিবৃত্তি আসন্ন। এ যেন এক শুভসন্ধিক্ষণ। গণতন্ত্রের উদ্বর্তন-এর পরম পরীক্ষা। শ্রীমতী গান্ধীর আর সমর্থনের জন্য ভাবনায় থাকতে হবে না। দেশের মানুষ অকুণ্ঠভাবে সমর্থন দিয়েছে। অকুণ্ঠভাবে ফিরে পাবে আশা রাখে।

এমন এক মাহেন্দ্র মুহূর্তে ছোটখাটো ব্যাপারে খুঁতে খুঁত করা মানায় না। তবু একটি বিষয়ে আমরা না মন দিয়ে পারছি না। মেয়েরা ভোট দিয়েছেন দলে দলে। আপনার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন সতর্কতায় পুরুষকে হার মানিয়েছেন। কিন্তু লোকসভার আসনে তাঁদের সংখ্যা এত কম কোন নির্বাচনেই ছিল না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে মহিলা এম পি সংখ্যা সতেরো। তৃতীয় লোকসভায় ছিল ৩৬। তাই সর্বোচ্চ সংখ্যা। আর পঞ্চম নির্বাচনে তার অর্ধেকেরও কম। কাজেই আমাদের আপসোস। এমন কি প্রথম লোকসভাতে ছিলেন ২১ জন মহিলা মেম্বার। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়তে ২৬ আর ৩৬। চতুর্থ লোকসভায় সামান্য কমলো। দাঁড়ালো ৩২। এবার একেবারে আশ্চর্য ব্যাপার। বিস্ময়করই বটে!

অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম কেন এমন হয়েছে। বিভিন্ন রকম উত্তরও পেলাম। সাংবাদিক বললেন এ একেবারেই কারণহীন এক ঘটনামাত্র! অবশ্য তিনি পুরুষ। ইন্দিরাজী এক চন্দ্র সব তমসা দূর করে বসে আছেন, কাজেই তারকাদের সংখ্যায় কেবা আগ্রহ দেখায়? মহিলাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার ব্যাপারে কেউ আর এগোয় না। রাজনৈতিক দলও সব তেমন আর যথেষ্ট "টিকিট" মেয়েদের দিচ্ছেন কই? শতকরা ১৫টি আসন ছিল লক্ষ। সে সব আশার কিছুই হলো না। যাঁরা নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন তাঁদের শতকরা মাত্র তিনজন নির্বাচিত হয়েছেন। বহু চেনা মুখ চলে গেছে। সারদা মুখার্জি, সুশীলা নায়ার, সুচেতা কৃপালনী, তারকেশ্বরী সিংহ প্রভৃতির লোকসভার আনাগোনা শেষ। আর শেষ বাংলা দেশের মহিলা কর্মীদের কজন। ডাঃ ফুলরেণু গুহ, উমা রায় ইত্যাদি কেউ নেই। নূতন মুখের মধ্যে মেয়েই বা কটি? হাতে গোনা তিন। নূতন দিল্লির প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ-এর শীলা কল আর নির্দলীয় প্রার্থী যোধপুরের রাজমাতা কৃষ্ণকুমারী।

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন রাজধানীর কৃষ্টিসম্পন্ন অংশে। দিল্লির, বিশেষ নূতন দিল্লির প্রার্থী কেউই কোনদিন খাস দিল্লিওয়ালা ছিলেন না। একদিন নূতন দিল্লির আসনে সীমান্তের মেহের চাঁদ খান্না

ছিলেন আর আজ জনতা সীমান্তে মুহিতা মুকুল। মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ভারত সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। মুকুলের জন্ম শিক্ষা দিল্লিতে। কিছুদিন অবশ্য বিশ্বভারতীতে ছিলেন। পুরোপুরি প্রবাসী বাঙালী। আমরা কিন্তু মুকুলের এমন সার্থক বিকাশে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এ আই সি সির মহিলা বিভাগের ভার তিনি অনেকদিন বহন করেছেন। কংগ্রেসের মহিলা পত্রিকা "Women on the March" ইংরাজী এবং হিন্দি "মহিলা প্রগতিকে পথপর" দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন। all India Women Voter's association বা নিখিল ভারতীয় মহিলা ভোটার সমিতির সভাপতিত্ব করেছেন। কাজেই মহিলাদের সত্য প্রতিনিধি তিনি। বর্তমান নির্বাচনে একেই কম মহিলা এসেছেন তার উপর অনেকেরই দৃষ্টি মহিলা প্রগতির বাইরে। এমন কি কৃশকায় স্বতন্ত্র দলের নির্বাচিত তনদেহী রজমাতা গায়ত্রী দেবী পর্যন্ত বলেন তাঁর রাজনীতিতে মেয়েদের জন্য ভিন্ন করে করবার কিছু নেই। এক সময় কুচবিহার রাজকুমারী, জয়পুরের মহারাণী গায়ত্রী দেবী ধরাতলে সেরা রূপসীদের একজন গণ্য হতেন। রাজনীতির সঙ্গে মানিনীর লাবণ্য একাকার হয়ে চমৎকার এক চটক রচনা করেছিল। তিনিও অবলীলাক্রমে বলছেন মেয়েদের জন্য করবার আর কিছু নেই। এও কি তবে এক মতবাদের নূতন ধারা?

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বলেন মেয়েদের অধিকার আজও সিদ্ধান্তগত মাত্র। তাকে কার্যকরী করা দরকার। সম্ভবত মেয়েদের জন্য কাজ করেছেন বলেই জানেন কাগজে বা খাতায় আইন পাশ করাটাই অধিকারের সব নয়। তাঁর বিশ বছরের কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্ম-জীবনে বিরাট এক অংশ মহিলা প্রগতিতে উৎসর্গীকৃত। আমার ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানবার ও চিনবার সুযোগও হয়েছিল মেয়েদের জন্য তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ও আগ্রহের জন্য। নিজে সুশিক্ষিত, কৃষ্টি-সম্পন্ন পরিবেশের মানুষ কিন্তু সবার জন্য সুযোগের সচেষ্ট সম্পাদনাই সেদিন আমাকে বেশী করে প্রভাবিত করেছিল।

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষিত মহিলা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম এ, বিশ্বভারতী থেকে বাংলা সাহিত্যে, হার্বার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, ইংরাজী ও হিন্দী ভিন্ন তামিল ও ফরাসী জানেন। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে পাণ্ডিত্যের অহংকার দিয়ে কর্কশ করে তোলেনি। বাঙালী মেয়ের মতই মধুর স্পর্শে বিদ্যাকে অলঙ্কার করে রেখেছেন। মুকুল বন্দ্যো-পাধ্যায় সাংবাদিক এবং লেখিকা। Dowry banned Women and Elections ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত পুস্তক, সাংবাদিকতা ঘেঁষা সাহিত্যের মধ্যে দেশের মেয়েদের সমস্যা এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে ধরার জন্য আর কেউ এভাবে চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না।

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ বিভাগের পর বৈদেশিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিল্লি এসেছিলেন। তারপরের অধ্যায় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগ। নূতন কংগ্রেসের প্রাণসঞ্চারে প্রচুর প্রচেষ্টা ভবানীবাবু করেছেন। মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনে পেয়েছিলেন মাত্র ১৯ দিন সময়। ভবানীবাবুর বিন্যাস করা, সাজানো ব্যবস্থা ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব ছিল। আমার ও মনে হয় নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্র যতদিন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল ততদিন আর এক কথা, এখন যদি জীবনের প্রতি ক্ষেত্র মেয়েদের জন্য খোলা হয়ে যায় তবে অন্ততঃ প্রথম পর্বে চাই সহমর্মিতা। সহমর্মী হবে সবাই। নারীর জন্য যে মহিলাই সহানু-ভূতিশীল হবেন তা নয়, পুরুষও তার অধিকারের স্বীকৃতি দেবেন। সার্থক হবে সমাজের সকল মঙ্গল।

মুখের কচি ভাবটা এখনও যেন পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। হাসিটাও সরল। এদিকে শুঁড়ির দোকানে আগেভাগে ঢুকে বসবার জায়গার সুবন্দোবস্ত করে ফেলেছে. বোঝা যায় এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে ইনি খুবই ওয়াকিবহাল। আর এক বড় একটা গোঁফ যখন রাখতে আরম্ভ করেছে। রামখোকা, নাকি ইঁচড়ে পাকা এক ছোকরা, ঠিক কোন্ শব্দটা এখানে জুতসই হবে রামানন্দ চিন্তা করছিল।

'আসুন, আমার সঙ্গে এদিকে চলে আসুন।' নন্দ আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। বার ঘেঁষে ভিতরে প্রকাণ্ড হল ঘর। একটা টুল টেবিলও খালি নেই। কেবল মানুষের মাথা, বোতল গেলাস, শালপাতায় শালপাতায় আদা ছোলা শশা পেঁয়াজ কুচি সিদ্ধ আলুর নৈবেদ্য। নন্দ দাঁড়াল না। এগিয়ে চলল। রামানন্দ ও জগত তাকে অনুসরণ করছে। হলের শেষ মাথায় আর একটা দরজা। তিনজন দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এবার প্রস্রাবখানার ঝাঁঝাল গন্ধটা প্রবল হয়ে নাকে খোঁচা দিল। খুব কাছেই পায়খানা প্রস্রাবের জায়গা। তা হলেও মাথার ওপরটা খোলা। একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ ডালপালা ছড়িয়ে আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে কটা জ্বলজ্বলে তারা দেখা গেল।

'চমৎকার চমৎকার।' জগত রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল। 'এই আমাদের পোর্টিকো—পোর্চ?'

'হুঁ, হুঁ, লাউঞ্জ, লবি, যা হোক একটা কিছু বলুন দাদা।' ওপাশ থেকে ভারি গলায় একজন হেসে উঠল।

আলো কম। দেওয়ালের গায়ে টিমটিম করছে একটা বাল্‌ব। তার ওপর এত বড় একটা ঝাঁকড়ামাথা গাছের অন্ধকার। কেমন ভুতুড়ে ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে জায়গাটায়। মানুষের আকার আকৃতি বোঝা গেলেও চেহারার খুঁটিনাটি মালুম হয় না। তবে মানুষটা যে খুব মোটা বোঝা যাচ্ছিল। গলার স্বর শুনে মনে হয় জালার ভিতর থেকে বুঝি কেউ কথা বলছে।

তিনজনই ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশটা দেখল। উল্টোদিকের দেওয়ালে পিঠ ছেড়ে দিয়ে দু পা ছড়িয়ে সেই পর্বতসদৃশ মানুষটি টুলের ওপর বসে আছে। সামনে জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের পাটাতনের ওপর বোতল গেলাস আদা ছোলা দেশলাই সিগারেটের বাক্স রাখা হয়েছে।

'টেবিলখানা চমৎকার হয়েছে।' নন্দ গুজগুজ করে হাসল।

'যা খুশি করুক, ওদিকে আমাদের তাকাবার সময় নেই, তুমি মাল নিয়ে এসো তো। বসুন রামানন্দবাবু, বসে পড়ুন।' জগত এদিকের একটা বেঞ্চের ওপর বসল।

রামানন্দর পাশে বসল ও একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল।

'ভেতরে যেমন ভিড়, এখানটা তেমনি নিরিবিলি দেখছি।'

'নন্দ পাকা ছেলে।' জগত নিচু গলায় বলল। কিন্তু নন্দ তখনও দাঁড়িয়ে। 'কি হল!' জগত সেদিকে চোখ তুলল। 'দু নম্বর, হুঁ, একবারে একটা বোতল আনাই ভাল। পাঁইট ফাইটে পোষাবে না। কি বলেন রামানন্দবাবু?'

'আমি কিন্তু খুব একটা বেশি খাব না।'

'আহা, নববধূর লজ্জা এখন রাখুন দিকিনি, আপনি কতটা খাবেন না-খাবেন সে আমি বুঝব।'

রামানন্দ চুপ।

'কি হল নন্দলাল', জগত ঘাড় ফেরাল।

নন্দ ঘাড় চুলকাল।

'এই দ্যাখো!' জগত তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পারল। 'আমিও শালা যেমন।' সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করল। 'কাটলেট-টাটলেট কিছু খাবেন কি?'

'আহা, আগে তো আসল জিনিস আসুক।'

জগত চারমিনারের প্যাকেট খুলে এক শলা তুলে নিল। 'সেসব পরে দেখা যাবে।' 'এই ভাবে' সিগারেট তুলে নিয়ে জগত [illegible]।

'কত কাল ভদ্রলোককে আনতে পাঠালেন, সেখানে তো কাউন্টারে যা ভিড়।'

'নন্দলাল ঠিক ম্যানেজ করে নিয়ে আসবে।' জগত পায়ের ওপর পা তুলে দিল। 'একটা বেয়ারাকে ডেকে বলতে পারতাম, কিন্তু ওদের আশায় বসে থাকলে কোমরে ব্যথা ধরে যেত। আমি ওদের চিনি।'

'আপনার এই বন্ধুটির সঙ্গে কিন্তু পরিচয় হল না।'

'হবে হবে। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আপনাদের দুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এত বড় সুযোগ এসেছে, আমি মনে করি আজ একটা গ্রেট-ডে, অন্তত আমার পক্ষে, হা-হা।'

'ভাল।' রামানন্দ খুশি হল। অর্থাৎ জগত মণ্ডলের সঙ্গে কবি রামানন্দ সেনের বন্ধুত্ব হয়েছে, আবার এদিকে দেখা যাচ্ছে নন্দলাল নামের মানুষটিও জগতের এক দিনের বন্ধু, কাজেই শুঁড়ির দোকানে এসে এই দুটি বন্ধুর মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ জগত মণ্ডল [illegible] কাজে লাগাবে এ তো জানা কথা।

কিন্তু রামানন্দ দেখছিল, ওপাশে [illegible] অন্ধকারে বসা পাহাড়ের মতন মানুষটি, একবার হেসে উঠে সেই যে চুপ করে গেল, তারপর মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই।

লজ্জা পেয়েছে? অপদস্থ হয়েছে? স্বাভাবিক। রামানন্দ চিন্তা করল, তার এমন গলাভরা হাসির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে এই দলের একটা মানুষ গ্রাহ্য করল না, একবার ওদিকে তাকাল না পর্যন্ত।

গেলাসটা হাতে নিয়ে একলা কেমন মনমরা হয়ে মানুষটা এদিকে তাকিয়ে আছে, বসে থাকার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হল। যেন গেলাসে চুমুক দেবার উৎসাহটাও হারিয়ে ফেলেছে। ও দেখে মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক। জায়গাটা অন্ধকার হলেও পরনে রীতিমত ধোপদুরস্ত জামা কাপড়ের খানিকটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। যেন চোখে চশমাও রয়েছে। কাচ দুটো মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে। মনে হচ্ছিল, চশমার কাচ না, যেন নিজে ভদ্রলোক হয়ে এই তিনটি ভদ্রলোকের কাছ থেকে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য ইত্যাদি পাওয়ার আঘাত সামলাতে না পেরে এমন বিশালকায় মানুষটার চোখ দুটো ছলছল করছে।

রামানন্দর মনের ভাব জগত মণ্ডল বুঝতে পারল কিনা জানা গেল না। তবে জগত একবারও সেদিকে তাকাচ্ছিল না। বরং বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকের দরজায় চোখ রাখছিল। নন্দ কখন বোতল নিয়ে ফেরে।

নন্দর সঙ্গে তিনটা কাচের গেলাস দুটো সোডার বোতল ও শালপাতায় জড়ান এক আদা ছোলা নিয়ে একটা বেয়ারাও চলে এল।

তিনজন আর কোণার দিকে জালার মতন ভুঁড়ি নিয়ে সেই ভদ্রলোক, এ ছাড়া

আর কাউকে সেখানে দেখা গেল না। প্রস্রাবের গন্ধ, অন্ধকার, ডালপালা ছড়ান বিরাট একটা গাছ, এবং গাছের ফাঁকে নতুন আলপিনের মতন ঝকঝকে এক মুঠো তারা—এ সব কবিত্ব উপভোগ করে মদ খাবার মতন শৌখীন লোকের এখানে একান্ত অভাব বোঝা যাচ্ছিল। অথচ ভিতরে হল্লা হই-চই হল্লার কমতি ছিল না। যেন মাঝে মধ্যে একটা দুটো মানুষ টলোমলো পায়ে ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা প্রস্রাবখানায় ঢুকে বেশ কিছুটা সময় লাগিয়ে হিসহিস শব্দ করার পর ওয়াক থু করে একটা থুথুটুতু ছিটিয়ে তারপর আবার জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। এখানকার এই অন্ধকার আসরের দিকে ভুল করেও কেউ তাকায় না।

রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালা মুটে মজুর আনাজের কারবারী মাছের বেপারীদের ভিড় এই দোকানে, হট্টগোলটা এই জন্যই বেশি।'

'তুমি কি এদের ঘেন্না কর নন্দ!' ভাল করে একপাত্র পেটে না পড়তেই জগতের চোখ মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর চোখের মতন রক্তাভ হয়ে ওঠে। এই নিয়ে জগতের একটা চাপা গর্ব আছে। তা বলে অ্যাঞ্জেলোর মতন ছবি আঁকিয়ে সে হতে চায় না। উঁহু, অ্যাঞ্জেলো না ডা ভিঞ্চি না বত্তিচেলি না টিশিয়ান না—অবন ঠাকুর বা যামিনী রায়, কেউ না—জগত মণ্ডল জগত মণ্ডলের মতন আঁকতে চায়। কোনো স্কুলের টিকেট তার গায়ে থাকবে এটা তার সহ্য হবে না। সে নিজেই একটা স্কুল, আর্টের ক্ষেত্রে কোনো নীতি কোনো ধারা কোনো ডগমা চালু থাকতে পারে জগত মণ্ডল বিশ্বাস করে না। আজ যা হল আজকের মতই তা শেষ হয়ে গেল, কাল কি হবে সেটা কালকে বোঝা যাবে। একদিনের সূর্য ওঠার সঙ্গে আর একদিনের সূর্য ওঠার মিল খুঁজে চাওয়ার পাগলামো জগতের নেই। প্রত্যেক দিনই নতুন করে সূর্য ওঠে। আকাশের রং মেঘের রং পর পর দুদিন একরকম থাকে না। এক একদিনের উল্কাপাতের চেহারা এক এক রকম। এই শিল্প। আর যেমন করে গোলাপ ফুটল কাল সেভাবে ফুটবে না, শত মাথা কুটলেও না। আজকে ফোটা আজকের শুকিয়ে যাওয়াতেই শেষ কাল সকালে পাপড়ি খসার পালা। 'নন্দ তুমি কি এদের ঘেন্না কর, মুটে মজুর ঠেলাওয়ালা ফেরিওয়ালাদের?' হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে জগত আদা নুন মুখে দিল।

'উঁহু।' নন্দ মাথা নাড়ল। 'এখন থেকে আমাকে জনগণেশের পুজো করতে হবে তা না হলে আমি বাঁচতে পারব না।'

'গণতন্ত্র!' জগত বিড়বিড় করে উঠে হাসল।

'তুমি হাসছ জগত, এদিকে আমার নাভিশ্বাস উঠেছে, সবাই মিলে আমায় কোণঠাসা করে দিচ্ছে, আমার আর বাঁচবার পথ থাকছে না।'

রামানন্দ হাঁ করে শুনছিল। হাসি হাসি মুখ করে জগত এদিকে ঘাড় ফেরাল। 'ভাল কথা, রামানন্দবাবু, আগে আপনাদের দুজনের পরিচয়টা করিয়ে দেই, হ্যাঁ, শ্রীনন্দলাল—না না, নন্দদুলাল কেমন, পুরো নামটা তাই তুমি লিখছ না নন্দ?'

নন্দ ঘাড় কাত করল। কথা না বলে গেলাসে বড় করে চুমুক দিল।

'হ্যাঁ, শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য', জগত গড়গড় করে বলে চলল, 'আধুনিক গল্প লেখক—হল না, বাংলা ছোটগল্পে নতুন রীতির পথিকৃৎ তো বটেই, সম্প্রতি ছোট গল্পের রূপকল্প সৃষ্টিতে যার জুড়ি নেই, আর এই হলেন, এক নামে বললে দেশ যাকে চেনে, কবি রামানন্দ সেন, আধুনিক কবিতা বললে সকলের আগে যাকে আমাদের মনে আসে—'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আশ্চর্য, কতদিন ভেবেছি, কলকাতায় আছি, কবি রামানন্দ সেনও কলকাতায় থাকেন, অহরহ নামটা চোখে পড়ছে, কানেও শুনেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষটিকে চোখে দেখলাম না, মুখটা অপরিচিত থেকে গেল। ভাবলাম রামানন্দ বুঝি ডুমুরের ফুল।'

রামানন্দ হাসল।

'জগতবাবু এতক্ষণ নন্দ নন্দ করছিলেন, একবারও কিন্তু আমার মনে হয়নি, এই নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, আধুনিক গল্প লিখে বাংলা দেশকে যিনি বার বার চমকে
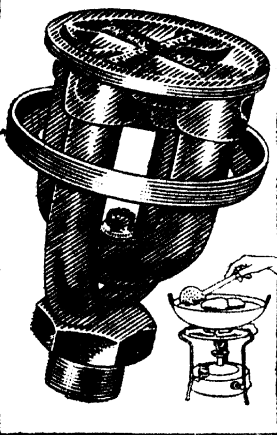
দিয়েছেন। আজ আমার হাতের কাছে চাঁদ নেমে এল।'

'বেশ বেশ, এইবেলা দুজন সুস্থ হয়ে বসুন, গ্লাসের জিনিসটুকু শেষ করুন।'

জগত ঢোঁ করে হাতের গেলাস খালি করে ফেলল। পরস্পর পরিচিত হয়ে উৎসাহ যেমন তেমন সৌজন্যটাই এখানে বড়, গেলাস হাতে রামানন্দ ও নন্দদুলাল দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

জগতের কথায় দুজন আবার বসল।

'হুঁ, কি বলছিলে নন্দ।' প্রথমবারের মতন এবারও জগতই তিনটা গেলাসে সমান করে মদ ঢেলে নিল, সোডা মেশাল। নতুন সিগারেট ধরাল। 'সবাই মিলে তোমায় কোণঠাসা করছে—সবাইটা কারা ?'

'গোটা বাংলা দেশ, এখন রাজনীতি প্রবল, গণতন্ত্র শেষ কথা।'

'তারপর ? কি চাইছে ওরা তোমার কাছে এখন ? গণসাহিত্য ?'

নন্দ গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'হুঁ, চাইছে অনেক কিছু, নিপীড়িত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত সংগ্রামশীল মানুষের জীবনস্পন্দন আমার লেখার মধ্যে নেই, আমি নিজেকে নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যস্ত নিজের মন ছাড়া আর কারো কোনো মানুষের মনের গভীরে ঢুকবার দায়দায়িত্ব আমি খুইয়েছি, কেবল নিজের আইডেনটিটি খুঁজে বেড়ানোর মধ্যে আমার সব উদ্যম, মনগড়া ভাষা নিয়ে বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা, যুগমানুষের ছাপ আমার লেখায় নেই, সাম্যবাদী সচেতনতা ছিটে-ফোঁটাও আমার মধ্যে তারা খুঁজে পাচ্ছে না, সাহিত্যের নামে ফ্যান্টাসীর রঙিন বুদ্বুদ ওড়ানোই আমার কাজ, আমি অমাজনীয় অবৈজ্ঞানিক—ওদের ভাষায় সাহিত্য করতে বসে আমি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া মানবতাবাদের পুজো করে চলেছি।'

'এইবার ঠ্যালা সামলাও।' মুখে মদ নিয়ে জগত কুলকুল করে হেসে উঠল। 'রামানন্দ বাবু', রামানন্দর চোখের দিকে তাকাল না সে, মাথার ওপর অশ্বত্থের ছড়ান ডালপালা দেখল। 'আপনাদের আধুনিক কবিতা নিয়েও কি এই সব দাবীদাওয়া হয়েছে ?'

'বলতে পারব না, সাহিত্য আমি ছেড়ে দিয়েছি, অনেকদিন কবিতা লিখিনা, কাজেই ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে—' বলতে বলতে রামানন্দ থেমে গেল।

'তা কি হয়, লিখতে আপনাকে হবেই —এক চুমুকে হাতের পাত্র শূন্য করে নন্দদুলাল কেমন করে জানি হাসল। 'আজ লেখা বন্ধ রেখেছেন, কাল সকালেই দেখবেন আপনার হাতের আঙুলে আবার সুড়সুড়ি করছে—'

'হুঁ, করতেই হবে।' তিনটে গ্লাস এক সঙ্গে শেষ হয়ে যেতে জগত আবার মদ ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'বলে কিনা আজ একাদশীর উপোস চলেছে, কবিতা লেখা বন্ধ। কাল গলা পর্যন্ত ঠেসে কুল পাবেন না, রাত জেগে পাতার পর পাতা লিখেও রামানন্দবাবুর মনে হবে আরো কবিতা লিখি আরো লিখি।' মদ ঢালা শেষ করে জগত হি-হি করে হাসল।

মানুষটা সত্যি রসিক। রামানন্দ না হেসে পারেন না।

'তা কবিতা গল্প নিয়ে যেমন—আপনাদের আঁকাটাকা নিয়ে তেমন কোনো আওয়াজ উঠছে না।' রামানন্দ চোখ ট্যারা করে মণ্ডলের মুখ দেখল।

'হুঁ, উঠবে বইকি, আজ না উঠলেও কাল উঠবে। বন্যা এলে কেবল কি বেগুন ক্ষেত লংকা ক্ষেত ডোবে, উঠোনে জল ঢোকে ঘরে ঢোকে হেঁসেলে ঢোকে—কাঠ ঘুঁটে হাঁড়ি কলসী জুতো খড়ম সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়।' তিনটা গ্লাসেই খানিকটা করে সোডার জল মিশিয়ে নিল জগত। 'তাতে আমার অসুবিধে হবে না কিছু, আপনার মতন নন্দর মতন আমার তো কথার কারবার নেই, শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া নেই যে একটা কথা বেঠিক হলে দশ দিক থেকে দশটা কথা উঠবে, একটা শব্দ বেচাল হলে দশ দিক থেকে দশটা শব্দ পটকা হয়ে ছুটে এসে আমাকে নাস্তানাবুদ করে দেবে। আমার বোবা তুলি কেবল রঙ ছিটোতে জানে, বেশ তো, তাতেও যদি আপত্তি ওঠে, তখন না হয় সবুজ নীল ধুয়ে ফেলে টকটকে লাল রঙে তুলি ভিজিয়ে নেব, পাখি চাঁদ ফুলটুলের দিকে না ঝুঁকে লাঙল বলদ নৌকো কোদাল কুড়ুল আঁকাআঁকি করব।'

রামানন্দ শব্দ করে হাসল। নন্দ হাসল না।

'নন্দ ভায়ার মনের ভার কাটছে না। হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে দেখে ঘাবড়ে গেছে।'

'একটু ঘাবড়াতে হচ্ছে বইকি।' জগতের হাতের আগুন থেকে নন্দ সিগারেট ধরিয়ে নিল। 'হাওয়ার ঝোঁকটা হঠাৎ বেড়ে গেল কিনা, তা হলেও হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না, আমাকে লিখে খেয়ে বাঁচতে হবে, তা না হলে, তুমি জান জগত, ডি লক্স এস্প্ল্যানার-এর সাদা ঘোড়া কালো হরিণের এমন প্রিয় আড্ডা ছেড়ে আজ খেনো গিলতে কেন আমাকে এখানে ছুটে আসতে হল, ওখানে টাই সুটে বুট মুর্গি মটন ফিলটার টিপড্ এর দামী ধোঁয়া নিয়ে আসর গরম, কিন্তু ওদের নিয়ে গল্প লিখলে কাগজওয়ালারা এখন ভয়ানক নাক সিঁটকায়, বস্তা-পচা বুর্জোয়া সাহিত্য বলে লেখা ফিরিয়ে দেয়, বই করতে চাইলে পাবলিশাররা ছাপতে চায় না, সব্বাই চাইছে প্রগতি সাহিত্য, শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারাদের নিয়ে তাজা রক্তঝরা লেখা।'

'ভাল করেছ নন্দ, বুদ্ধিমানের কাজ করেছ, এখানে জনগণেশের অবাধ বিচরণ। ছেঁড়া পা-জামা ছেঁড়া লুঙ্গি ছেঁড়া গেঞ্জি খালি-পা, আদা-ছোলা বিড়ির ধোঁয়ার এই বিরাট আসর ছেড়ে তোমার দূরে সরে থাকলে চলবে না, দুদিন আগে হোক পরে হোক এখানে তোমাকে আসতেই হত। তোমার কলমের জোর আছে, দেখার চোখ আছে, শোনার কান আছে। এখানে বসে প্রাণভরে কদিন টেনে যাও। গণ-সাহিত্য কবজা করতে তোমার দুদিনের বেশি তিনদিন লাগবে না।'

'বটেই তো, বটেই তো, এমন যার পদের ভাষা, এমন অনবদ্য যার স্টাইল—' রামানন্দ না, জগত না, তিনজন একসঙ্গে চমকে উঠল, অন্ধকার কোণার সেই পাহাড় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এক পা এক পা করে কাছে এসে দাঁড়াল। 'নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।'

জগত রামানন্দর মুখ দেখল। রামানন্দ নন্দদুলালকে দেখল। নন্দদুলাল জগতকে দেখল। তারপর এক সঙ্গে তিনজন সেই বিরাট শরীরটার দিকে চোখ রাখল। রোমশ হাত দুটো জোড় করে তখনও বুকের কাছে ধরা। তিনজনকে পৃথক-ভাবে নমস্কার জানিয়ে একটা বিগলিত হাসি নিয়ে ঐরাবতের মতন মানুষটা যেন ছিল যেন প্রতিনমস্কারের অপেক্ষা করছে।

'আস্তানা।' রামানন্দ বিড় বিড় করে উঠল। 'কি চাইছেন আপনি?' জগত রুক্ষ হয়ে উঠল।

'কিছু না, আপনাদের দেখছি।' তালশাঁসের মতন জোড়া হাত্তাল। আলোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বলে এতক্ষণের সেই অন্ধকার মুখ তিনজনই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। ভুরু দুটো দেখবার মতন। এক শ' মানুষের মধ্যে এমন ভুরু দেখা যায় না। যেন মাথার চুলের চেয়ে ভুরুর চুল বেশি। গায়ের রং কালো এবং শরীরটা প্রকাণ্ড বলে জন্তুর চেহারার মতন পুরু ভুরু দুটো যেন ওই মুখে মানিয়েছে বেশ।

'আপনি কোথায় থাকেন?' নন্দদুলাল ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল।

'আমি কলকাতায় থাকি।'

'ওখানে বসে খাচ্ছিলেন, এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন কেন?'

'দেখছি, কবি রামানন্দ সেনকে দেখছি, বিখ্যাত গল্প লেখক নন্দদুলাল ভট্টাচার্যকে দেখছি, শিল্পী জগত মণ্ডলকে দেখছি।'

তিনজন হঠাৎ চুপ করে গেল।

'এতকাল শুধু নাম শুনেছি, তিন প্রতিভার একসঙ্গে এক জায়গায় এভাবে মিলন দেখব, যেন এখনো নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অজ আমার কী রাত্রি প্রভাত হয়েছিল! আমি ধন্য হয়ে গেলাম।' আলকাতরার মতন গায়ের রং অথচ দাঁতগুলি এত সাদা পরিচ্ছন্ন, এক শ' মানুষের মধ্যে এমন দাঁত দেখা যায় কি না সন্দেহ।

'বসুন, বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?' জগত আঙুল দিয়ে সামনের ফাঁকা বেঞ্চিটা দেখাল।

পাহাড়ের মতন শরীর নিয়ে মানুষটা বসল। বেঞ্চিটা ক্যাঁক করে উঠল।

'আপনার গেলাস পাইট ওখানে রয়ে গেল।' নন্দ সিগারেট বাড়িয়ে দিল।

'থাকুক গে, গেলাসে মাল নেই, বোতল খালি, সব শেষ করে এসেছি।'

'আর একটু খাবেন?'

'নিশ্চয় খাব, তিন গুণীর সঙ্গে একত্র বসে খাব বলে তো এখানে উঠে এলাম। আজ আমার জীবন ধন্য।'

নন্দ নিজের হাতে দেশলাইয়ের কাঠি জেলে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

'ধন্যবাদ, আঁ, খাব না! এখন নতুন করে গেলাস আনাতে, দাঁড়ান—বেয়ারা বেয়ারা!' হেঁড়ে গলায় মানুষটা চেঁচিয়ে উঠল।

'বেয়ারাকে ডাকছেন কেন, এখানে মাল শেষ হয়ে গেছে, তার চেয়ে বরং—' রামানন্দ ওদিকের অন্ধকারে কোণের টেবিলের উপর ফেলে আসা তার শূন্য গেলাসটার দিকে চোখ ফেরাতে নন্দদুলাল একছুটে উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে এল।

'কী মুশকিল!' কেন বাংলা দেশের বিখ্যাত গল্পলেখক তার এঁটো গেলাস হাতে দিয়ে তুলে আনল দেখে মানুষটা বিব্রত হল, বিরক্ত হল খুব। 'আমি ওটা নিয়ে আসতে পারতাম, বেয়ারাকে ডাকলে বেয়ারা এনে দিত তা ছাড়া দেখি।' জগতের হাঁটুর কাছে হাত বাড়িয়ে বোতলটা আলোর দিকে শূন্যে তুলে ধরে ভদ্রলোক এমন একটা চেহারা করল। 'বাঃ, আছে তো আর দু ফোঁটা মাল, অল্পসল্প এ দিয়ে, শিশির—এ দিয়ে পার্টি জমে কখনো—দাঁড়ান বেয়ারা বেয়ারা—'

'বেয়ারাদের এখন পাবেন না।' রামানন্দ খিঁচিয়ে উঠল। 'পিক্ আওয়ার, খুব ভিড় ওদিকে মনে হয়।'

'হ্যাঁ! সন্ধ্যের বেলায় শালারা খুব—' আর এভাবে ডাকাডাকি করা কি অপেক্ষা করা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে রাগে গজগজ করতে করতে পাহাড়ের মতন শরীরটা ঠেলে মানুষটা ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল।

'বেশ শাঁসালো মক্কেল মনে হয়।' নন্দদুলাল দাঁত ছড়িয়ে হাসল।

'তাই তো মনে হয়, গুণী সম্বর্ধনা করতে নিজেই মদ আনতে ছুটল, পার্টি দেবে বলে গেল না?' জগত হাসল।

'হুঁ।' জগতের দিকে চোখ তুলে রামানন্দ শব্দ না করে হাসল। 'গুণীদের দেখে খুব খুশি হয়েছে, একটু খরচপত্র করতে চাইছে।'

'বেশ ভাল হাতেই খরচ করবে দেখুন না।' নন্দদুলাল মাথা ঝাঁকাল।

'মনে হল পকেটে এখনো যথেষ্ট টাকা আছে।'

'কতক্ষণ বসে ওখানে খাচ্ছিল কে জানে?' অর্থাৎ জালার মতন ভুঁড়িটায় মহাপুরুষ কি পরিমাণ মাল ঢুকিয়েছে এবং কতটা মাতাল হয়েছে জগত যেন ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না। 'একটু শিক্ষিত বলে মনে হল, না রামানন্দবাবু?'

'মনে হয় বেশ ভালরকম শিক্ষিত।' রামানন্দর আগে নন্দ কথা বলল। 'আধুনিক গল্প কবিতা সম্পর্কে বেশ খোঁজখবর রাখে, তোমার আঁকা ছবি সম্পর্কেও খুব ইন্টারেস্টেড মনে হল।'

'প্রফেসার?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকোল।

'জানি না মশাই কোন্ হরিদাস পাল, আসুন ক ফোঁটা শিশির বিন্দু আমরা শেষ করে ফেলি।' হেসে জগত বোতল উপুড় করে তিনটা গেলাসে একটু একটু করে বাকিটুকু ঢেলে নিল। 'গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াচ্ছে, ব্যস্, আর কিছু চাই না। আমরা এতেই খুশি।'

'পাবলিশার কেউ হতে পারে।'

'হুঁ,' নন্দর দিকে চোখ তুলে জগত বড় করে ভেংচি কাটল। 'সেই গুড়ে বালি ব্রাদার, সেই দিন বাসি হয়ে গেছে, ভেবেছ খরচপত্র করে মদ খাইয়ে খুশি করে তোমার একখানা পাণ্ডুলিপি চেয়ে নিয়ে বই করবে, তবেই হয়েছে আর কি. আপনি কী বলেন রামানন্দবাবু?'

রামানন্দ শব্দ না করে গেলাসের পানীয়টুকু শেষ করল।

লম্বা করে চুমুক দিয়ে জগতও হাতের পাত্র খালি করে ফেলল।

'হুঁ', সেদিন ছিল যুদ্ধের ঠিক পরটায়, আমরা তখন স্বাধীনতা পেয়েছি, কালচারের ঠেলায় দেশ থই থই করছিল, রাতারাতি দুমদাম সব পাবলিশার গজাতে লাগল, কেননা সরকারী খয়রাত পেয়ে রোজই নতুন লাইব্রেরী গজাচ্ছে, তখন সাহিত্যিকদের একটু ভালমন্দ খাইয়ে দাইয়ে খাতির যত্ন করে পাবলিশারদের কেউ কেউ বইটই চেয়ে নিয়েছে। আজ তো শুনছি বইপাড়ায় মড়াকান্না শুরু হয়েছে, এ বলে আমায় দ্যাখ ও বলে আমায় দ্যাখ—ঠিক কিনা রামানন্দবাবু, ওপাড়ায় তো আপনারও যাতায়াত আছে?'

'বইয়ের জগত থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেছি জগতবাবু, বলেছি আপনাকে, আমি আর কিছু খোঁজখবর রাখি না।'

জগত কথাটা শুনেও শুনল না। নন্দদুলালের মুখটাই দেখছিল। 'বুঝলে নন্দ, এখন একটা দোকানে ঢুকলে এক কাপ চা পাও কিনা সন্দেহ—আমরা ছবি আঁকি তোমাদের বইয়ের কভারটভার করে দিতে হয়, কাজেই ও পাড়ার একটু খোঁজ খবর রাখি বইকি।'

'তা হলে লোকটা কে?' হতাশ হয়ে নন্দদুলাল চোখ তুলে [illegible] পাত্তা দেখছিল।

'হরিদাস পাল, যে-ই হোক, খাওয়াতে চাইছে খাব, এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই—রামানন্দবাবু, মিথ্যা বললাম?' জগত রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাতে রামানন্দ গুজগুজ করে হাসল।

'মাল নিয়ে আদৌ আসে কিনা দেখবে—আমার তো মনে হয় মহাপুরুষ সটকে পড়েছে।'

'আশ্চর্যের কিছুই না, শুঁড়িখানায় এমন একটি দুটি চিজ হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়—এতক্ষণে হাতীটার ফিরে আসা উচিত ছিল কিন্তু নন্দ!' যেন এই নিয়ে নন্দদুলালের সঙ্গে আর এক প্রস্থ রসিকতা করার ইচ্ছা হল জগতের। হঠাৎ থেমে গেল।

হাতীর মতন প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে থপ থপ পা ফেলে মানুষটা ফিরে এল। হাতে বোতল। পিছনে বেয়ারার হাতে সোডা ও এতবড় একটা ঠোঙা। ঠোঙার কাগজ ভিতর থেকে তেলে ভিজে উঠে এরমধ্যেই একটা কালচে দাগ ধরেছে। গরম কাটলেটের গন্ধ পাওয়া গেল।

'মশাই, আপনি দেখছি সত্যি একটা পার্টি লাগিয়ে দিলেন।' গাল ছড়িয়ে জগত হাসল।

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা, প্রতিশ্রুতি ও কর্মপন্থার মধ্যে পার্থক্য

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনোত্তর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যের মূল সমস্যাগুলির গুরুত্ব পুনর্বিবেচনা করা দরকার। নির্বাচনের আগে সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দই এই রাজ্যের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিগত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি এবং অনুসৃত নীতির মধ্যে কোন মিল নেই।

এই রাজ্যের এখন সবচেয়ে জরুরী সমস্যা হল শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন অর্থনৈতিক সংস্কার, অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। কেন্দ্রীয় সরকার বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি অবহেলা করে এসেছেন। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয় এই রাজ্যে; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই রাজ্যই হল পুরোধা। রাজনৈতিক চেতনা এই রাজ্যে যত বেশি অন্য কোন রাজ্যে তত নেই। কিন্তু অবহেলা ও শোষণের ফলে এই রাজ্য যতটা সমস্যা-জর্জরিত হয়েছে, অন্য কোন রাজ্য ততটা হয়নি। বেকার সমস্যা সমগ্র ভারতেরই সমস্যা; কিন্তু বেকার সমস্যার তীব্রতা এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি এবং এই সমস্যাই এখন পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে বেকার সমস্যা যে অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে তার প্রতি সব সরকারই অন্ধ ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা তো ছিলই, তাছাড়া পর পর দুইটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা যা আশা করেছিলাম, তা পাইনি। রাষ্ট্রপতির শাসন তো সমস্যার তীব্রতা আরও বাড়িয়েছিল। কথাগুলি যা বলছি, কোনটিই নতুন নয়। আমাদের রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং কর্মীগণ যে তা জানেন না তাও নয়। সমস্যা হল এখন পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন তাঁরা কিভাবে এই রাজ্যকে সমস্যা-মুক্ত করবেন সেকথা ভাবছেন কি না এবং সেভাবে কর্মসূচী বাস্তবে প্রয়োগ

করার ব্যবস্থা করছেন কি না।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার কথা আলোচনা করলে প্রথমেই কলকাতার সমস্যার কথা বলতে হয়। এই মহানগরীর গৌরব এখন অবলুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এবং ভারতের বাইরে এই মহানগরী সম্পর্কে মানুষের মনে যে সম্ভ্রমের ভাব ছিল, তা এখন মুছে গেছে। অথচ এই মহানগরীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে পারলে জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদই সুদৃঢ় হয়। কিছুদিন আগে কলকাতা মেট্রোপলিটান উন্নয়ন পরিষদ জল সরবরাহ, ময়লা দূরীকরণ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বস্তি দূরীকরণ প্রভৃতি বহুবিধ উন্নয়নসূচীর কথা ঘোষণা করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই সামান্য কাজ শুরু হয়েছে। যদি বর্তমান সরকার দুই বছরের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারেন এবং যদি অর্থাভাব না ঘটে তবে হয়ত এই মহানগরীর সমস্যাগুলির আংশিক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। গঙ্গার উপর দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল দশ বছর আগে। কিন্তু আজও সেই কাজ শুরু হয়নি এবং তা আদৌ হবে কি না অথবা হলেও কবে হবে, আমরা তা জানি না। বাগবাজার থেকে [illegible] ভূগর্ভস্থ রেল লাইন [illegible] করেছিলেন; কিন্তু কাজ কবে শুরু হবে এবং কতদিনে শেষ হবে তাও আমরা জানি না। কলকাতা কর্পোরেশনের [illegible] বস্তি দূরীকরণের কাজ, রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ, ময়লা দূরীকরণ ও জল সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করার কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ বকেয়ার জন্য, কলকাতা কর্পোরেশনের আদায়ী কর ঠিকভাবে আদায় করতে পারলে প্রচুর টাকা পাওয়া যেত এবং কর্পোরেশনের তহবিলে ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হত। যে কর্মসূচীগুলি ঘোষিত হয়েছে অথচ রূপায়িত হয়নি, সেগুলির কাজ এখনই শুরু করা দরকার এবং একদিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই সমান দায়িত্ব, যদিও প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের কিছু বেশি। এখনও যদি কোন উন্নয়নসূচী গৃহীত না হয় এবং **ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা না হয়** তবে কলকাতা মহানগরীকে পঙ্গু করে রাখা হবে; সেক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।

কলকাতা মহানগরীর সমস্যার কথা বাদ দিলেও এই রাজ্যের আরও কয়েকটি সমস্যার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে যার প্রকৃত সদ্ব্যবহার এখনও হয়নি। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মেদিনীপুর জেলার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য হলদিয়া প্রকল্পের পূর্ণ ব্যবহার করা যেতে পারে। হলদিয়া বন্দর সম্পূর্ণভাবে চালু হলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেরই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত পরিবর্তন হবে। ফরাক্কা প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের কিছুটা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নতি নির্ভর করে। প্রশ্ন হচ্ছে যে সুযোগগুলি আমাদের সামনে আছে, সেগুলির সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে অযথা বিলম্ব হচ্ছে—অথচ কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। সরকারের নীতি যদি কর্মসংস্থানমুখী হত এবং কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার দিত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এখন এত অবনতি হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে [illegible] প্রয়োজন। [illegible] পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক [illegible] এই [illegible] পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন [illegible] পিছিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এই [illegible] ব্যবস্থাকে এই [illegible] অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে [illegible] পক্ষেরই সমান [illegible] অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু কল-কারখানা এখনও বন্ধ আছে। লক আউট ও স্ট্রাইক—এই উভয়ের প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বাড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বেকার সমস্যার তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার এটিও একটি কারণ। যদি পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হয় তবে অনেক কিছুই করা দরকার। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট একটি কর্মসূচী যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবে রূপায়িত করা।

সুব্রত গুপ্ত

"ওদের বাড়ি! আর কারো বাড়ি নয়?" ললিত রাগতভাবে বলে।

"হাঁ, হাঁ, দিদিরও বাড়ি। আমারি ভুল।" রত্ন স্বীকার করে।

"তোমার ভুলের মূলে আর কারো প্রেরণা কাজ করছে নিশ্চয়। নইলে তুমিই বা অমন ভুল করবে কেন? যাক, দিদি যে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে এটা যারা তোমাকে বলেছে তারা জেনেশুনে মিথ্যা বলেছে। অবশ্য এমন একটা সময় এল যখন দিদিকেই মুখ ফুটে বলতে হলো, আমি থাকতে শান্তি নেই। আমার চলে যাওয়াই শ্রেয়।" ললিতও স্বীকার করে।

এর পরে জাপান নিয়ে দুই বন্ধুতে জমে যায়। দিদির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে। কিন্তু পরে আবার ওঠে। রত্ন জানতে চায়, দিদি ফিরে যাচ্ছেন না কেন? বাধা দিচ্ছে কে? দেবার অধিকারই বা আছে কার? বাধা দিলে মেনে নিচ্ছেই বা কে?

"বাধা দিচ্ছি আমরাই। ওদের অন্তঃপরিবর্তন না হলে দিদি ওবাড়িতে একটুও শান্তি পাবে না। হবে অন্তঃপরিবর্তন। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গোরাই সাধাসাধি করে চিঠি লিখছে। ওর বাচ্চাটা আবার দিদিকে খুব ভালোবাসে কিনা।" ললিত সরল মনে বলে।

প্রভাত ও সুলেখার অসবর্ণ বিবাহে গুরুজনরা কেউ আসেননি। বেলুড়ের কলোনিও দ্বিমত ছিল। অনেকেই বিপক্ষে। তাই বিয়েটা হলো বেশ একটু ঘরোয়াভাবে। ঘটা করে নয়। তা হলেও প্রভাত যা করেছিল তা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে আর কেউ কখনো করেনি। রেজিস্ট্রেশন তো হলোই, তারপরে হলো আর্যসমাজী মতে হোম আর ব্রাহ্মসমাজী মতে আচার্যের ভাষণ। আচার্য হলেন ওর পুরাতন হেডমাস্টার মশায়। এঁরা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

বিয়ের পর ললিত বলে, "তুমি তো পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে দিয়েছ। এখন তোমার কলকাতা বা কুষ্টিয়ায় গিয়ে কাজ কী? তার চেয়ে চল না আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি।"

রত্নর হাতে কাজ ছিল না। শরীরও চায় দম নিতে। মনের ভিতরেও এমন জট পাকিয়ে গেছে যে জট খোলার জন্যেও চাই অখণ্ড অবসর। তা ছাড়া দেশ দেখার শখ তো চিরদিনের। ললিতের প্রস্তাবে সে খুশি হয়ে সম্মতি দেয়।

সমস্ত বাধাবিঘ্ন একে একে অতিক্রম করে প্রভাত ও সুলেখা বিধিমতো মিলিত হয়েছে। এখন আর কী! 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' সারা জীবনটাই যেন একটানা একটা মধুমাস। প্রভাত গদগদভাবে বলে, "তোমাদের বেলাও যেন তাই হয়, রত্ন।"

ললিত কিন্তু বিয়ের পর থেকে [illegible] রিয়ালিস্ট হয়েছে। রত্নকে নিকটে পেয়ে বলে, "বিয়ের আগে হাজারটা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে পারো, কিন্তু সব চেয়ে বড়ো পরীক্ষাটাই যে বিয়ের পরে। তোমাদের বেলাও তার ব্যত্যয় হবে না, রত্ন।"

রত্ন বুঝতে পারে না ললিত কিসের ইঙ্গিত করছে। বিয়ের পরে তো সব মধুময়, যদি দু'পক্ষে ভালোবাসা থাকে। অবশ্য ভালোবাসা না থাকলে বা একপক্ষে না থাকলে অন্য কথা।

"তুমি একটার পর একটা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারো, কিন্তু [illegible] গিয়ে যেদিন ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দেবে সেদিন তোমার অগ্নি-পরীক্ষা। অরবিন্দ যে অরবিন্দ তিনিও সে পরীক্ষায় ফেল।" ললিত ভয় দেখায়।

রত্ন ধরতে পারে না ললিত কী বোঝাতে চাইছে। কিসের জন্যে এ গৌরচন্দ্রিকা। "ভেবেছিলুম আমার সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এবার পাস করলে সেই হবে চূড়ান্ত। তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করলে ললিত, যে পরীক্ষার শেষ নেই। ও যেন [illegible]।"

গলা খাটো করে ললিত বলে, "তেমনি তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে তোমার সামনে আরো একটা পরীক্ষা আসছে। সেটা তোমাদের বিয়ের পর।"

"আমাদের বিয়ে!" রত্ন করুণ হেসে বলে, "আমাদের বিয়ে কি কোনোদিন হবে! কবে স্বরাজ হবে, হিন্দু আইন বদলাবে, ততদিন বেঁচে থাকলে হয়!"

ললিত সমবেদনা জানায়। "তখন যদি আমার সঙ্গে জাপান যেতে তা হলে তোমাকে এত বাধা পেতে না। বৌদ্ধ হলেও তোমাদের সংস্কারে বাধত না। কিন্তু যে কথাটা আজ আমি তোমাকে বোঝাতে চাই সেটা তা নয়। ধরো, কাল সকালেই স্বরাজ হলো, পরশু আইন পালটাল, তরশু তোমাদের বিয়ে। তারপরে কী? সারাজীবনটাই হানিমুন। না, বন্ধু। আরো একটা পরীক্ষা আছে। তার নাম পুরুষপরীক্ষা।"

রত্ন এবার খানিকটে আঁচ করতে পারে। সভয়ে নীরব থাকে।

ললিত একরোখা লোক। যা ধরে তা ছাড়ে না। বলে, "মেয়েদের হাতে একবার ক্ষমতা এলে আর ডিভোর্স একবার চালু হলে ক'টা বিয়ে তিনদিন টিকবে মনে কর? ওরা বাজিয়ে নেবে কে পুরুষ, কে পুরুষ নয়। এতদিন আমরাই বাজিয়ে নিয়েছি আর ডিভোর্স না করেই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেছি। বা অন্য স্ত্রীলোক।"

রত্নর এসব শুনে কাঁপুনি ধরে। এর যে ভালোবাসা, এত যে ত্যাগস্বীকার, এ কি কোনো কাজেই লাগবে না, যদি পুরুষ-পরীক্ষার সময় নারীর বিচারে সে না-মঞ্জুর হয়!

"নারীই কি এর একমাত্র বিচারক ও তার বিচারই কি চূড়ান্ত বিচার? আর কোনো আদালত বা আপীল নেই?" রত্ন বিমূঢ় হয়ে শুধায়।

"না। সেইজন্যেই তো আমি হিন্দু আইন পরিবর্তনের বিপক্ষে। তোমরা বলবে প্রতিক্রিয়াশীল। গৌরী তো আমার মুখদর্শন করবে না। কিন্তু একবার যদি মেয়েদের হাতে ক্ষমতা আসে ওদের পরীক্ষায় কে যে পাস করবে আর কে যে ফেল, তা দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। রত্নকান্ত, তোমাকে আমি একজন বিবাহিত পুরুষ হিসাবে সাবধান করে দিচ্ছি। নারীর শক্তি বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে পুরুষ-পরীক্ষাও পড়ে। আর সে পরীক্ষার ওরাই পেপার-সেটার, ওরাই পরীক্ষক, ওরাই সর্বেসর্বা।" ললিত ভয় জাগায়।

"বেশ তো, আমার ভয় কিসের?" রত্ন সাহসে বুক বাঁধে। সে কি পুরুষ নয়?

"মনে রেখো, ফাইনাল টেস্ট হচ্ছে রাইডিং টেস্ট।" ললিত ওইখানেই দাঁড়ি টানে।

রত্নও এই নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। দুনিয়ায় আর কি কোনো কথা নেই?

জ্যোতিদা ও বেবাদির প্রসঙ্গ উঠলে ললিত শ্লেষের সঙ্গে বলে, "ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোক হতে গিয়ে ওরা ভুলে যাচ্ছে যে ওর নীট ফল হবে ছোটলোকিকরণ।"

রত্ন দেখে যে জাপান থেকে ললিত একটি ফ্যাসিস্ট বনে এসেছে। ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তবে আশা ছেড়ে দেয় না যে বন্ধুর সাহচর্যে ওর মতবাদ ধীরে ধীরে নিবারিত হবে। সেই কথা ভেবে

ওর সঙ্গে নূরপুরে রওনা হয়। ভাগীরথী তীরে।

বেয়াল্লিশ

নূরপুরে টেনে নিয়ে গেল ললিত নয়, ললিতের দিদি সুধা। কিংবা বলতে পারা যায়, নিয়তি। যে শক্তি সকলের অগোচরে কাজ করে যাচ্ছে, কাউকে জানতে দিচ্ছে না।

সুধাদিকে চিনতে একমুহূর্ত দেরি হয় না। বেগমপুরে ক্ষণেকের জন্যে দেখা হয়েছে যদিও। অত্যন্ত মধুর স্বভাবের মহিলা। কিন্তু এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেছেন। হয়তো এককালে চোখ ঝলসে দেবার মতো রূপ ছিল। এখন নিষ্প্রভ।

"হাঁ রে, তোর চেহারা অমন প্যাঁকাটির মতো হয়েছে কেন! যেখানে থাকিস সেখানে খেতে দেয় না?" সুধাদি রত্নকে যত্ন করে খাওয়ান।

রত্নও জিজ্ঞাসা করতে পারত, আপনারই বা এ দশা কেন? রাতে ঘুম হয় না?

এটা সেটার পর গোরীর প্রসঙ্গ ওঠে। সুধাদিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেন, "গোরী দিন দিন শতদলের মতো ফুটে উঠছে, রত্তন। মাতৃত্বের মতো এ সংসারে আর কী আছে! আর কী চমৎকার ছেলে ওই নেপো! আমি ওকে নেপো না বলে ডেঁপো বলি। যা দুষ্টু! ও ছেলে বড়ো হলে একটা কিছু করবে।"

ললিত ফোড়ন দেয়, "হাঁ, আর একটি সিপাহীবিদ্রোহ। বাইশ বছর বয়সে, ১৯৫৭ সালে।"

"ও কি তা হলে নানাসাহেবের অবতার?" রত্ন পরিহাস করে।

"আমি তো সেইজন্যে নানাসাহেব বলে ডাকি।" ললিতও হাসে।

কথায় কথায় সুধাদি বলেন, "গোরীর এখন পরিপূর্ণ সংসার। অমন সংসার ফেলে ও যাবে কোথায়! কার হাতে দিয়ে যাবে? তা কি কখনো হয়?"

রত্ন বুঝতে পারে যে সুধাদি সব জানেন। দিদি হিসাবে ওকে নিবৃত্ত করতে চান। ও কিছু বলে না, শুধু শুনে যায়।

"আমিও বলি যে, কাজ কী কোথাও গিয়ে? যে মানুষ ষোল আনার জন্যে বারো আনা ছেড়ে যায় সে কি ঠিক জানে যে ষোল আনা তার কপালে জুটবে? যদি না জোটে তখন কী হবে? আবার সেই বারো আনার কাছে ফিরতে হবে তো? ততদিনে বারো আনাও হয়তো বেহাত। তখন একূলও গেল ওকূলও গেল। পুরুষ ছেলে ও-ঝুঁকি নিতে পারে। নেয়ও। কিন্তু মেয়েছেলে কি নেয়, না নিতে পারে কখনো?" তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেন।

"হাঁসের জন্যে যে আচার হাঁসীর জন্যে তা নয়।" ফোড়ন দেয় ললিত।

রত্ন তা শুনে হেসে অস্থির। সস্ হলো কিনা আচার!

ললিত হাসিয়ে হাসিয়ে বলে, "হাঁসীর কথা হাসির কথা নয়।"

সুধাদি নিজের কথা ভেঙে বলতে চান না। আকারে ইঙ্গিতে যা বোঝান তা যথেষ্ট নয়। তিনি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন না বিতাড়িত হয়েছেন রহস্যভেদ করতে পারে না রত্ন। কবে ফিরে যাচ্ছেন জানতে চাইলে বলেন, "আমার স্থান যেখানে স্থিতি সেখানে। আমার ভাইদের প্রয়োজন বেশী। ওদের প্রয়োজন কম। ওরা আমাকে গভর্নেসের চাকরি নিতে ডাকছে। ডেঁপোর গভর্নেস! তা আমার ভাইপো ভাইঝিরা আমাকে ছাড়লে তো! আমার চোখে ডেঁপো যেমন হেবোও আমার চোখে ডেঁপোও যেমন হেবোও তেমনি, আর টুনীও কিছু কম নয়। এরাই দলে ভারী। আজকাল তো সব কথায় ভোট।"

সুধাদি যে বিষম আঘাত পেয়ে চলে এসেছেন এটা তো পরিষ্কার। আঘাতটা পেলেন কার কাছে, গোরীর কাছে না যশোবাবুর কাছে তা জেনে কী হবে? রত্ন কেঁচো খুঁড়তে যায় না। শেষকালে কি কেউটের ছোবল খাবে?

"যে বউ কতকাল বাদে মা হয়েছে, ছেলের মা, তারই তো সব চেয়ে বেশী মান, সব চেয়ে বেশী মহত্ব। তাকেই তো সবাই মাথায় করে রাখে। নিঃসন্তান একটি বিধবাকে পোঁছে কে? হলেই বা বাড়ির বড় বউ। আমার দিন ফুরিয়েছে রত্তন, আমার দিন আর ফিরবে না, ভাই। তোর সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা হলো। এই আমার আনন্দ।" তিনি আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মোছেন।

আসলে রত্ন যা জানতে চেয়েছিল তা সুধাদির সংবাদ নয়, গোরীর সমাচার। যেটুকু পাওয়া গেল সেটুকু চিঠিপত্রে পাওয়া যায়নি। সুধাদি এখন দুয়োরানী হতে পারেন, কিন্তু গোরী তো সুয়োরানীর মতো মানমর্যাদা পাচ্ছে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত না হলে দুয়োরানী আর ফিরছেন না। ফিরলে ফিরবেন ওরা বহরমপুর প্রয়াণ করলে।

"বহরমপুরে বাড়ি হচ্ছে, কে যেন বলছিল।" রত্ন সে প্রসঙ্গ তোলে।

"আমিও শুনেছি, ভাই। আমার ভালো লাগছে না। একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকলে মান-অভিমান কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি হয়, কিন্তু সব সময় দেখা তো পাই। আর কি কখনো দেখা হবে? হতে পারেও বা। গঙ্গাযাত্রার সময়। বাড়িটা তো শুনেছি গঙ্গার ধারেই উঠছে।" সুধাদি চোখের জল ঝরান।

"ছেড়ে দাও ওদের কথা।" ললিত বিরক্ত হয়ে বলে। "আমি তো শুনেছি যশোবাবুর আবার বিলেত যাবার সাধ হয়েছে। আরো হাজার কয়েক টাকা খসিয়ে আসবেন। ও টাকা আমাকে দিলে আমিও কোন না ব্যারিস্টার হয়ে ফিরতুম? তা তো হবার নয়, জাপান গিয়ে হয়েছি সেরি-কালচারিস্ট। কেই বা বোঝে, কেই বা পোঁছে!"

ললিতের প্রাণের জ্বালা তো ওইখানে। কিন্তু গোরীর উপরে ওর অপ্রসন্নতা কেন? যখন দিদির কথাবার্তায় মনে হয় না যে গোরীর দিক থেকে কোনো অপরাধ ঘটেছে।

পরে দুই বন্ধুতে নিভৃত আলাপ হয়। ললিত বলে, "গোরীকে আমি দোষ দিইনে। ওর জীবন ও নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। যা হবার তা হয়ে গেছে। অতীতের জন্যে কি কেউ ভবিষ্যৎ খোয়ায়? তবে দিদির

উপর সুবিচার হয়নি। ওরাও বুঝতে পারছে, তাই বার বার লোক পাঠাচ্ছে। দিদিও যেমন, একটুতেই গলে যায়। আমরাই ওকে আটকে রেখেছি। দিদির মতো কেউ একজন না থাকলে আমাদেরও তো পরিবারটা ভাগ হয়ে যেতে পারে।”

রঞ্জুর মনটা গোরীর কাছে পড়ে আছে। বলে, “গোরী তা হলে নতুন করে আরম্ভ করেছে। মুক্তির জন্যে আর ভাবছে না।”

“তা কখন বললুম?” প্রতিবাদ করে ললিত। “মুক্তি হচ্ছে ওর নিশ্বাসপ্রশ্বাস। তুই একটা কথা ও বোঝে না। ছেলের মা হতে হলে স্বামীর স্ত্রী হতে হয়। এমন কোনো পদ্ধতি কেউ জানে কি যাতে স্বামীর স্ত্রী না হয়ে ছেলের মা হওয়া যায়?”

“আমি তো জানিনে।” রঞ্জু ঘাড় নাড়ে।

গোরী ভাবছে ও মা হয়েছে বলে স্ত্রী হয়েছে তা নয়। এই যে স্বাবিরোধ এই নিয়ে ও কষ্ট পাচ্ছে। কষ্ট দিচ্ছেও। ছেলেকে ভালোবাসব, ছেলের বাপকে ভালোবাসব না, এটা কি কখনো সম্ভব? এক বাড়িতে থাকলে, একঘরে রাত কাটালে যা হবার তা হবেই। থিওরিতে আর প্র্যাকটিসে ঢের তফাৎ। আমিও তো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। রাখতে পারলুম কি? মানুষের চেয়ে প্রকৃতি অনেক বেশী শক্তিশালী। আমরা যাকে প্রবৃত্তি বলি সেটা প্রকৃতিরই নামান্তর। কী করবে, গোরী? কতটুকু ওর শক্তি?” ললিত উপহাস করে।

“হুঁ!” বলে রঞ্জু চুপ করে যায়। যা বোঝবার তা বোঝে।

“শেষ না দেখে বলা যায় না। এ নাটক ট্র্যাজেডীও হতে পারে। কমেডীও হতে পারে। নায়িকা নায়কের সঙ্গেও যেতে পারে, প্রতিনায়কের সঙ্গেও ঘর করতে পারে। হা হা হা হা! হি হি হি!” ললিত হাসি চাপতে পারে না।

“হাসছ কেন, হাসির কী পেলে?” রঞ্জু দাবড়ি দেয়।

“আর একটা সম্ভাবনা রাধিকার মতো ঘরও করা, বাহিরও করা। ও কী! ক্ষেপে উঠলে কেন? মারবে নাকি?” ললিত ওকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে।

“ভাই ললিত, গোরী আমাকে পতিরূপে বরণ করবে কিনা জানিনে, আমি কিন্তু মনে মনে ওকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি। আমার স্ত্রী পরের ঘর করবে এটা আমার অসহ্য। এ বেদনা আমি অহরহ অনুভব করছি। তুমি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ। এ জ্বালা আমাকে দগ্ধ করছে।” রঞ্জু কাতরস্বরে বলে।

ললিত জানত না যে রঞ্জু গোরীর ভালোবাসা তার অবর্তমানে এতদূরে গড়িয়েছে। বেচারা রঞ্জু! ওর জন্যে সমবেদনায় বিগলিত হয় ললিত। বলে, “কেন অতদূরে গেলে? এখন পিছু হটবে কী করে? তুমি কি মনে করেছ পিছু হটতে হবে না জীবনে?”

“আমি যে ওর চেয়েও আরো এক কদম এগিয়ে গেছি। গোরী যে একদিন আমার সন্তানেরও মা হবে। গোরীর মুখে আমি যে আমার মেয়ের মুখ দেখতে পাই। সেটা সম্ভব হবে কী করে ও যদি বার বার পরের সন্তানের মা হয়? হবেই, যদি তুমি যা বলেছ তা সত্য হয়ে থাকে।” রঞ্জু অব্যক্ত ব্যথায় আর্তনাদ করে।

“পাগলা না ক্ষ্যাপা! চল তোমাকে বহরমপুরের পাগলা গারদে রেখে আসি। কেন, দুনিয়াতে কি আর কোনো মেয়ে নেই? সুন্দরী যদি বল, জাপানীদের মতো কেউ নয়। আর বউ যদি বল ওরাই সকলের সেরা। আমার হাত পা বেঁধে রেখেছে সাবু। তা নইলে আমি ওদেশ থেকে একা ফিরতুম না। জোড়ে ফিরতুম।” ললিত কবুল করে।

“আমি যে প্রেমের ডোরে বাঁধা। এ ডোরও যে বিয়ের ডোরের মতো অটুট। গোরীর কাছে যা আশা করেছি তা যদি না পাই তবে যে আমাকে আরেক নারীর কাছে হাত পাততে হয়। সেই বা কেন দেবে যদি ভালোবাসা না পায়, যদি স্ত্রী না হয়? তবে কি আমার প্রেমিক সত্তা দুই ভাগে বিভক্ত হবে? দেহ মন হৃদয় আত্মা দুজনের মধ্যে ভাগ করে দিলে আমি নিজে বাঁচব তো?” রঞ্জু ভেবে আকুল হয়।

“শেকসপীয়ার না কে যেন বলেছেন, প্রেমিকেরা পাগলেরা আর কবিরা সবাই কল্পনা দিয়ে গড়া। তুমি তো একাধারে প্রেমিক আর পাগল আর কবি। উপরন্তু একটি ফুল। তোমার গোরী তোমাকে এপ্রিল ফুল বানাবে।” ললিত ভবিষ্যদ্বাণী করে।

রঞ্জু তাতে আরো আঘাত পায়। বলে, “তুমি একটা ফলস প্রোফেট। তোমার কথা ফলবে না। আমাদের ইলোপমেন্ট অনেকদূর এগিয়ে রয়েছে। একদিন রাজবাহাদুরের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসবে রূপমতী। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে।”

ললিত তার কল্পনার বহর দেখে হেসে বাঁচে না। আরো দুয়েকদিন দুই বন্ধু একসঙ্গে কাটায়। বেশির ভাগ নদীর ধারে। বিদায়ের পর রঞ্জুর খেয়াল হল যে ললিত ওর বউকে কড়া পর্দায় রেখেছে, রঞ্জুর সামনে বেরোতে দেয়নি। এমন প্রতিক্রিয়াশীল!

(ক্রমশ)

আমরা পুরুষেরা
জানি কি ভাবে
শীতলতা ও আরাম
পেতে পারি।
Johnson's
baby
powder
সবাই পারেন জনসন্স* বেবী হ'তে
(এমনকি বাবাও)
জনসন অ্যাণ্ড জনসন*
* ট্রেডমার্ক
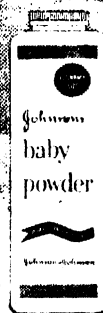
ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির পাঁচজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির অতিথিরূপে ভারত দর্শনে এসেছিলেন। দলটির নেতৃত্ব করেন রয়েল সোসাইটির বর্তমান সভাপতি এবং নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালান হজকিন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রয়েল সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি লর্ড ব্ল্যাকেট, বিশিষ্ট ট্রপিকেল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ স্যার হ্যারল্ড হিমসওয়ার্থ, রসায়ন বিজ্ঞানী স্যার হ্যারল্ড টমসন এবং সোসাইটির কর্মসচিব স্যার ডেভিড মার্টিন। উল্লেখ্য, লর্ড ব্ল্যাকেট বিগত চল্লিশ বছর ভারতীয় বিজ্ঞান প্রগতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। ১৯৪৭ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় অনরারি ডক্টরেট ডিগ্রি এবং ১৯৪৯ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি অনরারি ফেলোশিপ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এ প্রসঙ্গে তরুণ বিজ্ঞানীদের সাফল্যের পথে রয়েল সোসাইটির ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে।

বাঁ দিক থেকে : স্যার হ্যারল্ড হিমসওয়ার্থ, লর্ড ব্ল্যাকেট

পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রিটেনের এই বিজ্ঞান সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ বিজ্ঞানীদের তাঁদের সাফল্যের শুরু থেকেই উৎসাহ দেওয়া। কারণ ওঁরা মনে করেন, যে সমস্ত বিজ্ঞানী স্বকীয় মেধা এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যান, উপযুক্ত সম্মান তাঁদের দিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, যত কম বয়েসে সেটা করা যায় ততই ভাল। এতে করে পরবর্তী সময়ে স্থূল দৈহিক এবং মানসিক সামর্থ্য বজায় থাকতে থাকতেই তাঁরা অনেক বেশি উদ্যমের পরিচয় দিতে পারবেন। উচ্চতর বিজ্ঞান সাধনায় যে অনুপ্রেরণা যোগাবে বস্তুতে তার প্রতিফলন দেখা দেবে।

রয়েল সোসাইটি তাঁদের দীর্ঘকালের ইতিহাসে চিরদিনই এই প্রতিশ্রুতিটি বজায় রেখে এসেছেন। শুধু অতীতেই নয়, আজও পর্যন্ত তরুণ বিজ্ঞানীদের তাঁরা উৎসাহ দিয়ে আসছেন। মৌলিক কোন আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তাঁদের সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করেন। পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে এটি এক বিশিষ্টতম সম্মান।

অপরাপর সংস্থার মত রয়েল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন তরুণ মেধাবী এবং উৎসাহী কয়েকজনের সক্রিয় উদ্যম। প্রতিষ্ঠা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি জন উইলকিনস, তখন বয়েস ৪৬। ইনি ইতিহাসখ্যাত অলিভার ক্রমওয়েল-এর শ্যালক। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রবার্ট বয়েল। তখন তাঁর বয়েস ৩৩ এবং কনিষ্ঠতম ব্যক্তিটি ছিলেন ক্রিস্টোফার রেন। প্রথম জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করলেও উত্তরকালে ইনি ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কররূপে সম্মান লাভ করেছিলেন।

হ্যাঁ, ইতিহাস আছে বইকি? রয়েল সোসাইটির দীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাসের সকলেই যে বিশ্ববিশ্রুত সে কথা হয়ত বলা চলে না এবং শ্রেষ্ঠ কাজ করলেই যে সব সময় বিশ্ববিশ্রুত হওয়া যায় একথাও ঠিক নয়। তবু যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই সংস্থাটি কাজে নেমেছিলেন উত্তরকালে যতদূর সম্ভব সেটা রক্ষা করার তাঁরা চেষ্টা করেছেন। তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, ১৬৭১ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়েসে আইজাক নিউটন এই সোসাইটির ফেলোরূপে নির্বাচিত হন। এবং আরও চমকপ্রদ ঘটনা, এই সোসাইটিই তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থ **'দি ম্যাথেমেটিকাল প্রিন্সিপলস অভ নেচারল ফিলোজফি'** সর্বপ্রথম লাটিন ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। আর তার যাবতীয় খরচ যুগিয়েছিলেন সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব এবং প্রখ্যাত **হ্যালির ধূমকেতু** আবিষ্কারক এডমান্ড হ্যালি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে। ঐ সময় হ্যালির বয়েস মাত্র ৩১।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রয়েল সোসাইটির বিশিষ্টতম বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন জোসেফ ব্যাংকস। ১৭৬৬ সালে মাত্র ২২ বছর বয়েসে তিনি এর ফেলো নির্বাচিত হন এবং তার ১২ বছর পর মাত্র ৩৪ বছর বয়েসে সোসাইটির সভাপতি। পরবর্তী বিয়াল্লিশ বছর এই পদে তিনি সম্মানে কাজ করে গেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে ব্যাংকস প্রকৃতিবিজ্ঞানী রূপে ক্যাপ্টেন কুক পরিচালিত প্রথম নৌযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেটা ১৭৬৮-৬৯ সাল। কুক এই অভিযানে পৃথিবীকে বেষ্টন করে সর্বপ্রথম প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ব্যাপক পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে সফর করার সময় ব্যাংকস ঐ সমস্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আগ্রহী হন। এবং মুখ্যত তাঁরই পরিকল্পনায় পরবর্তীকালে ঐ সমস্ত অঞ্চলে কৃষিসংক্রান্ত উপনিবেশ গড়ে ওঠে। তিনিই সর্বপ্রথম চীন থেকে মালয় পর্যন্ত ব্যাপক চা চাষের প্রচলন করেন।

ব্যাংকস-এর পর এলেন হামফ্রে ডেভি। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পঁচিশ বছর বয়েসে তিনি ফেলো নির্বাচিত হন। সভাপতির আসন লাভ ১৮১৯, ব্যাংকস-এর অবসর নেবার পরেই। ডেভি তাঁর বিখ্যাত 'সেফটি-ল্যাম্প' আবিষ্কার করে খনি কর্মীদের মধ্যে আজও অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর গবেষণাগারের সহকারী এবং বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে বত্রিশ বছর বয়েসে ১৮২৪ সালে ফেলো নির্বাচিত হন। ঐ ঘটনার সাত বছর পর তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ-এর ব্যাপারটি

আবিষ্কার করেন এবং বাইশ বছর পর প্রকাশ করেন তড়িৎ-চুম্বকীয় কম্পন বা বেতার তরঙ্গ সম্পর্কিত অনবদ্য তত্ত্ব। আর ঐ একই কথা বলা চলে চার্লস ডারউইনের ক্ষেত্রেও। তাঁর বহু বিতর্কিত এবং আলোড়নকারী গ্রন্থ **অরিজিন অভ স্পীসিজ** প্রকাশিত হওয়ার কুড়ি বছর আগে যখন তিনি ২৯, তখনই ফেলো রূপে রয়েল সোসাইটিতে তিনি যোগদান করেছিলেন।

তবু ১৮৫০ নাগাদ সোসাইটির কর্তৃপক্ষ মনে করলেন, আরও যতখানি সম্ভব ঠিক ততটা উৎসাহ সত্যিই কি তাঁরা তরুণদের দিয়ে উঠতে পারছেন? সম্ভবত এই আত্মজিজ্ঞাসার পরই দেখা গেল, ১৮৫১ সালে ২৬ বছর বয়েসে টমাস হেনরি হাকসলে এলেন ফেলো হয়ে। আর তার পর পর এলেন জন টিনডাল, ৩১, কেলভিন ২৬, ম্যাকসওয়েল ২৯, জে জে টমসন ২৭ এবং রাদারফোর্ড ৩১। অর্থাৎ দেখা গেল, বিশ্বখ্যাতি অর্জন করার অনেক আগেই বহু বিজ্ঞানী এই সংস্থার ফেলোর সম্মান অর্জন করে বসেন।

আছেন। দীর্ঘ নামের তালিকায় হ্রস্ব-

ওয়ার্ক-এ শেলীর কাব্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন।

দীর্ঘ তালিকা এখন থাক। কারণ শুধু নামই নয়, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির জন্যে দেশের আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, তাদের ছাত্র, শিক্ষক—যখন যেখানে যাঁদের মধ্যেই তাঁরা বিজ্ঞান প্রতিভার উন্মেষ দেখতে পেয়েছেন, কোন রকম সংস্কারের মধ্যে ডুবে না থেকে তাঁরা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণাক্ষেত্রেও তাঁদের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*

যাঁরা এসেছিলেন : এক, অধ্যাপক অ্যালান হজকিন, এফ আর এস। ১৯৭০-এ লর্ড ব্ল্যাকেটের পর রয়েল সোসাইটির সভাপতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয় স্নায়বিক স্পন্দনের সঞ্চারণে শারীরবৃত্তীয় তত্ত্ব। এরই উপর অনবদ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৩ সালে অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হাকস্‌লে এবং অধ্যাপক স্যার জন একক্লস-এর সংগে যুগ্মভাবে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জানুয়ারি ১৯৭০-এর পর
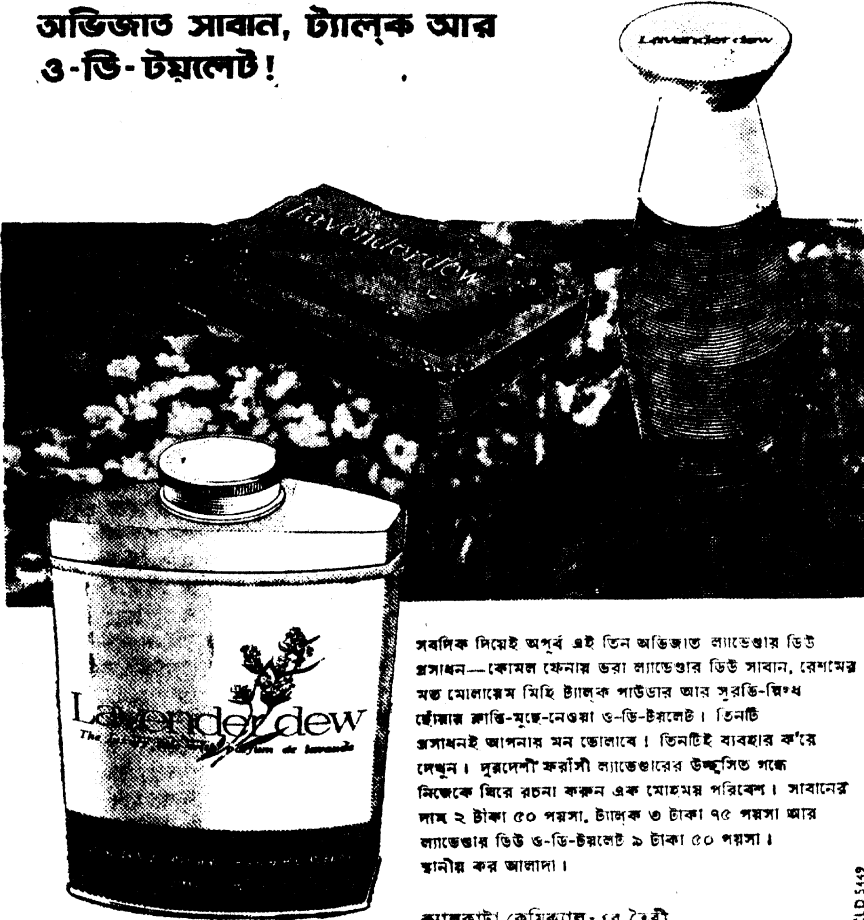
থেকে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের জন হামফ্রে প্লামার অধ্যাপক রূপে কাজ করছেন। জন্ম ফেব্রুয়ারি ৫, ১৯১৪। বর্তমানে পেশীতন্তুর উপর তিনি গবেষণা করছেন। **দুই,** লর্ড ব্ল্যাকেট, এফ আর এস। ১৯৭০-এর আগে তিনিই রয়েল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। তাঁর অনবদ্য আবিষ্কার তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে—তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত দ্রুতগামী কণিকাদের সঙ্গে পদার্থের সংঘর্ষজনিত প্রতিক্রিয়া—মহাজাগতিক রশ্মিতে অন্তর্নিহিত কণিকার বৈশিষ্ট্য—এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র। ১৯৪৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানের উপর তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জন্ম নভেম্বর, ১৮৯৭। শিক্ষা ম্যাগডালেন কলেজ এবং গবেষণা ক্যাভেন্ডিস গবেষণাগারে লর্ড রাদারফোর্ডের অধীনে। তিনি ১৯২৪ সালে তেজস্ক্রিয় কণিকার আঘাতে মৌলিক পদার্থের রূপান্তরিত হওয়ার সময়কার আলোকচিত্র তুলতে সমর্থ হন। তিনি এবং ইটালীর বিজ্ঞানী ওকশিয়ালিনি ক্লাউড-চেম্বারে প্রবেশকারী মহাজাগতিক রশ্মির ছবি তোলার জন্যে বিশেষ ধরনের একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, তাঁরা তা দূর করেন। উল্লেখ্য, মার্কিন বিজ্ঞানী এন্ডারসন সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় এই কণিকাটির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁরা মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের বর্ষণের ব্যাপারটিও আবিষ্কার করেন। **তিন,** স্যার হ্যারল্ড টমসন। জন্ম ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮। বিভিন্ন রাসায়নিক সমস্যার সমাধানে বর্ণালী বিজ্ঞানের প্রয়োগ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। **চার,** স্যার হ্যারল্ড হিমসওয়ার্থ। জন্ম মে, ১৯০৫। কৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানী। **পাঁচ,** স্যার ডেভিড মার্টিন। ১৯৬০-৬১ সালে কটকে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-সমন্বয় সংস্থার অধিবেশনে রয়েল সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করেন।

ক্যানসার কি সংক্রামক?

অন্তত জরায়ুর ক্যানসার সম্পর্কে এ কথাই তো কেউ কেউ **বলতে** শুরু করেছেন? **সম্প্রতি জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিশেষজ্ঞ আইভর রয়স্টন** এবং লাউরে অরেলিয়া স্ত্রীলোকের ক্যানসার আক্রান্ত জরায়ুর **কোষ পরীক্ষা করেছিলেন।** ক্যানসার **প্রাণীকোষের স্বাভাবিক গঠন এবং কার্যাবলীর মধ্যে পরিবর্তন আনায় শরীরের বিপাকীয় পদ্ধতিটি ভিন্নতর হয়ে পড়ে। ও'রা লক্ষ করেন, এই রোগে আক্রান্ত জরায়ুর পরিবর্তিত কোষগুলির মধ্যে বিশেষ ধরনের ভাইরাসের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। গোত্রের দিক দিয়ে এই ভাইরাস উপশ্রেণী বা সাবটাইপ-২-এর মধ্যে পড়ে এবং বিশেষ শ্রেণীর অ্যান্টিবডি ওদের ধ্বংস করতে পারে। উল্লেখ্য, স্ত্রী-যোনির সংক্রামক রোগ সৃষ্টির মূলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ভাইরাসগুলির ভূমিকা খুবই সক্রিয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, পুরুষ অথবা মহিলার যৌনসংসর্গের মাধ্যমে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। উল্লেখ্য, কোন কোন পশুর শরীরে ভাইরাস সংক্রমণের জন্যেই যে ক্যানসার হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রয়স্টন এবং অরেলিয়া যা বলছেন যদি সেটা সত্যিই প্রমাণিত হয়, জরায়ুর ক্যানসার নিরাময় করাটা তখন মোটেই শক্ত কিছু হবে না। এবং এ রোগের প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। এ তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অভ সায়েন্স-এর কার্যবিবরণীর ৬৭ খণ্ডের, ২০৪ পৃষ্ঠায়।**

আমাদের নক্ষত্র জগতে

পালসারস এবং নিউট্রন নক্ষত্র তাত্ত্বিক-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে আজ বড় রকমের একটি প্রশ্ন। ক্যালিফোর্নিয়া টেকনোলজির জর্জিয়া ওস্ট্রাইকার এবং প্রিন্সটোনের নতুন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী মার্টিন রীজ এবং জোসেফ সিলক এখন আমাদের নক্ষত্র-জগতের মৃত পালসারগুলির দিকে চেয়ে রয়েছেন। ও'রা মনে করেন, আমাদের নক্ষত্র-জগতেই কম করে কয়েকশ কোটি মৃত পালসারের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরই ধারণা ওরা আসলে এক একটি মৃত এবং নিস্তব্ধ নিউট্রন নক্ষত্র। লক্ষ কোটি বছর আগে প্রাণের বিস্ফোরণ বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে তাদের সরব করে রাখলেও, এখন তারা স্তিমিত, শান্ত এবং নিস্তব্ধ। ঐ তিনজন তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা, দূরাকাশ থেকে আগত মৃদু এক্স-রশ্মির উৎস ওরাই। এই এক্স-রশ্মির শক্তি ১০০ ইলেকট্রন ভোল্টের মত এবং চেষ্টা করলে আমাদের নিকটতম নির্বাপিত পালসারটিকে খুঁজে বের করাও অসম্ভব হবে না।

ও'দের বক্তব্য, পালসারদের প্রবলতম প্রাণশক্তির সময়কাল মাত্র তিরিশ লক্ষ বছর। অর্থাৎ ঐ সময় ধরে তারা সবচাইতে বেশি সতেজ থাকে। হিসেব করে দেখা গেছে আমাদের গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগতের বয়স ১০০০০০০০০০০ বছর। অতএব এই সময়ের মধ্যে বহু পালসারই জন্মগ্রহণ করেছিল এবং কয়েক লক্ষ বছর ধরে সপ্রদীপ্ত থেকে নিভে গেছে। তুলনায় এখন ঐ সমস্ত মৃতের সংখ্যা বর্তমানের সক্রিয় পালসারদের থেকে অনেক বেশি। ওসট্রাইকার, রীজ এবং সিল্ক একটি হিসেবও খাড়া করেছেন। ও'দের মতে আকাশের নক্ষত্রজগতে মোট ১০০০০০০০০০টি নিউট্রন নক্ষত্র বহাল তবিয়তে বিচরণ করছে। আমাদের সূর্যে যতটা বস্তু রয়েছে ঐ নিউট্রন নক্ষত্রের এক একটির বস্তুর পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি। অথচ অত বেশি পরিমাণ সামগ্রী এঁটে পুরে রাখা হয়েছে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার ব্যাসের এক একটি গোলকের মধ্যে। কারণ নিউট্রন নক্ষত্রের ব্যাস ঐ কুড়ি কিলোমিটারেরই মত। তাদের বাইরের তলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ প্রচণ্ড। এত প্রচণ্ড যে, এক গ্রাম বস্তুকে যদি শূন্য থেকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ আকর্ষণের ফলে বস্তুটি তার বুকে গিয়ে এত জোরে আঘাত করবে যে, তার ফলে বস্তুটি থেকে প্রায় ১০০০০০০০০০০০০০০ জুলের সমতুল্য শক্তির উদ্ভব হবে। এবং তার বেশির ভাগটাই পাওয়া যাবে উত্তাপ শক্তিরূপে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এ পর্যন্ত তাপ-অনাকেন্দ্রিক একীভবন বিক্রিয়া বা থার্মো-নিউক্লিয়ার ফিউসন রিঅ্যাকসনের মাধ্যমেই সবচাইতে বেশি শক্তির উদ্ভব ঘটনা সম্ভব হয়েছে। এবং প্রতি গ্রাম বস্তুর ক্ষেত্রে তার পরিমাণ ১০০০০০০০০০০০০০ জুলেরও কম। অর্থাৎ ঐ পদ্ধতিতে এক গ্রাম বস্তু থেকে ১০০০০০০০০০০০০০ জুলের বেশি শক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ওস্ট্রাইকার এবং তাঁর সতীর্থদের তত্ত্ব : মৃত পালসারগুলি চারপাশের আন্তর্নক্ষত্রশূন্য থেকে ভাসমান মহাজাগতিক ভস্ম বা বস্তুকণা সংগ্রহ করে নিজেদের দেহগুলি বাড়াতে শুরু করে। বস্তুকণা সবেগে ওদের গায়ে গিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি করে তা দশের পেছনে তেত্রিশটি শূন্য জুড়ে দিলে যে অঙ্কটি দাঁড়াবে তত ওয়াট ক্ষমতার সমান। এই শক্তির বেশির ভাগই উত্তাপে পরিণত হয় এবং পরে মৃদুশক্তি-সম্পন্ন এক্স-রশ্মি ফোটন রূপে বিকিরিত হতে থাকে। কিছুটা তার সঙ্গে উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন এক্স-রশ্মিও থাকে।

জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে ও'দের এই অভিনব তত্ত্ব ইতিমধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আশা করা যায় নিউট্রন নক্ষত্রের রহস্য উদ্ঘাটনে এই তত্ত্ব যথেষ্ট সাহায্য করবে।

সমরজিৎ কর
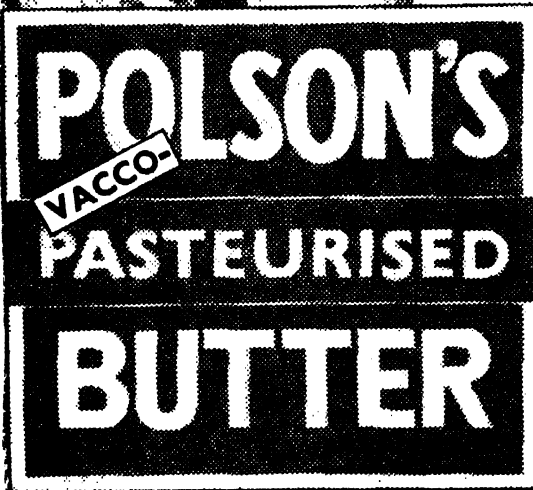
ইন্দ্রজিৎ

জরাভরতের উপাখ্যান

জড়ভরতের উপাখ্যান আপনাদের জানা আছে। রাজা সম্পদ, ভোগসুখ ত্যাগ করে মোক্ষ লাভের আশায় সাধন ভজনের উদ্দেশ্যে রাজা চলে গেলেন বনে। কিন্তু দৈবচক্রে এক মৃগ শিশুর মায়ায় এমনভাবে আবদ্ধ হলেন যে ভজন পূজন সাধন আরাধন সবই গেলেন ভুলে। ফলে পরজন্মে নরজন্ম ঘুচিয়ে রাজাকে মৃগশাবক হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হল। কোন বিষয়ে অত্যধিক অনুরক্ত হলে মানুষের এই দশা হয়। রাজা ভরত জড় ভরতে রূপান্তরিত হন। বলা বাহুল্য সকল মানুষই অল্পবিস্তর মোহগ্রস্ত. সবাই একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকে। সেটা ভাল মন্দের কথা নয়; কিছু একটা নিয়ে মেতে থাকতে পারলে জীবনের অশান্তি উদ্বেগ অনেকখানি ভুলে থাকা যায়। তবে মন জড়িয়ে গেলে শেষটায় ফাঁপরে পড়তে হয়। এই আমার কথাই ধরা না, সারা জীবন কেটেছে ছেলে ছোকরা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। গোড়ার দিকে বয়সের ব্যবধানটা ছিল কম, পরে যত দিন গিয়েছে সে ব্যবধান ক্রমে বেড়েই গিয়েছে। কারণ ছাত্রের বয়স বছরের পর বছর একই থেকেছে, আমারই বয়স বেড়েছে। ওদের সাধ আহ্লাদের সঙ্গে আমার নিজের সাধ আহ্লাদকে মিশিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে হয়েছে কি, দেহের বয়সটা যে অনুপাতে বেড়েছে মনের বয়সটা সে অনুপাতে বাড়েনি। আজকে কেউ যদি আমাকে অপরিণতবুদ্ধি বলে গাল দেয় তাহলে সেটা আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। সারাজীবন এমন মনে প্রাণে যৌবনের আরাধনা করেছি যে জড়ভরতের উপাখ্যান মানতে গেলে পরজন্মে আমার অনন্ত যৌবন লাভ করবার আশা আছে। কিন্তু সে তো পরজন্মের কথা। ইতিমধ্যে এ জন্মের সংক্ষিপ্ত যেটুকু বাকি আছে তারই মধ্যে বার্ধক্যের ধাক্কাটুকু সামলে নিতে হবে। বহু বিলম্বে আবিষ্কার করেছি যে আমার সমবয়স্কদের তুলনায় বুদ্ধিবৃত্তি বিবেচনায় আমি কুড়ি পঁচিশ বছর পিছিয়ে আছি। এদিকে আজকের উদ্দাম যৌবন যেরূপ উল্লম্ফনে এগিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে প্রাণ রাখাই দায়। এখন আমার ভাবনা হয়েছে—'ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে/ সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।'

মানুষের মন বড় বেয়াড়া; সে বয়সকালের হিসাব রাখে না, আপন খেয়াল খুশি মত চলে। কিন্তু তার দেহযন্ত্রটি অতিশয় নিয়মনিষ্ঠ; সে বয়সকালের ধর্ম মেনে চলে। দেহধারীকে উদ্দেশ করে যথাকালে যথাবিহিত সাবধানবাণী উচ্চারণ করে। কিন্তু আমার মতো কিছু সংখ্যক লোক আছে, তারা সময়কালে সেসব ইঙ্গিত গ্রহণ করে না। পরে একটা সময় আসে যখন দেখা যায় এরা সর্বপ্রকারে বেমানান। বয়স হয়েছে কিন্তু বয়সোচিত স্থৈর্য ধৈর্য গাম্ভীর্য নেই; চুল পেকেছে কিন্তু বুদ্ধি পাকেনি; দেহ অচল, মন চঞ্চল। টানা পোড়েনের মধ্যে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়। বেশ খানিকটা ন্যাবানি চুবানি খেয়ে বর্তমানে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছি। অর্থাৎ বয়স যে হয়েছে সেটা মেনে নিয়েছি। আবার শুধু মেনে নিলেই হয় না। এতকাল যেমন যৌবন ধর্মের চর্চা করেছি, বার্ধক্যেরও তেমনি চর্চা করতে হয়। জেনে চিনে বুঝে মর্ম গ্রহণ করতে পারলে তবে সে আপনার হয়। জরা পীড়া বয়োবৃদ্ধির চিহ্ন দেহে বহন করেছি কিন্তু মনে তাকে স্থান দিইনি। এজন্যে তাকে আপনার করে পাইনি। বয়স যে হয়েছে আমার মন এই সবে তা জ্ঞাতসারে স্বীকার করল। কাজেই বলতে পারেন এতদিনে আমার বয়ঃপ্রাপ্তি হল। বিলম্বে হলেও মোহভঙ্গ যে হয়েছে এটিই বড় কথা। জড় ভরত মৃগশাবকের মোহে পরমাত্মার ধ্যান থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন. আমি তেমনি যৌবনের মোহে পড়ে জীবনের একটা মস্ত বড় অংশকেই হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছিলাম! কাজেই আমার এটিকে বলতে পারেন জরাভরতের উপাখ্যান।

বিনা চর্চায় কোন জিনিসই মানুষের আয়ত্তে আসে না। স্বভাবধর্মে যে জিনিস আপনি এসে যায় তাকেও নিজস্ব বলে দাবি করা চলে না, যতক্ষণ না তার স্বরূপটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছি। জীবনধর্মের নিয়মে মানুষের কৈশোর গিয়ে যৌবন, যৌবন গিয়ে প্রৌঢ়াবস্থা, তারপরে বার্ধক্য। কিন্তু কোনটারই স্বরূপ আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কারণ দৈনন্দিনের দাবি মেটাতেই আমরা প্রত্যেকে এত ব্যস্ত যে কৈশোর যৌবন বা বার্ধক্যের স্বতন্ত্র পরিচয় আমরা সম্যকভাবে পাই না। এমন যে যৌবন —দেহ মনের কূল ছাপিয়ে বন্যার মতো আসে, সেও সব সময়ে আমাদের সজ্ঞানে আসে না। জীবন সংগ্রাম এমন কঠোর, যৌবন কখন আসে কখন যায় লোকের খেয়াল থাকে না। যেখানে প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত, সেখানে যৌবন আসতে না আসতেই যৌবনান্ত।

চর্চার কথা বলেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি এখন ঘরে বসে বার্ধক্যের

চর্চা শুরু করেছি অর্থাৎ কিনা বার্ধক্য-প্রাপ্তদের জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে অভ্যাস করছি। বার্ধক্য যথাসময়ে আপনিই আসে, তাকে আবাহন করে আনতে হয় না। বার্ধক্যের লক্ষণ দেহে মনে আপনিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বয়স মানুষের নানা শক্তি হরণ করে। হৃত শক্তি, হৃত স্বাস্থ্যের ফলে মানুষের কর্মশক্তি, চলৎশক্তি এমন কি চিন্তাশক্তিও হ্রাস পায়। কবি ইয়েটস্ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের যে চিত্রটি এঁকেছেন সে বড় মর্মান্তিক—An aged man is but a paltry thing. A tattered coat upon a stick. দর্পহারী মধুসূদনের ন্যায় শক্তিহারী বার্ধক্য অশক্ত এবং অক্ষমের উপরে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। ওঠা বসা, চলাফেরা, কাজকর্ম সবই সাবধানে করতে হয়। কাজেই বার্ধক্যের চর্চা বলতে সাধারণত বোঝায় অক্ষমতার চর্চা। আমি সে চর্চার কথা বলিনি। আমার বার্ধক্য চর্চা বার্ধক্য সম্বন্ধে অ্যাকাডেমিক আলোচনা বই আর কিছু নয়। বৃদ্ধ মানুষের স্বভাব, তার আচার ব্যবহার, ধ্যান ধারণা, কি নিয়ে কিভাবে বৃদ্ধের জীবন কাটে তারই আলোচনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে বার্ধক্যের ফিলজফি। রবার্ট বার্টন-এর Anatomy of Melancholyর ন্যায় একে বলতে পারেন Anatomy of Old Age.

বয়সের হিসাবে আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। তাহলেও আজ পর্যন্ত ওর সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি। আমার সমবয়স্কদের সমাজে কোন কালে আমি মিশিনি। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের সাহচর্যে জীবন কাটানোর ফলে বয়সের সঙ্গে আমার স্বভাবের একটা গরমিল থেকে গিয়েছে, সে কথা আগেই বলেছি। সে কারণেই বৃদ্ধ হয়েও বৃদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা আমি অর্জন করিনি। যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন, তার চাইতে বার্ধক্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সহজ। সেজন্যেই ইদানীং বার্ধক্য সম্পর্কে একটু আধটু আমি ভাবতে শুরু করেছি। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে বার্ধক্য আমার সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করেছে। কোনরকম জোরজবরদস্তি না করে অতি আলগোছে অলক্ষিতে এসেছে। আমি যেভাবে ওকে অমান্য করেছি তাতে ও অনায়াসেই আমার ঝুঁটি ধরে, ঘাড় ধরে দুচার ঝাঁকুনি দিয়ে দিব্যি জানান দিয়েই আসতে পারত। কিন্তু তেমন কিছুই করেনি। বোধ করি সস্নেহ কৌতুকে ভেবেছে, বেশ তো ভুলে থাকতে চাও, তা থাক না। আজ মান্য না করকে, একদিন আমাকে মেনে নিতেই হবে। মেনে যে নিয়েছি তারই প্রমাণ আজকের এই জল্পনা।

যৌবন আর বার্ধক্যের মাঝপথে আছে প্রৌঢ়াবস্থা—বলা যেতে পারে বার্ধক্যের প্রস্তুতিপর্ব। কিন্তু লোকে তাকে খুব একটা আমল দেয় না—যৌবনের জের হিসাবেই দেখে। প্রৌঢ় বয়সে যে শান্ত সংযত সম্বৃত ভাবটি আসবার কথা অনেকের জীবনেই তা আসে না। অন্তত আমার জীবনে তা কোনকালেই আসেনি। বলতে গেলে পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি পথে কোথাও না থেমে না জিরিয়ে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিলাম যে দেহে মনে কোথায় কি ভাঙচুর ঘটছে সেসব কোনদিন খেয়ালেই আসেনি। উন্মনা রমণী অকস্মাৎ যৌবন সচেতন হয়ে বলে—যৌবন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই, আমি ছিলেম অন্য মনে। আমারও হয়েছে তাই। কবে চুল পাকল, কবে দাঁত নড়ল কিছুই জানি নাই, আমি ছিলেম অন্যমনে। যৌবন যদি অগোচরে আসে তবে বড় দুঃখের কথা। ও জিনিসের কণামাত্রও অনাদরে নষ্ট হলে মন প্রবোধ মানে না। বার্ধক্য সম্বন্ধে এমন কথা কেউ বলেও না ভাবেও না। বোধ করি এই কারণেই এ দু-এর প্রকৃতিতে একটা পার্থক্য আছে। যৌবন স্বভাবতই প্রগল্ভ, সে কাউকে সহজে উদাসীন থাকতে দেয় না। বার্ধক্য আচারে ব্যবহারে বিনীত, মৃদুস্বভাব। দোষের মধ্যে গায়ে পড়ে উপদেশ দেবার একটু অভ্যাস আছে। অনেক দেখে শুনে ঠেকে শিখেছে তো—অনভিজ্ঞদের কাছে নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চায়। বেচারী জানে না যে এ যুগে বৃদ্ধস্য বচনং অগ্রাহ্যম্। উল্টে সবাই গালমন্দ দেয়, ও তা গায়ে মাখে না। সকলের প্রতিই একটি সস্নেহ প্রশ্রয় আছে। এই দেখুন না কেন, আমার বার্ধক্যের কথা সে নিজে আমাকে মনে করিয়ে দেয়নি, মনে করিয়ে দিয়েছে জীবনের যার আরাধনা করলাম সেই সাধের যৌবন। নাক সিঁটকিয়ে বলেছে, আঃ, তুমি আর কতদিন আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, নাও এবার তল্পিতল্পা গোটাও। ও বড় দেমাক। বলতে গেলে মানুষের জীবনে ও হচ্ছে প্রথম পক্ষের ঘরণী কিন্তু মেজাজ তার সব সময়ে তৃতীয় পক্ষের মতো। বার্ধক্যের ওসব ভড়ং নেই। প্রসন্ন হেসে সকলকেই অভ্যর্থনা করে। বলে, এসো এসো, অনেক দাপাদাপি, ছুটোছুটি করেছ। এবার আমার দাওয়ায় বসে একটু জিরিয়ে নাও। সত্যি বলছি, বেশ লাগছে দাওয়ার এই ছায়াটিতে। যৌবনের রৌদ্রতাপে ঝলসে যাওয়া আমার দেহ মন একটু যদি জুড়িয়ে নেওয়া যায়।

দেহ মন কথা দুটিকে আমরা এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করি যেন দুটি যমজ ভাই। কিন্তু এদের দুজনার বয়স কি এক? বয়সের ক্রিয়া দেহের উপরে যতখানি, মনের উপরে ততখানি কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বার্ধক্যের ফলে দেহ নিষ্ক্রিয় হলে মনও নিষ্ক্রিয় হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে বলে আমি মনে করিনে। বরং শয্যাশায়ী রুগ্ন ব্যক্তির বেলায় দেখা যায় দেহ যে পরিমাণে নিষ্ক্রিয় হয় মন সে পরিমাণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। নিজের বেলায় দেখেছি যখনই শয্যা গ্রহণ করতে হয়েছে মনটা তখনই দূর দূরান্ত পর্যটনে বেরিয়েছে। নানা রকমের উদ্ভট কল্পনা মনে এসে ভিড়

করেছে। দেহ ও অচল হলে মন সচল হয়। অন্ততঃ এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে জরা দেহকে যতখানি কাবু করে মনকে ততখানি করতে পারে না। ইংরেজিতে যাকে senility বলে সেটি নিয়ম নয়, নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণভাবে এটুকু বলা যেতে পারে যে বয়স কালে মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় না হলেও কোন কোন ব্যাপারে একটু নিস্পৃহ বোধ করে। শিশুকাল থেকে মানুষ ক্রমে যেমন বড় হতে থাকে তার চেনা জানার বিস্তার তেমনি বাড়তে থাকে। নিত্য নতুনকে জানবার চেনবার স্পৃহা মানুষের স্বভাবগত। অচেনাকে চিনে, অজানাকে জেনে মানুষ আনন্দ পায়। বলেও থাকি যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের জানবার চেনবার আকাঙ্ক্ষা মেটে না। কার্যত কিন্তু দেখা যায়, একটা সময় আসে যখন জীবনটা ক্রমে বুজে আসে, চেনা জানার জগৎটা ক্রমে সংকুচিত হতে থাকে। সমবয়স্ক আত্মীয় বন্ধুরা একে একে এ লোক ছেড়ে পরলোকে চলে যান। যাঁরা থাকেন তাঁরা নিতান্ত পরলোকে না গেলেও সংসারের টানাপোড়েনে পর হয়ে যান। তা ছাড়া জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মনে খানিকটা বৈকল্য দেখা দেয়। ভাবে, Sufficient unto the day is evil thereof—এই যা হয়েছে এই ঢের, নতুন কিছুর মধ্যে আর নিজেকে জড়াবে না। প্রবৃত্তির ধার কমে যায়, মনে নিবৃত্তি আসে। যৌবন-কালে অজানা অচেনা হাতছানিতে কেবলই ডাকতে থাকে; কিন্তু চোখে একবার ছানি পড়লে হাতছানির ডাক আর মনে সাড়া জাগায় না।

জীবন এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁচেছে যেখানে পেছনের দিকে জীবনের যতখানি বিস্তার সুমুখে ততখানি নয়। সমুখের পথ নিঃশেষিতপ্রায়। যেটুকু বাকি আছে তাতে লোভনীয় বা কামনীয় কিছু থাকতে পারে এমন আশা করা কঠিন। ব্রাউনিং-এর 'the best is yet to be'—নিতান্তই ফাঁকা আশ্বাস বলে মনে হয়। মনটা ফিরে ফিরে পেছনের দিকেই তাকায়। পেছনে যা ফেলে এসেছে তাই মনকে টানতে থাকে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এই তিন নিয়ে মানুষের জীবন। এই বয়সে মানুষ বর্তমান থেকে অবসর গ্রহণ করে। পুত্র-কন্যার হাতে বর্তমানকে সমর্পণ করে নিজের হাত পা গুটিয়ে বসে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিস্পৃহ। বর্তমানের উপরে মুষ্টি আলগা করে দিয়েছে, ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়াবার উৎসাহ নেই। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে বাদ দিলে বাকি যা থাকে তাকে বলে ভূত। এজন্যে একটা বয়সে সকল মানুষই অল্পবিস্তর ভূতগ্রস্ত। লোকে বলে ভূতের পা পেছন দিকে। খুব সম্ভব কারণেই ভূতগ্রস্ত মানুষের অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মনটা পশ্চাৎমুখী।

পরিচিত জগৎটা সংকুচিত হয়ে যাওয়াতে অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্ব সম্পর্কে মানুষ একটু বেশি সচেতন হয়ে ওঠে, বিশেষ করে কাছের মানুষজন, প্রতিবেশী সম্পর্কে। সব চাইতে বেশি সচেতন হয় নিজের সম্বন্ধে। এতদিন নিজের সঙ্গেই পরিচয়টা ছিল অসম্পূর্ণ। বহির্মুখী মন, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় ছিল না। এখন আত্ম-পরিচয়ের লগ্ন। Know thyself বা আত্মানং বিদ্ধি—আমার অনেক সময় মনে হয়েছে এ সব উপদেশ শুধু জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি নয়, নিশ্চয় বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির উক্তি। যৌবনের ধর্ম বসুধৈব কুটুম্বকম্—দুনিয়া-সুদ্ধ সবাইকে জান, চেন। বার্ধক্যের নির্দেশ, এবার থিতিয়ে বস, নিজেকে চেন।

দেহ অশক্ত হওয়ার দরুণ গতিবিধি সীমাবদ্ধ। গৃহের আশে পাশে পদচারণা আর মনের অলিতে গলিতে স্মৃতিচারণা—বৃদ্ধ ব্যক্তির নিত্যকর্মপদ্ধতি। পদচারণায় আমার রুচি নেই। পা গুটিয়ে কোথাও বসতে পারলে আমি সহজে উঠে দাঁড়াই না, চলা তো দূরের কথা। খিদে বাড়াবার জন্যে হাওয়া খেতে বেরোনো আমার ধাতে সয় না। স্মৃতিচারণের মস্ত বড় সুবিধে এই যে, তাতে শারীরিক শ্রমের কোন প্রয়োজন হয় না। ঘরে বসেই দূর-দূরান্তর পরিক্রমা সম্ভব। ভৌগোলিক ব্যবধান তো বটেই সময়ের ব্যবধানও অতিক্রম করা চলে। নিমেষে পঞ্চাশ বছরের পশ্চাৎভূমিতে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। বলা বাহুল্য স্মৃতিমাত্রই সুখস্মৃতি নয়, দুঃখের স্মৃতিও ঢের আছে। কিন্তু কালের ব্যবধানে সুখ দুঃখ কোনটারই তীব্রতা আর থাকে না, গায়ে একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ে যায়। তখন তাকে আর নিছক সুখ-দুঃখ বলে চেনাও যায় না। সে তখন রসে পরিণত হয়। কাব্যরসের মতো এই জীবনরসও উপভোগ্য। রসানুভূতি মাত্রই আনন্দের অনুভূতি। বয়স অনেক কিছু কেড়ে নেয় কিন্তু সব ক্ষতির পূরণ হয়ে যায় স্মৃতিসুধারসের নিবিড় স্পর্শে।

শুনেছি বয়সের ভারে কখনো কখনো মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। সেটাকে অবশ্যই একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি বলতে হবে। বর্তমান হাতছাড়া, ভবিষ্যৎ থেকেও নেই, অতীতই একমাত্র সম্বল। সে সম্বলটুকু থেকে মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তাহলে সেটা হবে নিষ্ঠুরতম বঞ্চনা। তবে আগেই বলেছি senility-র এ দুর্দৈব খুব বেশি ক্ষেত্রে ঘটে বলে আমি মনে করিনে। বয়স দেহের শক্তি যতখানি অপহরণ করে মনের শক্তি ততখানি নয়। যার চিন্তাশক্তি আছে তার চিন্তা করবার অধিকার যেমন অপর কোন মানুষ কেড়ে নিতে পারে না, তেমনি বার্ধক্যও তা কেড়ে নিতে পারে না। বার্ধক্য আর জরা ঠিক এক কথা নয়। বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল নব্বুই এর কোঠায় পৌঁছেও চিন্তার প্রাখর্য পুরোপুরি বজায় রেখেছিলেন। আশি বছর বয়সেও রবীন্দ্র প্রতিভায় এতটুকু ভাঙচুর ঘটেছিল এমন কথা কেউ বলবে না। গান্ধীজী সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। চার্চিল, দ্যগল্-এর নেতৃত্ব-প্রতিভা সত্তরে এসে তবে পূর্ণতা লাভ করেছে। সত্তরের কোঠায় মাও সে তুঙ সত্তর কোটি মানুষের দেশে একচ্ছত্র অধিপতি। মনে পড়ছে কোথায় যেন পড়ে-ছিলাম, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুনের বয়স ছিল সত্তর; তখন তাঁর শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ। আবার পশ্চিম দেশের কোন পণ্ডিত হিসেবকিতেব করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ট্রয়-এর যুদ্ধের সময় হেলেন-এর বয়সও ছিল সত্তর। ঐ বয়সেও তিনি উর্বশীর ন্যায় ভুবনমোহিনী রূপসী। যাকগে, এ সব হল গিয়ে সত্য যুগের কথা, কিন্তু আগে যে সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে, এই কলি যুগেও সত্তর বছর বয়সটা খুব একটা ফ্যালনা জিনিস নয়। আমি ঐ ভরসাতেই সত্তরের অপেক্ষায় বসে আছি। বোধ করি আমার প্রতিভারও পূর্ণ স্ফুরণ তখনই হবে।

বৃদ্ধদের বিষাদ-মনোবিকার / অসীম বর্ধন

মানুষের বয়স বাড়লে, অক্ষম অথর্ব হয়ে পড়লে যে সব বিশেষ ধরনের দৈহিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলি নিয়ে নানাভাবে চর্চা-গবেষণা করতে করতে একটি নতুন বিজ্ঞান-শাখা গড়ে উঠেছে—জেরিয়াট্রিক্স্ (Geriatrics), যাকে বাংলায় বলতে পারি 'বৃদ্ধচর্যা'।

আজ যখন সমাজে বেশির ভাগ লোকে দীর্ঘজীবী হতে চলেছে, তখন অনেক দিন বেঁচে থেকে বার্ধক্যদশা লাভ করাটার আর কোনো কৃতিত্ব থাকছে না, কিংবা কমবয়সীদের কাছে শ্রদ্ধাভক্তি পাওয়ারও যুক্তি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষমাত্রেই জীর্ণদেহ সম্পর্কে এমন একটা সচেতনতা লাভ করে এবং নানারকম শখ আগ্রহ কমে গিয়ে এমন শীতলপাহারা জাগতে থাকে, যার ফলে নতুন এক ধরনের আতঙ্ক-অস্বস্তির মানসিক পীড়নে কষ্ট পেতে হয়।

বৃদ্ধ বয়সে মানসিক অস্বস্তির ধরনটা এমনি বিশেষ ধাঁচের হয় বলেই ফ্রয়েড লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর সাইকোঅ্যানালিসিস্ বা মনঃসমীক্ষণ বৃদ্ধদের মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে না; মনোবিজ্ঞানী ইয়ুঙ-এর গবেষণাতেও ঠিক সেই সমস্যা ধরা পড়েছে। ইয়ুঙ বলতেন, বার্ধক্যের ফলে শক্তি-সামর্থ্যের সংকোচন ঘটে এবং সারা জীবন যা কিছু করা হয়েছে, তাকে আঁকড়ে থাকতে ইচ্ছে হয় বলেই বৃদ্ধদের মধ্যে মনোবিকার লক্ষ্য করা যায়; অল্পবয়সের যে-সব আচরণ এ বয়সে আর করা চলে না, সেগুলোর দিকে ঝোঁক হয় বলেও বার্ধক্যে মনোবিকার সৃষ্টি হয়। বুড়ো হয়ে পড়াটা মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির মাপকাঠিতে বাঞ্ছনীয় নয় বলেই বৃদ্ধ মানুষের মনে তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বৃদ্ধ বয়সে একটা মস্ত মানসিক সমস্যা হলো উদ্বেগ। নানারকম অপূরণীয় ঝোঁক আর বিবেকের অসহনীয় শাসনের মাঝে যে টানাপোড়েন মানুষ ভোগ করে, বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকাই স্বাভাবিক। কেননা, বৃদ্ধ হতে থাকলে যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে আসে, খাওয়া-দাওয়ার রুচি কমে যায় এবং ভাব-আবেগ দমন করাও সহজ হয়ে পড়ে। সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে অবচেতন মনের অবদমিত আবেগ-প্রক্ষোভের তাড়না যতটা না থাকে, তার চেয়ে বেশি করে বাড়ে দিন-দিন যে শারীরিক অক্ষমতা বাড়তে থাকে তারই বাস্তব মনোবেদনা এবং মৃত্যু সম্ভাবনার আশঙ্কা।

বয়স বাড়তে থাকলে যেসব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা জাগে, সেগুলির পেছনে অনেক রকমের কারণ থাকে। এর মধ্যে একটি কারণ হলো, নিজের সম্পর্কে আস্থা হারানো। কোনো মানুষ যত বৃদ্ধ হবে, ততই তার চোখের সামনে সমসাময়িক মানুষের ব্যাধি বা মৃত্যু দেখতে হবে, আর ততই জাগবে বিষণ্ণ মনোভাব। ঐ সব ব্যাধিগ্রস্ত বা মৃত লোকেরা যতই সমবয়সী এবং সমশ্রেণীভুক্ত হবে, বিষণ্ণতা ততই গভীর হবে এই ভাবনায় যে, একই ভাগ্য তাঁরও হতে পারে। স্বাভাবিক সুস্থ কোনো বৃদ্ধের কোনো সহকর্মী বা বন্ধু যদি হঠাৎ করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন, তাহলে বৃদ্ধটি স্বভাবতই নিজের দেহ সম্পর্কে একটু বেশি রকম সচেতন বোধ করতে থাকবেন এবং একটু মাথা টিপ্‌টিপ্ করলেই একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

এসব ব্যাপারে ডাক্তারদের বিশেষ কিছু করার থাকে না, তবে মৃত্যুভয় সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে বৃদ্ধেরা প্রাণখোলা কথা, আলাপ করতে পারলে উপকার হয়। বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে ও বিষয়ে কথা বলে বৃদ্ধ মানুষ কোনো সুখ পায় না, কারণ সকলেই সংস্কারবশে ওসব অলক্ষুণে কথা নিয়ে আলোচনা করাটা পছন্দ করে না, এড়িয়ে যেতেই চায়। বাড়ির ডাক্তার যদি বুড়ো মানুষের ঐ সব হতাশাপূর্ণ আক্ষেপের কথাগুলি মন দিয়ে শোনেন, তাহলে বিষণ্ণতার একটা পরিমাপ করতে পারেন এবং সেই মতো চিকিৎসার বিধান দিতে পারেন।

বয়স বাড়লে কাজ করবার সুযোগ-সুবিধা কমে আসে, দেহের শক্তি কমে যায়, নতুন জনমানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় গড়ে ওঠার অবকাশও থাকে না, নতুন আগ্রহও কিছু জাগে না, বেঁচে থাকার উপযোগিতাও কিছু বুঝতে পারা যায় না। তখন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মন, নিজেকে মনে হয় সমাজে অবাঞ্ছিত। দৈহিক এবং সামাজিক এই অক্ষমতার জন্যেই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে

হতে থাকে, নিরাপত্তা বোধ আহত হতে থাকে। অনেক বৃদ্ধের মনে এই সব কারণেই আতঙ্ক জাগে,—তাঁকে বুঝি দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে, আলাদা করে দেওয়া হবে। বৃদ্ধ হলে কাউকে একেবারে সব কাজের দায়িত্ব থেকে বসিয়ে দেওয়া ঠিক নয়: একটা ছোটখাটো কাজ তিনি না করলে চলবেই না, এটা তাঁকে বুঝতে দেওয়া দরকার। তাঁর পরামর্শও নিতে হয় মর্যাদা-বোধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে সাফল্য অর্জন করাই যে-সমাজের আদর্শ, সেখানে কোনো লোক ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজ করার পর যখন অবসর নিতে বাধ্য হন, অর্থাৎ রিটায়ার করেন, তখন তাঁর মনে হয়, তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযোগী নন। কাজ করে রোজগার করে আমার একটা দাম আছে, পাঁচজনের কাছে মর্যাদা পাওয়ার অধিকার আছে আমার। কয়েকজনের ওপর প্রভুত্বও করার সামর্থ্য আছে—এই মনের অহমবোধ (মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে 'ইগো') শক্তিলাভ করে। চাকরী থেকে রিটায়ার করলে হঠাৎ এই অহমবোধ আহত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

[illegible] থেকে একদিন অবসর-[illegible] ছুটি পেয়ে, অফিসে রিটায়ারমেন্টের দিন-অভিনন্দন লাভ করে, বাড়ি ফিরে এসে যে-আনন্দ জাগে মনে, সেটা সাময়িক কিছু দিন—সেটা যেন মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ারই মতো। ধীরে ধীরে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, বাড়ির সকলেও ছেলেমেয়েরা কোনটির ওপর তাঁদের মতামত [illegible] সন্তুষ্ট নয়। রিটায়ার্ড ভদ্রলোকেও বাড়িতে থাকতে থাকতে লক্ষ্য করেন, অফিস যাবার সময়ে তিনি যে মর্যাদা বাড়িতে পেতেন, এখন সেটা কমে যাচ্ছে। বাড়ির গিন্নী [illegible] মনে করেন, অবসরপ্রাপ্ত কর্তাটির বাড়িতে চুপচাপ বসে না থেকে ঘরের এটা সেটা কাজকর্ম করা উচিত, তাতে কিছু কর্তা বিরক্তি বোধ করেন. অনেক সময়ে ক্ষিপ্ত হয়েও ওঠেন। সামান্য জিনিস নিয়ে খিটিমিটি লাগে, সামান্য কষ্টকে খুব বড় বলে মনে হয়, যাকে কাছে পান তাকেই শোনাতে থাকেন, 'আহা, আগে [illegible] দেশ কাটতো গো!'

যাঁদের বন্ধুবান্ধব কম, বাইরের আগ্রহ বেশি নয়, অবসরপ্রাপ্ত বয়সে তাঁরাই বেশি কষ্ট পান। যাঁরা কর্মজীবনে কেবল কর্ম-স্থলেই প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছু আগ্রহ সীমাবদ্ধ রাখেন, তাঁদের অবসরপ্রাপ্ত জীবনে মানসিক ক্ষতির পরিমাণটা খুব বড় হয়ে ধরা পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা যায়, বাড়ির লোকেরা সবাই যেন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে কাজকর্মহীন বুড়ো মানুষটার বদ-মেজাজে; সবার ওপরেই তিনি যেন অল্পেতেই খড়্গহস্ত হয়ে উঠছেন। কেউ আর তাঁকে সইতে পারছে না। সকলেই ভাবছে, বুড়ো হলে অমনিই হয়; বুড়ো মানুষটার মনটাকে কেউ আর বিশেষভাবে বোঝবার চেষ্টা করে না। সবাই তাকে এড়িয়ে চলে. 'বুড়ো বয়সের ভীমরতি' মনে করে আমলই দেয় না। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই যে-কোনো বৃদ্ধের পক্ষেই মর্মান্তিককর। বুড়ো হলেও এখনও তাঁর দেহ-মনের অনেক কিছুই অটুট রয়েছে. কিন্তু তা সত্ত্বেও কাঁচাবয়সী অনভিজ্ঞ আত্মীয়স্বজনরা, বাচ্চারা যখন বুড়ো মানুষটাকে প্রকাশ্যে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে, তখন স্বাভাবিক বৃদ্ধমাত্রই রেগে ওঠেন, এমনকি মনের ক্ষোভে সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন. সব কিছু হারাতে বসেছেন এমনি একটা উদ্বেগ দুশ্চিন্তা মনে বাসা বাঁধতে শুরু করে. খিটি-খিটে আর বিষাদগ্রস্ত মনমরা হয়ে পড়তে থাকেন। সে বড়ো করুণ!

বিষাদগ্রস্ত বৃদ্ধ মানুষকে এই মনোবিকার থেকে রক্ষা করতে হলে তাকে আশ্বাস দিতে হবে, এই কথাই সবাই বলবে; কিন্তু কেবল ফাঁকা আশ্বাস-বাণীতে কিছু না হতেও পারে। তাই কিছু ভাববেন না বলবার আগে ডাক্তার ডেকে এনে ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে দেওয়াটাই সমীচীন। তারপরে ডাক্তারের মুখে কোনো আশ্বাস-বাণী শুনলে বৃদ্ধের মনটা হালকা হয়ে ওঠে।

একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, বৃদ্ধ হলে অনেকে বারবার ডাক্তার দেখান, তার মানে এই নয় যে কোনো পরামর্শ চান; অনেকেই শুধু প্রাণ খুলে দুটো দুঃখকষ্টের কথা বলে আসতে পারলেই খুবখুবে বোধ করেন, তৃপ্তিলাভ করেন। তখন এমন সব প্রশ্ন করেন, যেগুলির জবাবে উচ্চাঙ্গী বিজ্ঞানের তথ্য তাঁরা শুনতে চান না; শুনতে চান সাধারণ উদ্বেগ ভাবনা উপশমেরই উপযোগী তথ্য। কোনো বৃদ্ধ যদি স্ট্রোক সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেন, তবে তাঁকে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না শুনিয়ে আগে জানতে হবে কেন হঠাৎ ঐ প্রশ্নটি করলেন এবং তাঁর প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে ঠিক সেই মতো আশ্বাসজনক জবাব তাঁকে শোনাতে হবে। বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকলে সে সম্পর্কেও প্রতিবিধানের পথ বলে দিয়ে আত্মস্থ করে রাখতে হবে। তিনি যা যা বলতে চাইবেন, কোনো বাধা না দিয়ে সবটুকু শুনে যেতে হবে, যেন নিশ্চিন্ত হয়ে সব কথা তিনি বলতে পারেন।

অনেক সময়ে বৃদ্ধ বয়সে স্বামী বা স্ত্রী, অথবা এমন কোনো নিকটতম সঙ্গী মারা যায়, যার ওপরে খুব নির্ভর করতে হতো, তাহলে বিষাদ-মনোবিকার দেখা দেয়। বেঁচে থাকার আগ্রহ কমে যায়, দুর্বল বোধ করতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনেকে কেবল রুটিন কাজের মধ্যে কোনোরকমে দিন কাটাতে থাকেন, খিদে নষ্ট হয়ে যায়, ঘুম কমে যায়, সামান্য ব্যাপারে অত্যধিক চঞ্চল হয়ে পড়েন। চরম অবস্থায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে যায়।

এই ধরনের বিষাদ মনোবিকারগ্রস্ত বৃদ্ধদের মধ্যে কম করে শতকরা দশ জনের জরাজনিত মস্তিষ্কের আর্টেরিওস্ক্লেরো-

সিস বা ধমনী-কাঠিন্য হয়, ফলে বিষাদের কারণটা সামাজিক, মানসিক, না শারীরিক তা সব সময়ে ঠিক ধরতে পারা যায় না। তবে কিছু দিন আগে যদি কোনো দুর্বিপাক ঘটে থাকে, তাহলে সেটাকেই বিষাদের বড় একটা সামাজিক-মানসিক কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। আবার যদি লক্ষ্য করা যায়, খুব দ্রুত শারীরিক সামর্থ্য কমে যাচ্ছে, তাহলে বিষাদের মুখ্য কারণটা শরীরের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করে সেই মতো চিকিৎসা চালাতে হবে। বংশের আর-কেউ কখনো থ্রম্বসিস বা সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কিনা, সেটা জানা গেলেও অনেক সময়ে চিকিৎসার ধারা ঠিক করা সহজ হয়।

বৃদ্ধ বয়সে বিষাদগ্রস্ত হয়ে কেউ যখন খাওয়া ঘুম কমিয়ে ফেলেন, ক্রমাগত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকেন, তখন চিকিৎসা চালানো খুব শক্ত হয়ে পড়ে। কারণ এগুলোর ফলে শরীরের দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং ডাক্তারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে অবিলম্বে হাসপাতালে বা প্রশান্ত পরিবেশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে জরুরী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহবাতিক মনোবিকারও জাগে। বয়সের দরুন অনুভূতি এবং সচেতনতা কমে যায়, শুনতে দেখতে ভুল হয় বলে নানারকম ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে সন্দিগ্ধ মন গড়ে ওঠে। কোনো সন্দেহের প্রতিবাদ করলে সন্দেহ আরো গভীর হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ বয়সে একটানা যন্ত্রণাদায়ক কোনো রোগভোগ হলে কিংবা মাথায় কোনো আঘাত লাগলে, অথবা প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড বা চোখের ছানি অপারেশন হলে, অনেকক্ষেত্রে এলোমেলো চিন্তা কাজ কথা বলার লক্ষণ দেখা দেয়। হয়তো বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে ভোর মনে করে দাঁত মাজতে চান, গভীর রাতে জেগে উঠে সময় ঠিক করতে না পেরে 'ভাত দাও' বলে খেতে চাইলেন। এরকম লক্ষণ দেখা গেলেই সায়কায়াট্রিস্টের অর্থাৎ মনের ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। গ্লুকোজ, ফেনোথিয়াজাইন প্রভৃতি ওষুধ-পথ্য প্রয়োগ করে বৃদ্ধ বয়সের এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে অনেকটা স্বাভাবিক করে তোলা আজকাল সম্ভব হচ্ছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলেই বৃদ্ধ বয়সের কোনো মনোবিকার জন্মায়নি, মনে করা ঠিক নয়। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো গোঁফ দাড়ি কামানো বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরও কথাবার্তার মধ্যে অসংলগ্নভাব দেখা যায়। অনেক সময় কথাবার্তার মধ্যেও কিছু ধরা মুশকিল। হয়তো জিগ্যেস করলেন, 'আজ কত তারিখ ?'—এ প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে জবাব শুনতে পারেন, 'আজ সকালে খবরের কাগজ দেখিনি।' কিংবা প্রশ্ন করেছেন, 'কেমন কাটছে দিন ?'—জবাব পেতে পারেন, 'এই কেটে যাচ্ছে একরকম !' অনেকে প্রশ্ন শুনে শুধু খানিকটা হাসবেন, যেন প্রশ্নটা কত অদরকারী। প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার আর-একটি পন্থা লক্ষ্য করা যায়—বৃদ্ধ মনোবিকারগ্রস্ত লোক যে-প্রশ্নের জবাব দিতে চান না, তার জন্যে ঘরের কোনো লোকের দিকে ফিরে বলে ওঠেন, 'কি হে বলে দাও না, কি জিগ্যেস করছেন !' ঘরে কেউ না থাকলে প্রশ্নকর্তাকেই বলে দেন, 'ও তো তুমি সব জানোই।'

এই সব কারণে বৃদ্ধ বয়সে কার সত্যিকারের মনোবিকার হয়েছে, তা ঠিকভাবে জানতে হলে কেবল কথাবার্তা, প্রশ্ন-উত্তর এ সবের ওপর নির্ভর করা চলবে না।

কতকগুলি বিশেষ আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখলে বেশ বোঝা যায় মনোবিকার সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। যেমন বাড়ির মধ্যেই হারিয়ে যাওয়া, পাড়ায় বেরিয়ে চেনা পথও ভুলে যাওয়া, ঘুম থেকে জেগে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা, বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অকারণে দূরে চলে যাওয়া, রাস্তার গাড়িঘোড়া ভ্রূক্ষেপ না করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করা, এ সব লক্ষণ দেখলে ডাক্তারকে জানাতে হয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, কথা বলতে বলতে বিনা কারণে কেঁদে ফেললেন; ছবি দেখছেন, রেডিও শুনছেন,—হঠাৎ চঞ্চল হয়ে সামান্য বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে উঠলেন—এসব দেখলেও চিকিৎসার দেরী করতে নেই।

বৃদ্ধ বয়সে এ ধরনের মনোবিকার দেখা গেলে নানারকম প্রশ্ন করে বিরক্ত করা একেবারে উচিত নয়। অস্বাভাবিক কাজকর্মের দরুন বিদ্রূপ, বকুনি, বা প্রকাশ্যে অপমান করা খুবই ক্ষতিকর। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাতে বিষাদের গভীরতা বেড়ে গিয়ে বৃদ্ধ মানুষটির জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সাধারণত ৬৫ বছর বয়সের পর থেকেই মস্তিষ্কের ধমনী-কাঠিন্যের (আর্টেরিও-স্ক্লেরোসিস) লক্ষণগুলি ধরা পড়ে; বিবেচনাশক্তি কমে যায়, আগ্রহ থাকে না, চিন্তামূলক বিষয়ে মন দিতে পারেন না। রুটিন মতো কাজ করে চলেন, রুটিনের নড়চড় হলে বিরক্ত হন। সকালবেলা খবরের কাগজখানা হাতে না পেলে অস্থির, কিন্তু হাতে নিয়ে খুলে ধরে থাকবেন, ঠিক পড়ার মতো পড়ছেন না—তা বেশ বোঝা যায়।

কর্মজীবনে খুব হাসিখুশি মিশুকে থাকতেন যে-মানুষ, তিনিও বার্ধক্যজনিত মস্তিষ্কের ধমনী-কাঠিন্যে আক্রান্ত হতে পারেন, তবে দীর্ঘদিনের স্বভাববশত তাঁর আচরণে বিষণ্ণতার ছাপ প্রকট হতে দেখা না যেতেও পারে। তিনি বাইরের আচরণে বেশ স্বাভাবিক মনে হলেও অন্তরে মনমরা হয়ে পড়তে থাকেন।

৫৫ থেকে ৬৫ বছরের বৃদ্ধদের এইরকম মনোবিকারের সূচনা হয় বলে এই বয়সটা থেকেই তাঁদের ওপর সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হয়। জনবহুল শহরে যেখানে কেউ কাউকে দেখে না, সেখানে এই বয়সের বৃদ্ধরা নিরাপদ নন। গ্রাম পরিবেশে অল্প লোক থাকে বলে মনোবিকারবশে বুড়ো মানুষ কোনো ভুল করে ফেললে সেটা সহানুভূতির চোখে দেখবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে, এই বয়সে জনবহুল জায়গা থেকে তাদের প্রশান্ত পরিবেশে নিয়ে যেতে পারলে উপকার হয়।

বাড়ির পরিবেশ যদি ভালো হয়, দেখাশোনা করার লোক থাকে, তাহলে অনিচ্ছুক কোনো বৃদ্ধকে বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় বা হাসপাতালে নার্সিং হোমে জোর করে পাঠানো একেবারেই ঠিক নয়। বৃদ্ধের ইচ্ছা, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা বাড়ির লোকজনের মনোভাব আর আগ্রহ, এবং আর্থিক সামর্থ্য—এতগুলি বিষয় ভালোভাবে বিবেচনা করে তবে চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হয়।

মোহনের ওখানে

গোমেস্ গেল্ কোথায়, জানেন? ওয়ার্ড নম্বর ছেচল্লিশ, পোস্ট-অফিস তাল-তলা। ট্রাম যায় না, বাস যায় না, আমি যাই। আমি যাই—কালে-ভদ্রে—বন্ধুবর মোহনের বাড়িতে। গল্প করতে। হ্যাঁ, মোহন গোমেসই বটে—বাঙালী খ্রীষ্টান।

সেদিন ডায়েরির নিষ্কলংক এক পৃষ্ঠার সামনে বসে ছিলাম। কলমের টুপিটা খুলতে খুলতে ভাবছিলাম : অনেক তো লিখেছি; কি আর লেখা যেতে পারে?... পকেট থেকে বের করলাম সদ্যপ্রাপ্ত চিঠি-খানা : "মাঝে ঐসব পর্যটকের কথা পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে উঠি..." তাহলে? ও ঘরে নিচের তলায় লিলির বাচ্চাটা কাঁদছিল, পার্থ পিসির সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছিল, [illegible] পিরিয়ডটা মুখস্থ করছিল...তার উপর শুনলাম টিয়া-ও রেওয়াজ করতে শুরু করেছে। তখন বুঝলাম : ইনস্পিরেশনের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক—পরিস্থিতি প্রতিকূল।

হঠাৎ ভাবলাম মোহন গোমেসের কথা : খ্রীষ্টীয় সমাজে কথক হিসেবে ওঁর নাম আছে। দেখি, ওঁর কোনো গল্প [illegible] পাওয়া যায় কি না। বাড়ি এসে দেখি : উনি নেই, মেয়ে আছে। আমাকে নিরাশ দেখে মেয়েটি বলল : "বাবা না থাকলে কি হয়, আমি নিজেই আপনাকে একটা গল্প বলব: নিজের গল্প, স্কুলের গল্প, নিজের বোর্ডিং স্কুলের গল্প।"

মেয়েটি শুরু করল : "আমার নাম কল্যাণী গোমেস..." আমি মন্তব্য না করে পারলাম না যে, কথাটা আমার অজানা নেই; ঐ নামেই আমি নিজে ওকে ব্যাপ্টাইজ করেছি। তাতে কান না দিয়ে মেয়েটি জানাল যে, আমার একান্ত অসুবিধা না থাকলে আমি যদি চুপটি করে গল্পটি শুনে যাই, তাহলে সে—কল্যাণীকুমারী—যুগপৎ বাধিত ও কৃতজ্ঞ বোধ করতে ভুল করবে না। প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি ওকে আর ইন্টারাপ্ট করব না।

"আমার নাম কল্যাণী গোমেস, বয়স চোদ্দ, মেধাবী ছাত্রী; বাবার নাম শ্রীমোহন-কুমার গোমেস, ওরফে জগদেব, স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি করেন; মায়ের নাম...না, মায়ের নাম বলতে নেই..."প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে মেয়েটিকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, ডায়েরির পাঠকবৃন্দ কল্যাণী গোমেস নামক বঙ্গবালার চোদ্দ পুরুষের নাম-ঠিকানা জানার দুর্দমনীয় ঔৎসুক্যে না-ও ভুগতে পারেন।

মেয়েটি একটু ভাবল। এই দুটি 'ফলস্ স্টার্ট'-এ একটুও অপ্রতিভ না হয়ে অন্যভাবে ঘোড়া ছুটোল এবার। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকলাম।

বলল ওদের ক্লাবের কথা, 'মজার ক্লাবের' কথা—

কল্যাণীর গল্প

সিস্টারেরা বলেন : আমাদের সবারই নাকি আছে প্রধান একটা গুণ আর প্রধান একটা দোষ। আমার প্রধান দোষ হল গিয়ে দুর্বলতা। গায়ে নয়, মনে। নিজ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমি. চারি দিকে দেখি—কল্পনা করি—অজস্র বিপদ, অসংখ্য আশঙ্কা। এদিকে কেউ আমাকে কিছু করতে বললে ন্যায়-অন্যায় কিছু বিচার না করে তা-ই করে ফেলি আমি। মাঝে মাঝে, জানেন, পরিণাম হয় শোচনীয়।

মা সেদিন স্কুলে এসেছিলেন। অনেক কথা বলেছিলেন [বাড়ির কথা, পাড়ার কথা, পুসির কথা...], অনেক প্রশ্ন করেছিলেন [স্বাস্থ্যের কথা, ক্লাসের কথা, ডলির কথা...] আর রেখে গিয়েছিলেন এক বাক্স সন্দেশ—সেন মহাশয়ের মিঠাইখানায় কেনা টাটকা সন্দেশ।

একটি মেয়ে—বড় মেয়ে—আমাকে আর আমার মিষ্টির বাক্সটিকে দেখে বলল, আমার মা ভারি সুন্দরী...আর আমি নাকি বিলকুল তাঁরই প্রতিচ্ছবি। ওকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যাচ্ছিলাম; ও কিন্তু আমাকে থামাল, বলল ওদের ক্লাবের কথা, 'মজার ক্লাবের' কথা। সদস্য আপাতত চারজন; আমাকে নেবে ওরা, আর ক্লাবের নাম হবে পঞ্চভূত। আমি বললাম, পঞ্চভূত নামটা 'মজার ক্লাবের' উপযুক্ত নামই বটে। বললাম, আমার সুস্পষ্ট অযোগ্যতা সত্ত্বেও ওরা যে আমাকে ক্লাবের সদস্য-পদে নির্বাচিত করেছে, তাতে আমি বিশেষ আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। বললাম, সন্দেশের বাক্সটা ভূতসঙ্ঘের আর চার ভূতের সঙ্গে আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক...।

মেয়েটি বলল, "উত্তম; বাক্সটাকে কলের ঘরে রেখে আয়। অন্য সব মেয়ের সঙ্গে শুতে যাবি নিয়মমতো। ঘুমিয়ে পড়বি না কিন্তু। গির্জের চূড়ায় বড় ঘড়িতে ন-টা বাজবে যখন, তখন চুপি চুপি বেরিয়ে কলের ঘরে আসবি; আমরা থাকব তোর অপেক্ষায়। কেউ-ই যেন টের না পায়।"

"আসব..." বললাম হাসিমুখে, পঞ্চ-ভূতের পঞ্চম ভূত হওয়ার আনন্দেই।

সান্ধ্য ভোজ সেরে আমরা যখন গির্জায় গেলাম সান্ধ্য প্রার্থনা করতে, অন্তরের অন্তরে সেই দুর্বলতা আমাকে যেন আবার আক্রমণ করতে লাগল। ভাবলাম, ঐ মজার ক্লাবে যোগ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা না করলেই পারতাম। কিন্তু একটি বড় মেয়ে যখন বলেছে, তবে আর ভাবনা কি? বড় মেয়েরা আমার চেয়ে কত ভাল করে বোঝে ন্যায়-অন্যায়ের কথা!

এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে, শোবার ঘরে এসে খাটে শুয়ে জেগে-থাকার অসুবিধা একটুও বোধ করলাম না। ডর্মি-টোরির সিস্টারকে আসতে শুনলাম, চোখ

বুজলাম, ঘুমের ভান করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম. উনি ভাবলেন. লক্ষ্মীটি দিব্যি ঘুমুচ্ছে। লক্ষ্মীটি কিন্তু ঘুমুচ্ছিল না. শুধু ভাবছিল, যাবে কি না পঞ্চভূতের ক্লাবে। হঠাৎ স্থির করলাম. যাব না; বড় মেয়েরা যা-ই বলুক না কেন. যাব না। আর তখনই বাজল ন-টা, গির্জের চূড়ার বড় ঘড়িতে।

নৈশাভিযান

উঠলাম. যেন যন্ত্রচালিত হয়ে। পা বাড়ালাম কলের ঘরের অভিমুখে। দেখলুম, চারজনেই আছে—হাতে আমার সেই সন্দেশের বাক্স, আর একটা কেক্, আর কেক্ কাটার একটা ছুরি। খিদে আমার মোটেই ছিল না. ওরা কিন্তু পেট ভরে খাচ্ছিল, পেট ভরে হাসছিল, আর অনেক ঠাট্টার কথা বলছিল। ওদের হই-চই-এর মধ্যে আমাকে টানতে চাইল, পারল না। ভীষণ ভয় করতে লাগল; ধীরে ধীরে অবসন্ন মনে বুঝতে লাগলাম, আমি ওদের দলের কেউ নই...ওরা যেন অন্য পৃথিবীর মেয়ে। আমার সঙ্গে যত আলাপ জমাতে লাগল, আমি ততই মৌন থাকলাম। চোখে জল আসছিল।

ওরা পরের সভার পরিকল্পনা করল. করতে দিলাম, "আসব" বললাম; জানতাম কিন্তু আসব না। ভাবছিলাম, ওরা এখানেই ইতি টানবে। টানল না। বলল আমার 'দীক্ষার' কথা। মজার ক্লাবের সদস্যা হওয়ার জন্য দীক্ষা নাকি চাই। মনে মনে বলছিলাম, কেয়ার করি না তোমাদের মজার ক্লাবটাকে ফিরে যাই...পারলাম না ওদের বলতে। ওরা কিছুক্ষণ বলাবলি করে আমাকে বলল, বড় সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়ে "আগুনের পরশমণি" উচ্চৈস্বরে গান করতে। ওরা নাকি গানের প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে না শুনতে পেলে দীক্ষাটা হবে অবৈধ।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়িতে উঠলাম, গান ধরলাম। বড়ই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা : কড়িকাঠে প্রতিধ্বনিত গানটা আর যেন থামতে চাচ্ছে না "পুণ্য কর, পুণ্য কর"-র পুনঃপুনরুচ্চারণে। দ্বিতীয় কলিটা সেমুহূর্তেই ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ...আমার চোখেই ডোর্মিটোরি-র সিস্টারের টর্চলাইট। পালাব পালাব ভাবছিলাম...পালানো হল না : আমার সারা শরীরটা যেন জমে এসেছে ভয়ে। স্থির করলাম, এবার কাঁদব, কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চাইব...কিন্তু গানটা যে থামতে চাচ্ছে না : "সারা রাত ফোটাক তারা নব নব..."।

সিস্টার আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করতে থাকলেন, আমার চোখে টর্চলাইট রেখে। রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীর মতো লাগছিল। এবার বুঝি উনি আমার এই "দেহখানি তুলে ধরে" নাড়িয়ে ঝেড়ে ঝাঁকাবে...কিন্তু না...শুধু বললেন, অনুকম্পার স্বরে শুধু বলতে থাকলেন, "আহা রে, বেচারী লক্ষ্মীটি..."।

হঠাৎ শুনলাম, সিস্টার যেন মনে মনে বলছেন স্বপ্নভ্রমণের কথা। আমার এক বুদ্ধি এল...আস্তে আস্তে গানের তালে তালে হাঁটতে লাগলাম "আঁধারের গায়ে গায়ে" ডোর্মিটোরি-র দিকে। নিজের জায়গায় পৌঁছে খাটে উঠলাম, গানটা না থামিয়ে। সিস্টার আমাকে শোয়ালেন, চাদরে আলপিন এঁটে। গান ফুরোলে পর উনি আমার কপালে এক ক্রুশচিহ্ন এঁকে "ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন" বলে চলে গেলেন। আর আমিও অপ্রত্যাশিত এই বিপদমুক্তির জন্য ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম :

পরের দিন সিস্টার আমাকে ডেকে পাঠালেন, গত রাত্রের বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। বলতে বলতে ওঁর যেন খুব মজা লাগছিল। আমার কিন্তু একটুও মজা লাগছিল না। উনি বললেন : অনেকেরই আছে—এমন কি ওঁর এক দাদারও ছিল—এই স্বপ্নভ্রমণের অভ্যাস; এতে কিন্তু । সিস্টার বললেন । আশ্চর্য কিংবা লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণই নেই।

ওরা হাসছিল আর অনেক ঠাট্টার কথা বলছিল

আশ্চর্য ঠেকছিল না, লজ্জিত হচ্ছিলাম খুব। সব খুলে বলতে চাচ্ছিলাম—পঞ্চভূত, মজার ক্লাব আর দীক্ষার সব কথা। পারলাম না। সিস্টার ভাবলেন, স্বপ্নভ্রমণের এই সংবাদ পেয়ে আমি বুঝি মর্মে মর্মে আঘাত পেয়েছি। আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, ক্যাডবেরি খাওয়ালেন, কিছু না ভাবতে বললেন; প্রতিজ্ঞা করলেন, আমাকে ওরকম অবস্থায় আর পড়তে দেওয়া হবে না; প্রতিটি রাতে উনি নিজেই আসবেন আমার খাটের চাদরে মজবুত আলপিন আঁটতে।

অনুতপ্ত চিত্তে

কাটল সুদীর্ঘ দিন—অনুতাপ আর অনুশোচনায়। তবু শান্তি পাচ্ছিলাম না মনে। ভাবলাম, ঐ চারটি মেয়ে ভীষণ খারাপ মেয়ে। আর আমি কিনা ওদের আরও খারাপ হতে সাহায্য করেছি!...আর কত কাপুরুষ ওরা : আমাকে এমনিভাবে গান করতে বলে পালানো...। ওদের মতো মেয়ের জন্য এত স্কুলের এত দুর্নাম রটে!...ওদের আবার ভয় ছিল : আমি যদি বলে ফেলি...। বললাম না কিন্তু, কাউকেই বললাম না ঐ মজার ক্লাবের কথা। কোনো সিস্টারকেও না, কোনো মেয়েকেও না। তবু বলার ইচ্ছা. বলার তাগিদ আমাকে যেন ছাড়তে চাচ্ছিল না। বুঝলাম, না বললে শান্তি পাব না। স্থির করলাম : ফাদারকেই বলব, সাপ্তাহিক 'পাপস্বীকারে'।

শনিবার দিন এল; গেলাম। গির্জায় দাঁড়ালাম সবার সঙ্গে পাপস্বীকারের লাইনে। একের পর এক মেয়েরা ফাদারের সামনে হাঁটু গেড়ে গত সপ্তাহের পাপের তালিকা উচ্চারণ করে।"মিথ্যা কথা বলেছি, অবাধ্য হয়েছি, চিমটি কেটেছি, ক্লাসে বক বক করেছি, না বলে জিনিস নিয়েছি...আর করব না"। ফাদারের পরামর্শ শুনে, তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করে, হাত জোড় করে বেরিয়ে আসে...।

লাইনটা কমে আসছিল। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম; ভাবলাম, সব বলব—ঐ 'পাপটা' বাদ দিয়ে। হঠাৎ 'ঘুমোচ্ছিস?' বলে পিছনের মেয়েটি আমাকে ঠেলে কোমরে ঘুষি মারল। দেখলাম, আমার সামনে আর কেউ নেই—শুধু ফাদার পাপস্বীকার আসনে বসে, ওঁর অভ্যাস মতো চোখের সামনে হাত রেখে, অনুতপ্ত পাপিনীদের অপেক্ষায়। এগিয়ে এলাম বীরাঙ্গনার পদক্ষেপে।

"পরমেশ্বর তোমার অন্তরে তথা ওষ্ঠাধরে বিরাজ করুন, তুমি যেন তোমার সমস্ত পাপ, অনুতপ্ত চিত্তে, স্বীকার করতে পার..." ফাদারের আনুষ্ঠানিক আশীর্বচনের উত্তরে 'আমেন' উত্তর দিয়ে চোখ বুজে, কম্পিত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলাম মুখস্থ-করা আমার সেই পীড়াদায়ক, লজ্জাদায়ক, শঙ্কাদায়ক গল্পটা।

চলছিল বেশ। নিরাপদেই পৌঁছোলাম আমার পাপস্বীকারের "পুণ্য কর পুণ্য কর" পরিচ্ছেদে। হঠাৎ বুঝলাম, পাপস্বীকার-আসনটা যেন কাঁপছে। চোখ খুলে দেখি, ফাদার উচ্চৈস্বরে হাসছেন। হাসি থামানোর চেষ্টায় নিজের মুখে রুমাল পুরেছেন, আলখাল্লার আস্তিনে চোখ মুছছেন। আমি তো বজ্রপাতে স্তম্ভিত। আর কিছু বললাম না, শুধু দেখতে থাকলাম। তিনি তখন একটু শান্ত হয়ে বললেন, "তার পর?..." বললাম সিস্টারের আগমন, সিস্টারের টর্চলাইট, সিস্টারের "আহা রে বেচারী লক্ষ্মীটির" কথা।

আর পারা গেল না। অর্থাৎ আমি পারতে পারতাম, ফাদার কিন্তু আর পারলেন না : হিহি হোহো হাহা করে হাসতে লাগলেন। বুঝলাম, খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রলয় আসন্ন...তবুও, প্রথামতো পাপস্বীকার শেষ করে বললাম, "এই সপ্তাহে কৃত যত পাপ আর আমার সারা জীবনের সমস্ত

পাপের জন্য আমি দুঃখিত; পরমেশ্বরের কাছে আর তাঁরই প্রতিনিধি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

ইতিমধ্যে ফাদার নিজেকে অনেকটা সামলাতে পেরেছেন; একটু কাশলেন, বললেন তাঁর এই অপ্রত্যাশিত অবাঞ্ছিত হাসির জন্য তিনি সত্যি সত্যি দুঃখিত। আরও বললেন, আমার পাপস্বীকারের মধ্যে ও'র হাসি জাগাবার মতো কিছু কারণও ছিল বটে। আর সত্যি তা-ই; আমি এতক্ষণ এই কথাটা ভাবিনি কেন?...উনি আরও বললেন, লক্ষ্মী মেয়ে হতে, সবাইকে 'ভাল দৃষ্টান্ত' দেখাতে, আর ঐ ক্লাবের কথা স্মৃতি থেকে মুছে দিতে। তা-ই করব স্থির করলাম। আশ্চর্য রকম হালকা লাগল মনটা।

ক্লাবের আর কোনো সভা ডাকা হল না। ঐ চারটি মেয়ের সঙ্গে আমি ভাব করলাম। “নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচল কালো” : বুঝলাম, ওরা আসলে কোনোমতেই খারাপ মেয়ে নয়।

ইতিমধ্যে কল্যাণীর ছোট বোন এক পেয়ালা চা আর দুটি বিস্কুট নিয়ে এক তেপায়ায় রেখে বলল, “খান...।”
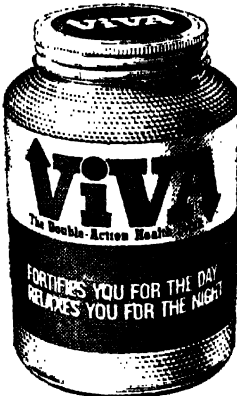
নব রসের সঙ্গীতগ্রন্থ ও বিজাপুরের দরবার

এক বড়ো সুলতানের কাহিনী। জনপ্রিয় সুশাসক; উদার, বদান্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নরপতি। পরম সাংস্কৃতিবান, শিল্পপ্রাণ। একাধারে সংগীতজ্ঞ, কবি, চিত্রকর। ধ্রুপদ আদি সংগীতরচয়িতা, গুণগ্রাহক, কলাবন্তের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষক। বহুযুগের সাংস্কৃতিক জগতে একটি অবিস্মরণীয় নাম: বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)। তাঁর সংগীতপ্রেমে বিজাপুর দরবার হয়েছে অমিত যশ ও কীর্তির অধিকারী। সহস্রাধিক সুর-শিল্পীর বিশাল সমাবেশ স্থল। গুণী-জন-ধন্য, নৃত্যে গীতে বাদ্যে ছন্দে নিত্য মুখরিত দরবার—দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের (১৫৮০-১৬২৬) সময়।

দরবারে সেই বিপুল সংগীতচর্চা শুধু, বৃথা আড়ম্বর নয়। সংগীত শিল্পীদের সঙ্গে সুলতানের নিবিড় হার্দিক যোগ। সংগীতই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধ্যান জ্ঞান। অন্তরের সাধন ও প্রাণের আরাম। সংগীতজ্ঞ কবির মর্ম সৃষ্টি তাই 'কিতাব-ই-নওরস' (নবরসের পুস্তক)—নানা রাগে গঠিত তাঁর স্বরচিত ধ্রুপদ গানের গ্রন্থ।

ইব্রাহিম আদিলের এই ধ্রুপদ সংগীত-রচনা একটি ঐতিহাসিক কীর্তি। মহারাষ্ট্রে সংগীত চর্চার ইতিহাসে ধ্রুপদের কথা এই প্রথম পাওয়া গেল। সেকালে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বিজাপুর এমনভাবে সংহত ছিল যে, রাজ্যটি মহারাষ্ট্রের অন্তর্গতরূপেই গণনীয়। অপরপক্ষে, সাঙ্গীতিক বিষয়ে মহারাষ্ট্র উত্তর ভারতীয় সংগীতধারার সঙ্গে যুক্ত, ভৌগোলিকভাবে দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত হলেও। বিন্ধ্য পর্বতমালা বিভক্ত করেছে উত্তরভারত ও দাক্ষিণাত্যের সীমা। কিন্তু উত্তর ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্য সংগীতের জন্য বিভাজন রেখা কৃষ্ণা নদী রচনা করেছে। সেকালে উত্তরাঞ্চল মহারাষ্ট্রের সংগীতচর্চা তাই উত্তর ভারতীয় ধারা অনুসারী বিজাপুরের সুলতানের ধ্রুপদ রচনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে, তা মহারাষ্ট্রের উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতি গ্রহণের সূচনা করে। যে ১৫টি রাগে আদিল শাহ তাঁর ধ্রুপদ গীতাবলী রচনা করেন, তার কোনটিই কর্ণাটকী সংগীত রীতিগত নয়।

'কিতাব-ই-নওরস'-এর পরিচয় দেওয়া

বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিল শাহ (২)

হয়েছে নিবন্ধের শেষে। প্রথমে গ্রন্থকারের বৃত্তান্ত। সংগীতজ্ঞরূপে ইব্রাহিম ধ্রুপদ সংগীত রচয়িতা; তাম্বুরিন, গীটার ধরনের সংগীতযন্ত্র ইত্যাদির বাদক; সংগীতের তত্ত্বজ্ঞ এবং এক ক্ষণজন্মা সংগীতপ্রেমিক। উক্ত পুস্তক থেকেই জানা যায়, তাঁর দরবারে একদা সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রায় চার হাজার সংগীতশিল্পী। তাঁদের তিনি তিনটি শ্রেণীতে চিহ্নিত করেন। (১) হুজুরী—এঁরা থাকতেন সুলতানের সান্নিধ্যে। (২) দরবারী—এঁরা হুজুরীদের নিকটে শিক্ষা পেতেন ও দরবারে অবস্থান করতেন। (৩) শাহরী এঁরা দরবারীদের শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন, এঁদের বাসস্থল ছিল নওরসপুরে।

অন্তত প্রায় সহস্র সংগীতগুণী ইব্রাহিমের দরবারে অনেক সময়েই অবস্থান করতেন। এত অধিক সংখ্যক শিল্পী তাঁর লাভ করবার কারণ হল, দক্ষিণ ভারতের মহা সমৃদ্ধ শিল্পী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সে রাজসভার হিন্দু গুণীমন্ডলী বিজাপুরে আশ্রয় পান সুলতানের বদান্যতায়।

সমস্ত শিল্পীদেরই সুলতান প্রতিপালন করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মাসিক বৃত্তি পেতেন সরকার থেকে; কেউ কেউ বিজাপুর, সাহপুর প্রভৃতির রাজস্ব থেকে দক্ষিণা লাভ করতেন। কেউ বা বৃহৎ জায়গীর প্রদত্ত হতেন বৃত্তির উপরন্তু।

সদা সংগীতগুণী পরিবৃত হয়েও আদিল শাহ অন্যান্য চারুকলা ও বিদ্যাচর্চার সবিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর গুণগ্রাহিতায় সর্বপ্রকার শিল্প ও সাহিত্যের নানা কৃতী ব্যক্তির মিলনস্থল হয় বিজাপুর দরবার। সে সভায় যেমন হিন্দু গায়ক বাদক পন্ডিতদের সমাবেশ, তেমনি জনপ্রিয় পারসিক কবি হুজুরি, প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ফেরিস্তা রত্ন অলংকার স্বরূপ বিরাজ করতেন। মহম্মদ কাসিম ফেরিস্তা (১৫৭০-১৬১২) ইব্রাহিমের দরবারে নিযুক্ত হন ১৫৮৯ সালে। সুলতানের নির্দেশে ও আনুকূল্যে তিনি ফরাসি ভাষায় 'তারিখ-ই-ফেরেস্তা' বা 'গুলসান-ই ইব্রাহিম' নামে বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। ফেরিস্তার বিবরণে প্রকাশ যে, আদিল শা স্বয়ং অনেক কাসিদা (এক শ্রেণীর ফরাসী কাব্য) ও গজলের রচয়িতা। কিন্তু সেসবই লুপ্ত হয়ে গেছে।

সকল প্রকার গুণী ও বিদ্বানদের মধ্যে সুলতানের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন সংগীতজ্ঞরা। তার একটি নিদর্শনস্বরূপ বলা যায় যে তাঁর দরবারের এক শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী বখতার খাঁ কলাবন্তের সঙ্গে সুলতান আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন। কোন কোন মতে, বখতার খাঁ ছিলেন আদিল শাহের অন্যতম সংগীতগুরু। বখতার খাঁ কলাবন্ত বাদশা জাহাঙ্গীরের দরবারে গুণপণা প্রদর্শন করেছিলেন, একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।...

ইব্রাহিমের পূর্ববর্তী কোন কোন আদিল শাহী সুলতানও ছিলেন কাব্য রচয়িতা। কিন্তু তাঁর তুল্য বহুমুখী প্রতিভাধর তাঁরা কেউই ছিলেন না, কিংবা এমন সংগীতজ্ঞ। দাক্ষিণাত্যেরই কুতুবশাহী দরবারের মতন বিজাপুরেও ইব্রাহিমের আগে থেকে পারসিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও সমাদরকে যুক্ত করলেন

সশ্রদ্ধচিত্তে। ক্রমে ভারতীয় কৃষ্টির ধ্যান ধারণায় গঠিত ভাবমূর্তি তার অন্তরলোকে রূপায়িত হয়ে উঠল।

সুলতানের দরবারে নিযুক্ত জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিত-দের সংখ্যা হল উল্লেখযোগ্য। বিপুলসংখ্যক হিন্দু গায়ক বাদকদের সঙ্গলাভ তিনি নিয়ত করতেন। সেই পরিবেশে এবং আপন প্রবণতায় ভারতীয় দেবদেবী-নির্ভর হয়ে ওঠে ইব্রাহিমমানস। এমন অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে করা হত যে তিনি তাঁদের ভজনাকারী ছিলেন। তাঁর একটি প্রাসাদ সংলগ্ন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব তাঁর বিশ্বাসের সমর্থকরূপে গণ্য করা যায়।

সঙ্গীতে কাব্যে চিত্রশিল্পে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে মননে চিন্তনে ভারতবর্ষীয় হয়ে-ছিলেন আদিল শাহ। তার অন্যতম প্রকাশ তাঁর ভারতীয় ভাষার চর্চায়। হিন্দী ও মারাঠী দুই ভাষাতেই তিনি আপনাকে প্রকাশিত করতেন। ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতেন মারাঠীতে। মারাঠী প্রভাবিত দাক্ষিণী হিন্দীতে সঙ্গীতাদি রচনা করতেন। ভারতীয় নাট্য ও কাব্য শাস্ত্রের নয়টি রসের তত্ত্ব বড়ই আকৃষ্ট করেছিল তাঁর চিত্তকে। সেই নবরসের ভাব প্রেরণায় তিনি স্বরচিত ধ্রুপদ সঙ্গীত গ্রন্থের নামকরণ করেন : 'কিতাব-ই-নওরস'। তাঁর সভা কবি জুহুরীর মতে, 'কিতাব' লেখকের উদ্দেশ্য ছিল—ভারতীয় সাহিত্যের নব রসের (শৃঙ্গার, বীর, বীভৎস, রুদ্র, ভয়ঙ্কর, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও শান্ত) সঙ্গে মুসলমানদের কিংবা ফরাসী-জানা পাঠকদের পরিচয় সাধন করানো।

নব রস শব্দটির প্রতি সুলতান এমন মমতা বোধ করতেন যে তাঁর পরিকল্পিত নগরীর নাম দেন : নউরসপুর। 'নউরস মহল' নামকরণ করেন সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্যে নির্দিষ্ট তাঁর প্রিয় প্রাসাদের। তাঁর রাজকীয় পতাকা (আলম-ই-নউরস') ও শীলমোহরে 'নউরস' নামটি মুদ্রিত থাকত। কোন কোন বিজাপুরী মুদ্রাতেও অঙ্কিত হত 'হান-ই-নউরস। তা ছাড়া—রাজ্যের হিসাব, রাজস্ব ও আয়-ব্যয় বিভাগের নাম 'হিসাব-ই-নউরস', একটি বিশেষ উৎসবের নাম 'ইদ-ই-নউরস', বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত শিল্পীদের নাম লস্কর-ই-নউরস। ফেরিস্তার ইতিহাসের অপর নাম 'নউরস নামা, হস্তীর নাম 'নউরস পৈকর', এক কবির লেখনী-নাম 'নউরসী' ইত্যাদিও সুলতানের ইচ্ছানুসারে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে নউরস কথাটি এমন-ভাবে জড়িত হয়ে যায় যে, ইব্রাহিম রচিত সঙ্গীতাবলীও অনেক সময় পরিচিত হত 'নউরসী গান' নামে (যথা 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' গ্রন্থে)।

ভারতীয় ভাষা ব্যবহারের ফলে তিনি নৃত্য গীতের জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদের নাম 'আনন্দ মহল' রেখেছিলেন। তেমনি তাঁর আর একটি শব্দ 'সঙ্গীত মহল' নামাঙ্কিত।

সুলতানের জনপ্রিয়তা ছিল যে 'জগদ-গুরু' উপাধিতে তাও তাঁর মহৎ চরিত্রের সঙ্গে ভারতীয় মানসিকতার কারণে। তাঁর 'কিতাব-ই-নওরসে'র অপর নাম 'তস্নিফ্-ই জগৎগুরু'—'জগৎগুরু সংকলন'। তাঁর অন্য এক উপাধি 'অবলাবন্ধী' (দুর্বলের রক্ষক) একই ভারতবর্ষীয় ভাবাপন্নতার দ্যোতক।

অথচ বিজাপুরের এই আদিল শাহী বংশ আদিতে তুরস্ক জাতীয়। প্রথম আদিল শাহ আবদুল মুজফ্ফর ইউসুফ (১৪৮৯-১৫১০) পশ্চিম এশিয়ার কোন রাজ্য থেকে নানা বিপর্যয়ের পর ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসেছিলেন। তা হল ১৪৫৬—১৪৬০ সালের কথা। দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়ে ইউসুফ আদিল তাঁর পালক-পিতা ইমাদুদ্দিনের সহায়তায় বিদর রাজ্যের সুলতান মহম্মদ বাহমনির দেহরক্ষী দলে নিযুক্ত হন। তারপর রণদক্ষতার পরিচয় দিয়ে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করে হলেন বিজাপুরের সুবাদার। অবশেষে, সুলতানের মৃত্যুতে বাহমনি রাজ্যের বিশৃংখল অবস্থায় সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে নিজেকে বিজাপুরের সুলতান-রূপে ঘোষণা করলেন (১৪৮৯)। সেই থেকে বিজাপুরে আদিল শাহী রাজ্যের পত্তন। ১৫১০-এ ইউসুফের মৃত্যুতে তাঁর পুত্র ইসমায়েল, তারপর ইসমায়েল-পুত্র প্রথম ইব্রাহিম, তাঁর পরে আলী আদিল ও শেষোক্তের পরে দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিজাপুর রাজ্যের সুলতান হন। তিনি পঞ্চম এবং তাঁর পরবর্তী তিনজনের মধ্যে শেষ সুলতান সিকান্দারের সময় বিজাপুর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত করে নেন (১৬৮৬) আওরঙ্গজেব। আটজন আদিল শাহী সুলতানদের মধ্যে দ্বিতীয় ইনি হন সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর আমলে রাজ্যের গৌরব ও প্রসিদ্ধি সব চেয়ে বৃদ্ধি পায়। ১৪৮৯ থেকে ১৬৮৬ পর্যন্ত ২০০ বছর বিজাপুর নগরীই ছিল রাজ্যের রাজধানী।

বিজাপুর কিন্তু আদিল শাহীদের তুলনায় অনেক প্রাচীন। ইউসুফ আদিলের ৪০০ বছর আগেও এ নগরীর গৌরবপূর্ণ অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রকৃত নাম 'বিজয়পুর' বিদেশীদের উচ্চারণে হয়ে পড়ে বিজাপুর। সেই বিজয়পুরে ৯৯৬ শকাব্দের (১০৭৪-৭৫ খৃঃ) একটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেকালের এক রাজা কোন যুদ্ধ জয় করে এখানে নির্মাণ করেন স্বয়ম্ভু সিদ্ধেশ্বর মন্দির—তারই প্রশস্তি-লিপি। সে মন্দির সম্ভবত মালিক কাফুরের পুত্র মারিজুদ্দিনের হাতে অন্যান্য দেব-স্থানের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।

বিজয়পুরে স্বয়ম্ভু সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সমকালে অঞ্চলটি ছিল পশ্চিম চালুক্য রাজবংশের অধীন। কিন্তু তারও বহুকাল আগে এ নগরী সগৌরবে বর্তমান ছিল। কারণ নানা প্রাচীনতর শিলালিপি, বুদ্ধদেবের বিভিন্ন উৎকৃষ্ট মূর্তি খননের ফলে উদ্ধার পেয়েছে বিজয়পুরে। কিন্তু

প্রাক-মুসলমান আমলের সে সব ইতিহাস এক প্রকার লুপ্ত।...

মধ্য যুগের পরিণতকালে চারজন সুলতানের অধীন ছিল দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমদনগর ও বিদর রাজ্য চতুষ্টয়। তাঁরা জোটবদ্ধ হয়ে (১৫৬৪) সুসমৃদ্ধ অন্ধ্র রাজ্য বিজয়নগরের রাজা রামরাজের বিরুদ্ধে মারাত্মক শত্রুতা করেছিলেন। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে তালিকোটের সেই অসম সংগ্রামে প্রথমে বিজয়ী হয়েছিলেন বিজয়নগর-নৃপতি। কিন্তু পরে রামরাজ পরাস্ত ও নিহত হলে শত্রুপক্ষীয় সেনাদল বিজয়নগরের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। বিজাপুরের সুলতান তখন আলী আদিল শাহ্ (১৫৫৭—১৫৮০)। বিজয়নগরের সেই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যে আলী আদিল বিশাল বিজাপুর নগরীকে সুরক্ষিত করে নেন। হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ করলেও রাজ্য চারটি পরস্পরের মধ্যে বিবদমান ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়তা সত্ত্বেও।

বিজাপুরের আলী আদিল শাহ আহমদনগরের সুলতান নিজাম শাহের সঙ্গে দুবেলা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। নিজের ভগ্নীকে বিবাহ দেন নিজাম শাহের পুত্রের সঙ্গে এবং স্বয়ং বিবাহ করেন নিজাম কন্যাকে। আলী আদিলের সেই বেগমই ইতিহাস-খ্যাতা চাঁদবিবি (বাঙালী নাট্যরসিকরা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নাটক থেকে যাঁর কিছু পরিচয় পেয়েছেন)।

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, নিঃসন্তান আলী আদিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহ্মাসজের পুত্র ইব্রাহিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মনোনয়নের এক বছর পরে জনৈক খোজার হাতে আলী আদিল নিহত হলে সুলতান পদে অভিষিক্ত হন ৯-বছর বয়সী ইব্রাহিম (১৫৮০)। নাবালক সুলতানের অভিভাবিকারূপে চাঁদবিবি কামিল খাঁর কাছে বাধা বসে ইব্রাহিমের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সুলতানের বিবাহ হয় হায়দরাবাদের ভাগনগরে, মহম্মদ কুলি কুতুব শাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী মালিকা জেহানের সঙ্গে।

যৌবনকাল থেকে ইব্রাহিম আদিল শাহ্ নৃপরূপে আদর্শরূপে নিজের পরিচয় দেন। সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রাঙ্কণ ইত্যাদি কলাচর্চার সঙ্গে রাজকার্যেও বিচক্ষণ, নায়ক ও দূরদর্শী দেখা যায় তাঁকে। এমন যোগ্যতা, উদারতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে শাসন যন্ত্র তিনি পরিচালনা করতেন যে, প্রজাদের মনে কোন অসন্তোষ ও অশান্তি ছিল না। সর্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়কে আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী উপাসনার স্বাধীনতা দিয়েও আস্থাভাজন হয়েছিলেন সাধারণের। অন্যদিকে, রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে শত্রুর প্রতি আচরণে তিনি যেমন দৃঢ়চিত্ত, তেমনি কূটবুদ্ধি পরায়ণ। কিন্তু সংগ্রামে বাধ্য হলে রীতিমত বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে শত্রুর সম্মুখীন হতেন। অথচ বিনা প্রয়োজনে কদাচ মত্ত হতেন না যুদ্ধের তাণ্ডবে।

তখন আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকোণ্ডা ও বিদর, দাক্ষিণাত্যের এই প্রতিবেশী চার রাজ্যের মধ্যে বিজাপুরই সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। চার সুলতানের মধ্যে ইব্রাহিম আদিলের শক্তি, সম্মান ও গুণগাথা সবচেয়ে বেশি। সেই সর্বাঙ্গীণ সুসময়ে ১৫৯৯ সালে নতুন রাজধানীর মানসে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে এক সুপরিসর নগরের ভিত্তি পত্তন করলেন। তার নামকরণ হল—নওরসপুর।

বিজাপুরের দু' ক্রোশ পশ্চিমে নওরস নগর মহাসমারোহে গঠিত হতে লাগল। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নির্মাণ আরম্ভ করলেন সৌধাবলী। সুলতানের সংগত যা নওরস মহল প্রভৃতি প্রাসাদের গঠনকার্য সম্পূর্ণ হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত উদ্যোগ আয়োজনে গড়া নওরসপুর থেকে যায় একটি অসমাপ্ত নগরী। জ্যোতির্গণনায় বিশ্বাসী সুলতানকে জ্যোতিষীরা জানালেন —এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে তাঁর অমঙ্গল ঘটবে। সুতরাং সমস্ত পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হল অর্ধপথে। আপন মনোমত নওরসনগর সম্পূর্ণ করবার সাধ ও স্বপ্ন আর তাঁর চরিতার্থ হল না।...

তবে নওরসপুর পূর্ণত নির্মিত না হলেও এবং এখানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত না হলেও নগরটি একেবারে অব্যবহার্য ও ত্যক্ত হয়নি। আদিল শাহ্ এখানে অনেক সময়ে অবস্থান করতেন এবং স্থানীয় তাঁর প্রিয় প্রাসাদ নওরস মহলে উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাটাকারে বহু সঙ্গীতানুষ্ঠান হত। সুলতান রচিত একটি গানের (দর মুকমে কানড়া নৌকল, শেষ কলিতে পাওয়া যায় যে, গুণী নগরী নামে সুপরিচিত নওরসপুরে তিনি এই সব নওরস (সঙ্গীত) রচনা করেন ঃ 'ইবরাহিম আকহে' যো কবিত নবরস নবরসপুর গুণ নগর'।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এক বিষম বিপদ ঘনিয়ে এল বিজাপুর রাজ্যে এবং সুলতানের জীবনেও। স্বাধীন দাক্ষিণাত্যের স্বর্ণাঙ্গনে মুঘল আক্রমণের কৃষ্ণ ছায়া পাত হতে লাগল। বিজাপুর দরবারের সঙ্গীতাদি বিদ্যাচর্চার সুকুমার শ্রীময়ী পরিবেশে সে এক করাল গ্রাসের সম্ভাবনা।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মুঘলাতঙ্ক

(সৈ ৬৫৭)

শুধু আকবরের আমলে নয়, আরো আগে থেকে। হুমায়ুন একবার কিছুদিনের জন্যে খান্দেশ উপস্থিত হতেই দাক্ষিণাত্য নৃপতিরা দস্তুরমত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। খাণ্ডেশের মহম্মদ সুলতান তখন একদিকে তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যকে যুদ্ধের হলাহল থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানান হুমায়ুনকে, অন্যদিকে আত্মরক্ষার জন্যে সম্মিলিত হতে আহ্বান জানান দাক্ষিণাত্য সুলতানদের। সেই সাধারণ বিপর্যয়ের মুখে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, বিদর আত্মরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু গুজরাটের আমীররা সে যাত্রা হুমায়ুনকে এমন ব্যতিব্যস্ত রাখে যে, অব্যাহতি পেয়ে যায় দাক্ষিণাত্য। তবে মুঘল অভিযানের সম্ভাবনা গত হলে চার রাজ্যের সুলতানরা পুনরায় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে মেতে ওঠেন।

এখন, ষোল শতকের শেষভাগে, দাক্ষিণাত্য সুলতানদের রাজ্যগুলিতে বিপর্যয়ের সংকেতধ্বনি করে তাঁদের পুরাণো আত্মকলহ। সুবর্ণভূমি দাক্ষিণাত্যের দিকে আকবরের বহুদিন যাবৎ লুব্ধদৃষ্টি ছিল। ১৫৯০ সালে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে মুঘল শাসন কায়েম হলে তিনি নতুন করে মন দিলেন দক্ষিণে। উপযুক্ত সুযোগও ১৫৯৫ সালের পর তাঁর মিলল। আহমদনগরের সুলতানের ওই বছরে মৃত্যু হলে নতুন করে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধল দাক্ষিণাত্যে। বিচক্ষণ ইব্রাহিম আদিল সকলকে বার বার সতর্ক করলেন মুঘল বিপদের প্রতি অবহিত হতে। কিন্তু তাঁর সাবধান বাণী সত্ত্বেও সুলতানদের চৈতন্য হল না।

আকবর পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করলেন দাক্ষিণাত্য অভিযানে। বিশাল মুঘল বাহিনী আসিরগড় অবরোধ করতে এল। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে এই দুর্গের পতন ঘটল ১৬০১ সালের জানুয়ারীতে। তার তিন মাস পরেই মুঘল শক্তি আহমদনগর অধিকার করলে (এপ্রিল, ১৬০১)।

বিজাপুরে, গোলকোণ্ডার সুলতানরা প্রমাদ গণলেন অবস্থাদৃষ্টে। এবার আকবরের বাহিনীর শিকার হবার পালা তাঁদের।

বিজাপুর সুলতান সোনার রাজ্য রক্ষার জন্যে আকবরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়াই উচিত বিবেচনা করলেন। সন্ধির প্রস্তাবে শর্তাদি সাব্যস্ত হল দূতের মাধ্যমে। ধনরত্নাদি অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে কন্যা বেগম সুলতানাকে আকবর-পুত্র দানিয়েল মীর্জার হস্তে সমর্পণ করবেন ইব্রাহিম—এই মর্মে মুঘল বাদশা সম্মত হলেন। আকবরের বয়স তখন ৬২ বছর, তাঁর মৃত্যুর মাত্র দেড় বছর আগেকার কথা—নচেৎ হয়ত 'বৃহন্নর সৌভাগ্যের সম্মুখীন হতে হত বিজাপুর নন্দিনীকে।

মুঘল পক্ষ থেকে মণিমুক্তা ইত্যাদি উপচার ও বাগ্দত্তাকে নিয়ে আসবার জন্যে আকবর তাঁর প্রতিনিধিরূপে মীর জামালুদ্দিনকে প্রেরণ করলেন।

কিন্তু বিজাপুর দরবারে জামালুদ্দিনের অবস্থান দীর্ঘায়িত হতে লাগল নানা অজুহাতে। তার গোপন কারণ, মুঘল দূতকে সুলতান আদিল শাহ্ প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করেছিলেন। গোপনতর উদ্দেশ্য—আত্মজার সঙ্গে ইব্রাহিমও এই 'বিবাহে' সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণ হয়ে যথাসাধ্য প্রয়াসী হন ক্রমাগত বিলম্ব ঘটিয়ে এড়িয়ে যাবার। দুর্দান্ত মদ্যপ দানিয়েল মীর্জার হারেমে আদরিণী কন্যাকে সম্প্রদান করতে পরম সংস্কৃতিবান, মার্জিত-রুচি আদিল শাহ্ নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। বেগম সুলতানা নিহায়েৎ বালিকা। তার বয়স ১১/১২ বছরের অনধিক (পরম সংস্কৃতিবান, মার্জিতরুচি এবং সুলতান ইব্রাহিমেরই বয়স তখন ৩৩ বছর মাত্র)। আর কুখ্যাত সুরাপায়ী, ৩২ বছর বয়স্ক দানিয়েল মীর্জা (তার এক বছর পরেই অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে)। এই মৃত্যু-পথযাত্রীর সঙ্গে কন্যার 'বিবাহ' দিতে আদিল শাহ্ সম্মত হয়েছিলেন মুঘল আক্রমণ এড়াবার জন্যে, বাধ্য হয়ে। তাই জামালুদ্দিনকে অর্থমূল্যে হস্তগত করে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু বৃথা প্রয়াস। ধূর্ত আকবর জামালুদ্দিন তথা ইব্রাহিমের অভিসন্ধি আন্দাজ করে আসাদ বেগ নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিজাপুর দরবারে পাঠালেন। কন্যাদান থেকে অব্যাহতি লাভের কোন পথ আর রইল না সুলতানের। জামালুদ্দিনের সঙ্গে ইব্রাহিম-নন্দিনীকে নিয়ে যাত্রার আয়োজন আসাদ বেগ সম্পূর্ণ করলেন। এ সময় বিজাপুর দরবারে সুলতানের সঙ্গে আসাদ বেগের যে কথোপকথন হয়, আকবর প্রসঙ্গে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিল-কন্যা সম্পর্কিত বিবরণ দেবার পর আকবরের সেই বিতর্কিত সঙ্গীত প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে।

আদরের বালিকা কন্যার সঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছায় নিজের প্রিয় হস্তী 'চঞ্চলা'কেও দশ মণ ওজনের স্বর্ণালঙ্কারের সঙ্গে উপহার দিতে বাধ্য হলেন বিজাপুর সুলতান। আসাদ বেগ ব্যক্তিগতভাবে আকবরকে নিবেদন করবার জন্যে বিজাপুর

থেকে কয়েকটি পেটিকাপূর্ণ উচ্চ মূল্যের পোর্তুগীজ সুরা' ক্রয় করলেন।

আসাদ বেগ ও জামালুদ্দিনের যাত্রা শুরু হল বিজাপুরের কিশোরী শাহ্‌জাদীকে নিয়ে। তাঁর পক্ষে কজন অনুচরী মাত্র সঙ্গিনী। 'বিবাহ' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্যে বেগম সুলতানার পিতা, মাতা কিংবা কোন আত্মীয় স্বজন নেই। মুঘল প্রহরাধীনে তিনি প্রেরিতা হলেন গোদাবরী নদীর তীরে পৈথানের উদ্দেশে। সেখানে দানিয়েল মীর্জা শিবিরে অবস্থান করছেন। কিন্তু অত দূরে পৌঁছবার অনেক পূর্বেই আর একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল এই দলের যাত্রা পথে।

মীর জামালুদ্দিন প্রভৃতির সঙ্গে শাহ্‌জাদী সীমান্তবর্তী নদীর ধারে উপনীত হলেন। সেই রাত্রে সেখানে অপেক্ষা করবার সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল। যাত্রীদলের তাম্বুগুলি উড়ে গেল প্রবল ঘূর্ণি বাত্যায়। আর সেই বিপর্যয়ের সুযোগে অন্ধকার নিশীথিনীতে রাজকুমারী মুঘল রক্ষীদের অজ্ঞাতে পলায়ন করলেন।

কিন্তু পরের দিন সকালে মীর জামালুদ্দিন বিজাপুর দুহিতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেন 'অতি লজ্জাজনকভাবে'। এইভাবে গোদাবরী নদীতীরে পৈথানে আনীতা হয়ে সুলতানের নাবালিকা কন্যাকে তাঁর সমস্ত আত্মজন থেকে বহুদূরে দানিয়েল মীর্জার সঙ্গে 'বিবাহ' দেওয়া হল (জুলাই ১৬০৪)। তার দশ মাস মাত্র পরেই (এপ্রিল, ১৬০৫) বুরহানপুরে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায় দানিয়েলের পান জর্জর দেহ।...

এখন বিজাপুর দরবারে সুলতানের সঙ্গে আসাদ বেগের সেই গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন প্রসঙ্গ। তার ভূমিকাস্বরূপ আসাদ বেগের পরিচয় আগে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর জন্ম ও বাসস্থল পারস্যের কজ্বীন। সেখান থেকে আফগানিস্তানের হিরাটে অবস্থান করবার সময় তিনি কবি ও গদ্য লেখক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তারপর ১৫৮৫ সালে ভারতের মুঘল দরবারে উপস্থিত হয়ে আবুল ফজলের অধীনে নিযুক্ত হন। ১৬০২-এ আবুল ফজল ষড়যন্ত্রে নিহত হলে আসাদ বেগ কর্মসংস্থানের প্রার্থনা জানান আকবর সকাশে। বাদশা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে বলেন, 'তোমাকে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা আমার মনে অনেকদিন থেকে ছিল। কিন্তু আবুল ফজলের কাজে ছিলে বলে আমি তা করিনি।' আসাদ বেগের প্রতি আকবরের এতখানি আস্থা ছিল যে, আবুল ফজলের প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান নেবার ভার দিয়েছিলেন তাঁকে। শুধু তাই নয়, তারপর তিনি মুঘল দরবারে প্রাপ্ত 'উপহার দ্রব্যাদির কোষাধ্যক্ষ' নিযুক্ত হন। আকবরের দরবারে যে প্রচুর পরিমাণ উপঢৌকন বাদশাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে ভেট দেওয়া হত তা চিন্তা করলে বোঝা যায়, আসাদ বেগকে কতখানি বিশ্বাস করতেন তিনি। সুতরাং বিজাপুর দরবারে মীর জামালুদ্দিনের দীর্ঘসূত্রতায় ক্রুদ্ধ হয়ে আকবর তাঁর এই অনুগত পাত্রকেই আদিল শাহের কাছে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন। আসাদ বেগ তখন প্রায় ১৮ বছর যাবৎ আকবরকে দেখেছিলেন অতি নিকট থেকে। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আসাদ বেগ যখন থেকে মুঘল দরবারে যাতায়াত করেন ও আবুল ফজলের কাছে নিযুক্ত হন, তানসেন তখনো পরিণত বয়সে দরবারে বিদ্যমান ছিলেন। ১৫৮৯ সালের ২৬ এপ্রিল তানসেনের মৃত্যু পর্যন্ত চার বছর কালে স্বনামধন্য গায়ককে দরবারে আকবরের সমক্ষে বহুবার সঙ্গীত পরিবেশন করতেও দেখেন আসাদ বেগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৫ই অক্টোবর, ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যুর পর থেকে জাহাঙ্গীরের দরবারেও আসাদ সসম্মানে ছিলেন।

মুঘল পক্ষে আদিল শাহের দরবারে দূত

নিযুক্ত আসাদ বেগ সরকারীভাবে বিজাপুরের ব্যাপারে যা কিছু করেন, বলেন, শোনেন তার যাবতীয় বৃত্তান্ত এবং ১৬০২-১৬০৫ পর্যন্ত অন্যান্য কিছু ঘটনাবলীও তিনি 'ওয়াকে ইয়ে-ই আসাদ বেগ' নামে স্বরচিত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। নিম্নলিখিত তথ্যাবলী উক্ত পুস্তক থেকেই গৃহীত হওয়ায় তাদের সত্যতা সন্দেহাতীত।

আকবর কর্তৃক দৌত্যকার্যে ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসাদ বেগ ১৬০৪ সালের ১০ই জানুয়ারি মঙ্গলবার বিজাপুর সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইব্রাহিম আদিল শাহের নিকটে বিদায় গ্রহণ করবার সময় তিনি যখন প্রাসাদে আমন্ত্রিত হন, তার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন আসাদ বেগ :

দরবারে সেদিন বিরাট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আসাদ বেগ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সময় দেখলেন, সুলতান এমন তন্ময়চিত্তে গান শুনেছেন যে, আসাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন কদাচিৎ। কিছুক্ষণের জন্যে প্রাধানত সংগীত ও সংগীতশিল্পীদের বিষয়েই কথোপকথন চলল।

ইব্রাহিম জানতে চাইলেন, 'আকবর কি সংগীত ভালবাসেন?'

আসাদ উত্তর দিলেন, 'বাদশাহ্ কখনো কখনো সংগীত শোনেন।'

তারপর সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, বাদশার সামনে গান করবার সময় তানসেন কি দণ্ডায়মান থাকতেন, না উপবিষ্ট হতেন?

আসাদ জানালেন, 'দরবারে কিংবা দিনে তানসেনকে দণ্ডায়মান অবস্থায় গান গাইতে হত। কিন্তু রাত্রে এবং নওরোজ ও ফাল্গুন উৎসবে তানসেন ও অন্যান্য গায়কেরা উপবেশনের অনুমতি পেতেন গান গাইবার সময়।'

ইব্রাহিম বললেন আসাদ বেগকে, 'সংগীত এমনই যে তা সদা সর্বদা শোনা উচিত। সংগীতশিল্পীদের সুখী রাখা উচিত।'

'আকবর সবচেয়ে বেশি কি ভালবাসেন?' বিজাপুর সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন আসাদ বেগকে।

'লড়াই করা হস্তী ও দুষ্প্রাপ্য রত্ন সংগ্রহ', আসাদের উত্তর।

এই কটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর কিন্তু আকবরের সংগীতজ্ঞতার প্রসঙ্গে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এই সমকালীন বিবৃতি নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করলে কি ধারণা সৃষ্টি হয়— ভারতের নানা শ্রেষ্ঠ গুণী তাঁর দরবারে অবস্থান সত্ত্বেও যিনি 'কখনো কখনো' গান শুনতেন; তানসেন প্রমুখ গায়কদের যাঁর দরবারে সংগীত পরিবেশন কালেও উপবেশনের অনুমতি পাওয়া যেত না, দুপের তুল্য সুক্ষ্ম কারুকলা সমন্বিত, সংগীত-অপেক্ষা রাগসংগীত দণ্ডায়মান অবস্থায় গাইতে হত; যাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল হস্তী ও মণিমাণিক্য—সেই নিরন্তর পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধবাজ মুঘল শাসক কি আদৌ সংগীতজ্ঞ ছিলেন? সংগীতপ্রিয়তাও তাঁর কতটুকু ছিল, উল্লিখিত তথ্য ও মন্তব্যাদির আলোয় উন্মুক্ত মন নিয়ে সে কথা বিচার বিবেচনা করে দেখুন আধুনিককালের আকবর-গবেষকবৃন্দ। আকবরের মৃত্যুর মাত্র দেড় বছর আগে এবং তাঁর রাজত্বের ৫০ বছর পূর্ণ হবার পরে আদিল শাহের তুল্য সংগীতৈকপ্রাণ সুলতানের 'আকবর কি সংগীত ভালবাসেন?' এই প্রশ্নের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করুন। 'সংগীত গুণীদের সুখী রাখা উচিত' ইব্রাহিমের মন্তব্য আকবরের তথাকথিত সংগীতজ্ঞ পৃষ্ঠপোষকতার অলীকতার প্রতি কটাক্ষ কিনা চিন্তা করে দেখুন। তানসেন প্রমুখ মুঘল দরবারের গুণীরা যে যথার্থ সুখী ছিলেন না, সুলতানের উক্তি থেকে এমন সন্দেহ জাগাও অসংগত নয়। আকবরের শক্তিশালী বাহিনীর আশঙ্কায় যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন, আকবরের কন্যাকে বাদশার দুর্দান্ত সুরাপায়ী, মৃত্যু-পথযাত্রী পুত্রের হারেমে দান করতে সম্মত হয়েছেন তিনিও অত্যন্ত সংযতভাবে এমন উক্তি ও মতামত প্রকাশ করেছেন যা আকবরের সংগীতজ্ঞতার বিষয়ে প্রচলিত ভ্রম-প্রমাদকে বিধ্বস্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিক-মনা গবেষকগণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করুন, আকবরের সংগীতবিষয়ে যত কিংবদন্তী পল্লবিত হয়েছে তার উৎস-মূলে কতখানি আছেন আবুল ফজলের প্রশস্তি। এবং এ বিষয়ে আবুল ফজলের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা। আকবরের সংগীতজ্ঞতা সম্পর্কে আসাদ বেগের অপক্ষপাত, নিঃস্বার্থ বিবৃতি এবং বদায়ুনী-কথিত 'নির্লজ্জ চাটুকার' আবুল ফজলের :

His majesty has composed more than 200 tunes.' 'His majesty has such a knowledge of the science of music as trained musicians did not possess' ইত্যাদি অসার স্তুতিবাক্যের মধ্যে কোনটি ঐতিহাসিক সত্য ও গ্রহণযোগ্য—সে-কথা সুধীবৃন্দের পরিশীলিত মন নিয়ে নতুন

করে বিবেচ্য ও বিচার্য। আনুষ্ঠানিক-ভাবে এ বিষয়টিও অনুধাবনযোগ্য যে, তানসেন প্রমুখ গুণীদের আকবর মুঘল দরবারে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করেছিলেন সঙ্গীতপ্রীতির কারণে অথবা নিছক দরবারী শোভা ও সম্ভ্রম জাগাবার জন্যে। অলমতি বিস্তরেণ।

আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের আমলেও মুঘল শক্তির সংস্পর্শ বিজাপুরে সুলতানের ঘটেছিল, কিন্তু সেসব বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ আদিল শাহের সঙ্গীত জীবনে তা অবান্তর।...

সুলতানের সঙ্গীতকৃতির উজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপে 'কিতাব-ই-নউরস' গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এটি তাঁর স্বরচিত সঙ্গীতাবলীর সংকলন। গানগুলি তাঁর বিভিন্ন সময়ের রচনা এবং গীত হবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতজ্ঞ ইব্রাহিম কর্তৃক নানা রাগে গঠিত হয়েছিল। সবগুলির রচনা-কাল সঠিক জানা না গেলেও বেশির ভাগই তাঁর জীবনের আকবর সম্পর্কিত অধ্যায়ের পূর্ববর্তীকালে রচিত। কারণ পুস্তকটির যে কখানি হস্তলিখিত খণ্ড সুলতানের জীবিতকালে প্রস্তুত হিসাবে পাওয়া গেছে, সবই ১৬০৪ সালের আগে লিপিবদ্ধ। মূল রচনা ফরসী অক্ষরে এবং সেকালের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে প্রচলিত 'দক্ষিণী হিন্দী' ভাষায় গ্রন্থাকার লাভ করে। সে হিন্দীতে উত্তর ভারতীয় ব্রজভাষার প্রভাবও বিদ্যমান।

তারপর সুদীর্ঘকাল পরে, হায়দরাবাদের সালার জঙ্গ মিউজিয়ম, বোম্বাইয়ের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ম প্রভৃতিতে রক্ষিত সেকালের হস্তলিখিত পুস্তক থেকে ১৯৫৬ সালে দিল্লির ভারতীয় কলা-কেন্দ্র কর্তৃক ডক্টর নাজির আহমদের সুযোগ্য গবেষণার ফলস্বরূপ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই নতুন সংস্করণে ডঃ নাজির আহমদ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাঠ নিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা ও পর্যালোচনা করে ইব্রাহিমের গীতাবলী প্রকাশ করেন। ফরসী হরফের পাশাপাশি দেবনাগরী লিপিতে গানগুলি মুদ্রিত এবং ইংরেজী অনুবাদ, টীকা, দীর্ঘ ভূমিকা ইত্যাদি যুক্ত করে ডঃ আমেদ পাঠক সাধারণকে উপহার দিয়েছেন 'কিতাব-ই-নউরস'।

গ্রন্থে আদিল শাহ্ রচিত ৫৯টি গান প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ৫৭টি গান ১৫টি সুপরিচিত উত্তর ভারতীয় রাগে গঠিত। যথা ঃ ভূপালী (২), রামকী (২), ভৈরব (৬), মারু (২), আশাবরি (২), দেশী (১), পূর্ব (১), বরারি (১), তোড়ি (8), মল্লার (৫), গৌর (২), কল্যাণ (৪), ধনাশ্রী (২) কানাড়া (১৯) ও কেদারা (৪)। দুটি মাত্র বিদেশী সুর হজিজ ও নৌরোজ-এ সুলতান একখানি করে গান রচনা করেছেন। কানাড়া বা কর্ণাট রাগ তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল মনে হয়, কারণ ১৯ খানি গান তিনি গঠন করেন কানাড়ায়। সেকালের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বিশেষ বিজাপুরে কানাড়ার সমধিক প্রচলনও তার কারণ হওয়া সম্ভব। তেমনি তৎকালীন দাক্ষিণাত্যে হয়ত সুপ্রচলিত ছিল ভৈরবও। তাঁর অন্যতম প্রিয় রাগরূপেও এটি গণনীয়। প্রতিটি গানের শীর্ষে রচয়িতা রাগের নাম নির্দিষ্ট করে সেই সঙ্গে নউরস কথাটিও যুক্ত করে দেন। যথা—দর মুকাম ভূপালী নউরস, দর মুকাম ভৈরব নউরস, দর মুকাম কনড়া নউরস ইত্যাদি।

আদিল শাহের সঙ্গীতাবলী যে ধ্রুপদ, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ধ্রুপদের চারটি তুক বা কলির পরিবর্তে এই গানগুলি তিনটি কলিতে গঠিত। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারি ও আভোগের মধ্যে ইব্রাহিম রচিত ধ্রুপদে সঞ্চারি কলিটি অনুপস্থিত। অন্তরাকে 'বৈন' বলা হয়েছে এইসব গানে ('অন্তরা' কথাটিও উল্লিখিত আছে কোন কোন রচনায়) এবং স্থায়ী অংশে কোন শিরোনাম দেওয়া নেই। আভোগ কলিটি যথানামেই পরিচিত করা আছে। 'কিতাব-ই-নউরসে'র ধ্রুপদ গানের তিন বিভাগ হওয়ার কারণ, কোন কোন মতে, ধ্রুপদ সঙ্গীতের চার তুক ও খেয়াল গানে প্রচলিত খেয়ালেও অবশ্য চার কলির অস্তিত্ব দেখা গেছে। দুই কলির মধ্যে বিবর্তন পথে আদিল শাহের গানগুলি মধ্যপন্থার ভূমিকা পালন করেছে।

গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখ্য যে, কোন কোন গানে রাগ রাগিনীর লক্ষণ বা রূপ বর্ণনা করেছেন বিজাপুরে সুলতান। যথা—রাগ আশাবরী, রাগ কেদারা, রাগিনী রামক্রি, রাগিনী কানাড় ইত্যাদি। আশাবরীর বর্ণনার শেষে আদিল শাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি লক্ষণ (গীতি) রচনা করলেন ঃ—

দর মুকাম আশাবরী নউরস
অশাবরী অম্বি গোরী চম্পক স'র
রগত পীতম্বর ক'চুকি নীলী সর্ব সিগার
অন্তরা
জোতি জোতি হাঁস বেলত পে পো
চৌপর ফাঁসে তোর
এচত বস্তর নব বর মর নার
আভোগ
চঞ্চল চপল চখ পে তরম যো অনেক পার
যো লচ্ছন আকাছ ইবর হিম কবির কার

রাগসঙ্গীতে সুলতান যে রীতিমত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাঁর নউরসের গানগুলিতে তা সুপ্রকাশ।

গানের বিষয়ের মধ্যে নানা প্রসঙ্গের সমাবেশ দেখা যায়। সুলতানের ভক্ত, কবি, প্রেমিক প্রভৃতি স্বভাবে অভিব্যক্ত প্রকাশলাভ হয়েছে তাঁর গীতাবলী। কত ভাবের মাধুর্য এই উৎকৃষ্ট গানগুলিতে দ্যুতি বিকীরণ করেছে। ভারতীয় দেবদেবীদের উদ্দেশে তিনি অন্তরের নতি জানিয়ে প্রার্থনা করেছেন নানা সঙ্গীতে। বিদ্যা ও কলা চর্চার দেবী সরস্বতী এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির দেবতা গণেশ তাঁর সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার পাত্র-পাত্রী। তাঁর হাতের প্রিয় যন্ত্র মোতি খাঁর কথা একাধিক গানে উল্লেখিত দেখা যায়। প্রিয় বেগম চাঁদ সুলতানার প্রতি প্রেমিকের সম্ভাষণ করেছেন কোন কোন গানে। তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র তাম্বুরিনের প্রতি আসক্তি একাধিক সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। অপার্থিব ও পার্থিব এমনি নানা বিষয়ের অবতারণা তিনি করেছেন।

আদিল শাহের সঙ্গীতাবলী থেকে জানা যায় সেকালে প্রচলিত নানা বাদ্যযন্ত্রের পরিচয়। যথা—(১) তত জাতীয় (অর্থাৎ তারের সুর-যন্ত্র) ঃ তাম্বুরিন, কামচা (এসরাজ ধরনের), রুবাব, যন্তর ও চাঙ্গ। (২) শুষির (অর্থাৎ ফুৎকারে বাদিত যন্ত্র) ঃ শাহ্নাই, পাবা, নাই, থলু ও উপাঙ্গ। (৩) আনদ্ধ (অর্থাৎ সঙ্গতের চর্মবাদ্য) ঃ ডুলক (ঢোলক), ডফ, হুর্গেতাল ও বিরদঙ্গ বা মৃদঙ্গ।

সুলতান তাঁর নানা গানে ভক্ত মানসিকতায় ভারতীয় দেব দেবী বন্দনা করেছেন। একটি গানে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীকে মাতা,

এবং জনপতি গণেশকে পিতারূপে নতি ও ভক্তি জানিয়েছেন তিনি :

নউরস মোর যুগ যুগ জীউ আনন সারো পূর্ণ
পুত্র সরস্বতী মাতা ইব্রাহিম প্রসাদ ভৈ দুনি
গজবদন গণেশ মাতা পিতা উত্তম্ মনু
নির্মল নপথ ফটক শীধি তাস
ইব্রাহিম কবিত কহে সো আপ নওয়াজ
পরগট কেনহু ধন নেকো রাস

তাঁর কোন কোন গানে যেমন হিন্দু পুরাণে জ্ঞান এবং ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসও সুপরিস্ফুট, তেমনি সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও লক্ষনীয় :

ইয় বন্দর বন্দনা রাস মোতি
ইয় চন্দর ইন্দু চন্দনা ঐরাবত হস্তী
ইয় বিদ্যাবধূ চন্দন জল ভাগিরথী
ইয় গিয়ানী চন্দর চন্দনা মঙ্গল বিভূতি...

প্রাতঃকালে (পবিত্র) গঙ্গাবারিতে শরীর শৌচ ও শুদ্ধ করে নেবার কথাও তিনি স্পষ্টভাবে আর একটি গানে বলেছেন :

দর মুকাম কানড়া গৌরস
পরথম সন্ধ্যা কর উন গঙ্গা নথ সোত
ভৈ ভুজা অংগ [illegible]
অন্তরা
সুতার বন্তর [illegible] ঔর চোখী ঠাঁও
পাচ্ছে জপ কর ফটিক মল সংগ
আভোগ
লিয়ো সুভ নাম শ্রীসরস্বতী কো তব
পায়ো জস নবরস সরস রংগ
ইব্রাহিম করন কহত দণ্ডবত করত তব
হোত রোম রোম ভয়ো উমংগ

ভৈরব রাগের লক্ষণ বর্ণনায় একটি গানে শিবের যোগী রূপের ঐতিহ্য মণ্ডিত পরিচয় দিয়েছেন আদিল শাহ :

ভৈরো কর পুরে গার ভাল তিলকচন্দ্র
[illegible] নেত্র জটা মগট গঙ্গাধর
একহাত রুণ্ড নর ত্রিশূল [illegible] কর
[illegible] দশিত জগ গণহাই ঈশ্বর...

গৌরী রাগিণীকে কল্পনা করেছেন সুন্দরী ব্রাহ্মণীরূপে :

পলকা পীতাম্বর বনদ লেতি
ভাং ব্রাহ্মণী আখিয় কামিনী
[illegible] নয়ন দীতি
পলকা পীতাম্বর বনদ লেতি
[illegible] ঝলক গীতি
[illegible] দৃষ্টি ঈশ পার্বতী

সুলতানের ধ্যান ধারণার পরিচয়ে আর অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ হয় নেই।

সরস্বতীর বরপুত্র আদিল শাহ্ যেন-তেন জীবন সার্থক করেছিলেন সংগীত ও বিদ্যাচর্চারূপে দেবীর আরাধনায়।

কিন্তু শান্তিতে ললিতকলা সাধনার সুযোগ তাঁর অনেক সময়েই রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে ব্যাহত হয়ে যায়।

মুঘল পর্বের পরে আহমদনগরের সেনাধ্যক্ষ মালিক অম্বর ১৬২৩ সালে বিজাপুরী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তাঁর অতি সাধের নউরসপুর লুণ্ঠনের পরে বিধ্বস্ত করে দেয়।

তার তিন বছর পরেই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন সুলতান। অভিজ্ঞ ইউরোপীয় চিকিৎসকদের যথাসাধ্য চেষ্টা, বিজাপুরে রাজ্যের সমগ্র প্রজাকুল, গুণী ও শিল্পী সমাজের প্রার্থনাকে ব্যর্থ করে তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই বিজাপুরে দরবারের মহা গৌরব যুগও অস্তাচলে যায়।

তবে সঙ্গীত জগতের স্মৃতিস্মৃতি ও কিতাব-ই-নউরসের গীতাবলী সঞ্জীবিত রেখে দিয়েছে ইব্রাহিম আদিল শাহের অমর নামটি। আর এক স্মরণের রূপরেখা ধরে বিজাপুরের দু ক্রোশ দূরে তোরবেহু গ্রামের কাছে তাঁর প্রাণের নউরসপুরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। সেই লুপ্ত নগরীর বিরাট বহিঃপ্রাকারের ভগ্নাংশ আজো দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের সাক্ষ্য হয়ে। সেখানে অতীতের নানা বাস্তু কীর্তির কঙ্কালের মধ্যে পরিকল্পিত নগরের কেন্দ্রস্থলে আর একটি উচ্চ প্রাকারে ঘেরা সেকালের নউরস মহলের ধ্বংসস্তূপ। এই বিস্তৃত-পরিধি ভগ্নাবশেষ জুড়ে উত্তপ্ত বাতাসের হা হা শব্দ কি সেই সুদূর আনন্দ-লোকের জন্যে দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়? এই মৃত ইট কাঠ পাথর এককালে কি সুর-ঝঙ্কারে প্রাণ-স্পন্দিত হত, সুলতানের অনন্য সংগীত-প্রেম ও দাক্ষিণ্যে কত মরমী শিল্পীর গীতে বাদ্যে নৃত্যে কেমন অলকাপুরীর রূপ লাবণ্য ধারণ করত সংগত মহল—আজ সেসব বিগত কাহিনী মাত্র। ঈদ-ই-নউরস নামে আদিল শাহ্ যে বিরাট উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন, মাসের ন তারিখের সঙ্গে যুক্ত শুক্রবারে যার অনুষ্ঠান হত সাড়ম্বরে, যে জন্যে কত উদ্যোগ আয়োজন ব্যবস্থাপনা, সমস্ত দরবারী শিল্পীরা যেখানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশ নিতেন, রাজ্যের তাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যাতে যোগ দিতেন সুলতানের আহ্বানে, যে সঙ্গীত সম্মেলন সার্থক হত গুণী জ্ঞানী মনীষীদের সমাবেশে, যেখানে সমবেত শিল্পীদের তিনি প্রচুর পুরস্কারে সম্মানিত করতেন—সেসব ঘটনার কেন্দ্রস্থল ছিল এই নউরস মহল। মহাকালের সর্বগ্রাসে আজ কোন দরদী পথিক হয়ত সেদিনের কথা বিমুগ্ধচিত্তে একবার স্মরণ করবেন। আর অতীতের পারাবার থেকে তাঁর কানে ভেসে আসবে কবেকার কানাড়ায় গাওয়া গানের একটি কলির রেশ :

লিয়ো সুভ নাম শ্রীসরস্বতী কো
তব পায়ো জস নউরস সরস রংগ
ইব্রাহিম করণ কহত দণ্ডবত করত
তব হোত রোম রোম ভয়ো উমংগ

(সরস্বতীর শুভ নাম যদি আমরা পুনরাবৃত্তি করি, শুধু তাহলেই পুণ্য ও মহত্ত্ব অর্জন করতে পারি। ও ইব্রাহিম, দেবীর নিকটে শুধু আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদনেই সত্যকার আনন্দ লাভ করা যায়...)

সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কলেজ ভবনে তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৫০০ নিদর্শন দেখা যায়।

ইতিপূর্বে সরকারী ও বেসরকারী আর্ট স্কুল ও কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছে। কলকাতা আর্ট কলেজের ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য হল, তাঁদের সুনির্বাচন পদ্ধতি। দু'একটি বিভাগের অল্প কয়েকটি নিদর্শন ছাড়া সবগুলিই সুনির্বাচিত ও একটি নির্দিষ্ট মানের পরিচায়ক। কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের যে একটি ঐতিহ্য ও নিজস্ব শিক্ষাধারা আছে সেটি প্রদর্শনী দেখেই বোঝা যায়। প্রাচীন অঙ্কন নিদর্শন থেকে প্রতিলিপি আঁকা থেকে শুরু করে মডেল ও লাইফ স্টাডির ওপর প্রাধান্যদান করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ সেই সঙ্গে নিয়মিতভাবে স্কেচও করে থাকেন। বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে বোঝা যায় যে সকলেই স্বাধীনভাবে আপনার মনে কাজ করেছেন। অঙ্কনরীতির দিক থেকে বিচার করলে রিয়ালিস্টিক থেকে শুরু করে আধুনিক ও বিমূর্ত রচনাও চোখে পড়ে, কিন্তু অহেতুক উগ্রপন্থী জাতীয় কোনও কাজের আভাস পাওয়া যায় না। ভাস্কর্য বিভাগে সমকালীন গঠনরীতির পরিচয় মেলে এবং প্রাচীর চিত্রবিভাগে রঙীন টালি ব্যবহারের ওপর প্রাধান্য দেখা যায়। কমার্শিয়াল বিভাগে কয়েকটি প্রচারপত্র অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখে মনে হয়, সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ সুযোগ্য শিক্ষকদের কাছে যথাযথ শিক্ষালাভ করছেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে বিশ্বপতি মাইতি, বীরেন মল্লিক, পঙ্কজ সেন চৌধুরী, বিষ্ণুপদ ধর ও দেবাশিস সরকার-এর কাজে সম্ভাবনার বীজ দেখা যায়।

ড্রয়িং ও পেন্টিং বিভাগে রিয়ালিস্টিক ও বিমূর্ত জাতীয় রচনা ছাড়াও নুড স্টাডি ও প্রতিকৃতির নিদর্শন চোখে পড়ে। দুজন শিক্ষার্থীর কাজ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বীরেন মল্লিকের ক্রাসটেশন ও বিশ্বপতি মাইতির ক্রাই। প্রথমটি বিমূর্ত শ্রেণীর, সবুজ বহিঃরেখা প্রধান কম্পোজিশনে রঙের আঁচড়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শিল্পী বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বীরেন মল্লিকের নুড স্টাডিরও নাম করা যায়। দ্বিতীয়টি ইমপ্যাস্টো রীতিতে আঁকা, গভীর রঙের স্তরভেদ লক্ষণীয়। সুকৌশল রঙ ব্যবহার পদ্ধতির জন্য গীতা ভট্টাচার্যের ডকইয়ার্ড অনেকের ভাল লাগে। প্রতিকৃতির মধ্যে রতন মিত্রের স্টাডি প্রশংসা দাবী করে। লাল রঙের স্বল্পতা কল্পনায় জন্য তাঁর রেড বিল্ডিংও মন্দ লাগে না। আঁকাবাঁকা রেখাপ্রধান কম্পোজিশনে দীপিত পালের রচনা বৈচিত্র্যের আভাস মেলে। অন্যান্য ছবির মধ্যে আশিস দাসের প্রতীকমূলক বিমূর্ত রচনা ফ্রম দি ব্যারেল অব দ্য গান, হুসেনের পূর্ণ প্রতিকৃতি ও সুমিত্রা নন্দীর ফেস্টিভ মুড-এর নাম করা যায়। গ্রাফিক ও স্কেচ বিভাগে প্রথমেই গোবিন্দ রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চাপা বাদামী রঙের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পুরোভাগে উপযুক্ত সবুজ রঙ ব্যবহার করে মূর্তির অবতারণা করেছেন। রঙ সংমিশ্রণ গুণে ছবির সামগ্রিক রূপ দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। বিশ্বপতি মাইতির ইমপ্রেশানিস্টিক স্কেচটি সুন্দর। অপরাপর ছবির মধ্যে পার্থ চৌধুরীর ইয়েলো ফিল্ড, দীপিত পালের টপলাদিক জাতীয় স্কেচ, তুষারকান্তি দাসের মাই রেকগনাইজড ফিশ ও গৌতম বসুর স্কেচ উল্লেখযোগ্য। গ্রাফিকের নিদর্শন বিশেষ উল্লেখ্য না হলেও কয়েকটি এচিং দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেমন ধীরেন মল্লিকের রিলিভো জাতীয় এচিং, আশিস দাসের ১নং এচিং, ও সুচিত্রা মিত্রের এচিং। এই প্রসঙ্গে অমর ভট্টাচার্যের উডকাট-এর নামকরা চলে। জলরঙ বিভাগে ক্ষুদিরাম মাইতির রোডসাইড সিগন্যাল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পিসারোর কিছু প্রভাব থাকলেও শিক্ষার্থী শিল্পীর সরল রঙ ব্যবহার পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত বোধ প্রশংসনীয়। সবুজ রঙের তারতম্য ও স্তরভেদ সৃষ্টির জন্য রামলাল ধরের রুইন ইন গ্রীন অনেকের চোখে পড়ে। অন্যান্য ছবির মধ্যে স্বপন নন্দীর দার্জিলিং রেল স্টেশনের নাম করা যায়। প্রাচীরচিত্র বিভাগে রঙীন টালির কয়েকটি কাজ প্রথমেই চোখে পড়ে যায়—বিশেষ করে বিমূর্ত শ্রেণীর। রঙ নির্বাচন ও সেই টালি সুসংস্থাপনের জন্য রঙীন টালির বিমূর্ত প্রাচীরচিত্রগুলি আকর্ষণীয় হয়েছে। উপযুক্ত স্থানে এগুলি যে শোভাবর্ধন করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে সেলিনা খাতুনের মোজেইক-এর নাম করা চলে। বিমূর্ত প্রাচীর চিত্র হিসাবে গীতা বর্মনের নিদর্শনও উল্লেখ্য। আরও একটি সুন্দর কাজ পঙ্কজ সেন চৌধুরীর—এগ টেম্পারায় রচিত বিমূর্ত প্রাচীরচিত্র। রেখা ও ডিম্বাকার প্রধান কাজটি দেখে অনেকেই মুগ্ধ হন। অপরাপর নমুনার মধ্যে সুভাষ বোসের আলঙ্কারিক ল্যাণ্ডস্কেপ, সুচিত্রা মিত্রের মোজেইক ও অনুপ মুখার্জীর মোজেইক উল্লেখযোগ্য। পাঁচজন শিক্ষার্থী

ভাস্করশিল্পীর ভাস্কর্য গঠনে সমকালীন রীতির সন্ধান মেলে। প্রথমেই বালে ড্যান্সার (মনোজ সরকার) চোখে পড়ে। প্লাস্টার ও জাল সহযোগে শিল্পী নর্তকীর মূর্তিটি সাবলীল আকারে গঠন করেছেন। উপবেশনের বিশিষ্ট ভংগীমার জন্য অপূর্ব সাহার পোড়ামাটির কমপোজিশন অনেকের ভাল লাগে। প্রতিকৃতির মধ্যে বিপিন জৈন-এর গায়ত্রী ও ব্রোকন হেড (প্লাস্টার)-এর নাম করা যায়। ভারতীয় বিভাগেও কয়েকটি ছবি চোখে পড়ে। অধিকাংশ শিল্পীই প্রাচীন পুরাণের পরিবর্তে দৈনন্দিন জীবনে দেখা নানা বস্তু থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। সেই সংগে আছে মিনিয়েচর শিল্পের কয়েকটি সুন্দর প্রতিলিপি। বিশ্বপতি মাইতির দুটি ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আউটিং ফর ফিশিং ও ম্যান অ্যান্ড লাইফ। শিখা চ্যাটার্জীর আলংকারিক ছবি (কুইন উইথ হার অ্যাটেন্ডান্টস) মন্দ লাগে না। অপরাপর ছবির মধ্যে লালমোহন মিস্ত্রির রিকশাওয়ালার নাম করা চলে। মিনিয়েচর শ্রেণীর ছবির মধ্যে গীতা বর্মন (৪১৫, ৪১৬), ইতি কুণ্ডুর (৪২৪) এবং ওয়াশ ও রঙ ব্যবহারের জন্য অন দি হিল-ওয়ের উল্লেখ করা যায়। এই শিক্ষার্থিনীর লেডি অন ব্যালকনিও মন্দ লাগে না।

কমার্সিয়াল বিভাগে বিজ্ঞাপন তথা প্রচার, বইয়ের প্রচ্ছদপট, শো কার্ড, ক্যালেন্ডার ডিজাইন, কভার ও প্রাচীরপত্রের নিদর্শন দেখা যায়। শ্লোগানকে প্রাধান্যদান করার জন্য কয়েকটি প্রাচীরপত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে—যেমন বিকৃপদ ধরের ১৭১ ও ১৭২। এই প্রসংগে বিকলাংগ শিশু বিষয়ে আঁকা দীপেন গুপ্তের কোলাজ রচিত প্রাচীর-পত্রেরও নাম করা উচিত মনে করি। অন্যান্য শিক্ষার্থীশিল্পীর মধ্যে গৌতম নন্দন (শো-কার্ড ও বিজ্ঞাপন), দীপক দাস (শোকার্ড), বাণীব্রত পোদ্দার (প্রচ্ছদপট), ক্যালেন্ডার পরিকল্পনায় শিউলি গুহঠাকুরতার নাম করা চলে। আরও একটি সুন্দর নিদর্শন—অনাথ শিশুদের সাহায্যকল্পে নিখিলেশ দাস-গুপ্তের আঁকা আবেদনভিত্তিক প্রাচীরপত্র। কারুশিল্প বিভাগে বাটিক, চামড়া ও কাঠের তৈরী নানা নিদর্শন দেখা যায়। প্রচলিত বাটিকের শাড়ি, স্কার্ফ ও থলি ছাড়া কয়েকটি ছবি অনেকের চোখে পড়ে—বিশেষ করে দেবাশীষ সরকারের গণেশ জননী ও পল্লীদৃশ্য। চামড়ার কাজের মধ্যে নতুন ডিজাইনের ছোট বড় মনিব্যাগ ও পোর্ট-ফোলিও ব্যাগের নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশই রঙীন কারুকার্যের জন্য চোখে পড়ে যায়। কাঠ ও কাঠ খোদাই কাজের মধ্যে নানা আকারের খেলনা, বাতিদান, ফুলদানী, ট্রে ও ধূপদানী দেখা যায়। সবগুলিই সুদৃশ্য ও ব্যবহার উপযোগী। বিশেষ করে পবন পত্তর ট্রে (দুদিকে খোদাই কারুকার্য) অনেকের চোখে পড়ে। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সুদিন মাইতির বন্ধনী প্রথার ছাপা স্টোল-এর নাম করা যায়।

*

শহরে বাস করে আমরা অনেক সময়েই ময়দানে বা রাস্তার ধারে কোনও গাছের দিকে নজর দিই না। জনাকীর্ণ শহরের মধ্যেও যখন কয়েকটি কৃষ্ণচূড়া বা পলাশের ডাল গভীর রক্তরাগে রঙীন হয়ে ওঠে তখন হয়ত অনেকেই একবার সেদিকে চেয়ে দেখেন। কিন্তু সতেজ, পত্রবহুল অথবা রুক্ষ গাছের অসংখ্য ডালপালার দিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি পড়ে না, বা দেখার প্রয়োজনও বোধ করি না। অথচ বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের ডাল-পালার মধ্যেও যে একটি বিশেষ আকার, ছন্দ ও সংগতি থাকে, সেটি রসিকজনের চোখে ধরা পড়ে। বিদেশের খ্যাতনামা কয়েকজন শিল্পী ভাস্কর গাছের ডালপালা তথা মানবদেহের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের মধ্য থেকে স্বাভাবিক আকার অবলম্বনে ভাস্কর্য-শিল্প সৃষ্টি করেছেন। জেনারেল জে জেগানাথান বিভিন্ন গাছের বিশেষ ধরনের

ডালপালা সংগ্রহ করে তাদের বিশেষ রূপ ও ছন্দ আবিষ্কার করেছেন। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তিনি সম্প্রতি এই জাতীয় ডালপালার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বলা বাহুল্য, কয়েক বছর পূর্বে শ্রীমতী অর্জুন রায় এই জাতীয় একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—দিল্লীতে সে প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছিল। স্বাভাবিক বিকাশ রূপ ও আকার অনুযায়ী জেনারেল জে জেগানাথান ডালপালাগুলিকে সংস্থাপিত করেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল তাঁর সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি। প্রত্যেকটি নিদর্শন এত স্বাভাবিক যে দেখে মনে হয় বুঝিবা ভাস্করের ভাস্কর্য নিদর্শন। প্রত্যেকটির মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে একটি বিশেষ মুড বা বক্তব্য। রূপ-দানের জন্য কোনওটিতে তিনি স্বাভাবিক রঙ রেখেছেন, আবার প্রয়োজনমত শিল্প-সৃষ্টির খাতিরে কোনটি তিনি উপযুক্ত রঙে পালিশ করেছেন, অথচ কোনও ক্ষেত্রেই সেগুলি অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কোথাও একটি মোটা ডালকে স্বাভাবিকভাবে বসিয়ে রেখেছেন, দেখে মনে হয় উপবিষ্ট কোনও লোকের পৃষ্ঠদেশ। আবার অন্য ক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি সরু ডালই তাদের বিচিত্র আকারের মধ্য দিয়েই বিশেষ একটি রূপ দান করছে।

ওরিয়েন্টাল —জেনারেল জেগানাথান

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে রিদম্, ক্লিওপেট্রা, ইক্‌স্‌টেসি ও ইভিল আইজ-এর নাম করা চলে। সজ্জাপ্রণালী ও বিশেষ করে পরিচয়লিপির জন্য জেনারেল প্রশংসা অর্জন করেন। প্রত্যেক পরিচয়লিপিই একান্ত উপযুক্ত, অন্য কিছু কল্পনাও করা যায় না। কর্মজীবনে সৈনিকের গুরুদায়িত্ব পালন করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যে রসিক ও কবি-সুলভ মনের অধিকারী পরিচয়লিপি ও আবিষ্কৃত ডালপালার মধ্য দিয়ে তার আভাস পাওয়া যায়। রুচির পরিচায়ক হিসাবে ডাল-পালাগুলি যে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

*

আকাডেমি গ্যালারীতে সম্প্রতি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা কয়েকটি ছবি প্রদর্শিত হয়। অধিকাংশই জলরঙে আঁকা ছোট ছোট প্রতিকৃতি বিশেষ, তবে পেন্সিলে আঁকা নিদর্শনও ছিল। এই সঙ্গে তাঁর আঁকা চতুষ্কোণভিত্তিক ছবি ও বিশেষ করে কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র থাকলে প্রদর্শনীটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠত। তাহলেও গগনেন্দ্র-নাথের আঁকা বিভিন্ন প্রতিকৃতির প্রদর্শনীর আয়োজন করে আকাডেমি কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হলেন—কারণ অনেকেই

গগনেন্দ্রনাথের সুকৌশল তুলিচালনা রীতি দেখার সুযোগ লাভ করলেন।

চিত্রমেলা প্রসঙ্গে

২৮শে ফাল্গুন সংখ্যার 'দেশ'-এ চিত্র-প্রদর্শনী বিষয়ক ফিচারে চিত্রপ্রিয় লিখিত মুক্তাঙ্গন শিল্পমেলা বিষয়ক প্রতিবেদনে পরিবেশিত একটি তথ্যগত ভুল সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। চিত্রপ্রিয় লিখেছেন, "বিশেষ করে প্রকাশ কর্মকারের উৎসাহে যখন প্রথম চিত্রমেলার আয়োজন করা হয় তখন অনেকেই এটিকে শিল্পী-সুলভ সাময়িক খেয়াল হিসাবে গণ্য করেছিলেন।......প্রথম বছরের সাফল্য দেখে পরে শিল্পী অসিত পাল প্রমুখ......ও সোসাইটি অফ কনটেমপোরারী আর্টিস্ট-এর পরিচিত শিল্পী-সম্ভাবৃন্দ শিল্পমেলায় যোগদান করে......।" চিত্রপ্রিয় যদি বন্ধু প্রকাশের ঢাক পিটতে চান তবে আমরা কেন অখুশী হব? তবে তিনি যদি ভুল সংবাদ পরিবেশন করে আমাদের সংস্থাকে লোক-চক্ষে ছোট করতে চান তবে আমাদের প্রতিবাদ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। সবার জ্ঞাতার্থে জানাই: প্রকাশ কর্মকারের সঙ্গে প্রথম মুক্তাঙ্গন শিল্পমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক সনৎ কর, কোষাধ্যক্ষ ছিলেন সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ বিকাশ ভট্টাচার্য। মেলা কমিটির দপ্তর ছিল সোসাইটিরই স্টুডিও ১৫৭বি ধর্মতলা স্ট্রীটে। এবং সবাই জানেন যে, আলো, মাইক্রোফোন, ডিসপ্লে স্ট্যান্ড, চায়ের ক্যান্টিন আর লেখাজোকার ব্যাপার সুসম্পন্ন করার জন্য সোসাইটির শৈলেন মিত্র, শ্যামল দত্তরায় ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর ভূমিকা কি ছিল। আর সোসাইটির শিল্পী-সম্ভাবৃন্দেরা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিনা জানার জন্য আমরা চিত্রপ্রিয় রচিত দেশ-এ প্রকাশিত প্রথম চিত্রমেলা বিষয়ক প্রতিবেদনটিকে আলোচ্য প্রতিবেদনের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করতে চাই। প্রথম মেলার মতনই দ্বিতীয় মেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন সোসাইটির শ্যামল দত্তরায় (রবীন মণ্ডলের সঙ্গে), কোষাধ্যক্ষ ছিলেন লালুপ্রসাদ সাউ আর নিম্নস্বাক্ষরকারী ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি। এ-তাবৎ কাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সব মেলার দপ্তর ছিল সোসাইটির স্টুডিওতে। এ-সব তথ্যই চিত্রপ্রিয় মশাইয়ের জানা; পুরনো দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত মেলাবিষয়ক তাঁর রচনাগুলি তার সাক্ষী। তাই মনে হয়, ভুলটা তাঁর ইচ্ছাকৃত। কি উদ্দেশ্যে, কার অনুপ্রেরণায়, কার স্বার্থে এই ইচ্ছাকৃত প্রমাদ? আর হ্যাঁ, এই অসিত পাল ভদ্রলোকটি কে?

প্রণবরঞ্জন রায়

যুগ্ম সম্পাদক, সোসাইটি অফ কনটেমপোরারী আর্টিস্টস।

গত ১৩ই মার্চের সংখ্যায় দেশ-এ চিত্র প্রদর্শনী কলামে কিছু ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। জানি না আপনার এ সংবাদের সূত্র কোথায়! সম্মিলিত কোন উদ্যোগে এ-জাতীয় খবরে শিল্পী মহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে ভেবেই আপনাকে জানাচ্ছি, সোসাইটি অফ কনটেম-পোরারী আর্টিস্ট-এর সদস্যবৃন্দ কলিকাতা চিত্রমেলার সাফল্য দেখে পরের বছর যোগ দেননি। তাঁরা প্রথম বছরে উদ্যোগপর্বেই চিত্রমেলা '৬৯-এর সহিত যুক্ত ছিলেন এবং আমাদের প্রস্তুতি কার্যালয় তাঁদের ঘরেই প্রথম থেকেই ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে আসছেন। এ ছাড়া প্রথম বছরে কোন গোষ্ঠী হিসাবে না গিয়ে বাংলা দেশের শিল্পী হিসাবে অনেকেই যোগদান করেন। এর মধ্যে অনেক গোষ্ঠীও আছেন আবার অনেক গোষ্ঠীহীন একক শিল্পীও যোগ দেন। শ্রীআসিত পাল ও শ্রীরতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছাত্র শিল্পীরা উদ্যোগপর্বেই যুক্ত ছিলেন। চিত্রমেলা '৬৯ এর প্রধান সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ববোধে এ চিঠি লেখা। আপনার চিত্র-সমালোচনা পড়ে যতদূর মনে হয়েছে, আপনি নিরপেক্ষ। যদি আপনার নিজস্ব কলমে এটা প্রকাশ করেন তবে শিল্পী মহলে ভুল সংবাদের জন্য কোন কালিমার আর অবকাশ থাকবে না। ইতি ১৪।৩।৭১

শ্রীঅমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

লেখকের বক্তব্য

কোনও বার্ষিক অনুষ্ঠান যতদিন পর্যন্ত তিন চার বছর যাবৎ সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে আয়োজিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠানটির বিষয়ে জনসাধারণের মনে একটি সন্দেহ থাকে। প্রথম চিত্রমেলা যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন তার সাফল্যে সকলেই খুশী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় চিত্র-মেলার বেলায়ও সেই কথা বলা চলে। তৃতীয়

কৃষি শিক্ষা

উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিক সমাজ বলতে বাংলার কৃষক সমাজকেই বুঝায়, এদের হাতে জমি বিশেষ নাই, আনুমানিক মোট জমির ৪০ ভাগ মাত্র হবে। পরিবার পিছু জমির মালিক এক একর থেকে দশ বারো একর। সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রথানুযায়ী, জমি বংশানুক্রমে ভাগ হয়ে হয়ে ছোট ছোট টুকরা জমিতে পরিণত হয়েছে, যা আধুনিক কৃষি খামার পরিকল্পনার প্রধান অন্তরায়। এই চাষীরা কায়িক শ্রম করে, নিজের জমি নিজে চাষ করে এবং পুঁজি ও যন্ত্রপাতির অভাবে অনেকে কিছু জমি ভাগচাষে চাষ করায়। এদের হাতে কোন পুঁজি নাই, শুধু জমিটুকুই সম্বল। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করে যে আয় হয়, তাতে খরচার অতিরিক্ত কিছুই লাভ থাকে না,, তার Lion Share টাকার দাদনদার এবং কৃষি-পণ্যের ব্যবসাদাররাই ভোগ করে। জমি থেকে যে সম্পদটুকু তৈয়ার হয়, তা থেকে বাংলা-দেশের কুকুর বিড়াল থেকে আরম্ভ করে সবাই বেঁচে আছে। বাংলাদেশের বর্তমান গ্রামীণ অর্থনীতি এইটুকু সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক সমাজ হলো, যাদের হাতে কোন জমি নাই, এদের সংখ্যা আনু-মানিক শতকরা ৪০ ভাগ হবে। এরা বেশীর ভাগই জোতদার এবং জমিদারের জমি ভাগচাষ করে এবং অনেকে কৃষক এবং জোতদারের বাড়ি শ্রম দিয়ে বা অন্যান্য শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এই উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক এবং শ্রমিক সমাজ আনুমানিক মোট জনসংখ্যার ৭০ ভাগ হবে। এই কৃষিশ্রমিকরা গ্রাম ছেড়ে শহরে বা বাংলার বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ সুবিধাই পায় নাই। এই উচ্চ ও নিম্ন শ্রমিক সমাজ গ্রামে হিংসাদ্বেষ, সাংসারিক ও গ্রামীণ কলহে জর্জরিত ও বিব্রত এবং নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

বাংলাদেশের শহর এবং গ্রামের মূল অর্থনীতি অবাঙালী সমাজের দ্বারা পরি-চালিত। শ্রমবিমুখ বাঙালী সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক কৌলিন্যের বড়াই করে তথাকথিত 'ভদ্রলোক' সেজে বসে রইলো, আর কঠোর পরিশ্রমী অবাঙালী সমাজ শ্রমিক হয়ে বাংলা দেশে এসে চা-বাগান, কলকারখানা, বড় ব্যবসা এবং জমির মালিক হয়ে বসে আছেন। শহর থেকে দূরে গ্রামে, গঞ্জে, হাটে শহরে সব জায়গায়ই এদের পাওয়া যায়। গ্রামে কৃষকের কৃষিপণ্যের বিনিময়ে, অগ্রিম টাকার দাদন, এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসা সবই এরা করছেন। এক কথায় বলতে গেলে, বাংলা দেশের মূল অর্থনীতির চাবিকাঠি হলো এদের হাতে।

গুজরাটী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী—এদের কায়িক শ্রমকে ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগে ভাগ করা যায় না। সেখানে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণও শ্রমিকের কাজ করে। সেখানে যাদের হাতে জমি এবং পুঁজি ছিলো, তারা দলবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো গ্রামের জমির উপর, ফলে গ্রামে গ্রামে সৃষ্টি হলো হাজার হাজার ছোট বড় আধুনিক কৃষিখামার এবং মানুষের শ্রমের সঙ্গে হাজার হাজার ট্রাক্টর পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির শ্রম যোগ হলো, বিরাট পুঁজি নিয়োজিত হলো, ফলে গ্রামে সৃষ্টি হলো এক বিরাট কর্মকাণ্ড। সেখানে আধুনিক চাষ বিরোধী ভূমি ব্যবস্থা, সেচ, পুঁজি, শিক্ষা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাব, সম্পদ সৃষ্টির বাধা হয়ে রইলো না। গ্রাম থেকে যে সম্পদ সৃষ্টি হলো, তা থেকে গ্রামে এবং শহরে নানা শিল্প গড়ে উঠলো। সেখানে আধুনিক কৃষকদের মধ্য থেকেই এলো মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি, প্রশাসক, সরকারী কর্মচারী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি, যার ফলে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই কৃষিভিত্তিক নেতৃত্ব, সংগঠন, পুঁজি ইত্যাদির অভাব হয় নাই।

সুজলা, সুফলা সোনার বাংলায় দেখা যাবে এর ঠিক বিপরীত এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছবি। বাংলাদেশের কোন গ্রামেই আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ ছোট বড় কৃষিখামার একটিও চোখে পড়বে না। এর কারণ কি? শুধু কি আধুনিক চাষবিরোধী ভূমির ব্যবস্থা, জল-সেচ, পুঁজি ও শিক্ষার অভাব? প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সময় প্রতিটি জিলায় Big Growers Loan হিসাবে প্রায় ৪০/৫০ হাজার টাকার কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই টাকায় বাংলাদেশে কয়টি আধুনিক কৃষিখামার সৃষ্টি হয়েছে। এখনও প্রতিটি জিলায় বহু জমিদার এবং জোত-দারের আধুনিক কৃষি খামার করার মত উপযুক্ত জমি আছে, কিন্তু কয়জন বাঙালী আধুনিক চাষকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করেছে। গ্রামের শিক্ষিত সমাজ অর্থাৎ যাদের হাতে জমি এবং পুঁজি ছিলো, তারা দল-বদ্ধভাবে জমিতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে, চলে এলো শহরে, জমি পড়ে রইলো ভাগ-চাষির হাতে, ফলে সৃষ্টি হলো গ্রামে এক বিরাট শূন্যতা এবং কালোছায়া। শ্রমবিমুখ
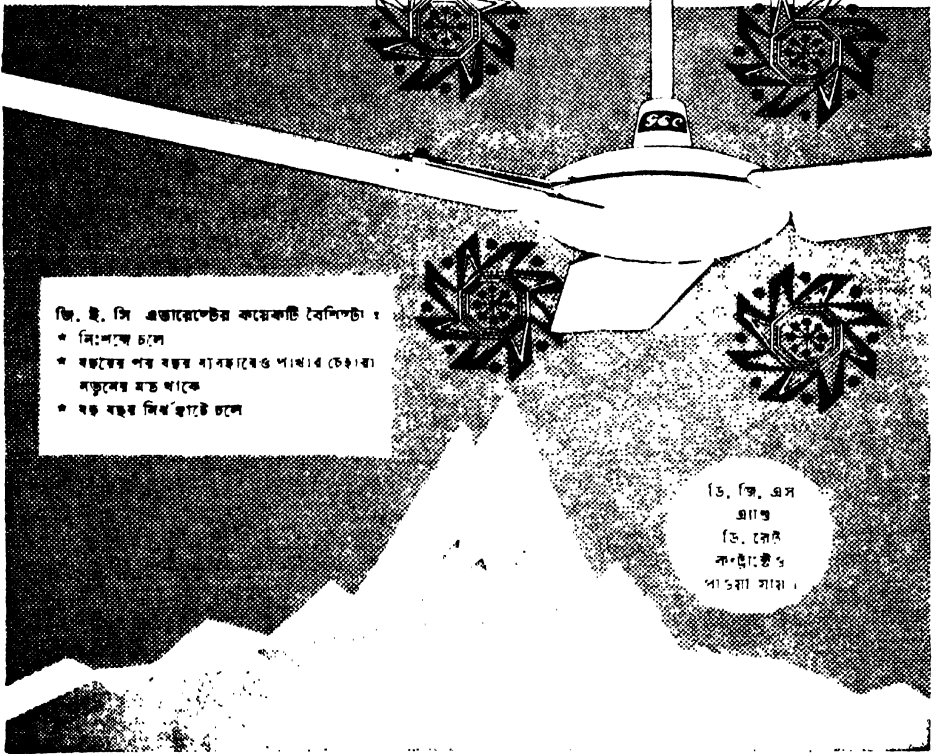
উচ্চ ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই এলেন, মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি, প্রশাসক, সরকারী কর্মচারী, সমাজসেবী, সাংবাদিক সাহিত্যিক ইত্যাদি, ফলে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বলিষ্ঠ কৃষিভিত্তিক নেতৃত্বের অভাব হলো প্রতিটি স্তরে। এই তথাকথিত শ্রমবিমুখ বুদ্ধিমান ভদ্রলোকেরা মস্তিষ্ক খাটিয়ে অর্থাৎ কায়িক শ্রমকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করতে চাইলো সম্পদ এবং সমাজকে নাগপাশে বেঁধে রাখলো শ্রমবিহীন কেরানীতে, ফলে বিগত ২৩ বৎসরে সৃষ্টি হলো লক্ষ লক্ষ বেকার।

সেই অশিক্ষিত কৃষক সমাজ যারা শুধু জমিকে আঁকড়ে রইলো, তারা গ্রামীণ ও পারিবারিক কলহে জর্জরিত হয়ে পড়লো, এবং হিংসাদ্বেষ এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারেই রয়ে গেল। কোন সুষ্ঠু কৃষি পরিকল্পনা এদের সামনে তুলে ধরা হলো না। সরকার থেকে অর্থাৎ উঁচু তলা থেকে যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হলো, যেমন বড় এবং ছোট সেচ পরিকল্পনা, কৃষি শিক্ষার প্রসার, কৃষকদের আধুনিক কৃষিতে শিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনা, কৃষি ঋণ, উন্নত বীজ, সার ও ঔষধের সরবরাহ, সমবায় আন্দোলন ইত্যাদি, কোনটাই গ্রামীণ কৃষি সম্পদ আহরণ করতে সাহায্য করলো না, সব পরিকল্পনাই কাগজে আবদ্ধ হয়ে রইলো। গ্রামীণ কুটীর শিল্প ও সমবায় আন্দোলন ধ্বংস হলো, ফলে সৃষ্টি হলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বিরাট শূন্যতা, এবং গ্রামে কৃষিভিত্তিক শিল্প আর গড়ে উঠলো না, বিগত ২৩ বৎসরে বাংলা দেশে সৃষ্টি হলো হাজার হাজার বেকার।

বাংলা দেশের গ্রামীণ জীর্ণ অর্থনীতিকে আধুনিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে পুনর্বিন্যাস করার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রস্তাব রাখছি। গ্রামীণ বাংলায় অফুরন্ত কৃষি সম্পদ এখানে সেখানে পড়ে আছে, যেমন, অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তামাক, শাকসব্জি এবং দুধ, মাংস, রেশম, ফল ইত্যাদি, কিন্তু আজও কোন সুষ্ঠু কৃষি পরিকল্পনার মাধ্যমে এই গ্রামীণ সম্পদ আহরণ করার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। গত তিন বৎসর যাবৎ জলসেচের জন্য অগভীর নলকূপ ও পাম্পসেট দেওয়ার পরিকল্পনা চালু হওয়ার পর থেকে, গ্রামে ছোট ছোট চাষীদের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। একজন ছোট চাষী উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে অধিক ফলনশীল ফসলের চাষ করে প্রতি একর জমি থেকে বৎসরে ৩০০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত লাভ (Surplus money) করছে। ছোট চাষী পরিবার যাদের জমির পরিমাণ ২ একর থেকে ১০।১২ একর তাদেরই এই চাষে বেশী উৎসাহ। এই অধিক ফলনশীল চাষের সঙ্গে যদি অধিক দুগ্ধবতী গাভী, মুরগী, রেশম এবং ফলের ও শাকসব্জির চাষ যোগ করা যায়, তবে এই ছোট চাষীরা আরো বেশী সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান অনুন্নত কৃষিকে আধুনিক কৃষিতে রূপান্তরিত করতে হলে প্রয়োজন মিশ্র কৃষি খামার পরিকল্পনা এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণ। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামে হাজার হাজার ব্যবসায়ভিত্তিক ছোট বড় মিশ্র কৃষিখামার, যৌথ খামার, সমবায় খামার, ফলের বাগান, ডেয়ারি ফার্ম, মুরগীর খামার গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করা চাট্টিখানি কথা নয়, এর পাহাড় সমান বাধা সমাজের নানা স্তরে যুগযুগান্তর ধরে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এই মৌল সমস্যাগুলি জাতীয় ভিত্তিতে

সমাধান করতে প্রয়াসী হতে হবে। এই মৌল সমস্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো :—

১। বিভিন্ন স্তরে বলিষ্ঠ কৃষিভিত্তিক নেতৃত্ব, ২। আধুনিক খামার পরিকল্পনা-বিরোধী ভূমি বিন্যাস, ৩। প্রয়োজনীয় পুঁজি, ৪। প্রয়োগভিত্তিক কৃষির শিক্ষার প্রসার, ৫। কৃষি গবেষণা, ৬। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সার, বীজ ও ঔষধ সরবরাহ ও তার প্রয়োগ, ৭। বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলন, ৮। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপনন, ৯। কায়িক শ্রমের সামাজিক মর্যাদা।

এই মৌল সমস্যাগুলি রাতারাতি সমাধান করা মোটেই সম্ভব নয়। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, সরকারী পরিকল্পনা ও প্রশাসনের উপর ভরসা করে মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধান মোটেই সম্ভব নয়। জাতীয় ভিত্তিতে প্রয়াসী হতে হবে। গ্রাম, অঞ্চল, ব্লক ও জিলাভিত্তিক প্রগতিশীল কৃষক সংগঠন, সমবায় সংস্থা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, যেমন, হিমঘর, ফল ও শাকসবজি সংরক্ষণের কারখানা, তামাক ও রেশম শিল্প, চিনির কল, চালকল, কৃষি যন্ত্রপাতির কারখানা ইত্যাদি গড়ে তুলে গ্রামে এক বিরাট কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি করতে হবে। শ্রমবিমুখ বাঙালীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমাজব্যবস্থাকে আধুনিক কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে এক সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে হবে। কায়িক শ্রমকে জাতীয় মর্যাদায় স্থান দিতে হবে।

সূর্যকান্ত মণ্ডল
মালদা

সংবাদভাষ্য

'রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য' প্রসঙ্গে শ্রীমতী ললিতা কুণ্ডুর আলোচনাটি পাঠ করে যুগপৎ বিস্মিত ও মর্মাহত হলাম। পত্রলেখিকার মোটামুটি বক্তব্য : রূপদর্শীর অধিকাংশ রচনা 'অরুচিকর' ও 'শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।' শ্রীমতী কুণ্ডু এই প্রসঙ্গে রূপদর্শীর ৬ ফেব্রুয়ারীর রচনাটি উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু 'দেশ' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে বলছি 'রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য' আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং এই লেখাটির জন্য আমি সারা সপ্তাহ সাগ্রহে অপেক্ষা করি। 'ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার ক্ষমতা রূপদর্শীর প্রশংসনীয়' শুধুমাত্র বললে রূপদর্শীর কিছুই বলা হয় না। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এক কুৎসিত পূতিগন্ধময় রাজনীতি প্রসূত ক্ষয়রোগ জনজীবনকে যে এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছে রূপদর্শী নির্ভীকভাবে বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে একদল তন্দ্রা-বিস্মৃত লোককে সেই নিষ্ঠুর সত্য সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। আমার বক্তব্য যে অতিশয়োক্তি নেই রূপদর্শীর 'মনের মুকুলকে শোষক পোকার হাত থেকে রক্ষা করুন' রচনাটি পড়লেই পত্রলেখিকা উপলব্ধি করতে পারবেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
বারাকপুর

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকা বাঙলাদেশের সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সারির স্থান অধিকার করে আছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিশেষ করে ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ৬ই মার্চ রূপদর্শীর সংবাদ ভাষ্য পাঠ করার পর আমার মত নিরপেক্ষ পাঠকেরও চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। রাজনৈতিক দল এবং নেতাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করার মত রাজনৈতিক পত্রিকার অভাব বাঙলাদেশে নেই। দেশ পত্রিকার কাছে পাঠক সাধারণ আশা করে সাহিত্য, প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা যা সমকালীন বাস্তবের স্পর্শে রঞ্জিত। এ প্রসঙ্গে গত ইং ১৩ই মার্চ আলোচনা অংশে বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা ললিতা কুণ্ডুর প্রতিবাদের সঙ্গে আমি একমত। আশা করি রূপদর্শী তাঁর কলমে শালীনতার সীমা অতিক্রম করবেন না।

দিলীপ কান্তি রায়
কলিকাতা ৫০

দৃশ্যপট

১৩ই মার্চ তারিখের দেশ পত্রিকার দৃশ্যপট পড়ে মনে হল লেখক পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের ওপর কতখানি ছায়াপাত করছে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতটি কিন্তু ঠিক এক নয়। পাকিস্তানী সমরশক্তি পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সৈন্যের ভূমিকা পালন করছে (মুজিবর সাহেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য)। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কার্যকলাপ আমাদের গৌরবের বিষয়। আমাদের পরিত্রাতা হিসাবে তারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

আর কেন্দ্রের বঞ্চনা ও উপেক্ষাকে আমাদের প্রতি সক্রিয় সহযোগিতায় পরিণত করবার যথেষ্ট সুযোগ এখনও এদেশে আছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজনের কথাটা সকলের সম্মুখে তুলে

(সি ১৩০)

ধরা যায়। একথা বোধ হয় ঠিক নয় যে বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদের মধ্যে আছে বা আসছে। কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন যে পশ্চিমবঙ্গের মত ছোট দেশের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকার চিন্তা আজকের যুগে নিতান্তই অবাস্তব এবং বিপজ্জনকও বটে। আর পূর্ব-বঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পিছনে কোন বিদেশী শক্তির ইন্ধন ছিল কিনা জানিনা তবে এটুকু বোঝা যায় যে এ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত।

স্বাভাবিক কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাগুলি আমাদের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য জাগ্রত করবে এবং একই ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী হিসাবে আমাদের সুগভীর সহানুভূতি ওপার বাংলার দিকে ধাবিত হবে এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত না থাকলেও একথা ঠিক যে সীমান্তের এপারে বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব কোনদিন প্রশ্রয় পায়নি এবং হয়ত পাবে না।

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

আনি

সংখ্যা ১৯, দেশ-এ অসীম রায়-এর 'আনি' নামক গল্পটি আমার কাছে সমসাময়িক বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সংযোজন বলে মনে হয়েছে। লেখক অজ্ঞাকের পশ্চিম বাংলার নবোদ্ভূত যুব মনস এবং সেই যুবমানসের সাথে গত কয়েক দশকের মানসিক প্রবণতার যে দুস্তর কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য এই লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই আমাদের আন্তরিক বিচার ও দৃষ্টি দাবি করে।

অরিন্দম বোস
পাটনা

॥ ২ ॥

আমি আপনাদের দেশ পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক। যদিও আমি বর্তমানে ছাত্র তবুও আপনাদের দেশ পত্রিকার প্রতিটি অংশ আমি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করি, কিন্তু আপনাদের এই দেশ পত্রিকা সম্বন্ধে আমার যে অকুণ্ঠ প্রশংসা জমা হয়ে আছে তা আমি ব্যক্ত না করে পারলাম না। কারণ আপনাদের ২৮ ফাল্গুন প্রকাশিত দেশে অসীম রায় রচিত 'আনি' নামক বাস্তব গল্পটা পড়লাম। পড়ে সত্যি বলতে কি আমার মনের মধ্যে ঠিক যে কি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শুধু এইটুকুই বলতে পারি শ্রীরায় আনি-গল্পের মাধ্যমে যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা আমাদের এই সমাজে অতি নির্মম সত্য ঘটনা—তাই পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় আনির বাবার মতন কত সন্তান আর বাবা মা'র মুখে। তখনই মনে হয়, বিপ্লব একটা দরকারই, যাতে করে আর ফুল ফুটতে ফুটতে যেন ঝরে না পড়ে যায় ঐ আনির মতন। এই গল্পের লেখককে তাঁর এই গল্পের জন্য আমার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাই।

উত্তমকুমার মল্লিক
দক্ষিণপল্লী, রহড়া।

ভ্রম সংশোধন

গত ২০ মার্চ তারিখের সংখ্যায় "অন্তর্বর্তী নির্বাচন : পশ্চিমবঙ্গের রায়" শিরোনামায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও লোকসভার সদ্য-সমাপ্ত নির্বাচনের যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভ্রমক্রমে মালদহ লোকসভা কেন্দ্রে বিজয়ী প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঐ কেন্দ্রের তৃতীয় স্থানাধিকারীর নাম, তাঁর দলের নাম ও প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা সহ উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন শ্রীমতী উমা রায় (নব কংগ্রেস); তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১,০৩,৩০৫টি।

এ ছাড়া, বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থীর সঙ্গে স্বরূপনগর কেন্দ্রের প্রাক্তন একজন বিধানসভা-সদস্যের নামের মিল থাকায় ভ্রমক্রমে তাঁর ছবি এবারের বাদুড়িয়া কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থীর বলে মুদ্রিত হয়েছে।

আমরা উপর্যুক্ত ত্রুটিদ্বয়ের জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'

সাহিত্য সংবাদে আজ আর সাহিত্য বিষয়ে কিছু লেখার কথা মনেই আসছে না। সারাদিন রেডিওর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছু একটা শুনতে চাইছি। যা শুনতে চাই, তা পাওয়া যায় না, তবু সারা দিন উৎকর্ণ খোঁজাখুঁজি।

সিনেমায় ছাড়া কখনো যুদ্ধক্ষেত্র দেখিনি, আজ মনে হচ্ছে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের পাশেই রয়েছি। এর উত্তেজনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বাংলা দেশে বহুকাল কোনো যুদ্ধ হয়নি, তার ফলে অবশ্য এ দেশটা শান্তিময়, সুজলা-সুফলা থাকতে পারেনি। বরং আমরা একটা নির্জীব ও ভ্রান্ত জাতিতে পরিণত হচ্ছিলাম। আজ বাংলা দেশে যে কারণে যুদ্ধ বেধেছে, বাঙালীর পক্ষে এর চেয়ে ন্যায্য কারণ আর হয় না।

আজ ২৭শে মার্চ, হঠাৎ খবর পাচ্ছি, শেখ মুজিবর রহমান বন্দী হয়েছেন। ছ্যাঁৎ করে উঠছে বুকের মধ্যে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, না, না, অসম্ভব। যদিও জানি, এই স্বাধীনতার সমরে মুজিবর যদি প্রাণও হারান—সেও হবে তাঁর পরম গৌরব-জনক বীরের মৃত্যু। কিন্তু এই সংকট সময়ে মুজিবরের নেতৃত্বও যে চাই। একটু বাদেই আবার খবর আসছে, মুজিবরের ধরা পড়ার খবর মিথ্যে, স্বাধীন বেতার থেকে মুজিবর সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। তখন মনে হয়, চোখের সামনে প্রথম যাকে দেখতে পাবো, তাকে আমার সব কিছু দান করে দেবো।

গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালেন। ভারত সরকার কি সিদ্ধান্ত নেবেন বা কবে সিদ্ধান্ত নেবেন জানি না—আমাদের যাওয়া উচিত, আমি যেতে চাই। এদেশ ওদেশের প্রশ্নই এখানে ওঠে না। বায়রণ গ্রীসে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, রামমোহন রায় জয়ধ্বনি করেছিলেন ফরাসী বিপ্লবের, স্পেনের মুক্তি যুদ্ধে ইংলণ্ড আমেরিকার লেখকরা লড়াই করতে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফরাসীদের রেজিস্টেন্স মুভমেণ্টে মনপ্রাণ জড়িত ছিল পৃথিবীর সকল লেখক-বুদ্ধিজীবীর।

পার্শ্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনাতন "বাংলা দেশ"কে অন্য দেশ হিসেবে ভাবতে এখনো ঠিক অভ্যস্ত হতে পারিনি আমরা। আমরা নিজেদের এখনো বাঙালী বলি, কিন্তু "বাংলা দেশ" হবে অন্য দেশ! ব্যাপারটা গোল বোতলের চৌকো কর্কের মতন নয়? তবে, এ কথাও ঠিক, পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান যেদিন "বাংলা দেশ" নাম গ্রহণ করলো, আমাদের এখানে একটুও আপত্তি জাগেনি, একটুও ঈর্ষাকাতর ভাব দেখায়নি কেউ। আমরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি, ওরা এই নামের যোগ্য।

পূর্ব বাংলার আন্দোলন প্রথম শুরুই হয়েছিল ভাষার দাবিতে। ওখানে আঠেরো বছর আগে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল তরুণেরা। বাংলা ভাষা ও বাংলা দেশের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার আন্দোলন ওখানে এমনভাবে দানা বেঁধেছে। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া বিপ্লব হয় না, এ কথা সত্য। পশ্চিম পাকিস্তানীরা চব্বিশ বছর ধরে নিষ্পেষণ করেছে বাংলা দেশকে। সেই কথাটাই আবার প্রমাণিত হলো যে, না খাইয়ে রেখে শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষকে পোষ মানিয়ে রাখা যায় না। তবে, এ কথাও ঠিক, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসাই ওখানে বিপ্লবকে এমন ত্বরান্বিত করলো। বৈপ্লবিক তত্ত্বের কপচানি কিংবা বই পড়া মুখস্থ যুক্তির চেয়ে এর আবেদন সোজা এসে হৃদয় স্পর্শ করে। একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, "বাংলা দেশে" এই অভূতপূর্ব গণজাগরণে ওখানকার কবি-লেখক-শিল্পীদের ভূমিকা অসামান্য। শেখ মুজিবর রহমান নিজেও একজন সাহিত্য রুচিসম্পন্ন মানুষ, রাজনৈতিক বক্তৃতাতেও তিনি সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন। গুরুতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি ওখানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন।

৭ই মার্চ ঢাকায় ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর পেছনে একটা নতুন পতাকা উড়ছিল। তাতে তিনটি কবিতার উদ্ধৃতি ছিল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও জীবনানন্দ দাশের। জীবনানন্দের লাইনটি দেখে আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না! রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়ের রচনা দেখে ততটা আশ্চর্য হই না, কেন না ওঁদের কিছু রচনার আনুষ্ঠানিক প্রচলন অনেক দিন থেকেই হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দ নির্জনতার কবি হিসেবে পরিচিত, এবং এখনো তিনি "আধুনিক কবি।" তবু যে জনসভায় একটা দেশের ভাগ্য নির্ধারিত হলো, সেখানে জীবনানন্দের কবিতা স্মরণ করা হয়েছিল, এটা কোন এক ধরনের গাঢ় মমতা বোধ হয়। সাহিত্য প্রেম যে এই আন্দোলনের সঙ্গে কতখানি সংশ্লিষ্ট—এই ঘটনা থেকে তা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। জীবনানন্দ দাশের রচনা পাঁতি পাঁতি করে খুঁজলেও একটও শ্লোগানধর্মী লাইন পাওয়া যাবে না, সবই নিভৃত সাহিত্য রসসিক্ত।

আমাদের এখনকার কোনো রাজনৈতিক জনসভায় এই রকম কোনো ব্যাপার কল্পনা করা যায়? যাক, ওসব কথা এখন ভেবে লাভ নেই। এই মুহূর্তে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বাংলা দেশ জিতবে। জিতবেই।

সনাতন পাঠক

পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছাত্রনেতা তারিক আলির লেখা "পাকিস্তান জঙ্গী শাসন না লোক-রাজ?" বইটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। তবে বাঙালী পাঠকের সহানুভূতি লেখক কতটা পাবেন তা সংশয়াতীত নয়। পূর্ব বাংলার
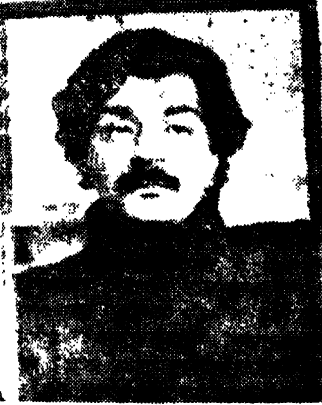
তারিক আলি

স্বাধিকারবাদী ছাত্র আন্দোলন—যা কিনা এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয় অধিকার করে আছে—তার থেকে তারিক আলির দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতই স্বতন্ত্র। তারিক আলি ট্রটস্কিপন্থী চতুর্থ ইনটারনাশনেলের একজন সক্রিয় সদস্য। চতুর্থ ইনটারনাশনেলের নবম কংগ্রেসে তিনি যোগ দেন এবং আন্তর্জাতিক কার্যকরী সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হন। বইটিতে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। পূর্ব বাংলার সম্পর্কে লেখার সময় মুজিবর রহমানের চাইতে লেখক মৌলানা ভাসানির অন্তরঙ্গতর। মুজিবর রহমানকে তিনি চিয়াং কাইশেকের বাঙালী সংস্করণ বলে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেননি। অপর দিকে মৌলানা ভাসানিকে টাইমস পত্রিকা "that hangover from the past" বলাতে লেখক বিশেষ ক্ষুব্ধ।

লাহোরের ছেলে তারিক আলি ১৯৬৩তে অকসফোর্ড য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে আসেন। সাউথ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার ফলে তিনি শীগগিরই চারিদিকে সুপরিচিত হয়ে পড়েন। ১৯৬৫তে তারিক আলি হলেন অকসফোর্ড য়ুনিভার্সিটি ইউনিয়নের প্রথম পাকিস্তানী প্রেসিডেণ্ট। য়ুরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে, উত্তর ভিয়েতনামে তিনি যথেষ্ট ভ্রমণ করেছেন। তেমনি আমেরিকা ও ফ্রান্সে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানী বামপন্থী ছাত্রদের আমন্ত্রণে তিনি পাকিস্তান সফরে আসেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিক আলি পাকিস্তানে পদার্পণ করেন। দিনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেদিনই আয়ুব খান রাজনীতি থেকে তাঁর সরে দাঁড়াবার সংকল্প ঘোষণা করেন। সেই বছরই জুন মাসে আরো একবার তিনি পাকিস্তান ঘুরে যান। প্রধানত তাঁর সফরলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপরই লেখা এই বই।

১৯৬৮ সালের মে মাসে ফ্রান্সে যে অভূতপূর্ব ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সেই বছরই নভেম্বরে পাকিস্তানে ছাত্র বিপ্লবের এক তুলনামূলক আলোচনা

Pakistan Military Rule or People's Power ? by Tariq Ali. Jonathan Cape Ltd., London. 55s. (1970).

তারিক আলি এই বইতে করেছেন। একদিক থেকে দেখলে পাকিস্তানের ছাত্র বিপ্লবের সাফল্য অভূতপূর্ব। নভেম্বরে ছেলেরা পাকিস্তানের শহরগুলির পথে পথে যে আন্দোলনের সূচনা করল ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই তার সাফল্য সূচিত হল। পৃথিবীর আর কোন দেশের ডিকটেটরকে ছাত্র আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে রাজ-

গ্রন্থ প্রচ্ছদ

নীতির মঞ্চ ছেড়ে যেতে হয়েছে? তবে পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য, আয়ুবের বদলে এলেন ইয়াহিয়া, এক ডিকটেটরের বদলে আর এক ডিকটেটর। প্রকৃত সাফল্য হাতের কাছে এসেও এল না। তবু ডিকটেটর সম্বন্ধে, মার্শাল ল' সম্পর্কে লোকের মনে জুজুর ভয় কেটে গেল। দৃষ্টিভঙ্গীর ঘটে গেল আমূল পরিবর্তন।

"আয়ুবের প্রাসাদের পতন" অধ্যায়টি সুলিখিত। আয়ুবের পতনের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক ১৯৬৯ সনের

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব বাংলার সংগ্রামের মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। আগেই বলেছি পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী নেতা মুজিবর রহমানের প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল নন। যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন এই শ্রদ্ধেয় নেতাকে একটু হেয় প্রতিপন্ন করার লোভ সামলাতে পারেননি। কিন্তু পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলনের কথা লিখতে বসে, পূর্ব বাংলার অবদানের কথা, পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্বের কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—

It was clear that East Pakistan was in the vanguard of the, struggle, and that it was giving the lead to the entire nation; and in East Pakistan itself the students dominated the political scene.

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব বাংলা যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে ছিল। ২৩শে জানুয়ারী রাত্রে জ্বলন্ত মশাল হাতে পঁচিশ হাজার ছাত্র ঢাকার পথ পরিক্রমা করেন ও তাদের এগারো দফা দাবির সমর্থনে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী এক বিরাট শোকসভায় মৌলানা ভাসানি এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবর রহমানের সঙ্গে ধৃত জাহুরুল হক জেলের মধ্যে বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যান। জাহরুল হকের মৃত্যুতে আয়োজিত এই শোকসভায় মৌলানা তার বক্তৃতা শেষ করেন—বাঙালী জাগো, আগুন জ্বালো—এই বলে। বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের মধ্যস্থল থেকে কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ব্যাপারটা যদিও কাকতালীয় ছিল তবুও সকলের চমক লেগে গিয়েছিল। আয়ুবের মুসলিম লীগের নির্মীয়মান হেডকোয়ার্টারস ভবনটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ঢাকা শহরে কারফিউ অমান্য করে হাজার, হাজার লোক বেরিয়ে আসেন। ছাত্ররা সেনাবাহিনীকে সমঝিয়ে দেন যে দেশে যখন একটা বন্যাতেই হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে সে জায়গায় স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার কয়েক শত ছেলের বুলেটের মুখে মৃত্যুতে কি বা আসে যায়। ১৮ই রাত্রিতে কারফিউ অমান্য করে শ্রমিক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের পথে বেরিয়ে আসার বেশ রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন, " . . . and Dacca became a mass of moving people"— ঢাকা শহর যেন এক চলমান জনসমুদ্রে পরিণত হল।

এরপর ২১শে আয়ুবের পাকিস্তানী রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণের ঘোষণা এবং ২২শে মুজিবর রহমানের মুক্তি লাভ।

পূর্ব বাংলার নানা সমস্যার মধ্যে ভাষা আন্দোলনের উল্লেখ লেখক অবশ্যই করেছেন। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারী বিরাট ছাত্র সমাবেশের ওপর পুলিস গুলি চালালে ছাব্বিশজন নিহত ও চার শ' জন আহত হন। তবে লেখকের মতে ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে 'সিম্বলিক' রূপ পরিগ্রহ করেছে। বছরের পর বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে তাদের অধীনস্থ কলোনি মনে করে শোষণ করে এসেছে। নানা অবিচার, অত্যাচারের ফলে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও আক্রোশ ভাষা আন্দোলনের মধ্যে প্রকাশের পথ খুঁজে পায়।

আয়ুবশাহীর প্রতি লেখকের বিরাগ লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে আছে। আয়ুবের রাজত্বের দশ বছরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে Decade of development. তারিক আলি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, ডেভেলপমেণ্ট বই কি! নিজেদের সম্পত্তি, টাকা পয়সার ডেভেলপমেণ্ট ভালই হচ্ছিল। মুষ্টিমেয় ধনশালী পরিবারের হাতে সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল এবং এই পরিবারগুলি প্রত্যেকটিই পশ্চিম পাকিস্তানের। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে এই দশ বছর হল এক অন্ধকারের যুগ। আয়ুবের "ghosted" আত্মজীবনীটির প্রতি তারিক আলির অসীম অবজ্ঞা। আর গ্রীণ বুক নামে আয়ুবের thoughts-এর সংকলনটি তিনি তাচ্ছিল্যভরে আয়ুবের অন্যতম gimmicks বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

শেষ অধ্যায় 'পাকিস্তান ও স্থায়ী বিপ্লব'এ তারিক আলি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ও বর্তমান কর্মসূচী কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারিক আলির মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অথবা ধ্বংস হয়ে যাওয়া —এ দুটির মধ্যে পাকিস্তানকে একটি বেছে নিতে হবে। তার রাজনৈতিক মতামত গ্রহণ করা বা না-করা পাঠকের রুচিসাপেক্ষ। কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী অথবা নিরপেক্ষ পাঠকের কাছেও বইটি আগ্রহের সঞ্চার করবে। মতামত অনেক সময় একপেশে হলেও বইটিতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের অনেক তথ্য পাওয়া যায়, আর লেখার ঋজু বলিষ্ঠ ভঙ্গীর জন্য পড়তেও ভাল লাগে।

কৃষ্ণা বসু

কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, 'কবিতাগুলিকে যদি আমার ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের ক্রমিক বিবর্তনের একটি অসম্পূর্ণ সূচীপত্র হিসেবে দেখা হয়, তাহলে খুশি হব।' এ-কথা বলতে পারেন যে-কোনো কবি, শ্রেষ্ঠ কবিতা বা কাব্য সংগ্রহ নামাঙ্কিত সংকলনের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু, যেকোনো কবির কাব্য সংগ্রহে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাসের বিবর্তনটি সম্ভবত এমন স্পষ্ট করে ধরা যায় না, যেমন যায় নীরেন্দ্রনাথ প্রণীত সংকলনে। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় একমাত্র, যিনি বদলেছেন দ্রুত ও ক্রমাগত, যার ফলে 'নীল নির্জন' থেকে 'কলকাতার যীশু' অবধি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থকে, প্রায় চারটি পৃথক অধ্যায়ে চারজন কবির রচনা-কর্ম বলে মনে হতে পারে। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি পরস্পরের পরিপূরক। শেষ ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে ধরা হচ্ছে 'কলকাতার যীশু' ও 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' গ্রন্থদ্বয়ের কবিতাগুলিকে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলা হচ্ছে এই কারণে যে যাকে পরিণতি বলে যার দ্ব্যর্থহীন স্ফুরণ ঘটে সমসাময়িক ইতিহাস ও ঘটনার সংঘাতে উদ্ভূত অভিজ্ঞতার দার্শনিক অভিব্যক্তিতে—নীরেন্দ্রনাথের এই পর্বের কবিতায় তা যতো স্পষ্ট ও সংহত, পূর্ববর্তী কবিতায় তা নয়।

কাব্যচর্চার গোড়ার দিকে নীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশুদ্ধ রোমান্টিক—ছন্দে যাঁর দখল অসামান্য, শব্দ যাঁর হাতে হয়ে ওঠে [illegible], বিষাদ ও অন্ধকার যাঁকে ছুঁয়ে যায় মাঝে মাঝে ('শিয়রে মৃত্যুর হাত' ও 'ঘর' কবিতা দুটি দ্রষ্টব্য); কিন্তু যাঁর

অধিকাংশ উচ্চারণই আলো হাওয়ায় উদ্ভাসিত রৌদ্রময় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে—

'কেন আর কান্নার ছায়ায়
অস্ফুট ব্যথার কানে কানে
কথা বলো, বেলা বয়ে যায়
এসো এই রৌদ্রের বাগানে।'

(রৌদ্রের বাগান/পৃঃ ২৬)

...'এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো
পোশাকে মুখ লুকিয়ে, দ্যাখো কতো না সাবধানে
আঁচলে কাচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা;

এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো
ঝরে না ভেঙে পড়ে না ঢেউ—এখানে থাকব না।'

(ঢেউ/পৃঃ ১৩)

কিন্তু, জীবনানন্দের পর বাংলা কবিতায় তন্মাত্র নিসর্গ কোনো কবির একমাত্র অভিনিবেশ হতে পারে না। নিছক প্রকৃতি-মনস্কতা কবিকে আর তাঁর অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কিত করে না—নিসর্গের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ক্রমশ পরিণত হয় ভ্রান্তিমূলক ধারণায়। এই উপলব্ধি নীরেন্দ্রনাথের কবিতাতেও অচিরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'অন্ধকার বারান্দা' গ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় ((দ্রষ্টব্য) 'জলের কল্লোল' কবিতাটি) তাঁর অপরিমিত বিশ্বাস ও শুদ্ধতায় চিড় ধরার আভাস স্পষ্ট—মনে হয় পূর্বে যা ছিল লক্ষ্য ও আশ্রয়, ক্রমশ তা রূপ নিচ্ছে লক্ষ্য-সন্ধানের উপায় হিসেবে। নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় এখন থেকেই বাজতে থাকল সন্দেহ, বিষাদ ও অস্থিরতার সুর। 'তোমাকে বলেছিলাম' কবিতাটি এইরকম, যেখানে বর্ণাঢ্য, রূপ-সচেতন, শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আকর্ষণ তাঁর কাছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তিনি—

'আজও আমার ফেরা হয়নি।
রক্তের সেই আবেগ এখন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

তবু যেন আবছা আবছা মনে পড়ে,
আমি তোমাকে বলেছিলাম।'

(তোমাকে বলেছিলাম/পৃঃ ৪৮)

মনে রাখতে হবে এখনো পাশাপাশি তিনি লিখে যাচ্ছেন 'সোনালী বৃত্তে', 'জলের দুপুরে' বা হলুদ আলোর কবিতা', যেখানে 'কারা যেন সংসারের মায়াবী কপাট/খুলে দিয়ে ঘাস, লতা, পাখির স্বভাবে/সানন্দ সুস্থির চিত্তে মিশে গেছে'; যেখানে 'পশ্চিমের মাঠে/মানুষের স্নিগ্ধ কণ্ঠ', 'তার সমস্ত আবেগ/হয়তো সংহত হয় রৌদ্রের হলুদ উত্তাপে।' কিন্তু ব্যবহৃত শব্দগুলি তাঁর 'ঢেউ বা রৌদ্রের বাগান' কবিতার মতো নিশ্চিত প্রত্যয়ব্যঞ্জক করতে পারছি না। 'কে জানে' বা 'হয়তো' গোছের সংশয়াতুর শব্দও মিশে যাচ্ছে সঙ্গে

ভ্রম সংশোধন

'দেশ'—২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১-এ (৩৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা) প্রকাশিত ৩১৭ পৃষ্ঠার বি. সরকার এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২-এর বিজ্ঞাপনে এম. এ. বাংলা সহায়িকা (৫ম—৮ম পত্র) দাম ২০, টাকার 'পরিবর্তে' ১৫, পড়িতে হইবে।

সঙ্গে। এবং মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে বলে ফেলছেন, 'দৃশ্যের ভিতর থেকে দৃশ্যের বাহিরে/প্রেম-ঘৃণা-রক্ত থেকে প্রেম-ঘৃণা রক্তের বাহিরে/গিয়ে তোর শান্তি নেই' ইত্যাদি।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে 'অন্ধকার বারান্দা' পর্যায়ের শেষ রচনা 'মৌলিক নিষাদ'। এই কবিতাটিতেই নীরেন্দ্রনাথের পরিবর্তিত, ভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ শোনা গেল। নিজের এবং কবিরা যেহেতু মানুষেরই প্রতিনিধি, সেই অর্থে মানুষের—সংকটাপন্ন, বিক্ষত ও রক্তময় অস্তিত্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর প্রিয় নিসর্গ দৃশ্যাবলীকে (দৃশ্য বলেই যেগুলি নির্বিকার ও অক্ষম) আর তিনি আশ্রয় বলে মানতে পারছেন না; কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ ও চিত্রকল্পও বিশেষভাবে পাল্টে গেছে—

'পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর নদীর ঠিক
পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি। পিতামহ,
দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর চেয়ে দেখছি,
রাত্রির আকাশে
ওঠেনি একটাও তারা আজ।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর মৃত্যুর
কাছাকাছি
নিয়েছি আশ্রয়। আমি ভিতরে বাহিরে
যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে
যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু
অন্ধকার।
পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে
বেঁচে আছি।'
(মৌলিক নিষাদ/পৃঃ ৫৮)

শুধু বিষয় পরিবর্তন বা মৌলিক নিষাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়াই নয়; বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় একই সময়ে, তাঁর প্রকরণও গেল পাল্টে। পয়ারের বহন ক্ষমতা ও শক্তি বিষয়ে এখন তিনি একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ। আগে তাঁর কবিতায় ছন্দ বাজত নিজেকে জানান দিয়ে—মাঝে মাঝে আবহ ছাড়িয়ে যেত মূল সঙ্গীতকে। মৌলিক নিষাদ-এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কবিতার গঠন আরো ঝকঝকে ও মেদহীন; শব্দ, প্রতীক, চিত্রকল্পের প্রয়োগ আরো নিপুণ ও গভীরস্পর্শী হয়েছে ঠিকই—কিন্তু, বিষয় থেকে এরা আর আলাদা হয়ে পড়ছে না।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নীরেন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি বিশদ ও প্রত্যক্ষ বিষয়-নির্ভর আলোচনার দাবি রাখে। তাঁর কবিতায় দুরূহতা নেই। কবিতাকে তিনি অভিজ্ঞতার বিমূর্ত রূপায়নকর্ম বলে ভাবেন না।

'কলকাতার যীশু' বা 'চতুর্থ সন্তান' কবিতা দুটি এই ভূমিকায় পড়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে তাঁর সমস্ত ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে 'ঈশ্বর! ঈশ্বর!' কবিতাটিতে।

'ঈশ্বরের সঙ্গে আমি বিবাদ করিনি।
তবুও ঈশ্বর
হঠাৎ আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলেন?
অন্ধকার ঘর।
আমি সেই ঘরের জানলায়
মুখ রেখে
দেখতে পাই, সমস্ত আকাশে লাল আভা।
নিঃসঙ্গ পথিক দূর দিগন্তের দিকে
চলেছেন।
অস্ফুট গলায় বলে উঠি :
ঈশ্বর! ঈশ্বর!

'নীলনির্জন' থেকে উপরোক্ত কবিতার কবির পার্থক্য বিপুল ও সুদূর; বস্তুত এঁদের একই কবি বলে চিহ্নিত করা যায় না। বর্ণগন্ধময় রূপজ পৃথিবী থেকে কবি নীরেন্দ্রনাথের নির্বাসন এখন সম্পূর্ণ; এখন তাঁর সামনে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, দৃশ্য নেই, অভিভূত মুহূর্ত নেই—মনে হয় একা ভ্রাম্যমান এক মানুষ বিবেকে পরিশুদ্ধ হতে চলেছেন। তাঁর পরিভ্রমণের পথ সেইদিকে—যেখানে দূরত্ব ও নৈকট্য প্রবঞ্চনা করে পরস্পরের সঙ্গে, যেখানে 'মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে /সারি সারি বাতি-স্তম্ভ দাঁড়িয়ে রয়েছে,/কিন্তু পৌর ধর্মঘটের কারণে তাতে আলো নেই।/রাস্তার দু-ধারে ছিটকে সরে যাচ্ছে আলিঙ্গনে বদ্ধ নরনারী।'

১২৯/৭০

অপরাজিত হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল। শুধু ইউনিফর্ম গায়ে খেলোয়াড়দের নাম—বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—অশোক কুমার, সুব্বায়া, গুরুবক্স, পেজ, তৌফিক, শেরখাঁ, ডিন, রহিম ও ওসমান; বসে—রাজকুমার, এস মুখার্জী ও সমিদ নুর।

হকি লীগের খেলা শেষ হয়েছে। বেটনের খেলাও আরম্ভ হয়ে গেছে। ফুটবলও মাঠে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ক্রিকেট এখনো শেষ হয়নি। না লীগ, না নক আউট। হকি ও ফুটবল মরশুমের সন্ধিকালে প্রতি বছরই এমন হয়।

মোহনবাগানের হকি লীগ জয়

এবার হকি লীগ জয় করেছে মোহনবাগান। এবার নিয়ে ১১ বার, তার শেষ ৩ বারই অপরাজিত থেকে লীগ জয়ের সম্মান।

সন্দেহ নেই, শক্তি ও দলগত সংহতির সার্থক রূপায়ণেই মোহনবাগানের লীগ জয়। তবু কিন্তু এবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন আখ্যার উপর খুব গুরুত্ব দিতে পারছি না। কেননা, রানার্স ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনও অপরাজিত আছে, অপরাজিত আছে লীগ কোঠায় পঞ্চমস্থান অধিকারী মহমেডান দলও যারা ১০টি খেলা ড্র করে ১০টি পয়েন্ট হারিয়েছে ৫টি শক্তিহীন দলের কাছে, যে ৫টি দলের প্রথম ডিভিসনে অস্তিত্ব বজায় রাখা নিয়েই সন্দেহ ছিল।

এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়, মোহনবাগানের লীগ জয় যোগ্যের যোগ্য সম্মান হলেও লীগ এবার মোটেই জমেনি, খেলা হয়েছে খাপছাড়াভাবে। তার আরও প্রমাণ শক্তিহীন রাজস্থান, যারা শেষ খেলাটির আগে একটি খেলাও জিততে পারেনি তারা তিনটি অপরাজিত দল—মোহনবাগান, ইস্টার্ণ রেল এ এ এবং মহমেডান স্পোর্টিং—তিনটি দলের কাছ থেকেই একটি করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। একই কথা বলা যায় লীগ কোঠার অষ্টম স্থানাধিকারী কাস্টমস সম্বন্ধেও। লীগ কোঠায় দেখা যাবে ১৮টি খেলা থেকে কাস্টমসের সংগৃহীত পয়েন্টের সংখ্যা ২০। কিন্তু কাস্টমস ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান, দুটি বড় দলের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে এক পয়েন্ট করে কেড়ে নিয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের উপর্যুপরি ৮টি জয়ের পর কাস্টমসই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, লীগ রানার্স ইস্টার্ন রেল এ এর একটানা ২১টি জয়ের পর বাধা হয়ে দাঁড়ায় শক্তিহীন রাজস্থান। তারপরেও দুটি খেলায় রেল দলকে পর পর পয়েন্ট হারাতে হয় বি এন আর এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে। শেষ খেলায় এবং চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় ইস্টার্ন রেলকে মোহনবাগানের কাছে চতুর্থ পয়েন্ট হারিয়ে লীগও হারাতে হয়। লীগে রেল দল হারিয়েছে ৪ পয়েন্ট, মোহনবাগান ৩ পয়েন্ট। এক পয়েন্টের ব্যবধানে চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান একটি করে পয়েন্ট হারিয়েছে কাস্টমস, মহমেডান এবং ইস্টার্ন রেল এ এ দলের কাছে।

শেষ খেলা 'স্টার্ন' রেল মোহনবাগানকে পরাজিত করতে পারলে তারা সর্বপ্রথম লীগ জয়ের সম্মান পেতে পারত। প্রথম একটি গোল করেও এগিয়ে গিয়েছিল রেল দল। কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান গোলটি শোধ করে দেয়। স্টিকস হয়েছে বলে এই গোলের বিরুদ্ধে রেল খেলোয়াড়রা এক যোগে আম্পায়ারের কাছে প্রতিবাদ জানান। আম্পায়ার অবশ্য তাঁদের আবেদন প্রত্যাখান করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন গোলদাতা নুরের সত্যিই স্টিকস হয়েছিল। কিন্তু আম্পায়ার যা গ্রাহ্য করেননি এবং দ্বিধাহীন চিত্তে যে গোলের নির্দেশ দিয়েছেন সে গোল সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে কোন লাভ নেই। মোটের উপর লীগের সামগ্রিক প্রতিযোগিতা থেকে এইটুকুই উপলব্ধি করা গিয়েছে এবার হকি লীগ হয়েছে উত্তাপ ও আকর্ষণহীন।

অন্যান্যবারের মত বাইরের কয়েকজন খেলোয়াড় এবারও যথারীতি বড় বড় ক্লাবে খেলেছেন। তাছাড়া বাইরের কয়েকজন নাম করা খেলোয়াড়, কয়েক বছর ধরেই যারা কলকাতার মাঠে সুপরিচিত, তাঁরাও ভাল খেলতে পারেননি। যেমন ইস্টবেঙ্গলের গোবিন্দ, চাঁদ সিং, মোহনবাগানের তৌফিক,

শের খাঁ, সায়দ নূরে, অশোক কুমার প্রভৃতি। কিছুটা চোখে লেগেছে মোহনবাগানের রাজকুমারের এবং ইস্টার্ন রেলের ইব্রাহিমের খেলা। বেশী গোলদাতাদের তালিকায় ইব্রাহিমের স্থান দ্বিতীয়। গোল করেছেন ১৫টি। কিন্তু ইস্টার্ন রেল পাঁচটি খেলাতে জিতেছে শুধু ইব্রাহিমের একটি করে গোল করার ফলে। গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ার্ড গোবিন্দ মোট ১৮টি গোল করে।

একটি বাঙালী তরুণের কথা না লিখলে হকি লীগের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছেলেটির নাম অমিত দাশগুপ্ত। মোহনবাগানের বিকল্প সেণ্টার ফরোয়ার্ড। গুরুত্বপূর্ণ বড় ম্যাচে অবশ্য অমিতকে খেলানো হয়নি। খেলেছেও কম ম্যাচ। কিন্তু ওই অল্পসংখ্যক ম্যাচ খেলেই তিনটি হ্যাটট্রিক করে অমিত তার সম্ভাবনাময় হকি জীবনের প্রতিশ্রুতি রেখেছে।

নীচে প্রথম ডিভিসনের লীগ টেবল দেওয়া হল।

	খেঃ	জঃ	ড্র	পঃ	স্বঃ	বিঃ	প
মোহনবাগান	১৮	১৫	৩	০	৫৫	১	৩৩
ই আর এ এ	১৮	১৪	৪	০	২৪	১	৩২
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১২	৪	২	৩৫	৪	২৮
বি এন আর	১৮	১১	৬	১	২২	৩	২৮
মহঃ স্পোর্টিং	১৮	৮	১০	০	১১	২	২৫
পোর্ট কমিঃ	১৮	৮	৫	৫	২১	১১	২১
কাস্টমস	১৮	৪	১২	২	১১	৩	২০
এন্টালি	১৮	৪	১০	৪	৬	৯	১৮
এলেঃ রেমণ্ড	১৮	৪	৯	৫	৬	৭	১৭
খালসা ব্লুজ	১৮	৩	৯	৬	১০	১৯	১৫
ই আর এ সি	১৮	৪	৭	৭	৫	১২	১৫
রাজস্থান	১৮	১	১২	৫	২	৭	১৫
গ্রীয়ার	১৮	৩	৮	৭	৭	১৭	১৪
ডবলিউ বি পুলিস	১৮	২	১০	৬	২	১৬	১৪
এরিয়ান	১৮	২	৯	৭	৫	২০	১৩
স্পোর্টিং ইউঃ	১৮	২	৭	৯	৫	২৪	১১
উয়াড়ি	১৮	০	১০	৮	৪	২৩	১০
আর্মেনিয়ান্স	১৮	১	৬	১১	২	২৭	৮

অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ

লণ্ডনের ওয়েম্বলীতে অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টনের ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার রুডি হরটোনো ১৫—১ ও ১৫—৫ পয়েণ্টে স্বদেশীয় খেলোয়াড় মুলেজাদিকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৪ বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। বিশেষভাবেই বলবার কথা এই ৪ বছরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন খেলোয়াড় হরটোনোর কাছ থেকে একটি সেটও নিতে পারেননি।

উইম্বলডন টেনিসের বিজয়ীর যেমন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মান তেমন অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত। টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টনে কিন্তু বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই এবং তা নেই উইম্বলডন এবং অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের জন্যই।

যাই হক এবারকার অল ইংলণ্ড ব্যাড-মিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের পাঁচটি বিভাগের পুরস্কার গিয়েছে পাঁচটি দেশে। পুরুষদের সিংগলস জয়ের সম্মান ইন্দোনেশিয়ার। মহিলাদের সিংগলস জয় করেছেন সুইডেনের ২৭ বছর বয়সী মিসেস ইভা টোয়েডবার্গ ফাইনালে ডেনমার্কের মিনি বার্গল্যাণ্ডকে ১১—৩, ৬—১১ ও ১১—২ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

পুরুষদের ডাবলস জয় করেছেন মালয়েশিয়ার পার গুনালন এবং নীগ বুন বী। তাঁরা ইন্দোনেশিয়ার রুডি হরটোনো ও এবং ইন্দ্র গুনোওয়ানকে ১৫—৫ ও ১৫—৩ পয়েণ্টে পরাজিত করেছেন।

জাপানের নর ইকো তানাগি এবং হিরো তাকি ১৫—১০ ও ১৮—১৩ পয়েণ্টে ব্রিটেনের মিসেস গিলিয়ান গিলকস ও মিসেস জুডি হাসম্যানকে হারিয়ে পেয়েছেন মহিলাদের ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপ।

মিক্সড ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার গিয়েছে ডেনমার্কে। এস পিরি ও মিসেস উল্লা স্টাণ্ড ফাইনালে ব্রিটেনের ডেরেক টালবট এবং মিসেস গিলিয়ান গিলক্সকে ১৫—১২, ৮—১৫ এবং ১৫—১১ পয়েণ্টে পরাজিত করেছেন।

দেখা যাচ্ছে মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনাল ছাড়া কোন ফাইনালেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মেলেনি। মহিলাদের ডাবলসে পরাজিত জুটির অন্যতম মিসেস জুডি হাসম্যান সম্বন্ধে বলা যেতে পারে তিনি আগে আমেরিকার খেলোয়াড় ছিলেন। এর আগে ১০ বার অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন। এবার ফাইনাল খেলার আগে তাঁর কনুইয়ে দারুণ চোট লাগে এবং ব্যথা নিবারক ইনজেকশন নিয়ে তাঁকে খেলতে হয়।

তৃতীয় টেস্টেও ভারতের বাহাদুরি

জর্জ টাউনের বোরডা মাঠে ভারত এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট ড্র হলেও প্রথম দুটি টেস্টের মত এ টেস্টেও ভারতের খেলোয়াড়দের বাহাদুরি বেশী। কেননা ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতে প্রথম ব্যাটিং করা সত্ত্বেও ভারতের স্পিনাররা এক সময়ে ২৫৬ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৮টি উইকেট ফেলে দিয়েছিল। তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ৩৬৩ রানে ইনিংস শেষ করল তখন ওই বড় ধরনের রানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ভারতকে অসুবিধায় পড়তে হল বৃষ্টিভেজা উইকেটে ব্যাটিং করার জন্য। তবু ভারত প্রথম ইনিংসের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান থেকে ১৩ রানে এগিয়ে যেতে পেরেছে ব্যাটের বিক্রমে। সারদেশাই, সোলকার এবং কৃষ্ণমূর্তি—তিনজন ব্যাটসম্যান যদি রান আউট না হতেন তবে ভারতের পক্ষে আরও বেশী রানে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। অবশ্য তাতেও খেলার জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হত না। উইকেট থেকে স্পিনাররা কোনই সুযোগ পাননি। ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে সোবার্স এবং ডেভিস অনায়াস ভঙ্গিতে ব্যাট করেছেন, দুজনেই সেঞ্চুরি করেছেন এবং দুজনেই শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকেছেন।

তৃতীয় টেস্টে ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা উদীয়মান ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকারের। ত্রিনিদাদে যিনি জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৬৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৭ রানে নট আউট থেকে জয়-সূচক বাউণ্ডারী স্ট্রোক করেছিলেন সেই গাভাসকার জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে করেছেন ১১৬ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ৬৪।

তরুণ বিশ্বনাথের কৃতিত্বও কম নয়। হাঁটুতে চোট থাকায় বিশ্বনাথ প্রথম দুটি টেস্ট খেলতে পারেননি। এই টেস্টে প্রথম খেলে ৫০ রান করেছেন এবং এই ৫০ রানের মধ্যে দিয়েছেন তার ব্যাটিং প্রতিভার পর্যাপ্ত পরিচয়।

১ এপ্রিল থেকে কেনসিংটন ওভালে দুই দেশের যে চতুর্থ টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে সে খেলায়—বিশেষজ্ঞদের ধারণা জয়-পরাজয় মীমাংসা হওয়া শক্ত। কেননা, কেনসিংটন ওভালের পিচও ব্যাটসম্যানের সহায়ক। দেখা যাক কি হয়।

একলব্য

হকি খেলার আইন কানুন

গত সপ্তাহে মাপজোক সহ হকি মাঠের চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। আইনে বলা আছে গোল-লাইন এবং স্ট্রাইকিং সার্কেলের লাইন ৩ ইঞ্চি চওড়া হবে। সাইড লাইনের চওড়া সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু সাধারণত সাইড লাইন ২ থেকে ৩ ইঞ্চি চওড়া হয়ে থাকে। কিন্তু সম্ভব হলে সাইড লাইন ৩ ইঞ্চি চওড়া করে গোল লাইনের সঙ্গে সমতা রাখা ভাল। সব লাইনই আঁকতে হবে সাদা রেখায়।

বলা বাহুল্য, লাইনগুলি মাঠেরই অংশ এবং বিভিন্ন এরিয়ারও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ স্ট্রাইকিং সার্কেলের লাইন স্ট্রাইকিং সার্কেলের মধ্যেই রয়েছে বলে ধরতে হবে। সুতরাং স্ট্রাইকিং সার্কেলের লাইনের উপর থেকে হিট করে গোল করা হলে স্ট্রাইকিং সার্কেলের মধ্য থেকে হিট করে গোল করা হয়েছে বুঝতে হবে।

মাঠে সবশুদ্ধ ১০টি পতাকার প্রয়োজন হয়। ৪ কোণের ৪টি পতাকা সাইড লাইন ও গোল লাইনের সংযোগস্থলে পুঁততে হবে। বাকি ৬টি পতাকা পুঁততে হবে সাইড লাইন থেকে বাইরে এক গজ দূরে। কোন পতাকা দণ্ড ৪ ফুটের কম উঁচু হবে না সে কথা আইনেই আছে। ৪ ফুটের বেশী উঁচু হলে ক্ষতি নেই।

সাইড লাইন, গোল লাইন, সেন্টার লাইন এবং স্ট্রাইকিং সার্কেলের লাইন একটানা রেখায় আঁকতে হবে। ২৫ গজ লাইন আঁকতে হবে বিন্দু বিন্দু (ডটেড লাইন) রেখায়।

যদিও হকি মাঠের মাপ দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ এবং প্রস্থে ৫৫ থেকে ৬০ গজ হবে, আন্তর্জাতিক হকি বোর্ডের পরামর্শ হচ্ছে, সমস্ত আন্তর্জাতিক খেলার মাঠের মাপ হবে ১০০ গজ দীর্ঘ এবং ৬০ গজ প্রস্থ।

হকি বোর্ডের মতে ঘাসের মাঠেই খেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। তবে মাঠ খেলার পক্ষে উপযুক্ত হওয়া চাই।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

খেলা আরম্ভের আগে মাঠে উপস্থিত হয়ে ভালভাবে দেখে নেবেন মাঠের মাপজোক এবং লাইনের দাগ ঠিক আছে কিনা। যদি কোন ত্রুটি চোখে পড়ে তবে তখনই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তা শুধরে নেবেন।

১০টি পতাকার দণ্ড যেন কোনভাবে ৪ ফুটের কম না হয় এবং আইনমত সেগুলি যেন যথাস্থানে পোঁতা থাকে।

খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ

কর্নার হিট করার সময় কখনো পতাকা সরাতে চেষ্টা করবেন না।

॥ আইন ৪ ॥ গোল এবং গোলপোস্ট

(এ) প্রতি গোল লাইনের কেন্দ্র স্থলের উপর গোল স্থাপন করতে হবে। ৪ গজ ব্যবধান রেখে দুটি পোস্ট খাড়াইভাবে পুঁতে একটি হরাইজেন্টাল ক্রসবার দিয়ে দুটি পোস্টের উপরের দুই মুখ জুড়তে হবে। মাটি থেকে ক্রসবার উঁচু থাকবে ৭ ফুট (ভিতরের মাপ)। গোল পোস্টের সামনের দিক গোল লাইনের বাইরের দিকের কিনারার সঙ্গে মিশে থাকবে। গোল পোস্টের মাথা ক্রসবারের উপরে উঠবে না এবং ক্রসবারের মাথাও পাশের দিকে গোল পোস্টের বাইরে যাবে না। গোল পোস্ট এবং ক্রসবারের চওড়া হবে ২ ইঞ্চি এবং গভীরত্ব (ডিপ) ৩ ইঞ্চির বেশী হবে না। মাঠের দিকে গোল পোস্ট এবং ক্রসবারের আকার হবে চতুষ্কোণ (রেক্টাঙ্গুলার)। গোলের পেছনে গোল পোস্ট, ক্রসবার এবং মাঠের সঙ্গে গোল নেট শক্ত করে এমনভাবে খাটাতে হবে যেন নেটের বাঁধুনির ব্যবধান ৬ ইঞ্চির বেশী না হয়।

(বি) ১৮ ইঞ্চির বেশী উঁচু নয় এমন গোল-বোর্ড গোলের পাদদেশে এবং গোল লাইনের বাইরে স্থাপন করতে হবে। সাইড বোর্ড থাকবে গোল লাইনের সঙ্গে সমকোণে এবং গোল পোস্টের পেছন দিকে সাইড বোর্ড এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন পোস্ট যতটা চওড়া সাইড বোর্ড ভেতরের দিকে বা বাইরের দিকে তার থেকে বেরিয়ে না যায়।

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) গোল নেটের মধ্যেই গোল বোর্ড থাকে এবং নেট এমনভাবে খাটাতে হয় যে, বল একবার নেটে ঢুকলে সেই বলের যেন বেরিয়ে আসার আর কোন সম্ভাবনা না থাকে। গোল নেট যেন ছেঁড়া না হয়।

(২) খাড়া গোল পোস্ট এবং ক্রসবার সমকোণে স্থাপন করতে হয়। গোল লাইনের বাইরের দিকের কিনারার সঙ্গে গোল-পোস্টের সামনের দিক মিশে থাকবে আইনেই সে কথা বলা আছে।

(৩) আইনে গোল পোস্ট বা ক্রসবার কি রঙের হবে তার উল্লেখ নেই। কিন্তু সাদা রঙের হওয়া বাঞ্ছনীয়। গোলাকার গোল পোস্ট আইন বিরুদ্ধ। অন্ততঃ পেছনের দিক গোলাকৃতি হলেও গোল পোস্ট এবং ক্রসবারের সামনের দিক (মাঠের দিক) অবশ্যই চতুষ্কোণ হবে।

মুকুল

হকি খেলার গোলপোস্ট

উডস্টক ও ওয়াডলে, এবং তারপর

পরনে জিনস, লম্বা চুল—পরিচালক মাইক ওয়াডলেকে দেখে নাকি মনে হয় "উডস্টক"-এর মেলায় যারা ভিড় করে এসেছে তিনি যেন তাদেরই একজন। তবু ওদের আর ওয়াডলের মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা রয়েছে, একটা "গ্যাপ"। এই "জেনারেশন গ্যাপ" সম্বন্ধে ওয়াডলে বেশ সচেতন। তাঁর বয়স আঠাশ, সাত বছর তাঁর কেটেছে মেডিকেল ছাত্র হিসাবে। ওয়াডলের পরিবেশ ও জেনারেশন সামাজিক কার্যকারিতার কথা ভুলতে পারে না। অপরদিকে আমেরিকার রক মিউজিক ও "ইয়ুথ এক্সপ্লোশান"-এর চেহারা অন্য। দুই চেহারার এই পার্থক্য এই "জেনারেশন গ্যাপ" ওয়াডেলের চিন্তার বাইরে ছিল না। তবে "উডস্টক"-এ (সম্প্রতি কলকাতায় দেখানো হয়েছে ছবিটি) এই সমস্যা যদি তেমন প্রাধান্য পেয়ে না থাকে ওয়াডলে এবিষয়ে আরও গভীরে যাবেন হয়ত তাঁর পরের ছবিতে।

প্রথমে আন্ডারগ্রাউন্ড ছবি করতেন ওয়াডলে (ডেভিড হোলজম্যানস ডায়েরি, নো ভিয়েতনামিজ এভর কলড মি নিগার)। ক্রমশ তিনি মাইনরিটি দর্শকের কাছ থেকে সরে আসতে চাইলেন। শুরু হল "উডস্টক"-এর প্রস্তুতি। যেভাবে তিনি "উডস্টক" বানাতে চেয়েছিলেন তাতে টাকার দরকার। তাই তিনি ওয়ারনারের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল—সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের কাছে আসা। ছবিটির ফর্ম যা তার মূলে ওয়ারনারের প্রভাব আছে একথা জোরের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন ওয়াডলে। তবে একথা তিনি সরলভাবেই বলেছেন, যা তিনি করতে চেয়েছিলেন "উডস্টক" তা হয়নি। ডকুমেণ্টারি ছবিই তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল "ইণ্টারভিউ ফুটেজ"। কিন্তু নিউ ইয়র্কের হোয়াইট লেক অঞ্চলের মেলায় গিয়ে তিনি বুঝলেন, ওরা গান শুনতেই চায়, পরিচালকের কথা নয়। ফলে গানই প্রাধান্য পেল ছবিতে।

অসুবিধা আরও ছিল। ওয়াডলে চেয়েছিলেন উডস্টক-এ যারা জড়ো হয়েছিল সমালোচকের দৃষ্টিতে অদের মানসিকতা ও

ইউনিটের সঙ্গে মাইক ওয়াডলে—নীচে ডানদিকে

মূল্যবোধের বিশ্লেষণ করতে। ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক স্টেট লেজিস্লেচার মিউজিক ফেস্টিভ্যাল বেআইনী করে দিলেন। ওয়াডলে তখন ওই আইনের দিকে চেয়ে ছবির কিছু অংশ বাদ দিলেন। শান্তি ও প্রেমকে দিলেন অগ্রাধিকার। ওয়াডলে বলেছেন:

"In that sense, you could say that woodstock is a commercial movie, in that it's really semi-sales job on behalf of the kids."

"উডস্টক"-কে ওয়াডলে যা করতে চেয়েছিলেন তা হয়ত হয়নি, কিন্তু "উডস্টক"

মাইক ওয়াডলে

যা হয়েছে তারই মূল্য কম কী। মার্কিন যৌবন-জোয়ারের এক অদ্ভুত রিপোর্টাজ "উডস্টক"। ওয়াডলের পরবর্তী ছবি হোয়াইট মিডলক্লাশ আমেরিকা নিয়ে। কাদের নিয়ে এই ছবি? ওয়াডলের কথায়—

"Not the radical right and not drop-outs, but moderately liberal people . . . the kind of people I grew up amongst Ohio . . . the kind of people you get in John Cheever's short stories."

ওয়াডলে বলেন, বেশির ভাগ ছবি আসে নিউ ইয়র্ক বা পশ্চিম উপকূল থেকে। সেখানে সমসাময়িক জীবনধারা। ট্র্যাডিশন যেখানে এখনও বিদ্যমান সেই সব জায়গায় ছবি হয় না। তাই ওয়াডলে ছবি করবার জন্য যেতে চান মিডওয়েস্ট-এর শহরে যেখানে তিনি বড় হয়েছিলেন। নতুন সব মূল্যবোধ তরুণ-তরুণীদের জীবনেও স্থান পাচ্ছে আজকাল। কী রকম? অবিবাহিত মেয়েরা তাদের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে মায়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করে না, আবার স্ত্রী-স্বাধীনতার মূল্য যে কী সেটাও তারা মাকে বুঝিয়ে দের সহজে। এই ভাবে দুই "জেনারেশন"-এর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উডস্টক-এ তিনি যুবসমাজের বাইরের চেহারা দেখিয়েছেন, এবার তার অস্তিত্বের মূলে চলে যেতে চান। উডস্টক-এর মতই তিনি নতুন ছবির এডিটিংয়ের প্রতি বেশি মনোযোগ দেবেন। উডস্টক-এর মতই এক একটি দৃশ্য কেটে নেওয়া হবে গানে, তবে এবার সেটা হবে লোকগীতি বা "ফোক রক"। সেটা মধ্যবিত্ত আমেরিকার জীবনের সংগীত হয়ত হবে না তবে এমন সংগীত হবে যাতে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য ঐকতান সৃষ্টি করবে, জন্ম দেবে এমন একটা পরিবর্তনের সুর যা নিয়ে ওয়াডলে আজ সব চাইতে বেশি ভাবিত। অবশ্য ছবি তিনি তখনই তৈরি করবেন যখন তিনি নিশ্চিত জানবেন যে ছবি তৈরির প্রয়োজন আছে।

চিত্র-সমালোচনা

সোনা বৌদি
(দীপালি চিত্র)

নাম যদিও "সোনাবৌদি", ছবির আরম্ভ 'মস্তান'দের নিয়ে। শুরুতেই অ্যাকশন। পাড়ার বখাটে ও গুণ্ডা ছেলেদের শিরোমণি বিকাশ সোনাবৌদির আদরের ঠাকুরপো। বিপথগামী এই দেবরকে নিয়ে সোনাবৌদির উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। 'মস্তান'-দলের সঙ্গে "সোনাবৌদি" কাহিনীর যোগ-সূত্র এইখানেই।

মস্তান-দলের অন্তর-কলহ ও দুই প্রধানের মারামারি পর্যন্ত দর্শক বেশ উত্তেজিত। "সোনাবৌদি" নামে একটা ঢিমে-তেতালার মেলোড্রামার কথাই মনে জাগে। সেটা গোড়াতেই অনুপস্থিত বলে দর্শক বেশ স্বস্তির চিত্তে ছবির মস্তান-পর্বটি উপভোগ করেন। আসলে ছবিটির নাম যা বলে "সোনাবৌদি" তা নয়। অবশ্যই সোনাবৌদি তিতিক্ষা ও উদারতার মূর্তিমতী রূপ—মাটির জগতে যা দেখা যায় না, কেবল বাংলা সিনেমাতেই যা লভ্য। তবু আগের সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এক্ষেত্রে উপকরণগত অমিল না থাকলেও পরিবেশনায় পার্থক্য আছে।

"সোনাবৌদি" নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের নাটক নয়। শিল্পপতির ঘরের ব্যাপার। এখানে সোনাবৌদি ও তার স্বামী রমেশ বরাবর যে মহত্ত্ব ও সরলতা দেখিয়ে গেছে সেটাই নাটকের একটা বড় পুঁজি। তারা যদি রক্ত-মাংসের মানুষ হয় কিংবা একটু বেশি বুদ্ধি রাখে তবে শয়তানের চক্রান্ত আর

"ধন্যি মেয়ে" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুখেন দাস।

টেঁকে না। অতএব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু না বুঝে-শুনে তাদের কষ্ট পেতে হয় এবং চোখের সামনে অন্যায় দেখেও তার প্রতিবাদ বা প্রতিকারের ইচ্ছা তাদের জাগে না। জ্যাঠতুত ভাই ও বৌদির চক্রান্তের শিকার হল তারা অতি সহজেই। [illegible] ক্যাশ টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদ [illegible] ইচ্ছা করলেই, একটু রুখে দাঁড়িয়েই খণ্ডন করতে পারত। বাবাও জানেন, তারা চুরি করতে পারে না। অথচ কর্তব্যনিষ্ঠ ও আদর্শ পুত্র রমেশ এই মিথ্যা দুর্নামের পর অসুস্থ ও বৃদ্ধ বাবাকে অসহায় অবস্থায় রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরা চলে না গেলে অবশ্য ক্রাইমের উপাদানগুলি ঠিকমত সাজানো যায় না। ক্রাইম-পর্বে সাসপেন্স আছে। এই পর্বের খলনায়ক বিনোদ—রমেশের জ্যাঠতুত ভাই।

অতএব দেখা যাচ্ছে, শুধু নাম দেখে কাহিনীর বিষয় আন্দাজ করা কঠিন। সোনাবৌদি সারা নাটক জুড়ে নেই। কাহিনীও ওই অর্থে নায়িকা-প্রধান নয়। তবে সোনাবৌদির স্নেহ ও ভালবাসা শেষ পর্যন্ত বিপথগামী বিকাশের চৈতন্য ফিরিয়ে দিয়েছে। নাটকের শেষে বিকাশ এসে [illegible] বৌদির পাশে এবং খলনায়কের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তারপর পূর্ব অপরাধের জন্য পুলিসের হাতে ধরা পড়ার আগে বৌদিকে বলে গেছে, অন্যায় কাজ আর সে করবে না।

ইদানীং বাংলা ছবিতে যখনই মস্তানদের দেখি তখনই একটি বিশেষ [illegible] সোনার [illegible]

জন্মায়?—বক্তব্যের আকারে এই প্রশ্নটি দর্শকের কাছে পেশ করা হয়। সুখের কথা, অভিনেতা ও গল্পকার সুখেন দাস এবং চিত্রনাট্যকার-পরিচালক পীযূষ গাঙ্গুলি অন্যায়কে অন্যায় হিসাবেই দেখেছেন এবং অত্যাচারের প্রতিরোধ যে হওয়া দরকার সে ইঙ্গিতও দিয়েছেন এক প্রতিবেশীর একক সাহসিকতায় এবং সোনাবৌদির সংলাপে। বিকাশ কেন মন্দপথে গেল সে নিয়ে পরিচালক কাউকেই দোষী করেননি। দোষ যে বিকাশেরই এবং মানুষ হওয়ার সুযোগ যে সে নিজেই নষ্ট করেছে তাও ছবিতে স্পষ্ট। পরে যে বিকাশ মানুষ হতে চেয়েছে এবং তার ভিতরকার মনুষ্যত্ব যে নষ্ট হয়ে যায়নি তাও স্বাভাবিকভাবে দেখানো হয়েছে। সমাজ-বিরোধীদের দেখাতে গিয়ে পরিচালক সমাজ-সমালোচনার ফরমুলাটি যে বিসর্জন দিয়েছেন সেজন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন। তবে পরিচালক চিত্রনাট্যকার পীযূষ গাঙ্গুলিকে অন্য কয়েকটি ফরমুলা ও পরিচিত ছকে কাজ করতে হয়েছে। ফরমুলা পুরনো হলে ক্ষতি নেই যদি দর্শক নতুন করে আমোদ পান। পরিচালকের এর বেশি কাম্য কিছু ছিলও না ছবিতে। এবং তিনি যে সফল হয়েছেন তার মূলে ট্রিটমেন্ট-এর গুণ আছে। গল্পটিকে ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে যাওয়ার আগে আরও কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতি হয়ত জুড়ে দেওয়া যেত। অর্থাৎ কোন্ ব্যাপারটা কীভাবে এগোল তার আর একটু বিশদ বিবরণ। কিন্তু সবই তো সাজানো ঘটনা হত। তার চাইতে যথাসম্ভব ঘটনা কেটে-ছেঁটে পরিচালক বাঞ্ছিত গতির মধ্য দিয়ে যে গল্পটিকে পারিবারিক মিলন ও দুর্বৃত্তের পতনে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাতে ছবিটি আরও উপভোগ্য হয়েছে। এ ছবিতে মন্থরতা অসহ্য মনে হত।

গল্পলেখক হিসাবে সুখেন দাস দর্শকের মন বেশি জয় করেছেন না অভিনেতা হিসাবে—দর্শক সে আলোচনা অবশ্যই করতে পারেন। পর্দায় সুখেন দাসের অবর্তমানেও যখন প্রেক্ষাগৃহে হাততালি শোনা গেছে তখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি গল্প দর্শকের ইচ্ছাপূরণের কাছ ঠিকমতই লেগেছে। তবে বিকাশের চরিত্রে সুখেন দাস, বিশেষত মস্তান রূপে, দর্শককে মাতিয়ে রেখেছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মস্তান হিসাবে অল্পকালের জন্য সমিত ভঞ্জ বিশ্বাসযোগ্য। বাবার ব্যবস্থা দেখার কালে রমেশের মধ্যে যে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করেছেন দিলীপ রায় তা চমৎকার। পরে যে তা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সে দোষ শিল্পীর নয়। নাটকের প্রয়োজনে তাঁকে যেভাবে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে তাতে কোন শিল্পীর পক্ষেই অভিনয় কুশলতা দেখানো সম্ভব নয়। রমেশ দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়েছে—এর কোন দরকার ছিল কি? অবশ্য চরিত্রটিকেই যখন পঙ্গু

"এখনই" (পরিচালনা : তপন সিংহ) ছবিতে অপর্ণা সেন। ফটো—দেশ

করা হয়েছে তখন বাইরের অঙ্গহানি আর কী ক্ষতি করতে পারে? তার ভাই কুচক্রী বিনোদের ভূমিকায় নিরঞ্জন রায় খলচরিত্রের অভিব্যক্তি ও মানসিকতা সঠিক ব্যক্ত করেছেন। তাঁর স্বার্থপর স্ত্রীর বেশে কণিকা মজুমদারও কম যান না।

অশেষ মহৎ গুণের প্রতিমা আদর্শ কুলবধূর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এর আগেও নাটকে বহু কষ্ট ভোগ করে দর্শকের চোখে জল এনে দিয়েছেন। এবারেও তিনি সফল, ওই ইমেজের কোন অঙ্গহানি করেননি। তাঁর শ্বশুরের চরিত্রে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটারের অভিনয় করে গেছেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় (চৌধুরী পরিবারের চিকিৎসক) সময় সময় এমনভাবে সংলাপ উচ্চারণ করেছেন যা খুবই কৃত্রিম মনে হয়েছে। নতুবা তাঁর অভিনয় মোটা-মুটি ভালই লাগবে। বিনোদের বোনের চরিত্রে শিবানী বসুকে বেশ স্বাভাবিক লেগেছে। ক্যামেরায় (মনীশ দাশগুপ্ত-কৃত) তাকে দেখিয়েছে ভাল। অন্যত্রও ক্যামেরার কাজ সুন্দর। কালীপ্রসাদ রায়ের এডিটিং ছবির গতি বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে।

"পান্না-হীরে-চুনী"-তে গানের সুর দিয়ে অজয় দাস যে সুনাম অর্জন করেছিলেন তা এ ছবিতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। গান শুনতে ভাল, আবহসংগীতও জায়গায় জায়গায় সুকল্পিত। তবে যেখানে গান না হলেও চলত সেখানে গান। আবার এ ধরনের ছবিতে এত করুণ মুহূর্ত অথবা নাটকীয় আবেগ অথচ তার উপযোগী কোন গান নেই। নাটকীয়তার আর সব নিয়ম যখন থাকত তখন আবেগমণ্ডিত গান বাদ গেল কেন? থাকলে হয়ত হিট করত।

আশা ছিল নির্বাচনের পরে শান্তির বাতাস বইবে, পশ্চিমবঙ্গের এই নিদারুণ সঙ্কটের মেঘ কেটে যাবে এবং চিৎপুরের প্রায়-অচল যাত্রা-ব্যবসায় আবার স্বচ্ছন্দগতিতে চালু হলে এই ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচবে। নির্বাচন সত্যি কাটল, কিন্তু সংকট?

চিৎপুরের যাত্রাপাড়া এখনও প্রায় জনশূন্য। গদির দুয়ার খুলে দিবারাত্র বসে আছেন পরিচালক কি সরকার কিন্তু খা হচ্ছে শিল্প, নায়েকের দেখা নেই। হঠাৎ যদি বা কোনো নায়েক চিৎপুরে এসেছেন, কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁর কিছু সময় কাটতে না কাটতেই কোম্পানী বাগান রণাঙ্গন হয়ে উঠল। জান আগে না গান—নায়েক তৎক্ষণাৎ ছুটলেন হাওড়া কি শিয়ালদার পথে। না পুরো হল কথা, না বায়নার কাজ।

জনৈক দলপতি সেদিন সখেদে বলছিলেন, যাত্রার অনাদায় পর্বটা বরাবরই ছিল। তবে গান ভাল হলে বা বিক্রির অবস্থা সুস্থ থাকলে অনাদায়ের বালাই ছিল না। হালে সেটা হচ্ছে। গত কার্তিক থেকে পৌষে যে বায়না লেখাপড়া হয়েছে তার গান করতে গিয়ে বিপদে পড়ছেন অনেক দল। চুক্তির টাকা দূরে থাক, শোনা যাচ্ছে উলটে দলের ম্যানেজারকে দিয়ে হাতচিঠা লিখিয়ে নিয়ে দল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—এমন ঘটনা সম্প্রতি কয়েকটি ঘটেছে বলে প্রকাশ।

কারা এসব করেন? উত্তরে অনেকেই

...ছেন ঃ কোনো এক রাজনৈতিক দল। ...দল-পরিচালক কথাচ্ছলে বলছিলেন ...সালে পশ্চিমবঙ্গে এই দল ...ফাণ্ড বা অন্যান্য উন্নয়নকর্মের ...বেশিরভাগ বায়না করেছিলেন। ...বায়না হলে ধরেই নেওয়া যায় ...পক্ষ ৫০০ টাকা পার্টির চাঁদা ...। ...হলে যাত্রাদলের পাওনা হয় ...০০ টাকা। কিন্তু বলা হবে সেখা কম ...দর্শক বেশি। ...যাত্রাগানের যতখানি অপহরণ করা ...দেখা যাবে শতকরা ৪০ ...হয় না। বাস্তবিক সেখানে ...কিছু নেই। প্রতিবাদের ...লিখিয়ে নিতে পারে, ...সরে পড়াই ভাল।

...আগে আর এক ধরনের ...জানা গেল। মধ্য চিৎপুরের ...একটি বিখ্যাত যাত্রাদলের পক্ষ ...হয়েছে, ওই দলটি বাস করে ...ফেরার পথে হঠাৎ শিবপুরে ...হাতের শিকার হয়। ...এক ট্রাফিকের মুখে যখন সব গাড়ি ...দাঁড়ালো, ঠিক সেই সময় ...উপর দৃষ্টি পড়ে ...। আচমকা তারা বাসটি ...করে কয়েকটি পোশাকের বাক্স ...নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনাটি, বলা-...প্রকাশ্য দিবালোকেই ঘটেছে বলে ...গেছে।

...দিবালোকেই যদি এমন ঘটনা ...মতন জায়গায় পড়লে ...রাত্রির অন্ধকার হয় তো ...অবশ্য গত পাঁচিশ ...সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণের ...করছেন কিন্তু আমাদের ...এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী হতে ...দেখা যানি। এখন যখন গোটা ...ব্যবসায় বিপন্ন—সরকার ...আত্মরক্ষার ...বলে যাত্রা দল ও তার ...করবেন।

—সূত্রধার

নতুন ছবির খবর

সেন্সরের ছাড়পত্র লাভ

...ফিল্মসের "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ" ছবিটির সেন্সর হয়েছে। ...রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ ও ...গান রয়েছে ছবিটিতে। এবং ...জীবনকাহিনীর সঙ্গে রয়েছে ...ইতিহাস। চিত্রনাট্য ...ও চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন ...দীপক গুপ্ত। দিলীপ রায় ছবিটির নাম-ভূমিকার শিল্পী। অন্যান্য

"জীবন-জিজ্ঞাসা" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে উত্তমকুমার ও কুমার রায়।
ফটো—দেশ

বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, গীতা দে প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

"আনন্দ" আসছে

হৃষীকেশ মুখার্জির নতুন ছবি "আনন্দ" (ইস্টম্যান কালার) মুক্তি পাচ্ছে আগামী সপ্তাহে। গল্প শ্রীমুখার্জির নিজেরই লেখা। শিল্পীরা হলেন : রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন, সুমিতা সান্যাল, সীমা প্রভৃতি। সলিল চৌধুরী সুরকার।

গান-রেকর্ডিং

কাহিনীকার-পরিচালক কনক মুখার্জির নতুন ছবি "মন পিয়াসী"র (এ আর এস এস ফিল্মস) গান সম্প্রতি অমল মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় রেকর্ড করা হয়েছে। গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শবরী নন্দী।

নতুনদের নিয়ে হিন্দী ছবি

প্রযোজক হেমন্তকুমার ইতিপূর্বে হিন্দী ছবিতে একাধিক শিল্পীকে প্রথম উপস্থিত করেছিলেন। আজ তাঁরা জনপ্রিয় স্টার। এবার যে নতুন হিন্দী ছবি তিনি তৈরি করছেন তাতেও দুই নতুন শিল্পী রিতেশ ও রিনাকে উপস্থিত করছেন। ছবিটির নাম "বিশ সাল পহেলা" (গীতাঞ্জলি পিকচার্স)। প্রবীর রায় ছবির পরিচালক।

বিশ্বরূপায় "কোথায় পাবো তারে"

কালকূটের জনপ্রিয় উপন্যাস "কোথায় পাবো তারে" বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ হচ্ছে। রাসবিহারী সরকার কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাট্যপরিচালনাও তাঁর। এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, জয়শ্রী সেন, দিলীপ রায়, প্রহ্লাদ দাস বাউল, সুধাংশু মাইতি, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, মনু মুখার্জি, উমা পালচৌধুরী, সংগীতা কর, গীতা নাগ, রত্না দত্ত, নির্মল ঘোষ প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পূর্ণদাস বাউল। অন্যান্য সংগীতের ভার নিয়েছেন সুধাংশু মাইতি। আলোকসম্পাত, দৃশ্যরচনা ও আবহ পরিবেশ রচনায় রয়েছেন যথাক্রমে তাপস সেন, সুরেশ দত্ত ও কমল চৌধুরী।

নাট্য-প্রতিযোগিতা

তৃতীয় নিখিল ভারত সর্বভাষার পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা আগামী ২৪ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত নিউ দিল্লির আইফ্যাকস হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন নিউ দিল্লির কালিবাড়ির বেঙ্গলি ক্লাব। রেজেস্ট্রিভুক্ত যে কোন সংস্থাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। যোগদানের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বেঙ্গলি ক্লাব, কালিবাড়ি, নিউ দিল্লি—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন উদ্যোক্তারা।

অরণ্যদেব লী ফক

বলীলা-উম্বির সোনাবেলায় ...
ওর অর্ধেকটা বালি, অর্ধেকটা খাঁটি সোনা!
ওরেব্বাস!

শুনেছ হে, এর দাম হাজার ডলার!
আরও বেশী!

সোনার সন্ধান পেয়ে ওরা উন্মাদ হয়ে উঠেছে।
সোনা, শুধু সোনা, শুধু সোনা!
মাইল মাইল সোনা!
কোটি কোটি ডলার!

সমুদ্রের ধারে রাইফেলগুলো পড়ে রয়েছে, ওদের খেয়াল নেই!

অরণ্যদেবের জেড-পাথরের বাড়িটিও অমূল্য ----
শুধু আমরা আছি, আর আছে মাইল মাইল সোনা!
কেউ নেই এর মধ্যে -----
৪/৭

কী যেন নাম এই জায়গাটার?
বলীলা-উম্বি। লোকটা বলেছিল, সোনার লোভে কেউ এখানে এলে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়।

শুনে ভয় লাগছে হে!
ভয় কিসের? সোনার মধ্যেই শুয়ে থাকব, চমৎকার!

সোনা.. সোনা...
সব আমাদের!
ইয়ে, বলছিলুম কী, দলে আমরা দুজন থাকলে দিব্যি আধাআধি বখরা হত।
তোর এক মাইল সোনা, আর আমার এক মাইল সোনা!

বাংলা (পূর্ববঙ্গ) দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। গত ২৫ মারচ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে সশস্ত্র বাহিনী ঢাকায় পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিস বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে সামরিক প্রশাসন নির্বিচারে দমননীতি চালাতে আরম্ভ করে। ঢাকায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ২৪ ঘণ্টার জন্য কারফ্যু জারি করা হয়। নানাস্থানে বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ কুমিল্লা, চাঁদপুর প্রভৃতি শহরের পথে পথে পাক সৈন্যবাহিনী ও নাগরিকদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলে। ঢাকার বেতার ও টেলিভিসন কেন্দ্র মিলিটারি দখল করে রেখেছে। প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছেন। বাংলা দেশে সামরিক কর্তৃত্ব কার্যকরভাবে জারির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেনানট জেনারেল টিক্কা খাঁ ১৬ দফার এক নির্দেশনামা জারি করেন। এরপর গত ২৭ মারচ দুঃশাসক এই টিক্কা খাঁ আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছেন। এদিন শেখ মুজিবর রহমানের স্বগৃহে গ্রেফতারের সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলায় বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৮০ হাজার। উত্তরে রংপুর, সৈয়দপুর দক্ষিণে খুলনা, যশোর, পূর্বে কুমিল্লা—সব এখন আজাদী বাহিনীর করায়ত্ত। অন্যত্র পুরোদমে লড়াই চলছে। বাংলার বহু নিরস্ত্র লোক হতাহত হয়েছে। উভয়পক্ষে এখন সমানে লড়াই চলছে। মুক্তি ফৌজ এখন ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

দেশী সংবাদ

২২ মারচ—ওড়িশার রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারি আজ রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির কাছে এক রিপোর্টে রাজ্যে পুনরায় রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করার সুপারিশ করেছেন। আজ মধ্যরাত্রে ওড়িশার রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। গত ২৩ জানুয়ারি ওড়িশায় রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করা হয়েছিল।

রবি-সোম চব্বিশ ঘণ্টায় বিভিন্ন ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে হাওড়ায় দুজন গুলিতে, আততায়ীর ছুরিকাঘাতে কলকাতায় দুই, হাওড়ায় এক, ইছাপুরে এক ও বর্ধমানের ভাতারে একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী খুন হয়েছেন।

২৩ মারচ—রেলমন্ত্রী আজ সংসদে ১৯৭১-৭২ সনের রেল বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটের বৈশিষ্ট্য হলো—রেলে যাত্রী ভাড়া ও মালের মাশুল যা ছিল তাই আছে, বাড়ছে না। তবে ঘাটতি হচ্ছে অত্যন্ত বেশী। মোট ৫৩ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। চলতি বছরে এ পর্যন্ত ঘাটতি ২৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৮ বছর থেকে হ্রাস করে ৫৫ বছরে নিয়ে আসার কোন অভিপ্রায় সরকারের নেই। এ ব্যাপারে যে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে এবং সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ করে যাদের বয়স ৫৫-র কাছাকাছি তাদের মনে যে উদ্বেগের সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

২৪ মারচ—লোকসভায় আজ অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হলো। এই বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ সর্বসাকুল্যে ২৪০ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন আজ লোকসভায় বলেন যে, মে মাসে যখন চূড়ান্ত বাজেট হবে তখন পুরো বাজেটে এই ঘাটতি রাখা হবে না।

নব কংগ্রেসের শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি প্রাক্তন রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ সুবিধা বিলোপের জন্য সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে সরকারের প্রগতিশীল নীতিগুলির পক্ষে জনগণ যখন পরিষ্কার রায় দিয়েছেন সরকারের এ ব্যাপারে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

২৫ মারচ—বিরোধী বামপন্থী দলপতিরা আজ নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-

আলোচনাকালে এই প্রস্তাব করেছেন যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয় সভার অধিবেশন আহ্বান করা হোক। তাঁরা আরও প্রস্তাব করেছেন—রাজন্য ভাতা বিলোপের জন্য সরকারের উচিত একটি আইন প্রণয়ন করা।

নয়াদিল্লির এক খবরে প্রকাশ : সি পি আই আজ গণসংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। বৈপ্লবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের পথে সুপ্রিম কোর্ট যে বাধা সৃষ্টি করেছেন তা অপসারণের জন্য সংবিধান সংশোধন এবং আরও নানা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সি পি আই প্রচার অভিযানে নামারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২৬ মারচ—আজ কলকাতার পৌর অধিবেশন চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসুধাংশু মিত্র, জল বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশ্যামলাল এবং প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এস ওঝা এই প্রথম সারির তিনজন অফিসারকে সাসপেনড করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ : গঙ্গায় নতুন জল প্রকল্প করার যে চেষ্টা চলছে তাকে পণ্ড করার জন্য এঁরা নাশকতা-মূলক কাজের তুল্য অপরাধ করেছেন।

২৭ মারচ—নয়াদিল্লিতে বাংলা দেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য সরকারের ওপর ক্রমেই জনমতের চাপ পড়ছে। তবে সরকার সতর্কভাবেই মুখ খোলার ব্যাপারে সতর্ক। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদে সমস্ত বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। তাঁরা মোটামুটি যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান, সংসদের উভয় সভায় সেই ধাঁচেরই একটা প্রস্তাব পরে নেওয়া হয়।

শ্রীবিজয় সিংহ নাহার পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভার উপমুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। আজ নবকংগ্রেস পরিষদ দলের এক ঘরোয়া বৈঠকে একথা স্থির হয়েছে। তবে তিনি কোন্ কোন্ দফতর নেবেন, তা এদিন ঠিক হয়নি।

২৮ মারচ—সংগ্রামী বাংলা দেশের জন্য এই বাংলার মানুষদের যে কী গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, আজ কলকাতার নাগরিক সভায় তা প্রকাশ পেল। শ্রীবিজয় সিংহ নাহার বলেন—বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে পশ্চিম বাংলা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেন। তিনি সরকারকে বলেন আমাদের অনুমতি দিন, আমরা ওদের পাশে গিয়ে লড়তে চাই। শ্রীঅজয় মুখার্জি ঘোষণা করলেন—আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।

পাকিস্তানের অভিযোগ ভারত অযথা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে এবং হুগলী নদীতে একটি ভারতীয় জাহাজকে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র হিসাবে। ভারত এই উভয় অভিযোগই বিদ্বেষপ্রসূত বলে মনে করেন।

বিদেশী সংবাদ

২২ মারচ—২৫ মারচ "জাতীয় পরিষদ"-এর প্রস্তাবিত অধিবেশন আবার পিছিয়ে যাওয়ায় শেখ মুজিবর রহমান-এর কোন প্রতিক্রিয়া হবার কথা নয়, কারণ তাঁর চার দফা দাবি প্রেসিডেন্ট আগেই মেনে না নিলে আওয়ামী লীগ-এর "গণপরিষদ"-এ যোগ দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

২৩ মারচ—সুইজারল্যান্ড বেতারে বলা হয়েছে যে, পিকিংস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই-এর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। চীন সোভিয়েট সীমান্ত নিয়ে আলোচনার জন্য যে রুশ প্রতিনিধিদল এখানে আছে তার নেতারাও এই বৈঠকে যোগ দেন।

২৪ মারচ—পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকেরা আজ ঢাকায় টেলিভিশন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থা কেন নেওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি। এর বাঙ্গালী কর্মীরা আজ রাত্রে কাজে যোগ দেননি।

২৫ মারচ—পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলায় নতুন করে আবার সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় সেনাবাহিনী ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে গত দুদিনে নিহত হয়েছেন ১১০ জন। আহত হয়েছেন দুশোরও বেশী।

২৬ মারচ—পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার পথে করাচিতে বলেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট মোচনের ঢাকা বৈঠকে কোন মীমাংসা না হওয়ায় তিনি নৈরাশ্য বোধ করছেন। এর জন্য তিনি শেখ মুজিবর রহমানকে দায়ী মনে করেন।

২৭ মারচ—পাক ফৌজী কর্তৃপক্ষ সীমান্তের ওদিক থেকে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর লোকদের সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তারা সরে যাওয়ার আগে তাঁদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বাংলা দেশ-এর জনগণের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

২৮ মারচ—মুজিবর ও তাঁর দল যদি আরও কিছুকাল ইয়াহিয়া শাহীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন তা হলে রাশিয়া বাংলা দেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে পারে এবং আরও কয়েকটি বৃহৎ শক্তিও এই স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে বলে মস্কোর কূটনৈতিক মহলের ধারণা। বাংলা দেশে রক্তপাত বন্ধ করতে হলে এ ছাড়া আর কোন গতি নেই বলে রাশিয়া মনে করে।

বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা	...	...	৯৬৯
ব্যঙ্গচিত্র—	...	...	৯৭০
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—	...	...	৯৭১
দৃশ্যপট—শ্রীনবারুণ গুপ্ত	...	...	৯৭২
বৈদেশিকী—দেবরাজ	...	...	৯৭৪
পঞ্চতন্ত্র—সৈয়দ মুজতবা আলী	..	...	৯৭৫
কুয়াশা—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	...	...	৯৭৯
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	...		৯৮৯

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ... ৯৯৩
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব ১০০৩
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর ... ১০০৫
চিত্রপ্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয় ১০১৫
রঙ্গ ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ১০১৭
ডায়েরীর ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন ... ১০২৩
বিচিত্র ব্রেজিল—শ্রীমতী আরতি দত্ত ১০২৭
আলোচনা— ১০৩৩

বিষয়	লেখক			পৃষ্ঠা
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত		...	...	১০৪১
পুস্তক পরিচয়—		...	...	১০৪৫
খেলার মাঠে—একলব্য		...	...	১০৪৯
হকি খেলার আইনকানুন—মুকুল			...	১০৫১
রংগজগৎ—		...	...	১০৫৩
অরণ্যদেব—		...	...	১০৫৯
সাপ্তাহিক সংবাদ—		...	...	১০৬০

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীসমীর দত্তগুপ্ত

সেকাল ও একাল
১৮৭৮ সাল। কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম
চলছে আর বাবুরা ঘুড়ী উড়িয়ে ও
পায়রার লড়াই দেখে সময়
কাটাচ্ছেন। এমনি সময়ে তাঁদের
সেই আয়েসী জীবন যাত্রাকে আরও
মধুর ক'রে তুলতে জবাকুসুমের
আত্মপ্রকাশ।
তারপর এলো স্ত্রী শিক্ষার ঢেউ,
বিজলী টানা ট্রাম ও মোটর গাড়ী
এবং আবির্ভাব হ'ল উড়ো জাহাজের।
পৃথিবীর বুকে ঘটালো দু'টি মহাযুদ্ধ।
ক্রমে ক্রমে বদলে গেল সমাজ-জীবনযাত্রা,
ছেলেমেয়েদের সাজ-সজ্জা, রুচি প্রভৃতি।
কালের পরিবর্তনে মানুষের রুচি
বদলালেও সব সময়ে সব রুচির সঙ্গে খাপ
খাইয়ে চলেছে জবাকুসুম।
কেশ প্রসাধনে জবাকুসুমের স্বীকৃতি চিরন্তন
জবাকুসুম কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
Jabakusum taila
C. K. SEN & CO PRIVATE LTD
KALPANA-JK 98
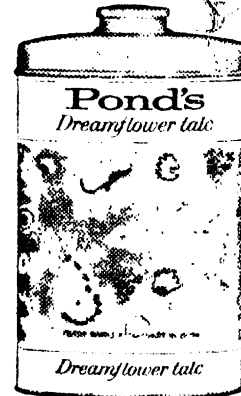
আপনার সন্তান কি স্কুলে যেতে শুরু করেছে?... ফেরাডল দিয়ে তার জীবন ভাল ভাবে আরম্ভ ক'রে দিন

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার স্কুলে যাওয়ার দিনগুলোর ওপর। এই সময়ে লেখাপড়ায় ও খেলাধূলায় এক ধাপ আগুয়ান থাকার জন্যে তার প্রয়োজন আরো বেশী বল এবং আরো অধিক উদ্যম ও প্রাণশক্তি।

শুধু ফেরাডলই আপনার সন্তানকে যোগাতে পারে দুধ, খাদ্যশস্য, তরিতরকারি, ফল, ডিম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের সঠিক পরিমাণে গুণ ও পুষ্টি—লোহা, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। আপনার সন্তানের হাড় ও দাঁতের দৃঢ় গঠন, পেশীর বৃদ্ধি, রক্তের পুষ্টি, শরীরের প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলা, চোখের সতেজ দৃষ্টিশক্তি এবং সুস্থসবল শারীরিক বৃদ্ধির জন্যে ফেরাডল অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রত্যেকদিন সকালে ও রাত্রে সরাসরি বোতল থেকে কিম্বা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আপনার সন্তানকে ফেরাডল খাওয়ান!

ভুলবেন না, পরিবারের সকলের জন্যেই ফেরাডল উপকারী।

ফেরাডল

খেতে সুস্বাদু

পরিবারের সকলের জন্যে উপকারী

পার্ক-ডেভিস উৎপাদন

® রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেডমার্ক। রেজিস্ট্রীকৃত ব্যবহারকারী: পার্ক-ডেভিস (ইণ্ডিয়া) লিঃ, বোম্বাই-৭৮ এ.এস.

JAISONS—418

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৩
শনিবার ২৭ চৈত্র ১৩৭৭

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	৩১·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক ,,	...	১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ,,	...	৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	...	৫৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১৪·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৪৪·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৮৩·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 10 April, 1971

পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটলো এক বছর পরে, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার একটি মন্ত্রিসভা এই রাজ্যের শাসনভার হাতে নিলেন। পূর্বেকার দুটি যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার নেতৃত্বও ছিল তাঁর হাতে। তবে সে দুটি মন্ত্রিসভার সঙ্গে বর্তমান সরকারের তফাত অনেক। সবচেয়ে বড় তফাৎ, আগের দুটি মন্ত্রিসভা, যা যুক্তফ্রণ্ট নামে পরিচিত, তাতে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ছিল বড় শরিক। বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে অমার্কসবাদী দলগুলির কয়েকটিকে নিয়ে এবং এর নাম হয়েছে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার। নব কংগ্রেস এই দলের বড় শরিক, অন্যান্য দলগুলি যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সরকারকে সমর্থন করছে তাদের মধ্যে আছে : সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস, গুর্খা লীগ, মুসলিম লীগ, পি এস পি, এস এস পি। গত দোসরা এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করেছেন। আপাতত মন্ত্রিসভার সদস্য থাকছেন পঁচিশজন, কুড়িজন পূর্ণ মন্ত্রী ও পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। নব কংগ্রেসের নেতা শ্রীবিজয়সিংহ নাহার উপমুখ্যমন্ত্রীরূপে থাকছেন।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, যে নতুন অমার্কসবাদী সরকারটি এই রাজ্যের প্রশাসনভার হাতে নিলেন তাঁদের পায়ের মাটি খুব শক্ত নয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে মাত্র দুটি সদস্যসংখ্যা তাঁদের হাতে বেশি ছিল, নব কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীনেপাল রায় আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর সেই সংখ্যা আরও কমে মাত্র একটিতে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা কোনো সরকারের পক্ষেই স্বস্তিজনক নয়। আবার এটাও ঠিক, এই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি মন্ত্রিসভা গড়ার চেষ্টা করলেও প্রয়োজনীয় একশো উনোচল্লিশটি সদস্যের সমর্থন পেতেন না, পানও নি। বর্তমান মন্ত্রিসভার এই দুর্বলতা আমাদের বরাবরই উদ্বেগের কারণ হবে ঠিকই; তবু আশা করা যায়—যদি এই মন্ত্রিসভা তাঁদের কর্মসূচী মতন কাজ করে যান, বিবাদ বা রেষারেষিতে মত্ত না হন তবে সেই শুভবুদ্ধিই এঁদের বাঁচাবে, জনসাধারণকে সেবার সুযোগ দেবে।

নতুন সরকার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের প্রথম কাজ হবে, অশান্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। জনসাধারণের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরিয়ে আনা, শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং হত্যার রাজনীতি বন্ধ করার কাজে এই সরকার যদি সফল হন তবে সর্বজনের শুভেচ্ছা ও সাহায্য যে তাঁরা পাবেন এ-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও অন্য কয়েকটি জরুরী কর্মসূচী গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীর অন্যতম একটি প্রধান বিষয় হল, ভূমি নীতি। বর্তমান সরকার ঘোষণা করেছেন, সরকারী খাস জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, এবং তা মোটামুটি তিন থেকে সাড়ে তিন মাস সময়ের মধ্যে। চূড়ান্ত কোনো নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত যে সব খাস অথবা অন্যপ্রকার জমি কৃষকদের হাতে এসেছে তা থেকে তাদের উচ্ছেদ করাও হবে না। দ্বিতীয় জরুরী কাজ হল, এই সরকার পশ্চিমবঙ্গে আবার সব বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, নতুন শিল্প চালু করা, উৎপাদনে উৎসাহ দান করা হবে বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীল জাতি ও উপজাতি প্রভৃতির ব্যাপারে সরকার উদার ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এঁদের উন্নতির সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে। ন্যায়সঙ্গত অগ্রাধিকারও দেওয়া হবে। রাজ্যের পরিকল্পিত উন্নতি বিধানের জন্যে দুটি ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাও গড়ে তোলা হবে। আরও নানাবিধ কাজের মধ্যে বর্তমান সরকার আর একটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে চান, তা হল শিক্ষা। আজকের শিক্ষালয়গুলিতে যে বিশৃঙ্খলা চলেছে তা দূর করে সুষ্ঠুভাবে ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা যাতে শিক্ষা লাভ করতে পারেন সেজন্যে সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন।

গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার যে অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার হাতে নিলেন এমন অবস্থায় ইতিপূর্বে কোনো সরকারকেই ক্ষমতা হাতে নিতে হয় নি। আমরা আশা করব, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে নতুন সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন।

তৃতীয় প্রচেষ্টা

স্থির বুদ্ধির কাছে আবেদন

স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বাংলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা যখন রক্ত ঢেলে দেশের মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছেন, যখন তাঁরা স্বৈরাচারী ফৌজী হামলাবাজদের সুসজ্জিত অস্ত্র ট্যাংক, জেট বিমানের নৃশংস আক্রমণ প্রতিহত করছেন নামমাত্র অস্ত্র এবং অপরিসীম শৃঙ্খলাবোধ, একতা আর অপরাজেয় মনোবল সম্বল করে তখন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বেলিত জনমন জীবন-মরণ যুদ্ধে রত বাংলা দেশের মানুষকে সমর্থন জানাচ্ছেন একদিন বাংলা বনধ্ ডেকে, দলে দলে প্রতিদিন সীমান্তে ভিড় বাড়িয়ে, খবরের কাগজে ফেনিল উচ্ছ্বাস, ছড়া আর কবিতার বন্যা বইয়ে এবং বুকে কালো ব্যাজ এঁটে যার খুশি কৌটো হাতে চাঁদা সাধতে বেরিয়ে পড়ে।

কাগজে পড়ে, লোকের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে, আমরা এমন প্রচণ্ড বেগে ভাবের বন্যায় ভেসে চলেছি যে কূলে উঠতে পারব কিনা জানিনে। আন্তরিক ভাবেই আমরা আকুপাকু করছি কিছু করার জন্য, এমন কিছু, কাজ যা বাংলা দেশের মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের ন্যায় সংগত সংগ্রামে সহায়তা করবে, যা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ফৌজীতন্ত্রী হামলাবাজদের ব্যাপক আক্রমণ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে, মানবতাকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে, যা জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের উপর ফৌজীতন্ত্রের বে-আইনি হামলা রুখতে মদত যোগাবে।

এই আমরা চাই। কিন্তু বন্ধুগণ, একবার ভেবে দেখুন ভাবের বন্যায় দুরন্ত বেগে ভেসে যেতে যেতে আমরা কী করছি? আমরা (এক) পুরাতন অভ্যাসের বশে একদিন বাংলা বন্ধ ডেকে দিলাম, (দুই) শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে যে মন নিয়ে লোকে টেসট ক্রিকেট, ফুটবল ফাইনাল বা একঘেয়ে দিনগত পাপক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য একটু অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিয়ে মুখ বদলাতে পিকনিক করতে যায় অথবা কিছু না ভেবেই (?) সেইভাবে সীমান্তে গিয়ে ভিড় বাড়াচ্ছি, (তিন) সংবাদপত্র আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্পর্কে এমন কোনও বিচার বিশ্লেষণ করছি-নে যা থেকে ভাবাবেগে উদ্বেলিত জনগণ কোনরকম নির্দেশ গ্রহণ করতে পারেন, উচ্ছ্বাসময় বিবৃতি, কবিতা এবং ছড়ার ছড়াছড়িতে ও বিশ্লেষণ বিহীন রচনার স্তূপে সংবাদপত্রের পাতা ভারাক্রান্ত করছি, (চার) সবাই সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে শুধু লাফালাফি করছি এবং (পাঁচ) বিশৃঙ্খলভাবে চাঁদা আদায়ের জন্য উচ্ছৃঙ্খল ছোকরাদের হাতে নিরীহ নাগরিকদের বিড়ম্বনা বাড়িয়ে চলেছি।

ভেবে দেখুন, আমাদের এই আচরণের দ্বারা আমরা কার কোন উপকারে লাগছি? এই পথে, এই রকম শৃঙ্খলা, সংগঠনবিহীন অবস্থায় অ্যাজ ইউ লাইক ইট গোছের মানসিকতা সম্বল করে, যে দেশে রোজ হাজার হাজার লোক মরছেন এবং অন্ততঃ

তার, চারগুণ লোক মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ওষুধ, খাদ্য, রক্তের অভাবে ছটফট করছেন, অস্ত্রের অভাবে যে দেশের লোক পরাক্রান্ত হামলাবাজদের প্রতিহত করতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করছেন, পেট্রোলের অভাবে যে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের যানবাহন স্তব্ধ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে, যে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা অবিলম্বে সাহায্য পাঠাবার আবেদন জানাচ্ছেন, বলুন, তাঁদের কতটুকু সহায্য আমরা পৌঁছে দিতে পারব?

বন্ধুগণ, আমরা যদি সত্যিই বাংলা দেশের মুক্তিকামী জনগণের পাশে দাঁড়াতে চাই, তাঁদের সংগ্রামী হাতের শক্তি বৃদ্ধি করতে চাই তবে প্রথমেই আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হল ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে সুশৃঙ্খলভাবে এক সংগঠনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা। কারণ যে বিপুল পরিমাণ সাহায্য আমাদের দিতে হবে, অনেক দিন ধরে দিয়ে যেতে হবে তার সংগ্রহ এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়া একমাত্র শক্তিশালী সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব। কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিক্ষিপ্ত প্রয়াস সে কাজকে এগিয়ে নিতে পারে না।

এই মুহূর্তে আমরা কী করতে পারি?

আমার মনে হয়, আমাদের আবেগ-উদ্দীপ্ত কর্মোদ্যোগকে দুটি সুস্পষ্ট খাতে বইয়ে দিতে পারি। প্রথমত আমরা সুসংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের সরকারের উপর এই চাপ দিতে পারি যে, তাঁরা যেন কূটনৈতিক পথে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের জন্য পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারকে বাধ্য করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সক্রিয় করে তুলতে অগ্রসর হন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সিকিউরিটি কাউনসিলকে এই বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর করে তুলতে পারেন। আন্তর্জাতিক কূটনীতির বিধিনিষেধের মধ্যেও ভারত সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভা যেভাবে বাংলা দেশের আক্রান্ত জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবার বাসনা প্রকাশ করেছেন তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, তবে আরও এগিয়ে আসবার জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই চাপ বজায় রেখে যেতে হবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দ্বারা আমরা যেন আমাদের সরকারকে দুর্বল না করে ফেলি। তাতে বাংলা দেশেরই বিপদ বাড়াব।

এইবার সাহায্যের কথা। রাস্তাঘাটে কৌটো বাজিয়ে যে সাহায্য তোলা যায়, সেই ছিটেফোঁটা সাহায্যের কথা বলছিনে। আমি বলছি, কার্যকরী সাহায্যের কথা। টন টন সাহায্য। এরও দুটো দিক আছে। প্রথমত, আমাদের দিক থেকে এই বিপুল সাহায্য তোলা এবং দ্বিতীয়ত ওপারে আওয়ামী লীগের হাতে তা পৌঁছে দেওয়া। এবং এর জন্য সরকারি বা বেসরকারি স্তরে পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই পুরো ব্যবস্থাটাই এত জটিল যে এর জন্য ধীর স্থির এবং সাংগঠনিক পথে না এগুলে আসল কাজ কিছুই হবে না। আমাদের সব সদিচ্ছা কালোবাজারে বিকোবে। অতএব, বন্ধুগণ, সতর্ক হোন; ভাবাবেগকে সংযত, সুসংহত করুন।

সীমান্তে অযথা অপ্রয়োজনীয় ভিড় বাড়াবেন না। অবাঞ্ছিত লোকেদের ভিড় সীমান্তে এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলবে। ফলে এপারের সাহায্য ওপারে যেতে পারবে না। এবং পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী বিদেশে এই কথাই বলে বেড়াবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে, আমরাই পাকিস্তানের অংগরাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করেছি। বাংলা দেশে ব্যাপকভাবে গণহত্যা ঘটিয়ে যে পাপ তারা করেছে, তা চাপা দেবার জন্য বিশ্বের জনমতকে তারা যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে, দোহাই, সেইভাবে আচরণ করুন।

নতুন মন্ত্রিসভা

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করেছেন। আবার অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ই মুখ্যমন্ত্রী। আবার নানা দলের কোয়ালিশন এবং আবার বিধানসভায় সরকারের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা—সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৯৬৭ সনের চেয়েও অনেক অনেক কম।

শুরুটা অবশ্য খুব ভালায় ভালয় হতে পারে নি। নানা গণ্ডগোলের মধ্যে এই সরকারের জন্মলাভ। প্রথম গণ্ডগোল দেখা দেয় জোট গঠন নিয়ে—কে কে মিলে সরকার করবেন সেই প্রশ্নে। যেসব দলের সমর্থনে নতুন সরকারের পক্ষে ১৪০ তাঁরা কিন্তু সবাই সরকারে নেই। সি পি আই এবং ফরোয়ারড ব্লক সরকার গঠনে অজয়বাবুকে সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের আনুষ্ঠানিক সমর্থন ছাড়া সরকার হতেও পারত না। কিন্তু তাঁরা সরকারে যোগ দিতে রাজী হতে পারেন নি।

যাঁরা মিলিত হয়ে সরকার গঠন করেছেন তাঁদের সমাবেশও এক বিচারে বিচিত্র। তাঁরা নানা মতের দল। নির্বাচনে প্রায় সবাই সকলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁরাই আজ এক নেতিবাচক প্রয়োজনের তাগিদে একজোট হয়েছেন। এর মধ্যে আছেন নব কংগ্রেস, আবার এরই মধ্যে আছেন মুসলিম লীগ। আদি কংগ্রেসের দুজন এম এল এর সমর্থন ছাড়াও এ সরকারের চলা কঠিন।

এর ফলে যাঁরা মিলে সরকার গঠন করেছেন তাঁরা সবাই যথাসম্ভব বেশী মূল্যে

... ... চেয়েছেন। যেমন ধরুন, মুসলিম লীগের কথা। লীগের ৭জন এম এল এ। সরকার গঠনে সামিল হওয়ার মূল্য হিসাবে তাঁরা ৭-এর মধ্যে ৩ জনকেই মন্ত্রী করার দাবি জানালেন। কংগ্রেস এবং অজয়বাবুও সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কারণ, তাঁদের প্রচণ্ড ভয় ছিল মুসলিম লীগ যদি সি পি এমের দিকে চলে যায়! মুসলিম লীগ তাঁদের দাবি মত ৩ জন মন্ত্রী পেয়েছেন। কিন্তু এর ফলে শুরু থেকেই তাঁদের নিয়ে কোয়ালিশনের ভেতরে বেশ কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে।

তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে। কারণ কোয়ালিশনের বৃহত্তম দল কংগ্রেস অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গ্রহণে রাজী হলেও মন্ত্রিসভায় বাংলা কংগ্রেসের আর এক নেতা সুশীল ধাড়াকে ঠাঁই দেন নি। সুশীল ধাড়ার উপর কংগ্রেসের অনেকেই খাপ্পা। নির্বাচনের আগে তাঁরা অনেকেই অবশ্য সুশীল ধাড়াকে খোসামোদ করে চলতেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস-নব কংগ্রেস আসন রফার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পরই তাঁদের অনেকের রাগটা সুশীল ধাড়ার উপর গিয়ে পড়ে। তখনও অবশ্য তাঁরা সুশীল ধাড়া সম্পর্কে ভীত। কারণ, তখনও নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। তখনও অনেক নব কংগ্রেসী মনে করতেন যে বাংলা কংগ্রেস অন্তত গোটা তিনেক আসনে জিতবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধারণা ছিল যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় সুশীল ধাড়ারও একটা বেশ বড়ই রোল থাকবে। সেই ভয়ে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগে তাঁরা সুশীল ধাড়ার বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলেন নি। কিন্তু যেই ফলাফল বেরিয়ে গেল অমনি সবাই প্রকাশ্যে সুশীল ধাড়া বিরোধিতা শুরু করে দিলেন। বললেন, সুশীল ধাড়াকে কিছুতেই মন্ত্রিসভায় নেওয়া চলবে না।

এতে ইন্ধন জোগালো সি পি আই। ফলে, সুশীল ধাড়া মন্ত্রিসভা থেকে বাদ গেলেন। এর জের কিন্তু এত সহজে মিটবে না। লেগে থাকার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে সুশীল ধাড়ার।

*

জের সহজে মিটবে না নব কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধেরও।

কোয়ালিশন নিয়ে, মন্ত্রিসভা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট ঝড় বয়ে গিয়েছে।

প্রথম ঝড়টা ওঠে দলের নেতৃত্ব নিয়ে। কারণ, প্রথম প্রথম নব কংগ্রেসের একদল এম এল এর ধারণা ছিল যে তাঁদের দলের যিনি নেতা হবেন তিনিই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। সে ভুলটা যখন তাঁদের ভেঙে গেল, যখন তাঁরা বুঝলেন প্রধানমন্ত্রী অজয়বাবুকেই মুখ্যমন্ত্রী করতে চান, তখন নব কংগ্রেসের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিল, তাহলে কে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবেন? তাঁরা বুঝলেন, যিনি মন্ত্রিসভায় নব কংগ্রেসের মুখ্য প্রতিনিধি হবেন তিনিই হবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

ইতিমধ্যে কিন্তু বিজয় সিং নাহার দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন। স্বভাবতই তখন সবাই বুঝলেন, বিজয়বাবু যদি মন্ত্রিসভায় যান তাহলে তিনিই হবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। ওদিকে তরুণকান্তি ঘোষও উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। তিনি প্রথমে চেষ্টা করলেন বিধানসভা দলের নেতৃত্ব থেকে বিজয় সিং নাহারকে সরাতে। সেজন্য এম এল এ হস্টেলে কিছু তদবির তহারকিও চলল। কিন্তু অল্পেই বুঝে গেলেন, তা হবার নয়। তখন অন্য পথ ধরলেন। সেই পথে এমন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলেন যাতে বিজয়বাবু মন্ত্রিসভাতেই না যান। সেইজন্য বিজয়বাবু এবং অজয়বাবুর মধ্যে একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা হল। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হল না। শেষ পর্যন্ত বিজয়বাবুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন।

প্রথম প্রথম সাধারণ নব কংগ্রেসী এম এল এদের মধ্যে মন্ত্রিত্ব নিয়ে তেমন কোনও আগ্রহ বা লালসা ছিল না। তাঁরা তখনও সি পি
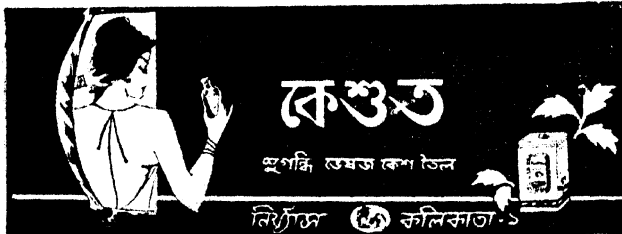
এম সম্পর্কে বিশেষ ভীত। তাঁরা তখনও ভাবছেন, সি পি এমকে কীভাবে আটকানো যায়। কিন্তু ওপরের নেতারা যখন ঝগড়াটা পুরো দমে শুরু করে দিলেন তখন দলের সাধারণ এম এল এরাও আস্তে আস্তে তাতে জড়িয়ে পড়লেন। মন্ত্রী হওয়ার জন্য দলের ভেতরে একটা কুৎসিত হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। মন্ত্রিসভা গঠন পর্যন্ত এই নিয়ে নানা ঝগড়াঝাঁটি চলেছে। এবং, এখনও তার রেশ মেটে নি।

একটা জিনিস কিন্তু লক্ষণীয়—নব কংগ্রেসের ছাত্র ও যুবকরা এই মন্ত্রিত্বের কলহে নামেননি। তাঁরা মন্ত্রী হতেও আগ্রহী নন। তাঁরা প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছেন, সরকারী পদ নয়, সাংগঠনিক কাজে তাঁরা আত্মনিয়োগ করবেন।

*

নতুন মন্ত্রিসভার ভবিষ্যত কী তা এখনই বলা কঠিন। তবে, এটা এখন রাজনৈতিক মহলের মোটামুটি সকলেরই জানা যে, এঁরা নিশ্চয়ই ১৯৭২-এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে আবার একটা নির্বাচন করতে চান।

ইতিমধ্যে এটাও জানা গিয়েছে যে জুন মাসের আগে নতুন মন্ত্রিসভা বিধানসভা ডাকতেও আগ্রহী নন। তাঁরা চান, ওই বিধানসভা অধিবেশনে বাজেট এবং কতগুলি বিল পাশ করিয়ে নিয়েই বিধানসভা ভেঙে দিতে এবং তারপর আবার নির্বাচন করতে।

এই নির্বাচনে একটা সার্বিক সি পি এম-বিরোধী জোট গঠনই তাঁদের লক্ষ্য। যে জোটে থাকবেন, নব কংগ্রেস, সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস মুসলিম লীগ, ফরওয়ার্ড ব্লক, পি এস পি, এস এস পি প্রভৃতিও। এঁরা ইতোমধ্যে সিট রফা নিয়েও কিছুটা আলাপ আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন হল, ততদিন এই মন্ত্রিসভা টিকবে কি না? এই প্রশ্নের জবাব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে নব কংগ্রেসীদের আচরণের উপর। তাঁদের আত্মকলহ যদি বাড়ে তাহলে এই মন্ত্রিসভাকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না।

তাছাড়া, বাঁচতে হলে সরকারকে বেশ কিছুটা কাজও দেখাতে হবে। প্রথমত লোকে দেখতে চাইবে, এই সরকার আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনায় কতটা সাফল্য অর্জন করলেন? দ্বিতীয়ত, রাজ্যের বড় বড় সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে এঁরা কী কী করছেন তাও সাধারণ মানুষ বুঝতে চাইবেন। তৃতীয়ত, রাজ্যে যাঁরা বিরাট বিপুল ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই গরীবরা বুঝে নিতে চাইবেন এই সরকার গরীবের ভাল দেখবে কি না।

এগুলির উপরেও অজয় সরকারের ভবিষ্যত নির্ভর করবে।

১।৪।৭১

নবারুণ গুপ্ত

ঘুমন্ত বিবেক

বাংলা দেশে যে লড়াই চলছে ইতিহাসে তার কোনও নজির নেই। একদিকে রয়েছে অন্তত ৮০ হাজার দুর্ধর্ষ ফৌজ, লড়াই তাদের পেশা. অতি-আধুনিক অজস্র অস্ত্র তাদের হাতে। তাদের মাথার ওপর ছাতা ধরেছে মার্কিন সেবার জেট. বন্দরে বন্দরে তাদের সঙ্গে জোট বাঁধছে নৌসেনা. কামান দাগছে ডাঙা লক্ষ্য করে, তিন হাজার মাইল লম্বা ঘুরপথে নিয়ে আসছে রসদ, গোলাগুলি. কামান, বন্দুক, নতুন সেনাও। তাদের বেশীর ভাগই হয় পাঞ্জাবী নয় পাঠান। বেলুচ, সিন্ধী বিশেষ নেই তাদের মধ্যে। আদৌ নেই বাঙালী। তারা আছে বেড়ার অন্য দিকে। তাদের ভরসা মনের জোর আর লোক সংখ্যা। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী এক মন, এক প্রাণ হয়ে যুঝছে রক্তের নেশায় পাগল পাঞ্জাবী-পাঠান পল্টনের সঙ্গে। লুঠ-করা কিছু আধুনিক অস্ত্র তাদের সম্বল। আর অবশ্য আছে সনাতন লাঠি-ছুরি-তরোয়াল-তীর ধনু আর অপটু হাতে তৈরি কিছু আগ্নেয়াস্ত্র আর বোমা। স্বাধীন বাংলা দেশ কোনও দেশের কাছ থেকেই স্বীকৃতি পায়নি যে, বিদেশ থেকে নগদ কড়ি ফেলে অস্ত্রশস্ত্র কিনবে। তবুও তারা বলতে গেলে খালি হাতে যেরকম লড়ে যাচ্ছে তাতে তাক লেগে গেছে তামাম দুনিয়ার।

বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজ দেখিয়ে দিয়েছে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, সেই সব নিধিরাম সর্দারেরা মরিয়া হয়ে উঠলে কী অসাধ্য সাধন করতে পারে। ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা ছেড়েছেন ২৫ মার্চ। তার আগেই জারি করে গেছেন বাংলা দেশকে শিক্ষা দেবার হুকুম। তাঁর বিমান ঢাকা ছাড়তে না ছাড়তেই লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দিয়েছিল তাঁর ফৌজ বাংলা দেশের প্রধান শহরে। তাঁর মন্ত্রণাদাতা জুলফিকার আলি ভুট্টো তখনও ঢাকায়। দেখতে দেখতে গোটা শহরটা ছারখার হয়ে গেল। কত ঘর বাড়ি যে জ্বললো, কত লোক যে মারা গেল তার কোনও হিসেব নেই। পাছে তার কোনও হিসেব কেউ রাখে তার জন্যে বিদেশী সাংবাদিকদের হোটেলে একদিন নজরবন্দী করে রেখে কড়া পাহারায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো বিমানে করাচিতে। তাঁদের কাছ থেকে খাতাপত্র, ক্যামেরা ফিল্ম সবই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, যদিও ঢাকায় জঙ্গী হুকুমতের তাণ্ডবলীলা দেখবার বা তার ছবি নেবার কোনও সুযোগ তাঁদের দেওয়া হয়নি। তবুও সাবধানের মার নেই এই ভেবেই তাঁদের সব নথিপত্র আর ছবি-ছবি তোলার সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
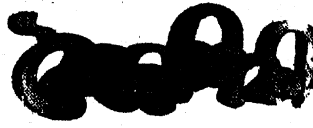
দেবরাজ

কিন্তু যত চেষ্টাই করা যাক, পাপ পারা তো ঢাকা যায় না, তা ফুটে উঠবেই। এত কায়দা করেও ইয়াহিয়া খাঁ দুনিয়ার চোখে ধুলো দিতে পারেননি। কেবল ঢাকায় নয় গোটা বাংলা দেশে কী হচ্ছে তা এখন বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে। তারা জানে লড়ায়ের পয়লা দফায় হার হয়েছে পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর। জুলিয়াস সীজারের মতো ইয়াহিয়া খাঁ ভেবেছিলেন তিনি আসবেন, দেখবেন আর জয় করবেন। তাঁর সে সাধ কিন্তু পোরেনি। এত কামান, বন্দুক, কিরীচ, রকেট, ট্যাংক সবই ব্যর্থ গেল। ঢাকার পথে পথে মৃতদেহের পাহাড় তুলেও তিনি ওই শহর জয় করতে পারেননি। ঢাকা সমানে যুঝে চলেছে সব অত্যাচার তুচ্ছ করে। শ্মশানের শান্তি নেমে এসেছে ঢাকার ওপর। তবুও কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁর পল্টন নিশ্চিন্ত নয়। যতক্ষণ তারা ছাউনিতে থাকে ততক্ষণ তাদের কোনও ভয় নেই। কিন্তু তার গণ্ডি পেরিয়ে সামান্য একটু দূরে যেতেও তারা ভরসা পাচ্ছে না। কেন না ইসলামাবাদ যতই তড়পাক না কেন খাস ঢাকার আশেপাশের এলাকাও মুক্ত করে ফেলেছে দখলদারদের কবল থেকে মুক্তি ফৌজ।

ইয়াহিয়া খাঁর আশা ছিল ভেতো বাঙালীকে জব্দ করা যাবে সহজেই. রাজাকারীদের দল ভড়কে যাবে সঙীন বন্দুক দেখলেই, তারা লুঙ্গী খুলে দৌড়ুবে দু'বার গুলির শব্দ শুনলেই। স্বাধীনতার ভূত তাদের ঘাড় থেকে নেমে যাবে দু' দশজন লোক মারা গেলেই। দু'চারটে বাড়ি ধ্বসে পড়লেই। তা যে হয়নি তাতে তাঁর খুন চেপেছে. তিনি শুরু করেছেন গণহত্যা, একটা গোটা জাতকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার মতলবে। তাঁর সে উদ্দেশ্য তিনি গোপন রাখতে চান বলেই শুধু বিদেশী সাংবাদিকদের নয়, রেডক্রশের লোকদেরও ঘেঁষতে দিচ্ছেন না বাংলা দেশের কোনও এলাকায়। রেডক্রশ তো আর কেবল লড়াইয়ের জায়গায় গিয়ে ত্রাণকার্য চালায় না: দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটলেও তারা আহত আর বিপন্নদের সেবা করে। ঢাকা চট্টগ্রামে যদি কেবল সরকারের সঙ্গে কিছু সরকার-বিরোধীদের সংঘর্ষ চলতো তা হলে হয়তো ইয়াহিয়া খাঁ রেডক্রশকে ওসব অঞ্চলে সেবার কাজ করতে দিতেও পারতেন। কিন্তু যা ঘটছে তা তো আর দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়। চলছে একটা ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধ আর তাকে ব্যর্থ করার জন্যে জাতকে জাত নির্মূল করার প্রাণপণ প্রয়াস।

কোনও প্রমাণ রেখে দুষ্কর্ম করতে চাইছেন না ইয়াহিয়া খাঁ। তাই কালো বোরখায় ঢেকে দিয়েছেন বাংলা দেশ যাতে কেউ না টের পায় তাঁর জঙ্গী শাসন যেখানে ভেঙে পড়েছে, সেখানে চলছে নিষ্ঠুর হত্যালীলা। এলোপাতাড়ি লোক খুন করে চলেছে ইয়াহিয়া খাঁর পাঞ্জাবী আর পাঠান পল্টন। তারা চায় বাংলা দেশকে খতম করে দিতে চিরকালের জন্যে, তার স্বাধিকারের সাধ চিরদিনের মতো ঘুচিয়ে দিতে। যে উপায় তিনি তার জন্যে বেছে নিয়েছেন তার চেয়ে জঘন্য কিছু নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তিনি দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করেছেন। আওয়ামি লীগকে করেছেন বেআইনী। সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন বাংলা দেশের সর্বত্র। কিন্তু তিনি জানেন ও সবের মেয়াদ আর কদিন? দেশদ্রোহিতার অভিযোগ মুজিবরের বিরুদ্ধে আগেও আনা হয়েছিল, তাতে তাঁর প্রভাব হ্রাস পায়নি। আওয়ামি লীগ আজ বেআইনী আছে, কাল থাকবে না। তখন আবার যে কে সেই। তাই তিনি প্রতিরোধের মূল উপড়ে ফেলতে চান বাংলা দেশের মুক্তিকামীদের যাঁরা মাথা তাঁদের নৃশংসভাবে খতম করে। মগজ যদি না হয় তাহলে শরীর থাকলেই বা কী আর না থাকলেই বা কী?

বাংলা দেশের নরমেধ যজ্ঞের লক্ষ্য কেবল পাইকারী হারে লোক খুন করা নয়, যাঁরা মুক্তিকামীদের বুদ্ধি যোগান, তাদের মনে আদর্শে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন, তাদের জানের মায়া ছেড়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে শেখান, তাঁদের অস্তিত্ব মুছে দেওয়া। বিশ্ব-বিদ্যালয় হচ্ছে স্বৈরাচারীদের কাছে অবাধ্যতার উৎস, তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই ইসলামাবাদের হত আক্রোশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর, সেখানকার অধ্যাপকদের ওপর, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, বেছে বেছে খুন করা হয়েছে সেখানকার অধ্যাপকদের, ছাত্র নেতাদের। সঙ্গে সঙ্গে এক কবরে পুরে দেওয়া হয়েছে আওয়ামি লীগের নেতাদের যাতে স্বাতন্ত্র্যের বাতি জ্বালাবার জন্যে বাংলা দেশে কেউ বেঁচে না থাকে। এমনতর নির্মম ব্যাপার দুনিয়ার ইতিহাসে কখনও হয়নি। অথচ সারা দুনিয়া একটা কড়ে আঙুল তুলেও ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে এগিয়ে আসছে না। ওটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে যদি ওই বীভৎস কাণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা হলে আর মানবিক অধিকারের ভণ্ডামি কেন, কেনই বা বিশ্ব-শান্তির ভড়ং?

বিদেশে (১১)

ঐ তো সামনে গোডেসবের্গ। উর্টবিষ শুধোলে, "আমার পিসি বলছিল তুমি নাকি এই টাউনটাকে জর্মনির সর্ব জায়গার চেয়ে বেশী ভালোবাসো? কেন, বলো তো?"

আমি মুচকি হেসে কইলুম, "যদি বলি তোর পিসির সঙ্গে হেথায় আমার 'প্রথম প্রণয়' হয়েছিল বলে?"

উর্টবিষ "ধ্যত্‌! আমি ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, লীজেল পিসির ধ্যানধর্ম শুধু কাজ আর কাজ। ফাঁকে ফাঁকে বই পড়া। এবং সে-বইগুলোও দারুণ সিরিয়স। বড় পিসি বরঞ্চ মাঝে মাঝে হাল্কা জিনিস পড়তো। কিন্তু ছোট পিসি ওসবের ধার ধারতো না। সে যেতো প্রতি প্রভাতে ট্রামে চড়ে বন্ শহরে—যেখানে সে চকরী করতো।"

আমি। "সেই সূত্রেই তো আমাদের পরিচয়। আমরা ঐ সকাল আটটা পনেরোর ট্রামে বন্ যেতুম। আমরা আর সবাই দু'একটে সিঁড়ি বেয়ে ট্রামে উঠতুম। আর লীজেল পিসি ডান হাতে একখানা বই আর বাঁ হাতে ট্রামের গায়ে সামান্যতম ভর করে সিঁড়িগুলোকে "তাচ্ছিল" করে এক লম্ফে উঠতো ট্রামের পাটাতনে। উঠেই এক গাল হেসে ডাইনে বাঁয়ে সমুখ পানে তাকিয়ে বলতো "গুটেন মরগেন" "সুপ্রভাত"। ওর ঐ লম্ফ মেরে ওঠার কৈশল দেখে আমি মনে মনে বলতুম, "একদম 'টম্‌ বয়'! ওর উচিত ছিল, মার্কিন মুল্লুকে 'কাউ বয়' হয়ে জন্ম নেবার। অথবা 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন'—গুরুদেবের ভাষায়।

গোডেসবের্গ তখন অতি ক্ষুদে শহর। সবাই সবাইকে চেনে। কিন্তু আসল কথা, ঐ আটটা পনেরোর ট্রামে থাকতো পোনেরো আনা কাচ্চাবাচ্চা। ইস্কুলে যাচ্ছে বন্ শহরে। এরা সবাই জানতো যে লীজেল পিসির, অবশ্য তখনো তিনি "পিসি" খেতাব পাননি, কাছে আছে, লেবেনচুস, দু'একটা আপেল, হয়তো নবাগত মার্কিন চুইং গম, মাঝে মাঝে চকলেট্। কাজেই বাচ্চারা সমস্বরে, কোরাস কণ্ঠে বলতো, অন্তত বার তিনেক "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত—"। তার পর সবাই তার চার পাশ ঘিরে দাঁড়াতো। সবাই বলতো, "লীজ লীজ, এজ্জে এজ্জে, এই এখানে বসুন"।

আমি বললুম "বুঝলি উর্টবিষ, তোর পিসি লীজেল ছিল আমাদের হীরইন অব দ পেল। তবে তুই ঠিকই বলেছিস ও কখনো প্রেম-ফ্রেমের ধার ধারতো না। আমি দু'একবার তার সঙ্গে হাফহার্ফ ফ্লার্ট করতে গিয়ে চড় খেয়েছি। অথচ আমাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধুত্ব ছিল গভীর। আমাকে কত কী না খাইয়েছে—ঐ অল্প বয়সেই বেশ দু' পয়সা কামাতো বলে। তখনকার দিনে ছিল—এখনো নিশ্চয়ই আছে—একরকমের বেশ মোটা সাইজের চকলেট—ভিতরে কনাক্। বড্ড আক্রা। কিন্তু খেতে—ওঃ! কী বলবো—মুখে ফেলে সামান্য একটু চাপ দাও। বাস্, হয়ে গেল। ভিজে ভিজে চকলেট আর তরল কন্যাকে মিশে গিয়ে, দ্যাখ তো না দ্যাখ, চলে গেল এক দম পেটের পাতালে। কিন্তু যাবার সময় ঐ যে কন্যাক্—তোরা যাকে বলিস ব্রান্টভাইন, ইংরিজিতে ব্র্যাণ্ডি, নাড়িভুঁড়ির প্রত্যেকটি মিলিমিটার মধুরে মধুরে চুলবুলিয়ে বুঝিয়ে দেতো, যাচ্ছেন কোন মহারাজ।...আর মনের মিলের কথা যদি তুলিস তবে বলবো, লীজেল ছিল বড্ডই লিবরেল। তাই যদিও নাৎসিরা তখনো ক্ষমতা পায়নি কিন্তু রাস্তাঘাটে দাবড়াতে আরম্ভ করেছে—পিসি সেটা আদৌ পছন্দ করতো না। আমিও না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ইংরেজ যে ইতি-মধ্যেই হিটলার বাবদে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সেটা আমার চিত্তে পুলক জাগাতো। পিসিও

স্বাধীন বাংলা দেশ

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ আজ সারা বিশ্বের সৎ ও বুদ্ধিজীবী মানুষের মনে বেদনার্ত আবেগের সৃষ্টি করেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী সংখ্যা (১৭ এপ্রিল) "দেশ" পত্রিকাটি বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা দেশের সংগ্রামী পটভূমিকায় এই সংখ্যার রচনাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। লেখক-সূচীতে রয়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, জসীম উদ্‌দীন, শামসুর রাহমান, হাফিজুর রাহমান, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উভয় বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক।
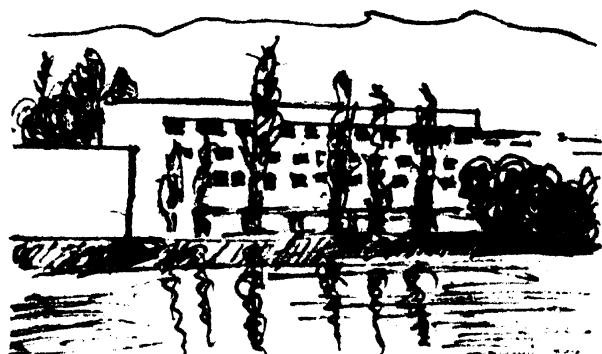
রাইন নদের পাড়ে জর্মন পার্লামেন্ট হাউস। একদম মডার্ন। বিরাট একটা বিস্কুটের টিন-এর মত॥

সেটা জানতো। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কথা উঠলেই সে ব্যথা পেত। বলতো 'ও কথা থাক না।' ওরকম দরদী মেয়ে চিনতে পারার সৌভাগ্য আমি ইহসংসারে অতি অল্পই পেয়েছি।"

হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ভাগিনা ডীটরিষ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। শুধোলুম "কি হল রে? তুই কি পরশুদিনের হাওয়া খেতে চলে গিয়েছিস?"

কেমন যেন বিষণ্ণ কণ্ঠে ভেজাভেজা গলায় বললে, "মামা, তুমি বোধ হয় জানো না, আমার বাবা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ওপারে চলে গেল কি করে।"

ডীটরিষের এখন যৌবনকাল। তার বাপ কেন, ঠাকুদ্দাও বেঁচে থাকলে আশ্চর্য হবার মত কিছু ছিল না। বললুম "আমি তো জানিনে, ভাই। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার হচ্ছেও না। কারণ তোর গলাটা কি রকম যেন ভারী ভারী শোনাচ্ছে—"

"তুমি এইমাত্র বললে না, তুমি, পিসি মুকুনাই নাৎসিদের পছন্দ করতে না। বস্তুত পিসি-পরিবারের কেউই নাৎসি ছিল না। যদিও আমি তোমার বান্ধবীকে পিসি বলে পরিচয় দিয়েছি, আসলে তিনি আমার মাসি। তাঁরা তিন বোন। আমার মা সকলের ছোট। তিনি বিয়ে করলেন এক নাৎসিকে—কট্টর নাৎসিকে। কেন করলেন জানিনে। প্রেমের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিল। বাড়ি গিয়ে তোমাকে তার ডাইরিটি দেখাবো। আর চেহারাটি ছিল সুন্দর—"

বাধা দিয়ে বললুম, "সে তো তোর চেহারা থেকেই বোঝা যায়।"

"থ্যাংকউ। আর বাবা ছিল বড্ডই সদয়-হৃদয়—"

"ভাগিনা, কিছু মনে করো না। আমি মোটেই অবিশ্বাস করি না যে তোর পিতা অতিশয় করুণ হৃদয় শান্তস্বভাব ধরতেন—তোর দুই মাসিই সে-কথা আমাকে বারংবার বলেছে। কিন্তু, আবার বলছি, কিছু মনে করো না, তাহলে তিনি নাৎসিদের কনসানট্রেশন ক্যাম্প সয়ে নিলেন কি করে?"

ডীটরিষ চুপ মেরে গেল। কোনো উত্তর দেয় না। আমি এবার, বহুবারের পর আবার বুঝলুম যে আমি একটা আস্ত গাড়োল। এ রকম একটা প্রশ্ন করা আমার মোটেই উচিত হয়নি। বললুম "ভাগিনা, আমি মাফ চাইছি। আমি আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব চাইনে। ওটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

ডীটরিষ বললে, "না, মামু। তুমি যা ভেবেছো তা নয়। আমি ভাবছিলুম, সত্যিই তো, বাবা এগুলো বরদাস্ত করতো কি করে? এবং আরো লক্ষ লক্ষ জর্মন? এই নিয়ে আমি অনেকবার বহু চিন্তা করেছি। তুমি জানো, মার্কিন-ইংরেজ রুশ-ফরাসী ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় বার বার নাৎসিদের প্রশ্ন করেছে 'তোমরা কি জানতে না যে হিটলার কনসানট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে খুন করছে?' উত্তরে সবাই গাইগুই করেছে। সোজা উত্তর কেউই দেয়নি। জানো তো যুদ্ধের সময় কত সেনসর, কত কড়াকড়ি। কে জানবে, কি হচ্ছে, না হচ্ছে। আমার মনে হয়, আবার বলছি জানিনে, বাবার কানে কিছু কিছু পৌঁচেছিল। কিন্তু বাবা তখন নিরুপায়। তিনি চান জর্মনির সর্বাধিকার। তাঁর ডাইরিতে বার বার, বহুবার লেখা আছে, 'ইংরেজ কে? সে যে বিরাট বিশ্ব জুড়ে খেতে চায় তাতে তার হক্কো কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মানি, তারা যদি আমাদের কিংবা ফরাসীদের মত কলচরড্ জাত হত তবে আমরা এ-নিয়ে কলহ করতুম না। কিন্তু ইংরেজ জাতটাই তো বেনের জাত। তারা কলচারের কি বোঝে!' ওদের না আছে মাইকেল এঞ্জেলো, না আছে গ্যোটে-কান্ট। আছে মাত্র শেকসপীয়র। ওদের না আছে স্থাপত্য, না আছে ভাস্কর্য, না আছে—" হঠাৎ বললো "ঐ তো বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

গরমের দিনে
তাড়াতাড়ি
ক্লান্তি আসে
গ্ল্যাক্সোজ-ডি নিমেষেই সজীবতা ফিরিয়ে আনে!
গ্রীষ্মের প্রাণান্তকর গরমে আহারে রুচি থাকে না বলে—
খাবারের মাত্রা কমে যায়, তাই অবসাদও বাড়ে।
অবসাদ, উত্তাপ, দূর করে শরীরকে স্নিগ্ধ সতেজ করুন
গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে। গ্ল্যাক্সোজ-ডি পান করুন ঠাণ্ডা জল
অথবা ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে। পলকের মধ্যে অনুভব
করবেন শরীরের মধ্যে এক নতুন শক্তির সঞ্চার হচ্ছে।
ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম ফসফেট আর গ্লিসারোফসফেট
সংযোগে তৈরি বলে গ্ল্যাক্সোজ-ডি
সহজেই শারীরিক ক্লান্তি আর
মানসিক অবসাদ কাটিয়ে দেয়।
সকাল সন্ধ্যে গ্ল্যাক্সোজ-ডি খেয়ে কাজে তৎপরতা ও সজীবতা
বজায় রাখুন।
গ্ল্যাক্সোজ-ডি করে তাজা, দেয় শক্তি
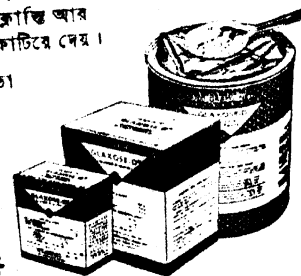
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কুয়াশা

বিলের দিক থেকে ঠিক তখনই সব জ্যোৎস্না ছিঁড়েখুঁড়ে কী একটা এগিয়ে আসছিল। একটা শব্দহীন হুড়মুড়ানি চলছিল, কারণ হট্টিটি পাখিটা টি টি টি ডেকেই হয়তো দূরের সতর্কতায় পালিয়ে গেল। আর নলখাগড়ার মাথায় সরু চাঁদটাও অবছা হয়ে পড়ল। সামান্য কয়েক-পা আগে ঝাঁড়ঝাসের ভিতর যে লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, মনে হল তাকে আগাগোড়া মুড়ে ফেলবার জন্যেই একটা খসখসে কাফন আস্তে আস্তে ভেসে আসছে। এবং হয়তো ও ভয় পেয়ে কোন অস্ফুট ককানি গলায় আঁকড়ে গুটিয়ে থাকবে, সামনের লোকটা বলে উঠল, কুহা, কুহা!

হাঁ, তাই বটে। কুহা—কুয়াশা। এবং সাইত্রিশ ভয় পায়নি জোবেদালি, উনিশ বছরের আঁকাড়া জোয়ান ছেলেটি, ওটা যেন তার বিস্ময়ের গোঙানি। এইরকম বিল খাল মাঠ আর রাতের সুমসাম নির্জনতা, এমন কনকনে শীত—যখন ব্যাঙ সাপ শামুকেরা ঘাসের নিচের ফাটলে চলে যায় এবং পোকামাকড়গুলোর জিভ সেঁটে যায়, সে অনেক দেখেছে। ওই জ্যোৎস্না দড়মড় করে ভাঙা হাতির পালের মত কুয়াশাও তাকে কতবার চাপা দিয়েছে। কিন্তু আজ, এখন ঠিক ওই মুহূর্তটাতে তার কী হয়েছিল—পরে কখনও বুঝিয়ে বলা সম্ভব হবে না। আর কষ্টের কথা কী, ফের একটা সুযোগ গেল। মোল্লাজীর পাতো জালটা যখন মাছের পিস্তিটার দিকে ঢলে পড়েছে, তখনই একটামাত্র মরণ ঝাঁপ দিতে পারত—শেয়াল যেমন করে বুড়ো মোরগ ধরে। একটুখানি ঝটপটি, অবাক হওয়ার গোঙানি, তারপর নিঃসাড় হয়ে ওঠা। বাস্।

তারপর—হাঁ, এই বিলটা অনেক বড়ো, অনেক দামে ঠাসা, গভীর, কুমীর থাকে, জলটুঙ্গিতে ঘেঁষাঘেঁষি বড় বড় বটপাকুড়ের ডালে ওঁৎ পেতে থাকে ভয়ংকর সব গৃধিনীরা এবং অনেক শেয়ালও ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায়—কারণ ওখানেই কোথায় ছেলেপোতার জায়গা আছে, লুকিয়ে বিয়োনো পাপের মাংসটুকু যৌনকাতর মেয়েরা এসে পুঁতে যায়—এইসব জায়গাতেই মোল্লাজীর লাসটার হিল্লে করা সহজ ছিল।

জোবেদালির কান্না পাচ্ছিল এতক্ষণে। অনেক আগে গেরস্থর রাখালী করত সে, এমনি কোন রাতে পালছাড়া কোন গরু, কী বাছুরের খোঁজে বিলের দিকে এসে ভীতু ছেলেটি যখন ঠাণ্ডায় কাঁপে যেতে-যেতে

দৌড়চ্ছে—অনেক দূরে কাঁপানো গলায় তার মায়ের ডাক আর আলো দেখেছে সে, হাতের ঘেরে পিদীম রেখে মা ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, 'জোবদু, জোবেদালি রে'... ওই হুট্টিটি পাখির মত ছিল মায়ের চেঁচানিটা,...এখন মনে হয়, ঠিক তেমনি করে তার মা এগিয়ে আসছে মাঠ ভেঙে—শামুকের খোলে পা দুটো রক্তারক্তি করে দৌড়চ্ছে। উঁহু, এখন আর জোবেদালির দিকে নয়। মায়ের কাঁপন্ত গলায় অন্য নাম—'মোল্লাজি, মোল্লাজি হে'...এবং এইটে ভাবতেই জোবেদালির বুকের ভিতর করকরে মাথা পেঁচিয়ে উঠেছিল।...হাঁ বাপজান, আমার মা!...

আর হানিক মোল্লাও চমকে ছিল। বাহান্ন বছরের কঠিন ভারি হাড়ের ভিতরটা সিরসির করে উঠেছিল। হাতের লম্বা কাটারিটা ঝুঁকে পড়েছিল ফাড়িঘাসের ভিতর। সারা বিকেল তালকাঠের 'বেলেটে' বালি দিয়ে ঘষে এত ধারাল করা হয়েছে সেটা, ক্ষুরের মতো লোম চাঁছা যায়। অথচ এখন মনে হচ্ছে, বিলের দিক থেকে আচমকা যেন সাদা-সাদা ফেরেশতা বা দেবদূতেরা দৌড়ে এসে দারুণ গোনাহ থেকে বাঁচাল মোল্লাজীকে—কারণ এই মানুষটি আজীবন এতবার নমাজ পড়েছে যে তার কপালে ছোপ পড়ে গেছে, যা হয়তো পাপীও 'বেহেশ্‌তী' মানুষ সনাক্ত করবার জন্যে বিশেষ চিহ্ন। হাঁ, দারুণ গোনাহর কাজ হত। এতদিনের সব বন্দোগির রোজগার একদলা তাজা রক্তের বদলে কিনে নিয়ে যেত শহুরে—মোল্লাজীর ধারণা, যার মুখটা ওই জোবেদালির বাপ আতর আলির মত শুওরমুখো। তবে, সুখের কথা—আতর আলি বেঁচে থাকলে তার বিবিকে পাওয়া যেত না। আর এই সামনের দেয়ালের মত ছোঁড়াটাকে সরিয়ে দেওয়ার ঝক্কি থাকত না। বাহান্ন বছরের মানুষ হানিফ মোল্লার কলজেটা এইসব আফসোসে ফালাফালা হচ্ছিল। সে একটু পরেই তো ডাকত জোবেদালিকে, 'বিত্তি'তে অনেক মাছ পড়েছে এবং সেটা এক্ষুনি ঝেড়ে নেওয়া দরকার বলত, তার ফলে জোবেদালি সংবাদের [illegible] ঝুঁকে বিত্তিটা ওঠানোর চেষ্টা করত এবং তক্ষুনি...

হা খোদা! হা [illegible]! [illegible] দুটো জোরালো আক্ষেপ বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে এই আলৌকিক পিরহানবৎ কুয়াশা সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসতেই মোল্লাজী চেঁচিয়ে উঠেছিল, কুহু কুহা! অথচ সে অভিজ্ঞ মানুষ। সে জানে এই শীতের বিলে এমনি করে কুয়াশা উড়ে গাঁওয়ালে চলে যায় রাত্রিবেলা। কিছুক্ষণের জন্যে ঢেকে যায় সব ঘাস গাছ মাঠ আর আসমান। শেয়ালেরাও ডাকতে ভোলে। অনেক দূরের সড়কে গাড়ির চাকার শব্দ আর গাড়োয়ানের কাঁপা-কাঁপা গানটাও কানের আড়ালে চলে যায়। হাঁ, এই রকম চলন্ত সজীব কুয়াশা হঠাৎ আঁধির মত এসে চমকে দেয় সবাইকে—এমন কি সমস্ত স্পন্দনশীলতাও যেন স্তব্ধ হয়। [illegible] আজের ব্যাপার মধ্যশীতের [illegible] হানিফ মোল্লা অনেকবার [illegible] পড়েছে। চমৎকারিনী। কিন্তু আজ [illegible] বিড়বিড় করে দোওয়া পড়েছিল [illegible] আরবী ভাষার উচ্চারণ করছিল, [illegible] বান্দাকে—এ মার অকৃতজ্ঞ দাসকে [illegible] হাত থেকে বাঁচাও প্রভু।......

*

সন্ধ্যার মুখোমুখি চটপট [illegible] খাওয়াদাওয়া সেরে যখন ওরা দুটিতে [illegible] দিকে বেরোচ্ছে, আচমকা বুকে ছাঁৎ করে উঠেছিল বানুবিবির। হয়তো ছেলের জন্যে হয়তো বা মরদটার জন্যে, সে বুঝতে পারে চলন্ত সজীব কুয়াশা হঠাৎ আঁধির মত দুটো মানুষ—সমান রক্ত বা যন্ত্রণা। মোল্লাজির কিছু ক্ষেত আছে, সমাজে সম্মান আছে, কিন্তু বাঁজা মরদ। সৎছেলেকে [illegible] দু বছর ধরে নিজের বাড়িতে রাখবার চেষ্টা কম করেনি। হতভাগা ছেলের গোঁ ঠিক তার মরা বাপটার মতই। ঘাড় বেঁকিয়ে শুধু বলে, ক্যানে? ফকুরে (পিসি) কাছে থাকে সে। ফাকু বেওয়া মানুষ। [illegible] জেলেপাড়ায় [illegible] তার। কোনো ক্ষেত [illegible] ভিটের মাথাও স্বামীর সঙ্গে বেচে খেয়েছে

বলে ভায়ের ভিটেয় এসে জুটেছিল। আশ্চর্য লাগে বানুবিবির, ওই ছেলেমানুষ জোবেদালি বলেছিল, ইখানে থাকো ফুফু, —সব দায় আমার। দায় তো নিলি, খাওয়াবি কী? বানুবিবি বলেছিল। জোবেদালি জবাব দিয়েছিল, তোমরা দুটি ননদভাজ, আমি একটা জোয়ান মরদ—আর পিথিমীটাও অনেক বড়। ভাবনা করি না—হুঁঃ!

এবং তারপর সে এক দুঃখের দিন। ভাবনা এসে গেল। ভাবনার সাথে দুঃখের লম্বা-চওড়া থাবায় ঘরের চাল হল ঝাঁঝরা, দেহগুলো গেল সিঁটিয়ে, ফালাফালা ছিঁড়ে গেল সব আশার নকসী কাঁথাগুলো। দুনিয়াটা ভালো করে তো চিনতে পারেনি অন্তর আমি—বলেছিল তু মোছলমানের মেয়ে, চাঁদসুরুযের মুখ দ্যাখাও তোর গোনা। সুতরাং বাইরের দুনিয়ায় তখন গুটিসুটি পা বাড়িয়ে বানুবিবি দ্যাখে, কী শক্ত রুখাশুখো মাটি, হরেক দুষমন জন্তু-জানোয়ারে ভরা—কাঠকুটো কুড়োতে গেলেই ঝোপের আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়ায় জ্যান্ত সাপ। রাগে দুঃখে বানুবিবি জ্বলছে। ধিকিধিকি আগুনে জ্বলছে। এবং টের পেয়েছে, একটা পথ এখনও আছে। কারণ, তার গতরের মধ্যে এখনও যৈবনের সোনার পিদীমটি নিবুনিবু হয় নি। তা না হলে কেন ওই তেলকুচকুচে দাড়ির ফাঁকে সব পানখাওয়া ঠোঁটের ঝিলিক আড়াল থেকে! বেঁচে আছে বানুবিবির। এই যৈবন থাকা গতরের বদলে কিনতে কিনতে পারে কিছু, পয়সাকড়ির কিছু বিছানাপত্তর টাকা পাটের গাঁঠ, আরও নানা রকম।.....

সুতরাং সবার আগে নিজের দিকে মন দিল সে। খুলেরাখা কাচের চুড়িগুলো আবার হাতে পরল। নিয়ে চুলে তেল দিল। কপালে ছিল সবুজপাতার টিপ। নাকছাবির থুথু দিয়ে মুখটা ঘষে চকচকে করল। এক টুকরো আয়না খুঁজে নিয়ে নিজেকে দেখেছিল সে।...আমি কি ছেলের মা, আঠারো সনের ওই ছেলেটার? কী মনে হয় গো তুমাদের? হাঁ, আমি বিহা করব আবার। আমি তো ননদমাগীটার মতন গতরধসা হইনি।

সেই সব শুনে জোবেদালির ফুফু চাপা গলায় জোবেদালিকে বলেছিল, ও বাপধোন জোবু, তোর মায়ের কী হয়েছে? পরীর দিষ্টি লেগেছে রে। ছি, ছি, ছি.....কী কান্ড বেওয়ামানুষের!

জোবেদালি অবাক হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কী ভালোলাগা লাগল মাকে, তার দুঃখিনী মাটাকে, বলার নয়। অত বড় ছেলে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেছিল—মা, তোকে জোনাকির মতন লাগছে। বারবার এই কথা বলে সে আর বুকে মাথা ঘষে। নাইকুন্ডলে আছাড়িপিছাড়ি খায় কী গাঢ় যন্ত্রণা। এই আনন্দ না—ভাবতেই হঠাৎ বিশ্বাস আসে, কোনোদিন কোন এক বিরাট মাঠের মধ্যে যদ্দুর চোখ চলে দুজনে হাঁটবে দুনিয়ার ওড় দেখতে।

এমন ছেলে জোবেদালি। ধেড়ে বয়সেও মায়ের গায়ে পা তুলে গলা জড়িয়ে ঘুমোয়। ঘুমের ঘোরে ছাড়াছাড়ি হলে অন্ধকারে হাতড়াত সেই নরম মাংসপিন্ডটা—মা মা গো! ভাঙা গলায় হাঁকরাত সে। ছটফট করত। এবং তখন অন্ধকারে ঘুমজড়ানো ভারী ও ভাঙা স্বরে মায়ের সাড়া, আহা, দুনিয়া তুমি দুষমন হও, আমি এই দিকে—এরকম দোস্তালি নিত জোবেদালি। নিন্দেতে যখন বুজেছি, সে বাপের আধখানি মত এই মা-টাকে পাড়ুটাকে বারবার দেখে নিতে ভুলিত পেত।

তারপর একটা জোর আঘাত এল।

হানিফ মোল্লার বাড়ি পাশের গাঁয়ে। সেই গাঁয়ে সেই বাড়িতে তার মা বিবি হচ্ছে জানতে পেরে জোবেদালি অস্ফুটে একবার বলেছিল, ক্যানে?

তারপর ভারি নীরবতা। টানা অনন্ত নীরবতা। রাতে মা তাকে কাছে টানতে চেয়েছে, সে সাড়া দেয়নি। মা বলেছে, আগ করেছিস বাছা? আগিস না। আমার বড় জ্বালা রে, বড় জ্বালা।...মা তাকে বোঝাত। চিরটা কাল তো আমার কাছে শুবি না, বাপ। তোর একটা বউ হবে—তখন কী করবি? আমিন তো বউ হয়েই যেত পয়সা-কড়ি নাই বলে হল না। হয়তো বাপটা বেঁচে থাকলে.... হঠাৎ থেমেছে বানুবিবি। আতের আঁধারে কথা মনে এলেই সে ভয় পেয়ে গেছে। যেন এইমাত্র গোরের ভিতর লোকটা পাশ ফিরল। তার দিকে তাকিয়ে আছে ঠান্ডা নিথর চোখে। কিছু বলছে—যা শোনা যাচ্ছে না। বানুবিবি তেমনি হঠাৎ কেঁদে উঠেছে—ক্যানে, পাপিষ্ঠে অমানুষ! একাতে সরম লাগে না আর? চোখ গেলে দেব তুমার।.....

বিয়ের দিন জোবেদালির পাত্তা নেই। খুব খোঁজাখুঁজি হল, তাকে পাওয়া যায়নি। গরীব মানুষের বাড়ি সেদিন বেহেশতের আয়োজন। হানিফ মোল্লার পুকুরের বড় বড় মাছ, ভাতের পাহাড়, মাটির ডেকচিভরা কুমড়োর তরকারি বালতি-বালতি মাষ-কলাইয়ের ডাল—গাঁসুদ্ধ হাপুসহুপুস খাচ্ছে। আহা, ছেলেটার খাওয়া হল না! হাঁড়িভরতি নাস্তা—গুড়ের 'ক্ষীর', 'পাকান'-পিঠে, বড় বড় লাড়ু—ছেলেটার জন্যে বুক ফেটে যাচ্ছিল। জীবনে এ সব 'আঁমাতো'-দেখ সে কি খেয়েছে কোনদিন! হতভাগিনী বানুবিবির আফসোস! হাতে সোনার রুলি, রুপোর বাজু, গলায় সোনার মাদুলিগাঁথা রেশমী সুতোর মালা, নাকে নাকছাপি, কানে

সংসার, এই তুমার ঘর, মা! মিথ্যা কষ্ট দিও না...

আর সেই শরৎকালটা একা বিছানায় শুয়ে, ঘুমের ঘোরে মাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়ে, কতবার আচমকা ডেকে সাড়া না পেয়ে গভীর শূন্যতায় ধড়ফড় করা রাতগুলো কেটে গেছে। মনে পড়েছে, মা বলত ও ফুফুকে—ঘুমোলে পরে ছেলাটার ঠোঁটখানি দেখো, ঠিক যেন চুকচুক করে মাই টানছে এত বড় ছেলাটা, তবে কি না অভ্যেস গেল না ভাই। দেখো, দেখো বাছার ঠোঁট দুখানি কেমন ঘুমিয়ে থাকে! ......ফুফু দেখেছিল নাকি। বলেছিল, হ্যাঁ রে জোবেদ, উ কি অভ্যেস রে? এখনও মায়ের 'তোন' (স্তন) খাওয়া? বিহা দিলে তো ম্যাটিবিটির বাপ হয়ে যাবে বাপু! জোবেদালির যেন দুধের দাঁত—হয়েছে।...যাঃ শালীবিটি, আমি বিহাই করব না।...তবে আঁধিবে কে খাওয়াবে কে?...না—মা। হাঁ, ওই এক কথা না। মা বলতে তার গলা ভারি হয়ে আসে, বুক বিশাল হয়, রক্ত চনমন করে, মাথা ওঠে—শুন্যতা ছাড়িয়ে—এবং বাইরে থেকে ঘরে ফেরার সময় প্রতিটি পা পড়তে থাকে মায়ের দিকেই—এটা জানা হয়ে গেল দুনিয়াবে আমি দুজন ভাবি না। যেমন কিনা পাখি উড়ে যায় গাছের দিকে, আমার মায়ের কাছে যাওয়াটাও তেমন।

কিন্তু জোবেদালি দূরিকে পড়ত হানিফ মোল্লা ওকে খুঁজতে এল। মোল্লাই অনেকেদের করত, আনন্দ ভরা সুখের সংসার—ছেলে নেই, অথচ মনে কত সাধ—কিছুই হচ্ছে না। ইখানে না ... ঘেটে ঘেটে কোরান শরীফ পাঠ করছে। তবে যাবে না গো! কারো কি চোখ পড়? আচ্ছা তো একটু ... চাঁদ চেহারা দেখে বিহা দেব ... সেইটেই তো কথা। ওই দুঃখটাই ... জোবেদালির মনে—যেমন কিনা ঘরের ভিতের বাস্তুসাপের বাসা। মাঝেমাঝে ফোঁসফোঁস করে পিদিমজ্বলা দেখলেই। সাধ্য নেই তাকে তুমি মারো।

একা ফিরে গেছে হানিফ মোল্লা। দরজার ফাঁক প্রতীক্ষিত চোখ দুটোর উদ্দেশে। বলেছে, নাঃ, এল না। এবং তারপর মোল্লাজী টের পেয়েছে, বানুবিবি অন্ততঃ আজ রাতের মত খড়ের আঁটি হয়ে গেল। আজ আর গতরের সুখ আশা করা বৃথা। রাগে দুঃখে আর হিংসায় তখন সারা রাত হানিফ মোল্লার চোখে ঘুম নেই। ইচ্ছে করেছে, ওই দুষমন ছোঁড়াটাকে...থাক্, মনের কথা মনে। আর, এ বড় গোনাহর চিন্তা নুসল্লী মানুষের পক্ষে। বেহেশতের লোভ তার আছে। দোজখের আগুনের ভয়ও আছে। একদা বেহেশতবাসী হতে পারলে এ কোন ছার মেয়ে, অনেক হুরপরী তোমার সেবার জন্যে দেবদূতেরা পালকি চাপিয়ে নিয়ে আসবেন। অতএব, মোল্লা, ঠিকসে চলো।

তবে কথা কী, বানুবিবির গতরের ন ফের নতুন বান ডাকিয়ে এসে গেছে। দুবেলা-চারবেলা পেটপুরে খায় আর মাংসে রোশনী খেলে। চোখের নিচেটা ফুলে ওঠায় ঘুম-ঘুম আবেশ নেশা আর বিহ্বলতা, দুষ্টাকে নাচিয়ে তোলে। বুকখানা ঠেলে উঠছে দিনেদিনে। পাঁজরেপেটে আগুনের ঢেলা ছলকাচ্ছে। ঝমঝম গয়না বাজিয়ে গরবিনী সুখে হাঁটে ভরা সংসারে।

তাই কি? বান্‌্বিবি আফসোসে বলে, পোড়া গতর আমার—যত সুখ তারই। আমার মোন যে গতরের বৈরী, সেটা কেউ জানে? মোনে আর গতরে দুষমনী আছে গো! খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, তবো গাখানা ফুলছে। মোনে কালবীজের নাদি পড়ে আঁকুর গাজিয়েছে, শরীলটা দেখে তুমি ধরতে পারবা না। যদি বলো কী তুমার দুঃখ, কানে কানে বলি—হাঁ, উই ছেলাটা, আমার অবুঝ ছেলাটা।

আড়ালে সমব্যথী পেলে কেঁদে উঠেছে বান্‌্বিবি। সে থালাভরা ভাতশালুন নিয়ে সামনে বসে আছে; ওদিকে হয়ত ছেলেটা জঙ্গল ঢুঁড়ে বুনোকচুর পাতা এনে সানকিভরে খাচ্ছে—এটা তো সহ্যের বাইরে। এখানে থাকলে কত পোশাক পরত সে। 'সারাকোলে' চেপে বেড়াত। টকিসিনেমার গান শুনত। টাকিবাজী দেখতে যেত শহরে—হাতে বাঁধা থাকত হাতঘড়ি। সে ছাড়া কত সুখ! বান্‌্বিবির কত সাধ। সে সব মটেই—না। মাঝে মাঝে বিশ্বাসী লোকের হাতে টাকাপয়সা দিয়ে পাঠায়—হারামজাদা ছেলে তাও ছোঁয় না। ফেরত ছুড়ে

কর্ন প্রোডাক্টস্‌-এর নির্বাচিত

পুরস্কৃত পাকপ্রণালী

★

জেলি কৃষ্ট্যালস্‌ দিয়ে তৈরী

মিসেস্‌ পেরিন এফ. লালকাকা

রেক্স জেলিতে আছে অপূর্ব ফলের স্বাদ—শিশু ও বয়স্কদের সবারই প্রিয়। নানা উপলক্ষ্যে নানা-রকমের পুডিং ও ডেসার্ট তৈরী করতে পারবেন। রেক্স জেলি কৃস্টালস্‌ সবচেয়ে সেরা, কেননা, সেরা-সেরা উপাদানে তৈরী এবং অতি সযত্নে প্রস্তুত।

৬ রকমের পছন্দমত চমৎকার স্বাদ

উপকরণ:

১ টিন
স্লাইস-করা আনারস
১ প্যাকেট
রেক্স জেলি
কৃস্ট্যালস্‌-
পাইনএপল্‌
১ প্যাকেট
ব্রাউন এণ্ড পলসন
প্যারাইট
কাস্টার্ড পাউডার
পাইনএপল্‌

১। আনারসের টিনের ভেতর থেকে পাতলা রসটি বের করে নিন। প্যাকেটে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে সেইভাবে রেক্স জেলি তৈরী করে টিনের মধ্যে ঢালুন। ঠাণ্ডা হয়ে জমে যেতে দিন।

২। প্যাকেটে যে ভাবে নির্দেশ দেওয়া আছে সেইভাবে ব্রাউন এণ্ড পলসন প্যারাইট কাস্টার্ড পাউডার ও দুধ দিয়ে সরেস কাস্টার্ড তৈরী করুন ও ঠাণ্ডা হতে দিন।

৩। পরিবেশন করার আগে টিনটিকে ১/২ মিনিট গরম জলের মধ্যে রাখুন যাতে টিনের গা থেকে খাবারটি আলগা হয়ে আসে। টিনের তলার অংশটি কেটে নিয়ে ভেতরকার জমানো ফল বার করে নিন। পুডিংএর ডিসের ওপর রাখুন। পরিবেশনের আগে দুটি স্লাইসের মধ্যে মধ্যে কাটুন। ওপরে কাস্টার্ড ছড়িয়ে দিন।

বিনামূল্যে! নতুন পাকপ্রণালী বই নং ৩

আজই এক কপির জন্য লিখুন। বিনামূল্যে আমাকে এক সেট পাকপ্রণালী পাঠাবেন।
ইংরেজী / হিন্দী / বাংলা / তামিল / তেলেগু / মালয়ালম / গুজরাটি / মারাঠি / কন্নাড়া

নাম ——————

ঠিকানা ——————

——————

এই কুপনটি ভরে ডাকে পাঠিয়ে দিন:
পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট,
কর্ন প্রোডাক্টস্‌ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,
শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই-১ বি. আর

DE-7

আপনার পরিবারের সবার মনের মত এ রকম আরো নানা খাবারের জন্য এই পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি রাখুন।

কর্ন প্রোডাক্টস্‌ কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

শ্রীনিবাস হাউস, ওয়াডবি রোড, বোম্বাই—১ বি. আর

Bensons:0610-Beli

ওখানে তৈরি হচ্ছিল জোবেদালিও। তার কাছে শরীয়ত ঝাপসা, জীবনটা স্পষ্ট —যেমন ওই মাঠঘাট বনবাদাড়। ঘরবাড়ি। ওই আকাশ। তার চারপাশে অনবরত চাপা ষড়যন্ত্রের শব্দ ওঠে। মা ও তার মাঝের পাঁচিলটা যত স্পষ্ট হতে থাকে, তত তার রক্ত অস্থির হয়।...

এবং শেষ না চাইতেই বিষ্টি পেল হানিফ মোল্লা। বানুবিবি অবাক। শুধু ভাবল, কী জানি কী মনে হল বাছার, মন আর মানল না, তাই এল। নিজেরে তার পা পড়ে না কিছুক্ষণ। কিন্তু কী ছিল যেন জোবেদালির চোখে, মনে কেমন ছমছমানিও রয়ে গেল। মাঘের এই বিকেলটা ছিল ভারি চমৎকার। উজ্জ্বল রোদের দিন। আকাশে মেঘের কুটোটি নেই। হঠাৎ হানিফ মোল্লা বলেছিল, ভাই যাঃ! কাল সাঁঝে যে বিবিগুলো বিলে পেতে এলাম, চুপসার দিনটাও গেল, আনা হল না তো!

বানুবিবি বলেছিল, ক্যানে? মাহিন্দার কাকেও পাঠাও। নিয়ে আসুক।

মোল্লা মুখ নেড়েছিল।...চোঁড়েই পাবে না কেউ। বিলের মধ্যে ফাঁড়িঘাসের জঙ্গলে পাং আছে। আমাকেই যেতে হবে। মস্তর ঘুঘু কিম্বর পড়েছে এতক্ষণ।

এই বলে সে মস্তো একটা হেসো শান দিতে বসেছিল। তখনও জোবেদালির সঙ্গে হবর কথা ওঠেনি। কিন্তু পোড়া মুখে বেরিয়ে গেল বানুবিবির—বেশ তো, সকাল সকাল খেয়েদেয়ে বাপব্যাটাতেই যাও। বাছা আমার উদিকেও সরেস কি না। মাছের নাম শুনলে আটকায় কে?

*

দুটি পুরুষই অবাক হয়ে চোখ তুলেছিল। প্রথমে জোবেদালির গলা শোনা গেল, হুঁ, আম্মো যাবো। তারপর হানিফ মোল্লার হুঁ, ভালই হবে।

দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটির চেহারা দুটি পুরুষ মনে প্রতিবিম্বিত হতে হতে, তারা অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল কখনও পাশাপাশি, কখন আগেপিছে—এবং হয়তো তখন গাঁয়ের কোন দাওয়ায় বসে লম্ফের আলোয় সুর ধরে খতিবসাব (মসজিদে যিনি খোৎবা অর্থাৎ ঈশ্বর এবং মহম্মদবংশীয় খলিফাদের গুণকীর্তন পাঠ করেন) একটা সহি জঙ্গনামা পুঁথি পাঠ করছেন : এ বড় অদ্ভুত জঙ্গ কেয়ামত খবর॥

*

দুটি অস্থির পুরুষ কিছুক্ষণের জন্যে চলন্ত পাড়ে, কুয়াশার মধ্যে ডুবে থাকল। কেউ কাকে দেখতে পাচ্ছিল না কিছুক্ষণ। তারপর ফের নষ্ট জ্যোৎস্নার বাগানে ফিকে হলদে ফুলগুলো ফুটল। টিট্টিটি পাখিটার ডাক শোনা গেল দূরে—টি-টি-টি...টি-টি-টি...। এক টুকরো চাঁদ ঝলসে উঠল বুবলা বনের মাথায়। শেয়াল ডাকতে থাকল। নির্জন আদিম সেই দুনিয়াটা আগের মতই নিরুদ্বেগ ও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল সামনে। হানিফ মোল্লা ডাকল, জোবেদালি।

উঁ?

চলো, ঘরে যাই।

জোবেদালি হাসবার চেষ্টা করল। হয়তো ঘৃণায়, হয়তো ব্যঙ্গে।...মাছ কী হবে? বলল সে।

মাছ? হানিফ মোল্লাও হাসল—হয়তো ঘৃণায়, হয়তো ব্যঙ্গে।...আমার পুকুরে অনেক মাছ।

তাইলে এসেছিলা ক্যানে?

ক্যানে?

হুঁ। জোবেদালি নাবালক নয়।

হানিফ মোল্লা অতি কষ্টে চেরা গলায় তু আমার দুষমন জোবেদালি। হাঁ, বিষম দুষমন।

উনিশ বছরের জোয়ান পুরুষ এ কথায় হা হা করে হেসে উঠল। কিংবা এ হাসি হাসি নয়, মহরমের মর্সিয়াজারির শোক-প্রকাশের হাহাকার। কিংবা এ হাসি দ্বারকা নদীর হড়পা বানের দৌড়ে এসে বিশাল গাছের শেকড়ে মাথা কোটা। সে বলল, কথাটা আম্মো ভাবি মোল্লাজী, আম্মো।

ভাবিস?

হুঁ। ভাবি।

বাহান্ন বছরের হানিফ মোল্লাও হা হা করে হাসল। এ হাসি হাসি নয়। প্রবল আগুনের ধকধক করে জ্বলে ওঠা। কিংবা মিথুন পাগল মোষের দাপাদাপি ফাঁড়ি ঘাসের বনে। হাসতে হাসতে দু'পা এগিয়ে এল সে।

জোবেদালি একটু পিছিয়ে বলল, তুমি আমাকে কাটবা মোল্লাজী?

চল্, ঘরে যাই।

জোবেদালি মুঠো পাকিয়ে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলল না।

হানিফ মোল্লা বলল, ই ফায়সালা জেবনে চুকবে না বাপ। আয়, ঘরে যাই। এবং আরো এগিয়ে সে হাত ধরল জোবেদালির। জোবেদালি হাতটা ছাড়িয়ে নিল তক্ষুনি। কিন্তু পা বাড়াল। ওরা পাশাপাশি খুবই আস্তে চলতে থাকল। হাঁটুঅব্দি ঘাসের বন, নিচে ছপছপে জল। ঠাণ্ডায় পাগুলো নিঃসাড়। কিন্তু সারা জীবনের অভ্যাসে এইসব ঠাণ্ডা ওদের সহনীয়। ওদের পায়ের মাংসে আদিম পৃথিবীর প্রাকৃতিক চিত্রাবলী রয়েছে।

শুকনো জমিতে পৌঁছন মাত্র আচমকা একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল দুজনে।

আর জ্যোৎস্নার গায়ে আঁচড় কাটতে থাকল লম্বা ধারালো ঠাণ্ডা এক ফালি ইস্পাত। টুকরো চাঁদের গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বার কতক উঠল আর নামল সেটা। ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শোনা গেল দুটি পুরুষ ফুসফুসের।

এবং ফের তখনই বিলের দিক থেকে সাদা চওড়া উড়ন্ত কাফনের মত ঘন কুয়াশার আরেকটা ঝাঁক এসে গেল। ফের একটি করাতচেরা কাঠের চিৎকার শোনা গেল, কুঁহা, কুঁহা! দুটি যুধ্যমান পুরুষ শরীর ঢাকা পড়ল কিছুক্ষণের জন্যে। আর ওই আর্ত প্রাগৈতিহাসিক হুঁশিয়ারিটা রক্তের পুরনো স্রোতে খিল ধরিয়ে দিয়েছিল সম্ভবত—ধনুক আর ছিলা হঠাৎ আলাদা হয়ে পড়ল।...

*

মেয়েমানুষের অবুঝ মন। পায়ে বাজছিল ঝমরঝমর রেশরম মল। হাতে দুলন্ত আলো। কী যেন টের পেয়েছিল—মনের ভিতর এখানেওখানে কাটারির ঝিলিক আর চাপা গুরু গুরু আওয়াজ কোথাও ভবে ভয়ঙ্করতম ঝড়ের খবর পেয়ে আলুথালু কেশে বানুবিবি বেরিয়ে এসেছিল। গাঁয়ের বাইরে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তার ডাকতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু কার উদ্দেশে ডাক দেবে, এই বড় ভাবনা। তার একপাশে গতর, অন্য পাশে মন। এই বিষম জ্বালা।

তবু সে ডাকবার জন্য মুখ খুলল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে গেল।

বিলের দিক থেকে কী একটা এগিয়ে আসছে। চাপা পড়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার মঠ। ভাঙা চাঁদটাও আস্তে আস্তে মুছে গেল। নিশ্চিহ্নকারী চলন্ত সজীব কাফনের সামনে বোবা হয়ে যেতে যেতে সে দেখল মোল্লাজীকে। কালো বিশাল এক পুরুষ দেহ তার কাছে প্রচণ্ড আশ্বাস নিয়ে ফিরে আসছে।

হানিফ মোল্লা পালিয়ে আসছে। হাঁসফাঁস করে দৌড়চ্ছে। বানুবিবির সামনে এসে সে বলে উঠল, পালাও পালাও।

ছেলেটার কথা আর শুধনো হল না মায়ের। কারণ, খুবই কাছে ধাবমান সাদা হাতির পালের মত কিংবা মৃতদেহ পিরহানের মত, কুহী আসছে, কুহী!...

॥ উনিশ ॥

কে একদিন আমি শুধিয়েছিলাম, 'মা, তুমি কি কখনো ঈশ্বরকে দেখেছ?'

'...খ্যাপা! ঈশ্বরকে দেখব কি! ...কে কি দেখা যায়?'

'...তবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ... কি করে? আমি বলি, তিনি কি ... দেখা পেতেন?'

'... পেতেন কেন? তিনি ...ই দেখতেন নিজের মধ্যে নিজেকে।' ... 'ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে ...ই ভগবত্তা লাভ করেছিলেন। সেই ... কাঁচপোকার কথা ভাবতে ভাবতে ... একদিন কাঁচপোকাই হয়ে যায়— ... না তুই?'

'...প্রাপ্তি ঘটেছিল তাঁর, তুমি বলছ ...'

'...প্রাপ্তি, ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি সব। যদিও ... দেখা দিতেন না, তাঁর ঐশ্বর্য-বিভূতি ... করতেন না কখনো।'

আকাশ থেকে ঝাঁড়ে ঝাঁড়ে টাকা নোট বার করে আনছিল

'নিজেকেই নিজে দেখতেন, তুমি বলছ মা, সেটা আবার কী রকম?'

'তুই যেমন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাস না? সেই রকম আর কি! আত্ম-সম্মোহিত অবস্থায় চিত্তের আয়নায় আত্ম-সাক্ষাৎকার হতো তাঁর।...বুঝেছিস এবার?'

'না তো। কিচ্ছু বুঝলাম না।'

'আমার যদি সম্মোহনবিদ্যা জানা থাকত তাহলে তোকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম এখুনি—স্বর্গ মর্ত পাতাল ত্রিলোক ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে আনতাম তোকে...মা দুর্গাকে দেখতে পেতিস স্বচক্ষেই।'

'হিপনোটাইজম করে দেখাতে?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেদিন হিন্দু হোস্টেলের ম্যাজিক খেলায় সেই যাদুকরটা যেমন আকাশ থেকে ঝাঁড়ে ঝাঁড়ে টাকা নোট টেনে সব বার করে আনছিল দেখিসনি? তোদের সবাইকে হিপনোটিজম করেই ত! সেই রকম, ধ্যানের সাহায্যে নিজেকে সম্মোহিত করার এক কায়দা আছে—একদিকে মন রেখে একটানা ধ্যান করে যেতে হয়, তার ফলে যা হয় তাকেই বলে সমাধি। উনি সমাধিস্থ অবস্থায় আত্মদর্শন করতেন।'

'তা হলেই আমার ভগবানকে দেখা হয়েছে!' আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম— 'একটানা ধ্যানে বসব কি, একটুক্ষণের জন্যেও মনকে কোথাও আমি বসাতে পারিনে। ভগবানের কথা ভাবতে গেলেই যত রাজ্যের জিনিস আমার মগজে ভিড় করে আসে। কী করি আমি বল তো? ও ছাড়া কি, ভগবানকে দেখবার কোনো শর্টকাট নেই? ইংরিজী মেডইজির মতই?'

'থাকবে না কেন? সব কিছুরই শর্ট কাট আছে। বোম্ ভোলা না বলে গাঁজায় কসে

দম দিলে মুহূর্তের মধ্যে কৈলাসে শিব-দুর্গার সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। সাধু সন্ন্যাসিরা তাই করে থাকেন শুনেছি। অমনি করে ইন্দ্রলোকে অপসরাদের নৃত্যগীত দেখেন—শোনেন নাকি! তোর বাবা তো সন্ন্যাসী ছিলেন এক সময়ে, গাঁজাও খেতেন নাকি, তাঁকেই শুধাগে না!'

'শুধাবার দরকার কি? এখনো তো মাঝে মাঝে খান, আমায় লুকিয়ে। তাঁর খেয়ে রাখবার পর সেই ছিলিমটা নিয়ে একদিন না হয় টেনে দেখব লুকিয়ে—এক টান মাত্তর! দেখি না কী হয়!'

'এই মরেছে। তাহলে তোর সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস প্রাপ্তি ঘটে যাবে। সেইখানেই থেকে যাবি—আমার কাছে ফিরে আসতে পারবি না আর। মহেশ্বরের কাছেই থাকতে হবে তারপরে—নন্দী ভৃঙ্গির সাকরেদ হয়ে।'

'চাইনে আমার ভগবানকে তাহলে আমার সাফ জবাব—তোমাকে ছেড়ে ভগবানকে চাচ্ছে কে? নন্দীভৃঙ্গির সাকরেদ হবার দায় পড়েছে আমার!'

বাঁচালি বাপু!' হাসলেন মা—'তোর বাবা সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে গেছলেন, তুইও যদি আবার তাই করিস তা হলেই হয়েছে!'

'কী দুঃখে সন্ন্যাসী হব মা! ভগবানের খোঁজে? ভগবানের ওপর অতখানি টান নেই আমার। কলিগায় গোরদা রামপদদাদের একটা আড্ডা আছে জানো মা? ভারী তর্কাতর্কি হয় সেখানে সব সময়। ভগবান আছে কি নেই—এই নিয়ে তর্ক যত। আমি সেখানে বসি গিয়ে এক এক সময়। শুনি সব।'

মুহূর্তের মধ্যে কৈলাসে

তাই নাকি?'

'কলিগায় ফকির সরকারের বাড়ি থেকে দই আনতে যাই না? রামপদদাদের আড্ডাতেও যাই তখন। কলিগার অতুল গোঁসাই আমাদের ক্লাসফ্রেন্ড—তাদের বাড়িতেই সেই আড্ডাটা!...গোরদা কে হয় যেন তাদের। তাদের বাড়িতেই থাকে। আর, রামপদদা হচ্ছেন গোর গোঁসাইয়ের বন্ধু।'

'তোর চেয়ে বয়সে বড়ো বুঝি?'

'অনেক বড়ো। তিরিশ বত্রিশ বছর বয়েস হবে বোধ হয়। তারা বলে যে, তারা নাস্তিক ঈশ্বর ধর্ম কিচ্ছু মানে না? ওসব কিছু নেই নাকি। না মানা তো ভারী খারাপ, মা?'

'কেন, খারাপ কিসের।'

মা একেবারে নির্বিকার—'না মানলে কী হয়? ভগবান রাগ করেন? না, না-খেয়ে থাকেন

'বয়সে তারা বড়ো হলেও আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করতে যাই কিন্তু পারি না কিছুতেই। তারা বলে যে ঈশ্বর আছে তার প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ দাও। আমি কি করে তার প্রমাণ দেব? কিছুই জানি না আমি। তুমি বলে দাও না আমায়—ঈশ্বরকে কি প্রমাণ করা যায়? প্রমাণ আছে কোনো তার অস্তিত্বের?'

'আছে বই কি। প্রমাণও করা যায় কিছু

'কী প্রমাণ? আমি জানতে চাই কী করে প্রমাণ করা যায়—বলে দাও না আমায়।'

ঈশ্বরের প্রমাণ বিন্দুমাত্র।' মা জানালেন, 'বিন্দুমাত্রই প্রমাণ।'

'বিন্দুমাত্র প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, বিন্দুর যেমন অস্তিত্বই শুধু,
সেই রকম আর কি! তোর ওই জ্যামিতি
দিয়েই প্রমাণ করে দেওয়া যায় ভগবানকে
না বিশদ হল—পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু
রেডিয়াস নিয়ে সার্কেল টানা হয়
রেডিয়াস বাড়িয়ে কোনোটা বড়ো সার্কেল
হয়, কোনোটা বা ছোট সার্কেল হয়
সেই সার্কেলটাই হচ্ছে পয়েন্টের অস্তিত্বের
প্রমাণ তখন। তাই না? পয়েন্ট একটা
বলেই তো তার থেকে রেডিয়াসের সব

সার্কেল টানা গেল? তেমনি আমরাই হচ্ছি ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমরাই তাঁর সার্কেল নিজগুণে তিনি টেনেছেন আমাদের —তাঁর সেই টান থেকে বেরুনো।'

'ভগবানের সার্কেল আমরা?'

'হ্যাঁ। কারো বা বড়ো সার্কেল কারো বা ছোট সার্কেল। কেউ বা সূর্য হয়েছে, কেউ বা শুধুই যুঁই। কেউ রবিঠাকুর, কেউ বা... কেউ বা তোর ওই রিনি! যার যেমন ব্যাস তার তেমনি বৃত্ত। সেই বিন্দুমাত্র ঈশ্বর আছে বলেই জগদ্ব্যাপী আমাদের অস্তিত্ব। ঈশ্বর আছে বলেই আমরা আছি। আমরা হয়েছি, আমরা হচ্ছি। আমরা হব।'

'তা না হয় হলাম, কিন্তু তাই বলে ঈশ্বরকে তোমার তো জানা যাচ্ছে না মা!'

'জানা যায় না, তবে বোঝা যায়। ঠাকুর যাকে বলতেন বোধে বোধ। সেই ঈশ্বরবোধের থেকে যে জ্ঞানের উদয় তাই হলো গিয়ে তোর বেদ। আর, বেদের সেই বোধোদয় থেকে ব্যাস নিয়ে আমাদের এই জীবনের বৃত্ত রচনাই হচ্ছে গিয়ে মহাভারত। যার [illegible] কিনা, মহাপ্রকাশ। ঈশ্বরপ্রকাশ। আমাদের জীবনে ঈশ্বর বৃত্তিলাভ।'

'বেদব্যাসের মহাভারত—জানি না আমি।' সায় দিই মার কথায়।

'সেই মহাভারত কী? ঈশ্বরের কথাই তো। তাঁর লীলাকাহিনী। ভগবান ভূতলে [illegible] নিয়ে নেমেছেন—বিচিত্র দেহরূপে [illegible] তাঁর সেই রসায়ন। যেমন তাঁর কথা তেমনি আমাদের জীবনকথাও আবার। ঐ মহাভারতই আমাদের জীবনে কোনো না [illegible] রূপে কখনো না কখনো ঘটছেই। তুই দেখবি।'

'আমাদের জীবনবৃত্তান্তই লিখে গেছেন সেই মহাকবি? কবি বেদব্যাস?'

'আবার একালের তোর ওই রবিঠাকুরও সেই বেদব্যাসেরই আরেক রূপ। আরেক [illegible] সেইরূপে সেই তাঁরই। তাঁর রচনাও [illegible] এক মহাভারত। গীতাঞ্জলি পড়েছিস তো। কী সেটা? ভগবানের কথাই না?'

'হ্যাঁ মা। আবার তোমার রিনিও তাই। তাই না মা? রিনি অবশ্য ভগবানের কথা [illegible] না কিন্তু তাহলেও সেও ঐ ভগবানেরই কথা। ভগবানের শেষ কথাই সে, আমার [illegible]'

'[illegible]। এই জীবনবৃত্তেই নরলোকে [illegible] ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তা ছাড়া ঈশ্বরদর্শনের আর কোনো উপায় নেই। বুঝেছিস?'

'[illegible] কথাটা যা আমার মগজে [illegible] তা হচ্ছে এই যে, আমাদের জীবনের সব কিছুর কেন্দ্রই তিনিই মূল। সেই কেন্দ্রমূল থেকে বোধের ব্যাস নিয়ে বৃত্তে এসে তিনি কাত হয়েছেন—তাঁর মুলাকাত পেতে হলে সেই বৃত্ত পথে—আমাদের প্রবৃত্তিপথেই যেতে হবে—নানা বৃত্তের নানান বৃত্তান্তে পদে পদে তাঁর সাক্ষাৎ পাব। নইলে তিনি মূলে হাবাৎ। মূলে তাঁর খোঁজ পেতে গেলে তিনিও নেই। আমরাও নাস্তি!

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার...এই জন্যেই বিবেকানন্দ বলে গেছেন, তাই না মা?'

'হ্যাঁ, তাই। ফলেন পরিচীয়তে—বলে না? সব কিছুর প্রমাণ হচ্ছে তার ফলে—ফললাভে। ঈশ্বর কল্পতরু, আর কল্পতরুর প্রমাণ তার ফলেই তো মিলবার? তাই না?'

'হাতে হাতেই পাবার তো মা? আম লিচু যেমনটা আমি পাই?'

'নিশ্চয়। নইলে পরিচয়টা হবে কি করে? তাঁকে ডেকে তুই তোর কল্পিত ফল, এমনকি তোর অকল্পিতও যা—যদি তুই কল্পনাতীত ভাবে পেয়ে যাস, তাহলে সেটাই, ঈশ্বর যে আছে তার প্রমাণ হবে—নয় কি? ডেকে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ তুই পাস কি না—তবেই তোর বিশ্বাস হবে।'

'অবিশ্বাস করে ডাকলেও তো ফল পাবো? তুমি বলেছিলে না মা আমায়?'

'ঈশ্বরকে মনে রেখে তোর কর্মবৃত্তির পথে তোকে এগুতে হবে—দেখবি ঈশ্বর

তোর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। পদে পদে তাঁর সাহায্য পাবি. হাতে হাতে নগদ দেখিস। দেখে নিস।'

'ঈশ্বরের সাহায্য পাব সব সময়?'

'বলছি তো, তবে ঈশ্বরের সহযোগিতা পেতে হলে আমাদের তাঁর বোধের সাহায্য নিয়ে নিজের মনের মত কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে—তবে তিনিও সেই সুযোগে আমাদের সঙ্গে কর্মে প্রবৃত্ত হবেন তাহলে—নানান কর্মে প্রবৃত্ত তিনিই তো করছেন আমাদের। আমাদের কর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে তিনিই সারথি।'

'তিনি তো তাহলে শ্রীকৃষ্ণ?—সারথি যখন তুমি বলছ? আর আমরা তাহলে?'

'আমরা পার্থ। পৃথিবীর সন্তান সব।'

'তাহলে তো আমরা কেউ কম নই মা। তাঁর সাহায্যে কুরুক্ষেত্রকাণ্ড করতে পারি আমরা?'

'পারিই তো। মনের ঠিক প্রবৃত্তিটা ধরতে পারি যদি। সেই বোধও তিনিই দিয়ে দেন। তাঁর কাছে চাইতে হয়। তাঁর কাছে চেয়ে নিয়ে পেতে হয় সেই বোধ। সেই বোধকে কর্মে রূপায়িত করতে তিনিই আবার সহায়তা করেন। আমাদের যথার্থ প্রবৃত্তির পথেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়—পদে পদে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে।'

'প্রবৃত্তির পথে? এটা তুমি কী বললে মা? প্রবৃত্তি তো ভালো নয়, নিবৃত্তিই ভালো—আমাদের যতো ধর্মশাস্ত্রে এই কথাই তো বলে মা? বলে না?'

'ধর্মশাস্ত্র পড়েছিস তুই?'

'তা পড়িনি বটে, আমার সব সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড নলেজ। এখানে সেখানে এর ওর তার লেখা টেখা পড়ে এই জ্ঞান হয়েছে—তাই থেকেই বলছিলাম—এমন কি তোমার ঠাকুরও তো এই কথাই...'

'ঠাকুর কক্ষনো অমন কথা বলেননি, বলতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরে মন রেখে নিজের নিজের কাজ করে যেতে বলেছেন যার যেটা কাজ। সবাইকে তিনি তার নিজের মতন হতেই বলেছেন—নিবৃত্ত হতে বলেননি কাউকেই। গিরিশ ঘোষকে তিনি অভিনয় করে যেতেই বলেছিলেন—যেটা তাঁর কাজ। এবং তাঁর প্রবৃত্তি বুঝে মদ্যপানেও কোনো দিন বাধা দেননি তাঁর।'

'তাই বটে মা।' মেনে নিতে হয় আমায়।

'কবিরের কথা শুনেছিস? মুচির কাজ করত কবির। কিন্তু কবিকে আমাদের রবির কাছাকাছি। রবিঠাকুরের যেমন গীতাঞ্জলি তেমনি কবিরের ওই দোহা। প্রবাসীর পাতায় ক্ষিতিমোহন সেনের লেখায় তার পরিচয় পাবি তুই, পড়ে দেখিস। তাঁকে একবার কে যেন বলেছিল, গঙ্গাসাগর তীর্থে চল না? কবির বলল, কী হবে গিয়ে। আমার মন যদি ঠিক থাকে তো এখানেই মা গঙ্গা আমার। মন যদি চাঙ্গা তো কাঠুরিয়ামে গঙ্গা......আমি আমার কাজে লেগে থাকব। গঙ্গা মাঈর যদি খুশি হয় তিনি আমার এই জলের কটোরাতেই এসে দেখা দেবেন। দিয়েছিলেনও তিনি।...নিজের কর্মবৃত্তির পথেই কবির পেয়েছিলেন মার দেখা।'

—'তবে নিবৃত্তির কথাও কোন্ কোন্ মহাপুরুষ যেন বলেছিলেন মা, তাঁদের নাম এখন মনে পড়ছে না।'

'নিবৃত্তির পথে যাওয়া মানে ভগবানের বিরুদ্ধে যাওয়া। তা কি হয় নাকি কেউ? না, কেউ পারে তা কখনো। এটাই বোঝ না, ভগবান তো গোড়ায় নিজের মূলে কেন্দ্রে চিৎরূপে নিবৃত্ত হয়েই ছিলেন, তাতে কোনো সুখ নেই দেখে কোনো আরাম না পেয়েই না এই আনন্দের পথে রূপের পথে অবারিত হলেন—প্রবৃত্তির পথে গা ভাসিয়ে দিলেন নিজের। তাঁর সেই স্রোতের উলটো দিকে কি যাওয়া যায়? কেউ পারে তা? চেষ্টা করলেও তিনি ঘাড় ধরে তার ঘুরিয়ে দেন যে! প্রবৃত্তির পথে আসতে হয় ফিরে আবার।'

'এখন মনে পড়ছে মা!' আমি উসকে উঠি—'নিবৃত্তির কথাটা বাবার মুখেই আমি শুনেছিলাম যেন।'

'যা, তবে তোর বাবার কাছ থেকেই ভালো করে জেনে আয়গে।'

শুনেই আমি তক্ষুনি এক ছুটে চলে যাই বাবার কাছে, আর পরমুহূর্তে টেনিস বলের মতন বেয়ারিং পোস্টে ফেরৎ চলে আসি মার কোর্টে। 'বাবা বলছেন—সংস্কৃত শ্লোক টোক কী সব আউড়ে যেন বললেন, যার মানেটা হচ্ছে যে প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম, অর্থাৎ কিনা, ভূতদের এইরকমই প্রবৃত্তি বটে কিন্তু নিবৃত্তিতেই নাকি রয়েছে মহাফল। ভূত কী মা?'

'ভূত কী, তা তুই জানিস নে?'

'আমিই তো, তাই না? তুমি তো আমায় ভূত বলে ডাকো এক এক সময়, হনুমান কথাটা খুঁজে পাও না যখন। আমরাই তো ভূত মা, তাই না? মারা যাবার পর প্রেত হয়ে যাব সবাই।'

'তোকে বলেছে।' হাসলেন মা—'মরবার পর তোকে প্রেত হতে হবে না কখনো—মা তা হতে দেবেন না। মায়ের পেটে জন্ম নিবি তক্ষুনি আবার।'

'অবিশ্যি মার যদি মানে তোমার যদি তাই অভিপ্রেত হয়। সে তো আর আমার ইচ্ছের ওপর নয়।...কিন্তু মহাফলটা কী জিনিস, যা নাকি নিবৃত্তে চলে মেলে?'

'কাঁচকলা।'

'বেলও তো হতে পারে?' আমি বলি—'বাবা যখন বেল খান রোজ রোজ।'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। তবে সন্ন্যাসী হয়ে নাড়া না হলে পরে তো আর বেলতলায় যাওয়া যায় না রে। তুই কি তাহলে সন্ন্যাসী হতে চাস?'

'কক্ষনো না। জটাজুট রেখে ছাইভস্ম মেখে কী লাভ? আমি তোমার ওই প্রবৃত্তির পথেই রয়েছি সব সময়।...কিন্তু মা, তোমার ওই প্রবৃত্তির কথাটা বাবাকে যখন বললাম না, শুনেটুনে বাবা কী বললেন জানো মা? বললেন যে তোর মার কথাটা বিলকুল দর্শন বিরুদ্ধ। আমাদের কোনো দর্শনশাস্ত্রে এমন কথা বলে না।'

'দর্শন টর্শন জানিনে, ষড়দর্শন পড়িনি কখনো। এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব দর্শন—আমি নিজে যা দেখেছি, যা দেখছি তাই।' মা জানান—'এখন বল তো তোর আসল প্রবৃত্তিটা কোন্ দিকে? কোনদিকে তোর মনের ঝোঁক, বল দেখি আমায়?'

'বলব? বলব মা?...' বলতে গিয়ে আমি আমতা আমতা করি, কিন্তু নামটা আওড়াতে পারি না কিছুতেই—

'বলব মা? আমার ঝোঁক খালি তোমার দিকে। তোমাকেই আমি দেখি তো। তোমাকেই দেখেছি, দেখছি সব সময়।' বলে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার কথাটায় আরো একটুখানি জোর লাগাই : 'এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব দর্শন।'

(ক্রমশ)

আর সেই সাধনার যে সিদ্ধিলাভ করেছেন তা তো বোঝাই যাচ্ছে, কি বলেন জগতবাবু?'

'খলে কিনা সিদ্ধিলাভ, সাত সাতখানা উপন্যাস যাঁর বাজারে চালু, বুঝলেন ননীমাধববাবু', জগতের চোখ লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ননীমাধবের তুলনায় কিছুই না। ইতিমধ্যে চশমাটা খুলে ফেলে ননীমাধব পকেটে পুরেছে। পাটনাই পেঁয়াজের মতন লাল চোখ দুটো কী অসম্ভব দপদপ করছে। সেই লাল চোখের দিকে চোখ রেখে জগত হাসল। 'আধুনিকদের কথা বলছেন, এই আধুনিকদেরই মশাই আপনি এখন ঈর্ষার পাত্র।'

'হে' হে'—' ননীমাধব বিগলিত হয়ে উঠল। এক চুমুকে গেলাস খালি করে ফেলল। পকেট থেকে গন্ধমাখা সিল্কের রুমাল বের করে ঠোঁট মুছল। 'তবে কিনা একটা কথা বলব জগতবাবু।'

'বলুন, এই আসরে আপনিই বক্তা। আমরা শ্রোতা।' এবার রামানন্দ বোতল কাত করে চারটে গেলাসে ঢালল। জগত সোডা মেশাল।

রামানন্দ বলল, 'জগতবাবু ঠিকই বলেছেন, আপনি আমাদের ঈর্ষার পাত্র মশাই, আপনি বোধ করি খবর রাখেন না, এতকাল কবিতা লিখে এই আমি রামানন্দ সেন একখানা মোটে [illegible] বইও পাতে পেয়েছি। আজ [illegible] আট বছর পাবলিশারের ঘরে পড়ে আছে। উইয়ে খাচ্ছে ইঁদুরে কাটছে। নেই সেকেণ্ড এডিশন-টেই। আর এই [illegible] ভট্টাচার্য, নতুন রীতির গল্প লিখে [illegible] দেশকে বার বার চমকে দিচ্ছেন, সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকা পুজোর সময়, একুশজনের [illegible] হইচই করে নাচানাচি করে—আর [illegible] কোনো বেটা পাবলিশার এঁর একটা গল্পের বই ছাপান না। বিশ্বাস করবেন?'

'কাজেই', নন্দদুলাল বলল, 'আপনি আমাদের কাছে রাজার মতন, [illegible] মতন, সাহিত্যের কমল বনে আপনি হাতী, আমরা পিঁপড়ে।'

'না না, আপনাদের মতন আমার [illegible] ভাষা নেই, স্টাইলের জেল্লা নেই, [illegible] পুরোনো-ঢঙের লেখা, তবে একটা কথা নন্দদুলালবাবু, আমার মতন অভিজ্ঞতা আপনাদের কারোর নেই, [illegible] আমি জোর গলায় বলতে পারি।'

'ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতাটাই তো [illegible] আসল পুঁজি—গল্পটা না হলে দাঁড়াবে কিসের ওপর, আগে তো খড়মাটি, তারপর [illegible] পোঁচ। আগে গল্প, তারপর ভাষা। [illegible] টেকনিক।'

জগতের কথায় ননীমাধবের চওড়া ছাতি আরও চওড়া হয়ে উঠল। কেমন একটা উত্তেজনায় পেয়ে বসল মানুষটাকে।

'দাঁড়ান, আমি আর একটা বোতল নিয়ে আসি।'

'বসুন বসুন।' ননীমাধব উঠে যাচ্ছিল, নন্দদুলাল হাত চেপে ধরল। এদিকের [illegible] রামানন্দ ও জগত যেমন পাশাপাশি বসেছে তেমনি পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হতে নন্দদুলাল এধার থেকে উঠে গিয়ে উল্টোদিকের [illegible] ননীমাধবের পাশে বসেছে। 'এখনো বেশি-ভাগ মাল রয়ে গেছে বোতলে। আগে এটুকু শেষ হোক।'

'ক ফোঁটা শিশির বিন্দু। গণ্ডূষে সাবাড় হয়ে যাবে।' ননীমাধব গলা খুলে হাসল।

'যখন হবে—হবে। এখন আপনি স্থির হয়ে বসুন।' জগত বোতলের বাকি মদটুকু চারটে গেলাসে সমান ভাগ করে ঢেলে দিল। 'হুঁ, কী বলছিলেন, অভিজ্ঞতা। তাই তো, এই জন্যই না সাতখানা নভেল আপনার [illegible]।

নতুন বই হবে আমি কভার এঁকে দেব।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, পুজোর আগেই আর একখানা ছাড়ছি। আমি উমেশকে বলে রেখেছি, এবার নতুন আর্টিস্ট অর্থাৎ মডার্ন আর্টিস্টদের মধ্যে যারা বইয়ের প্রচ্ছদচিত্র করেন তেমন একজনকে দিয়ে আমার বইয়ের মলাট আঁকাবে। উঁহু, আমার কথা ঠেলতে পারবে না রমেশ, এখন চণ্ডীমাস্টার সেই সব দেখা-শোনা করে, প্রোপ্রাইটার জনার্দনবাবুর মেজ ছেলে, চমৎকার অমায়িক লোক, আমার লেখা রীতিমত ইয়েটিয়ে চলে।' ননীমাধব হেসে গেলাসটা তুলে দেখাল।

'আপনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন।' নন্দদুলাল প্রশ্ন করল। মানুষটার অভিজ্ঞতার বহরটা জানতে সে উসখুস করছিল।

'অনেক, বিহার ওড়িশা মাদ্রাজ বোম্বাই—ওদিকে আসাম মণিপুর—ব্যবসার খাতিরে দু' তিন মাস অন্তর একবার করে বেরোতে হয়।'

নন্দর চুপ। ব্যবসার কথাটা আগেই শোনা হয়ে গেছে। বৈঠকখানা বাজারে এই যে দোকানের পিছনেই ননীমাধব দত্তের ঘরেও তাদের আড্ডা। সারা দিন আড্ডা দিয়ে কারবার। রাতে আলো জ্বেলে জেগে জেগে উপন্যাস লেখা। আবার লেখার ফাঁকে ফাঁকে পড়া। আধুনিক গল্প কবিতা খুব ভাল লাগে। আধুনিক শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখার নেশাও কম না। 'লেখার ধাঁচটা পুরোনো কিন্তু মনটা আমার আধুনিক, একালের। সেদিক থেকে যে আমি পিছিয়ে আছি তা নয়।'

'না তা কেন থাকবেন। আপনার কথাবার্তা শুনেই তো বোঝা যাচ্ছে, মনের দিক থেকে আপনি অনেক এগিয়ে আছেন।'

'তাই তো', নন্দর সঙ্গে জগত গলা মেলাল। 'এই মন আর আপনার বিপুল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার দু' মাস তিন মাস পর পর বোম্বাই বিহার আসাম মণিপুর টুর দেওয়া—ইয়ার্কি, এত মানুষ দেখা এত জায়গা ঘোরা, তার ওপর কোনোরকম হই-হট্টগোলের মধ্যে না গিয়ে, নীরবে সাহিত্য সাধনা—আপনাকে মশাই মারে কে—আমার তো মনে হয়, মনে হয়—'

'হেম মজুমদার টজুমদারকে আপনি পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন।' জগত উপযুক্ত কথাটা খুঁজে পাচ্ছিল না, রামানন্দ ধরিয়ে দিল।

'হেম মজুমদারটা কে?' ননীমাধব সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

'অ, হেম মজুমদারের নাম শোনেননি।' জগত অল্প শব্দ করে হাসল, রামানন্দর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'রামানন্দবাবু, ননীমাধববাবু হেম মজুমদারের নামই শোনেননি।'

'আশ্চর্যের কিছু না। হেম মজুমদার এমন কিছু একটা মহাপুরুষ না যে পৃথিবীর সবাই তার নাম শুনবে কি নামটা মনে রাখবে।'

'আহা, তা হলেও তো লোকটা আকাদমী পুরস্কার পেয়েছে। চোদ্দটা বড় ও ছাব্বিশখানা ছোট উপন্যাস লিখেছে—কাজেই—'

জগতের কথা মাঝখানে থেমে গেল। ননীমাধব দত্ত জোরে শব্দ করে হেসে উঠল। 'এখন বুঝেছি, এখন মনে পড়ছে—দেখুন হঠাৎ কেমন অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিলাম, রামরাম মজুমদার, মানে আমার বড় শালা, পোস্তার মশলার দোকান যার, মজুমদার বলতে তার সঙ্গে নামটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম, হুঁ, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, হেম মজুমদার, বাংলা দেশের এখন সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক, যাকে পুরস্কার পেয়েছেন—'

'কিছু ক্ষতি ছিল না', অভয় দেওয়ার মতন গলায় সুর করে রামানন্দ বলল, 'কোনো ক্ষতি হবে না আপনি যদি ওই নামটা ভুলে থাকেন কি আদৌ নামটা না শোনেন, পাক না পুরস্কার, আমি তাকে পোস্তার একজন মশলা ব্যবসায়ীর চেয়ে বড় মনে করি না।'

'ঠিক কথা।' এবার নন্দদুলাল মাথা ঝাঁকাল। 'আমি হেম মজুমদারের একটা বইও পড়িনি। আমি মনে করি ও বেটা লেখকই নয়—শুনেছি বিলিতি বইয়ের চ্যাপ্টার চুরি করে নিজের উপন্যাসে ঢুকিয়ে দেয়—'

'ছি ছি, এটা ঠিক না।' ননীমাধব নাক সিঁটকবার মতন চেহারা করল। 'বলে কিনা নিজের জিনিসই এত দেবার থাকে, নিজের কথাই এত বলার আছে, বিদেশী বই থেকে চুরি করার কিছু দরকার পড়ে! কি জানি বাবা, আমি তো ভাবতেই পারি না আর একজনের লেখা চুরি করে কি ধার করে কেমন করে নিজের বইয়ে সেটা ঢোকানো যায়—তবে আর তোমার সৃষ্টির মৌলিকত্ব কোথায় রইল, সৌন্দর্যই বা থাকে কেমন করে—'

'তাই তো বলছি মশাই', গলার স্বর যতটা পারা যায় গম্ভীর করে তুলল জগত। 'আপনি আপনার সৃষ্টির মৌলিকত্ব নিয়ে চালিয়ে যান।' বলার সঙ্গে সঙ্গে শূন্য বোতলটা বেঞ্চির ওপর দুবার জোরে ঠুকল। উদ্দেশ্য, আর এক ফোঁটা মদ নেই সেদিকে ননীমাধবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 'হ্যাঁ, চালিয়ে যান, হেম মজুমদার আপনার কাছে দাঁড়াতে পারবে না, বানের জল হয়ে যেমন বাংলা সাহিত্যে ঢুকেছে, তেমনি বানের জল হয়ে একদিন বেরিয়ে যাবে। মজুমদার

আরও দামী পুরস্কার পেয়েছে—আপনি তার চেয়ে ঢের বড় পুরস্কার পাবেন, জ্ঞানপীঠ পাবেন।'

'কেন, নোবেল পুরস্কার পেতে ক্ষতি কি।' চোখ ঘুরিয়ে রামানন্দ বলল, 'যদি তেমন কাউকে দিয়ে এঁর একটা বই—ওই যে বললেন প্রেমের পিঞ্জর না কি ধান-ক্ষেতে-ঢেউ—কোন্‌টা আপনার মতে শ্রেষ্ঠ?'

'দুটোই ভাল বই, দুটোই দু' দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। একটায় আছে প্রেম ট্রাজেডী, দুটি যুবক যুবতীর হৃদয়-রহস্য নিয়ে লেখা, আর একটা সাম্যবাদী উপন্যাস, বাংলার চাষীদের জীবনের ট্রাজেডীর চিত্র তুলে ধরেছি।' এত মদ খাওয়ার পরেও ননীমাধব মেয়েছেলের মতন সলজ্জ ভঙ্গী করে হাসল।

'না, না, ওয়েস্টের ব্যাপার, বোঝেন তো', রামানন্দ একটা হাত শূন্যে তুলে দিল। 'সাম্যটাম্য নোবেল কমিটির পছন্দ না-ও হতে পারে, বরং ঐ প্রেমের পিঞ্জরখানাই কোনো ভাল লোককে দিয়ে ইংরেজী তর্জমা করে পাঠান—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—'

'দাঁড়ান, এভাবে জমছে না, মাল ফুরিয়ে গেছে, আর একটা বোতল নিয়ে আসি।'

ননীমাধব ভিতরে ছুটে গেল। নন্দদুলাল হাসতে হাসতে বেঞ্চির ওপর ভেঙে পড়ল।

'অনেক দিন এমন বাণিজ্য করে সুরাপান করা হয়নি।' জগত উল্টোদিকের বেঞ্চির ওপর প্রায় নন্দদুলালের পিঠের কাছে একটা পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসল।

রামানন্দ শব্দ না করে সিগারেট ধরাল।

'আমরা কিন্তু সহজে মাতাল হই না।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'তার মানে আমরা এ যুগের মানুষ এক সঙ্গে অনেক বেশি খেয়ে আগের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি নর্ম্যাল থাকতে পারি।'

পানের দোকানের সামনে আরশির ভিতর মুখ দেখতে দেখতে চারজন গল্প করছিল। আরশির ভিতর একজন আর একজনকে দেখে কথা বলছিল। এখন আর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা না, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ গভীর বিষয়ে তারা চলে এসেছে। রামানন্দ পান খায় না, শুধু সিগারেট টানছে, জগত বেনারসের লাল ও জর্দা সহযোগে ডবল খিলি পান মুখে গুঁজেছে। নন্দদুলাল পান সিগারেট কোনটাই খাচ্ছে না, দোকানীর কাছ থেকে সুপারী চেয়ে নিয়ে চিবোচ্ছে। ননীমাধব দত্ত পানও চিবোচ্ছে, সিগারেটও ফুঁকছে।।

'এ যুগের মানুষ বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন', জগত আরশির ভিতর ননী-মাধবের চোখ দুটো দেখল। 'আপনার কথা শুনে মনে হয় এই আমলে মদের আর জোর নেই, সব জলো হয়ে গেছে, তার মানে এখন ওরা মালের সঙ্গে অনেক বেশি জল মেশাচ্ছে, যার জন্য অনেক বেশি খেয়েও আমরা শক্ত স্বাভাবিক নর্ম্যাল থাকতে পারি, এই তো?'

'না', ননীমাধব সজোরে মাথা ঝাঁকাল। মাল ঠিকই আছে, খানকা ওদের দোষ দেব কেন, তবে কোনো কোনো জায়গায় সময় বিশেষে ছিপি খুলে যে এক আধটু জল ঢালাঢালি না হয় তা নয়—আমার কথা সেটা না, আমার বক্তব্য, আমরা আগের কালের মানুষের চেয়ে পরিমাণে ঢের বেশি খেয়ে স্ট্যাণ্ড করতে পারি, মাতলামী করি না। হুঁশ রেখে চলি।'

'তা হলে তো আপনি যাকে বলে, জেনারেশনের কথা তুলছেন মশাই।' আরশির ভিতর রামানন্দর থুঁতনি নড়ে উঠল। 'এই আমল সেই আমল, এই যুগ সেই যুগ?'

'হ্যাঁ, তাই তো।' ননীমাধবের মুখ মাথা একসঙ্গে নড়ে উঠল। ঠোঁটের সিগারেট নড়ে উঠল।

আরশির ভিতর জগত রামানন্দর সঙ্গে চোখ টেপাটেপি করল।

'তা হলে আপনি বলতে চাইছেন আপনার বাপ কাকারা সহজেই মাতাল হয়ে পড়ত, মানে একটুখানি গলায় ঢেলে রাস্তায় গড়াগাড়ি।'

রামানন্দ এমন ভঙ্গি করে কথা বলল, জগত চট করে আরশি থেকে মুখটা সরিয়ে নিল। নন্দদুলাল মুখ সরাল না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখল, তাতে বিশেষ কাজ হল না যদিও ভিতরের হাসির ধাক্কায় তার দু' গাল ফুলে উঠল, নাকের বাঁশী ফেঁপে উঠল।

ননীমাধব এসব গ্রাহ্য করল না।

'আমার বাপ কাকা আপনার বাপ কাকা জগতবাবুর বাপ কাকা নন্দবাবুর বাপ কাকা সকলের কথাই হচ্ছে মশাই।' কটমট চোখ করে ননীমাধব রামানন্দকে দেখল। 'এই যেমন এখন আমরা চারজন চার চারটে বোতল শেষ করে দোকান থেকে বেরিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আরশিতে স্বাভাবিক গলায়

চমৎকার ডিসেন্সি বজায় রেখে কথাবার্তা বলছি উঁহু, আপনাদের বাপ কাকাদের আমলে কিছুতেই তা হত না, এই পানের দোকানের সামনে রাস্তার ওপর ওরা হইচই বাধিয়ে দিত। অথচ আমরা এত ড্রিংক করে এসেছি, রাস্তার মানুষ প্রায় টেরই পাচ্ছে না, কেমন হে হরিহর।' পানের দোকানের হরিহরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল ননীমাধব। 'আমরা যে মদ খেয়েছি কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

হরিহর দাঁত ছড়িয়ে হাসল। মাথা নাড়ল।

'দেখলেন জগতবাবু।' ননীমাধব আরশির দিকে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'না বললে হরিহরও কিছু টের পেত না এই মাত্র আমরা আকণ্ঠ সুরাপান করে দোকান থেকে বেরিয়েছি।'

এ পাড়ায় হরিহরের দোকান অনেক দিনের, একেবারে কাছেই ননীমাধবের আসর আড্ডা।

দুজনের পরিচয়টা গভীর। ননীমাধবের মাতলামীর ধরনটা কেমন হরিহরের অজানা ছিল না। হয়তো এই জন্যই কথা বলার আগে সব কটা দাঁত বের করে হাসল। এই হাসির অর্থ জগত, রামানন্দ ও নন্দদুলাল বুঝল।

'কিন্তু সেকথা হচ্ছে না।' রামানন্দ চুপ থাকল না। বরং হঠাৎ হাতের মুঠো পাকিয়ে তুলল। 'আপনার বাপ কাকা মদ খেতে পারে বুঝেছেন, আমার বাবা কাকার কেউ এই জিনিস স্পর্শ করত না।'

'অঃ, একটা কথার কথা!' রামানন্দর রকম-সকম দেখে ননীমাধব একটু ঘাবড়ে গেল। 'আমি বাপ কাকা বলতে আমি এই যুগ আর সেই যুগ—দুটো আলাদা যুগকে বোঝাচ্ছিলাম।'

'তা-ই বোঝান না কেন, হুট করে আমার বাবা কাকাকে টেনে আনা আপনার অন্যায় ঠিক হয়নি। এদিকে বলছেন সাহিত্য করেন উপন্যাস লেখেন, কথাবার্তা ছোটলোকের মতন।'

'যাক গে রামানন্দবাবু—' উত্তেজনাটা নষ্ট হচ্ছে, রামানন্দ একটু রগচটা মানুষ, বুঝতে পেরে জগত মণ্ডল সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা করল। 'আপনার সেন্টিমেন্টে লেগেছে—ভদ্রলোক এতটা বুঝতে পারেননি—'

'না বুঝে এমন বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বের করা ঠিক হয়নি। নিজের বাপ কাকা মদ খেয়ে নর্দমায় গড়াত বলে আর সব মানুষের বাবা কাকাও তাই করত এই ধারণা উনি পোষণ করেন কি করে সেটাই আমার জিজ্ঞাস্য।'

'তা কারো কারো বাবা কাকা মদ খেত বইকি।' ব্যাপারটা লঘু করবার জন্য জগত শব্দ করে হাসল। 'আমার বাবা মদ খেত না, কিন্তু কাকা খেত, রোজ খেত। নন্দ, তোমার?'

'আমার বাবা গাঁজার ভক্ত ছিল। ডাক্তার মানুষ, বেশ ভাল পসার জমিয়েছিল। গাঁজা টেনে বাছাধন পসারটা নষ্ট করে দিল।'

'আমার বড় কাকা মদ খেত না। মেজ কাকা খেত। একদিন তো বড়কাকা রেগে গিয়ে মেজকাকার হাতের বোতল কেড়ে নিয়ে সেটা তার মাথায় ছুঁড়ে মারল।'

'মাথাটা ফেটে গেল নিশ্চয়?'

জগত মাথা ঝাঁকিয়ে টেনে টেনে হাসল। 'মাথা ফাটেনি। বোতলটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।'

'বাপ!' নন্দর চোখ গোল হয়ে গেল। 'তবে তো দেখা যাচ্ছে তোমার কাকার মাথাটা বোতলের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত ছিল হে?'

'হুঁ, তাই তো', জগত চোখ ট্যারা করে ননীমাধবকে দেখল। 'যেমন ইনি এইমাত্র বলছিলেন মদের চেয়ে এখন আমাদের এই যুগের মানুষের পেট লিভারের তেজ বেশি ক্ষমতা বেশি। তাই না ননীমাধববাবু?'

কিন্তু ননীমাধব আর কথা বলছিল না। গম্ভীর হয়ে রামানন্দকে দেখছিল।

'রামানন্দবাবু!' জগত ডাকল, 'চলুন আমরা এগোই, রিকশা ট্যাক্সি যা-হোক একটা ধরতে হবে।'

রামানন্দ স্থির নির্বিকার। যেন জগতের কথা কানে গেল না, বা কানে গেলেও তা গ্রাহ্য করল না। লাল ফোলা ফোলা চোখে একাগ্র ননীমাধবকে দেখছে। জগতের কাছে ব্যাপারটা সুবিধের মনে হল না, জগতের পাশে দাঁড়িয়ে নন্দও একটা কিছু আশঙ্কা করছিল। রামানন্দর সঙ্গে তাদের মেলামেশা ছিল না। জগতের সঙ্গে এক-দিনই শুধু কাদের পরিচয় হয়েছিল এবং পরিচয়টা কী সাংঘাতিক অপ্রীতিকর

(শে ১১৪)

অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল। সেই দমদম রেল লাইন ধরে রামানন্দর মতন জগতও হাওয়া খেতে গিয়েছিল। হঠাৎ গুণ্ডা ভেবে রামানন্দ যেমন করে জগতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে রামানন্দর সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখে জগতের মনের অবস্থা কী হয়েছিল। এমনি হাসিখুশি, চেহারার দিক থেকেও মানুষটা বেশ সৌম্যদর্শন এবং কথাবার্তার মধ্যেও একটা চমৎকার সরলতা রয়েছে। আসলে রামানন্দ যে রগচটা লোক, সহজেই মাথা গরম করে ফেলে, জগত সেটা প্রথম দিনই বুঝে গিয়েছিল।

'কি হল, রামানন্দবাবু, চলুন, আমরা এগোই', জগত আর একবার ডাকল, সেই সঙ্গে সে ননীমাধবকেও দেখল। 'কি মশাই, আপনি কোন্‌দিকে যাবেন, আড্ডায় ফিরে যাচ্ছেন, না কি আর কোথাও—'

রামানন্দ যেমন জগতের দিকে তাকাচ্ছিল না, তার কথা শুনছিল না, একদৃষ্টে কেবল ননীমাধবকে দেখছে, তেমনি ননীমাধবও রামানন্দকে দেখছে, অন্য কোনোদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না, যেন

জগতের কথায় আর কান দেবার সময়ই পাচ্ছে না।

নন্দদুলালের হাতে লুকিয়ে চিমটি কাটল জগত।

'এখনই না ঘুষোঘুষি শুরু হয়।' ফিসফিসিয়ে বলল সে।

'হোক না, ক্ষতি কি।' নন্দদুলাল চাপা গলায় হাসল। 'এত খাওয়া-দাওয়া করলাম, চারজনে চারটে বোতল কম কি। আড়তদার তো সন্ধ্যে থেকে বসে টানছিল, অথচ লোকে একটু টের পাবে না, এটাই বা কেমন কথা।'

'তাই তো।' জগত আর অপেক্ষা করল না। খেলাম আর রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তার মাঝিও বুঝতে পারল না যে আমরা মদ খেয়েছি—এতে আনন্দ থাকে না। শুধু একটু ঘুষোঘুষি করলে লোকে টের পাবে যে বাবুদের পেটে জিনিস পড়েছে, বাবুদের নেশা হয়েছে। ঠিকই বলেছ নন্দ—মদ খাওয়ার ষোল আনা আনন্দ পেতে হলে—'

জগতের কথা থেমে গেল। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল ননীমাধব দত্ত। রামানন্দর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে হু হু করে কেঁদে উঠল।

নন্দ শুনল, জগত শুনল, পানের দোকানের হরিহর এবং রাস্তার ওপর কলা বেগুন ঝিঙের দোকান সাজিয়ে বসেছিল মনমোহিনী—সবাই শুনল ননীমাধবের বুক ফাটা কান্না। শুনল এবং হাঁ করে তাকিয়ে থেকে তারা দৃশ্যটা উপভোগ করল।

রামানন্দর পা দুটো আঁকড়ে ধরে ননীমাধব ক্রমাগত বকাচ্ছে। 'আমায় ক্ষমা করুন কবি, আমায় ক্ষমা করুন, আমি না বুঝে আপনার মনে কষ্ট দিয়েছি, মাইরি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী। আপনার বাবা কাকা কোনোদিন সুরা স্পর্শ করেন নি। তাঁরা পুণ্যাত্মা ছিলেন মহাপুরুষ ছিলেন। আমার বাবা কাকার মতন পাপী ছিলেন না। আমার বাবা কাকা মদে বেশ্যায় লেপালেপি হয়ে থাকত। বাবা মরেছে লিভার পচে, কাকা মরেছে সিফিলিসের বিষে।।'

জগত নন্দর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। নন্দও হাসল।

'থাক হয়েছে,' জগত নুয়ে ননীমাধবের হাত ধরে টেনে তুলল। 'ক্ষমা চেয়েছেন যখন আর কি, রামানন্দবাবু আপনাকে ক্ষমা করেছেন, এইবেলা উঠুন।'

ননীমাধব তখনও হাউ হাউ করে কাঁদছে। তার পাঞ্জাবিতে ধুলো, কপালে নাকের ডগায় ধুলো। চারপাশের মানুষগুলি আড়তদারের অবস্থা দেখে চাপা গলায় হাসছে। [illegible]

আড়তদার যে এমন কান্নাকাটি করে তাদের কারো অজানা ছিল না। আজই তিনটি অচেনা বাবু সঙ্গে রয়েছে দেখে তারা যেমন অবাক হচ্ছিল তেমনি মজাটাও অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি উপভোগ করছিল।

'ছি আর কাঁদবেন না ননীবাবু,' ওপাশ থেকে একজন সান্ত্বনা দিল, 'বাবু আপনাকে ক্ষমা করেছেন।'

'হুঁ' আর একজনও সহানুভূতির গলায় বলল, 'বাবু খুব ভদ্দরলোক, আপনাকে তো আর কিছু বলছেন না, এখন আপনি আপনার আড়তে ফিরে যান।'

মানুষগুলি জগত এবং নন্দকে যতটা না দেখছিল রামানন্দকেই বেশি করে খুঁটিয়ে দেখছিল। রামানন্দ কিন্তু অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে তখনও কটমট করে ননীমাধবকে দেখছে। 'আপনি ননীমাধববাবুকে একবার মুখে বলুন যে ক্ষমা করেছেন।' একজন রামানন্দর দিকে এক পা এগিয়ে গেল। মানুষটিকে সেদিকে চোখ না ফিরিয়ে রামানন্দ গম্ভীর গলায় চিৎকার করে উঠল।

'কাল আবার আমি এই দোকানে মদ খেতে আসব, দেখি যদি আমার বাবা কাকাকে নিয়ে কেউ কথা বলে, আমি ঠিক ঘুষি মেরে নাকের বাঁশী ফাটিয়ে দেব।'

'না না, আর কেউ কিছু আপনাদের বলবে না। এ পাড়ার দোকান। আমরা তো এখানেই আছি। আপনারা আসবেন, বসে খাবেন। আসলে ননীবাবু মানুষটা ভালই। তবে কি না পেটে একটু বেশি পড়লে মুখ দিয়ে বেফাঁস একটা দুটো কথা বেরিয়ে পড়ে। তা তিনি ক্ষমা চাইছেন, কথাটা বলে তাঁর মনে দুঃখই হয়েছে। উঁহু, আর কেউ কিছু আপনাদের বলবে না। আপনারা বাবুরা অন্য পাড়া থেকে বৈঠকখানার দোকানে ড্রিংক করতে

মতন পয়সাঅলা মানুষ এ-পাড়ায় কটা আছে। যান, এই বেলা ঘরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়ুন।'

'শুয়ে পড়ব!' ননীমাধব মানুষটিকে দেখতে পেল না, তাহলেও সেদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হি-হি করে হাসল। 'সবে সন্ধ্যে যে ভাই. ননী দত্তর সবে এখন সন্ধ্যে, এখন হাড়কাটায় ইন্দুর ঘরে বসা হবে। ইন্দুমতী কচ্ছপের মাংস রেঁধে আমার পথ চেয়ে বসে আছে—আসুন. সিগারেট খান জগন্নাথবাবু, রামানন্দবাবু নিন, নন্দলালবাবু!' তিনজনের হাতে তিনটে আস্ত প্যাকেট তুলে দিয়ে আড়তদার পরিতৃপ্তির গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'অহো, এমন নামজাদা তিনজনার সাথে আজ পরিচয় হল, আমার কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য!'

'আমাদেরও সৌভাগ্য, এমন দরাজদিল মানুষ তুমি।' জগত বিড়বিড় করে উঠল। সিগারেট হাতে পেয়ে তিনজন আর এক মিনিট দাঁড়াল না। লম্বা পা ফেলে বৈঠকখানার গলি পার হয়ে বউবাজারের চওড়া রাস্তায় উঠে এল।

(ক্রমশ)

…নেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে কনফারেন্স বা ঐ জাতীয় আসরে …র আকর্ষণ আগের মত নেই। কেউ …উ বলছেন যে আকর্ষণটা একটু আধটু …বহুল পরিমাণেই হ্রাস পেয়েছে। টিকিট …বিক্রির হিসেব নিকেশ করলে হয়তো …যাবে আর্থিক ক্ষতি হয় না কিন্তু …টাও আসলে ঘটে আকর্ষণজাত কুয়লবোধের …থেকে নয় গচ্ছিত টিকিটের প্রাপ্তি …কেই। ফলে এই হয় যে হলের বাইরে …পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের ঘোষণা ঝুলোতে …যায় সেখানে কার্যত প্রায় শূন্য …প্রেক্ষাগৃহই দৃশ্যমান হয় ভিতরে ঢুকলে। …কারণ অনুসন্ধান করে যদি কেউ বলেন …বর্তমান নিরাপত্তার অভাব বা অপরাপর …পরিস্থিতিই এর জন্য দায়ী তাহলে সেটা …মেনে নিতে পারব না যেহেতু …অবস্থাতেও আনন্দের বা রসের …উপকরণ আমাদের সমাজকে প্রতি… …আকর্ষণ করে চলেছে। আসলে …সঙ্গীতে বোধ করি রসেরই জোগান …এসেছে এবং নব নব উন্মেষশালিনী …সাক্ষাৎ আর তেমন মিলছে না।

…যে কি কারণ তা নির্ণয় করা দরকার। …অভাব কখন ঘটে? যখন অনুষ্ঠান …ঠেকে। শিল্পী তাঁর অনুষ্ঠান …ক্ষণ ধরে চালিয়ে যেতে পারেন কিন্তু …বস্তুকে অধিকতর মর্যাদা প্রদান …না, যেটা করে সেটা হচ্ছে বস্তু… …কী বা কতটুকু দিতে পারলেন সেটা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গায়ক …আয়োজনের তুলনায়—বস্তুর …দৈন্যই তাঁদের জনপ্রিয়তা থেকে …বঞ্চিত করছে। যুগ অনেকটা এগিয়ে গেছে, শ্রোতারা শিক্ষিত;—তাঁরা চান সঙ্গীত-পরিবেশন এমন হবে যা এ যুগের কাল-চারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে অথচ তার ক্লাসিকাল ট্র্যাডিশনকেও ক্ষুণ্ণ করবে না। আর্টিস্টদের দিক থেকে সে চেষ্টা দেখা যায় না—তাঁরা এখনও সেই "মিডীভ্যাল" ঢঙেরই অনুকরণ করছেন। রেডিও খুলুন, আসরে …ন—আপনি অনুভব করবেন তানপুরার …ওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সেই সানুনাসিক …রে একটা অলস, মন্থর আওয়াজ। এটা অনেকক্ষণ ধরে চলবে তবেই শিল্পীর গলায় …র "সেট্" করবে। অর্থাৎ গোড়া থেকেই এমন একটা "লেথার্জিক" স্যাংসে'তে ভাব যে আধুনিক রুচির কাছে সেটা "রিপাগনেন্ট" না হয়েই পারে না। ঠুংরী …ন, সেখানেও অনুভব করবেন সেই [illegible]

এস্থেটিক চিন্তা এখনও [illegible] দুর্বল। অনেক ওস্তাদ আমাদের দেশে আছেন, তাঁরা প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করছেন। তাঁরা প্র্যাকটিশ করতে জানেন, শেখাতে জানেন তাঁদের নিয়মে (যদিচ তার মধ্যেও অনেক কিছু গোপন করবার প্রবণতা আছে); কিন্তু এ যুগের ছাত্রছাত্রী কি সেই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিতেই দীক্ষিত হবেন? এ যুগ কি তাঁদের নতুনভাবে সব কিছু নিতে শিক্ষা দেয়নি?

একটা কথা প্রায়ই শুনি—অমুক ওস্তাদ অমুককে শিখিয়েছেন বটে কিন্তু তেমন কিছু দেননি। এ যুগে এ কথার তাৎপর্য আমি বুঝি না। দেননি তো কি ভারি বয়ে গেল! শিক্ষার্থীর যদি প্রতিভা থাকে তাহলে তিনি তো স্বকীয় পন্থা নিজেই প্রস্তুত করে নিতে পারেন। অন্ততঃ সেই উদ্ভাবনের সময় যে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মশাই, কে কাকে কতটুকু দেয় বলতে পারেন? পঁচিশ পারসেন্টও যদি পান বাকি পঁচাত্তরটা আপনাকেই করে নিতে হবে। এই যে আমাদের দেশে এত বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চলেছে, নানা প্রয়োজনে এত সাজ-সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে, এর কতটা আমরা পেয়েছি অন্য দেশ থেকে? বড় জোর "টেকনিক্যাল নো-হাউ", তার বেশী নয়। কাউকেই কেউ তার সিক্রেটটা সহজে দিতে চায় না। কিন্তু তার জন্য কি অপর চতুর ব্যক্তি পরোয়া করে? সে তার কাজ গুছিয়ে নেবেই, কেবল কিছুটা সূত্র পাওয়া দরকার। এতবড় যে বেদ-বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র—এসবের অনেক ব্যাপারই তো সূত্রাকারে রাখা হয়েছিল; কিন্তু সেগুলিরও তো বহু ভাষ্য রচিত হয়েছে—এ যুগে তাদের দোষ ত্রুটিও অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে। আমাদের দেশের বৈদিক সাহিত্য নিয়ে একদা যেসব বিদেশী পণ্ডিত আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই এদেশে আসেননি—এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদের কাছে পাঠ গ্রহণ করবার সুযোগ পর্যন্ত লাভ করেননি (বরং বাধা যথেষ্ট পেয়েছিলেন), এমনকি তাঁরা সংস্কৃত উচ্চারণ করে পড়তেও পারতেন না—তথাপি আজ যে আমাদের অনেকে [illegible] সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সব ক্ষেত্রেই সব কিছুই করা সম্ভব হয় যদি বিদ্যা এবং বুদ্ধি থাকে। সর্বকালে সর্বস্থানে এটাই [illegible]। [illegible]

অনেকে বলেন সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা, গুরুর সাহায্য ছাড়া এ বিদ্যা অর্জনের আর কোনও পথ নেই। এ কথাকে কিছুমাত্র অস্বীকার করছি না, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে গুরুর মুখ যখন মুখর না হয় তখন কি করা কর্তব্য? গুরুমুখী বিদ্যালাভে অকৃতকার্য হয়ে শিষ্য কি মনের দুঃখে মরুমুখী হবে? মারমুখী হওয়াটা আরও অসঙ্গত। অতএব নিজের সম্বলটুকু নিয়েই তাকে অভিমুখী হতে হবে। প্রতিভাবান ব্যক্তি যেমন লোটা কম্বল সম্বল করেই লক্ষপতি হয় তেমনি সঙ্গীত জগতেও অর্জিত সম্বল সামান্য হলেও প্রতিভাবান শিল্পী নিজের চেষ্টাতেই সুর-শিল্পের শিল্পপতি হতে পারে। তবে হাঁ, যোগ্যতা থাকা দরকার। তা নইলে যেটুকু শিখে অর্জন করা তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই ভাল। অযোগ্যের পক্ষে নতুন উদ্ভাবনার চেষ্টা বড়ই মারাত্মক—তার প্রশ্রয় কোন-ক্রমেই দেওয়া উচিত হবে না।

সঙ্গীতকে সুশ্রাব্য করে তুলতে হলে যে কতকগুলি নীতি মেনে চলা দরকার তার প্রতি নিষ্ঠা বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় না, অথচ বাহাদুরির চেষ্টা আছে। সঙ্গীতের সংগঠন বলে একটা জিনিস আছে যার সম্বন্ধে অনেক শিল্পীকেই উদাসীন থাকতে দেখা যায়। ধ্রুপদ এই সংগঠনেরই উত্তম উদাহরণ

অথচ আজ এই পর্যায়ের গান লুপ্ত হতে বসেছে। উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে আমাদের একটা গৌরবজনক ঐতিহ্য চলে যাচ্ছে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে। গান যখনই শুনতে বসি তখনই শুনি স্থায়ী বলতে অতি অলস এবং শ্লথ ঢঙে একটি পর্দা থেকে আর একটি পর্দায় যাবার প্রয়াস। অনেকের স্থায়ীর রীতিটা এমনি যে অন্তরা নামক আর একটা কলি সম্বন্ধে তাঁদের যে সচেতনতা আছে এমন মনেই হয় না। সঞ্চারী ঢঙে সুরের বিস্তার প্রায় উঠেই গেছে। আভোগের প্রশ্নই ওঠে না কারণ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ভিন্নভাবে থাকবে তবে তো আভোগের ব্যাপার। খেয়াল শুনলে মনে হয় অনেক ওস্তাদ স্থায়ী নামক একটা কলির অন্ধ গলিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং অসংযত ঘোড়ার মত তাঁদের কণ্ঠ সেইসব শীর্ণ রুদ্ধ পথে তান বা সরগম নামক দুটি কর্তব্যের আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। সরগম-এর বেলাতেও দেখা যায় সেই জড়িত সানুনাসিক একটা ঢঙ যাতে কোনও পদার্থকে চিনে নেবার উপায় নেই এবং কি উদ্দেশ্যে যে আচমকা বেচারা সা রে গা মা-দের ওপর এরকম টান পোড়েন চালানো হয় তাও বলা শক্ত।

বহু যুগ আগেকার বহু অমার্জিত, অশিক্ষিত, অরুচিকর পদার্থ এখনও আমাদের সঙ্গীতে আর্ট হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে যেগুলির সংস্কার প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গীতের সংগঠন, বিন্যাস, পরিমিতি, সামঞ্জস্য, প্রয়োগবিধি সবগুলিই এস্থেটিক দিক থেকে বিচার করে কেবলমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করে নেওয়া দরকার। কিন্তু আরও কিছু বেশী এর সঙ্গে প্রয়োজন—সেটি হচ্ছে সঙ্গীতের রূপায়ণে একটি নব্য চিন্তার প্রকাশ। এই চেতনার প্রতিফলন যদি না ঘটে তা হলে আমরা নতুন কি পেলুম? তা যদি না পাই তবে এইটাই ধারণা হয় যে এই চেতনাকে জাগ্রত করতে যে মানসিক স্তরে আরোহণ করা দরকার, তার জন্য যে শিক্ষা, যে বোধের প্রয়োজন তা এখনও অর্জিত হয়নি। একথা অকুতোভয়েই বলব যে উপযুক্ত শ্রোতার তুলনায় উপযুক্ত শিল্পী পেছিয়ে আছেন। এ যুগের সৌন্দর্যচেতনা তাঁদের অল্পই উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের মূল্যায়নেও তাঁরা অপারগতার প্রমাণই দাখিল করে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে কতকগুলি অলঙ্কার এবং প্রয়োগের বৃত্তেই তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন যা এ যুগে নতুন উদাহরণ স্থাপন করবার মত ইণ্টেলেকটের পরিচয় বহন করে না। বিশেষ করে, সাহিত্যে, চিত্রে যে দীপ্ত বুদ্ধিপ্রণোদিত চেষ্টা দেখা যাচ্ছে তার পাশে সঙ্গীত-প্রয়াসকে নিষ্প্রভ বললে অত্যুক্তি হয় না।

শার্ঙ্গদেব

নিজের পাঠাগারে প্রিয়দারঞ্জন

অগ্রজ-বিজ্ঞানী-২

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। এখন ওঁর বয়েস হয়েছে। তাই যথেষ্ট আত্মমগ্ন। তবু বলা চলে, দেহের বয়েস বাড়লেও তুলনায় মনের বয়েস অনেক শ্লথগতি। ফলে অতীতকে এখনও যেমন উনি হারিয়ে ফেলেননি, তেমনি বর্তমানেরও প্রত্যক্ষ যোজ্যতা এবং রাসায়নিক সমীকরণ চিনে নিতে ওঁর ভুল হয় না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবশিষ্য, আচার্যের মতই অকৃতদার। জীবনের শুরু বিশ্লেষণী - রসায়নবিদরূপে। বিশ্লেষণ এখনও চলেছে। চলেছে বলেই প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি বলতে পারেন, 'স্বাধীনতার পর এদেশে গবেষণাকেন্দ্র অনেক স্থাপিত হয়েছে। ভাল লোকের চাহিদাও বেড়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় তারা অত্যন্ত কম। অনেক ক্ষেত্রে তাই স্বল্পযোগ্যতা-সম্পন্ন লোক বড় বড় পদ আঁকড়ে বসে আছেন। এঁদের লক্ষ কেরিয়ারের দিকে, প্রেস্টিজ এবং পোজিসন-এর দিকে। ছেলেরাও ঐ পথে এগোচ্ছে। ফলে আজকের বিজ্ঞান-প্রচেষ্টার খরচ যত বেড়েছে, তুলনায় উৎকর্ষ বা সাফল্য অনেক কম।'

বড় মানুষের সবচাইতে বড় লক্ষণ, তাঁর সত্যিকারের পারিপাট্য অন্তরে, শুধু বাইরে নয়। ওঁর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতাটাই আমার সবচাইতে বড় পাওনা।

তাঁকে আমি প্রথম দেখি গত বছর, কলকাতার বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে। সেদিন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি-বক্তৃতামালার বাৎসরিক অধিবেশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিষয়বস্তু প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রচিত প্রাচীন ভারতের রসায়নের ইতিহাসের পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক প্রিয়দারঞ্জন একে একে উপস্থাপিত করলেন অতীত ভারতের বিস্মৃত বিজ্ঞান সাধনার উজ্জ্বলতম অধ্যায়। উপস্থিত প্রবীণ এবং নবীন বিজ্ঞানীরা অভিভূত হয়ে শুনলেন। অভিভূত এই কারণে যে তাঁর বক্তব্যের উপাদানের চেয়ে সংকলনের মান সবচাইতে বেশি যেটা রেখাপাত করেছিল, সেটা তাঁর আত্মপ্রত্যয়, ভারতীয় ভাবধারার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং বিশ্বাস। যার মূল উৎস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরই প্রেরণা।

আচার্য তাঁর ছাত্রদের বলতেন, বিলেত গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি পাওয়ার মোহ ত্যাগ করতে হবে। ডিগ্রিটা তো উপলক্ষ, আসলে কাজ চাই, ভাল কাজ। সেটা এদেশেই

করা চলে। জীবনের প্রতিমুহূর্তে গায়ত্রী মন্ত্রের মত গুরুদেবের এই উপদেশটি প্রিয়দারঞ্জন শ্রদ্ধা করে এসেছেন। বিদেশে তিনি গেছেন। তবে ডক্টরেট ডিগ্রি আনার জন্যে নয়। প্রয়োজন ছিল অভিজ্ঞতার, কিছুটা অনুশীলন এবং বিশ্ববিজ্ঞানীদের সান্নিধ্য। তাই যাওয়া। এমন কি, প্রথম দিকের কিছু কিছু গবেষণাপত্র তিনি বিদেশী পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন বটে, তবে ১৯২৪ সালের পর তাঁর বেশির ভাগ মূল্যবান গবেষণা পত্র ইন্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটির নিজস্ব পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশী পত্র পত্রিকায় নিজের প্রবন্ধ ছাপা হলে তবেই সম্মান বাড়বে, এমন অন্ধ মোহ কোনদিনই তাঁর ছিল না।

অথচ দেশ এবং কালের প্রচলিত রীতি-নীতির প্রাচীর ভেদ করে যতখানি সম্মান বা স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য তা থেকে কখনও তিনি বঞ্চিত হননি। প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ অধ্যাপক উইলহেল্ম ক্লেম একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'অজৈব রসায়নের উপর সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। কিন্তু ভারতীয় গবেষকদের কথা উল্লেখ না করে প্রবন্ধের উপসংহার করতে চাই না। এই প্রসঙ্গে রামন, কৃষ্ণান এবং পি রায়ের কথা বললেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।' (Wenn ich im Vorstehenden einige Zuge der modernen Entwicklung auf dem Gebiet der anorganischen Chemie aufzeigen durfte, so mochte ich nicht schliessen, ohne des Anteils indischer Forscher an diesen Fortschritten zu gedenken. Wennich nur die Namen Raman, Krishnan, und P. Ray nenne, so mogen diese fur viele stehen.)

কেমিকেল রিভিউ পত্রিকায় অধ্যাপক রায়ের নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় অধ্যাপক এম টি বেক তাঁর কাছে ব্যক্তিগত একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'বাইগুয়ানাইড কমপ্লেক্সের বিষয়ে আপনার গবেষণার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত উৎসাহী। সম্প্রতি প্রকাশিত আপনার তথ্যপূর্ণ নিবন্ধটি গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক দিয়ে এটিকে আমার কাছে স্বর্ণখনির মত মনে হয়েছে। অনুগ্রহ করে এর একখণ্ড প্রতিলিপি পাঠালে বাধিত হব।' ঐ একই সময়ে মার্কিন দেশের প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানী, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন সি বেইলার একটি চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন 'বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আপনার স্বদেশের জন্যে যা করেছেন, তাতে আপনি গর্ববোধ করতে পারেন।' আর অন্যতম প্রিয়ভাজন শিষ্যটি সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'লাইফ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এমন নিরহংকার লোক, অথচ এমন একজন গুণীলোক খুব কমই আছেন। রসায়ন চর্চার সমিতিগুলিতে প্রবন্ধ পাঠের আগে আমার লেখা তাঁকে একবার দেখিয়ে নিই, তাঁর সমালোচনা এবং বিচারের জন্যে পাঠাই।... প্রিয়দারঞ্জন অন্তত কুড়িটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার যে কোন একটির সাহায্যে যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনায়াসে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করতে পারতেন। তিনি তা করেননি।' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৩২। বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জন সম্পর্কে আচার্যের মন্তব্য: His recent isolation of an isomer of thiosulphuric acid is a singular achievement and marks him out as an original investigator of a high order.

*

সেদিন বক্তৃতার পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পুরোধা আচার্য ডি এম বসু, ও প্রিয়দারঞ্জন বেরিয়ে এলেন। অনুগামী ... তরুণ গুণী বিজ্ঞানী, যাঁদের কেউ কেউ ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার ... দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ... ছিলেন প্রিয়দারঞ্জন। তবু তারই ... সুযোগ করে তাঁর কাছে এগিয়ে ...লাম। কোন ভূমিকা না করে সরাসরি ...লাম, অধ্যাপক রায়, আপনি অনুমতি ...লে এক সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে। আমরা আপনার মুখ থেকে আপনার কথা শুনতে চাই, আপনার ছাত্র ও কর্মজীবনের কথা।

মৃদু হাসলেন প্রিয়দারঞ্জন। বললেন, ... শুনবে? আচ্ছা, এসো।

... উঠলেন তারপর। ... নেই, ... নেই। আমন্ত্রণের ... আন্তরিকতা ছিল, প্রশ্রয় ছিল না।

... এটাই প্রিয়দারঞ্জনের বড় পরিচয়। ... কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক দেবব্রত ... বললেন, ১৯৪৮ সালে ... বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে পড়তে আসি, ... তখন যমের মত ভয় করতুম। ... ওঁর কাছে এতটুকু ফাঁকি ... নেই। একজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ... ভুল হলে, ওঁর ... ছিল ... কাছে বড় পাওনা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অজৈব রসায়ন শাখার ... উন্নতিকল্পে ওঁর অবদান ...। এ দায়িত্বও তাঁর উপর ... ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরই নির্দেশে।

জন্ম চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে, ...য়ারী ১৬, ১৮৮৮। পিতা কালি... রায়, মাতা শ্যামসুন্দরী দেবী। ওঁরা ... ভাই, তিন বোন। প্রিয়দারঞ্জন তৃতীয় ...। কবি নবীনচন্দ্র সেন, সাহিত্যিক দীনেশরঞ্জন সেন, গণিতবিদ ডঃ বিভূতিভূষণ সেন, অধ্যাপক বীরেন্দ্রবিনোদ রায় ...দের নিকটতম আত্মীয়। পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম। ১৬৬০-১৬৮০ সালে মহারাষ্ট্র বিপ্লবের ... উর্ধতন নবম পুরুষ রায় আনন্দ রায় ... ত্যাগ করে ... ত্রিপুরা জেলার ... গ্রামে উঠে যান। ... নয়াপাড়ার বসতি।

প্রাথমিক শিক্ষা নয়াপাড়ার দয়াময়ী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। ১৯০৪ চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস এবং রায়বাহাদুর গোলকচন্দ্র বৃত্তি লাভ। ১৯০৬ সালে প্রিয়দারঞ্জন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের বি এ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই উপলক্ষে ইডেন হিন্দু হোস্টেলে বাস। সেই সময়েই ...রূপে কাছে পেলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষদের। এঁরা সকলেই তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র। আর অধ্যাপকরূপে পেলেন এইচ এস পার্সিভাল, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মনোমোহন ঘোষের মত দিকপাল পণ্ডিতদের।

১৯০৮এ রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ১৯১১ সালে ঐ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই রসায়ন শাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক এবং মতিলাল মল্লিক সুবর্ণ পদক লাভ। এম এ পড়ার সময় তাঁর সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তী সময়ের প্রখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক ডঃ হেমেন্দ্রকুমার সেন ও বিমানবিহারী দে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সির রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যক্ষ। অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আচার্যের পক্ষে প্রিয়রঞ্জনের প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করতে বেশি সময় লাগেনি। ওঁকে আহ্বান জানালেন আচার্য। এম এ পাশ করার পর তাঁরই তত্ত্বাবধানে গবেষক-ছাত্ররূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ প্রেসিডেন্সি কলেজেই। কিন্তু এক বছর কাজ করার পর আগস্ট ১২, ১৯২২ গবেষণার সময় আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় পড়লেন। উষ্ণ সালফিউরিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। বিস্ফোরণ ঘটল। বাঁ পাশের চোখটি চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ কলকাতার সিটি কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা। এই সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপারে প্রায়ই তাঁর কথাবার্তা হত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে একটি গবেষণা কেন্দ্র গঠনের জন্যে দেশের বিজ্ঞানীদের
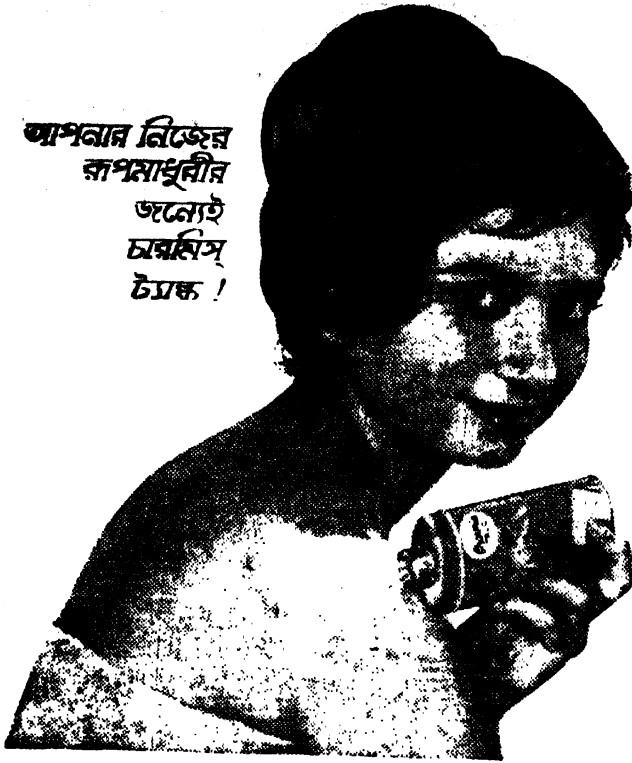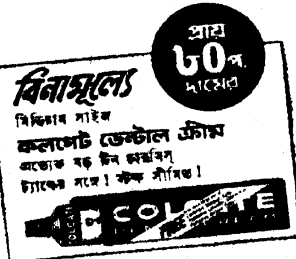
আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। আচার্য রসায়নশাস্ত্রের 'পালিত অধ্যাপক'। আশুতোষ এবং আচার্যের আমন্ত্রণে ১৯১৯ সালে প্রিয়দারঞ্জন 'সহকারী পালিত অধ্যাপক'-রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। কাজ গবেষণা এবং অধ্যাপনা, দুইই। বিজ্ঞান কলেজের অজৈব রসায়ন বিভাগের পুনর্গঠনের দায়িত্বও পড়ল তাঁর উপর। শুরু হল ব্যাপক গবেষণার কাজ। ১৯১৯ থেকে ১৯২৮, এই নয় বছর সহকারী পালিত অধ্যাপকের পদে কাজ করার সময় তিনি অনেকগুলি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করার ছিল এই সমস্ত গবেষণা কাজের স্বীকৃতি স্বরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভের মোহ তাঁর মধ্যে কোনদিনই প্রকাশ পায়নি। ওঁর ধর্ম, কাজের জন্যই কাজ করা, কাজের উৎকর্ষতাই কাজের সাফল্য।

হ্যাঁ, বিদেশে তিনি গেছেন, কেবল তারও উদ্দেশ্য ছিল উচ্চতর রসায়ন সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পাশ্চাত্য জগতের তখনকার আধুনিকতম গবেষণা-পদ্ধতির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন, নিছক উপাধি সংগ্রহ নয়। ১৯২৯ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ঐ সময় তিনি সেখানকার বহু গবেষণাগার পরিদর্শন করেন এবং সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন-এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইমফ্রেদ্ গবেষণাগারে সহকর্মীরূপে কাজ করার সুযোগ পান। কাজ করেন মাইক্রো কেমিস্ট্রির উপর অস্ট্রিয়ার গ্রাজ-এ অধ্যাপক এমিকের সঙ্গে, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন জার্মানী, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডের রসায়ন গবেষণা কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান সংস্থায়। ১৯৩২ সালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলহেস্ বিউটজার (Prof. W. Bottger) রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংকলন করেন প্রিয়দারঞ্জন তার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। জটিল-যৌগিক পদার্থের সংযুক্তি সম্পর্কে গবেষণা, অধ্যাপনা ও আলোচনায় তাঁকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থ Theory of Valence and the Structurs of Chemical Compounds. ১৯৫১ সালে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত The Committee of New Reactions of the International Union of Chemistryর তিনি অন্যতম সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। উক্ত

করা যেতে পারে, মাত্র সাতজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদদের নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। পর পর আট বছর এই কমিশনের সদস্যরূপে তিনি কাজ করেন। এর পরেও যখন তাঁকে সদস্য পদে নির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে কোন নবীন বিজ্ঞানীকে ঐ পদে নির্বাচন করার জন্যে পরামর্শ দেন। প্রিয়দারঞ্জনের এও এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তরুণ কর্মীদের উৎসাহ দেবার ব্যাপারে কখনই তিনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি, বরং সাহায্য করেছেন।

১৯৩৫-এ ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্স ফাউন্ডেশনের ফেলো ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের খয়রা অধ্যাপক, ১৯৫৬ 'পালিত অধ্যাপক' এবং বিশুদ্ধ-রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ, ১৯৪৭ ইণ্ডিয়ান কেমিকেল সোসাইটির সভাপতি, ১৯৬০ সালে আগ্রায় অনুষ্ঠিত কেমিস্ট্রি অভ কো-অর্ডিনেশন কমপাউন্‌ডস-এর সম্মেলনের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কাল্টি-ভেশন অভ সায়েন্সের অবৈতনিক কর্মসচিব এবং পরিচালক—অনেক, আরও অনেক সম্মানই তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক ব্যবহার, কথা কম, শুধু কাজ। মধুর স্বভাব এবং আত্মপ্রত্যয়ের জন্যে তার কোথাও কোন বিতর্কের অবকাশ ছিল না। উল্লেখ্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কাল্টিভেশন অভ সায়েন্স-এর অধ্যক্ষ থাকাকালে ডঃ মেঘনাদ সাহা স্মৃতি তহবিলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি ত্রিশ হাজার টাকা দান করেছিল। ও'র আকাঙ্ক্ষা, দেশে সার্থক গবেষণা প্রচেষ্টা গড়ে উঠুক, যেখানে বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে কাজের উৎকর্ষতাই হবে মূল লক্ষ্য।

সহকারীদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে দুশোরও বেশি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইও। ১৯৫৬ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত History of Hindu Chemistry-র আধুনিক সংস্করণ History of Chemistry in Ancient and Medieval India নামে গ্রন্থটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ভারতীয় বিজ্ঞান-ইতিহাসের গ্রন্থমালায় এ এক অভূতপূর্ব সংযোজন। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ : বিশ্বের উপাদান, রসায়ন ও সভ্যতা, অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী। ৮৩ বছর বয়েসও মনের দিক দিয়ে এখনও তিনি সজীব। আধুনিক বিজ্ঞান প্রগতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। (ও'র জীবনী সংকলন করতে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্র, ও'র কাছে আমার কৃতজ্ঞতা রইল)

দেশ-পত্রিকার পাঠক-পাঠিকার প্রতি

জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতার পর কতক-গুলি গবেষণাপত্র পরীক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত রইলেন। মাঝে শরীরটাও ও'র খারাপ গেল। মাত্র কয়েকদিন আগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শ্রীরবীন বন্দ্যো-পাধ্যায় আমাকে জানালেন, মাস্টারমশাই এখন কিছুটা সুস্থ। কথাবার্তা বলতে পারেন, বেশি নয়।

উত্তরে জানালাম, খুব বেশি সময় আমি নেব না। কোন তত্ত্ব বা রসায়ন জগতের জটিল কোন সমস্যার ব্যাপার জানার চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ব ধারণা, সেটাই আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার মত কাজ করবে।

রবীনবাবু জানালেন, আসুন। তবে বিকেল চারটের মধ্যে। সন্ধের দিকে উনি একটু বেড়াতে বেরোন।

যথাসময়ে প্রিয়দারঞ্জনের বাড়ির পাঠাগারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। রবীনবাবুও আমার অনুরোধে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়দারঞ্জনের তিনি ছাত্র। কথা ছিল, তাঁর মাস্টারমশাই-এর স্মৃতিচারণের সময় তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

কয়েক মিনিট পর পাঠাগারে প্রবেশ করলেন প্রিয়দারঞ্জন। মুখে স্বভাবসুলভ বিনম্র হাসি। সাধারণ দু একটি প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলার পর বললেন, কী জিজ্ঞেস করবে, কর।

বিরক্তি নয়, কাজের প্রতি আনুগত্য মনে হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিয়মানু-বর্তিতা এখনও তাঁর মধ্যে সক্রিয়।

আমাদের কথা শুরু হল তখনই।

প্র : অধ্যাপক রায়, আপনি যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের সুযোগ সুবিধে কী ধরনের ছিল, অনুগ্রহ করে একটু বলুন?

অধ্যাপক : ঠিক বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা বললে ভুল হবে। কারণ তখনও পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের উপর কোন স্নাতকোত্তর কোর্স খোলা হয়নি। আমাদের সময় প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজেই দুটি বছরের এম এস-সির রসায়ন বিভাগ খোলা হয়। শিক্ষক-

দের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো ছিলেনই, আর ছিলেন চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী। এ'র কোন উচ্চতর ডিগ্রি ছিল না। ইনি ডেমনস্ট্রেটরের কাজ এবং অ্যাডমিনিস-ট্রেশন দুই-ই দেখতেন। আগে বিভাগীয় প্রধান ছিলেন স্যার আলেকজান্ডার প্যাডলার। প্যাডলারের পর ঐ পদে আসেন কানিংহাম। ও'রা দুজনই আচার্যকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তখন ভারতীয় অধ্যাপকদের মধ্যে আরও ছিলেন জ্যোতিভূষণ ভাদুড়ী। ইনি ফিজিকেল কেমিস্ট্রি পড়াতেন। জৈব রসায়ন পড়াতেন প্রফুল্লচন্দ্র। বি এস সি ক্লাসে তিনি অজৈব রসায়নও পড়াতেন। ওই সময়ে বি এস-সি'তে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা মিলিয়ে একটাই পেপার তৈরি হত। রসায়ন শাস্ত্রে এম এস সি ডিগ্রি পরীক্ষায় আমাদের সময়ই এখনকার মত প্রথম আটটি পেপার চালু হয়। তবে হ্যাঁ, এখনকার দিনে সুযোগ বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু আমাদের সময় ছিল না। অবশ্য কাজ যেটুকু হতো, একসটেনসিভই হতো।

প্র : অধ্যাপক রায়, অন্যান্য অধ্যাপকদের তুলনায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের পড়ানর ধরনটা নাকি কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। শুনেছি—

অধ্যাপক : খুবই স্বতন্ত্র। ও'র পড়ানর পড়ানর কায়দাটাই ছিল অন্যরকম। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। বি এস সি পাশ এবং অনার্স ক্লাশ তিনি এক সঙ্গে নিতেন। তিনি পড়াতে আসার আগে ছাত্ররা এসে বসে থাকত। সেই সঙ্গে পড়ানর সময় যে সমস্ত পরীক্ষা করা হবে, তার সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ প্রস্তুত রাখা হত। ক্লাশ নিতেন খুব কম সময়ের জন্যে, পনের কুড়ি মিনিটের বেশি নিতেন না। উনি পড়াতেন, সেই সঙ্গে একের পর এক চলত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে। কম সময়ের জন্যে পড়ালে কী হবে, ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকত।

প্র : আপনাদের পাঠক্রমের সঙ্গে সম-সাময়িক পাশ্চাত্ত্য-পাঠক্রমের পার্থক্য কতটা ছিল?

অধ্যাপক : তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। তবে এখানকার পঠন পদ্ধতিটি তেমন ভাল ছিল না।

প্র : স্নাতোকত্তর পাঠের পর গবেষণার ব্যাপারে কতটা সুযোগ সুবিধে আপনারা পেতেন, অধ্যাপক রায়?

অধ্যাপক : প্রথম দিকে গবেষণার ব্যাপারে মোটেই কোন সুযোগ সুবিধে ছিল না। পরে প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগদীশচন্দ্র—ও'রা সরকারের সঙ্গে ফাইট করে গবেষণা উপলক্ষে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করেন। এবং প্রেসিডেন্সিতেই প্রথম গবেষণার সূচনা হয়। ঐ সময়েই আমি গবেষণার কাজ শুরু করি। সেটা ১৯১১। আমার প্রথম গবেষণা হাইড্রাজিন এবং ফেরিসায়ানাইড ডিটারমিনেশনের উপর ছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই প্রেসিডেন্সি কলেজে স্কুল অভ কেমিস্ট্রি প্রথমে শুরু করেন।

প্র : শুনেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অনেক সময় উচ্চতর ডিগ্রিবিহীন, অথচ মেধাবী-দের অনেক সময় কাছে টেনে নিয়ে গবেষণার কাজে লাগিয়ে দিতেন—

অধ্যাপক : কথাটা মিথ্যে নয়। জিতেন রক্ষিতের কথা ধর। উনি বি এস-সি পাশ করতে পারেন নি। কারণ অবশ্য অন্য। ঐ সময় বেশ কিছু ছাত্র স্বাদেশিকতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকায় ডিগ্রির মোহ তাঁদের অনেকেরই ছিল না। এই জিতেন রক্ষিত খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। আচার্য ও'কে ধরে এনে গবেষণার কাজে লাগিয়ে দেন। পরে ও'র সঙ্গে পেপার তৈরি করেন। পরবর্তী-কালে উনি গাজীপুরে আফিম রসায়ন বিভাগের প্রধান এবং রয়েল ইনসটিটিউট অভ কেমিস্ট্রির ফেলো নির্বাচিত হন। হ্যাঁ, ঐ গবেষণার সুযোগের কথা বলছিলাম। আমাদের সময়ে নিজের পেপার নিজের গাইড-এই করতে হত। তখন ডি ফিল ছিল না, ডি এস সি ছিল। গবেষণাপত্রের মান নির্ধারণ করা হত বিদেশে, বিদেশী পরীক্ষকরাই তা করতেন। আমাদের সময়কার লন্ডনের ডি এস সি ছিলেন ডঃ এইচ কে সেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডি

প্রসঙ্গ কথা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের ঘোষ-অধ্যাপক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (পি এইচ ডি, ডি এস সি) তাঁর মাস্টার মশায় প্রিয়দারঞ্জন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বললেন, ১৯৪৮ সালে এই কলকাতা বিশ্ব- বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ রসায়নের স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্ররূপে প্রবেশ করার পর দুটি নাম সম্পর্কে আমি সন্ত্রস্ত ছিলাম—আমাদের বিভাগীয় প্রধান পালিত-অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় এবং তাঁর সহকারী অধ্যাপক পুলিনবিহারী সরকার। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়ই ও'দের সম্পর্কে নানারকম ভীতিপ্রদ কাহিনী কানে আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের অগ্রজ ছাত্রদের মুখেও নানারকম আশঙ্কা-জনক কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আর তার সত্যতার প্রমাণ পেলাম যখন এম এস সি পরীক্ষার পর বিশেষ একটি প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হয়ে অধ্যাপক রায় আমাকে কুড়ি নম্বরের মধ্যে তেরো নম্বর দিয়ে শতকরা পঞ্চাশ নম্বরই যে ভাল নম্বর তার ব্যাখ্যা করেন তাঁর কোন এক সহকর্মীর কাছে। এরকম উদাহরণ বহু পাওয়া যাবে। অবশ্য পরবর্তী জীবনে এর উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করেছি। তখন এখনকার মত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঢালাও প্রথম শ্রেণী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। তাই তখন যাঁরা অধ্যাপক রায়ের মত শিক্ষকের কাছে ছাড়পত্র পেয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে কখনও তাঁদের ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তারপর তেইশ বছর অতিক্রান্ত হল। এই সময়ে নানা কারণে স্বল্পভাষী এবং আপাত কঠোর এই মানুষটির সংস্পর্শে এসে যে কোমল এবং স্নেহশীল অন্তরের পরিচয় পেয়েছি তার তুলনা বিরল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর গবেষণাগার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে তাঁর ছাত্র, শিষ্য এবং সহকর্মী-রূপে কাজ করেছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। দায়িত্ব পালনে কখনও তিনি নীতিবোধ বর্জন করেছেন বলে আমি জানি না। ১৯১৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং গবেষণা করে এই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অজৈব-রসায়ন বিভাগটিকে তিনি ভারতের অজৈব-রসায়ন গবেষণার একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেন। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অভ সায়েন্সের অজৈব-রসায়ন বিভাগটি তাঁরই পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮র মধ্যে তাঁরই পরিচালনায় যথেষ্ট গৌরব অর্জন করেছিল। অনুতাপের বিষয় এই প্রতিষ্ঠানটি এবং বিশেষ করে ঐ বিভাগটি কিছু অযোগ্য লোকের পরিচালনা-ধীনে এখন দ্রুত গৌরব এবং অবলুপ্তির পথে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ ম্যাগনেটো কেমিস্ট্রি, ম্যাক্রোকেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি অভ কো-অরডিনেশন কম্পাউন্ডস এবং মেটাল বাই-গুয়ানাইডস-এর উপর—যা তাঁকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে তার চাইতেও বড় কথা, বিজ্ঞানের স্থূল আঙ্গিককে অতিক্রম করে তাঁর মধ্যে আমরা সন্ধান পেয়েছি একজন যথার্থ মানব প্রেমিককে। তিনি মনে করেন **There is every reason to expect that Science would show us the right way to peace and freedom for mankind by its rationalising influence upon human mind and human ideas.**

এস সি পান সম্ভবত রসিকলাল দত্ত। পরে তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েট লেকচারার হন। আমাদের সময়ে গবেষণার জন্যে মাত্র তিনজন অধ্যাপক টাকা পেতেন—পালিত অধ্যাপক ২০০০ টাকা, ঘোষ এবং খয়রা অধ্যাপক প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে পেতেন। সাধারণ অধ্যাপকরা কোন অর্থ সাহায্য পেতেন না। পড়ানর জন্যে যে সমস্ত মালমশলা আসত তা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে সংগ্রহ করে প্রথম দিকে নিজেদের গবেষণা আমাদের চালাতে হয়েছে। পরে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় আমরাও বছরে দুশ আড়াইশ টাকার মত গ্রান্ট পেতে থাকি। তবে ঐ সীমিত সুযোগ সুবিধের মধ্যেও কাজ যেটুকু হয়, তা এখনকার বেশির ভাগ কাজের থেকে অনেক নির্ভরযোগ্য।

প্র : অধ্যাপক রায়, আপনার দীর্ঘ জীবনে ভারতের বহুমুখী গবেষণার সঙ্গে আপনি কোন না কোনভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। আপনার কী মনে হয়—স্বাধীনতার পর আমাদের জাতীয় গবেষণায় তেমন কি কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে নি?

অধ্যাপক : তা কেন আসবে না। আমাদের পরবর্তীকালে ক্রমে শিক্ষণ এবং গবেষণার অনেক উন্নতি ঘটেছে। গবেষকের সংখ্যা বেড়েছে, সেই সঙ্গে সুযোগ এবং বিভিন্নমুখী ক্ষেত্র। স্বাধীনতা পাওয়ার পরও কোন কোন গবেষণাগারে ভাল কাজ হয়েছে। তবে ইদানিং অর্থাৎ গত দশ বছর কাজের মান খুব কম গেছে। স্পিরিট অভ ডিভোশন কমেছে, ডেডিকেটেড স্পিরিটের অভাব লক্ষ্য করছি। এর প্রধান কারণ, স্বাধীনতার পর দেশে প্রচুর গবেষণাগার খোলা হল। সে তুলনায় যোগ্য গবেষক শিক্ষক পাওয়া গেল না। স্বল্পযোগ্যতা সম্পন্ন লোকের উপর ভার পড়ল কাজ চালানর। এর ফলে অনেক প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তরুণ কাজে বাধা পেতে লাগলেন।

প্র : এই মানের ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি কিছু—?

অধ্যাপক : বলব? বলার অনেক আছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, অনেক গাইড এখন মনে করেন, যত বেশি সংখ্যক ডি ফিল তিনি তৈরি করতে পারবেন, ততই তাঁর সম্মান, বড় বড় প্রমোশন মেলে। অবশ্য প্রচলিত অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বার্থে তা লেগেও যায়। কিন্তু এটা করতে গিয়ে পরি-স্থিতিটা কেমন দাঁড়ায়, শোন। কিছুদিন আগে ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার কাছে একটি থিসিস পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়। আমার সহ-পরীক্ষক ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত এফ আর এস। ডি ফিল-এর ঐ থিসিসটা পড়ে আমি রিজেকট করি। রেজিস্ট্রার আমাকে লিখে পাঠালেন, আপনি তো রিজেকট করলেন, কিন্তু লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ঐ অধ্যাপক কিন্তু ওটিকে রেকমেন্ড করে-ছেন। আমি উত্তরে তাঁকে লিখলাম, আমার রিপোর্টটা ঐ পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে তাঁর কী রিঅ্যাকসন হয়, আমাকে জানাবেন। লণ্ডন থেকে পরে ভদ্রলোক জানান, আমি যেসব ত্রুটি দেখিয়েছি, সবই সত্য। তবে অনেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত

থিসিস তাঁর কাছে পাঠান হয়, তার বেশির ভাগই ঐ ধরনের। তাই তিনি রেকমেণ্ড করেছেন। এমনও হয়েছে, থিসিস রিজেক্ট করা হলে, থিসিসের যিনি গাইড, তিনি স্বয়ং পরীক্ষকের কাছে এসে সেটিকে অনুমোদন করিয়ে নেবার চেষ্টা করেন

প্র : গবেষণাপত্র দাখিল করার ব্যাপারে শুনেছি বেশ কিছু অব্যবস্থাও এখন ধরা পড়েছে। এ সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য, অধ্যাপক রায়?

অধ্যাপক : সবচাইতে বড় ত্রুটি, রিসার্চ ল্যাবোরেটারিগুলিতে অনেক সময় দেখা যায়, যিনি যে বিষয়েই কাজ করুন না কেন, তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশের সময়, তাতে বিভাগীয় অধ্যক্ষের নাম জুড়ে দিতে হয়। এটা এখন একেবারে রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক। এটা না করলে গবেষণাপত্র প্রকাশের অনুমতিই পাওয়া যায় না। এর ফলে গবেষণা প্রকাশের ব্যাপারে তরুণ বিজ্ঞানীরা মোটেই উৎসাহ পান না। এ ছাড়াও, গবেষকরা যদি তাঁদের উপরস্থ কর্মীর

প্রীতিভাজন না হন, বাধা আসে। পাছে নিজের দুর্বলতা অর্থাৎ অযোগ্যতা ধরা পড়ে, তার জন্যে অনেক গাইড খুবে ভাল ছাত্রদের এড়িয়ে চলেন। অনেক গাইড তো নিজে হাতে পরীক্ষাও করে দেখেন না, অফিসে বসে টাইপ করে হুকুম দেন, আর দেশ বিদেশে মিটিং করে বেড়ান।

প্র : অধ্যাপক রায়, কোন কোন দেশে বিজ্ঞানের-ইতিহাস নামে একটি কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটার মূল্য অনেক বেশি। এক, এতে করে প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানের অগ্রগতি কীভাবে ধাপে ধাপে ঘটেছিল, সেটা জানা যাবে। দুই, জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞানের অর্থবহুল সম্পর্কটি বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে স্পষ্ট হবে। তিন, বিশেষ করে সেটা যদি স্বদেশের হয়, তাতে নিজেদের ওপর শ্রদ্ধাও বাড়বে। আচ্ছা, এ ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? কাজই বা কতদূর এগিয়েছে?

অধ্যাপক : তোমার এক, দুই এবং তিন নম্বর বক্তব্য সম্পর্কে আমি একমত। তবে কাজের কথা যদি বল, খানিকটা কটু মন্তব্য করতে হয়। ভারতের বিজ্ঞান-ইতিহাস রচনার ব্যাপারে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো পথিকৃৎ হয়েই রয়েছেন। (উল্লেখ্য, প্রিয়দারঞ্জন নিজেও একজন) কিছুদিন আগে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ্ সায়েন্সের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখার ব্যবস্থা হয়েছে। গত দশ বছর কাজ চলছে। তার সভ্য পঁচিশ তিরিশজন হবে। বছরে তাঁদের সভা-সমিতি বসে দু' তিনবার। তার খরচ এবং শুনেছি অন্যান্য বাবদ বাজেট ধরা হয়েছে এক লক্ষ টাকার মত, বছরে। অতএব দশ বছরে কত খরচ হল ভাব। এখনও সেই সংকলনের কাজ শেষ হয় নি। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্র হবে। অথচ যে কোন একজন যোগ্য বিজ্ঞানী, যিনি প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত আছেন, তাঁকে ও ভাবে পনের টাকা দিলে যে ধরনের বই প্রকাশিত হতে চলেছে, তার চেয়ে কিছু নিচু মানের কাজ হত না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ডঃ বিভূতি দত্ত মহাশয় হিসটোরি অভ্ হিন্দু ম্যাথেমেটিকস-এর দুটি খণ্ড প্রকাশ করে গেছেন। এর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য বই এখনও কেউ প্রকাশ করতে পারেন নি।

অধ্যাপক রায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেন :

'While there is a gain in quantity, there is corresponding deterioration in quality. The Average graduate is found to be a licensed ignoramus. In fact, in the course of my several lectures, I have not hesitated to say that the degree only serves as a cloak to hide degree holder's ignorance.

তাঁর বক্তব্য, উচ্চতর গবেষণার মান উন্নত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক এবং কলেজীয় শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের দরকার। তার মূল লক্ষ্য হবে, যথাযথ একটি আত্মনির্ভর ব্যক্তিত্বকে তৈরি করা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই লক্ষ্যপথে অনেকটা এগিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন এইচ কে সেন। তিনিই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত-রসায়ন বিভাগটির প্রতিষ্ঠা করেন, ডঃ বি কে দে প্রভৃতি। আচার্যের প্রেরণায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত রসায়নবিদ ডঃ নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ মেঘনাথ সাহা, ডঃ পুলিনবিহারী সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেও আচার্যের আদর্শে যাঁরা স্বাধীন বৃত্তিতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি কম্পানির মুকুন্দ চক্রবর্তী, সুধাংশুচন্দ্র চক্রবর্তী এবং অহীন্দ্র চ্যাটার্জি, ক্যালকাটা কেমিক্যালের ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রিয়দারঞ্জনের সহপাঠী এবং নদীয়া কেমিকেলস-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্ষীতিভূষণ ভাদুড়ী।

ভারতীয় অধ্যাত্মিকতায় অপরিসীম বিশ্বাস প্রিয়দারঞ্জনের। মহাত্মা গান্ধীর তিনি প্রকৃত অনুরাগী। ওঁর বিশ্বাস, বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের যথাযথ সমন্বয় ঘটানর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

সমরজিৎ কর

শিল্পসৃষ্টি করা যাঁদের পেশা তাঁরা যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা শখের শিল্পী, অর্থাৎ কেবল শিল্পপ্রীতির জন্য যাঁরা সকলের অগোচরে আপনার মনে ছবি আঁকেন তাঁরা, এতদিন পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার কথা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারতেন না। অথচ, আজকাল এ শ্রেণীর অনেক শিল্পীই তাঁদের শিল্পসম্ভার নিয়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হতে আদৌ দ্বিধাবোধ করেন না। তার কারণ সম্ভবত এই যে, দেশের জনসাধারণ আজ শিল্প বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, শিল্পচর্চার রেওয়াজও বেড়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কি মহিলা ও কি পুরুষ, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও শিল্প শিক্ষা না করেও ছবি আঁকছেন এবং নিজের আঁকা ছবির মান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েই নানা স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্বাধীন শিক্ষার্থী তথা মহিলাদের এ জাতীয় শিল্পকর্ম অনেকেই সম্প্রতি দেখে থাকবেন। অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে শ্রীমতী সুষমা গুপ্তাও তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করে একথা প্রমাণ করলেন। প্রদর্শনীতে তেলরঙে আঁকা ১৮টি নিদর্শন দেখা যায়।

বাঙালী না হলেও শ্রীমতী গুপ্তা বহুকাল যাবত বাংলা দেশে আছেন। আঁকার প্রতি যে তাঁর একটি স্বাভাবিক ঝোঁক আছে এবং তিনি যে যত্নসহকারে ও নিয়মিতভাবে ছবি এঁকে থাকেন প্রদর্শনীটি ঘুরলেই তা বোঝা যায়। প্রথম দিকে আঁকা তাঁর কয়েকটি ছবি দেখে সুপরিচিত শিল্পী ও শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীদিনকর কৌশিক তাঁকে উৎসাহ দেন। তাঁর উৎসাহদান যে ব্যর্থ হয়নি, প্রদর্শনীটিই তার প্রমাণ। শিল্পীর বিষয়বস্তুর অধিকাংশই নিসর্গ ও বহির্দৃশ্য, যদিও অঙ্কনরীতি মিশ্র, অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন রীতিতে কাজ করেছেন। তাহলেও অধিকাংশ ছবিই সুনির্বাচিত। রঙ ব্যবহারে শিল্পী নেহাত কাঁচা হাতের পরিচয় দেননি। প্রথমেই টু শ্রীনগর চোখে পড়ে। কয়েকটি দীর্ঘ গাছকে কেন্দ্র করে নীল ও কমলা রঙের মাধ্যমে শিল্পী শ্রীনগরে যাবার পথের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি ছোট ছবি অনেকের ভাল লাগে—আফটার দি রেন। একটি মূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে নীল, সবুজ ও সাদা রঙের পরিমিত ছোপ লাগাবার জন্য বর্ষণশেষের একটি স্নিগ্ধ রূপ ছবির মধ্যে ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে অন্য শ্রেণীর আরও একটি ছবির নাম করা যায়—নেট্‌স্‌। মাছ ধরার কয়েকটি জাল, শুকাবার জন্য নদীতীরে খুঁটিতে বাঁধা এবং খুঁটির ওপরে বসে আছে কয়েকটি পাখি। গভীর নীল রঙের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র দৃশ্যটি শিল্পী অতি সরলভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে কয়েকটিতে আবার দুর্বল রচনার আভাসও মেলে, এবং সেটা স্বাভাবিক। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে উইনটার মর্ন ও গুলমার্গ ভেল-এর নাম করা চলে।

ইভনিং গসিপ —শ্রীমতী সুশ্বেতা নন্দী

*

সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অংকনবিদ্যা শেখাবার জন্য অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছর যাবত একটি স্টুডিও পরিচালনা করে আসছেন। স্বল্প বেতনের বিনিময়ে যোগ্য শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে তাদের ছবি আঁকতে শেখানোই এই স্টুডিওর উদ্দেশ্য। স্টুডিওতে শিক্ষাধীন ছাত্রছাত্রীর কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় প্রতি বছর। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষ এইরূপ এক বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন অ্যাকাডেমি ভবনে। প্রদর্শনীতে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ২২জন ছেলেমেয়ের ৫৮টি শিল্প নিদর্শন দেখা যায়। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই জলরঙ বা প্যাস্টেল ব্যবহার করেছে, পেনসিলেও দু'-একজন কাজ করেছে। ছবির মধ্যে প্রতিকৃতি, নিসর্গ দৃশ্য ও স্টিল লাইফ-এর নিদর্শন দেখা যায়। কমপোজিশনের সংখ্যা কম। এবারে রঙ-বাহার ছবিও বেশী চোখে পড়ল না। প্রতিকৃতি আঁকায় শোভনা মিত্র প্রশংসা দাবি করে (৪২ নং)। নিসর্গ দৃশ্য রচনায় কুমকুম ঘোষ দস্তিদার (২৫ নং) ও ইন্দ্রজিৎ কুমার (২৯নং)-এর নাম করা যায়। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যামেলিয়া দত্ত, সঞ্জিৎ দত্ত, সুবাণ কউর ও অসিতা ব্যানার্জীর নাম করা চলে।

*

শিল্পী হোরিলাল অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে তাঁর স্কেচের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পরসিকদের কাছে হোরিলাল ঠিক অপরিচিত নন, কারণ ইতিপূর্বে এখানেই তিনি তাঁর স্কেচের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। আমেরিকান মহিলা শ্রীমতী ডোরিস ফ্লিন লিখিত কস্টিউমস অব ইন্ডিয়া (Costumes of India) পুস্তকখানি তিনি চিত্রিত করেন। হোরিলালের প্রদর্শনীর সময়ে শ্রীমতী ডোরিস ফ্লিন তাঁর পুস্তকখানিও অন্য একটি প্রদর্শনীতে স্থাপিত করেন। (বিশদ আলোচনা পরে প্রকাশিত হবে)। শিল্পী হোরিলাল কালিকলম ও পেনসিলের স্কেচ ও বহু বহির্দৃশ্য স্কেচ করেছেন। শিল্পী কালিকলম ব্যবহারে পটু, তবে বিশেষ করে যেখানে তিনি সম্মুখের বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানেই তিনি সাফল্যলাভ করেছেন। পেনসিল স্কেচ হিসাবে ১৯ ও ২০ নং অনেকের চোখে পড়ে। জলরঙ নিদর্শন হিসাবে আফটার দি এনগেজমেন্ট-এর নাম করা যায়। দু'-একটি স্কেচ ইলাসট্রেসন জাতীয়, যেমন শের শাজ টুম। অপরাপর ছবির মধ্যে হোলিম্যান অন দি হোলি রিভার উল্লেখযোগ্য।

*

শ্রীমতী সুশ্বেতা নন্দীর প্রদর্শনীও অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি তেলরঙে কাজ করেছেন। প্রদর্শনীতে তাঁর ১৬টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়।

১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পরে তিনি ১৯৭০ সালে সরকারী আর্ট কলেজ থেকে ড্রয়িং ও পেন্টিং-এ ডিপ্লোমা লাভ করেন। ইতিপূর্বে কয়েকটি যৌথ প্রদর্শনীতেও তাঁর রচনা নিদর্শন দেখা যায়। শিল্পীর রচনারীতি প্রধানত রিয়ালিস্টিক এবং যে স্থলে তিনি এই পদ্ধতিতে কাজ করেছেন সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছেন।

শিল্পী দু'-একটি বিমূর্ত ছবিও এঁকেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি। যেমন, সিম্ফনি। শিল্পী উপযুক্ত রং নির্বাচন করতে পারেননি, বিশেষ করে ছবিতে তীব্র লাল রঙ চোখে লাগে। তবে অন্যান্য ছবিগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কতকগুলি নুড স্টাডি প্রশংসা দাবি করে। এই প্রসঙ্গে স্টাডি ও রেক্লিনেশনের নাম করা চলে। বিশেষ করে ড্রয়িংয়ের দিক থেকে দ্বিতীয়টির নিম্নাংশ অনেকের চোখে পড়ে। আর একটি ছবিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইভনিং গসিপ। কমপোজিশন ও চাপা ও সরল রঙ ব্যবহারের ফলে বিষয়বস্তুটি অতি সহজভাবেই ফুটে উঠেছে। চাপা রঙ ব্যবহার প্রণালীর জন্য ভেনিউ অব কনফেসন প্রতীকমূলক রচনা হিসাবে মন্দ লাগে না। দু'-একটিতে শিল্পী গভীর রঙের তারতম্য তথা স্তরভেদ প্রকাশ করে বক্তব্যটুকু প্রাঞ্জলভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে দি স্টিমুল্যান্ট-এর নাম করা যায়। কমপোজিশনের দিক থেকে বিচার করলে প্লিমস এবং নাম করা যায়। ছাই ও চাপা সবুজ রঙের ভিত্তিতে আঁকা এই ছবিখানির স্তরবিন্যাসও মন্দ লাগে না। পরিকল্পনার দিক থেকে আর একটি ছবির উল্লেখ করা যায়—সোয়িং সিজন। পৃষ্ঠভূমির বিষয়ে অধিকতর সচেতন হলে ছবিখানি আরও উপভোগ্য হত সন্দেহ নেই।

চিত্রপ্রিয়

তেতাল্লিশ

একটি নারীর হৃদয় জয় করা যেন একটা রাজ্য জয় করা। জয় করেছে যে সে তো একজন রাজা। সে যদি তার সেই রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত তা হলে কি তার কোনো দুঃখ থাকত? কিন্তু সে যে শুধুমাত্র রাজা হয়েই ক্ষান্ত নয়। সে চায় সর্বস্ব জয় করতে। একটি নারীর সর্বস্ব জয় করা যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করা। জয় করলে সে সে হবে একজন সম্রাট। সম্রাট না হলে তার সুখ নেই যে। তাই রাজা হয়েও সে অসুখী।

রত্ন তার মনের কথাটা গৌরীকে সোজাসুজি জানায় না। আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে। গৌরী সেকথা বোঝে ঠিকই, কিন্তু উত্তর দেবার সময় সযত্নে এড়িয়ে যায়। সাড়া দেয় না। বার বার ও-প্রসঙ্গ উঠলে লেখে, "ও আমার বনের পাখী, মনের পাখী! তুই যেমন স্বাধীন আমি খাঁচার পাখী, কেমনে পাখী, আমিও কি তেমনি স্বাধীন? ওসব কথা যখন হবে তখন স্বাধীনে স্বাধীনে হবে। আগে তো আমাকে স্বাধীন হতে দে। যতদিন আমি পরাধীন ততদিন আমার আপনার বলতে আছে এক হৃদয়। বলতে গেলে সেই আমার স্বাধীন। সে কি আমি তোর হাতে নিঃশেষে সঁপে দিইনি?"

রত্ন কি বোঝে না যে সে যেমন স্বাধীন গৌরী তেমনি স্বাধীন নয়? মনটা শুধু তার অবুঝ। গৌরী কি পরাধীন বলে এতই পরাধীন যে এখন থেকেই আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করতে পারে না, মুক্ত হলে সে কার সঙ্গে স্বয়ংবরা হবে, কার সন্তানের জননী হবে? রত্নর ধারণা গৌরী এখনো মনঃস্থির করেনি, করতে চায়ও না। মুক্ত হলে পরে মনঃস্থির করবে। অথবা একেবারেই করবে না। বিবাহ মানেই তো বন্ধন। একবার বন্ধনমুক্ত হলে দ্বিতীয়বার বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে যায় ক'জন। প্রেমে পড়া আর বিয়ে করা তো সমান অবন্ধন নয়। প্রেম দিয়ে গেলে তার থেকে সহজে ছাড়ান আছে, বিয়ে ভেঙে দেওয়া কি তেমনি সহজ? মা হয়ে থাকলে তো আরো বেশী কঠিন।
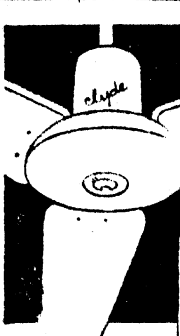
হৃদয় দেওয়া নেওয়া হচ্ছে প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতা। সমাজ সে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেও না, করতে গেলে পারেও না। কিন্তু সর্বস্ব দেওয়া নেওয়া হলো অন্য কথা। সেখানে প্রকৃতিদত্ত অধিকার দাবী করতে চাইলে আগে অবিবাহিত হতে হবে কিংবা অবিবাহিত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। রত্ন অবিবাহিত বলেই সর্বস্ব দিতে পারে বা দেবার কথা ভাবতে পারে। গৌরী তো এখনো অবিবাহিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। যেতে চাইলেই বা পারছে কোথায়। বিয়ের সময় থেকেই ওর পায়ে শিকল বাঁধা। মা হয়ে আবার দুই হাতে বেড়ী পরেছে। দোর খুলে দিলেও কি ও ঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে? বেরোলে আবার ফিরে যেতে চাইবে। ফিরে যাবার জন্যে দোর খোলা রাখতে চাইবে। ছেলে নয় তো, হস্টেজ। ছেলের বাপ কৌশলী পুরুষ। বেশ কৌশল করেই এই চালটি চেলেছেন।

পরিত্রাণের পূর্বে গৌরী তাই র মতো সুখস্বপ্ন দেখতে চায় না। বৃথা, ব এখন থেকে ভাবা বৃথা। তার চিঠি তেমনি মাতৃত্বের আকুলতাই থাকে। আর থা তেমনি ভালোবাসার বিচিত্র আবেগ। ত বেশী না। গৌরী যেন মনের পর ম পায়চারিই করছে, সামনের দিকে পা বাড় দিচ্ছে না। প্রেমের তা হলে প্রগতি সম্ভ কী করে? প্রেম কি তা হলে এক স্থিতাবস্থা — গতি নয়, স্থিতি?

তারপর প্রেম কি কেবল হৃদয়ের প্র হৃদয়ের টান? নারীত্বের প্রতি পৌরুষের ট নয়? পৌরুষের প্রতি নারীত্বের টান ন রত্ন যে পুরুষ আর গৌরী যে নারী এ কি ওদের দুজনের শুধুমাত্র হৃদয় আ বলেই? প্রশ্নটা রত্নকে আরো অবুঝ ক তোলে। ওর মনে হয় গৌরীর পুরুষোত্ত সে নয়, আর কোনো জন। কোনো অনাগ জন। সেই সুজনের বা স্বজনের জন্যে গৌরী তার নারীত্বকে হাতে রেখেছে। ক জন্যে হাত খালি করবে না। ওইখানে গৌরীর দুর্গমতা। রত্নর পক্ষে দুর্গমত

সমস্তটাই অনুমান। তবু অনুমা যুক্তির স্থান নেই। গৌরী তো কাগ কলমেই ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। বাহুপাশে ধ দেবে? রত্নর ধীরে ধীরে প্রতীতি হয় গৌরীর প্রেম তাকে রাজা রূপে অভিষে করলেও সম্রাটরূপে অভিষেক করবে ন দুজনার মাঝখানে থেকে যাবে দুস্ত ব্যবধান। মুক্তির পরেও গৌরী সে ব্যবধ রক্ষা করবে। আত্মসমর্পণ করবে না। যদি না পুরুষোত্তম হয়ে ওঠে। পৌরুষে

প্রতিযোগিতায় আর সবাইকে পরাস্ত করে। সৈনিক হয়, বীর হয়। ব্রাহ্মণের মতো বিদ্বান না হয়ে ক্ষত্রিয়ের মতো বলীয়ান হয়। কিন্তু জীবনকে ঢেলে না সাজলে তো ধনুর্ধর হওয়া যায় না। হতে পারে লেখনী-ধর। গোরী কি ধনুর্ধর ছাড়া আর কারো বাহুপাশে বাঁধা পড়বে? না, ও যতকাল সম্ভব মুক্ত থাকবে? মুক্তিই ওর অভিষ্ট? সেই সঙ্গে প্রেম। যে প্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যার সম্পূর্ণতার জন্যে কামনা-পূরণের অপেক্ষা নেই।

পরীক্ষার পড়ার চাপ না থাকায় রন্তুর মস্তিষ্ক অলস ছিল। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে একবার আকাশে ওঠে তো একবার পাতালে নামে। উচ্চতম চিন্তার শিখরে আরোহণ করে, সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নীচতম চিন্তার অতলে। মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা করে। দাহ যখন জুড়ায় না তখন নদীর জলে ডুব দেয়, সাঁতার কাটে। যতক্ষণ না শ্রান্ত হয়, ক্লান্ত হয় ততক্ষণ উঠে আসে না। ভিজে কাপড়ে থেকে ঠাণ্ডা লাগিয়ে একদিন তার সত্যি সত্যি জ্বর হয়। কুষ্টিয়ায় বাড়িতে ওপর তলার একমাত্র ঘরে সে রোগশয্যায় শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার খোঁজ খবর নেওয়া হয়। কিছু-দিন পরে জ্বর ছেড়ে যায়, কিন্তু তাকে নিচে নামবার অনুমতি দেওয়া হয় না। সে নজরবন্দী থাকে। চিঠি লেখে, মাসিকপত্র পড়ে, কেউ দেখা করতে এলে গল্পগুজব করে। হীরু, ওর বাল্যবন্ধু, রোজ একবার দেখা করে যায়। সন্ধ্যার দিকে।

রন্তুদের বাড়িতে বাউল বৈষ্ণব দরবেশ ফকিরদের জন্যে খোলা দরজা ছিল। তার বাবা ওদের সঙ্গে তত্ত্বকথা বলতে বলতে ওদের গান শুনতে শুনতে এক একদিন রাত করে ফেলতেন। তখন ওরা যায় কোথায়? ওইখানেই খায় দায়, মাদুর পাতে, যত না ঘুময় তার বেশী জেগে কাটায়। ভোর হবার আগেই ওরা নদীতে স্নান করে আসে, ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

চতুরী বলে একটি বিগতযৌবনা মধ্য-বয়সিনী ছিল ওদের একজন। রন্তু বাড়ি এলে ও কেমন করে যে টের পেত যেখানেই থাকুক রন্তুকে দেখতে ছুটে আসত। গান শোনাত, ভিক্ষা নিত কিংবা খেতে বললে খেয়ে যেত। এক আধদিন রাত করে ফেলত। তখন তাকে বারান্দায় জায়গা করে দেওয়া হত, সেইখানে শুয়ে বা জেগে রাত কাটাত। গান যেন ওর গলায় আপনি আসত। একটার পর একটা। বেশ মিষ্টি গলা। সবাই ওকে পছন্দ করত। কিন্তু ওর কোনো প্রার্থনা ছিল না। এমন কি ভিক্ষাও না। যে দিত সে না চাইতেই দিত। ও যেন একজন দাতা। ও গ্রহীতা নয়। নিয়ে ধন্য করে দিত। ওর চাউনি থেকে মনে হত ও তো নিতে আসেনি, নিচ্ছে যে সেটা ওর দাক্ষিণ্য।

রন্তুর জ্বর হয়েছে শুনে চতুরীও আসে দেখতে। দুদণ্ড বসে। একদৃষ্টে তাকায়। দুটো কথা বলে আশ্বাস দেয়। আপন মনে গুন গুন করে, আনন্দলহরী বাজায়। গানগুলির কোনোটি বাউল, কোনোটি বৈষ্ণব ধারার। কোনোটিতে দরবেশের মিশেল। রন্তুর ইচ্ছা করে লিখে নিতে, কিন্তু পারে না। বলে আরেকদিন আসতে। চতুরী যেন তাই চায়। আরেকদিন আসে। আরও একদিন। জ্বর ছেড়ে যাবার পর একদিন রন্তু ওর গানের কথা লিখে নেয়, কিন্তু সুর ধরে রাখবে কী করে। স্বরলিপি তো জানে না। সময়ে অসময়ে আসতে আসতে চতুরী একদিন রাতের বেলা রয়ে যায়।

রন্তু অনেকক্ষণ গোরীর ধ্যান করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে, জানতে পায়নি কখন কে এসে আর পায়ের দিকে বসে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে সে অনুভব করে তার বিছানায় সে একা নয়। জেগে উঠে বুঝতে পারে এ পরশ নারীর পরশ। অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, তবু তার অনুমান করতে বিলম্ব হয় না কে সেই নারী।

রন্তু স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। চতুরীর চতুর হস্ত তার দেহযন্ত্রকে আনন্দলহরীর মতো বাজায়। সেখানে স্পন্দন জাগে। শিহরণ জাগে। পুরুষের চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয় নারীর কেশ। সে ওকে বুকে টেনে নেয়। ওর কোলে আপনাকে সঁপে দেয়। যা ঘটবার তা চকিতেই ঘটে যায়। সম্পূর্ণ অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা। একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত।

চতুরী যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে যায়। বাড়ি যেমন নিঝুম ছিল তেমনি নিঝুম। শুধু রন্তুর চোখে আর ঘুম নেই। চেষ্টা করলেও সে আর ঘুমতে পারবে না। এমন রাত তো জীবনে আর কোনোদিন আসেনি। এমন

অন্তরঙ্গতাও হয়নি। এ কি কেবল কায়িক অর্থে? কায়ার সঙ্গে আত্মাও কি ছিল না? উপলব্ধি করল যে সে আত্মা নয় তো কে? যার সঙ্গে উপলব্ধি সেও কি আত্মা নয়?

কিন্তু হৃদয় যে অনুপস্থিত ছিল। সে আরেকজনের কাছে বাঁধা। দেহ একজনের সঙ্গে হৃদয় আরেকজনের সঙ্গে, এর নাম ব্যভিচারিতা। এটা নীতিবিরুদ্ধ। রত্ন যে ঘটনার অংশ নিয়েছে তা শত চেষ্টাতেও অঘটিত হবে না। এই চিন্তা তাকে বিমর্ষ করে রাখে। সে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়।

সে গোরীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, একথা যদি ও মেয়ে জানতে পায় তবে তো সব শেষ। হায়, হায়, এতদিনের প্রেম! তার এই পরিণতি! রত্নর প্রাণ ভরে কাঁদতে ইচ্ছা করে। তা বলে গোরীকে না জানিয়েও থাকা যায় না। সেটা আরো বড়ো অপরাধ।

চতুরীর উপরে ওর রাগ হয়। কিন্তু সেও তো একটি নারী। তার প্রাণেও তো অনুরাগ আছে। বিনা অনুরাগে তো সে এতদূর আসেনি। কখনো কি সে রত্নর কাছে কিছু চেয়েছে? না। ওটা স্বার্থের বিনিময়ে নয়। স্বার্থের বিনিময়ে নয়। নিঃস্বার্থ ও নিঃস্বার্থ।

রত্ন অস্বীকার করতে পারে না যে চতুরী ওকে সুখী করতে চেয়েছিল, সুখী করে গেছে। অথচ যে সুখ গোরীর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা যায় না সে সুখ সুখই নয়। সুখের সুখই তো প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা। তা হলে একে সুখ বলবে কেন? এটা এর চেয়ে নিচু দরের জিনিস।

তা হলে কি পাপ? রত্ন তা নিয়ে সারা রাত চিন্তাজ্বরে জর্জর হয়।

চুরাশি

চতুরীর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক যদি থাকত তা হলে রত্নর নীতিবোধ ওই নিয়ে পীড়িত হতো না। ওটা হতো প্রেমেরই প্রাকৃতিক পরিণতি। সমাজ যাই বলে বলুক। কিন্তু তা তো নয়। চতুরী হয়তো রত্নকে ভালোবাসে, রত্ন তো ওকে ভালোবাসে না। কখনো ওকথা ওর মনে উদয় হয়নি। ওটা কল্পনার অতীত।

চতুরীর উপর রাগ হচ্ছিল কেন ও অমন চোরের মতো ঘরে আসতে গেল, কেন গায়ের হাত দিতে গেল। রক্তমাংসের শরীর গরম হতে কতক্ষণ লাগে! তাও যদি পরিপূর্ণ সজাগ থাকত। ঘুমের ঘোর তখনো ভালো করে কাটেনি। শীতকাতর একটি নারী যদি কম্বলের বাইরে বসে কাঁপতে থাকে তা হলে তাকে কম্বলের ভিতরে একটু জায়গা করে দেওয়া কি পুরুষের পক্ষে শিভালরির রুদ্ধ!

শিভালরির কথা মনে আসতেই রত্নর রাগটা এক নিমেষে জুড়িয়ে যায়। তাই বলে অনুরাগে রূপান্তরিত হয় না। না, চতুরীকে সে ভালোবাসে না। কোনোদিন ওকে ভালোবাসেনি। ভালোবাসতে পারবে না। ও যদি ভালোবেসে থাকে ওর ভালোবাসার প্রতিদান দিতে পারবে না। গোরী বলে আরেকজন যদি না থাকত তা হলেও চতুরীর সঙ্গে সম্পর্কটা ভালোবাসার সম্পর্ক হতো না। এখন তো গোরী বলে আরেকজন রয়েছে। একই সম্পর্ক কি দুজনের সঙ্গে পাতানো যায়

ইচ্ছা করছিল চতুরীকে ডেকে বুঝিয়ে বলতে যে দুই নারীকে ভালোবাসা একজন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। উচিতও নয়। রত্ন যখন গোরীর তখন চতুরীর হতে পারে না। শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই শোভা পায়, রত্নর পক্ষে নয়।

কিন্তু কোথায় চতুরী পরের দিন ওর দেখা নেই। উড়ো পাখীর মতো ও উড়ে গেছে। রেখে গেছে কয়েকটি গানের রেশ। আর দিয়ে গেছে এমন একটি রসের আস্বাদন যা মধুরও নয়, তিক্ত নয়, সুধাও নয়, বিষও নয়, ভালোও নয়, মন্দও নয়, সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। পাপ? না পাপও নয়, পুণ্যও নয়। তাপ? হাঁ, তাপ। উত্তাপ। পরিতাপ। সন্তাপ।

এখন প্রশ্ন হলো গোরীকে আদৌ লিখবে কি না ওকথা। লিখলে কী লিখবে। ইচ্ছে করলে চতুরীর উপরেই সবটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে ভালো মানুষ সাজা যায়। নারী যদি অমন করে হঠাৎ চড়াও হয় পুরুষ বেচারা আত্মরক্ষা করে কী উপায়ে? কিন্তু রত্নর শিভালরিতে বাধে। দোষটা সে আপনার উপরেই টেনে নেয়। ওর উচিত ছিল অনুত্তেজিত থাকা। নয়তো উঠে বেরিয়ে যাওয়া। তা না করে ও চূড়ান্ত দুর্বলতা দেখিয়েছে।

যে কথাটি সে তার বুকের মাঝখানে সযত্নে বন্ধ করে রাখে সেটি হলো এই যে, নারীর চোখে সে পুরুষ। নারী তাকে পুরুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সে নারী গোরী নয় বলে কি সে নারী নয়? তার স্বীকৃতিরও দাম আছে।

কিন্তু এ বিষয়ে রত্নর সন্দেহ ছিল না যে চতুরীর সঙ্গে যা হলো তা যদি হতো গোরীর সঙ্গে তা হলে তা হতো দ্বিধাহীন-ভাবে মধুর, উত্তম, সুন্দর, অমৃত, পুণ্য।

অবশ্য তার আগে গোরীকে মক্ত হতে হতো। স্বকীয়া হতে হতো।

গোরীকে রেখে ঢেকে চিঠি লেখা এই প্রথম। ও যে বিষম রাগ করবে, ভীষণ রাগ করবে, ভীষণ অভিমান করবে এরকম একটা আশংকা রঙ্গকে কাঠ করে দিয়েছিল। কে জানে হয়তো সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বসবে। গোরীকে হারিয়ে রঙ্গর জীবনে আর কী অবশিষ্ট থাকবে। শন্য হয়ে যাবে না জীবন? তা বলে গোরীর কাছে ঘটনাটা গোপন করা কি ঠিক হতো? না, কিছুতেই ঠিক হতো না। প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের কাছে গোপন বলে কিছু থাকবে না। এইটেই আদর্শ। রঙ্গ এ আদর্শ যথাসাধ্য মেনে চলবে।

গোরী সাধারণত পত্রপাঠ উত্তর দেয়। এবার দেখা গেল তার দেরি হচ্ছে। অবশেষে এল তার চিঠি। আজে বাজে একশো রকম কথার পর চিঠি শেষ করে পনশ্চ দিয়ে লিখেছে, "যশোবাবুর যেমন সুধা তোমার তেমনি চতুরী। কী বলব, আমার যেমন কপাল! পুরুষ মানুষের যা স্বভাব!"

চিঠিখানা রঙ্গকে ব্যথা দেয় তা ঠিক।

কিন্তু সেই সঙ্গে তার নিজের উপর আস্থাও যোগায় যে সে পুরুষ। গৌরীও প্রকারান্তরে তা স্বীকার করেছে।

রন্তু এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে গৌরী রাগ করেনি, করেছে একটুখানি অভিমান। সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়নি। দেবার নামগন্ধ নেই। যথারীতি আদর জানিয়েছে। "মণি" বলেছে, "মানিক" বলেছে। তফাতের মধ্যে এই যে, "তুই" না বলে "তুমি" বলেছে, "তোর" না বলে "তোমার" বলেছে। তফাৎটা লক্ষ করবার মতো। রন্তুর বুকে লাগে। তবে কি গৌরী ওকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?

সত্য বলতে গিয়ে ফল এই হয় যে চিঠিপত্রের সুর কেটে যায়। তবু তো পূর্ণ সত্য নয়। রন্তু অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না। যা ঘটে গেছে তার উপর তার হাত থাকলে কি তা ঘটত? মানুষের স্বাধীনতা বাস্তবিক কতটুকু? উন্মুখ নারীকে বিমুখ করতে সেকালের মুনি ঋষিরাও কি পেরেছেন?

গৌরী যে কত বড়ো শক পেয়েছে সেটা চিঠিতে প্রকাশ না করলেও রন্তু সেটা নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বোঝে। তাই ওকে বার বার অভয় দেয় যে আর অমন কিছু ঘটবে না। গৌরী কিন্তু তার আশ্বাসবাক্যে ভোলে না। সেও একটি ভবী।

লেখে "তুই অনেক পড়াশুনো করে পণ্ডিত হয়েছিস বলে কি চতুরীর মতো চতুর? ও হলো বহুদর্শী। তোর মতো ছেলেদের এক হাটে কিনে এক হাটে বেচতে জানে। হায়, আমি যদি তোর কাছে থাকতুম! যতই ভাবছি ততই বুঝতে পারছি যে তোকে ওর মতো মেয়েমানুষের কবল থেকে রক্ষা করা আমারই কর্তব্য। আমার এ কর্তব্য আমি পালন করতে পারিনি বলেই তোর যা হবার তা হয়েছে। এখন তুই একটু ধৈর্য ধর। সবুর কর। আমি তো একদিন আসছিই। তুই বোধ হয় আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিস। তা না হলে কি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে যেতিস!"

রন্তুর অন্তর পুলকে ভরে যায়। গৌরী তা হলে আশা দিয়েছে যে দুধের স্বাদ দুধে মেটাবে। অবশ্য মুক্ত হবার পরে। ততদিন ধৈর্য ধরতে, সবুর করতে বলেছে। রন্তুও তাতে রাজী। ভ্রমর যে কমল ভিন্ন আর কোনো ফুলের মধু খায় না লালন ফকিরের না কার যেন এইরকম একটা পদ চতুরীর মুখে শুনেছিল। সেটাই শুনিয়ে দেয় গৌরীকে।

আবার মিটমাট হয়ে যায়। যেমনকে তেমন। অন্তত রন্তুর তো তাই ধারণা। ও যেমন নিজের অন্তর্দর্শী তেমনি অন্যের অন্তর্দর্শী হলে ওর ধারণা হয়তো অন্যরূপ হতো। মেয়েরা ক্ষমা করে, কিন্তু ভোলে না। প্রত্যেকেই এক একটি ভবী।

"কুষ্টিয়ায় তুই আছিস কী করতে? কী তোর দরকার।" গৌরী একদিন শাসনের সুরে লেখে। "তার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে একটা কাজকর্মের উদ্যোগ দেখ। যেটার প্রত্যাশায় বসে আছিস সেটা যদি আবার ফসকে যায়?"

কথাটা সত্যি। কাজকর্মের অভাবে রন্তুও অলস হয়ে পড়ছিল। তা বলে একেবারে নিষ্কর্মা নয়। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে ওর খাতির ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রায়ই বইপত্র ধার করে নিয়ে আসত। ফিরিয়ে দিতে গেলে তিনি তাকে আটক করতেন। আলাপ-আলোচনায় সন্ধ্যা কাবার হতো। মফঃস্বল শহরে অমন একটি দুর্লভ ব্যক্তির সঙ্গে ভাব বিনিময় রন্তুকে সতেজ রেখেছিল।

বাংলার বিখ্যাত হেডমাস্টার শ্রেণীর তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কখনো কাউকে মারতেন না, বকতেন না, ধমকাতেন না, বিদ্রূপ করতেন না। সবাই তাঁর চোখে বালগোপাল। কিন্তু শাসন করতেন ঠিক। সেটা হাসিমুখে শাসন। কদাচ কখনো হাসতে হাসতে কর্ণাকর্ষণ বা কেশাকর্ষণ। তারপর ডেকে নিয়ে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। আরও আশ্চর্য, ছেলেদের সবাইকে "তুমি" বলতেন।

কুষ্টিয়াতে রন্তুর সত্যি একটা দরকারী কাজ ছিল। সেটা গৌরীকে সে লেখেনি ছিল। মালাদির যিনি মাস্টারদা রন্তুর তিনি ঝন্টুদা। রন্তুর যিনি হেডমাস্টার মশায় ঝন্টুদারও তিনি হেডমাস্টার মশায়। তা ছাড়া রন্তুর সঙ্গে ঝন্টুদার একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। যদিও কোথাও এক জায়গায় তিনি স্থির হয়ে বসবার পাত্র নন তবু কিছুদিন থেকে তাঁর মধ্যেও একটা স্থিতির বাসনা জেগেছিল। সেই স্কুলেরই একটা মাস্টার পদ কেমন করে তাঁর বরাতে জুটে যায়। রন্তু জানত না যে ওটা তাঁর গুরুজনের কারসাজি। অনেক করে ওঁরা তাঁকে সংসারী করতে চেয়েছিলেন। ঝন্টুদা একই শহরে থাকায় রন্তুর দিক থেকে বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটালে ভারত-দর্শনের ফল হয়। হেন তীর্থ নেই যেখানে তিনি যাননি, হেন আশ্রম নেই যেখানে তিনি থাকেননি। অন্তত এক রাত।

এমন যে ঝন্টুদা তাঁকে সংসারী হবার মন্ত্রণা কি কেবল তাঁর গুরুজনরাই দিয়েছিলেন? রন্তুও কি দেয়নি? মালাদির চিঠিপত্র তাঁকে পৌঁছে দেবার ও তাঁর চিঠিপত্র মালাদিকে পৌঁছে দেবার ভার রন্তুই নিয়েছিল। তার সেই শখের হরকরা-গিরি একদিন হঠাৎ থামিয়ে দেন মালাদির [illegible]। তারপর চিঠিপত্র [illegible] [illegible] উপর পড়ল রন্তু সে [illegible] ঝন্টুদার সঙ্গে দেখা হলে প্রসঙ্গক্রমে মালাদির কথাও ওঠে। তিনি [illegible] হয়ে যান। যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই বলেন।

"রতন, তুমি যা ভেবেছ তা [illegible]" ঝন্টুদা বলেন। "আমি তো ওকে বিয়ে করতেই চাই, ওই আমাকে বিয়ে করতে নারাজ।"

"সে কী কথা, ঝন্টুদা! মালাদি যে কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছে!" রন্তু বলে।

"আমারও সেইরকম ধারণা ছিল। কিন্তু ক্রমেই অনুভব করছি যে ওর কাছে প্রিয়তর ওর পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি। তুমি কি লক্ষ করেছ যে ও লুকিয়ে লুকিয়ে ওর স্বামীর ফোটো পুজো করে? সংস্কার। সংস্কারই হিন্দুর মেয়েদের মনে বলবান। তুমি আমি ইংরেজী পড়া পুরুষ বলে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারি। কিন্তু ইংরেজী পড়িয়ে দেখা গেল মালার মনে একটুও রেখাপাত করল না। ওর মায়ের সঙ্গে ওর ভেদ নেই, রতন।" ঝন্টুদা বলেন।

মালাদির পক্ষ নিয়ে ঝন্টুদাকে বোঝানোও রন্তুর নিত্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একদিন স্তম্ভিত হয়ে গেল হেডমাস্টার মশায়ের মুখে শুনে যে, ঝন্টুদার গুরুজন ওঁর বিয়ে দিচ্ছেন, উনিও এতকাল বাদে রাজী হয়েছেন। না, মালা বলে একটি বিধবা মেয়ের সঙ্গে নয়।

(ক্রমশ

ফুরিয়ে যাবে যে! বাড়ীর সব্বাই আমার জনসন্স* ব্যবহার করছে
Johnson's baby powder
Johnson & Johnson
সবাই পারেন জনসন্স বেবী হ'তে
© Johnson & Johnson—India 1978
* ট্রেডমার্ক
জনসন অ্যাণ্ড জনসন*
JJ-1923

"জনসাধারণের কাছে আমি আজ যে-গ্রন্থটি উপস্থাপিত করছি, তাতে গ্রথিত হয়ে আছে ভ্রান্তিপ্রমাদ—লেখকের, অনুবাদকের আর আমারও।" কথাগুলো লিখেছিলেন আর্কেঞ্জেল দ্যুপেরো কার্মেল-সংঘের একজন অস্ট্রিয়ান মিশনারির ভারত-ভ্রমণকাহিনীর অনুবাদের ভূমিকায়, যে অনুবাদের পরিমার্জনা—নিজস্ব টীকা সমেত—তিনিই সম্পন্ন করেন। পুস্তকটির সটীক অনুবাদ জার্মান ভাষাতেও সাধিত হয়েছিল; অনুবাদক ও টীকাকার জে এম ফস্টের।

উদ্ধৃত বাক্যটিতে যে সত্যটা উদ্ঘাটিত হচ্ছে তা এই যে, বিদেশী পর্যটকেরা এদেশ ঘুরে, ঘরে ফিরে, গোল্লায় গোল্লায় কেতাব প্রণয়ন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের বক্তব্যগুলিতে যে ভুলের ফাঁকর বোঝাই হয়েছিল—সে বিষয়ে তাঁরা অনেকে অনবহিত ছিলেন না। দেখার ভুল, জানার ভুল, বোঝার ভুল, হাজার ভুল। আমরা তবু ওসব গ্রন্থ পড়ি ঔৎসুক্য মেটাই—অন্যদের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখার ঔৎসুক্য। সে দেখায় ভুল থাকতে পারে [এমন কি বিকৃতি], কিন্তু সেইসব অনিচ্ছাকৃত [কিংবা বিদ্বেষপ্রসূত] সত্যচ্যুতির স্বরূপ উপলব্ধিও আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহলের [তথা কৌতুকবোধের] এক মূল্যবান উপাদান।

নানা মুনি, নানা মত

ফাদার পাওলিনো আ সাংক্তো বার্তোলোমেও নামে ঐ যাজকটির কথাই ধরুন না কেন। মালাবার দেশে তেরোটি বছর বসবাস করে [১৭৭৬-৮৯] তিনি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম থেকে ইতালীয় ভাষায় রচিত 'ভারত ভ্রমণ' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বড়াই করে ঘোষণা করেন: "মালাবার দেশটিকে আমি ভালোভাবেই চিনতে শিখেছি—নিজের মাতৃভূমির চেয়েও বেশি।" মালাবার সম্পর্কে পাদ্রি মহাশয়ের জ্ঞান "স্পষ্ট, নির্ভুল, সঠিক ও সম্পূর্ণ"। পুস্তকটিতে তাঁর পূর্বসূরীদের প্রতি—ভারত-পথিক ও ভারত-বিশেষজ্ঞদের প্রতি—তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পরিচয় দেননি। নানাজনের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর মতভেদ। চাঁচাছোলা ভাষায় সেটা জানিয়ে দিতেও তিনি নির্দ্বিধ। অন্যের ভুল ধরতে গিয়ে নিজে আরও বড় রকমের ভুলে জড়িয়ে পড়েছেন, এমন উদাহরণও আছে। টীকাকারেরা তাঁদের টীকা লিখতে বসে ফাদারকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি। পারস্পরিক এই ঠোকাঠুকিটার জন্য বইটি বিশেষ উপভোগ্য।

সংস্কৃতজ্ঞ জোনস্ উইল্কিনস্ অ্যান্ড কোম্পানির উপর ফাদার পাওলিনো খড়্গহস্ত। ওঁরা নাকি বলে গিয়েছেন: দেবনাগরীই সংস্কৃতের যথার্থ ও সমুচিত লিপি!... বেচারী জোনস্, মায় উইল্কিনস্!... ওঁরা কি জানেন না, দেবনাগরী একটি লিপি নয়, দেবনাগরী একটা ভাষা! সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন ভাষার তালিকা পেশ করেন ফাদার: পালি, তামিল, মালাবার, কানাড়া, বাংলা ["ইতর বাংলা" যা নাকি এত দীনহীন ও বিকারগ্রস্ত যে অন্তঃস্থ 'ব' পর্যন্ত নেই তার বর্ণমালায়], মারাঠী, তেলেগু, গুজরাটী, দেবনাগরী—আর ঐ দেবনাগরীরই সগোত্র আরেক ভাষা: নেপালী।

"একমাত্র সেই দেবনাগরীকেই সংস্কৃতের যথার্থ লিপি বলাও যা, ইংরেজি স্ক্রিপ্টকে ইংরেজিরই নিজস্ব স্ক্রিপ্ট বলাও তাই!... তেলেগু এবং গ্রন্থম্ বর্ণমালার খোঁজও রাখেন না ওঁরা..." ঈষৎ অবজ্ঞার সঙ্গেই ফাদার সিদ্ধান্তে আসেন। ভারত উৎসাহী য়ুরোপীয়দের উদ্দেশে পরামর্শও না দিয়ে ছাড়েন না: "ভারতের পরিভাষা, ভারতীয় গ্রন্থাদি এবং হিন্দু সংস্কার বুঝতে হলে আগে তেলেগু, গ্রন্থম্ ও দেবনাগরীতে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত অভিধান রচনা করুন। মনে রাখবেন, সংস্কৃতে দ্ব্যর্থক ও শ্লেষাত্মক শব্দ অগণ্য, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত য়ুরোপনন্দন পালঙ্ক ও মাতঙ্গে, দীন্দ্র [হিন্দুর] ও দিয়ানা-য় [দেবী] পার্থক্য বোঝে না।"

আর জোনস্ নাকি তদুপরি পণ্ডিতি ক'রে বলে গেছেন: পারসিকদের আদি সাম্রাজ্যে যে ভাষা চলিত ছিল, সেটাই সংস্কৃতের জননী। পাওলিনো বাঁকা হেসে জানাচ্ছেন: জোনস্ সাহেবের উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া ঐ সাম্রাজ্যের টিকির খবর আর কোথাও মেলে না।

জোনসের উক্তির বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি আছে মেলাই। এক—প্রাচীন পারস্যের শিলালিপি ও মুদ্রালেখগুলিতে খাঁটি সংস্কৃতের আভাসমাত্র মেলে না। দুই—সংস্কৃতের মতো এত সমৃদ্ধ, দার্শনিক, কাব্যধর্মী ও নিখুঁত ভাষা কোনো কালেই যে কোনো মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিনকার কথ্য ভাষা ছিল, একথাটা বিশ্বাস্য নয়। তিন—ভারতে সংস্কৃত থেকে সূচিত ডজনখানেক ভাষার চলন, পারস্যে মাত্র একটি [জেন্দ, ফাদারের নিশ্চিত ধারণা, সংস্কৃতেরই অন্যতম ডায়ালেক্ট]। চার—প্রাচীন গ্রীকদের সঙ্গে প্রাচীন পারসিকদের যুদ্ধ-মারফৎ যোগাযোগ ঘটেছিল কম নয়। অথচ ঐ গ্রীকেরা সংস্কৃতের পাত্তা পর্যন্ত পায়নি। প্রাচীন পারসিকদের ভাষাই যদি সংস্কৃতের উৎস-ভাষা হয়ে থাকে, তবে তাদের কাছ থেকে নদীনগর বা ব্যক্তির সংস্কৃত নাম দু'একটা কি আর পাওয়া যেত না? পাঁচ—সংস্কৃত যদি ভারতেরই আদি ভাষা না হয়ে থাকে, তাহলে মনুর আমলের ভারতীয় মানুষ হাবাবোবা ছিল বলতে হবে—পারস্য থেকে যদ্দিন না সংস্কৃত আমদানি হল, ততদিন পর্যন্ত...। এসব থেকে এই উপপাদ্যই কি গ্রাহ্য নয় যে গোষ্ঠীর সন্ততিকুল একই সময়ে স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, সুপ্রচুর খাদ্যবস্তু এবং ঋদ্ধিশালী ভূমিসম্পদে আকৃষ্ট হয়ে একদল পারস্যে এবং একদল ভারতে বসত গাড়তে এসেছিল?

একটি পাদটীকায়, জোনসের মৃত্যুর সংবাদ অবগত হয়ে ফাদার পাওলিনো সখেদে লেখেন, "ইংরেজদের মধ্যে উনিই সবচেয়ে ভালো করে সংস্কৃত শিখেছিলেন। পারতেন স্মরণীয় ও বরেণ্য পুরুষ হয়ে উঠতে, যদি তাঁর রুচি শ্রম, পাঠ ও রচনাকে তিনি হিন্দু-পারসিক-তুর্কী-আরবী-তাতার-চৈনিক ... ইতিহাস-বিদ্যা - গীতিবিদ্যা - ... - জ্যোতির্বিজ্ঞান - রসায়ন - ভূগোল - পুরাণ বহুধা

আপনার
মুখের শোভায়
লাবণ্যের আভা
এনে দেয়!
POND'S
VANISHING CREAM
পণ্ড্‌স
ভ্যানিশিং ক্রীম
নিখুঁত
পাউডার বেস

নিক্ষিপ্ত না হতে দিয়ে এক ভাষায়, এক জাতিতে, প্রাচীবিদ্যার একটিমাত্র শাখায় সংহত ক'রে তুলতেন। সর্বশাখাতেই এক সঙ্গে উদ্ভাস জাগাতে গিয়ে সমস্তটাই তিনি প্রগুঢ় তমসায় সমাচ্ছন্ন রেখে গিয়েছেন।"

উইলকিনস ভগবদ্‌গীতার যে অনুবাদ করেছেন, পাওলিনো সেটাও সরাসরি নাকচ করে দেন : আরে দূর! সংস্কৃত শেখা কি চাট্টিখানি কথা? দশ বছর লাগে ওর ব্যাকরণ আর পদন্যাস বুঝতে। সাহেব সে পরিশ্রম করলেনই না, এদিকে পটাপট গোটা বইটা তর্জমা করে বাজারে ছাড়লেন......। পাদ্রেরের মতে "য়ুরোপে ঝুড়ি ঝুড়ি হাস্যকর বাজে মাল ছাপা হয়ে বেরোচ্ছে, অথচ মূল ভারতীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশের দিকে একটুকু নজর নেই কারো।" তাঁর অভিযোগ : য়ুরোপ শুধু ভারতের পণ্য-সম্পদের প্রতি লালায়িত; কিন্তু এই যে পৃথিবীর একটিমাত্র দেশ আজ পর্যন্ত তার পুরোনো শাস্ত্র, পুরোনো কাব্য, পুরোনো রীতিনীতি-প্রথাদর্শ বাঁচিয়ে রেখেছে, জীবন্ত রেখেছে প্রাচীনতার অখণ্ড ধারাটিকে তার প্রতি য়ুরোপ উদাসীন ও নিরাসক্ত। "প্রাচীন গ্রীকেরা বেরিয়ে পড়েছিল দেশ ছেড়ে ভারতের অভিমুখে, শিক্ষার আগ্রহেই। আর আমরা, অচল-অনড় থেকে, স্বল্পবিদ্যা সম্বল ক'রে, দুনিয়ার সব ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচার করার দাবি করি।..."

বিচিত্র মন্তব্যকণা

বেদ সম্পর্কে পাওলিনোর এক নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্ত আছে : বেদ মানে কোনো পুস্তক নয়, পুণ্য শাস্ত্র নয়, পুণ্য বিধান। আর এই প্রস্তাব যে কত অকাট্য, তার প্রমাণ দাখিল করে তিনি বলেন, "এইজন্যই প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে একরাশ বেদের সন্ধান মেলে : বেদবেলক, ঋগবেদ, বেদান্তবৃত্তি, বেদসার, অথর্ববেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ [চিকিৎসা-বিধান]...: 'বেদ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বেদ কোনো গ্রন্থ নয়।"

সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা কত? "আমার কাছেই একটা পুঁথি আছে, তাতে ৮০০৪টি বর্ণের সাক্ষাৎ পাই।" সংস্কৃতের সঙ্গে লাতিন ও গ্রীকের সাধর্ম্য নির্দেশ করে পাওলিনো অনুমান করেন, সংস্কৃত ঐ সব ভাষারই সঙ্গে একই সময়ে রূপ নিয়ে জেগে উঠেছিল—বাইবেলে বর্ণিত 'বাবেল-এর ভাষা বিপর্যয়ের' সেই অনির্দিষ্ট উষকালে। বিধবা vidua, ক্রমেলক camelus, অদ্য hodie, অদ্ edo প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার মধ্যে এমন অবাক-করা মিল রয়েছে। তা কি করে হল? গ্রীক আর রোমকেরা তো আর ভারতে এসে শব্দগুলো আমদানি করে নিয়ে যায়নি; আর ভারতীয়েরাও রোমে গিয়ে লাতিন শিখে এগুলো আত্মসাৎ করে নিয়ে আসেনি। সুতরাং "ফাদার পোঁস্ সংস্কৃতের যে-প্রাক্‌প্লাবনিক অস্তিত্বের কল্পনা করেছেন, তা নিঃসংশয়েই ভিত্তিহীন।"

সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে ইথিওপীয় বর্ণমালার সাদৃশ্য, মনু ও নোয়া-র অভেদ, জিপসিদের ভাষার সঙ্গে গুজরাটীর মিল [এবং তা থেকে জিপসিদের ভাষা যে সংস্কৃতেরই সন্তান, এই ধারণা]—গ্রন্থের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে এই সব মন্তব্য ও অভিমতের টুকরো। অমর সিংহের নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন অনুবাদ বিনা ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম য়ুরোপের কাছে যে-তিমিরে আছে, সে-তিমিরেই থাকবে। ভ্রাতৃ মানে বড় ভাই; সহধর্মিণী মানে সহস্র-গুণান্বিতা রমণী; 'শ্রি' এসেছে ওসিরিস্ থেকে—আর 'দীর্ঘ-ঈ'-সম্বলিত "শ্রী" কোনো দেবীকে বোঝায়। প্রথম ভারতীয় (!) ঐতিহাসিক মহীপাল cyaxere ব্যাবিলোনীয় ও মীড্‌দের মধ্যে দৌত্যকর্ম করেছিলেন!...আর হ্যাঁ...বুদ্ধ নামে সত্যি কোনো রাজা ছিলেন, এটা এক হাস্যকর অ-তথ্য : রূপকথা ও রূপক কথা থেকেই বুদ্ধের অভ্যুদয়; পাশ্চাত্য দেশের হের্মেস্ ও মের্কুরিস্-এর তিনি ভারতীয় কাউন্টার-পার্ট। ভাগবত-পুরাণ ভারতীয়দের চোখে এতটাই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত যে, তার পাঠ কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র হিন্দুরা শির চাপড়াতে থাকে; পাওলিনো নিজে তার কিছু শ্লোক স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন...। প্রসঙ্গত তিনি সংস্কৃত শব্দের লিপ্যন্তরে আঁকেতিলের বানান নিয়ে নিন্দে করতেও ছাড়েননি : যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন আঁকেতিলের কল্যাণে Djedashter এবং Djerdjoudohen হয়ে উঠেছে! আঁকেতিল অবশ্য জবাব দিয়েছেন, উত্তর ভারতে যেমন যেমন উচ্চারণ তিনি শুনেছেন, তেমন তেমন বানানই লিখেছেন।

হাল্‌হেড সাহেবের কথা মনে আছে? সেই যিনি হিন্দুদের আইনমালা সংকলন করেছিলেন। পাওলিনোর মতে, ওগুলো আধুনিক বিধিবিধান। আর আধুনিক বলেই গদ্যে রচিত, পদ্যে নয়। ঐ প্রকাণ্ড সংকলনটিতে "লোভী ও চতুর" বামুনদের সাহায্যের হাত আছে। হেস্টিংসের নেকনজরে পড়ার লালসায় তারা আইন প্রণয়নের কাজে এগিয়ে এসেছে। "এমনিতে মনে রাখতে হবে, ভারতের যাবতীয় প্রাচীন গ্রন্থ-ই পদ্যে গাঁথা, তা সে জ্যোতির্বিজ্ঞান-ই হোক কিংবা ভেষজবিজ্ঞানই হোক কিংবা ইতিহাস—আর, সবই গানের সুরে গাওয়া হয়ে থাকে।"

সুধী পাঠক কি জানেন, ব্রহ্মপুত্র একটা পর্বতের নাম? তিনি কি জানেন, ভারতীয় সঙ্গীতে সপ্ত নয় অষ্ট সুর আছে; সা রে গা মা পা ধা নি চা (!)? তিনি কি জানেন, কোনো হিন্দু রাজা কখনো আর-কোনো হিন্দু রাজাকে হত্যা করেন নি? তিনি কি জানেন, হিন্দু যোগীদের গো-স্বামী বলা হয়, তাঁরা কপালে গোময়-পিণ্ডকের [যথার্থ ঘুঁটে] ছাই মাখেন বলে?... ও-সব জ্ঞান তিনি অর্জন করবেন পাওলিনোর গ্রন্থ পাঠ করে।

বিচিত্র ব্রেজিল

আরতি দত্ত

ক্যারাবিয়ন দ্বীপগুলি ঘুরে ব্রেজিলের পথে প্রথম রাত কাটাতে হলো বেলেম শহরে। মাঝরাতে বেলেম পৌঁছে এয়ার পোর্টের কর্মীদের জানালাম আমার থাকবার কথা Grand Hotel-এ, সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হোক। তারা একগাল হেসে বললে, "সিনিয়োরা, সে হোটেল তো ছ'মাস আগে উঠে গেছে"। লাটিন আমেরিকার অধিবাসীরা সদাই হাসিখুশী, গুরুত্ব দেয় না কোন কিছুতে। সুদূর বিদেশে মাঝরাতে হোটেল উঠে যাবার কথা শুনে আমার মোটেই ভাল লাগেনি, বললাম, "এখন উপায়? রাস্তেই কি রাত কাটাবো নাকি?" তারা হই হই করে উঠলো, "সে কী সিনিয়োরা, বেলেম শহরে কি হোটেল নেই? আমরা এখুনি ব্যবস্থা করছি।" পর্তুগীজ ভাষায় বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা ও বাদানুবাদের পর ব্যবস্থা হলো। বেলেম শহরে আধো অন্ধকার পথে অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে চললাম অজানা হোটেলের উদ্দেশ্যে। ভয়ে ভাবনায় পথের ধারে দ্রষ্টব্য দেখবার মনের অবস্থা ছিল না, তবু তারই মধ্যে চোখে পড়ল পর্তুগীজ স্থাপত্যের বড় বড় বাড়ি। হোটেলটিও সেই ধরনের একটি মস্ত বাড়ি, নাম 'পিনগা পাপিয়া'। তখন মধ্যরাত পার হয়ে গেছে, আমার পাশের ঘরে কার যেন গীটার বাজিয়ে গান গাইছিল, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল প্রাণখোলা হাসির আওয়াজ, মনে হলো সত্যি এবার লাটিন আমেরিকায় এসেছি।

পরদিন ভোরে উড়ে গেলাম, গভীর অরণ্যের উপর দিয়ে পার হলাম বিখ্যাত আমাজন—পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশস্ত নদী। বহু দ্বীপে ছড়া আমাজন, তার বুকে একটি দ্বীপের আকার নাকি সুইজারল্যাণ্ডের সমান।

দুপুরের দিকে উত্তর ব্রেজিলের Parnambuco প্রদেশের রাজধানী রেসিফিতে পৌঁছলাম। আমার হোটেলের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে কাপাবারি নদী, অদূরে আতলান্তিক মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রেজিলের এ অঞ্চলে ভারতীয় খুব কমই আসে। ভারতীয় মেয়ে, পরনে শাড়ি, আজও এ অঞ্চলে দ্রষ্টব্য বস্তু তা জানা ছিল না, তাই সঙ্গিণীদের না জানিয়ে মেয়েদের চিরন্তন আকর্ষণ দোকান দেখতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। পথে লোক দাঁড়িয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ফিরে আসি হোটেলে। তাছাড়া ভাষা জানি না, একা দোকানে গিয়ে কি লাভ, কিছু তো কিনতেও পারবো না। আমার দূরবস্থার কথা শুনে এদেশের মহিলা প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত দোভাষী (inter-

শিশুভবন কর্মীরা—জারানা

preter) মেয়েটি হেসে গড়িয়ে পড়লো। মেয়েটির নাম ইভালিনা। পরের দিন দুপুরেবেলা সে আর তার ডাক্তার স্বামী আমাকে Olinda দেখতে নিয়ে গেল। অলিণ্ডা হলো এ প্রদেশের পূর্বতন রাজধানী, দুই শহরের মধ্যে দূর বেশি নয়। পর্তুগীজ ভাষায় লিণ্ডা মানে সুন্দর। এদেশের ইতিহাসের প্রদোষকালে পর্তুগীজ নাবিকেরা দূরে থেকে সমুদ্র সৈকতে পাহাড়ঘেরা জায়গাটি দেখে বলেছিলো; O! Linda'। পরে এইখানেই রাজধানীর পত্তন হয়, কিন্তু অলিণ্ডার রূপ থাকলেও ধারে কাছে জলের উৎস ছিল না তাই পরে রেসিফিতে রাজধানী চলে যায়। অলিণ্ডা আজও তার রূপ নিয়ে উদাসিনীর মত রেসিফির কাছে থেকেও দূরে।

রেসিফির ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে অলিণ্ডার অলিতে গলিতে অনেক শিল্পী ও কবির বাস, প্যারিসের শহরতলী মোমার্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এঁকে বেঁকে সরু পথ উঠে গেছে, চূড়াতে পর্তুগীজ গীর্জা। গীর্জাতে অনেক সোনা ও দামী পাথরের জিনিস ও মূর্তি আছে। দরজাগুলিতেও অনেক মণিমুক্তো ছিল একদিন, যা দুর্বৃত্তেরা নিয়ে গেছে চুরি করে। পাহাড়ের গায়ে আঙ্গুরলতা আর অলিভ গাছ ঘেরা ছোট ছোট বাড়ি। একটি সরু গলির মোড় ফিরতেই একটা চত্বরের সামনে এসে পড়লাম। চারপাশে ছোট ছোট ঘর। এটা নাকি এককালে ক্রীতদাসের বাজার (Slave Market) ছিল। এখানে এখন বিক্রি হয় ছোট ছোট দোকানে সুন্দর সুন্দর মাটির পুতুল, কাঠের নানারকম কারুকার্য করা জিনিস ও ছবি। এসবই একান্তভাবে এদেশীয়। অলিণ্ডার পাহাড় থেকে দেখা যায় ঘন পাইন বন আর বনের ধারে অনেক দূরে আতলান্তিকের নীল জল অশান্তভাবে তীরের উপর আছড়ে পড়ছে। পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধার দিয়ে আমাদের ফেরবার পথ। তখন অপরাহ্ন, পথ ছায়াঘন, সমুদ্রে ভেসে চলেছে অসংখ্য জেলে নৌকো। নৌকোগুলি বালসা কাঠের তৈরী, যে কাঠে তৈরী নৌকোয় 'kontaki' অভিযান হয়েছিল। ব্রেজিলের চারপাশের সমুদ্র জলে ডোবা, চোরা পাহাড়ে ভরা, একমাত্র বালসা কাঠের নৌকোই সে জলে ভেসে বেড়াতে পারে। তাই বহু যুগ ধরে এদেশের আদিবাসীরা বালসা কাঠের নৌকো চড়ে মাছ ধরে। মাছধরা এদের এক জীবিকা।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা এদেশের 'সাশা' (Sasha) নাচ দেখলাম। এটি হলো আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের নাচ এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই সন্ধ্যায় তারাই নাচলো। তাদের নাচ দেখে অতিথিরাও আর বসে থাকতে পারলেন না, সবাই সমবেতভাবে নাচতে আরম্ভ করলেন। অনেক গভীর রাত পর্যন্ত সাশা নাচ ও সঙ্গীত মাতিয়ে রাখলো সবাইকে।

ইভালিনা ও অন্য বান্ধবীদের কাছে এদেশের পারিবারিক জীবনের কথা শুনেতাম। এদেশে এখনও একান্নবর্তী পরিবার। ইভালিনার সংসার স্বামী, শাশুড়ী, ননদ, দেবর ও একটি ছোট মেয়ে নিয়ে। ননদ-এর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা সে ভাবী স্বামীর সঙ্গে একা বেরোতে পারবে না, সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলে অর্থাৎ 'সাপারোন' থাকা চাই। এরা সবাই প্রায় ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী।

ব্রেজিল আয়তনে ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ ও এদেশের লোক সবাই প্রায় পর্তুগীজ ভাষাভাষী—যদিও ল্যাটিন আমেরিকার অন্য সব দেশের ভাষা হলো স্পেনীশ। বিরাট এই দেশ, বিচিত্র এর পরিবেশ। দেশের বেশির ভাগই শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য। বহু হাজার বছর ধরে এই মহাদেশ তার বহু দূর বিস্তৃত বনানী, পর্বতমালা নিয়ে সুদীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের ধারে যেন ঘুমিয়েছিল। ব্রেজিলের বেশির ভাগ শহর গড়ে উঠেছে সমুদ্রের ধারে ধারে। এদেশের অধিবাসীরা আফ্রিকীয় নিগ্রো, ভারতীয় ও ইউরোপীয় বহু জাতের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে, তবে পর্তুগীজ প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। ব্রেজিলের সঙ্গে ভারতের বিশেষ একটা যোগ আছে। একদা ভারত থেকে পর্তুগীজরা আম, জাম, কলা, কাঁঠাল এদেশে নিয়ে এসেছিল। আম এদেশে প্রায় সোনার মত মূল্যবান। এদেশে থাকাকালীন অনেক সময় চোখে পড়তো বহু দূর বিস্তৃত আখের চাষ আর ধারে ধারে চিনির কল তৈরী হয়েছে।

ব্রেজিলের আবহাওয়ায় ইওরোপ থেকে আমদানী গরু মোষ বাঁচতো না, তাই নাকি ভারতবর্ষ থেকেই এদেশে গরু মোষের আমদানি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার জল হাওয়াতে আমাদের দেশের গরু মোষের চেহারার বেশ উন্নতি হয়েছে। ভারতীয় গরুর এদেশে বিশেষ নাম হলো জেবু (zebu)। জেবুদের দেখে মনে গর্ব হতো।

ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা উল্টে গেলে, যে কালে ভাস্কো ডি গামো ভারতবর্ষে যাবার জলপথ আবিষ্কার করবার পর, পর্তুগীজ বণিকরা ছলে, বলে, কৌশলে কোচিন ও কালিকট বন্দর দিয়ে দক্ষিণ ভারত থেকে রেশমী কাপড়, মশলা, নানারকমের মূল্যবান পাথর ইত্যাদি বিদেশে নিয়ে যেতো, সেইকালে একদল পথভ্রান্ত বণিক (Pedro Alvares Gabriel) পেদ্রো অলভারেস গেব্রিয়েল-এর নেতৃত্বে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের উপকূলে এসে উপস্থিত হয়। তখন তারা ভারতবর্ষে [illegible] করেই এদেশের আদিবাসীদের 'ইণ্ডিয়ান' নাম দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্রই আদিবাসীরা

ইণ্ডিয়ান' নামেই পরিচিত। অনেক বছর ধরে রাষ্ট্রপোষা ইওরোপীয় জলদস্যুরা মেলা, মূল্যবান পাথর ও সোনার সন্ধানে বণিকের ছদ্মবেশে ব্রেজিলের উপকূলে হানা দিতে থাকে। অনেক বছর ধরেই আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রথম দিকে আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা তাদের স্বভাবসুলভ সারল্যের সঙ্গে এই দুর্দান্ত আগন্তুকদের আতিথ্য দিয়েছিল ও তার পরিবর্তে পেয়েছিল মিথ্যাচার, প্রতারণা ও ঘৃণ্য ব্যাধি। আদিবাসীদের রক্তে লাল হয়েছিল ব্রেজিলের মাটি। পর্তুগীজ ধর্মযাজকরাই প্রথম তাদের সদয় ব্যবহার দেন, তাঁরাই প্রথম এদেশে নিয়ে আসেন শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাস। অত্যাচারী পর্তুগীজ শাসকরা যা করতে না পেরেছিল তাই সম্ভব হলো ধর্মযাজকদের দ্বারা অর্থাৎ আদিবাসীদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হলো। কিন্তু এ কেবল সমুদ্র উপকূলের ধারে-কাছের অধিবাসীদের কথা। আজও ব্রেজিলের বহু অংশ অনাবিষ্কৃত। আমাজন নদীর ধারে ধারে গভীর অরণ্যের মধ্যে বাস করে আদিবাসীরা। তাদের বলা হয় 'আমাজনের হারানো জাতি' (Lost Tribes of the Amazon)। বিদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আদিবাসীদের সংখ্যা তিন শ' চার কোটির জায়গায় এখন আনুমানিক ৭০ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। একেই বলি Amazon Tragedy।

আমাজন নদীর ধারে গভীর জঙ্গলে বাস করে এক উপজাতির কথা শুনে আমার মহাভারতের প্রমীলা রাজ্যের কথা মনে পড়ল। এই উপজাতি সম্পূর্ণ নারী-শাসিত এবং তাদের দলনেত্রীর শাসন খুব কড়া। এরা মাঝে মাঝে অন্য উপজাতি থেকে পুরুষ ধরে এনে বন্দী করে রাখে, কয়েক বছর পর তাদের মেরে ফেলে বা বলি দিয়ে দেয়। এমনকি এদের পুরুষ
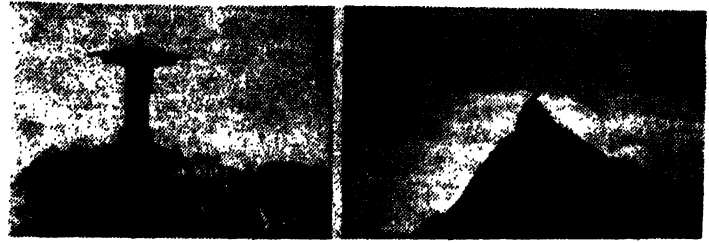
যীশুর মূর্তি (কোবকোভাদো)

কোবকোভাদো পাহাড়ের উপর যীশুর মূর্তি

শিশু জন্মালে তাকে মেরে ফেলে। এইসব উপজাতি সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা গেছে।

রিও-ডি-জেনেরিওতে থাকাকালীন এক সন্ধ্যেবেলা, একটি সমাজসেবক দুটি আদিবাসী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমার বান্ধবীর বাড়িতে এলো। তারা অসুস্থ, হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করানো দরকার। শুনলাম এরা Mbaya Guaikuru বা Indian Cavaliars জাতির লোক। ব্রেজিলের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল একদা এদেরই অধিকৃত ছিল। শত্রুপক্ষের ঘোড়া চুরি করে ক্রমে এরা ঘোড়ায় চড়তে শিখলো ও নিপুণ ঘোড়সওয়ার হলো। তখন ওদের সম্পত্তি ঘোড়ার সংখ্যা ছিল আট হাজারেরও বেশি। বহু বছর ওরা স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পেরেছিল ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে সন্ধি চুক্তি সই করলো পর্তুগীজদের সঙ্গে।

পরবর্তীকালে পর্তুগীজরা সন্ধির কোন চুক্তিই মেনে চলেনি। আজ সেই বিরাট উপজাতির সামান্য অংশই জীবিত আছে, তারা বাস করে মধ্য ব্রেজিলের Mato grasso অঞ্চলের গভীর অরণ্যের মধ্যে। এরা কৃষি করতে চায় না, প্রাচীর ঘেরা শহর চায় না, গতানুগতিক সংসার চায় না; এরা বনের ফল খেয়ে ও শিকার করে জীবনধারণ করে। ছেলে দুটির দুই গালে ও কপালে সুন্দর চিত্র আঁকা। এই শিল্পধারা নাকি এই জাতির বৈশিষ্ট্য। বেতের ও মাটির তৈরী জিনিসের উপর ওদের হাতের কাজ খুব সুন্দর। আমার বান্ধবী ও তার স্বামী এই উপজাতির মধ্যে কিছুকাল বাস করে তাদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন, তাই বিপদে পড়ে ওরা তাঁদেরই কাছে এসেছিল। বান্ধবী দুঃখ করে বললেন, এমন সুন্দর জাতটা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঁচবার ইচ্ছা যেন হারিয়ে ফেলেছে, এদের আজ Purpose of life নেই। প্রতি বছর নাকি সভ্য মানুষের উপহার হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, যক্ষ্মা ও যৌন-ব্যাধিতে হাজার হাজার আদিবাসীর মৃত্যু হয়। এছাড়া মিশ্র বিবাহের ফলেও আদিবাসী ইণ্ডিয়ানরা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে শুরু করেছে। একসময়ে শ্বেতাঙ্গরা আদিবাসীদের জমি জায়গা কেড়ে নিতে, প্রাণ নিতে দ্বিধা করেনি। আদিবাসীরা সেকথা ভোলেনি তাই Mato grasso অঞ্চল বা আমাজন নদীর ধারের জঙ্গলে শ্বেতাঙ্গদের যাওয়া মোটে নিরাপদ নয়।

ব্রেজিলের প্রাচীন মহিলা সঙ্ঘের সভা-নেত্রী তাঁর নিজস্ব ছোট প্লেনে করে এস্টারেলিনা (Esteralina) পল্লী অঞ্চলে নিয়ে গেলেন একদিন। সমুদ্র সৈকতের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি, নিচে অসংখ্য বালসা কাঠের ভিঙিতে জেলেরা মাছ ধরছে,

তীরের অনতিদূরে ছোট বড় নানা আকারের দ্বীপ। সে দ্বীপগুলির বেশির ভাগ ধনী ব্রেজিলিয়ানরা কিনে নিয়েছেন, তৈরী করেছেন তাঁদের প্রমোদ ভবন। দ্বীপ-গুলিতে জলের অভাব তাই মোটর বোটে করে কাছের শহর থেকে জল আনতে হয়। মেঘ করেছিল, আকাশে রামধনুর রঙীন সূর্য কিরণের ভেতর দিয়ে আমাদের ছোট্ট বিমান পার হলো, সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

আখ ক্ষেতের মাঝখানে খানিক জায়গা পরিষ্কার করা, তারই মাঝে আমরা এসে নামলাম। গ্রাম সেখান থেকে বেশি দূরে নয়। বিদেশী অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাতে গ্রামের মেয়ে পুরুষ পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে। দিনের আলোতেই রকেট ছোড়া, তুবড়ী জ্বালানো ও সংগে ব্যান্ড বাজনা, বন্দুক ছোঁড়া ও বোমা ফাটানো শুরু হলো। সমিতি গৃহে ওদেশের মেয়েদের হস্তশিল্প দেখলাম; দেখলাম কেমন করে তারা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিখছে। সেদিন সন্ধেবেলা 'Frivo' নাচ দেখলাম, তার সঙ্গে যে গান ও বাজনা হয় তাকে Carnival music বলা হয়। এই নাচে আফ্রিকান নাচের প্রভাব আছে। গ্রামের সব মেয়ে পুরুষ জমায়েৎ হলো, মালিক,

পাহাড় থেকে রিও

কর্মচারী, দাসদাসী সবাই একসঙ্গে নাচছে। এখানে ধনী দরিদ্রের কোন প্রভেদ নেই।

ব্রেজিলিয়ানদের মত এমন বন্ধুবৎসল অতিথিপরায়ণ জাত কম দেখা যায়। কোন মেয়ের গায়ে সুন্দর গহনা দেখলে প্রশংসা করবার উপায় নেই, কারণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা খুলে উপহার দেবেন। ওদেশের মানুষ প্রাণ খুলে হাসে, নাচে গান করে। ওদের সমাজে অনেকেই নাকি খেয়ে ও খাইয়ে ফতুর হয়। আমি যখন ব্রেজিলে যাই, তার অল্প দিন আগেই ওদেশে রাজনৈতিক ছোট একটি বিপ্লব হয়ে গেছে, কিন্তু এ নিয়ে কেউ বিশেষ চিন্তিত বলে মনে হলো না। এ যেন জীবনধারার একটি অঙ্গ। ব্রেজিলে জীবনযাত্রা বেশ ধীর তালে চলে, পাশ্চাত্ত্য দেশের মত ব্যস্ততা নেই, তাড়া নেই। সময় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এক ব্রেজিলিয়ান গৃহে নৈশ আহারের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। নিমন্ত্রণ ছিল সাড়ে আটটায়, রাত এগারোটা পর্যন্ত অতিথিরা এলেন, খাওয়া হলো মধ্য রাত্রিতে, রাত দুটোয় যখন বাড়ি ফিরলাম তখনও বাকি সকলে কাফির পেয়ালা হাতে গল্প করছেন।

পল্লী অঞ্চলে পথে যেতে যেতে চোখে পড়তো উন্মুক্ত প্রান্তর ও পাইন বনের ধারে মাঝে মাঝে অনেক ভাঙ্গাচোরা বাড়ি, দোকান, বাজার, মস্ত জনশূন্য গ্রাম, তার ভেতর দিয়ে পথ চলে গেছে। এগুলিকে Ghost Town বা ভৌতিক নগরী বলা হয়। বহু বছর আগে অনেক বিদেশী সোনার সন্ধানে এ দেশে এসেছিল। এ দেশে সোনা নদীর কূলে কূলে পাথরের মধ্যে পাওয়া যায়, খনিও খুব গভীর করবার দরকার হয় না। সোনা ফুরোতে সোনা সন্ধানীরাও দেশ ছেড়ে চলে গেছে, পড়ে আছে তাদের বাড়ি দোকান ও খনির ধ্বংসাবশেষ। জনমানবশূন্য অতীতের এই জনপদ দেখে মন কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যেত। এমনি ভুতুড়ে নগরী এ দেশে বহু জায়গায় ছড়ানো আছে।
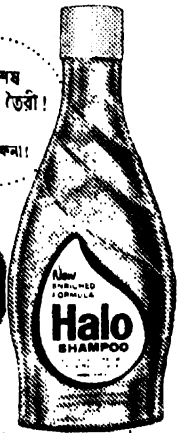
ব্রেজিলে নানা ধরনের সমাজ কল্যাণের কাজ দেখবার সুযোগ হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে দক্ষিণ ব্রেজিলের পারানা প্রদেশের রাজধানী কুরিটিবা থেকে কয়েক মাইল দূরে Begger's Home বা ভিখিরীদের আশ্রমটি। পাহাড়ের ধারে ধারে পাইন গাছে ঘেরা ছোট ছোট বাড়িতে আশ্রমবাসীরা থাকে। তারা বেতের কাজ করে, হাঁস মুরগী পালে, ক্ষেতে চাষ করে বিনিময়ে পারিশ্রমিক ও দু' বেলা খেতে পায়, বিছানা ও কাপড় পায়। আশ্রমে এখন দেড় 'শ জন পুরুষ আছে, পরে পরিবার নিয়ে ও মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা হবে। Pedroর সঙ্গে এইখানে আমার দেখা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে কুরিটিবার পথের ধারে সে ভিক্ষে করতো। এখন সে নিপুণতার সঙ্গে হাঁস মুরগীর দেখাশোনা করে। Pedroর ছেলে লেখাপড়া শিখে সাও পালোতে চাকরি করে। বুড়ো বাপকে সে কাছে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু Pedro রাজি নয়, বলে 'ভিখিরী ছিলাম, কাজ করবার সুযোগ পেয়ে কর্মী হয়েছি, আবার কর্মহীন জীবনে ফিরবো না।'

পৃথিবীর সেরা সুন্দরী নগরী হলো রিও-ডি-জেনেরিও। নামের মানে হলো জানুয়ারির নদী (River of January), অথচ Rio কোন নদীর ধারে নয়। শুনলাম জানুয়ারি মাসে প্রথম পর্তুগীজরা এ অঞ্চলে এসেছিল ও সমুদ্রের মোহনা বা Bay-কে তারা নদী বলে ভুল করেছিল। আতলান্তিকের বুকে অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে রিও, সমুদ্রের জলধারা রিও-কে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে রেখেছে। শহরের বিরাট রাজপথে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে অদূরে সমুদ্রের গা ঘেঁসে Sugarloaf পাহাড় একদিকে, অন্য দিকে Covcovado পাহাড়ের চূড়োয় চারতলা সমান উঁচু যীশুখৃষ্টের মর্মর মূর্তি Christ the Redeemer, ত্রাণকর্তা যীশু। যীশুর চোখে মুখে অপূর্ব শান্তি ও ক্ষমা। Covcovado পাহাড় থেকে রিও শহরটি ছবির মত সুন্দর দেখায়। Sugarloaf

রাজপথ—রিও। অদূরে Sugarloaf পাহাড়

ছাড়াও আরো নানা আকারের ছোট বড় পাহাড় ছড়ানো চারপাশে, নারকেল গাছের জঙ্গল ভিড় করে আছে সমতল ভূমিতে ও পাহাড়ের গায়ে। সব মিলিয়ে এত সুন্দর কোন নগরীকে মনে হয়নি। রাতের বেলায়, সমুদ্রের মোহনায় সব আলোগুলি জ্বলে উঠে রিও-কে আলোর মালা পরিয়ে দেয়।

রিওর চারপাশে ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার ছড়াছড়ি, অথচ এরই মধ্যে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অতি দরিদ্র বস্তি, সে অঞ্চলের নাম হলো Favela। সেখানে না আছে বৈদ্যুতিক আলো, না জল সরবরাহ, ওখানে পথই নর্দমা আবার নর্দমাই পথ। বেশির ভাগ অধিবাসী নিগ্রো। দক্ষিণ আমেরিকার অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে কেমন করে যে টিনের ঘরগুলো পাহাড়ের বুকে আঁকড়ে নিজেদের রক্ষা করে সেটাই আশ্চর্য। শুধু আশ্চর্য হইনি দেখে যে এদের ও আমাদের বস্তীর চেহারা এক, কারণ পৃথিবীর সব দারিদ্র্যের রূপ এক, সব ক্ষুধার্তের গান এক সুরে গাওয়া। এই দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে অদূরে Sugarloaf পাহাড়, নারকেল গাছের জঙ্গল, আরও দূরে দিকচক্রবালে নীল আকাশ মিলেছে আতলান্তিকের জলে আর অন্য পাশে নূতন "আকাশ সন্ধানী" ছবির মত সুন্দর দেখায়। Sugarloaf নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই চিরন্তন বৈষম্য উঁচু নিচু, ধনী দরিদ্র, সাদা কালো।

মিঞা তানসেন

বিগত সংখ্যা (২৭শে ফেব্রুঃ শনিবার) আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকমলেন্দ্র ভট্টাচার্য সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত ও দেশ পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত একটি পত্রের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর শ্রীযুক্ত দিলীপ মুখার্জির লিখিত মিঞা তানসেনের জীবন, তাঁহার একটি প্রণয় কাহিনী ও তানসেনের একজন বংশধররূপে ওস্তাদ তাজ খাঁর বর্ণনার প্রসঙ্গে অনুকূল মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কমলেন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরের এই অনুমোদনের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন বিশেষত তাজ খাঁর সম্বন্ধে; কেননা তাজ খাঁ যে তানসেনের বংশধর তাহা তিনি কোন পুস্তকে উল্লিখিত দেখেন নাই। এ বিষয়ে "আমরা বীরেন্দ্রকিশোরের মতামত জানিতে পারিলাম। তিনি বাংলায় তথা ভারতবর্ষে সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে তানসেনের ঐতিহ্যের এক প্রধান ধারক ও বাহক। তাঁহার লিখিত—"হিন্দুস্থানি সঙ্গীতে তানসেনের স্থান" এই বাংলা বইটি বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পুস্তক। তিনিই বংশের তানসেনের বংশধর সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুস্তকে তানসেনের বংশধারায় তাজ খাঁর কোন নাম নাই। শ্রীযুক্ত কমলেন্দ্রবাবুর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত পত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ বলিলেন :

"তানসেনের যথার্থই সামাজিক বিধানে বিবাহিতা পত্নী গোয়ালিয়রের হুসেনী ব্রাহ্মণীর দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সুরথ সেনের বংশ লোপ পায়। কনিষ্ঠ বিলাস খাঁর বংশধরগণ ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী রবাবীরূপে দিল্লীর দরবারে বহু শতাব্দী ধরিয়া সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সামাজিক বিধানে ও দরবারী আসনে তাঁহারাই তানসেনের পুত্র বংশীয় গুণী।

দিল্লীর দরবার ভাঙ্গিয়া গেলে ইঁহারা লক্ষ্ণৌ বারাণসীর দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। ইঁহাদের বিশদ বিবরণ রামপুর দরবারে বারাণসীতে ও কলিকাতা ঠাকুর রাজ দরবারে রক্ষিত হইয়াছে।

আমার পুস্তকে এই বংশের কথাই লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও রাজা নবাব আলী (লক্ষ্ণৌ) প্রভৃতি প্রামাণিক পুরুষগণ তানসেনের বংশ প্রসঙ্গে ইঁহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বিলাস খাঁর ভগিনী সরস্বতী হুসেনীরই গর্ভজাতা ছিলেন। তাঁহার সহিত বীনকার মিশ্রি সিংহের বিবাহ হয় এবং

সেই বিবাহের ফলে যে বংশধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই দিল্লীর ও অন্যান্য দরবারে তানসেনের দৌহিত্র ও বংশীয় বীণকার বলিয়া পরিচিত। আমি বিলাস খাঁর সরস্বতীর বংশধরদের সম্বন্ধে একই প্রামাণিক স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি; কিন্তু তানসেনের অসামাজিক অথবা গুপ্ত বিবাহের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তিনি বৃন্দাবনের কোন গোপিনীর সহিত গুপ্তভাবে পরিণয় স্থাপন করেন। অন্তরঙ্গ খাঁর জন্ম এই পরিবারের ফল স্বরূপ। পশ্চিম ভারতে জয়পুর গোয়ালিয়র প্রভৃতি দরবারে সেনী গুণীগণ এই বংশের রত্ন স্বরূপ ছিলেন। বিলাস খাঁ ও সরস্বতী বংশধরদের পরেই ইঁহাদের সম্মানিত স্থান ছিল। এই বংশের নানা শাখা প্রশাখা বিদ্যমান। তাজ খাঁ যে তানসেনের এই বংশের গায়ক এই বিষয়ে আমি কতকগুলি বিশিষ্ট প্রমাণ সম্প্রতি পাইয়াছি। প্রসিদ্ধ দেশ সেবক ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি তাঁহার লিখিত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা কিশোরীলাল মুখার্জি ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে বিখ্যাত ধ্রুপদী মোরাদ আলী খাঁ সাহেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। তিনি কিশোরীবাবুকে বলিয়াছিলেন যে তাজ খাঁ দরবারে প্রবেশ করিলে তিনি ও অন্যান্য ওস্তাদগণ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন; তাহার কারণ তাজ খাঁ তানসেনের একজন বংশধর যদিও তিনি বিলাস খাঁর বংশীয় নন। সর্বশেষে আমি সংগীতাচার্য শ্রী টি-এল-রাণার নিকট নেপাল দরবারের বিশদ বর্ণনা লাভ করিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন যে তাজ খাঁ শেষ জীবনে যখন নেপালের বীর সমশের জঙ্গ রাণার

...সংগীত সভায় নিযুক্ত হন তখন তাহাকে নেপাল রাজ্যে তানসেনের একজন বংশধর বলিয়া সম্মানিত করা হইত।"

আশা করি শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরের এই উক্তিতে শ্রীকমলেন্দ্রবাবুর প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাইবে।

হিতেন্দ্রকুমার রায়
কলিকাতা-৩১

প্রগতির পথে প্রথম যাঁরা

সাপ্তাহিক 'দেশ' গত ৭ই ফাল্গুন সংখ্যায় "ঘরে বাইরে" প্রবন্ধে উপরোক্ত শিরোনামায় লেখিকা বঙ্গ-উৎকলের দুই জন মহীয়সী মহিলার বিস্মৃতপ্রায় কার্য-কলাপের পুনরুজ্জীবন করেছেন। লেখিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ দেশে মহিলাদের প্রগতিপথে তাঁদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদক্ষেপের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। দীর্ঘকালব্যাপী সাংবাদিক জীবনে কটকে বসবাসকালে আমি এই প্রখ্যাতা ভগিনীদ্বয়ের নিকট-সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। স্বর্গতা শৈল-বালা দাস এবং সুধাংশুবালা হাজরার কর্মময় জীবনের অনেক তথ্য আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। কিছুকাল

স্ত্রীলোকের সঙ্গে ট্রেনে যেতে হবে তা নয়, তাদের এই 'নেটিভ' মহিলার চাকরদের সঙ্গেও ট্র্যাভেল করতে হবে, কেননা "ওরা এই ভারত সরকারেরই 'চাকর'! তাদের উদ্ধত আচরণের জন্য সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।"

("I told him I was insulted by the Europeans and so I wanted to teach them a lesson. They would not only have to travel with a native woman but a native woman's servants, as they are servants of India."—শৈলবালার ইংরেজীতে লিখিত আত্মজীবনী থেকে।) বলাবাহুল্য এ দুজন ইংরাজ কটকের উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। স্বাধীনতার বহু পূর্বে, তিরাত্তর বছর আগেকার এ ঘটনা। এক তেজস্বিনী বাঙালী মহিলার এরকম সাহস স্মরণ রাখার যোগ্য।

স্বর্গতা শৈলবালা দাস তাঁর দীর্ঘ ৯৬ বৎসর ব্যাপী জীবনে এর চেয়েও অনেক বেশী অনমনীয় সাহস, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সংগ্রামী মননশক্তির পরিচয় দেখিয়ে বহুবিধ আশ্চর্য কর্ম-সাফল্যে ভারতীয় নারী প্রগতি পথে অশেষ অবদান রেখে গেছেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম রমণীর জাতীয় পরিচ্ছদ "শাড়ি" পরিহিতা হয়ে বিলাতে ভারত সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর (১৯০৭ ইং) কোর্টে অর্থাৎ রাজ দরবারে সসম্মানে উপস্থিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন; তিনি পাটনায় সর্বপ্রথম ভারতীয় মহিলা অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হয়ে নিজের দক্ষতা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করে সরকার থেকে "প্রথম শ্রেণীর" বিচার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন; উক্তপদে অধিষ্ঠিতা থাকাকালে তিনি মোটর ভেহি-কেলস্ অ্যাক্টের ধারানুযায়ী মোটরগাড়ি চালনার সময় আলো ঠিকমত না জ্বালার অপরাধে পাটনা হাইকোর্টের ইংরাজ প্রধান বিচারপতিকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত (সামান্য পরিমাণে) করার দুঃসাহস দেখিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন (১৯২৬ ইং)। নারীজাতির উন্নয়নকল্পে তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রতিভা পাটনা ও ওড়িশার কটকের বাইরে অদ্যাবধি বিশেষ প্রকাশিত হয়নি। ওড়িশায় নারীর উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনে প্রথমে পিতা উৎকল-কেশরী মধুসূদন দাসের সাহচর্যে এবং পরে স্বকীয় প্রচেষ্টায় শৈল-বালা পথিকৃতের কাজ করে গেছেন। এই রাজ্যের প্রথম মহিলা কলেজ তাঁরই কীর্তি। পরে তাঁরই উদ্যোগে মধুসূদনের বাসভবনে ঐ কলেজ স্থানান্তরিত হয়ে তাঁর নামানুসারে "শৈলবালা উইমেনস কলেজ" সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। তাঁর প্রিয়তমা ভগিনী সুধাংশুবালার আইনজীবি হওয়ার দিকে ভারত সরকার ও ব্যবস্থাপক সভার প্রভাবশালী সদস্যদের সঙ্গে, এমনকি এসেমব্লির তদানীন্তন ইংরাজ প্রেসিডেন্ট

স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইট এবং স্বরাষ্ট্র সদস্য (হোম মেম্বর) স্যার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট প্রমুখ ধুরন্ধর রাষ্ট্র নায়কদের সঙ্গে মুখোমুখি তদ্বির করে ইণ্ডিয়ান লিগেল প্র্যাকটিসনারস অ্যাক্ট সংশোধন করিয়ে ভারতীয় আইন-পরীক্ষোত্তীর্ণা ভারতীয় নারীকে ওকালতী করার অনমনীয় সংগ্রামে জয়লাভ করার মূলে ছিল শৈলবালার আশ্চর্য শক্তিমত্তা ও সাহস। অবশ্য, বিচক্ষণ আইনজ্ঞ পিতা মধুসূদনের সহায়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে লেখিকা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেননি যে শ্রীমতী সুধাংশু হাজরা লিগেল প্র্যাকটিসনারস অ্যাক্ট সংশোধনের ফলে ১৯২৩ ইং সনে ১২ই ডিসেম্বরে পাটনা হাইকোর্টে যে প্রথম ওকালতী আরম্ভ করেছিলেন, সে হিসাবে তিনি ভারতবর্ষের "প্রথম মহিলা এডভোকেট বা উকীল" হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। কর্ণেলিয়া সোরাবজী ভারতের প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি উক্ত আইন সংশোধনের পরেই আরও এক বৎসর পরে কলকাতা হাইকোর্টে রীতিমত প্র্যাকটিস করার অনুমতি পেয়েছিলেন। সুধাংশুবালার অসাধারণ কৃতিত্বের সংবাদ তখনকার কলিকাতাস্থ, পাটনার ও পুণার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে এবং সাময়িকী পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

শচীন দত্ত
কলিকাতা-৬০

অগ্রজ বিজ্ঞানী

গত ২৮শে ফাল্গুন ১৩৭৭ (সংখ্যা ১৯) তারিখের 'দেশ' এ 'বিশ্ববিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধ 'অগ্রজ বিজ্ঞানী' পর্যায়ের সর্বপ্রথম আলোচনার প্রণম্য সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুকে উপস্থাপিত করার জন্য লেখক শ্রীসমরজিৎ কর এবং আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে অধ্যাপক বসুর সংস্পর্শে আসার সামান্য সুযোগ হয়েছিল। তাই আলোচনার মাধ্যমে দু একটি কথা নিবেদন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

প্রথমত অধ্যাপক বসুর সুযোগ্য ছাত্র ও উত্তরসূরী এবং স্বনামধন্য সমাজ-বিজ্ঞানী ডঃ সুরজিৎ সিংহ মহাশয়ের মন্তব্য পেশ করে প্রবন্ধকার বিশেষ মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে অধ্যাপক বসুর বর্ণাঢ্য ঘটনা বহুল জীবন, ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক অবদান সামান্য কয়েক পাতায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, অপরপক্ষে তাঁর বক্তৃতামালা সমাজের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অমূল্য সম্পদ। অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে—ইংরাজী বা বাংলায় তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন এমন প্রাঞ্জল, সারগর্ভ ও মনোহারী বিজ্ঞান ভিত্তিক বক্তৃতা বোধ হয় খুব কম পণ্ডিতের মুখে শোনা যায়। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৫ খৃঃ মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ী অঞ্চলে একটি আদিবাসী (কোড়া) সমাবেশের বক্তৃতার বিন্যাস আজও ভুলতে পারিনি। এইরকম অসংখ্য ঘটনা ভীড় করে আসবে যদি তাঁর অগণিত ছাত্র স্মৃতি রোমন্থন করেন।

দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের জাতি (Caste system) প্রথার ওপর অধ্যাপক বসুর মতন পণ্ডিত বিরল। তাঁর বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করা অসম্ভব। তবে সেনসাসে জাতি-বর্ণের বিবরণ তুলে দিয়ে বা শিল্পোন্নতির সুবাদে আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথার বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এর প্রমাণ সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান। সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও ব্যক্তি বিশেষের জাতি আমাদের দেশে যোগ্যতার একটি বিশেষ মান—যদিও সোচ্চার নয়, কিন্তু কার্যত ফলপ্রসূ।

বিবাহের ব্যাপারে যদিও কিছু কিছু অসবর্ণ যোগাযোগ চলছে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে অধিকাংশ মেলামেশার ক্ষেত্রেই এই শিথিলতা সীমাবদ্ধ। গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তি হলেও ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে সংকোচ বোধ করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষ্টি যেগুলি নাকি যথাযথভাবে মানের মাপকাঠি হওয়া

উচিত বেগণ্য খুবই অবহেলিত হয়। অবশ্য সর্বোপরি যে 'জাত' সম্মানিত হয় সেটি হল টাকার জাত। অর্থপ্রাবল্য থাকলে তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা, বাধ-নিষেধ কিছুই প্রযোজ্য হয় না। শিক্ষিত সমাজে, উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যেও জাতের বড়াই—সময় সুযোগমত করার অভ্যাস দেখেছি।

অধ্যাপক বসুর মন্তব্য যে বংশগত পেশায় পরিবর্তন হয়েছে সেটি মূলত অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও শ্রেণী প্রাধান্য প্রকট। যারা নাকি পূর্বেও জাতির বিচারে প্রথম পঙ্‌ক্তি বিবেচিত হয়নি আজও তাদেরকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে।

আমাদের সমাজব্যবস্থা সামগ্রিক উন্নতির প্রতিবন্ধক হিসাবেই বেশী কার্যকরী—আজও দেশের বেশীর ভাগ অসামঞ্জস্যের মূলেও সেই সমাজব্যবস্থা। অধ্যাপক বসুর অবদান ও পরবর্তীকালীন গবেষণা অবশ্যই আমাদের আলোর সন্ধান দেবে।

শক্তি গড়াই
আসানসোল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নয়া অর্থনৈতিক নীতি

পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সরকার ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করবেন। আমাদের দেশে বিশ বছর ধরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী হলেও আয় ও সম্পদের বৈষম্য খুবেই বেশি। মনোপলি কমিশনের ভাষায়—"The dangers from concentrated economic power and monopolistic and restrictive practices are not imaginary but do exist in a large measure either at present or potentially". মনোপলি কমিশনের সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৬৫ সালে ৪০০টির মধ্যে ৬৫টি জিনিসের উৎপাদনে অর্থনৈতিক শক্তি খুবই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং তিনজন প্রধান উৎপাদক মোট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন। ভারত সরকার ১৯৬৮ সালে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ আইন (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) প্রণয়ন করেন। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে, ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈষম্য ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অবশ্য কোন কোন উন্নতিকামী দেশে হয়ত এই বৈষম্য আরও বেশি. কিন্তু. ভারতে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শুরু থেকেই অর্থনৈতিক শক্তির সম-বণ্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এ বিষয়ে সাফল্যের সঙ্গে কোন নীতি অনুসৃত হয়নি। অর্থনৈতিক শক্তি যে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রীভূত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন যে বেশিদূর সম্ভব হয়নি এবং দেশের বিরাট জনসমষ্টির অধিকাংশই যে সাধারণ জীবনযাত্রার সুযোগ সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারছে না, একথা অবিদিত নয়। প্রধানমন্ত্রী ভালভাবেই একথা জানেন এবং সেজন্যই তিনি গরীবের দুঃখ দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর দলের জন্য ভোট সংগ্রহ করেছেন। ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্য মূলত আয়-বণ্টনের ত্রুটিপূর্ণ নীতির বিকাশ। আয় ও সম্পদের ন্যায়-সংগত বণ্টনের জন্য কর ব্যবস্থার পরিবর্তন নিশ্চয়ই প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর দল এখন লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনের অধিকারী। কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং কালো টাকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তিনি সহজেই পার্লামেণ্টে অনুমোদিত করিয়ে নিতে পারবেন। কর ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু আলোচনা

হয়েছে। তবে আয় ও সম্পদের সমবণ্টনের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হয় তবে সম্পদ কর, দান কর ও সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে কর-বহির্ভূত সর্বনিম্ন সীমা আরও কমিয়ে দিতে হবে, আয়কর ও মূলধন-মুনাফা কর আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে যাতে কেউ কর ফাঁকি দিতে না পারেন এবং গরীব জনসাধারণের উপর কর-ভার আরও হ্রাস করতে হবে। সমাজবাদীর ব্যাপক ব্যবস্থা করে পরিবর্ধিত জাতীয় আয়ের একটি অংশ সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যয় করতে হবে। এই কাজগুলি করা শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এখন খুবই সহজ। পার্লামেণ্টে তিনি এখন একাধিপত্য বিস্তার করতে পারছেন, এবং অগণিত দেশবাসীর সমর্থন ও আস্থা তিনি লাভ করেছেন। এখন সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই তাঁর কাছে অনেক কিছু আশা করবেন। যদি তিনি সেই আশা পূরণ না করতে পারেন, তবে তা হবে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। কিন্তু যদি তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেন, তবে সামাজিক ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে দেশ এক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং তাঁর সমাজতান্ত্রিক নীতির সাফল্য সূচিত হবে।

শ্রীমতী গান্ধী বেকার সমস্যা সমাধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটি Crash Programme গৃহীত হয়েছে এবং এজন্য এপ্রিল মাসে প্রাথমিকভাবে ৫০ কোটি টাকা খরচ করার একটি কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বেকার সমস্যা মোকাবিলার জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে আরও সাহসিক হতে হবে। বিনিয়োগ নীতির পুনর্মূল্যায়ন করে কিভাবে আরও বেশি করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। বিগত পাঁচ বছর শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল বেকার সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারা; অবশ্য বেকার সমস্যার এমন বহু কারণ আছে যেগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূর করা সম্ভব নয়। শ্রীমতী গান্ধী যে এই সমস্যার তীব্রতা কমাবার চেষ্টা করেননি তাও নয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে দেশ জুড়ে যে বেকার সমস্যার ভয়াবহ রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই সমস্যা অশান্তি, বিশৃংখলা, হতাশা ও নৈরাশ্যের যে আবর্ত পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি করেছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যথেষ্ট দায়ী এবং শ্রীমতী গান্ধী এক্ষেত্রে সফল হননি। হয়ত এজন্যই শ্রীমতী গান্ধী এখন বেকার সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর অর্থ-

নৈতিক নীতি তৈরি করছেন। পশ্চিমবঙ্গে এখন বেকার সমস্যার তীব্রতা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের বহু প্রকল্প ঘোষিত হলেও কার্যকরী হয়নি। এগুলি নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকরী হলে হয়ত আজ পশ্চিমবঙ্গের এত দুর্দশা হত না। এ বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে আরও ভালভাবে ভাবতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির সমাধানে তিনি যদি এখন এগিয়ে না আসেন, তবে এই রাজ্যের অশান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা তো দূর করা যাবেই না, বরং কলকাতা শহরের সমস্যাগুলি আরও তীব্রতর হতে থাকলে পরিণামে জাতীয় অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

শ্রীমতী গান্ধীর তৃতীয় ঘোষণা হল মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্পর্কে। এ বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই। কৃষি-উৎপাদনের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, খাদ্য-সংকটের তীব্রতাও কমেছে। অথচ সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর দাম ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও কিছুটা উন্নত হয়েছে। অথচ মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। এই সমস্যার আংশিক সমাধান করার জন্য গত জানুয়ারী মাসে ব্যাংক রেট শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে ছয় ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল; কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন বিশেষ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে হলে সর্বাগ্রে কালো টাকার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানো দরকার। এজন্য শ্রীমতী গান্ধীকে সাহসিক কর্মসূচী গ্রহণ করে যত শীঘ্র সম্ভব তা কার্যকরী করতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন কর ব্যবস্থার পরিবর্তন, উৎপাদন বাড়াবার সর্বাত্মক প্রয়াস এবং রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন। উৎপাদন-খরচ যাতে কমে সেদিকে যেমন দৃষ্টি দেওয়া দরকার, তেমনি বেসরকারী ক্ষেত্রে অনুৎপাদনমূলক বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রতিহত করা দরকার।

সুব্রত গুপ্ত

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্র দর্শন। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায়, নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন: মূল্য ১৫ টাকা।

কবিকর্ম ও দর্শনবিদ্যা এ দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? কবি ও দার্শনিকের অন্বিষ্ট বস্তু কি সমজাতীয়? উভয়ের চিন্তা, মনন, অভিজ্ঞতা কি সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত? এ জাতীয় প্রশ্নে আমরা মাঝে মাঝে বিচলিত হই। বোধ করি এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহী হয়েছে। ভূমিকায় শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য সে কথা বলেছেন। শচীনবাবুও গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কিনা সে বিচারে অগ্রসর হয়েছেন।

শচীনবাবু রবীন্দ্র-ভাবনায় দর্শন চিন্তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে দার্শনিক সে কথা ন্যায়শাস্ত্র আশ্রয় করেও বলা যায়। আবার ভারতীয় মনীষায় ত্রয়ী এবং আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে রবীন্দ্রমানস কোন পথ বেছে নিয়েছিল সে প্রসঙ্গও তিনি তুলেছেন। ত্রয়ীর পথ উপলব্ধি-অনুভূতির; অন্বীক্ষিকীর বুদ্ধি জ্ঞানের। রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার কথা ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দর্শনের পরিভাষা ব্যবহার করে এবং দর্শনের সমগ্র দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম আলোচনা চোখে পড়েনি। শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তার সাহায্যে রবীন্দ্র দর্শনের সারসংকলনে ব্রতী হয়েছেন। বিষয়টি দুরূহ এবং অভিনব। কালিদাসবাবু বলেছেন, 'দার্শনিক বলতে আমরা তাঁকেই বুঝি যিনি অপ্রাকৃত এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী আংশিক অথবা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তার নৈতিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের যা-কিছু মূলসূত্র সবগুলিই সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের দার্শনিক।' শচীনবাবু একে বিস্তৃত করেছেন। তিনিও রবীন্দ্র-দর্শনের মূলে লক্ষ্য করেছেন নাস্তিত্ব বা মৃত্যু এবং মানবকেন্দ্রিকতা। তবে সাধারণভাবে এ দুটি বিষয়ে আমরা যা ভাবি রবীন্দ্র দর্শনে তাদের যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে সে কথা প্রথম প্রবন্ধে বিস্তৃত হয়েছে এবং তা সংক্ষেপভাবে আলোচিত।' আমি আছি'র রহস্যই রবীন্দ্র দর্শনের পটভূমি। একেই বলা হয়েছে সত্তাদর্শন। রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্মের বিভিন্ন স্থানের সুনির্বাচিত উদ্ধারে সত্তাদর্শন ব্যাপারটি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পবিত্রবাবু প্রথম প্রবন্ধের বক্তব্য মেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রেয়োদর্শন বলতে কি

বোঝায় সে বিষয়ে মনোযোগী হয়েছেন। প্রেয় চৈতন্য সত্তা চৈতন্যেরই প্রকাশক। এই চৈতন্যের স্বরূপ আবিষ্কারে পবিত্রবাবু প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের চিন্তার বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষত হেগেল, কাণ্ট, ক্রোচে ইত্যাদির মতবাদের সম্পর্কে

রবীন্দ্র দর্শনের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন। ক্রোচের উপলব্ধি ও প্রকাশ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচিত ব্যাপার নিয়ে শ্রীরায় যে দক্ষ গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। যদিও আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত (আর একটু বিস্তৃত হলে ভাল হত) তথাপি একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে শ্রীরায়ের উদ্যম সুধীজনের সাধুবাদ পাবে। ভাল লাগল দেখে যে শ্রীরায় পঞ্চভূত গ্রন্থটির যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের সমাজ দর্শন। লেখক রবীন্দ্র রচনাবলীর অংশ নির্বাচন করে এই সমাজদর্শনের কথা বলেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোন মন্তব্য করেননি। তিনি নির্বাচিত অংশগুলির সূত্রসন্ধান করেছেন। তাঁর এই সূত্রগুলি একত্র করলে সমাজদর্শনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের পূর্ণ রূপটির সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাখার উচ্চতর গবেষণা বিভাগের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। এখন কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র দর্শন পাঠ্যতালিকাভুক্ত। সেদিক থেকে এই ধরনের অ্যাকাডেমিক আলোচনা প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কয়েকজনের লেখায় অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক আনুগত্য মাঝে মাঝে আলোচনার গতিকে কিছুটা ব্যাহত করে। তা ছাড়া তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্যের দ্বারাও কতকটা অভিভূত বলে মনে হল। পবিত্রবাবুর আলোচনা সেদিক থেকে আরও স্বচ্ছ। তবে একথা সকলেই মানবেন যে যেহেতু আলোচ্য গবেষকবৃন্দ এমন একটা বিষয়ে নিযুক্ত রয়েছেন যার আদর্শ বাংলা ভাষায় প্রায় অনুপস্থিত, সেই হেতু এঁদের ভূমিকা আদিকর্মিকের। আমরা আশা করব এই আলোচনা ভবিষ্যৎ গবেষকদের অনুপ্রাণিত করবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

সেই মন সেই দাহ। রাজ চক্রবর্তী। সুজনী প্রেস : ৬৭০ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য ১২·০০।

কার অবিচার?। শ্রীঅজিতকুমার দে। টিচার্স বুক হাউস : জটেশ্বর, জলপাইগুড়ি। মূল্য ৩·০০।

স্মৃতিসার সংগ্রহ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সং। চৈতন্য চতুষ্পাঠী, পানতলা রোড, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। মূল্য ৫·০০।

দ্বিতীয় পৃথিবী সন্ধানে। হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। মুক্তপত্র প্রকাশনী : বি-৪৮ রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮। মূল্য ৪·৫০।

রক্ত আঁখি কোড ক্যাকটাস। করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য। মণি প্রকাশনী : ৩৯বি ডেণ্ট মিশন রোড, কলিকাতা-২৩। মূল্য ২.০০।

বিপ্লবী মহানায়ক এম এন রায়। শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায়। এন কে ব্যানার্জি : ২ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৫.০০।

চতুর্ভঙ্গী (১ম খণ্ড)। শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান : ৩৮ গিরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৮.০০।

পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তারা চারজন। কল্যাণ সেন। রুমা ঘোষদস্তিদার : ১০৯ গান্ধী কলোনী, কলিকাতা-৪০। মূল্য ৪.০০।

হৃদয় ট্রেন বেজে ওঠে। যোগেন চৌধুরী। কবর : ১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১.০০।

মহাত্মা ও মানবতাবাদ। কেশবলাল ঘোষ। কল্লোলশংকর ঘোষ: ৪৪।৩৬ বি পি রোড, কলিকাতা-৫০। মূল্য ৬.০০।

বাঙলার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নব ভারত পাবলিশার্স : ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য প্রতি খণ্ড ১২.৫০।

বিদূষী বাক্। মনীশ ঘটক। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০।

দূরন্ত-দর্শী। সুধাংশু গুপ্ত। সুনীতি গুপ্ত : ১১৬/১সি, বি-এন রোড, কলিকাতা-১০। মূল্য ৩.০০।

গল্প বিচিত্রা। ইন্দুবিকাশ দত্ত। গোকুলবিহারী সামন্ত : সাগরপুর সার আশুতোষ সর্বার্থসাধক বিদ্যানিকেতন, সাগরপুর, মেদিনীপুর। মূল্য ৫.০০।

Footprints of Liberty (Speeches and Writings of Tulsi Chandra Goswami). Tulsi-Beena Trust : Rajbati, Serampore. Price Rs. 28.00.

Effectiveness of Socialist Production. Y. Shiryaev. Novosti Press Agency Publishing House, Moscow.

Soviet Jews: Fact and Fiction. Novosti Press Agency Publishing House: Moscow.

Russia and The Revolution: Viktor Mushtukov, Vadim Kruchina-Bogdanov. Novosti Press Agency Publishing House: Moscow.

Our Sons and Daughters. (Collection of Articles on Pedagogy). Chief Editor: Viktor Kolbanovsky. Novosti Press Agency Publishing House: Moscow.

অভিনব গোয়েন্দা উপন্যাস সিরিজ

বাংলা সাহিত্যে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা নায়ক

শিহরণ সেনের রোমাঞ্চকর কাহিনী

শিহরণ সিরিজ

প্রতিটি ২·০০ । বার্ষিক ১০·০০

গ্রাহক হোন। এজেন্সীর জন্য লিখুন

সাহিত্য সংঘ
৭৩ স্বামীজী সরণী । কলিকাতা-৪৮

(সি ১৩৫৬)

রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য-বিষয়ে
একমাত্র বই

সত্য গুহ-র

একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল

১৫·০০

৫০০ লেখক-লেখিকার আলোচনা
৪০০০ বইয়ের তালিকা

অধুনা
১৭/১-ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ১২

(সি ১৩২২)

মৃণাল চট্টোঃ — অমিয়ধন মুখোঃ
সম্পাদিত
বাঙলা দেশকে

'রক্ততিলক'

[লভ্যাংশ বাঙলা দেশের সাহায্যার্থে দেওয়া হবে ।

সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গের গণ-আন্দোলন ও মুজিবরের ভূমিকায় দুই বাঙলার ১০০ জন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কবিতায় সুশোভিত হয়ে এপ্রিলেই প্রকাশিত হচ্ছে। আনুমানিক মূল্য ৬ টাকা ডাকযোগে ৮ টাকা। অন্ততঃ ৫ কপি নিলে ২৫% কমিশন। ১৫, টাকা জমায় ভি পি করা হবে। অর্ডার বুক করুন।

* 'কুমুদ-নারায়ণ' মূল্যায়ন সংখ্যা ২, টাকা
* প্রগতি'র নব-বর্ষ' সংখ্যার প্রস্তুতি চলছে ২, টাকা
* 'বিশ শতকের বাংলা কবিতা' নিঃশেষিত-প্রায় ৫, টাকা
* করুণারঞ্জন ভট্টাচার্যের ৫ম কাব্যগ্রন্থ 'রক্ত আঁখি স্কোভ ক্যাকটাস' ২, টাকা

মণি প্রকাশনী
নব-নিকেতন, ৩১/বি, ডেটমিশন রোড
কলকাতা-২৩

(সি ১১৪১)

প্রাসাদ থেকে হারেম

নিগূঢ়ানন্দ ৭·০০

দিল্লী প্রাসাদপুটে পাথরে গাঁথা রাজভবনের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে অত্যাচারী খিলজী বাদশার লালসা কামনা মত্ততায় বন্দিনী বালার বিয়োগ-বিধুর বেদনার কাহিনী ॥

প্রেম-প্রবঞ্চনা পতনের অসামান্য কাহিনী।

সেই মন সেই দাহ

১২·০০

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

রাজচক্রবর্তী

লাস্ট অপারেশন

লেখকের উচ্চপ্রশংসিত রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস ২য় সংস্করণ পাঁচ টাকা।

বিষ্ণু গুপ্ত কৌটিল্য ১০·০০ — **লাল সেলাম**

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫·০০ — **আলোছায়া জানালায়**

মডেল পাবলিশিং — কলিকাতা ১২

(সি ১৪২৩)

আটাত্তর দিন পরে

সমরেশ বসু ॥ তিন টাকা

বাঘ্দা ৬, পাতক ৪, সুবর্ণা ৩,

কুমারী রানী এলিজাবেথ

সুকন্যা ॥ সাত টাকা

পৃথিবী যাহার নাম ১০, বৈশাখী বসন্ত ৬, ক্লিওপেট্রা ৬,

অন্য নাম জীবন রাঙ্গিনী দুহিনা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ ৫, মানস গুহ ॥ ১০,

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

রূপরাখা ৫, তিমির লগন ৪·৫০, এতটুকু আশা ৩,

এসো মৌসুম অঙ্গীকার ক্ষত ব্যথা

প্রফুল্ল রায় ॥ ৬, সম্রাট সেন ॥ ৬, তরুণ ভাদুড়ী ॥ ৩,

পথের তীর্থ সারদানা বিদ্ধ বিহঙ্গী

বীরেন্দ্র সরকার ॥ ৭, অমরেন্দ্র দাস ॥ ১৬, কণিষ্ক ॥ ৭,

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কালজয়ী জীবনী গ্রন্থ

শঙ্করনাথ রায়

ভারতের সাধক

১ম খণ্ড হইতে দশম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

করুণা প্রকাশনী ॥ ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

দেশের অস্বাভাবিক অবস্থা, বিশেষ করে বাংলা দেশ-এর উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নির্মম অত্যাচার এবং পাইকারী গণ-হত্যায় মানুষের মন খেলাধূলো থেকে বেশ-দূরে সরে গিয়েছে। ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলাই বলুন, নাগোয়ার বিশ্ব টেবল টেনিসের আসরের কথাই বলুন, আর ভারত-সিংহল বা পাক-ভারত ডেভিস কাপের কথাই বলুন—কোনো খেলাধূলোর খবরেই যেন মানুষের আর আগ্রহ নেই। তবু খেলাধূলো কিন্তু থেমে নেই। সব খেলাধূলোই চলছে উত্তাপহীন অবস্থার মধ্যে। কিংবা খেলার মধ্যে উত্তাপ-উত্তেজনার খোরাক থাকলেও তা মানুষের মন স্পর্শ করছে না। মানুষ অর্থে আমি ভারত, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার মানুষের কথাই বোঝাতে চাইছি।

শুধু জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এবং দেহ-মনের আনন্দ লাভের উপকরণ ও শারীরিক পটুতা অর্জনের প্রশ্নে খেলাধূলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন এবং এই সঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রে ও পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও পৃথক ক্রীড়ামন্ত্রক গঠন করা হয়নি। না কেন্দ্রে না পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে খেলাধূলোর জন্য একজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানের অ-কম্যুনিস্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় কারো উপর সে দায়িত্ব অর্পিত হয়নি, যদিও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের অধীন রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার অস্তিত্ব বর্তমান। কেন্দ্রীয় সরকারেও একই ব্যবস্থা। সেখানেও একটি ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে। তবুও অনেকেই মনে করেন খেলাধূলোয় অনগ্রসর ভারতে খেলাধূলোর উন্নতি এবং প্রসার প্রচারের জন্য পৃথক একটি ক্রীড়া-মন্ত্রক গঠিত হওয়া দরকার। খেলা-ধূলোয় যে সব দেশ উন্নত, সে সব দেশে আগে পৃথক ক্রীড়ামন্ত্রক ছিল না, সে সব দেশে এমন কি গ্রেট ব্রিটেনেও খেলা-ধূলোর জন্য একজন পৃথক মন্ত্রী আছেন। কিন্তু আমাদের এই বিরাট দেশে স্বাধীনতা লাভের পর ২৩ বছরের মধ্যেও খেলাধূলোর জন্য পৃথক ক্রীড়ামন্ত্রক গঠিত হল না।

অবশ্যই অন্যান্য দেশ-এর তুলনায় ভারতের সমস্যা অনেক, বহু সমস্যায় জর্জরিত আমাদের দেশ। তা সত্ত্বেও খেলাধূলোর দিকে জাতীয় সরকারের দৃষ্টি নেই, এ কথা বলা চলে না। এবারও কেন্দ্রীয় বাজেটে খেলা-ধূলোর উন্নতির জন্য বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য যেখানে খেলাধূলোর জন্য ২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল সেখানে ১৯৭১-৭২ সালের

অতীত দিনের খেলোয়াড়, এখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী
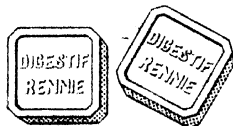
জন্য ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা বাড়িয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের সংগে রাজ্য সরকারগুলির বরাদ্দও কিছু বেড়েছে। তবু আমাদের বিরাট দেশের পক্ষে এ অর্থ নিতান্তই অপ্রতুল।

যাই হক, কেন্দ্রে যিনি নতুন শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন খেলাধুলোর পরম অনুরাগী সেই সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের উপর ভারতের খেলোয়াড়কুলের অনেক আশা ভরসা।

সিদ্ধার্থশংকর রায়কে খেলাধুলোর অনুরাগী বললে অনেক কম বলা হয়। সিদ্ধার্থবাবু অতীত দিনের একজন চৌকস খেলোয়াড় যিনি ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস খেলেছেন। ফুটবলে, বিশেষ করে ক্রিকেটে, বেশ সুনামের অধিকারী ছিলেন। তাছাড়া, পশ্চিম বাংলার খেলাধুলোর পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবেই ওয়াকিবহাল। এবং স্টেডিয়ামের সমস্যা সম্পর্কেও ১৯৫৭ সালে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় সিদ্ধার্থবাবু যখন আইন মন্ত্রী ছিলেন তখন কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সব কিছু খুঁতিয়ে দেখার এবং স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা প্রস্তুতের ভারও পড়েছিল সিদ্ধার্থবাবুর উপর, কাজও কিছুটা এগিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের নীতির সংগে মত বিরোধের ফলে রাজ্য মন্ত্রীসভা থেকে সিদ্ধার্থবাবু পদত্যাগ করায় স্টেডিয়ামের কাজও আর এগোয়নি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে সিদ্ধার্থবাবুর আজ অনেক দায়িত্ব। তবু পশ্চিম বাংলার ক্রীড়ামোদিরা আশা করে কলকাতায় স্টেডিয়াম তৈরীর জরুরী কাজে তিনি একটু আগ্রহ দেখাবেন এবং কেন্দ্র থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে বাংলার ক্রীড়ামোদিদের খেলাধুলোর স্বপ্নসৌধকে বাস্তবে রূপায়িত করবেন।

একলব্য

হকি খেলার আইন কানুন

হকি মাঠে গোল-পোস্টের অবস্থান থেকে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে : যদি বল গোল-পোস্টের ভেতরের দিকে প্রতিহত হয়ে আবার মাঠের মধ্যে ফিরে আসে আম্পায়ার কিসের নির্দেশ দেবেন? গোলের? ফ্রি হিটের? না করনারের? নাকি খেলা চলতে থাকবে?

ফুটবলের নিয়মে হলে খেলা চলতে থাকত। কিন্তু হকির গোল-পোস্ট থাকে মাঠের বাইরে, গোল-লাইনের বাইরের দিকে কিনারার সঙ্গে মিশে। সুতরাং গোল পোস্টের ভিতরের দিকে লেগে বল ফিরে এলে সে বলকে আর ইন প্লে বলে ধরা হবে না। সার্কেলের মধ্যে থেকে হিট হয়ে থাকলে গোল হবে, বাইরে থেকে হিট হলে ফ্রি-হিটের নির্দেশ দেওয়া হবে। রক্ষণকারী দলের হিট হলে করনার বা পেনাল্টি-করনার হবে।

এই ধরনের বহু প্রশ্নেরই উদ্ভব হতে পারে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। হকি মাঠের গোল-পোস্টের অবস্থান এবং ফুটবল মাঠের গোল পোস্টের অবস্থানের পার্থক্য বোঝাবার জন্য উপরের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

॥ আইন ৫ ॥ স্ট্রাইকিং সার্কেল

প্রতি গোলের সামনে এবং গোল-লাইন থেকে ১৬ গজ দূরে গোল-লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল করে ৪ গজ সাদা লাইন আঁকতে হবে। লাইনের চওড়া হবে ৩ ইঞ্চি। গোল-পোস্টকে কেন্দ্র বিন্দু ধরে এবং ১৬ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে কোয়ার্টার সার্কেল এঁকে এই লাইনের দুই মুখ কোয়ার্টার সার্কেলের সঙ্গে এবং কোয়ার্টার সার্কেল গোল-লাইনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ১৬ গজ ব্যাসার্ধের মাপ আরম্ভ হবে কোয়ার্টার সার্কেলের বাইরের দিকের কিনারা থেকে গোল-পোস্টের সামনের দিকের মুখ পর্যন্ত। ৪ গজ সাদা লাইনের সঙ্গেই সমতা রেখে কোয়ার্টার সার্কেলের লাইনও ৩ ইঞ্চি চওড়া করতে হবে। ৪ গজ লাইন, কোয়ার্টার সার্কেলের লাইন এবং গোল-লাইন দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সীমাকে বলা হবে স্ট্রাইকিং সার্কেল (অথবা সার্কেল)। সীমার লাইন-গুলি স্ট্রাইকিং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞাতব্য

(১) স্ট্রাইকিং সার্কেল বা সার্কেল বলা হলেও দুই গোলের সামনে একে অর্ধবৃত্তের (হাফ সার্কেল) মত দেখায়। শুধু পার্থক্য গোলের সামনের ঠিক ৪ গজ লাইন সরল লাইন, সার্কেল-লাইনের মত ঈষৎ বক্র নয়।

যারা মাঠের মাপজোক আঁকবেন তাদের স্মরণ রাখতে হবে, প্রতি গোলপোস্টকে কেন্দ্রবিন্দু ধরে এবং ১৬ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে কোয়ার্টার সার্কেল আঁকতে হবে এবং ৪ গজ সরল রেখার দুই মুখের সঙ্গে কোয়ার্টার সার্কেলের মুখ মিশিয়ে দিতে হবে।
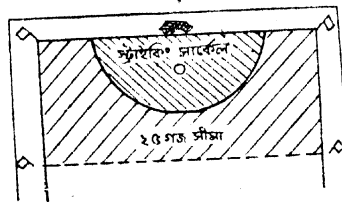
স্ট্রাইকিং সার্কেল

(২) প্রধানত তিনটি কারণে স্ট্রাইকিং সার্কেলের প্রয়োজনীয়তা। যেমন :

(এ) গোল করতে হলে আক্রমণ দলের খেলোয়াড়কে এই এরিয়ার মধ্য থেকে অবশ্যই হিট করে গোল করতে হবে। এই এরিয়ার বাইরে থেকে হিট করে গোল করা যাবে না।

(বি) এই এরিয়ার মধ্য থেকে গোল-কিপারের বল কিক করার অধিকার আছে।

(সি) করনার হিটের সময় এই এরিয়ার মধ্যে কারো অবস্থানের অধিকার নেই। আক্রমণ দলের খেলোয়াড়দের এরিয়ার বাইরে থাকতে হয়, রক্ষণ দলের খেলোয়াড়দের থাকতে হয় গোল-লাইনের পেছনে।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

যদি স্ট্রাইকিং সার্কেলের লাইনের বাইরের দিকের কিনারার মধ্যে বলের সম্পূর্ণ অংশ না থাকে, তবে বল স্ট্রাইকিং সার্কেলের বাইরে আছে বলে ধরতে হবে।

॥ আইন ৬ ॥ বল

(এ) নিয়মমাফিক বলের আচ্ছাদন হবে সাদা চামড়ার কিংবা সাদা রং করা অন্য কোন চামড়ার। সাধারণ ধরনের ক্রিকেট বলে যে ধরনের সেলাই থাকে হকি বলও সেইভাবে সেলাই করতে হবে। কিংবা সেলাই বিহীন বলেও খেলা হতে পারে।

(বি) ঠিক সাধারণ ধরনের ক্রিকেট বলের মত হকি বলের ভিতরকার সামগ্রী কর্ক (ওক জাতীয় বৃক্ষ) এবং টুইন (পাকানো সুতো) দিয়ে তৈরি হবে।

(সি) বলের ওজন ৫¾ আউন্সের বেশী বা ৫½ আউন্সের কম হবে না।

(ডি) বলের পরিধির মাপ ৯¼ ইঞ্চির বেশী বা ৮13/16 ইঞ্চির কম হবে না।

(ই) আইনমাফিক বলের অনুরূপে অন্য কোন রকমে তৈরী বলেও খেলা হতে পারে যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক সে বলে খেলতে সম্মত হন।

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) বল সম্পর্কীয় ৬ নম্বর আইনে 'এ' থেকে 'ডি' পর্যন্ত যে সব বিধির কথা বলা হয়েছে আইনমাফিক বল বলতে তাই বোঝায় এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলা ওই বলেই হওয়া উচিত। তবে আন্তর্জাতিক হকি বোর্ড ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরীর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্লাস্টিকে তৈরি বল পরীক্ষা করে দেখেছেন সে বল আইনমাফিক এবং দুই অধিনায়কের সম্মতি থাকলে সে বলে প্রতিযোগিতামূলক খেলা হতে পারে। অন্যভাবে এবং অন্য উপাদানে তৈরি হকি বলে ক্লাব ম্যাচ খেলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(২) যদি বলের সাদা রং কালো হয়ে যায়, অর্থাৎ বল খুব ময়লা হয়ে ওঠে, কিংবা জলবৃষ্টির ফলে বল ভারি হয়ে ওঠে বা আকারের বিকৃতি ঘটে, তবে বল বদল করতে হবে। এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আম্পায়ারের। তবে বলে কোন ত্রুটি দেখা দিলে খেলোয়াড়রা অবশ্যই বল বদলের দাবি করতে পারেন।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

(১) হাতের কাছে একাধিক অতিরিক্ত বল রাখার ব্যবস্থা করবেন।

(২) যদি খেলার মধ্যে বল ফেটে যায় বা অন্য কোনভাবে বল অকেজো হয়ে পড়ে তবে খেলা থামিয়ে আবার 'কমন বুলি' দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন।

মুকুল

সব এমব্রয়ডারী করা
কাপড়ই মনে হয়
একইরকম কিন্তু
হাকোবা
এমব্রয়ডারী করা কাপড়
আপনাকে
টাকার পরিবর্তে আরও
বেশি কিছু দেয়।

সত্যজিৎ রায়ের "সীমাবদ্ধ" ছবির দুই নতুন শিল্পী : পারমিতা চৌধুরী ও বরুণ চন্দ ফটো—দেশ

চি ত্র - স মা লো চ না

গ্যামবলার

(চিত্রমন্দির)

নায়ক রাজার (দেব আনন্দ) যেন বিধিদত্ত ক্ষমতা—জুয়ায় সে জিতবেই। প্রেমের জুয়ায় তার ভাগ্য কিন্তু তেমন সুপ্রসন্ন নয়। এক্ষেত্রেও নায়ক সমান সৌভাগ্যশালী হলে গল্প জমে না। রাজা জুয়াচোরই হোক কিংবা তার জন্মপরিচয় যত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকুক, চরিত্র সংশোধনের পর ধনীকন্যা চন্দ্রার (জাহিদা) পাণিগ্রহণে সে শেষ পর্যন্ত কোন বিপত্তি থাকবে না সেটা দর্শক অনুমান করেই নিয়েছিলেন। তার জন্য দরকার ছিল একটি আদালত-কক্ষ-নাটকের, যাকে বলে "কোর্ট-রুম ড্রামা"। সেখানে রাজা খুনের মিথ্যা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেল, এবং জানা গেল, সে সরকারী প্রোসিকিউটরেরই ছেলে। আদালতে তখন নায়কের জননীও উপস্থিত। ওই নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করতে হলে দর্শকের রীতিমত তিতিক্ষার প্রয়োজন।

তবে এস. ডি বর্মণের সুরে সুখশ্রাব্য গান, জুয়ার আড্ডায় মারামারি ও অন্যান্য মামুলি প্রমোদ-উপকরণের জন্য সময়টা সব সময় খুব খারাপ কাটে না। গ্যামবলার ভাল হওয়ার জন্য এবং নায়িকার বিশ্বাস ও পূর্ব-প্রণয় ফিরে পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে

চলে। তার এই জুয়াখেলার ফলাফল দেখবার জন্য দর্শকের আগ্রহ কিছুটা থেকেই যায়। তাছাড়া দেব আনন্দের সেই বিশেষ অভিনয়-ধারা ও কথা বলার ধরন তো আছেই, ফ্যানদের যা খুব পছন্দ। নায়িকা জাহিদাকেও তাঁদের ভাল লাগবে। ফিল্ম ব্যবসাটাই যদি গ্যামবল হয় তবে অমরজিৎ প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টম্যান কালারের "গ্যামবলার"-এর মার নেই।

না ট্য-স মা লো চ না

সূর্যশিকার

(পিপলস লিটল থিয়েটার)

আগেই জানা গেল "সূর্যশিকার" রাজনীতির নাটক নয়। রাজনীতি নিয়েই উৎপল দত্তের ইদানীং বেশির ভাগ নাটক। "সূর্যশিকার" রাজনীতিমুক্ত শুনে কৌতূহল বাড়ল। "সূর্যশিকার" দেখলাম, চিহ্নগুলি রাজনীতিক নাটকের নয়। তবে রাজা যখন আছে—রাজা নয়, সম্রাট—তখন রাজনীতি বা সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু একেবারেই বাদ যায়নি। রাজনীতির নামে বা নাম করে যদিও কিছু বলা হয়নি তবু "সূর্যশিকার"-এর সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের যে শূদ্র-শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ তার সঙ্গে আজকের রাজনীতিক নাটকের কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন তাত্ত্বিক সম্বন্ধ আছে। নাটকের মূল কথা অবশ্য অন্যত্র। নাট্যকার রাজনীতির খোলাখুলি বিশ্লেষণ ছেড়ে এবার আরও ভিতরে যেতে চেয়েছেন। তাঁর নাটকের সম্রাট-নায়ক বুদ্ধিজীবী

বিজ্ঞানীর কণ্ঠরোধে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানী-দার্শনিকের জ্ঞানলব্ধ এমন কোন সত্য উচ্চারিত হবে না যাতে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের ও শোষণের ভিত ধসে পড়তে পারে। তাই বৌদ্ধ-বিজ্ঞানী কল্‌হনের জিব কেটে নিতেও তাঁর বাধেনি। অমানুষিক অত্যাচার তিনি চালিয়েছেন কল্‌হন-শিষ্যা ইন্দ্রানীর উপর। কাঠের চাকার উপর ইন্দ্রানীর শরীর যন্ত্রণায় যত নীল হয়ে আসছে সমুদ্রগুপ্তের মনে তত কবিতার প্রেরণা জাগছে। সমুদ্রগুপ্ত কবি, সংগীতপ্রেমিক ও ভাববিলাসী। কবিতা, গান, কল্পনা ইত্যাদি বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি বস্তুবাদী সত্যের কণ্ঠরোধ করতে চান।

কে এই সমুদ্রগুপ্ত? ইতিহাসের কী? ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্তের কিছু পরিচয় এই নাটকের আছে। কিন্তু তাঁর এই কী দশা? সমুদ্রগুপ্তের মহিষীর গণিকাসুলভ মনোবৃত্তি, এক রাত্রির জন্য সেনাপতি হয়গ্রীবের শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য লালায়িত। উৎপল দত্ত কাল্পনিক চরিত্র বা নাটক সৃষ্টি করতে চান করুন। ইতিহাসের নাম ও তথ্যের উপর তিনি তাঁর কল্পনার এবং বিদ্রূপ ও শ্লেষের রোলার চালাতে গেলেন কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বিজ্ঞানের এই অসম্ভব উন্নতির যুগে কি শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা হচ্ছে না? বস্তুবাদী সত্য এই শতাব্দীতে যত বেশি উচ্চারিত হয়েছে সাহিত্য-শিল্প-কলাও কি সেই পরিমাণে বিকশিত হয়নি? "সূর্যশিকার"-এ বস্তুবাদী সত্যের প্রতিনিধি বৌদ্ধশ্রমণ কল্‌হন। তিনি কেমন বৌদ্ধ? জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাই কি শুধু তাঁর কাজ? ভগবান বুদ্ধের বাণী কী এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ না করেও হিন্দুরা বুদ্ধকে কেন অবতার বলে পুজো করেন এই নাটকের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। বুদ্ধের নির্বাণ ও বেদান্তের

পরম সত্যের তফাৎ কোথায় সে বিশ্লেষণও এ ক্ষেত্রে অবান্তর। তা ছাড়া ধর্মের দ্বন্দ্বেও তত্ত্ব এ নাটকে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। নাট্যকার কল্পিত বেদবিরোধী ইন্দ্রাণী আবার উপনিষদের "চরৈবেতি" বলেছে। সে যাক্। নাট্যকার এ নাটকে সত্য-মিথ্যার যে সংঘাত দেখিয়েছেন তার একদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অপর দিকে সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিতে হিন্দুদের দেবত্ব আরোপ। একালের অতি বড় বৈদান্তিকও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সত্যকে স্বীকার করেছেন। শ্রেষ্ঠ কবিও "জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানিয়েছেন। অতএব এই সংঘাত আজকের দিনে অকেজো। নাট্যকার যদি সত্য-মিথ্যার এই সংঘাতের

"আন মিলো সজনা" (পরিচালনা : মুকুল দত্ত) ছবিতে আশা পারেখ

"গ্যাম্বলার" (পরিচালনা অমরজিৎ) ছবিতে দেব আনন্দ ও জাহিদা

জন্য আনুমানিক ষোল শ' বছর আগের পটভূমি বেছে নিয়ে থাকেন তবে আপত্তির কারণ নেই। তখনকার দিনে পৃথিবী গোলাকার না সমতল এ নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়ে থাকলেও দিতে পারে। আজকের মানুষের এ নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তবে এই কাল্পনিক বিরোধের মধ্য দিয়ে নাট্যকার-পরিচালক যদি একালের কোন গোঁড়ামি, অন্ধতা ও যুক্তিহীনতার ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন সেটাও খুব ফলপ্রসূ হয়েছে মনে হয় না। তা ছাড়া, নাট্যকার তাঁর বক্তব্য অনুসারেই পুরো বিষয়টা সাজিয়েছেন। টেনে এনেছেন হিন্দু লোকাচার ও লৌকিক ধর্ম, জ্ঞানযোগীর আত্মোপলব্ধি বিষয় বা পরাবিদ্যা নয়। অপরদিকে কল্হন ভগবান তথাগতের ধর্মের কথা তত্ত্ব বলেনি যতটা বলেছে বিজ্ঞানচর্চার কথা। তাই বক্তব্য হয়েছে একদেশদর্শী।

বক্তব্য থাক, এবার নাটকটির কথায় আসি। "সূর্যশিকার" নাটক তো বটেই, তবে কোন্ আঙ্গিকের নাটক? আঙ্গিক বিচারে "সূর্যশিকার" অর্ধেক নাটক, অর্ধেক যাত্রা। একে তো কস্টিউম নাটক, তার উপর বিবেকের গান। ঘটনাও চলেছে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে। তবু "সূর্যশিকার" যাত্রার আসরেও চলে, চলে আধুনিক মঞ্চে। নাটকের নাট্যগুণেই যদি বড় কথা হয় তবে তা পুরোমাত্রায়ই পাওয়া যাবে "সূর্যশিকার"-এ। নাটকে যা-ই বলা হোক না কেন, নাটকটি প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে বসে দেখতেই হবে শেষ পর্যন্ত। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও চমক তৈরির ক্ষমতা নাট্য-পরিচালক উৎপল দত্ত আগেও দেখিয়েছেন, এ নাটকেও তা পর্যাপ্ত। সব চাইতে বেশি ভাল লাগে সেনাপতি হয়গ্রীব ও ইন্দ্রানীর কাহিনী। নারী যার কাছে বরাবর শুধু এক বাঁদির ভোগের সামগ্রী সেই হয়গ্রীব বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা ইন্দ্রানীর সংস্পর্শে কেমন করে ধীরে তাকে অন্য মানুষ হয়ে গেল এবং কীভাবে তার জীবনে প্রথম প্রেমের অনুভূতি ও সেই সঙ্গে কঠিন জটিলতা দেখা দিল সেটা নাটকের একটা অসামান্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। উৎপল দত্তের নাটক রচনার বিশেষ ক্ষমতার চিহ্নিত হয়গ্রীব-ইন্দ্রানীর উপাখ্যান।

আসলে নাট্যরস পরিবেষণ ও প্রয়োগের কৌশল, দলগত অভিনয়, প্রযোজনার মান ইত্যাদি বিচারে "সূর্যশিকার"-কে অবহেলা করার শক্তি নেই কোন দর্শকের। উৎপল দত্তের বক্তব্য যিনি মানবেন না তাঁরও নয়। তেমনি মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকবে না কোন দর্শকের যিনি হয়গ্রীবের চরিত্রে অসিত বসুর অভিনয় দেখবেন। টিম-ওয়ার্ক উত্তুঙ্গের, অভিনয় প্রত্যেকের অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। সত্যসন্ধানীর অনাসক্তি ও নির্মমতা যেমন প্রকাশ করেছেন কল্হনের ভূমিকায় সমীর মজুমদার, তেমনি ইন্দ্রানীর ব্যক্তিত্ব ও নারীমনের অদ্ভুত সুন্দর বিশ্লেষণ ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে। উৎপল দত্ত যে যে-কোন চরিত্রের নিখুঁত অভিনেতা সে প্রমাণ আবার দেখা গেল তাঁর সমুদ্রগুপ্ত-ভূমিকায়। তবু এঁদের সকলকে ছাপিয়ে অসিত বসুর অসাধারণ চরিত্রচিত্রণের কথাই বার বার মনে পড়ে। হয়ত চরিত্রটা অনেক রিয়াল ও হিউম্যান বলে। হয়গ্রীবের প্রতিটি মুহূর্তের দ্বন্দ্ব ও জটিল মানসিকতা তিনি আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, শোভা সেন হয়েছেন সম্রাজ্ঞী। এই চরিত্রের নীচতা ও নির্দয়তা তিনি চমৎকার দেখিয়েছেন। জগন্নাথ গুহ, মুকুল ঘোষ (গোহিল), অরুণ বকসি (বাকুপুর), সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (মধুকরিকা), সোহাগ সেন

(মহাশ্বেতা) প্রভৃতি সকলেই সুঅভিনয় করেছেন। দর্শককে খুব হাসিয়েছেন মৃণাল ঘোষ (বিদূষক)।

বিবেকের মত গান গেয়েছেন শ্যামল ভট্টাচার্য। তাঁর গলায় সুর আছে, সুর নেই কেবল গানে। প্রশান্ত ভট্টাচার্য সুরারোপিত গানে কথকতার আমেজ বেশি, সুরের আধিক্য কম। গানের সুরের ধরনটা একালের, কাহিনীকালের বলে ভাবতে কষ্ট হয়। তবে আবহ-সুর নানা মুহূর্তেই কার্যকর হয়েছে। উল্লেখযোগ্য তাপস সেনের আলোকপাত এবং অসিত বসুর মঞ্চসজ্জা, যা অনাড়ম্বর অথচ ইলিউশন সৃষ্টির কাজে সফল। পরিশেষে বলি, বক্তব্যবাহী এই নাটকের নামকরণও সুন্দর —"সূর্যশিকার"। দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের বাকি বাকি শুধু সূর্যশিকার, বস্তুবিজ্ঞানের সত্যকে পদানত করা। নাটকের সমুদ্রগুপ্ত নারকীয় অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এবং বুদ্ধিজীবীর বাক্-শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে সূর্যশিকার করেছেন। তার মধ্যে ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্তকে খুঁজতে যাওয়া বৃথা। ইতিহাসের সমুদ্রগুপ্ত আর যাই করুন মুখে মধু ও অন্তরে গরল নিয়ে এবং সত্য-আবিষ্কারকে মনে মনে স্বীকার করে শঠ-কুচক্রীর মত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মধ্য

দিয়ে সত্যের ও বিজ্ঞানসেবীর সর্বনাশ করেছেন এমন কোন নজির ইতিহাসে মেলে না। ইতিহাসের এই বিকৃতি কেন?

"আনন্দ" (পরিচালনা : হৃষীকেশ মুখার্জি) হিন্দী ছবিতে সুমিতা সান্যাল ও অমিতাভ বচ্চন

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমাস্টার'-এর পাঠক অথবা এই কাহিনীর চলচ্চিত্র-রূপের দর্শকদের ধারণা হতে পারে হয়তো বা যাত্রার 'হেডমাস্টার' এরই অনুকরণ, কিংবা এর ছায়ায় পালাকাহিনী রচিত। আসলে কিন্তু মাধবী নাট্য কোম্পানী নিবেদিত প্রসাদ ভট্টাচার্যের এই পালা-কাহিনীটি সম্পূর্ণই ভিন্ন। একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের একটি অতি সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্ধেশ্বরকে অতি দরিদ্র ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। অর্থ এবং সাংসারিক সমৃদ্ধিকে দু' পায়ে দলে যখন তাকে ছুটতে দেখা যায় আদর্শের পেছনে, তখন হয়তো শহরে, রাজনীতি-সচেতন [illegible] কিন্তু কলকাতার সীমা পেরোলে যে পালা [illegible] হয়ে বিপুল হর্ষে [illegible] পড়তে দেখেছি। অবশ্য আদর্শের [illegible] রূপকল্প পালার হেডমাস্টারেরও [illegible]। সামান্য মিল এখানেই। কিন্তু পথ ভিন্ন।

'অর্থই অনর্থ...' যুগ যুগ ধরে যাত্রা-পালা একথা বলেছে। এখানেও ওই নিয়েই মূল দ্বন্দ্ব। বিদ্যালয়ের প্রতাপশালী, বিত্তবান সেক্রেটারি আর দরিদ্র প্রধান শিক্ষকের মধ্যে যে সংঘাত ও লড়াই, আপাতভাবে, অবশ্য তা বিত্তবানের জয়ই সূচিত করেছিল, কিন্তু পরিণতিতে দেখা গেল ঠিক উলটো। [illegible] এবং [illegible] বিশ্বাসীদের চেষ্টায় তৃতীয়াংক পালার পরিণতি দর্শকে সত্যের জয় মুখরিত হয়ে উঠল। অস্বীকার করব না, এর পরতে পরতে আবেগের ছড়াছড়ি—ওই আবেগ বোধ হয় পল্লী প্রকৃতির দান।

যাত্রাপালায় মুহুর্মুহু ঘটনা চাই। এই ঘটনাকে সব সময় যুক্তির নিক্তিতে তোলা চলে না, কিংবা এর একদিকে তথাকথিত বাস্তবতার বাটখারা তুলে দিয়ে চুলচেরা পরিমাপ করাটাও সঙ্গত নয়। যাত্রার আসরে, যেখানে সবচেয়ে কম দর্শকের সংখ্যাই কয়েক হাজার—বেশি হলে হয় দশ বারো সহস্র—সেখানে এই গণনাটককে গণ-মানসের কথাও ভাবতে হয়। তাই বলে যারা বলে যাত্রার গণপ্রাণ গাছে ওঠে, তারা মিথ্যেবাদী। ইদানীংকার দু'একটি বিপ্লবী পালার কথা অবশ্য বাদ দিয়েই বলছি।

মাধবী নাট্য কোম্পানীর 'হেডমাস্টার'কে তাই সংযত আবেগের পালা বলব না। কাহিনীতে ঘটনার সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে অনেক উপকাহিনী এসেছে। ফলে ষড়যন্ত্র, কুচক্র, স্বার্থসিদ্ধি, হত্যা, বিভীষিকাও যুক্ত। আবার রয়েছে প্রবল কৌতুকীও। বিশেষ করে পালার 'ডাক্তার' চরিত্রটির বুঝি তুলনা হয় না অভিনয়েও। দিলীপকুমার এ-চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সনৎ বসুর (মেণ্টাবাবু) 'সিদ্ধেশ্বর' এর পাশাপাশি প্রায় সমতালে এগিয়ে চলেছে। এই দুটি চরিত্রের সম্পর্ক এবং কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত আচরণটুকু উপভোগের। দলের অনেক শিল্পীর মধ্যে রমেন ভাদুড়ী, মধুশ্রী, বেলা দেবী, সোনালী গোস্বামী, প্রবীরকুমার, মধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল গোস্বামীকে ভাল লেগেছে।

আসলে বিপ্লবের নামে চিৎপুরে যাঁরা উল্লাস করেন, দেশের মাটি মানুষের কথাকে পালাশিল্পের লক্ষ্য বলে মনে করেন না, কিংবা করতে কুণ্ঠিত হন, 'হেডমাস্টার' বোধ হয় তাঁদের ঘোলা দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে দিতে পারে।

—সূত্রধার

পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শিল্পী সংসদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয় যথাক্রমে তৃপ্তি মিত্র, উদয়শঙ্কর ও সরযূবালা দেবীকে

ফটো—দেশ

ভালো
তামাক
থেকেই হয়
ভালো
সিগারেট

Panama
20
CIGARETTES

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

বোধহয় কোনো খেলা। ইস্, আমারও গিয়ে খেলতে ইচ্ছে করছে।

না, ওয়াকার-কাকা* আমাদের ডেলায় থাকতে বলেছেন।
সটান শুয়ে থাকলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা

তিনি একাই একশো।

বুঝলে হার্ট, গোটাকয়েক ট্রাক না নিয়ে এলে তো এই সোনা এখান থেকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।
জঙ্গলের পথে না গিয়ে বরং জাহাজেরই ব্যবস্থা করা ভাল। তার আগে অবশ্য ওই দুটোকে খতম করতে হবে।

সুটকেস?
কোটি কোটি ডলার। কিন্তু হার্ট আর স্লিমের ভাবভঙ্গি তো ভাল ঠেকছে না। আমাদের ফাঁকি দিতে চায় নাকি?

?
?
?
?

রাইফেলগুলো?
ওই খানে-
রেখে-ছিলাম-
হুম!

কোথায় গেল?
কখন গেল?
কী করে গেল?
কে নিল?

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান এবং লোকায়ত্ত সরকার গঠন বর্তমান সপ্তাহের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ২ এপ্রিল শুক্রবার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। তার আগে এক বছর চোদ্দ দিন পরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নেওয়া হয়। এই কোয়ালিশন কেবলমাত্র সমর্থক সদস্যদের নিয়েই গরিষ্ঠ নয়, ভোটের হিসাবেও গরিষ্ঠ। এই মন্ত্রিসভায় ২০ জন পুরো মন্ত্রী এবং ৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ধরে মোট ২৫ জন শপথ নিয়েছেন পুরো মন্ত্রী ২০ জনের মধ্যে নব কংগ্রেস ১৪, বাংলা কংগ্রেস ১, পি এস পি (গণতান্ত্রিক সংহতি) ১, এস এস পি বিপ্লবী) ১, মুসলিম লীগ ২, গোরখা লীগ ১। মন্ত্রিসভায় যোগদানকারী এই ছয়টি দল ছাড়াও পি এস পি (সরকারী), সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, আদি কংগ্রেস এই কোয়ালিশনকে সমর্থন করেছেন। বিধানসভার মোট ২৮০টি আসনের মধ্যে এখন সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ২৭৬। মন্ত্রিসভায় দফতর বণ্টনের কাজও শেষ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়। এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার। —শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, শ্রীআবদুল সত্তার, ডাঃজয়নাল আবেদিন, শ্রীসন্তোষ রায়, শ্রীআবদুল বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী, ডাঃ গোপালদাস নাগ, শ্রীঅজিত পাঁজা, শ্রীজগদানন্দ রায়, অধ্যাপক শ্রীশান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীজ্ঞান সিং মোহনলাল, শ্রীআবদুল রউফ আনসারি, শ্রীসীতারাম মাহাতো, শ্রীকমল হেমব্রম, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস, শ্রীদেওপ্রকাশ রাই। শ্রী কে এম হাসানুজ্জমান এবং নাসিরুদ্দিন খান। রাষ্ট্রমন্ত্রী:—শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস, শ্রীঈশ্বর টিরকে, শ্রীরথীন তালুকদার, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র নস্কর এবং মহম্মদ সামায়ুন বিশ্বাস।

দেশী সংবাদ

২৯ **মারচ**—আজ লোকসভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে আগামী ১ এপ্রিল থেকে আরও ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসনকালের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে লোকসভায় ১৯৭১-৭২ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী বাজেটটিও অনুমোদিত হয়েছে।

৩০ **মারচ**—জোড়াবাগান কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত নব কংগ্রেস এম-এল-এ শ্রীনেপালচন্দ্র রায় আজ দুপুরে উত্তর কলকাতায় নিজ অফিসের মধ্যেই অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। হঠাৎ এক যুবক এসে রিভলবার থেকে শ্রীরায়কে লক্ষ্য করে পর পর দু'বার গুলি করে। আহত অবস্থায় তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

ভারত আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডারের যাবতীয় দেনা মিটিয়ে ফেলেছে। দুই দশকের মধ্যে এই প্রথম ভারত আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডারের দায় দেনা থেকে মুক্ত হল। ১৯৬৮ সাল থেকে ভারত দেনা মেটাতে শুরু করে এবং সাকুল্যে ৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ ডলার দেনা পরিশোধ করে

৩১ **মারচ**—বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ রাজ্যসভায় বলেন যে, ভারত কোনরকম পূর্ব শর্ত ছাড়া বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে রাজি। শ্রীসিং স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, বিমান ধ্বংসের জন্য ক্ষতিপূরণ দান, বিমান দস্যুদের ফেরৎ পাঠানো এবং ভবিষ্যতে বিমান চলাচলের ব্যাপারে নিরাপত্তার আশ্বাস সম্পর্কিত ভারতের দাবি অপরিবর্তিত রয়েছে।

পূর্ব বাংলার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তিগুলির আচরণে ভারত অত্যন্ত নিরাশ ও মর্মাহত বলে মনে হয়। মস্কো অথবা ওয়াশিংটন এমন কিছু করতে ইচ্ছুক নন যা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তথা পশ্চিম পাকিস্তান

সামরিক চক্রের অপছন্দ।

১ **এপ্রিল**—প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেন আজ দিল্লীতে সাংবাদিকদের বলেন যে, একটি বে-সরকারী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হচ্ছে। ওর সদর দফতর হবে দিল্লীতে। বাংলাদেশের নিপীড়িত মানবতার জন্য অর্থসংগ্রহ, সাহায্য ইত্যাদি সেবামূলক কার্যের সমন্বয় সাধনই হবে এই কমিটির কাজ।

২ **এপ্রিল**—রাজ্যের নবগঠিত কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি বলেন: "আমরা সকলের আগে অশান্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমরা সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করব।"

পুলিশ কমিশনারের অনুমতি না নিয়ে কেউ কলকাতার রাস্তায় চাঁদা আদায় করতে পারবে না। আজ সন্ধ্যায় সব থানার পুলিশকে কমিশনারের এই আদেশ জানিয়ে দিয়ে বলা হয়, যাঁরা এটি অমান্য করে চাঁদা তুলবে তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

৩ **এপ্রিল**—উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাসের (৮২) নেতৃত্বে আজ ওড়িশার ১৪ জনের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে। শ্রীদাস বিধানসভায় সদস্য নন। কোয়ালিশনের শরিক দলের মধ্যে স্বতন্ত্র দল থেকে ৬ জন, উৎকল কংগ্রেস থেকে ৬ জন ও ঝাড়খণ্ড থেকে ১ জনকে নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস (নব) কমিটিতে আজ শ্রী ডি সঞ্জীবায়া সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীজগজীবন রাম দলের সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। শ্রীসঞ্জীবায়া তাঁর জায়গায় অন্তর্বর্তী সভাপতি নিযুক্ত হন। এইবার নিয়ে শ্রীসঞ্জীবায়া দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

৪ **এপ্রিল**—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ঘোষণা করেন: ভারতের সীমান্তের ওপারে পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে, তাতে ভারতের পক্ষে নীরব দর্শক থাকা সম্ভব নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

উত্তরপ্রদেশের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি আজ শপথ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে নব কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আরও ৬ জন সদস্যও শপথ নেন। ত্রিপাঠি মন্ত্রিসভার অন্য ৬ জন সদস্যই ক্যাবিনেট মন্ত্রী। এদের মধ্যে একজন মহিলা।

বিদেশী সংবাদ

২৯ **মারচ**—বাংলা দেশের মুক্তিসেনা খবর পেয়েছেন, পাকিস্তান বিমানবাহিনী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কয়েকটি স্থানে বোমা-বর্ষণ করেছে। বেতার ঘোষণায় বলা হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের বহু বিশিষ্ট নেতা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সরাতে চান।

৩০ **মারচ**—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্ত্রী ও কন্যা কোন একটি দেশের বাণিজ্য দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। দেশটির নাম বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে যে, দেশটি বাংলা দেশের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। খবরটি আওয়ামী লীগের সূত্রে পাওয়া।

৩১ **মারচ**—বঙ্গ রণাঙ্গনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরাস্ত ও বিপর্যস্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এখন প্রধানত শহর অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করছে। মুক্তি ফৌজ মুক্তাঞ্চলে নিজেদের শক্তি সংহত করে প্রচণ্ডতর আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ওঁরা ঢাকায় খতম করেছেন একজন পাক ব্রিগেডিয়ারকে এবং যশোরে সদরের দুর্গ।

১ **এপ্রিল**—পরাস্ত বিপর্যস্ত পাক দখলদার বাহিনী এখন মরীয়া হয়ে বাংলা দেশের সর্বত্র মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। আক্রমণ—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে ছিন্নভিন্ন পাক সেনারা প্রধানত শহরাঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। সর্বত্র পাক-বাহিনীর এখন বেপরোয়া আক্রমণ।

২ **এপ্রিল**—পি টি আই ও ইউ এন আইয়ের খবরে প্রকাশ: ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসন কার্যত ভেঙে পড়েছে। তাদের ঘাঁটি কেবল ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি কয়েকটি শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। পাক ফৌজ এখন স্থলবাহিনীর ভরসায় না থেকে শহরে শহরে ফৌজী বিমান থেকে গোলাবর্ষণের পরিমাণ বাড়িয়েছে।

৩ **এপ্রিল**—সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকোলাস পদগোর্নি আজ রাতে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কাছে প্রেরিত এক বার্তায় অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। এই সংবাদ দিয়েছেন তাস।

৪ **এপ্রিল**—যুগোস্লাভ সংবাদ সংস্থা তানযুগ-এর একজন সংবাদদাতা পিকিং থেকে জানাচ্ছেন: চীনা পত্রিকাগুলি এই প্রথম বাংলা দেশ সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। তারা কোন মন্তব্য করেনি, কিন্তু এমনভাবে তথ্য প্রকাশ করেছে তা থেকে মনে হয় যে, সেখানকার (বাংলাদেশের) পরিস্থিতি গুরুতর ও জটিল।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাঙালী ও বাংলা দেশ—		... ১০৭৩
ব্যঙ্গচিত্র—		... ১০৭৪
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		... ১০৭৫
দৃশ্যপট—	শ্রীনবারুণ গুপ্ত	১০৭৬
বৈদেশিকী—	দেবরাজ	... ১০৭৮
এক নবদম্পতির উদ্দেশে—চট্টগ্রামে (কবিতা)	—শ্রীবুদ্ধদেব বসু	... ১০৮১
পত্রহারা (কবিতা)—	শ্রীজসীম উদ্ দীন	... ১০৮২
দুঃসময়ে মুখোমুখি (কবিতা)—	শ্রীশামসুর রাহমান	... ১০৮৩
রোশনারা (কবিতা)—	শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ১০৮৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অন্ধ আমার (কবিতা)—শ্রীহাসান হাফিজুর রহমান ... ১০৮৪
মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল (কবিতা)
—শ্রীসামসুল হক ... ১০৮৪
আমি তোমায় ভালোবাসি—শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব ... ১০৮৫
বাংলা দেশের কবিতা—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... ১০৮৯
এখন সেখানে যুদ্ধ চলছে—শ্রীসমরেশ বসু ... ১০৯৩
স্বাধীন বাংলা দেশ—শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ... ১১০১
বাংলা দেশের বিজ্ঞান চিন্তা—শ্রীসমরজিৎ কর ... ১১০৫
এই সংগ্রাম অনিবার্য ছিল—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ... ১১১৩
মুক্তির সংগ্রামে বাংলা দেশ—কলহন ... ১১১৯
পশ্চিমের বারান্দা পূবের জাফরি—জহুরী সদাগর ... ১১২৯
রত্ন ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশংকর রায় ... ১১৩৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	...	১১৪৫
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	১১৪৯
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	...	১১৫৪
ভালবাসার মুখ—শ্রীনগেন্দ্র দাশ	...	১১৫৭
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	১১৬৩
পুস্তক পরিচয়—	...	১১৬৫
খেলার মাঠে—একলব্য	...	১১৬৭
হকির আইন-কানুন—মুকুল	...	১০৭০
রঙ্গজগৎ—	...	১১৭১
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	১১৮০

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৪
শনিবার ৩ বৈশাখ ১৩৭৮

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীশীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৪১

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	...	৩১.০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	১৬.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	৮.০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩৬.০০ টাকা
ষান্মাসিক "	...	১৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক "	...	৯.৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	...	৫৬.০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২৮.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১৪.৫০ পয়সা

এশিয়া অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৪৪.০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২২.৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১১.৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৮৩.০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	৪২.০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	২১.৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday 17 April 1971.

বাঙালী ও বাংলাদেশ

এক একটা সময় আসে যখন দেশ আর দেশের মানুষ নিজেকে নতুন করে অনুভব করে। এই যে 'জনগণ' বলে কথাটা সবসময়ে মুখে মুখে চলে এর একটা বড় দুর্বলতা একে নেশায় আচ্ছন্ন করে এর মাথার পাশে বালিশ, হাত বোলালে সহজেই ঘুমিয়ে পড়ে; জাগানোর বেলাতেই যত কষ্ট, পরিশ্রম, ঝকমারি। কিন্তু যখন জেগে ওঠে তখন নিজেকে অনুভব করতে তার কষ্ট হয় না। আজ বাংলাদেশের অন্যপ্রান্তে যা ঘটছে তা কী শুধু ওখানেই ঘটছে, এখানে কী কিছু নয়? বোধ হয় এখানেও। আমরা, যারা বাঙালী, আমাদের মধ্যে কোথাও কিছু ঘটে চলেছে। হয়ত আমরা অনুভব করতে পারছি, চব্বিশ বছর আগে রাজনৈতিকভাবে যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটা যত বড় সত্যই হোক, তার চেয়েও বড় সত্য রয়েছে আমাদের মনে, অন্তরের নিভৃতে। দেশ যদি বা ভাগ হয়, তারের বেড়া দিয়ে তার সীমানা আলাদা করা যায়—তবু একই দেশের মানুষকে মনে মনে ভাগ করা সম্ভব নয়, সংস্কৃতির দিক থেকে কোনোক্রমেই নয়। আমাদের বাংলা দেশকে দু টুকরো করার পর রাজনৈতিকভাবে একটা পাঁচিল উঠেছিল; সেই পাঁচিলকে আরও শক্ত ও স্থায়ী করার জন্যে ও প্রান্তের বাংলায় দীর্ঘ চব্বিশ বছর কম চেষ্টা হয় নি, ধর্মের নামে নতুন সংস্কৃতি আমদানির চেষ্টাও হয়েছিল; কিন্তু সে-চেষ্টা সফল হয় নি। পূর্ব বাংলার মানুষ যে বাঙালী, তার মুখের ভাষা যে বাংলা, তার মনের মধ্যে যে বাঙালী আনা—তাকে চতুর হাতে মুছে দেবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই যে সজল শ্যামল বাংলা দেশ, যার মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষের জন্ম আর জীবনান্ত, যার খাল বিল নদী নালায়, গাছপালায়, আর আকাশের তলায় কোটি কোটি বাঙালীর জীবনরস সংগৃহীত তাকে ভুলে যাওয়া, অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে গড়ে উঠেছে এই বাঙালী মন। সে-মন ওদের, আমাদের; উভয়ের।

আজ ও-প্রান্তে যা ঘটছে, আমরা এ-প্রান্তের মানুষ হয়ে তাতে বিচলিত ও উদ্বেগ বোধ করব এটাই স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যহেতু আজ আমরা রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, কিন্তু মানসিকভাবে নয়। বাঙালীর যেটা মানস ইতিহাস চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতায় তা মুছে যায় না। ঠিক এই কারণেই আজ এপারের বাঙালী ওপারের বীভৎস হত্যালীলায় কাতর ও ক্ষুব্ধ। আমরা যে আজ বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত তার একটি কারণ এই যে, আমরা মনে করছি ওপারে আমাদের ভ্রাতৃহত্যা ঘটছে, সাড়ে সাতকোটি বাঙালীর জন্যে সাড়ে চার কোটি বাঙালীর এই বেদনা অন্যে হয়ত বুঝবেন না, আমরা বুঝি।

বলা বাহুল্য, মানুষ হিসেবেও আমাদের সকলের বেদনার কারণ রয়েছে। কারণটা মানবিক। এমন নির্বিচার, নৃশংস, পরিকল্পিত গণহত্যা সহ্য করা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, আমরা স্তব্ধ হয়ে দেখছি, গণতান্ত্রিক মতে যা সঙ্গত ও আইনসিদ্ধ ছিল তা বাধা করে জঙ্গীশাসন আর একতান্ত্রিকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া অনুচিত। হিটলারের স্বৈরাচার একদা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও বিভিন্ন জাতি সহ্য করেনি, মানবতার নাম করে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। তবে আজ ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর বিরুদ্ধেই বা কেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নীরব থাকবে। বাংলাদেশের সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্যে ন্যায়ের যুদ্ধ। আমরা এই সংগ্রামের সাফল্য কামনা করব, বার বার

প্রফুল্লকুমার স্মরণে

বৎসরের শেষ দিনটি চলে যাবার সময় আমাদের মনে একটি গভীর বেদনা দিয়ে যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও সম্পাদক স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় এমন দিনে (৩১ চৈত্র) আমাদের ছেড়ে বিদায় নিয়েছিলেন। সে আজ সাতাশ বছরের কথা। এই সাতাশটি বছরে স্বাভাবিকভাবেই নানা পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে এবং এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত পত্রিকাগুলিতেও। কিন্তু আমরা সর্বদাই আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ স্মরণ করে পথ চলার চেষ্টা করি। প্রফুল্লবাবুর আদর্শ ছিল : জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণহীনতা, স্বদেশ কল্যাণ। তাঁর এই আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি। বলিষ্ঠচরিত্র, উদার, স্বজন-বৎসল, নম্র ও অমায়িক এই মানুষটির স্মৃতি তাঁর বিয়োগ-দিনে বার বার আমাদের মনে আসে। আর এই দিনে আমরা তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

লক্ষ লক্ষ মুজিবুর!
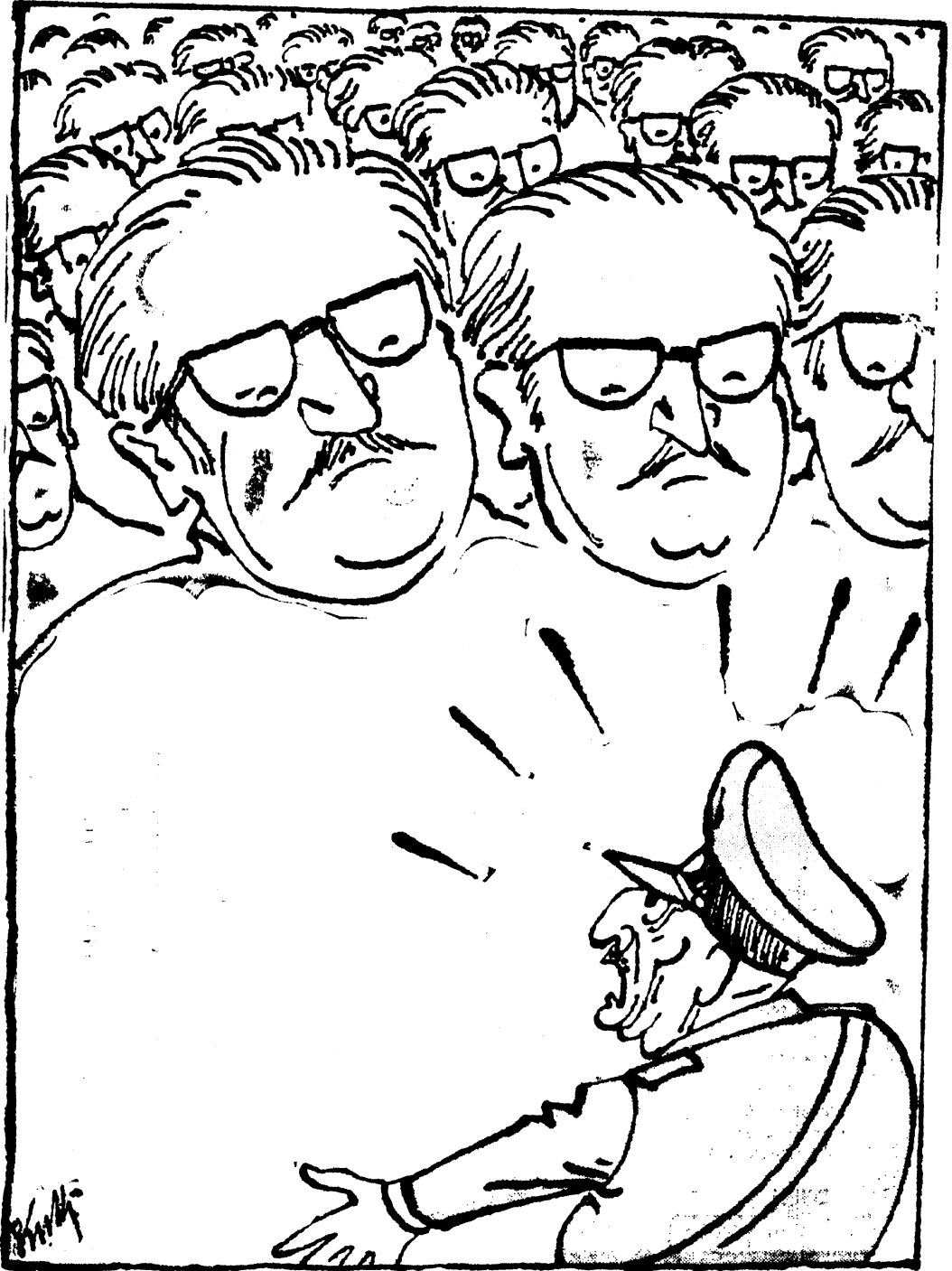
মাই ডিয়ার

চীনের চেয়ারম্যানদা, আমাদের ভাইস-চেয়ারম্যান চারুদার কোনও খবর বেশ কিছুদিন যাবৎ না পাওয়াতে বাধ্য হয়েই আপনাকে ডিসটারব করছি। প্লিজ রাগ করবেন না।

সম্প্রতি "বাংলা দেশের" জনগণ মুজিবুরের নেতৃত্বে ইয়াহিয়ার এগেনসটে ফাইট দিয়ে তাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে, জনগণের মুক্তি ফৌজ নামমাত্র হাতিয়ার সম্বল করে হাজারে হাজারে শহর ঘিরে ফেলছে, আর আপনি নাকি তা সাপোরট দিচ্ছেন না? সত্যি! আর ইনডিয়া এদের সাপোরট দিচ্ছে দেখে আপনি নাকি বলেছেন, ইনডিয়া পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে? সত্যি? সত্যি!

সত্যি দাদা, কথাটা বিশ্বাস হয়নি প্রথম। কারণ বুর্জোয়া কাগজের খবর কে বিশ্বাস করে। আমরা মাল-ফাল বেঁধে-ছেঁদে রেডি হচ্ছি বরডারে গিয়ে ইয়াহিয়ার বাচ্চাদের উপর তাক মত ঝাড়ব, একজন কমরেড আমাদের বললেন, এগুলো এপারে ঝাড়ব না ওপারে ঝাড়ব, সে বিষয়ে এখনও আমাদের লাইন ঠিক হয়নি। কেননা আপনি মুজিবুরকে সাপোরট দিচ্ছেন না। আপনি ইয়াহিয়ার সাইডে। বুর্জোয়া পেপারের কথা অবিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিজেদের কমরেডের কথা কি করে অবিশ্বাস করি বলুন। বিশেষ করে সে যখন আপনাদের কোট করছে। তাই বড়দা, আপনার স্মরণস্থ হয়েছি। প্লিজ, তাড়াতাড়ি একটা নির্দেশ পাঠাবেন। কেননা "কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এটাই হল বিপ্লবের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।" (এ তো দাদা আপনারই কথামৃত, পৃষ্ঠা ১০)

এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের এক দিকে ইয়াহিয়া এবং অন্য দিকে মুজিবুর। এক দিকে সিয়াটো সেনটো জোটের তল্পীবাহক সমরতন্ত্রের নৃশংস আগ্রাসী আক্রমণ এবং অন্য দিকে সাধারণ মানুষের মরিয়া প্রতিরোধ। বলুন বড়দা, কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? আমরা কাকে পেটো ঝাড়ব? আমাদের মাল রেডি, হাতও নিসপিস করছে, শুধু নির্দেশের অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে আছি।

এত বড় একটা কান্ড হচ্ছে বাড়ির পাশে, হাত গুটিয়ে বসে থাকতে কার ভাল লাগে বলুন। তাই দাদা বসে বসে রেড বুক পড়ছিলাম। একটা কথা বলব? কিছু মনে করবেন না? মিনি বুক সাইজের ৩৬০ পাতা, ঠাসা মনোটাইপে ছাপা। এটাকে দাদা বিপ্লবের মেড ইজি বলা বোধ হয় ভুল। আসলে ওটা এম সেনের নোট বই-এর মত। অত দাদা পড়া যায় না। যায়? বলুন? মানে অ্যাকশনের সংখ্যা এখন ক—ত বেড়ে

গেছে, পড়ার সময় কোথা বলুন তো। তাই আমাদের একটা অনুরোধ, রেড বুকটাকে একটু কমিয়ে-সমিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী করে দশটা প্রশ্নে সিওর সাকসেস গোছের কিছু একটায় দাঁড় করানো যায় না? তাতে বড়দা অনেক ফালতু জিনিস বাদ দেওয়া যেত, ফলে বিভ্রান্তি কম হত।

"জনগণের লাইন" শীর্ষক অধ্যায়ে আপনি ১৯৪৪ সালে বলেছিলেন (রেড বুক দ্বিতীয়

সংস্করণ পৃঃ ১৪০-১৪১) : "নিজেকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে গেলে, জনসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতেই হবে। জনসাধারণের জন্য যেসব কাজ করা হয়, সে সবেরই শুরু হওয়া উচিত জনসাধারণের প্রয়োজন থেকে..."

এই কথাটা পড়ে দাদা এখন কেমন ধাঁধা লাগছে। বাংলা দেশে জনগণ মুক্তি-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার স্যাবার জেট নিরস্ত্র জনগণের সংগ্রামী মনোবলকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রতি নিয়ত ছোঁ মারছে। আর আপনি বড়দা জনগণতান্ত্রিক দেশের মাটিতে তাকে নাকি নামতে দিয়ে তার খালি ট্যাংক দিব্যি তেলে ভরে দিচ্ছেন? দিচ্ছেন!

তা হলে বড়দা, মোদ্দা ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? বড্ড গুলিয়ে গেল যে। বাংলা দেশে জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হয়েছে। অতএব আপনার ১৯৪৪ সালের কথামৃত অনুসারে আমি "নিজেকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে", গিয়ে বাংলা দেশের "জনসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে" কাজ করব? এবং তদনুসারে ঠিক করব "কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু?" নাকি আপনাদের ১৯৭১ সালের কাজ দেখে বুঝব? দোহাই বড়দা, খুবই আতান্তরে পড়েছি। দয়া করে উদ্ধার করুন।

আপনার ১৯৪৪ সালের কথামৃত অনুসারে মুজিবুর আমাদের বন্ধু এবং ইয়াহিয়া আমাদের শত্রু হওয়া উচিত। আবার আপনাদের ১৯৭১ সালের কাজ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ইয়াহিয়াই আমাদের অর্থাৎ চীনের চেয়ারম্যানই যে-আমাদের চেয়ারম্যান এবং চীনের পথই যে-আমাদের পথ সেই আমাদের বন্ধু এবং মুজিবুর আমাদের বন্ধুর শত্রু। মুজিবুর শত্রু অতএব মুজিবুরের বাংলা দেশেও আমাদের বন্ধুর শত্রু, সেই কারণেই আমাদের শত্রুভাবাপন্ন জনগণের উপর নির্বিচারে বোমা ফেলার জন্য মারকিন প্লেনের সঙ্গে জনগণতান্ত্রিক তেলের সহযোগিতা করতে বাধছে না। এবং জনগণতান্ত্রিক তেল জঠরে ভরে আমাদের চীনের মাটিতে বিশ্রাম নিয়ে যে-সব স্যাবার জেট মৃত্যু উগরে দিচ্ছে তার বলি আমাদের কমরেড বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজের তোহার বাহিনীর লোকেরাও হচ্ছেন। হয়ত তোহাও একদিন সে স্যাবার জেটে ঝাঁঝরা হবেন (ঈশ্বর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন), কমরেড তোহা যুগ যুগ জীও, তারও জঠরে আমাদের চেয়ারম্যান তথা বড়দা আপনার তেল টলমল করবে! চেয়ারম্যান মাও যুগ যুগ জীও।

এ এক দারুণ দ্বন্দ্ববাদ!

দারুণ ধাঁধা। মাঝে মাঝে বড়দা সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। এই যেমন সেদিন হয়েছিল, যেদিন আপনার তথা আমাদেরও জনগণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী আধা-সামন্ততন্ত্র এবং আধা-পুঁজিবাদের তল্পীবাহক ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর নির্বাচনী সাফল্যের অভিনন্দন জানালেন। আমরা না নির্বাচন ভণ্ডুল করতেই চেয়েছিলাম! ধাঁধাটা লাগে এইখানে। জানি, এসব প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, জানি এ সব বুর্জোয়া ভাবালুতারই প্রভাব। তবু বড়দা, ফ্র্যাংকলি বলি, মানুষের মন এমনই এক বস্তু যে তাতে প্রশ্ন না উঠে পারে না। কি করি বলুন? এও জানি সেই অভিনন্দন আন্তরিক নয়, ওটা কূটনীতির খেলা। ওটা একটা রণকৌশল। ইয়াহিয়াকে সাপোরট দেওয়াটাও যেমন একটা রণকৌশল।

বড়দা, আপনার এই এক মস্ত সুবিধে। আপনার যাবতীয় সম্পর্কের ভিত্তিই রণকৌশলগত। এ ক্ষেত্রে আপনি ইয়াহিয়া-মুজিবুর, ইন্দিরা, তোহা বা আমাদের মধ্যে কোনও তফাত করেন না। কেননা আপনার নীতিটা হচ্ছে এই: এই দুনিয়া আমাদের এবং তোমাদেরও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু আমারই, তাই না, চেয়ারম্যানদা?

সেই পুরনো কায়দা

ইয়াহিয়া খাঁ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেভাবে পূর্ব বাঙ্গলাকে তাঁবে আনতে চাইছেন এবং যেভাবে বাঙ্গলা দেশে নিজস্ব দখল বজায় রাখার চেষ্টা করছেন একশ দেড়শ বছর আগে এই উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা সেইভাবে তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও বিদ্রোহ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটত সেনাবাহিনী। তারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছেই নির্বিচারে মানুষ খুন করত। দিন দশ পনেরো তারা যাকে সামনে পেত গুলী চালাত। তারপর যখন দেখত আর কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ করছে না এবং যখন বুঝত চ্যালেঞ্জ করার মত মনোবল স্থানীয় আর কোনও লোকের নেই তখন বিশিষ্ট কোনও তাঁবেদারকে খুঁজে পেতে বের করে তাকে স্থানীয় পুতুল-শাসক করে রাখত। তাকে সামনে রেখে আসল শাসন চালাত নিজেরা।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীও আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ব বাঙ্গলায় ঠিক সেই কায়দা অনুসরণ করে সাফল্য অর্জন করতে চাইছে।

নির্বাচন হল। তাঁরাই নির্বাচনের আয়োজন করলেন। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা বললেন, এবার আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি মত সংবিধান রচনা করতে চাই। আমরা এমন সংবিধান রচনা করব যে সংবিধান বাঙ্গলা দেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণের অবসান ঘটাবে, যে সংবিধান পূর্ব বাঙ্গলার মানুষকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দেবে।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তাতে

রাজী হল না। তারা সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পরিষদের ঘোষিত অধিবেশনই বাতিল করে দিল। পূর্ব বাঙ্গলা রাগে ফেটে পড়ল। ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে গেল। এইবার ইয়াহিয়া খাঁ এবং পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা তাঁদের কায়দা পাল্টালেন। অনেকেই মনে করলেন, তাঁরা বিংশ শতাব্দীর লোক। তাঁরা পূর্ব বাঙ্গলার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। শুরু হল ইয়াহিয়া-মুজিবর রহমন বৈঠক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই দেখল, এটা তাঁদের একটা কৌশল মাত্র। তাঁরা প্রস্তুত হওয়ার জন্য সময় নিচ্ছিলেন। প্রস্তুতি যখন হয়ে গেল তখন তাঁরা পুরোপুরি সেই উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে গেলেন। ২৫—২৬শে মার্চ ঠিক রাত একটার সময় সর্বত্র সেনাবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে তারা চেষ্টা করল শুধু নির্দিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করতে। তারা চিহ্নিত বাড়িগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ২৬শে মার্চ দিনের আলোয় তারা আরও সক্রিয় হয়ে উঠল। যেসব বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল সেগুলির উপর হামলা শুরু হল। গোটা দিন ধরে অকথ্য অত্যাচার চলল নিরীহ মানুষের উপর। এতক্ষণ পর্যন্ত বলতে গেলে তেমন কোনও প্রতিরোধ কোথাও হয়নি। কেউ সেনাবাহিনীকে বাধা দিতে সাহস পায়নি। একমাত্র ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ছাড়া। ২৬শে রাত্রির অন্ধকারে সাধারণ মানুষ সবাই জেলা শহরগুলি ছেড়ে দূর দূরান্ত গ্রামে পালালেন। ২৭ তারিখ থেকে প্রায় সব জেলা শহরেই প্রতিরোধ শুরু হল। সেনাবাহিনীর অত্যাচার এতদিনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারা নির্বিচারে শত শত মানুষকে গুলি করে মারতে শুরু করেছে। তারা ৮০।৯০ বছরের বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে নব জাতক পর্যন্ত কাউকে ছাড়ল না। তারা বাঙ্গালী মহিলাদের উপর পশুর চেয়েও অকথ্য অত্যাচার চালাল। প্রতিরোধ আরও বাড়ল। এগিয়ে এল ছেলেরা, এগিয়ে এল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙ্গালী রেজিমেন্টের সেনারা, এগিয়ে এল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙ্গালীরা এবং প্রায় গোটা আনসার, মোজাহেদ এবং পুলিস বাহিনী। আওয়ামী লীগ নেতাদের পূর্ব প্রস্তুতি বা যোগাযোগের ফলে এরা এল না। এরা এগিয়ে এল মা ভাই বোনদের উপর অকথ্য অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে।

চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি এলাকা থেকে চলে আসা কিছু ইউরোপীয়, মার্কিন এবং অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। কলকাতায়। দেশে ফিরে যাওয়ার পথে। অনেকেরই আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এখনও ওপারে রয়েছেন। তাই সবাই প্রাণ খুলে কথা বলেননি। তাছাড়া নিজ নিজ দেশের সরকারও তাঁদের বারণ করে দিয়েছেন মুখ খুলে কথা বলতে। জাহাজগুলি কলকাতা বন্দরে পৌঁছবার আগেই কলকাতার মার্কিন ও বৃটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা গিয়ে জাহাজে উঠেছেন। নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের তাঁরা সাবধান করে দিয়েছেন : কিছুই বল না রিপোর্টারদের। তবু কিছুটা কিছুটা বেরিয়ে এসেছে। প্রকাশ্যে নাম জানাতে বারণ করে এইসব বিদেশীরা বলেছেন পাক সেনাদের অত্যাচারের কাহিনী। এদের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণও ছিলেন। যাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেখেছেন। নাৎসী সেনাদের অত্যাচার দেখেছেন। তাঁরা সবাই বললেন : পাক সেনারা নাৎসী জল্লাদদের রেকরডকেও ম্লান করে দিয়েছে।

আমিও সম্প্রতি সাত আটদিন পূর্ব বাঙ্গলার ভেতরে ঘুরেছি। শহর থেকে দূরের, বিশেষ করে জেলা শহর থেকে দূরের গ্রামগুলিতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত। চাষী চাষ করছেন, হাট বাজার চলছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। তবে সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে প্রত্যেক গ্রামে লড়াইরও প্রস্তুতি চলছে। ছেলেরা লড়াইর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যারা শহরে শহরে লড়াই করছে গ্রাম থেকে তাদের জন্য সাহায্যও পাঠাচ্ছে যথাসম্ভব। পাক

সেনারা গ্রামে যেতে পারেনি। দূরের গ্রামগুলিতে যেতেই তারা সাহস পায়নি।

অস্বাভাবিক শহরগুলি। বিশেষ করে জেলা শহরগুলি। গোটা পূর্ব বঙ্গলার প্রায় সব জেলা শহর এখন জনশূন্য।

আমি যশোর শহরে গিয়েছিলাম। ১লা থেকে ৩রা এপরিল বিকাল পর্যন্ত যশোর শহর থেকে পাক সেনারা সরে গিয়েছিল। সেই সময়ে যশোর শহর ছিল মুক্তিসেনার অধীনে। ২রা এপরিল দুপুরে আমরা যশোর শহরে ঢুকেছিলাম।

মুক্ত যশোর। কিন্তু জনশূন্য। শহরের কোনও বাড়ির, কোনও অফিসের, কোনও দোকানের দুয়ার খোলা নেই। একজন বাসিন্দাও শহরে থাকতে ভরসা পাননি। সবাই পালিয়েছেন। পশুরা পর্যন্ত। যাঁরা মরেছেন পাক সেনাদের হাতে তাঁদের মৃতদেহগুলি সেইখানেই পড়ে আছে। স্বেচ্ছাসেবকরা কিছু কিছু মৃতদেহকে কবর দেবার চেষ্টা করছে।

যশোর কোরট ছাড়িয়ে ক্যানটনমেনটের দিকে এগিয়ে দেখলাম মাঠের মধ্যে একজন দরিদ্র বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়ে আছে। বোধহয় মাঠ দিয়ে পালাচ্ছিলেন। পারেননি। সেনাদের সামনে পড়ে গিয়েছিলেন।

বহু মৃতদেহ ছড়িয়ে। চাঁচড়ার রাজবাড়ির সামনে একটা বেশ বড় দীঘি। বহুদিনের দীঘি। তাই জল বেশী নেই। দেখলাম একজন মৃতের পা ভেসে আছে। শরীরের ওপরটা জলের নীচে কাদায় গেঁথে গিয়েছে। বোধহয় পাক সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে। কাদায় মাথাটা আটকে গিয়েছে।

একটা মসজিদ দেখলাম চাঁচড়ার মোড়ে। পাশের সব কাঁচা বাড়িগুলি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সেনারা। কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিল মসজিদের ভিতরে। সেখানেও ঢুকে মেসিনগান চালিয়েছে পাক সৈন্য। মসজিদের দেয়ালগুলি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

শহরগুলির আশপাশের সব গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে সেনারা। এগিয়েছে আর গুলি চালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগিয়েছে। যে পথ দিয়ে পাক সেনাবাহিনী এগিয়েছে সর্বত্র একই নিদর্শন। একই বর্বরতার চিহ্ন। নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষকে মারার একই নিদর্শন।

সেই পুরনো সাম্রাজ্যবাদী কায়দা, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ভুলে গিয়েছে, এ কায়দায় এখন আর সাম্রাজ্য শাসন চলে না। চলতে পারে না। কারণ এটা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

১১-৪-৭১।

নবারুণ গুপ্ত

বিসর্জন

দেবরাজ

বড়াই করে উইনস্টন চার্চিল একদিন বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লাটে তুলতে তিনি বিলেতের প্রধানমন্ত্রী হননি। কিন্তু গ্রহের এমনই ফের যে, সে সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় তাঁরই আমলে। ঠিক অমনি কথা জাঁক করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ হয়তো খোলাখুলি বলেন নি—আমি থাকতে পাকিস্তানের সূচাগ্র মেদিনীও হাতছাড়া হতে দেব, সদম্ভে এমনতর কোনও ঘোষণা তিনি হয়তো করেন নি। কিন্তু তাঁর মনের ভাবটা ওই রকমই। পূব বাংলাকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে তিনি নারাজ। প্রাণ গেলেও তার নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আর তাঁর দল আওয়ামি লীগের কোনও দাবিই তিনি মেনে নেবেন না এই তাঁর পণ। নইলে নাকি পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু যে কাণ্ড তিনি করছেন তাতে কী পাকিস্তানকে জিইয়ে রাখা সম্ভব হবে? দিনের পর দিন তাঁর হিংস্র ফৌজ লণ্ডভণ্ড করছে বাংলা দেশ। নিরস্ত্র লোকের ওপর তারা নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে, ট্যাঙ্ক চালিয়ে গোটা ঢাকা শহরটাকে মাঠ বানিয়ে ছেড়েছে, বোমা ফেলছে পূব বাংলার প্রতিটি শহরের ওপর. জাহাজ থেকে গোলা মেরে চট্টগ্রাম বন্দরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু এমন কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তাঁর লাভ হচ্ছে কী, আর আখেরেই বা কী হবে? এত অত্যাচারেও তো বাংলা দেশের লোকেদের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়নি।

লড়াইয়ে যদি ইয়াহিয়া খাঁর জিতও হয়—যদিও তার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না—তাহলে তিনি পাবেন কী? শাঁস তো মিলবেই না, আঁটিও নয়। শুধু ছোবড়া নিয়েই তাঁকে তুষ্ট থাকতে হবে। সে ছোবড়াও বেশী দিন তাঁকে চুষতে হবে না। আবার আগুন জ্বলে উঠবে বাংলা দেশে আর তাঁর ছোবড়াটুকু ছাই হয়ে যাবে। যতদিন না পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূব বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অশান্তি চলবে। ততদিন বাংলাদেশে তাদের দিনে স্বস্তি থাকবে না, রাতে ঘুম। এমন করে কী আর দেশ শাসন করা যায়? তা যদি যেতো তা হলে ইংরেজদের দুনিয়া-জোড়া এমন রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যেত না, ইন্দোচীনে আফ্রিকায় ফরাসীদের রাজ্যপাট বজায় থাকত, ওলন্দাজরা সুকর্ণর হাতে তাদের সাধের সাম্রাজ্য সঁপে দিয়ে মুখ কালো করে বিদেয় নিত না। গোটা দেশসুদ্ধ লোক যদি ক্ষেপে যায় তাহলে যত জবরদস্ত সরকারই হোক না কেন তার আর নিস্তার থাকে না—হয় তাকে মানে মানে সরে পড়তে হয় নয় তাকে গলাধাক্কা দিয়ে দূর করে দেয় লোকে।

অথচ চেষ্টা করলে ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারতেন। তার জন্যে দরকার ছিল সাহস আর স্বচ্ছ দৃষ্টি। কাজটা অবশ্য খুব সহজ হতো না. কিন্তু একেবারে অসম্ভবও তা ছিল না। পাকিস্তানকে নষ্ট করেছে গোঁড়া মৌলভির দল আর স্বার্থপর পাঞ্জাবী অভিজাত গোষ্ঠি। ধর্মের জিগীর তুলে মৌলভিরা চাপা দিতে চেয়েছেন পাকিস্তানের আসল অবস্থা। পাঞ্জাবী অভিজাতচক্রের হাতে প্রশাসন, ফৌজ, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প। তারা দিব্যি মজা লুটেছে পূবে পশ্চিমে আর চেয়েছে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ ছলে বলে কৌশলে বজায় রাখতে। গোল বাধিয়েছেন ইয়াহিয়া খাঁ এদের ফাঁদে পা দিয়ে। তিনি যদি নির্বাচকমণ্ডলীর রায় মেনে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের আর তাঁর আওয়ামি লীগের হাতে দেশের ভার তুলে দিয়ে ছুটি নিতেন তাহলে পশ্চিমী পাঞ্জাবীরা চটতো বটে কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষা পেত, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও। মুজিবুর রহমানকে ঘর ভাঙানি বলে পাকিস্তান রেডিও যে গালাগালি দিয়ে চলেছে তা ডাহা মিথ্যে। পাকিস্তান ভেঙে দেওয়ার কোনও ফন্দি আওয়ামি লীগ করেনি, নির্বাচনের সময় তেমন দাবি তারা তোলেও নি। ইয়াহিয়া খাঁ যদি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাঁর ফৌজদের নিরীহ বাঙালীদের ওপর লেলিয়ে না দিতেন তাহলে মুজিবর রহমান বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন না।

মুজিবর ভুঁইফোড় নেতা নন। তিনি অনেক দেখেছেন, অনেক সয়েছেন। আর পাঁচজন পাকিস্তানী নেতার মতো তিনিও এককালে পাকিস্তানের ভক্ত ছিলেন, ভেবেছিলেন পূবে বাংলার লোকেদের কষ্ট ঘোচাবে সেখানকার নয়া জমানা ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে, ইংরেজ শাসনের কবজ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে। ভুলেও তিনি ভাবেন নি যে জ্বলন্ত উনুন থেকে তাঁর দেশ গিয়ে পড়লো তপ্ত তাওয়ায়। চব্বিশ বছর ধরে তিনি দেখে আসছেন পাকিস্তানের বিরাট আসরে মাতব্বরি করছে পাঞ্জাবীরা বাঙালীর ঠাঁই সেখানে নেই বললেই হয় যদিও গণতন্ত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী সবার আগে আসন পাওয়ার কথা তারই। পাকিস্তানের রাজধানী হলো পশ্চিম এলাকায়। রাষ্ট্রভাষা হলো উর্দু যা পূবে বাংলার কেউ বলেও না, জানেও না, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো সব সরকারী পদ তা পাঞ্জাবীদেরই একচেটে। পল্টনে তো বাঙালীরা অধমেরও অধম। টাকা যা খরচ হচ্ছে তা বেশীর ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের তেলা মাথায় তেল ঢালতে।

তবুও বাঙালীদের ধৈর্য ভাঙেনি। তারা কাকুতিমিনতি করেছে বিস্তর পশ্চিম পাকিস্তানী আমীর ওমরাদের কাছে, মনে করিয়ে দিয়েছে তাদের দেশটা একা পশ্চিমের নয়, পূবেরও তাতে হিস্যা আছে আর সে হিস্যাটাই পাটিগণিতের নিয়মে বড়। দরবার করেছে তারা করাচি-পিণ্ডি-ইসলামাবাদে দেশ গড়ার দায়িত্ব তারাও নিতে চায় পশ্চিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, প্রশাসনে, ফৌজে, রাজনীতিতে, কূটনীতিতে যোগ দিয়ে। ভেতো বাঙালীর আবেদন নিবেদনে পাঞ্জাবীর পাথুরে মন গলেনি। সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠলো না, বাঙালী তখন আঙুল বেঁকাতে শুরু করলে। বাবু-বাছা করে যা পাওয়া যায়নি—যা কোনও দিন পাওয়া যাবে বলে মনেও হয়নি—তা পাওয়া গেল বিদ্রোহী হয়ে। পাকিস্তানে উর্দুর সঙ্গে বাংলাও পেল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। রক্তের কড়ি দিয়ে পেতে হয়েছিল সে অধিকার। তাতেও কিন্তু বাঙালীরা অসুখী হয়নি—পাকিস্তান থেকে উর্দু ভাষাকে বিদেয় দেবার দাবিও তোলেনি। পাকিস্তানে থেকেই নিজের জীবনকে সার্থক করতে চেয়েছিল পূবে বাংলার বাসিন্দা।

পাঞ্জাবী শাসকগোষ্ঠির ইচ্ছে নয় যে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঙালীরা বেঁচে থাকুক পাকিস্তানে। তারা চায় কুলিমজুর চাষাভুষো হয়েই বাঙালী দিন কাটাক, বড় জোর কেরানী হোক মাস্টার হোক, নিদেন পক্ষে উকিল কিংবা ডাক্তার। কিন্তু পশ্চিমাদের সঙ্গে সমান তালে সমান চালে চলার স্পর্ধা অসহ্য। তাই তারা অছিলে খুঁজে ফিরেছে কী করে বাঙালীকে চিরদিনের জন্যে দাবিয়ে রাখা যায়। নির্বাচনে আওয়ামি লীগের জিত এনে দিয়েছে সেই সুযোগ। মুজিবুর রহমান পূবে বাংলার স্বাতন্ত্র্য ছাড়া কিছু চাননি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাঙালী চাষী যে পাট তুলছে, চায়ের চাষ করছে তার মুনাফা তারই ভোগে লাগুক এই ছিল তাঁর দাবি, শোষণ-মুক্ত হয়ে পূবে বাংলা নতুন জীবন পাক এই ছিল তাঁর আশা। অন্যায় এর মধ্যে কিছু নেই, নেই দেশদ্রোহিতার নামগন্ধ। কিন্তু তা মানলে তো আর পশ্চিম পাকিস্তানের রবরবা থাকে না। তাদের চাপে পড়ে ইয়াহিয়া খাঁ বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছেন গণতন্ত্র আর ন্যায়বিচার। মিথ্যে অপবাদ দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে চাইছেন বাঙালীদের। ফল হয়েছে উল্টো। বাঙালীরা মরেনি। মরতে বসেছে পাঞ্জাবীদের সাধের পাকিস্তান। তার কবর খোঁড়া হয়েছে বাংলা দেশে যাকে তারা এত ঘেন্না করে।

বিনামূল্যে! শিঙার কুমকুম

তিনটি হালফ্যাশানের সেরা রঙের শিঙার
কুমকুমের একটি 'সেট' পাবেন হেজলীন স্নোর প্রত্যেক শিশির সঙ্গে।

হেজলীন স্নো

এই অপূর্ব্ব সুযোগ হারাবেন না।
বিনা মূল্যের এই উপহারটি
আপনার নিজস্ব।
আপনার পোষাকের সঙ্গে রঙ
মিলিয়ে মোট ৯টি নয়নাভিরাম
রঙের কুমকুম সংগ্রহ করুন।
মনে রাখবেন, হেজলীন স্নোই
আসলে একটি উপহার বিশেষ।
এই লোভনীয় সৌন্দর্য ক্রীম
যেমন মোলায়েম তেমনি কোমল
এর স্পর্শ।

তাড়াতাড়ি করুন!
স্টক থাকতে থাকতে!

হেজলীন স্নো

স্বাভাবিক সুকুমার সৌন্দর্যের গোপনকথা

Bens

এক নবদম্পতির উদ্দেশে—চট্টগ্রামে

বুদ্ধদেব বসু

আজ রাত্রে বালিশ ফেলে দাও, মাথা রাখো পরস্পরের বাহুতে,
শোনো দূরে সমুদ্রের স্বর, আর ঝাউবনে স্বপ্নের মতো নিস্বন,
ঘুমিয়ে পোড়ো না, কথা ব'লেও নষ্ট কোরো না এই রাত্রি—
শুধু অনুভব করো অস্তিত্ব।

কেননা কথাগুলোকে বড়ো নিষ্ঠুরভাবে চটকানো হ'য়ে গেছে,
কোনো উক্তি নির্মল নয় আর, কোনো বিশেষণ জীবন্ত নেই;
তাই সব ঘোষণা এত সুগোল, যেন দোকানের জানলায় পুতুল—
অতি চতুর রবারে তৈরি, রঙিন।

কিন্তু তোমরা কেন ধরা দেবে সেই মিথ্যায়, তোমরা যারা সম্পন্ন,
তোমরা যারা মাটির তলায় শস্যের মতো বর্ধিষ্ণু?
বোলো না 'সুন্দর', বোলো না 'ভালোবাসা', উচ্ছ্বাস হারিয়ে ফেলো না
নিজেদের—
শুধু আবিষ্কার করো, নিঃশব্দে।

আবিষ্কার করো সেই জগৎ, যার কোথাও কোনো সীমান্ত নেই,
যার উপর দিয়ে বাতাস ব'য়ে যায় চিরকালের সমুদ্র থেকে,
যার আকাশে এক অনির্বাণ পুঁথি বিস্তীর্ণ—
নক্ষত্রময়, বিস্মৃতিহীন।

আলিঙ্গন করো সেই জগৎকে, পরস্পরের চেতনার মধ্যে, নিবিড়।
দেখবে কেমন ছোটো হ'তেও জানে সে, যেন মুঠোর মধ্যে ধ'রে যায়,
যেন বাহুর ভাঁজে গহ্বর, যেখানে তোমরা মুখ গুঁজে আছো
অন্ধকারে, গোপনতায় নিস্পন্দ—

সেই এক বিন্দু স্থান, যা পবিত্র, আক্রমণের অতীত,
যোদ্ধার পক্ষে অদৃশ্য, মানচিত্রে চিহ্নিত নয়,
রেডিও আর হেডলাইনের বাইরে সংঘর্ষ থেকে উত্তীর্ণ—
যেখানে কিছু ঘটে না শুধু আছে সব

সব আছে—কেননা তোমাদেরই হৃদয় আজ ছড়িয়ে পড়লো
ঝাউবনে মর্মর তুলে, সমুদ্রের বিরতিহীন নিস্বনে,
নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, দিগন্তের সংকেতরেখায়—
সব অতীত, সব ভবিষ্যৎ আজ তোমাদের।

আমাকে ভুল বুঝো না। আমি জানি, বারুদ কত নিরপেক্ষ,
প্রাণ কত বিপন্ন।
কাল হয়তো আগুন জ্বলবে দারুণ, হত্যা হবে লেলিহান,
যেমন আগে, অনেকবার, আমাদের মাতৃভূমি এই পৃথিবীর
মৃত্তিকায়—
চাকার ঘূর্ণনের মতো পুনরাবৃত্ত।

তবু এও জানি ইতিহাস এক শৃঙ্খল, আর আমরা চাই মুক্তি,
আর মুক্তি আছে কোন পথে, বলো, চেষ্টাহীন মিলনে ছাড়া?
মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের—
যার প্রমাণ, যার প্রতীক আজ তোমরা।

নাজমা, শামসুদ্দিন, আর রাত্রির বুকে লুকিয়ে-থাকা যত প্রেমিক,
যারা ভোলোনি আমাদের সনাতন চুক্তি, সমুদ্র আর নক্ষত্রের সঙ্গে,
রচনা করেছো পরস্পরের বাহুর ভাঁজে আমাদের জন্য
এক স্বর্গের আভাস, অমরতার কল্পনা:

আমি ভাবছি তোমাদের কথা আজকের দিনে, সারাক্ষণ—
সেই একটিমাত্র শিখা আমার অন্ধকারে, আমার চোখের সামনে
নিশান।
মনে হয় এই জগৎ-জোড়া দুর্গন্ধ আর অফুরান বিবমিষার বিরুদ্ধে
শুধু তোমরা আছো উত্তর, আর উদ্ধার।

প্রবীণ কবি জসীম উদ্‌দীন দীর্ঘকাল যাবৎ ওপার বাংলার অধিবাসী। কিন্তু এপার বাংলাকে যে তিনি ভুলতে পারেননি তার প্রমাণ নিম্নোক্ত কবিতাটি। বিশেষভাবে "দেশ" পত্রিকার জন্য রচিত এই কবিতাটি ঢাকা থেকে তিনি পাঠিয়েছেন গত সাতাশে ফেব্রুয়ারি তারিখে। তাঁর রচিত কবিতা স্বাধীন বাংলা দেশ সম্পর্কিত এই বিশেষ সংখ্যার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে স্বাধীন বাংলা দেশের দুই বিশিষ্ট তরুণ কবি শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমানের দুটি সাম্প্রতিক রচনার পুনর্মুদ্রণ করা হল। দুটি কবিতাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার অল্প পূর্বে রচিত এবং ঢাকার একটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পুত্রহারা

জসীম উদ্‌দীন

মা

তোমরা কি কেউ দেখেছ আমার সোনার বাছনীটিরে,
আমার বুকের আদর যে তার অঙ্গে রয়েছে ঘিরে।
এখনো তাহার অধরে আমার রয়েছে চুমোর চিন,
এখনো তাহার কথায় বাজিছে আমার বুকের বীণ।
কি কারণে যেন মায়েরে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল,
কত পথ আমি রোদনে ভাসানু সে নাহি ফিরিয়া এলো।

পথিক

দেখেছি সে এক সৌম্য মুরতি, বই পুস্তক লয়ে,
আছে মশগুল শতেক শিষ্য পরিবৃত সে হয়ে।
পুঁথির পাতায় তাহার খ্যাতির অশ্ব-মেধের হয়,
দেশ দেশান্তে ঘুরিয়া সদাই বহিয়া আনিছে জয়।
পাতালের বালি আকাশের তারা দুই নখে তার গোনা,
বিশ্ব জগৎ ভরিয়া তাহার সুখ্যাতি-জাল বোনা।
সেই কি তোমার বুকের বাছনী বল অভাগিনী মাতা,
তারি তরে কি গো তব স্নেহ-বুক আকাশে বাতাসে পাতা?

মা

সে নয়—সে নয় আমার বাছনী, মুখে তার মৃদু হাসি,
গড়ায়ে পড়িছে পথে পথে শত শুভ্র ফুলের রাশি।
এমন তাহার চলন বলন এমন গঠন তার,
আমার বুকের মায়েলী স্নেহের মুরতী সে সুকুমার।

পথিক

তোমার ছেলের মতই দেখেছি, শ্রেষ্ঠী সে একজন,
মণি-মুক্তার পাহাড়ের পরে তাহার সিংহাসন।
দেশের যতেক সুখসম্পদ তাহার মুঠার তলে,
ইচ্ছামতন দেয় কারে কারে অনুগ্রহিত হলে।
সেই হতে পারে তোমার সে ছেলে, শোনগো দুঃখিনী মাতা,
তারি তরে বুঝি তব স্নেহ-বুক আকাশে বাতাসে পাতা।

মা

সে নয়—সে নয় আমার বাছনী, সৌম্য মুরতি তার,
বিদ্যুদ্দাম জড়াইয়া তারে প্রদক্ষে অনিবার।
যেথায় সে যায় কহন কথার কত যে কাহিনী গড়ে,
শুধ মেয়েনাকো মায়েদের মনে তাহারে আদর করে।
সোনার অঙ্গে রূপের লাবণি জড়ায়ে রয়েছে তায়,
বলত পথিক তাহার বিরহ কেমনে সহিছে মায়?

পথিক

সেই যে দেখেছি সমর ক্ষেত্রে মহা-সৈনিক সাজে,
দীপ্ত সাহসে অশনি গ্রাশনে যুঝিছে শত্রু মাঝে।
অঙ্গ তাহার শতক্ষতে লেখা খ্যাতির চিহ্নময়,
শত্রু নিধনে লহুর গঙ্গা পদতলে তার বয়।
দেশ-দেশান্তে তার জয়-গাথা গাহিছে ভাটের দল,
কীর্তিতে তার এ বোবা মেদিনী হয়ে ওঠে চঞ্চল।
সে হয়ত হতে পারে তব ছেলে, শোন অভাগিনী মাতা,
তারি তরে বুঝি দেশ-দেশান্তে তব স্নেহ-বুক পাতা।

মা

সে নয়—সে নয় আমার বাছনী, সৌম্য মুরতি তার,
যে দেখে তাহারে স্তব্ধ হয়ে পথে লুটায় যে অনিবার।
মুখে তার হাসি মধুর মধুর দুখ সন্তাপ নাশে,
তারে হেরি হৃদে মমতা কুসুম ফুটিয়া ফুটিয়া হাসে।
এমনি তাহার গঠন গাঠন, এমনি করিয়া চলে,
সহজেই তারে চিনিতে পারিবে কিছু মনোযোগী হলে।
শোনগো পথিক কত দেশে যাও দেখা যদি পাও তার,
কহিও এ বুকে শোকের চুল্লী জ্বলিছে অভাগী মার।

পথিক

হয়ত দেখেছি, সেই একদেশে রুগ্নজনের মাঝে,
মমতা-মুরতি ধরিয়া সে জন রয়েছে সেবার কাজে।
মুমূর্ষু রোগী জ্ঞান ফিরে পেয়ে হেরিছে শিয়রে তার,
কোন ফেরেশতা বসিয়া রয়েছে কত যেন আপনার।
শিরে দেয় হাত অধর মুছায় কহিয়া স্নেহের বাণী,
রোগের যাতনা সবটুকু যেন লয় সে হৃদয়ে টানি।
শুধালে কে তুমি? বলে মৃদুস্বরে ভাই ওরে শুধু ভাই
ভায়ের ব্যথার উপশম লাগি যোগী সাজিয়াছি তাই।
মহামারী আর বসন্ত রোগে ভরেছে সকল দেশ,
সেখানে ফিরিছে ঔষধ লয়ে সেই নয়া দরবেশ।
রুগ্নজনের মুখে দেয় পানি অঙ্গে বুলায় হাত,
আপন বুকের যত স্নেহ আছে মেখে দেয় তারি সাথ।
হেরিয়া তাহারে রোগ যন্ত্রণা রোগীরা ভুলিয়া যায়
যেন তাহাদের অঙ্গ ভরিয়া আদরায় স্নেহ-মায়।
সৌম্য-মুরতি অশ্রুসজল পীড়িত জনের দুখে,
আপনার সুখ দেছে বলিদান আনিতে পরের সুখে।
নিজের মৃত্যু মুঠায় লইয়া পরের মৃত্যুাসনে
যুঝিয়া চলেছে রোগ-ব্যাধি আর মারীর ভীষণ রণে।

মা

সেই—সেই হবে আমার বাছনী আমার বুকের মায়া,
তাহার জীবনে পেয়েছে আজিকে সেবার মুরতি কায়া।
শোন গো পথিক সেই দেশে তুমি আমারে চলগো লয়ে,
আমি হব তার কাজের দোসর মাতা ছেলে এক হয়ে। *

* কোন বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে।

দুঃসময়ে মুখোমুখি

শামসুর রাহমান

বাচ্চু তুমি, বাচ্চু তুই, চলে যাও, চলে যা সেখানে
ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে। আমি ব্যস্ত, বড়ো ব্যস্ত
এখন তোমার সঙ্গে, তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন
একটুও সময় নেই। কেন তুই মিছেমিছে এখানে দাঁড়িয়ে
কষ্ট পাবি বল?

না, তোকে বসতে বলবো না,
কস্মিনকালেও,
তুই যা, চলে যা।
দেখছিস না আমার হাতে কতো কাজ, দু-ঘণ্টায়
পাঠক-ঠকানো
নিপুণ সম্পাদকীয় লিখতেই হবে, তদুপরি
আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দেশ-বিদেশের বহু চিঠির জবাব এবং
প্রুফের তাড়া, নিত্য-নৈমিত্তিক
কবিতার সোনালি তাগাদ।
পত্রী-পত্রে কলার জন্য কিছু ঘণ্টা
বাঁচিয়ে রাখতে হয়, আমার সময় প্রতিদিন
সুমিষ্ট পিঠের মতো
ভাগ করে নিমন্ত্রিত খাচ্ছে যে সবাই।
তোর সঙ্গে বাক্যালাপ করার মতন, বাচ্চু তুই
বলতো সময় কই? কতক্ষণ থাকবি দাঁড়িয়ে,
রাখবি ঝুলিয়ে ঠোঁটে দুষ্টু হাসি?
তুই তো নাছোড় ভারী; গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে
এক্ষুনি চলে যা
সরাসরি চক্রাকৃতি রোডে; ছেচল্লিশ মাহুৎটুলীর খোলা ছাদে।
চকোলেট দেবো তোকে, দেবো তালশাঁস,
তুই যা চলে যা।
আমাকে তুই না পেলে আমার সকল কাজ রইবে পড়ে।
পাশের বাড়ির তেজপাতা-রঙ বুড়িটার ঘরে
মাঘের সকালে
মায়ের কল্যাণী হাতে বোনা চাদরে সোয়েটার পরে
সেওয়াম কিনতে পিঠা মোরগের ডাক-সচকিত
চাঁপা ভোরে, তোর মনে নেই
মেয়েদের সঙ্গে, নতুন মামীর সঙ্গে,
মামীর সাধের
আচারের বৈয়াম করেছি লুট দুপুর বেলায়,
তোর মনে নেই?
চক বাজারের ঘিঞ্জি গলির কিনারে
ম্যাজিকঅলার খেলা দেখেছি মোহন সন্ধ্যাবেলা
তোর মনে নেই?
মিছিলে নাদিরা ছিল, আমি তাকে দেখে চটপট
মিছিলের আলো নিতে হলাম আগ্রহী, চৌরাস্তায়
সুদিনের জন্যে বাগ্র দিলাম স্লোগান অনিবার—
তোর মনে নেই?
আমিও সাঁকোর ধারে গেছিলাম খেলায়, সঙ্গী পিতা।
চকিতে অদৃশ্য সাঁকো, জায়গাটা ভীষণ ফাঁকা, খাঁ খাঁ
মনে হলো যেমন অতর্কিত শূন্য লাগে ক্যানভাস,
চিত্রকর ফেললে মুছে ভুল ছবি তার।
চিকণ দিগন্তে হাম্বা রব, বললেন তো পাড়াতলী কতদূরে?
সঙ্গে তিনি, হেঁটে যেতে যেতে দিতেন মুগ্ধের নাম বলে
বলতেন, ঐ যে ছোট্ট খরগোশ, অনেক দূরের বিল থেকে
সদ্য-আনা শিকারের বোঝাটা নামিয়ে
রঙবেরঙের পাখিগুলো
সনাক্ত করতে ভিন্ন ভিন্ন নামে কি যে মজা পেতেন শিকারী।
দীর্ঘকাল সত্যি আমি মসজিদে যাইনি, শৈশবে
আজান যেতেন নিয়ে হাত ধরে মনে পড়ে। ইমামের সুরেলা
অবোধ্য ঠেকতো বলে ঝাড়লণ্ঠনের
শোভা কিংবা দেয়ালে শোভন লতাপাতা, ঠাণ্ডা টালি
দেখে, হৌজে রঙিন মাছের খেলা দেখে
কাটতো সময় মসজিদে, তোর মনে নেই?
কখনো ঝড়ের রাতে উথাল পাথাল রাতে, ব্যাকুল বাজান
দিতেন আজান, যেন উদাত্ত সে স্বর রুখবেই
অমন দামাল ঝড়, বাঁচাবে পুত্রের ঘরবাড়ি—
তোর মনে নেই?
কী বললি? এসেছিস দেখতে আমাকে?
এখন কেমন আছি? কতো সুখে আছি?
নাকি তুই চতুর ছদ্মবেশে
আমার ইন্টারভিউ নিতে চাস এতদিন পর।
চিঠির খামের গায়ে আমার নামের আগে 'জনাব' দেখে কি
তোর খুব পাচ্ছে হাসি? শোন,
আমি শামসুর রাহমান, মানে ভদ্রলোক, দিব্যি
ক্লিন-শেভড, ব্লেডের কৃপায়
আর ধোপদুরস্ত পোশাকে
এখানে সেখানে করি চলাফেরা বড়ো ঝলমলে
সামাজিকতায় ভরপুর,
কখনো উদাস ঘুরি চোরা কুঠুরিতে।
আমি শামসুর রাহমান, মানে সাংবাদিক, ক্ষিপ্র ভাষাকার;
আমি শামসুর রাহমান, মানে কবি......
আইডিয়াভিযানে আমিও
কখনো সমুদ্রে ভাসি, পর্বত শিখরে আরোহণ করি কখনো-বা,
পার হই রুক্ষ মরুভূমি, মেরুপথে পতাকা
আপন নিশান।
একটি অদ্ভুত ঘোড়া আমাকে পায়ের নিচে পেলে
চলে যায় দূরে তার কেশর দুলিয়ে
কখনো শিকার করি, হরিণ শিকার করি ঘরে।
আমার আনিমা ক্লান্তিহীন সুদর্শনা হবে
আমাকে অনেক কাছে ডাকে মত্ত নদীর ওপারে।
আমি তার সান্নিধ্যের লোভে
আপ্রাণ সাঁতার কাটি। তীরে প্রেতভূমি, সুদর্শনা
অকস্মাৎ পেঁচা হয়ে উড়ে যায়। নদী পেরুনোর
ব্যর্থ প্রয়াসে কেমন হারিয়ে যাই পরিণামহীন।
চিনতিস তুই যাকে, সে আমার মধ্য থেকে উঠে অন্তরালে
চলে গেছে। তুই বাচ্চু, তুই বড্ডো ছেলেমানুষ, অবুঝ।
কী বললি? শামসুর রাহমান নামক ধূসর
ভদ্রলোকটির
সন্তান রয়েছি তুই? তবে কোন্ ইন্দ্রজালে আজো
অমন সবুজ রয়ে গেলি, রয়ে গেলি এগারোয় স্থির?
এই যে আমাকে দ্যাখ, ভালো করে দ্যাখ,
দ্যাখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে—
আমার জুলপি সাদা দীর্ঘশ্বাসে ভরা, দক্ষিণেরে
প্রায়শ কাতর হই, চশমার পাওয়ার
দ্রুত যাচ্ছে বেড়ে......
এখন এই তো আমি বাস্তব অবসন্ন, বিশ্রামের নেই মহলত।
উজাড় নাইফেলের প্রেত ঘুরি ফাঁকা বারান্দায়।
এখন আমিও খুব সহজে ঠকাতে পারি, মধ্যুর নিন্দায়
মেতে যেতে উঠতে লাগে না দু মিনিটও; কখনো-বা
আত্মীয়ের মৃত্যু কামনায় কাটে বেলা,
আমাকে ভীষণ ঘেন্না করছিস, না রে?
এখন এই তো আমি। চিনতিস তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূরে ধু ধু অন্তরালে চলে গেছে। তুইও যা, চলে যা।

রোশনারা

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধূসের আকাশ তোমার পরশে সহসা হয়েছে নীল,
বাংলার নদী তোমার প্রাণের জোয়ারে দুকূলহারা,
তুমি খুলে দেছো মোদের প্রাণের রুদ্ধ দ্বারের খিল,
চির-বসন্ত বাংলার তুমি, অতুলনা রোশনারা।

আবার বুকের নীড়ে স্পন্দন করিয়াছে ভিড়,
আবার জেগেছে প্রাণে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার ফোয়ারা,
অবিশ্বাস ঠেলে ফেলে ভালোবাসা তোলে তার শির,
এ সব তোমারই সৃষ্টি—বাঙলার মেয়ে রোশনারা।

দুর্জয় বিপ্লব-বহ্নি জ্বলে নিত্য বাঙলার প্রাণে,
ক্ষুদ্র যাহা, ভীরু যাহা অগ্নি-ভস্মে মিলায় তাহারা,
নিখিলের হিয়া তুমি ভরে দিলে আগুনের গানে,
বহ্নির রূপ ধরি দেখা দিলে তুমি রোশনারা।

অস্ত্র আমার

হাসান হাফিজুর রহমান

নিসর্গের কণ্ঠজোড়া বর্ণিলপর্ণী টাইয়ের মতো
অজস্র উড়ছে শাড়ি
সারা দেশে একটিও মার্কিন পতাকা নেই,
অনাহত বাতাসের বিশুদ্ধ চলাচলে,
শিশুদের তাজা মুখ যেন ভোরের নিটোল ফুলে,
ঘরে ঘরে অপাপ বাগানের কণ্ঠবলা ছায়া,
অপার হর্মবাজি নিরেট ঔদ্ধত্যে আর ঠেকায় না কাউকেই দূরে।

ফুটপাতে ফুটপাতে কথকতা, রাজপথে ভাই ভাই হেঁটে চলে
কিংবা দৌড়য় দ্রুত কারে বা ডবল ডেকারে,
গ্রামকে টেনে নেয় শহর, শহরের কোলে বসে গ্রাম
ভোলে অভিমান,
আদিগন্ত সারি সারি পথের বাতির আবাহনে সন্ধ্যা নামে,
বাসাহারানোর ভয় ভুলে যায় পাখি।
ধূসর আকাশজোড়া আবিরের সুরঞ্জনা হাস্যময় পাড়।

দূরবিলাসী তীর্যক চোখ হেনে
বিদ্রূপের বেড়িবাঁধ ফাটিয়ে চৌচির
তক্ষুনি খিল খিল পড়বে লুটিয়ে তুমি
তাচ্ছিল্যের ঝঞ্ঝা হয়েঃ
এমন অভাবিত দৃশ্য তুমি কোথায় পেলে?
কোন্ দিবাস্বপ্ন এমন অলীক স্বর্গ
দিল হাতে তুলে? স্বেচ্ছায় বুঝি বা
প্রত্যুত্তরে আমার কথার দামে তোমাকে মহার্ঘ
করবো না আর। বরং দ্যাখো চেয়ে, নিজেরই স্নায়ুর কম্পনে
জেনে নাও ভবিতব্য অদূর অনিবার্য। দ্যাখো,
আজন্ম লালিত ধ্যানের প্রাসাদে তোমার ধরেছে ফাটল।
স্বপ্ন নয়—এক বিপরীত সত্য আজ ধূলিতে ধূলিতে কথা বলে।

তবুও বাঁকিয়ে ঘাড় অবিশ্বাসে তুরুপের শেষ তাস
ছাড়বে তুমি পরিত্রাণের সুখী হাঁপ ছেড়েঃ
অনাদি অটল দুর্গজয়ী অস্ত্র পাবে কোথায়?

মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
দ্যাখো না লক্ষ কোটি তীর চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,
কণ্ঠ তাদের আকাশবাতাস ছেয়ে?
অস্ত্র আমার তাদের চোখ,
অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা।

মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল

সামসুল হক

মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল, স্নান কর নির্মল নদীতে,—
জোয়ারে ছাপায় কূল—লাল জল—বুক থেকে টাট্‌কা প্রবাহিত।
নদীর উপরে নৌকো, গান ওঠে—জয় বাংলা, দস্যু কেঁপে ওঠে;
মাগো, শুধু তোর জন্যে ঘাট জুড়ে সূর্য-গলা লক্ষ পদ্ম ফোটে।

মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল আমাদের রক্তের নদীতে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

অগ্নি ভেলায় জ্বেলো বাতি

বল বীর, বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

এতদিন নিজেকে প্রশ্ন করেছি—এই বীররা কোথায়, তারা কি কেবল স্বপ্নলোকবাসী, কবির কল্পনাতেই তাদের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়? দু'চারজন যুবকের কথা মাঝে-মধ্যে শোনা যেত অবশ্য যাদের আমরা বিপ্লবী বলে জানতাম, নিন্দুকেরা আখ্যা দিতেন "সন্ত্রাসিক"। সব চেয়ে বড় বিপ্লবী-বীর যিনি তিনি প্রাণত্যাগ করলেন এক ধর্মান্ধের গুলিতে ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে। দূর দেশ থেকে বড়ো আকারের বীরত্বের কাহিনী ভেসে আসত—১৯৪১-৪২ সালে ইংল্যান্ড থেকে, সোভিয়েট রাশিয়া থেকে, কয়েক বছর পরে য়েনান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে, আরো সম্প্রতিকালে আলজিরিয়া থেকে, উত্তর ভিয়েতনাম থেকে। কে জানত বীরত্বের এমন জাজ্বল্যমান, এমন সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধেয় রূপ দেখা দেবে আমাদেরি বাড়ির পাশে, তাদেরি মধ্যে যাদের সঙ্গে এক মধুর ভাষা ও মহৎ সাহিত্যের সোনালী সূত্রে আমাদের রাখীবন্ধন সুদৃঢ়। সব চেয়ে নিবিড়ভাবে এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলা মিলেছে রবীন্দ্র প্রেমে। দুই বাংলা এক নয়, তবু তাদের ঐক্য বড়ো সুন্দর।

ঐক্য প্রধানত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। সে ঐক্য আজ আমাদের, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-কর্মীদের পক্ষে যেমন মর্মান্তিক বেদনার কারণ হয়েছে তেমনি অভূতপূর্ব গর্বের। যার নাম করতেও ঘৃণা বোধ হয় সেই টিক্কা খাঁর আদেশে ২৬শে মার্চ রাত্রে ঢাকা শহরে প্রথম হামলার সবচেয়ে হিংস্র আঘাত পড়ল প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিকদের উপর এবং দেশপ্রেমে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের উপর। চূড়ান্ত বর্বরতা, সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঐ বর্বরদের মগজে কিছু বুদ্ধি ছিল, যেমন চিতাবাঘের মগজেও থাকে। তারা খোঁজ খবর নিয়ে ঠিকই জানতে পেরেছিল যে বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল ওখানকার জ্ঞানী, স্রষ্টা ও ছাত্রদের জাগ্রত বুদ্ধি এবং উদ্দীপনাময় কর্মশক্তি। এতে আমরা স্বভাবতই গর্বিত। কিন্তু মার্শাল ল-এর ঐ মূঢ় অধিকর্তা বুঝতে পারে নি যে, চিত্তের আলো একবার জ্বলে উঠলে তাকে ফুঁ দিয়ে নেভানো যায় না; প্রাগৈতিহাসিক বিরাটকায় জন্তুদের মতন বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস টেনে যতই ফুঁ দেওয়া হয় ততই সে আলো ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানী এবং স্রষ্টার বুকে গুলি বসিয়ে দিলে তাঁরা মরেন না, অমর হয়ে থাকেন এই পৃথিবীতেই। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ পাদ্রিরা একথা জেনেছিলেন বহু শত প্রতিভাবানকে পুড়িয়ে ফেলে; পাকিস্তানের হিংস্র জেনেরালরাও একথা জানবেন শীঘ্রই। তবে সভ্য জগতের মনে (যদিও ভূভাগের কতটুকু অংশ আজ সভ্য তা মানচিত্রে খুঁজে বার করতে হলে আতশী কাচ লাগে) এবং ভাবী ইতিহাসের পাতায় ঐসব জেনেরালদের কলঙ্কিত নাম বেশ কিছুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হুলাগু খাঁকে, নাদির শাহকে, হিটলারকে কি আমরা সহজে ভুলতে পারব?

কয়েক মাস আগে আমার এক মামাতো বোনের সতেরো বছরের নাতনী নায়লা এলো ঢাকা থেকে, কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য। আমার ঘরে বসে এক সন্ধ্যায় গেয়ে শোনালো "ওহে জীবন বল্লভ"। কলানৈপুণ্যে খুব উঁচুদরের ছিল না, কিন্তু সমস্ত দেহমনপ্রাণ ঢেলে গাইল সে। তার গভীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসা আমার মনকে স্পর্শ করল। আমি নীলিমা সেনের দুটি রেকর্ড বাজালাম। তার চোখে জল এল। বুঝলাম সে সত্যিই আমার আত্মীয়; রক্তের সম্পর্ক তো বাইরের জিনিস, দৈহিক ব্যাপার। সনজীদা, ফাহমীদা, রাখী, বিলকীসের পরিশীলিত কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবার পর তো আমি ভাবতে পারি না এরা ভিনদেশের মেয়ে। পার্টিশানের দেওয়াল মজবুত করে, উঁচু করে তোলা থাক থাকাই ভালো; নানা ঐতিহাসিক, রাজনীতিক এবং সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কী এসে যায় তাতে। সে দেওয়াল ভেদ করে আমরা মিলেছি যার ডাকে (মুজীব হয়তো বলবেন মায়ের ডাকে) তার স্থান সমস্ত রাজনীতির অনেক উপরে। নায়লা কি এখন বেঁচে আছে?

আমার রক্ত সম্পর্কিত কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানেও আছেন, পূর্ব বাংলাতেও আছেন। তাঁদের কথা আমি ভাবছি না। আমি সর্বক্ষণ ভাবছি আমার সেই লক্ষ লক্ষ আত্মীয়ের কথা যাঁরা অনমনীয় বীর্যে ও অকুণ্ঠ আত্মদানে স্বাধীন বাংলা দেশ গড়ে তুলছেন—সেই বাংলা দেশ যার জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"। কেবল একই সাহিত্যানুরাগ নয়, একই প্রকার সমাজচেতনা ও ধর্মচেতনা পদ্মার দুই পারের বাঙালীকে অনুপ্রাণিত করে। সে সমাজচেতনা সহিষ্ণু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ডিকটেটরশিপ মাত্রকে ঘৃণা করে। তফাৎ এই যে তেমন ডিকটেটরশিপের বিকট হিটলরী চেহারা তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং না-জানি কত লক্ষ মানুষের রক্তের অক্ষরে চিনেছেন; আমরা এখনো পর্যন্ত একটু দূরে থেকে শুধু তার গর্জন শুনেছি। যেহেতু ইসলামের নামে বাংলা দেশকে পশ্চিম পাকিস্তান এতদিন বলপূর্বক শোষণ করে এসেছে এবং আজ লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলমানকে নির্মম ভাবে হত্যা করছে, নগর গ্রাম পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, তাই এঁদের চিত্ত আজ মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনা থেকে মুক্ত। বস্তুতপক্ষে বাংলা দেশের রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের পিছনে সংস্কারমুক্ত যুক্তিনির্ভর বুদ্ধির প্রেরণা

প্রথম থেকেই ছিল। সে বুদ্ধিমুক্তিকে খানিকটা বিভ্রমী ইংরেজি পরিভাষা প্রয়োগ ক'রে আমরা Secularism বলে থাকি, কিন্তু তা স্থূলে জড়বাদ বা বালকোচিত কালাপাহাড়ি নয়। জীবনের কঠোরতম অভিজ্ঞতায় ও আকুল বেদনায় সেই অধ্যাত্মবোধ লাভ করতে হয় যা শাস্ত্রশাসিত নয়, অনুষ্ঠান-চালিত নয়, মোল্লাপুরোহিত-কলুষিত নয়। আমার বিশ্বাস এই আত্মনির্ভর আত্মজিজ্ঞাসু মানবতান্ত্রিক জীবনবোধই (রবীন্দ্রনাথ তার সব চেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক) ওপার বাংলার এত বড়ো প্রাণতুচ্ছ-করা সংগ্রামের শক্তি যোগাচ্ছে। নইলে তাদের হাতে আর কী হাতিয়ার আছে? একে শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেম বললে ছোট করে বলা হয়। অথবা স্বদেশ বলতে তাঁরা কেবল একটি ভৌগোলিক খণ্ড বা সীমিত মানবগোষ্ঠী বোঝেন না।

তাঁরা এবং আমরা একই সোনার বাংলাকে ভালোবাসি। কিন্তু সে তো শুধু বিগত যুগের বা সম্প্রতিকালের সোনার বাংলা নয়। তাতে যে অনেক খাদ মেশানো, আসলের চেয়ে নকল অনেক বেশি। খাঁটি সোনার বাংলা পদ্মার ওপারেও নেই, এপারেও নেই। আমাদেরই সক্ষম হাতে তা গড়তে হবে — অনেক দুর্বিসহ দুঃখের, অনেক লক্ষ মৃত্যুর মূল্যে। এই গড়বার কাজটা ওপারে অনেক দূর এগিয়েছে, এপারে আমরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছি।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি ও খুনোখুনির ঘনতমসার পরপারে হঠাৎ আলো দেখা গেল পূর্ব বাংলার আকাশে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম এক মহান পুরুষকে যাঁর নাম আজ দুই পারের বাঙালীর মুখে এবং বঙ্গভূমির বাইরেও কত সমাদরে, কত আদরে উচ্চারিত হয়। দিব্যধামবাসীদিগকে চিৎকার ক'রে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে— এই মর্ত্যধামেও কচিৎ কখনো অমৃতের পুত্র জন্মলাভ করেন, অমৃত শক্তি ছড়িয়ে দেন লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ছেলে-বুড়োর বুকে। সেই অমৃতশক্তিকে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে এসেছে এক বিরাট জল স্থল ও বিমান বাহিনী—প্রাচীনতম বর্বরতায় উন্মত্ত এবং আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কোথায় পেল তারা এই প্রচণ্ড অস্ত্রবল? প্রধানত বর্তমান কালের তিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের কাছ থেকে—ইংরেজিতে যাদের বলে Super-Powers। এই পরাবিক্রম স্বল্পবুদ্ধি রাষ্ট্রাধিনায়করা কি জানতেন না যে, কোনো দুর্বল মিলিটারী শাসক গোষ্ঠীকে সর্বপ্রকার দুর্ধর্ষ মারণাস্ত্রে বলীয়ান করে তুললে উত্তমর্ণের স্বার্থ সিদ্ধির অনেক আগেই অধমর্ণ মিলিটারী জুণ্টা ঐসব অস্ত্র খরচ করবে নিজের গদী অটল রাখবার জন্য, অর্থাৎ নিজের দেশে বা কলোনিতে মুক্তিকামী জনতাকে কেটে ফেলার জন্য। গত ২৪ বছর পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের কলনি ছাড়া আর কি ছিল? দশ-বিশ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষের প্রাণের দাম ইয়াহ্ইয়া নামক জঙ্গী লাটের গদীর দামের চেয়ে অনেক কম—এই হিসাব ছাড়া আর কোনো হিসাব তিনি বোঝেন কি? পঁচিশ বছর আগে য়োরোপীয় শক্তিবর্গ এবং জাপান নিজ নিজ কলনি থেকে সরে আসতে বাধ্য হল। আর আজ colonial empire বজায় থাকবে শুধু পাকিস্তানের? পাকিস্তানের লুটেরা শাসকরা তাদের কলনির ঐক্যবদ্ধ সাত কোটি স্ত্রী পুরুষকে শায়েস্তা করবার জন্য কী বীভৎস কী অমানুষিক কাণ্ড করছেন তা কি কারও অজানা আছে?

কিন্তু কেন এই ভয়ংকর শাস্তি? কী অপরাধ করেছেন বাংলা দেশের সাত কোটি সাধারণ মানুষ একমাত্র আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করে, কী অপরাধ করেছেন আওয়ামী লীগের অসাধারণ নেতা কেবল স্বায়ত্তশাসন দাবী করে? সংখ্যাধিক্যের ওজুহাতে তিনি অনায়াসে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর রাজত্ব করার গণতান্ত্রিক অধিকারও দাবী করতে পারতেন। কিন্তু তেমন দাবী তিনি করেননি, কারণ মুজীবুর রহমান ধর্মবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ, ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ বোঝেন। তিনি বোঝেন যে পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলা দেশ এক দেশ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই যদি এক জাতি গঠন করতে পারত তবে আফগানিস্তান আর পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হল না কেন? শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, ভূগোলে ভাষায় সংস্কৃতিতে তারা পরস্পর-সংলগ্ন। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলা দেশের ভৌগোলিক দূরত্ব যেমন দুর্লঙ্ঘ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির দূরত্ব তেমনি বা ততোধিক দুর্লঙ্ঘ্য। এই সব বিবেচনা করে মুজীব কেবল বাংলা দেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন।

এত বড়ো অমার্জনীয় অপরাধ! অতএব মুজীবুরে

রহমানকে এবং তাঁর সকল সমর্থনকারীকে অর্থাৎ বাংলা দেশের সকল নাগরিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। মানুষকে কি এতই মূল্য দিতে হয় মানুষের মত বেঁচে থাকবার জন্য? আজ বাংলা দেশ একাই লড়ছে, প্রায় বিনা অস্ত্রেই লড়ছে। সামরিক সাহায্য দূরের কথা, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্লেনকে পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়া হয় করাচী থেকে। অথচ বাংলা দেশে হতাহতের সংখ্যা কত লক্ষে পৌঁছেছে তা কেউ জানে না। ইয়াহ্ইয়ার জঙ্গী সরকারের একমাত্র তুলনা হিটলারের নাৎসী গবর্ণমেণ্ট। কিন্তু হিটলারকে পর্যুদস্ত করবার জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ ছোটো বড়ো দেশ জোট বেঁধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। মুজীবুর রহমানের অত্যন্ত বৈধ সরকারের পাশে দাঁড়াবার মতো নৈতিক সাহস কিন্তু কারও নেই। বোঝাই যাচ্ছে গত তিরিশ বছরে প্রায় সারা পৃথিবীর নীতিবোধ আরো ম্লান হয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের আদর্শ আরও ধূলিমলিন। হিটলারকে সমর্থন করে চেম্বরলেন ধিক্কৃত হয়েছিলেন: আজ যে-সব ছোটো-বড়ো রাষ্ট্রপতিরা পাকিস্তানের খুদে হিটলারের সমর্থনে সোচ্চার বা নীরব তাঁদের ধিক্কার দেবারও কেউ নেই। যাঁদের দরাজ হাতে দেওয়া অতি জঘন্য সব অস্ত্র নিয়ে ইয়াহ্ইয়া একটি নিরস্ত্র দেশে ব্যাপক গণহত্যায় বদ্ধপরিকর, তাঁরা অস্ত্রদান বন্ধ করবেন এমন কোনো ইচ্ছা ঘুণাক্ষরেও এখনো প্রকাশ করেন নি। তার মানে বাংলা দেশের অগণিত লোকের নিহত বা বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনও পরোক্ষত দায়ী। ইয়াহ্ইয়া নাকি স্কুলে পাটিগণিত ভাল শিখেছিলেন। বোধ হয় তাই তিনি স্থির করেছেন যে বাংলা দেশের অন্তত দেড় কোটি লোককে দ্রুত হাত চালিয়ে মেরে ফেললে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ হয়ে যাবে। তখন নতুন করে নির্বাচিত গণপরিষৎ ডাকা হবে। কে বলে তিনি খাঁটি গণতন্ত্রের ধ্বজাধর নন।

তবু আকাশের সব আলো নিভে যায় নি। আমরা জেনেছি, প্রায় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সত্যিকার মনুষ্যত্ব কাকে বলে। দেখেছি শুধু দু-একজনের মধ্যে নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে। দু-একজন মহাপুরুষকে পুজো করে জীবনের উপর, ভগবানের উপর, বিশ্বাস রাখা কঠিন। কিন্তু লক্ষ মানুষ যখন দেবত্বের অভিজ্ঞান নিয়ে আসেন আমাদের মাঝখানে তখন আমরাও মানুষ হয়ে উঠবার প্রেরণা পাই। জন্মসূত্রে কেউ আর মানুষ হয় না, দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুই হয়। অনেক তপস্যায় মানুষকে মানুষ হতে হয়। সেই তপস্যার মন্ত্র দিয়েছেন শেখ মুজীবুর রহমান। তাঁর বাংলা দেশের অবর্ণনীয় দুঃখে আমাদের বেদনা সত্য কিন্তু যথেষ্ট নয়। তবু আমাদের গভীর বেদনা তাঁদের দুঃখকে সহনীয় করুক, সফল করুক: তাঁদের বীরোচিত মৃত্যু আমাদের জীর্ণ জীবনকে প্রাণিত করুক, পবিত্র করুক।

৭ এপ্রিল ১৯৭১

সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি, এইদিকে আমার স্বদেশ। ভেবেছিলুম, কত অসংখ্য মানুষ তো তাদের জন্মভূমিকে একটু-একটু করে ভুলে যায়, আমিও ভুলতে পারব। কিন্তু তা আর হল কই। স্বদেশকে আমি যে-মন-অন্য আনুগত্য ও ভালবাসা দিয়েছি, তার গৌরবকে আমারই আনন্দ এবং গ্লানিকে আমারই যন্ত্রণা বলে চিনেছি; তবু স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, পূর্ব বাংলার কথা আজও নিয়ত আমার মনে পড়ে, আমার রক্ত থেকে তার স্মৃতিকে এই এতগুলি বছরেও আমি মুছে ফেলতে পারিনি।

পূর্ব-বাংলাকে আমি ভুলে যেতে, ভুলে থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ভোলা গেল না। তার শ্যামল মুখশ্রী আমার চেতনায় আজও স্পষ্ট হয়ে জ্বলছে। আজও—রাত্রে ঘরেটার যখন আলো নিবিয়ে শুতে যাই, তখন—ফরিদপুর জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম তার সূর্যোদয়ের নম্র আলো ও সূর্যাস্তের কোমল অন্ধকার নিয়ে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দৃশ্যের এক দীর্ঘ মিছিল, যেন-বা চলচ্ছবির মতো, আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।

আমি দেখতে পাই সেই দোতলা কাঠের বাড়িটিকে, যার উত্তরে জনবসতি, পুবে ও পশ্চিমে পুকুর, দক্ষিণে ধূ-ধূ ধানখেত। দেখতে পাই, ভিতরের উঠোনের এক পাশে, কার্তিক পুজোর দিনটিকে এগিয়ে আনবার জন্যে, ঠাকুমার দেওয়া 'ঝাঁজার' ভিতর থেকে চকচকে ধানের চারা মাথা তুলছে। দেখতে পাই, বাইরের উঠোনে বেচারাম্দী তার আনুষ্ঠেস-বরবটির ঝাঁকা নামিয়ে রাখছে। দেখতে পাই, উনুন থেকে ফেনাভাত নামিয়ে বড়-কাকীমা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখতে পাই, পুকুরে জাল পড়ছে, চিনিটোরা অমগাছের বেয়াড়া ডালটা ঢেউতোলা টিনের চালে গা ঘষছে, কামলারা বসে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া বাঁধছে, টিউবওয়েল থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমপাড়ার মেয়ে-বউরা। পাঁচ-ছ বছর বয়সের সেই ম্যালেরিয়ায়-ভোগা রোগা শিশুটিকেও আমি দেখতে পাই, রাত ফুরোবার আগেই যার ঘুম ভেঙেছিল, শেষ-রাত্তিরের অন্ধকারে যে ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুনেছিল "যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকীর উদরে/স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে"। এইমাত্র সে পুকুর থেকে মুখ ধুয়ে ফিরল; একখানা প্রমাণ-ধুতিকে চারভাঁজ করে গলার পিছনে গিট লাগানো, হাতে খেজুর-রসের মস্ত গেলাস, ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে সে এখন খড়ের গাদার সিংহাসনের দিকে চলেছে। ওই সিংহাসনের উপরে বসে, খেজুর-রসে চুমুক দিতে-দিতে সে রোদ পোহাবে। শীতের সকাল। শিশির এখনও শুকিয়ে যায়নি। টিনের চাল থেকে ফোঁটায়-ফোঁটায় হিম ঝরছে উঠোনের উপরে। মাঠ থেকে হালকা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা উঠছে। এই সবই আমি দেখতে পাই। চল্লিশ বছর দূর থেকে দেখা। তবু, অতি দীর্ঘ এই দূরত্ব সত্ত্বেও, এমন-কী সেই শিশুটিকেও আমি চিনতে পারি।

কিছুই আমি ভুলিনি। কিছুই না। গোবিন্দপুর স্টেশন থেকে যে পথটা হঠাৎ ঢালু হয়ে খালের দিকে নেমে গিয়েছিল, সেই পথটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। খাল থেকে নৌকো কেরায়া করলুম, কাকার সঙ্গে গঞ্জ থেকে চিঁড়ে, মুড়ি, রসগোল্লা কিনে আনলুম, চলন্ত নৌকোর পাটাতনে উনুনে সাজিয়ে মা খুব চটপট ভাত আর বায়েক মাছের ঝোল রাঁধলেন, মাঝিরা দাঁড় টানছে, দুদিকের জল মোচড় খেয়ে পিছনে চলে যাচ্ছে, আসমান থেকে ছোঁ মেরে একটা মাছ তুলে নেবে, এই আশায় মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে একটা বাদামী রঙের চিল, খাল ছাড়িয়ে তিন-মাল্লাই নৌকো গিয়ে ধানখেতের দাঁড়ার মধ্যে ঢুকল, অল্প জল, এখানে দাঁড় চলবে না, পিছনে উঁচু গলুইয়ে হাল ধরে বসে আছে বুড়ো মাঝি, সামনে

দাঁড়িয়ে দুই জোয়ানে লগি ঠেলছে, ছইয়ের ফুটো দিয়ে হাত বাড়িয়ে জল ছুঁতে গিয়েছিলুম, ধানের ধারালো পাতায় আমার আঙুল ছড়ে গেল, কুমার-নদে পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে, খাল-বিলের সীমানা ছাড়িয়ে নদীতে পড়বামাত্র স্রোতের টানে নৌকো হঠাৎ ঘুরে যায়, নৌকোর পেটে ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ ওঠে, সেই শব্দটাই বা এখনও আমি ভুলতে পারলুম কই? মাঝি কখন ছইয়ের সামনে ঝোলানো লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়েছিল, জানি না; আকাশ আর নদী কখন কালো হয়ে গিয়েছিল, জানি না, নৌকোর দুলুনিতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, মাঝ রাত্তিরে দিদি হঠাৎ ঠেলা মেরে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। "ওঠ্ খোকা, আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।"

কলকাতায় আমাদের বাসা ছিল, পুব-বাংলায় আমাদের বাড়ি। সেই বাড়ির কথা যখন মনে পড়ে, তখন খাল, বিল, নদী, নালা, সর্ষেখেত, হলুদ ফুল, বাঁশের সাঁকো, কাঠের 'থল্', গঞ্জ, খামার, ধানের 'মলন', জলে-ডোবানো পাটের গন্ধ, হাটের পাশে ডিঙির সারি, হিজলের ছায়া, বাঁশবনের মট্‌মট্ শব্দ, ভোরের আলো আর সন্ধ্যার ম্লানতা আমাকে নিমেষে অধিকার করে নেয়। স্মৃতি বড়ো বেদনাবহ। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই, "কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে"? আমি বাসি। কেননা, আমি জেনে গেছি যে, স্মৃতিচারণের এই বেদনাও বড়ো আনন্দময়।

॥ ২ ॥

আজ তাঁকে নানা কারণে ভালবাসি; কিন্তু প্রথম-যৌবনে যে জীবনানন্দকে ভালবেসেছিলুম, তার একটা মস্ত কারণ নিশ্চয় এই যে, পুব-বাংলার এই শান্ত, শ্যামল—হয়তো-বা ঈষৎ করুণ—মুখশ্রী তাঁর ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নানা কবিতায় বড়ো সুন্দর ফুটেছে। মনে পড়ে, "মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে/আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে / পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,/শিশিরের জল" কিংবা "অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে/হিম হয়ে আসে/বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা"/কিংবা "অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল/জোনাকিতে ভরে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে/চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ..." ইত্যাদি সব লাইন পড়তে পড়তে চোখ জ্বালা করত, বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠত, গলার মধ্যে কিছু-একটা আটকে যেত; মনে হত, যেন মন্ত্রবলে তিনি আমাকে সেই হারানো-জগতের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। এই চাঁদ, এই খড়-নাড়া-মাঠের ফাটল, এই হিম-হয়ে-আসা বাঁশপাতা আর মরাঘাস, এদের কিছুই তো আমার অচেনা নয়, এই সবই তো আমার জন্মভূমির, আমার পুরনো পরিচিত পৃথিবীর অনিবার্য অনুষঙ্গ, কিন্তু ঠিক এমন করে যে এদের ছবিকে কেউ ফোটাতে পারেন, তা আমি কখনও ভাবিনি।

ছবি, ছবি আর ছবি। আজ আর আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমরা যারা আর-কখনও পুব-বাংলায় ফিরে যাব না, এই ছবিগুলিই এখন তাদের একমাত্র সম্বল; স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এখন যাঁরা পুব-বাংলার প্রতিষ্ঠিত কবি, তাঁদের রচনার দিকেও মূলত এই একই প্রত্যাশায়—ছবির প্রত্যাশায়—প্রথম আমি চোখ ফিরিয়েছিলুম।

প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। আল মাহমুদের কবিতায় "কিছুই থাকে না কেন? করোগেট ছন্ কিংবা মাটির দেওয়াল/গাঁয়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাটগাঁর দারুণ তুফানে..." কিংবা "কুয়াশায় ঢাকা পথ, ভোরের আজান আর নাড়ার দহন/পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ,/মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে ছড়ানো জাল আর/বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর" ইত্যাদি সব লাইন যখন পড়েছি, কিংবা শামসুর রাহমানকে যখন বলতে শুনেছি "কাঁঠাল গাছের ডালে হলদে পাখি লেজটি নাচায়/ঘন ঘন, বেলা বাড়ে.../অনেক পেছনে রইল পড়ে/লাউয়ের সবুজ মাচা, নদী, মাঠ,/কলাইয়ের খেত আর পুকুরের ঘাট" কিংবা হাসান হাফিজুর রহমান যখন গাঢ় কণ্ঠে জানিয়েছেন "যাবে নদী দূরে দূরে সমন্বিত/ভাঙা মাস্তুলের নৌকা ঠোঁটে নিয়ে" কিংবা সৈয়দ আলী আহসান যখন প্রায় প্রার্থনার মতো অথবা—বলতে পারি—শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণয়-সম্ভাষণের মতো উচ্চারণ করেছেন "আমার পৃথিবীর বৃষ্টি—মাটির/গন্ধ, ধানখেত ভেসে যাওয়া/আমগাছের ডাল ভেঙে পড়া/হঠাৎ গরুর ডাক, ভিজে যাওয়া/পাখির ডানা ঝাপটানো/

আমার পুকুরে, নদীতে,/ডোবায় লাবণ্যের সাড়া/ আমার পূর্ববাংলা অনেক রাত্রে/ গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো" তখন, সন্দেহ নেই, মূলত এই কারণেই আমি অভিভূত হয়েছিলুম যে, শব্দ দিয়ে রচিত চিত্রাবলীর এক আশ্চর্য অ্যালবাম এই সব কবিতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। সেই চিত্র পূর্ব-বাংলার চিত্র— আমার জন্মভূমির মুখচ্ছবি। পূর্ব বাংলার তরুণ কবিদের কবিতা পড়তে পড়তে মূলত এই কারণেই তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলুম যে, আমার যে জন্মভূমিকে আমি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি এবং যার কোলে আর কখনও আমার স্থায়ীভাবে ফিরে যাওয়া হবে না, আর-কিছু না হোক, অন্তত তার শ্যামল মুখশ্রীকে এই সব কবিতার মধ্যে বার বার আমি দেখতে পাব।

আমি জানি যে, শুধুই নদী-নালা-গাছপালা-খেত-খামার কি জ্যোৎস্না-রৌদ্র-মেঘ-কুয়াশার বর্ণনা দিয়ে একটা ভূখণ্ডের সার্বিক চিত্র তৈরি করা যায় না; উপরন্তু সেই ছবির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটাও খুব জরুরী। জানি যে, চিত্রটাকে সপ্রাণ ও—অন্তত আধুনিক মানুষের কাছে—গ্রাহ্য করে তুলবার জন্যে মানুষের মুখশ্রীকেও তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলা চাই; ঈশ্বরের সৃষ্টির পাশাপাশি স্থাপন করা চাই মানবসমাজের আপন হাতের সৃষ্টিকে। পূর্ব-বাংলার তরুণ কবিরা এই দ্বিতীয় দায়িত্বের প্রতিও যে প্রথম থেকেই লক্ষ্য রেখেছেন, তাঁদের কবিতাই তার প্রমাণ। নানা রকমের মানুষের মুখ তাঁরা তাঁদের লেখার মধ্যে এঁকে যাচ্ছেন; শহরের মাস্টার-কেরানী ছাত্র-মজুরের মুখের পাশাপাশি ছোটখাটো গঞ্জ আর গ্রামগুলোর জেলে, মাঝি, ব্যাপারী, পাইকার, চাষী, খেতমজুর মুখও সেখানে এতই অবিরল ফুটেছে যে, মানুষ সম্পর্কে তাঁদের মৌলিক আগ্রহের একটা সন্দেহাতীত সাক্ষ্য তার মধ্যে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, একই কবি সব রকমের মানুষের কিংবা সব রকমের মানবিক পরিশ্রমের ছবি আঁকছেন না, সেটা সম্ভবও নয়, কিন্তু তাঁদের সামগ্রিক রচনাকর্মের ভিতর থেকে যে এই সমস্ত কিছুর একটা সার্বিক চিত্রই প্রবলভাবে ফুটে উঠছে, এইটেই সুখের কথা।

উপরন্তু লক্ষণীয়, এই নবীন ও তেজী কবি-সমাজের আপনাপন বিশ্বাসের ছবিও তাঁদের লেখার মধ্যেই ফুটছে। কী তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও কিসে তাঁদের প্রত্যয়, তা জানাবার জন্যে আলাদা করে কোনও ফতোয়া কিংবা ইস্তাহার তাঁদের লিখতে হয়নি; তাঁদের কবিতা পড়েই আমরা জানতে পারছি যে, একদিকে যেমন পূর্ব-বাংলার ভৌগোলিক প্রকৃতিকে, তার জল হাওয়া আলো ও মাটির নিজস্ব চরিত্রকে তাঁরা নিবিড়ভাবে ভালবাসেন, অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসেবেও তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। নিছক প্রকৃতি-বর্ণনা কিংবা নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের উচ্চারণ কি কোন সংকবিকে একালে আর তৃপ্তি দিতে পারছে? তিনি জেনে গিয়েছেন যে, তাঁর সমকালীন জনসমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও যন্ত্রণাকে একটা বাঙময় রূপ না-দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। তিনি বুঝে গিয়েছেন, যা তাঁর একান্ত নিজস্ব, সেই অনুভূতিগুলির কথা তিনি লিখবেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে, আপন সময় ও আপন সমাজের একটা ব্যাখ্যাও তাঁকে দিয়ে যেতে হবে—তাঁর কবিতার মধ্যে। পূর্ব-বাংলার কবিদের লেখা পড়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, কবির এই বিশেষ দায়িত্বকে তাঁরা কেউই অস্বীকার করছেন না। আজকের পূর্ব-বাংলায় তরুণবয়সী এমন একজন কবিরও সম্ভবত সাক্ষাৎ মিলবে না, ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে যিনি নীরব; এমন কবিরও না, স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ঝরিয়ে অন্তত কয়েক লাইন যিনি লেখেননি। লক্ষ্য যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, অত্যন্ত সংযতবাক্ কবির কণ্ঠও তখন আবেগে কাঁপতে থাকে; উদ্দেশ্য যখন অত্যাচারীর সমালোচনা, অত্যন্ত নম্র

স্বভাবের কবির কণ্ঠও তখন বিদ্রূপে বেঁকে যায়। জন-আন্দোলনের ওষ্ঠে অব্যর্থ শব্দ যোজনা করে শহিদ কাদরি তখন বলেন, "সব কিছু অজ চিৎকার করে চাইতে হয়—স্বাস্থ্য, স্বস্তি এবং আয়ু"; রাজপথে রক্ত ঝরতে দেখে হুমায়ুন আজাদ তখন বলেন, "প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায়/ ব্লাডব্যাংকে, বাংলার মাটিতে"; অত্যাচারীর মত্ত অবাধ হত্যালীলা দেখে এনামুল হক তখন বলেন, "আবার হত্যার ঢেউ বুড়ী-গঙ্গা-বন্দরে উঠছে"; এবং জনতার অনিবার্য জয়যাত্রা প্রত্যক্ষ করে, পলায়মান দুঃশাসকদের প্রতি ঘৃণা ঝরিয়ে গোলাম সারওয়ার তখন বলেন, "ফুসমন্তর ফুসমন্তর ঝড় উঠেছে ওই/কোথায় জাঁহাপনা, তাঁহার খয়ের খাঁরা কই?"

॥ ৩ ॥

আগেই আমি বলেছি যে, কিছু ছবিই ছিল আমার প্রাথমিক ও প্রধান প্রত্যাশা। আমি আমার জন্ম-মৃত্তিকার মুখচ্ছবিকে আবার নতুন করে দেখতে চেয়েছিলুম, এবং তারই জন্যে হাত বাড়িয়েছিলুম পূর্ব-বাংলার এই কবি-সমাজের দিকে। কিন্তু এখন দেখছি, নিতান্ত কিছু ছবিই আমার হাতে তাঁরা তুলে দেননি; তাঁদের বিশ্বাস ও আদর্শের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয়পত্রও ওই কবিতাবলীর মাধ্যমে তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের কবিকর্মই প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও মানব-ধর্মে আস্থাশীল। হিন্দু-মানুষ, মুসলিম-মানুষ ইত্যাদি সংকীর্ণ পরিচয়ে কোনও আস্থাই তাঁরা রাখেন না। মানব-পরিচয়কেই তাঁরা তাবৎ মানুষের সবচাইতে বড়ো পরিচয় বলে জেনেছেন।

অন্যদিকে, বাঙালী হিসেবেও তাঁদের গৌরববোধের অন্ত নেই।

প্রশ্ন উঠবে, বিশুদ্ধ বাঙালিয়ানার এই গৌরব কি মানবিকতার বৃহত্তর আদর্শের বিরোধী? না, তা নয়। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। আয়ুব খাঁর সফরের বিবরণ পাঠাবার জন্যে ১৯৬০ সনের জানুয়ারি মাসে, দেশী-বিদেশী আরও অনেক সাংবাদিকের সঙ্গে, পূর্ব-বাংলার জেলায়-জেলায় কয়েকটা দিন আমাকে খুব ঘুরতে হয়েছিল। আয়ুব যেদিন পদ্মায় তাঁর স্টীমারে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন, সেদিন ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারি। ঠিক করলুম, আমরা ভারতীয়েরা আমাদের আনুষ্ঠানিক ভারতীয় পোশাক পরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করব। সেই অনুযায়ী পাতলুনের উপরে গলাবন্ধ কোট পরে নিচ্ছি, এমন সময় ঢাকার এক তরুণ কবি-সাংবাদিক সবিস্ময় প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপার কী দাদা? পোশাক পালটাচ্ছেন কেন?"

বললুম, "বাঃ, আজ যে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস। তোমাদের প্রেসিডেন্টের পার্টিতে তো আজ পুরোদস্তুর ভারতীয় পোশাকেই আমাদের যাওয়া উচিত।"

তরুণ কবিবন্ধু এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলে, নিচু গলায় বললেন, "দাদা, আপনি ভাগ্যবান, নিজেকে আপনি ভারতীয় বলে ভাবতে পারেন। আমরা কিন্তু নিজেদের [illegible] পাকিস্তানী বলে ভাবতে পারিনে। [illegible] বাঙালী।"

জিজ্ঞেস করেছিলুম, [illegible] পাকিস্তানী ভাবতে তাঁর অসুবিধে [illegible] কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, [illegible] কারণ, কোনও রকমের গোঁড়ামিতে [illegible] বিশ্বাস নেই, এবং পাকিস্তান-[illegible] যে একটা প্রচণ্ড গোঁড়ামি [illegible] গিয়েছেন। সেই গোঁড়ামিকে [illegible] মেনে নেন, তাহলে উদার মানবিকতা [illegible] গিয়ে পৌঁছনো তাঁদের পক্ষে শক্ত হবে।

আমার পরবর্তী প্রশ্ন: "কিন্তু [illegible] পরিচয়টাও তো মানব-পরিচয়ের [illegible] অনেক ছোট। এই ছোট-পরিচয় কি [illegible] পরিচয়কে আড়াল করে দেবে না?"

জ্বলজ্বলে গলায় তিনি উত্তর দিলেন, "না। হোক ছোট, তবু এই পরিচয়ের মধ্যে কোনও গোঁড়ামি নেই। আর তাই, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের এই পরিচয় কাউকে দূরে ঠেলে না, কাউকে পর বলে ভাবতে শেখায় না। দেখবেন, আপনারা যেমন ষোল-আনা বাঙালী থেকেও ষোল-আনা ভারতীয় হতে পেরেছেন, আমরাও তেমনি ষোল-আনা বাঙালী থেকেও ষোল-আনা মানুষ হতে পারব।"

তিনি ঠিকই বলেছিলেন। [illegible] বাংলা [illegible] এর সমস্ত কবির সমস্ত [illegible] আমি পড়িনি। কিন্তু যে কজনের [illegible] পড়েছি [illegible] সেই [illegible] স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে।

সংবাদ, সেখানে এখন যুদ্ধ চলছে। সেইখানে, যেখানে আমার জন্ম। যেখানে আমার দুরন্ত শৈশব কেটেছে। যেখানে আমার কৈশোর সুদূর স্বপ্নের চোখ মেলে তাকিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদদাতা, সংবাদ প্রতিষ্ঠান সমূহ জানাচ্ছে, সেখানে এখন যুদ্ধ চলছে। মানচিত্রে দাগিয়ে দেখানো হয়েছে, সেখানে এখন সর্বত্র মুক্তি আর স্বাধিকারের মরণপণ যুদ্ধ শুরু হয়েছে।

আমি এখন গঙ্গার কূলে, বাঙলার পশ্চিমা সীমায়। যেখানে গুপ্তঘাতকেরা চোরাগোপ্তা খুন করছে। নোংরা ষড়যন্ত্রে বাতাস বিষাক্ত। পঙ্কিল রাজনৈতিক হাওয়ায় লোকে বিভ্রান্ত এবং রুদ্ধশ্বাস।

তখনই সংবাদ, পূবে বাঙলায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে করাচির শোষণের বিরুদ্ধে। রাওলপিন্ডির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। মুহূর্তের মধ্যেই, সমস্ত হতাশার অন্ধকার ছাপিয়ে আলোর ঝলক লেগে গেল। আমি শুনতে পাচ্ছি, রণদামামা আমার বুকে বাজছে। আমি শুনতে পাচ্ছি, সেই একান্ত চেনা শহর ঢাকা, তার এক পুরনো পাড়া, জাফরের গলি থেকে ছেলেবেলার বন্ধু মনসুর আমাকে ডাক দিচ্ছে। নারিন্দার খালপাড় থেকে আবিদ মুখে হাত লাগিয়ে ডাক দিচ্ছে। দোলাইগঞ্জ স্টেশনের বিলের ওপার থেকে জয়নাল, আরমানিটোলা থেকে ইসমাইল ডাক দিচ্ছে। বেতারের ঘোষণায় আমি কান পেতে আছি, আর ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছি। সংবাদপত্রের পাতায় চোখ মেলে আছি, আর প্রতি ছত্রে ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছি। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারছি না। স্মৃতি আমাকে অস্থির করে তুলেছে।

যে-পরিচয়ে আজ স্মৃতিচারণে বসেছি, তার প্রথম আত্মপ্রকাশ একদা এই ঢাকা শহরকে নিয়েই। তখন উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের আগস্ট। তখন আমি এই গঙ্গার কূলে, পশ্চিমের সীমায়। সেই সময় পরিস্থিতি আলাদা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশ ক্ষতবিক্ষত। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ঢাকা শহর। দেখেছিলাম ইংরেজের কূটনীতি আর ষড়যন্ত্র। রক্তের অন্ধকারে দেখেছিলাম, চারদিকে আগুন আর লুঠতরাজ। তার মাঝখানে ছিটকে

পড়া দুটি মানুষ, অন্ধকার গলির এক ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়েছিল। অবিশ্বাস আর ভয় নিয়ে, দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। দু'জনেই দু'জনকে খুনী ভাবছিল। তারা একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। একজন সুতাকলের মজুর। একজন বুড়িগঙ্গায় নৌকার মাঝি। মাঝির হাতে একটি ছোট্ট পুঁটলি। পুঁটলির মধ্যে তার শিশু সন্তানদের নতুন জামা। সামনেই ঈদের পরব, তা-ই কিনেছিল। কেনবার জন্যই, নৌকা নোঙর করে, শহরে ঢুকেছিল। তখনও শহর শান্ত ছিল। লুটেরা খুনেরা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠেছিল। সে আর ফিরতে পারেনি। খুনীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নারায়ণগঞ্জের সুতাকলের মজুরও, প্রয়োজনে ঢাকায় এসেছিল। আর ফিরতে পারেনি। ডাস্টবিনের আড়ালে বসে তারা ফিসফিস করে, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছিল। দু'জনেই বুঝতে পেরেছিল, তারা কেউ কারো শত্রু নয়। মুখোশ পরা ভণ্ড নেতৃত্ব আর ইংরেজদের ষড়যন্ত্র তাদের শত্রু করেছিল। তারা নির্ভয়ে পাশাপাশি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল, ধূমপান করেছিল, সংসারের সুখ-দুঃখের কথা বলেছিল। তারপরে মাঝি ব্যাকুলভাবে বলে উঠেছিল, রাত পোহালে ঈদের পরব। বিবি ছাওয়ালেরা তার মুখ চেয়ে আছে, কখন সে ফিরবে। সে তার বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়েছিল, বলেছিল, 'আদাব।'

কিন্তু সে ফিরে যেতে পারেনি। ইংরেজ অফিসারের চোখ ফাঁকি দিয়ে, সান্ধ্য আইনকে ফাঁকি দিয়ে সে বিবি বাচ্চাদের কাছে ফিরে যেতে পারেনি। অফিসারের গুলিতে সে নিহত হয়েছিল, বাচ্চাদের জামা তার রক্তে ভিজেছিল। এই ঘটনার নাম ছিল 'আদাব।' 'আদাব' দিয়েই, এই লেখক প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল।

পঁচিশ বছর পরে আবার সেই পূর্ব বাঙলা, আর সেই ঢাকা। সেটা ছিল, ভুল বোঝাবুঝি, অবিশ্বাস আর আত্মহননের কাল। আজ আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল। মুক্তি এবং স্বাধিকারের—অর্থনৈতিক দুর্দশার জোয়াল ভেঙে ফেলার যুদ্ধ। ভাষা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম। এখন সেখানে যুদ্ধ চলছে। পরিস্থিতি এবং পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাড়ে সাত কোটি মানুষ, 'জয় বাংলা'র জয়গানে যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। সংবাদ, ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ প্রাণ বিসর্জিত।

আমার চোখের সামনে ঢাকা শহর ভাসছে। পুরনো শহর। নতুন শহর আমার অচেনা। তাকে আমি চোখে দেখিনি। দেশ বিভাগের আগে থেকেই, বুড়িগঙ্গার কূল ছেড়ে আমি গঙ্গার কূলে। তখন ঢাকা শহর রেল লাইন দিয়ে ঘেরা। সে রেললাইন শুরু হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে। চাসারা ফতুল্লা দোলাইগঞ্জ হয়ে ফুলবাড়িয়ায় এসেছে। সেখান থেকে তেজগাঁয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছে ময়মনসিংহের পথে। ফুলবাড়িয়া মানেই ঢাকা স্টেশন। তার ওপারে ধানমণ্ডি। এখনকার কাগজে লেখা হয় ধানমণ্ডি, আমরা বলতাম ধানমণ্ডাই—ধানমণ্ডাইয়ের মাঠ। রমনার মাঠ। ধু ধু মাঠ, কেবল মাঠ। যত বড় বড় খেলার ক্লাব, সব সেখানে। ঢাকা কলকাতার সব বড় বড় খেলা, সব সেখানেই হত। রমনায় রেসকোর্সের মাঠ। মাঠের আরো দূরে অভ্যন্তরে গোরা সৈন্যবাহিনীর ব্যারাক। পাহাড়ের টিলার মত উঁচু চাঁদমারি।

আমাদের এক নম্বর ওয়ার্ড একরামপুর থেকে, ধানমণ্ডাই অনেক দূরে। একদা একক সেখানে যাবার কোনো অনুমতি ছিল না। নিতান্ত নি[illegible] কোনো খেলা থাকলে, কলকাতা থেকে কোনো নামকরা রাজনৈতিক নেতা সভা করতে গেলে, বড়দের সঙ্গে যাবার অনুমতি মিলতো। বড় বড় রাজনৈতিক সভাও ধানমণ্ডাই বা রমনার মাঠে হত। তা ছাড়া, ধানমণ্ডাইয়ের মাঠের ওপর দিয়ে, ঘোড়ার গাড়িতে করে ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে যাওয়া হত। ধানমণ্ডাইয়ের মাঠের কোনো এক প্রান্তেই সেই ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির ছিল।

এখন ধানমণ্ডাইয়ের অন্য গৌরব সব থেকে বড় গৌরব, তাঁর বাড়ি সেখানে। যাঁর

কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য, এপারে বসে, রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে কান পেতে আছি। সেই বন্ধাবন্ধুর বাড়ি, নতুন গড়ে ওঠা শহর ধানমণ্ডিতে। চোখের সামনে মাঠ ভেসে ওঠে, অন্ধের মত সেই মাঠের বুকে হাতড়ে ফিরছি, কোথায় কোন্ সীমানায় তাঁর ঘর। সংবাদ, ইতিমধ্যেই যে-ঘর শত্রুরা কামানের গোলায় বিধ্বস্ত করেছে। প্রাণ নিয়েছে তাঁর অনুগামী যোদ্ধাদের, যাঁরা তাঁর সেই বাড়ি দুর্গের মত ঘিরেছিল। প্রাণ নিয়েছে তাঁর পুত্রের, যে তখনো সেই বাড়িতে বাস করছিল।

কল্পনা বড় দুর্বল। সেই বাড়ি আমি চিনে উঠতে পারছি না। কেবল অস্পষ্ট একটি নতুন শহর আমার চোখে ভাসছে।

কিন্তু স্পষ্ট ভাসছে সেই পুরনো শহর। রেললাইন বন্দী শহর। যার এক দিকে বুড়িগঙ্গা, দু' দিকে রেললাইন, আর দূরের উত্তরে, গ্রামের সীমায়, প্রায় তেজপুর ঘেঁষে। সংবাদ, পুরনো শহরেও যুদ্ধ চলছে। শত্রুর মর্টার, ট্যাঙ্ক, সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী, ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে, লক্ষ প্রাণ হত্যা করে, ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মুক্তি যোদ্ধারা পশ্চাদপদ নয়। তারা সমানে প্রতিরোধ করে চলেছে, রাস্তায় রাস্তায়, গলির মোড়ে মোড়ে। সেই সব রাস্তা আর গলি আমার চোখের সামনে ভাসছে।

আমার সামনে একরামপুরের রাস্তা ভাসছে। যে-রাস্তা দক্ষিণে চলে গিয়েছে সূত্রাপুরের দিকে। সূত্রাপুরের বিরাট বাজার এবং থানা, আর সেই পথেই ডাকঘর। থানার পাশ দিয়ে, রাস্তা বেঁকে গিয়েছে পুবে, দোলাই খালের দিকে। আমাদের খুব ছেলেবেলায় দোলাই খালের ওপরে ছিল ঝোলানো পুল। তারপরে হয়েছিল, পাকা-পাকি বাঁধানো পুল। ছেলেবেলায় ওর চেয়ে বড় পুল আর দেখিনি। অনেকদিন পুল দেখতে গিয়ে, তার প্রকাণ্ড লৌহ শরীরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি। পুল পার হয়ে, সোজা রাস্তা চলে গিয়েছে গেণ্ডারিয়ার দিকে। দক্ষিণে বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে ফরিদাবাদে। ফরিদাবাদ থেকে আবার বাঁক নিয়ে, সোজা চলে গিয়েছে নারায়ণগঞ্জের পথে। ফরিদাবাদ পার হলেই, ঢাকা শ্মশান। শ্মশানের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে।

সে সব রাস্তায় কি [illegible]জোয় বাহিনী নেমেছে। মুক্তিযোদ্ধারা কি সেখানে শত্রুর মুখোমুখি লড়াই করছে।

এই পথে এসে ঠেক লেগে গেল। জয়নালকে দেখতে পেলাম আমি। গেণ্ডারিয়ার গ্রাজুয়েট ইস্কুলে পড়তে যেতাম। বাড়ির সামনে, লক্ষ্মীবাজারে, গিরিশ মাস্টারের পাঠশালা ছেড়ে সেই প্রথম হাই ইস্কুলে পড়তে গিয়েছি। আমি একরামপুরের ঘিঞ্জি শহরের ছেলে। জয়নাল আসতো গোলাইগঞ্জ ইস্টিশনের বিলের

নতুন
প্রেস্টিজ
ভ্যাকুয়াম টাম্বলার
ছোট্ট ফ্লাস্ক
অনেক গুণ!
■ গরম কফি বা চা, বরফ ঠাণ্ডা বীয়ার বা অন্য পানীয় —ভ্যাকুয়াম টাম্বলার থেকে সোজা ঢেলে পান।
■ অফিসের টেবিলে, আপনার বিছানার পাশের টিপয়ে এবং স্কুলের বাচ্চাদের জন্যে একটি আদর্শ 'মিনি' ফ্লাস্ক। পছন্দসই হরেক রকম রঙে পাবেন 'প্রেস্টিজ' ফ্লাস্ক।

ওপার থেকে। জয়নাল আমার চোখে ভাসছে। গরীব চাষী ঘরের ছেলে। সেই বয়সেই পরনে চেক কাটা লুংগি, গায়ে হাফশার্ট, পায়ে ফিতে বাঁধা বুট জুতো। কপালের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া এক মাথা রুক্ষ চুল। ঝিলের বাতাস চুলের পাট বজায় রাখতো না। তার নিচে দুটি উজ্জ্বল চোখ। ওর দাঁতগুলো এত ঝকঝকে ছিল, যেন আলো ঠিকরে পড়তো।

প্রথম প্রথম কেবল চোখে চোখে চাওয়া। চোখে চোখ পড়লেই, দুজনের ঠোঁটের কোণেই হাসি জেগে উঠতো। অথচ কেমন একটা লজ্জাও যেন লাগতো। তাই চোখের পাতা নামিয়ে নিতে হত। আবার চোখ তুললেই, চোখা-চোখি। আবার হাসি, আবার লজ্জা, আবার চোখ নামানো। এই নীরব অনুরাগের খেলাটা চলেছিল কিছুদিন। তারপরে আর পারা যায়নি। তারপরে দুজনেই দুজনের কাছাকাছি হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে-ছিলাম। কথা বলবার জন্য মন ছটফট করছিল। কিন্তু এমনিতে তো কথা বলা হয় না। পুরো দুটি পয়সার গুলি লজেন্স কিনে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় গলে গিয়ে লজ্জায় বললাম, 'নাও।'

জয়নালেরও লজ্জা। হাত বাড়াতে পারছে না। আবার বললাম, 'নাও।'

তখন জয়নালের গলা শোনা গেল, 'আমার লগে দোস্তি পাতাইবা?'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম। ও বলল 'তবে কাইল (আগামীকাল) আমারে লাবেনচুষ দিও। এক ঘণ্টা আগে ইস্কুলে আইসো। দোস্তি পাতামু।'

বলেই দৌড়ে চলে গেল। খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকিয়ে হাসলো। আবার দৌড় দিল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মনে আছে, পরের দিন, সকাল নটার সময়ে ইস্কুলে গিয়েছিলাম। লজেন্স কিনে নিয়ে-ছিলাম আগেই। জয়নাল আমার আগেই এসেছিল। দেখেছিলাম, ইস্কুলের উঠোনের পাশে পাঁচিল ঘেঁষে, একটি আম গাছ তলায় ও বসে আছে। তখনো কোনো ক্লাস ঘর খোলেনি। আমি জয়নালের কাছে গেলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপরে ওর পিছন থেকে বের করল ঝকঝকে করে মাজা একটি ছোট ঘটি। দেখলাম ঘটির মধ্যে দুধ। সেইটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধর।'

আমি অবাক হয়ে ঘটিটা হাতে নিলাম। জয়নাল পকেটে হাত দিয়ে বের করল একটি কাঁচা ছোট শশা। সেটাও আমার হাতে দিয়ে বলল, 'খাও।'

প্রায় একটি অনুষ্ঠানের মত। আমার বুঝতে দেরি হল না, এ হল বন্ধু পাতাবার অনুষ্ঠান। আমি যত অবাক হয়েছিলাম, তত লজ্জা করছিল। ঘটি

আমার লগে দোস্তি পাতাইবা

আর শশা নামিয়ে রেখে, পকেট থেকে লজেন্স বের করে জয়নালকে দিলাম। জয়নাল সলজ্জ হেসে হাত বাড়িয়ে নিল। আমি বললাম, 'খাও।'

জয়নাল মুখে লজেন্স পুরলো। আমি শশায় কামড় বসালাম। তারপরে চোখা-চোখি হতেই, দুজনে হেসে উঠলাম, এবং হাসতেই লাগলাম, আর খেতে লাগলাম। জয়নাল বলল, 'এই দোস্তি আর কোনদিন ভুলব না।'

আমি ওর কথার প্রতিধ্বনি করলাম।

আজ এখন এপারে বসে ভাবছি, জয়নাল কোথায় আছে। জয়নাল কি এখন মুক্তি-যুদ্ধে লিপ্ত? তাহলে কোথায়? কোন রণাঙ্গনে? ঢাকা শহরেরই কোথাও কি? জয়নাল এখনো বেঁচে আছে তো?

পুরোনো শহরের অন্যান্য রাস্তা আমার চোখের সামনে ভাসছে। যেসব রাস্তা এক্রামপুর থেকে বিভিন্ন দিকে গিয়েছে। আমি জানি না, এখন সেসব রাস্তার নাম বদলে গিয়েছে কিনা। ডালপট্টি থেকে যে রাস্তা বাঙলা বাজারের দিকে গিয়েছে, বাঙলা বাজার থেকে পটুয়াটুলি, পটুয়া-টুলি থেকে ইস্লামপুর, ইসলামপুর থেকে আরমানিটোলা, আরমানিটোলা থেকে লালবাগ, আর লালবাগের সেই কেল্লা সব কি সেই নামে, তেমনিই আছে?

লালবাগে ছিল মাসীমার বাড়ি। কেল্লার মাঠের ধারে। কেল্লার উঁচু ঢিবির নিচে দুটি সুড়ং নেমে গিয়েছে। ভিতরে গভীর অন্ধকার, রহস্যময়। কত গল্প শুনেছি সেই সুড়ং সম্পর্কে। সুড়ং পথ নাকি সেই বুড়িগঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। ভিতরে নাকি অদ্ভুত সব জানোয়ার আছে। লম্বা লোহার শিকলে বেঁধে, সাহেবরা নাকি কুকুর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তারপরে আর সেই কুকুর ফিরে আসেনি। শিকলটা

ছিঁড়ে গিয়েছিল। শুনেছে শুনেতে গায়ের মধ্যে শিউরে উঠতো।

সংবাদ, পুরনো শহরের সেইসব রাস্তায় রাস্তায় সাঁজোয়া বাহিনী নেমেছে, মুক্তি-যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছে। কামানের গোলায় বাড়ি ঘর দোর বিধ্বস্ত। মাসীমাদের সেই বাড়িটা কি এখনো আছে? আর ইসমাইলদের বাড়ি? ইসমাইলদের বাড়িও ওদিকে, নবাবগঞ্জের কাছে।

ইসমাইলের সঙ্গে পরিচয় হবার কথা ছিল না। ওর বাড়ি, আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ইসমাইল ইস্কুলের পড়ো না। বয়সে আমার থেকে চার পাঁচ বছরের বড়। ভিক্টোরিয়া গোল পার্কের কাছে, যে রাস্তা গিয়েছে বরফ কলের দিকে সেখানে অনেক মোটর মেরামতির কারখানা। শহরের ট্যাক্সি বাস, সব সেইখানে। সেইখানে সাইকেল ভাড়ার দোকানও ছিল। আমরা দু' পয়সায় ঘণ্টা সাইকেল ভাড়া নিতে যেতাম। সাইকেল ভাড়া নিতে গিয়ে ইসমাইলের সঙ্গে পরিচয়। গায়ে তেল কালি মাখা জামা প্যান্ট। ইসমাইল মোটর ক্লীনার। নিজের থেকে যেচে এসে বলেছিল, ঠিক বড়দের চালেই বলেছিল, 'কী খোকা, সাইকেল ভাড়া নিবা? চল ভাল সাইকেল দেইখ্যা দেই।'

দিয়েছিল। ভাল নতুন সাইকেল দেখে দিয়েছিল। তাকে সবাই চেনে, তার খুব খাতির। যেতে যেতে ভাব হয়ে গিয়েছিল। তারপরে ইসমাইল একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। ওর মা হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন। গাল টিপে আদর করেছিলেন। ওর বোন মুখ টিপে হেসে দূর থেকে দেখেছিল। আমারই সমবয়সী কি না, তাই বোধহয় কাছে আসতে লজ্জা করছিল। ইসমাইলের মা পিঠে আর গুড় দিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। এখনো কানে লেগে আছে, 'আমার সোনামণি, বইয়া বইয়া খাও।'

তারপরে ইসমাইলকে আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বাড়িতে সেটা ভাল চোখে দেখা হয়নি। ইসমাইল ইস্কুলে পড়ো নয়, বয়সে বড়, একটা মোটর ক্লীনার ছোকরা। মা দিদি কেউ ওর সঙ্গে কথা বলেনি। খেতে পর্যন্ত দেয়নি। রাগে দুঃখে অপমানে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অথচ ইসমাইল কিছুই মনে করেনি। হয়তো ওর কষ্ট হয়েছিল, আমাকে জানতে দেয়নি।

আমাকে বারণ করা হয়েছিল, যেন ইসমাইলের সঙ্গে না মিশি। সে বারণ মানতে পারিনি। লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেতাম ভিক্টোরিয়া গোল পার্কের ধারে, কলতাবাজারের রাস্তায়। ইসমাইলের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতাম। ওদের বাড়ি যেতাম। সেই পলেস্তারাহীন ইঁটের বাড়ি, মাথায় টালি। উঠোনে কুল পেয়ারা আর ডালিম গাছ। ছাদে সারবন্দী বাঁদরের ভিড়। ইসমাইলের মা হাত ধরে ডাকতেন, 'আইয়ো আমার সোনামণি।'

দেশ বিভাগের পরে এপারে যেসব বন্ধু এসেছিল, তাদের মুখে শুনেছি, ইসমাইল নাকি সুরাবর্দি সাহেবের মোটর ড্রাইভার হয়েছে। তারপরে আর কিছু জানি না। এখন ইসমাইল কী করছে? ও কি ঢাকার রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। নাকি মুক্তিযোদ্ধা-দের ট্রাক নিয়ে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে চলেছে।

জানতে ইচ্ছা করছে, অথচ কিছুই জানবার উপায় নেই। জানবার উপায় নেই, আমার বন্ধুরা এখন কে কোথায় কী করছে। কেবল একথাই আমার মন বলছে, তারা সবাই এখন লড়ছে। সাড়ে সাত কোটির কেউ-ই বিচ্ছিন্ন নেই।

কলুটোলায়ও কি কামান উঁচিয়ে ট্যাংক ঢুকে পড়েছে অথবা সিংটোলায় বা পোড়া মহল্লার গলিতে? দিগবাজারের রাস্তায় কি সাঁজোয়াবাহিনী নেমেছে? বাঙলাবাজার পার হয়ে বুড়িগঙ্গার ধারে ছুটে চলেছে নাকি? নারিন্দার পুলের ওপর দিয়ে যে রাস্তা সোজা গিয়েছে টিকাটুলি, টিকাটুলি থেকে শান্তিবাগ, শান্তিবাগ থেকে রমনা, সব পথে পথেই কি গোলাগুলি চলছে, হাতাহাতি যুদ্ধ হচ্ছে? ভাড়াটে হিংস্র সেনারা কি লক্ষ্মীবাজারকে কাঁপিয়ে চলেছে? আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্মীবাজার পেরিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ক ঘুরে ট্যাংক-বাহিনী টহল দিচ্ছে নবাবপুরের রাস্তায়, যে রাস্তা চলেছে ধানমণ্ডির দিকে।

সংবাদ, ঢাকা শহরের সর্বত্র যুদ্ধ চলছে। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের পাহাড় জমছে। শকুনেরা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

জীয়সের গলিতে কী হচ্ছে। আমাদের সেই পাড়ায়? আমাদের পাড়ার মোড়ে কি কামান উঁচিয়ে রয়েছে। নাকি কামান দেগে সবই উড়িয়ে দিয়েছে?

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় আমাদের জীয়সের গলি তেমনিই আছে। শুধু হিন্দুর পাড়া নয়, হিন্দু মুসলমানের মেলানো পাড়া। মনসুরদের বাড়ি আর বেগম দিদিদের বাড়ি, আমাদের বাড়ির কাছে কাছেই। মনসুরদের বাড়িটা আমাদের বাড়ির প্রায় গায়েই। ও আমাদের সমবয়সী ছিল। আমরা এক সঙ্গে গিরিশমাস্টারের পাঠশালায় পড়তে যেতাম। ওর মায়ের নাম জোবেদা। আমরা জোবেদামাসী বলতাম। আমার মা, মায়ের বয়সীরা সবাই তাকে নাম ধরেই ডাকতো।

জোবেদা মাসীর টিনের বাড়িতে আমরা অনেক উৎপাত করেছি। আতা গাছে উঠে আতা পেড়েছি, কুল পেড়েছি, টিনের চালে উঠে টিন বাজিয়েছি। জোবেদা মাসী চিৎকার করে বকেছে, 'আরে দস্যি পাড়ী পোলা, তর মায়রে ডাইকা কইতাছি।'

কিন্তু মেসোমশাই বাড়িতে থাকলেও চুপচাপ। কোনো কিছুতেই তাঁর নিষেধ ছিল না। আমরা যেন কতগুলো দুরন্ত বাঁদর, কিছু বলার নেই। কেবল যে গাছে উঠে, চালে উঠে উৎপাত করেছি, তা না। জোবেদা মাসীর ঘাড়ে পিঠেও কম উঠিনি। মনসুর যা করতো, আমরাও তাই করতাম। জোবেদামাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো, কিন্তু হাসতে শুধু আর কিছু করতে দেখিনি। বাড়ি ছেড়ে বেরোতো না। জোবেদামাসীর বয়স অল্প ছিল, কখনো রাস্তায় বেরোতে দেখিনি। বিশেষ দরকারে বাইরে যেতে হলে বোরখা পরতো। গলির মোড় থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে যেত।

বেগমদিদির মায়েরা সেসব ছিল না। বিধবা মানুষ, সারাদিন পাড়া বেড়িয়ে বেড়াতো। আমরা মাসীমা বলতাম। বাবা দপ্তরে চলে যাবার পরে মাসীমা রোজ আমাদের উঠোনে গিয়ে বসতো, মাকে

ডেকে বলতো, 'বইন গো বইন, একটু পান দ্যাও!'

মায়ের তখন রান্না বান্নার কাজ। মুখে ধমক দিতো, 'হ, তোমার লেইগ্যা অখন আমি পান লইয়া বইয়া রইছি!'

মাসীমা সেই ধমকে কান না দিয়ে ছেলে ওল্লার সম্পর্কে একরাশ নালিশ শুরু করতো। ওল্লা মানে এপারে যাকে ডেয়ো পিপড়ে বলে। ওল্লাও আমাদের সমবয়সী ছিল। কিন্তু ওর লেখাপড়ায় মন ছিল না। ইস্কুল পালিয়ে সারাদিন আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। ডেঁয়ো পিপড়ে যে! মাসীমা বলতো, 'ছ্যামড়ার জ্বালায় জ্বইলা মরলাম। ছ্যামড়া মরলে বাঁচি।'

মা আবার ধমক দিতো, 'দ্যাখ বাগমের মা, আজাইরা প্যাচাল পাইড়ো না। পোলার মরণ নি আবার কেউ চায়!'

মাসীমা বলতো, 'সাধে কি আর কই, জ্বালায় কই!'

মাকে দেখতাম, পান সুপারি খয়ের চুন সব আলাদা আলাদা কাগজে পুঁটলি করে দিত। এক খিলি পানের ব্যাপার তো না। কয়েকটি পান দিতে হত। তবে বাটা ভরে না, কাগজে। ছোঁয়াছুঁয়ির মানামানিটা কিন্তু ছিল।

বেগম দিদিও বিধবা। তার এক মেয়ে ছিল, নাম আমিনা। আমাদের থেকে কয়েক বছরের বড়। দেখতে সুন্দর। রাস্তায় বা পাড়ায় বিশেষ বেরোতো না। ছাদে উঠে আমাদের সঙ্গে কথা বলতো। বেগম-দিদিদের বাড়ির পাশে, উপেন সাহার বাড়ি। সেই বাড়ির ছেলে ক্ষিতীশ। পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করে। আমিনার সঙ্গে খুব ভাব। পাড়ায় নানান গুজব। বড়দের কথা থেকেই বুঝতে পারতাম, ক্ষিতীশ আর আমিনার মধ্যে নাকি কী একটা ঘটতে যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় কথা, বাড়িতে বাড়িতে আলোচনা। ওসব কথার মধ্যে আমাদের থাকতে দেওয়া হত না। থাকতে না দিলেও কী একটা আবছা অনুভূতি যেন মনে আসতো।

তারপরে হঠাৎ একদিন শুনলাম, ক্ষিতীশ আর আমিনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাড়ায় নানান খবর, ওরা নাকি বিয়ে করেছে। ক্ষিতীশ মুসলমান হয়ে গিয়েছে। কয়েক-দিন নানা গুজব আর উত্তেজনা। কিন্তু দু'এক মাস পরে সবই থিতিয়ে গিয়েছিল।

দেশ বিভাগের পরে এপারে যখন পাড়ার মানুষদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের মুখে শুনেছি, সবাই এসেছে, ক্ষিতীশ আসেনি। ক্ষিতীশ ঢাকাতেই রয়েছে।

এখন যখন সংবাদ, সেখানে যুদ্ধ চলছে, তখন কেবলই মনে হচ্ছে, ওরা কী করছে। ক্ষিতীশ মনসুর ওল্লা ওরা কি সবাই মুক্তি-যুদ্ধে নেমে পড়েছে? ওরা এখন কোন রণাঙ্গনে লড়ছে? আমাদের বাড়ির পিছনে মসজিদের গা ঘেঁষে রহমান সাহেবের বাড়ি। তিনি জজকোর্টের উকীল ছিলেন। তাঁর ছেলে আলী—আলীদা। আমাদের থেকে উঁচু ক্লাসে পড়তো। সুতো মাঞ্জা দিতে আলীদার জুড়ি ছিল না। আলীদা ছাড়া সুতো মাঞ্জা দেওয়া হত না। আর ওর দুই বোন, আল্লালক্ষ্মী আর নাননি, আমাদেরই বয়সী। এতদিনে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে ছেলেপিলের মা হয়ে গিয়েছে। আমার ছেলেবেলার কড়ি খেলার বন্ধু।

আমার চোখের সামনে ভাসছে, সবাই মুক্তি যুদ্ধে লড়ছে। আলীদা আর তার বোনেদের ছেলেরা।

আমি এপারে গঙ্গার কূলে বসে, ওপারের দিকে চেয়ে আছি। কান পেতে আছি। ভাবছি, আমারও কি ডাক আসবে? যদি আসে, কবে? আমি সেই ডাকের জন্যই কান পেতে আছি।

স্বাধীন বাংলাদেশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ রঙের বনেদ—অর্থাৎ শস্য শ্যামল ভূ-প্রকৃতির প্রতীক, মাঝখানে উজ্জ্বল লাল রঙের বৃত্ত—দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গীকৃত শহীদের রক্ত চিহ্ন, তার ওপরে সোনালি রঙে আঁকা পূর্ব বাংলার মানচিত্র। এই পতাকা উড়ছে এখন স্বাধীন বাংলা দেশে। সেখানকার নতুন জাতীয় সঙ্গীত, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। আমাদেরও সবার ভালোবাসা যুক্ত হয়ে আছে বাংলা দেশের সঙ্গে।

একজন উত্তর প্রদেশীয় ভদ্রলোক আমায় প্রশ্ন করলেন কয়েকদিন আগে, ওপারের ওরা যে নিজেদের দেশকে পুরোপুরি বাংলা দেশ নাম দিয়েছে, তাহলে ঐটুকুই কি শুধু বাংলা দেশ? বাঙালী বলতে বাংলা দেশের মানুষকে বোঝায়, তাহলে ওরাই শুধু বাঙালী? ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী যারা, সেই তোমরা তাহলে কি?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, আগে বলুন, ওদিকের ওরা যে স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের অধিকারের জন্য জীবন মরণ লড়াই করছে, আপনি সেটা সমর্থন করেন তো?

কথাবার্তা হচ্ছিল অপরিস্ফুট ইংরেজিতে। কারণ উত্তর প্রদেশীয় ভদ্রলোকটি বাংলা জানেন না, আমি হিন্দী জানি না। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি রীতিমতন উত্তেজিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! শুধু সমর্থন কেন, যে-কোনো রকম সাহায্য করতেও আমরা প্রস্তুত। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রতি সারা ভারতবর্ষ—মাদ্রাজ থেকে পাঞ্জাব সবাই তো সমর্থন জানিয়েছে একবাক্যে। ধিক্কার জানিয়েছে ইয়াহিয়া চক্রকে।

আমি বললাম, তাহলে আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর জানাই। পূর্ব বাংলা যখন 'বাংলা দেশ' নাম নিল, তখন পশ্চিম বাংলার প্রায় কেউই আপত্তি জানায়নি, কেউ ঈর্ষা প্রকাশ করেনি। কারণ, ওদের অস্তিত্ব বিপন্ন, বাঙালীত্বের গর্ব যা পরিচয়ই ওখানকার মানুষকে এক করতে পারে, পেরেছে। আমাদের অস্তিত্ব সেরকমভাবে বিপন্ন হয়নি এখনো। তা ছাড়া, যখন ওদিকের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং এদিকের নাম পশ্চিমবঙ্গ—তখনও ওদিকের এদিকের আমরা সবাই বাঙালীই ছিলাম। এর পরেও থাকবো। পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে এর পরে আমরা 'বাংলা রাজ্য' করে নিতে পারি। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

উত্তর প্রদেশীয় ব্যক্তিটিকে বিনয়ের সঙ্গে আমি আরও বললাম, আর একটা কথা জানেন তো? আপনি বা আমি যদিও একই দেশের নাগরিক, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার যতটা সম্পর্ক—তার চেয়ে অনেক বেশী নিকট সম্পর্ক ঐ অন্যদেশ, বাংলা দেশের যে-কোনো মানুষের সঙ্গে। কারণ আমরা বাঙালী, আমরা একই বাংলা ভাষাতে কথা বলি।

তিনি বললেন, তোমরা বাঙালীরা বড্ড ভাবপ্রবণ।

আমি তৎক্ষণাৎ মেনে নিয়ে জানালাম, হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। এই ভাবপ্রবণতা আমাদের একটা দোষ, আবার এই ভাবপ্রবণতাই আমাদের বন্ধন। প্রত্যেক সচেতন মানুষই নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। কিন্তু বাঙালীর মতন বাংলা ভাষা নিয়ে এতটা বাড়াবাড়িও আর কেউ করে না। এটা তৈরী হয়ে উঠেছে ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষ পাকচক্রে।

বিরলে বসে চিন্তা করলে টের পাই, আমি নিজে যেমন, তেমনি অধিকাংশ বাঙালীই প্রখর যুক্তিবাদী নয়, একটু বেশী ভাবপ্রবণ। এদেশে যে তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী কেউ নেই তা নয়, আছেন কিছু কিছু, কিন্তু তাঁদের কথায় জনচিত্তে এমন তুমুলভাবে সাড়া জাগায় না। বাংলা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে এই যে প্রবল উদ্দীপনা, দলমত নির্বিশেষে সবাই এখানে ওদের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর, হাজার হাজার যুবক মনে মনে পোটেন্শিয়াল সৈনিক হয়ে আছে, এর মর্ম কি? এই রচনা লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত ভারত সরকার স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেয়নি বটে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার সরকার কার্যত স্বীকৃতি জানিয়ে অনুরূপ অনুরোধ জানিয়েছে কেন্দ্রের কাছে। পৃথিবীর আর কোথাও কি এমন হতে পারতো? কয়েকটা প্রশ্ন তো উঠবেই—কূটনৈতিক সন্দেহে

অস্ববিধে, বিশেষ শক্তির ভারসাম্য টসকায় কিনা কিংবা এতে আমাদের নিজস্ব কোনো লাভ আছে কি না। এখানে সেসব কিছু চিন্তা করার অবকাশই আসেনি. শেখ ম্বজিব্বর রহমান বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের জাগরণ হলো, বিনা দ্বিধায় আমরাও বলে উঠলাম, ঐ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যতদিন লড়াই চলবে, ততদিন আমরাও সঙ্গে আছি। বাঙালী হিসেবে আমরাও সহযোদ্ধা।

স্বাধীন বাংলা দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মোটেই শ্বধ্ব পাশাপাশি রাষ্ট্রের নয়, তার চেয়েও অনেক বেশী। ম্বজিব্বর বলেছেন, আমাদের সম্পর্ক ভৌগোলিক নয়, ঐতিহাসিক।

স্বাধীন বাংলা দেশ আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে সম্বদ্ধ হয়ে উঠ্বক, আমরা তার জন্য গর্ব বোধ করবো। ঐ দেশ আমাদেরও দেশ। তেইশ বছরের দ্বঃস্বপ্নের পর বাংলা দেশ আবার বাংলা দেশ। 'প্বর্ব পাকিস্তান' এই নাম আর সে কখনো বহন করবে না। পাকিস্তান ধারনার মৃত্যু হয়েছিল সেইদিন শেখ ম্বজিব্বর স্বাধীনতা ঘোষণা করার অনেক আগে—যেদিন আওয়ামী লীগ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, বাংলা দেশ আর ইসলাম রাষ্ট্র থাকবে না, বাংলা দেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মরক্ষার নামেই পাকিস্তানের জন্ম। নতুন সংবিধানে যদি সেই গোঁড়ামিকে আর প্রশ্রয় না দেওয়া হয়, তাহলে দেড় হাজার মাইল ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন দ্বটি আলাদা ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ আলাদা জাতি চরিত্র ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মান্বষের একই রাষ্ট্র পতাকার তলে থাকার কৃত্রিম চেষ্টার মানে কি?

কিংবা পাকিস্তানের মৃত্যুস্বচিত হয়েছিল তার জন্মের অব্যবহিত পরেই, যখন পাকিস্তানের সর্বেসর্বা জিন্না কড়া গলায় বলেছিলেন, আমি মহম্মদ আলি জিন্না বলছি, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দ্ব। তখন ঢাকার ছাত্ররা নির্ভীকভাবে উত্তর দিয়েছিল, না! আমরা বাংলা ভাষা চাই। ধর্মকে ছাপিয়ে সংস্কৃতির অধিকারের সেই গোড়া পত্তন। তারপর থেকে প্বর্ব বাংলার ব্বদ্ধিজীবী ও স্বস্থ লেখক সমাজ একবারও ভুল করেননি।

আমি হিন্দ্ব নই, যেমন ম্বসলমান হিসেবে পরিচিত আমার কয়েকজন বন্ধ্বও ম্বসলমান নন্। আমি ঈশ্বর মানি না, কোনো পরম ব্রহ্ম বা স্বক্ষ্ম শক্তিও মানি না। শ্বধ্ব মানি না বলবো না, ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথাও ঘামাতে চাই না। আমার ঐ কয়েকজন বন্ধ্বও তাই। ঈশ্বর-উদাসীন ব্যক্তিদের হিন্দ্ব বা ম্বসলমান বা খৃষ্টান নামে অভিহিত করার কি কোন য্বক্তি থাকতে পারে? যদিও কিছ্ব কিছ্ব

পারিবারিক বা সামাজিক আচরণ থেকেই. যায়—কিন্তু সেটা ধর্ম নয়, সংস্কৃতির অঙ্গ। আধুনিককালের উভয় বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সেইরকম আচরণগত বিভেদ কতটুকু? এই সরল সত্যকে উপেক্ষা করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগেও ধর্মের নামে একটি রাষ্ট্র চালানোর চেষ্টা কি অসম্ভব মূঢ়তা! যারা বন্দুক কামান নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তারা কালচার নামে ব্যাপারটাকে একেবারে গ্রাহ্যই করতে চায় না। কোনো জাতির কালচারও যে বন্দুক কামানের প্রবল প্রতিপক্ষ হতে পারে, এটা তাদের মনেই আসে না কখনো। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা নানান দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে—টাকা শুষেছে পূর্ব বাংলা থেকে। তারা খবর রাখেনি, বাঙালীদের মধ্যে একটা হাজার বছরের পুরোনো সংস্কৃতি আছে—এর ভিত্তি আজ এত সুদৃঢ় যে ধর্ম বা সামরিক ক্লীনির তুলে কিছুতেই একে ভাঙা যাবে না। দরিদ্র, শিক্ষাহীন এবং দুর্বল মানুষদের ধর্মের আফিম ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা অনেক পারেনো। কিন্তু বাঙালীরা দরিদ্র এবং কিছুটা দুর্বল হলেও সংস্কৃতিহীন নয় বলেই সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেয়ে ধর্মের বিভেদকে শেষ পর্যন্ত বড় করে দেখতে পারে না। বদরুদ্দীন ওমর এক জায়গায় এই ব্যাপারটাই সুন্দর ভাবে বলেছেন : "এ সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র পথ সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বস্তরে এবং সর্বভাবে খর্ব করা এবং উত্তীর্ণ হওয়া। এ প্রচেষ্টায় সফলকাম হলে, 'আমরা বাঙালী, না মুসলমান না পাকিস্তানী?' এধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানরা আর কোনোদিন নিজেদের কাছে উত্থাপন করবে না। এবং তখনই তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হবে নিজেদের জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়।"

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে থাকুক। ধর্মের আর কোনো সামাজিক ভূমিকা নেই পৃথিবীতে। ধর্মের নামে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ খুন হয়েছে। সব ধর্মেরই মূলকথা সাম্য ও মৈত্রী, কিন্তু তার জন্যই এত নররক্তপাত! অহিংসার কথা সবচেয়ে বেশী আছে খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মে, কিন্তু ঐ দুই ধর্মাবলম্বী দেশগুলিই পৃথিবীতে ঘটিয়েছে দুটি মহাযুদ্ধ। কমিউনিজম না ইহুদী নিধন—এই দোটানায় পড়ে গিয়ে রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপ ইহুদী নিধনই সমর্থন করেছিলেন। এই ধর্মের বিষাক্ত নেশা কত সাংঘাতিক যে ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য কোনো আদর্শ অবলম্বন করলেও মানুষ তা ভুলতে পারে না। ধর্মকে বাদ দিয়ে যে আদর্শ সাম্য ও মৈত্রীকেই প্রধান বলেছে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণী বৈষম্যই পৃথিবীর সব সংঘর্ষের মূলে কারণ বলে যেখানে সঠিকভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে, সেখানেও এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন না করলে চলে না। অনেক সময় আদর্শের চেয়ে খুনোখুনিই বড় হয়ে যায়। এখন পৃথিবীতে তারাই মহৎ রাষ্ট্র নায়ক, যাদের হাত মানুষের রক্তে রঞ্জিত।

পূর্ব বাংলা স্বাধীন বাংলা দেশে পরিণত হবার জন্য যে যুদ্ধে নেমেছে, ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। ধর্মের নামে নয়, পররাজ্য আক্রমণের লোভে নয়, স্বজনধ্বংসী বিপ্লবের নামে নয়—শুধু সংস্কৃতির বন্ধনে যে একটা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে—তার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো পৃথিবীতে। প্রমাণিত হলো, সৎ নেতৃত্ব ও সৎ আহ্বান পেলে একটা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ প্রাণ তুচ্ছ করে উঠে দাঁড়াতে পারে। সামরিক শিক্ষা না পেয়েও সাধারণ গ্রামবাসী প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে তুলে ধরতে পারে অস্ত্র। পারে, কারণ এই সংগ্রামের যুক্তির মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। ভিয়েৎনামে এই শতাব্দীর যে মহৎ লড়াই চলছে, তারই নবতর রূপ প্রকাশিত হলো স্বাধীন বাংলায়।

দাবি আদায় করার জন্য বাংলা দেশের মানুষ শান্তিপূর্ণ পথের সবকটিই পরীক্ষা

প্রচণ্ড আত্মসচেতনার সংগে একের পর এক তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে, তাদের যথাযথ দৃষ্টান্তগুলি উপস্থাপিত হয়েছে পুরোপুরি ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে। রচনার মধ্যে অনুকম্পা বা অশ্রদ্ধার কোন চিহ্ন নেই। আছে গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং সতর্কতা। আর সম্ভবত এটা সম্ভব হয়েছে, এই কারণেই, যাঁর উপর এই দুরূহ কাজের দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে তাঁর একাধারে ঐ বিষয়টির উপর যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনি বাংলা ভাষার উপর অধিকার এবং মমত্ববোধ অপরিসীম। বিনীতভাবে নিবেদন করব, এ পারের মানুষ আমরা উচ্চতর বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ঠিক ঐ ভাবে অগ্রসর হতে অসমর্থ হয়েছি বলেই এখনও পর্যন্ত আমরা 'গোড়ায় গলদ'-রোগে ভুগছি, কাজে কিছু করে উঠতে পারিনি।

কিন্তু ও'দের প্রেরণার উৎস কোথায়?

উৎস যে কোথায় সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড'-এর পরিচালক মুহম্মদ এনামুল হক মহাশয়। আলোচ্য গ্রন্থে 'পরিচালকের নিবেদন' প্রসঙ্গে হক মহাশয় বলেছেন:

'বাংলা-সাহিত্যে বেল্‌-লেটার বা সুকুমার সাহিত্যের অভাব না থাকিলেও, বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাদির অভাব অত্যন্ত প্রকট। অথচ, বর্তমান জগৎ বিজ্ঞানের জগৎ এবং বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন হইয়া আধুনিক বিশ্বে মানুষের জীবন-ধারণ অসম্ভব। এতৎসত্ত্বেও, বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি উদাসীনা দেখাইতে আমরা চির-অভ্যস্ত।'

'ইহার ফলে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিজ্ঞান আজও একটি নাম, এমন কি, নিছক একটি কল্পনামাত্র। সাধারণ মানুষ আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নানা ফল ভোগ করে বটে, কিন্তু মাতৃভাষার বিজ্ঞান-বিষয়ক বই পুস্তকের অভাবে বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের বিজ্ঞতার পরিবর্তে অজ্ঞতাই ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।'

'স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের কথা বাদ দিলেও, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব পীড়াদায়ক। কারণ, বিজ্ঞান বিদেশী ভাষার মধ্যস্থতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আবার, তাঁহারাও এমন কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, যাহা দেশের অগণিত মানুষের রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি দূর করিয়া অগণিত মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিতে সমর্থ।'

'ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বিজ্ঞানের বিশেষ-জ্ঞান অর্থাৎ প্রাণসত্তা-টুকু আমাদের বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠির আপন সত্তার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে নাই বা পারিতেছে না। অথচ, ধর্ম বলুন, দর্শন বলুন, ইতিহাস বলুন, আর সাহিত্যই বলুন, যে কোন জ্ঞানই আহরণ-কারীর আপন সত্তায় পরিণত না হইলে, তাহা কখনও ফলপ্রসূ হয় না। মূলতঃ এই কারণেই, আমাদের বিজ্ঞান চর্চাও বর্তমানে একরূপ নিষ্ফল।'

'পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য শিক্ষা-বিজ্ঞানী মাত্রই এই বিষয়ে একমত হইবেন যে, মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় মানুষকে শিক্ষা দিতে না পারিলে, জ্ঞান কখনও মানুষের আপন সত্তার সহিত মিশিয়া যায় না, অর্থাৎ জ্ঞান কখনও আত্মস্থ হয় না, এবং আত্মস্থতা বিহীন জ্ঞান নিতান্তই অকেজো। প্রকৃত-পক্ষে, আমরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করি বলিয়াই, আমাদের আহৃত জ্ঞান আটপৌরে-প্রয়োজনের বাহিরে অচল হইয়া পড়ে। কেননা, যে-প্রয়োজনের (আমাদের বেলায় গ্রাসাচ্ছাদন আহরণের) তাগিদে আমরা সচরাচর জ্ঞান আহরণ করিয়া থাকি, তাহা যখন মিটিয়া যায় তখন ইহার অন্য কার্যকারিতা ফুরাইয়া যায়। তখন ইহাকে আমরা হয় বহু ব্যবহৃত জীর্ণ-বস্ত্ররূপে পরিত্যাগ করি, নতুবা দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা ন্যাট-পড়া পরিধেয়রূপে অব্যবহার্য করিয়া ফেলি। যাবতীয় জ্ঞান-আহরণের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান সঞ্চয়ের বেলায়, আমাদের অবস্থা অবিকল এইরূপ।......'

'এতদিন আমরা পরাধীন ছিলাম। যেমন-তেমনভাবে কোন রকমে আমাদের দিন চলিয়া যাইত। এখন আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। এইভাবে আর আমাদের দিন চলিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শুধু নিজের কাজে নহে, দেশের কাজেও নিয়োজিত করিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে, দেশকেও উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, শিক্ষার নিম্নতম স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার, তথা রাষ্ট্রভাষার (কেননা, আমাদের রাষ্ট্রভাষাই আমাদের মাতৃভাষা) মাধ্যমে শিক্ষাদান করিয়া নাগরিকদের লব্ধ জ্ঞানকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে।'

'বলিতে বাধা নাই, যাহারা শিক্ষাবিদ্‌ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদিগকেই এই কাজ করিতে হইবে।... সুখের বিষয় এই, দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ দেশটাকে নিরাশ করেন নাই। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার ব্যবহার যে একান্ত আবশ্যক, আমাদের 'প্রবীণ-বিজ্ঞানীরা আজ তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতেছেন। ফলে, বিদেশী-ভাষার মধ্যস্থতায় আহৃত বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানকে আমাদের নবীন বিজ্ঞানীদের আপন সত্তায় পরিণত করিয়া দিয়া ফলপ্রসূ করিবার জন্য প্রবীণ বিজ্ঞানীরা মাতৃভাষায়

জৈব রসায়ন

দ্বিতীয় ভাগ

স্নেহজ চক্রাকেন্দ্রিক যোগকরাজি

ডক্টর মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা

ডি. এস-সি. (লণ্ডন) ; ডি. আই. সি. (লণ্ডন) ; এম. এস-সি. ;
পি. আর. এস. (কলিকাতা)

কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড

ডক্টর খুদা রচিত 'জৈব রসায়ন' গ্রন্থের টাইটেল পেজ

উচ্চমানের বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন। দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তারের খাতিরেই এই বোর্ড লাভ-ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছে, চারি খণ্ডে সমাপ্ত 'জৈব-রসায়ন' নামক গ্রন্থটি ইহাদের মধ্যে অন্যতম।...অধিকন্তু, ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত্-এ-খুদার ন্যায় প্রবীণ ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক যে-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইহার সম্বন্ধে আমার ন্যায় আনাড়ী লোকের কোন কথা বলাও ধৃষ্টতা মাত্র।...'

এই হল প্রেরণার উৎস। তাই ১৯৬৬-র মধ্যেই শুধু 'জৈব-রসায়ন' নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চতর মানের আরও কয়েকটি গ্রন্থ বাংলা দেশের কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রত্যেকটি বই-এর পেছনেই রয়েছেন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর উদ্যোগ। ফলে শুধু রচনা শৈলী নয়, বিষয়বস্তুর বিন্যাস এবং উৎকর্ষের দিক দিয়ে ঐ সমস্ত বই-এর মান আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা 'জৈব-রসায়ন'-এর ভূমিকায় লিখেছেন:

'বাংলা ভাষায় ভাবের প্রাচুর্য থাকিলেও শব্দের স্বচ্ছলতার অভাবে বিজ্ঞানের সাহিত্য এখনও গড়িয়া উঠে নাই।...রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে জাপান পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান আলোচনাকে নিজ ভাষায় আয়ত্ত করিয়াছিল বলিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা করি বলিয়া এখনও বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সক্ষম হই নাই। অথচ চীন আমাদের পরেই নিজ দেশের শাসনকার্যের স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু সেই প্রথম দিন হইতেই তাহারা বিজ্ঞানকে নিজ ভাষায় আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তথায় ১৯৪৯ সাল হইতেই তাহাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চীনা ভাষায় বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। আজ সারা বিশ্ব চীনের বিজ্ঞান-চর্চার ফল দর্শনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে।...'

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন বাংলা ভাষাকে মধ্যস্তরের শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করে, সেইদিন দেশের নূতন ভবিষ্যতের সূচনা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেই ১৯৩৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞানের পুস্তক আজিও আমাদের হস্তগত হইল না।...ইংরেজি যেন আমাদিগকে যূপকাষ্ঠে বন্দী জন্তুর ন্যায় মরণ ধরিয়া রাখিতে চায়। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া আশু প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে, এতদিনে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টিও এই প্রয়োজনের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ডের

প্রচেষ্টা ইহারই দিকে আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ দিয়াছে। এই জন্যই রসায়ন ক্ষেত্রে অন্ততঃ একখানি পুস্তক রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং এই প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় জৈব রসায়নের মাধ্যমে উপস্থিত করিলাম।'

'রসায়নের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে জৈব রসায়ন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু বহু এবং বিভিন্ন। ইহাকে সাধারণতঃ চারিটি বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায়। ইংরেজি ভাষায় এই বিভাগগুলি এলিফ্যাটিক, এলিসাইক্লিক, এরোম্যাটিক এবং হেটেরোসাইক্লিক নামে পরিচিত। ইহাদিগকে বাংলা ভাষায় যথাক্রমে স্নেহকেন্দ্রিক, স্নেহচক্রকেন্দ্রিক, সুরভিকেন্দ্রিক এবং ভিন্নাণুকেন্দ্রিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে।...'

'জৈব রসায়নের দ্বিতীয় ভাগে স্নেহচক্র-কেন্দ্রিক যৌগিকদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কাজ করি তখন বি এস-সি এবং এম এস-সি ক্লাসের ছাত্রদিগকে জৈব রসায়নের এই অংশটি পড়াইবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল।...সেই সময় এইরূপ একটি পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি।...ইংরেজিতে কোন পুস্তক প্রণয়নের স্পৃহা মনে জাগে নাই। তবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে অবিরত মনে হইয়াছে যে, এমন একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া প্রয়োজন।'

'বিজ্ঞানকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহজবোধ্য বাংলা ভাষায় প্রচার করিতে না পারিলে, আমরা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইব না। বিজ্ঞানের শিক্ষাধারা যেদিন দেশের শিক্ষার্থিগণ নিজ ভাষায় গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে সেইদিনই কেবল শিক্ষণীয় বিষয় সুস্পষ্টভাবে তাহাদিগের মনকে স্পর্শ করিবে এবং এই বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োগ করা তাহাদিগের জন্য তখনই সত্য সত্য সম্ভব হইয়া উঠিবে।...'

'যাঁহারা আমাদের দেশে শাসনভার পরিচালনা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহারা এতদিন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেন নাই অথবা প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিলেও মনে করিয়াছেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রথায় শিক্ষাবিধানের চেষ্টা প্রায় অসম্ভব। এই বিশ্বাসে অনেক বিজ্ঞানীও যে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও সত্য, কারণ তাঁহাদের অনেকেই মনে করেন যে, বাংলা ভাষায় উচ্চতর শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞানের পুস্তক প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব।'

'তথাপি আমার মনে হইয়াছে যে, এই কার্য তেমন কঠিন নহে, যাহার জন্য ইহাকে এখনও স্থগিত রাখা প্রয়োজন। সুখের বিষয় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এই জন্যই এই কার্য এত দিনে হাতে নিতে সাহস করিয়াছিলাম এবং আজ মনে করিতেছি, উহা আরও পূর্বে আরম্ভ করা প্রয়োজন ছিল।...'

*

এই আত্মসমালোচনাই বাংলা দেশের মানুষের বিজ্ঞান চিন্তায় অভিনব এক বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে। এবং গত দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই পুরনো সংস্কারকে অতিক্রম করে ব্যাপকভাবে ওঁরা জাতীয় বিজ্ঞান শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিন্যাস করার ব্যাপারে মনোযোগী হন। ছোটখাটো প্রবন্ধ এবং অসুবিধেগুলি দূর করে শুধু স্কুল-কলেজের উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশই নয়, জনপ্রিয়-বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে বাংলা ভাষা। ঠিক এই মুহূর্তে ব্যাপক পরিচিতি উপস্থাপন সম্ভব নয়। তবু আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে ডক্টর কুদরাত-এ-খুদার জৈব-রসায়নের দু'একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

*

'আমিনোর অম্ল ও বেসীগুণ সমতড়িতাঙ্ক (Isoelectric Point : আমিষগুলি যে সকল এমিনো অম্লদ্বারা সৃষ্ট তাহাদের গুণানুসারে, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমটি চক্রক ... যাহার মধ্যে সমসংখ্যক এমিনো $-NH_2$ বা কার্বক্সিল মূলক $-CO_2H$ ... যেমন গ্লাইসিন ও ... দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই সকল ... অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগের অধিকতর বেসী গুণ দেখা যায়। এই অবস্থার কারণ ... মধ্যে অতিরিক্ত এমিনো ... $-NH_2$ থাকা, যেমন আর্জিনিন ও ... রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ যে সকল ... মধ্যে একাধিক কার্বক্সিল $-CO_2H$ বর্তমান, যেমন এস্পার্টিক বা গ্লুটামিক অম্ল মধ্যে রহিয়াছে।

অথবা

কার্বোহাইড্রেটগুলিকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, উহাদের একটি শর্করা, আর একটি শ্বেতসার ও তৃতীয়টি সেলিউলোব।...শর্করা বলিতে আমরা বাংলা ভাষায় চিনি বুঝি অর্থাৎ ইক্ষুরস হইতে যে মিষ্ট দ্রব্যটি আহৃত হয় তাহাই চিনি বা শর্করা নামে পরিচিত। আমরা এখানে ব্যাপকভাবে শর্করা শব্দ দ্বারা সর্ববিধ চিনিকে অভিহিত করিব। যেমন ইংরাজিতে সুগার (Sugar) কথা দ্বারা সর্ববিধ চিনিকে বুঝায়। চিনি বা শর্করাগুলির পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, কতকগুলি শর্করা অম্লসহযোগে জলান্বিত হয় ও তখন উহাদের অণু হইতে কোথাও দুইটি, কোথাও বা তিনটি সরলতর শর্করার অণুর উদ্ভব ঘটে। এই সরলতম শর্করাগুলিকে এক-স্যাকারোয বা এক শর্করা বলা যাইতে পারে। যে সকল শর্করা অণু দুইটি সরলতর অণুর উদ্ভব ঘটায় তাহাদিগকে দ্বি-স্যাকারোয বা দ্বিশর্করী বলা যাইতে পারে...। এই নামকরণ আরও সংক্ষিপ্ত আকারে একোয বা মনোয, দ্বিওয বা ডাইওয এবং ত্রিওয বা ট্রাইওয নামেও

অভিহিত হইয়াছে।......'

অথবা,

চালমুগ্রিক অম্ল : এই দেশে চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে চালমুগরা বলে যে ফল পাওয়া যায় তাহারই নাম উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হিডনোকাপাস আলকালে দিয়াছেন।... অন্যান্য বীজ তৈলের ন্যায় চালমুগরার তৈলও বিশিষ্ট অম্লের গ্লিসেরাইড। ইহার আলকালী জলাপঘটন ফলে গ্লিসেরিন ও একটি অম্ল মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। এই অম্লগুলি অসাধারণ শ্রেণীর, ইহাদের একটি [illegible] অম্ল, যাহার অণু সংকেত $C_{16}H_{28}O_2$ এবং অন্যটি চালমুগ্রিক অম্ল যাহার অণুসংকেত $C_{18}H_{32}O_2$ ইহাদিগের মধ্যে আরও অনেকগুলি অম্ল অল্পতর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে তাহাদের মধ্যে গার্লিক অম্লের পরিমাণ বেশ যথেষ্ট মনে হয়, এখানে ইহার কথাও বিবৃত হইল।...'

প্রত্যেকটি খণ্ডের শেষে পরিভাষার দীর্ঘ তালিকাও যুক্ত করেছেন ডক্টর খুন্দা। যেমন : Accelrator—ত্বরিতক, Convergence—অভিগমন, অনুগমন, Cyclohexanol—চক্রিক ষড়ানল, Diazo acetic ester—দ্বিপ্রযো এসেটিক এস্টার Heat of Combustion দহনী তাপ, Mobility—গতিশীলতা, Nitration—নাইট্রায়ন, Strain theory-টান তত্ত্ব, Monobasic একক্ষারী, প্রভৃতি।

এ কথা ঠিক ঐ সমস্ত পরিভাষার ব্যাপারে কিছু কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে আলোচ্য গ্রন্থে ডক্টর খুন্দা যে ভাবে তাদের ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে উত্তরকালে ঐ সমস্ত শব্দের পরিশুদ্ধি করণের কাজও সহজ হবে। বাংলা দেশের মানুষের বিজ্ঞান চিন্তা ক্ষেত্রে এটাই বোধকরি সবচাইতে বড় রকমের একটি বিপ্লবের পরিচয়। আবর্তসৃষ্টি করে বসে না থেকে লক্ষ্য সম্পর্কে ও'রা যেন অনেক বেশি সতর্কতার সঙ্গে গবেষণা করেছেন এবং সেই পথে চলতে শুরু করে দিয়েছেন, আজ নয়, অনেক আগে থেকেই।

কিন্তু বৈষম্য সেখানেও ছিল। বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ক গবেষণা, কৃষি, পরমাণু বিজ্ঞান, শিল্প রূপায়ন প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই পশ্চিমের সঙ্গে পুবের মধ্যে কতখানি ব্যবধান পলক দৃষ্টিতেই যেন তা ধরা পড়ে। জাতির গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তর প্রকল্পগুলি রূপায়নের সময় পশ্চিম তার নিজের স্বার্থের দিকে সব সময় কড়া নজর রেখে এসেছে গোড়া থেকেই। সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোন আলোচনার মধ্যে না গিয়ে সামান্যতম হিসেব করলেই মূল ব্যবধানটি ধরা পড়বে।

যেমন ধরুন, পাকিস্তানে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বারো। পশ্চিমের ভাগে পড়েছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, পেশোয়ার, করাচি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুবে ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ময়মনসিং-এ, অপরটি লায়ালপুরে। প্রযুক্তি এবং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ঢাকা, লাহোর, ইসলামাবাদ এবং চট্টগ্রামে। কথা ছিল ঢাকার কাছে জাহাঙ্গীর নগরে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে বসান হয়েছে কোয়েটায় ভৌতপদার্থ এবং ভূতাত্ত্বিক বিষয়ক গবেষণাগার, পেশোয়ারে স্থাপন করা হয়েছে বন এবং লাহোরে সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবোরেটারি, ইসলামাবাদে জাতীয় স্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণাগার। অথচ পুবের মানুষদের ভাগে পড়েছে চট্টগ্রামের বন গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লার পশু গবেষণাগার এবং ঢাকার সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবোরেটারি। পরমাণু গবেষণা এবং উদ্যোগের সিংহ ভাগও পশ্চিমের দিকে। করাচিতে বসেছে ১৩৭ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনব্যাপী পরমাণু কেন্দ্র, গোয়াদর-এ সৌরশক্তি কেন্দ্র। পরমাণু সংক্রান্ত কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ইসলামাবাদে, টমব্রোজাম, ঢাকায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে রেডিও-আইসোটোপ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র বসেছে করাচি, লাহোর, জামসোরোতে, পুবে মাত্র একটি জায়গায়, ঢাকায়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণা কেন্দ্রের চারটির মধ্যে তিনটিই পড়েছে করাচি, লাহোর এবং পেশোয়ারের ভাগে, একটি ঢাকায়। সুইস সরকারের সহযোগে যন্ত্র-বিষয়ক কেন্দ্রটিও করাচিতে।... হিসেব করলে বৈষম্যের মাত্রা বেড়েই যাবে। আর সেই সঙ্গে যা চোখে পড়বে তা হল, বেশির ভাগ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং আধুনিকতম বিজ্ঞান উদ্যোগের ব্যাপারে পশ্চিমের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পুবের গরিষ্ঠদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে।

তবু তারই মাঝে বিজ্ঞান এবং কারিগরি ক্ষেত্রে যতটা সুযোগ পুবের মানুষ সংগ্রহ করতে পেরেছেন, যত বেশি সম্ভব সেটুকু তাঁরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন। কৃষিক্ষেত্র থেকে পাটের কারখানা, সেচ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, রেশম শিল্প, সবত্র। আর সেই সঙ্গে তাঁরা আরও একটি জিনিসের চাষ করেছেন, তার ফসলও ফলতে শুরু করেছে। সেটা হল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ফসল।

সুভাষচন্দ্র বসুর পর সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঙালী শেখ মুজিবুর রহমানের আবির্ভাবে আমরা গর্বিত। তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই বিস্ময় অহেতুক, 'বাংলাদেশের' এই গণজাগরণ মোটেই আকস্মিক নয়। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিরোধ সেখানে পর্যায়ে পর্যায়ে এত তিক্ত হয়েছে যে, তেইশ বছর পর তার স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবেই অভ্যুদয় ঘটেছে শেখ মুজিবুরের। ইয়াহিয়াশাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি-বাঙ্গালী যে-ইতিহাস সৃষ্টি করল, তার পিছনেও আছে দীর্ঘ ইতিহাস।

সে ইতিহাস মোগল পাঠান আমল থেকে উত্তর পশ্চিম ভারতের কর্তৃত্ব অস্বীকারের ইতিহাস, প্রাক স্বাধীনতাকালে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বশীভূত না হওয়ার ইতিহাস এবং শোষক মহাজন ও জমিদারের হাত থেকে মুক্তিলাভ প্রচেষ্টার ইতিহাস।

ফজলুল হক সাহেব একবার বলেছিলেন, "পলিটিক্‌স্ ইন বেঙ্গল ইজ ইন রিয়েলিটি ইকনমিক্‌স্ অব বেঙ্গল।"—বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি। সত্যিই তাই। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান এবং তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র, চাষী এবং জমিদারের প্রজা। জমিদাররা প্রধানত হিন্দু। স্বাধীনতা লাভের আগে মুসলমানদের নিজস্ব আন্দোলন বলতে ছিল ওই প্রজা আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক কারণেই তার লক্ষ্য ছিল হিন্দু জমিদার। কিন্তু সেটাকে উভয় পক্ষ থেকেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দুই

১৯৫৪ সাল। মুজিব তখন চৌত্রিশ বছরের যুবক। ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে যখন কলকাতায় আসেন, তখনকার তোলা ছবি

দলের সম্পর্ক বিষাক্ত করা হয়েছে। এই সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। গোড়ায় কংগ্রেস-কর্মী, পরে লীগ সমর্থক, ইত্তেফাকের সম্পাদক আওয়ামি লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী মনসুর সাহেব তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" বইয়ে লিখেছেন—

"বাংলার জমিদার হিন্দু, প্রজা মুসলমান, বাংলার মহাজন হিন্দু, খাতক মুসলমান, উকিল হিন্দু, মক্কেল মুসলমান, ডাক্তার হিন্দু, রোগী মুসলমান, জেলার হিন্দু, কয়েদী মুসলমান, হাকিম হিন্দু, আসামী মুসলমান। শুধু হিন্দু জমিদারেরাই মুসলমান প্রজাদিগকে তুই তুকার করিয়া অবজ্ঞা করিতেন এবং তাদের কাছারিতে ও বৈঠকখানায় এদের বসিতে আসন দিতে অস্বীকার করিতেন তাহা নয়, তাঁহাদের দেখাদেখি তাঁহাদের আমলাফয়লা, আত্মীয়স্বজন ঠাকুর পুরোহিত, উকিল ডাক্তাররাও মুসলমানদের নিজেদের প্রজা ও সামাজিক মর্যাদায় নিম্নস্তরের লোক মনে করিতেন। এটা জমিদার-প্রজার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল না। ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। কারণ একদিকে যেমন কায়েত প্রজারা জমিদারের কাছারি বৈঠকখানায় বসিতে পাইত, অন্যদিকে বর্ণহিন্দুর কাছে অমন নিগৃহীত হইয়াও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু তালুকদার বা ধনী মহাজনরাও মুসলমানদের সাথে বর্ণহিন্দুর মত ব্যবহার করিত।"

এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি কারণ যতটা সাম্প্রদায়িক, তার চেয়ে বেশি অর্থনৈতিক এবং সেই অর্থনৈতিক কারণেই আজ দেশ বিভাগের তেইশ বছর পর পূর্ববঙ্গের মুসলমান স্বধর্মী পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। জিন্নার দুই জাতি তত্ত্ব ছিল ধর্মীয়, এখন পূর্ববঙ্গে যে নতুন দ্বিজাতি তত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাতে ধর্মের স্থান নেই, আছে ভাষা ও সংস্কৃতি। এবং বলাবাহুল্য রয়েছে অর্থনীতিও।

গত তেইশ বছরের ইতিহাস শোষণের ইতিহাস, রাষ্ট্রের একটি গরিষ্ঠ অংশকে ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি নিয়ে পদানত করে রাখার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ থেকে টাকা সংগ্রহ করে সেই টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানে কারখানা বানিয়ে সেই কারখানার মাল পূর্ববঙ্গে বিক্রি করবার যে বিশুদ্ধ পদ্ধতি, তার অন্য নাম শোষণ। বছরের পর বছর সেই শোষণ চলেছে এবং পূর্ববঙ্গ হয়েছে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর। আর পশ্চিম পাকিস্তান? সেখানে দুধ ও মধুর বন্যা। তাছাড়া ছিল চাকরি বাকরিতে পাঞ্জাবী-আধিপত্য। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, সকলেরই তা জানা।

বাংলা দেশের সাড়েসাতকোটি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য আমাদের অনেকের এই সংগ্রাম। মুক্তির বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। বুলেট বন্দুক বেয়নেট দিয়ে বাংলা দেশের মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না। জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের দাবী ন্যায় সংগত, তাই সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।

বাংলা দেশের স্বাধিকার আন্দোলনকে দৃঢ়তর করার অন্যতম প্রয়াস হিসেবে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা।

শেখ মুজিবুর রহমান
১৮।৩।৭১

আওয়ামি লীগের মুখপত্র 'ইত্তেফাক'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় মুজিবর রহমানের আশীর্বাণী

অর্থনীতির উপরে ভাষা ও সংস্কৃতি। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই জিন্না সাহেব কর্তৃক গরিষ্ঠ নাগরিকের মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকারের চেষ্টা, ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন ও আত্মবলিদান, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতি আয়ুবশাহীর আক্রমণ এবং তার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ধিক্কার—সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে অনিবার্য রূপে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

সারা পূর্ববঙ্গে যে নতুন চেতনা, নতুন জাতীয়তা, তার মূলে রয়েছে 'বাঙালিয়ানা'। এই বাঙালিয়ানার মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমান। গত তেইশ বছর পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রবল প্রতাপে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি দেশের যুবক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সেই প্রতিক্রিয়াকে গণ বিপ্লবে সংঘবদ্ধ করার কৃতিত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের। মুজিবুরের পরিচয় তিনি জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী মুসলমান। এদিক থেকে তাঁর পূর্বসূরী এ কে ফজলুল হক। ফজলুল হক সাহেব ছিলেন আগাগোড়া বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালিত্বের জন্যেই তিনি বারবার সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নিজস্ব কৃষক প্রজাপার্টি গঠন করেছিলেন।

তবে বর্তমানের সব আন্দোলন এ তার নেতা মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ফজলুল হক সাহেবের নীতিগত না হলেও চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। দেশ বিভাগের আগে ফজলুল হকের অনুগামী ছিলেন দরিদ্র চাষী মুসলমান, যারা ছিলেন মুখ্যত হিন্দু জমিদারের প্রজা। অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা সাম্প্র-

দায়িক মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মুজিবুরের প্রধান সমর্থক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এ'রা মুক্তমনা এবং তাঁদের ক্রোধ হিন্দুদের প্রতি নয়, পশ্চিম পাকিস্তানী "প্রভুদের" প্রতি। দেশ বিভাগের সময়ে বালক অথবা দেশ বিভাগের পর জন্ম হয়েছে এমন পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের কাছে হিন্দু জমিদারদের শোষণ-কাহিনী অতীতের ব্যাপার বহুলাংশে কল্পিত; তাঁদের কাছে পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের বড় পরিচয়, তাঁরাও বাঙ্গালী, তাঁরাও একই ভাষা ও একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। তাই যে-সর্ব-ভারতীয় বা সর্বপাকিস্তানী নেতৃত্ব ওই বাঙ্গালীর এই দুই অংশের মধ্যে প্রাচীর তুলে বিরোধ সৃষ্টি করে চলেছিল, তাদের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে আঘাত হানল পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীরা। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি নির্দ্বন্দ্ব ঔদাসীন্য পিনডি-ঢাকার সম্পর্কের মত নয়, তাই দুই বঙ্গের তুলনা এক্ষেত্রে অচল। শুধু এইটুকু বলা যায়, দুই বাংলায় আন্তর্জাতিক সীমানা কৃত্রিম, পাসপোর্ট ভিসা অচল এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বন্ধনে দুই বাংলা অবিভাজ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি ফজলুল হক সাহেবের কয়েকটি উক্তি। আজ শেখ মুজিবুর রহমান দুই বাংলার সম্পর্কে যেসব কথা বলছেন, তা ফজলুল হকের বক্তৃতার ধারাবাহী।

১৯৫৪ সালের ৩০ এপরিল পূর্ব-বঙ্গে নবগঠিত যুক্তফ্রনট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক তাঁর ষাট বছরের পরিচিত ও প্রিয় শহর কলকাতায় এলে নানা স্থানে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। হিন্দু ভাইয়ের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হক সাহেব বিভিন্ন বক্তৃতা ও বিবৃতিতে যা বলেন, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা থাকে না, কিন্তু বাঙ্গালী মাত্রেই উল্লসিত হন। হক সাহেব বলেছিলেন—

(১) "দুই বাংলার মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা আমি দেখি না। দুই দেশের মধ্যে এই ব্যবধান কৃত্রিম। দুই বঙ্গের মধ্যে অবাধ যোগাযোগের সব বাধানিষেধ অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং আমি আমার এ প্রচেষ্টায় আমার বন্ধু বিধানবাবুর সহযোগিতা কামনা করি।"

(২) "জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে আমার আর কোন আশা বা আকাঙ্ক্ষা নেই। উভয় বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হয়েছে, তা অপসারিত করবার কাজ যদি আমি আরম্ভ করে যেতে পারি, তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করব। দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তা একটা স্বপন ও ধোকা মাত্র। করুণাময় খোদাতাল্লার দরবারে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করতে পারেন। আমার এই আকাঙ্ক্ষা যাতে পূরণ হয় সেজন্য আপনারা আমাকে দোয়া করুন।"

(৩) "বাঙ্গালীরা পূর্বে বা পশ্চিমে যে যেখানেই থাকুন না কেন, তারা অখণ্ড এবং তাদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে। বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দুভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গে কোন ফারাক নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দু ভাগ করে এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি, ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবেন না।"

(৪) "একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান—এই দুটি বিভেদাত্মক শব্দের সঙ্গে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ভারত বলতে আমি এখনও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমাদের এই সোনার দেশকে দু ভাগ করেছে, তারা দেশের দুশমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না। এই শব্দটি বিভ্রান্তি সৃচনা করবার ও স্বার্থসিদ্ধির একটি পন্থামাত্র।"

(৫) "আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ আমাকে ভারতের ইতিহাস গঠন করতে হচ্ছে। আশা করি ভারত কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি 'ভারত' বলতে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয় অংশকেই বুঝিয়েছি।"

"পূর্ব বাংলার মসলমানরা সাম্প্রদায়িক নন, তাঁদের অধিকাংশ দরিদ্র ও অজ্ঞ, কিন্তু তাদের মন ও দিল খোলা। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের তাঁদের বাঙ্গালী ভাইদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে ও মৈত্রীতে বাস করতে চান।"

(৬) "বাঙ্গালী অখণ্ড এক জাতি, তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং তাদের আদর্শ এক। জীবনের উদ্দেশ্য এক এবং জীবনধারণের পদ্ধতিও এক। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও দুই বাংলা মিলিতভাবে অনেক বিষয়ে সারা দেশকে পথ দেখাতে পারে।"

হক সাহেবের দিলখোলা স্বীকারোক্তির পরিণাম মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে তাঁর বিদায় এবং স্বগৃহে বন্দি-জীবন। শেখ মুজিবুর হক সাহেবের চেয়ে আরও মুক্তমনা, আরও উদার, তিনিও ওই একই ধারায় চিন্তা করছেন বলে তাঁর এবং দেশের ও দলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাক ফৌজ। জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব তাঁর চেলাদের বর্বর হত্যাকাণ্ডে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে জন্ম নিয়েছে নতুন দ্বিজাতি—হিন্দু আর মুসলমান নয়, বাঙ্গালী পানজাবী। যে বিরোধ ও বিভাগে পাকিস্তানের জন্ম সেই বিরোধ ও বিভাগের মধ্যেই জন্ম নিতে চলেছে নতুন রাষ্ট্র—যার নাম বাংলাদেশ, যার লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি, এবং যার কেন্দ্রে রয়েছেন বাঙ্গালীর নব জাগরণের কেন্দ্রমণি, শেখ মুজিবুর রহমান।
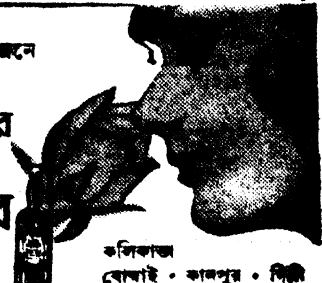
এর নাম অপর্ণা

মায়ের চোখের মণি, ১০০ অবধি স্কিপিং করতে পারে
আর নামতা পারে ১১ ঘর অবধি!

আসল জিনিষটি ওর চাই!

অপর্ণা কেবল বলে, 'আমি যখন হব মায়ের মস্ত বড়'।
ওর মা তাতে বলেন, 'খুব ভাল হবি, খুব কাজের হবি'।
আর তাইতো মা ওকে রোজ হরলিক্স খেতে দেন—
যাতে ওর বাড়ন্ত শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।
হরলিক্সই হলো আসল জিনিষ।
পুষ্টিকর উপাদান আর শক্তিদায়ক প্রোটিন থাকাতে
হরলিক্স ছেলেমেয়েদের শরীর গড়ে তুলতে বিশেষ
সাহায্য করে।

হরলিক্স খাঁটি গরুর দুধ, উৎকৃষ্ট গম এবং অন্যান্য
পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তৈরী বলেই এর এতো গুণ।
হরলিক্সের ওপর মায়েদের অগাধ বিশ্বাস।
ডাক্তাররা আজ ৮০ বছরের ওপর হরলিক্স খেতে
নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
রোজ হরলিক্স খেয়ে আপনার ও পরিবারের সকলের
স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখুন।
হরলিক্স সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তি দেয়।

'হরলিক্স' হ'লো আসল জিনিষ

HL 1884 A

'হরলিক্স' একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
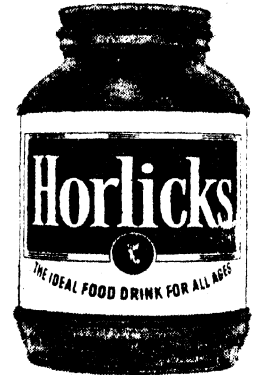
সেদিন সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াতেই আনন্দ, বেদনা আর রোমাঞ্চে মেশানো আশ্চর্য এক অনুভূতি আমায় অসাড় করে ফেলল। তাকিয়ে দেখলাম সেই মাঠ, সেই কাস্তের মতো বাঁকা খেজুরগাছ, সেই বাঁশ ঝাড়, সেই মেঠো পথ, সেই গোয়ালঘর, সেই মানুষ, সেই মাটি। আজও আমার শরীরে লেগে রয়েছে ওখানকার ঘাস-মাটির গন্ধ। এই তো সেদিন এলাম এপার বাংলায়। তবু, ওই মুহূর্তে ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, আমার আশৈশবের পরিচিত ছবিটা যেন কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। মনে হচ্ছিল, সোনার বাংলার সোনার আলোয় যেন মুখোমুখি হয়ে গেছে ওই আকাশ, ওই মাটি, ওই ঘাস। আমার তো এরকম অনুভূতি হওয়ার কথা নয়, আমি তো বেশি দিন এপার বাংলায় আসি নি। কারণটা আমার অন্যখানে। আমি যে আজ পূর্বপাকিস্তানে নয়, স্বাধীন বাংলা দেশের মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছি। যে বাংলা দেশের স্বপ্ন একদিন দেখেছিলেম আমরা—আমি, শাহাবউদ্দীন, হানিফ, আনোয়ার, আলো, ফণি, সীতাংশু, কবীরিয়া, বাচ্চু, বোরহান এবং আমাদের মতো পূর্ব বাংলার আরও অনেকে; সেই স্বপ্নের বাংলা দেশ বাস্তব মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে আজ আমার সামনে। তাই তো আজ এত আনন্দ, এত বেদনা। আনন্দ এই জন্যে যে, ১৯৫৯-৬০ সালে মুন্সীগঞ্জের চরে, রাত্রির অন্ধকারে শ্মশানে, গোরস্তানে, পাটক্ষেতে, ধানক্ষেতে নির্জনে যে বাংলা দেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তা আজ বাস্তবায়িত। বেদনা এই জন্যে যে, সেই স্বপ্নের বাংলা দেশ, সাধের বাংলা দেশ পাক-সৈন্যের হামলায় আজ বিপন্ন; বেদনা এই জন্যে যে, আজ রাইফেল হাতে শাহাবউদ্দীন, বাচ্চু, বোরহান, কবীরিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না।

আমার, আমাদের প্রতিটি বাঙালীর জীবনের এক অবিস্মরণীয় আনন্দের দিন,

কল্হন

লেখক আগে পাকিস্তানে সাংবাদিক ছিলেন। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের সঙ্গে নিজে জড়িত ছিলেন। তিনি এই রচনায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এবং নানান সূত্রে নিজের সংগ্রহ করা খবর জোড়া দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের একটি সম্ভাব্য পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরবার চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে জানাবেন এই মুক্তি-সংগ্রামের গোড়ার কথা, যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। এই সংখ্যা থেকেই লেখাটি ধারাবাহিক মুদ্রিত হবে।

সুখের দিন ১৩ চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৭৭ সাল। হ্যাঁ, বাংলা তারিখই বললাম। কেননা এত বাঙালী তার জীবন থেকে, মন থেকে বাংলা তারিখ, বাংলা সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মুছে ফেলতে চলেছিল, বিশেষ করে এপার বাংলায়। আজ বাঙালীর ঘরে ফেরার দিন। ১৩ চৈত্র অক্ষয় হোক, অমর হোক। যদিও জানি, ইতিহাসের পাতায় ওই ২৬ মার্চটাই চিহ্নিত হবে লাল কালিতে। তবু প্রার্থনা, তবু বলা, বাঙালীর হৃদয় থেকে যেন মুছে না যায় ওই ১৩ চৈত্র। ১৩ চৈত্র ছিল বড় আনন্দের, বড় সুখের দিন। ব্রিটিশ যেদিন ভারতের মাটি ছেড়ে গেল, সেদিনটাও আনন্দের ছিল। তবে আমাদের অনেকের কাছেই নয়। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। ব্রিটিশ দেশ ছেড়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে এইটুকু বুঝলাম। কিন্তু বুঝলাম না কেন দেশটা দু ভাগ হল, বাংলা দু ভাগ হল। কেন ওই সবুজ-সাদার চাঁদ-তারা খচিত পতাকার বিপুল আয়োজন যা দু দিন আগেও দেখতে পাই নি, কেন খুড়ো-জেঠা এবং বয়স্কদের মুখ বিমর্ষ। তখনও বুঝতে পারিনি যে, এপারের খণ্ডিত বাংলা দেশ পরাধীনই রয়ে গেল, স্বাধীন হল না, শুধু হাত বদল হল শাসকের। ইংরেজের হাত থেকে জিন্নাহ-লিয়াকত আলীর হাতে গেল; দিল্লি থেকে করাচিতে গেল। বুঝতে পারে নি আমার বন্ধুরাও—শাহাউদ্দীন বোরহান, বাচ্চু, কবীরিয়া, হানিফ। ওদের সঙ্গে মিলে দল বেঁধে ১৪ আগস্ট তিনি পয়সার বায়স্কোপ দেখে এলাম। মিষ্টি খেলাম; বন্ধুদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলাম 'পাকসার জমিন ইয়ে সাদ বাদ'। কিছুদিন বাদেই দেখলাম, দক্ষিণের পাড়ার ক্যান্তপিসীরা চলে গেল বর্ধমান না কোথায়। ক্যান্তপিসীর বাড়িতে, তুলসীমঞ্চ ঘেঁষে একটা ভালো ফুলগাছ ছিল। সকাল নেই, দুপুর নেই, ওই ফুলগাছের নিচে গিয়ে পাড়ার ছেলেরা গুলতি দিয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে ফুল পাড়তাম। ছোঁক ছোঁক করতাম। ক্যান্তপিসী কতদিন তাড়া করে আসত গালাগাল দিতে দিতে। কিন্তু ওই হেন খিটখিটে মেজাজের ক্যান্তপিসীও যখন পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে চলে গেল গাঁ ছেড়ে, খারাপ হয়ে গেল মনটা। তখন মনে পড়ল ক্যান্তপিসীর মনটা কত ভালো ছিল। কত
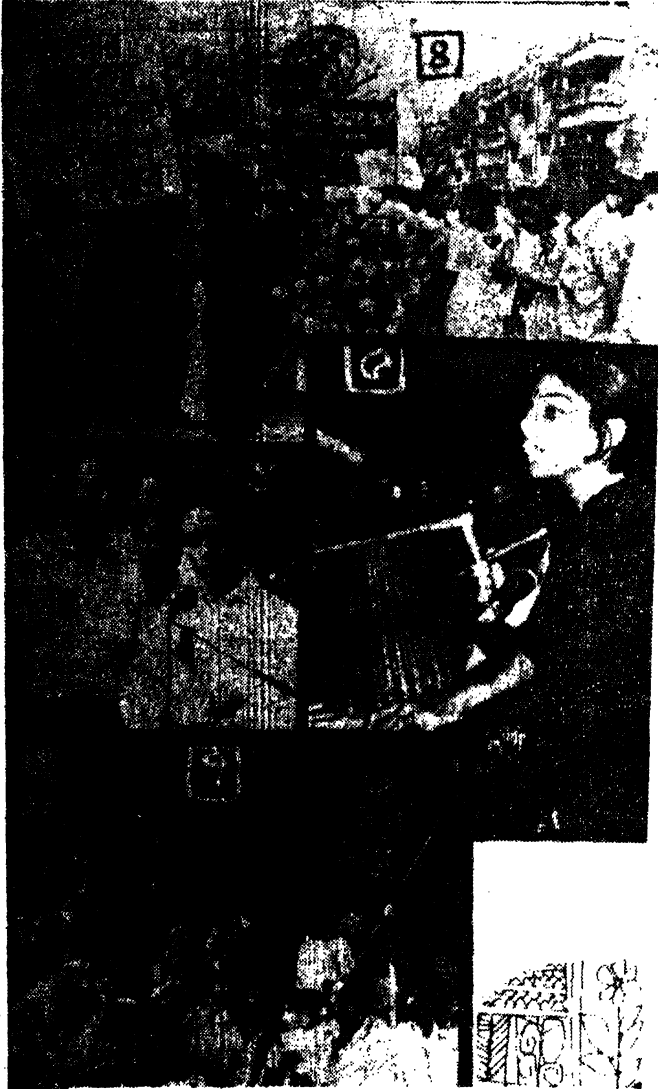
২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের স্মরণে ঢাকায় মিছিল ও অনুষ্ঠান

সময় আমাদের ডেকে ডেকে নারকেলের নাড়ু দিয়েছেন, মোয়া দিয়েছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বলেছেন, খা, আমার সামনে খাড়াইয়া খা। ক্যান্তাপিসীর মতো এ পাড়ার-ওপাড়ার অনেকে ফুলমাসীমা, সুবলকাকা আমাদের নারায়ণ ভুঁইমালী আরও অনেকে চলে গেল ওপারে, পশ্চিমবঙ্গে কইলকাত্তায়। আস্তে আস্তে হিন্দু পাড়াগুলি ফাকা হয়ে গেল বেশ। আমার বাবা কিন্তু তখনও নতুন নতুন জমি কিনে চলেছেন। শরিকরা বাড়ি বিক্রি করছেন, বাবা কিনছেন। বাবার ওই এক কথা, চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। প্রাণ থাকতেও আমি অন্যের হাতে তুলে দিতে পারব না এই ভিটা। যা হয় হবে।

এল পঞ্চাশের দাঙ্গা। হিন্দু মহল্লা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। কত ভিটেমাটি খাঁ খাঁ করতে থাকল। কত আম জাম কাঁঠাল মাটিতে পড়ে পড়ে পচে পচে নষ্ট হয়ে গেল। কত লেবু গাছেই বুড়িয়ে গেল। তবুও কিন্তু আমরা রয়েই গেলাম। স্কুলে তখন আমরা জিন্নাহর জীবনী পড়ছি। উর্দু ভাষা শিখছি। উর্দু পড়াটা স্কুলের ছেলেদের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে গেল। মুসলিম লীগের চেলা-চামুণ্ডাদের দাপটে তখন আমরা কোণ-ঠাসা। রাস্তাঘাটে ভয়ে ভয়ে কথা বলি। ১৪ আগস্ট এলে দেখতাম মুসলমানপাড়া থেকে হিন্দুপাড়ায়ই পাকিস্তানের পতাকা উড়ত বেশি। হিন্দুদের ভয় ছিল, পাছে পতাকা না ওড়ালে কিছু-একটা হয়ে যায়। পতাকা না ওড়ালে মুসলিম লীগের লোকজন এসে দু'একবার যে শাসানি না দিয়ে যেত তা নয়। তবে ছোটবেলা থেকেই আমার অবস্থাটা ছিল অন্য রকম। আমার বন্ধু ছিল রতন (মাজহারুল আজিজ), রশিদ, শাহাবউদ্দীন, বোরহান বাচ্চু, জীবরিয়া—ওরা। ওই সব বন্ধুদের বাড়িতে কত খেয়েছি, ঘুমিয়েছি, আড্ডা দিয়েছি। আমার কাছে তাই ওই সব কার্যকলাপ ছিল খানিক অপরিচিত।

এল বাহান্ন সাল। শুরু হল বাংলা ভাষায় দাবিতে তুমুল আন্দোলন। ঢাকায় মুসলিম লীগের বুলেটের গুলিতে প্রাণ দিল শফিক-রফিক-জাব্বার-বরকত আরও অনেকে। আমার মতো আমার বন্ধু—শাহারউদ্দীন, মফিজ, জীবরিয়া রশিদ ওরাও তখন বুঝেছে, ইংরেজ কুটচালে দেশটাকে ভাগ করেছে। আমাদের মধ্যে খেয়োখেয়ি লাগিয়ে দেশটাকে দুর্বল করে রাখছে। দেশ যখন স্বাধীন হল, জেলারেল থেকে পুলিস কমিশনার পর্যন্ত পাকিস্তানের সব ক্ষমতা তখনও ব্রিটিশ আমলাদের হাতে। জিন্নাহ-লিয়াকত আলী তাদেরই কথা শুনেছেন। করাচির রাষ্ট্র-নায়করা বাংলা দেশের আশাআকাঙ্ক্ষা কে পূরণ করতে পারলেনই না, বরং দিন দিন বাংলাকে শোষণ করলেন। বাংলা দেশের পয়সায় করাচিতে নতুন নতুন ইমারত উঠতে থাকল। আর এদিকে বাংলার বিক্ষোভকে দমিয়ে রাখার জন্য নিলেন রাষ্ট্রনায়করা সর্বনাশা সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়। ১৯৫২ সালে আমরা আমাদের মায়ের ভাষা, ভাইয়ের ভাষা, বুকের ভাষা, মুখের ভাষা, রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ-শরৎচন্দ্রের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লাম আন্দোলনে। বন্ধুদের পাশে পাশে এগিয়ে গেলাম টিয়ারগ্যাসের সামনে। সেইদিন থেকেই পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ঘরে ফেরার পালা হল শুরু। ১৩৭৭ সালের ১৩ চৈত্র সেই ঘরে ফেরার পালা শেষ হল। ওইদিনই সকাল ৯টা ৮ মিনিটে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান, আমাদের প্রিয় মুজিব ভাই বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সন্ধ্যে সাতটায় আবার শোনা গেল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ঘোষকের কণ্ঠঃ স্বাধীন

বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান শুনেছেন।

স্বাধীন বাংলার ভাই-বোনেরা আস্সালামু ওয়ালেয়কুম। মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সারা বাংলা দেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাংলার ধনসম্পদ লুন্ঠন করবার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে না পেরে ওরাও এখনও তাদের শোষণ অব্যাহত রাখতে চায়। ওরা তাই সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন-দিয়ে পৈশাচিকভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর।

সমগ্র বাংলা দেশ সহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্য প্রয়োগের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। আজ সারা বাংলা দেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ তাদের ওপর আঘাত হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। ক্যানটনমেনট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদাররা প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় শত্রুবাহিনী শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে তাদের সৈন্য এনে তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই পি আর ও মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী তাদের মুকাবিলা করার জন্য প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আজ মুক্তি-পাগল কৃষক, শ্রমিক-ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাই—শত্রু সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন; হানাদারদের যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুঁড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিন। হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহর অভিমুখে রওনা হোন এবং ক্যানটনমেনট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তিসেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মুক্তি সেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য চালিয়ে আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন।

বন্ধুগণ, আজকে সারা দেশের মানুষ উৎকণ্ঠায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরপরাধ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের ওপর ওরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে. দেখামাত্র গুলি করছে; হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে। এর নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই। আমরা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাই, বিশেষভাবে জানাই আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট, আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ করে বসে থাকবেন না। বাংলা দেশের এই সাড়ে সাত কোটি ভাইদের বাঁচাবার জন্য আমাদের সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হোন।

চাকায় ভাষা শহীদদের স্মৃতিবেদিতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করছেন শেখ মুজিবুর সহ অসংখ্য নারী-পুরুষ

বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন, আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচানোর তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন।

......পরিশেষে আমি জনগণকে অনুরোধ জানাব, এই দেশ—এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নির্দেশে পরিচালিত হতে। অন্য কারও নির্দেশ বাঙালীরা বরদাস্ত করবেন না; এবং কোনো মার্শাল ল বাঙালীরা মানে না। আমি আহ্বান জানাব বাংলার প্রতিটি নরনারীর কাছে, আপনারা মার্শাল ল মানবেন না। মার্শাল ল আমাদের কাছে গ্রহণের নয়, স্বাধীন বাংলার নাগরিক, স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা।

ওই কণ্ঠস্বর, ওই বাণী শিরায় শিরায় রোমাঞ্চ জাগাল। 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছিল তখন।

বৃথা যায়নি শেখ মুজিবের ওই ডাক। বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ জেগে উঠেছে। মুক্তি-পাগল মানুষেরা মেসিনগান ব্রেনগানের গুলি আর কামানের গোলা উপেক্ষা করে ঝাপিয়ে পড়ছে হানাদার শত্রুর উপর। প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তারা। মেসিনগানের গুলিতে, মর্টারের গোলায় মরছে আজ ওপারের লাখো লাখো নিরস্ত্র ভাই, বোন, মা। বন্দিনী মায়ের মুক্তির লড়াইয়ে ওদের বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগে আজ আমি, আমরা, এপার বাংলার মানুষেরা গর্বিত। ওদের ব্যথায় ব্যথিত। ওদেরকে সাহায্য না করতে পারার অক্ষমতায় আমরা লজ্জিত, ধিকৃত।

এপারের আমরা আজ উদ্বেলিত, উৎকণ্ঠিত। কেননা ওদের কান্না যে আমাদের হৃদয়ও স্পর্শ করে। দুইয়ের রক্তে, এক ভাষা, এক গান, এক সুর প্রবাহিত। ওদেরকে কি আমরা ভুলতে পারি? আমরা দুইজনেই যে বাংলা মায়ের একই নাড়ি-ছেঁড়া ধন; বাংলা মায়ের একই উদার আকাশ তলে, একই আলো-হাওয়ায়, একই অন্নে লালিত। তাই পৃথিবীর মানুষ চুপ করে বসে থাকলেও আমরা বসে থাকতে পারি না। আমার ভাইয়ের, বোনের, মায়ের, বন্ধুর এই নৃশংস হত্যায় আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। তাই তো বাংলা আজ উদ্বেলিত। শাহাবউদ্দিন শোন্, মুজিবভাই শুনুন, শুধু পশ্চিম বাংলা নয়, বাংলা বিহার, আসাম, ত্রিপুরা থেকে সুদূর কেরালা পর্যন্ত ভারতের পঞ্চান্ন কোটি মানুষ তোমাদের ডাকে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমাদের সাধের স্বাধীন বাংলা দেশকে কেউ স্বীকৃতি দিক না দিক পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসী দিয়েছে। এখানে মানবতার জয় হয়েছে। আজ এত বড় দুঃখের দিনে, বিপদের দিনেও এইটুকু যা সান্ত্বনা।

এই কিস্তিটা লিখতে লিখতেই খবর পেলাম রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলা দেশের জাতীয়সঙ্গীত রূপে নির্বাচিত হয়েছে। খবরটা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিছুদিন আগে যখন এখানে খবর বেরোল আজাদ রহমানের সঙ্গীত-পরিচালনায় ঢাকার শিল্পীদের গাওয়া 'পারের আকাশে সূর্য উঠেছে/আলোকে আলোকময়/জয় জয় জয় জয় জয় বাংলার জয়' কোরাস গানটি জাতীয়সঙ্গীত নির্বাচিত হয়েছে বাংলা দেশের, তখন একজন বন্ধুকে আমি বলেছিলাম, হতেই পারে না। কারণ, '৫২ সাল থেকে ঢাকার ছাত্র, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের কণ্ঠে কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এই গান: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি/চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

একুশে ফেব্রুয়ারি কিংবা নববর্ষের প্রভাতফেরীতে আমরা এই গান গেয়ে গেয়ে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের পথে পথে ঘুরেছি। ওই গান '৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের সময় ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলের জপের মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পোস্টারে পোস্টারে শোভা পায় ওই গান। জীবনানন্দের কবিতা: 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি—তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে যাই না আর।' এবং অতুলপ্রসাদের: 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।' সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর

জাগরণের দিনে জাতির কবি রবীন্দ্রনাথের এই প্রাণ-নিঙড়ানো ভালবাসায় মথিত গান যা সুরে স্বদেশী, জন্মে স্বদেশী, ভাবে স্বদেশী তা বাংলাদেশের জাতীয়সংগীত হবে না তো কি একটি সিনেমার গান জাতীয়সংগীত হবে? 'পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে আলোকে আলোকময়' গানটি 'জয় বাংলা' ছায়াছবির গান। মুজিবুরের ছয়-দফার প্রতীক ছয়টি ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে ছবিটি ঢাকার এফ-ডি-সি স্টুডিওতে তোলা হয়েছে। পরিচালনা করেছেন ফখরুল আলম; প্রযোজনা এম এ খয়ের। মুখ্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন আনোয়ার হোসেন এবং সাহান চৌধুরী। জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া ছবিটির ছাড়পত্র দেননি।

সেদিন বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে বুক ভরে বাতাস নিতে নিতে বলেছিলাম, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। বলেছিলাম, 'ওমা তোর চরণেতে এই দিলেম মাথা পেতে, দেগো দে তোর পায়ের ধূলো সে-যে আমার মাথার মানিক হবে।'

কিন্তু ওই মুহূর্তে মনে পড়ল, আমার সোনার বাংলা আজ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বর্বর পাক-হানাদারদের কামানের গোলায় দাউ-দাউ জ্বলছে শহর-বন্দর-গ্রাম। শত্রুর গোলায়, শত্রুর বোমায়, শত্রুর গুলিতে আমার আবাল্যের সংগী, আমার ভালো-বাসার ঢাকা বিধ্বস্ত, পরিত্যক্ত, মহাশ্মশান। আমার বন্ধুরা কে বেঁচে আছে, কে মরেছে, কে লড়ছে এখনও জানি না। উৎকণ্ঠিত, উদ্বেলিত আমি তাই ছুটে গেছি সীমান্তে সীমান্তে আমার বন্ধুর, আমার ভাইয়ের, আমার বোনের, আমার খোঁজখবর, আমার ঢাকার এক টুকরো খবরের আশায়। সীমান্তে পাওয়া খবর থেকে ঢাকার যে ছবি পেয়েছি তা বড়ো মর্মস্পর্শী, বড়ো বেদনার।

ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের বিশেষ পরিকল্পিত অভিযানটি প্রথম শুরু হয় ২৫ মার্চ মাঝ রাত্তিরে। হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা ঢাকার মানুষ ছাদে দাঁড়িয়ে ভীত ফ্যাকাশে মুখে অসহায়ের চাহনি নিয়ে দেখেছে পশ্চিমা সৈন্যদের নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ। যেদিকেই তাকিয়েছে চোখে পড়েছে শুধু আগুনে আর আগুন। ধোঁয়া আর ধোঁয়া।

সেদিন রাত সাড়ে নটা পর্যন্তও ঢাকার অবস্থা ছিল স্বাভাবিক। জিন্নাহ এভিনিউ এবং নিউ মার্কেটে রোজগার মতোই বিকিকিনি চলাচল করেছে নিশ্চিন্তে। বাস চলেছে, গাড়ি চলেছে রোজকার মতোই সবেতে কালো পতাকা লাগিয়ে। তখনও উতলা হাওয়ায় সেক্রেটারিয়েট ভবনের শীর্ষে বাংলা দেশের পতাকা উড়ছিল। পতাকা উড়ছিল হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা বেতার কেন্দ্রে, ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রে।

রাত সাড়ে নটার পরে পরেই মিলিটারি জীপ চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি ঘরে-ফেরা ঢাকাবাসীদের কাছে। কারণ মার্শাল ল' তো রয়েছেই। রাত সাড়ে দশটায় টিক্কা খানের নির্দেশে কুর্মিটোলা ক্যানটনমেণ্ট থেকে শুরু হলো যথার্থ সৈন্যাভিযান। ট্রাক ট্রাক সৈন্য শহর অভিমুখে ছুটল। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র—লাইট মেসিনগান, ব্রেনগান, স্টেনগান এবং রাইফেল। জীপে নিতে দেখা গেল রিকয়েললেসগান এবং মিডিয়াম মেসিনগান। একটি খবরে প্রকাশ, প্রথম দফায় টিক্কা খানের নির্দেশে তিন ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নামে। তাদের সঙ্গে ছিল এক স্কোয়াড্রন গোলন্দাজবাহিনী।

সৈন্যরা প্রথমেই অবরোধ করল তেজগাঁ বিমানবন্দর। বিমান বন্দরটি সৈন্যরা ঘিরে রইল। সেখানে ৩৭ এম এম গান লাগানো আরমারড কারও দেখা গেল। বিমানবন্দরের পর সৈন্যরা একে একে ঢাকার বেতার কেন্দ্র, ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের দখল নিল। ওখানে দুই-চারিজন কর্মচারী যা ছিল তাদের দিয়ে ভবনের মাথা থেকে বাংলা দেশের পতাকা নামিয়ে এনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। সেনাবাহিনী এগিয়ে চলল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার দিকে। একদল গেল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি পেরিয়ে ফুলার রোড ধরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। আর একদল গেল হাইকোর্টের ধার দিয়ে কার্জন হলের দুই পাশ দিয়ে। কিছুটা গিয়েই বাধা পেল সৈন্যরা। রাস্তায় রাস্তায় অনেক ব্যারিকেড তৈরী করা হয়েছে। [illegible] হল থেকে ছাত্ররা প্রথম বাধা দিল, [illegible] বোমা ছুঁড়ল। ৩০৩ রাইফেলের গুলি ছুড়ল। ওদিকে সৈন্যদের ব্রেনগান এল এম-জির গুলি এসে পড়তে লাগল হলগুলোতে। বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী মেসিনগানের গুলিতে তছনছ হলো। বৃটিশ কাউন্সিলের ওপর দিয়ে সৈন্যরা তখন পাশের ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়েছে। ছাত্ররা ছাদ থেকে ঘরের জানলা থেকে ৩০৩ রাইফেল আর ১২ বোরের বন্দুকে প্রতিরোধ করল সেনাবাহিনীর। প্রতিটি [illegible] চলল ছাত্র আর সৈন্য। অনেক [illegible] [illegible] ট্যাংক নিয়ে এলো। ট্যাংক [illegible] সরালো ব্যারিকেড। ৭৫ এম এম [illegible] থেকে গোলা বর্ষণ শুরু করল [illegible] প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে [illegible] গুলিতে। ওখানকার [illegible] হল ভেঙে ভেঙে পড়ল। প্রচণ্ড [illegible] মেসিনগানের মুখে ছাত্ররা আর [illegible] দাঁড়াবে। পিছু হটার পথও বন্ধ। [illegible] শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধের [illegible] করল পশ্চিমা সৈন্যদের। যারা [illegible] গুলিতে মারা যায়নি ছাত্রাবাসের ঘরে ঘরে ঢুকে চৌকির নিচ থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেসিনগান দিয়ে গুলি করেছে। ছাত্রবাসের সব ছাত্রই লড়াই করেছে তা নয়। কিন্তু যারা লড়াই করেনি তারাও রেহাই পায়নি। নির্বিচারে হত্যা করেছে সকলকে। এগিয়ে গেল একদল সৈন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে শহীদ মিনার এবং মেডিকেল কলেজের দিকে। বর্বর সৈন্যদের বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুর-চুর হল শহীদ মিনারের সুন্দর লাল কাচের আর্চগুলি। ফোঁটায় ফোঁটায় জমাট বাঁধা রক্ত ছড়িয়ে পড়ল মিনারের চত্বরে। শহীদ রফিক-শফিক বরকত-সালামের রক্তাক্ত হৃদয় আবার গুলিবিদ্ধ হলো। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য মুসলিম লীগের পুলিশের গুলিতে ওরা প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতির বেদী

এই মিনার। ঢাকার ছাত্ররা এই মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়েই নতুন সংগ্রামের শপথ নেয়। পূর্ব বাংলার ছেলেমেয়েদের সংগ্রামের প্রেরণা আত্মত্যাগের প্রেরণা এই মিনার। এপার বাংলা ওপার বাংলার সাড়ে বার কোটি মানুষের পবিত্র তীর্থমঞ্চ এই শহীদ বেদী। এই সেই শহীদ মিনার যেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে শোষকের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার দীক্ষা নেওয়া হয়। এই তো সেই দিন, একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির কাক-ডাকা ভোরে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর শপথবাণী উচ্চারণ করেছে, 'বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করা হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে বাঙালী আরও রক্ত দেবে, জীবন দেবে, কিন্তু স্বাধিকারের দাবির প্রশ্নে কোনো আপস করবে না।' শেখ মুজিবর রহমান যখন কথাগুলো বলছিলেন তখনো ভালো করে ভোরের আলো ফোটেনি। পরে আকাশে লালের ছোপ ধরেছে সবে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বুকে কালোব্যাজ লাগিয়ে খালি পায়ে সমবেত হয়েছে শহীদ বেদীর সামনে নতুন দিনের নতুন শপথ নিতে।

তিনি বলে চলেছেন, 'বাংলার মানুষ যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে বরকত-সালাম-রফিক-শফিরা নিজেদের জীবন দিয়ে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন। '৫২ সালের সেই রক্তদানের পর ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯-এ—বার বার বাঙালীকে রক্ত দিতে হয়েছে। কিন্তু আজও সেই স্বাধিকার আদায় হয়নি। আজও আমাদের স্বাধিকারের দাবি বানচাল করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য বাঙালীকে ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে হবে—এবার চূড়ান্ত সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে আমরা গাজী হয়ে ফিরতে চাই। চরম ত্যাগের এবং প্রস্তুতির বাণী নিয়ে আপনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুন, বাংলার প্রতিটি ঘরকে স্বাধিকারের এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে দেখিয়ে দিন, বাঙালীকে পায়ের নিচে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারু নেই।' একটু থেমে তিনি আবার বলেছিলেন, 'ষড়যন্ত্রকারী শোষক গণ-দুশমনের দল বার বার বাঙালীর রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছে। যারা নির্মম শোষণে লুণ্ঠনে বাংলার মানুষকে ভিখারীতে পরিণত করেছে, তারা আজও নিজেদের কুমতলব হাসিল করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।' শেখ মুজিব হাত তুলে কারু প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা জেনে রাখুন ১৯৫২ সাল আর '৭১ সাল এক নয়—ষড়যন্ত্রকারীদের বিষ দাঁত কী করে ভাঙতে হয় এখন আমরা তা জানি। কারু প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই, আক্রোশ নেই। আমরা চাই স্বাধিকার। আমরা চাই আমাদের মতোই পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচ এবং পাঠানরাও নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেউ আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে। ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়। সম্প্রীতি আর সংহতির নামে বাংলাদেশকে আর কলোনী বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে দেব না। যারা সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর স্বাধিকারের দাবি বানচালের জন্য বাঙালীকে ভিখারি বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখছে তাদের উদ্দেশ্য যে-কোনো মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।'

একটু থেমে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে শেখ মুজিব ফের বললেন, 'ভাইরা আমার বোনেরা আমার—সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে

এসে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন—বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়, বঞ্চিতও না হয়, লাঞ্ছিত অপমানিত না হয়। দেখবেন, শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।

'যতদিন বাঙলার আকাশ-বাতাস মাঠ-নদী থাকবে, ততদিন শহীদরা অমর হয়ে থাকবে। বীর শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফরিয়াদ করে ফিরছেঃ বাঙালী তোমরা কাপুরুষ হইও না। চরম ত্যাগের বিনিময়ে হলেও স্বাধিকার আদায় করো। বাংলার মানুষের প্রতি আমারও আহ্বান—প্রস্তুত হোন। স্বাধিকার আমরা আদায় করবই।' শেখ মুজিবের আহ্বানে বাঙালী সাড়া দিয়েছে। স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আজ ঝাঁপিয়ে পড়ছে মেসিনগানের গুলি আর মর্টারের গোলা অগ্রাহ্য করে। বন্দিনী মাকে মুক্ত করার জন্য শত্রুর আধুনিক গোলাগুলির মুখে অসম সাহসে লড়াই চালিয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। আজিমপুর গোরস্তান থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত যে-রাস্তা একুশে ফেব্রুয়ারির পবিত্র
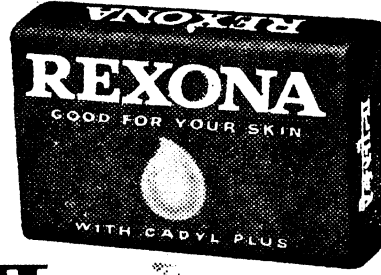
দিনে আলপনায় আলপনায় ভরিয়ে তুলেছিল ঢাকার ও কারু কলেজের ছাত্ররা, আজ তা রক্তে রক্তে লাল। একটি দুটি নয়, শয়ে শয়ে তাজা প্রাণের রক্তে হয়েছে রাঙা ওই পথ। যে-পথে শফিক-বরকত-জাব্বার প্রাণ দিয়েছে, যে-পথে আসাদ-মনিরুজ্জমান প্রাণ দিয়েছে সেই পথ আজ হাজার ছাত্রের রক্তে হয়েছে ছয়লাপ। হায়, কত প্রতিভা, কত মনীষা ঝরে গেল পাক-সৈন্যের মেশিনগানের গুলি আর কামানের গোলার সামনে কে তার খোঁজ রাখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন বিল্ডিং জ্বলছে দাউ-দাউ। ধোঁয়া আর আগুন ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শত্রুর মর্টারের গোলায় ধ্বসে গেছে মেইন বিল্ডিং। উড়ে গেছে মধুর ঐতিহাসিক ক্যান্টিন। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সংগ্রামের জন্ম হয়েছে ওই মধুর ক্যান্টিনে। ওই মধুর ক্যান্টিনে বসেই শেখ মুজিব, আজিজুল হক, আলী আহাদ, তোয়াহারা একদিন ভাষা-আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ওইখানেই জন্ম নিয়েছিল '৬২, '৬৬, এবং '৬৯ সালের গণ-আন্দোলন। ওই ক্যান্টিনের সঙ্গে মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, তোফায়েল আহম্মদ, সাইফুদ্দিন, মানিক, জামাল হায়দার, নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস, মাখন আরও অনেক অনেক বাংলা মায়ের বীর ছেলেমেয়েদের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে শেখ মুজিব থেকে শুরু করে অসংখ্য নেতার। আমাদের অনেক সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার স্মৃতি জড়ানো ওই ক্যান্টিন আর নেই। বর্বর দস্যুর গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেটি। রকেট ছুড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল সবত্র। সৈন্যরা বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ঘেঁষে রাস্তার কাছেই মধুর ক্যান্টিন। ওই ক্যান্টিন গুঁড়িয়ে দিয়ে ট্যাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকে পড়ল। ট্যাঙ্ক থেকে গোলা ছুটেছে রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে চিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আটশ ছেলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। দিন-কয়েক থেকে তারা ওখানেই থাকত। তাদের সঙ্গে থাকত তাদের কয়েকজন প্রিয় অধ্যাপকও। যারা তখনও বেঁচে ছিল, সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে নির্বিচারে গুলি করে মেরেছে তাদের। অধ্যাপকদের আবাস স্থানে ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে ডক্টর জিসরত আলী, ডক্টর সারওয়ার মুরশিদ, ডক্টর মনিরুজ্জামান, ডক্টর মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং আরও কয়েকজনকে। এঁরা সকলেই বিভাগীয় প্রধান। জহিরুল হক ইকবাল হলের একজন সেই রাত্রে কোনো মতে পাকিস্তানী সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার মুখে শুনেলাম সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী। অধ্যাপকদের সার করে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। অধ্যাপকদের পরিবারের লোকেরাও রেহাই পাননি। ঘুমন্ত শিশুদের বিছানায়ই মেরে রেখে চলে গেছে। এমন অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক এবং ছাত্র খুনের এমন নজিরও সম্ভবত আর নেই। জনৈকা বিদেশিনী এক পাক অফিসারকে জিজ্ঞেস করছিল তোমরা নিষ্পাপ শিশুদের কেন মারছ? সৈনিকটি জবাব দিয়েছে : না হলে ওরাই একদিন তাদের মায়ের, ভাইয়ের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। সৈন্যরা পরিকল্পিতভাবেই বাংলাদেশের সেরা অধ্যাপককে হত্যা করেছে। ইয়াহিয়ার অভিমত : মুজিবকে মদত দিচ্ছে অধ্যাপক এবং ছাত্ররা, তাঁরাই হলেন পূর্ব বাংলার সমস্ত গণ-আন্দোলনের অগ্র-পথিক। তাঁদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলে ভবিষ্যতে পূর্ব বাংলায় আর গণ-আন্দোলন দেখা দেবে না। শোনা যায়, দর্শন বিভাগের প্রধান ডক্টর গোবিন্দ দেবকেও বর্বরেরা হত্যা করেছে। অপর একটি খবরে বলা হয়েছে, তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়েছে। জানি না, কোনটা সত্যি। তিনি শুধু বেঁচে থাকুন আমাদের একান্ত কামনা এই। তাঁর মতো অধ্যাপক এ-যুগে বিরল। তাঁর বিভাগ বলে কথা নয়, সকল বিভাগের ছাত্রের কাছেই তিনি ছিলেন খুব প্রিয়। কোনো দুষ্টু ছাত্রকেও কখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অসংযত উক্তি করতে শুনিনি। আত্মভোলা দেবতুল্য অমন পণ্ডিত মানুষটির ছবি আজ চোখের সামনে ভেসে উঠছে বার বার; ওই সব অধ্যাপকদের জন্য মনটা আজ হুহু করে উঠছে। হায়, বাংলাদেশের কত মনীষা শেষ হয়ে গেল বর্বর দস্যুর বুলেটের গুলিতে।

[ক্রমশ]

জাহ্নবী সদাগর

পশ্চিমের ব্যারান্দা পূবের জাফরি

সেই ঝড় উঠল। কাল বোশেখী। অথচ সেদিন কেউ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে তা দেয়নি। সেই প্লাবন বইল। রক্তের। কিন্তু নদীর গভীরতার, তার পীড়নের পরিধির, তার যন্ত্রণার স্ফীতির মাপ নেবার যন্ত্র ছিল না কারুর হাতে। গরজই বা কার? নদীর চড়ায় যাদের বাস তাদের ছাড়া। বিভীষিকার ছবি দিয়ে যারা অ্যালবাম সাজাবে, তারা ঘরে দোর দিয়ে বসে তাস খেলবে না তো কী করবে? বা রে আমার অভিমান। বলিহারি।...

তের হাজার মাইল দূরে সাগরপারের দেশের সেই দিনগুলোর কথা আজ স্বপ্নের মতন মনে পড়ছে। জানতুম একদিন এসব স্বপ্ন হয়ে যাবে। পূর্বজন্মের স্মৃতির মতন আবছা হয়ে মিলিয়ে যাবে।...

আমার ঘরণী তার লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে একখানা চিঠি লুকিয়ে রেখেছে। আমায় বলেনি। কিন্তু আমি জানি ওটা তার ভবিষ্যতের সঞ্চয়। আকবরী মোহরের মতন যে সব দিন চলে গেছে, ওই চিঠিতে তার দু-এক রতি স্মৃতি লেগে আছে। মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে তাই দেখে। উঁকি মেরে আমিও একবার দু'বার দেখেছি—

"...তুলিন এবার তিনে পড়ল। এবার ওর জন্মদিনে তোর হাতে তৈরী জামাটা পরিয়ে দিয়েছিলুম। এখন ওটা ওর গায়ে ঠিক ফিট্ করে। আর এক বছর পরে ছোট হয়ে যাবে। তখন আর পরতে পারবে না। তবুও ওটা তুলে রাখব। কাউকে দেব না। তুলিন বড় হলে তাকে দেখাব। বলব 'তোর মাসি দিয়েছিল।' ও ততদিনে কলেজে পড়বে। তোকে চিনতে পারবে না। অবাক হবে। তারপর ওর একদিন বিয়ে হবে। কখনো সখনো তোদের কথা উঠবে। তারপর আস্তে আস্তে সবাই সবাইকে ভুলে যাব। আর হয়ত কোনদিন দেখা হবে না। ...কেন তোরা এসেছিলি রে?...আমরা শীগ্গির দেশে ফিরব। ঢাকায় কিংবা রাজসাহীতে, কোথায় থাকব এখনো ঠিক হয়নি। আচ্ছা এমনো তো হতে পারে, বাংলাদেশেই তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোর তো বাপের বাড়ি যশোরে, না? কখনো কি আর আসবি না?...' একদিন অনেক বড় হবে, হবেই আমি জানি। ওকে যে আমি কত ভালবাসি, তুইও জানিস না। ওকে তুই প্রেরণা দিবি। ফুটে উঠতে সাহায্য করবি। তাহলে তোকে আরো অনেক বেশি ভালবাসব।...

—তোর দিদি-মাসুদা।"

ঝড়ে সব তছনছ হয়ে গেছে। উত্তাল তরঙ্গগুলো ঘরোয়া বেতারে আর ধরা পড়ে না। ভালবাসার টিমটিমে লণ্ঠন জ্বেলে আমি এপারের বালিয়াড়ি তোলপাড় করছি। মাসুদা, মাসুদা বউদি তোমরা বেঁচে আছ?...বড়দা, তোমার উপহারের লুঙ্গীটা অনেকদিন ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু তোমার দেওয়া শচীনদেব বর্মণের রেকর্ডখানা বুকে আঁকড়ে রেখেছি। সেটা থেকে দিনরাত্রির

পানামা

সত্যিই ভালো সিগারেট

বাছাই-করা ভার্জিনিয়া তামাক নিপুণভাবে মিশিয়ে তাদের টাটকা স্বাদগন্ধ বজায় রেখে তৈরী হয় আপনার পানামা। নিজে খেয়েও আরাম পাবেন, অন্যকে দিতেও ভাল লাগবে!

সুরে গুনগুনিয়ে বেড়ায়—"কই গেলা রে বন্ধু কই রইলা রে..."...

*

প্রবাসে তখনো ভেরাত্তির পেরোয়নি। ওখানে আমার লোকাল গারজেন বেচু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবার আমার গার্হস্থ্যাশ্রমের হরেকরকম তদারকির ভার নিয়েছেন। আর আপিস ও বহির্বিশ্বের খবরদারির দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী। ওঁরাই পরিচয় করিয়ে দিলেন ও-বাংলার সহকর্মীদের সঙ্গে।

লম্বা চওড়া ফরসা সুঠাম চেহারার আবদুল মান্নান। 'ডু য়ু স্পিক্ বেংগলী'—আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন মিষ্টি হেসে—'আরে আমি বাঙালী, মশায়।' ছায়াছবির হিরো ছিলেন ঢাকায়, লাহোরে। করাচি থেকে বাংলায় খবর পড়তেন। অন্য নাম—ইশতিয়াক আমেদ। তাঁর ছোট ভাই ইকবাল। ছটফটে বাঙালী চেহারা। দাদার সঙ্গে কোথাও কোনো মিল নেই। মার্কিন বউ। সে এখন ওখানকার নাগরিক। পরীর মতন মেয়ে হয়েছে একটা। এঁরা দুই ভাই আর দেশে ফিরবেন না। আলাপ হল শরফুল আলমের সঙ্গে। এককালে কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়েছেন। ল-ও বোধ হয় পড়েছিলেন কিছুদিন। বৈশিষ্ট্যহীন টিপিকাল বাঙালী গড়ন। শুধু পুরু লেন্সের চশমার পেছনে ঝকঝকে বুদ্ধির আলো। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে ওঁর প্রচণ্ড ইয়ার্কির সম্পর্ক। ঢাকার নাট্যসংস্কৃতির আন্দোলনে শরফুল আলম একটি প্রতিষ্ঠিত ফিগার।

বিরলকেশ, ছিমছাম একটি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের টেবিলের পাশে এলুম। জয়ন্তবাবু বললেন—

'ইনি আমাদের বড়দা—সাঈদ সিদ্দিকি।' এক নম্বর গার্স্টিন প্লেস কলকাতা রেডিওর নাটক-গান ও সাহিত্য শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। কাজী নজরুল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও আব্বাসউদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ঢাকার সংস্কৃতি-মহলে এঁর পরিচিতি সর্বজনীন।

ওয়াশিংটনের ভার্মন্ অ্যাভেনিউয়ের ওপর ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্ট। প্রথম দিন সাতেক ওখানে ছিলুম। সেদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরেছি। দরজায় নক্। দরজা খুলেই দেখি আলম দম্পতি। ঈষৎ বিব্রত বোধ করছিলুম। এ বাসাটা অত্যন্ত সাময়িক। ফার্নিচার যৎকিঞ্চিৎ। ওঁদের কোথায় বসতে দেব। ওঁরা ওসবে আমল দিলেন না। আলম সাহেব আমার সোফার দিকে দৃকপাত না করে খাটের ওপর চেপে বসলেন। আমার বড় মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে মিসেস আলম তাঁর কাউন্টারপার্টকে চায়ের আয়োজনে সহায়তা করতে লেগে গেলেন। মিনিট দশেক একটা শিষ্টাচারের লেক-আপ ছিল। তারপর সেটা আপনিই উবে গেল।

: আরে দূর মিয়া, তোমাকে আপনি বলব কি। তুমি আমার ছোটভায়ের বয়সী। কী, রাগ করবে?

আমার হয়ে জবাব দিলেন আলমজায়া:

'তোমরা পুরুষগুলো অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড। আপনি থেকে তুমিতে আসতে এত সময় লাগে? আমি তো প্রথম থেকেই ওঁর গিন্নিকে তুমি বলছি। রাগ কোথায়, অনুরাগই তো দেখছি—

অকটোবর মাস। হিমের হাওয়ায় গাছগাছালি ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাদের গরম পোশাক তখনো তেমন বেশি কিছু কেনা হয়নি। ওঁরা সাবধান করলেন। এই সময় ঠাণ্ডা লেগে গেলে মুশকিল। ওঁদের গাড়িতে আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন বাজারে। আপত্তি ওজরে কান দিলেন না। একটা দোকানে ঢুকে বাচ্চাদের প্যাডেড্ জ্যাকেট কেনা হল। সবে তিনদিন এসেছি। সঙ্গে যথেষ্ট ডলার ছিল না। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড তখনো কিছুই হয়নি। আমি ইতস্তত করছিলুম। ওঁদের ওসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দাম দেবার সময়ে আলম আমার কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তাঁর স্ফীত পার্স কিঞ্চিৎ লঘু হল। আমার স্ত্রীর দ্বিধা দেখে শ্রীমতী আলম ক্ষেপে গেলেন। চোখ পাকিয়ে ধমক দিলেন—'এরকম পর-পর ভাবলে এখানে থাকা চলবে না। প্যাক করে কলকাতায় চালান করে দেব।' ফেরার পথে আলমভবনে কিঞ্চিৎ পানাহার হল।

'চলে তো?' পানরসিক আলমের সওয়াল।

'অল্পবিস্তর'—ঘাড় কাত করে জবাব দিই।

প্রায় বিনা বিরতিতে হাজার হাজার মাইল জেট বিমানের উচ্চতায় উড়ে বেড়ানোর পর মাটিতে নামলেও মাথায় জেট ঘোরে। স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। মানসিক অস্বস্তি থাকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। আমারও তখন সেই অবস্থাটাই যাচ্ছে। কেমন একটু আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব। ওঁদের সঙ্গে ঘণ্টা দুই কাটানোর সময়ে গোটাকতক আন্তরিক দমকা হাওয়ায় আমার মাথাটার অনেক উপকার হল। আড়ষ্টতা কেটে গেল।

এক সপ্তাহ পরে আমি ডীলড্রাইভে প্ল্যাসম্যানর অ্যাপার্টমেন্টে বাসা বাঁধলুম। আলম আর ইশতিয়াক ঐ পাড়ারই বাসিন্দা। বেচুবাবুরা থাকেন তিন ব্লকের মধ্যে। দুটো পাড়া বাদ দিলেই সিদ্দিকি সাহেবের বাড়ি। আমরা একটা অলিখিত অঘোষিত বাঙালী কলোনি কায়েম করলুম। তারপর দিন এগিয়ে চলল। ওয়াশিংটনে আমি পুরনো হয়ে গেলুম।

তখন পাক-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। আপিসে আমরা সময় পেলেই তুমুল বাকবিতণ্ডা চালাই। আবার যথারীতি বাঙালী কজন জোট বেঁধে

কজন করি। জয়ন্তবাবু, সঙ্গে না গেলে সিদ্দিকী সায়েবের ক্যাফেটেরিয়ায় কফি খেতে যাওয়া হয় না। বেচুদার পরামর্শ ছাড়া ইকবালের গোলাপচারার চিকিৎসা হয় না। তামিলভাষী, উর্দুভাষী, ইরাণী, গ্রীক ও মার্কিনী সহকর্মীরা ঠাট্টা করেন : তোমরা যে-যার দেশের শত্রু।

নভেম্বর মাসের একদিন সন্ধ্যেবেলা। সিদ্দিকীসায়েবের বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন। ওঁর বড় মেয়ে বকুল আমাদের সঙ্গে কথাটথা বলছে। ওর চোখ ছলছল করছে, মুখ ভার। অন্যদিনের মতন হাসি খুশি নয়। ছোট মেয়ে রুণুকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? বকুল বললে : 'ওঘরে রয়েছে। কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলিয়েছে। তাই...'

'কেন, কী হয়েছে ওর?'

বকুল বললে : 'কাকু কাল চলে গেলেন তো, তাই...!' ওর চোখ থেকে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ল।

জয়ন্তবাবু ওঁদের বাড়িতেই এক বছর ছিলেন। কালই দেশে ফিরে গেছেন।

রোদের দিনে পিকনিক, ঈদের দিনে গল্পগুজার, কখনো ভালবাসার জোয়ার, কখনো

"আমি গিয়ে আপনাকে তুলে নিয়ে আসব।"

"কী দরকার, ঠিকানা বলুন, ট্যাকিস নিয়ে—"

"দূর মশায় আমার গাড়ি আছে"

"অ—অ—তাহলে আর কথা কি। চলে আসুন। এখানে আড্ডা হচ্ছে।"

প্রথমেই অফিসের বসকে ধরলুম—একটু আগে পালাব। অতিথি আসছেন। ওঁর আসার খবর অবিশ্যি সরকারীভাবে আমরা আগেই পেয়েছি। কেবল তারিখটা জানা ছিল না। বস হাসিমুখেই মঞ্জুর করলেন। উপরন্তু এক চোখ টিপে বললেন—একটা ইনটারভিউ হয় না?

'দেখব।' বলে আমি এবার বাড়ির বসকে ফোন করলুম। হুকুম হল আসার পথে হোয়ার্ফ থেকে বড় দেখে কাৎ[illegible] শ্যাড (আমরা ওয়াশিংটনের বাঙালী সমা[illegible] যথক্রমে রুই এবং ইলিশ বলে চালাতুম) নিয়ে আসার; আর সেফওয়ে থেকে [illegible] পাউন্ড কাঁচা লংকা।

হাতে একটা জরুরী স্ক্রিপ্ট ছিল। সেটা শেষ করেই উঠে পড়ব ভাবছি। আবার ফোন। সেক্রেটারী বললে—'য়োর ওয়াইফ।

"শোনো, মিসেস আলম তো ওঁর লেখার খুব ভক্ত। উনি আর আলম সাহেব খানিক পরেই আসছেন। কাফি গিন্নি এখানেই। ওঁকে ছাড়ছিনে। তুমি আমার সময়ে ভাসুরকে উঠিয়ে নিয়ে এসো।"

আমার শ্রীমতীর ভাসুর—সহকর্মী মুহম্মদ কাফি, ওরফে কাফি খাঁ ঢাকার বেতার চলচ্চিত্র মঞ্চ ও টেলিভিশনের খ্যাতিমান ব্যক্তি। তিনি জানালেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের জয়েন করবেন। আমি কেটে পড়লুম।

কানেটিকাট অ্যাভেনিউয়ের ওপর উইণ্ডসর পার্ক হোটেল। দিন কতক আগেও এখানে এসেছিলুম গৌরদাকে (গৌরকিশোর ঘোষ) নিতে। এখানেই উঠেছেন বাংলার জনপ্রিয় লেখক 'শংকর'—মনিশংকর মুখোপাধ্যায়। তাঁর কল্যাণে আজ আমার সূর্যাস্তটা দেখা হল। তাঁকে ধন্যবাদ।

হোটেলে শংকরের রুমে তখন জমাটি আড্ডা। বন্ধুবর ধীরেন ঘোষ এবং কয়েকজন মারকিন তরুণ তরুণী ওঁকে ঘিরে রয়েছেন। ওখান থেকে ওঁকে নিয়ে বাড়ি চলে এলুম। পথের গাড়ির ভিড় কাটিয়ে ধাক্কা এড়িয়ে, পুলিসের শুভদৃষ্টি বাঁচিয়ে যতো সম্ভব সুকৌশলে তাড়াতাড়ি গাড়ি চলছে। অর্ধনিমীলিত চোখে বন্ধুবর শংকর টিপ্পনি দিলেন : এদেশে এলে [illegible] রাতারাতি কত স্মার্ট হয়ে যায়, [illegible]—আমার কপালে কমপ্লিমেন্ট [illegible]।

আমার বাড়িতে তখন চাঁদের হাট বসেছে। সস্ত্রীক আলম সাহেব, সস্ত্রীক কাফি সাহেব, ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] ডক্টরেট গৌতম গুপ্ত—আরো কেউ কেউ। আমরা আসার পর আড্ডা জমে উঠল। সমাগতদের প্রায় সবাই ছিলেন শংকরের নিয়মিত পাঠক। ঢাকার সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিয়েও আলাপ-আলোচনা হল। রাত আড়াইটের আগে সে আসর ভাঙেনি। আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হয় আমেরিকার মাটিতে এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলার মিলনের যে ছবি শংকর তুলেছেন, আমার বাড়ির ওই ছোট কিন্তু নিবিড় আড্ডাটাই তার সূত্রপাত।

কাফির বাড়িতেই আলাপ হল একটি ছেলের সঙ্গে। খুবই কম বয়েস। [illegible]-এর ওপর কমপ্যারেটিভ স্টাডি এবং রিসার্চ করতে এসেছে। 'নিউইয়র্ক'-এ [illegible] থাকে। তরুণ কবি [illegible]। আমার একটা ছুটির দিন সারা দুপুর আমার বাড়িতে [illegible] রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, ও বাংলার কয়েকজন কবি এবং নিজেদের লেখা কবিতা পড়ে [illegible] শোনার ফাঁকে ফাঁকে জিয়া তার বউদির সঙ্গে রান্নাঘরের গল্প ও ভাইঝিদের সঙ্গে খুনসুটি চালিয়ে গেল। যাবার সময়ে জিয়া দুই বাংলার মাঝখানে একটা ব্যবধানের কাল্পনিক পরদাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে গেল।

বোধহয় সেটা সাতষট্টি সালের শেষের দিকে। শেখ মুজিবুর রহমানকে পাক সরকার নানানভাবে নাজেহাল করার চেষ্টা করছেন। আমি সেই সময়েই একটা বিসুবিয়সের আন্দাজ পেয়েছিলুম। কৌতুক করেই বলেছিলুম : বড়দা, বোধহয় রহমানই আমার লিডার। আমায় ঢাকায় নিয়ে যাবেন? তার কয়েকমাস পরেই সিদ্দিকী সায়েব দেশে ফিরে যান। যাবার সাতদিন আগে এক সন্ধেবেলায় বাড়িতে খাবার টেবিলে বসে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে আমার হাত চেপে ধরলেন : যাবি ভাই, সত্যি?...চল দুই ভাই গিয়ে বাংলা মায়ের সেবা করি। যে যেমন করে পারি করব। আর ঢাকায় শহরে থাকব, নইলে গাঁয়ের বাড়িতে চলে যাব।

রুণু আর বকুল আমায় কথা দিয়েছে—ওদের জামতলায় তোলা নতুন ঘরখানা আমার জন্যেই সাজিয়ে রাখবে। আমি জানি, ও মেয়েগুলো কিছু ভোলে না।... "[illegible] কাকীমা? আপনাদের পেলে আম্মা যে কী করবেন, কী বলব। আমরা তো সব চিঠিতে আপনাদের কথা লিখি।"

তারপর ওরা চলে গেছে। ধানমণ্ডীর [illegible] কোথায় ওরা থাকত। যাকগে। ওরা আমার কে? ওরা বিদেশী রাষ্ট্রের মানুষ। ওরা যদি মরে গিয়ে থাকে তো আমরা কাগজে সমবেদনা প্রকাশ করব। ওদের যারা মেরেছে, তাদের [illegible] মেরেছে, পৃথিবীর বিজ্ঞ চিন্তাধারার অধীশ্বররা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—এটা ওদের ইণ্টারনাল ব্যাপার।

তারপর আমরাও একদিন ওয়াশিংটন ছাড়লুম। বিশেষ আর অসুবিধে কী? শুধু দুই বাড়ির দুই কর্ত্রীর খানিকটা অসুবিধে হয়েছিল। এত ভাঙাচুরো হলে কোথা থেকে কী দিয়ে মেরামত করবেন, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। একটা ফুলদানিতে দুটো একই রকম ফুল। দুটো আলাদা করবেন কী করে। সেদিন ভোরবেলায় বেগম কাফি বাড়ির লনে বসে তাই ভাবছিলেন বোধহয়। আমার মেয়ে ওঁর ওখানেই রাত্তিরে ঘুমিয়েছিল। তাকে নিতে গিয়েছিলুম আমরা। উনি ম্লান হাসলেন : 'আসুন ওরা ঘুমোচ্ছে।' দেখে [illegible] একটা হলিউড বেডে ওরা গলা [illegible] ঘুমোচ্ছিল—আমার মেয়ে [illegible] ওর মেয়ে। উনি কিছুতেই জাগাতে [illegible] না। আঁচলে চোখ মুছছিলেন। [illegible] পারি। কচিগলায় ফুঁকরে ফুঁকরে কাঁদছিল ওরা। মহুয়া আর মৌরী, [illegible] আর [illegible] ওরা এখনো যথেষ্ট বড় হয়নি। তাই বোঝে না বাবা-মা একই ভাষায় কথা বলছে, তবুও কেন ওরা আলাদা জাত, আলাদা দেশের মানুষ। এও বোঝে না এত যখন তীব্র ভালবাসা, তখন কিসের দায়ে তফাত হয়ে যেতে হবে।

*

জানতুম, ওসব স্বপ্নের দিন টেঁকে না। পুরনো সিনেমার মতন ফিকে হয়ে যায়। মাঝে মাঝে সেইসব স্বপ্ন এখনো ঘুমের ভেতর টেলিফোন করে 'আজ আর আপনার বাড়ি নেই। আপনার বাড়ির মালিক এখানে। আমাদের সায়েবের সঙ্গে সরাসরি এখানেই চলে আসবেন। কাবাব হয়েছে...' কিংবা : 'কী মিয়া, কী কর কী সন্ধেবেলা। চলে এস, একটু ছোট করে বানিয়ে বসা যাক। বিসমিল্লার সানাই আছে...'

কিংবা—

: কী বৌদি চলে আসব নাকি? খিদে পেয়েছে।

: নিশ্চয়। এক্ষুনি আসুন—কী খাবেন?

: গোস্ত আর পানি

: তাহলে তো পাবেন না। এখানে মাংস আর জল...

আমার একটা কনফেশন। কাইণ্ডলি নোট করে নিন। আমার কাছে লুকোনো একটা ওয়ারলেস ট্রান্সমিটার আছে। সেটার সাহায্যে আমি বিদেশীদের কাছে খবর পাঠাই। আমি বিদেশীদের ভালবাসা [illegible]। আমার পেছন থেকে মাথায় গুলি করতে পারেন। সামনের দিকে মারবেন না। ওটা গুঁড়ো হয়ে যাবে। ওয়্যারলেসটা। দামী জিনিস। ওটা পাবেন আমার জামা খুলে, গেঞ্জী তুলে, চামড়া হাড় পাঁজরা সরিয়ে, বুকের বাঁদিকে এতটুকু একটুখানি, বীপ্ বীপ্ করছে...টাইগার হিল থেকে দেখা এভারেস্টের মতন...আর তার ওপর দেখবেন র‍্যাডক্লিফের ছুরির দাগ...
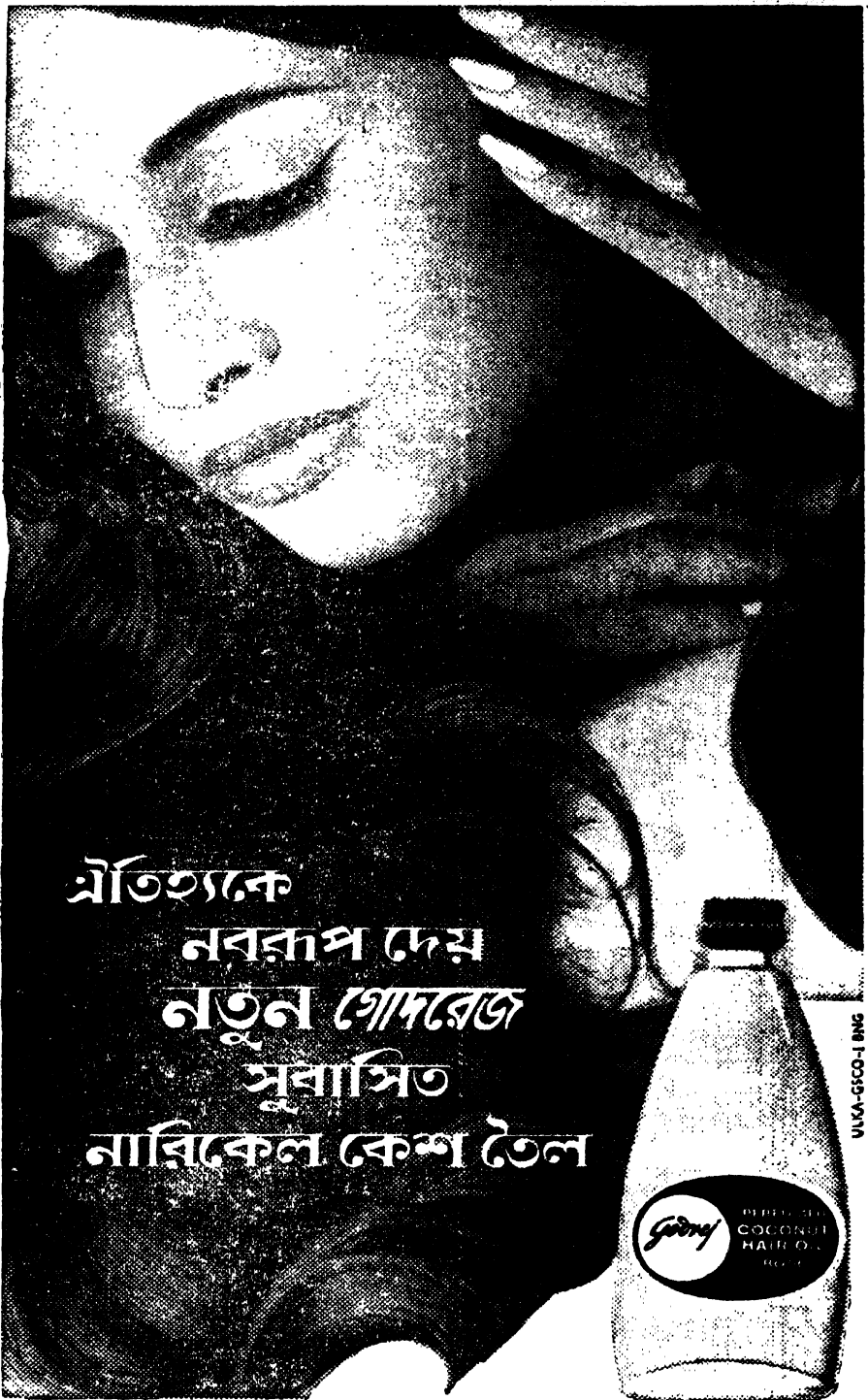
ঐতিহ্যকে
নবরূপ দেয়
নতুন গোদরেজ
সুবাসিত
নারিকেল কেশ তৈল
Godrej
COCONUT
HAIR OIL
ULKA-GSCO-1 BNG

পঁয়তাল্লিশ

যে মন করে হোক এ বিবাহ বন্ধ করা চাই। নইলে মালাদির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রত্ন তাড়াতাড়ি কলকাতা ছুটে যায় ও মালাদির সঙ্গে গোপনে দেখা করে।

"এখনো সময় আছে। শুধু তুমি একবার বল যে ঝনটুদাকে বিয়ে করবে। তা হলে বাকীটা আমরাই ম্যানেজ করতে পারব।" রত্ন অনুনয় করে।

"আমার কি অসাধ? আমি কি কোনো দিন বলেছি বিয়ে করব না?" মালাদি মোনালিসার মতো রহস্যময় হাসি হাসে। "দুইপক্ষ রাজী না হলে কি বিয়ে হয়?"

"কিন্তু ঝনটুদার মুখে শুনে এলুম তুমিই নারাজ।" রত্ন এ রহস্য ভেদ করতে পারে না।

"রত্ন, তোমাকে কি সব কথা খুলে বলা যায়? ওসব কহতব্য নয়। আমার মনের দুঃখ আমি মনে চেপে রাখি। কবে এর প্রতিকার হবে তা যদি জানতুম তা হলে শান্তি পেতুম। তবে এইটুকু বুঝি যে বিবাহ এর প্রতিকার নয়, ভাই।" মালাদি করুণ কণ্ঠে বলে।

"দয়া করে খুলে বল, দিদি। আমার উপর কেন এত অবিশ্বাস?" রত্ন অনুযোগ করে।

"না, অবিশ্বাস নয়। কিন্তু ওসব কথা মুখে আনা যায় না। আমি কারো কাছে বলিনে। মাকে ছাড়া। মা তো সেই জন্যেই খাপ্পা। বিধবা বিবাহের উপর ও'র যে রোগ সেটা আর একটি বিধবার কথা মনে করেই। বিধবাবিবাহ যদি চলে তবে ওরও তো আবার বিয়ে হতে প্যারে।" মালাদি আরো ঘোরালো করে।

"আর আমাকে ঝুলিয়ে রেখো না, দিদি। শুনিই না ব্যাপারটা কী। হেন সমস্যা নেই যার সমাধান নেই।" রত্ন আশ্বাস দেয়।

"তুমি দেখছি নাছোড়বান্দা ছেলে। না শুনে ছাড়বে না। কিন্তু পরে আবার আমাকেই দোষ দেবে যে আমি তোমাকে একটা কল্পিত কেচ্ছা শুনিয়েছি। না, না। থাক ওসব কথা। ও'র সঙ্গে আমার বিয়ে যখন হবার নয় তখন তোমারই বা কী করবার আছে? আমারই বা করবার আছে কী?" মালাদি চোখে আঁচল দেয়।

অনেক পীড়াপীড়ির পর মালাদি যা বলে তা শুনে রত্ন তাজ্জব বনে যায়। ঝনটুদা যাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন সে ওর মামাতো বোন বকুল। গুরুজনের প্রচণ্ড আপত্তি। তখন তিনি বৈরাগ্য নিয়ে বিবাগী হয়ে যান। বকুলের বিয়ে দেওয়া হয় এক বুড়ো বরের সঙ্গে। বুড়ো কিছু দিন পরে চোখ বোজে। রেখে যায় দুই পক্ষের ছেলেমেয়ে। প্রচুর সম্পত্তি। বকুল ততদিনে পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংসারে ষোল আনা মন নেই। থেকে থেকে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। যেখানেই ঝণ্টুদা সেখানেই ওর তীর্থ। দু'জনাতে মিলে একসঙ্গে ঘোরাফেরা হয়। কেউ দেখবারও নেই, কেউ বলবারও নেই। কোথায় বদরিকাশ্রম, কোথায় মাদুরা, কোথায় কাশী, কোথায় কামাখ্যা! তীর্থেরও লেখাজোখা নেই, ভ্রমণেরও ঠিকঠিকানা নেই। এই তো সেদিন প্রভাসপত্তন ঘুরে এল।

"আচ্ছা, এতে অন্যায়টা কোথায়?" রত্ন ঝণ্টু-বকুলের হয়ে তর্ক করে।

"অন্যায় বলে অন্যায়! যে তোমার মামাতো বোন তার সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি কেন? আর ওই বা কেমন ভাই-সোহাগী? দেবাটি যেখানে দেবীটিও সেখানে। লোকে কিছু মনে করবে না?" মালাদি দুষ্টু হাসি হাসে।

"লোকে তো তোমার আমার সম্বন্ধেও কত কিছু মনে করে। তা বলে কি তুমি

আমি অন্যায় করেছি?" রঞ্জু ওকে মনে করিয়ে দেয় যে ওরাও সম্পর্কিত ভাইবোন।

"আহা, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোনোদিন তেমন ছিল না। তুমি তো আমাকে তেমন চোখে দেখনি।" মালা কাটান দেয়।

রঞ্জু মালাদিকে কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও জানায়নি যে মনে মনে ওকে ভালোবেসেছিল। ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিল। গৌরী যদি তার জীবনে হঠাৎ উদয় না হতো তা হলে তার ভালোবাসা হয়তো পাত্রান্তরিত হতো না।

"মালাদি, একটা কথা তোমার কাছে এতদিন গোপন করেছি। আর দেখছি গোপন রাখা চলে না। কিন্তু ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি?" রঞ্জু ইতস্তত করে।

"সেবাদির ব্যাপার তো? সে আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। ওতে অত ভয়ের কী আছে? তোমার বাবা আপত্তি করলে আমরা তো আছি তাঁকে বোঝাতে। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও, রতন।" মালাদি অভয় দেয়।

"দূর! সেবাদির কথা কে বলতে চায়! বলতে চাই আরেকটি দিদির কথা। তাঁর নাম হুবহু তোমার নামের মতো। চেহারাও

তেমনি তোমারি চেহারা। তিনিও তেমনি বিধবা। কুমারী বিধবা।" রত্ন দুষ্টুমি করে বলে।

"এ জগতে আরো একজন মালা মিত্র আছে নাকি? সেও কি তোমার দিদি সম্পর্কীয়া? অ্যাঁ! তুমি তো খাসা ছেলে! এতদিন এ রহস্য ফাঁস করনি! আগে শুনলে একটা মালা টালা যোগাড় করে রাখতুম। এর মতো কম্প্লিমেণ্ট জীবনে আমি পাইনি। আমি ধন্য। তবে ওটা এ জন্মে হবার নয়, রতন। তুমি যদি এখনো ও রকম কল্পনা পুষে রেখে থাক তোমাকে নিবৃত্ত হতে বলব। আমার দিক থেকে যা আছে তা বিশুদ্ধ স্নেহ।" মালা বলে।

না, দিদি, ও কল্পনা আর আমার নেই। ভালোবাসারও রং বদলে গেছে। আর তুমি তো একথাও জানো যে আমি অন্যজনকে ভালোবাসি। না, সেবাদি নন। বলেছি তো হয় যে গৌরী ওর ডাকনাম।" রত্ন বলে।

কথাবার্তা আবার সিধে রাস্তা ধরে এগোয়। রত্ন জানতে চায় ঋণ্টুদার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ আছে কি না। ওঁর মতো আদর্শবাদী জিতেন্দ্রিয় ঋষিকল্প পুরুষ তো রত্নর নজরে পড়ে না।

"ঋষিকল্প! হা হা! বিশ্বামিত্র ঋষিকল্প।" খিল খিল করে হেসে ওঠে মালা।

"কেন অমন কথা বল?" রত্ন কটমট করে তাকায়।

"বলব না? তপোভঙ্গ ঘটাবার জন্যে মেনকাকল্প অপ্সরা রয়েছে যে! শুনে রাগ করছ! কিন্তু সত্য কথা চিরদিন অপ্রিয়।" মালা তার জ্বালা ব্যক্ত করে।

রত্ন তো হাঁ। এ কি কখনো হতে পারে যে ঋণ্টুদাও ওরই মতো দুর্বল! দুর্বলের পক্ষ নিয়ে ও একহাত লড়তে যায়। বলে, "তুমি তো স্বচক্ষে দেখনি। পরের মুখে শুনে বোকার মতো বিশ্বাস করেছ। ইউ আর এ ফুল।"

মালা তা শুনে ক্ষেপে যায়। "কী! আমি ফুল! তুমি বলতে চাও আমি অনুসন্ধান করিনি? তুমি আমাকে ফুল বলে আঘাত করতে পারো, আমি তোমাকে ব্লাইন্ড বলে প্রত্যাঘাত করব না?" মালা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে।

"কেন, আমি ব্লাইন্ড হতে যাব কেন?" রত্ন প্রতিবাদ করে ওঠে।

"কারণ তুমি ওদের ভাইবোনকে একসঙ্গে দেখনি। দেখলেই বুঝতে যে ওরা স্বামী-স্ত্রী। কাশীর বাঙালীরা কে না জানে! কে না বলাবলি করে!" মালা সজল চক্ষে বলে।

"তা হলে ওদের বিয়ে দিলেই চুকে যায়। মুসলমান সমাজে তো অমন কত হয়। ব্রাহ্মসমাজেও দুটি একটি কেস দেখা যায়।" রত্ন ভালোমানুষের মতো বলে।

"তা হলেই পাপের ভরা পূর্ণ হয়।" মালা উত্তেজিত হয়ে বলে। "একে বিধবা বিবাহ, তার উপর ভাইবোনের বিবাহ। তুমি কি সমাজ সংস্কারক, না সমাজসংহারক?" মালা রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়।

"আমি তো মনে করি ওরকম ক্ষেত্রে বিয়ে না করাটাই পাপ। বিয়ের বাধা নেই যখন, সিভিল ম্যারেজ করলেই চলবে।" রত্ন বিধান দেয়।

"ব্লাইন্ড! ব্লাইন্ড! ইউ আর ব্লাইন্ড! যার ছেলেপুলে হয়েছে, স্বামীর বিপুল সম্পত্তি, সে কেন ফকিরকে বিয়ে করবে? একটা মাস্টার বই তো নয়!" মালা উপহাস করে।

প্রেম আর কাম দুই ভিন্ন খাতে বইবে আর বিবাহ বইবে তৃতীয় এক খাতে, রত্নর মতে এরই নাম অন্যায়। একই কালে তিনটি নারীর প্রতি কর্তব্য কেউ পালন করতে পারে না। তা যদি করতে যায় তবে একটিকে না একটিকে বঞ্চিত করে, আর নয়তো নিজের জীবনটাকেই দুই-তিন ভাগ করে। রত্ন চায় অবিভক্ত জীবন। তাই তার আদর্শ হলো প্রেম আর কাম আর বিবাহের ত্রিবেণীসঙ্গম। একটিই নারী, তার তিনটি বেণী।

সে আশা করেছিল ঋণ্টুদার বেলাও তাই হবে। মালাদির কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে ঋণ্টুদা তিনটি নারীর মধ্যে আপনাকে ভাগ করে দিয়ে তিনজনের প্রতিই অবিচার করবেন। মালার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক, বকুলের সঙ্গে কামনার সম্পর্ক বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে পুত্রার্থক সম্পর্ক, এর মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য কোথায় যে ঋণ্টুদার জীবন সার্থক হবে?

রত্ন কলকাতা এসেছিল মালাদির সম্মতি নিয়ে ঋণ্টুদাকে জানাতে ও দু'জনের বিয়ের চেষ্টা করতে। হেডমাস্টার মশায় বাকীটুকু করতেন। ঋণ্টুদার গুরুজনকে বোঝাতেন। কিন্তু মালাদির অনিচ্ছা দেখে আর অগ্রসর

হয় না। মালাদির সঙ্গেও সেই শেষ দেখা। ওর বিচারে মালাদি সত্যি একটা ভুল করল। ঝণ্টুদাকে বিয়ে করে আয়ত্তের মধ্যে রাখলে ওকেও বাঁচাত, আপনিও বাঁচত। আর বকুল? সে তো এমনিও যাচ্ছে, অমনিও যেত। বিয়ের পরে ঝণ্টুদা কি আর ওমুখো হতে পারবেন নাকি?

কিন্তু ওটা যদি নিছক কামনার সম্পর্ক না হয়ে থাকে? যদি হয়ে থাকে সর্বাঙ্গীন প্রেমের সম্পর্ক? তা হলে কি ঝণ্টুদা অত সহজে বকুলের মায়া কাটাতে পারবেন? জীবনভোর দ্বিচারিতায় দোদুল্যমান হতে হবে তাঁকে। মালাদির সঙ্গে সম্পর্কটাই একদিন স্বপ্ন হয়ে যাবে। নিরাকার প্রেম স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যায়। বকুলের প্রেম সাকার বলেই ওর চেয়ে স্থায়ী। বিবাহ আর যার সঙ্গেই হোক না কেন, প্রেম যদি সত্য হয়ে থাকে তার হাত থেকে সহজে নিষ্কৃতি নেই। ঝণ্টুদার জীবনে বকুলই চিরন্তনী।

একটি নিরীহ বালিকার পাণিপীড়ন করতে যাচ্ছেন ঝণ্টুদা। বরযাত্রী হতে বলা হয়েছে রঞ্জুকে। চল্লিশের সঙ্গে চোদ্দর সপ্তপদী। আহা মরি, কী দৃশ্য। রঞ্জু তার জন্যে কুণ্টিয়া ফিরে যায় না। কলকাতায় সিনেমা ও থিয়েটার দেখে কাটায়। এসব দৃশ্য ঝণ্টুদার পরিণয়দৃশ্যের চেয়ে কম হাস্যকর আর কম ট্রাজিক। দু'দুটি নারীর অভিশাপ কুড়োবেন দাদা। আরো একটি যে পরে অভিশাপ দেবে না তা নয়।

জীবনদেবতার কাছে রঞ্জুর প্রার্থনা ছিল অন্নের জন্যে নয়, অমৃতের জন্যে। অমৃত যদি পায় অন্ন আপনি জুটবে। তার প্রশ্ন ছিল মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন। যা আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব?

কিন্তু গৌরী বলে একটি নারীর মুক্তির দায় কাঁধে তুলে নেবার পর থেকে তাকে অন্নের ভাবনাও ভাবতে হচ্ছিল। অন্নচিন্তা চমৎকারা। সে কি অন্য চিন্তার জন্যে অবকাশ দেয়? প্রতিযোগিতার চিন্তাটাও অন্নচিন্তারই অঙ্গ। সেটা যে শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না। পরীক্ষার ফল না বেরনো অবধি নিশ্চিত হওয়া যায় না। রঞ্জুর অবশ্য স্থির বিশ্বাস যে এবার কেউ তাকে রুখতে পারবে না, কিন্তু জোর করে বলতে পারেনা কার কপালে কোন পোজিশন আছে, কোন পোজিশন অবধি নেওয়া হবে। সেইজন্যে রঞ্জুর মনে অস্বস্তি ছিল।

ছিল ওর নতুন বন্ধু কেশবের মনেও। ওরা দু'জনে প্রতিযোগী হয়ে পরীক্ষায় বসলেও সহযোগীর মতো মেলামেশা করে। কলকাতায় কেশবদের ওখানে প্রায়ই ডাক পড়ে রঞ্জুর। নইলে কলকাতার একটা মেসে দূর সম্পর্কের এক কাকার সঙ্গে বাস করা ওর পক্ষে দুঃসহ হতো। ওখানে দিনরাত চাকরির কথা, আর নয়তো পরচর্চা। যা

পলিটিকস, আর নয়তো গড়ের মাঠের খেলার খবর, আর নয়তো রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ।

ওরা দুই বন্ধুতে তত্ত্বকথা বা খেলার খবর বা চাকরি জীবনের হালচাল নিয়ে মাথা ঘামায় না। একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে গুণীজনদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। সেইভাবে একজন বিশিষ্ট কবি, একজন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও একজন উদীয়মান ভাবুকের সঙ্গে চেনাশুনা হয় রঞ্জুর। দেশের ইন্টেলেকচুয়াল জীবনে এঁদের দুজনে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছেন, তৃতীয়জন এখনো অখ্যাত, কিন্তু কবে একদিন খ্যাত হবেন তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। কেশব বলে যুবকটি একটি চলন্ত বিশ্বকোষ।

জীবনে কত রকম কাজ রয়েছে করবার, করছেনও কত জন। রঞ্জুর জীবনের কাজটা কী? কিসের জন্যে তার জীবন? ছোট বা বড় একটা চাকরি জোটাতে পারলে অন্নবস্ত্রের ভাবনা থাকে না, জেগে থাকলে উন্নতিও করা যায়। কিন্তু জীবিকা আর জীবন এক জিনিস নয়। জীবিকায় সফল হতে গিয়ে জীবনে বিফল হওয়া তো হামেশা দেখতে পাওয়া যায়। রঞ্জুর চোখে যেমন সাফল্য মূল্যবান নয়। ব্যর্থতাও তার চেয়ে মহনীয়, যদি মহৎ কর্মে হাত দিয়ে ব্যর্থ হতে হয়।

দেশবিদেশের প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু লেখকের জীবন ছিল তার সামনে। এক এক সময় তার মনে হতো কীটসের মতো বছর পঁচিশ বা শেলীর মতো বছর ত্রিশ বাঁচাও শ্রেয়। তবু অমুক অমুকের মতো উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবসর নিয়ে সত্তর বছর বাঁচা শ্রেয় নয়। কেশব হয়তো সেই পন্থায় চলবে। কিন্তু রঞ্জুর জীবনের কাজ ওপথে এগোবে না যদি সে অমৃত হতে চায়। অমৃত পেতে চায়।

গৌরী আশা করেছিল যে কলকাতায় থেকে রঞ্জু অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা দেখবে। পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে তার জন্য হাঁ করে বসে থাকা মূর্খতা। কিন্তু রঞ্জুর সেদিকে মনোযোগও ছিল না, শরীরও পরীক্ষার শ্রমভারে বিকল। তা ছাড়া চাকুরির উমেদারদের যা যা করতে হয় তাতেও ওর গভীর অরুচি। সে তো ধরে রেখেছিল যে জ্যোতিদাই বম্বে গিয়ে নিজের জন্যে একটা কিছু জোটাবে, তারপরে রঞ্জুর জন্যে। কংগ্রেসী মহলে ওর যা প্রতিপত্তি ওর উদ্যোগে কার্যসিদ্ধি হবে। এখন জ্যোতিদাকে বা তার মতো একজনকে পাচ্ছে কোথায়? রঞ্জু তার অভাবে অসহায় বোধ করছে।

রঞ্জু তাই বৃথা চেষ্টা করে না জীবিকার জন্যে। ও যা হবার তা হবে। মানুষের পক্ষে যা করবার তা তো সে ইতিমধ্যেই করেছে। বাকীটা ভগবানের করুণা। তাঁর যদি এটাতে সায় না থাকে তবে অন্য ব্যবস্থা করবেন। না হয় গৌরীর মুক্তি আরো কিছুদিন পেছিয়ে যাবে। বিফল হলেও রঞ্জু তার নিজের জন্যে আফসোস করবে না। তার কলম আছে তার ডান হাত আছে। ওরাই তাকে দুবেলা দুমুঠো জোটাবে। গৌরীরও কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, কর্মশক্তি নেই? বছর খানেক বাদে সেও স্বাবলম্বী হতে পারবে। দুজনে মিলে উপার্জন করলে কেউ কারো চেয়ে কম স্বাধীন হবে না। বিবাহকে মনে হবে না একটা অপ্রীতিকর বন্ধন।

না, বিফল হলেও রঞ্জু হাহুতাশ করবে না। যে পন্থা কেশবের পক্ষে স্বধর্ম সেই পন্থাই রঞ্জুর পক্ষে পরধর্ম। গৌরীর মুক্তির প্রয়োজন না থাকলে সে পন্থার দিকে সে আকৃষ্ট হতো কি না সন্দেহ। এই নিয়ে তার মনে বরাবরই একটা দ্বিধা। ইউরোপ দেখার দুর্বার আকর্ষণ ভিন্ন তেমন কোনো মোহনীয়তা ছিল না সে পন্থার। হাঁ, ইউরোপ তাকে চিরদিন টেনেছে। নারী যেমন টানে পুরুষকে। একের মধ্যেই অপরের পরিপূরকতা। হাঁ, ইউরোপও তার জীবনে আর একটি নারী, আর একটি গৌরী। ইউরোপের কাছে যাবার এটিও একটি পন্থা। এটিই সরলতম। কারণ তার পিতার তো তেমন ধনবল নেই যে তিনি ওকে বিলেত পাঠাবেন। ছাত্রবৃত্তি জোটানো আরো শক্ত।

এ ছাড়া তার জীবনে আরো একটি টান ছিল। একদা সে কল্পনা করত চাষাণী বিয়ে করে জনগণের একজন হয়ে যাবে। সেইভাবে একপ্রকার পরিপূরকতাও হবে। মনোময় পুরুষ চায় প্রাণময়ী নারী। নইলে অতিমাত্র মনোময়তা তো বন্ধ্যা। তার কল্পনার চাষাণীই কি শেষে চতুরীর রূপ ধরে এল? যেমন প্রাণবতী তেমনি রসবতী। কিন্তু রূপবতী নয়, যুবতীও নয়। চতুরী যদি সমবয়সিনী হতো, দেখতে সুশ্রী হতো, রঞ্জুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বাউল কি ফকির হয়ে ছেলেটা পথে পথে ফিরত।

কোনো এক আখড়ায় মাথা গ'ুজত। কোথায় গোরী, কোথায় জীবিকা, কোথায় জীবনের পরিপূর্ণতার পরিকল্পনা! সব পড়ে রইত পেছনে। ভাগ্যিস চতুরী তা নয়!

ওদিকে গোরী মনে মনে জ্বলছিল। কুষ্টিয়ায় থাকলে ফের হয়তো ওরকম ঘটনা ঘটত, সেইজন্যে কলকাতায় গিয়ে চাকরির খোঁজখবর নিতে বলা। অন্য চাকরির। প্রতিযোগিতায় এবারেও যদি ব্যর্থ হয় তা হলে হাতের পাঁচ হিসাবে আর একটা চাকরি তো থাকবে। কিন্তু রঞ্জর চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় না যে তার লেশমাত্র চাড় আছে। থিয়েটার সিনেমা দেখে আড্ডা দিয়ে তার দিন কাটছে। বলে কিনা জীবনের পেয়ালা ভরিয়ে নিচ্ছে। স্বাদ নিয়ে দেখছে অমৃতের মতো লাগছে কি না।

রঞ্জ লেখে, "অমৃত কোথায় নেই? সবতাতেই আছে। তারপর মনে হয় অমৃত কোথাও নেই। সবটাই ছলনা।"

গোরী ওটা গায়ে পেতে নেয়। এমন রাগ করে যে লিখতে হাত কাঁপে। লেখে, "ওসব তত্ত্বকথা পরে শোনা যাবে। এখন যা করতে বলা হয়েছে তাই কর তো দেখি। একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নে। নইলে আপনিই বা খাবি কী, আর আমাকেই বা খাওয়াবি কী? আসমান থেকে কবে দৌলত নেমে আসবে তারই আশায় দিনপাত করবি? মনে রাখিস সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার মুক্তির একটা এসপার কি ওসপার হওয়া চাই। আমার ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। সবাই মিলে যেন ষড়যন্ত্র করেছে যে আমাকে এই খাঁচায় বন্দী করে রাখবে। খাঁচাটাও আর লোহার নয়, সোনার। জানিস, বহরমপুরে বাড়ি উঠছে? নতুন একটা জেল। ওটা আমার জন্যেই। তোর যদি বিন্দুমাত্র পৌরুষ থাকে তবে তুই আমাকে সময় থাকতে হরণ করে নিয়ে যা। গৃহপ্রবেশের পূর্বেই। কিন্তু বলছি কাকে? কে কান দিচ্ছে আমার কথায়? মন হয়তো পড়ে আছে কুষ্টিয়ায়। ওখানে যে অমৃত মেলে আমার কাছে তো তা মিলছে না।"

গোরী অবশ্য ভালোর জন্যেই ভালো মনে করে লিখেছিল। ভাবতেই পারেনি যে রঞ্জ তা পড়ে তেতে উঠবে। লিখবে, "গুরুমশায়, প্রণাম। যথেষ্ট গুরুগিরি হয়েছে। আমার জীবন আমি কেমন করে ভরাব নেব সেটার জন্যে পাঠ নিতে হবে কি না গুরুর কাছে! চাকরি বলতে যদি বোঝায় তেমন একটা চাকরি তার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই, গোরী। খাটতে তো হবে আমাকেই। তোকে তো নয়। খাটবার মতো বল কি এই দেহে আছে? দু দু'বার বিষম পরীক্ষাজ্বরে ভুগে এখন আমি কাহিল। আমি নিঃশেষিত। আমার পেয়ালা শুকিয়ে গেছে বলেই আমি তাকে এইভাবে ভরিয়ে নিচ্ছি। এই ইচ্ছাকৃত হেলাফেলায়। প্রতিদিনই নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হচ্ছে। জানিনে আমি কী হতে গিয়ে কী হয়ে উঠছি। জীবনে একটা কিছু করে দেখানো যেমন শক্ত তার চেয়ে আরো শক্ত একটা কিছু হয়ে ওঠা। তার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করাও কর্তব্য।"

রঞ্জ যদি ওইখানেই থামত তা হলে গোরীর কথা মেনে নিয়ে শান্ত হতো। কিন্তু ওর রোখ চেপে যায়। ও লেখে, "কুষ্টিয়ার কথা ভুলে যেতেই চেয়েছি। আমার ধারণা ছিল তুইও ভুলে গেছিস। মনে হচ্ছে তোর রাগের গোড়ায় সেই ঘটনা। কিন্তু আমার উপর রাগ করার আগে একবার নিজের উপরে রাগ করা উচিত নয় কি? আমি তোর প্রেমের মর্যাদা রাখিনি বলে লজ্জিত। কিন্তু তুইও কি আমার প্রেমের মর্যাদা রেখেছিস না রাখছিস? কই, আমি তো তা নিয়ে খোঁচা দিইনে। বুঝি তোকে পদে পদে আপস করতে হচ্ছে। তাই চোখ বুজে থাকি। মুখ বুজে থাকি। গুরুমশায়গিরি আমার মানায় না। কত ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে জীবনটাকে ঠিক রাখতে চেষ্টা করি। কম্পাসের কাঁটার মতো। আমি তোকে বলবার কে? তুই স্বাধীনা নায়িকা। আমিও স্বাধীন নায়ক।"

গোরীর বুক ফেটে কান্না ওঠে। কিন্তু সেটাকে ও মনে করে দুর্বলতা। রঞ্জ বকে যাচ্ছে। কড়া হাতে শাসন করা চাই। যে ভালোবাসে সে কি কেবল আদরই করবে, শাসন করবে না? শাসন করতে গেলেই কথা উঠবে গুরুমশায়গিরি করা হচ্ছে? কান্তাসম্মিত বলে একটা কথাও তো আছে। গোরী যদি কান্তা হয়ে থাকে তবে কান্তা-সম্মিত বাক্যও শোনাবে।

গোরী লেখে, "আমার দিক থেকে প্রেমের অমর্যাদা হয়েছে ও হচ্ছে বলতে তুই যা মীন করেছিস সেটা মীন মাইণ্ডের পরিচায়ক। কে জানত যে তুই এতটা মীন হবি! আমি ভেবে মরছি তোরই ভালোর জন্যে। তোর ভালো হলেই আমারও ভালো। আমি তলিয়ে গেলে তুই আমাকে টেনে তুলবি, কিন্তু তুই যদি নিজেই তলিয়ে যাস তবে আমাকে টেনে তুলবে কে? সেইজন্যেই তোকে একটু শাসিয়ে দেওয়া। সে অধিকার কি আমার নেই?"

(ক্রমশ)

নিজের নাক কেটে

ভিয়েৎনামের চেয়ে ভয়ানক, তার মাইলাই-এর নির্দয় নরহত্যার নিষ্ঠুরতাকে নিষ্প্রভ করা, ভোরস্টারের দক্ষিণ আফ্রিকার নিপাতনকে হার মানানো সোনার বাংলার উপর সীমাহীন বর্বরতার আজ বেশ ক'দিন কেটে গেল। যখন এ লেখা ছাপা হবে, পদ্মা মেঘনার মোহানার মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিণতির প্রকাশ হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, হয়তো তাদের সকল বাধা ধন্য করে সকরুণ সার্থকতা হাতছানি দেবে, হয়তো বা হারিয়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সংখ্যা বেড়ে উঠবে। কি হবে তা জানি না, কিন্তু আজ আর অন্য কিছুই ভাবতে পারছি না বলে অভাগা বাংলা দেশের নসিব নিয়েই দু' কথা বলছি।

বিশ্ব যেন এমন শব্দভেদী মৃত্যুগমনের মুখেও থমকে আছে! ওদিকে ভৈরব, রূপসা, আঠারোবাঁকী থেকে আরম্ভ করে শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা লালে লাল। ফরিদপুরের সেই গোপালগঞ্জের ছেলে মুজিবুর সাহেব-এর ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ। নাই বা রইল হাতে হাতিয়ার, দিল্ তাদের আছে তৈয়ার। মেয়েরাও নেমেছেন সম্মুখ সমরে। এক যুগ ছিল, তখন পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব, নারীকে স্পর্শ করতো না। অন্তঃপুর ছিল নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর এখন সভ্যতার শিখরে পৌঁছেছি বলে আমরা গর্ব করি কাজেই গৃহকোণটুকুও আর নিরাপদ নয়। দলে দলে নারী ও শিশুকে হত্যা করে তাণ্ডবলীলায় আধুনিক উৎসবে মেতে উঠেছে বর্বর মানুষ আর তাদের নেতা অধিনায়কের দল। ওদিকে এমন উদ্দাম নৃশংসতায় কি আর এমন তখ্‌ত-উ-তাউস পেলেন কর্তারা? পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ গোল বেধেছে। সে গোল রাজনৈতিক মাত্র নয়। বাজার একেবারে আগুন। অর্থনৈতিক মহাসংকট। ধনিনীরা যে কাবাব বিরিয়ানী খেয়ে তাম্বুলের আমেজটুকু উপভোগ করবেন সে-গুড়েও বালি। এমনিতেই এতদিন বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় পসরা আসতো বাংলা দেশ থেকে। আমার এক বন্ধু কাজে যেন পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। ধনী ঘরের সাদির সাদর নিমন্ত্রণ। ধুমধামের অন্ত নেই। আতরে, জাফরানে, বাদামে বেসামাল খুশবু। কিন্তু আহারান্তে মস্ত বড় থালা থালে তাম্বুলের থালা বের করলেন স্বয়ং গৃহকর্ত্রী। জর্দা কিমামের আবেশ বাতাস স্পর্শ করবার আগেই আবার থালায় তোলা হলো সেই তাম্বুল পাত্র। বন্ধুটি অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, এ কেমন ব্যাপার? যেখানে সোনাচাঁদির চমকে ঝলমল করছে

আসর সেখানে পানটুকুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব এত? উত্তরে জানলেন পানের মর্যাদার খবর। সে যে আসে হাজার হাজার মাইল পথ বেয়ে পূর্ববাংলার শ্যামল ছায়াঘন মমতা থেকে। পশ্চিমের রুক্ষতায় তাকে বাঁচাতে হয় সযত্নে। একটি পানের অর্থমূল্য দাঁড়ায় আট আনা থেকে এক টাকা।

হাজার হাজার বাঙালীর প্রাণ লুটিয়েছে পথের ধুলায়, তবু পশ্চিম পায়নি তার এতদিনের অভ্যস্ত পাওনা। খবরের কাগজের কলেবর ছোট হয়ে গেছে; কারণ বাংলার কল থেকে কাগজ আসছে না। সপ্ত কোটি বাঙালীর দ্বিসপ্ত কোটি ভুজ সম্বল আর পশ্চিমের পরোয়ানায় আছে আধুনিক আয়ুধ সম্ভার। মেশিন গান, ট্যাংক, বোমারু বিমান ইত্যাদি দিয়ে তাঁরা লড়াই করছেন—নিরস্ত্র নিরন্ন নরনারীর সঙ্গে। সাবাস তাঁদের সাহসকে, সাবাস তাঁদের শৌর্য, বীর্যের বাহাদুরিকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জ্বলেছে যেন খাণ্ডবদহন। হিন্দু জ্বলেছে, মুসলমান জ্বলেছে, জ্বলেছে বিদ্বান বিদগ্ধ মানুষ। যুবকেরা মুক্তিযুদ্ধের বাহিনীতে। মেয়েদের হস্টেলের দু'শ মেয়ে নিখোঁজ। তারা কোথায় কে জানে। ভাবতেও ভয় করে। ছেলেদের জন্য চিন্তা ভিন্ন। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় তারা "হয়তো জিনিয়া আনিবে সমর, নয়তো মরিয়া হইবে অমর।" কিন্তু যুবতী মেয়েরা? এও বিশ্বের নারী সমাজ চেয়ে দেখছে। কোন্ প্রগতির বড়াই করে তারা? সিরিমাভো বন্দরনায়কের দেশ পর্যন্ত পাকিস্তান বিমানের পথ সহজ করে দিয়েছে।

ভারতবর্ষ থেকে তিনটি মহিলা প্রতিষ্ঠান—অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স, ওয়াই ডব্লু সি এ এবং মহিলা ব্যবহারজীবী সমিতি সিরিমাভো সকাশে আবেদন জানিয়েছেন। তুমি মহিলা, তুমি নারী, এমন ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের অভিযান তোমার দেশের বুক বেয়ে যেতে দিও না। দুরন্ত রাবণও কলুষ স্পর্শে সীতাকে মর্যাদাহীন করতে পারেনি। গৃহধর্মচারিণী অসহায় নারীর আর্তনাদে বাংলা দেশের আকাশবাতাস আর্তনাদ করছে বিংশশতাব্দীর শেষে, তথাকথিত বিকাশের উন্নততর অধ্যায়ে। হাসপাতালের ডাক্তার, রোগী বা রোগিণী পর্যন্ত গুলিতে মরছে। বিভিন্ন স্থানে বোমারু বিমান অবিরাম গোলা বর্ষণ করছে। শিশু ও মহিলা পালিয়ে যাবার পথটুকুও পায়নি। কোথাও বা ভারত সীমানায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা গ্রামবাসীদের জানাচ্ছে আশ্রয়ের আবেদন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, বাংলা দেশের মানুষের প্রতি সমবেদনায় আমরা এক। বিশ্বজনের কাছে আবেদন করেছেন, এমন হত্যাকাণ্ডে দর্শকের ভূমিকায় থাকা চলবে না। যেমন করে হ'ক জনমতের চাপে নৃশংসতা বন্ধ করতে হবে। আমরা আশা করে থাকবো

জগতসভায় ভারতের আর্জি সফল হবে। ভারতের জনগণের একান্ত নিবেদনে সার্থক হবে বাংলার মানুষের আত্মদান।

*

প্রত্যেক দেশের বা প্রত্যেক স্থানবিশেষের কৌতুক রসবোধ ভারী মজার। সে রস বা ব্যঙ্গ সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় জন্ম নেয়। তুলে নেওয়া চলে না। ঢাকার "কুট্টি" বা মুসলমান গাড়োয়ান বা ছোট-খাটো ব্যবসায়ীর কৌতুক রস এক সময় বিখ্যাত ছিল। রঙ্গীন গেঞ্জি গায়, তেল চক-চকে চুল, বেশ একটা বেপরোয়া দার্শনিক দৃষ্টিতে তারা দুনিয়া দেখতো। সে দুনিয়াও ছিল ভিন্ন। যানবাহন ঘোড়ার গাড়ি, চলন-বলন ঢিলে ঢালা। সর্বগ্রাসী সভ্যতার সবটুকু তখনও দূরে।

ধরুন আপনি জুতো কিনবেন। দর কষে ফিরে গেলেন। পাশের কোন দোকান থেকে কিছু সস্তায় কিনলেন। সগর্বে সে খবর পাশের দোকানীকে বলতেই সে পানের রসটুকু গিলে বলে, "যে কয় পয়সা কম দিছেন তাই দিয়া ব্যাত কিনা লন।" অবাক হ'লেন। বেত দিয়ে কি হবে? "ক্যান? কাঁচা চামড়া যে। কুত্তায় তাড়া করবো বাবু।" আপনি কি আর উত্তর দেবেন?

রসবোধের রসিক গাড়োয়ান গাড়ি হাঁকাচ্ছে। ভিতরে বাবুটির নজরে পড়লো পথেচলা মেয়েটি যেন ললিত লবঙ্গলতা। গাড়ি এগিয়ে যায় আর মেয়েটি পিছিয়ে পড়ে। ও গাড়োয়ান গাড়ি থামাও। বড় হাওয়া। সিগারেট ধরানো যায় না। দু' একবার গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ান বুঝলো ব্যাপারটি। মেয়েটি পাশের গলি ধরলো। গাড়োয়ান হাঁক দিল, "হাওয়া তো গেছেগা বাবু, অখন চলি?"

আর একটি রসভরা মন্তব্য ছিল যদি কেউ ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া কম দিতে চাইতো বা গাড়োয়ানের মন না উঠতো। সে তখন বলতো "কইয়েন না, কইয়েন না, ঘোড়ায় শুনলে হাসবো!"

তরীফন বিবি

তরীফন বিবির তারিফ না করে পারছি না। বয়সটা তার নেহাৎ চ্যাংড়া নয়। তার মেয়ে ইফ্‌ফত বিবিই পাঁচ ছেলের মা। কিন্তু শরীরের বাঁধন যেন পেটা লোহার মত। সাহস জঙ্গী সিপাই-এর চেয়ে বেশী। বাড়ি তার বরিশাল। পিরোজপুরে না পটুয়াখালি ঠিক আমার মনে নেই। সে সাহেব বাড়িতে মেমের দাসীর কাজ অর্থাৎ আয়ার কাজ করে সারা বাংলা দেশটা চষে দেখেছে। শেষ বয়সে এসে বসেছে শ্বশুরের ভিটেতে। ঢাকা থেকে বিশ মাইল দূরে নরসিংদি। পাটুয়া সাহেবদের আনাগোনা ছিল সেখানে তাই তরীফন ভেবেছিল রং দেখা কলা বেচা দুইই হবে। ভিটে আগলানোও হবে আর ইউরোপীয় শিশুর ঝি হিসাবে কিছু জুটে গেলে দু'চার পয়সা যা আসবে তাতে ময়নামতীর মোটা শাড়ি আর মোটা ভাত আর সালুনের সংস্থান হ'য়ে যাবে।

তরীফন বিবি এখন রামপুরেহাটে। আমার তাকে বড় পছন্দ ছিল। গোল নাকের বেশর, তেল মাখা মাজামাজা রং, ময়নামতীর ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি সব মিলে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করতো। বয়স কম কিন্তু তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ তার মর্যাদাবোধ আমার শৈশবের অপরিণত মনেও গভীর দাগ কেটেছিল। বাঙালী সাহেব সেকালে বড় কড়া সাহেব হ'তেন। তরীফন মহকুমা শহরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির আয়া। মনিব আশা করতেন তাঁর শিশুদের সঙ্গে সাহেবি হিন্দিতে আয়া কথা বলবে। তরীফন তা পারতো না। তার সেই ঢাকা বরিশালের মেলানো টানের বেশ সাহেব শিশুরাও আয়ত্ত করে ফেলেছিল। দুঃখ আর লজ্জা মা বাপের যাই হ'ক শিশুরা তরীফন অন্ত প্রাণ। কি আর করা যায়।

ইস্কুলের পাশ দিয়ে সানঘাটা নদী। দূরে সাঁওতাল পরগণার নীল পাহাড়ীর নির্ঝর, সব জড়ো হয়ে সৃষ্টি করেছে অতি ক্ষুদ্র এক প্রবাহিনী। স্রোত নেই, আছে তার নিশিথ শীতল স্নেহ। ঘাট নেই আছে ঘাসে ঢাকা তট। বরিশালের বিশাল নদীর স্মৃতি তরীফনকে নিয়ে আসতো সানঘাটার কিনারায়। রামপুরহাট বাজে জলের অভাবে ঐ সানঘাটাই সম্বল। হিমঝুরি গাছটার সাদা সাদা ফুল টুপ টুপ করে সানঘাটার শান্ত বুকে যেখানে ঝরতো সেখানে ছিল তরীফনের সান্ধ্য আসর। আমরা যেতাম গল্প শুনতে। বরিশালের কি মস্ত নদী। কি তার এক গর্জন। লোকে বলে বরিশালের বন্দুক। কিন্তু হদিশ সে গর্জনের কেউ জানে না। কাল কেউটে সাপ হরদম হানা দেয়। মানুষগুলি যে বেপরোয়া। তরীফন কত সাপ মেরেছে। সেই যে আমগাছটায় বাঁধা মুরগীর ছানাকে ছোবল মারতে গেল কাল সাপ তার মুণ্ড থেঁতো করতে তো তরীফনের মুহূর্ত মাত্র লেগেছিল। প্রতিবেশীদের দেখেছে হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে চাল চিঁড়ে খুঁজতে গিয়ে সর্প দংশনে ঢলে পড়তে। তারাও যেন তেমন ভয় পেতো না। "কালে খাইছেরে" বলে হাঁক দিয়ে মাদুরখানা টেনে আঙ্গিনায় শুয়ে পড়তো। ছুতের

ভয়ও তরীফন কখনও পায়নি। প্রথম শ্বশুর ঘর করতে গিয়ে শুনেছিল খালের ধারে যেখানে মড়মড়ে বাঁশের সাঁকো তার পাশের গাছে নাকি এমন ভূত যে মোটর গাড়ি পর্যন্ত উল্টে দেয়। তরীফন তবু তবু করে সাঁঝের ঝোঁকে কলসী করে জল আনতো, ভূত তার তিন সীমানায় আসেনি।

মুকুন্দবাবু হেডমাস্টার মশাই স্কুল বাড়িতে বাস করতেন। অকৃতদার অমায়িক মানুষ। মাঝে মাঝে সানঘাটার আসরের শিশু সভ্যদের জন্য ভেট আনতেন বিস্কুট, লজেন্স। কখনও বা পাতলা কাঠের বাক্সে তুলোর বিছানায় শোয়ানো আঙুরের দু'চারটে মিলে যেতো। কারণ মুকুন্দবাবুও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শিশুদের খাতির করতেন।

মুকুন্দবাবুকে বলতে শুনেছি তরীফনের আত্মকাহিনী। তরীফনের দেশ বরিশাল। পূর্ব বাংলার মানুষও বলতো "আইতে শাল, যাইতে শাল, তার নাম বরিশাল।" মেজাজটা বরিশালে যেন সবারই বিষম। হুট করে চটে উঠলে সাংঘাতিক। নারী-সুলভ নমনীয় কোমলতা তরীফনের ছিল না। সাদি হলো আবার ঢাকা জেলায়। ঢাকার মানুষ বড় দেমাকে। ঢাকার ঐতিহ্য ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে ভরা। তরীফন তর্কে পারে না। রাগে ফোঁস ফোঁস করে একদিন বাপের ঘর ফিরে গেল। স্বামী তাকে আনতে গেলে তুমুল কলহ চললো। ভাত খেতে বসেছে আলহজ মিয়া। করকরা ভাত আর সরপরা সালুন সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছে তরীফনের মা। হঠাৎ তরীফনের শ্বশুর ঘরে ফিরবার কথা উঠলো। আলহজও আবেদন নিয়ে আসেনি। ঘরের বউ নিয়ে যাবে সে তো তার হক। স্বামিত্বের স্বত্বে দু'চারটে হক কথা কইতেই, কোথায় ছিল তরীফন, ছুটে এসে 'ল্যাজা' মেরে দিল পেটে। বরিশালিয়া 'ল্যাজা' সাংঘাতিক দাও। পেট থেকে খাওয়া ভাত বেরিয়ে এল। ডুকরে কেঁদে উঠলো বিবিজান। ডাক্তার বদ্যি হাসপাতাল করে আলহজ আরাম হলো কিন্তু পঙ্গু হয়ে গেল। পঙ্গু প্রিয়ের হাত ধরে নরসিংদি এসে বুঝলো তরীফন, তাকে কামাতে হবে। নইলে বাঁচবার পথ নেই। তাই সে উপার্জনের পথে নামলো। আলহজ আজ নেই। ইফ্‌ফও শ্বশুর ঘর করে সিলহেটে। তরীফন আগলায় ভিটে একলা।

দিন কতক আগে ইয়োরোপীয় মহিলার মুখে শুনলাম তরীফনের তারিফ। নামটা শুনে অবধি ভাবছি আমাদের সেই সানঘাটার আসরের কথা। সেই তরীফনই কি? বর্ণনায় প্রায় মিলে যায়। নাকের বেশরটি সুদ্ধ যা কিছু ছিল সব সে দিয়েছে মুজিবুর সাহেবের মুক্তি যজ্ঞে আহুতি। সাহেব বাড়িতে কাজ করার পয়সাটুকুও রাখতো না। দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতো ছোট্ট মাটির হাঁড়ি। তাতেই তার ভাতটুকু ফুটতো। আর ছিল মাটির সানকি। ঢেলে খেতে হবে তো! সেই তেল দেওয়া চুল টেনে বাঁধা, সেই কঠিন হাতের বলিষ্ঠ দৃঢ়মুষ্টি, দীর্ঘদেহ। বয়স এগিয়েছে কিন্তু মনের বলে সে আজও অটল। শুনলাম সে নাকি ল্যাজাখানা দিয়ে কেটেছে পাঞ্জাবী পশুর মুণ্ডু। পাশের বাড়ির করিম শেখের সুন্দরী যুবতী বউটাকে টেনে তার ইজ্জৎ কাড়বার চেষ্টায় ছিল ইয়াহিয়া সাহেবের সৈনিক। করিম শেখকে আগে মেরেছে। নরপশুর দল হইহই করে এসে তরীফনের এতদিনের আগলানো ভিটেতে লাগালো আগুন। পুড়ে মরেছে তরীফন কিন্তু করিমের বউটা বেঁচেছে। তার মুখেই মেমসাহেব শহর ছাড়ার আগে খবর পেলেন। কি করে সবটা বললেন না। মেমসাহেবের স্বামী রয়ে গেছেন সেখানে। বেশী বললে যদি তাঁর বিপদ কিছু হয়।

অনেক ভাবলাম। এ কোন তরীফন? যদি আমাদের তরীফন নাও হয় তবু তরীফনদের সব আত্মা আজ এক। আজ পূর্ব বাংলার সব মানুষের মনে এক ভাবনা। সোনার বাংলার সাত কোটি মানুষ স্বপ্ন দেখছে কবে তারা আপন গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। বন্দুক, কামান, বোমা, ট্যাঙ্ক তাদের স্বপ্ন ভাঙতে পারেনি। এখন মেয়েরাও সবাই তরীফন বিবি। যে রোশনআরা মাইন বা বিস্ফোরক বুকে বেঁধে ট্যাঙ্কের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যার জন্য রোশনআরা দিবস পালিত হলো, তার মতই শত শত মেয়ে বন্দুক চালানোর মহড়া নিচ্ছে। খুলনার যে রান্নাঘরে চচ্চড়ি রাঁধতে রাঁধতে গুলি খেয়ে মরলেন চারুলতা, যার জন্য সে রাস্তার নাম হলো শহীদ সরণী, তিনি দলেরই একজন, একমাত্র একক নন। বগুড়ায় জহরব্রত করেছেন মেয়েরা। সেকালের জহর ব্রত ছিল ভিন্ন। যুদ্ধ ছিল বর্মে বর্মে কোলাকুলি। এখন যুদ্ধ হীনতা নীচতার সীমা। ঘৃণ্য জঘন্যভাবে সদর অন্দর জুড়ে তার ব্যাপকতা। নারীকে তাই বেশী করে প্রস্তুত থাকতে হয়। তারা কেউ রাজনন্দিনী নন, রাণী পদ্মিনী নন। সাধারণ মেয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন পুড়ে ছাই হলো তখন দু'শ মেয়ে নিখোঁজ। শোনা যায় তার মধ্যে পঞ্চাশজন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উপর থেকে। অত্যাচারীর বর্বরতার চেয়ে এ মৃত্যু বরং বরণীয়। কাজেই নাও হতে পারে এ তরীফন সে তরীফন। তাতে কি বা আসে যায়। সোনার বাংলার সব মা, সব বধূ, সব ভগ্নী সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত। যারা মরণকে ভয় পায় না তাদের জয় করবে কে? ইয়াহিয়া খাঁ মহাশয়ের ভাড়াটিয়া বাহিনী তো কোন্ ছার।

শ্রীমতী

॥ ১১ ॥

নন্দলাল হাসছিল। হাসির তোড়টা ক্রমেই বাড়ছিল। গীর্জার কাছে এসে সে যেন আর হাঁটতে পারছিল না। হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে বসে পড়ার মতন অবস্থা।

'কি ব্যাপার!' হাসি জিনিসটা সংক্রামক। রামানন্দ হাসছিল জগত হাসছিল। নন্দদুলাল একটা গূঢ় কারণ নিয়ে হাসছিল। রামানন্দ ও জগত স্রেফ তার হাসি দেখে হাসছিল। অথচ কারণটা জানতে পারছে না, এই জন্য মুখে হাসি নিয়ে দুজন বিরক্ত হচ্ছিল কম না।

'এমন পাগলের মতন হাসার কোনো মানে হয় না।' যেন নিজে আর হাসবে না, হঠাৎ গম্ভীর হতে চেষ্টা করে রামানন্দ হাতের পুরোনো সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরাল। 'নন্দবাবু, ব্যাপারখানা কী বলুন তো।'

'এই নন্দ!' জগত চোখ পাকাল। 'এতটা সময় সামলে থেকে এখন বেশ মাতলামি আরম্ভ হয়েছে, না?'

নন্দদুলাল আকাশের দিকে চোখ তুলে হাসছিল। নাকি গীর্জার মাথার ঘড়িটা দেখছিল। দশটা বাজে। সন্ধ্যার দিকে রাস্তার ভিড়টা যেমন ছিল এখন অনেকটা কমে গেছে। তাহলেও ঘটাং ঘটাং করে ট্রাম যাচ্ছিল, হুড়মুড় করে বাস লরীর আসা যাওয়ার কমতি ছিল না। রাস্তায় মানুষের হাঁটাচলা কমেছে এই যা।

গীর্জা পিছনে ফেলে তিনজন সার্কুলার রোডের মোড়ে চলে এল। সেই বিলিতি মদের দোকানের সামনে। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

'মণ্ডল!' নন্দ ডাকল। হাসির চোটে তার চোখে জল এসে গেছে। রাস্তার আলো পড়ে চোখ চকচক করছিল।

'হুঁ, কি হয়েছে শুনি?' নন্দর সঙ্গে রামানন্দ ও জগত দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু কিছু বলতে আরম্ভ করতে গিয়ে নন্দ বলতে পারল না। আবার হি-হি করে হাসছিল।

'তোমার ঐ আড়তদারের সঙ্গে থেকে যাওয়া উচিত ছিল, তাহলে মাতলামিটা জমত ভাল।' জগত এবার রীতিমত রেগে গেল। 'রামানন্দবাবু, মিথ্যে বললাম!'

'আড়তদার এখন হাড়কাটার ইঁদুর কাছে যাচ্ছে।'

'আহা, আমাদেরও তো এমন একটা প্রোগ্রাম ছিল, কোথায় এই নিয়ে তিনজন আলোচনা করতাম, কিন্তু এই আদমী কোমরের কষি ঢিলে করে মেয়েছেলের মতো হাসছে তো হাসছেই। নন্দ!' জগত জোর ধমক লাগাল।

'না, আর হাসব না' যেন হাসি বন্ধ করাতে নন্দও চেষ্টা করছিল কিন্তু কেউ ভিতর থেকে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্রমাগত তাকে হাসাচ্ছিল। যাতে আর পেটের হাসিটা কোনোমতে না বেরোয় শক্ত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখল সে। চোখ তুলে এদিক ওদিক দেখল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা জিনিস তুলে জগত ও রামানন্দের চোখের সামনে ধরল।

'মাই গড!' রামানন্দ চমকে উঠল। জগতের চোখের তারা গোল হয়ে গেল।

নন্দর হাতের জিনিস দেখা শেষ করে দুজন তার চোখ দুটো দেখল। যেন পেট থেকে হাসির ভুড়ভুড়ি উঠে তার দুই চোখ আবার টইটম্বুর হয়ে উঠেছে।

'কাজটা কি ভাল হল নন্দ!' প্রায় পুরো একটা মিনিট চুপ থাকার পর জগত কথা বলল। তার তাকানো ও গলার স্বর থেকে বোঝা গেল সে আঘাত পেয়েছে।

'মানে আর একদিনের মালের খরচটা নন্দবাবু তুলে আনল।' অন্য আর কেউ না হাসলেও এবার রামানন্দ হাসল।

জগত মণ্ডল মাথা ঝাঁকাল।

'না নন্দর এ-কাজ আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। পকেটে টাকা থাকবে আনন্দ করব, হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক করব, রাখেলে যাব কি অন্য কোথাও মেয়ে নিয়ে

ফুর্তি করব, টাকা না থাকলে কিছুই করব না, চুপ করে থাকব; তা বলে—'

'তা বলে ফুর্তি করতে এটা বেচে টাকা যোগাড় করা হবে ভেবে ননীমাধবের পকেট থেকে আমি জিনিসটা তুলে এনেছি তোমায় কে বললে!' যেন নন্দও হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল, ছেড়ে কথা কইবে না এমন একটা তেজী ভাব নিয়ে জগতের দিকে তাকাল।

'আপনার হাত সাফাইয়ের প্রশংসা করতে হয় নন্দবাবু।' রামানন্দ মিহি গলায় বলে শেষ করল।

'অ্যাঁ, আমি ভাবতেই পারি না', নাক সিঁটকাবার মত চেহারা করে জগত সামনের রাস্তাটা দেখল, যেন নন্দর দিকে তাকাতে তার ঘেন্না করছিল। 'ছি ছি, মানুষটা আমাদের পরিচয় পেয়ে কাছে এসে বসল, আহ্লাদ করে এত খরচপত্র করে খাওয়ালে টাওয়ালে, আর সুযোগ পেয়ে ঠিক তারই সর্বনাশ করলাম আমরা।'

'সর্বনাশ কিছুই না, আড়তদারের অনেক টাকা, শুনলে না, কালই একটা নতুন ঘড়ি কিনছে।'

'তা কিনুক।' নন্দর দিকে মুখটা এবার না ঘুরিয়ে পারল না জগত। 'তা হলে তার পকেট থেকে এটা আমরা তুলে আনব? একটা কথার কথা!'

'আমি চাইছিলাম তার একটা ক্ষতি হোক।' নন্দর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল।

'কেন?'

'আমি চাইছিলাম তার আরো বেশ ভাল রকম সর্বনাশ হোক।'

'কেন?'

'গায়ের জোরে পারতাম না, মোষের মতন দেহ, না হলে ইচ্ছা ছিল ঘুষি মেরে বেটার নাকটা ফাটিয়ে দেই।'

'কেন, কি দোষ করেছিল ও, গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের মদ খাওয়ালে বলে।'

'না।' নন্দর মুখের পেশী কুঁচকে উঠল। চোখের তারা ছুঁচলো করে জগতের মুখটা দেখল। 'শুয়োরটা সাতখানা উপন্যাস বাজারে ছেড়েছে বলে।'

'অ, তাই বলো।' জগত চোখ ট্যারা করে রামানন্দকে এক নজর দেখল, ঠোঁট টিপে রামানন্দ হাসছিল, এক সেকেন্ডের জন্য একটা বিদ্রূপের হাসি জগতের চোখে মুখে উঁকি দিতে চেয়েছিল, জগত সঙ্গে সঙ্গে মুখটা গম্ভীর করে ফেলল। 'তা সে যদি উপন্যাস লিখতে পারে আর পারিশ্রমিক পেয়ে যায় তাতে তোমার রাগ করার, কিছু বলার থাকে কি।'

'একশ বার থাকে।' যেন বত্রিশ বছরের যুবক না, আবদারে একটি কিশোর, একটি রাগী ছেলে, নন্দর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আলুর ব্যবসা করে সে, তাই করুক, সাহিত্য... করার উপন্যাস

লেখার তার কোনো রাইট নেই, থাকতে দেওয়া উচিত না।'

জগত চুপ করে রইল।

রামানন্দ জোরে জোরে জোরে টেনে সিগারেটটা শেষ করতে লাগল।

'আমার এমন ইচ্ছা করছিল রামানন্দবাবু', নন্দ রামানন্দর দিকে তাকাল। 'হাতে ছুরিটুরি থাকলে ঐ মোটা ভুঁড়িটা বুঝি ফাঁসিয়ে দিতাম, হাসছিলাম ঠিকই, তার পয়সায় মদও খাচ্ছিলাম গল্পও করছিলাম, কিন্তু রাগে আক্রোশে ভেতরটা এমন জ্বালা করছিল আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

ঘড়িটা তা হলে এখন কি করবেন?'

'কিছুই করব না।' ঠোঁটটা বেঁকিয়ে নন্দদুলাল এদিক ওদিক দেখল, মানুষজন পাতলা, হয়ে গেছে, একটা দেবদারু গাছের দরুন জায়গাটাও অন্ধকার অন্ধকার, হাতের ঘড়িটা পেভমেণ্টের ওপর গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল নন্দ, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে সেটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

জগত একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'চলি রামানন্দবাবু।'

'কোনদিকে?'

নন্দ উত্তর করল না এবং রাগ করে জগতের দিকে শেষ পর্যন্ত আর তাকালই না। পেভমেণ্ট থেকে নেমে বড় বড় পা ফেলে রাস্তাটা পার হতে লাগল।

'কোথায় যাচ্ছে?' রামানন্দ বিড়বিড় করে উঠল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না—' বলতে গিয়ে জগত হঠাৎ থেমে গেল, রাস্তার ওপারে তার চোখ গেল। লাইট পোস্টের নিচে একটি যুবতী দাঁড়িয়ে। এবার জগত অনেকটা নিজের মনে হাসল। এখন বুঝেছি, এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'কে ওটি?' রামানন্দও মেয়েটিকে দেখল। 'ওর নাম রেখা—রেখা চক্রবর্তী।' জগত গুজগুজ করে হাসল।

'এই বিখ্যাত মেয়িটিকে আপনি চেনেন না!'

রামানন্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। দেখার মতন চোখ করে সে এখন রাস্তার ওপারে আলোর নিচে প্রকাণ্ড খোঁপা মাথায় সবুজ শাড়ি জড়ান প্রায় একটি কবিতার মতন সুন্দর দীঘল ছাঁদের শরীরটা দেখল।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে নাকি।' জগতের দিকে চোখ ঘুরিয়ে রামানন্দ আড়ষ্ট গলায় প্রশ্ন করল।

'সব আর্টিস্টের সঙ্গে ওর পরিচয়। কবি ছবি আঁকিয়ে গল্পলেখকরাই তো ওর বন্ধু।' জগত একটা হালকা নিশ্বাস ফেলল। 'কাল ওকে নিয়ে আমি ডায়মণ্ড হারবার বেড়িয়ে এসেছি। প্রায় সারাটা দিন দুজনে হইহই করে কাটালাম ৮

চমৎকার! আপনিও যাবেন নাকি ওখানে!'

'না:, নন্দদুলালকে নিশ্চয় হাতের ইশারা করে ডেকেছে। আমায় তো ডাকেনি। ডাকলে নিশ্চয় যেতাম। বরং নন্দদুলাল ওকে নিয়ে এখন একটু বেড়াক টেড়াক গল্পসল্প করুক।'

'হুঁ, এটা ভাল, নন্দবাবুর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে ওই আলুর বেপারী নীলমাধবকে দেখে।'

স্বাভাবিক, সাতখানা উপন্যাস লিখে ফেলেছে বেটা, কোন্ এক চণ্ডীমাতা পাব্লিশার সেসব রাবিশ ছেপেছেও। আজ কুড়ি বছর নন্দ দারুণ দারুণ সব গল্প লিখছে, একটা বই পাব্লিশারকে গছাতে পারল না। তবে কিনা—'

'বলেন—'

কথা থামিয়ে জগত হঠাৎ হাঁ করে রাস্তার ওপারের দৃশ্যটা দেখছিল। নন্দর হাত ধরেছে যুবতী। খিলখিল হাসছে। শরীর কাঁপছে। খোঁপা কাঁপছে। দুজন অপেক্ষা করছে। যেন ওই ট্যাক্সিটা ডাকবে।

'ভলাপচুয়াস।' জগত বিড়বিড় করে উঠল। 'বড্ড বেশি কামোদ্দীপক চেহারা মেয়েটার।'

রামানন্দ শুনল। চুপ করে রইল।

'তবে কিনা, হুঁ, নন্দর কথা বলছিলাম, মেয়েপাগলা আমরাও, একটু ভাল চেহারার ভাল শরীরের মেয়ে দেখলেই জিভে জল আসে কিন্তু ও যেন মাত্রা হারিয়ে ফেলে। এতটা ভাল না। ফলে হয়েছে কি তার লেখার মধ্যেও জিনিসটা ইদানীং একটু বেশি এসে গেছে। সেক্স। ফলে পাব্লিশাররা তার বইয়ে হাত লাগাতে ভয় পাচ্ছে। হাওয়াটা এখন সাংঘাতিক ঘুরে গেছে তো। পলিটিকস ছাড়া মানুষ অন্য কিছুতেই আর স্বাদ পাচ্ছে না।'

'তখন যেন বলছিল একটু গণতন্ত্রটনতন্ত্র লাগিয়ে গল্প লিখবে?'

'হবে না, নন্দকে দিয়ে হবে না।' জগত জোরে মাথা ঝাঁকাল। 'তার যেটুকু দেবার; মানে যে লাইনে সে লিখছিল খুব দিতে পারত, ভয়ানক এক্সপেরিমেণ্ট্যাল লেখা। জোরালো স্টাইল। কিন্তু সকলের স্বাদ লাগাবার মতন গল্প লিখতে গেলেই ও মরবে। মরেছেও। হয়তো পয়সার জন্য এখন সেভাবেই লিখতে চাইছে—গণসাহিত্য করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় কি।'

রামানন্দ চুপ করে রইল। জগত আর একবার চুপ থেকে রাস্তার ওপারের দুজনকে দেখছিল। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছে। নন্দ দরজা খুলে দিল। যুবতী আগে ভিতরে ঢুকল। পরে নন্দ। দুজনকে নিয়ে গাড়ি পার্ক সার্কাসের দিকে ছুটল।

'আপনার সঙ্গে একদিন পরিচয় করিয়ে দেব।'

'পরিচয় হয়েছে।' রামানন্দ এবার চাপা গলায় হাসল।

'হয়েছে? এতক্ষণ বলেন নি তো।' জগত খুশি হল। হুঁ, কবি রামানন্দ সেনের সঙ্গে পরিচয় না করে ওই আর্ট-রসিকা থাকতে পারবে না যে। কোথায় দেখা হল?

'এই বউবাজার স্ট্রীটেই। হুঁ, রাস্তার ওপর। পরে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা-টা খাওয়া হল। কবিতাটবিতা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনাও করল শ্রীমতী।'

'গুড্।' রামানন্দর হাতে চাপ দিল জগত মণ্ডল। 'কেমন, চলা বলা তাকানোর মধ্যে দারুণ সেক্স-আপীল রয়েছে লক্ষ্য করেছিলেন?'

'উর্ভার্স লেনে বাসা, বাপ রিটায়ার্ড জজ, ভাই পুলিস অফিসার, নিজে টেলিফোন ভবনে চাকরি করে—'

জগত শব্দ করে হাসল।

'আপনাকে এ-ই পরিচয় দিয়েছে বুঝি—আমার বলছিল ফরডাইজ লেনে থাকে, বাপ কোবরেজ, ওয়েলিংটনে ভাইয়ের ইলেকট্রিক গুড্‌স-এর দোকান, নিজে একটা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করছে।'

রামানন্দর চোখ দুটো গোল হয়ে গেল। 'আর আমাদের নন্দদুলালের কাছে কী খবরটা দিয়েছে শুনবেন না?'

রামানন্দ কথা না বলে কেবল একটা ঢোক গিলল। ওপারে লাইট পোস্টের নিচে যেখানে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল সেই ফাঁকা জায়গাটায় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে একটা ভিখিরি এসে জাঁকিয়ে বসেছে। চোখ আড় করে রামানন্দ তাই দেখছিল।

'নন্দকে বলেছে, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, শিগগীর হয়তো ওদের ডিভোর্স হয়ে যাবে। লোকটা আকাট মূর্খ, কোন সিনেমা হলে নাকি টিকেট বেচে, তার রুচি মেজাজ জীবনধারণের পদ্ধতি কোনোটার সঙ্গে শ্রীমতী খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না, জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে।'

'অ, তা হলে বিয়ে হয়েছে!' রামানন্দ জগতের দিকে চোখ ফেরাল।

'আপনি কুমারী ভেবেছিলেন, আমিও মশাই তাই, নন্দও গোড়ায় তাই মনে করত।' জগত ফ্যা-ফ্যা করে হাসল। 'তা কুমারী হোক, অকুমারী হোক, ম্যারিড, বিধবা বা ডিভোর্সী, জজ সাহেবের মেয়ে কি কোবরেজের কন্যা কি সিনেমার টিকেট বেচিয়ের গিন্নী—আমরা এসব কিছুই দেখব না, কিছুই জানার দরকার নেই, কি বলেন? আমরা দেখছি তুমি রূপসী যুবতী, এমন রসাল চেহারা নিয়ে বেছে বেছে রাজ্যের সাহিত্যিক কবি শিল্পীদের পাকড়াও করছ। এটাই আমাদের লাভ। তোমার ওই চমৎকার রুচির জন্যই তোমাকে আমরা মাথায় করে রাখব। সাধারণ একটা স্ট্রীট গার্লকে যে-চোখে দেখি তোমাকে আমরা সেই চোখে কোনোদিন দেখব না। ঠিক কিনা বলুন?'

'তা তো বটেই।' বিকাশের কাছে ওই মেয়ে কী পরিচয় দিয়েছিল কে জানে। রামানন্দ হঠাৎ চিন্তা করল। বিকাশদের পাড়ায় ওর এক মামাতো বোন থাকে, সেদিন বলছিল না? আর রামানন্দর মনে পড়ল সেদিন চায়ের দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে চমৎকার লড়াইয়ের ছবিটা। বাপ, কেন কথায় তুবড়ি ছুটছিল এইটুকুন একটা মুখ দিয়ে যা কিনা পাখির হাঁ-য়ের চেয়ে বড় না। ম্যানেজার তাতেই হারেল।

(ক্রমশ)
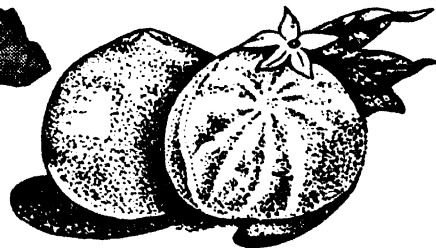
শ্রম-বিরোধ এবং শ্রম-স্বার্থ— পাশ্চাত্যে এবং ভারতে

শ্রম-বিরোধ শুধু যে ভারত অথবা অন্যান্য উন্নতিকামী দেশগুলিতেই ব্যাপক আকারে দেখা যাচ্ছে, তা নয়। বরং পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে শ্রম-বিরোধ তীব্রতর রূপে দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বৃটেন এখন অগ্রণী। বৃটিশ পোস্ট-অফিসগুলি সাতচল্লিশ দিন যাবৎ একটানা ধর্মঘট করে একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে। আবার গত মার্চ মাস থেকে শ্রমিক অসন্তোষ সেদেশে তীব্র রূপ ধারণ করেছে, এবং তার কারণ হল রক্ষণশীল সরকার কর্তৃক পার্লামেন্টে শ্রম-বিরোধ সম্পর্কিত বিল (Labour Relations Bill) অনুমোদিত করিয়ে নেওয়া। গত ১লা মার্চ বৃটেনের ১·২৫ মিলিয়ন শ্রমিক একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করে এই বিলের বিরোধিতা করেন; আবার ১৮ই মার্চ তারিখে ২ মিলিয়ন শ্রমিক ধর্মঘট করেন। ১৯২৬ সালের পর এত ব্যাপক আকারে শ্রমিক-ধর্মঘট বৃটেনে আর হয়নি। অনুমিত হয়েছে ১৮ই মার্চের ধর্মঘটে বৃটেনের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৭০ মিলিয়ন পাউন্ড অথবা ১২৬ কোটি টাকা। বৃটিশ সরকার এই নতুন বিলে যখন খুশী তখন শ্রমিকদের ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ করার ফলেই এই অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলি খুবই সুসংহত এবং শ্রমিক-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়ে থাকে তা বহুদেশেই দেখা যায় না। যদিও বৃটেনে সমাজ-বীমা এবং বিশেষ করে বেকার-ভাতার ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে তবুও ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ সে-দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ৭৫৩·৮১০ অথবা মোট শ্রম-শক্তির শতকরা ৩·৩ অংশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী শীতকালে বেকার লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে এক মিলিয়ন। বৃটেনের পোস্ট অফিসগুলির ধর্মঘট করার পিছনে ডাক-কর্মচারীদের দাবি ছিল শতকরা ১৯ ভাগ মজুরি বৃদ্ধি। সরকার নয় শতাংশ মজুরি বাড়াবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শ্রমিকরা এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে ডাক-কর্মচারীদের দাবির যৌক্তিকতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। সম্প্রতি শ্রমিকদের যে দুইটি প্রতীক ধর্মঘট হয়ে গেল, তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া বৃটেনে পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শুধু একদিন অথবা দুইদিন প্রতীক ধর্মঘট করে শ্রম-স্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন ঠেকানো যাবে না; বরং এ-জাতীয় ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকদের সংগ্রামের যে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সেই ধর্মঘট সম্পর্কে জনসাধারণের মনে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বৃটেনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রক্ষণশীল সরকারের পক্ষে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই এবং সেদিক দিয়ে বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রম-স্বার্থের সংরক্ষণ করতে পেরেছে। ১৯৭০-৭১ সালে বৃটেনের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের অবস্থা খুবই উন্নত হয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থাও খুব ভাল হয়েছে। অবশ্য এই উন্নতির কৃতিত্ব পাওনা হল পূর্বতন সরকারের যা গঠিত হয়েছিল শ্রমিক দলের দ্বারা; কেননা শ্রমিক সরকার তখন এমন কয়েকটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এড়ানো সম্ভব হয়। কিন্তু রক্ষণশীল সরকার শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উন্নত হওয়ার সুফল কিছুটা নষ্ট করতে চাননি; কারণ, সেক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Wage induced inflation) দেখা যেতে পারে। অথচ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি অনেকদিনের; ১৯৬৬ সাল থেকেই সরকার যে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের পক্ষে দাবি আদায়ের সুযোগ আসেনি। তাছাড়া আরেকটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ সরকার ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ করার প্রস্তুতি হিসাবে কৃষিজাত সামগ্রীর এবং বিশেষকরে খাদ্য সামগ্রীর দাম বাড়িয়েছেন এবং আগে কোন কোন খাদ্য সামগ্রীর উপর যে সরকারী খয়রাতি (subsidy) দেওয়া হত তা বন্ধ করেছেন। এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই আগামী নির্বাচনে শ্রমিক দল এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে। সম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, জনমত এখন অনেকটা শ্রমিক দলের অনুকূলে।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বেকার-সমস্যার গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা গত মার্চ মাসে দাঁড়িয়েছিল দেড় লক্ষ। বৃটেনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ-বীমার ব্যবস্থা তত ব্যাপক নয়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার-ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেস সমাজ-বীমার ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ-বীমার ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ বাড়ানো হয়েছে।

অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সমাজ-বীমার ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করা মোটেই কঠিন নয়। বৃটেন, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ যতটা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও তা করতে পারেনি। ইটালীতেও শ্রম-বিরোধের তীব্রতা বর্তমানে খুব বেশি। ইটালীর মোট শ্রম-শক্তির শতকরা ৩·৫ ভাগ বেকার। বেকার ভাতার কোন ব্যবস্থা সে দেশে নেই। অথচ সামাজিক নিরাপত্তার অন্যান্য ব্যবস্থাও তত ব্যাপক নয় যদিও গত দশকে ইটালীর জাতীয় আয় গড়ে ৫·৭ শতাংশ হারে বেড়েছে। গত মার্চ মাসে ইটালীর পোস্ট-অফিস কর্মচারিগণের একাংশ দুইদিনের জন্য ধর্মঘট করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন কারখানায় প্রায়ই শ্রমিক ধর্মঘট হচ্ছে।

কিন্তু ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র। ভারতের মত এত বড় দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার, সরকারের পক্ষে বেকার ভাতার সংস্থান করা সম্ভব নয়। সমাজ-বীমার এবং মজুরি-নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা ভারতে করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং শ্রমিক সরবরাহের প্রাচুর্যের জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির দর কষাকষি করার ক্ষমতা (bargaining capacity) খুবই সীমিত। তাছাড়া বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে মতৈক্য না থাকায় বহুক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ঠিক পথে চালিত হয়নি অথবা শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল হয়নি। দীর্ঘকালীন ধর্মঘট ভারতে বহু দেখা গেছে (বিশেষ করে চটকল, বস্ত্র শিল্প ও চা-বাগানে) এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি সফল হয়েছে। আবার বহু ক্ষেত্রে শিল্পপতিগণ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকদের সমস্যা বিশ্লেষণ করার ফলেও শ্রম-বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পরিণতি হিসাবে ধর্মঘট অথবা লক-আউটের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের সরকারী শিল্প-উদ্যোগে শ্রম অশান্তির তীব্রতাও যথেষ্ট অনুভূত হচ্ছে। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশন এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত একটানা একমাস ধরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশনের পাইলটগণ বেসামরিক বিমান চলাচলে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। আবার এ বছর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অশান্তির সৃষ্টি হলে ১৩ই মার্চ ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশনে লক-আউট ঘোষণা করতে বাধ্য হন। পশ্চিমবঙ্গের বহু কারখানা এখনও বন্ধ আছে। শ্রমিকরা যদি ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন তবে তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব ট্রেড ইউনিয়নগুলির। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি বহুধা বিভক্ত, শ্রমিক স্বার্থের চেয়েও রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পরিচালিত করে এবং এজন্য সাধারণ শ্রমিকগণ বহুক্ষেত্রে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বার্থের ক্রীড়নক হতে বাধ্য হন। সুষ্ঠু ও সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে পারে এবং শ্রম-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রধান প্রয়োজন শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

সুব্রত গুপ্ত

ম্যাটাডর সবরকম দাগ মুছে ফেলে দেয়

আপনি যদি ক্রেতাসাধারণের
স্ব-নিয়োজিত বিবেক হন,
তাহলে নিজেই এই দাবির
সত্যাসত্য যাচাই করুন।
এই কফি পট পরীক্ষা
চেষ্টা কোরে
দেখুন আজই।

১) খাঁটি ফোটানো কফি দিয়ে সাবধানে একটি কফি পট ভর্তি করুন।

২) আপনার পোশাকের মধ্যে ঢেলে দিন।

৩) স্রেফ দাগগুলো মুছে ফেলুন।

৪) দেখছেন ?

যা আমরা বলেছিলাম ঠিক তাই !

ম্যাটাডরে সেই সবকিছুই আছে যা সব সেরা স্যুটিং মাত্রেই থাকে, খুঁতহীন বুনট, একান্ত উপযুক্ত ঝুল। ঝকঝকে, তকতকে ফিনিশ। আর বেছে নেবার জন্য রয়েছে বেশ অনেক রকমের একরঙা, ডোরাকাটা ও চৌখুপি — গরমের দিনের উপযুক্ত রকমারি হাল্কা শেড থেকে শুরু করে মন, গাঢ় কেতাদুরস্ত রকমারি রঙ। কিন্তু ম্যাটাডর ভারতের সর্বত্র অন্যান্য স্যুটিংকে একাদিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ একমাত্র ম্যাটাডর যাবতীয় দাগ ঝেড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে বিশেষ কায়দায় তৈরি। কফির দাগ, কালির দাগ। তেলের দাগ। ঝোলের দাগ। কাদার দাগ। স্রেফ মুছে কিম্বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে তুলে ফেলুন।

Matador

একমাত্র + যুক্ত একটি স্যুটিং

তৈরি করে

mcin|m|ben|18

নাগেন্দ্র দাশ

ভালোবাসার মুখ

জগন্নাথ হল। সামনে দুটি পাশে মৌসুমী ফুলে ছেয়ে আছে। মস্ত বড়োবড়ো ডালিয়া সূর্যমুখীর সারিতে মালীর সঙ্গে রয়েছে আরেকটি মুখ। সে মুখ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার। ফুলের অরণ্যে ফুলের মতো নিষ্পাপ একটি মন। ক্লাসে পড়ান বার্ক-এর 'রিকনসিলিএশন...'। পড়ানোয় আশ্চর্য নাটকীয়তা। আশ্চর্য বাগ্মিতা। নাটকীয়তার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল তাঁর নাটকের প্রতি মমত্ব। ষাট। জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি। নৃপেন পরিমল সুশীল সত্য ও আমি হাজির হলাম জ্যোতির্ময়দার কাছে বার্ষিক নাটকের কি করব না করবো সে সম্পর্কে আলোচনা করতে। বললেন : 'লেখো। নিজেরা লেখো। নিজেরা দেখাশুনো করো। তোমাদের কাজ তোমরা চালাও।'

—'কিন্তু মহিলাশিল্পী ?'

—'আমি ব্যবস্থা করছি। সুশীল...' সুদর্শন সুশীল মজুমদার। নাটক ওর নেশা। বাঙলা নিয়ে পড়ত। কলকাতায় এসেছে কিনা জানা নেই। জ্যোতির্ময়দার ডাকে সুশীল চোখ তুলে তাকায়।

—'তুমি বিকেলে আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যাবে।'

'কোথায় ?'

—'বলছি। দাঁড়াও—নাটক কে লিখবে ? অন্তত দাঁড় তো করাতে হবে। পরে রিহার্সাল দিতে-দিতে সংলাপ ইত্যাদি পালটে নেয়া যাবে।'

নৃপেন চুপ করে ছিল এতক্ষণ। নৃপেন রায়। পদার্থবিদ্যার ছাত্র। পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণী নিয়ে এখন যুক্তরাজ্যে অধ্যাপনা-কাজে লিপ্ত। নৃপেন বলল :

—'আমি বলি কি জ্যোতিদা, ওসব লেখার মধ্যে না গিয়ে...' নৃপেনের কথা শেষ করতে দিলেন না জ্যোতির্ময়দা। ধমক দিয়ে উঠলেন : 'তা হলে কি চাও এখানে নতুন-কোন নাটক লেখা হবে না!'

—'কিন্তু সময় তো কম।'

'প্লট পেলে আমি চেষ্টা করতে পারি।' এতক্ষণ আমার দৃষ্টি ছিল জ্যোতির্ময়দার বাচ্চা মেয়ে দোলার দিকে। বিছানার চাদরে-আঁকা ঘোড়ার ছবির পাশে ওর হাতের খেলনা ঘোড়াটাকে মিলাবার চেষ্টা করছিল দোলা। আধো-আধো গলায় কি-যেন বলছিল। আমি সেই কথাগুলোকে ধরতে চাইছিলাম। না ভেবেই বললাম :

—'প্লট পেলে আমি চেষ্টা করতে পারি।'

কখন বাসন্তীদিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরজায়। পেছনে খাবারের ট্রে হাতে বাসার চাকর। বাসন্তীদি বললেন : 'তুমি সন্ধ্যেবেলা এসো নরেন। উনিও থাকছেন। আসকার ইবনে শেইখ আসবেন। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে নাটকের বিষয় ঠিক করা যাবে।' বাসন্তীদি জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার সহধর্মিণী। কোনো-এক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ের মেয়েদের নিজে শেখাতেন রবীন্দ্রসংগীত—রবীন্দ্রনাটক। জগন্নাথ হলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা বাসন্তীদির বিদ্যালয়ের মেয়েদের পেতাম নাচে-গানে নৃত্যনাট্যে।

নাটক তৈরি হয়ে গেল দিন তিনেকের মধ্যে। মহড়া প্রায়শ হতো জ্যোতির্ময়দার বসবার ঘরে। আসতেন আসকার ইবনে শেইখ। উপর থেকে নেমে আসতেন তখন-কার হাউস টিউটর সন্তোষ ভট্টাচার্য। মাঝে-মাঝে আসতেন প্রভোস্ট ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব। বসতেন। উৎসাহ দিতেন। ফরিদা আর ফাহমিদার সঙ্গে রসিকতা করতেন। ফরিদা ফাহমিদা কবি গোলাম মোস্তাফার বড় মেয়ের দুই মেয়ে। ফাহমিদার ডাক নাম মঞ্জু। আজকে যার নাম এপারে সকলেই জানেন রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী হিসেবে। ফরিদার সেকসপীয়ারের আবৃত্তির গলা ভারী সুন্দর। ইডেন কলেজে অনেকবার ফরিদা ইংরেজী নাটকে অভিনয় করেছে। এই ফরিদা ও মঞ্জু এলো নাটক 'পিছু ডাকে'-তে অভিনয় করতে। ফরিদা হয়েছিল 'লীলা' আর মঞ্জু 'সোমা'। মহড়ার সময়ে সঙ্গে আসতেন মাসীমা। ওদের মাকে

জগন্নাথ হল ১৯৬০

আমরা জগন্নাথ হলের অনেকেই মা'সীমা বলেই ডাকতাম। জ্যোতির্ময়দা সব সময় থাকতেন সঙ্গে-সঙ্গে। আসকার ইবনে শোইখ্ সাহেব মাঝে-মাঝে এসে পরামর্শ চাইতাম। নাটক উৎরে গেল। দু-রাত্রির অভিনয়ে প্রথম সন্ধ্যায় সকলের জন্য প্রবেশাধিকার ছিল। দ্বিতীয় রাত্রিতে অভ্যাগতরা এলেন। ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ফরিদার 'মলি' তুলনাহীন। মঞ্জুর রোম্যাণ্টিক 'সোমা' সকলের মন ছুঁয়েছিল। সকলের ওপরে অবশ্য মাসুদা চৌধুরীর 'করুণা'র অভিনয় অনেকের মনে দাগ কেটেছিল অনেকদিন।

নাটকপ্রসঙ্গ ছেড়ে জ্যোতির্ময়দার কথায় আসি। তখনও ডক্টরেট করেননি। বিলেত থেকে ডক্টরেট নিয়ে এসেছেন বছর তিন-চারেক। তারপর জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হলেন ডঃ জি সি দেবের জায়গায়। পুরোপুরি বাঙালী। অবশ্য আজ এইদিনে জ্যোতির্ময়দার অন্য একটি দিকে প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য জগন্নাথ হলের হাউস টিউটর ছিলেন। তিনি যেখানে ছিলেন সেই বাড়িতেই অন্য ফ্ল্যাটে আসেন জ্যোতির্ময়দা। এসেই বাড়ির রূপ সম্পূর্ণ পালটালেন তিনি। নানান রকমের ফুলের সমারোহে ফ্ল্যাট ভরে উঠলো। খেলাধূলার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক ছিলো তাঁর। হলের সামনের মাঠ পড়েছিল এবড়ো-খেবড়ো হয়ে। সরকারী সাহায্যে মাঠ সমান করালেন। লন টেনিসের ব্যবস্থা করলেন। হলের পেছনে পড়ে-থাকা জায়গাটুকু। [ক্যাণ্টিনের সামনেকার] মৌসুমীফুলে ভরিয়ে তুললেন। একাধিকবার ছোটোখাটো গানের আসর বসত সেই ফুলের বাগানে। উদ্যোক্তা জ্যোতির্ময়দা। সদাহাস্যময় মধুরালাপী এই সুপুরুষটিকে কোনদিনই আর দেখবো না। বরিশালের বানারিপাড়ার গুহঠাকুরতা পরিবারের জ্যোতির্ময়দা 'বরিশাল' বলতে আর গর্বে ফুলে উঠবেন না। তবে এ-ও জানি জ্যোতির্ময়দা অনেকের বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। সে-আগুন নেভবার নয়।

আরও অনেকেরই স্নেহের ছায়ায় অম্লান বন্ধুত্বের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। আটান্নতে বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করে ঢাকা গেলাম। জগন্নাথ হলে থাকার ব্যাপারে আসন-স্বল্পতার প্রশ্নে প্রথমেই তৎকালীন হলের প্রভোস্ট ডঃ দেবের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথম আলাপেই বুকে জড়িয়ে নিলেন। বুকে জড়িয়ে নেওয়াই ছিল ডঃ দেবের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। সেই বুকের উষ্ণতায় আমি উষ্ণ হয়ে উঠেছিলাম। চিরকুমার ডঃ দেবকে তারপর দেখেছি নিরন্তর দীর্ঘ দু'বছর ঢাকা থাকাকালীন। [illegible] থেকে উনষাট। আবার ষাট থেকে একষট্টি। দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। পরে [illegible] প্রধান হয়েছিলেন। নিবিরোধ [illegible] ব্যক্তিটিকে আরও নিবিড়ে পেলাম জগন্নাথ হলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। সে প্রসঙ্গ জ্যোতির্ময়দার আলোচনায় বলেছি। কার্জন হলে দ্বিতীয় রাত্রির অভিনয়ের শেষে গ্রীনরুমে ছুটে এলেন ডঃ দেব। আমাকে খুঁজে বললেন : 'ভেবেছিলাম মার খাবে। কিন্তু না, সবাই প্রশংসা করছেন।' এই ডঃ দেব। যখনই বাসায় যেতাম [স্যাভেজ রোডের মোড়ে—পিছনে কালীবাড়ি] বলতেন নিজের জীবনের কথা। বলতেন দিনজপুরের ছাত্র ছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় পথে-পথে কলা বিক্রি করতেন পড়াশুনার খরচ চালাবার জন্যে। ঢাকাতেও দেখেছি—মোটা একটা ধুতি। শীতের দিনে একটা হয়তো কালো কোট। অ্যানুআল ফিস্টে সেই পোশাকেই হয়তো অভ্যাগত গভর্নর আজম খান সাহেবকে জড়িয়ে ধরছেন। জ্যোতিপ্রকাশের [জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। ছোট গল্প লেখক] চিঠিতে কয়েকদিন আগে জেনেছিলাম উনি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে জ্যোতিপুরবীর কাছে আছেন। স্বাস্থ্যের কারণে জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবেন। জ্যোতিপ্রকাশের,

সঙ্গে ডঃ দেবের সম্পর্ক বড় মধুর। চির-কুমার ডঃ দেব জ্যোতিকে ছেলে ডেকে কাছে নিয়েছেন। জ্যোতি ছেলেবেলায় বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় এসে নিজের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় অবধি সবকটি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনার্স পড়ার শেষ বছরে ডঃ দেব জ্যোতিকে কাছে ডেকে নেন। জ্যোতি এখন ফিলাডেলফিয়ায় সাংবাদিকতার ওপরে পড়াশুনা করছে।

ডঃ দেবের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর আজও যেন চোখ বুজলে শুনতে পাই। চৌষট্টিতেও তাঁকে দেখেছি জানুয়ারিতে দাঙ্গাবিধ্বস্ত ঢাকায়। আমার ভিসার ব্যাপারে ভারতীয় হাই কমিশন অফিসের অরুণশশাংককে অনুরোধ জানাতে বলায় বলেছিলেন : 'নগেন, সকলেই তো দেশ ছেড়ে চলে গেল। এই জগন্নাথ হল। বাঙলাদেশের তাবৎ বুদ্ধি-জীবী হিন্দুদের এখানেই হাতে-খড়ি। দেখলাম, কেউ নেই। এক-এক করে সবাই চলে যাচ্ছে।' আমার হাত ধরে, সেই প্রথম দিনটির মতো, বলেছিলেন : 'থাকতে কি একদমই পারছ না ?' আজ শতকণ্ঠে চীৎকার করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না, সেদিন এখানে চাকরির ব্যবস্থা হওয়ায় আমি চলে এসেছিলাম। আমাকে কেউ বাধ্য করেনি। তাই মনের নিভৃতে চীৎকার করে কাঁদছি, আর বলছি : 'ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন, স্যার। মনে করুন এ ক'বছর যেন এখানে আমি পড়াশুনোর জন্যেই এসেছিলাম। এখন আমাকে আবার বুকের কাছে টেনে নিন। চিরদিনের জন্য টেনে নিন।' আমি আর ডঃ দেবের ভালো-বাসার মুখ দেখবো না।

রবীন্দ্রকাব্যের ক্লাসে মোহাচৌ-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা। মোহাচৌ, অর্থাৎ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। অবশ্য আলাপ বোধহয় তার আগেই হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পোর্টিকোতে হাজিরা খাতা হাতে উনি নামছেন। খাতার ওপর '১ এম : জি সি' অর্থাৎ প্রথমবর্ষ বিঃ এ গ্রুপ 'সি' লেখা দেখে জিগেস করেছিলাম—'আপনি ক্লাসে যাচ্ছেন স্যার ?'

—'গ্রুপ সি ?'

মাথা নাড়াতে কাঁধে হাত রেখে বললেন : 'চলো।'

আশ্চর্য হলাম কণ্ঠস্বরে। এ কণ্ঠস্বর কোথায় শুনেছি! রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনেছি রেকর্ডে। ঠিক তেমনি কোমল মিষ্টি সুরেলা অথচ ভরাট গলা। প্রতিটি কথা বলেন পরিষ্কার করে। এতটুকু জড়তা নেই। অথচ জানতাম উনি নোয়াখালির। আঞ্চলিক উচ্চারণের লেশটুকু পর্যন্ত নেই। পরে জেনেছিলাম—শান্তিনিকেতন-প্রাণ হায়দার সাহেবের উচ্চারণ-শুধরানো ছিল জীবনের অন্যতম সাধনা। সে সাধনায় তিনি আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রথম তো ভেবে-

হলেই বোধহয় তাঁকে পশুর হাতে প্রাণ দিতে হলো। মনে পড়ে কতো অপ্রিয় সত্য তিনি অকপটে উচ্চারণ করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলিমা ইব্রাহিমকে ডক্টরেটে ভূষিত করা উপলক্ষে এক ঘরোয়া অভিনন্দন সভার আয়োজন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাশি সংখ্যক ঘরে। সেখানে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব দিওয়ানা মদিনা প্রসঙ্গে লেখা স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেনের চিঠি পড়েছিলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছিলেন দিওয়ানা মদিনার বাস্তবতার দিক নিয়ে। সৈয়দ মুরতজা আলী সাহেব লিখিত নিবন্ধ পড়েছিলেন দিওয়ানা মদিনার বালিয়াচঙের ভৌগোলিক অবস্থানের সত্যাসত্য বিচার করে। অনেকেই অনেক কথা বলেছিলেন। আজ মনে করতে পারছি না। বলেছিলেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ হাই সাহেব, আলী আশরাফ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ মনীষীরা। উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নাট্যকার নুরুল মোমেন, রফিকুল ইসলাম [সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরেছিলেন] মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, আনিসুজ্জামান এবং আমরা অর্থাৎ জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সেবাব্রত চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু শরীফ, এনামুল হক, আবদুল গফফার চৌধুরী, আসমা চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই। কেউ কেউ বাঙলা ভাষার জন্যে গদগদভাব। যদিও তাঁদের এতোটা উচ্ছ্বসিত হবার প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেননি। প্রকারান্তরে বাঙলার নামে নাক উঁচিয়ে এসেছেন এতদিন [উপরে যাঁদের নাম করেছি, এঁরা কেউই নন—অপরাপর অনেকে ছিলেন, নাম মনে করতে পারছি না এই মুহূর্তে]। আহমদ শরীফ সাহেবের যখন বলার সময় এলো, তিনি বললেন : 'বুঝলাম অনেকই। বাঙলা ভাষার জন্যে আমাদের করণীয় অনেক বুঝলাম। কিন্তু এটা তো বুঝলাম না নিজের ছেলেকে ইংরেজী ইস্কুলে পাঠিয়ে বাঙলা ভাষার সেবা কি করে করা যেতে পারে।' 'ইস্কুল' কথাটার ওপর তিনি একটু জোর দিয়েছিলেন, বোধহয় 'বিদ্যালয়' কথাটি বলতে গিয়ে ইচ্ছেটা চাপতে হলো বলে। এমনি অপ্রিয় সত্য বলতেও তিনি পিছপা হতেন না। যার ফলে সহকর্মীদের মধ্যে তিনি বেশি প্রিয় ছিলেন, একথা আজ স্পষ্ট করে বলতে পারি না। বলতে পারি না অন্তত সেই মুহূর্তে যখন তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই, ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব, ডঃ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সাহেব, ডঃ আনিসুজ্জামান (?) ডঃ মনিরুজ্জামান (?) আজ কেউ তাঁর পাশে নেই; তিনিও তাঁদের পাশে নেই।

আজ ফিরে ফিরে মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সব পেয়েছি'র দেশ কথাটির অর্থ বুঝতে শিখিয়েছিল। আমি অনেক পেয়েছিলাম। অনেক ভালোবাসার মুখ আমি দেখেছিলাম। বলতে কি। বাঙলার মুখ আমি দেখেছিলাম। তাই বোধহয় এপারে এসেও একটি দিনের জন্যেও ওপারকে ভুলতে পারিনি। নীরব চোখের জলে ভেসেছি। হাহাকার গুমরে-গুমরে উঠেছে নিভৃত বুকের আড়ালে। কাগজ বের করতে গিয়েও বলেছি বানানো সীমান্ত আমি ভেঙে দেবো। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভূগোল কিসের! ৭ই চৈত্র, ১৩৭৬ জীবনানন্দের সুরে বলেছি : 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি।' আজ আমার প্রিয়জনকে হারানোর মর্মন্তুদ বেদনার মধ্যে এই সত্য বড় হলো। মর্মান্তিকরূপে সত্য হলো। আজ আমার অশেষ প্রার্থনা—ভালোবাসার মুখ আমি হারিয়েছি। স্বাধীন বাঙলা দেশের অগণন মা-বোন-ভাই-এর মধ্যে সেই মুখ আমি খুঁজে পেতে চাই। জানি, পাবোই।

সাহিত্য সংবাদ

আনন্দ পুরস্কার

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের জন্য গত কয়েক বছর যাবত বাংলা নতুন বছরের শুরুতে কয়েকটি পত্র-পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, এটা সাহিত্য-রসিক পাঠকের প্রায় সবাইকারই জানা আছে। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে দেওয়া এই পুরস্কারের নাম "আনন্দ পুরস্কার"। আনন্দ পুরস্কার সমিতির বিচারে ১৩৭৭ সালের প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর শিশিরকুমার পুরস্কার ও মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। মৌচাক পত্রিকার সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীকামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়া বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এ বছর থেকে একটি নতুন পুরস্কার দেওয়া শুরু করলেন। সেটির নাম "জয় বাংলা" পুরস্কার। এ বছর ওই পুরস্কার পেয়েছেন 'বাংলা দেশ'-এর শহীদুল্লা কায়সার।

কলকাতা—গুজরাট সংখ্যা

বাংলা দেশে যে ক'টি সাহিত্যপত্র এখন বেরোয় এবং বেশ কিছুকালের মধ্যে বেরিয়েছে তার মধ্যে "কলকাতা" পত্রিকাটি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মনোহর এবং সবচেয়ে পরিচ্ছন্নও বটে। তবে, পত্রিকাটির যে-কোনো সংখ্যা পড়ার পর খানিকটা অতৃপ্তি ও অস্বস্তি থেকেই যায়।

সুন্দর কথাটা আমি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার করেছি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশস্তি উচ্চারণ করেছিলেন এ পত্রিকাটি সম্পর্কেও তার অনেকগুলি খাটে। অর্থাৎ এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদপট ভারী সুন্দর, কাগজ ঈষৎ নীল বিচ্ছুরিত শ্বেত, ছাপা ঝকঝকে। এর রচনাগুলি আগে যত বিতর্কমূলক হতো, এখন অবশ্য ততটা নয়—এখন খানিকটা নরম সৌরভময়—তবে প্রতিটি রচনাই খুব আগ্রহ জাগায়। আর একটা দুর্লভ গুণ আছে এই পত্রিকাটির, কলকাতা পত্রিকার প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাট পর্যন্ত সর্বত্র সম্পাদকের হাতের চিহ্ন ও মুন্সীয়ানা ফুটে ওঠে। কোথাও কোনো বাক্য ভুল বা কুশব্দের প্রয়োগ নেই, পত্রিকার পক্ষ থেকে অবান্তর বাগাড়ম্বর করা হয়নি কোথাও। বিনীত অথচ দৃঢ়চেতা সম্পাদকীয় প্রতি সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

"কলকাতা"র বর্তমান সংখ্যাটি গুজরাট সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সে সম্পর্কে কিছু বলার আগে পত্রিকাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলা যাক।

এতগুলি দুর্লভ গুণ ও যোগ্যতা সত্ত্বেও কলকাতা পত্রিকাটি যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যজগতে বিশেষ কোনো স্থান করে নিতে পারেনি সে কথা স্বীকার করে নিতেই হয়। এই পত্রিকাটি বড় বেশী ভালো, সেইজন্য সাধারণ পাঠকের কাছে একটু দূরের বস্তু। মনে হয়, এক ধরনের শৌখিন সাহিত্যপ্রেমীরাই এই পত্রিকার পাঠক হতে পারেন। প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদ এত বেশী সুন্দর হওয়ার হয়তো প্রয়োজন ছিল না, আগাগোড়া বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো ভাষায় বেশ খানিকটা কৃত্রিমতা আনে। ভালো মন্দ মেশানো সাম্প্রতিক সাহিত্যের সঙ্গে এই চমৎকার পত্রিকাটি যে প্রাণের স্রোত মিশিয়ে দিতে পারেনি, এজন্য বেশ দুঃখ হয়।

নানা সংখ্যায় বিভিন্ন সম্পাদকের নাম থাকে বটে, কিন্তু এই পত্রিকার মূল সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত। এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ লেখকও তিনি। জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁর নিজের খেয়ালে পত্রিকাটির ক্রমশ ক্ষতি করছেন। এ পত্রিকা আমার কাছে সমালোচনার জন্য পাঠানো হয়নি, জ্যোতির্ময় দত্ত সেরকম ধাতুতে গড়াই নন, আমি লিখছি নিজের ঝুঁকি নিয়ে। জ্যোতির্ময় দত্তের বয়েস এখন বোধ হয় চৌত্রিশের কাছাকাছি, এরকম অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যে-কোনো দেশেই বিরল। এরকম বহু বিষয়ে জ্ঞানী বা গুণী আমি আর দেখিনি, এরকম বুদ্ধির প্রাখর্যও সচরাচর চোখে পড়ে না। মানুষটির অন্তঃকরণও অতি নরম, বিশ্বসংসারে তিনি বিনয়

মজুমদারের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, অনেক দীন দুঃখী মানুষেরও বন্ধু। একদা একটি ইংরেজী দৈনিকে তিনি কাজ করতেন, এখন বাক্যালাপে পারতপক্ষে তিনি একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন না। ব্যক্তিগত জীবনে এক ধরনের সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছেন, জীবনযাপন প্রতিদিন করে তুলছেন যথাসম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত—মাছ মাংস খান না, চা-সিগারেট মদ্য পান করেন না। খালি পায়ে হাঁটেন এবং যথাসম্ভব গন্তব্য-স্থলে হেঁটেই পৌঁছুতে চান। যাঁর আগেকার স্বভাব এর বিপরীত ছিল—তাঁর এই প্রকার বদল দেখে অনেকে আশ্চর্য হন, কিন্তু কোনো মানুষের ব্যক্তিগত শুদ্ধির প্রচেষ্টা আমার কাছে সব সময়ই শ্রদ্ধেয় মনে হয়। এবং জ্যোতির্ময় দত্তের সমস্ত ব্যবহারই আন্তরিক ও কপটতাশূন্য।

যাই হোক, এই প্রকার মনুষ যখন একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন তার ফল যথেষ্ট ভালো হতে গিয়েও হতে পারলো না, এইটা দুঃখের। যে পত্রিকার অধিকাংশ রচনা সংগৃহীত হয় পারিবারিক বা বন্ধুবান্ধবের সূত্রে, যার পাঠকমণ্ডল বাধ্য হয়েই নির্বাচিত, সে পত্রিকা রীতি-মতন সীমাবদ্ধ তো হবেই। যদিও শুনেছি, এককালে প্রমথ চৌধুরীর সবুজ-পত্র কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় অনেকটা এই ধরনের পত্রিকাই ছিল—কিন্তু তখনকার তুলনায় সাহিত্যের আবহাওয়া এখন অনেক আলাদা। সেকালের সবুজপত্র ও পরিচয়ের দু'-একটা সংখ্যা নাড়াচাড়া করে দেখেছি, আমার কাছে খুবই কৃত্রিম মনে হয়েছে।

এই পত্রিকায় কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না এবং এই পত্রিকার কোনো বিজ্ঞাপনও এখন আর কোথাও প্রচার করা হয় না। কারণ, পত্রিকার সম্পাদক ব্যবসায়ীদের তোষণ পছন্দ করেন না। এই মধুর স্বভাবের যুবকটিকে দেখে কাগজ-ব্যবসায়ী কাগজ সরবরাহ করেন নামমাত্র মূল্যে, ব্লক প্রস্তুতকারক ও মলাট ছাপাখানা সুন্দর ছাপা তুলে দেন শুধু সৌজন্যবশত, এমন কি প্রেসের কর্মচারীরাও কাজ করে দেন স্বার্থ ভুলে। সম্পাদক স্বয়ং চেনাশুনোদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্রাহক সংগ্রহ করেন। এইসব-গুলিই ভালো, অত্যন্ত ভালো কিন্তু অবাস্তব, এভাবে কোনো পত্রিকা চলে না বেশী দিন। বড় বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপন আদর্শবশত না নিয়ে কাগজ-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে কাগজ ক্রয় করাও মনকে চোখ ঠারা মাত্র। কাগজ-ব্যবসায়ী লিখিত বইয়ের সমালোচনা করে সেখানেও তাঁকে মূল্য দিতে হয়—সাহিত্যপত্রিকার পক্ষে এটা বেশী ক্ষতিকর।

জ্যোতির্ময় দত্ত নিজে অত্যন্ত শক্তি-শালী লেখক। ভালো রচনার অভাবে অনেক সময় তিনি নিজেই নানা নামে অনেকগুলো লেখেন। (প্রসঙ্গত, কলকাতার গত সংখ্যায় প্রকাশিত জ্যোতির্ময় দত্ত লিখিত "অতল পামরের সাগরযাত্রা" অতীব চমৎকার বাংলা গদ্যের নিদর্শন।) কিন্তু তরুণ লেখকদের ভালো রচনা যে তিনি আকর্ষণ করতে পারছেন না, সম্পাদক হিসেবে এটা তাঁর ব্যর্থতা।

বর্তমান সংখ্যাটি গুজরাট সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গুজরাটের সাহিত্যসম্পদ সম্পর্কে আমাদের পরিচয় খুবই কম। বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা গুজরাতী লেখক কলকাতাতেই থাকেন। তবুও প্রশ্ন এই, হঠাৎ একটি "গুজরাট সংখ্যা" প্রকাশের মানে কি? এইরকমভাবে কি তামিল, হিন্দী বা মারাঠী সাহিত্যের বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হবে? কেননা, ঐসব ভাষার সাহিত্য সম্পর্কেও আমরা অনভিজ্ঞ এবং ঐসব ভাষায় বেশ কয়েকজন লেখকও কলকাতায় থাকেন।

বলাই বাহুল্য, অন্য একটি ভাষার সাহিত্যকে তুলে ধরার জন্য যতখানি সম্পাদকীয় কৃতিত্ব থাকা দরকার, এই সংখ্যায় তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নেই। বোঝাই যায়, রচনা নির্বাচনে ও অনুবাদে কি অসীম পরিশ্রম করা হয়েছে। একটি অনুবাদও কৃত্রিম নয়, প্রসঙ্গগুণে প্রতিটি রচনাই মৌলিক বাংলার মতন সুখপাঠ্য। এবং এই সংখ্যাটি পাঠ করলে, সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে মোটামুটি আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের একটা ছবি ফুটে ওঠে।

এতে কবিতা লিখেছেন উমাশংকর যোশী, নীতিন মেহতা, অনিল যোশী, সিতাংশু যশোশ্চন্দ্র, রমেশ পারেখ। উমা-শংকর যোশীর কবিতাটি বিষয়গুণে স্বতন্ত্র, অন্য কবিতাগুলি অনুবাদের কৃতিত্বে সব একই লেখকের লেখা বলে মনে হয়। মধু রায় ও শিবকুমার যোশীর নাটক দুটি সুখ-পাঠ্য। গল্প লিখেছেন জয়ন্ত খত্রী, হসমুখ পাঠক, সুন্দরম, সুরেশ যোশী ও চন্দ্রকান্ত বক্সী। গল্পগুলির স্বাদ অন্য-রকম। বিশেষ অভিনিবেশযোগ্য।

প্রচ্ছদপটটি এত সুন্দর যে, দেখলে গা রি রি করে। আজকাল রুজেজ্ঞসের বাক্সে এরকম চমৎকার ছবি থাকে।

—সনাতন পাঠক

জীবনী ও ধর্ম

Chaitanya His Life and Doctrine : A. K. Majumdar : Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay : Price Rs. 25/-.

ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারা। বিভিন্ন তার উপাদান। সাধনার বৈচিত্র্যও কম নয়। অজস্রতা এবং বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয় সাধনার ঐক্যও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এক কথায় এই ঐক্যের সাধনার কথা বলা হয়েছে ভারত পন্থের সাধনা। ভারত আত্মার আবিষ্কার এই সাধনার লক্ষ্য। কবীর, নানক, দাদু চৈতন্য এঁরা সকলেই যে ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন তার মধ্যে এই 'ভারতপথ' খুঁজে বার করবার চেষ্টাই লক্ষণীয়। এই সাধনার মূল কথা শাস্ত্রীয় বিধিবিধান থেকে মুক্তির প্রয়াস। এই মুক্তির আনন্দ ষোড়শ শতাব্দে নিয়ে এসেছিলেন চৈতন্য। তাঁর করুণাঘন মাধুর্যে মনুষ্য-মহিমার চরম সূচিত হয়েছিল।

চৈতন্যের জীবৎকালেই চৈতন্যবন্দনা শুরু হয়েছিল। তাঁর জীবন কথা বিভিন্ন বৈষ্ণব সাধক-পদকর্তা আলোচনা করেছেন। চৈতন্যজীবনীর ব্যাস বৃন্দাবনদাস এবং লীলাশুক কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যাবদানের বৈচিত্র্য এবং তাৎপর্য সংকলিত করেছেন। তাঁদের আগেও কেউ কেউ করেছেন পরেও অনেকে জীবনকথা বিবৃত করেছেন। জীবনীকারেরা কখনও কখনও ভক্তির আবেগে জীবনকথাকে কিঞ্চিৎ অতিপ্রাকৃত অথবা অপ্রাকৃত করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। একালে গবেষকবৃন্দ সেসব জট ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। বাংলায় এ সম্বন্ধে ভালো বই আছে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সেসব তথ্যও যাচাই হয়েছে। কিন্তু ইংরেজীতে তথ্যসমৃদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যজীবনীর অভাব ছিল। শ্রীযুক্ত মজুমদার সে অভাব পূরণ করেছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দের ইংরেজী বৈষ্ণব গ্রন্থখানির কথা এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসে। ডক্টর দে বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে শ্রীযুক্ত মজুমদার জীবনী রচনার দিকে অধিক মনোযোগী। লেখক জীবনী রচনায় সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই সাবধানতা অপরিহার্য। বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্য জীবনচরিত গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদান বিচারে যে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত মজুমদার তাকে মান্য করেছেন। তদুপরি লেখকের বিচার ও অতন্দ্র নিষ্ঠাও যুক্ত হওয়াতে গ্রন্থটি তথ্যনিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শ্রীযুক্ত মজুমদার চৈতন্যাবদানের পটভূমি নিরূপণ করেছেন। সঙ্গত কারণে রামানুজ, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে হয়েছে লেখককে। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার মূলে এ সব মতবাদের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই ছিল।

বিশ্লেষিত হওয়াতে আলোচনা গভীর ও অব্যর্থ হয়েছে। চৈতন্যজীবনকথা আলোচনায় শ্রীযুক্ত মজুমদার কৃষ্ণদাসের গ্রন্থটির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইটিই স্বাভাবিক। অবশ্য অন্যান্য জীবনীগ্রন্থগুলিও উপেক্ষিত হয়নি। এদিক থেকে লেখকের ইতিহাস-নিষ্ঠা প্রশংসার্যোগ্য।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের যে পরিচয় এই গ্রন্থে পাই তা আর একটু বিস্তৃত হলে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়ত। এ বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ... হয়েছে তার সঙ্গে লেখকের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ বলে মনে হল না। কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সম্বন্ধেও লেখক বিরোধী মন্তব্য করেছেন। কিছুকাল আগে প্রকাশিত অমূল্য সেনের গ্রন্থের যে বিচার শ্রীযুক্ত মজুমদার করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। তীক্ষ্ণ যুক্তির অবতারণা করে শ্রীযুক্ত সেনের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণে শ্রীমজুমদার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ছায়া ঘন মেঘ। প্রশান্তকুমার সিংহ। টি লাইট বুক কোম্পানী ঃ ১৭৩/৩ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

নৃত্যের তালে তালে। ইসাডোরা ডানকান। অনুবাদ ঃ সুরিৎশেখর মজুমদার। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী ঃ ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·০০।

যাদুঘরে একা। নগেন্দ্র দাশ। সত্তরের কবিতা প্রকাশনী ঃ ৯৮/১ সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য ৩·০০।

রাস্তা। শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী ঃ ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৮·০০।

Agricultural Price Stabilization in India : Dr. B. V. Jha. Shot Publications : 3B Nadan Street, Calcutta-13. Price Rs. 39.00.

অধ্যক্ষ এস রায় শীল্ড আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপর্যুপরি ৪ বারের বিজয়ী ইউনিভার্সিটি ল কলেজ। মাঝ-খানে বসে প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ পি কে বসু

'বাংলা দেশ'-এর খেলার স্মৃতি

বাংলা দেশ' সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় খেলাধুলোর কথা লিখতে গিয়ে আজ বারবার মনে জেগে উঠছে বাংলা দেশ-এর খেলার স্মৃতি। তখন অবশ্য মুক্ত বাংলা দেশের পূর্ব বাংলা হিসাবেই এর পরিচয় ছিল। কিন্তু খেলাধুলোয়, বিশেষ করে ফুটবলে তার অবদান ছিল অসাধারণ।

পূর্ব বাংলার কত কীর্তিমান হিন্দু-মুসলমান ফুটবল খেলোয়াড় কলকাতার ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। আই এফ এ শীল্ডের খেলায় পূর্ব বাংলা থেকে আগত জেলা দলগুলির খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতার এক একটি মাঠ যে এক অপরাহ্ণের জন্য এক একটি জেলার অধিবাসীদের অধীনে চলে যেত সেই সুন্দর সুখস্মৃতির কথা লিখেও আজ লাভ নেই। আজ বারবার মনে পড়ছে নদীমেখলা শস্য-শ্যামলা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ফুটবল মাঠের কথা, যেসব মাঠে আমিও কিছু কিছু ফুটবল খেলেছি। বারবার মানসপটে ভেসে উঠছে ফুটবল মাঠে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা। খেলার আগে ও পরে এক সঙ্গে মিলে মিশে আম তরমুজ রসগোল্লা কাঁচাগোল্লা খাবার কথা। খেলা জিতে রাত্রিতে পাঁঠা-খাসি কিংবা মুরগি মেরে মহোৎসবের কথা।

মাকড়ার মাজেদ, ইতনার মজিদ, হাবিব, ঘোনাপাড়ার চাঁদমিঞা, যশোহরের ইউসুফ, জোনাসুরের আমীর আলী, কোটালীপাড়ার বালা মিঞা কি আজও বেঁচে আছেন? নাকি মুক্তি ফৌজের সঙ্গে মিশে বাংলা দেশ-এর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ে নেমেছেন?

দূর পূবে অর্থাৎ পদ্মার ওপারের খেলাধুলো সম্পর্কে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই। মুজিবুর রহমানের মহকুমাতেই আমার আদি বাড়ি ছিল। সেই সূত্রে যশোর-খুলনা-ফরিদপুরের সন্নিহিত অঞ্চলের খেলাধুলো সম্পর্কে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে খেলেছিও ওই অঞ্চলের বিস্তর মাঠে। চৌহদ্দি ছিল পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মত। হায়ার হয়ে খেলতে যেতাম নানা দলের সঙ্গে নানা জায়গায়। রাজবাড়ি, কালুখালি, কামারখালি, মধুখালি, কাশীয়ান, ভাটিয়াপাড়া, রূপাপাত, জোনাসুর, খান্দারপাড়া, বোয়ালমারি, উলপুর, মল্লিকপুর, ইতনা, মকুনা, লোহাগাড়া, লক্ষ্মীপাশা, নড়াইল—কত মাঠে না খেলেছি।

ইউসুফ, মজিদ, হাবিব, মাহেদ, চাঁদমিঞাকে যেমন চাচা বা দাদা তেমন ভোলা বসু, ডানা, কানু সরকার, জটা-পটাকে কাকা বা দাদা বলে খেলার মাঠে হিন্দু-মুসলমানের মিলন গ্রন্থি শক্ত করে বেঁধেছি। গোপালগঞ্জের জটা-পটা মুজিবের মহকুমারই দুই নাম করা খেলোয়াড় ছিলেন। ওই অঞ্চলে

কানু সরকার (মল্লিকপুরে) ডালা এবং ভোলা বসু (চতুল) ছিলেন স্বনামধন্য।

খেলার মাঠে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথায় আজ একটি কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে খেলাকে কেন্দ্র করে একটি কবিতার কথা। ঠিক কবিতা নয়, গানের প্যারোডি। আমরা যখন স্কুলের ছাত্র এবং খেলার মাঠে শিশু দর্শক তখন অনেকের কণ্ঠেই গানটি শুনেছি। ফকুরা এবং ইতনার এক আকচা-আকচি খেলাকে কেন্দ্র করে রচিত একটি গান ঃ

"আমরা হাফব্যাকেতে
সমান তিন এ'ড়ে
একটি বামুন, একটি কায়েৎ,
একটি পাঞ্জাবী নেড়ে॥
কেনা-পেণ্টো-হাবলা-ড্যাবলা যত।
লাথির চোটে গড়ায় সব
কদু-কুমড়োর মত॥
দেখলে মেলা হাতি লাগে ভীতি
হরিপদ যায় সিং নেড়ে।
আমরা হাফব্যাকেতে
সমান তিন এ'ড়ে॥"

এই প্যারোডির রচয়িতা ছিলেন ফকুরার কালিদাস। সম্ভবত নাম মাহাত্মোই তিনি কিছুটা কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন।

সে যাই হক, পাঞ্জাবী নেড়ে বলে যার উল্লেখ করা হয়েছে সেই মুসলমান খেলোয়াড় কিন্তু পাঞ্জাবের অধিবাসী বা পাঞ্জাব থেকে আগত খেলোয়াড় ছিলেন না। দশাসই চেহারার বিরাট পুরুষ ছিলেন বলেই বাঙালী মুসলমানকে পাঞ্জাবী নেড়ে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বামুন কায়েতের সঙ্গেই তিনি ছিলেন হরিহর আত্মা।

শুধু ফুটবলই নয়, যে অঞ্চলের কথা লিখছি ওই অঞ্চলে তখন অন্যান্য খেলাধুলোর যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে দেশীয় খেলাধুলো। যেমন গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবাঁধা, হাডু-ডু। আর ছিল নৌকো বাচ এবং লাঠি ও ঢাল-শড়কি খেলার প্রচলন। নদীর বুকে গলুইতে ফুলের মালা পরানো, তেল সিঁদুর মাখানো বাচের লম্বা নৌকোগুলির সে কি মনোরম দৃশ্য।

আন্দাজ করতে পারি দেশ বিভাগের পরে পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ আজকের বাংলা দেশে খেলাধুলোর রেওয়াজ অনেক বেড়ে গেছে। বছরখানেক আগের ছোট একটি ঘটনার কথাও আজ মনে পড়ছে।

মুজিবের ভায়রা ভাই। তাঁর নামও আয়ুব। রমদিয়া কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। আমার এক নিকট আত্মীয়র সহপাঠি বন্ধু। খেলাধুলোর পরম অনুরাগী এবং ফুটবল রেফারী। আমার আত্মীয়র মাধ্যমে জানতে পারলাম আয়ুব সাহেব আমার লেখা 'ফুটবলের আইন কানুন' বইখানি পাবার জন্য খুবই আগ্রহী। সম্ভবত এপারের বই ওপারে পাবার অসুবিধার জন্যই আয়ুবের ওই আবদার। বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং জানতে পেরেছিলাম বইখানি পেয়ে তিনি আমাকে শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই খুশি হননি, অদূর ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে দেখা করে খেলাধুলোর বিষয়ে বিশেষ করে ফুটবলের আইন কানুন সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। আয়ুব আজ কোথায় আছেন? তিনিও কি পাক-ফৌজের হাতে বন্দী হয়েছেন? কবে তার সঙ্গে দেখা হবে?

ছোটবেলার স্মৃতি থেকে আর একটি কথাও আজ মনে পড়ছে। কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কিন্তু এপার ওপারের প্রশ্ন কোনদিন বড় হয়ে ওঠেনি, রেষারেষির ছোঁয়াচ লাগেনি। বরং মোহনবাগানকেই সবাই জাতীয় দল হিসাবে মেনে নিয়েছে। ইউরোপীয় এবং পল্টনী গোরা দলের কাছে মোহনবাগানের পরাজয়ের খবরে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে হায় হায় করেছে।

সব শেষে আবার মনে পড়ছে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কথা, যিনি বলেছিলেন পাকিস্তানের নির্বাচনের পর তোমরা পূর্ব বাংলায় যেতে পারবে, ওরা পশ্চিম বাংলায় আসতে পারবে। এক সঙ্গে খেলাধুলো করতে পারবে। কবে আসবে সেই সুদিন?

মুকুল

ভারত রাবার আনতে পারবে কি?

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভারতের আর একটি খেলাই বাকি। অর্থাৎ বাকি শেষ টেস্ট খেলাটি, কুইন্স পার্ক ওভালে যে খেলার দিকে আমরা আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছি।

সফরের ১৩টি খেলার মধ্যে চারটি টেস্ট সমেত ১২টি খেলা শেষ হয়েছে। এর মধ্যে আমরা একটি টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে আছি। জিতেছি একদিনব্যাপী খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সম্মিলিত বিশ্ব-বিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে এবং তিনদিনব্যাপী খেলায় লীওয়ার্ড আইল্যান্ড দলের বিরুদ্ধেও। হেরেছি শুধু বারবাডোসের কাছে, একটি মাত্র খেলায়।

এখন প্রশ্ন, শেষ টেস্ট জিতে বা ড্র করে ভারত কি ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে 'রাবারের' সম্মান নিয়ে ফিরতে পারবে? শেষ টেস্টটি খেলা হচ্ছে ৬ দিন ধরে। সুতরাং জয়-পরাজয় মীমাংসা হবার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া কুইন্সপার্ক ওভালের উইকেটও বোলারদের সহায়ক।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, সফরের প্রথম দিকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে বর্তমান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পার্থক্য অনেকখানি। এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য যে বারবাডোজের কেনসিংটন ওভালে চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতের খেলোয়াড়রা বিপদের মধ্যে পড়েও যে দৃঢ়তায় খেলা ড্র করেছে সেই দৃঢ়তা দেখাতে পারলে রাবার নিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

কেনসিংটন ওভালের টেস্টেই ভারতকে বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। এই টেস্টেই ভারত সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান থেকে এগিয়ে যেতে পারেনি এবং এই টেস্টেই ভারতের প্রথম ফলো অন করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রধানত সারদেশাই ও সোলকারের ব্যাটের বিক্রমে ফলো অন করতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি দ্বিতীয় ইনিংসে প্রধানত সুনীল গাভাসকারের অনমনীয় দৃঢ়তায়। সারদেশাই এবং সুনীল দুজনেই সেঞ্চুরি করেছেন।

স্থানাভাবের জন্য চতুর্থ টেস্ট সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সম্ভব হল না। সেই সঙ্গে বাকি রইল রনজি ফাইনাল এবং বিশ্ব টেবল টেনিসের পর্যালোচনা।

একলব্য

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
বাটার জুবিলি
চপ্পলগুলির নকশাই এমন, যাতে হাওয়া
খেলতে পারে, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে
থাকে এক মোলায়েম ও স্নিগ্ধ আমেজ।
সুশ্রী ছিপছিপে গড়ন দেখেই
স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই
আসুন না, একবার
পায়ে দেখুন।
বাটা জুবিলি
জুবিলি ১১
১৬·৯৫
জুবিলি ২১
১৩·৯৫
জুবিলি ৫১
১৭·৯৫
জুবিলি ৩০
১৪·৯৫
Bata

হকি খেলার আইন কানুন

হকি খেলার স্টিকস সাধারণত দুই ধরনের। ইংলিশ ও ভারতীয়। ইংলিশ ধরনের স্টিকসের হ্যান্ডেল বা হাতল সুগোল নয়, কতকটা ডিম্বাকৃতি। স্টিকসের চ্যাপ্টা মুখের বক্রতাও কম। অর্থাৎ ভারতীয় স্টিকসের মত মুখ অতটা বাঁকানো নয়। ভারতীয় স্টিকসের হাতল গোলাকার এবং চ্যাপ্টা মুখ একটু বেশী বাঁকানো। ইংলিশ স্টিকসের চ্যাপ্টা মুখ তৈরী হয় সাধারণত অ্যাশ-উড-এর সরু তক্তা দিয়ে। আর ভারতীয় স্টিকসের চ্যাপ্টা মুখে সাধারণত ব্যবহার করা হয় তুঁত গাছ (মালবেরী-উড) বা ওই জাতীয় গাছের তক্তা। আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতীয় স্টিকসেরই কদর বেশী।

স্টিকস সম্পর্কে ৭ নম্বর আইন আলোচনার আগে বলে রাখা দরকার আইনে স্টিকসের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। তাই বলে কোন খেলোয়াড় যদি অতি দীর্ঘ স্টিকস নিয়ে খেলতে চান আম্পায়ার কি সম্মতি দেবেন? নিশ্চয়ই না। অপর খেলোয়াড়ের বিপদের কারণ হতে পারে এমন স্টিকস অনুমোদন করা যায় না।

অবশ্য স্টিকসের ওজন এবং চওড়া সম্পর্কে মাপ উল্লেখ থাকায় অতি দীর্ঘ স্টিকস তৈরি করাও শক্ত। তৈরি করা সম্ভব হলেও তা দিয়ে খেলা চলে না। যে খেলতে চায় তারই অসুবিধা হয় বেশী। তবু তর্কের খাতিরে বলা যায় ওজন ও চওড়া ঠিক রেখে কেউ যদি এমন স্টিকস তৈরি করে যা দেখতে কিম্ভূতকিমাকার এবং যা অপরের বিপদের কারণ হতে পারে তবে আম্পায়ার অবশ্যই এ ধরনের স্টিকস নিয়ে খেলতে দেবেন না।

"আইন ৭" স্টিকস

(এ) হকি স্টিকসের মুখের দিক হবে চ্যাপ্টা ধরনের এবং বাঁ দিকের চ্যাপ্টা মুখ হবে বাঁকানো বা ঘোরানো।

(বি) স্টিকসের মুখের (চ্যাপ্টা অংশ ও হাতলের সংযোগস্থলের নীচের অংশ) কিনারা ধারালো হবে না, মুখে ধাতুতে তৈরী কোন কিছু বসানো বা লাগানো যাবে না। মুখের প্রান্ত ধারালো বা তীক্ষ্ণ হবে না। মুখের অগ্রভাগ চৌকোভাবে কাটাও হবে না, সূঁচালোও হবে না। মুখের পাশ হবে গোলাকৃতি।

(সি) স্টিকসের মোট ওজন ২৮ আউন্সের বেশী বা ১২ আউন্সের কম হবে না। স্টিকস এমনভাবে তৈরী হবে যে, (হাতলে যদি কোন কাপড়ের বেষ্টনী থাকে তবে তা সমেত) স্টিকস যেন ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি রিং-এর মধ্য দিয়ে গলে যায়।

শাস্তি—উপরে লেখা বিধিমত স্টিকস না হলে আম্পায়াররা অন্য কোন স্টিকসে খেলতে দেবেন না।

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) আন্তর্জাতিক হকি বোর্ড কয়েক ধরনের হকি স্টিকস নিষিদ্ধ করেছেন। তার মধ্যে যাকে কাট-ব্যাক টো বলা হয় তা অন্যতম। হকি বোর্ডের আরও সিদ্ধান্ত : স্কোয়ার-কাট টো স্টিকসের মুখের উপরের
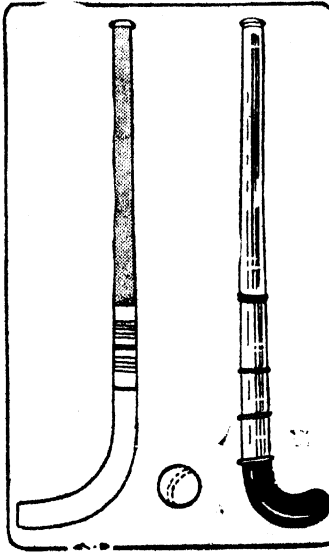
হকি স্টিকস বাঁ দিকে ইংলিশ টাইপ, ডান-দিকে ভারতীয় টাইপ। মাঝখানে হকি বল

এবং নীচের দিকই শুধু গোলাকার হবে না, সমস্তটাই কতকটা গোলাকৃতি হবে।

(২) স্টিকসের সামনের দিকের চ্যাপ্টা মুখের সমস্তটাই চ্যাপ্টা হবে।

(৩) স্টিকসের মুখ অবশ্যই কাঠ দিয়ে তৈরি করতে হবে। কাঠ ছাড়া অন্য কোন উপাদান এখন পর্যন্ত অনুমোদিত হয়নি।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

আইনসম্মতভাবে তৈরি নয় এমন কোন স্টিকসে খেলা অনুমোদন করবেন না।

২ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট রিং-এর মধ্য দিয়ে স্টিকস গলে গেলে বুঝতে হবে মাপ ঠিক আছে। ২ ইঞ্চি ব্যাস অর্থে রিং-এর ভেতরকার ব্যাস বুঝতে হবে। কাপড়ের বেষ্টনী যাকে বলে সার্জিক্যাল বাইন্ডিং তা স্টিকসের যে-কোন জায়গায় দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানেই বেষ্টনী দেওয়া হোক না কেন, বেষ্টনী সমেত স্টিকসের সমস্তটা যেন ২ ইঞ্চি রিং-এর মধ্য দিয়ে গলে যায়।

খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ

স্টিকসের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আইনে কিছু উল্লেখ না থাকলেও ওজন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সুতরাং কোন স্টিকস যেন ২৮ আউন্সের বেশী এবং ১২ আউন্সের কম ওজনের না হয়। মনে রাখবেন সার্জিক্যাল বাইন্ডিং সমেত সমস্ত স্টিকসই যেন দুই ইঞ্চি ব্যাসের একটি রিং-এর মধ্য দিয়ে গলে যেতে পারে।

কখনো প্রতিপক্ষের স্টিকস ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না।

"আইন ৮" বুট ইত্যাদি

বুট হোক, জুতোই হোক বা অন্য কোন পরিধেয়ই হোক, কোনও খেলোয়াড় এমন কিছু পরবেন না যা আম্পায়ারের মতে অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

শাস্তি—এই আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোন পরিধেয় আম্পায়ার অনুমোদন করবেন না।

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) খেলোয়াড়দের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে হকি বোর্ডের পৃথক কোন ভাষ্য নেই। তবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার নিয়মে যদি দুই দলের জামার রং এক ধরনের হওয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ ঘটে তবে একদলকে জামা পরিবর্তন করতে হবে। কোন দল জামা পরিবর্তন করবে লটারি প্রথায় তা ঠিক করা যেতে পারে।

(২) ভারতের আবহাওয়ায় এবং ভারতের মাঠে বুট পরার প্রয়োজন হয় না। অনেকে খালি পায়ে খেলেন। অনেকে আবার কেডস বা রবার সোলের জুতো পরে খেলেন। বুট পরায় কোন বাধা নেই। তবে বুট অবশ্যই নিয়মমাফিক হওয়া চাই। নিয়মমাফিক অর্থে বুটে কোন পেরেক উঁচু হয়ে থাকবে না। শুধু 'বার' অথবা 'স্টাড' সোলে থাকবে।

(৩) খেলোয়াড়ের পোশাক বলতে শার্ট, শর্ট, জুতো, মোজা বোঝাবে। গোলকিপার অবশ্যই প্যাড পরে খেলতে পারবেন। গোলকিপার অ্যাবডমিন্যাল প্রোটেক্টরও ব্যবহার করতে পারেন।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

লক্ষ্য রাখবেন কোন খেলোয়াড় যেন ভাঙ্গা স্টিকস নিয়ে খেলতে না নামেন।

মুকুল

"বাংলা দেশ"-এ সিনেমা

পূর্ব বাংলার সিনেমা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দীন আহমদের বক্তব্য :

"আমাদের এই বাংলা দেশে যেদিন "মুখ ও মুখোশ" নামক একটি বাংলা ছবি নির্মিত হল সেদিন আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার দেশের প্রথম বাংলা ছবি। ছবিটি দেখার জন্য যেদিন প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছিলাম সেদিন আমার মনে ছিল অনেক আশা। অনেক স্বপ্ন। সেদিন আমি ভেবেছিলাম এদেশে নিশ্চয়ই ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে।

পরবর্তীকালে সেই ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ এই ইণ্ডাস্ট্রির দিকে তাকালে আমি হতাশ হই। তাই বলে ব্যর্থতার সুর আমার কণ্ঠে নেই। আজ আমি আমার দেশের বাংলা ছবিগুলির মধ্যে সৃজনশীলতা আর রুচিস্নিগ্ধতার অভাব দেখতে পাচ্ছি। আমাদের বাংলা ছবিতে থাকে সস্তা রোমান্সের ছড়াছড়ি। ধানগাছ, কলাগাছ, ঝোপঝাড় বা বাড়ির অঙ্গিনার পাশে দাঁড়িয়ে নায়ক-নায়িকা প্রেম করে, হাত-পা ছুঁড়ে গান গায়।

কিন্তু আমি ভেবে অবাক হই, যে-দেশে লাখো লাখো মানুষ ঘূর্ণিঝড়ে নিহত হয়, বেঁচে থাকার জন্য, একমুঠো অন্নের জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়, চাকরির অভাবে পথে পথে ঘুরতে হয়, সেই দেশে কি কাহিনী নেই? সেই দেশে কি ভাল কাহিনীর জন্ম হতে পারে না?"

(ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ : "সচিত্র ঝিনুক")

ঢাকার একটি জনসভার সাংস্কৃতিক জগতের স্বাধীকার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, "এতকাল এদেশের শিল্পী সাহিত্যিকরা নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তাদের দৃষ্টির পথ ছিল বাধার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-দের বলছি, আপনারা দৃষ্টি প্রসারিত করুন, মনের খুশিতে সৃষ্টি করে যান। এখন থেকে আপনাদের বাধার প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হবে। সৃষ্টির অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে।

পূর্ব বাংলার প্রথম বাংলা ছবি আবদুল জব্বারের "মুখ ও মুখোশ" (১৯৫৯) ছবির পর বেশ কয়েক বছর ব্যবসার লাভ-লোকসানের সমস্যাটাই সম্ভবত সব চাইতে বড় হয়ে উঠেছিল চিত্রনির্মাতা ও পরিবেশকদের কাছে। সে-কারণে হাল্কা প্রমোদ-উপকরণ বা "সস্তা রোমান্সের ছড়াছড়ি" দেখা গেছে পূর্ব বাংলার ছবিতে। পশ্চিম বাংলার ছবিও কি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? তবে উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের প্রভাব আজ ভালভাবেই এসে পড়েছে "বাংলা দেশ"-এর সিনেমায়। পরিচালকরা আজ সমাজসচেতন, সমকাল সম্পর্কে সজাগ। **বাস্তবের আমরা ও ছবির আমরা এক নই কেন?** এই প্রশ্ন আজ উচ্চারিত (চিত্রালী ১৯ মার্চ '৭১)। উনসত্তরের আন্দোলনের প্রভাব যে চিত্র-পরিচালকরা উপেক্ষা করতে পারেননি তার প্রমাণ কয়েকটি বাংলা ছবি : "বিন্দু থেকে বৃত্ত", "মানুষ-অমানুষ", "জীবন থেকে নেয়া", "নদী ও নারী" ইত্যাদি। ক্রিয়েটিভ ছবি বলতে যা বোঝায় তারও অনুশীলন চলছে আজ পূর্ব বাংলার সিনেমায়। সেখানকার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রোজীর মতে ওই ধরনের কয়েকটি ছবি হল : "কখনো আসেনি", "কাঁচের দেয়াল", "সূর্যস্নান" ইত্যাদি।

পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটির প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। শিল্পের সব ক্ষেত্রেই একুশে ফেব্রুয়ারির অদৃশ্য শক্তি কাজ করে চলেছে। সিনেমায়ও তা সক্রিয়। পূর্ব বাংলার অন্যতম বিখ্যাত চিত্রপরিচালক জহির রায়হান একুশে ফেব্রুয়ারির উপর একটি ছবি তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বাধা পেলেন। জনৈক সরকারী কর্মচারী তাঁকে বললেন সেন্সারের ছাড়পত্র কখনই পাবে না এ ছবি। জহির

সমগ্র দেশের দুই জনপ্রিয় শিল্পী : কবরী চৌধুরী ও উজ্জ্বল—সুভাষ দত্তর "[illegible]" চিত্রে

নববর্ষের নব আকর্ষণ
পরদে কে পিছে
পরিচালনা কে. শঙ্কর সংগীত শঙ্কর জয়কিষণ
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ
পরিচালনা বাবুভাই মিস্ত্রি সংগীত এস. এন. ত্রিপাঠী
বুড্ডা মিল গয়া
মাত্র পরিবেশক বিলামোরিয়া লালজী

রায়হান অগত্যা তৈরি করলেন "জীবন থেকে নেয়া"। এই ছবির মুক্তির ব্যাপারে পরিচালককে সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়েছে। জহির রায়হান আন্তর্জাতিক মানে তৈরি করছেন সপ্তভাষিক ছবি "লেট দেয়ার বি লাইট"। এতে অভিনয় করছেন কলকাতার বনানী চৌধুরী।

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক অভিন্নতা যে কোনদিনই ক্ষুন্ন হয়নি তার প্রমাণ বেশি পাওয়া যায় পূর্ব বাংলার ফিল্মে। পশ্চিম বাংলার ছবির সঙ্গে পূর্ব বাংলার ছবির নামের মিল তো আছেই। যেমন, সমাধান, বিনিময়, চাওয়া-পাওয়া, প্রতিশোধ, মোমের আলো, খেলাঘর, এরাও মানুষ, ছদ্মবেশী, শিল্পী ইত্যাদি। নামের মিল আরও অনেক পাওয়া যাবে। ভাষা এক, অনেক সময় তাই নামও এক। কাহিনীর মিলও দেখা যায়, বিশেষত নাট্যপ্রধান গল্পের ক্ষেত্রে। 'সদ্যোমুক্ত' "সমাধান" ছবির (কাহিনী ও সংলাপ : উদয়ন চৌধুরী) "সিনোপসিস" পড়ে তাই মনে হল। মিল আরও আছে। সেখানে একদল তরুণ পরিচালক, ওই পরিবেশে যতখানি সম্ভব, নতুন ধরনের ছবি তৈরির কাজে ব্যস্ত। তাঁদের মধ্যে পরিচালক সুভাষ দত্ত উল্লেখযোগ্য। চিত্রপরিচালনার প্রেরণা তাঁকে দিয়েছে সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাচালী" ছবি। সুভাষ দত্তর প্রথম ছবি "সুতরাং" এবং পরে "কাগজের নৌকা" আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছে। আগে ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল, অভিনয়ও করেছেন "এদেশ তোমার আমার" ছবিতে। তারপর হলেন পরিচালক। সুভাষ দত্তর "কাগজের নৌকা", "আয়না ও অবশিষ্ট", "আবির্ভাব", "পালাবদল", "আলিঙ্গন" ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। "ঠিক অনুসরণ না করলেও সত্যজিৎবাবুর কর্মপদ্ধতি দেখে আমি অনুপ্রেরণা পাই"—সাংবাদিক সাক্ষাতকারে বলেছেন সুভাষ দত্ত।

জহির রায়হানের "এই নিয়ে পৃথিবী" ছবিতে ববিতা ও ওমর চিশতি

পূর্ব বাংলার, তথা পাকিস্তানের, প্রথম মহিলা চিত্রপরিচালিকা হলেন রেবেকা। তাঁর ছবির নাম "বিন্দু থেকে বৃত্ত", যাতে সমসাময়িক জীবনের পরিচয় রয়েছে। রেবেকা অভিনয়ও করেন। তাঁর "বিন্দু থেকে বৃত্ত", আগেই জানানো হয়েছে, সমকালীন সমস্যার ছবি।

পূর্ব বাংলার নিজস্ব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বয়স বেশি নয়। এই অল্পকালের মধ্যেই ঢাকায় এখন তিনটি স্টুডিওতে কাজ চলছে। ওখানে কালার ফিল্ম তৈরির ল্যাবরেটরি রয়েছে। ওই ল্যাবরেটরিতে শুটিং ফ্লোর রয়েছে চারটি এবং সাউন্ড থিয়েটার দুটি। বছরে গড়পড়তা ৩৫ থেকে ৪০টি ছবি তৈরি হয়। এখন ছবির প্রয়োজনার হার এমন বেড়েছে যে, আশা করা হচ্ছে এ বছরেই সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়ে যাবে। ছবি হচ্ছে অনেক, কিন্তু স্টুডিওর অভাব। পরিচালক সুভাষ দত্ত বলেছেন, আর একটি স্টুডিও না হলে কাজ চালানো মুশকিল।

প্রথমে ছিলেন তন্দ্রা মজুমদার, তারপর হলেন সুজাতা—চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। এখন সুজাতা আজিম, জনপ্রিয় অভিনেতা আজিমের স্ত্রী। ছবিতে : শিল্পী দম্পতি

পূর্ব বাংলায় ছবি তৈরির আয়োজন যেমনই থাকুক, উৎসাহ অফুরন্ত। এখন, বিশেষ করে উনসত্তরের আন্দোলনের পর, সিনেমা যাতে আর শুধুই প্রমোদচিত্র না হয় সে-বিষয়ে সমালোচক এবং জনসাধারণ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ১৯ মার্চের "চিত্রালী"-তে বলা হয়েছে—"তারপর বহু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে লোকছবির বাস্তববর্জিত আফিং উর্দু ছবির কল্পিত রূপলোক, তথাকথিত পারিবারিক ছবির বলয়ে খাবি খেতে খেতে এদেশের ছবি উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পর যেন নতুন মোড় খুঁজে পেল।......আমরা আশা করতে পারি, ছবির মানবীকরণের পথের অদৃশ্য বাধা

এবারের আন্দোলনের দুর্বারতা আরও দূর করবে।"

তা ছাড়া, আর একটি দাবি উঠেছে আজ। একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে ছবি চাই। এ নিয়ে কাগজে কাগজে লেখা হচ্ছে। একটি কাগজে লেখা হয়েছে—"একুশের বাণীকে গণ-মানসে পেঁছে দেবার কাজে চলচ্চিত্র অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। এই কারণেই ভাষা আন্দোলনের এই বিশ বছর পার হয়ে যাবার পরও একুশের পটভূমিতে একটা ছবি আমাদের সামনে এল না—এ অভিযোগ স্বাভাবিক ও সাধারণ।"

পূর্ব বাংলার নতুন ছবির খবর

পূর্ব বাংলার নতুন ছবির খবর কী এবার দেখা যাক। মার্চ মাসে মুক্তি পেয়েছে ফখরুল আলমের "জয় বাংলা", আনোয়ার আশরাফের "গান গেয়ে পরিচয়", মোস্তাফা মেহমুদের "মানুষের মন" এবং আজিজুর রহমানের "সমাধান" (সংগীত পরিচালনা : সত্য সাহা)।

বাংলা দেশ সিনেমার জনপ্রিয় স্টার রোজি

শাবানা—পূর্ব বাংলার সিনেমার একজন ব্যস্ততম নায়িকা। "সমাধান" ছবিতে

পূর্ব বাংলার স্টুডিওতে দীপালি কথাচিত্রের "পলাশের রং" ছবির সেটে সুরকার সত্য সাহার সুরে একটি গানের দৃশ্য টেক করা হচ্ছিল। জনৈক রিপোর্টার গানটির লাইন তুলে দিয়েছেন—

এ কি হল বল না,
এ মন যে মানে না,
কেন দেওয়া-পাওয়ার মাঝেতে
হিসাব মেলে না।

প্লে-ব্যাক শিল্পী আজিম গানটি গেয়েছেন। ছবিটি তাঁরই।

পরিচালক বাবুল চৌধুরী "প্রতিশোধ" ছবির কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। "নিজেরে হারায়ে খুঁজি"-র কাজ চলছে। কবরী ও রোজি—দুই ব্যস্ততম অভিনেত্রী এঁরা আছেন ছবিতে। রুহুল আমিন ছবির পরিচালক। বলাকা জন ছবির আউটডোর দৃশ্য গ্রহণের জন্য পরিচালক সুভাষ দত্ত চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। অভিনেত্রী কবরী ছবিটির প্রযোজিকা।

অবিভক্ত বাংলার সিনেমার জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক কমল দাশগুপ্ত এখন পূর্ব বাংলার অনেক ছবির সুরকার। তাঁর নতুন ছবি "পালংপুর"-এর মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে গত মাসে। ছবিটি পরিচালনা করছেন অমলকুমার বসু।

"আলম কলিজা" ছবি হচ্ছে। তৈরি করছেন হাসান ইমাম। "মিতা" নামে যে চিত্রপরিচালক পূর্ব বাংলায় পরিচিত তাঁর আসল নাম নারায়ণ ঘোষ। এখন তিনি "সুখের প্রজা" ও অন্যান্য ছবির কাজে ব্যস্ত। নতুন যেসব ছবির কাজ চলছে সেগুলি হল : "যখন বৃষ্টি এল", "অশ্রু দিয়ে লেখা", "স্বপন দিয়ে ঘেরা", "জীবনে একটি যন্ত্রণা", "এই নিয়ে পৃথিবী", "চৌধুরী বাড়ি", "দাসী" ইত্যাদি।

তখন বাংলার আকাশে বাতাসে
একটিই গান/বাংলার মাটি
বাংলার জল এক হউক, এক
হউক, এক হউক হে ভগবান।
তখন স্বদেশী হাঙ্গামায় বাড়িতে
বাড়িতে চলেছে তল্লাসী।
সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে
বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী নারী
মৃণাল অন্তঃপুরের দেয়াল
ভেঙে বেরিয়ে এল বিশ্বভুবনের
আলোয়। সে আর কোনদিন
সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের
গলিতে ফিরবে না।

কাহিনী । রবীন্দ্রনাথ পরিচালনা । পূর্ণেন্দু পত্রী প্রযোজনা । রূপশ্রী চিত্রগ্রহণ । শক্তি ব্যানার্জী সঙ্গীত । রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়
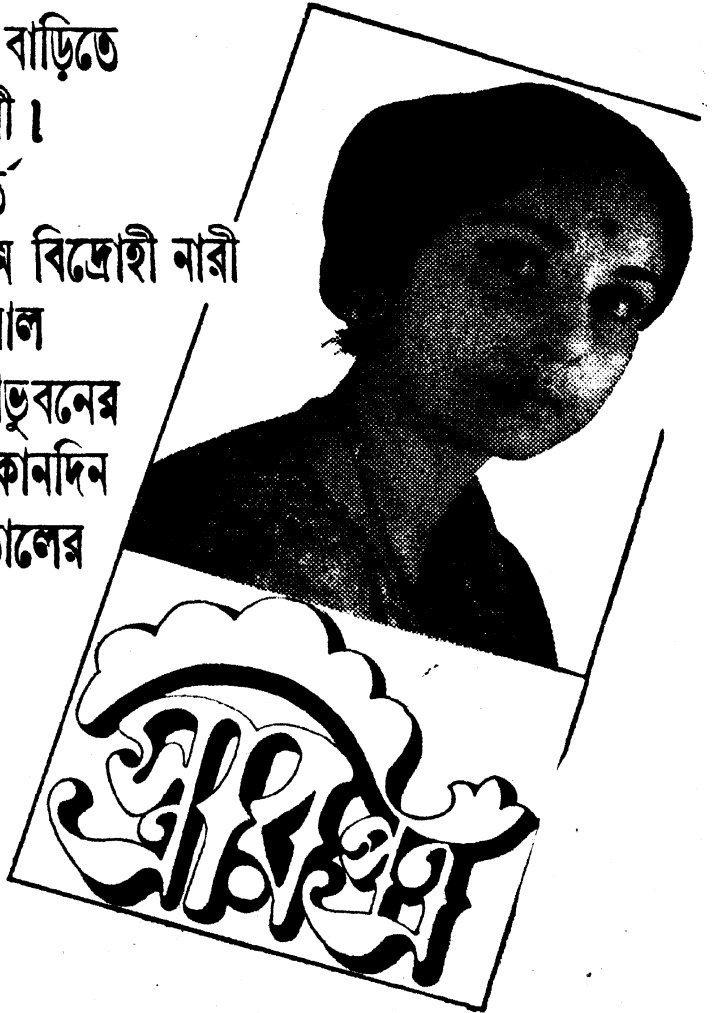
পূর্ব-বাংলার চিত্রশিল্পে আলোর ঝলক দেখে এলাম

বনানী চৌধুরী

গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৭০) ব্যক্তিগত কাজে ঢাকায় গিয়েছিলাম,—ঠিক ছিলো এক মাস থাকবো। আমাদের একটি আনন্দ-অনুষ্ঠানে ওখানকার কয়েকজন চিত্র-পরিচালক ও শিল্পীকে নিমন্ত্রণ জানালাম। সেদিন গেলাম জহির রায়হান সাহেবের বাড়িতে ওঁকে নিমন্ত্রণ জানাবার উদ্দেশ্যে। উনি দুম্ করে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি কতদিন থাকবেন এখানে?" আমি বললাম, "এক মাসের বেশী নয়।" অন্যমনস্কভাবে নিমন্ত্রণপত্রটি হাতে নিয়ে বললেন—"লেট দেয়ার বি লাইট ব'লে একটি বই আরম্ভ করেছি—একটি মায়ের চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে শিল্পী খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে গেলাম,—ওটা আপনাকে ক'রে দিয়ে যেতে হবে।" বললাম, "হঠাৎ কিছু বলতে পারছি না—যে কাজে এসেছি, সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছি, পরে বলবো।" উনি তাড়াতাড়ি আলমারী খুঁজে নিজের হাতে ওঁর লেখা একখানি বই দিলেন—নাম "আর কতদিন"। বললেন—"প'ড়ে দেখবেন, মায়ের চরিত্র আপনার ভালো লাগবেই।"

পড়লাম বইটি—খুউব ভালো লাগলো। বিশেষ ক'রে গল্পের বক্তব্যে আমি মুগ্ধ হলাম। এই বইয়ের মাধ্যমে উনি বলতে চেয়েছেন—মানুষ মানুষকে হত্যা করে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, জাতির নামে, স্বার্থের নামে, সংস্কৃতির নামে। এ হত্যার শেষ কোথায়? এই বর্বরতাই অনাদিকাল ধরে আমাদের পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে। হিংসার এই বিষ লক্ষ কোটি মানব-সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা ক'রেছে। কিন্তু মানুষ মরতে চায় না—মানুষ বাঁচতে চায়। মানুষ চায় জ্ঞান, চায় আলো, চায় শান্তি। তবু আলো নেই, শুধু অন্ধকার—মানুষ আলোর জন্যে হাহাকার করে।

এই বইয়ের একটি চরিত্র ব'লছে—"জানি ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা ক'রেছে হিরোশিমায়। ওরা আমার মাকে খুন ক'রেছে জেরুজেলেমের রাস্তায়। আমার বোনটাকে ধর্ষণ ক'রে মেরেছে ওরা, আফ্রিকায়। আমার বাবাকে মেরেছে বাংলা-ওয়ালেড়ে, গুলি ক'রে। আর আমার ভাই—তাকে ওরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা ক'রেছে—কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালো-বাসতো।" ব'লতে ব'লতে বুড়োটার দু' চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে। বুড়োটা পাগলের মত কথাগুলি বিড় বিড় ক'রে ব'লেই চ'লেছে—উদ্‌ভ্রান্তের মত।

আজকের পৃথিবীতে এ জিজ্ঞাসার বুঝি আর শেষ নেই। কোথায় আলো? কে দেবে আলোর সন্ধান?—এই হ'চ্ছে "লেট দেয়ার বি লাইটের" জিজ্ঞাসা। হয়ত বিশ্ব-বাসীর দরবারে—হয়ত ভগবানের দরবারে এই চির-জিজ্ঞাসা।

গল্পের বক্তব্যে মুগ্ধ হ'য়ে অতিথি শিল্পী হিসেবে কাজ শুরু করলাম। এফ ডি সি স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ শুরু হোলো। জহির সাহেব কথা দিয়েছিলেন এক মাসের মধ্যে আমার কাজ শেষ ক'রে—আমাকে ছুটি দিয়ে দেবেন। কিন্তু হোলো না;—এক মাস—তিন মাস হ'য়ে গেল।

কাজের মাধ্যমে ওখানকার নায়ক-নায়িকা, চরিত্রাভিনেতা—চিত্র-পরিচালক সকলের সঙ্গে পরিচয় হ'তে লাগলো। দেখলাম, চিত্রশিল্পের সর্ব পর্যায়ের লোকের মধ্যে সে কী কাজের উদ্দীপনা—কি প্রাণচাঞ্চল্য! শিল্পী কর্মব্যস্ত, পরিচালক কর্মব্যস্ত, কলাকুশলী ব্যস্ত। এফ ডি সি স্টুডিওতে চারটি ফ্লোরে দিবারাত্র অবিরাম শুটিং হচ্ছে। ওখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক এখন রাজ্জাক। "লেট দেয়ার বি লাইট"-এ আমি স্টুডিওয় ঢুকলাম সকাল নটায়,—

দেখলাম রাজ্জাক মেকআপ নিয়ে ফ্লোরে ঢুকছেন (অন্য কোনও বইয়ে)। আমি ফিরছি রাত দশটায় তখন ওখানে অসম্ভব হাড় কাঁপানো শীত। দেখি গেটের কাছে ফ্লোরের বাইরে, মুক্ত আকাশের নীচেও শ্যুটিং হচ্ছে, চারিদিকে আলোর মেলা। হঠাৎ একটা ঝোপের ভেতর থেকে রাজ্জাকের গলা পেলাম—চীৎকার ক'রে ব'লছেন—"কি ভাবী, আমাদের ফেলে চলে যাচ্ছেন (ওখানে সকলে আমাকে ভাবী ব'লে ডাকতেন।)?" কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি গায়ে মাথায় একটা চাদর জড়িয়ে—অসহ্য শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার তাগিদে ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছেন। শিশির পড়ে সর্ব-অঙ্গ ভিজে জবজবে হয়েছে। ভোর ৪টে পর্যন্ত নাকি শ্যুটিং চলবে। এই রকম আরও অনেক শিল্পীকেই দেখেছি দিবা-রাত্রি শ্যুটিং করছেন। জিজ্ঞেস ক'রলাম, "বিশ্রাম কখন করেন?" বললেন, "ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা।" এখনকার জনপ্রিয় নায়িকা কবরী, জনপ্রিয় চরিত্রাভিনেতা—আনোয়ার হোসেন। এদেরও ঐ একই অবস্থা, দিনেরাতে বিশ্রাম নেই।—জনপ্রিয় নায়িকাদের মধ্যে আরও যাঁরা আছেন—সুচন্দা (ব্যক্তিগত জীবনে জহীর রায়হান সাহেবের স্ত্রী), ববিতা, শবনম, [illegible], কবিতা, শাবানা।

নবাগত নায়কদের মধ্যে যাঁরা জনপ্রিয় —তাঁরা হলেন—ওমর চিশ্তী (ইনিই লেট দেয়ার বি লাইটের নায়ক)। উজ্জ্বল, [illegible], ইকবাল, কাসেম। মেয়েদের মধ্যে চরিত্রাভিনেত্রী রোজী খুবই ব্যস্ত। আরও আছেন—রওশন জামিল, রহিমা খাতুন, সুলতানা জামান, রানী সরকার, পূর্ণিমা।

চরিত্রাভিনেতা—মুস্তাফা, ফতেহ লোহানী, আমজাদ হোসেন (ইনি পরিচালক হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছেন), সুভাষ দত্ত (ইনিও প্রথম শ্রেণীর পরিচালক), শওকত আকবর হাসান ইমাম, দিলীপ বিশ্বাস, নারায়ণ চক্রবর্তী, দীন মহম্মদ, সাদেক। কমেডিয়ান আছেন—খান জয়নাল বেবী জামান, হাশমত।

পূর্ব বাংলার পরিচালক জহির রায়হানের সপ্তভাষিক ছবি "লেট দেয়ার বী লাইট"-এ অভিনয় করেন কলকাতার শিল্পী বনানী চৌধুরী

আমি প্রায় তিন বছর পরে ঢাকায় গেলাম,—দেখলাম, তিন বছরের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে ঢাকার চলচ্চিত্রশিল্প উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানতে পারলাম ১৯৭০ সালে ঢাকায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ৪১টি, তার মধ্যে ২টি ছাড়া সবগুলিই বাংলায় তোলা।

১৯৭১ সালে নাকি ৫০টি ছবির কাজ করবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওখানে এখন পাঁচটি স্টুডিও। একটি পুরানো (এফ ডি সি), এখানেই ভীড় বেশী। বাকী গুলির নাম—পূর্বাশা, বেঙ্গল স্টুডিও, পপুলার স্টুডিও, পাইলট স্টুডিও এবং জিওসিনে স্টুডিও। এগুলিতেও অল্প-স্বল্প শ্যুটিং চলছে।

"স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা" ছবিতে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় শিল্পীজোড় কবিতা ও রাজ্জাক

জহীর রায়হান সাহেব ছাড়া অন্য কোন পরিচালকের সঙ্গে আমি কাজ করিনি—তাই রায়হান সাহেবের কাজের ধারার সঙ্গেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে পেরেছি। ওঁকে দেখলাম, উনি একজন কাজ-পাগল পরিচালক—কি বাড়িতে, কি গাড়িতে, কি সেটে,—সবসময়েই তাঁর মাথার মধ্যে এক চিন্তা,—কাজ, কাজ—আর কাজ। সেটে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছেন, নিজেই ক্যামেরা ঘোরাচ্ছেন, নিজেই আলো-নিয়ন্ত্রণ তদারক করেছেন, কম্পোজিশন দেখে নিচ্ছেন, অভিনয় যাচাই ক'রছেন। একটা সেটে একটা শট্ ছিলো—ওপরে সিঁড়ির সামনে কিছু চরিত্র আছেন, সিঁড়ির দু' পাশে কিছু চরিত্র আছেন, এবং নেমে গিয়ে মেঝেতে কিছু চরিত্র আছেন। এটাকে উনি একটা শট্-এ নিতে চান। সিঁড়িটা একেবারে খাড়াই। নেবেন ওপর থেকে নীচের শট্—। নিজের কাঁধে ক্যামেরা বসিয়ে—নিজে ট্রলি হয়ে ২৫-৩০ বার নীচে নামলেন আর উঠলেন। এমনও দেখেছি একটা সাইলেণ্ট শট্-এর জন্যে লাইট ক'রলেন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। বইটার শ্যুটিং ক'রলেন ইংরেজীতে—বিভিন্ন ভাষায় ডাব্ করবেন শুনে এসেছি।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, বেশ কয়েকজন শিল্পী চিত্র-প্রযোজনায় এগিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে এককালের নামকরা নায়িকা সুমিতা দেবীও আছেন। ওখানে এফ ডি সি স্টুডিওয় খুবই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে দেখলাম।

প্রথম শ্রেণীর পরিচালকের মধ্যে আছেন—জহীর রায়হান, খান আতা, কাজী জহীর, মিতা, সুভাষ দত্ত, বেবী ইসলাম, নজরুল ইসলাম ও আব্দুল জব্বার খাঁ (ইনিই

ওখানকার প্রথম চিত্র "মাটি ও মানুষ" পরিচালনা করেছিলেন)। এ ছাড়া আরও যাঁরা পরিচালনাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রেছেন তাঁরা হ'লেন,—ফতেহ্ লোহানী, এহতেশাম মুস্তাফিজ মোস্তফা মাহমুদ বাবুল চৌধুরী, রহমান, নিজামুল হক, ই আর খান, বশীর হোসেন, নুরুল হক বাচ্চু, কিউ এ জামান, নাজমুল হুদা মিণ্টু।

চলচ্চিত্রশিল্প যেমন খুবই উন্নতি ক'রেছে, সেই অনুপাতে মঞ্চ অনেকটা পিছিয়ে আছে। অবশ্য বহু অপেশাদারী নাট্য-সংস্থা প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় নাটক অভিনয় ক'রে থাকেন। কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে জানতে পারলাম, তাঁরা অনেকে একটা স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন—এখনও সফল হ'তে পারেননি। ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট নামে মাত্র একটি মঞ্চ আছে—সেটায় কিছু না কিছু নাটক সব সময়েই অভিনয় হচ্ছে। শুনেছিলাম, একটি জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী উদ্যোগী হ'য়েছেন। এখানকার চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে ওদেশের শিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলী সকলের অসীম আগ্রহ ও জানবার উৎকণ্ঠা। যার ফলে ও'রা নাকি এখানকার কয়েকটি সিনেমা পত্রিকা—যার দাম ৩-৪ টাকা,—সেটা ১৭-১৮ টাকা দিয়েও কিনে থাকেন। কিছু কিছু ছেলেমানুষী উৎকণ্ঠার নমুনা বলি। কেউ কেউ জিজ্ঞেস ক'রলেন—"আচ্ছা অমুক শিল্পী নাকি অমুককে বিয়ে করেছেন? একথা সত্যি?" উত্তরে বললাম—"সেটা আমি সঠিক বলতে পারব না।" (যদিও ব'লতে পারতাম।) কেউ আবার জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা অমুক নায়িকা নাকি শুধু ফলের রস খেয়ে আছেন কয়েক বছর ধরে?" বললাম, "সেটাও আমার সঠিক জানা নেই" (সত্যিই আমার জানা ছিল না।)

"লেট দেয়ার বি লাইট"-এ আমার চরিত্রে শেষ দিনের কাজ ছিল;—মুক্ত আকাশের নীচে প্রায় আধ মাইল জোড়া সেটে—চারিদিকে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়ায় আকাশ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে—তার ভেতর থেকে অসংখ্য মানুষ—বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী ক্লান্ত পায়ে হেঁটে আসছে—আশ্রয়ের আশায় কারুর কাঁধে তাঁর প্রিয় কুকুরের বাচ্চাটি, কারুর হাতে খাঁচায় পোষা তার সবচেয়ে আদরের পাখিগুলি, কারুর কোলে পিঠে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। এরা কোন্ দেশের, কোন্ জাতের, কোন্ ধর্মের বোঝবার উপায় নেই,—নানান জাতের, নানান চেহারার, বিভিন্ন দেশের পোশাক-পরা জনস্রোত—!

মা (আমি যে চরিত্রটিতে অভিনয় করেছি) প্রত্যেকের কাছে আকুল ভাবে কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করছে, "আমার ছেলেকে দেখেছ

তোমরা, তার নাম তপু—সুন্দর চেহারা—একগোছা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল,—দেখেছ? দেখেছ তোমরা আমার তপুকে?" কেউ বলতে পারলো না তার তপুর খবর। সকলেই চলে গেল।

সেই পরিত্যক্ত অগ্নিদগ্ধ বিশাল প্রান্তরে মা একলা দাঁড়িয়ে—দূর-দিগন্তে ভাষাহীন চোখে!

শেষ দিনের কাজ সেরে সকলের কাছে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে এলাম। সকলে জানালেন অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাঁদেরও সকলের মুখে হাসি অমলিন।

আমি তাঁদের শেষ অভিবাদন জানালাম "খোদা হাফেজ!"

আজ দূরে বসে ভাবছি সেই ক'দিনের মুহূর্তগুলো, সেই শিল্প-সৃষ্টির উন্মাদনায় প্রমত্ত প্রাণগুলি আজ কোথায়, কেমন আছেন, কি তাঁরা ভাবছেন। তাঁরা কি আগের মতনই প্রাণোচ্ছল নির্ভয় হাসিতে [illegible] হয়ে উঠতে পারছেন?

দূর থেকে তাঁদের সর্বাঙ্গীণ নিরাপত্তার জন্যে অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে আমার ক্ষুদ্র প্রাণের আকুল প্রার্থনা জানাই অসীম করুণাময় ভগবানের কাছে। তাঁদের জীবনে [illegible]

বোম্বাই বিচিত্রা

সিলেটের রমাকান্ত

বছর বারোক আগে [illegible] রমাকান্ত সিলেট থেকে পালিয়ে এসেছিল। সিনেমা লাইনে কিছু একটা করার সখ। কলকাতায় [illegible] কিন্তু সেখানে কোনো সুবিধে হয়নি। [illegible] সিলেটের রমাকান্ত [illegible] রমাকান্তের [illegible] বছর [illegible] পেরোলো। রমাকান্ত যে আসলে সিলেটের লোক, মানে পূর্ব পাকিস্তানের [illegible] আর কেউই জানতো না।

সিলেটের রমাকান্ত [illegible] তাই তার চালচলন বেশ চালু। [illegible] প্রায় ১৫ হাইকিং করে রমাকান্ত চলে এল বম্বেতে। সিনেমা লাইনে কিছু একটা করার সখ' সেটাতে খুব একটা সময় লাগলো না রমাকান্তের। হিন্দুস্থান পাকিস্তান সীমানার চৌকিদারদের হাত এড়াতে যার সময় লাগেনি সে স্টুডিওর গেটকিপারকে বশে আনল অনায়াসে। তারপর 'কখনো একস্ট্রা', 'কখনো পার্ট টাইম অফিস বয়,' 'কখনো স্পট বয়' হয়ে কাজ করতে লাগলো।

সিনেমা লাইনে কিছু একটা করার সখ পূর্ণ হলেই, বিশেষ কিছু করার সখ জন্মায়। রমাকান্তেরও তাই হল। তাই স্টুডিও চত্বরের রমাকান্ত বছর খানেক হল এক উঠতি নায়কের বাড়িতে কাজ নিয়েছে।

রমাকান্ত তার হিরোর সঙ্গে আউটডোর শুটিং-এ গিয়েছিল মহাবালেশ্বর। ফিরেছে পরশু কাল। এ কে তো ফিল্ম লাইনের লোকেদের বাড়িতে দৈনিক পত্র-পত্রিকা পড়বার তেমন একটা রেওয়াজ নেই, তার উপর যদি আউটডোর শুটিং হয় তাহলে তো কথাই নেই। পরশু কাল বোম্বাই-এ ফিরেই বাংলা দেশের সব খবর পেয়ে গেছে রমাকান্ত। তারপরই ছুটে এসেছে আমার কাছে। ছুটে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। কারণ আমার ঘরে তখন দু'একজন অতিথি। তার মধ্যে [illegible] একজনের বুকে একটা কালো ব্যাজ, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা 'জয় বাংলা'। সেই ব্যাজটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো রমাকান্ত। আমি [illegible] সান্ত্বনা দিলুম। [illegible] রমাকান্তর [illegible] সবাই সিলেটে। এবং [illegible] কাগজের সব খবর যদি সত্যি হয় তাহলে হয়তো রমাকান্ত আজ একেবারে [illegible]। এক সাথে এতগুলো কথা মনে হওয়ায় মুখে কি বলব বুঝতে পারছি না, [illegible] খুললো, [illegible] একটা হাত [illegible] থেকে, "আমাকে এক্ষুনি একটা [illegible] টিকিট করে দিন [illegible], আমি এক্ষুনি দেশে ফিরে যাবো।" একটু থতমত হয়ে আমি বললাম, "[illegible] এখন [illegible] কি করবে?" [illegible] রমাকান্ত। [illegible] রমাকান্ত। আজ সকালে উঠতি হিরোর বাড়ি থেকে খবর এলো "রমাকান্ত পালিয়েছে"।

—সরলা শর্মা

মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে চিৎপুর

চিৎপুরকে নিরেট মনে হলেও, স্বাধীন বাংলা দেশ-এর ব্যাপারে সাহায্য হাত-পা গুটিয়ে মুখ বুজে বসে নেই। পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা চলছে, ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করার চেষ্টাও করছেন কেউ কেউ—শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা সফল হবে কিনা জানি না, তবে যাত্রাদলেরা আলাদা আলাদাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। নাট্যভারতী যাত্রাদলের মালিক কিষাণবাবু জানালেন, তাঁর দল এ-জন্য যে সাহায্যাভিনয় করছেন রবীন্দ্র সদনে, তাতে দলের শিল্পীরা একদিনের বেতন নেবেন না বলে স্থির হয়েছে। লোকনাট্য দলের নীলমণিবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন আসন্ন মরশুমে তাঁর দল 'জয় বাংলা' পালাভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ মুজিবুরের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে যে বাংলা দেশের মুক্তি-সংগ্রাম তার প্রতিচিত্র আসরে আসরে ও'রা অভিনয় করবেন। কে যেন বলছিল, প্রভাস অপেরাও নাকি 'আমি মুজিব বলছি' পালা প্রযোজনায় এগোচ্ছেন। আসলে চিৎপুরের সঙ্গে পূব বাংলার সম্পর্ক বহু যুগের। সে সম্পর্ক অনেক বেশী আত্মিক বলেই টানটা এত।

যাত্রাগানের পীঠস্থান হিসাবে আজ চিৎপুর চিহ্নিত হলেও, যাত্রাগানের আদি তীর্থ পূব বাংলা। ইতিহাস বলে বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং বাংলার উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও ভিন্ন ভিন্ন দেবকাহিনীকে আশ্রয় করে যাত্রাগানের উদ্ভব। এর মধ্যে রয়েছে শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসা তথা ভাসানযাত্রা এবং কৃষ্ণযাত্রা।

যাত্রা মূলতঃ গ্রামীন শিল্প হলেও, তার প্রচার ও প্রসার এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে শহরমুখী হতে চাইল। শেষে রাজধানীমুখী। এমনি করে গ্রামের শিল্প চিৎপুরে এসে গদীর পত্তন করলেও, দেশ বিভাগের আগ পর্যন্ত তার প্রধান রুজি রোজগারের স্থান ছিল পূব বাংলা। পশ্চিমবঙ্গে একেবারে যাত্রাগান হতো না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ চিৎপুরী দলই মরশুমেই দলবেঁধে রওনা হত পূব বাংলার দিকে। জমিদারপ্রধান জায়গা, সাধনার অভাব ছিল না। তা ছাড়া ছিল বারো মাসে তের পার্বণ উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপে মণ্ডপে বারোয়ারী গানের আসর। কে না জানে গত ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পূব-বাংলার অগণন হিন্দু-মুসলমান দর্শকই ছিল যাত্রাগানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

দুই বাংলা যখন এক ছিল, তখনও সংস্কৃতির এই একটি শাখাই দুই প্রান্তের মধ্যে স্থায়ী সেতু রচনার কাজ চালিয়ে এসেছে। নট্ট কোম্পানী বরিশাল থেকে এসে গান গেয়েছে রাঢ় অঞ্চলে। আবার মথুর সা-র দল থেকে শুরু করে সেকালের সব কটি কলকাতার দলকে ছুটতে হয়েছে পূব বাংলার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। কারণ তখন প্রমোদ-উপকরণ হিসাবে একমাত্র যাত্রাই ছিল প্রধান। সুতরাং 'বাংলা দেশ' স্বাধীন হোক, স্বয়ংভর হোক এই প্রার্থনা চিৎপুরই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি করে করছে।

—সূত্রধার

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতি এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ তিন সপ্তাহ যাবৎ চলছে। ইতোমধ্যে শেখ মুজিবরের মুক্তিবাহিনী এখন **বাংলা দেশের উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলকে** হানাদারমুক্ত **করেছে বলে** এই বাহিনীর পক্ষ **থেকে দাবি করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলে** বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুক্তিফৌজ পাক **হানাদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান** চালিয়ে যাচ্ছে। পাক হানাদাররা বিমানে **জাহাজে আক্রমণ চালাচ্ছে** গ্রামে-শহরে। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট এলাকার বাইরেও **সংঘর্ষ বিস্তৃতি লাভ করেছে।** যেসব এলাকায় মুক্তিবাহিনী পাক সেনাদের সঙ্গে এখন **সংঘর্ষে লিপ্ত তা হল : চট্টগ্রামের কক্সবাজার,** কালুরঘাট, হাটবাজারি, কুমিল্লার জঙ্গলিয়া **রেল স্টেশন আর বিবিবাজার, শ্রীহট্টের** শহরতলি। কর্ণফুলি নদীর দুই পাড়েও **অবিরাম গোলাগুলি চলছে।** শহর-ক্যানটনমেনটে অবরুদ্ধ। পাক সৈন্য মরিয়া হয়ে **বাইরে বেরুবার পথ খুঁজছে।** রবিবার সৈন্য, **অস্ত্রশস্ত্র** এবং রসদ বোঝাই দুটো পাক **জাহাজ ইসলামাবাদ থেকে এসে চট্টগ্রামে** নোঙর ফেলেছে। এ ছাড়া হজযাত্রীদের নাম **করে সৈন্যবাহী আর একটি জাহাজ** এসে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে। পাক সৈন্যদের এই **শক্তি বৃদ্ধিতে ওরা নতুন জায়গায়** আক্রমণ শুরু করেছে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া **হচ্ছে। অসংখ্য গ্রামবাসী** নিহত হয়েছে। ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে **কুমিল্লার বিবিবাজার গ্রামের কাছাকাছি** পাক সৈন্য পজিশন নিয়েছে। মুজিবর রহমানের **এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে** হিন্দুরা আছেন এই বিশ্বাসে বাংলা দেশের বিভিন্ন হিন্দু এলাকাগুলিতে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে পাক-বাহিনী। প্রচণ্ড লড়াই **চলছে বাংলার বিভিন্ন এলাকায়।** মুক্তিফৌজের অভিযান অব্যাহত।

দেশী সংবাদ

৫ এপ্রিল—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস **চ্যানসেলার, জহরলাল নেহরু** বিশ্ববিদ্যালয়ের **ভাইস চ্যানসেলার এবং অনেক** বিশিষ্ট **নাট্যকারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি** দল **আজ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে অবিলম্বে** বাংলা **দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং** বাংলা দেশের **জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে সক্রিয়** সাহায্য **দেওয়ার দাবি জানান।**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭১ সালের **প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় এবং** বি এ, বি এস-সি, **বি কম পারট ওয়ান পরীক্ষা স্থগিত** ঘোষণা **করা হয়েছে।** প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা **এপরিল মাসে এবং পারট ওয়ান** পরীক্ষা মে **মাসে হওয়ার কথা ছিল।** বিশ্ববিদ্যালয়ের **কনট্রোলার জানান, ওইসব পরীক্ষার** তারিখ পরে **বিজ্ঞাপিত করা হবে।**

৬ এপরিল—আজ সকালে **কলকাতা** হাই-**কোরটের** বিচারপতি **শ্রীকিরণলাল** রায় **কুমারটুলি অঞ্চলে তাঁর বাড়ির** সামনে গাড়ির **মধ্যে আততায়ীর গুলিতে আহত হন।** ওই **গুলি তাঁর চোখের উপর** ঘেঁষে মাথার মধ্যে **ঢুকে আটকে যায়। শ্রীরায়কে** মেডিকেল কলেজ **হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচার** করে **গুলি বার করার চেষ্টা চলছে।**

পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রথম দিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে :— সবার আগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন। সি আর পি এবং মিলিটারি দুই-ই মোতায়েন থাকছে। প্রয়োজন হলে পুলিস প্রশাসনে প্রতিটি স্তরে বড় রকমের রদবদল করা হবে।

৭ এপরিল—গতকাল নয়াদিল্লিতে চীনা **রাষ্ট্রদূত** পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পূর্ববাংলায় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের **জন্য** ভারতের বিরুদ্ধে দোষারোপ **করেছেন। ভারত চীনের এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেন এবং চীনের প্রতিবাদ** লিপি গ্রহণে **অসম্মত হন।** এই প্রথম একটি **চীনা মিশন সরকারীভাবে এই মন্তব্য করলেন।**

৮ এপরিল—বুধবার বিকাল থেকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত গুলি ও ছুরির আঘাতে একজন স্ত্রীলোকসহ ৯ জন নিহত হন। আজ দমদমে শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ (৪২) তাঁর বাড়ির দরজায় পাইপগানের গুলিতে নিহত হন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে গুলি ও ছুরিকাঘাতে একজন পুলিস কনসটেবল সহ আরও ৮ জন নিহত হয়েছেন।

৯ এপরিল—পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বিমানগুলি ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করছে বলেই এই সতর্কীকরণ। পাকিস্তানী বিমানকে হটিয়ে দেবার অথবা প্রয়োজন হলে ওইসব বিমানকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ মহাজাতি সদনে বাংলাদেশের সমর্থনে এক **জনসভায়** পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সামাজিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে; এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সে কথা আমরা বলেছি।

১০ এপরিল—এ বছর আনন্দ পুরস্কার পেলেন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসত্যজিৎ রায়। আনন্দ পুরস্কার সমিতির বিচারে ১৩৭৭ সালের প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীঘোষ ও সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার পান শ্রীরায়। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড ও দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রতি বছর আনন্দ পুরস্কার দেওয়া হয়।

১১ এপরিল—বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে আজ শহীদ মিনারের সামনে এক জন-সভায় অবিলম্বে স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবের সমর্থন জানান।

ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি আজ পশ্চিমবঙ্গ-বাংলা দেশ সীমান্তবর্তী পেটরাপোল পরিদর্শন করে এসে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াকে অবিলম্বে পাকিস্তানে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ এপরিল—বাংলায় একটার পর একটা জয়ের পালা শুরু হয়েছে। রংপুর শহর অধিকৃত, কুমিল্লা শহর মুক্ত, শ্রীহট্টের বিমান ক্ষেত্রও মুক্তিফৌজের করায়ত্ত। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুরে মুজিব সেনারাই জয়জয়কার। সংগ্রামী সেনারা এইদিন এই প্রথম সব রণাঙ্গন মিলিয়ে একটি যুক্ত কমান্ড গড়ে তোলার পথে পা বাড়ান।

৬ এপরিল—সারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পশ্চিমী সৈন্যবাহিনীর কোন চিহ্ন নেই। সবত্র মুক্তিবাহিনীর অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। লড়াই চলছে কয়েকটি শহরের দখল নিয়ে। আজ শ্রীহট্ট শহর মুক্ত : পিন্ডির বিমানগুলো ক্রমাগত এখানে বোমা ফেলে চলেছিল—এবার শ্রীহট্ট মুক্ত।

৭ এপরিল—এটনা আগ্নেয় গিরিতে নতুন একগারটি নতুন ফাটল থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসছে এবং পাথরের টুকরা কয়েক শ' ফিট পর্যন্ত উপরে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। গত দু'শ বছরের মধ্যে এরূপ উদ্গীরণ আর দেখা যায়নি।

৮ এপরিল—ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় জাহাজী সংস্থার ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ডঃ জয়ন্ত ধর্মতেজাকে বহিষ্কার করার আদেশে স্বাক্ষর করেন। দুই কোটি টাকারও বেশী অর্থ জালিয়াতির অভিযোগে ডঃ তেজার (৪৯) বিরুদ্ধে ভারতে মামলা চলছে।

৯ এপরিল—বাংলাদেশের বিপ্লবী বাহিনীর কর্তৃপক্ষ আজ জানান 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবরের বড় ছেলে শেখ কামাল নিহত হননি। তিনি নিরাপদেই আছেন। শেখ কামাল নিহত হয়েছেন বলে যে খবর বেরিয়েছিল বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ আজ তার সত্যতা অস্বীকার করেন।

১০ এপরিল—গতকাল এক বেতার ভাষণে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিরিমাভো বন্দরনায়েক বলেছেন, ক্ষমতা দখলের জন্য বিভিন্ন থানার উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে বহু সন্ত্রাসবাদী প্রাণ হারিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, তাঁর সরকার সর্বত্র সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করবেন, তাদের কোন মতেই মাথা তুলতে দেবেন না।

১১ এপরিল—আজ সারা সিংহল জুড়ে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সরকারী বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ অব্যাহত আছে। দক্ষিণ, উত্তর ও মধ্য প্রশাসনিক অঞ্চলগুলিতে আবার ২৮ ঘণ্টার জন্য কারফ্যু জারি করা হয়েছে। সরকারের দাবি সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের পশ্চাদ্ধাবন করছে।

নতুন
প্রেস্টিজ
ভ্যাকুয়াম টাম্‌বলার
ছোট্ট ফ্লাস্ক
অনেক গুণ!
বা চা, বরফ ঠাণ্ডা বীয়ার বা অন্য পানীয়
টাম্বলার থেকে সোজা ঢেলে খান।
টেবিলে, আপনার বিছানার পাশের টিপয়ে
এবং স্কুলের বাচ্চাদের জন্যে একটি আদর্শ 'মিনি'
ফ্লাস্ক। পছন্দসই হরেক রকম রঙে পাবেন 'প্রেস্টিজ'
ফ্লাস্ক।
উপহারের ক্ষেত্রে অন্য যেকোন ফ্লাস্কের তুলনায় সুনিশ্চিতভাবে সেরা।
হ্যামার মাস্টার
AITARS-HM 752 BN

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পরীক্ষা সমস্যা		১১৮৯
ব্যঙ্গচিত্র—		১১৯০
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		১১৯১
দৃশ্যপট	—শ্রীনারায়ণ গুপ্ত	১১৯২
বৈদেশিকী	—দেবরাজ	১১৯৪
পঞ্চতন্ত্র	—সৈয়দ মুজতবা আলী	১১৯৫
পুনরায় কিছু একটা হোক (কবিতা)	—শ্রীদীপ্তি ভট্টাচার্য	১১৯৮
সিঁড়ির নীচে (কবিতা)	—শ্রীসুভাষ ঘোষাল	১১৯৮
ভিক্ষার ঝুলি গভীর (কবিতা)	—শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়	১১৯৮

ভিকো **বজ্রদন্তী**
ইকোনমি সাইজ
টুথ পেষ্ট
কিনিলে

এক জার

ভিকো **টারমেরিক**
ভ্যানিসিং ক্রিম
বিনামূল্যে পাইবেন

সুবর্ণ সুযোগ

ভিকো বজ্রদন্তী
আয়ুর্বেদিক টুথপেষ্ট
গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরী। নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতেরক্ষয়, পায়োরিয়া দাঁত থেকে রক্ত ও পুঁজ ক্ষরণ, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

ভিকো টারমেরিক
চন্দনসুগন্ধী ভ্যানিসিং ক্রিম
দেহকান্তি উজ্জ্বল করে, চর্মকে কমনীয় ও কান্তিমুক্ত করে, কামানোর পর ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ, ছোট খাটো কাটা ছেঁড়া সারায়।

যতদিন ষ্টকে মাল মজুত আছে ততদিন পর্যন্ত এই উপহার পাইবেন

ভিকো ল্যাবোরেটরিজ
বোম্বাই—১৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
"কোন দিক দিয়ে এগিয়ে যাব" (কবিতা)	—শ্রীবুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়	... ১১৯৮
ভারতের অর্থনীতি	—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	... ১১৯৯
প্রহরা	—শ্রীঅভ্র রায়	... ১২০১
আমিও সৈনিক হয়েছিলাম	—শ্রীশুভ্রাংশু গুপ্ত	... ১২১১
ঘরে-বাইরে	—শ্রীমতী	... ১২১৫
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা	—ফাদার দ্যতিয়েন	... ১২১৭
রঙ ও শ্রীমতী	—শ্রীঅন্নদাশংকর রায়	... ১২২৩
বিশ্ববিজ্ঞান	—শ্রীসমরজিৎ কর	... ১২৩১
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা	—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	... ১২৩৯
গানের আসর	—শার্ঙ্গদেব	... ১২৪৭

মাথায় খুস্‌কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ায় খুস্‌কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় 'ক্লিনিক' প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্‌কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্‌কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্‌কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি-প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

'ক্লিনিক' কিভাবে কাজ করে

নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুনাশক ময়লাটি খুস্‌কি সাফ করে। একবার ব্যবহারের পর আবার শ্যাম্পু করা পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখে।

দ্বিতীয়বারের ফেনা এক মিনিট চুলে থাকতে দিন। এর ফলে 'ক্লিনিকের' উপাদান ভেতরে গিয়ে ভালো কাজ করে।

ক্লিনিক এই মিশ্রণ চুলের গোড়ায় গিয়ে খুস্‌কি দূর করে। চুল ক'রে তোলে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর।

নিয়মিতভাবে 'ক্লিনিক' ব্যবহার ক'রে যান—সপ্তাহে অন্তত একদিন—খুস্‌কি প্রতিরোধের শক্তি বাড়বে।

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
মুক্তির সংগ্রামে বাংলা দেশ—কল্হন	...	১২৫১
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	১২৬১
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	...	১২৬৯
পুস্তক পরিচয়—	...	১২৭৩
খেলার মাঠে—একলব্য	...	১২৭৫
হকি খেলার আইনকানুন—মুকুল	...	১২৭৭
রঙ্গজগৎ—	...	১২৭৯
অরণ্যদেব—	...	১২৮৬
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	১২৮৮

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মামণির গায়ের
গন্ধ কেমন মিষ্টি!
মামণিও নিশ্চয়ই
জনসন্স* বেবী!
Johnson's
baby
powder
সবাই পারেন জনসন্স বেবী হ'তে
(এমনকি মামণিও)
*ট্রেডমার্ক
জনসন অ্যাণ্ড জনসন*

ষোড়শ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

৬৫,৭০০ কপি
এ যাবৎ মুদ্রিত

ভারত প্রেমকথা

সুবোধ ঘোষ

মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য তার অজস্র প্রেমকাহিনী। সে প্রেমকাহিনী সকল মনের সর্বকালের আনন্দ। সে প্রেমের রূপ বিচিত্র সুন্দর ও সুমহিম। সে প্রেম মানবিক, তবু স্বগীয় : বেদনার্দ্র, তবু আনন্দ-ময় ; বিচ্ছেদে মলিন হয়েও মিলনে মধুর। সর্বকালের এই প্রেমকাহিনীগুলিকে সুবোধবাবু এক নূতনতর আঙ্গিকে এ-কালের পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর ভাষা ঐশ্বর্যময়, বর্ণনা কাব্যধর্মী, বিন্যাসও অভিনব। 'ভারত প্রেমকথা' প্রেম ও প্রণয়ের সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। আঙ্গিকের নূতনত্বে, কাহিনীর মনোহারিতায় ও ভাষার গৌরবে এক ক্লাসিক সৃষ্টির নিদর্শন।

॥ দাম ৮·০০ ॥

এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

বাসরদত্তা ৪·০০ বন উপবন ৪·০০ জিয়া ভরলি ৮·০০ বসন্ততিলক ৫·০০ শতকিয়া ৮.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৫
শনিবার ১০ বৈশাখ ১৩৭৮

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা
থেকে শ্রীঅশোককুমার সরকার
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
[illegible] [illegible]

*

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক ... ৩২·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ... ১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ... ৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(রেজিস্ট্রি মাশুলসহ)

বার্ষিক সডাক ... ৩৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ... ১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ... ৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক ... ৫৬·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ... ২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ... ১৫·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ... ৪৪·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ... ২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ... ১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক ... ৮৫·০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ... ৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক ... ২১·০০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৫ পয়সা

*

DESH

Saturday 24 April, 1971

পরীক্ষা সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনভার নতুন মন্ত্রিসভার হাতে এসেছে মাত্র কয়েক দিন আগে। এই রাজ্যের সমস্যা অনেক, তার জটিলতাও কম নয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিরতা আনার জন্যে মন্ত্রিসভার মাথা ঘামাবার অনেক কিছু থাকলেও অন্য একটি ব্যাপারে বিশেষভাবে নজর দেওয়া কর্তব্য, আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি হলেই ভাল। ব্যাপারটি হল, এই রাজ্যের শিক্ষা-ব্যবস্থা। আমরা কেউই আজ অস্বীকার করতে পারি না, এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। রাজনৈতিক ডামাডোলে, ছাত্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভে, সরকারী বিমূঢ়তায় গত দু তিন বছর কিংবা তার বেশী সময়ে যা ঘটেছে তাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হয়েছে তা অবর্ণনীয়। এই ক্ষতির জের টানার দুর্বুদ্ধি যেন আর না হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রের আবহাওয়ার উন্নতিসাধনের ইচ্ছা এবং নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার কথা ইতিপূর্বেই সরকারের মুখে শোনা গেছে। নতুন শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক-ভাবে তাঁর কাজ নাকি শুরুও করেছেন। অবস্থার উন্নতি কতটা কী হচ্ছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে নির্বাচনের পর স্কুল-কলেজ কিছু কিছু খুলেছে নিয়মিতভাবে কোথাও কোথাও ছোটখাটো ঘটনাও ঘটছে এখনো, তবু পরিবেশ কিছুটা বদলেছে, এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে স্কুল-কলেজ বসছে। আশা করা যায়, ক্রমে একটা স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে আসবে।

এই প্রসঙ্গে যা আমাদের বিশেষভাবে বলা উচিত, তা হল পরীক্ষা। মার্চ মাস থেকে জুনের মধ্যে পর পর বেশ কিছু পরীক্ষা থাকে; উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ফাইনাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সের পরীক্ষা ইত্যাদি। এবারে এখন পর্যন্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোনো পরীক্ষাই হয়নি। কবে হবে তাও সঠিক করে বলা যায় না। শোনা যাচ্ছে মে মাসের শেষ দিন থেকে হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষারও একই দশা, পার্ট ওয়ান কিংবা পার্ট টু কোনো পরীক্ষাই হয়নি। কবে হবে তাও কেউ জানে না, হয়ত জুনের শেষে কিংবা জুলাই মাসে।

পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে গড়িমসি, কোনো না কোনো অজুহাতে তাকে পিছিয়ে দেওয়া আমাদের এখানে একেবারে নতুন কিছু নয়; অনেক দিন থেকেই এর রেওয়াজ চলছে; তবু এবারের মতন বিলম্ব আর কী হয়েছে? কে জানে।

এই বিলম্বের দরুণ যেসব ক্ষতি ছাত্রছাত্রীদের স্বীকার করতে হবে তা কিন্তু সামান্য নয়। বিভিন্ন পাঠক্রমের যে ব্যবস্থা চালু আছে তাও বানচাল হয়ে যেতে পারে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আওতায় যে দুটি পরীক্ষা হয় তা না হওয়ার জন্যে কার ওপর দোষারোপ করা যায়? কর্তৃপক্ষ না কর্মচারীদের ওপর? উভয় পক্ষই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, দোষ তাঁদের নয়। আমরা কারও ওপর দোষারোপ করতে চাই না। কিন্তু যে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হয়েছে তাদের অবস্থা কী? তারা কেউ কেউ বিরক্ত, কেউ কেউ ক্ষুব্ধ, কারও কারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। মানসিক স্বস্তি কিংবা শান্তি বলে বেচারীদের কিছু নেই। খুবই আশ্চর্য যে, পর্ষদের বিরোধ সময় বুঝে বেধে উঠেছে।

যদি মে মাসের শেষ দিন থেকে এই সব পরীক্ষা শুরু হয়, এবং জুন মাসের শেষ পর্যন্ত চলে তবে পরীক্ষার্থীদের ফল বেরুবে কবে? জুলাই মাসে? এক মাসে কী সেটা সম্ভব? পরীক্ষার খাতাপত্র কেমন করে এত তাড়াতাড়ি দেখা হবে? পাইকারী হারে খাতা দেখার পরিণাম যে কী হয় তা নতুন করে বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। ছাত্রছাত্রীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন ব্যবস্থা আগে ছিল না। এখন বাস্তবিকপক্ষে এটা দায় সারার কাজ হয়েছে। পর্ষদের সৃষ্টি হয়েছিল যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে তার কোনো কিছুই পূরণ হল না। শুধু পরীক্ষা পরিচালনা তো নয়, আরও বড় উদ্দেশ্য ছিল—কিন্তু পর্ষদের যা হাল হয়েছে তাতে আমরা আর কিছু আশা করার কথা ভাবতে পারি না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ
কংগ্রেস
বিরোধী দল
"সমাজতন্ত্রের কার্যসূচী নিয়ে
অগ্রসর হবার পথ এখন পরিষ্কার।"
—শ্রীমতী গান্ধী

বাঙলা দেশ

পূর্ববঙ্গের নতুন নাম এখন আনুষ্ঠানিকভাবেই বাঙলা দেশ। প্রথমে ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তারপর ওঁরা নিজেরাই বলতেন পূর্ববঙ্গ। এখন নাম দিলেন বাঙলা দেশ। সেদিন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকুঞ্জে এই নতুন বাঙলা দেশের জন্ম হল। বৈদ্যনাথতলারও নতুন নামকরণ হয়েছে—বাঙলা দেশের জন্মলগ্ন থেকে বৈদ্যনাথতলা মুজিবনগর। নতুন বাঙলা দেশের অবিসংবাদী নেতা মুজিবর রহমানের নাম অনুসারে মুজিবনগর।

বাঙলা দেশ নামটা ওঁরা অবশ্য ঘরোয়াভাবে আগে থেকেই দিয়েছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা বলতে শুরু করেছেন বাঙলা দেশ। সেদিন ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর পরামর্শদাতারা নব নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন সেদিন থেকেই পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন—সেদিন থেকেই পূর্ববঙ্গ বাঙলা দেশ।

প্রথম প্রথম এই "বাঙলা দেশ" "বাঙলা দেশ" শুনে আমার একটু খারাপ লাগত। মনে হত, বেশ মজা করলেন তো ওঁরা, পূর্ববঙ্গ বাঙলাদেশ হয়ে গেল, পূর্ববঙ্গকে ওঁরা বাঙলাদেশ নাম ঘোষণা করলেন আর আমরা থেকে গেলাম পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বের দরবারে ওঁরাই শুধু বাঙালী, আর আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী! স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, এই কথাটা ভেবে আমার মনটা বেশ খারাপই হয়েছিল। ওদের অর্থাৎ ওপারের লোকের বিরুদ্ধে মনে মনে একটু

রাগই হয়েছিল।

কিন্তু এই লড়াইর শুরু থেকে যত বাঙলা দেশে গিয়েছি, যত ওদেশের লোকের সঙ্গে কথা বলেছি ততই আমার ভুল ভেঙ্গেছে। ওদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, ওদেশের ছোটবড় বেশ কয়েকটা শহরে গিয়েছি, ওদেশের ছোটবড় নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি এবং বার বার নিজের কাছে নিজেকেই দোষী বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, না আমি ভুল করেছিলাম, না আমি ওঁদের ভুল বুঝেছিলাম—ওঁরাই সত্যিকারের বাঙালী। বাঙলাদেশ নামের সত্যিকারের দাবিদার ওঁরাই হতে পারেন, আমরা পারি না।

আমিও ওই বাঙলারই ছেলে। ১৯৪৮ সালে এদিকে চলে এসেছি। সেই থেকেই এখানে। ওপারে যাওয়ার আর কোনও সুযোগ ঘটে নি। ওই বাঙলায় গত তেইশ বছরে কী বিরাট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তা দেখার এবং বোঝার সুযোগই আমার এর আগে কখনও হয়নি। শুধু লোক মুখে শুনেছি এবং কাগজে-পত্রে কিছুটা কিছুটা পড়েছি। ওঁদের ভাষা আন্দোলনের কথা আপনিও শুনেছেন আমিও শুনেছি। বাঙলা ভাষার জন্য যে ওপারের ছেলেরা প্রাণ দিয়েছেন সেটা বিশ্ববাসীও জানেন। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নানা কথা শুনে এবং পড়েও আমি এর আগে বুঝতে পারিনি যে ওঁরা কতটা বাঙালী হয়েছেন, নিজেদের বাঙালী বলার অধিকার কতটা অর্জন করেছেন।

পাকিস্তানের গোড়ায় কিন্তু পূর্ববঙ্গে এ জিনিস ছিল না। দেশ ভাগ হওয়ার আগেও পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য ছিল। ভাষাগত পার্থক্য। বিশেষ করে উচ্চারণগত। কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগাযোগ ছিল না, ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি আঞ্চলিক। লীগ রাজনীতি যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখন কিন্তু ভাষার মধ্যেও কিছুটা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব এল। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উগ্র লীগ পন্থীরা উর্দুর দিকে এগোলেন। তাঁরা অনেকেই নতুন করে উর্দু ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ল। উর্দুর উপর জোর দিয়ে সেখানে শুরু হল।

তারপর যখন দেশ ভাগ হল, যখন পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান হল, তখন এই প্রবণতাটা আরও বাড়ল। বাঙলা ভাষার মধ্যে উর্দু শব্দের ব্যবহার বাড়ল। নতুন নতুন উর্দু কথা শেখার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এ জিনিস আমিও পূর্ব পাকিস্তানে দেখেছি।

কিন্তু তারপর থেকেই হাওয়া পাল্টাতে শুরু করল। জিন্না সাহেব ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু—সেই হিসাবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষাও হবে উর্দু। কিন্তু ছাত্ররা তার প্রতিবাদ জানালেন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন শেখ মুজিবর। সেই থেকেই শুরু হল নতুন যুগ।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তখনও পূর্ববঙ্গের

নিজের জোরে

বাংলা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যেতে হয়েছে অজ্ঞাতবাসে। তাতে কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা কেউ দমেননি, তাঁর স্বদেশবাসীরাও নন। লড়াই তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন সমানে যদিও সে লড়াই পুরোপুরি অসমান। ইয়াহিয়া খাঁর হাতে আছে অজস্র অস্ত্রশস্ত্র—তার কিছু দুনিয়ার হাটে কেনা, কিছু বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া। বিলেত থেকে শুধু অস্ত্রশস্ত্র তাঁর আসেনি, এসেছে আমেরিকা থেকে, রুশিয়া থেকে আবার চীন থেকেও। তাঁর পল্টন রীতিমত যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষা পেয়েছে। তাঁর হাওয়াই জাহাজ আছে অনেক, যুদ্ধের জাহাজ আর ডুবো জাহাজও আছে। তবুও কিন্তু ভেতো বাঙালীদের শিরদাঁড়া সোজাই আছে, বেঁকেও যায়নি, ভেঙেও পড়েনি। আকাশ থেকে আগুন ঝরছে, সমুদ্রের তীর থেকেও, ডাঙায় তো সাক্ষাৎ যম ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতেও তারা হার মানছে না, জিততে পারছে না ইয়াহিয়া খাঁর দুর্ধর্ষ ফৌজ। হার তাঁর লড়াইয়ে কেবল হয়নি হয়েছে রাজনীতিতেও। মুজিবুর রহমান কেবল স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, সরকারও গড়েছেন ১২ এপ্রিল, সে সরকার রীতিমত শপথও নিয়েছেন ১৭ এপ্রিল, ইয়াহিয়া খাঁ চাননি সে অনুষ্ঠান হতে দেয়া হয়।

সেদিন কুষ্টিয়া জেলার বৈদ্যনাথতলায় যে অনুষ্ঠান হয়েছে তা মোটেই নাটকে ঘটে নয়। তার গুরুত্ব অসামান্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী যে মানুষ হয়ে উঠেছে ও অনুষ্ঠান তারই প্রমাণ। বৈদ্যনাথতলা এখন তার সাবেক নাম পালটে হয়েছে মুজিবনগর। ইতিহাসে তার ওই নামই অক্ষয় হয়ে থাকবে। চিরকাল লোকে মনে রাখবে বাঙালীর নতুন করে বাঁচবার সাধ ফলবার রূপ পেয়েছে ওখানকার আম-বাগানে। ১৭৫৭-র হিসেব বুঝি মিটল ১৯৭১-এ। বাংলা দেশের নয়া জমানার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সেদিনের অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেননি। তাঁর হয়ে কাজ চালিয়েছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁকে ঘিরে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ আর অন্য তিনজন মন্ত্রী—খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপটেন মনসুর আলি ও কামরুজ্জামান। ফৌজী প্রধান কর্নেল মহম্মদ উসমানি—যাঁকে মন্ত্রীদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে—তিনিও হাজির ছিলেন অনুষ্ঠানে। একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়বার জন্যে আনুষ্ঠানিক-ভাবে যা কিছু করবার দরকার সে সবই করা হয়েছে সেদিন—লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, দিব্য

দেবরাজ

দিনের আলোয় দুনিয়ার খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের চোখের সামনে।

প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন শপথ নেওয়ার অনুষ্ঠানে সারা দুনিয়ার কাছে তুলে ধরেছেন ইয়াহিয়া খাঁর বর্বর অত্যাচারের কাহিনী, আবেদন জানিয়েছেন স্বীকৃতির জন্যে। তা না পাওয়া গেলেও তাঁরা হতাশায় ভেঙে পড়বেন না, লড়াই চালিয়ে যাবেন যতদিন না ফয়শালা হয়। দরকার হলে বিশ বছর লড়াই করতেও তাঁরা তৈরি এ কথা জানিয়েছেন সেনাপতি উসমানি। ওটা নিছক বাতেকা বাত নয়—জান কবুল করে তাঁরা লড়ছেন, লড়েও যাবেন যতদিন না অত্যাচারীর দল বাংলা দেশ ছেড়ে চলে যায়। এ সাফ কথা—এর মধ্যে কারচুপি নেই, আপসের কোনও প্রশ্ন নেই। দেশের স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্যে যত রক্ত দেওয়া দরকার তা দিতে তাঁরা প্রস্তুত। কেউ পাশে এসে না দাঁড়ালেও তাঁরা একলাই চলবেন এই তাঁদের পণ। তাঁদের মনের জোর কত তা আর কেউ না বুঝুক হাড়ে হাড়ে বুঝছেন ইয়াহিয়া খাঁ। কিন্তু এখন বোধ হয় পিছু হটবার সুযোগ আর তাঁর নেই। হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার খসালে আর ফেরানো যায় না। আর ইয়াহিয়া খাঁ ফিরতে চাইলেই বা তাঁকে ফিরতে দিচ্ছে কে? পশ্চিম পাকিস্তানের শকুনের দল তখন তো তাঁকে ছিঁড়ে খাবে।

তাই মনে হচ্ছে যুদ্ধ বাংলা দেশে চলছে—চলবে। তাকে থামানো কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। সে কাজ পারেন দুনিয়ার দিকপালেরা। ব্যাপারটা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে তাঁরা যদি চুপ করে বসে থাকেন তা হলে বাঙালীর খুনে তার দেশের মাটি লাল হয়ে যাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানকেই, নাজেহাল হয়ে তাকে সরে আসতে হবে বাংলা দেশ ছেড়ে। বাংলা দেশ তখন হয়ে উঠবে বিরাট এক কবর। তবে সে কবরের ওপর একদিন না একদিন ঝকমকে এক তাজমহল গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। খেটেখুটে বাঙালী চাষী সেখানে আবাদ করে আবার সোনা ফলাতে পারবে। ধান, পাট, চা সবই রক্তে ভেজা জমিতে বুনে ঘরে তুলবে তারা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান? এখনই লড়াইয়ে সে জেরবার হয়ে পড়েছে। যুদ্ধে অস্ফালন করলে কী হয়, বুক তার ধকে ধকে করছে। আরও দিনকতক লড়াই চালালে তার পেঁয়াজও যাবে পয়জারও হবে, বাংলা দেশ তার হাতছাড়া হয়ে যাবে, নিজের যা কিছু আছে তাও খুইয়ে তাকে দেউলে হতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের যারা দরদী বন্ধু তারা বন্ধুর কাজ করবে যদি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লড়াই বন্ধ করাতে পারে। সেখানকার যাঁরা প্রধান তাঁদের হয়তো রোখ চেপেছে, বাংলা দেশকে তাঁরা একবার দেখে নিতে চান। তা ছাড়া পাকিস্তান রেডিওর মিথ্যে প্রচারের শিকার হয়ে তাঁদের অনেকেই হয়তো প্রকৃত অবস্থাটা যে কী তা বুঝতে পারছেন না। তার ওপর তাঁদের বিভ্রান্ত করছে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো রাষ্ট্র যারা বাংলা দেশের মুক্তি আন্দোলনকে পাকিস্তানের ঘরোয়া ঝগড়া বলে সত্যকে বিকৃত করছে। এতে বাংলা দেশের যন্ত্রণা হয়তো আরও বাড়বে কিন্তু আখেরে পশ্চিম পাকিস্তানের হবে ঘোর লোকসান। যা বাংলা দেশে এখন ঘটছে তার কোনও নজির ইতিহাসে নেই, কাজেই অন্য দেশের নজির এখানে খাটাতে গেলে দারুণ ভুল হবে। এমনভাবে সংখ্যালঘুদের সেই নাছোড়বান্দা বুড়োর মতো সংখ্যালঘিষ্ঠের সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাঁধের ওপর কোথায়ও চেপে নেই। তাদের জোর করে ফেলে দেওয়া ছাড়া বাঁচার আর কোনও পথ ছিল সংখ্যাগুরু বাঙালীর?

আশ্চর্যের ব্যাপার, গণতন্ত্রের এই লাঞ্ছনা দেখেও যে সব দেশ গণতন্ত্রের ধ্বজা ওড়াচ্ছে তারা তাকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসছে না। এলে গণতন্ত্রের মর্যাদাও রক্ষা হতো, লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোকের প্রাণ বাঁচতো, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত। ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে ওকালতি করেছে একমাত্র প্রজাতন্ত্রী চীন। তাও খানিকটা দায়িত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। রুশিয়া, আমেরিকা তো বাংলা দেশে গণহত্যার নিন্দে করেছে অনেকটা খোলাখুলি। কিন্তু সে নির্মম হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থাই তো তারা করছে না। ভিয়েতনামে অভিযান চালাবার জন্যে রুশীরা প্রাণ খুলে গালাগাল দিচ্ছে আমেরিকাকে, আর চেকোস্লোভাকিয়াতে রুশীদের কাণ্ডকারখানার প্রচণ্ড নিন্দে করেছে আমেরিকা। কিন্তু ভিয়েতনামীদের বাঁচাতে রুশীরাও আসরে নামেনি, চেকোস্লোভাকিয়ায় ক্ষণ বসন্তকে ধরে রাখতে আমেরিকানরাও সেখানে পাড়ি দেয়নি। মুখের কথায় যা হয় তার বেশী করতে কী রুশিয়া, কী আমেরিকা নারাজ। বাংলা দেশেও তাই হবে বলে মনে হচ্ছে। নিজের জোরেই তাকে টিঁকে থাকতে হবে, পরের মুখের দিকে চাইলে চলবে না।

বিদেশে (১২)

"তুই হালুঙ্কে"

সোল্লাসে হুহুঙ্কারে রব ছাড়লো শ্রীমতী লীজেল। "তুই গুণ্ডা—"

আমরা যেরকম কোনো দুরন্ত ছোট বাচ্চাকে আদর করে "গুণ্ডা" বলে ডাকি "হালুঙ্কে" তাই। শব্দটা [illegible] ভাষাতে জর্মানে প্রবেশ লাভ করেছে। গত চল্লিশ বছর ধরে দেখা হলেই লীজেল এইভাবেই আমাকে "অভ্যর্থনা" জানিয়েছে।

তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে দু গালে দুটো চুমো খেল।

[illegible] পাঠককে পূর্বেই বলেছি, লীজেল ছিল [illegible] এবং [illegible] সঙ্গে [illegible] ফুর্তি করতে [illegible] হয়েছি। তবে এটা হল কি প্রকারে? [illegible] শরীরে [illegible] ধরলো। বুঝিয়ে বলছি। এই ষাট বছর বয়সে তার কি আর "উম-বস্তু" আছে? এখন আমাকে জাবড়ে ধরে আলিঙ্গন করাতে সে শুধু তার অন্তরতম অভ্যর্থনা জানালো।

আমি মনে মনে বললুম চল্লিশ বছর লেটে, চল্লিশ বছর লেটে। এই আলিঙ্গন-চুম্বন চল্লিশ বছর পূর্বে দিলেই পারতে, সুন্দরী। পরে তাকে খুলেও বলেছিলুম।

ইতিমধ্যে ডর্টিবষ আমতা আমতা করে বললে, "আমরা তা হলে আসি। রাত্রে পার্টিতে দেখা হবে।" ওরা পাশেই থাকে। তিন মিনিটের রাস্তা। ওদের ভাব থেকে বুঝলুম, ওরা মনে করছে বিদ্যা ও সুন্দর যখন বহু বৎসর পর সম্মিলিত হয়ে গেছেন তখন ওদের কেটে পড়াই ভালো। আমাদের প্রেমটি যে চিরকালই নির্জলা জল ছিল সেটি হয়তো তারা গলা দিয়ে নাবাতে পারেনি—হজম করা তো দূরের কথা।

লীজেল আমাকে হাতে ধরে ড্রইংরুমের দিকে নিয়ে চললো। আমি বললুম, "এ কি আদিখ্যেতা! চল্লিশ বছর ধরে যখনই এ-বাড়িতে এসেছি তখনই আমরা বসেছি বাবা, মা, বড়দি, তুমি, ছোড়দি রান্নাঘরে। অবিশ্যি মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আজ কেন এ বাত্তায়? উদ্‌পোর ঐ বিরাট ড্রইংরুমে! বাপস্‌! তুই যদি এক কোণে বসিস আর আমি অন্য কোণে, তা হলে একে অন্যকে দেখবার তরে জোরদার প্রশান্ত মিলিটারি দূরবীনের দরকার হবে; কথা কইতে হলে আমাদের দেশের ডাক হরকরা, নিদেন একটা ট্রাঙ্ক-কল-ফোনের ব্যবস্থা, আর—"

লীজেল সেই প্রাচীন দিনের মত বললে, "চোক্‌কোর চোক্‌কোর! তুই চিরকালই বড্ড বেশী বকর বকর করিস্‌।"

গতি পরিবর্তিত হল। আমরা শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরেই গেলুম।

কিচেনের এক প্রান্তে টেবিল, চতুর্দিকে খান ছয় চেয়ার। অন্য প্রান্তে দুটো গ্যাস-উনুন, তৃতীয়টা কয়লার (সেটা খুব সম্ভব প্রাচীন দিনের ঐতিহ্য রক্ষার্থে)। দুই প্রান্তের মাঝখানে অন্তত দশ কদম ফাঁকা। অর্থাৎ কিচেনটি তৈরি করা হয়েছে দরাজ হাতে। বস্তুত লীজেলের মা যখন রাঁধতেন তখন এ-প্রান্ত থেকে আমাকে কিছু বলতে হলে বেশ গলা উঁচিয়ে কথা কইতে হত।

লীজেল একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "এটায় বস্‌"।

সত্যি বলছি, আমার চোখে জল এল। কি করে লীজেল মনে রেখেছে যে, চল্লিশ বৎসর পূর্বে (তিনি গত হয়েছেন বছর আটত্রিশেক হবে) তার পিতা আমাকে ঐ চেয়ারটায় বসতে বলতেন। আমি জানতুম, কেন। জানলা দিয়ে, ঐ চেয়ারটার থেকে দূরে-দূরান্তরের দৃশ্য সবচেয়ে ভালো দেখা যায়। পরে জানতে পেরেছিলুম, তিনি স্বয়ং ঐ চেয়ারটিতে বসে আপন ক্ষেত-খামারের দিকে এবং বিশেষ করে তাঁর বিরাট আপেলবাগানের দিকে নজর রাখতেন—(মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আমাদের যেরকম আমবাগান)। অবশ্যই তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ভালোবাসতেন। নইলে আমাকে তাঁর আপন আসন ত্যাগ করে, আপন অভ্যস্ত আসন ছেড়ে দিয়ে ওখানে বসতে বলবেন কেন? আমি তো সেখান থেকে তাঁর ক্ষেত-খামার, আপেলবাগান তদারীক করতে পারবো না—যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা তাঁর আপন "মুনিষ" না ভিন্-জন আমি ঠাহর করবো কি প্রকারে? আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ? সে দিকে আমার কোনো চিত্তাকর্ষণ নেই। একদিন ঐ শেষ কথাটি তাঁকে আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে—যাতে অন্যেরা শুনতে না পায়—তিনি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে অতিশয় সুন্দর স্মিতহাস্যে বললেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ান। তোমাদের দেশে এখনো কল-কারখানা হয়নি। তোমরা এখনো আছো প্র কৃ তি র শি শু। শিশু কি মায়ের সৌন্দর্য বোঝে? না। সে শুধু তার মায়ের স্তনরস চায়—সেই স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য কি সে বোঝে? যেমন তার বাপ বোঝে? ঠিক ঐরকম তোমরা তোমাদের মা-জননী জন্মভূমিতে ক্ষেতখামার করে খাদ্যরস আহারাদি গ্রহণ করো। তোমরা এখনো কি করে বুঝবে, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায়? সেটা শুধু হয় যখন মানুষ কল-কারখানার গোলাম হয়ে যায়। অর্থাৎ মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর, বড় হয়ে সে তার মাতৃদুগ্ধের মূল্য বুঝতে শেখে—"

আমি বললুম, "মানছি, কিন্তু দেখুন, গ্রীস, রোম এবং আমার দেশ ভারতবর্ষেও তো, কলকারখানা নির্মিত হওয়ার বহু পূর্বে উত্তমোত্তম কাব্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলোতেও বিস্তর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বর্ণনা আছে। তবে কেন—?"...

এসব কথাবার্তা যেন ঐ চেয়ারে বসে কানে শুনতে পাচ্ছি। কত বৎসর হয়ে গেছে। এমন সময় লীজেল আমার মাথায় মারলো একটা গাঁট্টা। আমার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। বিশেষ করে তার ঠাকুরমার ছবিটি।

"কি খাবে বলছিলে?"

আমি আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলুম, "আমি তো কিছুই বলিনি।"

"তবে চলো, তুমি যে সুপ পছন্দ করতে সেই সুপই করেছি—অর্থাৎ পী সুপ (কলাইশুঁটির সুপ)—এবারে বলো তুমি কি খাবে? তুমি যা খেতে চাও তার জন্য মাছ, মাংস, ক্রীম আছে।"

আমি বললুম, "দিদি, সুপ ছাড়া আমার অন্য কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। এই আর জনিতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড়।...তবে কিনা আমি বঙ্গসন্তান। হেথায় ডান পাশে রাইন নদী। সে নদীর উত্তম উত্তম মাছ খেয়েছি কত বৎসর ধরে। তারই যদি একটা কিছু—"

বেচারী লীজেল!

শুকনো মুখে বললে, "রাইনে তো আজকাল আর সে-মাছ নেই।"

আমি শুধোলুম, "কেন?"

বললে, "রাইন নদের জাহাজের সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছে। তাদের পোড়ানো তেল তারা ঐ নদীতে ছাড়ে। ফলে নদীর জল এমনই বিষে মেশা হয়ে গিয়েছে যে, মাছগুলো প্রায় আর নেই। আমার কাছে যেসব মাছ আছে সেগুলো টিনের মাছ।"

আমি বললুম, "তা হলে থাক্।"

পুনরায় কিছু একটা হোক

তৃপ্তি ভট্টাচার্য

বারবার দিক্ পাল্টাচ্ছি
যুদ্ধে-হারা ঘোড়সওয়ার সৈন্যের মতন
লোকালয়ে অথবা কখনো
একদম অচেনা কোনো কাঁটাগাছ পাকদণ্ডীর মোড়ে,
শৈশব আমার হাতে সংগোপনে যে অস্ত্র দিয়েছে
এই যে শরীর
ক্রমাগত ধার হয়ে চমকে উঠছে কোমরের ঘাটে
সামনে হলুদ হয়ে দিনান্তের মস্তক এখন
ঝুলে পড়ছে যুদ্ধক্ষেত্রে তমস্বিনী নদীর কিনারে
বিষণ্ণ কাকের মত আগত সন্ধ্যায়
সর্বস্ব লুণ্ঠিত হতে কতকাল বসে বসে দেখা যায় বল
এবং তোমার স্তবে নপুংসক অহংকার শুধু
ক্ষয়ে নিচ্ছে জমির সীমানা,
কয়েকটা রাজার কাছে যেতে চাই ফের
কিছু কিছু আত্মত্যাগী সৈন্যের সন্ধানে
তারপর বাহু বেঁধে আর একবার শেষে
একাগ্র যুদ্ধের মধ্যে নিহত বা জয়ের সংবাদে
পুনরায় কিছু একটা হোক ॥

সিঁড়ির নীচে

সুভাষ ঘোষাল

সিঁড়ির নীচে বাড়ীর কুকুর ক্রমশ জড়ো করছে তার কান্না।
গভীর রাত পর্যন্ত চরিত্রেরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে।
একজন যে স্মরণাতীত কাল থেকে বিধবা হলেও
এই মুহূর্তে আনন্দবতী।
একজন আসন্নপ্রসবা
মায়াবীর মতো উঠে যায়
আশ্রয় যেখানে রক্তনীলিপ্ত।

সবাই মৌন
এমন কি আমার মা
তার বয়সোচিত অভিমান নিথর।
আমি কখনও হতে পারি না এই রকম
আমার হাতে কখনও থাকে বাঁকুড়ার ঘোড়া
কখনও অনভিজ্ঞ নারীর প্রার্থনাজনিত উত্তাপ।

আর চোখের সামনে দেখছি
সমাপ্ত সিঁড়ির নীচে বাড়ীর কুকুর
ক্রমশ জড়ো করছে তার কান্না।

ভিক্ষার ঝুলি গভীর

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

যতোই পড়ুক-না কেন,
ঝুলির গভীরতা থাকবে
তাই তো ভিক্ষে!
কেননা, যারা দিচ্ছে,
তারাও আড়চোখে মেপে-নেয়
গভীরতা—
কেউ একটু আগে, কেউ ঠিক পরে।
বস্তুতঃ,
দান গভীরে না-দিলে
মনটা চুলকে-ওঠে দাতার;
এবং ভিখারীরও তাই—
গভীরে না পেলে।
সুতরাং,
যে দেয় সে অল্পই দেয়,
এবং, যে নেয়, সে-ও অল্প।
এইভাবে গভীর সৌহার্দ্য
পরস্পর অটুট রেখে যায়।

"কোন দিক দিয়ে এগিয়ে যাব"

বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়

কোনটা সুদিন? এইজন্য নিয়মিত কাগজপত্র ঘাঁটি
ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলে আসি, এইজন্য অতিক্রান্ত সময়ের পর
হাতঘড়ি দেখি, অধৈর্য হয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিই কিংবা
মাঝে মাঝে দূরের মাঠে পাখি-পাখালিদের ভিড় এবং
পিকনিকের আওয়াজ শুনতে পাই
কোনটা সুদিন? এজন্য রাতভোর উঠি, করকোষ্ঠি বিচার করে
শুভকার্যে হাত দিই, নিরলস ব্যয় করি নিজের জন্য
নিজের সবকিছু কিংবা আমার ভবিষ্যৎ।

কোনটা সুদিন? পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ, প্রেমিক দিন-
পুরনো ক্যালেণ্ডার ফেলে দিই, জানালায় নতুন পর্দা
টানাই, বিয়ের মধ্যরাতে জেগে থাকি, ফুলদানিতে
নতুন জল ভরে নিই, কোনটা চিরন্তনী?
কোন্‌দিক দিয়ে প্রকৃত সত্যের মুখে
এগিয়ে যাব?

লোক গণনা, জনশক্তি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

যে কোন উন্নতিকামী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে গুরুত্বের প্রতিবন্ধক হল অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুততর করতে হলে জনসংখ্যার চাপ কমানো দরকার। বর্ধিত জনসমষ্টির খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হয়। শিল্প কাঠামোর কতটা জনশক্তির (Man-power) প্রয়োজন অথবা কৃষিক্ষেত্রে জনসমষ্টির কতটা অংশ নিয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের একটি সুষ্ঠু ধারণা থাকা প্রয়োজন। জনসমষ্টির কতটা অংশ কারিগরি শিক্ষা লাভ করেছে অথবা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত কতজন শ্রমিককে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সরকারকে সর্বদাই ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তা না হলে অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে এবং বেকার সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে; আবার ক্ষেত্রবিশেষে কারিগরি শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিকের অভাবও দেখা যেতে পারে। জনসমষ্টির সমীক্ষা করার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় হল লোকগণনা বা আদমসুমারির (Census of population) আশ্রয় গ্রহণ করা। আমাদের দেশে লোকগণনার ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৮৭১ সালে; এ বছরের লোকগণনার তাৎপর্য হল এই ব্যবস্থার শতবর্ষপূর্তি। লোকগণনার মাধ্যমে আমরা যে শুধু জনসংখ্যা কত বাড়ল অথবা কত কমল তা জানতে পারি, তা নয়। লোকগণনার সঙ্গে দেশের মোট জনসমষ্টির বণ্টন আঞ্চলিক বসতি-ঘনত্ব, উপজীবিকা বণ্টন, কর্ম সংস্থানের ধারা, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য, জন্মহার, মৃত্যুহার, বয়স অনুপাতে জনসমষ্টির বণ্টন, স্ত্রী-পুরুষে জনসমষ্টির বণ্টন প্রভৃতি সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল হন। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে এজাতীয় তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সামাজিক জীবনের ছাপ প্রতিফলিত হয় লোকগণনার মধ্যে এবং দেশের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতির একটি চিত্র আমরা পাই এজাতীয় সমীক্ষা থেকে।

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনশক্তি পরিকল্পনার (Man-power planning) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উন্নতিশীল দেশগুলিতে নিরক্ষরতার সমূল বিনাশ যে একান্তভাবে কাম্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেসব নাগরিক শিক্ষিত হচ্ছেন, তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যেন তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সুসমঞ্জস হয়। আমাদের দেশে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে যে বেকার সমস্যার তীব্রতা দেখা যাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব। উচ্চতর শিক্ষার কাঠামো এমনভাবে তৈরি করা দরকার যেন দেশে কর্ম সংস্থানের সুযোগ এবং শিক্ষিত জনশক্তির কর্ম সংস্থানের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। ব্যক্তি এবং সমাজ—উভয়ের ক্ষেত্রেই এ জিনিসটার তাৎপর্য খুবে গভীর। কোন ব্যক্তিকে স্থির করতে হবে তাঁর ভবিষ্যৎ কী, অর্থাৎ কিভাবে তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে চান। এবং সেভাবেই তাঁকে গোড়া থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের দায়িত্ব হল তাঁদের ছেলেমেয়েরা কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে নিজেদের শিক্ষা চরিতার্থ করতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় কাজের সুযোগ পাবে সে বিষয়ে পূর্বেই সুনিশ্চিত হওয়া। যে ছাত্রের ঝোঁক চিত্রকলার দিকে, তাঁকে যেমন ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার করার জন্য তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি শিক্ষা-পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়, তেমনি যে ছাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে তাকে তার নিজস্ব পথ বেছে নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কিন্তু সমাজের দিক থেকে বিবেচনা করলে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত কারিগরী-বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন খুব বেশী হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হল অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন ক্ষেত্রে কী পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং এজন্য কী ধরনের শিক্ষিত শ্রমিক প্রয়োজন তার একটি সঠিক হিসাব রাখা। এজন্যই প্রয়োজন হল জনসমষ্টি সমীক্ষার। জনশক্তি বা শ্রমশক্তির পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নহারের লক্ষ্যমাত্রার উপর নির্ভরশীল। যে হারে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে বলে ধরা হয়েছে, তা থেকে যদি দেশ পিছিয়ে যায়, তবে বর্ধিত শ্রমশক্তিকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে না। বেকার সমস্যার তীব্রতা সে ক্ষেত্রে বাড়বে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।

জনশক্তির পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ আছে। ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, কারিগরি-বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি সকলেরই শিক্ষার স্তর আলাদা; নিজেদের কাজের ধারা অনুযায়ী তাঁদের শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। সরকারের উচিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা নির্ধারিত করে সেই অনুপাতে জনশক্তিকে সীমায়িত ও সুশিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু যে দেশের জনসংখ্যা ৫৫ কোটি এবং যে দেশে শিক্ষিত লোকের শতকরা হার ক্রমেই বাড়ছে, সে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শ্রমশক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা খুবেই কঠিন। চতুর্থ পাঁচসালা যোজনায় সরকার শিক্ষাব্যবস্থা এবং জনশক্তি পরিকল্পনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে তা যে আমাদের দেশে সফল হচ্ছে না তার প্রমাণের অভাব নেই। এক দিকে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রদের ভিড়, অথচ সবার পক্ষে ভর্তি হতে না পারা এবং অপর দিকে যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে বৃহত্তর জীবনের পথে পা বাড়ালেন তাঁদের চাকরি সংগ্রহ করতে না পারা—এটাই এখন আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের করুণ দিক। অথচ বিশ বছর ধরে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। যদি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এদিকে আরও আগে নজর দিতেন তবে হয়ত বেকার সমস্যার ফলে যে হতাশা ও নৈরাশ্য দেশের শান্তি-শৃংখলাকে বিঘ্নিত করেছে, তার তীব্রতা তত বেশী হত না।

সুব্রত গুপ্ত

করছিল। কেমন এক সুখের আস্বাদে শিথিল হয়ে আসছিল শরীরটা। সোফার ওপর চিৎপাত হয়ে সেন্টার টেবলে পা তুলে সে বাইরে অন্ধকারের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

একটু আগেও খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। মেঘ ডাকছিল, ঝড়ও ছিল সঙ্গে। গারাজের টিনের ছাউনির ওপর ঝম্‌ঝম্‌ করে ঘন বৃষ্টির শব্দ উঠছিল। যে শব্দটা খানিকক্ষণ শুনলেই কেমন ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। সায়েব মনে মনে চাইছিল আবার আসুক তেমনি ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টিটা। সাঁ সাঁ করে ঝড়ও উঠুক আবার। কাল রবিবার। সকালে ওঠার তাড়া নেই। যতক্ষণ খুশি জেগে অথবা ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টিটা ধরে গেল যেন। থেকে থেকে শুধু ভিজে হাওয়ার ঝাপটা মারছে এখন। বৃষ্টির জন্যে জানলাগুলো সব বন্ধ করে দিয়েছিল সোনালী। সায়েব একটা খুলে নিয়েছে। এত বৃষ্টিতেও গুমোটটা কাটল না যেন। সব জানলাগুলো খুলতে পারলে হয়ত ঘরটা বেশ ঠান্ডা হাওয়ায় ভরে যেত। কিন্তু জুলীর টন্‌সিলের কথা মনে করে সে একটাই খুলল শুধু।

চৌমাথার মোড়ে হিন্দুস্তানী পানের দোকানটা ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। রাস্তার ঝাপসা আলোয় তীরের মত ইলশেগুঁড়ির ঝাঁক। দোকানের পেছনে অন্ধকার মাঠটায় ব্যাঙ ডাকছিল। সারা বর্ষাটা প্রায় জলে ডোবা থাকে মাঠটা। গরমের সময় মাস তিনচার একটু যা শুকনো থাকে। কিন্তু এক পশলা জোর বৃষ্টি নামলেই আবার জল থইথই। সাপ, ব্যাঙ আর মশার রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। রঙ বেরঙের পোকা, ফড়িং, মথ-প্রজাপতি ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে বিচিত্র কত মথ, ফড়িং ঘরের মধ্যেও উৎপাত আরম্ভ করে। মাঠটায় এবার বাড়ি উঠবে শোনা যাচ্ছে। কোন এক কোম্পানীর কোয়ার্টার তৈরি হবে নাকি। দু-এক বছর আগেও ওখানে শেয়াল ডাকত। জুলীকে তখন শেয়ালের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত সোনালী। ব্যাঙের ডাক শুনলেও ও জড়োসড়ো হয়ে যায়। জুলীটাকে ভীষণ ভীতু তৈরি করছে সোনালী। অন্ধকার দেখলেও চমকে ওঠে। এখন জেগে গেলে হয়ত ভয় পেয়ে ও কেঁদেই উঠবে। থমথমে বর্ষার রাত পেয়ে ব্যাঙগুলো গলা ফুলিয়ে যা চীৎকার জুড়েছে।

প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে ধরাল সায়েব। ক'দিন থেকেই সিগ্রেটটা ছাড়বে ছাড়বে মনে করছে। কিন্তু কিছুতেই হয়ে উঠছে না শেষ পর্যন্ত। ভেবে ভেবে খাওয়াটা আরও বেড়ে গেছে কিনা কে জানে। তবে এখনো যখন ছাড়া যায়নি, তখন আর একটা খেতে দোষ কি? আর এই সব সময়েই ত সিগারেট টানতে সবচেয়ে আরাম। মুখ ভর্তি ধোঁয়া টেনে লম্বা একটা আরামের ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে। নাহ্‌, সিগ্রেটটা যে করে হোক ছাড়তেই হবে। মল্লিকদাকে ডাক্তার ক্যান্সার হাসপাতালে যেতে বলেছে। সিওর নয় তবু একবার দেখাতে দোষ কি। বেচারির দশাসই চেহারা একেবারে চুপসে গেছে।

—একি তুমি শোওনি এখনো? সোনালী কখন নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছে। হাত থেকে পলিথিনের জলের জাগটা নামিয়ে রেখে আবার প্রশ্ন করল সে,—কী ভাবছ বসে বসে?

—ভাবছি তোমার কথা।

সায়েব অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একটু উদাসীন ভঙ্গিতে বলল।

—আহা রে, কী কপাল আমার—

সোনালীর ঠাট্টার গলায় আদুরে সুর। নাচের কায়দায় এক পা ঘুরে ও সায়েবের চুল ধরে টানল।

হাত দুটো মাথার ওপর তেমনি তোলা সোজা পেছন দিকে বাড়িয়ে সায়েব টপ্‌ করে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

—এই ছাড়ো, ছাড়ো—

অকারণে হঠাৎ ফিসফিস করেই সোনালী। কিন্তু ছাড়বার কোন লক্ষণই দেখাল না সায়েব। উত্তরও দিল না কিছু। উল্টো-হাতের সাঁড়াশীর মধ্যে বরং আরও গভীরভাবে চেপে ধরতে চাইল ওকে। সোনালী ঝুঁকে পড়ে ওর চোখের পাতায় আলতো করে ফুঁ দিল। চুলের মধ্যে বিলি কাটল। মুখে মুখ লাগিয়ে আদরও করল কয়েকবার।

—ছাড় না প্লীজ, রাত হয়েছে অনেক, কাজগুলো চটপট সেরে নি—

মিষ্টি করে আবদার করছে সোনালী। একটু আগে ও দাঁতগুলো ব্রাশ করে এসেছে। ফ্লুরাইড, পিপারমেন্ট আর ক্লোরোফিল মিশ্রিত একটা মিষ্টি ওষুধ ওষুধ গন্ধ ওর

নিশ্বাসে। ওর ঘাড়, গলা, শরীর থেকেও একটা সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল। গন্ধটার একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে সায়েব। হাত দুটোকে আরও শক্ত করে ওর দেহটাকে জড়িয়ে থাকে সে। কোমল মাংসের উত্তাপে সুখের অনুভূতিটাকে একটু যেন বাড়িয়ে নিতে চায়।

সোনালীর কোমরটা আগের চেয়ে অনেক ভারি হয়ে এসেছে। মেদের ঢল নামছে চারপাশ জুড়ে। অথচ ফ্যাট চেক করবার জন্যে ওর সতর্কতার অন্ত নেই। কত মেপেজুপে খাওয়াদাওয়া করে। মাঝে শরীরচর্চার একটা বই দেখে ব্যায়ামও শুরু করেছিল। ভোরবেলার উঠে ও এখনো মাঝে মাঝে নানা রকম আসন করে। ফিগারটা ঠিক রাখবার ব্যাপারে সোনালী বরাবরই খুব সচেতন।

জুলী কোলে আসার পর থেকেই ও বেল্ট ব্যবহার করত। অ্যাবডোমেন গার্ড লাগিয়ে ও, পেট ও কোমরের সুন্দরী গড়ন ধরে রাখতে চেয়েছিল বহুদিন। কিন্তু সত্যিই আর কতদিন ধরে রাখা যায়? বয়সের কাছে ত একদিন সবাইকেই হেরে যেতে হয়। সোনালীও যাবে। এর জন্যে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু সোনালী হয়ত দুঃখ পাবে। শরীরটাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা ওর। বড় ভালবাসে নিজেকে। একদিন ওর শরীরের এই ধারাল গড়নটা ভেঙ্গে গেলে ও ভীষণ কষ্ট পাবে।

কে জানে, হয়ত এই জন্যেই ও দ্বিতীয়-বার মা হতে এত ভয় পেয়েছিল। কিছুতেই রাজী হয়নি। একরোখা জিদে যেন পেয়ে বসেছিল ওকে, পাঁচ বছরের আগে কিছুতেই না। শেষ পর্যন্ত নার্সিং হোমে ভর্তি হয়ে সেই দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল ও। ঘটনাটা এখনো ভুলতে পারেনি সায়েব। কোথায় যেন কাঁটার মত মনের মাঝে বেঁধে। একটা গোপন দুঃস্বপ্নের মত ভেতরে ভেতরে অনুভূতিটা চেপে আছে কোথাও। এ ত আজকাল আকছার ঘটছে। তবু কেন যেন মনে পড়ে যায়। সোনালী কি ভুলতে পেরেছে?

একরাশ নিওন আলো আছড়ে পড়তেই গোটা ঘরটা চমকে উঠল যেন। সোনালী টিউব লাইটটা জেলে দিয়েছে। একটা শব্দহীন আলোর বিস্ফোরণ ওর চারপাশ ঘিরে। পেঁচিয়ে পরা ম্যাজেন্টা রঙের ঝলমলে শাড়ি, ফেটে পড়া ওর গোলাপী গায়ের রঙ হঠাৎ চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় যেন। নাহ্, বয়সটাকে এখনো আটকে রেখেছে সোনালী। হয়ত আরো অনেকদিনই রাখতে পারবে। ওর লম্বা ফিগারের সঙ্গে বাড়তি মেদটুকু বেশ মানিয়েই গেছে।

সোনালীর মুখটা কালচে। বাঁ দিকের ঠোঁটের কোণটা আঙুলে ধরে ও সায়েবের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে নিঃশব্দে ভর্ৎসনা করল যেন। সায়েব হাসল। আঙুলের ডগায় একটা চুমু মাখিয়ে সেটা ওর দিকে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি করল। সোনালী ঠোঁট উল্টে জিভ দেখাল।

—তুমি আর বাইরে যাবে?

দরজার ছিটকিনি লাগাতে গিয়ে ওর আলোকিত শরীরটা ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। যেন অন্য সোনালী।

—নাহ্, আর যাবো না। বরং জুলীকে পারলে ওঠাও। বর্ষার রাত, যদি বিছানায় করে ফেলে—

—মনে ত' হয় না আর করবে, শোবার আগে ত' এক কলসী করেছে। তা ছাড়া ও আজ বেশ রাত করে ঘুমিয়েছে না?

কথা শেষ করে সোনালী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার ঝকঝকে দাঁতগুলোর জৌলুস পরীক্ষা করছিল। ঝুঁকে পড়ে একবার ভাল করে বাঁ দিকের গালের দাগটা দেখল। হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার মত একটা শব্দ করে, জায়গাটা দু' আঙুলে টিপে সায়েবকে দেখাতে চাইল।

—কী করেছো দেখতো—

—সোহাগ—

সায়েব বেশ আবেগ দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করতে চাইল।

—উঁউ—সোহাগ, জংলী কোথাকার—

সায়েব শব্দ করে হেসে উঠল এবার। সোনালীর শরীরটা আবার বাঁক নিল। মাথা নাড়ল এক অদ্ভুত মুদ্রায়।

বাইরে বৃষ্টির বেগটা একবার বেড়ে উঠেই কমে গেল। চড়বড় করে বড় বড় ফোঁটার শব্দ পেয়ে সায়েব জানলাটা বন্ধ করবে কিনা ভাবতে ভাবতেই আবার ধরে গেল বেগটা। এলোমেলো হাওয়ায় ঠিক জমতে পারছে না বৃষ্টিটা। সাঁইসাঁই করা দমকা হাওয়া চলেছে সমানে। ব্যাঙগুলো একটানা ডেকে ডেকে এখন একটু চুপ করেছে। মাঝে মাঝে এক আধটা অবশ্য ককিয়ে উঠছিল। বাইরে নতুন করে মেঘ জমছে হয়তো। আকাশ জুড়ে গুম গুম শব্দ উঠছে আবার।

সোনালী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। ফরসা একটা টাওয়েল ঘাড়ে গলায় ও মুখের

ফাউন্ডেশানটা তুলছিল। ফাউন্ডেশান মিল্কটা তুলে ও ক্রীম লাগাবে। সামনে কসমেটিকসের ট্রে। সেখানে চুলের ক্লিপ হাতের চুড়িগুলো সব খুলে জড়ো করে রেখেছে। মাথার ওপর ফণা তোলা ক্লিপ খোলা অবস্থায় এখন ওর বুকের ওপর প্রসারিত। মুখে পুরু করে ক্রীম লাগিয়ে আলতো হাতে ম্যাসাজ করতে করতে ও স্বগতোক্তি করল,

—ইস্, কি বিশ্রী ওয়েদার শুরু হল বলত। অসময়ে এমন প্যাচপেচে বৃষ্টি ভাল লাগে?

—কেন, খারাপ কি? চলুক না, কাল ত' ছুটি।

—তা ত বটেই। কুঁড়ের বাদশা ত', সারাদিন একখানা বই মুখে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে, তোমার আর কি?

—নাহ্, কাল ভাবছি, সারাদিন একেবারে 'সোনালী স্বপ্নে' মশগুল হয়ে কাটিয়ে দেব। সোনালী আয়নার মধ্যে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। পরে কপালে ভাঁজ ফেলে বলল,

—কথার বেলায় তুমি খুব-উব, না?

পরে বাঁ হাতে মুঠো করা চুলের মধ্যে চিরুনি চালাতে চালাতে বলল,

—জানলে, দীপাকে না, কালকে ইভনিং শোর দুখানা টিকিট কাটতে দিয়েছি। কিন্তু এই রকম ওয়েদার চললে কি হবে বলত?

ঠোঁট ফুলিয়ে যেন অনুযোগ করে ও। কথাটা শেষ করে একবার সায়েবের দিকে তাকাল।

ও তাই বল! তা জুলীকে কে রাখবে?

দীপা ওকে দুপুরে এসে নিয়ে যাবে।

চিরুনি থেকে ছেঁড়া চুলগুলো একটা খালি সিগারেটের প্যাকেটে ভরছে সোনালী। প্যাকেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে এসে বলল,

উঃ, বাইরেটা কী ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখেছ আজ? আরও চালবে মনে হচ্ছে—

এই রকম থাকলে কিন্তু তুমি জুলীকে দুপুরে পাঠিও না। বরং এক সঙ্গেই বেরুবো, তারপর দীপালী জুলীকে নিয়ে তোমাদের বাড়ি চলে যাবে।

— তাহলে ও ঠিক কান্নাকাটি জুড়ে দেবে, সামলানোই মুশকিল হবে, দেখো। যা একখানা হয়ে উঠছে না তোমার, আমিই হিমসিম খেয়ে যাই—

—তবুও ত মোটে একজন। যদি আরও—

হাসতে হাসতে কথাটা বলতে গিয়েও শেষ করতে পারল না সায়েব। মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই বুঝল, এটা তার বলা উচিত হয়নি। বলতে সে চায়ওনি। সোনালীর দিকে তাকিয়ে দেখল ওর হাতটা হঠাৎ থেমে গেছে। আয়নার মধ্যে তার চোখের দিকে সে অপলক তাকিয়ে। একরাশ বিস্ময় আর বিষণ্ণতা মাখান সেই দৃষ্টি। একটু হেসে ব্যাপারটা হালকা করতে চাইল সায়েব। কিন্তু পারল না। একটা অনুতাপ আর অস্বস্তির অনুভূতি রিনরিন করছিল কোথাও।

ঝির ঝিরে বৃষ্টির শব্দটা যেন একটু বাড়ছে। বাতাসে একটা গোঁ গোঁ শব্দ। জুলী মশারীর মধ্যে পাশ ফিরল। ঘুমিয়ে থাকলে ওকে আরও সুন্দর লাগে। বড় মায়া হয় মুখটা দেখে। আদর করে করে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। ওর গলা দিয়ে হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল। স্বপ্ন দেখছে বোধ হয়।

বেশিদিন হয়নি এখনো। মাত্র ক' মাস আগের কথা। সোনালীকে সে অনেক করে বোঝাতে চেয়েছিল, 'যে এসেই গেছে, তাকে তুমি কি করে অস্বীকার করবে?

—'কেন, আজকাল সবাই যে ভাবে করে' —কঠিন সংকল্পে দৃঢ় তার গলার স্বর।

কিন্তু ডাক্তার সোম পুরোনো আমলের মানুষ। সব শুনে বললেন, অ্যাকসিডেন্ট আবার কি? কল ইট এ গিফট। কত বয়স আপনার প্রথম বাচ্চার? ফাইন, তবে ত আড়াই বছরের গ্যাপ। এই ত ঠিক সময়। না মশাই, আপনাদের খুশীমত যদি বলে কেউ আসছে না বলে, এটা ঠিক হবে না।

ওটা ত একটা ফ্যাশানের ব্যাপার নয়। ডক্টর সোমের কথাগুলো বরাবরই একটু কাটাকাটা। পুরোনো আমলের নীতিবাগীশ মানুষ, মুখের কোন রাখঢাক নেই। সোনালী বোধ হয় এই জন্যেই ওঁর কাছে যেতে চায়নি। ওঁর কথা বলার ধরন সত্যিই যে কোন মহিলার পক্ষে সহ্য করা শক্ত।

কিন্তু সোনালী নিজেই যার সন্ধান আনল, সেনট্রাল নার্সিং হোমের সেই বিলেত ফেরৎ বোসও কেমন নিমরাজী হলেন প্রথমটায়। পরীক্ষা টরীক্ষা করে শেষে বললেন, 'হাজার হোক একটা লাইফ তো, ভাল করে ভেবে দেখুন।' সোনালীর একরোখা মনোবল দেখে পরে অবশ্য বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু একটু যে লেট করে ফেলেছেন ম্যাডাম, শুয়ে থাকতে হবে ক'দিন। অবশ্য খুব ভয়ের কিছু নেই। খাওয়া-দাওয়া ওষুধ-পত্তর ঠিক মত চালালে দিন পনেরোর মধ্যেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অনেকটা ঝুঁকি নিয়েও শেষ পর্যন্ত সোনালী তার জেদ বজায় রাখল। সব চুকে যাবার পরও প্রায় গোটা একটা দিন সে নার্সিং হোমে অচেতন হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু জ্ঞান ফিরতেই তার অন্য চেহারা। কেমন ভীত উদভ্রান্ত মনে হল তাকে। দুর্বল শীর্ণ মুখে আর একটুও সেই দৃঢ়তা নেই। টলটলে দুটো চোখ মেলে সে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সোনালী জানায়, সাহেব ভেবেছিল, সে অনেক।

বৃষ্টিটার আরও জোর হবে মনে হচ্ছে। দূর থেকে একটা সাঁ সাঁ শব্দ এগিয়ে আসছে। শুনে মনে হয় অনেক দূর থেকে কারা যেন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে কোথাও। এই সব সময় চুপচাপ গুম মেরে বসে থাকলে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যায়। অকারণে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মন। সাহেব অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল। হালকা গলায় সোনালীর দিকে তাকিয়ে বলল,

—ম্যাডাম, এক পেগ চলবে?

স্প্রে লাগানো প্রকাণ্ড একটা পারফিউম শিশি থেকে সোনালী ওর খোলা বুকে সেন্ট স্প্রে করছিল। সাহেবের বলার ভঙ্গি দেখে ভুরুটা ধনুকের মত বাঁকাল,

হবে স্যার, জাস্ট এ মিনিট।

ওর হাত থেকে গ্লাস নিয়ে জল ঢালল সাহেব। শাড়ির আঁচলটা টেনে মুখটা মুছল। ভুর ভুর করছে সুগন্ধ ওর সারা দেহে। সাহেব আর একটা হাত বাড়াল। সোনালী পিছিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যাডাম, ছোঁয়া হবে না?

ঘুম পেয়েছে? শোও না গিয়ে তুমি, কে আটকাচ্ছে—

—কি জান না?

—না।

কাঁপা গলায় কথাটা উচ্চারণ করে সোনালী। অনিচ্ছার সঙ্গেও যেন জোর আনে গলায়। চাপা হাসিতে মুখটা আবার আগের মত ভরে উঠল ওর।

চেস্ট ড্রয়ার থেকে সোনালী ওর করমচা রঙের জাপানী কাপটা বের করল। শোবার আগে রোজ ও এই কাপেই জল খাবে। কাপের মধ্যে রাত্তিরে খাবার ট্যাবলেট থাকে। রোজ শোবার আগে কাপ থেকে ট্যাবলেটগুলো নামিয়ে এক কাপ জল ভরে, একটা ট্যাবলেট খেয়ে নেয়। পুরো একটা কোর্সের পিল ও ওখানে জমিয়ে রাখে। এই নতুন নিয়মটা চালু হয়েছে সম্প্রতি। হিসেবের গোলমালের জন্যে একবার অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে। দ্বিতীয়বার আর যাতে না ঘটতে পারে, তাই ওর এত প্রকশান্। আসলে ও হয়ত আর কোনদিন মা হতে রাজী হবে না। কেমন একটা অদ্ভুত আশঙ্কা ওকে সদা সতর্ক করে রেখেছে। এই দুর্ঘটনার স্মৃতিই কি ওকে এত ভীত করে তুলেছে? রক্ত-মাংস হাড় মজ্জা থেকে শক্ত হাতে তাকে ছেঁটে ফেলেও কি ওর নিস্তার নেই?

নিওন বাতিটা নিবিয়ে, আবার সবুজ বাতিটা জ্বালল সোনালী। পোশাক বদলাবার জন্যে একটু অন্ধকার করে নিতে চায় ঘরটা। নাইট গাউনটা চাপিয়ে ও সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। শাড়ি, সায়া, জামা, ব্রা চেস্টের ওপর গুছিয়ে রাখছে এক এক করে। চন্দন রঙের কি একটা প্রসাধন ও রোজ গায়ে মাখে। সেটা বোধ হয় ফুরিয়েছে। অথবা কে জানে বাতিল হয়ে গেছে কি না। ডাক্ত শাদা রঙের একটা শিশি থেকে তরল মাখনের মত একটা ক্রীম বার করে ও মাসাজ করল। খুব আলতো করে ও পায়ের গোছ, উরু, নিতম্ব, পেট, বাহু ধীরে ধীরে রগড়ে নিচ্ছে। শেষ করে একবার দ্রুত হাতে ও পাউডারের পাফটা নিয়ে শরীরের একা অংশগুলোর ওপর বুলিয়ে নিল। হঠাৎ বুকের কাছটায় ঝুঁকে ও কি দেখতে দেখতে বলে উঠল,

—এই দেখ, আমার এইখানটায় না, একটা কী হয়েছে—

—ওখানে আবার কী হবে?

—কি জানি, কেমন যেন লাল হয়ে ফুলে উঠেছে—

—কেউ কামড়েছে টামড়েছে বোধ হয়—

—কেউ মানে?

—পোকা, পোকা; বর্ষার দিন কত রকম পোকাটোকা ঘুরছে চারদিক—

—খুব হয়েছে; অসভ্য কোথাকার—

ফিস্‌ফিস্ করে আবার কথাগুলো উচ্চারণ করছে সোনালী। সুরের মধ্যে কেমন একটা মনকেমনের ছোঁয়া। সবাজ আলোয় ক্রীম কলারের গাউন পরা ওকে দারুণ লাগছিল দেখতে। ইচ্ছে করলে এখন একটা বিউটি কম্পিটিশনে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে ও। অথচ শরীর নিয়েই ওর যত দুর্ভাবনা। বিশেষ করে সেই থেকে ও কেন ভয়ে ভয়েই আছে। যদি কিছু ঘটে যায়। একটা খারাপ কিছু। ওর জন্যে কেন কিছু একটা অমঙ্গল সব সময়েই ওত পেতে আছে। মেয়েদের ব্যাপারগুলোই সব উল্টো উল্টো। নিজেদের ইচ্ছে অনিচ্ছে নিজেরাই এত কম জানে!

বাইরে মেঘ ডেকে উঠল কড়্ কড়্ শব্দ করে। সোনালী একবার জানলার কাছে এসে বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল,

—জানলাটা বন্ধ করে দি?

—ফ্যান বন্ধ, এটাও বন্ধ করলে গরম হবে না?

—না গো, জুলীর ঠাণ্ডা লেগে যাবে'

ও ঝুঁকে পড়ে জানলার কপাট দুটো টানল। সিল্কের স্বচ্ছ নাইটির আড়াল থেকে ওর নগ্ন দেহটা ঢেউয়ের মত ভাঙছে। সায়েব সটান উঠে দাঁড়িয়ে ওকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল। নরম দেহটা সায়েবের বলিষ্ঠ বুকের মধ্যে একবার কেঁপে উঠল যেন।

রাক্ষস কোথাকার।

কথাটা উচ্চারণ করতে করতে সোনালীর গলা বুজে এল।

জুলী একপাশে, মাঝখানে সোনালী তারপর সায়েব। ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘর। বালিশের পার্টিশান দিয়ে জুলীকে আলাদা করা। সায়েব সোনালী মুখোমুখি। সোনালীর গরম নিশ্বাসের ঝলকে মুখ পুড়ে যাচ্ছিল সায়েবের। একটা পুতুলের মত ওকে ঘুরিয়ে সোজা করে নিল। তারপর মাথার বালিস সরিয়ে ওর উত্তাল নরম বুকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

—এই আমার লাগে না বুঝি—

সোনালীর চাপা গলা অন্ধকারে হিস্‌ হিস্‌ করছে। উত্তরে সায়েব ওকে আরও জোরে আকর্ষণ করল। একটা হাত পিঠের ওপর নিয়ে ডলতে ডলতে সশব্দে চাপড় দিল একটা। অনেকটা যেন মাসাজ করার মত।

—কী হচ্ছে, জুলী জেগে উঠলে শেষে—

কথা শেষ হল না সোনালীর দুটো ঠোঁটের মধ্যে চেপে সায়েব ততক্ষণে ওর ঠোঁটের নড়া চড়া বন্ধ করে দিয়েছে। মাথার মধ্যে ঝিং ঝিং করছিল সায়েবের। তার শিরা, উপশিরা, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী জুড়ে এক দারুণ ঝড় বয়ে চলেছে। উত্তেজনায় টন্ টন্ করছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সোনালী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছে। প্রতিদানে সায়েব ওর দু' গালে গলায় ঠোঁট বুলিয়ে দেয়। আর কাতরে কাতরে উচ্চারণ করে সোনা, সোনা, আমার সোনা। ঘুমিয়ে পড়া দেবর মত শুধু একটা উঁউঁ শব্দে সোনালী তার জবাব দেয়। শিউরে শিউরে ওঠে যেন দেহের প্রতিটি লোমকূপে। এক অসহ্য পুলকে যেন ফেটে পড়তে চাইছে সর্বাঙ্গ। এক নিবিড় যন্ত্রণায় গভীর আরামে ওর চোখ বুজে আসে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার চোখের ওপর পিট্‌পিট্ করে কেউ আলো ফেলল

যেন। সায়েবের উন্মুখ ইন্দ্রিয়, একমুখী মনোযোগের আবেশটা চড়াং করে ধাক্কা খায় হঠাৎ। তাকিয়ে দেখল, একটা জোনাকি। মশারির গায়ে প্রায় ওর চোখের ওপর দোল খাচ্ছে। ডানা তুলে ঘন ঘন নীলচে আলোর ঝলক ফেলছে চোখের ওপর। অন্ধকার বলেই হয়ত আলোটা এত চড়া লাগছে। তার আচ্ছন্ন বিহ্বল দৃষ্টিকে তীব্রভাবে আঘাত করছিল ওটা। সায়েব বিরক্ত হয়ে এক ঝাপটা মারল মশারির ওপর। জোনাকিটা একটু উড়েই আবার ফিরে এল দপ্‌দপ্‌ করতে করতে। সায়েব অপেক্ষা করেই ছিল। ঝাঁ করে ঝাপটা দিয়ে ওকে মশারির সঙ্গে পিষে দিতে চাইল এবার।

—উ-উ, কী করছ তুমি? ইস্‌, দাঁ লাগিয়ে দিলে বলো ত—

মৃদু আর্তনাদ করে ওঠে সোনালী। সায়েবের শক্ত কনুইয়ের ধাক্কায় বেশ ব্যথা পায় ও।

—জোনাকি একটা।

—জোনাকি তা কি?

—বাটা আমার চোখের ওপর যেন পিড়িক পিড়িক করে টর্চ মারছে।

—কই দেখি—

সোনালী ঘুরে গিয়ে সায়েবের পাশাপাশি উপুড় হয়ে দেখল। ওদের সামনে একটা আলোর বৃত্ত তৈরি করে জোনাকিটা দোল খাচ্ছে। একবার নীচেয় একবার ওপরে। হাওয়ার মধ্যে ডাইভ্‌ দিয়ে সাঁ করে একেবারে মুখের সামনে এল একবার। মশারির সঙ্গে মুঠো করে ধরতে গেল সোনালী। কিন্তু ধরা পড়েও ও হাত গলে বেরিয়ে গেল।

—দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায়।

সোনালী উঠে বসল। জুলীর পায়ের কাছে মিট্‌মিট্‌ করছে ওটা। মশারিটা ধরে ঝাঁকাল সে। জানলার খড়খড়ি দিয়ে দমকা বাতাস ঢুকে পড়ছে মাঝে মাঝে। হাওয়া পেয়ে যেন আরও মজা করে শরীরটা নাচাচ্ছিল ও। পাক খেয়ে শেষে সায়েবের মাথার ওপর বসতে গেল সে। সায়েব উঠে ধাঁ করে এক ঝটকা মারল মশারীর চালে। টানটান কাপড়ের ওপর ভেঙে পড়া তুবড়ির ফুলকির মত ওটা লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে গেল। দৃশ্যটা খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। সোনালীও মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে ওটাকে ওইরকম গড়িয়ে দেবার জন্যে রেডি হল। ক্ষুদে হাওয়াই জাহাজের মতন এক দফা অ্যারোব্যাটিকস্‌ দেখিয়ে দমকা হাওয়ার ধাক্কায় ভাসতে ভাসতে আবার মাথার ওপর আসছে ওটা। সোনালী হাত তুলে ধাক্কা দিতে গেল। কিন্তু তার আগেই সায়েব ওর মাথার ওপর দিয়ে একটা ভলি মেরে ওটাকে নিজের দিকে গড়িয়ে নিল।

জোনাকিটা শেষ পর্যন্ত একটা মজার খেলায় মাতিয়ে দিল ওদের। জুলী জাগলে খেলাটা আরো জমত। ও আবার ভীষণ জোনাকি-ভক্ত। ওর জন্যেই মাঠের মধ্যে কতদিন সায়েবকে জোনাকির পেছন পেছন ছুটতে হয়েছে। তিন চারদিন আগেও একটা শিশি ভর্তি জোনাকি এনেছিল ওরা মাঠ থেকে। এখন জুলী উঠলে ভীষণ মজা পেত এই দৃশ্যটা দেখে। ছুটোছুটি করে একাই ঘরটা মাতিয়ে রাখত ও।

জোনাকিটা এখন ড্রেসিং টেবিলের ওপর বসে আলো ছড়াচ্ছিল। আয়নার ঝকঝকে কাচটা কী অপূর্ব লাগছে দেখতে। গাঢ় অন্ধকার থেকে এক ফালি কাচ নীলচে আলোয় থেকে থেকে যেন শিউরে উঠছিল। সোনালী বলল, ধরবো ওকে?

—ধরো না।

সায়েব উদাসীন হয়ে বলল। তবুও ইচ্ছে করছিল ওটাকে ধরে জুলীর শিশির মধ্যে আটকে রাখে। সোনালী খাট থেকে নেমে আস্তে আস্তে জোনাকিটা লক্ষ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। জোনাকিটা বিড়বিড় করে কাচের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে সোনালী এবার অনায়াসে হাতের ওপর তুলল ওটাকে। হাত ছাড়িয়ে তবুও ঘুরে ওটা তার বাহু বেয়ে বুকের দিকে ছুটছিল। সোনালী প্রায় লাফিয়ে উঠল। এক ঝটকা মেরে ওটাকে মেঝের ওপর ফেলতে চাইল। নীলচে আলোর ক্ষীণ

আভায় সম্পূর্ণ নগ্ন সোনালীকে একটা অবাস্তব পরীর মত লাগছিল দেখতে। আলোর ঝলক ফেলে ফেলে জোনাকিটা ওর নগ্ন দেহটাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাসিয়ে তুলছিল। স্বপ্ন দেখার মত মশগুল হয়ে সায়েব দেখছিল। সোনালী ওকে ডাকল

—এই তুমি নীচেয় এসো না; দেখতে জ্বলীর শিশিটা কোথায়?

ফ্লাওয়ার ভাসের বাঁ দিকটা দেখো।

—আমি পাচ্ছি না। তুমি এসো না।

বলতে বলতে সোনালী কাঁসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল। বিছানার মধ্যে সায়েব পাজামাটা খুঁজছিল। শব্দ শুনে উলঙ্গ হয়েই ছিটকে বেরিয়ে এল।

—কোথায় লাগল তোমার দেখি—

—লাগেনি আমার: চেস্ট্ ড্রয়ারটা আলগা ছিল, হাতের ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গেছে। সায়েব সোনালীকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ওর ঘাড়ের কাছ থেকে জোনাকিটা ওর হাতে ধরিয়ে শিশিটা খুঁজতে খুঁজতে বলল,—

—আলোটা একটু জ্বাল না—

—কেন? আলোয় নিজের চেহারাটা কি একটু দেখতে ইচ্ছে করছে?

—দেখতে হলে নিজেরটা কেন, দেখার জিনিস ত আমার পাশেই আছে।

সায়েব একটা হাত বাড়িয়ে ওর গায়ের ওপর বুলিয়ে দেয়। সোনালী দুই হাতের তালুর কোটরে জোনাকিটাকে আটকে রাখতে চাইছিল। কিন্তু বারবার ওটা ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। একবার সোঁ করে হঠাৎ ওপরের দিকে উড়ে পালাল।

—যাঃ, উড়ে গেল আবার। সোনালী চেঁচিয়ে উঠল। তারপর লাফিয়ে ধরতে গিয়ে সায়েবের পিঠে দুম্ করে ধাক্কা খেল একটা।

শেষ পর্যন্ত ওদের দুজনকেই যেন একটা নেশায় পেয়ে বসল। জোনাকিটা ঘুরে ঘুরে ঘরময় উড়ছে। তার পেছনে একদিকে সায়েব আর একদিকে সোনালী দুটো নগ্ন দেহ অন্ধকারের মধ্যে সমানে চক্কর কেটে চলেছে। বাইরে অবিরাম ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে ক্ষণিক হাওয়ার ঝলক। আর তাড়া খাওয়া জোনাকিটার একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছোটাছুটি।

অবশেষে এক সময় দম ফুরিয়ে টলতে টলতে জোনাকিটা মশারির গায়ে বসল। সঙ্গে সোনালী ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক লাফে এগিয়ে ওটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

—এইবার ধরেছি তোমায়।

উত্তেজনায় প্রায় হাঁপাচ্ছিল সে। সায়েবও হাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সোনালী হাত খুলতে গিয়ে দেখল ওটা আর নড়তে পারছে না। আলোর ফুলকিটা কাপড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন স্থির হয়ে আছে। মরে গেছে ওটা। শরীরটা থেঁতলে জড়িয়ে গেছে।

—যাঃ তেরি মরেই গেল। হতাশ গলায় উচ্চারণ করল সোনালী।

—ঐটুকু পোকা, অমন বাঘের মত থাবা দিলে কখনো বাঁচে? সায়েব যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল।

ওরা দুজনেই সেই মৃত জোনাকির শবটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। একটা জীবন্ত আলোর কণা, কেমন একটা স্থির উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হয়ে গেছে। ওর থেঁতলানো ঘসটানো শরীরটা জুড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো আলোর কণা। কী বীভৎস লাগছিল এখন দৃশ্যটা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোনালী চোখ ফিরিয়ে নিল। কেন জানি ভীষণ খারাপ লাগছিল তার। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতিতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল যেন।

বিছানায় শুয়েও ওরা যেন আগের মত স্বাভাবিক হতে পারছিল না। ঝিরঝিরে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে দেয়াল ঘড়িটায় একটার ঘণ্টা বাজল। যেন কতদূর থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। নিবিড় নগ্ন দুটো শরীর পাশাপাশি উৎকর্ণ হয়ে সেই শব্দটা শুনল। উত্তেজনা হারানো দুটো ঠাণ্ডা দেহ। ওদের ঘুম আসছিল না, ওরা কথা বলতে পারছিল না। কেবল মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিল সেই বিস্ফারিত উজ্জ্বল দাগটার দিকে।

অতি ক্ষীণ সেই আলোর কণাগুলো যেন স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

TARGET
TARGET
20 CIGARETTES
৯০ পয়সায় ২০টি

[illegible]। পাক হানাদাররা প্রায় দু' শো বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই বিধ্বস্ত বাড়িটি তারই একটি নমুনা   চিত্র সত্যেন সেন

বিকেল হয় হয়। উলটো দিক থেকে একটা জিপ ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছিলো। জিপের সামনে জয় বাংলা পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। আমাদের দেখে গাড়িটা থামলো। গাড়ি থেকে নামলেন রাজামিয়া। আলাপ করিয়ে দিল এক মুক্তিযোদ্ধা, সামসুল আলম দুদু। ও আর ওবিদুল আগের আগের দিন মেহেরপুর থেকে আমাদের সঙ্গে ইয়াহিয়া ফৌজের কাছ থেকে ছিনিয়ে একটা ট্রাক চালিয়ে এপার বাংলায় এসেছিল। কুষ্টিয়া বিজয়ের ধ্বজা উড়িয়ে। সেদিন আমরা মেহেরপুরের ওপাশে আর যেতে পারিনি। সারারাত আকাশ থেকে পটাপট বোমা পড়েছে। একটানা আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরেই বিমান আক্রমণ চলেছে। তাছাড়া মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কও বন্ধ। কোথাও বড় বড় গাছ দিয়ে অবরোধ, কোথাও রাস্তার বিরাট গহ্বর কাটা। তবুও উদ্দেশ্য অটুট যে করেই হোক ভেড়ামারার পথে কুষ্টিয়া শহরে ঢোকা। আমার সঙ্গে ছিলেন দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমস-এর রিপোর্টার চাঁদ ঘোষ, কৃষ্ণনগরের পি টি আই-এর প্রতিনিধি রণু বোস, ফিল্ম ডিভিশনের মাদ্রাজের আরণাথী এবং কলকাতার [illegible] ফোটোগ্রাফার, অনেক বন্ধু ও অনেক দিন। সেদিন গোটা কুষ্টিয়া এলাকায় আমরা মুক্তিফৌজের জিপে চড়ে ঘুরেছি। প্রাগপুর থেকে ভেড়ামারা [illegible] মাইল, ভেড়ামারা থেকে কুষ্টিয়া [illegible] মাইল। কখনও হাঁটাপথে ধানক্ষেত পেরিয়ে, কখনও মেঠো পথে জিপে ধুলো উড়িয়ে আমরা এগিয়েছি। সোজা সড়কের এখানে সেখানে তখনও অবরোধ। বন্ধ। পথে যেখানে লোক দেখেছি, থমকে দাঁড়াতে হয়েছে।
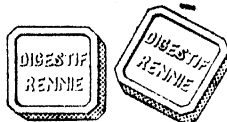
ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে হয়েছে, জয় বাংলা।

কুষ্টিয়া শহর তখন মুক্তিফৌজের দখলে। ওয়ারলেস স্টেশন, রিজারভড পুলিস সেনটার, সব কটা থানা মুক্তিফৌজের আওতায়। জেলা স্কুল, পুলিস লাইন, ডাকবাংলো, ওয়ারলেস হেড কোয়ারটার যেখানে যেখানে জঙ্গীশাহী ফৌজ আস্তানা গেড়েছিল, মুক্তিসৈন্যরা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। বীরবিক্রমে লড়াই করে ওদের নিঃশেষ করেছে। ঘরের দেওয়ালে বুলেটের দাগ, এখানে-ওখানে চাপচাপ রক্ত। জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া ঘরবাড়ি, বোমা আঘাতে বিধ্বস্ত বোবা নগরী। কিন্তু না এসবই যুদ্ধোত্তর একটা পরিস্থিতি। আমরা চাইছিলাম, ঠিক অ্যাকশন চলছে, এমন একটা জায়গায় যেতে।

*

সুযোগ এলো কিন্তু তার দুদিন পর। ৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার। ভেড়ামারার কাছে পদ্মার পাড়ে হারডিনজ ব্রিজের তলায় হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল আনন্দবাজার পত্রিকার সুখেন্দু রায় চৌধুরীর সঙ্গে। আমি পাকশি হয়ে পাবনার পথে—উদ্দেশ্য রাজশাহী যাওয়া। রাজশাহীতে তখন তুমুল লড়াই চলছে। সুখেন্দু বললো, ওর ইচ্ছে ঢাকা যাবে। আমরা একই সঙ্গে পায়ে হেঁটে হারডিনজ ব্রিজ পেরোলাম। সঙ্গে রাজামিয়া। প্রায় দেড় মাইল দুরত্বের ব্রিজটা পার হতে আমাদের বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট লাগলো। সারা ব্রিজের (হারডিনজ ব্রিজের অপর নাম) উপর থেকে পদ্মার শোভা যে কী অপরূপ! আমার চোখ জুড়িয়ে গেল।

পাকশি পৌঁছোতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। চারদিকে ব্ল্যাক-আউট। সুখেন্দু অন্য পথে চলে গেল, আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছা-সেবককে নিয়ে। রাজামিয়ার সঙ্গেই পাবনা শহরের দিকে জিপ নিয়ে ছুটলাম। আমার ঘড়িতে তখন ছটা দশ, কিন্তু রাজামিয়ার ঘড়ি তখন সময় বলছে ছটা চল্লিশ। আমিও পাকিস্তানের সময়ের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নিলাম।

আমরা কিছু দূর এগিয়েছি হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো। (পরে জেনেছিলাম, এ সাইরেন মুক্তিফৌজের সৈন্যরাই বাজিয়েছিল।) মাথার উপর দিয়ে দুদুটো জঙ্গী বিমান—রাজামিয়া বললেন, স্যাবার জেট, উড়ে চলে গেল। কিছু দূরেই দুমদুম বোমার আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর কড়কড় একটানা মেশিনগানের শব্দ। পালটা জবাব মেশিনগানের। রাজামিয়া, সঙ্গে মুক্তিফৌজের একজন সৈনিক হাতে রাইফেল, বুকে টোটার কেস, সারাক্ষণই যে আমাদের সঙ্গে ছিল, আমাকে নিয়ে একটা শিবিরে গিয়ে ঢুকলেন।

কুষ্টিয়া মেহেরপুরে এস ডি ও'র বাংলোয় বসে লেখক (ডানদিকে) আওয়ামী লীগ নেতা আবজালুর রশিদ এবং শাহিদুল্লার সঙ্গে বাংলা দেশের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে শুনছেন। এ ছবি ৩১ মারচ তোলা চিত্র—অলক মিত্র

ওখানে হারিকেনের অস্পষ্ট আলোতেও দেখলাম সারি বেঁধে পজিশন নিয়ে রয়েছেন মুক্তিফৌজের সৈনিকরা সতর্ক চোখের চাহনি। জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা। কারও হাতে ৩০৩ রাইফেল, কারও আবার হাতে মেশিনগান, মরটার। আমরা পেছনের রাস্তা ধরে ঢুকেছিলাম। তাই দেখতে পাইনি। সামনের দিকে পদ্মার পাড় ঘেঁষে একটা জঙ্গলের মধ্যে থেকে তখন মুহুর্মুহু গুলি ছুটছে এদিককার রাস্তা লক্ষ্য রেখে আবার পালটা শব্দ, পালটা আক্রমণ। ই পি আর ক্যাম্পের একজন সৈনিক (তার

যশোর শহর ঘিরে রেখেছে মুক্তিফৌজ — চিত্র : বিজন ব্যানার্জি

নাম জিজ্ঞেস করতে পারিনি। রাজামিয়াও জানেন না। রাজামিয়াকে বললেন, পাবনা শহর থেকে সৈন্যরা রাজশাহীর দিকে ছুটে যাচ্ছে। রাজশাহীতে তখন তুমুল লড়াই চলছে। আর যাবার আগে এই আক্রমণ। পাবনা দুদিন আগে থেকেই কিন্তু মুক্তিফৌজের দখলে। শেষ যে ক'জন সৈন্য ছিল, তারাও নিরুপায় হয়ে এভাবে রণে ভঙ্গ দিচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ এবং গুলি বিনিময়। সূচীভেদ্য ঘন অন্ধকার। সামনের জিনিসও দেখা যায় না। সে অন্ধকারের মধ্যেই মাঝে মাঝে ক্যাম্পের সৈনিকদের চাপা নিঃশ্বাস, ইশারায় কথা বলা। প্রায় তিন মাইল দূরে যুদ্ধ চলছে, কিন্তু এতদূরে থেকে মুক্তিফৌজের ক্যাম্প-এ বসেও আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার অবস্থা। কানের কাছে মুখ এনে একবার রাজামিয়া ফিসফিস করলেন, আর ইউ অ্যাফ্রেড ইয়ংম্যান? এ গোটা তল্লাটই এখন আমাদের। এদিকে আসতে ওরা সাহস করবে না।

পরে আরও অনেক পরে প্রায় মধ্যরাত্রে হার্ডিনজ ব্রিজ পেরিয়ে আমরা পাকশি থেকে ভেড়ামারা ফিরলাম। আমাদের সামনে গারড, পেছনে গারড। এ পাড়ে ব্রিজের তলায় অন্ধকারে শুধু সারি সারি মানুষের মাথা। বুটে ঠকঠক শব্দ তুলে মুক্তিফৌজ সৈনিকরাই আমাদের আগমনের কথা বলে দিলো। ওরা মুক্তিসৈন্যরা এ পাড়ে তখন সকলেই পজিশন নিয়ে। তাদের পাশ কাটিয়ে রাজামিয়ার জিপ, যেটা পার হবার সময় আমরা এ পাড়ে রেখে গিয়েছিলাম, আবার চললো ভেড়ামারার পথে—রাজামিয়ার বাড়ির দিকে।

সেদিন সারারাত জেগে রাজামিয়ার বাড়ির তিনতলার ঘরে বসে আমি প্রেস ম্যাটার টাইপ করেছিলাম (টাইপ রাইটার রাজামিয়ার বড় মেয়ে জাবেয়া, রাজশাহী কলেজের বি-এ ফাইনালের ছাত্রী, এনে দিয়েছিল। পরে জেনেছিলাম, ও টাইপরাইটার রাজামিয়ার নিজের) আর ভোর হতেই বরডার পেরিয়ে শিকারপুরের পোসট আপিস থেকে আমার ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলাম।

✻

তিরিশে মারচ থেকে বারই এপরিল, এই চোদ্দ দিনে আমি বাংলা দেশের বহু জায়গায় ঘুরেছি। কখনও পায় হেটে, কখনও রিক্‌শ চড়ে। কখনও আবার আওয়ামী লীগের জিপে চড়ে। কখনও বেতাই বরডার হয়ে মেহেরপুরের পথ ধরে কুষ্টিয়া। কখনও প্রাগপুর হয়ে ভেড়ামারা দিয়ে সারা ব্রিজ পেরিয়ে পাকশি পাবনার পথে। কখনও জলংগী হয়ে পদ্মা পেরিয়ে রাজশাহীর দিকে। আবার কখনও বেনাপোল-পেট্রাপোল ধরে যশোর-খুলনার দিকে। গোটা বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সে কী মনোবল! সত্য প্রত্যয়। ওরা সকলেই সৈনিক। কীভাবে লড়াই করে চলেছে। প্রত্যেকেই যেন আজ এক একটি মুজিবুর রহমান। ওদের প্রতিজ্ঞা, যতদিন না বাংলা দেশ স্বাধীন হচ্ছে, একটি লোকও বেঁচে থাকা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। পুরুষ-নারী, শিল্পী শ্রমিক-কৃষক, উঁচু তলার, নীচু তলার মানুষ সব স্তরের সকল মানুষ আজ এ সংগ্রামে হাত মিলিয়েছেন। ওদের সাথে আমি নিজেও মিশে গিয়েছিলাম। আমিও সৈনিক হয়ে গিয়েছিলাম। যুদ্ধকালীন বর্তমান বাংলার ছবি সুন্দর তুলে ধরেছেন এ যুগেরই নতুন এক মুসলমান কবি দেওয়ান আলোয়ার মুরশিদ। যে কবিতা আজ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে। সেটা দিয়েই লেখা শেষ করছি—

আবার রাজপথ জেগে উঠলো
ধরে বিধরে চাক চাক রক্তের
কালো পিণ্ড নিয়ে।
বাংলার স্বপন যে রক্তে যুদ্ধের
শিরায় মিশে নিয়েছিল জন্ম।
নীলক্ষেত পলাশীর সন্ধ্যাকালে আমতলা
মেডিকাল, নিভৃত পল্টন আবার
হতে চায় পলাশী।
রোদ রোদ জীবনের স্বাক্ষর নিয়ে
লিখে গেল যে বাঞ্ছিত হৃদয়ের
বদলাতে।
সেখানে আরও এক দোয়াত কালি
রেখে দিলাম আগামী নাগরিকের
জন্য!
লেখা হোক অ, আ, ই, ঈ আমার
মায়ের হৃদয়ে।
আপামর বাংলার মানুষের
গরম গরম রক্ত দিয়ে।

বুলবুল

ওর নাম বুলবুল। সেই নামেই সবাই জানে। আর জানেও যে অনেক লোক। বাঙ্গালী-মহলে বুলবুলকে সবাই সমাদর করে। সমাদর করে শুধু সুন্দরী

বুলবুল

বলে নয়। সুন্দরী সে সত্যিই। সহস্র মানুষের সমাগমে চট করে আপনার চোখ চলে যাবে ওর উপর। ঠিক বাগিচার বুলবুলি নয় কিন্তু। বরং বলতে পারি নীলোৎপলবপলতা। আমারও সেদিন ওকে এমনি করেই চোখে পড়েছিল। ফুটফুটে তন্বী কিশোরী। পরনে ঢাকাই শাড়ি। নিমন্ত্রণ বাড়ি। সব সাজসজ্জা, সব চমক ছাপিয়ে মধুর মূর্তিখানা। আমি কি জানি ও বঙ্গের বধূ? পরিচয় করিয়ে দিলেন গৃহকর্ত্রী, মিশরের রাজদূত পত্নী। নাম শুনে আর পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মচারীর ঘরণী বলে আমার শিয়ালদহ স্টেশনের মুটে মার্কা হিন্দী উর্দুতে বাক্যালাপ আরম্ভ করতে যাচ্ছি। বুলবুল বললেন 'আরে আমি যে বাঙ্গালী!' তারপর আলোচনা চললো বাংলা সাহিত্যের। পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নূতন ধারার। দেখলাম বঙ্গের বধূটির বুক ভরা মধু। কি দারুণ আগ্রহ আর আবেগে সে ভাষাকে ভালবাসে, দেশকে ভালবাসে।

সেদিনের বুলবুল আমাদের আর একবার অবাক করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতে রাজনৈতিক কারণে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন পাকিস্তান হাইকমিশনের সহকারী প্রেস অ্যাটাসে আমজাদুল হক ও কে সাহাবুদ্দিন। সাহাবুদ্দিন সাহেব সেকেন্ড সেক্রেটারী। আমজাদুল হক অকৃতদার। সাহাবুদ্দিন সহধর্মিণী বুলবুল। কি-বা তার বয়স। বিশ বাইশ পেরিয়ে বড় বেশী দূর এগোয়নি। কিন্তু সে বর্তমান পূর্ব বাংলার নারী সমাজের প্রতীক—সাধারণ কিন্তু অসামান্যা। সবার সঙ্গে এক কিন্তু কোথায় একটু ভিন্ন। রূপসী কোমলা কামিনী অথচ অদম্য মাধুর্যে মেশানো দৃপ্ত তেজ ও অন্যায় আচরণে অসহিষ্ণুতা। প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এই রূপবতী কন্যা আবার বজ্রের মত কঠোরও হতে পারেন।

বুলবুলের ভাল নাম খুরশেদা। ছোট ছোট দুই মেয়ে রহনুমা আর ফরহানা। একেবারে শিশু তারা। দায়িত্ব তাদের কম নয়। শিশু দুটিকেও আদর করে ডাকেন এলোরা ও অজন্তা। যুগ যুগান্তরের ঐতিহ্যের কাহিনীকে বোধ হয় স্মরণ করতে চান সারাক্ষণ।

এবার পূর্ব বাংলার সংকটে বুলবুল বড় বিচলিত। প্রথম কথাই সে বলেছিল, আমার বাবা মা ভাই বোন কেউই আর বেঁচে নেই। কেন? কি করে সংবাদ পেলেন? সংবাদ কি পাবার দরকার হয়? সংশয়ের সম্ভাবনাটুকুও নেই। বাড়ি আমাদের মুজিবুর রহমান সাহেবের পাশে। নিষ্ঠুর বর্বর মানুষ সে বাড়ির চিহ্নটুকুও রাখেনি। আমার বাবার বাড়ি বাকি থাকবে কি করে?" বুলবুলের ছোট ছোট তিন বোন, এক ভাই, সবাই-ই বোধ হয় ট্যাঙ্কের তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে। তাই বুলবুল আরও কঠিন, আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে উঠেছে। স্বামী বলেছিলেন মন স্থির করতে হবে বুলবুলকে। উচ্চ রাজকর্মচারীকে বরণ করেছিল একদিন, মা হয়েছে দুটি শিশুর। ভবিষ্যতের ভালমন্দের ভাবনার ভার তার। তার হাতে বিচার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত স্বামী। কিন্তু বুলবুলের সংকল্পে সময় লাগেনি। বাংলার মেয়ে বাংলার জন্য বাংলার মাটির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছে তার স্থিরীকৃত কর্ম। সেই মাটি, যে মাটিতে জন্মেছিল রোশন আরা বেগম। শুনেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্টালিনগ্রাডে এমনি করে আহুতি দিয়েছিল প্রাণ রুশ রমণীরা। এমনি করে মাইন বুকে বেঁধে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিধ্বংসী ট্যাঙ্কের উপর। বলিদানের এ কাহিনী অমর হ'য়ে আছে। হয়তো কুমিল্লার রোশন আরার মত শত সহস্র বাংলার মেয়ে তেমন করেই অমর হয়ে

(সি ২১৯১/১)

যাবে। জানি না জয়-পরাজয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কিনা ইতিহাসের উদ্ভবকাল।

খালেদার শ্বশুরবাড়ি চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের খবরও সে আমাদেরই মত সংবাদপত্রের সাহায্যে বা রেডিওতে শুনেছে। আর তো সব অন্ধকার। বিদেশী কাগজ লিখছে পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় শহর চট্টগ্রাম এখন মৃত শহর। পালিয়ে আসা বিদেশী বলছেন, "I saw army trucks stop and question Bengalis and then the brrr of automatic fire and they would be on the ground." এতো খবরের টুকরো মাত্র। এমন কত সংবাদ আসছে, তার সীমা নেই। শ্বশুরকুল, পিতৃকুল সবার খবরই ঐ একভাবে আসছে। বুলবুলের কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। তাই তার প্রতিজ্ঞা দেশের জন্য যথাসাধ্য করবে। ভারতে আশ্রয় ভিন্ন তা আর সম্ভব না। ঐসলাম বাদ যাবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে। তার আগেও জীবন ছিল দুঃসহ। কড়া নজরে রেখেছিলেন তাঁদের পাকিস্তান হাই-কমিশন। বুলবুলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই সম্ভব করেছে তাদের কঠিন সংকল্প। সে যে সবদিক ভাবেনি তা' নয়। এমনও হতে পারে যে জীবনে আর সোনার জন্মভূমিতে ফিরতে পারবে না। কিন্তু সাহস আছে তার। জন্মভূমিকে ভালবাসতে হলে এরকম সাহসেরই দরকার হয়েছে যুগে যুগে।

যে রাজত্ব শতকরা ৯৮ জনের সমর্থনকে অস্বীকার করে হাসপাতালের রোগী, বিদ্যালয়ের শিশু, গৃহকর্মরত ঘরণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নির্বিশেষে তরুণী সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে শেষ করে দিতে দ্বিধা করে না, সে রাজত্ব অন্তত বুলবুলের মত মেয়ের স্বীকৃতি পায় না। পূর্ব বাংলার নূতন যুগের নারী জেগেছে নূতন প্রেরণায়। ওরা অন্যায় সহ্য করতে নারাজ। প্রাণ যায় তাও স্বীকার। মেয়েদের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়েছে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে বলে। কে জানে সেই Women's Voluntary Militiaরা কোথায়, কজন তারা বেঁচে আছে, কজন প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে অকাতরে।

একবার আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম এক পাঁড় ইংরেজ রাজকর্মচারী বলেছিলেন পূর্ব বাংলার বিপ্লবের পিছু পূর্ব বাংলার মেয়েরা। এখন কারো ... সংসারের জননী জাগিয়ে দেন সন্তানের বুকে অন্যায়ের প্রতি অপার ঘৃণা। তা থেকে জন্ম নেয় বিপ্লব। তা সে যেরকম বিপ্লবই হোক। সে যুগে তারা মেয়েরা সাক্ষাৎ সমরে সামিল হবার সুযোগ কতটুকুই বা পেতেন। দিতেন প্রেরণা, সঞ্চার করতেন অনুপ্রেরণা। তার সঙ্গে নতুন যুগের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ যুগে তারা অস্ত্র ধরতে জানে, প্রাণ দিতে জানে আর জানে বুলবুলের মত বলিষ্ঠ হাতে মনোবল যোগান দিতে।

*

সম্প্রতি এক রকফেলার সাহেব প্রচুর পয়সা খরচ করে কিশোর বিদ্রোহের কারণ গবেষণায় নিযুক্ত করলেন যাঁকে তাঁর নাম George Paloczi Horvath। তিনি বিশ্বের বিদ্রোহী তরুণদের সঙ্গে কাটালেন নানাভাবে। গবেষণার শেষে বই লিখলেন Youth Up in Arms.

—বইখানা বেশ। তবে তাঁর বক্তব্য নূতন নয়। মহিলা মুক্তি সংগ্রাম, নিগ্রো জাতির বিদ্রোহ ইত্যাদি যেমন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ঠিক তেমনই কিশোর বিদ্রোহ প্রাপ্তবয়স্কের আচরণের প্রতিবাদ। বিদ্রোহীরা কেন কি করছে ভাবতে গেলে দেখতে হবে যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাদের কোথায় গলদ। সেইটাই গোড়ার কথা। তারপর তার ফলস্বরূপ বিদ্রোহের লক্ষণগুলির প্রশ্ন ওঠে।

শ্রীমতী

বহুবিবাহ প্রথা, সমাজের কিছু কিছু অংশে যা এখনও অনুসৃত হয়ে থাকে। ফসেটর তাঁর নোটে জানাচ্ছেন, বহুবিবাহ প্রথা জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সহায়ক নয়। কিছু লোক অনেকগুলো ক'রে বউ ঘরে তুললে, আর-কিছু লোকের বউয়ের বাজারে ঘাটতি পড়বেই—তাদের বাধ্য হয়ে থাকতে হবে চিরকুমার-সভার লাইফ-মেম্বার। তাছাড়া পুরুষের বহুবিবাহ নাকি কন্যা সন্তানের জন্মহার বাড়িয়ে দেয়। ফসেটর অনুমান করেন নায়ার রমনীদের একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘর করার প্রথাটাও সেই সঙ্গে চালু থাকায়, তার ফলে নায়ার-সমাজে পুত্র-সন্তানের জন্ম হয় বেশি। দুইয়ে মিলিয়ে বজায় থাকে ভারসাম্য।

"অপূর্ব সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা দেখেছি কিছু ..." ফাদার পাওলিনো বলেন। ব্রাহ্মণ-রমণীরা হাতে তালপাতার ছাতা নিয়ে পথ হাঁটেন, পথচারী পুরুষের সম্মুখীন হলে সেই ছাতার আড়ালে মুখ ঢাকেন। কিন্তু না ... কৌতূহলের অভাব নেই এতটুকু, ওটা শুধু লজ্জার ভঙ্গি, যেই আপনি পেরিয়ে এলেন, অমনি উনি পিছন ফিরে আপনাকে দেখবেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ভারতীয় রমণী যতই লজ্জাশীলা হোন, বিশ্বজোড়া নারী জাতির যে কৌতূহলী স্বভাব সর্বজনবিদিত, তা থেকে এঁরাও মুক্ত নন।

অমনি উনি পিছন ফিরে আপনাকে দেখবেন

আঁকেতিল এখানে ফাদারকে একটু ঠুকতে ছাড়েন না : আপনার ঐ ধবধবে সাদা মুখটার উপর অমন লম্বা-চওড়া কালো কুচকুচে দাড়ি নিশ্চয়ই আপাঙ্গে দেখে মেয়েরা আরেকবার তো ভালোমতো দেখবার জন্য ফিরে তাকাবেই! এর জন্য আবার রমণী-জাতির সর্বজনীন স্বভাব বৈশিষ্ট্যের তত্ত্ব-কথার দোহাই পাড়া কেন? ...

হিন্দু নারী পতিপ্রাণা, পতিকে সকল দুর্ভোগ-দুশ্চিন্তার আঁচ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সদাসচেষ্ট। যে-মেয়ে জানে, পতির মৃত্যু মানে তারও জীবনান্ত, পতিকে সুস্থসবল ও দীর্ঘায়ু রাখবার জন্য তার স্বাভাবিক প্রয়াস ও প্রবণতা তো থাকবেই। একমাত্র ক্ষত্রিয় বা রাজপুত রমণীদের মধ্যেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়ার রীতি বহাল আছে। এদের স্বামীরা যুদ্ধ ও রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকে আপন ভবন থেকে দূরে আর উপরন্তু রাজপুরীতে নানামুখী ষড়যন্ত্রের জাল সাধারণত পরিব্যাপ্ত, রমণীদের ক্ষেত্রে তাই পদস্খলনের সুযোগ থাকে বেশি। এইজন্যই কোনো ভারতীয় রাজা যখন মারা যান, তাঁর পত্নী ও উপপত্নীরা আগুনে পুড়ে মরে প্রমাণ করেন, রাজমৃত্যুতে তাঁদের কোনো হাত ছিল না। মরবার আগে তাঁরা বান্ধব পরিজনের হাতে তাঁদের মণি-রত্ন-অলংকার বিলিয়ে দিয়ে যান। সন্তান বা সন্তানবতী স্ত্রীলোকের অগ্নিতে আত্মদান নিষিদ্ধ, কেননা তার সন্তান তার পতিপ্রেমের প্রমাণ এবং সন্তানের জন্যই সে সমাজের চোখেও প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত।

ভারতীয় নরনারী

প্রধানত মালাবারীদের চরিত্রদর্পণেই ফাদার পাওলিনো ভারতীয় চরিত্রকে ধরবার চেষ্টা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। মালাবারীরা ওস্তাদ কৃষিবিদ, উদ্ভিদবিদ্যায় পারঙ্গম, গণিতশাস্ত্রে সুদক্ষ; বাগান করে নিপুণভাবে, শিকার করে জাত-শিকারীর মতো, উত্তাল ঢেউ পাড়ি দিয়ে মাছ ধরতে যায়, কাজে কর্মে তাদের জুড়ি নেই। সূর্যোদয়ে শয্যা ছাড়ে, সূর্যাস্তে শয্যায় ফেরে। গায়ে মাখে তেল, সুপুষ্ট গাত্র ত্বক স্বচ্ছ থাকে সতেজ। অবশ্য হিন্দুদের যৌবন মহিমা চূড়া ছোঁয় তিরিশে আর তারপরেই শুরু হয় ক্রম-অধঃপাত। সামগ্রিকভাবে হিন্দুরা চটপটে, কর্মতৎপর, কর্মকুশলী, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী—এবং মৃদু স্বভাবক। ভালোবাসে চিত্রধর্মী প্রকাশভঙ্গি কথা বলে সাজিয়ে-গুছিয়ে, সালঙ্কারে, সবিস্তারে। আপনাপন বিষয় ব্যাপার বিধিবন্দোবস্তের কালে তারা বড়ই ধীর-সুস্থির। এমন শান্তস্নিগ্ধ ও সর্বতোভদ্র প্রকৃতির জাত জগতে আর দুটি নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই নির্বিরোধী দিকটার প্রমাণ মেলে : হিন্দুরা প্রথম বাধিয়েছে এমন যুদ্ধের দৃষ্টান্ত বিরল; বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তবেই তারা অস্ত্র ধরে—আত্মরক্ষার্থে। "এ-দেশের

নানা প্রসঙ্গে

এদিকে তিনি যে টাটকা চোখে পূর্ব ধারণা অবলম্বন না ক'রে, ভারতকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন, কথাটা অবশ্যস্বীকার্য। ভারতের অনেক কিছু তাঁর প্রশংসা কেড়েছে, অনেক কিছুই তাঁর ভালো লাগে নি—কিন্তু গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা তিনি আন্তরিক-ভাবেই করেছিলেন। খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণের প্রয়াসও তাঁর গ্রন্থে লক্ষণীয়: জীবজন্তু পশুপক্ষীসম্ভার ও ঔষধাদি বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ফিরিস্তি দেন। সাপ দেখলে মোরগেরা কি করে, বলুন তো? কঁকর-ক শব্দে কুঁকড়ো-বাবাজি কুঁকড়ো-বিবিদের আর বাচ্চা কুঁকড়ো-মণিদের ওয়ার্নিং দিয়ে দেয়। তারপর ওরা গোল হয়ে সারি বেঁধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়—ঠিক যেমন, বাঘ দেখলে, ষাঁড়েরা বৃত্ত রচনা করে [লেজ কেন্দ্রের দিকে আর শিং-উঁচানো মাথাগুলো বাইরের দিকে রেখে] সেইরকম।

রাজা মারা গেলে মেছো পুকুরে বা দীঘিতে জেলেদের মাছ ধরা বারণ। নদীর মধ্যে নিষেধাজ্ঞার প্রতীকস্বরূপ একটা ডাণ্ডা পোঁতা থাকে আট দশ দিন পর্যন্ত। মৃতের আত্মা কোনো মাছের শরীরে গিয়ে ঢুকতে

পারে, নবীগুপ্ত' তাকে থিতিয়ে বসবার সময় দিতে হবে না?

অন্যদিকে দেখুন, মৃত রাজার বউ যদি সবর্ণ না হন, তাঁর ছেলে রাজার সিংহাসন পাবে না। পাবে রাজার বোনের ছেলে—কেননা সে ক্ষেত্রে রাজভগিনীই প্রকৃত রাণী-উপাধি ধরেন। ব্রাহ্মণ রাজারা অসম মিশ্র-পরিণয় করেন না; কাজেই তাঁদের পুত্রেরা বিনা বাধায় পিতৃ সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হন।

মেয়েদের সাদি হয় সাতে, বরের সঙ্গে মিলিত হয় বারোয়। স্বামী মারা গেলে পুত্রসন্তান না থাকলে সে তার যৌতুক নিয়ে বাপের বাড়ি ফেরে; আর থাকলে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কোনো কোনো নিম্নবর্ণের মধ্যে রীতি চালু আছে, বিয়ের সময় প্রধানের কাছে স্বামী একটি পাথর গচ্ছিত রেখে আসে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হলে সে ফেরৎ নিয়ে আসে পাথরটিকে। আর ফেরৎ আনা মানেই তালাক দেওয়া। তারপর বউকে বাপের বাড়ি চালান দিয়ে দেওয়া হয়। আরেক নিম্নবর্ণের রীতি অনুসারে বিয়ে হয় শুধু বড় ভাইয়ের, কিন্তু অনুপস্থিতিকালে অন্যান্য ভাইয়েরা বধূর সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

মেয়েদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র খুব সংকুচিত। রাজকর্মে ও রাষ্ট্র ব্যাপারে মেয়েদের অনুপ্রবেশ নিষেধ; তারা সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়াবার অনধিকারী। মেয়েরা নাকি পেট-আলগা, জিভ-আলগা—ও দুটিই তো প্রজ্ঞাক্ষয়করী। বেদ শেখানো হয় নি, ব্রাহ্মণেরা কখনো ভার্যার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন না। কেন, জানেন?...বউ যদি বদমাশ হয়, তবে বেজাত-বিধর্মীর কাছে ফাঁস করে দেবে; আর যদি ধীমতী হয়, পতিদেবকে প্রণাম জানিয়ে কেটে পড়বে!

মেয়েদের মাতৃরূপে মুগ্ধ হয়েছেন লেখক। ভারতীয় মেয়েরা সন্তানকে আপন হাতে মানুষ করাটাকে প্রকৃতিনির্দিষ্ট কর্তব্য বলেই মনে করেন। বাইরের হাতে বাচ্চা সঁপে দেওয়া তাঁদের কাছে নিষ্ঠুরতার শামিল। অশিক্ষিত, উটকো, মাইনে করা ধাত্রী আকারে-প্রকারে স্বভাবে-মেজাজে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের স্তন্যপুষ্ট শিশুরা বাপ-মায়ের থেকে ভিন্ন ধাত-চরিত্তির নিয়ে বেড়ে ওঠে। ফস্টের অবশ্য বলেন, ও-থিয়োরি য়ুরোপে অচল : সেখানে মেয়েরা নাচে-দৌড়ঝাঁপে তেতে ওঠে, ফের ঠাণ্ডা মেরে যায়; টক-নুন-মিঠে মিলিয়ে-মিশিয়ে তাদের আহারের মেনু। এমন মায়ের বুকের দুধে শিশুর স্বাস্থ্যের অপূরণীয় ক্ষতি ঘটে যেতে পারে। সুষম স্বাস্থ্যসম্পন্না নিস্তাপ ধাত্রীর স্তন্যই সেক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার

"...হিন্দুরা ধীরে-সুস্থিরে কাজ করে। য়ুরোপের পক্ষে এটাই এক মস্ত সুবিধা। ওরা যদি দ্রুতগামী হত, ওদের পণ্যসামগ্রী আমাদের বাজার প্লাবিত ক'রে দিত, শুষে নিত যেটুকু সম্পদ আমাদের এখনো আছে। ওদের তুলো আমাদের লাগে; আমাদের পশমে ওদের কোনো প্রয়োজনই নেই।"

এদিকে "বিজ্ঞান ও শিল্পকলা আমাদের কাছে এসেছে এশিয়া থেকেই; সেগুলিকে শুধু পূর্ণাঙ্গ-পরিণত করার কৃতিত্ব আমাদের। কলা ও বিজ্ঞানে মানুষকে প্রণোদিত করার জন্য চাই হৃদনুকূল আবহ ও পরিস্থিতি : একটানা পরিশ্রমের উপযোগী শীতল জলবায়ু, উচ্চাশা, লোভ, বিলাস-ব্যসনের তৃষ্ণা, নূতনত্বের প্রতি আগ্রহ, পুরস্কারের উদ্দীপনা। ইত্যাদিকার প্ররোচনা ও প্রয়োজনে আমরাই বেশি ক'রে ভুগি—এশিয়ার মানুষের চেয়ে। তাই আমরাই যে ওদের চেয়ে শিল্পাদি বিষয়ে অধিক অগ্রসর হয়েছি এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।"

গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে পাকানো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন : "কর্মক্ষমতায় ও বলবীর্যে য়ুরোপীয়েরা শ্রেষ্ঠ। এশিয়রা উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক গুণাবলীতে, ধীরতায়, সহিষ্ণুতায়, মানবিকতায়।"

সাতচল্লিশ

রত্ন জানত 'আপস' বলতে কী বোঝায়। রণজিতই ওর কানে মন্ত্র দিয়েছিল। গৌরী আর আগের মতো প্রতিরোধ করে না। যা করে তার নাম নিরোধ। ওর অসিধার ব্রত অচল। চললে সেটা অতি অমানুষিক হতো।

রত্ন এর জন্যে ওকে দায়ী করে না। বরং আপনার ঘাড়েই টেনে নেয় সব দায়িত্ব। সময়ে সফল হলে গৌরীকে ও মুক্ত করে নিয়ে যেত, তা হলে তো এ প্রশ্ন উঠতই না। কিন্তু খুঁচিয়ে ঘা করলে কার না মেজাজ বিগড়ে যায়? চতুরীকে রত্ন সাধতে যায়নি। কোনোদিন ওর সঙ্গ কামনাই করেনি। যে নারী অনাহূতভাবে শয্যায় এসেছে তার সঙ্গে অসিধার ব্রত উদ্‌যাপন করলে সেও একটা মুনি কি ঋষি হতো, তা ঠিক। কিন্তু মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। সেকালের মুনি ঋষিদের দৌড় তো দেখা গেছে। গৌরী তা হলে কেন ওকে খোঁচা দেয়? ও নিজে কী করছে?

এই হলো যুক্তি। কিন্তু যুক্তিটার কঠিন হলো এইখানে যে, কোনো প্রেমিকাই কোনো প্রেমিকের অন্যত্র সংসর্গ সহ্য করতে পারে না। তেমনি কোনো প্রেমিকই কোনো প্রেমিকার। বিশ্বাসভঙ্গ একবার যদি ঘটে তবে তার ধাক্কা সামলে ওঠা দায়। গৌরী ক্ষমা করলেও ভোলেনি। সে তো রত্নকে চোখে রাখতে পারছে না। ও ছেলে কখন কার পাল্লায় পড়ে কে জানে! তাই ওকে একটু সমঝিয়ে দিতে হয়। সমঝিয়ে দেওয়া কি খোঁচা দেওয়া?

রত্নও কি খোঁচা দিতে চেয়েছে নাকি? আঘাতের উত্তরে আঘাত দিয়েছে। কিন্তু সে আঘাত এমন আঘাত যে গৌরীর কাছে যেন আঁতে ঘা। প্রেমের অমর্যাদা করল কে, না গৌরী? প্রেমে যার মনপ্রাণ আত্মা ভরে আছে। দেহটাই শুধু বাকী। কী করবে, সে তো স্বাধীনা নয়। স্বাধীনা হলে মন প্রাণ আত্মার সঙ্গে দেহও ভরে দিত প্রেমে। এখন রত্নকে একথা বোঝাবে কে? স্বাধীনা ও পরাধীনার প্রভেদ ও বোঝে না। স্বাধীনা হলে ওকে কারো সঙ্গে আপস করতে হতো না। পরাধীন বলেই আপস করতে হচ্ছে। ওটা ওর দুর্বলতার দরুন নয়। রত্ন কিন্তু যেটা করেছে সেটা দুর্বলতার দরুনই। সে তো পরাধীন নয়। এই যে বৈষম্য এটা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?

রত্ন আর গৌরী দুজনেই বৈষম্যসচেতন। তার থেকে আসে সাম্যের প্রশ্ন। রত্নর মতে গৌরী যদি প্রেমের অমর্যাদা না করে থাকে তবে রত্নও করেনি, ভবিষ্যতে আবার অমন কিছু ঘটলে সেটাও প্রেমের অমর্যাদা হবে না। রত্নর বেলা যদি ওটা হয় দুর্বলতা তবে গৌরীর বেলাও কেন দুর্বলতা নয়? দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কী চেষ্টা সে করছে?

ওদিকে গৌরীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে ও যা করছে তার সঙ্গে সাম্য রক্ষার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। রত্ন যদি তার অনিচ্ছা সত্ত্বে বিবাহিত হতো তা হলেই স্ত্রীর সঙ্গে আপস করে সাম্য রক্ষা করত। রত্ন তো কুমার। চতুরী তো ওর কেউ নয়। যা ঘটেছে তা তো অনিচ্ছা সত্ত্বে নয়। দুর্বলতা। নিপট দুর্বলতা। পুরুষ জাতটাই কি দুর্বল?

রত্ন মনে করিয়ে দেয় যে গৌরীও তো কুমারী বলে দাবী করে। তার বিবাহ তো সে স্বীকারই করেনি। আপস করছে কোন যুক্তিতে? মেয়েদের যদি যুক্তির বালাই থাকত! যারা যুক্তির ধার ধারে না তাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

এমনি করে কথায় কথা বেড়ে যায়। নিষ্পত্তি হয় না। শেষে গৌরী কান্নাকাটি করে। মেয়েদের মোক্ষম অস্ত্র। রত্নও কথা দেয় যে আর অমন কিছু করবে না। গৌরীর জন্যে সবুর করবে। যাতে বেশী-দিন সবুর করতে না হয় তার জন্যে একটু চেষ্টাচরিত্র করবে। একটা সুযোগ যদি হাতছাড়া হয় আরেকটা যেন মুঠোর মধ্যে থাকে। তা যদি না হয় তবে আরো দেরি হবে। তার মানে আরো আপস করতে হবে। গৌরীর পক্ষে সেটা অস্বস্তিকর। সেও মানে যে একজনের সঙ্গে প্রেম ও আরেক-জনের সঙ্গে সহবাস কোনোজনের উপরই সুবিচার নয়।

তার স্বামী কিন্তু এই নিয়ে কিছু বলেন না, তাঁর পলিসি হলো গৌরীকে ধরে ধরে রাখা। অন্তত যতকাল না তার

করে শোনাবার মতো? আর কতদিন কাটবে গোপনে প্রেমপত্র লিখে? দেখা-সাক্ষাৎও আর হয় না। স্কুলে সেটাও বন্ধ, বা ভাই সুবাদে। তা হলে সেই সুবাদটাকে বরাবরের মতো মেনে নেয় না কেন? কে স্বপ্ন দেখে আরো অন্তরঙ্গ সুবাদের? কবে সফল হবে সে স্বপ্ন?

ত্রয়ী কথাটা একবার যদি মাথায় ঢুকল তো আর বেরোতে চায় না। না, আর দুই নয়। দুইয়ের যুগ গেছে। ত্রয়ীর যুগ এসেছে। গোরী এখন একটি ত্রয়ীর অংগ। ত্রয়ী না ভেঙে সে রঞ্জুর হতে পারে না। রঞ্জুও তার হতে পারে না। ওদের তিনজনের চালচিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে রঞ্জু তার মধ্যে ঠাঁই পেতে পারত, কিন্তু সেটা যেন সিংহ-বাহিনীর পায়ের তলায় সিংহের মতো। ওর পক্ষে ওটা অমর্যাদাকর। ওর প্রেমের পক্ষেও।

ভিতরে ভিতরে ওর পৌরুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল। পৌরুষ বলতে পুরুষের সত্তাও বোঝায়। রঞ্জু দিন দিন ইস্তক সচেতন হয়ে উঠছিল। প্রেমের জন্যে পুরুষ কি তার পৌরুষ বিসর্জন দিতে পারে? কিংবা পৌরুষকে খাটো করতে

জানে। গৌরীকেও জানতে দেয় না।

এমনি করে শুরু হয় সত্যের সংকট। গৌরীর কাছে সত্যরক্ষা করতে হবে, নইলে বিশ্বাস কতদিন থাকবে? তেমনি বাপ-খুড়োর সঙ্গে সত্যরক্ষা করতে হবে, নইলে তাঁরাই বা বিশ্বাস করবেন কতদিন! সকল সম্পর্কই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস চলে গেলে সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়। রত্ন কি সেটা সইতে পারবে?

অপর পক্ষে সত্যরক্ষা করাও সহজ কথা নয়। তারও ঝুঁকি আছে। বাবা বলবেন, গৌরীর সঙ্গে এখন থেকে আর কোনো সম্বন্ধ রাখিসনে। রত্ন বলবে, আমি যে অঙ্গীকারবদ্ধ। একটি বিপন্ন নারীকে বিপদ থেকে মুক্ত না করে আমারও মুক্তি নেই। বাবা কি সেটা স্বীকার করবেন? সহ্য করবেন? মনোমালিন্য অপরিহার্য।

সত্যের সংকট ক্রমে ঘনিয়ে আসে। রত্ন বুঝতে পারে যে গৌরী তার সখীদের বিশ্বাস করে যা জানিয়েছে আর রত্ন জানিয়েছে তার সখাদের আর মামাদিকে, তার কিছুটা বিকৃত হয়ে কুৎসায় পৌঁছেছে। বিকৃতকে সংশোধন করতে হলে প্রকৃতকে অনাবৃত করতে হয়। তাতে আবার অপর একটি পরিবারের সম্মান হানি ঘটে। যশোবাবু সমাজে অপদস্থ হন। আর গৌরীরও বিপদ বেড়ে যায়।

কী ফ্যাসাদ! নিজের বল না বুঝে আরেকজনকে বাঁচাতে গেলে দুজনেই ডুবে মরে, এমন তো অনেক সময় ঘটে। এটাও কি তারই মতো নয়! অথচ আরেকজনকে ডুবতে দেখেও জলে নামতে কুণ্ঠিত হয় যে জন সে কি মানুষ নামের যোগ্য! মানুষের ধর্ম মানুষকে বাঁচানো। যায় যাক প্রাণ।

গৌরীর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে রত্ন যা করেছে ঠিকই করেছে। মানুষ হিসাবে সে নেমে যায়নি। নেমে যেত যদি বিপন্ন নারীর ডাকে সাড়া না দিত। অপর পক্ষে এটাও তো ঠিক যে পিতার কাছে অপরাধী হয়েছে। মিথ্যা বলেছে। পরে একদিন ধরাও পড়বে। তখন কি আর মুখ দেখাতে পারবে। তাঁর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ!

মনের যখন এইরূপে বিভ্রান্ত অবস্থা তখন গৌরীর কাছ থেকে চিঠি আসে, ওরা বহরমপুরে যাচ্ছে, সেখানেই বসবাস করবে। রত্ন কি কোনোদিন ওদিকে যাবে না?

সামান্য একটা প্রশ্ন। কিন্তু সামান্য থেকে অসামান্য জন্মায়। দেখতে দেখতে বচসা বেধে যায়। সেটা যে পূর্ব পরিকল্পিত তাও নয়।

"বহরমপুরে একটা পাগলা গারদ আছে শুনেছি। সেইখানেই যেতে হবে একদিন। সেটা আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি, গৌরী।" রত্ন উত্তর দেয়।

"কেন, তুই কি পাগল? কার প্রেমে পাগল? প্রেমে না কামে?" গৌরী কটাক্ষ করে। ওর মনেও তো একটা জ্বালা আছে।

"সে জন্যে নয়। আমাকে জ্বালাতন করছে অন্য এক সমস্যা। আমি কি সব কথা খুলে বলব আমার বাবাকে? তোরও খুলে বলা উচিত তোর স্বামীকে। সত্যের সঙ্গে মোকাবিলা করে আমরা বাঁচি তো বাঁচব, মরি তো মরব। ভাসি তো ভাসব, ডুবি তো ডুবব। ডুবে ডুবে জল খেয়ে আর কতদিন বাঁচা যায়!" রত্ন লেখে।

"খবরদার! কোনো কথা অসময়ে প্রকাশ করিসনে। করলে ঝগড়া করব। বল তোরই দোষ। তুই-ই আমাকে ভজিয়েছিস তুই-ই আমাকে মজিয়েছিস।" গৌরী শাসে।

"আমি তোকে ভজাবই বা কেন, আর মজাবই বা কেন? তোর কি মাথা খারাপ? না মুখ খারাপ? অমন ইতর ভাষায় কী তুই বোঝাতে চাস?" রত্নও পাল্টা বাণ হানে।

"কী! আমি ইতর, না তুই ইতর? ইতর স্ত্রীলোকের সংসর্গে ইতর!" বলে গৌরী আহত ফণিনীর মতো ছোবল মারে।

প্রেমের ওটাও একটা স্তর। ওই পারস্পরিক দোষারোপ। রত্নও পাল্টা বলতে পারত যে গরিব হলেই ইতর হয় না, বড়লোকরাও ইতর হতে পারে, কিন্তু বলে না।

[আগামী সংখ্যায় শেষ]

Lakmé
মুকুতা-শুভ্র
দীপ্তি
ল্যাকমে ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে

সৌর-ঝটিকা বা 'সোলার-উইণ্ড' সম্পর্কে দুই দশক আগেও যে বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীদের হাজারো প্রশ্নজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, মহাকাশে ভাসমান গবেষণাগার এবং চাঁদের বুকে স্বনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষক-যন্ত্র স্থাপনের পর একে একে তারা উদ্ঘাটিত হতে চলেছে। অত্যন্ত হাল্কা এবং উষ্ণ সৌর-কণিকার মিশ্রণে তৈরি বিশেষ ধরনের ঐ বাতাস, যার মূল উপাদান হাইড্রোজেন, সৌরমণ্ডলের সর্বত্র নিয়ত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ঐ বায়ুমণ্ডল মুখ্যত সূর্যের জ্যোতিচ্ছটা বা 'করোনা'রই সম্প্রসারিত পরিমণ্ডল।

অণুকেন্দ্রিক-সংঘুতি বা নিউক্লিয়ার ফিউসন পদ্ধতি আমাদের নিকটতম জ্যোতিষ্ক সূর্যের অভ্যন্তরে যে অপরিমিত তাপ-শক্তির সৃষ্টি করে, তার সঠিক পরিমাণ গবেষকদের কাছে আজও পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটনের মুখ্য ভূমিকা যার উপর ন্যস্ত সেই বেতার দূরেক্ষণের শ্যেন দৃষ্টির পক্ষে সূর্যের বাইরের পরিমণ্ডল, যার নাম সৌরচ্ছটা, তাকে যথাযথভাবে উপেক্ষা করে আরও গভীরে, আরও কেন্দ্রের কাছাকাছি পর্যবেক্ষণ চালান একান্তই দুষ্কর। কিন্তু একটি রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজ একমত। সেটা হল, সৌরমণ্ডলের সর্বত্র একটা প্রবল ঝড় বয়ে চলেছে। সাধারণ বাতাস বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প প্রভৃতির সংমিশ্রণ, ঐ ঝড় তেমন কোন বায়ুমণ্ডলের ঝড় নয়। সে বাতাসের মূল উপাদান হাইড্রোজেন। তার মূল উৎস সূর্য। সেখান থেকেই পুঞ্জীভূত হয়ে ঐ হাইড্রোজেন প্রচণ্ড বেগে পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহের চারপাশ দিয়ে সারা সৌরমণ্ডলেই প্রবাহিত হচ্ছে। পৃথিবীর পাশ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার গতিবেগ ধরা পড়েছে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০ কিলোমিটারের মত। অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় ৯০০০০০ মাইল। অতঃপর এই গ্রহজগৎ অতিক্রম করে আন্তর্নক্ষত্র জগতের অভিমুখে তার যাত্রা। আর এই সময়ে সম্মুখে যা কিছু পড়ে—বিভিন্ন গ্রহ এবং ধূমকেতু থেকে উৎসারিত বাষ্প, বিচূর্ণ উল্কাপিণ্ডের ধূলিকণা, এমন কি মহাজাগতিক রশ্মি—তাদের ঝেঁটিয়ে সে এগিয়ে যেতে থাকে। পৃথিবীর ভ্যান-অ্যালান বিকিরণ বলয়ের বাইরের অংশের উপর এর প্রভাব অপরিসীম, মেরু-প্রভা, নৈসর্গিক চৌম্বক-ঝটিকা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি এরই হাতে। হয়ত বা পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও অংশত এরই উপর ন্যস্ত।

সৌর-কণার ধাক্কায় ধূমকেতুর পুচ্ছ সব সময় সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। Mrkos ধূমকেতুর এই ছবিটি প্যালোমার মাউন্টেন থেকে আগস্ট, ১৯৫৭ই তোলা হয়েছিল। সৌর-ঝটিকার মধ্যে তখন আলোড়ন থাকায় পুচ্ছটি এলোপাথারি ছড়িয়ে ছিল

হ্যাঁ, সৌর-ঝটিকার অস্তিত্ব কয়েক দশক আগেই ধরা পড়েছিল। গত দশকে মহাকাশযানের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে তার গতিবেগ এবং ঘনত্ব দু-ই মাপা সম্ভব হয়েছে। এই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার অন্য রহস্য এবং কার্যাবলী। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন সেই সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করছেন।

*

এই হ্রাস-বৃদ্ধি যতটুকু বলে মনে হয়েছিল, আসলে বাস্তব ক্ষেত্রে তার পরিমাণ অনেক বেশি। এত বেশি যে, শুধু পৃথিবীর নৈসর্গিক কোন কারণের পক্ষে ততটা পরিবর্তন ঘটানো মোটেই সম্ভব নয়। এবং মনে হল সূর্য থেকেই এমন কোন কণিকা ছুটে আসছে যারা মহাজাগতিক রশ্মির গমন পথে প্রচণ্ড রকমের বাধা সৃষ্টি করে। ফলে মহাজাগতিক কণিকারা প্রতিহত হয়ে আন্তর্নক্ষত্র জগতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সরে যায়, পৃথিবীর বুকে এসে আঘাত করতে পারে না। যখন সূর্যের পরিমণ্ডলে বিস্ফোরণ বা অনুরূপ সাময়িক কোন ঘটনা ঘটতে থাকে এই প্রতিহত করার কাজ আরও জোরদার হয়।

ব্যাপারটাকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন প্রখ্যাত সুইডেনের পদার্থবিদ্ ও. আলফ্‌ভেন। তাঁর ম্যাগনেটোহাইড্রোডায়নামিক্স বা চৌম্বক-উদগতি তত্ত্বের সাহায্যে। তাঁর মতে, অর্থাৎ বায়ু গতিশীল অবস্থায় থাকার সময় সাথে কিছুটা চৌম্বকক্ষেত্রও বহন করে থাকে। এবং এই তত্ত্বটিকে গ্রহণ করে করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ফিলিপ মরিসন ও তাঁর সতীর্থরা মন্তব্য করলেন, যদি তাই হয়, তাহলে বলা যেতে পারে সূর্য তার নিজস্ব দেহ থেকে নিয়ত তড়িতাহিত কণিকা মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ঐ কণিকাদের প্রত্যেকটি বহন করে চলে নির্দিষ্ট পরিমাণ চৌম্বকক্ষেত্র। যার সম্মুখে পড়ে মহাজাগতিক রশ্মি সৌর জগতের বাইরের জগতে বিতাড়িত হতে থাকে। সূর্য যেন রকম অস্থির এবং অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্ফোরণ ঘটায়, তড়িতাহিত ঐ কণিকাগুলির পরিমাণও বেড়ে যায়। তখন মহাজাগতিক রশ্মি আরও বেশি বাধার সম্মুখীন হয়। পৃথিবীর পরিমণ্ডলে তার মাত্রাও কমে আসে। এই মতবাদ বিভিন্ন তাত্ত্বিকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল।

আর ঠিক ঐ একই সময়ে সৌর-কণার অস্তিত্বের সমর্থনে আরও একটি জোরাল মতবাদ পরিবেশন করে বসলেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন, আকাশে যখন ধূমকেতুর উদয় হয়, তখন তার পুচ্ছভাগ সব সময় সূর্যের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে থাকে। নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করার সময় যেখানেই সে অবস্থান করুক না কেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত তার অগ্রভাগ ঝুঁকে থাকে সূর্যের দিকে মুখ রেখে এবং বায়বীয় লেজের অংশটিকে দেখলে মনে হয় কারা যেন ধাক্কা মেরে তাকে মহাকাশের সুদূর অঞ্চলে সরে যেতে বাধ্য করেছে। এই যে অপসৃতি, সূর্যের নিজস্ব অঞ্চল থেকে সর্বদা বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা, এর কারণই বা কী? এটাই তখন প্রশ্ন। প্রশ্ন, মাত্র দু দশক আগের তাত্ত্বিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীদের মনে। বর্তমানে সর্বসম্মতিক্রমে ধরে নেয়া হয়েছে, ধূমকেতুর পুচ্ছভাগের অত্যন্ত হাল্কা বায়বীয় অংশকে সূর্যের আলোই ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয়—সরিয়ে দেয় সূর্যের নিজস্ব অবস্থান বরাবর থেকে বিপরীত দিকে।

কিন্তু এই তত্ত্বেরও প্রতিকূলে মন্তব্য করে বসলেন গোটিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুডউইগ এফ বায়ারম্যান ১৯৫০ সালে। তিনি সরাসরি মন্তব্য করলেন, ধূমকেতুর অগ্রভাগ থেকে তার লেজের অংশটিকে যেভাবে দূরে ঠেলে দেওয়া হয় এবং এত সুদূর অঞ্চলে তাকে বিস্তৃত করা হয়, যা দেখে মনে হয়েছে, সূর্য থেকে বিকিরিত শুধু ফোটন-রশ্মির পক্ষে অতটা ধাক্কা মারা সম্ভব নয়। সূর্য রশ্মির ক্ষমতা কখনই অত প্রচণ্ডরূপে নিতে পারে না, একমাত্র বস্তুকণা বলতে আমরা যা বুঝি তার পক্ষেই ঐ ধরনের ধাক্কা মারা সম্ভব।

এবং ঐ কণিকা সূর্যের অভ্যন্তর থেকেই প্রবল বেগে নির্গত হয়ে থাকে।

বায়ারম্যানের এই আবিষ্কারের সপক্ষে দুটি মতবাদ তখন সরব হয়ে উঠেছিল। এক, হঠাৎ বিস্ফোরণের ফলে সূর্যের বুকে যে ছটার উদ্ভব, তারই মধ্যে থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সৌর-কণা প্রবল উচ্ছাসে মহাকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। উল্লেখ্য, এই সময় সূর্য প্রচুর পরিমান অতি-শক্তিসম্পন্ন প্রোটন কণা বা হাইড্রোজেন অণুকেন্দ্র বিকীর্ণ করে। দুই, অথবা সৌর-কলঙ্কের মধ্যস্থিত অজ্ঞাত কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় ত্বরণ-বলে ঐ কণিকারা আলোক-রশ্মির মত নির্দিষ্ট সরল পথে অগ্রসর হয়। তবে পরবর্তীকালে উভয় মতবাদই উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ ধূমকেতুর পুচ্ছভাগের বিস্তারের কায়দা-কানুন দেখে সকলেই এখন এক মত, শুধু সৌরছটা বা সৌর কলঙ্ক নয়, সূর্য তার সমস্ত অঞ্চল থেকেই নিয়মিত বস্তুকণা ছুড়ে দিচ্ছে সর্বত্র। বাতাসের গতিপ্রবাহ যেমন পৃথিবীর চারদিকে বিস্তৃত, সূর্যের ঐ কণার প্রবাহও সর্বত্র ছড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকে। তবে তার গতিবেগ বাড়তে পারে ঠিক তখনই যখন সৌরমণ্ডলে হঠাৎ কোন বিস্ফোরণের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু কীভাবে?

এ প্রশ্নের উত্তর যোগালেন চ্যাপম্যান। সেটা ১৯৫৭। ঐ সময়ে তিনি এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ই এন পার্কার কালোরডোর বোউলডার-এ অবস্থিত একটি মানমন্দিরে বসে সূর্যের জ্যোতিচ্ছটার উপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরের অংশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করা। অনেকের ধারণা ছিল, ঊর্ধাকাশে এগিয়ে গেলে বায়ুস্তর বুঝি ক্রমেই শীতল থেকে শীতলতর হয়ে আসবে। কিন্তু ঊর্ধাকাশে বেলুন পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। বরং বায়ুমণ্ডলের বাইরের স্তর অনেক বেশি উষ্ণ। চ্যাপম্যানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সম্ভবত সূর্যের জ্যোতিচ্ছটাই ঐ অঞ্চলের বায়ুস্তরের তাপমাত্রা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।

সূর্যের জ্যোতিচ্ছটা মুখ্যত অত্যন্ত হাল্কা হাইড্রোজেনের স্তর দিয়ে গঠিত। এত হাল্কা যে, সূর্যের নিকটতম অঞ্চলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ঐ হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ থেকে একশ কোটির মত। অর্থাৎ ঘনত্বের দিক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে যে বাতাস আমরা গ্রহণ করে থাকি তার দশ হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। জ্যোতিচ্ছটা সৃষ্টিকারী কণিকার গতিবেগ মেপে জ্যোতিচ্ছটার তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। সেই তাপমাত্রা প্রায় দশ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। প্রচণ্ড এই তাপীয় অবস্থায় পড়ে সেখানকার সমস্ত বায়বীয় অংশ আয়নিত অবস্থায় বিরাজ করে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তার উপাদান গিয়ে দাঁড়ায় প্রোটন এবং ইলেকট্রনে। এত বেশি তাপমাত্রা সত্ত্বেও জ্যোতিচ্ছটার বায়বীয় অঞ্চল অত্যন্ত হাল্কা হওয়ার দরুন নিজে থেকে আলো সৃষ্টি করার মত ক্ষমতা তার থাকে না। তবু পরিষ্কার আমরা দেখতে পাই। কারণ সূর্যের আলোক মণ্ডল থেকে নির্গত ফোটন কণিকা তার হাল্কা বায়ুমণ্ডলে এসে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ব্যাপারটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে এসে যেভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ঠিক সেই রকম।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের আলোকমণ্ডল বা ফোটোস্ফিয়ার অদৃশ্য হয়ে যায়। আর ঠিক সেই সময়ই ধরা পড়ে তার জ্যোতিচ্ছটার বহুবিস্তৃত অঞ্চল। ঐ সময়ে ছবি তুলে দেখা গেছে সূর্য থেকে তার জ্যোতিচ্ছটা কোটি কোটি মাইল দূরাঞ্চ

ভাবে বেড়ে যায় এবং পরবর্তী চার দিনের মধ্যে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল দূরত্ব পেরিয়ে পৃথিবীর বুকে এসে আঘাত করে। অর্থাৎ মনে করুন, আজ যদি রবিবার হয়, তাহলে জ্যোতিশ্ছটার নিচের অংশ থেকে যে সৌর কণা এই মুহূর্তে যাত্রা শুরু করল, আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার নাগাদ তার পৃথিবীতে পৌঁছনর কথা। আর তার দুই সপ্তাহ পর বৃহস্পতির পরিমণ্ডল পেরিয়ে সুদূরের আহ্বানে যাত্রা।

*

ঐ ভাবে যখন তারা চলতে থাকে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে কিছুটা চৌম্বক ক্ষেত্র। কারণ প্রতিটি সৌর-কণাই তখনও অয়নিত অবস্থায় বিরাজ করে। দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমে গেলেও, তুলনায় প্রতি একক আয়তনে তাদের সংখ্যা দারুণভাবে হ্রাস পেয়ে যায়। ফলে প্রোটন এবং ইলেকট্রনরা পরস্পরের স্পর্শে এসে অনায়নিত হতে পারে না। সূর্যের আবর্তন গতির দরুন (কারণ প্রতি ২৫ দিনে সূর্য তার নিজের অক্ষের চারপাশে একবার আবর্তন করে) ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের চেহারাটাও কুণ্ডলীর বা স্পাইরেলের মত দেখতে হয়।

বিগত এক দশক সোভিয়েত মহাকাশযান লুনিক-১ এবং ২ এবং মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-২ ও কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১০ যুগপৎ সৌর-কণার উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ হয়েছে। ঐ সমস্ত তথ্য থেকে দেখা যায়ঃ (এক) পৃথিবীর কাছাকাছি সৌর-ঝটিকার গতিবেগ সেকেণ্ডে ৪০০ কিলোমিটার, (দুই) সূর্য থেকে সাধারণভাবে সরল-রেখা পথেই সৌর-কণাগুলি অগ্রসর হয়। তবে সূর্যে সাময়িক অতিরিক্ত কোন বিস্ফোরণ ঘটলে তাদের গতির মধ্যে দমকা হাওয়ার মত ঝাপটা ভাব চোখে পড়ে, (তিন) লুনিক-১ এবং ২ আবিষ্কার করেছে পৃথিবীর কাছাকাছি সৌর-ঝটিকার প্রোটন কণার প্রবাহমাত্রা প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে দশ কোটির মত। এক্সপ্লোরার-১০ এবং মেরিনার-২ এর তথ্য, পৃথিবীর কাছাকাছি সৌর-ঝটিকার মধ্যে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক থেকে দশটি প্রোটন। এ থেকে মনে হয় সৌর জ্যোতিশ্চটার প্রাথমিক স্তরের তাপমাত্রা দশ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই হওয়া উচিৎ, (চার) আন্তঃগ্রহ অঞ্চলে সৌর-কণার চৌম্বক-মাত্রা এক গাউস-এর দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ এবং তার ক্ষেত্রের চেহারাও বেশির ভাগ সময় স্পাইরেল বা কুণ্ডলীর মত দেখা গেছে। তবে মাঝে মাঝে চৌম্বক-বল রেখা এলোপাথাড়ি উপর নিচে বা পাশ বরাবর হোঁচট খেয়ে চললে যেমন দেখায়, তেমন ধরনেরও দেখা যায়।

এই সমস্ত তথ্য থেকে বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত : (এক) সৌর-ঝড়ের মাধ্যমে সূর্য প্রতি সেকেণ্ডে এক টনের মত পদার্থ মহাশূন্যে বিলিয়ে দিচ্ছে, (দুই) হিসেব অনুযায়ী সূর্যের জীবনকাল পনের হাজার কোটি বছর। অতএব সৌর-ঝড়ের মাধ্যমে ঐ সময়ে সূর্য তার নিজস্ব ভরের এক সহস্রাংশের একশ ভাগের এক ভাগ শুধু হারিয়ে ফেলবে। (তিন) মহাশূন্যের অভিমুখে জ্যোতিশ্চটাকে অর্থাৎ সৌর কণাদের নিক্ষেপ করতে যতটা শক্তির প্রয়োজন হয় তার পরিমাণ সূর্যের মোট শক্তির দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। অর্থাৎ প্রতি একক আয়তনে এই শক্তি মাত্র এত কম যে, মহাশূন্যে ভাসমান কোন পদার্থের পক্ষে তার সংস্পর্শে এসে খুব বেশি উষ্ণ হয়ে ওঠার তেমন কোন আশঙ্কা নেই। (চার) সৌর-ঝড়ের সর্বোচ্চ প্রান্তসীমা ১৬০ জ্যোতিএকক এবং সর্বনিম্ন প্রান্তসীমা ৮ জ্যোতিএকক। উল্লেখ্য ১ জ্যোতিএককের দূরত্ব পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান।

প্রশ্ন, আমাদের সূর্যের মত অন্যান্য নক্ষত্রও কি মহাশূন্যে সৌর-কণার মত কণা বিচ্ছুরিত করে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হয়ত অনেকেই তা করে। তবে সেটা প্রমাণ করার আগে দেখে নিতে হবে ঐ সমস্ত নক্ষত্রেরও সূর্যের মত উত্তপ্ত জ্যোতিশ্চটা আছে কি না। তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা হয়েছে, কোন হাইড্রোজেন-নক্ষত্রের উপরের তলের তাপমাত্রা যদি ৬৪০০ ডিগ্রির কম হয় তাহলে তার মধ্যে পরিচালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এর অর্থ, ঐ নক্ষত্রের বুক থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে বাইরের দিকে ছুটে বেরিয়ে যাবে। এবং যেহেতু আমাদের নক্ষত্র-জগতের বেশির ভাগ নক্ষত্রই যখন হাইড্রোজেন-নক্ষত্র, অতএব এখানে আন্তর্নক্ষত্র ঝটিকার দর্শন সর্বত্রই পাওয়া যেতে পারে। সুদূরবর্তী নক্ষত্রে কোন জ্যোতিশ্চটা আছে কিনা তার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি।

তবু জিজ্ঞাসার এখনও শেষ নেই। শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নন, ভাবছেন ভবিষ্যতের মহাকাশ-অভিযানের প্রবক্তারাও। কারণ তাঁরা মনে করেন, সৌর-কণার গতিপথ, তথা সীমা প্রভৃতির হদিস পেলে আন্তর্নক্ষত্র জগতে মহাকাশযান চালনার ব্যাপারটা হয়ত সহজতর হয়ে উঠবে। একটা সমুদ্রের বুকে হাওয়ার গতিপথ জেনে পথ চলার মত, গন্তব্যস্থল সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত।

সমরজিৎ কর

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

শিবরাম চক্রবর্তী

কুঁড়

ভগবদ্দর্শনের প্রশ্নটা বাবার কাছেও পেড়েছিলাম আমি।

বাবা বলেছেন, ধ্যানের দ্বারা ধরা যায়। ধ্যান করেই তিনি প্রত্যক্ষ হন। আর ধ্যানে বসতে হলে? এমনি করে পদ্মাসনে নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসতে হবে — একটানা, যতক্ষণ পারো।' বলে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ হলেন।

এদিকে পদ্মাসনে বসা তেমন সোজা নয়, বসতে গেলে উল্টে পড়তে হয়। আর উল্টে যদি নাও পড়ি নেহাৎ, অমন অদ্ভুত ভাবে বসে থাকাটাও কষ্টকর। তার চাইতে বাবু-আসনে বসাটাও ঢের সুখের। তাছাড়া ঐভাবে বসে ভগবানের ধ্যান করতে গেলে নাকের ডগায় আনন্দ কি, আমার সবটা মন নাকের ডগায় পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সেইখানেই ওতপ্রোত হয়। [illegible] নিবদ্ধ থেকে মনের এই অবস্থানকে ধ্যানের বলা যায় না।

মাকে কথাটা বলায় তিনি বললেন— 'তোর বাবার যেমন! নাকের ওপর নজর রেখে জড়ভরতের মত কাঠগোবরে হয়ে বসে থেকে কী লাভ? ভগবান কি ঐ নাকের মাথায় রয়েছেন যে দেখা দেবেন? তুমি আরাম করে ইজিচেয়ারে বসে ডাকো না, কি বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে। মন দেওয়া নিয়ে কথা, নাক দেখানো নয়।'

'বেশিক্ষণ ডাকাই যায় না মা ভগবানকে, ভালও লাগে না ডাকতে।' আমি জানাই। 'তাছাড়া, ঐ নাক নিয়ে মানে, নিজের নাক নিয়ে মাথা ঘামানো আমার একদম ভাল লাগে না। এইটে উচিত হওয়া কি ভালো? কিন্তু ধ্যান হলে তো আমার আধ্যাত্মিক উন্নতির একেবারেই কোনো আশা নেই দেখছি।'

'ভগবান যেমন বিন্দুমাত্র, ভগবানকে ডাকার প্রয়োজনও তেমনি মুহূর্ত মাত্রই। [illegible] সর্ষপ, মানে [illegible] শিশুর ওপর সর্ষে রাখলে যতক্ষণ থাকে ততটুকুর জন্যই ভগবানে মন দিলে, তাঁর মন পেলেই ঢের। তার ফলে যে গতিলাভ হয়, যেদিকে যাবার প্রবৃত্তি হয়, তিনি যেদিকে নিয়ে যান সেইটেই হোলো তোর ভগবদ্‌প্রাপ্তি। খুব সহজ ব্যাপার। এত সহজ আর কিছু হয় না। প্রায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই।'

মার মতে, আমার মনে হোলো যে, ঐ নাকই দেখাতে হবে বটে, তবে কিনা একটু ঘোরালো পথে। প্রায় ঘুরিয়ে নাক দেখার মতই। বক্রপথে, বৃত্তির পথে, প্রবৃত্তির পথেই যেতে হবে আমায়—ভগবানকে পেতে হলে। এক সেকেণ্ড মাত্র ভগবানকে নিয়ে তার পর থেকে খালি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ভগবানকে পাওয়া। সবার সঙ্গে তাঁর সাথে সাথে চলা। যেতে যেতে আদানে প্রদানে তাঁকেই দিতে দিতে পেতে পেতে যাওয়া।

বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং-এর উপর ঠ্যাং তুলে...

'বাবা যে বলছে মা, ভগবানকে পাওয়া নাকি সোজা না। অনেক সাধনার দরকার।' বাবার কথার পুনরুক্তি আমার।

'ভগবান যদি মা হন তাহলে কি তাঁকে সাধ্য সাধনা করতে লাগে? মাকে তো এমনিতেই পাই—ছেলে হয়ে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা তো সবাই স্বয়ংসিদ্ধ রে! আজন্ম সিদ্ধ আমাদের। সাধনা যদি করতে হয় তো প্রবৃত্তির সাধনাই করতে হবে—বুঝেছিস? আমৃত্যু সেই সাধনা, জন্মজন্মান্তরে। তোর প্রবৃত্তি কী, মনের ঝোঁকটা কোন দিকে তোর সেইটে তুই বার কর আগে।'

মাথা ঘামাতে লাগলাম আমি তারপর। কোনদিকে মনের ঝুঁকি, মনের মধ্যে মাথা ঠুকি। ঠুকে ঠুকে মরি।

মনের ভেতর দিয়েই যদি ভগবানের প্রেরণা মেলে, তাহলে তাঁকে ডাকতে গেলে যেসব দিকে মন খেলে (ভগবান নিজেই খেলান কিনা কে জানে?) সেই দিকেই কি মনের ঝোঁক আমার? বুঝতে হবে তাই?

কী হতে চাই? কী করতে চাই আমি? মাথা খেলাই।

সেদিন ক্লাসে হেডসার শুধিয়েছিলেন সবাইকে—কে কী হতে চাই আমরা?

হেডসার কান্তিভূষণ ভট্টাচার্য ইংরেজি পড়াতেন আমাদের। এমন জলের মতন বোঝাতেন, এমন চমৎকার পড়াতেন যে। দৌলতপুর কলেজের প্রিন্সিপাল কামাখ্যাচরণ নাগ মশাই আমাদের ইস্কুলে রেকটর হয়ে যোগ দেয়ার সময় তাঁর সেরা ছাত্র কান্তিবাবুকে হেডমাস্টার করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে।

একমনে পড়িয়ে যেতেন তিনি, আজেবাজে কথা কইতেন না একদম। সৌম্যদর্শন ছিপছিপে চেহারার গুরুগম্ভীর মানুষ। হঠাৎ সেদিন তিনি পড়ার বাইরে ঐ প্রশ্নটা করে বসলেন কেন যে!

কেউ বলল সে ডাক্তার হবে, কেউ বললে যে বিজনেস করবে, কেউ হবে অ্যাডভোকেট—এমন কতো জনা কতো কী।

আই ওয়ান্ট টু বি এ পোয়েট। আমায় শুধাতে জবাব দিয়েছিলাম।

আমাদের বাড়িতে অর্ধ সাপ্তাহিক অমৃত-বাজার পত্রিকা আসত—দেশপ্রেমের বান ডাকত সেই কাগজে। প্যাট্রিয়ট— ঐ শব্দ কথাটা সেখান থেকেই শেখা আমার। অবশ্য, ফিলানথ্রপিস্ট—কথাটাও ততদিনে জানা হয়ে গেছে ঐ কাগজের কল্যাণেই। হেডসারের জবাবে ঐ প্যাট্রিয়টই জিভের গোড়ায় এসে গেল। হেডসারের জবাবে ঐ গালভরা কথাটাও আমি আওড়াতে পারতাম, কিন্তু কেন জানি না, ঐ প্যাট্রিয়টই জিভের গোড়ায় এসে গেল। ফিলানথ্রপিস্ট হতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে লাগে, তার আগে বহুৎ কষ্ট করে বড়লোক হতে হয়, তারপরেই না বিশ্বের উপকার করতে বেরুনো? কিন্তু ঐ প্যাট্রিয়ট হওয়াটা তার চেয়ে ঢের সোজাই যেন! সারা জীবন দিলে তো কথাই নেই, সোজাসুজি প্রাণটা দিলেও হওয়া যায়।

কিম্বা দেশের ভাবনায় ভাবিত ঐ অর্ধ সাপ্তাহিকের গরম গরম সম্পাদকীয় বা সংবাদের পৃষ্ঠা পাঠেই বুঝি আমি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকব। অথবা বাবার বইয়ের ভাঁড়ার থেকে বাগানো যোগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ম্যাজিনি-

মাতুলক্রম বলে না কি, আমার যদি নামের দিক দিয়েই সেই উপক্রম হয় তো ধারাবাহিকতাই বজায় থাকে তার।

দিনকতক বাদে একটা চিঠি এল মামার নামে—খামের চিঠি—ব বার কেয়ার অফে ইস্কুল থেকে ফিরে জানলাম মার কাছে।

মা বললেন, 'এ কী চিঠি এসেছে রে সুরেনের নামে, দ্যাখ দেখি। এক বর্ণও বোঝা গেল না তার।'

'খুললে কেন চিঠিটা? খুলতে গেলে কেন? মামার চিঠি, দেখছ না?'

'সুরেন তো রাজাপুরেই এখন, তার বাড়িতেই। কোনার ঠিকানায় না লিখে এখানে আবার তাকে লিখলো কে, কলকাতার থেকে খুদিদি, তোর বড় মাসীই হয়তো লিখে থাকবে, মনে করেছে সে এখানেই আছে এখনো—তাই ভেবেই, খবরটা কী, আমি খুলে দেখতে গেছি।...কিন্তু দেখছি, এ তো একটা আঁক। কী আঁক কে জানে?

'ইকোয়েশনের আঁক বলে ঠাওর হচ্ছে। তার সঙ্গে ফ্র্যাকশন ট্র্যাকশন ডেসিমেল সিঁড়ি ভাঙা সব মিশিয়ে বিদঘুটে এক হিজিবিজি কাণ্ড!'

'এ আঁক তুই জানিস নে?'

'কোন জন্মে না। কাদিরহোসেন জানে। কিন্তু তাকে তো এ চিঠি দেখানো যাবে না। যার চিঠি তার হাতে দিতে হবে।'

'কার চিঠি শুনি?'

'সে একজনের। শুনলে তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না।' বলে চিঠিখানা হাতিয়েই আমি সরে পড়ি।

সতীশকে চিঠিখানা দিই গিয়ে। খাম খোলা দেখেই সে খাপ খোলা তরোয়ালের মতই ঝলকে উঠেছে: 'খুলেছিস কেন?'

'আমি খুলেছি নাকি? মামার চিঠি মনে করে—মামাকে লেখা মাসির চিঠি ওই ভেবে না খুলে দেখেছে মা। দেখেও বুঝতে পারেনি কিছু। যা বিচ্ছিরি আঁক একখানা—তার ভেতরে নাক গলায় সাধ্য কার!' এক সাথে আমি মার আর আমার সাফাই গাই—'মনে হচ্ছে মা আমার মতই অঙ্কে দিগ্‌গজ। আমারই মা তো!'

'মোটেই তোমার আঁক নয়, সাংকেতিক ভাষায় লেখা। লীডার বুঝবে।' এই না বলে সে দ্বিরুক্তি না করে চিঠিখানা নিয়ে চলে যায়। কোথায় যায় কে জানে!

রাত্রে তাদের হোস্টেলে গেলে সে জানায় —'লীডার ভারী রাগ করেছে। এরপর থেকে ইস্কুলে যাবার পথে রোজ তুই পোস্ট আপিস হয়ে যাবি। জানবি তোর মামার নামে চিঠিপত্তর পার্শেল টার্শেল টাকাকড়ি মনিঅর্ডার টর্ডার এসেছে কিনা। এলে ফর দিয়ে সই করে নিয়ে সোজা চলে আসবি ইস্কুলে।'

'মনিঅর্ডার টাকাকড়িও আসবে নাকি আবার?' শুনে আমার উৎসাহ হয়।

'একটুই না! তাতে তোর আমার উৎসাহিত হবার কিছু নেই। বেল পাকলে কাকের কী! পার্টির টাকা—দলনেতাকে দিয়ে দিতে হবে তক্ষুনি।'

সতীশের কণ্ঠস্বর পৃথিবীর মতই উত্তর দক্ষিণে চাপা হয়ে আসে তারপর—'এমন কি তোর পিস্তল টিস্তলও আসতে পারে ঐ পার্শেলে। সেই খবর দিয়েছে ওই চিঠিতে।'

'পিস্তল!' শুনেই আমি চমকে উঠেছি।—'পিস্তল টিস্তল কেনরে!'

'আমাদের টার্গেট প্র্যাকটিশের জন্যই, আবার কী রে? স্বদেশী ডাকাতি করতে হবে না? টাকার যোগাড় হবে কেথেকে? কালিগাঁর ফকির সরকারের বাড়ি করব ডাকাতি। ওরা ভারী মহাজন, অনেক টাকা ওদের।'

'না না। ওর বাড়ি না। কিছুতেই নয়। ওই ভদ্রলোক দারুণ ভালো। বইটই পড়তে দেয় আমায়—ওর বাড়ি ডাকাতি টাকাতি নয়।'

'ঘাবড়াচ্ছিস? হয়তো তোদের বাড়িও করতে হতে পারে আমাদের। তখন তোকেও লাগতে হবে—থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে। কালি ঝুলি মেখে মুখোস পরে থাকবি, বাড়ির কেউ চিনতে পারবে না তোকে।...তোদেরও অনেক টাকা আছে, তাই না?'

'কাঁচকলা পাবি আমাদের বাড়ি। বাবার যা কিছু আছে সব কোম্পানির কাগজে জমা রাখা। কাগজ কখানা পাবি কেবল। তবে হ্যাঁ, মার গয়নাগুলো নিতে পারিস। চাইলে মা হয়ত নিজের থেকেই দিয়ে দিতে পারে দেশের কাজে। কেড়ে নিতে হবে না।'

'টাকা নেই তো চলে কি করে তোদের? শুনি? তোর বাবা তো কোনো চাকরি বাকরি করেন না।'

[illegible]

'ফলে তো, তুই মধ্য পার্টির। তোদের বাড়ি ডাকাতি হবে না নিশ্চয়। তার আগে তো টার্গেট প্র্যাকটিশ করে হাত টাত পাকাতে হবে আমাদের।'

'হাত পাকাবি কোথায়?'

'কেন, সিঁথিয়ার আমবাগানে। হাজার হাজার গাছের আড়ালে নিশ্চিন্তে প্র্যাকটিশ করা যাবে। নির্জন জায়গা। কেউ বড় একটা [illegible] ওর ভেতর—পিস্তলের আওয়াজ কারো কানে যাবে না।'

[illegible]

'সেই সঙ্গেই থাক।' আমার কথাটা সে এক কথায় উড়িয়ে দেয়।

কিন্তু এক কথায় পাকা আমের অত বড়ো বাগান ওড়ানো যায় না—আমি আবার তাকে বাগাতে লাগি: 'ওইসব ফলন্ত আম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে লোভ সামলাতে পারবি তুই? তোর হাতের তাক তো আমি জানি। শুধু ঢিলিয়েই তুই ফজলি আম নামিয়ে আনিস। পিস্তলের নিশান না জানি তোর আরো কতো জোর হবে! আর সিঁথিয়ার বাগানের কী সব আমরে ভাই!' আমের ভার আর ভার হাতের তারিফ এক বাক্যে করে আমি ওর আমড়াগাছি করি।

সে কিন্তু টলে না একদম। বলে যে, 'হ্যাঁ, সেইজন্যেই আনা হচ্ছে কিনা পিস্তল! আম পাড়বার জন্যে আনছি কিনা আমরা!' সে বলে: 'বিলেতে যে একটা জোর লড়াই বেধেছে খবর রাখিস তার? ইংরেজ জার্মানীর যুদ্ধ হচ্ছে জানিসনে?'

'জানব না কেন? আসে তো খবর কাগজ আমাদের বাড়ি। হিতবাদী অমৃতবাজার দুই আসে। সব খবর পাই আমরা। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের কী! কোথায় বিলেত আর কোথায় আমরা। তার সঙ্গে কার লড়াই আর আমরা কোনখানে!'

'কী বোকা রে!' তার চোখে কৃপাকটাক্ষ। 'আরে, আমাদের স্বাধীনতা লাভের এই তো মোকা রে। ইংরেজ জার্মানীর সঙ্গে লড়ায়ে বিব্রত—এই সুযোগে আমরাও তৈরি হবো এদিকে। রণক্ষেত্রের সৈনিক না আমরা? আমাদের অ্যানার্কিস্ট পার্টি ভারতজোড়া, জানিসনে?'

'শুনেছি এক আধটু। পড়েওছি খবর কাগজে।'

'এ সব কথা থাক এখন। কদিন বাদে পিস্তলের পার্শেলটা আসবে। কটা পিস্তল আসে কে জানে! ইস্কুলে আসার পথে রোজ খবর নিবি পোস্টাপিসে—এলেই

ডেলিভারি নিবি। আর নিয়েই না, সোজা চলে আসবি ইস্কুলে। ইস্কুল পালিয়ে তারপর প্রতিদিন দুপুরে আমাদের পিস্তলের মহড়া শুরু হবে ওই বাগানে—সেদিন থেকেই। বুঝেছিস?'

'পিস্তল নিয়ে লড়তে হবে বলছিস। কিন্তু লড়াবি কার সঙ্গে শুনি? তাহলে তো সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই যেতে হয় আমাদের, ওই বিলেতেই।'

'কেন, ইংরেজের সঙ্গেই লড়ব আমরা। এখানেই লড়াই করব। সারা ভারতই আমাদের রণক্ষেত্র। সর্বদাই আমাদের সংগ্রাম।'

'এখানে ইংরেজ কোথায় রে, এই গাঁয়? আমি শুধাই—'এই অজ পাড়া গাঁয় কই তোর ইংরেজ?'

'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নেই? পুলিস সাহেব নেই জেলার? সেখানে গিয়ে মেরে আসতে হবে তাদের। লীডারের হুকুম হলেই যেতে হবে আমাদের।'

'না ভাই, ওসব খুনোখুনি কাণ্ড আমার ভালো লাগে না।' আমার আপত্তি: 'পুলিস-সুপারকে প্রাণে মারলে যেন সুপারের প্রাণে লাগবে না?...মানুষ মারবে কেন মানুষকে? মারবার জন্যে তো মানুষের হয়নি। ভালোবাসাবাসির জন্যেই হয়েছে।'

'সব মানুষকে কি ভালোবাসা যায়? ওরা আমাদের ছেলেদের ধরে ধরে গুলি করে মারছে না! লটকে দিচ্ছে না ফাঁসিতে? তুই বল?'

'হ্যাঁ, সব মানুষকে ভালোবাসা যায় না, তা ঠিক।' মানতে হয় আমার—'তবে মানুষের মধ্যে যারা রূপসী মানুষ তাদের ভালো না বেসে পারা যায় না। সেইসব মানুষের ভালোবাসার জন্যে আমরা সব সময় উপোসী। তাদের রূপের উপাসনা করি আমরা।'

'তোর ওই সব রূপসী মানুষে উপোসী মানুষের কাতরা কথা যাক রাখ তো। দেশের স্বাধীনতা তুই চাস কি চাস না?'

'নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ওইসব খুনো-

কেন, ইংরেজের সঙ্গেই লড়ব আমরা

খারাপি না করে...না ভাই, কাউকে খুন করতে আমি পারব না। ওতে আমার একদম প্রবৃত্তি হয় না।'

'কিসে তোমার প্রবৃত্তি শুনি?'

প্রবৃত্তির প্রশ্নটা খট করে আমার মগজে এসে লাগে। মার কথাটা মনে পড়ে যায়... প্রবৃত্তির পথেই ভগবদ্গতি...আমাদের গতি ভগবানের দিকে, ভগবানের গতি আমাদের দিকে। উভয়ের গতিমুক্তি এক। একাধারে—এক ধারায়।

'কিসে আমার প্রবৃত্তি বলব? আয়, আমরা হাতে লেখা একখানা পত্রিকা বার করি। মাসিক কি ত্রৈমাসিক। আমার মতে সেই ভালো হবে তার চেয়ে। মাস মাস কি তিন মাস অন্তর বেরুবে কাগজটা। তাতে গল্প উপন্যাস কবিতা সব থাকবে। তুই লিখবি আমি লিখব হোস্টেলের আরো সব ছেলেরা লিখবে—বিল্টু টিল্টু, সবাই। ইস্কুলের লিথো মেশিনটা নিয়ে লিথো করেও বার করতে পারা যায়। কাগজটার নাম রাখা হবে অঞ্জলি। দেবী ভারতীর পায় অঞ্জলি আমাদের।

'তোর মাথা! দেশের স্বাধীনতা আগে, না, ওইসব তোর ছাতামাথা? দেশ স্বাধীন হোক না! সাহিত্যচর্চার ঢের সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু ইংরেজ এখন জীবন সংকট লড়ায়ে বিব্রত, তাকে খতম করার এমন সুযোগ আর মিলবে না। জার্মানরা ওদিকে হারাবে তাদের, আমরা এদিক থেকে তাড়াব।'

ওর কথাটাও নেহাত ফেলনা নয়, ভেবে দেখি। ভেবে দেখতে হয়।

'ভাবছিস কী? আমরা সবাই রণক্ষেত্রের সৈনিক এখন। ভারত মাতা পরাধীন না? কাগজপত্র বার করার সময় এখন নয়। লড়তে হবে এ সময়—লড়তে হবে, মরতে হবে, মারতে হবে। প্রাণ দিতে হবে, প্রাণ নিতে হবে—বুঝেছিস!'

'হ্যাঁ, প্রাণ দিতে হবে প্রাণ নিতে হবে—প্রাণ দেওয়া নেওয়ার কথাই বটে। ভেবে দেখি কথাটা রিনির ক্ষেত্রে যেমন রণক্ষেত্রেও তাই।

(ক্রমশ)

AZELINE
কিসের জন্যে
হেজলীন
এতো
নব বসন্তের মত এটি সতেজ ও সুরভিত…
এটি আপনাকে স্নিগ্ধ ও সতেজ রাখে ও সকলেই আপনার সঙ্গ কামনা করে। আপনার ভালো লাগবে এর মনমাতানো হাল্কা ফুলের গন্ধ। আপনার গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে থাকবে বলে হেজলীন বিউটি ট্যাল্কের কণাগুলি অপূর্ব মিহি ও মোলায়েম।
এটি এতো মিহি যে অক্লেশে মুখেও মাখতে পারেন!
Wellcome
aicm/bwj7a ben

নাঘ্মাতে নিয়ামৎ তথা ইস্রারে কেরামৎ

মাঝে মাঝেই এক তরুণ যন্ত্রীর সঙ্গে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হয়। সরোদ সম্বন্ধে একদিন কথা হচ্ছিল। এই যন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে অনেকেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। একাধিকবার বোধ হয় এ বিষয়ে লেখাও হয়েছে। সেদিন এইসব নানারকম আলোচনার পর মনে পড়ল "নাঘ্মাতে নিয়ামৎ"-এর কথা। এই গ্রন্থে বহু তথ্য আছে। তার মধ্যে সরোদ সম্বন্ধেও একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে. সে বিষয়ে বোধ হয় এই বিভাগে এ পর্যন্ত কিছু লেখা হয়নি। বিবরণটি হয়ত তেমন বেশী নয়: কিন্তু এই গ্রন্থটি থেকে অনেক সংবাদ আমাদের গোচর হয়। হয়ত এসব গ্রন্থের অনেক কিছুই ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে দেখা দরকার. তবে. এ গ্রন্থে এমন কিছু চেষ্টা করা হয়েছে যা অনাচিৎ করা হয়। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে গ্রীক ও আরব দেশীয় সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার এবং ভাগ্যক্রমে এর একটি সূত্রপাত এই গ্রন্থে করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন স্বনামধন্য রবাবী ও সরোদীয়া নিয়ামতুল্লা খাঁন। ইনি দীর্ঘকাল নেপাল রাজদরবারে ছিলেন এবং নবাব ওয়াজেদ আলী শার দরবারেও ছিলেন বেশ কয়েক বৎসর। ইনিও এসেছিলেন লখনউ থেকেই। গ্রন্থ থেকে জানা যায় তাঁর পিতা হেকদাদ খাঁর নিবাস ছিল বুলন্দ্‌শহর জেলার বাগারসী গ্রামে।

গ্রন্থটির মূলে রয়েছে একটি আরবী কেতাব—"মুসাকী"। এই আরবী পুস্তকটি আবার একটি গ্রীক সংগীত গ্রন্থের অনুবাদ। এরও একটি ইতিহাস আছে। এই ইতিবৃত্তটি দিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র, আর একজন প্রখ্যাত সরোদীয়া করামতুল্লা খাঁ। এঁরই হাতে গ্রন্থটি শেষ করবার দায়িত্ব এসে পড়ে। এই কারণে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে, "ইসরারে কেরামৎ-নাঘ্মাতে নিয়ামৎ"। কেরামতুল্লা বলছেন খলিফা মামুনের সময় আরব দেশের বাগদাদ শহরের ইবনে কিনদী এই গ্রন্থটি গ্রীক থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। অল কিনদী (যাঁর পুরো নাম—অবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইশাক অল কিনদী) ছিলেন একজন প্রচণ্ড দক্ষতার। আরব সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ফার্মার সাহেব বলেন যে কম-সে-কম সাতখানা গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ তিনি করেছিলেন এবং তাঁর রচনা থেকে—"We get a close insight into the theory and practice of virtuosi of

the age together with the theories derived from the ancient Greeks." এইরকম বহু আরবী তর্জমা থেকে গ্রীকদের বিবিধ বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে আরবেরা যখন এশিয়া ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন তখন এইসব গ্রন্থ নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আরবগণ গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান, বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা করেছিলেন। সঙ্গীত নাকি আরোগ্যবিধিতে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করা হত এবং এটি ছিল 'মেডিসিন'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি বিদ্যা। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় জনৈক বিক্রমাজিৎ-এর পরিবারভুক্ত চন্দ্রমাজিৎ নামক এক ব্যক্তি খলিফা হারুনে অল রশীদের রাজত্বকালে বাগদাদে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মোহম্মদ বিন মুসা নামক একজন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে বহু বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ভারতে ফিরে উক্ত চন্দ্রমাজিৎ নাকি সেইসব বিদ্যার প্রচারও করেছিলেন। এ সম্বন্ধে আমার কোনও তথ্যই জানা নেই। এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান যদি কেউ করে থাকেন, তাহলে তাঁর গবেষণার ফল জানতে পারলে উপকৃত হব।

এই গ্রীক গ্রন্থটির লেখক হচ্ছেন 'ফসাঘুরাস' অর্থাৎ পণ্ডিতপ্রবর পিথাগোরাস। এই গ্রন্থটির নাকি দুটি টীকাও রচিত হয়েছিল। এই মূল্যবান গ্রন্থটি কায়রোর এক গ্রন্থাগার থেকে উদ্ধার করে ইসমাইল নামক এক ব্যক্তি আর একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আবু আলী সিনাকে (আভিসিন্না) প্রদান করেন। ইবনে সিনা গ্রীক সংগীত সম্বন্ধেও বিশেষ গবেষণা করেছিলেন এবং আরব ও পারস্য সঙ্গীতের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাবও নাকি বহু শতাব্দী ধরে ছিল। আরবী গ্রন্থটি কিভাবে হাত বদল হয়েছে আমরা জানি না, অথবা এর একাধিক কপিও থাকা সম্ভব। যাই হোক, একজন আরব ভদ্রলোক গ্রন্থটি ভারতে নিয়ে আসেন এবং ১৮৯০ সালে নিয়ামতুল্লা খাঁ এঁর কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করে উর্দুতে অনুবাদ করেন।

হাকিম ফসাঘুরাস প্রণীত মুসাকী এবং অপরাপর বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাদি অনুশীলন করে নাকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় পরিভাষা গুলি গ্রীক আরব ও সংস্কৃতে প্রায় একই ধরনের। কেরামতুল্লা বলছেন, যদি এই গ্রন্থটি তাঁর অধিকারে না আসত তাহলে তিনি এই ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন যে ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দুস্তানী সঙ্গীতে যেসব পরিভাষা আছে সেগুলি কেবল ভারতেরই, অপর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই বা সেরকম পরিকল্পনা ছিল না।

গ্রীক গ্রন্থে পিথাগোরাস "কুকনুস" নামক একটি পক্ষীর বৃত্তান্ত দিয়েছেন। এই পাখিটিকে বলা হয়েছে জন-ই-আতিশ বা অগ্নিদেবী (ফায়ার গডেস)। এর থেকেই সঙ্গীত নিসৃত হয়েছে বলে আরবীতে একে বলা হয়েছে অল মখরজ্ মুসিকার। এই পাখির আয়ু নাকি সহস্র বৎসর এবং এর কোনও পুরুষ জাতি ছিল না। আয়ুষ্কাল পূর্ণ হলে এই পাখি নিজেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করে তার ওপর ডিম্ব প্রসব করত। কাষ্ঠাসনে বসে সে যে গান করত তার নাম "দরক্", যাকে আমাদের দেশে "দীপক" বলা হয়। ক্রমে তার গান থেকে আগুন জ্বলে উঠত এবং কাঠগুলি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকত. আর তাতে দগ্ধ হয়ে সেই পক্ষী আত্মাহুতি প্রদান করত। অন্তিম নিশ্বাসের পূর্বে সে যে শেষ ধ্বনি উত্থিত করত তাকে বলা হয় "মসাক" যা আমাদের দেশে মেঘরাগ নামে পরিচিত। এই ধ্বনিতে বর্ষণ নেমে আসত এবং ডিম থেকে তার শাবক বেরিয়ে এসে তার স্থান দখল করত। এই পাখির ঠোঁটে নাকি সাতটি প্রধান ছিদ্র ছিল। এছাড়া আরও বহুতর ছোট ছোট ছিদ্রও থাকত। হাকিম ফসাঘুরাস এই সাতটি ছিদ্র থেকে সাতটি স্বর নির্ণয় করেন এবং সাতটি সুরেরও উদ্ভাবন করেন যা আমাদের রাগের মত। আরবী ও হিন্দুস্থানীতে এই সুরগুলি এইভাবে দেওয়া হয়েছে :—

দরক (দীপক), মসাক (মেঘ), হদল (হিন্দোল), বওয়ান (ভৈরোঁ), মাকস (মালকোশ), সিরি (শ্রী); হরূন্ (কোনও হিন্দুস্থানী প্রতিশব্দ নেই।)।

এই উক্তির সত্যতা যাচাই করতে পারেন একমাত্র যাঁরা আরবী প্রাচীন সংগীতের তত্ত্ব জানেন তাঁরাই।

আরও বলা হয়েছে আরবী আসোয়াৎ হচ্ছে আমাদের সুর, জমজম হচ্ছে রাগ-সমূহের পুত্রাদির মত এবং নাঘমাৎ হচ্ছে রাগসমূহের ভার্যাদের সমান। আমাদের শ্রুতিতে নাকি মিজমার বলা হয়; আমাদের মূর্চ্ছনা হচ্ছে আরবের মুসল্লান এবং আমাদের গ্রাম হচ্ছে আরবীয় কমাম্।

গ্রন্থে আরবী ও গ্রীক স্বরসমূহের নাম দেওয়া হয়েছে—খরজ (ষড়্‌জ), রীতব্ (ঋষভ), গন্ধার (গান্ধার), মুলিম (মধ্যম), বসম্ (পঞ্চম), দফৎ (ধৈবত) এবং নফাদ (নিষাদ)। আমাদের সপ্তক হচ্ছে আরবের

'সিতারক', আমাদের তার সপ্তক আরবের "এজহার", মন্দ্র—মনজিল, মধ্য বায়িন, শুদ্ধ-তাম এবং বিকৃত মিরতা। সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হচ্ছে আরবীতে বাইশটি শ্রুতির নাম যেগুলি আমাদের বাইশটি শ্রুতির অনুরূপ। কিন্তু এই নামের লিস্টি দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর আর ভারক্লান্ত করলাম না। এই সমস্ত সংবাদই কতদূর প্রমাণসাপেক্ষ সেটি বিচার করে দেখা দরকার এবং একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই এই বিচার করতে পারেন।

এইবার যা দিয়ে শুরু করেছিলুম সেই সরোদের কথা। কেরামতুল্লা বলছেন—একদিন নেপালে তাঁর পিতা যখন সরোদ বাজাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সরোদ শব্দটা এসেছে কোন ভাষা থেকে। নিয়ামতুল্লা উত্তরে বলেছিলেন—এটি ফার্সী শব্দ। পুত্র আবার শুধোলেন—চাঙ্গ, রবাব, নাফিরী—এগুলি কোথাকার শব্দ?—তিনি বললেন কতকগুলি যন্ত্র আরবের, আর কতকগুলি পারস্যের। কেরামৎ আবার জানতে চাইলেন এইসব যন্ত্রের হিন্দু নামগুলি কি? পিতা বললেন, এগুলির কোনও হিন্দু নাম পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থের

'বয়ান ইজাদে সরোদ" অধ্যায় থেকে জানা যায় যে "সরোদ" শব্দটি ইউনানী সূত্র থেকে পাওয়া এবং একটি প্রাচীন ইউনানী যন্ত্র নাকি এই নামেরই ছিল। যন্ত্রটি নাকি হাকিম ফিসাঘোরাসই প্রথমে উদ্ভাবিত করেন। তবে সে যন্ত্র বর্তমান সরোদের মত ছিল না। নানা সূত্র থেকে এই খবর পাওয়া গেছে যে এই সরোদের সাতটি তার ছিল। অনেক আওয়াজ গলা দিয়ে বের করা যায় না সেই কারণেই নাকি ফিসাঘোরাস এই যন্ত্রটি প্রস্তুত করেছিলেন।

আর একটি চিত্তাকর্ষক খবর এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, কবি লঙফেলো তাঁর 'টু দি চাইল্ড" নামক কবিতায় সরোদ যন্ত্রটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন। কবিতাটি আমার পড়া নেই, অতএব কোনও মন্তব্য করতে পারলুম না। ইউনানী ইতিহাসেও নাকি এর বিবরণ আছে। কেরামতুল্লা বলছেন, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক এই যন্ত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেটি কোন সাল হবে বলতে পারছি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক খোঁজ করতে পারেন।

এর পরে বলা হয়েছে এক হাজার বছরেরও আগে থেকে সরোদ আফগানিস্তানে প্রচলিত আছে। এই সরোদের আওয়াজে গাম্ভীর্য এবং শৌর্য প্রকাশ পেত। এই কারণে ওই অঞ্চলের ফৌজদের মধ্যেই যন্ত্রটি প্রচলিত ছিল। আড়াইশো বছর থেকে সরোদ হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। ১৮৯০ সাল (অর্থাৎ আরবী গ্রন্থের সংগ্রহের সময়) থেকে যদি ধরা যায় তাহলে প্রমাণ হয় যে, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সরোদ বাজনার প্রচলন ভারতে শুরু হয়েছে।

এই যন্ত্রের পরিবর্তন এবং সরোদ পিয়ারে জীবন সম্বন্ধে কেরামতুল্লা বলছেন—"প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে মেটিয়াবুরুজে জনাব ওস্তাদ বাসৎ খাঁ সাহেব যিনি তাজ খাঁ সাহেবের পুত্র ছিলেন, তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন নিয়ামতুল্লা খাঁ। বাসৎ খাঁ মিয়া তানসেনের বংশধর ছিলেন এবং সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। নিয়ামতুল্লা খাঁ ওয়াজেদ আলি শার দরবারে ছিলেন। ইনিও লখনউ থেকে এসেছিলেন। এই সময়ে সরোদে পরিবর্তন করা হয়। এগার বছর পরে নিয়ামতুল্লা নেপালে চলে যান। ইনি তিরিশ বছর নেপালে ছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি নেপাল থেকে সম্রাট এডওয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে দিল্লিতে বাজাতে আসেন। এইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিয়ামতুল্লা খাঁ সরোদে কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করেন যা আগে হয়নি। আদিতে সরোদে কাঠের প্লেট ছিল আর বাজনা হত তাঁতের তারে। তিনিই প্রথম লোহার প্লেট আর লোহার তার যোগ করলেন। প্রাচীন

সুবিনয় রায়

সরোদে দুটি তাঁতের পর্দা থাকত। নিয়ামতুল্লা এটি তুলে দিলেন। লোহার প্লেটের ওপর তাঁতের পর্দা রইল না বলে লোহার পর্দা সংযোগ করা হয়েছিল কিন্তু নিয়ামতুল্লা সেটিও বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। নিয়ামতুল্লা সরোদের ঠাট সুরশৃঙ্গার আর রবাবের মত ফেলেছেন।"

এই পরিবর্তন সম্বন্ধে ওস্তাদ হাফিজ আলীর উক্তি আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন তাঁর পরিবারের মুরাদ আলী স্টীলের প্লেট আর স্টীলের তার যোগ করেন। কোনও বাদানুবাদে যেতে চাই না। হাফিজ আলীর মন্তব্য কয়েক বছর আগে প্রকাশ করেছি, এই গ্রন্থের উক্তিও দেওয়া হল। এ বিচারও বিশেষজ্ঞদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল।

এখন প্রশ্ন হল—মূল আরবী গ্রন্থটি বর্তমানে কোথায়? নেপালে—না ভারতে, না গ্রন্থটি বিনষ্ট হয়েছে?

পরিশেষে বিশেষ সহায়তার জন্য ওস্তাদ ওমর খাঁ সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের একক অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্রীসুবিনয় রায়ের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার স্বীকৃতি অবিসম্বাদিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমন খ্যাতিমান অধ্যাপক দুর্লভ। বহু সার্থক ছাত্রছাত্রী আজ প্রায় তিরিশ বৎসর ধরে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতেই নয়, মার্গ সঙ্গীতেও তাঁর দক্ষতা কম নয় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠা এই কারণেই দৃঢ়মূল। জনপ্রিয় শিল্পীদের যে গ্ল্যামার থাকে সুবিনয়বাবুর সেটা নেই—তিনি সেটি অর্জন করতে চেষ্টাও করেননি, কিন্তু তাঁর অসাধারণ ডিগনিটি প্রকৃত বোদ্ধাদের জগতে তাঁকে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি জনপ্রিয় শিল্পীরূপে পরিচিত নন, নিষ্ঠাবান অধ্যাপকরূপে পরিজ্ঞাত।

এপ্রিলের চার তারিখে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে রবীন্দ্র সদনে শ্রীসুবিনয় রায়ের একটি একক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে তিনি কুড়িটি গান গেয়ে শোনান। এর মধ্যে দু-একটি গানে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন শ্রীচন্দন ভট্টাচার্য, শ্রীমুকুলেশ চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅমর দত্ত, শ্রীমতী সংঘমিত্রা গুপ্ত এবং শ্রীমতী অণিমা বসু। সুবিনয়বাবু তাঁর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রীতিতে রচিত বেশ কয়েকটি গান পরিণত শিল্পীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরিবেশন করেন। এগুলির মধ্যে "স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে", "জগতে আনন্দ যজ্ঞে তোমার নিমন্ত্রণ", "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা", "আছ অন্তরে চিরদিন" এই কটি গান বিশেষ মর্মস্পর্শী হয়েছিল। দুরূহ তালাদিতেও তাঁর যথেষ্ট অধিকার পরিলক্ষিত হল। তবলা, পাখোয়াজ এবং খোল বাদনে দক্ষতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরাপর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গানের মধ্যে "অমল কমল সহজে জলের কোলে", "ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী", "আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে", "কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান", "ওগো পথের সাথি নমি বারম্বার" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "কখন বসন্ত গেল এবার হল না গান"—এই গানটিতে টপ্পার কাজগুলি সুমধুর এবং আবেদনটিও আবেগে গভীরতায় শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রেখেছিল।

যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেছিলেন শ্রীনীলম মিত্র, শ্রীকার্তিক বসাক এবং শ্রীবিজলী সেন। নীলমবাবুর বেহালায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার বস্তু। এই প্রতিভাবান যন্ত্রশিল্পীর মনোরম সহযোগিতাও উপভোগ করেছি।

শার্ঙ্গদেব

॥ ২ ॥

ওই রাতে পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে আরও যেসব অধ্যাপক-অধ্যাপিকা নিহত হয়েছেন তাঁরা হলেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক আবদুর রেজাক, ডক্টর মফিজুল্লাহ্ কবির, ডক্টর ইন্নাস আলী, ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা।

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাও বর্বর সৈনিকদের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪নং স্টাফ কোয়ারটারে বাস করতেন। সৈন্যরা শ্রীগুহঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা এবং চৌদ্দ বছরের একমাত্র কন্যাকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে এনে গুলি করে

কল্‌হন

মেরেছে। শ্রীগুহঠাকুরতা ছিলেন ইংরেজীর একজন কৃতী অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। শ্রীগুহঠাকুরতার ডাক নাম খোকা। তাঁর বাবা নেই। বৃদ্ধা মা এখন কলকাতায় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীজ্যোৎস্নাময় গুহঠাকুরতার কাছে থাকেন।

যে সব অধ্যাপক নিহত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কৃতী এবং ঢাকার সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শোনা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভার ছিল মেজর ইমামের ওপর। তাঁর হাতে একটা তালিকা ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ারটারে ঢুকে তালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে একে একে অধ্যাপকদের হত্যা করেছেন।

পাকিস্তানী সৈন্যরা বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং গণ-সংগ্রামের পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ভবনটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। ভবনটি এক সময় তৈরী হয়েছিল পূর্ব-বাঙলা ও আসাম সরকারের সেক্রেটারিয়েট করার উদ্দেশ্যে। পরে তার বৃহত্তর অংশে গড়ে উঠেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। পূর্ব-প্রান্তের খানিকটা অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পশ্চিমে মেডিকেল কলেজ লাগোয়া ভবনটির সামনের অংশ ধ্বসে পড়েছে পাক

সৈন্যের মর্টার আর কামানের গোলায়। পূব দিকের ছোট্ট এবং চিলতে ভবনটির বলতে গেলে কিছুই আর আস্ত নেই। ভেঙেছে দক্ষিণ প্রান্তের ভবনটিও। পরে যারা খানিকটা দূরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের কথা থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ভবনটি এখন ইঁট, কাঠ, সুরকি আর লোহার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই ঐতিহাসিক বট-গাছটিও দিন কয়েক আগেও যার নিচে দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্নি-শপথ নিয়েছিল ১১-দফা এবং ৬-দফা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার। একটা জাতির দীর্ঘদিনের তিলে তিলে সঞ্চয়-করা সম্পদ—কত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি আর পুস্তক যে পুড়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে পাক-সৈন্যের কামানের গোলায় আর রকেটে, কে তার খোঁজ রাখে। একদিন হয়ত আবার ইমারত হবে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যাবে কি সেইসব অমূল্য বই আর পুঁথি? পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই যত গণ-আন্দোলন হয়েছে তার জন্ম হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বেলতলা, আমতলা, বটতলায় আর মধুর ক্যানটিনে। তাই ইয়াহিয়া-টিক্কা খান চক্র নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ব-বাঙলার গণ-আন্দোলনের প্রথম সারির সৈনিক হলো ঢাকার নির্ভীক ছাত্র, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক এবং শিল্পীরা। তাই ইয়াহিয়ার রোষের খড়্গ প্রথমেই নেমে এসেছে তাঁদের ওপর। ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্ত: এদের দমাতে আর কমাতে পারলে পূর্ব-বাঙলায় ভবিষ্যতে গণ-আন্দোলন আর মাথা চাড়া দিতে পারবে না। যদি তাদের পূর্ব-বাঙলা ছাড়তেই হয়, তাহলেও যাতে আগামী কয়েক বছর পূর্ব-বাঙলা দাঁড়াতে না পারে তারই জন্য বুদ্ধিজীবীদের এই পাইকারি হত্যার আয়োজন। শুনেছি বর্বর পাক-সৈন্যের বুলেট আর বেয়নট থেকে হাইকোর্টের বিচারপতিরা পর্যন্ত রেহাই পান নি।

পাক দস্যুরা বহু অধ্যাপক এবং ছাত্রকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছে। নিহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন বিল্ডিং ও জগন্নাথ হল এবং ইকবাল হলে। মেইন বিল্ডিং-এ ছিল আট শ'র মতো ছাত্র। তাঁদের ক'জন বেঁচে আছেন এখনও খবর জানা নেই। জগন্নাথ হল এবং ইকবালের আবাসিক ছাত্রদের খুব সামান্যই পাক সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সকলেই হিন্দু। হলের প্রভোস্ট ছিলেন ডক্টর গোবিন্দ দেব। হলের মাঠে, বারান্দায়, ঘরে, সিঁড়িতে সর্বত্র কয়েকদিন পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল অনেক মৃতদেহ। রোকেয়া হল পর্যন্ত ওই একই দৃশ্য। রোকেয়া হলের মেয়েরাও প্রথম বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে ঘরে ঘরে গিয়ে পলায়মান মেয়েদের ধরে ধরে অকথ্য নির্যাতন করেছে। ওই দৃশ্য দেখে অনেকেই ছাদ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছে। পরবর্তী এক খবরে প্রকাশ, পঞ্চাশ জনের মতো মেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। একশ'র মতো মেয়েকে পাক সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে। জানি না, ওদের ভাগ্যে কী লাঞ্ছনা, কী নির্যাতন জুটেছে। ওদের মাত্র কয়েকজন রাতের অন্ধকারে পালাতে পেরেছে বলে জানা যায়। রোকেয়া হলের সহ-সভানেত্রী ছিলেন আয়েশা খানম। রোকেয়া হলের প্রতিটি ছাত্রী তাঁর কথায় উঠত বসত। হলের নেত্রী ছিলেন মতিয়া চৌধুরী। আয়েশা তাঁরই উত্তরসূরী। অগ্নি-কন্যা মতিয়া চৌধুরীর মতোই দিন কয়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর চোখে দেখা দিয়েছিল আগুনের ফুলকি, শপথের দৃঢ়তা। জানি না, ওই পঞ্চাশজনের মধ্যে আয়েশাও আছে কিনা। এমনি আর একজন বীরাঙ্গনা ছাত্রী রোশেনারা। বুকে মাইন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে শত্রুর ট্যাংকের নিচে। নিজে মরেছে, কিন্তু শত্রুর একটি ট্যাংক ধ্বংস করে মরেছে। রোশেনারা আজ মরেও অমর। রোশেনারা ঢাকা উইমেন

কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। শুধুমাত্র হাতবোমা সম্বল করেও বাঙলার দামাল ছেলেরা পাক-ট্যাংকের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেছে শয়ে শয়ে। ডজনে ডজনে গুলি খেয়েছে, মরেছে, তবুও তারা ট্যাংকের ওপরে উঠে ভিতরে নিক্ষেপ করেছে হাতবোমা। এমনি ভাবে মুক্তিফৌজের বীর ছেলেরা লালবাগ এলাকায় শহরে আরও তিনটি চীনা টি-৫৪ ট্যাংক ধ্বংস করেছে।

রোকেয়া হলের সদ্য-গড়া শহীদ-মিনারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে পাক-সৈন্যরা। এই বছরই শহীদ দিবসে বেদীটির উদ্বোধন করেছিলেন হলের প্রভোস্ট আক্তার ইমাম।

পাক-সৈন্যের সবচেয়ে বেশি আক্রোশ ছিল ইকবাল হলের আবাসিক ছাত্রদের ওপর। ইকবাল হলের নতুন নামকরণ হয়েছে জহুরুল হক হল। ঢাকায় ছাত্রদের কাছে সার্জেন্ট জহুরুল হক ইকবালের চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধেয়। ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তানের সৈন্যদেরই হাতে ১৯৬৯ সালে শহীদ হয়েছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক। শেখ মুজিবের মত তিনিও ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী। সার্জেন্ট জহুরুল হককে আটক রাখা হয়েছিল তৃতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৪ নম্বর ব্যারাকে। ১৫ ফেব্রুয়ারির রাত্রে ডিউটির প্রাইভেট সার্জেন্ট জহুরুল হক ল্যাট্রিনে যেতে চাইলে রক্ষী ভোর হওয়ার আগে দ্বার খুলে দিতে অস্বীকার করে। সামরিক কাস্টোডিয়ান মেজর নাসেরের কিন্তু নির্দেশ ছিল আসামীরা প্রয়োজনবোধে যে-কোনো সময় ল্যাট্রিনে যেতে পারবেন। তর্কাতর্কির পর গার্ড-কমান্ডার মঞ্জুর হোসেইন শাহ্ দরজা খুলে দিল বটে, কিন্তু সার্জেন্ট হক এবং তাঁর এক সঙ্গী কয়েক পা এগোতে-না-এগোতেই মঞ্জুর হোসেইন পিছন থেকে গুলি করল তাঁদের। জহুরুল হক এবং তাঁর সঙ্গী লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। তাঁরই স্মরণে ইকবাল হলের নাম পাল্টে ছাত্রেরা নতুন নামকরণ করেছে জহুরুল হক হল। এবারকার সংগ্রামের কেন্দ্র ছিল জহুরুল হক হল। 'স্বাধীন বাঙলা ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদ'-এর প্রধান কার্যালয় ছিল এই হলেই। এই হলেরই ক্যান্টিনে বসে নূরে আলম সিদ্দিকী, সাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আবদুর রব, রেজাউল হক মোস্তাক প্রমুখ ছাত্র নেতারা ৯ মার্চ 'স্বাধীন বাংলা দেশ' আন্দোলনের প্রস্তাব নেয়। অপর এক প্রস্তাবে বাংলা দেশের জাতীয় সরকার গঠনের জন্য ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরকে অনুরোধ জানায়। সভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগকে শুধু 'ছাত্র লীগ' নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। এই হলে বসেই 'ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদ' স্বাধীন বাংলার পতাকার পরিকল্পনা করেছিল দিন কয়েক আগে। কাজেই ইয়াহিয়া-টিক্কাখানের রুদ্ররোষ তো ওই হলের আবাসিক ছাত্রদের ওপর সবচেয়ে বেশি পড়বেই। ইকবাল হলে সৈন্যরা বিনা বাধায় ঢুকতে পারে নি। ছেলেরা রাইফেল, বন্দুক আর হাতবোমা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা লড়াই চালিয়ে গেছে মেশিনগান, মর্টার আর ট্যাংকের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা ওদের রুখতে পারেনি। সৈন্যরা আধুনিক মারণাস্ত্র হাতে দলে দলে তিন দিক থেকে ঢুকে পড়েছে আবাসিক হলে। ঘরে ঘরে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করেছে। ঘরে ঘরে ঢুকে ধরে নিয়ে এসেছে ছাত্র আর অধ্যাপকদের। যারা ছাদে উঠেছিল প্রাণভয়ে, রেহাই পায়নি তারাও। একটি খবরে প্রকাশ, জহুরুল হক হলের ২১ জন ছেলেকে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করেছে পাক-সৈন্যরা। অধ্যাপকদেরও হত্যা করেছে ওরা। সামান্য দুই চারজন যাঁরা এখনও জীবিত ছিলেন তাঁদের দিয়ে কবর খুঁড়িয়েছে। লাসগুলি বড়ো বড়ো গর্ত খুঁড়ে কবর দিয়েছে যারা, তারাও রেহাই পায়নি। কবর দেওয়া হয়ে গেলে তাদেরও গুলি করে হত্যা করেছে বর্বরেরা। তারা তাদের মারণযজ্ঞের কোনো সাক্ষীই রাখতে চায় না। পৃথিবীকে বোঝাতে চায়, দেখো ঢাকায় কিছুই হয়নি। সবই ভারতের মিথ্যা রটনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের একাংশ

সলিমুল্লা মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস সর্বত্র ঢুকেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। পৈশাচিক আনন্দে নির্বিচারে ছাত্র আর অধ্যাপক নিধন চালিয়ে গেছে তারা সেই রাত্রে। ওই দিনকার মারণযজ্ঞের প্রথম বলি হয়েছিল সম্ভবত বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির সামনেকার প্রহরারত ই. পি. আরের কয়েকজন বাঙালী।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে-সময় পাক-সৈন্যরা দাগছিল কামান আর মর্টার, ছুঁড়ছিল রকেট আর মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করছিল নিরীহ, নিরস্ত্র ছাত্র আর অধ্যাপকদের, ঠিক ওই একই সময়ে সেনাবাহিনীর একটা বিরাট দল এগিয়ে গেছে রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের দিকে। আর একটা গেছে ই. পি. আরের হেড কোয়ার্টার্স পিলখানার দিকে। দিন কয়েক থেকে নানান ছুতোয় তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা চলছিল দেখে পুলিশ আর ই. পি. আরের লোকেদের মনে সন্দেহ একটা দেখা দিয়েছিল। তারা বুঝতে পারছিল, কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কীরূপে সেইটাই জানত না তারা। তারা ভেবেছিল হয়তো মার্শাল ল' জোরদার করা হবে, কঠোরতর করা হবে; ধরপাকড় হবে প্রচুর। কিন্তু পাক সৈন্যরা আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে যে সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়বে এটা ভাবেনি কেউ। তাই তাদের কাছে আক্রমণটা ছিল অতর্কিত। পাক সেনাবাহিনী রাজারবাগের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স ঘিরে ফেলতেই সকলে লাফিয়ে

উঠল। যে যেমন অবস্থায় ছিল, প্যান্ট অথবা লুঙ্গি পরা, গেঞ্জি অথবা শার্ট গায়ে সেই অবস্থাতেই মুহূর্তে তুলে নিল রাইফেল। যে-কয়টা মেসিনগান ছিল তা নিয়ে একটা দল উঠে গেল ছাদে। অন্যেরা রাইফেল হাতে পজিসন নিল জানলায় জানলায়, অলিন্দে অলিন্দে। রাইফেল হাতে মোকাবিলা করল তারা সৈন্যদের। পুলিশরাও যে এমন নির্ভীক, এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারে সৈন্যরা আগে ভাবতেও পারেনি। ২৬ মার্চ বিকেল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল বাঙালী পুলিশরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাক ফৌজের একটা বিরাট বাহিনীকে। শেষটায় পাক সৈন্যরা ব্যবহার করেছে রকেট, মর্টার, আর ট্যাংক। পুলিশরা হয়ত প্রায় সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু মেরেছেনও অনেক।

১৩ এপ্রিল ঢাকার একজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'লো। তিনি নিজেই একজন মুক্তি-যোদ্ধা। ঢাকারই ছেলে। পাক-সেনা যখন রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করে, তখন তিনি ব্যারাকের খুবই কাছে ছিলেন। তাঁর মুখেই সেদিন পাক-সেনা কর্তৃক রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক আক্রমণের নিখুঁত ছবি তুলে ধরছি। তাঁর কথাঃ '২২ মার্চই হঠাৎ একটা গুজব রটে যায় যে, পাক-সৈন্যের এক বিরাট-বাহিনী আজ ঢাকায় নামবে। ধরপাকড় এবং হত্যা দুই-ই তারা চালাবে। আমরা প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম। কিন্তু কিছুই হ'লো না, তবু, কখন কী হয়—এই ভেবে আমরা মোটামুটি প্রস্তুত হ'য়েই রইলাম। রাত জেগে, রাইফেল হাতে ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় পাহারা দিয়ে চলছিলাম কয়েকদিন ধরেই। ভোরে আবার রাইফেল ট্রেনিং নিতে যেতাম। কয়েক দিন খুবই খাটুনি পড়ে গিয়েছিল। তবু, উৎসাহে আমাদের ঘাটতি পড়েনি।

'২৫ মার্চ বিকেলে খবর পেলাম আজ একটা-কিছু হবে। আওয়ামী লীগ অফিস থেকে আমাদের তৈরী হয়ে থাকতে বলল।

'আমি তখন বন্ধুদের সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের কাছে একটা বাড়িতে। পুলিশদের সঙ্গে কথা হ'য়েছিল তারা সংকেত দেখালে আমরা তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাব। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে দেখা গেল দুই দীর্ঘ সারিতে মিলিটারি জীপ আসছে। পিছনে মিলিটারি ট্রাক। জীপ রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের সামান্য দূরে এসে থামল। পুলিশ ব্যারাকের সমস্ত আলো তখন নেভানো ছিল। জীপ থেকে জোরালো সার্চলাইটের আলো ফেলা হলো বাড়িটায়। সামনের সারি থেকে এক-জন মিলিটারি অফিসার মাইকে চীৎকার করে বলল, 'দো লাইন'। সম্ভবত কথাটা ফলো লাইন। একটু নীরবতা। আবার মিলিটারি অফিসারটি চীৎকার করে বলল, 'ফো লাইন'। এবারে জবাব এলো পুলিশ ব্যারাক থেকে। একসঙ্গে একরাশ রাইফেলের গুলি গিয়ে বিদ্ধ করল প্রথম সারির প্রায় সব কয়জন সৈন্যকে। পিছনের জীপ থেকে আবার চীৎকার শোনা গেল, 'ফো লাইন। উয়ি ওন্ট রিপিট এগেইন।' পুলিশ ব্যারাক থেকে কোনো সাড়া নেই। মিলিটারি জীপের সার্চ লাইটের আলো নিভে গেল। অন্ধকার নেমে এলো। পরমুহূর্তে রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে দিয়ে একসঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা মেসিনগান। টা-টা-টা-টা একনাগাড়ে চলল গুলি। পুলিশ ব্যারাক থেকেও প্রত্যুত্তর এলো। গুলির শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে ট্যাংকের ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনলাম। ওগুলো দূরে মালিবাবাগের রাস্তায় দাঁড় করানো ছিল। ট্যাংকের শব্দে জানলার শার্সিগুলো ঝনঝন করে কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল সব কাঁচ এখনই গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। ওরা ট্যাংক থেকে কামান দাগাল, রকেট ছুঁড়ল। দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠল।

পুলিশ ব্যারাক থেকে সংকেত আর আসেনি। আমরাও মাত্র কয়েকটি রাইফেল সম্বল করে এগিয়ে যেতে সাহস করিনি। তাতে কিছুই লাভ হতো না। আমরা শেষ রাতের দিকে চলে এসেছি। পুলিশরা বেশ কয়েক ঘণ্টা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে।'

ওই একই অবস্থায় পিলখানায় ই. পি আর বাহিনীও লড়াই চালিয়ে গেছে ৪৮ ঘণ্টা। ই. পি. আরের কিছু লোক শেষ মুহূর্তে পিছু হটে আওয়ামী স্বেচ্ছা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বলে জানা যায়।
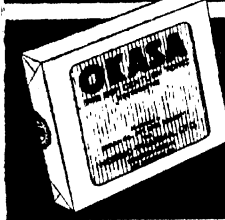
সৈন্যদের মর্টার আর কামানের গোলায়, রকেটে রাজারবাগ আর পিলখানার আশ-পাশের অনেক বাড়িই পুড়ে এবং ভেঙে গেছে। ওইসব অঞ্চলে দিন তিনেক পর্যন্ত শুধু দেখা গেছে আগুন আর ধোঁয়া।

শুধু ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি ইয়াহিয়ার সৈন্যরা। মধ্য ও পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকায়ও চালিয়েছে তাদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। মধ্য-ঢাকার মালিবাগ পুরানো পল্টনে বাড়ি বাড়ি ঢুকে কত লোককে যে মেরেছে সৈন্যরা তার ইয়ত্তা নেই। যেই বাড়িতে দেখেছে বাঙলা দেশের পতাকা, সেই বাড়ির মেয়ে-পুরুষ-শিশু প্রতিটি মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বর্বরেরা।

সৈন্যরা কয়েকটি ভাগে ঢুকে পড়েছিল পুরনো ঢাকায়। নবাবপুর রোড হয়ে গেছে একটা দল, নিউ মার্কেট হয়ে চকবাজার অভিমুখে গিয়েছে আর-একটা দল। যেতে যেতে পথের দুই ধারের বাড়িঘর দোকানপাট খেয়াল-খুশিমতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, ভেঙে-চুরে দিয়ে গেল সৈন্যরা। নবাবপুর রোডের দুই ধারের অনেক বাড়ি, অনেক দোকান পাক-সৈন্যের মর্টারের গোলায় ভেঙে গেছে, পুড়ে গেছে। এখনো সড়কের দরজায়, দেওয়ালে দেওয়ালে পাওয়া যাবে গোলা গুলির নিশানা। পাক সৈন্যদের তাণ্ডব চলেছে বেশি তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজার, বাংলাবাজার, সদরঘাট, ইসলামপুর প্রভৃতি এলাকায়। তাঁতিবাজার, শাঁখারিবাজারের পঁচাশি-নব্বই ভাগ অধিবাসী হিন্দু। বাংলা বাজারের অধিবাসীদেরও অধিকাংশই হিন্দু। এইসব এলাকা খুব ঘনবসতিপূর্ণ। বাড়িগুলো একটার গায় একটা লাগানো; ঘিঞ্জি। সৈন্যরা এলাকাগুলো ঘিরে ফেলে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কত নরনারী আর শিশু যে সেই আগুনে পুড়ে মরেছে কে তার হিসাব রাখে! যারাই বেরিয়েছে সৈন্যদের এল এম জির গুলি তাদের দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় আবার তাদের অনেককে একত্রে হাত তুলে দাঁড় করিয়ে এমাথা থেকে ওমাথা লাইট মেসিনগান চালিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন পর্যন্ত ওইসব এলাকায় দেখা গেছে শুধু আগুন আর আগুন। কোনো কোনো স্থানে মানুষ মরিয়া হয়ে দা, লাঠি, বন্দুক, বল্লম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সৈন্যদের মোকাবিলার জন্য। সেখানে অত্যাচার আরও বেশি হয়েছে।

২৫ মার্চ মাঝরাতেই সৈন্যদের একটা দল ইত্তেফাক অফিস ঘিরে ফেলে পাঞ্জাবী ভাষায় চীৎকার করে বলতে সকলকে বেরিয়ে আসতে বলে। কেউ বেরোয় না সহ ভয়ে। কেউ বেরুয়ও না। বেরুলেও রক্ষা পেত না। সৈন্যরা রকেট ছুঁড়ে আগুন লাগিয়ে দিল ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোডের ইত্তেফাক পত্রিকার অফিসে। তারপর সেই জ্বলন্ত বাড়ির ওপর দিয়ে চালিয়ে দিল ট্যাংক আর সেই সঙ্গে মেসিনগানের গুলি। ট্যাংকের নিচে গুঁড়িয়ে গেল দামী অফসেট মেসিন। আরও কত কি! আগুনে আর গুলিতে পুড়ে মরেছে সেদিন-কার নাইট শিফ্‌টের প্রচুরকর্মী। তোফাজ্জল হোসেন এবং তাঁর সহকর্মীদের অনেক পরিশ্রম, অনেক কষ্টের বিনিময়ে তিলে তিলে গড়ে তোলা সৌধ পাক-সৈন্যরা গুঁড়িয়ে দিল। ইত্তেফাক বরাবরই গণ-আন্দোলনের তীব্র সমর্থক। আওয়ামী লীগের গণ-সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার ছিল ইত্তেফাক। ইত্তেফাকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৯ সালে, সাপ্তাহিক হিসাবে। তাও ছিল অনিয়মিত। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৯৪৯ থেকে ৫১ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের মাত্র তেরটি সংখ্যা বেরোয়। দৈনিক হিসাবে ইত্তেফাকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর। তারপর কয়েকবারই সরকারের কোপে পড়তে হয় এই পত্রিকাটিকে। আয়ুবী আমলের শেষ দিকেও পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময় ইত্তেফাকের প্রকাশ বন্ধ ছিল। '৬৬ সালে আয়ুব প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, পত্রিকা বন্ধ রেখেছিলেন শুধু, ইয়াহিয়া পত্রিকা ভবনটিরই অস্তিত্ব রাখলেন না।

শুধু ইত্তেফাকই নয়, ইংরেজি সাপ্তাহিক 'পিপল' পত্রিকার অফিসটিও সৈন্যরা জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। পিপল ছিল ইয়াহিয়া-ভুট্টোর কট্টর সমালোচক। আর একটি সংগ্রামী পত্রিকা 'সংবাদ'-এরও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে শোনা যায়। আয়ুব-বিরোধী গণ-আন্দোলনে এই পত্রিকাটিরও ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

পত্রিকাটির সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী। সহ-সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার। বংশালরোডের এই ভাঙাচোরা বাড়িটির সঙ্গে আমারও অনেক কর্মদিনের স্মৃতি জড়িত। পত্রিকাটি বর্তমানে ওয়ালি খান গ্রুপ ন্যাপের মুখপত্র।

ইয়াহিয়ার এই ধ্বংসযজ্ঞের সহায়তা করেছে ঢাকার অবাঙালী মুসলমানেরা। তারা বিভিন্ন এলাকায় মাথায় মুখে কাপড় জড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আওয়ামী লীগ কর্মী এবং নেতাদের বাড়ি। দেখিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অফিসারদের বাড়ি। ঢাকায় অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অফিসার এবং সৈনিকরা কয়েকদিন আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেখ মুজিবকে সমর্থন করার। ২৩ মার্চ বিকেলে বায়তুল মোকাররমের প্রাঙ্গণে বিমান, নৌ এবং স্থল-বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের এক সমাবেশ হয়। তাঁরা সেখানে ঘোষণা করেছিলেন, আজ থেকে আমরা আর কেউ প্রাক্তন নই। আজ থেকে আমরা আছি নেতা আর জনতার পাশে। তাঁর যাতে শেখ মুজিব এবং তাঁর মুক্তিফৌজের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারেন তার জন্যে পাক-সৈন্যরা তাঁদের খোঁজে হন্যে হয়ে বেড়িয়েছে সেই রাতে এবং তার পরেও। তাঁদের অধিকাংশকেই পাক-সৈন্যরা খুঁজে পায়নি। দু-একজনকে পেয়েছে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। নিহতদের একজন হলেন কর্নেল ওসমানী। যাঁদের পায়নি, তাঁদের অনেকের ঘরে ঢুকে ঢুকে তাদের স্ত্রী-কন্যার ওপর ধর্ষণ করেছে, তারপর সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে সৈন্যদের ব্যারাকে।

সৈন্যদের হাত থেকে মন্দির, মসজিদ কিংবা গির্জাও রেহাই পায়নি। ঢাকার রেসকোর্সের পাশে বহুদিনকার পুরনো ঐতিহ্যবাহী রমনা কালিবাড়ি পাক-সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে। সেখানকার পূজারী এবং অন্যান্য লোকজন কেউই বেঁচে নেই বলে জানা গেছে। সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে নবাবপুর রোডের বহু পুরনো সেন্ট টমাস গির্জা। ২৫ মার্চ রাত্রিতে সৈন্যদের মর্টার আর কামানের গোলায় গির্জাটি ধ্বসে গেছে। ঢাকা বৃটিশ কাউন্সিলের একজন কর্মচারী শ্রীচার্লস হুউই এবং ভি-এস-ওর দুইজন সদস্য গির্জার ছবি নিতে গিয়েছিলেন। পাক-সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্টে। একটি ফায়ারিং স্কোয়াড তাঁদের দাঁড় করিয়ে গুলি করতে যাবে, সেই মুহূর্তে মার্কিন কনস্যুলেটের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর হস্তক্ষেপের ফলে তাঁরা তিনজন প্রাণে বেঁচে যান। তবে ওই মুহূর্তে তাঁদের ঢাকা ত্যাগ করতে হয়। বলা বাহুল্য, ক্যামেরা তাঁরা ফেরত পাননি।

২৫ তারিখ মাঝরাত্তির থেকে সারারাত, আবার ২৬ তারিখ সকালে খানিকটা সময় বাদ দিয়ে সারাদিন সারা রাত্তির ধরে চলে সৈন্যদের তাণ্ডব। ২৭ তারিখ সকালে কয়েকঘণ্টার জন্য কার্ফু তুলে নেওয়া হয়। লোকের মধ্যে তখন ঢাকা ছেড়ে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়। যাঁরা তখনো বেঁচে ছিলেন, বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে পালাতে শুরু করেন। চারটে থেকে শুরু হয় আবার কার্ফু। আবার সেই তাণ্ডব—জ্বালানো-পোড়ানো, গুলি-চালানো, অত্যাচার-নির্যাতন।

ইছামতীর ধারে সীমান্তের কাছে ঢাকার জহুরুল হক হলের একজন ছাত্রের দেখা পেলাম। নামটা আমি

জানি। তবু নামটা তাঁরই ইচ্ছায় এখানে উহ্য রইল। ২৫ মার্চের সেই বিভীষিকাময় রাত্রে সে ওই হলে ছিল। বরাতজোর বেঁচে গেছে। বহু পথ অতিক্রম করে বাড়ি এসে পৌঁছেছে। ভাষার একটু অদল বদল হবে, তবু তারই জবানীতে সৈন্যদের ধ্বংসযজ্ঞের একটা ছবি তুলে ধরছি। সৈন্যরা যখন মেসিনগান নিয়ে আক্রমণ করে, আমি তখন ঘুমুচ্ছিলাম। মেসিনগান, রাইফেল আর বোমার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে তাকিয়েই দেখি, সৈন্যরা হলের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। অনেক ছাত্র মিলে বাধা দিচ্ছে, হাত বোমা ছুঁড়ে মারছে বারান্দা থেকে, ছাদ থেকে। বিপদ বুঝে আমি অন্যদিক দিয়ে সরে পড়লাম। তখন একদিকে সৈন্যরা ঢুকে পড়ে জানলা দিয়ে মেসিনগান চালিয়ে বন্ধুদের হত্যা করে চলেছে। সে রাতটায় একটা গাছে লুকিয়ে ছিলাম। পরদিন খুব ভোরে সৈন্যরা খানিক সরে যেতেই আমি গুটিগুটি লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পুরোনো ঢাকার একটা ধ্বসে-যাওয়া বাড়িতে সারাদিন কাটালাম। খাওয়ার কথা মনেই হয়নি। রাত্রিতে বেরোতে পারলাম না। পরের দিন সকালে পোটলাপুঁটলি হাতে কিছু কিছু লোকজনকে হাঁটতে দেখে সাহস করে আমিও ভাঙা-বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে আমিও বুড়িগঙ্গার ধারে এসে নৌকো নিয়ে ওপারে এলাম। প্রাণের ভয়ে বহু লোক ছুটছে। পথে আসতে আসতে বহুবার মাঝে অনেক মানুষের চোখে পড়ছে। হিন্দু-মুসলমান, মেয়ে পুরুষ-শিশু কেউই সৈন্যদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কয়েক জায়গায় দেখেছি চাপ-চাপ রক্ত, রক্তের ধারা। বোধহয় সেখানে কেউ মরে পড়েছিল, সরিয়ে নিয়ে গেছে। বুড়িগঙ্গার ধারে দেখলাম দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে তার বছর-দেড়েকের একটা ছোট্ট বোনকে কাঁখে নিয়ে, বছর তিনেকের একটা ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ওপারে যাবার পয়সা নেই। তাছাড়া এত ভিড় যে ওরা লাফিয়ে উঠতেও পারছে না। মেয়েটিকে দেখে অবাক হলাম। ও কোথায় যাবে। বাবা-মা কোথায়? আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল ও। আস্তে আস্তে একটা-দুটো করে কথা জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েটি নিজের নাম বলল, শাহিনা। পরনে ছিল শাড়ি। ছোট্ট ভাইবোন দুটোর পরনে কিছুই ছিল না। মেয়েটি বলল, 'রাইতে আমরা ঘুমাইয়া আছিলাম। বিহানে উইঠা দেহি, আমাগো আব্বাজান বাসা থেইকা বাইরের পথটায় পইড়া রইছে। লহুতে সারা গাও ভাইসা যাইতাছে। আমি গিয়া আব্বাজানের মাথাটা তুইলা ধরলাম, আব্বাজান আর চাইল না।' বলে মেয়েটি হুহু করে কাঁদতে থাকল। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর আম্মা কই?' উত্তর দিল, 'জ্বর অইছিল। হেই পুষ মাসে মইর‍্যা গেছে।' জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাবি? কার কাছে থাকবি।' মেয়েটি খালি কাঁদতে থাকল। জানি না বাপমাহারা ওই তিনটি অনাথ শিশু আজ কোথায় যাবে? আমার পক্ষেও ওদের নিয়ে আসার উপায় ছিল না। ওদের হাতে দুটো টাকা দিয়ে অতি-কষ্টে একটা নৌকো চেপে ওপারে এলাম। তার বেশি তখন দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমিও সব কিছু ফেলে এক জামা-পাজামা পরে চলে এসেছি। পকেটে যা ছিল তাই সম্বল।

তারপর কখনো মাঠঘাট পেরিয়ে, কখনো নৌকো করে, কখনো হেঁটে, কখনো রিকশায়, কখনো লঞ্চে এসেছি। পথে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হয়নি। ঢাকার ছাত্র বলে পরিচয় দিতে সব জুটে গেছে।'

ছাত্রটির কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও যা জেনেছি, সে সবের উল্লেখ আগেই স্থানে স্থানে করেছি, ওসবের আর পুনরাবৃত্তি করছি না।

ধানমণ্ডী এবং ইন্টার কনটিনেন্টাল হোটেলের সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাকও সৈন্যদের সঙ্গে জোর লড়াই চালিয়ে গেছে বেশ কয়েকঘণ্টা। লালবাগ এলাকায় পাক-সৈন্যরা ঢুকতে পারেনি বেশ কয়েকদিন। এলাকাটা মুক্তিফৌজের দখলেই ছিল। ঢাকা বেতারকেন্দ্রের দখল নিয়েও দিন-দুই প্রবল যুদ্ধ করেছে মুক্তিফৌজ। শেষ অবধি দখল নিয়েও ছিল, আবার হাতছাড়া হয়ে গেছে। ঢাকার শহরাঞ্চল এখন পাক-সৈন্যদের দখলে। কিন্তু শহরতলি অঞ্চল, যেমন ডেমরা, জয়দেবপুর, সাভারে মুক্তি-ফৌজের বেশ প্রাধান্য রয়েছে। ওইসব অঞ্চলে মাঝে মাঝেই প্রবল সংঘর্ষ হচ্ছে দুপক্ষে। পাকসৈন্যদের সবচেয়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে নারায়ণগঞ্জে ঢুকতে

গিয়ে। একটা খবর পেয়ে ২৫ মার্চ নাগাদ নারায়ণগঞ্জে দলে দলে ছেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। তারা পাগলা-ফতুল্লায় রাস্তার দুধারে বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে। যেমনটা ফেলেছিল '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের সময়। পুল ভেঙে, রাস্তা কেটে, রেললাইন তুলে, নানানভাবে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তারা নারায়ণগঞ্জে যাবার পথ দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল। ঢুকতে না পেরে সৈন্যরা নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করেছে। শুনি, নারায়ণগঞ্জ জেটি বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মুক্তিফৌজের একটা বিরাট বাহিনী জমায়েত হয়েছিল নরসিংদীতে। সৈন্যরা সেখানেও এলোপাথাড়ি বোমাবর্ষণ করে চলেছে। নরসিংদী বাজার বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। পাকিস্তানী সৈন্য সেবার জেট থেকে শহরতলি অঞ্চলে বোমা ফেলে চলেছে থেকে থেকে।

॥ ৩ ॥

২৬ মার্চ যে-সময়ে স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের ঐতিহাসিক ঘোষণা চলছিল প্রায় ওই সময়েই করাচি বেতার থেকে শোনা যাচ্ছিল প্রেসিডেণ্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের তর্জন এবং গর্জন। তিনি বললেন: শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চান। এই অপরাধের জন্য তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, দেশের সর্বত্র সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হলো। রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হলো।

খান সাহেবের বুদ্ধি-সুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসম্বাদী নেতা যিনি, যিনি নির্বাচনে পূর্ব-বাঙলার শতকরা ৯৮·৭ ভাগ আসন পেয়ে জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন, যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন প্রাদেশিক পরিষদেও, তিনি হলেন দেশদ্রোহী আর জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়া যাঁর পিছনে জনগণের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই, যিনি সুযোগ বুঝে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পিস্তল দেখিয়ে আয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতায় এসেছেন, তিনি হলেন দেশপ্রেমিক! আশ্চর্য! এই রকম নির্লজ্জ উক্তি তিনি করলেন কী করে। তিনিই না গত নির্বাচনের পর ঢাকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, 'আমি সৈনিক। গণ-প্রতিনিধিদের হাতে যথাসত্বর ক্ষমতা তুলে দিয়ে আমি আমার ব্যারাকে ফিরে যেতে চাই। আমি জানি, জনসাধারণ সামরিক শাসন পছন্দ করে না।' তিনিই না নির্বাচনের পর শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে সংবর্ধনা জানিয়েছেন! সেই ডিসেম্বরের মুজিব আর মার্চের মুজিবের মধ্যে তিনি এমন কি পরিবর্তন দেখলেন যার জন্য তিনি তাঁকে পাকিস্তানের শত্রু বলে আখ্যা দিলেন! শেখ মুজিব নির্বাচনের আগেও ৬-দফার এবং ১১ দফার কথা বলেছেন, ওই ছয় দফার ভিত্তিতেই জনগণের রায় চেয়েছেন, জনগণও তাঁর পক্ষে তাঁদের সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। ছয়-দফার দাবিতে নির্বাচনে শেখ মুজিবকে প্রতিযোগিতা করতে দিতে দোষের হ'লো না, দোষের হ'লো নির্বাচনের পর ছয়-দফার দাবি তোলায়; ছয়-দফা

এগারো দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের খসড়া করায়? তিনিই না নির্বাচনের পর ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে অন্যায় করা হয়েছে। তারা নানাদিক থেকে বঞ্চিত। তাদের জন্য কিছু করা উচিত। তিনি না আরও বলেছেন, আমি তথাকথিত সংহতিতে বিশ্বাস করি না। তাহলে কেন তার এই ভাবান্তর? দুদিন আগেও তো প্রেসিডেন্ট ভবনে বসে শেখ মুজিবের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন সংকট নিরসনের জন্য। কী এমন কারণ ঘটল যার জন্য শেখ মুজিব রাতারাতি অচ্ছুৎ হয়ে গেলেন! ইয়াহিয়া খান কারণ হিসেবে বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের পতাকাকে অপমান করেছেন? কবে? নিশ্চয়ই তিনি ২৩ মার্চের কথা বোঝাতে চাইছেন। ২৩ মার্চ পাকিস্তান-দিবস। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের স্মারক-দিবস। পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনে এবার সেদিন প্রশ্ন দেখা দিল, দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পদে পদে লাহোর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীরা ইসলামের দোহাই পেড়ে সংখ্যাগুরু পূর্ব-বাঙলার ওপর শোষণ এবং নির্যাতন চালিয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাবের স্মরণ দিবস পালন করে লাভ কী? পূর্ব-বাঙলা কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়ে গেছে। লাহোর প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছিলেন মহম্মদ আলী জিন্নাহ নিজে। লাহোরে মুসলিম লীগের পূর্ণ অধিবেশনে খসড়াটি এক বাক্যে অনুমোদিত হয়েছিল। প্রস্তাবটিতে 'পাকিস্তান' কথাটির কিন্তু উল্লেখমাত্র ছিল না। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত ইউনিটগুলি নিয়ে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক রদবদল করে ভারতকে এমন কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করতে হবে যাতে করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ —সেখানে একাধিক 'স্বাধীন রাষ্ট্র' গড়ে উঠবে এবং সেই সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

কিন্তু কার্যত কী হয়েছে? পূর্বাঞ্চলের ইউনিটটি আর 'রাষ্ট্র' হতে পারেনি, হয়েছে উপনিবেশ। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সব কিছুকেই পঙ্গু করে দিয়েছে ১২শ মাইল দূরের পশ্চিমাঞ্চলের ইউনিটটি যার নাম হয়েছে 'পাকিস্তান'। প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলের চারটি ইউনিটও তো হবে স্বশাসিত এবং সার্বভৌম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান কয়েকবারই এই দাবি তুলেছে। পূর্ব বাঙলাও তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে পেতে চেয়েছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে। গত নির্বাচনে (যা ছিল পাকিস্তানে প্রাপ্ত-বয়স্কের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন) পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ একবাক্যে সমর্থন জানিয়ে তাদের হয়ে শেখ মুজিব এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগকে ছয়-দফা এবং এগারো দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাঙলার ন্যায্য অধিকার আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ছয়-দফা লাহোর প্রস্তাবের বহির্ভূত তো নয়ই, বরং ছয়-দফায় কেন্দ্রকে পাওনার বাইরেও অনেকটা 'কনসেশন' দেওয়া হয়েছিল। শেখ মুজিব কেন্দ্রের ওপর পররাষ্ট্রনীতি এবং দেশরক্ষা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। ইউনিট-গুলির হাতে দিতে চেয়েছিলেন বৈদেশিক বাণিজ্য এবং কর বসাবার অধিকার। আসলে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন, বাঙলা দেশ থেকে পশ্চিমা শোষণ বন্ধ হউক; চেয়েছিলেন পূর্ব বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পাক, পরতে পাক। তাতেই বাদ সাধলেন ইয়াহিয়া-ভুট্টো-টিক্কাখান-পীরজাদা চক্র। নিজের খেয়াল খুশি মতো ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে জিজ্ঞাসামাত্র না করে ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী করে দিলেন এবং পূর্ব-বাঙলার মানুষের ওপর চাপিয়ে দিলেন সেনা-বাহিনীর রেজাব। পশ্চিমা সৈন্যদের বুলেটের গুলিতে কতো মায়ের সন্তানকে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হলো। সেই প্রতিবাদে বাঙলার ছাত্র-শ্রমিক কৃষক ক্ষেপে উঠল: আর নয়, বার বার অনেক রক্ত দিয়েছি, এবার পাল্টা মারের সময় এসেছে, সময় এসেছে হামলা প্রতিরোধের। এই রক্তঝরা পটভূমিকায় তাই 'স্বাধীন বাঙলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম-পরিষদ' এবং 'স্বাধীন বাঙলা কেন্দ্রীয় শ্রমিক-সংগ্রাম পরিষদের' ডাকে ২৩ মার্চ সারা বাঙলায় প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। সরকারি-বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানের সবুজে শাদায় চাঁদতারা খচিত পতাকার পরিবর্তে উঠল স্বাধীন বাঙলাদেশের পতাকা। কালচে সবুজ জমিনের ওপর সিঁদুর-রাঙা বৃত্ত। বৃত্তের ভিতরে সোনালিতে আঁকা পূর্ব-বাঙলার মানচিত্র। সবুজ শস্য-শ্যামলা বাঙলা দেশের প্রতীক। সিঁদুরে-রাঙা বৃত্ত শহীদের রক্ত-রাঙানো নতুন প্রভাত, আর সোনালিতে আঁকা পূর্ব-বাঙলার মানচিত্র হলো সোনার বাঙলা। কাজেই লাহোর প্রস্তাব-বিরোধী হয়েছে কী? নিশ্চিতভাবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম পূর্বাঞ্চলের স্বতন্ত্র পতাকা থাকতেই পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে থাকাটা ছিল পূর্ব-বাঙলার সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের প্রয়োজনে রাজনৈতিক সম্মিলন। পূর্ব-বাঙলা উদারতাবশেই তাদের 'রাষ্ট্র-সংঘের রাজধানী করতে দিয়েছে করাচিতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-বাঙলা ন্যায্যতই ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের দাবি জানাতে পারত।

(ক্রমশ)

॥ ১২ ॥

বাদ, সবুজ ঘাস আর কোথায়। চারদিকে এমন কড়া রোদ চৈত্রের, গা পুড়ে যায়, গরম বালুর ওপর পা দিলে পায়ে ফোস্কা পড়ে।

বেলা দশটা থেকে দমকা গরম হাওয়া আরম্ভ হয়। তারপর যত বেলা বাড়ে আগুনের হলকা বইতে থাকে।

কিন্তু এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। শফীও না, মাধুরীও না।

স্বাভাবিক আকাশ নিয়ে রোদ নিয়ে মেঘ নিয়ে মাথা ঘামাবার একটা বয়স থাকে। একটা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছোবার আগে আবহাওয়া ধান-পাট বাদ [illegible] জন্য ফলপাকুড় কি কলাগাছ খরা চললে যে মানুষ গরু ছাগল হাঁস মুরগির অসুখ বিসুখ হতে পারে এ সব কে চিন্তা করে।

রামানন্দ অবশ্য আট বছর বয়স থেকে রোদের কথা মেঘের কথা গাছপালার কথা খুব ভাবত। কখন জ্যোৎস্না উঠবে কবে থেকে অন্ধকার রাত আরম্ভ, ঘাসের আগায় শিশির জমেছে কিনা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করত। পাখির ডাকটাক শুনত।

মনে তখন থেকে কবি হওয়ার জন্য সে তৈরী হচ্ছিল। যেমন ছোটবেলা থেকে কারো কারো মধ্যে কোনো অসুখের বীজ লুকিয়ে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। তারপর সেই অসুখ তাকে সারাজীবন ভোগায়।

কিন্তু এদের সেসব নেই, কাব্যের বিষাক্ত ব্যামোর কীট শফীর মাধুরীর রক্ত দূষিত করতে পারেনি যে চাঁদ দেখলে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, চৈত্রের আগুন দেখলে অবাক হবে, কি বৃষ্টি হলে হাততালি দেবে।

তারা সুখী। তারা সুস্থ।

আবহাওয়া নিয়ে ধান-পাট নিয়ে যারা দাম নিয়ে চিন্তা। ভাবনা আরো বেশি বয়সে আসে। অক্ষয় এসব নিয়ে ভাবে, ইয়াকুব মিঞা ভাববে। কেননা তাদের অন্য দায়দায়িত্ব রয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য জমির ফলনটলনের সঙ্গে মেঘ বৃষ্টি কুয়াশা রোদের সম্পর্ক আছে বইকি। তা জমি অবশ্য কারো নেই, ইয়াকুবের কোনোদিনই ছিল না। ভেড়ি লোপাট হয়ে যাবার আগে এদিকেই ধারে কাছে দুচার বিঘে ধানের জমি করেছিল অক্ষয়, ভেড়ির সঙ্গে সেগুলিও গেছে। হুঁ, ব্যবসা, সেটা আছে। অক্ষয়ের হাঁস মুরগির চাষ, শফীর বাবার ডিমের কারবার—এই নিয়ে অক্ষয়ের মাথা বেদনা, ইয়াকুবের দুশ্চিন্তা- একটানা খরা চললে গরমি দিতে থাকলে হাঁস মুরগির মড়ক আরম্ভ হবে, ডিমের কারবার লাটে উঠবে। কিন্তু এই নিয়ে শফী কি মাধুরী ভাববে নাকি। হাঁস মুরগি ডিম পাড়ে, অক্ষয়ের কথা মতন মাধুরী সেগুলি জমিয়ে রাখে, ইয়াকুবের কথা মতন শফী এসে একদিন ঝাঁকায় তুলে সব নিয়ে যায়। বাস, তারপর তারা আর কিছু ভাবে না।

রোদে জলে কুয়াশায় মেঘে খরায় বানে তাদের একরকম আনন্দ। তারা সর্বদাই খুশি। সব সময় হাসছে।

হাসবার, আনন্দ করার বয়স যে ওদের।

শিয়ালদা থেকে রামানন্দকে দিয়ে একটা শীতল পাটি আনিয়েছে মাধুরী। বলা যায় আনাতে পারল। মাধুরী ক'দিনই বলেছিল। রামানন্দ ভুলে ভুলে গেছে। রোজই অক্ষয়কে দেখতে সে হাসপাতালে যায়। আর রোজ ভাবত ফেরার পথে মাধুরীর পাটিটা কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে একথা সেকথা বলতে বলতে পাটির কথা শেষ পর্যন্ত তার আর মনেই থাকত না।

তারপর আর কি। বাড়ি ফিরে মাধুরীর কথা শুনতে হত। এই নিয়ে মাধুরী ঠোঁট ফুলিয়ে একদিন দুদিন অভিমান পর্যন্ত করেছে।

কাল বাড়ি থেকে বেরোবার সময়, মেয়েরা যেমন একটা কথা মনে রাখতে আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখে, রামানন্দও তার রুমালের কোণায় বড় করে একটা গিঁট দিয়ে রেখেছিল।

হাসপাতালে এই নিয়ে অক্ষয় একটু ঠাট্টা মস্করা করতে ছাড়েনি। অর্থাৎ 'মেয়ে মানুষ' কথাটা তার মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল, হুঁ, দুবার একবার পকেট থেকে ময়লা রুমালটা বের করে রামানন্দ যখন মুখ মুছতে গেছে রুমালের গিঁটটা অক্ষয়ের চোখে পড়েছে। আর একবার পকেট থেকে সেটা সে বের করতেই অক্ষয় ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়েছিল। 'ওটা কি হে মাস্টার, তোমার রুমালের কোণায়?'

রামানন্দ হেসে ফেলেছিল।

'পাটি, মাধুরীর শীতল পাটি।'
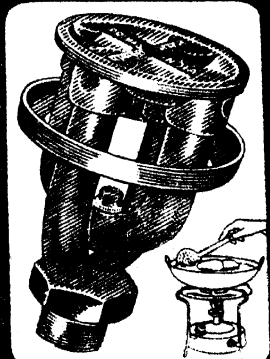
চট্ করে অক্ষয় কথাটা বুঝতে পারেনি। ফ্যাকাশে চোখ করে রামনন্দর মুখটা দেখছিল।

তখন রামনন্দ ব্যাপারটা তাকে খুলে বলে। মাধুরীর পাটি কিনে নিয়ে যাবার কথা রোজই সে ভুলে যাচ্ছে। এই জন্য রুমালে আজ গিঁট দিয়ে বেরিয়েছে। আজ আর তার ভুল হবে না।

'তুমি দেখছি মাস্টার মেয়েছেলের বাড়া।' অক্ষয় শব্দ করে হেসেছিল। অক্ষয়ের এক জেঠীর আঁচলে নাকি রোজ এমন একটা না, তিনটে চারটে করে গিঁট দেওয়া থাকত। জিজ্ঞেস করলে জেঠী বলত, আমার কি পোড়ার মাথায় কোনো কথা মনে থাকে, সব ভুলে যাই রে বাবা। এবং কোন্ কথার জন্য কোন্ গিঁটটা আঁচলে দিয়েছে জেঠী এক এক করে অক্ষয়কে বুঝিয়ে দিত। এটা ভাঁড়ারের চাবির, ক'দিন ধরে চোরের উপদ্রব শুরু হয়েছে, এখন আর শেকল তুলে দিলে হয় না, শোবার আগে দরজায় তালা দিতে হয়, ভুলে না যাই তাই আঁচলে গিঁট, এটা আমার লঙ্কা ক্ষেতে বেড়া দেবার ব্যাপার, মনেই থাকে না ছাই—

কালও একটা ছাগল ঘুরঘুর করছিল, আর এই গিণ্ট হল সক্কালবেলা কাল তোর জেঠা যখন হাটে যাবে, আমার দোক্তা পাতার কথা মনে করিয়ে দেব—ক'দিন ধরে কেবল ভুলে যাচ্ছি।

অক্ষয়ের জেঠীর গল্প শুনে রামানন্দও দারুণ হেসেছিল।

আজ শীতল পাটি দেখে মাধুরী খুব খুশি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের পিছনে মাদার ঝোপের কাছে, কেন না চারদিকে ধুধু বালুর মরুভূমির মধ্যে ঐ একটা জায়গাতেই কিছু নধর দুর্বাঘাস গজিয়েছে, শফীকে দিয়ে মাধুরী ঘাসের ওপর ঘটা করে নতুন পাটি বিছিয়েছে। গাছের ছায়া পড়ে জায়গাটা ঠাণ্ডাও বেশ। অনেকক্ষণ পাটির ওপর দুজনে শুয়ে গল্প করেছে। তারপর ঘরের গরমে তিষ্ঠোতে না পেরে রামানন্দও এক সময় সেখানে চলে গেছে।

মাস্টারকে দেখে মাধুরীর এত ভাল লাগছিল। তিনজন যখন একত্র হয় রামানন্দকেও গল্পটল্প করতে হয়, চুপ করে থাকলে মাধুরী চটে যায়।

'এসো মাস্টার, তোমার জন্য জায়গা রেখেছি।' মাধুরী একদিকে সরে বসে, শফী আর এক ধারে শরীরটা গুটিয়ে বসে। শীতল পাটির ওপর রামানন্দ পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে। চোখ তুলে ওপারের দিকে তাকায়। রুক্ষ তামাটে আকাশ স্তব্ধ হয়ে আছে। বাতাস বন্ধ। একটা দমবন্ধ করা গুমোট চারদিকে।

তা হলে হবে কি, ঠিক এখানটায় সেই অস্বস্তি নেই। এখানে নব বসন্তের পরিবেশ। গুচ্ছ গুচ্ছ মাদার ফুল ফুটে আছে। রামানন্দর ঠিক মাথার ওপর মাদারের ঝোপ ঘেঁষে একটা ডুমুরের চারা গজিয়েছে। কী অসম্ভব চকচক করছে চওড়া পাতাগুলি। সবুজ তো বটেই। এত টাটকা এত পরিচ্ছন্ন, মনে হয় কেউ যেন বাক্স থেকে খুলে এই মাত্র পাতাগুলি গাছের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য একটু হাওয়াও টের পাওয়া যায় এই ঠাণ্ডা ছায়ার জায়গাটায় এলে। মাদার ফুল নড়ছে, ডুমুর পাতা কাঁপছে। ঝোপের পিছনে কয়েকটা শালিক চড়ুই কিচিরমিচির করছে।

তা ছাড়া এই দুটি মানুষ? একজন রামানন্দর ডাইনে, একজন বাঁয়ে বসে আছে।

তাদের চোখের দিকে তাকাও।

তোমার মনেই হবে না চৈত্রের গনগনে আগুন নিয়ে পৃথিবীটা নীরস ধূসর বন্ধ্যা হয়ে আছে। বা কোনোদিন ছিল। বা কখনও তা হবে।

এত প্রাণ ঐ দুটি চোখে। চঞ্চল অস্থির। যেন কত বর্ষার সজল মেঘ, কত স্নিগ্ধতা নিয়ে সারাক্ষণ তারা পূর্ণ হয়ে আছে। বলে কিনা ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়দায়িত্ব আর ধান-পাটের কথা ভেবে মন খারাপ করা! তারা মন খারাপ করে না। স্বভাব তাদের করতে দেয় না, বয়স তাদের বাধা দেয়।

একমাত্র অক্ষয়ের জন্য মাঝে মাঝে মন খারাপ করা ছাড়া সংসারে আর কিছুর জন্য ভাববার আছে মাধুরী মরে গেলেও তা বিশ্বাস করে না।

তা-ও অক্ষয় বিনা অপারেশনেই হাসপাতাল থেকে চলে আসবে শোনার পর থেকে ক'দিন ধরে মাধুরীর ফূর্তি ধরতে গেলে শতগুণ বেড়ে গেছে।

আর এদিকে শফীর হয়েছে মজা। অবশ্য বাপের জন্য কি আর তার মন ভিতরে ভিতরে না কাঁদে!

হাসপাতালে আছে ইয়াকুব। অক্ষয়ের মতন মেডিকেল কেস। না। লিভার সরকারে নেওয়া হয়েছে তাকে। লিভার ফুলে গেছেন। অতিরিক্ত সরাব খাওয়ার কুফল। সফীর মুখে যা শোনা গেল, ডাক্তাররা নাকি বলছে, আর এক ফোঁটা মদ পেটে গেলে ইয়াকুব মিঞাকে বাঁচান যাবে না।

সে যাই হোক, ভালয় ভালয় ইয়াকুব হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসুক, আর সবাই যেমন চাইছে, শফীও নিশ্চয় চাইবে।

কিন্তু এখন তো দিনকতক সে, যাকে বলে, ছাড়া গরু। একেবারে ডাক চাপ নেই বকা ঝকা নেই। মারধর বন্ধ। ডিম অবশ্য সে আগের মতোই নিয়ে যাচ্ছে। শফীর ফুফা তিলজলা থেকে এসে একদিন দুদিন করে রক্ষাবাক্ষর থাকছে। বেপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, টাকা পয়সার লেনদেন শফীকে দিয়ে তো হয় না। একটা তত্ত্বাবধারক মানুষের দরকার। হাসপাতালে যাবার আগে ইয়াকুব খবর পাঠিয়ে শফীর ফুফাকে আনিয়েছে। ফুফা এদিক দেখছে, ওদিকে তিলজলায় নিজের দর্জির দোকান রয়েছে, তা-ও তাকে দেখতে হয়। শফীকে দেখবে চোখে চোখে রাখবে এত সময় কোথায় মানুষটার।

কাজেই শফীউল্লার এখন আহ্লাদ ধরে না।

ফূর্তির বান ডাকছে এই দুতিন দিন ধরে।

কালও দুপুরবেলা এখানে খাওয়া-দাওয়া করেছে। মাধুরী যেমন বলেছিল, কাল শিয়ালদার বাজার থেকে মৌরলা মাছ আর কাঁচা আম নিয়ে এসেছিল শফী। আম দিয়ে চমৎকার মাছের চচ্চড়ি রান্না করেছিল মাধুরী। অনেকদিন তার আম দিয়ে মাছ খেয়ে রামানন্দও খুব তৃপ্তি পেয়েছিল যেন আজও স্বাদটা জিভে লেগে আছে আজ মাধুরীর কথা মতন বেলেঘাটার বাজার থেকে শফী চিংড়ি মাছ ও ইঁচড় এনেছে। রামানন্দ বাজার করে ঠিকই। কিন্তু মাধুরী যেমন যেমন বলে দেয় সব সময় সেভাবে সব মনে রেখে জিনিসগুলি আনতে পারে না সে। একটা আনে তো আর একটা আনতে ভুলে যায়। এই জন্য শফীকে দিয়ে বাজার করিয়ে মাধুরী বেশি সুখ পায়।

এবং এটা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, শফী দুবেলাই এখানে খাবে। তা না হলে তাকে শিয়ালদা কি রাজাবাজার ফিরে গিয়ে হোটেলে খেতে হয়। মাধুরীর এটা মনঃপূত

না। হোটেলের খাওয়া—কেবল কতগুলি পয়সার শ্রাদ্ধ। নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে খাওয়াও যখন ছোঁড়াকে দিয়ে সম্ভব না। তবু তার ফুফা যদি পাকাপাকিভাবে ক'দিন কলকাতায় এসে থাকত। তা তো না। কাল দুপুরে এসেছিল ফুফা। ডিমের বেপারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে টাকা-পয়সার বিলি ব্যবস্থা করে দিয়ে বিকেলেই আবার তিলজলা ফিরে গেছে। আবার আসতে সেই সোমবার সকাল। কাজেই শুক্কুর শনি রবি এই তিনটা দিন ছেলেটা একা একা ওখানে থাকেই বা কি করে, আর খাওয়ার এই কষ্ট।

সফী তো এই চাইছে।

সারাদিন দুজনের গল্প এক সঙ্গে খাওয়া ওঠা বসা। মাধুরী রান্না করে, শফী বাটনা বেটে দেয়, মাছ কুটে দেয় আনাজ কুটে দেয়। এদিক থেকে মাধুরীর কাজের কত সাহায্য হয়। আজ সকালে শফী সবটা উঠোন ঝাঁট দিয়েছে। তেমনি ভাইকে মাধুরী আদরও করছে। এক মুঠ বেশি ভাত একটু বেশি তরকারী শফীর পাতে ঠেলে দিতে পারলে সে খুশি। চানের সময় ভাইয়ের গায়ে মাথায় ভাল করে তেল মাখিয়ে দেওয়া। তারপর যখন চান করে এল জোরে চিরুনি চালিয়ে একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল সমান করে দেওয়া। কাল ওই ঘন প্রায় জটধরা চুল আঁচড়াতে গিয়ে মাধুরী একটা চিরুনি ভেঙেছে। এত জোরে মাধুরী চিরুনি চালাচ্ছিল, চুলে টান পড়াতে শফী ক'বারই আঃ উঃ করেছিল। কিন্তু চিরুনি ভেঙে গেল বলে মাধুরী হাল ছেড়ে দেবে নাকি। তক্ষুনি রামানন্দর চিরুনিটা তুলে নিয়ে শফীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে আবার জোরে জোরে আঁচড়াতে শুরু করেছে।

শফী বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

'আচ্ছা, তুমি আমায় কী ভাব বলো দিকিনি?'

'কিচ্ছু না, তুই একটা জংলী। ঐ যে মাস্টার বলে শেয়াল, তাই। এমন একটা মাথা করে রাখে কেউ—জীবনে কোনোদিন তেল পড়ে না, জল পড়ে না।' মাধুরী ছেড়ে কথা কইবার পাত্রী না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেছিল।

'এমন করছ, মনে হয় আমি ডান হাত বাঁ-হাত চিনি না, অবোধ শিশু, নিজের মাথা নিজে আঁচড়াতে পারব না।' শফী বিড়বিড় করে বলেছিল তখন।

'তাই তো দেখছি, নিজে পারলে তোর চুলের এই অবস্থা হয়!' মাধুরীও চিরুনি চালান বন্ধ করেনি। কটাস কটাস করে কথা বলছিল আর হাত নাড়ছিল।

শফী তখন চুপ করে ভেবেছে। কী ভাবছিল ছোঁড়া! কাছেই রামানন্দ দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তার হাসিও পাচ্ছিল খুব। ঐ যে, যার পাতলা ঠোঁটে গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে, চোখের নীল প্রায় লাল হয়ে উঠল, সূর্য ওঠার আগের আকাশের অবস্থা, পনেরো ষোল পার হতে চলল বয়স, গলার স্বর ভাঙতে আরম্ভ করেছে—চোয়াল থুতনি একটু একটু শক্ত হচ্ছে, নিজেকে প্রায় চিনতে পারছে না, বুঝতে পারছে না—কী ছিলাম আমি কী হতে চলেছি, আকাশের স্থির মেঘ না কি চঞ্চল বৃষ্টির ফোঁটা, সমুদ্রে ছিটকে পড়ল না কি বনের ধারের নিরালা ছোট্ট দীঘির বুকে টুপটাপ লাফিয়ে পড়ে ছোট ছোট ঢেউ জাগাল—এমন যার মনের অবস্থা, দিশাহারা অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত—ঠিক সেই মুহূর্তে একটি যুবতীর কাছে সে অবোধ শিশু ছাড়া কিছু নয়? এখনো তার ডান বাঁ জ্ঞান হয়নি? মাথায় তেল দিতে জানে না, চিরুনি চালাতে শিখল না?

চেহারা দেখে রামানন্দ বুঝতে পেরেছিল শফীর মনে খুব লেগেছে, অভিমান হয়েছে। অথচ একটু আগে খালে নেমে শফী তার শৌর্যবীর্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়ে এসেছে। তুখোড় সাঁতারু সে। উঁহু, রাজাবাজারে দীঘিপুকুর পাবে কোথায়, খরচ করে ইয়াকুব মিঞা ছেলেকে হেদোয় কি গোলদীঘিতে সাঁতার শিখতে পাঠাবে সেই আদমীই সে নয়। শফী সাঁতার শিখেছে মেটিয়াবুরুজে তার মামার দীঘিতে, একটা না, বড় বড় দুটো দীঘি মামার। তা ছাড়া তিলজলা ফুফুর বাড়ি গেলে সেখানেও সে পুকুর দীঘি পায়। অনেক দিন তার জলে কাটে তখন।

পাড়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল রামানন্দ। পানকৌড়ির মতন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে কোথায় চলে গিয়েছিল শফী। হ্যাঁ, ভাইকে নিয়ে এক সঙ্গে মাধুরী চান করতে জলে

নেমেছিল। মাধুরী মোটামুটি ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু শফীর কাছে শিশু। তা ছাড়া ডুব সাঁতারটা মাধুরী ভাল করে রপ্ত করতে পারেনি। তবে শফী তাকে শিখিয়ে দেবে আশ্বাস দিয়েছে, তার সঙ্গে দু'চারদিন অভ্যাস করলেই ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে মাধুরীও অনেক দূরে চলে যেতে পারবে। আজ একবার দুবার মাধুরী চেষ্টা করেছিল। ডুব দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু জলের নিচে দু' হাতের বেশি এগোতে পারেনি। যেখানে ডুব দেয় ঠিক প্রায় সেখানেই তার মাথাটা আবার ভেসে উঠতে দেখা গেছে। এমন দুবার হয়েছে। অথচ শফী সঙ্গে সঙ্গেই আছে। জল থেকে মাথা তুলে মাধুরীর সে কী খিল খিল হাসি। পারল না বলে যে একটু লজ্জা পাবে তা না। শফী চটে গিয়েছিল। একটু সাহস করতে হবে চেষ্টা করতে হবে, জোর ধমক দিয়েছিল সে। জলের ওপর মাথা রেখে হাত পা ছোঁড়া যেমন, ডুব দিয়েও ঠিক সেভাবেই জল কেটে এগিয়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন না। তৃতীয়বার মাধুরী [illegible] ভাল করে চেষ্টা করতে গেল তখন [illegible] চুলটা [illegible] সে এক [illegible] কাণ্ড। থাক আজ আর দরকার নেই, শফীর রাগ তখনও কমেনি। [illegible] দেখা যায় না। [illegible] করল সে। এক হাতে [illegible] থেকে মাধুরীর চুল ছাড়াচ্ছিল আর এক হাত দিয়ে মাধুরীর কোমর জড়িয়ে ধরে [illegible] জলের ওপর ভেসে থাকতে সাহায্য করছিল। [illegible] সময় হাত পা ছেড়ে মাধুরী তখন বেশ ভয় [illegible] চেষ্টায় কিছুতেই ভেসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হত না। তখন রামানন্দ দেখেছে শফীর বুদ্ধি সাহস গায়ের জোর। কেমন চটপট হাত চালিয়ে মাধুরীকে সে [illegible] থেকে ছাড়িয়ে আনল।

[illegible] বাস্তবিক তখন দেখবার মত।

রামানন্দের মাথার ওপর ঘন ছায়া ছিল। তীরের ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল। [illegible] দুটি মানুষের সাঁতার কাটা দেখছিল সে। এদের ফেলে তো সে ঘরে ফিরে যেতে পারে না। তা ছাড়া তেমন [illegible] তার ছিল না। বরং গাছের ছায়ায় ঘাসের বুক থেকে উঠে আসা ঝিরঝিরে বাতাসটা তার ভাল লাগছিল। আর চোখের সামনে সেই আশ্চর্য—হ্যাঁ, ছবিই একটা। চৈত্রের তেজালো রোদ না, মনে হচ্ছিল আকাশ ভেঙে রাশি রাশি আগুন ঝরে পড়ছে। তবে কিনা জলের ঠাণ্ডায় আগুনের ঝলসানিটা যে তারা তেমন টের পাচ্ছিল না এটা বেশ বোঝা গেছে। [illegible] জঙ্গল থেকে মাধুরীর নিবিড় কালো চুল ছাড়িয়ে তার তলপেটে একটা হাত রেখে একটু ওপরের দিকে শরীরটা ঠেলে ধরে—যেমন করে মানুষ একখণ্ড কাঠ কি একটা হাঁড়ি জলের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আসে মাধুরীকে নিয়ে সেভাবে সাঁতার কেটে শফী অতি সহজে তীরের কাছে চলে এল। শফীর কালো পাথর কোঁদা শরীর অনেকক্ষণ জলে ভিজে থেকে চৈত্রের চোখ ধাঁধান রোদে কেমন ঝকঝক করছিল। তার মাথার ঝাঁকড়া চুল এমনভাবে চোখ কপাল ঢেকে রেখেছিল, হঠাৎ ছোঁড়াকে মানুষ ভাবতে ইচ্ছা করছিল না, মনে হচ্ছিল জলচর কোনো জীব। যেন প্রকাণ্ড একটা গোলাপী রঙের খাদ্যবস্তু নিয়ে সে তীরের কাছে ভেসে এসেছে। অনেকক্ষণ জলে থেকে মাধুরীর চামড়া আরও মসৃণ গোলাপী লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। যেন জলচর জীবটা অনেক যুদ্ধটুদ্ধ করে আর পাঁচটা প্রাণীকে ঘায়েল করে লোভনীয় খাদ্যটা জয় করে এনে এবার নিরাপদ ডাঙার কাছে এসে তারিয়ে তারিয়ে খাবে। শফীকে এত বেশি প্রগলভ সবল বিক্রমশালী মনে হচ্ছিল। সেই তুলনায় মাধুরীকে কত করুণ অসহায় দেখাচ্ছিল। সুন্দর একটি প্রাণী, যাকে কেবল খাওয়া যায়, রূপ ছাড়া যার আর কোনো সম্বল নেই।

আর বাড়ি ফিরে কিনা সামান্য চুল আঁচড়ান নিয়ে মাধুরীর কাছে শফী পাঁচ বছরের একটি খোকা হয়ে গেল। মানে মাধুরী তাকে প্রায় সেই চোখে দেখছিল না? ধমক টমকও দিচ্ছিল।

কাজেই ছোঁড়ার রাগ অভিমানটা তখন দেখার মতন ছিল। এই জন্যই রামানন্দ মনে মনে হেসেছিল। তারপর অবশ্য খেতে বসে আবার শফীর সেই হাসিখুশি চেহারা, দিদির সঙ্গে হইচই গল্প। এক সঙ্গে রামানন্দ খেতে বসেছিল। ইঁচড়টা মাধুরী চমৎকার রেঁধেছে। জিনিসটাও ভাল এনেছিল শফী। অনেক ভাত খেয়ে ফেলেছে আজ রামানন্দ। খানিকক্ষণ ঘরের

বিছানায় গড়িয়ে টড়িয়ে এখন আলস্য ভাঙাতে বাইরে গাছতলার ছায়ায় শীতল পাটির ওপর এসে পা ছড়িয়ে বসেছে। শফী ও মাধুরী মাস্টারকে দেখে খুশি। দুজনের গল্পের যে মাথামুণ্ড ছিল না রামানন্দ জানত। এই নিয়ে তারও মাথা ব্যথা ছিল না। তবে একটা জিনিস সে লক্ষ্য করল। মাধুরীর খোঁপায় এক মুঠো লাল ফুল। শফীর কারিকুরি রামানন্দ বুঝতে পারল। কালও ছোঁড়া তাই করেছিল। রামানন্দর সামনেই গাছ থেকে কিছু ফুল পেড়ে এনে মাধুরীর খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল

'কেমন লাগছে মাস্টার?' মাধুরী হাসছিল।

'সুন্দর—ভাল।' রামানন্দ বলতে পারত, বলল না, শফীর দিকে চোখ ফেরাল। 'কেমন রে শফী?'

কেননা শফী তার দিদিকে সাজিয়েছে, তার মুখ থেকে কথাটা শোনা দরকার।

লাজুক হাসি হেসে শফী প্রথম রামানন্দকে দেখল, তারপর মাধুরীর দিকে তাকাল। এক সেকেণ্ড কিছু একটা ভাবল। তারপর আর ভাবল না। রামানন্দ

খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন ছাত্র সম্প্রতি অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে ১১ জন ছাত্রের ৩০টি শিল্পকর্মনিদর্শন দেখা যায়।

স্কেচ —শেখরচন্দ্র শেঠ

ভারতের পাঁচটি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি সংক্ষেপে আই-আই-টি, থেকে শিক্ষা শেষ করে যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁরা সকলেই ইঞ্জিনীয়ার বা আর্কিটেক্ট অর্থাৎ স্থপতি হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। স্থপতিবিদ্যা শিক্ষার্থীদের যদিও এক বছরের জন্য চারুকলা বিদ্যা শেখার প্রয়োজন হয়, অন্য বিভাগের ছাত্রদের শিক্ষাকালে ঠিক এ জাতীয় কিছু অবশ্য শিক্ষনীয় থাকে না। প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে শেখরচন্দ্র শেঠ একজন স্থপতি, উচ্চ শিক্ষার জন্য এখন গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাছাড়া এককালে তিনি শিল্পী গোপেন রায় ও সুদর্শন বেনেগলের কাছে শিল্পবিদ্যা শিখেছিলেন। অবশিষ্ট ১০ জন ছাত্রই শখের শিল্পী, অর্থাৎ কেবলমাত্র আনন্দ লাভ করার জন্য আপনার মনে ছবি আঁকেন। অথচ বলতে বাধা নেই, সকলের শিল্পকর্মনিদর্শন দেখে বিস্মিত হলাম। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিগুলি সুনির্বাচিত ও নির্দিষ্ট একটি মনের পরিচায়ক। সকলেই জল বা তেল রঙ ও টেম্পারা ব্যবহার করেছেন এবং প্রত্যেকের রচনারীতিতে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অর্থাৎ কেউ কেউ রিয়ালিস্টিক রীতিতে ছবি এঁকেছেন, আবার কেউবা বিমূর্ত রীতিতে আঁকার চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে কয়েকটি ছবিতে চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ রচনাই পরীক্ষামূলক; যদিও কয়েকটি অঙ্কনরীতি ও রঙ ব্যবহারের জন্য প্রশংসা দাবি করে। প্রথমেই শেখর শেঠ অরবিন্দ চন্দ্র, মধুসূদন রায় ও বি অশোকের রচনাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেখর শেঠ চাপা জলরঙ ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁর আঁকা লুধিয়ানার কয়েকটি দৃশ্য অনেকের চোখে পড়ে। রিয়ালিস্টিক হলেও তাঁর ড্রয়িং ও পরিপ্রেক্ষিত বোধ অধিকাংশ স্থলে প্রায় নির্ভুল এবং পরিচ্ছন্ন যেমন পেন্টিং ৫ ও ৬। অরবিন্দ চন্দ্র নানা জ্যামিতিক ক্ষেত্র, বিশেষ করে বৃত্ত ও আয়ত ক্ষেত্র অবলম্বনে বিমূর্ত রচনার চেষ্টা করেছেন, সেই সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ছবিও দেখা যায়। এগুলি নিছক পরীক্ষামূলক, সে হিসাবে মন্দ লাগে না। চাপা সবুজ রঙে আঁকা পার্সিয়ান বাজার-এর রিলিফের বৈশিষ্ট্য অনেকের চোখে পড়ে। প্রতিকৃতির দিক থেকে নিগ্রোস উল্লেখ্য। মধুসূদন রায়ের ছবিতেও বিভিন্ন অঙ্কনরীতির আভাষ মেলে, যেমন দীঘা ও হ্যাংরি বার্ডস-এ। প্রথমটি রিয়ালিস্টিক, দ্বিতীয়টি আধুনিকধর্মী। এই প্রসঙ্গে কিমেশান-এরও নাম করা যায়। বি অশোকও বিমূর্ত রীতিতে এঁকেছেন এবং তাঁর ছবিগুলিও পরীক্ষামূলক। তবে রঙ ব্যবহার পদ্ধতি ও চিন্তাধারার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর কয়েকটি রচনা

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ স্থলেই তিনি গাঢ় রঙ ব্যবহার করেছেন ও প্রতীক-মূলক আকারের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, যেমন লাল ও কমলা রঙ প্রধান 'দি উম্ব'। হলুদ ও সবুজ রঙ প্রধান 'দি উওম্যান' ঠিক রসোত্তীর্ণ হয়নি। ইম্পাস্টো প্রথায় আঁকা অ্যাবস্ট্রাক্ট রচনাটি কিন্তু অনেকের ভাল লাগে। এই সংগে বেগুনী রঙ প্রধান মাসলটোনের'ও নাম করা যায়। শ্রীকান্ত হিরণনিকার-এর কয়েকটি স্কেচ জাতীয় ছবি সকলের চোখে পড়ে যায়, বিশেষ করে ইমপ্রেশনিস্টিক রীতিতে আঁকা টেম্পারার কম্জ পেন্টিং ৮। সন্দীপ মানির স্বচ্ছ নিসর্গ দৃশ্য উড বার্ডস-এরও এই সংগে নাম করা চলে। অপরাপর ছাত্রদের মধ্যে পি খিরওয়াস্-কারের সিরামিক টাইলের রচনা জাতীয় ছবি পেন্টিং-৭, শংতনু ঘোষের ল্যান্ডস্কেপ ২ ও অ্যাকশন পেন্টিং-এর নিদর্শন হিসাবে এস আর দেশপাণ্ডের রোআপ উল্লেখযোগ্য।

*

আকাডেমি গ্যালারীতে মিঃ জন ওয়াটকিন সম্প্রতি একটি শিল্পচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে

তাঁদের সম্প্রতি আয়োজিত রপ্তানী সম্মেলন (Export Conference) উপলক্ষে তাঁদের বিভিন্ন স্থানের কর্মীদের উৎসাহ দেবার জন্য নানা বিভাগে কয়েকটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি স্থিরচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। দেশের বিভিন্ন শহর থেকে ৪ থেকে ১২ বছর বয়স্ক ১৬০০ ছেলেমেয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। তাদের মধ্য থেকে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত কয়েকটি ছবি সম্প্রতি বাটা সু কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে প্রদর্শিত হয়। দেশের ছেলে-মেয়েদেরকে কেন্দ্র করেই যে আনন্দ ও উৎসব যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে কথা বাটা কর্তৃপক্ষ জানেন, তাই চিত্র প্রতিযোগিতার জন্য তাঁরা অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। অকাতরে বললাম এই জন্য যে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ছবির জন্য তাঁরা ২৫০০ টাকা পুরস্কার দেন এবং পেন্টিং ও ড্রয়িং বিভাগে প্রথম নির্বাচিত ছবির জন্য তাঁরা ১০০০ টাকা পুরস্কার দান করেন; তাছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও কনসোলেশন পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হয়। ছবিগুলি দেখেই বোঝা যায় যে ছেলেমেয়েরা আপনার মনে যা খুশি তাই এঁকেছে। কোনও ছবিতে নির্দিষ্ট কোনও বিষয়বস্তুর সন্ধান মেলে না। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া জাপান কেবলমাত্র রেখার মধ্য দিয়ে হিজিবিজি (doodle) জাতীয় যা এঁকেছে তার তুলনা মেলা ভার। মাত্র চার বছরের শিশু চম্পা দাসের রেখাভিত্তিক ড্রয়িং নিদর্শনেও কল্পনা ও আকার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। রিতা আনন্দের জলরঙে আঁকা ছবিটি অনেকের চোখে পড়ে। দু'একজনের ছবিতে আবার উদ্ভট কল্পনার পরিচয় মেলে, যেমন সমিরা গয়ালানির ড্রয়িং। অপরাপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বি পদ্মা রেড্ডি, রুক্মিণী রাজাগোপাল, কে শ্রীনিবাস, বাসন্তী চ্যাটার্জি, দিব্যেন্দু মুখার্জি, বিজয় দেশকার ও সৌমিত্র বিশ্বাসের নাম করা যায়। আশা করি প্রতি বছর এই জাতীয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বাটা কর্তৃপক্ষ দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দান করবেন।

নির্বাচিত স্থিরচিত্র নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ চোখে পড়েনি। অধিকাংশ স্থিরচিত্রই বাইরে তোলা, তবে একটা জিনিস চোখে পড়ল : অধিকাংশ প্রতিযোগীই জুতোর ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, জানি না এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ ছিল কিনা। স্থিরচিত্র প্রতিযোগিতাতেও কর্তৃপক্ষ অর্থব্যয় করেছেন। প্রথম পুরস্কার ৫০০০, দ্বিতীয় ৩০০০ ও তৃতীয় ২০০০—এ ছাড়া ১০০০ টাকার বিশেষ পুরস্কার ও কনসোলেশন পুরস্কারও দেওয়া হয়। স্থিরচিত্র নিদর্শনের মধ্যে কোনওটিই প্রথম পুরস্কার লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়নি। কম্পোজিশনের দিক থেকে একটি নিদর্শন ভাল লাগে—পার্টের কক্স-এর তোলা স্থিরচিত্রটি একটি গাছের দুটি শাখার ডালে দুটি পা রেখে একজন দাঁড়িয়ে আছেন, কেবল ছবির নিম্নাংশটুকু দেখা যাচ্ছে। অর্ধশায়িত দুটি ডাল ও লোকটির দাঁড়াবার বিশিষ্ট ভঙ্গীর জন্য একটি সুন্দর কম্পোজিশন হয়েছে। শকীল মোহাম্মদের ব্রেকিং দি ওয়েদার সাধারণ নিদর্শন মন্দ লাগে না। তবে ডাঃ এচ এস দেওয়ানের হার্ডল ক্রসিং অনেকের চোখে পড়ে—বিশেষ মুহূর্তটিকে স্থিরচিত্রশিল্পী ক্যামেরায় ধরেছেন। অপরাপর স্থিরচিত্রশিল্পীদের মধ্যে শিব কুমার-এর নাম করা যায়। এই প্রসঙ্গে আরও একটি নিদর্শন উল্লেখ করা চলে: খেলার মাঠের গ্যালারীর পিছন থেকে তোলা একটি দৃশ্য, সিঁড়ির ধাপের মত গ্যালারীর শূন্য বেঞ্চ ও তারই মধ্য দিয়ে দেখা যায় শূন্য মাঠের অংশবিশেষ।

চিত্রাপ্রিয়

সঙ্গীত

পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (প্রথম ভাগ) —স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা। দশ টাকা।

বাংলা দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রীগণের মধ্যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছেন সে সম্বন্ধে বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন নেই। পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস তাঁর দীর্ঘ অধ্যয়ন, গবেষণা ও সংগ্রহের ফল। এই গ্রন্থটিকে তিনি 'বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস' বলে পরিচিত করতে চেয়েছেন: কারণ কীর্তনের প্রসঙ্গে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কিত বহু আলোচনা

এতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আরও তিনটি ভাগে বিভিন্ন খণ্ডে প্রদান করা হবে।

আলোচ্য গ্রন্থে কুড়িটি পরিচ্ছেদ এবং একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদগুলিতে কীর্তন গানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, পদ ও পদাবলী, চর্যা ও নাথ-গীতি, চর্যা গীতির গঠন ও গায়নশৈলী, বাংলা দেশের সাংগীতিক পটভূমি, কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ, গীত [illegible] সংগীততত্ত্ব, জয়দেব ও পদাবলী, [illegible] [illegible] ও বড়ু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা [illegible] [illegible] ও শ্রীরাধাসংগীত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা আছে। [illegible] কীর্তনতত্ত্বের মূলে আলোচনা প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটি মুখবন্ধস্বরূপ। গ্রন্থকার কোথাও নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য গোঁড়ামির আশ্রয় নেন নি, পরন্তু বহু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের মতামত বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় স্বামীজী বলেছেন—'উত্তর ভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে রাগের যে বিকাশ, কিংবা দক্ষিণ ভারতের সংগীত-পদ্ধতিতে বিচিত্র তালের যে অনুশীলন এখনও বর্তমান আছে বাঙলার বৈষ্ণব-পদাবলী কীর্তনে তালের বিকাশ তাদের চেয়ে অনেক বেশী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাঙলার পদাবলী কীর্তন ক্লাসিকাল সংগীতপদ্ধতির অন্যতম। প্রাণবান ও ঐশ্বর্যময় এই সংগীত। দুঃখের বিষয়, অভিজাত ক্লাসিকাল সংগীতের যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁদের দৃষ্টি এখনও বাঙলার এই নিজস্ব সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট নয়।' এই উক্তি খুবই সমীচীন এবং কীর্তনের তাল পদ্ধতি এবং তালগুলির বিশেষ বিশেষ নামকরণ যে কি করে হয়েছে এ বিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে জানি না। সমালোচক মনে করেন বাংলা দেশে দীর্ঘকাল ধরে প্রাচীন প্রবন্ধ সংগীতের ধারা চলে এসেছিল এবং প্রাচীন তালপদ্ধতিও বাংলা দেশে অপরিবর্তিতভাবেই ছিল; কারণ বাংলা দেশ মুসলমান শাসনে আসবার পর থেকেই পশ্চিম বা উত্তর ভারত থেকে বহুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে অন্যত্র যেখানে সঙ্গীতে বিবিধ বৈচিত্র্য দেখা দেয় বাংলায় সেখানে পুরাতন ঐতিহ্যই প্রচলিত ছিল। যাই হোক বর্তমানে ক্লাসিকাল কীর্তনের ধারকগণ প্রায় অস্তমিত হয়েছেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা এখনই কঠিন হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে এটি আরও

দুরূহ হবে এবং হয়তো বহু বিষয়ে আলোকপাত করা আর সম্ভব হবে না।

স্বামীজী গ্রন্থটি এই সময়ে রচনা করে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এবং বলা বাহুল্য, এর তথ্যাদি গবেষকদের ও অনুসন্ধিৎসুদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে।

ইতিহাস কাহিনী

কুমারী রাণী এলিজাবেথ। সুকন্যা। করুণা প্রকাশনী। ২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : সাত টাকা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে যে ধরনের বাজার চলিত বই সাধারণ পাঠকের স্বাদ-বিভ্রম ঘটাচ্ছে কুমারী রাণী এলিজাবেথ তাদের স্বগোত্র নয়। এ বই-এর পাত্রপাত্রীরা কেউ কল্পিত চরিত্র নয়, ঘটনাও অবাস্তব নয়। ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রে, তথ্য ও কঙ্কালে মেদমাংস সংযোজন করে সুকন্যা কুমারী রাণীর যে পরিচয় অঙ্কিত করেছেন তাকে কিছুতেই "রোমান্স অব হিস্ট্রী" পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

রাণী এলিজাবেথ একাধারে রাজনৈতিক চরিত্র ও মানবিক চরিত্র। রাণী এলিজাবেথের ইচ্ছা-স্বীকৃত কুমারীত্ব, রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির পরিচালনায় এই কুমারীত্বকে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার, য়ুরোপের তা-বড় তা-বড় রাজা ও রাজপুত্রদের নাজেহাল করার অত্যন্ত মনোজ্ঞ কাহিনীর সঙ্গে লেখিকা পরম দক্ষতায় এলিজাবেথের নেপথ্য জীবনের অন্তরঙ্গ বর্ণনা, বাসনা কামনা, সুখ দুঃখ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এলিজাবেথের শেষ জীবনের নিয়তি, আর্ল ও এসেক্সের প্রেম ও মৃত্যু এলিজাবেথের বিষণ্ণ বার্ধক্য লেখিকা যে সংযম ও নিস্পৃহতার সঙ্গে রচনা করেছেন, তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ৩৯/৭১

পত্রিকা

অন্যদিগন্ত। কবিতা ত্রৈমাসিক। পঞ্চম সংকলন। সম্পাদক—শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮/১২৮, লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫। দাম—এক টাকা।

পরিচ্ছন্ন রুচির সুসম্পাদিত এই সাহিত্য পত্রটি আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ওপার বাংলা এবং এপার বাংলার সাম্প্রতিক কবিতা ছাড়া ভারতীয় অন্য ভাষা, যেমন—হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী ভাষার কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষারও কিছু অনুবাদ কবিতা আছে। প্রবন্ধ লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনীন্দ্র রায়, সুশীল রায়। অন্নদাশংকর রায়, দীনেশ দাস, অমিতাভ চৌধুরী, কৃষ্ণ ধর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এবং কঙ্কন নন্দী, মোহাম্মদ [illegible]উদ্দীন আহমদ খান, সৈয়দ আলি আহসান, আবুল কাসেম, মনিরুজ্জামান প্রমুখের কবিতা আছে। কবিতার মতো গল্প লিখেছেন—[illegible] সরকার। এ ছাড়া আলোচনা পর্যায়ে আছেন—শান্তনু দাস, রাজীব সেন।

প্রগতি। [কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা] পৌষ-মাঘ। সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯বি ডেন্ট মিশন রোড, কলিকাতা-২৩। দাম—দু টাকা।

কবি, সাহিত্যিকের উদ্দেশ্যে সংকলিত 'প্রগতি'র আগের দু'একটি সংখ্যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সম্প্রতি লোকান্তরিত কুমুদরঞ্জন ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই সংখ্যাটিও পাঠকসমাজের কাছে প্রশংসিত হবে বলে আশা করা যায়। কবিতা, আলোচনা প্রবন্ধে এই দুই সাহিত্যিককে স্মরণ করেছেন অনেকে। এঁদের মধ্যে কালিদাস রায়, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সংকলনটি নিঃসন্দেহে প্রশংসিত হবে এ আশা করা যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

জাহাজ ডুবি। সত্যব্রত রায়। জ্ঞান নিকেতন : ১৮এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩.০০।

আমার দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন (১৩-১৪ অধ্যায়)। শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স : ১-১-১ এ-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২.০০।

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় বিষেণ সিং বেদী ব্যাটিং করছেন

চ্যাম্পিয়নশিপেও ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৫টি বিষয়ে তারা চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছিল। তারপর ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালের বিশ্ব-আসরে তারা হাজির হয়নি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে।

৬ বছর পর এবার জাপানের নাগোয়া শহরে আয়োজিত বিশ্ব আসরে আবার চীন যোগ দিয়ে ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৪টিতে চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে দলগত বা দেশগত প্রতিযোগিতা সোয়েদলিং কাপ জয়েরও গৌরব রয়েছে। বাকি তিনটি জয় মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে। পুরুষদের সিঙ্গলসে সুইডেন এবং পুরুষদের ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছে হাঙ্গেরী। জাপানের শুধু মহিলাদের দলগত প্রতিযোগিতা কর্বিলন কাপ লাভের সম্মান। আর কোন দেশই কোন জয়ের সম্মান পায়নি। দলগত প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ভারত পেয়েছে চতুর্দশ স্থান, মহিলা বিভাগে ভারতের মেয়েরা পেয়েছে পঞ্চদশ স্থান; ব্যক্তিগত জাতিগত প্রতিযোগিতায় ভারতের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা বেশীদূর এগোতে পারেনি।

চারটি কেন, চীন হয়তো আর দুই একটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়নের সম্মান পেতে পারত যদি রাজনৈতিক কারণে তারা কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে অস্বীকার না করত। কাম্বোডিয়ার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলার তালিকা স্থগিত হওয়ায় চীনের বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় চুয়াং সে-তুঙ্গ এবং উদীয়মান খেলোয়াড় লি চিং-কোয়াং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি।

১৯৬১, ১৯৬৩ এবং ১৯৬৫ সালের পর তিনটি বিশ্ব আসরে চুয়াং সে-তুঙ্গ চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী হন। আগেই বলেছি, তারপর চীন আর বিশ্ব আসরে অবতীর্ণ হয়নি। ফলে উপর্যুপরি ৪ বার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভে ভিক্টর বার্নার রেকর্ড স্পর্শ করারও তার সুযোগ ঘটেনি। এবারও রাজনৈতিক কারণে তার টেবল টেনিসে বিশ্ব জয়ের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল। ভিক্টর বার্না অবশ্য মোট ৫ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী। তবে বার্নাই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন 'আমার রেকর্ড চুয়াং সে-তুঙ্গই ভেঙে দেবেন।

তবে খবরে প্রকাশ, চুয়াং সে-তুঙ্গের চেয়েও বর্তমানে চীনের প্রতিভাধর খেলোয়াড় হচ্ছেন লি চিং কোয়াং। ২৪ বছর বয়সী এই নাটা খেলোয়াড় অপূর্ব দক্ষতায় টেবিলের উপর তুফান ছুটিয়ে সোয়েদলিং কাপের খেলায় দুজন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে সহজেই পরাজিত করেছেন।

নাগোয়ার বিশ্ব আসরে এবার সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ১৫ নম্বর বাছাই সুইডেনের ১৮ বছর বয়সী খেলোয়াড় স্টেলান বেংটসনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। এবং বলবার কথা, জাপানের দুজন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে পরাজিত করে।

নীচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হল:

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল—সুইডেনের স্টেলান বেংটসন ২১—১৭, ১১—২১, ২১—১৩ ও ২১—১০ পয়েন্টে জাপানের সিগিও ইটোকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল—চীনের লিন হুই-চিং ২১,১৭, ২১—১৫, ১৩—২১ ও ২১—১৯ পয়েন্টে চীনেরই চেং মিন-চিনকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—হাঙ্গেরীর টি ক্লাম্পার ও ইস্তাভন জানিয়ার ১১—২১, ২১—১৬, ২১—১০ ও ২১—১৬ পয়েন্টে চীনের চুয়াং সে-তুঙ্গ ও লিয়াং কো-লিয়াংকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল—চীনের লিন হুই-চেং ও চেং মিন-চি জাপানের মিকো হিরানো ও রেইকো সাকামোটোকে পরাজিত করেন ২১—১১, ২১—১৬ ও ২১—১০ পয়েন্টে।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল—চীনের লিন হুই-চেং ও চাং সিন-লিন ২১—১৯, ১৫—২১, ২১—১৬ ও ২১—১৮ পয়েন্টে যুগোস্লাভিয়ার আন্টন স্টিপানসিক ও রুমানিয়ার মাই আলেকজান্ড্রুকে পরাজিত করেন।

চীন-মার্কিন মিতালী

টেবল টেনিস খেলাকে কেন্দ্র করেই চীন-মার্কিন মিতালী দানা বেঁধে উঠেছে। নাগোয়ার বিশ্ব আসরের পর চীনের আমন্ত্রণে মার্কিন টেবল টেনিস দল চীন সফরে গিয়ে সেখানকার আতিথেয়তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। আমেরিকার খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা সভায় চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই স্বাভাবিক ভাবেই বলেছেন, এই সফর দুই দেশের সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সত্যিই তাই। রাজনৈতিক চিন্তায় পরস্পরের বিরোধী এবং শক্তিশালী যে দুটি দেশের মধ্যে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে কোন যোগসূত্র ছিল না টেবল টেনিসই তাদের মধ্যে মিলনের সেতু তৈরী করে দিল। এর পর অলিম্পিক অঙ্গনেও চীনের প্রবেশ অবধারিত। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আভেরি ব্রান্ডেজ এই মিতালীর পর বলেছেন, অলিম্পিকে চীনকে সাদরে গ্রহণ করা হবে যদি চীন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য মেনে নেয়। অথচ একদিন এই চীনই বলেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ আভেরি ব্রান্ডেজ যতদিন আন্তর্জাতিক কমিটির সভাপতির পদে থাকবেন, ততদিন চীন অলিম্পিকে যোগ দেবে না। চীনের নতুন চিন্তাধারায় আমেরিকা হয়তো আর সাম্রাজ্যবাদী দেশ নয়।

একলব্য

হকি খেলার আইন কানুন

আগের সপ্তাহে বুট ও খেলোয়াড়দের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কীয় ৮ নম্বর আইন আলোচনা করা হয়েছে। শুধু খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ শীর্ষক স্তম্ভটি ছাপা হয়নি। উপদেশে বলা হয়েছে, বুট এবং পোশাক পরিচ্ছদ যদি আইন-মাফিক না হয় তবে খেলোয়াড় মাঠ থেকে বার হয়ে যাবার আদেশ পেতে পারেন। তাতে সাময়িকভাবে দলকে অসুবিধায় পড়তে হবে। মাঠ থেকে বার হয়ে যাবার আদেশপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে বুট ও পোশাক পরিচ্ছদের ত্রুটি সংশোধন করে আম্পায়ারকে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে আবার মাঠে ঢুকতে হবে।

"আইন ৯" বুলি

(এ) বুলি করার সময় দুই পক্ষের একজন করে খেলোয়াড় সাইড-লাইনের দিকে মুখ করে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াবেন। প্রত্যেকের নিজের গোল-লাইন থাকবে তার ডানদিকে। দুজনের মাঝখানে মাঠের উপরে থাকবে বল। এইবার দুজন বল ও লাইনের মধ্যে নিজের পাশে। প্রথমে স্টিকস দিয়ে মাঠ স্পর্শ করবেন, পরে বলের উপরে দুজন দুজনের স্টিকস মুখোমুখি ঠেকাবেন (স্টিকসের মুখ দিয়ে স্টিকসের মুখ স্পর্শ করবেন)। এইভাবে মাঠ ও স্টিকস-এর মুখ পর্যায়ক্রমে তিনবার স্পর্শ করার পর একজন অবশ্যই স্টিকস দিয়ে বলকে খেলার মধ্যে ঠেলে দেবেন।

(বি) যতক্ষণ না বল খেলার মধ্যে চলে যায়—ততক্ষণ অপর সব খেলোয়াড় বল ও নিজেদের গোল-লাইনের মধ্যে দাঁড়াবেন এবং কোনো খেলোয়াড় বলের পাঁচ গজের মধ্যে দাঁড়াবেন না।

(সি) খেলা আরম্ভের সময়, একটি গোল হবার পর আবার খেলা আরম্ভের সময় এবং হাফ-টাইমের পর খেলা আরম্ভের সময় বুলি করতে হবে মাঠের কেন্দ্রস্থল থেকে।

(ডি) সার্কেলের মধ্যে গোল-লাইন থেকে পাঁচ গজের মধ্যে কোন বুলি করা যাবে না।

শাস্তি—বুলির নিয়মকানুনের কোনো ব্যতিক্রম হলে আবার বুলি করতে হবে। বার বার এই নিয়মের ব্যতিক্রম করলে আম্পায়ার প্রতিপক্ষ দলের সপক্ষে ফ্রি-হিটের নির্দেশ দিতে পারেন। আর সার্কেলের মধ্যে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় আইনের ব্যতিক্রম করলে আম্পায়ার পেনাল্টি কর্নারের নির্দেশ দিতে পারেন।
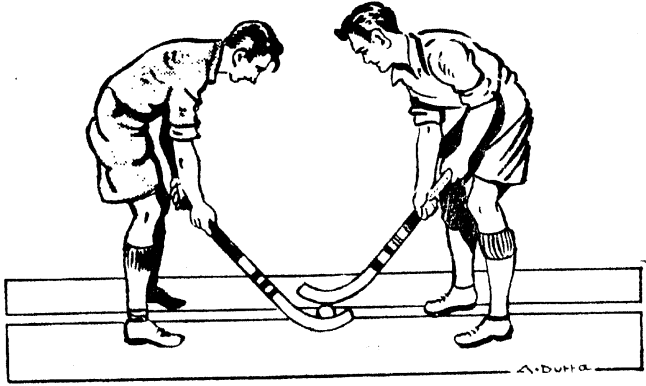
বুলি করার পদ্ধতি

হকি বোর্ডের ভাষ্য ও জ্ঞাতব্য

(১) ৯ নম্বর আইনের "এ" ধারা অনুযায়ী বুলির সময় স্টিকস-এর সঙ্গে স্টিকস-এর মুখে মুখে অর্থাৎ মুখের চওড়া দিকের সঙ্গে চওড়া দিকের স্পর্শ হবে। আর স্পর্শ হবে সরাসরি ঠিক বলের উপরে।

(২) যে দুজন বুলি করবেন তাঁরা ছাড়া অন্য সব খেলোয়াড়কে বল থেকে অন্ততঃ পাঁচ গজ দূরে থাকতে হবে। কেউই বলের আগে থাকতে পারবেন না—অর্থাৎ থাকতে হবে নিজেদের গোল-লাইন ও বলের লাইনের মধ্যে কোন জায়গায়। অবশ্য বুলি হবার পর সবাই এগোতে পারেন। সার্কেলের মধ্যে বুলি হলে অবশ্যই গোল-লাইন থেকে পাঁচ গজ দূরে বুলি করতে হবে। তাই সাইডের স্থান গোল-লাইনের যত নিকটই হোক।

আম্পায়ারের প্রতি উপদেশ

(১) আইনে আছে যাঁরা বুলি করবেন তারা মুখোমুখি দাঁড়াবেন একদিকের সাইড লাইন পেছনে রেখে এবং আর একদিকের সাইড লাইন সামনে রেখে এবং নিজের গোল-লাইন রেখে ডানদিকে। এর পরিবর্তে অর্থাৎ গোলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বুলি করা যায় না। আম্পায়ারদের লক্ষ্য রাখতে হবে কোন খেলোয়াড় যেন বুলি করার সময় দাঁড়াবার ব্যাপারে যথাযথভাবে নিয়ম পালন করেন।

(২) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বুলি হবে?

(এ) খেলা আরম্ভের সময়।

(বি) কোন গোল হবার পর আবার খেলা আরম্ভে।

(সি) হাফ-টাইমের পর বা অতিরিক্ত সময়ের খেলা আরম্ভে।

(ডি) কোন খেলোয়াড়ের আঘাতজনিত ঘটনায় খেলা বন্ধ হবার পর আবার আরম্ভে। কিংবা অন্য কারণে খেলা বন্ধের পর আরম্ভে।

(ই) যখন দুই পক্ষের দুজন খেলোয়াড় একই সঙ্গে কোন আইন লঙ্ঘন করবেন তখন খেলা বন্ধ হলে আবার আরম্ভে।

(এফ) বল গোলকিপারের প্যাডের মধ্যে কিংবা আম্পায়ার বা খেলোয়াড়ের পোশাকের মধ্যে আটকে গেলে।

(জি) আম্পায়ারের বিনা অনুমতিতে কোন খেলোয়াড় মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ করলে যদি খেলোয়াড়কে সতর্ক করার জন্য খেলা থামানো হয় তবে আবার খেলা আরম্ভে।

(৩) যদি কোন খেলোয়াড় বুলি করার সময় ঠিক ঠিকভাবে আইন পালন না করেন তাঁকে সতর্ক করে দেবেন। সতর্ক করার পরেও আইন লঙ্ঘন করলে বিপক্ষ দলকে ফ্রি-হিট দিয়ে খেলা আরম্ভ করাবেন।

খেলোয়াড়ের প্রতি উপদেশ

বহু খেলোয়াড় বুলি করার সময় পর্যায়ক্রমে ৩ বার মাঠ ও প্রতিপক্ষের স্টিকস স্টিকস দিয়ে স্পর্শ করেন না। কিংবা তৃতীয় বার প্রতিপক্ষের স্টিকস নিজের স্টিকস দিয়ে সজোরে ঠেলে দিয়ে অথবা সজোরে আঘাত করে নিজের খেলোয়াড়ের কাছে বল ঠেলে দিতে চেষ্টা করেন। এটা অন্যায়। বুলির সময় বলের পাঁচ গজের মধ্যে দাঁড়াবার প্রয়াস বা বুলি হবার আগেই বলের আগে চলে যাবার চেষ্টা আইনের চোখে অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে।

মুকুল

তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "অানন্দ" গল্পটি সিনেমায় দেখানো হয়েছে, আনন্দর বন্ধু ডাঃ ভাস্করের (অমিতাভ বচ্চন) লেখা। ভাস্কর ডায়েরিতে আনন্দর কথা লেখে, সেটাই পরে বই হয় এবং সরস্বতী পুরস্কার পায়। সিনেমার আরম্ভে সাহিত্যে ডাঃ ভাস্করের সরস্বতী পুরস্কার প্রাপ্তির অনুষ্ঠান। এই সম্পর্কে কল্পিত সরস্বতী পুরস্কার পাইয়ে দিয়ে কাহিনীকার-পরিচালক যদি আত্মপ্রতায়ের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাতে আপত্তির কারণ নেই, তবে দর্শকের কাছ থেকে পরিচালকের একটি পুরস্কার প্রাপ্য। সুপরিচালনার গুণে ছবিটি যে তাঁদের ভাল লাগবে এটাই হৃষীবাবুর পুরস্কার। ছবির উপভোগ্যতার মূলে সুন্দর সংলাপ, যে সংলাপ নাটকের উপযোগী, খুব কার্যকর হয়েছে। টেপ-রেকর্ডারে দুই বন্ধুর (ডাঃ ভাস্কর ও অানন্দ) কবিতা ও কথা যখন তুলে রাখা হচ্ছিল এবং বিশেষ করে দুজনের উচ্চহাসি তখনই বোঝা গিয়েছিল তা আবার আনন্দর মৃত্যুর পর শোনানো হবে। এই সাজানো ঘটনা যদিও বা স্বাভাবিক নাটকীয়তাকে বেশ কিছুটা ব্যাহত করেছে তবু ক্লাইম্যাক্স ওই কথা ও হাসির জন্যই মনে দাগ কাটে। বরঞ্চ তার আগের একটি মুহূর্ত অর্থপূর্ণ —যেখানে দেখানো হয়েছে ডাঃ ভাস্করের ডায়েরির সাদা পাতা খোলা পড়ে আছে, সে আর আনন্দর কথা লিখতে পারছে না, যেন সব শূন্য, "ব্ল্যাঙ্ক"। কথা নেই বলেই মুহূর্তটি মর্মস্পর্শী।

ছবির বৈশিষ্ট্য শিল্পী নির্বাচনেও। অমিতাভ বচ্চন ও সুমিতা সান্যাল

হয়েছেন স্বামী-স্ত্রী। সেটা দেখা গেছে ছবির গোড়ায়, পরে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয়েছে তাদের পরস্পরের কাছে আসা। আনন্দ বেঁচে থাকতে তাদের বিয়ে হয়নি। ওদের রোমান্স পরিচালক রুচিবোধের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। এবং ওই চরিত্র শিল্পীদের অভিনয়ও মার্জিত। অমিতাভ বচ্চন ছবিতে আগাগোড়াই সুন্দর অভিনয় করেছেন। আবেগের নাটকটিকে রমেশ দেও ও সীমা, ললিতা পাওয়ার ও জনি ওয়াকারের দানও কম নয়। এঁরা সকলেই আনন্দকে ঘিরে রয়েছেন। জনপ্রিয় স্টার রাজেশ খন্নাকে দেখামাত্রই কিংবা তাঁর কথা শুনেই যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু চরিত্রটিতে বাস্তবতা যাঁরা খুঁজতে চাইবেন তাঁরা শিল্পীর কথা বলার কৃত্রিমতা ও অভিনয়ের আতিশয্য সহজভাবে নেবেন না। তবে অবশ্য কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর কিছু না হোক আনন্দের চরিত্রে অভিনয় রাজেশ খান্নার পক্ষে নতুন ধরনের একটা কাজ হলো বটেই। এবং পরিচালকের আনন্দর [illegible] [illegible] করেননি। [illegible] দর্শককে হাসাবার [illegible] তিনি ঠিকই হাসিয়েছেন, যেখানে কাঁদাবার সেখানে কাঁদিয়েছেন। অনন্দ [illegible] চরিত্রে রাজেশ খান্না তা পুরোপুরি হতে পেরেছেন।

নতুন ছবির খবর

চিত্রলোকের প্রণয়-কাহিনী

মার্চেন্ট-আইভরি প্রোডাকশনস এবার যে ইংরেজী ছবিটি উপস্থিত করছেন তার নাম বম্বে টকীজ। নিউ এম্পায়ারে ছবিটি মুক্তি পেতে পারে। বোম্বাই-ছায়াছবির এক নায়ক, তার স্ত্রী ও প্রণয়ীকে নিয়ে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক জেমস আইভরি। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন শশী কাপুর, অপর্ণা সেন, জেনিফার কেন্ডেল, উৎপল দত্ত, নাদিরা, সৈয়দ জাফরি, হেলেন এবং পাকিস্তানের অভিনেত্রী জিয়া মোহিউদ্দীন। শংকর-জয়কিষণ সংগীত পরিচালনা করেছেন। পপ-গান গেয়েছেন ঊষা আয়ার।

"জননী" (পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলি) ছবিতে জয়া ভাদুড়ি

মার্চেন্ট-আইভরি প্রোডাকশনের ইংরাজী ছবি "বম্বে টকীজ" ছবির চিত্রগ্রহণের সময় অভিনেতা শশী কাপুর, ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র ও পরিচালক জেমস আইভরি

বোম্বাই বিচিত্রা

উত্তর বোম্বাই-এর একটি ছোট্ট এলাকার নাম খার। বোম্বাই নগর পালিকা এবং ডাক-তার বিভাগের স্ট্যাম্প অনুযায়ী খার-এর অন্য পরিচিতি হল বোম্বাই একান্ন। অন্যান্য অনেক এলাকার মত খারও একটি অত্যন্ত সাধারণ জায়গা। খার-এ কোনো মিউজিয়াম নেই, আর্টগ্যালারী নেই, কোনো বিশেষ মনুমেন্ট নেই, এমন কি বোম্বাই-একান্নয় একটা সিনেমা হাউসও নেই। এসব কিছুই নেই তবু খার-এ একটি বাজার আছে, যে বাজারে 'আরব সাগরের জল নোনা' হওয়া সত্ত্বেও মিঠে জলের মাছ পাওয়া যায়।

খার বাজারে আপনি যদি নিয়মিত বাজার করতে যান তাহলে চলচ্চিত্র জগতের অনেককেই চলতে ফিরতে দেখবেন সেখানে। আজ থেকে বছর সাত-আট আগেও যখন খারের বাজার আজকের মত একেবারে মেছোবাজার হয়ে যায়নি তখন হেমন্ত মুখার্জি, শশধর মুখার্জি, এমন কি বিমল রায়কেও খার বাজারে মাছ কিনতে দেখা গেছে। আজকাল কর্তারা বাজারে যাওয়াটা এড়িয়ে চলছেন। কারণটা সম্ভবত বাঙালীর ভীড়। এই শিল্পীদের [illegible] এখন খার বাজারে। খার বাজার থেকে মাইল খানেকের মধ্যে, আমাদের লাইনের যাঁরা থাকেন তাঁদের মধ্যে হেমন্ত মুখার্জি, সুবোধ

'চেতনা' (পরিচালনা : বি আর ইশারা) ছবিতে অনিল ধাওয়ান ও রেহানা সুলতান

মুখার্জি, শচীন দেববর্মণ, মাণিক দত্ত, অনিতা দত্ত, প্রদীপকুমার, শশধর মুখার্জি, নীতীন বোস, শচীন ভৌমিক, ধ্রুব চ্যাটার্জি, গীতা দত্ত, মণি ভট্টাচার্য। মাইল দেড়-দুই-এর পাল্লায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে হৃষীকেশ মুখার্জি, বিমল রায় পরিবার, সত্যেন বোস, বিশ্বজিৎ প্রভৃতিকে ধরা গেল। এ'রা তো হলেন আমাদের লাইনের কিন্তু যাঁরা এ লাইনের লোক নন এবং যাঁদের ধরা গেল না, খারের বাজারকে বঙ্গ রঙের ভিন্ন রঙে রঙীন কিন্তু তাঁরাই করেছেন।

আজ থেকে বছর কয়েক আগে অবধিও বম্বেতে রবিবার মর্নিং শো-এ বাংলা ছবি নিয়মিত দেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। আজকাল প্রত্যেক রবিবার বিভিন্ন এলাকায় অন্তত তিনটি চিত্রগৃহে নিয়মিত বাংলা ছবি দেখানো হচ্ছে। তাহলেই বুঝুন বোম্বে বাজারে বঙ্গ সন্তানরা কি হারে জমিয়ে বসতে শুরু করেছেন।

✻

'প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই প্রতিভাবান' এমন একটা কথা বিভিন্ন মহলে প্রচলিত। যদিও এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট সন্দেহ হবে অনেকের প্রতিভা সন্দর্শনে তবু সেটা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। কিছু দিন আগে স্থানীয় ওপন এয়ার থিয়েটারে বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে, উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় স্থানীয় বঙ্গ-শিশুরা মঞ্চে 'আবোল তাবোল'কে জীবন্ত করে তুললো। অনুষ্ঠানটির আয়োজন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মতে এটি 'আবোল তাবোল' নৃত্যনাট্য, কিন্তু আমি স্বচক্ষে একপাল শিশুকে 'আবোল তাবোল' নিয়ে যেভাবে বিভোর হয়ে খেলতে দেখলাম, সে খেলাকে কোনো ফর্মের নামাবলি জড়িয়ে ছোট করার কোন রকম ইচ্ছে আমার নেই। তাই এই অনুষ্ঠানকে নৃত্য, নাটক বা নৃত্যনাট্য কিছুই না বলে বিশুদ্ধ 'আবোল তাবোল' বলাই উত্তম মনে করছি। শিশুদের নিয়ে আমাদের মত ধেড়েরা যদি মাঝে মাঝে এমন ধারা 'আবোল তাবোল'-এর আয়োজন করেন তাহলে বোধ হয় আমরা সকল দিক থেকেই উপকৃত হই। মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে এই ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানাদি করলে হয়ত আমরা 'আমাদের শিশুদের' কাছ থেকে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অনুধাবনশীলতা, সহৃদয়তা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারি। আলোচ্য শিশুদের 'আবোল তাবোল' দেখে মুগ্ধ হয়ে যখন ব্যাক স্টেজে গেলাম, তখনই সুপরিচিত ,সুসজ্জিত শিশুদের একজনও জিজ্ঞেস করলো না 'কেমন দেখলেন' বা 'কেমন লাগলো স্যার?' বা 'আমাদের সামান্য প্রয়াস' ইত্যাদি। তারা তখনো আপন নেশায় বুঁদ অনেকক্ষণ তাদের দেখার পর বুঝলাম, ওরা এত স্বচ্ছন্দ, ওরা

এত সুন্দর, ওরা এত সাবলীল তার কারণ ওরা যা কিছু করেছে সাগ্রহে করেছে সানন্দে করেছে। আবোল তাবোলের বোলে, আপন-আনন্দের ছন্দে করেছে। দর্শকদের দেখেনি, সমালোচকদের তোয়াক্কা করেনি, যা শিখেছে তা মনে রাখবার চেষ্টা করেছে তারপর যা কিছু, সেটা সব আনন্দ।

সরল শর্মা

যাত্রা দলের বিজ্ঞাপনে মালিক, পরিচালকের সম্মান প্রায় সমান সমান। এক আধটি দলের কথা অবশ্য তুলে রাখতে হবে। সেখানে অবস্থা ঠিক উলটো। দলের বিজ্ঞাপনে মালিকের ছবি যদি ছাপা হয় আপত্তি উঠবে কি? না, উঠবে না। ওঠেনি আজ পর্যন্ত। তবে অন্যান্য গদিতে এই নিয়ে কথা হয়েছে, এবং সেই বিশেষ দলের প্রথম সারির শিল্পীদের সম্বন্ধে উক্তিও যে কেউ শোনেনি সে-কথা চিৎপুরবাসীরা অস্বীকার করতে পারবেন না। আবার এর বিপরীত চিত্রও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। যেখানে বিজ্ঞাপনে কেবল পরিচালকের নামটাই বড় অক্ষরে প্রচার করা হয়, মালিকের নাম অনুপস্থিত। যাত্রাপাড়ার বিজ্ঞাপনে মোটামুটি এই রীতিই হালফ্যাশানে চালু। কিন্তু হ্যান্ডবিল, প্রোগ্রাম কি পকেট-পোস্টারে ওটা উহ্য রাখা বেআইনী। সেখানে স্বত্বাধিকারী কোথায় 'ব'-ফলা পেল কি পেল না তা নিয়ে চিৎপুরের মাথাব্যথা নেই।

এ-পরিচালককে অনেকে পালা-পরিচালক, অভিনয়-নির্দেশক, প্রয়োগকর্তা বলে ভুল করে থাকেন। আসলে কিন্তু যাত্রা-পরিচালকদের অনেকেই অভিনয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। এঁরা দল-চালনার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান। গদীতে বসে দলের বায়না করা, পুজোর পর কোলিয়ারি এলাকা অথবা আসামের তিনসুকিয়ায় বসে 'চেন' সাজানোই এঁদের কাজ। দেশের পথঘাট ভাল করে জানা না থাকলে তাঁর পক্ষে দক্ষ পরিচালক হওয়াই মুশকিল। বায়নাকে তিনি এমনভাবে সাজাবেন, যাতে দলের বসতি না যায়, ট্রান্সপোর্ট কস্ট বেশি না লাগে। এ-ছাড়া প্রতিযোগিতার বাজারে দাঁড়িয়ে নাহেক টানার মতন জ্ঞানও টনটনে থাকা দরকার।

নট্ট কোম্পানীর শ্রীসূর্য দত্ত অবশ্য ব্যতিক্রম। আদিতে তিনি মোশনমাস্টার, পরে ম্যানেজার—যত দূর জানি তিনি পরিচালক হিসাবে বিজ্ঞাপিতও নন। অথচ

"পরদে কি পিছে" (পরিচালনা : কে শঙ্কর) ছবিতে বিনোদ মেহেরা ও জোগিতাবালি

কে না জানে সূর্যবাবুর নামে এখনও সাড়া জাগে। আজকাল সংখ্যা কমতির দিকে হলেও একদা সূর্য দত্তই ছিলেন দলের প্রধান আকর্ষণ। তখনকার লোকেরা যাত্রাগানের নির্দেশককে মোশনমাস্টার বলে জানত বলে 'পরিচালক' কথাটি নিয়ে গোলমাল হয়নি। সেকালে ম্যানেজার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিচালকও ছিলেন। প্রায় এক যুগ আগে পদ হিসাবে ও দুটি আলাদা হয়ে গেছে। এখন ম্যানেজার থাকেন দলের সঙ্গে, পরিচালক বসেন গদীতে অথবা ব্রাঞ্চ অফিসে। সূর্যবাবুর পরে ডাকাবুকো পরিচালক হিসাবে চিৎপুর পেয়েছিল শ্রীহরিপদ বায়েনকে। ইনি 'হরিপদর'ণী' নামে একদা বিখ্যাত ছিলেন। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতেন। ভদ্রলোক পুরোদস্তুর মোশনমাস্টার না হলেও অনেক গুণই তাঁর ছিল। অভিনয় ও প্রয়োগ এ দুটোই তিনি বুঝতেন। পরে আসেন এ কালের বিখ্যাতরা—শ্রীশম্ভু ঘোষ, কমল শী, নিরঞ্জন, জানকী সেনগুপ্ত, মধু বড়াল, নিতাই দত্ত, রঞ্জন বসু মল্লিক, অনিল দাস এবং আরও অনেকে। এঁরা সকলেই স্থায়ী পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত। চিৎপুরের অস্থায়ী পরিচালকও অনেক। এঁদের কথা বারান্তরে বলব।

কিন্তু পরিচালক কথাটা নিয়ে খটকা এখনও রয়ে গেছে। দু' যুগ আগেও পালা-নির্দেশনা বা পালা পরিচালনা কে করছেন সেটা বিজ্ঞাপনের মুখ্য বিষয় ছিল না। এখন চিৎপুরী হিরোরা অনেকেই পালা পরিচালকরূপেও আবির্ভূত হচ্ছেন। তাঁদের উচ্চ যোগ্যতার কথা প্রচারিত হচ্ছে। এবং চিৎপুরী দল-পরিচালকরা ক্রমশ পরিচালক কথাটা বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। সংযোজক, জনসংযোগ সচিব, যোগাযোগকারী এ-সব শব্দ ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। অদূর ভবিষ্যতে এর চেয়েও গালভরা নামে তাঁদের ভূষিত করার চেষ্টা হবে না, তা নয়।

—সূত্রধার

বহুরূপীর "পাগলা ঘোড়া" নাটকে রায় ও দেবতোষ ঘোষ

"পাগলা ঘোড়া"র অভিনয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি

বহুরূপীর নতুন নাট্য প্রযোজনা বাদল সরকার রচিত ও শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'পাগলা ঘোড়া' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চে প্রতি রবিবার নিয়মিত সকালবেলা প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছে। পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে

এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল, কিন্তু দর্শকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে নাটকটির আরো কতকগুলি অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই নাটক চলবে বলে আশা করা যায়।

সঙ্গীতচক্রের "শ্যামা"

আগামী ২৫ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রবীন্দ্র সদনে সংগীতচক্রের শিল্পীগোষ্ঠী কবিগুরুর "শ্যামা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানের শিল্পীরা হলেন হেমন্ত মুখার্জী, সুচিত্রা মিত্র, ধীরেন বসু, সাগর সেন, জয়শ্রী লাহিড়ী, নরেশকুমার প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ধীরেন বসুর।

বাংলার বাইরে তরুণ অপেরা

তরুণ অপেরা আগামী ২৪ ও ২৫ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের ভিলাই নগরে "হিটলার" ও "লেনিন" পালা দুটি অভিনয় করবেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় মিলন সংঘ তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ২৬ ও ২৭ এপ্রিল রায়পুরে রবীন্দ্র ভারতীর ব্যবস্থাপনায় "লেনিন" ও "নেপোলিয়ন" অভিনীত হবে। এর পর ২৮ ও ২৯ এপ্রিল রাউরকেলায় "হিটলার" ও "লেনিন" অভিনয় করবেন তাঁরা। স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী ক্লাব এর উদ্যোক্তা।

"নন্দ ডাকাত" ছবির গান রেকর্ডিংয়ে কণ্ঠশিল্পী গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও সংগীত-পরিচালক অনিল দত্ত

স্টার থিয়েটারের নতুন মালিকানা

পয়লা এপ্রিল থেকে উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত স্টার রঙ্গালয়ের হাতবদল হয়েছে। নতুন স্বত্বাধিকারী হলেন শ্রীরণজিৎমল কাংকারিয়া। এর আগে ১৯৩৮ সন থেকে এই থিয়েটারের মালিক ছিলেন শ্রীসলিলকুমার মিত্র।

এই হাতবদলের ব্যাপার নিয়ে নাট্যরসিক ও শিল্পীমহলে অনেক কৌতূহল ও আশংকা ছিল। সেই কারণেই গত ৫ এপ্রিল শ্রীকাংকারিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে শ্রীমন্মথ রায় জানান, সলিলবাবু মঞ্চের স্বত্ব হস্তান্তর করেছেন প্রধানত শারীরিক কারণে। তিনি অপুত্রক। তাঁর অবর্তমানে এই মঞ্চের দরজা যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তারই জন্য তিনি এমন একজন লোকের হাতে এই মঞ্চের ভার দিয়েছেন যিনি স্টার রঙ্গালয়কে রঙ্গমঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ। এ ছাড়া যেমন ভাবে এই মঞ্চ এতকাল চলে এসেছে সেই ভাবেই মঞ্চ চালাবার শর্তে রাজী হয়েছেন শ্রীকাংকারিয়া।

এই সব শর্তের কথা শ্রীকাংকারিয়া স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, থিয়েটারের জন্য নির্দিষ্ট দিনের বাইরে তিনি প্রয়োজন বোধে এই মঞ্চে শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে তা এখনই নয়।

স্টার থিয়েটারের পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত মঞ্চজগৎ থেকে সলিলবাবুর আকস্মিক বিদায় গ্রহণে নিঃসঙ্গ, বন্ধুহারা এবং বেদনার্ত। অশ্রুসজল চোখে তিনি জানান, শ্রীশিশির মল্লিকের অনুরোধে তিনি পুনরায় স্টার মঞ্চের দায়িত্ব নিয়েছেন। যতদিন সক্ষম থাকবেন ততদিন এই মঞ্চের ঐতিহ্য রক্ষাই হবে তাঁর প্রধান কাজ।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

আমার রাইফেল তো এইখানেই ছিল
আমারটাও
সব কটা রাইফেল হাওয়া!

রাইফেলের তো আর ডানা গজায়নি!
কে সরাল?
আমরা ছাড়া আর-কেউ তো এখানে নেই!

কীলাউয়ির সোনাবেলায়-····
হর্ট, তুমিই নিশ্চয় আমাদের রাইফেলগুলোকে লুকিয়ে রেখেছ!
ওরে বোকা, আমার নিজের রাইফেলটাও কি লুকিয়ে রেখেছি?
তাইতো, আমারটাও তো নেই!

হঠাৎ তোমার রাইফেলের কথা মনেই বা পড়ল কেন?
আ···
তোমারই বা মনে পড়ল কেন?
তোমার মতলবটা কী বলো তো···
4/23

নিশ্চয় তুমি আমাদের উপরে রাইফেল চালাতে চেয়েছিলে তাই না?
তোমারও নিশ্চয় ওই একই মতলব ছিল···
মজা টের পাইয়ে দিচ্ছি!

পথের কাঁটা সরিয়ে দেওয়াই ভাল!
যা বলেছ!

হঠাৎ গুলির আওয়াজ···
থামো!

-বজ্রকণ্ঠে অরণ্যদেবের আদেশ!
আমিই রাইফেলগুলো সরিয়েছি!
!

অরণ্যদেব

লী ফক

গুলির শব্দ!
ওই তো ওয়াকার-বাবা* দাঁড়িয়ে আছেন।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-বাবা

এই শব্দ তাঁরই পিস্তলের।
কিন্তু কেউ জখম হয়নি। মনে হচ্ছে, ভয় দেখাবার জন্যে গুলি চালিয়েছেন।

কীলাউয়ার সোনাবেলায়-----
তোমরা এখানে লুঠ করতে এসেছ।
লুঠ করবার মতো কী আছে এখানে? শুধুই তো বালি!

এই বালির দাম যে কোটি কোটি ডলার, তা তোমরা জানো। ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তাই পরস্পরকে খুন করতে চেয়েছিলে। পবিত্র এই বিবাহের জায়গাটিকে তোমরা অপবিত্র করেছ...
৪/১০

এবারে বালি খুঁড়ে গর্ত করো!
কী?
তুমি কি ঠাট্টা করছ?
ওরে বাবাস, এ তো ঠাট্টার ব্যাপার নয়!

.....
আমাদের গর্ত খুঁড়তে বলছ কেন?
আরো খোঁড়ো!

বাস, যথেষ্ট হয়েছে! এবারে এই গর্তের মধ্যেই থাকো তোমরা!

'লোভ নিয়ে যে কীলাউয়িতে যায়, সেখানে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়।' — অরণ্যের প্রবাদ
!

বাংলা দেশের সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠা আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১২ এপ্রিল সোমবার এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয় এবং ১৭ এপ্রিল শনিবার মুজিবনগরে এই নতুন রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয়। কুষ্ঠিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় বৈদ্যনাথতলার নাম বর্তমানে মুজিবনগর। নবগঠিত সরকারের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ৬ জন। সর্বশীর্ষে শেখ মুজিবর রহমান—প্রেসিডেণ্ট, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুদ্দিন আহমদ—প্রধানমন্ত্রী, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। উপ-রাষ্ট্রপতির নাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম। স্বাধীন বাংলা দেশ সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই নেতারা ঘোষণা করেন:—আমরা অবাধ নির্বাচনে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আইন-সম্মত গণ-প্রতিনিধি। অতএব আমাদের দ্বারা গঠিত 'বাংলা দেশ' সরকার সম্পূর্ণ বৈধ এবং আইন-সম্মত স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। ১ বৈশাখ মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভার বর্তমান কাজ হবে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেটের মত। মন্ত্রিসভা আওয়ামি লীগের অন্যান্য প্রধানদের সহিত ইতিমধ্যে এক গোপন বৈঠকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন:—(১) রাজধানী কোথায় হবে, (২) বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়া, (৩) নিজেদের মুদ্রা প্রচলন করা, (৪) সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুকে পরাজিত করা এবং (৫) দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা। মুজিবরের মুক্তিফৌজ এখন দেশের তিন-চতুর্থাংশ নিয়ন্ত্রণ করছেন।

দেশী সংবাদ

১২ এপ্রিল—আজ কলকাতা পৌর সংস্থার বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ফ্রন্টের নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে ফ্রন্টের ইতি ঘটে। বড় শরিক সি পি এম-এর প্রস্তাবেই দু'বছরের শিশু ফ্রন্টের অপমৃত্যু ঘটেছে। সি পি এম, সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক, আর এস পি, এস ইউ সি, আর সি পি আই, ওয়ারকারস পারটি, এস এস পি ইত্যাদি দলগুলি ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আজ নয়াদিল্লিতে প্রকাশিত ১৯৭১ সালের লোকগণনার প্রাথমিক হিসাবে দেখা যায়, কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার মোট জনসংখ্যা ৭০,৪০,৩৪৫। জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তর বোমবাই-এর স্থান দ্বিতীয়। এখানে বসবাস করেন ৫৯,২৩,৩৯৯। ফলে এবারকার আদমসুমারীর পর এই প্রথম পুণা শহর মেটরোপলিটান শহরের মর্যাদা পেল।

১৩ এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা আজকের বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারী চাকুরির কর্মপ্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা বাড়িয়ে ৩০ বছর করার প্রস্তাব হয়েছে। এতদিন এই বয়ঃসীমা ছিল ২৫। কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বেড়েছে এবং কাজ না পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের বয়সও বাড়ছে।

১৪ এপ্রিল—ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র আজ নয়াদিল্লিতে স্বীকার করেন যে, বিদ্রোহী দমন অভিযানে ভারত সিংহলকে 'কিছু সাহায্য' দিচ্ছে। সিংহল বন্ধু দেশগুলি থেকে কিছু সামরিক সাহায্য পাচ্ছে বলে সিংহল সরকার যে বিবৃতি দিয়েছেন, সে সম্পর্কেই মুখপাত্রটি ওই মন্তব্য করেন।

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া খবরে জানা যায় যে, ইসলামাবাদ অবিলম্বে তাদের কলকাতা দূতাবাসের আয়তনকে সংকুচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদ্দেশ্য: পরিস্থিতি বুঝে যে কোন মুহূর্তে কলকাতার পাক-ডেপুটি হাইকমিশন বন্ধ করে দেওয়া।

১৫ এপ্রিল—সীমান্তের হামলাবাজী বন্ধ কর। আর যেন গোলাগুলি না পড়ে। দিল্লি পিন্ডিকে কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। ভারতের সাফ বয়ানকে একটা কূটনৈতিক লড়াইয়ের সূচনা বলা যেতে পারে। আমাদের গ্রামের ওপর পাক-বাহিনী গোলা নিক্ষেপ করেছিল তারই বিরুদ্ধে এই নোট এবং তীব্র প্রতিবাদ। ওদিকে পিন্ডিও ভারতীয় এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া তিনজন সিপাহীকে ফেরৎ দেবার দাবি সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে।

১৬ এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত জেলায় পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় এক লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নাল আবেদিন জানান, একমাত্র পশ্চিম দিনাজপুরেই ৭০ হাজার উদ্বাস্তু এসেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ওইসব জেলায় ১০০ জন মেডিকেল অফিসার প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা কলেরা ও বসন্তের টিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে যাবেন।

জয়ন্তী শিপিং করপোরেশনের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ডঃ ধর্মতেজাকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আদালতের হাজতে রাখা হয়েছে। নয়াদিল্লির একজন ম্যাজিসট্রেট এই আদেশ দেন। ম্যাজিসট্রেট ডঃ তেজার অনুরোধ অনুযায়ী তাঁকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করেন।

১৭ এপ্রিল—সি পি এম কর্তৃক চুক্তিভঙ্গ এবং পৌর ফ্রন্ট ভেঙে দেওয়া সত্ত্বেও ফরওয়ারড ব্লক তাদের দলের মেয়র পদ সম্বন্ধে আশাবাদী। অপর দিকে সি পি এমও তৎপর। তাদের এক মুখপাত্র বলেন, তাঁরা যথার্থ-বামপন্থীদের নিয়ে জোট বাঁধতে চান। মেয়র ডেপুটি মেয়র বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের দাবি তাঁদের নেই। কোন বিশেষ দলকেও কোন পদের জন্য প্রস্তাব তাঁরা করেননি।

১৮ এপ্রিল—আজ কলকাতার পাক দূতাবাস পিন্ডির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলা দেশের প্রতি আনুগত্য জানাল। জানিয়ে দিল আজ থেকে এটা পাকিস্তানী দূতাবাস নয়, এটা বাংলা দেশ সরকারের দূতাবাস এবং এটাই হবে আমাদের একমাত্র পরিচয়।

স্বাধীন বাংলা দেশের সরকারী খামে পাঠানো চিঠি ভারতে এসে পৌঁচচ্ছে। ভারতের ডাক বিভাগ সেই চিঠি যথারীতি বিলিও শুরু করেছেন। স্বাধীন বাংলা দেশের খামে যে চিঠি পাঠানো হচ্ছে তাতে ফিলড পোস্ট অফিসের সিলমোহরের ছাপ পড়ছে।

বিদেশী সংবাদ

১২ এপ্রিল—গুয়েভারাপন্থী বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানের ফলে সিংহলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহীদের তৎপরতা চলছে এক সপ্তাহ ধরে। রাজধানীতে ব্যাংকগুলি খোলা থাকছে প্রতিদিন মাত্র আধ-ঘন্টার জন্য। এর কারণ শহরতলি এলাকা থেকে রিটার্ন না আসায় তাঁদের পক্ষে হিসাবপত্র করা খুব শক্ত হয়ে পড়েছে।

১৩ এপ্রিল—সিংহলী সেনাবাহিনী আজ দাবি করেছে যে, বহু বিদ্রোহী দলত্যাগ করেছেন এবং অস্ত্রশস্ত্র ও উর্দি পরিত্যাগ করেছেন। বিদ্রোহীরা নাকি এখন মরীয়া হয়ে বন্দুক উঁচিয়ে বালক ও কিশোরদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করছেন। খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে বিদ্রোহীরা লুঠতরাজ করছেন বলে জানা গিয়েছে।

১৪ এপ্রিল—চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন-লাই অবশেষে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তিনি বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আর বলেছেন, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে চীন পাকিস্তানকে সাহায্য করবে।

১৫ এপ্রিল—বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা কয়েকটি নির্ভরযোগ্য ইঙ্গিত পেয়ে আজ আশান্বিত যে, আগামী সাতদিনের মধ্যেই অন্তত চারটি দেশ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সম্ভবত স্বীকৃতি দেবে। এই দেশগুলি হল:—সিংগাপুর ও বর্মা (এশিয়া) এবং ইউরোপে ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়া।

১৬ এপ্রিল—বাংলার পূর্ব প্রান্ত জুড়ে আজও প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রাম কুমিল্লা থেকে ময়মনসিং পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ছাড়া এদিন বাংলা দেশের পশ্চিম খণ্ডে পাক ফৌজ চুয়াডাঙ্গা শহরে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে। ফলে বাংলা দেশ সরকারের অস্থায়ী সদর দফতর এই শহর থেকে একটি অজ্ঞাত স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের চতুর্থ সপ্তাহের সূচনা হল।

১৭ এপ্রিল—সিংহলে গুয়েভারা পন্থীদের বিদ্রোহের আজ দ্বাদশ দিবস। নিরাপত্তা বাহিনী আজ তাদের বিরুদ্ধে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে। বিদ্রোহীদের একটি বড় ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে এবং পাঁচটি থানা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের তৎপরতা বন্ধ হয়নি।

১৮ এপ্রিল—ওয়াকিবহাল মহলের খবরে জানা গিয়েছে যে, চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানকে একটি বার্তায় সুস্পষ্টভাবে এই আশ্বাস দিয়েছেন যে—চীন পাকিস্তানী সৈন্যকে সম্প্রসারিত করবার জন্য সব রকমের সাহায্য দেবে।

শ্রেষ্ঠ রচনা ॥ শ্রেষ্ঠ লেখক

শংকরের

অসামান্য উপন্যাস

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজন করল

চতুর্থ মুদ্রণ নিঃশেষিত প্রায়

॥ ছয় টাকা ॥

মিত্র-ঘোষ

বাংলা পকেট বই

বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ও ছাপা।

প্রতি খণ্ড — দুই টাকা

প্রথম দফার সাতখানি বইয়ের অসামান্য সাফল্যের কৃতিত্ব সহৃদয় পাঠকদেরই। তাঁদের এই সহযোগিতার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিভূতি রচনাবলী

৪র্থ ও ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাহকগণ সত্বর সংগ্রহ করুন — প্রথম তিন খণ্ড সামান্য কয়েক কপি অবশিষ্ট আছে। কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিহেতু পুনর্মুদ্রণে অবশ্যই মূল্যবৃদ্ধি পাবে। প্রতি খণ্ড ১৫.

আবদুল জব্বারের অনন্যসাধারণ গ্রন্থ

বাংলার চালচিত্র ১০,

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের বিচিত্র রচনা

জঙ্গলে জঙ্গলে ৫,

জীবন মজুমদারের উপন্যাস

পাখী ৫॥

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

এবার ফেরাও ৫,

জ্যোতির্বিন্দ্র চৌধুরী ও রবিজিৎ চৌধুরীর তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ

সুবর্ণসরির উপজাতি ৫,

প্রমথনাথ বিশী ও বীথিকা চক্রবর্তী

বঙ্কিম সাহিত্যে বিচার ১২॥

প্রমথনাথ বিশীর

বঙ্কিম সরণী ১০,

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ভাগবতীতনু ১০,

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

যমুনোত্তরী হ'তে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ ৫,

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

স্বয়ংবৃতা ৬,

বাসুদেব বসুর

নেফা—সুন্দরী নেফা ৪॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

মণিমহেশ ৬॥

বিমল করের **সীমারেখা ৪॥০**

মনোজ বসুর **বন কেটে বসত ১০,**

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

আমি কান পেতে রই ১৪,

শংকু মহারাজের

উত্তরস্যাং দিশি ১০, **গঙ্গাসাগর ৮,**

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

সেই মরুপ্রান্তে ১১,

ময়ূর মহল (যন্ত্রস্থ)

সাহানা দেবীর

মৃত্যুহীন প্রাণ ৪॥

সুমথনাথ ঘোষের **বাঁকাস্রোত ৬॥**

সৈয়দ মুজতবা আলীর **পছন্দসই ৭,**

কমলা মিশ্রের

কাশ্মীর থেকে কুমারীকা ৭,

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

পূর্বাচল ১১,

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কলকাতার উন্নয়ন—		১৩০৫
ব্যঙ্গচিত্র—		১৩০৬
রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য—		১৩০৭
দৃশ্যপট—	শ্রীনিরুপম গুপ্ত	১৩০৮
বৈদেশিকী—	দেবরাজ	১৩১০
নজরুলের গানের পাণ্ডুলিপি—		১৩১২
মানুষের সঙ্গে আর (কবিতা)—	শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৩১৪
ন্যায়দণ্ড (কবিতা)—	শ্রীদেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩১৪
রুনু চলে গেছে (কবিতা)—	শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩১৪
নরেনদা—	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১৩১৫
অতিথি—	শ্রীঅসিত গুপ্ত	১৩১৯

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	১৩২৭
রঙ্গ ও শ্রীমতী—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	১৩২৯
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীসুব্রত গুপ্ত	১৩৩৪
এই তার পুরস্কার—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	১৩৩৬
বিশ্ববিজ্ঞান—শ্রীসমরজিৎ কর	১৩৪১
ডায়েরির ছেঁড়া পাতা—ফাদার দ্যতিয়েন	১৩৪৭
চিত্র প্রদর্শনী—চিত্রপ্রিয়	১৩৪৯
পরীক্ষার হলে নৈরাজ্য ও তৎসংলগ্ন কথা—শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়	১৩৫৩
মুক্তির সংগ্রামে বাংলা দেশ—কলাধন	১৩৫৯
ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	১৩৬৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আলোচনা- - ১৩৭১
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক - ১৩৭৮
বিদেশী বই— - ১৩৭৯
পুস্তক পরিচয়— - ১৩৮১
খেলার মাঠে—একলব্য - ১৩৮৩
হকি খেলার আইনকানুন—মুকুল - ১৩৮৫
রঙ্গজগৎ— - ১৩৮৭
অরণ্যদেব— - ১৩৯৩
সাপ্তাহিক সংবাদ— - ১৩৯৪
বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র— - ১৩৯৫

প্রচ্ছদ : শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি"

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে গীতার এই শ্লোকটি ধ্বনিত হল শুধু একটি কথা বোঝাতেই যে, ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খানের ট্যাংক বা সেবর জেট বিপ্লবের ঢেউকে ক্ষণিকের জন্যে প্রতিরোধ হয়তো করতে পারে, কিন্তু মুক্তি ফৌজের হৃদয়ে মন্দ্রিত বিপ্লবের প্লাবনের সেই অগ্নিবীজকে রুদ্ধ করার ক্ষমতা ওদের নেই। এই প্লাবনের কর্ণধার শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর 'মুক্তি ফৌজের' সম্মানে :

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে বিপ্লবের মূলে উৎসের সব ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এবং সেই প্লাবিত ভূমিতে বিদ্রোহের সম্যক বিশ্লেষণ, যে বিদ্রোহ আগামী দিনের যে কোনো স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে বাধ্য। অত্যন্ত দুর্লভ সূত্রে প্রাপ্ত অজস্র ঘটনার কথা এই বিশেষ সংখ্যার সম্পদ। রণক্ষেত্র ও সীমান্ত থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় পাওয়া বিবরণ এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিদেশী আলোকচিত্রীর তোলা কৌশলতাপূর্ণ রঙিন ছবি * শেখ মুজিবের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের বিশেষ রচনা। পূর্ববঙ্গের লেখক লেখিকাদের গল্প, স্মৃতিচারণ, কবিতাবলী এবং শিল্পসৃষ্টি।

ওপার বাংলায় যখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মম অত্যাচার করছিল, তখন এক দুঃসাহসী তরুণ সাংবাদিক তাঁর আপন পত্রিকা-প্রতিনিধিকে গোপনে ওপারে পাঠিয়ে দিলেন এবং উনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ করলেন কিভাবে শেখ মুজিব এবং ওখানকার যুব সম্প্রদায় এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধতা করছেন। এই সাংবাদিকের নাম **পান্নালাল দাশগুপ্ত**। ইনি এই বিপ্লবের বিস্তৃত পটভূমিকার কথা লিখছেন ধর্মযুগে।

* ১৯৪৮ সাল, ঢাকায় জিন্নার জনসভায় মুক্তকণ্ঠে উর্দুর পরিবর্তে বাংলা ভাষার দাবী জানানোর জন্য মুজিব ও তাঁর কয়েকজন সহচর গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের ওপর পুলিশ জঘন্য নির্যাতন করে। সহচরদের মধ্যে ছিলেন পুলিন দে, যিনি পরে পূর্ব-বাংলা এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচিত হন। **পুলিন দে** আমাদের জন্য লিখছেন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং জীবনী।
* লন্ডনে শেখ মুজিবের সঙ্গে ভারতীয় সমাজবাদী এক যুব-নেতার সহসা সাক্ষাৎ। ফলে, উভয়ের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে, পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাব নিয়ে, উর্দু ও বাংলা, এশিয়ার দারিদ্র্য ও সমাজবাদ তথা আরো বহু বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রথম প্রকাশ করছেন **জর্জ ফার্নাণ্ডিস্**।
* স্বয়ং সীমান্ত ঘুরে এসে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তথ্য ধর্মযুগের জন্যে লিখছেন নবীন তেজস্বী লেখক **হামিদ দলওয়াই**।
    * এই রাজনৈতিক বিদ্রোহের মূলে যে সাংস্কৃতিক চেতনা পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে এসে নতুন সংস্কৃতির পথ খুঁজেছে তারই বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ওপার বাংলার—বদরুদ্দিন উমর ও রেয়াজুল হক মাণিক, এপার বাংলার—মিহির আচার্য ও মৈত্রেয়ী দেবী।
    * পূর্ব বাংলার লেখক তথা ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শৌকত আলী লিখছেন আশ্চর্য গল্প 'তৃতীয় রাত্রি'।
    * "চৈত্রকে হয়ে অগ্নিবর্ষী দিন"—ওপার বাংলার নবজন্ম মহিলা কবির বাছাই করা নতুন কবিতাবলী : **কল্পনা মুহুরির, খালিদা আদিব চৌধুরী, জাহানারা আরজু, নীলোফর পান্না, আবু ওবেদা, শামসুন্নাহার বেগম, জুবেদা খাতুন রাণী, নুরুন্নেসা চৌধুরী, লতিফা হিলালী।**
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের সেই ভাষা বিপ্লবের ডাক কিভাবে আজকের এই বিদ্রোহের শঙ্খনাদ হয়ে উঠল—তাই নিয়ে লিখছেন **গণেশ মন্ত্রী**।
* পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ বানিয়ে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান অমানুষিক শোষণ করেছে, তারই সমীক্ষা করছেন ইকনমিক্ টাইমসের এম এল কামাথ।
* নির্বাচনের আগে ভয়ংকর বন্যায় পূর্ব বাংলার অফুরন্ত ক্ষয়ক্ষতি ও ইয়াহিয়া খানের উপেক্ষার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছেন **রামমূর্তি**।
* ভারতবর্ষের সবচেয়ে লোকচিত্তহর প্রথম শ্রেণীর সংগীত-পরিচালক শচীন দেববর্মণ ওপার বাংলার মানুষ, জানেন তো! ওঁর গানে ওই মাটির সুর বাজে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার **নবেন্দু ঘোষও ওই বাংলার।** 'ফিল্ম সংসার'-এ এদের ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি-রোমন্থন।

আরো আরামভরা, আরো শৌখিন, বাটার সানওয়ে স্যান্ডাল যথাযথ স্নিগ্ধ, বিলাসী ও হালকা। যেখানে-খুশি যখন-খুশি পায়ে দিন —দেখবেন কখনো আর পা থেকে খুলতে ইচ্ছে করছে না। এতই ভালো। স্যান্ডাল পরার এ এক নতুন শৌখিন সুখ—স্বাচ্ছন্দ্যের এক নতুন আবেশ। আজই পায়ে গলিয়ে নিন বাটার সর্বাধুনিক স্যান্ডাল ; তার নকশায় সুরুচি, নকশায় আরাম।
বাটা সানওয়ে
সানওয়ে ১০
সানওয়ে ১৭
১৯·৯৫
সানওয়ে ৩৩
১৯·৯৫
চলুন... হাওয়ায়-হাওয়ায়
Bata

কলকাতার উন্নয়ন

কলকাতা অনেকদিন থেকেই দুঃস্বপ্নের শহর হয়ে রয়েছে। তার দারিদ্র্য, অভাব ভার বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা, খুনোখুনি—আরও কত কী এই শহরকে নিত্য কলংকে প্রায় মসীবর্ণ করে তুলেছে। একটা সময় ছিল যখন মানুষ কলকাতায় ছুটে আসত কল্লোলিনী কলকাতাকে দেখতে নিজেরা আগ্রহে। আজ এই শহর সকলের কাছে বিভীষিকা, বাইরে থেকে কেউ আসতে সাহস করে না বড়। ভারতের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কলকাতা যে কত ভয়াবহ এবং নিকৃষ্ট তা প্রমাণ করার জন্যে দুর্মুখের অভাব নেই, বোম্বাই, দিল্লির অনেক কাগজে তা মাঝে মাঝে ফলাও করে প্রচারও করা হয়। আমরা যারা কলকাতাবাসী তাদের কাছে এত নিন্দা গায়ে লাগে। সেটা স্বাভাবিক। অথচ এটাও অস্বীকার করা যায় না, বাইরে যা রটে তার সবটাই মিথ্যে নয়। অনেকদিন থেকে আমরাও তাই হাঁক দিতে শুরু করেছি : কলকাতা বাঁচাও।

মৃতপ্রায় কলকাতাকে যে অবশেষে বাঁচাবার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা এখনও আমরা তেমন করে জানতে পারিনি। এই ডামাডোলের দিনে দৃষ্টি এবং মন দুইই এমন জায়গায় পড়ে আছে যে এই কলকাতায় যেসব কাজ নতুন করে শুরু হয়ে গেছে তার দিকে নজর পড়ে না। বোধ হয় এবার নজর পড়া দরকার তাতে খানিকটা আশ্বাস জাগবে। এমন কি কলকাতার যে উন্নতি হতে যাচ্ছে তার বিষয়ে সাধারণের কিছু বক্তব্যও থাকতে পারে।

কলকাতার যা বিরাট ও জটিল সমস্যা তার মধ্যে রয়েছে : জল নিকাশ, রাস্তাঘাটের উন্নতি, বস্তি উন্নয়ন, পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি, যানবাহনের সুব্যবস্থা ইত্যাদি। এর মধ্যে অনেকগুলি কাজই কলকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন সংস্থা হাতে নিয়েছেন এবং কাজও চলছে। যেমন জল নিকাশের একাধিক কাজ একই সঙ্গে করা হচ্ছে, এমন কি কলকাতা শহরের কোনো কোনো এলাকায় যেখানে বর্ষার জল কোমর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে—সেখানেও জল নিকাশের কাজে হাত পড়েছে। রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধনের কাজও আমাদের নজরে পড়তে শুরু করেছে। পানীয় জলের সরবরাহ বৃদ্ধি এ-বছরের জুন-জুলাই মাসের মধ্যে খানিকটা হয়ে যাবার কথা, সে-কাজেও হাত পড়েছে। বস্তি উন্নয়নের জন্যে টাকা খরচের চিন্তা এখন অনেকটা কমে এসেছে, বিভিন্ন বস্তির উন্নয়ন কাজও শুরু হওয়ার মুখে। কলকাতায় যানবাহনের কতটা উন্নতি ঘটেছে তা অবশ্য বলা যায় না, তবে ট্রাম কোম্পানী এতকাল পরে একাধিক জায়গার লাইন মেরামতের কাজে হাত দিয়েছেন। দীর্ঘকাল অবহেলায় ফেলে রাখার জন্যে লাইনের ক্ষতি এত বেশী হয়েছে যে নিত্য ট্রাম দুর্ঘটনা ঘটছে। অনতিবিলম্বে এর সম্পূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। সরকারী বাস দু পাঁচখানা হয়ত নতুন করে রাস্তায় নেমেছে কিন্তু তা নজরে পড়ার মতন নয়।

আমাদের এই মুহূর্তে আর-একটি বড় চিন্তা কলকাতায় চক্র-রেলের কাজকর্মের কী হল? কিংবা পাতাল রেলের? এই বিশেষ ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা, সমীক্ষা, সুপারিশের অন্ত নেই। এক একসময় এক একজন আসেন আর নতুন করে কোনো সুপারিশ করে যান। যেমন গত বছরে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী শ্রীনন্দ পাতাল-রেল আরম্ভের কথা বলেছিলেন। রুশ-বিশেষজ্ঞরা সমীক্ষাও করেছিলেন। কিন্তু হালে দেখা যাচ্ছে, যোজনা কমিশন অন্য কথা ভাবছেন। তাঁরা রেল-বোর্ডকে বলেছেন দ্রুতগামী পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করতে। অর্থাৎ যে পরিবহণ ব্যবস্থাই করা হোক তাতে অর্থনৈতিক লাভ হবে, কি হবে না? যতদূর মনে পড়ছে, পুরোনো কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিস্তৃতভাবে একটি রিপোর্ট দাখিল করে দেখিয়েছিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও রেলপথ ব্যবহারের হিসেবে চক্রবেড় রেলে লাভের সংখ্যা ভালই হবে। আমাদের মনে হয়, যতটা সহজে ও দ্রুত চক্ররেলের কাজ সম্ভব—অন্য কোনো রেলপথ স্থাপনে তা সম্ভব নয়। এখানকার বেকার সমস্যার কথা মনে রেখে দ্রুত এই রকম একটি কাজে হাত দেওয়া উচিত।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৮ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৬
শনিবার ১৭ বৈশাখ ১৩৭৮

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার

সংযুক্ত সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

*

টেলিফোন
২৩-২২৮৩ ২৩-৮৫৬১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	...	৩২·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	১৬·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	৮·০০ টাকা

ভারতে ও পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	...	৩৬·০০ টাকা
ষান্মাসিক ,,	...	১৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক ,,	...	৯·৫০ পয়সা

ভারতের বাহিরে
(জাহাজ ডাকে)

বার্ষিক	...	৫৮·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২৮·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১৪·৫০ পয়সা

আসাম অঞ্চলে
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৯৪·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	২২·৫০ পয়সা
ত্রৈমাসিক	...	১১·৫০ পয়সা

ভারতের অন্যত্র
(বিমান ডাকে)

বার্ষিক	...	৮৩·০০ টাকা
ষান্মাসিক	...	৪২·০০ টাকা
ত্রৈমাসিক	...	২১·৫০ পয়সা

*

দাম ৬০ পয়সা
উত্তরবঙ্গ ও আসামে
অতিরিক্ত বিমান মাসুল ৭ পয়সা

*

DESH

Saturday, 1 May, 1971

ঝাণ্ডা উঁচা রহে
হামারা.....
নজরুল ইসলাম
তাজুদ্দিন আহমদ

২৫ মারচ গভীর রাত্রে খ্যাপা কুকুরের মত রক্তলিপ্সু সৈন্য বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থ এবং সামরিকতন্ত্র গণতান্ত্রিক চেতনায় নবদীক্ষিত এবং উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজ ২৪ এপরিলের ঘোলাটে মধ্যাহ্নে বসে ঠান্ডা মাথায় জমা খরচ নিতে গিয়ে দেখছি, বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে ব্যাপ্ত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আশা এখনও গুঁড়িয়ে যায়নি।

অত্যাচারের অকল্পনীয় মাত্রা ছাড়িয়েও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অতর্কিত ভাবে হত্যা করে, রোকেয়া হলের ছাত্রীদের ধর্ষণ করে, খুন করে, মসজিদ মকতব ঘরবাড়ি গ্রাম শহর জ্বালিয়ে খাক করে বা বোমার ঘায়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে এবং পাইকারী হারে লাখ লাখ নারী শিশু, বৃদ্ধ যুবা, কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক (এমন কি পুলিস ও বাঙ্গালী সৈনিকদেরও) হত্যা করে ইয়াহিয়া খাঁ দেখছেন ৫৫ হাজার বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের মাত্র সূচাগ্র পরিমাণ ভূমি, মাত্র গোটা কয়েক ক্যান্টনমেন্ট, কিছু শহর এবং তারই সন্নিহিত কিছুটা জমি দখলে রাখতেই তাঁর দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

এ যুদ্ধ চালাতে পাকিস্তানের দৈনিক খরচ এক কোটি টাকারও বেশী লাগছে। সমস্ত রকম রফতানি বন্ধ হবার ফলে বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে দ্রুত কমে যাচ্ছে। আর্থিক সংকট এমন চরমে এসে পড়েছে যে পাকিস্তান তার সাহায্যকারী ও অন্যান্য উত্তমর্ণ দেশগুলোর কাছ থেকে যে বিপুল অর্থ ধার নিয়েছিল তার সুদ ও আসলের কিস্তি পরিশোধ স্থগিত রাখতে ওই সব দেশের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সূত্রে পাওয়া খবর বলছে, জুন মাসের মধ্যেই পাকিস্তানকে অন্ততঃ ৮৫ কোটি টাকা ঋণ শোধ করতে হবে।

শ্রীহিরণ্ময় কারলেকর স্টেটসম্যান পত্রিকায় (২৪ এপরিল, পৃঃ ৬) পাকিস্তানের সামরিক শক্তির এক হিসেব দিয়েছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সামরিক ক্ষমতার জোরে বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখা কত অসম্ভব। তাঁর হিসাবে মারচ মাসের আগে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের পুরো সামরিক শক্তি ছিল এই: সৈন্য পাঁচ ব্রিগেড এবং দুটো সাঁজোয়া রেজিমেন্ট। এবং এ ছাড়া ছিল ১৭ হাজার ই পি আর এবং আধা সামরিক আনসার ও মুজাহিদ ২০ হাজার। এ ছাড়া ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনার ছলে টালবাহানা করতে করতে ১৮ মারচের মধ্যে আরও ১০ হাজার সৈন্য আমদানি করেন।

বর্তমানে ই পি আর আনসার আর মুজাহিদ বাহিনী পুরোপুরি বাংলাদেশের পক্ষে লড়ছে। সিংহলের পথে নতুন সৈন্য
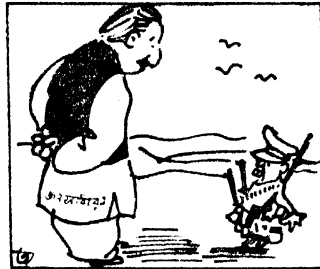
আমদানি করার পর পাকিস্তান ইন্টার-ন্যাশনালের বোয়িং যোগেই অন্ততঃ সামরিক পোশাকে সৈন্য আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি দাঁড়িয়েছে এই: সৈন্য চার ডিভিশন, তিন রেজিমেন্ট ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি, দুই ব্যাটেলিয়ন রেকি স্কাউট এবং দুই স্কোয়াড্রন বিমান। সব মিলিয়ে পঁচাশি থেকে নব্বই হাজারের বেশী হবে না।

পূর্ব বাংলার প্রশাসনযন্ত্র যদি ইয়াহিয়ার দখলে থাকত তবে এই সামরিক শক্তি দিয়ে তিনি বাংলাদেশের সাত কোটি লোকের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে হয়ত বা দিতেও পারতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিব এই ক্ষেত্রে ইয়াহিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে দুনিয়াকে সামগ্রিক অসহযোগ আন্দোলনের এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। বেসামরিক প্রশাসন-যন্ত্র বাংলাদেশে সম্পূর্ণ অচল। একেবারে অচল।

ইয়াহিয়ার সুসজ্জিত বাহিনী হয়তো মাত্রা ঢেকে নিক, শহরগুলো দখল করুক, এবং বিশ্বের যাবতীয় মারণাস্ত্র এনে ক্যান্টন-মেন্টগুলোকে সুরক্ষিত করুক, প্রশাসন চালু করতে না পারা পর্যন্ত ইয়াহিয়ার কোনও বিজয়ই স্থায়ী হবে না। বাংলাদেশের অসহযোগী মানুষের শক্তি নিঃসন্দেহে এইখানে।

এখন দেখা যাক, ৫৫ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত সাত কোটি অসহযোগী মানুষ অধ্যুষিত দেশে সামরিক প্রশাসনও যদি প্রতিষ্ঠা করা হয় তা হলে সেটা কতদূর কার্য-কর হবে। বা তা জনসাধারণের উপর আদৌ কোনও প্রভাব ফেলতে পারে কি না। ইয়াহিয়া যদি তাঁর সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বাংলাদেশে মোতায়েন করেন অর্থাৎ বর্তমানের ৯০ হাজার সৈন্য বাড়িয়ে যদি দু লক্ষ বিশ হাজারে পরিণত করেন, যা তাঁর সাধ্যের বাইরে, তবে প্রতি বর্গমাইল এলাকা প্রশাসনিক বশে রাখার জন্য চারজন সৈন্য রাখতে হয়। পূর্ব বাংলায় এত সৈন্য পাঠান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য এর সঙ্গে কিছু দালাল বা ভাড়াটে বা নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পিত লোক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে শত্রুভাবাপন্ন দেশে এই সামান্য শক্তি নিয়ে কারও পক্ষে প্রশাসনিক কাজ চালান অসম্ভব।

বাংলাদেশ সরকার যদি এই প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যৎ রণনীতি নির্ধারণ করেন এবং তাঁদের শক্তির এই অফুরন্ত উৎস সম্পর্কে সচেতন হন, তবে আমার ধারণা তাঁরা অবিলম্বে অস্ত্রসাহায্য না পাবার দোহাই অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বস্তুত দুটো ফ্রন্টেই তাঁদের যুগপৎ কাজ করে যেতে হবে। (এক) প্রশাসনিক ফ্রন্টে অসহযোগ বজায় রেখে যাওয়া, এবং (দুই) সামরিক শক্তি এবং গেরিলা শক্তি সংহত করে সর্বদাই ইয়াহিয়ার বাহিনীকে ব্যতি-ব্যস্ত রেখে তাঁদের শ্রান্ত ক্লান্ত এবং হতাশ করে তোলা। যুদ্ধকে গড়িয়ে নিতে হবে।

পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে তাতে তার যুদ্ধ-প্রকোষ্ঠায় ফাটল ধরতে বাধ্য। এবং অতি ধীরে, অতি বিলম্বে হলেও, বিশ্বের জনমত জাগছে এবং তা ইয়াহিয়ার পক্ষে যাচ্ছে না। এক-তরফা অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং গণহত্যার বিভীষিকার প্রমাণ ধীরে ধীরে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সৈনিকদের এ যুদ্ধকে টেনে নিয়ে যেতেই হবে এবং তার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদেরই। হাজার হাজার জীবন আহুতি দিয়েও সে দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন। বিবেকবান এবং স্বাধীনতা-কামী প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের উচিত ন্যায়পরায়ণ যোদ্ধার মত তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করা।

বাংলা দেশের লড়াইয়ে বড় রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা

পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলা দেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আর একবার পৃথিবীর প্রায় সব বড় রাষ্ট্রের মুখোস খুলে গেল। বড় রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিতে, শক্তিশালী দেশগুলির কাছে মানবতা যে আসল প্রশ্ন নয়, সেটা আর একবার খুব নগ্নভাবে ধরা পড়ল।

প্রথমেই আসা যাক পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ প্রথমে আলোচনার একটি বিশেষ কারণও আছে। সেই কারণটি হল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছুদিন থেকেই অত্যন্ত গোপনে পূর্ব-বাংলার ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঠিক কী উদ্দেশ্যে বলা কঠিন, তবে এটা এখন মোটামুটি নিশ্চিত ভাবেই জানা যাচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্তত তিন চার বছর ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এসেছেন এবং এই সময়ে তাঁরা নানাভাবে দলের নেতাদের আশ্বস্ত করেছেন। তাঁরা আওয়ামী লীগের নেতাদের ঠিক কী ভাষায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জানি না; কিন্তু এটা জানা গিয়েছে যে চরম মুহূর্তে তাঁদের কাছ থেকে সবচেয়ে সক্রিয় সাহায্য পাবেন বলে আওয়ামী লীগ নেতারা ভরসা করেছিলেন।

মুক্তি যুদ্ধের গোড়ায় পূর্ব বাংলার ভেতরে এবং বাইরে আমি ছোট বড় বহু আওয়ামী লীগ নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : আচ্ছা, আপনারা কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন বলে আশা করছেন? তাঁরা সবাই যে রাষ্ট্রটির

নাম সর্বাগ্রে বলেছিলেন সেই রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমি তারপর জানতে চেয়েছিলাম : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো প্রকাশ্যে এমন কোনও কথা এখনও পর্যন্ত বলেন নি যা থেকে মনে হতে পারে যে

ওঁরা বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করবে। তাহলে আপনারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অমন ভরসা করছেন কেন? ওঁরা সবাই জবাব দিয়েছিলেন : মার্কিন প্রতিনিধিরা আমাদের দলের নেতাদের বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং নেতারা সেইসব প্রতিশ্রুতির কথা আমাদের জানিয়েছিলেন।

সেই থেকেই আমরা অনুমান করছি যে এখন যখন চরম মুহূর্ত এসে গিয়েছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে।

মার্কিন প্রতিনিধিরা আওয়ামী লীগের নেতাদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জানি না, সম্ভবত একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া আর কারু পক্ষে তা বিশদভাবে জানাও সম্ভব নয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে তাঁরা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং এও এখন পরিষ্কার যে চরম মুহূর্তে তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। এখন দেখেছি বহু আওয়ামী লীগ নেতার মনোভাব : আমেরিকা আমাদের গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছে।

এই পূর্বপ্রতিশ্রুতির বিতর্কমূলক প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিলেও পূর্ব বাংলার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকার কোনও প্রশংসনীয় ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মার্কিন নেতারা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে এমন কোনও কথা বলেন নি যা থেকে মনে হতে পারে, তাঁরা ইয়াহিয়া খাঁর বর্বরতার নিন্দা করছেন। পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব বাংলায় হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষকে খুন করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং তার সচিত্র সংবাদ গোটা মার্কিন মুল্লুক দেখেছে, কিন্তু তবু মার্কিন নেতারা চুপ। একমাত্র ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং বলেছিলেন : পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে তাকে ঠিক কোনও রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা চলে না। সেই বক্তব্যও মার্কিন কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, কিটিং ঠিক একথা বলেন নি। খবরের কাগজে ভুল রিপোর্ট করেছে।

[illegible] না এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন বলেও শোনা যায় নি। বরং, যে সব খবর শোনা যাচ্ছে তা থেকে মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র গোপনে ইয়াহিয়া সরকারকেই সক্রিয় সমর্থন জানাচ্ছেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখন বিমানে পূর্ববাংলায় সৈন্য আসছে থাইল্যাণ্ডের উপর দিয়ে। ব্যাংককে সেইসব বিমান তেলও নিচ্ছে। এটা কী মার্কিন সম্মতি ছাড়া সম্ভব?

শুধু একটা ছোট্ট জিনিসেও ধরা পড়ছে মার্কিন মনোভাব। চট্টগ্রাম এবং চালনা থেকে যেসব জাহাজ আসছে কলকাতায় তাঁদের সকলেরই খালাসীদের উপর ক্যাপটেনরা নির্দেশ দিচ্ছেন, পূর্ব বাংলার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বাইরে একটি কথাও বলবে না। এর মধ্যে মার্কিন ক্যাপটেনরাও আছেন। কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম থেকে কিছু বিদেশীকে নিয়ে একটি জাহাজ আসে কলকাতায়। কলকাতা বন্দরে দেশী বিদেশী

বহু সাংবাদিক তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বলাতে গেলে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেই প্রথম চট্টগ্রাম থেকে মানুষের আগমন। সাংবাদিকরা তাঁদের কাছে বহু খবর আশা করেছিলেন। কিন্তু প্রায় ডায়মণ্ড হারবার থেকেই জাহাজে ওঠে বসলেন মারকিন ও বৃটিশ দূতাবাসের প্রতিনিধিরা। তাঁরা আগে থেকেই নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক করে দিলেন : তেমন কিছু বল না সাংবাদিকদের। সেটা উচিত হবে না।

ইয়াহিয়া খাঁর বর্বরতা চাপা দেওয়ার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ রাষ্ট্রদূতদের এত উৎসাহ কেন?

অনেকে বলেন, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মারকিন প্রভাবাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি তো পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সেটা কি ইয়াহিয়ার বিরোধিতা নয়? আমার মতে, না! কারণ, যা ও'রা বন্ধ করেছেন সেটা ঋণের টাকা। ঋণের টাকা বন্ধ করা ছাড়া উপায়ই নেই। পৃথিবীর সবাই এখন এটুকু বুঝেছেন যে ইয়াহিয়া সরকারকে এখন কর্জ দিলে তা ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই, নিজ নিজ স্বার্থেই বহু রাষ্ট্র আপাতত ইয়াহিয়া সরকারকে কর্জ দেওয়া বন্ধ রেখেছেন।

ঠিক এই রকমই ভূমিকা বৃটেনেরও। বৃটেনও প্রকাশ্যে ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে কিছুই বলছে না। বরং, গোপনে তাঁকে সাহায্য করছে। পূর্ব বাংলায় সৈন্য পাঠাবার প্রয়োজনে বৃটিশ অধিকারভুক্ত দ্বীপ ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন বলতে পারেন, এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তাই আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। ধরেই নিলাম, এটা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু ও'রা কি কোনও দিন কারু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলান না? ও'রা কি শুধু নিজ নিজ দেশ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন? ইতিহাস কী বলে?

✻

পূর্ব বাংলার ব্যাপারে চীনের ভূমিকা আরও বিচিত্র। চীন পূর্ব বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের তো সমর্থন করছেই না, উল্টে ইয়াহিয়া খাঁকে মদত দিচ্ছে।

চীনের না হয় আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর সম্পর্কে নানা সন্দেহ আছে। সেই কারণে যদি চীন নেতারা বলেন, আমরা ও'দের সমর্থন করব না, তাও না হয় বোঝা যায়। কিন্তু ভাবলে তাঁরা পৃথিবীর জঘন্যতম জল্লাদ ইয়াহিয়া খাঁকে সমর্থন করছেন কী করে? যে ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব বাংলায় হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে খুন করছে সেই ইয়াহিয়া খাঁকে কোনও কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত রাষ্ট্র সমর্থন করে কোন্ মুখে? এই চীনা নেতৃত্বই এই সেদিনও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিদ্রোহী-দের প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

চেকরা যা করেছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষও তাই করছেন। তাঁরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে লড়ছেন। চেক মুক্তি সংগ্রামকে যে ভাবে রাশিয়া দমন করেছিলেন তার চেয়েও শত সহস্র গুণে নিষ্ঠুর ভাবে ইয়াহিয়া গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার গণবিদ্রোহকে দমন করতে চাইছেন। যে চীন চেকোশ্লো-ভাকিয়ার ব্যাপারে রাশিয়াকে নিন্দা করেছে সেই চীন আজ হঠাৎ এত ইয়াহিয়া-প্রেমী কেন? মারকসবাদের কোন্ সূত্র অনুসারে তাঁরা ইয়াহিয়া খাঁর সমর্থক?

রাশিয়া যে এই লড়াইয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের সমর্থক সেটা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণাতেই বোঝা গিয়েছে। তিনি প্রকাশ্যে দুটি রাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন—একটি রাশিয়া, আর একটি ভারত।

✻

এ লড়াইয়ের জঘন্য ভূমিকা আফ্রো-এশিয়ার নতুন স্বাধীনতালব্ধ রাষ্ট্রগুলিরও। তাঁরা পৃথিবীর সব এলাকার মুক্তি যুদ্ধকে সমর্থন জানান, কিন্তু পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে চুপ।

পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানের সমর্থক বা পাকিস্তান সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিরূপ কোনও কথা বলতে অনিচ্ছুক প্রধানত তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে; আর এই আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রগুলি ইয়াহিয়ার পক্ষে প্রধানত ধর্মীয় বাঁকিতে। তাঁরা মনে করছেন, পূর্ব বাংলা স্বাধীন হলে "ঐশ্লামিক রাষ্ট্র" পাকিস্তান টিঁকবে না। তাই তাঁরা ইয়াহিয়ার পক্ষে।

এরাই মুখে স্বাধীনতার কথা বলেন! এরাই আবার ধর্মীয় অজুহাতে জল্লাদকে সমর্থন করেন! কত বড় সব স্বাধীনতা যোদ্ধা!

২৬-৪-৭১।

নবারুণ গুপ্ত

দেবরাজ

নতুন রাষ্ট্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর আন্তর্জাতিক আইনে বলে রাষ্ট্রের লক্ষণ চারটে। তাদের পয়লা নম্বর হচ্ছে জনসংখ্যা, দু নম্বর একটা নির্দিষ্ট এলাকা, তিন নম্বর প্রশাসন যন্ত্র আর চার নম্বর, সার্বভৌম ক্ষমতা যা স্বাধীনতারই আর এক নাম। রাষ্ট্র মানুষের সংগঠন, বনের জানোয়ারদের নিয়ে বনে-জংগলে রাষ্ট্র গড়া যায় না যদিও বনেজংগলে বুনো মানুষদের নিয়ে রাষ্ট্র গড়া চলে। তবে রাষ্ট্র গড়তে গেলে কম পক্ষে কত লোক দরকার তার কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পাকাপাকি এলাকাও একটা রাষ্ট্রের চাই, কেবল ভবঘুরেদের নিয়ে কোনও রাষ্ট্রের পত্তন হয় না। কিন্তু কতটা অঞ্চল দখলে না থাকলে রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্যতা মিলবে না তারও কোনও কানুন নেই। একটা এলাকার লোকদের সুখসুবিধের ব্যবস্থা করার জন্যে সরকারের দরকার আর সে সরকারের হাতে থাকা চাই পূর্ণ ক্ষমতা। দেশ সার্বভৌম হলেই সেটা সম্ভব। নইলে রাষ্ট্রের মর্যাদা সে দেশ পাবে না। পরাধীন দেশকে কখনও রাষ্ট্র বলে মেনে নেওয়া যায় না। তাই যতদিন ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজদের তাঁবে ততদিন রাষ্ট্র বলে এ দেশ গণ্য হয়নি।

যে দেশ কখনও পরাধীন ছিল না কিংবা যে অনেককাল আগেই স্বাধীন হয়েছে তাদের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু যারা অনেককাল পরের দাসত্ব করে সদ্য স্বাধীন হয়েছে তারা যে সার্বভৌম তার প্রমাণ কী? যেখানে ব্যাপারটা আপসে ঘটে, শাসক মেনে নেয় শাসিতের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার, সেখানে কোনও ঝামেলা থাকে না। ইংরেজ-ফরাসী-ওলন্দাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তাদের অধীন দেশগুলোর স্বাধীনতার দাবি মেনে নিয়েছে ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক। ভারতবর্ষ কী পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া কিংবা মালয়েশিয়া, সেনেগাল কী ঘানা এরা যে স্বাধীন দেশ তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এদের স্বাধীন বলে স্বীকার করার সঙ্গে দুনিয়ার সব রাষ্ট্রই এদের সার্বভৌম দেশ বলে মেনে নিয়েছে। একের পর এক এরা দিব্যি ইউনাইটেড নেশনস্ অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়েছে। তাতে কেউ কোন আপত্তি তোলেনি। এরা যে রাষ্ট্র সে কথা তামাম দুনিয়া আজ মানে। পুরোনো বনেদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে এই সব নতুন গড়া রাষ্ট্রের কোনও তফাত আইনের চোখে নেই, কোনও দেশও ভেদাভেদ করে না।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মেনে নিলেও সব ক্ষেত্রেই সারা দুনিয়া কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর নতুন মর্যাদা মেনে নেয়নি। কোনও কোনও দেশ এ ব্যাপারে বাছবিচার করেছে। এমন অনেক দেশ এখন রয়েছে যাদের রাষ্ট্র বলে কেউ মানে, আবার কেউ মানে না। তাদের অবস্থা অনেকটা ত্রিশংকুর মতো। তারা রাষ্ট্রও বটে, আবার নাও বটে। পূর্ব জার্মানি, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম—এদের রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে অনেক দেশ এখনও রাজী নয়। পশ্চিম জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েত-নামকেও ও মর্যাদা দিতে কোনও কোনও দেশ নারাজ। ইস্রায়েলকেও রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে আরব দেশগুলোর ভীষণ আপত্তি। তাইওয়ানকেও আলাদা রাষ্ট্র বলে কেউ মানে, কেউ মানে না। লালচীনকে এখনও পর্যন্ত জাতে ওঠাতে বিস্তর দেশের অমত। এর ফলে এ সব দেশের অনেকেরই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঢোকার পথ বন্ধ। দু কোরিয়া, দু ভিয়েতনাম কী দু জার্মানির কেউই ইউনাইটেড নেশনসের মধ্যে নেই। বিশাল লাল চীন সে সভায় ঢুকতে পারেনি, পেয়েছে পুঁচকে তাইওয়ান স্বনামে নয়, চীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে। আরবরা বাধা দিয়েও সেখানে ইস্রায়েলের ঢোকা রুখতে পারেনি।

এই সব ছোটো-বড়, গোটা-কাটা দেশগুলো কী তা হলে রাষ্ট্র নয়? সবাই তাদের রাষ্ট্র বলে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র কী তাদের বলা চলবে না? রাষ্ট্রের বিচার তো বাইরের ছাপ দিয়ে হয় না, হয় তার নিজস্ব শক্তির বিচার করে। আইনে যখন বলছে যে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে সেই রাষ্ট্র তখন এদের যদি সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তা হলে এদের রাষ্ট্র বলা হবে না কোন যুক্তিতে? আসল সমস্যা হচ্ছে এদের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে কি না আর সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় ফয়সালা করবে কে? আজও পর্যন্ত কোনও আন্তর্জাতিক বিচারালয় নেই যেখানে এ মামলার বিচার হতে পারে কিংবা হলে তার রায় সকলে মানতে বাধ্য। সবই তাই নির্ভর করছে ঘটনাপ্রবাহের ওপর। আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামকে বলছে রুশিয়ার তাঁবেদার আর রুশীরা বলছে দক্ষিণ ভিয়েতনাম আমেরিকার তাঁবেদার। তাদের ভাবখানা হচ্ছে তাঁবেদার দেশের আবার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে কী করে? কিন্তু যদি স্পষ্ট দেখা যায় দু দেশই নিজের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে তখন তাদের রাষ্ট্র বলে মেনে না নিয়ে উপায় কী?

সীমান্তের ওপারে যে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে তার অবস্থাটা ঠিক কী? তার ভবিষ্যৎ কী নির্ভর করবে অন্যদের মর্জির ওপর? একটা দেশকে ভেঙে দুটুকরো করে দুটো আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করার বিস্তর নজির ইতিহাসে আছে। পরাধীন দেশকে ভেঙে দু টুকরো করা হয়েছে এই উপমহাদেশেই। তাতেই ভারতবর্ষ আর পাকিস্তানের দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম। স্বাধীন নেদারল্যাণ্ডকে দু ভাগ করে উদ্ভব হয়েছে বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ড এই দুটো আলাদা রাষ্ট্রের। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব বাংলার নতুন রাষ্ট্র গড়া কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। এর পেছনে কোনও বাইরের রাষ্ট্রের উস্কানি নেই। তেইশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলার ওপর যে অবিচার করেছে, যে অত্যাচার চালিয়েছে তারই পরিণাম হচ্ছে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সেখানকার বাঙালীদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়া। যারা এ ব্রত নিয়েছে তারা যে বাংলাদেশের বাসিন্দাদের একান্ত আপন জন তা প্রমাণ হয়েছে নির্বাচনে। সে নির্বাচনে যে কোনও কারসাজি ছিল না সে কথা ইয়াহিয়া খাঁ চেষ্টাতেও অস্বীকার করতে পারেন না।

বাংলাদেশের মনের মানুষ যাঁরা তাঁরা যে সংগঠন গড়েছেন তাকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে না নেওয়ার কোনও সংগত কারণ নেই। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর আনুগত্য তাঁরা পেয়েছেন, রাষ্ট্রের সত্যিকারের বনিয়াদ যে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস সে তো তাঁদের রয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামোটা এখনও একটু নড়বড়ে। কিন্তু যুদ্ধের সময় কোন দেশে সেটা শক্ত থাকে? মুক্তিফৌজদের সঙ্গে যারা লড়ছে সেই ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গীশাহী তো গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, ফৌজী ছাউনির বাইরে তার হুকুম তো কেউ মানছে না। অন্যদিকে মুক্ত অঞ্চলগুলোতে এখনও বাংলাদেশের সরকারের নির্দেশই মেনে নিচ্ছে লোকেরা। তাঁদের সরকারই আসল সরকার, ইসলামাবাদের প্রতিনিধিরা দখলদার ছাড়া আর কিছু নয়। বৈধ সরকার বলতে কিছু যদি বাংলাদেশে থাকে তার রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন। অন্য দেশ যদি সে সরকারকে স্বীকৃতি দেয় তা হলে সার্বভৌমত্বের দাবি তার কায়েম হবে। না দিলে তাকে কঠিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। তার সার্বভৌমত্ব নির্ভর করছে বিদেশের মর্জির ওপর নয়, দেশের লোকের সমর্থনের ওপর। সে সমর্থন নতুন রাষ্ট্র পেয়েছে। ভিত তার পোক্ত।

নজরুলের গানের পাণ্ডুলিপি

কাজী নজরুল ইসলামের উজ্জ্বল বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন নিম্নোক্ত রচনাটি। স্বর্গত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রীচরণারবিন্দে পুলক-পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ কাজী নজরুল যা নিবেদন করেছিলেন আজ সে গানটি বিশেষ বিখ্যাত। কবি যতীন্দ্রমোহনের নাতনী শ্রীমতী দীপালী চক্রবর্তীর হেফাজত থেকে রচনাটি সংগ্রহ করেছেন শ্রীপার্থ মুখোপাধ্যায়। আগামী ৯ মে কাজী নজরুলের জন্মদিবস স্মরণে রেখে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করা হল।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর
শ্রীচরণারবিন্দে
পুলক-পুষ্পাঞ্জলি।

এ জল ও-কাজল-চোখে পাষাণী আনলে বল কে
টলমল জল-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে ॥
দিল কি পুব-হাওয়াতে দোল, বুকে কি বিঁধিল কেয়া
কাঁদিয়া কাটালে গগন এলায়ে ঝামর-অলকে ॥
চলিতে পৌঁছি কি হায় রে বাজিল বৈঁচি-কাঁটাতে.
হারাতে কাঁচুলির কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে ॥
যে-দিন মোর-দেওয়া-মালা ছিঁড়িলে আনমনে সখি.
জড়ালে বেল-কুসুমী-হার বেণীতে সেদিন ওলো কে ॥
যে-পথে নীর-ভরণে যাও বসে রই সেই পথ-পাশে.
দেখি, নিত, কার পানে চাহি কলসীর সলিল ছলকে ॥
এ সরসীর ঢেউ ওঠে কাঁখে না ছুঁই — নয়ন-নোলকে ॥
বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিটলো না কবি.
ফটিক-জল! জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে ॥

নজরুল ইসলাম

খেয়ে দেখুন কী সুন্দর কফির স্বাদ!

নতুন বেরিয়েছে! দামেও সুবিধে

রিকরি ইনস্ট্যান্ট

কফি আর চিকরির নিখুঁত ব্লেন্ড

খাওয়া মাত্র চনমনে চাঙ্গা, কফির মজাই তো সেইখানে। রিকরি খান। দেখবেন হুবহু সেই আমেজ। টিনের কৌটোয় থাকে বলে এতে কফির স্বাদগন্ধ পুরোমাত্রায় বজায় থাকে। আর একেবারে নিখুঁতভাবে ব্লেণ্ড করা যাতে আপনার মর্জিমতন কখনও হালকা কখনও কড়া করে বানিয়ে নিতে পারেন। রিকরির অপূর্ব স্বাদ আজই উপভোগ করুন। রিকরি যে এত ভালো তার কারণ এটি তৈরি করেছেন নেসকাফে প্রস্তুতকারীরা—ইনস্ট্যান্ট কফি তৈরিতে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি যাঁদের হাতযশ।

নেসক্যাফে যাদের তৈরী তাদেরই

OMNR-3-24145

নেস্‌লে-র তৈরী
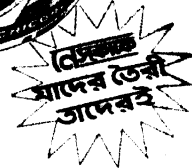
মানুষের সঙ্গে আর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে…
প্রধান অসুখ নিয়ে কলকাতায় ঘোরে লক্ষ লোক
আজ কিছুদিন হলো তারই মধ্যে বসন্ত এসেছে
প্রত্যক্ষ পলাশে, পাশে মুচকুন্দ চাঁপার নোলক—
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।
মানুষের সব গিয়ে এখন রয়েছে হিংসা বুকে
প্রেম-পরিণয় গিয়ে এখন সে রক্তের অসুখে
মোহ্যমান. প্রাণ নিতে পারে
নিশ্চিত কোথাও কোনো ভুল থেকে গেছে
ব্যবহারে।
মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়—
মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর ॥

এই ন্যায়দণ্ড

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নাও, একবার এই ন্যায়দণ্ড হাতে তুলে নিয়ে দেখ
নিজেকে রাজার মতো শক্তিশালী মনে হয় কিনা—
রাখো জোর: সময়বিশেষে সকলকে হ'তে হয় বিচারক
বিচারকের জন্যে নির্দিষ্ট সিংহাসন থাকবে
তেমন কি কোনো পূর্বশর্ত আছে?
ধুলোর আসনে বসে করো বিচার—।
ন্যায়দণ্ড তুলে নাও একবার, নিজেকে মনে করো রাজা
রাজার চেয়েও শক্তিশালী রাজা।
দেখ মাথা নত করে অপরাধীরা ক্ষমা ভিক্ষা করছে তোমার
তোমার করুণার জন্যে অপেক্ষা করছে এখন।
অপরাধীদের অনেকরকম চেহারার মধ্যে বিনয়ী একটি!
কিন্তু শাস্তি দেবার আগে তুমি অন্তত প্রশ্ন কর
এই বিনয় এতদিন কোথায় ছিল ওদের?

রুনু চলে গেছে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রুনু চলে গেছে: শরীরের মাপ তার
নির্বিকার
ঝুলে আছে ফেলে যাওয়া পুরানো জামায়।
কাল কাক ভোরে
যখন সূর্যের মুখে লেগেছে আগুন,
যখন এ কলকাতার প্রতিটি উদ্বাস্তু গাছে
শিকড়ের কাছে
জমে উঠছিল ছায়া,
রুনু রুনু রুনু
স্বদেশী শরীর নিয়ে এক ঘুম থেকে উঠে
আবার শুয়েছে একা ফুটপাতের শীতে।

বড় রাস্তার মানুষ তারপর ঢুকেছে গলিতে,
গলির আকাশ
চৌমাথার বাইরে এসে অকস্মাৎ ট্রাফিকের লালে
থমকে দাঁড়িয়ে, ম্লান দেয়ালে দেয়ালে
পড়ে গেছে তেরো নদী ওপারের ভাষা,
ভেবেছে, এবার শৃঙ্খলা তবে
কোন পথে দৈনন্দিন শ্মশানে দাঁড়াবে।

জানি বহু কথা কাজ স্পর্শ বাকি ছিল,
ছিল বাকি প্রধান নির্ণয়,
গ্রন্থকে বিশ্বাস করে ভুল পড়ে গেলে
যেভাবে কৈশোর প্রচলিত যৌবনে পৌঁছোয়,
আজ তারও চেয়ে বেশী পরিশেষ
শ্লেষ
প্রয়োজন ছিল যেন:
না হলে এখনো শব্দের ভগ্নাংশে কেন
কলার খোসার মতো শুয়ে আছে রুনু,
ওপরে প্রথম যে দেবে পা আছাড় খাবেই,
তারপর দূরে
ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে আহত পথিক!

তোমার জামার মাপ ভুল ছিল রুনু।

পুরস্কার পাওয়ার গৌরব পঁচিশ বছরের তরুণ সাহিত্যব্রতীকে কি রকম মাতিয়েছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

১৮৮৮র ৭ই জুলাই জন্ম। তাও বাংলা শুধু নয় তখনকার সমস্ত ভারতের রাজধানীর একেবারে মধ্যভাগে ধনে মানে বিদ্যায় আভিজাত্যে সংস্কৃতিতে বাঙ্গালী সমাজের স্বনামধন্য ঠনঠনিয়ার দেব পরিবারে।

শুধু সাহিত্য নয় বাংলাদেশের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাসের অন্য দুরন্ত দোলাও তাকে দুলিয়েছে, সুতরাং। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিতে যে প্রচণ্ড ফাটল ধরিয়েছে সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বয়স তাঁর বোল সতেরো। বনেদী ঘরে শান্ত সুবোধ ছেলে হয়ে এসব আলোড়নের পাশ কাটিয়ে থাকবার মানুষ তিনি ছিলেন না। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাগ নিতে তিনি দ্বিধা করেননি।

সাহিত্যের জগতে তাঁর অনুরাগীরা বাইরে থেকে তাঁর যে চেহারা আজ কয়েক দশক ধরে দেখে আসছেন তার সঙ্গে তাঁর প্রথম জীবনের এই ইতিহাস ঠিক যেন মেলানো যায় না।

নামেই নরেন্দ্র নয় চেহারায় সত্যিই সেই স্বাভাবিক সহজাত রাজকীয় আভিজাত্য। সৌম্য শান্ত চরিত্র-সৌষ্ঠবের এক গৌর-প্রতিম উত্তুঙ্গ অটলতা প্রথম দেখার সঙ্গেই আপনা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্ভ্রম জাগায়। এই চেহারার পেছনে শুধু যৌবনের সেই দেশ-প্রেমের উদ্বেলতা কেন, তাঁর যথার্থ সংস্কার-মুক্ত মনের আয়রণ উদার নির্ভীক জীবন নিষ্ঠার আভাস সহজে পাওয়া যায় কি?

না পাবার কারণ এই যে নরেন্দ্র দেব সেই বিরল মানুষদের একজন যাঁদের জীবন চর্চা আন্তরিক ও অকৃত্রিম। আত্ম-বিজ্ঞাপনের কোন তাগিদ তার পেছনে নেই।

বাইরে থেকে দেখলে যাঁর আলেখ্য ও জীবন শান্ত সমাহিত নিস্তরঙ্গ, তিনি তাঁর সময়কার স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি দুঃসাহসী সক্রিয় ব্যক্তিগত ভূমিকা নিয়েছেন। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের সাহিত্যিকেরা গল্পে উপন্যাসে যে নির্ভীক বলিষ্ঠতার কথা কল্পনা করেছেন নরেন দা সেই যুগে তার পরিচয় দিয়েছেন বাস্তব জীবনে।

নরেন দার কোনো প্রসঙ্গ তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী বাংলার সাহিত্যিক সমাজের অনন্যা বর্ষীয় স্বনামধন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কথা না বললে সার্থক ও সম্পূর্ণ হয় না। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর প্রেম ও বিবাহ বাংলা সাহিত্যের নেপথ্য

ইতিহাসের একটা উজ্জ্বল স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

আজ যা মধুর ও বর্ণাঢ্য একদিন তাতে কিন্তু সামাজিক সংকীর্ণতার ভ্রূকুটিতে তীব্র তিক্ত স্বাদই পাওয়া গিয়েছিল বেশ একটু। সমাজ তখন আজকের তুলনায় অনেক অনুদার, জনমতও এখনকার মত উপেক্ষণীয় নয়। সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার শাস্তিতে ভাবী জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তখন খুব বিরল ছিল না। এ সব জেনে শুনেও নরেন্দ্র দেব আর রাধারানী দেবী তাঁদের হৃদয়সত্য নির্ভয়ে অটল নিষ্ঠায় অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন নি। তাঁদের সেদিনকার সেই দৃঢ়তা ও দুঃসাহসে এমন একটি দাম্পত্য জীবন আমাদের সামনে গড়ে উঠেছে মহিমা ও মাধুর্যে যা কিংবদন্তী হয়ে থাকবার যোগ্য বলে মনে হয়। সাহিত্যের জগতে এমন সুখী ও সার্থক দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবতে এলিজাবেথ ব্যারেট আর রবার্ট ব্রাউনিং দম্পতি ছাড়া আর কারুর কথা আমারও স্মরণ হয় না।

নরেন্দ্র দেবের দাম্পত্য জীবনের এই উল্লেখটুকু তাঁর সাহিত্যজীবন ও চরিত্র বোঝবার জন্যেও প্রয়োজন। সরল নিরভিমান একান্ত সহৃদয় নির্বিচারে সকলের সঙ্গে মিশুক, অথচ নিজের যা উপলব্ধি সে জীবন-সত্যে নিষ্ঠা যাঁর বজ্রদৃঢ় সেই মানুষটির মধ্যে কোথাও সত্য বা মিথ্যা কোনো আস্ফালনের একটু বাষ্পও কোনো দিন ছিল না। সরব ঘোষণা ছাড়া যাদের কাছে আর কিছু যায় না তাদের কাছে তাঁর পরিচয় তাই একটু অস্পষ্টই থাকতে পারে। অভ্রভেদী প্রতিভা কি উদ্দাম উল্কা বেগের পরিচয় না দিয়েও কেমন করে এই মানুষ সাহিত্যের জগতে এমন একটি মুগ্ধ শ্রদ্ধার আসন অনায়াসে অধিকার করেছেন তা হেঁয়ালির মনে হতে পারে তাদের কাছে।

নরেনদার দীর্ঘ জীবনের অনেক অধ্যায় আজ সাধারণ সাহিত্যানুরাগীর কাছে অজ্ঞাত। প্রধানত কবি হিসেবেই তিনি পরিচিত এবং মৌলিক কবিতার চেয়ে ওমর খৈয়াম ও মেঘদূতের অনুবাদের ওপরই তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কবিতা লেখা ও অনুবাদ করা বাদে দীর্ঘ জীবনে সাহিত্যের কোন বিভাগই বলতে গেলে তিনি অবহেলা করেন নি। গল্প উপন্যাস নাটক ভ্রমণ কাহিনী সব কিছুই তিনি লিখেছেন সাবলীল হাতে, সেই সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারেও পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছেন বহুক্ষেত্রে। বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাট্য বিষয়ক সাপ্তাহিক 'নাচঘর' তাঁর সংযুক্ত সম্পাদনায় সমৃদ্ধ হয়েছে অনেক দিন, ছায়াছবির যুগ শুরু হবার পর প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'বায়স্কোপ'-এর পরিচালকমণ্ডলী তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। শিশু ও কিশোরদের পত্রিকা 'পাঠশালা' সম্পাদক হিসাবে সগৌরবে চালিয়েছেন পনেরো বছর ধরে।

অনলস দীর্ঘ জীবন, বহুমুখী সাধনা, ছোট বড় অসংখ্য কীর্তি। যা কিছুতে হাত দিয়েছেন তাতে তাঁর ঐকান্তিকতার ছাপ অন্ততঃ অস্পষ্ট থাকে নি। সার্থকভাবে যা করেছেন তার তালিকা রীতিমত দীর্ঘ। কিছু তার যে আজ বিস্মৃতিবিলীন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেমন 'মানবেন্দ্র শূর'। এই নামে যে সব বিদ্রূপাত্মক রচনা এককালে বহু পাঠককে আনন্দ আর কৌতুকের খোরাক দিয়েছে তার আসল লেখক যে নরেন্দ্র দেব এ কথা আজ আর ক'জন জানে।

বাংলা দেশ একেবারে অকৃতজ্ঞ নয়। কাজ যা করেছেন নরেনদা তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি যে পান নি এমন নয়। সাহিত্যই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সাহিত্যের নামে কেউ ডাক দিলে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাংলার পি ই এন, শিশু-সাহিত্য পরিষদ ও শরৎ সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন, তীর্থপতি ছিলেন সাহিত্য তীর্থের। দুবার সহসভাপতি হয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের। শিশু সাহিত্যের জন্যে 'মৌচাক' পুরস্কার পেয়েছেন 'ভুবনেশ্বরী পদক' পেয়েছেন সাহিত্যের জন্যে, এ বৎসর যুগান্তর অমৃতবাজার পত্রিকার তরফ থেকে পেয়েছিলেন 'শিশির-কুমার পুরস্কার' যা নিজে হাতে নেওয়া তাঁর আর হল না।

সাহিত্য রচনা আর পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়া অন্য কাজও করেছেন প্রচুর। ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর সঙ্গে প্রচার-উপদেষ্টা হিসেবে জড়িত ছিলেন ত্রিশ বছর। ভারতবর্ষে তো বটেই, তার বাইরে পাশ্চাত্য দেশেও ঘুরে এসেছেন অনেক জায়গায়। যার পরিচয় আছে তাঁর 'রাজপুত্রের দেশে', 'সাহেব বিবির দেশে' ইত্যাদি বই-এ।

কিন্তু এসবই যেন মনে হয় বাহ্য।

নরেন্দ্র দেব থেকে তিন পুরুষ ধরে সাহিত্যের আবালবৃদ্ধবণিতার একান্ত আপনার জন এক ও অদ্বিতীয় নরেনদা হয়ে ওঠার রহস্যের সন্ধান কি ওই কীর্তির সম্মানের তালিকায় পাওয়া যায়?

অসামান্য সাহিত্যিক দু-চারজনকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে এ যুগে কিন্তু সাহিত্যের এমন 'নরেনদা'-র আমাদের পরের যুগেও কোনোদিন দেখা যাবে, তা জোর করে বলবার ক্ষমতা কারুর নেই।

নরেনদা'-র কথা ভাবতে গেলেই মনে এ প্রশ্ন না জেগে পারে না যে, সাহিত্যকে শুধু সৃষ্টি-প্রতিভাই কি সার্থক করে রাখে? মনে হয় না।

সাহিত্য জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে সত্য আর সার্থক হয়ে থাকে নরেন দা-র মত বিরল অসামান্য দু-একটি মানুষের জন্যে সাহিত্যই যাঁদের জীবন, আর যাঁদের জীবন মূর্ত সাহিত্য।

এঁরা সত্যিই অন্য স্তরের মানুষ। শেষ যাত্রার আগে যাঁরাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন যে, কোনো ধর্মানুষ্ঠান নয়, সারা জীবন যার দ্বারা সঞ্জীবিত

হয়েছেন, সেই রবীন্দ্র-সংগীত দিয়েই যেন পৃথিবী থেকে তাঁদের বিদায় দেওয়া হয়; আর, মৃত্যুর দু'দিন আগে শেষ আহ্বানের ইঙ্গিতস্বরূপে বার্ধক্যের প্রতিকারহীন পঙ্গুতা নিয়ে রসিকতা করে লিখতে পারেন,—যে ঘোড়াটার সওয়ার হয়ে তিরাশি বছর অনেক দৌড়, ঝাঁপ করে এসেছি—এখন যে তার পায়ে আর জোর নেই বলে নোটিস দিয়ে বসেছে। বিশ্বস্ত ঘোড়া। কখনও কোনো উৎপাত করেনি। অবাধ্যতা ত নয়ই। পা দুটো তার দুর্বল হলেও কাগজে চড়াচ্ছে সে আমাকে ঠিক হাজির করে দিত বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ঘোড়ার সহিসটি বড় অবাধ্য। সে দুর্বল ঘোড়াকে আস্তাবল থেকে বার করতে ভয় পায়। কিছুতেই রাজী হয় না......

নালিশ নেই, তিক্ততা নেই। জীবনের নিষ্ঠুর সত্যকে এমন অম্লানবদনে মেনে নেবার দীনতা নরেনদা কোথায় পেয়েছেন? কোনো ধর্মে নয়। পেয়েছেন সারা জীবনের অকপট সাহিত্যানুরাগে আর সাধনায়।

নরেন দা-র মত মানুষের জীবনই সাহিত্যকে তাই সবচেয়ে দুর্লভ আরেক মহত্ত্ব দেয়।

পা থরে বসে সুতপা পায়ে তেল মাখছিল। একটু আগে নুন দিয়ে জোঁক ছাড়িয়েছে। বিকেলে হাটে গিয়েছিলাম। আচমকা বৃষ্টি নামল। হাট গেল ছিটিয়ে ছত্রাকাকাই হয়ে। হাট হঠাৎ ফেঁসে যাওয়ায় পাইকারদের হল মস্ত লাভ। তারা বাইশ টাকা মণে পটল পেয়ে গেল।

সুতপার জন্যে আমার কিছুমাত্র সুবিধে হল না। ওর পেট-কাটা জামা আর পেটের নিচে ফর্সা মসৃণ মাংসের ঢেউ দেখে মাছের দাম বাড়িয়ে ওরা দিল। ছ' টাকার কম করল না। হাট থেকে আমাদের আস্তানা মাইল দুয়েকের রাস্তা; আসতে আসতে সন্ধ্যা উত্তরে গেল। বাইশ বছর পরেও গাঁয়ের পর গাঁয়ে শুধু স্বর্গের আলো। বৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং তাও বন্ধ। সঙ্গে একটা টর্চ এনেছিলাম। সুতপাকে সামলাতে সারাক্ষণ সেটা পকেটেই ভরে রাখতে হল। এঁটেল মাটি, পা-রাখা যায় না—এত পিছল। সুতপা একাধিকবার আছাড় খেতে খেতে বাঁচল। জোঁক ধরল পায়ে। হাঁটা থামিয়ে অন্ধকারে পথের মাঝখানে সে প্রায় কান্না জুড়ে দিল।

আমি বললাম, 'তুমি করছ কী! পাড়া-গাঁয়ে বিষ্টি-বাদলার দিনে এ রকম একটু হয়েই থাকে!'

সুতপা ফোঁস করল, 'একটু? একে তুমি একটু বল? উঃ কি অন্ধকার আর কি কাদা! তারপর এই ভীষণ ভীষণ জোঁক। মনে হচ্ছে এখান থেকে আর কোন দিন কলকাতায় ফিরতে পারব না।'

আমি বলতে পারতাম, শখ করে তুমিই এখানে আসতে চেয়েছিলে। তখন ভাবতেও শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছিল। তোমাকে সামলানো যাচ্ছিল না। সাতাশ বছরের মেয়ে যেন সাত বছরের খুকি হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু তখন এসব কথা বলা যায় না। বললে নতুন করে বিস্ফোরণ ঘটতে পারত।

আমি ওকে ধরে ধরে আরো খানিকটা নিয়ে এলাম। সামনে একটা বাঁশের ছোট সাঁকো। তার তলা দিয়ে বর্ষার জল তোড়ে বেরুচ্ছে।

সুতপা দেখেই চীৎকার করে উঠল, 'এটা! এটার কথা তো মনে ছিল না। আমি আর যাব না।' বলে সে দুর্দান্ত কাদার ওপর তার ফুল-ভয়েল নিয়ে বসে পড়ল। আমি
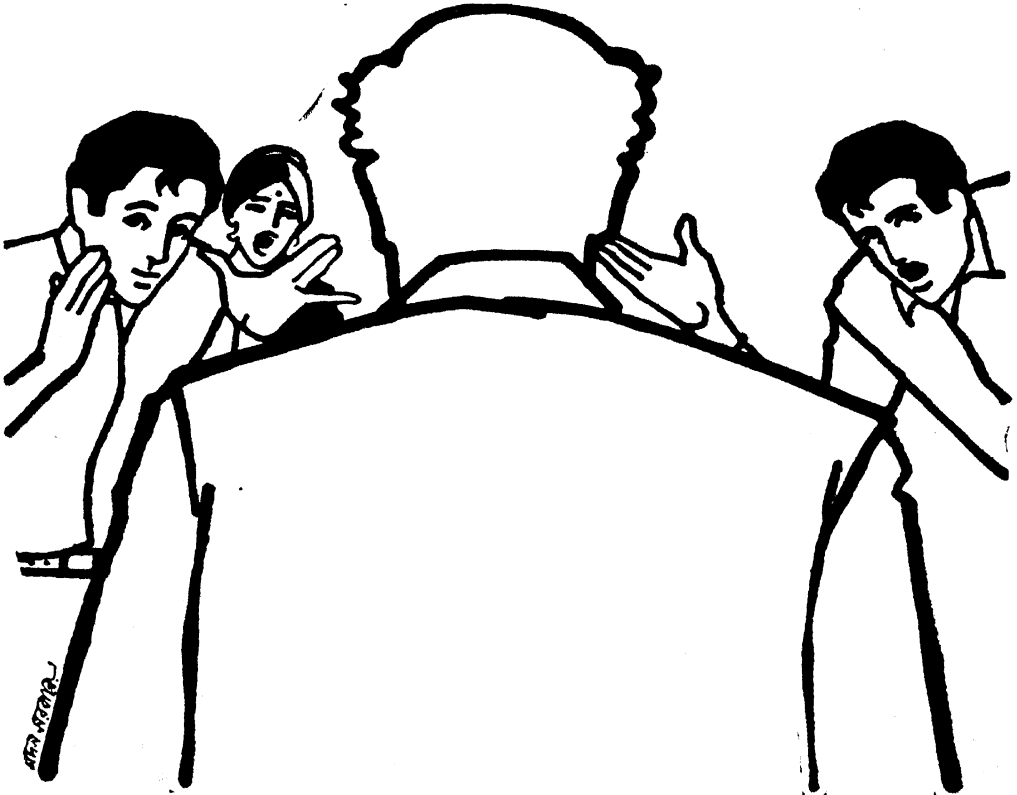
বাজারের থলিটা এ-হাত থেকে ও-হাত করলাম। প্যাণ্টের পকেট থেকে টর্চ বার করে আলো ছড়ালাম। কয়েকটা সোনা-ব্যাঙ লাফিয়ে গেল।

দিনের বেলা, যে-সাঁকোটাকে অত্যন্ত সাদা-সিধে মনে হয়েছিল, বৃষ্টির পর অন্ধকারে সেটাকে যেন কুটিল আর দুরভিসন্ধিমূলক ঠেকতে লাগল। আসবার সময় মাহিষ্যদের পাকা বাড়ি, পর পর গোলাঘর, সুন্দর সুন্দর দোলমঞ্চ দেখেছিলাম। অন্ধকার এর মধ্যে কালি দিয়ে সব মুছে রেখেছে।

আমারও একটু ভয় করল। রাস্তা চিনে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব তো! লোকজনও কাউকে দেখছি না। দূরে ইছামতীর জলের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছে; বোধ হয় কারা নৌকায় পারাপার হচ্ছে। টর্চটা ঘুরিয়ে সুতপার দিকে আনলাম। মুখে কাদা, হাতে কাদা, পায়ের গোছ পর্যন্ত কাদার পুরু প্রলেপ। শাড়ি হাঁটু অবধি গুটিয়ে তোলা। বার্টাম স্ট্রীট থেকে শখ করে কেন বাতাসী চটিজোড়ায় দু' স্লাইস রুটির ওপর আচ্ছা করে মাখানো মাখনের মতো কাদার মোটা আস্তর। বিকেলে যত্ন করে বাঁধা টপ-হেভী খোঁপা দ্বারকার থামের মতো ভেঙে ঘাড়ের কাছে ঝুলছে।

সুতপাকে খুবই বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'এবার চল। ফিরতে নইলে রাত হবে।' প্রথমে অবাধ্য ঘোড়ার মতো কি যেন একটা আওয়াজ করল, তারপর হঠাৎ বলে বসল, 'আমাকে কোলে করে পার করে দাও।'

যে-ভয় এতক্ষণ আড়ালে অপেক্ষা করছিল সুতপার ওই কথা শোনার পর সেটা বেরিয়ে এসে আমাকে পুরোদস্তুর চেপে ধরল। আমি বললাম, 'সে কি! তা হলে দুজনেই পড়ে খুন হব যে...'

সুতপা বলল, 'জানি। তোমার সাহসই নেই। তুমি পারবে না।'

আমি আহত হয়ে বললাম, 'তুমি বোকা হয়ে যাচ্ছ সুতপা। এর মধ্যে সাহস-অসাহসের কি আছে। ওই একটা হ্যাংলা বাঁশ—ওর ওপর দিয়ে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়! তোমার সঙ্গে ভালোবাসা আছে বলে আমি তো জাদুকর হয়ে যাই নি। আমি বাঁশের খেলা জানি না।'

সুতপা উঠে দাঁড়ালো। ওর পিছনে বীভৎসভাবে কাদা লেগেছে। পাছে দেখতে পায় তাই তাড়াতাড়ি টর্চ নিবিয়ে দিলাম। ও ঠিক দেখতে পেয়ে আবার কাঁদ-কাঁদ হল: 'য়ে মা, শাড়িখানা আমার গেল। এই সেদিন সেল থেকে কিনলাম।'

আমি বললাম, 'বাঃ, তুমি নিজে কাদায় বসলে, এখন কাঁদছ!'

সুতপা সাঁকোর একেবারে কাছ পর্যন্ত গেল। আমি ফের টর্চের বোতাম টিপলাম। ও একটা পা বাঁশের ওপর দিল, আবার টেনে নিল। 'না আমি পারব না, আমার ভয় করছে।'

'চল না, আমি তোমার পেছনেই আছি। তোমাকে ধরে থাকছি। তুমি পড়বে না।'

ও বলল, 'না।' বলে যেটুকু এগিয়েছিল সেটুকু আবার পিছিয়ে এল।

'আসলে তোমার মধ্যে ফায়ার নেই অসীম।' বিনা প্ররোচনায় ফাঁকা মাঠের মাঝখানে সুতপা আমাকে আক্রমণ করে বসল।

আমি বললাম, 'কেন? হঠাৎ একথা উঠছেই বা কী করে?'

'না, আমি তো দেখছি। এখনকার পুরুষেরা যেই তিরিশের ওপারে যায়, তার কোলবালিশ হয়ে যায়। তাদের দিয়ে কিসসু হয় না। দেখছ না, আঠারো, কুড়ি, বাইশ বছরের ছেলেরা দেশটাকে কি রকম তাজা রেখেছে!'

বুঝলাম সুতপা যদিও সব তত্ত্বীর

কথা বলছে কিন্তু ও কেবল আমারই ভেতর প্রয়োজনীয় আগুন দেখতে পাচ্ছে না।

অন্ধকারে কতকগুলো জোনাকি নিশ্চিন্ত-ভাবে নাচানাচি জুড়েছিল। সুতপা আগেও আমার মধ্যে আগুনের অভাব দেখেছে। কিন্তু তখন আর ভালো লাগছিল না। খুব ক্লান্ত আর বিরক্ত বোধ হচ্ছিল।

আমি বললাম 'সুতপা অন্ধকারে আর বিপ্লব করে কাজ নেই। এবার ঘরে ফেরার কথা ভাব। আর আমার মধ্যে যে ফায়ার নেই তার জন্যে আমার অনুশোচনাও নেই। দরকার হলে আমি সারা জীবন মুরগী চরে করে কাটিয়ে দেব। এখন চল।'

এই সময় খানিক দূরে অন্ধকারের ঝোপে একটা লালচে আলো দেখলাম। লণ্ঠন নিয়ে কে যেন আসছে। আলোটা সাঁকোর ওপারে এসে থামল

লোকটা পরিস্ফুট হল। ও আমাদের সুরেনবাবুর। আমরা যেখানে আছি, সেখানে আমাদের তদারকি করে। উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে, পেটা স্বাস্থ্য, ছেলেটাও খুব ভালো। দুঃখের বিষয়, চা করতে জানে না। যখনই চা করে সারা কাপ-প্লেটে গুঁড়ো চায়ের পাতা। দেওয়ালী পোকার মতো মাখিয়ে আনে।

'আপনাদের দেরি দেখে আলাম।' ওদিক থেকে বলল সুরেশ।

'বেশ করেছ।' সুতপা ফের সাঁকোর মধ্যে গেল। 'বাব্বাঃ বাঁচলাম। দম আটকে আসছিল এতক্ষণ। উঃ যেমন বৃষ্টি, তেমনি কাদা, আর কি রাক্ষুসে জোঁক!'

'অন্ধকারও পড়েছে আজ চাট্টি। কি তিথি কে'ন দেখি!' সুরেশ বলল।

'সত্যি কি অন্ধকার! এত অন্ধকার জীবনে দেখিনি।' সুতপা বলল।

'এবার চলে আসেন। ফিরে আবার রান্না-বাড়ি করতে হবে।'

'আমার নার্ভ ফেল্ করছে। পারব না!' সুতপা আবার একটা পা বাঁশের ওপর দিল।

'কিছু হবে না নে, আসেন।'

'সুরেশ প্লীজ, আমাকে পার করে দাও। পড়ে যাব তা না হলে।'

সুরেশ এপারে এসে লণ্ঠনটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধরেন তো দাদাবাবু এটা।' তারপর সুতপাকে পাঁজাকোলা করে ওপারে নিয়ে গিয়ে তুলল।

আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম। আমার কিছুই করবার ছিল না। অক্ষমতার দরুন ভেতরে এক প্রচণ্ড জ্বালা হতে লাগল। কিন্তু সে জ্বালা তো অর্থহীন! তাতে কারো কিছু উপকার হয় না, কেবল নিজের পেপটিক আলসার বাড়ে।

ফিরে হাত-পা ধুয়ে প্রথমে জোঁক ছাড়াল সুতপা। তারপর বারান্দার বাইরে একটা তিনকোণা পাথরের ওপর বসে পায়ে তেল মাখতে লাগল। সুরেশ রান্নার যোগাড় দেখছে। আমি একটা বেতের চেয়ারে বসে জলের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম।

আকাশ তখনো ভিজে ভিজে। চাঁদে জলছবি। একটা নৌকা চলেছে উলুবেড়িয়ার দিকে। হ্যারিকেন জ্বলছে তাতে; অনেক লোকজন। বোধ হয় তাস খেলছে ওরা। খেলতে খেলতে বাড়ি পৌঁছে যাবে। আমার মাথার ওপর দিয়ে একটা সরাল উড়ে গিয়ে অর্জুন গাছে বসল।

এত শান্ত জায়গা, তবু শান্তি নেই। মনে মনে দগ্ধ হচ্ছি। শুধু সুতপার খোঁচা হলে ভুলে যাওয়া যেত কিন্তু সুরেশবাবুর যেন লাল পেনসিলে আমার তলায় দাগ দিয়ে গেল। সুতপার কথাই ঠিক। তুমি সাহসী নও, তুমি কৌশল জান না, তুমি অক্ষম।

যাকে নিয়ে যন্ত্রণা সে কিন্তু তখন আশ্চর্য নির্বিকার। যেন ওইখানে পা ঝুলিয়ে বসে সে চিরকালই তেল মাখছে। আমি খানিকটা জোর করে আগেকার প্রসঙ্গ খুঁচিয়ে তুললাম, তুলতে চাইলাম। না তুলে শান্তি পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার অহংকার আহত হচ্ছিল।

'দেখ সুতপা', সিগারেটের শেষটুকু আঙুলের টোকায় যথাসাধ্য দূরে ছুঁড়ে দিতে দিতে বললাম, 'পৃথিবীতে হিরোদের আজকাল দরকার নেই। ওরাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ইতিহাস খুললে তুমি দেখবে, হিরোদের আজগুবি সব অ্যামবিশন-এর জন্যেই পৃথিবীর আজ এই দুর্বিষহ অবস্থা। এবার ওরা একটু রেহাই দিক। পৃথিবীকে তার নিজের মতে থাকতে দিক।'

হাঁটুর ওপর পর্যন্ত সুতপার ফর্সা পা অন্ধকারে ফসফরাসের মতো জ্বলছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল। শাড়ির পর্দা পড়ে গেল ঝপ্ করে। 'যাই রান্নাটা দেখে আসি।' বলে সে রান্নাঘরের দিকে এগুলো। একটু গিয়ে ফিরে এসে বলল, 'অসীম তুমি ভীষণ কাওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছ!'

কলকাতায় ফিরে পুরো একটা দিন সুতপার দেখা পাওয়া গেল না। ফোনেও সাক্ষাৎ নেই। আমার ভাবনা হল। হঠাৎ অসুখবিসুখে পড়ে গেল নাকি? না কি ওর জাঁদরেল অধ্যাপক বাবা এই বেড়াতে যাওয়া নিয়ে কিছু বলেছেন? সুতপা তো আগেও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, একা আমার সঙ্গে অবশ্য এই প্রথম। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তো আমি ও'র কাছে যাচ্ছি অনুমতি চাইতে। সুতপা সব বলে ঠিক করে রেখেছে। শুধু আমার তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কথাটা পাড়তে হবে। ওই একটা পালাই মনে মনে এখন গেয়ে চলেছি।

পরের দিন সকালে টেম্পল শাড়িতে জ্বলন্ত অবস্থায় সুতপাকে পাওয়া গেল। ঠোঁটে অবশ্য হালকা লিপস্টিক। কপালে সেই ঠোঁটের রঙের একটি টিপ—নুড়োর ঘুঁটির সাইজের।

আমি বললাম, 'কি ব্যাপার! শরীর খারাপ-টারাপ নাকি?'

'না।' হাতের ব্যাগটা সুতপা খাটের ওপর ছুঁড়ে দিল।

'তবে?'

'আটকে গিয়েছিলাম।' সুতপা জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আমি আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগলাম। চিবুকের কাছে একটা দাড়ি পেকেছে। কামানো না থাকলে দাড়িটাকে হিমালয়ের চূড়ার মতো সাদা আর গম্ভীর দেখায়। তখন মনে বেশ ভালো বিশুদ্ধ ভাব আসে।

আমি বললাম, 'তোমার বাবা ভালো আছেন তো?'

আমি বললাম, 'পিনাকীর জুলপি টাংগ হোক অথবা বন্দুক তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমি তোমার বাবার কাছে কবে যাচ্ছি বল।'

সুতপা অবাক হল। 'বাবার কাছে কেন?' তারপর বুঝতে পেরে—'ও, বিয়ের কথা পাড়তে! যাবে, যাবে। অত তাড়া কিসের! চারদিকে যা গন্ডগোল। এখন কি বিয়ে করার সময়!'

আমাকে বহু সন্দেহ এবং প্রবল ধাঁধার মধ্যে রেখে সুতপা চলে গেল। আবার দু দিন সে নিখোঁজ। নিজের আর্কিটেক্টের কাজ-কর্মের বাইরে যা আমি করতে পারি, তা হল ভাবনা। আমার পক্ষে দুঃখজনক সব কিছুই ওই দুদিনে ভেবে ফেললাম। একবার মনে হল ফোন করি। তারপর ভাবলাম, কি

...আর! আমার জীবনে ঘটনা স্বয়ংসম্পন্ন। তাদের আমি কিছুতে রোধ করতে পারি না। সুতরাং যা ঘটবার ঘটে থাকুক।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ দেখলাম সুতপার নম্বরটা আমি পেতে চেষ্টা করছি। চাকতি ঘোরাবার পর ফোনটা একটানা বেজে চলল। মনে হল কেউ ধরবে না। অদৃশ্য জায়গা ছেড়ে ফোনটা তখন আমার মাথার ভেতরে বাজতে লাগল। ভাবলাম, কেউ ধরার আগে রিসিভারটা নামিয়ে রাখি। তারপর ভাবলাম, সুতপা নিজে যদি না ধরে তখন বরং নিঃশব্দে ছেড়ে দিলেই চলবে।

কিন্তু কে যেন ধরল। কে ধরল বুঝতে পারলাম না। সুতপার বাবা, মা বা ভাই কেউ নয়।

অন্য কেউ। হতে পারে পিনাকী। আমার পক্ষে একেবারে অজানা, আনকোরা একটা গলা। গলাটা ভারির দিকে, একটু ধরা ধরা, একটু যেন উদ্ধত ভাব।

কোন কথা না বলে আমি রিসিভারটা আস্তে নামিয়ে রাখলাম।

রাত করে শুই; সকালের দিকে ঘুমটা ঝেঁকে আসে। স্বপ্ন, আজকাল দেখতে চাই না, কেননা স্বপ্নের সঙ্গে জীবনের সংযোগ নেই। ন্যূনতম স্বপ্নও জীবনে মেটে না। তবু ওই ভোরের দিকেই স্বপ্নগুলো লাট্টুর মতো পাক খেতে থাকে। আমার বাড়ির ভার বসন্তের ওপর। সে আমার শৈশব থেকে আছে। আমার বাবার আমল থেকে। ভোরে সে হরিণঘাটার দুধ আনতে যায়। চা করে আমাকে ডাকে। বাইরের দরজা ততক্ষণ খোলাই থাকে।

সেই অবসরে সুতপা এসে আমার ঘুম ভাঙালো।

আমার চোখ কিছুই আবিষ্কার করেনি। মাথার ভেতর তখনো ঘুমের কুয়াশা। একি স্বপ্ন না সত্যি, মায়া না মতিভ্রম এই ধরনের মামুলী কতকগুলো ঠাট্টাও করেছিলাম। বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখলাম সুতপা মাথা নিচু করে বসে আছে : গা ঢেলে দিয়ে। মনে হল পিঠটা যেন হঠাৎ ভীষণ দুমড়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কে যেন প্রমপ্‌ট করে দিল : সুতপার কিছু হয়েছে। 'কী হয়েছে সুতপা?'

সুতপা জবাব দিল না। সেইভাবে বসে রইল। শুধু ওর পিঠটা, মশারীর চাল যেমন হাওয়ায় ফুলে ওঠে, তেমনি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বুঝলাম, সুতপা কাঁদছে।

আমি ওকে তুলে ধরলাম। খাটের পিছনে বালিশ দিয়ে উঁচু করে বসিয়ে দিলাম। পা-টা মাটিতে ঝুলছিল। বললাম, 'পা-টা তুলে একটু আরাম করে বস।'

এতক্ষণে ওর পুরো চেহারার ছবিটা পাওয়া গেল। সেদিনকার রাতের চেয়েও বিধ্বস্ত এবং এলোমেলো। সেদিন ওর সর্বাঙ্গে কাদা ছিল। আজ সমস্ত মুখ কালিবর্ণ। কপালের চামড়া কে যেন গুটিয়ে রেখেছিল। তারপর ছেড়ে দিয়েছে। ভাঁজগুলো খুব স্পষ্ট। সম্ভবত রাতে ঘুম হয়নি, মুখ ঝামার মতো খসখসে।

আমি বললাম, 'সুতপা তোমাকে দেখে আমার ভয় করছে...কি হয়েছে বল তো?'

সুতপা প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল, 'তুমি ভাবতে পারবে না অসীম। কাল সারা রাত কি অবস্থায় গেছে! জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হবে ভাবিনি। উঃ কি অপমান কি আতংক!'

'তোমাদের সেই অতিথি আছে না গেছে?' প্রশ্নটা আমাকে অস্থির করছিল।

আমি যেন জানতাম এই সবের মধ্যে অতিথির একটা বড় রকম ভূমিকা রয়েছে।

'অতিথি!' সুতপা উঠে বসল। তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ও অতিথি নয়!'

আমি বললাম, 'তবে! ও কে?'

সুতপা এ কথার জবাব দিল না। বলল, 'অসীম, আমরা কি বোকা! একটু সন্দেহ পর্যন্ত করতে শিখিনি। অথচ যা দিনকাল পড়েছে তাতে তো কাউকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। আমরা মরব, অসীম। নিজেদের স্বভাব-দোষে আমাদের মরতে হবে।'

'আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা।' মনে হল, সুতপা খুব বেশি বিপন্ন বোধ করছে, তাই ও এত বিচলিত। কথাগুলো-ও তাই ধাঁধা হয়ে বেরুচ্ছে। 'হেঁয়ালী রেখে কী হয়েছে তাই বল।'

সুতপাকে এতক্ষণ ভেঙে-পড়া দেখাচ্ছিল, এবার নিজেকে গেঁথে তুলল। 'কাল সন্ধ্যে-বেলা গগন এসেছিল।'

আমি বললাম, 'গগন কে?' স্মৃতির ভেতর অনুসন্ধান চালিয়েও গগনের হদিশ পেলাম না। তখন একটু বিরক্তও লাগল। সুতপা এত রহস্য করছে কেন?

'গগন পিনাকীর বন্ধু।'

'বেশ তো! তারপর?'

'সঙ্গে ওর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। বাবা তখন নিজের লাইব্রেরী ঘরে বসে। পিনাকী বাবার সঙ্গে গগনের আলাপ করিয়ে দেয়। বাবার যেমন—বাবা ওকেও রাত্তিরে খেয়ে যেতে বলেন। খানিক পরে গগন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আপনার টেলিফোনটা কোথায় স্যার? বাবা তখন আমাকে ডেকে বলেন, ওকে টেলিফোনটা কোথায় দেখিয়ে দাও তো!'

আমি বলে উঠলাম, 'ও, বলতে ভুলে গেছি। আমি তোমাকে কাল সন্ধ্যায় টেলিফোন করেছিলাম। কে একজন ধরেছিল।'

সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'ক'টার সময়?'

'এই ধর সাতটা।'

সুতপা একটু ভেবে বলল, 'জানিনা।

বলে বার্থ হুমকী দেখান। গগন ছেলেটি এতক্ষণ তার কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা লম্বা ছুরি বার করে টেবিল ল্যাম্পের ওপারে এক অন্ধকার ভূখণ্ডে অপেক্ষা করছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলে, 'আমি তৈরি স্যার। আপনাদের প্যাটার্নটা এত জানা! মাতৃস্নেহের পরেই পুলিসী-স্নেহের কাতৃজ্ঞ আপনারা।' তারপর সুতপার দিকে ফিরে বলে, 'চলুন লাইনটা কেটে আসি।'

'লাইনটা আমার সামনে কেটে দিল। কিন্তু অসীম—' বলতে বলতে সুতপা ভীষণ কেঁপে ওঠে।

'তার চেয়েও অসহ্য ওদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসা। ভেবে দেখ, যারা ভয় দেখাচ্ছে, ঘরে আগুন দেবে বলছে, তাদেরই আমাকে বলতে হচ্ছে, মাছের কালটা আরেকটা নেবেন? ও কি, কাস্টার্ড যে একেবারেই খেলেন না? উঃ সে যে কি শাস্তি!'

'আমি বললাম, 'অতিথি যে! অতিথিদের আদর করা আমাদের প্রাচীন নিয়ম। কত গল্প আছে, জান না?'

যাই হোক, সুতপার বাবা শেষ পর্যন্ত পিনাকীকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে-ছিলেন। বলতে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি বলেছিলেন, 'পিনাকী, আমি তোমাকে যত্ন করে পড়িয়েছি। কখনো খারাপ ব্যবহার করিনি। এই মেয়েটা আর ওর মার দিকে তাকিয়ে অন্তত আমাদের রেহাই দাও। প্লীজ!'

সকলের খাওয়া শেষ হয়েছিল। পিনাকী শূন্য প্লেটের দিকে বরফের মতো চোখ করে তাকিয়ে। মনে হয় তার চোখ কিছুই দেখছিল না। সমরেন্দ্রবাবুর কথা শুনল কি শুনল না, তাও বোঝা গেল না। উঠে বেসিন থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলো। খাবার ঘর আর বাইরের ঘরের মাঝখানে দরজা অটকে দাঁড়িয়ে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটতে লাগল। গগন সমরেন্দ্রবাবুর চেয়ারের পিছনে গলির জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। জানলাটার ওপারে দেড় হাত এক গলি এবং লম্বা পাঁচিল। ওইখানেই বাড়িটা শেষ হয়েছে। গগন বোধ হয় সেই টানা পাঁচিলের গায়েই কোন ফুল ফুটতে দেখছিল।

'স্যার, এই জন্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি ইত্যাদি কথা-গুলো আমরা খাপের মাঠে ফেলে এসেছি।' পিনাকী এতক্ষণে সমরেন্দ্রবাবুর অনুরোধের জবাব দিল। যেন বড়, দেশ ঘুরে নিয়ে এলো কথাটা। 'শ্রদ্ধা-ভক্তি যদি করতেই হয় তো দেশকে করব, জাতিকে করব, সমস্ত মানুষকে করব। আপনার মতো একজন তুচ্ছ কাপুরুষ, ইনডিভিজুয়ালকে করতে যাব কেন?'

সমরেন্দ্রবাবু এ কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন। তাঁর আশা ছিল পিনাকী হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। হাজার হোক, তাঁর পুরনো ছাত্র তো! এরপর তিনি আর একটা কথাও বললেন না। হাত ধুয়ে সেই চেয়ারেই আবার ধপ্ করে বসে পড়লেন। আমি সাহসী নই, তবু সুতপার নাকি তখন আমার কথাই মনে হচ্ছিল।

রাত বাড়তে লাগল। রাস্তার শব্দ কমে এলো। মোড়ের দোকানটার ঝাঁপ পড়ে গেল। একটা ঝড়ো হাওয়া উঠলো। রাতে বোধ হয় বৃষ্টি হবে। সমরেন্দ্রবাবু অনেক পরে একটা চুরুট ধরালেন।

পিনাকী এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন স্যার?'

'তার মানে?' সমরেন্দ্রবাবু হতভম্ব হলেন। তাঁর কানের পাশ গরম হয়ে উঠলো। ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল অপমানে। এতদূর! পিনাকী হয়তো তাঁর সামনেই সিগারেট ধরাতে চায়!

কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল। কি আশ্চর্য, দেশলাইটি তিনি এতক্ষণ [illegible] হাতে নিয়ে [illegible] ছাড়ে-ছাড়ি তিনি [illegible] লুকিয়ে ছাড়তে [illegible] কিন্তু পারলেন না। পারলেন না, কেননা ঠিক তাঁর চেয়ারের পিছনেই গগন দাঁড়িয়ে।

শেষ কোন উপায় না দেখে টেবিলের ওপরে দিয়ে দেশলাইটা তিনি পিনাকীর দিকেই ছুঁড়ে দিলেন। দিয়ে যেন নিষ্কৃতি পেলেন। পিনাকী খপ্ করে সেটা হাতের মুঠোয় ধরে নিল। [illegible] তিনি সে হাসি [illegible]।

আমি যাই হোক প্রায় লাফিয়ে উঠলাম, 'ইস, তোমার বাবা নিজের হাতে তুলে দিলেন দেশলাইটা? এখনই আবার বললাম, কথাটা কি ভাবলে?'

সুতপা একটু হাসল, 'না দিয়ে উপায় কি? তখন আর কী করতে পারতাম, বলো?'

সত্যিই তো আমরা আর কি করতে পারি! সমরেন্দ্র অক্ষমতাই যখন আমাদের একমাত্র সম্বল। তাড়িয়েও তো পারিনি। সেই সুযোগের অপেক্ষায় যখন হাত থেকে ফিরছিলাম, সমরেন্দ্রের সুতপাকে কোলে তুলে যখন সাঁকো পার করছিল, তখন অক্ষম আমি কিছুই করতে পারিনি।

দেশলাইটা নয়, দেশলাই অতি তুচ্ছ জিনিস। আর যাই হোক, দেশে দেশলাইয়ের অভাব এখনো হয়নি। কিন্তু সমরেন্দ্রবাবু সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু তুলে দিয়েছেন পিনাকীর হাতে।

নীলিমা ইব্রাহিম

কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে আমরা সহপাঠিনী ছিলাম। নীলিমা ইব্রাহিম তখন ছিলেন নীলিমা রায়চৌধুরী। সেকালে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা এত বেশী ছিল না। আমাদের বাইরের জীবনে অবাধ চলাফেরা বা নানা জিনিসে আগ্রহ প্রকাশ করার সুযোগও ছিল না। কাজেই সহপাঠী সঙ্গীসাথী সবাই অত্যান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। নীলিমা সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর একান্ত আপন একজন।

তার সাহিত্যে অনুরাগ তখন থেকেই ছিল। আমাদের প্রথম বছরটা কেটেছিল সরল সেন মশায় যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়িতে। নূতন গৃহ হলো কিছু পরে। সরল সেন মশায়ের ঘরোয়া ব্যবস্থা কলেজের প্রথম বছরটা আরও নিবিড় বন্ধনে সবাইকে বেঁধেছিল। যেন একটি মস্ত যৌথ পরিবারের অংশ আমরা। দরোয়ান ভূজাওয়ের ঝাল ছোলা আর ঘন জমাট আড্ডা ছিল মুখ্য উপজীবা। সাহিত্য ইত্যাদিতে অবলম্বনীয় যা কিছু তাকে ঘিরে খোশ-খোরাক যোগাতো নীলিমা প্রমুখ কজন। তাই ওকে এত বেশী আজ মনে পড়ছে। শুনেছিলাম শরৎ সাহিত্যে নীলিমার বিশেষ গবেষণা ওকে বাংলাদেশের সাহিত্যসাধনায় উচ্চ আসন দিয়েছে। শরৎবাবুতে অসীম আগ্রহ তখনও ছিল ওর। গফুর অর্থাৎ মহেশ গল্পের গফুরকে আমরা সবাই গভীরভাবে ভালবাসতাম। মহেশ আমাদের পাঠ্য ছিল। কতবার পড়েছি বলতে পারি না। মায়েদের তাড়া খেয়ে বই নিয়ে বসলেই পড়তাম মহেশ। আর পড়তাম রাজমহল। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক লেখা নিয়ে আজকের ছেলেমেয়ে ছিনিমিনি খেলছে ভাবতে তাই অবাক লাগে।

মহেশ পড়ে আমরা যখন কেঁদেকেটে খুন নিজের মত নীলিমা বলতো, 'আরে আমাদের এত বড় সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র মেলা ভার।' তখন তলিয়ে ভাববার অভিজ্ঞতা ছিল না। সম্প্রতি শংকরের 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার কালে যেসব চিঠিপত্র এসেছে তাতে বুঝেছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যারা জান দিয়েছেন সেই পূর্ব বাংলার সাহিত্যানুরাগীর দলের দুঃক্ষোভ অভিমান বাংলার বড় বড় লেখক ও কবির উপর। কত কিছু তাঁরা রচনা করেছেন, কত শত চরিত্র। কই মুসলিম চরিত্রে তেমন আগ্রহ তো নেই।

হয়তো কিছু সত্য। নীলিমা তাই সেই সাহিত্য সাধনার গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিল। ডাঃ ইব্রাহিম চিকিৎসক। তাঁকে বিবাহ করে নীলিমা ঘর বেঁধেছিল ঢাকাতে। সে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার রিডার পদ পেয়েছিল। কত উপন্যাস আধুনিক পূর্ব বাংলাকে ঘিরে রচনাও করেছিল। তার "কেয়াবন সঞ্চারিণী" কর্মী মেয়ের জীবনের কাহিনী। কর্মী মেয়ে আধুনিক সমাজের সৃষ্টি। উপার্জনের পথে পা দিয়ে সে জড়িয়ে যায় নানা সমস্যায়। তার উপার্জন তখন আর দশ জনকে করে তোলে স্বার্থপর। সেটুকু বজায় রাখতে তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভুলে যান কর্মী মেয়েও সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়ে নয়। তার জীবনও চায় মানুষের চিরন্তন চাহিদা।

কেয়াবন সঞ্চারিণী নূতন কিছু নয়। দুনিয়া জোড়া মেয়ের ঐ একই সমস্যা আজ। নীলিমা ইব্রাহিম তারই প্রতিধ্বনি তুলেছিল শুভবুদ্ধি হিসাবে তার নিজস্ব পরিবেশ ঘিরে। সেই পরিবেশের জন্য সে প্রাণ দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধীজনের সঙ্গে এই মহীয়সী মহিলাও শহীদ হয়েছে। তার সংসার ছিল, পুত্র কন্যা ছিল—তারা যে কোথায় জানি না। সারা জগতের নারী-সমাজ কেন এমন সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারছেন না, ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়।

খবরের টুকরো

১৯৭১ সালের লোকগণনা শেষ হয়েছে ৩রা এপ্রিল। ৯ই এপ্রিল কিছু মোটা মোটা খবর আদমসুমার সংস্থা প্রকাশ করেছেন। নয় দিনের ব্যবধানে যে তথ্য আদমসুমারের তরফ থেকে পেশ করা হয়েছে তাতে দেশের জনসংখ্যাঘটিত বেশ কয়েকটা খবর মেলে। তালিকাভুক্ত করার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার কর্তা শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মশায় বললেন, সেনসাসের পুরোপুরি রিপোর্ট প্রকাশ করতে আরও বছর দেড়েক সময় নেবে। কিন্তু বর্তমান খবর বা তথ্য সংগ্রহ হয়েছে সেন্সাস কর্মীদের দলগত ব্যাপক কার্যবিধির শৃঙ্খলায়। আয়োজন হয়েছিল relay system-এর। তাই এত সত্বর বহু তথ্য সাধারণকে ধরে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আদমসুমারের হিসাবে দেখা যাচ্ছে নারী পুরুষের ratio বা অনুপাত স্পষ্টভাবে। পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা অধোগতির দিকে। আগেও সর্বভারতীয় অনুপাত কমই ছিল। বর্তমান পরিসংখ্যান প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৯৩২ মেয়ে।

প্রদেশগুলিতেও মেয়ে কমছে। উড়িষ্যাতে ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যানে ১০০১টি মেয়ে প্রতি ১০০০ পুরুষে পাওয়া গিয়েছিল। এখন সেখানে দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৮৯টি নারী। কেরালাতে এখনও নারীর সংখ্যাই বেশী। তবে অনুপাত আগের চেয়ে কম। প্রতি হাজার পুরুষে ১৯৬১ সালে

ছিল ১০২২ নারী, আর আজ ১০১১।

সর্বভারতীয় হিসাবে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ literateদের অনুপাত ২৯·৩৫। ১৯৬১ সালের হিসাবে literate সংখ্যা ছিল ২৪·৩৩। আদমসুমারের বেলায় যে নারী বা পুরুষ যে-কোন ভাষা লিখতে পড়তে পারেন ও অর্থবোধ আছে তাকেই literate ধরা হয়। মহিলা literateদের অনুপাত শতকরা ১৮·৪৭। ১৯৬১-এ তা ছিল ১২·৯৫ মাত্র। চণ্ডীগড় ও দিল্লিতে নিরক্ষর মহিলা সবচেয়ে কম। বিহার ও আসামে সবচেয়ে বেশী।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত অর্থাৎ demographic উপাত্ত বা data ভিন্ন ভারতীয় সেনসাস অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সব প্রকাশ করেন। নানা গবেষণায় অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করা হয়। তার একটি থেকে মহিলাদের কর্ম-সংস্থানে আধুনিক জীবনের নূতন এক দিক উদ্‌ঘাটিত হয়। জীবিকার অনুসন্ধানে গৃহের বাইরে আসা নেহাৎ বছর কয়েক আগের ব্যাপার। কিন্তু নিরক্ষরতা দূর করার চেয়েও দ্রুতগতিতে বেড়েছে দু' পয়সা কামিয়ে সংসারের অভাব মোচন করার ইচ্ছা। সরকারী চাকুরি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে কেরাণী পর্যায়ে শতকরা ২·৪টি মহিলা কর্মী। এখন সেনসাস বিভাগের কাছে আমাদের অনুরোধ তাঁরা নারী জীবনের এই নূতন অধ্যায়ের তত্ত্বানুসন্ধানে আর একটু তৎপর হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করুন। ভারতবর্ষে আদমসুমারই ভারতীয় নাগরিক সম্বন্ধে সংবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ একক ব্যবস্থা। কাজেই মহিলাদের উপার্জন ক্ষেত্র সম্বন্ধে যে কোন বিধি অবলম্বন করা হবে তার ভিত হবে পরিসংখ্যানের হিসাব।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা এখন ৫৪ কোটির উপরে। আশঙ্কা করা হয়েছিল আরও বেশী হবে। আদমসুমারে বোঝা যাচ্ছে পরিবার নিয়ন্ত্রণের কিছু ফল হয়েছে। ঠিক ঐভাবেই তথ্য সংগ্রহের ফল হয়তো একদিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা উন্নতির নিদর্শন নির্দেশ করবে। কিছু দিন আগে একটি প্রশ্ন সাধারণের মনকে নাড়া দিয়েছিল। কি অনুপাতে শিক্ষিত এবং বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত নারী জাতীয় জীবনে নিরর্থক অর্থাৎ national waste, আদমসুমারে যদি তার অনুসন্ধান করা হয় তবে তথাকথিত উচ্চ শিক্ষা অথবা আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ শিক্ষায় নারীর ভূমিকা নিয়ে অতিপ্রয়োজনীয় বিচার সহজ হবে।

টুকিটাকি

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি আলুর খোসা ব্যবহারের নানা উপায়। আলুর খোসা ফেলে দেবেন না। বড় আলু হলে বেশ করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নেবেন। তারপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটানে খোসা ছাড়িয়ে সেই খোসা গরম তেলে ভেজে পরিবেশন করবেন।

ক্রীম ব্যবহারে অনেক সময় আমরা ফেটাইনি। ক্রীম না ফেটে ফুলিয়ে নিলে কাজ সহজ হবে। আজকাল অনেক সময় ক্রীম প্রায় দুধের মত পাতলা হয়। তাকে ফেটে ফাঁপানো কঠিন। ক্রীম খুব ঠাণ্ডা করে তাতে ডিমের সাদা অংশ ফেটে মিলিয়ে নিলে আশানুরূপ ফল হবে। পাউডার কফি যদি খুব ভালভাবে মুখ বন্ধ হয় এমন পাত্রে ঠাণ্ডায় (সম্ভব হলে রেফ্রিজারেটরে) রাখেন তবে কফি ভাল থাকবে।

চায়ের জল যেমন ভাল করে ফুটলে চায়ে সুঘ্রাণ ও স্বাদ হয়, ঠিক তেমনি, কফির স্বাদ পেতে হলে কখনও জল একেবারে ফুটতে দেবেন না।

শ্রীমতী

উপন্যাস

এক সুন্দর প্রভাতে বন্ধ সহসা মনস্থির করে। গৌরীর সঙ্গে ওর যে প্রেম সম্পর্ক সেই সম্পর্কে ফিরে যাবে। অথবা ভাইবোন সম্পর্ক পাতাবে। ওই সূত্রেও তো বোনকে বাঁচানো যায়। তবে আবার প্রেমের সম্পর্ক পাতানোর কী দরকার। প্রেমের সম্পর্ক পাতালে প্রেমের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত যেতে হয়। ততদিন কি গৌরী সবুর কোনো দিন যেতে পারবে? ওর জেদই ওকে যেতে দেবে না। ছেলের মুখ চেয়ে ছেলের বাপকেই স্বামী বলে মেনে নিতে হবে। স্বামীকে তাঁর স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করলে সতীন এসে জুটবে।

অমন একটা সিদ্ধান্ত নিতে বন্ধ যেতে যাচ্ছিল কিন্তু একটু আগে যেটা অকল্পনীয় ছিল একটু বাদে মনে হলো সেইটেই স্বাভাবিক। এতদিন যেন সে একটি মধুর স্বপ্ন দেখছিল। এবার জাগরণ। এখনো স্বপ্নের রেশ লেগে রয়েছে, তবু স্বপ্নটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাকে আর জোড়া দেবার, প্রলম্বিত করবার উপায় নেই।

গৌরীকে জানাতে হাত ওঠে না, অথচ না লিখেও পারে না। যা লেখে তার মর্ম, "তুইও থাকছিস, আমিও থাকছি, আমাদের দুজনের মাঝখানে রেশমের সুতোর মতো একটা সম্পর্কও থাকছে, কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক নয়। তার পরিবর্তে আমাদের সেই ভাইবোন সম্পর্ক। রাখীবন্ধ ভাই বহিন। হুমায়ুন বাদশা ও রাজপুত রানী। তোর বিপদের ডাকে আমি সাড়া দেব। কিন্তু প্রেমের ডাকে নয়। প্রেমের জগতে তুইও স্বাধীন থাকবি, আমিও স্বাধীন থাকব। তোর মতো ভালোবাসা আর কেউ আমাকে ভালোবাসেনি, কিন্তু ভালোবাসবে না কেমন করে বলি? হয়তো সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসবে। কিছুই হাতে রাখবে না। তোর পক্ষে সেটা কোনোদিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তুই মা হয়ে অবধি রূপান্তরিত হয়েছিস। তোর মধ্যে আমি আর বাবাকে খুঁজে পাচ্ছিনে। যার রূপ দেখেছি সে মাতো না। তোর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হবে কী করে? যেটা হবার নয় সেটার স্বপ্ন না দেখে যেটা সম্ভব সেটার উপরেই নির্ভর করা শ্রেয় নয় কি? সেটার নাম ভাইবোন সম্পর্ক। রাখীবন্ধ ভাইবহিন। আমি অনেককালের হয়েছি ও রয়েছি, তোর যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন তোকে মুক্ত করব। আর তা হলে প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে গ্রহণ করি। আবার নতুন করে শুরু হোক আমাদের যাত্রা।"

গৌরীর কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাত। ও মেয়ে ক্ষণকালের জন্যে মূর্ছা যায়, তারপরে কোন কেউ অনর্থ বাধায়। কেউ বুঝতে পারে না কেন।

বছর দুই আগে গৌরী তো আত্মহত্যা করতেই উদ্যত হয়েছিল। বন্ধ কেন এসে ওকে নিরস্ত করতে গেল? সে যে পরে এমন বেইমানী করবে তা কি ও জানত? জানলে কি ওর কথায় কান দিত? একটি অবলা নারীর সঙ্গে অমন বেইমানী যে করে সে কি এর জন্যে নরকে যাবে না? আছে, আছে তার কপালে অনন্ত নরক।

এখন আর আত্মহত্যা করা চলে না। বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে। তবু কিছু একটা করতেই হবে ওকে। না করলে নয়। একজন ওকে ফাঁকি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল, এটা কি ও বরদাস্ত করবে? যার সঙ্গে যার প্রেমের সম্পর্ক একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে তার ভাইবোন সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে কখনো? শেলী তাঁর বধূ হ্যারিয়েটকে ফেলে পালিয়ে যাবার পর আদর করে চিঠি লেখেন, "আমার আত্মার বোন হ্যারিয়েট।" হ্যারিয়েট সার্পেন্টাইনে ঝাঁপ দিয়ে মুখের মতো জবাব দিয়ে যান। শেলীও কি সুখী হলেন? পরে একদিন জাহাজডুবি হয়ে তাঁরও তো ঘটল সেইরূপ সলিল সমাধি।

এসব কথা মনে করিয়ে দিয়ে গৌরী যে উত্তর দেয় তার মর্ম, "শেলী কি তোর উৎসমুখে ফিরে যেতে পারে? জীবনের যেমন পশ্চাদ্গতি নেই প্রেমেরও তেমনি উজান গতি নেই। প্রেমিক প্রেমিকা যদি আর প্রেমের সম্পর্ক রাখতে না চায় তবে সব সম্পর্কই কেটে যায়। তুই কি [illegible] প্রস্তুত? আমি তো ভাবতেই পারিনে, মাণ। তোকে আমি কটু কথা বলেছি বলে আমার মন পুড়ে যাচ্ছে। তোর পায়ে ধরে মাফ চাইছি। ক্ষমা কর। ভুলে যা। কিন্তু অমন করে শাস্তি দিসনে। তোর কোথায় বাধছে আমায় খুলে বল। আমি প্রতিকার করব।"

এর পরে বোঝাপড়ার দীর্ঘ পালা। তারই মাঝখানে হঠাৎ একদিন কাগজে বেরিয়ে যায় প্রতিযোগিতায় যারা সফল হয়েছে বন্ধই তাদের সকলের শীর্ষে। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর কাছ থেকে টেলিগ্রাম এসে হাজির। উল্লাস-ভরা অভিনন্দন।

"মাণিক রে, ধন্য তোর তপস্যা! এবার তুই ইন্দ্রত্ব লাভ করবি। ইন্দ্র হলে শচীও আসবেন। আমি কে যে আমাকে কেউ ইন্দ্রলোকে বসে স্মরণ করবে?" গোরী লেখে।

সফল হয়েছে বলে রঙ্গর মনে সুখ নেই। গোরীকে তো সুখের ভাগ দিতে পারবে না। কোথায় পড়ে থাকবে গোরী আর কোথায় চলে যাবে রঙ্গ! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। দূরত্ব কি শুধু ভূগোলের হিসাবে বাড়বে? দেখা সাক্ষাতের লেশমাত্র সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে জীবনেও এক প্রকার শূন্যতা সৃষ্টি হয়। পূরণ করার জন্যে নতুন নতুন নারীর পদপাত ঘটে। বিলেতের মতো দেশে কত নারীর সঙ্গে আলাপ হবে। তাদের মধ্যে কেউ যে আকর্ষণ করবে না, আকৃষ্ট হবে না, কেমন করে তা বলা যায়? রঙ্গ যদি অচঞ্চল থাকতে না পারে সেটা কি তারই দোষ? যৌবনের ধর্ম নয়?

কী মনে করে লেখে, "তুই থাকতে আর কেউ কেন শচী হবে? কিন্তু তুই থাকলে তো? আমি বলি কী, তুইও বিলেত চল। এক সঙ্গে নয়, মাস কয়েক বাদে। ততদিনে আমিও গুছিয়ে বসে থাকব। ওইভাবেই তোর মুক্তি আর আমাদের পরিণয়।"

গোরী তো কেঁদে আকুল। ওর খোকনকে ফেলে ও স্বর্গে যেতেও চায় না। বিলেত দেশটা তো মাটির। অমন কাজ যদি করে তবে খোকনকে তো চিরকালের মতো হারাবেই, আত্মীয়স্বজন সবাইকেই হারাবে।

"তোর প্রস্তাবটা তো চমৎকার। কিন্তু মা হয়ে কোলের ছেলেকে কার হাতে সঁপে দিয়ে যাব? ডাইনীর হাতে? ওর বাবা নির্ঘাত আবার বিয়ে করবেন। আর ডাইনীর নিঃশ্বাস লেগে নটে গাছটি শুকিয়ে যাবে। এত বড়ো অধর্মের ভাগী হয়ে তোরই বা কোন সুখ? তার চেয়ে আরো কিছুকাল সবুর কর। খোকন একটু বড়ো হোক। মাকে ছেড়ে থাকতে শিখুক। আমি তোর পথ চেয়ে বসে থাকব। তুই ফিরে এলে তারপরে যা তোর ইচ্ছা তাই হবে।" গোরী জবাব দেয়।

রঙ্গ দেখে নিজের মুক্তির জন্যে গোরী আর অধীর নয়। একজন যে দুটি বছর প্রবাসে কাটাবে আরেকজন সে দু' বছর দেশে থেকে কোলের শিশুটিকে মানুষ করবে। বেশ. তবে তাই হোক। কিন্তু রঙ্গ আর অপেক্ষা করতে রাজী নয়। সে যদি আর কারো প্রেমে পড়ে তবে সে স্বাধীনতা তার থাকবে। গোরীর মুক্তি সুদূরে বলে রঙ্গর মুক্তি বন্ধক থাকবে কতকাল!

"আমি তোকে কথা দিয়েছি. কথা রাখব। তোর মুক্তির জন্যে দায়ী থাকব। কিন্তু আমার নিজের মুক্তি তো চিরদিনের জন্যে সমর্পণ করতে পারিনে। আমাকেও মুক্ত থাকতে হবে. গোরী। আর কেউ যদি আমাকে ভালোবাসে ও আমার ভালোবাসা পায় তবে তার সঙ্গেই প্রেমের সম্পর্ক পাতাব। তোর সঙ্গে ভাইবোন সম্পর্ক। যদি আপত্তি না

থাকে তোর।" রঞ্জু পরিষ্কার করে জানায়।

"এর পরেও আমার মুক্তি তোর হাত থেকে নেব? কেন, তোর হাত থেকে কেন? আর কারো হাত থেকে কেন নয়?" গোরীও স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দেয়। "বৃন্দাবনে কানু বিনা কি পুরুষ নেই? যে আমাকে ভালোবাসবে সে-ই আমাকে মুক্ত করবে। তোকে আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দিলুম।"

এতদিন মুক্তির জন্যে গোরীই তাড়া দিচ্ছিল। এখন গোরীকেই তাড়া দিতে হচ্ছে। মুক্তির লগন যতই নিকট হয়ে আসে ততই প্রকট হয় যার মুক্তি তার অনিচ্ছা। বছর দু' তিন অপেক্ষা করলে কি অনিচ্ছা পরিণত হবে ইচ্ছায়? মনে তো হয় না।

রঞ্জুর ধারণা ছিল মুক্তির সমস্যাটাই গোরীর জীবনের মূল সমস্যা। তার ওই ধারণার পরিবর্তন হয়। যে নারী সমাজের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তার বাঁধন খুলে দিতে বা কেটে দিতে হলে আরো বড়ো শক্তিমান পুরুষের আরো বড়ো প্রেমশক্তির প্রয়োজন। প্রেমই তার জীবনের মূল সমস্যা।

প্রয়োজনের সঙ্গে শক্তিকে পরিমাপ করে দেখা গেল রঞ্জুর শক্তি গোরীকে মুক্ত করবার পক্ষে এখন তো নয়ই, কোনো দিন যথেষ্ট বড়ো হবে কি না সন্দেহ। সে যেমন পুরুষ হিসাবে দুর্বল তেমনি প্রেমিক হিসাবেও ক্ষীণপ্রাণ। কেমন করে সে গোরীর মতো একটি শক্তিমতী নারীর প্রেমশক্তির সমকক্ষতা করবে! ওদের মিলন যদি বা ঘটে তবে তা বিচ্ছেদের জন্যেই। ঘটলে ওই মুক্তিটুকুই ঘটবে, তার বেশী নয়। শুধুমাত্র মুক্তিটুকুর জন্যে গোরী এত বড়ো ঝুঁকি নেবে? স্বামীত্যাগ, পুত্রত্যাগ, সামাজিক আশ্রয়ত্যাগ? এখন তো নয়ই, পরে নেবে বললেও তা নির্ভরযোগ্য নয়।

স্বামীও রাখব, পুত্রও রাখব, কুলও রাখব, শীলও রাখব, এদের হাতে রেখে শ্যামও রাখব। এই যার মনোগত অভিপ্রায় তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কতদিন থাকতে পারে? একটি বিবাহিতা নারীর পরকীয়া প্রেমের শরিক হয়ে রঞ্জুই বা কোন সার্থকতা পাবে?

"ভাবনা কিসের, গোরী, তোর যদি স্বরা না থাকে তোর পুরুষোত্তম একদিন না একদিন তোর জীবনে উদয় হবেন, তোকে একহাতে মুক্তি দেবেন, আরেক হাতে প্রেম। তাঁর জন্যেই প্রতীক্ষা শোভা পায়, আমার জন্যে নয়।" রঞ্জু সান্ত্বনা দিয়ে লেখে।

"মেয়েদের তুই অত ছোট ভাবিস কেন? ওরা স্বভাবত একনিষ্ঠ। তোদের মতো ভ্রমর-স্বভাব নয়। আমি যাকে ভালোবেসেছি তারই জন্যে প্রতীক্ষা করব।" গোরী আশ্বাস দেয়।

জ্যোতি কেমন করে জানতে পায় যে ওদের দু'জনের প্রণয়ভঙ্গ ঘটে গেছে। রঞ্জুকে বলে, "তুমি যখন প্রেমে পড়েছিলে এখনো ভুল করনি। প্রেমের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এখনো ভুল করছ না। অনিচ্ছুককে তুমি ইচ্ছুক করবে কোন জাদুবলে? যখন ওর নিজের ইচ্ছা হবে ততদিন যদি তুমি আর-কোনোখানে বাঁধা পড়ে না থাক তবে তুমিই ওকে মুক্ত করবে। এখন তুমি তোমার আপনাকে মুক্ত কর।"

প্রেম কি কারো প্রজা যে, "আয়" বললেই আসবে, "যা" বললেই যাবে? রঞ্জু যাই বলুক না কেন তার প্রেম তা শোনে না। প্রেমের সম্পর্কটা চুকে গেলেও প্রেম যেমন ছিল তেমনি থাকে। রঞ্জুও তার উপর জোরজুলুম করে না। তার স্বভাব নয় জোর খাটানো। অন্যের উপরেও না। আপনার উপরেও না।

তবে সে সর্বতোভাবে স্বাধীন থাকতে চায়। যদি আর কারো প্রেমে পড়ে প্রেমের স্বাধীনতা তার থাকবে। গোরীর প্রেম তার অন্তরায় হবে না। বৃন্দাবনে যদি কানু বিনা আরো পুরুষ থাকে তবে রাধা বিনা আরো নারীও কি নেই? তাদের জন্যে দুয়ার খোলা রাখার নামই পুরুষের মুক্তি। মুক্ত মানে [illegible]।

একদিন কানন এসে খোঁচা দেয়। "কি হে, কৃষ্ণ! তুমি তো বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় [illegible]। ওদিকে রাধা বেচারির কী দশা হবে। তোমার নামে কলঙ্ক রটবে যে তুমি একটি অভাগিনী নারীকে পাগলিনী করে পথে বর্জন করলে। ছি ছি! কী কাঠ হৃদয়! পারুলদির কান্না যদি দেখতে।"

ইতিমধ্যেই সে গোরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে। ওর মতো অসুখী আর কে? ও বলে নিজের সুখের জন্যে কোলের ছেলেকে তো বিসর্জন দিতে পারে না।

রঞ্জু চুপ করে থাকে। গোরীর কাছে ওরকম প্রত্যাশা করা ওর উচিত হয়নি। ওটা ওর ভুল। গোরী যে অমন প্রস্তাবে রাজী হয়নি সেটা সকলের ভাগ্যের জন্যেই। রঞ্জুর দিক থেকেও ভালো। একটি পুত্রবিরহিতা জননীকে নিয়ে বিদেশে ও নিজেই নাজেহাল হতো।

"শোন, তোমার সঙ্গে আরো কথা আছে" কানন বলে, "পারুলদির সঙ্গে তোমার একবার শেষ দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওকে তো কেউ আসতে দেবে না। তোমাকেই যেতে হবে। তুমি কবে যাবে বল। আমিই তোমাকে আবার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। ওদের নতুন বাড়ি তো তুমি চেনো না।"

রঞ্জু বলে, "বেশ তো। তুমিই একদিন নিয়ে যেয়ো।"

দুই বন্ধুতে মিলে একটা দিন ফেলা গেল। কথা রইল যে দেখা করেই পরবর্তী ট্রেনে ফিরে আসবে। রাত্রে থাকবে না। কলকাতায় মেলা কাজ ছিল।

গোরীর সঙ্গে প্রথম দর্শনের মতো শেষ দর্শনও সেই গোধূলিবেলায়। মাঝখানে দু' বছরের চেয়ে কিছু বেশী ব্যবধান। বৈশাখ নয়, আষাঢ়।

যশোবাবু রঞ্জুকে পরম ভদ্রতার সঙ্গে স্বাগত করেন ও তার কৃতিত্বের জন্যে অভিনন্দন জানান। তারপর দোতালার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে খসখসের পর্দার আড়ালে বসিয়ে দেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে

নদীর দৃশ্য দেখা যায়। রঞ্জু উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কখন এক সময় গোরীর আবির্ভাব। ট্রে হাতে। যশোবাবু দু' চার কথার পর নিচের তলায় নেমে যান কাননকে নিয়ে। বাগান দেখাবেন।

ও মেয়ে কে'দে কে'দে চোখ দুটিকে জবাফুল করেছে। কেশও অবিন্যস্ত। রঞ্জু আসছে বলে সাজসজ্জারও বিশেষত্ব নেই। বিষাদের প্রতিমা। তবে খুশিরও আমেজ লেগেছে রঞ্জুকে এতদিন পরে আবার কাছে পেয়ে।

গোরীই প্রথম কথা বলে। "ভেবে দেখছি আমার মুক্তি এককালীন হবার নয়, কিস্তিতে কিস্তিতে হবে। উনি আমাকে এর মধ্যে বেশ খানিকটে মুক্তি দিয়েছেন। পরে আরো দিতে রাজী হয়েছেন। ইংরেজের পলিসি আর কী! দেখাই যাক না সত্যরক্ষা করেন কি না। যদি বুঝতে পারি ওটা একটা ভাওতা আমিও একদিন যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাব। তোকে আর বিব্রত করব না। ততদিনে তুই হয়তো আর কোনো রূপবতীর রূপে বিভোর বা গুণবতীর গুণে মুগ্ধ। জগতে কত নারী আছে, ওদের সঙ্গে প্রেমের প্রতিযোগিতায় আমিই যে শীর্ষস্থান অধিকার করব সে আত্মবিশ্বাস কি আমার আছে? আমি তোর অতীত হতে পারি, আমি তোর ভবিষ্যৎ নই। তোকে আমি আটকে রাখব না, ধন। রাখতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ত্রিভুবন ঘুরে একদিন যদি অনুভব করিস যে আর কেউ তোকে আমার মতো ভালোবাসে না, যদি তোর প্রত্যেকটি ভালোবাসা ব্যর্থ হয় তা হলে আবার আমার দিকে ফিরে তাকাস, নইলে আর ফিরে তাকাসনে।"

রঞ্জুর কণ্ঠস্বরেও তেমনি আবেগ। "তোর মতো ভালোবাসা কেউ আমাকে কখনো বাসেওনি, বাসবেও না, গোরী। তুই এক ও অদ্বিতীয়। তোর কথা ভেবে আমার হৃদয়ে আজ বিষাদ ভিন্ন আর কোনো ভাব নেই। এ বিষাদ এত প্রগাঢ় আর এত গভীর যে দুটো বছর এর কাছে কিছু নয়। একটি প্রেমবতী অবলা নারীকে আমি পরিত্যাগ করে যাচ্ছি এর মতো অপরাধ আর কী হতে পারে! যে প্রেম ধ্রুব তাকে ফেলে আমি অধ্রুবের আশায় ছুটেছি। এর মতো মূঢ়তাই বা কী আছে! তবু এটাও সত্য যে আমি তার জন্যে মুক্ত থাকতে চাই যে আমাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বস্ব সমর্পণ করবে। সানন্দে আমার সন্তানের জননী হবে। আমার জীবনের সঙ্গে জীবন জুড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবে।"

গোরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "ওরে ক্ষ্যাপা, তোকে দোষ দিচ্ছে কে? আমি তো নয়। আমার জীবনের সাধ আমি হব বিপ্লবী নায়িকা। তোর সঙ্গে গেলে কি আমার সে সাধ পূর্ণ হবে? বলতে গেলে আমিই তোকে পরিত্যাগ করছি। আমিই অপরাধী। তারপর তুই যাকে চাস সে একটি সীতা কি সাবিত্রী। যে নারী স্বয়ংবরা হবে। কিন্তু পুরাণে কি লিখেছে ওরাই প্রেমিকার শিরোমণি? না রে, ও'দের উপরেও ঠাঁই রাধা নামে একটি গোপীর। রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি।"

একাধারে রাধা আর বিপ্লবী নায়িকা! এ নারীর সঙ্গে ছন্দ রেখে জীবনের পথ চলবে কে? এ পুরুষ তো নয়। সে পুরুষোত্তম আজ এখনি দৃশ্যমান না হলেও পরে একদিন হবেন। তখন গোরীর জীবনে ছন্দ আসবে।

রঞ্জুও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "কোনো দুটি প্রেম একই রকমের হয় না। আমাদের এ প্রেম অদ্বিতীয়। আমরা সত্যরক্ষা করব প্রেমিকের কাছে বা প্রেমিকার কাছে না হোক, প্রেমের কাছে। ভালোবাসা চিরদিন থাকে না। যে ক'দিন থাকে সেই ক'দিন যেন আপনার

কাছে সত্য হয়। তুই আমাকে, আমি তোকে সত্যই ভালোবেসেছি, গোরী। কিন্তু এর পরে যদি ভালোবাসাকে টেনে লম্বা করতে যাই ওটা আর সত্য থাকবে না। অসত্য নিয়ে আমরা কী করব, গোরী?"

"আমি যে এ জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারব, এ আমার বিশ্বাস হয় না, মানিক। তোর কথা আলাদা। নারীর কাছে পুরুষের যত কিছু পাবার আছে তা যখন মেটাতে পারছিনে, পারব কি না অনিশ্চিত, তখন তোর পাওনা তুই আর কারো কাছে পাবি। আমি কিন্তু আমার এই মানিকটিকেই আঁচলে বেঁধে রাখব। আর আমার কপালে সইবে না।" গোরী চোখে আঁচল দেয়।

রঞ্জু তার দুটি হাত ধরে বলে, "রাধে, তোর প্রেমের ঋণ কি এ জন্মে ভুলতে পারি? প্রেমের পরীক্ষায় তোরই জয় হয়েছে, আমার হয়নি। যে পরীক্ষায় আমি জিতেছি সেটা প্রেমের পরীক্ষার মতো অত কঠোর নয়। গোরী, তুই আমার চেয়ে বড়। আমার সুপিরিয়র। তুই বিজয়িনী। আমি তোকে বন্দনা করি।"

গোরীর দুটি গাল বেয়ে ধারা বয়ে যায়। রঞ্জু একটু ঝুঁকে পড়ে দুই হাত দিয়ে মুছিয়ে দেয়। দিতে দিতে কী যে খেয়াল হয়, আচমকা ওর একটি গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে দেয়। গোরী চমকে উঠে সরে যায়। তারপর সরে এসে এদিক ওদিক চেয়ে ত্বরিত প্রতিদান দেয়। তারপর ছুটে পালিয়ে যায়।

এদিকে প্রেমের দেবতা হাল ছেড়ে দিয়ে বসলেও ওদিকে বিবাহের দেবতা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। প্রজাপতির নির্বন্ধে রঞ্জুকে তার কাকার এক বন্ধুকন্যার পাণিগ্রহণ করতে হবে। এ বাড়িতে পণগ্রহণ হয় না বলে ওঁরা প্রস্তাব করেছেন যে রঞ্জু যদি ওর বধূকে বিলেত নিয়ে যেতে চায় তবে যাবতীয় খরচ ওঁরাই বহন করবেন। ক্যা মজাদার মওকা! ওটা কিন্তু এমন নির্বোধ যে সরাসরি "না" বলে দেয়। পাছে কেউ তর্জমা করে "না" মানে "হাঁ" তাই বাবাকে চিঠি লিখে জানায় যে এ জীবনে সংসারী হতে ওর ইচ্ছা নেই।

বাবা ওর তর্জমা করেন এই বলে যে ছেলে তাঁর সন্ন্যাসী হবে। তিনি দারুণ শোক পান। সে বাড়ি ফিরে গেলে তার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করেন। শেষে খোলাসা করে বলতে হয় যে সংসারী না হওয়ার অর্থ সন্ন্যাসী হওয়া নয়, বিবাহ না করা। ব্যাপারটা আরো খোলাসা হত যদি সে সাহস করে বলত যে সে অন্য একটি মেয়ের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিণয়ের জন্যে নয়, মুক্তির জন্যে। ওটা এমন একটা প্রহেলিকা যে তাঁর কাছে সহজবোধ্য হত না। হয়তো আরো শোক পেতেন। তাই সত্য গোপন করতে হয়।

ফলে রঞ্জুর মনে অস্বস্তি। অস্বস্তি ক্রমে ক্রমে অসুখে দাঁড়ায়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিতে দিতে শরীর মন নিঃশেষিত। প্রেমের পাট চুকিয়ে দিতে গিয়ে হৃদয় নিঃশেষিত। এখন নির্দিষ্ট দিনে রেলপথে বম্বে অবধি গিয়ে জাহাজ ধরতে পারলে হয়।

ওদিকে ইউরোপ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অন্তরালবর্তিনী মোহিনীর মত। একটা দিনও তার তর সইছে না। এদিকে তো ত্রিশঙ্কুর মত ন যযৌ ন তস্থৌ। অবশেষে আর থাকতে না পেরে সে রোগীর পথ্য সম্বল করে পথে বেরিয়ে পড়ে। তার বাবা আশীর্বাদ করেন যাত্রা শুভ হোক।

গোরীর সঙ্গে চিঠি লেখালেখির বিরাম ছিল না। কিন্তু সুরটা আর প্রণয়ের নয়। ওরা এখন আবার ভাইবোন। রঞ্জুর ধারণা গোরী ওটা গ্রেসফুলভাবে মেনে নিয়েছে। দুজনে দুজনের কাছে বিদায় নেয়। পুনর্দর্শনায় চ। পুনর্দর্শনায় চ।

বম্বেতে পা দিয়ে রঞ্জু দেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে একটি বিস্ময়। একটি পার্সেল। আবিষ্কার করে ওতে আছে একখানি নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়। খদ্দরের তৈরি তার উপর রুপালি কাজ। সেই সঙ্গে একটি রেশমী রুমালে বাঁধা কী এক অপূর্ব বস্তু খুলে দেখে, গুচ্ছ গুচ্ছ ঘন কৃষ্ণ অলক কাঁচি দিয়ে কাটা। কী নির্মম! কী করুণ! নারীর কেশের গুরুভার কি ও বইতে পারে? জাহাজের ডেক থেকে নির্জন দেখে সে কেশ বাতাসে ভাসিয়ে দেয়। এক ঝাঁক পাখীর মত গুচ্ছ গুচ্ছ অলক উড়ে চলে অলকার অভিমুখে।

সমাপ্ত
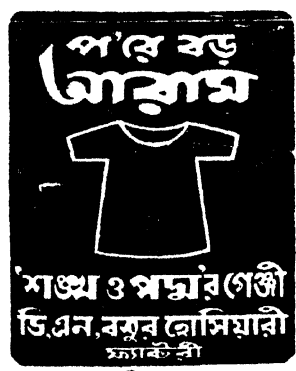
মে-দিবস এবং ভারতের শ্রম-আন্দোলনের একটি দিক

বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর নিজের দাবি বা অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সূচনা বহুদিন আগেই হয়েছিল এবং মে-দিবস সেই ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিকরা আজ সংহত হচ্ছেন। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী যতটা সুসংহত, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ততটা নয়। তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যথেষ্ট উন্নত। ধনতান্ত্রিক দেশই হোক আর সমাজতান্ত্রিক দেশই হোক, শ্রমিকদের কয়েকটি সাধারণ দাবি সব দেশেই সমান। শ্রমিকরা সেই দাবি আদায়ের সংগ্রাম করে থাকেন ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারাও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দল এবং শ্রমিক সঙ্ঘ গঠনকারী রাজনৈতিক দল একটিই এবং সেজন্য সরকার এবং শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে সর্বদাই মতৈক্য থাকে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘের দায়িত্ব হল উৎপাদন বৃদ্ধির হার যাতে বজায় থাকে এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বুনিয়াদ যাতে আরও সুদৃঢ় হয় সেজন্য সরকারকে সাহায্য করা। কিন্তু যে সকল দেশ পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক নয় এবং যে সকল দেশ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়—সেই দেশগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণকারী রাজনৈতিক দলই যে সরকার গঠন করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রিটেনে যখন শ্রমিক দল সরকার গঠন করেছিল তখন শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-অশান্তি খুব কম ছিল; কিন্তু রক্ষণশীল দল সরকার গঠন করার পর শ্রমিক-অশান্তি তীব্র আকার ধারণ করে। আবার রক্ষণশীল সরকার এমন আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে যখন খুশী তখনই শ্রমিকরা ধর্মঘট না করতে পারেন। আসল কথা হল—অধিকাংশ দেশেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশি—তাই আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলাদলির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দলাদলি জড়িত। ভারতের মত উন্নতিশীল দেশে এ ধরনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী হতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, লাগাতার ধর্মঘট ঘোষণা করার আগে বহু শিল্প অথবা কারখানায় শ্রমিকদের গোপন গণভোট নেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলির নীতির প্রতি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে হয়েছে। এজন্য সর্বত্র যে শ্রমিক-স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছে তা নয়।

কিন্তু মে-দিবসের আহ্বান শ্রমিকদের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান—বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক-স্বার্থ রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে রেখে শ্রমিকদের এগিয়ে যেতে হয়। সেজন্য বিশ্বের সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এ দিনটি পালন করে থাকেন এবং নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাকে জোরদার করার শপথ নিয়ে থাকেন। তবে শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব দ্বিবিধ। একদিকে যেমন শ্রমিকরা নিশ্চয়ই তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন; অপরদিকে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের পক্ষে যা কিছু করণীয় তা করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাবেন, সাধারণ মানুষ এটাই প্রত্যাশা করেন। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে শ্রমিক শ্রেণীরও শ্রীবৃদ্ধি অবশ্য যদি শ্রমিক শ্রেণী বর্ধিত উৎপাদন এবং বর্ধিত জাতীয় আয়ের সুফল লাভ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হল জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন করা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে, তাঁদের মধ্যে সেই বর্ধিত উৎপাদনের বা বর্ধিত আয়ের একটি ন্যায়-সঙ্গত অংশ বণ্টন করা। যদি দেশের শ্রমিক শ্রেণী তাদের প্রয়োজনীয় মজুরি এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকেন—অথবা বিকল্প-ভাবে বলতে গেলে সরকার যদি শ্রমিক-স্বার্থ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সচেতন থাকেন, তবে উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবদান আরও বেশি হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দেশে অসুবিধা হল, কোন ট্রেড ইউনিয়নকে নিয়ন্ত্রণ করে যে রাজনৈতিক দল, সেই দল যদি মন্ত্রিসভা গঠন করতে না পারে এবং সরকার যদি অন্য কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা গঠিত হয়, তবেই সেই ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি অনুগত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সরকার শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী। যদিও ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের দ্বারা প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের দ্বারা প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত খুবই কম, তবুও শ্রমিক স্বার্থ বজায় রাখার পন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই দুইটি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ খুবই বেশি। নবগঠিত কংগ্রেস সরকারও একটি ট্রেড ইউনিয়নকে (ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) যথেষ্ট প্রভাবিত করে থাকেন। এক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষেও সর্বদা সঠিক পথ খুঁজে নেওয়া কঠিন হয়। কারণ, যত মত, তত পথ! অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে চায় না, সব দলের নেতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা হল যতটা সম্ভব শ্রমিক সমর্থন আদায় করা; কেননা, নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় সামিল হয়ে নিজেদের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ যুগপৎ বজায় রাখা। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পপতিদেরও একথা ভেবে দেখা দরকার যে, শ্রমিকদের সহযোগিতা না পেলে তাঁদের পক্ষে শিল্পোৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। সেজন্য এমন একটি আবহাওয়া তৈরি করার জন্য সবাইকে চেষ্টা করতে হবে যেখানে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক তিক্ত না হয়। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী যখন মে দিবস উদ্‌যাপন করছেন, তখন বহু কলকারখানা বন্ধ, বহু শ্রমিক বেকার এবং তাদের পরিবারবর্গ অভুক্ত অথবা অর্ধভুক্ত। কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল তা ভেবে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের দায়িত্বের চেয়েও বেশি দায়িত্ব হল রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের এবং সরকারের। দেশকে সবাই ভালবাসেন এবং দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সবারই কাম্য; সেই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে জোরদার করার প্রচেষ্টায় সবাই কি সামিল হতে পারেন না? রাজনৈতিক দলাদলিকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করা কখনই উচিত নয়।

সুব্রত গুপ্ত

॥ ১৩ ॥

'আমি কবি রামানন্দ সেনের কাছে এসেছিলাম।'

'আমিই রামানন্দ সেন।' উৎসাহের সঙ্গে রামানন্দ বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরও হয়ে গেল। তার যেন মনে হল পরিচয়টা মহিলার কাছে গোপন করাই উচিত ছিল। গোপন করলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত কি।

একটা অস্বস্তি নিয়ে রামানন্দ তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে মাধুরী ও শফাকে দেখল।

দুজন আর বসে নেই। উঠে দাঁড়িয়েছে। মাদার ঝোপের ছায়ায় দাঁড়িয়ে চোখ বড় করে এদিকে তাকিয়ে আছে। বেশ মনোযোগ দিয়ে নতুন মানুষটিকে দেখছে। চমৎকার শাড়ি জামা পরনে। মুখখানাও সুন্দর। ফরসা রং। জুতোর ওপর নকশা করা শায়ার লেসটা উঁকি দিয়ে আছে।

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

'পাইকপাড়া।'

'হঠাৎ এখানে? আমার কাছে?' রামানন্দ ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকাল। মহিলার পায়ের জুতোয় প্রচুর ধুলো লেগেছে। বোঝা যায় তিনি অনেক হেঁটেছেন।

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কদিন ধরেই চেষ্টা করছি। কাল আপনার স্কুলে গিয়েছিলাম, শুনলাম ছুটি নিয়েছেন।'

হুঁ, রামানন্দ মনে মনে বলল, এই ছুটিই ছুটি। আর আমার স্কুলে 'ফেরে যাওয়া হবে না।

চাকরিটা সে ছেড়ে দেবে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে।

'স্কুলে তো আমি ঠিকানা দেইনি, মানে এখানকার ঠিকানা, আপনি কার কাছে খোঁজ পেলেন?' গলার স্বরটা রুক্ষ করে ফেলল রামানন্দ। চোখ ছুঁচলো করে মহিলার মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু ভদ্রমহিলা সেইজন্য অসন্তুষ্ট হল না। অথবা এমন একটা মন ভোলানো হাসি হাসল, ভিতরের অসন্তোষ বা রাগ প্রকাশ পেতে দিল না।

শফী ও মাধুরী একভাবে এদিকে তাকিয়ে আছে। তারা নিশ্চয় বুঝতে পারছে মাস্টার বিরক্ত হচ্ছে, অথচ মেয়ে-ছেলেটি বেশ ধৈর্য রেখে হাসিমুখে কথা বলছে। এই জন্য তারা অবাক হচ্ছিল বইকি। কৌতূহলও তাদের কম হচ্ছিল না। দুটি মানুষের চোখ দেখে রামানন্দ বুঝতে পারছিল।

'আপনার ঠিকানা জানা ছিল না, পুরোনো বাসা ছেড়ে দিয়েছেন, আপনার স্কুলে খোঁজ নেবার আগে কলেজ স্ট্রীটে আপনাদের পদাবলী অফিস সেই চায়ের দোকানেও আমি গিয়েছিলাম।'

রামানন্দ প্রমাদ গনল।

'কি বলল ওরা? কার সঙ্গে কথা হয়েছিল?'

'সকলেই ছিলেন। শুভেন্দুবাবু বিকাশবাবু নবকিশোর অরুণাভ, সকলের সঙ্গেই সেদিন পরিচয় হল।'

'আপনি কি পদাবলী নিয়মিত পড়েন?'

'আমি পদাবলীর গ্রাহিকা। আমার নাম হেনা সেন। রাণী পার্বতীসুন্দরী কলেজে আমি পড়াই।'

অধ্যাপিকার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রামানন্দ নতুন করে চোখ বুলোল।

'ওরা কেউ আমার এখানকার ঠিকানা জানে না। এই জনাই জিজ্ঞেস করছি, ঠিকানাটা কোথা থেকে আপনি যোগাড় করলেন।' যেন রামানন্দ পাল্টা জেরা আরম্ভ করল।

হেনা সেন মুখের হাসি বিলীন হতে দিল না।

'আমাদের পাইকপাড়ার সোনালী বাসর, একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, আপনি নাম শুনেছেন কিনা জানি না।'

'না, শুনিনি।' রামানন্দ সজোরে মাথা

ঝাঁকাল। 'আপনি সেখান থেকে এসেছেন বুঝি?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনার লেখা শুধু ভালবাসি বললে সবটা বলা হয় না, একজন ভক্ত পাঠিকা আপনার, আমাদের সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েরাও আপনার লেখার ভীষণ ভক্ত।'

'দেখুন।' রামানন্দ চোখ দুটো ছোট করে ফেলল। 'অনেকদিন আমি লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। পদাবলীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন, কার কাছেই বা আমার ঠিকানা পেলেন কিছুই আমি জানি না। যাই হোক, যে উদ্দেশ্য নিয়েই আসুন বা যেখান থেকে আমার ঠিকানা জোগাড় করে থাকুন—আপনাকে শুধু একটা কথাই আমি বলব যদি লেখার জন্য এসে থাকেন আপনাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। আমি কবিতা লিখি না, কাউকে লেখা দিই না।'

'না, লেখার জন্য আমি আসিনি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' ঝলক দিয়ে হেনা সেন হেসে উঠল।

মেয়েটা কেমন বেহায়া। মাধুরী বিড়বিড়

রাস্তাঘাটটা জেনে নিয়ে আমি আজ নিজে এলাম—'

'আপনি ওদের কে? অ বুঝেছি—ওই ক্লাবের একজন কেউকেটা, তাই তো?'

চেহারাটা এবার এত বিকৃত করে ফেলল রামানন্দ, হেনা সেন তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'আমি সোনালী বাসরের সেক্রেটারী।'

'তাই তো বললাম, আপনি ঐ চক্রের কুলকুণ্ডলিনী, দুনিয়ায় এত জিনিস থাকতে বেছে বেছে রামানন্দ সেনের কবেকার একটা পচা লেখা, কোনোদিনই যা কেউ পড়েনি নগ্ন গোধূলি অভিনয় করবেন—আপনার বুদ্ধির বলিহারী!'

হেনা সেন আবার ঝলক দিয়ে হাসল।

'আপনি বলতে পারেন ওটা আপনার একটা অতি সাধারণ বাজে লেখা—কিন্তু আমাদের কাছে এ কী জিনিস আপনাকে বোঝাতে পারব না! সোনালী বাসরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ওই নাটিকা আমরা মঞ্চস্থ করব ঠিক করেছি। হ্যাঁ, একদিনই অভিনয় হবে। আগামী বাইশে মার্চ সন্ধ্যেবেলা। আপনাকে অনুমতি দিতে হবে।'

'একদিন কেন!' রামানন্দ বজ্র করে ভেংচি কাটল। 'সহস্র রজনী ওই ছুঁচোর কেত্তন চালিয়ে যান। আমার আপত্তি নেই। ঢিল ছোঁড়া আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে থাকুন।'

হেনা সেন আর হাসল না। রুমাল দিয়ে চেপে চেপে কপালের ঘাম মুছল। যেন তার আরো কিছু বলার আছে। রামানন্দর মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইল।

'কি হল। কিছু বক্তব্য আছে আপনার? না কি লিখিত অনুমোদন চাইছেন?'

হেনা সেন সুন্দর করে গ্রীবা নাড়াল।

'আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট।'

'তা হলে—' রামানন্দ থেমে গেল। মুখ ফুটে কি করে আর এক ভদ্রমহিলাকে চলে যেতে বলা চলে। একটা দারুণ বিতৃষ্ণা তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। চোখ তুলে রামানন্দ গাছের ডালে শালিক বুলবুলি দেখল। তারপর চোখ নামিয়ে, পাছে মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়, ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশে দাঁড়ান শফরীকে মাধুরীকে দেখল। 'কিরে শফরী, তোদের মেলায় যাওয়া ঠিক হল?' যেন এখানকার প্রসঙ্গ শেষ, ভদ্রমহিলাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে রামানন্দ চেঁচিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে গেল।

শফরী ও মাধুরী একটু লজ্জা পাওয়ার মতন ঠোঁট টিপে হাসল এবং একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চুপ করে রইল।

হেনা সেনও ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার সুন্দর চেহারার মেয়েটিকে ও কালো ছিপছিপে লুঙ্গি গেঞ্জি পরা মাথায় কোঁকড়া চুল কিশোরকে দেখল। বস্তুত এরা কারা হেনা ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না। কবি রামানন্দ সেন বিবাহিত সে জানে। কিন্তু এই মেয়েটি যে তার স্ত্রী না এই সম্পর্কে সে নিশ্চিত ছিল। কেননা রামানন্দর বয়সের তুলনায় মেয়েটি অনেক বেশি কচি। তা ছাড়া রামানন্দ অপুত্রক, হেনা কার মুখে যেন শুনেছিল। কাজেই এরা হয়তো কবির আত্মীয়-টাত্মীয় হবে।

'এঁরা মেলায় যাচ্ছেন বুঝি?' হেনা নতুন করে হাসতে চেষ্টা করল।

'হ্যাঁ, নাওভাঙ্গার চড়কের মেলা। আমিও যাব!' রামানন্দ মোটা গলায় উত্তর করল।

'খুব ভাল। গাঁয়ের মেলা সত্যি দেখবার মতন। এই যন্ত্রসভ্যতার যুগেও যে আমাদের এইসব মেলাটেলা কীর্তন যাত্রা কবি কথকথাগুলো এখনো বেঁচে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়।'

'হ্যাঁ অবাক হতে হয়।' রামানন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে থুথু ফেলল। কটকট করে মহিলার মুখ দেখল। এবার তাকে অন্দ হতেই হবে। 'তা হলে এই জন্যই আপনার এখানে আসা! আমার নগ্ন গোধূলি মঞ্চস্থ করতে চাইছেন, এই তো?'

'আমার আর একটা আবেদন আছে।'

'কী আশ্চর্য, আবার আপনার আবেদন থেকে যাচ্ছে—' রামানন্দ গর্জন করে উঠল।

'বিশেষ কিছুই না, আমরা নিজেরা এসে আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাব, সেদিন মানে বাইশে মার্চ সন্ধ্যেবেলা আমাদের সোনালী বাসরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। আপনার কোনো কষ্ট হবে না, বেশিক্ষণ আপনাকে ধরে—'

'দেখুন—' রামানন্দ হেনা সেনকে শেষ করতে দিল না, উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপছিল, পাছে না একটা নাটকীয় কিছু করে ফেলে, নিজেকে সংযত করার জন্য মহিলার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে মাথার ওপর গাছের পাতা দেখতে লাগল। 'আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এবার দয়া

করে আপনি চলে যান।' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রামানন্দ কথাটা বলল।

'আমাদের এই একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।'

'আপনি যে দেখছি—আশ্চর্য, কী বলব!' যেন রামানন্দ সঠিক সংজ্ঞাটা ঠিক করতে পারছিল না। 'কোনোরকম সভাসমিতি ফাংশন জলসা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি যাই না, কোনোদিন কোথাও গেছি বলে মনে পড়ে না, আর আজ তো সাহিত্য টাহিত্য আমার চোখের বিষ, আমি হাঁস-মুরগি নিয়ে আছি—আপনি অন্য কোনো কবি সাহিত্যিক দেখুন।'

'না, তা কি করে হয়। সোনালী বাসরের ছেলেমেয়েরা আপনাকেই চাইছে, আপনার কাব্যনাটিকা আমরা অভিনয় করছি—আমাদের সকলের ইচ্ছা সেদিন আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন।'

'হবে না হবে না!' রামানন্দ চিৎকার করে উঠল।

শফী ও মাধুরী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। উঁহু, ছেলে পড়ানোর ব্যাপার না, যেন অন্য কিছু, কিন্তু কী সেই জিনিস? মাস্টার ওই মেয়েছেলেটির সঙ্গে কি নিয়ে এত তর্ক করছে বুঝতে না পেরে তারা অস্বস্তি বোধ করছিল। মাধুরী জানত, অক্ষয়ের কাছে রামানন্দ জিনিসটা গোপন করেনি, স্ত্রীর সঙ্গে মাস্টারের অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। অক্ষয় বা মাধুরী রামানন্দর স্ত্রীকে কখনো দেখেনি। হঠাৎ এই মেয়েছেলেটিকে এখানে দেখে মাধুরীর একবার সন্দেহ হয়েছিল, এই কি মাস্টারের বউ? না, তা কি করে হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী মাথা নেড়েছে, মাস্টারের বয়স হয়েছে, রগের কাছে দু একটা পাকা চুল চোখে পড়ে, প্রায় মাধুরীর বয়স না হলেও বেশ একটু বয়স হয়েছে মহিলার, সুতরাং কিছুতেই এটি মাস্টারের স্ত্রী হতে পারে না।

এখন মাধুরীর সন্দেহ হচ্ছিল নাকি একটা আপস মীমাংসার ব্যাপার নিয়ে বউয়ের পক্ষ থেকে মাস্টারের শ্বশুরবাড়ির কেউ এল। যে জন্য এত কথা কাটাকাটি মুখ নাড়ানাড়ি চলেছে?

শফীর কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা রহস্যময় ঠেকছিল।

রামানন্দ সমানে চেঁচাচ্ছে।

'আমি যাব না, যাব না।'

'ছেলেরা কিছুতেই ছাড়বে না।' যেন সেন হাসছিল।

'আপনারা কি জোর করে আমায় ধরে নিয়ে যাবেন!'

'আজকালকার ছেলেদের চেনেন তো! ওদের রোক চেপেছে কবি রামানন্দ সেনকে চাই, না হলে সোনালী বাসরের এ বছরের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকবে, বিশেষ করে এবার রামানন্দর লেখা কাব্য নাটিকা ওরা মঞ্চস্থ করছে।'

'আজকালকার ছেলে!' রামানন্দ খিঁচিয়ে উঠল। 'আমি যাব না, আমায় জোর করে নিয়ে যাবে তাই না? এদিকে গোয়েন্দাগিরি করে আমার ঠিকানাটি খুঁজে বার করা হয়েছে। আঁ, মগের মুলুক পেয়েছে—অরাজকতা চলছে!'

'শুনুন—'

'আমি যাব না, বাস, এই শেষ কথা। আমি আর কোনো কথাই শুনছি না।'

'এটা আপনার পাগলামি, সাহিত্য থেকে দূরে সরে এসেছেন, সাহিত্য আপনার চোখের বিষ—দুদিন পরে হোক দশদিন পরে হোক, সাহিত্যে আপনাকে ফিরে যেতেই হবে, কবিতা আপনাকে লিখতেই হবে—না লিখে পারবেন না, কিন্তু সেটা বড় কথা না, একটা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে সবাই আপনাকে চাইছে সেখানে আপনার না যাওয়াটা কাজের কথা না, সাহিত্যের প্রশ্ন বাদ দিলেও এতগুলো মানুষের আবদার অনুরোধ উপেক্ষা করা, এদের সকলের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করা—সামাজিক দায়িত্বের কথা চিন্তা করেও আপনাকে—'

'হুঁ, এত বড় কথা!' রামানন্দ লাফিয়ে উঠল। 'ভয়ানক বড় বড় উপদেশ দিচ্ছেন যে আমাকে—সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্য! আমি সামাজিক নই, ঘোর অসামাজিক—অসামাজিক আমাজিত অভদ্র—এবার হল তো। যান কোথায় যাবেন, আপনি ফিরে যান, আর আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

থপথপ পা ফেলে রামানন্দ মাধুরীদের কাছে ফিরে গেল। কেমন যেন একটা রহস্যের হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে হেনা সেন একটু সময় সেদিকে চেয়ে রইল, তারপর গাছের ছায়া ছেড়ে রৌদ্র মাথায় নিয়ে গরম বালুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

'মাস্টার, কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল?'

মাধুরীর চোখের দিকে তাকিয়ে রামানন্দ কিছু একটা ভাবল। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি এসব বুঝবে না।'

'মেয়েছেলেটা কোথা থেকে এসেছিল?'

'কলকাতা থেকে।'

'তোমার কেউ হয়?'

'নাঃ' বলতে গিয়ে রামানন্দ পরে থুতনি নাড়ল। 'হুঁ, আমার মাসী হয়।' এবার রামানন্দ মুখটা বিকৃত করে হাসল।

'মাসী!' মাধুরীর চোখ গোল হয়ে উঠল। 'তোমার চেয়ে যে অনেক ছোট।'

'কী মুশকিল! মাসী পিসি বুঝি ছোট থাকতে নেই। মানুষের মামা কাকা বয়সে ছোট হয় না? কি রে শফী!'

'হুঁ, হয় বইকি। আমার ছোট চাচা আমার তিন বছরের ছোট।'

মাধুরী লজ্জা পেল। বুঝতে পেরে রামানন্দ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা করল।

'তবে ঐ কথা রইল। আসছে শনিবার তিনজনে চড়কের মেলায় যাব।'

'দিদি বলছিল সূর্যি ওঠার আগে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

শফীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে রামানন্দ মাধুরীকে দেখল।

'বাঃ, খুব ভাল বলেছ মাধুরী, ঠাণ্ডায়

ঠাণ্ডায় আমরা নাওভাঙ্গা পৌঁছে যাব, চমৎকার হবে।' সকাল থেকেই বুঝি মেলা বসে।'

মাধুরী কিন্তু উত্তর করল না। দূরের সাদা বালুর দিকে চেয়ে রইল। মেয়ে-ছেলেটাকে একটা পাখির পালকের মত দেখাচ্ছিল। ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছে।

'দিদি বলছিল সারাদিন আমরা মেলায় থাকব। দুপুরে একটা গাছতলায় কাঠ জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করব।'

'দারুণ হবে!' চোখ পাকিয়ে রামানন্দ রীতিমত চিৎকার করে উঠল। 'সাংঘাতিক ফুর্তি হয় তা হলে সেদিন। চড়কের মেলাও দেখা হচ্ছে চড়ুইভাতিও খাওয়া হচ্ছে।'

শফরীর দিকে না, মাধুরীর দিকে সরাসরি চোখ রেখে রামানন্দ কথা বলছিল, কিন্তু মাধুরী যেন তখনও সেই মাসীর কথাই চিন্তা করছে।

'তোমার বউয়ের ব্যাপার নিয়েই আজ মাসী এসেছেন, তাই না মাস্টার?'

'বউয়ের বিষয়!' রামানন্দ চমকে উঠল। 'কেন?'

'মানে তোমাদের দুজনের মধ্যে যদি একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়?'

'অ, সেই কথা!' রামানন্দ গলার নিচে হাসল। 'মাথা খারাপ! মাটির পুতুল ভেঙ্গে গেলে তা আর জোড়া যায় না, আর জোড়া লাগিয়ে দিলেও বাচ্চা মেয়েটার তাতে মন ওঠে না, নতুন পুতুল চায়। যে মানুষ ঘর ছেড়ে চলে যায় তার সঙ্গে আর বোঝা-পড়া কি। তা ছাড়া এই ব্যাপারে মাসী-পিসীদের ডাক্তারী অচল।'

মাধুরী নতুন করে ভাবনায় পড়ল।

'হুঁ, খুব আনন্দ হবে মাধুরী। আমি নিজে মাথায় করে হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল নিয়ে যাব।'

মাধুরী ফিক করে হাসল।

'তোমার যেমন বুদ্ধি মাস্টার। নাওভাঙ্গার মেলায় হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল কাঠ তেল নুন সব কিনতে পাওয়া যায়। আমাদের কিছুই এখান থেকে বয়ে নিয়ে যাবার দরকার হবে না।'

'আচ্ছা!' রামানন্দর চোখের তারা নেচে উঠল।

'তবে তো আর কথাই নেই। ঝাড়া হাত-পা নিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

'বুঝলি শফরী', যেন মাসীর চিন্তাটা ভূত হয়ে মাধুরীর মাথায় ভর করেছে। 'ভদ্র-মহিলা নতুন মেয়ের খোঁজ নিয়ে এসেছিল: মাস্টারকে আবার বিয়ে করাবে।'

'এই এতক্ষণ পর সার কথাটি বলতে পারলে।' রামানন্দ হেসে বড় করে মাথা ঝাঁকাল।

'হুঁ, নতুন মেয়ে—নতুন পুতুলের খবর নিয়ে এসেছিল মাসী। বুঝলি শফরী?' রামানন্দ শফরীর দিকে চোখ ফেরাল।

স্যারের বিয়েটিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে শফরী মাটির দিকে চোখ রেখে টিপে টিপে হাসছিল।

'তুমি কি রাজী হয়েছ মাস্টার!' মাধুরীর উৎকণ্ঠা দূর হল না। 'দেখলাম যেন মাসীর সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করছিলে?'

'আহা, আগে তো আমাকে মেয়ে দেখতে হবে। ভদ্রমহিলা চাইছিলেন এখনি তাঁকে কথা দেই—সেটা কি করে সম্ভব তোমরাই বল।'

'না, তা কি করে সম্ভব।' মাধুরী এতক্ষণ পর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারল। 'নিজে পাত্রী না দেখে কক্ষখনো কথা দেবে না, বিশেষ তোমার আগের বউটা যখন এমন করে দাগা দিয়ে ঘর ভেঙ্গে চলে গেল। কি বলিস শফরী—'

শফরী ঘাড় কাত করল।

রামানন্দও নিশ্চিন্ত হল। এদের কাছে এই ভাল। রামানন্দ এককালে কবিতা লিখত, তার কবেকার লেখা একটা পচা কাব্যনাটিকা মঞ্চস্থ করতে পাইকপাড়ার কোন এক সোনালী বাসর উঠে-পড়ে লেগেছে, আর সেই মামলা নিয়ে অধ্যাপিকা হেনা সেন দুপুরের রোদ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে এখানে ছুটে এসেছিল—এই সমস্ত হাবিজাবি কথা মাধুরী ও শফরীর মাথায় ঢুকত না। তাদের মাথার ভিতরটা এখানকার নীল আকাশের মতন ঝকঝকে সুন্দর, পায়ের নিচের দূর্বা-ঘাসের মতন নরম মন। শহুরে সংস্কৃতির হাজার ভড়ং ভাড়ং-এর চেয়ে সরাসরি জন্ম মৃত্যু বিয়ে তারা ভাল বোঝে। হুঁ, রামানন্দ মাস্টারের বউ রামানন্দকে ছেড়ে চলে গেছে, সুতরাং রামানন্দ আবার বিয়ে করবে। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই বলে তারা ধরে নিয়েছে। বিয়ে, গাঁয়ে চড়কের মেলা বসলে দল বেঁধে মেলায় যাওয়া, চড়ুইভাতি খাওয়া, দুপুরের গনগনে রোদে খালের জলে চোখ লাল করে ডুবিয়ে সাঁতার কাটা, মাদার ফুল ফুটলে একমুঠো ফুল চুলে গুঁজে দেওয়া। সংসারে এর অতিরিক্ত কোনো জিনিস আছে বোঝাতে গেলেও এই দুটি মানুষ বুঝবে না।

'আহ্, শনিবারের আগেই যদি মানুষটা বাড়ি এসে যায়! খুব মজা হয়, কেমন রে শফরী?'

অক্ষয়ের কথা বলছে মাধুরী।

রামানন্দ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ, বরং শনিবারটা পার করে অক্ষয় বাড়ি আসুক আমি চাইছি।'

'কেন!' মাধুরী ভুরু কুঁচকোলো।

'এখনো শরীরটা দুর্বল। তেমন করে হাঁটা চলা করতে পারবে না, করা ঠিকও না। আমরা তিনজন হইহই করে মেলায় যাব, আর বেচারা একলা ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকবে। ভীষণ মন খারাপ লাগবে তার।'

কথাটা মাধুরী বুঝল।

'তা-ও বটে। আমাদেরও কষ্ট হবে। সবাই যাচ্ছি, ও যেতে পারছে না।' রামানন্দর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাধুরী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। 'বরং শনিবারটা পার করে বাড়ি আসুক—ঠিকই বলেছ মাস্টার।' যেন বিড়বিড় করে গাছটার সঙ্গে ও কথা বলতে লাগল।

একটা হলদে প্রজাপতি মাধুরীর ফুল গোঁজা খোঁপার কাছে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। শফরীর চোখের পলক পড়ছে না। সেদিকে তাকিয়ে আছে।

রামানন্দর মনে হল এক জোড়া কালো প্রজাপতি। অশান্ত হলদে প্রজাপতিটা উড়ছে। শফরীর চোখের প্রজাপতি দুটো স্থির শান্ত হয়ে আছে।

(ক্রমশ)

হাওয়া বদলের পালা

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

॥ যন্ত্রসভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে প্রকৃতি এবং পরিবেশের মধ্যে যে প্রচণ্ড রকম বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষজ্ঞরা তার জন্যে আতঙ্কিত। মানুষই বিভিন্নভাবে তার সর্বনাশা উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর পরিবেশকে কলুষিত করে তুলেছে। কী ভাবে, কোন রকম জটিল তত্ত্ব বা তথ্যের মধ্যে না গিয়ে অত্যন্ত সাধারণ ভংগীতে বর্তমান নিবন্ধে তারই কিছুটা আভাস দিয়েছেন এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর শিক্ষণ বিভাগের প্রধান এবং কলকাতার লবণ হ্রদ অঞ্চলে ভারতের পরমাণু কমিশনের উদ্যোগে যে সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি বসানোর কাজ চলছে তার প্রজেক্ট অফিসার ॥

এই ভাবে কলকাতা শহরের বুকে টন টন কার্বন কণা ছড়িয়ে পড়ছে... —নিজস্ব চিত্র

পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমে গরম হচ্ছে—একেবারে আক্ষরিক অর্থে গরম, মানে উষ্ণ। নেহাৎ অলীক কল্পনা নয় পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখুন। দেশে বিদেশের পথে বিপথে আজ প্রায় কুড়ি কোটি মোটর গাড়িই চলাফেরা করছে। ঐ সমস্ত গাড়িতে দৈনিক কম করেও কুড়ি কোটি লোক চলাফেরা করবে ঠিকই কিন্তু সেই সংগে প্রত্যেক চলন্ত গাড়ি থেকে প্রতি বছর ৭০০ কিলোগ্রাম কার্বন মনোক্সাইড, ১০০ কিলোগ্রাম হাইড্রোকার্বন, আর ৩৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেনের অক্সাইড, যে বের হয়ে থাকে তারা যায় কোথায়? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঐ সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু হালকা বলে ঊর্ধ্ববায়ুস্তরের দিকে উঠে যায় নইলে যদি তারা পথেঘাটে জমা হত সম্ভবত এতদিন হেনরী ফোর্ডকে মরণোত্তর বিচারের কাঠগড়ায় এনে হাজির করা হত মানুষ মারার গর্হিত অপরাধে অভিযুক্ত করে।

কিন্তু হেনরী ফোর্ড একা কেন অপরাধীরা সংখ্যাতীত। একটি ৩৫০ মেগাওয়াটের কয়লা-চালিত শক্তিকেন্দ্র থেকে প্রত্যেকদিন ৭৫ টন সালফার ডাইঅক্সাইড, ৬ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড ও পাঁচ টন ধোঁয়া বের হয়ে বাতাসে মিশছে। এতে এই সব শিল্পাঞ্চলের লোকেদের নিঃশ্বাসের বেগ নানা অবাঞ্ছিত ব্যাধি ঢুকছে। শিল্পাঞ্চলের টন যাদের, তাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, জামা কাপড় পর্দা প্রভৃতি তাড়াতাড়ি ময়লা হচ্ছে আর ধোঁয়াশার উৎপাতে সকলে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রকৃতি ও চরিত্র অন্যরকম। এ কেবল কারখানার উপরের আকাশে চাঁদোয়ার মত স্থির হয়ে থাকছে না—সমস্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে। জীবজন্তু প্রাণীর প্রশ্বাস ও গাছপালা থেকে সর্বক্ষণই কার্বনডাইঅক্সাইড তৈরী হয়ে বাতাসে জমছে। এটা হল প্রাকৃতিক উপায়ে স্বাভাবিক। তার সংগে যোগ হচ্ছে জ্বালানী পুড়ে বার হওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড, মোটর গাড়ি, কল-কারখানা ও ঘর-গৃহস্থালীর। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা প্রতি লক্ষে ৩২ ভাগ। এ শতাব্দীর মধ্যে এটা বেড়ে হবে লক্ষে ১৫০। কার্বন ডাইঅক্সাইড অংশত অবলোহিত রশ্মি শুষে নেয়। এর ফলে সব বিকিরণজাত তাপ জমা হয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, বায়ুমণ্ডলে যত বেশী এই গ্যাস জমা হবে তত পৃথিবী থেকে বিকীর্ণ তাপ বাইরে যেতে না পেরে আটকে থাকবে এবং সারা পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকবে। এমনই ভয়াবহ যে সে বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে ভরসা হয় না।

শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে অসাবধানতা, অজ্ঞতা ও অবহেলা বশে যে আবর্জনা আমাদের পরিবেশে—স্থলে, জল ও বাতাসে জমা হয়ে চলেছে তার গতি রোধ করতে না পারলে যে সার্বজনীন বিপদ অবশ্যম্ভাবী সেটা বুঝতে একটু সময় লাগল। যখন এই সব পরিত্যক্ত ময়লা পড়ার ফলে কোনো হ্রদ ও নদীতটের জল সাঁতারের অনুপযোগী বলে ঘোষণা করা হয় তখন বুঝতে হবে সেই বিপদকে আর রোধ করা গেল না। এভাবে চলতে থাকলে শেষে সাঁতার কাটার জন্য কোনো জলই অবশিষ্ট থাকবে না। সাঁতার অবশ্য জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। আগে রুটি পেলে তবে তো কেক। সুতরাং সাঁতারের থেকেও জরুরী কাজগুলির জন্য বিশুদ্ধ জলের ঘাটতি যদি হয়? না কি তা ইতিমধ্যেই কোথাও হয়েছে?

এই নিয়ে আন্তর্জাতিক শলাপরামর্শের জন্য বৈঠক বসছে স্টকহলমে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে। ডাকছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। তাই পরিবেশ-বিজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সকলে, এতদিন বাদে। বিপদ ঘটছে শুনলেই

প্রথম প্রতিক্রিয়া আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে পালানো বা কোথাও লুকিয়ে পড়া, কিন্তু বিপদের সময় যাঁরা মাথা ঠাণ্ডা করে ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারেন তাঁরাই বিচক্ষণ। কাজেই ১৯৭২এ বৈঠক বসবে শুনে যদি কেউ ভাবেন সে তো অনেক দেরী ততদিনে যদি দূষিত বায়ু সেবন করে আমরা ভয়ানক রকম অসুখে পড়ে যাই কিম্বা যদি অকালে মারাই যাই তাহলে উদ্যোক্তাদের খুব একটা বিচক্ষণ বলা যায় না। বিশেষজ্ঞরা ভেবে দেখছেন, বায়ুদূষিত এবং সর্বাঙ্গীণভাবে পরিবেশের দূষিত হওয়াটা সময় নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে দেখার বিষয়। সেটা তলিয়ে বুঝে দেখার জন্য সময় চাই বইকি। প্রথমে দেখতে হবে কি কি ভাবে পরিবেশ বিষাক্ত হয়েছে, তারপরে দেখতে হবে সেগুলি বর্জন করা একেবারে অসম্ভব কিনা, যদি না হয় তবে অন্য পথের সন্ধান, অর্থাৎ ভিন্ন জ্বালানীর খোঁজ। এ সবই মোটামুটিভাবে ভাবা ও লেখা হয়ে গেছে। এখন যা বাকি আছে তা হল সকলে একত্রে বসে বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে একটা সংযুক্ত কার্যপন্থা তৈরি করা।

প্রথমে দেখা যাক কি কি উপায়ে পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে। বিবেচনা করে দেখা যাক নোংরাকে বিশেষজ্ঞরা কটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

প্রথম হল রাসায়নিক আবর্জনা। তার সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সবুজ বিপ্লব আমাদের দেশে হয়েছে শুনে কে না আনন্দিত হয়েছেন? কিন্তু কী পথে এই বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হল শুনলে নিশ্চয় যে কেউ আনন্দিত হবার আগে দুবার চিন্তা করবেন। সবুজ বিপ্লব কথার অর্থ শস্যক্ষেত্রে বিপ্লব—চারিদিকে সবুজের প্রাচুর্য। তা সম্ভব হল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে। কৃত্রিম সার যা মানুষের হাতে তৈরি। প্রকৃতির উপর ভরসা করে বসে থাকতে গেলে ক্রমাগত উৎপাদন, মাটির উর্বরতা কমে আসবে, সবুজ বিপ্লব কোনদিনই আসবে না। সুতরাং উৎপাদন বাড়াবার জন্য সার দেওয়া হল, প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার, যে সারের বেশ বড় রকমের একটি অংশ শেষ পর্যন্ত জলে ধুয়ে নদী বা সমুদ্র বা অন্য জলাশয়ে গিয়ে পড়ছে। তাতে যা ঘটছে তাকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিচ্যুত হওয়া। সেই জলটা আর আগের মত বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকছে না। সেই জলের মাছদের কথা ভাবুন। তাদের কাছে সমস্যাটা আরো প্রাণান্তকর। ডি-ডি-টি বা ঐ জাতীয় অন্য কীটনাশক ওষুধ সম্বন্ধেও একই কথা।

রাসায়নিক আবর্জনা ঠিক কীভাবে পরিবেশকে বিষাক্ত করছে সেটা চোখে
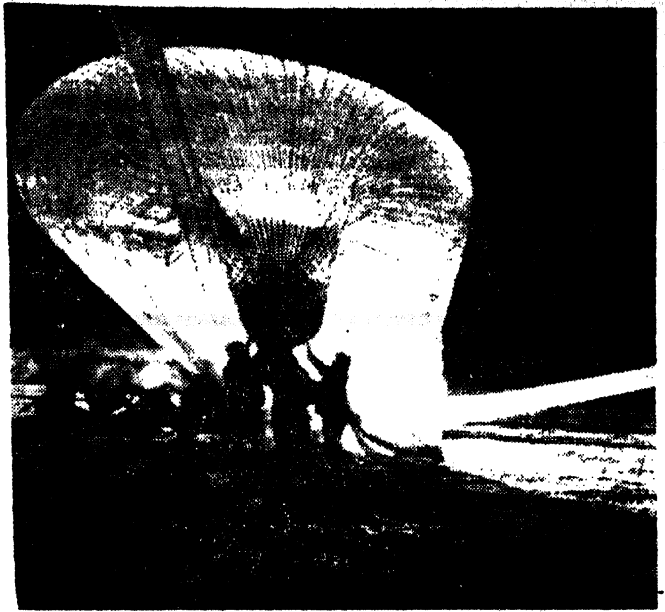
রাতের অন্ধকারে প্রায় চাল্লিশ কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে এই বেলুনটি পাঠানোর আয়োজন প্রায় শেষ করে এনেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। উদ্দেশ্য, সৌর এবং মহাকাশ বিকিরণ কীভাবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে অথবা বেতার বার্তা আদান প্রদানের ব্যাপারে বাধা দেয়, এদের উপর মৌলিক গবেষণা চালান। আকাশে ওঠার পর বেলুনটিকে দেখাবে গ্রীক বর্ণ 'ওমেগা'-র মত। তাই এই প্রকল্পটির ওঁরা নাম রেখেছেন 'ওমেগা'।

দেখা যায় না। আবর্জনার শ্রেণী বিভাগে এর পরে আসছে এমন সব উপদ্রব যেগুলি দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এর মধ্যে পড়ছে ধোঁয়া, ধুলোবালি, শব্দ, জলের উপর ময়লা তেলের স্তর ইত্যাদি। ধোঁয়া ও ধোঁয়াশার ফলে যানবাহন চলাচলে যে অসুবিধা হয়, বিশেষত বিমান চলাচলে, তার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। শব্দের ফলে ক্ষতিটা প্রধানত মানসিক এবং পরোক্ষভাবে কর্মক্ষমতা হ্রাস। সমুদ্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে নোংরা তেল ভাসতে থাকলে সামুদ্রিক পাখি ও জলচর জীবের ক্ষতি তো হবেই, উপরন্তু তেলের জন্য বেশী মাত্রায় আলো ও তাপ বিকিরণ করায় প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওলটপালট হতে পারে।

তিন নম্বর আবর্জনা হল তাপ। তাপকে ঠিক সাধারণ অর্থে আবর্জনা শ্রেণীভুক্ত করা চলে না কিন্তু আমাদের পরিবেশকে যা যা কলুষিত করছে তাকেই সংক্ষেপে আবর্জনা বলে ধরা হচ্ছে। মানব সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে ততই প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে শক্তির চাহিদা ক্রমবর্ধমান এবং তার থেকে অবশ্যম্ভাবী কুফল তাপ অপচয় যা আবর্জনা হিসেবে ক্রমেই বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। প্রতি

কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ক্ষমতা উৎপন্ন করতে ১-৮ কিলোওয়াট ঘণ্টা তাপ শক্তি বাজে খরচ হয়ে যায়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত না হয়ে তাপ হিসেবে ছড়িয়ে যায়। যে কোন পারমানবিক শক্তিকেন্দ্রে এই অপচয়ের পরিমাণ ৩ কিলোওয়াট ঘণ্টা। শক্তি উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে, তার সঙ্গে বাড়ছে শক্তিতে রূপান্তরিত না হওয়া তাপ। এই তাপ জমে জমে ক্রমশ পরিবেশকে করে তুলছে অস্বাস্থ্যকর। আবহাওয়া চক্রে সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে—কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রসঙ্গে। এ ছাড়া যে কোন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র দরকার ঠাণ্ডা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল। এই জল যখন গরম হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে যায় তখন তাতে অক্সিজেনের পরিমাণও হ্রাস পায় যেটা জলজ প্রাণীর পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর।

প্লেনের কথাই ধরুন। সেগুলো উড়ন্ত অবস্থায় প্রতি দশ মিনিটে পোড়ায় ১ টন জ্বালানী। তার থেকে তৈরি হচ্ছে ২ থেকে ৩ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও প্রায় দেড় টন জলীয় বাষ্প। যে উচ্চতায় জেট ও সুপারসনিক বিমানের গতিবিধি সেখানে চট করে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে বিজাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটে না।

কি হতে পারে সেটা অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল।

আবহমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের মাত্রা বাড়লে আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর তার প্রভাব পড়বেই। হয়ত তার প্রভাব কিছুদিন বাদে কিম্বা অনেকদিন বাদে টের পাওয়া যাবে। যেখানেই অনেকদিনের প্রশ্ন আসছে সেখানেই নিজেদের অজান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়তে পারে—যাক এখুনি তো নয়। কিন্তু উনিশ শো পঞ্চাশ সালেও আমরা তো উনিশ শো একাত্তরের কথা ভেবে পরিকল্পনা করিনি। সুতরাং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতেই দেখা যাবে কখন দুম করে উনিশ শো চুরাশী এসে গেছে। তারপর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ।

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁরা ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলছেন, পরিবেশ শুদ্ধিকরণের জন্য দরকার একটি চার-দফা কর্মসূচী। এক—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দুই—আমাদের শক্তি ও সামগ্রীর চাহিদা কমানো, তিন—আবর্জনার পরিমাণ কমানো, চার—যেসব আবর্জনা অবশ্যম্ভাবী সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। যাঁরা এই কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করছেন তাঁদের প্রতি আমাদের সর্বাত্মক সহানুভূতি আছে। তবে শক্তি ও সামগ্রীর চাহিদা কমানোর ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল। যেমন ধরুন এক হাজার কিলোমিটার পথ চলতে একটি গাড়ি ততটা অক্সিজেন খরচ করে যতটা একজন মানুষ এক বছরে করে। তাহলে বলা যেতে পারে এক হাজার কিলোমিটার পথ আপনি গাড়িতে না গিয়ে যদি পালকি চড়ে যান তাহলে খানিকটা অক্সিজেনের সাশ্রয় হয়। পালকি বেহারাগুলো অবশ্য [illegible]। তিন নম্বর—আবর্জনার পরিমাণ কিভাবে কমানো যেতে পারে। যেসব জ্বালানী পোড়ালে বেশী আবর্জনা উৎপন্ন হয় যেমন কয়লা, তার সঞ্চয় এমনিতেই কমে আসছে। সুতরাং পরমাণু শক্তির প্রবর্তন একটা পথ। যেখানে কয়লা চালিত শক্তিকেন্দ্র অথবা কারখানা আছে তার চারপাশ কেমন যেন শ্রীহীন, কালিঝুলি মাখা। গাছপালা নেই বললেই চলে। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে যেহেতু ধোঁয়া বেরোয় না সেখানে পরিবেশটিও কেমন ছিমছাম, ঝরঝরে, ছবির মত, দেখলেই ভালো লাগে।

এত সহজে এত বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এটা খুব আশ্চর্য নয় কি? তাহলে বিশেষজ্ঞদের জানিয়ে দিতে হয় যে, কষ্ট করে স্টকহলমে সামনের বছর তাঁদের সম্মিলিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তার আগেই সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। অপরাধ না নিলে নিবেদন করি, এটা লোকের চোখে ধুলো দেওয়া নয়? পারমাণবিক জ্বালানিতে যদিও ধোঁয়া নেই কিন্তু পারমাণবিক আবর্জনা আছে। [illegible] চাইতেও এমন কিছু খুশী হবার মত নয়। পরমাণু জ্বালানীর কারখানা থেকে যেসব পরিত্যক্ত বস্তু বেরোয় সেগুলি প্রধানত তেজস্ক্রিয়। তাদের মধ্যে কোন কোনটিকে প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যেতে পারে। কোনটি একেবারেই নিষ্প্রয়োজনীয়। তাদের বিশেষ ব্যবস্থা করে আলাদা জমা রাখা হয়। নদীতে সমুদ্রে ফেলা হয় না। তেজস্ক্রিয় পদার্থের কোনটির আয়ু বেশি কোনটির কম। সেই অনুযায়ী তাদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা আছে।

তাপের অপচয় বন্ধ করার ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত তেমন কোন উপায় উদ্ভাবিত হয়নি, কিন্তু রাসায়নিক আবর্জনার পরিমাণ চেষ্টা করলেই অনেকটা কমানো যেতে পারে। কিছুটা [illegible] শিল্পপতিরা, কিছুটা জনসাধারণ। বিজ্ঞানীরা শিল্প-

উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচা মাল নির্বাচনে সাহায্য করতে পারেন যাতে করে কারখানায় অপ্রয়োজনীয় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী উৎপন্নের পরিমাণ কমে যায়। আর জন সাধারণের কর্তব্য, তাঁদের গৃহস্থালীর আবর্জনা, অথবা পথ চলতে গিয়ে কাগজ টিনের কৌটো, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, প্রভৃতি তাঁরা যেন এলোপাথারি নিক্ষেপ না করেন।

কিন্তু কেবল যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতার ব্যাপক বিস্তার হলেই যে পরিবেশে আবর্জনা বাড়বে সেটা ঠিক নয়। আমাদের পরিবেশ বিষাক্ত করছে প্রচণ্ড জনসংখ্যার চাপ। পৃথিবীর গড় জনবসতি যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২২ আমাদের সেখানে ১৩৩। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২২, আমাদের সেখানে ১৩৩। কলকাতা ও বৃহত্তর বোম্বাইতে জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গকিলোমিটারে যথাক্রমে ৫০,০০০ ও ৩৫,০০০। অনুমান করা যেতে পারে কলকাতার প্রতি বর্গকিলোমিটারে অন্তত পাঁচ/ছ হাজার টন এবং [illegible] পরিমাণ আবর্জনা [illegible] তার নিত্য সঙ্গী সমস্ত কলকাতাবাসী। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ভারতের পরিবেশ নির্মল হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রায় সমস্ত শিল্প উৎপাদন বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করে সেজন্য এখানকার বড় শহরগুলিতে [illegible] পৃথিবীর যে কোন শিল্পোন্নত দেশকে হার মানায়। পরিবেশের দূষিতকরণ নিয়ে আমাদের দেশে খুব বিশদ অনুসন্ধান এখনো হয়নি। তবে কিছুদিন আগে ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে এই নিয়ে বেশ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল। ঐ কেন্দ্রের শ্রী [illegible] [illegible] দেখা যাচ্ছে বোম্বাইবাসীদের অস্বস্তিবোধ [illegible] ১৯৬৮-৬৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রতি বছরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে নিঃসৃত সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ১ কিলোগ্রাম, ভারতে ১.৭ কিলোগ্রাম, এবং বৃহত্তর বোম্বাই-এ ১২০ টন।

হিসেবটা [illegible] বিশদ করা যাক, প্রতি বর্গকিলোমিটারে ঃ

কার্বন মনোক্সাইড—পৃথিবীতে ১.৭ কিঃ গ্রাম, ভারতে .৮ কিঃ গ্রাম, বৃহত্তর বোম্বাই-এ ৫২০ টন; নাইট্রোজেনের অক্সাইড—পৃথিবীতে .৩৫ কিঃ গ্রাম, ভারতে .২ কিঃ গ্রাম এবং বৃহত্তর বোম্বাই-এ ৪০ টন, অ্যামোনিয়া—পৃথিবীতে .০২৭ কিঃ গ্রাম ভারতে .০৪ কিঃ গ্রাম এবং বৃহত্তর বোম্বাই-এ ১০ টন; হাইড্রোকার্বন—পৃথিবীতে .৬ কিঃ গ্রাম, ভারতে ২.১ কিঃ গ্রাম এবং বৃহত্তর বোম্বাই-এ ২০০ টন ইত্যাদি।

অর্থাৎ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, শিল্পাঞ্চলে অপ-দ্রব্যের পরিমাণ অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আগে ধারণা ছিল হয়ত বাতাসের সাহায্যে তারা সমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তা যে পড়েনি বোম্বাই-এর উদাহরণই তার প্রমাণ। অতএব কীভাবে ঐ সমস্ত দূষিত সামগ্রীর পরিমাণ অন্তত আবহাওয়ার মধ্যে কমিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে আমাদের এই মুহূর্তেই অনেক বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করলে ভবিষ্যতে আরও শিল্প সম্প্রসারণ সত্ত্বেও আমাদের পরিবেশকে আরও মারাত্মক দূষণের হাত থেকে হয়ত রক্ষা করাও যেতে পারে।

মহাকাশে জীবন-সংকেত

এ সম্ভাবনাটিকে হয়ত আর অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি 'সায়েন্স' (১৭০ খণ্ডের, ৯৮৪ পৃষ্ঠা) পত্রিকায় মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স এবং চার্লস উইন্ডসোর বিশেষ পদ্ধতিতে ফরম্যালডিহাইড এবং অ্যামোনিয়াকে উষ্ণ করে বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন বলে খবর বেরিয়েছে। এর আগে কেউ কেউ অবশ্য প্রমাণ করেছেন অতি-বেগুনী রশ্মি বা আলট্রাভায়ওলেট রে-র সংস্পর্শেও ঐ দুটি পদার্থ বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। উল্লেখ্য, জীব-কোষ সৃষ্টির মূল-বস্তু প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়েই তৈরি

এবং আন্তর্নক্ষত্র জগতে ফরমাল্ডিহাইড এবং অ্যামোনিয়া, এই উভয় যৌগেরই ইতিমধ্যে সন্ধান পাওয়া গেছে মেজার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে। ফক্স এবং উইণ্ডসোর তাঁদের গবেষণাগারেই ঐ দুইটি পদার্থকে ২০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার চেয়ে কম উষ্ণতায় গরম করে নয় রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন।

ইতিপূর্বে প্রায় বছর দুই আগে অস্ট্রেলিয়ায় একটি উল্কাপিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এটির নাম রাখা হয় Murchison। উল্কাপিণ্ডটি কার্বনসমন্বিত কনড্রাইট গোষ্ঠীভুক্ত। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সাইরিল পোন্নামপেরুমা এবং তাঁর সহকারীরা এর মধ্যে কম করেও পাঁচ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। পরে হাইড্রোকার্বন এবং কার্বন অণুর সন্ধানও তার মধ্যে পাওয়া গেছে।

এ সমস্ত দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও জীবজগত বিরাজ করছে কী না, সে কথা এখনই জোর দিয়ে বলা চলে না। তবে জীবন সৃষ্টির মূল উপাদান কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিড যে মহাবিশ্বের অন্যত্রও বিরাজ করছে, এটা অবধারিত। কে জানে, হয়ত বা তাদেরই কোনটি কোনটি আদি যুগে পৃথিবীর বুকে এসে বাসা বাঁধে, পরে জটিল কোন যোগসূত্রে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে বসে কোন এককোষী প্রাণী যা উত্তরকালে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান জীবজগৎ সৃষ্টি করেছে।

আপনার শিশু

হ্যাঁ, আপনার শিশু ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এবং জন্মের পর অন্তত আঠারো মাস বয়েস পর্যন্ত যদি নিয়মিত প্রয়োজন মত পুষ্টিকর খাদ্য না পায়, তার দৈহিক দুর্বলতা থাকবেই। সেই সঙ্গে তার মস্তিষ্কের যথাযথ বুদ্ধি ব্যাহত হবে এবং মানসিকতার দিক দিয়ে কিছুটা পঙ্গুও। বেশ কিছুকাল ম্যাঞ্চেস্টারের জন ডবিং এই বিষয়টির উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে লক্ষ করেছেন, মানুষের মস্তিষ্কের ক্রমান্বয় বুদ্ধি দুই ধাপে ঘটে থাকে। এক, মায়ের পেটে যখন শিশুর বয়েস চার কি পাঁচ মাস, তখন। দুই, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছয় মাস থেকে আঠারো মাস বয়েস পর্যন্ত। অতএব ঐ দুই সময়ে উপযুক্ত পরিমান খাদ্য না পেলে মস্তিষ্কের বুদ্ধি স্বাভাবিক ভাবে ঘটতে পারে না। ফলে, পরবর্তী জীবনে বুদ্ধি-বিকাশের ক্ষেত্রে তারা অনেকটা পিছিয়ে থাকে।

রবীন্দ্র পুরস্কার—১৯৭১

বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনার জন্যে এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন প্রবীণ বিজ্ঞান-লেখক শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কারের সম্মানী পাঁচ হাজার টাকা। বইটির নাম **মহাকাশ পরিচয়**। প্রকাশক, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। লেখক এই বইটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্বরূপ এবং মহাকাশ অভিযানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিবেশন করেছেন।

শ্রীগুহর জন্ম ১৯০০ সালে, ফরিদপুরে। ব্রহ্মচারী গবেষণাগারে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর তিনি রাসায়নিকের কাজ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে **আকাশ রহস্য, ভৌগোলিক প্রকৃতি বিজ্ঞান**, প্রভৃতি।

শ্রীগুহ এই পুরস্কারের তিন চতুর্থাংশ অর্থ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কল্যাণে দান করেছেন।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

এপ্রিল ১৭ এবং ১৮ তমলুক ১ নং ব্লকের নাইকুড়ি ঠাকুরদাস ইনসটিটিউসনে একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মেদিনীপুর কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সেন এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে বিজ্ঞানের এমন ব্যাপক বিষয়ের উপর অনুষ্ঠান রীতিমত উৎসাহব্যঞ্জক। অধ্যাপক ভাদুড়ী তাঁর দুই দিনের ভাষণে এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : এক, সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রদের কাছে এমন পরিবেশে যে কোন বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব প্রদর্শিত বিষয়গুলি শুধু চমক সৃষ্টি করার মত করে যেন না গড়া হয়। এমন ধরনের বস্তু দেখানো উচিৎ যার সঙ্গে স্থানীয় মননশীলতা এবং সম্ভব হলে প্রয়োজনীয়তার একটা সুষ্ঠু সম্পর্ক থাকে। দুই, ছাত্রদের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চালাও আলোচনা কম করে, কীভাবে বিজ্ঞানী হওয়া যায় অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করা যায় তেমন বিষয়বস্তুর অঙ্গিকেই বিশদ আলোচনা করা দরকার। অধ্যাপক সেন, পরিভাষার গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন। দুই দিনের উৎসবে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ জয়ন্ত বসু, শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশংকর চক্রবর্তী প্রভৃতি। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং সাফল্যের মূলে ছিলেন তমলুক এক নম্বর ব্লকের বি-ডি-ও শ্রীসতীশ বসু, শ্রীবলাই মান্না, কানাই মান্না, শ্রীপরেশচন্দ্র মালাকার, শ্রীনিরঞ্জন সাহু প্রভৃতি।

স্বীকার : অগ্রজ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় সম্পর্কিত তথ্যের জন্যে আমরা কিছুটা শ্রীনীরেন্দ্রনাথ কানুনগোর কাছে ঋণী।

—সমরজিৎ কর

চৌধুরী, সুস্মিতা দত্ত, সুপ্রীতি দাস, সুপ্রভা ঘোষ, দীপা মজুমদার···। সবাই সশরীরে উপস্থিত।

হঠাৎ "কল্পনা রায়···!" ডাকটা প্রতিধ্বনিত হল স্টেশনের অ্যাস্‌বেস্টস্‌-আবৃত শেড-এর কড়িকাঠে। মিলল না উত্তর।

দিদিমণি চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, প্রশ্নবোধক ভ্রূলতাকুঞ্চনে। শোনা গেল শুধু মাল-বাহী বাষ্পশকটের ইঞ্জিনের শিস্‌।

"আরতি সোম···"

'কিশোরী' এবার নিজেই খুঁজতে লাগল, সম্মিলিত মেয়েদের সারিতে সারিতে। জিগ্যেস করল ওদের কারও নাম 'আরতি সোম' কি না।

অপ্রত্যাশিত অযাচিত এই সহযোগিতায় বিরক্ত হয়ে দিদিমণি ওকেই প্রশ্ন করলেন, "তোমারই নাম নয় তো?"

"আজ্ঞে না, মিস্‌ কিং...মানে..."

"তবে তোমার নামটা কি?"

"আমার নাম সন্ধ্যা। সন্ধ্যা মুখার্জি।"

"আর তোমার নাম?" আমার দিকে একটু যেন গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তিনি বললেন।

লজ্জা কিসের?···বল্‌ না তোর না···" সহৃদয়তার ভাণ ক'রে মেয়েটি বলল। তারপর দিদিমণির উদ্দেশে, কৈফিয়তের

আমাকে ক্ষমা করুন, আর কোনদিন করব না...

ছলে, "ওর নাম জানেন?···লতা। লতা মঙ্গেশকার। বাংলা ভালো জানে না। ওর বাবা কি না মারাঠা সেনাপতি। ওর গলা আবার ভীষণ মিষ্টি।"

"মঙ্গেশকর?···"

"না...ম, ও-র গ-র একার, হালবা শ, মঙ্গেশকার···" তারপর যেন অসংলগ্নভাবে শিক্ষয়িত্রীকে জিগ্যেস করল আরতি সোম: "আপনি রেডিয়োতে খুব বেশি গান শোনেন না, না?"

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাত ন'টা। বাক্‌স খুলে সব কিছু বার করেছি। মায়ের স্নেহে মাখা সব কিছু: ফ্রক, ফিতে, সাবান···। সাজিয়েছি নিজের ছোট আলমারিতে। কাপড় খুলেছি। তারপর খাটের পায়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে বসেছি। পিতৃমাতৃহীনা নির্বাসিতা কল্পনার প্রথম প্রার্থনা। বাড়িতে এখন—ঠিক এই রাত ন'টায়—বাবা, মা, দিদি, ছোট ভাই-বোনেরা, ওরাও সবাই মিলে প্রার্থনা করছে, পরিবারের প্রত্যেকজনের মঙ্গলের জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে। আর আজ প্রার্থনা-শেষে চোখের কোণে এক বিন্দু জল মুছে মা বলতে ভুলবেন না: "···আর প্রভু, আমাদের কল্পনাকে রক্ষা কর, ও যেন কনভেন্ট স্কুলে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে ওঠে।" আর পারলাম না, ফুঁপিয়ে উঠলাম···ভারী লক্ষ্মী মেয়েই কিনা, আজ স্কুলে পৌঁছোনোর আগে থেকেই মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছি।

শোনা গেল এক পদক্ষেপ। আমার কাঁধের উপর একটি হাত পড়ল। মাথা তুলে দেখলাম: ওই সেই দিদিমণি।

"ক্ষমা করুন, দিদিমণি···আমাকে ক্ষমা করুন। আর কোনো দিন করব না···কোনো দিন না। আরতির সঙ্গে আর মিশব না। আরতি ভীষণ খারাপ মেয়ে।"

"আরতি মোটেই খারাপ মেয়ে নয়। একটু দুষ্টু বটে, ঠাট্টা করতে ভালোবাসে। আর আমারও এক দুর্বলতা আছে: ওর দুষ্টুমিতে প্রশ্রয় না দিয়ে পারছি না। আসলে স্টেশনে আমাকে নিয়ে নয়, তোমাকে নিয়েই ও ঠাট্টা করছিল। আর আমিও আমার অভ্যাসমতো ওর ঠাট্টায় যোগ দিয়েছিলাম। ওকে যে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি: কতবার ঠাট্টা ক'রে আমাকে না-চেনার ভাণ ক'রে বলেছে মিস্‌ কিংকং; কতবার নিজেকে বলেছে সন্ধ্যা। লতার আবির্ভাব অবশ্য ওর উপস্থিত বুদ্ধির এক নতুন আবিষ্কার।"

তারপর একটু যেন নীচু গলায় তিনি বললেন, "জানো, খুব ছোট বেলায় ওর মা মারা গিয়েছেন; আমি ওকে মানুষ করেছি। আরতি আমার আপন ভাইঝি; আমার নাম অঞ্জলি সোম।"

তারপর?

তারপর আমাকে কোলে টেনে নিয়ে তিনি খাটে বসলেন, বললেন, "বাড়ির জন্য মন যেমন করছে, না?···আর ভেবো না, এসো, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই···" বলে তিনি মৃদু সুরে শুরু করলেন: "কেন কিছু কথা বল না···।"

শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলকাতায় তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তখন তিনি আমাকে একবার পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যেতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাপীঠে শিল্পকলা শিক্ষক হিসাবে তিনি সেখানে একটি চিত্র ভাস্কর্য সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছেন, আমি যেন অবশ্য দেখে আসি। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী উমানন্দ ও সাগরময়বাবু ও আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। সাগরময়-বাবু বললেন আপনিই বরং ঘুরে আসুন। দু দিন সেখানে থেকে, চিত্র ও

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ —প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

ভাস্কর্যশালার সংগ্রহসম্পদ দেখে ফিরে এসে আজ মনে হয় না গেলে সত্যিই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম।

পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম ও তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরুলিয়ায় ৬৮ একর জমির ওপর বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয় ১৯৫৮ সালে। উদ্দেশ্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দেশের ছেলেদের শিক্ষাদান করা। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের বিশ্বাস বাল্যকাল থেকেই ছেলেদের মনে সৌন্দর্যবোধের চেতনা জাগ্রত করা উচিত। যা কিছু সুন্দর, ছেলেরা যেন বাল্যকাল থেকেই তা দেখার সুযোগ পায়। আচারে ব্যবহারে শিক্ষায়দীক্ষায়, খেলাধুলায় — সব ক্ষেত্রে যদি তারা সৌন্দর্যের পূজারী হয় তাহলে পরবর্তী জীবনেও, তারা যেখানেই থাকুক, সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বিদ্যালয় গৃহ 'সারদামন্দির'

বলা বাহুল্য, বিদ্যাপীঠের চারিদিকেই দেখলাম, রূপ ও সৌন্দর্যের বিকাশ। প্রধান ভবনের উপরে সরস্বতী দেবীর মূর্তি, নীচে সমগ্র দেওয়ালব্যাপী ভারতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক রিলিফ রচনা। সিঁড়ির পাশে নোটিস বোর্ডে ছেলেদের তোলা স্থির-চিত্র নিদর্শন, দ্বিতলে সমগ্র বারান্দায় ঝোলানো নানাজাতীয় ছবি — মিনিয়েচার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিও। দীর্ঘ আম ও হিজল গাছের ছায়াতলে ছোট ছোট বাড়ি — দেওয়ালে আঁকা ভারতীয় নানা প্রাচীরচিত্র। তারই আশেপাশে ইতস্তত রাখা প্রাচীন কোনও শিলালিপি বা অর্ধভগ্ন ভাস্কর্য নিদর্শন। অতিথিশালার দেওয়ালে আঁকা বাউল-বৈরাগী বা কৃষ্ণবলরামের মূর্তি। এখানে ছোট ছোট ছেলেদের ঘুম ভাঙে সানাইয়ের সুমধুর আবাহন তানে, পশ্চিম আকাশের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার যবনিকা নেমে আসে অসংখ্য পাখীর কলতানে। চিত্রকলা বিভাগের নিয়মিত ছাত্র ছাড়া অন্য বিভাগের ছাত্ররাও ছবি আঁকার ব্যাপারে কত উৎসাহী, তার প্রমাণ পেলাম চিত্রশালায় যাবার পথে। কয়েকটি ছেলে রামানন্দের হাতে কাগজে আঁকা ছবিগুলি দিয়ে বলে উঠল — দেখবেন স্যার, কেমন হয়েছে। শুনলাম, এ ধরনের অনুরোধ রামানন্দের কাছে প্রায় প্রত্যহ আসে। চারুকলা বিভাগের ঘরটি ছোট, কিন্তু মনোমত সাজানো — দেওয়ালে ছেলেদের স্বতস্ফূর্ত-ভাবে আঁকা পেনসিল, প্যাস্টেল ও জলরঙের

বিদ্যাপীঠের দেওয়ালচিত্র

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
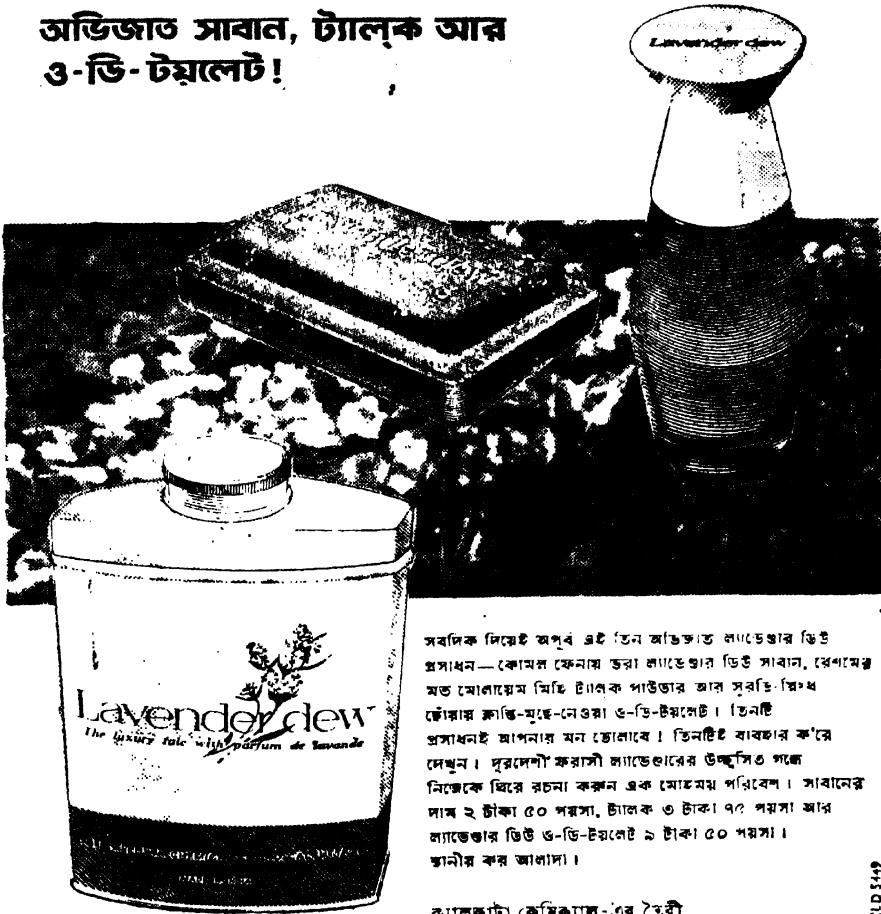
আঁকা কয়েকটি নিদর্শন। চিত্রশালায় প্রবেশ করে সত্যিই বিস্মিত হলাম—বিস্তীর্ণ হলঘরটির সমস্ত দেওয়ালের ওপর নানা আকারের ছবি, মধ্যে আধুনিক ধরনের দণ্ডায়মান কয়েকটি স্ক্রীন, সেখানেও বিভিন্ন শ্রেণীর নানা শিল্প নিদর্শন। দেখেই বোঝা যায় যে, অনুসন্ধিৎসু শিক্ষাবিদ্ তথা সাহিত্যিক যেমন এক-একটি দুর্লভ বই সংগ্রহ করে তাঁর একান্ত নিজস্ব পুস্তকাগার গড়ে তোলেন, শিল্পী রামানন্দও অসীম চেষ্টা ও পরিশ্রমে বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাতনামা শিল্পীদের নিদর্শন সংগ্রহ করে বিদ্যাপীঠের এই দুর্লভ চিত্রশালাটি গড়ে তুলেছেন। বলতে বাধা নেই, সংগ্রহসৌন্দর্য ও সম্পদের দিক্ থেকে এ জাতীয় চিত্রশালা কোনও সাধারণ বিদ্যায়তনে, অন্তত আমি দেখিনি। প্রথমেই চোখে পড়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের কামার-পুকুর বাড়ির একটি মডেল। সেই সঙ্গে একত্রে নজরে পড়ে খ্যাতনামা কয়েকজন শিল্পীর শিল্প নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ছোট্ট সমুদ্র দৃশ্য, নন্দলাল বসুর বনফুল ও কাটুমকুটুম (হেলাফেলার কাজ) জাতীয় রচনা, গগনেন্দ্রনাথের ওয়াশ

প্রথায় আঁকা নিসর্গ দৃশ্য, যামিনী রায়ের বাধিকা ও অসিত হালদারের কয়েকটি ছবি ও পেনসিল ড্রয়িং উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আঁকা, বিশেষ করে, কয়েকটি মূর্তিও চোখে পড়ে। এগুলি ছাড়া রামানন্দ অন্যান্য যে সব শিল্পীদের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (মেলা), মুকুল দে (এচিং), রমেন চক্রবর্তী (পণ্ডুরটি — এচিং), মণীন্দ্র গুপ্ত, প্রশান্ত রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিজের আঁকা দুর্গা ও ভ্যান গ'র রীতি অনুযায়ী রচিত নিসর্গ দৃশ্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে গোপাল ঘোষ, অন্নদা মুন্সী ও রথীন মৈত্রের নিদর্শনও দেখা যায়। তবে পরিচিত আরও কয়েকজন সমকালীন শিল্পীর রচনা সংগ্রহ করার জন্যও রামানন্দ চেষ্টা করছেন। চিত্রশালার আর একটি সম্পদ কয়েকটি পুরানো পটচিত্র, বিশেষ করে জগন্নাথ ও মনসা পটের নাম করা যায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেও নেপালের প্রাচীন পুঁথি ও ভানখা, গঙ্গা দেবীর পুরানো পাণ্ডুলিপি, সোনালী রঙ প্রধান অতি প্রাচীন কৃষ্ণরাধা চিত্র ও পিতলের ছোট ছোট প্রাচীন গণেশ ও বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখ্য। হাতির দাঁতের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন চোখে পড়ে, বিশেষ করে সিংহ, মন্দির ও ময়ূর-জাঁতি এবং সমুদ্রগুপ্তের আমলের বিভিন্ন মুদ্রা। ভাস্কর্যশালা তথা যাদুঘরের সংগ্রহ সম্পদও নেহাত নগণ্য নয়। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে জাপানের আলঙ্কারিক হাতির দাঁতের নিদর্শন (বোধিসত্ত্ব), চীন ও জাপানের প্রাচীন মৃৎ ও সিরামিক শিল্প

সিরামিক বিভাগে তৈরি ছেলেদের কাজের নমুনা

নমুনা, রোঞ্জ ফুলদানী, পুরানো পট ও পুঁথি, কাঁথা, খোদাই-করা পুরানো কাঠের বাক্স ও ঘট। এ ছাড়া দেখা যায় নানা জাতীয় মাটির খেলনা — বাঁকুড়ার ঘোড়া থেকে পুরুলিয়ার পুতুল পর্যন্ত যাদুঘরের আর একটি আকর্ষণ নানা জাতীয় ও নানা আকারের রঙীন মুখোশ, গৌড় পাণ্ডুয়ার একদা খ্যাত চকচকে টালির কাজ ও মহাভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। বিদ্যাপীঠের সিরামিক বিভাগেও কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন দেখা গেল।

*

রূপ, রস ও সৌন্দর্যবোধ তথা চেতনা। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলেছেন দুজন — শিল্পী রামানন্দ ও পরিচিত ভাস্কর-শিল্পী সুনীল পাল। প্রথম জন বিদ্যাপীঠ স্থাপন কাল থেকেই শিল্পকলা শিক্ষক হিসাবে যুক্ত আছেন। বর্তমান সম্পাদক স্বামী প্রমথানন্দের উৎসাহে, শিল্পীসুলভ চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি চিত্রশালা ও বিদ্যাপীঠের পরিবেশ মনোহর করে তুলেছেন। সুনীল পাল রচনা করেছেন বিভিন্ন ভাস্কর্যমূর্তি ও রিলিফ এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বিদ্যায়তনের রূপরেখা। অনেক সময় তিনি রবিবার ভোরে বিদ্যাপীঠে পৌঁছে স্বেচ্ছায় সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতায় ফিরে গেছেন। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে কিভাবে দেশের বহুমূল্য শিল্পসম্পদ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হতে পারে বিদ্যাপীঠের চিত্রশালাই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় বিভিন্ন বস্তুগুলির যথাযথ কাল নিরূপিত হয়ে গেলে দর্শকদের বোঝার পক্ষে আরও সুবিধা হবে এবং কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

*

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পী মুকুল দে-র ৫০টি এচিং ও ১৯ জন শিল্পীর ৮৫টি শিল্পনিদর্শন দেখা যায়।

প্রিণ্ট নেবার নানা নতুন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার প্রচলন হবার ফলে গ্রাফিক শিল্পকলার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল আকার বা ড্রয়িং অপেক্ষা প্রিণ্ট পদ্ধতির নানা কারুকার্যের ওপর প্রাধান্য দান করা হয়। অথচ ৩০/৪০ বছর পূর্বে রিয়ালিস্টিক বা আকারপ্রধান খোদাই কাজের গুরুত্ব ছিল অধিক। এ জাতীয় কাজে

ভাস্কর্য নিদর্শন —বিদ্যাপীঠের ছাত্রের

শিল্পী মুকুল দে, রমেণ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পিগণ ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। প্রায় ১৫/১৬ বছর পূর্বে নয়াদিল্লীতে শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত মহলানবিশ মহোদয়ের বাড়িতে মুকুল দে-র গ্রাফিক শিল্প প্রদর্শনী দেখার সুযোগ হয়েছিল। বর্তমান প্রদর্শনীটি সেই রকম সুনির্বাচিত না হলেও এখানে কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে শিল্পীর নির্ভুল ড্রয়িং ও সূক্ষ্ম খোদাই কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশই ছোট, তা সত্ত্বেও কয়েকটিতে শিল্পীর স্বীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, যেমন অন দি ওয়ে টু কাকনীতলা, খড়্গপুরের মসজিদ, বড়বাজারের কটন্ স্ট্রীট, অন দি রিভার হুগলি ও মিডনাইট ক্লাই।

ছবিগুলি সবই ভারতীয় রীতিতে রচিত—কয়েকটি গ্রাফিক নিদর্শনও দেখা যায়। একাধারে ভারতীয় রীতিতে আঁকা এতগুলি ছবি দেখে মনে হয়, এ যুগেও একদল শিল্পী আছেন, যাঁরা যুগের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আপন মত অনুযায়ী ভারতীয় রীতিতে ছবি এঁকে যান। আধুনিক বা বিমূর্ত শিল্পের পরিবর্তে ভারতীয় রীতিতে এঁকেই তাঁরা আনন্দ লাভ করেন ও বলা বাহুল্য দর্শকদেরও আনন্দ দেন। তাঁদের মতবাদ যে দৃঢ় তা কয়েকটি ছবি দেখে বোঝা যায়। অবনীন্দ্রনাথ (সোনার ধান), নন্দলাল বসুর (হরগৌরী), গগনেন্দ্রনাথ (মাদার ইউনিভার্স) ও যামিনী রায় (বধূ)-এর কয়েকটি শিল্প নিদর্শন দেখার সুযোগ দিয়ে কর্তৃপক্ষ সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাঞ্চনফুল ও সুনয়নী দেবীর তাপসীরও নাম করা যায়। অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে কয়েকজনের রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বারকা চ্যাটার্জির দাদামশায় (তরল চা-য়ে ওয়াশ অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি) একটি উল্লেখ্য নিদর্শন। রথীন দত্তর পরীক্ষামূলক কয়েকটি ছবি অনেকের ভাল লাগে। রঙ ও রেখা সহকারে শিল্পী যেন নানা অলংকারের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মিড্ডে মেলডি, অন দি ওয়ে টু মার্কেট ও স্প্রিং-এর নাম করা চলে। অজয় ঘোষের রচনায়ও পরীক্ষা প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়—গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও মুক্তধারা অনেকের ভাল লাগে। ছন্দকর্ষণে মিশরীয় রীতির প্রভাব দেখা যায়। ধীরেন ব্রহ্মর রেশমের ওপর আঁকা ছবিতে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়নি। পরিকল্পনার দিক থেকে শঙ্কর আঢ্য-এর মনমোহিনী প্রশংসনীয়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে নিমাই বসু (রাত্রি), হীরেন দত্ত (উইন্টার ও কার্পেট সেলার), বিশ্বনাথ ঘোষ (আলোর প্রকাশ), বরেন নিয়োগী (উন্মাথ) ও শান্তি মুখার্জি (পার্থসারথি—গ্রাফিক)-র নাম করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

কোথাও পরীক্ষা হচ্ছে না। ঠিক যেমন করে হওয়া উচিত। অবশ্য হচ্ছে না বললে কেউ কেউ হয়তো আপত্তি তুলবেন। হতে পারছে না বলাটাই বোধহয় সমীচীন। তাও বা বলি কি করে। বাসে করে কলেজে আসার পথে রবীনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। অন্য কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক। বললেন: আমাদের তো পরীক্ষা হচ্ছে না। ঠোঁট উল্টে বললেন: [illegible] কোন লাভ নেই। নকল না-করে তো একটাও পাশ করতে পারবে না।

হয়তো কথাগুলি [illegible] পরীক্ষা এখন প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। [illegible] ভবিষ্যৎ খুব ভাল লাগেনি না। [illegible] পরীক্ষা হচ্ছে না। [illegible] ভাবটা—[illegible] চলছে চলবে। [illegible] ধোয়ামোছা [illegible] ঠিক [illegible] না। কারণ আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটা পরীক্ষা-কেন্দ্রিক। ক্লাসে [illegible] কি পড়াচ্ছেন, [illegible] শেখালো বা না শিখলো তাতে কিছুই যায় আসে না। যদি সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারে তাহলেই তার পরমপ্রাপ্তি। অতএব পরীক্ষা না-থাকলে পরীক্ষা পাশের প্রশ্ন থাকে না। পরীক্ষা পাশের প্রশ্ন যদি না-থাকে, তাহলে রোজ রোজ কষ্ট করে কলেজে আসার দায় ক্রমেই ছাত্ররা অনেকেই না-ও নিতে চাইতে পারে। কাজেই আমরা যারা স্কুল কলেজ-গুলো আছে বলেই খেয়ে পড়ে বাঁচছি, তাদের বোধ হয় অত চট্ করে দার্শনিক হয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়।

আজ আমার পাহারা দেওয়ার ভার ছিল সাত নম্বর ঘরে। ঢুকে দেখি, ত্রিশজন ছাত্রের যায়গায় প্রায় ষাটজন ছাত্র বেঞ্চিতে বসে। প্রত্যেকটি বেঞ্চি থেকে সীট্ নম্বর ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং প্রত্যেক বেঞ্চিতে চারজন করে ছাত্র বসে আছে। এবং এত গণ্ডগোল হচ্ছে যে পরীক্ষার হল বলেই মনে হচ্ছে না। এই অবস্থায় একজন ইনভিজিলেটর যে কত অসহায় বোধ করেন তা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। অবশ্য আমি অসহায় বোধ করলে তো চলবে না। এটা আমার ডিউটি। অর্থাৎ অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই ডিউটির জন্যই আমি মাইনে পাই। প্রায় করজোড়ে অনুরোধ জানালাম অন্ততপক্ষে পরীক্ষা হলের আবহাওয়া বজায় রাখতে। [illegible] হল। প্রশ্ন-পত্রটি [illegible] করে [illegible] এক কোণে এসে দাঁড়ালাম।

এক [illegible] সেই সময় [illegible] যখন সামান্য [illegible] করলে অথবা [illegible] খাতা [illegible] হয়, তাকে হল থেকে বের করে পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া যায়। এখন সময় আরো কঠিন হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষকের আবহমান সম্পর্ক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমন ঘটনা আজ অহরহ ঘটছে যেখানে শিক্ষক পরীক্ষার হলে তাঁর দায়িত্ব পালনের অপরাধে প্রহৃত হয়েছেন। কাজেই খুব একটা আদর্শ-বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পরীক্ষার হলে কঠিন হওয়া এখন বোকামির পর্যায়েই পড়ে। কারণ, যিনি সৎভাবে ইনভিজিলেশন ডিউটি দেবেন তার পক্ষে কেউই দাঁড়াবেন না। না স্কুল-কলেজ, না বোর্ড-বিশ্ব-বিদ্যালয়। এখন সকলেই নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত। ছাত্ররা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তরে হামলা করলে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলেজ কর্তৃপক্ষকে দেখিয়ে দেন, তারপর কলেজ কর্তৃপক্ষ দেখিয়ে দেন শিক্ষকবৃন্দকে, আবার শিক্ষক-বৃন্দের একজনই হয়তো গোপনে অন্য এক-জনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। অসহায় [illegible] দায়িত্ব চাপে এক সেই [illegible] উপরে। এখন সকলেই সর্ব[illegible] হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা পরীক্ষার হলে [illegible] কেন। আশা করাটাও অন্যায়।

হলে নিদারুণ গণ্ডগোল হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকটি ছেলেই সামনে পেছনে যে যেদিকে পারছে সেখান থেকেই অন্য পরীক্ষার্থীর খাতা দেখে লিখছে। কেউ কেউ দূরের ছাত্রদের সঙ্গেও উচ্চৈস্বরে জ্ঞানের আদান প্রদান করছে। সমস্ত অবস্থাটা প্রায় অসহ্য। একটি অসহায় জীবনের অক্ষমতা হতাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই অবস্থায় কি করা যায় তা বিশ্ব-বিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনদি[illegible] পরামর্শ দেননি। অথচ আমার সামনে হ[illegible] থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন প[illegible] নেই। মুশকিল এই যে নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে; যদি বেরিয়ে য[illegible]

...পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এত তোড়-জোড় করলাম কেন। বহু যায়গায় পরীক্ষা হতে পারেনি; পরীক্ষা নেওয়া যায়নি; নেওয়া হয়নি। এসব জেনেও কেন তাহলে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে সবাই মিলে স্থির করেছিলাম। তখন কি আমরা জানতাম না যে নকল হবে, ব্যাপক অসাধু প্রচেষ্টা দেখা দেবে। তখন কি আমরা জানতাম না যে এসব হলেও আমরা শাস্তির ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাহলে কেন আমরা কতগুলো শিক্ষিত লোক আমাদের অক্ষমতা ও অসহায়তার কথা বুকে চেপে পরীক্ষা নবই বলে স্থির করেছিলাম। তার কারণ খুবই সরল।

কারণ, আমরা মুখে যে যতই শিক্ষাদর্শ নিয়ে আলোচনা করি না কেন, আমরা সকলেই স্পষ্টভাবে জানি যে আমাদের একটিই মাত্র কর্ম স্কুল কলেজে, তাহল প্রতি বছর পরীক্ষাটা ঠিকমত করিয়ে দেওয়া। অভিভাবকদের প্রবোধ দেওয়া যে আমরা কিছু করেছি। অন্তত পক্ষে একটা প্রোমোশন-লিস্ট বা একটা প্রগ্রেসিভ রিপোর্ট ডকুমেন্ট হিসেবে রেখে দেওয়া। কাজেই পরীক্ষা। সে পরীক্ষা যদি না-হয়, অর্থাৎ না-হতে না-হতে যদি পরীক্ষা ব্যাপারটাই বন্ধ হয়ে যায়—তাহলে স্কুল কলেজ চলবে না। না-যদি চলে আমরা খেতে পাব না বহু লোক। অভিভাবকরা এমন-স্কুলে ছেলে পাঠাতে রাজি হবেন, যেখানে পড়াশুনো হয় না কিন্তু পরীক্ষা হয় এবং সারা বছর পড়াশুনো হয় কিন্তু পরীক্ষা হয় না এমন স্কুল কলেজের নাম শুনলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অতএব ছাত্র রেখে মাইনে আদায় করে যদি স্কুল কলেজ চালাতে হয় তাহলে পরীক্ষার ব্যবস্থাও শত বিঘ্নের মধ্যেও করতে হবে। যেখানে শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাস-মাইনে পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত আছে সেখানে শিক্ষকরা কেউ পরীক্ষার জন্য ব্যাকুল নন।

সরকারী নামকরা স্কুল কলেজগুলির হিসেব নিলে ব্যাপারটা ঠাহর করতে কোন অসুবিধা হবে না। অথচ বে-সরকারী স্কুলকলেজগুলির ছাত্রদের কাছ থেকে বকেয়া টিউশান ফী আদায়ের শেষ অস্ত্র পরীক্ষা। এমন একটি স্কুল কলেজ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ যেখানে পরীক্ষার আগে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয় না যে, বিদ্যায়তনের বকেয়া ফী ইত্যাদি জমা না-দিলে ছাত্রদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না অথবা পরীক্ষার ফল বের করা হবে না অথবা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিলাপ করতে দেওয়া হবে না।

বিশেষ করে আজকাল যেহেতু শিক্ষা ব্যাপারটাই অনিশ্চিত কিছুর জন্য বিনিয়োগ বোঝায় সেজন্য ছাত্র ও অভিভাবকরা সু-নিয়মিত টিউশান ও অন্যান্য ফী জমা দিতে শৈথিল্য দেখান। গরীব ছাত্রের কথা তবু বুঝি কিন্তু অবস্থাপন্ন লোকেদের ক্ষেত্রে যখন এটা হয় তখন ব্যাখ্যা করি কি করে? ব্যাখ্যাটা একমাত্র এইভাবে করা যায় যে অভিভাবকদের শতকরা নব্বই ভাগ ছেলে-দের কলেজে পড়াতে পাঠান অন্য উপায়ন্তর নেই দেখে। অর্থাৎ বেকার বসে থাকার চেয়ে নিয়মমত যাতায়াতের অভ্যাস রাখা ভাল, এই অর্থে অধিকাংশ ছাত্র কলেজে পড়া-শুনো করে। কোন উদ্দেশ্য কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদে, কোন উচ্চাশার উৎপীড়নে কলেজে পড়াশুনো করে এমন ছাত্রের সংখ্যা বিরল। অতএব আজকের কলেজে পড়াশুনো মানে একটা সুঅভ্যাস বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। ফলতঃ অভি-ভাবকের পক্ষেও কলেজের ফী ইত্যাদি দেওয়াটা নিরুপায় দুঃখকে স্বীকার করে নেওয়া মাত্র। তাই অধিকাংশ স্কুল কলেজে ফী চুকিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন আসে ঠিক পরীক্ষার আগে। অতএব পরীক্ষা স্কুল কলেজগুলির 'মুশকিলাসান'।

এই গরজেও আজকাল ভাটা পড়তে শুরু করেছে। কারণ সকলেই বুঝে গেছে পরীক্ষা এখন একটা অনুষ্ঠান মাত্র। ডিগরী এখন নাম ঠিকানার নথিপত্র। অতএব, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আস্তে সুস্থে সব কিছু হবে। এক দুই বছর ফেল করলেও কোন ক্ষতি নেই—নকলের দায়ে দু'এক বছর বসে থাকতে হলেও দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ, যারা পাশ করে বসে থাকবে তাদের সময়ে যন্ত্রণা উপস্থিত হবেই কিন্তু যারা ধীরে সুস্থেব পথিক তাদের বেকারত্বে জ্বালাটা কম দহন করবে এইটেই উপরি পাওনা। ভয় ভাবনা লজ্জা-বোধ কেটে গেলে সব আচরণই মানুষকে শোভা পায়। তখন শৃংখলা বলে কিছু থাকে না। তখন নকল বা শিক্ষককে ভয় দেখানো পরীক্ষার হলে দাঙ্গা করা সবই সম্ভব হয়।

এই জন্য দোষ যতটুকু চাপে স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের ঘাড়েই চাপে। অভিভাবকরা পর্দার আড়ালে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অভিসম্পাত করেন কিন্তু নিজের পুত্রের পড়াশুনো, স্বভাবচরিত্র, বিভিন্ন দিকে গতায়াতের কতটুকু খবর তিনি নিজে রাখেন সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যে পুত্রের বল্গা তার পিতামাতা বা অভিভাবক ধরে রাখলো না—হাজার হাজার ছেলের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে তার রাশ টানবে স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এ এক হাস্যকর কল্পনা।

অথচ এর একটা সমাধান যে ছিল না তা নয়। স্কুল ও কলেজের, বিশেষ করে কলেজের ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে অধিক সংখ্যায় স্কুল-কলেজ বাড়িয়ে তোলা। এটা দুভাবে হতে পারে সরকার যদি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নেন। সে ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অর্থের সিংহভাগ শিক্ষার খাতে ব্যয় করতে হবে। বর্তমানের দয়ার দান'এর মনোভাব ঘোচাতে হবে। তারপর ইচ্ছা করলে সরকার সাধারণ মেধার ছাত্রদের জন্য নানা ধরনের কর্মের ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে উচ্চশিক্ষার জন্য একমাত্র মেধাবী এবং উৎসাহী ছাত্রদের নির্বাচিত করতে পারেন। আর এক ভাবে হতে পারে যদি অভিভাবকরা ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আরো কিছু ব্যয় বাড়াতে রাজি হন। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিদ্যায়তনকে অনেক কম-সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতে হবে। ফলে শৃংখলা ফিরে আসবে, শিক্ষকরাও ব্যক্তি-ছাত্রের উপর নজর রাখতে পারবেন এবং সমষ্টিগতভাবে ছাত্রদের উপর কমান্ড ও কন্ট্রোলও অনেক বেশী থাকবে। যেটা আমরা দেখি আর্মি এডুকেশনাল কোরে, পাবলিক স্কুল, কনভেন্ট ও মিশনারীদের বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

জানি, অনেকেই এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলবেন এবং বলবেন এমনিতেই ছেলেদের স্কুল-কলেজের খরচ চালানো প্রাণান্তকর ব্যাপার তার উপর আরো ফী বাড়ানো মানে শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে তুলে রাখা। কথাটা এক অর্থে সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার কথা বলছি। যেখানে বিচারটা হবে মেধা দিয়ে ও আগ্রহ দিয়ে, কোন ছাত্রের পারিবারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে নয়। ছাত্র যদি গরীব পিতার সন্তান হয় তার ভাল ফলের জন্য রাষ্ট্রই তাকে দেখবে। আর যদি ধনীর ছেলে হয় তাহলে বর্ধিত হারে কলেজের বেতন দিয়ে পড়াশুনো চালানো তার পক্ষে কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। আর কষ্ট যদি কিছু হয় সে কষ্ট মানতে হবে। যেমন মানতে হয় অন্য সব কিছুর দাম বাড়লে। যতই দাম বাড়ুক সব কিছুর মূল্য হাতে হাতে চুকিয়ে দিতে

হয়। বড় অংকের বাড়িভাড়া, বর্ধিত হারে ইলেকট্রিসিটির বিল, অগ্নিমূল্যের জলো দুধ ও বরফ দেওয়া মাছ। তখন সামান্যই আফসোস দেখা যায়। উত্তেজনা যদি হয় তাও চায়ের কাপের উপর প্রশমিত হয়ে পড়ে। শুধু একটা জায়গায় অপ্রশমিত উত্তেজনা টগবগ করতে থাকে—সেটি হল স্কুল-কলেজের মাইনে এক টাকা বাড়ালে। এক পয়সাও মাইনে বাড়ানো চলবে না। যখন খুশি দেব। ফাইন দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে হাতে মাথা কাটা যাবে। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস ফেকাল্টির অধিকাংশ বিষয়ে এম এ পড়ার টিউশান ফী ছিল বার টাকা মাত্র। আজ কুড়ি বছর বাদে যখন সব কিছুর দাম চার থেকে পাঁচগুণ বেড়ে গেছে তখনও সেই টিউশান ফী বার টাকাই আছে। দু টাকা বাড়াতে গেলে খণ্ড বিপ্লব হয়ে যাবে। যে সব ছাত্রসংস্থা একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছাত্র-কল্যাণের জন্য আন্দোলন করতে ঘৃণা বোধ করে, বোধ হয় তারাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই দু টাকার জন্য লড়ে যাবে। অথচ শিক্ষা খাদ্য ও কেডড়াতেলা কলেজঘাটে শেষরাত্রের অস্বাভাবিক খরচ বাড়ালে আমাদের দেশে প্রতিবাদ জানানোর কেউ নেই।

সেই প্রথম, অন্যের বিস্ময়ের জন্য মিনিট পাঁচেক হলঘর চুপচাপ ছিল। তারপর আবার সেই সেই। বই কাউকে খুলতে দেখিনি সত্য কিন্তু একে অন্যের উত্তরপত্র দেখেছে, কেউবা জিজ্ঞেস করছে দূরের বেঞ্চির ছেলেকে, কেউবা খাতা খুলে রেখে অযাচিত সাহায্য করছে সহপাঠীকে। মোটের উপর যদি দোষী বাছতে হয় তো হলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়ের অবস্থা হবে। এটা যে শুধু বর্তমান শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়, এটা মোটামুটি গোটা কলকাতার প্রত্যেকটি উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কোথাও শাসন বলতে শৃংখলা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। থাকবেই বা কি করে, ছেলেরা নিজেরাই কবুল করল কেউ কিছু জানে না—কোনো পড়াশুনো করেনি। পরীক্ষা হচ্ছে তাই দিতে এসেছে। সেটা আরো ভাল বুঝলাম যখন দেখলাম সামান্য স্কেল ও পেন্সিল গোটা হলে দশজনও আনেনি। সেই দশটাই বিভিন্ন বেঞ্চিতে ঘোরাফেরা করছে।

অর্থাৎ পরীক্ষার ব্যাপারে কেউই সিরিয়াস নয়। কলেজ পরীক্ষার ব্যাপারে সিরিয়াস নয়—ব্যাপারটা তবু বুঝি, কিন্তু ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার ক্ষেত্রে? সেও কি এমনি চলবে? যে পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্রদের মেধা ও বুদ্ধির সরাসরি বিচার এবং শ্রেণী বিভাগ হয়ে যায় অর্থাৎ যার ভিত্তিতে সহজেই বলা যেতে পারে এ-ফার্স্ট ক্লাস ও-সেকেণ্ড ক্লাস ও-কোনক্রমে পাস। এই রায় প্রায় ঈশ্বরের দেওয়া রায়ের মত। সারা জীবন ভাঙিয়ে খাওয়ার অক্ষয় ভাণ্ডার। এরই উপর ভিত্তি করে জীবনে অনেক কিছু গড়ে অনেক ভাঙে, বহু সৌধ সৃষ্টি হয় অনেক স্বপ্ন ভেঙে যায়। সেখানে কি তা হলে নিম্নতম পবিত্রতা রক্ষা করা যাবে না? এত বড় বিচারের কাঠগড়াতে দাঁড়িয়েও কি এত অসত্য ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়ে চলবে? এর একমাত্র ছোট্ট জবাবঃ হয়তো চলবে। চলবে এজন্য যে পরীক্ষা হলের এই

যে ফাঁক আজ প্রকট হয়ে পড়েছে তা সমাজের সর্বস্তরের অন্তঃসারশূন্যতারই একটি দিক মাত্র। কেউ একে আটকাতে পারবে না। শুধুমাত্র কি ছাত্রের ফাঁকি? এর সঙ্গে শিক্ষকের ফাঁকি মিলে কি ধূলোপরিমাণ হয়নি?

একদিন ছাত্র ছিলাম। মাস্টারমশায়ের দেওয়া পরীক্ষার নম্বরকে ধ্রুব বিচার বলে বিশ্বাস করতাম। খুব ভাল পরীক্ষা দিয়ে খুব খারাপ নম্বর পেয়েও মাস্টারমশায় বা পরীক্ষা পদ্ধতির গলতির কথা ভাবার স্পর্ধা ছিল না। নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছি। আজ সুদীর্ঘ না হলেও কিছুকাল মাস্টারির সঙ্গে যুক্ত থেকে এটা বুঝেছি এই পরীক্ষা পদ্ধতি তথা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি আছে। সামাজিক সামর্থ্যের বিরাট দেউলিয়াপনাকে এই শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা ঢেকে রেখেছে। যদি কোন দিন এই শিক্ষা ও পরীক্ষাব্যবস্থার ঢাকনাটা খসে পড়ে যায় তাহলে যে একটা ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটে যাবে, তার ইঙ্গিত সম্ভবত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এর মধ্যে পেয়ে গেছেন।

পরীক্ষার খাতা বিচারের পদ্ধতির মধ্যে অনেক দিন ধরেই নিদারুণ ত্রুটি চলে আসছে। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে অস্বাভাবিক রকম ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পর থেকেই এটা বিশেষ করে বোঝা যাচ্ছে। ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে নিশ্চয় বলা যায়, স্কুল-কলেজের ঘরোয়া পরীক্ষার খাতা না-দেখেই-প্রায় নম্বর দেওয়া হয়। এই না-দেখে নম্বর দেওয়ারও নানা পর্যায় আছে। পরীক্ষক উত্তরপত্রের প্রতি পাতায় একটি কি দুটি ভুলে কলম ছুঁয়ে নম্বর দিয়ে গেলেন। কেউ প্রতি উত্তরের প্রথম ও শেষাংশে চোখ বুলিয়ে নম্বর দিয়ে গেলেন। কোন কোন প্রতিভাবান পরীক্ষক উত্তরপত্রের ওজনের প্রতি লক্ষ রেখে একেবারে কভার-পেজ-এ নম্বর বসিয়ে দিলেন। ফলত কলেজের ঘরোয়া পরীক্ষা থেকে কোন ছাত্র নিজের মেধা বা প্রস্তুতির মান বা ভুলত্রুটির হিসেব কোনমতেই অনুমান করতে পারে না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্রদের পক্ষে নিজেদের সংশোধনের কোন প্রশ্নই উঠে না। স্কুল-কলেজের ঘরোয়া পরীক্ষা এখন উদ্দেশ্যহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের উপর বিশেষ দোষারোপ করা হয়। এ বিষয়ে তাদের যে প্রকৃতই একটা দায়িত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। সে দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না এটাও সত্য।

তবু এ ব্যাপারে শিক্ষকদের পক্ষেও যে কিছুই বলার নেই তাও নয়। কলেজগুলিতে হাজার হাজার ছাত্র। ছাত্র ও শিক্ষকের আদর্শ অনুপাত যেখানে বলা হয় ১০ : ১ থেকে ১৫ : ১ সেখানে আমাদের কলেজগুলিতে অনুপাত হল ৫০ : ১। এই অনুপাতে আর যাই হোক লেখাপড়া হয় না। বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখার সাধারণ ক্লাসে এখনো ১২৫ থেকে ১৭৫টি ছাত্র নিয়ে ক্লাস করতে হয়। এবং এই সব ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানোর চেয়ে তাদের আয়ত্তে রাখার পরিশ্রম অনেক বেশী। এই সব ক্লাস যখন চলতে থাকে তখনই আসে পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা গ্রীষ্মাবকাশে তবু দেখার সুযোগ আছে। কিন্তু কলেজের ক্ষেত্রে প্রায় পড়ি কি মরি করে খাতা দেখতে হয়। বেশ কয়েক শ' ছেলের টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে সেই ফলের টেবুলেশান করে তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের পাঠাতে হয়। তারপর আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ফর্ম ফিলাপ করার বিচিত্র কর্ম যজ্ঞ। আছে কলিজিয়েট, নন-কলিজিয়েট ও ডিস-কলিজিয়েটের হিসাব নিষ্পত্তি করা। কেস্যুয়েল পরীক্ষার্থী ও মাইগ্রেশানের জটিল ব্যাপার। ফলত খুব কম কলেজেই খাতা দেখার জন্য (ক্লাস চলাকালীন) সাত দিনের বেশী সময় পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় তাও নয়। শেষ পর্যন্ত খাতা দেখার ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই: যা হোক করে দেখে দিন। অন্ততপক্ষে মার্কসীটটা তো জমা দিন। এমন অবস্থায় যথা আদেশ তথা কাজই হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হিসাব এর চেয়ে কিছু ভাল নয়। স্কুল কলেজে যাঁরা পরীক্ষার খাতা দেখেন মোটের উপর তারাই বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখেন। পার্থক্য এই, কলেজ-পরীক্ষার খাতা দেখলে উপুরি পয়সা পাওয়া যায় না। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখলে বেশ কিছু পয়সা হাতে আসে। ফলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখায় শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহের কিঞ্চিত আধিক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু কলেজের পরীক্ষার খাতা ক্রমাগত চালাকির সঙ্গে দেখার যে অভ্যাস গড়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখার সময় সে পাটোয়ারী বুদ্ধিকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। তার ফলে যোগ্য ছেলের কম নম্বর পাওয়া ও অযোগ্য ছেলের চমকপ্রদ নম্বর পাওয়ার ঘটনা আজকাল অনেক ঘটছে। তার উপর দরবার, উমেদারি, তাঁবেদারির ঘটনা যেগুলো এতকাল চাকরি পাওয়া, লাইসেন্স যোগাড় করা, মোটা অঙ্কের টেণ্ডার ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী ছিল বহুক্ষেত্রে তা এখন পরীক্ষার খাতা দেখা ও ফলকে প্রভাবিত করছে। এ সব তো আছেই—এ ছাড়া আরও অক্ষমনীয় ত্রুটিও আছে। অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণ ও দায়িত্ববোধের ত্রুটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্ররা কতটা শিখলো তারই পরিমাপ করার প্রচেষ্টা হয়। সে পরীক্ষায় যখন দেখি দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত কোন শিক্ষক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনায় হয় ধাঁধার খেলায় মেতেছেন অথবা ছাত্র-ঠকানোর কৌতুকে মশগুল হয়ে পড়েছেন, নয়তো নিজের দুর্দান্ত জ্ঞানের বহর প্রশ্নপত্রেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তখন দুটো জিনিস মনে হয়। এক, আমাদের শিক্ষা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি যদি বা ঘটিয়ে থাকে চরিত্র ও দায়িত্ববোধের জন্ম দিতে পারেনি। দুই, একশো বছর কাটিয়ে দিয়েও আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনতন্ত্রে কোন শৃঙ্খলা এল না। যদি আসতো তাহলে প্রশ্নপত্রে ভুল, পাঠ্যসূচীর বাইরে থেকে প্রশ্ন দেওয়া, সমগ্র পাঠ্যসূচী প্রসারিত করে প্রশ্ন না দেওয়ার মত অমার্জনীয় ভুল পৌনঃপুনিকভাবে ঘটে আসতো না। এরই প্রতিক্রিয়ায় পরীক্ষার হলে আজ যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তাকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। বর্তমান ব্যবস্থায় পরীক্ষার হলের নৈরাজ্যকে নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসা একপ্রকার অসম্ভব কল্পনা।

এই অবস্থার চরম শিকার হয়েছে কিছু মাঝারি ধরনের ছেলে যাদের সংখ্যা স্কুল কলেজে কম নয়। তারা মোটামুটি জানে শোনে, লেখাপড়াও কিছু করেছে। এরা কেউ সুদূর মফস্বলের ছেলে, কেউ নৈতিক বোধযুক্ত অভিভাবক পিতার পুত্র, কেউ মানসিকতার দিক থেকে অসাধু উপায় অবলম্বনে অপটু। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এরা যেখানে শতকরা পঞ্চাশ নম্বর পেয়েছে কি পায়নি সেখানে যারা কিছুই জানে না বলে তাদের চার বছরের শিক্ষকরা সাক্ষ্য দেবেন, তাঁরা শতকরা ষাট ভাগ নম্বর পেয়ে বসে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেদিনও যেখানে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া একটা দুর্লভ ব্যাপার ছিল সেখানে এখন অনেক বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাসের হোরিখেলা শুরু হয়ে গেছে। এর ফলে যে ছেলেটি সত্যি ফার্স্ট ক্লাসের যোগ্য তার আর কোনই মর্যাদা রইল না। এর ফলে দূরের মানুষের কাছে মুড়িমুড়কির এক দাম হয়ে গেল। এই যে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে গেল অর্থাৎ একজন পড়াশুনা করে ডিস্টিংশান পেল আর একজন কৌশল করে ডিস্টিংশান পেল—এই দুয়ের মধ্যে সাধারণভাবে তফাৎ করার কোন উপায় নেই। এর ফলে কষ্ট করে রাত জেগে পড়েশুনে পরীক্ষা দেওয়ার যে বিশ্বাস তা যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে কৌশলে পরীক্ষা দেওয়ায় ছাত্ররা আস্থাশীল হয়ে পড়ে তাতে তাদের দোষ দেওয়ার মত কিছু থাকবে কি? মোদ্দা কথা হল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে একটা বিরাট ফাঁকির উপর

দাঁড়িয়ে আছে সেটা আজ নগ্নভাবে প্রকাশিত। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের কোনই সম্পর্ক নেই। স্কুল কলেজগুলি ছেলেমেয়েদের পিঠে যাহোক একটা স্ট্যাম্প মেরে দেওয়ার কারখানায় পরিণত হয়েছে। মানবিক আচার আচরণ, সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ, চরিত্র সৃষ্টি, ভালমন্দ ও নৈতিক বোধ সৃষ্টির প্রয়াস আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আমাদের ডিগ্রির সঙ্গে আমাদের জীবিকার কোন সম্পর্ক নেই। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার স্টেট ব্যাঙ্কের ডেবিট ক্রেডিট করবে এই নিষ্ঠুর বৈপরীত্যকেও আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। একজন কেরাণীর কাজের জন্য যেখানে স্কুল ফাইনাল কি হায়ার সেকেন্ডারী পাস ছাত্র যথেষ্ট যোগ্য সেখানে এম এ এম এস সি নিযুক্ত করে আমাদের কর্তারা আত্মপ্রসাদ পেতে পারেন কিন্তু এর ফলে যে বিরাট শক্তির অপচয় ঘটে, যে প্রতিক্রিয়া ঘটে যুব মানসে—তার ফলশ্রুতি আটকে রাখা যাবে না।

সমস্ত কার্যেরই একটা কারণ আছে। সেটা যদি দেখার দৃষ্টি থাকে তাহলে এই অরাজকতার জন্য ছাত্রদের দোষ দেওয়া যায় না। এই যে হাজার হাজার ছাত্র কলেজগুলিতে পড়ছে প্রকৃতপক্ষে তাদের সামনে কি ভবিষ্যৎ আছে? আজ তারা বুঝে গেছে যে পাস করে তারা বেকারের সংখ্যাকে বাড়াবে মাত্র এ ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের সামনে নেই। বাস্তবের সঙ্গে যোগ শূন্য পরিকল্পনা, কোটি কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বিযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের যুব সমাজকে হতাশা ও বেদনার অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। ঔদাসীন্য ও অবহেলা যদি যুবমানসে আক্রোশের জন্ম দিয়ে থাকে সেজন্য দুঃখ করা চলে, অনুতপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু আপামর ছাত্র ও যুব সমাজের ঘাড়ে সে দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

একদিকে কর্মসংস্থানের কোন আয়োজন নেই। হাজার হাজার শিক্ষিত, নিপুণ ও অনিপুণ কারিগর ও অশিক্ষিত লোক বেকার হয়ে বসে আছে, অন্যদিকে কি সরকারী কি বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রে ওভারটাইম, এক্সটেনশান, রি এমপ্লয়মেন্ট, বয়স্ক ব্যক্তি নিয়োগের অজস্র ঘটনা ঘটে চলেছে। একটা ফুলটাইম চাকরির সঙ্গে পার্ট টাইম চাকরি করছেন এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। পারেন-না কি সরকার এই মর্মে আদেশ জারি করতে যে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর কি সরকারী কি বেসরকারী কোন কর্মক্ষেত্রে কোন লোকই অপরিহার্য নন। প্রত্যেককে ঐ নির্দিষ্ট বয়সে অবসর নিতে হবে। যে কোন ব্যতিক্রম দণ্ডনীয় হবে। অর্থাৎ সর্বত্র তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য জায়গা করে দিতে হবে। সকল পার্টটাইম চাকরিতে যোগ্য তরুণদের স্থান করে দিতে হবে। এই কথাটা সরকার যে স্পষ্ট করে দ্ব্যর্থহীনভাবে এই চূড়ান্ত দুর্দিনেও বলতে পারছেন না তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে বেকারি ঘোচাবার বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা সরকারের নেই। যদিও জানি এত বড় দেশে নিঃশেষে বেকারি ঘোচাবার এটাই একমাত্র পথ নয়, তবু এই বেদনা চেপে রাখা যায় না যে আর্মিতে যখন অফিসারদের এক্সটেনশান ও রি-এমপ্লয়মেন্টের বন্যা চলছে তখন দেশের পরম দুর্দিনে শর্টসার্ভিস কমিশনে যে যুবকরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ভাগ্য বৃদ্ধ-অফিসারদের মর্জি উপর ভোগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একেবারে সেই যযাতির উপাখ্যান। অর্থাৎ পিতার লালসা ও কামনার কাছে পুত্রের যৌবন বলি হয়ে চলেছে।

তাছাড়া স্কুল কলেজের ফ্যাক্টরী চলছে তো চলছেই। এ অনেকটা কুম্ভমেলার ভিড়ের মতন। সামনের লোক এগুলো না, কেউ দেখার বা হুঁশিয়ার করবার নেই বলে পেছনের লোকও এসে পড়লো সামনে। এমনি করে যে চাপের সৃষ্টি হবে তাতে অনেক হাহাকার যে উঠবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এরই ফলে আজ কোথাও কোন বন্ধন নেই। আমি যদি মরে যাই তাহলে সমাজ সংসার নিয়ে আমি কি করবো—বিড়ালের মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত উক্তি—সে কি আজকের তরুণ সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করতে পারে না? প্রত্যক্ষভাবে সকলে এমন করে না বললেও অবচেতন মনে এই চিন্তা আঘাত করছে বলেই—শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব আজ খসে পড়ছে। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। ব্যক্তিগত আচরণে সামাজিক অনুষ্ঠানে, পূজা পার্বণে, খেলাধুলার মাঠে, পরীক্ষার হলে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছাত্ররা যদি পরস্পর কথা বলে,

পরীক্ষার হলটাকে আমরা একটু অন্য চোখে দেখি বটে, একটু অতিরিক্ত বিশৃঙ্খলা এখানে আশা করি বটে, কিন্তু তা করবার কোন কারণ নেই। পরীক্ষার হল সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোন স্থান নয়। সমাজে যদি দায়িত্বহীনতা, নীতিহীনতা ও চরিত্রহীনতার অজস্র ঘটনা ঘটে চলতে পারে, তাহলে পরীক্ষার হলে জীবন-মরণ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছাত্ররা যদি পরস্পর কথা বলে, বই দেখে, নকল করে, বাধা পেয়ে শিক্ষককে ভয় দেখায় এবং মারধোর করে তাতে দুঃখিত ও বেদনার্ত হওয়া যায় কিন্তু অবাক হওয়ার আর কিছু থাকে না।

তাই মনে হয় আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতটাকে পরীক্ষা করে দেখার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে। যেটা ১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্ট করার কথা ছিল, সেটা বিক্ষুব্ধ ১৯৭১ সালে করতে বসে ২৪ বছর সময় হেলায়ফেলায় নষ্ট করে দেওয়ার দুঃখ আমাদের বুকে যতই বাজুক তবু যদি এই শিক্ষা ব্যবস্থা, এই পরীক্ষা ব্যবস্থা, এই মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলা না হয় তাহলে আমাদের হয়তো আরো অনেক মূল্য দিতে হবে।

॥ ৩ ॥

পূর্ববাঙলা যে এতদিন নিজেদের পতাকা করে নি, সেও পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষের উদারতা; বা বলতে পারেন, তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব; বা কিছু মিরজাফরের কারসাজির ফল। যে সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি হয়েছিল তা যে ছিল পশ্চিমাদের নির্ভেজাল ধোঁকা তা যারা উপলব্ধি করলেন কিছু দিন পরেই, তাঁদের মুখ বন্ধ করার বন্দোবস্ত হলো 'সংহতি রক্ষা', 'ইসলাম বিপন্নের' ধুয়া এবং সেই সঙ্গে ভারত-বিরোধী জিগির তুলে। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আরও কয়েকজন দরদী নেতা পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষের চোখ খুলে দিলেন। এতদিন তাঁরা মার খেয়েই যাচ্ছিলেন, এবারে তাঁদের ন্যায্য পাওনা দাবি করতে লাগলেন। তাই তাঁরা ২৩ মার্চ ঘরে ঘরে নতুন পতাকা তুলেছেন। সেই সোনার বাঙলার পতাকা যার স্বপ্নই তাঁরা একদিন দেখেছিলেন।

সেদিন বাঙলা দেশের নবজাগ্রত সৈনিক অর্থাৎ আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয়। শেখ মুজিব নিজের বাসভবনের সামনে বাঙলা দেশের পতাকা উত্তোলন করে অভিবাদন গ্রহণ করলেন স্বেচ্ছাবাহিনীর মার্চ-পাস্ট অনুষ্ঠানের।

২৩ মার্চ দিনটিতে 'প্রতিরোধ দিবস' পালনের কারণ ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ওই দিনের 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল : 'স্বাধীনতার নামে মানুষের স্বাধিকার হরণ যেমন লাহোর-প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না, তেমনি সে-প্রস্তাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে কলোনী বানাইবার ও তার কোটি কোটি মানুষকে ক্রীতদাসে পর্যবসিত করারও কোনো প্রস্তাবনা ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইবার পর হইতে শাসকগোষ্ঠী তেইশ বছর যাবৎ তাহাই করিয়াছে এবং 'সংহতি'র নামে দুই যুগ ধরিয়া গণশোষণ, নিপীড়ন ও স্বাধীনতা হরণকার্যই

কল্হন

চালাইয়াছে। একটা ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা সাতচল্লিশের ১৪ অগাস্ট শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙলার হতভাগ্য মানুষ সে স্বাধীনতার কোনো স্বাদ ভোগ করিতে পারে নাই। জনসংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলের মানুষেরা স্বাধীনতার 'সু-অমৃত' ভোগ করিয়াছে তাহা হইল নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনা। 'ঝুটা আজাদী'র এমন 'মহিমা' যে, বাঙলার বঞ্চিত, বিশীর্ণ মানুষের প্রতিবাদ জানানোর অধিকারটুকুও উহার কল্যাণে হৃত, লুণ্ঠিত হইয়াছে।

বস্তুত বাক্-স্বাধীনতা হইয়াছে নব্য-ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর হস্তে ফার্স্ট ক্যাজুয়েলিটি এবং স্বাধীনতার মূলে সনদ লাহোর প্রস্তাব হইয়াছে উঁহাদের মেসিন-গানের মুখ্য শিকার।'

এই ক্ষেত্রে লাহোর প্রস্তাব স্মরণ-দিবস পালনের সার্থকতা কোথায়? তাই পূর্ব বাঙলায় এই বছর ওই দিনটি 'প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে পালিত হয়। কিসের প্রতিরোধ? প্রতিরোধ নির্যাতনের বিরুদ্ধে, প্রতিরোধ হামলার বিরুদ্ধে, প্রতিরোধ শোষণের বিরুদ্ধে।

ইয়াহিয়া খান 'পতাকা অপমানের' কথা বলেছেন। বাঙলা দেশের ভবনে ভবনে,

সভায় সভায় তিনি কি ওই ২৩ মার্চই বাঙলা দেশের পতাকা প্রথম দেখলেন? ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের জনসভায় বাঙলা দেশের যে পতাকা উড়েছিল, সেই খবর নিশ্চয়ই চরের মারফত তাঁর কর্ণগোচর হয়েছে। ১৫ মার্চ ঢাকায় পৌঁছেও কি বাঙলা দেশের দু'-চারটা পতাকা তাঁর নজরে আসে নি? তবু তো তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। ২২ তারিখও তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছেন। শেখ মুজিব 'রাষ্ট্রদ্রোহী', কই এমন কথা তো তখনো তাঁর মুখে শোনা যায় নি। শুনি, তিনি এই পর্যন্তও রাজী হয়েছিলেন যে, বিভিন্ন ইউনিটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে তিন মাসের জন্য ক্ষমতা তুলে দিতে তিনি রাজী হয়েছেন। তিনি থাকবেন প্রতিটি ইউনিটের প্রধান। এবং মার্শাল ল তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলার পরই তাঁর মত গেল পাল্টে। তিনি মার্শাল ল তুলে নিতে রাজী হলেন না। যুক্তি দেখালেন, মার্শাল ল তুলে নিলে আইনত রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁর থাকাটাই বেআইনী হয়ে যাবে। কিন্তু শেখ মুজিব তাঁর দাবির প্রতি রইলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর মত, মার্শাল ল তুলে না নেওয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন তামাশায় পরিণত হবে। বর্তমানে পরিষদ-সদস্যদের বাক্‌স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তা ছাড়া সেনাবাহিনী এক দিকে পূর্ববাঙলার নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে যাবে, সেই সময় সদস্যরা পরিষদে নির্বিকার বসে থাকবেন—এ হয় না। আলোচনা ওইখানে এসে ভেঙে গেল। তখনও কিন্তু ইয়াহিয়া মুখ খুললেন না। ওপর-ওপর খবর ছড়ালেন, ২৫-২৬ তারিখ জাতির উদ্দেশে এক বেতার-ভাষণে তিনি তাঁর ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সামরিক আইন তুলে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ ঘোষণা করবেন। ২৪ মার্চও শেখ মুজিবের সহকর্মীদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং সহযোগীরা আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কেন? এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে, সংকট নিরসনের জন্য কয়েকদিন ধরে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পিছনে ইয়াহিয়া খানের কতটুকু আন্তরিকতা ছিল।

ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গ, বেলুচিস্তান, পাখতুনিস্তানের এবং উপজাতীয় অঞ্চলের বহুদিনকার দাবি মেনে নিয়ে ১৯৭০ সালের ১ এপ্রিল পশ্চিমপাকিস্তানে এক ইউনিটের বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন। তিনি পূর্ববাঙলার দাবি অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট থেকে জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচনের দাবিও মেনে নিলেন। পশ্চিমপাকিস্তানের পাঁচটি ইউনিটের সম্মিলিত লোকসংখ্যা সাড়ে চার-পৌনে পাঁচ কোটি। আর পূর্ববঙ্গের একা সাড়ে সাত কোটি। ওই নীতির ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের আসন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬২, পাঞ্জাবের ৮২, সিন্ধু ২৭, বেলুচিস্তান ৪, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ১৮ এবং উপজাতীয় এলাকা ৭। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের একার আসন দাঁড়াল ১৬২। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচটি ইউনিটের মোট আসন-সংখ্যা দাঁড়াল ১৩৮। তা ছাড়া মনোনীত ১৩টি মহিলা আসন সংখ্যার বেশিটাই অর্থাৎ ৭টি দেওয়া হয়েছে পূর্ববঙ্গকে। এর অর্থ দাঁড়াল, পশ্চিমপাকিস্তানের ওপর পূর্ববঙ্গের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া। এতদিন পাকিস্তানে অধিনায়কত্ব ছিল পশ্চিমপাকিস্তানের লোক, বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা।

এবার সেই ক্ষমতা পূর্ববঙ্গের হাতে তুলে দেওয়ার প্রাথমিক জমি তৈরি করে দিলেন সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

নভেম্বরে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল। কম করেও দশ লাখ লোক প্রাণ হারাল সেই দুর্যোগে। অনেকে ভেবেছিলেন, এই দুর্যোগের অজুহাতে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখবেন। কিন্তু রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের সকল আশঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে ইয়াহিয়া নির্ধারিত দিনেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করলেন। পূর্ববঙ্গে শেখ মুজিব এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে জুলফিকর আলী ভুট্টো সবচেয়ে বেশী আসন পেলেন। জাতীয় পরিষদের সর্বমোট নির্বাচিত আসনসংখ্যার ১৬০টি আসন শেখ মুজিব পেলেন পূর্ববঙ্গের অপর দুজন নির্বাচিত সদস্য শ্রীনুরুল আমিন, শ্রীত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র) শেখ মুজিবকে সমর্থন জানালেন। অপর দিকে ভুট্টোর দলের আসন সংখ্যা ৮১। বেশ কয়েক দিন নীরব থাকার পর ইয়াহিয়া খান সঙ্গতভাবেই শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করলেন। এই পর্যন্ত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার সদিচ্ছায় কারুরই সন্দেহ থাকে না। অনেকেই বললেন, ইয়াহিয়া জঙ্গী-শাসকদের একটা ব্যতিক্রম নজির স্থাপন করতে চান। আয়ুবের মতো ভুল তিনি করবেন না। তিনি দেশে জনসাধারণের কাছে আদর্শ হয়ে থাকতে চান। দু-চারজন কট্টর জঙ্গীশাহী বিদ্বেষী লোককে অবশ্য তখনও বলতে শুনেছি, 'ওসব ভেক! সুযোগ বুঝলেই খোলস ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে ইয়াহিয়া। আরে, যা-ই করুক না, কয়লার ময়লা কখনো যায় না।' যাই হোক, ইয়াহিয়া খানের সদিচ্ছায় আরও সন্দেহ থাকে না, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চল ইউনিটের দাবি মেনে নিয়ে তিনি ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেল। যদিও শেখ মুজিব ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকতে বলেছিলেন। ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই দিনটি ঠিক করলেন। কাজটা যদিও গণতন্ত্রবিরোধী এবং ত্রুটিপূর্ণ, তবু এই পর্যন্ত ছিল সব কিছুই ভালো।

একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন ঠিক করার আগে থেকেই ভুট্টোর আবোল-তাবোল বকা চলছিল এবং দিন ঠিক করার পরেও তা কমেনি বরং বেড়েছে। নির্বাচনের পর কয়েকটা দিন ভুট্টো ভদ্রলোকের মতোই কাটিয়েছেন। সবাইকে বলে বেড়িয়েছেন মুজিবের সঙ্গে তাঁর কোনো মতবিরোধ নেই। মনের কথাটি কিন্তু তিনি একদিন লনডন টাইমসের রিপোর্টার পিটার হার্স্ট এবং অন্যান্য কয়েকজনকে বলে ফেলেছিলেন যে, তিনি মুজিবের ছয় দফা সমর্থন করেন না। পিটার হার্স্ট তাঁর পত্রিকায় এই কথা লেখায় তিনি ক্ষেপে গেলেন। তিনি পিটার হার্স্টকে দেখে নেবেন বলে শাসালেন। আরও বললেন, তিনি ক্ষমতায় গেলে ভারত, ব্রিটেন এবং কেনিয়াকে দেখে নেবেন। এই জিগির তাঁর জনসমর্থন কুড়োবার পুরনো কায়দা। কিন্তু শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই জিগির যে কোনো কাজেই আসবে না তা তাঁর মাথায় ঢুকল না। ১৩ ডিসেম্বর লারকানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো বললেন, 'শাসনতন্ত্রের মূল নীতি প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে ঐক্যমতে পৌঁছুতে না পারলে তাঁর দল বিরোধী দলের আসনে বসবে।' সাধু সিদ্ধান্ত। কিন্তু ২০ ডিসেম্বর গণতন্ত্রের সকল রীতিনীতি উপেক্ষা করে গোঁয়ারের মতো ভুট্টো বলে উঠলেন, 'তাঁর দল বিরোধী দলের আসনে বসবার ভাগ্য মেনে নিয়ে ক্ষমতায় আসার অপেক্ষায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করে থাকতে পারে না।'

---

২১ ডিসেম্বর আর একটু বেতাল হয়ে বললেন, 'ওসব মেজরিটি-ফেজরিটি আমি বুঝি না। কেন্দ্রের ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ও পি পি পি-র সমান বখরা থাকতে হবে। কারণ, এই দুইটি পার্টিই পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের অধিকারী। আমি শ্রীমতী বন্দরনায়কের মতো মহিলা নই। আমি অপোজিশনে বসে সন্তুষ্ট থাকার মতো লোক নই। আমাকে অবশ্যই ক্ষমতায় বসতে হবে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'পি পি পি ব্যতীত পশ্চিমপাকিস্তানের অপরাপর জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সহায়তায় আওয়ামী লীগ যদি তাদের নিজস্ব টাইপের শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবার মত দুঃসাহস করে, তবে তার ফল দেশের পক্ষে মারাত্মক হবে।'

তারপর ভুট্টো চেষ্টা করলেন, হাইজ্যাকিং-এর ব্যাপারটা নিয়ে সারা পাকিস্তান জুড়ে একটা তুমুল ভারত-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলবেন। তাঁর ধারণা, সেই ভারত-বিরোধী আবহাওয়ায় সদস্যরা, এমন কি আওয়ামী-লীগ সদস্য পর্যন্ত 'স্ট্রং সেন্টারের' অনুকূলে মত দেবেন। ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে নিজের লোকদের দিয়ে দু-এক দিন বিক্ষোভ দেখানো এবং হাই-কমিশন ভবনে কিছু ভাঙচুর করা ছাড়া তাঁর লাভের খাতায় জমা পড়ল না কিছুই। ভারতীয় বিমান ডাকাতি করে এনে, লাহোরে নামিয়ে সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন উপেক্ষা করে বিমানটি ধ্বংস করে দিলেন পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তান-সরকার বিমানটি ধ্বংসের দায়িত্ব যতই বিমান-দস্যুদের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করুন না কেন, পৃথিবীর কারু আর এ কথা বুঝতে বাকি নেই যে, পাকিস্তান সরকারেরই কারসাজি ওটা। বিমানদস্যুদের পাকিস্তান সরকার খাবার দিতে পারলেন, কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেন, আর তাঁদের বিমানটি ধ্বংস করার কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না—এও কি বিশ্বাসযোগ্য? শুধু তাই নয়, বিমানটি ধ্বংসের পর তাদের শুশ্রূষা করা এবং জামাই-আদরে আপ্যায়ন করারও কোনো ত্রুটি করেননি পাকিস্তান সরকার। যদি পাকিস্তান-সরকার মনে করে থাকেন যে, বিমানটি ধ্বংসের জন্য দায়ী বিমানদস্যুদ্বয়, তা হলে ভারতের দাবি অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তান দোষীদের ভারতের হাতে তুলে দিন। ভারতের দাবি মেনে না-নেওয়া পর্যন্ত সঙ্গত কারণেই ভারত তার ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল করা বন্ধ করে রেখেছেন। বিমানটি ধ্বংস করে যে পাকিস্তান অন্যায় করেছে পাকিস্তানের জনগণের তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এ নিয়ে পূর্ববাংলার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে পাকিস্তান-সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে। পাকিস্তানেরই অপরাধের জন্য পাকিস্তানের লোক ভারত-বিরোধী জিগিরে মেতে উঠবে—এমন আশা করে ভুট্টো খুব ভুল করেছেন। জনসাধারণকে ক্ষ্যাপাতে গেলে কিছু ন্যায্য কারণ থাকা চাই। সঙ্গত কারণ না থাকাতেই তাঁর ডাকে সাড়া মেলেনি কোথাও। না বেলুচিস্তান, না উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, না পূর্ববঙ্গ। এমন কি, তাঁর পাঞ্জাব এবং সিন্ধুতেও আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পারেনি তাঁর ডাক। কয়েক দিন বাদেই ব্যাপারটা মানুষের মন থেকে মুছে গেল। এই পরিকল্পনাটিও বানচাল হওয়ায় ভুট্টো বললেন, 'আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের আসন পেতে পারে, কিন্তু জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।' দিন কয়েক বাদেই জানালেন, 'পিপলস পার্টির অভিমত ছাড়া কোনো শাসনতন্ত্র হতে পারবে না।'

তারপরও যখন দেখলেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং তাঁর হুমকিধমকি শেখ মুজিব কানেই তুলছেন না, তখন তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বয়কট করার কথা ঘোষণা করলেন। আরও বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা এখন বিপন্ন। ঘরবাড়ি খালি ফেলে, আত্মীয়পরিজনকে একা রেখে তাঁরা এখন পূর্ববঙ্গে যেতে পারেন না।' পূর্ব-বঙ্গে গেলে 'জিম্মি' হয়ে পড়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন তিনি। তা সত্ত্বেও যখন তিনি দেখলেন অধিবেশনের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং পশ্চিমের অন্যান্য দলের সদস্যরা ঢাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, অনেকে মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও চালাচ্ছেন এবং যখন তাঁর মনে এই সন্দেহ গাঢ় হলো যে, মুজিব তাঁর সমর্থন ছাড়াই অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে চলেছেন তখন ক্ষ্যাপার মতো বলে উঠলেন, 'পশ্চিম থেকে যে সদস্যই ঢাকায় যাবেন তাঁকেই তিনি দেখে নেবেন।' তিনি আরও ভয় দেখালেন, হরতাল ডেকে সারা পশ্চিমপাকিস্তানের যাবতীয় কাজ-কর্ম তিনি স্তব্ধ করে দেবেন। ভুট্টো ভেবে-ছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানের একমাত্র মুখপাত্র-রূপে তিনি দর কষাকষি করবেন। এমন কি, মওকা মতো 'ভেটো'ও প্রয়োগ করবেন। কিন্তু তখন এটা আর কারু জানতে বাকি নেই যে, ভুট্টোসাহেব কোনো 'ভেটো'র অধিকারী কোনো 'বৃহৎ শক্তি' নন, তা তিনি সিন্ধু-পাঞ্জাবের ক্ষমতার দুর্গের দম্ভ যতই দেখান না কেন। ওটা তাঁর আস্ফালন দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা। তাই ওই আস্ফালনেও কোনো ফল হলো না। না মুজিব, না ইয়াহিয়া—কোনো পক্ষ থেকেই কোনো সাড়া এলো না। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের দিন যতই এগিয়ে এলো, তাঁর সুরও ততই নরম হয়ে এলো। জাতীয় পরিষদে যোগদানের জন্য পি পি পি-র অনেক তরুণ সদস্যের কাছ থেকেই চাপ এলো। দলে ভাঙন ধরার আশঙ্কা দেখা দিল। ভুট্টোর দলের সেক্রেটারি জে এ রহিমই ভুট্টোর বিরুদ্ধে এক পত্রে অভিযোগ আনলেন, 'ভুট্টোসাহেব দলের মধ্যে পীর, মওলানা ও জমিদার ও পাটমেশালী প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষমতালোভীদের জুটিয়ে জনসাধারণকে সমাজতন্ত্রের ধোঁকা দিয়েছেন।' তা ছাড়া ভুট্টোও দেখলেন, তিনি জাতীয় পরিষদে যোগ না দিলেও শেখ মুজিবের ক্ষতি তো হবেই না, বরং সুবিধা হবে। শেখ

নিজের দায়িত্বেই করেছেন। ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার পরই ইয়াহিয়ার এই সিদ্ধান্ত। পূর্ববাঙলার গভর্নর এস এম আহসান বাঙালীদের দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। শোনা যায়, তিনি বাঙালীদের ওপর

নির্যাতন চালাতে পারবেন না বলে ইয়াহিয়াকে জানিয়েছিলেন, তাই আহসানকে বিদায় নিতে হলো ১ মার্চ তারিখেই। পিণ্ডি থেকে ফিরেই আহসান শেখ মুজিবের সঙ্গে এক ঘণ্টা আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু জানা না গেলেও, আমরা এ ধারণা করতে পারি, মুজিব ইয়াহিয়ার মনোভাব সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আভাস পেয়েছেন। অবাঙালী আহসানকে ইয়াহিয়া সরিয়ে নিয়ে গেছেন, কিন্তু পূর্ব বাঙলার মানুষ আহসানের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেনি। তারা তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছেন সমস্ত অন্তরের বেদনা মিশিয়ে। পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করায় গভর্নর আজম খানকেও একদিন সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আয়ুব খান। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজমকে বিদায় দিতে গিয়ে কেঁদে ছিল সেদিন। করাচি-পিণ্ডির কর্তারা পূর্ববঙ্গকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছেন অতীতে করে যাচ্ছেন বর্তমানে। পশ্চিমাঞ্চলের সকল শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের মূল কাঠামো কিন্তু বরাবরই অভিন্ন রয়ে গেছে। প্রমাণ ইয়াহিয়া, প্রমাণ আয়ুব। সংকট-মুহূর্তে দুজনেই পূর্ববাঙলার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন গভর্নর আজম খান এবং এস এম আহসানকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। লক্ষণীয়, দুজনেই অবাঙালী। দুজনেই বাংলা দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের সমব্যথী হয়েছিলেন। এককালের মির্জাকে সরিয়ে আয়ুবকে ক্ষমতায় আনতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন আজম খান; আবার আয়ুবকে সরিয়ে ইয়াহিয়াকে গদিতে বসাতে সাহায্য করেছিলেন এস এম আহসান। দুজনেই দেশের ভালোর জন্য সরল বিশ্বাসে ওই প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সহযোগী হয়েছিলেন। দুজনেই পরে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তারপর যখনই তাঁরা জনসাধারণের হয়ে কথা বলতে গেছেন, তখনই তাঁরা হয়েছেন বিতাড়িত। যাক্ যা বলছিলাম। অধিবেশনে বসতে যাওয়ার মাত্র দু' দিন আগে যে অজুহাতে ইয়াহিয়া অধিবেশন মুলতুবী রাখলেন, তা থেকেই ইয়াহিয়ার অভিসন্ধি সম্পর্কে পূর্ববাঙলার রাজনীতিবিদদের মনে কতগুলি সিদ্ধান্ত গড়ে উঠল :

এক ॥ আয়ুবের মতোই ইয়াহিয়া ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তবে আয়ুবের মতো খোলাখুলি নয়। তিনি কাজটি হাসিল করতে চেয়েছিলেন কূট চালের মাধ্যমে। নির্বাচনটাই ছিল তাঁর চাল। তাঁর ধারণা ছিল, পূর্ববঙ্গে যখন এত দল, তখন প্রতি দলই কিছু-না-কিছু আসন পাবে। সকলে তখন মুজিবের কথায় সায় দেবে না। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারেও তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবেন না। সেই খেয়োখেয়ির অজুহাত দেখিয়ে তিনি জনসাধারণকে বলবেন, আমার প্রিয় দেশবাসী দেখুন, আমার কাজ আমি করেছি। আমি গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চাইছি। কিন্তু তাঁরা খেয়োখেয়িতে মেতে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের মতের মিল না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাচ্ছে না বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু চালটা ভেস্তে গেল। ভেস্তে দিল পূর্ব বাঙলার সাধারণ মানুষ। তাঁরা ছয়-দফার ভিত্তিতে শেখ মুজিব এবং তাঁর দলকে বিপুল ভোটে পূর্ববাঙলার একচ্ছত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগকে এবং জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে কথা বলবার সুযোগ করে দিলেন। ইয়াহিয়ার শাণিত অস্ত্র বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকেই ফিরে এলো। ইয়াহিয়া পূর্ববঙ্গকে আত্মদ্বন্দ্বের আবর্তে ফেলে দুর্বল এবং পঙ্গু করে রাখতে চেয়েছিলেন। সেই ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল একজোট, একমত। পূর্ববঙ্গের সকলে আওয়ামী লীগের পতাকা তলে এসে জমায়েত হলেন।

দুই ॥ ইয়াহিয়ার মনে একসময় এই আশাও জেগেছিল যে, প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভ দেখালেই মুজিব ছয় দফার প্রশ্নে আপস করে বসবেন। এবং পরিবর্তে তিনি নিজে প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে মুজিবের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারবেন। তাই তাঁকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেছিলেন। মুজিব সেই টোপও গিললেন না দেখে ইয়াহিয়া অন্য উপায়ের কথা ভাবতে বসলেন।

তিন ॥ ইয়াহিয়া 'হাইজ্যাকিং'-এর বিষয়টি অবলম্বন করে একটা জাতীয় সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন যাতে করে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জনসাধারণের নির্বাচনী রায়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ সাধন ভারত। ভারত ইচ্ছে করলেই বদলা হিসাবেই কোনো পাকিস্তানী বিমান আটকে রাখতে পারত, একটা সংকট বাধিয়ে তুলতে পারত, যেটা ইয়াহিয়া চেয়েছিল মনেপ্রাণেই। ভারত শুধু তার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে দিল। ধ্বংস-করা বিমানটির ক্ষতিপূরণ দান এবং বিমানদস্যুদের ভারতে ফেরত পাঠানোর দাবিটি শর্তপালনসাপেক্ষে ভারত পুনরায় পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার আশ্বাসও দিল। পাকিস্তানের এই অন্যায় কাজ বিশ্বেরও সমর্থনও পেল না। ফলে ইয়াহিয়ার কাম্য জাতীয় সংকট দেখা দিল না। ইয়াহিয়ার এই অভিসন্ধির বড়ো প্রমাণ, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী করার

অন্যতম কারণ হিসাবে তাঁর ভারতের নাম উল্লেখকরণে।

চার ॥ ইয়াহিয়া ৩ মার্চ অধিবেশন মুলতুবী রেখে ছয়-দফার প্রশ্নে আপস করার জন্য তিনি পরোক্ষে মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। আর যাচাই করতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিবের পিছনে সত্যিকারের গণসমর্থন কতখানি? নির্বাচনে দু-একটি দল যোগ দেয়নি। ফলে শেখ মুজিবুরের সত্যিকারের গণ-সমর্থনটা যাচাই হয়ে ওঠেনি। কিন্তু শেখ মুজিবের গণ-সমর্থনের দৌড় বুঝে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বড়ো রকমের গণ-আন্দোলন দেখা দিলে যাতে অবস্থা আয়ত্তে রাখা যায় তার জন্য গভর্নর আহসানকে সরিয়ে লেফটেনান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে পূর্ববঙ্গের সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এটা হলো ইয়াহিয়ার ৪ নম্বর ভুল।

পাঁচ ॥ ইয়াহিয়া খানকে তাঁর লেফটেনান্ট, বিশেষ করে টিক্কাখান-পীরজাদা-হামিদআলী চক্রের চাপের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে। হরিও পরিণতি আয়ুবের মতোই হতে যাচ্ছে দেখে ইয়াহিয়া খান তাঁর জেনারেলদের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন। ইয়াহিয়া খান যে-কোনো মুহূর্তে গদিচ্যুত হতে পারেন—সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই বলে এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে, ইয়াহিয়া ধোয়া তুলসীপাতা। পূর্ব-বঙ্গ এবং শেখ মুজিবকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে তাঁরও উৎসাহের কমতি ছিল না। তাঁর বেতারবক্তৃতার সুর শুনলেই তা বোঝা যায়। যে-কাজটা তিনি পরবর্তী সময়ে করলেন জেনারেলদের চাপে পড়ে সেই কাজটা তিনি কিছুটা আগে করে ফেলেছেন—এই যা। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, গোঁয়ার জেনারেলদের চাপে পড়ে দাবার চাল দিতে তাঁর মস্ত ভুল হয়ে গেল, যে ভুল শোধরানোর আর কোনো উপায়ই থাকল না তাঁর পক্ষে।

ইয়াহিয়া খান যদি রাজনীতিজ্ঞ হতেন তা হলে কিছুতেই অধিবেশন মুলতুবী রাখার ঝুঁকি নিতেন না। সেনাবাহিনীর লোক বলেই তিনি বুঝতে পারলেন না যে তাঁর এই ঝুঁকির পরিণতি কতো মারাত্মক হতে পারে। শেখ মুজিব যে কোনো চাপের কাছেই নতি স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করেও যদি ইয়াহিয়া তা বুঝতে না পেরে থাকেন তা হলে বুঝতে হবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব আছে। আর মুজিবের পিছনে গণ-সমর্থন আছে কিনা তা প্রমাণের জন্য অধিবেশন মুলতুবী না রাখলেও পারতেন। ৩ জানুয়ারি রেস-কোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যে জনসমাগম হয়েছিল পাকিস্তানের ইতিহাসে তো বটেই, এমন কি পৃথিবীর কম রাষ্ট্রের ইতিহাসেই তার নজির মিলবে। পত্রপত্রিকার দৌলতে ইয়াহিয়ার কাছে তার বিবরণ নিশ্চয় পৌঁছেছে। আমি যত দূর জানি, গভর্নর এস এম আহসানও ইয়াহিয়াকে সেই ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তবু সেই অভূতপূর্ব জনসমাবেশের খানিকটা বিবরণ এখানে দেওয়ার লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না।

সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। দশ দিক হতে মানুষের ঢল এসে নেমেছিল সেদিন ঢাকার রেস-কোর্স ময়দানে। দিন-কয়েক আগে থেকেই প্রদেশের দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধিকারকামী জনতার কাফেলার। লোক আসার জন্য রেল কোম্পানী সেদিন অতিরিক্ত ৩০ ভাগ বগির ব্যবস্থা করেছিল, দিয়েছিল তিনটি বিশেষ ট্রেন। তা ছাড়া লোক এসেছে পায়ে হেঁটে, বাসে, ট্যাক্সিতে, লরীতে, রিকশায়, স্কুটারে—যে যেভাবে পেরেছে রেস-কোর্স ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিয়ে ৭৫টি বাসের এক দীর্ঘ শোভা-যাত্রা গিয়েছিল সেদিন ঢাকায় সঙ্গে ছিল তাঁদের বাদ্যযন্ত্র। দুপুর বারোটা-একটার মধ্যেই ৭৩ একরের বিশাল রেস-কোর্স ময়দান জনতার সমুদ্রে পরিণত হলো। মাঠ ছাপিয়ে জনতার জোয়ার ক্রমে প্লাবিত করে ফেলল বাঙলা অ্যাকাডেমীর সামনের রাস্তা, ঢাকা ক্লাব, ইনজিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট এবং আর্ট কলেজের সামনেকার রাস্তা। উত্তরে শাহবাগ হোটেল পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ। মানুষ হোটেলের ছাদে, চারদিকের উদ্যানের গাছে।

(ক্রমশ)

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালোবাসা

শিবরাম চক্রবর্তী

॥ একুশ ॥

অবশেষে একদিন পার্শেলটা এল।

স্কুলের পথে পোস্টাপিসে খবর পেয়েই মামার নামের ফর দিয়ে আমার সই ফরফরিয়ে সেটার ডেলিভারি নিয়েছি।

সটান চলে গেছি ইস্কুলে—সিঙ্গাপুর আমবাগানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে।

বাংলার স্যার সতীনাথবাবু ততক্ষণে এসে গেছেন ক্লাসে।

তিনটে কেন রে?

পার্শেলটা দেখেই না লাফিয়ে উঠেছে সতীশ। অবশ্যি বসে বসেই যতটা লাফানো যায়—স্যারের নজর বাঁচিয়ে।

'কী আছে রে ওতে?' জানতে চেয়ে ফিস-ফিসিয়েছে পাশের ছেলেটি।

'ডিক্‌সনারি।' ফাঁস করেছি আমি। 'দেখাব নাকি? দেখতে চাস? খুলব?'

শুনেই সে আর দ্বিরুক্তি করেনি, দ্বিতীয় বার তাকায়নি সেদিকে—নাড়ানাড়ি করা দূরে থাক।

খানিক বাদে বলেছে, বিয়ের আগে কোনো নারী ঘটিত ব্যাপারে থাকতে নেই ভাই! বি এ পাশ করার আগে কি কেউ ডিকসনারি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে?

'নারী আর ডিকসনারির মধ্যে মিলটা কোনখানে?' আমি জানতে চেয়েছিলাম। 'কোনো সম্বন্ধ নেই?' তার পাল্টা জিজ্ঞাসা।

আমাদের ভেতরে সে একটু পরিপক্কই বলতে হয়, কেননা তার পুরুষ্টু গোঁফ বেরিয়েছিল, বিয়েও হয়েছিল দিন কতক আগে। তেখনকার দিনে পাড়া গাঁয়ে বাল্য-বিবাহ চালু ছিল বেশ। হয়ত সেই কারণেই ডিকসনারি নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা সে পছন্দ করেনি।

আমি আর সতীশ আর কথা না বাড়িয়ে পিরিয়ড শেষ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম।

তারপরে পিরিয়ড কাবার হতেই স্কুল পালিয়ে সতীশ আর আমি চলে গেছি আমবাগানে পিস্তলের হাত বাগাতে।

ছায়াচ্ছন্ন নিরালা এলাকায় খোলা হল পার্শেল।

তিনটে পিস্তল এবং আরো কতকগুলো কী যে দেখা গেল তার ভেতরে।

'তিনটে কেন রে?' শুধোলাম আমি সতীশকে। 'এর একটা তোর একটা আমার। তৃতীয়টা কার জন্যে কে জানে!'

'কেন, তুই জানিসনে?'

'লীডার জানে। বলেনি সে আমায়। আমিও জানতে চাইনি। সেরকম চেষ্টা করাও অন্যায়। শুধু জানিয়েছিল যে তিনটে আসবে মোটমাট।'

'আর এগুলো সব কী রে?'

'কার্তুজ। আমাদের টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য।'

'এত কার্তুজ?'

'লাগবে না? সহজে কি কারো নিশানা দুরস্ত হয় নাকি? অবশ্যি প্র্যাকটিসের পরেও বেঁচে যাবে এর অনেক। পরে সেগুলো কাজে লাগবে আমাদের। আমাদের কিম্বা আমাদের দলের।'

'সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি প্র্যাকটিস করতে আসবে না?'

'তার হাত দুরস্ত আছে—আগের থেকেই। তাছাড়া সে যে কে তাও আমি জানি না। লীডার আমায় জানাননি। টের পাবো সেই আক্রমণের দিনটায়। কিন্তু হাতে হাতে টের পেলেও হয়ত তাকে দেখতে পাব না।' মনে হোলো বলতে গিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন সে চাপল।

'তিন তিনটে ঝকঝকে পিস্তল! বেশ দেখতে কিন্তু!' আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি।

তাক করে দেখতে লাগি তারপর

লুকিয়ে দেখার পর তাক করে দেখতে লাগি তারপর।

হাত তৈরি হবার পর সতীশ একদিন এসে জানাল—'এই শোন! আমাদের কষ্ট করে সদরেও যেতে হবে না। আর ম্যাজিস্ট্রেট কি পুলিস সাহেবকে জেলায় গিয়ে মারতে হবে না। এখানেই আসছেন তাঁরা কদিন বাদে অর।'

'তাই নাকি?' আমি জানতে চাই—'কেন আসছে রে?'

'দুজন না হলেও ওদের একজন তো

আসছেই নির্ঘাত। খবর পেয়েছে আমাদের লীডার।'

'ইস্কুল ভিজিট করতে বুঝি?'

'তা নয়। মীটিং করতে এখানে। বিলেতে যুদ্ধ বেধেছে না? বাংলাদেশে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তৈরি হচ্ছে সেইজন্যে। তার সোলজার রিক্রুট করতেই তাঁরা আসছেন। ইস্কুলের ছেলেদের কি এখানকার যুবকদের কেউ সেই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চায় যদি।'

'বেঙ্গল রেজিমেন্ট? হ্যাঁ, দেখেছি বটে কাগজে। স্কুল কলেজের অনেক ছেলে সৈন্যদলে নাম দিয়েছে তাও জানি।'

'এখন, আমাদের প্ল্যানটা কিরকম হবে শোন্। সভাটা হবে স্কুলের মাঝখানে ড্রিল মাঠে সামিয়ানা খাটিয়ে—যেমনটা হয়ে থাকে ফি বছর প্রাইজ বিতরণ উৎসবের সময়। তবে এবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস সাহেব আসছেন না? তাই এবার আরো জমকালো হবে সভাটা।'

'তাতো হবেই। সে আর বলতে হয় না।'

'যেমন হয়ে থাকে, সভার একধারে হবে ডায়াস—সেখানে চেয়ার সাজিয়ে বসবেন ঐ সাহেবরা, গাঁয়ের গণ্যমান্য যতো লোক, রেকটার, হেডসার আর মাস্টার মশায়রা। এমনি আমার আন্দাজ। আর তার সামনে সারি সারি পাতা বেঞ্চে বসব শুধু আমরা—যত ছাত্ররা।

'ফি বছর বসে যেমন।' তার আন্দাজে আমার ঢিল ছোঁড়া।

'তুই বসবি গিয়ে একেবারে সামনের সারিতে, বুঝেছিস। পকেটে গুলিভরা পিস্তল নিয়ে। আর আমি বসব ঠিক তোর পেছনেই—কয়েক সারি পিছনে—আমার পকেটেও থাকবে পিস্তল।'

'তোর পিস্তল কিসের জন্যে রে! তুই কাকে-মারবি আবার?' আমি ভেবে পাই না—'ও বুঝেছি। পাছে আমার হাত কাঁপে, তাক ফসকে যায় যদি—তাকে শেষ করার জন্যেই বুঝি তুই...? মানে, আমার লক্ষ্য তেমন ঠিক হয়নি এখনও তোর ধারণা?'

'না না। সেজন্যে নয়।' সে বলে। 'তাক কেন ফসকাবে তোর? তোর নিশানা অব্যর্থ। আমি দেখেছি। না, সেজন্যে নয়...'

'তবে কিসের জন্যে? তোর পিস্তল আবার কেন তাহলে?'

'তোর জন্যেই রে।' বলে সে একটুখানি হাসে।

তার হাসিটা আমার তেমন ভালো লাগে না। হেঁয়ালীর মতই লাগে কেমন!—'আমার জন্যে তার মানে? আমার পিস্তল তো রয়েছেই, তার ওপরে আবার কেন? আমারটা যদি কোন কারণে জ্যাম হয়ে যায়, যথা সময়ে গুলি না বেরয় যদি?'

'তোর পিস্তলটা যেমন তোর জন্য আবার ওই সাহেবটার জন্যও যেমন, আমার পিস্তলটাও সেই রকম আমার জন্যও—ফের আবার তোর জন্যও তেমনি।'

'আমার জন্যও তেমনি? তার মানে?'

'তা আমি বলব না। মানা আছে বলবার।' বলে সে একটুখানি ঢোক গেলে—'সব কথা কি সবাইকে সব সময় বলা যায়?'

'আমি কি সবাইকার মধ্যে হলুম? আমি তোর বন্ধু না?' ফোঁস করে উঠি: 'এক পার্টির ছেলে না আমরা?'

'বলতে পারি। গোপনে। কাউকে বলবি না বল?'

'বলব কেন? এসব কথা কি বলাবলির?'

'যক্ষুনি তুই পুলিস সাহেবকে গুলি করবি না আর সে পড়ে যাবে—সেই মুহূর্তেই তোকে গুলি করতে হবে আমার। বুঝেছিস? লীডারের এই হুকুম।'

'আমাকে মেরে ফেলবি! তুই!' তার পিস্তলের তাক হবার আগেই যেন আমার তাক লেগে যায়।

'আমি না মারলেও তোকে তো মরতেই হবে—তা কি তুই জানিসনে? গুলি করার পরই তো ধরা পড়ে যাবি।—পুলিসের হাতে ধরা পড়বি তুই। চেনা ছেলে, সবাই তোকে চেনে, পালাবি কোথায়? আর ধরা পড়লেই তোর ফাঁসি হবে। হবে না?'

'তা হবে। তা হবে বটে।' আমতা আমতা করে মানতেই হয় আমায়। 'কিন্তু তাই বলে ফাঁসি যাবার আগেই...এই ভাবে মারাটা... মারা যাওয়াটা...' আমার কথা আটকে যায়।

গলার কাছে দলা পাকিয়ে কী একটা যেন ঠেলে উঠতে থকে। কান্নাই নাকি?

'সেই তোকে মরতেই হবে। সেই মরবি কিন্তু পুলিসের হাতে অনেক মারধোর খেয়ে অনেককে মেরে তার পরে মরবি—তার চেয়ে আগেই খতম হয়ে যাওয়াটা কি ভালো নয়? তোর পক্ষেও ভালো, দলের পক্ষেও।'

'দলের কাকে আমি মারতে যাচ্ছিলাম?' কাউকেই তো চিনি না আমার দলের।'

'ধরা পড়বার পর থানায় নিয়ে পুলিস যা বেধড়ক মার লাগাত না, পুলিসের সেই পিটুনির বহর তো জানিস নে...জানলে তুই ঢের আগেই মরতে চাইতিস—নিজেকেই নিজে গুলি করে মরতিস। কিন্তু তখন আর সে উপায় নেই তোর। লেট হয়ে গেছে।'

'খুব মারে বুঝি পুলিস? থানায় নিয়ে গিয়ে খুব কসে ঠ্যাঙায়?'

'মারে না? নখের মধ্যে পিন ফুটিয়ে দেয়, কম্বলে মুড়ে রামধোলাই লাগায়, ঠ্যাং বেঁধে কড়িকাঠে লটকে ঝুলিয়ে রাখে...'

'এই উলটো ফাঁসিটা কেন? আগের থেকে আসল ফাঁসির মহড়া দিয়ে রাখতেই নাকি?'

'কসে চাবকাবার জন্য, আবার কেন? তারও পরে আরো আছে...ন্যাংটো করে বরফের চাপড়ার ওপরে শুইয়ে রাখে...'

'ন্যাংটো করে? না না, ন্যাংটো হতে আমার ভালো লাগে না একদম।'

প্রবল আপত্তি আমার—'খালি গা হতে লজ্জা করে ভারী।'

'তোর আপত্তি তারা শুনছে কি না। কারো লজ্জা ফজ্জার ধার ধারে কি না তারা।'

সতীশ বেয়াড়া করে—'কেন, খালি গা হতে লজ্জাটা কিসের তোর? আমরা তো হোসটেলের ছেলেরা কেউ কেউ ফুটবল খেলার শেষে সন্ধেবেলায় এসে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি গিয়ে—পাড়ের ওপর প্যান্ট-শার্ট সব খুলে রেখে—খালি গায় সাঁতার কাটি কেমন—আমাদের কই লজ্জা করে না তো।'

'আহা, তোর মতন শরীর হত যদি—দেখাবার মত অমন—আমারও খালি গা হতে লজ্জা করত না তাহলে, ইচ্ছেই করত বরং। কিন্তু দেখছিস তো এই প্যাকাটির মতন চেহারা, হাড় বার করা জিরজিরে এই শরীর নিয়ে কেউ কি কারো সামনে খালি গা হতে চায়?'

'সে আমি জানি না ভাই তবে শোয়াবেই ওরা ওই বরফের চাঙাড়ে। এবং একেবারে দিগম্বর করে—কিছুতেই ছাড়বে না। যার যা দস্তুর। বরফের ওপর শুতে কেমন লাগে জানিস?'

'খেতে তো ভাল্লোই জিনিসটা, শুতে কেমন কে জানে! কখনো তো শুয়ে দেখিনি।'

'দেখতে পাবি বেঁচে থাকলে। টের পাবি হাতে হাতে তখন। দেখতে চাস নাকি?'

'না, কিন্তু শোয়াতে যাবে কেন তারা? তাতে লাভ তাদের? তারা তো সোজাসুজি নিয়ে আমায় ফাঁসিতে লটকে দিলেই পারে! শেষমেষ তাই যখন লটকাবে, লটকাবেই, ছাড়বে না, তখন তার আগে মড়ার ওপর এত খাঁড়ার ঘা মারাটা কিসের তরে?'

'কনফেসন আদায় করতে তোর। তোর দলে আর কে কে আছে তাই জানবার জন্যেই...'

'দলের কাউকেও তো আমি জানি না ভাই! কী জানাব? কার নাম করবো?'

'আমাকে তো জানিস। যন্ত্রণার চোটে আমার নামটা বলে দিবি নিশ্চয়। না বলে পারবি না। পার পাবি না। তখন তারা আমাকে পাকড়ে নিয়ে গিয়ে ওই সব কাণ্ডই করবে আবার। মারের চোটে আমিও বলতে বাধ্য হব তখন।—যার নাম জানি তার! এই করে করে শেষ পর্যন্ত গোটা দলটাই ধরা পড়ে যাবে আমাদের। সেই কারণেই তোকে এই অঙ্কুরেই বিনাশ করা।'

শুনে আমি গুম হয়ে যাই। অঙ্কুরিত বিনাশের সম্মুখে পল্লবিত হবার কোনো উৎসাহ পাই না।

সে কিন্তু গুমরে ওঠে তার পরেই—'পার্শেলের মধ্যে মোট তিনটে পিস্তল ছিল, মনে নেই তোর?'

'হ্যাঁ, ছিল তো। বেশ মনে আছে।'

'তার মানেটা কী জানিস?' বলে সে একটুখানি থামে—'অকালে মরার জন্যে মন খারাপ করছে তোর? মনে কোনো দুঃখ রাখিস নে। কিছু ভাবিস নে। আমিও তোর সহযাত্রী ধরে নে না। তোর পরে আমিও হয়ত এই পৃথিবীতে আর থাকব না। ওই তৃতীয় পিস্তলটি, মনে হচ্ছে আমার জন্যেই হয়ত।'

'তোর জন্যে? তার মানে?' অন্য আরেক ধাঁধার সামনে আমি বাধা পাই আবার।

'মানে, সেদিন হয়ত কে জানে, সেখানেই আর কেউ অমনি বসে থাকবে আমার পেছনে—আমাকে মারবার জন্যে তাক করে! সঙ্গে সঙ্গে সাফ করে দিতে আমায়। কেউ বলতে পারে?'

'তোদের লীডার না কি? না অন্য কেউ?'

'কী জানি কে! আমি কী জানি?'

'নিজেদের মধ্যে এই খুনোখুনি? না ভাই, ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভালো লাগছে না। যাই বল তুই।'

'ভালো লাগালাগির কথা নয় তো, দলের কানুন। যে বিয়ের যা মন্তর বলে না? তাই।'

(ক্রমশ)

প্রচ্ছদ : ভ্রম সংশোধন

চলতি সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকার ৩রা বৈশাখ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, সংখ্যা ২৫। শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল চোখে পড়ল।

শিল্পী প্রচ্ছদপটে বাঙলা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে কবি জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি খুবই পরিচিত উদ্ধৃতির ভুল ব্যবহার করেছেন। কবি তাঁর উক্ত কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন, "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর"। কিন্তু শ্রীপত্রী মহাশয় ঐ উদ্ধৃতির শেষের দিকে..."খুঁজিতে যাই"...স্থানে করেছেন... "খুঁজিতে চাই....."।

আপনাদের কাছে অনুরোধ, কবির এই উদ্ধৃতিটির ভুল সংশোধন করবেন। এই সূত্রে শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের প্রচ্ছদের বক্তব্য ও অলংকারের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

শচীন দাশ
কলকাতা ৩২

ভালোবাসার মুখ

৩রা বৈশাখের "দেশ" পত্রিকায় "ভালবাসার মুখ" এই প্রবন্ধে শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয়, বড়ে দুঃখের সহিত, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব" এর উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন, গোবিন্দ দেব দিনাজপুরের ছাত্র এবং অর্থাভাবে তিনি কলা বিক্রি করিয়া পড়ার খরচ চালাইতেন। এ তথ্য ঠিক নহে। আমাদের বাড়ি শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড পরগনার লাউড়া গ্রামে। গোবিন্দ পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ হাই স্কুল হইতে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাস হইতে পড়াশুনা করিয়া, দর্শনশাস্ত্রে এম এ পরীক্ষায় অনার্স-এ প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। কয়েক বছর পরে তিনি পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন। বিগত যুদ্ধের সময়, দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের শাখা খোলা হইলে, গোবিন্দ তাহাতে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দেন। তারপর দেশ বিভাগ হইলে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। আমরা পঞ্চখণ্ডের "দেবপুরকায়স্থ" বংশ নামে খ্যাত; সুতরাং গোবিন্দ দিনাজপুরের ছাত্র ও ছাত্রাবস্থায় কলা বিক্রয় করিতেন এ কথা সত্য নহে।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ
কলকাতা-২৬

(২)

৭ম সংখ্যা 'দেশ'-এ [১৭ই এপ্রিল] প্রকাশিত আমার লেখা 'ভালোবাসার মুখ' নামের স্মৃতিকথায় বার্ক-এর বই-এর উল্লেখ করেছি 'রিকনসিলিএশন...'। নামটি হবে, 'স্পিচেস্ অন্ কনসিলিএশন উইথ্ আমেরিকা'। এগারো বছর আগের পড়া বইটার নাম ভুল করার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে মার্জনা চাইছি।

নগেন্দ্র দাশ

স্বাধীন বাঙলা

বাঙলা দেশ সম্পর্কে সমগ্র আবেগ এবং উচ্ছ্বাসকে লক্ষ্য করে সেখানকার মানুষের কথা অনেক রকম করে মনে পড়ছে। ১৯৪৭ সালে শরৎ বসু ও আবুল হাসেমের স্বাধীন বাংলার (Independent Bengal) প্রয়াস নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন দিল্লীর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের হাইকম্যাণ্ড। সুরাবর্দি ও ফজলুল হক-ও স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে যোগ দিয়েছিলেন। ঠিকে শরৎ বসুর ছয় দফার সংকলন করা হয়েছিল আরো কয়েক দফা স্বাধীন বাংলার সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে। কিন্তু হায়! দিল্লী শরৎ বসুকে সরিয়ে দিলেন, জিন্নাহ সরিয়ে দিলেন আবুল হাসেমকে। উপরন্তু সুরাবর্দি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকলেও তাঁর সম্পর্কে জিন্নাহ বললেন, "মুসলিম লীগের হাই-কম্যাণ্ডের তরফ থেকে সুরাবর্দিকে আমি কিছু বলার ক্ষমতা দিই নি।" এ সব কথা যদি কেউ আলোচনা করেন, তবে আজকের মানুষ অনেক সত্যের মুখ দেখতে পাবে।

অন্য দিকে পরিহাসটা এই রকম; বাংলার যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পূর্ব পাকিস্তানী করা হয়েছিল শুধু মুসলমান এই মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের পশ্চিমী ভাগ্যবিধাতারা তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান জ্ঞান করলেন না। তার প্রমাণও দিতে থাকলেন অনবরত। বাঙালীও যে মুসলমান হতে পারে এ কথা অবাঙালী মুসলমান বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের বিশ্বাসে আসে না। তাদের ধারণা, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা বাঙালী, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আছে, অতএব হিন্দু। তাই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি পালটে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল বাংলা ভাষাকে উর্দু হরফে লেখার পরিকল্পনা করেও। একুশের রক্ত সে পরিকল্পনা মুছে দিয়েছে। আয়ুব-ইয়াহিয়ার আমলেও অফিসে অনেক স্থলে বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে। সব সাইনবোর্ড ও গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখা হয়েছে।

কিন্তু পরিহাসটা আরো নির্মম হয়ে বিঁধে হয় যখন জানতে পারি বাংলা দেশের যে মানুষেরা তাদের ভাষার দাবিতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ বহুদিন তাদেরকে বাঙালী মনে করেন নি। বলেছেন : ওটা মুসলমান। আমাকেই অনেকে বলেছেন : 'আপনাকে মুসলমান বলে মনে হয় না, বাঙালীর মতো মনে হয়—বললে কেউ বিশ্বাস করে না আপনি মুসলমান, ইত্যাদি।' হায়! মুসলমান আবার বাঙালী হয় কী করে?

বড় দুঃখ হয় এই উভয় তরফেরই মানুষদের মূঢ়তায়। কেউ বললে : আমি মুসলমান নই বাঙালী; কেউ বললে : আমি বাঙালী নই, মুসলমান। নিজেকেই প্রশ্ন

কাঁর : আমি বাঙালী মুসলমান, না মুসলমান বাঙালী?

অত গণ্ডগোল আমি বুঝতে পারি না। শুধু এইটুকুই জানি : আমার ভাষা বাংলাই থাকবে. আমার মাতৃভূমি বাংলাই থাকবে। এখন টান পড়েছে আমার পেটে, আমি বাঁচতে চাই. এখন আমি আর শোষিত হতে চাই না। সমানাধিকারের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত মানুষ হিসাবে আমি একদিন ঠিকই সম্মানিত হব।

শেখ দরবার আলম
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ,
কলকাতা-১

মিশরীয় ধর্মে পশু দেহধারী দেবতা

গত ২৭শে মার্চের "দেশ" পত্রিকায় আলোচনায় শ্রীসুমঙ্গল রাণা মহাশয় জানিয়েছেন যে আমার রচনাটি তিনি আগ্রহ সহকারে পড়েছেন. তার জন্য তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর মতানুযায়ী এ প্রবন্ধটি "মিশরাভিজ্ঞ এবং গবেষকগণের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক হবে" এবং তা যদি হয়, তবে আমার শ্রম আমি সার্থক বলেই মনে করব।

শ্রীরণা মহাশয়ের আলোচনার উত্তরে আমার সর্বপ্রথম বক্তব্য হল তিনি আমার রচনার ঐ অংশের সাথে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের গ্রন্থখানির ঐ পৃষ্ঠা দুটি আর একবার মিলিয়ে দেখবেন যে কোথও আক্ষরিক অনুবাদ হয়েছে কিনা। আর আমার এ রচনাটি অনুবাদ কর্ম নয়, তবে কোথাও এ দাবি করিনি যে এটা আমার মৌলিক রচনা। শুধু বিদেশ কেন স্বদেশের ক্ষেত্রেও কোন বিষয়ের ওপর আমরা যদি কিছু চিন্তা করতে যাই, তবে ঐ বিষয়ের পণ্ডিত বা গবেষকদের মতামতের অনেকটা সাহায্য আমাদের নিতে হয়, সে ক্ষেত্রে অনেক সময়ে আমাদের জ্ঞানটা "হাতফেরতা" হয়ে যায়, অর্থাৎ second বা third hand knowledge". সুতরাং বক্তব্যের মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক।

আর, আকর গ্রন্থগুলির স্বীকৃতির প্রসঙ্গে বলা যায়, "দেশ" হল সাধারণের জন্য পত্রিকা, কোন গবেষণামূলক পত্রিকা নয়, সেজন্য আকর গ্রন্থের স্বীকৃতির রেওয়াজ তো চোখে পড়েনি। তবুও শ্রীরাণা মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষার্থে সেগুলি হল :

১। **Penguin Herodotus** edited by A. J. Evans.

২। **Pyramids of Egypt** by J. E. S. Edwards—(Pelican Books revised edition, London, 1961).

৩। **The Folk-Art of India** by Sudhansu Kumar Ray.

৪। (ক) **The Gods of Ancient Egypt** by W. M. F. Flinders Petrie.

(খ) **Souls Journey to Paradise** by Donald A. Mackenzie—Wonders of the Past edited by J. A. Hamerton.

৫। **Archaic Egypt** by W. B. Emery—(Pelican Books).

৬। **The Art of Ancient Egypt** Published by Phaidon Press, Viena.

সুধীন দে
পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার,
কলকাতা-১২

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা

প্রখ্যাত লেখক শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর লেখা "ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা" আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে পড়ে আসছি।

এই সংখ্যাতে (১০-৪-৭১) দেখলাম তিনি লিখেছেন যে কবির মুচির কাজ করতেন। আমি যতদূর জানি কবির মুসলমান জোলা ছিলেন। তাঁত বোনা তাঁর পেশা ছিল। ভক্ত কবির অবশ্যই traditional হিন্দু মুসলমান ধর্মের অনেক ওপারের স্তরের সাধক ছিলেন। প্রসঙ্গত জানাই সন্ত রবিদাস জাতে চামার (মুচি) ছিলেন।

ক্ষিতিমোহন তাঁর দোহা নিয়ে বহু লিখেছেন। ১৯৩৩/৩৪ সালে রেডিওতে তিনি কবিরের দোহা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "ভক্ত কবির সিদ্ধ পুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।" সব বাঙালীরই জানা।

কবির মুচিই হোন বা তাঁতীই হোন তার জন্য শিবরামের লেখার রস মাধুর্যের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয়নি। প্রসঙ্গত কথাটা মনে এল তাই লিখলাম।

শ্রীসুশান্ত হালদার
নতুন দিল্লি-২৩

গণতন্ত্র ও বাংলা দেশ

পূর্ববাংলার খবর বিভিন্ন দেশের বেতার কেন্দ্র ও সংবাদপত্র মারফৎ কিছু কিছু এই সুদূর বিদেশেও এসে পড়ছে এবং তাতে বাংলাভাষাভাষী মাত্রই বিচলিত না হয়ে থাকার উপায় নেই। কয়েকটি বিষয় এই তাণ্ডব থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠছে :— যেখানে কোন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক

বংশের সাক্ষাৎ বংশধর হয়েও আকবর স্বদেশী !) কারণ 'লরেন্স বিনিয়ন আকবরের রাজ্য-বিস্তারকে বিদেশীর রাজ্য-বিস্তার হিসাবে লক্ষ্য করেননি' এবং মনে রাখতে হবে জার্মান ঐতিহাসিক Count Von Noer আকবরের রাজ্য-বিস্তারের মধ্যে প্রশংসার দিকই দেখেছেন !' একই পদ্ধতিতে পত্রলেখক কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের সমর্থনের সাহায্যে ভারতবর্ষে ইংরেজের সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তারকে স্বাগত জানাতে পারতেন অকাট্য যুক্তিতে ! বিনিয়নের আকবরকে সমর্থন জানবার একটি প্রধান কারণ হল—'Much of his system was to be permanent'। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যেও শাসন ব্যবস্থার অনেক কিছু স্থায়ী হয়েছিল—অতএব বৃটিশ অধিকারকেও আমাদের নৈতিক সমর্থন জানানো উচিত ! পত্রলেখকের ইতিহাস-ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গুরুতর বিচ্যুতির এই পর্যায়ে নেমে আসতে হয়। ন্যায় ও স্বাজাত্য-বোধের অভাব তাঁর এই স্ববিরোধিতার জন্য দায়ী কিনা যেন তিনি চিন্তা করে দেখেন। 'Though a foreigner, be identified himself with India he had conquered'

আকবর সম্পর্কে বিনিয়নের এই পক্ষপাতদুষ্ট বিশ্লেষণকেও নির্বিচারে মেনে নিয়েছেন পত্রলেখক। কিন্তু বিদেশীর রঙীন চশমা ত্যাগ করে গভীরভাবে জাতীয় ইতিহাসের তিনি মর্মসন্ধান করুন।

(৭) 'দিন্-ইলাহী'র মধ্যে আকবরের 'দাম্ভিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ' শুধু স্মিথ কেন, এই তথাকথিত 'ধর্ম' সমন্বয়ের' মিথ্যা প্রচারে যাঁরা বিভ্রান্ত নন তাঁরা সকলেই মনে করেন। কারণ 'দিন-ইলাহী'র দ্বারা নিজেই পয়গম্বর হতে চেয়েছিলেন মুঘল শাসক। সেজন্যই এই অপচেষ্টা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়—মাত্র ১৮ জন তাঁকে তোষামোদ করবার জন্যে 'দীন ইলাহী'র শপথ নেন!

(৮) 'জেসুইট পাদ্রীদের...আশা দিয়েও শেষ পর্যন্ত আকবর খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হননি।' কিন্তু কেন আশা দিয়েছিলেন? এটিও ত তাঁর ধর্ম জিজ্ঞাসার ছল ও ভণ্ডামীর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। খৃষ্টান পাদ্রীরা সেজন্যে আকবরকে যে 'চতুর', 'ভড়ংধারী' ও 'দাম্ভিক' প্রভৃতি 'আখ্যান' করে গেছেন' তা সম্পূর্ণ যথার্থ! 'ভিনসেণ্ট স্মিথ এদেরই প্রধান সাক্ষী হিসাবে মেনে' ঐতিহাসিকরূপে কর্তব্য পালনই করেছেন।

(৯) বদায়ুনি গোঁড়া মোল্লা, আকবরের প্রতি বিক্ষুব্ধ, তাঁর বিবরণীতে সন তারিখের ভুল দুটি ইত্যাদি হওয়া সত্ত্বেও আকবরের নিম্নলিখিত ঘটনাদিতে সন্দেহের কি আছে? যথা,—মথুরায় তাঁর দিল্লীর সম্ভ্রান্ত কুলকামিনীদের সঙ্গে 'বিবাহ' সম্বন্ধের ইচ্ছা, সেজন্যে খোজা ও কাওয়ালদের হারেমে কন্যাদের তদন্ত ও নির্বাচনের জন্যে প্রেরণ, তার ফলে নগরীতে মহা ত্রাসের সঞ্চার, আবদুল ওয়াসির অতুলনীয় রূপসী পত্নীর প্রতি বাদশার নেকনজর, ইত্যাদি।

(১০) আকবরের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে পত্রলেখক নিঃসঙ্কোচভাবে এই তাঁর সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের নাম একই পঙ্‌ক্তিতে স্থাপন করেছেন; কারণ চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অশোকেরও একাধিক পত্নী ছিল! এখানে পত্রলেখক নিদারুণ ভুল করছেন, সুতরাং তাঁকে জাগরিত করা আবশ্যক; মধ্যযুগের ভারতে প্রায় সকল রাজাই বহুপত্নীক ছিলেন, আকবরকে বহুবিবাহের জন্যেই কলঙ্কিত চরিত্র বলা হয়নি, একাধিক বিবাহ ও লাম্পট্য সমার্থক নয়, আকবরের পরস্ত্রীলোলুপতা, মুঘলের নামে নওরোজ বাহিনীর অজুহাতে পর্যুদস্ত রাজাদের পুরনারী হরণ, কোন কোন ক্ষেত্রে নারী লুণ্ঠনের জন্যেই যুদ্ধ-সাধন, বিহারীমল প্রভৃতি রাজার অসহায়তার সুযোগে রাজকন্যাকে নিজের হারেমে প্রেরণ (মিনাবাজারে সাপ্তাহিক পাঠিয়ে নানা সম্ভ্রান্ত কুল মহিলাদের শ্লীলতা নাশের প্রসঙ্গ আগেই উল্লিখিত হয়েছে), সতীদাহ নিবারণের ছলনায় শুধু যুবতীদের শ্মশান থেকে 'উদ্ধার' করে হারেমে বাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে পাঁচ হাজারেরও অধিক হতভাগিনীকে হারেম নামক বাদশাহী লালসাগারে সংগ্রহ—প্রভৃতি জানা এবং জাজ্বল্যমান তথ্যাবলী প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পাগলের মতন তাঁর কাছে 'সব ঝুট হ্যায়!' চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক ত' আকবরের প্রায় দু'হাজার বছর পূর্ববর্তী। আকবরের দু'চার শ' বছর আগেকারও কোন ভারতীয় রাজার নাম পত্রলেখক করুন যাঁর নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে এতপ্রকার 'মহান গুণাবলী' প্রকাশ পেয়েছে। সুদূর ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সঙ্গে আকবরের তুলনার প্রসঙ্গ নিতান্তই অবান্তর ও অসমীচীন।...

পত্রলেখকের আরো কয়েকটি উক্তি আছে যা সমালোচ্য। কিন্তু পত্র আর দীর্ঘ না করে উপসংহারে মূল সূত্রস্বরূপ একটি বিষয় স্মরণ করে নেওয়া যায়। পরাধীনতার অন্যতম অভিশপ্ত ফল এই যে, তা দাস মনোভাব সৃষ্টি করে বিজিত জাতির মনে। পরাক্রান্ত শাসকদের সম্বন্ধে ভয়সঞ্জাত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগায়। তার আমাদের পরাধীনতা ত' হাজার বছরের। কিন্তু এখন আমরা স্বাধীন জাতি, এই হীনমন্যতাবোধ আর শোভা পায় না।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

[এ-সম্পর্কে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ সম্ভব নয়।]

বিশ্ববিজ্ঞান

শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই। যদিচ পরীক্ষামূলক বিষয়বস্তুর আলোচনার বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্বাচনেই সাবধানী হওয়া প্রয়োজন।

গত ১৬ জানুয়ারীর দেশে পেঁয়াজ সম্বন্ধে আলোচনায় বলা হয়েছে "ক্ষুদ্রান্তের অভ্যন্তরে কার্যকরক নিঃসরণের ব্যাঘাত জনিত রোগে ভুগছেন তাঁদের ক্ষেত্রে পেঁয়াজ প্রচণ্ড (?) রকম উপকারী", পরিভাষাটি জারক রস না হয়ে জারকরস (digestive juce) হওয়া উচিত ছিল। (এটি ছাপার ভুল!)

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী দেশে আপেল সম্বন্ধে আলোচনায় বিতর্কিত বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। সাইট্রিক এসিড ও পেকটিনের জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এক স্থানে বলা হয়েছে বিশুদ্ধ পেকটিন-এর জলীয় দ্রবণ মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে নয় গ্রাম ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার শতকরা নব্বুই ভাগ সাবাড় করে দিয়েছে"। ব্যাকটেরিয়ার পরিমাপ গ্রামে হয় বলে আমার জানা নেই। Bactrial Count (জীবাণু সংখ্যা গণনা) দ্বারা তার পরিমাপ নির্ধারিত হয়। অনুবাদে কয়েকটি জীবাণুর নামেরও ভুল অনুবাদ হয়েছে—প্রোটাস না হয়ে প্রোটিয়াস (Proteus), সালমোনেল্লা না হয়ে সালমোনেল্লা (Salmenella), ছত্রাক ক্যানাডিয়া না হয়ে ক্যানডিডা (Candida) হওয়া উচিত ছিল। সিজেল্লা/সিগেল্লা (Soigella) এবং সেরেয়াস/সিরিয়াস (Sereus) উভয়ই হয়ত চলতে পারে।

আপেলের ভুল ব্যবহারে উদরাময় রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী। প্রথমত আপেল সহজে গেঁজিয়ে (Fermentation) যায় তাই পেটে "বায়ু" জমবার সম্ভাবনা প্রবল। দ্বিতীয়ত আপেল হজম করা কষ্টসাধ্য।

"Apples are not highly digestable when eaten raw; when cooked they form a useful food which has a gentle laxative influence." Food Hygiene by Wu Glunic Harry & Harry Hill, Page—333) সিদ্ধ করলে আপেল কিছুটা Predigested হয়ে তাই হজমে অসুবিধা হয় না। গরমে আপেলস্থ পেকটিন জেলীতে পরিণত হয়। এই জেলী অন্ত্রের ভিতর দেওয়ালে একটা সুখকর আবরণ (emollient coating on intestinal wall) দেওয়াতে উদরাময় নিবারণে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' বহুল পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায় এবং খনিজ লবণ বেশীর ভাগই জলে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

৬ মার্চের দেশে ডঃ নীহারসের চমকপ্রদ চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয় জানানোর জন্য ধন্যবাদ। এক জায়গায় বলা হয়েছে "একটি মুরগীর পেটের ভিতর থেকে ভ্রূণ বের করে নিয়ে সেই ভ্রূণের কোষের সঙ্গে বিশেষ ধরনের দ্রবণ মিশিয়ে পেলটে রাখা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ইনজেকশান দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে হৃৎপিণ্ডটি আবার সক্রিয় হয়।" মুরগী ডিম পাড়ে এবং 'তা' দিয়ে বাচ্চা ফুটোয়। তাই মুরগীর পেটের ভিতর ভ্রূণ থাকতে পারে না।

ডাঃ গোপেন্দু চৌধুরী
কলকাতা-১২

লেখকের নিবেদন:

দেশ-এর মার্চ ২৭, ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ অমরেন্দ্র পাল এবং বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ গোপেন্দু চৌধুরীর চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। সালমোনেল্লা এবং সেরেয়াস—ঠিক এই রকম উচ্চারণ একাধিক বিদেশী বিজ্ঞানীর মুখে আমি শুনেছিলাম এবং সেইভাবেই শব্দ দুটিকে ব্যবহার করেছি। বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দ প্রকাশের সময় উচ্চারণগত ভ্রান্তি দূর করার ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা

চৌধুরীকে জানাচ্ছি, 'জরক রস'ও ছাপার ভুল। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট' বলতে যা বোঝায়, আপেল প্রসঙ্গে উল্লেখিত জীবাণুবিজ্ঞানীরা সেটাকে সম্ভবত ঐ ভাবে গ্রহণ করেননি। সংবাদের মূল বয়ানটি ছিল এই রকম:

. . . . concentration of only 1 per cent killed 90 per cent of nine gram negative bacteria within 15 minutes, and almost all after two hours . .. .

না, ডাঃ নীহানসের চিকিৎসা প্রসঙ্গে জনৈক বিশেষজ্ঞ-সাংবাদিক মুরগীর ভ্রূণ কথাটাই ব্যবহার করেছেন। ঠিক ডিম বলতে যা বোঝায়, নীহানস তার ব্যবহার করেননি। মুরগীর পেটে শুক্রকোষ এবং ডিম্বকোষের মিলনে যে প্রাথমিক জৈবিক দশার সৃষ্টি হয়—যখন তার পাশে ডিমের সেই কঠিন আবরণ তখনও তৈরি হয়নি—ভ্রূণ বলতে তিনি সেটাকেই বুঝিয়েছেন।

প্রসঙ্গত নিবেদন, 'বিশ্ববিজ্ঞান' পর্যায়ের কোন রচনা বা তথ্যই নিছক অনু-বাদ নয়। বিভিন্ন সংবাদ এবং তথ্যের উপর নির্ভর করে স্বতন্ত্রভাবে তাদের পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়।

রবীন্দ্র পুরস্কার

এ বছর সৃজনমূলক সাহিত্যে রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'এখনই' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। গতবার এই পুরস্কার পেয়েছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব।

রমাপদ চৌধুরীর জন্ম খড়গপুরে, ১৯২২ সালে। কলকাতা নিবাসী, আদিবাস বর্ধমান। পড়াশুনো করেছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরেজি সাহিত্যে এম এ। জীবিকা সাংবাদিকতা।

'এখনই' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়।

রমাপদ চৌধুরী খুব বেশী লেখেন না, তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস বিষয় বৈচিত্র্যে ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আলাদা স্বাদের। 'এখনই' উপন্যাসের উপজীব্য আধুনিক যুব সম্প্রদায়। হতাশা, অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তায় বিক্ষুব্ধ এই যুব সমাজ, পড়াশোনা তাদের কাছে প্রায় বোঝার মতন—কোনো চোখের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অভিভাবকদের সাথে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা পদে পদে, মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে দ্রুত; অধিকতর মেলামেশার সুযোগের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম, শরীর, বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণাও নতুন রূপ নিচ্ছে। এই সমাজ ও ব্যবস্থাকে বদলাবার জন্যও এই যুব সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর। এই সম্প্রদায়ই এখন সর্বত্র আলোচ্য, কিন্তু সাহিত্যে এদের কথা এখনও তেমনভাবে আসেনি। এদের সম্পর্কে রমাপদ চৌধুরী মমতা ও বিচারবোধ সমন্বিত একটি নিখুঁত ছবি রচনা করেছেন। বাস্তবের রূঢ় সত্য মেশানো থাকলেও উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। পিতা-মাতা অনেক সময় তাঁদের সন্তানদের আচরণ ঠিক বুঝতে পারেন না, কিন্তু একজন সাহিত্যিক তাঁর পরের জেনারেশনের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ দুঃখের কথা সত্যভাবে উপস্থিত করতে পারেন। রমাপদ চৌধুরী ছাড়া এই যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে সমরেশ বসু ও বিমল করও শক্তিশালী উপন্যাস রচনা করেছেন।

এবারের রবীন্দ্র পুরস্কারের বৈশিষ্ট্য, লেখকদের বয়সের প্রবীণতার দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে পঞ্চাশের কম বয়স্ক একজন লেখককে সম্মানিত করতে পারলেন। এবং আধুনিক কালের যুবক যুবতীদের কাহিনী সাহিত্যের অভিভাবকদের স্বীকৃতি পেল। আগে এই সব লেখায় ছোকরাদের গল্প সম্পর্কে অনেকের মধ্যে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখা যেত।

রমাপদ চৌধুরী

অন্য দুটি শাখায় এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন—জিতেন্দ্রকুমার গুহ 'মহাকাশ পরিচয়' এই বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার জন্য; এবং বাংলা ছাড়া অন্য ভাষায় রচিত বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ক রচনার জন্য শংকর সেনগুপ্ত।

উল্টোরথ পুরস্কার

উল্টোরথ পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত কবিতার জন্য পুরস্কার এ বছর পেয়েছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু।

বৃষ্টির দিনে মিছিল

মঙ্গলবার ২০ এপ্রিল প্রায় সারাদিনই কলকাতায় তুমুল বৃষ্টি। ঝোড়ো হাওয়ারও বিরাম নেই। দুপুরের দিকে একটু কমলেও বিকেলবেলা বৃষ্টি আবার ঝেঁপে এলো। সেদিন বিকেল পাঁচটায় পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সংগ্রাম সহায়ক কমিটি একটি মিছিল ডেকেছিলেন। সেই দুর্যোগেও শোভাযাত্রায় এসেছিলেন অনেকে।

ময়দানের কাছ থেকে শুরু হলো শোভাযাত্রা। নীরব। সামনে ফেস্টুন ধরে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মনীন্দ্র রায়। মিছিলের অগ্রভাগে দেখেছিলাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে। এবং সরযূ দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সাধনা রায়চৌধুরী।

বৃটিশ, মারকিন ও সোভিয়েট দূতাবাসের সামনে এসে মিছিলের পক্ষ থেকে একটি করে স্মারকপত্র দেওয়া হয়। তাতে দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি ও অবিলম্বে বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতিদানের।

এরপর মিছিলটি যায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের দূতাবাসে। সেখানকার কর্মীদের অভিনন্দন ও সমভ্রাতৃত্ব জানাবার জন্য। দূতাবাসের বন্ধ দরজা খুলে যায়, অনেকেই ভেতরে যান—বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি হোসেন আলি ও অন্যান্য অফিসাররা স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানান, সুচিত্রা মিত্র গান করলেন, অনেকেই গলা মিলিয়েছিলেন।

শোভাযাত্রায় আরও যাঁরা উপস্থিত ছিলেন : শঙ্খ ঘোষ, জনাব গোলাম কুদ্দুস, সুনীল দাশ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, নিখিল সরকার, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, প্রসূন বসু, তুষার চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু, পিনাকেশ সরকার, কালীকৃষ্ণ গুহ, শান্তনু দাস, দিলীপ সেনগুপ্ত, সুধীন ব্যানার্জি, আবু আতাহার এবং আরও অনেকে।

আমি বিশ্বাস করি, আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, যে-সমস্ত লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী দুর্যোগের জন্য বা অন্য গুরুতর কারণে সেদিন আসতে পারেননি, তাঁদেরও হৃদয় যুক্ত ছিল ঐ নীরব মিছিলের সঙ্গে।

সনাতন পাঠক

বিদেশী বই

ডেসমণ্ড মরিস প্রাণীবিজ্ঞানী। অক্সফোর্ডের পি এইচ ডি এবং ইংলণ্ডের জুলজিক্যাল সোসাইটির কিউরেটর। মরিস অনেকগুলি বই লিখেছেন, অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক বই Naked Ape সাংঘাতিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষ। প্রাণীবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে মরিস মানুষকে দেখেছেন। মরিসের কথায় এই পৃথিবীতে ১৯৩ রকমের বানর (ape-এর ভাল প্রতিশব্দ না পেয়ে আমি বানরই ব্যবহার করছি, বিদগ্ধ পাঠক ক্ষমা করে নেবেন) আছে। এর মধ্যে ১৯২ রকমের বাঁদরের গা লোমে ঢাকা, একটি মাত্র নগ্ন। এই নগ্ন বাঁদরের দল নিজেদের "মানুষ" নামে পরিচয় দেয়। বানরের মধ্যে সর্বোত্তম এই প্রাণী যে বড়ো উচ্চমার্গের এই চিন্তায় সময় কাটাতে খুব ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু ভুলেও তারা তাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে কথা বলে না। নগ্ন বানররা গর্ব করে বলে যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তাদের মগজের পরিমাণই সবচাইতে বড়। কিন্তু সেই সাথে এই প্রাণীদের পুরুষাঙ্গও যে সবচাইতে বড় সে কথাটা তারা বেমালুম লুকিয়ে যায়। মরিসের কথা হল, তিনি প্রাণীবিজ্ঞানী এবং নগ্ন বানর এক ধরনের প্রাণী। মানুষের নগ্ন বানরদের সম্পর্কে একটু জটিল এই অজুহাতে তিনি তাদের প্রাণী হিসাবে আলোচনা করবেন না এটা তিনি ভাবতে পারেন না। মরিস বলেন যে, পাহাড় জঙ্গলের উপজাতিদের পর্যবেক্ষণ করে নগ্ন বানরের আদি জানা যাবে না কারণ এই উপজাতিরা নগ্ন বানরের ইতিহাস থেকে দূরে চলে যাওয়া অপরিণত গোষ্ঠী। এদের নিয়ে আলোচনা করে এই প্রাণীর খবর পাওয়া যাবে না। অন্যদের তথাকথিত সভ্য মানুষের, অগ্রবর্তীদের মধ্যেই তার ইতিহাস খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু এই বিশেষ ধরনের বানর নগ্ন কেন? আমরা যত রকমের বানর দেখতে পাই তাদের সকলের গায়ে লোমের আস্তরণ আছে। আমাদের পৃথিবীর যে আবহাওয়া তাতে এই নগ্নতার কোনো সুবিধা নেই। তবে কেন সে নগ্ন? এই নগ্নতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মরিস পাঁচ কোটি থেকে আট কোটি বছর আগে চলে গিয়ে মানুষের বিবর্তন দেখিয়েছেন। বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষরা পোকামাকড় খেয়ে বাঁচতো সেখান থেকে তারা ক্রমশ বানর হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা পরিবর্তনের চাপে পড়ে বানরদের শিকারী হয়ে উঠতে হলো। বাঘ সিংহের মতো শরীরের গঠন না থাকার দরুণ নগ্ন বানরদের পূর্বপুরুষ অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখলো। যখন শিকারী হলো তখন এদের একসঙ্গে শিকার করতে বেরোতে হতো। এই শিকার নগ্ন বানরদের একে অন্যকে সাহায্য করতেই হতো—মেয়েরা থাকতো পেছনে বাচ্চাদের নিয়ে। সুতরাং মেয়েদের জন্য ডেরা বাঁধতে হলো। শুধু নিজে শিকার করে খেলেই হবে না বাচ্চাদের জন্য মেয়েদের জন্য খাবার আনতেই হতো। শিকারী বানর থেকে উৎপত্তি হলো গেরস্থালী বানরের। গেরস্থালীর ঝামেলা নিয়ে ভাবতে হলো, তাকে বেশী করে মগজের ব্যবহার করতে হলো, জন্ম হল সাংস্কৃতিক বানরের। কিন্তু এখনো সে মূলত তার পুরাতন ব্যবহারেরই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

মরিস দেখিয়েছেন যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে এই বিশেষ প্রাণী কিভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিভাবে মানুষের হাত পা মাথা আজকের আকার পেয়েছে। যে প্রক্রিয়াটা মানুষের সবচেয়ে কাজে লেগেছে সেটাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলে নিওটেনি। সহজ কথায় তার মানে হলো পরিবর্ধিত শৈশব। শৈশবের নানা লক্ষণকে বয়স্ক অবস্থায় ধরে রাখাই এই প্রক্রিয়ার কাজ। একটি সাধারণ বানরের বাচ্চা যখন জন্মায় তখন তার মগজের শতকরা সত্তর ভাগ নিয়ে জন্মায়। আমাদের বাচ্চাদের জন্মের সময় থাকে মাত্র তেইশ ভাগ। জন্মের ছ মাসের মধ্যে সাধারণ বানররা তাদের পুরো মগজ লাভ করে আর মানুষের লাগে তেইশ বছর। আপনার আমার প্রজনন ক্ষমতা লাভ করবার পর দশ বছর অবধি মগজের বিকাশ হয়, শিম্পাঞ্জীর প্রজনন ক্ষমতা লাভের ছয় সাত বছর আগেই সেটা হয়ে যায়।

বর্ধিত শৈশবকালের ফলে মেয়েদের কাজ বেড়ে গেল তাদের শিশুদের পরিচর্যা করা অনেক সময়-সাপেক্ষ হয়ে গেল। এখন এদের কে দেখে? এই সমস্যার সমাধান হলো জোড় বাঁধার মধ্যে দিয়ে। একটি ছেলে একটি মেয়ে জোড় বাঁধতে লাগলো। এর ফলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মেয়েরা পুরুষদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতো, মেয়েদের নিয়ে পুরুষদের মধ্যে ঝগড়ার সম্ভাবনা অনেক কম হলো। এটার প্রয়োজন ছিল কারণ বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কমাতেই হতো। শিশুপালনে পুরুষরা সাহায্য করতে শুরু করলো, পত্তন হলো পারিবারিক জীবনের। মরিস বলেন যে, অত্যন্ত সুসভ্য সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন মনুষ্যজাতি সেদিনের সেই শিকারী জীবনের বহু অভ্যাসই আজো ছাড়েনি। এখন মানুষ শিকার করতে যায়, শুধু ভাষা বদলে বলে "কাজে যাচ্ছি।" শিকার করে বাড়ি ফেরা "অফিস থেকে ফেরা।" জোড় বাঁধারই নাম প্রেম এবং বিবাহ।

প্রাণীবিজ্ঞানী ডেসমণ্ড মরিস

The Naked Ape by Desmond Morris. Publisher: McGraw Hill Book Co.

কিন্তু এর সঙ্গে নগ্নতার সম্পর্ক কি? মরিস অনেক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। সবগুলি এখানে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। তবে একটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্বানুসারে মানুষ কিছুদিন জলচর প্রাণী হিসাবে কাটিয়ে ছিল এবং সেই সময়ে তার লোম ঝরে যায় এই জন্যই মানুষই একমাত্র বানরজাতীয় প্রাণী যে সাঁতরাতে পারে। মিসিং লিংক যে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি তার কারণ সমুদ্রে আমরা তার ফসিলের খোঁজ করিনি। মরিস কিন্তু প্রমাণাভাবে এ তত্ত্ব খারিজ করেছেন।

সে তত্ত্ব মরিস মেনেছেন সেটা হলো এই যে, বাঘ সিংহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়বার ক্ষমতা মানুষের ছিল না তবু ঠিক সেই কাজই করতে হতো মানুষকে। এর ফলে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা যেতো ভীষণ বেড়ে। নিওটেনির ফলে মানুষ অনেকদিন ধরে নানা জিনিস শিক্ষা করতে পারতো বাবা মার কাছ থেকে তাতে সে ওস্তাদ শিকারী হয়ে উঠেছিল বংশানুক্রমে শিকারের কায়দা রপ্ত করে। তবু দৌড়ের হাত থেকে রেহাই তার ছিল না। মানুষ লোম ত্যাগ করে এবং শরীরে ঘর্মগ্রন্থি গজিয়ে নিয়ে সে সমস্যার সমাধান করলো। মরিস সাদরে এই তত্ত্ব গ্রহণ করলেও পাঠক পারবেন না। কারণ মরিসের নিজের মতে মেয়েরা বরাবরই কম কাজ করেছে। তাদের তো দৌড় ঝাঁপ করতে হয়নি অথচ নরবানরদের মধ্যে পুরুষদের অপেক্ষাই তো লোম বেশী। এ প্রশ্ন মরিস তোলেননি।

নগ্ন বানরের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করার পর মরিস এই প্রাণীর যৌন আচার, এর অনুসন্ধিৎসা, এর বাচ্চা পালন পদ্ধতি, ঝগড়া মারামারির কায়দা, আরামপ্রিয়তা এবং অন্যান্য পশুদের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। আড়াই শো পাতার এই বইয়ে নানা রকম বিতর্কিত তথ্য আছে। পুরো বইটার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাবে না তবে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

হাসির উৎপত্তি সম্বন্ধে মরিস বলেন যে, এরও কারণ আমাদের নগ্ন গাত্র। বাচ্চা শিম্পাঞ্জীরা তাদের মার লোমকে আঁকড়ে ধরে থাকে। একটু বড় হলে মাঝে মাঝে মার কোল ছেড়ে বেরিয়ে আসে, কিন্তু কোনো বিপদের গন্ধ পেলেই মার কাছে ফিরে যায়। মানুষের বাচ্চার সেরকম কোনো সুবিধা নেই। শিম্পাঞ্জীর বাচ্চার মতো মার জন্য সেও কাঁদে কিন্তু মা এলে আঁকড়ে ধরবার মতো লোম মার গায়ে নেই। তাই মানুষের বাচ্চা হাসি আবিষ্কার করেছে। মাকে হাসি দিয়ে ভুলিয়ে মার কাছে সে বেশীক্ষণ থাকতে পায়। আমাদের গায়ে আমাদের নিকট আত্মীয়দের মতো লোম নেই এবং তাই আমরা হাসি এরকম কথা অনেকের কাছেই খুব সহজগ্রাহ্য হবে না। তবে মরিস কাউকে খুশী করতে কলম ধরেননি। মরিস মনে করেন যে নারীর স্তনের আসল উদ্দেশ্য হলো দুই নিতম্বের অনুকরণে সামনের দিকে দুটি মাংসপেশী গজানো। নগ্ন বানর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন নারীর যৌন উত্তেজক নিতম্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল তাই স্তনের উৎপত্তি। এই পরিস্থিতিতে যাদের সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে তারা হলো মনুষ্যশিশু। স্ত্রী নগ্ন বানরের স্তন শিশুর মাতৃদুগ্ধ খাবার উপযোগী নয়। তা যদি হতো তবে দুধের বোতলের ছিপি যে রকম স্তনের বোঁটাও সেরকম হতো।

মরিসের এ মন্তব্য অনেক প্রাণীবিজ্ঞানীই মেনে নেননি এবং প্রতিবাদে বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে। মরিসের প্রধান বক্তব্য যে, আমরা আজো আমাদের পূর্বপুরুষদের অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আমরা আসলে ছোট ছোট জাতি হিসাবে থাকতে চাই। আমাদের পরিচিত লোকের সংখ্যা যদি আমরা কখনো গুণে দেখি তাহলে দেখবো তার সংখ্যা আর যে কোনো একটি বন্য উপজাতির গোষ্ঠীর সংখ্যা এক হবে। আমাদের এখনো নিজেদের ডেরাটিকে স্বতন্ত্র করে রাখার ঝোঁক মরে যায়নি। আমাদের ঘরে ছবি রাখা আর রাস্তার কুকুরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোস্টে প্রস্রাব করা আসলে একই ব্যাপার। দুজনেই আমরা আমাদের থাকার জায়গাটিকে স্বতন্ত্র করে নিচ্ছি। অন্যান্য কুকুরেরা বুঝবে যে এ এলাকাটা একটা বিশেষ কুকুরের আর আমার ঘরটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে। যাঁরা খেতে বসে গরম ভাত না পেলে রেগে যান তাঁরা শুনুন আপনি সেই পাঁচ কোটি বছর আগের অভ্যাস ভুলতে পারেননি। সেই যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা টাটকা শিকার করে কাঁচা খেতেন, তখন রক্ত সে খাবার উষ্ণ থাকতো। আপনিও সেই অভ্যাসের দাস রয়েছেন। যেসব স্ত্রী স্বামীর তাসের আড্ডায় গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সময় নষ্ট করা দুচক্ষে দেখতে পারেন না তাঁরাও শুনুন মিছেই স্বামীকে দোষ দিচ্ছেন তিনি, যখন সমস্ত ছেলেরা মিলে সামন্ত শিকারে বেরোত সে সময়ের স্মৃতি এখনো ভুলতে পারেননি।

মরিস বই আরম্ভ করেছেন এই বলে যে, মানুষের সুকুমারবৃত্তি নিয়ে গবেষণা বহু হয়েছে, মানুষের জান্তব বৃত্তি নিয়ে আলোচনাই তার উদ্দেশ্য। বইটি প্রকাশ হবার পর মানুষের সুকুমার বৃত্তি নিয়েই আলোচনা নতুন করে শুরু হয়েছে। সমালোচকরা প্রায় তুলোধোনা করেছেন মরিসকে। তার একটা কারণ মরিস নিজে। তাঁর বই-এর কোনো কোনো অধ্যায় দারুণ ভাল আবার কোনো অধ্যায় প্রায় অপাঠ্য। তাছাড়া লোককে চমকানোর প্রয়াস তো অনেক জায়গাতেই প্রকট। কোনো কোনো জায়গায় আবার স্রেফ 'মনে হলো বলে বললাম' এ ধরনের যুক্তিও আছে।

এ সব দোষ সত্ত্বেও বইটি পড়তে ভাল লাগে এবং বেশীর ভাগ সময়ই চিন্তার খোরাক যোগায়।

প্রিয় শর্মা

সাফল্য মেনে নিয়েও সমালোচক সঙ্গতভাবেই বলেছেন রক্তকরবীর প্রতীকী অর্থ বাস্তব নাট্যরস থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠেনি। তৃতীয় প্রবন্ধ অভিনয়ের অভিপ্রেত আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাটকের বক্তব্য যেমন মানবচরিত্রনিহিত মুক্তলীলার স্বরূপ প্রকাশ, তার অভিনয়েও তেমনি স্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া চাই।

পরিশিষ্টে দুটি প্রবন্ধ আছে। 'নাটকের গান' আর 'ঋতুমণ্ডল ও রক্তকরবী'। 'নাটকে গান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাটকে গানের তাৎপর্য, তার ব্যবহার বাহুল্য, তার বাহনমর্যাদা এবং তাকেই সর্বস্ব করে নাটক রচনার চেষ্টার এক চমৎকার বিবরণ পাই, আর শেষ প্রবন্ধে রক্তকরবীর প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে সমালোচক দেখতে পান এক একটি ঋতুর লীলা সমস্ত চরিত্রগুলি মিলে এক আবর্তিত ঋতুমণ্ডল আর সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে এক সামগ্রিক সময়। মানব সংঘাতের কাহিনীর বাতাবরণে এই প্রকৃতি মানুষের সহজ চলাচলের প্রেক্ষাপট যে নতুন ডাইমেনশন এনেছে তা সমালোচকের কবি দৃষ্টির গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির অলক্ষ্য নিদর্শন। ২১৫/৭০

রাজনৈতিক রচনা

বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান। কল্হন। সাহিত্য প্রকাশ. ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। বারো টাকা।

'কল্হন' বিরচিত 'বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান' গ্রন্থখানি ইতিমধ্যেই ব্যাপক বাঙালী পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে। ভারত বিভাগ তথা পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস আভাসে রেখে মুখ্যত ১৯৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯'-এর পঁচিশে মার্চ অর্থাৎ পাকিস্তানে নতুন করে সামরিক আইন জারি, আয়ুবের পতন ও ইয়াহিয়া খানের আগমন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সতের বছরের উত্থান-পতনবন্ধুর রাজনৈতিক আবর্ত ও সমান্তরালভাবে বিকশিত গণ-জাগরণের এক বিশ্বস্ত দলিল হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। শুধু তাই নয়, অতিসাম্প্রতিক পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অবধারণেও গ্রন্থখানির গুরুত্ব অসাধারণ।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থে লেখক পাকিস্তানের জঙ্গী অপশাসনের স্বরূপ ও নির্মমতা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের স্বাধিকার অর্জনের বিভিন্ন ছোট-বড় স্তরগুলি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গত, শুধু পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই নয়—পশ্চিম পাকিস্তানে জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামের চিত্রও লেখক অঙ্কিত করেছেন। বিশেষ করে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কায়েমী শাসক-বর্গের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং আবদুল গফফুর খান প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে মরণ-পণ প্রতিরোধের কাহিনীও লেখক সবিস্তারে জানিয়েছেন। ফলে, সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের নিষ্ঠুর অন্তঃচরিত্রটি গ্রন্থে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান'-এ প্রচুর তথ্যযোগে অজস্র ঘটনা সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনার রাজনৈতিক গুরুত্ব বিষয়ে লেখক যে আলোকপাত করেছেন তা যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক। পূর্ব বাংলায় জনসমাবেশে জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন, ছাত্রজাগরণের বিভিন্ন স্তর এবং প্রতিবাদ প্রতিরোধ, আত্মদানের রক্তক্ষয়ী ইতিহাস, আয়ুবতন্ত্রের স্বরূপ; জঙ্গী শাসকের নির্মম নিপীড়ন; ফজলুল হক, মৌলানা ভাসানী, মুজিবুর রহমন প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং মুক্তি আন্দোলনের ক্রমবিস্তার, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের কূটকার্যকলাপ—ছোট বড় নানা রঙের রাজনৈতিক ঘটনা-গুলি লেখকের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। লেখক নিজে পূর্ব বাংলার একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় ঘটনাগুলি তথ্য-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পেরেছে। উপরন্তু লেখক নিজে পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কর্মী হিসাবেও গণআন্দোলনকে যে শ্রদ্ধা ও আবেগের সঙ্গে দেখেছেন তাতে মুক্তি আন্দোলনের অন্তঃস্বরূপ এবং উন্মাদনার দিকটি পাঠকমাত্রকেই অভিভূত করে ফেলবে।

'বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান' বাজারে প্রচলিত তথাকথিত রাজনৈতিক উপন্যাস পর্যায়ের নয়। অনেকটা ডায়েরী এবং রিপোর্টাজের ঢঙে লেখা। ফলে, সমগ্র বিষয় বিন্যাসের মধ্যে এমন একজাতীয় নাটকীয় চমক আছে যা পাঠককে বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতন্দ্র রাখে। কোথাও বিষয়বস্তু নীরস রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতায় ক্লান্তিকর ঠেকে না। মাঝে মাঝে বড় বড় রাজনৈতিক প্রসঙ্গের ছেদ টেনে এমন কতগুলি ছোটখাটো ও আকর্ষণীয় বিষয়ের সূত্রপাত করা হয়েছে, যেমন—ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন, সূর্য সেনের মুক্তি সংগ্রাম—যা পাঠককে গ্রন্থপাঠে মনোযোগী করে রাখে। গ্রন্থের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং বিভিন্ন রাজসাক্ষীর সওয়াল জবাব—অধ্যায়টি। লেখক প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ রূপ ও গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি বিষয়ে যে সব ছোটখাটো দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন—আজকের মুক্তি সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে তার মূল্য অনেকখানি। রচনারীতিও যথেষ্ট প্রসাদগুণসম্পন্ন। পূর্ব বাংলার গণ-আন্দোলনের অন্যতম যোদ্ধা হিসাবে মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনায় যে উষ্ণতা ও আন্তরিকতা লক্ষ করা যায় তা-ও রচনাকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মাঝে মাঝে ওপার বাংলার কবিদের কিছু কিছু উদ্ধৃতি রচনা মধ্যে সংযুক্ত হওয়ায় আন্দোলনের ভাবাবেগের দিকটা চমৎকার ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের দীর্ঘ সতের বছরের রাজনৈতিক বিক্ষোভের একটা পরিপূর্ণ ছবিচিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে বইখানিতে।

উপন্যাস

তাঞ্জাম। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪.৫০ পয়সা।

বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী। প্রথমদিকে তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত করেছিলেন। সেই প্রথমদিকে তাঁর রচনার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণবোধ ছিল কিন্তু ইদানীং বিভূতিভূষণের রচনায় সেই সাহিত্যগুণে কমে এসেছে। আলোচ্য উপন্যাসটি তো আমাদের নিরাশ করেছে। বিষয়বস্তু অতি সাধারণ, ক্লান্তিকর এবং সাহিত্য মূল্যের দিক থেকে একেবারেই সামান্য। উপন্যাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত কষ্ট করে পড়তে হয়, এমনি দুর্বল কাহিনী। 'তাঞ্জাম' পড়বার পর মনে হচ্ছে লেখকের কোথাও ক্লান্তি এসেছে।

তারপর প্রকাশকও বইটি অযত্নে করে ছেপেছেন। প্রথমদিকে প্রুফের বিস্তর ভুল রয়েছে এবং সেইজন্য এক বিচিত্র ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকাশকের এইসব দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। ১৮৫/৭০

প্রাপ্তি স্বীকার

জর্জর। বীরেন চক্রবর্তী। পরেশচন্দ্র দাস : ৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪.০০।

আমার শৈশব। পরিকল্পনা : শ্রীমহেন্দ্র-নাথ দত্ত। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেডঃ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২৫.০০।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখো-পাধ্যায়। জিজ্ঞাসা : ১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ১০.০০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে 'রাবার' জয়ে ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় এক স্বর্ণ অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

'রাবার' আমরা আগেও পেয়েছি। প্রথম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে (১৯৫২—৫৩ সালে)। তারপর নিউজিল্যাণ্ড (১৯৫৫—৫৬, ১৯৬৫ এবং ১৯৬৮ সালে) এবং ইংলণ্ডের (১৯৬২ সালে) বিরুদ্ধে। বিদেশ থেকেও রাবার না এনেছি এমন নয়। কিন্তু যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেস্ট যুদ্ধে আমাদের জয়ের ঘরে শূন্য ছিল সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয় এবং প্রথম 'রাবার' লাভ শুধু কৃতিত্বেরই পরিচয় নয়, গৌরবেরও কীর্তিগাথা। এই কিছুদিন আগেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছিল ক্রিকেটের অলিম্পিকে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন। ব্যাটের বিক্রমে এখনো তারা পরম শক্তিশালী। ওদের দেশে গিয়ে ওদেরই সঙ্গে টেস্ট-যুদ্ধে জয় যেন সিংহের বিবরে প্রবেশ করে সিংহকে পরাস্ত করা।

শুধু টেস্ট-যুদ্ধে জয় কেন, সামগ্রিক ফলাফলেই সাফল্যের পর্যাপ্ত পরিচয়। পাঁচটি টেস্ট সমেত মোট ১৩টি খেলার মধ্যে পরাজয় শুধু একটি খেলায়। বারবাডোজের কাছে ৯ উইকেটে। চাঁদের কলঙ্কের মত ওইটুকু না থাকলে এই ক্রিকেট অভিযানকে আমরা চন্দ্র অভিযানের মতই মনে করতে পারতাম।

পোর্ট অফ স্পেনের দ্বিতীয় টেস্ট জয়ও কিছুটা অপ্রত্যাশিত। দুই ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার ফল। কেউই ভাবতে পারেনি, যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে ফলো-অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল তারা ৪ দিনের মধ্যে ওভাবে হার স্বীকার করবে। তবু ওই জয়ে অবশ্যই আমাদের স্পিনারদের কৃতিত্ব স্বীকার্য। স্বীকার্য দলের সংহতি এবং আত্মবিশ্বাসের কথাও। আবার এ কথাও স্বীকার করতে হবে এই সংহতি, আত্মবিশ্বাস এবং অনমনীয় দৃঢ়তার আরও বেশী পরিচয় মিলেছে বিপর্যয় লগ্নে, পরাজয়ের আশঙ্কার মুখে। যেমন প্রথম টেস্টে মাত্র ৭৫ রানের মধ্যে ভারতের ৫টি উইকেট পড়ে যাবার পর সারদেশাই ও সোলকারের ব্যাটের বিক্রমে নতুন জুটির রেকর্ড সৃষ্টি এবং শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ফলো-অন করিয়ে খেলাকে জয়ের সম্ভাবনার মধ্যে টেনে নেওয়া। যেমন, বারবাডোজের কেনসিংটন ওভালে ভারতের ফলো-অন

একুশ বছরের ছেলে গাভাসকার—চেহারা দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। আর ক্রিকেট-কীর্তিতে? ইচ্ছে করে কোলে করে বা মাথায় তুলে নাচতে

বাঁচিয়ে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বাঁচানো। চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ৩২৯ রানে এগিয়ে এবং তাদের হাতে ৬টি উইকেট তখন ভারতের আশাবাদী সমর্থকেরও সন্দেহ ছিল ভারত ওই টেস্ট বাঁচাতে পারবে কিনা। কিন্তু প্রথম টেস্টের মতই ওই

ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট অ্যাভারেজ

ভারত-ব্যাটিং

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	অ্যাভারেজ
এস গাভাসকার	৪	৮	৩	৭৭৪	২২০	১৫৪·৮০
ডি সারদেশাই	৫	৮	০	৬৪২	২১২	৮০·২৫
ই সোলকার	৫	৭	১	২৪৪	৬৫	৪০·৬৬
এ মাঁকড়	৩	৫	১	১৪০	৫৩*	৩৫·০০
ই প্রসন্ন	৩	৪	২	৬১	২৫	৩০·৫০
জি বিশ্বনাথ	৩	৫	০	১৩৫	৫০	২৭·০০
এ ওয়াদেকার	৫	৭	০	১৫১	৫৪	২১·৫৭
এস বেঙ্কটরাঘবন	৫	৬	০	১০৫	৫১	১৭·৫০
আবিদ আলী	৫	৭	০	১১৯	৫০*	১৭·০০
বি বেদী	৫	৬	৩	৩৭	২০*	১২·৩৩
এম জয়সীমা	৩	৫	০	৪৩	২৩	৮·৬০
এস দুরানী	৩	৪	০	২৪	১৩	৬·০০
পি কৃষ্ণমূর্তি	৫	৬	০	৩৩	২০	৫·৫০

জয়ন্তীলাল—১টি টেস্টের এক ইনিংসে ৫ রান।

* তারকা চিহ্ন নট আউটের নির্দেশসূচক।

টেস্ট ইতিহাস ঘরে এসেছিল। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭০ রানে ৬টি উইকেট পড়ে যাবার পর সারদেশাই ও সোলকার সপ্তম উইকেট জুটিতে করেছিলেন ১৮৬ রান—জুটির আর এক রেকর্ড। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বাঁচিয়েছিলেন সুনীল গাভাসকার দের্ঘদিন ধরে ব্যাট করে এবং শেষ পর্যন্ত ১১৭ রানে নট আউট থেকে।

● দিনব্যাপী পঞ্চম টেস্টেও ভারতের পরাজয় আশঙ্কা ছিল। কিন্তু গাভাসকারের অতুলনীয় ব্যাটের বিক্রমে, প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরির ফলে বিজয় পতাকা উঁচু রেখেই ভারত দেশে ফিরতে পেরেছে।

আরও মনে রাখতে হবে সফরের প্রথম দিকের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চেয়ে শেষের দিকের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ছিল অনেক শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গ্যারি সোবার্স গর্ব করে বলেছিলেনও সে কথা। বলেছিলেন, শেষ দু'টি টেস্টে চাকা ঘুরে যাবে। আমরাই জিতব ও-দু'টি খেলায়। কিন্তু ভারতের খেলোয়াড়রা তাঁদের জিততে দেননি। অনমনীয় দৃঢ়তা, মনোবল আর ব্যাটের বিক্রমে।

সত্যি কথা বলতে কি, জর্জ টাউনের তৃতীয় টেস্টম্যাচ টেম ড্র হওয়া ছাড়া চারটি টেস্টেই দেখা গেছে ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় লড়াই, আশা-আশঙ্কার দ্বন্দ্ব, রেকর্ড ভাঙা-গড়ার পাল্লা। আরও বলবার কথা, বিদেশের মাটিতে বেশীর ভাগ তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতকে কিছুটা অসুবিধার মধ্যেই প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। ছোটখাটো চোট আঘাতে পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়রা দলকে সাহায্য করতে পারেননি। যেমন বিশ্ব ক্রিকেটে ১৯৭১ সালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সুনীল গাভাসকার আঙুলের চোটের জন্য প্রথম টেস্ট সমেত ৪টি ম্যাচ খেলতে পারেননি, প্রসন্নর মত বিশ্বখ্যাত স্পিনার খেলতে পারেননি দু'টি টেস্ট, ওপেনিং ব্যাটসম্যান মানকড়কেও শেষ টেস্টে দলভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এমন কি অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান জয়ন্তীলালেরও হাতে চোট ছিল। তাছাড়া ৫টি টেস্টের মধ্যে প্রথম ৩টি টেস্টে অধিনায়ক ওয়াদেকারের টসে হারও কিছুটা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। কিন্তু ভাগ্য সাহসীর সহায়। এই সফর ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাহস ও শৌর্যের সফর। এই সফরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের এক মন—এক প্রাণ—একতার জয়। কোন বিদেশ সফরে এমন কি কোন হোম সিরিজেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন একতার পরিচয় মেলেনি। সার্থক নেতৃত্ব অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকারের। সাবাস সারদেশাই ও সুনীল গাভাসকার। [illegible] জানাতে হয় সোলকার, আবিদ আলী, ভেঙ্কটরাঘবন, প্রসন্ন বেদীকেও। এমন কি আগামী ইংলণ্ড সফরে যে দুরানিকে বাদ দেবার কথা উঠেছে তাঁকেও। দ্বিতীয় টেস্টে দুরানি যদি লয়েডের মত খেলোয়াড়কে অল্প রানে ফিরিয়ে দেবার পর শূন্য রানে সোবার্সের উইকেট ছিটকে না দিতে পারতেন তাহলে জয় কি সম্ভব হত? হয়তো হত। কিন্তু ওই টেস্ট জয়ে দুরানির অবদান অনেকখানি।

ভারত—বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	অ্যাভারেজ
এস বেঙ্কটরাঘবন	২৮৯·৪	৬৬	৭৪৪	২২	৩৩·৮১
ই প্রসন্ন	১৫৯·৫	৪০	৪০৭	১১	৩৭·০০
বি বেদী	৩১০·৩	৯৩	৬৫৬	১৫	৪৩·৭৩
আবিদ আলী	১৬০·২	২১	৫২৩	১১	৪৭·৫৪
এস দুরানি	৬১	১৩	১৬১	৩	৫৩·৬৬
ই সোলকার	২১৯	১৯	৩৬১	৬	৬০·১৬

জয়সীমা ২৩—৪—৬৪—০; গাভাসকার ১—০—৯—০; মাঁকড় ৫—০—৩৩—০; ওয়াড়েকার ৩—০—১২—০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—ব্যাটিং

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	অ্যাভারেজ
সি ডেভিস	৪	৮	৪	৫৩১	১২৫*	১৩২·৭৫
এম ফস্টার	২	৪	২	১৭৫	৯৯	৮৭·৫০
ডি লুইস	৩	৫	২	২৫৯	৮৮	৮৬·৩৩
জি সোবার্স	৫	১০	২	৫৯৪	১৭৮*	৭৪·২৫
আর কানহাই	৫	৯	১	৪৩৩	১৫৮*	৫৪·১২
আর ফ্রেডারিক্স	৪	৮	০	২৪২	৮০	৩০·২৫
সি লয়েড	৫	১০	০	২৯৫	৬৪	২৯·৫০
ডি হলফোর্ড	১	২	০	৫৩	৪৪	২৬·৫০
জে কারু	৩	৫	০	১২১	৬৫	২৪·২০
এম ফিন্ডলে	২	৩	১	৩৭	৩০*	১৮·৫০
এস ক্যামাচো	২	৪	০	৬৮	৩৫	১৭·০০
এ ব্যারেট	২	৪	০	৩৩	১৯	৮·২৫
জি শিলিংফোর্ড				৩১	২৫	৭·৭৫
জে শেফার্ড	২	৩	০	১২	৯	৪·০০
জে নরিগা	৪	৫	২	১১	৯	৩·৬৬
ইউ ডো	২	২	১	৩	৩	৩·০০

এল গিবস ১টি টেস্ট ২৫ রান, কে বয়েস ১টি টেস্ট ৯ রান, ইনসান আলী ১টি টেস্ট, ব্যাট করেননি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	অ্যাভারেজ
জে নরিগা	২০০·২	৪৭	৪৯৩	১৭	২৯·০০
কে বয়েস	১২·২	৫	৫৯	৩	২৯·৫০
জে শেফার্ড	১০৩	২৬	২২৩	৭	৩১·৮৫
ভি হোল্ডার	৮২	২৮	১৯২	৬	৩২·০০
জি সোবার্স	২১৯	৬৯	৪০২	১১	৩৬·৫৪
ডি হলফোর্ড	৫৫	৮	১৩১	৩	৪৩·৬৬
এ ব্যারেট	৮০·৪	১৯	১৯৪	৪	৪৮·৫০
ইউ ডো	৮৮	১৪	২৬৪	৫	৪৮·৮০
এম ফস্টার	৩৯	১৪	৫২	১	৫২·০০
জি শিলিংফোর্ড	৭৫	৯	২১৭	৪	৫৪·২৫
ইনসান আলী	৩৮	৫	১২৫	১	১২৫·০০

কানহাই ১—০—১—০; কারু ১৪—৪—২০—০; লয়েড ১২—৪—৪৬—০; গিবস ৪০—১৭—৬৫—০; ডেভিস ৩১—৫—৬৯—০; ফ্রেডারিক্স ৫—০—১০—০।

প্রতিভার চমক

এই সঙ্গে প্রকাশিত টেস্ট অ্যাভারেজ থেকে খেলোয়াড়দের গুণাগুণ আন্দাজ করা যাবে। তবু সারদেশাই ও সুনীল গাভাসকার, যাঁদের প্রতিভার চমকে সারা ক্রিকেট বিশ্ব আজ আলোড়িত তাঁদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হবে।

আমরা জানি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে

অভিজ্ঞতা আছে বলেই দিলীপ সারদেশাইকে দলভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২র ওই সফরে ভারতকে ৫টি টেস্টেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সারদেশাইও দিয়েছিলেন ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয়। ৩টি টেস্টে তাঁর রান ছিল—১৬ ঃ ২; ৩১ ঃ ৬০ এবং ০ ঃ ০; আর এবার সারদেশাইয়ের রান? ২১২ ঃ ×; ১১২ ঃ ৩; ৪৫ ঃ ×; ১৫০ ঃ ২৪; ও ৭৫ ঃ ২১—মোট ৬৪২। বিদেশের মাটিতে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ওরই প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। এবং প্রথম টেস্টে ৭৫ রানে ভারতের ৫টি উইকেট পড়ে যাবার পর সারদেশাইয়ের ডাবল সেঞ্চুরি সফরের টার্নিং পয়েন্ট।

আর সুনীল গাভাসকার? জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশী রান (৭৭৪) করায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। ৪টি সেঞ্চুরি। তার মধ্যে উপর্যুপরি ইনিংসে শেষের ৩টি, শেষটি আবার ডাবল। বিজয় হাজারের পর টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করায় ভারতের দ্বিতীয় পুরুষ। কিন্তু এক সিরিজে সবচেয়ে বেশী রান সংগ্রহে সবচেয়ে বেশী সেঞ্চুরি করায় এবং টেস্ট আভারেজে ভারতের প্রথম। আভারেজে বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের পরই আজ ওর স্থান।

—একলব্য

হকি খেলার আইনকানুন

বুলি করার সময় প্রথমে মাটিতে স্টিকের মাথা ঠেকাতে হবে, পরে বলের ঠিক উপরে ঠেকাতে হবে দুই স্টিকের মুখ। আবার মাটিতে, আবার বলের উপরে। এইভাবে তিনবার মাঠ ও স্টিক ঠেকাঠেকির পর একজন খেলোয়ার মধ্যে বল ঠেলে দেবে

ফুটবল খেলার আইনে খেলা আরম্ভের সময় যতক্ষণ মধ্য মাঠ থেকে যথাযথভাবে কিক-অফ না হয়, অর্থাৎ বল তার পরিধি অতিক্রম না করে ততক্ষণ খেলা চালু হয়েছে বলে ধরা হয় না। বল তার পরিধি অতিক্রম না করা পর্যন্ত কোনও খেলোয়াড় আইন লঙ্ঘন করলে তার জন্য কোনও বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া যায় না। কিন্তু হকি খেলা আরম্ভের সময় মধ্যমাঠ থেকে যথাযথভাবে যদি বুলি করা না হয় বুলির সময় একজন বার বার আইন ভঙ্গ করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে ফ্রি-হিটের নির্দেশ দিয়ে খেলা আরম্ভ করা যায়। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভের সময়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে দুজন বুলি করছেন তাঁদের কেউ যদি বারবার আইন ভঙ্গ করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে ফ্রি-হিট দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

॥ ১০ **নম্বর আইন** ॥ সাধারণ নিয়মকানুন

(এ) বল খেলার জন্য হকি স্টিকের শুধুমাত্র চ্যাপ্টা মুখ ব্যবহার করা যাবে। নিজের হকি স্টিক হাতে না নিয়ে কোনও খেলোয়াড় খেলায় অংশ নিতে পারবে না বা খেলায় কোনরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না।

(বি) যখন স্টিক দিয়ে, বল মারা হবে তখন স্টিকের কোন অংশ কাঁধের উপরে উঠবে না। বল মারতে যাবার শুরুতেই হোক কিংবা বল মারা হয়ে যাবার পরেই হোক, কোন সময়ই স্টিক কাঁধের উপর উঠতে পারবে না। কাঁধের উপরের কোন বলও স্টিকের কোন অংশ দিয়ে থামানো বা মারা যাবে না। বলের দিকে ধাবিত হবার সময়ও কোনও খেলোয়াড় স্টিকের কোনও অংশ কাঁধের উপর তুলতে পারবেন না।

(সি) বল আন্ডারকাট (তলায় মেরে উপরে তোলা) করা চলবে না। কিংবা এমনভাবে বল মারা চলবে না যে মারে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে অথবা খেলায় বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকবে। স্কুপ স্ট্রোক (বলের পেছনে আলতোভাবে স্টিক স্থাপন করে বল উপরের দিকে চালিত করা) আইনসম্মত। তবে স্কুপ স্ট্রোক করার সময়ও যাতে বিপদের আশঙ্কা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্কুপ করতে হবে। ১৩নং আইন অনুযায়ী ফ্রি-হিটের সময় স্কুপ করা যাবে না। বল মাটির উপরে অর্থাৎ শূন্যে থাকা সময়ে হিট করা যায়। তবে এই হিটের সময় বি ধারা পালন করতে হবে। অর্থাৎ স্টিক কাঁধের উপরে উঠবে না এবং কাঁধের উপরের কোন বল হিট করা যাবে না।

(ডি) হাত দিয়ে ছাড়া শরীরের কোন অংশ দিয়ে ইচ্ছে করে বল মাঠের উপরে বা শূন্যে থাকা সময়ে থামানো যাবে না। যদি হাত দিয়ে বল ধরা হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে বল খেলার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার জন্য স্টিকের সাহায্যকারী হিসাবে পায়ের পাতা বা পায়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অর্থাৎ স্টিকের পেছনে পা রেখে সেই স্টিক দিয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করা বে-আইনী।

(ই) হাত দিয়ে বল ধরে তোলা যাবে না, ছোঁড়া যাবে না, বহন করা যাবে না, পা দিয়ে বল কিক করা যাবে না। কিংবা স্টিক দিয়ে ছাড়া কোনওভাবে বা কোনও দিকে হাত অথবা পা দিয়ে বল চালিত করা যাবে না।

(এফ) প্রতিপক্ষের স্টিকে আঘাত করা যাবে না, হুক করা যাবে না, প্রতিপক্ষের স্টিক ধরা যাবে না কিংবা কোনওভাবে স্টিকে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না।

(জি) প্রতিপক্ষ বল খেলার সময় বল ও প্রতিপক্ষের মাঝ দিয়ে দৌড় বাধার সৃষ্টি করা যাবে না। কিংবা বাধা সৃষ্টির জন্য বল ও প্রতিপক্ষের মধ্যে দাঁড়ানো বা স্টিক নাড়ানো চলবে না। বাঁদিক থেকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করাও নিষিদ্ধ। তবে আগে বল আয়ত্তে পেয়ে খেলার ফাঁকে পরে যদি কোনও খেলোয়াড় বাঁ দিক দিয়ে প্রতিপক্ষের স্টিক স্পর্শ করে বা প্রতিপক্ষের শরীর স্পর্শ করে তবে পৃথক কথা। প্রতিপক্ষকে কোনওভাবে চার্জ করা, কিক করা, ধাক্কা দেওয়া, ল্যাং মারা, আঘাত করা এবং ধরে রাখা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ।

(এইচ) নিজের সার্কেলের মধ্যে গোল-কিপার শরীরের যে-কোনও অংশ দিয়ে বল থামাতে পারেন কিংবা পা দিয়ে বল কিক করতে পারেন। গোল প্রতিরোধের সময় আম্পায়ারের মতে হিট করা বল যদি গোল কিপারের শরীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তবে গোল-কিপারের কোন দোষ হবে না।

(আই) যদি গোল-কিপারের প্যাডের মধ্যে কিংবা খেলোয়াড ও আম্পায়ারের পরিধেয়র মধ্যে বল আটকে যায় তবে আম্পায়ার খেলা বন্ধ করে যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকে বুলি দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। অবশ্যই ৯-এর আইনের বিধান মেনে নিয়ে।

(জে) যদি কোন আম্পায়ারের গায়ে বল লাগে তবে বল খেলার মধ্যে চালু আছে বলে ধরতে হবে।

(কে) অহেতুক লাঠিবাজি করে খেলা কিংবা বিপজ্জনকভাবে খেলা বে-আইনী। আম্পায়ারের মতে খেলোয়াড়ের যে আচরণ অসৎ আচরণ বলে মনে হবে তা দন্ডনীয় অপরাধ।

—মুকুল

চরিত্র এ-ছবিতে খারাপ নয়। ভোলাকে পুত্রাধিক ভালবাসেন আর একজন বাসিন্দা। তিনি নাজির হোসেন। অর্থাৎ ওই বাড়িতে ভাল-মন্দ দুই জাতের লোকই আছে। মন্দ লোকদের হাতে সরল ও নির্দোষ ভোলার নির্যাতন, ভাল লোকদের কাছে ভোলার মানসিক শান্তি। এই পরিস্থিতিতে পরিচালক এস এস বাজন নাটক সৃষ্টি করেছেন।

ওই বাড়িতে কি সুন্দরী কুমারী মেয়ে নেই? মেহমুদের ছবির নায়ক বলে কি রোমান্টিক গল্প থাকবে না? তা-ও বাদ যায়নি। গৌরীকে (নবাগতা রাধা) ভালবেসে ফেলেছে ভোলা। গৌরীকে সবাই পাগল বলেই জানে, ভোলা জানে পাগলামিটা গৌরীর একটা ভান। (নতুন শিল্পী হলেও রাধার অভিনয় বেশ ভাল।) গৌরীকে অনর্থক দোষ দিয়ে লাভ কী। ছবিতে অনেকের আচরণই অনেক সময় পাগলামি মনে হবে। আসলে সবই প্রমোদ-ব্যবস্থা—কখনও রংতামাশায় কখনও করুণরসে। ওদিক থেকে তথাকথিত আমোদের রসদ ছবিতে যথেষ্ট। তার উপর সংগীত-পরিচালক রাহুল দেববর্মণ কিছু পুরনো ও সদ্য হিট্ গানের সুর নিয়ে একটি প্যারডি দ্বৈতগান সাজিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর

"পুরব ঔর পশ্চিম" (পরিচালনা মনোজকুমার) ছবিতে মনোজকুমার ও সায়রা বানু

বাঁধার কাজটা আরও সার্থক হতে পারত। বহু চরিত্র সমন্বিত এ নাটকের যেটুকু শ্লথ গতি দর্শককে পীড়িত করে তার জন্য নাট্যকার দোষ পাবেন না। প্রস্তুতির কাজটি আরও ভালভাবে হলে, শিল্পীরা নিজেদের আরও কিছুটা তৈরি করে মঞ্চে নামলে ভাল ফল পাওয়া যেত।

এ নাটকের নির্দেশকের (সন্তোষ সেন) আরও কিছুটা সজাগ থাকারও দরকার ছিল। টিমওয়ার্ক তৈরী করতে তিনি পারেননি। এত শিল্পীর যেখানে আনাগোনা সেখানে মঞ্চসজ্জারও কিছু ওলটপালট করা দরকার। তৎকালীন বেশভূষা ও আচার-আচরণ সম্পর্কেও নির্দেশক ততটা মনযোগী ছিলেন না। তবে শিল্পীদের চরিত্রবন্টন উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। দর্শনে তাঁরা প্রত্যেকেই চরিত্র উপযোগী। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ক্ষেত্রে মনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, হর্ষ চট্টোপাধ্যায়, হীতেন চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্ত চক্রবর্তী, মুকুল সরকার, গোবিন্দ নন্দী, দীপ্তি ভট্টাচার্য ও পুতুল চক্রবর্তী দর্শকদের প্রশংসা পাবেন। শিশির গাঙ্গোপাধ্যায় ও যূথিকা ভট্টাচার্য—এই দুই শিল্পী নিখুঁত অভিনয় করেছেন। এঁদের দুজনের নাম তাই আলাদা করে উল্লেখ করা হল। অন্যান্য চরিত্রগুলি মোটামুটিভাবে কাজ চালানো গোছের। সঙ্গীতের ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। বৈরাগীর গান দুটি স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া চলত।

নতুন নাটক

দুই চরিত্রের নাটক

সমকালীন পটভূমিতে রচিত মাত্র দুটি চরিত্রের নাটক ধনঞ্জয় বৈরাগীর "পরাজিত নায়ক" থিয়েটার সেন্টারে প্রতি রবিবার অভিনীত হচ্ছে। নাটকের উদ্বোধন বাংলা নববর্ষে। তরুণ রায় নাট্যপরিচালনার ভার নিয়েছেন। মঞ্চ পরিকল্পনায় রয়েছেন রঘুনাথ গোস্বামী। নাটকের দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়।

রঙমহলে "উত্তরণ"

রঙমহলের নতুন নাটক "উত্তরণ"। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনীর ভিত্তিতে নাটকটি রচনা করেছেন বীরু মুখোপাধ্যায়। ২৯ এপ্রিল "উত্তরণ" মঞ্চস্থ হয়েছে। সরযূ দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, সর্বেন্দু, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দে, রত্না ঘোষাল, কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নাটকের প্রধান চরিত্রের শিল্পী।

বোম্বাই বিচিত্রা

চিত্র জগতের বক্স অফিসের বড় বড় অফিসাররা আজকাল আর বড় ছবি করার পরামর্শ দিচ্ছেন না। গত কয়েক বছরের বক্স অফিসের হিসেব খতিয়ে দেখা গেল যে 'হিট' ফরমুলার নকশা কাটা জালে সাধারণ দর্শক তেমন ভাবে ধরা পড়ছেন না। 'ম্যাগনাম অপাস', 'ম্যামথ', 'ওয়ান্ডার কলোসাস', 'এনটারটেনমেন্ট এক্সট্রাভাগাঞ্জা' ইত্যাদি খেতাবে এবং জাঁকজমকের জৌলুসে দর্শকের চোখ ধাঁধানো যাচ্ছে না, মন ভরানো যাচ্ছে না! তাই আবার বক্স অফিসের বড় কর্তারা গল্প খুঁজতে শুরু করেছেন, ইকনমির দিকে নজর দিচ্ছেন। কিছু দিন আগে অবধি একজন প্রাজ্ঞ প্রযোজক একটি সিনেমাস্কোপ, রঙীন ছবি করার তাল করছিলেন, গত সপ্তাহে তিনি সিনেমাস্কোপ করার প্ল্যানটি ত্যাগ করেছেন। আলোচ্য ছবির নির্ধারিত নায়কের বাড়িতে সেদিন সকালে উক্ত প্রযোজক সদলবলে উপস্থিত হয়ে নায়ককে জানালেন যে 'ছবিটি আগামী মাসেই আরম্ভ হবে কিন্তু, সিনেমাস্কোপ হবে না!' এ সংবাদ শুনে নিরাশ-নায়ক প্রশ্ন করলেন, 'কেন?' উত্তরে প্রযোজক বললেন, 'আমার হৃদ্যন্ত্র সিনেমাস্কোপের ধকল সইতে পারবে না, রাহু শনি এখন আমাকে ওভার অ্যামবিশাস

প্রামাণিক চিত্র 'দুর্বার গতি পদ্মা' : বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার বেশে অভিনেতা বিশ্বজিৎ। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ট্রায়ো ফিল্মসের এই তথ্য চিত্রটি তৈরী হচ্ছে

হতে বাধা দিচ্ছে।' প্রযোজকের কথা সযত্নে শুনলেন নায়ক তারপর বললেন, "দ্যাট রিমাইণ্ডস মী, আপনার হরোস্কোপটা যদি সঙ্গে এনে থাকেন তা হলে রেখে যান, নইলে পরে পাঠিয়ে দেবেন, আমার গণৎকারকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নেব, আমারও আজকাল শনির দশা চলছে, যার তার সঙ্গে ছবি করা এখন আমারও ঠিক নয়।' একথা শুনে প্রযোজক যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু মনের অসন্তোষ মনেই রেখে মুখে বললেন, 'হ্যাঁ তাতো ঠিকই, যার তার সঙ্গে কাজ করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নয়,—অবশ্য আমাদের কথা আলাদা—আমাদের ব্যানার অনেক পুরোনো এবং আমাদের ব্যানারের একটা গুডউইলও আছে—' নায়ক মাঝ পথে থামিয়ে দিলেন প্রযোজককে, 'ওসব গুড-উইল-টুডউইলের কোনো মূল্য নেই আজকাল দর্শকদের হরোস্কোপে আজকাল বৃহস্পতি তুঙ্গে—" এই বলে নায়ক বাইরে চলে গেলেন। নায়ক বিহীন বসবার ঘরে উচ্ছিষ্টের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলাম আমরা। এবার পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইলাম। কেন ঠিক বোঝা গেল না ... প্রথম সৌজন্য ভঙ্গ করবে ... ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ... এমন সময় নায়কের সেক্রেটারী এলেন। তাকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ পেলেন আলোচ্য প্রযোজক। খপ করে তাঁকে এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হিরোর হরোস্কোপ বিচার করে কোন্ পণ্ডিত?" প্রযোজকের এই আচমকা প্রশ্নে প্রায় হকচকিয়ে গেলেন নায়কের সেক্রেটারী। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে, ব্যবসায়ী গাম্ভীর্য পুরো বজায় রেখে বললেন, "ও ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে—হরোস্কোপের জগতে আমার কোনো স্কোপ নেই।" উত্তর শুনে প্রযোজক পথে বসার মত আবার এসে বসলেন গদী আঁটা আরাম কেদারায়। দু-তিনবার ঘামহীন তৈলাক্ত মুখ মুছলেন ... রুমালে। হিরোর সেক্রেটারী একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর রামভক্ত হনুমানের মত হিরো নির্ধারিত খালি চেয়ারের পদপ্রান্তে বসে, স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বললেন, "শুনলাম আপনার ছবিটা নাকি আর সিনেমাস্কোপ হচ্ছে না!" প্রযোজক প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "সেই জন্যেই তো হরোস্কোপের ল্যাটা!" হিরোর সেক্রেটারী চতুর লোক, সে হা করলেই 'হাওড়া' বুঝে ফেলে, সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছে সেটা আঁচ করতে তার খুব অসুবিধে হলো না। জ্বলন্ত সিগারেটে একটা মোক্ষম টান দিয়ে সে বললে, 'আপনি হিরোকে সাইন করিয়েছিলেন প্রায় দু' বছর আগে, তখন আপনার নাম হিরোর নামের চেয়ে নামকরা ছিল, তার ওপর ছিল সিনেমাস্কোপের ক্রেজ, বর্তমানে হিরোর নাম আপনার নামের চেয়ে বেশী মূল্যবান, তার ওপর আপনি মাইনাস সিনেমাস্কোপ, সুতরাং বুঝতেই পারছেন—' হিরো নিজের মুখে যদি একথাগুলো বলতেন তাহলে হয়ত অন্য কথা ছিল, কিন্তু তার সেক্রেটারীর কাছ থেকে এ ধরনের বেয়াদপি সহ্য করা অসম্ভব মনে হল প্রযোজকের। তিনি বললেন, এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হিরোর নাম করেই বললেন, "এ গরম বেশী দিন থাকবে না, একথা মনে রেখো!" প্রযোজকের উত্তেজিত উক্তিতে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে সেক্রেটারী জবাব দিল, "লাখ কথার এক কথা বলেছেন স্যার, ... আমাদের গরমের দিন, তাই আপনি ... কাছে এসেছেন আমাদের বসবার ঘরে ... নেই। এর উল্টো যেদিন হবে, সেদিন আপনার জায়গায় আমরা যাব। ... লাইন স্যার, আপনি বিজ্ঞ লোক আপনাকে আর কি বলব, সবই তো জানেন। এ লাইনে কপাল থাকলেই দেমাক—শুধু দেমাক হলেই দমবন্ধ!" দৈব বাণী শোনার মত সবাই সেক্রেটারীর সেক্রেড বাণী শ্রবণ করছিলাম আমরা এমন সময় হিরো প্রবেশ করলেন, সুসজ্জিত, সবাই উঠে দাঁড়াল, হিরো মৃদু হেসে রওনা হলেন স্টুডিওর পথে। বাকিরা বসে রইলো, যেন এটা তাদেরই বাড়ি।

সরল শর্মা

'জয় বাংলা' সংগীতানুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) দফতরের টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টরদের উদ্যোগে গত ১৪ এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যের জন্য একটি বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। এই উপলক্ষে আনুমানিক পনের হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

গানের অনুষ্ঠানে যোগ দেন সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখার্জি, নির্মলেন্দু চৌধুরী, শৈলেন মুখার্জি, বাসবী নন্দী, অমল মুখার্জি, সাগর সেন, পিণ্টু ভট্টাচার্য এবং রুমা গুহঠাকুরতা ও ক্যালকাটা ইউথ কয়্যারের কয়েকজন শিল্পী। আবৃত্তিতে ছিলেন কাজী সব্যসাচী। ভি বালসারা দেশাত্মবোধক যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন।

এমন কখনও কখনও হয়েছে, প্রচণ্ড মতানৈক্য এবং রেষারেষি থাকা সত্ত্বেও যাত্রাদলের মালিকরা শেষ পর্যন্ত এক তাঁবুর নীচে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন। ১৯৫৯ থেকে ৬১-র মধ্যে তা ছিল আরও প্রবল। তখন যাত্রাদলের অবস্থা খারাপ, ব্যবসায়েও ভাঁটার টান ছিল জোর। তবু বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর ছায়ায় জোড়াবাগানের রাজবাড়ির যাত্রা উৎসব উপলক্ষে সব বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে সকলে এক হলেন। মনে আছে সে দিনের সভায় সময় মালিক

পরিচালকরা কেউ গদীতে ছিলেন না।

না, সেই মতৈক্যই শেষ নয়। ১৯৬৪ সালে চীন যখন ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন হঠাৎ একের পর এক যাত্রাদলকে বসে থাকতে হয়। মালিকরা জরুরী অবস্থার অজুহাতে বায়না বাতিল করতে লাগলেন—কোন দল আপার আসামে তখন, কোন দল লোয়ার আসামে এবং অনেক দলই উত্তরবঙ্গে ঠায় বসা। এ সময়েও শৈলেন মোহান্ত আর শম্ভু ঘোষ এলেন। দুঃখের দিনে সেই বোধ হয় সকলের একত্রে বসা প্রথম ও শেষ। তারপর বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং যাত্রা মঙ্গল সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম দেওয়া হল। সেখানে মোহান্ত, ঘোষ দুজনেই ছিলেন। তবু ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল না। মনে আছে, কে যেন প্রস্তাব দিয়েছিলেন (শিব ভট্টাচার্য কী?) মঙ্গল সমিতিতে শিল্পীদেরও সদস্য করা হোক। উত্তরে একদল মালিক বললেন, অসম্ভব। কারণ মালিকে শিল্পীতে সম্পর্কটা হল খাদ্য খাদকের। মঙ্গল সমিতি তারপর সামান্য কয়েক দিনই চলেছিল। পরে শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে যাত্রা শিল্পী সমিতি গঠিত হল, কিন্তু সেখানেও মতৈক্য দেখা যায় নি।

ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সকলের সঙ্গে কথা বলেছি বহুবার। নট্ট কোম্পানির মাখনবাবু, নবরঞ্জনের জীবন দাস, অম্বিকার অমিয় বসু, ভারতী অপেরার কালীবাবু, প্রভাসের তিনকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, নিউ আর্যর গোপাল চট্টোপাধ্যায় এমন কি নিউ গণেশ অপেরার গোষ্ঠবাবু পর্যন্ত সায় দিয়েছেন বারবার। কিন্তু শেষাবধি হয় নি। নইলে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য পা বাড়িয়েই আছেন, সত্যম্বরের শৈলেনবাবু, নবরঞ্জনের শম্ভু ঘোষ, তরুণ অপেরার শান্তিগোপাল, নাট্যভারতীর কিষাণ দাশগুপ্ত, মাধবী নাট্য কোম্পানির জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরী এবং নিউ রয়েলের নারায়ণ ভট্টাচার্যও, কিন্তু কে জানে কেন, শেষ পর্যন্ত মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এতকাল পরে চিৎপুরে আবার এক মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য ও সহায়তার উদ্দেশ্যে এর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ দলই সর্ববিধ সাহায্য করবেন বলে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এগিয়ে এসেছেন শৈলেন মোহান্ত, শম্ভু ঘোষ, শান্তিগোপাল, শিব ভট্টাচার্য, কিষাণ দাশগুপ্ত, জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরী এবং অনেকে। এর মধ্যে দুটি আলোচনা বৈঠকও সমাপ্ত।

কিন্তু এই সহায়তা কীভাবে করা যায়? নগদ অর্থে? প্রস্তাবে দু' একটি দল হয়তো রাজি হতেন, কিন্তু এ মরশুমে বেশিরভাগ দলই চরম ক্ষতিগ্রস্থ। তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য দেওয়াই কঠিন। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যে, চিৎপুরে যাত্রাপাড়া থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি নতুন জীপগাড়ি। এই সাধু ও মহৎ প্রস্তাবে সবাই আনন্দিত।

শেষাবধি স্থির হয়েছে, কলকাতা শহরে একটি যাত্রা-উৎসবের মাধ্যমে এই টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হবে। যাত্রাশিল্পীদের বেশিরভাগ অংশই বলেছেন, এই উৎসবে অভিনয়ের জন্যে তাঁরা পারিশ্রমিক বা বেতনাংশ নেবেন না। উৎসবের যাবতীয় আদায়ীকৃত অর্থ এই খাতে জমা হবে। নবগঠিত কমিটি আশা করছেন পঃ বঙ্গ সরকার এই উৎসবকে প্রমোদকর থেকেও রেহাই দিয়ে এ-কাজে সহায়তা করবেন।

—সূত্রধার

বোম্বাই বিবেকানন্দ ক্লাবের "আবোল-তাবোল" পরিবেশন

গত বসন্তপূর্ণিমার সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের বিবেকানন্দ ক্লাবের সঙ্গীত বিভাগ বান্দ্রার

বোম্বাইয়ে "আমি এ চাইনি" নাটকের একটি দৃশ্যে

রং মন্দির মুক্ত অঙ্গনে সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল" পরিবেশন করলেন। পরিবেশনার গুণে কল্পনার জগৎ রঙেরঙে, নৃত্যে-গীতে, আলোতে, রূপসজ্জাতে ঘণ্টা খানেকের জন্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। পাঁচ বছর থেকে বারো বছরের শিশুদের দিয়ে "আবোল তাবোলে"র বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যারা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল তারা হল সঞ্জয় মিত্র, বাবুয়া সরকার, সুরজিৎ পাল রায়, সৌমিত্র দত্ত, আদিত্য ভট্টাচার্য, কৌশিক সাহা, জয়দীপ মিত্র, সুমিত আচার্য, অনুশ্রী আচার্য, মৌসুমী ব্যানার্জী, রাখী সাহা, সুমিতা দেব, নীলাঞ্জনা দত্ত, মধুমিতা কর্ণগুপ্ত, রীতা সরকার, রীতা রায়চৌধুরী, শম্পা চ্যাটার্জী, স্বাতী চ্যাটার্জী, শিপ্রা চ্যাটার্জী, কাকলী বিশ্ব, মজুমদার, পার্থসারথী মজুমদার, দেবাশীষ মুখার্জী, ঋতুপর্ণা দত্ত, সুব্রতা দেব, নন্দিনী চৌধুরী ও ঋতেশ হালদার।

শ্রীঅশোক ঘোষাল স্বপনবুড়োর রূপসজ্জায় বয়স্ক হয়েও শিশুদের আজগুবী চোখের বিশেষ সঙ্গী হয়েছিলেন। ছোট্ট নূপুরের ভূমিকায় মধুশ্রী পাল মিষ্টি অভিনয় করেছে। সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী আচার্য, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, শংকর সেনগুপ্ত, বিশ্বপতি মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মুখোপাধ্যায়, পূর্ণিমা নাগ চৌধুরী ও ভাস্কর দত্তগুপ্ত। সুরকার অরুণ বসুর দেওয়া সুর, শিল্পী মিলন মুখোপাধ্যায়ের রং ও রেখার বিচিত্র পরিকল্পনা ও তরুণ ঘোষের আলোর ব্যবস্থা, এসবের মাধ্যমে "আবোল তাবোলে"র জগৎ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ইন্দ্রাণী আচার্য, সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, দীপিকা চৌধুরী ও বিশ্বপতি মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থনায় ছিলেন দিব্যেন্দু গুহ। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাবের সভ্যরা এই স্টেজেই "আমি এ চাইনি" ও "শিকার" মঞ্চস্থ করেন।

মায়া দে সম্মানিত

খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী শ্রীমায়া দে এ বছর ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই এর বিবেকানন্দ ক্লাব গত বসন্ত পূর্ণিমার দিন বান্দ্রার রঙ্গমন্দির মুক্তাঙ্গনে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। ক্লাবের সভাপতি শ্রীনিশীথ চক্রবর্তী ক্লাবের তরফ থেকে একটি মানপত্র প্রদান করেন।

রবিরশ্মির 'বিশ্বজন মোহিছে'

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে "রবিরশ্মির" প্রথম অনুষ্ঠান "বিশ্বজন মোহিছে" ৩রা মে সন্ধ্যা সাতটায় রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় আছেন সাগর সেন। নৃত্য পরিকল্পনায় রয়েছেন মঞ্জুলিকা দাস ও রামগোপাল। গ্রন্থনা—ভাস্কর বসু, রবিরশ্মির নবীন শিল্পীরা এতে যোগ দেবেন।

পদাবলীর "অর্ঘ্য"

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে আগামী ২ মে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রবীন্দ্র সদনে পদাবলী নিবেদন করছেন "অর্ঘ্য"। এতে রবীন্দ্র কাহিনীর মূকাভিনয় করবেন যোগেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ও সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের কবিদের কবিতা আবৃত্তি করবেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'দিবস রজনী' নামে রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যের দ্বৈত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুনীব দত্ত।

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

খারাপ লোকগুলো কীলাউয়িির দিকে গেছে। অরণ্যদেব সেখানে একা। তাঁর জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।
অরণ্যদেবের জন্যে ভয়?

কিন্তু ওদের সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে। অরণ্যদেবকে আক্রমণ করতে পারে।
অরণ্যদেবকে আক্রমণ?

কীলাউয়িির সোনাবেলায়---প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে-----
এবারে কী করবে?
কিচ্ছু না।
৭/৬

এইভাবে আমাদের মারতে চাও?
নয় কেন? তোমরাও তো খুনোখুনি করতে চেয়েছিলে। লোকে এখানে বিয়ে করতে আসে। তোমরা এসেছিলে লুটপাট আর খুন করতে।

জল!
জল!
জল পাবে কোথায়? সোনা চাও তো সোনা দিতে পারি।

জল!
জল!
সোনা চাই না! শুধু জল চাই!
জল!

অরণ্যদেবের যদি কিছু হয়, তা হলে নিজেদের কখনো ক্ষমা করতে পারব না।
প্রায় পৌঁছে গেছি।

'লোভ নিয়ে যে কীলাউয়িতে যায়, সেখানে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়।' অরণ্যের প্রবাদ

কলকাতার পিনডির (পাকিস্তানের) নতুন ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রীমেহেদি মাসুদের নাজেহাল অবস্থা এই সপ্তাহের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। কিছুদিন আগে কলকাতার পাক ডেপুটি হাই কমিশনার বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করে সারকাস অ্যাভেনিউতে অবস্থিত পাক দূতাবাস নিজেদের দখলেই রাখেন। ২১ এপ্রিল বুধবার পাকিস্তানের নব নিযুক্ত ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রীমেহেদি মাসুদ দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। কিন্তু তাঁর বসবাসের ব্যবস্থাই একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিমান বন্দর থেকেই ফোনে কলকাতার অনেক নাম করা হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে শহরের দক্ষিণাঞ্চলে একটি হোটেলে ঠাঁই করে নেন। শ্রীমাসুদ পাক দূতাবাস তাঁর দখলে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান। কিন্তু কলকাতার পাক দূতাবাস একটি ভাড়াটে বাড়িতে অবস্থিত বলে এ সম্পর্কে পঃ বঃ তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। কারণ ইহা আইনগত ব্যাপার। শ্রীমাসুদ যে হোটেলে পুলিস পাহারায় অবস্থান করছিলেন সেখানে পশ্চিম-বঙ্গের জনসাধারণের বিক্ষোভের ফলে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বিক্ষোভকারীরা হোটেলেরও কিছু ক্ষতিসাধন করে। ২২ এপ্রিল বুধবার শ্রীমাসুদ মহাকরণে পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্য সচিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি প্রচন্ড বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। এদিন তিনি হোটেল ছেড়ে ধর্মতলা স্ট্রীটে ভিন্ন রাজ্যের একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকেন। এই খবর পেয়ে সেখানেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। তিনি যেখানে যান সেখানেই বিক্ষোভ। তাঁর ২৬ এপ্রিল সোমবারের আগে কলকাতা ছাড়বার সম্ভাবনা নেই। শোনা যাচ্ছে পাকিস্তান এবং ভারত সোমবারের মধ্যে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনের অফিস বন্ধ করে দিচ্ছেন। শ্রীমাসুদ বর্তমানে দমদম বিমানঘাটিতে রয়েছেন।

দেশী সংবাদ

১৯ এপ্রিল—প্রবীণ খ্যাতনামা কবি শ্রীনিরেন্দ্র দেব দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নবনীতা সেনও কবি। শ্রীদেবকে এবার শিশির-কুমার পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই পুরস্কার তিনি নিজের হাতে নিতে পারলেন না।

বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটির সম্পাদক শ্রীসুধীনকুমার আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, গত ৭ এপ্রিল তারিখে তাঁরা বাংলা দেশের সাহায্যের জন্য পথে অর্থ সংগ্রহ করার অনুমতি চেয়ে পুলিস কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিস কমিশনার কোন কারণ না দেখিয়ে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছেন।

২০ এপ্রিল—ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনের সদস্যদের এবং তাঁদের পরিবার-বর্গকে আনবার জন্য কাঠমান্ডু থেকে একটি বিশেষ বিমান আগামীকাল ঢাকায় যেতে পারে। বিমানটির যাত্রা পাকিস্তান অনুমোদন করেছে কিনা তা সরকারীভাবে কিছু জানা যায়নি।

কলকাতার পূর্বতন পাক ডেপুটি হাইকমিশন ভবনটির দখল নিয়ে যে ঝগড়া শুরু হয়েছে তা পাকিস্তানেরই ঘরোয়া ব্যাপার। এবং পাকিস্তানই তার সমাধান করবে। ভারত নয়। পাকিস্তানকে একথাও জানানো হয়েছে যে, এই ঝগড়ার ফয়সালার জন্য ভারত জোর খাটাবে না। কারণ আইনে বাধে।

২১ এপ্রিল—একদিনে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত স্মরণার্থীর সংখ্যা ষাট হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলবার এদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৩ হাজারের মত। আজ তা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৭৩ হাজারের উপর। এদের মধ্যে ৭৫ হাজারের বেশী আশ্রয়প্রার্থীকে ছয়টি সীমান্ত জেলার ৩০টির মত গ্রহণ কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রী ... কে খাদিলকর নয়াদিল্লীতে বলেন, মানবতার দিক

থেকে বিবেচনা করে ভারত সরকার পূর্ব বাংলা থেকে আগত প্রায় তিন লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর ব্যয়ভার বহনে সম্মত হয়েছেন। বাংলায় অবস্থার উন্নতি হলে তাঁরা আবার দেশে ফিরে যাবেন।

২২ এপ্রিল—ভারতীয় ক্রান্তি দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, সরকারের উচিত কাশ্মীরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। পাকিস্তান কাশ্মীরে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠাতে শুরু করেছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ আবদুল্লা নিশ্চুপ। এ থেকে মনে হয় কাশ্মীরে পাকিস্তানের কার্যকলাপের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার যোগ আছে।

২৩ এপ্রিল—আজ কলকাতার পৌর অধিবেশনে নতুন বছরের জন্য মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র পদে সি পি এম প্রার্থীদ্বয়কে পরাজিত করে সি পি এম বিরোধী জোটের প্রার্থী শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত (ফঃ বঃ) মেয়র এবং পান্নালাল দাস (পি এস পি) ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।

সম্প্রতি রচিত 'এখনই' উপন্যাসটির জন্য এবারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন শ্রীরমাপদ চৌধুরী। ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'এখনই' বর্তমানে চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হচ্ছে। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক শ্রীরমাপদ চৌধুরী ১৯৬৩ সালে তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন।

২৪ এপ্রিল—রাজ্যগুলিকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার জন্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি আজ সংবিধান বদলানোর দাবি করেন। সংবিধান না পালটালে এক সময় পরিণামে গিয়ে বিচ্ছিন্নতাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, সংবিধানে পরিবর্তন হলে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে একটি সমঝোতার সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের যে-সব অধ্যাপক পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তাঁদের অন্ততঃ ছ' মাসের জন্য 'পরিদর্শক শিক্ষক' হিসাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সরকারী পুনর্বাসন দপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হবে।

২৫ এপ্রিল—ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশন অফিস বন্ধ করে দিতে হলে ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে—এই মর্মে পাকিস্তানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলে ভারত সরকার আজ দাবি জানিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৯ এপ্রিল—মহাকাশে একটি স্থায়ী যন্ত্রাগার প্রতিষ্ঠা এবং মহাকাশে যাত্রায়াতের জন্য একটি বন্দর স্থাপনকল্পে সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ কয়েকটি ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে এবং প্রথম উদ্যোগে পৃথিবীর কক্ষ পথে একটি যন্ত্রাগার পাঠিয়েছে।

২০—এপ্রিল—সিংহল সরকার আজ বলেন যে, সিংহলের কিছু অংশ এখনও বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে এবং বিদ্রোহীরা স্থানীয় লোকেদের উপর আক্রমণ জোরদার করেছেন। যেসব জায়গা সন্ত্রাসবাদীদের দখলে আছে তাঁরা এখন সেই সব অঞ্চলে দলবদ্ধ হচ্ছেন।

২১ এপ্রিল—ক্রাগোশি ... শাসনাদেশ চালাচ্ছে পৈশাচিক তান্ডব, পশ্চিম পাকিস্তানেও শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যাপক ধরপাকড়। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার লোককে তারা জেলে পুরেছে। এদের মধ্যে আছেন বহু শিক্ষিত জননেতা, ছাত্র নেতা ও শ্রমিক নেতা।

২২ এপ্রিল—পাকিস্তানের পিকিং দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও অন্য কয়েকজন অফিসার বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন বলে বাংলাদেশ সরকারের কাছে খবর এসেছে। কিন্তু চীন সরকার তাদের আটক করে রেখেছেন বলে ওই খবরে জানান হয়েছে।

২৩ এপ্রিল—মহাকাশ অভিযানে সোভিয়েটের এক বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ পদক্ষেপের প্রথম পর্যায়ে তিনজন সোভিয়েট মহাকাশচারী পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছেন।

২৪ এপ্রিল—৪১ ঘন্টার উপর মহড়া করে মানুষ সমেত সোভিয়েট মহাকাশযান সয়ুজ-১০ স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ স্টেশন স্যালুটের সঙ্গে যোগে যায়। মহাকাশে এই মিলন খানিকক্ষণ স্থায়ী হয়।

২৫ এপ্রিল—আজ যশোর রণাঙ্গনে মুক্তি ফৌজের মূল ঘাটি দখল করতে এসে হানাদার-দের গোলন্দাজ বাহিনী দারুণ ঘায়েল হয়। মুক্তি সেনাদের প্রচন্ড পালটা আঘাতে তারা আধুনিক সমর সরঞ্জাম ফেলে পালায়। কিছু চীনা অফিসার পাক বাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছিল। তারাও যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দেশ হয়। বাংলা বাহিনী দখলদারদের ঘাটিতে গিয়ে চীনের প্রচুর উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র পায়।